বঙ্গশ্রী
Rajanikanta Das Collection
TAILO
&
OUTFITT
GAUZ
&
BANDAG
ভীম নাগের সন্দেশ
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
ও
সর্ব্বোৎকৃষ্ট
ভীম নাগ—ভবানীপুর
বিশুদ্ধ, স্বাদু ও

কেশের
যত্ন লইতে
ভুলবেন না
বাথগেটের
সুগন্ধি ক্যাষ্টর অয়েল
কেশ-প্রসাধনে শ্রেষ্ঠ।
ইহা ব্যবহারে—
BEWARE OF IMITATION
CASTOR OIL
Bathgate & Co.
CHEMISTS
CALCUTTA

আশ্চর্য্য ঔষধ

গাছ-গাছড়া জাত ঔষধের বিস্ময়কর ক্ষমতা।

(নিষ্ফল প্রমাণ হইলে ১০০৲ টাকা খেসারত দিব)।

'পাইলস কিওর'

যন্ত্রণাদায়ক বা দীর্ঘকালের পুরাণো সর্ব্বপ্রকার অর্শ—অন্তর্ব্বলি, বহির্ব্বলি, শোণিতস্রাবী ও বলিহীন অর্শ সত্বর আরোগ্য করে। সেবনের ঔষধ মূল্য ২৲ টাকা, মলম ১৲ টাকা।

"গনোরিয়া কিওর"

পুরানো বা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক গনোরিয়া সারাইয়া হতাশ ব্যক্তিকে নবজীবন প্রদান করে। বয়স বা রোগের অবস্থা যেরূপই হউক না কেন, সর্ব্ব অবস্থায়ই কাজ দিবে। একদিনে যন্ত্রণা কমায়, পুঁজ বন্ধ করে, ঘা সারায়, প্রস্রাব সরল করে এবং প্রস্রাব সংক্রান্ত সমস্ত উপদ্রবের উপশম করে। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

"ডেফনে

সর্ব্বপ্রকার কর্ণরোগ, শ্রবণশক্তি হানি ও ভোঁ ভোঁ শব্দের চমৎকার ঔষধ। পুঁজ পড়া ও কাণের বেদনা প্রভৃতি সারায়। শ্রবণশক্তি বাড়ায় ও শ্রবণশক্তি হানি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে। মূল্য ২৲।

"পরীক্ষিত গর্ভকারক যোগ" (বন্ধ্যাত্ব দূর করার ঔষধ)

জীবনব্যাপী বন্ধ্যাত্ব দূর করিয়া হতাশ নারীকে সন্তান দেয়। সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ, বিশেষতঃ মৃত-বৎসায় উপকার দেয় এবং সন্তান-সন্ততিকে দীর্ঘজীবি করে। এই ঔষধ ব্যবহারেচ্ছু ব্যক্তিদের রোগের বিস্তৃত বিবরণ পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। মূল্য ২৲ টাকা।

শ্বেতকুষ্ঠ ও ধবল

এই ঔষধ মাত্র কয়েকদিন ব্যবহার করিলে শ্বেতকুষ্ঠ ও ধবল একেবারে আরোগ্য হয়। যাহারা শত শত হাকিম, ডাক্তার, কবিরাজ ও বিজ্ঞাপনদাতার চিকিৎসায় হতাশ হইয়াছেন, তাহারা এই ঔষধ ব্যবহার দ্বারা এই ভয়াবহ রোগের কবলমুক্ত হউন। ১৫ দিনের ঔষধ ২॥০ টাকা

জন্ম নিয়ন্ত্রণ

জন্ম নিয়ন্ত্রণের অব্যর্থ ঔষধ। ঔষধ ব্যবহার বন্ধ করিলে পুনরায় সন্তান হইবে। মাসে ২।৩ বার এই ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে। এক বৎসরের ঔষধের দাম ২৲ টাকা। সমস্ত জীবন সন্তান বন্ধ রাখার আর এক রকমের ঔষধ ২৲ টাকা। স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয়।

স্তম্ভন পিল

সন্ধ্যায় একটী বড়ী সেবনে অফুরন্ত আনন্দ পাইবেন। ইহা হারানো পৌরুষ ফিরাইয়া আনে ও অবিলম্বে ধারণশক্তির সৃষ্টি করে। একবার ব্যবহারে ইহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা কখনো বিস্মৃত হইবেন না। মূল্য ১৬টী বড়ি ১৲ টাক

পাকা চুল

কলপ ব্যবহার করিবেন না, আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় সুগন্ধি তৈল ব্যবহার দ্বারা পাকা চুল কৃষ্ণবর্ণ করুন। ৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত উহা বজায় থাকিবে। আপনার দৃষ্টিশক্তি বাড়িবে এবং মাথা ধরা আরোগ্য হইবে। কয়েক গাছা চুল পাকিয়া থাকিলে ২৲ টাকার শিশি ও বেশী পাকিয়া থাকিলে ৩॥০ টাকার শিশি এবং প্রায় সব চুল পাকিয়া থাকিলে ৫৲ টাকার শিশি ক্রয় করুন। নিষ্ফল হইলে দ্বিগুণ মূল্য ফেরত দিব।

আশ্চর্য্য গাছড়া

কেবলমাত্র চোখে দেখিলেই অবিলম্বে সাংঘাতিক রকমের বৃশ্চিক, বোলতা ও মৌমাছির দংশনজনিত বেদনা সারে। লক্ষ লক্ষ লোক এই ঔষধ ব্যবহারে সুফল পাইয়াছে। শত শত বৎসর রাখিয়া দিলেও ইহার গুণ নষ্ট হয় না।

বাবু ব্রিজনন্দন সহায়, বি-এ, বি-এল, এডভোকেট, পাটনা হাইকোর্ট—আমি "বৃশ্চিক দংশন সারানোর" গাছড়া ব্যবহারে খুব ফল পাইয়াছি। একটা ছোট মূলে শত শত লোক আরোগ্য হয়। এই গাছড়া নির্দ্দোষ এবং অতি প্রয়োজনীয়। জনসাধারণের ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। মূল্য ২॥০ টাকা।

বৈদ্যরাজ অখিল কিশোর রাম

আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ ভিষক-রত্ন

৫৩নং পোঃ অঃ কাটরী সরাই (গয়া)

"তোমার সৌন্দর্য্য-দূত যুগ যুগ ধরি',
এড়াইয়া কালের প্রহরী ;
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্ত্তা নিয়া,
ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"
—তাজমহল

শিশির ষ্টুডিওর

তোলা ছবি

তাজমহলের ন্যায় আপনাকে চিরদিন প্রিয়জনের মুখখানি স্মরণ করাইবে।

৩৪জি, প্রতাপাদিত্য রোড,
(ত্রিকোণ পার্কের পশ্চিম)
কালীঘাট—কলিকাতা।

কি বল্‌ছেন ?

কেন ? আপনি কি কালা নাকি ?

নাক.আবার কি, একেবারেই যে ? বেশ.ত, আপনি আজই শ্যারম্যান "ডেফ্‌টোনো অয়েল" ব্যবহার করুন। ইহা সর্ব্বকারণজনিত বধিরতার অমোঘ মহৌষধ. প্রতি শিশি নেট্ মূল্য ৭॥০ টাকা। অর্শ ও ভগন্দর চিরতরে নির্ম্মূল করুন। "পাইলস্ ক্রু" ১ মাসের মূল্য ১২৸০। হাঁপানির জন্য আর ভাবেন কেন ? ৩০৲ টাকায় চুক্তি নিয়া আরোগ্য করা হয়। ধবল ও শ্বেতকুষ্ঠ যত দিনেরই হউক "লি উ কো ডা র মা ই ন" আপনাকে আরোগ্য করিবেই, বিফলে দ্বিগুণ মূল্য ফেরৎ দিয়া থাকি। নমস্কার।

ডাঃ শ্যারম্যান, এফ-সি-এস, বালিয়াডাঙ্গা, ফরিদপুর।

জাহ্নবে সমাপ্তি !

হাঁপানি কাশি ও যক্ষ্মার সমূলে নির্ব্বাসন

চিরায়ুষ্মতি হব ওঁ তৎ সৎ ওঁ শাশ্বত দিব্যভাবে আছ তুমি প্রত্যক্ষ করিতে রসে, রূপে, গন্ধে, শব্দে ও স্পর্শে মানবের প্রাক্তন কর্ম্মফল, রেখেছ গাঁথিয়া মণির মালার মত, দিবে নাকি হইতে সমাপ্ত ? গবেষণা যাঁর ভিত্তি, আনিয়াছে দিব্যশক্তি, মুক্ত করিতে মানবেরে চিরতরে কালের কবল হতে। "ধ্যাগমা টিন" অধঃকরণ "রিলিভিং অয়েন্টমেণ্ট" করিবে বক্ষে লেপন ১ সপ্তাহ পরীক্ষার অভিনব ফল প্রত্যক্ষ করিবেন। মূল্য ৮৸০. অন্য যে কোন দুরারোগ্য ব্যাধি ৫৲ ফিঃ পাইলে ব্যবস্থা করি; ঔষধ মূল্য স্বতন্ত্র—

ডাঃ শ্যারম্যান, এফ-সি-এস, বালিয়াডাঙ্গা, ফরিদপুর।

এইমাত্র বাহির হইল:

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচিত ও শিল্পী বিনয়কৃষ্ণ বসু চিত্রিত
চৈ-তা-লী ৩৲

বিভূতি বাবুর
নীলাঙ্গুরীয় (২য় সং) ৩৲
বরযাত্রী (২য় সং) ২॥০
বসন্তে ২॥০ **শারদীয়া** ২৲

মোহিতলাল মজুমদারের
আধুনিক বাংলা সাহিত্য
(দ্বিতীয় সংস্করণ)—৩॥০

সরোজকুমার রায় চৌধুরীর বহুপ্রশংসিত উপন্যাস
শৃঙ্খল (২য় সং)—২॥০

আশালতা সিংহের
সমর্পণ ২॥০ **অন্তর্য্যামী** ২॥০
নূতন অধ্যায় ২॥০
সমী ও দীপ্তি ১৲

তারাপদ রাহার
যোগিনীর মাঠ ১॥০

সুশীলকুমার দের
অদ্যতনী ২৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত
টমাস বাটার আত্মজীবনী
উপন্যাসের ন্যায় হৃদয়গ্রাহী—৪৲

নবগোপাল দাস, আই-সি-এস্
অনবগুণ্ঠিতা ২॥০
তারা একদিন ভালোবেসেছিল ১৷০

মণীন্দ্রলাল বসুর
সোনার হরিণ ১৷০

প্রমথ রায়ের
নিরালায় ১৲

শীঘ্রই বাহির হইবে

শিল্পী বিনয়কৃষ্ণ বসু অঙ্কিত চিত্রে শোভিত—বিভূতি বাবুর
বর্ষায় (২য় সং) ৩৲

সরোজকুমার রায় চৌধুরীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস
শতাব্দীর অভিশাপ ২॥০
একটি হারানো অংশ সংযোজিত (২য় সং)

পরিমল গোস্বামীর রস-রচনা
শৈল চক্রবর্ত্তী চিত্রিত
ঘুঘু ২৲

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ—১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মুখেই
বিশুদ্ধ
সুস্বাদু
পুষ্টিকর
প্রমথ নাথ পাল এণ্ড
রক্ষিত লেন (চিনিপট্টী)
বড়বাজার, কলিকাতা
বাসন্তী
ঘৃত

PRICE : 8 OZ. PHIAL RS. 2 4
16 OZ. PHIAL RS 3 8.

FOR PARTICULARS APPLY TO :

L. H. EMENY

MERCANTILE BUILDINGS, LAL BAZAR, CALCUTTA.

PHOTO
D. RATAN & CO.
ডি. রতন এণ্ড কোং
22-1. CORNWALLIS ST. CALCUTTA
ফটো

Dealers in

INDIAN MINERAL

&

RAW MATERIALS FOR SOAP

31, JACKSON LANE, CALCUTTA.

PHONE B. B. 1397.

প্রসিদ্ধ রং ব্যবসায়ী

১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বন্দুক ও তৎসংক্রান্ত

সর্ব্বপ্রকার সরঞ্জামের

একমাত্র

স্থান

এ, সি, কুণ্ডু

প্রসিদ্ধ বন্দুক-ব্যবসায়ী

১৭০, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

স্বপ্নের আবেশ
ক্যাষ্টর অয়েল
ফ্রাঙ্ক রস্ এণ্ড কোং লিঃ
কলিকাতা

সচিত্র বাঙ্গালা মাসিক পত্র

একাদশ বর্ষ—২য় খণ্ড

[পৌষ ১৩৫০—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১]

ষাণ্মাসিক সূচী

প্রবন্ধ

গল্প

সঙ্গীত ও স্বরলিপি

উপন্যাস

নাটক

দিনান্তে স্মরণে জাগে প্রভাতের সুর শিল্পী—শ্রীগৌরী

বেঙ্গল সেন্ট্রাল ... বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
সংগ্রাম ও শান্তি
সকল অবস্থাতেই
আপনাদের
সেবা করিতে
প্রস্তুত।
হেড অফিস :
৩ ও ৪, হেয়ার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
ফোন : কলিকাতা ৬১১
শাখাসমূহ :
ঢাকা, কালিম্পঙ্, শিলিগুড়ি,
শান্তিপুর, বালী, রাজসাহী,
বগুড়া, কৃষ্ণনগর, তারকেশ্বর
ও রাণাঘাট।

১১শ ২য় বর্ষ, খণ্ড, ১ম সংখ্যা **বিষয়-সূচী** পৌষ—১৩১০

[২৯ পৃষ্ঠায়

ইকনমিক টেইলার্স

আধুনিক সভ্য জগতে

অঙ্গ[illegible] মার্জ্জিত রুচি

ও

আভিজাত্য বৃদ্ধি করিতে

পোষাক-পরিচ্ছদ

অনেকখানি

সহায়ক

আমরা আপনাকে সাহায্য করিতে

সর্ব্বদাই প্রস্তুত

৪৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিষয়-সূচী—২৭ পৃষ্ঠার পর]

চিত্র-সূচী

বিজ্ঞাপন সুচী

Drops of Ink make Millions think

KAJAL-KALI

LEADING SINCE 1924

ভারতের
COCOLA
কোকোলা
COCONUT OIL
জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া

"দুর্গা-পূজা"র প্রয়োজনীয়তা

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

(৬)

জমির উৎপাদিকা-শক্তির শ্রেণী-বিভাগ

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার জন্য যে যে দ্রব্য, গুণ ও শক্তি যে যে পরিমাণে মানুষের প্রয়োজন হয় সেই সেই দ্রব্য, গুণ ও শক্তি তদতিরিক্ত পরিমাণে উৎপাদন করায় প্রকৃতির কোন বাধা না থাকা সত্ত্বেও মানুষের কেন বিবিধ রকমের অভাবের উৎপত্তি হয়, তাহা ভাবিতে বসিলে বিস্মিত হইতে হয়।

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে যে সমস্ত দ্রব্য, গুণ ও শক্তি মানুষের প্রয়োজন, তাহার প্রত্যেকটী যাহাতে প্রত্যেক নর-নারী প্রয়োজনীয় পরিমাণে পাইতে পারেন, তাহার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও মানুষের অভাবের উদ্ভব হয় কেন—তাহা নিরূপণ করিতে হইলে একদিকে যেরূপ মানুষের ইচ্ছা, বুদ্ধি, জ্ঞান, কর্ম্মশক্তি ও কর্ম্মপ্রবৃত্তির ইতিবৃত্ত পরিজ্ঞাত হইতে হয়—সেইরূপ আবার জমির উৎপাদিকা-শক্তির ইতিবৃত্ত জানিবার প্রয়োজন হয়। জমির উৎপাদিকা-শক্তির ইতিবৃত্ত জানিতে হইলে জমির সহিত জল ও বায়ুর কি সম্বন্ধ তাহাও পরিজ্ঞাত হইতে হয়। ইহার কারণ—জমি, জল ও বায়ু—এই তিনটী অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশ্রিত। একটী আর একটীকে ছাড়িয়া বিদ্যমান থাকিতে পারে না।

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে যাহা যাহা প্রয়োজন হয়—তাহার প্রত্যেকটীর গ্রহীতা মানুষ, দাতা—জমি, জল ও বায়ু, এবং ব্যবস্থাকর্ত্তা প্রকৃতি অথবা তেজ ও রসের মিশ্রণের পাঁচটী অবস্থা (অর্থাৎ অদ্বৈত, মায়া, দ্বৈত, আত্মা এবং বিচ্ছেদ অবস্থা)।

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে মানুষের যাহা যাহা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন, সেই সমস্ত দ্রব্য, গুণ ও শক্তি মানুষ যাহাতে গ্রহণ করিতে পারে ; জমি, জল ও বায়ু যাহাতে সেই সমস্ত দ্রব্য, গুণ ও শক্তি দান করিতে পারে- তাহার সমস্ত ব্যবস্থাই এই ভূ-মণ্ডলে প্রকৃতির দ্বারা সম্পাদিত হয়। উপরোক্ত সমস্ত ব্যবস্থাই প্রকৃতির দ্বারা সম্পাদিত হওয়া সত্ত্বেও মানুষের যখন তাহার ঈপ্সিত ও প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যের অথবা গুণের অথবা শক্তির কোনরূপ অভাব উপস্থিত হয়, তখনই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, হয় মানুষের গ্রহণ করিবার শক্তির, নতুবা জমি, জল ও বায়ুর প্রদান করিবার শক্তির কোনরূপ দুষ্টতা ঘটিয়াছে।

উপরোক্ত কারণে, মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার অক্ষমতার কারণ কি কি, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে এক দিকে যেরূপ মানুষের গ্রহণ করিবার শক্তির কি কি দুষ্টতা কোন্ কোন্ কারণে ঘটিতে পারে তাহার অনুসন্ধান করিতে হয়—অন্য দিকে আবার জমি, জল ও বায়ুর কি কি দুষ্টতা কোন্ কোন্ কারণে ঘটিতে পারে, তাহাও পরিজ্ঞাত হইতে হয়।

জমি, জল ও বায়ুর দুষ্টতা কত শ্রেণীর ও কোন্ কোন্ কারণে ঘটিতে পারে,তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইলে—জমি, জল ও বায়ুর উৎপত্তি, রক্ষা ও পরিবর্ত্তন স্বতঃই সাধিত হয় কোন্ কোন্ কার্য্য-ক্রমে এবং কোন্ কোন্ কার্য্য নিয়মে, তাহার কথা আগে আলোচনা করিতে হয়।

কোন্ কোন্ কার্য্য-ক্রমে এবং কোন্ কোন্ কার্য্য নিয়মে জমি, জল ও বায়ুর উৎপত্তি রক্ষা ও পরিবর্ত্তন স্বতঃই সাধিত হয়—তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে জমির উৎপাদিকা-শক্তি এবং জল ও বায়ুর বিশুদ্ধতা কোন্ কোন্ কার্য্য-নিয়মে স্বতঃই রক্ষিত হয়—তাহা জানা সম্ভব হয়। জমির উৎপাদিকা-শক্তি এবং জল ও বায়ুর বিশুদ্ধতা কোন্ কোন্ কার্য্য-নিয়মে স্বতঃই রক্ষিত হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে জমি, জল ও বায়ুর দুষ্টতা কত শ্রেণীর এবং কোন্ কোন্ কারণে ঘটিতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করা সাধ্যায়ত্ত হয়।

যে যে কার্য্য-ক্রমে ও কার্য্য-নিয়মে জমির উৎপাদিকা-শক্তি এবং জল ও বায়ুর বিশুদ্ধতা স্বতঃই রক্ষিত হয়, সেই সেই কার্য্য-ক্রম ও কার্য্য-নিয়মের কথা অত্যন্ত বিস্তৃত। চারিটী বেদের সংহিতাংশ, ব্রাহ্মণাংশ, আরণ্যকাংশ, প্রাতি-শাখ্যাংশ, শ্রৌত-সূত্রাংশ ও গৃহ্য-সূত্রাংশের সমগ্রভাগে জমির উৎপাদিকা-শক্তি এবং জল ও বায়ুর বিশুদ্ধতার কথার সম্পূর্ণতা আছে। চারিটী বেদ সমগ্রভাবে পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলে জমির উৎপাদিকা-শক্তি এবং জল ও বায়ুর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে যত কথা জানিবার আছে, তাহা সম্পূর্ণ ও নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানা যায় না।

জমির উৎপাদিকা-শক্তি এবং জল ও বায়ুর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে যত কথা জানিবার আছে, তাহা জানিতে হইলে চারিটী বেদ সমগ্রভাবে জানিবার প্রয়োজন হয়—ইহা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য দুইটী। প্রথমতঃ, জমি-তত্ত্ব কত বিস্তৃত তাহা ভাই-বন্ধুগণকে জানাইয়া দেওয়া; দ্বিতীয়তঃ, ঐ তত্ত্ব যে এতাদৃশ প্রবন্ধে সর্ব্বতোভাবে বিবৃত করা সম্ভবযোগ্য নহে—তাহা ভাই-বন্ধুগণের অনুমানযোগ্য করা।

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থে জমি-তত্ত্বের যে সম্পূর্ণতা পাওয়া যায়, অন্য কোন ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থে সেই সম্পূর্ণতা পাওয়া যায় না। অন্যান্য ভাষায় লিখিত জমি-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত গ্রন্থ আছে—সেই সমস্ত গ্রন্থে জমি-তত্ত্বের সম্পূর্ণতা ত' দূরের কথা; ঐ তত্ত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা আছে তাহা প্রায়শঃ নির্ভরের অযোগ্য। আমাদিগের সিদ্ধান্তানুসারে বর্ত্তমান বিজ্ঞানে জমি-তত্ত্বের যে সমস্ত কথা আছে, সেই সমস্ত কথা প্রায়শঃ ভ্রমপূর্ণ এবং জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি রক্ষা করিবার বিরুদ্ধ। সমগ্র মানবসমাজে আধুনিক কালে যে হাহাকার উঠিয়াছে, তাহার সাক্ষাৎ কারণ—বর্ত্তমান বিজ্ঞানে জমি-তত্ত্ব অথবা উদ্ভিদ্-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা আছে—সেই সমস্ত কথা জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি রক্ষা করিবার বিরোধী।

যে সমস্ত কথা বিবৃত না করিলে মানুষের দ্রব্য, গুণ ও শক্তিগত অভাবের উৎপত্তি হয় কেন তাহা বুঝা সম্ভব হয় না—সেই সমস্ত কথা ব্যাখ্যা করিতে হইলে জমি-তত্ত্ব অথবা জমির উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কয়টী কথা না বলিলে নয়, আমরা এই প্রবন্ধে সেই কয়টী কথা মাত্র উল্লেখ করিব।

জমি-তত্ত্ব অথবা জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা এই আলোচনায় যে কয়টী কথা বলিব—সেই কয়টী কথা পূর্ণ জমি-তত্ত্বের অতীব সামান্য অংশ মাত্র।

মানুষের দ্রব্য, গুণ ও শক্তিগত অভাবের উৎপত্তি হয় কেন, তাহা স্থির করিতে হইলে একদিকে যেমন জমির উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি হয় প্রাকৃতিক কোন্ কোন্ কার্য্য-ক্রমে তাহা পরিজ্ঞাত হওয়ার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার জমির উৎপাদিকা-শক্তি কয় শ্রেণীর তাহাও জানিবার প্রয়োজন হয়।

জমির উৎপাদিকা-শক্তি কয় শ্রেণীর তাহা জানা না থাকিলে জমি ও তাহার উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি ও রক্ষার কার্য্য-ক্রম বুঝা যায় না।

জমির উৎপাদিকা-শক্তি কয় শ্রেণীর তাহা জানা না থাকিলে যেমন "জমি ও তাহার উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি ও রক্ষার কার্য্য-ক্রম" সম্বন্ধীয় কথা বুঝা যায় না; সেইরূপ আবার জমি ও তাহার উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি ও রক্ষার কার্য্য-ক্রম কি কি তাহার কথা জানা না থাকলে জমির উৎপাদিকা-শক্তি কয় শ্রেণীর তাহা বুঝা যায় না।

"জমি ও তাহার উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি ও রক্ষার কার্য্য-ক্রম কি কি" তৎসম্বন্ধে আমরা ইহার পর আলোচনা করিব।

ঐ আলোচনায় দেখা যাইবে যে, এই পৃথিবীর প্রত্যেক অংশের জমির দেহাভ্যন্তরে যেমন তাহার গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তি বিদ্যমান আছে সেইরূপ আবার সমতার প্রবৃত্তিও বিদ্যমান আছে। আরও দেখা যাইবে যে, পৃথিবীর প্রত্যেক অংশের জমির দেহাভ্যন্তরে তাহার গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের সমতার অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে বটে; কিন্তু স্বভাবতঃ সমতার প্রবৃত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলশালিনী হয় এবং জমির অভ্যন্তরস্থ গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের উপরোক্ত সমতার প্রবৃত্তির আতিশয্য হইতে জমির উৎপাদিকা-শক্তির উদ্ভব হয়।

জমির অভ্যন্তরস্থ গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি কর্ম্ম ও গমন-সমূহের যেরূপ সমতা, অসমতা ও বিষমতার প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে, জমির উৎপাদিকা-শক্তিও সেইরূপ সমতা, অসমতা ও বিষমতার প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে।

এই ভূ-মণ্ডলে যত জমি আছে তাহার সর্ব্বত্রই এক শ্রেণীর দ্রব্য উৎপন্ন হয় না এবং উৎপাদনের পরিমাণও সর্ব্বত্রই একরূপ নহে।

উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণের ও গুণের উপরোক্ত বিভিন্নতা জমির উৎপাদন শক্তির বিভিন্নতা হইতে উদ্ভব হয়।

মানুষের ইচ্ছাসমূহের পূরণ করিতে হইলে যে সমস্ত দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, তাহার অধিকাংশই যে মূলতঃ জমি হইতে উৎপন্ন হয়—তাহা আমরা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। জমি হইতে যে সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত দ্রব্যকে কাঁচামাল বলা হয়। শিল্প ও কারুকার্য্যের দ্বারা কাঁচামাল-সমূহকে মানুষের ব্যবহার-যোগ্য করা হয়।

মৃত্তিকার গুণ ও শক্তি প্রভৃতির প্রভেদ অনুসারে জমির উৎপাদন-শক্তির প্রভেদ ঘটিয়া থাকে এবং জমির উৎপাদন-শক্তির প্রভেদ অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর জমি হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্য বিভিন্ন শ্রেণীর পরিমাণের হারে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জমির সর্ব্বত্রই যদি সর্ব্বশ্রেণীর দ্রব্য পরিমাণের সর্ব্বোচ্চ হারে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হইত—তাহা হইলে জমির উৎপাদন-শক্তির উৎপত্তির কারণ অথবা উৎপাদন-শক্তির শ্রেণী-বিভাগের কথা মানুষের না জানা থাকিলেও চলিত। কিন্তু তাহা সম্ভবযোগ্য হয় না বলিয়াই জমির উৎপাদন-শক্তির উৎপত্তির কারণ এবং উহার শ্রেণী-বিভাগের কথা মানুষের জানা একান্ত প্রয়োজনীয়।

জমির দেহস্থ তেজ ও রসের গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনশীলতা পরীক্ষা করিয়া যেরূপ জমির উৎপাদন শক্তির শ্রেণী বিভাগ করা সম্ভব হয়, সেইরূপ আবার জমি-জাত দ্রব্য-সমূহের গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনশীলতা-সমূহ পরীক্ষা করিয়াও জমির উৎপাদন-শক্তির শ্রেণী-বিভাগ করা যাইতে পারে।

জমি হইতে যে সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহার প্রত্যেকটী হয় মানুষের মেদ নতুবা অস্থি নতুবা মজ্জা নতুবা বসা নতুবা মাংস নতুবা রক্ত নতুবা চর্ম্ম নতুবা চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কোন না কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় নতুবা বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কোন না কোন কর্ম্মেন্দ্রিয় নতুবা মন নতুবা বুদ্ধি প্রভৃতির আকৃতি অথবা গুণ অথবা কর্ম্ম-শক্তি অথবা কর্ম্ম-প্রবৃত্তির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের কোনটী বা আহার্য্যে পরিণত হইবার যোগ্য, কোনটী বা পানীয়ে পরিণত হইবার যোগ্য, কোনটী বা বসনে পরিণত হইবার যোগ্য, কোনটী বা ভূষণে পরিণত হইবার যোগ্য, কোনটী বা শয্যায় পরিণত হইবার যোগ্য, কোনটী বা আসবাবে পরিণত হইবার যোগ্য, কোনটী বা প্রসাধন-দ্রব্যে পরিণত হইবার যোগ্য এবং কোনটী বা ভেষজ দ্রব্যে পরিণত হইবার যোগ্য। মানুষের কোন প্রয়োজন নির্ব্বাহের যোগ্যতা নাই এমন কোন দ্রব্য জমি হইতে স্বতঃই উৎপন্ন হয় না। জমি হইতে যে যে দ্রব্য যে যে দেশে উৎপন্ন হয়, সেই সেই দ্রব্য সেই সেই দেশের মানুষের কোন না কোন প্রয়োজন সাধন করিতে সক্ষম। জমি হইতে যে যে দ্রব্য যে যে দেশে উৎপাদন করা সম্ভব এবং স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে—সেই সেই দ্রব্য সেই সেই দেশের মানুষের কোন না কোন প্রয়োজন সাধন করিতে সক্ষম বটে; কিন্তু উৎপাদন-প্রণালীর দুষ্টতায় এবং দ্রব্য ব্যবহার প্রণালী সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে জমি হইতে যে সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন হওয়া সম্ভব, সেই সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকটী মানুষের অনিষ্ট সাধন করিতেও সক্ষম। কোন্ দ্রব্যের কোন্ প্রয়োজনীয়তা তাহা যে প্রত্যেক মানুষেরই জানা থাকে—তাহা নহে। কোন মানুষই সর্ব্ববিধ দ্রব্যের সর্ব্ববিধ প্রয়োজনীয়তার সহিত পরিচিত থাকেন না।

উপরোক্ত কথা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জমির উৎপাদিকা-শক্তির শ্রেণী-বিভাগের ভিত্তি মূলতঃ দুই শ্রেণীর। এক,—কোন্ দ্রব্য মানুষের কোন্ শ্রেণীর প্রয়োজনীয়তা সাধনে সক্ষম, তাহা দেখিয়া জমির উৎপাদিকা-শক্তির শ্রেণী-বিভাগ সাধিত হইতে পারে। আর,—তেজ ও রসের মিশ্রণের কোন্ অবস্থা হইতে জমির উৎপাদিকা শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে তাহা দেখিয়া জমির উৎপাদিকা শক্তির শ্রেণী-নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

কোন্ দ্রব্য মানুষের কোন্ শ্রেণীর প্রয়োজনীয়তা সাধনে সক্ষম—তাহা দেখিয়া জমির উৎপাদিকা-শক্তির বিভাগ কোন্ প্রণালীতে করিতে হয়—তাহার বর্ণনা আমরা এই আলোচনায় করিব না। উহা অত্যন্ত বিস্তৃত। দ্রব্যসমূহের উপরোক্ত শ্রেণী-বিভাগ চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিষয়-সমূহের অন্তর্গত।

জমির দেহস্থ তেজ ও রসের মিশ্রণের কোন্ অবস্থা হইতে কোন্ শ্রেণীর উৎপাদিকা শক্তির উদ্ভব হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া জমির উৎপাদিকা-শক্তির শ্রেণী নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা আছে, সেই সমস্ত কথার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অংশ আমরা অতঃপর আলোচনা করিব।

প্রত্যেক মানুষের দেহে যেরূপ তেজ ও রসের মিশ্রণ এবং তেজ ও রসের মিশ্রণের সমতা, অসমতা ও বিষমতার শক্তি, প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম বিদ্যমান থাকে; সেইরূপ জমির অথবা মৃত্তিকার দেহের সর্ব্বত্র তেজ ও রসের মিশ্রণ এবং এই মিশ্রণের সমতা, অসমতা ও বিষমতার শক্তি, প্রবৃত্তি এবং কর্ম্ম বিদ্যমান থাকে।

জমির অথবা মৃত্তিকার দেহের সর্ব্বত্র তেজ ও রসের যে মিশ্রণ এবং ঐ মিশ্রণের যে সমতা, অসমতা ও বিষমতার শক্তি, প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, সেই মিশ্রণ এবং মিশ্রণের সমতা, অসমতা ও বিষমতার শক্তি, প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম হইতে জমির উৎপাদনের শক্তি, প্রবৃত্তি ও কর্ম্মের উদ্ভব স্বতঃই হইয়া থাকে।

জমির অথবা মৃত্তিকার দেহের সর্ব্বত্রই যেমন তেজ ও রসের মিশ্রণ বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ আবার সর্ব্বত্রই তেজ ও রসের মিশ্রণের সমতা, অসমতা ও বিষমতার শক্তি ও প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে বটে; কিন্তু সর্ব্বত্রই যে তেজ ও রসের মিশ্রণের সমতা, অসমতা ও বিষমতার শক্তি ও প্রবৃত্তি সমান ভাবে সমান পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, তাহা নহে। মহাদেশসমূহের কোন জমিতে অথবা মৃত্তিকায় স্বভাবতঃ অসমতা ও বিষমতার শক্তি ও প্রবৃত্তির তুলনায়

সমতার শক্তির ও প্রবৃত্তির আধিক্য বিদ্যমান থাকে। কোন জমিতে অথবা মৃত্তিকায় স্বভাবতঃ সমতার ও বিষমতার শক্তি ও প্রবৃত্তির তুলনায় অসমতার শক্তির ও প্রবৃত্তির আধিক্য বিদ্যমান থাকে। আবার, কোন জমিতে অথবা মৃত্তিকায় স্বভাবতঃ সমতার ও অসমতার শক্তি ও প্রবৃত্তির তুলনায় বিষমতার শক্তির ও প্রবৃত্তির আধিক্য বিদ্যমান থাকে।

যে জমির দেহে তেজ ও রসের মিশ্রণের সমতার শক্তি ও প্রবৃত্তির আধিক্য স্বভাবতঃ বিদ্যমান থাকে, সেই জমিকে সমতাযুক্ত জমি বলা হয়। সমতাযুক্ত জমির উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ একদিকে যেরূপ পরিমাণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার মানুষের শরীরস্থ তেজ ও রসের সমতা বর্দ্ধক হয়।

যে জমির দেহে তেজ ও রসের মিশ্রণের অসমতার শক্তি ও প্রবৃত্তির আধিক্য স্বভাবতঃ বিদ্যমান থাকে, সেই জমিকে অসমতাযুক্ত জমি বলা হয়। অসমতাযুক্ত জমির উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ একদিকে যেরূপ সমতাযুক্ত জমির উৎপাদনের তুলনায় পরিমাণে কম হইয়া থাকে সেইরূপ আবার মানুষের শরীরস্থ তেজ ও রসের অসমতা-বর্দ্ধক হয়।

যে জমির দেহে তেজ ও রসের মিশ্রণের বিষমতার শক্তির ও প্রবৃত্তির আধিক্য স্বভাবতঃ বিদ্যমান থাকে, সেই জমিকে বিষমতাযুক্ত জমি বলা হয়। বিষমতাযুক্ত জমির উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ একদিকে যেরূপ অসমতাযুক্ত জমির উৎপাদনের তুলনায় পরিমাণে কম হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার মানুষের শরীরস্থ তেজ ও রসের বিষমতা-বর্দ্ধক হয়।

উপরোক্ত কথাসমূহ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জমির দেহস্থ তেজ ও রসের সমতা, অসমতা ও বিষমতার শক্তি ও প্রবৃত্তি ভেদে জমির উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের গুণ, কর্ম্মশক্তি ও কর্ম্ম-প্রবৃত্তির সমতা, অসমতা ও বিষমতার ভেদ ঘটিয়া থাকে। জমির উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ তাহাদের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির সমতা, অসমতা ও বিষমতা ভেদে মানুষের দেহস্থ তেজ ও রসের সমতা, অসমতা ও বিষমতার বৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে।

উপরোক্ত হিসাবে জমির উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর, যথা :—

(১) মানুষের শরীরের সমতা সম্পাদক অথবা সমতাযুক্ত দ্রব্য ;
(২) মানুষের শরীরের অসমতা সম্পাদক অথবা অসমতাযুক্ত দ্রব্য ;
(৩) মানুষের শরীরের বিষমতা সম্পাদক অথবা বিষমতাযুক্ত দ্রব্য।

জমির উৎপন্ন দ্রব্য যেমন তিন শ্রেণীর, জমির উৎপাদক-শক্তিও সেইরূপ তিন শ্রেণীর, যথা :—

(১) সমতাযুক্ত উৎপাদক-শক্তি ;
(২) অসমতাযুক্ত উৎপাদক-শক্তি ;
(৩) বিষমতাযুক্ত উৎপাদক-শক্তি।

এই ভূ-মণ্ডলে যত জমি আছে, তন্মধ্যে কোন কোন দেশের জমির উৎপাদিকা-শক্তি প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সমতাযুক্ত, কোন কোন দেশের জমির উৎপাদিকা-শক্তি অসমতাযুক্ত এবং কোন কোন দেশের জমির উৎপাদিকা-শক্তি বিষমতাযুক্ত।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যে দেশের জমির উৎপাদিকা-শক্তি সমতাযুক্ত, সেই দেশের জমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমতা-সম্পাদক দ্রব্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিতে সক্ষম।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কোন কোন দেশের জমির উৎপাদিকা-শক্তি সমতাযুক্ত, কোন কোন দেশের জমির উৎপাদিকা-শক্তি অসমতাযুক্ত এবং কোন কোন দেশের জমির উৎপাদিকা-শক্তি বিষমতাযুক্ত বটে ; কিন্তু যে দেশের যে জমির উৎপাদিকা-শক্তি প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সমতাযুক্ত, সেই দেশের সেই জমির উৎপাদিকা শক্তি যে অসমতা অথবা বিষমতাযুক্ত হইতে পারে না—তাহা নহে। প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জমির সমতাযুক্ত উৎপাদিকা-শক্তি মানুষের ব্যবহারের দোষ-গুণ ভেদে অসমতাযুক্ত অথবা বিষমতাযুক্ত হইতে পারে। যে কোন দেশের যে কোন জমির সমতাযুক্ত উৎপাদিকা-শক্তি যেরূপ মানুষের ব্যবহারের দোষ-গুণ ভেদে অসমতা অথবা বিষমতাযুক্ত হইতে পারে—সেইরূপ আবার, যে কোন দেশের যে কোন জমির অসমতাযুক্ত অথবা বিষমতাযুক্ত উৎপাদিকা-শক্তিও সমতা ও বিষমতা অথবা সমতা অসমতাযুক্ত হইতে পারে।

সম্বন্ধে মানুষের ব্যবহারের দোষ গুণ ভেদে জমির উৎপাদিকা শক্তির শ্রেণী-বিভাগের পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে বটে ; কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যে দেশের জমির উৎপাদিকা-শক্তি স্বভাবতঃ সমতাযুক্ত সেই দেশের জমির উৎপাদিকা-শক্তি মানুষের ব্যবহারের দোষে অসমতা অথবা বিষমতাযুক্ত হইলেও, যে যে দেশের জমির উৎপাদিকা-শক্তি স্বভাবতঃ অসমতা অথবা বিষমতাযুক্ত, সেই সেই দেশের জমির উৎপাদিকা-শক্তি ব্যবহারের দোষে যত অধিক অসমতা অথবা বিষমতাযুক্ত হইতে পারে অথবা হয়, তত অধিক অসমতা অথবা বিষমতাযুক্ত হইতে পারে না এবং হয় না।

সেইরূপ আবার যে যে দেশের জমির উৎপাদিকা-শক্তি

স্বভাবতঃ অসমতা অথবা বিষমতাযুক্ত সেই সেই দেশের জমির উৎপাদিকা শক্তি মানুষের ব্যবহারের গুণে সমতাযুক্ত হইতে পারে বটে; কিন্তু যে যে দেশের জমির উৎপাদিকা-শক্তি স্বভাবতঃ সমতাযুক্ত, সেই সেই দেশের জমির উৎপাদিকা-শক্তি মানুষের ব্যবহারের গুণে যত অধিক পরিমাণে সমতাযুক্ত হইতে পারে এবং হয়, তাহার তুলনায় তত অধিক পরিমাণে সমতাযুক্ত হইতে পারে না এবং হয় না।

প্রত্যেক দেশের জমির উৎপাদিকা-শক্তির শ্রেণী-বিভাগ যেরূপ মানুষের ব্যবহারের দোষ-গুণ ভেদে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে এবং হয়, সেইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মেও ঐ শ্রেণী বিভাগের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

যে দেশের জমির উৎপাদিকা-শক্তি স্বভাবতঃ সমতাযুক্ত সেই দেশের জমি সারা বৎসরই যে সমান ভাবে সমতাযুক্ত থাকে তাহা নহে। প্রতি বৎসরই ঋতু-ভেদে জমির উৎপাদিকা-শক্তির সমতার পরিমাণ হ্রস্বতাপ্রাপ্ত হইবার প্রবৃত্তিযুক্ত হয় এবং অসমতা ও বিষমতা প্রাপ্ত হইবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়।

যে যে দেশের জমির উৎপাদিকা শক্তি স্বভাবতঃ সমতাযুক্ত, সেই সেই দেশের জমির যেমন ঋতু-ভেদে অসমতা ও বিষমতা প্রাপ্ত হইবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়; সেইরূপ যে যে দেশের জমির উৎপাদিকা-শক্তি স্বভাবতঃ অসমতা অথবা বিষমতাযুক্ত, সেই সেই দেশের জমিরও উৎপাদিকা-শক্তি ঋতু-ভেদে বিষমতা ও সমতা অথবা সমতা ও অসমতা প্রাপ্ত হইবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়।

জমির উৎপাদিকা-শক্তির শ্রেণী-বিভাগে যেরূপ সমতা, অসমতা ও বিষমতা—এই তিনটী শ্রেণী বিদ্যমান আছে, সেইরূপ আবার সমতা, অসমতা ও বিষমতার পরিমাণের বিভিন্নতাও বিদ্যমান আছে। যে যে জমির উৎপাদিকা-শক্তি 'সমতাযুক্ত' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য, সেই সেই জমির প্রত্যেক অংশেরই উৎপাদিকা-শক্তির সমতার পরিমাণ যে সর্ব্বতোভাবে সমান—তাহা নহে। সমতাযুক্ত উৎপাদিকা-শক্তির সমতার পরিমাণ যেরূপ সর্ব্বত্রই সর্ব্বতোভাবে সমান নহে, সেইরূপ উৎপাদিকা-শক্তির সমতার পরিমাণ সর্ব্বতোভাবে অপরিবর্ত্তনের যোগ্য নহে। সমতাযুক্ত উৎপাদিকা-শক্তির যেরূপ অসমতা ও বিষমতার উদ্ভব হইতে পারে, সেইরূপ আবার সমতা, অসমতা ও বিষমতার পরিমাণেরও পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে।

অসমতাযুক্ত উৎপাদিকা-শক্তিতে যেরূপ বিষমতা ও সমতার উদ্ভব হইতে পারে, সেইরূপ আবার অসমতা, বিষমতা এবং সমতার পরিমাণেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে।

বিষমতাযুক্ত উৎপাদিকা-শক্তির জমিতে যেরূপ সমতা ও অসমতার উদ্ভব হইতে পারে, সেইরূপ আবার বিষমতা, সমতা এবং অসমতার পরিমাণেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে।

প্রত্যেক দেশেরই জমির প্রত্যেক অংশের উৎপাদিকা-শক্তির স্বাভাবিক সমতা, অথবা অসমতা অথবা বিষমতার এবং তাহাদের পরিমাণের উপরোক্ত পরিবর্ত্তনসমূহ দুই শ্রেণীর কারণে ঘটিয়া থাকে। ঐ দুই শ্রেণীর কারণকে যথাক্রমে "প্রাকৃতিক" ও "ব্যবহারিক" বলিয়া আখ্যাত করা যাইতে পারে।

যে যে প্রাকৃতিক কারণে জমির উৎপত্তি হয় এবং যে যে প্রাকৃতিক কারণে জমির দেহে তেজ ও রসের মিশ্রণের বিদ্যমানতা ও পরিবর্ত্তন সম্ভবযোগ্য হয়, সেই সেই প্রাকৃতিক কারণের বিদ্যমানতাবশতঃ জমির উৎপাদিকা-শক্তির স্বাভাবিক সমতা, অসমতা ও বিষমতার এবং তাহাদের পরিমাণের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। এতাদৃশ প্রাকৃতিক কারণে জমির উৎপাদিকা-শক্তির যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, সেই সমস্ত পরিবর্ত্তনকে প্রাকৃতিক কারণ-জাত পরিবর্ত্তন বলা হয়।

প্রাকৃতিক কারণসমূহের অস্তিত্ববশতঃ যেমন জমির উৎপাদিকা-শক্তির সমতা, অসমতা ও বিষমতার এবং তাহাদের পরিমাণের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ জমি-সম্বন্ধে মানুষের ব্যবহারের দোষ গুণ বশতঃও জমির উৎপাদিকা-শক্তির সমতা, অসমতা ও বিষমতার এবং তাহাদের পরিমাণের পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। জমি-সম্বন্ধে মানুষের ব্যবহারের দোষ-গুণবশতঃ জমির উৎপাদিকা-শক্তির সমতা, অসমতা ও বিষমতার এবং ঐ সমতা-প্রভৃতির পরিমাণের যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, সেই সমস্ত পরিবর্ত্তনকে ব্যবহারিক-কারণ-জাত পরিবর্ত্তন বলা হয়।

জমির উৎপাদিকা শক্তি বিষয়ে প্রাকৃতিক কারণে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, সেই সমস্ত কারণে আপাত-দৃষ্টিতে একদিকে যেরূপ জমির উৎপাদিকা-শক্তির হ্রাস ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ আবার উৎপাদিকা-শক্তির বৃদ্ধিও ঘটিয়া থাকে।

জমির উৎপাদিকা-শক্তির হ্রাস ও বৃদ্ধি বলিতে কি বুঝায়, তাহা স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইলে জমির উৎপাদিকা-শক্তি সম্বন্ধে পাঠকগণকে আরও কয়েকটী কথা শুনিয়া রাখিতে হয়। জমির উৎপাদিকা-শক্তির হ্রাস ও বৃদ্ধি বলিতে কি বুঝায় তাহা ধারণা করিতে হইলে জমির উৎপাদিকা-শক্তি সম্বন্ধে আর যে সমস্ত কথা জানাইবার প্রয়োজন হয়, আমরা অতঃপর সেই সমস্ত কথার আলোচনা করিব।

এই ভূ-মণ্ডলে জমি হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্ভিদশ্রেণী, কীট-পতঙ্গশ্রেণী, সরীসৃপশ্রেণী, পক্ষিশ্রেণী, পশুশ্রেণী এবং মনুষ্যশ্রেণীর যে সমস্ত স্থূল পদার্থ আছে, তাহাদের প্রত্যেকটীর বহুবিধ গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমন বিদ্যমান আছে। ঐ সমস্ত গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের মধ্যে জনন-শক্তি ও জনন-প্রবৃত্তি অন্যতম। জমি হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্ভিদ প্রভৃতি প্রত্যেক শ্রেণীর স্থূল পদার্থের স্বাভাবিক জনন-শক্তি ও জনন-প্রবৃত্তি বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু কোন দুই শ্রেণীর স্থূল পদার্থের স্বাভাবিক জনন-শক্তি অথবা স্বাভাবিক জনন-প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে এক রকমের নহে। প্রকৃতি-জাত কোন দুই শ্রেণীর স্থূল পদার্থের স্বাভাবিক জনন-শক্তি ও জনন-প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে এক রকমের নহে বটে, কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে সমস্ত শ্রেণীর স্থূল পদার্থের জনন শক্তির ও জনন-প্রবৃত্তির সমানত্ব বিদ্যমান আছে। যে সমস্ত বিষয়ে সমস্ত শ্রেণীর স্থূল পদার্থের জনন-শক্তি ও জনন-প্রবৃত্তির সমানত্ব বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে জনন শক্তি ও জনন-প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তনশীলতা অন্যতম।

কোন স্থূল পদার্থের জীবনের কোন দুই মুহূর্ত্তে তাহার জনন-শক্তি ও জনন প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে অপরিবর্ত্তনশীল অথবা স্থিতি-শীল (Static) থাকে না। প্রত্যেক স্থূল পদার্থের জনন-শক্তি ও জনন প্রবৃত্তি প্রত্যেক মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল (Dynamic)।

পরিবর্ত্তনশীলতায় যেরূপ সমস্ত শ্রেণীর স্থূল পদার্থের জনন-শক্তি ও জনন-প্রবৃত্তির সমানত্ব বিদ্যমান আছে, সেইরূপ মৃত্তিকা ছাড়া আর সমস্ত স্থূল পদার্থের, প্রথমতঃ, জনন-প্রবৃত্তির অপ্রকাশ, দ্বিতীয়তঃ, জনন-প্রবৃত্তির প্রকাশ এবং তৃতীয়তঃ, জনন-প্রবৃত্তির ও জনন-শক্তির ক্ষয় ও বিনাশ এই তিন বিষয়েও সমানত্ব বিদ্যমান আছে।

এই ভূ-মণ্ডলে মৃত্তিকা ছাড়া আর যত শ্রেণীর স্থূল পদার্থ আছে, তাহার প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক পদার্থের জনন-শক্তি ও জনন প্রবৃত্তি বাল্যে অপ্রকাশিত থাকে। যৌবনে উভয়ই প্রকাশিত হয়। প্রৌঢ়াবস্থা হইতে বার্দ্ধক্য অবস্থার দিকে অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে, প্রথমতঃ, জনন-প্রবৃত্তির হ্রাস হইতে থাকে, দ্বিতীয়তঃ, জনন-প্রবৃত্তির বিনাশ ও জনন-শক্তির হ্রাস, তৃতীয়তঃ, জনন-শক্তির বিনাশ ঘটিয়া থাকে।

মৃত্তিকার জনন-শক্তি ও জনন-প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন অন্যান্য স্থূল পদার্থের জনন-শক্তি ও জনন-প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তনের সহিত স্বভাবতঃ সাদৃশ্যযুক্ত নহে। মৃত্তিকার জনন-শক্তি ও জনন-প্রবৃত্তি একদিকে যেমন কখনও অপ্রকাশ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে না, সেইরূপ আবার কখনও স্বভাবতঃ সর্ব্বতোভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয় না।

ভূ-মণ্ডলের স্থলভাগের (অর্থাৎ সমগ্র মৃত্তিকাভাগের) কোন অংশ স্বভাবতঃ সমতা-প্রধান, কোন অংশ স্বভাবতঃ অসমতা-প্রধান, আর কোন অংশ স্বভাবতঃ বিষমতা-প্রধান। ভূ-মণ্ডলের স্থলভাগের উপরোক্ত সমতা, অসমতা ও বিষমতার উদ্ভব স্বভাবতঃ কেন হয়, তৎসম্বন্ধে কার্য্য-কারণের যুক্তি আছে। ভূ মণ্ডলের স্থল-ভাগের উপরোক্ত সমতা, অসমতা ও বিষমতার প্রধান নিয়ামক দুইটি, যথা :—

(১) দিক্ বিভাগের পূর্ব্ব-পশ্চাৎবর্ত্তীতা ;

(২) সাগর-সমতলের তুলনায় দেশসমূহের উচ্চ-নীচত্ব।

ঐ যুক্তির কথা অত্যন্ত বিস্তৃত। তাহার আলোচনা এখানে করা সম্ভব নহে। জমির সমতা, অসমতাও বিষমতা সম্বন্ধে উপরোক্ত কার্য্য কারণের যুক্তির সহিত পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষের জমি এই ভূ-মণ্ডলের অন্যান্য দেশের তুলনায় স্বভাবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমতাযুক্ত। ইহা দ্বারা আরও দেখা যাইবে যে, সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী দেশ সমূহের জমি সাধারণতঃ অসমতার প্রবৃত্তিযুক্ত হইয়া থাকে। সমতল ক্ষেত্রের দেশসমূহের জমি সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত সমতার প্রবৃত্তিযুক্ত এবং পার্ব্বত্য দেশসমূহের জমি সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত বিষমতার প্রবৃত্তি-যুক্ত হইয়া থাকে।

ভূ-মণ্ডলের স্থলভাগের প্রত্যেক দেশের জমির একদিকে যেরূপ উপরোক্ত সমতা, অসমতা ও বিষমতা ভেদে একটা না একটা স্বাভাবিক উৎপাদন-শক্তি অথবা জনন-শক্তি বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ আবার প্রত্যেক দেশের জমির উৎপাদন-শক্তির একটা স্বাভাবিক পরি-বর্ত্তনের প্রবৃত্তিও বিদ্যমান থাকে। যে দেশের জমির উৎপাদন-শক্তি স্বভাবতঃ সমতাযুক্ত, সেই দেশের জমির উৎপাদন-শক্তি বৎসরের মধ্যে প্রথম চারি মাস প্রথমতঃ সমতা হইতে অসমতায় উপনীত হইবার জন্য প্রবৃত্তিশীল হয়, তাহার পর দ্বিতীয়তঃ দ্বিতীয় চারিমাস সমতা হইতে বিষমতায় উপনীত হইবার জন্য প্রবৃত্তিশীল হয়, সর্ব্বশেষে তৃতীয়তঃ তৃতীয় চারিমাসে বিষমতা হইতে সমতায় উপনীত হইবার জন্য প্রবৃত্তিশীল হয়। ঐরূপ আবার যে দেশের জমির উৎপাদন-শক্তি স্বভাবতঃ অসমতাযুক্ত সেই দেশের জমির স্বাভাবিক উৎপাদন-শক্তি বৎসরের মধ্যে প্রথম চারিমাস প্রথমতঃ অসমতা হইতে বিষমতায় উপনীত হইবার জন্য প্রবৃত্তিশীল হয় ; দ্বিতীয়তঃ দ্বিতীয় চারিমাস বিষমতা হইতে সমতায় উপনীত হইবার জন্য প্রবৃত্তিশীল হয় ; তৃতীয়তঃ তৃতীয় চারিমাস সমতা হইতে অসমতায় উপনীত হইবার জন্য প্রবৃত্তিশীল হয়। যে দেশের জমির উৎপাদন-শক্তি স্বভাবতঃ বিষমতাযুক্ত, সেই দেশের জমির

পুষ্প-স্মরণিকা

(ত্রয়োদশ-বার্ষিকী স্মৃতি-উৎসব)

— সভাপতি —

ডাঃ শ্রীরাধাবিনোদ পাল। (ভাইস চ্যান্সেলার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

তুমি মোর জীবনের মাঝে মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী,
চির-বিদায়ের আভা দিয়া
রাঙায়ে দিয়েছ মোর হিয়া
এঁকে গেছ সব ভাবনায় সূর্যাস্তের বর্ণ চাতুরী।

রবীন্দ্রনাথ

৪ঠা জুন, ১৯৪৪ সাল

পুষ্প-স্মৃতি-বাসর।

দীপক চিত্র প্রতিষ্ঠান।

— নৃত্য —

বেলা বসু, কমলা পাল ও সন্ধ্যারাণী।

— নৃত্য পরিকল্পনা ও প্রযোজনা —

বুলু

— সঙ্গীত পরিচালনা —

অজিত বসু ও অলোক দে।

— ইণ্ডিয়ান আর্ট ডিস্‌প্লের সৌজন্যে

বেলা ঘোষ, বেলা বসু, সন্ধ্যারাণী,

আশা বসু ও কমলা পাল

দীপক সিনেমার সৌজন্যে—সভা-বাসর প্রাপ্ত।

— হাস্য বিনোদন —

মীরা গার্লেন্স।

স্বাভাবিক উৎপাদন-শক্তি বৎসরের মধ্যে প্রথম চারিমাস প্রথমতঃ বিষমতা হইতে সমতায় উপনীত হইবার জন্য প্রবৃত্তিশীল হয়; দ্বিতীয়তঃ, দ্বিতীয় চারিমাস সমতা হইতে অসমতায় উপনীত হইবার জন্য প্রবৃত্তিশীল হয়; তৃতীয়তঃ, তৃতীয় চারিমাস অসমতা হইতে বিষমতায় উপনীত হইবার জন্য প্রবৃত্তিশীল হয়।

সমতা, অসমতা ও বিষমতা ভেদে ভূ-মণ্ডলের স্থলভাগের জমির প্রত্যেক অংশের উৎপাদন শক্তিতে যে একটা স্বাভাবিক শ্রেণী-বিভাগ আছে এবং জমির উৎপাদন-শক্তির স্বাভাবিক নিয়মানুসারে যে একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবর্ত্তনের প্রবৃত্তি আছে, তাহা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের জানা নাই। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের জানা নাই বলিয়া বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের নিকট জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির এবং উহার শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবর্ত্তনের কথা উৎকট কল্পনা-প্রসূত (utopian) গল্প বলিয়া মনে হইতে পারে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের যাহা জানা নাই, তাহাকে উৎকট কল্পনা-প্রসূত (utopian) গল্প বলিয়া মনে করা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। এই ব্রহ্মাণ্ডে এমন বহু ব্যাপার থাকিতে পারে এবং আছে যাহা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের জানা নাই। সম্প্রদায় বিশেষের জানা নাই বলিয়া কোন একটী কথাকে উৎকট কল্পনা-প্রসূত বলিয়া মনে করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। জমির উৎপাদন শক্তির স্বাভাবিক শ্রেণী-বিভাগের কথা এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবর্ত্তনের কথা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের জানা থাক আর নাই থাক, ঐ কথাগুলি অকাট্য যুক্তি এবং প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথমতঃ, জমির যে স্বাভাবিক উৎপাদক শক্তি আছে, দ্বিতীয়তঃ সমস্ত জমির স্বাভাবিক উৎপাদক শক্তি যে সমান নহে এবং তৃতীয়তঃ, সারাবৎসর কোন জমির উৎপাদক-শক্তি যে সমান থাকে না এই তিনটী কথা, যে কেহ জমির স্বভাবের সহিত পরিচিত, তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না।

জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি যখন সমতাযুক্ত হয়, তখন ঐ জমির উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ মানুষের দেহে যে শ্রেণীর সমতা সাধন করিতে সক্ষম হয় ঐ স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি যখন অসমতা বা বিষমতাযুক্ত হয়, তখন ঐ জমির উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ মানুষের দেহে সেই শ্রেণীর সমতা সাধিত করিতে সক্ষম হয় না। জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি যখন সমতাযুক্ত হয়, তখন ঐ জমি হইতে যত অধিক পরিমাণের দ্রব্য উৎপন্ন করা সম্ভব হয়, জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি যখন অসমতা অথবা বিষমতা-যুক্ত হয়, তখন ঐ জমি হইতে তত অধিক পরিমাণের দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় না।

স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির সমতা-যুক্ত জমির যেরূপ প্রাকৃতিক নিয়মে অসমতা ও বিষমতার উদ্ভব হয়, সেইরূপ আবার স্বভাবতঃ অসমতাযুক্ত জমির বিষমতা ও সমতার উদ্ভব হয় এবং স্বভাবতঃ বিষমতাযুক্ত জমির সমতার ও অসমতার উদ্ভব হইয়া থাকে।

জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির উপরোক্ত পরিবর্ত্তন সমূহ লক্ষ্য করিলে অনিবার্য্য ভাবে ইহা সিদ্ধান্ত হয় যে, "জমির উৎপাদিকা-শক্তি বিষয়ে প্রাকৃতিক কারণে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, সেই সমস্ত কারণে এক দিকে যেরূপ উৎপাদিকা-শক্তির হ্রাস ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ আবার উৎপাদিকা-শক্তির বৃদ্ধিও ঘটিয়া থাকে।"

প্রাকৃতিক কারণে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির যেরূপ হ্রাস ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ আবার বৃদ্ধিও ঘটিয়া থাকে —ইহা শুনিলে আপাতঃভাবে মনে হয় যে, জমির উৎপাদিকা শক্তি যাহাতে প্রাকৃতিক কারণে হ্রাস না পাইতে পারে, তৎ-সম্বন্ধে মানুষের কোন সতর্কতা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন নাই। এরূপ মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে। জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি প্রাকৃতিক কারণে হ্রাসপ্রাপ্তির অভিমুখে প্রবৃত্তিশীল হইলে ঐ স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি যাহাতে বাস্তবতঃ হ্রাসপ্রাপ্ত না হইতে পারে—তজ্জন্য মানুষের বিশেষ-ভাবে সতর্ক হইতে হয়।

কোন্ কোন্ কারণে এই সতর্কতা অত্যাবশ্যকীয়, তাহা জমির উৎপাদিকা-শক্তিবিষয়ক তিনটী স্বাভাবিক নিয়ম পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে স্পষ্ট হয়, যথা:—

(১) যে সমস্ত জমির উৎপাদিকা-শক্তি স্বভাবতঃ সমতাযুক্ত, সেই সমস্ত জমির উৎপাদিকা-শক্তি যখন প্রাকৃতিক নিয়মে অসমতাযুক্ত ও বিষমতাযুক্ত হইবার জন্য প্রবৃত্তিশীল হয়, তখন আবার স্বভাবতঃই সমতাযুক্ত হইবার জন্যও প্রবৃত্তিশীল হয় বটে; কিন্তু জমির সমতাযুক্ত উৎপাদিকা-শক্তি একবার অসমতা অথবা বিষমতাযুক্ত হইলে পুনরায় প্রাকৃতিক নিয়মে স্বভাবতঃ সমান পরিমাণে সমতা লাভ করিতে পারে না।

(২) যে সমস্ত জমির উৎপাদিকা-শক্তি স্বভাবতঃ অসমতাযুক্ত, সেই সমস্ত জমির উৎপাদিকাশক্তি যখন প্রাকৃতিক নিয়মে বিষমতা ও সমতা লাভ করিবার জন্য প্রবৃত্তিশীল হয়, তখন প্রাকৃতিক নিয়মেই পুনরায় অসমতাযুক্ত হয় বটে, কিন্তু জমির অসমতাযুক্ত উৎপাদিকা-শক্তি একবার বিষমতাযুক্ত হইলে পুনরায়, কেবলমাত্র প্রাকৃতিকশক্তিতে সর্ব্বতোভাবে সমতা লাভ করিতে সক্ষম হয় না। তখন সমতা লাভ করিবার জন্য অথবা অসমতার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিবার জন্য প্রবৃত্তিশীল হইলেও বিষমতার

প্রবৃত্তিই থাকিয়া যায় এবং স্বাভাবিক অসমতার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

(৩) যে সমস্ত জমির উৎপাদিকাশক্তি স্বভাবতঃ বিষমতাযুক্ত, প্রাকৃতিক নিয়মে সেই সমস্ত জমির সমতাযুক্ত হইবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে ঐ সমস্ত জমির স্বাভাবিক বিষমতা-যুক্ত উৎপাদিকা-শক্তির কথঞ্চিৎ পরিমাণে সমতালাভ করা সম্ভবযোগ্য হয় বটে; কিন্তু ঐ স্বাভাবিক বিষমতা-যুক্ত উৎপাদিকা-শক্তি যখন পুনরায় সমতাযুক্ত হইবার প্রবৃত্তি হইতে অসমতাযুক্ত হইবার প্রবৃত্তিশীল হয়, তখন আবার অসমতাযুক্ত হয় এবং অসমতাযুক্ত হইবার পর যখন আবার বিষমতাযুক্ত হইবার জন্য প্রবৃত্তিশীল হয়, তখন স্বাভাবিক বিষমতা আরও বৃদ্ধি পায়।

জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির পরিবর্ত্তনের উপরোক্ত তিনটী স্বাভাবিক নিয়ম সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাই হউক না কেন, উহা যখন প্রাকৃতিক নিয়মে অসমতার অথবা বিষমতার প্রবৃত্তি লাভ করিতে প্রযত্নশীল হয়, তখন ঐ অসমতার অথবা বিষমতার প্রবৃত্তি যাহাতে অসমতার অথবা বিষমতার কার্য্যে পরিণত না হয়—তাহার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে প্রত্যেক দেশের জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস প্রাপ্তি অনিবার্য্য হয়।

জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইলে একদিকে যেমন মানুষের সর্ব্ববিধ ঈপ্সিত দ্রব্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হয় না, সেইরূপ আবার এই ভূমণ্ডলের বায়ু ও জল হয় অসমতা অথবা বিষমতা প্রাপ্ত হইয়া পড়ে। তখন মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতো-ভাবে পূরণ করা ত' দূরের কথা, কোন ইচ্ছাই সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যার প্রয়োজনীয় পরিমাণে পূরণ করাও সম্ভবযোগ্য হয় না।

তখন মানুষের শারীরিক ও মানসিক এই উভয় রকমের স্বাস্থ্যই বিপন্ন হইয়া পড়ে।

প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির অসমতা ও বিষমতা লাভ করিবার প্রবৃত্তি যাহাতে অসমতা ও বিষমতা লাভ করিবার কার্য্যে পরিণত না হয়, তাহা করিতে না পারিলে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির হ্রাস-প্রাপ্তি অনিবার্য্য হয় বটে এবং তাহাতে ভূমণ্ডলের সমস্ত মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করাও অসম্ভবযোগ্য হইয়া পড়ে বটে; কিন্তু প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ জমির স্বাভাবিক উৎপাদন-শক্তির অসমতা ও বিষমতা লাভ করিবার প্রবৃত্তি যাহাতে অসমতা ও বিষমতার কার্য্যে পরিণত হইতে না পারে—তাহা সর্ব্বতোভাবে করা সম্পূর্ণভাবে মানুষের সাধ্যায়ত্তর্গত।

প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ জমির স্বাভাবিক উৎপাদন-শক্তির অসমতা ও বিষমতা লাভ করিবার প্রবৃত্তি যাহাতে অসমতা ও বিষমতার কার্য্যে পরিণতি লাভ করিতে না পারে, তাহার পন্থা কি কি—তাহার কথা আমরা "জমি ও তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির রক্ষা বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব কি কি?" শীর্ষক আলোচনায় বিবৃত করিব।

ব্যবহারিক কারণে জমির উৎপাদিকা শক্তির যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, তৎসম্বন্ধে আমরা এক্ষণে আলোচনা করিব।

ব্যবহারিক কারণে জমির উৎপাদিকা-শক্তির কি কি পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে—তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে এক দিকে জমির উৎপাদিকা-শক্তির পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে এমন কি কি ব্যবহার জমি সম্বন্ধে মানুষ সাধারণতঃ করিয়া থাকে—তাহা স্থির করিতে হয়; অন্যদিকে আবার জমির উৎপাদিকা শক্তি যাহাতে কোনরূপে হ্রাস পাইতে না পারে, তদ্বিষয়ে সুনিশ্চিত হইতে হইলে জমি সম্বন্ধীয় ব্যবহারে মানুষের কি কি বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হইতে হয়—তাহাও স্থির করিতে হয়।

প্রথমতঃ, জমি সম্বন্ধে মানুষের ব্যবহারের দোষ ও গুণ সাধারণতঃ কি কি হইয়া থাকে, এবং দ্বিতীয়তঃ, জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি যাহাতে হ্রাস পাইতে না পারে তাহা করিতে হইলে—জমি সম্বন্ধীয় ব্যবহারে মানুষের কোন্ কোন্ বিষয়ে সতর্ক হইতে হয়, এই দুইটী বিষয় স্থির করিতে হইলে জমির এবং তাহার উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি, রক্ষা ও পরিবর্ত্তন হয় কোন্ কোন্ কার্য্য-ক্রমে তাহা বিদিত হইতে হয়।

আমরা, অতঃপর, প্রথমতঃ, জমির এবং তাহার উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি, রক্ষা ও পরিবর্ত্তন হয় কোন্ কোন্ কার্য্য-ক্রমে তাহার আলোচনা করিব।

ঐ আলোচনার পর, ব্যবহারিক কারণে জমির উৎপাদিকা শক্তির কি কি পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে এবং মানুষের অভীষ্ট পদার্থের যাহাতে কোনরূপ অভাব না হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে জমির উৎপাদিকা-শক্তি বিষয়ে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়, তাহার আলোচনা করিব। এই আলোচনার নাম হইবে—"জমি ও তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি রক্ষা বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব কি কি?"

জমির এবং তাহার উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি ও রক্ষার কার্য্য-ক্রম

জমির উৎপত্তির কার্য্য-ক্রম কি কি তাহা আমরা "এই ভূ-মণ্ডলের সর্ব্ববিধ পদার্থের ও মানুষের উৎপত্তির ও অস্তিত্বের ইতিবৃত্ত"-শীর্ষক আলোচনায় পাঠকবর্গকে

শুনাইয়াছি। ঐ কথাগুলি আরও বিশদভাবে সাজাইয়া পাঠকবর্গকে শুনাইতে হইবে।

এই আলোচনায় যাহা যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই ভূ-মণ্ডলে যে সমস্ত পদার্থ আছে, তাহা খণ্ড ও অখণ্ড ভেদে দুই শ্রেণীর ও ঐ দুই শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক পদার্থটী কতকগুলি উপাদান, কতকগুলি গুণ; কতকগুলি শক্তি, কতকগুলি প্রবৃত্তি, বিবিধ শ্রেণীর কর্ম্ম এবং বিবিধ শ্রেণীর গমনের মিশ্রণে রচিত।

এই ভূ-মণ্ডলে যে সমস্ত পদার্থ আছে তাহার প্রত্যেকটীর প্রত্যেক শ্রেণীর শক্তি, প্রত্যেক শ্রেণীর প্রবৃত্তি এবং প্রত্যেক শ্রেণীর কার্য্য ও প্রত্যেক শ্রেণীর গমন সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণ হইতে স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণ হইতে এই ভূ-মণ্ডলের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক শ্রেণীর উপাদান, প্রত্যেক শ্রেণীর গুণ, প্রত্যেক শ্রেণীর শক্তি, প্রত্যেক শ্রেণীর প্রবৃত্তি, প্রত্যেক শ্রেণীর কর্ম্ম এবং প্রত্যেক শ্রেণীর গমনের উৎপত্তি হয়, সেই সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণ বায়বীয় ও বাষ্পীয় অবস্থায় সর্ব্বদা এই ভূ-মণ্ডলকে অণ্ডাকারে ঘিরিয়া রহিয়াছেন।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রস তাঁহাদের যে যে অবস্থায় এই ভূ-মণ্ডলকে সর্ব্বতোভাবে অণ্ডাকারে ঘিরিয়া রহিয়াছেন সেই সেই অবস্থার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অবস্থা পাঁচটী, যথা :—

(১) অদ্বৈত-অবস্থা ;
(২) মায়া-অবস্থা ;
(৩) দ্বৈত-অবস্থা অথবা ব্যোম-অবস্থা ;
(৪) কাল-অবস্থা অথবা বায়বীয়-অবস্থা ;
(৫) বিচ্ছেদ-অবস্থা অথবা বাষ্পীয়-অবস্থা।

তেজ ও রসের উপরোক্ত পাঁচটী অবস্থায় স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের প্রধান নিদান তাঁহাদের প্রকাশ ও বিচ্ছেদের প্রকার ও পরিমাণ। "স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের প্রধান নিদান তাঁহাদের প্রকাশ ও বিচ্ছেদের প্রকার ও পরিমাণ"—এই কথায় কি বুঝায় তাহার ব্যাখ্যা আমরা ইহার পরে করিব।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রস তাঁহাদের যে যে পাঁচটী অবস্থায় এই ভূ-মণ্ডলকে সর্ব্বতোভাবে অণ্ডাকারে ঘিরিয়া রহিয়াছেন সেই পাঁচটী অবস্থার শেষোক্ত অবস্থা অর্থাৎ বিচ্ছেদ-অবস্থায় পরিণতি ঘটিলে অণ্ডাকারের পরিবর্ত্তে ঊর্দ্ধাধঃ আকারের কতকগুলি আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্মের উৎপত্তি হয়।

এই আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্মসমূহের কথাও অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে আমরা এই প্রবন্ধের যথাস্থানে আলোচনা করিব।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের অদ্বৈত-অবস্থা হইতে বিচ্ছেদ-অবস্থার উদ্ভব হইলে এবং উপরোক্ত ঊর্দ্ধাধঃ আকারের আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্মসমূহের উৎপত্তি হইলে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের ক্রমে ক্রমে এবং যুগপৎ তরল অবস্থা, স্থূল-অবস্থা, উদ্ভিদ্-অবস্থা, চরজীব-অবস্থা এবং মহাকাশ-অবস্থার উৎপত্তি হয়।

এই ভূ-মণ্ডলের চরাচর প্রত্যেক পদার্থের যে এক একটী সীমাবদ্ধ আকৃতি বিদ্যমান আছে ঐ ঐ সীমাবদ্ধ আকৃতি সাক্ষাৎভাবে সম্ভবযোগ্য হয়—সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের বায়বীয়, বাষ্পীয়, স্থূল ও তরল অবস্থা হইতে।

যে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণ হইতে এই ভূ-মণ্ডলের প্রত্যেক পদার্থের উৎপত্তি হয়—সেই সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণই আবার প্রত্যেক পদার্থের দেহাভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত হন এবং অধিষ্ঠিত হইয়া প্রত্যেক পদার্থের বিভিন্ন গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনরূপে প্রকাশ পান।

এক তেজ ও রসের মিশ্রণের বিভিন্ন খেলায় এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ববিধ পদার্থের সর্ব্ববিধ প্রকাশ হয়—ইহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহার পর যদি আবার শুনা যায় যে, তেজ ও রসের যে যে খেলায় এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ববিধ পদার্থের সর্ব্ববিধ প্রকাশ—সেই সমস্ত খেলা কুত্রাপি 'এলোমেলো' অথবা বিশৃঙ্খলাযুক্ত নহে; পরন্তু, সর্ব্বত্রই গণিতশাস্ত্র-সঙ্গত নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত—তাহা হইলে আরও বিস্মিত হইতে হয়। কাহারও কাহারও কাছে হয়ত ইহা মনে হইবে যে, তেজ ও রসের মিশ্রণের গণিতশাস্ত্র-সঙ্গত এতাদৃশ বিস্ময়কর খেলার কথা অলীক কল্পনা-প্রসূত (utopian)। যাঁহার যাহা ইচ্ছা—তিনি তাহাই মনে করুন, তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। এক তেজ ও রসের গণিতশাস্ত্র-সঙ্গত কার্য্য-ক্রমে ও কার্য্য-নিয়মে যে এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশ সাধিত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই—ইহা আমাদিগের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত যে একদিন এই ভূ-মণ্ডলের সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক দেশে শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইয়াছিল এবং এই সিদ্ধান্ত যে ছেষট্টি হাজার বৎসর ধরিয়া মানবসমাজের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল—তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। গত ছয় হাজার বৎসর হইতে ভারতবর্ষের চণ্ডালগণের কৃতকার্য্যের ফলে পদার্থ-তত্ত্বের উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক সত্যে নানারকম আবর্জ্জনা মিশ্রিত হইয়াছে এবং মানবসমাজ হাবুডুবু খাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

পদার্থ-তত্ত্বে তেজ ও রসের মিশ্রণের যে অবস্থাকে "অদ্বৈত-অবস্থা" বলা হয়, সম্বন্ধ-তত্ত্বে তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় "ব্রহ্ম" বলিয়া অভিহিত করা হয়। ব্রহ্মের কার্য্যকে সম্বন্ধ-তত্ত্বে সংস্কৃত ভাষায় "ব্রহ্মা" বলা হইয়া থাকে।

পদার্থ-তত্ত্বে তেজ ও রসের মিশ্রণের যে অবস্থাকে "মায়া-অবস্থা" বলা হয়, সম্বন্ধ-তত্ত্বে তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় "বিষ্ণু" বলিয়া অভিহিত করা হয়।

পদার্থতত্ত্বে তেজ ও রসের মিশ্রণের যে অবস্থাকে "দ্বৈত-অবস্থা" বলা হয়, সম্বন্ধ-তত্ত্বে তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় "ঈশ্বর" বলিয়া অভিহিত করা হয়।

তেজ ও রসের মিশ্রণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত 'দ্বৈত-অবস্থা'য় উপনীত না হন্, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ মিশ্রণে কোনরূপ 'ভিতর-বাহিরে'র (Inside and outside-এর) প্রকাশ ত' থাকেই না; পরন্তু, 'ভিতর-বাহিরে'র বিভেদের প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত অনুভব করা যায় না।

তেজ ও রসের মিশ্রণ যখন 'দ্বৈত-অবস্থা'য় উপনীত হন, তখন ঐ মিশ্রণে 'ভিতর-বাহিরের' বিভেদের প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়।

দ্বৈত-অবস্থার ভিতর-বাহিরের বিভেদের প্রবৃত্তি হইতে এই ভূমণ্ডলের চরাচর পদার্থের শরীর ও মনের উদ্ভব হয়।

তেজ ও রসের মিশ্রণের 'অদ্বৈত-অবস্থা'য় দেহের যে অংশ হইতে মানুষের শরীরের উদ্ভব হয়, সেই অংশকে সম্বন্ধ-তত্ত্বে সংস্কৃত ভাষায় "শিব" বলিয়া অভিহিত করা হয়। আর যে অংশ হইতে মানুষের মনের উদ্ভব হয়—সেই অংশকে সম্বন্ধ-তত্ত্বে সংস্কৃত ভাষায় "মহেশ্বর"বলিয়া অভিহিত করা হয়।

তেজ ও রসের মিশ্রণের 'অদ্বৈত-অবস্থা'য় একদিকে যেরূপ তেজ অথবা রসের কোন শক্তির অথবা কোন গুণের অথবা কোন বৃত্তির কোনরূপ প্রকাশের কোনরূপ প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে না—সেইরূপ অবার ঐ মিশ্রণের ঐ অবস্থার অবয়বে কুত্রাপি দুই রকমের পুরুত্ব অথবা দুই রকমের ঘনত্ব পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে না।

ঐ মিশ্রণ যখন 'মায়া-অবস্থা'য় উপনীত হন, তখন উঁহার অবয়বে তেজ ও রসের মিলিত শক্তি, গুণ ও বৃত্তির প্রকাশ হইবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় বটে; কিন্তু তখনও কোন শক্তির, অথবা কোন গুণের অথবা কোন বৃত্তির স্পষ্টভাবে কোন রকমের প্রকাশ হয় না। তেজ ও রসের মিশ্রণের "মায়া-অবস্থার" অবয়বের কুত্রাপি দুই রকমের পুরুত্ব (Thickness) অথবা দুই রকমের ঘনত্ব (Density) বিদ্যমান থাকে না।

তেজ ও রসের মিলিত শক্তি, গুণ ও বৃত্তি সমূহের প্রকাশ হয় তখন, যখন তেজ ও রসের সর্ব্বব্যাপী;মিশ্রণ "দ্বৈত-অবস্থায়" উপনীত হন। তেজ ও রসের সর্ব্বব্যাপী মিশ্রণ যখন দ্বৈত-অবস্থায় উপনীত হন, তখন যে কেবলমাত্র উঁহাদের মিলিত শক্তি, গুণ ও বৃত্তি সমূহের প্রকাশ হয়—তাহা নহে। দ্বৈত-অবস্থায় উপনীত হইলে তেজ ও রসের পৃথক ভাবে প্রকাশিত হইবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত উদ্ভব হয় এবং যুগপৎ তেজ ও রসের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হইবার কর্ম্ম পর্য্যন্ত আরম্ভ হয়। তেজ ও রসের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হইবার কর্ম্ম আরম্ভ হইলেই যে তেজ ও রসের বিচ্ছেদ ঘটে, তাহা নহে। তেজ ও রসের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হইবার কর্ম্ম আরম্ভ হইলেও তেজ ও রস তাঁহাদিগের দ্বৈত-অবস্থার প্রথম ভাগে মিলিত থাকে। এই অবস্থায়, একদিকে যেরূপ তেজ ও রসের মিলিত শক্তি, গুণ ও বৃত্তির স্পষ্ট প্রকাশ হয়; সেইরূপ আবার পৃথক্ হইবার কর্ম্ম-সমূহের প্রকাশ হয়। দ্বৈত-অবস্থায় তেজ ও রসের পৃথক্ হইবার বিভিন্ন কর্ম্ম প্রকাশ হয় বটে; কিন্তু তেজ ও রসের মিলিত গুণ ও শক্তি ছাড়া বিচ্ছিন্ন কোন গুণ অথবা কোন শক্তির প্রকাশ হয় না।

দ্বৈতাবস্থায় তেজ ও রসের মিশ্রণের দেহে পুরুত্ব (Thickness) ও ঘনত্বের (Density-র) বিভিন্নতা সমূহের প্রকাশ হয়। তেজ ও রসের মিশ্রণের দেহে পুরুত্ব ও ঘনত্বের বিভিন্নতা-সমূহের প্রকাশ হইলে ঐ দেহে চলনশীলতার (Dynamic-ness-এর) প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়। মায়া-অবস্থায় এবং অদ্বৈত অবস্থায় তেজ ও রসের মিশ্রণ সর্ব্বতোভাবে চলনহীন (Static) থাকেন।

দ্বৈতাবস্থার তেজ ও রসের মিশ্রণের দেহে চলন-শীলতার প্রবৃত্তির অবস্থা উদ্ভব হইলে, পদার্থ-তত্ত্বে ঐ অবস্থাকে সংস্কৃত ভাষানুসারে "মরুৎ" অথবা "বাতাস"-অবস্থা বলা হয়। পদার্থ-তত্ত্বে তেজ ও রসের মিশ্রণের যে অবস্থাকে "মরুৎ" অথবা "বাতাস-অবস্থা" বলা হয়; সম্বন্ধ-তত্ত্বে সংস্কৃত ভাষায় সেই অবস্থাকে "রুদ্র" বলা হইয়া থাকে।

তেজ ও রসের মিশ্রণের দ্বৈতাবস্থায় পৃথক্‌ভাবে তেজ ও রসের প্রকাশিত হইবার কর্ম্ম ও চলনশীলতার প্রবৃত্তি উদ্ভব হইলে তেজ ও রসের মিশ্রণের দ্বৈতাবস্থায় দেহে তেজ ও রসের পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হইবার কর্ম্মের ও চলনশীলতার দুইটী পৃথক্ পৃথক্ প্রতিক্রিয়া ক্ষেত্রের উদ্ভব হয়। তেজের কর্ম্মের ও চলন-শীলতার প্রতিক্রিয়া ক্ষেত্রকে সংস্কৃত ভাষায় "ভানু" (Sun) বলা হয়। রসের, কর্ম্মের ও চলনশীলতার প্রতিক্রিয়া ক্ষেত্রকে সংস্কৃত ভাষায় "শশী" (Moon) বলা হয়।

তেজ ও রসের মিশ্রণের দ্বৈতাবস্থার দেহে কেবলমাত্র "ভানু"-ক্ষেত্রের এবং "শশী"-ক্ষেত্রের উদ্ভব হওয়া সম্ভব এবং কেবলমাত্র ঐ দুইটী ক্ষেত্রেরই উদ্ভব হয়। তেজ ও রসের মিশ্রণ তরল অবস্থার পরিণতি লাভ না করিলে এবং পৃথক-ভাবে তেজাতিশয্যের ও রসাতিশয্যের প্রকাশ সম্ভব না হইলে "ভানু" ও "শশী"র যথাক্রমে "সূর্য্য" ও "চন্দ্র"রূপে প্রকাশ পাওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না এবং প্রকাশ হয় না।

আধুনিক বিজ্ঞানে সূর্য্য ও চন্দ্রের আকৃতি, গুণ, শক্তি ও বৃত্তি সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা পাওয়া যায়—সেই সমস্ত কথা

আমাদিগের মতে অত্যন্ত অস্পষ্ট, অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং সর্ব্বতোভাবে মানুষের বিচারবুদ্ধিহীন অমানুষোচিত মস্তিষ্কের অলীক কল্পনা-প্রসূত। দেব-দেবীর পূজা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানে সূর্য্য ও চন্দ্রের সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা পাওয়া যায়, তাহা সর্ব্বতোভাবে স্পষ্ট। ঐ কথাসমূহ হইতে সূর্য্য ও চন্দ্রের আকৃতি, গঠন, গুণ, শক্তি ও বৃত্তি সম্বন্ধে আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। দেব-দেবীর পূজা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানে সূর্য্য ও চন্দ্রের আকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা আছে, সেই সমস্ত কথার প্রত্যেকটী যাহাতে মানুষ নিজ নিজ চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকার দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা অথবা সঙ্কেত প্রদর্শিত আছে। "বানরের গলায় মুক্তার হার" দিলে যেরূপ ঐ হারের মর্য্যাদা বিলুপ্ত হয়, সেইরূপ ভারতের চণ্ডালগণের হাতে পড়িয়া মনুষ্যসমাজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে সূর্য্য-তত্ত্ব ও চন্দ্র-তত্ত্ব—সেই সূর্য্য-তত্ত্ব ও চন্দ্র-তত্ত্ব, বিস্মৃতির গর্ভে নিপতিত রহিয়াছে। সূর্য্য-তত্ত্ব ও চন্দ্র-তত্ত্বের কথা ত' দূরে থাক, দেব-দেবীর পূজা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানে যে সমস্ত বিভিন্ন বিষয়ক তত্ত্বের কথা পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেক তত্ত্বটী সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ ও সর্ব্বতোভাবে সন্দেহের অযোগ্য। ঐ সমস্ত তত্ত্বের প্রত্যেকটী ভারতীয় ঋষির নিজস্ব এবং সমগ্র মনুষ্যসমাজের যৌথ সম্পত্তি। ভারতীয় ঋষির কোন কার্য্য কেবলমাত্র ভারত অথবা ভারতবাসীর জন্য গণ্ডীবদ্ধ ছিল না। গণ্ডীবদ্ধতা ভারতীয় চণ্ডালগণের অপ-সৃষ্টি।

ভারতবাসিগণের মধ্যে যাঁহারা মনে করেন যে, ভারতীয় সূর্য্য-তত্ত্ব অথবা চন্দ্র-তত্ত্বের কোন কথা গ্রীক অথবা মিশর-বাসিগণের নিকট হইতে ভারতীয়গণ ধার করিয়াছিলেন, তাঁহারা আজকালকার Mutual Admiration Society-রূপী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ও অধ্যাপক হইতে পারেন বটে; কিন্তু প্রকৃত বিজ্ঞানক্ষেত্রে ছাগশিশুর মত নির্ব্বোধ ও অজ্ঞ।

উপরোক্ত সমালোচনা-মূলক কথা লইয়া আমরা এখানে আর অধিকদূর অগ্রসর হইব না।

তেজ ও রসের মিশ্রণের দ্বৈতাবস্থার দেহে তেজ ও রসের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রকাশ হইবার কর্ম্ম ও চলনশীলতার প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে তেজ ও রসের মিশ্রণের কাল-অবস্থার (আত্মার) উদ্ভব হয়। তেজ ও রসের মিশ্রণের কাল-অবস্থা পরিণতি ও বৃদ্ধি লাভ করিলে তাঁহাদের "বিচ্ছেদ-অবস্থার" উৎপত্তি হয়। তেজ ও রসের বিচ্ছেদ অবস্থার অস্তিত্বে উঁহাদের "জল" অথবা "তরল-অবস্থার", পরিণতিতে "স্থল" অথবা "স্থূল-অবস্থার", বৃদ্ধিতে "উদ্ভিদের", ক্ষয়ে "চর-জীবগণের", এবং বিনাশে মহাকালের অথবা "মিশ্রিত বাষ্পীয়" অবস্থার—উৎপত্তি হয়।

"স্থূল-অবস্থার" অথবা স্থলের উৎপত্তি হওয়ার অপর নাম "জমির উৎপত্তি হওয়া"।

জমির উৎপত্তি হওয়ার মূল কারণ ও কার্য্য-ক্রম কি কি তাহার উত্তরে সংক্ষেপতঃ দুইটী কথা বলিতে হয়, যথা:—

(ক) জমির উৎপত্তির মূল কারণ—তেজ ও রসের মিশ্রণের অদ্বৈত-অবস্থা,

(খ) জমির উৎপত্তির কার্য্য-ক্রম চারিটী, যথা:—(১) তেজ ও রসের মিশ্রণের মায়া-অবস্থা, (২) তেজ ও রসের মিশ্রণের অদ্বৈত-অবস্থা, (৩) তেজ ও রসের মিশ্রণের কাল-অবস্থা এবং (৪) তেজ ও রসের মিশ্রণের বিচ্ছেদ-অবস্থা।

জমির উৎপত্তি হওয়ার কার্য্য-ক্রম কি কি—তাহা বিশদ-ভাবে বুঝিতে হইলে তেজ ও রসের মিশ্রণের অদ্বৈত-অবস্থা হইতে বিচ্ছেদ-অবস্থার উৎপত্তি হয় যে যে কার্য্য-ক্রমে এবং বিচ্ছেদ-অবস্থার যে যে কার্য্য হইয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে ধারণা করিবার জন্য প্রযত্নশীল হইতে হয়।

যে যে কার্য্য ক্রমে তেজ ও রসের মিশ্রণ স্বতঃই তাহা-দিগের অদ্বৈত-অবস্থা হইতে বিচ্ছেদ অবস্থায় পরিণতি লাভ করেন এবং বিচ্ছেদ-অবস্থায় যে যে কার্য্য হইয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে বিশদভাবে ধারণা করিতে হইলে তেজ ও রসের মিশ্রণ স্বতঃই তাহাদিগের অদ্বৈত-অবস্থা হইতে বিচ্ছেদ-অবস্থার পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হন কোন্ কোন্ কারণে, তাহা বিদিত হইতে হয়।

তেজ ও রসের মিশ্রণ স্বতঃই তাঁহাদিগের অদ্বৈত-অবস্থা হইতে বিচ্ছেদ-অবস্থায় পরিণতি লাভ করিতে পারে কেন, তাহার কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি। পাঠকগণের স্মরণার্থে, যে কারণে তেজ ও রসের মিশ্রণ স্বতঃই তাঁহাদিগের অদ্বৈত-অবস্থা হইতে বিচ্ছেদ-অবস্থায় পরিণতি লাভ করেন, সেই কারণের কথা আমরা পুনরুল্লেখ করিতেছি। অদ্বৈত-অবস্থা হইতে তেজ ও রসের মিশ্রণের বিচ্ছেদ-অবস্থায় পরিণতি লাভ করিবার প্রধান কারণ দুইটী, যথা:—

(১) সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র তেজের স্বীয় বৃদ্ধি-সাধন করিয়া রস হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য প্রযত্ন;

(২) সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র তেজের সহিত রসের মিলিত থাকিবার প্রযত্ন।

মিলিত অবস্থাতেও পৃথক্‌ভাবে তেজ ও রস যে উপরোক্ত দুইটী প্রযত্নে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন তাহা স্মরণ রাখিলে তেজ ও রসের মিশ্রণ স্বতঃই কেন অদ্বৈত-অবস্থা হইতে বিচ্ছেদ-অবস্থায় উপনীত হন, তাহা অনায়াসে ধারণা করিতে পারা যায়। তেজ ও রসের মিশ্রিত অবস্থাতেও যে পৃথক্‌ভাবে উপরোক্ত দুইটী প্রযত্ন সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে—তাহা স্মরণ রাখিতে পারিলে শুধু যে তেজ ও রসের

মিশ্রণের বিভিন্ন অবস্থার উৎপত্তির কথা বুঝিতে-পারা যায় তাহা নহে। এই ব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু পদার্থ আছে, তাহার প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক পদার্থের উৎপত্তি, রক্ষা, পরিণতি, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশের ইতিবৃত্ত,—তেজ ও রসের মিলিত অবস্থাতেও পৃথক ভাবে যে তাঁহাদিগের উপরোক্ত দুইটী প্রবত্ব সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে—তাহা স্মরণ রাখিলে, সর্ব্বতোভাবে বুঝা সম্ভব হয়।

এই ব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু পদার্থ আছে, তাহার প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক পদার্থের আকৃতি, গুণ, শক্তি ও বৃত্ত্যাদির উৎপত্তি প্রভৃতি হয় কেন—তাহা বুঝিতে হইলে আরও দুইটী কার্য্য-নিয়মের কথা স্মরণ রাখিতে হয়, যথা :

(১) তেজ ও রসের মিশ্রণের প্রত্যেক পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় তাঁহাদের সর্ব্ববিধ পরবর্ত্তী অবস্থাসমূহের সর্ব্ববিধ গুণ, শক্তি ও বৃত্তি অপ্রকাশিত ভাবে বিদ্যমান থাকে। সর্ব্ববিধ পরবর্ত্তী অবস্থাসমূহের সর্ব্ববিধ গুণ, শক্তি ও বৃত্তি অপ্রকাশিত ভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় বিদ্যমান থাকে বটে; কিন্তু পরবর্ত্তী অবস্থাসমূহে যে সমস্ত গুণ, শক্তি ও বৃত্তি প্রকাশ পায়, সেই সমস্ত গুণ, শক্তি ও বৃত্তির কোনটাই পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় প্রকাশিত ভাবে বিদ্যমান থাকে না;

(২) তেজ ও রসের মিশ্রণের প্রত্যেক পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় যে গুণ, শক্তি ও বৃত্তি অপ্রকাশিত ভাবে বিদ্যমান থাকে না—সেই গুণ, শক্তি অথবা বৃত্তি কোন পরবর্ত্তী অবস্থায় প্রকাশিত হইতে পারে না। কোন পরবর্ত্তী অবস্থায় কোন গুণ, শক্তি অথবা বৃত্তির প্রকাশ দেখিলেই বুঝিতে হয় যে—ঐ গুণ, শক্তি অথবা বৃত্তি কোন না কোন পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় অপ্রকাশিত ভাবে বিদ্যমান আছে।

আমরা এতাবৎ জমির উৎপত্তির ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে যে সমস্ত কথার আলোচনা করিয়াছি, সেই সমস্ত কথা হইতে তেজ ও রসের মিশ্রণের অদ্বৈত-অবস্থা হইতে দ্বৈত-অবস্থায় প্রকাশিত হইবার কার্য্য-ক্রম কি কি—তাহা সংক্ষিপ্তভাবে ধারণা করা যায়। দ্বৈত-অবস্থা হইতে বিচ্ছেদ-অবস্থায় তেজ ও রসের মিশ্রণ কোন্ কোন্ কার্য্য-ক্রমে প্রকাশিত হন, তাহার কোন কথাই আমরা এতাবৎ আলোচনা করি নাই। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণ, দ্বৈত-অবস্থা হইতে কোন্ কার্য্য-ক্রমে বিচ্ছেদ অবস্থায় প্রকাশিত হন—তাহা অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে জানা না থাকিলে জমির এবং তাহার উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি, রক্ষা ও পরিবর্ত্তনের কার্য্য-ক্রম কি কি তাহা বুঝা যায় না।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণ তাঁহাদের দ্বৈত-অবস্থা হইতে স্বতঃই বিচ্ছেদ-অবস্থায় প্রকাশিত হন কোন্ কোন্ কার্য্য-ক্রমে এবং তাহার পর তরল প্রভৃতি অবস্থার উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কার্য্য-ক্রমে, আমরা এক্ষণে তাহারই আলোচনা করিব।

তেজ ও রসের মিশ্রণ যখন তাঁহাদের দ্বৈত-অবস্থায় পরিণতি লাভ করেন, তখন প্রথমতঃ, তেজের পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হইবার কর্ম্মসমূহের উৎপত্তি হয়। তেজের পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হইবার কর্ম্মসমূহের উৎপত্তি হইলেই তেজের কর্ম্মসমূহ পৃথক্ হইয়া যায়। তেজের পৃথক ভাবে প্রকাশ হইবার কর্ম্মসমূহ পৃথক্ হইলে, রসের মিলিত থাকিবার কর্ম্মসমূহও পৃথক হয়।

তেজের কর্ম্ম ও রসের কর্ম্ম পৃথক হইলে, চলনশীলতার (dynamic-এর) উদ্ভব হয়। চলনশীলতার উদ্ভব হইলে তেজ ঊর্দ্ধমুখী এবং রস নিম্নমুখী হইয়া থাকেন।

তেজ ও রসের মিলিত থাকা সত্ত্বেও যখন তেজের ঊর্দ্ধমুখী এবং রসের নিম্নমুখী চলনশীলতার উৎপত্তি হয়, তখন তেজ ও রসের মিশ্রণের দেহে যে অবস্থা প্রকাশিত হয়, সেই অবস্থার নাম তেজ ও রসের মিশ্রণের "কাল-অবস্থা"।

পদার্থতত্ত্বে তেজ ও রসের মিশ্রণের যে অবস্থাকে "কাল অবস্থা" বলা হয়; সম্বন্ধতত্ত্বে সেই অবস্থাকে সংস্কৃত ভাষায় "আত্মা" বলিয়া অভিহিত করা হয়।

তেজ ও রসের মিশ্রণ তাঁহাদের কাল-অবস্থায় প্রকাশিত হইলে তেজের পৃথক্ভাবে প্রকাশিত হইবার বৃত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং তৎসঙ্গে রসেরও মিলিত ভাবে থাকিবার কর্ম্ম-তেজের পৃথক্ভাবে প্রকাশিত হইবার বৃত্তির অনুরূপ ভাবে চলিতে আরম্ভ করে।

উপরোক্ত কারণে তেজ ও রসের মিশ্রণ তাঁহাদের কাল-অবস্থায় প্রকাশিত হইলে দুই শ্রেণীর রাসায়নিক কার্য্যের সূচনা হয়। এই দুই শ্রেণীর রাসায়নিক কার্য্যকে সামবেদের ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের ভাষায় "কৃষ্ণ" ও "পিঙ্গল" বলিয়া অভিহিত করা হয়। দর্শন ও বিজ্ঞানের ভাষায় যাহাকে "উৎক্ষেপণ ও আকুঞ্চন" বলা হয়, সেই দুইটী কর্ম্মের মিলিত অবস্থা উপরোক্ত "কৃষ্ণ" নামক রাসায়নিক কার্য্যের পরিণতি। আর দর্শন ও বিজ্ঞানের ভাষায় যাহাকে 'অবক্ষেপণ' ও 'প্রসারণ' বলা হয়। সেই দুইটি কর্ম্মের মিলিত অবস্থা উপরোক্ত পিঙ্গল নামক রাসায়নিক কার্য্যের পরিণতি।

ইংরাজী Conics Section-এ যাহাকে "Hyperbola" বলা হয়, তাহাই সংস্কৃত ভাষায় "উৎক্ষেপ ও আকুঞ্চন" নামক দুইটী কর্ম্মের মিলিত অবস্থা। আর যাহাকে "Parabola" বলা হয়, তাহা সংস্কৃত ভাষায় "অবক্ষেপণ ও প্রসারণ" নামক দুইটী কর্ম্মের মিলিত অবস্থা।

উৎক্ষেপণ ও আকুঞ্চন (Hyperbolic work) এবং অবক্ষেপণ ও প্রসারণ (Parabolic work)—এই চারিটী কথা সাধারণতঃ চারিশ্রেণীর—আবয়বিক কর্ম্ম (Physical work) প্রকাশক বলিয়া মনে করা হয়। পাঠকগণকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কৃত্রিম পদার্থের—রাসায়নিক কর্ম্ম ছাড়া আবয়বিক কর্ম্ম হইতে পারে বটে, কিন্তু স্বভাবজাত পদার্থে রাসায়নিক কর্ম্ম ছাড়া নিছক আবয়বিক কর্ম্ম হইতে পারে না।

উৎক্ষেপণ ও আকুঞ্চন এবং অবক্ষেপণ ও প্রসারণ এই চারিটী কথায় চতুর্ব্বিধ আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্মের মিশ্রণ বুঝিতে হয়। ঐ চারিটী মিশ্রিত কর্ম্মে আবয়বিক কর্ম্মের আতিশয্য থাকে বলিয়া উহাদিগকে চতুর্ব্বিধ আবয়বিক কর্ম্ম বলিয়া ধরা হয়।

তেজ ও রসের মিশ্রণে তেজের পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হইবার বৃত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে এমন একটি ক্ষেত্রের উৎপত্তি হয় যে ক্ষেত্রে তেজ ও রস মিলিত অবস্থায় থাকে অথচ বিচ্ছেদের প্রবৃত্তিও অত্যন্ত প্রাবল্য লাভ করে। এই অবস্থায় গণিতশাস্ত্রসঙ্গত শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে কতিপয় রাসায়নিক (chemical) ও আবয়বিক (physical) কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। এই সমস্ত রাসায়নিক ও আবয়বিক কর্ম্ম এবং তাহাদের গণিতশাস্ত্রসঙ্গত শৃঙ্খলা স্পষ্ট ভাবে ধারণা করিতে না পারিলে একদিকে যেরূপ তেজ ও রসের মিশ্রণের 'কাল-অবস্থা' ও 'বিচ্ছেদ অবস্থা' পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় না; অন্যদিকে আবার জল ও ভূমি প্রভৃতির উৎপত্তি হয় কেন, তাহাও ধারণা করা যায় না।

উপরোক্ত রাসায়নিক ও আবয়বিক কর্ম্ম এবং তাহাদের গণিতশাস্ত্রসঙ্গত শৃঙ্খলা কোন লৌকিক ভাষায় সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করা সম্ভব যোগ্য নহে। উহা সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত হইয়াছে সামবেদে এবং ঈক্ষণমিতি (Conics Section) নামক শাস্ত্রে। ঈক্ষণমিতি স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যায় যে উহা প্রধানতঃ এক শ্রেণীর রাসায়নিক গণিতশাস্ত্র। প্রকৃতিজাত পদার্থসমূহের দেহে প্রতিনিয়ত যে সমস্ত রাসায়নিক কার্য্য চালতে থাকে এবং ঐ সমস্ত রাসায়নিক কার্য্যের ফলে যে সমস্ত আবয়বিক প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয় সেই সমস্ত রাসায়নিক কার্য্যের ও আবয়বিক প্রতিক্রিয়ার এবং উভয়ের সম্বন্ধের মধ্যে যে সমস্ত গণিতশাস্ত্রসঙ্গত শৃঙ্খলা বিদ্যমান আছে, সেই সমস্ত শৃঙ্খলার ব্যাখ্যা ঈক্ষণমিতির আলোচ্য বিষয়বস্তু।

ঈক্ষণমিতি জানা না থাকিলে মানুষের বহুবিধ প্রয়োজনীয় তত্ত্ব অজ্ঞাত থাকে, যথা—

(১) জল, স্থল এবং বাতাসকে সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ রখিবার পন্থা;

(২) জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকাশক্তি সর্ব্বতোভাবে অটুট রাখিবার পন্থা;

(৩) জমিজাত শস্য ফল, মূল ও শাক-সব্জী প্রভৃতি যাহাতে সর্ব্বতোভাবে মানুষের স্বাস্থ্যপ্রদ হয়, তাহা করিবার পন্থা;

(৪) কৃষিকার্য্য ও শিল্পকার্য্য এবং তজ্জাত পদার্থসমূহ যাহাতে মানুষের অস্বাস্থ্যকর না হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার পন্থা;

(৫) রাসায়নিক কার্য্য এবং রাসায়নিক কার্য্যজাত পদার্থসমূহ যাহাতে মানুষের অস্বাস্থ্যকর না হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার পন্থা;

(৬) মানুষের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছে অথবা অটুট রহিয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার পন্থা।

এক কথায় মানুষের সর্ব্ববিধ অভাব ও সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিয়া সর্ব্বরকমের ঐশ্বর্য্য ও সুখ সাধন করিতে হইলে যে জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহার মূল ঈক্ষণমিতির আলোচ্য বিষয়বস্তু। সন্দেহের অযোগ্য ঈক্ষণমিতির সম্পূর্ণতা সামবেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, প্রাতিশাখ্য, শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্রে সংস্কৃত ভাষায় কথিত আছে। আর কোন ভাষায় উহা অত সম্পূর্ণ ভাবে কথিত হইয়াছে কি না তাহা আমাদের জানা নাই।

পরিতাপের বিষয় এই যে, ভারতবাসিগণ সংস্কৃত ভাষাকে ভারতবর্ষের ভাষা বলিয়া মনে করেন বটে; কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় লিখিত "ঈক্ষণমিতি"—এই কথাটী পর্য্যন্ত মানুষের অবিদিত হইয়া পড়িয়াছে।

ইংরাজী ভাষায় যে Conics Section কলেজের ছাত্রগণকে পড়ান হয়, তাহাতে ঈক্ষণমিতির বিভিন্ন কথা, যথা: Parabola, Hyperbola, Ellipse, Focus, Direction, Axis, Vertex প্রভৃতি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উপরোক্ত Conics Section হইতে উপরোক্ত কথাসমূহের সর্ব্বতোভাবের তাৎপর্য্য ত দূরের কথা, কোন তাৎপর্য্য আদৌ বুঝা যায় না।

আমাদের অনুমান এই যে, ঈক্ষণমিতি যেরূপ সামবেদে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল, সেইরূপ হিব্রু ও আরবী এই দুইটি ভাষাতে কোন না কোন গ্রন্থে কথিত হইয়াছিল। উহা পরবর্ত্তী কালে হিব্রু ভাষা হইতে গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছিল। যাঁহারা হিব্রু ভাষা হইতে গ্রীক ভাষায় ঐ গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ গ্রন্থের প্রকৃত মর্ম্ম ধারণা করিতে অক্ষম ছিলেন। গ্রন্থের প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া উহার অনুবাদ করায়—অনুবাদে, গ্রন্থের আসল বক্তব্য পরিস্ফুট হয় নাই। ইংরাজী ভাষায় রচিত Conics Section গ্রীক ভাষায় রচিত উপরোক্ত গ্রন্থের অনুবাদ। গ্রীক ভাষায়

অনুদিত গ্রন্থ অস্পষ্ট হওয়ায় ইংরাজী ভাষার গ্রন্থও অবোধ্য হইয়াছে।

তেজ ও রসের মিশ্রণের কাল অবস্থায় তেজের পৃথক ভাবে প্রকাশিত হইবার বৃত্তি আরম্ভ হইলে রসের মিলিত থাকিবার প্রবৃত্তি বশতঃ তেজের ক্রম বৃদ্ধিমূলক যে রাসায়নিক কর্ম্মের উৎপত্তি হয়—সেই রাসায়নিক কর্ম্মের নাম "কৃষ্ণ"। তেজের পৃথক ভাবে প্রকাশিত হইবার বৃত্তির মাত্রা যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, রসের মিলিত থাকিবার প্রবৃত্তির মাত্রাও তত বৃদ্ধি পায়। রসের মিলিত থাকিবার প্রবৃত্তির মাত্রা যত বৃদ্ধি পায় "কৃষ্ণ" নামক কর্ম্মের মাত্রা তত বৃদ্ধি পায়।

তেজের পৃথক ভাবে প্রকাশিত হইবার প্রবৃত্তির মাত্রা যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে রসের মিলিত হইবার বৃত্তির মাত্রাও তদনুরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে বটে ; কিন্তু তেজের পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হইবার শক্তিও যত অধিক পরিমাণের হইয়া থাকে, রসের মিলিত থাকিবার শক্তি তত অধিক পরিমাণের হয় না।

তেজের পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হইবার বৃত্তি যত বৃদ্ধি পায়, তেজের প্রকাশিত হইবার শক্তিও তত বৃদ্ধি পায়, এবং রসের মিলিত থাকিবার প্রবৃত্তি তদনুরূপ মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু রসের মিলিত থাকিবার শক্তি তদনুরূপ কমিয়া যায়। রসের মিলিত থাকিবার শক্তি যত অধিক কমিয়া যায়, "কৃষ্ণ" নামক রাসায়নিক কর্ম্ম তত বৃদ্ধি পায়।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণ যখন দ্বৈত-অবস্থা হইতে কাল-অবস্থায় উপনীত হন তখন,

প্রথমতঃ—ঊর্দ্ধাধঃ চলনশীলতার উৎপত্তি হয়।

ঊর্দ্ধাধঃ চলনশীলতার উৎপত্তি হইলে,

দ্বিতীয়তঃ—"কৃষ্ণ" নামক রাসায়নিক কার্য্যের উৎপত্তি হয়।

"কৃষ্ণ" নামক রাসায়নিক কার্য্যের উৎপত্তি হইলে—

তৃতীয়তঃ—তেজ ও রসের মিশ্রণের দেহে উৎক্ষেপণ ও আকুঞ্চন নামক দুইটি কর্ম্মের উৎপত্তি হয়।

উৎক্ষেপণ ও আকুঞ্চন নামক কর্ম্মের উৎপত্তি হইলে,

চতুর্থতঃ—কাল ও অবস্থার তেজ ও রসের মিশ্রণের দেহে "পিঙ্গল" নামক রাসায়নিক কার্য্যের উৎপত্তি হয়। "পিঙ্গল" নামক রাসায়নিক কার্য্যের উৎপত্তি হইলে,

পঞ্চমতঃ—কাল-অবস্থার তেজ ও রসের মিশ্রণের দেহে অবক্ষেপণ ও প্রসারণ নামক দুইটি আবয়বিক কর্ম্মের উৎপত্তি হয়।

"কৃষ্ণ" ও "পিঙ্গল" নামক দুই শ্রেণীর রাসায়নিক কার্য্যে এবং উৎক্ষেপণ, আকুঞ্চন, অবক্ষেপণ ও প্রসারণ এই চারি শ্রেণীর আবয়বিক কর্ম্ম কালাবস্থার তেজ ও রসের মিশ্রণে চলিতে থাকিলে,

ষষ্ঠতঃ—ঐ মিশ্রণের দেহের তেজ ও রসের বিচ্ছিন্নতার সূচনা হয়। তেজ ও রসের মিশ্রণের অণ্ডাকারের দেহে তেজ ও রসের বিচ্ছিন্নতার সূচনা হইলে,

সপ্তমতঃ—রসাংশ তাহার গুরুত্ববশতঃ ঐ অণ্ডাকারের দেহের কটিদেশের নিম্নভাগে পুঞ্জীভূত হইবার জন্য চলনশীল হয় এবং তেজাংশ অণ্ডাকার দেহের সর্ব্বত্র ঊর্দ্ধগামী হইয়া চলনশীল হয়।

কালাবস্থার তেজ ও রসের মিশ্রণের অণ্ডাকারের দেহে পৃথক্ ভাবে তেজ ও রসের কর্ম্ম আরম্ভ হইলে এবং উহার কটিদেশের নিম্নভাগে রসপুঞ্জের সঞ্চয়াতিশয্য হইলে,

অষ্টমতঃ—অণ্ডাকারের দেহের কটিদেশের নিম্নভাগ কৃষ্ণ ও পিঙ্গল নামক দুই শ্রেণীর রাসায়নিক কার্য্য এবং উৎক্ষেপণাদি চারি শ্রেণীর আবয়বিক কর্ম্মবশতঃ বাষ্পময় হয়। সংস্কৃত ভাষায় এই বাষ্পকে "অম্বু" বলা হয়।

কালাবস্থার তেজ ও রসের মিশ্রণের অণ্ডাকারের দেহে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তেজ ও রসের কর্ম্ম আরম্ভ হইলে এবং উহার কটিদেশের নিম্নভাগে বাষ্পের উৎপত্তি হইলে,

নবমতঃ—ঐ কটিদেশের নিম্নভাগে উপরোক্ত "কৃষ্ণ" ও "পিঙ্গল" নামক দুই শ্রেণীর রাসায়নিক কার্য্য বশতঃ রসাতিশয্যপ্রসূত বাষ্পের সহিত তেজের সংযোগে অগ্নি অথবা বহ্নির উৎপত্তি হয়। কয়লা অথবা কাষ্ঠের সহিত তেজের সংযোগ হইতে অথবা এই ভূ-মণ্ডলস্থ বৈজ্ঞানিকগণের বাষ্পের সহিত তেজের সংযোগ হইতে অথবা বৈদ্যুতিক (electric) কার্য্য হইতে যে শ্রেণীর অগ্নির উৎপত্তি হয় সেই শ্রেণীর অগ্নি, আর, কালাবস্থায়—তেজ ও রসের মিশ্রণের অণ্ডাকারের দেহের কটিদেশের নিম্নভাগে রসাতিশয্য-প্রসূত বাষ্পের সহিত তেজের সংযোগে যে প্রাকৃতিক অগ্নির উৎপত্তি হয় সেই স্বভাব-প্রসূত অগ্নি—এক শ্রেণীর নহে। উপরোক্ত কৃত্রিম ও স্বাভাবিক এই দুই শ্রেণীর অগ্নিরই দাহিকা-শক্তি আছে। দাহিকা-শক্তি বিষয়ে কৃত্রিম অগ্নি ও স্বাভাবিক অগ্নি সাদৃশ্যযুক্ত। দুই শ্রেণীর অগ্নির প্রভেদ এই যে, কৃত্রিম অগ্নির দহনে যে জ্বালা আছে, স্বাভাবিক অগ্নির দহনে সে জ্বালা বিদ্যমান থাকে না। ইহার কারণ, কৃত্রিম অগ্নির দেহ এক শ্রেণীর বিষের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে। তাহাতে মানুষের মরণ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। স্বাভাবিক অগ্নির দেহে কোন শ্রেণীর বিষ বিদ্যমান থাকে না। উহা অসমতা অথবা বিষমতা প্রাপ্ত না হইলে কখনও মানুষের কোনরূপ অহিতকারী হইতে পারে না। পরন্তু, মানুষের সর্ব্বতোভাবে হিতকারী হইয়া থাকে।

কালাবস্থায় তেজ ও রসের মিশ্রণের অণ্ডাকারের দেহের কটিদেশের নিম্নভাগে রসাতিশয্য প্রসূত বাষ্পের সহিত তেজের সংযোগে যে প্রাকৃতিক অগ্নির উৎপত্তি হয় সেই স্বভাবপ্রসূত অগ্নি অনেক রকমে স্বাস্থ্যবান্ মানুষের জঠরাগ্নির সহিত সাদৃশ্যযুক্ত।

স্বাভাবিক অগ্নির উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে এবং কোন্ কোন্ কার্য্যনিয়মে—তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা থাকিলে, যাহাতে মানুষের কোনরূপ অপকারী না হয় তাদৃশ ভাবে কৃত্রিম অগ্নির উৎপাদন করা সম্ভব হয়। যাহাতে মানুষের কোনরূপ অপকারী না হয় তাদৃশ ভাবে কৃত্রিম অগ্নির উৎপাদনে কোনরূপ খনিজ তৈল অথবা খনিজ স্নেহপদার্থ অথবা খনিজ কোন পদার্থের ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয় না। খনিজ কোন পদার্থের সহিত তেজ সংযোগে যে অগ্নির উৎপত্তি হয় সেই অগ্নির বিষাক্ততা অনিবার্য্য। ইহার কারণ খনিজ পদার্থের মধ্যে যাহারা সহজেই দাহ্য (inflamable) তাহারা স্বভাবতঃ মানুষের শরীরের ও মনের অস্বাস্থ্যকর। ঐ সমস্ত দাহ্য পদার্থ যে স্বভাবতঃ মানুষের শরীরের ও মনের অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে তাহার স্বাভাবিক কারণ আছে। ঐ সমস্ত স্বাভাবিক কারণের ব্যাখ্যা করিতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়। প্রবন্ধান্তরে উহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধে ঐ সম্বন্ধে আর বেশী কথা বলা চলে না।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের বৈদ্যুতিক ও ষ্টীমের কলের সাহায্যে যে সমস্ত কার্য্য করা হইতেছে সেই সমস্ত কার্য্য আপাতঃ-দৃষ্টিতে মানুষের খুবই সুবিধা ও বিস্ময়ের উৎপাদক, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সমস্ত কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, উহার প্রত্যেকটী মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারক এবং জমির উৎপাদিকা-শক্তির বিষমতাসাধক। উহার প্রত্যেকটী যে জমির উৎপাদিকা-শক্তির বিষমতাসাধক হইতে বাধ্য তৎসম্বন্ধে আমরা ইহার পর বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

যাহাতে মানুষের কোনরূপ অপকার না হইতে পারে, সেইরূপ কৃত্রিম অগ্নি উৎপাদন করিবার যে সঙ্কেত আছে—সেই সঙ্কেত মানুষের জানা থাকিলে বৈদ্যুতিক ও ষ্টীমের কার্য্যসমূহ যাহাতে মানুষের শরীরের অথবা মনের কোনরূপ অনিষ্টসাধক না হয় তাহা করা সম্ভবযোগ্য হয়।

কালাবস্থার তেজ ও রসের মিশ্রণের অণ্ডাকারের দেহে অগ্নির উৎপত্তি হইলে রসাতিশয্য-প্রসূত বাষ্প জলাকারে পরিণত হইতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে ক্রমে মহাসমুদ্রের রূপ ধারণ করে।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রস যখন মিলিত আকার হইতে জল-আকারে পরিণত হয় তখন উহারা বিচ্ছেদ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, ইহা বলা হয়।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রস যখন বাষ্পীয় অবস্থা হইতে জল-অবস্থায় পরিণত হন, তখন আর উঁহাদের বায়বীয় অণ্ডাকারের দেহ বিদ্যমান থাকে না। তেজ ও রসের মিশ্রণের অদ্বৈত-অবস্থা, মায়া-অবস্থা, দ্বৈত-অবস্থা এবং কাল-অবস্থার যে যে শ্রেণীর বায়বীয় অণ্ডাকারের দেহ বিদ্যমান থাকে, সেই দেহ বিচ্ছেদ-অবস্থায় উপনীত হইলে তরল অণ্ডাকারের দেহে পরিণত হয়।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রস যখন বাষ্পীয়-অবস্থা আকার হইতে জল-আকারে উপনীত হন, তখন রস জলাকারে এবং তেজ অগ্নি-আকারে পরিণতি লাভ করিয়া বিচ্ছেদ-অবস্থা লাভ করেন। রস জলাকার ধারণ করায় এবং তেজ অগ্নি-আকার ধারণ করায় তেজ ও রসের মিলিতাকারের বিচ্ছেদ অবস্থার উদ্ভব হয় বটে কিন্তু তেজ ও রসের সর্ব্বতোভাবের বিচ্ছেদ কোন অবস্থাতেই ঘটিতে পারে না। উহার রস যখন জলাকার ধারণ করেন, তখন জলের মধ্যে রসাতিশয্য বিদ্যমান থাকে বটে ; কিন্তু জল সর্ব্বতোভাবে তেজ-শূন্য হয় না। সেইরূপ তেজ যখন অগ্নির আকার, অথবা বিদ্যুৎ-আকার ধারণ করেন, তখন ঐ অগ্নি ও বিদ্যুতের মধ্যে তেজাতিশয্য বিদ্যমান থাকে বটে ; কিন্তু অগ্নি ও বিদ্যুৎ সর্ব্বতোভাবে রস-শূন্য হয় না। এইরূপ ভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক স্বভাবজাত পদার্থের দেহের কতকগুলি অংশে তেজাতিশয্য বিদ্যমান থাকে, আর কতকগুলি অংশে রসাতিশয্য বিদ্যমান থাকে বটে ; কিন্তু কোন পদার্থের কোন অংশই উহা তেজাতিশয্যযুক্তই হউক অথবা রসাতিশয্যযুক্তই হউক—সর্ব্বতোভাবে তেজ অথবা রস-শূন্য নহে। স্বভাবজাত কোন পদার্থ কখনও সর্ব্বতোভাবে তেজ অথবা রস-শূন্য হইতে পারে না অথবা তেজের বিচ্ছেদমূলক প্রযত্ন থাকিলে তেজ ও রসের সর্ব্বতোভাবের বিচ্ছেদ কুত্রাপি ঘটিতে পারে না—এই কথাটি যে কেবলমাত্র স্বভাবজাত জীবিত পদার্থের পক্ষে সত্য, তাহা নহে, উহা স্বভাবজাত মৃত পদার্থের পক্ষেও সত্য।

এই ভূ-মণ্ডলের প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের মধ্যে যে সমস্ত পদার্থের মরণ হয়, তাহারা সাধারণতঃ স্থূলশরীরযুক্ত। যে সমস্ত পদার্থ তরল অথবা বায়বীয়, তাহাদিগের পরিবর্ত্তন হয় বটে ; কিন্তু সর্ব্বতোভাবে মরণ হয় না। স্থূলশরীরযুক্ত পদার্থ-সমূহের বহিরাবরণ স্থূল বটে ; কিন্তু তাহাদিগের প্রত্যেকের অভ্যন্তরে তরল ও বায়বীয় অংশ বিদ্যমান থাকে। উহাদিগের (অর্থাৎ স্থূলশরীরযুক্ত পদার্থসমূহের) মরণ হইলে উহাদিগের শরীরের স্থূলাংশ ও তরলাংশ সর্ব্বতোভাবে তেজশূন্য হয় বটে ; কিন্তু বায়বীয় অংশ সর্ব্বতোভাবে তেজশূন্য হয় না।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণে যে তেজ বিদ্যমান থাকেন তাঁহার বিচ্ছিন্ন হইবার প্রযত্নের এবং বিচ্ছেদ-অবস্থার বিদ্যমানতা সত্ত্বেও এই ব্রহ্মাণ্ডের কোন পদার্থ ই সর্ব্বতোভাবে তেজ অথবা রসশূন্য থাকিতে পারে না কেন এবং যেখানে তেজ সেইখানেই রস থাকে কেন তাহা মানুষের জানিবার বিষয়। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের বিচ্ছেদ অবস্থায় অথবা বায়বীয় অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় উপনীত হইবার পর যে সমস্ত পরিণতি হইয়া থাকে সেই সমস্ত পরিণতির কার্য্যকারণ শৃঙ্খলানুসারে জানা থাকিলে উপরোক্ত তথ্য জানা যায়।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণের বিচ্ছেদ-অবস্থার প্রকাশ হইলে এবং মহাসমুদ্রের উৎপত্তি হইলে তেজ ও রসের কি কি পরিণতির এবং কার্য্যের উদ্ভব হয়, আমরা অতঃপর তাহার আলোচনা করিব।

মহাসমুদ্রের উৎপত্তি হইলে উহার নিম্নস্থ "অগ্নির" তেজ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কাল-অবস্থার অণ্ডাকারের তেজ ও রসের মিশ্রণের কটিদেশের নিম্নভাগ উপরোক্ত অগ্নির তেজ এবং মহাসমুদ্রের বিদ্যমানতাবশতঃ প্রতিক্রিয়া-যুক্ত হইতে থাকে এবং তেজ-বৃদ্ধিমূলক নূতন একটী রাসায়নিক কার্য্যের উদ্ভব হয়। নূতন এই রাসায়নিক কার্য্যের নাম সংস্কৃত ভাষায় "ঋত"।

উপরোক্ত তেজ-বৃদ্ধিমূলক "ঋত" নামক রাসায়নিক কার্য্য এবং মহাসমুদ্রের ভার (weight) এই দুইটীর বিদ্যমানতা নিবন্ধন নিম্নদিকে রস ও তেজের মিশ্রণের কাল-ক্ষেত্রে, দ্বৈত-ক্ষেত্রে এবং মায়া-ক্ষেত্রে নূতন নূতন প্রতিক্রিয়াসমূহের উদ্ভব হইতে থাকে। এই প্রতিক্রিয়াসমূহের উদ্ভবের ফলে তেজের সহিত রসের সমতা প্রযত্নমূলক একটী নূতন রাসায়নিক কার্য্যের উদ্ভব হয়। নূতন এই রাসায়নিক কার্য্যটীর নাম সংস্কৃত ভাষায় "সত্য"।

কালাবস্থার মিলিত তেজ ও রসের অণ্ডাকারের ক্ষেত্রের কটিদেশের নিম্নভাগে—বিচ্ছেদ-অবস্থার অথবা মহাসমুদ্রের উৎপত্তি হইলে "ঋত" নামক তেজ-বৃদ্ধিমূলক এবং "সত্য" নামক রসের সমতা প্রযত্নমূলক দুই শ্রেণীর রাসায়নিক কার্য্যের বিদ্যমানতাবশতঃ তেজ ও রসের একটী নূতন ভাবের মিশ্রণ আরম্ভ হয়। "ঋত" নামক তেজ-বৃদ্ধিমূলক এবং "সত্য" নামক রসের সমতা প্রযত্নমূলক রাসায়নিক কার্য্যের বিদ্যমানতাবশতঃ তেজ ও রসের যে নূতন ভাবের মিশ্রণ আরম্ভ হয়, সেই মিশ্রণের ফলে মহাসমুদ্রের কেন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া আয়তনে মহাসমুদ্রের এক-চতুর্থাংশ বিস্তৃতি লাভ করিয়া স্থূল অণ্ডাকারে কাল-ক্ষেত্রের উপরিভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া স্থলের অথবা ভূমির উৎপত্তি হয়। ইহাই ক্রমে ক্রমে মহাদেশসমূহে পরিণতি লাভ করে। সংস্কৃত ভাষায় ইহার অপর নাম "পৃথিবী"।

"পৃথিবী", "মহাসমুদ্র" ও "মহাকাশ"—এই তিনের সমষ্টিগত ক্ষেত্রের নাম "ভূ-মণ্ডল"। পৃথিবী, মহাসমুদ্র ও মহাকাশ এই তিনের অভ্যন্তরস্থ গণিত-শাস্ত্রসঙ্গত শৃঙ্খলাযুক্ত চলনশীলতার (Dynamicness-এর) নাম "জগৎ"।

বায়বীয় কাল-ক্ষেত্রের রূপ যে রকম বায়বীয় অণ্ডের (Eliptical) মত, তরল বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রের রূপ যে রকম তরল অণ্ডের মত (Eliptical), সেই রকম পৃথিবীর রূপ স্থূল অণ্ডের মত।

বায়বীয় কাল-ক্ষেত্র, বাষ্পীয় বিচ্ছেদ-ক্ষেত্র, তরল মহাসমুদ্র এবং স্থূল পৃথিবী—এই চারিটী ক্ষেত্রের রূপ তিন দিক হইতে দেখা যায়। যথা, (১) ঊর্দ্ধাধঃ, (২) পূর্ব্ব-পশ্চাৎ এবং (৩) উত্তর-দক্ষিণ। উপরোক্ত ত্রিবিধ রূপ অণ্ডাকারের (of the shape of an Ellipse)।

এই ভূ-মণ্ডলের যে কোন অংশ হইতে কাল-ক্ষেত্র, (বায়বীয়-ক্ষেত্র), বিচ্ছেদ-ক্ষেত্র, (বাষ্পীয়-ক্ষেত্র), তরল-ক্ষেত্র এবং পৃথিবীর সমগ্র অবয়ব মানুষ যাহাতে নিজ নিজ চক্ষুদ্বারা দেখিতে সক্ষম হইতে পারে—তাহার সঙ্কেত আছে। এই সঙ্কেতের কথা আমরা "দেব-দেবীর পূজাসংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানে"র আলোচনায় বিবৃত করিব।

পৃথিবীকে কমলালেবুর আকারের মনে করা একটা কাল্পনিক অনুমান মাত্র। পৃথিবীর অভ্যন্তরে এবং সমগ্র পৃথিবীর বহিঃসীমানায় যে সমস্ত রাসায়নিক (chemical) এবং আবয়বিক (physical) কর্ম্ম (work) ও গমন (motion) প্রকৃতির নিয়মে গণিত-শাস্ত্রসঙ্গত শৃঙ্খলায় সাধিত হইয়া থাকে সেই সমস্ত রাসায়নিক এবং আবয়বিক কর্ম্মের ও গমনের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে পৃথিবীর রূপ যে কমলালেবুর মত হইতে পারে না ; পরন্তু, অণ্ডাকারের মত হইতে বাধ্য — তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে হয়।

আমাদিগের মতে বর্ত্তমানের বিজ্ঞানের খেলা কুত্রাপি বিচার-শক্তি-যুক্ত মানুষের মস্তিষ্কের খেলার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত নহে। বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজে পৃথিবীর যে মানচিত্র (Map) প্রচারিত আছে তাহা আমাদিগের উপরোক্ত মন্তব্যের একটী সাক্ষ্য।

একটু বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, পৃথিবীর মানচিত্র পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইতে বাধ্য। ইহার কারণ—পৃথিবীর বহিঃসীমানা পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা, (১) উপরিভাগ, (২) সম্মুখভাগ, (৩) দক্ষিণভাগ, (৪) পশ্চাৎভাগ, (৫) উত্তরভাগ। পৃথিবীর রূপ কমলালেবুর মতই হউক অথবা অণ্ডের মতই হউক—উহার মানচিত্র পাঁচ ভাগে বিভক্ত না করিলে উহার যথাযথ রূপ ধারণা করা যায় না। অথচ প্রচলিত মানচিত্রে পৃথিবীকে দুই ভাগে (Hemi-

sphere) বিভক্ত করিয়া একটী সমতল-ক্ষেত্রের চিত্রের ন্যায় চিত্রিত করা হইয়াছে। পৃথিবী কমলালেবুর আকারের হইলেও একটী সমতল-ক্ষেত্র হইতে পারে না।

পৃথিবীর মানচিত্র যথাযথ ভাবে ধারণা করিতে না পারিলে জমির অথবা তাহার উৎপাদিকা শক্তির উৎপত্তি, রক্ষা ও পরিবর্ত্তনসমূহ প্রাকৃতিক কোন্ কোন্ কার্য্য-শৃঙ্খলায় হইয়া থাকে, তাহা বুঝা যায় না; তাহা ছাড়া, পৃথিবীর কোন্ অংশের গুণ, শক্তি ও বৃত্তি অন্যান্য অংশের তুলনায় কিরূপ হওয়া সম্ভবযোগ্য, তাহাও পৃথিবীর মানচিত্র যথাযথ ভাবে ধারণা করিতে না পারিলে বুঝিতে পারা যায় না। পৃথিবীর কোন্ অংশের গুণ, শক্তি ও বৃত্তি অন্যান্য অংশের তুলনায় কিরূপ হয়—তাহা নির্দ্ধারণ করিতে না পারিলে সমগ্র পৃথিবীর সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সমৃদ্ধি সাধন করিতে হইলে কোন্ দেশের অথবা কোন্ দেশের মানুষের কতখানি দায়িত্ব তাহা নিরূপণ করা যায় না!

উপরোক্ত কারণে, আমরা ভূমির উৎপত্তির কথার আলোচনায় পৃথিবীর প্রচলিত মানচিত্রের বিষয়ে যে সমস্ত ভ্রান্তি আছে তাহার কথাও উত্থাপন করিয়াছি। পাঠকগণকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পরস্পরের সম্বন্ধ, উহার বর্ত্তমান মানচিত্র হইতে নির্ভুলভাবে ধারণা করা যায় না।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মিশ্রণে বিচ্ছেদ-অবস্থার এবং তরল-অবস্থার অথবা মহাসমুদ্রের উৎপত্তি হইলে কালক্ষেত্রের অংশবিশেষে "ঋত" এবং "সত্য" নামক নিম্নগামী ও ঊর্দ্ধগামী রাসায়নিক দুইটী কার্য্যের ফলে একদিকে যেরূপ পৃথিবীর অথবা ভূমির উৎপত্তি হয়—সেইরূপ আবার দ্বৈত ক্ষেত্রান্তর্গত "ভানুক্ষেত্র" এবং "শশিক্ষেত্র"ও প্রাতক্রিয়ান্বিত হয়। কালক্ষেত্রের উপরোক্ত—"ঋত" ও "সত্য" নামক দুইটী রাসায়নিক কার্য্যের ফলে ভানুক্ষেত্র ও শশিক্ষেত্র প্রতি-ক্রিয়ান্বিত হইলে ঐ দুইটী ক্ষেত্রের সর্ব্বতোভাবে সূর্য্য ও চন্দ্ররূপে প্রকাশ হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়। ঐ দুইটী ক্ষেত্রের প্রকাশ হওয়া সম্ভবযোগ্য হইলে কতিপয় রাসায়নিক ও আবয়বিক কার্য্যের নিবন্ধন উহাদের উদয় ও অস্ত অনিবার্য্য হইয়া থাকে। সূর্য্য ও চন্দ্রের উদয় ও অস্তের কথা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইলে, প্রকৃতিজাত পদার্থের রসায়নতত্ত্ব ও আবয়বিক কর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা জানিবার প্রয়োজন হয়। এই কথাগুলি একদিকে অত্যন্ত দুরূহ অঙ্কশাস্ত্রের কথা, অন্য-দিকে আবার, পারিভাষিক শব্দ ছাড়া ঐ কথাগুলি প্রকাশ করা সম্ভবযোগ্য নহে। সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রকাশ অথবা উদয় ও অস্তের কথা ব্যাখ্যা করিতে বসিলে প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। এই কারণে আমরা এই প্রবন্ধে সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রকাশ অথবা উদয় ও অস্তের কথায় আর বেশীদূর অগ্রসর হইব না।

পাঠকগণকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রকাশে এবং উদয়ে ও অস্তে যে সমস্ত রাসায়নিক ও আবয়বিক কার্য্য বিদ্যমান থাকে, সেই সমস্ত রাসায়নিক ও আবয়বিক কার্য্যের এবং ভূমির ও তাহার উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি, অস্তিত্ব ও পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

পৃথিবী অথবা ভূমির উৎপত্তি সম্বন্ধে এ যাবৎ যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, আমরা এখানে সেই সমস্ত কথা একত্রিত করিয়া পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের কাল-অবস্থায় পরিণতি লাভ করিবার পর উহাদের যে যে কার্য্য-ক্রমে পৃথিবী অথবা ভূমির উৎপত্তি হয়, সেই সেই কার্য্য-ক্রমের মধ্যে প্রধান প্রধান উল্লেখযোগ্য কার্য্য-ক্রম বারটী, যথা,—

(১) কাল-অবস্থায় অথবা কাল-ক্ষেত্রে তেজের বিচ্ছিন্ন হইবার আবয়বিক কর্ম্ম ও গমনের প্রবৃত্তি। ইহার ফলে তেজ ও রসের কাল-অবস্থার বায়বীয় দেহে উৎক্ষেপণ ও আকুঞ্চন আকারের কর্ম্ম ও গমনের প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়।

(২) কাল-অবস্থায় অথবা কাল-ক্ষেত্রে রসের মিলন রাখিবার আবয়বিক কর্ম্ম ও গমন। ইহার ফলে তেজ ও রসের কাল-অবস্থার বায়বীয় দেহে অবক্ষেপণ ও প্রসারণ আকারের কর্ম্ম ও গমনের উৎপত্তি হয়।

(৩) কাল-অবস্থায় অথবা কাল-ক্ষেত্রে তেজের বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য "কৃষ্ণ" নামক রাসায়নিক কর্ম্ম ও গমনের প্রবৃত্তি। ইহার ফলে কাল-ক্ষেত্রে বায়বীয় অগ্নির উৎপত্তি হয়।

(৪) কাল-অবস্থায় অথবা কাল-ক্ষেত্রে রসের মিলিত হইবার জন্য "পিঙ্গল" নামক রাসায়নিক কর্ম্ম ও গমন। ইহার ফলে বাষ্পের অথবা বিচ্ছেদ অবস্থার উৎপত্তি হয়।

(৫) বিচ্ছেদ-অবস্থায় অথবা বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রে তেজের বিচ্ছিন্ন ভাবে আবয়বিক কর্ম্ম, গমন ও চলনশীলতার প্রবৃত্তি। ইহার ফলে তেজ ও রসের বিচ্ছেদ অবস্থার বাষ্পীয় দেহে উৎক্ষেপণ ও আকুঞ্চন আকারের কর্ম্ম, গমন ও চলনশীলতার প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়।

(৬) বিচ্ছেদ-অবস্থায় অথবা বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রে রসের মিলিত থাকিবার জন্য আবয়বিক কর্ম্ম ও গমন। ইহার ফলে তেজ ও রসের বিচ্ছেদ-অবস্থার বাষ্পীয় দেহে, অবক্ষেপণ ও প্রসারণ আকারের কর্ম্ম ও গমনের উৎপত্তি হয়।

(৭) বিচ্ছেদ-অবস্থায় ও বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রে তেজের বিচ্ছিন্নভাবে 'বিরূপাক্ষ' নামক রাসায়নিক কর্ম্মের ও গমনের প্রবৃত্তি। ইহার ফলে, বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রের বাষ্পীয় অগ্নির উৎপত্তি হয়।

(৮) বিচ্ছেদ-অবস্থায় ও বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রে রসের মিলিত থাকিবার জন্য "বিশ্বরূপ" নামক রাসায়নিক কর্ম্মের ও গমনের প্রবৃত্তি। ইহার ফলে জলের অথবা তরল-অবস্থার উৎপত্তি হয়।

(৯) তরল-অবস্থায় অথবা তরল-ক্ষেত্রে তেজের বিচ্ছিন্ন ভাবে আবয়বিক কর্ম্ম, গমন ও চলনশীলতার প্রবৃত্তি। ইহার ফলে তেজ ও রসের বিচ্ছেদ অবস্থার তরল-দেহে উৎক্ষেপণ ও আকুঞ্চন আকারের কর্ম্ম, গমন ও চলন-শীলতার প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়।

(১০) তরল-অবস্থায় অথবা তরল-ক্ষেত্রে রসের মিলিত থাকিবার জন্ম আবয়বিক কর্ম্ম ও গমন। ইহার ফলে তেজ ও রসের বিচ্ছেদ-অবস্থার তরল দেহে অবক্ষেপণ ও প্রসারণ আকারের কর্ম্ম ও গমনের উৎপত্তি হয়।

(১১) তরল-অবস্থায় অথবা তরল-ক্ষেত্রে তেজের বিচ্ছিন্ন ভাবে "ঋত" নামক রাসায়নিক কর্ম্ম ও গমনের প্রবৃত্তি। ইহার ফলে তরল অবস্থার ও তরলক্ষেত্রের আগ্নর উৎপত্তি হয়।

(১২) তরল-অবস্থায় অথবা তরল-ক্ষেত্রে রসের মিলিত থাকিবার জন্ম "সত্য" নামক রাসায়নিক কর্ম্ম ও গমনের প্রবৃত্তি। ইহার ফলে স্থূল-অবস্থার অথবা স্থলের উৎপত্তি হয়।

আমরা অতঃপর জমির রক্ষা স্বভাবতঃ সাধিত হয় কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে তাহার কথা আলোচনা করিব।

এই আলোচনায় "পৃথিবী" "জমি", "ভূমি", "মহাদেশ" —এই চারিটী শব্দ মূলতঃ একই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। এই চারিটী শব্দের অর্থে যে কোন প্রভেদ নাই তাহা নহে। ঐ চারটী শব্দের অর্থে যে প্রভেদ আছে তাহা আমাদের এই আলোচনায় গণনা করিবার প্রয়োজন হয় না।

"তরল-অবস্থা" "জল" "মহাসমুদ্র" এবং "সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের বিচ্ছেদ-অবস্থা"—এই চারিটী শব্দও একই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। এই চারিটী শব্দের অর্থেও প্রভেদ আছে। এই প্রভেদ আমরা এই আলোচনায় গণনা করিতেছি না।

জমির রক্ষা স্বতঃই হইয়া থাকে কোন্ কোন্ কার্য্য-প্রণালীতে, তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে জমির স্বাভাবিক উৎপত্তিতে যে বারটী প্রধান প্রধান কার্য্য-ক্রম আছে, সেই বারটী প্রধান প্রধান কার্য্য-ক্রমের কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হয়।

জমির রক্ষা স্বভাবতঃ সাধিত হয় কোন্ কোন্ কার্য্য-ক্রমে তাহা বুঝিতে হইলে মহাসমুদ্রের স্বাভাবিক অবস্থা স্বতঃই রক্ষিত হয় স্বভাবতঃ কোন্ কোন্ কার্য্য-ক্রমে তাহা আগে পরিজ্ঞাত হইতে হয়।

মহাসমুদ্রের উৎপত্তি অথবা সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের বিচ্ছেদ-অবস্থার প্রকাশ হইলে তেজ তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মানুসারে অধিকতর বৃদ্ধি পাইবার জন্ম এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে রস হইতে অধিকতর বিচ্ছিন্ন হইবার জন্ম প্রযত্নশীল হন্। এই প্রযত্নশীলতার পরিণতিতে বাষ্পীয়ক্ষেত্রে প্রথমতঃ, চতুর্ব্বিধ আবয়বিক কর্ম্মের এবং দ্বিতীয়তঃ, দ্বিবিধ রাসায়নিক কার্য্যের উৎপত্তি হয়। তেজের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং উপরোক্ত রাসায়নিক কার্য্যের কথা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যায় যে, তরল-অবস্থার উৎপত্তি হইলে ঐ তরল-অবস্থা পুনরায় বাষ্পাবস্থায় পরিণতি লাভ করিবার জন্ম প্রযত্নশীল হয়। কিন্তু তথাপি যে উহা বাষ্পে পরিণত না হইয়া তরল রূপে অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হয়, তাহার প্রধান কারণ তরল অবস্থার ভারের (weight-এর) বিদ্যমানতা।

তরল অবস্থার উৎপত্তি হইবার পর তেজের রুদ্র মূর্ত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধ পায় বটে, কিন্তু তরল অবস্থার ভার (weight) বশতঃ কাল-ক্ষেত্রের নিম্নভাগ প্রসারিত হয় এবং উহা দ্বৈত-ক্ষেত্রের অধিকতর সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়। দ্বৈত-ক্ষেত্রের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইলে দ্বৈত-ক্ষেত্রও প্রসারণ (expansion) লাভ করে এবং ঐ প্রসারণের ফলে উহা অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী মায়া ক্ষেত্রের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়। মায়া-ক্ষেত্রের সান্নিধ্য-প্রাপ্ত হইলে, মায়া-ক্ষেত্র, দ্বৈত-ক্ষেত্র এবং কাল-ক্ষেত্র এই তিনটী মিলিত হইয়া বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রের ঊর্দ্ধাধঃ কর্ম্ম, গমন-শীলতা ও চলন-শীলতাকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে অণ্ডাকারের কর্ম্ম, গমন-শীলতা ও চলন-শীলতায় পরিণত হইতে বাধ্য করে।

বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রের ঊর্দ্ধাধঃমুখী কর্ম্ম, গমন-শীলতা ও চলন-শীলতা কথঞ্চিৎ পরিমাণে—অণ্ডাকারের কর্ম্ম, গমনশীলতা ও চলনশীলতায় পরিণতি লাভ করিলে তেজের রুদ্রমূর্ত্তির প্রচণ্ডতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এইরূপে বিচ্ছেদ অবস্থায় তেজের যে রুদ্রমূর্ত্তি বশতঃ তরলের অথবা জলের বাষ্পে পরিণতি লাভ করা অবশ্যম্ভাবী হয়, সেই রুদ্রমূর্ত্তির জন্যই কাল-ক্ষেত্র, দ্বৈত-ক্ষেত্র এবং মায়া-ক্ষেত্রের পরস্পরের সান্নিধ্য ঘটিয়া থাকে এবং বিচ্ছেদ অবস্থার ঊর্দ্ধাধঃ কর্ম্ম, গমন ও চলন-শীলতার অর্দ্ধেকাংশ অণ্ডাকারের কর্ম্ম, গমন ও চলনশীলতায় পরিণতি লাভ করে।

বিচ্ছেদ অথবা তরল অবস্থার রক্ষা স্বভাবতঃ কিরূপে সাধিত হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত উত্তর একটী, যথা :—

বিচ্ছেদ অথবা তরল অবস্থার ঊর্দ্ধাধঃ কর্ম্ম, গমন ও চলন-শীলতার এবং অণ্ডাকারের কর্ম্ম, গমন ও চলনশীলতার সমতা।

কথাটী আরও স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইলে বলিতে হয় যে, মহাসমুদ্রের এবং এই ভূমগুলের যে সমস্ত তরল অবস্থার পদার্থ আছে, তাহার প্রত্যেকটীর দেহে কতকগুলি গুণ, শক্তি ও বৃত্তি আছে। ঐ গুণ, শক্তি ও বৃত্তি ছাড়া প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক তরল অবস্থার পদার্থের দেহে কর্ম্ম, গমন ও চলনশীলতা বিদ্যমান থাকে। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক তরল অবস্থার পদার্থের দেহে যে সমস্ত কর্ম্ম, গমন

ও চলনশীলতা বিদ্যমান থাকে সেই সমস্ত কর্ম্ম, গমন ও চলনশীলতার শ্রেণীবিভাগ পঞ্চবিধ, যথা :—(১) অণ্ডাকারের (২) উৎক্ষেপণাকারের, (৩) আকুঞ্চন-আকারের (৪) অবক্ষেপণ-আকারের (৫) প্রসারণ আকারের। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক তরল অবস্থার পদার্থের দেহে উপরোক্ত পঞ্চবিধ কর্ম্ম, গমন ও চলনশীলতা আপনা হইতেই যুগপৎ হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক তরল অবস্থার পদার্থের দেহে স্ব স্ব গুণ, শক্তি, ও বৃত্তি বিদ্যমান থাকে। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক তরল অবস্থার পদার্থের দেহের স্ব স্ব স্বাভাবিক গুণ, শক্তি ও বৃত্তির অস্তিত্ব অথবা রক্ষা যে সম্ভব হয় তাহার প্রধান কারণ তরল দেহের কর্ম্ম, গমন ও চলনশীলতার অণ্ডাকারের পরিণতির সহিত ঐ সমস্ত কর্ম্ম, গমন ও চলনশীলতার উৎক্ষেপণ, আকুঞ্চন, অবক্ষেপণ ও প্রসারণ-আকারের পরিণতির সমতা। এই সমতা রক্ষিত না হইলে কোন তরল অবস্থার পদার্থের গুণ, শক্তি ও বৃত্তির প্রাকৃতিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। উপরোক্ত সমতার অভাব হইলে তরল পদার্থ হয় বাষ্পাকার নতুবা অস্বাভাবিক ঘনত্ব লাভ করিয়া থাকে এবং অন্যান্য পদার্থের অপকারক হয়।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের বিচ্ছেদ অথবা তরল অবস্থার কর্ম্ম, গমন ও চলনশীলতার অণ্ডাকারের পরিণতির সহিত ঐ সমস্ত কর্ম্ম, গমন ও চলনশীলতার উৎক্ষেপণ, আকুঞ্চন, অবক্ষেপণ ও প্রসারণ আকারের পরিণতির সমতা বিদ্যমান না থাকিলে যেরূপ বিচ্ছেদ অথবা তরল অবস্থার অস্তিত্ব অথবা রক্ষা সম্ভবযোগ্য হয় না, সেইরূপ স্থূল-অবস্থার উৎপত্তি এবং রক্ষাও সম্ভবযোগ্য হয় না।

মহাসমুদ্রের কর্ম্ম, গমন ও চলনশীলতার উপরোক্ত অণ্ডাকারের পরিণতির সহিত উহার উৎক্ষেপণ, আকুঞ্চন, অবক্ষেপণ ও প্রসারণাকারের পরিণতির সমতা পৃথিবীর উৎপত্তি এবং রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। মহাসমুদ্রের যে সমস্ত কর্ম্ম, গমন ও চলনশীলতা থাকে সেই সমস্ত কর্ম্ম, গমন ও চলনশীলতার অণ্ডাকারের পরিণতির সহিত তাহাদের উৎক্ষেপণাকার, আকুঞ্চনাকার, অবক্ষেপণাকার ও প্রসারণাকার পরিণতিসমূহের সমষ্টিগত পরিণতির সমতা থাকিলেই পৃথিবীর উৎপত্তি ও রক্ষা সম্ভবযোগ্য হয় বটে; কিন্তু কেবলমাত্র মহাসমুদ্রের কর্ম্মাদির উপরোক্ত সমতা থাকিলেই পৃথিবী-রক্ষা সাধিত হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না। পৃথিবীর গুণ, শক্তি ও বৃত্তির রক্ষা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সাধিত হয় তাহার ব্যবস্থায় পৃথিবীর যে সমস্ত কর্ম্ম, গমন ও চলনশীলতার অণ্ডাকারের পরিণতি আছে সেই সমস্ত পরিণতি যাহাতে উৎক্ষেপণ, আকুঞ্চন অবক্ষেপণ ও প্রসারণ আকারের পরিণতিসমূহের সমষ্টিগত পরিণতির সহিত সমতাযুক্ত হয়, তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। এই ব্যবস্থা প্রকৃতির দ্বারা সাধিত হয়।

প্রকৃতি ঐ ব্যবস্থা কিরূপভাবে সাধিত করেন তাহার কথা আমরা অতঃপর আলোচনা করিব।

মহাসমুদ্রের উৎপত্তি হইলে তেজ যেরূপ তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মানুসারে অধিকতর বৃদ্ধি পাইবার জন্য এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে রস হইতে অধিকতর বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য প্রবত্নশীল হন, পৃথিবীর উৎপত্তি হইলে সেইরূপ তেজের বৃদ্ধি পাইবার কর্ম্ম এবং রস হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার কর্ম্ম প্রবলতর হয়।

মহাসমুদ্রের উৎপত্তি হইলে তেজের বৃদ্ধি পাইবার কর্ম্ম এবং রস হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার কর্ম্মের পরিণতিতে যেরূপ "ঋত" নামক রাসায়নিক কার্য্যের উদ্ভব হয়, পৃথিবীর উৎপত্তি হইলেও সেইরূপ তেজের বৃদ্ধি পাইবার কর্ম্ম এবং রস হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার কর্ম্মের পরিণতিতে "ঋত" নামক রাসায়নিক কার্য্যের উদ্ভব হয়। মহাসমুদ্রের উৎপত্তিক্ষেত্রে "ঋত" নামক রাসায়নিক কার্য্য যত প্রবল হয়, পৃথিবীর উৎপত্তিক্ষেত্রে "ঋত" নামক রাসায়নিক কার্য্য তাহার চতুর্গুণ প্রবল হয়। পৃথিবীর উৎপত্তিক্ষেত্রের "ঋত" নামক রাসায়নিক কার্য্য যে মহাসমুদ্রের উৎপত্তিক্ষেত্রের "ঋত" নামক রাসায়নিক কার্য্যের তুলনায় চারিগুণ প্রবলতর হয়, তাহা প্রমাণ করা ঈক্ষণমিতির বিষয়। ঈক্ষণমিতি জানা থাকিলে এই বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়।

মহাসমুদ্রের উৎপত্তি হইলে যেমন তেজের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং "ঋত" নামক রাসায়নিক কার্য্যের ফলে মহাসমুদ্রের বাষ্পে পরিণত হইবার সম্ভাবনাই বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ পৃথিবীর উৎপত্তি হইলেই ঐ তেজের উপরোক্ত ধর্ম্ম এবং "ঋত" নামক রাসায়নিক কার্য্য বশতঃ পৃথিবীর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া বাষ্পাকারে পরিণত হইবারই সম্ভাবনা অধিকতর প্রবল হয়।

মহাসমুদ্রের বাষ্পে পরিণত হইবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও উহা যেমন আপন ভার এবং "সত্য" নামক রাসায়নিক কার্য্যের বিদ্যমানতা বশতঃ বাষ্পে পরিণত না হইয়া পৃথিবীর উৎপাদক ক্ষেত্র হইয়া থাকে, সেইরূপ পৃথিবীও আপন ভার এবং 'সত্য' নামক রাসায়নিক কার্য্যের বিদ্যমানতা বশতঃ চূর্ণ বিচূর্ণ না হইয়া উদ্ভিদ এবং চরাচর জীব সমূহের উৎপাদক ক্ষেত্র হইয়া থাকে।

তরল অবস্থার উৎপত্তি হইবার পর তেজের রুদ্রমূর্ত্তি যেরূপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, স্থূল অবস্থার উৎপত্তি হইবার পরও সেইরূপ তেজের রুদ্রমূর্ত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। স্থূল অবস্থার উৎপত্তি হইবার পর তেজের রুদ্রমূর্ত্তি যে উগ্রতা ধারণ করে তাহা তরল অবস্থার উৎপত্তির পরবর্ত্তী উগ্রতার তুলনায় চারিগুণ হইয়া থাকে ইহা প্রমাণ করাও ঈক্ষণমিতির বিষয়।

তরল অবস্থার উৎপত্তি হইবার পর তেজের রুদ্রমূর্ত্তি অত্যন্ত উগ্র হওয়া সত্ত্বেও যেরূপ তরল অবস্থার ভার বশতঃ

কালক্ষেত্রের নিম্নভাগ প্রসারিত হয়, সেইরূপ স্থূল অবস্থার উৎপত্তি হইবার পরও তেজের রুদ্রমূর্ত্তি চতুর্গুণ উগ্র হওয়া সত্ত্বেও স্থূল অবস্থার অতিরিক্ত ভারবশতঃ কালক্ষেত্রের নিম্নভাগ চতুর্গুণ প্রসারিত (expanded) হয়। পৃথিবীর স্থূল অবস্থার অভ্যন্তরে তরল অবস্থা বিদ্যমান থাকায় এবং মহাসমুদ্র ও পৃথিবী এই উভয়েরই ভার কালক্ষেত্রের কটি-দেশের নিম্নাংশের উপর স্থাপিত হওয়ায় পৃথিবীর উৎপত্তিতে কালক্ষেত্রের উপর অধিকতর ভার স্থাপিত হয়।

তরল অবস্থার উৎপত্তির পর তাহার ভার (weight) এবং কালক্ষেত্রের প্রসারণ বশতঃ কালক্ষেত্র যেরূপ দ্বৈতক্ষেত্র ও মায়াক্ষেত্রের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পৃথিবীর অথবা স্থূল অবস্থার উৎপত্তির পর তাহার অতিরিক্ত ভার এবং কালক্ষেত্রের চতুর্গুণ প্রসারণ বশতঃ এই কালক্ষেত্র অধিকতর বেগে দ্বৈতক্ষেত্র, মায়াক্ষেত্র এবং অদ্বৈতক্ষেত্রের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মাণ্ডে যদ্যপি এই পৃথিবীর স্থূলক্ষেত্রের উদ্ভব না হইত এবং কেবলমাত্র তরলক্ষেত্র পর্য্যন্ত উৎপাদিত হইত, তাহা হইলে কালক্ষেত্রে কেবলমাত্র মায়াক্ষেত্র পর্য্যন্ত সংযুক্ত হইয়া তাহার কার্য্য করিতে পারিত, কিন্তু স্থূল ক্ষেত্রের উদ্ভব হওয়ায় এই ভূ-মণ্ডলের পক্ষে অদ্বৈতক্ষেত্রের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় এবং ভূ-মণ্ডলের প্রত্যেক পদার্থের পক্ষে অল্পাধিক মাত্রায় অদ্বৈতক্ষেত্রের সংযোগে কর্ম্ম-শক্তির উৎপত্তি হয়।

মহাসমুদ্রের উৎপত্তি হইলে কালক্ষেত্রের প্রসারণ বশতঃ কালক্ষেত্র যখন মায়াক্ষেত্রের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়, তখন যেমন মায়াক্ষেত্র, দ্বৈতক্ষেত্র এবং কালক্ষেত্র মিলিত হইয়া বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রের ঊর্দ্ধাধঃ কর্ম্ম, গমনশীলতা ও চলনশীলতাকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে অণ্ডাকারের কর্ম্ম, গমনশীলতা ও চলনশীলতায় পরিণত হইতে বাধ্য করে; সেইরূপ পৃথিবীর উৎপত্তি হইলে কালক্ষেত্রের চতুর্গুণ প্রসারণ বশতঃ কালক্ষেত্র যখন অদ্বৈতক্ষেত্রের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয় তখন মায়াক্ষেত্র, দ্বৈতক্ষেত্র এবং কালক্ষেত্র মিলিত হইয়া অদ্বৈতক্ষেত্রের সংযোগে বিচ্ছেদক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থ স্থূলক্ষেত্রের ঊর্দ্ধাধঃ কর্ম্ম; গমন-শীলতা ও চলনশীলতাকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে অণ্ডাকারের কর্ম্ম, গমনশীলতা ও চলনশীলতায় পরিণত হইতে বাধ্য করে।

মহাসমুদ্রের ঊর্দ্ধাধঃ কর্ম্ম, গমনশীলতা ও চলনশীলতা যে ঊর্দ্ধাধঃ অণ্ডাকারের আকার হইতে পরিণতি লাভ করে এবং সমতা প্রাপ্ত হয় তাহার কারণ যেরূপ কালক্ষেত্র, দ্বৈতক্ষেত্র এবং মায়াক্ষেত্রের মিলিত ঊর্দ্ধমুখী কর্ম্ম, সেইরূপ পৃথিবীর ঊর্দ্ধাধঃ কর্ম্ম, গমনশীলতা ও চলনশীলতা যে ঊর্দ্ধাধঃ আকার হইতে অণ্ডাকারে পরিণতি লাভ করে—এবং সমতা-প্রাপ্ত হয় তাহার কারণ—কেবলমাত্র কালক্ষেত্র, দ্বৈতক্ষেত্র, মায়াক্ষেত্র এবং অদ্বৈতক্ষেত্রের মিলিত ঊর্দ্ধমুখী কর্ম্ম নহে।

পৃথিবীর উৎপত্তি হইবার পর "ঋত" ও "সত্য" নামক রাসায়নিক কার্য্য দুইটী যে যে অবস্থায় পরিণতি লাভ করে সেই সেই পরিণতির ফলে এবং পৃথিবীর আপন ভার বশতঃ পৃথিবী যখন অধিকতর বেগে অদ্বৈতক্ষেত্রের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয় তখন সমগ্র পৃথিবী একদিকে যেরূপ অদ্বৈতক্ষেত্রের কটিদেশের নিম্নভাগের বিদ্যমানতা বশতঃ অধিকতর বেগের ঊর্দ্ধমুখী কর্ম্ম, গমন ও চলনশীলতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আবার অদ্বৈতক্ষেত্রের কটিদেশের ঊর্দ্ধভাগের বিদ্যমানতা বশতঃ অধিকতর বেগের অধঃমুখী কর্ম্ম, গমন ও চলনশীলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

উপরোক্ত কারণে কেবলমাত্র পৃথিবীই যে অধিকতর বেগের ঊর্দ্ধাধঃমুখী কর্ম্ম, গমন ও চলনশীলতা প্রাপ্ত হয় তাহা নহে, মহাসমুদ্রও এই কারণে অধিকতর বেগের ঊর্দ্ধাধঃমুখী কর্ম্ম, গমন ও চলনশীলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মহাসমুদ্রের এই ঊর্দ্ধাধঃমুখী কর্ম্ম, গমন ও চলনশীলতা জোয়ার-ভাটায় পরিণত লাভ করে।

মহাকাশের উৎপত্তির মূল কারণও পৃথিবীর উপরোক্ত অধিকতর বেগের ঊর্দ্ধাধঃ কর্ম্ম, গমন ও চলনশীলতা।

পৃথিবীর আকৃতি, গঠন, গুণ, শক্তি ও বৃত্তি সম্বন্ধীয় কথা অত্যন্ত বিস্তৃত। ঐ সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা এই প্রবন্ধে বলা সম্ভব নহে। সাধনার দ্বারা বুদ্ধির ও মনের উন্নতি সাধন করিতে না পারিলে ঐ সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা বুঝা এবং মনে রাখা সম্ভব নহে। এই কারণে পৃথিবী অথবা ভূমির উৎপত্তি ও রক্ষা সম্বন্ধে আর যে সমস্ত কথা আছে, তাহার আলোচনা এখানে আর করিব না।

সাধারণ পাঠকগণকে এই কথা শুনাইতে ও বিশ্বাস করাইতে চাই যে, যাঁহারা বলেন যে, বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতা-সাধন করা সম্ভবযোগ্য নহে, তাঁহারা অজ্ঞ ও ভ্রান্ত। বিজ্ঞানের সর্ব্বতোভাবের সম্পূর্ণতা সাধন করা সম্পূর্ণ সম্ভব। সম্পূর্ণতা যুক্ত বিজ্ঞান এখনও বিদ্যমান আছে এবং উহা আছে ভারতবর্ষে। উহা রচিত হইয়াছে ব্যাসদেবের দ্বারা ও সংস্কৃত ভাষায়। মানুষ যে এখন আর উহা বিদিত নহে, তাহার কারণ প্রধানতঃ দুইটী, যথা: (১) মানুষের মনের ও বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা, (২) প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞতা ও পরবর্ত্তী কালের একটী বিকৃত ভাষাকে সংস্কৃত ভাষা বলিয়া মনে করা।

সম্পূর্ণতাযুক্ত বিজ্ঞান এখনও যে বিদ্যমান আছে, তাহা প্রসঙ্গক্রমে ভাই-বন্ধুগণকে দেখাইবার জন্য প্রত্যেক পদার্থের উৎপত্তির মূল কারণ, তেজ ও রসের মিলিত প্রকাশ-পদ্ধতি

এবং তেজ ও রসের বিচ্ছিন্ন প্রকাশ-পদ্ধতি সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কথাসমূহ তাঁহাদিগকে শুনাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

জমি ও তাহার উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি ও রক্ষা সম্বন্ধে যে যে কথা এই আখ্যায়িকায় বলা হইয়াছে, আমরা এক্ষণে সংক্ষিপ্তভাবে সেই সমস্ত কথার পুনরুল্লেখ করিব।

জমি ও তাহার উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি ও রক্ষা সম্বন্ধে এই আখ্যায়িকায় যে যে কথা বলা হইয়াছে সেই সমস্ত কথার প্রধান লক্ষ্য একটী, যথা:—

"ব্যবহারিক কারণে জমির উৎপাদিকা-শক্তির কি কি পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করা।"

কথাটি আরও স্পষ্ট করিতে হইলে বলিতে হয়, মানুষ জমির যে যে ব্যবহার করিয়া থাকে, সেই সমস্ত ব্যবহারের কোন্ কোন্ ব্যবহার জমির প্রাকৃতিক উৎপাদিকা শক্তির রক্ষা ও বৃদ্ধির সহায়ক, আর কোন্ কোন্ ব্যবহার জমির প্রাকৃতিক উৎপাদিকা শক্তির ক্ষয় ও বিনাশের সহায়ক তাহা নির্দ্ধারণ করা আমাদের এই আখ্যায়িকার প্রধান লক্ষ্য।

কোন্ কোন্ শ্রেণীর ব্যবহারে জমির উৎপাদিকা শক্তির রক্ষা ও বৃদ্ধি, আর কোন্ কোন্ শ্রেণীর ব্যবহারে উহার ক্ষয় ও বিনাশ হয় তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, প্রথমতঃ, জমির উৎপত্তি ও রক্ষা হয় কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে ও কার্য্যনিয়মে এবং দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে ও কোন্ কোন্ কার্য্যনিয়মে তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়।

আমাদিগের সিদ্ধান্তানুসারে এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ববিধ পদার্থের উৎপত্তির মূল কারণ তেজ ও রসের মিশ্রণ।

তেজ ও রস এই ব্রহ্মাণ্ডের বহিঃস্থিত সীমানায় সর্ব্বতোভাবের মিলিত অবস্থায় (অর্থাৎ অদ্বৈত অবস্থায়) অণ্ডাকারে বিদ্যমান আছেন বলিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক পদার্থের স্বতঃই উৎপত্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়।

জমির উৎপত্তি হয় কোন্ কোন কার্য্যক্রমে ও কার্য্যনিয়মে তাহা ব্যাখ্যা করিতে হইলে তেজ ও রসের সর্ব্বসমেত পাঁচটি অবস্থা উল্লেখযোগ্য।

তেজ ও রসের মিলিত ভাবের দুইটী অবস্থা, আর তেজ ও রসের বিচ্ছিন্ন হইবার কর্ম্ম-প্রবৃত্তিমূলক দুইটি অবস্থা, এবং তেজ ও রসের বিচ্ছিন্ন হইবার কর্ম্মমূলক একটী অবস্থা—এই পাঁচটি অবস্থা—জমির উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে হয়।

তেজ ও রসের মিলিত ভাবের দুইটি অবস্থা সর্ব্বতোভাবে কর্ম্ম, গমন ও চলনশীলতাশূন্য (static)। এই দুইটি অবস্থার নাম—

(১) অদ্বৈত অবস্থা,

(২) মায়া অবস্থা।

রাত্রিকালে তারকামণ্ডিত যে নীলাকাশ এই ভূ-মণ্ডল হইতে দেখা যায়, সেই নীলাকাশের পশ্চাতে তেজ ও রসের উপরোক্ত অদ্বৈত ও মায়া অবস্থা বিদ্যমান আছেন। রাত্রিকালীন নীলাকাশের যে-অংশ এই ভূ-মণ্ডল হইতে স্পষ্টভাবে দেখা যায় ঐ অংশ তেজ ও রসের দ্বৈত অবস্থা।

তেজ ও রসের বিচ্ছিন্ন হইবার কর্ম্মপ্রবৃত্তিমূলক যে দুইটী অবস্থা বিদ্যমান আছে, সেই দুইটি অবস্থার প্রথম অবস্থাটির নাম "দ্বৈত অবস্থা" এবং দ্বিতীয় অবস্থাটির নাম "কাল অবস্থা"। দিনের বেলায় নীলাকাশের যে অংশ এই ভূ-মণ্ডল হইতে দেখা যায়, সেই অংশ তেজ ও রসের "কাল-অবস্থা"। দিনের বেলায় নীলাকাশের অব্যবহিত পরে যে অংশ এই ভূমণ্ডল হইতে দেখা যায়, সেই অংশ তেজ ও রসের "বিচ্ছেদ-অবস্থা"।

এই ভূ-মণ্ডলের প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে যে কোন না কোন শ্রেণীর গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম, গমনশীলতা ও চলনশীলতা দেখা যায়, তাহার উৎপত্তি হয় তেজ ও রসের দ্বৈতক্ষেত্র হইতে। নীলাকাশের যে অংশে তেজ ও রস মিলিতভাবে অথবা বিচ্ছিন্ন হইবার কর্ম্মপ্রবৃত্তিমূলক অবস্থায় বিদ্যমান থাকেন নীলাকাশের সেই অংশের নাম দ্বৈতক্ষেত্র দ্বৈতক্ষেত্রের দুইটি অংশ আছে। একটী অংশে তেজ ও রস মিলিত ভাবে অথচ বিচ্ছিন্ন হইবার কর্ম্মপ্রবৃত্তিমূলক অবস্থায় বিদ্যমান থাকেন। দ্বিতীয়াংশে তেজ ও রস মিলিত ভাবে অথচ বিচ্ছিন্ন হইবার কর্ম্ম ও গমন-প্রবৃত্তিমূলক অবস্থায় বিদ্যমান থাকেন।

তেজ ও রসের দ্বৈতক্ষেত্র বিদ্যমান না থাকিলে এই ভূ-মণ্ডলের প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে যে কোন না কোন শ্রেণীর গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম, গমনশীলতা ও চলনশীলতা দেখা যায়, তাহার কোনটীরই উৎপত্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য হইত না।

তেজ ও রসের দ্বৈতক্ষেত্র বিদ্যমান না থাকিলে এই ভূমণ্ডলের প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে যে-সমস্ত গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম, গমনশীলতা ও চলনশীলতা দেখা যায়, তাহার কোনটীরই উৎপত্তি সম্ভবযোগ্য হয় না বটে; এবং তেজ ও রসের দ্বৈতক্ষেত্রের বিদ্যমানতা বশতঃই এই ভূমণ্ডলের প্রত্যেক পদার্থের গুণ প্রভৃতির উৎপত্তি সম্ভবযোগ্য হয় বটে; কিন্তু কেবল মাত্র দ্বৈতক্ষেত্রের বিদ্যমানতা হইতেই এই ভূমণ্ডলের পদার্থসমূহের উপরোক্ত গুণ প্রভৃতির উৎপত্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না।

এই ভূ-মণ্ডলের পদার্থসমূহের উপরোক্ত গুণ-প্রভৃতির উৎপাদন যাহাতে সুনিশ্চিত হয় তাহার ব্যবস্থার জন্য একদিকে যেরূপ তেজ ও রসের মিলিত অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হইবার কর্ম্মপ্রবৃত্তিমূলক দ্বৈত-অবস্থার অথবা দ্বৈতক্ষেত্রের বিদ্যমানতা প্রয়োজনীয়, সেইরূপ আবার তেজ ও রসের "কাল-অবস্থা" এবং "বিচ্ছেদ-অবস্থা"ও প্রয়োজনীয়।

তেজ ও রসের দ্বৈত-অবস্থায় এই ভূ-মণ্ডলের পদার্থ-সমূহের গুণ, শক্তি, কর্ম্মপ্রবৃত্তি ও গমনপ্রবৃত্তিসমূহের বীজ পর্য্যন্তের উৎপত্তি হইয়া থাকে। চলনশীলতার প্রবৃত্তির, অথবা কর্ম্মের, অথবা গমনের অথবা চলনশীলতার বীজের উৎপত্তি তেজ ও রসের দ্বৈতাবস্থায় হয় না।

এই ভূ-মণ্ডলের পদার্থসমূহের মধ্যে যে সমস্ত পদার্থের চলনশীলতা আছে সেই সমস্ত পদার্থের চলনশীলতার প্রবৃত্তির বীজের উৎপত্তি হয় তেজ ও রসের 'কাল-অবস্থায়' 'কাল ক্ষেত্রে'। কালক্ষেত্রে এই ভূ-মণ্ডলের পদার্থসমূহের চলন-শীলতার প্রবৃত্তির বীজ উৎপত্তি হইলে উহাদের গুণ, শক্তি, কর্ম্মপ্রবৃত্তির বীজ, গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি রূপে প্রকাশ পায় এবং বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রে ঐ বীজ গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া কর্ম্ম, গমন ও চলন রূপে প্রকাশ পায়। বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রে ঐ বীজ যে গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া কর্ম্ম, গমন ও চলনরূপে প্রকাশ পায় তাহার রূপ প্রথমতঃ বাষ্পীয় হইয়া থাকে। তাহার পর যুগপৎ তরল ও স্থূল রূপের প্রকাশ হয়; স্থূল রূপের প্রকাশ হইলেই জমির উৎপত্তি হয়।

জমির ও তাহার উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি ও রক্ষা হয়, কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে ও কোন্ কোন্ কার্য্যনিয়মে তাহা স্পষ্ট ভাবে ধারণা করিতে হইলে দুই শ্রেণীর ভাবনার প্রয়োজন হয়।

প্রথম শ্রেণীর ভাবনার চিন্তনীয় বিষয় পাঁচ শ্রেণীর, যথা:—

(১) তেজ ও রসের বিচ্ছেদ অবস্থার সহিত তেজ ও রসের কাল-অবস্থার সম্বন্ধ ও পার্থক্য;

(২) তেজ ও রসের কাল-অবস্থার সহিত তেজ ও রসের দ্বৈত-অবস্থার সম্বন্ধ ও পার্থক্য;

(৩) তেজ ও রসের দ্বৈত-অবস্থার সহিত তেজ ও রসের মায়া-অবস্থার সম্বন্ধ ও পার্থক্য;

(৪) তেজ ও রসের মায়া-অবস্থার সহিত তেজ ও রসের অদ্বৈত-অবস্থার সম্বন্ধ ও পার্থক্য;

(৫) তেজ ও রসের অদ্বৈত-অবস্থার বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাবনার চিন্তনীয় বিষয় তিন শ্রেণীর, যথা:—

(১) তেজ ও রসের বিচ্ছেদ অবস্থার সহিত তরল-অবস্থার সম্বন্ধ ও পার্থক্য;

(২) তেজ ও রসের কাল-অবস্থা, বিচ্ছেদ-অবস্থা, তরল-অবস্থা, স্থূল-অবস্থা এবং মহাকাশ-অবস্থার পরস্পরের সম্বন্ধ ও পার্থক্য;

(৩) তেজ ও রসের কাল-অবস্থা, বিচ্ছেদ-অবস্থা, তরল-অবস্থা, স্থূল-অবস্থা, উদ্ভিদ্-অবস্থা, চরজীব-অবস্থা এবং মহাকাশ-অবস্থার পরস্পরের সম্বন্ধ ও পার্থক্য।

উপরোক্ত দুইশ্রেণীর ভাবনা হইতে জমি ও তাহার উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি, রক্ষা ও পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যাহা যাহা জ্ঞেয়, তাহার সমস্তই জানিতে পারা যায়।

জমি ও জমির উৎপাদিকা-শক্তি সম্বন্ধে মানুষের কি কি দায়িত্ব আছে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে যে যে বিষয়ে লক্ষ্য করিতে হয় আমরা এক্ষণে সেই সেই বিষয়ের কথা বিবৃত করিব।

ভূমি ও জমির উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে মানুষের যে সমস্ত দায়িত্ব আছে সেই সমস্ত দায়িত্ব নির্দ্ধারণ করিতে হইলে জমি ও তাহার উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি, রক্ষা ও পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বহু বিষয়ে লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন হয়।

জমি ও তাহার উৎপাদিকা-শক্তি সম্বন্ধে মানুষের যে-সমস্ত দায়িত্ব আছে সেই সমস্ত দায়িত্ব নির্দ্ধারণ করিতে হইলে বহু বিষয় লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন হয় বটে; কিন্তু তন্মধ্যে আটটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা এক্ষণে ঐ আট শ্রেণীর লক্ষ্যযোগ্য বিষয়ের আলোচনা করিব।

উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীর ভাবনার পাঁচটী বিষয়ে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাবনার তিনটী বিষয়ে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে **প্রথমতঃ,** দেখা যায় যে, তেজ ও রসের বিচ্ছেদ অবস্থার প্রকাশ না হইলে জমির উৎপত্তি হওয়া সম্ভব হয় না। তেজ ও রসের কাল-অবস্থার প্রকাশ না হইলে, তেজ ও রসের বিচ্ছেদ অবস্থার প্রকাশ হওয়া সম্ভব হয় না। তেজ ও রসের দ্বৈত-অবস্থার প্রকাশ না হইলে, তেজ ও রসের কাল-অবস্থার প্রকাশ হওয়া সম্ভব হয় না। তেজ ও রসের মায়া-অবস্থার প্রকাশ না হইলে, তেজ ও রসের দ্বৈত-অবস্থার প্রকাশ হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না। তেজ ও রসের অদ্বৈত-অবস্থার বিদ্যমানতা না থাকিলে তেজ ও রসের মায়া-অবস্থার প্রকাশ হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না।

অন্যদিকে ইহাও দেখা যায় যে, তেজ ও রসের অদ্বৈত-অবস্থা বিদ্যমান থাকিলেই তেজ ও রসের মায়া-অবস্থা অবশ্যম্ভাবী হয়। তেজ ও রসের মায়া-অবস্থা বিদ্যমান থাকিলেই তেজ ও রসের দ্বৈত-অবস্থা অবশ্যম্ভাবী হয়। তেজ ও রসের দ্বৈত-অবস্থা বিদ্যমান থাকিলেই তেজ ও রসের কাল-অবস্থা অবশ্যম্ভাবী হয়। তেজ ও রসের কাল-অবস্থা বিদ্যমান থাকিলেই তেজ ও রসের বিচ্ছেদ-অবস্থা অবশ্যম্ভাবী হয়। তেজ ও রসের বিচ্ছেদ-অবস্থা বিদ্যমান থাকিলেই তরল-অবস্থা, স্থূল-অবস্থা (অথবা জমির উৎপত্তি), উদ্ভিদ-অবস্থা, চরজীবের-অবস্থা এবং মহাকাশের অবস্থা অবশ্যম্ভাবী হয়।

উপরোক্ত কথাসমূহ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জমির উৎপত্তি ও রক্ষা একদিকে যেরূপ তেজ ও রসের বিচ্ছেদ অবস্থা, কাল-অবস্থা, দ্বৈত-অবস্থা, মায়া-অবস্থা এবং অদ্বৈত-অবস্থার সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, সেইরূপ আবার তরল-অবস্থা অথবা মহাসমুদ্রের উৎপত্তি ও রক্ষা, উদ্ভিদ শ্রেণীর উৎপত্তি ও রক্ষা, চরজীব-শ্রেণীর উৎপত্তি ও রক্ষা এবং মহাকাশের উৎপত্তি ও রক্ষার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীর ভাবনার পাঁচটী বিষয়ে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাবনার তিনটি বিষয়ে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে, **দ্বিতীয়তঃ**, দেখা যায় যে, তেজ ও রসের অদ্বৈত অবস্থা, মায়া অবস্থা এবং দ্বৈত অবস্থার কার্য্যক্রমে ও কার্য্য-নিয়মে তরল অবস্থার (মহাসমুদ্রের) স্থূল অবস্থার (অথবা জমির), উদ্ভিদ অবস্থার, চর-জীব অবস্থার এবং মহাকাশ অবস্থার উৎপত্তি, অস্তিত্ব ও পরিণতি সাধিত হইয়া থাকে। কোন পদার্থের বৃদ্ধি অথবা ক্ষয় অথবা বিনাশ কখনও তেজ এবং রসের অদ্বৈত অথবা মায়া অথবা দ্বৈত অবস্থার কার্য্যক্রমে ও কার্য্যনিয়মে সাধিত হয় না। এই কারণে চলিত প্রবাদানুসারে ঈশ্বরকে মঙ্গলময় বলা হইয়া থাকে!

তৃতীয়তঃ, দেখা যায় যে, তরল অবস্থার (অর্থাৎ মহাসমুদ্রের), স্থূল অবস্থার (অর্থাৎ জমির) ও মহাকাশ অবস্থার যে পরিবর্ত্তন স্বতঃই সাধিত হয় এবং উদ্ভিদ অবস্থার ও চর-জীব অবস্থার যে বৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশ স্বতঃই সাধিত হয়, তাহার কারণ তেজ ও রসের কাল-অবস্থা ও বিচ্ছেদ অবস্থার কতিপয় কার্য্যক্রম ও কার্য্যনিয়ম।

৪র্থতঃ, দেখা যায় যে মহাসমুদ্রের, পৃথিবীর ও মহাকালের যে সমস্ত স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে এবং উদ্ভিদশ্রেণীর ও চরজীবশ্রেণীর বৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশাত্মক যে সমস্ত অবস্থা স্বভাবতঃ ঘটিয়া থাকে, স্বাভাবিক বৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশাত্মক সেই সমস্ত অবস্থার অন্যথা করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত নহে।

পঞ্চমতঃ, দেখা যায় যে, মহাসমুদ্রের, পৃথিবীর ও মহাকাশের যে সমস্ত স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, সেই সমস্ত স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের অন্যথা করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত নহে বটে; কিন্তু ঐ সমস্ত স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও পৃথিবীর যে উৎপাদিকা-শক্তি স্বভাবতঃ বিদ্যমান থাকে, তদ্দ্বারা সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে।

ষষ্ঠতঃ, দেখা যায় যে, তেজ ও রসের কাল-অবস্থা ও বিচ্ছেদ-অবস্থার স্বাভাবিক কার্য্যক্রমে ও কার্য্যনিয়মে মহাসমুদ্রের, পৃথিবীর ও মহাকাশের গুণ, শক্তি, কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, কর্ম্ম, গমন-প্রবৃত্তি ও গমনে অসমতার অর্থাৎ বিচ্ছেদ-মিলনাত্মকতার প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ ঘটিয়া থাকে এবং তাহা অনিবার্য্য।

মহাসমুদ্রের, পৃথিবীর ও মহাকাশের গুণ, শক্তি, কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, কর্ম্ম, গমন-প্রবৃত্তি ও গমনের অসমতার প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ ঘটিলে প্রাকৃতিক কার্য্যক্রমে ও কার্য্য-নিয়মে বিষমতার অর্থাৎ বিচ্ছেদাত্মকতার প্রবৃত্তি অনিবার্য্য হইয়া থাকে।

মহাসমুদ্রের, পৃথিবীর ও মহাকাশের গুণ, শক্তি, কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, কর্ম্ম, গমন-প্রবৃত্তি ও গমনের অসমতা ঘটিলে জমির উৎপাদিকা-শক্তির হ্রাস অনিবার্য্য হইয়া থাকে। বিষমতা ঘটিলে জমির উৎপাদিকা-শক্তির হ্রাস আরও অধিকতর পরিমাণে ঘটিয়া থাকে। মহাসমুদ্রের, পৃথিবীর ও মহাকাশের গুণ, শক্তি, কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, কর্ম্ম, গমন-প্রবৃত্তি ও গমনের অসমতা অথবা বিষমতা ঘটিলে জমির উৎপাদিকা-শক্তির যে হ্রাস অনিবার্য্য হয়, জমির উৎপাদিকা-শক্তির সেই হ্রাস ঘটিতে থাকিলে কোন মানুষের কোন ইচ্ছাই সর্ব্বতো-ভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

মহাসমুদ্রের, পৃথিবীর ও মহাকাশের গুণ, শক্তি, কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, কর্ম্ম, গমন-প্রবৃত্তি ও গমনের অসমতা অথবা বিষমতা ঘটিলে কোন মানুষের কোন ইচ্ছাই সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না বটে; কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে মহাসমুদ্রের পৃথিবীর ও মহাকাশের গুণ, শক্তি, কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, কর্ম্ম, গমন-প্রবৃত্তি ও গমনের অসমতার প্রবৃত্তি ঘটিলে স্বভাবতঃই যেরূপ বিষমতার প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ স্বভাবতঃই আবার কথঞ্চিৎ সমতার প্রবৃত্তিরও উদ্ভব হয়।

মহাসমুদ্রের, পৃথিবীর ও মহাকাশের গুণ, শক্তি, কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, কর্ম্ম, গমন-প্রবৃত্তি ও গমনের স্বভাবতঃ সমতার প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তাহা করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত। উহা করিতে পারিলে সমগ্র মনুষ্যসমাজের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতো-ভাবে পূরণ করিতে হইলে যাহা যাহা প্রয়োজন হয় তাহার প্রত্যেকটী উৎপাদন করা সহজসাধ্য হইয়া থাকে।

প্রাকৃতিক কারণে মহাসমুদ্রের, পৃথিবীর ও মহাকাশের গুণ, শক্তি, কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, কর্ম্ম, গমন-প্রবৃত্তি ও গমনের স্বভাবতঃ অসমতার প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে স্বভাবতঃই আবার বিষমতার ও সমতার প্রবৃত্তির উদ্ভব হইয়া থাকে বটে, কিন্তু মানুষের অন্যায় ব্যবহারে মহাসমুদ্রের, পৃথিবীর ও মহাকাশের গুণ, শক্তি, কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, কর্ম্ম, গমন-প্রবৃত্তি ও গমনের অসমতার প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে স্বভাবতঃই আবার সমতার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় না।

মানুষের অন্যায় ব্যবহারে মহাসমুদ্রের অথবা পৃথিবীর অথবা মহাকাশের গুণ, শক্তি, কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, কর্ম্ম, গমন-প্রবৃত্তি ও গমনের অসমতার প্রবৃত্তির উদ্ভব হইলে যাহাতে পুনরায় সমতার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়, তাহা করা একমাত্র মানুষের সাধ্যান্তর্গত।

মানুষের অন্যায় ব্যবহারে মহাসমুদ্রের অথবা পৃথিবীর অথবা মহাকাশের এই তিনটির কোন একটীর গুণ, শক্তি, কর্ম্মপ্রবৃত্তি, কর্ম্ম, গমন-প্রবৃত্তি অথবা গমনের অসমতা ঘটিলে অন্য দুইটীর গুণ, শক্তি, কর্ম্মপ্রবৃত্তি, কর্ম্ম, গমনপ্রবৃত্তি অথবা গমনের অসমতা ঘটিয়া থাকে।

সপ্তমতঃ, দেখা যায় যে, পৃথিবীর বাহিরে—যেরূপ তেজ ও রসের অদ্বৈত-অবস্থা, মায়া-অবস্থা, দ্বৈত-অবস্থা, কাল-অবস্থা, বিচ্ছেদ-অবস্থা, তরল-অবস্থা, স্থূল-অবস্থা এবং মহাকাশ-অবস্থা বিদ্যমান আছে, সেইরূপ পৃথিবীর অভ্যন্তরেও তেজ ও রসের অদ্বৈত-অবস্থা, মায়া-অবস্থা, দ্বৈত-অবস্থা, কাল-অবস্থা, বিচ্ছেদ-অবস্থা, তরল-অবস্থা, স্থূল-অবস্থা এবং মহাকাশ-অবস্থার কার্য্য বিদ্যমান আছে।

অষ্টমতঃ, দেখা যায় যে, পৃথিবী যে স্বভাবতঃ উৎপাদিকা-শক্তিযুক্ত হইয়া থাকে তাহার প্রধান কারণ—তাহার অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের বায়বীয় অবস্থার, বাষ্পীয় অবস্থার, তরল-অবস্থার, স্থূল-অবস্থার এবং মহাকাশ-অবস্থার গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের সমতা রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি।

পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের বায়বীয় অবস্থার, বাষ্পীয় অবস্থার, তরল অবস্থার, স্থূল অবস্থার এবং মহাকাশ অবস্থার গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমন যে স্বভাবতঃ সমতা রক্ষা করিবার জন্য প্রবৃত্তিশীল হয়, তাহার কারণ আটটি; যথা:—

(১) পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবিধ অবস্থার (অর্থাৎ বায়বীয়, বাষ্পীয়, তরল, স্থূল ও মহাকাশ-অবস্থার) প্রত্যেকটীর উৎক্ষেপণ আকারের, আকুঞ্চন আকারের, অবক্ষেপণ আকারের, প্রসারণ আকারের এবং অণ্ড আকারের আবয়বিক ও গমনের প্রবৃত্তির শৃঙ্খলা;

(২) পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবিধ-অবস্থার চতুর্ব্বিধ রাসায়নিক (অর্থাৎ 'কৃষ্ণ', 'পিঙ্গল', 'ঋত' ও 'সত্য') কর্ম্মের শৃঙ্খলা;

(৩) পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবিধ অবস্থার পঞ্চবিধ অগ্নির গুণ, শক্তি ও বৃত্তির উৎপত্তি ও রক্ষা বিষয়ক কার্য্যের শৃঙ্খলা;

(৪) পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ বায়বীয় অবস্থার বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণতি, বাষ্পীয় অবস্থার তরল অবস্থায় পরিণতি, তরল-অবস্থার স্থূল-অবস্থায় পরিণতি, স্থূল-অবস্থার মহাকাশ-অবস্থায় পরিণতি, মহাকাশ অবস্থার—বায়বীয় অবস্থায় পরিণতিমূলক শৃঙ্খলা;

(৫) পৃথিবীর আপন ভারবশতঃ ব্রহ্মাণ্ডের আদিক্ষেত্রের অর্থাৎ তেজ ও রসের অদ্বৈত-অবস্থার সহিত যে সংস্রবের উদ্ভব হয়, সেই সংস্রব বশতঃ পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ অণ্ডাকারের আবয়বিক কর্ম্ম ও গমনশীলতার সহিত উৎক্ষেপণ আকারের, আকুঞ্চন আকারের, অবক্ষেপণ আকারের ও প্রসারণ আকারের কর্ম্ম ও গমনসমূহের সমষ্টিগত ভাবে যে সমতার উৎপত্তি হয়, সেই সমতার শৃঙ্খলা;

(৬) পৃথিবীর আপন ভারবশতঃ ব্রহ্মাণ্ডের আদিক্ষেত্রের অর্থাৎ তেজ ও রসের অদ্বৈত-ক্ষেত্রের সহিত যে সংস্রবের উদ্ভব হয় সেই সংস্রব বশতঃ পৃথিবীর ঊর্দ্ধাধঃমুখী, উত্তর-দক্ষিণ-পার্শ্বাভিমুখী এবং পূর্ব্ব-পশ্চিম-পার্শ্বাভিমুখী যে সমস্ত চাপ বিদ্যমান আছে, সেই সমস্ত চাপের শৃঙ্খলা;

(৭) পৃথিবীর অভ্যন্তরে পৃথক পৃথক ঘনত্বের যে সমস্ত সমাবেশ আছে, সেই সমস্ত সমাবেশের শৃঙ্খলা;

(৮) পৃথিবীর অভ্যন্তরে তেজ ও রসের যে প্রবাহ আছে, তেজ ও রসের সেই প্রবাহের শৃঙ্খলা।

জমি ও তাহার উৎপাদিকা-শক্তি সম্বন্ধে মানুষের কি কি দায়িত্ব তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে জমি ও তাহার উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি, রক্ষা ও পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যে আট শ্রেণীর বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হইল, সেই আট শ্রেণীর বিষয়ের প্রত্যেকটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

ঐ আট শ্রেণীর বিষয়ের মধ্যে যে যে আট শ্রেণীর কারণে পৃথিবীর উৎপাদিকা-শক্তির স্বভাবতঃ সমতার প্রবৃত্তি-যুক্ত হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়, সেই আট শ্রেণীর কারণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগের বিষয়।

জমি ও তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি রক্ষা-বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব কি কি তদ্বিষয়ে আমরা অতঃপর আলোচনা করিব।

'লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

পৌষ—১৩৫০

১১শ বর্ষ, ২য় খণ্ড—১ম সংখ্যা

মধুসূদনের চতুর্দ্দশ-পদী কবিতাবলী

ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, এম্ এ, পি-আর এস্, পি, এইচ্-ডি,

এক সময়ে আমাদের বিশ্বাস ছিল, মানুষের মধ্যে যাহারা বীর তাহারা আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে সর্ব্বদা গদা ঘুরাইয়া ফেরে; যিনি ধার্ম্মিক তিনি প্রথম হইতে শেষ-পর্যন্ত ধর্ম্মের ধ্বজাটিকে এমন করিয়া তুলিয়া রাখেন যে, কোন প্রতিকুল বাতাসেই তাহার আর এতটুকুও নড়-চড় হইবার উপায় নাই; আবার জলন্ত আগুনে পোড়াইয়াও সতীর সতীত্বে এতটুকু খাদ মিলিত না। জীবন সম্বন্ধে সেই ছিল একটা সহজ বিশ্বাস—সরল দৃষ্টির যুগ। আধুনিক যুগের আমাদের জীবনও জটিল, দৃষ্টি ততোধিক কুটিল। বিংশ শতাব্দীর কোনও দশরথ তাঁহার যুবক পুত্রকে তাঁহার একটা অসাবধান এবং অসঙ্গত প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য বনে যাইতে বলিলে রামচন্দ্র যে শুধু গোয়াড়ামি করিয়াই পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিত তাহা নহে,—পিতৃসত্য পালনের ন্যায় তুল্য মূল্যের আরও বহু কর্ত্তব্যের নজির দিয়া পিতাকে হয়ত যুক্তি-সঙ্গত ভাবেই নিরস্ত করিতে পারিত; কিন্তু কলিযুগের রামের পক্ষে তাহা সম্ভব হইলেও ত্রেতাযুগের রামের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই,—কারণ যুবক রাম যখন পিতৃভক্ত, তখন সে পিতৃভক্তিরই জীবন্ত বিগ্রহ—আর কিছুই নহে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সরল দৃষ্টিটি আমাদের এখনও যায় নাই। অবশ্য, না যাইবার ঐতিহাসিক কারণও আছে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসে দেখিতে পাই, যাঁহারা মঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছেন তাঁহারা বৈষ্ণব কবিতা রচনায় হাত দেন নাই; যাঁহারা রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবত অবলম্বন করিয়া কাব্য-রচনা করিয়াছেন তাঁহারা মঙ্গলকাব্য বা গীতি-কবিতার ধার ধারেন নাই। সংস্কৃত কবি কালিদাস অবশ্য মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, খণ্ডকাব্যও রচনা করিয়াছিলেন—আবার নাটকও রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু আসলে মনে হয়, কালিদাসের মহাকাব্যও মহাকাব্য নয়, নাটকও নাটক নয়—মূলতঃ সবই কাব্য। সাহিত্যের ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায় যে, বিশেষ বিশেষ লেখক একটি বিশিষ্ট প্রতিভা এবং কবি-মানস লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। যিনি বড় নাট্যকার তিনি বড় কবি নহেন, যিনি বড় কবি তিনি শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক নহেন। তবে এ কথাটি প্রাচীন সাহিত্যিক-গণের সম্বন্ধে যেমন করিয়া খাটে, আধুনিক সাহিত্যিকগণের সম্বন্ধে তেমন করিয়া খাটে না। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বিরল হইতে পারে, কিন্তু আজকের দিনে আর অসম্ভব নহে।

বাঙলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবি-প্রতিভার এই জটিল রূপ প্রথম দেখিতে পাইলাম মধুসূদনের ভিতরে। "How you are, Old boy, a Tragedy, a volume of Odes, and one half of a real Epic poem! All in the course of one year; and that year only half half old! মাস ছয়েকের ভিতরে একখানি ট্র্যাজেডি, এক সংখ্যা গীতি-কবিতা, একখানা সত্যকার মহাকাব্যের অর্দ্ধেক! বিস্ময়ের কথা সন্দেহ নাই এবং মধুসূদনের প্রতিভার বিরাটত্বকেও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে মধুসূদন সম্বন্ধে একটা কথা মনে হয়, তিনি বিরাট প্রতিভা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার আবির্ভাব এত আকস্মিক এবং তাঁহার কর্ম্মজীবন এত দ্রুত এবং অনিয়ন্ত্রিত যে তাঁহার প্রতিভা তাহার স্বরূপ প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র এবং অবসর লাভ করিতে পারে নাই। ফলে তাঁহার অনেক রচনাকেই সুনিয়ন্ত্রিত প্রতিভার পরিণত দান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না, অনিয়ন্ত্রিত প্রতিভার পরীক্ষা-মূলক চেষ্টা। এই জন্যই কোনও একটি সাহিত্য-সৃষ্টির পরই মধুসূদনকে থামিয়া ভাবিয়া লইতে হইয়াছে, প্রতিভার বিকাশের প্রকৃষ্ট পথ খুঁজিয়া লইতে হইয়াছে,—মন কখনও

কখনও সংশয়ে দুলিয়াছে, নিজেই অনেক সময় বুঝিতে পারেন নাই, "তরুণ গড়ুর সম কি মহৎ তাঁহার ক্ষুধার আবেশ।" মধুসূদনের জীবন এবং তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির ভিতর দিয়া তাঁহার প্রতিভার যেটুকু পরিচয় মেলে তাহা হইতে মনে হয়, তিনি আসলে কবি এবং কবিতার ক্ষেত্রেও তিনি মহাকাব্যকার। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস ছিলেন তাঁহার শৈশবের সঙ্গী, বাল্মীকি, হোমার, ভার্জিল, ট্যাসো, দান্তে, মিলটন ইঁহারাই ছিলেন তাঁহার যৌবনের স্বপ্ন। এই জন্য 'মেঘনাদবধে' তাঁহার প্রতিভার সম্যক্ স্ফূর্ত্তি,—তাঁহার বর্ণিত অঙ্গনারাও 'বীরাঙ্গনা। "What say you? Or must I sink into a writer of occasional Lyrics and Sonnets for the rest of my days? The idea is intolerable! Give me the সিংহল, old boy. I like a subject with oceanic and mountain scenery with sea-voyages, battles and love-adventures. It gives a fellow's invention such a wide scope." গীতি-কবিতা আর সনেট লিখিতে মন উঠিতেছে না,—এমন ঘটনা চাই যেখানে সামুদ্রিক এবং পার্ব্বত্য দৃশ্য থাকে, সমুদ্রযাত্রা থাকে, যুদ্ধ থাকে, দুঃসাহসিক প্রেম থাকে; নতুবা কল্পনার সম্যক স্ফূর্ত্তির ক্ষেত্র কোথায়? বিরাটত্বের এইরূপ একটা দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা লইয়াই মধুসূদনের জন্ম—এ বীরধর্ম্ম তাঁহার সাহিত্যে ও জীবনের অন্য সকল ক্ষেত্রেও।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঊনবিংশ শতাব্দীর বীর কেবল মাত্র বীর নহে,—সে হয় ত গহন পার্ব্বত্য দেশে অথবা খাখা করা মরুভূমির বুকে বসিয়াও গোলাগুলির ফাঁকে ফাঁকে আপন মনে গান গায়। তাহার প্রকৃতিগত ধর্ম্মে এই উভয় কর্ম্মের ভিতরে সত্যকার কোনও বিরোধ নাই। মহাকাব্যের কবি মধুসূদনও চমৎকার লিরিক্ লিখিয়াছেন, ইহার ভিতরেও তেমনই কোন. বিরোধ নাই। ইহার ভিতরে কোনটা তাঁহার খাঁটি প্রতিভার দান কোনটা নহে, এ প্রশ্নই ওঠে না,—দুইটাই তাঁহার খাঁটি প্রতিভার দান হইতে পারে এবং এখানে হইয়াছেও তাহাই। আসলে এ লিরিকের ধাত এবং লিরিকের ধাতের ভিতরে আমরা যেমন করিয়া একটা বিজাতীয়ত্বের ভেদ রেখা দিয়া থাকি, এই বর্ত্তমান যুগের জটিল কবিমানসের ধর্ম্মে সে ভেদবাদ অনেকখানিই অচল। আর আমরা একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিব, আমরা যাহাকে সুবিশুদ্ধ এপিক্‌ধাত বলি, মেঘনাদ-বধে শুধু তাহাকেই পাই এমন নহে, মহাকাব্যের ধ্রুপদ রাগিণীব মাঝে মাঝে কেমন করিয়া লিরিকের তান আসিয়া গিয়াছে। আসিবেই ত—কবিমনের এই যৌগিক ধর্ম্মই যে যুগধর্ম্ম।

'মেঘনাদবধে'র কোলাহল-মুখরিত রণোন্মাদনার পাশে 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' মধুসূদনের নিভৃত আপন মনের গান। এই নিভৃত মনের গানেই মানুষের অন্তরের প্রকৃষ্ট পরিচয়। আমরা সাধারণতঃ কোনও বড় লোককে জানিতে এবং বুঝিতে চাই তাঁহার জীবনের বড় বড় কাজের ভিতর দিয়া। ওটা আমাদের ভুল; মানুষের অন্তরাত্মার পরিচয় সব সময় বড় বড় কাজের ভিতর দিয়াই নহে, সে পরিচয় জড়াইয়া থাকে অনেক সময় জীবনের ছোট ছোট টুকরা টুকরা কাজ ও কথার ভিতর দিয়া—পাহাড়ের ফাটলে ফাটলে সোনার রেখার মত। অনেক কথা অনেকক্ষণ বসিয়া সুন্দর করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া বলিতে হইলে আমাদিগকে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বহু কলা-কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলিতে হয়। এই বহু ভাষণ এবং কলাকৌশলের আড়ালে আমাদের সহজ মনের পরিচয় অনেকখানি ঢাকা পড়িয়া যায়। 'মেঘনাদবধে'র ভিতরে মধুসূদনের মনের পরিচয় রহিয়াছে বটে,—কিন্তু মহাকাব্য-জাতীয় কাব্যের একটা স্বধর্ম্মও রহিয়াছে,—কবিমনকে সেখানে এই কাব্যের স্বধর্ম্মের আড়ালে খানিকটা চাপা পড়িতে হইয়াছে। কিন্তু সেই কবিমনের সহজতম এবং সুন্দরতম প্রকাশ এই চতুর্দ্দশপদী কবিতাগুলির ভিতরে।

মধুসূদন এই কবিতাগুলিতে যে ইটালীয় সনেটের গঠনরীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন চতুর্দ্দশটি পদই (পংক্তি) তাহার আসল ধর্ম্ম নহে—আসল ধর্ম্ম নিজের মনের ভাবাবেগের প্রকাশের ভিতরে একটা কঠোর সংযম। সনেট লিখিবার সকল কৃতিত্বই এইখানে,—হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস যত বড়ই হোক, তাহাকে ঘনীভূত করিয়া ছোট একটি ছাঁচের ভিতরে নিটোল ভাবে ঢালিয়া দিতে হইবে,—একটুও বেশীকম হইলে চলিবে না; এইখানেই বিপদ, এবং এই জন্যই সার্থক সনেট একান্ত বিরল। নবীন সেন কোন দিন সার্থক সনেট লিখিতে পারিতেন না,—ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের ন্যায় উচ্ছ্বাসের পর উচ্ছ্বাসের আবেগ আসিয়া সনেটের ক্ষুদ্র পরিসরকে ছাপাইয়া কবিকে যে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইত, তাহার ঠিক-ঠিকানা ছিল না। কিন্তু মধুসূদনের এই সংযম ছিল,—তিনি হৃদয়ের তরল উচ্ছ্বাসকে ঘনীভূত করিতে জানিতেন, কল্পনার রাশ টানিয়া ধরিতে জানিতেন, এই জন্যই বাঙলা-সাহিত্যে সনেটের যে তিনি কেবলমাত্র প্রথম লেখক তাহা নহে,—তিনি সার্থক লেখক। মধুসূদনের সুপ্রসিদ্ধ 'বঙ্গভাষা' কবিতাটির কথাই ধরা যাক। সংযমধর্ম্মে নবীন সেন মধুসূদনের প্রায় বিপরীত বলিয়া এ কবিতাটিকে নবীনসেন কিরূপ লিখিতেন দেখা যাক।

হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পর-ধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি

নবীন সেন ইহার পরেই তাঁহার জীবন-কাহিনী তুলিতেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিত ঘূর্ণাবর্ত্তে অনুতাপ ও তজ্জনিত বিলাপের উচ্ছ্বাস। তারপরে—

> কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি
> অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়মন,
> মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি,
> কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন।

এখানেও আমরা আর একদফা আত্ম-জীবনের ফিরিস্তি এবং উচ্ছ্বাসের পুনরাবর্ত্তন আশা করিতে পারিতাম। তারপরে—

> স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,—
> "ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
> এ ভিখারি-দশা তবে কেন তোর আজি?
> যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!"
> পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
> মাতৃভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।

ইহার কোন ঘটনাই নবীনচন্দ্রের হাতে এত সংক্ষে ঘটিতে পারিত না। প্রথমে থাকিত দেশ-কাল-পাত্রের বিস্তারিক বর্ণনা সহ একটি সুদীর্ঘ-স্বপ্ন-বৃত্তান্ত—জননী কুললক্ষ্মীও অত সহজে নিস্তার পাইতেন না; তারপরে সুদীর্ঘ উত্তর-প্রত্যুত্তর তারপরে কবির প্রত্যাবর্ত্তন—সাহিত্যের সাধনা ও সিদ্ধির অন্ততঃ সামান্য কিছু ইতিহাস। কিন্তু মধুসূদন কত অল্প কথায় মনের কত কথা প্রকাশ করিয়াছেন। মধুসূদনের প্রথম জীবনের উঞ্ছবৃত্তির অনুশোচনা—পরবর্ত্তী কালে বাঙলা ভাষার প্রতি তাঁহার হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা এবং সাহিত্য-সাধনায় তাঁহার আত্ম-প্রত্যয় এখানে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

সনেটের আদি কবি (ইটালীয়) পেট্রার্কার কবিতাগুলির ভিতরে সনেটের আরও একটি মৌলিক ধর্ম্ম দেখিতে পাই। এখানে চৌদ্দ পংক্তির কবিতাটিকে সাধারণতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম আট ছত্র লইয়া যে ভাগ, কবির রসময় বক্তব্যটিকে তাহার ভিতর দিয়াই উপস্থাপিত করিতে হইবে; পরবর্ত্তী ছয় পংক্তির ভাগে থাকিবে উপস্থাপিত বক্তব্যটিরই কিঞ্চিৎ সম্প্রসারণ। সনেট যাঁহারা প্রথম ইংরেজী কবিতায় আমদানী করেন, সেই কবিদ্বয়—ওয়াট এবং সারে এই নিয়ম রক্ষা করিয়াছিলেন; মিল্টনও মোটামুটি এই নিয়মের অনুগামী ছিলেন, সেক্সপিয়ার এই বাঁধন মানেন নাই; তবে ঐ স্বল্পায়তনের ভিতরে যে কবিমনের একটিমাত্র কথাকে সুষ্ঠু এবং সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিতে হইবে এই মৌলিক লক্ষণ সম্বন্ধে কাহারও কোথাও কোন শিথিলতা নাই। মধুসূদনও বেশীর ভাগ কবিতাতে এই আট লাইন ও ছয় লাইনের ভাগ রক্ষা করিয়াছেন, আবার অনেক স্থানে করেন নাই। তবে বক্তব্যের আত্ম-পরিপূর্ণ সুষ্ঠু প্রকাশের ব্যতিক্রম কোথাও নাই। অবশ্য দু' এক স্থলে মাত্র কবি একই বিষয়ের অবলম্বনে দুইটি সনেট পরস্পরে যুক্ত করিয়াছিলেন,—এই পরস্পর যুক্ত দুইটি সনেটের ভিতরে বিষয়টি সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র ভিতর দিয়া মধুসূদনের কাব্য-বিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা আমরা জানিতে পারি। প্রিয়তমা বঙ্গভাষার অঙ্গ হইতে মিত্রাক্ষরের স্বর্ণালঙ্কার-রূপ বন্ধন খুলিয়া ফেলাকে মধুসূদন তাঁহার জীবনের একটা মস্ত বড় মহৎ কাজ বলিয়া মনে করিতেন। ওটা যেন চলিতেছিল অন্তরের প্রেমের অভাবকে অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য দ্বারা ভরাট করিয়া তুলিবার চেষ্টা।

> বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
> লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
> মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ী। কত ব্যথা লাগে
> পর' যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
> স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে।
> ছিল না কি ভাব-ধন, কহ, লো ললনে,
> মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে
> ভুলাতে তোমারে দিল এ তুচ্ছ ভূষণে?

কবিতারাণীর প্রতি সত্যকারের সোহাগ থাকিলে যে মিত্রাক্ষরের অলঙ্কার দ্বারা তাহার মন ভুলাইবার প্রয়োজন করে না, এ-বিশ্বাস মধুসূদনের মনে দৃঢ়বদ্ধ ছিল। এই জন্যই সারা জীবন এই ছন্দ লইয়া পরীক্ষা। তিলোত্তমা কাব্যে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম বড় পরীক্ষা,—এখানে মধুসূদনের ভাষা ও ছন্দে বেশ জড়তা—একটা আড়ষ্টতা রহিয়াছে। 'মেঘনাদ-বধে' ভাষা ও ছন্দ অনেক উন্নত হইয়াছে, কিন্তু তাহা নিখুঁত নহে; অনেকখানি নিখুঁত 'বীরাঙ্গনা-কাব্য'; কিন্তু মধুসূদন সর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল এই 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে। নিগড়হীন মুক্ত কবিতা এখানে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত; তাহার কারণ বাঙ্গালা ভাষার প্রাণধর্ম্মের সহিত এতদিনে তাঁহার নিবিড়তম পরিচয় ঘটিয়াছিল।

সাহিত্যের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রসগুলি সম্বন্ধে মধুসূদনের সনেট রহিয়াছে। ইহার ভিতরে রৌদ্ররস—

> বড়ই কর্কশ-ভাষা নিষ্ঠুর, দুর্ম্মতি.
> সতত বিবাদে মত্ত, পুড়ি রোষানলে।

শৃঙ্গার রসের বর্ণনাও তেমন জমিয়া উঠে নাই। জমিয়া উঠিয়াছে বীররস এবং করুণরস, মধুসূদন যে দুই রসের সত্যকার রসিক।

> ব্যোমকেশ-সম কায়; ধরাতল পদে,
> রতন-মণ্ডিত শিরঃ ঠেকিছে গগনে।
> বিজলী-ঝলসা-রূপে উজ্জ্বল জলদে।
> ...
> "বীররস এ-বীরেন্দ্র; রসকুল-পতি।"

বীরেন্দ্র বীররস 'রসকুলপতি' বটে; কিন্তু করুণরস 'রস-কুলে

রাণী'। রসকুলপতি হইতে রসকুলরাণীর প্রতিই মধুসূদনের হৃদয়ের আকর্ষণ বেশী ছিল বলিয়া মনে হয়।

সুন্দর নদের তীরে হেরিনু সুন্দরী
বামারে মলিনমুখী, শরদের শশী
রাহুর গরাসে যেন! বিরলেতে বসি,
মৃদু কাঁদে সুবদনা; ঝরঝরে ঝরি,
গলে অশ্রুবিন্দু, যেন মুক্তাফল খসি!
সে নদের স্রোতঃ, অশ্রু পরশন করি,—
ভাসে, ফুল্ল কমলের স্বর্ণকান্তি ধরি,
মধুলোভী মধুকরে মধুরজে বসি,
গন্ধামোদী গন্ধ বহে সুগন্ধ প্রদানি।
না পারি বুঝিতে মায়া, চাহিনু চঞ্চলে
চৌদিকে, বিজন দেশ; হৈল দৈববাণী
"কবিতারসের স্রোতে এ নদের ছলে;
করুণা বামার নাম—রসকুল রাণী;
সেই ধন্য, বশ সতী যার তপোবলে।"

করুণরসের প্রতি মধুসূদনের এই আকর্ষণ শুধু একটা কাবিক উচ্ছ্বাস নহে; ইহাতে মধুসূদনের কাব্যধর্ম্মের স্বরূপও উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। মধুসূদনকে আমরা বীররসের কবি বলিয়াই জানি; কিন্তু মেঘনাদবধ-কাব্যে জমিয়া উঠিয়াছে কোন্ রস সবচেয়ে বেশী? মনে হয় তাহা করুণ রস। বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রধান রস কি? বীর না করুণ? বীররস এবং করুণরস পরস্পরবিরোধী নহে, করুণরস বীররসের ব্যভিচারী;—সুতরাং উভয়ে একসঙ্গে মিশ্রিত হইয়া থাকিতে পারে। মধুসূদনের সাহিত্য-সৃষ্টিতে প্রধানই হইয়া উঠিয়াছে বীরমিশ্রিত করুণরস।

অনেকে বলেন, করুণরসই একমাত্র রস, আর সকল রস করুণরসেরই প্রকারভেদ মাত্র; সুতরাং মূলতঃ করুণ রসকে অবলম্বন করিয়াই সকল সাহিত্য গড়িয়া উঠে। ইংরেজী কবি কীট্‌স্-এর বাণী আমরা অনেকেই জানি—

"Our sweetest songs are those that tell of
saddest thought."

কবি ভবভূতি তাঁহার "উত্তররামচরিতে" বলিয়াছেন—

একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদাদ্—
ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্ত্তান্।
আবর্ত্ত-বুদ্বুদ-তরঙ্গময়ান বিকারান্
অম্ভো যথা সলিলমেব তু তৎ সমগ্রম্।

রস এক, সে করুণরস; নিমিত্তভেদে ভিন্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সে পৃথক্ পৃথক্ রূপে বহু বিবর্ত্তের আশ্রয় গ্রহণ করে। সমুদ্রের জল যেমন বিভিন্ন কারণে আবর্ত্ত, বুদ্বুদ এবং তরঙ্গ প্রভৃতি বিকার লাভ করে,—কিন্তু মূলে তাহার সবই জল। রস যে মূলে এক, তাহা অনেক আলঙ্কারিকই স্বীকার করিয়াছেন; কেহ কেহ এই করুণরসকেই এই মূলরস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মধুসূদনের কাব্য-সৃষ্টি সমগ্রভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাইব—মনের জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তিনিও যেন এই বিশ্বাসেই বিশ্বাসী ছিলেন, এবং এইজন্যই বোধ হয় রসকুল-রাণী করুণরসের প্রতি মধুসূদনের হৃদয়ের এত আকর্ষণ।

মধুসূদন তাঁর 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র ভিতরে দেশ-বিদেশের পূর্ব্বসূরিগণকে তাঁহার হৃদয়ের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইঁহাদের ভিতরে যেমন ভিক্টর হিউগো, আলফ্রেড টেনিসন্ রহিয়াছেন, আবার ব্যাস্, বাল্মীকি, কালিদাস প্রভৃতি রহিয়াছেন, অন্যদিকে আবার বাঙ্গালীর ঘরের কবি জয়দেব, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম, ভারতচন্দ্র, এমন কি ঈশ্বর গুপ্তও রহিয়াছেন। এই পূর্ব্বসূরিবর্ণনা মধুসূদনের প্রতিভার ঔদার্য্য। সকলে এমন করিয়া করেন নাই,—পারিতেনও না, কাশীরাম দাসের বন্দনায় মধুসূদন যে শুধু কাশীরামের প্রতি তাঁহার আশৈশব শ্রদ্ধাকেই সুন্দর এবং গম্ভীরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নহে, অল্পায়তনের ভিতরে অদ্ভুত সংযম লইয়া সংস্কৃত মহাভারতের বাঙ্গালারূপে অবতরণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন।

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি-দ্বৈপায়ন,
ঢালি সংস্কৃত হ্রদে রাখিলা তেমতি,
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী—
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন!)
সগর-বংশের যথা সাধিল মুকতি;
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবনে;
সেইরূপে ভাষাপথ খনন স্ববলে
ভারতরসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে।
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশী! কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্!

জনম-দুঃখিনী সীতার জন্য মধুসূদনের হৃদয়ের নিভৃত প্রান্তে একটি কোমল আসন বিছান ছিল। 'মেঘনাদ বধে'র ভিতরে ইহার স্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে, এই সনেটগুলির ভিতরেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা,
বৈদেহি! কখন দেখি, মুদিত নয়নে,
একাকিনী তুমি, সতি, অশোক-কাননে
চারিদিকে চেড়ীবৃন্দ চন্দ্রকলা যথা
আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে! হায়, বহে বৃথা
পদ্মাক্ষি, ও চক্ষুঃ হ'তে অশ্রুধারা ঘনে।

'রামায়ণ' কবিতাটিতে মধুসূদন সীতাকে 'নিত্য-কান্তি কমলিনী তুমি ভক্তিজলে!' বলিয়াছেন।

এই চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীকে অবলম্বন করিয়া মধুসূদনের অন্তর্নিহিত স্বদেশপ্রীতি, স্বজাতিপ্রীতি এবং হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং প্রীতি সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস বাহুল্য আজ কাল বেশ একটা রেওয়াজ হইয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাগুলির ভিতরে আমরা দেখিতে পাই, বাঙলার নদ-নদী মাঠ-ঘাট, এমন কি বাঙলার প্রান্তরের বৃদ্ধ বটগাছটি এবং বাঙলার কাননের 'বউ কথা কও' পাখীটি পর্য্যন্ত বিদেশে মধুসূদনের মন অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এই ত গেল স্বদেশপ্রীতির কথা। বাঙলার কবি, বাঙলার মনীষী, বাঙলার ভাষা ও সাহিত্য—বাঙলার পাল-পার্ব্বণ, আনন্দ-উৎসবও মধুসূদনের মন ভরিয়া রাখিয়াছিল, ইহা তাঁহার গভীর স্বজাতি প্রীতির নিদর্শন। তারপরে বাঙলার 'শ্রীপঞ্চমী' 'আশ্বিন মাস, 'বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির', 'বিজয়া দশমী', 'কোজাগরলক্ষ্মীপূজা' প্রভৃতি সম্বন্ধে কবিতা মধুসূদনে অন্তর্নিহিত স্বধর্ম্ম (হিন্দু) প্রীতির পরিচায়ক। এ প্রসঙ্গে অনেকেই বলেন যে, মধুসূদন স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে চলিয়া গেলেও এবং বিদেশী সভ্যতা, শিক্ষা এবং ধর্ম্ম—এমন কি বিদেশী পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার গ্রহণ করিলেও স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মপ্রীতি তাঁহার অন্তরে ফল্গুস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছিল। এই আবিষ্কারে উৎসাহিত হইয়া অনেকে আবার মধুসূদনের নামের পূর্ব্ববর্ত্তী 'মাইকেল' কাটিয়া সেখানে অপূর্ব্ব 'শ্রী'র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

আমার মনে হয়, এ কবিতাগুলিকে একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখা উচিত। কাব্যের ক্ষেত্রে কবির ব্যক্তিপুরুষের পরিচয় স্বদেশ-প্রেমিক, স্বজাতি-প্রেমিক বা স্বধর্ম্ম-প্রেমিকরূপে তত নয়, যতখানি কবিরূপে। একটি কবিমন এবং একটি সাধারণ মনের ভিতরে প্রভেদ কোথায়? একটি সাধারণ মন বাহ্য বস্তুকে বা ঘটনাকে গ্রহণ করে মুখ্যতঃ তাহার ব্যবহারিক রূপে; সেই ব্যবহারিক রূপের ভিতর দিয়া যেটা প্রধান হইয়া ওঠে তাহা বস্তু বা ঘটনার অর্থক্রিয়াকারিত্ব। কিন্তু প্রত্যেক বস্তু বা ঘটনার ব্যবহারিক রূপকে ছাপাইয়া তাহার আর একটী মূর্ত্তি ধরা পড়ে কবিমনের কাছে—উহা বস্তু বা ঘটনার রসমূর্ত্তি; এখানে অর্থক্রিয়াকারিত্বের প্রভাব কিছু কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাকে কখন প্রধান করিয়া দেখিলে চলিবে না, প্রধান হইয়া উঠে কবির মনের কাছে ঐ রসমূর্ত্তি। যে কবিতাগুলির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা দ্বারা সবচেয়ে বেশী করিয়া যে কথাটি প্রমাণিত হয় তাহা এই যে মধুসূদনের ভিতরে বাস করিত একটি সত্যকারের কবিমন, যে দেশ, জাতি, সমাজ, ধর্ম্মের সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া পারিপার্শ্বিক জগৎকে গ্রহণ করিতে পারিত তাহার বিশুদ্ধ রসমূর্ত্তিতে। দেশ-কাল-পাত্রের বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই একান্ত ভাবে পরিচ্ছিন্ন বস্তুর যে রূপ তাহা বস্তুর সাহিত্যিক রূপ নয়, দেশ কাল পাত্রের ঊর্দ্ধে সকল স্বার্থ ও সংস্কারের ঊর্দ্ধে বস্তুর যে রসরূপ তাহাই যথার্থ সাহিত্যের সামগ্রী। আমার মনে হয় 'শ্রীপঞ্চমী', 'আশ্বিনমাস', 'বটবৃক্ষতলে শিবলিঙ্গ', 'বিজয়া দশমী', 'কোজাগর লক্ষ্মীপূজা' প্রভৃতিকে মধুসূদন প্রধানতঃ বাঙালী বা হিন্দু দৃষ্টিতে দেখেন নাই, দেখিয়াছেন মূলতঃ তাঁহার কবিদৃষ্টিতে।

ধর্ম্ম সম্পর্কে বলিতে গেলে বলিতে হয়, মধুসূদন হিন্দু ছিলেন না খৃষ্টানও ছিলেন না। হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসের গলদ বুঝিতে পারিয়াই যে তিনি ত্রাণকর্ত্তা যিশুকে আশ্রয় করিয়াছিলেন তাহা নহে, আশৈশব যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে উন্মাদ করিয়া জীবনের পথে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া দিয়াছিল, সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাঁহাকে স্বদেশ, স্বজাতি এবং স্বধর্ম্মত্যাগী এমন কি স্বভাষা, স্বসাহিত্যত্যাগী করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি যে নিজের ভাষা এবং সাহিত্যকে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার ভিতরেও প্রধান ছিল একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অদম্য যশোলিপ্সা। ইংরেজী কাব্য রচনা করিয়া সেই যশ লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকিলে তিনি ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরতেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। সুতরাং মধুসূদনের খৃষ্টধর্ম্ম বিশ্বাসের ভিতরে ভিতরে হিন্দু-বিশ্বাস ও সংস্কারের ফল্গুস্রোতের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

'নিশাকালে নদীর তীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির' দেখিয়া মধুসূদনের যে ভাল লাগিয়াছিল এবং সেই সুখময় স্মৃতিটি যে সুদূর ভরসেলস নগরে তাঁহার মানস-নেত্রে জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহার কারণ কোন প্রচ্ছন্ন ধর্ম্ম সংস্কার নহে, তাহার কারণ 'নিশাকালে নদীর তীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দিরের' একটি সৌন্দর্য্য এবং রহস্যমণ্ডিত রসমূর্ত্তি; মধুসূদন ঐ মন্দিরকে দেখিয়াছিলেন ও সেই রসমূর্ত্তিতে এবং তাহাকে কাব্যে প্রকাশও করিয়াছেন সেই রসমূর্ত্তিতে। বিশ্বসৃষ্টি যে তাহার সকল আয়োজনের দ্বারা নিভৃত নিশিতে কোনও বিশ্বনাথের আরাধনায় মগ্ন তাহা কোনও ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রণোদিত না হইয়া বিশুদ্ধ কাব্যবুদ্ধি-প্রণোদিতও হইতে পারে। কোজাগর লক্ষ্মীকেও মধুসূদন এই জাতীয় দৃষ্টিতেই দেখিয়াছিলেন। নিত্য নূতন শিক্ষা ও সংস্কৃতির ফলে আমাদের নব্য শিক্ষিতদের মন হইতে অনেক ধর্ম্মসংস্কার লোপ পাইয়াছে—এ কথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না; কিন্তু তথাপি দেখিতে পাই, শুচিস্নাতা কুলবধূগণ পূর্ণিমার সন্ধ্যায় বিচিত্র আলপনায় ঘর ভরিয়া দিয়া যখন আম্রের পল্লবসহ ভরা কুম্ভ স্থাপন করে এবং পুষ্পে চন্দনে ধূপে দীপে একটা আবেষ্টনীর সৃষ্টি করে, তখন তাহা আমাদের মন্দ লাগে না। তাহার কারণ, এই সমস্ত আয়োজন এবং আবেষ্টনীর ধর্ম্মের মূল্য ব্যতীত আর একটা বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য একটা রসের দিক আছে, উহা দেশ-কাল-পাত্রের বাহিরে। অবশ্য ধর্ম্মসংস্কার যে

এখানে কিছুই কাজ করে না, একথা বলা যায় না, তবে তাহার কাজই এখানে প্রধান নহে; সে আমাদের অবচেতনে থাকিয়া অস্ফুট বর্ণচ্ছটায় সুন্দরকে আরও সুন্দর করিয়া তোলে।

আমাদের সাহিত্যের জগৎটা অনেকখানিই স্মৃতির জগৎ —'Emotion recollected in tranquillity'। স্মৃতি জীবনের আবর্জ্জনাকে দুই হাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া জীবনের সুখ-দুঃখ-হাস্য-অশ্রুমাখা যাহা কিছু মর্ম্মস্পর্শী, তাহাকেই আঁচল ভরিয়া যত্নে সঞ্চিত করিয়া রাখে; স্মৃতি আমাদিগকে যখনই একাকী নিরালা মনে পায়, তখনই তাহার সঞ্চিত রত্ন ভাণ্ডার হইতে সপ্তরঙের রত্নগুলি আমাদের মানসপটে ভাসাইয়া খেলে—অতি মধুর তাহাদের আস্বাদন। সুদূর ফরাসীদেশের ভর্‌সেল্‌স্‌ সহরে বসিয়া বাঙলা দেশের নদ-নদী, বৃক্ষ-লতা, আকাশের পাখী, উৎসব-আনন্দ—সকলের স্মৃতি মধুসূদনের চিত্ত ভরিয়া দিয়াছিল। আমরা আমাদের প্রিয়জন হইতে যত দূরে সরিয়া যাই, সে আমাদের নিকট একটা অপূর্ব্ব মহিমা লইয়া ততই মধুর হইতে মধুরতম হইয়া ওঠে। স্বদেশ সম্বন্ধেও তাহাই; দূর হইতে কল্পনায় আমরা তাহার সকল ত্রুটি সকল দৈন্য ভরিয়া লই, তখন কি মধুর তাহার স্মৃতি—কি অমোঘ তাহার আকর্ষণ। মধুসূদনের ক্ষেত্রেও হইয়াছিল তাহাই, তাই—

> সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
> সতত তোমারি কথা ভাবি এ বিরলে;
> সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
> শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
> জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।
> বহুদেশ দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
> কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
> দুগ্ধ স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।

শৈশবের বহু স্মৃতিজড়িত এই কপোতাক্ষ নদ! 'আশ্বিন মাসে'—

> সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
> এসেছেন ফিরি উমা, বৎসরের পরে,
> মহিষমর্দ্দিনীরূপে ভকতের ঘরে;
> ... ...
> কি আনন্দ! পূর্ব্বকথা কেন ক'য়ে স্মৃতি,
> আনিছ হে বারিধারা আজি এ নয়নে?
> ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব্ব-ভকতি?

শৈশবের ধর্ম্মসংস্কার—আনন্দের স্মৃতি—তাহার ভিতরে একটা অপরূপ মাধুর্য্য রহিয়াছে; বঙ্গের আশ্বিন মাস, তাই সুদূর প্রবাসে কবিমনে একটি অপূর্ব্ব রসমূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত।

স্নেহের দুলালী উমাকে লইয়া বাঙালীর হৃদয়-তারে বাৎসল্য প্রেমের করুণ-মধুর সুর চিরদিন ঝঙ্কার দিয়াছে। কবিওয়ালা, পাঁচালীওয়ালা ও যাত্রাওয়ালাগণের 'আগমনী' সঙ্গীত করুণ রসের সুধাধারা। বাঙালীর সেই করুণ সুরটী মধুসূদনের হৃদয়েও ঝঙ্কার তুলিয়াছিল। 'বিজয়া-দশমী' সেই সুরেই ঝঙ্কৃতা—

> "যেয়ো না, রজনী, আজি লয়ে তারাদলে।
> গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!
> উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
> নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।
> বারোমাস তিতি, সতি নিত্য অশ্রুজলে
> পেয়েছি উমায় আমি, কি সান্ত্বনা-ভবে—
> তিনটি দিনেতে কহ, লো তারা কুন্তলে
> এ দীর্ঘ বিরহজ্বালা এ মন জুড়াবে?
> তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
> দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী
> মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণকুহরে!
> দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে আমি জানি,
> নিবাও এ দীপ যদি।"—কহিলা কাতরে
> নবমীর নিশাশেষে গিরীশের রাণী।

ইহা বাঙলার আগমনী গানেরও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, অমিত্রাক্ষরেরও পরম সফলতা—সনেটেরও সফল উদাহরণ। এইখানেই মধুসূদনের শক্তির পরিচয়—এইখানেই তাঁহার প্রতিভা লোকোত্তর।

বউ কথা কও (গল্প)

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

পাগল!

পাগল না হলে বাগানের এতগুলো গাছে একটা পাখীও বসতে দেয় না। কাক, চিল, বাগুড় থেকে সুরু করে মায় শকুনি পর্য্যন্ত। কেউ যদি এসে বসল পাগলটা বিরাট এক খানা লাঠি নিয়ে তাড়া সুরু করলে পিছু পিছু, যতক্ষণ না তাকে বাগান থেকে তাড়াচ্ছে রেহাই নাই।

আগাছায় বাগানটা ভর্ত্তি, বক্রেশ্বর নদীর ধারে গ্রামপ্রান্তে নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোন সুদূর অতীতকাল থেকে, নীচেটা সেয়াকুল, বৈঁচি, বনখেজুরের জঙ্গলে ভর্ত্তি।

পাশের ভাঙ্গা নুইয়ে পড়া বাড়ীটার দিকে পাগল ছুটে চলেছে "এই যো আপ আপ"।

তার কণ্ঠস্বরে নির্জ্জন বাগান, ধ্বসে-পড়া বাড়ীটা ভরে উঠেছে।

কুসুমযাত্রার মুখুয্যেদের বাড়ীগুলো তালপুকুরের পাড় থেকে সুরু করে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ধ্বসে পড়েছে। বাড়ীগুলোর উপর গজিয়েছে বট অশথ গাছের জঙ্গল, যেন কার সমাধির উপর প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে ওরা। বিরাট মন্দিরটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে' কোন রকমে টীকে রয়েছে।

বাড়ীখানা অবশ্য একদিনে ভাঙ্গে নি, ভাঙ্গন ধরেছিল অনেক দিন আগে থেকেই, পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে এসে নবেন্দুর সময়েই।

বংশের একটি মাত্র সন্তান হয়ে জন্মান নাকি অভিশাপ? সত্যি কি না জানি না!

সুন্দর সুপুরুষ চেহারা, সবচেয়ে মধুর ছিল তার কণ্ঠস্বর! ভগবান দুই হাত দিয়ে তাকে এ দানে ভাগ্যবান করেছিলেন। নারাণবাবুও ছিলেন গানের ভক্ত, ছেলের গলা দেখে তিনিও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। বাড়ীতে ওস্তাদ রেখে মুখুজ্যে ম'শায় ছেলের গান শেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। পুত্রগর্ব্বে নিজের বন্ধুদের কাছে তাঁর বুক ভরে উঠত। মুখুয্যে ম'শায়ের মনে আসে একদিনকার কথা। অনেকদিন আগে এক ফকীর নবেন্দুর গান শুনে অযাচিত ভাবে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন "বাচ্চা, তুমরা তানসেন বন যাও।" নবেন্দু ঠিক বোঝেনি হয়ত কথাটার অর্থ। বুঝেছিলেন নারাণবাবু।

গিন্নীর মুখ ভার। নারাণবাবু অনেকটা চেষ্টা করেও কথা কওয়াতে পারলেন না। অগত্যা ফুরসির নলটা মাটিতে ফেলে দিয়ে উঠতে যাবেন—শব্দ শুনে গিন্নী ফিরে চাইলেন, "উঠছ যে, জল খাবে না?"

নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দেন নারাণবাবু, "না কায আছে?"

ধীরে ধীরে বার হয়ে যাচ্ছেন হঠাৎ—গিন্নী পথরোধ করে দাঁড়ালেন, "শোন! একটা কথা তোমায়—?"

জিবটা বারকতক তালুতে ঘর্ষণ করে নেন নারাণবাবু, "আহা বলই না।"

"হাঁ, ছেলেটার পরকাল যে ঝরঝরে করছ - তাই আর না বললে পারলাম না! ওকে—"

বাধা দিয়ে ওঠেন মুখুয্যে মশায়, "ও তাই বল।"

পরিত্যক্ত নলটা তুলে নিয়ে ঝাঁকিয়ে বসলেন, "শোন তা হলে, বিষ্টুপুরের বড় ওস্তাদ কি বলছিলেন জান,—ও চেষ্টা করলে একজন মস্ত গায়ক হবে, বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে, আর তাকে আমি গান শেখাব না, এটা কি একটা কথা হলো!"

মা গজ গজ করতে থাকেন। কিন্তু নবেন্দুর শিক্ষায় বাধা পড়ল না। সৌম্য শ্মশ্রুবহুল মুখমণ্ডল, যেন কোন সমাধিস্থ ঋষি। ওস্তাদজী দেখলে নবেন্দুর মনে আসে এক অজানা লোকের কথা, পাখোয়াজ, তানপুরা, সারেঙ্গীগুলো তার কাছে দেবতার পীঠস্থানের মতই পবিত্র! মানুষের সাধনার বেদীতল দেবতারও প্রণম্য, যেখানে হয় আত্মার আরতি অবচেতন মনের ভাবে।

সূর্য্য ঢলে পড়ছে পশ্চিমদিগন্তে। এক ছোপ লাল রং কোন হতভাগ্যের বক্ষরক্তের মত আকাশপ্রান্ত ভরে তুলছে, মাথার উপর উদার আকাশে সাত রংএর সারি! সপ্তাশ্বের পদচিহ্ন আকাশপথ ভরিয়ে তুলছে, দূর বনানীশীর্ষে জাগে বিদায়-বিধুর সন্ধ্যার আহ্বান।

নবেন্দু আলাপ করে চলেছে পূরবী রাগিণী! কায়াহীন অরূপ রূপায়িত হয়ে ওঠে মনের সামনে! বিদায়বিধুর সন্ধ্যায় নেমে আসে কোন বিসর্জ্জিতা ঋষিকন্যার জ্যোতিহারা ম্লান দেহ, ধরণীর ধূলাকণায় ছড়িয়ে পড়ে তার যশঃসৌরভ। ঢেউএর গানে জাগে তার বন্দনা। তারে তারে রূপায়িত হয়ে ওঠে কোন নীরব অতীতের কাহিনী। ভাষাহীন হয়ে ফুটে ওঠে বিরহীর সাধনায়! পাণ্ডুর সূর্য্য কার উদ্দেশ্যে প্রণতি জানিয়ে ঢলে পড়ে…ফুলের দিন হয়ে এল অবসান, পথহারা বিহগ ফিরে গেল বৃক্ষশাখার নীড়ে। দূরে গ্রামপ্রান্তে নিভে গেল ভীরু সন্ধ্যাপ্রদীপ। নদীর মৃদু কলতান নীরব আকাশ-বাতাসে মাথা খুঁড়ে মরে।

ঊষার ডাকে ফিরে চাইল স্বপ্নাবিষ্টের মত নবেন্দু। হাতের আলোটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে ঊষা, "আচ্ছা মানুষ যা হোক, মাথা খারাপ নাকি! বলতে পার দিনরাত ঐ আপদগুলো নিয়ে পড়ে থাকবে?"

ঘরের নীরবতা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়! ঊষার কথাগুলো নবেন্দুর মনের দরজায় এসে ঘা দেয়—আজ থেকে নয়।

প্রায় বছর খানেক হল নবেন্দুর বিয়ে হয়েছে আমোদপুরের জমিদার-বাড়ীতে। গিন্নীর কথাতেই নারাণবাবু

ছেলের বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। দিনরাত কাণের কাছে উঠতে বসতে খোঁটা—ছেলেকে এইবার ডোর কপ্‌নী কিনে দিও, বুঝলে।

অগত্যা নারাণবাবু পাত্রীর সন্ধান সুরু করলেন, আর ভাগ্যক্রমে জুটে গেল আমোদপুরের মোহিনী বাবুর মেয়ের সঙ্গে। হাজার হোক, নামকরা জমিদারঘর কুটুম্ব করতে পারলে লাভ ভিন্ন ক্ষতি কিছুই নাই। আর মেয়ে কিছু মন্দ নয়, মুখুয্যে মশায় ভয় পেয়েছিলেন যে বড় ঘরের মেয়ে, হয় ত চোটপাট একটু হবে, কিন্তু শেষ অবধি ভয়টা থাকে নাই।

অনেক আশা নিয়েই এসেছিল উষা স্বামীর ঘরে, মনে ছিল ওর রং এর পরশ, সারাদেহে বাঁধনহারা যৌবনের প্রাচুর্য্য, চোখে কোন স্বপ্নবিলাসীর মায়াঞ্জন! কিন্তু রূপের নেশা সকলকে মুগ্ধ করে না, করতে পারে না।

নবেন্দুর ধাবমান মূর্ত্তির দিকে চেয়ে বলে ওঠে উষা, "যাওয়া হচ্ছে যে!"

মুখ না ফিরাইয়াই উত্তর দেয় নবেন্দু, "কাজ আছে।"

"কাজ আছে! সারাদিন ত সেতার এস্রাজ নিয়েই হা হা করছ! অমন কাজের মুখে—"

কথাটা শেষ হল না। নবেন্দু আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল, বিছানার উপর বেহালাটা পড়ে রয়েছে, দু'হাত দিয়ে তুলে নিয়ে তার দুটো ধরে প্রাণপণে টানতে থাকে। ভেঙ্গে ফেলবে, ছিঁড়ে ফেলবে টুকরো টুকরো করে, ওগুলোকে আর রাখবে না।

কি মনে করে ছুড়ে ফেলে দিল বেহালাটাকে, সশব্দে ঘরের কোণে গিয়ে পড়ল, আলোটা নিবিয়ে দিয়ে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ে গণ্ডদেশ বয়ে।

রাত্রি হয়ে গেছে। পাড়াগাঁয়ের নির্জ্জন পথে লোকজন নাই, নিঝুম গাছগুলো প্রহরীর মত ধূলিধুসর রাস্তাটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। নতুন পুকুরের কালো জলে আকাশের তারা চুমো দিয়ে যায়, রাতের বাতাস আকাশপ্রান্তে বুলিয়ে যায় হালকা হাতের স্পর্শ—গাছের মাথায় শিহরণ জাগিয়ে।

নবেন্দু সবেমাত্র ফিরেছে মণিরামপুর থেকে। ওখানকার দত্ত-গোষ্ঠীতে চলেছে বংশানুক্রমিক ভাবে সঙ্গীতের চর্চ্চা··· সারা ভারতের অনেক বড় বড় ওস্তাদের পদধূলি রয়েছে আজও ওদের বিরাট বাড়ীতে। আলাউদ্দিন খাঁ, বনোয়ারী সিংহ, লক্ষ্ণৌর মতিয়া বাঈজী, আরও অনেকে...সেই আসরে আজ নবেন্দুও গিয়েছিল নিমন্ত্রিত হয়ে। দুদিন পরে ফিরেছে আজ।

গলার ভারি মালাগাছটা টেবিলের উপর সন্তর্পণে নামিয়ে উষার ঘুমন্ত মুখখানিতে এঁকে দেয় তীব্র চুম্বনরেখা।

ধড়্‌মড়্‌ করে উঠে পড়ল। সামনেই নবেন্দুকে দেখে মাথার কাপড়টা একটু টেনে বসল! নবেন্দু বলে চলেছে - "বুঝলে উষা এবার ঠুংরীতে—"

উষা উঠে পড়ল। কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে, "পাচীর মাকে বলে দিচ্ছি নীচে রান্নাঘরে খাবার দেবে, তোমার না হয় ঘুম নেই, বাড়ীর আর সবাই কি জেগে বসে থাকবে।"

ইতস্ততঃ করে ওঠে নবেন্দু, "আহা পাচীর মা কেন আবার। তুমিই চল না।"

"আমার শরীর ভাল নেই।". শুয়ে পড়ল উষা।

নবেন্দু এতক্ষণে কারণটা কিছু অনুমান করতে পারে। শ্বশুর-বংশের সঙ্গে মণিরামপুরে দত্তগোষ্ঠীর কি রকম একটু বিবাদ আছে, তার বিয়ের সময়েই ত গোলমাল বেধেছিল। হয় ত তাই উষার এ অভিমান। অপ্রস্তুতের মত বলে বসে—কিন্তু ওরা যে আমায় নেমন্তন্ন করে বসল। ওদের মেজবাবু সেদিন আমার হাত ধরে বল্লে—না গেলে—"

ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে উষা, "আমাকে কি বলছ ওসব, বাবাকে বলবে। একটু ঘুমুতে দেবে তুমি, রাত দু'পুরে কি ফ্যাসাদ?

নবেন্দু বার হয়ে গেল ঘর থেকে, সরাবাড়ীটা নিঝুম স্বপ্নপুরীর মত গম্ভীর। খানিকটা তোবড়ান চাঁদ তিন্তিড়ি গাছটার সরু ডালের আড়ালে উঁকি মারছে সুপ্ত ধরণীর দিকে। ঝিঁঝি পোকার একটানা ডাকে বাশবনে দল বেধে জোনাকীর দল খুঁজে ফেরে কোন পথহারাকে।

ক্রমশঃ ক্ষীণ চাঁদ জানালা থেকে সরে গেল, চাঁদের ভালবাসা মিশিয়ে যায় অতল অন্ধকারে।

হঠাৎ উষার ঘুম ভেঙ্গে যায়। নিদ্রাবশে অলস হাত দুটা কাকে যেন জড়িয়ে ধরতে যায়। নিটোল বুকে জাগে রাতের মায়া, চোখ বুজে কার দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে দেয় অবলম্বন খুঁজবার প্রচেষ্টায়।

উষার স্বপ্নজড়িমা দূর হয়ে গেল। বিছানায় কেউ নাই। উষা এলিয়ে পড়ে বিছানায়। পাশ-বালিশটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে লুটিয়ে পড়ল!

ঘুম আসে না।

বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী যায় নি নবেন্দু। ছোট শালীর বিয়েতে অনেক করে শ্বশুর ম'শায় নিয়ে গেছেন মেয়ে জামাইকে। বিয়ে বাড়ী, নিকট দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনে বাড়ী ভর্ত্তি।

গ্রামের বরযাত্রী, রাতের অতিথি কিন্তু বর কিংবা বর-কর্ত্তার চেয়েও সম্মান তাদের না কি বেশী। বাইরে খাজাঞ্চী-খানার বিরাট হলঘরে তাদের থাকবার জায়গা হয়েছে, লোকজন আমলা গোমস্তা সকলেই তাদের তদারক করতে ব্যস্ত! বিন্দুমাত্র ত্রুটী হলেই রাগ···খাও খাব না, আবার তেমন তেজী বরকর্ত্তা হলে আলটিমেটাম দেবেন—ছেলের

বিয়ে দেব না! সুতরাং গোলমাল যাতে না হয়—তার জন্যই ব্যস্ত!

বর সভায় এসেছে! স্ত্রী-আচার দেশাচারের পরে সুরু হবে প্রথমেই জামাই বরণ করার পালা। শ্বশুর মশায় সমস্ত জামাইদেরকে বরণ করে নূতন জামাইকে নিয়ে পড়বেন। কিন্তু যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই, নবেন্দুকে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেছে কেউ তা' জানে না! বিয়ের লগ্ন চলে যাচ্ছে, অথচ বরণ না করলেও নয়, চারদিকে খোঁজাখুঁজি পড়ে গেল!

শ্বশুর মশায় একে ব্যস্তবাগীশ লোক! তার উপর কন্যাদায়! সারাদিন উপোস করে মেজাজটাও রুক্ষ হয়ে আছে! বিবাহ-সভাতেই জামাই-এর উদ্দেশে দু'চারটে কথাও বলতে ছাড়েন না।

নবেন্দুর এখন সময় নাই! বরযাত্রী এবং উপস্থিত অনেক সমজদার শ্রোতাই রয়েছে; সুতরাং গান জমতে দেরী হল না। তাঁদের অনুরোধে নবেন্দুকে গাইতে হয়েছে ইমন ...।

মধ্যরাত্রির রহস্যময়ীরূপে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে কোন মানস-কন্যার অশরীরী কান্না! কামনার সমাধিতীরে মানবমনের আত্মাহুতির সেতু রচিত হয়, আকাশের তারায় তারায় জাগে শিহরণ, আবেশে তারা কম্পিত হয়ে ওঠে।

অনেক ডাকাডাকির পর সে এসেছে, শ্বশুর মশায় রুক্ষমুখ আগ্নেয়গিরির মত ফুসছেন। লগ্ন এসে গিয়েছে! কে যেন ওদিক থেকে দন্তহীন মাড়িটা বের করে "বাবাজী! গায়েন করে- যাত্রাদলের লোক ঐ তোমার শ্বশুরের আসরে, বুঝলে!" অকারণেই হাসতে থাকে হি হি করে।

উষা একলা পেয়ে ঝাঁঝিয়ে ওঠে, "মানুষ কি কোন দিনই হবে না তুমি?"

নবেন্দু অবাক না হয়ে পারে না! "কেন, কি করলাম?"

"কি আর করলে? বাবা যা না তাই বললেন। অত লোকের সামনে যাত্রাদলের লোকের মত গান করতে লজ্জা লাগে না। যা কর বাড়ীতে কর, বাবার মাথা নীচু করে লাভটা কি হবে বলতে পার?"

জানলা দিয়ে উঁকি মারছে অনেকগুলো মুখ...মাথা। বড়দিদি দরজার পাশ দিয়ে সরে গেলেন। নবেন্দু নীরবে বার হয়ে এল।

নবেন্দুকে কলকাতায় আসতে হবে। All Bengal Music Conference-এ নিমন্ত্রণ আছে। দিন কয়েক খেটে খুটে কয়েকটা নূতন রাগ তৈরী করে চলেছে।

নিঝুম রাত্রির মাঝে সুর-বাহারের তারে তারে গুমরে ওঠে কার নীরব ক্রন্দন—বিপ্রলব্ধ ধরণীর আবেদনের সাথে দিগদিগন্তে গুমরে ফেরে।

সারাদেশে ছড়িয়ে পড়বে তার নাম, সকলে চিনবে-শুনবে তার গান। সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়বে তার যশঃসৌরভ, কোন ফকীর নাকি তাকে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, "দুসরা তানসেন বনেগী।"

মহাপুরুষের আশীর্ব্বাণী সফল করে তুলতে হবে। এ তার সাধনা, জন্মজন্মান্তরের কামনা।

"শুনছ!" উষার ডাকে ফিরে চাইল। সেজেগুজে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজ ফাল্গুনী-পূর্ণিমা।

নবেন্দুর গায়ে একটা ছোট্ট ধাক্কা দিয়ে বলে ওঠে, "আর শুনছ! গান ত' হবে সারাদিন, একটু থাম।"

ফিরে চাইল, "এ কি! নূতন শাড়ী; সারা গায়ে গহনা, কনে বউ-এর মত, ব্যাপার কি?"

হাসির ঝিলিক টেনে বলে ওঠে উষা, "আজ যে আমাদের...হাঁ মশায় জানেন না যেন কিছু!"

নিজেকে এলিয়ে দিল নবেন্দুর গায়ের উপর। আজ তাদের বিবাহ দিন, এই ফাল্গুনী-পূর্ণিমায় তারা পেয়েছিল দু'জনে দু'জনকে। "ও কি!" হাসি মুছে গেল মুখ থেকে।

নবেন্দু বাইরে চলে যাচ্ছে তানপুরাটা হাতে করে। দলিতা ফণিনীর মত উঠে পড়ে উষা, "দাঁড়াও, চলে যাচ্ছ যে!"

"কালই কলকাতায় যেতে হবে উষা, সময় নাই।" বেরিয়ে গেল ধীর পদে, পিছু পিছু খানিকটা এসে আবার ফিরে গেল উষা ঘরের মধ্যে। প্রাণপণে ঠোঁটটা কামড়ে ধরে উদ্গত অশ্রু সামলাবার চেষ্টা করেও পারে না। বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ল উষা, দু'চোখে তার ঝরে পড়ছে বাঁধনহারা অশ্রু, কান্নার আবেগে ফুলে ফুলে ওঠে তার দেহ।

জানলার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়ে মেঝেতে, শিকগুলোর ছায়া সোনালী আলোর গায়ে বন্দীর শৃঙ্খল এঁকে দিয়েছে, আলোর মাঝে রচনা করেছে আঁধারের বেদীতল।

প্রমথর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল অনেক দিন পরে। ছাড়ল না কিছুতেই, একরকম জোর করেই টেনে নিয়ে গেল তার বাড়ীতে। খুব আদর-যত্ন করলে, একসঙ্গে পড়ত কি না, আর ক্লাসের মধ্যে দু'জনের বন্ধুত্বই ছিল সবচেয়ে বেশী।

"বস, আমি আর একজনকে ডেকে আনি।"

নীরবে বসে আছে নবেন্দু, দরজার কাছে কার শাড়ীর খস্খসানি শুনে চমকে উঠল। প্রমথ টানাটানি করে নিয়ে এসে হাজির করল এক শাড়ীপরা মূর্ত্তিকে! প্রথমটা নবেন্দুর সামনে খুব লজ্জা লেগেছিল মেয়েটির, প্রথম আলাপের সঙ্কোচ কাটাতে একটু সময় লাগল, হাত দু'টো তুলে ছোট্ট একটা নমস্কার করতেই ঘেমে লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠেছিল।

আলাপটা হয়ে গেল, "বুঝলে নমিতা, ও আমার বন্ধু নবেন্দু, যার গান সেদিন Radioতে Relay হচ্ছিল। সারা বাঙ্গালার মধ্যে একজন নামকরা গাইয়ে।"

বনহরিণীর মত কালো চোখের মুগ্ধ চাহনি তুলে নবেন্দুর দিকে চেয়ে আবার ঘোমটা নামিয়ে নিল।

সে-দিনটা কাটল বেশ! নমিতা কিছুক্ষণের মধ্যে বেশ আলাপ জমিয়ে ফেলল। খাবার সময়েই সুরু হল ফ্যাসাদ—মেয়েদেয় যা বৈশিষ্ট্য। ঐ কটি' খেলে চলবে কি করে। বাড়ী ছেড়ে কি খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন? শরীর টিকবে কি করে?—"

নীরবে নবেন্দু হাসতে থাকে, হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল নমিতা, "আচ্ছা, বৌদি কেমন দেখতে? দেখাবেন না আমাকে? খুব সুন্দর, না?" কথাটার উত্তর দেয় প্রমথই, "তোমায় চেয়ে অনেক সুন্দর নমি, তুমি ত' কালো?" নমিতা মুখখানা তুলেই আবার নামিয়ে নিল।

রাত্রি হয়ে গেছে, নবেন্দুর ঘুম আসে না। নূতন জায়গা; তা'ছাড়া কেমন একটা অস্বস্তি যেন মনের মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছে, হাঁ, জীবনের একটা দিকে সে নজর দেয় নি, দেবার দরকার বোধ করে নি, কিন্তু মনে হয় সে ভুল করেছে, হ্যাঁ সে ভুলই করেছে।

মাথাটা দপ দপ করতে থাকে, সারা মন যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, বাইরে এসে দাঁড়াল নবেন্দু। রাত্রির নীরবতা সারা মনে বিস্তার করে কোন সুরহারা বাঁশীর আলাপন, নীরব প্রকৃতির দিকে ম্লানবিধুর নয়নে চেয়ে রয়েছে আকাশের তারকা, কোন সর্ব্বহারার নিষ্ফল মিনতির মতো। ছাদে উঠতে যাবে···, হঠাৎ কাদের কণ্ঠস্বর শুনে থমকে দাঁড়াল।

ওরা দু'জনেই ছাদে রয়েছে, নমিতার মিষ্টি হাসি আঁধারের গায়ে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে, প্রমথ তাকে বুকের কাছে নিবিড় ভাবে টেনে নিয়ে বলে ওঠে, "তুমি বড় দুষ্টু, কেবল বাজে কথা।"

বুকে মাথা রেখে উত্তর দেয় নমি, "হ্যাঁ, তাই। দুষ্ট কে বোঝা আছে, আমি ত' কালো-গো, কালো-কুৎসিৎ। তুমিই ত' বলেছ আজ।"

দু'জনের সম্মিলিত হাসিতে ছাদ ভরে যায়! তাদের অজ্ঞাতেই নেমে এল নবেন্দু!

গাছের মাথায় রাত্রির ক্লান্ত বাতাস দীর্ঘতানে গুঞ্জরণ তুলে যায়।

উষার শরীর বিশেষ ভাল নয়। মাথাধরা, জ্বর—নানা উপসর্গ। কয়েকদিন হ'ল বাপের বাড়ী এসেছে। বাপ-মায়ের কাছে থেকে শরীরটা যদি একটু সারে। মেজদির ছেলেটাকে কোলে নিয়ে আদর করতে থাকে উষা। নারী-জীবনের সার্থকতার প্রতীক এরা, বুকভরা স্নেহ নিয়ে অপেক্ষা করে ভবিষ্যৎ-এর কোন মা তার সন্তানের জন্য। কেউ সফল হয়, সার্থক হয়, কেউ বা সারাজীবনেও দুঃখের বোঝা হালকা করতে পারে না। তার জীবনাঙ্গনে আসে না কোন নবাগত স্বর্গলোকের সুষমা নিয়ে।

ছেলেটাকে প্রাণপণে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় তার মুখ আচ্ছন্ন করে দেয় উষা। ছেলেটা মুক্ত হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে···শেষকালে কেঁদে ফেলল।

মঞ্জরীর বিয়ে হয়েছে নবীপুরে। একটীমাত্র বৌ ঘরে, সুতরাং সব সময় আসা হয়ে ওঠে না; এসেছে আজ কয়েক-দিন অনেক করে। উষার ঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে বলে ওঠে মঞ্জরী, "ওকি লো, তোর এমন দশা কেন!"

মলিন হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে তুলে বললে উষা, "এমনি, রূপ কি কারও হাতধরা?"

মুচকি হেসে ঘাড়টা নাড়তে থাকে মঞ্জরী, "বুঝেছি রে—বুঝেছি।···একলা থাকতে পারবে তো?"

"তুইও ত একা এসেছিস।"

"আসতে কি দেয় উষা, কত করে এলাম। শেষকালে গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করিয়ে নিলে, আসছে সোমবার ফিরে যেতে হবে। ভাবছি ভাই, এরই মধ্যে আবার না এসে পড়লে হয়। কি বেহায়া ওরা জানিস ত। তোর কর্ত্তাটি বুঝি তোর আঁচল ছাড়ে না?" মঞ্জরী বলে চলেছে।

বাইরের দিকে চেয়ে থাকে উষা! খর রৌদ্র রুক্ষ প্রান্তরের বুকে নিঃস্বতার মাতন তোলে। শ্যামল তরুছায়ায় দল বেঁধে অপেক্ষা করে গরুবাছুরের দল। আকাশের দিকে চেয়ে চীৎকার করে চলেছে কোন হতভাগ্য পাখী—একবিন্দু জলের আশায়, "ফটিক জল"! সারা ধরণীর বারিরাশি তার তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে না—আকাশের দিকে চেয়ে চীৎকার করে চলে বারিবিন্দুর আশায়।

মঞ্জরী বলে ওঠে, "ওকি, বরের কথা শুনে চুপ করে রইলি যে? বিরহ নয় রে! হু ঠিক তাই! হাঁ, শুনলাম একটা কথা—সদুপিসি, পদ্মপিসি বলছিল! তাই ত ছুটে দেখতে এলাম পোড়ারমুখীকে।"

রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে উষা, "কি বল?"

মাথাটা বারকতক দোল দিয়ে বলে ওঠে, "আহা নেকি, জানিস না কিছু—ইস! হ্যাঁরে, ক'মাস!" মঞ্জরী তার হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল।

চোখদুটো উষার কুঁচকে ওঠে। মিথ্যার প্রাসাদ যা গড়ে উঠেছে ওদের মনে, তাকি সত্য হবে কখনও ঠাকুর!

চোখ দুটো ফেটে বার হয়ে আসে বাঁধনহারা অশ্রু—পরাজয়ের গ্লানি! বিস্মিত হয়ে ওঠে মঞ্জরী।

মঞ্জরী কাল শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে। স্বামী এসেছিল তাকে নিয়ে যাবার জন্য। উষা ছাদ থেকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল ওদের দিকে, দুজনে কেমন চলে গেল ঐ সোনাফসলের মাঠের মধ্য দিয়ে—গাড়ীটা আর দেখা গেল না।

দিনশেষের সূর্য্য রাত্রির অন্ধকারের কোলে নিষ্প্রভ হয়ে ডুব দেয়…দুষ্ট ছেলের মত মাথা তোলে আবার অন্ধকারের ওপারে।

মা অবাক হয়ে উষার কথা শুনে। আঁচলটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলে উষা, "হ্যাঁ মা, আমাকে যেতেই হবে।"

বাবা এসব কিছু বোঝেন না—বোঝবার চেষ্টাও করেন না। নীরবে শুনে যান। যাবার ব্যবস্থাই হ'ল।

মা বলে ফেললেন, "তোমার মেয়ের কি হয়েছিল জান? জামাই-এর সঙ্গে রাগারাগি করেই এসেছিল বোধ হয়—রাগ পড়েছে, আর থাকতে পারে? জানি না বাবা আজকালকার ছেলে-মেয়েদি'কে।"

কর্ত্তা ফোড়ন দিতে ছাড়েন না, "তোমারই মেয়ে কি না, তাই।" কথাটা শেষ না করেই বার হয়ে গেলেন—দাঁড়ালে শেষকালে ঝগড়াই বেধে যাবে।

নবেন্দু বাড়ী এসেছে আজ সকালে প্রমথর ওখান থেকে। নমিতার কথা ভোলেনি—বেশ আছে ওরা দুটিতে।

ঘরের জিনিষপত্র সব অগোছাল। বিছানার চাদরটা পড়ে রয়েছে নীচে। টেবিলে রাজ্যের ধূলো, বিছানাটাও তাই। ঘরের মধ্যে পড়ে রয়েছে ছেঁড়া কাগজ, সিগারেটের ছাই, আধপোড়া দেশলাই কাঠি! তানপুরা, এস্রাজটায় জমেছে ধূলো, বেহালাটা এককোণে পড়ে রয়েছে পরিত্যক্ত হয়ে, একটা তার ছেঁড়া।

ছেলের ডাকে মা ঘরে এলেন।

"এসব কি? ঘর না আসামের জঙ্গল? এখানে মানুষ থাকে?"

অপ্রস্তুত হয়ে যান মা, "তাই ত রে, বৌমা নাই এ ক'দিন, ঘরদুয়োর সব অগোছাল হয়ে রয়েছে। তুই যাবার পরদিনই বৌমাও গেছে বাপের বাড়ী।"

"বেহালাটা ওখানে কেন?"

মা নীরব থাকেন। নবেন্দু বুঝতে পারে কতকটা। চোখের সামনে ভেসে ওঠে দশদিন আগেকার একরাত্রির কাহিনী—কোন এক নগণ্য নারী আত্মনিবেদনের অভিসারে প্রত্যাখ্যাত হয়ে রাগে দুঃখে নিজের পাশবিকতাকে প্রকাশিত করবার চেষ্টা করেছে, তারই ছাপ রয়েছে এই ঘরের ধূলিকণায়, ঐ বেহালার গায়ে।

মা বেরিয়ে গেলেন, "একটু বোস বাছা, আমি পাচীর মাকে ডেকে নিয়ে আসছি।"

ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে নবেন্দু, "না, ডাকতে হবে না আর।"

নীরবে মা শুনে গেলেন তার কথা। প্রতিবাদ করতে পারলেন না।

উষা ফিরে এসেছে। অনেক আশায় বুক বেঁধে সে আবার শ্বশুরবাড়ীতে ফিরে এসেছে। শাশুড়ী আশ্চর্য্য হয়ে যান, "বৌমা!"

শাশুড়ীর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বলে, "হ্যাঁ মা, চলে এলাম, এখানে আমি না থাকলে বাবার কষ্ট হবে।"

নারাণবাবু আর বেড়াতে পারেন না, বয়সের ভারে সারা দেহ নুইয়ে গিয়েছে; ধরণীর রচনার পরিবর্ত্তন তাঁর চোখে ঢেউ তুলে চলে গেছে অনন্তের পানে, নীলাভ নিষ্প্রভ আঁখি-তারাতে ওপারের স্বপ্ন-ছায়া।

নারাণবাবু বৌমাকে দেখে উঠে বসলেন বিছানার উপর।

রুদ্ধনিঃশ্বাসে ঘরে ঢুকতেই উষার মনে জেগে ওঠে একটা হাহাকার। বিছানাপত্র যন্ত্রপাতি কিছুই নাই। পাচির মা বলে ওঠে, "তুমি চলে যাবার পর দাদাবাবু এসেই মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বিছানাপত্র সব বাইরের ঘরে নিয়ে গেছে। আমি ত কিছু বুঝি না বাবা, সোমত্ত ছেলে, অমন উড়ু উড়ু ভাব, বিচিত্তির বাবা।"

উষা খাটের বাজুটা ধরে স্বপ্নাবিষ্টের মত চেয়ে থাকে, তার অজ্ঞাতেই কপাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে বাঁধনহারা বারিরাশি তৃষিতা ধরিত্রীর বুকে।

পাচির মা সরে এসে ফিস্ ফিস্ করে ওঠে, "বৌ-দিদিমণি, উলুইচণ্ডীর কবচ কথা কয়। এনে দোব একটা…মঙ্গলবার দিন ধারণ করবে, রেশমের সুতো দিয়ে; একবার সোয়ামীর দিকে চাইলেই ব্যস। কিছু ভেবো না দিদিমণি, ব্যাধি যেমন ওষুধও তেমনি আছে। ঘরে বাঁধা থাকবে।"

ধীরে ধীরে বার হয়ে গেল উষা—পরাজয় আজ হয়েছে তার, কিন্তু কেন জানে না—জানে না সে।

রাত্রি হয়ে গিয়েছে। চারিদিকে নেমেছে তমসাময়ী রাত্রির ঘন আলিঙ্গন; আবেশে আকাশের তারকা শিউরে ওঠে…কামনার প্রাণহীন রূপ…রাতের বাতাস প্রকাশিত করে তোলে কার অন্তরে।

সাদা চাদরে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে চলেছে উষা রাতের আঁধারে পা টিপে টিপে। বৃদ্ধ নারাণবাবুর ঘরের আলোটা সারা রাত মিট মিট করে জ্বলে। সারাটা বাড়ী নিঝুম, একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছে দুরন্ত ছেলের মত, জেগে রয়েছে ঐ চাঁপা-গাছটা—লজ্জাহীনা মেয়ের মত হাসছে।

বাইরের ঘরে নিশীথরাত্রে নবেন্দু প্রদীপ জ্বেলে তানপুরা নিয়ে বসেছে।

বেহাগ আলাপ করে চলেছে। সারা দেহে পড়েছে প্রদীপের ম্লান আলো, এখানে ওখানে পাতাভ আলোটা দেখে বোধ হয় কোন নিপুণ শিল্পীর তৈরী প্রস্তরমূর্ত্তি! চেতনাহীনভাবে আলাপ করে চলেছে, রাগিণীর সুরে সুরে ফুটে ওঠে কামনার আকুল আবেদন, নিশীথরাত্রে স্বপ্নপ্রিয়া প্রেম নিবেদন করে সুরের ভাষায়! তারার ছোঁয়া তার

চোখের মণিতে সপ্তসিন্ধুর কল্লোল-গান রচনা করে তার পদপ্রান্তে ভাষাহীন বন্দনা, সপ্তসুরের সম্মোহিনীতে লুটিয়ে পড়ে সাধকের যুগ যুগান্তের শাশ্বত প্রিয়া, কল্পলোকে তার বসতি—মানব মনের বাৰ্দ্ধক্য যেখানে নাগাল পায়না। সে চিরযৌবনা—চির চঞ্চল, সুনীল আকাশপ্রান্ত ভেদ করে রূপের রোশনীতে সে নেমে আসছে তারই দিকে।

হাতের তানপুরাটা শিথিল হয়ে খসে পড়ে তার হাত থেকে! কার নিবিড় স্পর্শ তাকে ছেয়ে দেয়, চোখের সামনে ফুটে ওঠে এক সুন্দর বনানী, বিহগ কাকলী সেখানে ভরিয়ে রেখেছে বনতলকে! কার বাহু-বন্ধনে···কোন এক রূপসী নারীর বাহু-বন্ধন তাকে নিয়ে গেছে ধরণীর অনেক উৰ্দ্ধে! কার উষ্ণ নিশ্বাস ব্যাকুল করে তোলে নবেন্দুকে, নরম অধর দুটো প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে তাকে নীরব করে দেয়।

উত্তেজনায় উষার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে! ত্রস্তপদে বার হয়ে এল নবেন্দুর ঘর থেকে! চারিদিক নীরব। প্রদীপের শিখাটা বাতাসে কেপে উঠছে। কখন যে দুর্ব্বার আকর্ষণে উষা নবেন্দুর ঘরে ঢুকেছিল জানে না! চকিত চাহনীতে চারিদিক চেয়ে নিয়ে অন্ধকারে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

নবেন্দুর সামনের নারীমূর্ত্তি, ঘনকেশপাশে মুখ আবৃত করে বলে ওঠে—তুমি ত ভালবাস না, তবুও আমি আসি।

চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বলে নবেন্দু—না-না আমি ত তোমাকেই ডাকছিলাম এতদিন! আজ পেয়েছি তোমাকে!

সরে গেল সে! মাতাল হাসির একটু লহরী তুলে সরে গেল নারীমূর্ত্তি! নবেন্দুও ব্যাকুলভাবে এগিয়ে যায় তার দিকে! দুজনেই চলেছে···মাঝখানে অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান, ধরে ফেলে নবেন্দু, সামনের দিকে সরে গেল সে—দূরে বহু দূরে! চকিতের মধ্যে আলোর ঝলকে চারিদিক ভরে ওঠে।

শ্যামল তরুশ্রেণীর মাথায় সোনালী আলোর রক্ত মুকুট! নবেন্দুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। নূতন সূর্য্যের আলো ঘরখানা ভরিয়ে তুলেছে। চোখ দু'টো রগড়াতে থাকে।

সারাদিন ধরে অপেক্ষা করে নবেন্দু রাত্রির জন্য। রাত্রি হয়েছে। আবার নেমে আসে আকাশের ওপার থেকে অন্ধকারের জোয়ার, আলোর ঝরণা বিলুপ্ত করে দেয়। রাত্রির হিমশীতল স্পর্শ দিনান্তের সূর্য্যকে তেজহীন করে' নিয়ে আসে প্রাণহীনতার সংবাদ।

আলাপ করতে বসেছে নবেন্দু। ভোলে নি কালকের স্বপ্নপ্রিয়ার মুখখানা, তার মাতাল হাসি, আঁখিতারার কামনার দীপ্তি। পৃথিবীর নয় ওরা। ওরা উৰ্ব্বশীর জাত, বেদনার কালীদহে জন্ম যাদের।

বাইরের দরজাটা শব্দ করে খুলে গেল। নবেন্দু বিরক্ত হয়ে ওঠে। উষা ফিরে চাইল। উষা—উষা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

চীৎকার করে ওঠে নবেন্দু—"এখানে কেন?"

"আসতে নেই?" উষার স্বরে দৃঢ়তা ফুটে বের হয়।

উঠে এল নবেন্দু! 'না, দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাও বেরিয়ে যাও।'

উষার দেহে খেলে যায় একটা শিহরণ! সে বলে ওঠে "না যাব না।"

রুদ্ধ আক্রোশে এগিয়ে আসে নবেন্দু।

উষার নড়বার ক্ষমতা নাই, কে যেন তাকে আটকে দিয়েছে মাটির সঙ্গে। নবেন্দু তাকে টেনে হিড় হিড় করে বাইরের দিকে আনছে।

চীৎকার শুনে দরজার কাছে এসে পড়েছেন মা—পাচীর মা, ঠাকুর, গোবিন্দচাকর, আরও দু' একজন! উষাকে বার হয়ে আসতে দেখে তারা নীরবে সরে গেল। ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল নবেন্দু।

উষার সারাটা অন্তর ভরে ওঠে হাহাকার, চোখ বয়ে জল গড়িয়ে পড়ে দর দর করে।

সকাল হয়েছে। সোণালী আলো জেগে ওঠে পূব আকাশের গায়ে, শ্যামল বনানী-প্রান্তে জাগে রক্তসূর্য্যের বন্দনা, পাখীর কাকলিতে সুপ্ত আকাশ ভরে ওঠে। পৃথিবীর হ'ল জাগরণ। কোন হতভাগ্য বিদায় নিল চিরতরে। সবার হ'ল সুরু, তার হল সারা। উষা আর জগতে নাই, জীবনের বোঝা ভারি হয়ে পথ রুদ্ধ করেছে। ঘরের কড়িকাঠে ঝুলছিল তার বিস্ফারিত মূর্ত্তি। চোখ দুটো বার হয়ে এসেছে।

সারাবাড়ীতে একটা হৈ-চৈ পড়ে যায়। মা কেঁদে ওঠেন, বৃদ্ধ পিতার শীর্ণ কোটরগত চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু। নবেন্দু নীরবে দাঁড়িয়ে দেখল।

কয়েকদিন পর। নারাণবাবুর দেহ-মনে এসেছে অনেক পরিবর্ত্তন। জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশের উড়ে যাওয়া মেঘের জটলা দেখেন···কে যেন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে ঐ মেঘের ওপারে অনেক দূর থেকে! গোদাল লতায় হলদে টুনটুনি পাখীর জটলা, লাল টুকটুকে তেলাকচুর ফুলে একটা ছোট পাখী ক্ষিপ্র চাউনিতে চারিদিকে চেয়ে নিয়ে চুমো দিচ্ছে আবার

নারাণপুর মৌজার মামলায় হেরে গেছেন নারাণবাবু। কাগজপত্র আর ভাল নজর হয় না। নিবারণ গোমস্তা··· অবশ্য আর এখন গোমস্তা নয়, বাবুদের ঘাড়ে পা দিয়ে সেও এখন বেশ গুছিয়ে নিয়েছে।

সেই শোনালে খবরটা! বৃদ্ধের অন্তরে জাগে একটা বিতৃষ্ণার ছায়া! থাক্ গে, যা হবার হবে, ওসব আর ভাবতে পারা যায় না! দিন তাঁর ঘনিয়ে এসেছে, চোখের সামনে কারা যেন সব দল বেঁধে এগিয়ে আসছে। শীর্ণ

কঙ্কালসার চেহারা শূন্য আকাশের বুক থেকে ঐ মেঘের আড়াল থেকে নেমে আসছে! আলো, দিনের আলো নিভে আসছে, ঐ পাখীগুলো গোদালতার উপর থেকে উড়ে গেল, সব কেমন ধোঁয়াটে অন্ধকার···ঐ আকাশে।

একটা আর্ত্ত চীৎকার ক'রে বুড়ো লুটিয়ে পড়ল বিছানায়। আর জ্ঞান ফেরে নি! তিনদিন অজ্ঞান অবস্থায় থেকে নারাণবাবু চলে গেলেন! তবুও নবেন্দুর চোখে কেউ এক ফোঁটা জল দেখে নি। পাড়ার সবাই বলে, "ছেলে যা হোক বাবা! বৌ গেল, অমন মোজা গেল, সব চেয়ে যে আপন 'বাবা' সেই গেল—তবুও রা কথা নেই।"

মায়ের ধূলিধবলিত মূর্ত্তির দিকে চেয়ে নবেন্দু বেরিয়ে এল ঘর থেকে, চোখে তার শূন্য দৃষ্টি। সারা আকাশের ক'দিকে যেন সে হাতড়াচ্ছে!

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাবার পর আবার বাড়ীতে ফিরে আসে নীরবতা! বিরাট বাড়ীখানা, মা আর ছেলে, আর জন-কয়েক ঝি-চাকর, রাত্রির নীরবতা জমাট বেঁধে কালো আকাশের সঙ্গে মিতালী পাতায়, জোনাকীর দল কার সন্ধানে চারিদিক ঘুরে বেড়ায়।

উষার ঘরটা খোলাই রয়েছে! রাত্রির বাতাস বিছানার চাদর খানা জানলার খড়খড়িটায় দোল দিয়ে যায় মাঝে মাঝে! নবেন্দু ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল, ঘরের আসবাব-পত্র ঠিকই আছে আগেকার মত!

প্রদীপটা জ্বেলে বহুদিন পর বসল আবার আলাপ করতে, উষার মৃত্যুরাত্রের পর!

ধুলো ঝেড়ে নিয়ে আবার তারগুলো নাড়তে লাগল! যাদুকরের হাতের মায়ায় মূর্ত্ত হয়ে ওঠে সুরের মায়াজাল, প্রদীপের ম্লান শিখাটি কেঁপে কেঁপে উঠছে, নিবিষ্ট মনে আলাপ করে চলেছে! বাইরের নিস্তব্ধ ধরিত্রীর বাতাসে অলস ভাবে শয়ন বিছায় তার সুরের মূর্চ্ছনা!

ও কি! অস্পষ্ট প্রদীপের আলোতে দেখা দেয় কার অশরীরী আত্মা! সর্ব্বাঙ্গে খেলে যায় একটা শিহরণ, অতনুর ইঙ্গিত চঞ্চল করে তোলে! শিউরে ওঠে নবেন্দু! আগেকার দিনে দেখা সে সুন্দর মূর্ত্তি নয়, সে রূপসী স্বপ্ন-চারিণী নয়, এ তার পরিচিত! অতিপরিচিত!

উষার চোখগুলো ঠিক্‌রে বাইরে আসতে চাইছে, চুল-গুলো সারা মুখখানাকে ঢেকে ফেলেছে—লজ্জাসরমের বালাই নাই!

শিউরে ওঠে নবেন্দু! চোখ দুটা বন্ধ করেও রেহাই নাই! উষা চেয়ে রয়েছে তার দিকে ক্রুদ্ধ বিস্ফারিত নয়নে, চোখে ওর প্রতিহিংসার জ্বালা, কি তীব্র সে চাউনি। না-না!

তানপুরাটা সজোরে ছুঁড়ে দিল তার দিকে। মুহূর্ত্ত মধ্যে মিলিয়ে গেল উষার দেহ! সারা ঘরখানাতে খেলে যায় একটা হাসি, নীরবতা চীর খেয়ে শতখান হয়ে গেল!

আধখানা পাণ্ডুর চাঁদ আকাশের কোলে ম্লান ভাবে চেয়ে রয়েছে পৃথিবীর দিকে! বাগানের কালো গাছগুলো—বন-ঝাউ, দেবদারু গাছটা, কোন মৃত দানবের মত নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাত্রির স্বল্পান্ধকারে!

নবেন্দু নীরবে চেয়ে রয়েছে ঐ আকাশের দিকে! মাথাটা যেন দপ্ দপ্ করছে! সারা রাত্রি ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ঐ আকাশের দিকে চেয়ে! যার সঙ্গে কোন দিনই কোন সম্বন্ধ রাখতে সে চায় নি, আজ কেন সে আসে—বোঝে না নবেন্দু।

সারা বাড়ীতে কারা যেন নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে ঘুরে বেড়াচ্ছে দল বেঁধে! ওরা ঐ প্রেতের দল—তাকে গলা টিপে মেরে ফেলবে, তারও চোখ দুটো অমনি···অমনি ঠিকরে বার হয়ে আসবে, কালো কাজল-কালো আঁখিতারা!

খুব কাছে কে যেন চীৎকার করে ওঠে ব্যাকুল কণ্ঠে, "চোখ গেল! চোখ গেল!"

পিছু পিছু কে যেন মিনতিভরা কণ্ঠে বলে চলেছে "বৌ কথা কও!—বৌ কথা কও!"

নবেন্দুর সর্ব্বশরীরে জাগে একটা শিহরণ! শিরায় শিরায় খেলে যায় চঞ্চল রক্তপ্রবাহ, তাকে ব্যঙ্গ করে চলেছে কারা দল বেঁধে! দ্রুতপদে বাগানের দিকে নেমে এল সে! রাত্রির অন্ধকারে চীৎকারটা তখনও থামেনি—মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে!

সারা বাগানে ছুটে বেড়াচ্ছে নবেন্দু, পরিহাস বন্ধ করে দেবে সে ওদের চিরতরে!

পরদিন সকালে ওকে দেখা গেল বাগানে, সারা চোখে-মুখে একটা পরিবর্ত্তন। একরাত্রেই সে বদলে গেছে অনেকখানি। পাতার আড়ালে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

*

ও আর ভাল হয় নি! সেই থেকে বাগানে বাগানে খুঁজে বেড়ায় সেই রাত্রের দু'জনকে। কোন পাখী গাছে বসছে দেখলেই লাঠিখানা হাতে নিয়ে ছুটে যায়, তার চীৎকারে সারা বাগান মুখরিত হয়ে ওঠে। সময়ে অসময়ে তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়—"এই যো আপ্ আপ্!" পাগল ছুটেছে কোন পাখীর পিছনে পিছনে।

সাংবাদিকের অভিজ্ঞতা

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পরাধীন দেশে বাস করিলে সর্ব্বদাই কোন না কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সেই জন্য গত প্রায় ৭৫ বৎসর ধরিয়া আমাদের এই ভারতবর্ষে নানাভাবে মুক্তির আন্দোলন চলিতেছে। আমাদের সাংবাদিকের জীবনে প্রথম অসুবিধা এই পরাধীনতা। সর্ব্বদা যে অসুবিধাটির কথা মনে রাখিয়া পথ চলিতে হয়, তাহার কথাই প্রথমে মনে পড়ে। এদেশের বিদেশী গভর্ণমেণ্ট যদি ভুলক্রমে কখনও কোন ভাল কাজ করে এবং কোন সংবাদপত্র তাহার সুখ্যাতি করে, তাহা হইলে পাঠক-সমাজ তখনই বলিয়া উঠিবে—নিশ্চয়ই সম্পাদক গভর্ণমেণ্টের নিকট ঘুষ খাইয়াছে বা সম্পাদককে রায়বাহাদুর উপাধি প্রদানের লোভ দেখান হইয়াছে। ইহা এক দিককার কথা। অপর দিকে সরকারী খাঁড়া সর্ব্বদাই সাংবাদিকের উপর তোলা আছে- কখন যে কাহার ঘাড়ে পড়িবে কেহই বলিতে পারেন না। সংবাদপত্রসমূহ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যে কর্ম্মচারী আছেন, তিনি সর্ব্বদা কোন না কোন পত্রের সম্পাদককে ডাকিয়া ধমকাইয়া দিতেছেন। ইহাই নাকি তাঁহার কাজ। গভর্ণমেণ্টের কোন কাজের কোন আলোচনা যদি একটু কড়া হয়, অমনি আর রক্ষা নাই। ভারত রক্ষা আইন এতই ব্যাপক যে তাহার মধ্যে "থালির মধ্যে হাতি পোরার মত" সবই ধরা যায়। এই অবস্থায় ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ-বাসের মত আমাদের এই পরাধীন জাতির মধ্যে সাংবাদিক-দিগকে কাজ করিতে হয়। অথচ একথা গোপন করিয়া লাভ নাই যে আমরা সকলেই মুক্তির আন্দোলনের সেবক। কি ভাবে দেশকে এই পরাধীনতার কবল হইতে মুক্ত করা যায়, অহোরাত্র সেই চিন্তাই করিয়া থাকি এবং সংবাদপত্রের মধ্য দিয়া সেই ভাব প্রচার করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল। যাহাই লিখি না কেন, তাহার মধ্য দিয়া যদি বর্ত্তমান শাসন-যন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশের লোকের মনোভাব সৃষ্টির কোন উপাদান না থাকে, তাহা হইলে সে লেখা নিস্ফল হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম একত্র থাকিতে পারে না, সেই জন্য এক দিক দিয়া যেমন সংবাদপত্রগুলিকে কড়া বাঁধনে বাঁধিবার জন্য সরকার পক্ষের চেষ্টা—অপর দিকে তেমনই গভর্ণমেণ্টকে ফাঁকি দিবার জন্য সাংবাদিকগণের চেষ্টার অন্ত নাই। কি করিয়া আইন বাঁচাইয়া বা আইনকে ফাঁকি দিয়া কড়া কথা বলা যায়, সে বিষয়ে যিনি যত অধিক দক্ষ, আমাদের দেশে তিনিই তত বড় সাংবাদিক। সেজন্য এদেশে সত্যসত্যই পণ্ডিত না হইয়া সাংবাদিক হওয়া চলে—অন্য কোন সভ্য দেশে তাহা সম্ভব কিনা জানি না। তাই বলিয়া আমাদের দেশে যে পণ্ডিত সাংবাদিক নাই, তাহা মনে করিবার কারণ নাই। কারণ, স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বা শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় প্রভৃতি ইহার ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম সর্ব্বদেশে সকল সময় দেখিতে পাওয়া যায়।

কিরূপ সামান্য কারণে সাংবাদিকগণকে সরকারী সংবাদপত্র-নিয়ন্ত্রণকারী কর্ম্মচারীর নিকট ধমক খাইতে হয়, তাহা শুনিলে আপনারা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। তখন সবেমাত্র ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। হঠাৎ একদিন তলব আসিল, "আপনি ভারত রক্ষা আইন অনুসারে অপরাধী হইয়াছেন, এখনই আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ ও বুঝাপড়া করুন, নচেৎ মামলা করা হইবে।" অষ্টমীর ছাগশিশুর মত কম্পমান দেহে যথাকালে তাঁহার নিকট গিয়া হাজির হইলাম। আমি রাজনীতির ব্যবসাই করি না—আমার কাগজ রাজনীতি-বর্জ্জিত বলিয়া লোক উপহাস করিয়া থাকে। কাজেই মনে মনে ভাবিলাম, এমন কি অপরাধ হইয়াছে, যে জন্য এই তলব। তাঁহার নিকট শুনিলাম, একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে গত বারের অর্থাৎ ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপের কিরূপ লোকক্ষয় ও অর্থ নষ্ট হইয়াছিল, তাহার হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। বিজ্ঞ কর্ম্মচারী মহাশয় বলিলেন, "এখন আমরা অর্থাৎ ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এ সময়ে যদি আপনি এই ভাবে যুদ্ধের ভয়াবহতা সাধারণের নিকট উপস্থিত করেন, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে যুদ্ধ কার্য্য পরি-চালন করা সম্ভব হইবে না। লোক সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করিবে না বা যুদ্ধের জন্য গভর্ণমেণ্টকে টাকা ধার দিবে না। খবরদার, আপনার এই প্রথম অপরাধ, সে জন্য ক্ষমা করিলাম। ভবিষ্যতে সাবধান হইয়া চলিবেন।" শুনিয়া ত অবাক্—আমি ত এ বিষয়ে অতি সাবধানী লোক, তাহার অধিক আর কত সাবধান হইব। যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহাই হইবে। ইহা একদিনের ঘটনা। আর একদিনের ঘটনা শুনুন। প্রেস অফিসার পত্রযোগে জানাইলেন, আপনি আইন অমান্য করিয়াছেন, কেন আপনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইবে না, তাহা জানাইবার জন্য অবিলম্বে আমার সহিত সাক্ষাৎ করুন। এবারও যথাকালে যথাস্থানে যাইয়া হাজিরা দিলাম। কি অপরাধ জানি না যে উকীলের বা ব্যারিষ্টারের সহিত পরামর্শ করিয়া নিজেকে একটু শক্ত করিয়া লইয়া যাইব। যাহা হউক শুনিলাম, কাগজে এক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে; লেখক যে স্থানে ভ্রমণ করিতে গিয়া-ছিলেন, তথায় কতকগুলি দ্রষ্টব্য গৃহের মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করেন নাই, কারণ সে সকল গৃহে এখন সৈন্যগণ বাস করিতেছে। এ কথাই না কি অপরাধের কারণ হইয়াছে। ভারত রক্ষা আইন অনুসারে কোন কোন গৃহে সৈন্য রাখা হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করাই নিষিদ্ধ। আমার কাগজ পড়িয়া যে শত্রুরা আমাদের প্রভুদের সৈন্য সমাবেশের খবর পাইবে— এ কথা মনে করিয়া সরকারী কর্ম্মচারীটির বুদ্ধির তারিফ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না এবং মনে মনে যতই

ইহা আলোচনা করিতে লাগিলাম, ততই মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। এইরূপ ঘটনার বহু ফিরিস্তি দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড কত যে ভোগ করিতে হয়, তাহা না বলাই ভাল। কিল খাইয়া কিল চুরি করা ছাড়া আমাদের আর উপায় কি?

এই ত' গেল একদিকের শাসন। অপর দিকের শাসনের কথা শুনুন। দেশে ৭ই আগষ্টের আন্দোলন চলিতেছে, আন্দোলনকারীরা রেল লাইন নষ্ট করিতেছেন, থানা ও ডাকঘর পোড়াইতেছেন, ট্রাম জ্বালাইতেছেন। এরূপ আরও কত কাজ করিয়াছেন তাহা আপনাদের অজ্ঞাত নহে। আমাদের মাথার উপর সরকারী খড়্গ ঝুলিতেছে, কাজেই এইসব কাজের প্রশংসা করিয়া যে ছেলেদের একটু উৎসাহ দিব তাহার উপায় নাই। কাজেই 'সাপও না মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে' এই ভাবে দুই কূল বজায় রাখিয়া কোন ক্রমে কর্ত্তব্য সম্পাদনের চেষ্টা করি। ঐ বিষয়ে সরকার পক্ষ হইতে উপদেশ দানেরও শেষ নাই। কাজেই কিছু না লিখিয়া নিরপেক্ষ থাকারও উপায় নাই। দীর্ঘ প্রবন্ধের মধ্যে একটি লাইন প্রকাশিত হইল—"অমুক স্থানে আন্দোলনকারীরা যাহা করিয়াছে, তাহা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে।" আমি লিখিয়াছি, আর একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা পড়িয়া অনুমোদন করিয়াছেন, আর একজন অতি-সাবধানী ভদ্রলোক তাহার প্রুফ দেখিয়াছেন। কেহই উহার মধ্যে আপত্তি করিবার কিছু পান নাই। কাজেই যথাকালে উহা ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

একদিন অফিসে বসিয়া কাজ করিতেছি, ৫।৬টি ১৬।১৭ বৎসরের ছেলে একসঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাবিলাম, হয় কোথাও সভাপতিত্ব করিবার আহ্বান আসিল, না হয় সকলেই হয় ত কবিতা লিখিয়াছে, একসঙ্গে দিয়া যাইবে। যাহা হউক, তাহা নহে। তাহারা একখানা কাগজ বাহির করিল ও তাহার মধ্যে একটি পাতা খুলিয়া একটি লাইন দেখাইল—তাহার নীচে দশবার রেখা টানিয়া সে-দিকে আমার মন আকৃষ্ট করিবার ব্যবস্থা পূর্ব্বেই করা হইয়াছিল। তাহারা বলিল—আমরা দেশের সুবিধার জন্য যাহা করিয়াছি, আপনি তাহা 'অন্যায়' বলিয়া লিখিয়াছেন কেন? তাহাদের অনেকগুলি কাগজ বাহির করিয়া দেখাইলাম যে সর্ব্বদাই আমি তাহাদের কার্য্যের প্রশংসা করিয়া থাকি—সে সকল প্রশংসাও আমাদের কাগজের মধ্যেই বহুস্থানে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহারা পুত্রস্থানীয়—বাবা, বাছা বলিয়া তাহাদের শান্ত করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কে আমার কথা শুনে? তাহাদের নেতা তাহাদের বলিয়া দিয়াছেন—আমি যেন আমার কৃত অপকর্ম্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবার প্রতিশ্রুতি দিই—তাহারা তাহা শুনিয়া যাইবে। অনেক বকাবকি করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ধমক দিয়া বালকগণকে বিদায় করিলাম। কিন্তু তাহাতেও আমার নিষ্কৃতি হয় নাই। শুনিলাম, সাইক্লোষ্টাইল করা কংগ্রেস বুলেটিনে আমাকে গালি দেওয়া হইয়াছিল—তাহা দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই।

আমাদের দেশের সাংবাদিকদিগের আর একটি বড় অসুবিধা আছে। আমাদের দেশে সংবাদপত্রসেবা সম্মানজনক কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও তাহা এখন পর্য্যন্ত অর্থকরী হয় নাই। স্বর্গত বিপিনচন্দ্র পাল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতির মত অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাও দারিদ্র্যের জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে অনাহারে মরিতে হইয়াছে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাগ্যও সর্ব্বজনবিদিত। এ অবস্থায় যাহারা সাংবাদিকের পেশা গ্রহণ করিতে আসেন, তাহাদের সকলকে আমি একটি কথা বলিয়া থাকি—হয় আমীর, না হয় ফকির ছাড়া কাহারও এ দেশে সাংবাদিকের পেশা গ্রহণ করা উচিত নহে। যিনি আমীর, তিনি পয়সার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সকল কাজ করিয়া যাইতে পারেন। যখনই অর্থের প্রয়োজন হইবে, তাহা মিটাইবার জন্য তাঁহাকে আর পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। সাংবাদিকদিগকে নানাস্থানে যাইতে হয়, নানা বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য পুস্তক সংগ্রহ করিতে হয়, এ সকল কাজের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহা সাধারণ সাংবাদিকগণ তাঁহাদের বেতনের দ্বারা সঙ্কুলান করিতে সমর্থ হয় না। সে জন্য ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি সত্ত্বেও তাঁহাদের প্রতিভার স্ফুরণ হয় না। শক্তি থাকিলেও তাহা ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। সে জন্য অর্থবান ব্যক্তিদিগেরই এই পেশা গ্রহণ করা উচিত। আর যাহাদের অর্থের কোন চাহিদা নাই—যাহারা সকল সময়ে দারিদ্র্যের সহিত জীবনকে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা এই জীবন গ্রহণ করিতে পারেন। তবে তাঁহাদিগকেও যে অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না, এমন নহে। সাধারণের সহিত যত অধিক মেলামেশা করা যায়, ততই কাজের সুবিধা হয়। সাংবাদিকগণকে সর্ববিদ্যাবিশারদ হইতে হয়, তাহা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। সেজন্য বড় বড় পণ্ডিতগণের সহিত সর্ব্বদা মেলামেশা করিলে তাহারা যে সকল বিষয় ভাল জানেন, সে সকল বিষয়ের আলোচনা তাঁহাদের দিয়া করাইয়া লওয়া চলে; সে বিষয় স্বর্গত রামানন্দবাবু যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুকরণযোগ্য। তিনি তাঁহার যুগের সকল শ্রেষ্ঠ মণীষী পণ্ডিতকে তাঁহার কাগজের লেখক করিয়া লইয়াছিলেন ও পুস্তক সমালোচনার কার্য্য তাঁহাদের দ্বারা করাইয়া লইতেন, সে জন্য তাঁহার কার্য্যে সকলেই সন্তুষ্ট হইত। ঐতিহাসিক প্রবন্ধ যদি ইতিহাস বিষয়ে বিশেষজ্ঞ

সংশোধন করিয়া দেন, তবে তাহাতে পরিবর্ত্তন বা সংশোধনে লেখক আপত্তি না করিয়া বরং সন্তোষ লাভ করেন। ঐতিহাসিকের লিখিত পুস্তক যদি বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিক সমালোচনা করিয়া লেখকের দোষ ত্রুটিও দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে লেখক অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারেন না। এই ভাবে কার্য্য করিবার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রামানন্দবাবু সকলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র হইয়াছিলেন। সে জন্য তাঁহার সম্পাদিত কাগজগুলি সকল লোক শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিত। রামানন্দবাবু নিজেই কাগজের মালিক ও সম্পাদক ছিলেন, সে জন্য তাঁহার পক্ষে এই সকল কাজ করার কোনই অসুবিধা ছিল না। কিন্তু বেতনভুক সম্পাদকগণের এই সকল সুযোগ লাভ করিবার সুবিধা নাই। এই সকল কার্য্য করিতে যেরূপ আর্থিক স্বচ্ছলতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রয়োজন, আমাদের দেশে বেতনভুক সম্পাদকগণ তাহা লাভও করেন না। শ্রীযুক্তহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে জীবনে কোন দিন আর্থিক অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই—সেজন্য তিনি আজ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পাদক বলিয়া আদর লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ জ্ঞানস্পৃহা, ধীশক্তি, শ্রমশীলতা, স্মৃতিশক্তি প্রভৃতির সহিত যদি আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকিত, তাহা হইলে তিনি আজ এত বড় সম্পাদক হইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। সে জন্য যাহাদের জীবনে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য নাই বা আসিবার সুবিধা নাই, তাঁহাদের আমি সাংবাদিকের জীবন গ্রহণ করিতে নিষেধ করি।

সাংবাদিকের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হইলে যে অসাধারণ সম্মান লাভ হয়, তাহা অপর কোন পেশার লোকের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু জীবনে সেই সম্মান লাভের যোগ্যতা লোক যদি অর্জ্জন না করে, তাহা হইলে সর্ব্বদা তাহাকে সঙ্কুচিত অবস্থায় বাস করিতে হয়। অথবা লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া থাকিতে হয়। কোন খ্যাতনামা সাংবাদিকের সহিত কয়েকটি স্থানে যাইবার সুযোগ লাভ হইয়াছিল; তাঁহাকে লোকে অসামান্য সম্মানও দান করিয়াছে; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাহার জ্ঞান বা বিদ্যার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার ফলে লোক শুধু ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিতেই বাধ্য হইয়াছে। সাংবাদিকের জীবনে এরূপ দুর্ভোগ যাহাতে না আসে, সে জন্য সর্ব্বদাই তাহার প্রস্তুত হইয়া থাকা কর্ত্তব্য। অথবা তিনি যদি অকপটে নিজের অক্ষমতা ও ত্রুটির কথা জ্ঞাপন করিতে দ্বিধা বোধ না করেন, তাহা হইলে লোকের তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা বরং বাড়িয়া যায়, কমে না।

সাংবাদিক জীবনের অসুবিধার আর একটি প্রধান কারণ, এ দেশে শিক্ষার ও শিক্ষিত লোকের অভাব। যে দেশ যত শিক্ষিত, সে দেশে সংবাদপত্রের আদর ও প্রতিপত্তি ততই বেশী। সেই জন্যই এ দেশে সংবাদপত্রের ব্যবসা এখনও পর্য্যন্ত অর্থকরী হইয়া উঠে নাই। একদিকে সরকারপক্ষের সহিত চিরদিন সংগ্রাম করিতে হয় বলিয়া ব্যবসা হিসাবে সংবাদপত্র চালান কঠিন হইয়া পড়ে। অন্যদিকে দেশীয় ব্যবসায়ীরাও সংবাদপত্রগুলির সহিত ভালভাবে সহযোগিতা করিতে পারেন না। ভারতবর্ষে—বিশেষ করিয়া কলিকাতায়, সকল বড় বড় ব্যবসাই এখনও পর্য্যন্ত বিদেশীদের হাতে আছে। তাহাদের সহিত মুক্তিকামী ভারতবাসীর স্বার্থের সংঘাত পদে পদে চলিতেছে। সে জন্য কলিকাতার বিদেশীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি দেশীয় সংবাদপত্রগুলির অনুরাগী ত নহেন, বরং বিরোধী। যতটুকু সহযোগ না করিলে তাঁহাদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ততটুকু সাহায্যই তাঁহারা করিয়া থাকেন। দেশীয় ব্যবসায়ীদের একদিকে সহযোগ করার সামর্থ্যের অভাব, অন্যদিকে গভর্ণমেণ্টের মুখ চাহিয়া তাঁহারা গভর্ণমেণ্ট বিরোধী সংবাদপত্রগুলির সহিত সহযোগ করিতে সাহস করেন না—এই উভয় কারণে সাময়িক পত্রগুলি উপযুক্ত বিজ্ঞাপন লাভ করে না, করিতে পারে না এবং সে জন্য অর্থের দিক দিয়া সম্যক পরিপুষ্ট হইবারও সুবিধা পায় না। ধনিক-মনোবৃত্তি ছাড়াও এই কারণেও দেশের বেতনভুক্ সাংবাদিকগণের পক্ষে অধিক অর্থ উপার্জ্জনের সম্ভাবনা কম। বোম্বাই প্রদেশে অধিকাংশ ব্যবসা দেশীয় লোকদিগের করতলগত থাকায়,তথায় সংবাদপত্রগুলির অবস্থা বাংলাদেশের সংবাদপত্রসমূহের অবস্থা অপেক্ষা ভাল। পরাধীনতার জন্য আমরা যে রৌরবীচক্রের মধ্যে বাস করিতেছি, ইহার অন্যতম কারণ তাহাই—সেকথা আর স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। এমন কি সরকারী কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত উগ্র জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র অফিসের কর্ম্মীদের সহিত কথা বলিতে, মেলামেশা করিতে বা বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে ভয় পাইয়া থাকেন। দেশের এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত হই বটে, কিন্তু কবে এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া আমরা শঙ্কাও অনুভব করিয়া থাকি।

বিজ্ঞান জগৎ

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ধারা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ

দুই

নিয়ম আবিষ্কারের সাধারণ পদ্ধতি—
পরীক্ষা ও পরিমাপ

এই পদ্ধতির ব্যাখ্যা দানের জন্য আমরা একটা নির্দ্দিষ্ট ওজনের বাতাসের পক্ষে উষ্ণতার সঙ্গে আয়তনের সম্বন্ধ-নিরূপণ-প্রণালীকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করবো। আমরা দেখেছি, বায়ুর এবং সাধারণতঃ গ্যাস মাত্রেরই প্রসারণশীলতা কঠিন ও তরলের তুলনায় খুব বেশী, সুতরাং এদের বেলায় আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি সহজেই ধরা পড়ে এবং পরিমাপে ভুলের সম্ভাবনাও হয় কম। তবু এ ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধান হতে হয় এই জন্য যে, গ্যাসের অণুগুলি স্বভাবতঃ পলায়নপর, সুতরাং এমন ব্যবস্থার প্রয়োজন যে, পরীক্ষণীয় বাতাসের এক কণাও আধারপাত্র থেকে বেরিয়ে আসতে না পারে, অথচ উষ্ণতার ফলে অনায়াসে প্রসারিত হতে পারে এবং প্রসারণের মাত্রাও সহজে ও নির্ভুল রূপে মাপা যায়।

প্রথমেই বিবেচনা করবার দরকার যে, গরম করলে শুধু আয়তনই নয়, গ্যাসের চাপও সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। দেখা যায় যে, একটা বায়ুপূর্ণ বোতলে ছিপি এঁটে ওকে আগুনের তাপে গরম করতে থাকলে একটু বাদে ছিপিটা ফট্ করে খুলে যায় এবং বোতলের কাচ পাতলা হলে, ভেতরকার বায়ুর চাপে বোতলটাও ভেঙে চুরমার হতে পারে।* এ ক্ষেত্রে বদ্ধবায়ুর আয়তনটা বাড়বার সুযোগ পায় না; গরম হয়ে ওর চাপটাই ক্রমে বাড়তে থাকে এবং শেষে খুব বেড়ে গিয়ে ঐরূপ কাণ্ডকারখানা ঘটায়। মোটের ওপর আমাদের সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, উষ্ণতার ফলে সাধারণতঃ গ্যাসের চাপ ও আয়তন উভয়েরই বৃদ্ধি ঘটে। যে ক্ষেত্রে আয়তনটা বাড়বার সুযোগ পায় না সেক্ষেত্রে চাপটাই শুধু বাড়তে থাকে এবং বাড়ে অতিমাত্রায়। অন্যপক্ষে, আয়তন যদি স্বচ্ছন্দে বাড়তে পারে তবে চাপের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। প্রত্যেক পরীক্ষাতেই পরীক্ষার উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে থাকে।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বায়ুর চাপটা ঠিক থেকে শুধু আয়তন বাড়তে পারে এইরূপ ব্যবস্থারই প্রয়োজন। এর সহজ উপায় হচ্ছে একটা বোতলে ছ্যাঁদাওয়ালা একটা ছিপি এঁটে ওতে দু'মুখ-খোলা একটা সরু ও লম্বা কাচের নল পরিয়ে দেওয়া। নলটার একমুখ থাকবে বাইরে ও অপর মুখ থাকবে বোতলের ভেতরে। পরাবার আগে নলের ভেতর এক ফোঁটা তেল বা পারদ ঢুকিয়ে দিতে হবে। ফলে একটা নির্দ্দিষ্ট ওজনের বাতাস বোতলের ভেতর আটকা পড়বে এবং আটক অবস্থাতেও ওর আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে কিছুমাত্র বাধা হবে না।
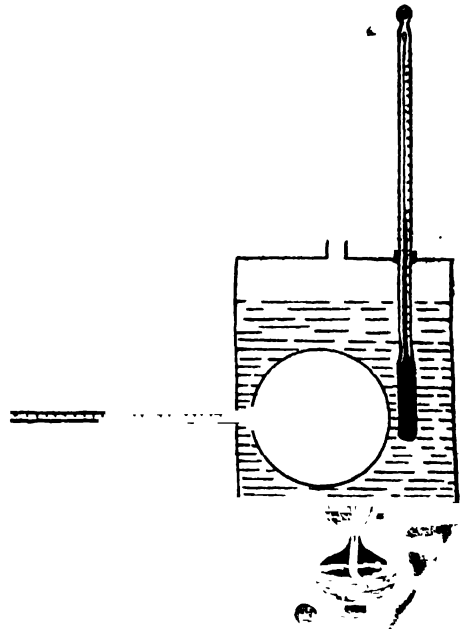
১নং চিত্র

* সুতরাং পাঠকদের মধ্যে কারুর এরূপ পরীক্ষা করার ইচ্ছা হ'লে কাচের বোতলের বদলে কোন ধাতুর পাত্র ব্যবহার করাই ভাল।

১নং চিত্রে বোতলের বদলে একটা ফাঁপা কাচের গোলক দেখানো হয়েছে। গোলকটা থেকে একটা সরু কাচের নল বেরিয়ে এসেছে। নলের গায়ে দাগ কাটা এবং ওর ভেতর এক ফোঁটা পারদ রাখা হয়েছে। পারদ-বিন্দুটা অর্গল স্বরূপ হয়ে ভেতরের বাতাসকে বাইরের বায়ুরাশি থেকে আলাদা করে রেখেছে, অথচ বদ্ধ বায়ুটা গরম হ'লে, ওর চাপ বাড়তে না বাড়তেই ঐ ক্ষুদ্র অর্গলটা বাইরের দিকে একটুখানি সরে গিয়ে চাপটাকে আদৌ বাড়তে দেবে না। নলে দাগ কাটার উদ্দেশ্য নলটাকে একটা স্কেল বা মাপকাঠি রূপে ব্যবহার করা। পারদবিন্দুটা নলের ভেতর দিয়ে কতটা পথ (স্কেলের ক'টা দাগ) স'রে গেল তা' দেখে এবং ঐ পথের দৈর্ঘ্যকে নলের ছিদ্রমুখের ক্ষেত্র-ফল দিয়ে পূরণ ক'রে বদ্ধ বায়ুর প্রসারণের মাত্রা জানা যাবে। এইরূপ ব্যবস্থায়, উষ্ণতা বৃদ্ধিতে বদ্ধ বায়ুর আয়তনই শুধু বাড়তে থাকবে, চাপটা বাড়বার সুযোগ পাবে না, পরন্তু বাইরের মুক্ত বায়ুর চাপের সঙ্গে সর্ব্বদা সমতা রক্ষা করে চলবে।

পরীক্ষণীয় বাতাসের উষ্ণতা বাড়াবার সহজ উপায় হচ্ছে গোলকটাকে একটা জলপূর্ণ পাত্রের ভেতর বসিয়ে দিয়ে জলটাকে গরম করা এবং ক্রমাগত নাড়তে থাকা, যাতে ক'রে জলের উষ্ণতা সবদিকে সমান হতে পারে এবং গোলকটাও সবদিক থেকে সমভাবে গরম হতে পারে। গোলকের কাচটা পাতলা হলে—পাতলা হওয়াই বাঞ্ছনীয়—জলের তাপ সহজে ওর ভেতর ঢুকে গিয়ে ভেতরের বাতাসকে গরম করে তুলবে। এইরূপ অবস্থায় গোলকের ভেতরের ও বাইরের উষ্ণতাকে সমান ব'লে ধরে নেওয়া চলবে এবং থার্ম্মোমিটা-রের সাহায্যে জলের উষ্ণতা মেপে, বদ্ধবায়ুর উষ্ণতা মাপা হ'ল ব'লে মনে করা চলবে। এখন উষ্ণতা একটু একটু ক'রে (এক ডিগ্রী বা দু'ডিগ্রীর ধাপে) বাড়াতে থাকলে বদ্ধবায়ুর আয়তন প্রতি ধাপে কতটা ক'রে বাড়ে তা' মেপে জুখে অনায়াসে নিরূপণ করা যাবে এবং তার থেকে বাতাসের পক্ষে উষ্ণতার সঙ্গে আয়তনের সম্বন্ধটাও জানতে পারা যাবে।

আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সম্বন্ধ নিরূপণ। এজন্য পরিমাপের ফলগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে (টেবলের আকারে) সাজিয়ে লেখা সুবিধাজনক;—যেমন—'ট' ডিগ্রী উষ্ণতায় আয়তন 'ঠ' পরিমিত, 'ত' ডিগ্রীতে 'থ', 'প' ডিগ্রীতে 'ফ' পরিমিত, এইভাবে। অনেক ক্ষেত্রে এই টেব্‌লের দিকে তাকিয়েই নিয়মটাকে অনায়াসে ধরতে পারা যায়, বিশেষতঃ নিয়মটা যদি সমানুপাতের বা বিপরীত অনুপাতের নিয়ম হয়। অন্যথায় নিয়মের আকার সহজে নিরূপণের জন্য পরিবর্ত্তনশীল রাশিদ্বয়ের সম্বন্ধজ্ঞাপক একটা নক্‌সা বা রেখা-চিত্র আঁকবার প্রয়োজন।

রেখা-চিত্র আঁকবার সাধারণ প্রণালী এইরূপ। প্রথমতঃ কাগজের ওপর একটা বিন্দু ('চ' বিন্দু) চিহ্নিত ক'রে নিয়ে সেখান্ থেকে পরস্পরের লম্বভাবে দু'টা সরল রেখা—'চ ক' ও 'চ খ' রেখা-টানতে হবে (২ নং চিত্র)। এই বিন্দুকে বলা যায় ভিত্তিবিন্দু (origin) এবং রেখাদ্বয়কে বলা যায় অক্ষ-রেখা (Axis of Reference)।

২নং চিত্র
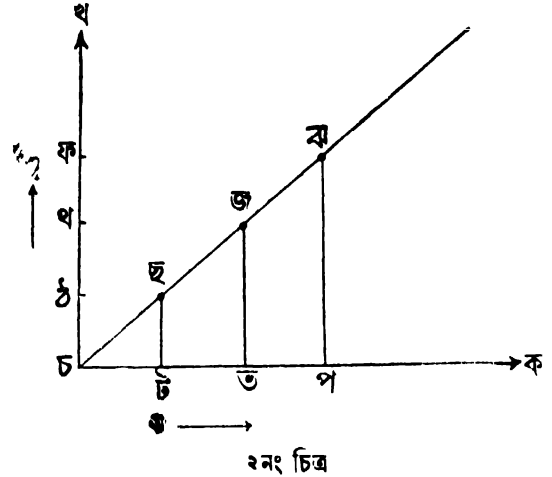
এই রেখা দু'টাকে পরিবর্ত্তনশীল রাশিদ্বয়ের—এখানে উষ্ণতা ও আয়তনের—প্রতীকরূপে গ্রহণ ক'রে ওদের দৈর্ঘ্য দ্বারাই ঐ দুই রাশির বিভিন্ন মাত্রা জ্ঞাপন করা যেতে পারে। ধরা যাক্ 'চ ক' রেখাটা উষ্ণতা ও 'চ খ' রেখাটা আয়তন নির্দ্দেশ করছে এবং প্রথম রেখার 'চ ট' 'চ ত' 'চ প' প্রভৃতি অংশগুলি টেবলে লিখিত 'ট' 'ত' 'প' প্রভৃতি উষ্ণতার এবং দ্বিতীয় রেখার 'চঠ' 'চথ' 'চফ' প্রভৃতি অংশগুলি টেবলে লিখিত 'ঠ' 'থ' 'ফ' প্রভৃতি আয়তনের সমানুপাতিক। ফলে প্রথমোক্ত রেখাগুলি ('চট' 'চ ত' প্রভৃতি) বদ্ধ বায়ুর ক্রম-বর্দ্ধমান উষ্ণতা এবং শেষোক্ত রেখাগুলি ('চঠ' 'চথ' প্রভৃতি) ঐ সকল উষ্ণতার পক্ষে ওর আয়তনের যথাক্রম-মূল্যগুলি (corresponding values) নির্দ্দেশ করবে। এখন উষ্ণতা-রেখার 'চ' বিন্দু থেকে আয়তন-রেখার সমান্তরালভাবে এবং আয়তন-রেখার 'ঠ' বিন্দু থেকে উষ্ণতা-রেখার সমান্তরাল ভাবে দু'টা সরল রেখা টানলে ওরা পরস্পরকে একটা বিশিষ্ট স্থানে—'ছ' বিন্দুতে ছেদ করবে। অনুরূপ প্রণালীতে 'ত' ও 'থ' বিন্দু থেকে এবং 'প' ও 'ফ' বিন্দু থেকে উক্ত ধরণের এক এক জোড়া রেখা টানলে ওরা পরস্পরকে 'জ' 'ঝ' প্রভৃতি বিন্দুতে ছেদ করবে। 'ছট' ও 'ছঠ' রেখা দু'টাকে কিম্বা—'ছঠ' রেখাটা

'চট' রেখার সমান ব'লে—'ছট' ও 'চট' রেখা দু'টাকে বলা যায় 'ছ' বিন্দুর পাদদ্বয় (Co-ordinates). সেইরূপ 'জত' ও 'চত' 'জ' বিন্দুর এবং 'ঝপ' ও 'চপ' 'ঝ' বিন্দুর পাদদ্বয়কে নির্দ্দেশ কর্চ্ছে। এখন 'ছ' 'জ' 'ঝ' প্রভৃতি বিন্দুগুলিকে পর পর যোগ করে দিলে 'ছ জঝ' নামক যে রেখা-চিত্র (সরল বা বক্র রেখা) পাওয়া যাবে তার চেহারাটাই জানিয়ে দেবে পূর্ব্বোক্ত বদ্ধ বায়ুর উষ্ণতার সঙ্গে ওর আয়তনের সম্বন্ধ-নির্দ্দেশক নিয়মটাকে—অর্থাৎ এই রাশিদ্বয়ের ক্রম-পরিবর্ত্তনে উভয়কে উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ রক্ষা করে চলতে হয় তার আকারটাকে। কারণ, এই রেখা-চিত্রের যে বিন্দু থেকেই ওর পাদদ্বয়কে টানা যাক না কেন প্রত্যেক স্থানের পক্ষেই ওরা ওদের দৈর্ঘ্য দ্বারা পরিবর্ত্তনশীল রাশিদ্বয়ের (এখানে উষ্ণতা ও আয়তনের) ক্রম-পরিবর্ত্তনের মাত্রা ও পরস্পরের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করবে এবং এইরূপে নিয়মের আকারটাকে মূর্ত্তিদান করবে।

এই প্রণালী অবলম্বনে কেবল উষ্ণতার সঙ্গে আয়তনের সম্বন্ধই নয়—উষ্ণতার সঙ্গে চাপের, চাপের সঙ্গে আয়তনের এবং সাধারণতঃ পরস্পর-সম্বদ্ধ যে কোন পরিবর্ত্তনশীল রাশিদ্বয়ের সম্বন্ধের আকারটাকে রেখা-চিত্রের ভেতর দিয়ে স্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তুলতে পারা যায়। বিজ্ঞানে রেখা-চিত্রের গুরুত্বও এরই জন্য। ক্ষেত্রভেদে রেখা-চিত্রটা বিভিন্ন আকার ধারণ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন ২নং চিত্রে দেখানো হয়েছে) আমরা পাই একটা সরল রেখা কিন্তু বহু ক্ষেত্রে রেখাটা বক্রাকার ধারণ করে, যার কোনটা বৃত্ত, কোনটা উপবৃত্ত (Ellipse) কোনটা অধিবৃত্ত (Parabola), কোনটা পরাবৃত্ত (Hyperbola) আবার কোনটা বা এমন বিদ্‌কুটে যে ওর দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারা যায় যে, এ ক্ষেত্রে নিয়মটা অত্যন্ত জটিল কিম্বা রাশিদ্বয় আদৌ পরস্পরের অপেক্ষক নয় এবং পরস্পরের সঙ্গে কোন নিয়ম দ্বারা সংবদ্ধ নয়। ২নং চিত্রের দিকে তাকালে এও প্রতিপন্ন হবে যে, উক্ত পাদদ্বয়ের অনুপাতটা যদি রেখা-চিত্রের সকল বিন্দুর পক্ষেই সমান হয় তবে রেখাচিত্রটা ('ছ জ ঝ') সরল রেখার আকার ধারণ করে এবং পরিবর্ত্তনশীল রাশিদ্বয় পরস্পরের মধ্যে সমানুপাতের সম্বন্ধ জ্ঞাপন করে। যদি ঐ পাদদ্বয়ের পূরণফল একটা নির্দ্দিষ্ট রাশি হয় অর্থাৎ একটা পাদ যে অনুপাতে বাড়ে, অপরটা সেই অনুপাতে কমতে থাকে (যেমন ৩নং চিত্রে দেখানো হয়েছে) তবে রেখা-চিত্রটা বাঁকা হয় ও পরাবৃত্তের আকার ধারণ করে, এবং তার থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, এ ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তনশীল রাশিদ্বয়ের মধ্যে বিপরীত অনুপাতের সম্বন্ধ বিদ্যমান।

এখন আমাদের জিজ্ঞাসা হবে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে (পরীক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে) রেখা-চিত্রটা কি আকার ধারণ করে থাকে? এর উত্তর এই যে, উক্ত প্রণালীতে নিখুঁতভাবে পরীক্ষা ও পরিমাপ সম্পন্ন ক'রে পূর্ব্বোক্ত টেবলের সাহায্যে উষ্ণতা ও আয়তনের সম্বন্ধজ্ঞাপক রেখা-চিত্র আঁকলে দেখা যাবে যে, রেখাটা এক্ষেত্রে ২নং চিত্রের মত সরল রেখার আকার ধারণ করে। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত এসে পড়ে যে, চাপ ঠিক রেখে বাতাসের উষ্ণতা বাড়াতে থাকলে ওর আয়তন বাড়ে উষ্ণতার সমানুপাতে। এই নিয়ম চার্লসের নিয়ম নামে পরিচিত। দেখা গেছে এই নিয়ম কেবল বায়ুর পক্ষেই নয়, সকল গ্যাসের পক্ষেই সমভাবে প্রযোজ্য। চার্লস এই নিয়মকে এই ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন—কোন গ্যাসের উষ্ণতা যদি সেন্টিগ্রেড স্কেলের এক ডিগ্রী মাত্রায় বাড়তে (বা কমতে) থাকে তবে প্রত্যেক ধাপে ওর আয়তনের বৃদ্ধির (বা হ্রাসের) মাত্রাটা হবে, শূন্য ডিগ্রীতে (বা গলন্ত বরফের উষ্ণতায়) ওর আয়তন যত তার ২৭৩ ভাগের এক ভাগ মাত্র। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পরীক্ষা ও পরিমাপ সম্পন্ন করেই চার্লসের নিয়মের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল।

এই নিয়ম থেকে দেখা যায় যে, চাপ ঠিক থেকে কোন গ্যাসের উষ্ণতা যদি সেন্টিগ্রেডের শূন্য ডিগ্রীর (বরফের উষ্ণতার) ২৭৩ ডিগ্রী নীচে নেমে যায় তবে ওর আয়তন সম্পূর্ণই লোপ পাবার কথা,—অর্থাৎ তখন ওর আয়তনটা হবার কথা শূন্য পরিমিত। এজন্য এই উষ্ণতাকে (গলন্ত বরফের উষ্ণতা থেকে সেন্টিগ্রেড স্কেলের ২৭৩ ডিগ্রী পরিমাণের কম উষ্ণতাকে) সত্যকার শূন্য উষ্ণতা বা শূন্য ডিগ্রী ব'লে ধরে নেওয়া হয়। একে বলা যায় গ্যাস-স্কেলের শূন্য ডিগ্রী। সাধারণ সেন্টিগ্রেড স্কেলের সঙ্গে গ্যাস স্কেলের একমাত্র পার্থক্য এই যে, শেষোক্ত স্কেলের শূন্য ডিগ্রী প্রথমোক্ত স্কেলের শূন্য ডিগ্রী থেকে ২৭৩ ডিগ্রী নীচে অবস্থিত। চার্লসের নিয়ম সকল উষ্ণতাতেই সমান ভাবে প্রযোজ্য-এইটা মেনে নিলে বলতে পারা যায় যে, গ্যাস স্কেলের এক ডিগ্রীতে কোন গ্যাসের আয়তন যা' হবে, দু' ডিগ্রীতে হবে তার দ্বিগুণ, তিন ডিগ্রীতে তিনগুণ, এইরূপ। সুতরাং চার্লসের নিয়মকে এই ভাবেও প্রকাশ করা যেতে পারে—যদি গ্যাস-স্কেলে কোন গ্যাসের উষ্ণতা মাপা যায় এবং ওর চাপ ঠিক রাখা যায়, তবে ওর আয়তন ও উষ্ণতা পরস্পরের সমানুপাতিক হয়ে থাকে। ২নং চিত্রে নিয়মটাকে এই আকারেই প্রকাশ করা হয়েছে এবং ফলে রেখা-চিত্রটা (ছ জ ঝ সরল রেখাটা) ভিত্তি-বিন্দু 'চ' এর ভেতর দিয়ে চলে গেছে।

পরীক্ষা ও পরিমাপ থেকে এও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, যদি উষ্ণতা ঠিক রেখে কোন গ্যাসের ওপর চাপের মাত্রা

বাড়ানো যায় তবে ওর আয়তন ক্রমে কমতে থাকে এবং কমে—চাপ যে অনুপাতে বাড়ে সেই অনুপাতে। সংক্ষেপে এই নিয়মকে এইভাবে প্রকাশ করা যায়—একটা নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতার পক্ষে গ্যাস মাত্রেরই চাপ ও আয়তনের মধ্যে বিপরীত অনুপাতের সম্বন্ধ বিদ্যমান। ইংলণ্ডের রবার্ট বয়েল ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে পরীক্ষা ও পরিমাপের সাহায্যে এই নিয়ম প্রথম আবিষ্কার করেন। বয়েলের নিয়মও চার্লসের নিয়মের মত সকল খাঁটি গ্যাস সম্বন্ধেই খাটে।

পূর্ব্বে যা' বলা হয়েছে তার থেকে বোঝা যাবে যে, বয়েলের নিয়মের রেখা-চিত্রটা হবে একটা পরাবৃত্ত—৩নং চিত্রের 'ত থ দ ধ' রেখার মত।
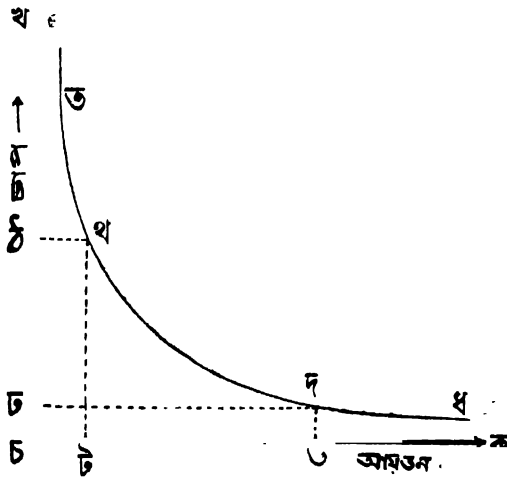
৩নং চিত্র

এখানে 'চক' রেখাটা গ্যাসের আয়তন এবং 'চখ' রেখা ওর চাপের মাত্রা নির্দ্দেশ করছে। এখানে গ্যাসের উষ্ণতা ঠিক থাকছে (অর্থাৎ ঠিক থাকতে পারে পরীক্ষায় এইরূপ বন্দোবস্ত করা হয়েছে) সুতরাং এ চিত্রে উষ্ণতা রেখা আসে না। 'চাপ' ও আয়তনই এখানে একমাত্র পরিবর্ত্তনশীল রাশি। চিত্রে 'থ' বিন্দুর পাদদ্বয়ের সঙ্গে 'দ' বিন্দুর পাদদ্বয়ের তুলনা করে দেখানো হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে 'থ ট' পরিমিত চাপের পক্ষে গ্যাস-বিশেষের আয়তন পরিমাপে দাঁড়িয়েছে 'চ ট' পরিমিত এবং 'দ ড' পরিমিত চাপের পক্ষে আয়তনটা পাওয়া গেছে 'চ ড' পরিমিত। আরো দেখা যাচ্ছে যে, প্রথমোক্ত রাশিদ্বয়ের পূরণফল (বা 'থ চ' আয়তক্ষেত্রটা) শেষোক্ত রাশিদ্বয়ের পূরণ ফলের (বা 'দ চ' আয়তক্ষেত্রের সমান। এ কথা এই চিত্রের প্রত্যেক বিন্দু সম্পর্কেই খাটে।

প্রশ্ন হয়—যদি গ্যাসের উষ্ণতা, চাপ ও আয়তন সবই একসঙ্গে বদলাতে থাকে তবে ওদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ-সূচক নিয়মের আকার কি রকম হবে? এর উত্তর চার্লস ও বয়েলের নিয়মের সংযোগ সাধন ক'রে সহজেই পাওয়া যায়, সুতরাং আর আলাদা পরীক্ষা বা পরিমাপের প্রয়োজন হয় না। উভয় নিয়মের সংযোগের ফলে আমরা এই নিয়মটা পাই—গ্যাস মাত্রেরই চাপ ও আয়তনের পূরণ-ফলটা ওর উষ্ণতার সমানুপাতিক। এখানে 'উষ্ণতা' বলতে গ্যাস-স্কেলের উষ্ণতা এবং গ্যাস বলতে খাঁটি গ্যাস* বুঝতে হবে। এই নিয়মকে গ্যাস-নিয়ম (Gas-Law) বলা যায়। এই নিয়ম থেকে আমরা দেখতে পাই যে, যদি গ্যাসের চাপ, আয়তন ও উষ্ণতার যুগপৎ পরিবর্ত্তন হতে থাকে তবে এরূপ স্থলেও এই রাশিত্রয়ের মধ্যে একটা বিশিষ্ট সম্বন্ধের মর্য্যাদা রক্ষা করেই পরিবর্ত্তনটা ঘটে থাকে। সাধারণতঃ যে ব্যাপারে তিন বা ততোধিক পরস্পর-নির্ভরশীল রাশির যুগপৎ পরিবর্ত্তন হ'তে থাকে সেখানে রাশিসমূহকে জোড়ায় জোড়ায় নিয়ে এবং অন্যগুলির পরিমাণ ঠিক রেখে প্রত্যেক ক্ষেত্রে পরীক্ষা ও পরিমাপ দ্বারা ঐ বিশিষ্ট জোড়ার মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ করতে হয়; অতঃপর ঐ সকল বিভিন্ন সম্বন্ধকে গণিতের নিয়ম অনুসারে একসূত্রে গ্রথিত ক'রে সবগুলি রাশির অন্তর্গত ব্যাপক সম্বন্ধটা নিরূপণ করা চলে।

তরল ও কঠিন পদার্থের বেলায় গ্যাস-নিয়মের মত এত সরল ও সাধারণ একটা নিয়মের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এর থেকে এবং অন্যান্য কারণ থেকে বৈজ্ঞানিক-গণ সিদ্ধান্ত করেন যে, তরল ও কঠিনের তুলনায় গ্যাসের অণুদের চালচলন ও পরস্পরের প্রতি ব্যবহার অপেক্ষাকৃত সরল বা অন্ততঃ কম জটিল। • এই পার্থক্যের কারণ স্বরূপ অনুমান করা হয় যে, কঠিন এবং তরল দ্রব্যের অণুগুলি অপেক্ষাকৃত ঘন-সন্নিবেশের ফলে, বিশেষভাবে পরস্পরের আকর্ষণের অধীন, সুতরাং ঐ সকল অণুর গতিবিধি আদৌ পরস্পরের প্রভাবমুক্ত নয়। অন্যপক্ষে, গ্যাসের অণুগুলির, লীলাভূমি অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ, সুতরাং মোটের ওপর এই সকল অণু পরস্পরের আকর্ষণমুক্ত। ফলে এইরূপ প্রত্যাশাই স্বাভাবিক যে, গ্যাসের সঙ্কোচন-প্রসারণ ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত সরল নিয়মের এবং সকল গ্যাসের পক্ষে একই নিয়মের প্রভাব পরিলক্ষিত হবে।

তবু গ্যাসকে তরল ও কঠিনের দল ছাড়া করে সম্পূর্ণ আলাদা শ্রেণীর পদার্থরূপে কল্পনা করা যায় না। আমরা জানি, বরফ, কিম্বা জলের সঙ্গে জলীয় বাষ্পের উপাদানগত কোন ভেদ নেই। একই অণুর দল উষ্ণতা ও চাপের তারতম্য হেতু (উষ্ণতা বৃদ্ধি ও চাপ হ্রাসের ফলে) কখনো অতিমাত্র চঞ্চল এবং বিস্তীর্ণ প্রদেশে ব্যাপ্ত হয়ে পরস্পরের আকর্ষণ-মুক্ত স্বাধীন অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ফলে আকৃতি ও আয়তনের

* যে গ্যাস চার্লস্ ও বয়েলের নিয়ম মেনে চলে তাকে বলা হয় খাঁটি গ্যাস; কিন্তু এরূপ সংজ্ঞা, Tautological বা পুনরাবৃত্তি মাত্র।

বৈশিষ্ট্য হারিয়ে গ্যাসের ধর্ম্ম অবলম্বন করে; আবার কখনো অত্যধিক চাপ ও শৈত্যের ফলে খুব ঘন-সন্নিবিষ্ট ও পরস্পরের আকর্ষণ এলাকার অন্তর্গত হয়ে তরল বা কঠিন পদার্থরূপে বিশিষ্ট আয়তন বা আকার ধারণ করে। সুতরাং এইরূপ প্রত্যাশাও স্বাভাবিক যে, গ্যাসমাত্রই তরলত্বে অগ্রসর হবার পথে ওর চাপ, উষ্ণতা ও আয়তন সম্পর্কীয় সরল সম্বন্ধটাকে একটু একটু করে বদলে নিয়ে গ্যাস-নিয়মটাকে অপেক্ষাকৃত জটিল আকার দান করবে। ফলে অনুমান করতে হয় যে, চার্লস্ ও বয়েলের নিয়ম প্রাকৃতিক নিয়ম হলেও মানুষের তৈরি নিয়মের মতই অল্পবিস্তর সংশোধন-সাপেক্ষ এবং ওদের প্রয়োগক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ। চাপ বা উষ্ণতার মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেলে—খুব বেশী বা খুব কম হলে—আমরা এ-সকল নিয়মের প্রযোজ্যতা আশা করতে পারিনে এবং মাত্রার ভেতরেও চার্লসের নিয়ম যে হুবহু জ্যামিতিক সরল রেখার দ্বারা বা বয়েলের নিয়ম যে হুবহু জ্যামিতিক পরাবৃত্ত দ্বারা প্রতিবিম্বিত হবে, তাও আশা করতে পারিনে।

এই উক্তির প্রমাণও সহজেই পাওয়া যায়। আমরা দেখেছি, চার্লসের নিয়মের নির্দ্দেশ এই যে, গ্যাস-স্কেলের শূন্য ডিগ্রীতে (বা সেন্‌টিগ্রেড স্কেলের ২৭৩ ডিগ্রীর নীচে) গ্যাস মাত্রেরই আয়তন হওয়া উচিত শূন্য-পরিমিত। কিন্তু কোন জড় পদার্থেরই অবয়ব একেবারে লোপ পাবে কিম্বা পদার্থটা একেবারে জ্যামিতিক বিন্দুতে পরিণত হবে এরূপ কল্পনা জড়দ্রব্যের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। বিস্তৃতি যার প্রধান ধর্ম্ম তার আয়তন একেবারে লোপ পেতে পারে না। বুঝতে হবে, উষ্ণতা সীমা ছাড়িয়ে কমতে থাকলে হয় তো গ্যাসটা আর গ্যাসের অবস্থায় থাকে না, অথবা হয় তো ওর চাপটাকে ঠিক রাখা যায় না কিম্বা ওর অণুগুলির ব্যবহারে এমন জটিলতা বা অবসাদ এসে পড়ে, যাতে ক'রে ওকে ওর স্বাভাবিক নিয়মানুবর্ত্তিতার গণ্ডির বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। বয়েলের নিয়ম সম্বন্ধেও অনুরূপ কথা খাটে। চাপ বাড়াতে থাকলে গ্যাসের আয়তন যদি বিপরীত অনুপাতের নিয়ম মেনে ক্রমাগত কমতেই থাকে, তবে শেষটা—একটা খুব বড় চাপের পক্ষে—ওর আয়তন হবে বিন্দু-পরিমিত, যা' অসম্ভব। বুঝতে হবে তার আগের থেকেই গ্যাসটা একটু একটু ক'রে রুখে দাঁড়ায় এবং আর কোন কারণে না হোক, শুধু স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই নিয়ম অমান্যের অ-সরল পথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়। সুতরাং সীমা ছাড়িয়ে গেলে চার্লস্ বা বয়েলের নিয়ম—হয় তো কোন প্রাকৃতিক নিয়মই—তার বিশুদ্ধতা রক্ষা ক'রে চলতে পারে না। তবু নিয়মলঙ্ঘন ব্যাপারেও বহুক্ষেত্রে একটা দাঁড়া বা রীতি দেখতে পাওয়া যায়, যা'কে সেক্‌স্‌পিয়রের ভাষায় বলা যেতে পারে—There is method in its madness। খুব বেশী চাপের বেলায় বয়েলের নিয়মে যে-ধরণের বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয় এবং বৈলক্ষণ্যের ভেতরেও যে-সকল method বা রীতি আত্মপ্রকাশ করে, তার কতকটা রবিন্‌সন্, রে'ণো, আমাগাট প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের পরীক্ষা থেকে জানতে পারা গেছে; অধিকন্তু উক্ত গ্যাস-নিয়ম যে বস্তুতঃ সংশোধন-সাপেক্ষ এবং সংশোধিত আকারে প্রকাশ করলে তা' যে গ্যাস ও তরলের ধর্ম্মকে একসূত্রে গ্রথিত করতে সক্ষম, তারও পরিচয় পাই আমরা ভ্যান্‌ডার-ওয়াল্‌সের গবেষণা এবং ঐ নিয়ম সম্পর্কে তাঁর সংশোধিত সূত্র থেকে।

নিয়মের ব্যতিক্রমের আর একটা বিশিষ্ট উদাহরণেরও উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। আমরা বলেছি, উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সকল পদার্থেরই আয়তন বাড়ে এবং উষ্ণতা হ্রাসে আয়তন কমে। সাধারণতঃ এই-ই নিয়ম এবং এর বিশিষ্ট কারণ স্বরূপ বলা হয় যে, গরম হবার সঙ্গে সঙ্গে পদার্থের অণুগুলির চঞ্চলতা—ঘূর্ণন, কম্পন, ধাবন প্রভৃতি জাতীয় সকল প্রকার গতিবেগ—সকল পদার্থের পক্ষেই বৃদ্ধি পায়, সুতরাং পরস্পরের আকর্ষণ ছিন্ন ক'রে ব্যাপকতর প্রদেশে ছড়িয়ে পড়বার প্রবৃত্তিও সকল ক্ষেত্রেই বেড়ে যায়। তবু এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম দেখা যায় এবং তার বিশিষ্ট উদাহরণ হচ্ছে সেণ্টিগ্রেড স্কেলের ৪ ডিগ্রী উষ্ণতার জল। এই উষ্ণতায় জল গরম হলেও আয়তনে বাড়ে, ঠাণ্ডা হলেও বাড়ে। পরীক্ষার ফল এই যে, সাধারণ উষ্ণতার (বিশ পঁচিশ ডিগ্রীর) জলকে ক্রমাগত ঠাণ্ডা করতে থাকলে প্রথমে ওর আয়তন কমতে থাকে কিন্তু উষ্ণতার মাত্রা ৪ ডিগ্রীর নীচে নেমে যেতেই (এবং বরফে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত) ওর আয়তন আবার বাড়তে থাকে। সুতরাং ৪ ডিগ্রী উষ্ণতাতেই জলের ঘনত্ব হয় বৃহত্তম। এর একটা ফল হয় এই যে, শীতপ্রধান দেশে—যেখানে জলের ওপর সর্ব্বদা খুব ঠাণ্ডা ও কন্‌কনে হাওয়া বইতে থাকে—নদী নালা পুষ্করিণীর ওপরকার জলটা ঠাণ্ডা হয়, সুতরাং নীচের জলের তুলনায় ঘন ও ভারী হয়ে নীচে নেমে যায় এবং নীচের হাল্‌কা জলটা উপরে উঠে আসে। এইরূপ ওঠা-নামার ফলে সমগ্র জলরাশির উষ্ণতা কমতে কমতে ৪ ডিগ্রীতে নেমে যায়। তারপর ওপরের জলটা আরো ঠাণ্ডা হ'য়ে আয়তনে বাড়তে থাকে ও ওপরেই থেকে যায় এবং শেষ পর্য্যন্ত বরফে পরিণত হ'য়ে নীচের জলরাশির ওপর ভাসতে থাকে—যার মধ্যে মৎস্যাদি জলচর জীবের প্রাণধারণ কিম্বা ইতস্ততঃ বিচরণের কোন বাধা হয় না। এই উদাহরণ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, নিয়মের ব্যতিক্রমও ক্ষেত্রবিশেষে প্রাণিজগতের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যতিক্রম থাকুক বা না থাকুক এবং তা' আমাদের মঙ্গল বা অমঙ্গলজনক হোক, নিয়ম এড়িয়ে চলার ক্ষমতা যে আমাদের আদৌ নেই—তা চলতে ফিরতে, প্রতি-পদে ও প্রতি হোঁচটেই আমরা স্পষ্ট অনুভব করে থাকি।

বৈজ্ঞানিকগণের তিন শতাব্দব্যাপী অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফলে এইরূপ এবং এর চেয়ে বহুগুণে জটিল শত শত নিয়ম আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এদেরকে আশ্রয় ক'রেই পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভিন্ন বিভাগগুলি দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছে। প্রত্যেক বিজ্ঞানের প্রত্যেক নিয়মই প্রাকৃত ঘটনার অন্তর্গত পরিবর্ত্তনশীল রাশিসমূহের (চাপ, আয়তন, উষ্ণতা, দেশ, কাল, বস্তু, বল, শক্তি প্রভৃতির) মধ্যে এক একটি বিশিষ্ট ধরণের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ ক'রে থাকে। কেপলার বা নিউটন আবিষ্কৃত গ্রহ-নক্ষত্রাদির ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্পর্কীয় নিয়মই হোক কিম্বা ফুরিয়ারের তাপ-সঞ্চালন এবং ওমের তড়িৎ-সঞ্চালন সম্পর্কীয় নিয়মই হোক, অথবা ফ্যারাডের তড়িৎ-বিশ্লেষণ (Electrolysis) এবং তাড়িত-চৌম্বক-প্রভবন (Electro-Magnetic Induction) সম্বন্ধীয় নিয়মই হোক্, প্রত্যেক নিয়ম সম্পর্কেই আবিষ্কারকের লক্ষ্য হচ্ছে এইরূপ একটা প্রশ্নের উত্তর দান—যখন অমুক ব্যাপারটা ঘটে, তখন পরিবর্ত্তনশীল রাশিগুলি পরস্পরের মধ্যে কোন্ ধরণের সম্বন্ধ বজায় রেখে ব্যাপারটাকে ঘটতে দেয়?

কেপ্‌লারের নিয়ম জানিয়ে দেয় যে, গ্রহগণের সূর্য্য-প্রদক্ষিণ ব্যাপারে সূর্য্য থেকে ওদের দূরত্ব এবং ওদের প্রদক্ষিণ-কাল ভিন্ন ভিন্ন হলেও ঐ সকল দূরত্ব ও ঐ সকল প্রদক্ষিণ-কালের মধ্যে একটা বিশিষ্ট সম্বন্ধ বজায় রেখে—দূরত্বগুলির ঘনফল এবং প্রদক্ষিণ-কালগুলির বর্গ পরস্পরের সমানুপাতিক এই সম্বন্ধ বজায় রেখে—প্রদক্ষিণ-কার্য্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। নিউটনের মহাকর্ষের নিয়ম থেকে আমরা জানতে পাই যে, গ্রহগণ সূর্য্যকে কেপ্‌লারের নিয়ম অনুসারে প্রদক্ষিণ করতে বাধ্য হয় এই জন্য যে, ঐ গ্রহপতি ওদের ওপর স্বীয়াভিমুখে এমন এক একটা আকর্ষণ-বল—যা'কে বলা যায় মহাকর্ষণ-বল—(Force of Gravitation) প্রয়োগ করেন, যার সঙ্গে এবং গ্রহগণের দূরত্বের সঙ্গে একটা পরিমাণগত সম্বন্ধ—ঐ সকল বল ও ঐ সকল দূরত্বের বর্গ পরস্পরের বিপরীতানুপাতিক, এই সম্বন্ধ—বিদ্যমান; সুতরাং যা' (কেপ্‌লারের নিয়মের তুলনায় অধিকতর মূল নিয়ম ব'লে) বিশিষ্ট মর্য্যাদা দাবি করে, এবং আরো বিশেষ ক'রে দাবি করে এই জন্য যে, এই নিয়ম কেবল গ্রহগণের ভ্রমণ-প্রণালীই নয়, পরন্তু গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা, ধূমকেতু বা উল্কা-পিণ্ড জাতীয় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জড়দ্রব্যের গতিবিধির ব্যাখ্যাদানেই সমভাবে প্রযোজ্য। ফুরিয়ারের নিয়ম আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ তাপ যখন পদার্থের গরম জায়গা থেকে ঠাণ্ডা জায়গার দিকে প্রবাহিত হতে থাকে, তখন প্রবাহের মাত্রাটা প্রত্যেক স্থানেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে সেখানকার উষ্ণতা-প্রবণতা (Temperature-Gradient) দ্বারা অর্থাৎ ঠাণ্ডা জায়গার দিকে একটুখানি স'রে যেতেই উষ্ণতা প্রতি ধাপে কতটুকু ক'রে কমে যায় তার দ্বারা এবং এই রাশি দু'টার (প্রবাহের মাত্রা ও উষ্ণতা-প্রবণতার) মধ্যে সমানুপাতের সম্বন্ধ বজায় রেখে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। এইরূপ প্রত্যেক ব্যাপারেই আমরা একটা না একটা সম্বন্ধের অস্তিত্ব খুঁজি। যেখানেই পরিবর্ত্তনশীল রাশিসমূহের মধ্যে এইরূপ পরস্পর-মুখাপেক্ষিতা, সেখানেই নিয়মের অস্তিত্ব এবং প্রত্যেক স্থলেই আবিষ্কারকের লক্ষ্য হবে ওদের পরস্পরের অন্তর্গত সম্বন্ধটাকে একটা সূত্ররূপে বা একটা রেখা-চিত্রের আকারে মূর্ত্তিদান। এর সোজাসুজি এবং সাধারণ পদ্ধতি আমরা দেখলাম পরীক্ষা ও পরিমাপ। এ ছাড়াও ক্ষেত্রভেদে অন্যান্য যে সকল পদ্ধতি অবলম্বিত হয়ে থাকে অতঃপর সে সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করবো। মূলতঃ ঐ সকল প্রণালী এই সাধারণ পদ্ধতিরই অন্তর্গত এবং অল্পবিস্তর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল, তবু বৈশিষ্ট্য-নির্দ্দেশের জন্য ওদের পৃথক্ আলোচনারও গুরুত্ব রয়েছে। যা' বলা হলো তা'র থেকে এও প্রতিপন্ন হবে যে, প্রকৃতিতে খেয়ালখুশি আছে কি নেই কিম্বা নিয়মের পেছনে মঙ্গল বা অমঙ্গলজনক কোন উদ্দেশ্য রয়েছে কি না এবং থাকলে তা' কার মুখ তাকিয়ে চলে, তা' নিঃসন্দেহে বলা যায় না। নিশ্চয় ক'রে যা' বলা যেতে পারে তা' হচ্ছে এই যে, যখন যে আকারেই প্রাকৃতিক নিয়ম আমাদের কাছে উপস্থিত হোক্ না কেন, তা' মেনে চলতে আমরা বাধ্য সুতরাং প্রকৃতির অংশ ও দ্রষ্টারূপে আমাদের সব চেয়ে বড় কাজ হবে ঐ সকলের আবিষ্কার

[ক্রমশঃ

গ্রহের ফের (গল্প)

শ্রীশান্তি দেবী

এই পৃথিবীর সব সুখ হ'তে বঞ্চিত হতেই যেন আমি জন্মেছিলুম। শিশুকালেই মা বাবাকে হারালুম। এক নিঃসন্তান কাকীমা তাঁর অন্তরের সঞ্চিত সবটুকু স্নেহ দিয়ে আমায় গ্রহণ করে নিলেন। কিন্তু তিনিও আমায় ছেড়ে চলে গেলেন, তখন আমার বয়স মাত্র সতেরো। জীবনে আমি একা থাকবার জন্যই যেন জন্মেছিলুম। স্নেহাতুরা কাকীমার শোকে আমি দু'চোখে অন্ধকার দেখলুম। পৃথিবীর রুক্ষ বাস্তবতার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হল আমার।

এই বয়সেই ভাবতে হবে নিজের কথা নিজেকে। আমি কাজের জন্য অনেক জায়গায় দরখাস্ত করলাম। তারপর এক আপিসে আমার একটা কাজ জুটল। যন্ত্রচালিতের মত নিরানন্দ দিনগুলো কোনরকমে কেটে যাচ্ছিল। এমন সময় দেখা হোল ওয়ালটারের সাথে। আবার মনে হোল এই পৃথিবী কতো সুন্দর—এ জগতে বেঁচে থাকার মত আনন্দ বুঝি আর নেই। জীবনটাকে আর অর্থহীন বলে মনে হোল না আমার। ওয়ালটার আমার হৃদয়ে ছুঁইয়ে দিলে জীয়ন-কাঠির মধুর স্পর্শ !

আমাদের বিয়ের পরে ওয়ালটার সহরের একেবারে শেষ প্রান্তে ছোট্ট একখানা বাড়ী কিনলে। বিয়ের প্রথম বছরটা আমি আপিসের কাজ করেছি—কিন্তু দ্বিতীয় বছরে এলো আমাদের নতুন ছোট্ট অতিথি রুথ, তার সোনালী চুল আর বাদামী চোখদুটি নিয়ে। কাজেই আমাকে কাজ ছাড়তে হলো। রুথকে নিয়ে আমাদের সুখের নীড় আনন্দে ভরে উঠল। সেদিনকার অনাবিল আনন্দের দিনগুলো মনে হলে আজও হৃদয়টা কেমন যেন বার বার কেঁপে উঠে। স্বামী ওয়ালটার আর কন্যা রুথ—এই দুইটি প্রাণীর ভিতর যেন জগতের সব সৌন্দর্য্য আর মায়া এসে আশ্রয় করেছিল। আমি তাদের ভিতর নিজেকে একেবারে নিঃশেষে ঢেলে দিলুম—এত সুখ, এত আনন্দ! স্বপ্নময় মধুর আবেশে কত আরামে চোখ বুজে ছিলুম, আর বিধাতা তখন নিষ্ঠুর হাসি হেসে আমার ভাগ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন !

ওয়ালটার একদিন আমায় বললে, আপিসের কাজের জন্যে তাকে একবার সহরতলীতে যেতে হবে, ফিরে আসতে দিন দুই দেরী হবে। বিয়ের পরে তাকে ছেড়ে একদিনও থাকি নি, দুদিন সে থাকবে না শুনে অজানিতে হঠাৎ আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওয়ালটার আমার ব্যথিত মুখের দিকে চেয়ে বললে: ও কি? অত মন খারাপ করছ কেন? দুটো দিন বই ত নয়, আচ্ছা একটা রাত তুমি একলা থাক, পরশু রাত্রের শেষ ট্রেণে নিশ্চয়ই আমি ফিরে আসব।

ট্রেণ ছেড়ে দিলে—ওয়ালটার জানলা দিয়ে তার হাসি ভরা মুখখানা বের করে যতক্ষণ আমাদের দেখা যায়, রুমাল নাড়তে লাগল। আমার কোলে ছিল রুথ—সে তার ছোট্ট হাতখানা নেড়ে ওয়ালটারকে বিদায় জানালে। আমি শুধু চেয়ে রইলুম—চলন্ত গাড়ীর মাঝে একখানি সহাস্য মুখের দিকে। আস্তে আস্তে গাড়ী চলে গেল—ওয়ালটারকে আর দেখা গেল না। আমার চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল এল—অশান্ত মনকে প্রবোধ দিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম, একটা আশ্চর্য্য শূন্যতা বুকটাকে যেন ঘিরে বসল।

ঠিক ছিল একদিন রাত্রে প্রতিবেশিনী মিস এ্যালেন এসে আমাদের বাড়ীতে শোবেন। পরের দিন সন্ধ্যেবেলা ভারী নির্জ্জন লাগছিল আমার। এ্যালেন আমার মনকে প্রফুল্ল করবার জন্যেই বললেন: চল, একবার সিনেমায় ঘুরে আসি। এ্যালেনের কথায় তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলুম, তবু ত বায়োস্কোপের ছবি দেখে মনটাকে ভুলিয়ে রাখা যাবে।

প্রায় দশটার সময় আমরা বাসায় ফিরে এলুম। নীচের ঘরগুলো আমি তালা বন্ধ করে উপরে উঠে এলুম। রুথ দু'এক মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। আমার কিন্তু ঘুম এলো না। মিস এ্যালেনকে বললুম: আমার বড়দিনের উপহার দেখবে? তারপর শোবার ঘরে আসতেই দেখলুম—মাঝের দরজাটা খোলা। আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। বললুম: এ কি? এই দরজাটা ত আমি বন্ধ করে গিয়েছিলুম। এ্যালেন বললে: বোধ হয় হাওয়াতেই খুলে গেছে। এ নিয়ে আর কিছু যে ভাবতে হবে—সেটা ভাবিনি তখন।

ড্রয়ার খুলে এ্যালেনকে উপহার দেখাচ্ছিলুম। একটা গোলাপী রংএর রাত্রের পোষাক দিয়েছিল ওয়ালটার আমাকে। মিস এ্যালেন সেই পোষাকটা তুলে ধরে বললে: বাঃ কি চমৎকার! এটা একবার পরবে ভাই? বেশ মানাবে কিন্তু তোমাকে! আমি পোষাকটা পরে ছোট মেয়ের মত ঘরময় নাচের ভঙ্গীতে একবার ঘুরে বললুম: বাঃ বাঃ এ গোলাপী পোষাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে আমায়। মিস এ্যালেন হেসে বললে: সত্যি! ঠাট্টা নয়—তোমাকে ভারী মিষ্টি দেখাচ্ছে! পরিহাসে, কথায় মনটা একটু হাল্কা হয়েছিল—হঠাৎ আবার মনে হোল ওয়ালটার আসে নি এখনও, এ্যালেনকে বললুম: ভাই ওয়ালটার আজ রাত্রের ট্রেণে আসবে বলেছিল—সে যেন নিরাপদে এসে পৌছায়। তার সঙ্গে কিছু টাকাপয়সা থাকবে কি না, তাই ভাবনা হচ্ছে। এ্যালেন বললে: ভগবান যেন তাকে নিরাপদে রাখেন। আমি বললুম: শেষ ট্রেণে এলে সাড়ে বারোটার মধ্যে এসে পৌছুবে সে।

এ্যালেন পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আমি জানলা খুলে একবার বাইরের দিকে চেয়ে দেখলুম—চাঁদের ম্লান আলো

ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর বুকে। একটা থমথমে নিস্তব্ধ ভাব বিরাজ করছে চারদিকে। সাদা বরফ ঝরছে। সেই রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে সাদা বরফ ঝরা ম্লান চাঁদনী রাত্রে কি যেন গভীর বেদনার ছায়া! প্রকৃতির সব সৌন্দর্য্য যেন আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কেবল কুয়াসাচ্ছন্ন আকাশ ঢেকে রেখেছে পৃথিবীর সুষমা! একটা উদাস-করা ঠাণ্ডা হাওয়া আমার শরীরটাকে রোমাঞ্চিত করে তুলল, তাড়াতাড়ি জান্‌লা বন্ধ করে আমি শুয়ে পড়লুম বিছানায়।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গল সদরের কড়া নাড়ার শব্দে! হঠাৎ বুকের ভিতর আমার যেন মোচড় দিয়ে উঠল—ওয়ালটার আসেনি ত কাল রাত্রে! বিছানা ছেড়ে জান্‌লা খুলে ডাক দিলুম, "কে?" নীচ থেকে আমাদের দুধওয়ালা বললে, আপনাদের বাড়ীর পিছনের দরজা একেবারে খোলা! ব্যাপার কি? আমি আর এ্যালেন তাড়াতাড়ি কাপড় জামা পরে নীচে নেমে গেলুম। নীচের প্রায় সব দরজাই খোলা, অথচ সবগুলি দরজাই আমরা কাল রাত্রে বন্ধ করে গিয়েছিলুম। এ্যালেন বল্‌লে, কাল রাত্রে বোধ হয় আমরা যখন সিনেমায় ছিলুম তখন কেউ ঘরে ঢুকেছিল, আবার আমরা ঘুমিয়ে পড়তে দরজা খুলে বেরিয়ে গেছে। ভয়ে আমার গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এসেছিল, আস্তে আস্তে বললুম, ঠিক তাই।

এমন সময় দুধওয়ালা এসে পাংশু মুখে সেখানে দাঁড়ালে, তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে। আমি আমার সমস্ত শক্তি একত্র করে বল্‌লুম, বল কি হয়েছে, শীগ্‌গির বল। দুধওয়ালা বল্‌লে, গ্যারেজের সামনে মিঃ ইভান্‌স্ ওয়ালটার পড়ে আছেন! আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, বেঁচে আছেন ত? দুধওয়ালা আস্তে আস্তে মাথা নাড়লে। এ্যালেন আমায় জড়িয়ে ধরলে, আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, ওয়ালটার! ওয়ালটার! রুথ-রুথ! তৃতীয়বার পৃথিবীতে আবার আমি নিঃসহায় হলুম।

দিন যায়! ওয়ালটারের অভাবে দিন ত আর বসে থাকে না! আবার কাজ নিতে হোল আপিসে। প্রথমে ইচ্ছে হয়েছিল আত্মহত্যা করব, ওয়ালটারকে ছেড়ে পারব না একদিনও পৃথিবীতে থাকতে। কিন্তু রুথের কচি মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুই করতে পারলুম না! আমার বাড়ীর নীচের দুটো ঘর ভাড়া দেব বলে মনে করে একদিন কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিলুম, দু' একদিন পরেই একজন আধ-বয়সী ভদ্রলোক আমার ঘরগুলো দেখতে এলো। আমার চোখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই ভদ্রলোক হঠাৎ অস্বাভাবিক ভাবে চমকে উঠ্‌লো, কিন্তু বেশ সপ্রতিভভাবে সে নিজেকে সামলিয়ে নিলে। ঘরদুটো পছন্দ করে অগ্রিম ভাড়া দিয়ে চলে গেলো। টাকা আমার একান্ত প্রয়োজন, তাই মিঃ হল্‌টন্‌কে খুব পছন্দ না হলেও বাড়ী ভাড়ার উদ্বৃত্ত টাকা কয়টা ঘরে আসবে ভেবে আমি খুশী না হয়ে পারলুম না।

প্রথম প্রথম মিঃ হল্‌টন্ আমাদের কাছ থেকে বেশ দূরে দূরেই থাকতো। কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করতে লাগলো। রুথকে সে ভাল ভাল উপহার দিয়ে বশ করতে চেষ্টা করতে লাগলো, কিন্তু আমার মেয়ে রুথ কিছুতেই মিঃ হল্‌টনের কাছে যেত না—একদিন সে আমায় বল্‌লে, মা, মিঃ হল্‌টন্‌কে তোমার ভাল লাগে? আমার একটুও ভাল লাগে না! কেন জানিনে। মিঃ হল্‌টন্‌কে আমিও ভাল চোখে দেখতে পারিনি একদিনও কিন্তু তার ব্যবহারেও কোনদিন কোন অভদ্রতা চোখে পড়ে নি! আস্তে আস্তে আমার বিমুখ মনকে আমি অনেকখানি সংযত করে এনেছি। মিঃ হল্‌টন্ মাঝে মাঝে রুথের জন্য চকলেট খেল্‌না নিয়ে আসে, আমার সঙ্গেও ভদ্রভাবে কথা বলে। কিন্তু যতই সে আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার চেষ্টায় থাকতো আমি ততই সতর্ক ভাবে তাকে এড়িয়ে চলতুম।

তখন আগষ্ট মাস। বেশ গরম পড়েছে, রুথকে বিছানায় শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে আমি জান্‌লার গোড়ায় এসে বসলুম! পুরোণ স্মৃতি আমার মনকে চঞ্চল করে তুলল। সেই নিস্তব্ধ ম্লান চাঁদের আলোয়— মনে পড়ে গেল ওয়ালটারের হীম-শীতল কাতর মুখখানা, কোন নিষ্ঠুর তার মাথায় এমন নির্ম্মম ভাবে আঘাত করেছিল কে জানে? পথের ধুলায় পড়েছিল তা'র দেহ, না জানি কত কষ্টে কত ব্যথায় তার শেষ নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল!

হঠাৎ মনে হোল ওয়ালটার যদি আজ এখনই আসে! নিজের হাতে যে মানুষকে বিদায় করে দিয়েছি, তাকে আবার ফিরে পাওয়ার কল্পনা করতে পারার মধ্যেও একটা আনন্দ আছে! ভারী গরম ছিল দিনটা, আমি উঠে কাপড় জামা খুলে ড্রয়ারের সামনে দাঁড়াতেই আমার সেই গোলাপী রং-এর রাত্তিরের গাউনটার কথা মনে পড়ল। ড্রয়ার টেনে বের করলুম সেই গাউনটা! মনে পড়ে গেল সেই গোলাপী গাউনটা পরে আমি যখন কৌতুক-উচ্ছল, তখন ওয়ালটারের মৃত্যুদূত অপেক্ষা করেছিল আমারই ঘরে। আমি যদি তাকে দেখতে পেতাম তখনই, তবে ত আর এ অঘটন ঘটত না!

কত কথা যে মনে হতে লাগল তখন। বার বার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল আমার, চোখ মুছে স্থির হয়ে বসে ভাবতে লাগলুম আবার। নিজের অজ্ঞাতসারে একটা অদ্ভুত ইচ্ছা জাগল মনে ঐ গাউনটা পরবার জন্যে। গাউনটা পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছি, ওয়ালটার ত একদিনও এই গাউনটা পরতে দেখেনি আমাকে। আজ যদি সে থাকত। এমন সময় হঠাৎ দরজার গোড়ায় কে বল্‌লে, বাঃ, বাঃ, এই গোলাপী পোষাকটায় কি সুন্দর দেখাচ্ছে

তোমাকে। লাটিমের মত ঘুরে দাঁড়ালুম আমি! কে? খোলা দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে মিঃ হল্টন; তার ছোট ছোট কাল চোখের পৈশাচিক তীব্রতা আমায় যেন দগ্ধ করতে লাগল! আমার ভিতরে প্রত্যেকটা রক্তবিন্দু যেন জমে গেছে। পাথরের মূর্ত্তির মত আমি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম, যে কথা এক্‌নি মিঃ হল্টন বল্‌লে, ঠিক এই কথাই ত আমি সেদিন রাত্রে উচ্চারণ করেছিলুম, তবে? তবে কি এ-ই আমার পৃথিবীর একমাত্র শেষ আশ্রয়—আমায় প্রিয় স্বামীর হত্যাকারী? হল্টন যদি সেই রাত্রে আমার মুখ হতে এ কথা না শুনে থাকে, তবে কি করে ঠিক সেই কথাগুলো আজ তার মুখ থেকে উচ্চারিত হল? আমাকে নীরব দেখে সেই দুরাত্মা এগিয়ে এল আমার আরও কাছে! একবার ইচ্ছে হোল ড্রয়ার টেনে রিভলভারটা বের করে এখনই হত্যাকারীর উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে দিই! কিন্তু এক মুহূর্ত্তে নিজেকে শান্ত করে নিলুম আমি—ঘুমন্ত রুথের কচি মুখের দিকে চেয়ে!

হল্টন আমার পাশে এসে দাঁড়াল, মিসেস ইভান্‌স্‌, তুমি আমায় এত এড়িয়ে চল কেন, বল দেখি? তুমি কি কিছুই বোঝ না? এত নিষ্ঠুর তুমি? আমার সমস্ত রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল ওকে হত্যা করার জন্যে, কিন্তু তাতে ত লাভ হবে না কিছুই, বেচারা রুথ শুধু তার মাকে হারাবে। হল্টনের হাত এগিয়ে এল আমার দিকে, বিদ্যুৎবেগে আমি সরে গেলুম পিছনে, নিজেকে যথাসাধ্য সংযত করে বিছানার দিকে তাকিয়ে বল্‌লুম, মিঃ হল্টন, আজ আর কথা নয়—রুথ জেগে উঠলে কাঁদবে। তোমার সঙ্গে পরে কথা হবে। রুথ বিছানায় পাশ ফিরে আবার শান্তভাবে ঘুমোতে লাগল। মিঃ হল্টন সেদিন আর কিছু বল্‌লে না। মনে মনে সে খুসী হয়ে যেন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ দরজায় খিল দিয়ে আমি শুয়ে পড়লুম, আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা আমার ছিল না, পা দুটো থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল। এই সেই খুনী, আর কেউ নয়! পুলিশ যে কাজে অসমর্থ হয়েছে, আজ সে কাজ আমি করব! এই সেই হত্যাকারী—যে আমার রুথকে শিশুবয়সে পিতৃহীন করেছে আর আমার জীবনকে ব্যথাতুর নিঃসঙ্গ করে দিয়েছে।

কিন্তু কি করে তাকে শাস্তি দেওয়া যায়? তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত কোন প্রমাণ ত নেই? সারা রাত কত অদ্ভুত অভাবনীয় চিন্তায় কেটে গেল! তার পর দিন যতক্ষণ পর্যন্ত হল্টন বাড়ী থেকে বেরিয়ে না গেল, ততক্ষণ আমি আমার ঘরের দরজা বন্ধ রেখে দিলাম। বেরিয়ে যেতেই আমি একরকম ছুটে তার ঘরগুলো দেখবার জন্য গেলাম! যদি কোন প্রমাণ পাই তার বিরুদ্ধে!

তার সুটকেস্ ছুটোর সব জিনিষ ঢেলে ফেল্‌লুম মাটীতে, একটা ছোট কাগজের বাক্সে নেকড়া দিয়ে জড়ানো আমার স্বামীর রিষ্ট ওয়াচটা আমার বিস্ফারিত চোখের সামনে কঠিন পরিহাসের মত দেখাতে লাগল। ঘড়িটাকে টেনে বাক্স থেকে বের করতেই একটা আংটি গড়িয়ে পড়ল মাটীতে! এই ত সেই আংটি—জীবনের শুভমুহূর্ত্তে যেদিন পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য্য ও আনন্দ আমায় ঘিরে রেখেছিল, সেই মধুময় দিনে যে আংটি পরিয়ে দিয়েছিলুম ওয়ালটারের হাতে!

অশ্রুর বন্যা নামল দু'চোখে! হায়! যে ঘরে ওয়ালটার থাকবার কথা, আজ সেই ঘরে বাস করছে তার হত্যাকারী? চোখের জল মুছে আমি উঠে দাঁড়ালুম! কাঁদবার সময় নেই, অনেক কাজ সামনে! হল্টনের ঘরের জিনিষ যেখানে যা ছিল, গুছিয়ে রেখে আমি তৎক্ষণাৎ পুলিশ আপিসে ছুটলুম।

আমার গল্প শুনে পুলিশ অফিসার অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তিনি বল্‌লেন, চমৎকার! আপনার বুদ্ধি প্রসংশনীয়! আমরা ঠিক ছটার মধ্যে আপনার বাড়ী যাব। হল্টন ছটার মধ্যে বাড়ী আসে আমি তা বলেছিলুম।

হল্টন এসে ঘরে ঢুকতেই আমি গিয়ে বল্‌লুম, মিঃ হল্টন, আপনার সঙ্গে দুজন ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন! মিঃ হল্টন বৈঠকখানায় এসে পুলিশ অফিসার দেখে একটু চমকে উঠল যেন, বল্‌লে—এর মানে কি? অফিসার বল্‌লেন, মানে আর কি? এই আপনার ঘরটা আমরা একবার দেখতে এসেছি। যখন তার বাক্স খুলে আংটি আর ঘড়ি বের করা হোল, তখন হলটন একবার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল চারদিকে, কিন্তু পালাবার রাস্তা ছিল না তার, একজন অফিসারের কঠিন মুষ্টি তখন সজোরে চেপে রয়েছে তার হাত দুটি। একজন অফিসার বল্‌লেন, এই আংটি আর ঘড়ি চিনতে পারছেন মিসেস্ ইভ্যান্‌স্? আমি হল্টনের অদ্ভুত চোখের দিকে স্থির তীব্র দৃষ্টি রেখে বল্‌লুম, হ্যাঁ, এই ঘড়ি আর আংটি আমার স্বামী ওয়ালটারের।

হলটন্ চেঁচিয়ে বল্‌লে, "এ গুলো আমি চিকাগোতে পেয়েছি।" একজন অফিসার বল্‌লে, "হ্যাঁ, মিঃ ইভান্‌সের মৃতদেহ থেকে পেয়েছ বটে।" হলটন খুব রাগ দেখিয়ে বল্‌লে, "কক্ষনো না—মিথ্যাবাদী কোথাকার। কিন্তু এতে তো আর আমাকে তোমরা দোষী প্রমাণ করতে পারবে না। প্রধান অফিসারের সাথে আমার দৃষ্টি বিনিময় হতেই আমি দেয়ালে পিঠ দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌লুম, "আমি প্রমাণ করে দিতে পারি, যে রাত্রে আমার স্বামীকে হত্যা করা হয়, সেদিন তুমি এই ঘরে ছিলে।" হলটন্ আমার স্থির চোখের দৃষ্টি হতে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বল্‌লে, "বেশ ত প্রমাণ করুন।" আমি বল্‌লুম, "বাঃ বাঃ এই গোলাপী পোষাকে আমাকে কি

সুন্দর দেখাচ্ছে!" হল্‌টন বেত্রাহতের মত পিছিয়ে গেল—তার মুখ সাদা ছাই-এর মত হয়ে গেল। আমি বল্লুম, "এই কথাগুলো তুমি আমারই মুখে সেই রাত্রে শুনেছিলে—আর গেলো রাত্তিরে সেই কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে তুমি উচ্চারণ করেছ। আমার সেই কথাগুলো মিস্ এ্যালেন আর তুমি ছাড়া আর কেউ শোনেনি।" আমার চোখ হ'তে আগুনের হল্কা বেরিয়ে আসতে লাগল। হল্‌টন্ কি বল্‌তে চেষ্টা করলে, একটা অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে এল তার মুখ হ'তে! তারপর সে জান্‌লা দিয়ে লাফিয়ে পালাতে চেষ্টা করলে। কিন্তু তখন তাকে দু'জনে দু'দিক হ'তে চেপে ধরেছে। হল্‌টনের হাতে হাতকড়া পড়ল। পরের দিন পুলিশের প্রধান কর্ম্মচারী আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি বল্লেন, "হল্‌টন তার দোষ স্বীকার করেছে। আপনারা সেদিন সিনেমা থেকে ফিরে আসার কতক্ষণ আগে সে জানলা দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকেছিলো, আপনাদের পায়ের শব্দ শুনে সে তাড়াতাড়ি খাটের নীচে লুকিয়েছিল। আপনারই মুখে সে শুন্‌তে পায় যে ওয়ালটার সাড়ে বারোটার সময় টাকা পয়সা নিয়ে ফিরবে। তারপর সকলে ঘুমিয়ে পড়ার পর সে গ্যারেজের সামনে গিয়ে অপেক্ষা করে। ওয়ালটার ফিরার পর হল্‌টন্ পিছন হ'তে তাকে মাথায় আঘাত করে। হল্‌টন্ এখন খুব দুঃখ করে বল্‌ছে যে, তার সত্যই ওয়ালটারকে মেরে ফেলবার ইচ্ছা ছিল না, তার ইচ্ছে ছিল ওঁকে অজ্ঞান করে তার টাকাগুলো নিয়ে নেওয়া! ওয়ালটারের কাছে দুই হাজার টাকা ছিল। হল্‌টন্ সেই টাকা দিয়ে এখন ব্যবসা করছে। তারপরের ঘটনা আপনি জানেন।"

আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছিলুম ওঁর কথা। অফিসারটি একটু হেসে বল্লেন, "জানেন? হল্‌টন্ এখন দুঃখ করছে, বল্‌ছে, "আমি য'দ বোকার মত কাল মিসেস্ ইভান্‌সকে গোলাপী পোষাকের কথা না বল্‌তুম্, তবে কারও সাধ্যি ছিল না আমায় সন্দেহ করে।—কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর অফিসারটি চলে গেলেন।

আমি একলা বসে আবার ভাবতে লাগলুম। ভগবানের কি অদ্ভুত বিধান। আজ যে আমার স্বামীর হত্যাকারী এভাবে ধরা পড়ল—এ কি হল্‌টনের বোকামীর জন্যে—না কোন অদৃশ্য মহাশক্তির ইচ্ছায়? মানুষের ইচ্ছার উপরে ভগবানের যে ইচ্ছা আছে তার বিরুদ্ধে কা'রও কিছু নালিশ পৌঁছায় না, নইলে কেনই বা আমি হারাব এভাবে ওয়ালটারকে? বাইরে আকাশে ঘন কালো মেঘ জমেছে—জানালা খুলে তাকিয়ে দেখলুম—পৃথিবী আজ তার পুঞ্জীভূত বেদনারাশি নিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে আছে—আমার দু'চোখে নেমে এল অশ্রুর বন্যা—ততক্ষণে বৃষ্টি নাম্‌ল বাইরে ঝর্ ঝর করে।*

* এ'টি বিদেশী গল্পের মর্ম্মানুবাদ।

দেশের অবস্থা ও আমাদের কথা

......শুধু যে গভর্ণমেণ্টই তাঁহাদের রিপোর্টে ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর ক্রমিক উন্নতির কথা লিখিয়া থাকেন, তাহা নহে, আমাদের দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, দার্শনিক, সমাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ এবং সংবাদপত্রওয়ালাগণও প্রায়শঃ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঐ একই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, ষ্টীম-এঞ্জিন, এরোপ্লেন, মোটর গাড়ী, বেতারবার্ত্তা, বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা, সিনেমা, টেলিফোন, ছাপান পুস্তক, স্কুল-কলেজ প্রভৃতি যখন এত সুলভ হইয়া পড়িতেছে, তখন নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর উন্নতি হইতেছে। কিন্তু, ইঁহারা বিস্মৃত হন যে, মানুষ যাহা কিছু চায়, তাহা তাহার অন্ন-বস্ত্রের স্বচ্ছলতা, স্বাবলম্বন, সন্তুষ্টি, স্বাস্থ্য, দীর্ঘ যৌবন এবং দীর্ঘ জীবনের জন্য। হইতে পারে যে, ষ্টীম-এঞ্জিন প্রভৃতি বড় অদ্ভুত জিনিষ এবং তাহাতে অনেক উন্নত মাস্তিষ্কের পরিচয় আছে। কিন্তু, ঐ ষ্টীম-এঞ্জিন প্রভৃতির উন্নতি ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি দেখা যায়, জনসাধারণের অন্ন-বস্ত্রাদির অভাব, পরমুখাপেক্ষিতা, অসন্তুষ্টি, অস্বাস্থ্য অকালমৃত্যু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা হইলে কি যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর উন্নতি হইতেছে?......

—বঙ্গশ্রী, অগ্রহায়ণ—১৩৪৩

সর্প ও সর্পবাদ

শ্রীসুরেশ চন্দ্র ঘোষ

সর্ব্বপ্রকার সর্পই বিষধর, এই সত্য হয় তো অনেকেই অবগত নহেন। যাহাদিগকে আমরা বিষাক্ত বলিয়া মনে করি না, শিকার বা ভক্ষ্যপ্রাণীকে বিষে জর্জ্জরিত করিবার শক্তি তাহাদেরও আছে, ইহা আমরা পর্য্যবেক্ষণ করিলেই জানিতে পারিব। তবে ইহা সত্য যে, এমন কতকগুলি সর্প আছে যাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীকে বিষের সাহায্যে অবশ করিয়া ফেলিয়া গলাধঃকরণ করিতে সমর্থ, বড় বড় প্রাণীকে এইরূপ করিতে পারে না! এই সকল সর্পের বিষে বৃহদাকার প্রাণীদের কোন ক্ষতি হয় না বলিয়া সাধারণ জনগণ ইহাদিগকে বিষবিহীন বলিয়া বিবেচনা করে। সত্য কথা বলিতে গেলে, ইহারাও বিষধর বটে, কিন্তু সেই বিষের মাত্রা বেশী নহে বলিয়া মনুষ্যাদি বৃহদাকার জীব তাহাদের দ্বারা দংষ্ট্র হইলে বিনষ্ট হয় না।

সম্ভবতঃ প্রকৃতি দেবী সর্পকে ভক্ষ্য-বস্তু আহরণে বা গ্রহণে সহায়তা করিবার জন্যই বিষ দিয়াছিলেন, কিন্তু যাহাদের বিষের মাত্রা বেশী তাহারা প্রকৃতির এই অভিপ্রায়কে অতিক্রম করিয়া দেশবাসার বিভীষিকায় পরিণতি পাইয়াছে। কতকগুলি সর্প এমন যে তাহাদের বিষে জর্জ্জরিত হইয়া মনুষ্য এবং অন্যান্য প্রকাণ্ডকায় প্রাণীবা অতি অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইটি মনে রাখা দরকার যে, যাহাদিগকে আমরা অত্যন্ত বিষাক্ত মনে করি, তাহাদের বিষের তীব্রতা বেশী, ইহা সত্য নহে, মাত্রাধিক্যই মনুষ্যাদির মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। যে ভূগর্ভবাসী র‍্যাম্পটেলড্ বা উখার ন্যায় পুচ্ছবিশিষ্ট সিলিবুরা জাতীয় সর্প ভূমিলতা বা কেঁচো খাইয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদের বিষের তীব্রতা গোক্ষুরা সর্পের বিষ অপেক্ষাও অধিক, কিন্তু এই শ্রেণীর সর্প স্বল্প পরিমাণে বিষের অধিকারী বলিয়া কেঁচোর মত অতি নিম্নস্তরের প্রাণী ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও বিষের সহায়তায় বিকল বা বশীভূত করিতে সমর্থ হয় না। সুতীব্র হলাহল থাকা সত্ত্বেও এই সর্প মনুষ্যাদি বৃহদাকার জীবকে দংশন করিলে কোন অনিষ্ট হয় না। মাত্রার স্বল্পতার জন্য সেই সুতীব্র বিষ প্রায়ই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

বিষাক্ত সর্পের সংখ্যা সকল দেশে সমান নহে। যাহাদের বিষ বেশী—তাহারাই বিষাক্ত এবং যাহাদের বিষ অল্প তাহারা বিষবিহীন বলিয়া বিবেচিত—এই সত্য আমরা যেন বিস্মৃত না হই। অষ্ট্রেলিয়ায় অধিকাংশ সর্পই অত্যন্ত বিষাক্ত। বিষবিহীন বা স্বল্পবিষ সর্পের সংখ্যা সেখানে খুবই কম। অন্য দিকে মাদাগাস্কার দ্বীপে এমন একটিও সর্প নাই,যাহাকে আমরা বিষাক্ত বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। এখানে বিষাক্ত বলিতে মনুষ্য এবং অন্যান্য বৃহদাকার জীবের জীবননাশক বিষের কথাই বলা হইতেছে। কাশ্মীরের কোন কোন অংশে সর্প নাই বলিয়া জানা যায়। দক্ষিণাপথের রত্নগিরি এবং তালাইমালাই শৈলমালায় যে সকল সর্প বাস করে তাহাদের দ্বারা কোন অনিষ্ট অনুষ্ঠিত হইবার আশঙ্কা নাই ইহাও শুনা যায়। যাহারা অন্যত্র বিশেষ বিষাক্ত বলিয়া পরিচিত, এই অঞ্চলে তাহারাও নাকি অনপকারী।

একটি ফুর্সা সর্প ইঁদুর ধরিয়াছে

ভারতবর্ষে প্রায় তিনশত প্রকারের সর্প দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে জলচর বা সলিলবাসী সর্পও রহিয়াছে। ভূগর্ভবাসী সর্পদিগের ভিতর চল্লিশ প্রকার বিষাক্ত বা মনুষ্যের পক্ষে অনিষ্টকর সর্প দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই তালিকার ভিতর সমুদ্রচর সর্প ধরা হয় নাই। সমুদ্রচর সর্ব্বপ্রকার সর্পই ভীষণ বিষধর বলিয়া বিবেচিত। ভয়ঙ্কর বিষধর স্থলচর সর্পদিগের মধ্যে দুই প্রকার গোক্ষুর, দ্বাদশপ্রকার চিতা, সাত প্রকার প্রবাল সর্প এবং উনিশ প্রকার ভাইপার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রশ্ন হইতে পারে, ইহাদের প্রত্যেকটি মনুষ্যের মৃত্যু ঘটাইবার মত বিষের অধিকারী বটে কি না? ইহার উত্তরে আমরা বলিব, না। ভারতবর্ষের পাঁচ প্রকার স্থলচর

সর্প একটি পূর্ণবয়স্ক সুস্থ সবল মানুষের মৃত্যু ঘটাইতে সক্ষম। রাজগোক্ষুর (বৈজ্ঞানিক লাটিন নাম নিয়া বুঙ্গারাস), সাধারণ গোক্ষুর (নিয়াটি পুডিয়ান্স), সাধারণ চিতা (বুঙ্গারাস কিরি-উলিয়াস), ফুর্সা বা করাতপুচ্ছ ভাইপার (এবিস কারিনাটি) এবং রাসেলস্ ভাইপার (ভাইপেরা রাসেলিয়াই) ইহারাই মনুষ্যের মৃত্যুকারক বিশেষ বিষধর সেই সর্পপঞ্চক।

ইহারা এই মৃত্যুজনক বিষ মনুষ্যের শরীরে কেমন করিয়া সঞ্চার করে—এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। বিষাক্ত প্রাণী মাত্রেরই শরীরে এক একটি বিষ-সঞ্চারক অঙ্গ বা অস্ত্র বিদ্যমান আছে। বোলতা এবং কাঁকড়াবিছার পুচ্ছের ভিতর একটি করিয়া বিষের থলে ও হুল থাকে। সাধারণ বৃশ্চিক সুতীক্ষ্ণ সাড়াসীর মত এক প্রকার শস্ত্রের সাহায্যে দংশনপূর্ব্বক বিষ সঞ্চারিত করে। কতকগুলি এমন মৎস্য আছে যাহাদের শিরদাঁড়া বিষাক্ত। বিস্ময়ের বিষয়, এখনও অনেকে মনে করিয়া থাকেন, সর্প তাহার জিহ্বার সাহায্যে দংশন করে এবং বিষ ঢালিয়া দেয়। সর্পের সঙ্কীর্ণ, দ্বিধাবিভক্ত জিহ্বার সহিত বিষের কোন সম্পর্ক নাই। জিহ্বা সর্পের স্পর্শেন্দ্রিয় ছাড়া অন্য কিছু নহে। উত্তেজিত হইলেও সর্পেরা জিহ্বা বাহির করিয়া থাকে, ইহা সত্য বটে ; কিন্তু দংশন ব্যাপারের সহিত উহাদের কোনও সম্বন্ধ দেখা যায় না।

প্রকৃতি সর্পকে বিস্ময়কর বিষ-সঞ্চারক অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন। মানুষ এই অস্ত্রকে অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। এই অস্ত্র অনেকটা ডাক্তারদিগের ব্যবহৃত হাইপোডার্ম্মিক সিরিঞ্জের অনুরূপ। এই সিরিঞ্জাকৃতি যন্ত্র বা অঙ্গের ভিতর বিষধর বা বিষ সঞ্চিত রাখিবার একটি গ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থির অভ্যন্তরস্থ বিষ পিস্টনাকৃতি প্রত্যঙ্গের সাহায্যে একটি প্রণালীতে নীত হয়। এই প্রণালীটি একটি শূন্যগর্ভ সূচিবৎ প্রত্যঙ্গের সহিত সংলগ্ন। এই সূচের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগের ছিদ্রপথে বাহির হইয়া বিষদংষ্ট্র ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে। সর্পের বিষ সঞ্চিত রাখিবার আধারস্বরূপ গ্রন্থিটি বৃহৎ। এই গ্রন্থি সর্পের চক্ষুর নীচে ও পশ্চাতে বিরাজিত। কতকগুলি শক্তিশালী পেশী এই গ্রন্থিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং এই পেশীগুলির দ্বারাই গ্রন্থিটি পরিচালিত। পেশীগুলি পিস্টন বা চাপদণ্ডের কাজ করে বলিলে ভুল হয় না। সর্প কোন ব্যক্তিকে দংশন করিবার সময় পেশীগুলি চাপ দিয়া গ্রন্থি হইতে বিষ নির্গত করে। ঐ নির্গত বিষ পূর্ব্বোক্ত প্রণালীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়। প্রণালীটির সহিত সর্পের একটি শূন্যগর্ভ দন্তের সংযোগ রহিয়াছে। ইহাই বিষদন্ত। সর্পবিষ উক্ত প্রণালীর ভিতর দিয়া বহিয়া গিয়া বিষদন্তে প্রবেশ করে এবং পরে বিষদন্তের ছিদ্রপথে দংষ্ট্র প্রাণীর শরীরে সবেগে সঞ্চারিত হয়। সর্পের প্রকৃতি প্রদত্ত বিষপ্রয়োগকারী প্রত্যঙ্গগুলি সত্য সত্যই বিস্ময়কর। এই প্রাকৃতিক হাতিয়ারগুলি এমন ক্ষিপ্রতা ও নৈপুণ্যের সহিত স্বকার্য্য সাধন করে যে প্রাণনাশক বিষ ক্ষতস্থানের ভিতর গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়া সত্বর সর্ব্বশরীরে প্রসারিত হইয়া পড়ে। এই বিষবাহক বা বিষ-সঞ্চারক যন্ত্রপাতিগুলি সকল সর্পের ভিতর সমান বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই, ইহা অবশ্য সত্য। বিভিন্ন সর্পের ভিতর বিকাশের বিভিন্ন অবস্থা আমরা দেখিতে পাই। কতকগুলি সর্পের বিষদন্ত শূন্যগর্ভ নহে। ইহাদের দন্তের সহিত সংলগ্ন একটি গর্ত্ত বা প্রণালী বিষসঞ্চার কার্য্যে সহায়তা করে। এই বিষবাহক গহ্বর বা প্রণালী এত সূক্ষ্ম যে, শক্তিশালী ম্যাগনিফাইং গ্লাস ভিন্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। কোন কোন সর্পের বিষদন্তের গহ্বর খালের ন্যায় আকার ধারণ করিয়াছে। খালের পার্শ্বগুলি একটি স্থানে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া গহ্বরবৎ হইয়াছে। এই গহ্বর দন্তের গাত্রে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। গোক্ষুর এবং চিতার বিষদাঁত শেষোক্ত শ্রেণীর।

ভাইপার জাতীয় সর্পের বিষদাঁত পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে এই সত্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। ইহাদের দাঁত সম্পূর্ণরূপে শূন্যগর্ভ এবং নলাকার। এই দাঁতের গায়ে পূর্ব্বোক্ত গহ্বরের অতি অস্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

রাসেলস্ ভাইপার প্রভৃতি কোন ভাইপার-শ্রেণীর সর্প লইয়া পরীক্ষা করিলে আমরা দেখিতে পাইব ইহাদের বিষ-সম্পর্কীয় যন্ত্র বা অঙ্গগুলি যেরূপ পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে, সর্পের মধ্যে যাহারা ভীষণতম বলিয়া বিবেচিত, সেই কোব্রা বা গোক্ষুরের ঐ সকল অঙ্গগুলি সেরূপ বিকাশলাভ করে নাই। ভাইপার দিগের বিষদন্ত যখন ব্যবহৃত হয় না, তখন কব্জার ন্যায় একপ্রকার প্রত্যঙ্গ ইহাদিগকে আচ্ছাদিত হইতে সাহায্য করে। যেমন তরবারী খাপের ভিতর রক্ষিত রহে, তেমনই একপ্রকার আচ্ছাদনের অভ্যন্তরে এই দন্ত তখন অবস্থান করে। যখন এই জাতীয় সর্প দংশন করিবার জন্য বদন ব্যাদান করে, তখন ইহাদের বিষদন্ত স্বতঃই এই আবরণ হইতে বহির্গত হয়। খাপমুক্ত তরবারীর মতই তখন ইহা সোজা হইয়া দাঁড়ায় এবং বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সহিত স্বকার্য্য সাধনে সমুদ্যত হয়। এই বিষদন্ত কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিনষ্ট হইলে এইরূপ অবস্থার জন্য রক্ষিত অপর বিষদন্ত তাহার স্থান অধিকার করে। এইরূপ অবস্থার জন্য প্রত্যেক ভাইপারের মুখের ভিতর কতকগুলি সূচির ন্যায় সূক্ষ্মাগ্র বিষ-দাঁত অস্ত্রাগারে সঞ্চিত শস্ত্রসমূহের ন্যায় রাখা থাকে। দরকার হইবামাত্র তাহাদের একটি আগাইয়া আসিয়া অক্ষম আহত বা নিহত দাঁতটির স্থান অধিকার করে।

মনুষ্যের বিভীষিকাস্বরূপ পাঁচ প্রকার বিশেষ বিষধর

সর্পের নাম উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। এই সর্প-পঞ্চকের ভিতর রাজগোক্ষুর (কিং কোব্রা বা হামাদ্রায়াদ) সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও ভীষণ-দর্শন। ১৫ ফিট ৫ ইঞ্চি দীর্ঘ রাজগোক্ষুরও দেখা গিয়াছে। আর্দ্রভাবাপন্ন অতি নিবিড় জঙ্গল ইহাদের বাসস্থল। শুষ্ক আবহাওয়ায় বা অনিবিড় বনে ইহারা বাস করে না। আসাম এবং ব্রহ্মদেশের অত্যন্ত গভীর জঙ্গল ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বাসস্থল—এ বিষয়ে সংশয় নাই। দক্ষিণ ভারতের নিবিড় অরণ্যানীতেও ইহারা দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু আসাম, ব্রহ্মেই ইহাদের সংখ্যা সর্ব্বাধিক। অনেকের বিশ্বাস, রাজগোক্ষুর বিনা কারণে চড়াও হইয়া আক্রমণ করিয়া থাকে। কোন প্রাণী ইহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র ইহারা আক্রমণার্থ বেগে আগাইয়া আসে, এইরূপ বিশ্বাস সাধারণের মনে বদ্ধমূল। বিশেষজ্ঞগণ জানেন,—সাধারণের এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নহে। আমাদের বিশ্বাস, কোন সর্পই বিনা কারণে আক্রমণ করে না। মনুষ্য দেখিলে অধিকাংশ রাজগোক্ষুরই পলাইতে চেষ্টা করে এই সত্য সংশয়াতীত। শতকরা ৯৯টি সর্পই এইরূপ করে। রাজ-গোক্ষুর চড়াও হইয়া আক্রমণ করিতে আসে এরূপ দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। কদাচিৎ কখন এইরূপ দেখা যায় বটে, কিন্তু অনুসন্ধান বা পর্য্যবেক্ষণ করিলে ঐরূপ ক্ষেত্রেও জানা যাইতে পারে যে, সর্পটি আক্রান্ত হইবার আশঙ্কাতেই আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। হইতে পারে সর্প ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এই কার্য্য করিতেছে। আসামের চা বাগানে কর্ম্মরত একটি কুলী রমণী একটি রাজগোক্ষুরের দ্বারা আক্রান্ত হইবার ফলে মারা যাওয়ার কাহিনী আমরা জানি। এই হতভাগ্য নারীটি দংশনের আধ ঘণ্টা পরেই মারা গিয়াছিল। তৎকালীন প্রিন্স অফ ওয়েলস (অষ্টম এডওয়ার্ড) নেপাল জঙ্গলে শিকার করিবার সময় এগার ফিট লম্বা একটি রাজগোক্ষুর গুলি করিয়াছিলেন। সাপটি যুবরাজের সম্মুখে মাত্র কয়েকপদ দূরে প্রায় মনুষ্যসমান উচ্চে মাথা তুলিয়া অবস্থান করিতেছিল।

রাজগোক্ষুরের বর্ণ সাধারণতঃ গাঢ় বাদামী বা কৃষ্ণ হইয়া থাকে। কতকগুলির গাত্রে রেখাসমূহ বা চিহ্নসকল দৃষ্ট হইয়া থাকে বটে, কিন্তু লক্ষ্য করিলে জানা যাইবে, সাধারণতঃ তরুণবয়স্ক সাপদের গাত্রেই এইরূপ রেখারাজি বিরাজিত থাকে। সাধারণ গোক্ষুরের ফণা যেরূপ পূর্ণ পরিণত বা সুপ্রশস্ত, রাজগোক্ষুরের সেরূপ নহে। তবে কোন সর্প মনুষ্য সমান উচ্চে মাথা তুলিয়া ফণা প্রসারণপূর্ব্বক অবস্থান করিলে (ঐ সর্পের ফণা তেমন প্রশস্ত না হইলেও) সেই দৃশ্যবিশেষ বিচিত্র, বিস্ময়কর ও ভয়াবহ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। এই দৃশ্য দর্শনে ভীতিতে অভিভূত মানুষ সর্পকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিলে তাঁহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। প্রশ্ন হইতে পারে, ফণা বস্তুটি কি? ফণা সর্পের স্কন্ধদেশের পঞ্জর বা পাঁজরার প্রসারণ হইতে সম্ভূত হয়। এই প্রসারণ শক্তি সকল সর্পের নাই বলিয়া সকলে ফণা তুলিতে পারে না। গোক্ষুরের মধ্যে এই শক্তি বা প্রকৃতি পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

রাজগোক্ষুর অন্যান্য সর্প ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে।

রাসেল্‌স্ ভাইপার

বিষাক্ত বা বিষবিহীন সকলপ্রকার সর্পই ইহারা গলাধঃকরণ করে। নিরপরাধ বা নির্ব্বিষ ঢামন সাপ এবং স্বজাতীয় অন্য কোন বিষধর উভয়কেই সমভাবে ইহারা ভোজ্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। একবার একটী রাজগোক্ষুর ৯ ফিট দীর্ঘ একটি অজগরকে গলাধঃকরণ করিয়াছিল। সাধারণ গোক্ষুর সর্পের সহিত আমরা সকলেই স্বল্পবিস্তর পরিচিত। কেহ কেহ গৃহেই ইহাদের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছেন। কেহ কেহ সাপুড়িয়া বা বেদেদের দ্বারা প্রদর্শিত ক্রীড়ার সময় সাধারণ গোক্ষুরকে ফণা প্রসারণপূর্ব্বক বেদিয়াদিগের দ্বারা ধৃত বস্ত্র-বিশেষে সগর্জ্জনে ছোবল মারিতে দেখিয়াছেন। প্রাচীন জীর্ণ অট্টালিকাগুলির ফাটল এই জাতীয় সর্পের প্রিয় বাসস্থান। মৃত্তিকানির্ম্মিত গৃহের গর্ত্তসমূহকেও ইহারা গৃহরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। অবশ্য সর্প গর্ত্ত প্রস্তুত করে না, মূষিকাদির

দ্বারা প্রস্তুত গর্ত্তে বাস করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইঁদুর ও ভেক ভক্ষণ করিয়া গোক্ষুরগণ জীবন ধারণ করে। তবে সুযোগ পাইলে পাখী ও পাখীর ডিমকেও ইহারা আনন্দে ভোজন করে।

সর্প গোশালায় প্রবেশ করিয়া গাভীর স্তন্য পান করে, এইরূপ বিচিত্র বিশ্বাস শুধু ভারতবর্ষে নয়, ইউরোপেও অনেকে পোষণ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ কহেন, তাঁহারা সর্পকে এইরূপ কার্য্য বা চৌর্য্য করিতে দেখিয়াছেন, কিন্তু আমরা সর্পের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারি ইহা আদৌ সম্ভব নহে। যেরূপ ওষ্ঠ ও জিহ্বা থাকিলে স্তনের বোঁটা চাপিয়া ধরিয়া স্তন্য চুষিয়া খাওয়া সম্ভব হয়, সর্পের সেরূপ পরিচালনীয় ওষ্ঠ ও শূন্যতা সৃষ্টিকারী জিহ্বা আদৌ নাই—এই সত্য সর্ব্বথা স্মরণীয়। সর্পের শক্ত বা দৃঢ় ওষ্ঠ এবং দ্বিধাবিভক্ত রজ্জুবৎ জিহ্বা এইরূপ কার্য্য করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ ই অনুপযোগী।

সকল গোক্ষুরের গাত্রবর্ণ এবং গাত্রস্থ বিচিত্র চিহ্নসমূহ একই প্রকার নহে। বিভিন্নশ্রেণীর গোক্ষুর বিভিন্ন বর্ণ ও চিহ্ন ধারণ করে। সাধারণ গোক্ষুরকে তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। বিভাগগুলিকে উপরিভাগে বিভক্ত করা চলে। এক জাতীয় গোক্ষুরের ফণায় চক্ষুবৎ চিহ্ন বিদ্যমান আছে। আর একজাতীয় গোক্ষুর চক্রচিহ্নবিশিষ্ট ফণা ধারণ করে। এই চক্রচিহ্নের বর্ণ সম্পূর্ণ শ্বেত কিম্বা নবনীতের ন্যায়। অবশিষ্ট শ্রেণীর গোক্ষুর কৃষ্ণকায়। এই কৃষ্ণকায় গোক্ষুরই কেউটে আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে এবং ইহারা অপেক্ষাকৃত ভীষণ এবং অধিক ক্রোধপ্রবণ বলিয়া বিবেচিত হয়। বিশেষ কোন চিহ্ন ইহাদের নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট দেহে দৃষ্ট হয় না। সিন্ধুদেশ, রাজপুতনা, পঞ্জাব প্রভৃতি শুষ্ক আবহাওয়াশালী প্রদেশগুলিতে শেষোক্ত শ্রেণীর গোক্ষুর প্রায়ই লক্ষিত হয়।

গোক্ষুর সর্পগণ স্বভাবতঃ ভীরু—এই সত্য হয় তো অনেককে বিস্মিত করিবে। মানুষ দেখিবামাত্র ইহারা প্রথমেই পলায়নের পথ অনুসন্ধান করে—এ বিষয়ে লেশমাত্রও সংশয় থাকিতে পারে না। যদি পলায়নের পথ সে না পায়, তবেই ফণা তুলিয়া সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে আক্রমণে উদ্যত হয়। পলাইবার সুযোগ দিলে গোক্ষুর অতি শান্তভাবে চক্ষুর অগোচরে অবস্থিত নিরাপদ স্থানে গমন করে। সর্প দূরের কথা, পলায়নের পথ না পাইলে সামান্য ইঁদুরও মরিয়া হইয়া মানুষকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়—এই সত্য আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

গোক্ষুরগণ বর্ষার প্রারম্ভে ডিম্ব প্রসব করে। পরিত্যক্ত বল্মীক বা উই-ঢিপিকে ইহারা প্রায়ই ডিম পাড়িবার স্থানরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। ডিম হইতে সর্পশিশু বাহির হইতে প্রায় দুই মাস সময় লাগে। ডিম্ব হইতে সদ্যঃসম্ভূত গোক্ষুর দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭ ইঞ্চি হইয়া থাকে। জন্মের অতি অল্প সময় পরেই ইহাদের বিষাক্ত প্রকৃতি প্রকট হইয়া পড়ে। বয়স্ক সর্প অপেক্ষা সর্পশিশুর দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা অধিক, এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। যে গাম্ভীর্য্য বা সতর্কতা আমরা বয়স্ক সর্পের মধ্যে দেখিতে পাই, স্বল্পবয়স্ক সর্পের মধ্যে তাহা আদৌ নাই। অত্যন্ত চঞ্চল স্বভাব বলিয়া উত্তেজনার কারণ না থাকিলেও ইহাদের সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে দংশন করা অসম্ভব নয়।

সর্পাঘাতে যে সকল মৃত্যু ভারতবর্ষে ঘটিয়া থাকে, তাহাদের অধিকাংশই ক্রেৎ বা চিতাসাপের কীর্ত্তি এই কথা মিথ্যা নহে। পার্ব্বত্য ও অরণ্য প্রদেশে চিতাসাপের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক এবং ইহারা এমন ভাবে অবস্থান করে যে ইহাদের বিদ্যমানতা সহজে বুঝা যায় না। যে পঞ্চপ্রকার বিষধর সর্পের কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের ভিতর চিতা পারি-পার্শ্বিকের সহিত আপনাকে মিশাইয়া এমনভাবে আত্মগোপন করে যে, মানুষের প্রবঞ্চিত হইবার খুবই সম্ভাবনা থাকে। ধান্যক্ষেত্রে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আগাছার জঙ্গলে ইহারা এমন ভাবে নীরবে অবস্থান করে যে, জানিতে না পারিয়া পথিকের পক্ষে ইহাদের উপর পদার্পণ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় সর্পদষ্ট হইবার সম্ভাবনাই ষোল আনা। আমরা ছোটনাগপুর অঞ্চলে সর্পদংশনের ফলে যত লোককে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াছি, তাহাদের শতকরা ৯৯টি চিতার দ্বারা দষ্ট। সকল ক্ষেত্রেই সর্পগাত্রে অজ্ঞাতসারে পদার্পণের ফলেই এই শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়া থাকে। বাড়ীর ছাদে, এমন কি কড়ি বর্গাতেও চিতা সাপ থাকিতে দেখা যায়। সময়ে সময়ে সুপ্ত ব্যক্তির শয্যার উপর ছাদ হইতে চিতাসাপ পড়িতে দেখা গিয়াছে। পশ্চিমে চিতাসাপকে ক্রেৎ বা করেৎ বলে। চিতা নামটি গাত্রস্থ বিচিত্র চিহ্নচয়ের বার্ত্তাই বিজ্ঞাপিত করিতেছে।

চিতা বা করেৎ সাপের বর্ণকে গাঢ় নীলাভ কৃষ্ণ বলা চলে। মধ্যে মধ্যে শ্বেতবর্ণ চক্রাকার চিহ্ন থাকার জন্যই 'চিতা' এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে। এই চক্রাকার চিহ্নগুলি যুগ্মভাবে অবস্থান করে অর্থাৎ একস্থানে, দুইটী করিয়া থাকে এবং পুচ্ছপ্রদেশে অধিকসংখ্যক থাকিতে দেখা যায়। অনেক সময় একপ্রকার নির্ব্বিষ বা নির্দ্দোষ সর্পকে চিতা বলিয়া মনে করিয়া এই ভীষণ বিষধর সর্পের স্বভাব সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। চিতার সহিত সাদৃশ্যশালী এই নির্দ্দিষ্ট সর্পকে ইংরেজীতে 'উল্‌ফ স্নেক্' বা নেকড়ে সাপ বলা হয়। উহাদের বৈজ্ঞানিক নাম 'লিকোদন আলিকাস।' শুধু বর্ণ ও চিহ্ন দেখিয়া সর্পের জাতি নির্দ্ধারণ করা বিপজ্জনক ব্যাপার। এমন অনেক সাপ আছে যাহারা দেখিতে চিতার ন্যায় কিন্তু

বিষধর নহে। ইহাদিগকেও চিতা ভাবিয়া সকল চিতা বিষধর নহে এইরূপ ধারণা অনেকে পোষণ করেন। চিতা মাত্রই অত্যন্ত বিষাক্ত— এই সত্য কেহ যেন বিস্মৃত না হন। সর্পের গাত্রে একপ্রকার শল্ক বা আঁইস থাকে। বর্ণ বা চিহ্নের দ্বারা সর্পের জাতি নির্দ্ধারণের চেষ্টা না করিয়া শল্কের দ্বারা চেষ্টা করিলে আমরা অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। নেকড়ে সাপের সহিত চিতার পার্থক্য শল্কের দ্বারাই আমরা অবগত হইতে পারিব। নেকড়ে সাপের সমগ্র পৃষ্ঠদেশের শল্কগুলির সকলেই গঠনে এবং আকারে সমান কিন্তু চিতার পৃষ্ঠস্থ শল্কসমূহের সকলগুলি সমান নহে। চিতার পৃষ্ঠপ্রদেশের মধ্যস্থ শল্কশ্রেণীর অন্তর্গত শল্কগুলির আকার অপর অংশের শল্ক অপেক্ষা বৃহত্তর এবং ছয়টি পার্শ্ববিশিষ্ট। অনেকে গোক্ষুরকেই সর্ব্বাপেক্ষা বিষাক্ত বলিয়া মনে করেন কিন্তু কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিব চিতা বিষাক্ততায় গোক্ষুর অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। চিতাও একান্ত ভীরু প্রকৃতির এবং অত্যন্ত উত্তেজিত না হইলে ইহারা কাহাকেও আক্রমণ করে না।

রাসেল্‌স ভাইপারও ভারতবর্ষের নানাস্থানে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। শস্যক্ষেত্রে, পথিপার্শ্বে আগাছার জঙ্গলে ইহারা বাস করে। মানুষের বাসস্থলের নিকটেই ইহারা থাকিতে ভালবাসে; অন্যান্য ভাইপার জাতীয় সর্পের ন্যায় ইহারাও সূর্য্যকর বা রৌদ্র সেবন করিতে ভালবাসে। ইহারা স্বভাবতঃ অত্যন্ত অলস এবং ইহাদের স্বভাবে স্ফূর্ত্তি বা প্রফুল্লতার একান্ত অভাব পরিদৃষ্ট হয়। ইহারা কোনস্থানে একবার অবস্থান করিলে সহজে সে-স্থান ত্যাগ করিতে চায় না। গোক্ষুরাদির ন্যায় মানুষ দেখিলে ইহারা ভীত হইয়া পলায়নের পথ অনুসন্ধান করে না; নির্ব্বিকার যোগি-পুরুষের ন্যায় তদবস্থায় পড়িয়া রহে। ইহারা সাধারণতঃ ইন্দুর খাইয়া জীবন ধারণ করে। এ-বিষয়ে ইহারা মানুষের কল্যাণকারক বলিতে হইবে, কারণ ইঁদুরকুলের দ্বারা মানুষের অত্যন্ত অনিষ্ট অনুষ্ঠিত হয়। আমরা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি যে, বিধাতাপুরুষ বা প্রকৃতিদেবী কোন প্রাণীকেই অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। প্রত্যেক সৃষ্টপ্রাণী স্রষ্টার কোন না কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে।

সরীসৃপ বা সর্পমাত্রই অণ্ডজ বা ডিম্ব হইতে জাত, কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। কোন কোন শ্রেণীর সর্প—বিশেষ অধিকাংশ ভাইপার এবং সকল সমুদ্রচর সর্প ডিমের পরিবর্ত্তে সন্তান প্রসব করে। ইহাদের ডিম নৈসর্গিক নিয়মে দেহের অভ্যন্তরেই ফুটিয়া উঠে। রাসেল্‌স ভাইপার বহু
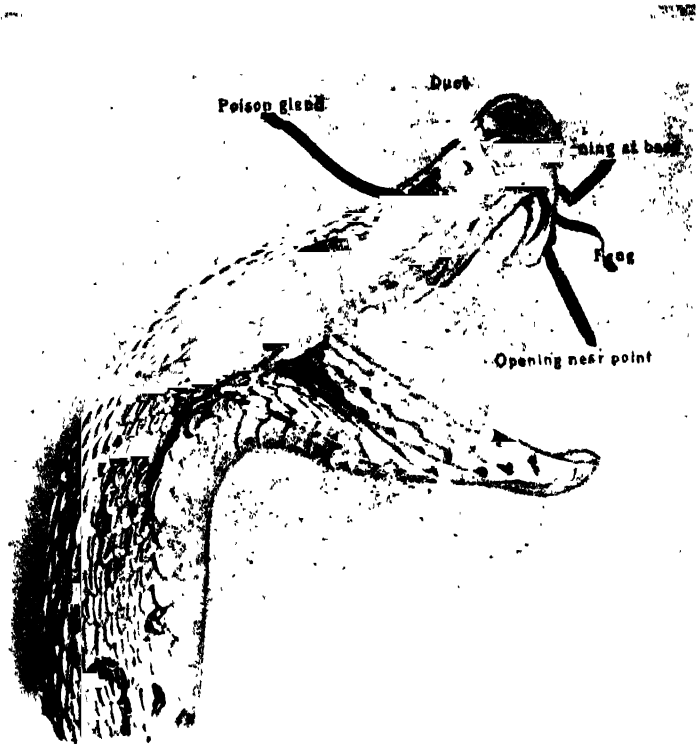
সর্পের বিষ সম্পর্কীয় অঙ্গ বা যন্ত্রগুলি। সর্পটি রাসেল্‌স ভাইপার poison gland=বিষ-গ্রন্থি, duet—বিষ-বাহক নালী, opening at base—তলদেশের ছিদ্র, fang—বিষদন্ত, opening near point—অগ্রভাগের ছিদ্র।

সন্তান প্রসব করে। ৬৩টি সন্তান প্রসবকারী রাসেল্‌স ভাইপার দেখা গিয়াছে। এই সন্তানের সকলগুলিই জীবিত ছিল। এই সকল সর্পশিশু বিষাক্ততায় প্রসূতি অপেক্ষা যৎসামান্য ন্যূন বলিলে ভুল হয় না। রাসেল্‌স্ ভাইপার ৫ ফিট ৬ ইঞ্চি দীর্ঘ হইতে দেখা যায়।

'ফুর্সা' বা করাতের ন্যায় শল্কবিশিষ্ট ভাইপারদিগকে অধিক দীর্ঘ হইতে দেখা যায় না। এক ফুটের বেশী লম্বা ফুর্সা খুব কমই দেখা যায়। ক্ষুদ্রকায় হইলেও ইহাদের

বিষাক্ততা ও রুদ্র প্রকৃতি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই এই জাতীয় সর্প দেখা যায়; তবে শুষ্ক আবহাওয়া বিশিষ্ট প্রদেশগুলিতেই ইহারা অধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। রুক্ষ মরু প্রদেশের বক্ষে লক্ষ লক্ষ ফুর্সা লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সর্পদষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ২০ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভারতবর্ষের কোন কোন অংশে বিশেষ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশই এই শ্রেণীর সর্পাদিগের দ্বারা দষ্ট, অনুসন্ধানের সাহায্যে ইহা জানা যায়। ফুর্সারা মুক্তস্থানে অবস্থান করিয়া রৌদ্র সেবন করিতে বিশেষ ভালবাসে বলিয়া ইহাদের দ্বারা দষ্ট হইবার সম্ভাবনাও অধিক। অনেক সময় বোম্বাই অঞ্চলে বাড়ীর বারান্দায়, সোপানের উপর, অঙ্গনে, পথের পার্শ্বে ফুর্সাদিগকে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। পদ-পিষ্ট হইলে ইহাদের দ্বারা দষ্ট ও বিনষ্ট হওয়া আদৌ অসম্ভব নয়। ভারতবর্ষীয় সর্পসমূহের মধ্যে ফুর্সাই আক্রমণকারী হিসাবে অগ্রগণ্য বলিলে সত্য বলা হয়। সে-হিসাবে গোক্ষুর অপেক্ষাও ইহাদের ভীষণতা বেশী। উত্তেজনার অতি সামান্য কারণ ঘটিলেও ইহাদের দ্বারা আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সংগ্রহশালায় রক্ষিত ফুর্সারা দর্শকদিগকে তাহাদের পিঞ্জরের গরাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে যেরূপে ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করে, তাহাতে বুঝা যায়—মুক্তি পাইলে ইহারা কিরূপ ভাব অবলম্বন করিবে। ইহারা বিদ্যুৎবেগে আক্রমণ করে এবং আক্রমণকালে একপ্রকার বিচিত্র বিশিষ্ট ভঙ্গী অবলম্বন করিয়া থাকে। তখন উহার মস্তকের দ্বারা দেহটিকে আচ্ছাদিত করে এবং দেহটিকে দুইটি ভাঁজে কুণ্ডলী পাকাইয়া একপ্রকার অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়া থাকে। কুণ্ডলীগুলি অবিশ্রান্ত সঞ্চালিত হয়। এই সঞ্চালনের ফলে পরস্পর ঘষিত হওয়ায় একপ্রকার সর্ সর্ শব্দ সর্ব্বদা নির্গত হয়। ইহাদের শরীরের পার্শ্বদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শল্কগুলির প্রত্যেকটির মধ্যস্থলে একপ্রকার কণ্টকাকৃতি বা করাতের ন্যায় উচ্চাংশ বিদ্যমান বলিয়া ইহারা "স-স্কেল ও ভাইপার" আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপ শল্ক পরস্পর আহত বা ঘর্ষিত হইলে একপ্রকার বিচিত্র শব্দ বাহির হওয়া স্বাভাবিক। এই শব্দ স্পষ্টই শোনা যায়। শরীর সঞ্চালনের সময় এই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আর এক প্রকার শব্দও শ্রুত হয়। শেষোক্ত শব্দ জিহ্বার অবিশ্রান্ত দ্রুত স্পন্দন হইতে সম্ভূত।

ফুর্সার বর্ণের ভিতরেও বৈচিত্র্য আছে। এই বর্ণগুলি পারিপার্শ্বিকের সহিত এইরূপ মিলিয়া যায় যে, ইহাদের বিদ্যমানতা অনেক সময় জানা যায় না। অবশ্য প্রকৃতিদেবী প্রাণীপুঞ্জকে রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ বর্ণসামঞ্জস্য প্রায়ই সম্পাদন করিয়া থাকেন। অবস্থান স্থানের অনুরূপ বর্ণ অনেক প্রাণীকেই ধারণ করিতে দেখা যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ফুর্সাদিগকে সাধারণতঃ মরু-অঞ্চলেই অধিক দেখা যায়। শরীরের অর্দ্ধাংশ মরুস্থানীয় ধূসর বালুকারাশিতে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া যখন ইহারা অবস্থান করে, তখন বালুকার বর্ণের সহিত ইহাদের দেহবর্ণের সাদৃশ্যের জন্য মরুপথচারীর পক্ষে ইহাদের অবস্থিতির কথা অবগত হওয়া সহজ হয় না। সাধারণ চিতা এবং ফুর্সা উভয়েই অত্যন্ত বিষাক্ত হইলেও নির্দ্দোষ বা নির্ব্বিষ সর্পদিগের সহিত বর্ণগত ও চিহ্নগত সাদৃশ্য থাকার জন্য অনেকের পক্ষে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। বর্ণ ও চিহ্ন দেখিয়া ভুলক্রমে এই বিষধর সর্পদ্বয়কে অন্য কোন অনপকারী সর্প ভাবিয়া কেহ কেহ দংশনের ফলে অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এক প্রকার বাদামীবর্ণ বিশিষ্ট বৃক্ষবাসী সর্প বর্ণে ও চিহ্নে প্রায়ই ফুর্সার অনুরূপ। এই বৃক্ষবাসী সর্পের লাটিন নাম 'ডি ট্রিগোনাটা'। কেবল মস্তকের শল্কসমূহের দিকে লক্ষ্য করিলে উভয়ের পার্থক্য ধরা পড়ে। ফুর্সার মস্তকস্থ শল্কগুলি গাত্রস্থ শল্কের অনুরূপ, কিন্তু বাদামী বৃক্ষসর্পটির মস্তকের শল্কগুলি পৃষ্ঠদেশের শল্ক হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বৃক্ষসর্পের মস্তকের শল্কগুলি যেরূপ প্রশস্ত ও সমতল গাত্রশল্ক সেরূপ আদৌ নহে। একমাত্র এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই ফুর্সা ও বাদামীবৃক্ষসর্পের পার্থক্য বুঝা যায়।

বিষাক্ত সর্প কামড়াইলে তাহা মারাত্মক হইবেই, এমন কোন কথা নাই। মৃত্যু বিষের পরিমাণের উপর নির্ভর করে তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বিষের পরিমাণ এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরের দ্বারা তাহা শোষিত হওয়ার উপরেও মৃত্যু নির্ভর করে—ইহাও সত্য। এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, সাপ কামড়াইল বটে, কিন্তু সেই দংশনে সামান্য মাত্র বিষ শরীরে উর্দ্ধস্থ অংশে শোষিত হইয়া নিঃশেষ হইয়া গেল, ঐ বিষ শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিল না। আবার এমন হইতে পারে, দংশনের সময় সর্পটির বিষের ভাণ্ডার প্রায়ই শূন্য ছিল বলিয়া সে উপযুক্ত পরিমাণ বিষ ক্ষতস্থানে চাপিয়া দিতে পারে নাই। এমনও দেখা গিয়াছে, স্বল্পবিষ সর্প এমন ভীষণভাবে দংশন করিয়াছে যে,বিষের মাত্রা অধিক হওয়ার জন্য দষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে। যাহাদিগকে বিষবিহীন বলিয়া মনে করা হয়, তাহাদের কামড়েও কোন ব্যক্তি মরিলে জানিতে হইবে সেই সর্প তাহার বিষের ভাণ্ডার ক্ষতস্থানে উজাড় করিয়া দিয়াছে। তবে এরূপ হইতে পারে—বিষবিহীন সর্প দংশন করিলেও দষ্টব্যক্তি বিষাক্ত সর্প কামড়াইয়াছে ভাবিয়া মৃত্যুভয়ে এরূপ অভিভূত হইয়া পড়ে যে, সেই ভীতিই তাহার মৃত্যু ঘটাইয়া দেয়। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন—অতিশয় ভীতি বিষ অপেক্ষাও শীঘ্র মৃত্যু ঘটাইতে পারে। আমাকে বিষাক্ত সাপে কামড়াইয়াছে, আমি বাঁচিব না, এইরূপ ধারণা মনে জন্মিলে শরীরে যে-সকল উপসর্গ

দেখা দেয়, সর্পবিষজনিত উপসর্গসমূহের সহিত তাহার সাদৃশ্য বিদ্যমান—বিশেষজ্ঞগণ এই মত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সর্পবিষের প্রাথমিক ও প্রধান উদ্দেশ্য সর্পদিগের দ্বারা আক্রান্ত বা ভক্ষ্যপ্রাণীদিগকে বিষে নিস্তেজ বা জর্জ্জরিত করিয়া ফেলা। ঐরূপ না করিলে তাহাদিগকে গলাধঃকরণ করায় সুবিধা ঘটিবে না। বিষ ভোজ্য জীর্ণ করিবার পক্ষেও সর্পদিগকে সহায়তা করে। এই বিষ বিদ্যমান বলিয়া অপর কোন বিষাক্ত সর্পের বিষ তাহাদিগের মৃত্যু ঘটাইতে পারে না। অবশ্য ইহাও সত্য যে, এক বিষধর সর্প অন্য বিষধর সর্পকে কামড়াইলে এবং দষ্টা সর্প অতিরিক্ত বিষ সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হইলে দষ্টসর্পের মৃত্যু ঘটা অসম্ভব নয়। তবে দষ্টসর্পের স্বকীয় বিষের মাত্রা বিশেষ বেশী হইলে ঐরূপ দংশনেও মৃত্যু হয় না। রাসেলস্ ভাইপার কোন গোক্ষুরকে কামড়াইলে ঐ ভাইপারের পক্ষে এত বিষ সেই গোক্ষুরের শরীরে সঞ্চারিত করা সম্ভব হয় না—যাহার দ্বারা তাহার মৃত্যু হইতে পারে। কারণ, ভাইপারের বিষের পরিমাণ গোক্ষুরের বিষ-ভাণ্ডারে সঞ্চিত বিষ অপেক্ষা অনেক কম। অন্যদিকে একটি রাজগোক্ষুর একটি সাধারণ গোক্ষুরকে দংশন করিয়া অনায়াসে মারিয়া ফেলিতে পারে। রাজগোক্ষুর যে বিষ সাধারণ গোক্ষুরের শরীরে সঞ্চারিত করিবে, তাহা সাধারণ গোক্ষুরের শরীরস্থ বিষ অপেক্ষা বহুগুণ বেশী।

সর্পবিষ অতিশয় তীব্র জিনিষ। জল মিশাইলে বা রৌদ্রে শুকাইলেও উহার ভীষণতা বা মৃত্যুজনক স্বভাব হ্রাস হয় না। সর্পবিষ অত্যন্ত জটিল পদার্থ। ইহার রাসায়নিক বিশ্লেষণ অসম্ভব বলিলেও ভুল হয় না। দেখিলে বা পরীক্ষা করিলে আমরা গোক্ষুর ও রাসেলস্ ভাইপার উভয়ের বিষের তারতম্য বুঝিতে পারি না। সেই বিষ কোন প্রাণীর শরীরে সঞ্চারিত করিয়া বিষজনিত উপসর্গসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা বুঝিতে পারি ঐ বিষ কোন জাতীয় সর্পের। একই বিষ বিভিন্ন প্রাণীর দেহে বিভিন্ন উপসর্গসমূহ উৎপন্ন করে ইহাও সত্য। কোন সর্পবিষ এক প্রাণীর মৃত্যু ঘটাইতে পারে বলিয়া অন্য প্রাণীরও ঘটাইবে ইহা সত্য নহে। আমাদের অধিক পরিচয় মনুষ্যশরীরে সর্পবিষের ক্রিয়ার সহিত।

মনুষ্য-শরীর সর্পবিষকে এত সত্বর শোষণ করিয়া লয় যে, বিষবিনাশক বা আরোগ্যকর উপায়সমূহ প্রায়ই ব্যর্থ হইয়া থাকে। বিষ একবার সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইলে কোন উপায়ই কার্য্যকর হয় না। বন্ধন ও ক্ষতস্থান কর্ত্তন প্রভৃতি কার্য্য উপযুক্ত সময়ে সম্পাদিত হইলে মৃত্যু নিবারিত হওয়া অসম্ভব নয়। সম্ভব হইলে সময়ে সময়ে বিষাক্ত অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গটী শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করাও প্রয়োজন হইতে পারে। যাহাতে বিষ অধিক অগ্রসর না হইতে পারে সেই চেষ্টাই করিতে হয়। দষ্ট ব্যক্তিকে বাঁচাইবার জন্য কত জড়ি-বুটি, মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়া-ফুঁকার আশ্রয় মানুষ লইয়া থাকে। আরোগ্য-বিষয়ে বিজ্ঞানের একটি নবতম অবদান উল্লেখযোগ্য। অনেকেই সীরাম-চিকিৎসার কথা শুনিয়া থাকিবেন।

উই ঢিবিতে গোক্ষুর-সর্প, প্রসূত ডিম্বসমূহকে রক্ষা করিতেছে
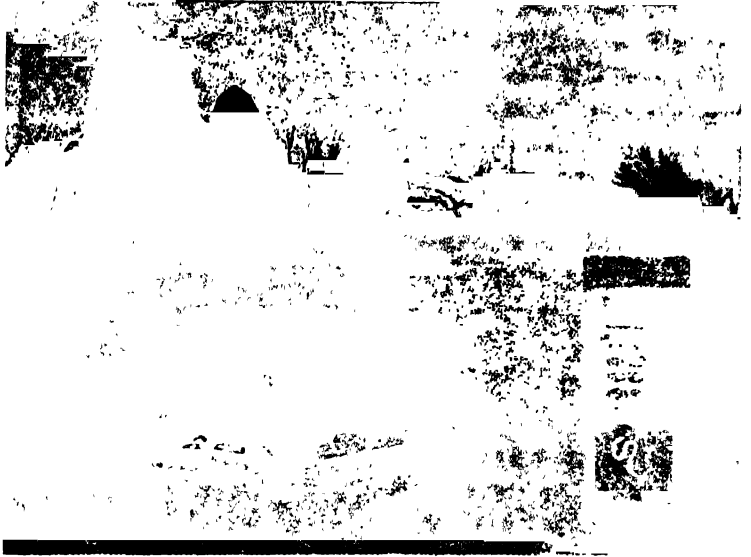
বর্ত্তমানে প্রায় সব রোগেই বিষের দ্বারা বিষ বিনাশের চেষ্টা অনুষ্ঠিত হইতেছে। সর্পবিষের দ্বারাই সর্পবিষ নাশ—ইহাই এখানে সীরাম-চিকিৎসা। সত্য কথা বলিতে ইহাই একমাত্র চিকিৎসা যাহার দ্বারা প্রকৃতই কল্যাণ ঘটিতে পারে।

সীরাম প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অশ্বের দেহে সর্পবিষ (ইন্‌জেক্ট) সঞ্চারিত করিয়া সীরাম প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথমে যৎসামান্য বিষ কোন অশ্বের শরীরে প্রবিষ্ট করান হয়। পরে তদপেক্ষা কিছু বেশী ঐ অশ্বের দেহে সঞ্চার করা হইয়া থাকে। বিষের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়াইতে হয়। এইরূপে ক্রমান্বয়ে কয়েকবার করা দরকার। শেষবারে এত বেশী বিষ অশ্বের দেহে প্রবেশ করান হয়, প্রথমেই সঞ্চারিত করিলে যাহার দশমাংশই সেই অশ্বের মৃত্যু ঘটাইতে পারিত। কিন্তু

অশ্বের শরীর ক্রমশঃ বিষে অভ্যস্ত হইয়া যাওয়ার জন্য ঐরূপ অতিরিক্ত বিষও তাহার মৃত্যু ঘটা'তে পারে না। অবশেষে ঐ বিষাক্ত অশ্বের রক্ত হইতে সীরাম নামক জলীয়াংশ গ্রহণ করা হয়। ঐ সীরাম বিষবিনাশক ভেষজরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যখন প্যারিসের প্যাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউটের অধ্যাপক ক্যালমেট এইরূপ সীরাম প্রথম প্রস্তুত করেন, তখন তিনি মনে করিয়াছিলেন—তিনি সর্ব্বপ্রকার সর্পবিষের ঔষধ আবিষ্কার করিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল, অশ্বকে যে জাতীয় সর্প-বিষে জর্জ্জরিত করা হইত উহা হইতে প্রস্তুত সীরাম সেই-জাতীয় সর্পকর্ত্তৃক দষ্ট ব্যক্তির পক্ষেই আরোগ্যকর হইতে পারে। গোক্ষুর বিষে অভিষিক্ত অশ্বরক্ত হইতে প্রস্তুত সীরাম রাসেল্‌স ভাইপার বা চিতাসাপের দ্বারা দষ্ট ব্যক্তির দেহে প্রবিষ্ট করান হইলে অনিষ্ট না হউক বিশেষ কোন ইষ্ট অনুষ্ঠিত হয় না। যদি সকল বিষাক্ত সর্পের বিষ মিশাইয়া ঐ মিশ্র বিষের দ্বারা অশ্বকে জর্জ্জরিত করিয়া সীরাম প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে একই সীরামে কাজ হইতে পারে ইহা সত্য। বর্ত্তমানে কসেটলির প্যাস্তুর প্রতিষ্ঠানে গোক্ষুর ও রাসেলস ভাইপার উভয় সর্পের বিষকে মিশ্রিত করিয়া যে সীরাম তৈয়ারী করা হইতেছে, তাহা উক্ত দুই প্রকার সর্পদষ্ট ব্যক্তির পক্ষেই আরোগ্যপ্রদ হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে নূ্যনপক্ষে বাৎসরিক প্রায় বিশ হাজার লোক সর্পদষ্ট হইয়া বিনষ্ট হয়। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুদের দ্বারা যত লোক নিহত হয়, এই সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক অধিক সংশয় নাই। প্রত্যেক সর্পদষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু তালিকাভুক্ত হয় না ইহাও সত্য। সুতরাং বিশ হাজার অপেক্ষা অনেক বেশী লোক সর্পদংশনের ফলে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে, ইহা নিশ্চিত। পূর্ব্বে যখন রেলপথাদি প্রস্তুত হয় নাই এবং এদেশে জঙ্গলের সংখ্যা অধিক ছিল, তখন অধিকসংখ্যক নরনারী সর্পদষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইত, ইহাও সংশয়াতীত। বর্ত্তমান অপেক্ষা সর্পভীতি তখন অধিক ছিল, সে বিষয়েও সংশয় নাই। সুতরাং সর্প সম্বন্ধে নানাপ্রকার অদ্ভুত ধারণা এদেশে প্রচলিত থাকা স্বাভাবিক। সর্পবাদ স্বল্পবিস্তর সকল দেশেই বিদ্যমান কিন্তু সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে ইহা পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। কাশ্মীর, মালাবার, নেপাল এই তিনটি প্রদেশে সর্পবাদ প্রবল আকারে প্রবর্ত্তিত বলিয়া মনে হয়। অবশ্য ভারতের পৌরাণিক কাহিনীসমূহের একটা অংশে আমরা সর্পবাদের বিশেষ বিচিত্র বিকাশের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ফণাধর গোক্ষুর সর্পই দেবতারূপে পূজিত হইয়া থাকে। দক্ষিণ ভারত ও কাশ্মীরে এইরূপ পূজার প্রচলন অধিক।

সর্পবাদ শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ এরূপ কেহ যেন মনে না করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্বল্প বিস্তর সকল দেশেই ইহা রহিয়াছে। এক সময় ইউরোপেও ইহা দৃষ্ট হইত। খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সহিত উহা ক্রমশঃ অপগত হইয়াছে। আফ্রিকার কোন কোন অংশে সর্পপূজা এখনও প্রচলিত আছে। সুদূর প্যালিওলিথিক যুগে সর্পপূজা কিরূপ আকারে প্রচলিত ছিল তাহা এখন নির্দ্ধারণ সহজ নহে বটে, কিন্তু সেই যুগের শিল্পীদের অঙ্কিত সর্পমূর্ত্তি গুহা-গৃহগাত্রে আজিও বিদ্যমান রহিয়া সর্প ও সর্পবাদের প্রাচীনতার বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সর্প অতি প্রাচীন কাল হইতে অমরতার প্রতীক রূপে পূজিত হইয়া আসিতেছে। সর্পের আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এই বিশ্বাসের জন্য অনেকটা দায়ী। সর্প তাহার পুচ্ছকে মুখ-বিবরে প্রবেশ করাইলে চক্রাকার ধারণ করে। এই চক্রবৎ প্রাণী বা পদার্থের আদি এবং অন্ত নির্দ্ধারণ করা যায় না। সুতরাং সর্প অনন্ত জীবনের প্রতীক বলিয়া গণ্য হওয়ার একটা কারণ আমরা দেখিতে পাইতেছি। নির্ম্মোক বা খোলশ ত্যাগ করিয়া সর্প প্রতি বৎসর নূতন দেহ ধারণ করে, সুতরাং প্রাচীন কালের নরনারীর পক্ষে এই প্রাণীকে চির যৌবনের প্রতীক মনে করিয়া পূজা বা সম্মান করাকে বিস্ময়কর ব্যাপার বলা চলে না। সর্প অনন্তজীবন ও চিরন্তন যৌবনের প্রতীকরূপে আজিও কোন কোন দেশে পূজিত হইয়া থাকে।

সর্পকে ক্রূর-বুদ্ধি বিবেচনা করা হয় বটে, কিন্তু ইহারা সেরূপ বুদ্ধিমান প্রাণী নহে বলিয়াই বিশেষজ্ঞগণের অভিমত। তবুও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন বা কৌশলী ব্যক্তিকে সর্পের সহিত তুলনা করার প্রথা প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। বাইবেলে উপদেশ আছে—সর্পের ন্যায় জ্ঞানী, কিন্তু ঘুঘুর ন্যায় নির্দ্দোষ হও। সর্পের সহিত সয়তানের তুলনা করা হইয়াছে। সয়তান সর্পবেশে আদিম মানব-মানবীকে ছলনা করিয়াছিল বলিয়া কাহিনী প্রচলিত আছে।

সর্প সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা সুমহান কল্পনা বা পরিকল্পনা আমরা অনন্ত বা শেষ নাগের ভিতর দেখিতে পাই। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্ন এই চতুর্ব্যূহ-তত্ত্ব বৈষ্ণব দর্শনে বর্ণিত আছে। অনন্ত বা শেষ নাগ সঙ্কর্ষণ নামক তত্ত্ব বা শক্তির অন্যতম অভিব্যক্তি। লক্ষ্মণ এবং বলরাম সঙ্কর্ষণাবতার বলিয়া বিবেচিত। বাসুদেব শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলে সঙ্কর্ষণ নিত্যানন্দরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক প্রপঞ্চে প্রকটিত হন, গৌড়ীয় বা বঙ্গবাসী বৈষ্ণবগণ এই মতবাদ মানিয়া থাকেন। যখন অনন্ত কারণার্ণবে বাসুদেব বা নারায়ণ শয়ন করিয়া আছেন তখন সঙ্কর্ষণরূপী শেষ-নাগ তাঁহার মস্তকে সহস্র ফণা-ছত্র ধারণ করিয়াছেন—এই পরিকল্পনা অতি অপূর্ব্ব সন্দেহ নাই। এই অনন্ত ফণাধর মহানাগের মস্তকে পৃথিবী

রক্ষিত রহিয়াছে, এই মতবাদও বিচিত্র সন্দেহ নাই। শেষ-নাগ বা বাসুকি যখন এক ফণা হইতে অপর ফণার উপরে পৃথিবীকে ধারণ করেন, তখনই ভূমিকম্পন অনুভূত হইয়া থাকে, এরূপ পৌরাণিক কাহিনী প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। জ্যোতির্ব্বিদ্যার অন্যতম প্রবর্ত্তক গর্গমুনি শেষ-নাগের নিকট ঐ বিদ্যা শিক্ষা করেন বলিয়া কথিত।

নাগরাজ বাসুকির ভগিনী বলিয়া কল্পিত সর্পমাতা বা সর্পদেবতা মনসাদেবীর পূজা বঙ্গদেশে আজিও প্রচলিত আছে। প্রবন্ধ-লেখকের জন্মপল্লীতে মনসাদেবীর সিঁদুর প্রলিপ্ত প্রস্তরমূর্ত্তির পূজা প্রাচীন কালের মত আজিও চলিতেছে। সাধারণ নরনারীর ধারণার ভিতর বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন সঞ্চারিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই মনসাপূজার মূল পদ্মপুরাণ। চন্দ্র সদাগর এবং বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দ্র সম্বন্ধীয় কাহিনী পদ্মপুরাণ হইতে জন্মলাভ করিয়া নানাপ্রকার বিচিত্র গাঁথায় ও গীতে পরিণতি পাইয়া বাঙ্গালার আকাশ ও বাতাসকে পূর্ণ করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের মতে ভারতীয় সর্পপূজা অনার্য্য বা দ্রাবিড়ীজাতিদিগের দ্বারা প্রবর্ত্তিত নহে, আর্য্যেরাই ইহার প্রবর্ত্তক। এই মতবাদ সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আমাদের মনে হয় না। নিবিড় অরণ্যানীর অধিবাসী অনার্য্যদিগের দ্বারা ভয়ঙ্কর বিষধর সর্পসমূহ শঙ্কা ও সম্ভ্রমসহকারে সম্পূজিত হইবার সম্ভাবনা স্বল্প নহে। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস নামক কৃষ্ণলীলাত্মক কাব্য-ত্রয়ে এক অভিনব বিচিত্র পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ লইয়াছেন। তিনি নাগরাজ বাসুকিকে অনার্য্যজাতিদের নেতা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে নাগগণ একপ্রকার আর্য্যেতর জাতি মাত্র। সে যাহা হউক সর্প বা সর্পদেবতার পূজার ভাব নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যেই অধিক, এ বিষয়ে সংশয় নাই। সুতরাং সর্পপূজা অনার্য্য জাতিরাই প্রথমেই সম্পাদন করিয়া থাকিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। পরে সর্পবাদ আর্য্যদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক প্রকার উন্নত ও বিশুদ্ধ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা শুধু ভয়ঙ্কর ছিল, আর্য্য-ঋষিদের কল্পনা তাহাকে সুন্দর ও সুমহান করিয়া তুলিয়াছে। গীতার বিভূতিযোগে সর্প ও নাগ বিভিন্ন বিবেচিত হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণ সর্পদিগের মধ্যে আমি বাসুকি এবং নাগগণের মধ্যে আমি অনন্ত এইরূপ বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। বৈদিক অহিকে অন্ধকারের প্রতীক বলা চলে; পরে অহি শব্দের অর্থ সর্প হইয়াছে বটে কিন্তু সুদূর বৈদিক যুগে 'অহি' বলিলে অন্ধকার ও ঝঞ্ঝার অধিষ্ঠাত্রী দানবী শক্তিকে বুঝাইত।

ডক্টর ভোগেলের মতে সর্পের অদ্ভুত আকৃতি, ভয়াবহ প্রকৃতি, মৃত্যু-জনয়িত্রী শক্তি সম্মিলিত হইয়া যে সর্প-ভীতি মানুষের মনে জন্মাইয়াছে তাহাকেই সর্পবাদের জননী বলা চলে। সংস্কৃত সাহিত্যে শুধু ভূগর্ভবাসী নয়, জলরাশিবাসী, অন্তরীক্ষচারী এবং এমন কি ঊর্দ্ধলোকের অধিবাসী সর্পসমূহের কাহিনী রহিয়াছে। মহাকবি কালিদাস সমুদ্রবাসী অজগর সর্পের কথা রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে কহিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র পুষ্পকরথে আরোহণ পূর্ব্বক অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের সময় সীতাদেবীর দৃষ্টি সমুদ্রোপকূলের দিকে আকৃষ্ট করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা আমরা এই স্থানে উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সর্প-দেবতা—হরিদ্বার

"বেলা-নিলায় প্রসৃতা ভুজঙ্গা মহোর্ম্মিবিস্ফূর্জথু-নির্ব্বিশেষাঃ।
সূর্য্যাংশুসম্পর্ক-সমৃদ্ধরাগৈর্ব্যজ্যন্ত এতে মণিভিঃ ফণস্থৈঃ।"

(ঐ দেখ, বায়ু সেবনের জন্য বড় বড় অজগর সর্প সকল সমুদ্রতটে প্রকাণ্ড দেহ প্রসারিত করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। উহাদের নাসিকাগর্জ্জনে সমুদ্রের তরঙ্গগর্জ্জনেরই অনুরূপ। দেখ, উহাদের ফণায় বিরাজিত মণিরাজির দীপ্তি রবিরশ্মি-পাতে কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ মণির জন্যই উহাদিগকে চিনা যাইতেছে।)

মণিমণ্ডিত-মস্তক ফণিকে অবলম্বন করিয়া ভারতীয় কবিকুলের কল্পনা, নানাপ্রকার কমনীয় কবিতাকুসুম প্রসব করিতে সমর্থ হইয়াছে। শুধু মণি নহে, ফণাধর গোক্ষুর সর্পের মস্তকে মঙ্গলজনক স্বস্তিক চিহ্ন রহিয়াছে বলিয়া

কথিত। সহস্রশীর্ষ শেষ-নাগের প্রত্যেক মস্তকে মণি ও স্বস্তিক চিহ্ন বিদ্যমান বলিয়া কল্পিত। স্বস্তিক জার্ম্মানীর জাতীয় চিহ্নে পরিণতি পাইয়াছে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ইহা নানাভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে বটে কিন্তু ভারতবর্ষেই স্বস্তিকের জন্ম, সে বিষয়ে সংশয় নাই। স্বস্তিক চিহ্নধারী সর্প মঙ্গলের প্রতীক বলিয়া বিবেচিত হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। ভারতের কোন কোন অংশে সর্পকে বন্ধ্যাত্ববিনাশক বা সন্তানদাতা বলিয়া মনে করা হয়। ঐ সকল অঞ্চলের অধিবাসিনী সন্তানহীনা নারীরা এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই সর্প বা সর্পদেবতার অর্চনা করিয়া থাকে। বাস্তু-সাপের কথা অনেকে শুনিয়াছেন। অনেক স্থানে এই সকল সর্প গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বাস্তু-সাপের পূজা শুধু ভারতবর্ষে নয়, অন্যান্য দেশেও প্রচলিত আছে। কেহ কেহ এইরূপ পূজাকে সার্ব্বভৌম বলিয়া মনে করেন। কোন কোন স্থানের অধিবাসীরা বাস্তুসাপকে পরলোকগত পিতৃপুরুষ বিশেষ মনে করিয়া পূজা করে। গৃহের মায়া ত্যাগ করিতে না পারিয়া ইহারা সর্পরূপে অবস্থান করিতেছে এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত। সুতরাং বাস্তুসাপ মারিয়া ফেলা অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য বলিয়া বিবেচিত। বাঙ্গালা দেশেও বাস্তুসাপ মারা অনুচিত বিবেচিত। এই সর্প কাহারও কোন অনিষ্ট করে না বলিয়া কথিত।

পাঞ্জাবের পার্ব্বত্যপ্রদেশের প্রত্যেক গৃহস্থ গৃহে সর্পমূর্ত্তি রাখিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, এইরূপ করিলে কোন বিষধর সর্প গৃহে প্রবেশ করিবে না। দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিয়া এবি ছুবিও ভারতবর্ষের ঐ অঞ্চলের গৃহস্থদিগের দ্বারা সর্প অতিশয় সম্মানিত হওয়ার বৃত্তান্ত তাঁহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "কোন গৃহে সর্প প্রবেশ করিলে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া বা মারিয়া ফেলা দূরের কথা, তাহাকে সাদরে খাদ্যদ্রব্য উপহার প্রদান করা হয়। ঐ সর্পের উদ্দেশ্যে বলিও প্রদত্ত হয়। হিন্দুরা বিষাক্ত সর্পকে বৎসরের পর বৎসর সাদরে গৃহে রাখিয়া দেয় এবং উহাকে ভোজ্যপদার্থ প্রদান করে। সমগ্র পরিবারের সর্পদষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকিলেও কেহ উহাকে হত্যা করিতে সাহসী হয় না।" এবি ছুবি মুসলমান শাসন ভারতে প্রতিষ্ঠিত থাকার সময় আসিয়াছিলেন।

মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হজরৎ মহম্মদ বাস্তুসাপকে এক-জাতীয় জিন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। জিনকে এক প্রকার উপদেবতা বলা চলে। কায়রো নগরে বাস্তুসর্প আজিও সম্মানিত হয় এবং উহাকে গৃহদেবতা বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে বলিলে ভুল হয় না। এমন কি, কায়রোর এক একটি পল্লীরও রক্ষক সর্প রহিয়াছে। সর্পকে ধন-রত্নাদির রক্ষক মনে করার প্রথা প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ভূগর্ভে প্রোথিত গুপ্তধন-রক্ষাকারী সর্পের কথা শুনা যায়। এ বিষয়ে বড় বিচিত্র ও রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রচারিত রহিয়াছে। মিঃ কর্ব্বিস কথিত বৃত্তান্তের মর্ম্ম আমরা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। এক গুপ্তকক্ষে গুপ্তধন রহিয়াছে জানিয়া মিঃ কর্ব্বিস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এই কন্দর-সদৃশ অন্ধকার গৃহে কার্ব্বিস তাহার লোক-জনকে প্রবেশ করিতে বলিলে কেহ প্রবেশ করিতে সাহসী হইল না। তাহারা বলিল, সেই কক্ষে ধনরক্ষক উপদেবতা সর্পমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। কর্ব্বিসের অনুরোধে তাহারা অবশেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভূগর্ভস্থ কক্ষে অবতরণ করিতে স্বীকৃত হইল। রজ্জুর সাহায্যে অবতরণ করিয়া তাহারা সেই কক্ষতলে অবতীর্ণ হইবা মাত্র একটি প্রকাণ্ড সর্প তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহারা আর্ত্ত-স্বরে চীৎকার করিয়া এই লোমহর্ষণ সংবাদ কর্ব্বিসকে জানাইল। শেষকালে কর্ব্বিস স্বয়ং এবিষয়ে সন্ধান করিয়া ঐ ভূগর্ভস্থ গৃহের এক গর্ত্তে জাহাজ নোঙ্গর করিবার জন্য ব্যবহৃত স্থূল রজ্জুর ন্যায় একটি পদার্থকে কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকিতে দেখেন। তাঁহাকে দেখিয়া ঐ পদার্থটি তাহার মস্তক ভূমি হইতে বহু উচ্চে উত্তোলন করে বটে কিন্তু তাহার দেহের অধিকাংশ তখন ভূতলে কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া রহিল। কিছুকাল পরে অগ্নিকাণ্ডের ফলে এই সর্পটি দগ্ধ হইয়াছিল কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও কোন গুপ্তধন আবিষ্কৃত হয় নাই।

সুদক্ষ সাপুড়িয়ারা গুপ্তধনরক্ষক সর্পকে চিনিতে পারে বলিয়া কথিত। কোন কোন মন্ত্রশক্তিশালী সুনিপুণ সাপুড়িয়া সেইরূপ সর্পকে অনুসরণ করিয়া গুপ্তধন লাভ করিয়াছে বলিয়া কাহিনী প্রচারিত আছে। ক্রুক এ বিষয়ে অতি ভয়াবহ কাহিনী কহিয়াছেন। প্রথম সন্তানটিকে বালরূপে সেই গুপ্তধন-রক্ষক সর্পকে দিবার অঙ্গীকারে তাহারা সাপুড়িয়াকে গুপ্তধন রক্ষিত থাকার স্থান দেখাইতে সম্মত হয়, ক্রুক এইরূপ শুনিয়া-ছিলেন। ক্রুকের মতে সর্পবাদের সহিত নরবলির সম্পর্ক বরাবরই বিদ্যমান।

কাশীতে নাগেশ্বর নামক দেবতা, ভিলদিগের তারা এবং খন্দ হাতির তারা-পেন্নু সর্পদেবতা সন্দেহ নাই। তবে সর্প-দেবতাদিগের ভিতর বহু দেশে অর্চ্চিত মনসাই প্রধান। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে নাগপঞ্চমী নামক পর্ব্ব আজিও অনুষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে এই পর্ব্ব বিভিন্ন ভাবে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। বোম্বাই অঞ্চলে এবং যুক্তপ্রদেশে নাগপঞ্চমীর দিন সর্পগণকে আতপ ও দুগ্ধের দ্বারা পূজা করার প্রথা আজিও প্রচলিত। এই দিবসে পুঞ্জাব প্রদেশের রমণীরা বস্ত্রালঙ্কারে শোভিত হইয়া স্নান করে

এবং স্নানসিক্ত বস্ত্রেই সর্পদেবতার উদ্দেশে দুগ্ধধারা ঢালিয়া দেয়। তাহারা পুষ্প-মাল্য, তাম্বূল, ফলমূল প্রভৃতি পুজোপহার কোন বল্মীক বা উই ঢিবির উপর রাখিয়া দেয়। বল্মীক বিষধর সর্পের বাসস্থল এই বিশ্বাসের মূলে সম্পূর্ণ সত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। বিহার-প্রদেশে এই পর্ব্বের সময় নারীগণ অনেকে একত্র হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে। বলা বাহুল্য, ইহারা সর্পদেবতার পূজার জন্যই প্রার্থী হইয়া থাকে। ইহাদিগকে নাগিনী নামে অভিহিত করা হয়। এইরূপ ভিক্ষাকার্য্য দুইদিন ধরিয়া চলে। এই সময় ইহারা খাদ্যে লবণ ব্যবহার করে না এবং উন্মুক্ত স্থানে শয়ন করে। উদয়পুরে এই সময় একপ্রকার উদ্ভিদ দ্বারদেশে স্থাপন করার প্রথা প্রচলিত। এই উদ্ভিদ থাকিলে সর্প গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া কথিত। বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক পল্লীগ্রামে এই পর্ব্ব যেভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তেমন ভারতের অন্য কোন প্রদেশে হয় না। পূজাপার্ব্বণ অনুষ্ঠানে বাঙ্গালী অগ্রগণ্য, সে বিষয়ে লেশমাত্রও সংশয় নাই। বাঙ্গালীর প্রখর প্রতিভা, বাঙ্গালীর উচ্চ কল্পনা, বাঙ্গালীর আশ্চর্য্য নিষ্ঠা প্রত্যেক পূজা ও পর্ব্বকে অপূর্ব্ব সুষমা ও মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমন্বয় বাঙ্গালায় এমন কতকগুলি বিচিত্র ও বিশিষ্ট অনুষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আদৌ দৃষ্ট হয় না।

দিগ্বিজয়ী আলেকজেণ্ডার ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতবাসীদিগের দ্বারা গুহাবাসী বা গুহায় রক্ষিত সর্প অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত সম্পূজিত হইতে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার নৌসেনাধ্যক্ষ নিয়ার্কস তদীয় বিবৃত বৃত্তান্তে ভারতবাসী সুদীর্ঘ সর্পের কথা কহিয়াছেন। তিনি ভারতে ১৬ কিউবিট দীর্ঘ সর্প দর্শন করিয়াছিলেন। ভারতাগত অন্যান্য ইউরোপীয় লেখকগণ ইহা অপেক্ষা দশগুণ দীর্ঘ সর্প দর্শনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নানাদেশজয়ী আলেকজেণ্ডার সম্বন্ধে নানা বিচিত্র কাহিনী প্রচারিত হওয়া অসম্ভব নহে। আলেকজেণ্ডার মাসিদনাধিপতি ফিলিপের পুত্র, কিন্তু এই সকল কাহিনীতে এই দিগ্বিজয়ী বীরের সর্প-পিতার কথা উল্লিখিত রহিয়াছে। আলেকজেণ্ডার পীড়িত হইলে তাঁহার সর্প-পিতা অরণ্য হইতে আরোগ্যকর শিকড় সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্ম ও শ্যামদেশের তাইলিং নামক সম্প্রদায় আপনাদিগকে সর্প বা নাগের সন্তান বলিয়া মনে করে। আসাম ও ব্রহ্মের মধ্যবর্ত্তী আরণ্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসী নাগা নামক সম্প্রদায়ের সহিত নাগের কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন না। এই নাগা শব্দ 'নগ্ন' হইতে সম্ভূত বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস কিন্তু আমরা এই মত সমর্থন করিতে পারি না। নাগ হইতে নাগা শব্দ সঞ্জাত, আমরা এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করি। ডক্টর ভোগেল তাঁহার "ইণ্ডিয়ান সার্পেণ্ট লোর" নামক পুস্তকে যাহা বলেন, তাহা আমাদের ধারণাকেই সমর্থন করে। আসাম সীমান্তে অবস্থিত মণিপুর রাজ্যের নৃপগণও আপনাদিগকে নাগবংশীয় বলিয়া মনে করেন। না-কুং-বা নামক এক প্রকার সর্প মণিপুরের রাজগৃহে গৃহ-দেবতারূপে অর্চ্চিত হইয়া থাকে, রাজারা বলেন, তাঁহারা এই সর্পদেবতার বংশধর। রাজগৃহে রক্ষিত এই সর্পরূপী দেবতা কোন কারণে রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইলে দীর্ঘতর আকার ধারণ করে বলিয়া কথিত। কাশ্মীর, ছোটনাগপুর এবং মধ্যপ্রদেশস্থ বাস্তার—এই তিনটি রাজ্যের রাজারা আপনাদিগকে নাগবংশীয় বা সর্পদেবতা-সম্ভূত বলিয়া মনে করেন। ইঁহাদেগের নাগ হইতে সম্ভূত হওয়া সম্বন্ধে বিচিত্র কাহিনীসমূহ প্রচারিত রহিয়াছে।

আমরা গুপ্তধনরক্ষক সর্প সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পিপা নামক ব্রাহ্মণের কাহিনী অনেকেই জানেন। এই ব্রাহ্মণ এইরূপ একটি সর্পকে দুগ্ধাদি দ্বারা নিত্য পরিতৃপ্ত করিত এবং ঐ পরিচর্য্যার বিনিময়ে কিছু কিছু ধনরত্ন প্রাপ্ত হইত। ব্রাহ্মণের পুত্র সমগ্র গুপ্তধন একই সময়ে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে ঐ সর্পকে মারিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করে। ফল বিপরীত হইয়া পড়ে। সর্পটি পিপার পুত্রকে মারিয়া ফেলিয়া করালকুণ্ডলীর দ্বারা তাহার দেহটিকে জড়াইয়া ধরে। পিপা সর্পটিকে পুনরায় সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হয়। ঐ সন্তোষের বিনিময়ে মৃত্যুর পর এই ব্রাহ্মণ সর্পদেবতায় পরিণত পায় বলিয়া কথিত। বোম্বাই অঞ্চলে বন্ধ্যাত্বের কারণ সম্বন্ধে বিচিত্র বিশ্বাস প্রচলিত আছে। স্ত্রী বা স্বামী পূর্ব্বজন্মে সর্পহত্যা করিয়া থাকিলে সেই মহাপাতকের জন্য তাহারা সন্তানহীন হইয়া থাকে। উপরে উক্ত পিপা সম্পর্কীয় কাহিনীর অনুরূপ গল্প ইউরোপেও প্রচলিত আছে।

আমরা অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে যতটুকু জানিয়াছি, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস, সর্পবাদের প্রভাব বা প্রচার বঙ্গদেশেই বেশী। সর্পদেবতা মনসার পূজা বাঙ্গালায় যেরূপ ব্যাপকরূপে প্রচারিত আছে, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে বা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তাহা দৃষ্ট হয় নাই। বাঙ্গালায় বিষধর সর্পের সংখ্যা (বিশেষ গোক্ষুর) অধিক বলিয়াই বোধ হয় এইরূপ হইয়াছে। শব্দসমূহের সাহায্যে বঙ্গভূমির চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া সুকবি অক্ষয়কুমার সেই জন্যই কহিয়াছেন—

"শিরে ধরে ফণা-ছত্র কাল-ভুজঙ্গিনী,
অবলেহে পা-দুখানি সাগ্রহে শার্দ্দূল!"

পশ্চিম ও পূর্ব্ব উভয় বঙ্গেই সর্পদেবতা মনসাদেবীর পূজা প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। এমন কতকগুলি প্রসিদ্ধ দৈব ঔষধ আছে, যাহারা মনসার কৃপায় লব্ধ বলিয়া কথিত। প্রবন্ধ-

লেখকের জন্মস্থানের পার্শ্বস্থ একটি ক্ষুদ্র-পল্লীগ্রামে দুইটি প্রস্তর-প্রস্তুত মনসা-মূর্ত্তি বহুকাল হইতে বিরাজিত রহিয়াছে। এই অতি ক্ষুদ্র গ্রামটিতে মনসার বিশেষ কৃপা বিদ্যমান আছে বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই গ্রামবাসীর মুখে শুনিয়াছি গ্রামের কোন নরনারী আজ পর্য্যন্ত সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। এই উক্তি সত্য হইলে বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। একাধিক ব্যক্তির মুখে এইরূপ উক্তি শ্রুত হইয়াছে।

জীবননাশক সর্পবিষ জীবনরক্ষক ভেষজরূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে এই সত্য অনেকেই অবগত। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য-গণকে এ-বিষয়ে অগ্রণী বলা চলে। কৃষ্ণসর্পের ভীষণ বিষকে ঔষধরূপে ব্যবহার করা সামান্য অভিজ্ঞতা ও স্বল্প সাহসের কার্য্য নহে। যখন মস্ত, মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়াও কোন ফল দেখা যায় না, তখন সর্পবিষ-ঘটিত ঔষধে ফল হইতে দেখা গিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে সান্নিপাতিক জ্বরেই সর্পবিষঘটিত ঔষধের ব্যবহার বেশী। সুবিখ্যাত সুচিকাভরণ প্রভৃতি সর্পবিষঘটিত ঔষধ ব্যবহারে বহুক্ষেত্রে বিস্ময়কর ফল দৃষ্ট হইয়াছে।

হে অভাগ্য কবি!

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

স্বার্থহীন বন্ধুপ্রীতি বিশ্বাসের চরমতা ভদ্র ব্যবহার
হে অভাগ্য কবি,
একদা জানিতে যদি যশের মন্দিরে তব এনে দিবে চির অন্ধকার
বন্ধুত্বের বৈরাচার ঈর্ষ্যাপূর্ণ ষড়যন্ত্র দুর্ব্বচন ক্রূর অত্যাচার
বিষাইবে জীবনেরে, আজ তব দুঃখ বলে থাকিত না কিছু;
দীর্ঘশ্বাসে চঞ্চলতা, রাত্রির তিমিরপ্রান্তে ছুটিত না পিছু।

কেন তব কবি-খ্যাতি হয়েছিল কোন্ এক অখ্যাত প্রভাতে!
হে অভাগ্য কবি,
কেন তুমি মিশেছিলে শতাব্দীর সভ্যতার শিক্ষাগর্ব্বী
মানুষের সাথে!
উপকার পেলে যত, তুলনায় বহুগুণ অপকার এ হিংস্র ধরাতে
দুই হাতে ভরে লও, পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে দণ্ড লও তবে,
মানদণ্ডে অপমান ভারাক্রান্ত,—নহ কবি! বলে আজ সবে!

সময়ের দান সবে: একথা ভুলেছ তুমি কাব্যের উল্লাসে
হে অভাগ্য কবি
দেখাইলে জনে জনে অনুরাগ ভালোবাসা,
উপহাস বিনিময়ে আসে,
কেহ কহে—"আপনারে করিতে প্রচার তব স্বার্থ নিয়ে
সবাকার পাশে
ছুটিতেছ রাত্রিদিন।" কেহ কহে—"শঠতার জীবন্ত প্রতীক্,
প্রকাশিতে পাণ্ডুলিপি ভ্রমিতেছ মদোন্মত্ত বিভ্রান্ত পথিক।"

কবিতার গ্রন্থ রচি' কিবা লাভ করিয়াছ দরিদ্র জীবনে!
হে অভাগ্য কবি,
আত্মসাধনার পথ হারায়েছ উচ্চ আশা সাথে নিয়া কুগ্রহ পিছনে;
দুর্ব্বৃত্তেরে তোষামোদ করিয়াছ,— অ-বরেণ্যে সাংঘাতিক পণে।
কোথায় দাঁড়ালে তুমি! চেয়ে দেখ একবার অদৃশ্য অঙ্গুলি
রচিছে মৃত্যুরে তব। রচনার রূপচ্ছন্দা দেশ যাবে ভুলি'।

যৌবনের সীমা হ'তে জীবনের দিনমণি সায়াহ্নের পানে
হে অভাগ্য কবি,
এলো বুঝি, ফাল্গুনের পুষ্পরেণু পথে ঝরে,—আর কেন!
ডাকো ভগবানে,
অনেক হয়েছে লেখা, অনেক হয়েছে বলা;
নিন্দাস্তুতি পেলে সবখানে
পাপের নিরথি ভয় স্তম্ভিত হয়েছ সত্য, অক্ষম কঞ্চুকী
বাণীর বাহন বঙ্গে,—গোবিন্দদাসের মত তুমি ভাগ্যদুখী।

উচ্চপদ আভিজাত্য যে যুগ করিছে পূজা, প্রতিভার দাম
হে অভাগ্য কবি,
সে যুগ দিবে কি কভু! ঐশ্বর্য্যের স্তরিমায় শুয়ে
পঙ্গু কিনিতেছে নাম,
লেখনীর দুর্ব্বলতা ঢেকে যায় ঢক্কা নাদে,
চাটুবাদে পুরে মনস্কাম।
অক্ষমেরে দাস-বজ দিবে রেখে হৃদিমঞ্চে,—দুঃখ কেন তায়!
শুনিতে পাও কি কবি! অনন্ত বিশ্বের কবি ডাকিছে তোমায়!

শ্রীকুমুদিনীকান্ত কর

(উপন্যাস)

চৌদ্দ

মীনা বলিতে লাগিল—

"হঠাৎ বহুলোকের সমকণ্ঠের একটা চীৎকার শোনা গেল। তিনি চম্‌কে উঠে' পাল্কী থামিয়ে লাফিয়ে পড়্‌লেন। একটু যেন অস্থির হ'য়ে সে-শব্দ লক্ষ্য ক'রে সাম্‌নের দিকে চেয়ে থাক্‌লেন। দৃষ্টি উদ্বেগে ও বিস্ময়ে ভরা; পা দুটী থেকে থেকে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ছিল। আমি পাল্কীতে ব'সেই কৌতূহলী হ'য়ে সাম্‌নের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম, একটু দূরেই বহুলোক একত্র জমা হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। মনে হচ্ছিল তা'রা যেন আমাদের জন্যই অপেক্ষা কর্‌ছিল। তা'দের কতকগুল ঘোড়সওয়ার, আর বাকী সব পদাতিক—বরকন্দাজ। সকলেই অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত। তাদের হাতের ঢাল, তলোয়ার, বর্শাগুলি দিনের আলোয় ঝক্ ঝক্ কর্‌ছিল। পুরা ছ' ফুট লম্বা জোয়ান্ সব। তাদের মাথায় বাবরী চুল হাওয়ায় দুল্‌ছিল। সর্ব্বাগ্রে মাত্র একজন ঘোড়সওয়ার। সে সর্দ্দার। বুঝ্‌তে আমার বিলম্ব হ'ল না কা'রা এরা। মনে মনে আনন্দও হচ্ছিল, হাস্‌ছিলামও। কিন্তু হাসিটা বোধ হয় আমার অজ্ঞাতসারেই মুখের কোণে ফুটে উঠেছিল। হঠাৎ দেখ্‌লাম আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁ'কে কোন প্রশ্ন কর্‌বার অবসর না দিয়ে চ'খের ইঙ্গিতে ডেকে বল্‌লাম, "ভেতরে এস, বল্‌ছি—"

"তিনি সন্দিগ্ধচিত্তে পাল্কীতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "এরা কি আমাদেরই লোক? তুমি যেন চেন ব'লে মনে হচ্ছে?"

"হেসে বল্‌লাম, "হাঁ, তোমারই ত' লোক এরা?... চিন্‌তে পার্‌ছ না? দেখ চেয়ে ভাল ক'রে ঐ সকলের আগে কে দাঁড়িয়ে?"

"তিনি কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বল্‌লেন, "কে এ?"

"বল্‌লাম চিন্‌তে পার্‌লে না? "ভজু সর্দ্দার!..."

"তিনি অবাক হ'য়ে বল্‌লেন, "ভজু সর্দ্দার!..." তারপর একান্ত বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন, "আবার সেই...এ নিশ্চয়ই দেওয়ান্ ম'শায়ের কাজ—তিনি কি মনে করেন..."

"ছাখ দেওয়ান্ ম'শায়কে তুমি অমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ক'রে কথা কইও না। তিনি পিতারও অধিক।"

"কোন রাজপুত্তুর যাচ্ছে না কি যে অশ্বারোহী, পদাতিক সৈন্য চল্‌ছে তাঁর সঙ্গে?"

"রাজপুত্তুর বৈ কি? যাঁ'দের কাছে রাজপুত্তুর তাঁ'দের কাছে রাজপুত্তুর।"

"আর তোমাদের এই ভজু সর্দ্দারটি,...সব কাজেই কি?...দাঁড়াও।"

"এবার সত্যি সত্যি আমার রাগ হ'ল ভজু কাকাকে এমন ক'রে বলাতে। বল্‌লাম, "ছাখ, তাকে তুমি এমন যা-তা ক'রে ব'ল না। সে তোমার এবং আমার কে এবং কি তাও কি তোমায় ব'লে দিতে হবে?"

"তা' তুমি যেও রাজরাণী হ'য়ে। আমার ও-সব পোষাবে না।" ব'লে তিনি চুপ করলেন। আমিও আর কোন কথা না ব'লে চেয়ে থাক্‌লাম তা'দের দিকে।

"দেখ্‌তে দেখ্‌তে এসে পড়্‌লাম তা'দের কাছে। পাল্কী থাম্‌ল। পুনরায় তা'রা মনিবের নাম ক'রে হর্ষধ্বনি ক'রে উঠ্‌ল। সে-শব্দ দিগন্তে মিলিয়ে যেতে না যেতে যুদ্ধনাদে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠ্‌ল—হর-হর-বম্-বম্—রাম-শিঙ্গা-নাদ গগন বিদীর্ণ ক'রে দিগ-দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হ'ল। তিনি ছুটে বেরুলেন চঞ্চলপদে। আনন্দোজ্জ্বল মূর্ত্তি তাঁর। কিন্তু উত্তেজনায় চঞ্চল। কি সুন্দরই দেখছিলাম তখন তাঁকে। শিঙ্গা, রণনাদ একটা তীব্র উন্মাদনা এনে দেয়, মানুষকে মাতিয়ে তোলে, মানুষ আপনা ভুলে যায়, নিজকে বিসর্জ্জন দিতে পাগল হ'য়ে উঠে! কি এ-জিনিস তা আমি জানি, কারণ আমি কৈশোরে সে-স্বাদ পেয়েছি। মানুষ যোদ্ধ্‌বেশে সাজলেই আলাদা মানুষ হয়ে যায়। তখন সে কেবল যুদ্ধ এবং বীরত্বের কল্পনাতেই ডুবে থাকে এবং যে কোন অবস্থায় যোদ্ধার রীতি-নীতি পালন করাই ধর্ম্ম ব'লে মনে করে। তিনি কোষ থেকে তলোয়ার খুলে ললাট স্পর্শ ক'রে অনুচরদের প্রত্যভিবাদন জানা'লেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই রণ-শিঙ্গা, রণ-নাদ—হর-হর-বম্-বম্—সে-শব্দ দিগ্-দিগন্ত মুখরিত ক'রে তুল্‌ল। সে-উন্মাদনার হাত থেকে আমাকে রক্ষা করা বড় কঠিন হ'য়ে পড়েছিল। সংস্কারবশে আমার দক্ষিণ হস্ত কটিতে কোষবদ্ধ অসি খুঁজ্‌ছিল। ভজু সর্দ্দার ঘোড়ায় ছুটে এসে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে আমাদের দু'জনকে প্রণাম কর্‌ল। এই সময় অনেক কষ্টে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ইঙ্গিতে জানালাম, সাবধান! ভজু কাকাকে নিয়ে কিছু ব'ল না। তিনি মৃদু হেসে ভজু সর্দ্দারের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "ভজু কাকা! এ-আবার কি এখানে?"

"ভজু সর্দ্দার উত্তর কর্‌ল, "এখানেই আমাদের রাজ্যের সীমান্ত, বাবা।"

"সে এই জমিদারীকে বলত রাজ্য। এ-রাজ্যের কর্ত্তা তা'র রাজা। এ-ছাড়া সে কিছু জান্‌ত না, এখনো জানে না। এ-জিনিস যে তা'র কত আপনার তা ব'লে শেষ করা

যায় না। 'আমাদের রাজ্যের সীমান্ত' বল্‌তেই তা'র বুক যেন টান হ'য়ে তিন হাত উঁচু হ'য়ে উঠেছিল। চ'খে মুখে তা'র সে কি গর্ব্ব ফুটে বেরুচ্ছিল !

"তিনি বল্‌লেন, "তা'তে কি ?"

ভজু সর্দ্দার বল্‌ল, "এর পরই কৈলাসপুরের জমিদারী—তা'রাও সব এসেছে নিয়ে যেতে। একটু দুরেই অপেক্ষা করছে তারা।"

"অর্থাৎ তোমরা সব আমায় পাহারা দিতে দিতে নিয়ে যাবে, এই ত' ইচ্ছাটা তোমার ভজু কাকা ?"

"হাঁ, বাবা।"

"কেন, আমার কোষে তলোয়ার নেই ? আমার বাহুতে কি বল নেই ? আমি কি বিখ্যাত ঢালী-সর্দ্দারের নিকট শিক্ষা পাই নাই ?"

"লক্ষ্য করলাম সর্দ্দারের চোখ দুটো যেন আনন্দ-জ্যোতিতে জ্বলে উঠ্‌ল। গর্ব্বে বক্ষঃ স্ফীত হ'য়ে উঠ্‌ল তা'র। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বল্‌লে,

'হাঁ বাবা, প্রাণ দিয়ে তোমায় শিখিয়েছি, আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমায় নিঃশেষে দান করেছি। আমার কত বড় গর্ব্ব তুমি তা…তা' জানেন মাত্র তিনি যিনি মাথার উপরে আছেন। নিশ্চয়! নিশ্চয়! তোমার ঐ দৃঢ়মুষ্টিতে ঐ তলোয়ার থাক্‌লে সমকক্ষ একশ' বীরেরও সাধ্য নাই তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করে, তা জানি, কিন্তু বাবা তোমার সম্মান, তারপর—তারপর তোমায় একা ছেড়ে দিতে মন যে চায় না বাবা! বিদেশে তোমায় একা যেতে দিতে সাহস হয় না! তোমায় চ'খের আড়াল কর্‌তেও যে ভয় হয়! আমাদের যে আর কেউ নেই বাবা তুমি ছাড়া, অমত ক'র না বাবা।'

" 'কি যে বল্‌ছ তুমি, ভজুকাকা ? আমায় যেন একটা পুতুল ক'রে রাখ্‌তে চাও তোমরা, একটা জড় পিণ্ড ব'লে ভাবছ আমায়। আমি নিজকে নিজে রক্ষা করতে পারি না, একথা ইঙ্গিতেও কেউ জানালে আমি সহ্য করতে পারি না।'

"মুখখানা তাঁর বিরক্তিতে ভরে উঠল।

"ভজুকাকা নিরুপায়ের ন্যায় আমার দিকে একবার তাকা'ল। আমি নীরবে মাথার ঘোমটা আর একটু টেনে দিলাম। আমিও যে নিরুপায় তা তার বুঝ্‌তে আর বাকী থাক্‌ল না। সে নীরবে একটু কি ভাব্‌ল, তারপর বল্‌ল, 'আচ্ছা বাবা, তা হ'লে আমরা তোমাদের পৌঁছিয়ে দিয়ে আস্‌ছি ওখানে, ওরা সেখানে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।"

"তিনি হাস্‌লেন, বল্‌লেন, 'ভজুকাকা! রাগ করেছ বুঝি আমার উপর ?"

"বৃদ্ধ অমনি দাঁতে জিব কেটে বল্‌ল, 'রাগ করব কা'র উপর ? তোমার উপর ? ছি বাবা, এ কি বল্‌ছ তুমি ?

"তাঁ'র প্রতি স্নেহের আতিশয্যে বৃদ্ধের মুখখানা প্রফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল। তাঁর মতি-গতি একটু ভাল হয়েছে মনে ক'রে এই সুযোগে পুনরায় প্রস্তাব করল, 'আচ্ছা বাবা, আমাদের সকলকে না নাও কেবল একটী তোমার সঙ্গে যাক্ ?'

"তিনি বল্‌লেন, 'কে সে ?'

"বৃদ্ধ টান হ'য়ে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে নিজের লোকদের দিকে চেয়ে কি একটা ইঙ্গিত করল। তৎক্ষণাৎ একটী ঘোড়সওয়ার তীরবেগে ছুটে এল আমাদের দিকে। মুহূর্ত্তে আমাদের সাম্নে এসে টপ ক'রে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়্‌ল। ঠিক একটী শার্দ্দূলের ন্যায়, মাটির উপর পায়ের একটু সামান্য শব্দও শোনা গেল না। সে যখন বিনীতভাবে আমাদের দণ্ডবৎ ক'রে টান হ'য়ে দাঁড়াল তখন আমাদের প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টি তা'র উপর নিবদ্ধ হ'য়ে রইল। দীর্ঘ ঋজু দেহ, উন্নতবক্ষ, ক্ষীণ কটি, দৃঢ় মাংস-পেশী, বঙ্কিম গ্রীবা, স্কন্ধোপরি দোলায়মান দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ, শ্যেন দৃষ্টি, উন্নত নাসিকা, প্রশান্ত মুখ, তা'র দিকে চেয়ে চেয়ে মনে মনে বল্‌লাম, হাঁ বীর বটে !' প্রাণ আমার যারপর নাই উল্লসিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

"বৃদ্ধ ভজু সর্দ্দার হাসিমুখে বল্‌ল, "এই লোক, বাবা !"

"কিছুক্ষণ তা'র দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ তিনি ব'লে উঠ্‌লেন, 'ভজু কাকা ! আমাদের রক্ষা করবার মত শক্তি ওর আছে কি না, তা' ত' একবার পরীক্ষা কর্‌তে হবে' ?"

"আমার দৃষ্টি তখনো সেই লোকটীর উপরেই নিবদ্ধ ছিল। দেখ্‌লাম, তা'র প্রশ্নটা শোনা মাত্র প্রশস্ত ললাট কুঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ল। বুঝ্‌লাম তা'কে তাচ্ছিল্য করার জন্য তার অভিমানে বড় আঘাত লেগেছে। কিন্তু তা'র সেই দীর্ঘ ঋজু দেহের অন্য কোন একটু অংশ এতটুকুও তা'র চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ করল না। আশ্চর্য্য তা'র দৃঢ়তা !

"বৃদ্ধ একটু গর্ব্বের হাসি হাস্‌ল। বল্‌ল, তা-তা ওরা তোমার সমানে সমানে কি ক'রে অস্ত্র ধর্‌বে, বাবা ? ওরা যে তোমার—"

"কি সব বল্‌ছ তুমি, ভজু কাকা ? ওতে আমাতে তফাৎ কি ? আমরা সব এক।"

"এরূপ কথা শুন্‌তে তা'রা অভ্যস্ত নয়। তা'রা যা শুন্‌তে অভ্যস্ত, তা মানুষকে ছোট ক'রেই দেয়। তা'রা ছোট, তা'রা অধম এইই কেবল তা'রা জন্মাবধি শুনেছে এবং শুনে শুনে বিশ্বাসও করেছে তাই। কাজেই একথা শুনে বৃদ্ধের বুকটা যেন দশ হাত উঁচু হ'য়ে উঠল।"

"কিন্তু এখানে এই পথের মাঝে কি ক'রে…তা'র পর রাণী মা রয়েছেন সঙ্গে। লোকে যে –"

"তা'তে আর কি হ'য়েছে ? লোকের কথা ভেবে কিছু দরকার নাই, ভজু কাকা ?"

"বৃদ্ধ এই সময় একবার আমার দিকে তাকাল। উদ্দেশ্য বোধ হয়, এ বিষয়ে আমার সম্মতি আছে কি না দেখা। আমি মৃদু হাসলাম। তাই আমার সম্মতি মনে ক'রে সে সানন্দে বললে, আচ্ছা তবে আমি কিন্তু এখন তোমার গুরু, তোমার নফর'নয়, আমার আদেশ মানতে হবে—"

"তিনি বললেন, নফর তুমি কোন দিনই নও, সর্দ্দার? তুমি এ বংশের বন্ধু, আমার গুরু—অস্ত্রগুরু। তোমার আদেশ চিরদিন শিরোধার্য্য!—"

"আমি তাদের কথা শুনবার জন্য ব্যস্ত হয়ে তাদের দিকে চেয়েছিলাম। দেখছিলাম আমার সম্মুখে একজন কৃতজ্ঞ শিষ্য আর একজন শিষ্যের মহৎ ভাবে গৌরবান্বিত গুরু দণ্ডায়মান! গর্ব্বিত সর্দ্দার সজল নয়নে উর্দ্ধ দিকে চেয়ে আপন মনে বলে উঠল, 'কর্ত্তা! উপযুক্ত বংশধর তোমার—"

"আমার আনন্দ আর ধরছিল না। কিসের সে আনন্দ তা বোধ হয় বলতে হবে না, দাদা! একটা গর্ব্বে—সে যে কত বড় গর্ব্ব তা ব'লে বুঝানো যায় না—আমার মন ভরে রইল!

"এক মুহূর্ত্ত সে ওভাবে চেয়ে থাকল। পরে সে গম্ভীর কণ্ঠে ডেকে উঠল, 'শম্ভু!' সেই আগন্তুকের নাম শম্ভু।

সে সসম্ভ্রমে উত্তর করল, 'সর্দ্দার!'

সর্দ্দার আদেশ করল, "প্রস্তুত হও। শম্ভু প্রস্তুত হ'য়ে টান হ'য়ে দাঁড়াল। তিনি প্রস্তুতই ছিলেন। তাঁর দিকে চেয়ে সর্দ্দার বলল, 'লাঠিতে'?"

"তিনি বললেন, না, অস্ত্রে—খোলা তলোয়ারে।"

"বেশ! কিন্তু অস্ত্র অঙ্গে আঘাত করবে না, কেবল অস্ত্র-কৌশল, শুধু কোপ দেখিয়ে যাবে। তা দেখেই আমি জয়-পরাজয় বিবেচনা করব, আমার অঙ্গুলি হেলনে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে।"

"উভয় যোদ্ধা অস্ত্রগুরুর নিকটে এসে জানু পেতে অস্ত্র দ্বারা ললাট স্পর্শ ক'রে অভিবাদন জানাল। হঠাৎ দেখতে পেলাম শম্ভু কর্ত্তার সম্মুখে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে একই উপায়ে তাঁকে অভিবাদন করতে উদ্যত হওয়া মাত্র তিনি অস্ত্র সমেত তার হাতখানি ধরে বীরের ন্যায় ব'লে উঠলেন, না শম্ভু! এ ভাবে নয়, এস সমানে সমানে।"

"সর্দ্দার গম্ভীর কণ্ঠে ব'লে উঠল, ঠিক! এক্ষেত্রে অভিবাদন একমাত্র আমারই প্রাপ্য।"

"আর একবার সর্দ্দারের সতর্কবাণী শুনতে পেলাম—সাবধান! অস্ত্র কা'রো অঙ্গে লাগবে না—এস এবার।"

"তারা সম্মুখীন হ'য়ে দাঁড়াল।

"পুনরায় আদেশ হ'ল—প্রস্তুত? তন্মুহূর্ত্তে উভয়ের অসি কোষ-মুক্ত হ'য়ে মাথার উপরে ঝক্ ঝক্ করতে লাগল। পর মুহূর্ত্তে আদেশ হ'ল—লড়।

তৎক্ষণাৎ ইস্পাতের সংঘর্ষে একটা ভয়ানক শব্দ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ফুলকি চারিদিকে ছুটে গেল। কি ক্ষিপ্রগতি উভয়ের, সত্যই যেন বিদ্যুৎগতি! কি আশ্চর্য্য রণচাতুর্য্য! কি অদ্ভুত অস্ত্রকৌশল! মানুষ দুটি যেন বায়ুতে মিশে গেল! কেবল অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা শোনা যাচ্ছিল। থেকে থেকে অস্ত্রের সংঘর্ষণে আগুনের ফুলকি ইরম্মদের ন্যায় বায়ু-পথে ছুটতে দেখছিলাম।

শঙ্কিত সর্দ্দার অস্থির হ'য়ে ছুটাছুটি করছিল তাদের চারিদিকে। আমি রুদ্ধশ্বাসে সে যুদ্ধ দেখলাম। উত্তেজনায় আমার শরীর তপ্ত হয়ে যেন কাঁপছিল। আমার নিজের বুকের দ্রুত স্পন্দন অনুভব করতে করতে নিজেই চমকে উঠেছিলাম।

আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ন্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাদের পরীক্ষা করছিল। শম্ভু বারম্বার তাঁহার অপ্রতিহত গতি রোধ করলেও তার শরীরের উপর বার কয়েক তলোয়ারের কোপের সঙ্কেত তিনি করে গেলেন।

সর্দ্দার হৃষ্টচিত্তে সেগুলির হিসাব রাখছিল। আমারও মনে মনে আনন্দ হওয়ায় একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম। হঠাৎ তাদের দিকে চাইতেই আমার দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল। এই সময় শম্ভু প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণ কৌশলে ব্যর্থ করে তড়িতের ন্যায় অদম্য গতিতে তাঁর উপর এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের তলোয়ার অব্যর্থ সন্ধানে অদ্ভুত কৌশলে প্রতিদ্বন্দ্বীর কেশাগ্রমাত্র স্পর্শ ক'রে ফিরে গেল। একটু—একটুমাত্র আঘাতে নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা তার! শুধু স্পর্শ ক'রে অস্ত্র ফিরে গেল। কত সবল বাহুতে ধরা ছিল সে তলোয়ার তা' এখন আমি ভাবতেও পারি না। চোখের সামনে তাঁর নিশ্চিত মৃত্যু থেকে শম্ভুর অস্ত্র-চালনার সঙ্গে সঙ্গে আমি আতঙ্কে শিউরে উঠে প্রাণপণে চীৎকার করতে গিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে থর্ থর্ ক'রে কাঁপছিলাম।

এই সময় সহসা আদেশ হ'ল "থাম। আর না।"

চেয়ে দেখলাম—তারা রণশ্রান্ত শার্দ্দুলের ন্যায় চোখাচোখি চেয়ে তলোয়ারে ভর করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাপাচ্ছে। একটু পরে সর্দ্দার বলে উঠল 'আমার বিচার এই'—তারা উৎসুক নেত্রে তার দিকে চেয়ে রইল। এই সময় অন্য লোকজন সব ফলাফল শুনবার জন্য এসে নিকটে উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়ায়েছিল। সর্দ্দার শম্ভুর দিকে ফিরে বলল, 'তোমার কেরদানি কিছুই দেখতে পাওয়া যায়নি—তার পর তাঁর দিকে চেয়ে স্মিতমুখে বলল, তোমার তিন কোপ পরিষ্কার তিনটি, সুতরাং জয়মাল্য তো—'

"না—" আমি চীৎকার ক'রে উঠলাম,—না, আমার নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই চমকে উঠলাম। কখন বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ওরকম চীৎকার ক'রে উঠেছিলাম তা আমি

বুঝতেই পারি নাই। বললাম, "না সর্দ্দার! তুমি স্নেহে অন্ধ। জয়মাল্য শম্ভুর প্রাপ্য।"

সকলের সম্মিলিত বিস্মিত দৃষ্টি আমার উপর স্থাপিত হ'ল। চিন্ময় রায়ের কুলবধূ তাদের সম্মুখে! এখানে? ওই পথের মাঝে? যুদ্ধক্ষেত্রে? তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কুলবধূ এ কি বলছে? এ দৃশ্য অপ্রত্যাশিত অসম্ভব, কল্পনাতীত! তারা স্তম্ভিত, স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল, নিস্পন্দ, নির্ব্বাক! বিশেষ ক'রে সর্দ্দারের চোখ-মুখ অসীম বিস্ময়ে ভরা! এমন কি তাঁর পর্য্যন্ত বিস্ময়ের অন্ত ছিল না।

সর্দ্দার বিস্মিত কণ্ঠে বলল, "মা! তুমি—তুমি!" বৃদ্ধ বলতে বলতে থেমে গেল। কিন্তু তার মনোভাব স্পষ্টই বুঝতে পারলাম।

"শম্ভুর প্রাপ্য বলছ মা?"

"'হাঁ, সর্দ্দার।'

"কি ক'রে?—কি ক'রে?—তুমি ঠিক দেখেছ, মা?

"আমার জ্ঞান সম্বন্ধে বৃদ্ধের সন্দেহ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু তা প্রকাশ করতে তার যারপর নাই সঙ্কোচ হচ্ছিল। আমি তখনি তার সে সন্দেহ দূর ক'রে দিলাম। বললাম, 'ঠিক দেখেছি আমি—শম্ভুর শেষ আক্রমণ তিনি রোধ করতে পারেন নি। তার তলোয়ার অব্যর্থ সন্ধানে প্রতিদ্বন্দ্বীর শির লক্ষ্য ক'রে বিদ্যুদ্বেগে ছুটে গেল। মুহূর্ত্তে শির লুটিয়ে পড়বে পৃথিবীর বুকে—নিশ্চয় নিশ্চয়!

আমি ভয়ে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলাম, কিন্তু আর্ত্তনাদ ফুটে বেরুল না, কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দেখলাম শম্ভুর তলোয়ার অতি অদ্ভুতভাবে কেবল তাঁর কেশ স্পর্শ ক'রে ফিরে গেল! অঙ্গ স্পর্শ পর্য্যন্ত করে নি তাঁর। তিনি জানতে পর্য্যন্ত পারেন নি তা। অদ্ভুত!—অদ্ভুত শিক্ষা শম্ভুর!—

"বৃদ্ধের বিস্ময় আরো বেড়ে গেল।"

"আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! যা আমারও দৃষ্টি এড়িয়ে গেল, তা ধরা পড়ল রাণী-মার কাছে? সত্যিই কি তবে অন্ধ হয়েছিলাম স্নেহে? হয় ত' তাই—কিন্তু—কিন্তু তিনি কি তবে?—"

"বৃদ্ধ কথাগুলি মনে মনে ভাবতে থাকলেও কখন তার বিস্মিত কণ্ঠে তা উচ্চারিত হয়ে উঠছিল তা সে জানতেও পারে নাই।

"তবে কি এ-বিদ্যা জানা রাণীমার? নিশ্চয়, নিশ্চয়, তা না হ'লে এমন সূক্ষ্ম দৃষ্টি তাঁর হ'ত না। প্রশ্ন অতি স্পষ্ট। অদূরে দাঁড়িয়ে তিনি হেসে উঠলেন। তাঁর উপর এমন রাগ হতে লাগল আমার যে তা আর তোমায় কি বলব। কতবার চ'খের ইঙ্গিত করলাম তাঁকে না হাসতে কিছু প্রকাশ না করতে। কিন্তু কে শুনে কার কথা। তার মনে তিনি হেসেই যাচ্ছিলেন। জান ত' দাদা, তাঁর খেয়াল। করি, চুপ ক'রে দাঁড়িয়েই থাকলাম। বিস্মিত বৃদ্ধ পুনরায় ওঁর দিকে চেয়ে পুনরায় আমার দিকে তাকাল। তার অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে আমার মাথা নত হয়ে পড়ল। একটু পরেই মাথা উঠিয়েই বৃদ্ধের প্রসন্ন মুখ সর্ব্বপ্রথম দেখতে পেলাম। সে ডাকল, "মা!—" বড় আনন্দের ডাক! চোখ-মুখ তার আনন্দে যেন ডুবু-ডুবু! তার পরের প্রশ্ন কি তা বুঝতেই পারছিলাম। তাকে আর অবসর না দিয়ে হঠাৎ বলে উঠলাম, "সর্দ্দার! শম্ভু জয়ী, এখনো তোমার বলা হয় নাই তা..."

"হাঁ মা' ব'লে কর্ত্তব্যপরায়ণ বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ তার প্রভুর দিকে ফিরে গম্ভীর ভাবে বলল, "তোমার পরাজয়—" তারপর শম্ভুর দিকে চেয়ে বলল, "শম্ভু! তোর জয়! ভাগ্যবান তুই!"

"শম্ভু আনন্দে ঘোড়ার প্রথামত দূর হতেই অস্ত্রসমেত গুরুকে প্রণাম জানাল এবং বিনীতভাবে সদাহাস্যময় প্রভুর নিকট উপস্থিত হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে যেতেই প্রভু তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে ব'লে উঠলেন, "ওরা বলছে তুই আমায় হারিয়েছিস্ শম্ভু। আয় তোকে এবার কুস্তিতে হারাব।" ব'লেই তাকে দুই ধাক্কায় দূরে সরিয়ে দিয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে মালকোচা করে মল্লের ন্যায় দাঁড়ালেন। শম্ভু স্মিতমুখে নতমস্তকে অদূরে দাঁড়িয়ে সর্দ্দারের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করতে থাকল। সর্দ্দার হাসিমুখে প্রভুকে সম্বোধন করে বলল, "না, বাবা, থাক, এখন সময় নেই।" কেবল একটা প্যাঁচ হয়ে যাক না সর্দ্দার? ব'লে তিনি জেদ করতে লাগলেন। আমি বহু চেষ্টায় তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ইঙ্গিতে তাঁকে ও-সব করতে বারণ করলাম। আমার সৌভাগ্যবশতঃ তিনি ইঙ্গিতটা মেনে নিলেন। চেয়ে থাকলেন আমার দিকে। মুখে সেই হাসি—সেই অপূর্ব্ব হাসি; যার তুলনা হয় না! তেমন হাসিও আর কোথাও কারো দেখলাম না, দাদা? অমন মানুষ, অমন হাসি বুঝি আর হয় না।"

মীনা মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, সর্দ্দারকে ডেকে বললাম, "ভজু কাকা! শম্ভুকে ডেকে দাও ত' এখানে?"

"সর্দ্দারের ইঙ্গিতে শম্ভু নিকটে এসে তফাৎ থেকেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে ব'লে উঠল, "মা! আশীর্ব্বাদ—"

"একটীবার মাত্র মাতৃ-সম্বোধনে আমার অন্তরে বাহিরে কি যেমন কি একটা ঘটে গেল! আমার বাস্তব জগৎ যেন কেমন ওলট পালট হয়ে গেল! আমি তখন মাতৃ-গৌরবে আত্মহারা, আমার যে তখন কি হ'ল তা আমি ব্যক্ত করতেও এখন অক্ষম। আমার দক্ষিণ হস্ত আপনা থেকেই উর্দ্ধে উঠে আশীর্ব্বাদ করার ভঙ্গিতে স্থির হ'য়ে রইল। আমার

গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল, "শম্ভু! পুত্র! মায়ের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।"

"শম্ভু মাথা তুলে চ'খ মেলে আমার দিকে চাইল। সন্তানেরই ন্যায় ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকল আমার পানে। আমাতে বোধ হয় তখন সে মাতৃ-মূর্ত্তিই দেখছিল। আনন্দ-ভরা হৃদয়ে সে বলে উঠল, "মা!" হাত দু'টী তার অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বুকের কাছে এসে থামল। দেখতে দেখতে আমার হাত দু'টী আমারই গলা থেকে ছ'লহর মোতির মালা তুলে নিয়ে এল। মোতির মালা আমার হাতের মধ্যে বায়ুতে থেকে থেকে দুলতে লগেল। বলে উঠলাম, "শম্ভু পুরস্কার গ্রহণ কর।"

"শম্ভুর গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল, "মা! শম্ভু শুধু মায়ের স্নেহেরই ভিখারী।"

"শম্ভু! এই-ই আমার স্নেহের চিহ্ন, আশীর্ব্বাদ-পূত—ধর, গ্রহণ কর।"

"শম্ভু নতশিরে অঞ্জলিপুটে উহা গ্রহণ করবামাত্র অন্য সকলে প্রভুর জয়ধ্বনি করে উঠল! শম্ভু যেন আনন্দে পাগল হয়ে ছুটে গেল তার সঙ্গীদের কাছে। কোথা থেকে ধাঁ করে দু'হাতে দু'খানা খোলা তলোয়ার নিয়ে রেকাবে পা না দিয়েই একটু দূর থেকেই একলাফে তার ঘোড়ায় চড়ে বসল। তার ইঙ্গিত পাবামাত্র শিক্ষিত ঘোড়া টপকে ছুটে বেরুল। তলোয়ার ঘুরাতে ঘুরাতে শম্ভু একসময় ধাবমান ঘোড়ার উপর উঠে দাঁড়াল। তলোয়ার তার ঘুরছিল এত দ্রুত যে তা দেখা যাচ্ছিল না, বায়ুতে যেন মিশে গিয়েছিল। এই সময় উনি এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। একটু দূরে পেছনে ভজু সর্দ্দার। ঠিক যেন একটা উল্কাপাতের ন্যায় ক্রীড়মান শম্ভু আমাদের চ'খের সামনে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। "সাবাস্! সাবাস।" বলে উনি প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টিতে সে-দিকে চেয়ে থাকলেন। আমি সর্দ্দারকে সম্বোধন ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম, "শম্ভু কোন্ জাতি?"

সে সগর্ব্বে উত্তর করল, "আমার স্বজাতি—নমঃশূদ্র।"

তৎক্ষণাৎ গম্ভীর কণ্ঠে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল, "না সর্দ্দার! তোমরা নমঃশূদ্র নও, নমঃসিংহ—"

"চেয়ে দেখলাম বৃদ্ধের তেজস্বী মূর্ত্তি গম্ভীর হয়ে উঠল। চ'খ তার জ্বল্ জ্বল্ করতে লাগল—চ'খ থেকে তেজঃ যেন ফুটে বেরুচ্ছিল, ভ্রূ কুঞ্চিত হ'ল। ললাটের শিরাগুলি স্ফীত হয়ে উঠল, পলকহীন দৃষ্টি তার দিক্ চক্রবালে নিবদ্ধ হয়ে রইল। কোন্ সুদূর অতীত যেন তার চ'খের সামনে ছবির ন্যায় ভেসে উঠেছিল। দেখতে দেখতে বৃদ্ধের দৃষ্টি যেন কি এক অব্যক্ত বেদনায় ব্যথিত হয়ে উঠল। সহসা একটা সুদীর্ঘ শ্বাসের সঙ্গে সে বলে উঠল, "হায় মা! এখনো যদি দেশ তা ব'লে গ্রহণ করত।"

"এই সময় আর একটী লোক একটা প্রকাণ্ড বর্শা ঊর্দ্ধে ছুড়ে দিয়ে তীর বেগে অনেক দূর ঘোড়া ছুটিয়ে এসে অ লীলাক্রমে তা শূন্যেই ধ'রে ফেলল। উনি প্রশংসা করতে লাগলেন। আমি সর্দ্দারকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এ কোন্ জাতি?" উত্তর পেলাম, "বাগ্দী।"

"আরো একটী ঘোড়সওয়ার বায়ুবেগে ছুটে আসছিল। আমাদের দিকে। ঘোড়ার খালি পিঠে লাগাম না ধ'রে অনায়াসে বসেছিল সে। হাতে তার তীর-ধনু। আমাদের সম্মুখ দিয়ে তীর ছুড়ে একটা প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় ছুটে গেল সে। অদূরবর্ত্তী তালশীর্ষ সে লক্ষ্য করছিল। তার গিয়ে দেখতে দেখতে সেখানে বিদ্ধ হ'ল। উনি উল্লাসে 'সাবাস্; সাবাস্' বলে চীৎকার ক'রে উঠলেন।

"আমি সর্দ্দারকে সম্বোধন করে সেইরূপ প্রশ্ন করলাম, "এরা?"

"বৃদ্ধের সেই একই রূপ গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর হ'ল "সাঁওতাল।"

পনের

"বৃদ্ধ সর্দ্দার যখন অতীতে বিচরণ করতে করতে অস্বা-ভাবিক রূপে গম্ভীর হয়ে পড়েছিল, উনি যখন লোকজনদের অস্ত্র-শস্ত্রের ক্রীড়া-কৌশলে উল্লসিত এবং মুগ্ধ হয়েছিলেন, আমার মনে তখন কি হচ্ছিল, জান দাদা? ভাবছিলাম, রাজ-চক্রবর্ত্তী স্বয়ং রামচন্দ্রকে যাদের সখ্য ভিক্ষা করতে হয়েছিল এবং যাদের সখ্য লাভ ক'রে তিনি ধন্য হয়েছিলেন, তাদের কি ক'রে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ক'রে এমন অস্পৃশ্য ক'রে তুললাম আমরা। আশ্চর্য্য! সবল বাহু যুগ যুগ ধ'রে অবহেলা, অনাদর, অমর্য্যাদা এবং অকর্ম্মণ্যতার মধ্যে প'ড়ে থেকে থেকে আজ অসার, পঙ্গু হয়ে গেছে! বিপন্ন অপরাজ প্রাণভয়ে কাতরে সাহায্য ভিক্ষা করলেও আজ আর তার সাড়া পায় না। বাহুই যদি গেল তখন অপরাজ আর কি করে আত্মরক্ষা করবে? তবে কি মৃত্যু অনিবার্য্য? এত বীর্য্যবান্ রয়েছে দেশময়, তবুও কেন শুনতে পাই তেজবীর্য্য নাই এদের, এরা মৃত? সত্যিই কি তাই? তাঁরা কি শুধু শুষ্ক তৃণাচ্ছাদিত কাঠামের উপর মাটির গড়া পুতুল, অন্তঃসার বিহীন, জীবনহীন? শুধু একটী সুন্দর পুতুল মাত্র, দেব-দেবী বা মানুষ নয়? সবই ত রয়েছে—যে উপাদানে গ'ড়ে উঠে সর্ব্বাঙ্গ, তা ত রয়েছে প্রস্তুত নৈবেদ্যের আকারে, কিন্তু দেবতার পদে তা নিবেদন করবে কে? কোথা সেই পুরোহিত যাঁর মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে মৃত উপাদানগুলি সঞ্জীবিত হয়ে উঠে মানুষ গড়ে তুলবে? ভাবনায় অবসন্ন মন আমার তখন আশার বাণী শুনিয়েছিল—ওরে শান্ত হ, শান্ত হ, এসেছে, সেদিন এসেছে, আর দেরী নাই, অভাব কিসের? নাই কি? এ

প্রশ্ন নিরন্তর আমার অন্তর আমায় করেছে! একদিন আমার অন্তরাত্মা এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন—নাই কি? নাই প্রাণ, আদেশ করেছিলেন, এই ব'লে—চাই বলি—আত্ম-বলি—হিংসা, দ্বেষ, অভিমান বলি, পরার্থে—তবেই পাবি ভাইকে সবাইকে-জগৎকে—"

"মা!—বৃদ্ধের মাতৃ-সম্বোধনে চম্‌কে চেয়ে দেখলাম আমার নিকটেই পাল্কী প্রস্তুত। বড় বেগে একটা দীর্ঘশ্বাস ছুটে এল। ধীরে ধীরে তা ত্যাগ ক'রে নীরবে পাল্কীতে উঠে বসলাম। কিন্তু তিনি তখনো সে-স্থান ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর মন তখনো লোকজনদের সেই তলোয়ার বর্শা প্রভৃতির দিকে ছিল। বৃদ্ধকে কেবলই বল্‌ছিলেন, ভজু কাকা! একটু—"

"বৃদ্ধ বল্‌ছিল, না বাবা, আর সময় নেই। ওদিকে ওরা-কুটুম্বরা অপেক্ষা করছেন। এখানে আর এসব ভাল দেখায় না, লোকে বল্‌বে কি?"

"তার জেদে অগত্যা তিনি এসে পাল্কীতে উঠলেন।"

"তখনো আমার মন থেকে সে-ভাবগুলি যায় নাই। মনটা কেবল তরঙ্গায়িত হচ্ছিল। নীরবে অন্যদিকে চেয়ে-ছিলাম। হঠাৎ তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়তেই দেখলাম তিনি গম্ভীর হয়ে আছেন। একটু বিস্মিত হ'য়ে ভাবলাম, তাঁর ত এ স্বভাব নয়! মনে কেমন একটা খটকা লাগল। ধীরে ধীরে তাঁর একখানি হাত আমার হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে বল্‌লাম, রাগ করেছ?"

"চোখ-মুখের ভাবটা যারপর নাই কঠিন ক'রে আমার দিকে দৃক্‌পাত পর্য্যন্ত না ক'রে ব'লে উঠলেন, এত লোকের মাঝখানে আমায় এমন অপমান করলে, আবার জিজ্ঞাসা করছ রাগ করেছি কি না?—"

"সত্যিই তিনি অপমান বোধ করেছেন ভেবে মনে মনে ভারি অনুতপ্ত হ'লাম। তাঁর দু'খানা হাতই এবার আমার হাতের মধ্যে নিয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বল্‌লাম, আমি বুঝি ইচ্ছা ক'রে করেছি কিছু? ওরকম একটা বাধা না দিলে যে একটা মিথ্যা কাণ্ড হ'য়ে যেত, লোকজনেরা অলক্ষ্যে হাসত, তোমার প্রতি ওদের অশ্রদ্ধা দেখলে আমার বুঝি তা সহ্য হ'ত! শম্ভু অতি সাঙ্ঘাতিক যোদ্ধা, যারপর নাই ক্ষিপ্রগতি। অস্ত্রধারণে সিদ্ধহস্ত না হ'লে তার তলোয়ার এমন অদ্ভুত ভাবে তোমার কেশমাত্র স্পর্শ ক'রে ফিরে যেত না। সে দৃশ্যে আমারও অন্তর কেঁপে উঠেছিল, ভয়ে আমি আর্ত্তনাদ ক'রে উঠেছিলাম, কিন্তু আমার শুষ্ক, জড়ীভূত কণ্ঠ ভেদ ক'রে সে আর্ত্তনাদ বাইরে প্রকাশ পায় নাই। তোমার যে অপমান হ'ত?"

"আমার চ'খের পাতা দুটী জলে ভিজে উঠেছিল। এটা নারীর স্বভাব নয় কি দাদা?"

বহুক্ষণ ধরিয়া নীরবে স্তব্ধ হইয়া তাঁহার অ ধারণ কাহিনী শুনিতে শুনিতে ভাবিতেছিলাম—আজও তবে এদেশে এমন মেয়ে হয়!" হঠাৎ এত কথা এত ভাবনার মাঝখানে তাহার প্রশ্নে আমি যেন চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম, "কোন্‌টা মীনা?"

মীনা বলিল, "এই যে নারীর স্বামীর মনোরঞ্জনকারিণী মনোবৃত্তি। স্বামীর অসন্তোষ উৎপাদনের ভয়ে সদা ভীতা নারীর অশ্রু-তর্পণ।"

"তা হয় ত হবে। ভাল বুঝি না। তুমি বল্‌ছ এটা তার স্বভাব। কিন্তু সত্যিই কি এতে কপটতা কিছু নাই?"

"কপটতা!" যেন একটা অভাবনীয় অপমানজনক কথা শুনিয়া সে স্তব্ধ, অবাক হইয়া কেবল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। নীরবে তাহার উত্তর প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

মীনা বলিয়া উঠিল, "কি বল্‌লে, কপটতা? কি অপমান, নারীর করছ এই একটী মাত্র কথায়! তোমরা নারীকে কেবল প্রহেলিকা বলেই ক্ষান্ত হও নাই, ভাবে, কথায়, কার্য্যে আরো কত বৃথা অপমানের বোঝা তার মাথায় চাপিয়ে দিয়েছ। কিন্তু কতটুকু জান তোমরা নারীর? তোমাদের ধৃষ্টতা দেখে অবাক হই! কি অবুঝ তোমরা, আশ্চর্য্য!"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া তাহার দিকে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কিন্তু মীনা আমার একটা কথার জবাব দিতে পার?—"

সে মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিল। বুঝিলাম সে আমার প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত।

এই প্রশ্ন করিলাম, "সত্যিই কি নারী মনে-প্রাণে স্বামীর গৌরবে গৌরব, মানে মান, অপমানে অপমান, দুঃখে দুঃখ, সুখে সুখ অনুভব করে? সত্যিই কি সে নিজের অস্তিত্ব এভাবে ভুলে যেতে পারে, নিজের সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারে আর একটী লোকের জন্য—যে তাকে গ্রাহ্য করলেও করতে পারে, না করলেও না করতে পারে? সত্যিই কি তার এই ত্যাগে—এই আপাতদৃষ্ট ত্যাগে কোন স্বার্থগন্ধ নাই? তার ভোগ, বিলাস, বাসনা, ভবিষ্যৎ জীবনের স্বার্থ এমনভাবে বলি দেওয়া তার পক্ষে কি সম্ভব? দেহ ও মনের এই স্বাভাবিক ধর্ম্মজ্ঞান বর্জ্জন করা কি মানুষের অসাধ্য নয়? নারী ত মানুষ, মীনা! এসব—এই স্বামীর জন্য নারীর এ সব করা—কি অনেকটা লোক-দেখান বা সংস্কারের জন্যই তারা ক'রে থাকে না? তার পক্ষে কি ওসব সম্ভব, মীনা?

"নিশ্চয়—নিশ্চয় সে পারে এসব! এ তার পক্ষে অতি সহজ ধর্ম্ম। যে না পারে সে নারীনামের অযোগ্যা—সে নারী নয়!—"

আহত ফণিনীর ন্যায় গ্রীবা দোলাইয়া সে যেন গর্জ্জিয়া উঠিল। চোখ-মুখ তাহার আরক্ত হইয়া উঠিল। চোখ হইতে যেন আগুনের ফুলকি ছুটিতে লাগিল। তপ্ত শোণিত-প্রবাহ এই উত্তেজিতা নারীর কোমলাঙ্গকে যেন থাকিয়া থাকিয়া কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল, আমি স্তব্ধ হইয়া সেই তেজস্বিনী নারীর দিকে নীরবে রুদ্ধশ্বাসে চাহিয়া রহিলাম।

বিরুদ্ধভাবাপন্ন উপাদানে গঠিত পুরুষ এবং নারীর দেহ ও মন। নারীত্ব কি, নারীর মনস্তত্ত্ব বা নারীর মনোবৃত্তি কি, তা তুমি তোমার ও দেহ ও মন দিয়ে কি ক'রে বুঝবে? তা যে সম্ভব নয়। তুমি যে নারী নও। ব্রহ্মাণ্ডের বীজ নিহিত রয়েছে যে নারী-শক্তিতে, জগতের মঙ্গলামঙ্গল বিশেষভাবে নির্ভর করছে যার ইচ্ছার উপর, তাকে তোমরা কত ছোট ক'রে দেখছ, আশ্চর্য্য! কতটুকু জ্ঞান তোমরা তাদের? কি ধৃষ্টতা!"

আমি সেই একইভাবে মূক হইয়া বসিয়া তাহার গম্ভীর তেজোদীপ্ত মুখ লক্ষ্য করছিলাম। কিছুকাল সে নীরব হইয়া রহিল। হঠাৎ এক সময় দেখিতে পাইলাম তাহার অধরকোণে মৃদুহাসি ফুটিয়া উঠিতেছে। অবাক হইলাম। কারণ জানিতে আর অপেক্ষা করিতে হইল না। সে বলিল, "তোমার এ মনোবৃত্তির জন্য তুমি দায়ী নও। বর্ত্তমান যুগই এজন্য দায়ী—অর্থাৎ, যা কিছু আছে তা ভাল নয়, তাকে ধ্বংস করতে হবে, কেন না তা নারী-প্রগতির পরিপন্থী। কিন্তু তার পরে কি, তা ধ্বংস করে কি করতে হবে, কোন্ পথে অগ্রসর হতে হবে, তা কারো জানা নাই, ভাবেও না বড় সেজন্য কেউ···উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল সব ধ্বংসের স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে ভেসে চলেছে, এই-ই যদি প্রগতি, তবে মৃত্যু কত দূর?

সে নীরব হইল। তাহার কথাগুলি অন্তরে তরঙ্গ তুলিয়া বড় জোরে আঘাত করিতে লাগিল। গবাক্ষ দিয়া নীল আকাশের গায়ে ভেসে-চলা শুভ্র মেঘগুলির দিকে ভাবিত অন্তরে চাহিয়া রহিলাম। বোধ হয় বহুক্ষণ ছিলাম এভাবে। হঠাৎ যখন কক্ষের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলাম তখন দেখিলাম হীরুর সেই প্রতিকৃতির দিকে তাহার পলকহীন দৃষ্টি নিবদ্ধ। হঠাৎ এক সময় তাহার সারা মুখখানা হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "শোন দাদা, কেমন দুষ্টুমি তার? আমায় অমন ক'রে ভাবিয়ে তুলে, আমায় নাকের জলে চ'খের জলে এক ক'রে, অস্থির ক'রে তুলে শেষে কি না সে হাসতে লাগলো? আমি অবাক হয়ে তার দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে ভাবছি, একি! কিন্তু তার হাসি আর থামে না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কথা নাই, বার্ত্তা নাই' হঠাৎ তুমি ওভাবে হাসছ যে?" সে অম্নি হাসতে হাসতে গানের সুর ক'রে ব'লে উঠলো, "আমার কিন্তু কিছু দোষ নাই, নিজের কথা সে নিজেই প্রকাশ ক'রে দিয়েছে।"

প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, 'কে সে?' কিন্তু তখনি তার কথার অর্থ বুঝতে পেরে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ ক'রে বল্লাম, "ও—ও -ও—কি দুষ্টু! এসবই তোমার চালাকি?"

হাসতে হাসতে বল্লেন, "আমি কি তোমায় বলেছিলাম না কি, যে হে মহাশক্তি, মহিষমর্দ্দিনীরূপে তুমি অবতীর্ণ হও?"

"তোমার জন্যই ত এত সব কাণ্ড হল। কিছুর মধ্যে কিছু না পথের মাঝে হঠাৎ আরম্ভ করে দিলে একটা তুমুল কাণ্ড। তুমি ওরকম কিছু না করলে ত আর আমি কিছু করতে যেতাম না? কি লজ্জায়ই ফেলেছ তুমি আমায়? ভজুকাকা, লোকজন সবাই এখন জেনে গেল। তোমার জ্বালায় যদি পথ চলবারও জো আছে।"

"তা ভালই ত হয়েছে। এখন থেকে ত আর তোমার লজ্জা করবার দরকার নাই? বা লোকে জান্‌বার ভয়ও আর নাই। তোমায় সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে এবার ইচ্ছামত দেশময় ঘুরে' বেড়াব···"

"যাও···তোমার কেবল ঐ এক কথা।"

"তবুও তিনি হাস্‌ছিলেন। আমিও আর রাগের মুখোস পরে থাক্‌তে পার্‌লাম না। তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে হেসে বল্লাম, "তুমি যা-কর, আমি যেন কেমন করে গিয়ে পড়ি তার মধ্যে। কিসের এ টান?···" তিনি মধুর হাসি হেসে আবার আমার হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে অনিমেষ নয়নে চেয়ে থাক্‌লেন নীরবে আমার মুখের দিকে। সত্যি কি যে সব করেছি এতক্ষণ! মনে হচ্ছে যেন স্বপ্নের দেশে ঘুরে এসেছি এতক্ষণ! যেন একটা আশ্চর্য্য আরব্যোপন্যাসের কাণ্ড ঘটে গেল এতক্ষণ ধ'রে!

বল্লেন, "ও স্বপ্ন নয়, মীনু! সত্যিকার, আমার মানস পূত! আমি যে চিরদিন তোমায় নিয়ে সেই আরব্যোপন্যাসের রাজ্যেই ঘুরে বেড়াতে চাই। ইচ্ছা হয়, সেই ঘোড়া আমাদের চল্‌তে থাক্ চিরদিন, আর যেন আমরা ফিরে না আসি... মীনু! মীনু! আজ যে আনন্দ আনন্দ আর আমার অন্তরে ধরছে না, দুকূল ছাপিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে আমায় এক অজানা আনন্দের রাজ্যে, সেখানে কেবল তুমি আর আমি, আর আনন্দ। ভাষা আমার হারিয়ে গেছে, প্রকাশ কর্‌তে পারছি না আমার কিছুই···মীনু! এত আনন্দ! আজ বুঝি পাগল হয়ে যাব।" আমায় আলিঙ্গনবদ্ধ করলেন, আমি দুনিয়া ভুলে তাঁর বুকে আশ্রয় নিলাম।

তাহারা স্বামী স্ত্রী আমার কাছে অন্তর খুলিয়া দেখাইতে চিরদিনই দ্বিধাহীন। সেই একই প্রকার দ্বিধাশূন্যভাবে মীনা তাহার গোপনে যতনে রক্ষিত মর্ম্মকথা বলিয়া গেল। সে চোখ বুজিয়া নীরব হইয়া রহিল। তাহার আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমার মনে হইল মীনা যেন সত্যি সত্যি স্বামী-সঙ্গ এবং স্বামীর অঙ্গ-স্পর্শ-সুখ অনুভব করিতেছে।

[ক্রমশঃ
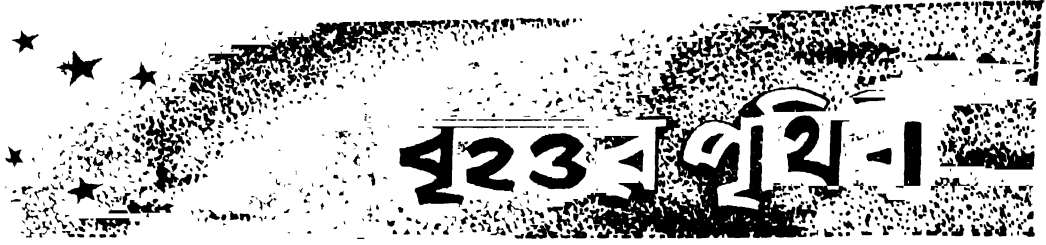
আমেরিকা ও ভারতবর্ষ

শ্রীতারানাথ রায় চৌধুরী

(১৯৪৩)

বর্ত্তমান বিশ্ব-সমরে আমেরিকা ইংলণ্ডের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াতে আজ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ এই কলিকাতা সহরে আমরা লক্ষ লক্ষ আমেরিকান সৈন্যকে দেখিতে পাইতেছি। তাহাদের বদান্যতা, সহৃদয়তা, কুশলতা ও ত্যাগ স্বীকারের নানা কথাও আমাদের সমাজে প্রচারিত হইয়া আমাদের কৌতুহল বৃদ্ধি করিয়াছে, আমেরিকা ও তাহার অধিবাসী সম্বন্ধে কিছু জানিবারও আমাদের বাসনা হইয়াছে, ইতিমধ্যে আমেরিকাবাসীর গোচরার্থে বহু পুথি, পুস্তকও নানাজনে লিখিয়া আমাদের কৌতুহল নিবৃত্তি করিয়াছেন।

আমেরিকা ইউরোপীয় জাতির উপনিবেশ মাত্র। এক সময়ে ব্রিটেন উহার মালিক ছিল, তাহার পর আমেরিকানরা ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া যুক্তরাজ্যকে অর্থাৎ ইউনাইটেড ষ্টেটস্ অব আমেরিকাকে স্বাধীন করে। বাঙ্গালী পাঠক মাত্রই স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস পড়িয়াছেন এবং সেই দিনও কলিকাতা সহরে ঘটা করিয়া স্বাধীনতা দিবস পালন করা হইয়াছে, এই আমেরিকা আজ ইংরেজের পরম মিত্র—রণে সহায়। এই যুদ্ধে যদি আমেরিকা আসিয়া না দাঁড়াত তাহা হইলে এত দিনে যুদ্ধও ইউরোপের ঘোরতর পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া বন্ধ হইত।

আমেরিকা একটী গণতান্ত্রিক দেশ। অনেকগুলি প্রদেশকে একটী যুক্ত শাসন-সংসদের মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া এই যুক্তরাজ্য গঠিত হইয়াছে। আদিম আমেরিকান অর্থাৎ রেড ইণ্ডিয়ান গণ (নিগ্রো প্রভৃতি জাতি সমন্বয়ে এই রেড ইণ্ডিয়ান সমাজ গঠিত হইয়াছে) ও আমেরিকার শ্বেতাঙ্গগণ এই যুদ্ধে বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি মিঃ রুজভেল্টের পরিচালনাধীনে ইউরোপীয় ও এশিয়ার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে, এই বঙ্গদেশে ও আসামেও বহু নিগ্রো জাপানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বসিয়া আছে।

আমাদের দেশ রক্ষা করিবার জন্য আমেরিকান সৈন্য আমাদের দেশে আসিয়াছে। এই কথাই ইংরেজ সরকার আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন এবং আমাদিগকে অস্ত্রহীন করিয়া ইহাও জানাইয়া দিয়াছেন যে আমরা স্বীয় দেশ রক্ষা কার্য্যে সম্পূর্ণ অপারগ, কাজেই ব্রিটিশ, আমেরিকান, নিউ-জিলাণ্ডার, অষ্ট্রেলিয়ান, আফ্রিকান ও নিগ্রো সৈন্যের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই কলিকাতায় লক্ষ লক্ষ আমেরিকান সৈন্য উপস্থিত আছে।

বর্ত্তমান আমেরিকা জ্ঞানে বিজ্ঞানে খুবই উন্নত হইয়াছে, আমেরিকাকে পৃথিবীর ধনকুবেরের দেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একমাত্র ব্যবসায় দ্বারাই তাহাদের এই ঐশ্বর্য্য এবং প্রতিনিয়তই তাহাদের চেষ্টা হইতেছে কি উপায়ে তাহারা আরও ঐশ্বর্য্য বাড়াইতে পারে।

সর্ব্ব বিষয়ে আমেরিকা উন্নতিলাভ করিয়াছে, স্থপতি বিদ্যায়, সঙ্গীতে, বিজ্ঞানে,—ভুতত্ত্বে, নৌবিদ্যায়, সমর কৌশলেও আমেরিকা আজ জগতে শ্রেষ্ঠস্থান দখল করিয়া বসিয়াছে। সভ্য জগতের বর্ত্তমান মাপকাটিতে মাপিতে বসিলে আমেরিকার স্থান আজ প্রথম, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিগত এক শত বৎসরে আমেরিকা যে উন্নতি লাভ করিয়াছে আজ বিশেষভাবে তাহার অনুশীলন করিলে জগতের সকল জাতিকেই বিস্মিত হইতে হইবে, কিন্তু আমরা ভারতবাসী অষ্টাবিংশ উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীতে সভ্যজাতির তুলনায় কোন উন্নতি লাভ করিতে পারি নাই। প্রথম আমেরিকার শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইব, যুক্তরাজ্যের জনসাধারণকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য আমেরিকার জনপ্রতিনিধিগণের কিরূপ উদ্যম ও অধ্যবসায়।

গত পঞ্চাশ বৎসরে যুক্তরাজ্য শিক্ষা বিস্তার করে কি করিয়াছে, আমরা প্রথমেই তাহা বলিব। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যের পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশু হইতে সতেরোবৎসর বয়স্ক বালক পর্য্যন্ত ২,১৪০০০০০ দুই কোটী চৌদ্দ লক্ষ বালক বালিকা নিম্ন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করিয়াছে। উক্ত বৎসরে গড়পরতা ১০৬০০০০০ এক কোটী ছয় লক্ষ বালক বালিকা স্কুলে উপস্থিত ছিল, ইহাতে দেখা যায় প্রতি একশতটী আমেরিকান বালক বালিকার মধ্যে ৪৫টী বিনা বেতনে শিক্ষা লাভ করিয়াছে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের স্কুলের বিবরণী হইতে দেখা যায় পাঁচবৎসর হইতে সতেরো বৎসর বয়স্ক স্কুলে শিক্ষা প্রাপ্ত বালক বালিকার সংখ্যা তিন কোটী আট লক্ষ। গড়পরতা উপস্থিতি দুই কোটী তেইশ লক্ষ। ইহাতে আমরা দেখিতে পাই প্রতি ১০০টী আমেরিকান বালক বালিকার মধ্যে ৭২টী শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে।

সেখানকার বিদ্যালয়গুলি স্থানীয় করের দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রত্যেক গ্রাম, নগর ও সহর আপন আপন প্রয়োজন অনুরূপ শিক্ষা কর দিয়া থাকে। সময় সময় ষ্টেটও শিক্ষাকর আদায় করিয়া স্থানীয় অভাব মিটাইয়া থাকে।

একমাত্র নিউইয়র্ক সহরের শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব, বর্ত্তমান যুক্ত-রাজ্য কিরূপ দ্রুত গতিতে জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে প্রয়াসী। একশত বৎসর পূর্ব্বে যুক্ত রাজ্যে এডুকেশন বোর্ড গঠিত হয়, নিউ ইয়র্ক নগরীর ঐ বোর্ডে ৩৪ জন স্কুল কমিশনার, প্রত্যেক ওয়ার্ড হইতে দুই জন করিয়া কমিশনার গ্রহণ করা হয়, এই বোর্ডের অধীনে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১১৫টী অবৈতনিক ছাত্র এক মাত্র নিউ ইয়র্কে ছিল, উক্ত স্কুলে ৪৭৩৯৩ জন ছাত্র ভর্ত্তি হয়, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে সেস্থানে ৭৬১টী স্কুল ও ৯৭৪৪২০টী স্কুল ও ৩৪৩৯৬ জন শিক্ষক, এই শিক্ষা ব্যয়খাতে বাৎসরিক ব্যয়বরাদ্দ ১৫০,০০০০০০ ডলার (আমেরিকান মুদ্রা) পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ইহাই সর্ব্বোচ্চ বাজেট বলিয়া পরিগণিত, প্রথমে যখন নিউ ইয়র্ক নগরীতে স্কুল স্থাপিত হয় তখন সামান্য একটী কুঠরীবিশিষ্ট কাঠের ঘরেই উহার স্থাপনা হইয়াছিল, এখন সেস্থানে ১৫০,০০০০০০ ডলার ব্যয় করিয়া ইষ্টক ও মার্ব্বেল প্রস্তর নির্ম্মিত সৌধমালায় বিদ্যালয় বসে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের দশ হাজার বালক বালিকার স্থান হইয়াছে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ১০ দশ হাজার ক্লাস, প্রত্যেক ক্লাসে ৪০টী অথবা কিছু বেশী বালক বালিকা লইয়া একটী দল।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যতীত মাধ্যমিক শিক্ষাতে প্রতি স্কুলে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা গড়পরতা এক হাজার। নগরের ৭২টী হাইস্কুলে বিশেষ যত্নসহকারে শিক্ষা দেওয়া হয়, বালক বালিকা গণের ভাবধারার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তবে শিক্ষা দেওয়া হয়। ছোট ছোট বালক বালিকাগণকেও শিশু বেলা হইতে নানা প্রকার পুতুল ও ছবির সাহায্যে এমন শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি আমেরিকায় রহিয়াছে যে ঐ সকল বালক বালিকা বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শিক্ষা লাভে বিন্দুমাত্র বেগ পায় না।

বর্ত্তমান যুদ্ধে আমেরিকার শিক্ষাপদ্ধতিরও আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যুদ্ধের জন্য স্কুলগৃহেও বিরাট বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাইতেছি, ক্লাসে শিক্ষকগণ গণিত বিদ্যা শিক্ষা দিতে গিয়া অধুনা ছেলে মেয়েকে আতাফল গণনার চেয়ে বিমান বিদ্যার অঙ্ক শিখাইয়া থাকে, ধরুন, বালক বালিকার অঙ্ক: বিমান পি ৪০ ঘণ্টায় ৩৭০ মাইল যাইতে পারিলে প্রতি ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে বায়ুর গতি থাকিলে ৫ পাঁচ শত মাইল অতিক্রম করিতে সেই বিমানের কতক্ষণ সময় লাগিবে। ভূগোল বিদ্যারও অনুরূপ শিক্ষা দিয়া থাকে। ভূগোলের সাহায্যে বালক বালিকাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। এক দেশ হইতে অপর দেশে যাইতে হইলে কোন্ কোন্ দেশ নগর গ্রাম অতিক্রম করিবে কত ঘণ্টা, কত মাইল উড়িতে পারিবে। এই বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য বিজ্ঞান সম্মত বহু মানচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য যে অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে সেই বিষয়েও ছাত্রদিগকে প্রত্যেক তথ্য শিক্ষা দেওয়া হয়, ফুটবল বা ক্রিকেট বল ও ব্যাট না দিয়া বেয়নেট হাতে দিয়া বর্ত্তমানে ব্যায়ামচর্চ্চা করান হয়, গৃহে গিয়া ঘর করার বিষয় পারদর্শী হইবার জন্য বালক বালিকাকে বস্ত্রাদি রক্ষা, খাদ্যসংরক্ষণ এবং সেলাই, প্রাথমিক সেবা প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। সময়ে সময়ে ছাত্রগণকে যন্ত্রপাতির ঘরে লইয়া নানা যন্ত্র পরিচালন বিষয়েও বিস্তৃতভাবে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, ছয় বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদিগকে বিমানের ছবি আঁকিতে দেওয়া হয়, Bombardier Torpedo, এইরূপ কঠিন শব্দগুলির অর্থও বানান শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রাকৃতিক জীব বিজ্ঞানেও তাহাদিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য জেব্রা অথবা গঙ্গাফড়িং প্রভৃতি কি ভাবে রং বদলায় তৎবিষয়ে শিক্ষা দেয়, যুদ্ধের জন্য হঠাৎ আমেরিকার বিদ্যালয়গুলিতে নূতন ধরণের শিক্ষা প্রণালীর মধ্যে যে বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। এক রাশিয়া ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন দেশে শিক্ষার ভিতর দিয়া এইরূপ আধুনিক সময়োপযোগী শিক্ষা প্রচলনের কোথাও ব্যবস্থা আছে কি না আমরা শুনি নাই।

রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার সাধনায় যুক্তরাজ্য আজ যে বিপুল পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আপনার দেশের বালক বালিকাকে ভাবী যুগের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস করিতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

নিগ্রো সমাজ

আমেরিকার শিক্ষা প্রচেষ্টার মধ্যে কেহ যেন মনে না করেন যে আমেরিকানরা নিগ্রোদিগকে উপেক্ষা করিতেছে তাহা নহে, নিগ্রোগণও সমানভাবে স্কুল কলেজে শ্বেতাঙ্গ বালক বালিকাগণের ন্যায় অধুনা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে বহু আমেরিকান নিগ্রো শুধু যোগদান করা নহে বিমান পরিচালনা বিদ্যায়ও তাহারা কৃতি হইয়া আমাদের দেশে বসিয়া জাপানকে জয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, আমেরিকান শ্বেতাঙ্গগণের ন্যায় উহারাও স্বদেশ ভক্ত এবং বীর, তাহারাও অধ্যাবসায়ী, উৎসাহী পরিশ্রমী এবং কৌশলী।

এক সময়ে আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গে আমাদের দেশের মুসলমান হিন্দুর ন্যায় বিরোধ ছিল। পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা ছিল, কিন্তু যুদ্ধের দরুণ তাহা আজ লুপ্ত প্রায়, একই গণতন্ত্র শাসিত রাজ্যে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের স্থান। নিগ্রো সমাজ সমান ভাবেই সমাজে স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে।

আমেরিকার সমৃদ্ধি

সমৃদ্ধিশালী আমেরিকার বর্ত্তমান ধনবলের সংখ্যা করা সম্ভব নহে, অপর দিকে আমেরিকার জনবলও আজ জাগ্রত। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন রুশ ও জাপানে প্রবল যুদ্ধ ঘটে তখন জাপানের সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি জেনারেল "নোগী" একদা বলিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে এক ঘোরতর সমর ঘটিবে, সেই সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরের জল উভয় জাতির রক্তে লাল হইয়া উঠিবে।

সেইদিনের আমেরিকা জানিত একদিন প্রশান্ত মহাসাগরের অপর প্রান্তে যে জাপান সামরিক ঐশ্বর্য্যে বলিয়ান হইয়া উঠিতেছে, তাহার সহিত আমেরিকাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামিতে হইবে। আজ সত্যই আমেরিকাকে আত্মরক্ষার জন্য সমরে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে, জাপান প্রশান্ত মহাসাগর আক্রমণ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে আমেরিকার অধিকৃত বহু দেশ দখল করিয়াছে। ইংরেজ অধিকৃত অষ্ট্রেলিয়াও আক্রমণ করিয়াছে, আমেরিকা যদি প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানকে বিধ্বস্ত করিতে পারে তবেই আমেরিকার রক্ষা, নতুবা জাপান আমেরিকার সাম্রাজ্য বিস্তারের সুখস্বপ্নকে একেবারে শূন্যে মিলাইয়া দিবে, ইতিমধ্যেই আমেরিকার বড় উপনিবেশ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ জাপান দখল করিয়াছে। জাপান আজ শক্তিমান্ আমেরিকাও শক্তিশালী। ভারতের পথ দিয়াও আমেরিকা জাপানকে আক্রমণ করিবার জন্য বহু সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। আমেরিকান সৈন্যের বঙ্গদেশে উপস্থিতি তাহার প্রধান কারণ।

আমেরিকার সহিত ভারতবাসীর কি সম্বন্ধ সে কথা আজ অন্য দিক দিয়া বিচারার্থ উঠিয়াছে। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ১৯১৪ সালের যুদ্ধেও আমেরিকার কাছ থেকে বহু কোটী টাকা ঋণ করে। এই যুদ্ধেও আমেরিকা ইংরেজকে ধনজন ও অস্ত্র দিয়া সাহায্য করিতেছে এবং লোক মুখে প্রকাশ ইংরেজ ভারতবর্ষের খানিকটা অর্থাৎতিত অংশ বিশেষ অথবা পুরা ভারতটা আমেরিকার নিকট ইজারা দিয়াছে। মিঃ ফিলিপস্ প্রভৃতি আমেরিকান্ রাজনীতিক পণ্ডিতগণ সেই জন্যই বার বার ভারতবর্ষ আসতেছেন।

আমরা রাজনৈতিক ব্যাপারে আজ আমারিকানদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাইয়া বসিয়াছি ভবিষ্যতে ইহার কি পরিণাম দাঁড়াইবে জানি না। কিন্তু দৃশ্যতঃ আমরা আমেরিকান্ সৈন্যের উপস্থিতিতে এবং ভারতবর্ষে আমেরিকানগণের উপস্থিতিতে কতকটা আশঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছি।

আমরা যে সময়ে স্বাধীনতার আন্দোলন করিতেছি রাষ্ট্র ক্ষেত্রে ইংরেজের সহিত যখন রাষ্ট্র ব্যবস্থা লইয়া একটা যুক্তিসঙ্গত সংঘর্ষ চলিতেছে, তখন আমেরিকান্ সৈন্যদের বাঙ্গালায় উপস্থিতি আমাদের আতঙ্কের কারণ হইয়া উঠিয়াছে ইহা অহেতুকী নহে।

আমেরিকার বিপুল সৈন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছে এবং ভারতের বুকে বসিয়া আমেরিকা দৈনিক কোটী কোটী টাকা ব্যয় করিতেছে। এই বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজকে যুদ্ধজয়ে সাহায্য করিয়া আমেরিকা আজ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের পদবীতে উন্নীত হইয়াছে। গণতন্ত্রের উপাসক আমরা। গণতান্ত্রিক আমেরিকাকে সাম্রাজ্যতন্ত্রের আওতায় আসিতে দেখিয়া আমরা যে আতঙ্কিত হইয়াছি ইহাও স্বাভাবিক।

আমেরিকা, ভারতের সহিত তার সম্বন্ধ, সৌহৃদ্য বন্ধুতা মিত্রতা, নিঃস্বার্থ ভাব প্রভৃতি যত কিছু আছে তাহা প্রচারের জন্য বহু পুথি পুস্তকও প্রকাশ করিয়াছে। মোটকথা, আজ আমেরিকা বলিতে চায়, তাহারা ভারতবাসীদের পরম বন্ধু, সুহৃদ, শুভাকাঙ্ক্ষী। জাপান পাছে ভারতবর্ষ দখল করে বঙ্গভূমিতে পদার্পণ করিয়া বাঙ্গালীর স্বাধীনতা অপহরণ করে আমেরিকা তাহাই ভাবিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই সসৈন্যে বাঙ্গালায় আসিয়াছে উদ্দেশ্য শুভ বটে!

যাহা হউক ভবিষ্যতে আমেরিকার সম্বন্ধে আমাদের আরও বলিবার আছে তাহা বলিব, এবং আজ এখানেই ভারতে আমেরিকার সৈন্যের উপস্থিতি সম্বন্ধে কিছু বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

আমেরিকান ভাষ্য :—তাহারা আমাদের দেশ আক্রমণ করিতে বা দখল করিতে আসে নাই, জাপানের হাত হইতে চীনকে রক্ষা করিবার জন্যই ভারতের পথে তাহারা সমরায়োজন করিয়াছে. সেই জন্য আমেরিকা Service of Supply' স্থাপন করিয়াছে—এই বাংলা দেশে। আর এই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে ১১ দফা কাজ করিতে হইতেছে। (১) রসদ ও সৈন্য চালান, (২) যুদ্ধের প্রয়োজনে দোকানাদি ও গুদামাদি স্থাপন, (৩) বিশ্রামগৃহ ছুটী ও থাকিবার স্থান, (৪) যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহ সঞ্চয়, এবং সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ, (৫) সৈনিকদের শিক্ষাকেন্দ্র, (৬) সৈন্যদের আগমন, স্থান দান ইত্যাদি (৭) ইভাকুয়েসান আহতদের জন্য হাসপাতাল আদি স্থাপন, (৮) রেল রাস্তা সংস্কার, রক্ষা, সৈন্য চলাচল ও যানবাহন চলাচলের পথ রক্ষা (৯) রাস্তা, বাড়ী ও রেল লাইন নির্ম্মাণ, (১০) Control of Tariff, এই কথার বাংলা লিখিলাম না। সর্ব্বশেষ (১১) Handling mail and censorship.

আমেরিকার একটী বিপুল বিমান বলও আমাদের দেশে রহিয়াছে, বহু ক্ষেত্রেই বিমান্ বাহিনী ইংরেজকে এই যুদ্ধে সাহায্য করিতেছে। বর্ম্মার যুদ্ধে এই আমেরিকান বিমান

কলিকাতা হইতে মাণ্ডইতে ৪৬৭ জন ইংরেজ সৈন্তকে লইয়া যায়, এবং ৪২৪ জন ইংরেজকে যুদ্ধক্ষেত্রের বিপজ্জনক এলাকা হইতে কলিকাতায় লইয়া আসেন। আন্দামানে জাপানের নৌবহরের উপরে প্রথমেই আমেরিকান্ বিমান হইতে বোমা ফেলা হয়, ঐখানে বসিয়া জাপানীরা কলম্বো ও ত্রিকোনোমলি আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এই আক্রমণের সময়ে আমেরিকার ছয় খানি বিমান আকাশ যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল রেঙ্গুনেও এই বিমান বহর বহুবার আক্রমণ করিয়াছে।

মোটের উপরে আমেরিকা আজ ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গ দেশে সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধে প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে। জাপান ভারত আক্রমণ করিলেই আমেরিকা জাপানকে বিধ্বস্ত করিবে। আমরা সেই দিনটী দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।

প্রাচ্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য

শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ইউরোপীয় চিত্রকলায় প্রকৃতির হুবহু অনুকরণ হ'ল প্রধান ব্যাপার। একশ্রেণীর মতবাদ হচ্ছে এই যে, বাহ্য-প্রকৃতির হুবহু নকল করলে, তার অন্তর্নিহিত ভাবধারার বিকাশ আপনিই হবে। তাই ও-দেশে বেশী জোর দেওয়া হয় প্রকৃতির অনুকরণে—যতটা না দে'য়া হয় ভাবপ্রকাশের দিকে। এজন্য ইউরোপীয় অনেক চিত্রে ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক দুর্ব্বলতা দেখা যায়। তার এ একটা কারণ হ'তে পারে যে, শিল্পী যখন কোন চিত্রের খস্‌ড়া মনে মনে ভাবেন—তখন তার প্রথম মনে পড়ে গঠন (form), তাই গঠনের দিকেই ঝোঁক থাকে বেশী। শিল্পীমনের রসের উৎস থাকে অপরিস্ফুট।

কিন্তু প্রাচ্যদেশীয় চিত্রকলায় ঠিক এর উল্টো ব্যাপার—প্রথম ভাব, পরে গঠন, রঙের সমাবেশ—জোরাল হয়ে উঠবে ভাব, ভাবপ্রকাশে সহায়তা করে প্রাকৃতিক গঠন। তাই প্রাচ্যদেশীয় শিল্পীর সৃষ্ট জগৎ প্রাকৃতিক জগতের বিষয়বস্তুর সঙ্গে হুবহু মেলে না—তারা যেন রূপ রসে ভরপুর আর একটা জগৎ সৃষ্টি করে। এই বাস্তব জগৎ থেকেই সে মাল মশলা সংগ্রহ করে—কিছুটা নিয়ে, কিছুটা বাদ দিয়ে; নিজের কল্পনায় ভেঙ্গে গড়ে যে-জগৎ সে সৃষ্টি করে—সে-জগৎ এ মর-জগৎ থেকে আলাদা। ধরা যাক্ একটা সিংহের মূর্ত্তি আঁকতে হবে—সিংহ পশুরাজ, অমিত তেজশালী বীরত্ব-ব্যঞ্জক তার আকৃতি, তার তেজোদ্দীপ্ত ভাব অধিকতর পরিস্ফুট করতে গিয়ে যদি বনের পশুরাজের আকৃতির সঙ্গে হুবহু না মেলে, তাতে ক্ষতি নাই: সিংহের বীরত্বব্যঞ্জক ভাব সুপরিস্ফুট হ'য়ে উঠলেই প্রাচ্যদেশীয় শিল্পীর নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল। শিল্পীর তুলিকাস্পর্শে সিংহ হ'য়ে উঠবে প্রাণবন্ত, তবেই ত' তার সার্থক সৃষ্টি। বীর যোদ্ধার ছবি আঁকতে গিয়ে প্রাচ্যশিল্পী ফুটিয়ে তুলবে বীররসের ছবি—তেজোদ্দীপ্ত গড়ন—ধমনীতে তার রক্তের নাচন—প্রতি অঙ্গে ফুটে উঠবে যুদ্ধের উন্মাদনা।

চীনদেশের একটী ছোট গল্পে প্রাচ্যশিল্পের ভাবধারার সুষ্ঠু পরিচয় মেলে। এক চিত্রকর প্রাচীরগাত্রে ড্রাগনের মূর্ত্তি আঁকছেন। শিল্পীর তুলিকার শেষরেখাপাতের সঙ্গে সঙ্গে ড্রাগনটী জীবন্ত হ'য়ে প্রাচীর গাত্র থেকে চলে গেল। যদিও নিছক গল্প, তবুও এর ভেতর থেকে প্রাচ্যশিল্পের প্রাণের সন্ধান মেলে।

আমাদের মনে এমন বহু জিনিষ আমরা অনেক সময় দেখতে পাই—যার আদর্শ বাস্তবজগতে দেখা যায় না। শিল্পী সে-সব ফুটিয়ে তুলতে পারে তার তুলিকাস্পর্শে। প্রাচ্যশিল্পে এমন কতকগুলি সৃষ্টির নমুনা মেলে, যেমন চীনের ড্রাগনমূর্ত্তি (সর্পের অতি-প্রাকৃত মূর্ত্তি), যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির মূর্ত্তি। প্রকৃতির গণ্ডী পেরিয়ে স্বাধীন মনের এই সব অলৌকিক রসমূর্ত্তি এরা রচনা করেছেন।

চিত্রকলার উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি। শিল্পীমনে যে রসের সমাবেশ হয় তাহাই চিত্রে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠে। প্রাচ্যশিল্পীর মন প্রকৃতির এই বাহ্যরূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—তার কল্পনাশক্তিতে তাই রূপপরিকল্পনার অফুরন্ত ভাণ্ডার। অতি আধুনিক ভাববাদী ইউরোপীয় চিত্রেও শিল্পীমনের এই স্বাধীনতা দেখা যায়। প্রকৃতির হুবহু নকল করা ছেড়ে দিয়ে তারাও কল্পনার ভাবরাজ্য থেকে বিষয়বস্তুর আমদানী করছেন।

প্রতীচ্যের শিল্পীরা তাদের শিল্পের অন্তর্গত ভাবধারাকে ফুটিয়ে তুলতে প্রধান অবলম্বন গ্রহণ করেছেন শারীরিক গঠনের স্বাভাবিকতা, আলোছায়া, পারিপ্রেক্ষিকের সাহায্য—যাতে করে বিষয়বস্তুর modelling হুবহু ফুটে ওঠে। মনুষ্য-চিত্র আঁকতে গিয়ে তাঁরা চেষ্টা করেন যাতে প্রতিটী অঙ্গের গঠন রক্ত-মাংসের গঠনের হুবহু অনুরূপ হয়ে ওঠে। মনে হয় যেন মনুষ্যদেহের মাংসপেশী বহুল শারীরিক সৌন্দর্য্য অঙ্কনই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য—ভাব প্রকাশ তার পরের কথা। তাই কায়িকগঠনছন্দ যতটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে—চিত্রের অন্তর্গত ভাবধারা ততটা সুপরিস্ফুট হয় না। তাই ইউরোপীয় বহু

চিত্রে শারীরিক গঠনের অপূর্ব্ব রূপসমাবেশ আমরা দেখতে পাই—চিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবধারা আমাদের ততটা মুগ্ধ করে না। গ্রীসের সুবিখ্যাত ভিনাসের মূর্ত্তির কায়িক গঠনের পবিত্র রূপমাধুরী যতটা সুপরিস্ফুট, ওর পবিত্র ভাব ততটা পরিস্ফুট হয় নি। মাইকেল এঞ্জেলোর অনেক চিত্রে দেখা যায় পালোয়ানের মত মানুষের আকৃতি। এ-সব রচনায় প্রতিটী মাংশপেশী সুচারুরূপে বিন্যিত হ'য়েছে। মানুষের মনের যে পেশী আছে, সে-কথা তারা ভাবে নি। যে-জিনিষ চোখে দেখা যায় না, তাকে নিয়ে ভাবতে তারা রাজী নয়। ওদের কাছে প্রথম হচ্ছে গঠন, পরে ভাবপ্রকাশ। কিন্তু প্রাচ্যশিল্পে প্রথম হচ্ছে ভাবপ্রকাশ, পরে গঠন। প্রাচ্যের বুদ্ধমূর্ত্তির দিকে চাইলে মনে হয় যেন প্রেম, মৈত্রী, করুণার অবতার। মানুষের শারীরিক গঠনের সঙ্গে তার হুবহু সাদৃশ্য নাই। তার রূপ মরজগতের নয়—মরজগতের ঊর্দ্ধে ভিন্ন একটা জগতের, যা মানুষের কল্পনায় সৃষ্ট হ'তে পারে। বুদ্ধের রূপসৃষ্টি করতে গিয়ে প্রাচ্যশিল্পী ভেবেছে তাঁর মনের কথা, মনের রূপ—তাই তাঁর মনের রূপ ফুটে উঠেছে বাহ্য আকৃতিতে। গ্রীক্ প্রভাবান্বিত গান্ধার শিল্পে প্রতীচ্য আদর্শ অনুযায়ী গঠিত তপঃক্লিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তিতে দেখতে পাওয়া যায়—তপস্যার পরিশ্রমে বুদ্ধের শরীর কঙ্কালসার হয়েছে—বক্ষপঞ্জরের প্রতিটী অস্থি দেখা যাচ্ছে—তপস্যার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ নাই—অনাহারে অনিদ্রায়, পরিশ্রমে ভগ্নস্বাস্থ্য সাধারণ মানুষের আকৃতি। বুদ্ধের মানসিক সৌন্দর্য্য ওরা ভাবে নি। কিন্তু প্রাচ্যের ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তির প্রতি অঙ্গে পবিত্র জ্যোতিঃ। অধ্যাত্ম সাধনায় শান্ত, সৌম্যমূর্ত্তি জ্ঞানের মহিমায় উজ্জ্বল তাঁর মানসিক রূপ।

প্রতীচ্য করেছে মানুষের পূজা। "What a piece of work is a man! how noble in reason! how infinite in faculty! in form and moving how express and admirable! in action how like an angel! in apprehension how like a God! the beauty of the world! the paragon of animals!" তাই দেখি দেবতার মূর্ত্তি রচনা করিতে গিয়েও তারা মানুষের আদর্শই গ্রহণ করেছে। কিন্তু প্রাচ্য প্রাচীনকাল থেকেই অতিমানুষের সাধনা করে এসেছে। তার কাছে এ-জগৎ অনিত্য, অস্থায়ী মায়া, তাই তার সাধনা মানুষকে ছাড়িয়ে, সে অনাদি অনন্ত শক্তির মহিমা পৃথিবীর রূপবিকাশের মধ্যে ফুটে ওঠে—তারই সাধনা। শিল্পসৃষ্টির মধ্যেও তাই ফুটে ওঠে তার সাধনার ঐরূপ।

পূর্ব্বে প্রতীচ্য সমালোচকরা ধারণা করে রেখেছিলেন যে, প্রাচ্যশিল্পে ভাবের বিকাশ নেই। প্রাচ্য শিল্প "Grotesque", এই মনে করে শ্রেষ্ঠ-শিল্পের আসর থেকে এদেশের শিল্পকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। তারা ভাবতেন যে প্রাচ্যদেশ ছিল জাকজমকশালী, আড়ম্বরপ্রিয়,—এর শিল্পের বৈশিষ্ট্য শুধু বর্ণসম্পাতে—ভাবধারার বিকাশ এতে নেই। এ সম্বন্ধে Sir Lawrence Binyon তাঁর সুবিখ্যাত পুস্তক "Painting in the far East"এ এই কারণ দেখিয়েছেন যে, ঐ সমস্ত সমালোচকরা "Gorgeous East"এর বিলাস এবং আড়ম্বরের দিকটাই শুধু দেখার সুযোগ পেয়েছেন। ওরা দেখেছেন নানারকম চিত্রশোভিত চাকচিক্যময় গালিচা, কারুকার্য্যখচিত স্বর্ণরৌপ্যের নানাবিধ পাত্র, miniature, জাপানী colour print ইত্যাদি—আর শুনেছেন আলাদিনের আশ্চর্য্য কাহিনী, আরব্যরজনীর চমকপ্রদ বিবরণ, বহু পারস্য কবির কাব্যকথা। ইউরোপে স্থিত নিকৃষ্ট শ্রেণীর কিছু চৈনিক চিত্র এবং চীনামাটির পাত্রের (Chinese porcelain) নিদর্শন থেকেও ঐরূপ ভ্রান্ত মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। উৎকৃষ্ট শিল্পকলার নিদর্শন দেখার সৌভাগ্য তাদের হয় নি। কিন্তু প্রাচ্য সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন, তারা এ-দেশীয় ভাবধারা এবং শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিত হয়ে এ-দেশীয় শিল্প যে যে-কোন দেশের উচ্চাঙ্গের শিল্পের সঙ্গে সমপর্য্যায়ে স্থান লাভ করতে পারে, তা' দেখিয়েছেন। Havell, Lawrence Binzon, Okakura, Coomarswamy প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষীরা সপ্রমাণ করেছেন যে প্রাচ্যশিল্পে ভাবধারার বিকাশই মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রাচ্যশিল্পের চরম বিকাশ হ'য়েছিল চীনদেশে এবং ভারতবর্ষে। তাই চীন ও ভারতের শিল্প এবং তার অন্তর্নিহিত ভাবধারা সংক্ষেপে আলোচনা করব। এ-দেশের শিল্প ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানা মতবাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত—সে-সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করা দরকার।

ভারতের প্রাচীন চিত্রের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে অজন্তা, বাগ প্রভৃতি গিরিগুহাগাত্রে। বুদ্ধের জীবনের নানা বিষয়বস্তুর অবলম্বনে এগুলি রচিত। বর্ণসুষমায় এবং রেখার কুশলতায় এই চিত্রগুলি অতুলনীয়। তুলির প্রতি টানেই মানুষ, দেবদেবী পশু প্রভৃতির চিত্র ভাবধারায় জীবন্ত হ'য়ে ফুটে উঠেছে। Griffith সাহেব তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "Rock cut Temples of Ajanta"-তে লিখেছেন, "The painters were giants in execution. Even on the walls, some of the lines, drawn with one sweep of the brush, struck me as wonderful... The art lives. Faces question and answer, laugh and weep, fondle and flatter; limbs move with freedom and grace, flowers bloom; birds soar, and the beasts spring, fight or patiently bear burdens." এর পরে বিভিন্ন সময়ে হিন্দু এবং

বৌদ্ধ শিল্পের ওপর দিয়ে আক্রমণকারীদের যে ঝড় বয়ে গেছে, তা'তে ভারতের বহু শিল্পনিদর্শন ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। তা' সত্ত্বেও যে-সমস্ত অবশিষ্ট রয়েছে, তাতেই ভারতশিল্পের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মুঘলযুগে সম্রাট আকবরের সময় ভারতীয় চিত্রকলার আর এক গৌরবময় যুগ আরম্ভ হয়। মুঘলযুগের এই চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির আমদানী হয় পারস্য দেশ থেকে; ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতি এবং ভাবধারার সংস্পর্শে এসে ইহা এক নূতনরূপ গ্রহণ করল। ভারতীয় আবহাওয়ার সঙ্গে মিশে ইহা ভারতের একটী নিজস্ব রূপ হ'য়ে দাঁড়াল। মুঘলযুগের শিল্পীরা গতানুগতিক প্রথায় চিত্রাঙ্কন না ক'রে কতকটা বাস্তবের অনুকরণ আরম্ভ করে। রাজদরবারের নানাবিধ দৃশ্য, অন্তঃপুরের দৃশ্য, যুদ্ধ এবং শিকারের নানাবিধ বিষয়বস্তু অবলম্বনে চিত্রাঙ্কন সুরু হ'ল। চিত্রে নিকট, দূরত্ব এবং আলোছায়ার প্রবর্ত্তন হ'ল। এই সময়ের আঁকা ছবি উজ্জ্বল বর্ণসুষমায়, কোমল এবং সরসরেখার পরিবেষ্টনীতে এবং সর্ব্বোপরি একটা decorative effect-এর মাধুর্য্যে ভরপুর। প্রাচ্যশিল্পের নিজস্ব ভাবটী এই সব চিত্রেও অক্ষুন্ন দেখা যায়।

বহুদিনের সাধনা চীনের চিত্রকলাকে পুষ্ট করেছে। খৃষ্ট জন্মের ২৭০০ বৎসর পূর্ব্বেও যে সে দেশে উন্নত ধরণের চিত্রকলার চর্চা ছিল, তার উল্লেখ পাওয়া যায় সে দেশীয় পুরান কাহিনীতে। ওদেশে লেখার সূত্রপাত যখন থেকে হয়েছে, চিত্রকলার অনুশীলনও তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীতে চীনদেশে Confucius-এর মতবাদের প্রচলন হয়, এবং চীনের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক জীবনকে গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত করে তোলে। Confucius গভীর ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, সঙ্গীত, সাহিত্য ও শিল্পকলা জাতীয় জীবনধারাকে গড়ে তোলে। তাঁহার মতবাদ ছিল যে মানুষ সর্ব্বাগ্রে আত্মশাসন করবে, বিভিন্ন মানুষ সমাজের জন্য তার ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ করবে; বিশাল সাম্রাজ্যে সবাই পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ, সবাই আপন আপন কাজ করে যাবে এবং সম্রাট প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে রাজ্যশাসন করবেন। চীনের জাতীয় জীবনকে তিনি উন্নততর করেছিলেন—দেশের সমাজ ব্যবস্থায় যাতে শান্তি থাকে—সামাজিক জীবনে মানুষের নৈতিক চরিত্র যাতে অক্ষুন্ন থাকে তার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। জ্ঞানী মনীষীদের আদর্শে যাতে জনসাধারণ অনুপ্রাণিত হতে পারে—এজন্য বড় বড় লোকের প্রতিকৃতি অঙ্কনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, "Art should serve the state". Lao Tzn নামে আর একজন মনীষী Confucius-এর ৫০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মেছিলেন, তার প্রবর্ত্তিত Taoism মতবাদের দিকটাও ওদেশীয় এক-শ্রেণীর চিত্রে সুপরিস্ফুট দেখতে পাওয়া যায়। খৃষ্ট জন্মের ১৭৬ বৎসর পূর্ব্বে চীন দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বার্ত্তা পৌঁছায়। মহামুনি বুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। ৬৭ খৃষ্টাব্দে চীন সম্রাট Ming Ti বৌদ্ধধর্ম্মের মূলকথা জানবার জন্য ভারতে লোক পাঠালেন। তারা বুদ্ধের মূর্ত্তি এবং বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ নিয়ে দেশে ফিরে এল। বুদ্ধধর্ম্মের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকলাও তাকে সাদরে তার অভ্যর্থনা জানাল—চিত্রকলার জগতে একটা আমূল পরিবর্ত্তন হল।

প্রাচ্যশিল্পীর প্রধানঅবলম্বন তার বর্ণকুশলতা এবং রেখা-সম্পাত। যুগ যুগ ধরে তারা রেখাচিত্রের অনুশীলন করে আসছে। Modelling, Perspective আপনা-আপনি এসে তাদের রেখাচিত্রের মধ্যে ধরা পড়ে। বর্ণসম্পাতে এবং রেখার কুশলতাই এদের modelling হয়। চৈনিক চিত্রকরের অঙ্কিত ছবি একটুখানি চাঁদের আলো, তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের সফেন উচ্ছ্বাস, মৃদু বায়ু সঞ্চালনে হিন্দোলিত কয়েকটা ক্রিসেনথিমাম ফুল—কয়েকটা-রেখার অতি নিপুণ সম্পাত এই বিশ্বস্রষ্টার অপূর্ব্ব সৃষ্টির রূপবিকাশের রসাস্বাদ পরিবেশন করে। ড্রাগন এবং বাঘের ছবি এদের খুব প্রিয় বিষয়। দুইটিই শক্তির প্রতীক। ড্রাগন অধ্যাত্মশক্তির নিদর্শনস্বরূপ এবং বাঘের ছবি জড়শক্তির প্রতীক। ওদের প্রায় প্রত্যেক শিল্পীই এই বিষয় নিয়ে ছবি একেছেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য, ফুল এবং পাখীর ছবি, নানারকম জন্তু জানোয়ারের চিত্র অঙ্কনে এদের প্রতিভা অতুলনীয়। সহরের ধুলাবালি, গণ্ডগোলের মধ্য থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃতির মাঝখানে, অরণ্যে, গিরিকন্দরে, নদীতীরের নির্জ্জনতা উপভোগ করা চীনদেশীয় লোকের স্বভাবের অন্তর্গত ছিল। Taoism-এর mysticism এই প্রকৃতির রূপ-বিলাসী ভাবধারাকে ধর্ম্মের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দিয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের আগমনে, গিরিগুহার বিহার, চৈত্যে বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশীলনে এই ভাবকে আরও প্রবল করে তুলল। তাই ওদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির চিত্রে—শান্ত, নির্জ্জন গিরি-শৃঙ্গ থেকে আরম্ভ করে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র, মৃদু বায়ু সঞ্চালনে আন্দোলিত বসন্তের পুষ্পাস্তরণ, মেঘ ঘন আকাশে উড্ডীয়মান বলাকার রাশি—বিশ্বস্রষ্টার অনন্তলীলাময় রূপ ধারার মধ্য দিয়ে তাঁর অস্তিত্বের কথা পরিস্ফুট হয়েছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার এবং অনুশীলনে প্রাচ্য আর্টের জগতে যে অভিনব আলোড়ন জেগেছিল—সে ভাবটী নষ্ট হয়েছে। পূর্ব্বেকার আকাশ, বাতাস, পৃথিবী শিল্পীর মনে যে গভীর দাগ কাটত, সেরকম এখন আর নেই। তবুও প্রাচ্য তার শিল্পের বৈশিষ্ট্য আজও বজায় রেখেছে।

গান

মিশ্র ইমন-বেহাগ—কাহারবা

রাতের আকাশে চাঁদ জেগে রয়
আর জাগে মোর আঁখি,
তার সাথে জাগে একটি স্বপন
গোপন বেদনা ঢাকি'।

আকাশ যেন রে অন্তর মোর,
চাঁদের আলোকে করে নিশি ভোর,
সুমধুর এই লগনে আমার
সুন্দরে' শুধু ডাকি।

কল্পনা এ যে মিথ্যা মাধুরী
রাতের মায়াবী ছায়া,
ঊষার আলোকে এখনি হারাবে
শুক্লা চাঁদের মায়া।

এই নিশিখন গত নিশি হবে,
মিলন-মালিকা ম্লান হ'য়ে রবে,
আমি শুধু একা বেদনার স্মৃতি
হৃদয়েতে নিয়ে থাকি।

কথা—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত   সুর—শ্রীবৈদ্যনাথ দে   স্বরলিপি—শ্রীমতী শান্তি ঘোষ (সরকার)

—স্বরলিপি—

+	0	+	0
‖ মা মা -া -গা	রা গরা সা -ন্া	সা -পা -া হ্মা	গা -মা গা -রা
‖ রা তে ॰ র্	আ কা॰ শে ॰	চাঁ ॰ দ্ জে	গে ॰ র য়
রা -গা মা ধা	ধনা -র্সা -পা -া	ধা -গা -পা -া	া -া -া -া
আ র্ জা গে	মো॰ ॰ ॰ র্	আঁ ॰ খি ॰	॰ ॰ ॰ ॰
পা -র্গা র্গা র্গা	র্রর্মা -র্গর্রা র্সা -া	নর্সা -র্রর্সা ণা পধা	র্সা -া -া -া
তা র্ সা থে	জা॰ ॰॰ গে ॰	এ॰ ॰ক টি স্ব॰	প ন্ ॰ ॰
মা মপা পা -া	পা ধা ণা ণর্রা	র্সা -া -া -া	-রা -া -া -া
গো প॰ ন ॰	বে দ না ঢা॰	কি ॰ ॰ ॰	॰ ॰ ॰ ॰

আর জাগে মোর আঁখি।

O O

গা গা -পা পা | ধনা -ধনা নপা -া | পা র্রা র্রর্গা র্রর্গা | র্রর্সা -া -া -া
আ কা শ যে | ন॰ ॰॰ রে॰ ॰ | অ ন্ ত॰ র॰ | মো॰ ॰ ॰ র্

পা না না -া | র্সা র্সর্রা র্রা -া | র্সা র্সর্গা র্রর্গা র্গর্রা | র্সা -া -া -া
চাঁ দে র ॰ | আ লো॰ কে ॰ | ক রে॰ নি॰ শি॰ | ভো ॰ ॰ র্

পা পনা না র্সা | নর্সা -র্রর্জ্ঞা র্সর্রা -া | র্সা র্গর্রা ণা ধা | ণা পা -া -া
সু ম॰ ধু র | এ॰ ॰॰ ই॰ ॰ | ল গ॰ নে আ | মা ॰ ॰ র্

সা -সরা রা রা | গা -রগা মা মধা | পা -া -া -া | -রা -া -া -া
সু ॰ন্ দ রে | শু ॰॰ ধু ডা॰ | কি ॰ ॰ ॰ | ॰ ॰ ॰ ॰

আর জাগে মোর আঁখি।

O O

ন্া -সা রা গা | রগা -জ্ঞপা পা -া | জ্ঞপা -জ্ঞগা রা রা | গমা -গরা সা -া
ক ল্ প না | এ॰ ॰॰ যে ॰ | মি॰ ॰॰ থ্যা মা | ধু॰ ॰॰ রী ॰

ধ্া ন্া -রা রা | গা গনা না ধনা | ধপা -া -া -া | -া -া -া -া
রা তে ॰ র্ | মা য়া॰ বী ছা॰ | য়া॰ ॰ ॰ ॰ | ॰ ॰ ॰ ॰

গা পা -না -া | না না না -র্সা | ধা ধর্সা না -ধা | পা পনা ধা -া
উ ষা ॰ র | আ লো কে ॰ | এ খ॰ নি ॰ | হা রা॰ বে ॰

পা -পা পা -পা | জ্ঞা গা রা সা | সগা -া -া -া | -া -া -া -া
শু ক্ লা ॰ | চাঁ দে র মা | য়া॰ ॰ ॰ ॰ | ॰ ॰ ॰ ॰

না না না র্সা | নর্সা -নধা পা -া | গা পা না পধা | র্রা -া র্সা -া
এ ই নি শি | খ॰ ॰॰ ন ॰ | গ ত নি শি॰ | হ ॰ বে ॰

না র্রা র্গা -র্মা | র্গর্রা র্গর্রা র্সা -া | র্রা -া ধা না | ধনা -র্রা র্সা -া
মি ল ন ॰ | মা॰ লি॰ কা ॰ | ম্লা ন্ হ য়ে | র॰ ॰ বে ॰

পা না না না | র্সা -না র্সা -া | পধা ধণা র্রর্সা ণা | ধণা -ধণা পা -া
আ মি শু ধু | এ ॰ কা ॰ | বে॰ দ॰ না॰ র | স্মৃ॰ ॰॰ তি ॰

সা সরা রা রা | গা -রগা মা মধা | পা -া -া -া | -রা -া -া -া
হৃ দ॰ য়ে তে | নি ॰॰ য়ে থা॰ | কি ॰ ॰ ॰ | ॰ ॰ ॰ ॰

আর জাগে মোর আঁখি

ললিত-কলা

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী, এম্-এ, পি-আর-এস্

এক

'কলা'-শব্দের অর্থ অংশ ও শিল্প। সাধারণতঃ, চন্দ্রের ষোড়শ ভাগের এক ভাগকে কলা বা চন্দ্র-কলা বলা হইয়া থাকে। এ হেতু কলা-শব্দের অর্থ করা হয়—ষোড়শ ভাগ১। ইহাই কলা-শব্দের মুখ্য অর্থ। ইহা হইতে কলা-শব্দের গৌণ অর্থ কল্পনা করা হয়—অংশ-বিশেষ, কলা-শব্দের 'শিল্প' অর্থটি উহার এই 'অংশ' অর্থ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। 'কলা-বিদ্যা' বলিলে বুঝিতে হইবে—বিদ্যার বিবিধ অংশ-বিভাগ। বিদ্যার এই অংশগুলিই শিল্পরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। এই কারণে কবিরাজ রাজশেখর তাঁহার 'কাব্যমীমাংসা'য় চতুঃষষ্টি ললিত-কলাকে কাব্যের উপবিদ্যা নামে আখ্যাত করিয়াছেন২। পক্ষান্তরে, বামন তাঁহার 'কাব্যালঙ্কারসূত্রে' কলাগুলিকে মূল-বিদ্যারই অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন৩।

কাব্যে ও শাস্ত্রে ললিত-কলার সমান সমাদর। মহাকবি কালিদাস ত 'রঘুবংশে'র অষ্টম সর্গে অযোধ্যার রাজ্ঞী ইন্দুমতীকে ললিত-কলা-বিদ্যায় তাঁহার স্বামী মহারাজ অজের 'প্রিয়শিষ্যা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন৪। মহাকবি ভবভূতিও 'মালতীমাধবে' নায়ক মাধবকে 'কলাবান্' অর্থাৎ চতুঃষষ্টি ললিত-কলায় অভিজ্ঞ বলিয়াছেন৫।

ললিত-কলার সংখ্যা যে চতুঃষষ্টি—তাহার উল্লেখ নানা কাব্যালঙ্কার-গ্রন্থে পাওয়া যায়। শাস্ত্র-গ্রন্থের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণে' এই চতুঃষষ্টি সংখ্যার স্পষ্ট উক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহাতে বলা হইয়াছে—একাগ্রচিত্ত বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ চতুঃষষ্টি অহোরাত্রে তাবৎসংখ্যক কলা আয়ত্ত করিয়াছিলেন৬।

শ্রীমদ্ভাগবতে অবশ্য চতুঃষষ্টি সংখ্যার উল্লেখ থাকিলেও কলাগুলির নাম প্রদত্ত হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের সুবিখ্যাত টীকাকার শ্রীধরস্বামী 'শৈবতন্ত্র' হইতে চতুঃষষ্টি কলার নাম সংগ্রহপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন৭। শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যতম টীকাকার বল্লভাচার্য্যও শৈবতন্ত্রোক্ত চতুঃষষ্টি কলার নাম ও তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন৮।

এস্থলে একটি বিষয় বিশেষরূপে লক্ষ্য করা উচিত। যদিও শ্রীধর ও বল্লভ উভয়েই বলিতেছেন যে—'শৈবতন্ত্র' তাঁহাদিগের উভয়েরই উপজীব্য, তথাপি শ্রীধরস্বামীর বিবরণের সহিত বল্লভাচার্য্যের বর্ণনার বহু পার্থক্য আছে। আবার শ্রীমদ্ভাবগতের আর একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় বলিয়াছেন—চতুঃষষ্টি কলার বিবরণ শৈবতন্ত্রে দ্রষ্টব্য। তিনি কলাসমূহের নামোল্লেখ বা বিবরণ প্রদান করেন নাই৯। শ্রীমদ্ভাগবতের আর একজন টীকাকার শুকদেব 'বিদ্যাসংগ্রহনিবন্ধ' নামক গ্রন্থ হইতে চতুঃষষ্টি কলার নাম ও বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন১০। শ্রীভাগবতের অপর এক বিশিষ্ট টীকাকার সনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন—চতুঃষষ্টি কলা ত সকলেরই পরিজ্ঞাত। এতদ্ব্যতীত তিনি "ক্ষুদ্রসিদ্ধিরূপ" কয়েকটি বিশিষ্ট কলারও নামোল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় দৃষ্ট হয় যে, এই সকল কলা 'কল্পসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে১১।

---

১ "কলা তু ষোড়শো ভাগঃ"—অমরকোষ।
"কলা স্যাদংশশিল্পয়োঃ"—ভানুজি-দীক্ষিত-কর্তৃক উদ্ধৃত 'হৈম'। "কলা স্যাৎ কালশিল্পয়োঃ"—হৈম। 'কলা স্যাৎ কালশিল্পয়োঃ। কলনে মূলরৈবৃদ্ধৌ ষোড়শাংশে বিধোরপি"—হৈম।

২ "কলাস্তু চতুঃষষ্টিরুপবিদ্যাঃ"—রাজশেখর, কাব্যমীমাংসা, কবিরহস্য, 'কবিচর্য্যা রাজচর্য্যা চ'—দশম অধ্যায়।

৩ "শব্দস্মৃত্যভিধানকোশচ্ছন্দোবিচিতিকলাকামশাস্ত্রদণ্ডনীতিপূর্ব্বা বিদ্যাঃ" —বামন, কাব্যালঙ্কারসূত্র (১।৩)।

৪ "গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ"--রঘুবংশ, অষ্টম সর্গ, অজ-বিলাপ, শ্লোক ৬৭।

৫ "স্ফুরিতগুণদ্যুতিসুন্দরঃ কলাবান্"—মালতী-মাধব (২।১০)।

৬ "অহোরাত্রৈশ্চতুঃষষ্ট্যা সংযত্তৌ তাবতীঃ কলাঃ"—শ্রীমদ্ভাগবত, দশম স্কন্ধ (৪৫।৩৬)। 'বিষ্ণুপুরাণে' ও 'হরিবংশে'ও ঐরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে বিষ্ণুপুরাণে ও হরিবংশে চতুঃষষ্টি ললিত-কলার কোন উল্লেখ নাই। বিষ্ণুপুরাণে আছে—

"সরহস্যং ধনুর্ব্বেদং সসংগ্রহমধীয়তাম্।
অহোরাত্রৈশ্চতুঃষষ্ট্যা তদদ্ভুতমভূদ্দ্বিজ॥"
—বিঃ পুঃ (৫।২১।২১)

হরিবংশে দৃষ্ট হয়—

"তৌ চ শ্রুতিধরৌ বীরৌ যথাবৎ প্রতিপদ্যতাম্।
অহোরাত্রৈশ্চতুঃষষ্ট্যা সাঙ্গং বেদমধীয়তাম্॥
চতুষ্পাদং ধনুর্ব্বেদং শস্ত্রগ্রামং সসংগ্রহম্।
অচিরেণৈব কালেন গুরুস্তাবভ্যশিক্ষয়ৎ"॥
—হঃ বঃ (বিষ্ণুপর্ব্ব ৩৩।৬-৭)॥

৭ "তাবতীশ্চতুঃষষ্টিকলাঃ, তাশ্চ শৈবতন্ত্রোক্তা লিখ্যন্তে, যথা—শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতা ভাবার্থদীপিকা (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৫।৩৬)। বলা বাহুল্য এই যে, উক্ত 'শৈবতন্ত্র' বা তৎ-সজাতীয় কোন গ্রন্থ অদ্য পর্য্যন্ত আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

৮ "তাঃ কলাঃ শৈবতন্ত্রোক্তা লিখ্যন্তে"—শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্যকৃতা সুবোধিনী (শ্রীমদ্ভাগ ১০।৪৫।৩৬)।

৯ "তাবতীঃ চতুষষ্টিকলাঃ। তাঃ শৈবতন্ত্রে দ্রষ্টব্যাঃ"—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিকৃতা সারার্থদর্শিনী (শ্রীমদ্ভাগ ১০।৪৫।৩৬)।

১০ "তাবতীঃ চতুষষ্টিঃ কলা বিদ্যাঃ সঞ্জগৃহতুরিত্যন্বয়ঃ। তাশ্চোক্তা বিদ্যাসংগ্রহনিবন্ধে—" শ্রীযুক্তশুকদেবকৃতঃ সিদ্ধান্তপ্রদীপঃ (শ্রীমদ্ভাগ ১০।৪৫।৩৬)। এই বিদ্যাসংগ্রহনিবন্ধও এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আমাদিগের দৃষ্টিতে পড়ে নাই।

১১ "কেচিত্তু কলাঃ কল্পসংহিতোক্তাঃ—ক্ষুদ্রসিদ্ধিরূপা...অন্যা এব কলাঃ প্রাহুঃ"—শ্রীমৎসনাতনগোস্বামিকৃতা বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী (শ্রীমদ্ভাগ ১০।৪৫।৩৬।

শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্য টীকাকারগণ (যথা শ্রীযুক্ত সুদর্শন সূরী, শ্রীমদ্বীররাঘবাচার্য্য, শ্রীমদ্বিজয়ধ্বজতীর্থ, শ্রীমজ্জীব গোস্বামী, শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ ইত্যাদি) এ বিষয়ে কোন বিশেষ বিবরণ প্রদান করেন নাই ১২।

'শব্দকল্পদ্রুম' নামক অধুনা-সঙ্কলিত অভিধানে 'কলা'-শব্দের অন্যতম অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে—'শিল্পাদি'। উহার দৃষ্টান্তস্বরূপে রামায়ণের আদিকাণ্ড হইতে একটি শ্লোকও উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গবাসী সংস্করণে ও মাদ্রাজের ল-জার্ণাল প্রেসে মুদ্রাপিত সংস্করণে ঐরূপ কোন শ্লোক উল্লিখিত স্থানে দৃষ্ট হয় না ১৩।

শব্দকল্পদ্রুমেও চতুঃষষ্টি কলার নাম প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থে বলা হইয়াছে—শৈবতন্ত্রোক্ত চতুঃষষ্টি ললিতকলার নাম লিখিত হইল। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীধরস্বামী ও বল্লভাচার্য্য শৈবতন্ত্রোক্ত চতুঃষষ্টি কলার নাম করিয়াছেন। অথচ তাঁহাদিগের পরস্পর মতানৈক্য সুস্পষ্ট। শব্দ কল্পদ্রুমও আবার বলিতেছেন যে শৈবতন্ত্রোক্ত চতুঃষষ্টি কলার নাম লিখিত হইতেছে। আর বিস্ময়ের বিষয় এই যে—শব্দকল্পদ্রুমের বিবরণের সহিত শ্রীধরস্বামী ও বল্লভাচার্য্য উভয়ের উক্তিরই পার্থক্য আছে। এই সকল অনৈক্য দর্শনে সহৃদয় সুধীবৃন্দ যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে ইচ্ছা করেন, সেইরূপই করিবেন। এতৎসম্বন্ধে বর্ত্তমানে আমরা কোন নির্ম্মূল সিদ্ধান্ত-স্থাপনে প্রয়াসী নাহ। ১৪

কাব্য-অলঙ্কার-পুরাণাদি শাস্ত্র ব্যতীত আর একখানি গ্রন্থে এই চতুঃষষ্টি ললিত-কলার নাম প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি প্রাচীন ও সর্ব্বজন-পরিচিত। ইহাই মহর্ষি বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' বা কামশাস্ত্র। কামসূত্রের প্রথম 'সাধারণ' অধিকরণের তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে—কামশাস্ত্রের অঙ্গবিদ্যাই চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা।১৫

বাৎস্যায়ন এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ধর্ম্মবিদ্যা, অর্থবিদ্যা ও তাহাদিগের অঙ্গবিদ্যার অর্জ্জনকালের অবিরোধে মানব কামসূত্র ও তদঙ্গবিদ্যা (চতুঃষষ্টি কলা) অধ্যয়ন করিবে। ১৬

১২ শ্রীমৎসুদর্শনাচার্য্য কৃত 'শুকপক্ষীয়ে', শ্রীমজ্জীবগোস্বামি-কৃত 'ক্রমসন্দর্ভে' বা শ্রীমদ্বলদেব-বিদ্যাভূষণ-কৃত 'বৈষ্ণবানন্দিনী'তে এ সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। শ্রীমদ্বীররাঘবাচার্য্য-কৃত 'ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা'য় ও শ্রীমদ্বিজয়ধ্বজ-তীর্থ-কৃত 'পদরত্নাবলী'তে কেবল বলা হইয়াছে যে, কলাবিদ্যার সংখ্যা চতুঃষষ্টি।

১৩ "শিল্পাদি। [যথা রামায়ণে (১।৯।৮) "গীতবাদিত্রকুশলা নৃত্যেষু কুশলাস্তথা। উপায়জ্ঞাঃ কলাজ্ঞাশ্চ বৈশিকে পরিনিষ্ঠিতাঃ"] (খুব সম্ভবতঃ ইহা ঋষ্যশৃঙ্গ আনয়ন প্রকরণের শ্লোক। কিন্তু প্রচলিত দুইটি সংস্করণে শ্লোকটি পাওয়া যায় নাই। হয় ত উহা অন্য কোন সংস্করণে আছে।)

১৪ "অথ শৈবতন্ত্রোক্তাশ্চতুঃষষ্টিকলা লিখ্যন্তে"—শব্দকল্পদ্রুম (বরদাপ্রসাদ-বসু-কর্ত্তৃক প্রকাশিত দেবনাগরী সংস্করণ, দ্বিতীয়কাণ্ড, পৃঃ ৫৮)।

১৫ "কামসূত্রং তদঙ্গবিদ্যাশ্চ"—কাঃ সূঃ ১।৩।১।

১৬ "ধর্ম্মার্থাঙ্গবিদ্যাকালাননুপরোধয়ন কামসূত্রং তদঙ্গবিদ্যাশ্চ পুরুষোঽধীয়ীত"—কামসূত্র (১।৩।১)।

এই সূত্রটি বিশেষভাবে আলোচ্য। ধর্ম্মার্থাঙ্গবিদ্যা—ধর্ম্মবিদ্যা, অর্থবিদ্যা ও তদুভয়ের অঙ্গবিদ্যা। ধর্ম্মবিদ্যা—শ্রুতি ও স্মৃতি। অর্থবিদ্যা—বার্ত্তাশাস্ত্র (অর্থাৎ কৃষি-পশুপালনাদি বিদ্যা) উভয়ের অঙ্গবিদ্যা দণ্ডনীতি ও আন্বীক্ষিকী (সাঙ্খ্য ন্যায়াদি যুক্তিশাস্ত্র)১৭।

১৭ শ্রীমদ্‌যশোধরেন্দ্রপাদ তাঁহার 'জয়মঙ্গলা'-নামক সুপ্রসিদ্ধ কামসূত্র-টীকায় যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহাই উপরে উল্লিখিত হইল। স্বর্গত পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয় সূত্রটির অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহারও আভাস নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। তর্করত্ন মহাশয় দ্বিবিধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—(ক) ধর্ম্মবিদ্যা—চতুর্দ্দশ বিদ্যা—(১) পুরাণ, (২) ন্যায়শাস্ত্র (তর্কবিদ্যা), (৩) মীমাংসা (বেদবাক্য-বিচার), (৪) ধর্ম্মশাস্ত্র (স্মৃতি), (৫) শিক্ষা, (৬) কল্প, (৭) ব্যাকরণ, (৮) নিরুক্ত, (৯) জ্যোতির্ব্বিদ্যা (১০) ছন্দোবিচিতি (৫ম হইতে ১০ম পর্য্যন্ত বেদের ছয় অঙ্গবিদ্যা—'ষড়ঙ্গ' বা 'বেদাঙ্গ' নামে খ্যাত), (১১) ঋক্‌সংহিতা, (১২) যজুঃসংহিতা, (১৩) সামসংহিতা ও অথর্ব্বসংহিতা (১১শ হইতে ১৪শ পর্য্যন্ত চারিবেদ)—

"পুরাণ-ন্যায়মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ।"

উক্ত চতুর্দ্দশ শাস্ত্র ধর্ম্মপ্রমাণ বলিয়া ধর্ম্মবিদ্যা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অর্থবিদ্যা—অর্থশাস্ত্র—শুক্রনীতি, কৌটিলীয়-নীতি, কৃষিশাস্ত্র ইত্যাদি। তদীয় অঙ্গবিদ্যা—আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ ইত্যাদি। "এই সমস্ত শিক্ষা করিয়া তাহার অবিরোধে কামসূত্র ও তাহার অঙ্গ চতুঃষষ্টি কলা শিক্ষণীয়"। (খ) দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা—এই ধর্ম্মবিদ্যা ত্রয়ী ও আন্বীক্ষিকী (সাঙ্খ্য ও ন্যায়)। স্মৃতি ও পুরাণ ইহারই অন্তর্গত। অর্থশাস্ত্র—বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি। বার্ত্তা—কৃষ্যাদি-শাস্ত্র (আদিপদ দ্বারা পাশুপাল্য ইত্যাদিও বুঝিতে হইবে)। দণ্ডনীতি—রাজনীতি। এই ধর্ম্মবিদ্যা ও অর্থবিদ্যার যাহা অঙ্গ তাহাও অধ্যয়নীয়। ধর্ম্মবিদ্যার মধ্যে ত্রয়ীর অঙ্গ—শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণাদি ষড়ঙ্গ। "আর অর্থবিদ্যার মধ্যে বার্ত্তার অঙ্গ—পশুচিকিৎসা-শাস্ত্রাদি,দণ্ডনীতির অঙ্গ—ধনুর্ব্বেদাদি এবং লৌকায়তিক আন্বীক্ষিকী—বার্ত্তা ও দণ্ডনীতির অন্তর্গত"। (তর্করত্ন মহাশয়ের শেষ কয়টি কথার সমর্থন কিরূপে করা যাইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। বার্ত্তার অঙ্গ পশুচিকিৎসা-শাস্ত্রাদি—ইহা অতি সঙ্গত কথা। ধনুর্ব্বেদকে উপবেদ বলা হয়—একারণে উহাকে 'উপাঙ্গ' বলাই সঙ্গত। কোনরূপে না হয় ধনুর্ব্বেদকে দণ্ডনীতির অঙ্গ বলা হইল। কিন্তু 'লৌকায়তিক আন্বীক্ষিকী' 'বার্ত্তা ও দণ্ডনীতির অন্তর্গত' কিরূপে হইতে পারে, তাহা আমাদিগের বুদ্ধির অগোচর। কারণ, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি—যাহা তর্করত্ন মহাশয় অর্থশাস্ত্রান্তর্গত বলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাও আস্তিক শাস্ত্র-প্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে, লৌকায়তিক আন্বীক্ষিকী নাস্তিক-প্রস্থানের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। আস্তিক-প্রস্থানের যে কোনও বিভাগে উহার অন্তর্নিবেশ অসঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়।) তর্করত্ন মহাশয় অতঃপর বলিয়াছেন. সাঙ্গ চতুর্ব্বিদ্যা (চতুর্ব্বেদ-বিদ্যা ?) আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি শিক্ষা করিয়া তাহার অবিরোধে কামসূত্র ও তদীয় অঙ্গ চতুঃষষ্টি কলা শিক্ষণীয়। এই যে দ্বিবিধ অর্থ, তাহার, তাৎপর্য্য একই। কামসূত্র ও কলাশিক্ষার অনুরোধে ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়নের কাল ন্যূন করা চলিবে না।—কামসূত্র, ৺পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়-কর্ত্তৃক সম্পাদিত বঙ্গবাসী সংস্করণ (১৩৩১), পৃঃ ৫৫।

পক্ষান্তরে, যশোধরেন্দ্রপাদ তাঁহার 'জয়মঙ্গলা' (তর্করত্ন মহাশয়ের মতে 'জয়মঙ্গল') টীকায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। এস্থলে মূল পঙক্তি কয়টিও তুলিয়া দেওয়া হইল—"তত্র ধর্ম্মবিদ্যা শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ। অর্থবিদ্যা বার্ত্তাশাস্ত্রম্। তয়োরঙ্গ-বিদ্যা দণ্ডনীতিঃ, যোগক্ষেমসাধনাৎ, আন্বীক্ষিকী তু তত্ত্বনিশ্চয়হেতুত্বাৎ। তাসাং প্রধানানাং

বামন কলাকে কামশাস্ত্রের অঙ্গবিদ্যা বলেন নাই। কাম-শাস্ত্রের মতই উহাও একটি 'মূলবিদ্যা'—ইহাই তাঁহার অভিমত। আবার রাজশেখরের মতে চতুঃষষ্টি কলা 'উপবিদ্যা' মাত্র ১৮। পক্ষান্তরে মহর্ষি বাৎস্যায়নের সিদ্ধান্তে কলাগুলি কামসূত্রের 'অঙ্গবিদ্যা' বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছে ১৯। ঋষির বচন বলিয়া এই মতই গ্রহণীয়—ইহা মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

অতএব আর্ষ বচনানুসারে প্রতিপন্ন হইল যে—কলাবিদ্যা কামশাস্ত্রের অন্তর্গত। শ্রুতি-স্মৃতি ইত্যাদি ধর্ম্মবিদ্যা, বার্ত্তাদি অর্থবিদ্যা ও তদুভয়ের অঙ্গবিদ্যাস্বরূপ দণ্ডনীতি ও আন্বীক্ষিকী এই সকল শাস্ত্রের আলোচনার পর যে সময় অবশিষ্ট থাকিবে সেই অবসরে পুরুষের পক্ষে কামসূত্র ও তদঙ্গভূত চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

সূত্রানুসারে এই বিধি পুরুষের পক্ষে প্রযোজ্য ২০। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতেছে যে নারীর পক্ষে কামশাস্ত্র ও তদঙ্গ-বিদ্যা কলাশাস্ত্রের অধ্যয়নের অনুকূল কোন বিধি আছে কি না? মহর্ষি বাৎস্যায়ন উক্ত তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় সূত্রে বলিয়াছেন যে, বিবাহ ও যৌবন-সঞ্চারের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকও পিতৃগৃহে কামসূত্র ও তদঙ্গবিদ্যা অধ্যয়ন করিবে ২১। যশো-ধরেন্দ্র টীকায় বলিয়াছেন, তরুণী পরিণীতা হইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য থাকে না। এ কারণে তাঁহার সাঙ্গ কামসূত্র অধ্যয়নের সম্ভাবনা নাই২২। কিন্তু যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বে বালিকা কন্যা পিতৃগৃহে পিতার অধীনে বাস করেন। তথায় পিতার অনুমতি লইয়া উপযুক্ত বিশ্বস্ত শিক্ষকের নিকট হইতে তাঁহার পক্ষে কামশাস্ত্র ও কলাশাস্ত্র অধ্যয়নের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে২৩।

যৌবন-সঞ্চারের পূর্ব্বে বালিকা পিতৃগৃহে থাকিয়া সাঙ্গ কামসূত্র অধ্যয়ন করিবে—ইহাই বালিকার পক্ষে বিধি।

যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে তরুণী পরিণীতা হইয়া থাকেন। অন্ততঃ তৎকালেই তাঁহার পরিণয় হওয়া সঙ্গত বলিয়া সূত্রকার মনে করেন। পরিণীতা হইলেই তিনি পরের অধীন হইয়া পড়েন। অতএব, তৎকালে যদি তাঁহাকে এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহা হইলে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত উহা করা নিষিদ্ধ। এই উদ্দেশ্যেই মহর্ষি তৃতীয় সূত্রে বলিয়াছেন যে—যুবতী যদি সাঙ্গ কামসূত্র অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে স্বামীর অনুমতি লইয়া উহা অধ্যয়ন করিতে পারেন ২৪। অর্থাৎ—যদি স্বামী অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে অধ্যয়ন করা সঙ্গত, নতুবা নহে; কারণ পতির বিনা অনুমতিতে বিবাহিতা যুবতী নারী সাঙ্গ কামশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে পতি তাঁহাকে স্বচ্ছন্দচারিণী বলিয়া আশঙ্কা করিতে পারেন—ইহাই যশোধরেন্দ্র বলিয়াছেন২৫।

স্ত্রীলোকের সাঙ্গ কামসূত্রাধ্যয়নে বস্তুতঃ অধিকার আছে কি না—তাহা লইয়া বাৎস্যায়ন বহু বিচার করিয়াছেন। আগামী সংখ্যায় উহার সারার্থ প্রদত্ত হইবে। [ক্রমশঃ

যথাস্বমধ্যয়নকালানুপরোধয়ন্ হাপয়ন্নন্তরান্তরা কামসূত্রমিদমেব তদঙ্গ-বিদ্যাশ্চ গীতাদিকা অধীয়ীত পাঠশ্রবণাভ্যাম্"।—জয়মঙ্গলা (কামসূত্র ১।৩।১)

১৮ ২ ও ৩ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১৯ কামসূত্রের 'অঙ্গবিদ্যা' বলিতে যে কলাগুলিকে বুঝাইতেছে—তাহা কামসূত্রের সাধারণ অধিকরণের তৃতীয় অধ্যায়টির পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। আর যশোধরও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"তদঙ্গ-বিদ্যাশ্চ গীতাদিকাঃ"।

২০ "...পুরুষোঽধীয়ীত"... কামসূত্র (১।৩।১)

২১ "প্রাগ্‌যৌবনাৎ স্ত্রী"—কাঃ সূঃ (১।৩।২)

২২ "প্রাগ্‌ যৌবনাৎ স্ত্রী কামসূত্রং তদঙ্গবিদ্যাশ্চাধীয়ীত পিতৃগৃহ এব। তরুণ্যাঃ পরিণীতত্বাদস্বতন্ত্রায়াঃ কুতোঽধ্যয়নম্? 'যুবতিঃ' ইতি পাঠান্তরম্। তত্র স্ত্রীপর্য্যায়ো দ্রষ্টব্যঃ"—জয়মঙ্গলা, কাঃ সূঃ (১।৩।২)। কোন কোন গ্রন্থে পাঠান্তর আছে—'যুবতিঃ'। সে ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে যে—'যুবতি'-পদের অর্থ স্ত্রীলোক মাত্র—যৌবনদশাপন্না নারী নহে; এরূপ অর্থ না করিলে সূত্রটির পূর্ব্বাপর-সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। যৌবনসঞ্চারের পূর্ব্বে যৌবন-প্রাপ্তা স্ত্রী সাঙ্গ কামসূত্র অধ্যয়ন করিবেন—এরূপ অর্থ ত পূর্ব্বাপর-বিরোধী। তাই যশোধর 'যুবতি' অর্থে 'স্ত্রী-সাধারণ' করিয়াছেন।

২৩ ৺তর্করত্ন মহাশয় টিপ্পনী করিয়াছেন—যুবতীর পক্ষে কামসূত্র অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। 'অধ্যয়ন' অর্থে গুরুর নিকট হইতে পাঠ গ্রহণ।—তর্করত্ন মহাশয়ের সংস্করণ, পৃঃ ৫৬। বস্তুতঃ যুবতীর পক্ষে কামসূত্রের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ—একথা বলা যায় না। সূত্রকারের বক্তব্য এই যে, যৌবন-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই নারীর বিবাহ হয় (অন্ততঃ তৎকালে হইত বলিয়া বুঝা যায়)। একারণে বিবাহিতা যুবতী নারী পতির অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে পারেন—অন্যথা পতি তাঁহাকে দুষ্টচরিত্রা বলিয়া সন্দেহ করিতে পারেন। ইহাই সূত্রকারের আশয়; যশোধরেন্দ্রও এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। যুবতীর কামসূত্রাধ্যয়ন যে একেবারে নিষিদ্ধ—এরূপ কথা কেহ কোথাও বলেন নাই। পতির অনুমতি ব্যতীত যুবতীর কামসূত্র-পাঠ নিষিদ্ধ—ইহাই স্বারসিক তাৎপর্য।

২৪। "প্রত্তা চ পত্যুরভিপ্রায়াৎ"—কাঃ সূঃ (১।৩।৪)।

প্রত্তা—প্র—দা+ক্ত+স্ত্রিয়াং টাপ্। 'প্রত্তা' অর্থে প্রকৃষ্টরূপে দত্তা অর্থাৎ বিবাহিতা, ঊঢ়া।

২৫ "নিষ্ঠায়ামেব "অচ উপসর্গাত্তঃ ইতি ততম্। ঊঢ়েত্যর্থঃ। ত্রিবিধং দানং—মনসা বাচা কর্ম্মণা চেতি। পত্যুরভিপ্রায়াদিতি। যদা পত্যানুজ্ঞাতা, তদাধীয়ীত। অন্যথা স্বৈরিণীত্যাশঙ্কনীয়া স্যাৎ"—জয়মঙ্গলা, কাঃ সূঃ (১।৩।৪)

তর্করত্ন মহাশয় এপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"পরিণীতা নারীর পক্ষে পতির আজ্ঞা ব্যতীত যৌবন-সঞ্চারের পূর্ব্বেও কামসূত্র অধ্যয়ন নিষিদ্ধ" (তঃ সং, পৃঃ ৫৬)। সূত্র দুইটি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়—যৌবনের পূর্ব্বে নারী অবিবাহিতা থাকেন, তখন তিনি অধ্যয়ন স্বেচ্ছায় করিতে পারেন, আর বিবাহের পরে স্বামীর অনুমতি লইয়া অধ্যয়ন করিতে পারেন—স্বেচ্ছায় নহে—ইহাই সূত্র দুইটির সরল অর্থ। তৃতীয় সূত্রের 'প্রাগ্‌যৌবনাৎ' এই অংশটির অনুবৃত্তি চতুর্থ সূত্রে করিয়া চতুর্থ সূত্রটিকে অযথা ভারাক্রান্ত না করিলে চলে না কি? অন্ততঃ টীকাকার যশোধরেন্দ্র এরূপ অনুবৃত্তি করিবার পক্ষপাতী নহেন।

সন্ধি (গল্প)

শ্রীদুলাল বসু

বা'রবাড়ীর উঠানের এক কোণে মাঝারি দোচালা গোয়াল ঘর। তারই উত্তরদিকের ছিটেবেড়ার দেওয়ালে মিত্রদের বিন্দু ঝি দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে ঘুঁটে দেওয়া সুরু করে। থেমে থেমে একটা চাপা ধুপ ধুপ শব্দ হয় যেন অলস দুপুরের ভারী পায়ে চলাফেরার শব্দ। দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুঁটে দেয় বিন্দু আর মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে মেজো বাবুর ঘরের কোণের দিকের জানলাটার গরাদের ফাঁক দিয়ে, ছ'মাসের মেয়েটার দিকে নজর রাখে, মেয়েটা শুয়ে থাকে ঘরের সামনেকার দালানে। ঘরের দরজা খোলাই থাকে, বাড়ীর মেয়েরাও কেউ নীচে থাকে না কারণ বুড়োকর্ত্তার একটানা খিটখিট করা রোগ কেউ সহ্য করতে পারে না, ওপরের দালানে গিয়ে জড় হয় বিন্তি খেলতে। কর্ত্তা শুয়ে থাকেন ঐ ওপাশের মাঝের বড় ঘরখানায়, আর মাঝে মাঝে আপন মনেই বক্ বক্ করেন। কণ্ঠস্বর সব সময় শোনা যায় না; ভুগে ভুগে গলার আওয়াজ নিস্তেজ হ'য়ে এসেছে। কিন্তু এ বাড়ীর লোকের কাছে কর্ত্তার বক্‌বকানী শোনবার দরকার হয় না, ও একটা অনুভূতি সাপেক্ষ ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। খিট্ খিট্ তিনি করবেনই, তার জন্যে কোন কারণ থাকার দরকার হয় না। একটানা বিশ বছর ধ'রে তিনি ভুগছেন; রোগ একটা নয়, বাত আছে, ব্লাড-প্রেসার আছে, আবার বছর দুয়েক হ'ল পক্ষাঘাতও দেখা দিয়েছে। বাঁ-হাতটা একেবারে প'ড়ে গেছে; থিয়েটারের সাজাহানের মত হাতখানা, কোমর ছাড়িয়ে আরও খানিকটা নীচে পর্য্যন্ত এসে একটু ট্যারাচে ভাবে দেহের সঙ্গ এঁটে থাকে। বড় একটা উঠে হেঁটে বেড়ান্ না, তবে দু'একটা অবশ্য কর্ত্তব্য পালনের জন্যে বাধ্য হ'য়ে উঠতে হয়। পুরাণো চাকর সিধুই দেখা-শোনা করে আর গালাগালির ভাগটা সেই ভোগ করে সবচেয়ে বেশী। ছেলেরা বা বৌয়েরা বড় একটা কাছে ঘেঁসে না; গিন্নী বহুদিন হ'ল স্বর্গে গিয়ে বেঁচেছেন, আর মেয়েরা থাকে শ্বশুর-বাড়ীতে, ছ'মাসে-ন'মাসে এক আধবার আসে বটে, তবে বাপের সঙ্গে সম্পর্ক তারাও রাখে না।

চটকলে যারা কুলির সর্দ্দারি করে, তাদের পরিণাম সম্বন্ধে এর বেশী কিছু আশা করা যায় না। কুলিদের পয়সা মেরে তারা রোজগার করে মন্দ নয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রাখতে কিছু বড় একটা পারে না। ভাটিখানা আর তার আনুসাঙ্গিকের একটা চৌম্বক শক্তি আছে। কর্ত্তার কথা বলছি। তাঁর রোজগার আর উচ্ছৃঙ্খলতা সমানে পাল্লা দিয়ে ছুটেছিল একটানা ত্রিশ বছর! প্রথমটাতে ভাঁটা পড়ল বয়স হওয়ার দরুণ চাকরী যাওয়াতে, আর পরেরটির নেশা ছুটল অবশ্য প্রথম কারণে নয়, রোগে। এখন কাজ কিছু নেই, পঙ্গু হয়ে পরম আলস্যে শুয়ে থাকেন আর কুলিসর্দ্দারের অভ্যস্ত মজুরি খাস্তর জাবর কাটেন।

বেশ শান্তশিষ্ট বিন্দুর ছ'মাসের মেয়েটা। কোন হাঙ্গামা নেই, দিনরাত চুপচাপ পড়ে থাকে কেবল বিদ্রোহ করে খিদে পেলে। মেয়েটার গলা কিন্তু ছ'মাস বয়েসের পক্ষে বেশ ভারী আর মোটা, কাঁদলে কাণে বেশ বাজে,—অনেকটা ঝামা দিয়ে লোহার কড়া ঘষার কর্‌করে আওয়াজের মত। তবে এ বাড়ীতে মেয়েটা বড় একটা কাঁদে না, তার কারণও থাকে না। বিন্দু বহু সন্তানবতী না হ'লেও তার আভজ্ঞ মাতৃত্ববোধ শিশু সম্বন্ধে একটা তীক্ষ্ণ অনুভূতিতে বেড়া দেওয়া। মেয়েকে সে কাঁদতে দেয় না—তার কারণের কাঁটাগুলো সম্বন্ধে সে ভারী সতর্ক।

কিন্তু একদিন মেয়েটা কেঁদেছিল। সেইদিনকার কথা নিয়েই এ গল্পের আরম্ভ! সেদিন ঘুঁটে দেওয়া সেরে বিন্দু গেছে ঘাটে বাসন মাজতে, মেয়েটা তখন পরম নিশ্চন্তে ঘুমোচ্ছে; বিন্দু তা দেখেও গেছে। কিন্তু অঘটনও মাঝে মাঝে ঘটে। দালানের এক কোণে মাটি তুলেছিল একদল কাঠপিঁপড়ে। মেয়েটার পাশ দিয়েই সারবন্দীভাবে আসাযাওয়া করছিল তারা। ঘুমন্ত মেয়েটার ডান হাতখানা গিয়ে পড়ল তাদের পথের ওপর। তারপর বিপক্ষের আক্রমণ! পাঁচসাতটা পিঁপড়ে একসঙ্গে নির্ম্মমভাবে কামড়ে দিয়েছে! কচি মেয়ে—একেবারে ডুক্‌রে কেঁদে উঠল। আগের রাত্রে কর্ত্তার ঘুম হয় নি। সকাল থেকেই মেজাজ সপ্তমে চ'ড়ে আছে। সিধু পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে সকাল থেকেই। বৌঝিরাও নীচে কেউ নেই, ওপরের দালানদুর্গে অন্য দিনের মতই তাসের আসর জমিয়েছেন! শুনতে পেলেও ঝিয়ের মেয়ের কান্না থামাতে তাঁরা আসবেন না। কর্ত্তা একেবারে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলেন! মেয়েটা ভারী গলায় একটানা কেঁদে চ'লেছে। একটা বিশ্রী গালাগালি দিয়ে কর্ত্তা বিছানায় উঠে বসলেন। লাঠিটা র'য়েছে ঐ ও কোণে; সিধু বোধ হয় জব্দ করবার জন্যই ওটাকে ইচ্ছে ক'রে সরিয়ে রেখে গেছে। কি একটা সঙ্কল্প ক'রে হামাগুড়ি দিয়ে কর্ত্তা নেমে পড়লেন মেঝেতে। বাতের ব্যথাটা ক দিন ধ'রে চাগিয়েছে, কোমরটাও টন্‌টন করছে, কিন্তু লাঠিটার কাছে পৌঁছ'তেই দেরী নেই।

……লাঠিটা নিয়ে দেয়াল ধ'রে কর্ত্তা উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ঠুকঠুক ক'রে লাঠি ধ'রে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন বাইরের দালানে। তাঁর সঙ্কল্প ততক্ষণে মুখের ওপর প্রতিটি রেখায় আত্মপ্রকাশ ক'রেছে। চোখ দুটোতে একটা হিংস্র পৈশাচিক জ্বালার উল্লাস! গ্রাষ্ম দুপুরের প্রচণ্ড রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছিল। হঠাৎ যেন একটু ঝাপ্‌সা হ'য়ে গেল! অকারণেই কর্ত্তা একবার আকাশের দিকে চাইলেন।…এ দালান আর ও দালানের মধ্যে একটা চৌকো উঠানের ব্যবধান। একবার এদিক ওদিক চেয়ে কর্ত্তা নামলেন উঠানে। অনাবশ্যক দেরী করেই উঠানের সীমা পার হলেন—এর চেয়ে অনেকটা জোরেই তিনি হাঁটতে পারেন। তারপর দালান। সেটুকু ব্যবধান চোরের মত লঘুপদে পার হ'য়ে কর্ত্তা এসে দাঁড়ালেন একেবারে মেয়েটার ঠিক সামনে।—কিন্তু তার দিকে চেয়ে থাকা যাচ্ছে না কেন? কারণ তিনি বুঝতে পারলেন না; লাঠিটা নামিয়ে রেখে—মুখটা ফিরিয়ে, একটু কুঁজো হ'য়ে ডান হাতটা দিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে খপ্ করে চেপে ধরলেন গলাটা। ক্যাঁক্ ক'রে একটা বিশ্রী আওয়াজ দিয়ে মেয়েটা চুপ করে গেল। কিন্তু ছেড়ে দিলেই আবার চেঁচান সুরু হবে। আস্তে আস্তে চাপ দিতে কর্ত্তা অনুভব করলেন পাতলা জিব্‌টা ঠেলে এসে হাতের মুঠো স্পর্শ করছে। একটু একটু করে ডানহাতের সমস্ত শক্তিটুকু মেয়েটার গলার আধখানা ঘিরে মৃত্যুচক্র রচনা করেছে। হাতটা ভিজে লাগতেই মুঠো শিথিল করে হাতখানা ফিরিয়ে আনলেন চোখের এলাকায়। একি! রক্ত! কিন্তু অবাধ্য চোখ কিছুতেই পিছনে দৃষ্টিপাত করতে চায় না। মনের শক্তিতে দৃষ্টি একটু ফরতেই চোখে পড়ল কষ্ বেয়ে একঝলক্ রক্ত মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু অনভ্যস্ত হাতের হত্যা, সে যে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে দিয়ে গেল। লাঠিটা ধরে তোলবার পর্য্যন্ত শক্তি নেই! ডানহাত-খানা থর্‌থর্ ক'রে কাঁপছে। দালান থেকে উঠানে নামতে গিয়ে কর্ত্তা যেন ইচ্ছে ক'রেই ধাক্কা খেয়ে ঠিক্‌রে পড়ে গেলেন উঠানে। জ্ঞান-টুকুও লুপ্ত হয়ে গেল; কিন্তু হঠাৎ নয় আস্তে আস্তে যেন ইচ্ছে করেই জ্ঞান হারান'র মত।

বাড়ীতে একটা চাপা সোরগোল উঠল প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। অবশ্য বিন্দু ঝি অজ্ঞান হ'য়ে না পড়লে সোরগোলটা ভীতিপ্রদই হ'য়ে পড়ত। কর্ত্তারই হাত পাঁচ ছয় দূরে উঠানের মাঝখান বরাবর একরাশ ভাঙ্গা বাসনের মাঝখানে বিন্দু অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিল। অতএব আপাততঃ বিন্দুর দিক্ থেকে গোলমালের আশঙ্কা ছিল না। ঘটনাস্থলে উপস্থিত কেউ ছিল না, অতএব খুনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী পাওয়া যেত না; বাড়ীর লোকের কাছেও সমস্ত ব্যাপারটার পৌর্বাপর্য্য রহস্যময়ই থেকে যেত, কিন্তু…

কর্ত্তার ডানহাতের তিনটি আঙ্গুলে পাতলা রক্তের দাগ ততক্ষণে শুকিয়ে গাঢ় হয়ে গেছে।

ব্যাপারটাকে বাড়ীর ভেতরেই চেপে ফেলা হ'ল। মেয়েটাকে পুঁতে ফেলা হ'ল বাড়ীর পেছনের বাগানে অজ্ঞান বিন্দু বন্দী হ'য়ে রইল ছাদের ওপর একটা টিনের চালা ঘরে, আর কর্ত্তা মারা গেলেন সেই রাত্রেই,

রাত্রি দুটোয় :—তাঁর আঙুলের দাগগুলো অবশ্য গরম জলে তুলো ভিজিয়ে তুলে ফেলা হয়েছিল।

মনুষ্যত্বের মুখোস সময় সময় মানুষের কাছে ভয়াবহ হ'য়ে ওঠে। এর পেছনে থাকে একটা লজ্জা কিংবা একটা ভয়। বিন্দুকে মেজবাবু জলের সঙ্গে একটা তরল পদার্থ মিশিয়ে খাইয়ে দিলেন।—জিনিষটার ঝাঁঝ ছিল বোধ হয় ;—অর্দ্ধচেতন বিন্দু জল খেতে খেতে নাকমুখ কুঞ্চিত ক'রেছিল।

পাঁচদিন পরে যখন বিন্দু এসে মিত্তিরবাড়ীর সদর দরজায় দাঁড়াল, সে তখন বদ্ধ পাগল।

আপনি যদি কখনও ঝড়গাঁয়ে যান ওখানকার লোকে আপনাকে এক গল্প শোনাবে। ধরুন, আপনি হয় ত' নতুন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর হ'য়ে রাইপুর থানায় বদলী হ'য়েছেন। রাইপুর থেকে ঝড়গাঁ ত মাত্র তিন মাইল। কোন না কোন তদন্তে আপনাকে ঝড়গাঁয়ে যেতে ত হবে ; ওরা আপনাকে ভয় ক'রবে সম্ভ্রম করবে—ত্রুটি কিছুরই রাখবে না—কিন্তু গল্পটাও শোনাবে। নতুন লোক পেলেই ওরা গল্পটা শোনায়। অবশ্য গাঁ শুদ্ধ লোক ভেঙ্গে প'ড়ে গল্প শোনাতে আসে না। ওর একটা প্রচারকেন্দ্র আছে। হাটের মুখে গোলপাতা-ছাওয়া একখানা ছোট ঘরে কেশব ময়রার দোকান। গল্পটা শোনায় এই কেশব ময়রা। রাইপুর ষ্টেশন থেকে ঝড়গাঁয়ে আসতে পাকা তিন মাইল রাস্তা আপনাকে অনেক মাঠঘাট পেরিয়ে আসতে হবে। আপনি পরিশ্রান্ত হবেন নিশ্চয়ই। বসতি সুরু হবার মুখেই হাট, আর হাটের মুখেই কেশবের দোকান আপনার চোখে পড়বে প্রথমেই। আপনাকে দেখতে পেলেই কেশব ডাকবে, "আসুন গো বাবু একটু ব'সে যান, গরম জিলিপী ভাজছি। আপনি জিলিপীর প্যাঁচে পড়বেন। একটু ইতস্ততঃ হয় ত করবেন প্রথমে কিন্তু যাবেন ঠিক-ই। কেশব এক ঘটি জল দেবে, আপনি মুখ হাত ধুয়ে বসবেন ওর তক্তপোষে। জিলিপীর ঠোঙাটি এগিয়ে দিয়ে কেশব বস'বে হুঁকো হাতে। এই সময়ে গল্পের স্রোত নামবে। ও ব'লে যাবে আর আপনি হাঁ ক'রে শুনবেন। গল্প বলতে বলতে অবশ্য ও মাঝ পথে হঠাৎ থামবে মাঝে মাঝে,—বলবে, "ওকি বাবু, জিলিপী যে জুড়িয়ে গেল।"

কেশব যে গল্পটা বলে সেটা মাত্র বিশ বছর আগেকার ঘটনা। সেই গল্পেরই অর্দ্ধেকটা আমি প্রথমে বলেছি—অবশ্য আমার নিজের মত ক'রে। ঐ পর্য্যন্ত ব'লে কেশব অনেকক্ষণ দম নেয়, তারপর বলে, "এদিকে একটু উঠে আসুন বাবু, ঐ যে দেখছেন বট গাছের আড়ালে ছাওলাধরা দেড়তলা বাড়ীটা, ঐ হ'ল গো' আপনার মিত্তির বাড়ী।" তারপর যে চাটাইখানার উপর বসে ও দোকানদারী ক'রে তারই একটা কোণ তুলে, নীচে থেকে অতি ময়লা আর ভাঁজ-করা একখণ্ড ছাপানো কাগজ বের ক'রে। বেশ বোঝা যায়, কেশবের পরিমাণ-জ্ঞান অতি তীক্ষ্ণ। কোন্ কথার পিঠে কোন্ কথাটি মানায়, কেশব তা' জানে। তাই ওর গল্পটা কোথাও ঝুলে পড়ে না—শেষ পর্য্যন্তই বেশ জমাট থাকে।

কেশবের কাগজের টুক্‌রোটা, খবরের কাগজের একটু বিচ্ছিন্ন অংশ। বিশ বছরের পুরোণ একটা বিজ্ঞাপন ওতে দেখতে পাওয়া যায়—'উন্মাদ চিকিৎসালয়—'ঝড়গাঁ'। এর নীচে দশ বার লাইনে অনেক কথাই লেখা আছে, কিন্তু অস্পষ্ট হয়ে এসেছে লেখাগুলো—পড়া যায় না। কেশব বলে, বিন্দু ত' বাবু, উন্মাদ হ'য়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াত। এই গাল পাড়ছে···এই বিড়্ বিড়্ ক'রে বকছে, গাঁয়ের বৌ-ঝিরা ত' ভয়ে অস্থির। আর মিত্তির বাড়ীর মেজবাবুকে দেখ্‌তুম—কেমন হ'য়ে যাচ্ছেন! আমরা আর কি বুঝ্‌ব। নিজেরাই নানাকথা বলাবলি করি। হঠাৎ একদিন এক সন্ন্যাসী এলেন গাঁয়ে। ভারী জবর সন্ন্যাসী। ইয়া জটাজটো আর লম্বা দাড়ী। বাবা পঞ্চাননতলায় এসে তিনি আস্তানা গাড়লেন। মেজবাবু গিয়ে কেঁদে প'ড়লেন তাঁর পায়ে। ঠাকুর ত' দয়া ক'রলেন। দিন নেই, রাত নেই, মেজবাবু তাঁর পিছনে পিছনে ঘোরেন—পরনে লাল চেলী আর কপালে লাল চন্দনের তেলক। আমরা ভাবলুম, মেজবাবুও বুঝি সংসার ভাসিয়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে যাবেন। কিন্তু তা' হ'ল না। সন্ন্যাসী ঠাকুর একাই একদিন নিরুদ্দেশ হলেন। হঠাৎ শুনলুম, মেজবাবু আশ্রম খুলছেন। খুললেনও আশ্রম—তবে ঠিক আশ্রম নয়—ঐ উন্মাদ-চিকিৎসালয়।—কেশব এবার গম্ভীর হ'য়ে ওঠে।

'উন্মাদ চিকিৎসালয়—' মাত্র একজনেরই চিকিৎসা হ'য়েছিল। অবশ্য 'চেষ্টা করা হয়েছিলো' বললে আরও ভাল হয়। অনেক লোকজন লাগিয়ে বিন্দুকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল আশ্রমে। যেতে সে চায় নি। প্রচণ্ড সংগ্রামে, আঁচড়ে কামড়ে তিন চার জনকে জখম ক'রে দিয়েছিলো। চিকিৎসা চলেছিলো মাসখানেক। অবশ্য দেখতে পেতো না কেউ। আজ শোনা যায়, ডাবের জলে 'চান' করানো হ'ল ; অমুক দিন শোনা গেল গোখরো সাপের খোলস পুড়িয়ে নাকে ধোঁয়া দেওয়া হয়েছে। এর পর থেকে বাকী ঘটনাটুকু রহস্যময় হয়ে আছে। কেশব ময়রা এটুকু ভাল' বুঝতে পারে না।—ব'লে ব্যাপারটা কেমন যেন একটু গোলমেলে লাগে বাবু। একদিন সন্ধ্যেবেলা দোকানে ব'সে আছি—খদ্দের পত্তর বিশেষ নেই। মিত্তির বাবুদের পুরোণ' চাকর সিধু এসে বললে, 'শুনেছ কেশব, বিন্দু বেটি কোথায় পালিয়েছে। কাল থেকে তাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। মেজবাবু ত' পাগলের মত হ'য়ে গেছেন। আশ্রমে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে খালি পায়চারি করছেন, আর কি সব বকছেন, বিড় বিড় ক'রে। এসো না একবার—যাবে দেখতে?' আমার ছোট ভাই মাধবকে দোকানে বসিয়ে গেলাম সিধুর সঙ্গে। আমাদের সাড়া পেয়ে মেজবাবু হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে খড়ম পায়ে খট্ খট্ ক'রে নেমে এলেন। বললেন, 'কি চাই এখানে? অন্ধকারে ঠিক ঠাওর না পেলেও বুঝতে পারলুম চোখ দুটো ঝাঝালো হ'য়ে উঠেছে। 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে ; বিন্দু নেই এখানে। আমি কিছু জানি না—আমায় কোন কথা জিগ্যেস ক'রো না। ওঃ—এমন জানলে কি আমি তার চিকিৎসা ক'রতুম!'—আমরা ভয়ে কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। মেজবাবু ফিরে গিয়ে দড়াম ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন।

পরদিন সকাল হ'তেই গাঁয়ে হৈ চৈ বেধে গেল। মেজবাবু না কি গলায় দড়ি দিয়ে আশ্রমের ঘরের আড়কাঠায় ঝুলছেন। গিয়ে দেখি গাঁ ভেঙে লোক জড় হ'য়েছে। দারোগা সাহেবও এসেছেন কালো ঘোড়ায় চ'ড়ে। ঘরের দরজা ভেঙ্গে লাস নামান হ'ল। মেজবাবুর হাত দুটো লাল টক্ টক্ করছে। যেন রক্ত শুকিয়ে চাপ হ'য়ে ব'সে গেছে। দারোগা সাহেবের সঙ্গে জমাদারের চাপা কথাবার্ত্তা হ'ল হাত দুটো নিয়ে। মিত্তির বাড়ীর অন্য সব কর্ত্তারাও ছিলেন। কথা তাদের সঙ্গেও হ'ল। কি যে ব্যবস্থা হ'ল কে জানে—পুলিশের লোকেরা ত' আমাদের লাঠির গুতো দিয়ে সরিয়ে দিলে ;—একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দিলে না। আর আমরা কিছু জানি না বাবু। হ্যাঁ, একটা কথা—শ্মশানে গিয়ে কিন্তু মেজবাবুর হাতে কোন দাগ দেখ্‌তে পাই নি।'—

'ও কি বাবু! আর একটা র'য়ে গেল যে—' কেশব দেখতে পায় ঠোঙার তলায় আরও একখানা জিলিপী প'ড়ে আছে। এবার ও একটু হাসে।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের দুইটি রচনা

(১)

পৌরাণিক চিত্র

শিব-মন্দির

কুন্তী। নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ॥
নমস্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে।
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥
নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥

হে যজ্ঞেশ্বর যোগেশ্বর, অনাদি আশুতোষ, ভূতনাথ ভৈরব, দেবদেব মহাদেব, পিনাকী ত্রিপুরারি, ব্যোমকেশ মৃত্যুঞ্জয়! দাসীর পূজা গ্রহণ কর। আশীর্ব্বাদ কর প্রভু! পিতৃহীন পুত্রগণের কল্যাণ হোক্।

(গান্ধারীর পূজা লইয়া প্রবেশ)

গান্ধারী। একি! কে মন্দির-মধ্যে শিব-পূজা কচ্ছে? স্ত্রীলোক দেখছি! গভীর ধ্যানমগ্না! কে তুমি? এ কি কুন্তী! তুমি এ শিবমন্দিরে কেন?

কুন্তী। কে? দিদি! আমি তো এখানে নিত্যই এসে বাবার পূজা ক'রে যাই। তুমি কখন এলে?

গান্ধারী। কুন্তি! এ কি ঔদ্ধত্য তোমার! তুমি কি জান না—রাজমাতা রাজপত্নী না হ'লে এ যোগেশ্বর শিব মন্দিরে এসে পূজা কর্‌বার কারও অধিকার নাই। আমি নিত্য এসে বাবার পূজা ক'রে থাকি। তুমি কার আদেশে—কি সাহসে আমার পূজিত স্বয়ম্ভুর মন্দিরে এসে পূজা কর্‌লে? বল।

কুন্তী। দিদি! তুমি জ্যেষ্ঠা—তিরস্কার কর্‌বার অধিকার তোমার আছে। কিন্তু এ তোমার অন্যায় তিরস্কার। আমি কি রাজমাতা—রাজপত্নী নই? তুমি ও যে অধিকারে এসে বাবার পূজা ক'রে থাক, আমিও সেই অধিকারে এসে বাবার পূজা করি। কুরুবংশে প্রবেশ ক'রে অবধি আমি এই যোগেশ্বর মন্দিরে এসে পূজা ক'রে থাকি। তুমি এসে পূজা করো—তাতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু আমাকে এ মন্দিরে এসে পূজায় বঞ্চিতা কর্‌তে তোমার কোন অধিকার নাই।

গান্ধারী। বটে! বিধবার এত অহঙ্কার। এই স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ পূজা করলে পুত্র রাজ-চক্রবর্ত্তী হবে—এ সন্ধান বুঝি কৌশলে কারও মুখে অবগত হয়েছ, তাই ঈর্ষ্যায় অন্ধ হ'য়ে আমার পূজার অগ্রে এসে বাবার পূজায় প্রবৃত্ত হয়েছ! যাও—মন্দির হ'তে বহিষ্কৃত হও।

এই দেবস্থানে দেবপূজায় তোমার মত আমারও যখন অধিকার আছে, তখন আমি কখনই এ স্থান ত্যাগ কর্‌বো না।

গান্ধারী। তোমার পুত্রগণের বীরত্বের অহঙ্কারে বুঝি এত স্পর্দ্ধা কর? ভেবেছ কি—তোমার রাক্ষস-স্বভাব পশু প্রকৃতি ভীম এসে তোমায় রক্ষা কর্‌বে?

কুন্তী। ভগ্নি! বুঝলেম—তা হ'লে দুষ্টমতি দুর্য্যোধন একা ভীমকে বিষ প্রদান করে নাই। এ ষড়যন্ত্রে তুমিও তা হ'লে ছিলে। কিন্তু জেনো ভগ্নি! হিংসায় কখনই জয়লাভ হয় না। আমার একমাত্র সহায় ধর্ম্ম। তাঁরই কৃপায় বিষপানে মৃত ভীমকে আবার ফিরে পেয়েছি।

গান্ধারী। তুমি যে সতীর আদর্শ। ধর্ম্ম যে তোমার সহায় হবেন—এ আর আশ্চর্য্য কি। তোমার মত হীনার সঙ্গে আমার দ্বন্দ্ব কর্‌বার প্রবৃত্তি নাই। এ শিব-মন্দিরে আমি ভিন্ন আর কারও পূজার অধিকার নাই। এবার আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা কর্‌লুম। আর কখনও এ মন্দিরে প্রবেশ কোরো না। যাও—

কুন্তী। আমি বার বার বলেছি—এ মন্দিরে পূজার অধিকার আমার সম্পূর্ণ আছে। আমি তোমার অনুগ্রহ-প্রার্থিনী বলেই এত কথা বলছি। পতিহীনা অভাগিনী ব'লেই এতটা উপেক্ষা করতে সাহসী হয়েছ। তুমি রাজমহিষী—শত পুত্রের জননী—তোমার পুত্রেরা রাজৈশ্বর্য্যে পালিত। আমার শিশুরা রাজপুত্র হয়েও তোমাদের অনুগ্রহ-অন্নে—দীনের ন্যায় পালিত। কিন্তু ভগ্নি! তারাও এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেছে—ভারতরাজ্যে তাদেরও অধিকার আছে। যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ, দুর্য্যোধন কনিষ্ঠ। তুমি দুর্য্যোধনের কল্যাণ কামনায় বাবার মন্দিরে যে মানসে পূজা করতে এসেছ, আমিও পুত্রের কল্যাণ কামনায় সেই মানসেই পূজা করতে এসেছি। তোমার যেরূপ জননী-হৃদয়—আমারও তাই। জননী হয়ে জননীর অন্তরের ব্যথা বুঝে আজ তোমার এ কি আচরণ ভগ্নি!

গান্ধারী। বুঝলেম, তোমার যুধিষ্ঠির ভারতের রাজ-চক্রবর্ত্তী সম্রাট হবে, সেই কামনায় তুমি বাবার মন্দিরে প্রত্যহ পূজা দিতে আস। দৈবক্রমে আজ তোমার এই চৌর্য্যবৃত্তি ধরা পড়েছে। যাও, এখনই এই মন্দির পরিত্যাগ করো, নচেৎ বাইরে পরিচারিকা অবস্থান কর্চ্ছে, অপমানিতা হবে।

কুন্তী। হে শান্তিময়! হে উমাপতে! হে অনাথনাথ! তোমার এই পবিত্র মন্দিরে এসে আজ এত অশান্তি কেন প্রভু? দাসী কি অপরাধে অপরাধিনী?

গান্ধারী। তোমার অপরাধ—অনধিকার প্রবেশ।—চোরের মত তুমি আমার শিবমন্দিরে প্রবেশ করেছ। যাও—দূর হও। এখনও নীরব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলে?

কুন্তী। আমি কখনই পূজা অসমাপ্ত রেখে এ মন্দির ত্যাগ করব না।

গান্ধারী। কে আছিস্—

(সহসা লিঙ্গমূর্ত্তি হইতে মহাদেবের আবির্ভাব)

শিব। হও ক্ষান্ত, ত্যজ দ্বন্দ্ব কুরুকুলবধূ!
অর্দ্ধ অঙ্গ মোর স্বয়ং পার্ব্বতী;
কাহার শকতি অংশ করিবারে মোরে?
ভক্তিভরে যেই জন পূজে—
ক্ষুদ্র কি মহৎ—তার প্রতি বহু প্রীতি মোর।
বহু বর্ষ গত—এ মন্দির করিয়া নির্ম্মিত
পূজিয়া আসিছে মোরে কুরুবধূগণ;
সে কারণ রাজ-রমণীর পূজা
হেথা মম প্রিয় সমধিক।
তোমা দোঁহে কুরুকুলবধূ—
রাজরাণী—রাজমাতা তোমা দোঁহে—
ভক্তিগুণে কেহ নহে ঊন;
দোঁহার পূজায় মম অসীম আনন্দ।
ত্যজ দ্বন্দ্ব—দুই ভগ্নী প্রীতির বন্ধনে
নিতি নিতি পূজা কর মোর।
কিন্তু, যদি এক জন মাত্র মোরে চাহ পূজিবারে
শুনহ আদেশ মোর—
কনকের দল—মা'ণক-কেশর—
সহস্রেক সুগন্ধ চম্পক সহ
রজনী প্রভাতে এ মন্দিরে আসি
যেই জন প্রথমে পূজিবে মোরে,
নিশ্চয় জানিবে আমি হইব তাহার।
মম আশীর্ব্বাদে—
তাহারই তনয় হ'বে কুরুবংশপতি।

[মহাদেবের অন্তর্দ্ধান]

গান্ধারী। জয় ত্রিপুরারি! জয় আশুতোষ। (কুন্তীর প্রতি) আর তোমার চিন্তা কেন! বাবা তো তোমারই হলেন! তোমার সব দেবতাদের ঔরসের ছেলে!—দেবতা-দের মনে শক্তি। দেবশক্তি বলে কি দিনরাতের মধ্যে সহস্র এক কনকের দল—মাণিকের কেশর চাঁপা তৈরি ক'রে দিতে পারবে না। বাবার প্রত্যক্ষ আদেশ শুনেছ। দেখ, কাল যেন থামকা আর জ্বালাতন করতে এসো না। (প্রস্থান)

কুন্তী। বাবা! এ আবার কি কঠোর পরীক্ষায় ফেল্‌লে! আমি যে বড় অসহায়া, স্বামিহীনা, পুত্রগণ শিশু—পরগৃহে বাস, পর-অন্নে প্রাণধারণ।

(২)

ঐতিহাসিক চিত্র

চরিত্র

জগৎ শেঠ মহাতাব চাঁদ	}	শ্রেষ্ঠি-ভ্রাতৃদ্বয়
ঐ স্বরূপ চাঁদ	}	
আলি ইব্রাহিম	—	মীরকাসিমের বন্ধু
সামসের উদ্দিন	—	মীরজাফরের বন্ধু
খোজা বাজিদ	—	আর্ম্মাণী বণিক্

জগৎ শেঠের বাটী

(মহাতাব চাঁদ, স্বরূপচাঁদ ও খোজা বাজিদ)

মহাতাব চাঁদ! চুপ কর, সামসের উদ্দিন আস্‌ছে।
(সামসের উদ্দিন ও আলি ইব্রাহিম খাঁর প্রবেশ)।

মহাতাব চাঁদ। আস্‌তে আজ্ঞা হয়—আস্‌তে আজ্ঞা হয়

সামসের। বেশ হয়েছে। খোজা বাজিদ সাহেবও আছেন, আপনি মধ্যস্থ হোন। আমাদের দু'জনের একটা তর্ক হয়েছে। মহাশয় প্রাচীন লোক, আলীবর্দ্দীর আমল থেকে আছেন, আপনাদ্বারাই স্বরূপ মীমাংসা হবে। তর্কটা এই—বাঙ্গালায় হিন্দু বড়, কি মুসলমান বড়? আমি বলি—হিন্দু বড়।

আলী। উনি জুলুম ক'রে তর্ক করছেন। আমি কা'কেও বড় ছোট মনে করিনে। আমি বলি, বাঙ্গালার জল-হাওয়া যার গায়ে লেগেছে—সব সমান। এ-বাঙ্গালার মাটীতে পা দিলে কেউ আর বড় ছোট থাকে না।

মহাতাব! মহাশয়! বাঙ্গালার গৌরাঙ্গই বড়।

সামসের। সে তো নিশ্চিত! গৌরাঙ্গই তো হিন্দু-মুসলমানের বাস্তু দেবতা। এখন গৌরাঙ্গকে তুষ্ট রাখতে হিন্দু পারে, কি মুসলমান পারে!

স্বরূপ। মহাশয়! ক্লাইভ হ'তে মুসলমানের পূজাই তো গৌরাঙ্গ পেয়ে আসছে।

সামসের। আজ্ঞে, মুসলমান তো রূপোর চাকি দিয়ে পূজো করে, মন্ত্র তো আপনারা পড়েন!

আলী। হিন্দুর অপরাধ কি! মুসলমান যে মন্ত্র পড়তে চান, হিন্দু সেই মন্ত্র পড়ান!

সামসের। সে কি! এমন কথা বলবেন না। মশাই! মুসলমানকে গৌরাঙ্গ-প্রেমে দীক্ষা দিলে কে বলুন? রাজা রাজবল্লভ না হ'লে কি মুসলমান গৌরাঙ্গ চিনতো! আর রায়দুর্ল্লভ, শেঠজীরা, মাণিকচাঁদ—এঁরা না ক্লাইভের পূজা করলে কি মীরজাফর সাহেব গৌরাঙ্গের পূজা ক'রে গদী পেতেন!

মহাতাব। মশাই! সে-কথা আর কেন তুলছেন?—আমরা হিন্দু-মুসলমান উভয়ে মিলেই ঝকমারি করেছি!

আলী। সেই নিমিত্তই আমি বলছি—হিন্দু-মুসলমান আমরা উভয়েই তুল্য ভক্ত।

সামসের। শোন শোন, আমার সওয়াল শোনো। একবার ঝকমারি ক'রেই কি হিন্দু-মুসলমান নিশ্চিন্ত আছি, আবার যে ষোড়শোপচারে গৌরাঙ্গ-পূজা কোল্‌কাতায় হয়েছে শুনচি। সে-পূজা ধুমধাম ক'রে মুর্শিদাবাদেও না কি অচিরে হবে। নবাবের হুকুমে বজরা সজ্জিত হচ্ছে। এবার গৌরাঙ্গ-প্রধান ভ্যান্সিটার্টের পদার্পণ সম্ভব।

আলী। ম'শায়ের তো অন্তর পাওয়া যাচ্ছে না। ম'শায় চিরদিনই স্পষ্ট বক্তা শুনি, নবাবকেই ক্লাইভের গর্দ্দভ বলে-ছিলেন;—এখানে তো বড় স্পষ্ট কথা বলছেন না। মনের ভাবটা কি প্রকাশ করুন।

সামসের। ম'শায়! মনের ভাব বড় অপ্রকাশ নাই। ম'শায়ও তো শেঠজীর বাড়ীতে একটা মনের ভাব নিয়ে আসছিলেন, বান্দাও অবশ্য একটা ভাব নিয়ে এসেছে। খোজা বাজিদও শেঠজীদের সঙ্গে একটা ভাব নিয়ে বসেছিলেন।

খোজা। না না, ভাব আর কি! সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।

সামসের। ম'শায়ের তো সোরার ব্যবসা, শেঠজীর তো সোরার ব্যবসা নাই যে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। ম'শায় হচ্ছেন কাজের মানুষ, বিনা কাজে কি পা বাড়ান?

আলী। আজ্ঞে এবার স্বরূপ বলছেন, বিনা কাজে কেউ পা বাড়ান না। তা দেখুন কাজ দু'রকম আছে—এক মেটান কাজ, আর এক বাধান কাজ।

সামসের। আর এক সংবাদ লওয়া কাজ।

আলী। আজ্ঞে, সংবাদটা তো মেটান বাধান উভয় কাজের অন্তর্গত বই তো নয়!

সামসের। স্বীকার পেলেম।

আলী। তবে ম'শায় বোধ হয় জানতে এসেছেন যে, কাসিম আলীখাঁ বাহাদুর কোল্‌কাতায় কি কচ্ছেন। ইংরাজদের সঙ্গে হিসেব-নিকেশের জন্য নবাব পাঠিয়েছেন। তা হিসেব-নিকেশ কচ্ছেন, না নবাবের নিকেশের পন্থায় আছেন? আর সে পরামর্শের ভেতর এঁরা আছেন কি না? তা দেখুন, আমিই আপনাকে ব'লে দিই—একটা বাধাবাধিই সম্ভব। পরামর্শের ভেতর এঁদেরও থাকার সম্ভব! নিজের নিজের স্বার্থ বড় পদার্থ। ম'শায়ই বুঝুন না, নবাব সাহেবের স্বার্থে আপনার স্বার্থ জড়িত, তাই এসেছেন। এঁদেরও স্বার্থ আর একরূপ, তাই এঁরা একত্র।

মহাতাব চাঁদ। কি বলচেন—কি বলচেন—স্বার্থ কি? স্বার্থ কি?

আলী। ম'শায়! ভয় পাচ্ছেন কেন? গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট সাহেব যদি না পৌঁছে থাকেন, পৌঁছলেন ব'লে। আর যদি না পৌঁছেন, হেষ্টিংস সাহেব রেসিডেণ্ট রয়েছেন, নবাব হঠাৎ কিছু জবরদস্তি করতে পারবেন না।

সামসের। ম'শায় তো বক্তৃতাটি দিব্য করলেন, কিন্তু বক্তব্য তো কিছু বুঝলুম না। স্বীকার পেলেম, সংবাদ নিতে এসেছি, তার পর—

আলী। তার পর শুনুন। উপস্থিত নবাবের কার্য্যে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের স্বার্থে আঘাত পড়ে। অট্টালিকা হ'তে দীনের কুটীরে সে আঘাত! অবস্থার পরিবর্ত্তন না হ'লে দেশের সর্ব্বনাশ! প্রকাশ্যে হোক, গোপনে হোক্, সে চেষ্টার ত্রুটী কথনই হ'বে না। আমার বক্তব্য এই যে, পরস্পর স্বার্থ নিয়ে পরস্পরে কলহ না ক'রে স্বার্থের প্রধান বিঘ্নের বিরুদ্ধে একত্র হ'লে হয় না?

খোজা। সে কি?

আলী। 'সে কি'—ওই সর্ব্বনাশের মূল। এই 'সে কি' বাঙ্গালা হ'তে দূর না হ'লে বাঙ্গালার মঙ্গল নাই। নবাব পরিবর্ত্তন শতবার হ'লেও বাঙ্গালার প্রজার শান্তি নাই।... সামসের উদ্দিন সাহেব! নবাবকে বলুন—নবাবীপদ গ্রহণ করেছেন, নবাবী ভারও গ্রহণ করুন। নচেৎ উপযুক্ত লোককে ভার প্রদান ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আমোদ করুন।...

এখনও উপায়ের সম্ভাবনা, দু'দিন পরে আর সে উপায় থাকবে না।

সামসের। সেই উপায়ের জন্যই কি মীরকাসিম সাহেব কোলকাতায় গিয়েছেন?

আলী। তাঁর যেরূপ ইচ্ছা তিনি করেছেন। তাঁর একার ইচ্ছার উপর কিছুই নির্ভর করে না। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের এক স্বার্থ হওয়ার উপর সমস্ত নির্ভর।...আমাদের পরস্পর পৃথক্ স্বার্থ হওয়ায় হানি নাই। চিরদিনই পরস্পর স্বার্থ পৃথক্ থাকবে। কিন্তু যারা বঙ্গভূমির শোষক, তাদের বিরুদ্ধে এক স্বার্থ হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। নচেৎ আজ যে নবাব কাল তিনি পথের ভিখারী হবেন; আজ যিনি ধনাঢ্য আমীর, কাল তিনি আবাসহীন হবেন; আজ যিনি ম'স্থগণ্য প্রধান, কাল তিনি হীনের হীন হবেন।...এই সকল পরিবর্ত্তনের কারণ হবে। সতর্ক হবার সময় উপস্থিত। আমাদের আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করা উচিত নয়।

সামসের। আলী! কি নিমিত্ত অরণ্যে রোদন কচ্চ? আমার প্রশ্নের ভাব কি তুমি বোঝ নাই? হিন্দু-মুসলমান যদি এক স্বার্থে জড়িত হবে, তবে বিদেশী বাণিজ্য কিরূপে বিস্তার হবে?

আলী। তুমি এই সাধু প্রস্তাব কচ্চ, কিন্তু আমার মনে কি আছে তা জান? তুমি হেথায় প্রস্তাব কচ্চ, অন্যদিকে ষড়যন্ত্রের ধারা প্রবলবেগে প্রবাহিত হচ্চে। নিশ্চয় জেনো আশু কোন বিভ্রাট হবে। বিনা স্বার্থে গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট কলিকাতা পরিত্যাগ ক'রে মুর্শিদাবাদে পদার্পণ কর্চ্চেন না।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। নবাব বাহাদুর দরবারে শেঠজীদের আহ্বান করেছেন। ম'শায়ের বাটীতেও ম'শায়ের সন্ধানে গমন করেছিলেন।

মহাতাব চাঁদ। কিরূপ অনুমতি হয়?

সকলে। আজ্ঞে, আমরা বিদায় হলেম।

[সকলের প্রস্থান]

স্বর্গত মহাকবি গিরিশচন্দ্রের মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন সংস্করণে তাঁহার যে সকল রচনা পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, তাহাদিগের মধ্য হইতে দুইটি রচনা এ সংখ্যায় উদ্ধৃত করা হইল। উহাদিগের প্রথমটিতে একটি পৌরাণিক চিত্র ও দ্বিতীয়টিতে একটি ঐতিহাসিক চিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। আগামী মাঘ সংখ্যায় ৺গিরিশচন্দ্রের এইরূপ অন্যান্য রচনা, যাহা তাঁহার গ্রন্থাবলীতে স্থান পায় নাই, প্রকাশিত হইবে। ঐ সকল রচনা প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছেন—প্রবীণ সাহিত্যিক ও সমালোচক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ রায়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী এ-বিষয়ে তাঁহার সহযোগিতা করিবেন। ১৯০০ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে গিরিশচন্দ্রের ইংরাজিতে স্বাক্ষর নিম্নে দেওয়া গেল। বঃ সঃ

1/11/00

সেদিনের পৃথিবী ও আজকের মানুষ

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নিজ দলের নরনারীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপন, অথবা অপর দলের মেয়েদের স্ত্রীরূপে গ্রহণকালে, অর্থাৎ বহির্বিবাহ প্রচলিত হওয়ার পরও উভয় সময়েই নর-নারীর মধ্যে বহু বিবাহ প্রথার প্রচলন আমরা দেখি। তবে পুরুষদেরই বহু বিবাহ বা অধিক সংখ্যক নারী সম্ভোগের দিকেই ঝোঁক ছিল বেশী। এর একটা কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, প্রেম ও অন্যান্য সুকুমার মনোবৃত্তি সকল তখন ছিল অজ্ঞাত। দ্বিতীয়তঃ, নারীর বাহ্য সৌন্দর্য্যই পুরুষকে অন্ততঃ সে যুগে আকৃষ্ট করত, এবং যে নারীকে পুরুষের হঠাৎ ভাল লাগত, তাকেই সে তখন পেতে চাইত। আর দৈহিক শক্তিই যখন তাকে লাভ করার একমাত্র উপায়, তখন শক্তি প্রয়োগে অথবা চুরি ক'রে পুরুষ লাভ করত তার ঈপ্সিতাকে। এ ছাড়া আরও একটা কারণ আছে। প্রসবের পর কিছুকাল সাধারণতঃ মেয়েদের পক্ষে যৌনাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি সম্ভব ছিল না। পশুপালন করতে শেখার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একমাত্র স্তন্য দানেই তখন সন্তানকে পালন করতে হত। সুতরাং এই সময়ে পুরুষকে যৌন ক্ষুধা মেটাবার জন্য অন্য নারীকে গ্রহণ করতে হ'ত।

মেয়েদের মধ্যেও তখন একের অধিক পুরুষের সঙ্গে যৌন-সম্পর্ক স্থাপনে বাধা ছিল না। তবে নারীদের মধ্যেও বহু স্বামী গ্রহণ বোধ হয় পুরুষের বহু স্ত্রী গ্রহণ অপেক্ষা অনুপাতে কিছু কম ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে এক নারী একাধিক নিঃসম্পর্কীয় পুরুষকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করত। এ রকম অবস্থায় নারী পর্য্যায়ক্রমে কয়েক মাস ক'রে এক এক স্বামীর সঙ্গে বাস করত। সন্তানাদি সম্বন্ধেও ব্যবস্থা ছিল বড় অদ্ভুত। নারীর প্রথম জাত সন্তান অথবা প্রথম দুটি পুত্রকে প্রথম স্বামীর সন্তান বলে গণ্য করা হ'ত। তার পরের সন্তান দ্বিতীয় স্বামীর, পরেরটি তৃতীয়ের এই ভাবে হিসাব চলত। অপর ক্ষেত্রে এক নারী ভ্রাতৃসম্পর্কীয় একাধিক পুরুষের স্ত্রী হিসাবে পরিগণিত হ'ত। এই ধরণের পদ্ধতির প্রচলন আমরা দেখি তিব্বতীয়দের মধ্যে। কিন্তু অনেকের মতে এটা ঠিক এক নারীর বহু বিবাহ নয়। আদিম যুগে একটা অবস্থায় যে দলগত বিবাহের প্রচলন ছিল এটা সেই ধরণের। এই ধরণের বিবাহ পদ্ধতির কারণ হিসাবে জনসংখ্যার উল্লেখ করতে হয়। যে জাতের মধ্যে নারীর সংখ্যা কম এবং পুরুষের সংখ্যা অনেক বেশী, সেই সব জাতির মধ্যে এই ধরণের বিবাহের প্রচলন থাকা আদৌ সম্ভব নয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, আদিম যুগে মানুষের মধ্যে শিশু হত্যা চলিত ছিল। সাধারণতঃ হত্যা করা হ'ত মেয়েদেরই। এর কারণ ছিল অনেক। শিকার প্রভৃতি উদরান্নের সংস্থান ব্যাপারে মেয়েরা বিশেষ কাজে আসত না, অথচ খাদ্যের ভাগ দিতে হত তাদের। সে সময়ে একদল অপর দলকে আক্রমণ করত মেয়েদের স্ত্রী হিসাবে লাভ করবার জন্যে। কাজেই মেয়েরা ছিল প্রত্যেক দলের প্রলোভনের বস্তু। সেই জন্যই যে দলের লোকসংখ্যা কম, সেই দুর্ব্বল দলের পক্ষে মেয়েরা হ'ত ভার বিশেষ। তা ছাড়া শৈশবাবস্থায় শিশুরা থাকত মায়ের কাছে বোঝা বিশেষ, দ্রুত পলায়নের পক্ষেও এরা ছিল যথেষ্ট বাধা। এই সব কারণে আদিম জাতের মধ্যে শিশুদের বিশেষ মেয়েদের হত্যা করা হ'ত।

আদিম অবস্থায় শিশুদের বাঁচার পক্ষে আর একটা বিশেষ অন্তরায় ছিল। একেবারে শৈশবে মা মারা গেলে শিশুর মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোন উপায় ছিল না। মাতৃস্তন্য হ'তে বঞ্চিত শিশুকে অনাহারের হাত হ'তে কেমন করে বাঁচান যেতে পারে, আদিম মানুষের এ সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। মায়ের দুধের পরিবর্ত্তে দিতে পারা যায়, শিশুর উপযোগী এমন কোন খাদ্যও তখন তাদের ছিল না। কাজেই শৈশবে মা মারা গেলে শিশুদেরও বাধ্য হ'য়েই মেরে ফেলা হ'ত।

ভ্রূণ হত্যা এবং গর্ভপাতও তখন মেয়েদের মধ্যে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। যৌবনারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে গর্ভ ধারণের ফলে মেয়েদের নানা অসুবিধা ভোগ করতে হোত। অতিরিক্ত গর্ভ ধারণের ফলে যৌবনশ্রী যে অকালে নষ্ট হ'য়ে যায় এও তারা সহজেই বুঝিতে পেরেছিল। সুতরাং অধিক সংখ্যক সন্তানের জননী হবার অনিচ্ছা তাদের মধ্যে জাগে, ফলে তারা ভ্রূণ হত্যা ও গর্ভপাতের আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রাথমিক পদ্ধতিই তারা সে সময় অবলম্বন করেছিল। বৃদ্ধা রমণীরাই

অন্তঃসত্ত্বা নারীর পেটে চাপ দেওয়া হোত এবং অতিরিক্ত দলনের ফলে গর্ভপাত ঘটত। কোন কোন জাতের মধ্যে গর্ভবতী নারীরা অত্যন্ত গরম সিদ্ধ কাঁচা কলা ভোজন ক'রত ভ্রূণ হত্যার উদ্দেশ্যে। জন্ম নিরোধের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অবলম্বিত প্রাথমিক পদ্ধতির প্রয়োগ আমরা আদিম যুগ হইতেই দেখতে পাই।

জীবনের বসন্তকালে, শক্তি ও উদ্যমে চঞ্চল যৌবনে নারীরা সাধারণতঃ গর্ভ ধারণের জন্য ও সন্তানাদির ভারে অধিকাংশ সময়ই গুরুশ্রমের অনুপযুক্ত থাকত। ফলে তাদের জন্য কতকগুলো কাজ নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। ভার বহনের কাজে নিযুক্ত হ'ত তারাই। কোন দূরবর্ত্তী স্থানে যাবার সময় দলের পুরুষেরা বর্শা অথবা তীর ধনুকাদি হাতে নিয়ে আগে চলত এবং সন্তান ও অন্যান্য যাবতীয় সামগ্রী বহন ক'রে চলত মেয়েরাই। অবশ্য এই থেকে যদি আমরা মনে করি যে, মেয়েদের অবস্থা ক্রীতদাসী অপেক্ষা কোন অংশে উন্নত ছিল না, তা হ'লে ভুল করা হবে? মেয়েরা নিজেই এ ব্যবস্থা সমর্থন করত। তারা বলতো যে, পথে যে কোন মুহূর্ত্তে আকস্মিক বিপদ আসতে পারে এবং সেই বিপদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য পুরুষকে সকল সময় সুযোগ দেওয়া দরকার এবং তাকে ভার বহন হতে মুক্ত রাখাই প্রয়োজন।

পুরুষ ও মেয়েদের বিভিন্ন কার্য্যধারার ও কার্য্য বিভাগের মূলে স্থান ও প্রকৃতির অবস্থা যথেষ্ট রূপান্তর এনেছে। যে সকল স্থানে শিকারের পশু দুর্লভ, খাদ্য সংগ্রহ বা কৃষিকার্য্য পরিচালন কষ্টকর, সেই সকল স্থানের অধিবাসীরা সন্তানাদি সক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত মেয়েদের জীবনধারণ ব্যাপারে সাহায্য করে এবং তাদের সঙ্গে থাকে। অপর পক্ষে, যে সকল দেশে খাদ্যাদি অতি সহজেই লাভ করা যায়, সে দেশে মেয়েদের স্বামীর ওপর নির্ভর করার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। সেই সকল স্থানেই আমরা দেখতে পাই, নর নারীর যৌন সম্পর্ক ক্ষণ স্থায়ী। পুরুষ ও নারীর মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর পরিবর্ত্তন হয় বহুবার এবং সন্তানাদি জন্ম গ্রহণের পরেও পুরুষরা অনায়াসে এক স্ত্রী ত্যাগ করে অপর নারীর সঙ্গে অন্য স্থানে গমন করে।

একেবারে আদিম অবস্থায় সন্তানরা মাতৃবংশের নামই গ্রহণ করত এবং মাতৃবংশের সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক থাকত অধিক। কারণ, প্রথমাবস্থায় যখন অপর দলের মেয়ে কেড়ে নিয়ে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার পদ্ধতি আসে নি এবং 'বীন্না' ধরণের বিবাহ পদ্ধতি যখন প্রচলিত ছিল, তখন পুরুষ গিয়ে বাস করত মেয়ের পরিবারে। ফলে উভয়ের মিলনে জাত সন্তানাদি বাস ক'রত মায়ের পরিবারে। বিশেষ, বহু বিবাহ তখন প্রচলিত থাকায় পুরুষ অনেক সময় এক পরিবারকে ত্যাগ করে অন্য পরিবারে গিয়ে নূতন স্ত্রীপিতার সঙ্গে বাস করায় পিতার সঙ্গে সন্তানের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কম। যখন যে যে মেয়ের পরিবারে পুরুষ বাস করত, সেই পরিবারেই আধিপত্য ক'রত পুরুষের ওপরে। তারপর যখন অপর দলের মেয়ে কেড়ে নিয়ে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার পদ্ধতি এল, তখন স্বভাবতঃই ছেলেরা বাস করতে লাগল পিতার পরিবারে। পিতার নামই তখন তারা গ্রহণ করত। তা ছাড়া অপর দলের মেয়ে লুট ক'রে আনা পদ্ধতি হওয়ায় প্রত্যেক দলই সন্তানের প্রয়োজন ও উপযোগীতা উপলব্ধি ক'রল বেশী ক'রে। তারপর ক্রমশঃ লুট করে আনা পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হয়ে মূল্য দিয়ে মেয়ে গ্রহণ করার পদ্ধতি এল। যে দেশে পুরুষের সংখ্যা বেশী এবং মেয়ের সংখ্যা অনুপাতে অনেক কম, সেই সব দেশে বর্ত্তমান কালেও বিবাহের সময় কন্যাপক্ষকে অর্থদানের রীতি আছে। বিবাহের সময় বরযাত্রী নিয়ে যাওয়ার মূলেও আছে সেই কন্যা লুট করে আনা পদ্ধতির স্মৃতি। তখন বিবাহেচ্ছু পাত্র সদলে অস্ত্রাদি নিয়ে কন্যাপক্ষকে পরাজিত ক'রে পাত্রীকে লুট ক'রে আনত। বর্ত্তমানে সেই পদ্ধতিরই শেষ চিহ্ন হিসাবে এখনও বিবাহের সময় বরের সঙ্গে বরযাত্রী যায়।

মানুষ কেমন ক'রে ও কি কারণে দলবদ্ধ হ'তে আরম্ভ করে, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু মানুষ দলবদ্ধ হলেও বিভিন্ন দলের মধ্যে একটা রেশারেশি চ'লত। খাদ্যের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে নিজের দলের লোকদের মধ্যেও মত-বিরোধ অসম্ভব ছিল না। কাজেই প্রথম হতেই মানুষ সহযোগিতা ক'রতে শিখেছে আত্মরক্ষা ও বাঁচার প্রয়োজনে। অধিকতর শক্তিশালী শিকারের হাত হ'তে বাঁচার জন্যে, অপর দলের আক্রমণ হ'তে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মানুষ পরস্পরকে সহযোগিতা করতে শিখেছে। তারপর নাচ, গান, প্রভৃতি হৃদয়ের স্বতঃ উৎসারিত আনন্দের মধ্য দিয়ে এই সহযোগিতার বন্ধন হয়েছে দৃঢ়তর। উদারতা ও পরমত-সহিষ্ণুতাও এসেছে এরই মধ্য দিয়ে। শক্তিশালী প্রথমে দুর্ব্বলের উপর উৎপীড়ন ক'রে সিংহভাগ আদায় করতে নিশ্চয়ই বিমুখ হয়নি; কিন্তু দলের অপর পাঁচজনের অসুবিধা ঘটায় সকলে মিলে তাকে হত্যা ক'রে বা তাড়িয়ে দিয়ে এর প্রতিশোধ নিয়েছে। এই ভাবেই এসেছে আত্মসংযম, অপরের স্বার্থ ও প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি। দরদী মনোভাব, অপরের সুখ দুঃখ বোধ, ত্যাগের ক্ষমতা নৈতিক উন্নতি, নীতি জ্ঞান—সবই এসেছে সংসর্গের ফলে, মানুষ সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করায়।

সমব্যথা ও শুশ্রূষা

অনুভূতি কেমন ক'রে মানুষের মধ্যে এসেছে একথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু অপরের দুঃখ বা ব্যথা পেলে মানুষ সে বেদনা, সে ব্যথার গুরুত্ব অনুভব ক'রতে শিখল কেমন ক'রে? একজন মানুষের কষ্ট দেখেই আদিম মানব

তখনই তার কষ্টের পরিমাণ উপলব্ধি করতে পারে নি। অপরের বেদনা অনুভব করবার জন্য প্রয়োজন হয়েছে দু'টি বিষয়ের—ভুক্তভোগ ও স্মৃতিশক্তি। যে মানুষ নিজে একদিন একটা কষ্ট ভোগ ক'রেছে, কোন অঙ্গ হানির বেদনা অনুভব করেছে, সে যখন অপর কোন ব্যক্তিকে সেই যন্ত্রনাই পেতে দেখেছে, তখন তার স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তাকে তার বিগত দিনের কথা, ফলে সে অনুভব করতে পেরেছে অপরের বেদনার পরিমাণ কতখানি। তার মনে সাহায্য এবং শুশ্রূষা করার বাসনাও জেগেছে এই বোধের চেতনা লাভে। এই ভাবেই প্রথম মানুষের মনে জেগেছে দরদ, এসেছে সেবার আকাঙ্ক্ষা। তারপর মানসিক উন্নতি ও প্রগার ধর্ম্মানুরাগ হ'তে সেবা মানুষের জীবনে এক বৃহৎ অংশ অধিকার ক'রে বসেছে। অপর পক্ষে অধিকার ভেদ কায়েমী হ'লে, অর্থ-নীতিক ভিত্তিতে যখন মানুষের জাতিভেদ নির্ণীত হ'তে লাগল, তখন কারও কাছে যেমন সেবা হ'ল ধর্ম্মের অঙ্গ, তেমনই কেউ বা সেবা করতে লাগল নিজেকে মহৎ প্রতিপন্ন করতে, বিত্তশালী হয়েও নিজেকে নিরহঙ্কার ও দুঃখীর ব্যথী প্রমাণ করতে। আবার ধনবৈষম্যের ফলে যাদের প্রাণ সত্যিই কাঁদল, সমাজের এক বৃহৎ অংশের বেদনার মধ্যে যারা দেখল সমাজের লোলুপ, আত্মঘাতি রূপ, তাদের মনে জাগল বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, চাইল এই অবস্থার নিরসন, চাইল ধনসাম্যের মধ্য দিয়ে সকলের সুখদুঃখের পরিমাণকে সমান করতে, সুন্দরের প্রতিষ্ঠাই হ'ল তাদের বাসনা। কিন্তু এই ধনের উৎপত্তি ও ধনবৈষম্য মানুষের মধ্যে এল কেমন ক'রে?

অধিকার ও সম্পত্তি

অধিকারের ধারণা আদিম মানুষের মনে জন্মেছে একেবারে প্রথম অবস্থা হ'তেই। পশুদের নিকট হ'তে বোধ হয় এ চেতনা তাদের হয়েছে। রিক্ত মানুষ যখন ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টায় কিছু সংগ্রহ করতে চেয়েছে, তখন পেয়েছে বাধা। হয় ত' গাছের ফল পাড়তে গিয়ে বানরের কাছে বাধা পেয়েছে, ফলে তাকে উপলব্ধি করতে হয়েছে যে, বস্তুটি অপরের করায়ত্ব, এবং ফলটি নিতে গেলে হয় তার সঙ্গে মারামারি করতে হবে, নতুবা গ্রহণ না করেই চলে যেতে হবে, অর্থাৎ তার অধিকারকে মেনে নিতে হবে। প্রথমে মানুষের অধিকার ছিল পরিবার, গোত্র অথবা দলগত ভাবে। যে স্থানে তারা বাস করত, সে স্থান কোন ব্যক্তি বিশেষের ব'লে মনে করা হোত না, যে খাদ্য তারা সংগ্রহ ক'রত, সেটা দলের মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া হ'ত। কিন্তু তা হলেও ব্যক্তি-বিশেষের অধিকারও প্রায় এর সঙ্গে সঙ্গেই জন্মলাভ করে। যে ব্যক্তি প্রথম পাখী, পশু প্রভৃতি শিকারের বস্তু দেখতে পেত, তার সব চেয়ে ভাল অংশই হ'ত সেই ব্যক্তির প্রাপ্য। এই আদিম অবস্থায় মানুষের সম্পত্তিও বিশেষ কিছুই ছিল না। খাদ্যই হচ্ছে সর্ব্বপ্রথম তাদের অধিকার সাব্যস্ত করার দ্রব্য। নিজের অংশটুকুর ওপর যে অপরের কোন অধিকার নেই একথা তারা জানিয়ে দিত-শারীরিক শক্তি প্রয়োগে অপর কেউ সেটা কেড়ে নিতে এলে। অধিকার সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা তখনও হয় ত' তা'দের হয় নি, পেটের জ্বালাই তাদের বাধ্য ক'রত খাদ্য সংরক্ষণে। কিন্তু এই ভাবেই আসে সহিষ্ণুতা, ব্যক্তি বিশেষের নিকটস্থিত বস্তুবিশেষের ওপর ঐ ব্যক্তির দাবী স্বীকারের মনোভাব। অস্ত্র, সাজ-সজ্জার দ্রব্য প্রভৃতি তখন ছিল আদিম মানবের সম্পত্তি। তারপর সম্পত্তির ওপর অধিকার সাব্যস্ত হয় আরও দৃঢ় ভাবে যখন দাসের আবির্ভাব হয়। কারও বীরত্বে বা কৃতিত্বে যখন দলের কোন ব্যক্তিকে অপর একজন কিছু দান ক'রল আনন্দে, তখনই এটা বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হ'ল যে, দেয় বস্তুর ওপর প্রথমোক্ত ব্যক্তির অধিকার ছিল, এবং দানের ফলে গ্রহীতার সম্পূর্ণ অধিকার জন্মাল ঐ বস্তুতে। তারপর ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সম্পত্তিও বর্দ্ধিত হয়েছে, অধিকারের সীমারেখাও নানা আইন-কানুনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়ে গেছে। সম্পত্তিতে অধিকার এবং সেই সম্পত্তি অপরের হাতে না দেওয়ার মনোভাব হ'তেই এসেছে পুত্রের পিতৃবংশে অবস্থান, এবং বহু বিবাহের পরিবর্ত্তে এক বিবাহের প্রচলন।

[ক্রমশঃ

বিরহ (গল্প)

শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ, এম-এ,

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন বুঝিতে পারিলাম না। সত্য কথা বলিতে কি, বুঝিবার কোনদিন বিশেষ কোন চেষ্টাও করি নাই। একে রাধার বিরহ, তাহার উপর অধ্যাপক মহাশয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ, গবেষণাপূর্ণ ও উদ্দীপনাপূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই দুইএ মিলিয়া আমায় রীতিমত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বিরহ-জর্জ্জরিত ক্লাশের মধ্যে আমি এক কড়িকাষ্ঠ গণনা করা ছাড়া আর কিছুতেই মন স্থির করিতে পারিতাম না। কিন্তু আজ পরীক্ষা-সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া চক্ষু ফাটিয়া জলের পরিবর্ত্তে রক্ত বাহির হইবার যোগাড় হইল। এ আমি করিয়াছি কি? রাধার বিরহ-তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা তো দূরের কথা, আজ পর্যন্ত একখানা বইও সংগ্রহ করিলাম না। পয়সা খরচ না করিলে পরীক্ষায় পাশ করা যায়!

সুনীতিবাবুর "ফিললজির নোট"গুলো সাপের ছুঁচো গেলার মত কোন রকমে গলাধঃকরণ করিয়া ছয়টা নাগাদ যখন ইউনিভারসিটি হইতে বাহির হইলাম—তখন শরীরের উপর দিয়া রীতিমত ঘামের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। কিন্তু আজ আমি মন স্থির করিয়াছি। বিরহ আমায় বুঝিতেই হইবে।

সটান চলিলাম পুরাণো বই-এর দোকানের দিকে। পুরাণো বইএর দিকে টান আমার দুইটি কারণে। প্রথমতঃ পয়সা বাঁচে; দ্বিতীয়তঃ পুস্তকের মধ্যে তাহার পূর্ব্ব-অধিকারীর যে সমস্ত মন্তব্য থাকে, আমার নিকট সেগুলি অমূল্য। বৌদ্ধ সহজিয়াবা যেমন গুরুর উপদেশে সহজ মতে সাধনার পথে অগ্রসর হইতেন—আমিও তেমনি পরীক্ষা-তন্ত্রের সহজ সমাধানে উপস্থিত হইতাম মন্তব্যরূপ গুরুর উপদেশে। মাঝে মাঝে আমার এই সহজধর্ম্ম যে প্রচার করি নাই—তাহা নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেহই আমার এই মত গ্রহণ করিতে চাহে নাই।

যাই হোক, চলিলাম আলো-আঁধিয়ার মাখা, এ,আর,পি, দেওয়াল পরিবেষ্টিত কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের ফুটপাথ দিয়া। ভাবিতেছিলাম কি একটা,—কমলালয়ের শাড়ী, রাতুর জুতো, দেলখোসের চপ—এই রকম কিছু একটা নিশ্চয় হইবে—হঠাৎ দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার চক্ষুর সহিত নেহাৎ আকস্মিক ভাবে চোখাচোখী হইতেই একটি স্বর অতি-পরিচিতের মত সম্বোধন করিয়া উঠিল—আইসেন বাবু, আইসেন! মধ্যবর্ত্তী 'স'কারের উপর তাহার অনাবশ্যক জোর ছিল।

আশ্চার্য্য হইলাম বই কি একটু! এইরূপ কায়াহীন স্বরের সহিত আমার ব্যক্তিগত কোন পরিচয় আছে বলিয়া তো কই স্মরণ করিয়া উঠিতে পারিলাম না। কালিকাতার অলিতে গলিতে যে উড়ে, মেড়ো, খোট্টা, চোর, পকেটকাটা, গাঁটকাটা, হাঁচি, টিকটিকি, কলাছোপা ইত্যাদির দল ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে এবং ঝোপ পাইলেই যে কোপ বসাইয়া দিবে—এ বিশ্বাস আমার উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া। সুতরাং মুহূর্ত্তের মধ্যেই বুঝিয়া লইলাম—এ ব্যাটার নিশ্চয় কোন অভিসন্ধি আছে। যাইব কি যাইব না ভাবিতেছি—এমন সময় আবার ডাক আসিল—এবার কায়া সমেত স্বর—কি বই চান?

ও হরি! এটা তো একটা বইয়ের দোকান দেখছি, আর পুরাণোও বটে। এমন দিবালোকে কিই বা ও করিতে পারে—এই রকম পাঁচসাত ভাবিয়া দোকানের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। দোকানদার একটি খোঁড়া টুল আগাইয়া দিয়া বসিতে বলিল। এতক্ষণে লোকটিকে দেখিবার সময় পাইলাম। হ্যাঁ—চেহারা বটে একখানা! বয়স আন্দাজ করা দুরূহ; চল্লিশ হইতে পারে—পঞ্চাশও হইতে পারে—বেশীও হইতে পারে। চুলগুলি শাদা, তাহা ঘাড়ের দিকে চৌদ্দআনা, সামনের দিকে একআনা—দুই কাণের দিকে দুই পয়সা করিয়া ছাঁটা। পাকা দাড়ির ছাঁটা দেখিয়া মনে হয় একটি পিরামিডকে যেন উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মাথার উপর কুঞ্চিত চুলগুলি সযত্নবিন্যস্ত। মোটের উপর লোকটিকে দেখিলে মনে হয় যেন সৌখিনতার একটি ধ্বংসাবশেষ।

সামনেই টেলিগ্রাম একখানা পড়িয়াছিল। সেটা নেহাৎ অবান্তর ভাবেই কুড়াইয়া লইতে দোকানদারটি বলিয়া উঠিল—আর ছ্যাখেন কি মশাই? ইংরাজ এবার ডকে।

চমকিয়া উঠিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কাগজটি পড়িয়া গেল। ইংরাজদের প্রতি আমার আস্থা অসীম—জগতে তাহারা অনেক কিছু করিয়াছে—এরূপ প্রবাদ আছে; চরখির মত একবার ঘুরিয়া লইলাম—কি জানি কে কোথায় বসিয়া থাকিবে—কারণ "the walls have also ears", বিশেষতঃ the A.R.P. walls, যা তা কথা বলিলেই হইল! বলিলাম—মানে, বলিতে বাধ্য হইলাম—মানি না।

মস্তকটিকে মুরুব্বির মত হেলাইয়া যেন মনের কথা বুঝিতে ওস্তাদ—এইভাবে দোকানদারটি প্রতিবাদ করিয়া বলিল—আলবাৎ মানেন।

তারপর চক্ষু দুইটিকে অদ্ভুতভাবে ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতর—ক্ষুদ্রতম করিয়া—মস্তকটিকে কয়েকবার নাটকীয় ভঙ্গীতে হেলাইয়া দুলাইয়া—নূরের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—আমি কিন্তু মশাই সত্যি কথা বলতে ভয় পাই না। জানেন মশাই, আমি কে? ছমছম্ উল্লার বংশে আমার জন্ম। ছকু মিঁয়া, বাবা, ভয় করে না কাউকেই...হুঁ।

ছমছম্ উল্লার নাম শুনি নাই—কারণ, অস্বীকার করিয়া লাভ নাই—ইতিহাসে আমার জ্ঞান খুব কম। কিন্তু কোন জিনিষ নিছক সত্য বলিয়াই যে সব সময় জোর গলায় প্রচার করিতে হইবে—ছকু মিয়ার এই মতের সহিত আমার মতের মিল হইল না। কিন্তু তথাপি কোন্ এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে তর্ক জমিয়া উঠিল। এবং এসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যাহা হইয়া থাকে এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। তর্কে কিছুই বাদ গেল না। রাশিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া অসভ্য জাপান, বর্ব্বর জার্ম্মাণী, সুসভ্য বৃটেন ও আমেরিকা এবং মূর্খ ভারতবর্ষের আলোচনা শেষ করিয়া যখন হকি বাদুকর ধ্যানচাঁদে আসিয়া পৌঁছিয়াছি—তখন খেয়াল হইল যে এখনও আসল কাজটাই বাকি রহিয়া গিয়াছে। বলিলাম, "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন আছে ?"

কথাটাকে লুফিয়া লইয়া ছকু উত্তর দিল, "কমতি কি আছে বাবু ?"

তাহার পর একটি অর্দ্ধছিন্ন ধূলিমলিন বই আনিয়া দিল। বই দেখিয়া সত্যই দমিয়া গেলাম। বলিলাম, "এ যে একেবারে ছেঁড়া হে।"

দীর্ঘ বিরহীর মত একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া ছকু বলিল, "এর কি আর আদর আছে মশাই ? কে পড়ে ?"

কথাটা বেশ মনে লাগিল, বলিলাম, "তাই না কি ?"

ছকু ঝাঁঝাল সুরে উত্তর দিল, "হ্যাঁ। আজকালকার ছেলেমেয়েরা সব ইডেন-গার্ডেন আর লেক এই করেই গেল।"

প্রতিবাদ করিতে গেলাম, আমাকে কথা কহিবার অবকাশ না দিয়া ছকু বলিয়া উঠিল, "ঐ হয়েছে, মশাই, হয়েছে। আজকালই না হয় ব্লাক-আউটের বাজার লেকের নামটা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু ভেবে দেখুন দেখি, রাধার প্রেমের কাছে..."

কথাটাকে শেষ না করিয়াই বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "আরে ছোঃ। সে কৃষ্ণও নেই, সে রাধাও নেই। তার পর একটু ভাবোন্মত্তের মত বলিল, রাধার প্রেমের কি তুলনা আছে ? আহা..."

একটা সুযোগ মিলিয়া গেল। ক্লাশে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বুঝিতে পারি নাই। এখন এই ছকুমিঞার নিকট হইতে বিরহকাণ্ডটা যদি বুঝিয়া লইতে পারি তো পরীক্ষার দিক হইতে অনেক কাজে লাগিতে পারে। এই ভরসায় একটু উৎসাহিত হইয়া বলিলাম, "কি রকম ?"

সুর সমেত মাথা নাড়িতে নাড়িতে ছকু বলিল, "আহা, শ্যামের বাঁশরী বাজে যমুনার কূলে কূলে—ঘরের কাজে রাধার মন নেই ; রাধা পাগল—একদম পাগল।"

তার পর চক্ষু মুদিয়া বহুদিনকার একটা ঘটনা স্মরণ করিয়া বলিল, "আমারও একদিন ছিল যখন—"

তার পরেই বিরাট এক কাণ্ড। তপোভঙ্গে ক্রুদ্ধ শিবের যেন তৃতীয় নেত্র জ্বলিয়া উঠিল। ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটি চক্ষু দেখিতে দেখিতে বিরাট বিরাটতর বিরাটতম হইয়া উঠিল। একটি হাতকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া শূন্যে ঘুঁষি লাগাইয়া দন্ত কিড়মিড় করিয়া বলিল, "খুন করবো খুন—"

এই কিনিব পয়সা দিয়া। এত ঝঞ্ঝাট কে পোয়ায় বলুন তো ? খুনের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া চো চো দৌড় দোব' কি না ভাবিতেছি, এমন সময় ছকু মিয়া শান্ত হইল এবং যেন লজ্জিত হইয়াছে এইভাবে বলিল, না, না আপনাকে নয়।

আবার গলদঘর্ম্ম। রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলাম, "কি ব্যাপার বল তো !"

ছকু বলিল, "আমার মাদীর কথা মনে পড়ে গেল, বাবু। মেয়েটাকে কি ভালবাসতাম। দু'জন মারা যাবার পর আর ও ঝঞ্ঝাটেই যাব না মনে করেছিলাম। কিন্তু ওর বাপ ব্যাটাই ত আমার হাতে পায়ে ধরে কেঁদে বললে, মিয়া সাহেব, আপনি না হলে মেয়েটার সদ্গতি আর কে করবে ? খোদার ইচ্ছে বুঝলেন বাবু'জ, খোদার ইচ্ছার উপর তো আর কিছু করবার নেই। ভাবলাম মেয়েটা বাঁচলো। খেতে পাচ্ছিল না। নইলে—বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই—ওর বাড়ীর খবর কে না জানে ? শুনবেন ওর বাড়ীর কেচ্ছা ?—

ছকুমিয়ার শ্বশুর বাড়ীর কেচ্ছা শুনিবার মত ধৈর্য্য ও সময় আমার ছিল না, বলিলাম, "ও সব কথা আর শুনে কি হবে ?"

ছকুও সায় দিয়া বলিল, "ঠিক কথা। মরুগ গে ছুক্রী। যার জন্যে এত করলাম, যার জন্যে দোকানটাকে পর্য্যন্ত উচ্ছন্ন দিলাম, যার জন্যে বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই কলকাতা উজাড় করে জিনিষপত্র দিয়েছি, সেই কি না শেষ কালে পালিয়ে গেল ? বুঝলেন মশাই—এই সংসারটাই মায়া, কার জন্যে খাটা। এই যে দোকান দেখছেন, এর উপর এতটুকু মায়াও আর নেই, পয়সাই হচ্ছে হাতের ময়লা।—খোদা—খোদা !"

বলিলাম, "কোথায় পালিয়ে গেল ?"

বিরক্তভাবে ছকু বলিল, "তা কি আর জানি মশাই ? এক বার যদি জানতে পারতাম তো গলায় পা দিয়ে ছোঁড়াটার জিবটা ফড় ফড় করে আধ হাত বার করে দিতাম না। জোচ্চোর, বাটপাড়, লম্পট কোথাকার।

আর বেশী বাড়ানো উচিত হইবে না। সন্ধ্যাও হইয়া গিয়াছে ; বলিলাম, "এটার দাম কত ?"

ছকু বলিল, "নতুন দাম হচ্ছে গিয়ে তিন টাকা। তবে আপনাকে বলে আড়াই টাকায় দোব।"

আমার উপর তাহার করুণার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। চক্ষুদ্বয় কপালের অর্দ্ধেকটা তুলিয়া বলিলাম, "আ-ড়া-ই টা-কা—!"

ছকু গিয়া বলিল,—"বেশ, দু'টাকা সাত আনাই দেবেন। ওর জন্ত আর কি হচ্চে? আপনাদের সঙ্গে কি আর দর-কষাকষি করা যায়? আপনারা ছাড়া এ বই পড়ে কে, বলুন তো?"

চিন্তাগ্রস্তের মত ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম,—"কিন্তু দামটা যে বড্ড বেশী বলছো হে—"

ছকু বলিল;—আজ্ঞে, বাজারটা একবার ঘুরে দেখুন, এর একপয়সা কমে যদি পান তো আপনায় অমনি দিয়ে দোব।

যাই হোক শেষ পর্য্যন্ত দুই টাকায় রফা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন লইয়া বাড়ী ফিরিলাম।

*

জন্মের পর মৃত্যু যেমন অবশ্যম্ভাবী, আহারের পর আমার নিদ্রাটিও সেইরূপ। তবে জন্ম হইলেই কিছু সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু আসে না—কিন্তু আহার হইবা মাত্র চক্ষু দুইটি আমার বুজিয়া আসিবেই। কিন্তু এ হেন চক্ষু দুইটিকেও আজ তাহাদের চিরাচরিত নিয়ম ভঙ্গ করিতে বাধ্য করিয়াছি; কারণ, আজ আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিরহের দশটি দশা ও মহাভাবস্বরূপিণীর আধ্যাত্মিকতা আমায় বুঝিতেই হইবে। নচেৎ পরীক্ষা-দানবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন আশাই নাই। আর যে পরীক্ষা-দানবের হস্ত হইতে ছলে বলে আত্মরক্ষা করিতে না পারে—সে কাপুরুষ ও হতভাগ্য—দুই-ই। তাহার জন্য ভূভারতে কে বিরহ প্রকাশ করিবে?

বই-এর ভিতরটা দেখিয়া রীতিমত ভড়কাইয়া গেলাম। অক্ষরগুলি সব আনুনাসিক সঙ্গীন উঁচাইয়া বীরদর্পে দাঁড়াইয়া আছে। ক্ষুদ্র নিরস্ত্র বাঙালী সন্তান আমি—আমার সাধ্য কি যে তাহাদের ব্যূহ ভেদ করি। যুদ্ধ ভিন্ন এক পাও অগ্রসর হইতে দেয় না যে!

কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য না কি কিছু নাই। সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে হইতে যমুনার কূলে উপস্থিত হইলাম। উজ্জ্বল তরঙ্গ-ভঙ্গে কালিন্দীর জল-অপ্সরীরা কুলু কুলু করিয়া চলিয়াছে। বৃন্দাবনের গাছে গাছে ফুলের বেসাতি। হাজার হাজার পাখী আপনার আনন্দে গান গাহিয়া চলিয়াছে। গোঠে গোঠে হাজার হাজার গোপবালক মনের আনন্দে নৃত্য করিয়া চলিয়াছে। ধীরে ধীরে মধ্যাহ্নের সূর্য্য পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়িল। আকাশে বাতাসে গোখুর ধূলিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। হাম্বারবে গাভীরা সব গৃহে ফিরিয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যা হয় হয়। গোপবধূরা কালিন্দীর জলে আসিয়া সমবেত হইল। যমুনার জল-অপ্সরীরা গোপবালা-দিগকে আলিঙ্গন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। চারিদিকে আনন্দের এত আয়োজন, এত কোলাহলকে ছাপাইয়া হঠাৎ বাঁশী বাজিয়া উঠিল কাহার? ঐ দূরে কদম্বের মূলে বসিয়া কালা নয়? আপন মনেই সে বাঁশী বাজাইয়া চলিয়াছে। বৃন্দাবনের গোঠে গোঠে, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষে—দূর হইতে দূরে সেই বাঁশীর সুর কাঁপিয়া কাঁপিয়া চলিল। রন্ধন-শালায় রাধা কেবলই ভুল করিয়া বসিতেছে। ঝোলের সঙ্গে অম্বল, অম্বলের সঙ্গে ঝাল, শাকে কানাশোয়া পানি—ভুলের পর ভুল। ঘরের কাজে তাহার মন বসিতেছে না—প্রাণটা তাহার আকুলি বিকুলি করিতেছে। কেন? গভীর রজনী, পৃথিবী অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া কাহার অভিসারে বহির্গত হইয়াছে? আকাশের অসংখ্য নক্ষত্র চিক চিক করিয়া হাসিতেছে। রাধা নিদ্রিতা। হঠাৎ কার বাঁশী বাজিয়া উঠিল? রাধার নিদ্রা টুটিয়া গেল। উন্মাদিনী রাধা অন্ধকারের বক্ষ চিরিয়া বাঁশীর সুর লক্ষ্য করিয়া চলিল। কিছুদূর গিয়াই থামিয়া গেল। কই, আর তো শোনা যায় না। কোন্ দিকে? রাধা পথ ভুল করিয়াছে। ঐ তো ঐ দিকে বাঁশীর সুর। রাধা ফিরিয়া সেই দিক ধরিল। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই মনে হইল, ভুল পথে চলিয়াছে। কোন্ দিকে বাঁশী বাজিয়া চলিয়াছে? হে নিষ্ঠুর বাঁশরি, তুমি কোথায়? উন্মাদিনী কি করিবে? আবার আবার এ চারিদিকেই—উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম—চারিদিকেই বাঁশী বাজিতেছে। ক্রমশঃ বৃন্দাবনের মাটি ছাড়িয়া সেই সুর আকাশে উঠিল—তারপর তারায় তারায়—তারপর আরও উচ্চে বিশ্ববীণার তারে ঘা পড়িল। সুপ্ত বিশ্ব কাঁপিয়া উঠিল। এক অনাদি অব্যক্ত সুর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিশ্বব্যাপী বিরহ জাগাইয়া তুলিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের বিরহ-জর্জ্জরিত মুখগুলি মনে পড়িয়া গেল। আজ দেখিলাম শুধু তাহারাই নহে—সমস্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ে—তাহার ইট, কাঠ, কড়ি, বরগা, মায় অধ্যাপকেরা পর্য্যন্ত একসুরে রাধার মত জিজ্ঞাসা করিতেছে—'কে না বাঁশী বায় বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।' কে যে বাজায় তাহার সন্ধান নাই—অথচ অহোরাত্র বাজিয়া চলিয়াছে, তাহার বিরাম নাই।

ভাবিতেছিলাম ছকু মিয়ার কথা। মনে হইল, ছকুর বিরহের নিকট রাধার বিরহ দাঁড়াইতে পারে না। রাধার বিরহে পয়সা খরচ হয় নাই—মাত্র একটি বাঁশের বাঁশী—তাও হয় তো কেনা নয়। আধুনিক মতে ও বিরহ না হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু ছকুর বিরহ খাঁটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যে তৃতীয় পক্ষের জন্য ছকু কি না করিয়াছিল এবং চাই কি ভবিষ্যতে আরও কি না করিতে পারিত—সেই তৃতীয় পক্ষই কি না তাহাকে ফেলিয়া চম্পট দিল। বেচারি! তাহার জন্ত মনটা সত্যই খারাপ হইয়া গেল।

তৃতীয় পক্ষের নিকট গিয়া দেখি, সে তো সুখে স্বচ্ছন্দে

ঘরকন্না করিতেছে। তাহাকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলিলাম এবং পরিশেষে এ সংবাদও দিতে ভুলিলাম না যে, ছকু মিয়ার মক্কা যাইবার আর বেশী বিলম্ব নাই। সে একটু ব্যঙ্গ করিয়া হাসিল মাত্র। গা জ্বলিয়া গেল।

শ্যামের কাছে গিয়া বলিলাম,—বাপুহে, তোমার আক্কেলটা কি বল তো! রাধাকে পাগল করে চম্পট তো দিলে, বৃন্দাবনের অবস্থাটা একবার দেখ তো···

শ্যামচন্দ্র একটু মুচকিয়া হাসিলেন মাত্র। বিরক্তিতে গাটা রি রি করিতে লাগিল; রাগিয়া বলিলাম, কিসের জন্যে তুমি বাঁশী বাজালে—আর কিসের জন্যেই বা রাধাকে পাগল করলে—তার কৈফিয়ৎ দাও—হি হি করে হাসলে চলবে না···

শ্যামচন্দ্র বলিলেন—বাঁশী বাজাই আমার ইচ্ছে। রাধা কেন পাগল হয়—তাকেই জিজ্ঞাসা করো।

বলিলাম—যত সব 'ভিলেন' কোথাকার। পেয়েছিলে রাধাকে, তাই দু'প্যাঁচ খেলে নিলে; হতুম আমি—তো বুঝে নিতুম তোমার কারসাজি—হুঁ···।

শ্যামচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, বটে! মজাটা দেখ তবে···

বাঁশী বাজিয়া উঠিল—আকাশ বাতাস কাঁপিয়া একটানা গোঙানির মত বাঁশী বাজিয়া উঠিল। হু হু করিয়া নিদ্রিত লোক সব জাগিয়া উঠিল। এ কি! এ তো সেই বাঁশী নয়; এ যে সেই শেষ বিচারের শেষ বাঁশী! সঙ্গে সঙ্গে কান্নার শব্দ···

ঘুম ভাঙিয়া গেল। ব্যাপার কি? তখনও বাঁশী বাজিয়া চলিয়াছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া সমস্ত বিশ্বটা যেন একটা প্রচণ্ড বেদনার ভারে ভাঙিয়া পড়িতে চায়!

বুড়া চাকর কাঁদিয়া বলিল—আমি কালকেই বাড়ী যাব।

এত রাত্রে কি বুড়ার বিরহ জাগিয়া উঠিল? শ্যামচন্দ্র তো আচ্ছা লোক দেখিতেছি! চাকর-হারা হইয়া এই বাজারে কি হাত পুড়াইয়া খাইব?

বলিলাম—হলো কি?

সে ভীতি-বিহ্বল স্বরে বলিল—আংরেজের বাঁশী।

মানে? সাইরেন নাকি?

তাই তো! উঠিয়াছিলাম, শুইয়া পড়িলাম।

এও তো সেই শ্যামের বাঁশী! আহা, কি মধুর! তোমার ধ্বনির মোহ এত! ভাবিলাম—শ্যামচন্দ্র, তোমার বাঁশী একটা মাত্র রাধাকে গৃহছাড়া করিয়াছিল—আয়াণ ঘোষের কিছু করিতে পারে নাই; কিন্তু এ বাঁশী শত শত রাধা আর শত শত আয়াণ ঘোষকে গৃহছাড়া করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর এই বাঁশীর নিকট তোমার বাঁশী হার মানিয়াছে। বিশ্বাস না হয়—আজিকার এ নিশীথ কলিকাতায় পদার্পণ কর। সম্মুখে চাহিয়া দেখিবে জনশূন্য প্রকাণ্ড রসারোড একটি অজগরের মত পড়িয়া আছে। তাহার দুই পাশে ঘোমটায় ঢাকা অসংখ্য আলোক-সুন্দরীরা করুণ দৃষ্টিতে অনাগত কাহার প্রতীক্ষায় যেন দাঁড়াইয়া আছে। আকাশের আধফালি চাঁদ কলিকাতার এই ছন্নছাড়া ভাব দেখিয়া মাঝে মাঝে মেঘের মধ্যে আত্মগোপন করিতেছে। মাঝে মাঝে বেলি ফুলের গন্ধ আর কোকিলের ডাক মনটাকে বড় উদাস করিয়া দিতেছে···

সবেমাত্র সকাল হইয়াছে। ঘুম ভাঙিয়া গেল পাশের বাড়ীর কচকচিতে। চক্ষু রগড়াইয়া দেখি, সেখানে একটি বিরাট কাণ্ড: নায়ক বনাম নায়িকা; অর্থাৎ কর্তা বনাম গিন্নী। কর্তার হাতে চটি—আর গিন্নীর হাতে ঝাঁটা। উভয়েই বাক্যবলে উভয়কে জর্জরিত করিয়া ক্রুদ্ধ নেত্রে পরস্পরের দিকে চাহিয়া আছে। হঠাৎ এক অভাবনীয় পরিবর্তন: নায়ক জুতা ছুড়িয়া ফেলিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল: আজ আমি আত্মহত্যা করবো। ইস্ত্রী হয়ে···

ইস্ত্রী ওরফে গিন্নী প্রকাণ্ড নথ নাড়া দিয়া এবং ঝাটা শূন্যে আস্ফালন করিয়া বলিল, এ! মিনষের আদিখ্যেতা দেখ না। ফের যদি ঐ সব ছাই পাঁশ খাবে—আর রাত্রে বাড়ী আসা বন্ধ করবে—তো তোমার চৌদ্দপুরুষকে ঝেটিয়ে ঘর থেকে বিদায় করবো। আমায় যে সে মেয়ে পাও নি, বাপু। গোঁসাই পাড়ার ডাকসাইটে জগদ্দল রায়ের মেয়ে আমি, হুঁ। তোমার মত দশগণ্ডা পুরুষ চরাতে পারি, জান?

তারপর মুখ বাঁকাইয়া বিকৃত কণ্ঠে বলিল, আবার ঢং হচ্ছে···আ-ত্ম-হ-ত্যা করবো। কর না, কর···কর! আপদ চুকে যায় তো তা হলে! বেহায়া···আশী বচ্ছরের বুড়ো কোথাকার—ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাশের বাড়ী হইতে একটি ডেঁপো ছোকরা বলিয়া উঠিল: বাব্বা, জব্বর বিরহ।

তারপরেই গাহিয়া উঠিল:—

সখিরে, পিরীতি ভীষণ জ্বালা।
হাসিয়া হাসিয়া পিরীতি করিনু
ফিরে না চাহিল কালা।

উঠিয়া পড়িলাম।

বাথরুমে ঢুকিয়া দেখি ওপাশের বাড়ীতে আমারই একটি সহপাঠিনী জোর গলায় আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে:

মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।
কানু হেন গুণ নিধি কারে দিয়ে যাব।

না, ভাল লাগিতেছে না। মুখ না ধুইয়াই ফিরিয়া

আসিলাম রেডিয়োতে 'ঝরিয়া' প্যাটার্ণে এক পাগলা গান ধরিয়াছে :

সখিরে, কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥

সবাই মিলিয়া পাগল করিয়া দিবে না কি? বাড়ীতে বসিয়া থাকা তো ক্রমশই দায় হইয়া উঠিল দেখিতেছি। এখন পালানোই শ্রেয়ঃ।

চাকর বলিল, যাচ্ছেন কোথায়?

বলিলাম—জাহান্নামে…

হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেলাম। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের যে কিছুই পড়া হইল না।

আকবরের রাষ্ট্র সাধনা

এস, ওয়াজেদ আলি, বি-এ (কেন্টাব) বার-এট-ল

চার

স্বয়ং জাঁহাপনা আজ তাদের কাছে আলোকের সন্ধান করছেন। মুক্তির কামনায় তাঁদেরই শরণাপন্ন হয়েছেন। পরমার্থের বিষয় তাঁদেরই জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। আলেমদের আর পায় কে? গর্ব্বে তাঁরা ফুলে উঠলেন, ধরাকে সরা জ্ঞান করতে লাগলেন। সৌভাগ্যের এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে তাঁরা কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন, আর নিজেদের কদর্য্য স্বরূপ নির্লজ্জভাবে সকলের কাছে সুপ্রকট করে তুললেন।

মিথ্যার গৌরব ক্ষণস্থায়ী। ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে আলেমদের মধ্যে তুমুল কলহ কোন্দল এসে দেখা দিল। কার পাণ্ডিত্য বেশী আর কার পাণ্ডিত্য কম, অনাবিল সত্যের সন্ধান কে রাখে আর কে রাখে না, স্বর্গীয় আলোক বিতরণ করবার বিধিসম্মত অধিকার কার আছে, আর কার নাই; গুরুগিরির প্রমাণ্য সনদ কে পেয়েছে আর কে পায় নি; এই সব গুরুতর ব্যাপার নিয়ে তুমুল তর্কাতর্কি, ভীষণ রেশারেশি, আর অন্তহীন বাদ-বিতণ্ডা এসে দেখা দিল। শাহিন শাহের কাছে নিজের জ্ঞানের সীমাহীন পরিধি দেখাবার জন্য, আর প্রতিযোগীর অতলস্পর্শী অজ্ঞতা প্রমাণ করবার জন্য সকলেই ব্যাকুল, সকলেই উদগ্রীব। কণ্ঠস্বর ক্রমেই উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠতে লাগলো। যুক্তি গেল, তর্ক এল, তর্ক গেল, চিৎকার এল; চিৎকার গেল, গালাগালি এল। মিথ্যা অপবাদ, ভীত্তিহীন অভিযোগ, ছলনা, চাতুরী, নীচ ষড়যন্ত্র, হৃদয়হীন বিশ্বাসঘাতকতা সবই এই মোহগ্রস্ত, স্বার্থান্ধ ধর্ম্মবণিকদের মধ্যে শনৈ শনৈ আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো। শাহিন শাহের ধৈর্য্যের মজবুত বাঁধও শেষে ভাঙ্গল। তিনি কড়া হুকুম জারি করলেন, যে কোন আলেম শাহি দরবারে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলবে, কিম্বা অভদ্র আচরণ করবে, সভা থেকে তাকে বের করে দেওয়া হবে। স্বার্থ সর্ব্বস্ব এই ঘোর সংসারী ধর্ম্ম-বণিকদের কাছে শাহিন শাহ যে ধর্ম্মের কৌস্তুভ মণির সন্ধান পেলেন না সে কথা বলাই বাহুল্য।

পাঁচ

অকপট চিত্তে, একান্ত মনে সত্যের সন্ধানে যে ফিরে খোদা সত্যের সন্ধান তাকে দেন; এই হল বিশ্বের চিরন্তন নীতি। আকবরের বেলাতেও এ নীতির ব্যতিক্রম হয় নি। তাঁর মন যখন আচারধর্ম্মী মৌলভিদের প্রতি একান্ত ভাবে বিরূপ; তাঁদের কাছ থেকে সত্যলাভের সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টার ব্যর্থতায় অন্তর যখন তাঁর একান্তভাবে বিষাক্ত; ঠিক সেই সুযোগের মুহূর্ত্তে তরুন যুবক আবুল ফজল ভাগ্য নক্ষত্রের নির্দ্দেশে একদিন শাহি দরবারে উপস্থিত হলেন। অসাধারণ প্রতিভা এবং অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের অধিকারী এই যুবক ছিলেন, সেই যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শেখ মোবারকের দ্বিতীয় পুত্র। শেখ মোবারক যেমন পাণ্ডিত্যে অতুলনীয় ছিলেন, তেমনি চরিত্রের বলিষ্ঠতায়, চিত্তের স্বাধীনতায়, আত্মসম্ভ্রমের তীক্ষ্ণতায় সে যুগের আলেমদের মধ্যে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। শাহী দরবারের প্রলোভন এবং প্রতিযোগীতা থেকে তিনি বহু দূরে থাকতেন, আর জ্ঞানের নিঃস্বার্থ সাধনায় একান্ত সরল ভাবে জীবন যাপন করতেন। সাপ যেমন নেউলকে ভয় করে, মোল্লা মৌলুভিরাও তাঁকে তেমনি ভয় করে চলতেন, কেননা তিনি তাদের ভণ্ডামির স্বরূপ দশের সমক্ষে প্রকাশ করতে কিছুমাত্র ইতঃস্তত করতেন না।

আবুল ফজল পিতার পাণ্ডিত্য এবং স্বাধীন মনোবৃত্তি উভয়ই উত্তরাধিকার সূত্রে পরিপূর্ণমাত্রায় পেয়েছিলেন। আচার পন্থী আলেমের দল শেখ মোবারককে যেমন ভয় করে চলতেন, তাঁর অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন এই দ্বিতীয় পুত্রকেও তেমনি তাঁরা সশঙ্ক দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করেছিলেন। শাহিদরবারে আবুল ফজলের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে তারা প্রমাদ গুণতে আরম্ভ করলেন।

ছয়

মানুষ চিনতে আকবরের বিলম্ব হত না। আর গুণের আদর করতে কখনও তিনি পরাঙ্মুখ হতেন না। প্রতিভাশালী যুবক আবুল ফজল রাজসভায় উপস্থিত হওয়ামাত্র তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। অতি অল্পকালেই তিনি বাদশার একান্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। দরবারের বিভিন্ন গুরুতর বিষয় সম্পর্কে বাদশা তার সঙ্গে সলা-পরামর্শ করতে আরম্ভ করলেন। রাজসভার আবহাওয়া বদলে গেল।

পিতা পুত্র স্বার্থসর্বস্ব, ধর্মান্ধ মোল্লা মৌলভিদের কাছ থেকে এতদিন যে লাঞ্ছনা ভোগ করে এসেছিলেন, আবুল ফজল তার কথা কখনও ভুলেন নি। চির শত্রুদের জব্দ করবার প্রশস্ত সুযোগ এতদিন পরে তাঁর হাতে এল। দরবারে মোল্লা মৌল্‌ভিদের কলহ কোন্দল স্বার্থের তাড়নায় নিত্যই বেড়ে চলেছিল। কুটবুদ্ধি আবুলফজল কৌশলে এখন তাতে ইন্ধন যোগাতে লাগলেন। জ্ঞানাভিমানী আলেমদের অজ্ঞতাকে সুপ্রকট করার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রীয় বিতর্ককে তিনি একান্ত দক্ষতার সঙ্গে মূল সূত্রের দিকে পরিচালিত করতে লাগলেন। দলিলের কথা, যুক্তির কথা, প্রমাণের কথা নিত্যই উঠতে লাগলো। মৌলুভিরা হাঁপিয়ে উঠলেন। বাদশার কৌতূহলের অন্ত নাই, জিজ্ঞাসার অন্ত নাই, আগ্রহের অন্ত নাই। আর এদিকে, মৌলুভিদের সে কৌতূহল নিবৃত্তির ক্ষমতা নাই, সে জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার ক্ষমতা নাই, সে আগ্রহকে সন্তুষ্ট করবার ক্ষমতা নাই। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আবুল ফজল সুকৌশলে বিতর্ককে এমন এক জটিল বনানীর মধ্যে নিয়ে উপস্থিত করলেন যে কৌতূহলী বাদশাহ সত্যের পরিস্ফুট রূপ দেখবার জন্ম অ-মুসলমান পণ্ডিতদের সাহায্যের জন্ম আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন। দিল্লীর দরবারে কখনও যা ঘটেনি তাই এখন ঘটল। বাদশার তরফ থেকে পারসিক, খৃষ্টান, হিন্দু, জৈন প্রভৃতি ধর্মের পণ্ডিত এবং সাধু সন্তদের কাছে নিমন্ত্রণ যেতে লাগলো। বাদশাহ চান সকলেই আসুন, সকলেই নিজ নিজ ধর্মের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করুন; সত্য কোথায় লুকানো আছে, একবার তা খুঁজে দেখা যাক। সর্বধর্মের, সর্বশাস্ত্রের, সর্বদর্শনের আলোচনায় শাহী দরবার মুখরিত হয়ে উঠলো।

সাত

আকবর স্বভাবতঃই একান্ত উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। সত্য জানবার আর সত্যের নির্দেশ মত চ'লবার একটা দুর্নিবার প্রবৃত্তি তাঁর অন্তরে সর্বক্ষণ কাজ করে যাচ্ছিলো। তারপর, ন্যায়-নিষ্ঠা ছিল তাঁর মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য। অন্যায় কিম্বা অত্যাচার দেখলে তার প্রতিকারে তিনি বদ্ধপরিকর হয়ে উঠতেন। তিনি যে অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। বড় বড় পণ্ডিতেরা অনেক চেষ্টা করেও যে তত্ত্ব আয়ত্ত করতে পারতেন না, আকবর সহজেই তা বুঝে ফেলতেন। সর্বোপরি তার বিরাট ব্যক্তিত্ব সর্বপ্রকার সংস্কার এবং সংকীর্ণতার শৃঙ্খল থেকে নিজেকে মুক্ত করবার এবং অতিমানবোচিত (Superman) বিশ্বে পরিভ্রমণ করবার বিস্ময়কর শক্তির অধিকারী ছিল। বিভিন্ন ধর্মের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার ফলে আকবর বুঝলেন, সত্য কোন বিশেষ ধর্মের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। সব ধর্মেই সত্য আছে। আর সব ধর্মেই মিথ্যার আমেজও ওতপ্রোতভাবে প্রবেশ করেছে। তিনি আরও বুঝলেন, যে ধর্মের মূলগত আদর্শ এক জিনিস আর তার আনুসঙ্গিক আচার-বিচার, ক্রিয়া-কর্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জিনিস। সাধারণ মানুষ ধর্মের মূলগত আদর্শের কথা ভুলে আচার-বিচার, ক্রিয়া-কর্ম নিয়েই মেতে যায়; আর তা থেকেই আসে যত কলহ, কোন্দল, বিভেদ, বিচ্ছেদ, আর হিংসা বিদ্বেষ। জনসাধারণ ধর্মের অন্তর্নিহিত আদর্শ স্পষ্ট করে দেখবার কিম্বা বোঝবার ক্ষমতা রাখে না। তারা আচার অনুষ্ঠানকেই ধর্ম বলে মনে করে, আর, অন্ধ যেমন তার যষ্টিকে আকড়ে ধরে থাকে, সাধারণ মানুষও তেমনি ধর্মের বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানকে আকড়ে ধরে থাকে। ধর্মের বণিকেরা, ভণ্ড তপস্বীরা মানুষের চরিত্র ভাল করেই বোঝে। তারা তাদের জ্ঞানের এবং বোধন শক্তির স্বল্পতার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে, নানা রকম বুজরুকির সাহায্যে, তাদের মধ্যে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে; আর সেই আধিপত্যকে কায়েমী করবার উদ্দেশ্যে নানা রকম সংকীর্ণতা এবং কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেয়; আর এই উদ্দেশ্যে ভিন্ন দলের, ভিন্ন সম্প্রদায়ের, ভিন্ন সমাজের লোকেদের প্রতি বিদ্বেষের আগুনকে প্রচণ্ড ভাবে জ্বালিয়া তোলে। প্রকৃত যাঁরা ধার্মিক, প্রকৃত যাঁরা খোদাভক্ত, তাঁদের কিন্তু এ পথ নয়। তাঁরা চান, মানুষের মঙ্গল! তাঁরা চান মানুষের মিলন! তাঁরা চান, মানুষের ঐক্য! সত্যের একাধিপত্যের দাবী আসে মনের কার্পণ্য থেকে, অন্তরের অনুদারতা থেকে, জ্ঞানের স্বল্পতা থেকে। আকবরের উদার মন অনিবার্য্য ভাবে তাঁকে শেষোক্ত দলের দিকেই নিয়ে গিয়েছিল। আকবরের এ সময়কার মনের অবস্থা আবুল ফজল একটী কবিতায় অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন:

> হে প্রভু, প্রত্যেক মন্দিরেই তাদের আমি দেখতে পাই যারা সত্যই তোমার সঙ্গে পরিচিত!
>
> প্রত্যেক ভাষাই তোমার জয় গানে মুখরিত! সাকার বাদী আর মুসলিম উভয়ই তোমার তল্লাসেই মশগুল!
>
> সব ধর্মের সেই একই কথা—তুমি অচিন্তনীয়, তোমার তুলনা নাই!

মুসলমানের মসজীদে তোমারই গুণগান হয়,
খৃষ্টানের গীর্জ্জার ঘণ্টাও তোমার প্রেমেই ধ্বনিত হয়!

কখনও আমি খৃষ্টানের গীর্জ্জায় যাই, আর কখনও যাই মুসলমানের মসজীদে! প্রভুহে আমার, যেখানেই যাই না কেন, তোমার তল্লাসেই আমি ফিরি!

তোমার প্রকৃত প্রিয় যারা,

তারা সনাতন পন্থীও নয়, আর নব্য পন্থীও নয়!

উভয় দলই সত্যের অমল আলোক থেকে বহু দূরে অবস্থিত! নব্য পন্থীরা তাদের বিদ্রোহ নিয়েই মশগুল, আর সনাতন পন্থীরা মশগুল তাদের আচার নিয়ে, বাচ-বিচার নিয়ে!

গোলাপের পরাগ তাদের অন্তরেই পাওয়া যায়,
সুগন্ধী আতরের কারবার যারা করে!

আট

কেবল ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা নিয়ে সময় কাটাবার জন্য আকবরের জন্ম হয় নি। প্রকৃতি দেবী তাঁকে অশেষ যত্নের সঙ্গে গড়েছিলেন, এক অভূতপূর্ব্ব কাজের জন্য। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন জাতি এবং কৃষ্টির লোকের দ্বারা অধ্যুষিত বিশাল এই ভারত ভূমিতে অভিনব আদর্শে গঠিত এক রাষ্ট্র স্থাপনের উদ্দেশ্যেই আকবরের সৃষ্টি। প্রকৃতি দেবী আমাদের বৈচিত্রময় এই মাতৃভূমিতে এমন এক রাষ্ট্র সৌধ গড়তে চেয়েছিলেন, যা পূর্ব্বে, কোন যুগে কোন দেশে কখনও দেখা যায় নি। সেই অপূর্ব্ব সৌধে একত্ববাদী মুসলিম আর বহুত্ববাদী হিন্দু; আমিষভোজী খৃষ্টান আর নিরামিষ জৈন; সূর্য্যোপাসক পারসিক আর জেহোভা ভক্ত এহুদি, সকলে পরম আনন্দে এক সঙ্গে বসবাস করবে; সকলে পরস্পরকে ভাইয়ের মত ভালবাসবে; প্রত্যেকে প্রত্যেকের ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা এবং ভক্তির চক্ষে দেখবে; প্রত্যেকে প্রত্যেকের সভ্যতার সম্মান করবে; আর সকলে মিলে উদার, সার্ব্বজনীন, সকলের মঙ্গলকামী, সকলের আশ্রয়স্থল এক রাষ্ট্রতন্ত্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করবে। আর সে অদৃষ্ট পূর্ব্ব রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের চরম এবং পরম লক্ষ্য হবে মঙ্গলময় সেই বিশ্ব-প্রভুর উদ্দেশ্য সাধন, যিনি সর্ব্ব ধর্ম্মে, সর্ব্ব সমাজে, সর্ব্ব সভ্যতায় তাদের জীবন-কেন্দ্ররূপে বিরাজ করেন। আর যিনি সে রাষ্ট্রের অধিনায়ক হবেন তিনি জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক রাষ্ট্রবাসীকে নিজের সন্তানরূপে দেখবেন, আর প্রত্যেক রাষ্ট্রবাসী তাঁকে দেখবে তার শ্রদ্ধেয় পিতারূপে। রাষ্ট্রীয় পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম্মকেই রাষ্ট্রপতি নিজের ধর্ম্মরূপে গণ্য করবেন, আর সেই ধর্ম্মের প্রতিভূরূপে তার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। নিজের পৈতৃক ধর্ম্ম তিনি অবশ্য বর্জ্জন করবেন না, কিন্তু তাঁর আচারে, তাঁর ব্যবহারে এ সত্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে যে, সব ধর্ম্মই তিনি মানেন, আর সব ধর্ম্মের প্রতিই তিনি সমান শ্রদ্ধাবান। তা' ছাড়া বিরাটতর ঐক্যের পরিপোষক এক প্রতিষ্ঠানেরও তিনি নেতৃত্ব করবেন। সর্ব্ব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের নিয়ে সে প্রতিষ্ঠান গঠিত হবে। আর তার কাজ হবে সর্ব্ব ধর্ম্মের ঐক্য প্রচার করা, সর্ব্ব ধর্ম্মের লোকেদের জন্য সহজ সাধারণ একটা সাধনতন্ত্রের সৃষ্টি করা, আর সর্ব্ব ধর্ম্মের মৌলিক সত্যের দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করা। আর রাজকীয় শক্তিকে, রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রকে, রাজ্যের আদেশ-অনুশাসন এবং বিধি নিষেধকে সেই মৌলিক সত্যের নির্দ্দেশ পরিচালিত করার জন্য রাষ্ট্র-নেতাকে সাহায্য করাও হবে সে প্রতিষ্ঠানের বড় একটা কাজ। অপূর্ব্ব, স্বপ্নবৎ এই আদর্শের উপলব্ধির জন্যই যেন প্রকৃতি দেবী আকবরকে সযত্নে গড়েছিলেন। আর এই আদর্শকে রূপায়িত করবার শক্তিও তাঁর ছিল।

আকবর যে তাঁর জীবনকে এই ভাবে দেখতেন; এই বিরাট কাজকেই যে তিনি তাঁর জীবনের mission—তার দৈব নির্দ্দিষ্ট সাধনা বলে মনে করতেন; আর এই সাধনার প্রেরণাই যে তাঁর সর্ব্ব কর্ম্মকে, সর্ব্ব চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করতো, তার যথেষ্ট প্রমাণ আকবরের জীবন-কাহিনীতে পাওয়া যায়। অভিনব রাষ্ট্রের গোড়া-পত্তনের প্রাক্কালে শিকরীর মসজীদের মিম্বর থেকে দেশবাসীদের সম্বোধন করে আকবর জোর গলায় বলেছিলেন:

বিশ্ব-প্রভুই আমাকে বাদশাহি দিয়েছেন! তিনি আমাকে প্রতিভা দিয়েছেন, শক্তি দিয়েছেন, অতুল বিক্রমের অধিকারী করেছেন!

ন্যায় এবং সত্যের সাহায্যে তিনি আমায় পথ প্রদর্শন করেছেন!

সত্যের প্রেমে অন্তরকে আমার ভরপুর করেছেন!
মানুষের ভাষা তাঁর মহিমা বর্ণনা করতে পারে না!
আল্লা হো আকবর! পরমেশ্বরই সকলের ঊর্দ্ধে!

[ক্রমশঃ

শিশু-সংসদ

(রূপকথা)

শ্রীবাণীকুমার

এক যে ছিল রাজা, তার ছিল এক রাণী। রাজার যেমুনি ধন-দৌলত, তেমনি তা'র জন-বল। রাজা রাণীকে একদিন হারিয়ে পাগলের মত হ'য়ে গেল। একটা ঘরে নিজেকে বন্ধ ক'রে রাজা দিন নেই রাত নেই শুধু কাঁদে আর দেওয়ালে মাথা খোঁড়ে। রাজপুরীর সকলে তো গেল ভয় পেয়ে—রাণী গেলেন, এবার যুক্তি ক'রে ঘরের রাণীর শোকে রাজাও বুঝি যান। তখন মন্ত্রীরা চারটি দেওয়ালে বেশ মোটা ক'রে তুলো এঁটে দিলে। এই উপায়ে রাজার মাথা বাঁচানো হোলো। তারপরে তা'রা রাজ্যের সকলকে জানিয়ে দিলে যে—কোনো প্রজা কোনো রকমে যদি রাজার দুঃখ দূর করতে পারে, সে রাজ-দর্শন তো পাবেই, আর পাবে পুরস্কার। দলে দলে লোক এলো গেলো, কত কথা বললে। কিন্তু কোনো কথাতেই রাজার মন টল্লো না। রাজা কোনো লোকেরই কথায় কাণ পাতলো না।

শেষকালে এলো একটি তরুণী কন্যা। পা' থেকে মাথা পর্য্যন্ত একটা কালো ঘেরাটোপে নিজেকে ঢেকে রাজার সামনে সে উপস্থিত হোলো। মেয়েটি এসে কোনো কথাই বল্লে না, শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। তা'র কান্না আর সইতে না পেরে রাজা ফিরে চাইলে। মেয়েটি তখন প্রথম কথা কইলে, "আমি আপনার দুঃখ দূর করবার জন্যে আসি নি, মহারাজ! সে চেষ্টাও আমার নেই। বরঞ্চ এসেচি আপনার দুঃখ আরও বাড়িয়ে তুলতে। আপনারও যেমন কষ্ট, আমারও তেম্নি কষ্ট। আমি ধন-জন-পরিজন সব খুইয়ে এখন শুধু কপাল চাপড়াই আর কাঁদি। এ-জগতে আমার কেউ নেই গো, আমি একলা।" কথা ক'য়ে যাচ্ছে আর কাঁদচে, আবার কথা শেষ ক'রেই গলা ছেড়ে কান্না শুরু ক'রে দিলে। রাজারও ব্যথা আবও উথলে উঠলো। রাজাও কাঁদে, মেয়েটিও কাঁদে, আর যে যা'র দুঃখের কথা বলে। শেষে সব কথা ফুরিয়ে গেল, চোখের জল ঝরে' ঝরে' গেল শুকিয়ে। রাজা তখন যেন একটু সুস্থ বোধ করতে লাগলো। তা'র বুকের ভারী বোঝাটা নেমে গেল।

রাজকন্যা

মেয়েটি ছিল খুব বুদ্ধিমতী। সে তখ্নি মাথার ঘোমটা সরিয়ে ফেল্লে। তা'র টানা টানা জ্বলজ্বলে কালো চোখ দু'টি শুকতারার মত ফুটে উঠলো। তা'র মুখটি যেন ফুটন্ত পদ্ম। রাজা মেয়েটির রূপ দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেল। আর রাণীর জন্যে তা'র দুঃখ রইলো না, মেয়েটিকে মিষ্ট কথায় আদর করতে লাগ্লো। কিন্তু মেয়েটি তখনও দুঃখের ভান করে রইলো।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে, "আমার বুকের ব্যথা কোনদিনই ঘুচবে না, আমার আপনার বলতে যারা—তা'রা সবাই আমাকে একলা ফেলে চলে গেছে। হায়! এ-জীবন আর রেখে ফল কি!"

রাজা ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠলো, "তোমাকে মিনতি করচি কন্যা, আর দুঃখের কথা কোয়ো না। মিছেমিছি কেন দুঃখ করবে!"

কন্যা বল্লে, "তার বদলে পাবো কি?"

রাজা বল্লে, "ঘর-বাড়ী, অগ্নিপাটের শাড়ী, সন্ধ্যেমালতী বসন, গয়নাগাঁটি, আর রাণীর মাথার মুকুট।"

কন্যার মনের সাধ পূরণ হোলো। রাজা ঐ কন্যাকে বিয়ে করলে। এই অঘটন ঘট্তে দেখে রাজপুরীর সকলে তো অবাক্!

শঙ্খচূর্ণী

রাজার একটি মেয়ে ছিল—নাম তা'র চম্পাবতী। তা'কে দেখতে ছিল খুব রূপসী। কনকচাঁপার মত রঙ, তিল ফুলের মত নাক, মুক্তোর মত দাঁত, চোখ দু'টি ঠিক আধফোটা পদ্মের মত—যেন ফুলের পরী রাজা কন্যা হ'য়ে জন্মেছে। তা'র বিমাতা যখন ঘরে এসে তার মায়ের সর্ব্বস্ব অধিকার ক'রে নিলে, চম্পাবতী লুকিয়ে চোখের জল ফেল্তে লাগলো। তার বয়স তখন সবেমাত্র পোনেরো বছর। নতুন রাণী যেদিন রাজবাড়ীতে এলো, সঙ্গে আনলে তার বোনের মেয়েকে। মেয়েটির তিনকুলে কেউ ছিল না। তার কাছেই সে ছেলেবেলায় মানুষ হয়। তারপর মায়াবিনী কয়াধু তাকে বড় করে তোলে। নতুন রাণীর বোনঝির নাম ছিল শঙ্খচূর্ণী। তার চেহারাও ছিল শঙ্খচূর্ণীর মত দেখতে, আর মুখখানি ঠিক মুক্তকেশী বেগুনের মত—মুখের রঙ যেন পাঁচমিশুলী ছিটের কাপড়। তার ওপরে রাহার বড় বড় লাল্চে আঁচিল—আর আঁচিলের মাঝখানে খোঁচা খোঁচা কাঁটার মত

চুলের গোছা। মায়াবিনী কয়াধূ শঙ্খচূর্ণীর ধর্ম্ম-মা ছিল, সে তার ভালোর জন্যে অনেক চেষ্টা করে, গুণ করে, মন্তর-তন্তর পড়ে' তার বদ্ চেহারা আর বিশ্রী মেজাজ একেবারেই পালটাতে পারে নি। সেইজন্যে শঙ্খচূর্ণীর মাসী নতুন রাণী সতীনের মেয়ে চম্পাবতীর রূপ আর গুণ দেখে যেমন হিংসেতে জ্বলে পুড়ে মরে, তেমনি নিজের আদরের বোনঝির কুরূপ আর অসভ্য আচার দেখে হতাশ হ'য়ে যায়। চম্পাকে যত রকমে অসুখী করা যেতে পারে, নতুন রাণী তাই করতে কিছুই বাকি রাখলে না। শুধু তাই নয়, মাসী আর বোনঝিতে মিলে সব সময়েই উঠতে বসতে রাজার কাছে চম্পার নামে মিথ্যে বানিয়ে যা' তা' লাগাতে আরম্ভ করলে।

একদিন রাজা নতুন রাণীকে বললে, "দেখো রাণী, আমার মেয়ে আর তোমার বোনঝি—দু'জনেরই বিয়ে দেবার বয়স হয়েছে। তাই আমার ইচ্ছে—আমার রাজসভায় যে রাজকুমার প্রথম এসে পৌঁছুবে, তারই সঙ্গে এই দু'জনের মধ্যে একজনের বিয়ে দিতে চাই।" রাজা তার মনের সাধ রাণীকে জানাতে সাহস করলে না। চম্পাবতীর বিয়ে হয়ে গেলে রাজা নিশ্চিন্ত হয়।

কিন্তু এই কথা শুনে রাণী ব'লে উঠলো, "আমার মনে হয় যে—আমার বোনঝির বিয়ের কথা আগে ভাবা দরকার, কারণ সে তোমার মেয়ের চেয়ে বয়সে বড়। আর শঙ্খচূর্ণী চম্পার চেয়ে অনেক বেশী স্থির-ধীর-নম্র, ভদ্র ব্যবহার যে কি—সে খুব ভালো-জানে। সেইজন্যে আমার বোনঝি সবার আগে বর-বরণের সুবিধা পাবে।" রাজা ছিল সুখ-লোভী। অশান্তিকে সে দূরে ঠেলে রাখতে চাইতো, তাই আর কোনো কথাটি না ব'লে ইচ্ছা না থাকলেও রাণীর মতে সায় দিলে। রাণীর যা ইচ্ছে তাই হবে।

কয়েকদিন পরেই রাজসভায় এলো দূত। দূত সংবাদ দিলে—"রাজা মোহনকুমার সেই দেশে বেড়াতে আসবেন। তাঁর রূপে, গুণে তাঁর নাম সার্থক হ'য়ে উঠেছে।" রাণী এই খবর পাবামাত্র আর দেরী না করেই বড় বড় স্বর্ণকার, সেরা সেরা জহুরী, দলে দলে দর্জ্জি ডেকে পাঠালে। তারা দেখে শুনে খুব ভালো ভালো গয়না, ভালো ভালো পোষাক তৈরী করবে—শঙ্খচূর্ণীকে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সাজাবার জন্যে, এমন সাজ হবে, যা পরলে শঙ্খচূর্ণীর রূপ যাবে বদলে। কিন্তু চম্পাবতীর ভাগ্যে একটিও নতুন পোষাক বা গয়না জুটলো না। রাণীর মত নেই। এমন কি রাণী রাজকন্যার দাসীদের অর্থ দিয়ে বশ করে চম্পার পোষাক, গয়না যা ছিল—সমস্তই সরিয়ে দিলে। চম্পাবতী সাজ-সজ্জা করতে গিয়ে দেখে তার একটিও ভালো পোষাক নেই, একটিও গয়না নেই। তখন দাসীদের শুধলে, "কোথায় গেল আমার সব জিনিস-পত্তর ?"

এক দাসী বল্লে, "কি বলবো রাজকন্যে। ভয়েতে আমি বলতে পারি নি—পোষাক রোদ্দুরে শুকুতে দিয়েছিনু। যখন তুলে আনতে গেনু, ওমা—দেখি সব জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে গেচে। কি হবে গো! সেই থেকেই আমি ভেবে মচ্ছি। আমাকে মাপ করো এবারটির মত।"

আর এক দাসী বল্লে, "রাজকন্যে, আমার সোয়াস্তি নেই, রেতে ঘুম নেই। শুধু বসে বসে ভাবছি—কেমন করে কাপড়-জামার পাখা হয়। যেই ছাদে মেলে দিয়েছি, অমনি হাওয়ায় উড়তে উড়তে আকাশে মিলিয়ে গেল। আমার হাত নেই, উড়তেও পারি না। আমার দোষ নেই, কন্যে!"

অপর আর একজন বল্লে, "ওরা যা বললে রাজকন্যে তার চেয়েও আশ্চর্য্যি আমার কথা। এই দেখো না—আমি কত সাবধানে, চারদিকে কত নজর রেখে—গয়নাগুনো প্যাটরায় ঝেড়ে মুছে তুলে রেখেছিনু। তোলো কি—একদিন মনে কনু, দেখি গয়নাগুনো কেমন আছে। ও মাগো—আমি গালে হাত দিয়ে বসে পনু—একেবারে মূচ্ছো যাই যাই আর কি। গয়না-গুনো ইঁদুরে প্যাটরা কেটে কুচি কুচি করে নিয়ে পালিয়ে গেছে। আমার পোড়া বরাত! কি করবো—কি না করবো—ভেবেই পাচ্ছি নি।"

রাজকন্যা চম্পাবতী সব বুঝতে পারলে। সে পড়লো মহা ভাবনায়। কি সে পরবে। রাজপুত্রের সামনে সে কি বেশে গিয়ে দাঁড়াবে। তার পরণে শুধু একটা অত্যন্ত পুরোণো মোটা কাপড়, তা আবার ময়লা হ'য়ে গেছে। উপায় না দেখে সেই সাতকুটি কাপড়খানা সে পরে রইলো। রাজা মোহনকুমার রাজপুরীতে এলো। এই খবর না পেয়েই রাজকুমারী চম্পা একটা কোণের ঘরে লুকিয়ে পড়লো। এই দীন বেশ তাকে লজ্জা দিতে লাগলো। দুঃখে, ক্ষোভে সে কেঁদে ফেললে। সে রাজার মেয়ে, তার মা নেই বলে এই দশা।

নতুন রাণী তরুণ রাজাকে খুব আদরে যত্নে অভ্যর্থনা করলে। রাজা মোহনকুমারকে নিয়ে যাওয়া হোলো একটি সাজানো ঘরে—সেখানে ব'সে অপেক্ষা করছিল শঙ্খচূর্ণী। কি তার সাজের বাহার। হীরে-মণি-মাণিক্যের গয়নাগুলো তার গায়ে ঝক্ ঝক্ করচে, যেন ঠাট্টা ক'রলে তার কুরূপকে। এতো সাজ-সজ্জা করেও তার কদর্য্য চেহারা ঢাকা পড়ে নি। রাজা মোহনকুমার ছিল অত্যন্ত বিনয়ী ও মিষ্টস্বভাব, তবুও রাজা তার পানে চেয়ে দেখতে পারলে না। রাজা জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় রাজকন্যা চম্পাবতী? তার নাম শুনেই তো আমি এসেচি।" তখন "খোঁজ খোঁজ" রব পড়ে গেলো। শেষ কালে চম্পাবতীর দেখা মিললো, একটা অন্ধকার ঘরের কোণে সে মুখ নীচু ক'রে ব'সে আছে। রাজা মোহন সেই ঘরের দ্বারে এসে রাজকন্যাকে ডাকলে, —"রাজকুমারী চম্পাবতী!"

আর সে লুকিয়ে থাকতে পারলো না। সকল লজ্জা সে ঠেলে ফেলে দিলে। আস্তে আস্তে রাজা মোহনকুমারের কাছে রাজকুমারী এগিয়ে এলো। সরমে তখন তার মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। রাজকন্যার না ছিল সাজ, না ছিল গয়না, পরণে শুধু একটা ময়লা ছেঁড়া কাপড়, তবুও তার রূপ ফুটে বেরুচ্ছে। রাজা মোহন কানে শুনেছিল চম্পাবতীর রূপের গুণগান, এখন চোখে যা দেখলে—কথায় সে বলা যায় না। রাজা মোহনকুমার

মনে মনে খুব সন্তুষ্ট হ'য়ে রাজকন্যার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করলে। রাজকন্যার মনও খুসি হ'য়ে উঠলো। গয়না-কাপড় বা সাজসজ্জার কথা কারোর মনেই রইলো না।

এই খবর পেয়ে নতুন রাণী রাগে গর্‌গর্‌ করতে লাগলো। তখুনি সে রাজার কাছে গিয়ে কান্নার ভান করে বললে, "আমি এ রাজ্যের রাণী, আর এক ফোঁটা মেয়ে ঐ চম্পা মোহনকুমারের কাছে আমার নিন্দে করে! তোমার ভরসা না পেয়ে তার এতোদূর সাহস হয় কেমন করে? এর যদি না কোনো বিহিত করো, আমি জলস্পর্শ করবো না।"

রাজা তো ভয়েই অস্থির! এক রাণীকে হারিয়েছে, আবার বুঝি এ রাণীকেও হারাতে হয়! রাজা রাণীকে ঠাণ্ডা ক'রে বললে—"তুমি কি চাও—বলো। আমি চম্পাকে শাস্তি দোবো।"

রাণী খুব চতুরা। বললে, "ছেলেমানুষ সে, তাকে শাস্তি দিয়ে কি ফল! এক কাজ করো। এই পুরীতে যতদিন রাজা মোহনকুমার থাকবে, সেই সময়টুকু চম্পাকে দুর্গের সব চেয়ে উঁচু ঘরে বন্ধ করে রাখবার হুকুম দাও।" যেই বলা, অমনি সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজ। রাজার হুকুমে রাজকন্যা চম্পাবতীকে দুর্গের একটা ঘরে আটক্‌ করা হোলো।

এধারে কিন্তু তরুণ রাজা রাজকন্যার আবার দেখা পাবার আশায় উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করে। সময় চ'লে যায় তবু রাজকন্যার দেখা নেই। রাজা মোহনকুমার ভাবে—রাজকন্যা চম্পাবতীর মন কি পাথরের মত! রাণী এদিকে সকলকে কড়া হুকুম দিয়ে দিলে—চম্পাবতীর নামে যে যত পারে নিন্দে রটিয়ে বেড়াক্‌। তরুণ রাজা তাই যাকে রাজকন্যার কথা জিজ্ঞেস করে, সেই তার নামে এমন সব নিন্দে করতে থাকে, যা শুনলে মন বিগড়ে যায়। কিন্তু রাজা মোহনকুমার এই নিন্দের একটি কথাও বিশ্বাস করলে না। সে শুধু বললে, "এ-সমস্ত বানানো। চম্পাবতী এতো মন্দ নয়।"

চম্পাবতী দুর্গের ঘরে একলা ব'সে শুধু কাঁদে, আর করুণ সুরে বলে, "রাজা মোহনকুমারের দেখা পাবার আগে যদি আমাকে এই অন্ধকার ঘরে পাঠিয়ে দিতো, তাহলে আমার এ-কষ্ট সওয়া আরও সহজ হোতো। তরুণ রাজার মিষ্টি ব্যবহার কেমন করে ভুলি। আমাদের যাতে আর না দেখা হয়, সেইজন্যে আমার সৎমা আমাকে এইরকম কড়া শাস্তি দিচ্চে।" কিন্তু তার সকল কান্না বাতাসে ভেসে যায়। কেউ একটিও কথা শোনে না।

তরুণ রাজার মন ভোলাবার জন্যে নতুন রাণী দামী দামী উপহার পাঠিয়ে দিলে। হয় তো এই লোভে রাজার মন তার প্রিয়পাত্রী বোনঝি শঙ্খচূর্ণীর ওপর পড়তে পারে। যে সমস্ত উপহার এলো, তার মধ্যে একটা নতুন জিনিস ছিল। একটি গোটা লাল চুণিপাথরে তৈরী কলিজা, তার মাঝখানে একটি হীরার তীর বেঁধা, আর তা ঝুলচে একটি মুক্তালতায়। এক একটি মুক্তা যেমন বড় তেমনি চমৎকার। তরুণ রাজা এই উপহারটি সব চেয়ে পছন্দ করলে। জিজ্ঞাসা করতে তাকে বলা হোলো যে সব প্রথম যে রাজকুমারীর সঙ্গে তরুণ রাজার দেখা হয়—এই উপহার সেই রাজকুমারীর। তার প্রার্থনা, তরুণ রাজা মোহনকুমার তাকে বিয়ে করুক্‌। কিন্তু মোহনকুমার যখন বুঝতে পারলে, যে রাজকুমারীর কথা বলচে রাণীর অনুচর—সে শঙ্খচূর্ণী, তখন তরুণ রাজা সমস্ত উপহার ছুঁড়ে ফেলে দিলে। দাস-দাসীদের বললে, "ফিরিয়ে নিয়ে যাও এই উপহার। আমি নোবো না।" তবুও মোহনকুমারের আশা মিটলো না। একটি বারের জন্যেও
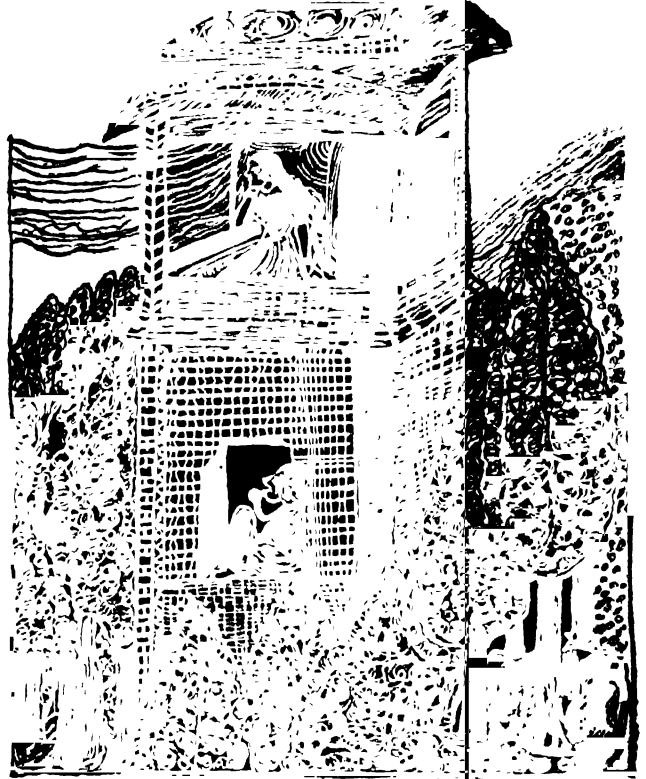
বন্দিনী রাজকন্যার পাহারা

আর সুন্দরী চম্পাবতীর দেখা মিললো না। আর না থাকতে পেরে তরুণ রাজা সাহসে ভর করে রাণীকে শুধুলে, "ছোট রাজকুমারীর কি হয়েছে? তার তো দেখা আর পাই না!" রাণী এই কথায় ভীষণ রেগে গিয়ে উত্তর দিলে, "স্বয়ং রাজা—ছোট রাজকুমারীর যিনি বাপ, তিনি হুকুম দিয়েছেন, যতদিন না আমার পালিত কন্যা শঙ্খচূর্ণীর বিয়ে হয়, ততদিন চম্পাবতী তার ঘর থেকে বাইরে আসতে পাবে না।"

তরুণ রাজা কাতর হ'য়ে বললে, "এই পরমাসুন্দরী কন্যাকে ঘরে বন্দিনী করে রাখে যারা—তাদের পাষাণ প্রাণ! এতে কি ফল হবে?"

রাণী কোনো জবাব দিতে রাজি হোলো না। রাজা মোহন-

কুমার তখন তা'র একজন খুব বিশ্বাসী অনুচরকে ডাকিয়ে পাঠালে। অনুচরের ওপর ভার পড়লো রাজকন্যা চম্পাবতীর সন্ধান আনতে। সেই অনুচর অনেক চেষ্টা ক'রে রাজবাড়ীর এক দাসীর সঙ্গে কথা ক'য়ে ঠিক করলে যে—সেই দাসী সাঁঝের পরে দুর্গপুরীর জানালায় রাজকন্যা চম্পাবতীকে নিয়ে আসবে, আর সেই দুর্গের সঙ্গে লাগানো উদ্যানে আসবে রাজা মোহনকুমার। কথাটা কিন্তু গোপন রাখতে হ'বে। দাসী সব ঠিক ক'রে দেবে আশ্বাস দিয়ে আগেভাগেই পাঁচটি সোনার মোহর হাত পেতে নিয়ে আঁচলে বাঁধলো। দাসীর মনে যে কু-মতলব ছিল, অনুচর তা' একেবারেই সন্দেহ করলে না। দাসীটা আরও লাভের আশায় অবিশ্বাসের কাজ করলে। সোজা সে রাণীর কাছে গিয়ে তরুণ রাজার সঙ্কল্প ফাঁস ক'রে দিলে। রাণী সেই কথা জানতে পেরে একটা নতুন ফন্দী আঁটলে। চম্পাবতীকে দুর্গের আর একটা ছোট ঘরে পুরে' তালা বন্ধ ক'রে দেবার ব্যবস্থা করলে। আর তার আদুরে বোন্-ঝিটিকে সেই জানালায় পাঠাবে—ঠিক হোলো।

অন্ধকার রাত। রাজা মোহনকুমার ধরতে পারলো না, বাতায়নে যে অপেক্ষা করে আছে—সে তার পছন্দ-করা সুন্দরী রাজকন্যা নয়। তাই তরুণ রাজা শঙ্খচূর্ণীকে চম্পাবতী ভেবে তা'র মনের সমস্ত অনুরাগ উজাড় ক'রে দিলে। শেষকালে নিজের আংটিটি আঙুল থেকে খুলে মেকি রাজকন্যার আঙুলে পরালে। তারপরে তা'কে তরুণ রাজা বললে, "রাজকন্যা চম্পা, তুমি আমাকে কথা দাও, কাল আমার সঙ্গে এই পুরী ছেড়ে পালিয়ে যাবে।" রাজা কিন্তু লক্ষ্য করলে, রাজকন্যা উত্তর দেয় দু'একটি কথা ব'লে, গলার স্বরও যেমন শুনেছিল—তেমন মিষ্টি নয়। তবু সে মনকে বোঝালে। হয়তো রাজকন্যা রাণীর কাছে ধরা পড়বার ভয়ে এই রকম গলা বদলে অল্প কথা বলচে। রাজা মোহনকুমার ইচ্ছে থাকলেও আর বেশী দেরী করলে না। "রাজকন্যা নিরাপদ হোক্", এই ভেবে সেখান থেকে সে চ'লে গেল। কিন্তু মোহনকুমার রাণীর এই ছলনা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলে না।

পরের দিন সন্ধ্যায় শঙ্খচূর্ণী মাথায় দীর্ঘ ঘোমটা টেনে একটি খুব ছোট গোপন দরজা দিয়ে হামাগুড়ি টেনে বেরিয়ে এলো। সেখানে রাজা মোহনকুমার রাজকন্যার অপেক্ষায় উনপঞ্চাশটি ডানা-ওলা সোনাব্যাঙে টানা একটি ছোট্ট রথের মধ্যে ব'সে ছিল। এই অদ্ভুত রথটি তা'কে দান করে তারই এক মস্ত বড় যাদুকর বন্ধু। মায়া-ব্যাঙের রথ ছোটে পবন-গতিতে। সেই মায়ারথ উড়লো শূন্যে, এক মুহূর্ত্তেই সেই রাজ্য পেরিয়ে চললো সোঁ সোঁ করে বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। অনেক দূর যখন তারা চলে এসেছে, রাজা মোহন বললে, "রাজকন্যা, এবার আমি মাটিতে নামি। আমরা মাটির মানুষ, পৃথিবীতেই আমাদের বিয়ে হ'বে।" সেই মেকি রাজকন্যা সঙ্গেসঙ্গেই বাজি হ'য়ে বললে, "রাজপুত্তুর, আমাদের বিয়ে তো আর রাস্তায়-ঘাটে হ'তে পারে না। লোকে নিন্দে করবে। তাই বলছি—কাছেই আমার ধর্ম্ম-মা'র বাড়ী, সেখানে বেশ ধুমধাম করে আমাদের বিয়ের উৎসবটা যদি হয়—তা হ'লে সবথানিই বজায় থাকে।" রাজা সহজ মনে হাসতে হাসতে উত্তর দিলে, "তাই হোক্। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।"

উড়ন্ত ব্যাঙগুলো মায়ারথ টেনে ছুটলো কয়াধুর মায়াপুরীর দিকে। সেখানে পৌছেই শঙ্খচূর্ণী তাড়াতাড়ি তা'র মায়াবিনী ধর্ম্ম-মা'র কাছে গেল। মায়াবিনীকে আড়ালে ডেকে যা' যা' ঘটেছে—সব কথা খুলে বললে। তারপর তা'র পা' দু'টো জড়িয়ে ধরে মনের কথা ব'লে ফেললে, "ধর্ম্ম-মা, আমার সহায় হও। নইলে এ-প্রাণ রাখবো না।"

মায়াবিনীর মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠলো, ধীরে ধীরে বললে, "শঙ্খ, তুমি যে কাজে আমাকে সহায় হ'তে বলছো—তা' খুব সহজ নয়। রাজা মোহন চম্পাবতীকে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালোবাসে। সত্যি-কারের ভালোবাসা তো সহজে হার মানে না। আমার সন্দেহ হয়—এবারেও তুমি হতাশ হ'বে।"

এই সময়ে রাজা মোহনকুমার একটা বড় ঘরে অপেক্ষা করছিল। সেই ঘরের স্বচ্ছ হীরার দেওয়ালের ভিতর দিয়ে রাজা স্পষ্ট দেখতে পেলে কয়াধু আর শঙ্খচূর্ণী দু'জনে কথা কইচে। সে চমকে উঠলো। চীৎকার করে বলে উঠলো, "তা' হ'লে কি আমার আদরের চম্পাবতীকে কেউ সরিয়ে নিয়ে গেলো?" সেই মুহূর্ত্তেই তা'রা দু'জনে রাজার কাছে এসে হাজির। কয়াধু কথা কইলে—যেন হুকুম ক'রছে,—"রাজা মোহন, চেয়ে দেখো এই আমার ধর্ম্ম-মেয়ে রাজকুমারী শঙ্খচূর্ণী। একে বিয়ে করবে তুমি, কথা দিয়েছে। এখুনি ওকে বিয়ে করতে হ'বে।"

রাজা হঠাৎ এই ব্যাপারে থতমত খেয়ে গেল, তারপর সাম্‌লে নিয়েই বলছে—"এ কি চক্রান্ত! ওই কুরূপাকে আমি কোনো কথা দিই নি।"

শঙ্খচূর্ণী গলা চড়িয়ে জবাব দিলে, "কি! তুমি আমার এই আঙুলে আংটি পরিয়ে দাওনি? তুমি আমাকে বলোনি—তোমার সঙ্গে পালিয়ে আসতে?"

রাগে রাজার মুখ লাল হ'য়ে উঠলো। অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বললে, "আমাকে ঠকানো হয়েছে। মায়া-ব্যাঙের দল—ডানা ঝেড়ে ওঠ, আমি এখান থেকে এখুনি চলে যেতে চাই।"

মায়াবিনী রাজার গায়ে তা'র যাদুদণ্ড বনমানুষের হাড়টা ছুঁইয়ে জোর গলায় শুনিয়ে দিলে—"তোমার যাবার সাধ্য কি! যেখানে আছ সেইখানেই থাকো।" সঙ্গে সঙ্গে তার পা' দুটো যেন মেঝেতে বেধে গেল, গজাল মেরে কে যেন আটকে দিয়েছে।

রাজা ভীষণ রেগে গিয়ে বললে, "যতো মন্দ তুমি করতে পারো করো। কিন্তু জেনো, আমি চম্পাবতীকে ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করবো না"

কয়াধু প্রাণপণ চেষ্টা করলে রাজার মন ঘোরাতে, কোনো ফলই হোলো না। শঙ্খচূর্ণী রাজার পায়ে পড়ে কত কাঁদলে, কত মাথা খুড়লে, কত মিনতি করলে, কিন্তু সে অচল, অটল। কুড়ি দিন, কুড়ি রাত চললো তাদের চেষ্টা। তবু রাজার মন টললো না। শেষে তারা বিরক্ত হ'য়ে হাল ছেড়ে দিলে। কোনো উপায় আর না দেখে কয়াধু ব'লে উঠলো, "রাজা মোহন, দু'টি সর্ত্ত আছে। তার মধ্যে একটি তুমি ইচ্ছামত

বেছে নাও। বারো বছর ভীষণ শাস্তিভোগ করো, না হয়—আমার ধর্ম্ম-মেয়েকে বিয়ে করো!"

রাজা ইতস্ততঃ না করেই উত্তর দিলে, "আমি নিজের ইচ্ছায় বেছে নোবো শাস্তি, সে যতই কঠিন হোক্। আমি কোনোমতেই শঙ্খচূর্ণীকে বিয়ে করবো না। আমার বরাতে যাই থাক্।"

মায়াবিনী কয়াধূ অত্যন্ত রেগে হেঁকে উঠলো, "তা হ'লে বারোটি বছর প্রায়শ্চিত্ত ক'রে মরো! আজ থেকে তুমি পাখী হ'য়ে এই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে!" তারপর বিড়-বিড় ক'রে কি মন্তর পড়তে লাগলো কয়াধূ। সঙ্গে সঙ্গে রাজা মোহনকুমারের মানুষ আকার গেলো বদ্‌লে। তার হাত দু'টো গোছা গোছা পালকে ভ'রে গেলো, হাতের বদলে হোলো দু'টো ডানা। তার পা দু'খানি হয়ে গেলো কালো আর মোচড়ানো—বাঁকা বাঁকা নখে ভর্ত্তি পাখীর পা'। দেখতে দেখতে তার সুন্দর দেহ বদ্‌লে হ'য়ে গেলো পাখীর মত। আর তার মাথায় যে রাজমুকুট ছিল, তার জায়গায় গজিয়ে উঠলো একগোছা শাদা পালক। মোহনকুমার পাখী হোলো বটে, কিন্তু তার গাইবার আর কথা কইবার ক্ষমতা মায়াবিনী কেড়ে নিতে পারলে না। করুণ ডাক ছেড়ে নীলকণ্ঠরূপী রাজকুমার মায়াবিনীর ভয়ঙ্কর পুরী থেকে তক্ষুনি উড়ে চলে গেলো।

মায়াবিনী তখন আর কি করে, শঙ্খচূর্ণীকে বললে, "দেখলে তো চোখে সব। এবার রাণী-মাসীর কাছে ফিরে যাও।" ভাঙা-মনে শঙ্খচূর্ণী রাজপুরীতে ফিরলো। রাণী চীৎকার ক'রে উঠলো, "চম্পা এ-র ফল ভোগ করবে। রাজা মোহনের সু-নজরে পড়ে ও নিজের দুঃখ নিজেই ডেকে এনেছে। ওকে ফল পেতে হবে।" রাণীর গেল জেদ চড়ে, তাছাড়া সতীন মেয়ের ওপর হিংসে। রাণী বোন্‌ঝিকে ঝক্‌ঝকে দামী পোষাকে সাজালে, গায়ে পরিয়ে দিলে অগস্তি গয়না, মাথায় সাজিয়ে দিলে সোনার মুকুট, আর আঙুলে রাজা মোহনের দেওয়া সেই আংটি। সাজ-সজ্জা করিয়ে রাণী শঙ্খচূর্ণীকে দুর্গপুরীতে নিয়ে গেল—যেখানে চম্পাবতী মনের দুঃখে বন্দিনী হয়ে বসে আছে। ঘরের দরজা খোলা হোলো। চম্পা অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখলে। রাণী আর শঙ্খচূর্ণী। রাণী রাজকন্যাকে ডেকে বলতে লাগলো, "এই চম্পা, ভালো ক'রে চোখ দু'টো বার করে চেয়ে দেখ! তোর বোন্ তোর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও—তোকে একটা সুখবর দিতে এসেছে।"

রাজকন্যা তাড়াতাড়ি ব'লে ফেললে, "সুখবর, রাণীমা!"

রাণী তুষ্ট হাসি হেসে বললে, "হ্যাঁ, সুখবর। শঙ্খচূর্ণীকে রাজা মোহনকুমার এতো ভালোবাসে যে ওকে বিয়ে করে তবে ছেড়েছে। শঙ্খ—দিদি তোর এখন রাজরাণী, তোর আনন্দ হয় নি?"

চম্পাবতী এই কথা শোনামাত্রই মূর্চ্ছা গেল। রাণী খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো। এবার ছুটলো রাজার কাছে রাজকন্যার নামে মিথ্যেকথা সাজিয়ে নালিশ করতে। 'রাজা মোহন চম্পাবতীকে পছন্দ করে, আর চম্পাবতীও রাজা মোহন ছাড়া কিছু জানে না!' এ যেন রাণীর বুকে শেল বেঁধে।

রাণী রাজাকে গিয়ে বললে, "তোমার মেয়ের মন একেবারে বিগড়ে গেছে। যা' তা' আবোল তাবোল বকে যাচ্ছে। কখনো হাসে, কখনো কাঁদে। মাথার বোধ হয় ঠিক নেই। যদি মেয়ের ভালো চাও, তবে সদা-সর্ব্বদা কড়া নজর রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে। কোনোমতেই ওকে দুর্গপুরী থেকে বাইরে আসতে দেওয়া উচিত মনে হয় না। রাজা মোহন ওকে তুচ্ছ করে চলে গেছে, তাই বোধ হয় ওর এই পাগল দশা!"

রাজা একবার সন্দেহের দৃষ্টিতে রাণীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে, তারপর বললে, "রাণী, তুমি যা' ভালো বোঝো তাই করো। এ-সব ব্যাপারে আমি হাত দিতে চাই না। তোমার কোনো কাজেই আমার অমত নেই, বরং খুসি হবো।" রাণীর অমতে কাজ করা রাজার একেবারেই শক্তি নাই।

পরদিন সন্ধ্যায় চম্পাবতী তার বন্ধ ঘরের জানালাটা খুলে সেখানে গিয়ে বসলো। নিঝুম বোবা প্রকৃতির দিকে চেয়ে চেয়ে সারারাত জানালার ধারে বসে কাঁদতে লাগলো, ভোর হোলো তবুও তার কান্না থামে না। এদিকে সেই নীলকণ্ঠ পাখী রাজকন্যার দেশে উড়ে এসেছে, তার বিশ্বাস—রোজ জানালার ধারে এম্‌নি বসে বসে কাঁদে। তখনো তার প্রিয় রাজকন্যা দুর্গপুরীতে

উড়ুক্কু ব্যাঙের রথে মোহনকুমার

বন্দিনী রয়েছে, এই ধারণায় সেই বাড়ীর চারধারে কেবলি উড়ে বেড়ায়। পাছে তাকে দেখে চিনতে পারে শঙ্খচূর্ণী, এই ভয়ে সে শুধু রাত্রিতে সেখানে আসে, রাজকন্যার খোঁজ করে। দেখা পায় না। সেদিন পূর্ণিমা রাত্রি। জ্যোৎস্নার আলোয় নীলকণ্ঠ দেখতে পেলে কে এক কন্যা দুর্গপুরীর জানালায় বসে কাঁদছে। ভরসা করে তার কাছে সে উড়ে গেল। কন্যাকে চিনতে তার আর দেরী হোলো না। যাকে এতোদিন সে খুঁজেছে, এই তো সেই কন্যা!

নীলকণ্ঠ বলে উঠলো, "রূপসী চম্পাবতী, তোমার দুঃখকষ্ট চিরদিনের নয়। যারা মিথ্যে মিথ্যে তোমাকে এত কষ্ট দিচ্ছে, তারা এর প্রতিফল পাবে।"

রাজকন্যা চারদিকে চেয়ে দেখে ভয়ে ভয়ে শুধুলে, "কে আমাকে সান্ত্বনার কথা শোনাচ্ছো? কে এমন দরদী?"

"এক অসুখী রাজা—যে তোমাকেই শুধু ভালোবাসে।" এই কথাগুলো শেষ ক'রেই নীলকণ্ঠ জানালার ওপর উড়ে এসে ব'সে পড়লো। প্রথমে চম্পাবতী পাখীকে মানুষের মত কথা বলতে শুনে ভয় পেয়ে গেলো। কিন্তু সে ভয় অল্পক্ষণের। তখুনি রাজকন্যা পাখীটির গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলো।

রাজকন্যা জিজ্ঞেস করলে, "তুমি কে গো, মোহন পাখী।"

রাজা মোহনকুমার উত্তর দিলে, "তুমি আমায় নাম ধ'রে ডাকচো, তবু ছল্ করচো—আমাকে চিন্‌তে পারোনি ব'লে।

আমাকে যাদু করে পাখী বানিয়ে দিয়েছে এক মায়াবিনী। শুধু তোমায় ভালোবাসি, এই আমার দোষ। তোমার জন্যে আমি সব সইতে পারি।"

চম্পাবতী আশ্চর্য্য হয়ে বলে উঠলে—"তুমিই রাজা মোহন-কুমার ?"

নীলকণ্ঠ ঠোঁট নেড়ে বললে—"আমিই সেই মোহনকুমার, কন্যে। তোমাকে বিয়ে করবো এই ছিল আমার পণ, তাইতো আমাকে এই শাস্তি মাথায় পেতে নিতে হয়েছে। তবু আমার কোনো দুঃখ নেই। এদিন যাবে—

চম্পাবতী ব'লে উঠলো, "আর আমাকে ভুল বোঝাতে এসো না, কুমার। আমাকে মিথ্যে বলে আর লাভ কি! জানি—তুমি শঙ্খচূর্ণীকে বিয়ে করেছ। সে রাণীর সাজে, মাথায় সোণার মুকুট ধ'রে, আঙুলে তোমার আংটি পরে—আমাকে ঠাট্টা করতে এসেছিল।"

নীলকণ্ঠ তার কথায় বাধা দিয়ে বললে, "সমস্ত মিথ্যে, সব সাজানো।" তখন সে রাজকন্যার কাছে যা যা ঘটেছিল—একে একে ঘটনাগুলো ব'লে গেল। রাজার স্থির ও সত্য অনুরাগ রাজকন্যাকে এতোদূর সুখী ক'রে তুললে যে তা'র কারাবাসের সকল যন্ত্রণা সে ভুলে গেল। কথা কইতে কইতে ভোরের আলো ফুটে উঠলো। নীলকণ্ঠ বললে—"চম্পাবতী, আর তো থাকতে পারি না। এবারে বিদায় নিতে হ'বে।"

চম্পাবতী বললে, "কিন্তু কথা দাও, প্রতিদিন রাতে তুমি আমার কাছে উড়ে এসে আমরা দু'জনে মনের আনন্দে গল্প ক'রে সারা রাত কাটিয়ে দোবো।"

নীলকণ্ঠ বললে, "তুমিও কথা দাও, এমনি রোজ সন্ধ্যাবেলায় জানালায় এসে বসবে। আমি তোমার দেখা পাবো।"

দুজনে পরস্পর প্রতিজ্ঞা করে তখনকার মত ছাড়াছাড়ি হোলো।

তার পরদিন নীলকণ্ঠ তার নিজের রাজ্যে উড়ে গেল। সে তার রাজপ্রাসাদে ঢুকে ঠোঁটে করে একজোড়া চমৎকার কাজকরা পান্নার কঙ্কন নিয়ে ফিরে এলো রাজকন্যার কাছে। এই ভাবে রোজ সন্ধ্যায় রাজকন্যার জন্যে সে নানা রকম উপহার নিয়ে আসে, কখনো আনে মন-ভোলানো রতন-মাণিক, কখনো বা দামী দামী অন্য সব উপহার। এই সকল জমকালো পোষাক, অলঙ্কার রেখে দেবার মত রাজকন্যার যায়গা ছিল না। তার ছেড়া কাঁথার নীচে খেজুর-পাতার একখানি পাটি পাতা ছিল, শেষে আর উপায় না দেখে সমস্ত জিনিস তার তলায় রাজকন্যা লুকিয়ে রেখে দিলে। দিনের বেলায় নীলকণ্ঠ বনের মধ্যে একটা গাছের কোটরে লুকিয়ে থাকতো। গাছের ফল খেয়েই সে বেঁচে রইলো। এক এক সময় নীলকণ্ঠ এমন মধুর কল-গান করতো যে, সেই বনের পথে যারা হাঁটতো তাদের ধারণা হোলো, "নিশ্চয়ই এখানে কোনো ভূত বা মায়াপরী থাকে।" রটে গেল, ঐ বনটি ভূত-প্রেতের বাসা। এই ঘটনার ফলে সেই বনের ত্রিসীমানায় কেউ যেতে সাহস করতো না। নীলকণ্ঠের হোলো সুবিধে। সে নিশ্চিন্ত মনে সেখানে বাস করতে লাগলো। দু'টি বৎসর রাজকন্যা ও নীলকণ্ঠের মিলন নির্ব্বিবাদে চললো। রাজকন্যার একলা জীবনের একমাত্র সঙ্গী হোলো সেই পাখী। দিনের আলো নিভে যেতে না যেতেই নীলকণ্ঠ তার রাজকন্যার কাছে এসে হাজির হয়। সারা রাত তারা হাসে, গান গায়, কত কথা কয়, তবু তাদের তৃপ্তি হয় না। যেন কত কথা আছে—সব যেন বলা হয়নি। রাজকন্যা রোজ সন্ধ্যায় তার দরদীকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে সাজ-সজ্জা করে। রোজ যেন তাদের মিলন-বাসর বসে।

এরি মধ্যে দুষ্টা রাণী প্রাণপণ চেষ্টা করেও শঙ্খচূর্ণীর বিয়ে দিতে পারলে না। তার কুশ্রী চেহারা যে দেখলে সেই মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। সকল রাজকুমারই একবাক্যে বললে, "যদি চম্পাবতী রাজকন্যাকে পেতুম, তাহলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকতো না।"

শঙ্খচূর্ণী আর তার রাণী মাসী রাগের চোটে দিশেহারা হয়ে গেল। সতীনের মেয়ের এত সুখ্যাৎ! তারা রাজকন্যাকে বিনাদোষে আরও কঠিন শাস্তি দেবে—ঠিক করলে। এক দিন তারা এই সম্বন্ধে রাত দুপুর পর্য্যন্ত যুক্তি আঁটলে। তারপর হঠাৎ তারা দুর্গপুরীতে গিয়ে উপস্থিত। চম্পাবতী মনের মত সেদিন বেশ-ভূষা করেছে, গায়ে পরেছে মণি-রত্ন-বসানো গয়না, আর প্রতিদিনকার মত সেদিনও জানালার ধারে নীলকণ্ঠের সঙ্গে বসে বসে কথা কইচে। তারা দুজনে মিলে যখন গান ধরেছে, ঠিক সেই সময়ে রাণী রাগে গরগর করতে করতে সেই ঘরের মধ্যে দৌড়ে ঢুকে পড়লো। চম্পাবতী চোখের পলক না ফেলতেই জানালাটা খুলে দিয়ে নীলকণ্ঠকে চুপি চুপি বললে, "পালাও, পালাও।" কিন্তু নীলকণ্ঠ রাজকন্যাকে ফেলে রেখে উড়ে যেতে চাইলো না। তার দুঃখ হ'তে লাগলো—তার এমন সাধ্য নেই যে রাজকন্যাকে রক্ষা করে।

রাণী ও শঙ্খচূর্ণী চম্পাবতীর জাঁকালো গয়না, আর তার চোখ ঝলসানো রূপ দেখে চমকে গেলো।

তারা জানতে চাইলে, কোথা থেকে এই সমস্ত গয়না এলো ?

চম্পাবতী উত্তর দিলে, আমি এ-সব এখানেই পেয়েছি। এই শুধু আমি জানি।

তোর বাপ আর তার রাজ্যকে ছারেখারে দেবার মতলবে কোনো শত্রু রাজার সঙ্গে সড় করেচিস, নয় ? তাই এই ঘুস পেয়েছিস ?

রাজকন্যা এই শুনে ঘৃণার সুরে মরীয়া হয়ে বললে, "তা সম্ভব হতে পারে। অনেকেই তো জানে আমি এখানে দু'বছর বন্দী রয়েছি, আর তোমরা হয়েচো আমার শাস্তি দেবার মালিক।

তার সৎমা গলা সপ্তমে চড়িয়ে বলে উঠলো, "কার মন ভোলাবার জন্যে তুই এতো ঘটা করে সেজেছিস, মণি-রত্নে গা মুড়ে ফেলেছিস যে ? বলি—আস্পর্দ্ধা তো কম নয়। সবখানেই যে বাড়াবাড়ি দেখতে পাচ্ছি।

রাজকন্যা নির্ভয়ে জবাব দিলে, 'তা দেখবে বৈ কি! ভগবান চোখ দিয়েছেন, দেখবে না! আমি এই ঘরে একলা পড়ে থাকি। না আছে কাজ, না আছে কিছু! কি করি! সময় তো কাটাতে হবে! তাই সারাদিন আমার দুর্ভাগ্যের জন্যে কেঁদে কেটে,

হাহুতাশে না কাটিয়ে, খানিকটা সময় নিজেকে সাজিয়ে শান্তি পাই! সে কি খুব আশ্চর্য্য মনে করো? এ-সব আমার থকতে নেই?"

রাজকন্যার এই সোজা উত্তরে রাণীর একেবারেই মন উঠলো না। সে ঘরটা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজতে আরম্ভ করলে। বেশীক্ষণ খুঁজতে হোলোনা, বিছানার তলায় নানা রকমের দামী দামী অনেক মণি-পাথর রয়েছে দেখতে পেলে। সেই মুহূর্ত্তে নীলকণ্ঠ ডেকে উঠলো ডাক দিয়ে, চম্পাবতী, তোমার শত্রুর দিকে নজর দাও! এই শব্দে রাণী অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। কারণ পাখীটা তার চোখে পড়েনি। তার বিশ্বাস হোলো—কোনো অপদেবতা এর সহায় হয়েছে। সতীনের মেয়েকে অত্যাচার করতে আর তার সাহসে কুলোলো না। কিন্তু এর মধ্যে কি রহস্য আছে, তাই বার করবার জন্যে রাণী একটা দাসীকে পাঠিয়ে দিলে দুর্গ-পুরীতে।—তার কাজ—দিন-রাত্রি রাজকন্যার ওপর লক্ষ্য রাখবে, আর ঘুমোবে তারই ঘরে। অভাগী চম্পাবতী ভরসা করে আর জানালা খুললে না। বাইরে দেখলে তার প্রাণের নীলকণ্ঠ জানালার ওপর অস্থির হয়ে ডানা ঝাপটাচ্চে। তবুও না। প্রতি রাতে নীলকণ্ঠ আসে ফিরে যায়। রাজকন্যার চোখ ফেটে জল আসে। এক মাস এমনি করে কাটলো। দিনে রাতে নজর রাখতে রাখতে শেষে একদিন ক্লান্ত হয়ে দাসী খুব ঘুমিয়ে পড়লো। তখন চম্পাবতী জানালা খুলে, পরিষ্কার গলায় গাইলে—

মোহন পাখী, মোহন পাখী,
তোমার আশায় ব'সে থাকি,—
এসো এসো সুনীল পাখা দুলিয়ে।
আসবে তুমি, বসবে কাছে,
তাইতো আমার পরাণ নাচে,
দেবে আমার সকল ব্যথা ভুলিয়ে।

এই ডাক যেমনি শোনা অমনি নীলকণ্ঠ উড়ে এসে বসলো বাতায়নে, আবার দুজনাই দুজনকে কাছে পেয়ে আহ্লাদে নাচতে লাগলো। তারা ভোর পর্য্যন্ত কথায়-গানে-গল্পে কাটিয়ে দিলে, পরের দিন রাত্রে তাদের আবার দেখা হোলো। কিন্তু তিন দিনের দিন মাঝ-রাতে সেই চর দাসীটা হঠাৎ জেগে উঠলো। চোখ চেয়ে দেখলে রাজকন্যা একটি ফুটফুটে নীল পাখীর সঙ্গে খোলা জানালার ধারে বসে আছে। পাখীটা তার কাণে কাণে চুপি চুপি কথা বলচে, আর তার ঠোঁট দিয়ে রাজকন্যাকে আদর করচে। দাসী তো অবাক। সে চুপটি করে শুয়ে রইলো, যেন কত ঘুমোচ্চে। কিন্তু সকাল হতেই দাসী ছুটলো রাণীর কাছে খবর দিতে। যা যা দেখে সে দেখেছে সব রাণীকে জানালে। রাণী আর শঙ্খচূর্ণী বুঝতে পারলে—নীল পাখী আর কেউ নয়, নিশ্চয় রাজা মোহন কুমার। তারা এই ভেবে সেই দাসীকে আবার পাঠিয়ে দিলে দুর্গপুরীতে রাজকন্যার ঘরে। আর এদিকে তারা এক নিষ্ঠুর কাণ্ড করবার ফন্দি আঁটলে।

পরের দিন সন্ধ্যা উত্তরে যাবার পরে—দুঃখিনী রাজকন্যা আবার জানালা খুলে ডাক দিলে নীলকণ্ঠকে গান গেয়ে।

দিনের পরে দিন, রাতের পরে রাতি,—
তোমার দেখা পাবো বলে—রই যে মোহন পাখী!
এসো এসো বন্ধু আমার
এসোরে নীল পাখী!
কণ্ঠে মধুর শিস্ তোলো আর—
গাওরে থাকি থাকি।
হাওয়ার দোলায় দুলে দুলে এসো প্রাণের সাথী!
আর কতখন বইবো একা মিলন-বাসর পাতি।

কিন্তু সারা রাত রাজকন্যা গান গায় আর ডাকে—এসো আমার নীলকণ্ঠ, এসো, এসো! আমি একলা বসে আছি তোমার জন্যে! দেখা দাও—দেখা দাও। কোনো সাড়া এলো না! কোথায় নীলকণ্ঠ। তার কোনো বিপদ হয়নি তো। এই ভাবনা আসতেই রাজকন্যার বুকটা ধড়াস ক'রে উঠলো।
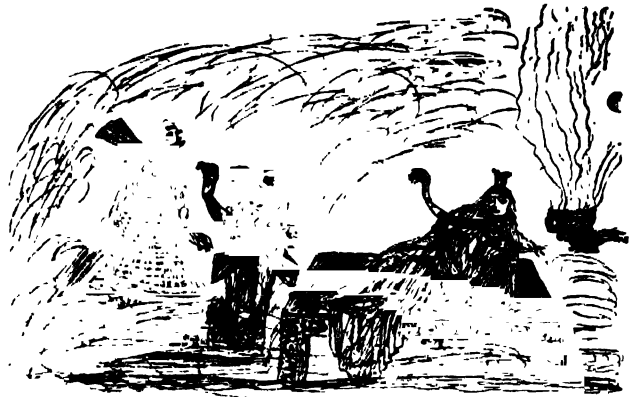
কয়াধ মোহনকুমারকে বললে, শঙ্খচূর্ণীকে বিয়ে করতে হবে-

সত্যই নীলকণ্ঠ পড়লো বিষম ফাঁদে। দুষ্টা রাণী চর পাঠিয়ে নীলকণ্ঠের বাসার খোঁজ পেলে। তারপর রাণী নিজে সেখানে গিয়ে গাছের কোটরের মধ্যে ধারালো ক্ষুর বেঁধে দিয়ে এলো। নীলকণ্ঠ এ-সব না জেনে শুনেই বাসায় যেই ঢুকতে যাবে—অমনি তার ডানা আর পা কুচ্ কুচ্ করে কেটে গেল। নীলকণ্ঠ যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করতে করতে মাটিতে পড়ে গেলো, আর তার নড়বার শক্তি রইলো না। রাজকন্যা এই সর্ব্বনাশের কথা কিছুই জানতে পারলে না। তার মন কিন্তু খুব খারাপ হয়ে উঠলো।

ভাগ্য যেখানে সহায়, বিপদ এলেও—সে বিপদ এড়িয়ে যেতে কতক্ষণ। এমনি বরাতজোর, ঠিক সেই বনে রাজা মোহনের পরম বন্ধু সেই মায়াবী যাদুকর এসে হাজির। যেদিন মায়াবী বন্ধুর কাছে খালি রথ নিয়ে উড়ুক্কু মায়া-ঘোড়া গুলো ফিরে এলো, সেই দিন থেকেই তার রাজা-বন্ধুর কুশলের জন্যে ভাবনা হয়েছে। তাই সারা পৃথিবীটা বন্ধুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে। তবুও তার খোঁজ পায় নি। শেষকালে যাদুকর নখদর্পণে দেখতে পেলে---একটা ঘন বন, তার মাঝে একটা বড় গাছ, সেইখানে একটা নীল

পাখী। যাদুকরের মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। একি! বন্ধু মোহনকুমারের ছবি তো চোখে পড়লো না! এর মধ্যে নিশ্চয় কোনো রহস্য আছে। যাই হোক, যাদুকর সাত-পাঁচ আর না ভেবে—সেই বনে পৌঁছে তার শিঙায় দিলে খুব জোরে তিনবার ফুঁ। বন কেঁপে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়লো—রাজা মোহনকুমার, কোথায় তুমি বন্ধু? রাজা মোহন তার পরম বন্ধুর গলা শুনেই চিনতে পারলো। দুর্ব্বল কণ্ঠে সাড়া দিলে, বন্ধু গাছের তলায় এগিয়ে এসো। আমাকে বাঁচাও। আমার আর মানুষের আকার নেই। আমি এখন নীলকণ্ঠ পাখী।

যাদুকর তথুনি সন্ধান ক'রে সেই দুর্ভাগা পাখীর দেখা পেলে। তাকে যত্ন করে কোলে তুলে নিয়ে তার সমস্ত ক্ষত সারিয়ে দিলে—নানান্ করণ-কারণ করে। একটু সুস্থ হবার পর নীলকণ্ঠরূপী রাজা মোহন সমস্ত ঘটনা যাদুকর বন্ধুকে শোনালে। রাজা আর যাদুকর—দুজনেরই ধারণা হোলো—যে চম্পাবতী নিশ্চয় বিশ্বাস ভেঙেচে, রাজা মোহনের কাছে ভালবাসার ভান দেখিয়ে। একথা ভাবতেও তাদের দুঃখ হোলো। রাজা মোহন বন্ধুকে বললে, "এখন তুমি ছাড়া আমার অন্য গতি নেই। আমাকে বাকি দশবছর একটা খাঁচায় পূরে নিরাপদে রাখো।"

মায়াবী বল্‌লে, "কিন্তু মুস্কিল আছে অনেক। দশ দশটা বছর তুমি যদি তোমার রাজ্যে না ফেরো, তা হলে সকলেরই ধারণা হবে—তুমি মরে গেছ। শত্রুরা সেই সুযোগে তোমার রাজ্য অধিকার করে নেবে।

রাজা এই কথা শুনে বন্ধুর মত জিজ্ঞেস্ করলে, "আচ্ছা,আমি কি আমার রাজ্যে ফিরে গিয়ে আগের মত রাজ্য শাসন করতে পারি না?

যাদুকরের দুঃখ হোলো বন্ধুর কথা শুনে। উত্তর দিলে, "না বন্ধু! ও ভাবে রাজ্য শাসন করা হয় তো সম্ভব হবে না। পাখী হবে রাজা, তোমার প্রজারা কেন মানবে? এখন রাজ্য যে-রকম করেই হোক্ বাঁচাতে হবে। আমি এই সমস্যার একটা সহজ উপায় বার করবার চেষ্টা করছি।

এদিকে রাজকন্যা চম্পাবতী তার একমাত্র ভালোবাসার ধন তার দরদী সঙ্গীর দেখা না পেয়ে কেঁদে কেঁদে সারা হোলো। ভাবনায়-চিন্তায় ও দুঃখে রাজকন্যা পড়লো ভীষণ অসুখে। তার মুখে আর কোনো কথা নেই, দিনরাত শুধু সে গায়—

নীলকণ্ঠ নীলকণ্ঠ।
দুখের আমার নেই অন্ত।
তোমার দেখা চাই বন্ধু!
নিরালা হায় ওই পন্থ।
পহর বসে বসে গুনচি!
বিনি সুতোয় হার বুন্‌চি!
স্বপ্নে তোমার গান শুন্‌চি!
এসো এসো মধুমন্ত!

কিন্তু তার গান, তার কথা—বাতাসে মিলিয়ে গেল।

এইরকম করে দিন যায়। কিছুদিন পরে ভাগ্যদেবী রাজকন্যার 'পরে মুখ তুলে চাইলেন। সে-দেশের রাজার হোলো কঠিন অসুখ। তার বাপের অসুখের কথা সে জানতেই পারলো না, রাজা রোগে ভুগে মারা গেল। নতুন রাণী আর তার বোনঝি শঙ্খচূর্ণী রাজ্যের সমস্ত লোকের চক্ষুশূল ছিল। রাজ্যের প্রজারা রাজার মৃত্যুর পরেই রাজপুরীতে এসে গণ্ডগোল বাধিয়ে দিলে। সকলে চেঁচাতে লাগলো, "কোথায় আমাদের রাজকন্যা চম্পাবতী? তাকে আমরা রাণী করবো।" রাণী এইসব দেখে শুনে প্রাণের ভয়ে পালাবার চেষ্টা করলে। আর পালাতে হোলো না। প্রজারা রাণীকে ধরে তার নাক-চুল কেটে মাথায় ঘোল ঢেলে রাজ্যের বাইরে দূর করে দিয়ে এলো। কিন্তু শঙ্খচূর্ণী আগে হতেই একটা সুড়ঙ্গ রাস্তার ভেতর দিয়ে কোনো রকমে পালিয়ে বাঁচলো তার ধর্ম্ম-মা কয়াধূ মায়াবিনীর পুরীতে পৌঁছে।

রাজকন্যা চম্পাবতীকে দুর্গপুরী থেকে নিয়ে আসা হোলো রাজপ্রাসাদে। তাকে মন্ত্রীরা মিলে সিংহাসনে বসিয়ে মাথায় মুকুট পরিয়ে দিলে। চম্পাবতী হোলো সেই রাজ্যের রাণী।

রাজকন্যার শরীর কিন্তু দুঃখে কষ্টে ভেঙে গিয়েছিল। রাণী চম্পাবতীর শরীর খারাপ, সকলেরই চিন্তা। রাজবৈদ্য এলো, স্বাস্থ্য-সঞ্জীবনী সুধা খেতে দিলে। শত দাস-দাসী রাণী চম্পার স্বাস্থ্য ফেরাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলো। খুব যত্নে ও আদরে চম্পাবতীর স্বাস্থ্য ভালো হোলো। কিন্তু তার হাজার সুখের মধ্যে জেগে রইলো একটি চিন্তা—তার সাধের নীলকণ্ঠের দেখা আবার কবে মিলবে। কিছুদিন পরে রাণী চম্পাবতী তার হয়ে রাজ্য চালাবার ভার বুদ্ধিমান মন্ত্রীদের হাতে তুলে দিলে। তারপর একদা রাত্রে একলা বেরিয়ে পড়লো। সঙ্গে নিলে কেবল তার নিজের কয়েকটি অলঙ্কার। কোথায় যাবে চম্পাবতী—এ-কথা কোনো লোককে সে জানালো না।

এরি মধ্যে রাজা মোহনকুমারের বন্ধু যাদুকর মায়াবী গেল যাদুকরী কয়াধূর পুরীতে। সেখানে গিয়ে বন্ধুর মুক্তি চাইলে। কয়াধূ জানতো অনেক যাদুবিদ্যা, সে ছিল ডাকিনী, তাই তার শক্তির কাছে যাদুকর ছিল ছোট। যাদুকর কয়াধূকে কত লাভের আশা দিলে, কত লোভ দেখালে, কিন্তু কয়াধূ কিছুতেই রাজা মোহনকে মুক্তি দিতে রাজী হোলো না। মোহনকুমার যদি আমার ধর্ম্মমেয়ে শঙ্খচূর্ণীকে বিয়ে করে, তা হলে তাকে মুক্তি দিতে পারি। কয়াধূর এই সর্ত্ত শুনে যাদুকর শঙ্খচূর্ণীকে একবার দেখতে চাইলে। তার কিম্ভুতকিমাকার রূপ চোখে পড়তেই যাদুকরের পদ্মহস্ত চোখ দুটো টেরা হয়ে গেল, তা হলে কি হয়, নীলকণ্ঠ অনেক কষ্ট সয়েছে, সামনে তার ঘোর বিপদ—রাজ্য তার যায় যায়, তার জ্ঞাতি শত্রু সিংহাসন অধিকার করবার মতলব করছে। এই সব ভেবে চিন্তে যাদুকর কয়াধূকে অনেক অনুনয় বিনয় করতে লাগলো। শেষকালে স্থির হোলো, রাজা মোহন একবছরের জন্যে আবার মানুষের মূর্ত্তি ফিরে পাবে, আর ততোকাল শঙ্খচূর্ণী বাস করবে তার রাজ-প্রাসাদে। এই সময়ের মধ্যে রাজা মোহনের চেষ্টা হবে—তার বিয়ের মত পাল্টাবার জন্যে। একবছর

পরেও যদি শঙ্খচূর্ণীকে বিয়ে করতে তার মন না চায়, তা হলে সে আবার পাখীর রূপ পাবে। যাদুকর বন্ধুর অনুরোধে নীলকণ্ঠ ইচ্ছে না থাকলেও মত দিলে।

রাজা মোহনকুমার আবার মানুষের আকার পেয়ে আপন রাজ্যে ফিরে গেলো। কিন্তু তার রাজকাজের ভাবনার চেয়ে আসল ভাবনা হোলো, কেমন করে সে শঙ্খচূর্ণীর সঙ্গে বিয়ের দায় এড়িয়ে যেতে পারে।

এদিকে রাণী চম্পাবতী এক গরীব মালির মেয়ে সেজে যাত্রা শুরু করেছে। মাথায় তার এলো চুলগুলো চূড়ো করে বাঁধা, সেই চূড়োতে লাল করবীর মালা জড়ানো! কাঁখে একটি ঝুড়ি। পথ চলেছে একলা। কোথায় যাবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কখনো চলে, কখনো বসে, আবার চলতে থাকে। কত দেশ, কত সমুদ্র সে পেরিয়ে চললো তার প্রাণের বন্ধু প্রিয় রাজার খোঁজে।

একদিন চম্পাবতী তার পা দুখানি একটি ছোট্ট নদীর জলে ডুবিয়ে দিয়ে বসে আছে—সেই সময়ে আফিম ফুলের মত লালচে রঙের এক বুড়ি লাঠিতে ভর দিয়ে তার কাছে এগিয়ে এসে বল্লে, "হ্যাগা সুন্দরী মেয়ে। তুমি এখানে একলা বসে কি করছো?

রাণী চম্পাবতী উত্তর দিলে, "দয়াময়ী, আমি তো একলা নই। শত দুঃখ আমার সঙ্গী।" তার দুচোখ জলে ভরে উঠলো।

বুড়ি তার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বলতে লাগলো, "আমাকে বলো, কি তোমার দুঃখ। জানতে পারলে হয়তো আমি তোমার দুঃখ কিছু কমিয়ে দিতে পারি।"

চম্পাবতী তখুনি বুড়ির কথা মাথায় পেতে নিলে। তার সমস্ত দুঃখের কাহিনী শোনালো বুড়িকে। বুড়ি এক মনে সব শুনে গেলো। তারপর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই বুড়ির বদলে জেগে উঠলো এক মোহিনী সিদ্ধা যোগিণী। চম্পাবতী আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলো। যোগিণী তাকে কইলে, "রূপসী চম্পাবতী, আশ্চর্য্যের কিছু নেই। আমার দিদি কয়াধুর নাম শুনেচো তো? সে-ও সিদ্ধদের মেয়ে, আমিও তাই। তবে সে মায়াবিদ্যা শিখে হয়েছে ডাকিনী কয়াধু, আর আমি ওই বিদ্যা জেনে হয়েছি যোগিনী বাতাসী। তোমার মনের কথা আমি জানতে পেরেছি। তুমি যে রাজার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্চো, তার আর পাখীর রূপ নেই। আমার বোন কয়াধু তাকে আবার মানুষ করে দিয়েছে। এখন রাজা আছে নিজের রাজ্যে। আশা ছেড়ো না। তোমার দুঃখ যাবে, সুখ পাবে। এই নাও, এই মায়া-প্রদীপ। প্রদীপে যে মায়া-কাজল আছে, চোখে পরো, পথের বাধা কেটে যাবে। আর জেনে রাখো, চারবার মাত্র এই প্রদীপ জ্বলবে। যখনই সাহায্যের খুব দরকার হবে—এই প্রদীপ জ্বেলো, ফল পাবে।

এই ব'লে যোগিনী বাতাসী অদৃশ্য হয়ে গেল। চম্পাবতী এবার নতুন আশায় বুক বাঁধলে। মায়া-প্রদীপ থেকে কাজল নিয়ে পরলে, চোখের সামনে দেখলে, সোজা সরল পথ খোলা রয়েছে। চল্‌লো সে রাজা মোহনকুমারের দেশে। দশ দিন দশ রাত্রি রাস্তা হেঁটে শেষকালে সে পৌঁছুলো এক উঁচু পাহাড়ের নীচে। পাহাড়টা গজদন্তের তৈরী, একেবারে খাড়া হয়ে আকাশে উঠেছে। কেউ পায়ে হেঁটে এই গজদন্ত পাহাড়ে উঠতে পারে না। চম্পাবতী বারবার চেষ্টা করলে, কিন্তু বৃথা তার চেষ্টা। মহা ভাবনায় পড়লো। হঠাৎ তার মনে পড়লো, যোগিনীর দান সেই মায়া-প্রদীপের কথা। তখুনি প্রদীপটি জ্বালিয়ে দিলে। মুহূর্ত্ত পরেই পাহাড়ের দিকে চেয়ে দেখে, তলা থেকে চূড়ো পর্য্যন্ত পাহাড়ের গায়ে একটা সিঁড়ি, আর পাহাড়-চূড়ো থেকে ঝুলছে একটা মোটা রেশমের দড়ি। চম্পাবতী তখন তরতর ক'রে পাহাড়ে উঠে গেল। চূড়ো পার হয়ে অপর দিকে নেমে যা' দেখলে, তাতে তার মুখ শুকিয়ে গেলো। সামনে মস্ত এক কাচ-মণির উপত্যকা। এর ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া ভীষণ বিপদ। কি করবে, ভাবছে। এমন সময় সে মায়া-প্রদীপটি আবার জ্বালিয়ে দিলে। অমনি বাতাস কেটে সোঁ সোঁ করে দু'টো পায়রা উড়ে এলো তার কাছে। তারা ছোট্ট একটা ডুলি-রথে যোতা রয়েছে। চম্পাবতী খুসি হয়ে সেই ডুলিতে গিয়ে বসলো। পায়রা

রাণী চম্পাবতী যায় মোহনকুমারের দেশে

দু'টি উড়লো আকাশে চম্পাবতীকে নিয়ে। কাচ-মণির উপত্যকার ওপারে তারা পৌঁছুলো। রাণী তখন তাদের ডেকে বললে,—

"পায়রা ভাই, পায়রা ভাই,—শোনো বলি আমি,
একটি দেশের তরে আমার মন কাঁদে দিন-যামী।
তোমরা দু'জন বন্ধু হয়ে নিয়ে চলো মোরে,
যেথায় রাজা মোহনকুমার বসে সভা করে।"

দুই পায়রা উড়ে চললো বাতাসে সাঁতার কেটে দিনরাত। শেষকালে তারা পৌঁছুলো মোহন নগরের দরজায়। রাণী চম্পাবতী পায়রা দু'টিকে আদর করে চুমো খেয়ে বললে, "তোমরা এবার যাও, ছোট-বন্ধু উড়ে যাও।"

মোহন নগরে ঢোকবার সময় চম্পাবতীর বুক কেঁপে উঠলো। পাছে তাকে চিনতে পারে এই ভয়ে সে মাখলে ফুলের রেণু।

এবার রাজপথ ধরে চম্পাবতী চললো এগিয়ে। রাস্তায় যেতে যেতে দেখলে, একদল মেয়ে রঙীন্ সাজ করে মাথায় নিয়ে ফুলের ডালা, ফলের ডালা, মণির থালা, গয়নার পেটী, জলের ঝারি, মুখে শাঁখ—চলেছে সারি বেঁধে। চম্পাবতী তাদের জিজ্ঞেস্ করলে, "কোথায় যাচ্চো গো তোমরা? আজ কি এখানে উৎসব?" দলের একটি মেয়ে উত্তর দিলে, "হ্যাঁ গো, তুমি কিছু জানো না? নতুন এসেছ বুঝি? কাল যে আমাদের রাজার সঙ্গে রাজকুমারী

শঙ্খচূর্ণীর বিয়ে গো! আমরা মন্দিরে যাচ্ছি। সেখানে কাল সকালে দেবতা সাক্ষী করে বিয়ে হবে।" চম্পাবতী আবার শুধুলে, "রাজার দেখা কোথায় গেলে পাবে?" বলে দেবে? সেই মেয়েটি বললে, "এসো না আমাদের সঙ্গে। কালকে সকাল বেলায় মন্দিরেই রাজার দেখা পাবে।" পথ চলতে চলতে চম্পাবতী জানতে চাইলে, "আচ্ছা মেয়ে, আমি তো শুনেছি, রাজকুমারী দেখতে ভালো নয়। রাজা তাকে তবুও বিয়ে করছেন? কেন বলতে পারো?" মেয়েটি হেসে বললে, "অতো-শত জানি না, বাপু! তবে আমিও শুনিচি—দায়ে প'ড়ে রাজা এই বিয়েতে অনেকদিন পরে মত দিয়েছেন।"

দুঃখিনী চম্পাবতী রাত কাটিয়ে দিলে মন্দিরের একটি কোণে শুয়ে থেকে। ভোরের প্রথম পাখী ডাকতে না ডাকতেই, চম্পাবতী উঠে স্নান সেরে এলো। তারপর মন্দিরের দেবতার কাছে নিজের প্রার্থনা জানালে। তখনো কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি। চম্পাবতী তাড়াতাড়ি আড়ালে গিয়ে সাজলো মালিনী মেয়ের সাজে, চোখে এঁকে দিলে মায়া-কাজল, আর মুখে ঘন করে মাখলো পাঁচ ফুলেরই লাল-নীল-হলদে-সাদা-সবুজ রঙের রেণু। একটু পরেই সকলে জেগে উঠলো। নাটমন্দিরে একটা বেদীর ওপর দু'টো সোনার সিংহাসন পাতা হোলো, মাথার ওপর মনি-মাণিক্যের ঝালর দেওয়া চাঁদোয়া। একটি সিংহাসনে বসবে রাজা মোহনকুমার, আর একটিতে শঙ্খচূর্ণী। শঙ্খচূর্ণীকে তখন সকলেই রাণী বলে মানে। রাজা ও রাণী একশো আট ঘোড়ার রথে চড়ে মন্দিরে এসে পৌঁছুলো। বেজে উঠলো ভেরী-তূরী। রাজা-রাণী এসে সিংহাসনে বসলো। রাজাকে দেখতে যতো সুন্দর, শঙ্খ-চূর্ণীকে দেখতে ততো কদাকার। চম্পাবতী রাজপুরীর মেয়েদের সঙ্গে মিলে-মিশে একটা শাদা চামর হাতে নিয়ে শঙ্খচূর্ণীর সিংহাসনের ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। শঙ্খচূর্ণী তাকে দেখবামাত্রই ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো, "কে এই বহুরূপী বুনো মেয়েটা? ওর এতোবড় সাহস, আমার সোনার সিংহাসনের পাশে আসে?"

চম্পাবতী বললে, "আমি মালিনী-মেয়ে। অনেক দূর থেকে এসেছি, তোমার কাছে কতকগুলো সেরা-সেরা মণিরত্ন বেচবো বলে। এ-সব রতন দুর্ল্লভ।" এই বলে চম্পাবতী তার ঝুড়িটি থেকে বার করলে এক জোড়া পান্নার কঙ্কন। এই কঙ্কন দুটী রাজা মোহন একদিন চম্পাবতীকে দিয়েছিল। কঙ্কন-জোড়াটি দেখে শঙ্খচূর্ণীর নেবার জন্যে লোভ হোলো। রাজাকে দেখিয়ে বললে, "দেখো, কী চমৎকার কঙ্কন! এ আমার চাই।"

রাজা পান্নার কঙ্কন দু'টি দেখে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল, কি বলবে ঠিক করতে পারলে না, তারপরে একটু ভেবে বললে, "দেখো রাণী, আমার বিশ্বাস, এ কঙ্কন দু'টির দর আমার রাজ্যের সমান। আমার ধারণা—এই রকম কঙ্কন জগতে মাত্র এক জোড়াই আছে!"

শঙ্খচূর্ণী কি আর লোভ সামলাতে পারে। সে চম্পাবতীর কাছে গিয়ে কঙ্কনের দাম জিজ্ঞেস করলে।

উত্তর হোলো, "তুমি আমাকে যতই ধন দাও—ঠাকরুণ, আমি তার বদলে এ কঙ্কন বেচতে পারবো না। কিন্তু রাজপুরীতে যে আকাশ-কন্যার প্রতিধ্বনি-ঘর আছে, সেই ঘরে যদি আমাকে একরাত্রি থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে পারো, তা হলে আমি তোমাকে আমার এই পান্নার বালা জোড়াটি দোবো।"

"এক্ষুনি—এক্ষুনি! এ তো ভারী ব্যাপার! এই বলে তার মুখে আর হাসি ধরে না, তার লাঙলের ফালের মত দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়লে।

এর আগের কথা হচ্চে এই যে—রাজা মোহন যখন ছিল নীলকণ্ঠ পাখী, সেই সময়ে সে চম্পাবতীকে এই আশ্চর্য্য আকাশ-কন্যার প্রতিধ্বনি-ঘরের কথা বলে। এই ঘরে কথা কইলেই রাজা তার নিজের ঘরে বসে প্রত্যেকটি কথা শুনতে পায়। সেই কারণে চম্পাবতী প্রতিধ্বনি-ঘর চেয়ে নিলে এক রাত্রির জন্যে। সে জিজ্ঞেস করবে রাজাকে—কেন সে তাকে নিষ্ঠুরের মত ছেড়ে চলে এসেছে, কি তার দোষ? এর চেয়ে আর কি ভালো উপায় থাকতে পারে! কিন্তু অভাগী চম্পারাণীর সব চেষ্টা মিথ্যে হোলো। সারা রাত প্রতিধ্বনি-ঘরে সে কত কাঁদলে, কত মান-অভিমান, কত সাধা, কিছুই রাজার কানে গেল না। কারণ রাজা নিজের সব ব্যথা ভোলবার জন্যে একটা কড়া ঘুমোবার ওষুধ খেয়ে রাতভোর অঘোরে ঘুমিয়েছিল। কোনো ফল হোলোনা দেখে পরের দিন চম্পাবতী মহা গোলে পড়ে গেল। সে ভাবলে, "রাজা যদি আমার কথাগুলো শুনে থাকে—তা হলে আমাকে আর ভালোবাসে না। আর যদি সে কোনো কথা না শুনে থাকে, তবে কেমন করে তাকে শোনাবো আমার মনের কাহিনী?'

আবার সে চেষ্টা করবে—এই হোলো তার সঙ্কল্প। শঙ্খচূর্ণীকে ভোলাবার জন্যে তার কাছে সেই পান্নার কঙ্কণের মত আর ওরকম মণি-মাণিক্য তো নেই। তখন চম্পাবতী তিনবারের বার মায়া-প্রদীপটি জ্বালালে। এক নিমেষে চোখের পরে দেখলে একটা ছোট্ট রূপোর রথ—তাতে আটটা সবুজ রঙের ইঁদুর যোতা, সেই রথের সারথি একটা লাল মোটা বড় ইঁদুর, আর রথের পিছনে বেগুনী রঙের এক রক্ষী। রথের মধ্যে বসে চারটি ছোট ছোট নীল পুতুল, সেগুলো নেড়ে-কুঁদে নানান রকম খেলা দেখাচ্চে।

রাণী চম্পাবতী নিজেই এই এমৎকার অদ্ভুত খেলেনা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। রাজার বাগানে গিয়ে সেই খেলেনা হাতে অপেক্ষা করে রইলো—কখন আসে শঙ্খচূর্ণী বেড়াতে। শঙ্খচূর্ণী আসবামাত্রই চম্পাবতী ইঁদুরগুলোকে ছুট্। করালে, ছোট ছোট পুতুলগুলোকে বললে, রাণীকে পেন্নাম কর,—তারা মাথা নীচু করে পেন্নাম করতে লাগলো। এইসব দেখে শঙ্খচূর্ণী একেবারে অবাক হয়ে গেল। সে এই জিনিসটা পাবার লোভে আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললে, "কত দাম গো—মালিনী মেয়ে? এই মজার আজব জিনিসের জন্যে তুমি যা চাও আমি তাই দোবো।

চম্পাবতী বললে, "যাই বলো আর যাই কয়ো, সোনার লোভে এরকম জিনিস আমি ছাড়বো না। তবে যদি আর এক রাত্রি আকাশ-কন্যার প্রতিধ্বনি-ঘরে থাকবার হুকুম পাই, তা হলে না হয় ছাড়তে পারি। শঙ্খচূর্ণী তখুনি রাজী হোলো। কিন্তু চম্পাবতীর কপাল মন্দ। সেদিনও রাজা ঘুমোবার ওষুধ

বেশী মাত্রায় খেয়েছিল। রাণী চম্পাবতীর কান্না, অভিমান, বা কোনো কথা রাজা মোহনের ঘুমের ব্যাঘাত করলে না।

তার পরের দিন চম্পাবতীর শেষ চেষ্টা। শেষবার মায়া-প্রদীপটি জ্বললো। সৃষ্টি হোলো একটা সুন্দর বৌ-কথা-কও পাখী, কিন্তু ছ'রকম পাখী মিলিয়ে এই পাখী তৈরী; চুনির চোখ, হীরের ঠোঁট, নীলার ঘাড়, পান্নার ডানা, প্রবালের গা, মুক্তোর লেজ, মাথায় সোনার টোপর' আর পা পরশ-পাথরের। যেমন মধুর সুরে গাইতে পারে, তেমনি বলতে পারে ভাগ্যের কথা। এই সাধু-খেলেনাটি নিয়ে চম্পাবতী তাড়াতাড়ি চললো শঙ্খচূর্ণীর ঘরের পাশে। যখন সে শঙ্খচূর্ণীর আসার অপেক্ষায় বসে আছে, সেই সময়ে রাজার এক অনুচর সেখানে এসে তাকে বললে, ও মালিনী-মেয়ে, তুমি রোজ রাতে এতো চেঁচামেচি করো যে—আমাদেরও মাথা ধরে যায়। রাজামশায় ভাগ্যিস ঘুমের ওষুধ খান, নইলে ওঁরও মাথা খারাপ হয়ে যেতো। আমাদেরও গদ্দান মাটিতে লুটিয়ে পড়তো। তুমি সারারাত অতো বক্ বক্ করো কেন বলো তো?

চম্পাবতী এতোক্ষণে বুঝতে পারলে, কি হয়েছে। সে তখন একমুঠো মোহর অনুচরের হাতে দিয়ে বললে, তুমি আজ রাত্রে রাজাকে ঘুমের ওষুধ দেবে না—যদি কথা দাও, তা হলে এই সমস্ত মুক্তো, হীরে, জহরৎ তোমার হবে। অনুচর এতো মণি-রত্ন জীবনে কখনো দেখে নি। সে কি আর 'না' বলে! কথা দিয়ে সে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই শঙ্খচূর্ণী তার ঘর থেকে সেই ঘরে এলো। সেই আশ্চর্য্য বৌ-কথা-কও পাখীটিকে দেখে নিতে চাইলে: জিজ্ঞেস করলে, এর জন্যে কি চাই তোমার?

চম্পাবতীর উত্তর, আমার এক দর, এক কথা। আকাশ-কন্যার প্রতিধ্বনি-ঘরে আরও এক রাত্রি থাকতে চাই। সেই পাখীটিকে দেখে শঙ্খচূর্ণীর মন এমনি মজে গিয়েছিল যে—সাত-পাঁচ না ভেবেই সে বলে ফেললে, আচ্ছা, তাই হবে। পাখীটা পেয়ে সে এতোখানি খুসি হোলো যে, চম্পাবতীকে একটা সোনার মোহর দিয়ে দিলে।

রাজপুরীর সকলে ঘুমিয়েছে। চম্পাবতী প্রতিধ্বনি-ঘরে। বুক তার দুর্ দুর্ করছে। আজ শেষ রাত্রি। ভগবানকে ডেকে চম্পাবতী রাজাকে ডাক দিলে' বললে,—এগো রাজা, তুমি আমার কি দোষ দেখলে—যার জন্যে তুমি আমাকে এই শাস্তি দিচ্চো? তুমি আমাকে ভুলে গিয়ে বিয়ে করেছ শঙ্খচূর্ণীকে। কি আমি করেছি—বলো! তা হলে কি এ-জগতে সব মিথ্যে ? স্নেহ, ভালোবাসা, দয়ামায়া বিশ্বাস—সব মিথ্যে? আর কুরূপ মিথ্যেটাই সত্যি হোলো? সাড়া দাও—ওগো সাড়া দাও! কাঁদতে কাঁদতে সে ভেঙে পড়লো। সেদিন রাজা ছিল জেগে। শুনতে পেলে সব কথা। অনুচরের ডাক পড়লো। রাজা জানতে চাইলে, আকাশ-কন্যার প্রতিধ্বনি-ঘরে কে জাগে? অনুচর কাঁপতে কাঁপতে বললে, মহারাজ, জাগে সেই মালিনী মেয়ে, যে রাণীমাকে পান্নার কাঁকন বেচেছে। রাজা মোহনকুমার এই কথা শুনে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেল। আর দেরী না করে একটা গোপন সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল প্রতিধ্বনি-ঘরে। ঘরে ঢুকতেই সে চিনতে পারলে—এ মালিনী মেয়ে আর কেউ নয়, তারই চম্পাবতী। তখন রাজা চম্পাবতীর কাছে ক্ষমা চাইলে। যার যা ভাগ্যে ঘটেছে—সমস্তই দু'জনে জানতে পারলে শুধু ভাগ্যের দোষে তারা ছাড়াছাড়ি হয়েছে। আবার তাদের মিলন হোলো।

কিন্তু এখনো তাদের মিলনের পথে ভীষণ বাধা। সেই দুষ্টা যাদুকরী কয়াধুর হাত এখনো এড়িয়ে যেতে পারেনি রাজা। তা'র গোঁ এখনো সে বজায় রেখেছে। কি উপায়, তারা ভেবে উঠতে পারলে না। দুঃখের দিন চিরকাল থাকে না। রাজার সেই যাদুকর বন্ধু আর সিদ্ধা যোগিনী বাতাসী সেখানে এসে উপস্থিত হোলো। তাদের দু'জনের শক্তি মিল্‌তে, কয়াধুর শক্তি হার মানলে। তারা তখন আশ্বাস দিয়ে রাজা ও রাণী চম্পবতীকে বললে, "তোমাদের হতাশের দিন চ'লে গেছে। চলো মন্দিরে, সূর্য্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য্যকে সাক্ষী রেখে তোমাদের মিলন হবে। তারপর সন্ধ্যায় হবে বিয়ের উৎসব। রাজা মোহনকুমারের যোগ্যা রাণী চম্পাবতী।" কয়াধু যাদুকর ও যোগিণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে আর সাহস করলে না।

এই মিলনের খবর শঙ্খচূর্ণীর কানে যেতেই, সে ছুটতে ছুটতে রাজার কাছে এলো। শঙ্খচূর্ণী মালিনী-মেয়েকে চিনতে পেরে হতভম্ব হ'য়ে গেল। সে যে তারই শত্রু, তারই ভাগীদার চম্পাবতী! তখন তার মাথা গেল বিগড়ে। মুখ দিয়ে কড়া কড়া গালাগালি বার করতে লাগলো। রাজাকে বললে, "ওকে দূর করে দাও; নইলে আমার ধর্ম্ম-মাকে বলে মজা টের পাইয়ে দোবো।" কথা আর কইতে হোলো না। শঙ্খচূর্ণীকে যোগিনী বাতাসী আর যাদুকর এক সঙ্গে মন্তর-তন্তর করে বানিয়ে দিলে একটা বুনো শূকরী। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে সে ছুটে বেরিয়ে গেলো। তখন সকলের মুখে উঠলো হাসির রোল।

সমস্ত বিপদ থেকে নিস্তার পেরে—রাজা মোহনকুমার ও রাণী চম্পাবতী বিয়ে করে মনের সুখে দিন কাটাতে লাগলো। সুখের রাজ্য সোনার হাসি উঠলো ফুটে।—

রাজ্য করে মোহনকুমার,
বামে চম্পাবতী।
রাজা-রাণীর পুণ্য-ফলে
স্বরগে বসতি।
রাজ-ভাণ্ডার খোলা থাকে
প্রজা-ছেলের লাগি'।
সুখের সেথা নাই অবধি,
দুঃখ গেছে ভাগি'।
হিংসা সেথা নাই কোনো আর,
সবাই গলাগলি।
চোর-ডাকাতের নাই কোনো ভয়,
অভাব গেছে চলি'।
ফুল ফুটে রয় বনে বনে,
অলিরা গায় গান।
দেশের বুকে দিনরাতি বয়
উৎসবেরি বান্।

উদয়ন-কথা

[গোড়ার কাহিনী]

প্রথম পর্ব্ব

তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের ছেলে অভিমন্যু। তাঁর ছেলে পরীক্ষিৎ। পরীক্ষিতের ছেলের নাম ছিল শতানীক। শতানীক ছিলেন বৎসদেশের রাজা। বৎসরাজ্যের রাজধানী ছিল কৌশাম্বী। শতানীকের রাণীর নাম ছিল বিষ্ণুমতী। মন্ত্রী যুগন্ধর, সেনাপতি সুপ্রতীক। রাজা প্রথমে ছিলেন নিঃসন্তান। পরে শাণ্ডিল্য নামে এক ঋষিকে দিয়ে তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করান—তাতে তাঁর এক ছেলে হয়। তিনি ছেলেটির নাম রেখেছিলেন সহস্রানীক। দেবতাদের পক্ষ হ'য়ে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে শতানীক মারা পড়েন। এই দুর্ঘটনার পর থেকে দেবরাজ ইন্দ্র সহস্রানীকের উপর খুব স্নেহ দেখাতে থাকেন। এমন কি, একবার তাঁকে স্বর্গে নিমন্ত্রণও ক'রে পাঠিয়েছিলেন। সহস্রানীক ইন্দ্র-ভবনে এসে উপস্থিত হ'লে ইন্দ্র তাঁকে জানান যে, তিনি একজন শাপভ্রষ্ট বসু—পূর্ব্বে তাঁর নাম ছিল বিধূম। আর একজন শাপভ্রষ্টা অপ্সরা অলম্বুষা তাঁরই মত পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন—অযোধ্যার রাজা কৃতবর্ম্মার মেয়ে হ'য়ে। যথাকালে তাঁদের দু'জনের বিবাহ হবে।

ইন্দ্রের মুখে নিজের জন্মরহস্য জেনে নিয়ে সহস্রানীক স্বর্গ থেকে তাঁর নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন। কিছুদিন পরে ইন্দ্রের কথামত অযোধ্যার রাজকন্যা মৃগাবতীর সঙ্গেই সহস্রানীকের শুভবিবাহ হ'য়ে গেল।

কিছুকাল বেশ সুখে তারা সংসার করছিলেন, এমন সময় এক দারুণ বিপদ ঘটল। একদিন মহারাজ সহস্রানীক অন্য-মনস্ক ছিলেন, এমন সময় অপ্সরা তিলোত্তমা তাঁকে ডেকে কোন কথা বলেন। রাজা তা' শুনতে পান নি—কাজেই তার উত্তর দেন নি। অপ্সরা তিলোত্তমা কিন্তু ভাবলেন যে, রাজা হয়ত' তাঁকে অগ্রাহ্য করেছেন। তাই তিনি রেগে দিলেন অভিশাপ। সেই শাপে রাজা ও রাণীর মধ্যে চোদ্দ বছরের জন্য বিচ্ছেদ হয়। রাণী তখন পূর্ণগর্ভা। একদিন তাঁর এক অদ্ভুত সাধ হ'ল যে, তিনি রক্তের সরোবরে স্নান করবেন। রাজা পড়লেন বড় বিপদে। অথচ গর্ভবতী নারীর সাধ পূর্ণ না করলে গর্ভের সন্তানের অকল্যাণ হয়। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে রাজা কৃত্রিম উপায়ে ঠিক রক্তের মত লাল রঙ্ দিয়ে একটি সরোবর তৈরী ক'রে দিলেন। তাতে রাণীর সাধ পূর্ণ হ'ল বটে কিন্তু এক বিপদ্ এড়াতে গিয়ে ঘটল আরও এক ভারী বিপদ্। রাণী যখন সরোবর থেকে নেয়ে উঠছিলেন, তখন তাঁকে রক্তমাখা একখণ্ড মাংস মনে ক'রে একটা মস্ত বড় পাখী ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল। পরে যখন পাখীটা বুঝতে পারলে যে, সে যা ছোঁ মেরে এনেছে তা একটা জীবন্ত মানুষ, তখন সে রাণীকে মহর্ষি জমদগ্নির আশ্রমের কাছে ফেলে দিয়ে চলে যায়। রাণী মহর্ষি জমদগ্নির আশ্রমেই আশ্রয় পেলেন। তখন তিনি আসন্ন-প্রসবা। ঋষির আশ্রমেই রাণীর একটি পরম সুন্দর ছেলে হ'ল।

জমদগ্নি তপোবনে তিলোত্তমার অভিশাপের কথা জানতে পেরেছিলেন ব'লে রাজাকে কোন খবর দিলেন না। রাণী ও শিশুরাজকুমার পরম যত্নে মহর্ষির তপোবনেই প্রতিপালিত হ'তে লাগলেন। এদিকে রাজা ও রাণীকে এই ভাবে হারিয়ে বড়ই ব্যাকুল হ'য়ে পড়লেন। নানাদিকে নানারূপ খোঁজ ক'রেও যখন রাণীর সন্ধান মিলল না, তখন তাঁর দুঃখের আর সীমা রইল না। ইন্দ্র তাঁর কাতরতা দেখে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে নিজের সারথি মাতলিকে পাঠিয়ে দিলেন। মাতলি এসে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে গেলেন যে, অপ্সরা তিলোত্তমাকে অগ্রাহ্য করার ফলে তাঁরই শাপে রাজা ও রাণীর চোদ্দ বছর ছাড়াছাড়ি হবে। চোদ্দ বছর বাদে রাজা আবার রাণী ও ছেলেকে ফিরে পাবেন। রাজা এই কথায় কতকটা আশ্বস্ত হলেন।

এই সময় রাজার বুড়ো মন্ত্রী যুগন্ধরের একটি ছেলে হয়। ছেলেটির নাম হ'ল যৌগন্ধরায়ণ। সেনাপতি সুপ্রতীকও এই সময় একটি পুত্র লাভ করলেন। তার নাম রাখা হ'ল—রুমণ্বান্। সহস্রানীকের বাধ্য শতানীকের একজন ব্রাহ্মণ বন্ধু ছিলেন। তাঁরও এই সময়ে একটি ছেলে হয়েছিল। তিনি ছেলেটির নাম রেখেছিলেন বসন্তক।

ওদিকে রাজা সহস্রানীকের ছেলেটি মহর্ষি জমদগ্নির আশ্রমে বেশ যত্নেই লালিত পালিত হইতেছিলেন। তাঁর নাম রাখা হয়েছিল—কুমার উদয়ন। মহর্ষি নিজে তাঁকে বিদ্যা-শিক্ষা অস্ত্রশিক্ষা দিতেন। যখন তাঁর বয়স বার-তের বছর, তখন একদিন তিনি বনের মাঝে এক ব্যাধের হাত থেকে একটি সাপের জীবন রক্ষা করেন। সাপের জীবনের দাম হিসাবে কুমার উদয়ন তাঁর নিজের হাত থেকে তাঁর রাণী-মায়ের দেওয়া একগাছি তাগা খুলে ব্যাধকে দিয়ে দেন। সাপটি ছিলেন নাগদের রাজা। তিনি রাজকুমারের উপর খুব সন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁকে 'ঘোষবতী' নামে একটি বীণা উপহার দেন। তা' ছাড়া পান-সাজবার ও তিলক-রচনায় অদ্ভুত কৌশল কুমারকে শিখিয়ে দিয়ে কুমারের কাছে বিদায় নিয়ে পাতালে তাঁর নিজের রাজ্যে চলে যান।

ব্যাধ রাজকুমারের দেওয়া তাগাগাছটি রাজধানীতে বেচতে গিয়ে রাজপুরুষদের হাতে ধরা পড়ে। কারণ, তাগাটির উপর হীরা-মণি-মুক্তা দিয়ে মহারাজ সহস্রানীকের নামের অক্ষরগুলি বসান ছিল। রাজার কাছে এই চোরাই

তাগা পাঠান হ'লে তিনি ব্যাধকে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। কারণ, তিনি তাগাটি দেখেই চিনতে পেরেছিলেন যে, এ সেই তাঁর হারাণো রাণীর হাতের তাগা। তখন চোদ্দ বছর প্রায় কেটে এসেছিল। তাই রাজা বুঝলেন যে—নিশ্চয়ই দৈব রাণীকে ফিরে পাওয়ার এই সুচনা ক'রে দিয়েছেন। তাই তিনি ব্যাধকে কোন শাস্তি দিলেন না। বরং তাকে নানা রকম পুরস্কার দিয়ে তার মনস্তুষ্টি করতে লাগলেন। পরে ব্যাধের মুখে সব সংবাদ জেনে নিয়ে তাকে সঙ্গে করে গিয়ে মহর্ষি জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। সেখানে হারাণো রাণী মৃগাবতী ও কিশোর কুমার উদয়নের সঙ্গে তাঁর নূতন ক'রে মিলতে হ'ল। মহর্ষির তপোবনে দিন কয়েক খুব আনন্দে কাটিয়ে জাঁক-জমকের সঙ্গে রাণী ও কুমারকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজ সহস্রানীক রাজধানীতে ফিরে এলেন। কিশোর উদয়ন রূপে ও গুণে অতুলনীয় হয়ে উঠেছিলেন। শুভদিন দেখে কুমারকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা হ'ল।

এর পর আরও কিছুকাল পরম সুখে রাজ্য চালাবার পর সহস্রানীক বুঝতে পারলেন যে, তিনি এবার বুড়ো হ'য়ে পড়ছেন। তাই তিনি রাজ্যের সকল ভার ছেড়ে দিলেন যুবরাজ উদয়নের হাতে। মন্ত্রী, সেনাপতি—এঁরাও খুব বুড়ো হয়েছিলেন। তাই মন্ত্রী যুগন্ধর নিজের কাজ ছেড়ে দিলেন ছেলে যৌগন্ধরায়ণের হাতে। সেনাপতি সুপ্রতীকের কাছ থেকে তাঁর ছেলে রুমণ্বান্ পেলেন সৈন্য চালাবার ভার। আর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছেলে বসন্তক হলেন নবীন রাজা উদয়নের বিদূষক—রহস্যালাপের বন্ধু।

তারপর বৃদ্ধ রাজা-রাণী, মন্ত্রী, সেনাপতি, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি প্রাচীনের দল নবীনদের কাছ থেকে চিরদিনের মত বিদায় নিয়ে পাণ্ডবদের মত হিমালয় পর্ব্বতের উপর দিয়ে মহাপ্রস্থান করলেন। [ক্রমশঃ

পরাজয় (নাটক)

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[মঞ্চ আবার আলোকিত হল। দেখা গেল অন্ধকারে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন রামবাবু। বাইরে থেকে চাঁদের আলো ওর মুখে পড়েছে। দর্শনকক্ষ থেকে দেখা যাচ্ছে খালি সিলোটী। হাতে একখানা চিঠি আর একটা কাগজ। রামবাবুর স্ত্রী ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললেন; রামবাবু ফিরে চাইলেন]

স্ত্রী। আমায় ডেকে পাঠিয়েছ?

রাম। হাঁা, কাগজখানা পড় আর অনাদি চিঠি লিখেছে পড়ে দেখ।

[স্ত্রী চিঠিখানা আর কাগজখানা হাতে নিলেন: পড়তে আরম্ভ করলেন মুখ তার পাংশুবর্ণ হয়ে গেল]

রাম। আমি জানতাম (উত্তেজিত হয়ে ঘরে পাইচারী করতে আরম্ভ করলেন—হঠাৎ থেমে) আমি জানতাম ও এমনি করে আমার মুখ হাসাবে। আমি জানতাম ও এমনি করে সমাজে আর আমার বন্ধুবান্ধবের কাছে আমায় ছোট করবে। আমার সুনাম, আমার অর্থ, আমার সম্পত্তি, আমার যশ সমস্ত ও এমনি করে ভাসিয়ে দেবে—আমার কপালে এমনি করে কলঙ্কের টীকা পড়াবে। (আবার উত্তেজিত হয়ে পায়চারী করতে আরম্ভ করলেন) এতবড় একজন লোকের ছেলে হয়ে কিনা সামান্য একজন নার্সের জালে জড়িয়ে পড়ল—হত্যার মামলায় আমার ছেলে!

স্ত্রী। তুমি এত উত্তেজিত হয়ো না—চুপ করে এক জায়গায় বোস।

রাম। তুমি কি বল! উত্তেজিত হব না। আমার ছেলে—সে কি না কোথাকার কে এক নার্সের কবলে পড়ে হত্যার মামলায় জড়িত। ভাবতে পার তুমি?—আমার ছেলে ক্রোড়পতির ছেলে হয়ে—সামান্য নার্সের কবলে! আমার এতবড় আঘাত সে দিতে পারল! সে একবার ভাবলে না তার বুড়ো বাবার কথা—তার স্নেহের কথা, তার ভালবাসার কথা, তার কৌলিন্যের কথা—তার সমাজ, তার সংসার, তার প্রতিপত্তি কোন কথাই তার মনে পড়ল না? তার উচ্ছৃঙ্খলতা, তার স্বেচ্ছাচারিতা—সেইটাই সব চাইতে বড় হোল! একবার সে ভাবলে না যে তার বুড়ো বাবার সে একমাত্র পুত্র—তার অন্ধের লাঠি।

স্ত্রী। আঘাত কি সে একা তোমাকেই দিয়েছে? আমায় দেয় নি। আমার কতদিনের সাধ অনাদির মেয়েকে আমার বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করব—আমি এতবড় আঘাত নিশ্চুপে সহ্য করতে পারলাম আর তুমি পারবে না।

রাম। কৈ আর পারলাম! আমার এতবড় ব্যবসা—আমার এত সম্পত্তি সমস্ত ভেসে যেতে বসেছে। খোলামকুচির মতন যে টাকা রোজগার করেছি খোলামকুচির মতনই যদি তা নষ্ট হয়ে যায় তাতে কোন দুঃখ নেই—কিন্তু আমি

শুধু ভাবছি আমার সমাজের কথা, আমার বন্ধু বান্ধবদের ঠাট্টার কথা—আমার কুলের কলঙ্কের কথা। কাল এখানকার কাগজে কাগজে মামলার সমস্ত ইতিহাস একটার পর একটা পাতা ভর্ত্তি হয়ে রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি হবে। বড় বড় পোষ্টার পড়বে হকাররা চিৎকার করবে আর পৃথিবীশুদ্ধ সবাই শুনবে আমার পুত্র শ্রীমান এই মামলার একজন প্রধান আসামী—সে কোথাকার কে এক সামান্য নার্সের কবলে—তাকে বিয়ে করতে চায়। আমার মুখ বন্ধ করে সমস্ত সহ্য করতে হবে। বন্ধু বান্ধবরা দুঃখ প্রকাশ করবে—তাদের সেই সহানুভূতির পেছনে থাকবে এক পৈশাচিক আত্মতৃপ্তি। ঘরে ঘরে সবাই এ নিয়ে তর্ক করবে—মিথ্যে সত্যির জাল বোনা হবে আর তা ছড়িয়ে পড়বে দিকে দিকে। ডিনার টেবিলে এক মুখরোচক খাদ্য হবে। আমার মুখ বুজে সব সহ্য করতে হবে—কারণ! আমি তার পিতা—সে আমার পুত্র—আমার একমাত্র পুত্র।

স্ত্রী। তা তুমি এখন কি করবে?

রাম। কি করব! কি করব! আমার করবার কি কিছু মুখ আছে—ভদ্র সমাজে মুখ দেখাবার পথ কি সে রেখেছে?

স্ত্রী। হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে ত চলবে না—কিছু করতেই হবে।

রাম। করতে ত হবেই—কারণ আমি তার বাবা, সে আমার ছেলে। না করলে সমাজ বলবে আমি পিতার উপযুক্ত কর্ত্তব্য করি নি—কিন্তু কি যে করব তা আমি নিজেই জানি না। যদি সম্ভব হ'ত তাহলে আজই আমি ওকে চিঠি লিখে ত্যাজ্যপুত্র করতাম কিন্তু তা সম্ভব নয়। দেখ আমি কি করি (আবার পায়চারী করতে আরম্ভ করলেন) নাঃ চিঠিতে কোন কাজ হবে না অনাদিও ওকে সামলাতে পারবে না—আর তা ছাড়া অনাদিকে আমি লিখবই বা কোন মুখে। সেপথ কি আর আমার গুণধর পুত্র রেখেছে। ছিঃ ছিঃ আমার ছেলে হয়ে—এমন ছেলের মুখ না দেখাই উচিত—অসচ্চরিত্র—

স্ত্রী। তুমি কি আরম্ভ করেছ?

রাম। তুমি বুঝবে না, তুমি বুঝবে না—কত বড় আঘাত যে সে আমায় দিয়েছে, তা তুমি বুঝতে পারবে না, যদি বুঝতে তা হ'লে তুমিও পাগলের মত ছুটাছুটী করেও কোন কুল কিনারা পেতে না। ভাবতে পার কত বড় অন্যায় কাজ সে করেছে—

স্ত্রী। তা কি আর পারি! সে ত আর আমার ছেলে নয়! আমার জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত দিয়ে ত তাকে মানুষ করি নি! ছোটবেলায় তাকে কোলে করে আদর করি নি, নিজের তনু দিয়ে বুকে ক'রে তাকে ত মানুষ করি নি।

রাম। তবু তুমি মুখ বুজে সব সহ্য করছ!

স্ত্রী। আমি যে "মা"! ছেলের শত সহস্র অপরাধও যে আমায় মাথা পেতে নিতে হবে। সে যাক্, তুমি তাহ'লে না হয় নিজেই যাও।

রাম। যেতে হবে বৈকি। আমি যাব! আমি যাব, সুকান্ত যদি আসতে রাজি না হয় তা হ'লে চিত্রার কাছ থেকে আমি হাত পেতে তাকে ফিরে চাইব! আমি যাব! আমি যাব!

[মঞ্চ আবার ঘুরে গেল, মধুসূদন কাকার ঘর। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে—মিটমিটে একটী আলো জ্বলছে: চিত্রা বসে আছে মাথার কাছটিতে, একজন তরুণ ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করছেন]

মধুসূদন কাকা। মা! আমি যাই!

চিত্রা। কাকা!

ডাক্তার। আপনি একটু নজর রাখুন চিত্রা দেবী, আমি এখুনি আসছি— [প্রস্থান

কাকা। আমি আজ ক'দিন থেকে তোর কথা ভাবছি, কাগজে তোর মামলার কথা প'ড়ে অবধি মনটা ভয়ানক খারাপ—

চিত্রা। আমি জানতাম না কাকা, আমি জানতাম না কাকা—তোমার এই বাড়াবাড়ির কথা জানলে, আমি কখনই তোমায় ছেড়ে থাকতাম না।

কাকা। আমি কিন্তু সব সময়ে তোর কাছে কাছে থাকি, ঠিক তোর পাশটিতে (কিছুক্ষণ পর) মা-মণি, তোকে যা যা বলেছি সব মনে আছে? আমাদের বেঁচে থাকবার সার্থকতা কি, কি করে জীবন কাটালে মরবার সময় সব চেয়ে শান্তিতে মরা যায়—জীবনের কি হওয়া উচিত, সব মনে আছে?

চিত্রা। সব মনে আছে কাকা, চিরকাল মনে থাকবে —যতদিন বাঁচব।

কাকা। আজ তোকে আমার নিজের কথা কিছু বলবো মা—কিছু কিছু তোকে বলেছি, কিন্তু সব বলা হয় নি। আজ তোকে সব কথা বলব! যাই তোকে বলি না কেন মা, আমায় কিন্তু কোনদিন তোর ছোট্ট ছেলে ছাড়া অন্য কিছু ভাবিস না।

চিত্রা। তুমি চিরকালই আমার মধুসূদনকাকা!

কাকা। তাই যেন থাকি মা! আমার দোষগুণের বিচার করবেন বিচারকর্ত্তা, তুই শুধু মধুসূদনকাকা বলেই আমায় শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ডাকিস।

চিত্রা। কাকা!

কাকা। জানি না মা আমার খেয়ার শেষ কোথায়, কিন্তু তার জন্যে ভাবনা নেই—পার একদিন না একদিন হবই হব। হ্যাঁ যা বলছিলাম। একদিন ছিল যখন আমি ভয়ানক খারাপ ছিলাম—ভয়ানক খারাপ। তার হিসাব

করব আমি ভগবানের কাছে—সে সময় আমার এল বলে, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি অন্তিম বিচারকক্ষের দরজা আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে, আমি প্রস্তুত।

চিত্রা। কাকা!

কাকা। মেয়ে হয়ে জন্মান ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। আজ তোকে একটা মেয়ের কথা বলব। তখন আমি ছিলাম ছোট, ঠিক তোর মতন, আমি ছিলাম খারাপ। আমার সামনে ছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, অনন্ত অবকাশ, প্রশস্ত পৃথিবী। যা কিছু ভাবা যায়, যা কিছু চাওয়া যায়! আমি ছিলাম ধনী, হ্যাঁ ধনী। যুবক এবং ধনী—প্রত্যেকের যা কাম্য! আর ছিল একটী নারীর ভালবাসা। ছোট্ট মা! ভগবানের বিচারে নরাধম পুরুষকে যদি কেউ বাঁচাতে পারে ত, তা একমাত্র নারীর ভালবাসা! বিশেষ করে আমার মতন যারা তাদের! [থেমে দূরে বেহালায় বাজছে করুণ রাগিণী] মেয়েটী ছিল ভয়ানক গরীব, কিন্তু হৃদয়ে তার ছিল অফুরন্ত ভালবাসা, অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য। সে হল আমার স্ত্রী—হ্যাঁ স্ত্রী, যদিও না ছিল সে আমাদের সমাজের, না ছিল সে আমাদের জাতের, তবু সে হল আমার স্ত্রী। কারণ আমরা দুজনেই ছিলাম ছোট, কিন্তু মা—সে বিয়েতে আমরা কেউই সুখী হলুম না। সমানে সমানে বিয়ে না হলে কেউ কখনও সুখী হয় না, কখনও না! তারপর এল একদিন, আমি ধনী যুবক স্বামী, সে দরিদ্র যুবতী স্ত্রী, সামনে আমার এক চরম পরীক্ষা, স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন। কেমন করে, তা নাই বললুম, কিন্তু যদি সে স্বার্থত্যাগ করতে পারতাম, তা হলে সবই ঠিক হয়ে যেত, কিন্তু তা আর করা হল না, জীবনে অমন মুহূর্ত্ত একবারই আসে, আমারও তাই হল, এখন অবশ্য সব ভগবানের হাত। তারপর ক্রমে দিন যেতে লাগল, ক্রমেই জীবনে এল ভাঙনের পালা, উচ্ছৃঙ্খলতার চরম সীমায় উঠে দেখলাম, স্ত্রী আমার আত্মহত্যা করেছে, ছেলে নিরুদ্দিষ্ট। মা, যাকে বিয়ে করবে, এইটুকু ভেবে বিয়ে করবে মা, যে সামাজিক অবস্থা এক না হলে কখনও সে বিয়েতে স্বামী স্ত্রী সুখী হয় না। তুই গরীব বড়লোকের ছেলেকে কখনও বিয়ে করিস না।

[এমন সময়ে ঘরে ঢুকল ডাক্তার, পরীক্ষা করে দেখল, তারপর চিত্রাকে একপাশে ডেকে]

ডাক্তার। আর সময় নেই—

চিত্রা। আমি কিছু করতে পারি?

ডাক্তার। ব্যথা বেশী বাড়লে আপনি এই মলমটা বুকে মালিশ করবেন, আর কিছুই করবার নেই। আমি এক্ষুণি আসছি—Injectionটা তৈরী করে আনি।

[ডাক্তার চলে গেল]

কাকা। [হঠাৎ] না! না! তুমি ভুল করছ, আমি ত' তা বলি নি, আমি তা বলি নি, তোমার ভয়ানক ভুল হচ্ছে—হ্যাঁ! হ্যাঁ সে পালিয়েছে, সে পালিয়েছে সে নিরুদ্দিষ্ট! তারপর? অনন্ত পথে যাত্রা করব, অন্তিমের আশায় আমি দেখতে পাচ্ছি দূরে ভগবানের বিচারকক্ষ, সেখানে সবাই আমার অপেক্ষা করছে, বেহালা—আমার বেহালা—

চিত্রা। কাকা! ও কাকা!

কাকা। ও মা আমার—আমার মা তুই বুঝি—ও মা মা—আমার জন্যে ভগবানের কাছে একটু প্রার্থনা কর! এক ফোঁটা জল ফেল—আমার যাত্রা-পথ সচ্ছল হয়ে উঠুক!

চিত্রা। কাকা! কাকা!

কাকা। একটু প্রার্থনা কর, আমি ছিলাম খারাপ—ভয়ানক খারাপ—

চিত্রা। কাকা। [কাকার বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ল]

কাকা। ঐ-ঐ দরজা খুলে গেল—

[করুণ রাগিণী জোরে বেজে উঠল, ঘরখানি ক্রমেই অন্ধকার হয়ে যেতে লাগল। অন্ধকারে শুধু শোনা গেল]

চিত্রা। কাকা! কাকা! আমি আঁধার রাতের একলা পথিক—

[ক্রমেই সব মিলিয়ে গেল]

[আবহ সঙ্গীত বাজছে করুণ রাগিনীতে। সন্ধ্যার অন্ধকার, দৃশ্যটী চিত্রার বাড়ীর বাইরের ঘর: পেছন দিকের জানলা থেকে একটু আলো পড়েছে, তাতেই দেখা যাচ্ছে একজন ভদ্রলোক ঘরে বসে আছে: চিত্রা ঘরে ঢুকল: আলো জ্বালল: চিত্রার মুখে বিষাদের সুর: ঘরে বসে আছেন রামবাবু। আলো জ্বালতেই তিনি চমকে উঠে চিত্রার দিকে চাইলেন—চিত্রা অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল, তারপর নমস্কার করে বলল]

চিত্রা। আপনি?

বাবা। হ্যাঁ আমি সুকান্তর বাবা, তুমিই কি চিত্রলেখা?

চিত্রা। হ্যাঁ, আপনি বসুন। [বাবা বসিলেন না]

বাবা। আমি সুকান্তর সঙ্গে তিনবার তোমার বাড়ী ঘুরে গেছি, একবারও তোমার দেখা পাই নি।

চিত্রা। আমার এক অতিবৃদ্ধ বন্ধু আজ মারা গেছেন, আমি তাঁর কাছেই ছিলাম, আপনি বসুন।

বাবা। হ্যাঁ এই যে বসি। তুমি আজ ক্লান্ত, তোমাকে আর বিরক্ত করব না, তোমার সঙ্গে আমার গুটিকতক দরকারী কথা ছিল —

চিত্রা। বলুন—

বাবা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হবে না, তুমি স্থির হয়ে বোস—

চিত্রা। [বসল] বলুন।

বাবা। কাগজে এবং আমার বন্ধুর পত্রে আমি তোমার এবং সুকান্তর সমস্ত ব্যাপারটা পড়লাম। জানি না, তোমার সমাজে এ নিয়ে কোন আলোচনা হয়েছে কি না, কারণ

তোমাদের সমাজে এ রকম ব্যাপার হামেসাই ঘটছে। আর তাছাড়া তোমাদের মতন লোক, ক'লকাতায় এক জনতা সৃষ্টি করে আছে, কাজেই একে অন্যের খবরাখবর নেবার সময় পায় না। কিন্তু আমাদের সমাজ ত' খুব ছোট কিনা, কোথায় কি ঘটছে তার সব খবরই সবাই রাখে; কাজেই বুঝতে পারছ তোমাদের এ' ব্যাপার নিয়ে আমাদের সমাজে বেশ একটা হৈ-চৈ এরই মধ্যে হয়ে গেছে এবং আমার ছেলের এই কেলেঙ্কারীর জন্যে আমায় যথেষ্ট অপদস্থও হতে হয়েছে। আজ তোমায় দেখে বুঝতে পারছি সেই প্রথম তোমায় দেখে মুগ্ধ হয়েছিল, আর আমি এও জানি যে সে তোমায় বিয়ে করতে চায়; কিন্তু আমি চাই না যে তুমি তাকে বিয়ে কর।

চিত্রা। আপনি একটা ভয়ানক ভুল করছেন—

বাবা। [অট্টহাসি] ভুল আমি কখনও করি না, ভুল আমি জীবনে কখনও করি নি। যদি করতাম, তাহলে আজ আমি যা হয়েছি তা হতাম না। বুঝলে মা! ভুল রামকান্ত কখনও করে না, লোক দেখলেই সে ঠিক চিনে নিতে পারে!

চিত্রা। আপনি সুকান্ত সম্বন্ধে কথা বলতে এসেছেন, সেই কথাই বলুন। তিনি আপনার সম্বন্ধে অনেক কথাই আমায় বলেছেন এবং এ কথাও বলেছেন যে, আপনি হয় ত' আমাকে ভাল চোখে দেখবেন না।

বাবা। থাক্! থাক্! অতকথা বলবার কোন দরকার নেই। অতকথা আমি শুনতে আসিও নি, আর চাইও না। সুকান্ত তোমায় পছন্দ করতে পারে কিন্তু আমাকেও যে করতে হবে তার কোন মানে নেই; যাক, যাক যা বলছিলাম—সুকান্ত হয় ত' তোমাকে ভালবাসে এবং তুমিও হয় ত' সুকান্তকে ভালবাস সে ব্যাপারটা হোল সম্পূর্ণ তোমাদের ভেতর। সেই খানেই যদি ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হত তা' হলে হয় ত' আমার হস্তক্ষেপ করার কোন প্রয়োজন হত না। কিন্তু ব্যাপারটা সেই খানেই শেষ নয়, আরও অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়িয়েছে এবং আমি সেইটের নিষ্পত্তি করতেই এসেছি। তোমাকে আঘাত দেওয়া বা তোমাকে অপমান করতে আসা আমার উদ্দেশ্য নয়। জীবনে স্পষ্টবাদিতাই আমি সব চেয়ে বড় জিনিষ বলে মানি এবং তোমায় স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি যে, আমি চাই না সুকান্ত তোমায় বিয়ে করুক। আমি চাই না যে সামান্য একজন নার্স আমার ছেলেকে সম্পূর্ণ রূপে করায়ত্ব করে তাকে দিয়ে যা ইচ্ছে হয় তাই করাক—

চিত্রা। এত কথা বলবার কি কোন দরকার আছে?

বাবা। আছে, কারণ সুকান্ত আমার ছেলে, তুমি হয় ত' ঠিক জান না বাংলা দেশে কত কন্যাদায়গ্রস্ত ধনী বংশ আছে যারা আমাদের বংশের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। কত মেয়ে সুকান্তর মত স্বামী এবং আমার বংশের মতন বংশে প্রবেশ লাভ করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে।

চিত্রা। হ্যাঁ আমি জানি অনেক মেয়েই তা চায়—

বাবা। এতদিন হয় ত সে ধারণা তোমার ছিল না—

চিত্রা। হয় ত না—

বাবা। থাকলে এতবড় মারাত্মক ভুল তুমি নিশ্চয়ই করতে না—

চিত্রা। কি জানি আমি অন্য মেয়েদের মতন নই।

বাবা। যাকগে ওসব কথা আলোচনা না করাই ভাল। আমি তোমায় স্পষ্ট জানাচ্ছি যে, সুকান্তকে তুমি বিয়ে করতে পাবে না—

চিত্রা। তিনিই প্রথম—

বাবা। জানি সেই হয় ত' প্রথম তোমাকে এ কথা বলে—কিন্তু তুমি ত' বোঝ যে এই পৃথিবী সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা কত অল্প। দেখ-ভবিষ্যতে কত বড় একটা ব্যবসা চালাতে হবে—তুমি ত বোঝ তোমার মত গরীব ঘরের মেয়েকে আমাদের ঘরে নিলে আমাদের বংশ মর্য্যাদা কতখানি কমে যাবে। তাকে সমাজে চলাফেরা করতে হলে, তাকে পূর্ণ উদ্যমে ব্যবসা চালাতে হলে—স্বজাতে, স্বঘরে এবং অবস্থাপন্ন সংসারে বিয়ে করতে হবে বৈকি? আর তুমি বুদ্ধিমতি—তোমারও এসামান্য ব্যাপারটা বোঝা উচিৎ। সুকান্ত বড্ড সরল, তার মন বড্ড নরম—আর তাছাড়া আমি তার বিয়ের ব্যবস্থা করেছি।

চিত্রা। সুকান্ত আমায় সে কথা বলেছে। কিন্তু শুনেছি মেয়েটি বিয়ে করতে চায় না।

বাবা। মেয়েটির মতামতে কি এসে যায়? বিয়ে দেবেন তার পিতা! সে কথা থাক—আমি চাই না যে তুমি তাকে বিয়ে কর।

চিত্রা। এ ক্ষেত্রে আপনি আমায় কি বলেন?

বাবা। তুমি তাকে বল যে তুমি তাকে বিয়ে করতে রাজি নও।

চিত্রা। আমি তা পারব না। তবে তিনি যদি নিজ মুখে একথা আমায় বলেন তাহলে আমি তাঁর জীবন থেকে সরে দাঁড়াব

বাবা। তুমি বেশ জান—একথা সে বলতে পারবে না—সে তোমায় ভালবাসে।

চিত্রা। আমিও পারবো না।

বাবা। কিন্তু তোমায় পারতেই হবে।

চিত্রা। আমায় ক্ষমা করুন, আমি পারবো না।

বাবা। পারবে না? তুমি কি ভেবেছ চিত্রলেখা

তোমার রূপের ফাঁদ পেতে আমার ছেলেকে আমার কাছ থেকে তুমি ছিনিয়ে নিয়ে যাবে? আমার ছেলে আমারই চোখের সামনে খুনের দায়ে অভিযুক্ত এক নার্সকে বিয়ে করবে, আর আমি তাই দেখব। আমি তা হতে দেব না—আমি তা হতে দেব না। সুকান্ত বোকা মুখ্যু! কিন্তু তুমি ত' বুদ্ধিমতি, তুমি ত সব বোঝ। দয়া করে আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও—জানি তাতে তোমার অনেক ক্ষতি হবে—কিন্তু এটা বুঝতে পারছ না কেন, তোমার ক্ষতি হলেও তার এতে যথেষ্ট লাভ হবে। তুমি গরীব, আমি তা জানি—

চিত্রা। সেইটেই বোধ হয় আপনার সবচেয়ে বড় আপত্তি?

বাবা। হ্যাঁ—মানে—হ্যাঁ তাও বলতে পার—তাই যদি ধরে নাও—তাহলে আমার বক্তব্যটাও স্পষ্ট হয়ে যায়। তুমি যদি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও—আমি তোমার দারিদ্র্য ঘুচিয়ে দেব—তুমি যত টাকা চাও আমি দেব—দশ হাজার—কুড়ি হাজার, পঞ্চাশ হাজার—যত চাই।

চিত্রা। আপনি টাকার ওজনে আমার ভালবাসার ওজন করতে চান? আপনি কি ভাবেন আমি তাদেরই মতন, যারা পথের ধারে বসে ভালবাসার ব্যবসা করে?

বাবা। না না, মানে তুমি আমার ভয়ানক ভুল বুঝেছ—

চিত্রা। লোকে যেমন টাকা দিয়ে ভগবান কিনতে পারে না—তেমনি ভালবাসাও কিনতে পারে না—আমার আর কিছু বলবার নেই।

বাবা। তবু তুমি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দেবে না? আমার বংশমর্য্যাদা, আমার সম্পদ, আমার প্রতিপত্তি এমনি করে ভেঙ্গে দেবে? তুমি—

চিত্রা। আমার আর কিছু বলবার নেই।

বাবা। বেশ যাবার আগে তোমাকে জানিয়ে গেলাম—তোমায় বিয়ে করলে সুকান্তকে আমার সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করব। তোমার জন্য আমার ছেলেকে হারাতে পারবো কিন্তু বংশমর্য্যাদা, সমাজ হারাতে পারবো না।

[তিনি বেরিয়ে গেলেন : চিত্রা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কি ভাবল, তারপর ঘরের কোণে টেবিলে চিঠি লিখতে ব'সল।]

[ক্রমশঃ

খোয়াই] [শ্রীরেণুকা কর

স্বপ্ন

স্বপ্ন দেখি নতুন দিনের,
নতুন মাটি, নতুন তৃণের
নিকষ কালো অন্ধকারের
অতল হ'তে সূর্য্যোদয় ;

জয় হবে রে জয় হবে,
মরেই মরণ ক্ষয় হবে,
জীবন দিয়ে তাইতো জীবন
নতুন রূপে হয় উদয় !

শঙ্কাহারা নতুন বাণী
জন্ম নেবে জানি, জানি,
নতুন কবির মালাখানির
নতুন ফুলের গন্ধ পাই ;
নতুন আলোর রঙীন সোনায়
নতুন পাখী কী গান শোনায়,
আলোহারা চোখের তারা
জাগে নতুন স্বপ্নে তাই ।

কোথায় যেন অন্ধকারে
ঘূর্ণী হাওয়া বারে বারে
উথ্‌লে ওঠে অতল হ'তে,
কালের স্রোতে ঢেউ তোলে ;

গর্জ্জনে তার কান পেতে রই,
নতুন গানের সুর বুঝি ঐ···
নবীন প্রাণের মুক্তধারা
জাগে নতুন কলরোলে ।

কে বলে রে স্বপ্ন মিছে !
ঘুমিয়ে পড়া বুকের নীচে
নতুন হৃদয় জাগছে শুনি
জীবন ধ্বনির ইঙ্গিতে ;

স্বপ্নভাঙা প্রস্রবনের
ঝর্ণাজলের সঞ্চরণের
কলধ্বনির মন্ত্র বাজে
নতুন সুরের সংগীতে !

অপগত সংশয়, সন্দেহ শঙ্কা,
ঐ শোন্‌ জীবনের জাগরণ-ডঙ্কা,
ঘুমভাঙা গান শোন্‌, শোন্‌ তার ঝঙ্কার,
গান নহে, রণজয়ী ধনুকের টঙ্কার ;
মরণের হিম বুকে বিদ্যুৎ মনিকায়
কী আগুন জলে ওঠে রক্তের কণিকায় !
বন্ধন অবসাদ ক্রন্দন অবসান,
নররূপে জাগে আজ মানুষের ভগবান ।

পাতালের পুঞ্জিত তমসার হল জয়,
জীবনের আলো জাগে—নাহি ভয়, নাহি ভয় ।

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

সোনার বাংলা

'শস্য-শ্যামলা সোনার বাংলা'—কই সে নামের সার্থকতা ?
হেথায় মিলে না শস্যের কণা, স্বর্ণরেণু ত দূরের কথা !
রিক্ত জননী অন্নপূর্ণা, ভাণ্ডারে নাই খাদ্যলেশ ;
ক্ষুধার জ্বালায় মূর্চ্ছিতপ্রায় ধুকিছে সোনার বাংলা দেশ ।
মানুষের গড়া এ দুর্ভিক্ষে লাঞ্ছনা হ'লো মানবতার,
কঙ্কালসার উপবাসী আর পারে না বহিতে জীবনভার ।
নগরীর পথে চলচ্চিত্র নরনারীদের বিকৃতরূপ,—
মরণোৎসবে মৃত্যু-মিছিল, শ্মশানক্ষেত্রে শবের স্তূপ !
খাদ্য-ভিখারী দীন নরনারী অনাহারে হেথা নিত্য মরে ;
ধনীর বিলাস হয় না ক'হ্রাস, ভোগের পেয়ালা উপ্‌ছে পড়ে ।
বুভুক্ষুদের বঞ্চিত করি' সঞ্চিত করে বিত্ত যারা,—
ভগবান্‌, তব ন্যায়ের রাজ্যে কভু কি ক্ষমার যোগ্য তা'রা ?

শ্রীনীলরতন দাশ, বি-এ

সাদীর বাণী

সৎ যেবা নিজগুণে সে ত তব লভেছে প্রসাদ,
নিষ্পাপ হৃদয় তার সেই তব শুভ আশীর্বাদ।
চাহিনাক ভগবান অসতের হউক দুর্গতি,
চাহি, তারে কৃপা করো সে কৃপায় ঘুচুক দুর্ম্মতি।

বিড়ালেরে পাখা দেন নি বিধাতা, জলে সে শক্তি হারা,
নতুবা পক্ষি মৎস্য বংশ ধ্বংস করিত তারা।
গোরুর মতন শৃঙ্গ পায় নি ভাগ্যে গাধার দল
নতুবা তাহার দাপটে দেমাকে কাঁপিত এ ধরাতল।

এক মুঠো ভাত দাও—ঘৃণ্য পশু কুকুর বিড়াল
ভুলিবে না উপকার—অনুগত রবে চিরকাল।
কর শত উপকার অকৃতজ্ঞ এমনি মানব
তুচ্ছ ত্রুটী হ'লে পরে বৈরী হবে ভুলে গিয়ে সব।

চরণ লেহন করে যে রসনা সেই রসনার
কাছে যদি শিক্ষা লও কোন মূল্য নাই সে শিক্ষার।

কৃপণের মুষ্টি হ'তে স্বর্ণ লাভ বড়ই দুষ্কর

তার স্বর্ণ পেতে হ'লে হ'তে হয় দস্যু বা তস্কর
তার চেয়ে ঢের সোজা মাটি খুঁড়ে স্বর্ণের উদ্ধার।
মানুষের ঘর্ম্ম লভে কর্ম্মযাগে স্বর্ণের আকার।

প্রবলের হাতে নিত্য সহি লোক অবজ্ঞা পীড়ন,
দুর্ব্বলে দলিয়া করে প্রতিশোধ সাধের পূরণ।
দুনিয়ার প্রথা এই—একই কথা সমাজে সংসারে,
মাথায় পাদুকা বয় দক্ষ খুব পাদুকা প্রহারে।

নিজেই নিজের কাজ কর সব, হোক পরিশ্রম।
ভালো নয় মূঢ় ভৃত্য, ক্ষতি করে, নিত্য করে ভ্রম।
খাটো জুতা পারে দিয়ে খুঁড়াইয়া হাঁটা বড় দায়,
তার চেয়ে খালি পায়ে চলা ভালো ধূলায় কাঁদায়।

পরকে শাসন বৃথা নিজের গোপন কথা করিয়া প্রকাশ,
না রুধি নির্ঝর মুখ নদীর প্রবাহরোধে বৃথাই প্রয়াস।

তোমার মুখের কথা যতদিন রয় বুকে
ততদিন সে তব অধীন।
অধীন হইবে তার সেই সঙ্গে শতেকের,
পরকর্ণে বলিবে যেদিন।

পিঠই শুধু চেনে তারা পশ্চাতে থাকিয়া যারা
করিছে দংশন,
সম্মুখে না এলে আর কেমনে জানিবে তার
হৃদয় কেমন।

পারেনা কহিতে কথা মূক পশু ঢের ভালো
বহুভাষী মানুষের চেয়ে,
মনুষ্যের মত সেও করেনাক বচনের
অপচার বাক্‌শক্তি পেয়ে।

সত্যামিত হিত সার বাক্য যদি বলিবার
ইচ্ছা হয় তবে কথা কও,
নতুবা কয়ো না কথা কেবল হানিতে ব্যথা,
পশুসম মৌনী হ'য়ে রও।

গুণই দেয় পরিচয় বুঝাতে হয়না কভু
সৎ কি অসৎ,
বাজালেই বুঝা যায় নকল কি খাঁটি টাকা
লাগেনা শপথ।

গুণ যদি থাকে, তাহা দিবে নিজ পরিচয় তবে,
কস্তুরীর পরিচয় বাক্যে নয়, তাহার সৌরভে।

উঠের পিঠে চড়ে চলেনা ঘটা ক'রে
উঠের মত ভার বহেনা,
কাহারো প্রভু নয় দাসও নয় কারো,
কাহারো তাঁবেদারী সহেনা।
করে না মাথা নীচু গর্ব্বভরে কভু
মাথাও করে নাক উচ্চ,
মরারো আগে সেই মুক্তজীব জেন,
স্বর্গ তার কাছে তুচ্ছ।

অকারণ পর নিন্দা চেয়ে ভালো ডাকাতি বা চুরি,
নিন্দায় পৌরুষ নাই নাহি লাভ নাই বাহাদুরি।
চুরিতে কৌশল লাগে ডাকাতিতে লাগে বাহুবল,
অনেকের চৌর্য্য কিংবা দস্যুতাই জীবিকা সম্বল।
পর নিন্দা করে যেই কাপুরুষ কে তার সমান?
পরেই হরণ করে হয়না নিজেও লাভবান্।

নিন্দা কারো করো না ক, করিয়া কোনই লাভ নাই।
দুর্জ্জনের নিন্দা করা শত্রুবৃদ্ধি সে ত খামকাই।
সজ্জনের নিন্দা পাপ, দুর্জ্জনেরই নাই পাপ ভয়,
দুর্জ্জন, দুর্জ্জনবৈরী কোনটাই হওয়া ভাল নয়।

আহারে যে জন লুব্ধ যত গুণ থাকুক তাহার?—
প্রত্যাশা করো না কভু তার কাছে আত্মমর্য্যাদার।

ধনীরে কেন হিংসা করো, তাহার মত অভাগা কে?
চলিয়া যাবে পড়িয়া রবে সকলি তার পিছুতে।
তোমার যবে যাইতে হবে চলিয়া যাবে একভাবে,
কিছুর তরে রবেনা ক্ষোভ রবেনা মায়া কিছুতে।

জিজ্ঞাসা করিতে যার লজ্জা নাহি হয়
সেই জন জ্ঞানলাভ করিবে নিশ্চয়।
শিক্ষাগুরু যার এই বিশ্ব চরাচর,
তার মত জ্ঞানী কেবা এ বিশ্ব-ভিতর?

মিছা কেন গালমন্দ দাও হিংসাপুরে
নিজের জ্বালায় সে ত মরে জ্বলে পুরে॥

শ্রীকালিদাস রায়

বুভুক্ষু গণ-দেবতা

চারিদিকে শুনি হাহাকার—
"এক মুঠি দানা দাও", নর-নারী করে চীৎকার।
পল্লীর ঘরে ঘরে ভাণ্ডার হইয়াছে খালি,
সবার ছিন্নবাস—সারা গায়ে ফোঁড় আর তালি;
চালে কারো ছন নাই—বরষায় বাস করা দায়,
মহাজন টাকা চায়—প্রতিদিন আসে তাগাদায়।
হাঁড়িতে চাউল নাই, সবে মিলে রহি' উপবাসী,
হলের বলদ জোড়া হাটে ল'য়ে বিকায়েছে চাষী।
আর তার কিছু নাই—সর্ব্বহারা নিরুপায় হ'য়ে
এসেছিল পথ 'পরে বধূ আর ছেলে মেয়ে ল'য়ে।
ভিখ্ নাহি মেলে কোথা—পল্লীতে নাই কিছু আর,
শহরেতে এসেছিল—আশা ছিল মিলিবে খাবার।
নগরের রাজপথে গৃহহারা নরনারী চলে
"এক মুঠি খেতে দাও" জনে জনে সকাতরে বলে।
তাহাদের পানে কেহ ফিরে নাহি চাহে একবার,
আপনার কাজে চলে—অবসর নাহি শুনিবার।
শিশু কাঁদে মা'র কোলে এক ফোঁটা দুধ লাগি' হায়!
"এতটুকু ফেন দাও" মাতা তার দ্বারে দ্বারে চায়;—
অনাহারে কাটে দিন—ফুকারিয়া কাঁদে ক্ষুধাতুর'
"দয়া করো হে দেবতা" বলে তারা—শুনি তার সুর;
রাস্তায় ফেলে দেয়া এঁটো পাতা কুড়াইয়া সবে
খুঁটে খুঁটে ভাত ডাল খায় তারা মহা কলরবে।
মানুষে কুকুরে আজ কিছু হায় ভেদাভেদ নাই;
রাজপথে চলি আর চেয়ে চেয়ে রোজ দেখি তাই।

বন্দে আলি মিয়া

বহুরূপায় গোবিন্দায় নমঃ

যাহাকেই পূজি'—তোমায়ই ত' পূজা করি;
তুমি বহুরূপ—অপরূপ তুমি হরি।
পত্র-পুষ্প-ফল-জল দিই যাহা,
পঁহুছায় গিয়া তোমারি চরণে তাহা;
সব ঘট আমি তোমারি লাগিয়া ভরি।

প্রজা হ'য়ে আমি তোমারেই দিই কর,
কর্ত্তা যে তুমি—তোমারই এ বাড়ী-ঘর।
মধু-কথা বলি—স্তুতি সে তোমা'রি প্রভু,
সেবা যার করি, সে সেবা তোমারি তবু;
সব নতি লহ তুমি সর্ব্বেশ্বর।

তুমি দাতা, তুমি ভিখারী, সাজিয়া যাচ,
দূরে খুঁজি যবে, নিকটে দাঁড়ায়ে আছ।
তুমি তরু, তুমি কাষ্ঠ, ধাতু ও শিলা,
অচিন্তনীয় অপূর্ব্ব তব লীলা;
তুমি ছাড়া কারো হয় না কো কোন কাজও।

যে গান গেয়েছি—তোমারি সে প্রার্থনা,
ভাল যা' করেছি—তোমারি সে উপাসনা।
তুমি বহুরূপ, তাই আশা জাগে প্রাণে,
যে দিকেই যাই ছুটি'—সে তোমারি পানে;
তুমি সমুদ্র, আমি তব বালুকণা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কবর

এইখানে এই কবরের পাশে কথা কেউ কয়ো নাক,
হালকা চরণে ধীরে ধীরে চল,—আমার মিনতি রাখ।
এধারে ওধারে আপনি ফুটেছে অসংখ্য বনফুল,
ঘুম পাড়ানিয়া গান গাহে পাখী গুঞ্জরে অলিকুল।
একতারা যেন বাজাইয়া চলে ক্ষীণ কায়া গেঁয়ো নদী,
শীতল পবন কিশোরীর সম চঞ্চল নিরবধি।
ফুলের গন্ধ, পাখীর কূজন, আকাশের নীল ছায়া,
পদতলে ক'চি নরম ঘাসেরা—করুণকোমল কায়া।

মোর জীবনের প্রথম স্বপ্ন, প্রথম কামনা মম,
চিরনিদ্রায় শায়িত হেথায় ছিন্নপুষ্পসম।
স্নিগ্ধ মধুর এই মৃত্তিকা, ভালবাসি এই ধূলি,
বহু বাঞ্ছিত মুক্তার মত বক্ষে নিলাম তুলি'।
মমতা মাখানো গাছের ছায়ারা, দিগন্তজোড়া মাঠ,
কে যেন এখানে বসিয়ে দিয়েছে অশেষ রঙের হাট।

মতিউল ইস্‌লাম

লাহোরের চিঠি

প্রিয়বরেষু,

বন্ধু! তোমার কবিতা-পত্র আসিল অত্র সাঝে,
সুললিত তার ভাষা প্রতিভার ছত্রে ছত্রে বাজে;
পঞ্চ-নদের মঞ্চ-আড়ালে মহা-প্রপঞ্চে আছি,
বাপ্পা নিতুই পাঞ্জাব ভুঁই ছাড়িতে পারিলে বাঁচি,
কোথায় মিলিবে বাঙলা মায়ের শ্যামল স্নিগ্ধ স্নেহ,
দাড়ি ও ঝুটির রাজ্যের মাঝে কোনো মতে রাখি দেহ।

বিপদ-সূচক সাইরেন-বেণু শিহরি' তুলেছে বটে,
মধুসূদনের মধু নাম জপ নহিলে ছিল কি ঘটে?
আখেরের কাজ গুছায়ে নিতেছ ভাগ্যবন্ত দাদা!
তুমি মরে হবে দেব দেবেন্দ্র আমি মরে হব গাধা।
সিঁড়ির নীচের ফাঁকাটি এ-ফাঁকে গড়িছ সিদ্ধ-পীঠ,
লক্ষ টাকার prospect পাবে প্রত্যেকখানি ইঁট;
ইষ্টের ধ্যানে ধূমপান সেটা অনুপান খুবই খাসা,
স্তিমিত নয়ান ঘন ঘন টান ভাব-সমুদ্রে ভাসা,
'প্যাকেট-টা' আর 'পকেটে' রেখোনা, রেখেদিও ঐ ট্যাকে
গৃহিনীকে ভাই করিও স্নেহাই ক্ষীনজীবী প্রাণী একে!

জাপানি বোমায় হবে না মরণ সে-কথা জানিও ঠিক,
ধাঁদা-চাঁদ-ওয়ালা রাত্রে ধাঁদারা যতই না হানা দিক।
ছাতের উপর 'প্যাটরল' করে 'ফাইটার' দিন-রাত,
তুমিই লিখেছ শহরের মাথা বাঁচায় 'বেলুন-ছাত'।
'এ্যান্টি-এয়ার-ক্রাফট-গান'গুলো মুরুৎ নেই তো খাড়া,
'শেল'গুলো তার জাপানি-কায়ার টনকে দিয়েছে নাড়া।
সেদিনও তো ভাই 'কুকুর-লড়াই' আকাশে হয়েছে বড়ো,
তিন 'বম্বার' হয়েছে কাবার তুমি তো কাগজ পড়ো!
এগুলো নেহাৎ 'নিউসেন্স রেড' কেবল দেখাতে ভয়,
দুটো বা একটা 'শলিটারি প্লেন' ফরমেশানে' তো নয়।

দেশে পাঠাবার প্রস্তাব করে প্রেয়সীর পরিহাস—
ঠিক ই হয়েছে, ভুলে গেছ দাদা সেই সে 'এক্সোডাস্'?
গিয়ে গেলোবারে জানি হাড়ে হাড়ে ভুগতে হয়েছে ওঁকে,
তোমার ও কষ্ট অতি সুস্পষ্ট দেখে আসিয়াছি চোখে।
শয্যা-পার্শে সোফার ওপর সাজায়ে কাহার ছবি—
বিরহ-ব্যথার দীর্ঘনিশ্বাস নিত্য ছেড়েছ কবি?

এ কথা সত্য গুজোবগুলোই তোলে আতঙ্ক প্রাণে,
মিথ্যা রটায়ে কি যে লাভ হয়— কিছুই বুঝিনা মানে।
লাহোরেতে বসে শুনলাম দাদা! কতই না সমাচার,
ছাতাওয়ালা গলি ছাতু হয়ে গেছে—ব্রীজ নেই হাওড়ার।
লালবাজারের পথে পথে নাকি লাল রক্তের ঢেউ,
'ক্লাইভ ষ্ট্রীটে'র 'বিল্ডিংস্' গেল কোথায় জানেনা কেউ।

একেবারেই অক্কা পেয়েছে খিদিরপুরের 'ডক্',
টালার বোমার ধাক্কা দিয়েছে টালিগঞ্জকে 'শক্'।
লাটসাহেবের বাড়ী নড়ে গিয়ে পেড়ে গেছে ময়দানে,
একটা বিরাট লেক হয়ে গেছে লাট-প্রাসাদের স্থানে।
এই ধরণের নানা বরণের শুনে নানা 'রিউমার',
কলিকাতাবাসী প্রিয়জন তরে কাঁপে নাকো প্রাণ কার?

চৌরঙ্গীর রঙ্গালয়ের অশঙ্ক ছবিখানি
একেছ বন্ধু! কাগজের বুকে নিপুন লেখনি টানি'।
এখানেও ভাই অতি বিচিত্র সমানই চিত্র আছে,
সপ্ত-সিন্ধু পার হতে এসে সাত জাত মিলিয়াছে।
বদামি-সাদায় নাচে গান গায় নাহি জ্ঞান ভেদাভেদ,
প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যে বুঝি মিটে গেছে বিচ্ছেদ।
গীতার বচন ঝাড়ে না কো এরা—চিতাকেও নাহি ডরে,
বর্ত্তমানের অর্থ বুঝেই বাঁধা থাকে নাকো ঘরে।
স্ত্রী ও পুরুষ সমান ওদের এক সুরে সুর বাঁধা,
জঙ্গী গোরার সঙ্গী হইয়া যোগ দ্যায় কাজে দাদা!
W. V. S. প্রতিষ্ঠানের কাজ-ও চলেছে বেগে,
সহযোগিতার সার্থকতায় 'অফিস' রয়েছে জেগে।
স্বয়ং লাটের ঘরণী আছেন উদ্‌যোগীদের মাঝে,
নিজ আদেশে 'সাহেব' মেয়েদের উৎসাহ দেন কাজে।
অবাক নয়নে চেয়ে থাকি ভাই চোখে ভরে আসে বারি,
আমাদের দেশে কবে অবশেষে হবে এই মত নারী!!

ওদিকের সব খবর দিলেতো—এদিকের কথা শোনো,
কলিকাতা আর লাহোরের মাঝে তফাৎ দেখিনে কোনো।
খবার বটে উড়েনা আকাশে সাইরেণ কেঁদে সারা,
'শেলটার' নিয়ে সিঁড়ির তলায় ভুগেনি অন্ধ-কারা।
কড়-কড় দুম্ আওয়াজে এখানে চম্‌কে উঠেনা পিলে—
'গশিপে' গুজবে আমাদের তবু প্রায় প্রাণে মেরে দিলে।
এর চেয়ে ছিল অনেক কাম্য কামানের মুখে থাকা,
না হয় নিতাম তোমাদেরই মত খাড়া সিঁড়ি তলে ঢাকা।
ভেবো না বন্ধু মুখের এ কথা শুধু কপচানো বুলি,
কলিকাতা পথে ধাবমান হতে চরণ রয়েছি তুলি'।
ট্রান্‌সফারের চেষ্টা করেছি হই নি সিদ্ধ-কাম,
দয়াময় প্রভু দেবেন না যেতে মোরে কলিকাতা ধাম।
কাজ ছেড়ে দিয়ে যাওয়া যেতো দাদা! কিন্তু টাকা তো চাই,
অতি অনুগত রজত প্রহত ক্রীতদাস আমি ভাই।

'অক্টোবরের' দুই তারিখেতে গৃহিনী এলেন হেথা,
'মডেল টাউনে' বাড়ী সাজালেন বড় অফিসারি কেতা।
কলিকাতা হতে চাকর আসিল নাবালক এক ছোঁড়া,
কারণ এখানে চাকরি সস্তা চাকর বহুৎ থোড়া।

অতি আধুনিক প্রগতি-পন্থী ফ্রয়েডের বড় চেলা,
মুখে খুব দড়ো কাজে খুব খরো 'গিফ্‌টেড্‌' তার বেলা।
ঝাড়ুদারণীকে প্রাণ নিবেদিয়া বিনিময়ে পেয়ে ঝাটা,
প্রেমিক হতাশে মিলালো বাতাসে ভাবিলাম গেল ল্যাটা।
দিন-দুই চারে ফিরে এলো দ্বারে যেন কত অনুতপ্ত,
বলে, তুমি বাপ করো মোরে মাপ অভিনয়ে খুব রপ্ত।
এই কয়দিনে চাকর বিহনে গিন্নী ছিলেন হয়ে,
কি করিব ভাই কাজের বালাই রাখিলাম সেই জন্যে।
সু-সময় নিয়া বাক্স ভাঙিয়া গিয়াছেন অবশেষে,
এদিকেও পাকা! তবে বেশীটাকা ছিলনাকো সুটকেশে।

চাকর, চাকর জপি দিনভোর, যাকে তাকে ধরে ধরে—
বলি দাদাভাই, তোদের দোহাই, লোক দেখে দাও মোরে।
মাথা নেড়ে সব বলে সম্ভব হলে আমি নিজে রাখি,
বৌ, মেয়েদুটো খেটে খেটে দাদা হয়ে গেছে ফিঙেপাখি।
আছে গোদা মালী সেই শুধু খালি তরণীর কাণ্ডারি,
মশ্‌লাটা বাটে বাজারে ও হাটে কিনেআনে তরকারী।
ঠিকে-ঝিকে যদি ভাগা কিনে দাও মালীকে পড়াবে মল,
হোক্ পায়ে গোদ, ব্যাটা নির্ব্বোধ, সেই আজ সম্বল।

পৃথিবী জুড়িয়া আজ হাহাকার, তুমি আমি যাবো কোথা?
কাল কি যে হবে এই ভেবে ভেবে মন হয়ে গেল ভোঁতা।
বিশটাকা মণ চালের এখনি, চোখেতে দেখিনে আটা,
'প্রফিটিয়ার'রা হয়েছে প্রবল, সবার পথের কাঁটা।

কোথা চুপে চুপে গম গেল উবে লহমায় রাতারাতি,
গরীবের দল হয়েছে বিকল, দাঁতে লেগে গেছে দাঁতি।
আড়াই টাকায় চায়ের পাউণ্ড, চিনি তো দেখিনে চোখে,
লক্কড় কালো শক্কড় দিয়ে চা-পান করিছে লোকে।

আনি দোয়ানি ও পয়সা তো প্রায় অশরীরি হয়ে আছে,
আসরেতে ফের নাম্‌বেন কবে, কি জানি কেমন ছাঁটে?

পোড়াবার কাঠ, কয়লা ক্রমেই হয়ে এলো প্রায় লোপ,
কাঁচা চাল আর তরকারি হবে প্রাণ বাঁচাবার টোপ।
ধুতি-শাড়ী আর গামছার দাম কলিকাতা অনুরূপ,
সাহেব সাজিয়া তাই থাকি দাদা ধুতি ভালোবাসি খুব।
সাড়ী ছিঁড়ে গেলে গিন্নীকে ভাই সালোয়ার দেবো কিনে—
শুধু ভয় হয় সকল সময় পারবো তো নিতে চিনে?

কলিকাতা হতে তাই বলি ভাই লাহোর নহে ক দূর,
আজ তবে আসি প্রীতি লও দাদা প্রবাসী এ বন্ধুর! *

মডেল টাউন।
২৪শে জানুয়ারী, ১৯৭৩।

* ফাল্গুন মাসে ভারতবর্ষে প্রকাশিত 'কলিকাতার চিঠি'র উত্তর কোন কারণ বশতঃ এতদিন অপ্রকাশিত ছিল। 'কলিকাতার চিঠি' কবিতাটি কবি নরেন্দ্র দেবের রচিত।

শ্রীপ্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরহী কৃষাণ

কয় বিঘা ছিল খামারের ভুঁই আধা চাষ ছিল তাহার সাথে,
সারা বছরের খোরাক চলিত নুন শাকে আর পান্‌তা ভাতে।
আজো তাই আছে তবু কিছু নাই সবি এলোমেলো লক্ষ্মীছাড়া,
বুকখানা মোর ভেঙে দিয়ে গেছে দুঃখ নাহি ক আমার বাড়া।

অঘ্রাণী ধান আসিয়াছে ঘরে এখানে সেখানে রয়েছে পড়ে,
এসে দেখে যাও, কোথা গেলে তুমি, বুকের ভিতরে কেমন করে!
'পৌষে পরব' এসেছে ফিরিয়া, তুমি তো এলে না আবার ফিরি,
দেখে যাও এসে খোকনে তোমার কাঁদিয়া হয়েছে কেমন ছিরি।

উঠানে উঠানে সাদা আল্‌পনা সবার বাড়ীতে নানান সাজে,
তোমার উঠানে গোবরের লেপ পড়েনি—দেখিলে বেদনা বাজে।
কালো গাইটার বাছুর হয়েছে বক্‌না বাছুর দেখ গো আসি,
আমার এ হাতে খায় না সে ঘাস, তারো দুটি চোখ যায় যে ভাসি।

খেজুরের গুড় নূতন উঠেছে, রস ঝরিতেছে নূতন গাছে,
মাচার উপরে নারকেল তোলা, যেমন থুয়েছ তেমনি আছে।
সবাই রয়েছে. কিছুই নাইকো তুমি ছাড়া সব ছন্নছাড়া,
একটা 'চন্দ্রপুলি'র জন্যে বাছাদের চোখে শাওন-ধারা।

দরজার মাথে সিঁদুরের টিপ যেমন দিয়েছ তেমনি আছে,
বাঁশের উপরে লাল ডুরে খানা...কড়ির সিকাটি তাহার কাছে।
কত রাত জেগে গেঁথেছিল সিকা ইঁদুরে কাটিয়া ফেলিছে তায়,
ফিরে এসো তুমি লক্ষ্মী আমার কোনো কথা আমি কব না হায়।

নিজ হাতে তুমি বুনেছিলে চারা ফুল ফুটিয়াছে সে-গাছ ভরে,
'কলমের গাছে' মুকুল এসেছে, দেখিলে না হায় বারেক তরে।
দেখিলে না হায় ছাগলে মুড়িছে তোমার সাধের গাঁদার গাছ,
যেখানে তাকাই শুধু, নাই নাই খাঁ খাঁ করে ওঠে এ-বুক আজ।

ঘরে বুনিতেছে মাকড়সা জাল বাহির উঠানে আগাছা কত,
এসে দেখে যাও লক্ষ্মী আমার আমি যে পারি না সহিতে অত।
ঘরে ফিরি যবে আঁধার ভবন কোনো কিছু আমি পাইনে খুঁজে,
হাবুডুবু খাই ভাবনার স্রোতে ঝিমাই কেবলি চক্ষু বুজে।

জলের ঘটিটা পাইনাকো খুঁজে, খুঁজেও পাইনে·খড়ম জোড়া.
দিন ভর শুধু হয়রাণ সার হেথায় হোথায় কেবলি ঘোরা।
তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বলে না সাঁঝ নাহি পড়ে আমার ঘরে,
ছেলে মেয়েগুলি বিছানায় শুয়ে হাহাকার করে কাঁদিয়া মরে।

চাওনি তো কিছু কিছুই লওনি যেথানে যা সব রয়েছে পড়ি',
ফিরে এসো তুমি লক্ষ্মী আমার এবারের মত ক্ষমাটি করি'।
কিছুই লওনি চলে গেছ তুমি ভেঙে দিয়ে গেছ পাঁজরখানা,
শূন্য এ ঘর হাহাকার করে—নয়নের জল মানেনা মানা।

শ্রীগোপেশ্বর সাহা

ধ্বংস কর

জগৎ জুড়ে রব উঠেছে ধ্বংস কর, ধ্বংস কর,
প্রলয় বিষাণ বাজ্‌লরে ঐ অনলশিখার সঙ্গ ধর।
রুদ্রশিবের তাণ্ডবে ঐ রব উঠেছে তাথৈ তাথৈ,
ভয়ঙ্করী হুঙ্কারিছে, বীর সেনানী বর্ম্ম পর।

চণ্ডী রণে মৃত্যুরূপা ধ্বংস হবে অসুর যত,
মহাকালের শ্মশান মাঝে দিগম্বরী নৃত্য রত।
বদ্ধ ঘরের রুদ্ধ আগল ভাঙল ক্ষ্যাপা মুক্তি পাগল,
সুন্দ উপসুন্দ সহ রক্তবীজের বংশ হত।

ধ্বংস কর ভ্রান্তি মায়া ধ্বংস কর সৃষ্টিছাড়া,
নষ্টামী আর ভণ্ডামীরে কইবে হেঁকে তফাৎ দাঁড়া।
অহংকারের উচ্চ চূড়া, নিশ্বাসে হোক ধূলায় গুঁড়া,
অনৃত হোক্ ভস্মীভূত ঊর্দ্ধে উঠুক্ হাতের খাঁড়া।

আদিম কালের পাপের বোঝা ঘূর্ণী হাওয়ায় যাক্ না উড়ে,
প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় অমল হবে স্বর্ণ পুড়ে।
বর্ণগরব স্বর্ণহরণ, এক সাথে হোক্ দুয়ের মরণ ;
সত্য-কেতু নিত্য উড়ুক মিথ্যুকের ও গৃহের চূড়ে।

অট্টহাসির হট্টগোলে ভাঙল ধনীর অট্টালিকা,
ভিত কেঁপেছে অহংকারীর উঠ্‌ল জ্বলে প্রলয় শিখা।
সাম্যবাদের বৃংহিত ঐ, রুদ্ররাগে দীক্ষিত কৈ ?
পুঁজীবাদীর ভিত্তি কাঁপে, যৌবনে দাও জয়ের টিকা।

ফেলাও পশুর মুখোস তবে সরল পথের যাত্রী চলো,
বক্ষে টানি' আর্ত্তজনে দুঃখীরে নিজ ভ্রাতা বলো।
অশ্রু যাদের গ্রীষ্মে-শীতে, টানো তাদের বুকের ভিতে—
আলিঙ্গনের আলিম্পনে ভাইয়ের দুঃখে ব্যথায় গলো।

ধ্বংস করো অসত্যেরে ধ্বংস করো বিভেদবোধ,
পিছন-পড়ে রইলো যারা তারাই এবার তুলবে শোধ।
চরণতালে চরণ মিলা, গভীর জলে ভাসবে শিলা।
অসম্ভবও সম্ভবিবে, সাম্‌নে চলো ভাঙরে রোধ্।

অত্যাচারীর খড়্গ কাড়ো অসুন্দরের এবার মরণ,
চিত্তে পীতাতঙ্ক-ভীতি সমূলে হোক্ অপসরণ।
স্বাধীনতার সৌধ গড়ো, নাজি-জুজুর ভয়েই জড়ো !
ধ্বংস কর, ধ্বংস কর, ঊর্দ্ধে উড়াও বিজয় কেতন।

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট-ল

কায়স্থ জাতির পরিচয়

শ্রীবিশ্বনাথ সেন, এ্যাটর্নী-এ্যাট-ল

কায়স্থ জাতির পরিচয় সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে যথেষ্ট মতান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। একদল বলেন যে, কায়স্থগণ শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্গত; অপর একদল বলেন যে, তাহা সম্ভব নহে—কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়ের বংশধর। একথা সত্য বটে যে প্রাচীন ক্ষত্রিয়দিগের শৌর্য্য বীর্য্য কায়স্থদিগের মধ্যে অতি অল্প ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু সেই কারণে কি তাহারা জাতির গৌরব হইতে বিচ্যুত হইবে?

কায়স্থদিগের প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে তাহাদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ইতিহাস জানা প্রয়োজন—তাহারা কে, কোথা হইতে এবং কখন তাহাদের উদ্ভব হইল প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা দরকার। এ সম্বন্ধে দুই প্রকার মত আছে। একদল বলেন যে, মহারাজ আদিশূরের রাজত্বকালে গৌড়ে অর্থাৎ উত্তর বঙ্গে (বর্ত্তমান রাজসাহী বিভাগে) ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের অভ্যুদয় হইয়াছিল। মহারাজ আদিশূর রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই উপলক্ষে উত্তরপশ্চিম অঞ্চল হইতে কয়েকজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে পাঁচজন ভৃত্য আসিয়াছিল; তাহারাই বঙ্গীয় কায়স্থের আদি-পুরুষ। কায়স্থজাতির পূর্ব্বপুরুষ ব্রাহ্মণের ভৃত্য ছিলেন, অর্থাৎ শূদ্র; সুতরাং বঙ্গীয় কায়স্থগণ শূদ্র।

এখানে বলা যাইতে পারে যে, আদালতের বিচারে একথা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, বঙ্গীয় কায়স্থগণ শূদ্র। To Cal 688 (Raj Kumar vs. Bisseswar) ও 25 C. W. N. 639 (Beswanath Prosad vs. Soroshibala)। উক্ত দুই মোকদ্দমায় কলিকাতা হাইকোর্ট যে রায় দিয়াছেন তাহাতে কায়স্থদিগকে শূদ্র বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন। হাইকোর্ট একথাও বলিয়াছেন যে, কায়স্থগণ বহুপূর্ব্বে ক্ষত্রিয় থাকিতে পারে কিন্তু বহুদিন কাল শূদ্রকে সকল বিষয়ে অনুকরণ করার ফলে তাহারা শূদ্রে পরিগণিত হইয়াছে। এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান চিহ্ন উপনয়ন; কায়স্থদিগের মধ্যে কদাচ কখনও দুই একজনকে উপনয়ন ধারণ করিতে দেখা যায়। পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে কর্ণভেদ, চূড়াকরণ প্রভৃতি সংস্কার যাহা প্রতি ঘরে ঘরে পালিত হইত তাহা আজ অতি বিরল। অল্প কথায় বলিতে গেলে ক্ষত্রিয়ের বহু কুলপ্রথা কায়স্থরা পালন করেন না পরন্তু তাহারা শূদ্রকে অনেক বিষয়ে অনুকরণ করিতেছে। এখানে বলা যাইতে পারে যে, ক্ষত্রিয়-দিগের মরণ অশৌচ দশ দিন; শূদ্রের একমাস; কায়স্থরা একমাস পালন করেন। কিন্তু সেজন্য তাহারা কি বর্ণ গৌরব হারাইবে? তাহা হইলে আবার প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, তাহাদের মধ্যে যাহারা উপবীত ধারণ করিয়াছেন ও পূর্ব্বের নিয়ম-কানুন পালন করিতেছেন তাহারা ক্ষত্রিয় না শূদ্র? যদি একথা বলা যায় যে, তাহারাই কেবল মাত্র ক্ষত্রিয় বাকি সকলেই শূদ্র তাহা হইলে বড় জটিল ব্যাপার দাঁড়ায়। এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, বিহার কায়স্থ সম্বন্ধে পাটনা হাইকোর্ট 6 Pat 506 (Iswari Prosad vs. Ram Hari) ও 37 Pat 245 (Rajendra vs. Gopal) এই দুই মোকদ্দমায় তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন। আদালতের বিচারে বঙ্গীয় কায়স্থগণ যাহাই ধার্য্য হউক না কেন, আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে আমাদের শাস্ত্রে কায়স্থ-দিগের পরিচয় কি পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বঙ্গীয় কায়স্থদিগের সম্বন্ধে অনেক প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মত এই যে, মহারাজ আদিশূরের রাজত্ব কাল হইতে তাহাদের অভ্যুদয়। কিন্তু আমাদের বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রচনা করিয়াছেন তাহাতে লিখিয়াছেন যে, আদিশূরের বহুপূর্ব্বে গুপ্ত সম্রাটগণের রাজত্ব কালে কিংবা তাহার পূর্ব্বেও "মিত্র," "দাস," "ভদ্র," "পাল" প্রভৃতি বহু কায়স্থ গৌড়ে অর্থাৎ বর্ত্তমান রাজসাহী বিভাগে বাস করিত[১]। আরও দেখা যায় যে, প্রাচীন গৌড় একদিন কায়স্থ সমাজের প্রধান কেন্দ্র ছিল; এক্ষণে বঙ্গদেশে যে সকল কায়স্থ বসবাস করে তন্মধ্যে অনেকেরই একদিন গৌড়ে বাস ছিল[১]। এখন আমাদের দেখিতে হইবে যে, গৌড়ে কায়স্থদিগের উদ্ভব সম্বন্ধে কি কি প্রমান পাওয়া যায়। প্রাচীন কুলজী[২], সংগ্রহীত তাম্রশাসন[৩] পুঁথি প্রভৃতিতে এই মর্ম্মে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গৌড় কায়স্থ চিত্রগুপ্তের দ্বাদশ প্রকার শাখার মধ্যে একটী শাখা। সংগৃহীত কয়েকটি শ্লোক সাধারণের বুঝিবার জন্য নিম্নে দেওয়া গেল।

"চিত্রগুপ্ত বিচিত্র ও চিত্রসেন ভাই
যমের অনুজ বলি কীর্ত্তি কথা গাই।
চিত্র হইতে হইল চারি কুমার
গৌড়, মথুর সকসেন ও ভটনগর।

* *

চিত্রগুপ্ত গেল স্বর্গে বিচিত্র পাতালে
চিত্রসেন পৃথিবীতে আদিবাস রাঢ়ে।
তাহার ঘরেতে পুত্র তিন জন হয়
চিত্রপাল, কীর্ত্তিচন্দ্র, বিচিত্র উদয়।

* *

মোর এক নিবেদন শোন মহাশয়
রাঢ়েতে আছিলেন যখন "বিচিত্র উদয়"
পদ্মিনীর দুই কন্যা বিবাহ করিল
দুই ঘরে দশ পুত্র তাহার জন্মিল।

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস কায়স্থ-কাণ্ডের ২য়াংশ—২০—৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) উত্তর রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা, দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা, রাঢ়ীয় সমাজের বিষয় জিজ্ঞাসা।

(৩) মহারাজ জয়নাগের তাম্রশাসন—১—১৫ পংক্তি দ্রষ্টব্য।
Epigraphia Indica, Vol XIX.

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ নারায়ণ দত্ত মহাশএ
মহানাদ 'ঘোষ', 'বসু', 'মিত্র' মৃত্যুঞ্জয়
এই চাইর পুত্র হইল পদ্মিনীর ঘরে
আর ছয় পুত্র হইল সম্ভবার উদরে
'চন্দ্র', 'সেন', বড় জন 'দত্ত' মহাশএ
হরিহরে 'দাস' 'সিংহ', মহাতেজোমএ
তাহার অনুজ নাহি আর কেহ
সকলের কনিষ্ঠ হইল চন্দ্রভান 'গুহ'।

এখন আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে, কায়স্থজাতির বীজ-পুরুষ অর্থাৎ বিচিত্র দুইবার বিবাহ করিয়াছিলেন। এবং দুই পত্নী হইতে বর্ত্তমান "ঘোষ", "বসু", "মিত্র" "সেন", "দত্ত", "সিংহ", "দাস" প্রভৃতি দ্বাদশ ঘরের সৃষ্টি হয়। এই দশ ঘরই মহারাজ আদিশূরের সময়ে রাঢ় দেশে অর্থাৎ গৌড়ের দক্ষিণাংশে (বর্ত্তমান রাজসাহী বিভাগ) বাস করিত। এই দশ ঘর সিদ্ধ কায়স্থ বলিয়া কুলগ্রন্থে প্রসিদ্ধ। ইহারা যে চিত্রশাখা তাহার কোন সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়া 'কর', 'নন্দী', 'পাল' 'ধর', 'সোম' 'ভঞ্জ', 'রুদ্র', 'চন্দ্র', 'গণ', 'বর্দ্ধন', 'শীল', 'হাতি' 'ভদ্র', 'হাজরা' প্রভৃতি ৮৭টী ঘর কায়স্থ আছে। ইহারাও মূল গৌড়ীয় কায়স্থ। সর্ব্ব-সমেত ৯৯ ঘর কায়স্থ বঙ্গদেশে আছে। শেষে যে ৮৭ ঘর কায়স্থের কথা বলা হইয়াছে তাহারা চিত্রশাখার অন্তর্গত কিনা এ বিষয়ে প্রাচীন গ্রন্থ সকলের মধ্যে বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং পূর্ব্বে যে বলিয়াছি যে, কায়স্থ জাতির উদ্ভব সম্বন্ধে একদল ব্যক্তির মত যে, মহারাজ আদিশূরের সময় হইতে গৌড়ে যাগযজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য কায়স্থ জাতির অভ্যুদয় হয় তাহার ভিত্তি এইখানে। কারণ একথা সত্য যে, গৌড়দেশের নানাস্থানে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের কার্য্য লক্ষ্য রাখিবার ও রাজকীয় ব্যাপার তত্ত্বাবধানের জন্য নানা উচ্চ-পদে কায়স্থ কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে অথবা তাহার পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়গণ আপনাদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিল—অসিজীবী (military) ও মসীজীবী (civilian) (৪)। মসীজীবী ক্ষত্রিয়গণ রাজকীয় ব্যাপার তত্ত্বাবধান অর্থাৎ Secretarial কাজ করিতেন ও অসিজীবী ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধকার্য্য ও দেশরক্ষা কার্য্য করিতেন। মসীজীবী ক্ষত্রিয় হইতে কায়স্থ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। শেষের ৮৭ ঘর চিত্রগুপ্ত শাখা না হইলেও শূদ্র নহে; কারণ তাহাদের প্রত্যেকের গোত্র আছে এবং পুরোহিতের গোত্রপ্রবর অনুসারে প্রত্যেকের গোত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।(৫) শূদ্রগণের কোন গোত্র নাই।

কায়স্থ জাতির আদিপুরুষ সম্বন্ধে অনেকের আবার মত যে, চিত্রগুপ্তই তাহাদের বীজ বা আদিপুরুষ। বলা বাহুল্য, গরুড়-পুরাণে চিত্রগুপ্ত ও বিচিত্র কায়স্থের আদিপুরুষ ও ধর্ম্মরাজানুজ বলিয়া পরিচিত।(৬) চিত্রগুপ্তের জীবনী সম্বন্ধে(৭) আমরা জানিতে পারি যে তিনি দ্বিজ ছিলেন। তাঁহার দুই পত্নী ছিল, ইরা ও দক্ষিণা, উভয়ই ব্রাহ্মণ কন্যা; তাঁহাদের গর্ভে দ্বাদশ সন্তানের জন্ম হয়। প্রাচীন গৌড়ে যে 'ঘোষ', 'বসু' প্রভৃতি উপাধিধারী দ্বাদশ ঘর কায়স্থ চিত্রগুপ্ত-কায়স্থ বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহাদিগকে চিত্রগুপ্তের উক্ত দ্বাদশ সন্তানের বংশধর বলা যাইতে পারে।

এখন আমরা বুঝিতেছি যে, কায়স্থ জাতির আদিপুরুষ চিত্রগুপ্ত বা বিচিত্র যেই হউক না কেন, তিনি যে দ্বিজ ছিলেন সে বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং কায়স্থ জাতির উৎপত্তি যদি দ্বিজ হইতে হইয়া থাকে তাহারা কখনও শূদ্র নহে। আরও প্রমান পাওয়া যাইতেছে যে, তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ রাজকীয় ব্যাপার তত্ত্বাবধান ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কাজ করিতেন তখন তাহারা মসীজীবী ক্ষত্রিয় অর্থাৎ civilian, কারণ, শূদ্রের কাজ ছিল অনুরূপ। ইহা ছাড়া আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বে অনেক ব্রাহ্মণসন্তানের সহিত কায়স্থ-দিগের পূর্ব্বপুরুষের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্য কোন জাতির বিবাহ-প্রথা বিরল ছিল।

আদালতের বিচারে যাহা ধার্য্য হইয়াছে যত দিন না তাহার অন্যথা ধার্য্য হয়, ততদিন উহা ভুল বলা চলে না। কিন্তু আমরা যদি হিন্দু আইন সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করি, আমরা দেখিতে পাইব যে, শূদ্র এবং কায়স্থ এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। (১) কায়স্থ সমাজের সকলেরই গোত্র আছে কিন্তু শূদ্রের তাহা নাই। (২) গোত্র থাকার দরুণ কায়স্থদিগকে বিবাহ ব্যাপারে অনেক নিয়ম মানিয়া কাজ করিতে হয়; ইংরাজীতে ইহাকে prohibited degree বলে; কিন্তু শূদ্রের কোন বাধাবিঘ্ন নাই। (৩) দত্তক গ্রহণ ব্যাপারে কায়স্থদিগকে হিন্দুশাস্ত্রের নিয়ম "পুত্রচ্ছায়াবহনং" আজিও পালন করিতে হয়; কিন্তু শূদ্রদিগের কোন বাধাবিঘ্ন নাই।(৮) তাহারা ইচ্ছা করিলে যে কোন ব্যক্তিকে দত্তক লইতে পারেন; এমন কি নিজ কন্যা বা ভাগিনীর পুত্রকে দত্তক লইতে কোন বাধা নাই।(৯) (৪) দত্তক লইবার কালে কায়স্থদিগকে যথারীতি হোমাদি ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিতে

(৪) Ancient History of India—Smith

(৫) ব্রাহ্মণপাড়ার কুল পঞ্জিকা।

(৬) গরুড় পুরাণ (১৩১৪) ৩২২ পৃষ্ঠা।

(৭) সরল বাংলা অভিধান—সুবলচন্দ্র মিত্র সঙ্কলিত—৫২২ পৃষ্ঠা।

(৮) দত্তক মীমাংসা—Sec—৫—১৮

(৯) (১) দৌহিত্রো ভাগিনেয়শ্চ শূদ্রেষু ক্রিয়তে সুতঃ।
ব্রাহ্মণাদিত্রয়ে নাস্তি ভাগিনেয়ঃ সুতঃ কাচিৎ॥ শৌনক।

(২) দত্তক মীমাংসা—Sec—১—107.

হয় কিন্তু শূদ্রের পক্ষে কিছুর প্রয়োজন নাই।(১০) সেই কারণে অসতী ও অপবিত্র রমণীও শূদ্রদিগের মধ্যে মৃত স্বামীর তরফ হইতে দত্তক লইতে পারে।(১১) কায়স্থ-সমাজে অবৈধ ও জারজ সন্তান মাত্র ভরণ-পোষণ দাবী করিতে পারে কিন্তু শূদ্রদিগের মধ্যে বহুক্ষেত্রে বিশেষতঃ ক্রীতদাসীর পুত্র সম্পত্তির অংশ পাইয়া থাকে।(১২) এইরূপ কায়স্থ ও শূদ্রের মধ্যে এত প্রভেদ আছে যে, সে সকল বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে কায়স্থ ও শূদ্র কখনও এক শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে না। কায়স্থ শূদ্র অপেক্ষা অনেক শ্রেয়ঃ, সুতরাং তাহারা ক্ষত্রিয়।

ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, আদিশূর, বল্লালসেন প্রভৃতি রাজগণের সময় যাগ-যজ্ঞ উপলক্ষে অনেক কায়স্থ বঙ্গদেশে নানাস্থানে রাজ-অনুগ্রহে আধিপত্য স্থাপন করিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে দেশাচার, কুলাচার প্রভৃতির ফলে তাঁহারা নিজাদগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বা বিভাগ গঠন করেন—এইরূপ ক্রমে বর্ত্তমান রাঢ় অর্থাৎ বর্দ্ধমান বিভাগ, বারেন্দ্র অর্থাৎ প্রেসিডেন্সি বিভাগ, বঙ্গজ অর্থাৎ ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থ উৎপন্ন হইয়াছে।

(১০) 20 C. W. N901 (Asita—vs—Niroda), 5 5 Cal770 (Indramani—vs—Beharilal)
(১১) 45 Bomb459 (Mushappa—vs—Kalappa)
(১২) Yagnavalka II—134—135

পুরাতনী

পিঠে-পুলি

৺উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব

পুলি পিঠে—কিবা মিঠে। রোদে পিঠ দিয়ে বসে খাই, আর বাঙ্গালার গুণ গাই! হায়রে আজ যাহারা "মদন ছাবার" মোহে মসগুল্, তারা যদি এই পৌষের মিঠে-মধুর রৌদ্রে পিঠ দিয়া নলেন গুড়ের পায়েসে ডুবাইয়া পুলি-সরু-চাকলি-পিঠে খাইত, তবে আর ঐ নিরাস্ব ছিবরের মত জিনিসগুলা গিলিত না! আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝিত বাঙ্গালীর প্রাণে কত রস—সে রসের কি মাধুর্য্য! ফিরিঙ্গীর ঐ মদন ছাবা বোষ্ট রুটি যেমন শুকনো পোড়া, ফিরিঙ্গীর প্রাণটাও তেমনি কাটখোট্টা; যারা ঐ ফিরিঙ্গীর রাঁধা খাদ্যগুলা খাইয়াছে, তাহাদের জাতিপাত ত হইয়াছেই, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর কোমল মধুর প্রাণখানিও হারাইয়াছে।

আর দেখিয়া যাও, যারা পৌষপার্ব্বণে পুলিপিঠে খায়, পিতৃ-পিতামহের ধারা বজায় রাখে, তাদের কিবা আনন্দ, কিবা উৎসব; বাংলার এই দুর্দ্দিনেও তাদের ঘরে সুখের জোয়ার বহিয়াছে! পৌষ-পার্ব্বণের দিন প্রাতে পিসিমা বলিতেন, দেখিয়া আয়—"পাঁদাড়ে শেয়াল ফুলিতেছে!" এমন মিঠে বাঙ্গালীর এই পুলি পিঠে, যে বনের পশুও ইহার লোভে পুলক-স্পর্শে ফুলিয়া ওঠে! কে তোরা ছাড়িলি রে হতভাগা, এমন সুধা-স্বাদু ঘরের জিনিষ! ছাড়িয়াছিস্ বলিয়াই তোদের এমন দুর্গতি।

অদ্বৈতানন্দ-সাগরে ডুবিতে ডুবিতে এই পিঠে-পুলির রসে মজিলাম। কাজ নাই আমার ভূমানন্দ—অদ্বৈত অনুভূতির নির্ব্বিকল্প সমাধি। আমি জন্ম-জন্মান্তর বাঙ্গালার গ্রাম-অঙ্কে জন্মাইব, ঐ পিঠেপুলিরই অনুপম অনুরাগে। এ আমার মোহ নহে, বুড়া বয়সের লোভও নহে, আজ অদ্বৈতত্বকে ভাল করিয়া অনুভব করিলাম, উহা ত নাস্তিত্ব নহে—উহা যে অস্তিত্বের অমৃতে অমৃতায়মান—'রসো বৈ সঃ'—যাহা আছে সবই সেই রসমহিমায় মহিম-মধুর। তাই আরণ্যক ঋষির সত্যদৃষ্টি—"মধুমৎ পার্থিবং রজঃ"। আমি আজ অনুভব করিয়াছি—আমার বাংলার সবই ভূমার মহিমায় মহিমান্বিত। তাই আমি আজ আমার পিসিমার হাতে গড়া পুলি পিঠের স্বাদ লইতে লইতে সেই অদ্বৈত রসাস্বাদন করিতেছি। বিশ্বাস হয় না? ভালবাসিও, আমার—তোমারও বঙ্গভূমিকে!—তবে পুলি-পিঠের স্বাদে ভূমানন্দই অনুভূত হইবে।

আজ পিঠে-পার্ব্বণ—কাল উত্তরায়ণ! এইটুকু বুঝা চাই। আজ আমরা ভোগের প্রমোদে মাতিয়া উঠি, কাল অম্লান-বদনে সত্যব্রত পালন করিয়া বীর-শয্যা গ্রহণ করি। আমরা কাঙ্গালও নই—ভোগীও নই। আজ আমাদের উৎসব—কাল আমাদের বিসর্জ্জন! এস, আজ পেট পুরিয়া পুলি-পিঠে খাই—বুঝিয়া লই অন্তরের নিগূঢ় অনুভূতি দিয়া মাতৃস্নেহ, খুড়, জেঠি, পিসি, মাসীর উদ্বেলিত মমতা। কাল ব্রত উদ্‌যাপন করিব—দেশের জন্য—আমার সমাজ-সভ্যতা স্বজাতির জন্য—শরশয্যা বরণ করিব, আত্ম-বিসর্জ্জন করিব। পৌষ-পার্ব্বণের পর উত্তরায়ণে নির্দ্দেশ করিতেছে—ভোগের পর—ত্যাগ,—পিঠে খাইতে খাইতে ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। *

* "সন্ধ্যা হইতে উদ্ধৃত।"

রবীন্দ্রবাবুর পত্র

"সাহিত্য সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু"

"মান্যবরেষু

পুরী,
৬ই ফাল্গুন।

চন্দ্রনাথবাবুর প্রতি আমার বিদ্বেষভাব আপনি যেরূপে প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন, তাহা আপনার উপযুক্ত হয় নাই। কারণ, বিষয়টা আপনি কেবল এক দিক হইতে দেখিয়াছেন। আমার পক্ষ হইতে যে দুই একটি কথা বলা যাইতে পারিত, তাহা আপনি একটিও বলেন নাই, সুতরাং আমাকেই বলিতে হইল।

"বাল্য-বিবাহ লইয়া চন্দ্রনাথবাবুর সহিত আমার প্রথম বাদ-প্রতিবাদ হয়। সে আজ বছর দুই তিন পূর্ব্বের কথা। ইতিমধ্যে আমি তাঁহার কোন লেখা সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই।

"আপনার অবিদিত নাই, প্রথম ভাগ সাধনায় মাসিক পত্রের সমালোচনা বাহির হইত। তাহাতে উল্লেখযোগ্য অথবা প্রতিবাদযোগ্য প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত হইত। সাহিত্যে চন্দ্রনাথবাবু যে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সাধনার সাময়িক সমালোচনায় তাহার দুইটি লেখার প্রতিবাদ বাহির হয়—দুই একটি প্রতিবাদ দীর্ঘ হইয়া পড়ায় স্বতন্ত্র প্রবন্ধরূপেও প্রকাশিত হইয়াছিল। চন্দ্রনাথবাবু যখন তাহার পুনঃপ্রতিবাদ করেন তখন তদুত্তরে আমাদের যাহা বক্তব্য ছিল আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম। আহার এবং লয়তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপে উপর্য্যুপরি অনেকগুলি বাদ-প্রতিবাদ বাহির হয়। আপনি যদি এমন মনে করিয়া থাকেন যে, বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর সহিত আমার মতান্তর হওয়াতেই আমি সাধনায় সমালোচনার উপলক্ষ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণপূর্ব্বক আমার বিদ্বেষবুদ্ধির চরিতার্থতা সাধন করিয়াছিলাম, তবে তাহা আপনার ভ্রম—ইহার অধিক আর আমি কিছুই বলিতে চাহি না। "কড়াক্রান্তি" প্রবন্ধে এমন দুই একটি মত প্রকাশিত হইয়াছিল যাহার কঠিন প্রতিবাদ করা আমার একটি কর্ত্তব্যস্বরূপে গণ্য করিয়াছিলাম। আপনি যদি সে প্রবন্ধটী সাধারণ সমক্ষে প্রকাশযোগ্য জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে গুরুতর আপত্তিযোগ্য কিছু না পাইয়া থাকেন তবে উক্ত প্রতিবাদটিকে বিদ্বেষভাবের পরিচায়ক মনে করা আপনার পক্ষে অসঙ্গত হয় নাই।*

"হিং টিং ছট্" নামক কবিতায় আমি যে চন্দ্রনাথ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ করিয়াছি ইহা কাহারও সরল অথবা অসরল কোন প্রকার বুদ্ধিতে কখনো উদয় হইতে পারে তাহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। আপনি লিখিয়াছিলেন "অনেকেই বুঝিয়াছে, যে, এই বিদ্রূপ ও ঘৃণাপূর্ণ কবিতার লক্ষ্য চন্দ্রনাথ বাবু—" এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যাহারা আমার সেই কবিতাটি বুঝিয়াছে তাহারা সেরূপ বুঝে নাই। অবশ্য আপনি অনেককে জানেন, এবং আমিও অনেককে জানি—আপনার অনেকের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি যে অনেককে জানি তাঁহাদের মধ্যে এক জনও এরূপ মহৎ ভ্রম করেন নাই। এবং আমার আশা আছে, চন্দ্রনাথ বাবুও তাঁহাদের মধ্যে একজন।

"চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত মতভেদ হওয়া আমি আমার দুর্ভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করি। কারণ, আমি তাঁহার উদারতা

---

* গত বর্ষের একাদশ-সংখ্যক সাহিত্যে "তর্কবৈচিত্র্য" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধ-প্রসঙ্গে মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের এই পত্র। কিন্তু, এই পত্র, সাহিত্য-সম্পাদককে কেন লেখা হইল, তাহা কেবল এক রবীন্দ্র বাবু ব্যতীত আর কাহারও বুঝিতে পারিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে কথা তিনি কিছুই বুঝাইয়া বলেন নাই। রবীন্দ্র বাবু কোন্ বনিয়াদে আমাদিগকে তর্কবৈচিত্র্যের লেখক স্থির করিলেন? ইহা তাঁহার কবিজনোচিত স্বপ্ন হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে কবিত্ব কিছুই নাই। সুতরাং, পুরাতন বা তাঁহার নিজের নবাবিষ্কৃত সত্যও নাই। তর্কবৈচিত্র্য প্রবন্ধ আমরা নিজে লিখি নাই। অতএব, তাহার মতামতের জন্য আমরা দায়ী নহি। সে বিষয়ে রবীন্দ্র বাবুর যাহা কিছু বক্তব্য, তাহা প্রবন্ধাকারে ও প্রাসঙ্গিক ভাবে লিখিয়া পাঠানই রবীন্দ্র বাবুর উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া আমাদিগকে অনর্থক আক্রমণ করিয়া এই পত্র লেখেন ও প্রকাশিত করিতে অনুরোধ করেন। পরের কথা যাহাই হউক, প্রথমেই রবীন্দ্র বাবুর এই বিষম ভ্রম। পত্র প্রকাশিত করিয়া, তাঁহার এই ভ্রম প্রদর্শন করা আমাদের ইচ্ছা ছিল না; আর সেইজন্যই তাঁহার পত্র আমরা প্রকাশিত না করিয়া, পত্রের দ্বারা পত্রের প্রত্যুত্তর দিয়াছিলাম। কিন্তু রবীন্দ্র বাবু তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন। উপস্থিত বিষয়ে যে তিনি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা প্রকাশিত না হইলে কিছুতেই তিনি নিরস্ত হইবেন না। কাজেই অগত্যা আমরা, তাঁহার পত্র, প্রকাশের উপযুক্ত না হইলেও, প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ করিলাম কেবল তাঁহার অনুরোধে এবং সাধনার অযথা দোষারোপের জন্য। নহিলে, বহুদিনাবধি সাময়িক পত্রের লেখক ও কিয়ৎ পরিমাণে পরিচালক হইয়া রবীন্দ্র বাবু এরূপ বেতালা পত্র লিখিতে কুণ্ঠিত হয়েন না এবং তাহা প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করেন, ইহা সাধারণ্যে প্রকাশ করা তাঁহার সম্মানের পরিচায়ক নহে।

রবীন্দ্র বাবু আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে সকল কথা বলিতেছেন, আমাদিগকে সম্বোধন করার জন্যই তাহাদের একটিরও অর্থ নাই। অতএব সে সকল কথার উত্তর দেওয়া আমরা আদৌ আবশ্যক বিবেচনা করি না। "তর্কবৈচিত্র্য" প্রবন্ধের লেখক যদি আবশ্যক বোধ করেন, দিতে পারেন।
—সাহিত্য-সম্পাদক।

*তা বটে। এই অযাচিত উপদেশের জন্য মাননীয় উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ। তাঁহার এ উক্তির দ্বারা চন্দ্রনাথ বাবুর প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকট হইতেছে সন্দেহ নাই। আর এই অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়া আমাদের "আদর্শ সমালোচনার" দু' একটি ছত্র মনে পড়ে।

ও অমায়িকতার অনেক পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার অধিকাংশ মত যদি বর্ত্তমান কালের বৃহৎ একটি সম্প্রদায়ের মত না হইত, তাহা হইলে তাঁহার সহিত প্রকাশ্য বাদ-প্রতিবাদে আমার কখনই রুচি হইত না। কিন্তু মানুষ কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতে যে কোন কাজ করিতে পারে এ কথা দেশ-কাল-পাত্র বিশেষের নিকট প্রমাণ করা দুরূহ হইয়া পড়ে এবং তাহার আবশ্যকও নাই।

"আপনি লিখিয়াছেন "মানিলাম চন্দ্রনাথ বাবুর মতই অপ্রামাণ্য, সকল সিদ্ধান্তই অসিদ্ধ এবং সকল কথাই অগ্রাহ্য। কিন্তু এই এক কথা একবার বলিয়াই ত রবীন্দ্রনাথ বাবু খালাস পাইতে পারেন। এক কথা বারম্বার বলিবার প্রয়োজন কি? যদি এমন সম্ভাবনা থাকিত যে, চন্দ্রনাথ বাবু নিজের ভ্রান্ত মতসমূহ ত্যাগ করিয়া অবশেষে রবীন্দ্রনাথ বাবুর মত গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলেও এই অনন্ত তর্ক কতক বুঝা যাইত, কিন্তু সে সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই।" মার্জ্জনা করিবেন, আপনার এই কথাগুলি নিতান্ত কলহের মত শুনিতে হইয়াছে, ইহার ভালরূপ অর্থ নাই। কলহের উত্তরে কলহ করিতে হয়, যুক্তি প্রয়োগ করা যায় না, অতএব নিরস্ত হইলাম।

"উপসংহারে সবিনয় অনুরোধ এই যে, আপনি একটা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, নিজের মত যদি সত্য বলিয়া জ্ঞান না করা যায় তবে পৃথিবীতে কেহ কোন কথা বলিতে পারে না। অবশ্য, কেন সত্য জ্ঞান করি তাহার প্রমাণ দিবার ভার আমার উপর। যদি আমার মত প্রচার দ্বারা পৃথিবীর কোন উপকার প্রত্যাশা করি, এবং বিরুদ্ধ মতের দ্বারা সমাজের অনিষ্ট আশঙ্কা করা যায় তবে যতক্ষণ প্রমাণ দেখাইতে পারিব, ততক্ষণ নিজের মত প্রচার করিব ও বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিব ইহা আমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। এ কার্য্য যদি বারম্বার করার আবশ্যক হয় তবে বারম্বারই করিতে হইবে। কবে পৃথিবীতে এক কথায় সমস্ত কার্য্য হইয়া গিয়াছে? কোন্ বদ্ধমূল ভ্রমের মূলে সহস্রবার কুঠারাঘাত করিতে হয় নাই? আমি যাহা সত্য বলিয়া জানি তাহা বারম্বার প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াও অবশেষে কৃতকার্য্য না হইতে পারি, আত্মক্ষমতার প্রতি এ সংশয় আমার যথেষ্ট আছে, তবু কর্ত্তব্য যাহা তাহা পালন করিতে হইবে এবং যদি চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত আমার পুনর্ব্বার মতের অনৈক্য হয় এবং তাঁহার কথার যদি কোন গৌরব থাকে তবে আপনারা যিনি যেরূপ অর্থ বাহির করুন আমাকে পুনর্ব্বার প্রতিবাদ করিতে হইবে।

(স্বাক্ষর) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"পুঃ—

অনুগ্রহ-পূর্ব্বক নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশ করিবেন।

—শ্রীরঃ"

সাহিত্য, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩০০ হইতে উদ্ধৃত।

-তত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীচণ্ডীর অপর নাম দেবীমাহাত্ম্য। দেবী কে? তাঁহার স্বরূপ কি? এবং তাঁহার কার্য্য কি? এই কয়টী প্রশ্নের উত্তর শ্রীশ্রীচণ্ডী-গ্রন্থে উপাখ্যান ব্যপদেশে বলা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে তিনটী উপাখ্যান বা চরিত আছে। প্রথমটী মধুকৈটভবধ-চরিত, মধ্যমটী মহিষাসুরবধ-চরিত তৃতীয় বা উত্তরটী শুম্ভ-নিশুম্ভবধ-চরিত।

এই তিনটী চরিতের ব্যাখ্যানের পূর্ব্বে মেধস মুনি সুরথ রাজার প্রশ্নের উত্তরে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে দেবীর পরিচয় দিয়াছেন:

> নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
> তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম।

তিনি নিত্যা অর্থাৎ সর্ব্বদা বিদ্যমানা এবং এই জগৎই তাঁহার মূর্ত্তি এবং তাঁহার দ্বারাই এই সর্ব্ব অর্থাৎ এই জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

দেবী শব্দ "দিব্" (প্রকাশে) এই ধাতু হইতে উৎপন্ন। দিব্ হইতে দেব তাহাতে স্ত্রী-প্রত্যয় করিয়া দেবী। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে যিনি প্রকাশশীলা। প্রকাশ অর্থাৎ manifestation হইতেছে শীল স্বভাব যাঁহার তিনি দেবী।

দেবী জগৎরূপে প্রকাশিতা হইয়াছেন, তাই তিনি জগৎ-মূর্ত্তি। (জগৎ হইতেছে মূর্ত্তি যাঁহার। বহুব্রীহি সমাসের দ্বারা দেবীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে)। তাহা হইলে মেধস মুনি উক্ত শ্লোকে এমন একটী তত্ত্ব (principle)কে নির্দ্দেশ করিতেছেন যাহা চিরকাল আছেন এবং যাহা জগৎরূপে manifested বা প্রকাশিত হয়েন এবং জগতে পরিব্যাপ্ত থাকেন।

এখন প্রশ্ন উঠে, এই তত্ত্ব বা principleটী কি জাতীয় অর্থাৎ জড় বা চেতন। আমরা শ্রীশ্রীচণ্ডীর সমস্ত চরিত-

গুলি পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইব এই principleটী আদৌ জড় নহে। ইহা চেতন বা conscious.

বৈজ্ঞানিকগণ আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একটা energyর ক্রমশঃ রূপান্তরিত অবস্থা। Energy হইতে matter এবং matter হইতে energyতে transformation নাকি অবিরত চলিতেছে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যম চরিত সমালোচনা কালে আমরা দেখিব মেধসমুনি যে তত্ত্বটীকে (principle) নিত্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহার উৎপত্তির বিবরণে তাঁহাকে তেজঃ বা শক্তি বলিয়াছেন, বরং সকল দেবতার সম্মিলিত শক্তি বা একত্রীভূত শক্তি বলিয়াছেন। শক্তির ইংরাজী প্রতিশব্দ energy। মেধস মুনির নির্দ্দিষ্ট তত্ত্ব (principle) শক্তি বা energy বটে, কিন্তু তাহা বৈজ্ঞানিকের ভাষার energy নহে, ইহা এই আলোচনায় আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব।

আলোচ্য গ্রন্থে মেধস মুনি "নিত্যা" শক্তির অবতারণা করিয়া তাহার তিনটী বিশেষ আবির্ভাবের বিষয় উল্লিখিত তিনটী চরিতের মধ্য দিয়া দেখাইয়াছেন। প্রথম চরিতটীর পটভূমিকা (background) সৃষ্টির প্রাককাল। যোগ নিদ্রাগত বিষ্ণু কারণ সলিলে অনন্ত শয্যায় শায়ীত। নাভি-কমল হইতে ব্রহ্মা সবে উৎপন্ন হইয়া এখনও কমলাসনস্থ। এমন সময় দুইটী অসুর মধু ও কৈটভ বিষ্ণুর কর্ণমূল হইতে উদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ব্রহ্মা উপায়ান্তর না দেখিয়া বিষ্ণুকে যোগনিদ্রাগত দেখিয়া তাহাকে জাগরিত করিবার জন্য যোগনিদ্রার স্তব করিয়া তাঁহাকে বিষ্ণুকে জাগরিত করিতে এবং মধু কৈটভকে সম্মোহিত করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া "দেবী তামসী" বিষ্ণুকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য বিষ্ণুর নেত্র, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় ও বক্ষস্থল হইতে বহির্গত হইয়া অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার নয়ন পথে প্রত্যক্ষ হইলেন। তাহার পর বিষ্ণু জাগরিত হইয়া মধু কৈটভকে বধ করিলেন।

এখন দেখা যাউক, এই আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য কি। এখানে "যোগ-নিদ্রা" কথাটী ব্যবহৃত হইয়াছে। বিষ্ণু যোগ-নিদ্রাগত। প্রশ্ন উঠে বিষ্ণুর পক্ষে নিদ্রা কি করিয়া সম্ভব হয়। যিনি চিদ্ঘন আনন্দময় সৎস্বরূপ তাহার আবার নিদ্রা কি? না, তাঁহার নিদ্রা নাই। এখানে ব্যবহার হইয়াছে "যোগনিদ্রা" কথাটী। সৃষ্টি তখনও হয় নাই, জগৎ তখনও আসে নাই। বিষ্ণুর জগতের সহিত যোগ হয় নাই। জগৎ ব্যাপারে বিষ্ণু তখনও পরিপূর্ণ দৃষ্টি দেন নাই তাই তাঁহাকে "যোগ নিদ্রাগত" বা জগতের সহিত "যোগের অভাবযুক্ত" বলা হইয়াছে। অর্থাৎ জগৎব্যাপার সম্বন্ধে ইচ্ছা বা ঈক্ষণ না হওয়ায় তিনি নিদ্রাগত, এইরূপ বলা হইয়াছে। ঈক্ষণ বা ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগ হইলেই সৃষ্টি আরম্ভ হয়।

ব্রহ্মাকে আমরা সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জানি—বিষ্ণুর নাভি-কমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি অর্থাৎ বিষ্ণুর ঈক্ষণ বা ইচ্ছাশক্তি জগৎব্যাপারে প্রযুক্ত হইবামাত্র তাঁহার যে অবস্থা হইল তাহাই ব্রহ্মা। ব্রহ্মাকে আমরা আমাদের ভাষায় শ্রীবিষ্ণুর মন বলিতে পারি। নাভি আমাদের দেহের অর্থাৎ orgaism-এর প্রাণশক্তির একটী কেন্দ্র। তাই শ্রীভগবানেও নাভির আরোপ করা হইয়াছে। প্রাণশক্তিরও ইঙ্গিত ইহাতে থাকিতেছে। সৃষ্টি ব্যাপার মানেই প্রাণশক্তির লীলা।

আলোচ্য উপাখ্যানটীতে আমরা পাইতেছি ব্রহ্মার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই বিষ্ণুর কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুইটী অসুরের উৎপত্তি এবং তাহারা ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে সমুদ্যত। তথাকথিত জড়-জগতে আমরা জানি কোনও শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইলেই তাহাকে বাধা দেয় আর একটী শক্তি, সেটার নাম "inertia." সৃষ্টির প্রাক্‌কালে সৃষ্টিশক্তির প্রতীক ব্রহ্মাকে বাধা দিল বা হত্যা করিতে উদ্যত হইল cosmicinertia—যাহার নাম করা হইয়াছে মধু ও কৈটভ। মধু কথাটীতে মিষ্টত্বের ইঙ্গিত আছে। কৈটভ অর্থে যে অবস্থায় থাকা যায় সেইটাতেই থাকিতে ইচ্ছা করা অর্থাৎ inertia, আমরা জানি, যদি সম্যক্ চেষ্টা না আসে কোনও প্রযত্নের প্রারম্ভে কেবলমাত্র ইচ্ছার স্ফুরণে কার্য্যসিদ্ধি হয় না। দেখা যায় একটা জাড্য বাধা দেয় অর্থাৎ যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থায় থাকিতে ইচ্ছা করে এবং তাহা মিষ্টও লাগে। ইচ্ছাশক্তি প্রবল না হইলে অবস্থান্তরে যাওয়া সম্ভবপর হয় না। এই মিষ্টলাগা ও একই অবস্থায় থাকিবার ইচ্ছা মধু ও কৈটভ নামে আখ্যাত হইয়াছে। তাই সবেমাত্র ঈষৎ স্ফুরিত ইচ্ছাশক্তি বা ব্রহ্মা ঐ দুই অসুরের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন এবং শ্রীবিষ্ণুর পরিপূর্ণ জাগ্রত ইচ্ছাশক্তি তাহাকে রক্ষা করিল এবং সৃষ্টি ব্যাপার করাইল।

মেধস ঋষি এই উপাখ্যানের দ্বারা যাহা প্রতিপন্ন করিলেন তাহা এইরূপ,—দেবী সৃষ্টির পূর্ব্বে যোগনিদ্রারূপে বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাই তিনি দেবী তামসী। সৃষ্টির ঈক্ষণ হইলে তিনি ইচ্ছাশক্তিরূপে প্রকটিত হইলেন। কমলাসনস্থ ব্রহ্মা ও মধুকৈটভ রূপকের দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তির জগৎরূপে প্রকটিত হওয়ার ক্রমটী দেখান হইয়াছে। দেবী ভগবানের জাগ্রত ইচ্ছাশক্তিরূপে সৃষ্টির মূলীভূতা কারণ এবং জগৎরূপা—ইহাই প্রথম চরিতের প্রতিপাদ্য, এবং এই শক্তি যে জড় নহে ইহাও প্রতিপন্ন হইল। কারণ, বিষ্ণু জড় নহেন চিৎ পদার্থ (consciousness) তাঁহার শক্তি জড় হইতে পারে না। এখানে প্রশ্ন উঠে, যদি ঐশী শক্তি চেতন এবং তাহাই

জগতের কারণ হয় তাহা হইলে বৈজ্ঞানিকের জড় জগৎ কোথা হইতে আসে ? যাহা কারণে নাই তাহা কার্য্যেও থাকিতে পারে না। হিন্দু শাস্ত্রে বলে জড় বলিয়া কোন পদার্থ নাই। যেটা জড় বলিয়া আমরা আমাদের ভাষায় বলি তাহা ঐ ঐশী শক্তির ঘনীভূত (concentrated) রূপ, জড়রূপে প্রতিভাত।

এক্ষণে আমরা মধ্যম চরিত্রটীর আলোচনা করিব। প্রথম চরিতে আমরা পাইলাম সৃষ্টির আদিতে দেবী সৃষ্টির মূলীভূতা কারণ ও সৃষ্টিরূপা হইলেন। সৃষ্টির ব্যাপার চলিল। বৈজ্ঞানিকদের কৃপায় আমরা সৃষ্টির ক্রম যেটা পাইতেছি সেটা এইরূপ :—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম energy ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া প্রথমে inorgani world এ পরিণত হইল, তাহার বহুকাল পরে ক্রমশঃ organism-এর উৎপত্তি। ক্রমশঃ biological জগৎ আসিল। আমরা প্রাণের ও জৈব চেতনার স্ফুরণ দেখিতে পাইলাম। এই প্রাণের ও জৈব চেতনার স্ফুরণ ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া মানবের বিকাশ হইয়াছে। মানবের মধ্যে আমরা আত্ম-চেতনা বা আমিবোধ (self conciousness) দেখিতে পাই। এই আমিবোধ ক্রমোন্নতির ধাপে ধাপে ক্রমশঃ পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই আমিবোধ বা কর্তৃত্ব বোধ যে ঐশী শক্তিরই রূপান্তর তাহাই মধ্যম চরিতে তথা উত্তর চরিতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। পার্থক্যের মধ্যে মধ্যম চরিতের আমি বোধটী অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরের। সেটা আখ্যায়িকার সমালোচনা কালে পরিস্ফুট হইবে।

মধ্যম চরিত্রের নায়ক হইতেছেন মহিষাসুর। মহিষ biological স্তরে একটী বলবান জন্তু। মহিষ বলের প্রতীক। মহিষাসুর এইরূপ একটী প্রচুর প্রাণশক্তি বিশিষ্ট আমিত্বপূর্ণ জীব। সে দেবতাদের রাজ্য জয় করিল এবং দেবতারা স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইলেন এবং অসুর ইন্দ্র হইয়া বসিল। কাজেই দেবতারা "ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া যে স্থানে মহাদেব ও বিষ্ণু অবস্থিত ছিলেন তথায় গমন করিলেন।" এবং নিজেদের দুঃখ নিবেদন করিলেন। তখন হরি, হর ও ব্রহ্মা কুপিত হইলেন। "তারপর প্রথমে অতি কোপপূর্ণ বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শঙ্করের মুখমণ্ডল হইতে প্রচুর তেজ নির্গত হইল এবং ক্রমশঃ ইন্দ্রাদি দেবগণের বদনমণ্ডল হইতে অতি মহৎ তেজঃ নির্গত হইয়া তৎসমস্তই একত্র মিলিত হইল।" অনন্তর সেই "তেজ একত্র হইয়া একটী নারীদেহে পরিণত হইল।" সেই নারী সকল দেবতার শক্তি লাভ করিলেন এবং তিনি ঘোর রণে মহিষাসুরকে বধ করিলেন এবং দেবতাগণকে হৃত স্বর্গরাজ্য দান করিলেন। এই হইল মোটামুটি উপাখ্যান।

এখানে দেবতা ও তাহাদের রাজ্য এবং তাহা অসুর কর্তৃক হৃত হওয়া এই সকল বিষয়ের একটী সংক্ষেপ আলোচনার প্রয়োজন আছে। আমাদিগের শাস্ত্রাদিতে ইন্দ্রাদি বহু দেবতার উল্লেখ আছে। এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন, দেবতাগণ ভগবান নহেন। ভগবান ত্রিমূর্ত্তিতে অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বররূপে ধ্যেয় হইলেও তিনি এক। এবং দেবতা হইতে বিভিন্ন। আমরা বহু দেবতাবাদী হইলেও একেশ্বরবাদী। দেবতা সৃষ্টির মধ্যে একটী বিশেষ স্তরের সৃষ্ট বিদেহ জীব-বিশেষ। তাঁহারা ঐশীশক্তির সৃষ্টি কার্য্যে সাহায্যকারী তৎকর্তৃক সৃষ্ট জীব। এবং তাঁহারা যাবৎ সৃষ্টি অবস্থিতি করেন। যেমন একটা রাজ্য পরিচালনা করিতে হইলে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির অধীনে নানা বিভাগের পরিচালক (Governor) প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ দেবতাদের প্রয়োজন। উদাহরণক্রমে বলা যাইতে পারে সৃষ্টিতে দৃষ্টিশক্তির একটা বিভাগ আছে। নানাস্তরে দৃষ্টিশক্তির ক্রমশঃ অভিব্যক্তি হইতেছে এবং তাহা একটী কেন্দ্রীভূত শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। জগতের মূলীভূতা ঐশীশক্তি এই কেন্দ্রটীর ভার একটী দেবতাকে দিয়াছেন, তিনি হইতেছেন সহস্রচক্ষু ইন্দ্র। অর্থাৎ তিনি সহস্র অর্থাৎ অসংখ্য চক্ষুর দ্বারা সমস্ত জগতের দৃষ্টিশক্তির কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। এইরূপ অন্যান্য দেবতার বিষয়ও বুঝিতে হইবে। আমরা চক্ষুদ্বারা দেখি, আমরা মনে করি আমরা দেখি কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের দৃষ্টিযন্ত্র পরিচালনা ব্যাপারে আমাদের নিজেদের কোনও অধিকার নাই। সেটীর পরিচালনা করিতেছেন ইন্দ্র। এখন যদি আমি সাধনার দ্বারা এমন শক্তি অর্জ্জন করি যে আমার দৃষ্টিশক্তি এবং দৃষ্টিযন্ত্র অর্থাৎ চক্ষু আমার সম্পূর্ণ করায়ত্ত হইল ; অর্থাৎ আমার দেখা না দেখা সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছাধীন, তাহা হইলে আমার এই কার্য্যের দ্বারা ইন্দ্র রাজ্যচ্যুত হইবেন অর্থাৎ আমার চক্ষুর ব্যাপারে ইন্দ্রের আর কোনও হাত থাকিবে না। তাহা হইলে সৃষ্টি-শৃঙ্খলা ব্যাহত হইবে। মহিষাসুর এইরূপ কিছু করিয়াছিল বুঝিতে হইবে। সে তাহার আমিত্বকে এতটা শক্তিশালী করিয়াছিল যে তাহার দেহ সম্পর্কে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাহাদের অধিকার চ্যুত হইয়াছিলেন—তাহা সৃষ্টি ব্যাপারে বিঘ্ন আনিল (অর্থাৎ equilibrium unsettled করিল) কাজেই দেবীর আবির্ভাব হইল।

এখানে প্রতিপাদ্য হইল Organism এর "আমি" শক্তি এবং দেবতাদের শক্তি সবই এক মূলীভূত ঐশী শক্তির বিকাশ এবং সম জাতীয় লইয়া একে অন্যের রাজ্য অধিকার করিতে পারে না এই ঐশীশক্তির আনুগ হইয়া "আমি" থাকিতে পারে, ইহার প্রতিকূলতা করিয়া দেবতার অধিকার লাভ করিতে যাইলে তাহার বিনাশ হইবে। মূল ঐশী শক্তি সৃষ্টির পশ্চাতে রহিয়াছেন। দেবতাগণ সৃষ্টি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থ নিজরাজ্য

পাইবার প্রয়াসে তাহার শরণাপন্ন হওয়া মাত্রই সকলের সম্মিলিত তেজকে অবলম্বন করিয়া দেবী আবির্ভূতা হইলেন। এই মহিষের দ্বারা স্বর্গরাজ্য অধিকার ও সম্মিলিত দেবতার শক্তি হইতে দেবীর আবির্ভাব প্রভৃতি হইতে সৃষ্টির এই স্তরেও ঐশী শক্তির পরিব্যাপ্তি স্পষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা উত্তর চরিত অথবা শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধের উপখ্যানটী আলোচনা করিব। প্রথম চরিতে আমরা evolution-এর প্রথম স্তরে এবং দ্বিতীয় চরিতে আমরা biological evolution-এর ব্যাপারে ঐশী শক্তির লীলা দেখিয়াছি। এইবার আমরা জৈব চৈতন্যের (Human consciousness) এর একটী বিশেষ ব্যাপারের সম্পর্কে ঐশী শক্তির লীলা দেখিতে পাইব। উত্তরচরিতের প্রধান নায়ক শুম্ভ ও নিশুম্ভ, তারপর আরও কয়েকটী গৌণ নায়ক আছেন; তন্মধ্যে প্রধান রক্তবীজ। এই কয়টী অসুরের দ্বারা জৈব চৈতন্যের বা human consciousness-এর কয়েকটী দিক দেখান হইয়াছে।

এই উপাখ্যানটী বলার আগে জৈব চৈতন্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটী সংক্ষেপ আলোচনা আবশ্যক। সৃষ্টির ক্রম-বিকাশ হইয়া আমরা অর্থাৎ মানুষ self-conscious হইয়াছে অর্থাৎ তাহার "আমি" জ্ঞান হইয়াছে। সে জ্ঞান "আমি খাই", "আমি পরি" "আমি সুখী", "আমি দুঃখী" ইত্যাদি অর্থাৎ কোন একটী ক্রিয়ার ভাষায় আমি বোধ জাগে। ইহাকে আমাদের শাস্ত্রে "অহংকার" বা অস্মিতা বলিয়াছে। এই "আমি জ্ঞান" আবার আমাদের দেহকে আশ্রয় করিয়া আছে একটা নামের ও রূপের সঙ্গে জড়াইয়া আছে—আমি শম্ভু শর্ম্মা অর্থাৎ আমি বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ বংশ জাত শম্ভু নামক ব্যক্তি এইরূপ একটা বোধ আছে। এইটীকে নাম-রূপাশ্রিত অহংকার বলে, ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ personality; আর একটা বোধ আছে সেটী ও অহংকার—সেটী নাম-রূপাশ্রিত নহে সেটী মাত্র "আমি"—ইংরাজীতে যাকে বলে individuality বা ব্যক্তি বোধ। জন্ম-পরম্পরা আলোচনা করিলে এই individuality-র আমিটা বোঝা সহজ হইবে। আমি এজন্মে "শম্ভু শর্ম্মা" পূর্ব্বজন্মে ছিলাম "রাম শর্ম্মা" তাহার পূর্ব্বে ছিলাম "অভিরাম" তাহা হইলে আমি কোনটা? আমি কোনটাই নহি। "আমি আমি" এইটি individuality বোধ। কিন্তু ভেদজ্ঞান সম্বলিত। বিশুদ্ধ অহং নয়। ইহাও অহংকার।

আলোচ্য গ্রন্থের উত্তর চরিতে শুম্ভাসুর এই individuality-র প্রতীক, নিশুম্ভ তাহার অনুজ personality-র প্রতীক এবং রক্তবীজ তাহার সেনাপতি ঐ ক্রিয়ার ভাষার আমি বা অস্মিতা। এই অসুরদ্বয় শুম্ভ, নিশুম্ভ ও মহিষাসুরের ন্যায় দেবতাগণের স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া দেবতাগণকে তাড়াইয়া দিয়া রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল। মধ্যম চরিতের ন্যায় আবার দেবতারা নিরুপায় হইয়া পূর্ব্বদত্ত দেবীর বর স্মরণ করিয়া "গিরিরাজ হিমালয়ে গমন করিয়া দেবী বিষ্ণুমায়াকে সম্যক্‌রূপে স্তব করিলেন।" এই স্তবটী আলোচনা করিলে দেবীর চেতনত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্ব সর্ব্বরূপত্ব সংসাধিত হয়। যাহা হউক, দেবী পার্ব্বতী সে সময় গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন। তিনি স্তবনিরত দেবতাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহার স্তব করিতেছ? এই প্রশ্নের শেষ হইতে না হইতেই দেবী শিবা পার্ব্বতীর শরীর-কোষ' হইতে বিনির্গতা হইয়া উত্তর দিলেন, "ইহারা আমার স্তব করিতেছে।" দেবী শিবা বা মঙ্গলকারিণী শক্তি পার্ব্বতীর শরীর-কোষ হইতে বিনির্গতা হইয়া দেবতাগণের ইষ্টকার্য্যে প্রবৃত্তা হইলেন। তাঁহার অতি মনোহর রূপ শুম্ভ ও নিশুম্ভের ভৃত্য চণ্ড ও মুণ্ড দেখিতে পাইলেন। তাহাদের প্রমুখাৎ শুম্ভ তাঁহার রূপ-বর্ণনা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে পাইতে বাসনা করিলেন এবং তৎ-সকাশে দূত প্রেরণ করিলেন। দূতের দ্বারা যে বার্ত্তাটি পাঠাইয়াছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।

মম ত্রৈলোক্যমখিলং মম দেবা বশানুগাঃ।
যজ্ঞভাগানহং সর্ব্বানুপাশ্নামি পৃথক্ পৃথক্॥

"সমস্ত ত্রিলোক আমার, সকল দেবতারা আমার বশীভূত ও অনুগত, আমিই বিভিন্নরূপে সমগ্র যজ্ঞভাগ ভক্ষণ করিয়া থাকি অতএব তুমি আমাদের নিকট আগমন কর, আমাকে অথবা আমার অনুজ নিশুম্ভকে ভজনা কর।

দেবী ইহার প্রত্যুত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহাও প্রণিধান-যোগ্য। দেবী দূতকে বলিলেন, "তুমি সত্যই বলিয়াছ শুম্ভ যে ত্রিলোকের অধিপতি ও নিশুম্ভ যে তদ্রূপ এ বিষয়ে তুমি একটুও মিথ্যা বল নাই; কিন্তু পূর্ব্বে একটা প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলাম সেটী এই:—

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥

অর্থাৎ যিনি আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিবেন অথবা যিনি আমার তুল্য বলশালী, তিনিই আমার পতি হইবেন।

এই উত্তর-প্রত্যুত্তরের পর সংগ্রাম বাধিল, তারপর একে একে সকল সেনাপতি ক্রমে নিশুম্ভ ও শুম্ভ বধ হইল।

এই আখ্যায়িকায় আমরা দেবীর আবির্ভাবের যে বিবরণটী পাইলাম তাহা বড়ই অর্থপূর্ণ। মধ্যম চরিতে আমরা পাইয়াছি যে, তিনি সকল দেবতার সম্মিলিত শক্তি অবলম্বন করিয়া আবির্ভূতা হয়েন। একটা সন্দেহ হইতে পারে যে, সেখানে যে শক্তিটী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন তাহা সকল দেবতার শক্তিকে অপেক্ষা করেন। অর্থাৎ সকল দেবতার শক্তি না মিলিত হইলে ঐ শক্তি উৎপন্ন হইত না। অর্থাৎ যেন তাহার স্বতন্ত্রতা নাই। উত্তর চরিতের বিবরণে

আর সে সন্দেহের অবকাশ নাই। তিনি পার্ব্বতীর শরীর-কোষ হইতে পার্ব্বতীর কোনও রূপ ইচ্ছার প্রেরণা না থাকা অবস্থায় স্বতঃ বিনির্গতা হইলেন। এইখানে আরও একটী বিষয় প্রণিধানযোগ্য। "পূর্ণের" অংশও "পূর্ণ"; তাহা সকল অবস্থাতেই "পূর্ণ" এই সত্যটীও ঐ আবির্ভাব ব্যাপারে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। পার্ব্বতীর চৈতন্য অংশ হইতে পূর্ণা শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে।

সাধনার দ্বারা শুম্ভ-নিশুম্ভ অহংকারের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, ভেদ জ্ঞানের আমির শেষ সীমায় পৌছিয়াছে। দেবতাদের সমস্ত অধিকার (ত্রিলোকের অধিকার) কাড়িয়া লইয়াছে। জৈব চৈতন্য ও দেবতাদের চৈতন্য একজাতীয় বলিয়া ইহা সম্ভব। এই রাজ্যাধিকার ব্যাপারে এই একত্বটা প্রমাণিত হইয়াছে। এবং ভেদজ্ঞানে যে দেবত্ব লাভ করা যায় এটাও দেখান হইয়াছে। কিন্তু ভেদজ্ঞান রাখিয়া ঐশী শক্তিকে আয়ত্ত করা যায় না এইটাই শুম্ভ বধ করিয়া দেখান হইয়াছে। শুম্ভ যখন দেবীকে পত্নীত্বে বরণ করিতে চাহিল তখন যুদ্ধ বাধিল, এবং বহুকাল বিস্তৃত যুদ্ধের পর শুম্ভ নিশুম্ভ বিনষ্ট হইল। অর্থাৎ ভেদজ্ঞানের নাশ হইয়া ঐশী শক্তির সহিত একত্ব স্থাপন হইল ইহা আমরা যুদ্ধের বিবরণে, বিশেষ করিয়া, রক্তবীজ বধের বিবরণ-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই। রক্তবীজকে কাটিলে তাহার রক্ত ভূমিতে পড়িয়া শত শত রক্তবীজ উৎপন্ন হইতে থাকে। তাই দেবী স্বীয় বিভূতি কালিকাদেবীকে আহ্বান করিয়া রক্তবীজের রক্ত ভূমিতে পড়িবার পূর্ব্বেই পান করিতে আদেশ দিলেন। এইরূপে রক্তবীজের ধ্বংস সাধন হইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, রক্তবীজ অস্মিতা বা অহংকারের প্রতীক। এই অহংকারের বধ সাধন অতীব দুঃসাধ্য। আমরা যতই কেন চেষ্টা করি না, অহংকার কোন না কোন রূপে দেখা দেয়। 'আমার' অহংকার নাই বলিলে অহংকারেরই প্রশ্রয় হয়। কিন্তু জাগতিক সমস্তই ঐশী শক্তির লীলা, এইরূপ দৃঢ়বোধ জন্মিলে সমস্ত কার্য্য তাহাতে অর্পণ করিতে হয়, এইরূপ করিলে ঐশী শক্তির সহিত একত্ব স্থাপিত হয় এবং অহংকার দূর হয়। যুদ্ধ প্রসঙ্গে এইটাই বিপরীত ভাবে বলা হইয়াছে। দেবী রক্তবীজের রক্ত পান করিয়া তাহার বধ সাধন করিলেন। রক্তপানই একত্ব সাধন।

রক্তবীজ বধের পর নিশুম্ভ ও শুম্ভের বধ সাধন হইল। অহংকারেরই তিনটী দিক রক্তবীজ, নিশুম্ভ ও শুম্ভ। উপাখ্যান-বশে তাহাদের পৃথক পৃথক বধ সাধন দেখাইলেও রক্তবীজ-বধের সহিতই তাহাদের নাশ হইয়াছে। এবং এই নাশের প্রধান ব্যাপার হইল ঐশী শক্তিতে অহংকারের লয় হওয়া।

অতএব, উত্তরচরিতের প্রতিপাদ্য হইতেছে ভেদজ্ঞানের "আমির" সাধনার পরাকাষ্ঠা লাভ করিলে হয় ত মানুষ দেবত্ব লাভ করিতে পারে—যেমন শুম্ভ করিয়াছিল; কিন্তু ভেদজ্ঞানের দ্বারা ঐশী শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারে না। সে চেষ্টায় তাহার বিনাশ হইবে এবং ঐশী শক্তিই জয়ী হইবেন। এবং ভেদজ্ঞানের আমিকে গ্রাস বা নাশ করিয়া তাহার বিলোপ সাধন করিবেন অর্থাৎ জৈব চৈতন্য ও ঐশী শক্তির একত্ব স্থাপন হইবে।

দেবীমহাত্ম্যের আলোচনায় আমরা দেখিলাম, সৃষ্টির আদিতে অবচেতন ক্ষেত্রে ঐশী শক্তির প্রেরণা, প্রাণশক্তির ক্ষেত্রেও সেই শক্তিরই লীলা এবং জীব-চৈতন্যের মধ্যেও অহংকাররূপে সেই একই ঐশী শক্তি বিদ্যমানা। ভেদজ্ঞানে জীব আত্মশক্তি বা অহংকারের আশ্রয় করিলেও অবশেষে তাহাকে ঐশী শক্তির আনুগত্য স্বীকার করিতেই হইবে। নতুবা তাহার মুক্তি নাই।

ততঃ কিম্?

গঙ্গা-সমীরণ

বাঙ্গলা দেশের তথাকথিত দুর্ভিক্ষ উপলক্ষ করিয়া রাজনীতির আখড়ার বাঞ্ছিত দল যে overdramatisation করিয়াছিলেন, সেই অতিরঞ্জনের অসত্য একেবারে হাতে হাতে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহারা মিথ্যা রটনা করিয়াছিলেন যে, কলিকাতাতে নাকি সহস্র সহস্র কঙ্কালসার নরনারী মূত্র পুরীষ-সিক্ত পথে-পার্কে মৃত্যুর অপেক্ষায় বসিয়া আছে। এই সাংঘাতিক সংবাদে গঙ্গা-সমীরণ বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি কলিকাতা এবং শহরতলী পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন এবং চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন হওয়াতে উক্ত প্রোপাগাণ্ডার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার ১৫ই অগ্রহায়ণ তারিখের বিবৃতিতে প্রকাশ :—

(১) আমি কলিকাতা ও শহরতলীর পথ-ঘাট, পুষ্করিণী-পার্ক, অলি-গলি, মায় স্লিট-ট্রেঞ্চ পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া আসিলাম। দুর্গন্ধ-বিকারক কোনও বস্তু নাই। চক্ষু বা নাসিকাগ্রাহ্য কোনও ময়লার পরিচয় পাওয়া গেল না।

(২) কলিকাতার কোনও জায়গাতে কঙ্কালসার নজরে পড়িল না—অর্থাৎ পত্র-পত্রিকার মারফৎ যে রকম ছবি দেখা গিয়াছিল, তাহা মিথ্যা এবং সাজানো বলিয়া মনে হয়।

(৩) কলিকাতার অধিকাংশ জায়গাতে ভিখারী দেখিতে পাইলাম না—প্রায় লণ্ডনের মতন হইয়া উঠিয়াছে। যে-সকল কাঙালী কালীঘাট "চেম্বার" জোগাড় করিতে পারিয়াছে, তাহাদের কারবার জোড় চলিতেছে, কারণ যুদ্ধের বাজারে অনেক লোক আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়া অজস্র টাকা লুটিতেছে এবং শনিবারে মায়ের মন্দিরে গিয়া সস্তায় পুণ্যার্জ্জন করিতেছে। লাটসাহেবের প্রতিবাসী কতকগুলি ভিক্ষুককে অল্পদিন আগেও গভর্ণমেণ্ট হাউসের চারিদিকে ফুটপাথে দেখা যাইত; তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি চেনা-মুখ এবার খুঁজিয়া পাইলাম না। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনেও সেই অবস্থা। তথাকথিত Destitute-দের তো চেহারাও দেখিতে পাইলাম না। বোধ হয় নিশ্চয় নিখিল-বঙ্গ দুর্গত সম্প্রদায়ের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ আহার, বাস, পরিচ্ছদ, শিক্ষা, চিকিৎসা, মেয়ের বিবাহ, ছেলের চাকরী ইত্যাদি যাবতীয় সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের জন্য লাইফ্ ইন্সিওর্যান্স এবং ওল্ড্ এজ্ পেন্শনের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে শুনিলাম এবং তদুপলক্ষে একটি কমিশনও গঠিত হইবে। কমিশনারদের উচ্চ বেতন এবং অল্প কাজ। বর্ণ-হিন্দু ছাড়া যে কেহ দরখাস্ত মুশাবিদা করিয়া রাখিতে পারেন।

(৪) ফুটপাথে কোথাও ভিখারী দেখিতে পাইলাম না। পথ-ঘাট পরিষ্কার। কলিকাতার কোনও দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা কিছুদিন যাবৎ সম্পাদকীয় মন্তব্যের মারফাৎ অনেক মিথ্যার আবর্জ্জনা পরিবেশন করিতেছিলেন—পাঠক সম্প্রদায় তাহা অমৃতজ্ঞানে গ্রহণ করিতেছিল। এবার দেখিলাম, আবর্জ্জনা-স্তূপ দূরীভূত হইয়াছে। উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য "সিধে" হইয়াছে; সম্পাদকীয় স্তম্ভ "শাদা" হইয়াছে—তুষারকান্তি ধারণ করিয়াছে। শোনা যাইতেছে—উক্ত পত্রিকা পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হিন্দুর পুণ্যময় তীর্থস্থান প্রয়াগ সঙ্গমে আপিসের মস্তিষ্ক পাঠাইয়া দিতেছে—মস্তিষ্ক অথবা অন্য কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সেকথা এখনো সঠিক জানা যায় নাই।

(৫) সিনেমা-থিয়েটার ইত্যাদি জায়গাতে এতো ভীড় যে টিকেট পাওয়া গেল না।

(৬) ইচ্ছা ছিল একবার মফঃস্বলের অবস্থাটা নিজের চোখে দেখিয়া আসি। কিন্তু যাই কিসে করিয়া? রেলের টিকিট জোগাড় করিতে পারিলাম না; শুনিলাম ভাগ্য এবং মুরুব্বির জোর না থাকিলে আজকাল কোনও বিষয়ে কোনও আশা নাই। কিন্তু এ কথা ঠিক যে কলিকাতার অবস্থা যখন এতো ভাল, পল্লীগ্রামের অবস্থা আরও অনেক ভাল—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, কারণ তাহা নিঃসন্দেহ।

(৭) খাদ্যাভাবের নামে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এবং পঞ্চ মহাদেশচুম্বী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নানাস্থান হইতে জল-স্থল-অন্তরীক্ষ পথে এতো খাদ্য আসিয়া পড়িয়াছে এবং তাহার উপরে বঙ্গদেশে এ বছর যেরূপ Bumper Crop হইয়াছে—তাহাতে ঘোর আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে যে, এই প্রদেশে অতি শীঘ্রই অতি ভোজন এবং তজ্জনিত অজীর্ণ রোগের মহামারী দেখা দিবে। ইহার একমাত্র প্রতিকার—খাদ্যদ্রব্য আটক করিয়া স্থানান্তরে রপ্তানি করা।

৮। উপসংহার

∴ প্রমাণিত হইল যে—

(ক) এ বছর বাঙ্গলাদেশে দুর্ভিক্ষ নাই

(খ) তথাকথিত দেশনেতা এবং সংবাদপত্রগুলি মিথ্যাবাদী—

(গ) ভারতবর্ষ স্বাধীনতালাভের যোগ্য নয়।

[Q. E. D.

পুস্তক ও আলোচনা

মধুমতী ঃ (কাব্যগ্রন্থ)—শ্রীসুরেশ বিশ্বাস প্রণীত, উষা পাবলিসিং হাউস, ৯০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, মূল্য—এক টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে **দীপশিখা** ও **কলহংসের** কবি শ্রীযুক্ত সুরেশ বিশ্বাসের একচল্লিশটী কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বর্ত্তমান যুগের অন্যতম বিশিষ্ট শক্তিশালী কবি। তাঁহার বলিষ্ঠ কাব্য-রচনাপদ্ধতি তাঁহাকে যশস্বী করিয়াছে।

'দীপশিখা' কবির লাবণ্য-প্রভাতের প্রথম স্পন্দন। তাঁহার মধ্যে পল্লীমাতার পুণ্যশ্রী ও সরল মর্ম্মস্পর্শী গ্রাম্য-সুরের আবেষ্টনী দেখা যায়। পরবর্ত্তী 'কলহংস' পূর্ব্ববঙ্গের সুজলা সুফলা শ্যামা প্রকৃতির স্নেহমাধুর্য্য ও পল্লীজীবনের ফসলে পরিপূর্ণ। উক্ত দুইখানি গ্রন্থ রসিকসমাজের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে সুরেশ বিশ্বাসকে পল্লী-কবি হিসাবে শুধু দেখা যাইতেছে না, যুগের কবিরূপেও তিনি ধরা দিয়াছেন। 'মধুমতীর' অন্তর্নিহিত রস ও অনুপ্রাণনা অন্তর্লোকে আনন্দ সঞ্চার করে।

প্রথম কবিতাগুচ্ছ **উদ্গাত্রীর** ভিতর প্রশস্তি। কবির অধ্যাত্মপথের এষণা ইহার মধ্যে আয়াত। রবীন্দ্রনাথ, প্রভু জগবন্ধু ও 'কালিদাসের প্রতি' যে অর্ঘ্য দেওয়া হইয়াছে তাহা ভাব-সৌন্দর্য্যে পূর্ণ।

'অন্তরের অরুমাল্যে' কবি বলিতেছেন—

"হৃদয়ের অর্ঘ্য-মাল্য এমনি নিঃস্বার্থ সমারোহে,
সাজাও গোপনে কবি, আত্মপ্রীতি মোহে!
ধন নয়, মান নয়, নিন্দাস্তুতি সমবস্তু জানি'
অজপা মন্ত্রের ছন্দে পাদপদ্মে অশ্রু অর্ঘ্য দানি'
রাখিও প্রণাম,
প্রসন্ন নয়নদ্যুতি বিচ্ছুরিত চিত্তদলে পূর্ণ হোক তব মনস্কাম!

এখানে "অজপা মন্ত্রের ছন্দে" প্রয়োগটির ভিতর বিশিষ্টতা আছে।

দ্বিতীয় গুচ্ছ—খরস্রোতা। রোমান্টিক ভাব-প্রবাহের বেগবতী গতি স্বপ্নময় পটভূমির উপর রূপচ্ছন্দা হইয়াছে। হৃদয়ের বালুবেলায় খরস্রোতা কাব্যলক্ষ্মীর স্নিগ্ধপ্রভা বিকীর্ণ করিয়াছে।

তৃতীয় গুচ্ছ—তটিনী। ইহার ভিতর কয়েকটী গাথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা অতীতের ঐতিহ্য হিসাবে এক-দিকে যেমন মূল্যবান, অন্যদিকে তেমনি ভাবে ও ভাষায় হৃদয়গ্রাহী।

মানব-জীবনের সমালোচনা ও দার্শনিকতা তৃতীয় গুচ্ছের স্তরে স্তরে আন্দোলিত। বহিঃপ্রকৃতির আলিম্পনার উপর অন্তঃপ্রকৃতির প্রেম-বিগ্রহ-স্থাপনার কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। কবির মানবিকতা আছে, যাহা একান্ত দুর্লভ।

চতুর্থ গুচ্ছ—স্নিগ্ধা। কতিপয় রসোত্তম ভাবগূঢ় কবিতার সহিত পরিচয় ঘটিল। এ শ্রেণীর কবিতা অনুভূতি-প্রধান। 'মধুমতীর' চারিটি রূপই মনের গতিপথে নানা ভাবের দ্যোতিত-প্রভ। শব্দ-সংযোজনা, ভাবের অভিব্যক্তি, বলিষ্ঠ ভাষা, ছন্দবৈচিত্র্য, ধ্বনি-মাধুর্য্য, ব্যঞ্জনা, রসোত্তীর্ণ প্রসাদগুণ, বিশিষ্ট লিখন শৈলী এবং নবতর ভঙ্গিমার একত্র সমাবেশে আলোচ্য কাব্য-গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সাময়িক পত্রিকার অনুগ্রহপুষ্ট সাম্প্রতিকগণের কাব্যরচনা উত্তরোত্তর যেরূপভাবে অপকর্ষ আনিতেছে তাহাতে মনে হয়, বঙ্গভারতীর মন্দির অলঙ্কৃত করিবার মত শক্তিশালী কবির সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। সেদিক দিয়া বিচার করিলে 'মধুমতী'র উৎকর্ষ গ্রন্থকারের কবি-প্রসিদ্ধি সহজাত শক্তি ও প্রতিভা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। আশা করা যায় গ্রন্থখানি রসিক-সমাজে সমাদৃত হইবে। 'মধুমতী' পাঠ করিয়া এরূপ আনন্দ লাভ করা গেল যে, অকুণ্ঠচিত্তে গ্রন্থকারকে অভিনন্দিত করা যাইতেছে। —শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

অনবগুণ্ঠিতা :—শ্রীনবগোপাল দাস প্রণীত উপন্যাস। জেনারেল প্রিণ্টার্স এ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—২॥০ টাকা মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থে পাশাপাশি মুখ্য চারিটি চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। অমল, প্রতিমা, প্রতাপ ও সাধন। প্রতিমা অমলের স্ত্রী, প্রতাপ ও সাধন অমলের বন্ধু। গ্রন্থের যেখানে সুরু হইয়াছে, সেখানে দেখা যায়, অমল ও প্রতিমার সুখী দাম্পত্য-জীবন তাহাদের স্বল্প পরি-বেষ্টনীর মধ্যে একটিমাত্র সুষ্ঠু সন্তান-কামনার স্বপ্ন-মুখর হইয়া উঠিয়াছে। অমল ডাক্তার, সর্ব্বদা রিসার্চ লইয়া ব্যস্ত, প্রতিমা শিল্পী। যখনই দুঃখের চাপ অত্যুচ্চ হইয়া উঠিত, স্ব স্ব ক্রিয়াগুলির মধ্যে মনঃসংযোগ করিয়া অন্ততঃ কিছুটা খণ্ডকালের জন্যও উভয়ে আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিতে চাহিত। এম্‌নতর একটা মনোবিকলন-মুহূর্ত্তে প্রথম বন্ধু প্রতাপের আবির্ভাব।

ইহার পরে, যেখানে পট-পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সেইখানেই সাধনের আবির্ভাব। অমলের সহিত সাধনের পরিচয় বিলাতে। নিঃস্ব প্রাণী সাধন। আত্মীয়-পরিজনহীন সে সংসারে, কোথাও এতটুকু শান্তি বা সান্ত্বনা তাহার জন্য কাহারও প্রাণে গচ্ছিত নাই। এই অবস্থায় বিলাতে একটি নারীর প্রেমে সে আবদ্ধ হয়; কিন্তু নিয়তি তাহাদের মিলনের পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। অমলের কাছে কিছুই অজ্ঞাত ছিল না। পরে যখন সাধন কলিকাতায় ফিরিয়া বন্ধুত্বের দাবীতে অমলের বাড়ীতে আসিয়া উঠিল এবং প্রতিমাকে নাম ধরিয়া ডাকিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল, অমল তাহাকে বিন্দুমাত্র বাধা দিল না, কিন্তু তাহাতে করিয়া সে যে একেবারে সংশয়মুক্ত হইল, তাহাও নয়। ইহা তাহার আত্মকেন্দ্রিক। প্রতিমা বন্ধু-পত্নি হইলেও তাহার আশ্রয়ে আসিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহার হৃদয় জয় করিতে সাধন উন্মুখ হইয়া উঠিল। ক্রমাগত দিন যাপনের পর যথার্থই প্রতিমা একদিন অমলের অনুপস্থিতিতে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে একেবারে সাধনের কাছে সমর্পণ করিল।

গ্রন্থের চরিত্র-সৃষ্টির দিক দিয়া অনবগুণ্ঠিতা নাম সার্থক হইলেও ইহাকে 'উপন্যাস' না বলিয়া 'বড় গল্প' বলাই শোভন হইবে। সামাজিক দৃষ্টিতে বস্তু-জগতে অমলের মত চরিত্রের পুরুষ এবং প্রতিমার মত চরিত্রের নারী কচিৎ কোন বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে দৃষ্টিগোচর হইলেও লেখকের আলোচ্য এই কাহিনী যেরূপ নিছক চিত্ত-বিনোদনের আনন্দের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা একদিকে যেমন সামাজিক স্বাস্থ্যের উৎকর্ষতা দায়ক নয়,অন্যদিকে সেইরূপ যৌবনধর্ম্মী বয়স্ক তরুণ-তরুণীর চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটাইবারই প্রয়াসী। যে ভাগ্যবিড়ম্বনা ও ভুলের বশবর্ত্তিতায় মানুষের জীবন মরুভূমি হইয়া উঠে, তাহাকে ভিন্ন-কাহিনীর উপড়ে গড়িয়া শিল্পী-মনের পরিচয় দিলে লেখকের যথার্থ প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যাইত, সন্দেহ নাই। "সাগর দোলায় ঢেউ", "হে আত্মবিস্মৃত" প্রভৃতি গ্রন্থের দিক হইতে অনবগুণ্ঠিতা এই কারণেই ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। —শ্রীরণজিৎকুমার সেন।

ভারতীয় প্রসঙ্গ

কলিকাতায় জাপানী বিমানের হানা

গত প্রায় ১১ মাসের মধ্যে ফেণী, চট্টগ্রাম এবং পূর্ব্ব বঙ্গের অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলে জাপানী বিমান অনবরতঃ হা'না দিয়া চলিলেও কলিকাতায় আক্রমণ বন্ধ রাখিয়াছিল। কলিকাতায় জাপানী বিমানের প্রথম আক্রমণ হয় ১৯৪২ সালের ২০শে ডিসেম্বর। তৎপর হইতে ক্রমাগতঃ ২১, ২২, ২৪, ও ২৭শে ডিসেম্বর এবং ১৯৪৩ সালের ১৫ই ও ১৯শে জানুয়ারী পর্য্যায়ক্রমে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ট, ও ৭ম বার কলিকাতা আক্রান্ত হয়। কিন্তু বিগত ১৯শে জানুয়ারীর পর হইতে গত ৪ঠা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতায় আর কোন বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয় নাই। ৫ই ডিসেম্বর রবিবার পুনরায় কলিকাতায় জাপানী বিমান হানা দেয়। ইহাই কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম দিবাভাগে বিমান আক্রমণ।

কৃষক সমাজের দুর্গতি

গত কয়েক বৎসরের তুলনায় এই বৎসর যদিও আমন ধান্য অধিক পরিমানে ফলিয়াছে, তথাপি পল্লী অঞ্চল সমুহের সংবাদ হইতে জানা যায় যে, তাহা কাটিবার লোকের অভাবে আগামী ফাল্গুন মাসের পূর্ব্বে হয়ত সমগ্র ফসল ঘরেই আসিবে না। বাংলার সর্ব্বত্র যখন মহা দুর্ভিক্ষের ছায়া, তখন সারা দেশে এই অতিরিক্ত ধানের আবাদেও কেন এই বিপর্য্যয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

বাংলায় জাপানী আক্রমণের গোড়া হইতে সমগ্র দেশের স্বাভাবিক সুস্থতা যখন তচ নচ্ হইতে আরম্ভ ক'রল, বন্যায় আর অনাবৃষ্টিতে যখন মাঠের ফসল সি'টাইয়া যাইতে বসিল, তখনও অনাহারক্লিষ্ট দেহে কৃষকেরা শস্য উৎপন্নের শেষ চেষ্টা করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু চারিপাশ হইতে অতি দ্রুত গতিতে যখন দুর্ভিক্ষ একেবারে ঝাঁকিয়া আসিল, তখন কোথায় গেল জমি, লাঙ্গল আর গরু, যে পারিল—যথাসর্ব্বস্ব তাহার বিক্রয় করিয়া নানাদিকে ভিক্ষাবৃত্তির জন্য ছুটিল। যাহারা রহিয়া গেল, তাহাদেরও অধিকাংশই অনাহারে, কলেরায়, মহামারীতে ধীরে ধীরে প্রাণ হারাইল। ফলে যদিবা জমিদার জাইগীরদারদের অনুগৃহীত মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা বীজ বপন সম্ভব হইল, কিন্তু তাহার অঙ্কুর হইতে বাংলার অধিকাংশ ক্ষেত্রে যখন আবার সোনা ফলিয়া উঠিল, তখন তাহা ঘরে তুলিবার আজ আর লোক জুটিতেছে না। কেহ কেহ যাহারা আবার নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছে, অনাহারে রোগে তাহাদের দেহ একেবারে জর্জ্জরিত। কর্ম্মক্ষমতা পর্য্যন্ত আজ তাহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে।

সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিষদে এক খাদ্যবিতর্ক সভায় খাদ্য সচিব স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব এই সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া বলেন: "আমরা প্রয়োজন হইলে এই সমস্ত লোককে (দুর্ভিক্ষ-পীড়িতকে) গরু বাছুর, তৈজসপত্র, বস্ত্র ও জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিনিবার জন্য ঋণ ও অর্থ সাহায্য করিব। দুর্ভিক্ষকালে যাহারা জমিজমা বিক্রয় করিয়াছে, তাহারা পুনরায় সামর্থ্যানুযায়ী দীর্ঘকালের কিস্তি-বন্দীতে যাহাতে মূল্য দিয়া জমিগুলি ফিরিয়া পাইতে পারে, তাহার জন্য আইন প্রণয়নের প্রয়োজনও হইতে পারে।"

যদিও এই বক্তব্য শ্রীবাস্তব মহোদয়ের ব্যক্তিগত অভিমত, তথাপি ইহা যদি তিনি যথেষ্ট চেষ্টার দ্বারা অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিতে পরিণত করিতেও সমর্থ হন, তবে হয় ত' আংশিকভাবেও দুর্গতদের কথঞ্চিৎ উপকার হইলেও হইতে পারে। ব্যাধির মূল যতক্ষণ না দূর হয়, বাহিরের প্রলেপে আরোগ্যলাভ সম্ভব কি?

গ্রো মোর ফুড

অর্থাৎ অধিক শস্য (খাদ্য) উৎপন্ন কর। এবার বাংলার খাদ্য-শস্য হঠাৎ শূন্যেতে উঠিয়া যাওয়াতে উহার "কাবুলী দাওয়াই" বিশেষ ভাবে বাতলাইয়াছিল—অধিক খাদ্য-শস্য উৎপন্ন কর, তাহা হইলেই ভয় নাই। অন্ন বিনে মানুষ মরিবে না। কিন্তু উদ্যোক্তাদের এবং বক্তাদের আমরা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি—অধিক শস্য উৎপন্ন করিলে ঐ খাদ্যশস্যও যে মজুতকারিদের গোলাজাত হইবে না অথবা বাংলাদেশ হইতে "নিরুদ্দিষ্ট" হইবে না, তাহা ফুড আন্দোলনকারীরা "গ্যারাণ্টি" দিতে পারেন? ধানও জমিয়াছিল, চালও হইয়াছিল, কিন্তু কিছু সমুদ্রে কিছু আফ্রিকায়, ইরাণে, তুরাণে লঙ্কায় ও অন্যান্য স্থানে যে চালগু'লি লুকাইবে তাহার প্রতীকার কি? তারপর যেমন করিয়া পঙ্গপালে বাংলার চাল, গম, ঘোড়া, ছেড়া, মাছ তরকারী নিঃশেষে খাইয়া ফেলিল, তাতে যত শস্যই হউক না কেন,

বাংলার লোক খাইতে পারিবে কি? গ্রো-মোর-ফুড—সৌর বায়ার (buyer) যে লইয়া যাইবে তাহার উপায় কি?

পরিকল্পনা ও কাজের লোক

নৈহাটী হিন্দু-সম্মিলনীর সভাপতি শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ বাঙ্গালার বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রণিধানযোগ্য কথা আছে। স্থানাভাবে "বঙ্গশ্রী"তে সম্পূর্ণ অভিভাষণের অনুবাদ প্রকাশ করা সম্ভব নয়—কিয়দংশ আলোচনা করিব।

সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালার আর্ত্তজনগণের জন্য সারা ভারতবর্ষ জুড়িয়া যে আন্তরিক সমবেদনা ও স্বার্থ-ত্যাগের প্রমাণ দেখা যাইতেছে, তাহা হইতে সহজেই দুইটি সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হয়—প্রথমতঃ, অখণ্ড-হিন্দুস্থান স্বপ্ন নয়, সত্য; দ্বিতীয়তঃ, অর্থনৈতিক মানদণ্ডে পাকিস্থান একটি অবাস্তব কল্পনা-বিলাস মাত্র।

লীগ্-মন্ত্রীমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি কয়েকটি তীক্ষ্ণ ঋজু সত্য "আঘাত" করিয়াছেন। তাঁহার কথার ভিতর দিয়া একটি অপ্রিয় সত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, বাঙ্গালার এই দারুণ দুর্গতি মানুষের সৃষ্টি! ইহার জন্য দায়ী—মুষ্টিমেয় স্বার্থ-সেবকের লোভ, অবিচার, অসাধুতা এবং অকৃতিত্ব। কেবল সমালোচনা করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ক্ষান্ত হন নাই। ভবিষ্যতের কথাও ভাবিয়াছেন। দেশবাসীকে তিনি সতর্ক করিয়াছেন যে, এখন আমাদের একমাত্র ভরসা আমন ফসল এবং এই আমন ফসল যদি "বেহাত" হইয়া যায়, তাহা হইলেই "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা"। এখন উপায় কি? মুমূর্ষু জাতি বাঁচিবে কি করিয়া? এ-বিষয়ে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(১) কয়েকটি পল্লীগ্রাম লইয়া এক একটি কেন্দ্র গঠন করিতে হইবে। জাতির ব্রত হইবে "আত্ম-রক্ষা", "আত্ম-নির্ভরশীলতা"

(২) সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি লইয়া Food Committee গঠন করিতে হইবে। প্রত্যেক কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় যথেষ্ট খাদ্য মজুত না রাখিয়া যদি রপ্তানির চেষ্টা হয়, তাহা বন্ধ করিতে হইবে।

(৩) ধর্ম্ম-গোলা এবং সমবায় সমিতি গঠন করিতে হইবে। মহাজনের কবল হইতে চাষীকে বাঁচাইতে হইবে। প্রত্যেক কেন্দ্রের উৎপন্ন ফসল এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন জেলাতে ধান-চাল বিভাগ ও বণ্টন করিতে হইবে।

(৪) Hoarder, profiteer, middleman সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিতে হইবে।

(৫) কলিকাতা ও শহরতলীর জন্য সরকারকে বাঙ্গালার বাহির হইতে খাদ্য আমদানি করিতেই হইবে। কম্যুনিষ্ট সমালোচক হয় তো এই "অসাম্যবাদে" রুষ্ট হইবেন। কিন্তু বাস্তবিক ইহাতে "অসাম্য" নাই। যোদ্ধা এবং যুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট বহু লোক কলিকাতায় জড়ো হইয়াছে। তাহাদের খোরাক জোগানো "Imperial responsibility"—সে-দায়িত্ব যেন অনশনক্লিষ্ট বঙ্গপল্লীর উপরে না পড়ে।

(৬) সরকারের উচিত ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতিপথে হস্তক্ষেপ না করা। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ উভয়েই যেন সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন।

(৭) বাঙ্গালা হইতে খাদ্য রপ্তানি ও দাদন প্রথা বন্ধ করিতে হইবে—Embargo on export and moratorium on dadans.

(৮) সমস্ত দলের প্রতিনিধি লইয়া গবর্ণমেণ্টের উচিত একটি প্রাদেশিক খাদ্য সমিতি গঠন করা। সে সমিতিতে যেন "মানুষ" থাকে, যেন কেবলই "আজ্ঞে—হাঁ"-র দল না হয়। পল্লী ও জেলার সমিতিগুলি প্রাদেশিক সমিতির অন্তর্ভুক্ত হইবে। যানবাহন, মূল্যনিরূপণ, খাদ্যবণ্টন ইত্যাদি সকল বিষয়ে প্রাদেশিক সমিতির প্রভুত্ব থাকা প্রয়োজন।

(৯) বেশী এবং ভাল এবং রকমারি ফসল উৎপন্ন করার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া দরকার। তাহাতে বেকার সমস্যারও সমাধান হইবে।

(১০) তথাকথিত "utility organisations" এবং "panicky buying by industrial concerns" বন্ধ করিতে হইবে।

(১১) পল্লীজীবন ছন্নছাড়া হইয়া পড়িয়াছে—তাহাকে বাঁচাইতে হইবে।

(১২) বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের লইয়া একটি commission গঠন করিতে হইবে—five-year plan-র জন্য। সরকারী statistics আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। বাঙ্গালার চাহিদা কি; উৎপাদন-শক্তি কি ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে যথাযথ অনুসন্ধান করিতে হইবে। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো "ঢালিয়া সাজিতে" হইবে।

(১৩) পল্লী-শিল্পের উদ্ধার করিতে হইবে—চরকা, তাঁত। গ্রামবাসী মুমূর্ষু; গ্রামে গ্রামে কুটীর-শিল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিকল্পনার এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে দেখা যায় যে, তিনি বর্ত্তমান সমস্যার একটা কার্য্যকরী সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। খুব গোঁড়া মার্ক্স-টাউজিগ্-বাদী অর্থনীতিজ্ঞ হয় তো তাঁহার বক্তব্যের মধ্যে "১০০১"-টি

ভ্রম-প্রমাদ দেখাইয়া বসিবেন। Demand-supply-র আপেক্ষিক সম্বন্ধ লইয়া সাগর-পার হইতে-আগত আধুনিকতম থিওরীর অজীর্ণ-গন্ধি গবেষণা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণে পাওয়া গেল না; সুতরাং তথাকথিত "বিশেষজ্ঞে"-র আসরে হয় তো তাহা "অপাংক্তেয়।"

বৈদেশিক প্রসঙ্গ

"মানব সমাজের মুক্তি"

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, 'আর্মি এণ্ড নেভি' পত্রিকায় "মানব সমাজের মুক্তি" কথার এক মহৎ উদ্দেশ্য সম্বলিত বিবৃতি দান করিয়াছেন। বিশ্বদূত রয়টার সেই প্রবন্ধের খানিকটা আমাদিগের অবগতির জন্য পরাধীন ভারতবর্ষেও পাঠাইয়াছেন। রুজভেল্টের উক্তি: মানব সমাজকে ক্রীতদাস করিবার জন্য যে সকল পাপী এই বিশ্বযুদ্ধ বাধাইয়াছে, তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা সম্বন্ধে তথ্য ও হিসাবের অঙ্ক অক্ষরে অক্ষরে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই তথ্য মিত্রপক্ষের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তির পরিচয় ও সকলের স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার উদ্দেশ্য! ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল জাতিই সমান অধিকার ভোগ করিব।"—ইত্যাদি। মৃত প্রেসিডেণ্ট উইলসনের বাণীতেও ইহাই ছিল। সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডও যখন সিংহাসনে আরোহন করেন, তখন এই কথাই বলিয়াছিলেন। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার বাণীতেও এই কথাই ছিল। সম্রাট রাজা পঞ্চম জর্জ্জের সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষেও আমরা এই বাণী শুনিয়াছি। এই যুদ্ধের পূর্ব্বেকার '১৪ সালের যুদ্ধেও মিত্রশক্তি ঐ সকল কথাই শুনাইয়াছিলেন। পরাধীন ভারতবাসীর ক্রীতদাসবৃত্তি কিন্তু এখনও ঘুচিল না। গণতন্ত্রের জন্য মিত্রশক্তি যুদ্ধ করিতেছেন, মানব সমাজকে পাশবিক সাম্রাজ্যবাদীর হাত হইতে উদ্ধার করাই মিত্রশক্তির সাধু উদ্দেশ্য, মিঃ রুজভেল্ট বাণীর পর বাণী দিয়া এখন আশ্বাসবাণী আমাদিগকে শুনাইতেছেন। কিন্তু ভারতের কারাগার গণতন্ত্রের সেবক, কংগ্রেসের কর্ম্মীগণের কারাযন্ত্রণা একটুও ঘুচে নাই। বরং ভারতবাসীর পায়ের শৃঙ্খল আরও দৃঢ় হইতেছে, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তি যতক্ষণ ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র পরিচালনা করিবেন, ভারতবাসীরও ক্রীতদাসত্ব ঘুচিবে না। মানব সমাজের মুক্তি প্রেসিডেণ্ট বাণীমুখে শুনাইয়াছেন, কিন্তু এই ভারতের ভাগ্যাকাশ ক্রমেই তমসাচ্ছন্ন হইতেছে, আমরা বাঙ্গালী ৫৲ টাকার চাউল ৫০৲ পঞ্চাশ টাকায় কিনিয়াও নিষ্কৃতি পাইতেছি না। গৃহস্থ ঘরে চাউল রাখিলে (অবশ্য সরকারী হিসাবটা গণতন্ত্রবাদী গভর্ণরের হিসাবে) ফৌজদারী আদালতে হাকিমের কৃপায় সাজা হইতেছে। দিনের পর দিন আমাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ কঠোর হইতেও কঠোরতর হইতেছে, তদুপরি জাপানী বোমা, মুনাফাখোরের অত্যাচার, দুষ্ট ম্যালেরিয়ার সয়তানি, ভারতরক্ষা আইনের কঠিন শৃঙ্খল, বাঙ্গালার বক্ষে আমেরিকান ভারতীয় সৈনিকের রণনৃত্য, নিগ্রো ও কাফ্রীর অট্টহাসি, এই সকল বাঙ্গালার ভাগ্যে আসিয়া জুটিয়াছে। আমাদের পেটে অন্ন নাই, পরনে ধুতি নাই, তেলে জলে বাঙ্গালীর শরীর। একটু সরিষার তেল পাইবার যো নাই। রেলে, ষ্টিমারে, বাসে, ট্রামে সর্ব্বত্র বাঙ্গালী গাদার মরার ন্যায় অচল হইয়া উঠিতেই, টাকার ভাঙ্গানী পাওয়া যায় না। রোগীর জন্য সাগু, মিশ্রি দুর্ল্লভ, সরকারী ঘোষণায় চাউল, ডাল, সাগু, মিশ্রি সস্তা হইলেও আমরা তাহা পাই নাই। বাঙ্গালীর মাছভাত, দুইই এখন অপ্রতুল। কাজেই রুজভেল্ট সাহেবের শ্রীমুখ-বাণীর "মানব সমাজের মুক্তি"র বাণী আমাদিগের নিকটে বিসদৃশ ঠেকিতেছে। অত্যাচারী পাপীর সাজা ত রুজভেল্ট সাহেব দিবেন। মিত্রশক্তি অত্যাচারীর নামের লিষ্টও করিতেছেন, কিন্তু চল্লিশ কোটী ভারতবাসীকে যাহারা পায়ে শৃঙ্খল দিয়া ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছে, যাহাদের রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও অদৃশ্য হইয়াছে, যে সামাজিক স্বাধীনতাও ছিল, তাহাও আইনের নিগড়ে বাঁধিবার চেষ্টা চলিয়াছে। এ দেশে যাঁহারা স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা কারারুদ্ধ হইয়াছেন। রুজভেল্ট তাঁহাদের সম্বন্ধে একটুও কি ভাবেন?

আমাদিগকে ক্রীতদাস করিয়া রাখিবার অধিকার কাহারও নাই তবুও এই গণতন্ত্রি যুদ্ধে, ব্যক্তি স্বাধীনতা ঘোষণার দিনে গণতন্ত্রের দোহাইএর দিনে মানব-সমাজের কল্যাণ কামনার জয়ঢক্কা নিনাদের দিনে আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছি, আমরা পরাধীন দাস মাত্র। আমাদের স্বাধীনভাবে কথা বলিবার অধিকার নাই, বাঙ্গালাদেশকে অন্যায়ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করার প্রতিবাদও আমরা করিতে পারি না। রুজভেল্ট সাহেব এই সংবাদগুলি রাখেন কি? আত্মনিয়ন্ত্রের অধিকার আমরা চাই, কিন্তু লণ্ডনের ডাউনিং ষ্ট্রীটের বাণী আমরা চাহি না।

ধূমকেতু

কিছুদিন পূর্ব্বে রয়টার জগতবাসীকে জানাইয়াছে—সম্প্রতি আফ্রিকায় এক নূতন ধূমকেতু উদয় হইয়াছে। আমরা কিন্তু এই নূতন ধূমকেতুর সন্ধান বুয়ার যুদ্ধ সময় হইতেই জানিতে পারিয়াছিলাম। এই ধূমকেতু পুচ্ছ বিস্তার করিয়া সম্প্রতি ইংলণ্ডে আসিয়া দেখা দিয়াছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রানুযায়ী বিচার করিলে দেখা যায়, এই ধূমকেতুর পুচ্ছ হইতে যে ধূম উদ্গীর্ণ হইতে সুরু করিয়াছে, সেই ধূম কম সাংঘাতিক নহে। ইনি সম্প্রতি বলিয়াছেন, ইউরোপে মাত্র—অথবা জগতে মাত্র তিনটী শক্তি এই মহাযুদ্ধে টিকিয়া থাকিবে।

ইংলণ্ড রুষিয়া এবং আমেরিকা। আর সব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, ফ্রান্স ও ইটালী মুছিয়া গিয়াছে। জাপানীও যাইবে। "এফ এম" স্মাটস্ সাহেবের অর্থাৎ ফিল্ড মার্শাল বৃদ্ধ স্মাটসের জ্যোতিষ বিস্তার এইরূপ অপূর্ব্ব পারদর্শীতা দেখিয়া আমরা সত্যই খুসী হইয়াছি। ম'সিয়ে ভিনল, মিঃ জীরো বা ভন্ হিট্লার আর মঃ মুসোলিনী এঁরা কি বলেন?

ধূমকেতু শুধু একটা জায়গাতে দেখা দেয় নাই, আমরা ভারতীয় জ্যোতিষাগারে খুঁজিয়া সম্প্রতি ৯টী ধূমকেতুর সন্ধান পাইয়াছি। ইহাদের অগ্নিবর্ষী পুচ্ছ বিতরণে সারা জগত যে ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়িয়াছে, এই নয়টী ধূমকেতুর স্থান—আফ্রিকা, ইংলণ্ড, ইটালী, জার্ম্মানী, রুষিয়া, চীন ও আমেরিকা, ফ্রান্স। ইহা ব্যতীত ভারতবর্ষের আকাশে একটী ধূমকেতুর পুচ্ছ তাড়নায় আমরা উপলব্ধি করিতেছি, এই ধূমকেতুটীর উদয়স্থান ক্ষীরোদ সাগরের কূলে, কিন্তু পুচ্ছটী বিস্তার ভারতবর্ষে। জ্যোতিষে ফল-বলে —দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ বিগ্রহ, ধ্বংস, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে আমরা ধূমকেতুর প্রভাব দেখিয়া আসিতেছি, তাই এখনও বসিয়া ভাবি, একটী ধূমকেতুর প্রভাবেই প্রাণ ওষ্ঠাগত, ৯টীর প্রভাবে জগতের গতি কি হইবে?

শান্তির পিছনে

মাঝে মাঝে রয়টার সংবাদ দিতেছে—এই মহাযুদ্ধের শেষ হইল আর কি? চারিদিকেই নাকি শান্তিদেবী "অলিভ পত্র" হাতে লইয়া ছুটিয়াছি করিতেছেন। কালনেমীর লঙ্কা ভাগও হইয়া গিয়াছে, স্মাটস্‌র হাচিংসন প্রভৃতি ভদ্রলোকগণ তার ফতোয়াও দিয়াছেন। কোরিয়ান্ জনসনেরও মুক্তির বার্ত্তা ঘোষণা করা হইয়াছে। কেবল "হতভাগ্য" ভারতবর্ষের কথা কেহ বলিতেছে না। ইংরেজের এই জমিদারীর কথা কেহ তুলিতেছে না। এই যে Permanent Settlement-এ ব্রিটন খাস দখলী স্বত্ব পাইয়াছে, আমরা ইংরেজের ভাষা শুনিতে পাই, এখানে চল্লিশ কোটী মানুষ পুত্তলিকা প্রায় রহিয়াছে। পুত্তলিকার কান আছে, শুনিতে পায় না, পা আছে চলিতে পারে না, মুখ আছে খাইতে পারে না। অতএব এই চল্লিশ কোটী পুতুলকে নাচাবে ইংরাজ! কিন্তু এই শ্বেতাঙ্গ কোম্পানীগুলি কি ভুলিয়া যান্—ভারতবর্ষের পরাধীনতার পন্থাতেই জগতের ভাবী যুদ্ধের বীজ পোতা আছে।

এই কয় মাসে সমগ্র বাংলায় কত লোক মরিয়াছে—জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর এই চারিমাসে না খাইতে পাইয়া কত লোক মরিয়াছে, সরকার তথা বাংলার স্বদেশজাত মন্ত্রিগণ তাহার কিছু একটা হিসাব প্রকাশ করিবেন কি?

ভারতের স্বাধীনতা-সমস্যা

সম্প্রতি লণ্ডনস্থ ভারতীয় দুর্ভিক্ষ-কমিটির এক অধিবেশনে ভারতীয় দুর্ভিক্ষ-কমিটির সভাপতি ও পার্লামেণ্টের শ্রমিক দলভুক্ত সদস্য মিঃ কোভ এক আলোচনা প্রসঙ্গে সর্ব্বসাধারণকে সচেতন করিয়া বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষ যে বিদেশী শাসনের অধীন হইয়া রহিয়াছে, তাহাই ভারতের প্রকৃত সমস্যা।"

আজ ভারতবর্ষের চরম দুর্গতির জন্ম কে বা কাহারা দায়ী, তাহা স্যার নরমান এঞ্জেলের মতো বৃটিশ শুভার্থী বা চার্চ্চিল-গভর্ণমেণ্ট স্বীকার না করিলেও মিঃ কোভ প্রভৃতির মতো প্রকৃত নীতিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে তাহা আর অজ্ঞাত নাই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবীতে ভারতে ক্রীপস্ প্রস্তাবের ব্যর্থতা বৃটিশ-কেবিনেটে সেদিনও যথেষ্ট জ্বালার সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু বিগত পৌনে দুইশত বৎসর ধরিয়া ভারতের মতো বৃটেন যদি পরাধীনতার চাপে এম্‌নি করিয়া নির্য্যাতিত হইত, তবে বোধ হয় সে জ্বালা ভারতের চিতাগ্নিকেও ছাড়াইয়া যাইত। ভারতীয় সমস্যা সমাধানে এখনও বৃটিশ শাসকশ্রেণী পূর্ণপ্রাণে দৃষ্টি দিন, ইহাই আমাদের আজিকার সর্ব্বপ্রধান দাবী। কারণ, ঘরে বসিয়া 'গণ-তন্ত্র' উচ্চারণের দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে লেবানন

সম্প্রতি আরবস্থিত লেবানন রাজ্যে যে ঘোরতর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা গত কিছুদিন ধরিয়া ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে ক্রমাগত প্রকাশিত হইতেছে, এবং লেবাননের কঠোর স্বাধীনতা-সংগ্রাম আমাদের মনেও এক গভীর শ্রদ্ধা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। লেবাননবাসী যে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতা হইতে মুক্ত, তাহা নয়। খৃষ্টান এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট ভেদ রহিয়াছে। কিন্তু জাতীয় সংগ্রামের দিনে তাহারা একই ঐক্যবদ্ধ লেবাননবাসী। মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মনেতা সাম্রাজ্যলোভী স্বাধীন ফরাসী-কর্ত্তা জেনারেল কাত্রুকে দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া দিয়াছেন, "আমরা সকলেই লেবাননবাসী। দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে আমাদের মধ্যে খৃষ্টান বা মুসলমানের কোন ভেদ নাই।"

বস্তুতঃ জেনারেল কাত্রু ভারত সম্পর্কে বৃটিশ নীতির অনুসরণ করিয়া লেবাননের খৃষ্টান ও মুসলমানের মধ্যে একটা ভেদের সৃষ্টি করিয়া সম্পূর্ণ লেবানন রাজ্যটি নিজের অধিকারে আনিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শৃগালকে ডিঙাইয়াও কাঁকুড়া চলে। জেনারেল কাত্রুর সেই পরিশ্রম মাঠে মারা গিয়াছে। বাধ্য হইয়া তাই ইতিমধ্যেই তাঁহাকে লেবানন সাধারণ তন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট ও মন্ত্রিদিগকে মুক্তিদান করিতে হইয়াছে। কাত্রুর চাল্‌বাজি ও ধূর্ত্ত কূটবুদ্ধি আজ একদিকে যেমন সমগ্র

পৃথিবীতে একেবারে নগ্নভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি লেবাননের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের দৃষ্টান্ত হইতে ভারতবর্ষও তাহার আত্মশক্তির যথেষ্ট শিক্ষা পাইবে।

তেহেরাণ সম্মেলনের পরিকল্পনা

সম্প্রতি ইরাণের রাজধানী তেহেরাণ সহরে মার্শাল ষ্টালিন, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং মিঃ চার্চ্চিলের মধ্যে এক জরুরী পরামর্শ বৈঠক হইয়া গিয়াছে। যাহাতে জল, স্থল এবং অন্তরীক্ষ হইতে জার্ম্মানীকে তীব্র আক্রমনের দ্বারা বিশ্বের সর্ব্বত্র যুদ্ধ জয়ের সহিত যথাশীঘ্র এই মহাসংগ্রামের অবসান ঘটান যায় এবং প্রয়োজন হইলে অনতিবিলম্বে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা সহজ হয়, বৈঠকের ইহাই মূল আলোচনার বিষয় ছিল। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধ পরবর্ত্তীকালেও জগতের বিভিন্ন জাতিসমূহের ভাগ্য নিয়ন্ত্রনে এই ত্রিশক্তিই একত্রে কাজ করিবেন বলিয়াও সিদ্ধান্ত করিয়া রুজভেল্ট-ষ্ট্যালিন-চার্চ্চিল স্বাক্ষরিত এক ঘোষণাবাণী প্রচারিত হইয়াছে। এই প্রচারপত্রে প্রসঙ্গতঃ বলা হইয়াছে—"আমাদের জাতিত্রয় যেমন মনে-প্রাণে পৃথিবী হইতে স্বৈরাচার, দাসত্ব, অত্যাচার ও অসহিষ্ণুতা দূর করিতে আগ্রহী, এমনি আগ্রহী অন্যান্য ছোট বড় সমস্ত জাতির সংযোগ ও সহায়তা লাভ করিতে আমরা সচেষ্ট হইব। গণ-তান্ত্রিক জাতিসমূহকে লইয়া আমরা যে বিশ্বব্যাপী পরিবার রচনা করিতে চাহি, তাহার মধ্যে সকলকে আমরা সাদরে অভিনন্দন করিয়া লইব।...আমরা ভরসার সহিত সেই দিনের জন্য চাহিয়া আছি, যে-দিন পৃথিবীর কোনো জাতি আর স্বৈরাচারের দ্বারা উৎপীড়িত হইবে না, যেদিন সকলে স্বেচ্ছানুযায়ী এবং স্ব স্ব বিবেকসম্মত ভাবে স্বাধীন জীবন যাপন করিতে পারিবে।"

আটলান্টিক্-চার্টারের ঘোষণা হইতে অদ্যাবধি বহু আবেদন নিবেদন করিয়া দেখা গিয়াছে। একমাত্র ভারতবর্ষের দাবীই পূরণ করিতে এই পর্য্যন্ত চার্চ্চিল-রুজভেল্ট-সঙ্ঘ মনের বিন্দুমাত্রও উদারতার পরিচয় দেন নাই।

কায়রো সম্মেলন

সম্প্রতি কায়রো সহরে মিঃ চার্চ্চিল, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং মার্শাল চিয়াং-কাইশেকের সহযোগে সুদীর্ঘ পাঁচদিনব্যাপী এক ত্রি-শক্তি আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। জাপানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত শক্তিবর্গের পক্ষ হইতে ব্যাপক পরিকল্পনানুযায়ী জল, স্থল এবং অন্তরীক্ষ হইতে এক সহযোগে সমরোদ্যমে প্রবৃত্ত হওয়াই এই কায়রো অধিবেশনের মূল বিবেচ্য বিষয় ছিল। আলোচনায় বলা হইয়াছে—

সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার ঘাঁটি হইতে জেনারেল ম্যাক আর্থারের নেতৃত্বে যদিও জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান হইতেছে, কিন্তু তাহা শুধু জলপথেই সম্ভব; উপরন্তু এই সঙ্গে তাহাকে যদি স্থলপথে ও বিমানবলে যথেষ্ট শক্তির দ্বারা আঘাত করা না যায়, তবে তাহাকে পরাভূত করা সহসা সম্ভব হইয়া উঠিবে না। চীনের সহায়তা এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। জাপানের কয়মোসা দ্বীপ চীনের ফুকিন অঞ্চল হইতে ১০ মাইলের অধিক দূরে অবস্থিত নয়। সুতরাং অবিলম্বে বিমানবলের দ্বারা চীনকে সাহায্য করিয়া উক্ত ফুকিন অঞ্চলের বিমান ঘাঁটিগুলি হইতে জাপানকে আক্রমণ করা যাইতে পারে। চীনের পক্ষ হইতে প্রস্তাবনায় বলা হয়, এই জন্য অনতিবিলম্বে বার্ম্মা রোড উন্মুক্ত করা প্রয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতেও ব্রহ্মদেশে ব্যাপক আক্রমণ চালানো আবশ্যক।

চূড়ান্ত একটা খসরা হইল বটে, কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়াইয়াছে মার্শাল ষ্টালিনকে লইয়া। ইউরোপীয় যুদ্ধ এখনও ক্রুতভাবেই আগাইয়া চলিয়াছে। যদিও রাশিয়ার বহু ক্ষেত্র হইতে জার্ম্মানী পশ্চাদপসরণ করিয়াছে, তথাপি অন্যপথে সে পুনরায় আক্রমণ করিতে সর্ব্বদাই উদ্যত রহিয়াছে, এমন কি ইউক্রেনীয় বাহিনীর ব্যূহ রক্ষার দিক হইতে জার্ম্মানীর পানেৎসের বাহিনী লইয়া ফন ষেখের নিয়ন্ত্রণে দক্ষিণাঞ্চলে যথেষ্ট চাপ দিবার ফলে রাশিয়াকে কিয়েভের অভিমুখে পশ্চাদপসরণ করিতে হইতেছে। ইত্যবসরেই জার্ম্মানরা জিতোমির ও কোরোস্তেন সহর দখল করিয়া লইয়াছে।

সুতরাং জার্ম্মানীকে লইয়া যখন রাশিয়াকে দৃঢ় ভাবে ব্যস্ত থাকিতে হইতেছে, তখন কায়রো অধিবেশনের সিদ্ধান্তানুযায়ী তাঁহাকে যে সহসা জাপানকে আঘাত করিবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হইয়া উঠিবে, তাহা বলা যায় না! তবে মিত্রশক্তির সাম্প্রতিক এই সমরোদ্যমে রাশিয়া যদি তাহার ভ্লাডিভোষ্টকের বিমান ঘাঁটিগুলি জাপানকে আক্রমণ করিবার জন্য ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে হয়ত অন্তরীক্ষ হইতে যুদ্ধ চালানর পথ অনেকটা সুগম হইতে পারে। কিন্তু রাশিয়াও যে তাহা হইলে আত্মরক্ষা বিষয়ে একেবারে চিন্তামুক্ত হইবে, তাহা নয়। তদুপরি রাশিয়া জাপানের সঙ্গে সম্প্রতি অনাক্রমণাত্মক চুক্তিতে আবদ্ধ আছে। অন্ততঃ ইউরোপীয় যুদ্ধের কিছু একটা ফলাফল নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত রাশিয়া যে সেই চুক্তি ভাঙিবে, এরূপও আশা করা যায় না। সুতরাং এমতাবস্থায় বৃটেন, আমেরিকা ও চীনের সম্মিলিত শক্তি দ্বারাই জাপানকে আক্রমণ করিবার প্রথম সূচনা সূচিত হইতেছে। ভবিষ্যতে মার্শাল ষ্টালিনের সহিত আলোচনার দ্বারা সাম্প্রতিক অনুষ্ঠিত কায়রো অধিবেশনের সিদ্ধান্ত আরও কতদূর পাকা হয়, আমরা তাহা দেখিবার অপেক্ষায় রহিয়াছি।

FOR Graceful
ORNAMENTS INSIST ON
Mira MOOKHERJEE & CO.
• RENOWNED SINCE 1884 •
BANKERS and JEWELLERS
35, ASHUTOSH MUKERJEE ROAD, CALCUTTA
SOUTH 1278 • GRAM. METALITE

বাংলার বেকার সমস্যার সমাধান
তাঁতের কাপড়
বিরাট 'মল'-এর প্রাসাদ-দ্বার
থেকে নিরাশ হ'য়ে ফির্‌বার পথে
একবার পায়ের ধূলো দিন।
১৮৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
[কলেজ ষ্ট্রীটের মোড় হইতে পূর্ব্বদিকে দুই মিনিটের পথ—উত্তর পার্শ্বে]

বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস্

হেড অফিস—৯১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

কাপড়-কাঁচা, গায়ে-মাখা—দু'রকমের সাবানের জন্যই

"বঙ্গলক্ষ্মী" প্রশস্ত ।

THE NEW INDIAN GLASS WORKS (Calcutta) LTD.

Factory :—**2, Church Road, Dum Dum Cantonment**
and
101/1, Ultadanga Main Road.

OFFICE :—**7, Rawdon Street, Calcutta.**

Manufacturers of all kinds of BOTTLES both narrow and wide-mouth, stoppered and screw-caps.

NEUTRAL GLASS A SPECIALITY.

ADRENALINE and VACCINE FILES and TUBES are manufactured from absolutely neutral glass.

For Particulars Apply to the Head Office of the Company.

২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা
মাঘ—১৩৫০
একাদশ বর্ষ

কেশের
যত্ন লইতে
ভুলিবেন না
বাথগেটের
সুগন্ধি ক্যাষ্টর অয়েল
কেশ-প্রসাধনে শ্রেষ্ঠ
ইহা ব্যবহারে
BEWARE OF IMITATION
Bathgate & Co
CHEMISTS
CALCUTTA

Dutta & Co.
QUALITY SHOE MAKERS
CHEAPEST, BEST AND DURABLE
STOCKISTS: CAWNPORE -AND- AGRA SHOES.
16/1, SHYAMACHARAN DEY STREET,
COLLEGE ST, COLLEGE ROW & SHYAMACHARAN DEY ST, JUNC.
CALCUTTA.
G.D.N.

ভগ্নস্বাস্থ্য হইতে অটুটস্বাস্থ্য
?
যদি আপনি
প্রত্যহ সেবন
করেন —
কল্পা
কল্পতরু রসায়ন
কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদভবন
কল্পতরু প্রাসাদ
২২৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

PRICE : 8 OZ. PHIAL RS. 2-4
16 OZ. PHIAL RS. 3-8.

FOR PARTICULARS APPLY TO :

L. H. EMENY

MERCANTILE BUILDINGS, LAL BAZAR, CALCUTTA.

বিস্তৃত ও সরল
টিপ্পনী
বঙ্গীয় সংস্করণ
রামায়ণ

স্পর্শে
স্বপ্নের আবেশ
রঙ্কোর ক্যাষ্টর অয়েল
এণ্ড কোং লিঃ
কলিকাতা
CASTOR OIL

শ্রীসত্যনারায়ণ মুখার্জি

পল্লীর ছায়াকোল

সর্ব্বযুগের সর্ব্বদেশের সর্ব্বজন-অভিনন্দিত

— কালিদাসের —

শ্রেষ্ঠ প্রণয়-নাট্য অবলম্বনে

রাজকমল কলামন্দিরের

প্রযোজনা ও পরিচালনা :

ভি, শান্তারাম

শ্রেষ্ঠাংশে :

জয়শ্রী ও চন্দ্রমোহন

প্যারাডাইসে ১৪ই জানুয়ারী থেকে

প্রত্যহ—২, ৫ ও ৮টায়। রবিবার বিশেষ প্রদর্শন—সকাল ১০-৩০ মিনিট

❖

— কাপুরচাঁদ পরিবেশনা —

১১শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা — বিষয়-সূচী — মাঘ—১৩৫০

[২৭ পৃষ্ঠায়

বঙ্গশ্রীর নিবেদন ও নিয়মাবলী

"বঙ্গশ্রী"র বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।০ টাকা। ষাণ্মাসিক ৩।০ টাকা। ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য ॥/০ আনা। মূল্যাদি—কর্ম্মাধ্যক্ষ, বঙ্গশ্রী, c/o মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, হেড অফিস—১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

আষাঢ় হইতে "বঙ্গশ্রী"র বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া চলে।

প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠিপত্র সম্পাদককে ১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হয়। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট দেওয়া না থাকিলে পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

লেখকগণ প্রবন্ধের নকল রাখিয়া রচনা পাঠাইবেন। ফেরতের জন্য ডাক-খরচা দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত লেখা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে 'বঙ্গশ্রী' প্রকাশিত হয়। ঐ-মাসের পত্রিকা, সেই মাসের ১০ তারিখের মধ্যে তাহা না পাইলে স্থানীয় ডাক-ঘরে অনুসন্ধান করিয়া তদন্তের ফল আমাদিগকে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে না জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে আমরা বাধ্য থাকিব না।

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ও সিকি পৃষ্ঠা যথাক্রমে ২০৲, ১১৲, ৬৲। বিশেষ স্থানের হার পত্র লিখিলে জানানো হয়।

বাংলা মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পুরাতন বিজ্ঞাপনের কোনও পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশ না আসিলে পরবর্ত্তী মাসের পত্রিকায় তদনুসারে কার্য্য করা যাইবে না। চলতি বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলে ঐ তারিখের মধ্যেই জানানো দরকার।

বিষয়-সূচী—২৫ পৃষ্ঠার পর

গিরিশ-সংখ্যা

সঙ্গীত ও স্বরলিপি

— উ প ন্যা স —

শিশু-সংসদ

অন্তঃপুর

চতুষ্পাঠী

বিচিত্র জগৎ

পুরাতনী

বিজ্ঞান জগৎ

২৯ পৃষ্ঠায়]

বিষয়-সূচী—২৭ পৃষ্ঠার পর

বিঃ দ্রঃ—অনিবার্য্য কারণবশতঃ এই সংখ্যায় উপন্যাস "অপমানিত" ও নাটক "পরাজয়"-এর প্রকাশ বন্ধ রহিল। বঃসঃ

বন্দুক ও তৎসংক্রান্ত

সর্ব্বপ্রকার সরঞ্জামের

একমাত্র

স্থান

এ, সি, কুণ্ডু

প্রসিদ্ধ বন্দুক-ব্যবসায়ী

১৭০, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা

২০, ১০, ৫, ২॥০ সের টানে পাওয়া যায়

মাঘ, ১৩৫০
১১শ বর্ষ—২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা

দুর্গা-পূজা"র প্রয়োজনীয়তা

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

(৬)

জমি ও তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির রক্ষা বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব কি কি?

জমি ও তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির রক্ষা বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব কি কি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে জমি ও তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি, রক্ষা ও পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে মূলতঃ যে আটটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন হয়, তাহার কথা আগেই বলা হইয়াছে।

এই আখ্যায়িকায় আমরা ঐ আটটি বিষয়ের কথা নূতন ভাবে সাজাইয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

জমি ও তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির রক্ষার বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব কি কি তাহা স্থির করিতে হইলে পাঁচ শ্রেণীর বিষয় আলোচনা করিতে হয়, যথা :—

(১) "জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির রক্ষা" এই কথায় কি কি বুঝায়?

(২) জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি রক্ষা করিবার পন্থা কি কি?

(৩) জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতা ও বিষমতায় প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক কার্য্য-ক্রমে ও কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক কার্য্য-নিয়মে?

(৪) জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির স্বভাবতঃ অসমতায় ও বিষমতায় প্রবৃত্তির বিদ্যমানতা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক কোন্ কোন্ কার্য্য-ক্রমে ও কোন্ কোন্ কার্য্য-নিয়মে সমতার প্রবৃত্তির অধিকতর বল রক্ষা সম্ভব হয়?

(৫) মানুষের কোন্ কোন্ অনাচারে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতায় ও বিষমতায় প্রবৃত্তির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলশালিনী হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়?

"জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির রক্ষা"—এই কথায় কি বুঝায়—তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইলে আগেই মনে রাখিতে হয় যে, জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির তিনটী অবস্থা আছে, যথা :—(১) সমতা, (২) অসমতা, (৩) বিষমতা; আরও মনে রাখিতে হয় যে, জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতায় (অর্থাৎ জমির অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের আবয়বিক ও রাসায়নিক মিশ্রণে যুগপৎ বিচ্ছেদ এবং মিলনের প্রবৃত্তির ও কর্ম্মের) অথবা বিষমতায় (অর্থাৎ জমির অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের আবয়বিক ও রাসায়নিক মিশ্রণে বিচ্ছেদের প্রবৃত্তির ও কর্ম্মের) উৎপত্তি হইলে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি হ্রস্বতা প্রাপ্ত হয়। আর জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির সমতায় (অর্থাৎ জমির অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের আবয়বিক ও রাসায়নিক মিশ্রণে মিলনের প্রবৃত্তিতে ও কর্ম্মে) জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির সমতা, অসমতা ও বিষমতা কাহাকে বলে—তাহা উপরোক্ত কথা হইতে বুঝা যায়। জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির সমতা, অসমতা ও বিষমতা কাহাকে বলে—তাহা বুঝিতে পারিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতা ও বিষমতা যাহাতে না ঘটিতে পারে এবং সমতা যাহাতে বজায় থাকে, তাহা করার নাম জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি রক্ষা করা।

জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি রক্ষা বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব কি কি, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, একদিকে যেরূপ জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির রক্ষা কাহাকে বলে—তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার প্রথমতঃ, জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতায় ও বিষমতায় উৎপত্তি হয় কেন, এবং দ্বিতীয়তঃ, ঐ উৎপাদিকা-শক্তির সমতা সাধন করা যায় কোন্ পন্থায়, তাহা স্থির করিতে হয়।

জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতা অথবা বিষমতা যাহাতে উদ্ভূত না হয় এবং ঐ স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির সমতা যাহাতে রক্ষিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে জমি ও তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির রক্ষা বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব পালন করা হয়।

উপরোক্ত কথা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জমি ও তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি রক্ষা করিবার পন্থা **মূলতঃ দুইটী,** যথা :—

(১) জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতা অথবা বিষমতা যাহাতে উদ্ভূত না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা ;

(২) জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির সমতা যাহাতে বজায় থাকে তাহার ব্যবস্থা করা।

উপরোক্ত দুইটী ব্যবস্থা সাধিত করিতে হইলে জমির বিষয়ে চারিশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সত্য মনে রাখিতে হয়। **প্রথমতঃ,** মনে রাখিতে হয় যে, জমির অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের গুণ, শক্তি, কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, কর্ম্ম, গমন-প্রবৃত্তি ও গমনের যেমন মিলন-প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ আবার বিচ্ছেদ-মিলন এবং বিচ্ছেদ-প্রবৃত্তিও বিদ্যমান থাকে।

একই জমির ভিতর একই জমির অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের গুণ, শক্তি, কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, কর্ম্ম, গমন-প্রবৃত্তি ও গমনের যুগপৎ মিলন-প্রবৃত্তির, বিচ্ছেদ-মিলন-প্রবৃত্তির এবং বিচ্ছেদ-প্রবৃত্তির বিদ্যমানতা সম্ভবযোগ্য হয় কোন্ কোন্ কারণে—তাহার সন্ধান করিতে পারিলে জানা যায় যে, এই পৃথিবীর প্রত্যেক অংশ সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের দ্বৈত-ক্ষেত্র, কাল-ক্ষেত্র ও বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত বলিয়া প্রত্যেক অংশের গুণ, শক্তি, কর্ম্ম ও গমন যুগপৎ মিলন, বিচ্ছেদ-মিলন ও বিচ্ছেদের প্রবৃত্তিযুক্ত হইয়া থাকে। দ্বৈত-ক্ষেত্রের সহিত সংযোগের জন্য বিচ্ছেদ-প্রবৃত্তির হ্রাস, কাল-ক্ষেত্রের সহিত সংযোগের জন্য বিচ্ছেদ-প্রবৃত্তির মধ্যেও মিলন-প্রবৃত্তির উদ্ভব এবং বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রের সহিত সংযোগের জন্য বিচ্ছেদ-প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়।

দ্বিতীয়তঃ, মনে রাখিতে হয় যে, সাক্ষাৎভাবে জমির অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমন হইতে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি হয়। জমির অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের সমতায় জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির সমতা, উহাদের অসমতায় জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতা. উহাদের বিষমতায় জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির বিষমতা ঘটিয়া থাকে।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের দ্বৈত-ক্ষেত্রের সহিত সংযোগে জমির অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের বিচ্ছেদ-প্রবৃত্তির শূন্যতার উদ্ভব হয়। এই শূন্যতাবশতঃ জমির অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি কর্ম্ম ও গমনের সমতা সাধিত হয়।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের কাল-ক্ষেত্রের সহিত সংযোগে জমির অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের বিচ্ছেদ প্রবৃত্তির মধ্যে মিলনের প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়। ঐ বিচ্ছেদ-মিলন-প্রবৃত্তি বশতঃ জমির অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের অসমতা সাধিত হয়।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রের সহিত সংযোগে জমির অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের বিচ্ছেদ-প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়। এই বিচ্ছেদ-প্রবৃত্তি বশতঃ জমির অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের বিষমতা সাধিত হয়।

তৃতীয়তঃ, মনে রাখিতে হয় যে, জমির অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের যুগপৎ ভাবে সমতা, অসমতা ও বিষমতার প্রবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও জমির অভ্যন্তরে সাত শ্রেণীর শৃঙ্খলা বিদ্যমান থাকে।

জমির অভ্যন্তরে ঐ সাত শ্রেণীর শৃঙ্খলা বিদ্যমান থাকে বলিয়াই জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির যুগপৎ সমতা, অসমতা ও বিষমতার প্রবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও সমতার প্রবৃত্তিরই আধিক্য হইয়া থাকে।

যে সাত শ্রেণীর শৃঙ্খলায় জমির অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের সমতা রক্ষিত হয়, সেই সাত শ্রেণীর শৃঙ্খলার কথা আমরা ইহার পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। পাঠকগণের স্মরণার্থ ঐ সাত শ্রেণীর শৃঙ্খলার পুনরুল্লেখ করিতেছি।

ঐ সাত শ্রেণীর শৃঙ্খলার নাম :—

(১) জমির অভ্যন্তরস্থ অণ্ডাকারের, উৎক্ষেপণ আকারের, আকুঞ্চন আকারের, অবক্ষেপণ আকারের এবং প্রসারণাকারের আবয়বিক কর্ম্ম ও গমন-সমূহের শৃঙ্খলা ;

(২) জমির অভ্যন্তরস্থ ষড়্‌বিধ রাসায়নিক কর্ম্মের (অর্থাৎ কৃষ্ণ, পিঙ্গল, বিরূপাক্ষ, বিশ্বরূপ, ঋত ও সত্য নামক কর্ম্মের) শৃঙ্খলা ;

(৩) জমির অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবিধ অবস্থার পঞ্চবিধ অগ্নির শক্তি ও বৃত্তির শৃঙ্খলা ;

(৪) জমির অভ্যন্তরস্থ বায়বীয় অবস্থার বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণতি, বাষ্পীয় অবস্থার তরল-অবস্থায় পরিণতি, তরল-অবস্থার স্থূল-অবস্থায় পরিণতি, স্থূল-অবস্থার মহাকাশ-অবস্থায় পরিণতি এবং মহাকাশ-অবস্থার বায়বীয় অবস্থায় পরিণতিমূলক শৃঙ্খলা ;

(৫) জমির অভ্যন্তরস্থ ঊর্দ্ধাধঃ, সম্মুখ-পশ্চাৎ এবং বাম-দক্ষিণ আকারের চাপসমূহের শৃঙ্খলা ;

(৬) জমির অভ্যন্তরস্থ পৃথক্ পৃথক্ খনন্ধের সমাবেশের শৃঙ্খলা ;

(৭) জমির অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের প্রবাহের শৃঙ্খলা।

চতুর্থতঃ, মনে রাখিতে হয় যে, এই পৃথিবীতে যদ্যপি মনুষ্যজাতির কার্য্যসমূহ না থাকিত, তাহা হইলে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির সমতা, অসমতা ও বিষমতার প্রবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক কার্য্য-ক্রম এবং প্রাকৃতিক কার্য্য-নিয়মে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির সমতার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলশালিত্ব রক্ষিত হইত।

জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি বিষয়ে উপরোক্ত চারিটী সত্য জানা থাকিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যদিও প্রাকৃতিক কার্য্যক্রমে ও প্রাকৃতিক কার্য্য-নিয়মে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতা ও বিষমতার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়, তথাপি প্রাকৃতিক কার্য্য-ক্রমে ও প্রাকৃতিক কার্য্য-নিয়মেই আবার জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির সমতার প্রবৃত্তি স্বতঃই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলশালিনী হইয়া থাকে। এতাদৃশ প্রাকৃতিক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও যে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতার ও বিষমতার উদ্ভব হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, তাহার একমাত্র কারণ জমিবিষয়ে মনুষ্য-জাতির অজ্ঞতা ও অনাচার।

জমি ও তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির রক্ষা বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব কি কি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে জমি বিষয়ে মনুষ্যজাতির কোন্ কোন্ শ্রেণীর অনাচার ঘটিলে স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির সমতার প্রবৃত্তির স্থলে অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তি বলশালিনী হইতে পারে এবং হইয়া থাকে তাহা স্থির করিবার প্রয়োজন হয়। উহা স্থির করিতে হইলে প্রাকৃতিক যে যে কার্য্য-ক্রমে ও কার্য্য-নিয়মে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তি উদ্ভব হয় এবং প্রাকৃতিক যে যে কার্য্যক্রমে ও কার্য্য-নিয়মে ঐ অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তি উদ্ভূত হইলেও সমতার প্রবৃত্তি অধিকতর বলশালিনী থাকে, সেই সেই প্রাকৃতিক কার্য্য-ক্রম ও কার্য্য-নিয়মের কথা বিশদভাবে জানিবার প্রয়োজন হয়। প্রাকৃতিক যে যে কার্য্যক্রমে ও কার্য্য-নিয়মে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় এবং ঐ অসমতার ও বিষমতার উদ্ভব হওয়া সত্ত্বেও প্রাকৃতিক যে যে কার্য্যক্রমে ও কার্য্য-নিয়মে সমতার প্রবৃত্তির আতিশয্য থাকে, তাহার কথা প্রকারান্তরে আমরা "জমির ও তাহার উৎপাদিকা শক্তির রক্ষার" প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করিয়াছি।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের বক্তব্য সুস্পষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে নূতন ভাবে উপরোক্ত কথাগুলির পুনরুল্লেখ করিতে হইবে। আমরা এক্ষণে, **প্রথমতঃ,** প্রাকৃতিক যে যে কার্য্য-ক্রমে ও কার্য্য-নিয়মে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির অসমতা ও বিষমতার প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়, **দ্বিতীয়তঃ,** অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তির বিদ্যমানতা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক যে যে কার্য্যক্রমে ও কার্য্য-নিয়মে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির সমতার প্রবৃত্তির অধিকতর বল রক্ষা করা সম্ভব হয় এবং **তৃতীয়তঃ,** মানুষের যে যে অনাচারে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলশালিনী হওয়া সম্ভবযোগ্য হইতে পারে এবং হইয়া থাকে—এই তিনটি বিষয়ের আলোচনা করিব।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের কাল অবস্থার অথবা কাল-ক্ষেত্রের সহিত সংযোগে যে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতার প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয় এবং বিচ্ছেদ-অবস্থার অথবা বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রের সহিত সংযোগে যে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির বিষমতার প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়, তাহা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের কাল-অবস্থার অথবা কাল-ক্ষেত্রের সহিত এবং বিচ্ছেদ-অবস্থার অথবা বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রের সহিত সংযোগবশতঃ জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয় বটে ; কিন্তু সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের কাল-অবস্থা এবং বিচ্ছেদ-অবস্থার উৎপত্তি না হইলে জমির উৎপত্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের কাল অবস্থা এবং বিচ্ছেদ-অবস্থার উৎপত্তি না হইলে যে জমির উৎপত্তি হওয়া সম্ভব-যোগ্য হয় না, তাহা আমরা "জমির এবং তাহার উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি ও রক্ষার কার্য্যক্রম" * শীর্ষক আলোচনায় দেখাইয়াছি। জমির উৎপত্তি না হইলে যে জমির উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না, ইহা বলাই বাহুল্য।

উপরোক্ত কথা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, **প্রথমতঃ,** সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের কাল অবস্থা ও বিচ্ছেদ অবস্থা ; **দ্বিতীয়তঃ,** জমির উৎপত্তি এবং **তৃতীয়তঃ,** স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতা ও বিষমতা—এই তিনটী অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের কাল-অবস্থা ও বিচ্ছেদ-অবস্থার সহিত জমির উৎপত্তির কার্য্যক্রমের ও কার্য্যনিয়মের কি কি সম্বন্ধ—তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, প্রাকৃতিক কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে ও কার্য্যনিয়মে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতা ও বিষমতার উৎপত্তি হয়, তাহা সঠিক ভাবে নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের কাল-অবস্থা ও বিচ্ছেদ-অবস্থার সহিত জমির উৎপত্তির সম্বন্ধ বিষয়ে স্পষ্টভাবে ধারণা করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

* বঙ্গশ্রী পৌষ ১৩৫০—৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের কাল-অবস্থা ও বিচ্ছেদ-অবস্থার সহিত জমির উৎপত্তির কার্য্যক্রমের ও কার্য্যনিয়মের কি কি সম্বন্ধ তাহা আমরা—"জমির এবং তাহার উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তির ও রক্ষার কার্য্যক্রম"* শীর্ষক আলোচনায় বিবৃত করিয়াছি।

পাঠকগণের বুঝিবার সহায়তার জন্য সংক্ষিপ্তভাবে ঐ আলোচনার আমরা পুনরুল্লেখ করিব।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের কাল-অবস্থা ও বিচ্ছেদ-অবস্থার সহিত জমির উৎপত্তির কার্য্যক্রমের ও কার্য্যনিয়মের কি কি সম্বন্ধ তাহা স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে হইলে, ইহা মনে রাখিতে হয় যে, জমি, সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের স্থূল (solid) অবস্থা আর "বিচ্ছেদ-অবস্থা", সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের বাষ্পীয় অবস্থা, এবং "কাল-অবস্থা" সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের বায়বীয় অবস্থা।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের বায়বীয় ও বাষ্পীয় অবস্থার সহিত তাঁহাদের স্থূল-অবস্থার সম্বন্ধ কি কি অথবা সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রস কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে ও কোন্ কোন্ কার্য্য-নিয়মে তাঁহাদিগের বায়বীয় অবস্থা হইতে বাষ্পীয় অবস্থায় এবং বাষ্পীয় অবস্থা হইতে স্থূল অবস্থায় স্বতঃই উপনীত হন তাহা পরিজ্ঞাত হওয়ার নাম—সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের কাল-অবস্থা ও বিচ্ছেদ-অবস্থার সহিত—জমির উৎপত্তির কার্য্যক্রমের ও কার্য্যনিয়মের সম্বন্ধ পরিজ্ঞাত হওয়া।

কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে ও কোন্ কোন্ কার্য্যনিয়মে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রস তাঁহাদিগের বায়বীয় ও বাষ্পীয় অবস্থা হইতে তাঁহাদিগের স্থূল অবস্থায় উপনীত হন—তাহার কথা আমরা "জমির ও তাহার উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তির ও রক্ষার কার্য্যক্রম"* শীর্ষক আখ্যায়িকায় আলোচনা করিয়াছি।

ঐ আলোচনায় দেখান হইয়াছে যে, সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রস তাঁহাদিগের অদ্বৈত-অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে স্বতঃই কাল-অবস্থায় উপনীত হন এবং তাহার পর স্বতঃই বিচ্ছেদ-অবস্থায় উপনীত হন। বিচ্ছেদ-অবস্থায় উপনীত হইবার পর স্বতঃই যুগপৎ তরল ও স্থূল-অবস্থায় উপনীত হন। তরল-অবস্থার উৎপত্তি না হইলে স্থূল-অবস্থার উৎপত্তি হয় না। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের বায়বীয়-অবস্থা, বাষ্পীয় অবস্থা, তরল-অবস্থা এবং স্থূল-অবস্থার সমাবেশে তাঁহাদিগের স্থূল-অবস্থার উৎপত্তি হইয়া থাকে। স্বাভাবিক কোন স্থূল পদার্থ, তরল, বাষ্পীয় ও বায়বীয় অবস্থাশূন্য হইতে পারে না এবং হয় না।

উপরোক্ত কারণে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতা ও বিষমতার প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কারণে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে একদিকে যেরূপ স্বতঃই জমির উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে ও কোন কোন কার্য্যনিয়মে তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের বায়বীয় অবস্থা হইতে বাষ্পীয় অবস্থা এবং বাষ্পীয় অবস্থা হইতে তরল-অবস্থা এবং তরল-অবস্থা হইতে স্থূল-অবস্থার উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে তাহাও সঠিক ভাবে জানিবার প্রয়োজন হয়।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের বায়বীয় অবস্থা হইতে বাষ্পীয় অবস্থার এবং বাষ্পীয় অবস্থা হইতে তরল অবস্থার এবং তরল অবস্থা হইতে স্থূল-অবস্থার উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে এবং কোন্ কার্য্যনিয়মে তৎসম্বন্ধে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য কথা আছে, তাহা আমরা "জমি ও তাহার উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি ও রক্ষার কার্য্যক্রম"* শীর্ষক আলোচনায় বিবৃত করিয়াছি।

ঐ আলোচনায় দেখান হইয়াছে যে, যে যে কার্য্যক্রমে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের কাল-অবস্থা হইতে পৃথিবীর অথবা ভূমির উৎপত্তি হয়, সেই সেই কার্য্যক্রমের মধ্যে প্রধান প্রধান উল্লেখযোগ্য কার্য্যক্রম **বারটী**, যথা :—

(১) কাল-অবস্থার ও কাল-ক্ষেত্রের বায়বীয় দেহে তেজের বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য উৎক্ষেপণ ও আকুঞ্চন আকারের আবয়বিক কর্ম্ম ও গমনের প্রবৃত্তি ;

(২) কাল-অবস্থার ও কাল-ক্ষেত্রের বায়বীয় দেহে রসের মিলিত থাকিবার জন্য অবক্ষেপণ ও প্রসারণ আকারের আবয়বিক কর্ম্ম ও গমন ;

(৩) কাল-অবস্থার ও কাল-ক্ষেত্রের বায়বীয় দেহে তেজের বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য "কৃষ্ণ" নামক রাসায়নিক কর্ম্ম ও গমনের প্রবৃত্তি এবং কালক্ষেত্রে অগ্নির উৎপত্তি ;

(৪) কাল-অবস্থার ও কালক্ষেত্রের বায়বীয় দেহে রসের মিলিত থাকিবার জন্য "পিঙ্গল" নামক রাসায়নিক কর্ম্ম ও গমনের প্রবৃত্তি এবং কালক্ষেত্রের বাষ্পের ও তেজের বিচ্ছেদ অবস্থার উৎপত্তি ;

(৫) বিচ্ছেদ-অবস্থার ও বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রের বাষ্পীয় দেহে তেজের বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য উৎক্ষেপণ ও আকুঞ্চন আকারের আবয়বিক কর্ম্ম ও গমনের ও চলন-শীলতার প্রবৃত্তি ;

(৬) বিচ্ছেদ-অবস্থার ও বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রের বাষ্পীয় দেহে রসের মিলিত থাকিবার জন্য অবক্ষেপণ ও প্রসারণ আকারের আবয়বিক কর্ম্ম, গমন ও চলন-শীলতা ;

(৭) বিচ্ছেদ-অবস্থার ও বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রের বাষ্পীয় দেহে তেজের বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য দ্বি-মাত্রায় "কৃষ্ণ" নামক রাসায়নিক কর্ম্মের ও গমনের প্রবৃত্তি এবং বাষ্পীয় অগ্নির উৎপত্তি ;

(৮) বিচ্ছেদ-অবস্থার ও বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রের বাষ্পীয় দেহে রসের মিলিত থাকিবার জন্য দ্বি-মাত্রায় "পিঙ্গল" নামক রাসায়নিক কর্ম্মের ও গমনের প্রবৃত্তি এবং জলের অথবা তরল-অবস্থার উৎপত্তি ;

* বঙ্গশ্রী পৌষ ১৩৫০—৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য

(৯) তরল-অবস্থার ও তরল-ক্ষেত্রের তরল দেহে রসের মিলিত হইবার জন্ত উৎক্ষেপণ ও আকুঞ্চন আকারের আবয়বিক কর্ম্ম, গমন ও চলন-শীলতার প্রবৃত্তি;

(১০) তরল-অবস্থার ও তরল-ক্ষেত্রের তরল দেহে রসের মিলিত হইবার জন্ত অবক্ষেপণ ও প্রসারণ আকারের আবয়বিক কর্ম্ম, গমন ও চলন-শীলতার প্রবৃত্তি;

(১১) তরল-অবস্থার ও তরল-ক্ষেত্রের তরল দেহে তেজের বিচ্ছিন্ন হইবার জন্ত "ঋত" নামক রাসায়নিক কর্ম্ম ও গমনের প্রবৃত্তি এবং তরল অবস্থার অগ্নির উৎপত্তি;

(১২) তরল-অবস্থার ও তরল-ক্ষেত্রের তরল দেহে রসের মিলিত থাকিবার জন্ত "সত্য" নামক রাসায়নিক কর্ম্ম ও গমনের প্রবৃত্তি এবং স্থূল অবস্থার অথবাস্থলেরউৎপত্তি।

উপরোক্ত দ্বাদশ শ্রেণীর প্রাকৃতিক কার্য্যক্রমে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রস তাঁহাদের কাল অবস্থা হইতে স্থূল-অবস্থায় পরিণতি লাভ করিলে স্থলের অথবা পৃথিবীর অথবা জমির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

জমির উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে, কেবলমাত্র তাহা জানিতে পারিলেই জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকাশক্তির অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কারণে, তাহা স্থির করিতে পারা যায় না। জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কারণে, তাহা সঠিকভাবে স্থির করিতে হইলে **প্রথমতঃ**, জমির উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে—তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়া, **দ্বিতীয়তঃ**, জমির আকৃতি ও গঠনের রক্ষা হয় কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে তাহা নির্ণয় করিতে হয়, তাহার পর, **তৃতীয়তঃ**, জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে তাহা স্থির করিতে হয়। জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে তাহা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে স্থির করিতে পারিলে ঐ স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতা ও বিষমতা স্বভাবতঃ কোন্ কোন্ কারণে ঘটিয়া থাকে তাহা স্থির করা যায়।

জমির আকৃতির ও গঠনের রক্ষা হয় কোন্ কোন্ কার্য্য-ক্রমে—তাহার ব্যাখ্যা আমরা "জমির এবং তাহার উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি ও রক্ষার কার্য্যক্রম"* শীর্ষক আলোচনায় করিয়াছি। ঐ আলোচনায় দেখান হইয়াছে যে, যে বারটি উল্লেখযোগ্য কার্য্যক্রমে জমির উৎপত্তি হয় সেই বারটি কার্য্য যথারীতি ক্রমানুসারে জমির উৎপত্তি হইবার পরও বিদ্যমান থাকে, এখনও আছে এবং চিরদিন থাকিবে।

জমির উৎপত্তি হইবার পর একদিকে যেমন যে বারটি উল্লেখযোগ্য কার্য্যবশতঃ জমির উৎপত্তি হয়, সেই বারটি কার্য্য সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ আবার জমির আপনার দেহের ভার (weight) বশতঃ সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের অদ্বৈত-ক্ষেত্রে, মায়া-ক্ষেত্রে এবং দ্বৈত-ক্ষেত্রের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সংস্রব অথবা সংযোগ বিদ্যমান থাকে। তাহা ছাড়া জমির দেহের অভ্যন্তরে তেজ ও রসের পাঁচটী অবস্থার (অর্থাৎ বায়বীয়, বাষ্পীয়, তরল, স্থূল ও মহাকাশ-অবস্থার) সমাবেশ বিদ্যমান থাকে। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের পাঁচটি অবস্থার সমাবেশ যেমন জমির দেহের অভ্যন্তরে বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ ঐ পাঁচটি অবস্থার গুণ, শক্তি, বৃত্তি, কর্ম্ম এবং গমনের কার্য্যশীলতাও পৃথক পৃথক ভাবে এবং সমষ্টিগত-ভাবে জমির দেহের অভ্যন্তরে বিদ্যমান থাকে।

প্রথমতঃ, জমির উৎপত্তির কারণ যে বারটি কার্য্য; **দ্বিতীয়তঃ**, জমির অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের পাঁচটি অবস্থার এবং পাঁচটী অবস্থার গুণ, শক্তি প্রভৃতির সমাবেশ; এবং **তৃতীয়তঃ**, জমির পারিপার্শ্বিক তরল অবস্থার মহাসমুদ্রের ও বাষ্পীয় অবস্থার মহাকাশের সমাবেশ; এই তিনটী বিষয়ের পরস্পরের সম্বন্ধজাত পরিণতি কি কি হইতে পারে, তাহা দুই ভাবে চিন্তা করিতে হয়। একভাবের চিন্তার নাম **গণিতশাস্ত্র-সঙ্গত চিন্তা**, অপর ভাবের চিন্তার নাম **রসায়নশাস্ত্র-সঙ্গত চিন্তা**।

উপরোক্ত দুইভাবের চিন্তার যে কোন ভাবের চিন্তার সহিত পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যায় যে, জমির প্রত্যেক অংশ বাস্তবতঃ দ্বিবিধ কার্য্যের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে সংশ্লিষ্ট। এক শ্রেণীর কার্য্য তেজ-জাত। তেজজাত কার্য্য আবয়বিক (physical) এবং রাসায়নিক (chemical) হইয়া থাকে। আর এক শ্রেণীর কার্য্য রস-জাত। উহাও আবয়বিক এবং রাসায়নিক আকারে বিদ্যমান থাকে।

যে সমস্ত তেজ-জাত কার্য্যের সহিত জমি অঙ্গাঙ্গী ভাবে সংশ্লিষ্ট সেই সমস্ত তেজ-জাত কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম জমির প্রত্যেক উপাদানের ও প্রত্যেক অঙ্গের বিচ্ছিন্নতা সাধন করা।

যে সমস্ত রস-জাত কার্য্যের সহিত জমি অঙ্গাঙ্গী ভাবে সংশ্লিষ্ট সেই সমস্ত রস-জাত কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম জমির বিভিন্ন উপাদানের ও বিভিন্ন অঙ্গের মিলন সাধন করা।

জমির প্রত্যেক অংশ যদ্যপি কেবলমাত্র এই ভূমণ্ডলের কাল-ক্ষেত্র ও বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রের উপরোক্ত তেজ-জাত এবং রস-জাত কার্য্যসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিত, তাহা হইলে জমির আকৃতির ও গঠনের এবং তাহার গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গঠনসমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হইত না। ইহার কারণ—যে সমস্ত তেজ-জাত কার্য্যের সহিত জমি অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট সেই সমস্ত তেজ-জাত কার্য্যের সমষ্টিগত

* বঙ্গশ্রী পৌষ ১৩৫০—৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য

পরিণতির (Resultant-এর) তুলনায় রস-জাত কার্য্যসমূহের সমষ্টিগত পরিণতির পরিমাণ সর্ব্বদাই অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হয়।

তেজ-জাত কার্য্যসমূহের সমষ্টিগত পরিণতির তুলনায় রস-জাত কার্য্যসমূহের সমষ্টিগত পরিণতির দৌর্ব্বল্যবশতঃ, জমির প্রত্যেক-অংশ যত্তপি কেবলমাত্র এই ভূমণ্ডলের কাল-ক্ষেত্রের ও বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রের তেজ-জাত ও রস-জাত কার্য্যসমূহের সহিতই সংশ্লিষ্ট থাকিত এবং দ্বৈতক্ষেত্র, মায়াক্ষেত্র ও অদ্বৈত-ক্ষেত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকিত, তাহা হইলে জমির অভ্যন্তরে তেজ-জাত বিচ্ছেদের কার্য্যসমূহ বলবান্ হইত। তেজ-জাত বিচ্ছেদের কার্য্যসমূহ বলবান্ হইলে রসের মিলনের কার্য্য-সমূহের স্থায়িত্ব রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হইত না এবং জমির আকৃতির ও গঠনের এবং তাহার গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনসমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হইত না।

তেজ-জাত বিচ্ছেদের কার্য্যসমূহের বলশালিত্ব সত্ত্বেও রস-জাত মিলনের কার্য্যসমূহের স্থায়িত্ব রক্ষা করা এবং আকৃতি, গঠন, গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনসমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যে জমির পক্ষে সম্ভবযোগ্য হয়, তাহার প্রধান কারণ—সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের দ্বৈত-ক্ষেত্র, মায়া-ক্ষেত্র এবং অদ্বৈত-ক্ষেত্রের অথবা দ্বৈতাবস্থা, মায়াবস্থা এবং অদ্বৈত-অবস্থার সহিত আপন ভার বশতঃ জমির সংযোগ।

উপরোক্ত বিরুদ্ধ অবস্থা সত্ত্বেও জমির পক্ষে তাহার স্বকীয় আকৃতি, গঠন, গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমন-সমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হয় কোন্ কোন্ কার্য্য-ক্রমে তাহা বুঝিতে পারিলে জমির উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি হয় স্বভাব বশতঃ কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে তাহা অনায়াসেই বুঝা সম্ভবযোগ্য হয়।

কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে জমির পক্ষে তাহার স্বকীয় আকৃতি, গঠন, গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনসমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হয় তাহা বুঝিতে পারিলে জমির উৎপাদিকা শক্তির উৎপত্তি হয় কোন্ কারণে ও কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে তাহা বুঝা অনায়াসসাধ্য হয়।

কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে জমির পক্ষে তাহার স্বকীয় আকৃতি, গঠন, গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনসমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হয় তাহা ধারণা করিতে হইলে জমির উৎপত্তির অবস্থায় জমির অস্তিত্ব কোন্ কোন্ কার্য্যের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত তাহার স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।

জমির উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে তাহা ধারণা করিতে পারিলে দেখা যায় যে, জমির উৎপত্তির অবস্থায় জমির অস্তিত্ব এই ভূ-মণ্ডলের উনিশ শ্রেণীর গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। যথা—

(১) হইতে (১২) পূর্ব্বোক্ত যে বার শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য কার্য্যবশতঃ জমির উৎপত্তি হয় সেই বার শ্রেণীর কার্য্য-জাত গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমন;

(১৩) সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের কাল-অবস্থার অথবা কাল-ক্ষেত্রের গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনসমূহ;

(১৪) সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের বিচ্ছেদ-অবস্থার অথবা বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রের গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমন-সমূহ;

(১৫) সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মহাকাশ-অবস্থার অথবা মহাকাশ-ক্ষেত্রের গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমন-সমূহ;

(১৬) সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের তরল-অবস্থার অথবা মহা-সমুদ্রের গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনসমূহ।

(১৭) সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের স্থূল-অবস্থার অথবা পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবিধ অবস্থার (অর্থাৎ বায়বীয়, বাষ্পীয়, তরল, স্থূল ও মহাকাশ-অবস্থার) উৎক্ষেপণ আকারের, আকুঞ্চন আকারের, অবক্ষেপণ আকারের, প্রসারণ আকারের এবং অণু আকারের আবয়বিক কর্ম্ম ও গমনসমূহ;

(১৮) পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবিধ অবস্থার ষড়্বিধ (অর্থাৎ কৃষ্ণ, পিঙ্গল, বিরূপাক্ষ, বিশ্বরূপ, ঋত ও সত্য নামক) রাসায়নিক কর্ম্ম ও গমনসমূহ;

(১৯) পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবিধ অবস্থার পঞ্চবিধ অগ্নির গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনসমূহ।

জমির উৎপত্তি হইবামাত্র জমির যে অস্তিত্বের উদ্ভব হয় জমির সেই অস্তিত্ব এই ভূ-মণ্ডলের উপরোক্ত উনবিংশ শ্রেণীর গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত বলিয়া রাসায়নিক গণিতশাস্ত্রের গণনাকার্য্যে ধরিয়া লইতে হয় বটে, কিন্তু বাস্তবতঃ জমির অস্তিত্ব কখনও কেবল মাত্র ঐ উনবিংশ শ্রেণীর গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের সহিত জড়িত থাকে না। জমির উৎপত্তি হইবামাত্র উহার আপন ভার বশতঃ সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের দ্বৈত-ক্ষেত্র, মায়া-ক্ষেত্র এবং অদ্বৈত-ক্ষেত্রের সহিত উহার যে সংযোগ হয়, সেই সংযোগ বশতঃ জমির অস্তিত্ব আরও তিন শ্রেণীর গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনসমূহের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত হইয়া থাকে। এই তিন শ্রেণীর গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের নাম—

(১) সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের দ্বৈতাবস্থা অথবা দ্বৈত-ক্ষেত্রের সহিত সংযোগবশতঃ জমির গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি,, কর্ম্ম ও গমন;

(২) সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মায়া-অবস্থা অথবা মায়া-ক্ষেত্রের সহিত সংযোগ বশতঃ জমির গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমন;

(৩) সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের অদ্বৈত-অবস্থা অথবা অদ্বৈত-

ক্ষেত্রের সহিত সংযোগ বশতঃ জমির গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমন।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের দ্বৈতাবস্থা, মায়াবস্থা এবং অদ্বৈতাবস্থার সহিত সংযোগবশতঃ জমির অন্তস্থ যে তিন শ্রেণীর গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত হয়, সেই তিন শ্রেণীর গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের উৎপত্তি হইলে জমির অভ্যন্তরে নূতন রকমের আরও পাঁচ শ্রেণীর গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের উৎপত্তি হয়। ঐ পাঁচ শ্রেণীর গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের নাম—

(১) জমির অভ্যন্তরস্থ ঘনত্বের পার্থক্যসমূহের সমাবেশজাত গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনসমূহ;

(২) বহিঃস্থিত চাপবশতঃ জমির অভ্যন্তরস্থ ঊর্দ্ধাধঃমুখী, উত্তর-দক্ষিণ পার্শ্বাভিমুখী এবং সম্মুখ-পশ্চাৎ অভিমুখী তিন রকমের চাপ-জাত গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনসমূহ;

(৩) জমির অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের প্রবাহজনিত গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনসমূহ;

(৪) জমির অভ্যন্তরস্থ অণুাকারের আবয়বিক কর্ম্ম ও গমনশীলতার সহিত উৎক্ষেপণাকারের, আকুঞ্চনাকারের, অবক্ষেপণাকারের ও প্রসরণাকারের, কর্ম্ম ও গমনসমূহের সমষ্টির সমতা—সাধন করিবার প্রবৃত্তিজাত গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনসমূহ;

(৫) জমির অভ্যন্তরস্থ বায়বীয় অবস্থার বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণতির, বাষ্পীয় অবস্থার তরল-অবস্থায় পরিণতির, তরল-অবস্থার স্থূল-অবস্থায় পরিণতির, স্থূল-অবস্থার মহাকাশ-অবস্থায় পরিণতির, মহাকাশ-অবস্থার বায়বীয় অবস্থায় পরিণতির প্রবৃত্তিজাত গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনসমূহ।

জমির রক্ষা সম্বন্ধীয় উপরোক্ত কথাগুলি পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জমির অস্তিত্ব যে স্বতঃই রক্ষিত হয়, তাহার কারণ সর্ব্বসমেত নয় শ্রেণীর পদার্থের সহিত জমির সম্বন্ধ; যথা—

(১) জমির উৎপত্তির বার শ্রেণীর কার্য্যের সহিত জমির সম্বন্ধ;

(২) সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের কাল-অবস্থার অথবা কাল-ক্ষেত্রের গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের সহিত জমির সম্বন্ধ;

(৩) সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের বিচ্ছেদ-অবস্থার অথবা বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রের গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের সহিত জমির সম্বন্ধ;

(৪) সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের তরল-অবস্থা অথবা মহা-সমুদ্রের গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের সহিত জমির সম্বন্ধ;

(৫) সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের স্থূল-অবস্থা অথবা পৃথিবীর সমগ্রভাগের সমষ্টিগত গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের সহিত জমির সম্বন্ধ;

(৬) সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মহাকাশ-অবস্থা অথবা ভূ-মণ্ডলের বায়ুমণ্ডলের গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের সহিত জমির সম্বন্ধ;

(৭) সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের দ্বৈত-অবস্থা অথবা দ্বৈত-ক্ষেত্রের অথবা ব্যোম-ক্ষেত্রের গুণ, শক্তি, কর্ম্ম ও গমনপ্রবৃত্তির সহিত জমির সম্বন্ধ;

(৮) সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মায়া-অবস্থা অথবা আকাশ-ক্ষেত্রের সহিত জমির সম্বন্ধ;

(৯) সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের অদ্বৈত-অবস্থা অথবা অদ্বৈত-ক্ষেত্রের সহিত জমির সম্বন্ধ।

জমির অস্তিত্ব যে স্বতঃই রক্ষিত হয় তাহার মূলে একদিকে যেরূপ উপরিউক্ত নয় শ্রেণীর সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, সেইরূপ আবার জমির নিজের ঐ নয় শ্রেণীর সম্বন্ধজাত সপ্তবিংশতি শ্রেণীর গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম এবং গমনও বিদ্যমান আছে। এই সপ্তবিংশতি শ্রেণীর গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনসমূহের ঊনবিংশতি শ্রেণীর গুণ প্রভৃতির উৎপত্তি হয় জমির উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে; তিন শ্রেণীর গুণ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়, জমির আপন ভার (weight) বশতঃ দ্বৈত, মায়া ও অদ্বৈত-ক্ষেত্রের সংযোগে। আর বাকী পাঁচ শ্রেণীর গুণ প্রভৃতির উৎপত্তি হয় পূর্ব্বোক্ত দ্বাবিংশতি শ্রেণীর পরিণতিক্রমে।

যে নয়শ্রেণীর সম্বন্ধ এবং সপ্তবিংশতি শ্রেণীর গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনবশতঃ জমির অস্তিত্ব স্বতঃই রক্ষিত হয়, সেই নয় শ্রেণীর সম্বন্ধ এবং সপ্তবিংশতি শ্রেণীর গুণ প্রভৃতির উৎপত্তির পূর্ব্বাপর পর্য্যায় স্থির করিবার নাম জমির অস্তিত্ব স্বভাবতঃ রক্ষা হওয়ার কার্য্যক্রম স্থির করা।

জমির রক্ষা হওয়ার সম্বন্ধে আগে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে সেই সমস্ত কথা অনুধাবন করিতে পারিলে কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে জমির অস্তিত্ব স্বভাবতঃ রক্ষিত হয় তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়।

যে যে কার্য্যে জমির অস্তিত্ব স্বভাবতঃ রক্ষিত হয় সেই সেই কার্য্যের মধ্যে পূর্ব্বাপর পর্য্যায়ক্রমে একুশটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যথা—

প্রথম—জমির অভ্যন্তরস্থ বায়বীয় অবস্থার বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণতির, বাষ্পীয় অবস্থার তরল অবস্থায় পরিণতির,

তরল-অবস্থায় স্থূল-অবস্থায় পরিণতির, স্থূল-অবস্থার মহাকাশ-অবস্থায় পরিণতির, মহাকাশ-অবস্থার বায়বীয় অবস্থায় পরিণতির প্রবৃত্তিজাত, গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমন-সমূহ।

দ্বিতীয়—জমির অভ্যন্তরস্থ অণ্ডাকারের আবয়বিক (Physical) কর্ম্ম ও গমনশীলতার সহিত উৎক্ষেপণাকারের, অবক্ষেপণাকারের ও প্রসারণাকারের কর্ম্ম ও গমনসমূহের সমষ্টির সমতা সাধন করিবার প্রবৃত্তিজাত গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনসমূহ।

তৃতীয়—জমির অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের প্রবাহজনিত গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনসমূহ।

চতুর্থ—জমির অভ্যন্তরস্থ ঊর্দ্ধাধঃমুখী উত্তর-দক্ষিণ-পার্শ্বাভিমুখী এবং সম্মুখ-পশ্চাৎ অভিমুখী তিন রকমের বাষ্প-জাত গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনসমূহ।

পঞ্চম—জমির অভ্যন্তরস্থ ঘনত্বের. পার্থক্যসমূহের সমাবেশজাত গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনসমূহ।

ষষ্ঠ—জমির অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবিধ অবস্থার (অর্থাৎ বায়বীয়, তরল, স্থূল ও মহাকাশ এই পাঁচটী অবস্থার) পঞ্চবিধ অগ্নির [অর্থাৎ বায়বীয় অগ্নি (Dry heat), বাষ্পীয় অগ্নি (Moistened heat), তরল অগ্নি (Hot liquid), স্থূল অগ্নি (Hot solid) এবং মহাগ্নি (Heat with simultaneous tendencies of drying as well as moisterning)—এই পাঁচ শ্রেণীর অগ্নির] গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনসমূহ।

সপ্তম—জমির অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবিধ অবস্থার, ষড়বিধ রাসায়নিক কর্ম্ম-[অর্থাৎ কৃষ্ণ (Heat increasing chemical work of aerial condition), পিঙ্গল (Moisture increasing chemical work of aerial condition), বিরূপাক্ষ (Heat increasing chemical work of gaseous condition) বিশ্বরূপ (Moisture increasing chemical work of gaseous condition) ঋত (Heat increasing chemical work of liquid condition), সত্য (Moisture increasing chemical work of liquid condition) এই ছয়-শ্রেণীর রাসায়নিক কর্ম্ম]-জাত গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনসমূহ।

অষ্টম—জমির অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবিধ অবস্থার উৎক্ষেপণাকারের, আকুঞ্চনাকারের, অবক্ষেপণাকারের, প্রসারণাকারের এবং অণ্ডাকারের কর্ম্ম ও গমনজাত গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনসমূহ।

নবম—মহাসমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ "সত্য" নামক রাসায়নিক কর্ম্ম ও গমন।

দশম—মহাসমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ "ঋত" নামক রাসায়নিক কর্ম্ম ও গমন।

একাদশ—মহাসমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ অবক্ষেপণ ও প্রসারণ আকারের আবয়বিক কর্ম্ম, গমন ও চলনশীলতা।

দ্বাদশ—মহাসমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ উৎক্ষেপণ ও আকুঞ্চন আকারের আবয়বিক কর্ম্ম, গমন ও চলনশীলতা।

ত্রয়োদশ—বাষ্পীয় ক্ষেত্রের অথবা বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থ "বিরূপাক্ষ" নামক রাসায়নিক কর্ম্ম ও গমন।

চতুর্দ্দশ—বাষ্পীয়-ক্ষেত্রের অথবা বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থ "বিশ্বরূপ" নামক রাসায়নিক কর্ম্ম ও গমন।

পঞ্চদশ—বাষ্পীয় ক্ষেত্রের অথবা বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থ অবক্ষেপণ ও প্রসারণাকারের আবয়বিক কর্ম্ম ও গমন।

ষোড়শ—বাষ্পীয় ক্ষেত্রের অথবা বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থ উৎক্ষেপণ ও আকুঞ্চন আকারের আবয়বিক কর্ম্ম ও গমন।

সপ্তদশ—বায়ু-ক্ষেত্রের অথবা কাল-ক্ষেত্রের "পিঙ্গল" নামক রাসায়নিক কর্ম্ম ও গমন।

অষ্টাদশ—বায়ু-ক্ষেত্রের অথবা কাল-ক্ষেত্রের "কৃষ্ণ" নামক রাসায়নিক কর্ম্ম ও গমন এবং অগ্নির কর্ম্ম ও গমন।

ঊনবিংশতি—বায়ু-ক্ষেত্রের অথবা কাল-ক্ষেত্রের অবক্ষেপণ ও প্রসারণ আকারের কর্ম্ম ও গমন।

বিংশতি—বায়ু-ক্ষেত্রের অথবা কাল-ক্ষেত্রের উৎক্ষেপণ ও আকুঞ্চনাকারের আবয়বিক কর্ম্ম ও গমন।

একবিংশতি—বায়ু-ক্ষেত্রের অথবা কাল-ক্ষেত্রের অণ্ডাকারের আবয়বিক কর্ম্ম ও গমন।

উপরোক্ত যে যে একবিংশতি কার্য্যক্রম, নয় শ্রেণীর সম্বন্ধ এবং সপ্তবিংশতি শ্রেণীর গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি., কর্ম্ম ও গমন বশতঃ জমির আকৃতি ও গঠন প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বতঃই রক্ষিত হয়, সেই সেই একবিংশতি কার্য্যক্রম, নয় শ্রেণীর সম্বন্ধ, এবং সপ্তবিংশতি শ্রেণীর গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমন-সমূহের কথা ধারণা করিতে পারিলে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে তাহা স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায়।

যে যে একবিংশতি কার্য্যক্রমে জমির আকৃতি ও গঠন-প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বতঃই রক্ষিত হয় সেই সেই একবিংশতি কার্য্যক্রমই জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তির কার্য্যক্রম।

যে যে একবিংশতি কার্য্যক্রমে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি হয়—সেই সেই একবিংশতি কার্য্যক্রমের সমতায় জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির

সমতা, উহাদের অসমতায় জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতা, উহাদের বিষমতায় জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির বিষমতা ঘটিয়া থাকে।

জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির সমতা, অসমতা ও বিষমতার লক্ষণ প্রকাশ পায় জমিজাত উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের পরিমাণে এবং ঐ উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের গুণ ও শক্তিতে।

জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির সমতা যত বৃদ্ধি পায়, জমি-জাত উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের পরিমাণও তত বৃদ্ধি পায়, এবং ঐ উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের ব্যবহারে মানুষের বিচারশক্তি এবং সমগ্র মনুষ্য-সমাজের পরস্পরের মধ্যের মিলন-প্রবৃত্তিও তত বৃদ্ধি পায়।

জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতা যত বৃদ্ধি পায়, জমি-জাত উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের পরিমাণ তত হ্রাস প্রাপ্ত হয়, এবং ঐ উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের ব্যবহারে মানুষের বিচারশক্তি তত ভ্রমপ্রমাদ-পরিপূর্ণ হয় এবং সমগ্র মনুষ্য-সমাজের পরস্পরের মধ্যে দলাদলির প্রবৃত্তিও তত বৃদ্ধি পায়।

জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির বিষমতা যত বৃদ্ধি পায়, জমির উৎপাদিকা-শক্তি তত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, জমিজাত উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের পরিমাণ তত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ঐ উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের ব্যবহারে মানুষের বিচারশক্তি ও শারীরিক স্বাস্থ্য তত হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং সমগ্র মনুষ্য-সমাজের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহের অথবা মারামারির প্রবৃত্তি তত বৃদ্ধি পায়।

জমিজাত উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের পরিমাণে এবং ঐ উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের গুণ ও শক্তিতে উপরোক্ত ভাবে যেরূপ জমির উৎপাদিকা-শক্তির সমতা, অসমতা ও বিষমতার লক্ষণসমূহের প্রকাশ পায়, সেইরূপ আবার জমির অভ্যন্তরস্থ পাঁচটী অবস্থার (অর্থাৎ বায়বীয়, বাষ্পীয়, তরল, স্থূল ও মহাকাশ)—এই পাঁচটী অবস্থা স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন শক্তিতে এবং পাঁচটী আবয়বিক কর্ম্মে (অর্থাৎ উৎক্ষেপণ, আকুঞ্চন, অবক্ষেপণ, প্রসারণ এবং অণ্ডাকারের কর্ম্মে) ও ঐ স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির সমতা, অসমতা ও বিষমতার লক্ষণসমূহে প্রকাশ হয়।

জমির অভ্যন্তরস্থ পাঁচটী আবয়বিক কর্ম্মেও পাঁচটী অবস্থার স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন-শক্তিতে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির সমতা, জমির অভ্যন্তরস্থ অসমতা ও বিষমতার লক্ষণ কিরূপ ভাবে প্রকাশ পায় তাহা পরবর্ত্তী কথাগুলি হইতে স্পষ্টতর ভাবে ধারণা করা সম্ভব হয়। উৎক্ষেপণ, আকুঞ্চন, অবক্ষেপণ ও প্রসারণাকারের আবয়বিক কর্ম্মসমূহের সমষ্টিগত পরিণতি এবং অণ্ডাকারের কর্ম্মের যতই মিলিত অর্থাৎ সমভাবে চলিতে থাকে, পৃথক্ পৃথক্ আবয়বিক কর্ম্মসমূহের অস্তিত্ব ততই বিলুপ্ত হয়। পৃথক পৃথক আবয়বিক কর্ম্ম-সমূহের অস্তিত্ব যতই বিলুপ্ত হয় জমির অভ্যন্তরস্থ, চতুর্ব্বিধ রাসায়নিক কর্ম্মের মিলিত শক্তি ততই বৃদ্ধি পায়। জমির অভ্যন্তরস্থ চতুর্ব্বিধ রাসায়নিক কর্ম্মের মিলিত শক্তি যতই বৃদ্ধি পায় জমির অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবিধ অগ্নির মিলিত শক্তি ততই বৃদ্ধি পায়। জমির অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবিধ অগ্নির মিলিত শক্তি যতই বৃদ্ধি পায় জমির অভ্যন্তরস্থ ঘনত্বের পার্থক্য ততই বিলুপ্ত হয়। জমির অভ্যন্তরস্থ ঘনত্বের পার্থক্য যতই বিলুপ্ত হয় জমির অভ্যন্তরস্থ ত্রিবিধ চাপ (ঊর্দ্ধাধঃমুখী, সম্মুখ-পশ্চাৎমুখী ও বাম-দক্ষিণাভিমুখী চাপ) ততই সমতা লাভ করে। জমির অভ্যন্তরস্থ ত্রিবিধ চাপ যতই সমতা লাভ করে, জমির অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের প্রবাহ ততই মিলিতভাবে কার্য্য করে। জমির অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের প্রবাহ যতই মিলিতভাবে কার্য্য করে, জমির অভ্যন্তরস্থ পাঁচটি অবস্থার পরিবর্ত্তনের শৃঙ্খলা ও বেগ ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জমির অভ্যন্তরস্থ পাঁচটি অবস্থার পরিবর্ত্তনের শৃঙ্খলা ও বেগ যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে জমির উৎপাদিকা-শক্তির সমতা ও সমতাজনিত বেগ ততই বৃদ্ধি পায়।

জমির অভ্যন্তরস্থ অণ্ডাকারের কর্ম্মের তুলনায় উৎক্ষেপণ, আকুঞ্চন, অবক্ষেপণ ও প্রসারণাকারের আবয়বিক কর্ম্ম-সমূহের সমষ্টিগত পরিণতি যতই অধিকতর ভাবে প্রকট হয় (অর্থাৎ অসম হয়) জমির অভ্যন্তরস্থ পৃথক পৃথক্ আবয়বিক কর্ম্ম-সমূহের অস্তিত্ব ততই প্রকাশ পায়। পৃথক্ পৃথক্ আবয়বিক কর্ম্ম-সমূহের অস্তিত্ব যতই প্রকাশ পায়, জমির অভ্যন্তরস্থ চতুর্ব্বিধ রাসায়নিক কর্ম্মের শক্তি ততই বিচ্ছিন্ন হয়। জমির অভ্যন্তরস্থ চতুর্ব্বিধ রাসায়নিক কর্ম্মের শক্তি যতই বিচ্ছিন্ন হয়, জমির অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবিধ অগ্নির শক্তিও ততই বিচ্ছিন্ন হয়। জমির অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবিধ অগ্নির শক্তি যতই বিচ্ছিন্ন হয়, জমির অভ্যন্তরস্থ ঘনত্বের পার্থক্য ততই বৃদ্ধি পায়। জমির অভ্যন্তরস্থ ঘনত্বের পার্থক্য যতই বৃদ্ধি পায় জমির অভ্যন্তরস্থ ত্রিবিধ চাপ ততই অসমতা লাভ করে। জমির অভ্যন্তরস্থ ত্রিবিধ চাপ যতই অসমতা লাভ করে জমির অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের প্রবাহ ততই বিচ্ছিন্নতা লাভ করে। জমির অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের প্রবাহ যতই বিচ্ছিন্নতা লাভ করে, জমির অভ্যন্তরস্থ পাঁচটি অবস্থার পরিবর্ত্তনের শৃঙ্খলারও বেগ ততই হ্রাস পাইতে থাকে। জমির অভ্যন্তরস্থ পাঁচটী অবস্থার পরিবর্ত্তনের শৃঙ্খলা ও বেগ যতই হ্রাস পাইতে থাকে, জমির উৎপাদিকা-শক্তির অসমতা ও অসমতাজনিত বেগ ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

জমির উৎপাদিকা-শক্তির অসমতা ও অসমতাজনিত বেগ যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, জমির অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবিধ কর্ম্মের বিশৃঙ্খলা ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জমির অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবিধ কর্ম্মের বিশৃঙ্খলা যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে,

জমির অভ্যন্তরস্থ ষড়বিধ রাসায়নিক কর্ম্মের পরস্পরের বিরুদ্ধতা ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জমির অভ্যন্তরস্থ ষড়বিধ রাসায়নিক কর্ম্মের পরস্পরের বিরুদ্ধতা যতই বৃদ্ধি পায়, জমির অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবিধ অগ্নির শক্তির মধ্যেও পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধতা বৃদ্ধি পায়। জমির পঞ্চবিধ অগ্নির শক্তির মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধতা যতই বৃদ্ধি পায়, জমির অভ্যন্তরস্থ ঘনত্বের সমাবেশে বিশৃঙ্খলাও ততই বৃদ্ধি পায়। জমির অভ্যন্তরস্থ ঘনত্বের সমাবেশে বিশৃঙ্খলা যতই বৃদ্ধি পায়, জমির অভ্যন্তরস্থ ত্রিবিধ চাপের পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধভাব ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

জমির অভ্যন্তরস্থ ত্রিবিধ চাপের পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধভাব যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, জমির অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের প্রবাহে ততই বিরুদ্ধতার উদ্ভব হয়। জমির অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের প্রবাহে যতই বিরুদ্ধতার উদ্ভব হয়, জমির অভ্যন্তরস্থ পাঁচটী অবস্থার পরিবর্ত্তনে বিশৃঙ্খলাও ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জমির অভ্যন্তরস্থ পাঁচটী অবস্থার পরিবর্ত্তনে বিশৃঙ্খলা যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, জমির উৎপাদিকা-শক্তির বিষমতা ও বিষমতা-জনিত বেগ ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

জমির উৎপত্তির কার্য্য-ক্রমসমূহ ধারণা করিতে পারিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জমির উৎপত্তির প্রাকৃতিক কার্য্য-ক্রমের মধ্যেই উহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতার ও বিষমতার কারণ বিদ্যমান থাকে। আগেই দেখান হইয়াছে যে, জমির উৎপত্তির সূচনা হয়, সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের "কাল-অবস্থায়" এবং ঐ উৎপত্তির প্রকাশ হয় সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের বিচ্ছেদ অবস্থায়। কাল-অবস্থার বৈশিষ্ট্য বিচ্ছেদ-মিলন অথবা অসমতা এবং বিচ্ছেদ অবস্থার বৈশিষ্ট্য বিচ্ছেদ অথবা "বিষমতা"। কাযেই, অসমতা ও বিষমতা যেমন জমির উৎপাদনের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত থাকে, সেইরূপ জমির উৎপাদিকা-শক্তির কারণসমূহের মধ্যেও ঐ অসমতা অথবা বিষমতার বীজ অথবা প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে।

জমির উপাদানের মধ্যে এবং উহার উৎপাদিকা-শক্তির কারণসমূহের মধ্যে অসমতা ও বিষমতার বীজ অথবা প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকিলেও জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি স্বতঃই অসমতা অথবা বিষমতা-প্রবণ (অর্থাৎ অসমতা অথবা বিষমতার প্রবৃত্তির আধিক্যযুক্ত) হয় না। তাহার কারণ অস্তিত্ব রক্ষার কার্য্য-ক্রমসমূহ।

জমির আকৃতি ও গঠন প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বতঃই রক্ষিত হয় কোন্ কোন্ কার্য্য-ক্রমে তাহার ব্যাখ্যায় দেখান হইয়াছে যে, জমির উৎপত্তি হইলে উহার আপন ভার (weight) বশতঃ, উহা দ্বৈতক্ষেত্র, মায়াক্ষেত্র এবং অদ্বৈতক্ষেত্রের সহিত সংযুক্ত হয়। দ্বৈতক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য—অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তির হ্রাস সাধন করা। মায়াক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য—সমতার প্রবৃত্তি জাগ্রত করা। অদ্বৈত-ক্ষেত্র পূর্ণ সমতার পূর্ণ আদর্শ।

অসমতা ও বিষমতার বীজ অথবা প্রবৃত্তি জমির উপাদানের মধ্যে ও উহার উৎপাদিকা-শক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকিলেও দ্বৈতক্ষেত্রের সহিত সংযোগবশতঃ জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। মায়াক্ষেত্রের সহিত সংযোগবশতঃ জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির সমতার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। অদ্বৈত-ক্ষেত্রের সহিত সংযোগবশতঃ জমির উৎপাদিকা-শক্তি সমতা-প্রবৃত্তির আধিক্যযুক্ত হয়।

জমির উৎপাদিকা-শক্তির অসমতা, বিষমতা ও সমতার উপরোক্ত কার্য্য-নিয়মসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে—যদিও জমির উপাদানের মধ্যে এবং উহার উৎপাদিকা-শক্তির কারণসমূহের মধ্যে—জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তি অথবা বীজ বিদ্যমান থাকে, তথাপি জমি যদ্যপি প্রকৃতি ছাড়া আর কোন পদার্থের দ্বারা আলোড়িত না হয়, তাহা হইলে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি অসমতা অথবা বিষমতার প্রবৃত্তির আধিক্যযুক্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ অসমতা অথবা বিষমতার আধিক্যযুক্ত হইতে পারে না।

জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি-সম্বন্ধীয় উপরোক্ত কথাগুলি অত্যন্ত দুরূহ। ঐ কথাগুলি সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে হইলে একদিকে যেরূপ তেজ ও রসের অদ্বৈত অবস্থা কোথায় ও কি আকৃতিতে বিদ্যমান আছে এবং ঐ অদ্বৈত-অবস্থা হইতে তেজ ও রসের মায়ার অবস্থা, দ্বৈত-অবস্থা, কাল-অবস্থা, বিচ্ছেদ-অবস্থা, তরল-অবস্থা, স্থূল-অবস্থা, উদ্ভিদ্-অবস্থা জীব-অবস্থা ও মহাকাশ-অবস্থার স্বতঃই উৎপত্তি ও রক্ষা হয় কোন্ কোন্ কার্য্য-ক্রমে ও কোন্ কোন্ কার্য্য-নিয়মে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিবার প্রয়োজন হয়—সেইরূপ আবার, **প্রথমতঃ**, জমির গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনসমূহের উৎপত্তি, রক্ষা ও পরিবর্ত্তনসমূহ স্বতঃই সাধিত হয় কোন্ কোন্ কার্য্য-ক্রমে ও কার্য্য-নিয়মে, এবং **দ্বিতীয়তঃ**, তেজ ও রসের দশটী অবস্থার প্রত্যেকটীর সহিত জমির পৃথক্ পৃথক্ ও সমষ্টিগত সম্বন্ধ কি কি, তাহাও স্পষ্টভাবে ধারণা করিবার প্রয়োজন হয়। জনসাধারণের প্রত্যেকের পক্ষে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের উপরোক্ত দশটী অবস্থা সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে ধারণা করা অথবা জমির গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের কথা পরিষ্কারভাবে বুঝা অথবা তেজ ও রসের দশটী অবস্থার সহিত জমির সম্বন্ধ অনুভব করা সম্ভবযোগ্য নহে। জনসাধারণ ত' দূরের কথা, আধুনিক তথাকথিত

বৈজ্ঞানিকগণের মস্তিষ্ক যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের সিদ্ধান্ত—সেই সিদ্ধান্তানুসারে আমাদিগের মতে "মেঘনাদ সাহা" অথবা "আচার্য্যদেব" শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণের পক্ষে জমি সম্বন্ধীয় উপরোক্ত কথাগুলি বুঝা আদৌ সম্ভবযোগ্য কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে।

জনসাধারণ অথবা "মেঘনাদ সাহা" ও "আচার্য্যদেব" শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণ জমির উৎপাদিকা-শক্তি সম্বন্ধীয় উপরোক্ত কথাগুলি বুঝিতে পারুন আর নাই পারুন, ঐ কথাগুলি যে ধ্রুবসত্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কার্য্যতঃ যাহাতে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির কোনরূপ অসমতার অথবা বিষমতার প্রাবল্য ঘটিতে পারে তাহার কোন কার্য্য প্রকৃতিতে না থাকিলেও জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতার ও বিষমতার কার্য্য ঘটিয়া উঠা কি কি প্রকারে সম্ভবযোগ্য হয়, আমরা এক্ষণে তাহার কথা আলোচনা করিব।

কার্য্যতঃ যাহাতে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির কোনরূপ অসমতার অথবা বিষমতার প্রাবল্য ঘটিতে পারে, তাদৃশ কোন কার্য্য প্রকৃতিতে যদিও নাই কিন্তু যাহাতে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির কোনরূপ অসমতার অথবা বিষমতার প্রাবল্য ঘটিতে না পারে তাদৃশ কোন কার্য্য অথবা ব্যবস্থা ও প্রকৃতিতে নাই। যাহাতে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির কোনরূপ অসমতার অথবা বিষমতার প্রাবল্য ঘটিতে না পারে তাদৃশ কোন কার্য্য অথবা ব্যবস্থা প্রকৃতিতে না থাকায়—প্রকৃতি-জাত পদার্থসমূহের পক্ষে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতা ও বিষমতা সাধক কার্য্য-সমূহ করা সম্ভবযোগ্য হয়। উপরোক্ত কারণে প্রকৃতি-জাত পদার্থসমূহের পক্ষে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির যে কেবল মাত্র অসমতা ও বিষমতাসাধক কার্য্য-সমূহই করা সম্ভবযোগ্য হয়, তাহা নহে; সমতা-সাধক কার্য্যসমূহ করাও সম্ভবযোগ্য হয়। প্রকৃতি-জাত পদার্থ-সমূহের পক্ষে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির সমতা-সাধক কার্য্যসমূহ কোন্ কোন্ প্রণালীতে করা সম্ভবযোগ্য হয় তাহার কথা আমরা আগে আলোচনা করিব না। জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতা ও বিষমতা-সাধক কার্য্যসমূহ প্রকৃতি-জাত পদার্থসমূহের পক্ষে করা কি কি প্রকারে সম্ভবযোগ্য হয়, তাহার কথা আমরা আগে আলোচনা করিব।

আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় যে, প্রকৃতি-জাত প্রত্যেক পদার্থের পক্ষেই জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতা ও বিষমতা-সাধক কার্য্যসমূহ করা সম্ভবযোগ্য। প্রকৃতি-জাত যে সমস্ত পদার্থ এই ভূমণ্ডলে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত পদার্থের স্বাভাবিক গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের সহিত সর্ব্বতোভাবে পরিচিত হইতে পারিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যদিও আপাত-দৃষ্টিতে প্রকৃতি-জাত প্রত্যেক পদার্থেরই জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতা ও বিষমতা-সাধক শক্তি আছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে প্রকৃতি-জাত প্রত্যেক পদার্থের স্বভাবতঃ ঐ শক্তি নাই। স্বভাবতঃ ঐ শক্তি আছে কেবল মাত্র—মনুষ্য-জাতির।

যে পদার্থের নিজের ইচ্ছা করিবার অথবা অপরের ইচ্ছা জাগ্রত করিবার শক্তির অভাব থাকে, সেই পদার্থের পক্ষে অপর পদার্থের অসমতা, বিষমতা ও সমতা সাধন করার সহায়তা করা সম্ভবযোগ্য হয় বটে; কিন্তু স্বাধীন ভাবে কোন পদার্থের অসমতা অথবা বিষমতা অথবা সমতা সাধন করা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না।

এই ভূ-মণ্ডলে যে সমস্ত শ্রেণীর পদার্থ আছে, তাহার প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক পদার্থের মানুষের ইচ্ছা পূরণ করিবার সামর্থ্য আছে বটে, কিন্তু মনুষ্য ছাড়া আর কোন পদার্থেরই নিজের ইচ্ছা করিবার অথবা অপরের ইচ্ছা জাগ্রত করিবার শক্তি বিদ্যমান থাকে না।

আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় যে, পশু পক্ষী প্রভৃতি ভূচর ও খেচর জীবের নিজের ইচ্ছা করিবার এবং অপরের ইচ্ছা জাগ্রত করিবার শক্তি বিদ্যমান আছে। ইচ্ছাতত্ত্বের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যায় যে, ইচ্ছাশক্তির একান্ত প্রয়োজনীয় কারণ বিচার-শক্তি। ঐ বিচারশক্তি ভ্রম-হীন হইতে পারে, আবার ভ্রম-যুক্তও হইতে পারে। যে পদার্থের বিচার-শক্তি থাকে না, সেই পদার্থের ইচ্ছা-শক্তির উৎপত্তি হইতে পারে না। বিচার শক্তি মনুষ্যজাতি ছাড়া আর কোন পদার্থের থাকিতে পারে না এবং থাকে না। এই কারণে ইচ্ছাশক্তি মানুষের একচেটে করা জিনিষ (monopoly)।

মনুষ্যজাতি ছাড়া পশু, পক্ষী প্রভৃতি ভূচর ও খেচর জীবগণের মধ্যে যাহাদের নিজের ইচ্ছা করিবার ও অপরের ইচ্ছা জাগ্রত করিবার শক্তি আছে বলিয়া আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়, সেই সমস্ত ভূচর ও খেচর জীবগণের ইচ্ছাশক্তি থাকে না বটে; কিন্তু তাহাদের ইচ্ছা-গুণ বিদ্যমান থাকে। উহাদের ইচ্ছা-গুণ বিদ্যমান থাকে বলিয়া ঐ সমস্ত জীবের এক একটীর এক একটী অঙ্গের সহিত বিশেষ বিশেষ পদার্থের বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে।

প্রকৃতি-জাত যে সমস্ত পদার্থ এই ভূ-মণ্ডলে দেখিতে পাওয়া যায়—সেই সমস্ত পদার্থের স্বাভাবিক গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনসমূহের সহিত উপরোক্ত প্রণালীতে সর্ব্বতোভাবে পরিচিত হইতে পারিলে একমাত্র মনুষ্যজাতিরই যে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতা, বিষমতা

এবং সমতা সাধন করিবার শক্তি স্বভাবতঃ বিদ্যমান থাকে এবং ঐ শক্তি যে আর কোন শ্রেণীর পদার্থের স্বভাবতঃ বিদ্যমান থাকে না, তদ্বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়।

কার্য্যতঃ যাহাতে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির কোনরূপ অসমতা অথবা বিষমতার প্রাবল্য ঘটিতে পারে, তাদৃশ কোন কার্য্য প্রকৃতিতে না থাকিলেও, জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতার ও বিষমতার কার্য্য ঘটিয়া ওঠা কি কি প্রকারে সম্ভবযোগ্য হইতে পারে তাহার কথা ভাবিতে বসিলে, মনুষ্যজাতির ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধীয় অনন্যসাধারণত্বের কথা স্মরণ করিয়া, উহা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে যে একমাত্র মনুষ্যজাতির অনাচারে—তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইতে হয়।

জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতা ও বিষমতার প্রাবল্য-সাধক কি কি অনাচার মনুষ্যজাতির পক্ষে সাধন করা সম্ভবযোগ্য তাহা স্থির করিতে হইলে ঐ উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি ও সমতা রক্ষার কার্য্য স্বভাবতঃ কি কি প্রণালীতে সাধিত হয়, তাহার কথা স্মরণ রাখিতে হয়।

জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি ও সমতা রক্ষার কার্য্য স্বভাবতঃ কি কি প্রণালীতে সাধিত হয়—তাহার আলোচনায় দেখান হইয়াছে যে, **প্রথমতঃ**, জমির অভ্যন্তরস্থ একবিংশতি শ্রেণীর কার্য্যক্রম, **দ্বিতীয়তঃ**, বহিঃস্থিত নয়শ্রেণীর পদার্থের গুণ, শক্তি, প্রকৃতি, কর্ম্ম ও গমনসমূহের সহিত জমির সম্বন্ধ এবং **তৃতীয়তঃ**, জমির সপ্তবিংশতি শ্রেণীর গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি;—এই তিন শ্রেণীর কার্য্যক্রম, সম্বন্ধ ও গুণ প্রভৃতি জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তির এবং সমতা, অসমতা ও বিষমতার কারণ হইয়া থাকে।

ঐ আলোচনায় আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, "যে যে একবিংশতি কার্য্যক্রমে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি হয়, সেই সেই একবিংশতি কার্য্যক্রমের সমতায় জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির সমতা, উহাদের অসমতায় জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির অসমতা, উহাদের বিষমতায় জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির বিষমতা ঘটিয়া থাকে।"

উপরোক্ত কথা হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির অসমতা ও বিষমতার প্রাবল্য-সাধক কি কি অনাচার মনুষ্যজাতির পক্ষে সাধন করা সম্ভবযোগ্য তাহা স্থির করিতে হইলে, যে যে একবিংশতি কার্য্যক্রমে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি হয় সেই সেই একবিংশতি কার্য্যক্রমের সমতা, অসমতা ও বিষমতা কি কি প্রকারে উৎপত্তি হয় তাহা নির্ণয় করিতে হয়।

উপরোক্ত একবিংশতি কার্য্যক্রমের সমতা, অসমতা ও বিষমতা কি কি প্রকারে উৎপত্তি হয় তাহা নির্ণয় করিতে হইলে **প্রথমতঃ**, জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির সমতা, অসমতা ও বিষমতার লক্ষণসমূহের প্রকাশ হয় কি কি প্রকারে তাহা ভূয়োদর্শনের দ্বারা স্থির করিতে হয়। তাহার পর, **দ্বিতীয়তঃ**, উপরোক্ত লক্ষণসমূহের প্রকাশ হওয়া সম্ভব হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা বিচারের দ্বারা স্থির করিতে হয়।

জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির সমতা, অসমতা ও বিষমতার লক্ষণসমূহের প্রকাশ হয় কি কি প্রকারে তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে এই আখ্যায়িকায় আলোচনা করিয়াছি*

ঐ আলোচনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, **প্রথমতঃ**, জমির অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবিধ আবয়বিক কর্ম্ম, **দ্বিতীয়তঃ**, ষড়্‌বিধ রাসায়নিক কর্ম্ম, **তৃতীয়তঃ**, পঞ্চবিধ অগ্নি, **চতুর্থতঃ**, বিবিধ ঘনত্বের সমাবেশ, **পঞ্চমতঃ**, ত্রিবিধ চাপ, **ষষ্ঠতঃ**, তেজ ও রসের প্রবাহ এবং **সপ্তমতঃ**, পাঁচটী অবস্থার স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন—এই সাতটী ব্যাপার অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। উপরোক্ত সাতটি ব্যাপারের শেষোক্তটির শৃঙ্খলিত ও মিলিত কার্য্যে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকাশক্তির সমতার উৎপত্তি হয়।

জমির অভ্যন্তরস্থ পাঁচটী অবস্থার স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের শৃঙ্খলিত ও মিলিত কার্য্য বলিতে কি বুঝায়, তাহা আমরা আগেই বুঝাইয়াছি।

পাঠকগণের সুবিধার জন্য আমরা উহার পুনরুল্লেখ করিব।

জমির অভ্যন্তরস্থ পাঁচটী অবস্থার স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের শৃঙ্খলিত ও মিলিত কার্য্য বলিতে কি বুঝায়, তাহা ধারণা করিতে হইলে জমির অভ্যন্তরস্থ পাঁচটী অবস্থা কি কি, তাহা আগে পরিজ্ঞাত হইতে হয়।

জমির অভ্যন্তরস্থ পাঁচটী অবস্থার নাম—

(১) বায়বীয় অবস্থা (aerial condition);
(২) বাষ্পীয় অবস্থা (gaseous condition);
(৩) তরল-অবস্থা (liquid condition);
(৪) স্থূল-অবস্থা (solid condition);
(৫) মহাকাশ-অবস্থা (বায়ু ও বাষ্পের মিশ্রিত অবস্থা) (atmospheric condition)।

ঐ পাঁচটী অবস্থার কোনটির সংজ্ঞা কি তাহা জানা না থাকিলে এবং জমির অভ্যন্তরে যাহা যাহা আছে তাহার সহিত পরিচিত হইতে না পারিলে জমির অভ্যন্তরস্থ উপরোক্ত পাঁচটী অবস্থার কথা বুঝা যায় না। অন্যদিকে,

* পূর্ব্বোক্ত ৭৩, ৭৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ঐ পাঁচটী অবস্থার কোনটির সংজ্ঞা কি তাহা জানা থাকিলে এবং জমির অভ্যন্তরে যাহা যাহা আছে সেই সমস্তের সহিত সর্ব্বতোভাবে পরিচিত হইতে পারিলে জমির উপরোক্ত পাঁচটী অবস্থা বিদ্যমান আছে তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়।

জমির অভ্যন্তরে যাহা যাহা আছে তাহার প্রত্যেকটীর গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম, গমন ও চলনসমূহের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে একদিকে যেরূপ জমির অভ্যন্তরে যে উপরোক্ত পাঁচটী অবস্থা বিদ্যমান আছে তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়; সেইরূপ আবার জমির অভ্যন্তরে যে সমস্ত কার্য্য স্বভাবতঃ বিদ্যমান থাকে সেই সমস্ত কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়; জমির অভ্যন্তরে যে সমস্ত কার্য্য স্বভাবতঃ বিদ্যমান থাকে সেই সমস্ত কার্য্যের সহিত সর্ব্বতোভাবে পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যায় যে, জমির অভ্যন্তরস্থ বায়বীয় অবস্থার পদার্থসমূহ সর্ব্বদা স্বভাব বশতঃই বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণতি লাভ করিবার জন্য প্রযত্ন-শীল হইয়া থাকে। বাষ্পীয় অবস্থার পদার্থ-সমূহ সর্ব্বদাই তরল অবস্থায় পরিণতি লাভ করিবার জন্য প্রযত্নশীল হইয়া থাকে। তরল অবস্থার পদার্থসমূহ সর্ব্বদাই স্থূল-অবস্থায় পরিণতি লাভ করিবার জন্য প্রযত্নশীল হয়। স্থূল-অবস্থার পদার্থসমূহ সর্ব্বদাই মহাকাশ-অবস্থায় পরিণতি লাভ করিবার জন্য প্রযত্নশীল হয়। মহাকাশ-অবস্থার পদার্থসমূহ বায়বীয় অবস্থায় পরিণতি লাভ করিবার জন্য প্রযত্নশীল হয়।

জমির অভ্যন্তরে উপরোক্ত পঞ্চবিধ পরিবর্ত্তনের প্রযত্ন সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে বলিয়াই জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি হয়।

উপরোক্ত পাঁচটী অবস্থার প্রত্যেকটী তাহার পরবর্ত্তী অবস্থায় পরিণতি লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রযত্নশীল থাকে বটে; কিন্তু ঐ পাঁচটী অবস্থার কোন অবস্থাটির সর্ব্বতো-ভাবের বিলুপ্তি সাধারণতঃ সম্ভবযোগ্য হয় না।

জমির অভ্যন্তরস্থ পাঁচটী অবস্থার প্রত্যেকটী যে তাহার পরবর্ত্তী অবস্থায় পরিণতি লাভ করিবার জন্য স্বতঃই প্রযত্নশীল হইতে পারে তাহার সাক্ষাৎ কারণ—জমির অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের প্রবাহিত হইবার শক্তি। জমির অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের প্রবাহিত হইবার শক্তির কারণ জমির অভ্যন্তরস্থ ত্রিবিধ চাপ। জমির অভ্যন্তরস্থ ত্রিবিধ চাপের কারণ জমির অভ্যন্তরস্থ বিবিধ ঘনত্বের সমাবেশ। জমির অভ্যন্তরস্থ বিবিধ ঘনত্বের সমাবেশের কারণ—জমির অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবিধ অগ্নি। জমির অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবিধ অগ্নির কারণ—জমির অভ্যন্তরস্থ ষড়বিধ রাসায়নিক কর্ম্ম। জমির অভ্যন্তরস্থ ষড়বিধ রাসায়নিক কর্ম্মের কারণ—জমির অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবিধ আবয়বিক কর্ম্ম।

প্রথমতঃ, জমির অভ্যন্তরস্থ পাঁচটী অবস্থার উপরোক্ত পরিবর্ত্তনের স্বাভাবিক প্রযত্নশীলতা; **দ্বিতীয়তঃ**, তেজ ও রসের প্রবাহ; **তৃতীয়তঃ**, ত্রিবিধ চাপ; **চতুর্থতঃ**: বিবিধ ঘনত্বের সমাবেশ; **পঞ্চমতঃ**, পঞ্চবিধ অগ্নি; **ষষ্ঠতঃ**, ষড়্‌বিধ রাসায়নিক কর্ম্ম এবং **সপ্তমতঃ**, পঞ্চবিধ আবয়বিক কর্ম্ম; জমির অভ্যন্তরস্থ এই সাতটি ব্যাপার এমন অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত যে, একটীর সমতা থাকিলেই অপর ছয়টীর সমতা বিদ্যমান থাকে। উহার যে কোনটীর অসমতা অথবা বিষমতা ঘটিলেই অপর ছয়টীর অসমতা অথবা বিষমতা ঘটিয়া থাকে।

উপরোক্ত কথা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জমির উৎপাদিকা-শক্তির সমতা, অসমতা ও বিষমতার সাক্ষাৎ কারণ—জমির অভ্যন্তরস্থ উপরোক্ত সাতটী ব্যাপারের সমতা, অসমতা ও বিষমতা।

আগেই প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতির কার্য্য এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত যে জমির অভ্যন্তরস্থ উপরোক্ত সাতটী ব্যাপারের সমতা, অসমতা ও বিষমতার প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ বিদ্যমান থাকে বটে; কিন্তু স্বভাবতঃ অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তি কখনও সমতার প্রবৃত্তির তুলনায় অধিকতর বলশালিনী হইতে পারে না। জমির অভ্যন্তরস্থ উপরোক্ত সাতটী ব্যাপারের অসমতার ও বিষমতার প্রবৃত্তি কখনও স্বভাবতঃ সমতার প্রবৃত্তির তুলনায় অধিকতর বলশালিনী হইতে পারে না বলিয়া উহাদের অসমতা ও বিষমতার কার্য্যও কখনও সমতার কার্য্যের তুলনায় স্বভাবতঃ অধিকতর বলশালী হয় না। জমির অভ্যন্তরস্থ উপরোক্ত সাতটী ব্যাপারের সমতার কার্য্য সর্ব্বদাই অসমতার ও বিষমতার কার্য্যের তুলনায় অধিকতর বলশালী হয়।

জমির অভ্যন্তরস্থ উপরোক্ত সাতটী ব্যাপারের সমতা, অসমতা ও বিষমতার উপরই জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির সমতা, অসমতা ও বিষমতা সাক্ষাৎভাবে নির্ভরশীল।

জমির অভ্যন্তরস্থ উপরোক্ত সাতটী ব্যাপার স্বভাবতঃ সমতার আতিশয্যযুক্ত থাকে বটে, কিন্তু মানুষের দুই শ্রেণীর কার্য্যে ঐ ব্যাপারের সমতার আতিশয্যের স্থলে অসমতার ও বিষমতার আতিশয্য ঘটিতে পারে।

মানুষের যে দুই শ্রেণীর কার্য্যে জমির অভ্যন্তরস্থ উপ-রোক্ত সাতটী ব্যাপারের সমতার আতিশয্যের স্থলে অসমতার ও বিষমতার আতিশয্য ঘটিতে পারে—মানুষের সেই দুই শ্রেণীর কার্য্য সাধারণতঃ জমির বহির্ভাগবিষয়ক ও জমির অন্তর্ভাগবিষয়ক হইয়া থাকে।

পৃথিবীর বহির্ভাগে (অর্থাৎ surfaceএ) যে-শ্রেণীর গমনের (motion এর) অথবা চাপের (pressureএর) উদ্ভব হইলে জমির অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবিধ আবয়িক কর্ম্মের অথবা ষড়্‌বিধ রাসায়নিক কর্ম্মের অথবা পঞ্চবিধ অগ্নির অথবা বিবিধ

ঘনত্বের সমাবেশের অথবা ত্রিবিধ চাপের অথবা তেজ ও রসের প্রবাহের অথবা পঞ্চবিধ অবস্থার পরিবর্ত্তনের স্বাভাবিক প্রযত্নশীলতার অসমতার ও বিষমতার উৎপত্তি হওয়া অনিবার্য্য হয়—সেই শ্রেণীর গমনের (motion এর) এবং চাপের (pressure-এর) সৃষ্টি করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত।

পৃথিবীর বহির্ভাগে যে যে শ্রেণীর গমনের (motions) ও চাপের (pressures এর) উদ্ভব হইলে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উপরোক্ত সপ্তবিধ ব্যাপারের অসমতার ও বিষমতার উৎপত্তি অনিবার্য্য হইয়া থাকে এবং যে যে শ্রেণীর গমনের ও চাপের সৃষ্টি করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত, সেইশ্রেণীর গমন ও চাপ মানুষের তিন শ্রেণীর কার্য্যে উদ্ভব হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়; যথা—

(১) মানুষের গমনাগমন-প্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধনার্থ যে সমস্ত যান-বাহনের উদ্ভব হয় সেই সমস্ত যানবাহনের গমনের (Internal motion এর) ও চলনশীলতার (motion from one place to another এর) আবয়বিক কার্য্যে ,

(২) মানুষের ঘরবাড়ীর আবয়বিক কার্য্যে ;

(৩) মানুষ তাহার বিবিধ তৃপ্তি সাধনার্থ বিদ্যুৎ, বাষ্প ও কয়লার সাহায্যে যে সমস্ত কৃত্রিম অগ্নির উৎপাদন করে সেই সমস্ত কৃত্রিম অগ্নির রাসায়নিক কার্য্যে।

মানুষ তাহার গমনাগমন-প্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধনার্থ যে সমস্ত যানবাহনের সৃষ্টি করে, সেই সমস্ত যানবাহনের গমন ও চলনশীলতার বেগ সুচিন্তিত ভাবে নিয়ন্ত্রিত অথবা সংযত না হইলে জমির অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবিধ আবয়বিক কর্ম্ম, ষড়বিধ রাসায়নিক কর্ম্ম, পঞ্চবিধ অগ্নি, বিভিন্ন ঘনত্বের সমাবেশ, ত্রিবিধ চাপ, তেজ ও রসের প্রবাহ এবং পঞ্চবিধ অবস্থার পরিবর্ত্তনের স্বাভাবিক প্রযত্নশীলতা যে অনায়াসেই অসমতা ও বিষমতা প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

সেইরূপ আবার মানুষ তাহার বস-বাসের জন্য যে সমস্ত ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করে সেই সমস্ত ঘর-বাড়ীর ভার (weight) সুচিন্তিতভাবে নিয়ন্ত্রিত অথবা সংযত না হইলে জমির অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবিধ আবয়বিক কর্ম্ম প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত সপ্তবিধ ব্যাপার যে অনায়াসে অসমতা ও বিষমতা প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহাও সহজে অনুমান করা যায়।

মানুষ তাহার বিবিধ তৃপ্তি সাধনার্থ খনিজ কয়লা, বাষ্প ও বিদ্যুতের সাহায্যে যে সমস্ত কৃত্রিম অগ্নির উৎপাদন করে, সেই সমস্ত কৃত্রিম অগ্নির তাপ সুচিন্তিতভাবে নিয়ন্ত্রিত অথবা সংযত না হইলে জমির বহির্ভাগে অসমান ভাবে তাপের কার্য্য হওয়া অবশ্যম্ভাবী। খনির কয়লা, বাষ্প ও বিদ্যুতের সাহায্যে যে সমস্ত কৃত্রিম অগ্নির উৎপাদন করা সম্ভব হয়, তাহা স্বাভাবিক অগ্নির তুলনায় মানুষের পক্ষে যে অত্যন্ত অপকারী তৎসম্বন্ধে আমরা "জমির এবং তাহার উৎপাদিকা শক্তির উৎপত্তি ও রক্ষার কার্য্য-ক্রম"-শীর্ষক আলোচনায় * বিবৃত করিয়াছি। জমির বহির্ভাগে অসমানভাবে তাপের কার্য্য চলিতে থাকিলে, ঐ অসমান তাপ বায়ুদ্বারা প্রবাহিত হওয়ায় জমির অভ্যন্তরস্থ ষড়্‌বিধ রাসায়নিক কর্ম্মের ও পঞ্চবিধ অগ্নির অসমতা ও বিষমতা অবশ্যম্ভাবী হয়। জমির অভ্যন্তরস্থ চতুর্ব্বিধ রাসায়নিক কর্ম্মের ও পঞ্চবিধ অগ্নির অসমতা ও বিষমতার উদ্ভব হইলে পঞ্চবিধ আবয়বিক কর্ম্মের, বিবিধ ঘনত্বের সমাবেশের, ত্রিবিধ চাপের, তেজ ও রসের প্রবাহের এবং পঞ্চবিধ অবস্থার পরিবর্ত্তনের স্বাভাবিক প্রযত্নশীলতার অসমতা এবং বিষমতাও অনিবার্য্য হয়।

জমির বহির্ভাগ বিষয়ক মানুষের উপরোক্ত তিন শ্রেণীর কার্য্যে যেরূপ জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির অসমতা ও বিষমতা অনিবার্য্য হয় সেইরূপ জমির অন্তর্ভাগ বিষয়ক মানুষের খনিজ পদার্থের খনন কার্য্যে ও জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির অসমতা ও বিষমতা অনিবার্য্য হইতে পারে।

জমির অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন ঘনত্বের সমাবেশের শৃঙ্খলা রাখিতে হইলে জমির অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন খনিজ পদার্থসমূহের বিভিন্ন ভাণ্ডারের stock এর) এক একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের প্রয়োজন হয়। **জমির অভ্যন্তরস্থ ষড়বিধ রাসায়নিক কর্ম্মের এবং পঞ্চবিধ অগ্নির কার্য্যসমূহের শৃঙ্খলার জন্য জমির অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন খনিজ পদার্থসমূহের বিভিন্ন ভাণ্ডারের এক একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের প্রয়োজন হয়।**

জমির অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন ঘনত্বের সমাবেশের ষড়বিধ রাসায়নিক কার্য্যের এবং পঞ্চবিধ অগ্নির কার্য্যের শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইলে বিভিন্ন খনিজ পদার্থের যে যে পরিমাণের ভাণ্ডার একান্ত প্রয়োজনীয় সেই সেই খনিজ পদার্থের সেই সেই পরিমাণের ভাণ্ডার যাহাতে জমির অভ্যন্তরে বজায় থাকে, তাহার ব্যবস্থা না করিয়া খনিজ পদার্থের খনন কার্য্য চলিতে থাকিলে জমির উৎপাদিকা শক্তির অসমতা ও বিষমতা অনিবার্য্য হয়।

জমির বহির্ভাগ ও অন্তর্ভাগ বিষয়ক মানুষের উপরোক্ত চারি শ্রেণীর কার্য্যে অর্থাৎ যানবাহনের গমনের কার্য্যে, ঘর

* বঙ্গশ্রী, পৌষ, ১৩৪০, পৃঃ ৩৮ দ্রষ্টব্য।

বাড়ী নির্ম্মাণের কার্য্যে, কৃত্রিম অগ্নি উৎপাদনের কার্য্যে এবং পদার্থের খনন কার্য্যে যেরূপ জমির উৎপাদিকা শক্তির সমতা প্রাধান্যের স্থলে অসমতার ও বিষমতার প্রাধান্যের উদ্ভব হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়, সেইরূপ মহাসমুদ্রের এবং মহাকাশ বিষয়ক মানুষের কার্য্যে ও জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির সমতার প্রাধান্যের স্থলে অসমতার ও বিষমতার প্রাধান্যের উদ্ভব হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়।

জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি ও সমতা রক্ষার কার্য্য স্বভাবতঃ কি কি প্রণালীতে সাধিত হয় তাহা আলোচনায় বহিঃস্থিত যে নয় শ্রেণীর * পদার্থের গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনসমূহের সহিত জমির সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে—সেই নয় শ্রেণীর পদার্থ কি কি তাহার সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে; ঐ নয় শ্রেণীর পদার্থের মধ্যে তেজ ও রসের তরল অবস্থার ও মহাকাশ অবস্থার কথা উল্লিখিত আছে।

সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের তরল অবস্থার অপর নাম মহাসমুদ্র।

এই ভূ-মণ্ডলের কটিদেশ হইতে নিম্নভাগ মহাসমুদ্রের দ্বারা ঘেরা রহিয়াছে। আর কটিদেশ হইতে উচ্চভাগ ঘেরা রহিয়াছে মহাকাশের দ্বারা। ইংরাজী ভাষায় সাধারণতঃ যাহাকে 'Atmosphere' বলা হয় সংস্কৃত ভাষায় তাহার নাম 'মহাকাশ'।

এই ভূ-মণ্ডলের স্থলভাগের অপর নাম "পৃথিবী"। "পৃথিবী" ও "জমি" এই দুইটী কথা আমরা এই প্রবন্ধে একই অর্থে ব্যবহার করিতেছি। পৃথিবীকে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের স্থূল অবস্থা বলিয়াও আখ্যাত করা হয়।

জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি ও সমতা রক্ষার কার্য্য স্বভাবতঃ কি কি প্রণালীতে সাধিত হয় তাহার আলোচনায় বহিঃস্থিত যে নয় শ্রেণীর পদার্থের গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনসমূহের সহিত জমির সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে সেই নয় শ্রেণীর পদার্থের মধ্যে জমির উৎপত্তির দ্বাদশ শ্রেণীর কার্য্যের অথবা কাল ক্ষেত্রের অথবা বিচ্ছেদ-ক্ষেত্রের অথবা দ্বৈত-ক্ষেত্রের অথবা মায়া-ক্ষেত্রের অথবা অদ্বৈত-ক্ষেত্রের সহিত জমির যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে সেই সমস্ত সম্বন্ধের কোনটাই সাক্ষাৎভাবে মানুষের কোন কার্য্যের দ্বারা অসমতায় ও বিষমতায় পরিণত হইতে পারে না।

জমির উৎপাদিকা-শক্তির সহিত সমগ্র পৃথিবীর, মহাসমুদ্রের এবং মহাকাশের যে সমস্ত সম্বন্ধ আছে সেই সমস্ত সম্বন্ধ সাক্ষাৎভাবে মানুষের কার্য্যের দ্বারা অসমতায় ও বিষমতায় পরিণত হইবার যোগ্য।

* পূর্ব্বোক্ত ৭১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

জমির অভ্যন্তরে যেরূপ পাঁচটী অবস্থার পরিবর্ত্তনের স্বাভাবিক প্রবত্তনশীলতা, তেজ ও রসের প্রবাহ, ত্রিবিধ চাপ বিবিধ ঘনত্বের সমাবেশ, পঞ্চবিধ অগ্নি, পঞ্চবিধ রাসায়নিক কর্ম্ম এবং পঞ্চবিধ আবয়বিক কর্ম্ম বিদ্যমান আছে, মহাসমুদ্র ও মহাকাশের অবয়বেও সেইরূপ ঐ সপ্ত শ্রেণীর ব্যাপার বিদ্যমান আছে। জমির অভ্যন্তরস্থ ঐ সপ্ত শ্রেণীর ব্যাপার মহাসমুদ্রের অথবা মহাকাশের ঐ সপ্ত শ্রেণীর ব্যাপারের সহিত সর্ব্বতোভাবে সমান নহে। সর্ব্বতোভাবে সমান না হইলেও খুব বেশী প্রভেদযুক্ত নহে। পরন্তু, অনেকাংশে সমতাযুক্ত।

জমি, মহাসমুদ্র ও মহাকাশ যে অত্যন্ত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত তাহা ঐ তিনটীর সম্বন্ধের দিকে লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। জমি, মহাসমুদ্র ও মহাকাশ যেরূপ বাহ্যতঃ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত সেইরূপ উহাদের অভ্যন্তরস্থ পূর্ব্বোক্ত সপ্ত শ্রেণীর ব্যাপারও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

জমির অভ্যন্তরস্থ সপ্ত শ্রেণীর ব্যাপারের সমতা, অসমতা ও বিষমতায় যেরূপ জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির সমতা, অসমতা ও বিষমতা ঘটিয়া থাকে সেইরূপ মহাসমুদ্রের ও মহাকাশের অভ্যন্তরস্থ সপ্ত শ্রেণীর ব্যাপারের সমতা, অসমতা এবং বিষমতায় ও জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির সমতা, অসমতা ও বিষমতা ঘটিয়া থাকে।

উপরোক্ত কারণে, জমি বিষয়ক মানুষের কার্য্যে যেরূপ জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির স্বাভাবিক সমতার প্রাধান্যের স্থলে অসমতার ও বিষমতার প্রাধান্যের উদ্ভব হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়; সেইরূপ মহাসমুদ্র এবং মহাকাশ বিষয়ক মানুষের কার্য্যে ও জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির স্বাভাবিক সমতার প্রাধান্যের স্থলে অসমতার ও বিষমতার প্রাধান্যের উদ্ভব হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়।

জমিবিষয়ক মানুষের যে সমস্ত কার্য্যে জমির উৎপাদিকা শক্তির অসমতা ও বিষমতার প্রাধান্য সৃষ্টি করে, সেই সমস্ত কার্য্য জমির বহির্ভাগ স্পর্শন ও অন্তর্ভাগ স্পর্শন ভেদে যেরূপ দুই শ্রেণীর, মহাসমুদ্র বিষয়ক মানুষের যে-সমস্ত কার্য্য জমির উৎপাদিকা শক্তির অসমতা ও বিষমতার প্রাধান্য সৃষ্টি করে সেই সমস্ত কার্য্যও মহাসমুদ্রের বহির্ভাগ স্পর্শন ও অন্তর্ভাগ স্পর্শন ভেদে দুই শ্রেণীর হইয়া থাকে।

মহাসমুদ্রের বহির্ভাগ স্পর্শী মানুষের যে-সমস্ত কার্য্য জমির উৎপাদিকা-শক্তির অসমতা ও বিষমতার প্রাধান্য সৃষ্টি করার যোগ্য তন্মধ্যে সমুদ্রযায়ী অর্ণবপোতসমূহের গমন ও চলনবেগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমুদ্রযায়ী অর্ণবপোত সমূহের গমন ও চলনবেগ সুচিন্তিতভাবে নিয়ন্ত্রিত না হইলে মহাসমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ চারিটী অবস্থার (অর্থাৎ বায়বীয়, বাষ্পীয়, তরল ও মহাকাশ অবস্থার)

পরিবর্ত্তনের স্বাভাবিক প্রবত্তনশীলতায় অসমতার ও বিষমতার প্রাধান্যের উদ্ভব হয়। মহাসমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ চারিটী অবস্থার পরিবর্ত্তনের স্বাভাবিক প্রবত্ত-শীলতার অসমতার ও বিষমতার প্রাধান্যের উদ্ভব হইলে যুগবৎ মহাসমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের প্রবাহে, ত্রিবিধ চাপের কার্য্যে, বিবিধ ঘনত্বের সমাবেশের কার্য্যে, চতুর্ব্বিধ অগ্নির কার্য্যে, ষড়বিধ রাসায়ণিক কার্য্যে, এবং পঞ্চবিধ আবায়বিক কার্য্যেও অসমতা ও বিষমতার প্রাধান্যের সৃষ্টি হয়। মহাসমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ সাতশ্রেণীর ব্যাপারে উপরোক্তভাবে অসমতার ও বিষমতার প্রাধান্যের সৃষ্টি হইলে, প্রথমতঃ, মহাসমুদ্রের অবস্থানের সহিত পৃথিবীর অবস্থানের যে সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে সেই সম্বন্ধে অসমতার ও বিষমতার প্রাধান্যের উৎপত্তি হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি অসমতা ও বিষমতার প্রাধান্যযুক্ত হইয়া থাকে।

মহাসমুদ্রের অন্তর্ভাগস্পর্শী মানুষের যে সমস্ত কার্য্যে জমির উৎপাদিকা-শক্তির অসমতা ও বিষমতার প্রাধান্যের সৃষ্টি হইতে পারে সেই সমস্ত কার্য্যের মধ্যে ডুবারী বাষ্পপোত-সমূহের বাষ্পীয় মিশ্রণ এবং গমন ও চলনবেগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডুবারী বাষ্পপোত-সমূহের বাষ্পীয় মিশ্রণ এবং গমন ও চলন বেগ সুচিন্তিতভাবে নিয়ন্ত্রিত অথবা সংযত না হইলে মহাসমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ পূর্ব্বোক্ত সাত শ্রেণীর ব্যাপারে অসমতার ও বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য।

মহাসমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ পূর্ব্বোক্ত সাতশ্রেণীর ব্যাপারে অসমতার ও বিষমতার উদ্ভব হইলে মহাসমুদ্রের সহিত পৃথিবীর যে সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে সেই সম্বন্ধে অসমতার ও বিষমতার প্রাধান্যের উৎপত্তি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি অসমতা ও বিষমতার প্রাধান্যযুক্ত হইয়া থাকে।

মহাকাশ বিষয়ক মানুষের যে সমস্ত কার্য্যে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির অসমতার ও বিষমতার প্রাধান্যের উৎপাদক, মানুষের সেই সমস্ত কার্য্য সাধারণতঃ মহাকাশ-ক্ষেত্রের অন্তর্ভাগস্পর্শী হইয়া থাকে।

মহাকাশক্ষেত্রের অন্তর্ভাগস্পর্শী মানুষের যে সমস্ত কার্য্যে জমির উৎপাদিকা শক্তির অসমতার ও বিষমতার প্রাধান্যের সৃষ্টি হইতে পারে সেই সমস্ত কার্য্যের মধ্যে আকাশযায়ী বাষ্পপোত সমূহের বাষ্পীয় মিশ্রণ এবং গমন ও চলন বেগ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া বেতারবার্ত্তা অথবা তারান্তর্গত বার্ত্তাবহনের জন্য মহাকাশ ক্ষেত্রের অন্তর্গত যে সমস্ত আবয়বিক এবং বৈদ্যুতিক অথবা রাসায়নিক তরঙ্গের উদ্ভব করিতে হয় সেই সমস্ত তরঙ্গের গমন ও চলন বেগ উল্লেখযোগ্য।

মহাকাশক্ষেত্রে করা হয় না অথচ মহাকাশক্ষেত্রের অন্তর্ভাগ স্পর্শ করে এমন অনেক কার্য্য মানুষের দ্বারা পৃথিবীর উপরিভাগে করা সম্ভব হয়। সেই সমস্ত কার্য্যের ফলে সাক্ষাৎভাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ পূর্ব্বোক্ত সাত শ্রেণীর ব্যাপারে অসমতা ও বিষমতার প্রাধান্যের উদ্ভব হয় না বটে; কিন্তু মহাকাশক্ষেত্রের অভ্যন্তরের পূর্ব্বোক্ত সাত শ্রেণীর ব্যাপারের অসমতা ও বিষমতার প্রাধান্যের উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়। মহাকাশক্ষেত্রের অন্তরস্থ পূর্ব্বোক্ত সাত শ্রেণীর ব্যাপারে অসমতা ও বিষমতার প্রাধান্যের উদ্ভব হইলে যে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তিতে অসমতা ও বিষমতার প্রাধান্য অনিবার্য্য হয় তাহা ঐ সম্বন্ধে আমরা আগে যে সমস্ত কথা বলিয়াছি সেই সমস্ত কথা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

পৃথিবীর উপরিভাগে যে সমস্ত কার্য্য মানুষের দ্বারা সাধিত হইলে সাক্ষাৎভাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ কোন ব্যাপারে অসমতার ও বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব হয় না; অথচ মহাকাশের অন্তরস্থ সাত শ্রেণীর ব্যাপারে অসমতার ও বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়, সেই সমস্ত কার্য্যের মধ্যে কৃত্রিম আগ্নেয়, রাসায়নিক, বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক কার্য্যসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আগ্নেয়, রাসায়নিক, বাষ্পীয়, বৈদ্যুতিক কার্য্যসমূহ জমি, জল ও হাওয়ার মধ্যে স্বভাবতঃ বিদ্যমান থাকে। আগ্নেয়, রাসায়নিক, বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক কার্য্যসমূহ স্বভাবতঃ জমি, জল ও হাওয়ার মধ্যে কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে ও কোন্ কোন্ কার্য্যনিয়মে হইয়া থাকে তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া এই সমস্ত স্বাভাবিক কার্য্যক্রম ও স্বাভাবিক কার্য্যনিয়মের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মানুষ যদ্যপি কৃত্রিমভাবে আগ্নেয়, রাসায়নিক, বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক কার্য্য-সমূহ নির্ব্বাহ করে তাহা হইলে ঐ সমস্ত কার্য্যে মহাকাশ-ক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থ কোন ব্যাপারে অসমতার অথবা বিষমতার প্রাধান্যের উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর হয় না। কিন্তু আগ্নেয়, রাসায়নিক, বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক কার্য্যসমূহ জমি, জল ও হাওয়ার মধ্যে যে যে কার্য্যক্রমে ও কার্য্যনিয়মে স্বভাবতঃ হইয়া থাকে সেই সেই স্বাভাবিক কার্য্যক্রম ও কার্য্যনিয়মের সহিত সামঞ্জস্য-যুক্তভাবে সম্পাদিত না হইলে অথবা স্বাভাবিক কার্য্যক্রম ও কার্য্যনিয়মসমূহের বিরুদ্ধভাবে সাধিত হইলে মহা-কাশক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থ সাত শ্রেণীর ব্যাপারে অসমতার ও বিষমতার প্রাধান্যের উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয়।

মনুষ্যজাতির কোন্ কোন্ অনাচারে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তিতে অসমতার ও বিষমতার আতিশয্য অনিবার্য্য হয় তাহা উপরোক্ত ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, জমি ও তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির রক্ষা বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব কি কি তাহা স্থির করা অনায়াস-সাধ্য হইয়া থাকে।

জমির উৎপত্তি ও রক্ষা, জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির উৎপত্তি ও রক্ষা, প্রাকৃতিক কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে ও কার্য্যনিয়মে স্বতঃই সাধিত হইয়া থাকে তাহা তথাকথিত আধুনিক বিজ্ঞানের আদৌ জানা নাই। তথাকথিত আধুনিক বিজ্ঞান ঐ সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা কহিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন—সেই সমস্ত কথা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ঐ সমস্ত কথা প্রায়শঃ অসংলগ্ন এবং ধারণা করিবার অযোগ্য। জমির উৎপত্তি ও রক্ষা স্বতঃই প্রাকৃতিক কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে ও কোন্ কোন্ কার্য্যনিয়মে সাধিত হইয়া থাকে তাহা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের জানা না থাকায় যে যে একবিংশতি কার্য্যক্রম, নয় শ্রেণীর সম্বন্ধ এবং সপ্তবিংশতি শ্রেণীর গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি কর্ম্ম ও গমনের সহিত জমির অস্তিত্ব ও পরিণতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেই একবিংশতি কার্য্যক্রমের কথা, অথবা নয় শ্রেণীর সম্বন্ধের কথা অথবা সপ্তবিংশতি শ্রেণীর গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের কথা বর্ত্তমান বিজ্ঞানে পাওয়া যায় না।

ঐ সমস্ত কথা বর্ত্তমান বিজ্ঞানে পাওয়া যাক্ আর নাই যাক্—ঐ সমস্ত কথা যে ধ্রুব সত্য তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহের কারণ নাই।

জমি ও তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির কথা বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব কি কি তৎসম্বন্ধে এতাবৎ যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে উহার সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয় যে, জমি জল ও হাওয়ার অন্তরে অথবা উপরিভাগে যে সমস্ত কার্য্য করিলে জমির অভ্যন্তরস্থ বায়বীয়, বাষ্পীয়, তরল স্থূল, ও মহাকাশ প্রভৃতি অবস্থা সমূহের পরিবর্ত্তনের স্বাভাবিক প্রযত্নশীলতার কার্য্যে, অথবা তেজ ও রসের প্রবাহের কার্য্যে, অথবা ত্রিবিধ চাপের কার্য্যে, অথবা বিবিধ ঘনত্বের সমাবেশের কার্য্যে, অথবা পঞ্চবিধ অগ্নির কার্য্যে, অথবা ষড়বিধ রাসায়নিক কার্য্যে, অথবা পঞ্চবিধ আবয়বিক কার্য্যে—সমতার আতিশয্যের স্থলে অসমতা অথবা বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব হইতে পারে—সেই সমস্ত কার্য্য মানুষ যাহাতে স্বেচ্ছায় বর্জ্জন করে তাহার ব্যবস্থা করা।

জমি জল ও হাওয়ার অন্তরে অথবা উপরিভাগে যে সমস্ত কার্য্য করিলে জমির অভ্যন্তরস্থ সাতশ্রেণীর স্বাভাবিক কার্য্যের কোন কার্য্যে অসমতার অথবা বিষমতার আতিশয্য ঘটিতে পারে—সেই সমস্ত কার্য্য মানুষ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে স্বেচ্ছায় বর্জ্জন করে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে—জমির ও তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির রক্ষা বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব পালন করা সম্ভবযোগ্য হয় বটে; কিন্তু ঐ ব্যবস্থা করা সহজসাধ্য নহে।

ঐ ব্যবস্থা সহজসাধ্য করিতে হইলে সমগ্র মনুষ্য-সমাজ যাহাতে ঐ উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় আন্তরিক ভাবে মিলিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়।

জমি অথবা জল অথবা হাওয়ার অন্তরে অথবা বাহিরে যে সমস্ত কার্য্য করিলে জমির উৎপাদিকা শক্তিতে অসমতার অথবা বিষমতার আতিশয্য ঘটিতে পারে—সেই সমস্ত কার্য্য মানুষ যাহাতে স্বেচ্ছায় সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করে তাহার ব্যবস্থা, সমগ্র মনুষ্যসমাজ যাহাতে ঐ উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় আন্তরিকভাবে মিলিত হয় তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে, হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। সমগ্র মনুষ্য-সমাজ যাহাতে ঐ উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় আন্তরিকভাবে মিলিত হয় তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে যে ঐ ব্যবস্থা (অর্থাৎ জমির উৎপাদিকা-শক্তিতে যাহাতে অসমতা অথবা বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব না হয় তাহার ব্যবস্থা) সম্পাদিত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে তাহার কারণ জমি, জল ও হাওয়া সর্ব্ব-ব্যাপক এবং অখণ্ড। জমি, জল ও হাওয়া সর্ব্ব-ব্যাপক ও অখণ্ড হওয়ায় ঐ তিনটির কোনটির কোন এক অংশে কোনরূপ অসঙ্গত কার্য্য হইলেই সেই অসঙ্গত কার্য্যের অবাঞ্ছনীয় পরিণতি সারা ভূ-মণ্ডলময় অল্লাধিক মাত্রায় বিস্তৃতিলাভ করিতে পারে এবং করিয়া থাকে। মনুষ্য-সমাজের সমগ্রাংশ যদি ঐ উদ্দেশ্যে মিলিত না হয় তাহা হইলে মনুষ্য-সমাজের যে অংশ বিদ্রোহী থাকে সেই অংশ দ্বারা জমি, জল ও হাওয়ার কোন না কোন অংশে উপরোক্ত অসঙ্গত কার্য্যসমূহের সম্পাদনের আশঙ্কা সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে। এই কারণে জমি অথবা জল অথবা হাওয়ার অন্তরে ও উপরিভাগে যে সমস্ত কার্য্য করিলে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তিতে অসমতা ও বিষমতার আতিশয্য ঘটিতে পারে সেই সমস্ত কার্য্য মানুষ যাহাতে স্বেচ্ছায় বর্জ্জন করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে সমগ্র মনুষ্য-সমাজ যাহাতে স্বেচ্ছায় ও আন্তরিক ভাবে মিলিত হয় তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়।

ভয় অথবা প্রলোভন বশতঃ মানুষে মানুষে যে সাময়িক অথবা কপট মিলন ঘটিয়া থাকে—সেই কপট অথবা কৃত্রিম মিলনে, জমি অথবা জল অথবা হাওয়া সম্বন্ধীয় মানুষের অসঙ্গত কার্য্যসমূহের আশঙ্কা সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত হইতে পারে না। ইহার কারণ জমি অথবা জল অথবা হাওয়া সম্বন্ধীয় মানুষের অসঙ্গত কার্য্যসমূহ মানুষ স্বেচ্ছায় ও আন্তরিক ভাবে বর্জ্জন না করিলে, লুকাইতভাবে যখন তখন ও যেখানে সেখানে মানুষ ঐ অসঙ্গত কার্য্যসমূহ সম্পাদন করিতে পারে।

সমগ্র মনুষ্য-সমাজ যাহাতে স্বেচ্ছায় ও আন্তরিকভাবে মিলিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে জমি অথবা জল অথবা হাওয়ার কোন অংশে মানুষের দ্বারা যাহাতে কোন রকমের অসঙ্গত কার্য্য না হয়—তাহার ব্যবস্থা হওয়া সম্ভবযোগ্য

হয় বটে ; কিন্তু সমগ্র মনুষ্য-সমাজ যাহাতে স্বেচ্ছায় ও আন্তরিক ভাবে মিলিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা সহজসাধ্য নহে।

সমগ্র মনুষ্য-সমাজ যাহাতে স্বেচ্ছায় ও আন্তরিকভাবে মিলিত হয় তাহার ব্যবস্থা সহজসাধ্য করিতে হইলে যুগপৎ পাঁচ শ্রেণীর ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় যথা ঃ-

(১) প্রত্যেক মানুষ যাহাতে স্বতঃই নিজেকে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের এক একটি অংশ বলিয়া গণ্য করিবার জন্য কৃতসংকল্প হন এবং নিজ নিজ ব্যক্তিগত অথবা বর্ণগত অথবা দেশগত অথবা জাতিগত অথবা সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্যসমূহের কথা উপেক্ষা করিতে আকৃষ্ট হন্ তাহার ব্যবস্থা ;

(২) প্রত্যেক মানুষ যাহাতে তাঁহার প্রত্যেক প্রয়োজনীয় ইচ্ছার পরিতৃপ্তি অনায়াসে সাধন করিতে পারেন এবং কোন প্রয়োজনীয় ইচ্ছার পরিতৃপ্তির জন্য কোনরূপ ক্লেশ অনুভব করিতে বাধ্য না হন্—তাহার ব্যবস্থা।

(৩) প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ ইচ্ছা যাহাতে স্ব স্ব আয়ত্বাধীন করা সম্ভবযোগ্য ও অনায়াসসাধ্য হয় এবং কাহারও কোন ইচ্ছা যুক্তিসঙ্গত ভাবে কোনক্রমে অপর কাহারও অনিষ্ট অথবা বিরক্তি সাধক না হয় তাহার ব্যবস্থা ;

(৪) প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক বিষয়কবুদ্ধি, জ্ঞান, কর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম সমূহ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কোন ক্রমে মতবাদ অথবা সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়—তাহার ব্যবস্থা ;

(৫) প্রাকৃতিক যে সমস্ত কার্য্যনিয়মে পদার্থসমূহের মিলন সংঘটিত হয় সেই সমস্ত কার্য্যনিয়মের সহিত সর্ব্বতো-ভাবে সামঞ্জস্য রাখিয়া যাহাতে সমগ্র মনুষ্য সমাজের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বন্ধন শৃঙ্খলিত হয় এবং যাহাতে মানুষের সামাজিক অথবা রাষ্ট্রীয় জীবনে কোনরূপ বিচ্ছেদ-মিলন (অর্থাৎ দলাদলি) অথবা বিচ্ছেদ ঘটিতে না পারে—তাহার ব্যবস্থা।

উপরোক্ত পাঁচশ্রেণীর ব্যবস্থা আপাত দৃষ্টিতে মানুষের অসাধ্য বলিয়া মনে হয় বটে ; কিন্তু "পদার্থতত্ত্ব" ও "মনুষ্য-তত্ত্বের" (বিশেষ ভাবে মানুষের মনস্তত্ত্বের) সহিত সর্ব্বতো-ভাবে পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যায় যে, উপরোক্ত পাঁচটী ব্যবস্থা করা মানুষের অসাধ্য হওয়া'ত দূরের কথা মানুষের দুঃসাধ্য পর্য্যন্ত নহে মানুষ চেষ্টা কারলে অতি সহজে ঐ পাঁচটী ব্যবস্থা সম্পাদন করিতে পারে,—

ঐ পাঁচটী ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা আরও অনেক কথা পরবর্ত্তী তিনটি আলোচনায় বিবৃত্ত করিব, যথা ঃ—

(১) "মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব কি কি," (২) "সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার নীতিমূলক সূত্র সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত," (৩) "সমগ্র মনুষ্য সমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার পন্থা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত—"

জমি ও তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির রক্ষা বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব কি কি তৎসম্বন্ধে এই আলোচনায় এতাবৎ যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে সেই সমস্ত কথা হইতে বুঝিতে হয় যে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির পরিমাণ যাহাতে কোনরূপে হ্রাস প্রাপ্ত না হয় তাহা করিতে হইলে পৃথিবীর কোন অংশের জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তিতে যাহাতে সমতার স্বাভাবিক আতিশয্যের স্থলে অসমতার অথবা বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব না হয় তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

পৃথিবীর কোন অংশের জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তিতে যাহাতে মানুষের কৃতকার্য্যে সমতার স্বাভাবিক আতি-শয্যের স্থলে অসমতার অথবা বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে নিম্নলিখিত নয় শ্রেণীর—ব্যবস্থার প্রয়োজন,—

(১) মানুষ তাহার গমনাগমনের প্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধনার্থ যে সমস্ত যান-বাহন ব্যবহার করিতে সক্ষম হয় সেই সমস্ত যান-বাহনের গমনের ও চলন-শীলতার বেগ যাহাতে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পৃথিবীর কোন অংশে তাহার অভ্যন্তরস্থ সপ্ত শ্রেণীর কার্য্যে অসমতা অথবা বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা ;

(২) মানুষ তাহার বসবাসের জন্য যে সমস্ত ঘর বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হয় সেই সমস্ত ঘর বাড়ীর ভার (weight) যাহাতে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পৃথিবীর কোন অংশে তাহার অভ্যন্তরস্থ সপ্ত শ্রেণীর কার্য্যে অসমতা অথবা বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা ;

(৩) মানুষ তাহার বিবিধ তৃপ্তি সাধনার্থ বিদ্যুৎ, বাষ্প ও কয়লার সাহায্যে যে সমস্ত কৃত্রিম অগ্নির উৎপাদন

করিতে সক্ষম হয় সেই সমস্ত কৃত্রিম অগ্নির রাসায়নিক কার্য্যসমূহ যাহাতে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পৃথিবীর কোন অংশে তাহার অভ্যন্তরস্থ সপ্ত শ্রেণীর কার্য্যে অসমতা অথবা বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা ;

(৪) পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন খনন্দের সমাবেশের ষড়বিধ রাসায়নিক কার্য্যের শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইলে বিভিন্ন খনিজ পদার্থের যে যে পরিমাণের স্বাভাবিক ভাণ্ডার (stock) একান্ত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন খনিজ পদার্থের সেই সেই পরিমাণের স্বাভাবিক ভাণ্ডার যাহাতে পৃথিবীর অভ্যন্তরে বজায় থাকে এবং ঐ প্রয়োজনীয় ভাণ্ডার বজায় না রাখিয়া যাহাতে পৃথিবীর কোন অংশে খনিজ পদার্থের খননকার্য্য চলিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা ;

(৫) সমুদ্রযায়ী অর্ণবপোত সমূহের গমন ও চলনবেগ যাহাতে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ঐ সমস্তের দ্বারা যাহাতে সমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ স্বাভাবিক সপ্ত শ্রেণীর কার্য্যে অসমতার অথবা বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা ;

(৬) ডুবারী বাষ্পপোত সমূহের বাষ্পীয় মিশ্রণ এবং গমন ও চলনবেগ যাহাতে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ঐ সমস্তের দ্বারা যাহাতে সমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ স্বাভাবিক সপ্ত শ্রেণীর কার্য্যে অসমতার অথবা বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা ;

(৭) আকাশযায়ী বাষ্পপোত সমূহের বাষ্পীয় মিশ্রণ এবং গমন ও চলনবেগ যাহাতে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ঐ বাষ্পীয় মিশ্রণ প্রভৃতির দ্বারা যাহাতে মহাকাশের অভ্যন্তরস্থ স্বাভাবিক সপ্ত শ্রেণীর কার্য্যে অসমতার অথবা বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা ;

(৮) বার্ত্তাবহনের জন্য তারযুক্ত অথবা তারহীন সরঞ্জামের ব্যবহারে যে সমস্ত আবয়বিক, বৈদ্যুতিক এবং রাসায়নিক তরঙ্গের উদ্ভব হয় সেই সমস্ত তরঙ্গের গমন ও চলনবেগ যাহাতে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সেই সমস্ত তরঙ্গের ফলে যাহাতে মহাকাশের অভ্যন্তরস্থ স্বাভাবিক সপ্ত শ্রেণীর কার্য্যে অসমতার অথবা বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা ;

(৯) পৃথিবীর উপরিভাগে যে সমস্ত কৃত্রিম আগ্নেয়, রাসায়নিক, বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক কার্য্য নির্ব্বাহ করা হয় সেই কার্য্য যাহাতে মহাকাশের ও পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ স্বাভাবিক আগ্নেয়, রাসায়নিক, বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক কার্য্যের সহিত সামঞ্জস্য যুক্ত হয় এবং কোনরূপে বিরুদ্ধ না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা।

পৃথিবীর কোন অংশের জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তিতে যাহাতে সমতার স্বাভাবিক আতিশয্যের স্থলে অসমতার অথবা বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব না হয় তাহা করিতে হইলে যে নয়টী ব্যবস্থার প্রয়োজন সেই নয়টী ব্যবস্থা সাধন করিতে হইলে সমগ্র মনুষ্যসমাজ যাহাতে স্বেচ্ছায় ও আন্তরিক ভাবে মিলিত হয় তাহার আয়োজন করিতে হয়।

সমগ্র মনুষ্যসমাজ যাহাতে স্বেচ্ছায় ও আন্তরিকভাবে মিলিত হয় তাহার আয়োজন করিতে হইলে যুগপৎ পাঁচ শ্রেণীর ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। যে পাঁচ শ্রেণীর ব্যবস্থা যুগপৎ সাধিত হইলে সমগ্র মনুষ্যসমাজের পক্ষে স্বেচ্ছায় ও আন্তরিক ভাবে মিলিত হওয়া সুনিশ্চিত হয়, সেই পাঁচ শ্রেণীর ব্যবস্থার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। ঐ পাঁচ শ্রেণীর ব্যবস্থার পুনরুল্লেখ করিব না।

জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির রক্ষাবিষয়ে মানুষের দায়িত্ব কি কি তৎসম্বন্ধে এতাবৎ যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত কথা মানুষের ব্যবহারের দোষে জমির উৎপাদিকা-শক্তিতে ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তিতে যাহাতে সমতার আতিশয্যের স্থলে অসমতার অথবা বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থাবিষয়ক।

ইহা ছাড়া জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তির পরিমাণের রক্ষাবিষয়ে মানুষের আর এক শ্রেণীর দায়িত্ব আছে।

মানুষের ব্যবহারের দোষে অথবা মানুষের অনাচারে জমির উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির অসমতা ও বিষমতার আতিশয্য ঘটিলে যেরূপ জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তির পরিমাণের হ্রাস ঘটিতে পারে, সেইরূপ কতিপয় প্রাকৃতিক কারণেও জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির পরিমাণের হ্রাস ঘটিতে পারে।

কতিপয় প্রাকৃতিক কারণেও যে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির পরিমাণের হ্রাস ঘটিতে পারে তাহার কথা আমরা "জমির উৎপাদিকা-শক্তির শ্রেণী-বিভাগ"* শীর্ষক আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছি।

জমি ও তাহার উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে যে কথা বলা হইয়াছে তাহা ধারণা করিতে পারিলে বুঝা যায় যে, জমির উৎপাদিকা-শক্তির ও প্রবৃত্তির ভিতর যেরূপ সমতা বিদ্যমান থাকে সেইরূপ অসমতা এবং বিষমতাও বিদ্যমান থাকে। জমির উৎপাদিকা-শক্তির ও প্রবৃত্তির ভিতর সমতা, অসমতা এবং বিষমতা এই ত্রিবিধ অবস্থাই

* বঙ্গশ্রী পৌষ ১৩৫০—৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য

বিদ্যমান থাকে বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক কার্য্য স্বতঃই এমন নিয়মে পরিচালিত যে, স্বভাবতঃ জমির উৎপাদিকা-শক্তিতে, উৎপাদিকা প্রবৃত্তিতে এবং উৎপাদনের কার্য্যে অসমতা ও বিষমতার তুলনায় সমতাই আতিশয্যযুক্ত হইয়া থাকে।

জমির উৎপাদিকা-শক্তিতে, উৎপাদিকা প্রবৃত্তিতে এবং উৎপাদনের কার্য্যে অসমতা ও বিষমতার তুলনায় সমতাই আতিশয্য-যুক্ত হয় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া অসমতা ও বিষমতা যে একেবারে সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত হয়, তাহা নহে। এই পৃথিবীতে এমন কোন জমি থাকিতে পারে না এবং নাই, যে জমির উৎপাদিকা-শক্তিতে ও প্রবৃত্তিতে আদৌ অসমতা অথবা বিষমতা নাই অথবা থাকে না। যখন জমির উৎপাদিকা-শক্তির ও প্রবৃত্তির সমতার আতিশয্যবশতঃ উৎপাদনের কার্য্য চলিতে থাকে, তখনও জমির উৎপাদনের কার্য্যের অন্তরালে যে উৎপাদিকা-শক্তি ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে, সেই উৎপাদিকা-শক্তিতে এবং উৎপাদিকা প্রবৃত্তিতে সমতার সহিত অসমতা ও বিষমতা মিশ্রিত থাকে।

জমির উৎপাদিকা-শক্তিতে ও প্রবৃত্তিতে অসমতা ও বিষমতার তুলনায় সমতার আতিশয্য থাকিলে জমির উৎপাদনের কার্য্য যেমন বিদ্যমান থাকে, সেই রকম সমতার ও বিষমতার তুলনায় অসমতার আতিশয্য অথবা সমতার ও অসমতার তুলনায় বিষমতার আতিশয্য থাকিলেও জমির উৎপাদনের কার্য্য চলিতে পারে এবং চলিয়া থাকে। প্রভেদ হয় এই মাত্র যে, জমির উৎপাদিকা-শক্তিতে ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তিতে সমতার আতিশয্য বিদ্যমান থাকিলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ যত অধিক হয় এবং ঐ উৎপন্ন দ্রব্য-সমূহের গুণ যত অধিক পরিমাণে মানুষের মনের ও শরীরের সমতাসাধক হয়, অসমতা অথবা বিষমতার আতিশয্য থাকিলে তাহা হয় না।

মানুষের কোন অসঙ্গত ব্যবহার না থাকিলে জমির উৎপাদিকা-শক্তিতে ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তিতে স্বভাবতঃ সমতার আতিশয্য ছাড়া অসমতার অথবা বিষমতার আতিশয্য বিদ্যমান থাকিতে পারে না। জমির উৎপাদিকা-শক্তিতে ও উৎপাদিকা বৃত্তিতে সমতার আতিশয্য ছাড়া অসমতার অথবা বিষমতার আতিশয্য স্বভাবতঃ উদ্ভূত হইতে পারে না বটে, কিন্তু যে সমস্ত জমির উৎপাদিকা-শক্তিতে ও উৎপাদিকা-বৃত্তিতে সমতার আতিশয্য বিদ্যমান থাকে সেই সমস্ত জমিই যে একশ্রেণীর অথবা একই পরিমাণের উৎপাদিকা-শক্তি ও উৎপাদিকা-বৃত্তিযুক্ত হয়, তাহা নহে। উৎপাদিকা-শক্তি অথবা উৎপাদিকা প্রবৃত্তি একই পরিমাণের না হইলেও পরন্তু বিভিন্ন পরিমাণের হইলেও সমতা-যুক্ত হইতে পারে।

প্রত্যেক জমির উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ও গুণ সাক্ষাৎ ভাবে দুই শ্রেণীর বিষয়ের উপর নির্ভরশীল; যথা :

(১) জমির উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির পরিমাণ;

(২) জমির উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তির সমতা অথবা অসমতা অথবা বিষমতার আতিশয্য।

জমির উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির পরিমাণ এবং অসমতা ও বিষমতার তুলনায় সমতার আতিশয্যের পরিমাণ যত অধিক হয়, জমির উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ তত অধিক হয় এবং ঐ সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের গুণ ও শক্তি তত অধিক পরিমাণে মানুষের সমতার আতিশয্য সাধন করিবার সক্ষমতাযুক্ত হইয়া থকে।

জমির উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির অসমতা ও বিষমতার তুলনায় সমতার আতিশয্য মানুষের অনাচার না থাকিলে প্রাকৃতিক নিয়মে প্রাকৃতিক কার্য্য-সমূহের দ্বারা সাধিত হয় বটে, কিন্তু জমির উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তির পরিমাণের বৃদ্ধি প্রাকৃতিক নিয়মে প্রাকৃতিক কার্য্যসমূহের দ্বারা সর্ব্বদা সাধিত হয় না। প্রকৃতিক নিয়ম ও প্রাকৃতিক কার্য্যসমূহের মধ্যে কতিপয় প্রাকৃতিক নিয়মে ও প্রাকৃতিক কার্য্যে বরং জমির উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির হ্রাস-প্রাপ্তির আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। কতিপয় প্রাকৃতিক নিয়মে ও প্রাকৃতিক কার্য্যে জমির উৎপাদিকা-শক্তিসমূহের ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তিসমূহের পরিমাণের হ্রাস-প্রাপ্তির আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে বটে, কিন্তু যাহাতে ঐ উৎপাদিকা-শক্তিসমূহের ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তিসমূহের সমতার আতিশয্যের স্থলে মানুষের অনাচারে অসমতার অথবা বিষমতার আতিশয্য ঘটিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা থাকিলে, এমন কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম ও প্রাকৃতিক কার্য্যের উদ্ভব হয়—যে-সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম ও প্রাকৃতিক কার্য্যের ফলে জমির উৎপাদিকা-শক্তিসমূহের ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তিসমূহের পরিমাণের হ্রাস-প্রাপ্তির আশঙ্কা তিরোহিত হইয়া যায়।

যাহাতে জমির উৎপাদিকা-শক্তিসমূহের ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তিসমূহের সমতার আতিশয্যের স্থলে মানুষের অনাচারে অসমতার অথবা বিষমতার আতিশয্য ঘটিতে না পারে, মনুষ্য-সমাজে তাহার ব্যবস্থা থাকিলে, উপরোক্ত দ্বিবিধ প্রাকৃতিক কার্য্য ও প্রাকৃতিক নিয়মের ফলে জমির উৎপাদিকা-শক্তি-সমূহের ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তিসমূহের পরিমাণের হ্রাস-প্রাপ্তির আশঙ্কা তিরোহিত হইয়া যায় বটে, কিন্তু মানুষের অনাচারে যাহাতে জমির উৎপাদিকা-শক্তিসমূহের ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তি-সমূহের অসমতা অথবা বিষমতার আতিশয্য ঘটিতে না পারে মনুষ্যসমাজে তাহার ব্যবস্থা না থাকিলে জমির উৎপাদিকা-শক্তিসমূহের ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তিসমূহের পরিমাণের হ্রাস-

প্রাপ্তির আশঙ্কা তিরোহিত হয় না। তখন প্রাকৃতিক কার্য্য ও প্রাকৃতিক নিয়মের ফলেই জমির' উৎপাদিকা-শক্তি-সমূহের ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তিসমূহের পরিমাণের হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটিতে আরম্ভ করে।

মানুষের অনাচারে যাহাতে জমির উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির অসমতা ও বিষমতার আতিশয্য ঘটিতে না পারে তাহার ব্যবস্থার অভাব হইলে, জমির যে উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির স্বাভাবিক পরিমাণের যে হ্রাস-প্রাপ্তি ঘটে, সেই হ্রাসপ্রাপ্তি তিরোহিত করিবার একমাত্র পন্থা মানুষ যাহাতে উপরোক্ত অনাচারসমূহ স্বেচ্ছায় বর্জ্জন করে তাহার ব্যবস্থা করা।

মানুষের যে সমস্ত অনাচারে জমির উৎপাদিকা-শক্তি ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির অসমতা ও বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব হইতে পারে সেই সমস্ত অনাচার মানুষ যাহাতে স্বেচ্ছায় বর্জ্জন করে মনুষ্যসমাজে তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তির পরিমাণের হ্রাস-প্রাপ্তির আশঙ্কা তিরোহিত হয় বটে এবং ঐ পরিমাণের অধিকতর হ্রাস ঘটিতে পারে না বটে কিন্তু যে পরিমাণে হ্রাস একবার হইয়া যায় সেই পরিমাণের পূরণ কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মে ও প্রাকৃতিক কার্য্যের ফলে সাধিত হয় না। উপরোক্ত কারণে জমির স্বাভাবিক উৎপাদকশক্তির ও উৎপাদক-প্রবৃত্তির পরিমাণের হ্রাস একবার সাধিত হইলে তাহার পূরণ করা মানুষের কার্য্যকৌশল ছাড়া আর কোন উপায়ে সম্ভবযোগ্য হয় না।

জমির উৎপাদিকাশক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির সমতার আতিশয্য বিষয়ে মানুষের অনাচার ঘটিলে যেরূপ প্রাকৃতিক নিয়মে ও প্রাকৃতিক কার্য্যের ফলে অসমতা ও বিষমতার আতিশয্য বশতঃ জমির উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির পরিমাণের হ্রাস ঘটিতে পারে, সেইরূপ মানুষের কোন অনাচার না থাকিলেও এবং সমতার আতিশয্য থাকিলেও প্রাকৃতিক নিয়মে ও প্রাকৃতিক কার্য্যের ফলে জমির উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির পরিমাণের হ্রাস ঘটিতে পারে।

মানুষের কোন অনাচার না থাকিলে এবং জমির উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তির সমতার আতিশয্য থাকিলেও প্রাকৃতিক নিয়মের ও প্রাকৃতিক কার্য্যের ফলে জমির উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তির হ্রাস কিরূপে ঘটিতে পারে তাহার কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে "জমির উৎপাদিকা-শক্তির শ্রেণী-বিভাগ" শীর্ষক আলোচনায় বিবৃত করিয়াছি। ঐ সমস্ত কথার পুনরুল্লেখ করিব না।

* বঙ্গশ্রী পৌষ, ১৩৫০—৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য

মানুষের কোন অনাচার না থাকিলেও কেবলমাত্র প্রাকৃতিক কার্য্যে ও প্রাকৃতিক নিয়মে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির ও স্বাভাবিক উৎপাদিকা প্রবৃত্তির পরিমাণের যে হ্রাস হয় সেই হ্রাসের পূরণও কেবলমাত্র কোন প্রাকৃতিক নিয়ম ও প্রাকৃতিক কার্য্যের ফলে সাধিত হয় না। উহাও মানুষের কার্য্য-কৌশল ছাড়া আর কোন উপায়ে সম্ভবযোগ্য হয় না।

প্রাকৃতিক কার্য্যনিয়মে ও কার্য্যক্রমে জমির উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তির পরিমাণের যে শ্রেণীর হ্রাস ঘটিয়া থাকে সেই শ্রেণীর হ্রাস যাহাতে না ঘটিতে পারে তাহার কার্য্য-কৌশল পরিজ্ঞাত হওয়া এবং ঐ সমস্ত কার্য্য কৌশলে অভ্যস্ত হওয়া জমি ও তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির রক্ষা বিষয়ে মানুষের অন্যতম দায়িত্ব।

প্রাকৃতিক কার্য্যনিয়মে ও কার্য্যক্রমে জমির উৎপাদিকা শক্তির ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তির পরিমাণের হ্রাস ঘটিলে মানুষের সাধ্যান্তর্গত যে যে কার্য্য-কৌশলে ঐ হ্রাস পূরণ করা সুনিশ্চিত হয়, সেই সেই কৌশলের ইতিবৃত্ত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বেদের ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোন ভাষায় লিখিত অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

যে সমস্ত কার্য্য-কৌশলে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তির হ্রাসপ্রাপ্ত পরিমাণের পূরণ করা সম্ভব হয় সেই সমস্ত কার্য্যকৌশল অত্যন্ত দুরূহ।

প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীর জ্ঞান ও উপলব্ধি ঐ সমস্ত কার্য্য-কৌশলের ভিত্তি; যথা :—

(১) জমির স্বাভাবিক উৎপত্তির ও রক্ষার প্রাকৃতিক কার্য্য-ক্রম ও কার্য্যনিয়মের জ্ঞান ও উপলব্ধি ;

(২) জমির স্বাভাবিক উৎপত্তি ও রক্ষা বিষয়ে জমির এবং বায়ু, বাষ্প প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে যে যে সম্বন্ধ সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান ও উপলব্ধি।

(৩) দেশভেদে জমির গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম ও গমনের যে সমস্ত ভেদ হইয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান ও উপলব্ধি ;

(৪) জমির উৎপাদিকা-শক্তি ও প্রবৃত্তির সমতাতিশয্য রক্ষার জন্য যে সাত শ্রেণীর প্রাকৃতিক কার্য্য প্রত্যেক দেশের জমির অভ্যন্তরে বিদ্যমান থাকে, জমির অভ্যন্তরস্থ সেই সাত শ্রেণীর কার্য্যের সমতা, অসমতা ও বিষমতার আতিশয্যের সহিত মৃত্তিকার উৎপাদনের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির পরিমাণের সম্বন্ধ বিষয়ে জ্ঞান ও উপলব্ধি ;

(৫) মহাকাশ-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মহাকাশ-ক্ষেত্রের কর্ম্ম ও গমনসমূহকে বাষ্প-ক্ষেত্র ও কাল-ক্ষেত্রের কর্ম্ম ও গমনসমূহের সহিত সংযুক্ত করিবার পন্থা সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভ্যাস।

প্রাকৃতিক কার্য্যসমূহের ফলে জমির উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির পরিমাণের যে হ্রাস ঘটিবার আশঙ্কা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে, সেই হ্রাস যাহাতে না ঘটিতে পারে তাহা করিতে হইলে, অথবা জমির উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির পরিমাণের হ্রাস ঘটিলে তাহার পুনরুদ্ধার করিতে হইলে, সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়; যথা :—

(১) জমিবিষয়ক উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর জ্ঞান যাহাতে মনুষ্যসমাজে প্রকাশিত ও প্রচারিত থাকে তাহার ব্যবস্থা;

(২) জমিবিষয়ক উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর জ্ঞানে জ্ঞানবান্ এবং পাঁচ শ্রেণীর উপলব্ধির কার্য্যে নৈপুণ্যযুক্ত মানুষের সংখ্যা যাহাতে মনুষ্যসমাজে বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা;

(৩) মানুষের যে সমস্ত কার্য্যে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তিতে ও উৎপাদিকা-বৃত্তিতে সমতার আতিশয্যের স্থলে অসমতা অথবা বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব হইতে পারে, সেই সমস্ত কার্য্য যাহাতে মানুষ স্বেচ্ছায় বর্জ্জন করে, তাহার ব্যবস্থা।

উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর জ্ঞান ও উপলব্ধির সন্ধান করিতে পারিলে এবং তিন শ্রেণীর ব্যবস্থা সাধিত করিতে পারিলে, প্রাকৃতিক কারণে যাহাতে জমির উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির পরিমাণের হ্রাস না হয় অথবা উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির পরিমাণের হ্রাস হইলে যাহাতে উহার পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় তাহার কার্য্য-কৌশল অবলম্বন করা যায়।

উপরোক্ত কার্য্য-কৌশলের মধ্যে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর কার্য্য আছে।

প্রথমতঃ, জমির প্রত্যেক অংশ যাহাতে রস-সঞ্চিত থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশে যে সমস্ত স্বাভাবিক স্রোতস্বিনী অথবা নদী বিদ্যমান থাকে সেই সমস্ত নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ-গতিসমূহকে অনুসরণ করিয়া ঐ সমস্ত প্রবাহ-গতি যাহাতে কোনরূপে সঙ্কুচিত না হয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেশময় কৃত্রিম খালসমূহের খনন করিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, বৎসরের যে যে দিনে পৃথিবী সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের কাল-ক্ষেত্রের, দৈত-ক্ষেত্রের এবং মায়া-ক্ষেত্রের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্ত্তী হয়, সেই সেই দিনে মহাকাশক্ষেত্রের পঞ্চবিধ আবয়বিক কর্ম্মের সহায়তায় পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবিধ আবয়বিক কর্ম্মের শক্তি ও প্রবৃত্তি, ষড়্বিধ রাসায়নিক কর্ম্মের শক্তি ও প্রবৃত্তি এবং পঞ্চবিধ অগ্নির কর্ম্মের শক্তি ও প্রবৃত্তির সমতাতিশয্যের ও পরিমাণের বৃদ্ধি সাধন করিবার জন্য যাজ্ঞিক কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন হয়। এই যাজ্ঞিক কর্ম্ম এক শ্রেণীর পূজার অন্তর্গত।

মহাকাশ-ক্ষেত্রের পঞ্চবিধ আবয়বিক কর্ম্মের সহায়তায় পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবিধ আবয়বিক কর্ম্মের, পঞ্চবিধ অগ্নির এবং ষড়্বিধ রাসায়নিক কর্ম্মের শক্তি ও প্রবৃত্তির সমতাতিশয্যের ও পরিমাণের বৃদ্ধি সাধনা করার কথা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের কাছে সর্ব্বতোভাবে অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। কিন্তু বেদে যে জমি-বিজ্ঞানের কথা আমরা ভাই-বন্ধুগণকে শুনাইতেছি, সেই বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যায় যে, ঐ যাজ্ঞিক কর্ম্মের কথা আজকালকার বিজ্ঞানের জ্ঞানের মাপকাঠিতে অলীক বলিয়া প্রতীত হইলেও হইতে পারে বটে কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে আদৌ অলীক নহে; পরন্তু সর্ব্বতোভাবে মানুষের সাধ্যান্তর্গত এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের যে সমস্ত অনাচারে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির সমতাতিশয্যের স্থলে অসমতা ও বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব হইয়া থাকে, সেই সমস্ত অনাচার যদি মানুষ স্বেচ্ছায় বর্জ্জন করিবার ব্যবস্থা করে তাহা হইলে এখনও উপরোক্ত যাজ্ঞিক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে এবং ঐ যাজ্ঞিক কর্ম্মের সহায়তায় সারা জগতের জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির পরিমাণের যে অংশের হ্রাস হইয়াছে তাহার পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়।

মানব সমাজে একদিন ঐ যাজ্ঞিক কর্ম্ম সারা ভূমণ্ডলে প্রতি বৎসর বৎসরের মধ্যে দশবার করিয়া অনুষ্ঠিত হইত। ঐ যাজ্ঞিক কর্ম্ম যে মানব সমাজে একদিন সারা ভূমণ্ডলে প্রতি বৎসর দশবার করিয়া অনুষ্ঠিত হইত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থে তাহার অকাট্য প্রমান এখনও পাওয়া যায়। আমরা ঐ প্রমানের কথা এখানে আলোচনা করিবনা।

উপরোক্ত যাজ্ঞিক কর্ম্মের কার্য্য-পদ্ধতি এবং কার্য্য-নিয়ম সম্বন্ধে ও এখানে আর কোন আলোচনা করিবনা। তাহার কারণ উহা অত্যন্ত দুরূহ এবং অনন্য-সাধারণ জ্ঞান সাপেক্ষ। উহা অত্যন্ত দুরূহ হইলেও মানব জাতির মধ্যেই এমন একাধিক মানুষ পাওয়া সম্ভব যাঁহারা ঐ যাজ্ঞিক কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে নৈপুণ্য লাভ করিতে পারেন।

জমি ও তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির রক্ষা বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব কি কি তৎসম্বন্ধে প্রধানতঃ যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য কথা মানুষের জানিবার প্রয়োজন সেই সমস্ত কথার আলোচনা আমরা এই আখ্যায়িকায় করিয়াছি। ঐ সমস্ত কথা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, জমি ও তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির রক্ষা বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর, যথা—

(১) মানুষের যে সমস্ত কার্য্যে জমি অথবা জল অথবা হাওয়ার স্বাভাবিক সমতার আতিশয্যের স্থলে অসমতার অথবা বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব হইতে পারে সেই সমস্ত কার্য্যের প্রত্যেকটী যাহাতে মানুষ স্বেচ্ছায় বর্জ্জন করে তাহার ব্যবস্থা করা।

(২) প্রাকৃতিক কার্য্যক্রম ও কার্য্যনিয়ম বশতঃ জমি অথবা জল অথবা হাওয়ার স্বাভাবিক সমতার আতিশয্যের স্থলে যে সমস্ত অসমতার অথবা বিষমতার আতিশয্যের প্রবৃত্তি উদ্ভব হইয়া থাকে সেই সমস্ত অসমতার ও বিষমতার আতিশয্যের প্রবৃত্তি যাহাতে কার্য্যে পরিণত না হইতে পারে তাহা করিবার জন্ম যে সমস্ত যাজ্ঞিক কর্ম্মের প্রয়োজন হয় সেই সমস্ত যাজ্ঞিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান যাহাতে সমগ্র মনুষ্য সমাজ বিধিবদ্ধভাবে সাধন করিতে পারে এবং করে তাহার ব্যবস্থা করা।

(৩) মানুষের অনাচার অথবা প্রাকৃতিক কার্য্যবশতঃ জমি অথবা জল অথবা হাওয়ার স্বাভাবিক সমতার আতিশয্যের স্থলে অসমতার অথবা বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব হইলে জমির উৎপাদিকা শক্তির ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তির পরিমাণের যে হ্রাস হওয়া অনিবার্য্য হয় সেই হ্রাস পূরণ করার জন্ম যে সমস্ত যাজ্ঞিক কর্ম্মের প্রয়োজন হয় সেই সমস্ত যাজ্ঞিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান যাহাতে সমগ্র মনুষ্য সমাজ বিধিবদ্ধভাবে সাধন করিতে পারে এবং করে তাহার ব্যবস্থা করা।

যাহাতে জমি ও তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিত হয় তাহার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন যে কতখানি তাহা আধুনিক মানব সমাজের শিক্ষিতগণের অধিকাংশই পরিজ্ঞাত নহেন ইহা আমাদিগের অভিমত।

আমরা কেন উপরোক্ত অভিমত পোষণ করি প্রসঙ্গক্রমে এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার একটু আলোচনা করিব।

আধুনিক মানব সমাজের প্রত্যেক দেশের মনুষ্যগণ গত সোয়াশত বৎসর হইতে স্ব স্ব দেশের শিল্প বাণিজ্য বিস্তারের জন্ম উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এই সোয়াশত বৎসরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই সোয়াশত বৎসর ধরিয়া শিল্প ও বাণিজ্যের তুলনায় প্রত্যেক দেশেই কৃষিকার্য্য উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কোন দেশেই কৃষিকার্য্য সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করা হয় নাই বটে, কিন্তু শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তারের যে উদ্যম প্রত্যেক দেশেই এই সোয়াশত বৎসরব্যাপী কালে পরিস্ফুট হইয়াছে তাহার তুলনায় কৃষি-প্রযত্ন একরূপ নগণ্য। কৃষিকার্য্য, শিল্প ও বাণিজ্যের তুলনায় এতাদৃশভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে কেন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, উহার প্রধান কারণ শিল্প ও বাণিজ্যে যে পরিমাণে লাভ হয় কৃষিকার্য্যের লাভের পরিমাণ তাহার তুলনায় অত্যন্ত কম। শিল্প ও বাণিজ্যে যে পরিমাণ লাভ হয় তাহার তুলনায় কৃষিকার্য্যের লাভের পরিমাণ এত কম হয় কেন তাহার সন্ধান করিলে দেখা যায় যে, উহার প্রধান কারণ জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তির পরিমাণের অল্পতা এবং ক্রমিক হ্রাস।

জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তির পরিমাণের অল্পতা এবং ক্রমিক হ্রাস হয় বলিয়া যে কৃষিকার্য্যের লাভ শিল্প ও বাণিজ্যের লাভের তুলনায় কম হয় এবং প্রধাণতঃ লাভের তুলনামূলক ঐ অল্পতা বশতঃই যে কৃষিকার্য্য শিল্প বাণিজ্যের তুলনায় উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে তাহা মানব-সমাজের বর্ত্তমান রাজন্যবর্গ যে বুঝিতে পারেন তাহা আমরা মনে করি না। মানব-সমাজের বর্ত্তমান রাজন্যবর্গ উহা বুঝিতে পারেন না বটে, কিন্তু উহা ধ্রুব সত্য।

আধুনিক মানব সমাজের প্রত্যেক দেশের মনুষ্যগণ যে স্ব স্ব দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তারের তুলনায় কৃষি-কার্য্যের বিস্তার উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাহার প্রধান কারণ কৃষি-কার্য্য যে মানব সমাজের দুঃখ দূর করিবার জন্ম কতখানি প্রয়োজনীয় তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না।

কৃষি-কার্য্যের প্রধান ভিত্তি জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির স্বাভাবিক পরিমাণ। জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির স্বাভাবিক পরিমাণ বজায় থাকিলে কৃষি-কার্য্যের লাভের তুলনায় শিল্প ও বাণিজ্যের লাভের পরিমাণ বেশী হইতে পারে না।

মানব সমাজের দুঃখ দূর করিবার জন্ম কৃষি-কার্য্য কতখানি প্রয়োজনীয় তাহা যখন মানব সমাজ ভুলিয়া যায়, এবং কৃষি-কার্য্যে উপেক্ষার উদ্ভব হয় তখনই বুঝিতে হয় যে মানব সমাজের দুঃখ দূর করিবার জন্ম জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তির স্বাভাবিক পরিমাণ বজায় রাখিবার প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তাহা মানবসমাজের অপরিজ্ঞাত হইয়াছে।

মানব সমাজের সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী বর্ত্তমান যুদ্ধের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তির স্বাভাবিক পরিমাণ বজায় রাখিবার প্রয়োজনীয়তা —যে কতখানি তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বুঝা যায়।

সমগ্র ভূ-মণ্ডলের স্থলভাগের প্রত্যেক অংশের স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তির স্বাভাবিক পরিমাণ যদি বজায় থাকিত তাহা হইলে প্রত্যেক দেশের মানুষগণের পক্ষে নিজ দেশের জমি হইতে নিজ নিজ দেশের সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যার আহার, বিহার এবং ব্যবহারের জন্ম যে সমস্ত কাঁচা-মাল যত যত পরিমাণে প্রয়োজন হয় সেই সমস্ত কাঁচামাল তত তত পরিমাণে অনায়াসে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য

হইত। নিজ নিজ দেশের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার আহার, বিহার এবং ব্যবহারের জন্য যে সমস্ত কাঁচামাল যত যত পরিমাণে প্রয়োজন তাহা যগুপি নিজ নিজ দেশের জমি হইতে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হইত তাহা হইলে নিজ নিজ দেশে বসিয়া প্রত্যেকেই দুঃখ মুক্ত হইয়া জীবন যাপন করিতে পারিতেন। বাণিজ্যের অজুহাতে কোন দেশের কোন লোকের সারা ভূ-মণ্ডলময় ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত না। বাণিজ্যের অজুহাতে কোন দেশের কোন লোকের সারা ভূ-মণ্ডলময় ঘুরিয়া বেড়াইতে না হইলে কোন দেশের মানুষকে অন্য দেশের জমি অথবা বাজার কৌশল পূর্ব্বক অথবা বল পূর্ব্বক দখল করিবার কথা ভাবিতে হইত না। কোন দেশের মানুষকে অন্যদেশের জমি অথবা বাজার কৌশলপূর্ব্বক অথবা বলপূর্ব্বক দখল করিবার কথা ভাবিতে না হইলে সারা ভূ-মণ্ডলময় যুদ্ধ ত' দূরের কথা, কোন দুইটী দেশের মানুষের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ হওয়া ও অসম্ভব হয়।

জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তির পরিমাণ যাহাতে পৃথিবীর কুত্রাপি হ্রাস না পায় এবং সর্ব্বতোভাবে রক্ষা হয় তাহার ব্যবস্থা থাকিলে যেরূপ সমগ্র মনুষ্য সমাজের প্রত্যেক মানুষের পক্ষে সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইয়া জীবন যাপন করা সম্ভবযোগ্য হয় এবং দুইটী দেশের মানুষের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ হওয়া অসম্ভব হয়, সেইরূপ আবার ঐ ব্যবস্থা না থাকিলে সারা ভূ-মণ্ডলব্যাপী যুদ্ধ হওয়া অনিবার্য্য হয় এবং শিল্প ও বাণিজ্যের সর্ব্ববিধ প্রসার সত্ত্বেও প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর হওয়া ত' দূরের কথা কোন দেশের কোন মানুষের কোন দুঃখই সর্ব্বতোভাবে দূর হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না।

জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির পরিমাণ যাহাতে কোনক্রমে হ্রাস না পায় তাহার ব্যবস্থা না থাকিলে যে কেবল মাত্র মানুষের আর্থিক অভাবের উদ্ভব হয় তাহা নহে ঐ ব্যবস্থা না থাকিলে প্রত্যেক দেশের স্বাভাবিক স্রোতস্বিনীসমূহ শুষ্ক হইবার জন্য প্রবৃত্তিশীল হয় এবং তাহাদের অভ্যন্তরস্থ কার্য্যসমূহের স্বাভাবিক সমতাতিশয্য নষ্ট হইয়া যায়। প্রত্যেক দেশের বায়ুমণ্ডলে ও তাহার অভ্যন্তরস্থ কার্য্যসমূহের স্বাভাবিক সমতাতিশয্যের স্থলে অসমতা ও বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব হয়।

স্বাভাবিক স্রোতস্বিনী সমূহের স্বতঃই উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত নহে। কোন্ কোন্ কারণে স্বাভাবিক স্রোতস্বিনী সমূহের স্বতঃই উৎপত্তি হয় তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যায় যে-যে কারণে জমি ও তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির উৎপত্তি হয় এবং ঐ স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির সমতাতিশয্য রক্ষিত হয় সেই সেই কারণেই প্রত্যেক দেশের স্বাভাবিক স্রোতস্বিনীসমূহের ও উৎপত্তি এবং রক্ষা হইয়া থাকে। জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির পরিমাণ ও সমতাতিশয্যের সহিত স্রোতস্বিনীসমূহের স্বাভাবিক স্রোতবেগের পরিমাণ ও সমতাতিশয্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটীর পরিবর্ত্তন হইলে আর একটীর পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হয়।

স্রোতস্বিনী সমূহের স্রোতবেগের পরিমাণের হ্রাস হইলে এবং তাহাদের সমতাতিশয্যের স্থলে অসমতার ও বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব হইলে মহাকাশের অভ্যন্তরস্থ সপ্তবিধ কার্য্যে ও সমতার আতিশয্যের স্থলে অসমতার ও বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব হয়। মহাকাশের অভ্যন্তরস্থ সপ্তবিধ কার্য্যে সমতার আতিশয্যের স্থলে অসমতার ও বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব হইলে মানুষের নানা রকমের ব্যাধির কারণ সমূহের উৎপত্তি হয় এবং মানুষের মনের কার্য্যে ও সমতার আতিশয্যের স্থলে অসমতা ও বিষমতার আতিশয্যের উৎপত্তি হয়।

এইরূপে, জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তির পরিমাণ যাহাতে কোনক্রমে হ্রাস না পায় মনুষ্যসমাজে তাহার ব্যবস্থা না থাকিলে একদিকে যেরূপ সর্ব্বব্যাপী অর্থাভাব দেখা দেয়, সেইরূপ মানুষের অস্বাস্থ্য, অশান্তি ও অসন্তুষ্টির কারণ সমূহেরও উৎপত্তি হয়।

আমাদিগের সিদ্ধান্তানুসারে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভব হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে পৃথিবীর কোন অংশের কোন জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির পরিমাণ যাহাতে কোনক্রমে হ্রাস পাইতে না পারে তাহা করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

জমি ও তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির পরিমাণ যাহাতে কোনক্রমে হ্রাস না পায় তাহা করিবার পন্থা সম্বন্ধে এই আখ্যায়িকায় যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে সেই সমস্ত ব্যবস্থা ছাড়া আর অন্য কোন ব্যবস্থায় উহা করা সম্ভবযোগ্য নহে। জমি ও তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির পরিমাণ যাহাতে কোনক্রমে হ্রাস না পায় তাহা করা কোন্ কোন্ ব্যবস্থায় সম্ভবযোগ্য হইতে পারে তৎ সম্বন্ধে ঋষি প্রণীত বিবিধ গ্রন্থে সম্পূর্ণ আলোচনা আছে। ঐ আলোচনায় দেখান হইয়াছে যে জমি ও তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তির পরিমাণের হ্রাস হইবার কারণ দুইটী যথা:—

(১) জমির উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তির স্বাভাবিক সমতাতিশয্যের স্থলে অসমতা ও বিষমতার আতিশয্য;

(২) জমির উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তির যে সাময়িকভাবের অসমতা ও বিষমতার আতিশয্যের স্বাভাবিক প্রযত্নশীলতা আছে, সেই স্বাভাবিক প্রযত্নশীলতা।

উপরোক্ত দুইটী কারণের প্রথমটী মানুষের কার্য্যের দ্বারা উৎপত্তি হইয়া থাকে, দ্বিতীয়টীর উৎপত্তি হয় প্রাকৃতিক কার্য্যক্রমে ও প্রাকৃতিক কার্য্য নিয়মে।

প্রাকৃতিক কার্য্যক্রমে ও প্রাকৃতিক কার্য্য নিয়মে যাহার উৎপত্তি হয়—তাহার অন্যথা করা উৎপত্তি-ক্ষেত্রের সহিত সংযোগ সাধন করিতে না পারিলে সম্ভবযোগ্য হয় না।

উপরোক্ত কারণে জমি ও তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির পরিমাণ যাহাতে কোনক্রমে হ্রাস না পায় তাহা করিতে হইলে যে সমস্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় সেই সমস্ত ব্যবস্থায় জমি ও তাহার উৎপাদিকা শক্তির উৎপত্তির মূল ক্ষেত্রের সহিত যাহার অন্তর্ভাগ ও উপরিভাগের সংযোগ সাধন করা একান্ত আবশ্যকীয় হয়।

আধুনিক বিজ্ঞানানুসারে মনে করা হয় যে কৃত্রিম দ্রব্যসমূহ রাসায়নিক সাররূপে ব্যবহার করিলে অথবা জমির যেখানে সেখানে কৃত্রিম খালের খনন করিয়া জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা করিলে জমির নষ্ট উৎপাদিকা শক্তির পরিমাণের পুনরুদ্ধার করা সম্ভবযোগ্য হইয়া থাকে। আমাদিগের মতে উহা সম্ভবযোগ্য হয় না। আমাদিগের ঐ মতবাদের কারণ এই যে উপরোক্ত দুইটী উপায়ের কোনটীতেই জমি ও তাহার উৎপাদিকা শক্তির উৎপত্তির মূল-ক্ষেত্রের সহিত জমির অন্তর্ভাগ ও উপরিভাগের সংযোগ সাধন করা সম্ভবযোগ্য হয় না। কৃত্রিম দ্রব্য সমূহ রাসায়নিক সার Manure-রূপে ব্যবহার করিলে অথবা জমির স্বাভাবিক প্রবাহ-গতি বিচার না করিয়া যেখানে সেখানে কৃত্রিম খালের খনন কারণে আমাদিগের মতে জমির উৎপাদিকা-শক্তির সমতার আতিশয্যের স্থলে অসমতার ও বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব করা হয়। জমির উৎপাদিকা শক্তির সমতার আতিশয্যের স্থলে অসমতার ও বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব হইলে সাময়িক ভাবে উৎপাদিকা প্রবৃত্তির কথঞ্চিৎ পরিমাণে উত্তেজনা সাধিত হয়। তাহাতে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ কয়েক বৎসরের জন্য অপেক্ষাকৃত কিছু বেশী হইতে পারে বটে কিন্তু ঐ উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের গুণ ও শক্তি মানুষের শরীরের ও মনের সমতার অপহারক এবং অসমতার ও বিষমতার সাধক হইয়া থাকে।

কৃত্রিম দ্রব্যসমূহ রাসায়নিক সার (manure) রূপে ব্যবহার করিলে অথবা জমির অভ্যন্তরস্থ কার্য্যসমূহের স্বাভাবিক প্রবাহগতি বিচার না করিয়া যেখানে সেখানে কৃত্রিম খালের খনন করিলে উপরোক্তভাবে জমির উৎপাদিকা প্রবৃত্তির অসমতার ও বিষমতার আতিশয্য বৃদ্ধি করা সম্ভবযোগ্য হয় বটে কিন্তু উৎপাদিকা-শক্তির সমতাতিশয্যের বৃদ্ধি করা কোনক্রমে সম্ভবযোগ্য হয় না।

আমরা ইহার পর "মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা বিষয়ে মানুষের দায়িত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত" সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ঝড়

শিল্পী—শ্রীরেণুকা কর

"लक्ष्मीस्त्वं धान्यरूपासि प्राणिनां प्राणदायिनी"

মাঘ—১৩৫০

২১শ বর্ষ, ২য় খণ্ড—২য় সংখ্যা

বাঙ্‌লার নদ-নদী

বৈ—না—ভ

দুই

নদী-প্রসাদভোগী বাঙ্‌লা

বাঙলার বৃহত্তর অংশ ব-দ্বীপাকৃতি। যুগ-যুগান্তর ধ'রে বাঙলায় নদ-নদীর অপূর্ব্ব কার্য্যরীতিতে তা'র আয়তন বেড়ে উঠেছে। দিনের পর দিন নদীর পলি-সঞ্চয়ে স্থলের হয়েছে উদ্ভব, আর সেই সঙ্গেই দেশের মাটি পেয়েছে বৃদ্ধি। কালে সে-স্থান মনুষ্য-বসতিরও উপযোগী হ'য়ে উঠেছে। পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর-সীমান্তের শৈল-রাজ্য সমস্ত নদীর উৎস-মুখ হ'লেও তাদের ভূমিদানের পরিমাণ নির্ভর করেছে নিজ নিজ জলস্রোতের পলি-বাহী গতিশীলতার 'পরে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে গঙ্গা ও তা'র শাখানদী-সকলের দান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব'লেই ধর্‌তে হয়। গাঙ্গ-'ব'দ্বীপের উৎপত্তি সম্পর্কে ভূতত্ত্ববিদ্‌দের অভিমত এই যে—ভারত-গাঙ্গেয় ভূমিতে যে সকল অবস্থা আজিও বর্ত্তমান রয়েছে—সেই অতীত ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞানের তৃতীয়ক যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত তা'র কোনো পরিবর্ত্তন ঘটেনি। দিনে দিনে প্রবাহ-বাহিত পলল থিতিয়ে প'ড়ে মন্থর অথচ শনৈঃ শনৈঃ রীতিতে পুঞ্জীভূত হ'য়ে এক প্রকাণ্ড চড়ায় পরিণত হয়েছে।

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের ধারণা—উত্তর কিংবা উত্তর-পূর্ব্ব দিক থেকে উৎসারিত নদীগুলির সহায়ে পূর্ব্ব ব-দ্বীপ গঠিত হয়,—উত্তরকালে গঙ্গা পুরাতন ব-দ্বীপের সংস্কার ক'রে তা'কে নবরূপে রচনা করতে মন দেয়, রাজমহলের সান্নিধ্য-অঞ্চল থেকে পুরাতনের উপর নূতন ব-দ্বীপ গঠন-কর্ম্ম আরম্ভ হয়। এই মন্তব্য সমর্থনের দিকে যাই যুক্তি থাক্, বাস্তবিকপক্ষে আমাদের বাসভূমির বহু স্তর গঠিত ও ক্রমোচ্চ হ'য়ে উঠেছে প্রধানতঃ হিমালয়-নিঃসৃত নদীগুলি দ্বারা, আর আংশিকভাবে ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণার পাহাড় থেকে নিঃসৃত নদীসমূহও শতাব্দীর পর শতাব্দী পলি বহন ক'রে এনে এই নির্ম্মাণ-কার্য্যে সহায় হ'য়ে উঠেছে। বিগত কালে এই সকল নদীর অকুণ্ঠিত দান আজ্‌কে মানুষের মধ্যবর্ত্তিতায় ও অন্যান্য কারণে অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছে। এই সমস্ত নদীর—বিশেষতঃ প্রধান ব-দ্বীপ-রচয়িত্রী গঙ্গার কার্য্যকারিতা পূর্ব্বযুগে কিরূপ ছিল, আর বর্ত্তমানেও তাদের ভূ-গঠনমূলক কার্য্য-তৎপরতা কি ভাবে বিদ্যমান আছে—তাই অবধারণ করা এ-স্থলে প্রয়োজন। হাজার হাজার বৎসর ধ'রে সমুদ্রের দিকে এই ব-দ্বীপের উন্নয়ন ও বিস্তার-কার্য্য সমগতিতে চলেছে, সম্ভবতঃ এই নির্ম্মাণ প্রণালী অনির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত অব্যাহতই থাক্‌বে। কারণ—নির্ম্মাণের যে উপাদান (অর্থাৎ সংহত পদার্থ থেকে বিশ্লিষ্ট পদার্থপিণ্ড)—তা'র ভাণ্ডার এক প্রকার অক্ষয়। বহু-সহস্র যোজনব্যাপী অববাহিকা-অঞ্চল থেকে বৃষ্টিধারা-স্রোতে পুঞ্জীভূত স্থান-বিচ্যুত মাটি ও উপলখণ্ড চালিত হ'য়ে আসে; এই অববাহিকা-অঞ্চলের মধ্যে বিশাল হিমালয়ের অনেকখানি অংশ পড়ে। এই উপায়ে বৎসরে বৎসরে গঙ্গা তা'র খর-স্রোতে অপরিমেয় পলি বহন ক'রে নিয়ে এসে মোহানায় সমস্ত উজাড় ক'রে ঢেলে দেয়। সাগর-সঙ্গমে নদীর রুদ্ধবেগ-মুক্ত পলি ধীরে ধীরে গর্ভে পতিত হ'তে থাকে। এই রীতিতে ব-দ্বীপের শিরোভাগে ডাঙার সৃষ্টি, এর ক্রমবিস্তারের ফলে—গঙ্গা (অন্য সকল ব-দ্বীপ-নির্ম্মাতার মত) স্বভাব-নিয়মে বহু শাখা-প্রশাখা ও উপনদীতে বিভক্ত হ'য়ে সমুদ্রের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। এই জন্য গঠিত ব-দ্বীপটি নানাভাগে বিভক্ত হ'য়ে পড়েছে। যথাসম্ভব ত্বরিতগতিতে স্থলভাগও হ'য়ে উঠ্‌ছে ক্রমোন্নত, আর সমুদ্রের পানে তা'র বিস্তৃতিরও আর ক্ষান্তি নেই। নদীর প্রত্যেক শাখা-প্রশাখা-বাহিত পলি বন্যার সময় নিম্ন তটভূমিতে সঞ্চিত হ'য়ে ক্রমশঃ তা'কে খুব তাড়াতাড়ি উঁচু ক'রে তোলে। কালে এই সমুন্নত তটভূমি

মানুষের বাস-স্থান ও কৃষিযোগ্য হ'য়ে ওঠে, তা' না হ'লে—কেবল সমুদ্রমুখে ব-দ্বীপের বিস্তৃতির বিশেষ কোনো উপকারিতা থাকে না। এখানে এইটুকু মনে রাখতে হ'বে যে—নদীর জোয়ার-ভাঁটা ব দ্বীপ উন্নয়নে বিশেষ সহায়। বাঙলার অধিকাংশ নদীতে সারা বৎসর ধ'রে নিত্য দু'বার প্রবল বেগে জোয়ার-ভাঁটার খেলা চলে। এই সকল নদীর মোহানায়—মৌশুমী মাসে উঁচু ডাঙ্গা-বাহিনী বন্যাধারায় সমানীত অদৃঢ়ীভূত পলির বিশাল ভাণ্ডার থাকে, নদী জোয়ারের সময় এই সঞ্চয় থেকে অসংলগ্ন পলি গ্রহণে পরিপূর্ণ হ'য়ে দেশাভ্যন্তর অভিমুখে ছুটে চলে। নদীর নিম্ন-তীরভূমি জোয়ারের জলে ডুবে যায়, তারপরে জল ভাটিয়ে যখন যায়—প্লাবিত ভূমিতে পলি প'ড়ে থাকে। কালক্রমে এই পলি-সঞ্চিত স্থান উঁচু হ'য়ে কৃষি যোগ্য হ'য়ে ওঠে, জমি আরো উর্ব্বর হয়, তদুপরি পার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহে ব-দ্বীপ গঠনে প্রকৃতি সাহায্য পায়। নদীতে নিত্য জোয়ার-ভাঁটা খেলার ফলে মোহানার কাছে বৎসরে বৎসরে সঞ্চিত পলি অসংহত অবস্থায় থাকে,—দু'টি প্রধান সমুদ্র-সঙ্গম-স্থলের (হুগ্‌লী ও মেঘ্‌নার মোহানাদ্বয়) মধ্যবর্ত্তী 'ব'-দ্বীপপার্শ্বে নদী-স্রোত পলি চারিয়ে দেয়।

এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে—'ব'দ্বীপ-গঠনে প্রকৃতির দু'টি সহায়, প্রথম—পৃষ্ঠভূমি-প্লাবী বন্যাবাহিনী, দ্বিতীয়—নদীর জোয়ার-ভাঁটা। প্রকৃতি তার এই কর্ম্মে সাহচর্য্য পেয়েছে দু'টি অনুকূল কারণ থেকে,—এই কারণ-দ্বয়ের মূল অনুসন্ধান করলেই আগে প্রত্যক্ষ হয়—পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত হিমালয়ের খাড়া উৎসর্পিত ঢালু গাত্রদেশ—যেখান থেকে মৌশুমীর সময়ে এই নির্ম্মাণের সমস্ত উপাদান প্রচুর পরিমাণে প্রকৃতি যোগান্ পায়,—আর পরোক্ষে—বঙ্গোপসাগরের ফণিলাকারের জন্য স্রোতের অস্বাভাবিক জোয়ারী প্রসার সম্ভব হয়,—এই জোয়ার সারা বৎসর ধ'রে দৈনিক দু'বার 'ব'-দ্বীপ-গঠনের সেই সমস্ত সরঞ্জাম ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চারিয়ে দিতে সাহায্য করে। 'ব'-দ্বীপের মুখে এই অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত জোয়ার ব-দ্বীপকে সমুন্নত ক'রে তুলতে অশেষ সহায় হ'য়ে উঠেছে—এ-কথা সত্য, কিন্তু আবার এই কারণটাই সমুদ্রের দিকে ব-দ্বীপ-বিস্তার কাজের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। উচ্চভূমি-প্লাবী বন্যা-বাহিকা নদীসকল সমুদ্রের সঙ্গম-মুখে যে পললরাশি ঢেলে দেয়, অতিরিক্ত ফুলে-ওঠা জোয়ারের স্রোতে ঐ আনীত পলল ব-দ্বীপ পার্শ্বে ছড়িয়ে পড়ে, তারপরে অন্তর্মুখী সমস্ত স্রোত এই পলল তুলে নিয়ে অসংখ্য জোয়ার-ভাঁটা-খেলা নদী-পথ দিয়ে ছুটে চলে, এর ফলে পলল-ভাগ খুব অল্প মাত্রায় ঘনীভূত হ'য়ে জমতে পায়, সেই জন্য 'ব'-দ্বীপ-বিস্তৃতির কাজে বাধা আসে। জোয়ারের কল্লোল-প্রবাহ অবশ্য নৌ-চালনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

বাঙলার অধিবাসীরা সকল নদীকেই ভক্তির চোখে দেখে,—কোনো নদীতে জোয়ার-ভাঁটা খেলুক্ বা না খেলুক্—নদীমাত্রই বাঙালীর শ্রদ্ধার সম্পদ,—তা'র কারণ—নদীই এই ভূমির জননী, ভূমিকে করে ফলবতী—উর্ব্বরা, আর জল নিকাশ ক'রে নদী হয় ভূমির রক্ষাকর্ত্রী। স্রোতোবাহিত পলি দ্বারা উর্ব্বরতা সাধন প্রত্যক্ষগোচর না হ'লেও অতি সমাদৃত সারের উপাদান নদীর জোয়ারে ভেসে এসে জমিতে সঞ্চারিত হয়, তারপরে যথাসময়ে বৃষ্টিতে নদীর স্রোতে ভেসে আসা পলির লবণ-ভাগটুকু ধুয়ে যায়—যেটুকু পলি প'ড়ে থাকে সেই হোলো জমি ফলাবার মূল জিনিস। এই ভাবে সুন্দর বনের আবাদ-করা পতিত জমির উর্ব্বরতা-সাধন অশেষরূপে প্রমাণিত হয়েছে।

বাঙলা কৃষিপ্রধান দেশ, সেই জন্য বঙ্গবাসীর অর্থ-নৈতিক মঙ্গল আসলে নদীর ওপর নির্ভর করে। যে-প্রদেশে নদী সলীল-গতি আর তা'র স্বাভাবিক কাজের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে—সেই প্রদেশের অধিবাসী নদীর অজস্র দান পেয়ে ভাগ্যবান্, স্বাস্থ্য-ধনে ধনী ও লক্ষ্মীবান্। পূর্ব্ববঙ্গ আজ এই সৌভাগ্যের অধিকারী। যেখানে নদী মজে' যাচ্ছে কিংবা প্রাকৃতিক কারণে বা মানুষের হস্তক্ষেপে নদী তা'র হিতকর কর্ম্মচেষ্টায় বাধা পাচ্ছে—সেই স্থানের যেমন স্বাস্থ্যের দিক্ থেকে অবনতি ঘটছে, তেম্‌নি জমির উর্ব্বরতাও যাচ্ছে নষ্ট হ'য়ে। এই দুর্ভাগ্যের অংশীদার মধ্য, পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গ। তা' হ'লে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে—বাঙলার নদ-নদী-সমস্যাই বাঙলার পল্লী-সংস্কার ও ক্রমোন্নতি বিষয়ক সমস্যা। বাঙলাদেশকে বাঁচাতে হ'লে এই সমস্যা সমাধানের চরম সময় এসেছে, নইলে এই দুর্গত বাঙলার বহু প্রদেশ অচিরে জলাভূমি ও জঙ্গলে পরিণত হ'বে। একদিন বিশেষ ক'রে এই দেশের পশ্চিম ও মধ্য অংশগুলি পতিত অবস্থা থেকে সমৃদ্ধ অবস্থায় ফিরে এসেছিল নদীরই কার্য্যকারিতার গুণে; এমন কি, এক শতাব্দী পূর্ব্বে পর্য্যন্ত এই সকল স্থান ছিল অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ও সমৃদ্ধিশালী।

বাঙলার জনসাধারণ তাদের দুর্দ্দশার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করতে পারে না। তাদের চোখের সামনে স্রোতস্বিনী নদী মজে' যাচ্ছে,—তা'রা হয় তো নিজেদের দুরদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়েই মনে মনে সান্ত্বনা লাভ করছে এই ভেবে যে—এ নিশ্চয় দৈবের বিধান। কিন্তু সান্ত্বনা রচনা করলেই মানুষ যে সর্ব্বনাশের হাত থেকে রক্ষা পাবে, সে সম্ভাবনা এ ক্ষেত্রে একেবারেই নাই। প্রত্যেক পল্লীবাসী যদি এ বিষয়ে অবহিত না হয়, তা' হ'লে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি অদূরভবিষ্যতে মনুষ্য-বাসের অনুপযোগী হ'য়ে উঠবে, আর বঙ্গমাতার সন্তানদের ক্ষুধার অন্নের জন্য ভিক্ষাপাত্র হাতে তুলে নিতে হ'বে ;—

আজকের এই অন্নসমস্যার দিনে এই সত্যই প্রমাণিত হ'য়ে গেছে যে, বাঙলার জমিতে এমন ফসল ফলে না—যা' দিয়ে তা'র সন্তানদের ক্ষুধা মিট্‌তে পারে, তা'র ভাণ্ডারে নিজস্ব এমন শস্য-সম্পত্তি নেই, যা'র দ্বারা সকল অধিবাসীর মুখে গ্রাস উঠবে। তাই বাঙলাকে সেই পরিমাণ ধান্য-ফসল ফলাতে হ'বে, যা' পেলে আর পরমুখাপেক্ষী হ'তে হ'বে না। ব্রহ্মদেশ থেকে চাউল আসতো, নেপাল থেকে চাউল আসতো—তাই বাঙলার প্রতিজনের নিত্য আহারে বিঘ্ন ঘটে নাই, কিন্তু আজকের দিনে সমস্ত আমদানি বন্ধ হ'য়ে গেছে—বাঙলার জীবন-ধারণের সমস্যাও গুরুতর হ'য়ে উঠেছে। এই কারণেই বাঙলাকে স্বাবলম্বী হ'তে হ'লে তা'র সচেতন হবার দিন এসে গেছে। তা'কে চাষের বৃদ্ধি করতে হ'বে, তা'কে ফিরিয়ে আনতে হ'বে পূর্ণ স্বাস্থ্য, তা'র আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু। আবার বাঙলা—সেই পূর্ব্বের সুসমৃদ্ধ বাঙলা—ভারতের মুকুটমণি বাঙলা রূপে-সম্পদে অপূর্ব্ব গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে উঠ্‌বে। কিন্তু নদীর পরিপূর্ণ সহায়তা না পেলে বাঙলার পক্ষে তা'র সেদিনের রূপ ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। এই জন্যই নদীকে রক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন। নদীকে রক্ষা করা কিরূপে সম্ভব—সে সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

এক্ষণে—বাঙলার নদীগুলিকে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে শ্রেণীভাগ ক'রে দেখাতে পারলে, নদ-নদীর সমস্যা আরো পরিস্ফুট হ'য়ে উঠবে।—

বাঙলার নদীগুলিকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভাগ করা যেতে পারে।

(১) **সদাস্রোতা নদী**। এই শ্রেণীভুক্ত নদীগুলি সংবৎসরব্যাপী সদা পূর্ণতোয়া থাকে।

(২) **খরস্রোতা নদী**। এই সকল নদী বর্ষার জলে স্ফীত হ'য়ে বন্যা আনে, জলাভাবে প্রবাহ-হারা হ'য়ে পড়ে'—শীর্ণ তটিনীতে পরিণত হয়, এমন কি অনাবৃষ্টির সময়ে স্থানে স্থানে শুকিয়ে যায়।

(৩) **জোয়ার-ভাঁটা-খেলা নদী**। এই শ্রেণীর নদী 'ব'-দ্বীপ-গঠনে খুব তৎপর, উর্ব্বরতা সাধনে ব্রতী, জল-নিকাশ করে, আর সারা বৎসর নাব্য, (অর্থাৎ নৌ-সুগম্য)।

প্রথমেই **সদাস্রোতা** নদীগুলির পরিচয় প্রদান করা যাক্।

সদাস্রোতা নদীসকল হিমালয়-শিখরে জন্ম নিয়ে আপন পূর্ণতোয়-প্রবাহ-প্রকৃতিকে সারাবৎসর অনবিচ্ছিন্ন জীবিত রাখে। এই জাতীয় নদী প্রধান 'ব'-দ্বীপ-গঠনকারী, এগুলি নাব্যানদী—অন্ততঃ নিম্ন বাঁকে বা শাখায় জলযান চলাচল সব সময়েই সম্ভব হ'য়ে ওঠে। এই সকল নদীর অববাহিকা অঞ্চল সুবিস্তৃত, তাই স্থানে স্থানে মৌশুমির সময়ে প্রতিনিয়ত বৃষ্টিপাতের ফলে জলাগমের অভাব হয় না। এই শ্রেণীর নদীর জল-ভাণ্ডার কোনোদিন দেউলে না হবার পূর্ব্বোক্ত একটি কারণ, আর একটি কারণ—ঐ সমস্ত জলাগম প্রদেশের অন্তর্গত উত্তুঙ্গ শিখর থেকে বরফ-গলা ধারা এসে নদীকে পরিপুষ্ট ক'রে তোলে। মৌশুমিতে নদী তো পূর্ণসলিলা হ'য়ে ওঠেই, কিন্তু অনাবৃষ্টির সময়েও জলপ্রবাহ এমন ভাবে বজায় থাকে—যা'র দ্বারা জল-সেচনের কাজ ও নৌ-চালন একেবারেই ক্ষুণ্ণ হয় না। এই সমস্ত নদীর অববাহিকায় বিস্তীর্ণ বনপ্রদেশ আছে ব'লেই বর্ষায় অধোভূমিতে জলসঞ্চয় বৃদ্ধি পায়, এই সঞ্চয় সংবৎসর ধ'রে নদীর বুক ভ'রে রাখ্‌তে সাহায্য করে। এই জন্য এই সমস্ত নদীর জোয়ার-ভাঁটা-প্রকৃতিযুক্ত জলনির্গমপথগুলি সাধারণতঃ অন্যান্য শ্রেণীর নদী অপেক্ষা অব্যাহত থাকে।

এই জাতীয় প্রধান নদ-নদী :—

(ক) **গঙ্গা**, তা'র শাখানদীগুলি ও প্রবাহিকা-সরিৎ সমূহ।

(খ) **ব্রহ্মপুত্র** ও তা'র সঙ্গিনী **তিস্তা** নদী।

(গ) **মেঘনা**, আর উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে তা'র কয়েকটি শাখা ও উপ-নদী।

গঙ্গা—বাঙলার সকল নদ-নদীর তুলনায় গঙ্গা 'ব'-দ্বীপ গঠনে যে শ্রেষ্ঠ সাহায্য দান করে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। প্রবাহিণী গঙ্গা ১,৫৪০ মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে সমুদ্রে এসে মিশেছে। ৩,৫০,০০০ বর্গমাইল বিস্তৃত অববাহিকা অঞ্চলে পতিত বাৎসরিক গড়ে ৪২ ইঞ্চি বৃষ্টিধারা গঙ্গা কর্ত্তৃক পরিবাহিত হয়। বন্যার জল-মুক্তিও প্রচুর পরিমাণে হ'য়ে থাকে। মুখ্যতঃ এই সব কারণে গঙ্গা এই 'ব'-দ্বীপের গঠন, উন্নয়ন ও উর্ব্বরতা সম্পাদনে অত্যন্ত হিতকারিণী নদী। কিন্তু আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মধ্যবাঙলায় গঙ্গার গতি পদ্মার মধ্য দিয়ে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। এই স্বাভাবিক গতি-পরিবর্ত্তনের ফলে মধ্যবাঙলা ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে উঠেছে, দেশের এই দুর্ভাগ্যের কারণ স্বয়ং প্রকৃতি। পূর্ব্বে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ভাগীরথীই ছিল গঙ্গার প্রধান প্রবাহ-গতি, কিন্তু তা'র পর থেকেই গঙ্গার মুখ্য প্রবাহ বর্ত্তমান পদ্মার মধ্য দিয়েই পরিচালিত হ'চ্ছে। পূর্ত্তবিদ্যাবিশারদ্ উইলিয়ম্ উইল্‌কক্স-প্রমুখ কোনো কোনো ব্যক্তির অভিমত যে—ভাগীরথী একটি খাত-মাত্র কিংবা সামান্য শাখানদী, পদ্মাই প্রকৃত গঙ্গা। এই অদ্ভুত মতবাদ একেবারেই সমর্থন করা যায় না। এর বিরুদ্ধে অনেকগুলি প্রণিধান-যোগ্য ভৌগোলিক,

ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও প্রচলিত বৃত্তান্ত-মূলক যুক্তি রয়েছে।

প্রথমতঃ—ভৌগোলিক দিক থেকে বিচার করলে বেশ বোঝা যায় যে—বাঙলার পশ্চিম প্রান্তেই অর্থাৎ হুগলী-নদীর মোহানা বরাবর সমুদ্রের দিকে 'ব'-দ্বীপ-বিস্তৃতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণেই হয়েছে, আর পূর্ব্ব-সীমান্তে অর্থাৎ (বর্ত্তমানে গঙ্গার নির্গম-পথ) মেঘনা নদীর মোহানার কাছে—'ব'-দ্বীপ-বিস্তার-সাধন খুব অল্পই হয়েছে—দেখা যায়। যদিচ মেঘনা-সাগরসঙ্গমে তিব্বতের সানপো নদীর জলে পুষ্ট ও গঙ্গাপেক্ষা বৃহত্তর ব্রহ্মপুত্র এসে মিলেছে, তথাপি হুগলী-মোহানার কাছাকাছি 'ব'-দ্বীপ-গঠন আজিও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে রয়েছে, তা'র মূল কারণ এই যে—বহুকাল ধ'রে গঙ্গার মুখ্য স্রোতোধারা ভাগীরথী বা হুগলী মোহানা দিয়ে নির্গত হোতো। বর্ত্তমানে বিশেষজ্ঞদের মতে গঙ্গার গতি ভিন্নপথে গেলেও যুগ-যুগান্তর ধ'রে গঙ্গা ও ভাগীরথী অভিন্নই ছিল। আজকে গঙ্গার প্রধান ধারা-প্রবাহ থেকে ভাগীরথী বা হুগলীনদী বঞ্চিত যদিবা হ'য়ে থাকে, তবু বলতে হ'বে—গঙ্গার পুণ্যধারা (সে ধারা যতই হ্রাসপ্রাপ্ত হোক্) ভাগীরথীর মধ্য দিয়ে এখনো প্রবাহিত।

দ্বিতীয়তঃ—হিন্দুর ধর্ম্ম-শ্রুতি ও ঐতিহ্য স্পষ্টই প্রমাণ করে যে—অতীত পৌরাণিক যুগ থেকে গঙ্গা পবিত্রজ্ঞানে হিন্দুগণ কর্ত্তৃক পূজিত হ'য়ে থাকে। স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতের নানাস্থানের নর-নারীগণ পুণ্য তীর্থস্নানের জন্য গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে আগমন করে, আর সকলে তীর্থস্নানে আসে—ভাগীরথী বা হুগলীনদীর তীরবর্ত্তী কালীঘাট, নবদ্বীপ, কাটোয়া, ত্রিবেণী প্রভৃতি নগরে, (মুক্তবেণী,—এলাহাবাদে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর যুক্তবেণী মুক্ত হয়েছে হুগলী নগরের কয়েক মাইল ঊর্দ্ধে অধুনা-লুপ্ত বাঙলার শ্রেষ্ঠ বন্দর সপ্তগ্রামের কাছে এই ত্রিবেণীতে)। আজিও পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু নর-নারী গঙ্গাস্নান করতে পদ্মানদীতে না গিয়ে হুগলী বা ভাগীরথী নদীতেই এসে থাকে, কারণ, পদ্মা গঙ্গার মত পূতসলিলা ব'লে গৃহীত হয় না, উপরন্তু পদ্মার তীরে হিন্দুদের কোনো তীর্থস্থান নাই। আর একটি যুক্তি এস্থলে দেওয়া দরকার। গঙ্গাকেই ভাগীরথী-জ্ঞানে বাল্মীকি ও শঙ্করাচার্য্য গঙ্গার যে স্তব রচনা করেছেন—তাই থেকে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে—ভাগীরথীই গঙ্গা অর্থাৎ হুগলীনদীই গঙ্গা। বাল্মীকির গঙ্গা-স্তবের ভাবটি উদ্ধৃত করলাম—

..."মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধাশৃঙ্গার-হারাবলি।
স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে॥"

শঙ্করাচার্য্যের গঙ্গা-স্তোত্রটির দু'টি পংক্তি এই—

..."ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতঃ।
তব জল-মহিমা নিগমে খ্যাতঃ॥"

অতএব সমস্ত কুটীল প্রশ্ন অতিক্রম ক'রে এই সত্যটুকুই প্রতীত হয় যে—ভাগীরথী বা হুগলীনদী যে স্থানে সমুদ্রে পড়েছে—সেই স্থানেই গঙ্গাসাগরসঙ্গম-তীর্থ।

তৃতীয়তঃ—ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে—গঙ্গা ও ভাগীরথীর ধারা একই ছিল। খ্রীষ্ট ১১৬ অব্দে ঐতিহাসিক প্লিনী ও খ্রীষ্ট ১৪০ অব্দে টলেমী ভাগীরথী-গঙ্গা-তীরস্থিত ত্রিবেণীর উল্লেখ করেছেন। খ্রীষ্ট ১৬১ অব্দে আরিয়ান্ কর্ত্তৃক কাটাড়প (অধুনা কাটোয়া) উল্লিখিত হয়েছে। পদ্মাতীরে এরূপ সুপ্রাচীন স্থানের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।

গৌড়সম্রাট্ ধর্ম্মপালের (৭৮০—৮২০ খ্রীঃ অঃ) খালিমপুর তাম্রলিপিতে অবিসংবাদী প্রমাণ পাওয়া যায় যে—প্রাচীন যুগে রাজমহলের উপরিভাগ পর্য্যন্তও গঙ্গা ভাগীরথী নামে অভিহিতা হোতো। পদ্মা কোনোকালেই এ নামে খ্যাত হয় নাই, কিন্তু গঙ্গার পশ্চিম-ধারা আজিও ভাগীরথী নামে প্রখ্যাতা। তা'ছাড়াও আর একটি কথা এই—বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের বিক্রমপুরে রাজধানী থাকলেও ভাগীরথী-তীরস্থ নবদ্বীপ নগরে তাঁদের গঙ্গাবাস ছিল। এই সমস্ত বিষয় থেকে সুস্পষ্টই ধারণা হয় যে—প্রকৃতপ্রস্তাবে ভাগীরথীই ছিল গঙ্গার প্রধান প্রবাহ। সেকালে পদ্মার সত্তাই কোনো অস্তিত্ব ছিল—এ মেনে নিলেও এইটুকুই বলা যেতে পারে—এই নদী গঙ্গার ধারা থেকে হয় বিচ্ছিন্ন ছিল, কিংবা গঙ্গার একটি সামান্য শাখারূপে প্রবাহিত হোতো, যে ক্ষুদ্রতার জন্য সেই অতীতের পদ্মা প্রধান নদীর নাম বা খ্যাতি পাবার যোগ্য হ'য়ে ওঠে নাই।

ইতিহাস আরো বলে যে—ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী গৌড় ছিল বাঙলার রাজধানী। তখন পদ্মা ছিল ক্ষীণকায়া, ভাগীরথী (বা হুগলীনদী) ছিল পূর্ণতোয়া জলবেণী-রমণীয়া। ঊর্দ্ধ ও নিম্ন ভাগীরথীই (গৌড়শাখা ও হুগলীর ঊর্দ্ধবাহু) ছিল আবহমান কাল থেকে মূল গঙ্গা আর বর্ত্তমানের পদ্মা ভাগীরথীর তুলনায় অচিরজাত নদী।

এবার পৌরাণিক একটি উপাখ্যান দিয়ে এই বক্তব্যের আর একটি প্রমাণ উপস্থাপিত করা যায়।—মহাভারতে আছে—ভগীরথ আগে চলেছেন, গঙ্গা তাঁর অনুবর্ত্তিনী হ'য়ে ব-দ্বীপের শিরোদেশে এসে পৌচেছেন উপত্যকা ভেদ ক'রে,—ভগীরথ সেখানে আহারের জন্য কিছুক্ষণ গতি স্তব্ধ করলেন। কিন্তু গঙ্গা পদ্মাবতীর শঙ্খধ্বনি শুনে ভগীরথের আহ্বান মনে ক'রে পূর্ব্বদিকের পথ ধ'রে পদ্মা দিয়ে প্রবাহিত হ'লেন। তখন ভগীরথ দিলেন তাঁর শঙ্খে ফুৎকার, গঙ্গা তাঁর ভুল বুঝতে পেরে আবার ফিরে এসে দক্ষিণ দিকে গতিশীলা হলেন। এই বিবরণের রূপক অংশটি বাদ দিলে এই অর্থ গ্রহণ করা যায় যে, পুরাকালে পদ্মাবতীর অস্তিত্ব থাকলেও বৃদ্ধি পাবার কোন সুযোগ সে পায় নাই। দক্ষিণ-প্রবাহিণী

ভাগীরথীর তুলনায় সেকালে এই নদী ছিল একটি ক্ষুদ্র শাখা মাত্র।

বস্তুতঃ,—বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও ধর্ম্ম বিষয়ক সমস্ত প্রমাণ থেকে স্থির করা যায় যে—ভাগীরথী গঙ্গার প্রধান গতিপথ ছিল। পূর্ব্বে তিস্তা-সম্পর্কিত নদীশ্রেণীর মধ্যে সমগ্র বন্যাধারা-বাহী উত্তরবঙ্গের নদীগুলির জল-নির্গম-প্রপাত পদ্মার ক্রমবৃদ্ধির পক্ষে অতিরিক্ত বাধা ছিল, বিশেষতঃ মহ' দা ও কোশী নদী। এর হেতু—তিস্তার অববাহিকা অঞ্চলে মৌশুমি আগেই দেখা দেয়, পদ্মাবতী বা পদ্ম গঙ্গা থেকে তা'র প্রাপ্য বন্যাধারার ভাগটুকু আহরণ কর্‌তে [illegible]ন ব্যস্ত থাকতো, সেই অবসরে খুব সম্ভব তা'র [illegible]াহিকাগুলির নিম্ন বাঁক-সকল উত্তরবঙ্গের ন[illegible]গুলির স্রোতে আক্রান্ত হোতো। নিম্নেজ উত্থ[illegible]-পতনশীলা 'ব'-দ্বীপের নদী সকলের এই প্র[illegible] অতি সাধারণ। যমুনা-নদীপথে যেদিন থেকে ব্রহ্মপুত্রের গতি পরিবর্ত্তিত হয়েছে, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে বোঝাবুঝির পালা হ'য়ে গেছে। বিশেষজ্ঞের মত—খ্রীষ্ট ১৮৩৮ অব্দেও ব্রহ্মপুত্র বা যমুনা সঙ্গমের কাছে গঙ্গাকে এতদূর পর্য্যুদস্ত কর্‌তে পেরেছে যে—গোয়ালন্দের উপরিভাগে কয়েকটি স্থানে গঙ্গা হ'য়ে ওঠে সুতরাং, এমন কি হেঁটে গঙ্গা পার হ'য়ে যাওয়া যেতো,—অগত্যা সমুদ্রাভিমুখে যাবার জন্য গঙ্গা নূতন পথ খুঁজে নিতে বাধ্য হয়। ইতঃপূর্ব্বে যে গরাই নদী কুষ্টিয়ায় গঙ্গা থেকে নির্গত হ'য়ে ক্ষুদ্র সরিৎরূপে প্রবাহিত হোতো, এক উরু-প্রমাণ জলে যে নৌকা চলে—সে পর্য্যন্তও যে নদীতে পারাপার কর্‌তে পারা যেতো না,—সেই গরাই নদী গঙ্গার ধারায় পুষ্ট হ'য়ে বিস্তার লাভ কর্‌লে—যেমন হোলো প্রশস্ত তেমনি গভীর।—এখন কলকাতা থেকে গঙ্গার উদ্ধ দিক পর্য্যন্ত এই নদীই জাহাজ-চলাচলের প্রধান জলপথ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে কোশী নদী ও পরে মহানন্দা উত্তরবঙ্গের নদী-শ্রেণীর সঙ্গে যোগানুরাগ পরিত্যাগ ক'রে উর্দ্ধ-গঙ্গার সঙ্গে আরো অন্তরঙ্গভাবে সংযোগ স্থাপন কর্‌লে। এই কারণে উত্তরবঙ্গের নদীসকলের একত্র জলভার ক্ষীণতর হ'য়ে গেল, উপরন্তু পদ্মার কলেবর আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোলো। তখন পদ্মার এই প্রবল অবস্থার কাছে উত্তরবঙ্গের নদীগুলির জলধারা যুঝে' উঠ্‌তে পার্‌লো না। বিশেষতঃ, গৌড়ের নিকট গঙ্গার প্রধান প্রবাহ পরিবর্ত্তিত হ'য়ে পদ্মা দিয়ে গতিশীল হবার পর থেকেই—পদ্মানদী—ভাগীরথী ও গঙ্গার পশ্চিম অঞ্চলের অন্যান্য শাখা-নদীকে ক্ষুণ্ণ ক'রে নিজে ত্বরিতগতিতে পরিপুষ্ট হ'তে লাগ্‌লো। বর্ত্তমানে গঙ্গা-প্রবাহে পুষ্ট পদ্মা বিশালকায়া অতি বেগবতী ভয়ঙ্করী নদী।

উক্ত গতি-পরিবর্ত্তন ভিন্ন পদ্মাগামিনী গঙ্গার নিম্ন বাঁকে গঙ্গার আর একটি দ্রষ্টব্য পরিবর্ত্তন হয়েছে। গঙ্গা এখন চাঁদপুর থেকে কুড়ি মাইল দূরে মেঘ্‌না নদীর সঙ্গে মিলিত, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতেও সে-স্থলে মেঘনার সঙ্গে গঙ্গার সংযোগ ঘটে নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে সেকালে গঙ্গা একপ্রকার মেঘ্‌নার সমরেখায় সমুদ্র-মুখের কাছ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হোতো; সেখানে গঙ্গা দ্বিশাখ হ'য়ে গিয়েছিল—একটি শাখা মেঘ্‌না-মোহানায় গিয়ে পড়তো, আর অন্য শাখাটি (সম্ভবতঃ এটি প্রধান) একটি স্বাধীন সাগরগামী পথ ছিল—দক্ষিণ শাহ্‌বাজপুর দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তবাহিনী তেঁতুলিয়া মোহানার মধ্য দিয়ে। পদ্মাগতি গঙ্গাপ্রবাহ ও মেঘ্‌নার পাল্টা যোগে যে প্রবল ধারাবতীর সৃষ্টি হোলো—সেই নদী রাজা রাজবল্লভের একুশরত্নপুরী গ্রাস ক'রে আখ্যাত হোলো "কীর্ত্তিনাশা" নামে। এর পরেও নদীর গতির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে, পদ্মা-প্রবাহিণী গঙ্গা আরো উত্তরে স'রে গিয়ে এখন চাঁদপুর থেকে উপরের দিকে কুড়ি মাইল দূরে সংযুক্ত হয়েছে মেঘ্‌নার সঙ্গে। বস্তুতঃ এই অঞ্চলটি নদ-নদীগুলির যেন ক্রীড়াস্থল।

মধ্য বাঙ্‌লার দিকে দৃষ্টি ফেরালেই নিঃসন্দেহে প্রতীতি জন্মায় যে—এই বিভাগকে গঙ্গা পূর্ব্বদিনে গঠন ও উর্ব্বর ক'রে তুলেছিল। সেদিন গঙ্গার ধারাপ্রবাহ প্রধানতঃ ভৈরবনদ ও ভাগীরথী দিয়ে প্রবাহিত হোতো। হুগ্‌লীর কয়েক মাইল উর্দ্ধে ত্রিবেণীতে গঙ্গা নিম্ন বাঁকে ত্রিধা বিভক্ত হয়। তিনটি জলবেণী—যমুনা, ভাগীরথী (বা হুগ্‌লী নদী), ও সরস্বতী—গঙ্গার শোভা বর্দ্ধিত করে। কিন্তু গঙ্গার তরঙ্গ-প্রবাহ পদ্মা-পথে পরিবর্ত্তিত হবার পর থেকে এই নদীগুলি ক্রমশঃ ক্ষীণকায়া হ'য়ে যেতে থাকে। যে ভাগীরথী একদিন গঙ্গার প্রধান গতিধারা ছিল—সেই নদী বর্ত্তমানে কেবল বন্যার সময় ভিন্ন এক প্রকার গঙ্গা থেকে বিচ্ছিন্ন বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না, আর বন্যাধারা যে পরিমাণে পরিবর্ত্তনের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে প্রবাহিত হোতো—সেই তুলনায় এখন অকিঞ্চিৎকর বলা যেতে পারে। সেইজন্যে এর পশ্চিম ও পূর্ব্ব শাখাদ্বয়—সরস্বতী ও যমুনা—আজকে মজে' গেছে। ভাগীরথীরও এই দশা হয়তো ঘটতো, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের নদীগুলি এই নদীতে এসে মিশেছে, আর নিম্নদিকে জোয়ারের প্রবাহ-সঞ্চার নিত্য পরিপূর্ণরূপে হ'য়ে থাকে, এই কারণে ভাগীরথী আজও সলিল স্রোতস্বতী। কিন্তু উপরিভাগে নদী দিনে দিনে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'য়ে আস্‌ছে, এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ের সীমা যদি আরো নীচের দিকে নেমে আসে, তা' হ'লে ভাগীরথী-তীরস্থ কলিকাতা-বন্দরের অস্তিত্ব একদিন লোপ পেতে পারে, এ আশঙ্কা একেবারেই অমূলক নয়। ভৈরব-

নদও এখন মজে' গেছে, প্রথমে জলাঙ্গী নদী ও পরে মাথাভাঙ্গা নদী এই নদকে অতিক্রম ক'রে প্রবাহিত হয়েছে। জলাঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা নদীদ্বয়ও আংশিকভাবে কৃত্রিম বাধা পেয়ে ক্রমে ক্রমে ভরাট্ ও স্বল্পতোয়া হ'য়ে উঠছে। এই দুই নদী গঙ্গা থেকে আর অধিক পরিমাণে জল টান্‌তে পারে না,—তাই উপযুক্ত জলপ্রবাহের অভাবে, নদীর দুই কূল উপচে-ওঠা যে-জল দুই তীরভূমিকে সিক্ত করতো, এই দুই নদীর পক্ষ থেকে সে কাজ আজ বন্ধ হ'য়ে গেছে, উপরন্তু তাদের জল-বণ্টন-ক্ষম শাখা-সরিৎগুলিকেও বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হ'য়ে উঠছে না। নবগঙ্গা, চিত্রা, কোবদক, বেৎনা, কোদ্‌লা প্রভৃতি বহুসংখ্যক শাখা-সরিৎ অতিরিক্ত জলপ্রবাহ বহন ক'রে নিয়ে গিয়ে সমগ্র অঞ্চলে জল-সঞ্চার কর্‌তো। কিন্তু বর্ত্তমানে পল্লীতে পল্লীতে জল-বিতরণকারী এই সকল সরিতের মধ্যে কতকগুলি শুকিয়ে গেছে, বাকিগুলি একে একে শুকিয়ে যাচ্ছে। এই কারণবশতঃ জমি ক্রমশঃ অনুর্ব্বর হ'য়ে উঠছে; জল-নিকাশ ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনের অশেষ অসুবিধা ঘটছে। প্রকৃতপক্ষে এই সরিৎগুলি দ্বারা বেষ্টিত সমস্ত অঞ্চল অত্যন্ত ম্যালেরিয়া-প্রধান। অনাবৃষ্টির সময়ে ঊর্দ্ধ্ব ধারাগত স্বাদু জলের নিতান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়, তার পরিবর্ত্তে জোয়ারী লোনা জল নির্দ্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে 'ব'-দ্বীপের ঊর্দ্ধ্বপানে আরো এগিয়ে চলে। সেইজন্য হুগলী নদীর জলে লবণাক্তভাগ বর্দ্ধিত হওয়ায় এই নদী আশ্রিত কলিকাতা সহরের ভবিষ্যৎ অধোগতি-কল্পনা বিশেষ চিন্তার কারণ হ'য়ে উঠেছে। পশ্চিম বাঙলার নদীগুলি থেকে অবৃষ্টি-ঋতুতে অতি অল্প পরিমাণেই পরিষ্কার জল-ধারা হুগ্‌লী নদীতে এসে পড়ে। এই সময়ে প্রায় সাত মাস মধ্য বাঙলার জলসঞ্চারী সরিৎগুলি গঙ্গাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্র নদীর স্বাদু জলের একমাত্র উৎস গঙ্গা। অথচ এই সকল সরিতের উপর নির্ভর করে একটি বিস্তৃত ভূভাগ—যে স্থান হুগলী-ভাগীরথী, গঙ্গা ও গরাই-আতাই শ্রেণীভুক্ত নদীগুলির মধ্যবর্ত্তী, আর তা'র সীমা সমুদ্র-পার্শ্ব পর্য্যন্ত। কিন্তু প্রকৃতি একেবারে বিমুখ নয় ব'লেই এই সমস্ত ক্ষুদ্র নদী কর্তৃক তাদের বালু-গর্ভের মধ্য দিয়ে—যে যে স্থলে বিচ্ছিন্ন জলকুণ্ড ও অন্তর্ভূমির জল-সঞ্চয় থাকে—সেই স্থানসমূহে গঙ্গা থেকে পরিস্রবণ-প্রবাহ গৃহীত হয়। এই অবস্থা সত্যই সঙ্কটজনক, এ বিষয়ের প্রতীকারের জন্য মনোযোগ না দিলে—উক্ত অঞ্চল পূর্ব্বের যে পতিত অবস্থা থেকে একদিন নদ-নদীর দ্বারা সংস্কৃত হয়েছিল, আবার ঐ আবাদ করা অঞ্চলই জলাভূমি ও জঙ্গলে পরিণত হ'বে।

বর্ত্তমানে আমাদের একমাত্র নির্ভর-স্থল ভাগীরথী, জলাঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা। এই অঞ্চলে জল-সঞ্চার করে ঐ তিনটি উদ্বৃত্ত-জল-বিতরণকারী নদী, কেবল এই নদীগুলিই গঙ্গার প্রবাহধারা থেকে অল্প পরিমাণ জল বহন ক'রে আন্‌তে সমর্থ। এ-ক্ষেত্রে বিবেচনা করা দরকার যে, এই সকল নদীকে ক্ষুণ্ণ ক'রে পদ্মাকে পরিপুষ্ট করার দিকেই যখন প্রাকৃতিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সে-স্থলে প্রথম কর্ত্তব্য এমন উপায় উদ্ভাবন করা—যার দ্বারা গঙ্গার স্রোতোধারা (পদ্মা দিয়ে প্রবাহিত না হ'য়ে) এই সকল নদীর মধ্য দিয়ে সম্যক্‌ভাবে প্রবাহিত হ'বে, কারণ—পদ্মার জল বহন করবার সমস্ত অবস্থা প্রকৃতি-ঘটিত ও সুফলপ্রসূ। গঙ্গা-তরঙ্গের প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত এই নদীগুলিকে রক্ষা করবার জন্য স্যার উইলিয়ম উইল্‌কক্স্ গঙ্গার অনুপ্রস্থে (অর্থাৎ একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত) প্রবাহরোধার্থ একটি বাঁধ বা জাঙ্গাল নির্ম্মাণ করতে প্রস্তাব করেন, তিনি বলেন এই বন্ধন পেলে গঙ্গা-ধারার উপযুক্ত পরিমাণ জল ঐ নদীগুলির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হ'তে বাধ্য হ'বে। কিন্তু এ প্রস্তাব ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় ব্যাপার কার্য্যে পরিণত করতে হ'লে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন, বাঙলার সে অবস্থা আজকে নয়। তাই অল্প সম্ভব ব্যবস্থা অবলম্বন করা আশু প্রয়োজন। হুগলী নদী ও তা'র অগ্রধারা সম্বন্ধে গবেষণা করার পরে এই প্রশ্ন উঠেছে যে, সত্যই কি মধ্য বাঙলা চিরস্থায়ী রূপে প্রকৃতির জলদান থেকে বঞ্চিত থাক্‌বে, কিংবা গঙ্গা-ধারার বর্ত্তমান ব্যতিক্রম কেবল অস্থায়ী ক্রিয়া। 'ব'-দ্বীপ-প্রবাহিত নদীগুলির বিশেষ রূপ ও প্রকৃতি বিচার কর্‌লে—এবিষয় সমীচীন বলে মনে হয়, গঙ্গা যে-অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এখন প্রবাহিত হ'চ্ছে—সেই ভূ-ভাগটিকে উন্নত কর্‌বার পরে আবার হয় তো মধ্য বাঙলার ও এই প্রদেশের ক্ষয়িষ্ণু নদীগুলির উন্নতি-সাধনে ব্রতী হ'বে। হুগলী নদীর অগ্রভাগের জলধারা বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে—ভাগীরথী, জলাঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা গিরিশিখর-নিঃসৃত গঙ্গার বন্যাজল থেকে এখনো বঞ্চিত নয়। এই নদীগুলি পর্য্যায়ক্রমে কখনো ক্ষীয়মাণ, কখনো বর্দ্ধিতকায়া অবস্থায় প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে। নদীয়ার এই নদীগুলির এই বিভিন্ন অবস্থা বিশেষভাবে লক্ষ্য-করা গেছে। সেই জন্য নদীগুলি যে একেবারে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে, এ মন্তব্য প্রমাণযোগ্য নয়। এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে যে—ব্রহ্মপুত্র গতি পরিবর্ত্তন ক'রে বর্ত্তমান যমুনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হ'চ্ছে। এই যমুনা গোয়ালন্দর কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ্বে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। অতএব, এখানে সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয়—যমুনা-বাহিত ব্রহ্মপুত্রের জলধারা উক্ত নদীত্রয়কে—বিশেষতঃ মাথাভাঙ্গাকে—পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুল্‌তে পারে। মাথাভাঙ্গা নদী গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-স্থলের খুব নিকটবর্ত্তী। সাধারণতঃ ব্রহ্মপুত্রের স্রোতোধারা এই সঙ্গমে সর্ব্বাগ্রে এসে পৌঁছে গঙ্গার জল-প্রবাহ অল্প বিস্তর রোধ কর্‌তে চেষ্টা করে, সেই জলপ্রবাহ ঊর্দ্ধ্বদিকে মুক্তি পাবার পথ খোঁজে, কিন্তু বাধাপ্রস্ত সেই গঙ্গাধারা প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে গরাই নদীর মধ্য দিয়ে মুক্তি পায়;

ঐ তিনটি নদীর কাছে পর্য্যন্ত সে জলস্রোত পৌঁছুতে পারে না। অতি ক্ষুদ্র সরিৎ থেকে গরাই প্রাকৃতিক সহায়ে ক্রমে ক্রমে অতিশয় বিস্তৃত হয়েছে। সুবিস্তীর্ণ নিম্নভূমিকে এখনো সমুন্নত করার কাজ বাকি রয়েছে ব'লেই গরাই নদী আরো বিস্তার লাভ করবে—অনুমান হয়। বস্তুতঃ এই নদী তা'র বামতটবর্ত্তী ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত সুবিস্তৃত অধোভূমিকে সমুচ্চ ও উর্ব্বর ক'রে তোলার কাজে মনোযোগী, তা' ছাড়াও সন্নিহিত অঞ্চলের উন্নতি-বিধানে এই নদীর ক্রিয়াশীলতা পরিদৃষ্ট হয়। প্রায় বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে গরাই নদীর নিম্ন বাঁক মধুমতী ও নবগঙ্গার মধ্যে একটি কৃত্রিম খালের সংযোগ ক'রে দেওয়াতে মধুমতী নদী এখন 'ব'-দ্বীপ গঠন কার্য্যে তৎপর হ'য়ে উঠেছে, যশোহর ও খুলনা জেলার পূর্ব্বাংশভূত এই অঞ্চল ভৈরব নদ ও নবগঙ্গা, চিত্রা প্রভৃতি ক্ষুদ্র জলসঞ্চারী নদীগুলি কর্ত্তৃক এর পূর্ব্বে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়েছিল। এই সকল নিম্ন অঞ্চল উন্নীত হবার পরে ব্রহ্মপুত্রের স্রোতাবেগে বাধাপ্রাপ্ত গঙ্গার স্রোত পার্শ্বস্থ মাথাভাঙ্গার বিচ্ছিন্ন জলকুণ্ডে পর্য্যন্ত পৌঁছুতে পারে,—আর আশা করা যায় যে, গঙ্গাপ্রবাহের অধিকাংশ জল এই নদীপথ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হ'য়ে উঠবে। কিন্তু প্রকৃতির পুনরায় সুদৃষ্টি ফিরে পাবার জন্য মধ্য বাঙলাকে হয় তো বহু বৎসর অপেক্ষা ক'রে থাকতে হ'বে। সেই কারণে এখন বিবেচনার বিষয় হ'চ্চে এই যে, কোনো কৃত্রিম উপায়ে এই প্রদেশের নদীগুলির সমুন্নত অবস্থা এনে দিতে সর্ব্বদিক থেকে চেষ্টা করা দরকার। ইতঃপূর্ব্বে যে বিশাল চর মাথাভাঙ্গার বিচ্ছিন্ন জলকুণ্ডের মুখ আবরণ ক'রে ছিল, সেই চর একপ্রকার বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে, আর গঙ্গার সঙ্গে এই নদীর সম্পর্কের অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে উন্নতির দিকে চলেছে। মধ্য-বাঙলার অন্য দু'টি প্রধান মাতৃকা-নদী জলাঙ্গী ও ভাগীরথীর বিচ্ছিন্ন জলকুণ্ডগুলিরও (মাথাভাঙ্গার মত না হ'লেও) ক্রমে ন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্চে। তথাপি শুধুমাত্র এই সকল জলকুণ্ডের উন্নতির ওপর নির্ভর ক'রে থাকাই যথেষ্ট নয়, এ কেবল প্রকৃতির খেয়াল ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। প্রকৃতির এই খেয়ালকে সুযোগ ধ'রে আমাদের কাজে লাগাতে হ'বে পরিপূর্ণ ভাবে, সেই জন্য এই সকল নদীর বহনশক্তিকে বাড়িয়ে তোলা, উপযুক্ত ধারণক্ষম জল-বণ্টনকারী সমস্ত সরিতের উপযোগী নির্গম-পথের ব্যবস্থা করা ও পল্লী অঞ্চলে অন্যান্য জলসঞ্চারের সুবিধা আনবার চেষ্টা করা দরকার। বিচ্ছিন্ন জলকুণ্ডগুলির উন্নততর অবস্থা বিবেচনা ক'রে বর্দ্ধিত জলভার যদি এই সমস্ত জলপথ দিয়ে নিঃসারিত না করা হয়, তা' হ'লে বর্ত্তমান অবস্থার কোনো প্রত্যক্ষ উন্নতির আশা করা যায় না। প্রকৃত পক্ষে জলাবতরণকারী সরিৎগুলিকে সঞ্জীবিত রাখতে হ'লে জমির বন্যাপ্লাবন নিতান্ত প্রয়োজন, অন্যথায় বন্যাবাহিত পলি গর্ভে থিতিয়ে প'ড়ে ঐ সকল সরিৎকে আবার জমাট ক'রে তুলবে। আবশ্যকবোধে উদকর্ষণ যন্ত্র দ্বারা কিংবা হাতে কেটে নদীগর্ভ থেকে মাটি তোলা—এই সকল সরিৎকে কার্য্যোপযোগী ক'রে তোলার কাজে প্রাথমিক সহায়,সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই,—কিন্তু উদকর্ষিণী দিয়ে নদীগর্ভ থেকে কর্দ্দম উত্তোলন করলেই যে নদীকে বরাবর বাঁচিয়ে রাখা যায়, তা' নয়। এই কার্য্য-প্রণালীর বাহুল্যের বিরোধী দিকটাও ভাববার কথা। নদী কি উপায়ে স্বভাব-স্রোতস্বিনী হ'য়ে বেঁচে থাকতে পারে, সে বিষয়ে অশেষ গবেষণার প্রয়োজন।

সরিৎগুলি মজে' যাওয়ার ফলে—গঙ্গার উচ্চ বন্যাস্রোত মধ্যবাঙলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ফসল-শস্য ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে অনেকবার ক্ষতি এনে দিয়েছে। গঙ্গার এই বন্যা-প্রকোপের অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে—নিম্নভূমিতে এমন মরশুমী শস্য ফলাতে হ'বে—যা' বন্যার অবস্থান্তরকে সামলে বেঁচে যেতে পারবে, স্পষ্টতঃ এই এক প্রতীকার আছে। গঙ্গাধারা-বঞ্চিত মধ্যবাঙলার জল-সঞ্চারী নদীগুলি মজে' যেতে আরম্ভ করে, তাই উচ্চ বন্যার সময় ভিন্ন গঙ্গার উদ্বৃত্ত জলে তা'রা কূলপ্লাবনে দেশকে আর্দ্র ক'রে তুলতে সমর্থ নয়। এই নদীগুলির ক্রমাবনতির ফলে বন্যাও বিরল হ'য়ে ওঠে,—অধিবাসীরা জলরোধ করবার জন্য বাঁধ বেঁধে সমস্ত বিলভূমি (বেশীর ভাগ-বিল ও বাঁওড়গুলি) অকালেই পতিত অবস্থা থেকে আবাদ ক'রে সংস্কারের-কাজ আরম্ভ ক'রে দেয়। এই প্রণালীতে প্রবাহিকা-অঞ্চল থেকে নদীগুলি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আরো স্রোতোহীন হ'য়ে পড়ে। এই প্রক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াও শুরু হয়েছে, যখনি গঙ্গার বন্যার জোয়ার আসে, এই সমস্ত মজে'-যাওয়া সরিৎ দিয়ে সেই বন্যার স্রোত ছুটে এসে দেশের ওপর উপ্‌চে পড়ে, বন্যার প্লাবনে দেশবাসীদের শুধু যে শস্য-হানি হয়—তা' নয়,—নীচু ডাঙ্গায় নির্ম্মিত সমস্ত-বাড়ী ভেঙে প'ড়ে যায়। অধোভূমিতেই এই দুরবস্থা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। পুরাতন রীতির পুনঃপ্রবর্ত্তনের 'পরে এ-র প্রত্যক্ষ প্রতিকার রয়েছে। বর্ত্তমান অবস্থায় যদ্দূর সম্ভব পূর্ব্ববঙ্গে গৃহীত পদ্ধতি মেনে নেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। উঁচু ডাঙ্গায় পুরাণো কৃষি-পদ্ধতি পুনরায় প্রবর্ত্তন করতে হ'লে জল-বণ্টন-কারী সরিৎগুলির সঞ্জীবন দ্বারা বাৎসরিক বন্যা-প্লাবন নিশ্চিত ক'রে তোলা দরকার হ'য়ে উঠবে। নীচু জমিতে এই অবস্থায় ঘর-বাড়ী তৈরী করতে হ'বে মাটির ঢিপি বা টিলার ওপর, আর পূর্ব্ববাঙলার প্রধান উৎপন্ন দীর্ঘ ধরণের ধান-গাছ রুইতে হ'বে,—তা-ও যদি বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী হ'য়ে না ওঠে, তা' হ'লে পরীক্ষা ক'রে এমন কোনো প্রকার ফসল ফলাবার ব্যবস্থা করতে হ'বে—যা'র এ-ক্ষেত্রে মার নাই।

মধ্য-বাঙলার নদীগুলিকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে গঙ্গা-প্রবাহ-ধারা যাতে তাদের মধ্য দিয়ে অধিক পরিমাণে

প্রবাহিত হয়—সেই উপায় উদ্ভাবনের জন্যে চেষ্টা দেখা দিয়েছে। এই চেষ্টার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে,—প্রথমতঃ—মধ্য-বাঙলার প্রাচীন সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে হ'লে পল্লীর জলবায়ু ও স্বাস্থ্যের অবনতি আর জমির উৎপাদন-শক্তির হ্রাসের গতিরোধ করা; দ্বিতীয়তঃ—গঙ্গার ধ্বংসকারী বন্যাকে নিম্ন সীমায় নিয়ন্ত্রণ করা—যে সীমাবদ্ধ ধারা ক্ষতিকর হ'বে না, হ'বে ইষ্টকারী; তৃতীয়তঃ—জল-নির্গমের সরিৎগুলির (জোয়ার ভাঁটা খেলার বাঁক পর্য্যন্ত) উন্নতি সাধন ও তা'দের স্বাভাবিক প্রবাহ-নির্দ্দেশ; চতুর্থতঃ—দেশাভিমুখে লোণা জলের সীমা-বিস্তার রোধ করা। নিম্নভূমিতে কি রকম ফসল ফলানো যেতে পারে—সে সম্বন্ধেও পরীক্ষা চলেছে।

এখন বক্তব্য এই যে—গঙ্গানদী সম্পর্কে যে কঠিন সমস্যা ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছে, সে-সমস্যার সমাধান করা সত্বর প্রয়োজন। গঙ্গার বন্যাস্রোতের উচ্চতা যেমন বেড়ে চলেছে, তেমনি অনাবৃষ্টির ঋতুতে প্রবাহ-ধারা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হ'চ্ছে। এই বিষয়টি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বাঙলাকে রক্ষা করতে হ'লে এই কঠিন ব্যাপার নিয়ে রাজসরকার, বিশেষজ্ঞের দল ও দেশবাসিগণের অশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত।

পরবর্ত্তী বারে তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র ও পশ্চিম-বঙ্গের নদ-নদী সম্বন্ধে আলোচিত হ'বে।*

[নদ-নদীগুলির মোটামুটি সংস্থান বোঝবার জন্যে ১১৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত রেখাচিত্রটি দ্রষ্টব্য]

(ক্রমশঃ)

* নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি থেকে সাহায্য গৃহীত।

(১) Rivers of the Bengal Delta by S. C. Mazumdar.
(২) Imperial Gazetteer.
(৩) Report on the Hooghly River etc.
(৪) শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত গৌড়-বঙ্গের ইতিহাস সম্বলিত হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস।
(৫) Economic & Commercial Geography.
(৬) ভূগোল ও তৎসম্পর্কিত গ্রন্থাবলী।
(৭) বিশেষজ্ঞদের কয়েকটি বিক্ষিপ্ত রচনা।

১৩৫০ সালে দামোদর নদের বাঁধ ভেঙেছিল কি করে ?

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

প্রতি বৎসর বর্ষাকালে এই পার্ব্বত্য নদ পাহাড় থেকে জলস্রোত-সংঘর্ষে ক্ষয়প্রাপ্ত পাথরগুঁড়া লক্ষ লক্ষ মণ বালুকা বয়ে এনে নিজের গর্ভ ভরাট করে ফেলেছে। ১৩৪২ সালের বন্যার পর অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের অভিমত শোনা গিয়েছিল যে, বর্দ্ধমান জেলার সাধারণ লেভেল থেকে দামোদরের গর্ভ (River Bed) দশ ফিট উঁচু হয়ে গেছে। বর্দ্ধমানের তদানীন্তন ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দে মহাশয় সে সময় দামোদরের অবস্থাটা আগ্রার দুর্গে বন্দী সম্রাট সাজাহানের সঙ্গে তুলনা করে, এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—বাঁধের বন্ধনে বন্দী হয়ে দামোদর ক্ষুব্ধ আক্রোশে ক্রমাগত বলছে, "দেব লাফ ? দিই লাফ !"

সম্প্রতি সিন্ধু থেকে আনীত ইঞ্জিনীয়ার বাহাদুরও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করে গেছেন।

শোনা কথায়, দামোদর বইছেন আমাদের মাথার চের উপরে। সুযোগ পেলেই আমাদের মুণ্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য তিনি প্রস্তুত। বিশেষতঃ বর্ষায় যখন বহু পার্ব্বত্য নদীর জল বহন করে তিনি উন্মত্ত দুর্ব্বার গতিতে ছোটেন।

১৩২০ সালে দামোদর গুহ গ্রামের বাঁধ ভেঙে প্রথম লাফ দিয়েছিলেন। সেবার বর্ষা ছিল প্রচণ্ড। জল এসেছিল অপর্য্যাপ্ত। বন্যা-স্রোতে বিধ্বস্ত হয়ে বর্দ্ধমানের পশ্চিমাংশে বহু ধন-সম্পত্তি ও বহু প্রাণহানি ঘটেছিল। সে সময় বর্দ্ধমানরাজ স্বর্গীয় বিজয়চান্দ মহাতাব বাহাদুর ও তাঁর পিতৃদেব কর্ম্মবীর স্বর্গীয় রাজা বনবিহারী কর্পূর বাহাদুরের অসামান্য হৃদয়বত্তা ও বদান্যতার যে সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলাম, এখনও তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রেখেছি। বাইরের সাহায্যও যথেষ্ট এসেছিল।

১৩৪২ সালে দ্বিতীয়বার বাঁধ ভাঙে। সেবার অপর্য্যাপ্ত বর্ষার ওজর চলে না। বেশ মনে আছে, প্রচণ্ড রৌদ্র, শুষ্কতার পর সে বছর ২০শে শ্রাবণ থেকে প্রবল বর্ষণ সুরু হয়েছিল এবং নদী-গর্ভ পূর্ণ হতে না হতেই হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে ২৯শে শ্রাবণ ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে বর্দ্ধমান সহরে খবর দেওয়া হয়েছিল "শিদ্না ও দাদপুরের মাঝে ২৮শে শ্রাবণ বাঁধ ভেঙেছে।

সরকারী তদন্তে সেবার বাঁধ ভাঙার হেতু কি নির্ণীত হয়েছিল জানি না। কয়েকজন উদ্যমশীল, নিরপেক্ষ বে-সরকারী সত্যানুসন্ধিৎসু, ভদ্রলোকের তদন্তে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল, বন্যা আসার পূর্ব্বেই বাঁধে সামান্য একটা

ছিদ্র বা ঘোগ দেখা গিয়েছিল। বাঁধ-কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত বেতনভোগী কর্মচারীরা সেটা লক্ষ্য করেন নি, বা দেখেও উপেক্ষণীয় মনে করেছিলেন। সেই ক্ষুদ্র ঘোগই অবহেলার আওতায় নির্বিঘ্নে বর্দ্ধিত হয়ে বন্যা-স্রোতকে বাইরে ঢালু জমিতে নেমে যাবার সুযোগ দেয়। নীচু জমি পেয়ে বন্যা উচ্চ নদী-গর্ভের পথে ছুটতে নারাজ। অতএব বাঁধ ধ্বসিয়ে বন্যা মহাবেগে হানামুখে প্রবাহিত হয়ে সেবারও প্রচুর ক্ষতি করে। চোর পালাবার পর বুদ্ধি যখন বাড়ল তখন ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো, সর্ব্বস্বান্ত স্থানীয় গ্রামবাসীদের উপর দোষ পড়ল—"সময় থাকতে তারা যদি ঘোগের মুখে দু' কোদাল মাটী ঠেসে দিত, তা হলে এমন সর্ব্বনাশ হোত না।"

চমৎকার যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ৎ? সরকারী তনখাপুষ্ট ভাগ্যবানদের অবহেলা-ত্রুটিতে যে হতভাগ্যরা গ্রামকে গ্রামশুদ্ধ বন্যার তোড়ে নিশ্চিহ্ন হবার আশঙ্কায় সদা শঙ্কিত, নিজেদের বাঁচাবার জন্য তারা ঘোগের মুখে দু' কোদাল মাটী দিতে কার্পণ্য করেছে?

যাঁরা দামোদরের বন্যার আক্রমণ-বিধ্বস্ত দুর্ভাগা নরনারীদের আতঙ্ক-উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা, মরণান্তিক দুর্দ্দশার দৃশ্য দেখেন নি তাঁরা একথা বিশ্বাস করুন! আমাদের মত ভুক্তভোগী জীব সে কথা প্রাণান্তেও বিশ্বাস করবে না। আমি স্বচক্ষে সম্প্রতি সে সময়কার মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখেছি। বাঁধের হানা-মুখ থেকে মেমারি দশ বারো মাইল দূরে। ১৯শে শ্রাবণ দ্বিতীয়বার যখন প্রবল বন্যা (সেইটাই প্রকৃত ভীষণ বন্যা। ওদিকের গ্রামাঞ্চলের লোকেরা ২রা শ্রাবণের বন্যাকে "ছোট বান" ও ১৯শে শ্রাবণের বন্যাকে "বড় বান" বলে) এসে মেমারীর চারপাশ ডুবিয়ে দিলে, সাঁকো ও মেঠো রাস্তা দিয়ে জল ঠেলে এসে যখন আমাদের বাসস্থান পর্য্যন্ত ডুবিয়ে দেবার উপক্রম করলে, তখন শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন কৃষ্ণ পক্ষের রাতে ঝড় বৃষ্টি ঘূর্ণবাত্যা উপেক্ষা করে গ্রামের কর্ম্মঠ ব্যক্তিরা কি কঠিন পরিশ্রমে সারারাত খেটে সে বন্যার আক্রমণ ব্যর্থ করেছিলেন, তা দেখেছি।

১৯শে, ২০শে, ২১শে শ্রাবণ রাত্রের বিভীষিকাময়ী স্মৃতি মনে পড়লে আজও অন্তঃকরণ শিহরিত হয়। উপর্য্যুপরি বন্যার তোড় বৃদ্ধিতে, গ্রামের চার পাশের নীচু জমিতে যে সব গরীব লোকেরা বাস করত, ভদ্র-পরিবারও তার মধ্যে আছেন—সে সব নিরাশ্রয় নরনারীর আতঙ্কিত চীৎকার, উদ্বেগ-ব্যাকুল ছুটাছুটি, দুর্দ্দশার চরমতম অবস্থা, বাঁধ-রক্ষক মাতব্বরগণ দেখতে পান নি, সুতরাং তাঁরা আরামে আছেন। তারপর ভেবে চিন্তে দাগ-সই কৈফিয়ৎ সৃষ্টি করে, বাঁধা গতের Much regrets to announce-এর বয়ান জুড়ে, বাঁধ ভাঙার হেতুনির্দ্দেশের সময় মনুষ্যত্ব, বিবেক, সত্যনিষ্ঠা, দায়িত্বজ্ঞান, হৃদয়বত্তা, কিছুর তোয়াক্কা রাখার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, নিষ্করুণ সরকারী রিপোর্টে সে সব কোমল-ভাবপ্রবণতার স্থান নাই। বিশেষতঃ কর্তৃপক্ষের কর্ত্তাব্যক্তিরা যখন দেশবাসীর উপর চটে আছেন, এবং বানে যারা ডুবে মরল, সে সব মড়াদের যখন কথা বলবার ক্ষমতা নাই।

কিন্তু মড়াও চিতার উপর চাঙ্গা হয়ে উঠে বসে, যখন বিচার-বুদ্ধি সচেতন হয়ে প্রশ্ন করে, "যে বাঁধ ভরা শ্রাবণ-ভাদ্রে চব্বিশ ফুট বানের ধাক্কা সামলে বেঁচে যায়, সে বাঁধ আষাঢ় মাসে মাত্র সতের ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি জলের ধাক্কায় ভাঙে কেন?"

প্রত্যক্ষদর্শী দায়িত্ববোধশীল ব্যক্তির কাছে সেস্থানের মানচিত্র সংগ্রহ করে দেখলাম, (সে মানচিত্র এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি) সেখানে বাঁধের নীচে জল ছিল না, বরঞ্চ বিস্তর চরভূম জেগেছিল। যে চরে চাষ আবাদ হোত, কলাবাগানও প্রস্তুত হইয়াছিল। অতএব?

হয়ত এর উত্তরে হঠাৎ প্রচণ্ড বন্যা আসার হুজুগ শোনা যাবে। তাও যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া যায়, তাহলে সে প্রচণ্ড বন্যা ইডেন ক্যানেলের বাঁধে ও গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উচ্চতা ডিঙিয়ে তিন মাইল দূরে রেল-লাইনের কাছে পৌঁছতে সতের ঘণ্টা সময় নিয়েছিল কেন? যে দামোদরের উত্তাল তরঙ্গমালা মিনিটে মাইল অতিক্রম করবার ক্ষমতা রাখে, সে ইডেন ক্যানেলের বাঁধে ও জি-টি রোডে অত হোঁচট খেয়ে মন্থর গতিতে আসে কেন?

কাগজে সরকারী ইস্তাহারে খবর ছাপা হয়েছিল, বাঁধ ভেঙেছে ১৬ই জুলাই (৩১শে আষাঢ়) শেষ রাত্রে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন রাত ১২টা ১টার সময়। তিন মাইল দূরে সে বন্যা পরদিন বেলা পাঁচটার পরে পৌঁছায় কেন?

জি-টি রোডে বাধা পেয়ে দামোদরের বাঁধ ও জি, টি রোডের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত মৌজা ডুবিয়ে আসতে বন্যা সম্ভবতঃ খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই রসুলপুরে পৌঁছাতে ১৭ই জুলাই রাত ১২ টা হয়েছিল। তারপর রেল-লাইনের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পাঁচ মাইল দূরে মেমারি পৌঁছাতে ভদ্রলোকের ১৮ই জুলাই প্রায় দিবা এক বা দ্বিপ্রহর হয়েছিল। বন্যার স্রোতগতিও তখন শান্ত ছিল। জল গড়িয়ে গড়িয়ে আসছিল।

অল্প বয়সে ইদিলপুরের বাঁধের উপর থেকে শ্রাবণ-ভাদ্রের দামোদরের বন্যা দেখেছি। মাঝখানের মূলস্রোত উচ্চ তরঙ্গ তুলে অধীর উন্মত্ত বেগে ছুটতে দেখেছি। সে দামোদর মেমারির মাঠে গিয়ে গৈরিক চাদর মুড়ি দিয়ে সেদিন শান্ত হয়ে শুয়ে আছে মনে হোল। শুধু হাওয়ার ধাক্কায় মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ চঞ্চল হচ্ছিল মাত্র।

এমন শান্ত ভদ্র বন্যায় বাঁধ ভাঙল কেন, খুঁজে পেলাম না। ব্যাপারটা বাস্তবিক রহস্যজনক।

অনেক রকম আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক তত্ত্বযুক্ত গুজব প্রচারিত হতে শুনলাম। বুঝলাম, এক মিথ্যাকে ঢাকবার জন্য দশ মিথ্যার সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত আধিভৌতিক কারণটা কি ?

১৩৫০ সালে বাঁধ ভেঙেছে চাঁচাই (প্রাচীন নাম চর্চ্চিকা নগর) সেক্সনের এলাকায়। এখানে বাঁধ-কর্ত্তৃপক্ষের অফিস আছে এবং ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী আছেন। পূর্ব্বে এ বিভাগের কাজে স্থানীয় অধিবাসীদের ভিতর থেকে লোক নিয়ে কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হোত। কি কারণে বলা শক্ত, এখন পশ্চিম বঙ্গের দলকে পদচ্যুত বা পদান্তরিত করে পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত হয়েছেন। পূর্ব্ববঙ্গের লোকদের যোগ্যতায় আমরা বাস্তবিক শ্রদ্ধান্বিত। কিন্তু সতের ফুট জলে দামোদরের বাঁধ ভাঙল কেন সে অর্থ বোঝা গেল না।

লোক-পরম্পরায় জানা গেল, সেখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী যা কৈফিয়ৎ দিয়েছেন,তার মূল মর্ম্মার্থ—রাত্রে বাঁধে ঘোগ পড়েছে (অর্থাৎ ছিদ্র হয়েছে) দেখে তিনি ঘোগ বন্ধ করবার জন্য গ্রামবাসীদের কাছে একখানি তক্তা চেয়েছিলেন। গ্রামবাসীরা কেউ তক্তা দেয় নি। অগত্যা তিনি সাইকেলে চড়ে চাঁচাই অফিসে গিয়ে (হানামুখ থেকে সেস্থান ৫।৬ মাইল দূরে) তক্তা ও লোকলস্কর নিয়ে যখন ফিরে আসেন, তখন দেখেন ছিদ্রটি সুশীল সুবোধ বালকের মত তাঁর প্রতীক্ষায় নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে নাই।···অবস্থা তখন আয়ত্তের বাইরে গেছে।" ইত্যাদি।

এ সংবাদে কর্ম্মচারী মহাশয়ের মহানুভবতায় ও গ্রামবাসীদের মূঢ়তায় দেশের লোক যুগবৎ মুগ্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। কর্ম্মচারী মহাশয়টি নিতান্ত নিরীহ ভাল মানুষ, তাই এই সব দুষ্ট গ্রামবাসীকে বন্যার গ্রাস থেকে বাঁচাবার জন্য তক্তা আনতে দশ বার মাইল ছুটাছুটি করেছিলেন। অন্য কোনও জবরদস্ত লোক হলে···।

স্মৃতির ঝুলি হাতড়াতে, চকিতে বেরুলো ১৩৪২ সালের বাঁধ ভাঙার কৈফিয়ৎ। অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য ত! ৮ বছরের তফাৎ হলেও এবং মাইল কতকের ব্যবধান থাকলেও—উভয় স্থানের গ্রামবাসীরা বানের তোড়ে নিশ্চিহ্ন হবার জন্য কি আশ্চর্য্য রকমে আগ্রহশীল।

তত্ত্বজ্ঞান এই পর্য্যন্ত লাভ ক'রে কৃতার্থ হবার পর দেশবাসী সবিস্ময়ে শুনলে, তদন্তে প্রকাশ হয়েছে, যে ৩১শে আষাঢ় বৈকালে আমীরপুর ও মাণিকহাটী মৌজার মাঝখানে বাঁধে একটী ছিদ্র হয়। বাঁধ-কর্ত্তৃপক্ষের কর্ম্মচারীদের চেষ্টায় সে ছিদ্র সন্ধ্যা নাগাদ বন্ধ হয়। সে ছিদ্র মেরামত করতে গ্রামবাসীরাও তাঁদের তত্ত্বাবধানে খেটে এসেছিল। কিন্তু সম্ভবতঃ ছিদ্রটী ভালরূপ বন্ধ না হওয়ায়···ইত্যাদি।

তারপর রাত্রে যে আবার ছিদ্রপথে জল বেরুতে আরম্ভ হয়েছে, সে সংবাদ গ্রামবাসীদের কেউ পায় নি। তক্তা চাওয়া দূরে থাক, বাঁধ ধ্বসে পড়বার সময় সেখানে কেউ উপস্থিত ছিল না। আচম্বিতে বহু রাত্রে বন্যা এসে তাদের ডুবিয়ে দিয়েছে। যারা সমর্থ ব্যক্তি তারা কেউ ছুটে গিয়ে বাঁধে উঠেছিল, কেউ গাছে উঠেছিল। বাকী সকলের কি হয়েছে, কেউ জানে না।"

সেটা জানাও নিষিদ্ধ ব্যাপার। তবে দূর দূরান্তরে বন্যার জলে কয়েকটা মৃতদেহ ভেসে যেতে অনেকে দেখেছে। বিশেষতঃ দ্বিতীয়বারের বন্যার পর একা মেমারির দক্ষিণ মাঠে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ৫৫ মাইলের কাছে "যোড়া সাঁকো"র আশে পাশে তিন চারটা গলিতে শবদেহ আটকে থাকতে দেখা গিয়েছিল। এই অজ্ঞাত পরিচয় হতভাগ্যদের কেউ কেউ তখনও উপুড় হয়ে মাথার দু'পাশে দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে জলে ভাসছিল। এই মৃতদেহগুলি সাঁকোর পাশে আটকে গিয়েছিল,তাই দেখতে পাওয়া গেল। বন্যার তোড়ে সাঁকোর ভিতর দিয়ে এমন কত মৃতদেহ পার হয়ে গেছে, তাই বা কে জানে ?

আর শক্তিগড় থেকে রসুলপুর পর্য্যন্ত রেল-লাইন ভেঙে যে মহা প্রচণ্ড স্রোত বয়ে গিয়েছিল, সে স্রোতের মুখে হাজার হাজার মণ পাথর বোঝাই মালগাড়ী নামিয়ে দেখা গেছে বন্যার পদাঘাতে তাও দূরে ছিটকে চলে গেছে, সুতরাং সে স্রোতের মুখে ?

আর গাছে উঠে যারা প্রাণ বাঁচিয়েছিল, তাদের বাঁচার ইতিহাসও অতি মনোরম। কারুর পা পর্য্যন্ত, কারুর কোমর পর্য্যন্ত বন্যার জলে ডুবে গেছল, সেই অবস্থায় গাছ আঁকড়ে ধরে ৩।৪ দিন তাকে ঝুলে থাকতে হয়েছিল। কারণ, দামোদরের স্রোত ইডেন ক্যানেল ও দেবীদহ নামক দহের সহযোগে এত দুর্দ্দাম হয়ে উঠেছিল যে, নৌকা নিয়ে সে স্রোত অতিক্রম করবার চেষ্টায় বর্দ্ধমানরাজের কর্ম্মচারীগণ, এ, আর, পি, কর্ম্মচারীগণ, Civil Defence Party, Rescue Party প্রভৃতি দল প্রথম ২।৩ দিন সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হয়েছিল। ৪ঠা শ্রাবণ যখন তাদের উদ্ধার করা হোল, তখন দেখা গেল, কারুর কারুর দেহ এমন অসাড় হয়ে গেছে যে, গাছ থেকে হাত ছাড়ানোও দুঃসাধ্য হয়েছিল।

দামোদরের বাঁধ ও গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মধ্যবর্ত্তী আমড়া, বেলনা, সাঁওতাল পাড়া, বামুন পাড়া, কাঙ্গুর, সোনা বোতরাম প্রভৃতি গ্রামগুলি থেকে এমন ৬০০।৭০০ লোক উদ্ধার করা হয়। তবুও, যারা উচ্চস্থানে ছিল, ঘরের চালে

উঠে চীৎকার করছিল, দূর গ্রামের মধ্যে ছিল,তাদের সবাইকে আনা সম্ভব হয় নাই।

আর রেল-লাইন ভেঙে যে প্রচণ্ড স্রোত বয়ে গেছল, তার মুখে পড়ে হাজার হাজার লোক সর্ব্বস্বান্ত নিরাশ্রয় হয়ে যে দুর্গতি ভোগ করেছিল, তার বর্ণনা আরও মর্ম্মান্তিক! সে আলোচনার স্থান এখানে নাই।

নয় লক্ষ বিঘা জমির ফসল ডুবিয়ে, হাজিয়ে মজিয়ে, হাজার হাজার মানুষের আশ্রয় নষ্ট করে, কোটী কোটী টাকার সম্পত্তি ধ্বংস করে যে বাঁধ ভাঙল, সে বাঁধ ভাঙবার সময় সেখানে বাঁধ-রক্ষকগণ কেউ উপস্থিত ছিলেন না, তাঁদের কর্ম্ম-নিষ্ঠা, উদ্যম-তৎপরতা, দক্ষতা, বিচার-বুদ্ধি ও দায়িত্ব-জ্ঞান এমন চমৎকার।

অতএব যে বাঁধ চব্বিশ ফুট জলের ধাক্কা খেয়ে টিকে থাকে, সে বাঁধ সতের ফুট জলে কেন ভাঙবে না? তার জন্য বৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক, দার্শনিক, কারুর গবেষণা নিষ্প্রয়োজন।

অনুসন্ধানে জানা গেল, বাঁধ রক্ষার জন্য বর্দ্ধমান মহারাজ ও রেল কোম্পানী প্রচুর টাকা বার্ষিক দক্ষিণা দিয়া থাকেন। তার জন্য মোটা বেতনে বড় বড় কর্ম্মচারী ত আছেন, ছোট কর্ম্মচারীও বিস্তর আছেন। বিশেষতঃ বর্ষার চারমাস, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, সারারাত জেগে বাঁধ পাহারা দেবার জন্য ও আবশ্যক মত মেরামত করবার জন্য, মাথা পিছু ১ টাকা দক্ষিণায় প্রতি রাত্রে বহু ওয়াচ-ম্যান বা পেট্রোল নিযুক্ত হয়। তারা কয়েক হাত অন্তর বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে থাকে এবং কোথায় কোথায় ছিদ্র হোল, বাঁধের কাছাকাছি যে জল অগভীর ও শান্ত থাকে, তাকে তাদের ভাষায় "থামাল" বলে, সে জলে কোথাও ঘূর্ণী সৃষ্টি হোল কি না—(অর্থাৎ যেখানে ছিদ্র হয়, তার কাছে জলটা ঘুরপাক খেয়ে ছিদ্র দিয়ে বেরোয়) সেগুলো লক্ষ্য করে এবং বিপজ্জনক ব্যাপারের আশঙ্কা দেখলে পরস্পরকে হাঁক দিয়ে অফিসের প্রভুদের সংবাদ দেয় ও আশু প্রতিকার ব্যবস্থা হয়।

এত বন্দোবস্ত সত্বেও সদ্যঃ মেরামত করা বিপজ্জনক ছিদ্রটার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য সেখানে কোনও দায়িত্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন কর্ম্মচারী দূরে থাক, একটা ওয়াচ ম্যান-পর্য্যন্ত উপস্থিত রইল না কেন?

এই "কেন"র উত্তরে ক্রমাগত অনুসন্ধানের ফলে অনেক মর্ম্মান্তিক নিগূঢ় রহস্য আবিষ্কৃত হতে লাগল। 'চাঁচাই'এর অধিবাসী আমাদের কল্যাণীয় আত্মীয়-সন্তান শ্রীমান হিমাংশু ভূষণ বসু মল্লিকের কাছে জানলাম, ভিতরের নিগূঢ় রহস্য-লীলার সংবাদ চাঁচাই'এর অধিবাসীরা অনেকেই জানেন। তাঁদের মধ্যে এমন কয়েকজন সাহসী ও সত্য-নিষ্ঠ ভদ্র-সন্তান
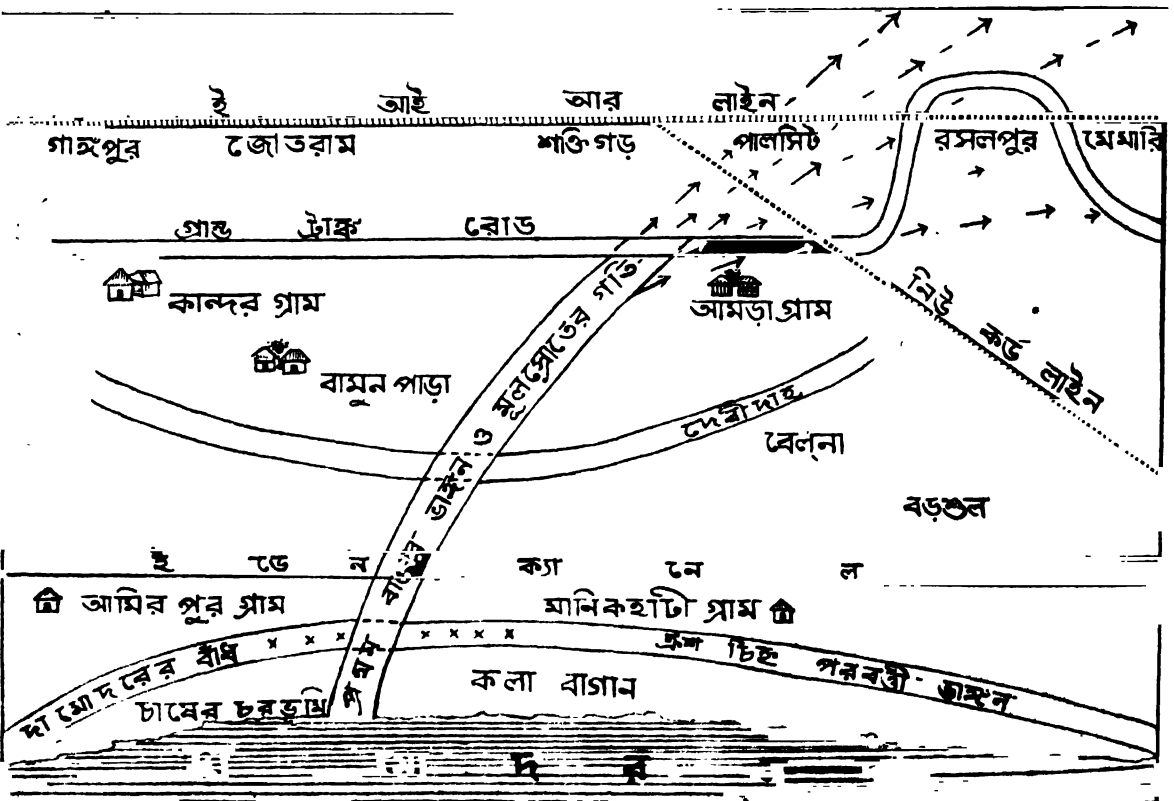
আছেন, যাঁরা উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা প্রকৃত তদন্ত হ'লে, সত্য সংবাদ প্রকাশে প্রস্তুত আছেন। অন্যথা, অযথা শত্রুতার অত্যাচার ভোগে বিপন্ন হওয়ার ইচ্ছা তাঁদের নাই, সেজন্য নিস্তব্ধ থাকেন সব জেনে শুনেও!

দেশের দশের মঙ্গলের জন্য সে সত্য প্রকাশিত হওয়াই উচিত। দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, সৎসাহসী, উদ্যমশীল কর্ম্মীদের এবং কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি।

এ কথা কি সত্য যে, মাণিকহাটী, আমীরপুরের মধ্যবর্ত্তী বাঁধের অবস্থা সেদিন বিপজ্জনক দেখে, রাত্রের বাঁধ পর্য্যবেক্ষণ ভার ওভারসিয়ার কণ্ট্রাক্টারের উপর দিয়ে নীচের দিকে কোথা বাঁধ দেখতে গিয়েছিলেন? কন্ট্রাক্টর বাঁধ পর্য্যবেক্ষণ-ভার শ্রীপতি বাউরী নামক একটা ওয়াচ ম্যানের উপর দিয়ে সে রাত্রে কলিকাতা গিয়েছিলেন? আর শ্রীপতি বাউরী (সম্ভবতঃ প্রভুদের নিশ্চিন্ততায় সুনিশ্চিন্ত হয়েই) সাঁওতাল বাড়ীতে গিয়ে সুনিদ্রা উপভোগ করছিল? তারপর ধীরে ধীরে ছিদ্র বেড়ে যখন বাঁধ ভেঙে দামোদর হুঙ্কার ক'রে বেরিয়ে পড়েছে, তখন শব্দ পেয়ে তার ঘুম ভাঙে?

এ সংবাদ যদি সত্য হয়, তা'হলে দুর্ভিক্ষের কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় দেশনেতা শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যাঁদের "লুণ্ঠনকারী নরঘাতক" বলে অভিহিত করেছেন, বাঁধ ভাঙার কারণ নির্ণয়ের জন্য উপযুক্ত তদন্ত হলে বাঁধের মধ্যেও তেমন অনেক 'লুণ্ঠনকারী নরঘাতকের" সন্ধান পাওয়া যাবে।

বাঁধের ব্যাপারের মধ্যে যে অনেক দুর্নীতি ও কলুষ প্রবেশ করেছে, অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তা জানেন। ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে তাঁদের আর নির্ব্বাক্ থাকা উচিত নয়। তা'হলে দেশের মারাত্মক সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য, ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের কাছে তাঁরাও দায়ী হবেন।

হল্যাণ্ডের বাঁধের উপমা দেওয়া ধৃষ্টতা, কটকের কাঠজুড়ির বাঁধ, হাতের কাছে আছে। সে বাঁধ ভুঁই ফুড়ে উঠেনি, সে বাঁধ মানুষেরই সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও পুরুষকারের জয়স্তম্ভ। বালি ভরাট গর্ত্ত, ফাটা ফুটা মাটীর বাঁধ ও শ্রীপতি বাউরী দলের কুপোষ্যদের বিরুদ্ধে দামোদর বিদ্রোহ-ক্ষিপ্ত, তার জন্য সত্য-উদ্‌ঘাটন ও ন্যায় সঙ্গত পথ চাই, নইলে দেশের রক্ষা নাই।

দেশের সৎ-সাহসী কর্ম্মীরা প্রতিকার ব্যবস্থায় প্রস্তুত হোন।

তেটনের ইতিহাস

নিশাপতি

(একখানি বর্ম্মি নাটক)

নাট্যকারের নাম সায়া ঊঅ। তিনি ইং ১৮৭৭ সালে এই নাটক রচনা করেন। ইহার ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী যুগটা ব্রহ্মদেশীয় নাটকের অবনতির যুগ। রাজনৈতিক এবং বিদ্রোহ প্রভৃতি কারণে দেশের শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়াছিল। নূতন নূতন নাট্যকারের রচনা নব নব রসের অঞ্জলি লইয়া সমাজের সম্মুখে বহুকাল আবির্ভূত হয় নাই। চির-আনন্দের দেশে আনন্দের স্রোত বহুকাল ধরিয়া রুদ্ধ হইয়া ছিল। সেই জন্য নৃত্য-গীত-বহুল এই নাটকখানি অভাবনীয়রূপে এমন জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ১৫০০০ বই বিক্রীত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সুবর্ণভূমিতে তেটন নামে যে রাজ্য ছিল তাহার ইতিহাসের সহিত এই নাটকের কোন সম্বন্ধ নাই। তবে নাট্যকারের এই নাম গ্রহণ করিবার কারণ বোধ হয় তেটনের পুরাতন গৌরব এবং সভ্যতা, পুরাতনের প্রতি মানুষের গভীর শ্রদ্ধা এবং স্বাভাবিক টান।

আখ্যান।—তেটনের মন্ত্রীরা বড়ই চিন্তিত। পরবর্ত্তী রাজা কে হইবে তাহা পূর্ব্বাহ্নেই স্থির করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অল্পবয়স্ক রাজা বিবাহ করেন নাই। তাঁহারা যাইয়া রাজাকে পরামর্শ দিলেন, আপনি অবিলম্বে বিবাহ করুন। রাজা বলিলেন, আমি বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি।

পরের দৃশ্য।—নিকটস্থ পাহাড়ের এক অর্দ্ধসভ্য জাতির দুইটী মাতাপিতৃহীন অনশনক্লিষ্ট ভাই-বোন্ জীবিকার্জ্জনের জন্য তেটন্ নগরে প্রবেশ করিল। নগরের মধ্যস্থলে সম্ভ্রান্ত ধনী দম্পতি পরস্পর দোষারোপ করিয়া তুমুল কলহ করিতেছিলেন। কলহের কারণ তাঁহাদের কোন সন্তান হইল না, এই বিপুল সম্পত্তির কি হইবে? এমন সময় সেখান দিয়া ভাই-বোন্ যায়। তাঁহারা মেয়েটীর অপরূপ রূপ এবং ছেলেটীর সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলের মত হাবভাব দেখিয়া অবাক্ হইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিলেন—তাহাদের কেহ নাই, কাজের সন্ধানে এখানে আসিয়াছে, তখন তাঁহারা মহানন্দে পুত্র ও কন্যারূপে তাহাদিগকে ঘরে তুলিয়া লইলেন।

তার পরের দৃশ্য।—শান পাহাড়ের সওদাগররা তাহাদের দেশের গান গাহিয়া নাচ নাচিয়া নগরে আসিল। দেখিতে দেখিতে তাহাদের জিনিষপত্র সব বিক্রী হইয়া গেল। তাহারা ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। এমন সময় ভাই-এর সঙ্গে তাহাদের মিতালি হইল। দিনের পর দিন তাহাদের পাহাড়ের দেশের অফুরন্ত অদ্ভুত কাহিনী শুনিতে শুনিতে সে মুগ্ধ হইল। সে সুন্দর দেশের সুন্দর তরু, লতা, সুন্দর পাখী, সুন্দর মানুষ, সুন্দর হ্রদ, সুন্দর ফুলের অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের কথা শুনিতে শুনিতে মোহন আবেশে সে মনে মনে সৌন্দর্য্যের আধার এক স্বপ্নরাজ্য রচনা করিল। সবাই আনন্দ সে-দেশের মানুষের। তাহারা প্রাণ ভরিয়া হাসে,

নাচে, গায়, দুঃখ তাহাদের কাছে ঘেঁসে না। হ্রদের তীরে গাছের ডালে বসিয়া পাখী মিষ্টি গান করিয়া জগৎ মাতায়; সে-দেশের মানুষ—তাহা শুনিয়া জগৎ ভুলিয়া যায়! সে-দেশের মেয়েরা ফুলেরই মত সুন্দর! মুখে তাদের ফুলের হাসি! মধুকণ্ঠে পাখীরই মত থাকিয়া থাকিয়া তাহারা গাহিয়া উঠে। দিক্-দিগন্তে ছড়াইয়া পড়ে সে-গানের অমিয়-ধারা। পৃথিবী যেন হইয়া যায় স্বর্গের নন্দন-কানন! সে স্বপ্নের দেশে যাইবার জন্ত সে পাগল হইয়া উঠিল। মা, বাপ, বোনের নিকট শান পাহাড়ে যাইবার অনুমতি চাহিল। তাহারা দুঃখিত মনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমতি দিল। মা বাপ বড় কাঁদিল। অশ্রুজল এবং বিষাদ-সঙ্গীতের মাঝে ভাই-বোন্ পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিল। ভাই চলিয়া গেল তাহার স্বপ্ন-রাজ্যে।

তার পরের দৃশ্য।—শান দেশের রাজার মনোদুঃখে দিন কাটে। তাঁহার একটী মাত্র মেয়ে, তাঁহার রাজত্বের কি হইবে? একদিন শান-রাজকুমারী তাঁহার বাগানে মনের আনন্দে নাচ, গান, খেলা করিতেছিল, এমন সময় সওদাগরদের সঙ্গে সেই ভাইটী সেখান দিয়া যায়। উভয়ে উভয়কে দেখে আর দেখে, কেবল দেখে! চোখে তাদের পলক পড়ে না! জগৎ তাহারা ভুলিয়া যায়! আনন্দে তাহারা নাচে গায়! প্রথম দর্শনেই তাহারা মজিল। শান-রাজ আসিলেন, দেখিলেন, ভাবিলেন, শেষে যুবককে পছন্দ করিলেন, তাহাকে উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

ইতিমধ্যে তেটনে বোনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। এক দেবতা, তাহার পূর্ব্বজন্মের ভাই, স্বপ্নে দেখা দিয়া স্নেহের চিহ্নস্বরূপ তাহাকে এক জোড়া কানের হীরার ফুল দিয়া গেলেন। সে কোন ভাল দিনে পরিবার জন্ত ইহা সযত্নে রাখিয়া দিল। একদিন রাজা পথ দিয়া যাইবার সময় হঠাৎ এক বাতায়নের পাশে এই ফুল-সুন্দরীকে দেখিয়া মোহিত হইলেন। হঠাৎ একদিন রাত্রিতে রাজা তাহাকে রাণী করিয়া লইয়া গেলেন। আজ তাহার পক্ষে একটা মহাদিন। সেই রাত্রে রাজার শয়ন-কক্ষে একা বসিয়া বসিয়া সে ভাবে, আজ সে রাজরাণী, সৌভাগ্যের অন্ত নাই তাহার। কত রকম করিয়া সে রাজার কথা ভাবিতে থাকে, তিনি রাজা আর আমি কি; আচ্ছা, সত্যই কি রাজা আমায় ভালবাসিতে পারিবেন? তাহার মনে পড়ে ভাইকে। সে ভাবিতে থাকে কোথায় তাহার ভাই, কি সে করিতেছে, আর কি সে আসিবে না, সে কি বাঁচিয়া আছে? রাজ-রাণী হওয়ার যে সুখ তাহা মুহূর্ত্তে দূর হইয়া যায়। তাহার কিছু ভাল লাগে না। সে ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। তাহার দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে চোখের জল নীরবে ঝরিয়া পড়ে! তার পর রাজার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া বহু যত্নে সঞ্চিত সেই হীরার ফুল দুইটী কানে পরিয়া অবসন্ন দেহে এক সময় বিছানায় ঢলিয়া পড়ে। দেখিতে দেখিতে তাহার আকৃতি হইয়া গেল এক রাক্ষসের। কানের ফুলেরই ছিল এই গুণ। যে দেবতা তাহাকে ইহা দিয়াছিলেন তাঁহারও জানা ছিল না এই গুণের কথাটা। রাজা আসিয়া দেখেন তাঁহার বিছানায় শুইয়া এক রাক্ষসী। তিনি ভাবিলেন, মায়াবিনী রাক্ষসী নারীর রূপ ধরিয়া রাণী হইয়াছে তাঁহার রাজত্ব ছারখার করিতে। তিনি রাগ করিয়া হুকুম দিলেন—রাণীকে মারিয়া ফেল। রাজার সব চেয়ে বেশী রাগ গিয়া পড়িয়াছিল রাণীর পালক পিতার উপর। কারণ, তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল যে, সে জানিয়া শুনিয়া এই রাক্ষসীকে তাঁহার রাণী করিয়াছিল। তাহার প্রতি হুকুম হইল, তাহাকে নিজ হাতে মেয়েকে মারিতে হইবে।

দুই

পরদিন ভোরে রাণীকে ভেলভেট-এর থলিয়ায় পুরিয়া একস্থানে লইয়া যাওয়া হইল। সৈন্তরা পিতাকে হুকুম করিল—লাঠিপেটা করিয়া রাণীকে মারিয়া ফেল। পিতা যার পর নাই উৎপীড়ন সত্ত্বেও অস্বীকার করিল। কিন্তু যখন মেয়ের অনুরোধ আসিল শীঘ্র তাহার যন্ত্রণার শেষ করিয়া দিতে, তখন নিরুপায় পিতাকেই সেই নৃশংস কাজও করিতে হইল। করুণ গান করিতে করিতে রাণীর শেষ নিঃশ্বাস পড়িল। বাপ কাঁদিল বুকফাটা কান্না। সৈন্তদের বুক ভাসিল অশ্রুজলে। রাণীর মৃতদেহ বুকে করিয়া এক কাঠের ভেলা ভাসিয়া চলিল নদীর স্রোতে। এই ছিল রাণীর শেষ অনুরোধ। তারপর একদিন রাজার শেষ নিঃশ্বাসের মর্ম্মান্তিক বেদনা বুকে করিয়া শূন্তে উঠিল এক ফায়া। ফায়ার চূড়ার ছোট ছোট ঘণ্টাগুলি মৃদু বায়ুতে দুলিয়া দুলিয়া বড় করুণ সুরে বাজিত নিশিদিন—টুং টুং টুং! সে সুরে ছিল যেন রাণীর শেষ গানের বিষাদ-সঙ্গীত! সে সুর গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ছড়াইয়া পড়িত দিক্-দিগন্তে!

ভেলা চলে ভাটি হাল্‌কা হাওয়ায় ধীরে ধীরে নদীর বুকে। ছোট ছোট ঢেউগুলি রাণীর অঙ্গ না ছুইয়া আছাড় খাইয়া পড়ে এদিকে ওদিকে। ভেলা যায় এক বনের পাশ দিয়া। বনদেবতা ধরিলেন রাণীর ভেলা, তুলিয়া রাখিলেন নদীর কিনারায়।

এদিকে ভাই বসিয়াছে শানদেশের সিংহাসনে। বোনের প্রেতাত্মা গিয়া তাহাকে দেখা দিল। ভাই পাগল হইয়া ছুটিল বোনকে দেখিতে। সঙ্গে চলিল শুধু একজন মন্ত্রী। বনদেবতা তাহাকে অলক্ষ্যে নিয়া আসিলেন সেই বনে, যেখানে তাহার বোনের মৃতদেহ আজও রহিয়াছে সেই থলিয়ার মধ্যে। বোনের মৃতদেহ দেখিয়া দুঃখে সে ম্রিয়মাণ

হইল। ভেলভেটের থলিয়া দেখিয়া ঘটনা সে অনুমান করিয়া লইল। প্রতিজ্ঞা করিল, ইহার প্রতিশোধ লইবে। মন্ত্রীকে পাঠাইল শান সৈন্য লইয়া আসিতে। বোনের মৃতদেহ সম্মুখে করিয়া ভাই বড় কাঁদিল। কত মৃত্যুর গান গাহিল।

মন্ত্রী শান সৈন্য লইয়া ফিরিয়া আসিলে ভাই সসৈন্যে ভেটনের দ্বারে গিয়া হানা দিল। ভেটনের রাজাও সৈন্য লইয়া বাহির হইল। উভয় সৈন্য যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া মুখামুখী দাঁড়াইয়াছে, তখন বোনের প্রেতমূর্ত্তি সে দৃশ্যে উপনীত হইয়া শান্তি স্থাপন করিল। স্বামী এবং ভাই-এর নিকট হইতে কথা আদায় করিল, ভবিষ্যতে তাহারা যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া আর শান্তিভঙ্গ না করে। তারপর প্রেতলোকের নাচ নাচিয়া গান গাহিয়া সে চলিয়া গেল। গানে সে তাহার জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনী বলিয়া গেল, তার জন্য দোষ দিল তাহার পোড়া অদৃষ্টের!

নাটকের একটী দৃশ্যের মর্ম্মানুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল :—

বধ্যভূমি

রাণী, তাঁহার পালক পিতা (নগরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি) এবং নগরের শাসনকর্ত্তার প্রবেশ।

রাণী (গান করিয়া)—এই বয়সেই আমার মৃত্যু হবে কেন বাবা? বেশীদিন ত আমি প্রাসাদে হেসে গেয়ে বেড়াই নাই যে এত শীঘ্র আমাকে মরতে হবে! এই পৃথিবীর খেলা ত বেশীদিন আমি খেলি নাই যে, এমন হঠাৎ আমাকে চলে যেতে হবে বাবা! জীবনটা কেমন বিশ্রী, নয়? আমার স্বামী রাজা—নিষ্ঠুর, নয়?

বাবা! বাবা! তোমাকে নিজ হাতে তোমার প্রিয়তম কন্যাকে হত্যা করতে হবে! তুমি হবে আমার জল্লাদ! বাবা তুমি ভয় পেও না আমাকে মেরে ফেলতে। ওরা ত আমায় মারবেই যেমন ক'রেই হউক। গ্রাহ্য করি না আমি। কিন্তু তোমার নিজের জীবনের কথাটা একবার ভেবো!

পিতা। হায় রে আমার হতভাগ্য সন্তান! কেমন করে আমি এমন সুন্দর অস্ফুটন্ত কোমল গোলাপের অঙ্গে আঘাত করব? কেমন করে এমন অমূল্য রত্নকে দূরে ফেলে দেবো? মা! মা! কি করেছি আমরা যার জন্য এত শাস্তি আমাদের? রাজা যখন তোমায় বিয়ে করতে চাইলেন, আমি হাতে যেন স্বর্গ পেলাম এই ভেবে যে, তুমি হবে আমার রাণী! তখন কি জানতাম যে এত বড় সৌভাগ্য এত শীঘ্র এমন দুর্ভাগ্যে পরিণত হবে? মা! স্নেহের দুলালি আমার! হাতের শৃঙ্খলটা কি তোর নরম হাতে বসে যাচ্ছে না? উঃ—নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর রাজা!

শাসনকর্ত্তা। বন্ধো! রাজার হুকুম আমাকে অবিচ্ছিন্ন তামিল করতে হবে। আপনাকেই রাণীকে হত্যা করতে হবে। আমাকে শুধু আমার কর্ত্তব্য পালন করতে হবে। এই সবুজ ভেলভেট থলেটায় আপনার মেয়ের কন্যাকে পুরে ফেলুন, তার পর তার মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত লাঠির আঘাত করতে থাকুন!

রাণী। বাবা! পায় ধরি তোমায়, আমার যন্ত্রণা আর বাড়িয়ে তুল না। বাবা! জ্ঞান হারায়ে ফেলছি আমি। শোন বাবা, তোমার মেয়ের মরণকালের ইচ্ছা। আমি যখন মরে যাব তখন আমার দেহটাকে একটা ভেলায় করে ভাসিও দিও গাঙ্গে! লোকেরা ভেলাটাকে দেখবে আর আমার কথা ভেবে চ'খের জল ফেলবে! আর এখানে ঠিক এই স্থানটিতে যেখানে তোমাকে এবং আমাকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে নির্য্যাতিত হ'তে হ'ল, সেখানে একটা ফায়া গ'ড়ে তুল, লোকেরা দেখে' আমাকে স্মরণ করবে এবং আমার জন্য দুঃখ করবে। আমি তাদের সকলেরই সহানুভূতি চাই, আরো চাই তারা যেন আমার দুঃখময় জীবনের বিয়োগান্ত দৃশ্যটি মনে রাখে। আমার ইচ্ছা তারা জানুক, নিষ্ঠুর রাজা তার মণি চেনে না।

বাবা! আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি! বাবা! বাবা! কোথায় তুমি? শীঘ্র আমায় মরতে দাও! ভেলভেট থলেটাতে আমায় প্রবেশ করতে দাও!

[রাণীকে থলিয়ার মধ্যে রাখা হইল।]

তিন

শাসনকর্ত্তা। সায়া! সায়া! আপনার কর্ত্তব্য করুন। এই নিন লাঠি। ধরুন্—ধরুন্! কিন্তু মরবার পূর্ব্বে রাণীকে ত প্রাসাদের দিকে মুখ ক'রে তিন বার নত মস্তকে প্রণাম করতে হবে। মৃত্যুর হুকুম-পাওয়া সব বন্দীদেরই এই রীতি।

[রাণীকে থলিয়ার বাহিরে আনা হইল।]

রাণী। (প্রাসাদের দিকে প্রণত হইয়া) রাজা! আমি তোমায় ভালবাসি না, আমি ঘৃণা করি তোমায়, কখনো তোমায় ক্ষমা করবো না। পর জন্মেও তোমায় ঘৃণাই করবো।...উঃ!...না না রাজা, তোমার রাণীর প্রতি তোমার হৃদয় কঠিন হ'লেও, সে তোমায় ক্ষমাই করে যাচ্ছে।

পিতা। মা! মা! স্নেহের দুলালি আমার! আমি তোকে কি ক'রে হত্যা করব?

রাণী। বাবা! স্নেহভরা বুক তোমার, ওকথা আর ভেব না তুমি, শীঘ্র আমার সব যন্ত্রণার শেষ ক'রে দাও!

শাসনকর্ত্তা। না না আর কথা নয় রাণী! শোকে দুঃখে আমার অন্তর শুকিয়ে উঠেছে, দুর দুর করে কাঁপছে! কিন্তু

—কিন্তু তবুও আমাকে আমার রাজাকে মান্য ক'রে চল্‌তেই হ'বে।

[রাণীকে পুনরায় থলিয়ার মধ্যে রাখা হইল]

রাণী। হায়! নিষ্ঠুর জীবন! হায়! নিষ্ঠুর প্রেম! কোথা আমার ভাই? তাকে একবার দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু হায়! কোথা সে? এখানে সে নাই কেন? বাবা! বাবা! আমার জ্ঞান লোপ পাচ্ছে। বাবা! শীঘ্র শীঘ্র এই যন্ত্রণা থেকে আমায় মুক্তি দাও।

পিতা। বিদায় স্নেহময়ী মা আমার, বিদায়—বিদায়! ভেলা করে তোমার দেহ ভাসিয়ে দেব নদীর জলে। কায়া গড়ব, তোমার সব ইচ্ছাই আমি পূর্ণ করব! কিন্তু হায় আমার প্রিয়তম সন্তানকে হত্যা কর্‌তে হবে আমাকে—নিজ হাতে! উঃ! উঃ!—

শাসনকর্ত্তা। সায়া! রাজার আদেশমত কাজ করুন। যন্ত্রণার হাত থেকে আপনার সন্তানকে শীঘ্র উদ্ধার করুন।

পিতা। বিদায় মা, বিদায়!

[সে লাঠির আঘাত করে]

রাণী। (ক্ষীণকণ্ঠে) আঃ আঃ—উঃ উঃ—বড় অ-অ যন্ত্রণা···বাবা! বাবা! কোথা তুমি? ভাই কোথা আমার ভাই? রাজা? কোথা রাজা? বাবা! বা—আ—আ—

[মৃত্যু]

রাণীর শোচনীয় মৃত্যুর পর আর কলম অগ্রসর হইতে চায় না। তবু জোর করিয়াই একটু বলিতেছি। এই দৃশ্যটি পৃথিবীর জাতীয় নাট্যসাহিত্যের সহিত তুলিত হইলে খুব নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে কি? অথচ ইহা রচিত হইয়াছিল কোন্ যুগে ব্রহ্মদেশে।

১। কায়া—প্যাগোডা। বুদ্ধদেবকেও বুঝায়।
২। ভেল্‌ভেটের থলিয়া···প্রথানুযায়ী ব্রহ্মের রাজবংশীয় কাহাকেও রাজাদেশে হত্যা করিতে হইলে তিনটি উপায়ে ইহা করা হইত—জলে ডুবাইয়া, আগুনে পোড়াইয়া অথবা ভেল্‌ভেটের থলিয়ায় পুরিয়া লাঠির আঘাত করিয়া। রাজবংশের পবিত্র শোণিত যেন বধ্যভূমিতে পতিত না হয়]
৩। সায়া—সম্ভ্রমসূচক সম্বোধন।

সাসানীয় যুগের শিল্প ও সংস্কৃতি

শ্রীগুরুদাস সরকার

খসরু পার্‌ভেজ ও সাসানীয় যুগের অবসান

(খৃঃ অঃ ৫৯০-৬৪২)

হরমুজদের উত্তরাধিকারী তৎপুত্র দ্বিতীয় খসরু, পার্‌ভেজ অর্থাৎ বিজয়ী নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী সবিস্তারে উল্লেখ না করিলে পারস্যের শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কি স্থাপত্যে, কি ভাস্কর্য্যে, কি উদ্যান রচনায়, ইহার সকল কিছুতেই তাঁহার যশঃ অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। রূপসী শিরীণের সহিত তাঁহার প্রণয়ব্যাপার মুসলমানযুগের পারসীক চিত্রকলায় নানান ছাঁদে অঙ্কিত হইয়াছে। ইতিহাসের খসরু কাব্যের খসরু হইতে বিভিন্ন, কিন্তু ইতিহাসের দিক দিয়া আলোচনা না করিলে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না।

দ্বিতীয় খসরু শুধু যে তাঁহার পিতার বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, হয়তো কতকটা বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে যে পিতৃহত্যায় সহায়তা করিতে হইয়াছিল, ইহা মিথ্যা নহে, কিন্তু ইহাতেও অন্তর্বিদ্রোহের প্রশমন হইল না। বিখ্যাত সেনাপতি তুর্ক-বিধ্বংসী বাহরাম্ চুবিন্ স্বয়ং রাজমুকুট ধারণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। খসরুকে পারস্য হইতে পলায়ন করিয়া রোমক সম্রাটের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। সম্রাট মরিসের (Maurice) বিপুল বাহিনী খসরুর সাহায্যার্থে প্রেরিত হওয়ায় প্রজাপুঞ্জ দলে দলে আসিয়া তাঁহারই পক্ষ অবলম্বন করিল। পারসীক কাব্যে রোমক সম্রাট খসরুকে কন্যাদান করিয়াছিলেন একথারও উল্লেখ আছে কিন্তু প্রামাণিক ইতিহাসে ইহার সত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। কাব্যগ্রন্থে উক্ত, মরিয়ম নাম্নী খসরুর প্রধানা রাজ্ঞী, যে রোমক রাজকুল-সম্ভূতা ছিলেন তাহা প্রমাণসাপেক্ষ বলিয়াই মনে হয়।

ইতিকথার বৃত্তান্ত হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বাহরাম্ চুবিন্‌কে পরাভূত করিতে খসরুকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। বোধ হয়, তিনি এই যুদ্ধে অস্ত্রের জন্যই শত্রু-কবল হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। সাহনামার বর্ণনা মতে বাহরাম্ চুবিন্ ছিলেন ভীমকায় মহাবলী (১)। তিনি খড়্গাঘাতে রোমক সেনানীর দেহ আবক্ষ দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিতেই রোমক সৈন্যদলের সাহস ও উদ্যম একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল। খসরু তাহাদিগের এই মানসিক অবসাদ ও পরাহত মনোভাব লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে পরদিন যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যাইতে পরামর্শ

(১) সাহ্‌নামা গ্রন্থের পুস্তক চিত্রেও চুবিন্ এই ভাবেই মূর্ত্ত হইয়াছেন।

দিলেন। ইতিকথায় বর্ণনামতে চুবিন রণস্থলীতে একাকী আগমন করিয়া শত্রুব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন কিন্তু তাঁহার বাহনটি হঠাৎ কোনও অব্যর্থসন্ধ ধানুকীর তীরে আহত হইয়া ভূপতিত হইল। তখন অসিচর্ম্ম ধারণ করিয়া সেই বিরাট-দেহ বীর যেন তৃণের ন্যায় শত্রুসৈন্য মথিত করিয়া একাই পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পরে একটি অশ্ব সংগৃহীত হইলে তদুপরি আরূঢ় হইয়া সম্রাটের অভিমুখে গমন করিতেই খসরুর শরীররক্ষী সৈনিকগণ সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। সাহ পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া শৈলশীর্ষে আরোহণ করিলেন—তাঁহার আর গত্যন্তর ছিল না। তাঁহার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া ভগবান হর্মুজ্‌দ্ স্রুষ নামক দেবদূতকে তৎসন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। শ্বেত অশ্বে সমারূঢ় হরিৎ পরিচ্ছদধারী স্বর্গদূতের দিব্যমূর্ত্তি দর্শনে, চুবিন্ ঐশী শক্তি তাঁহার বিপক্ষে এ-কথা বুঝিতে পারিয়া, নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন (১)। যুদ্ধে তাঁহার সৈন্যদল পরাভূত হইল, তাঁহার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া গেল। পুরাকাহিনীর এ-বৃত্তান্ত ইতিহাস বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না কিন্তু এ-কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, এ-জগতে জয়-পরাজয়, উন্নতি ও অবনতি সকলই যে ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন, প্রাচ্যদেশীয় মানব এ-বিশ্বাস কাব্যে ও কাহিনীতে ধর্ম্মগ্রন্থের ও রূপকথার সাহায্যে চিরকালই প্রচার করিয়া আসিয়াছে। রোমক শক্তি যে ভগবান হর্মুজদ্ প্রদত্ত দৈবীশক্তি অপেক্ষাও অধিক কার্য্যকারী হইয়াছিল, মুসলমান যুগের পারসীক কবিও এ-কথা স্বীকার করিতে সম্মত ছিলেন না। ইহাও সত্য বটে যে, পারসীকেরা চিরকালই জাতীয়তাগর্ব্বে গর্ব্বিত। বৈদেশিক শক্তির সাহায্যেই পারসীক সম্রাট পৈতৃক সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এ-কথা স্বীকার করিলে যে জাতীয় গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়, পারসীক জাতির উচ্চশির অবনমিত হইয়া পড়ে! যাউক সে-কথা।

সম্রাট মরিসের এ-উপকার খসরু বিস্মৃত হন নাই। হত্যাকারীর হস্তে মরিস্ প্রাণ হারাইলে পর, খসরু উহার প্রতিশোধ লইবার জন্য যুদ্ধে নিরত হইয়াছিলেন। তৎকালীন রোমক সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলতা হয় তো তাঁহার জয়-পিপাসা উদ্রিক্ত করিয়া থাকিবে। এই প্রথম রোমক যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া খসরুর সমরাভিযান বারত্রয় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল যথাক্রমে ৬০৮ খৃঃ অব্দে, ৬১৫ খৃঃ অব্দে ও ৬২৬ খৃঃ অব্দে। কোনও ঐতিহাসিকের মতে প্রথম অভিযান প্রকৃতপক্ষে আরব্ধ হয় ৬০৩ খৃঃ অব্দ হইতে। প্রথম যুদ্ধে খসরুর সৈন্যদল কন্স্তনতুনিয়ার (কন্‌ষ্টান্টিনোপলের) অপর পারে অবস্থিত চাল্‌কিডনে (Chalcidon-এ) প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। লুণ্ঠনবিধ্বস্ত সিরিয়া-প্রদেশে পারস্যের রাজশক্তি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই। খসরুর প্রথম পরাজয় ঘটে জুবার যুদ্ধক্ষেত্রে। এ-যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ৬১০ খৃঃ অব্দে সায়বানি নামক আরব-গোষ্ঠীর (clan-এর) সহিত। বিজয়শ্রী তখনও পারসীকগণের প্রতি বিমুখ হন নাই। পারসীক সৈন্য সিরিয়ার রাজধানী আন্তিওক (Antioch) লুণ্ঠন করে ৬১১ খৃঃ অব্দে, আর ৬১৪-৬১৫ খৃঃ অব্দে খসরুর সৈন্যবাহিনী জেরুসিলাম অধিকার করিতে সমর্থ হয় বাসিন্দা ইহুদীদিগেরই সহযোগিতায়। দামাস্কাস্ ইহার পূর্ব্বেই (৬১৩ খৃঃ অব্দে) পারসীক হস্তে নিপতিত হইয়াছিল। খসরু জেরুসিলাম জয় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, খৃষ্টিয়ানদিগের পরম পবিত্র

শিরীণ দ্বিতলের ছাদ হইতে দুই বাহু বাড়াইয়া অভ্যর্থনা করিতেছেন

(১) খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর একখানি সাহনামা পুঁথিতে এতদ্বিষয়ক সুন্দর চিত্র অঙ্কিত আছে। উহাতে মোজলযুগের পিঠভূমিকায়, পরবর্ত্তী কালের কোনও চিত্রকর একটি পানচাকী (water mill) আঁকিয়া দিয়া কৌতূহলের সৃজন করিয়াছেন।

প্রতীক, পবিত্র ক্রুশটিও (Holy Cross), জেরুসিলাম হইতে টেসিফুনে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ খৃষ্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, এই ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াই প্রভু যীশু দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন।

৬১৯ খৃঃ অব্দে মিসর দেশ অধিকৃত হইলে মিসরের রাজধানী বিখ্যাত সেকেন্দ্রিয়া (Alexandria) নগরী পারসীক সৈন্যের হস্তগত হয়। দেশ-বিদেশে এইরূপ জয়লাভ করিয়া খসরু "সমর-বিজয়ী" আখ্যা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার এ-গৌরব স্থায়ী হয় নাই। ৬২২ হইতে ৬২৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রোমকগণের সহিত যে যুদ্ধ হয় তাহাতে সর্ব্বত্রই পারসীকদিগের পরাভব ঘটে। ৬২৩ খৃঃ অব্দে রোমকদিগের নিকট পরাজিত হইয়া খসরু যে পশ্চাদপসরণ করিলেন, ইহার পর আর তিনি তাহাদিগকে নিজবশে আনয়ন করিতে সমর্থ হন নাই। উপর্য্যুপরি একটির পর একটি আঘাতে পারসীকেরা ক্রমেই হীনবল হইয়া পড়িল। সেনাপতি সাহ্‌বরজ, সরস নদীতটে পরাভূত হইলেন, রোমকেরা অজুরবৈজানে প্রবেশ লাভ করিয়া সেখানকার বিখ্যাত অগ্নি-মন্দির ধ্বংস করিয়া ফেলিল। ৬২৭ খৃঃ অব্দে টাইগ্রীস নদ-বিধৌত প্রদেশগুলি সমগ্ররূপেই রোমকদিগের আয়ত্তাধীনে আসিয়া পড়িল। যুদ্ধবিশারদ হিরাক্লিয়াসের (Heraclius-এর) বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার শক্তি আর পারস্য সম্রাটের ছিল না। টেসিফুনের সপ্তত্তি (৭০) মাইল উত্তরে, দস্তাগির্দ নামক সম্রাটের যে আবাস-স্থান অবস্থিত ছিল, ৬২৭ খৃঃ অব্দে তাহা আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইলে পর খসরু টেসিফুনে (Ctesiphon-এ) পলায়ন করিলেন। নিনেভের সান্নিধ্যে ১২ই ডিসেম্বর তারিখে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে পারসীক সেনাপতি প্রাণ হারাইলেও সৈনিকগণ ছত্রভঙ্গ হয় নাই। পলায়ন না করিলে সম্রাট খসরু হয় তো নিজ সিংহাসন রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন কিন্তু অদৃষ্টকে কে বঞ্চনা করিতে পারে? অর্থগৃধ্নুতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার জন্য খসরুর কুখ্যাতি রটিয়াছিল, এ-কারণ অনেকেরই মন তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিল। রাজার এই কাপুরুষোচিত পলায়ন ধূমায়িত অসন্তোষবহ্নিতে যেন নূতন ইন্ধনসংযোগ পাইয়া যোদ্ধৃবর্গ ও অভিজাতবংশীয় অনেকেই প্রকাশ্য রাজদ্রোহে লিপ্ত হইল। এমন কি, খসরুর একটি পুত্রও তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে দ্বিধা বোধ করিল না। অসহায় খসরু অবশেষে শত্রুহস্তে নিপতিত হইলেন। ইহা ৬২৮ খৃঃ অব্দের কথা। তাঁহার পরম স্নেহাস্পদ পুত্রগণ একে একে তাঁহারই সম্মুখে হত্যাকারীর হস্তে প্রাণ হারাইলেন। যে-পুত্রটি সিংহাসনের ন্যায্য উত্তরাধিকারী, সেও রক্ষা পাইল না। হৃত-সিংহাসন রাজাকে কারাগৃহে অবরুদ্ধ থাকিয়া অনেক প্রকার নিষ্ঠুর নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইল। কোথায় রহিল বিজয়-গৌরব, কোথায় রহিল সেই অতুল ঐশ্বর্য্য—যে ঐশ্বর্য্যের কথা এখন প্রায় রূপকথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাঁহার সেই সহস্রসংখ্যক হস্তী, পঞ্চদশ সহস্র অশ্ব ও উষ্ট্র, মণিমণ্ডিত রত্নসিংহাসন যাহার পদগুলিও মাণিক্যে গঠিত ছিল (composed of rubies), অন্তঃপুরের সেই দ্বাদশ সহস্র রূপসী, কোন কিছুই আর কাজে আসিল না, চিরায়মান মর্ম্ম-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া খসরু মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন (খৃঃ অঃ ৬২৮)। কথিত আছে যে, তাঁহার বিদ্রোহী পুত্র দ্বিতীয় কোবাদই খসরুকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার প্রাণ নাশ করেন। কালচক্রের আবর্ত্তনে পিতৃহন্তারক খসরু নিজ পুত্রের চক্রান্তেই প্রাণ হারাইলেন, সমগ্র পারস্যের একচ্ছত্র সম্রাটের ইহলীলা এইরূপ শোচনীয় ভাবেই সম্বৃত হইল। ইতিকথামূলক পারসীক কাব্যে খসরুর পিতৃঘাতী পুত্রের নাম শিরায়া অথবা শিরো বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, খসরু রাজ্য ও প্রাণ হারাইয়াছিলেন শাসনকার্য্যে দক্ষতা ছিল না বলিয়া। এ জগতে সফলতা লাভ না করিলে সকলকেই এরূপ অপযশের ভাগী হইতে হয়। রোমকদিগের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে পারস্যের শক্তিক্ষয়ই এই অধঃপতনের মূলীভূত কারণ বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

খসরু দার্শনিক তত্ত্ববিষয়ে কৌতূহলী ছিলেন বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন কিন্তু জীবনের কঠিন পরীক্ষায় দার্শনিক তত্ত্ব অনেক সময়েই নিষ্ফল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। লোকমুখে প্রচারিত হইয়াছিল যে,তিনি প্লাতুন্ (প্লেটো) ও অ্যারিষ্টটলের (Aristotl-এর) দার্শনিক তত্ত্বের সহিত বাল্যাবধিই পরিচিত ছিলেন। তাঁহার এ খ্যাতি কন্‌স্তান্তিনোপলেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সম্রাট জাষ্টিনিয়ান (Justinicen) এথেন্সের দর্শনশাস্ত্র অনুশীলনের প্রধান কেন্দ্র—তত্রস্থ একাডেমী (Academy) নামক বিদ্যাপীঠ বন্ধ করিয়া দিলে কিয়ৎসংখ্যক দার্শনিক পণ্ডিত খসরুর রাজ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, খসরুর দার্শনিক তত্ত্বে অধিকার ও দার্শনিক তত্ত্ব-চিকীর্ষা সম্বন্ধে যে সকল কথা পূর্ব্বে তাঁহাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইউরেনিওস্ নামক সিরিয়াবাসী কোনও স্বল্পশিক্ষিত পণ্ডিতবেশী প্রতারক দার্শনিক তত্ত্বের পরিভাষা চাতুর্য্যের সহিত প্রয়োগ করিয়া খসরুকে বিমুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে প্রকৃত পাণ্ডিত্যের যে উপযুক্ত সমাদর হইবে না, তাহা সহজেই অনুমেয়। "দর্শনে আদি কারণ" নামক ল্যাটিন ভাষায় লিখিত একখানি নিতান্ত প্রাথমিক শ্রেণীর (rudimentary) দার্শনিক গ্রন্থ খসরু পারস্যের লেখনীনিঃসৃত বলিয়া পরিচিত। ইহাতে নাকি চিন্তাবত্তার বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। মোটের উপর বুঝা যায় যে,খসরু এক সময়ে, কতকটা যেন পরিবেশ প্রভাবেই, দার্শনিক তত্ত্ব-বিচারে

আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং শুধু বিদ্যোৎসাহী বলিয়া নয়, পণ্ডিত বা বিদ্বানরূপে পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতেন।

মহারাষ্ট্ররাজ দ্বিতীয় পুলকেশিন্, যাঁহার নাম মুসলমান ঐতিহাসিক পুরুমেশরূপে রূপান্তরিত করিয়াছেন, খৃঃ অঃ ৬২৫ অব্দে খসরু ও তাহার পুত্রগণের জন্য উপঢৌকনসহ দূতবৃন্দ প্রেরণ করিয়াছিলেন। এ ঘটনা ঘটিয়াছিল খসরুর ৩৬ রাজ্যাব্দে (১)। তাবারির গ্রন্থে বর্ণিত আছে (২) যে, শিরো নামক খসরুর উত্তরাধিকারী (মনে হয়, এ নামটি কোবাদেরই নামান্তর হইবে) একটি হস্তী, একখানি তরবারি, একটি শ্বেত-বর্ণ শ্যেনপক্ষী ও ভারতীয় কিংখাব বস্ত্র (brocade) উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৬২৬ খৃঃ অব্দে পুলকেশিনের রাজসভায় পারসীক দূতগণের আগমন ঘটে। দুইজন বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক (৩) এ দৌত্যের চিত্র অজন্তার একনম্বর গুহায় অঙ্কিত রহিয়াছে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন এবং ডাঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথও এই মতই সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু ফরাসী পণ্ডিত গলুবে (Goloubeu) ও আচার্য্য ফুসে (Foucher) চিত্রটির বিষয়বস্তু বৌদ্ধজাতক-কাহিনী হইতে গৃহীত এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

এক নম্বর গুহা ষষ্ঠ শতাব্দীতে ক্ষোদিত ও চিত্রিত হইয়াছিল—আধুনিক গ্রন্থে এ অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। এ অনুমান সত্য হইলে সপ্তম শতাব্দীর ঐতিহাসিক ঘটনা ১নং গুহায় স্থান পাওয়া সম্ভব নয়। চিত্রান্তর্গত মূর্ত্তিগুলি পারসীকদিগের বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। এগুলি শকজাতীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিকৃতি হইতেই বা বাধা কি? শুধু প্রথম নম্বর গুহা বলিয়া নয়; অজন্তার দ্বিতীয় নম্বর গুহার কোন কোনও চিত্রেও ইরাণীয় প্রভাব আরোপিত হইয়াছে। শক সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইলে 'ক্ষত্রপ' উপাধিধারী শক শাসনকর্ত্তৃগণ মোগল সাম্রাজ্যের শেষ সময়ের সুবাদারগণের ন্যায় স্বাধীনতা লাভ করেন। অনুমিত হইয়াছে খৃঃ ৩৮৮ হইতে ৪০৯ অব্দের মধ্যে মহাক্ষত্রপ রুদ্রসিংহের অধিকার গুপ্ত-সাম্রাজ্যভুক্ত হয় (১)। ইঁহাদের রাজ্য পশ্চিম ভারতে অবস্থিত ছিল, সুতরাং ষষ্ঠ শতাব্দীর এই গুহা দুইটিতে শক-দিগের অবয়ব-আকৃতি চিত্রে বিন্যস্ত হওয়া অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। এক শতাব্দীর মধ্যেই কিছু পরাক্রান্ত শক-জাতির অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত তাঁহার ভারতীয় শিল্প বিষয়ক গ্রন্থে (২) লিখিয়াছেন যে, এই দুই গুহার (১নং ও ২নং গুহার) চিত্রগুলিতে "ইরাণীয় প্রভাব প্রতীত হয়"। আমরা অজন্তার গুহার চিত্রাবলী দর্শন কালে সর্ব্বত্র যে "প্রাণপ্রদ রূপ" ও যে 'ভাবাভিনিবেশ' লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহা ভারতীয় চিত্র-কলারই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে হইয়াছিল।

নিজামরাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গোলাম ইয়াজ্দানী নিজাম সরকার হইতে প্রকাশিত তৎপ্রণীত

শিরীণ চৈনিক ভঙ্গীতে গ্রীবা বাঁকাইয়া গবাক্ষসান্নিধ্যে দণ্ডায়মানা, অশ্বারূঢ় খসরু তাঁহার দুর্গদ্বারে।

অজন্তাগুহার চিত্র বিষয়ক পুস্তকে ১নং গুহায় খসরু ও শিরীণের চিত্র আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এ পরিচিতি গৃহীত হইলে নৃপতি খসরু ও রাজ্ঞী শিরীণের ইহাই প্রাচীনতম চিত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। চিত্রে রাজ্ঞী রাজার স্কন্ধ-দেশে বাহু রক্ষা করিয়া উপবিষ্টা। পার্শ্বে একজন পরিচারিকা একটি মধুপাত্র (আসবপাত্র) ধারণ করিয়া আছে। স্থালকের (থালীর) ন্যায় একটা পাত্রে করিয়া একব্যক্তি রাজা রাণীকে কি যেন দেখাইতেছে। তাক্-ই-বোস্তানের খোদিত

(১) Vincent A. Smith's Early History of India, 3rd Edition, p. 426.

(২) Tabari, Edition Noldke. 371 ft, J. R. A. S. N. S. XI.

(৩) ফার্গুসন (Fergusson) ও বুলার (Buller) ১ নম্বর ও ২ নম্বর গুহা সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছে।

(১) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গলার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৫১।

(২) ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা, পৃঃ ৮৩।

চিত্রে তিনটী মূর্ত্তির মধ্যে পুরুষমূর্ত্তি দুইটি যথাক্রমে নৃপতি খসরুর এবং অগ্নি উপাসক সম্প্রদায়ের জনৈক পুরোহিতের (Magi-র), এবং স্ত্রী মূর্ত্তিটি স্থানীয় প্রবাদ মতে শিরীণের চিত্র বলিয়াই সাধারণে। পরিচিত। সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কোনও অজ্ঞাতনামা পারসীক কবিও শিরীণের প্রতিমূর্ত্তি সম্পর্কে এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞগণ কিন্তু ইহার সমর্থন করেন নাই। তাঁহারা উহা দেবী অনাহিতের মূর্ত্তি বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন (১)।

পারস্যের মধ্যযুগ খৃঃ অঃ সপ্তম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই সাত শতাব্দীর মধ্যে পারসীক শিল্পে শিরীণের কোনও চিত্র পরিকল্পিত হইয়াছিল এরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। শ্রীযুক্ত ইয়াজদানীর চিত্রপরিচিতির ইহাই প্রধানতম অন্তরায় বলিয়া মনে হয়।

মুসলমান যুগের চিত্রশিল্পীর তুলিকাসম্ভূত সম্রাট দ্বিতীয় খসরুর প্রাচীনতম চিত্র পাওয়া গিয়াছে ওমিয়া (Omayyed) বংশীয় খলিফাদিগের রাজত্বকালে (২) নির্ম্মিত "কুসেইর অম্রা" (Qusayr Amra) প্রাসাদে। এ স্থানটি মরুসাগরের (Dead Sea'র) উত্তর সীমার পূর্ব্বভাগে, জর্দ্দন (Jordan) নদীর অপর পারে, মরুমধ্যে অবস্থিত। এখানকার একটি ভিত্তি-চিত্রে মুস্লিমধর্ম্ম-বিরোধী ছয় জন নৃপতির মধ্যে খসরুর চিত্রও স্থান পাইয়াছে। খসরু প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপবৃন্দের দ্বারা অভিনন্দিত হইতেছেন। মনে হয় এ খসরু খসরু অনুসিরওয়ান্ নহেন, ইনি দ্বিতীয় খসরু পারভেজই হইবেন। এই শেষোক্ত খসরুই নবী মহম্মদের মুস্লিম ধর্ম্ম গ্রহণ করার আমন্ত্রণ তাচ্ছিল্যের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন মুসলমান পারসীক চিত্রী, নিজামীর "খসরু ওয়া শিরীণ" কাব্য চিত্র-সম্পদে ভূষিত করার জন্য এই রাজদম্পতির বহুবিধ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। কোথাও খসরু শিরীণ যে দুর্গে আশ্রয় লইয়াছেন তাহারই দ্বারদেশে উপনীত, শিরীণ দ্বিতলের ছাদ হইতে দুই বাহু বাড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেছেন (১নং চিত্র); কোথাও বা কিংখাপ-নির্ম্মিত পটমণ্ডপতলে সভাসদপরিবৃত খসরু নিদ্রায় অচেতন, শিরীণ সম্মুখে দণ্ডায়-মানা। কোনও চিত্রে শিরীণের সমক্ষে সিংহাসনের সহিত যুদ্ধ করিয়া খসরু নিজ বীরত্ব প্রদর্শন করিতেছেন, অন্যত্র খসরুসনাথ শিরীণ এক পুষ্পিত তরুতলে উপবিষ্টা। অপর একটি চিত্রে শিরীণের কোনও সহচরী খসরু ও সখীগণ-পরি-বৃতা শিরীণকে কাহিনী শুনাইতেছেন, সিংহাসনের সম্মুখভাগ প্রোজ্জ্বল দীপমালায় উদ্ভাসিত। ব্রিটিশ মিউজিয়মের চারু-শিল্পসংগ্রহাগারে রক্ষিত পঞ্চদশ শতাব্দের শেষপাদের এক খানি চিত্রে শিরীণ চৈনিক ভঙ্গীতে গ্রীবা বাঁকাইয়া গবাক্ষ-সান্নিধ্যে দণ্ডায়মানা, অশ্বারূঢ় খসরু তাঁহার দুর্গদ্বারে উপনীত (২য় চিত্র)। এ চিত্র যখন রচিত হয় তখন পারস্যে তৈমুর-বংশীয়দিগের রাজত্বকাল।

এ সকল চিত্রের সহিত ইতিহাসের কোনও সম্পর্ক নাই বটে কিন্তু শিরীণের রূপ মধ্যযুগের মুসলিম শিল্পীর তুলিকায় কি ভাবে মূর্ত্ত হইয়া জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা হইতে যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সাসানীয় যুগের সম-কালীন আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হইলে রূপ-পরিকল্পনার ধারা হইতে বিশেষজ্ঞদিগের নিকট উহা যে সহজেই ধরা পড়িত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

খসরু বহুপত্নীক হইলেও তাঁহার পরমাসুন্দরী আর্ম্মেণিয়া দেশোদ্ভবা খৃষ্টীয়ান পত্নী শিরীণের প্রতিই যে তিনি সমধিক অনুরক্ত ছিলেন, এ কথা ইতিহাসে সমর্থিত হইয়াছে। নিজা-মীর কাব্যে শিরীণের যে চিত্র দেখিতে পাই, তাহাতে তাঁহাকে একনিষ্ঠতার আদর্শ বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। শিরীণ অশ্বারোহণে অভ্যস্তা ছিলেন এবং খসরু তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গিনীগণের সহিত পোলো (polo) খেলায় যোগদান করিতেন। নিজামীর কবিতায় বর্ণিত আছে যে, খসরু পোলো ক্রীড়ার স্থানে উপনীত হইলেই পরীসদৃশ, অশ্বারূঢ়া, সুমুখী ভাবিনীগণ স্ব স্ব অশ্বের সম্মুখের পদদ্বয় উত্তোলন করাইয়া সানন্দে লম্ফপ্রদান করাইতেন, কখনও দীপ্তগৌরবসদৃশ মহীপতি ক্রীড়ার গোলকটি নিজ অধিকারে আনয়ন করিতে সমর্থ হইতেন, কখনও বা উহা চন্দ্রোপমা রাজ্ঞীরই আয়ত্তে আসিত (১)। গীতবাদ্যে, ভ্রমণে, ক্রীড়ায়, সকল প্রকার আমোদ-প্রমোদে, শিরীণই ছিলেন খসরুর নর্ম্মসহচরী। কাব্যে তিনি রাজকুলজা বলিয়াই উক্ত হইয়াছেন।

সাহনামায় শিরীণের বিষয় যেরূপ লিখিত আছে, নিজামীর বর্ণনার সহিত তাহার যথেষ্ট অনৈক্য দেখা যায়। ফির-দৌসির বর্ণনামতে শিরীণই স্বয়ং অগ্রসর হইয়া খসরুর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। 'মোবেদ' অর্থাৎ জরাথুষ্ট্রীয় পুরোহিত সম্প্রদায় খৃষ্টীয়ান শিরীণকে পবিত্রকুল-সম্ভূতা বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন নাই। তিনি যে একেবারে নিষ্কলঙ্ক হইয়া খসরুর অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন নাই সাহনামায় এ ইঙ্গিতও যেন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

---

(১) Heroines of Ancient Persia নামক গ্রন্থে Bapsy Parvy ও এ প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। জোরোয়াষ্ট্রীয় ধর্ম্মে অনাহিত ছিলেন জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

(২) ওমিয়া বংশীয়দিগের রাজত্বকাল খৃঃ অঃ ৬৬০ হইতে ৭৫০ খৃঃ অঃ।

(১) "When he (Khasru) reach theed pologround
The fairy-faced ones curvetted on their steads with joy

•   •

At times the Sun bore off the ball, at times the moon."

একখানি পারসীক ইতিহাস-গ্রন্থের পুঁথিতে (১) লিখিত আছে যে, শিরীণ একজন সম্ভ্রান্ত পারসীকের গৃহে বাস করিতেন। বন্ধুত্বসূত্রে খসরু তথায় মধ্যে মধ্যে আগমন করিতেন। সেইখানেই শিরীণের সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। গৃহস্বামী উভয়ের ঘনিষ্ঠতায় অসন্তুষ্ট হইয়া শিরীণকে খসরুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করেন। উভয়ের মধ্যে তখন প্রণয়-সঞ্চার হইয়াছে। নিষেধ সত্ত্বেও খসরু ও শিরীণ পুনরায় পরস্পরের সহিত মিলিত হন এবং খসরু তাঁহার ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ শিরীণকে নিজের একটি অঙ্গুরীয়ক প্রদান করেন। এ কথা জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ গৃহপতি শিরীণকে ইউফ্রেটিস নদীতে নিক্ষেপ করার আদেশ দেন। অবিশ্বাসিনী বলিয়া সন্দেহ জন্মিলে অভিজাত বংশীয়দিগের অন্তঃপুরিকাগণের প্রতি এইরূপ কঠোর শাস্তি-বিধান-প্রথা শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপীয় তুর্কিতেও প্রচলিত ছিল বলিয়া শুনা যায়। শিরীণের প্রতি ভাগ্যদেবী বিমুখ ছিলেন না, তাই যে ভৃত্যটি এই দণ্ডাদেশ পালন করার জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল তাঁহার কাতর প্রার্থনায় দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া সে তাঁহাকে স্বল্প গভীর জলে ফেলিয়া দেয়। সেখান হইতে তীরে পঁহুছিতে সমর্থ হইয়া শিরীণ কোনও গির্জ্জায় আশ্রয়লাভ করেন এবং তথায় পরিচারিকার কার্য্যে নিযুক্ত হন। দীর্ঘ বৎসরগুলি একে একে কাটিয়া যাইতে লাগিল, শিরীণ পূর্ব্বেরই ন্যায় আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় একদিন কয়েকজন সৈনিককে গির্জ্জার নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি তাহাদেরই একজনের হস্তে সেই অভিজ্ঞানমূলক অঙ্গুরীয়কটি প্রদান করিয়া সম্রাটের নিকট উহা প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন। খসরু তখন রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। অঙ্গুরীয়ক পাইয়াই তিনি শিরীণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সত্বর তাঁহার উদ্ধারসাধন করিয়া তাঁহাকে নিজ প্রাসাদে আনয়ন করিলেন। সম্রাট পদবী লাভ করিয়াও খসরু পূর্ব্ব-প্রণয়িনীকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। এখন আর বিলম্বের হেতু ছিল না। মহা-সমারোহে তিনি শিরীণের সহিত উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। উভয়ের প্রেম এইরূপে পরিণয়ে পরিসমাপ্ত হইল। গুপ্তঘাতকের হস্তে খসরু নিহত হইলে পর, শিরীণের সপত্নীপুত্র (খসরুর গ্রীক পত্নীর পুত্র) শিরো অথবা শিরুইয়া বিমাতার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজ অঙ্কশায়িনী করিবার অভিলাষ প্রকাশ করে। শিরীণ এই নরপশুর চক্র হইতে উদ্ধারের উপায় নাই দেখিয়া বিষপানে আত্মহত্যা করেন। নিজামীর গ্রন্থে শিরীণ নিজবক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন এইরূপই উল্লিখিত হইয়াছে। সতীত্ব-ধর্ম্ম রক্ষা করার জন্য আত্মহত্যা করার এই জনপ্রবাদ বোধ হয় একবারে অমূলক নয়।

সাহনামার বর্ণনা অপেক্ষা এই পারসীক পুঁথির বিবরণই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয়। ফিরদৌসি লিখিয়াছেন যে, শিরীণ প্রধানা রাজ্ঞীর সুবর্ণময় প্রকোষ্ঠে অধিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন তাঁহাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়া। মনে হয়, বিদেশীনী ও বিধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন বলিয়াই শিরীণ এরূপ নিন্দাভাগিনী হইয়া থাকিবেন (১)। পারসীক ক্ষুদ্রক চিত্রে শিরীণ যেরূপ চিত্রিত হইয়াছেন তাহা খসরু শিরীণ বিষয়ক কাব্যগ্রন্থের, বিশেষ করিয়া নিজামীর আখ্যায়িকারই অনুযায়ী; সাহনামার শিরীণ শিল্পে সে স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। ইতিকথা ও কল্পনার মিশ্রণে খসরু ও শিরীণের যে মানচিত্র কবি নিজামী কাব্যলোকে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, পারস্যের চিত্রশিল্পীর তাহা স্বল্পরকম উপজীব্য হয় নাই।

শিরীণের প্রভাবে খসরু অনেকগুলি গির্জ্জা ও খৃষ্টীয় সন্ন্যাসীদিগের জন্য মঠ (monastery) নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মপন্থী মহাপুরুষদিগের কৃপায় এবং খৃষ্টীয় মতানুযায়ী প্রার্থনার ফলে মানবের যে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গললাভ হয় এ সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল কিন্তু সে বিশ্বাস স্থায়ী হয় নাই। পরে খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি তাঁহার কেমন যেন বিরূপতা জন্মে এবং এই মতপরিবর্ত্তনের ফলে গির্জ্জার ধন-সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া তিনি খৃষ্টীয়ানদের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। বৃদ্ধ বয়সে খসরু যে প্রতিহিংসা-পরায়ণ ও অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। সেনাপতি সাহবাজকে তিনি খৃষ্টীয়ানদের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিতে অনুমতি দেন। মুসলমান যুগের জিহাদ—এই প্রকার ধর্ম্মযুদ্ধেরই ব্যাপক অনুকরণ বলিয়া মনে হয়।

[ক্রমশঃ

(১) Ms. in author's possession bearing a seal dated 1224 A. H (1809 A.D.)

১। Sir Perey Sykes রচিত পারস্যের ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ৪৬১, ৪৬৬, ৪৮৬, ৪৮৭ পৃষ্ঠায় এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ৩৭ পৃষ্ঠায় শিরীণের কথা উক্ত হইয়াছে।

আকবরের রাষ্ট্র সাধনা

এস, ওয়াজেদ আলী, বি-এ, (কেণ্টাব) বার-এ্যাট-ল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নয়

খোদার উপর বিশ্বাস আকবরের যে কত দৃঢ় ছিল, কি ধরণের পবিত্র, পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে তিনি রাষ্ট্র সাধনা করতেন এবং জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতেন, তাঁর দৈব নির্দিষ্ট কাজ বা Mission-এর প্রতি তিনি যে কি গভীর এবং আন্তরিক বিশ্বাস পোষণ করতেন, আবুল ফজল বর্ণিত এক ঘটনা থেকে তার সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায়।

আকবর হাতী বড় ভালবাসতেন। তাঁর আস্তাবলে বার হাজারেরও অধিক হাতী থাকতো। তাদের মধ্যে "হাওয়াই" নামক হাতীটী সবচেয়ে জবরদস্ত বলে গণ্য হত। যেমন কড়া তার মেজাজ, তেমনি অসুরের মত তার সাহস, শক্তি এবং বিক্রম। যখন সে বিগড়ে যেতো, তাকে কাবুতে আনা তখন সত্যই এক দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতো। প্রবীণ দক্ষ মাহুতেরা হাজার হাজার হাতীকে যারা পোষ মানিয়ে ছিল, তারাও তখন তার উপর চড়তে, আর তাকে চালাতে ভয় পেতো।

একদিন "হাওয়াই" ক্ষেপে উঠল আর যাকে তাকে আক্রমণ করতে আরম্ভ করলে। ভয়ে অধীর হয়ে লোকেরা যে যে-দিকে পারলে পালাতে লাগল। বিষম গণ্ডগোলের সৃষ্টি হ'ল। দৈবক্রমে আকবর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিলমাত্র দ্বিধা না ক'রে ভারতেশ্বর সেই হাতীর উপর চড়ে বসলেন; আর "কুশের" তীক্ষ্ণ ফলকের সাহায্যে তাকে "রাম-বাঘ" নামক আস্তাবলের দুর্দ্ধর্ষ এক হাতীর বিরুদ্ধে পরিচালনা করলেন। "রাম-বাঘ" "হাওয়াই"য়ের প্রতিযোগী হাতীরূপে গণ্য হ'ত। এই দুই গজ-রাজের মধ্যে তখন তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। জনসাধারণ এবং রাজকর্ম্মচারীরা বাদশার জীবনের আশঙ্কায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। উপায়ান্তর না দেখে তারা প্রধান মন্ত্রী আতাগা খাঁর কাছে গিয়ে এই ভীষণ বিপদের কথা তাঁর কর্ণগোচর করলেন।

উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে আতাগা খাঁ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। অন্য কোন উপায়ের কথা ভাবতে না পেড়ে তিনি মাথার পাগড়িটী হাতে নিয়ে একান্ত মিনতির সঙ্গে হাতীর পিঠ থেকে নামবার জন্য বাদশাকে তাঁর করুণ আবেদন জানাতে লাগলেন। জনতার লোকেরা কাতর কণ্ঠে জাঁহাপানার মঙ্গলের জন্য বিশ্বনিয়ন্তার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। এই সব নারীসুলভ ব্যবহারে অধৈর্য্য হয়ে আতাগা খাঁনকে সম্বোধন করে তীব্র কণ্ঠে আকবর বললেন, "উজীর সাহেব, এসব আবেদন-নিবেদন এখুনি বন্ধ করুন, তা না হ'লে, আমি হাতীর পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করব।" বাদশার হুমকি শুনে আতাগা খাঁন এবং উপস্থিত দর্শকেরা নিজেদের সংযত করে এই প্রলয়কাণ্ড দেখতে লাগলেন।

বাদশার বাহন "হাওয়াই" হঠাৎ "রাম-বাঘকে" ভীষণ ভাবে এক দুর্ব্বল স্থানে আঘাত করলে। সে আঘাত সহ্য করতে না পেরে "রাম-বাঘ" পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে উর্দ্ধশ্বাসে পালাতে লাগলেন। "হাওয়াই"এর মাথায় তখন খুন চেপেছিল। জনতার ইঙ্গিত, চীৎকার, আবেদন, নিবেদন প্রভৃতির প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে বায়ুবেগে সে"রাম-বাঘের" অনুসরণ করতে লাগলেন। উন্মত্ত হস্তীযুগলের মর্ম্মান্তিক বৃংহন, উপস্থিত জনতামণ্ডলীর কাতর, করুণ চীৎকার, আর এ-সবের মধ্যে হস্তীপৃষ্ঠে সমাসীন ভারতেশ্বর নির্ব্বিকার মূর্ত্তি। সত্যই এক উপভোগ্য দৃশ্য!

গজরাজেরা দৌড়ুতে দৌড়ুতে শেষে যমুনা নদীর তীরে উপস্থিত হল। সেখানে নৌকা নির্ম্মিত প্রকাণ্ড একটি ভাসমান সেতু ছিল। নদী অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে "রাম-বাঘ" সেই সেতুতে গিয়ে পৌঁছুল। "হাওয়াই"ও অবিলম্বে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল। এই দুই ঐরাবতের দাপা-দাপিতে নৌকার সেতু ঝড়ের মুখের নৌকারমতই ভীষণ ভাবে নড়তে লাগলো। সেতুর নৌকাগুলি একবার এদিকে কাৎ হতে লাগলো, একবার ওদিকে কাৎ হ'তে লাগলো; একবার জলে ডুবতে লাগলো, একবার ভেসে উঠতে লাগলো। যমুনার শান্ত বারিধারা উত্তাল তরঙ্গাভিঘাতে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। জনতার লোকেরা নদীর জলে সন্তরণ করে উন্মত্ত হস্তী যুগলের অনুসরণ করতে লাগলো। গজরাজেরা শেষে অপর পারে গিয়ে উপস্থিত হল। সঙ্গে সঙ্গে বাদশার খেলার সখও মিটলো। তাঁর শাহী ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র "হাওয়াই" প্রকৃতিস্থ হল, অরি শান্তশিষ্ট শিশুটীর মত স্থির হয়ে দাঁড়াল। সুযোগ বুঝে "রামবাগ" কাল বিলম্ব না করে অতি সত্বর বিপদের স্থান থেকে অদৃশ্য হল।

আবুল ফজল বলেন এই ঘটনাটী নিয়ে বাদশার সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছিল। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বাদশার বললেন, "হিংস্র একটা মত্ত হস্তীর পৃষ্ঠে এইভাবে, এবং এমন অবস্থায় যখন সে তাঁর মাহুত এবং অন্যান্য অনেক লোককে হত্যা করেছে, কেন আমি আরোহণ করতে গিয়েছিলুম শোন। এই দুঃসাহসিক কাজের সাহায্যে আমি পরীক্ষা করতে চেয়েছিলুম, খোদার অপ্রীতিকর কোন কাজ আমার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে কিনা, আর খোদার অবাঞ্ছিত কোন উদ্দেশ্য আমার মনে স্থান পেয়েছে কিনা। আমি ভেবেছিলুম, সত্যই যদি সেরূপ কিছু ঘটে থাকে, তাহলে এই মত্ত হস্তীর কবলে আমার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাই বাঞ্ছনীয়। খোদাকে অসন্তুষ্ট করে বেঁচে থাকার চেয়ে মরণই শ্রেয়।"

দশ

আকবর যখন শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র সতের বৎসর। মোগল সাম্রাজ্য তখন আগরা এবং দিল্লীর সহরতলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই সংকীর্ণ সীমার বাইরে পাঠান এবং রাজপুত যোদ্ধাদের অপ্রতিহত প্রভাব। আকবরের সর্ব্বপ্রথম কাজ হল বিশাল এই ভারতভূমিতে একচ্ছত্র বাদশাহির প্রতিষ্ঠা। দিল্লীর বাদশাকে দেশের লোকেরা ভারতবর্ষের বিধিসম্মত সম্রাট রূপে মুখে স্বীকার করতেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁর আধিপত্য একান্তভাবে সংকীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দূরদর্শী, রাজনীতিকুশল আকবর সহজেই বুঝলেন, ভারতবর্ষে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনের জন্য রাজপুত শক্তির সাহায্য অপরিহার্য্য। তাঁর বিদেশাগত মোগল অনুচরেরা ছিলেন সংখ্যায় নগণ্য। কেবল তাঁদের সাহায্যে বিরাট এবং সুপ্রতিষ্ঠিত পাঠানপতিকে বিধ্বস্ত করা সম্ভবপর নয়। আকবর কাজের লোক ছিলেন। রাজপুত রাজন্যবর্গের সঙ্গে মিতালী স্থাপনের চেষ্টায় একান্তভাবে তিনি আত্ম-নিয়োগ করলেন।

এক্ষেত্রে সাধারণ ধরণের কুটনীতিক রাজপুরুষ কি ভাবে অগ্রসর হইতেন? তিনি রাজপুত রাজন্যবর্গের নিকট দূত পাঠাতেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতেন, আর পরস্পরের স্বার্থ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতেন। ফলে হয় তো বা'হ্যক একটা একতার সৃষ্টি হতো। রাজপুত আর মোগলের আন্তরিক ঐক্য কিন্তু তা থেকে কখনও জন্মলাভ করতো না। রাজপুত রাজপুতই থাকতো, আর মোগল থেকে যেত মোগল। এই ধরণের বা'হ্যক, রাষ্ট্রীয় সমস্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ঐক্যের আদর্শ কিন্তু আকবরকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর সাম্রাজ্যকে এমন এক দৃঢ় ভীত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে, যে, যুগ-যুগান্তর ধরে সে ভীত্ত অটল থাকবে। আর তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য নিজের মজবুত গাঁথু'নির বলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সগৌরবে ভারতবর্ষে বিরাজ করবে। আকবরের প্রতিভা এই বিরাট আদর্শের উপলব্ধির কার্য্যকরী পথ তাঁকে দেখিয়ে দিলে।

আকবরের সহজাত রাজনৈতিক বুদ্ধির কাছে এ সত্যটী ভাস্বর হয়ে উঠলো রাজপুতদের তথা হিন্দুজাতির পূর্ণ এবং আন্তরিক সহযোগীতা পেতে হলে অকপট ভাবে তাদের ভালবাসতে হবে, তাদের কথায় বিশ্বাস করতে হবে, গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার তাদের উপর ন্যস্ত করতে হবে, তাদের ধর্ম্মের, তাদের কৃষ্টির সম্মান করতে হবে, আর সর্ব্বোপরি, আত্মীয়তার দৃঢ় অথচ স্বাভাবিক বন্ধনে তাদের রাজন্যবর্গকে তাঁর বংশের সঙ্গে মজবুত করে বাঁধতে হবে। আকবর অবিচলিত পদক্ষেপে এই পথেই অগ্রসর হলেন।

এগার

দিল্লীর শাহী দরবারের আকার-প্রকার যেন এক ঐন্দ্রজালিকের ইঙ্গিতে হঠাৎ বদলে গেল। হিন্দু-মুসলমানের যে পার্থক্য আবহমান থেকে চলে আসছিল আকবরের আদেশে সে পার্থক্য সমূলে উৎপাটিত হল। হিন্দুদের সাদরে তিনি শাহী-দরবারে আহ্বান করলেন। দেখতে দেখতে মহারাজা, রাজা, ঠাকুর, সর্দ্দার প্রভৃতিতে দিল্লীর প্রাসাদ ভরে গেল। ঠিক মুসলমান আমীর ওমরাহদের মতো আকবর তাঁদের সম্মান করতে লাগলেন, উচ্চতম রাজপদ অকাতরে তাঁদের দান করতে লাগলেন। তাঁদের ধর্ম্মের প্রতি, তাঁদের কৃষ্টির প্রতি, তাঁদের সংস্কারের প্রতি, তাদের আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু-সম্রাটের মতই তিনি সম্মান দেখাতে লাগলেন। দিল্লীর তুর্কি বাদশাহের এই অভূতপূর্ব্ব, অচিন্তনীয় ব্যবহারে হিন্দুরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, কৃতজ্ঞতায় অন্তর তাদের ভরে গেল। ঐতিহাসিক মোহাম্মদ হোসেন আশাদ তাঁর "দরবারে আকবরী"তে লিখেছেন "দরবারের অবস্থা শেষে এই দাঁড়াল যে স্বজাতি বিজাতীয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য আর রইল না। সিপেহসালার (সেনাপতি), সুবেদার (প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা) প্রভৃতি উচ্চতম রাজপদ তুর্কিদের মত হিন্দুরাও পেতে লাগলেন। শাহীদরবারে একজন হিন্দুর সঙ্গে একজন মুসলমান, অথবা দুই জন মুসলমাণের সঙ্গে এক-জন হিন্দু সর্ব্বত্রই দৃষ্টিগোচর হতে লাগলেন। রাজপুতদের বাদশা সত্যই ভালবাসতেন, তাই তাদের সব কিছু এমন কি তাদের বেষভূষাও তাঁর দৃষ্টিতে প্রশংসনীয়রূপে প্রতিভাত হতে লাগলো। চোগা আর মুসলমানী পাগড়ি ছেড়ে তিনি রাজপুতদের আজারখা আর খিড়কীদার শিরস্ত্রাণ পরতে লাগলেন। দাঁড়ি বিসর্জ্জন করা হল। শাহী-তখত্ ছেড়ে তিনি সিংহাসনে বসতে সুরু করলেন। রাজপুত রাজাদের মত তিনিও হাতীতে চড়ে বের হতে লাগলেন। দরবারের আসবাব পত্র হিন্দুয়ানী ধরণের হয়ে গেল। বাদসার ব্যক্তি-গত খেদমতের জন্য হিন্দু এবং মুসলমান উভয় জাতির লোক নিযুক্ত হতে লাগলো। বাদশার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে ইরাণী এবং তুরাণী আমীর ওমরাহেরা ও হিন্দুয়ানী ধরণের পোষাক পরিচ্ছদ পরতে লাগলেন। তুর্কির শাহীদরবার হিন্দুর ইন্দ্রসভায় রূপান্তরিত হল।

বার

অবশ্য আকবরের এই হিন্দু প্রী'তির মধ্যে স্বধর্ম্মদ্রো'হিতার কিছুই ছিল না। হিন্দুদের তিনি অকৃত্রিম ভাবে ভাল বাসতেন, তাই তাঁদের আচার ব্যবহার এবং রীতি-নীতির কিছু কিছু নিজের জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই মাত্র। জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন "আকবর প্রথমতঃ

হিন্দু আচার ব্যবহার সেই ভাবেই গ্রহণ করেছিলেন যেমন করে লোক কোন নূতন দেশের নূতন ফল কিম্বা নূতন ধরণের প্রসাধন বস্তু গ্রহণ করে। প্রেমাস্পদের সবই যেমন প্রেমিকের কাছে সুন্দর দেখায়, হিন্দুর রীতি-নীতিও সেই রকম আকবরের কাছে সুন্দর দেখাতো।"

জাহাঙ্গীর যা বলেছেন তা সত্য, তবে এও সত্য যে, আকবর এই ব্যাপারে তাঁর অতুলনীয় রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির দ্বারাও অনুপ্রাণিত হয়েছিল। আকবর অকৃত্রিম ভাবে, অন্তরের সঙ্গে হিন্দুদের ভালবাসতেন; কূট রাজনীতি হিন্দুদের প্রতি উদারতা প্রদর্শনে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল; আর, এই উভয়বিধ প্রেরণা থেকে জন্মলাভ করেছিল তাঁর অভিনব রাষ্ট্র ব্যবস্থা যা রাজনৈতিক উদারতার প্রকৃষ্ট এক নিদর্শনরূপে বিশ্বে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আকবরের মন যদি একান্তভাবে উদার এবং সংস্কার মুক্ত না হত, ধর্মের মূলগত সত্যের সন্ধান তিনি যদি না পেতেন, তার রাজনীতিক সহজ বুদ্ধি যদি একান্ত নির্ভুলভাবে তাকে পরিচালিত না করতো, তা হলে তিনি এই নূতন পথের সন্ধান কখনও পেতেন না।

তের

ধর্মের মহফিলে অমোস্লেম পণ্ডিত এবং দার্শনিকদের অবাধ গতিবিধি; শাহি দরবারে হিন্দু রাজন্যবর্গের এবং অমাত্যদের অকুণ্ঠিত আবির্ভাব; স্বল্প বুদ্ধি গোঁড়া ধার্মিক এবং আচার পন্থী মৌলবিদের কাছে এসব একেবারে অচিন্তনীয়, অভাবনীয় ব্যাপাররূপে প্রতিভাত হতে লাগলো। পেচক সূর্য্যের আলোক সহ্য করতে পারে না। আচারপন্থী আলেম এবং তাঁদের ভক্তেরাও তেমনি আকবরের প্রতিভা এবং উদারতার অমল আলোক সহ্য করতে পারলেন না। তবে পেচক বেচারা সূর্য্যের রশ্মিরেখার প্রভাব থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য চোখবুজে বৃক্ষ কোটরে আশ্রয় নেয়, সূর্য্যের অনিষ্ট করবার কিম্বা তার গতিরোধের কোন চেষ্টা করে না। আচার পন্থীরা কিন্তু সে পথ অবলম্বন করলেন না; আকবরের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করবার জন্য তাঁরা বদ্ধপরিকর হলেন। জনসাধারণের মধ্যে আলেমদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এই প্রভাবের সাহায্যে তাঁরা আকবরের নূতন নীতি এবং ব্যবস্থাকে প্রতিহত এবং ব্যর্থ করবার চেষ্টায় আত্ম নিয়োগ করলেন। উচ্চকণ্ঠে তাঁরা প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন যে বাদশা ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয়েছেন, পবিত্র শরীয়েত নির্দ্দেশিত পথ তিনি বর্জ্জন করেছেন। সনাতন ইসলাম ধর্ম্মের তিনি বিরুদ্ধতা করছেন। তাঁর বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধের পতাকা উত্তোলন করা ধার্ম্মিক মুসলমানদের অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্য।

মোল্লা মৌলবিদের ভয়ে সঙ্কল্প থেকে বিচলিত হবার লোক আকবর মোটেই ছিলেন না। অবিচলিত ভাবে তিনি তার নব প্রবর্ত্তিত নীতির অনুসরণ করতে লাগলেন। ১৫৬২ খৃঃ অব্দে অম্বরের মহারাজ বিহারী মল বশ্যতা স্বীকার করতে দিল্লী আসেন। আকবর যথেষ্ট সমাদরের সঙ্গে তাঁর অভ্যর্থনা করলেন। মহারাজের কন্যার সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন, আর এই রাজকুমারীকে, শাহীমহলে উচ্চ সম্মানে বিভূষিত করলেন। ধর্ম্মসম্পর্কীয় ব্যাপারে তাঁকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হল। বিহারী মল উচ্চ মনসবদারের পদ লাভ করলেন। হিন্দু প্রজাদের অসন্তোষের প্রধান একটি কারণ ছিল "জিজিয়া" নামক রাজকর, যা হিন্দুদের জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল। ১৫৬২ খৃঃ অব্দে শাহী ফরমান জারী করে আকবর জিজিয়া কর তুলে দিলেন। হিন্দু তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে যে কর আদায় করা হত তাও তিনি বন্ধ করে দিলেন। বাদশার হিন্দুপ্রীতি আলেমদের চক্ষে শূলের মত পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়াল। তাঁর উচ্ছেদ সাধনের বিষয় তাঁরা কল্পনা-জল্পনা করতে লাগলেন। [ক্রমশঃ

হপ্‌ম্যান ও জীবন-নাটক

শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

নাট্যকার হপ্‌ম্যানের আদর্শে আজও কোন বাংলা নাটক রচিত হয় নি। নাটক রচনা করতে রসসৃষ্টির কোনো চেষ্টা না করে' সাধারণ আটপৌরে ঘটনার হুবহু বর্ণনা কার্য্য ও ভাষণ দ্বারা দিতে পারলেই শ্রেষ্ঠ নাটক হয় বলে' হপ্‌-ম্যানের অভিমত। ইনি নাটকের বিষয়-বস্তু নির্ব্বাচন, গল্পের গাঁথুনি ও বিশেষ চরিত্র বা ভাবের বৈশিষ্ট্য আদৌ ধরেন নি; ছবি তোলার মত দীর্ঘ একফালি ফিতে যেন ফটোগ্রাফে ভর্ত্তি করে' নিয়ে রঙ্গমঞ্চে ছেড়ে দিয়েছেন—নাট্য-শিল্পের বিন্দু-মাত্রও নাটকে যোগ করেন নি।

হপ্‌ম্যানের এই রীতি অনুসরণ করে' বৈচিত্র্য পরিবর্জ্জিত বাঙ্গালীর সমাজ-জীবন থেকে নাটকের উপকরণ সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়। তা' সত্ত্বেও ঘটনার হুবহু প্রতিচ্ছবি অনেকেই যখন তিনি আদর্শ নাটকরূপে নির্দ্দেশ করেছেন, তখন অনায়াসে একপ্রকার নাটকসৃষ্টি সম্ভব হয়। ইংরেজী সাহিত্য থেকেই এ জাতীয় নাটকের উদ্ভব হয়েছে এবং ইংরেজ জাতি একে জীবন-নাট্য (Biographical Drama) আখ্যা দিয়ে নাটকের একটি নবতর শ্রেণী নির্দ্দেশ করেছে। বিগত মহাযুদ্ধোত্তর যুগ থেকে এই নব রচনার যথেষ্ট পসার দেখা যায়।

জীবন-নাট্যের রচনা একদিক দিয়ে যেমন সহজসাধ্য,

অন্যদিক দিয়ে তেমনি শক্তিসাপেক্ষ। সমাজের বিখ্যাত ব্যক্তিদের কোনো একজনকে অবলম্বন করে' তাঁর জীবন-চরিত অনুসরণ করে' এগিয়ে চল্লেই হোল; কল্পনার দুরধিগম্য অরণ্যে পাদচরণ প্রয়োজন হয় না। সহজ কথায় জীবন-চরিতকে সংলাপময় কাহিনীতে রূপান্তরিত করলেই জীবন-নাট্যের একটা খসড়া পাওয়া যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, জীবন-নাটক রচনা একটি বেশ সহজসাধ্য ব্যাপার; কারণ, সমাজে বিখ্যাত ব্যক্তিরও অভাব নেই আর তাঁদের জীবন-চরিতও দুর্লভ নয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, এরূপ করলেই রচনা রসোত্তীর্ণ হবে কি না। উত্তর:—নিশ্চয় না। সুতরাং এর রসোত্তীর্ণতার আলোচনা প্রয়োজন।

একটি ব্যক্তিক জীবনের সমগ্র ইতিহাস নাটকে প্রদর্শন সম্ভব নয় এবং এর প্রচেষ্টাও বিজ্ঞ-জনোচিত বলে' বিবেচিত হবে না। সুতরাং বর্ণনীয় চরিত্রের পারিপার্শ্বিক মানে তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও ঘটনাবলী এবং তাঁর কার্য্য-পরম্পরা এত সব কিছুর ভেতর থেকে বাছাই করে' প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের গ্রহণ ও বর্জ্জন ব্যাপারে নাট্যকারের রস-সৃষ্টির যোগ্যাযোগ্যতার প্রথম পরিচয় পাওয়া যাবে; দ্বিতীয় পরিচয় হবে, তাঁর গৃহীত বিষয়সমূহের পরিবেশ-সুষ্ঠুতার ভিতর; নাট্যকারের তৃতীয় এবং চরম পরিচয় হবে তাঁর প্রকাশভঙ্গী ও আকর্ষণী শক্তির দক্ষতার উপর। একই সময়ে এই তিন ব্যাপারে জীবন-নাট্যকারের শক্তিমত্তার সদ্ভাব সুলভ নয়।

নাটককে রসঘন করতে হ'লে জীবনের নিগূঢ় অনুভূতিটির ক্রম-পরিণতির রহস্য ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত করতে হবে। মহান্ ব্যক্তি মাত্রেরই একটা মুখ্য উদ্দেশ্য বা আদর্শ থাকে। এ-কে লক্ষ্য নামেও অভিহিত করা যায়। এ লক্ষ্যের অন্তরালে যে নিবিড় অনুভূতি মানুষকে ধাপে ধাপে মহামানবে উন্নীত করে, সেই মূল অনুভূতিকে সুগোপনে কেন্দ্র করে' নাট্যকার দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে এগিয়ে যাবেন; জীবনের বহুবিধ সংঘাতের ভিতর দিয়েও এই অনুভূতিটিই কার্য্য করতে থাকবে, কার্য্য করতে থাকবে চরম গন্তব্যে পৌঁছুতে নিত্যক্রিয়াশীল হয়ে। এই হ'ল জীবন-নাটক রচনার গোপন সূত্র। জীবনের বহুবিধ অভিব্যক্তির মামুলী ইতিহাস প্রদর্শন যে করায় করাক্, রসবেত্তা নাট্যকার তা' করাবেন না। এখানেই জীবন-চরিত আর জীবন-নাটকের পার্থক্য।

বলা হ'ল, নাটকে একটি জীবনের সমগ্র ইতিহাস প্রদর্শনের প্রচেষ্টা বিজ্ঞ-জনোচিত নয়। সুতরাং জীবনের একটিমাত্র দিক্ নাটকে দেখাতে হবে। এই দিক্‌টি চতুষ্পার্শ্বস্থ যে সব ঘটনা নিয়ে পরিমণ্ডল রচনা করে, অবস্থানুযায়ী তাদের আগমন অবশ্য নিষিদ্ধ নয়। অপর সর্ব্ব জীবনের মুখ্য দিক্‌টাই নাটকে দেখাতে হবে। রবীন্দ্রনাথকে দেশ-প্রেমিক, চিত্তরঞ্জনকে কবি, আর বিবেকানন্দকে সাহিত্যিক করে' দেখালে চলবে না; কারণ এঁদের এসব গুণ পূর্ণমাত্রায় থাক্‌লেও এগুলো তাঁদের জীবনের মুখ্য অনুভূতির বিষয় নয়।

জীবন-নাটকে পরিবর্জ্জন কাম্য, পরিবর্দ্ধন কাম্য নয়। জীবন-নাট্যকার মহৎ ব্যক্তিকে মহত্তর করে' দেখাতে পারেন, বিচিত্রতার সমারোহে তাঁকে বর্ণাঢ্য করতে পারেন, কিন্তু অলীক কল্পনার বর্ণসংযোগে অতিরঞ্জিত করতে কখনো অনুমোদন পাবেন না। জীবনকে যথাযথ রেখে অভিব্যক্তির আকর্ষণ-নৈপুণ্যে দর্শকের মন আকৃষ্ট করতে যেই নাট্যকার পারেন, তাঁর রচনাই সাফল্যের জয়মাল্য অর্জ্জন করে।

সংস্কৃত নাট্য-শাস্ত্রে নাটকে বর্ণনীয় আখ্যায়িকাটিকে পর পর পাঁচটি পর্য্যায়ে ভাগ করা হয়েছে: (১) আরম্ভ, (২) প্রযত্ন, (৩) প্রত্যাশা, (৪) নিয়তাপ্তি ও (৫) ফলাগম। এই পাঁচটি বিভাগকে যথাক্রমে (১) পরিকল্পনা, (২) কার্য্য-সূচনা, (৩) ফল-সম্ভাবনা, (৪) নিঃসন্দিগ্ধতা ও (৫) পরিণতি —এই পাঁচটি নামে অভিহিত ক'রলে অনেকটা অর্থ-সারল্য হয়। জীবন-নাটক রচনা ব্যাপারে এই রীতিটি বেশ সাহায্যকারী। 'দেশবন্ধুর' জীবন ধরা যাক্। সাহেব সি-আর-দাশ কিরূপে ধীরে ধীরে চিত্তরঞ্জন হয়ে পরিশেষে সমগ্র দেশবাসীর অবিনশ্বর মর্ম্ম-সিংহাসনে দরদী বন্ধুর আসনে চিরপ্রতিষ্ঠিত হলেন, তার রহস্যটি উদ্‌ঘাটিত করতে হ'লে, সর্ব্ব প্রথমে আরম্ভাংশের পট-ভূমিকায় একটা পরিকল্পনা করে' নিতে হবে। এই পরিকল্পনাংশে থাকবে তরুণ ব্যারিষ্টার মিঃ দাশের ঐশ্বর্য্য লাভের অদম্য পিপাসা ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার চোখ-ঝল্‌সানো বিলাসজ্যোতিঃ; এই জ্যোতির্ম্মণ্ডলে বাস করবে শান্তশিষ্ট বাঙ্গালীর নিরীহ প্রবৃত্তির বিপরীত-মার্গী 'গট্ গট্' প্রকৃতির কতিপয় সাহেব-সুবার দল, যাঁরা তাঁর ধার করা সমাজ ও সংস্কারের পরিপোষক। তারপরের ধাপ হবে আলিপুরের ষড়যন্ত্রের অভিযুক্ত অরবিন্দ, বারীন্দ্রনাথ প্রভৃতির নির্ভীক দেশ-প্রাণতা ও অকুতোভয় বীরত্বের মত চিত্তরঞ্জনের ভারতীয় মানসের পরিচায়ক রূপে তাঁর বিশিষ্ট কাব্যসাধনা। এর পরের ধাপ হবে, প্রত্যাশা বা ফল-সম্ভাবনা। ফল-সম্ভাবনায় থাক্‌বে ব্যারিষ্টার সি-আর-দাশের অপারিশ্রমিক মামলা পরিচালনা ও দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ-বৃত্তির নবতর উন্মেষ। চতুর্থ ধাপে নাটক অনেকখানি এগিয়ে যাবে এবং এই ধাপে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবর্গের সঙ্গে পরিচয় ও স্বদেশের মুক্তি কামনায় রাষ্ট্র-নৈতিক যুদ্ধাহ্বান। এই অংশটিতে সি-আর-দাশের সাহেবী খোলসটি খুলে পড়ল এবং এই সঙ্গে জীবনের নব পর্য্যায়ে

সাহেব সি-আর-দাশ, দেশবাসীর নিকট চিত্তরঞ্জন নামেই সমধিক পরিচিত হ'লেন—দেখতে হবে। এটিই হবে নিঃসন্দিগ্ধতার অংশ। এখানে ফলাগমের কোনো সন্দেহই থাকবে না। শেষ ধাপটি এসে থামবে কাউন্সিল প্রবেশ ও সরকার বাহাদুরের সঙ্গে রাষ্ট্রযুদ্ধে জয়লাভ পর্য্যন্ত। এই অংশটিতে চিত্তরঞ্জন নাম কম শোনা যায়; এখন 'দেশবন্ধুই' তাঁর সত্য পরিচয়। এখানে চিত্তরঞ্জনের আদর্শ জীবনের চরম পরিণতি ঘটেছে।

মূল ঘটনাটির বিবর্ত্তনের হেতু স্বরূপ সকল নাটকেই যেমন আখ্যায়িকাটির ভারসমতা রক্ষার জন্য তার মূল কেন্দ্রে নারী চরিত্র অপরিহার্য্য, জীবন-নাটকেও তাই। 'দেশবন্ধু' নাটকে চিত্তরঞ্জন-পত্নী বাসন্তী দেবী ও তাঁর সহকর্ম্মিণী অন্যান্য তিন চারজন নারীকে সহজভাবেই আনা যায়। নাটকের পরিস্থিতিকে রোমাঞ্চকর করবার জন্য প্রয়োজন বোধে অন্যান্য নর-নারীর আবির্ভাবও ঘটানো সম্ভব হ'তে পারে।

দেশবন্ধু নাটকে মূল কাণ্ড স্বরূপ দেশবন্ধুর অনন্যসাধারণ দেশাত্মবোধ ও আনুষঙ্গিক শাখারূপে অনমনীয় ব্যক্তিত্ব ও নির্ভীক তেজস্বিতাই পল্লবিত হয়ে হয়ে ভাবী বনস্পতিতে পৌঁছুতে থাকবে। দয়া, আত্মত্যাগ, নীতি-পরায়ণতা প্রভৃতির প্রদর্শন এ বৃক্ষের সুভোগ্য ফুল ও ফলরূপে তাঁর জীবন-মহীরুহকে অধিকতর শোভনীয় করে' তুলবে। এইরূপে দীপঙ্কর, রামমোহন, বিবেকানন্দ, দেবেন্দ্রনাথ, মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, 'আশুতোষ, রাসবিহারী, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীদের জীবনও সুচারুরূপে নাটকায়িত করা যায়।

প্রতিটি বিভাগের জন্যেই যে এক একটি অঙ্ক নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। নাটকের অঙ্কসংখ্যা চার, পাঁচ, ছয়—এর যে কোনোটা হ'তে পারবে। নাটক পঞ্চাঙ্ক না হোলেই যে দোষের হবে, এ ধারণার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নেই।

রত্ন-প্রসবিনী বাংলার এখানে সেখানে কত মহাপ্রাণ মহাজন তাঁদের অমর জীবনের স্মৃতি ছড়িয়ে রেখেছেন, দ্রষ্টা নাট্যকার তাঁদের আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গিমায় দেখতে ও দেখাতে পারেন, প্রেম ও বাগাড়ম্বর-প্লাবিত প্রেক্ষা-গৃহ তাঁদের পুণ্য স্মৃতিতে পবিত্র করতে পারেন; কিন্তু কৈ, সেই দুই আর দুই—মাত্র চারখানার অধিক জীবন-নাটক আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঘটে উঠল না। আত্ম-বিস্মৃত জাতির চরিত্র-পূজায় পরাঙ্মুখতাই হয় তো এর একমাত্র কারণ বলে' নির্দ্ধারিত হবে।

বনফুলকে ধন্যবাদ! 'মধুসূদন' রচনা করে' ইনিই প্রথম বাংলা সাহিত্যে জীবন-নাটকের প্রবর্ত্তন করেন। পরবর্ত্তী নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত 'মাইকেল' রচনা করে' সহস্র সহস্র রঙ্গমঞ্চগামীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। বনফুল 'বিদ্যাসাগর' নামে আর একখানি নাটক রচনা করেছেন। বলা বাহুল্য, প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন এ নাটকে বর্ণিত হয়েছে। ইদানীং 'মধুসূদন' নামেও একখানা নাটক মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। এ ক'খানা নাটকের নামোল্লেখ করেই ক্ষান্ত হ'ব; আলোচনা যা' হবার হয়েছে, আমরা নীরবই থাকবো।

প্রবন্ধের প্রারম্ভে নাট্যকার হুপম্যানের উল্লেখ করা হয়েছে; সেজন্যে কেউ যেন একে জীবন-নাট্যকার বলে ভুল না করেন।

দুই

প্রাচীন আচার্য্যগণের মত উদ্ধৃত করিয়া মহর্ষি বাৎস্যায়ন দেখাইয়াছেন যে—স্ত্রী-জাতির কামশাস্ত্রাধ্যয়নে কোন অধিকারই নাই।১ পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলেন যে—নারীর শাস্ত্রে অধিকার না থাকায় ও শাস্ত্র গ্রহণ করিবার সামর্থ্য নাই বলিয়া এই কামশাস্ত্রে নারীকে উদ্দেশ করিয়া—ইহা কর্ত্তব্য বা ইহা কর্ত্তব্য নহে—এইরূপ শাসন (অর্থাৎ—হিতোপদেশ) নিরর্থক।২

মূলে পাঠ আছে—'শাস্ত্র গ্রহণের অভাব আছে বলিয়া' ("শাস্ত্রগ্রহণস্যাভাবাৎ")। যশোধর তাহার অর্থ করিয়াছেন —'(তাঁহাদিগের) শাস্ত্রে অধিকার নাই বলিয়া ও শাস্ত্র গ্রহণ করিতে (তাঁহারা) অসমর্থ বলিয়া'।৩

পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় অর্থ করিয়াছেন—"আচার্য্যগণ বলেন—স্ত্রী-জাতির (ব্যাকরণাদি) শাস্ত্র গ্রহণ না থাকায় এ শাস্ত্রে তাহাদের অধ্যয়নবিধি নিরর্থক"। ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"সংস্কৃত-ভাষা-জ্ঞান ব্যতীত এই শাস্ত্র অধ্যয়ন চলিতে পারে না; অথচ ব্যাকরণাদি শাস্ত্র পাঠ না থাকায় ভাষাজ্ঞানও স্ত্রী-জাতির হয় না, তবে অধ্যয়নবিধি ব্যর্থ—ভাষাজ্ঞানের অভাবে তাহারা অধ্যয়ন করিতে পারিবে না"।৪

তর্করত্ন মহাশয়ের এই উক্তি যশোধরের সংক্ষিপ্ত উক্তিরই ব্যাখ্যান-স্বরূপ-মাত্র। তবে উহারও বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইতে পারে।

এ ক্ষেত্রে মহর্ষি বাৎস্যায়ন পূর্ব্বাচার্য্যগণের মত বলিয়া যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বারসিক সিদ্ধান্ত নহে—পরন্তু পূর্ব্বপক্ষ-মাত্র। এই প্রাচীন-মতে স্ত্রী-লোকের শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকার নাই, যেহেতু শাস্ত্র-গ্রহণের সামর্থ্যই নারীর নাই। কেবল কামশাস্ত্র নহে—ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্র—ইহাদিগের যে কোন শাস্ত্রের অধ্যয়নেই সামর্থ্যাভাব—বশতঃ স্ত্রী-জাতির অধিকার নাই। এরূপ একটি মত যে প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল, তাহার বহু প্রমাণ বহু স্থলে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ স্ত্রী ও শূদ্র—এই দুই জাতিরই শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকার মতান্তরে নিষিদ্ধ ছিল। মহর্ষি-পাণিনি-কৃত অষ্টাধ্যায়ী-গ্রন্থের প্রত্যভিবাদন-প্রক্রিয়ার আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, তৎকালে স্ত্রী-শূদ্র-জাতির সংস্কৃত-ভাষাজ্ঞানও প্রায়ই থাকিত না।৫ স্ত্রী-শূদ্রের বেদাধ্যয়ন ত একান্তই নিষিদ্ধ ছিল।৬ আর বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইলেই বেদের অঙ্গভূত ব্যাকরণের অধ্যয়নও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। ব্যাকরণ-জ্ঞান না থাকিলে ভাষা-জ্ঞানও হইতে পারে না। ভাষা-জ্ঞানের অভাবে বেদ-বেদাঙ্গ ভিন্ন অন্য লৌকিক শাস্ত্রেও (যথা—কামশাস্ত্রাদিতে) প্রবেশলাভ সম্ভব হয় না। যাহার সংস্কৃত-ভাষাজ্ঞান নাই, তাহাকে আর কামশাস্ত্রাধ্যয়নে বিধি দেওয়ার ফল কি? এই উদ্দেশ্যেই পূর্ব্বাচার্য্যগণ কামশাস্ত্রাধ্যয়নে নারীর অধিকার নিষিদ্ধ বলিয়াছিলেন।

কিন্তু বাৎস্যায়ন এ মত পূর্ণরূপে স্বীকার করেন নাই। মহর্ষি বলিতেছেন যে, নারীর কামশাস্ত্রের প্রয়োগ-গ্রহণ ত আছে। আর প্রয়োগ হইতেছে শাস্ত্রপূর্ব্বক, অর্থাৎ—প্রয়োগের জ্ঞান শাস্ত্র-জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

যশোধর ইহার ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "প্রয়োগ" মানে 'অর্থ' (অর্থাৎ—তাৎপর্য্য)৮। এই প্রয়োগ করিতে হইলে শাস্ত্র-জ্ঞানের প্রয়োজন। নারীর যখন কামসূত্র-জ্ঞানের প্রয়োগে পূর্ণ অধিকার দেখিতে পাওয়া যায়, তখন বুঝিতে হইবে যে স্ত্রীলোকের কামশাস্ত্রাধ্যয়নেও নিশ্চয়ই অধিকার আছে। তর্করত্ন মহাশয়ও ইহা স্বীকার করিয়াছেন—"বাৎস্যায়ন বলেন, (স্ত্রী জাতির পক্ষে এই কামসূত্র অধ্যয়ন-বিধি ব্যর্থ নহে), কারণ কামসূত্রানুমোদিত প্রয়োগ (হাতে কলমে কার্য্য) শিক্ষা স্ত্রীলোকের অবাধিত, আর সেই প্রয়োগ-শিক্ষা শাস্ত্রজ্ঞানমূলক"।৯

যশোধর ইহাই কারণ দেখাইয়াছেন, কামসূত্রের প্রয়োগ-গ্রহণ (অর্থাৎ তাৎপর্য্য-শিক্ষা) নারীর বিহিত। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, নারী কামসূত্রের তাৎপর্য্য কোথায় শিখিতে যাইবে? কোন কামসূত্রাভিজ্ঞ পুরুষের নিকটে কি? উত্তরে টীকাকার স্বয়ং এ আশঙ্কার নিবৃত্তি করিয়া দিয়াছেন—না, কামসূত্রাভিজ্ঞ পুরুষের নিকট হইতে শাস্ত্রাধ্যয়ন-পূর্ব্বক তাৎপর্য্য-গ্রহণ নারীকে করিতে হইবে না।

১। "যোষিতাং শাস্ত্রগ্রহণস্যাভাবাদনর্থকমিহ শাস্ত্রে স্ত্রীশাসনমিত্যাচার্য্যাঃ" (কাঃ সূঃ ১।৩।৪)

২। "তাসাং শাস্ত্রানধিকারাৎ, শাস্ত্রং গ্রহীতুমসমর্থত্বাচ্চ। ইহেতি। কামশাস্ত্রে স্ত্রিয়মুদ্দিশ্য শাসনম্—ইদং কার্য্যমিদং নেত্যেবং রূপম্ উপদেষ্টু-মনর্থকমিত্যাচার্য্যা মন্যন্তে"—জয়মঙ্গলা। (কাঃ সূঃ ১।৩।৪)

৩। "তাসাং শাস্ত্রানধিকারাৎ শাস্ত্রং গ্রহীতুমসমর্থত্বাচ্চ"।

৪। কামসূত্র, বঙ্গবাসী সং, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৫৩।

৫। "প্রত্যভিবাদেঽশূদ্রে" (পাঃ ৮।২।৮৩ ("স্ত্রিয়াং ন" (বার্ত্তিক) মনুও ঐরূপ কথা বলিয়াছেন—"নামধেয়স্য যে কেচিদভিবাদং ন জানতে। তান্ প্রাজ্ঞোঽহমিতি ব্রূয়াৎ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাস্তথৈব চ॥" (২।১২৩)

৬। "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা"।

৭। "প্রয়োগগ্রহণং ত্বাসাম্, প্রয়োগস্য চ শাস্ত্রপূর্ব্বকত্বাদিতি বাৎস্যায়নঃ" (কাঃ সূঃ ১।৩।৫)

৮। প্রয়োগ—Production, practical application, practical' import.

৯। কামসূত্র, বঙ্গবাসী সং, প্রথম সং, পৃঃ ৫৬—৫৭; ইহার উপর টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন—"সূত্রের পঙ্‌ক্তিগুলি যত লাগুক না লাগুক—শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-জ্ঞান ও তন্মূলক ক্রিয়াশিক্ষা স্ত্রীলোকের যখন হইতে পারে, তখন এই শাস্ত্রশিক্ষাবিধি স্ত্রী জাতির পক্ষেও ব্যর্থ নহে।

তবে কামশাস্ত্র-জ্ঞানের প্রয়োগ নারীগণের উপযোগী বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। অথচ উহা অপর কোন পুরুষ-কর্ত্তৃক নারীকে কিরূপে উপদিষ্ট হইবে? (অর্থাৎ—কোন পুরুষ-কর্ত্তৃক নারীকে কামশাস্ত্র প্রয়োগের উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে না)। এ কারণে কামশাস্ত্রাধ্যয়নে স্ত্রীগণের অধিকার-বিধান সম্পূর্ণ সার্থক।১০

প্রয়োগ শাস্ত্রজ্ঞান-মূলক হইলেও স্বয়ং শাস্ত্র না পড়িয়া শাস্ত্রজ্ঞ অপরের নিকট হইতে কেবল প্রয়োগ-শিক্ষা করা যায়। পক্ষান্তরে, কেবল কামসূত্র-জ্ঞানের প্রয়োগটি নারীর পক্ষে পুরুষের নিকট হইতে শিক্ষার অযোগ্য। অতএব, উহার শিক্ষা নারীকে শাস্ত্র হইতেই করিতে হইবে। আর তাহা হইলেই শাস্ত্রাধ্যয়নে নারীর অধিকার সিদ্ধ হইল। এই যে নিয়ম—ইহা কোন কামসূত্রের পক্ষেই প্রযোজ্য নহে: পরন্তু সকল শাস্ত্রেই এইরূপ বিধান। ইহলোকে সকল শাস্ত্রেই দেখা যায় যে—শাস্ত্রজ্ঞ কতিপয় ব্যক্তিমাত্র, কিন্তু প্রয়োগ সকল লোক-গোচর।১১

যশোধর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—এই প্রয়োগ-গ্রহণ কেবল কামশাস্ত্র-পক্ষেই দৃষ্ট হয় না; যেহেতু ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ইত্যাদি সকল শাস্ত্রেই ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সূত্রকার উহাই স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন—লোকে কতিপয় মাত্র শাস্ত্রজ্ঞ দৃষ্ট হন, যাঁহারা তত্তৎ বিষয়ের তত্ত্ব-গ্রহণে সমর্থ। তাঁহাদিগের নিকট হইতে যাঁহারা শাস্ত্র-গ্রহণে সমর্থ ও যাঁহারা অসমর্থ, এই উভয় শ্রেণীর লোকই প্রয়োগ-শিক্ষা করিয়া থাকেন। এই কারণে বলা হয়—প্রয়োগ সর্ব্বজন-বিষয়ক। প্রয়োগ-গ্রহণ শাস্ত্র গ্রহণ হইতেও প্রধান; যেহেতু গৃহীত শাস্ত্রেরও ফল হইতেছে প্রয়োগ-জ্ঞান।১২

তর্করত্ন মহাশয় ইহার বিশেষ ব্যাখ্যান না করিয়া কেবল বলিয়াছেন, "গ্রন্থকারই অষ্টম সূত্র হইতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন"।১৩

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে—প্রয়োগই যদি সর্ব্ব-জন-বিদিত হইল, তাহা হইলে শাস্ত্রের জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন। শাস্ত্র আর কেহ পড়িতে চাহিবে না। সকলেই প্রয়োগ-মাত্র শিক্ষা করিয়াই কার্য্যসিদ্ধি করিতে চাহিবে। ইহার উত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন ১৪—

শাস্ত্র দূরস্থিত (অর্থাৎ—ব্যবহিত) হইলেও প্রয়োগ-জ্ঞানেরও হেতু।১৫

যশোধর বলিয়াছেন—"শাস্ত্র দূরস্থ কেন, তাহা নিম্নোক্ত বিশ্লেষণ-দ্বারা বুঝা যায়। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্রের আধার-স্বরূপ। যেহেতু শাস্ত্র শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি-কর্ত্তৃক গৃহীত ও প্রচারিত হইয়া থাকে। একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি প্রথমে শাস্ত্রাধ্যয়ন-পূর্ব্বক অনন্তর প্রয়োগেরও শিক্ষা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নিকট হইতে অন্য কোন এক অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি প্রয়োগটি মাত্র জানিয়া প্রয়োগবিৎ বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। এই প্রয়োগ-বিদের নিকট হইতে অপর কোন এক অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি আবার শুধু প্রয়োগ শিখিয়াই প্রয়োগবিৎ হন। আবার তাঁহার নিকট হইতে অপরে প্রয়োগ শিখেন। এইভাবে প্রয়োগ-শিক্ষা বহুল প্রচারিত হইতে থাকে। এ ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে—পরবর্ত্তী প্রয়োগজ্ঞগণের কেহই শাস্ত্রজ্ঞ না হইলেও তাঁহাদিগকে সম্প্রদায়ের মূল প্রবর্ত্তক যিনি ছিলেন, তিনি অবশ্যই শাস্ত্র ও প্রয়োগ—এই দুই বিষয়ই জানিতেন। অতএব, এ কথা বলা চলে যে, পরবর্ত্তী প্রয়োগবিদ্‌গণের সহিত শাস্ত্রের সম্বন্ধ নাই—আর এ কারণে শাস্ত্র তাঁহাদিগের নিকট হইতে দূরে অবস্থিত; কিন্তু প্রয়োগ তাঁহাদিগের জানা বলিয়া প্রয়োগের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ সম্পর্ক—সে হেতু প্রয়োগ তাঁহাদিগের নিকটস্থ। তবে ইহা ঠিক যে, পরবর্ত্তী প্রয়োগবিদ্‌গণের প্রয়োগ-জ্ঞানের মূল উৎস শাস্ত্রজ্ঞান; কারণ, এই সকল প্রয়োগবিদ্‌গণের যিনি আদি—সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন, তিনি যে স্বয়ং একাধারে শাস্ত্রজ্ঞ ও প্রয়োগবিৎ—সে বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এ কারণে, যশোধর বলিয়াছেন—বিপ্রকৃষ্ট হইলেও শাস্ত্র পরম্পরাক্রমে প্রয়োগের হেতু।১৬

তর্করত্ন মহাশয়ও এ বিষয়টি সংক্ষেপে বিশদভাবে

১০। "প্রযুঞ্জীত ইতি প্রয়োগোঽর্থস্তদ্গ্রহণং তাসাম্। তদ্বিজ্ঞেভ্যো যা। ভূক্ষ্যাগ্রগ্রহণম্। স চ যোষিদুপযোগীতি শাস্ত্রেণাবেদিতঃ কথমন্যৈরুপদিশ্যতে? তস্মাদর্থকং স্ত্রীশাসনম্"।—জয়মঙ্গলা (কাঃ সূঃ ১।৩।৫)

১১। "তন্ন কেবলমিহৈব, সর্ব্বত্র হি লোকে কতিচিদেব শাস্ত্রজ্ঞাঃ, সর্ব্ব-জন-বিষয়শ্চ প্রয়োগঃ" (কাঃ সূঃ ১।৩।৬)

১২। "তৎ প্রয়োগগ্রহণং ন কেবলমিহৈবাস্মিন্নেব কামশাস্ত্রে। সর্ব্বত্র হীতি। হিশব্দো হেতৌ। সর্ব্বেষু ব্যাকরণজ্যোতিঃশাস্ত্রাদিষু দৃশ্যতে। তদেব দর্শয়তি—লোক ইত্যাদিনা। কতিচিদেব শাস্ত্রজ্ঞাঃ যে তদ্গ্রহণ-সমর্থাঃ। তেভ্যঃ সমর্থৈরসমর্থৈশ্চ প্রয়োগো গৃহ্যত ইতি সর্ব্বজনবিষয়ঃ। প্রয়োগগ্রহণঞ্চ শাস্ত্রগ্রহণাৎ প্রধানম্। গৃহীতস্যাপি শাস্ত্রস্য প্রয়োগজ্ঞান-ফলত্বাৎ"—জয়মঙ্গলা (কাঃ সূঃ ১।৩।৬)

'প্রয়োগ'-শব্দের অর্থ ব্যবহার। 'গ্রহণ'-অর্থে শিক্ষা। ব্যাবহারিক শাস্ত্রগুলির সম্বন্ধে একথা বলা চলে যে, তাহাদিগের প্রয়োগ-গ্রহণ [practicalknowledge] শাস্ত্র-গ্রহণ (theoretical knowledge] অপেক্ষা আরও অধিকতর প্রয়োজনীয়, কারণ, ঐ সকল শাস্ত্রের জ্ঞান প্রয়োগেই সফল (অর্থাৎ—সার্থক) হইয়া থাকে।

১৩। কামসূত্র, বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৫৭।

১৪। "যদি সর্ব্বজনবিদিতই হইল, তবে শাস্ত্র-শিক্ষা নিষ্প্রয়োজন—শাস্ত্র ত সকলে অধ্যয়ন করে না, এই আশঙ্কা নিবারণার্থ কথিত হইতেছে"—বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৫৭।

১৫। "প্রয়োগস্য চ দূরস্থমপি শাস্ত্রমেব হেতু": ((কাঃ সূঃ ১।৩।৭)

১৬। "গৃহীতশাস্ত্রস্য দূরস্থমপীতি শাস্ত্রজ্ঞজনাধারত্বাৎ। বিপ্রকৃষ্টমপি শাস্ত্রং, পারম্পর্য্যেণ হেতুঃ। একঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ প্রয়োগং গৃহ্নাতি। ততোঽন্যঃ ততোঽন্য ইতি জয়মঙ্গলা (কাঃ সূঃ ১।৩।৭)

বুঝাইয়াছেন—"শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যাহা উপদেশ করেন—সেই উপদেশ মুখে মুখে প্রচারিত হয় এইরূপে প্রয়োগ-শাস্ত্রজ্ঞ (?) অশাস্ত্রজ্ঞ বহু ব্যক্তিই অবগত হয়; অতএব শাস্ত্র-প্রয়োগের সহিত সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট না হইলেও—অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ যিনি না হন—প্রয়োগ তাঁহার বিদিত হইলেও—মূলে কিন্তু শাস্ত্রই বর্ত্তমান। শাস্ত্র-প্রতিপাদিত বিষয় শাস্ত্রজ্ঞ জানিয়াছেন, তাহার পর তাঁহার দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে—সুতরাং শাস্ত্রই মূল হইতেছে। যাহা মূল, তাহার সহিত পরিচয় যে প্রয়োগ-প্রকর্ষের হেতু ইহা বলা বাহুল্য"।১৭

এ বিষয়ে মহর্ষি বাৎস্যায়ন স্বয়ং কয়টি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন :—

(ক) প্রথম দৃষ্টান্ত ব্যাকরণ-শাস্ত্রের। উহার অস্তিত্ব আছে বলিয়াই ত যাঁহারা বৈয়াকরণ নহেন অথচ যাজ্ঞিক—এরূপ ব্যক্তিগণও যজ্ঞানুষ্ঠানকালে উহ করিয়া থাকেন'।১৮

যশোধর ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—বৈদিক বিধি-বাক্য-দ্বারা যে বিষয় অবিহিত, যুক্তিদ্বারা আলোচনা-পূর্ব্বক তাহার—স্থাপন (অর্থাৎ—নির্ণয়) 'উহ'। এই উহ করিতে হইলে প্রাতিপদিক-লিঙ্গ-বচনাদির পরিবর্ত্তন করিতে হয়। এই উহ-প্রক্রিয়া ব্যাকরণে কথিত হইয়াছে। অতএব, যিনি স্বয়ং বৈয়াকরণ, তিনি ব্যাকরণ-জ্ঞানের সাহায্যে অর্থসঙ্গতি রক্ষা করিয়া উহ করিতে সমর্থ। কিন্তু এরূপও দৃষ্ট হয় যে,—যিনি বৈয়াকরণ নহেন—যাজ্ঞিক মাত্র, তিনিও যজ্ঞানুষ্ঠানে উহ করিয়া থাকেন। যথা—প্রকৃতি-যোগে বলা হইয়াছে, 'অগ্নির উদ্দেশে আটটি কপালে করিয়া পুরোডাশ আহুতি প্রদান করিবে'। বিকৃতি-যাগে উহার পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক যাজ্ঞিকেরা প্রয়োগ করেন—'ব্রহ্মতেজঃ-কামনায় সূর্য্যের উদ্দেশে চরু আহুতি প্রদান করিবে'। প্রকৃতি-যাগে অগ্নির উদ্দেশে পুরোডাশ আহুতি-বিধান—কারণ উহাতে অগ্নি দেবতা। বিকৃতি-যাগে সূর্য্য দেবতা। অতএব, তাঁহারই উদ্দেশে চরু আহুতি প্রদেয়। এ হেতু যাজ্ঞিকগণ "সূর্য্যের উদ্দেশে চরু আহুতি দিতে হইবে'—এইরূপে মূল বাক্যটির পরিবর্ত্তন সাধন করিলেন।১৯

যাজ্ঞিকগণ এই যে পরিবর্ত্তন করিলেন, তাহা যে তাঁহারা ব্যাকরণ-জ্ঞান-বলেই করিলেন, এরূপ নাও হইতে পারে। তবে বৈয়াকরণগণ ব্যাকরণ-জ্ঞান-বলে যুক্তি-পূর্ব্বক বিচার-দ্বারা যেরূপ পদাদির পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, ব্যাকরণ-জ্ঞানের অভাব-সত্ত্বেও বিচারাদি না করিয়াই গতানুগতিকতার বশবর্ত্তী হইয়া যান্ত্রিক ব্যবহারক্রমে যাজ্ঞিকগণও সেইরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাজ্ঞিকগণের সাক্ষাৎ ব্যাকরণ-জ্ঞান নাই, একথা সত্য। কিন্তু সাক্ষাৎ ব্যাকরণ-জ্ঞান যাঁহাদিগের আছে, সেই বৈয়াকরণদিগের উহ-করণ দেখিয়া তাঁহারাও তদনুকরণে উহ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ—বৈয়াকরণগণ সাক্ষাৎ উহ করিয়া থাকেন; আর যাজ্ঞিকগণ উহা করেন পরম্পরা-ক্রমে। তবে ইহা ত অবশ্যই স্বীকার্য্য যে—ব্যাকরণ বলিয়া একটি শাস্ত্র আছে,—তাহা হইতে বৈয়াকরণগণ সাক্ষাৎ উহ করিবার প্রক্রিয়া অবগত হন; আর স্বয়ং ব্যাকরণ না পড়িয়াও বৈয়াকরণগণের নিকট হইতে পরম্পরাক্রমে যাজ্ঞিক-গণ উহ-প্রক্রিয়ার শিক্ষা লাভ করেন। অতএব, বৈয়াকরণ-গণের ন্যায় যাজ্ঞিকদিগের উহ-শিক্ষা সাক্ষাৎ ব্যাকরণ-জ্ঞান-বলে না হইলেও উহের মূলে যে ব্যাকরণ-জ্ঞান বর্ত্তমান—ইহা সর্ব্ব-সম্মত সিদ্ধান্ত।২০

(খ) দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রের। জ্যোতিষ-শাস্ত্র আছে বলিয়াই জ্যোতিষ-শাস্ত্রে যাঁহারা অনভিজ্ঞ, তাঁহারাও পুণ্যাদিনে শুভকর্ম্ম করিয়া থাকেন।২১

যশোধর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, জ্যোতিষ-শাস্ত্র বর্ত্তমান আছে বলিয়াই জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ পুরুষগণও কোন জ্যোতির্ব্বিদের নিকট হইতে প্রশস্ত তিথি জানিয়া লইয়া তদ্দিনে অভীষ্ট শুভকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রেও প্রশস্ত দিন নির্ণয়ের উপায় শাস্ত্রই বটে।২২

তর্করত্ন মহাশয় এই সূত্রটির অতি বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন—"কিরূপ তিথি নক্ষত্রে কর্ম্ম করিলে কিরূপ দোষ হয়

১৮। "অস্তি ব্যাকরণমিত্যবৈয়াকরণা অপি যাজ্ঞিকা উহং ক্রতুষু-প্রযুঞ্জতে"—(কাঃ সূঃ ১.৩।৮)

১৯। "শব্দেনাচোদিতস্যার্থস্য যুক্ত্যা বিমৃশ্য চ স্থাপনমূহঃ। স চ প্রাতি-পদিকলিঙ্গবচনান্তরোপাদানেন ব্যাকরণে উক্তঃ। তদ্ব্যাকরণমস্তি, যতোহয়মূহঃ পারম্পর্য্যাশয়াৎ, ইত্যবৈয়াকরণা অপি যাজ্ঞিকাস্তং ক্রতুষু প্রযুঞ্জতে। তদ্ যথা—'আগ্নেয়মষ্টাকপালং পুরোডাশং নির্ব্বপেৎ' ইতি প্রকৃতিপ্রয়োগঃ। সৌর্য্যং চরুং নির্ব্বপেদ্ ব্রহ্মবর্চ্চসকামঃ' ইতি বিকৃতিপ্রয়োগঃ। অত্র সূর্য্য-মুদ্দিশ্যোহঃ, নির্ব্বপেদিতি লিঙ্গাৎ। সৌর্য্যং চরুং নির্ব্বপেদাগ্নেয়বদিতি"—

(কাঃ সূঃ ১।৩।৫)

প্রকৃতি—আদর্শ, prototype; যথা—একাহ সোমযাগের প্রকৃতি—অগ্নিষ্টোম। বিকৃতি—যাহাতে আদর্শের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আছে—variety; যথা—অগ্নিষ্টোমের বিকৃতি—অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র, অপ্তোর্যাম।

২০। 'তদ্ব্যাকরণমস্তি, যতোহয়মূহঃ পারম্পর্য্যাশয়াৎ"—জয়মঙ্গলা।

"একটি কর্ম্মে উপদিষ্ট মন্ত্রের—তাহার ন্যায় কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞাপিত অপর কর্ম্মে যে পদাদি পরিবর্ত্তন—তাহার নাম উহ। যথা—'শুন্ধন্তাং পিতরঃ' এই শাস্ত্রীয় মন্ত্রের 'শুন্ধন্তাং মাতামহাঃ'—এইরূপ উহ হইবে—'পিতরঃ' স্থলে 'মাতামহাঃ' এই পরিবর্ত্তন।—বঙ্গবাসী সং কামসূত্র, পৃঃ ৬৭—৬৮।

সায়ণাচার্য্য 'উহ' পদের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"প্রকৃতাবাম্নাতস্য বিকৃতৌ সমবেতার্থায় তদুচিতপদান্তর প্রক্ষেপেণ পাঠ উহঃ" (ঋগ্‌ভাষ্যোপক্রমণিকা) —প্রকৃতি-যাগে পঠিত মন্ত্রটিতে বিকৃতি-যাগে সঙ্গতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে যথোচিত-পদান্তর-প্রক্ষেপপূর্ব্বকপাঠের নাম উহ।

২১। অস্তি জ্যোতিষমিতি (পাঠান্তর—জ্যোতিষমিতি) পুণ্যাহেষু কর্ম্ম কুর্ব্বতে"—(কাঃ সূঃ ১।৩।৯)

২২। "অস্তি জ্যোতিষমিত্যজ্যোতিষিকা অপি কুতশ্চিদুপলভ্য শস্তদিনেষু কর্ম্ম কুর্ব্বতে। তত্র শাস্ত্রমেব হেতুঃ"—জয়মঙ্গলা।

এই স্থানে তর্করত্ন মহাশয় ব্যাকরণ-জ্ঞানের অভাবে উহ-বিকৃতির একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। উহা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অবান্তর।

এবং কিরূপ তিথি নক্ষত্রে কর্ম্ম করিলে শুভ হয়—এই সকল তথ্য জ্যোতিষ-শাস্ত্রে আছে। তিথি নক্ষত্র গণনাও জ্যোতিষ শাস্ত্রে আছে। শাস্ত্রজ্ঞগণ তিথ্যাদিগণনাও প্রতিদিন নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ; সাধারণে তাহা পারে না। কিন্তু "আজ নবান্নের দিন" এই শুভদিন প্রচার শাস্ত্রজ্ঞের মুখ হইতে হয় বটে, তাহার পর লোকমুখে প্রচারিত হইলে সকলেই তাহাতে নবান্ন ভোজনে প্রবৃত্ত হয়। এই দুইটি ধর্ম্ম্য উদাহরণ এবং পরবর্ত্তী দুইটি লৌকিক উদাহরণে সূত্রকার স্বীয় মত বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার মত এই যে স্ত্রী-জাতির প্রয়োগ-জ্ঞান আছে, ব্যাকরণ-জ্ঞানহীনের পক্ষে গতানুগতিক ভাবে উহ্য করার ন্যায় বা জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞের পক্ষে গতানুগতিক ভাবে শুভদিন ব্যবহারের ন্যায়। কিন্তু তাহার মূল ঐ ব্যাকরণ এবং ঐ জ্যোতিষ। স্ত্রীজাতির প্রয়োগ জ্ঞানের মূলেও এই কামশাস্ত্রই বর্ত্তমান। দুই চারজনও যদি শাস্ত্রশিক্ষা না করে—তাহা হইলে এই প্রয়োগও কালে বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতে পারে।—অতএব শাস্ত্রজ্ঞান-বিলোপ বাঞ্ছনীয় নহে, সেইরূপ স্ত্রীজাতির পক্ষেও এই কামশাস্ত্র-জ্ঞান বিলোপ বাঞ্ছনীয় নহে। জ্ঞান-বিলোপ বাঞ্ছনীয় না হইলে অধ্যয়ন আবশ্যক"।২৩

(গ) তৃতীয় ও চতুর্থ দৃষ্টান্ত একই রূপ—অশ্বশাস্ত্র ও গজশাস্ত্রের; এ কারণে দুইটি একই সূত্রে উক্ত হইয়াছে। সূত্রকার বলিতেছেন—

সেইরূপ অশ্বশাস্ত্র ও গজ শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়াও অশ্বারোহী (অশ্বসাদী) ও গজারোহী (হস্তিপক) (পরম্পরাক্রমে প্রয়োগ অবগত হইয়া) অশ্ব-গজগণকে বশীভূত করিয়া থাকে।২৪

যশোধর ব্যাখ্যা করিয়াছেন—হস্তি-চিকিৎসা অশ্ব-চিকিৎসা হস্তি-শিক্ষা অশ্ব-শিক্ষা ইত্যাদি তত্তৎ শাস্ত্র হইতে শিক্ষা না করিয়াও অশ্বারোহ অশ্বের ও হস্তিপক হস্তীর পোষণ দমনাদি কর্ম্ম করিয়া থাকে। তবে এই সকল ব্যবহারিক প্রয়োগের মূলেও শাস্ত্র।২৫

(ঘ) পঞ্চম দৃষ্টান্ত শাস্ত্র বিষয়ক নহে—লৌকিক। সূত্রকার বলিতেছেন—

২৩। কামসূত্র, বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৫৮—৫৯।

২৪। "তথাশ্বারোহা গজারোহাশ্চাশ্বান গজাংশ্চানধিগতশাস্ত্রা অপি বশয়ন্তি"—(কাঃ সূঃ ১।৩।১০)

বশয়ন্তে— আয়ত্ত করে, শিক্ষা দেয়, পোষ মানায়, break in

২৫। "হস্ত্যশ্ববেক্ষকং হস্তিশিক্ষা চেত্যানধীত্যাপ্যাৎ পোষণদমনাদিকং কর্ম্ম কুর্ব্বতে ইত্যেব। তত্রাপি শাস্ত্রমেব হেতুঃ"—জয়মঙ্গলা।

সেইরূপ রাজা আছেন—এই কারণেই দূরস্থিত জনপদবাসিগণ রাজশাসনের মর্য্যাদা অতিক্রম করে না—ইহাও সেইরূপ।২৬

যশোধর ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—পূর্ব্বোক্ত ন্যায় (অর্থাৎ শাস্ত্র দূরস্থ হইলেও প্রয়োগের মূল—এতদ্দৃষ্টান্তে যে সিদ্ধান্ত করা চলে—তাহাই এ ক্ষেত্রে ন্যায়)—দূরস্থ বস্তু হইলেও কারণ হইতে পারে—কেবল যে শাস্ত্রের পক্ষেই প্রযোজ্য তাহা নহে,লৌকিক বিষয়েও উহা সমভাবে প্রযোজ্য। যাহারা জনপদবাসী, তাঁহারা সাধারণতঃ রাজদর্শনের সুযোগ পান না, এ কারণে তাঁহারা রাজার নিকট হইতে দূরে অবস্থিত। তথাপি তাঁহারা জানেন যে—একজন নিয়মের ব্যবস্থাপক নিশ্চয়ই আছেন, যাঁহার নিকট হইতে এই নিয়মব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। এই কারণে সেই অদৃষ্ট (অতএব দূরস্থিত—ব্যবহিত) ব্যবস্থাপকের ভয়ে তাঁহার কৃত নিয়মমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিতে সাহসী হন না। দার্ষ্টান্তিক স্থলেও এই সকল দৃষ্টান্তানুসারী ন্যায় যোজনীয়।২৭

তর্করত্ন মহাশয় এ স্থলে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন "রাজার অস্তিত্ববৎ শাস্ত্রের অস্তিত্ব আবশ্যক, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যতীত শাস্ত্রের অস্তিত্ব থাকে না, সেইরূপ কামশাস্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন স্ত্রীজাতির মধ্যেও প্রচলিত রাখা আবশ্যক"।২৮

এ বিষয়ে অন্যান্য আলোচনা বারান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

২৬। "তথাস্তি রাজেতি দূরস্থা অপি জনপদা ন মর্য্যাদামতিবর্ত্তন্তে, তদ্বদেতৎ" (কাঃ সূঃ ১।৩।১১।

২৭। "ন শাস্ত্র এবায়ং ন্যায়ো যদ্দূরস্থমপি হেতুঃ, কিন্তু লোকেঽপীত্যাহ—অস্তি রাজেতি। দূরস্থা অদৃষ্টরাজত্বাৎ। অস্তি ব্যবস্থাপকঃ, যত ইয়ং ব্যবস্থেতি তত্রাস্য মর্য্যাদামতিক্রামন্তি তদ্বদেতদিতি দার্ষ্টান্তিকে যোজনীয়ম্"—(জয়মঙ্গলা ১।৩।১১

২৮। কামসূত্র, বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৬০।

এস্থলে তর্করত্ন মহাশয় সূত্রকারের একধাপ উপরে উঠিয়া পড়িয়াছেন সূত্রকার ও টীকাকার পূর্ব্বোক্ত আলোচনা-দ্বারা দেখাইয়াছেন যে—স্ত্রীলোকের কামশাস্ত্রোক্ত প্রয়োগ-বিজ্ঞান দৃষ্ট হয়; অথচ প্রয়োগের মূল শাস্ত্র। সেই শাস্ত্র স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক সাক্ষাৎ অধীত না হইলেও পরম্পরাক্রমে প্রয়োগের মূলে বিদ্যমান—ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ইহার অধিক সূত্রকার এখনও কিছু বলেন নাই। ইহার পরে সূত্রকার দেখাইবেন—কোন কোন স্ত্রীলোকেরও কামশাস্ত্রাধ্যয়ন দৃষ্ট হয়। অতএব, সূত্রকারের যাহা সিদ্ধান্ত, তাহার বিরোধী কোন কথা তর্করত্ন মহাশয় না বলিলেও সূত্রকার-কর্ত্তৃক সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্ব্বেই তর্করত্ন মহাশয় ভাবী সিদ্ধান্তের আভাস এস্থলে প্রদান করিয়াছেন।

[ক্রমশঃ

মায়াবাদ বা পরমার্থশূন্যবাদ

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার

(গৌড়পাদকৃত মাণ্ডূক্যকারিকার অলাতশান্তিপ্রকরণের সত্যানন্দকৃত ভাষ্য অবলম্বনে লিখিত).

মায়াবাদ বা অজাতিবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদের সার কথা শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"। স্বগতত্ব-স্বজাতীয়-বিজাতীয়ভেদশূন্য এক অদ্বিতীয় নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দস্বরূপ অনির্দ্দেশ্য একরস নিরবয়ব বিভু নিত্য নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় অজ বস্তুই ব্রহ্ম এবং তাহাই একমাত্র সত্য। জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞান, দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-দর্শন, ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভোগ ইত্যাদি সর্ব্ববিধ স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়ভেদময় নানা সবিশেষ সচ্চিদানন্দাভাসস্বরূপ, বাক্য-মনের দ্বারা নির্দ্দেশ্য, বহুরস সাবয়ব পরিচ্ছিন্ন সবিকার সক্রিয় জাত বস্তুই জগৎ এবং তাহা মিথ্যা, রজ্জু-সর্পবৎ, মরীচিকা-জলবৎ, গন্ধর্ব্বনগরবৎ, মায়িক ভ্রমোৎপন্ন অজ্ঞানপ্রসূত, পরমার্থতঃ অজাত। মিথ্যা রজ্জুসর্পের অধিষ্ঠান যেরূপ সত্য, রজ্জু মিথ্যা, মরীচিকাজলের অধিষ্ঠান যেরূপ সত্য মরীচি, মিথ্যা গন্ধর্ব্বনগরের যেরূপ সত্য আকাশ সেইরূপ মিথ্যা জগতের অধিষ্ঠান মাত্র সত্য ব্রহ্ম। রজ্জু হইতে যেমন রজ্জুসর্পের উৎপত্তি হয় না, মরীচি হইতে যেমন মরীচিকাজলের উৎপত্তি হয় না, আকাশ হইতে যেমন গন্ধর্ব্বনগরের উৎপত্তি হয় না, তেমনি ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হয় না। ব্রহ্ম অনির্ব্বচনীয় জগদ্ভ্রমের অধিষ্ঠান মাত্র, ব্রহ্মে এই জগদ্ভ্রম নিত্য অবিদ্যমান। যেমন সর্পভ্রমের অধিষ্ঠানরূপ রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া অনির্ব্বচনীয়, পরমার্থতঃ অসৎ, অজাত সর্প জাতবৎ দৃষ্ট হয় সেইরূপ জগৎভ্রমের অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া অনির্ব্বচনীয়, পরমার্থতঃ অসৎ, অজাত জগৎ জাতবৎ অনুভূত হয়। কে এই জগদনুভব করে? সংসারী জীব, যে এই জগতের জ্ঞাতা, দ্রষ্টা, ভোক্তা ইত্যাদি। এই সংসারী জীবও মিথ্যা জগতের অন্তঃপাতী অসৎ, নাস্তি অজাত। মিথ্যা এই সংসারী জীব দেহত্রয়ে অভিমান করিয়া জন্মমৃত্যুচক্রে পরিভ্রমণ করে। কিন্তু যে ভাসস্বরূপ সদব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া দেহাভিমানী আভাসরূপী জীব সংসারী হয় সেই ব্রহ্ম প্রতি দেহভ্রমের অধিষ্ঠানরূপ বিরাজিত থাকিয়া অসংসারী জীব। এই অসংসারী জীবই প্রত্যগাত্মা, ব্রহ্মাভিন্ন। ফল কথা, অনুভবিতা জীব ও অনুভাব্য বস্তু লইয়া যে জগৎ তাহা মিথ্যা, ব্রহ্ম বা আত্মা সত্য।

ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা হইলেও অনুভূত জগৎ লোকতঃ মিথ্যা নহে, এই জন্য মায়াবাদী দ্বিবিধ সত্যের কল্পনা করেন, ব্যবহারিক সত্য ও পারমার্থিক সত্য। জগৎ ব্যবহারিক সত্য, কিন্তু পরমার্থতঃ মিথ্যা, ব্যবহারাতীত ব্রহ্ম একমাত্র প্রকৃত সত্য। সত্যের এই দ্বৈবিধ্যের কল্পনা শ্রুতিতে নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন, জগৎ সত্য, ব্রহ্ম সত্যের সত্য ("সত্যস্য সত্যম্")। সত্য জগতের কারণ বলিয়া ব্রহ্ম সত্যের সত্য, এ কথাও শ্রুতি বলিয়াছেন (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ২।১।২০)। যাহা ব্যবহারতঃ সত্য তাহা যে পরমার্থতঃ মিথ্যা একথা শ্রুতি কোথাও বলেন নাই। শ্রুত্যুক্ত সত্যশব্দের এক অর্থ যে মিথ্যা হইতে পারে, এরূপ ভাবিবার কোন হেতু নাই।

সত্যের দ্বৈবিধ্যকল্পনা বৌদ্ধদার্শনিকদিগের। বৌদ্ধদর্শনের সমগ্র ইতিবৃত্ত আমরা উত্তমরূপে না জানিলেও দেখিতে পাই যে, নাগার্জ্জুন তাঁহার মাধ্যমিকশাস্ত্রে বলিতেছেন, "দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্ম্মদেশনাঃ। লোকসংবৃতিসত্যঞ্চ সত্যঞ্চ পরমার্থতঃ" (মধ্যমকমূল ২৪.৮)। নাগার্জ্জুন খৃষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীর লোক, গৌড়পাদের বহু-পূর্ব্ববর্ত্তী। গৌড়পাদ সংবৃতি ও পরমার্থ শব্দই গ্রহণ করিয়াছেন (মাণ্ডূক্যকারিকা, অলাতশান্তিপ্রকরণ, ৫৭, ৭৩, ৭৪)। সংবৃতি-শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহার-শব্দের প্রয়োগ আচার্য্য শঙ্করই প্রবর্ত্তিত করেন।

অস্মদ্দেশীয় দার্শনিকমাত্রই জানেন যে, বুদ্ধের শিক্ষা "দুঃখং দুঃখং ক্ষণিকং ক্ষণিকং স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং শূন্যং শূন্যম্"। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের পর তাঁহার উপদেশসকল পালি-ভাষায় ত্রিপিটক নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হয়। এই গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পাই যে, বুদ্ধদেব অজ্ঞান হইতে জগতের উৎপত্তির নির্ণয় করেন এবং এই উৎপত্তির নাম দেন প্রতীত্য-সমুৎপাদ। দুঃখের কারণ জন্ম, জন্মের কারণ ভব, ভবের কারণ উপাদান, উপাদানের কারণ তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণ বেদনা, বেদনার কারণ স্পর্শ, স্পর্শের কারণ ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের কারণ নামরূপ, নামরূপের কারণ বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের কারণ নামরূপ-বিজ্ঞান, নামরূপ-বিজ্ঞানের কারণ সংস্কার, সংস্কারের কারণ অজ্ঞান। জন্ম থাকিলে দুঃখ থাকে, জন্ম না থাকিলে দুঃখ থাকে না; ভব থাকিলে জন্ম থাকে, ভব না থাকিলে জন্ম থাকে না; ইত্যাদিরূপে দুঃখের দ্বাদশনিদান বুদ্ধদেব নির্ণয় করেন। এই দ্বাদশ-নিদানের মূল নিদান অজ্ঞান (মহাপদান সুত্তান্ত, মহানিদান সুত্তান্ত)। সুতরাং অজ্ঞানই দুঃখপর্য্যবসানক সমগ্রজগতের কারণ। অজ্ঞান কি? বুদ্ধদেবের মতে জগৎ যে অনিত্য ও অনাত্ম এই জ্ঞানের অভাবই অজ্ঞান (অঙ্গুত্তর নিকায় ২।১০)। জগৎকারণ যে অজ্ঞান এ কথা বুদ্ধদেবই প্রথম বলেন।

জগৎ গ্রাহ্য-গ্রাহকাত্মক, সুতরাং গ্রাহ্য ও গ্রাহক উভয়ই অনিত্য ও অনাত্ম, অর্থাৎ অন্তঃসারশূন্য, মিথ্যা, শূন্য (সংযুক্ত নিকায় ৩।১৯-২২)। বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহাকে দ্বিবিধ নৈরাত্ম্য বলা হয়, পুদ্গলনৈরাত্ম্য ও ধর্ম্মনৈরাত্ম্য। পুদ্গল বা পুরুষ বা জীব পঞ্চস্কন্ধ। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান (নামরূপের জ্ঞান, সবিশেষ জ্ঞান), এই পঞ্চ স্কন্ধ মিলিয়া জীব, জীবের এতদ্ব্যতিরিক্ত কোন সত্তা নাই। ধর্ম্মনৈরাত্ম্য গ্রাহ্য বিষয়ের নৈরাত্ম্য। অজ্ঞানবশতঃ মিথ্যা জগতে অভি-

নিবেশ জন্য জগদনুভব হয় ; অজ্ঞানজন্য তৃষ্ণা বা বাসনাই জগদনুভবের ও সংসারাসক্তির কারণ। এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া গৌড়পাদ বলিয়াছেন, "ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোঽস্য ন বিদ্যতে। এতৎ তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে ॥" (মাণ্ডুক্যকারিকা অলাতশান্তি প্রকরণ ৭১), "অভূতাভিনিবেশোঽস্তি দ্বয়ং তত্র ন বিদ্যতে। দ্বয়াভাবং স স বুদ্ধৈব নির্নিমিত্তো ন জায়তে ॥" (ঐ ৭৫) ; এবম্বিধ দ্বিবিধ নৈরাত্ম্য বা জগন্মিথ্যাত্ব বা শূন্যতা পরমার্থ সত্য, আর অজ্ঞান-প্রসূত বাসনাপ্রভব জগদস্তিত্ব সাংবৃতিক সত্য। মনে রাখিতে হইবে যে, জগৎকে শূন্য বলিলে এরূপ বুঝায় না যে জগৎ অনুভবের বিষয় নহে, পরন্তু ইহাই বুঝায় যে, জগৎ অন্তঃসার-শূন্য, বৌদ্ধ দার্শনিক ভাষায় স্বভাবশূন্য। "যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতং নৈবেহ প্রতিষিধ্যতে। সত্যতঃ কল্পনা ত্বত্র দুঃখহেতু-র্নিবার্য্যতে ॥" (বুদ্ধবাক্য)। "Śūnya is simply an insistence that all things have no self-essence" (Introduction to Mahāyāna Buddhism by William Mc. Goern. p. 21) জাগতিক বস্তুকে যতই বিশ্লেষণ করা যাউক তাহার মধ্যে কোন নিত্য সারবস্তু পাওয়া যায় না।

পালি বৌদ্ধশাস্ত্র অনুসারে বুদ্ধদেব কোন নিত্য সদ্বস্তুর কথা বলিতেন না, নিত্য আত্মা আছে কি না এ কথার আলোচনা করিতেন না। বরং এ বিষয়ের আলোচনা যে মাত্র বিভ্রান্তিকর, এই কথাই বলিতেন (সব্বাসব সুত্ত, সংযুত্ত নিকায় ১।৫২, ৩।১৪)। জগন্নাস্তিত্বরূপ শূন্যতা ভিন্ন কোন পরমার্থ সত্যের উপদেশ পালিশাস্ত্রে নাই। অবশ্য "নির্ব্বাণং শান্তম্" এ কথা আছে, কিন্তু এই নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ নির্ব্বাসন বা বাসনা-শূন্যতা এবং তজ্জন্য দুঃখাভাবরূপ শান্তি এবং পরিণামে পঞ্চস্কন্ধের বিভঙ্গহেতু জীবের শূন্যে বিলয়।

বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের পর বৌদ্ধগণের মধ্যে মত-ভেদ হয় এবং ফলে অনেকগুলি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। মৌলিক মতভেদ লইয়া প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়, স্থবিরপন্থী ও মহাসঙ্ঘিক। স্থবিরপন্থীরা শূন্যের পশ্চাতে কোন সদ্বস্তুর অস্বীকার করেন। মহাসঙ্ঘিকরা বলেন যে, সাধারণতঃ যাহা বুদ্ধদেবের শিক্ষা বলিয়া পরিচিত তাহা অজ্ঞ মূঢ় জনসাধারণের জন্য, জ্ঞানী শিষ্যদিগকে তিনি পরমার্থ সূক্ষ্মতত্ত্ব সদ্বস্তুর শিক্ষা দিয়াছেন যে-শিক্ষা মাত্র জগন্মিথ্যাত্ব-বিষয়ক নহে, পরমার্থ সদ্বস্তুবিষয়কও, জগন্মিথ্যাত্বই যে কেবল পরমার্থ সত্য তাহা নহে, নিত্য সদ্বস্তুও পরমার্থ সত্য।১ এই দুই সম্প্রদায়ের নিজেদের মধ্যেও ভেদ ছিল। ক্রমে এই দুই সম্প্রদায় হীনযান ও মহাযান (বা একযান বা অগ্রযান) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মাণ্ডুক্য-কারিকার অলাতশান্তি প্রকরণের ৯০ সংখ্যক কারিকায় গৌড়পদে অগ্রযান নামে মহাযানের উল্লেখ করিয়াছেন।

বৌদ্ধদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার মতভেদ শূন্যতা লইয়াই হয়। আমরা উপরে দ্বিবিধ নৈরাত্ম্যের কথা বলিয়াছি, পুরুষ নৈরাত্ম্য ও ধর্ম্মনৈরাত্ম্য। সর্ব্বসম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরাই দ্বিবিধ নৈরাত্ম্য স্বীকার করিলেও স্থবিরপন্থী বলেন যে একমাত্র পুরুষই শূন্য ; কারণ পুরুষ পঞ্চস্কন্ধের সমবায় মাত্র, তাহার স্বরূপ কিছুই নাই ; আর বাহ্যার্থ সকল ক্ষণিক, পরতন্ত্র হইলেও জাত, সুতরাং শূন্য নহে এবং বুদ্ধদেবও প্রতীত্যসমুৎ-পাদে অজ্ঞান হইতে ইহাদের জাতির উপদেশ দিয়াছেন।২

বিজ্ঞানবাদীরা বলেন যে বাহ্যার্থ ক্ষণিক বিজ্ঞানের প্রতিভাস মাত্র সুতরাং শূন্য, অতএব ইহাঁদের মতে পঞ্চস্কন্ধ পুরুষ ও বাহ্যার্থ উভয়ই শূন্য, কেবল ক্ষণিক বিজ্ঞানই তাহার ক্ষণিক, পরতন্ত্র, অস্তিত্বের দ্বারা গ্রাহক ও গ্রাহ্যরূপে প্রতিভাত হয়, বিজ্ঞান ক্ষণিক হইলেও শূন্য নহে। শূন্যবাদী মাধ্যমিকরা বলেন যে, যাহাই ক্ষণিক পরতন্ত্র, তাহাই অজাত, তাহাই শূন্য ; সুতরাং পুরুষ যেমন শূন্য তেমনি বাহ্যার্থ ও বিজ্ঞানও শূন্য। এইরূপ শূন্যবাদীরা দ্বিবিধ নৈরাত্ম্যকে সর্ব্বশূন্যতায় পরিণত করেন এবং জগদনুভূতিকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য সংবৃতিক সত্য ও পরমার্থ সত্য এই দ্বিবিধ সত্যের কল্পনা করেন। এই শূন্য-

১ "Buddha proposed or accepted a system denying the existence of an eternal soel, and reducing phenomenal existence to a congerius of separate elements evolving gradually towards final extinction. To this ideal of a lifeless nirvāna and an extinct Buddha some schools remained faithful. A tendency to convert Buddha into a super-human eternally living principle manifested itself early among his followers and led to a schism (The Cenception of Buddhist Nirvāna by the Stcherbatsky, p. 60).

২ "The Sarvastivādins hold that all elements (dharmas) exist on two different planes, the real essence of the element (dharma-svabhāva) and its momentary manifestation (dharma-lakshaṇa). The first exists always, in past, present and future. It is not eternal (nitya), because eternality means absence of change, but it represents the potential appearances of the element into phenomenal existence, and its past appearances as well. This potentiality is existing for ever (sarvadā asti). Even in the suppressed state of nirvāna when all life is extinct, these elements are supposed to represent some entity, although its manifestative-power has been suppressed for ever." (The Central Conception of Buddhism and the Meaning of the word Dharma by Th. Stcherbatsky, pp. 41-42).

বাদ হইতেই মহাযানের পূর্ণাঙ্গ বিকশিত হয়।[৩] পালি বৌদ্ধ শাস্ত্র ভিন্ন সংস্কৃত ভাষাতে বিরাট বৌদ্ধশাস্ত্র আছে, মহাযানের গ্রন্থ সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত।

শূন্যবাদের দুইটি স্তর আছে, প্রথম মাধ্যমিকদিগের অত্যন্তশূন্যবাদ ও দ্বিতীয় পরমার্থ-আর্যজ্ঞান-মহাশূন্যবাদ। প্রথম বাদে জগৎশূন্যতাই পরমার্থ সত্য ও দ্বিতীয় বাদে লোকোত্তরজ্ঞানে (মাণ্ডুক্যকারিকার অলাতশান্তিপ্রকরণ ৮৮) যে অসঙ্গ, সর্ব্বপ্রকার জগদাভাসশূন্য, অদ্বয় নিত্য চিন্মাত্র সত্ত্ব প্রতিফলিত হয় তাহাই পরমার্থ সত্য, পরমার্থ-আর্যজ্ঞান মহাশূন্যতা, মাত্র জগৎশূন্যতা নহে। প্রথমবাদকে আমরা নিষেধাত্মক ও দ্বিতীয়বাদকে বিধিনিষেধ-উভয়াত্মক বলিলেও বলিতে পারি। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, মহাযানী বৌদ্ধরাই কেবলাদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের কল্পয়িতা, যাহা আমরা গৌড়পাদের কারিকায় পাই, পরমার্থ-আর্যজ্ঞান-মহাশূন্যবাদই কেবলাদ্বৈতবাদ। দুই স্তরের শূন্যবাদই মহাযান নামে খ্যাত।

মাধ্যমিকদিগের অত্যন্ত শূন্যবাদের গ্রন্থ প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্র, নাগার্জ্জুনকৃত (খৃষ্টীয় দ্বিতীয়. তৃতীয় শতাব্দী) মাধ্যমিক সূত্র প্রভৃতি, শান্তিদেবকৃত (খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী) বোধিচর্যাবতার। পরমার্থ-আর্যজ্ঞান-মহাশূন্যবাদের প্রধান গ্রন্থ লঙ্কাবতার-সূত্র ও লঙ্কাবতার-সূত্র অবলম্বনে অশ্বঘোষকৃত মহাযান-শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র (এ অশ্বঘোষ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ বুদ্ধচরিত-রচয়িতা মহাকবি অশ্বঘোষ কি না এ বিষয়ে আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ সন্দেহ করেন, যথা কিমুরা)। গৌড়পাদের মাণ্ডুক্যকারিকার অলাতশান্তি-প্রকরণ লঙ্কাবতার-সূত্রের সারসঙ্কলন।

কিমুরা মনে করেন যে প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্রে যে "ধর্ম্ম স্বভাবনিত্য" বলা হইয়াছে তাহার দ্বারা নিত্য সত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে (Hīnayāna and Mahāyāna and the origin of Mahāyāna Buddhism by Ryuken Kimura, P. 82), এবং তিনি অধ্যাপক উমাদার গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছেন যে, নাগার্জ্জুন প্রজ্ঞাপারমিতা শাস্ত্রে ও ধর্ম্মধাতু শাস্ত্রে সর্ব্বধর্ম্মকে ও ধর্ম্মধাতুকে আদিশুদ্ধ বলায় নিত্য সত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ আছে, কারণ, বোধিচর্যাবতার-পঞ্জিকায় প্রজ্ঞাকরমতি সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে মাধ্যমিক মতে ধর্ম্মধাতু প্রভৃতি শব্দ সর্ব্বধর্ম্মের অত্যন্ত-শূন্যতারই ব্যঞ্জক।

বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের পর অল্পকালের মধ্যে মহা-সঙ্ঘিকগণ বিমলচিত্তস্বভাব আখ্যা দিয়া সত্ত্বের ধারণা করেন। লোকোত্তরবাদী মহাসঙ্ঘিকগণ লৌকিক ও উত্তর লৌকিক নামে দ্বিবিধ ধর্ম্মের কল্পনা করিয়া বলেন যে, লৌকিক ধর্ম্ম মিথ্যা, উত্তরলৌকিক ধর্ম্ম একমাত্র সত্য। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকে উপায়কৌশল্য-পরিবর্ত্ত অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, "বিদিত্বা বুদ্ধা দ্বিপদানা-মুত্তমাঃ প্রকাশয়িষ্যন্তি মমৈকযানম্। ধর্ম্মস্থিতিং ধর্ম্মনিয়ামতাং চ নিত্যস্থিতাং লোকে ইমামকল্প্যাম্", অর্থাৎ, ইহা জানিয়া মানবশ্রেষ্ঠ বুদ্ধগণ আমার একযান প্রকাশ করিবেন, ধর্ম্মের স্থিতি, ধর্ম্মের নিয়ামতা ও লোকে ধর্ম্মের এই অকল্প্য নিত্য-স্থিতি প্রকাশ করিবেন। মহাসঙ্ঘিকগণের দ্বিবিধ ধর্ম্ম মহা-যানে পঞ্চ ধর্ম্মে বিভক্ত হয়, যথা, নিমিত্ত, নাম, বিকল্প, সম্যক্ জ্ঞান ও তথতা। নিমিত্ত (রূপ) নাম ও বিকল্প লৌকিক ধর্ম্ম, সম্যক্ জ্ঞান ও তথতা উত্তরলৌকিক ধর্ম্ম। লোকোত্তর জ্ঞান, সম্যক্ জ্ঞান ও লোকোত্তর জ্ঞানের জ্ঞেয় সত্ত্ব তথতা। প্রকৃত পক্ষে সম্যক্ জ্ঞান ও তথতা একই চিৎ-তত্ত্বের দ্বিবিধ ভাব। যেমন গৌড়পাদ বলিয়াছেন, "আকল্পকমজং জ্ঞানং জ্ঞেয়াভিন্নং প্রচক্ষতে। ব্রহ্ম জ্ঞেয়মজং নিত্যমজেনাজং বিবুধ্যতে॥" (মাণ্ডুক্যকারিকা, অদ্বৈ-প্রকরণ ৩৩) মাণ্ডুক্য-কারিকার অলাতশান্তিপ্রকরণে গৌড়পাদ এই পঞ্চ ধর্ম্মের বিচার করিয়াছেন এবং সর্ব্বত্র ধর্ম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এবং নানাবিধ বিচারের দ্বারা নিমিত্তের মিথ্যাত্ব স্থাপন করিয়াছেন, "যত্র বর্ণা ন বর্ত্তন্তে বিবেকস্তত্র নোচ্যতে" (অলাতশান্তিপ্রকরণ ৬০) বলিয়া নামের মিথ্যাত্ব স্থাপন করিয়াছেন এবং "যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং চিত্তং চলতি মায়য়া। তথা জাগ্রদ্দ্বয়াভাসং চিত্তং চলতি মায়য়া॥" (অলাতশান্তি-প্রকরণ ৬১) বলিয়া বিকল্পের মিথ্যাত্ব স্থাপন করিয়াছেন। প্রকরণের ৭৪-সংখ্যক পর্য্যন্ত কারিকা প্রধানতঃ লৌকিক

---

৩ "According to the Mādhyamika System real was what possesed a reality of its own (svabhāva), what was not produced by causes (akṛta—asamskṛta), what was not dependent on anything else (paratra nirapeksha). In Hinayana the elements (Dharmas), although interdependent (Sanskṛta = pratītya—samutpanna) were real (vastu). In Mahāyāna all elements, because interdependent, were unreal (Sūnya = svabhāva-sūny). The definition of reality (tattva) in Mahāyāna is the following one—'uncognisable from without, quiescent, indifferentiated in words, unrealisable in concepts, non.plural—this is the essence of reality.'......In Hīnayāna we have a radical pluralism and in Mahāyāna a radical monism." (The Conception of Buddhist Nirvāṇa by Th. Stcherbatsky, pp. 40-41).

"Nāgārjuna in his Prajñāpāramita-Sāstra says, 'In Srāvaka doctrines (Hīnayāna) we have the idea of Purusha-Sūnyatā while in the Buddha-vehicle (Mahāyāna) both the teachings of Purusha-Sūnyatā and Dharma-Sūnyatā." (Hīnayāna and Mahāyāna and the Oginin of Mahāyāna Buddhism by Ryuken Kimura, p. 77).

ধর্ম‌ত্রয়ের মিথ্যাত্বস্থাপনে নিয়োজিত, ৭৫-সংখ্যক কারিকা হইতে শেষ পর্যন্ত উত্তরলৌকিক ধর্ম‌দ্বয়ের সত্যস্বরূপের বিবৃতিতে নিয়োজিত।

উপরে সম্যক্ জ্ঞান বা লোকোত্তর জ্ঞানের কথা বলিয়াছি। জ্ঞানের ত্রিবিধ বিভাগ ; যথা : লৌকিক জ্ঞান, শুদ্ধলৌকিক জ্ঞান ও লোকোত্তর জ্ঞান। লৌকিক জ্ঞান মূঢ় জনসাধারণের, শুদ্ধলৌকিক জ্ঞান মধ্যমসাধকদিগের ও লোকোত্তর জ্ঞান বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধগণের (লঙ্কাবতার-সূত্র ৬৬)। অলাতশান্তিপ্রকরণের ৮৭ ও ৮৮-সংখ্যক কারিকায় গৌড়পাদ এই ত্রিবিধ জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন।

পুনশ্চ, জ্ঞানের ত্রিবিধ স্বভাব মহাযানের আর এক বিশেষত্ব, পরিকল্পিত স্বভাব, পরতন্ত্র-স্বভাব ও পরিনিষ্পন্ন-স্বভাব। পরিকল্পিত স্বভাব জ্ঞান রজ্জুসর্প প্রভৃতির, পরতন্ত্র-স্বভাব জ্ঞান ব্যবহারিক জগতের, পরিনিষ্পন্ন-স্বভাব জ্ঞান পরমার্থ সত্যের। পরিকল্পিত স্বভাব ও পরতন্ত্র-স্বভাব সংবৃতি ও পরিনিষ্পন্ন-স্বভাব পরমার্থ। পরিনিষ্পন্ন-স্বভাব ও লোকোত্তর জ্ঞান একই বস্তু। পঞ্চ ধর্মে‌র মধ্যে নিমিত্ত, নাম ও বিকল্প পরিকল্পিত ও পরতন্ত্র, সম্যক্ জ্ঞান ও তথতা পরিনিষ্পন্ন। অলাতশান্তিপ্রকরণের ২৪, ৭৩ ও ৭৪-সংখ্যক কারিকায় গৌড়পাদ পরিকল্পিত ও পরতন্ত্রের মিথ্যাত্বের কথা বলিয়াছেন।৪

মহাযানে পরমার্থসত্যের অনেকগুলি নাম আছে যথা, তথতা বা অবিতথতা বা ভূততথতা, তথাগতগর্ভ, বিজ্ঞান, চিত্ত বা চিত্তমাত্র, শূন্যতা বা পরমার্থ-আর্য্যজ্ঞান-মহাশূন্যতা, ধর্ম্মধাতু। ইহাদের মধ্যে বিজ্ঞান, চিত্ত ও ধর্ম্মধাতু এই তিন নাম গৌড়পাদ ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা স্বল্পকথায় প্রত্যেকটি নামের অর্থ দিব।

তথতা বা অবিতথতা বা ভূততথতা—তথতা-শব্দটি শ্রৌতসাহিত্যে অপরিচিত হইলেও তথা, বিতথ, বৈতথ্য শব্দের ব্যবহার আছে। গৌড়পাদের ভাষ্য হইতেই ইহাদের অর্থ পাওয়া যায়। "বৈতথ্যং সর্ব্বভাবানাং স্বপ্ন আহুর্মনীষিণঃ" (মাণ্ডূক্যকারিকা, বৈতথ্যপ্রকরণ১), "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা। বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তো, বিতথা ইব লক্ষিতাঃ॥" (বৈতথ্য-প্রকরণ ৬, অলাতশান্তিপ্রকরণ ৩১), "আদ্যন্তবত্ত্বান্ মিথ্যৈব স্মৃতে স্মৃতাঃ" বৈতথ্যপ্রকরণ ৭, অলাতশান্তিপ্রকরণ ৩২)—এই সকল হইতে আমরা পাই বৈতথ্য-শব্দের অর্থ নাস্তিত্ব, মিথ্যাত্ব, বিতথ-শব্দের অর্থ নাস্তি, মিথ্যা, অবিতথ-শব্দের অর্থ অস্তি, সৎ, সত্য। অর্থ-অনুসারে অবিতথতা ও তথতা একই। ভূততথতা-শব্দের অর্থ ভূত, অর্থাৎ জাত, বস্তুর সম্বন্ধে তথতা।

তথাগত গর্ভ—তথতা শব্দের সহিত তথাগতগর্ভ শব্দের সম্বন্ধ রহিয়াছে। বুদ্ধের এক নাম তথাগত, অর্থাৎ সত্য-স্বরূপের অবতার। সুতরাং তথাগত-গর্ভ শব্দের অর্থ সত্য-স্বরূপের অবতার বুদ্ধের অন্তরস্থ সারভূত তত্ত্ব।

বিজ্ঞান—বিজ্ঞানকে প্রথমতঃ দ্বিবিধ বলা যাইতে পারে, পরমার্থ বিজ্ঞান ও সংবৃতি বিজ্ঞান। পরমার্থ বিজ্ঞান, অদ্বয়, শান্ত, অনাভাস, অজ ; সংবৃতি বিজ্ঞান গ্রাহক-গ্রহণরূপে বিজ্ঞানাভাস মাত্র, মিথ্যা (অলাত শান্তি প্রকরণ ৪৫-৪৮)। মহাযানে (লঙ্কাবতার-সূত্রে) অষ্টবিধ বিজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে সাতটি সংবৃতি বিজ্ঞান যথা, মন,মনোবিজ্ঞান ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিজ্ঞান। হীনযান মতে বিজ্ঞান ষড়বিধ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান।

চিত্ত বা চিত্তমাত্র—শ্রৌত সাহিত্যে চিত্ত শব্দের অর্থ অন্তরিন্দ্রিয় মন। মহাযান-সাহিত্যে পরমার্থ চিত্ত নির্বিষয়, নিত্য, অসঙ্গ, অজ (অলাতশান্তি প্রকরণ ২৬-২৮, ৪৬, ৫৪, ৭২, ৭৬, ৭৭)। পরমার্থ চিত্তকে চিত্তমাত্রও বলা হয়, যেমন চিৎকে চিন্মাত্র বলা হয়।

শূন্যতা বা পরমার্থ-আর্যজ্ঞান-মহাশূন্যতা—পূর্ব্বে আমরা দ্বিবিধ শূন্যতার কথা বলিয়াছি—পুরুষ শূন্যতা ও ধর্ম্মশূন্যতা। লঙ্কাবতার-সূত্রে সপ্তবিধ শূন্যতা বর্ণিত হইয়াছে, যথা—(১) লক্ষণ-শূন্যতা (অলাতশান্তি প্রকরণ ৬৭), (২) ভাবস্বভাব-শূন্যতা (ঐ ২৩), (৩) অপ্রচরিতশূন্যতা অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যশূন্যতা (ঐ ৮০), (৪) প্রচরিতশূন্যতা অর্থাৎ কর্ম্মশূন্যতা (ঐ ৭৯), (৫) নিরভিলাপ্যশূন্যতা অর্থাৎ অনির্ব্বাচ্যশূন্যতা (ঐ ৫২), (৬) পরমার্থ আর্যজ্ঞান মহাশূন্যতা (ঐ ৮১-৮২) এবং (৭) ইতরেতরশূন্যতা বা অন্যোন্যাভাব (ঐ ১৯)। ইহাদের মধ্যে পরমার্থ-আর্যজ্ঞান-মহাশূন্যতাই পরমার্থ শূন্যতা, অপরগুলি সংবৃতিশূন্যতা। সংবৃতিশূন্যতাগুলির মধ্যে লক্ষণশূন্যতা প্রধান, অলাতশান্তিপ্রকরণের ৬৭ সংখ্যক কারিকায় গৌড়পাদ নামতঃ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য স্থলে নামতঃ উল্লেখ না থাকিলেও, সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে। অজ, অনিদ্র, অস্বপ্ন, স্বয়ং-প্রভ, সকৃদ্বিভাত ভগবান, ধর্ম্মধাতু বলিয়া পরমার্থ-আর্যজ্ঞান-মহাশূন্যতার সুন্দর বর্ণনা ৮১-৮২ সংখ্যক কারিকায় রহিয়াছে। প্রত্যুত অলাতশান্তিপ্রকরণের আদ্যোপান্ত সপ্তবিধশূন্যতার বিবৃতি।

৪ The three classes are (1) illusion (parikalpita), (2) relative knowledge (paratantra), (3) absolute knowledge (parinishpanna). The first is absolutely false, as when a rope is mistaken for a snake. The second is a pragmatic comprehension of the nature of things sufficient for ordinary purposes, as when the rope is seen to be a rope. The third deals with the real and ultimate nature of things, as when a rope is analysed and its ultimate nature understood." (Introduction to Mahāyāna Buddhism by Mc. Gregor, p. 33).

ধর্ম্মধাতু—বোধিচর্য্যাবতারপঞ্জিকায় প্রজ্ঞাকরমতি বলিয়াছেন, "শূন্যতা তথতা ভূতকোটিঃ ধর্ম্মধাতুরিত্যাদিপর্য্যায়াঃ", অর্থাৎ শূন্যতা, তথতা, ভূতকোটি, ধর্ম্মধাতু প্রভৃতি একার্থক শব্দ। মহাযান শাস্ত্র ধর্ম্মধাতু শব্দের ব্যাখ্যা করেন, "ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মতা ধর্ম্মসমতা ধর্ম্মস্থিতিতা ধর্ম্মনিয়ামতা ধর্ম্মধাতুঃ তথতা অবিতথতা", অর্থাৎ ধর্ম্মধাতু ধর্ম্মসকলের ধর্ম্মতা, ধর্মসকলের সমতা, ধর্মসকলের স্থিতিতা, ধর্মসকলের নিয়ামতা, তথতা, অবিতথতা। উপরে বলিয়াছি—ধর্মধাতু পরমার্থ-আর্যজ্ঞান-মহাশূন্যতা। অলাতশান্তিপ্রকরণের ৮১-৮২ সংখ্যক কারিকায় ধর্মধাতুর বর্ণনা করা হইয়াছে।

সকল মহাযানগ্রন্থেই পরমার্থ সত্যের তথতা প্রভৃতি এই সংজ্ঞাগুলি ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ এই যে, প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি অত্যন্ত শূন্যবাদের গ্রন্থে ইহারা অত্যন্ত শূন্যতার দ্যোতক, আর লঙ্কাবতার-সূত্র প্রভৃতি অদ্বয় নিত্য সদ্বস্তু প্রতিপাদক পরমার্থ-আর্যজ্ঞান-মহাশূন্যবাদের গ্রন্থে ইহারা অসঙ্গ অনাভাস অজ, নিত্য অদ্বয় অনাখ্যেয় সদ্বস্তুর নির্দ্দেশক।

মাধ্যমিক মতে যে তথতা প্রভৃতি শব্দ অত্যন্ত শূন্যতার দ্যোতক তাহা প্রজ্ঞাকরমতি বোধিচর্য্যাবতারের টীকায় স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, যথা—"সর্ব্বধর্মাণাং নিঃস্বভাবতা শূন্যতা তথতা ভূতকোটিঃ ধর্মধাতুরিত্যাদিপর্য্যায়াঃ। সর্ব্বস্য হি প্রতীত্যসমুৎপন্নস্য পদার্থস্য নিঃস্বভাবতা পারমার্থিকং রূপম্ যথাপ্রতিভাসং সাংবৃতস্যানুৎপন্নত্বাৎ।" (বোধিচর্য্যাবতারপঞ্জিকা ৯।২)। বোধিচর্য্যাবতারেও উক্ত হইয়াছে (৯।৩০), "গ্রাহ্যমুক্তং যদা চিত্তং তদা সর্ব্বে তথাগতাঃ। এবং চ কো গুণো লব্ধশ্চিত্তমাত্রেঽপি কল্পিতে॥" অর্থাৎ চিত্ত গ্রাহ্যমুক্ত হইলেই যখন সকলে তথাগত হন, তখন চিত্তমাত্রও স্বীকার করিয়া লাভ কি?

অতি সংক্ষেপে প্রধান প্রধান বৌদ্ধ দার্শনিক মত সকলের বিশেষতঃ মহাযানমতের, স্থূল স্থূল কথাগুলি বলিলাম। বহু শতাব্দী ধরিয়া আলোচিত, পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত বৌদ্ধ-দর্শন দর্শন জগতের বিশাল সম্পদ। ইহার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব এবং আমার শক্তিরও অতীত।

ভারতীয় মধ্যযুগের সাধকসম্প্রদায়

রায় বাহাদুর শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ

ভারতীয় মধ্যযুগের সাধক-সম্প্রদায় সম্বন্ধে আলোচনার চেষ্টা আমার মত লোকের পক্ষে নিতান্তই ধৃষ্টতা। যাঁরা দীর্ঘজীবনব্যাপী অনুশীলনের ফলে এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য আহরণ করেছেন আর সম্যক্ জ্ঞান অর্জ্জন করেছেন তাঁদেরই উপরে এসম্বন্ধে আলোচনা করবার অধিকার বর্ত্তাইতে পারে। পণ্ডিতপ্রবর ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় তাঁর সারা জীবনের সাধনা এই সব সাধকের অমূল্য বাণী আহরণে নিয়োজিত করেছেন, সেগুলি তাঁর রমণীয় ভাষায় সহজবোধ্য করে বঙ্গবাসীকে উপহার দিয়াছেন। সাহিত্য ও সাধনক্ষেত্রে তাঁর এ দান অমূল্য—বঙ্গবাসী তাঁর কাছে চিরদিনের জন্য অচ্ছেদ্য ঋণপাশে বদ্ধ রইল। বহুবর্ষ ধরে আমার দীর্ঘ পর্য্যটনে তাঁর কতক কতক পুস্তিকা আমার নিত্যসহচররূপে কাছে থাকত—কতই না আনন্দ পেয়েছি তাতে—বন্ধু বান্ধবদের সেই আনন্দের ভাগী করা ছাড়া আমার আর কোন দুরাশা নেই। তাই আজ আপনাদের কাছে আমার এ ধৃষ্টতার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিতে সাহসী হচ্ছি।

ভারতবর্ষের যে ইতিহাসের সঙ্গে আমরা সাধারণতঃ পরিচিত সেটা রাষ্ট্রিক ইতিহাস। রাজায় রাজায় বিগ্রহ, বিজাতীয় রণবাহিনীর কাছে ভারতের পরাজয় প্রভৃতি ভারতের অকৃতার্থতারই পরিচয় এ ইতিহাসে বেশী করে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রিক সাধনা যে ভারতবর্ষের অন্তরের সাধনা নয়, তার প্রমাণও এ ইতিহাসে যথেষ্ট আছে। মাঝে মাঝে বড় বড় রাজা ও সম্রাট যে দেখা না দিয়েছেন তাও নয় কিন্তু তাঁদের মহিমা তাঁদেরই মধ্যে স্বতন্ত্র হয়ে বিরাজ করেছে, জনসাধারণের অন্তরের যোগ বা তাদের নিজেদের সৃষ্টির কাহিনী তা'তে পাওয়া যায় না। এই সব রাষ্ট্রিক দশা-বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়েও একটা স্বতন্ত্র আত্মিক সাধনার ধারা ভারতবর্ষে অনন্তকাল ধরে প্রবহমান দেখা যায়। আসলে সেইটেই ভারতের স্বকীয় সাধনা, তার অন্তরের জিনিষ। এই সাধনধারার ইতিহাসেই আমরা ভারতের প্রাণবান ইতিহাসের আভাষ পাই; ভারতের লক্ষ্য কি ছিল সিদ্ধিই বা কতটা হয়েছিল, ভারতের যথার্থ সার্থকতা কোথায়, তাও এই ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেই দেখতে পাই।

এই ইতিহাসের আরম্ভ বৈদিকযুগে যখন আর্য্যেরা এদেশে এলেন। তখনও ভারতবর্ষ দ্রবিড় ও প্রাচীনতর সভ্যতার সমৃদ্ধিতে সুসম্পন্ন। বহুবর্ষ ধরে ঘাত-প্রতিঘাতের সংঘাতে আর্য্য ও আর্য্যপূর্ব্ব নানা সভ্যতা মিলে একটা বিরাট ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠতে লাগল। সেই আদিমযুগে এ নূতন সৃষ্টি গড়ে উঠতে মোটেই বাধে নি, কারণ তখনকার সেই সব সমাজে প্রাণশক্তি ছিল পূর্ণমাত্রায়। সেই সৃষ্টির মধ্যেই আবার বহুতর জাতির ভারতে আগমনের বার্ত্তা আমরা পাই। শক, হূণ প্রভৃতি নানা জাতির উল্লেখ মহাভারতে ও পুরাণে দৃষ্ট হয়। অচিরেই তখনকার সেই প্রাণবান বিরাট ভারত-সমাজে এই সব জাতি সহজেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল।

তাদের আর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র রইল না। বাহিরের এই সব নানারূপ বিচিত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতি ও নব নব চিন্তার ধারায় প্রভাবেই হয় ত বৈদিকযুগের কর্মকাণ্ড ক্রমশঃ উপনিষদে আধ্যাত্মবাদের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগল। উপনিষদের অপূর্ব্ব চিন্তাধারা জ্ঞানযোগ আর ভক্তিবাদের প্রভাব তখনকার সমাজ-জীবনে প্রতিফলিত হ'য়ে প্রাণধারায় পরিণত হ'ল, আর চিন্তাশীল ভাবুকেরা নিগূঢ় মর্ম্মবাদী হ'য়ে উঠতে লাগলেন। মহাবীর, বুদ্ধ প্রভৃতি সাধকশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষেরা এই ধারাকেই আরও অগ্রসর করে দিয়ে গেলেন।

ভারত তখন জাগ্রত; দিকে দিকে তার প্রাণশক্তির প্রকাশ; ধর্ম্মমতে, ধর্ম্মসাধনায়, সমাজগঠনে, সমাজব্যবস্থায়, রাজ্য-শাসনে, শিল্পে, সাহিত্যে একটা জীবন্তভাব প্রস্ফুটিত। কালে সেই প্রচণ্ড প্রাণশক্তি ক্ষীণ হ'য়ে গেল ও মধ্যযুগে ভারত তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ল। তার ধর্ম্ম, তার সমাজব্যবস্থা, তার চিন্তা, তার চেষ্টা সবই এ যুগে তাদের বিশালত্ব হারিয়ে ক্ষুদ্রতা আর সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হ'ল।

এই মধ্যযুগে মুসলমান-শক্তির ভারতে আগমনে নবশক্তির সংঘর্ষে একটা নূতন প্রেরণা, একটা নবচৈতন্য আবার জেগে উঠলো। ভারতের বিশালতা ও সংখ্যাবাহুল্য সত্ত্বেও আর অসামান্য বীরত্বসম্পন্ন জাতি বর্ত্তমান থাকলেও ঐক্যের আদর্শের অভাবে অসংহত ভারত সংহত মুষ্টিমেয় আক্রমণকারীদের কাছে পরাস্ত হ'ল। ভারতের কতক অংশ মুসলমান আক্রমণকারীদের দ্বারা অধিকৃত হ'লেও ভারতের সনাতন কৃষ্টি ও সাধনার দিক দিয়ে আবার নবযুগের সূচনা হ'ল। নানা কারণে মধ্যযুগে ভারত শক্তিহীন হ'লেও তার অন্তরের শক্তি সুপ্ত ছিল। মুসলমান আক্রমণে তীর্থ-মন্দির ও নানাবিধ ধর্ম্মক্ষেত্র বারবার বিপন্ন ও বিধ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও ধর্ম্মের প্রধান স্থান হৃদয়-মন্দির ক্রমশঃ জাগ্রত হয়ে উঠতে লাগল। মুসলমান আক্রমণকারীদের সঙ্গে বহুতর ভক্ত, সুফী দার্শনিক, ধর্ম্মযাজক প্রভৃতি ভারতে এলেন। নব আগত আদর্শ ও সাধকদের মাহাত্ম্যের কাছে পাছে হার মানিতে হয় এই ভাবনায় ভারতের সাধকেরা তাঁদের বিস্মৃত ও পরিত্যক্ত পুরাতন মহৎ আদর্শগুলি আবার এনে সকলের সম্মুখে ধরতে লাগলেন ও সাধনার প্রয়োগ করতে লাগলেন। এই মধ্যযুগের নবভক্তি সাধনা ও আধ্যাত্ম্য দৃষ্টির মূলে।

উভয় সমাজেরই পুরাতনপন্থা নিষ্ঠাবান স্বধর্ম্মনিরত পুরোহিত ও ধর্ম্মযাজক-সম্প্রদায় তাঁদের স্ব স্ব সঙ্কীর্ণ সীমাতেই আবদ্ধ রইলেন, নবীনপন্থা উদারহৃদয় ভক্ত সাধকগণ সীমা ছাড়িয়ে জাতিনির্ব্বিশেষে অসীমের সন্ধান সর্ব্বসাধারণে ছড়িয়ে দিলেন। এই নবীনপন্থাদের অগ্রণী ছিলেন ভক্ত সাধক রামানন্দ।

রামানন্দ তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য দার্শনিক পণ্ডিতদের অনুসৃত পথে গেলেন না। সায়ণ, কুমারিল, শঙ্কর, রামানুজ, হিমাদ্রি, রঘুনন্দন প্রভৃতি সকলেই সংস্কৃত ভাষায় তাঁদের জ্ঞান, তাঁদের বাণী প্রচার ক'রে গেছেন। রামানন্দ সংস্কৃত ছাড়লেন, জনসাধারণে তাঁর ভক্তির বাণী ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, তিনি সাধারণের ভাষাতেই হিন্দিতে তাঁর বাণী প্রচার করলেন। হিন্দি ভাষার সম্পদ্ মহিমান্বিত হ'ল। তাঁর অনুসৃত পথে পরবর্ত্তী সকল ভক্ত সাধকই তাঁদের মর্ম্মের কথা লোকসমাজে হিন্দিতেই প্রচার ক'রে গেছেন। হিন্দিসাহিত্য-ভাণ্ডার এই ভক্তবাণী-সম্ভারে বিশেষ ক'রে সমৃদ্ধ।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে মুসলমান সুফী দার্শনিক সাধকদের সংঘর্ষে এই নবশক্তিপ্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। সুফী সাধকদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন বিখ্যাত সাধক মখদুম সৈয়দ আলি অল্ হুজরীরী। ইনি দাতা গঞ্জবখ্স্ নামেই বিশেষ পরিচিত। লাহোরে তাঁর সমাধিস্থলে আজও বহুতর হিন্দু-মুসলমান যাত্রীর সমাগম হ'য়ে থাকে। তিনি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে পাঞ্জাবে আসেন; লাহোরেই ছিল তাঁর সাধনক্ষেত্র। তাঁর নিষ্ঠা শুদ্ধ একেশ্বরবাদ ও গভীর সাধনায় বহু শিষ্য আকৃষ্ট হয় ও তাঁর প্রভাব উত্তর-পশ্চিম ভারতে আজও লুপ্ত হয় নি। তাঁর রচিত 'কশফ অল্ মহজুব' 'আবরণ উন্মোচন' সুফী সাধনান্বেষীর পক্ষে অমূল্য গ্রন্থ।

ইহার পর চিশতিয়া সুফী-সম্প্রদায়ের প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খাজা মুইন উদ্দীন চিশতি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে তখনকার কালের বিখ্যাত সুফী-সাধকদের শিক্ষা দীক্ষা সিরস্টান বাগদাদ প্রভৃতি নানাস্থানে আহরণ করে ভারতে এলেন, তিনি দিল্লীতেই প্রথম আসেন, তবে দিল্লীতে তাঁর সাধনাক্ষেত্র মনোমত না হওয়ায় হিন্দুর পবিত্র তীর্থ পুষ্করের সন্নিকটে আজমীরেই তাঁর সাধনার স্থান নির্ণয় ক'রে নিলেন। ভারতীয় সুফী পীরদের তিনি সাহানশাহ বলে খ্যাত। তাঁর দরগার স্মৃতিসৌধ আজমীরের একটী বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু। এটী আবার 'অড়াই দিনকা ঝোপড়া' ব'লে পরিচিত। কিম্বদন্তী এই যে, ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর দেহত্যাগের পর এত হিন্দু-মুসলমান শিষ্য-সমাবেশ হয়েছিল যে, মাত্র আড়াইটি দিনের মধ্যে তারা সবাই মিলে একযোটে এই অপূর্ব্ব সৌধ নির্ম্মাণ করে তুলেছিল। আজও এখানে হিন্দু-মুসলমান যাত্রীর ভিড় প্রতিদিনই লেগে আছে। আর বৎসরে কয়েকটী বিখ্যাত মেলা এখানে হয়—যখন সহস্র সহস্র যাত্রী ভারতের নানা স্থান থেকে সমবেত হয়ে এই মহাপুরুষের স্মৃতিতর্পণের অনুষ্ঠান করে। আজ আমাদের দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেশে হিন্দু-মুসলমানের কতই না বিরোধ বাক্‌বাদান নিয়ে, আর এই মুসলমান পীরের দরগা প্রহরে প্রহরে হিন্দু-মন্দিরের মত আজিও নহবতের মিষ্ট সুরতানে মুখরিত হচ্ছে।

শিষ্য পরম্পরায় এই সব সুফী-সাধকদের প্রভাব সারা উত্তর-পশ্চিম ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল, সুদূর বাঙলা বিহারও সে-প্রভাব থেকে বঞ্চিত হয় নি। বাঙলাদেশে শাহজালাল বিহারে মখদুম শাহ প্রভৃতি সাধকরা বহুল প্রচার করে গেছলেন। এই সেদিন রাজগীরে গিয়ে দেখে এলাম মখদুম শাহর সমাধি ঐখানে রয়েচে, আর বেশ সুরক্ষিতই রয়েচে।

এই অবস্থাতেই যখন সারা উত্তর-ভারতে একটা আধ্যাত্মিক জ্ঞানান্বেষণের সাড়া পড়ে গিয়েছিল, সেই সময় দ্রাবিড়ে রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে রামানন্দ এলেন উত্তর-ভারতে। এই মধ্য-যুগের গুরুই তিনি। তাঁর বিশ্ব-প্রেমে, সাধনার গভীরতায় ভক্তিভাবের প্রকৃত রস গ্রহণে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল না। তিনি বুঝেছিলেন—ভগবানের শরণাগত হয়ে যে ভক্তির পথে এল তার পক্ষে বর্ণাশ্রম-বন্ধন বৃথা, কাজেই ভগবদ্ভক্ত খাওয়া দাওয়ায় বাছাবাছি কেন করবে, তাই তিনি উচ্চকণ্ঠে গাইলেন—

> জাতি পংতি পুছহি নহি কোই
> হরিকো ভজে সো হরিকে হোই।

কি জাত, পংক্তিতে ভোজন চলে কি না এ-জিজ্ঞাসা কেন হবে? হরির যে ভজনা করে সে তো হরিরই দাস, আবার জাতের বিচার কিসের?

উচ্চ ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব রামানন্দ (১৪০০-১৪৭০) তাঁর কৃত্রিম উচ্চস্থান ছেড়ে প্রেম ও ভক্তির সহজ স্থানে নেমে এলেন ও জাতি আর ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রেম-ভক্তির উপদেশ দিতে লাগলেন, তাঁর বাণী বিশেষ কিছু রক্ষিত হয় নি, তাঁর দ্বাদশটী বিখ্যাত শিষ্যই তাঁর মহত্ত্বের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। শিখধর্ম্মগ্রন্থ "গ্রন্থসাহেবে" তাঁর একটীমাত্র বাণী উদ্ধৃত হয়েচে। তার মর্ম্মার্থ এইরূপ—

> কেন আর ভাই, মন্দিরে যেতে আমায় ডাক, তিনি বিশ্বব্যাপী, আমার হৃদয়-মন্দিরেই তাঁর দেখা পেয়েচি। উৎসবে যেতে ত আর আমার মন সরে না, মন-বিহঙ্গ যে তার পক্ষপুট সঙ্কুচিত করে বসে আছে। একদিন সুগন্ধি চন্দন নিয়ে আমিও পূজায় যেতে অগ্রসর হয়েছিলেম, দেখি ব্রহ্ম আমার হৃদয়েই বিরাজ করছেন, আর ত যাওয়া হোল না। সব ভুল সব মোহ নিমেষে গেল কেটে। রামানন্দের জীবন সার্থক হ'ল ব্রহ্মের পরশে তার লক্ষ কর্ম্মবন্ধন মুহূর্ত্তে গেল ছিন্ন হ'য়ে।

তাঁর প্রধান দ্বাদশজন শিষ্যের মধ্যে রবিদাস ছিলেন চামার, কবির মুসলমান-জোলা, ধন্না জাট চাষী, সেনা নাপিত, আর দুইজন মহিলা শিষ্যাও ছিলেন।

এই সব সাধক-কবিদের গানের উৎস মধ্য-যুগে ভারতবাসীর প্রাণকে সহজেই স্পর্শ করতে পেরেছিল। তার একমাত্র কারণ এই যে, মর্ম্মের বাণী তাঁদের মনে-প্রাণে হৃদয়ে আবিষ্কৃত অদ্বৈত পরমানন্দরূপই মূর্ত্ত হ'য়ে এই সব কাব্যে গানে ফুটে উঠেছিল। এ ত মন্ত্র পড়ে পূজা নয়, পরব্রহ্ম প্রত্যক্ষ সত্যরূপে তাঁদের জীবনে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলেই সহজ সুন্দররূপে তাঁদের কথা কাব্যে গানে প্রকাশ পেয়েছিল।

আমাদের বিশ্বকবি তাঁর অমর ভাষায় এই সাধক-কবিদের প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

> ভারতের মরমিয়া কবিরা শাস্ত্র-নির্ম্মিত পাথরের বেড়া থেকে ভক্তের মনকে মুক্তি দিয়েছিলেন। প্রেমের অশ্রুজলে দেবমন্দিরের অঙ্গন থেকে রক্তপাতের কলঙ্ক-রেখা মুছে দেওয়া ছিল তাঁদের কাজ। যাঁর আবির্ভাব ভিতরের থেকে আনন্দের আলোকে মানুষের সকল ভেদ মিটিয়ে দেয়, সেই রামের দূত ছিলেন তাঁরা। ভারত ইতিহাসের নিশীথরাত্রে ভেদের পিশাচ যখন বিকট নৃত্য করছিল, তখন তাঁরা সেই পিশাচকে স্বীকার করেন নি। ইংরেজ মরমিয়া কবি যেমন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন যে, বিশ্বের মর্ম্মাধিষ্ঠাত্রী দেবী আনন্দ-লক্ষ্মীই মানুষকে সকল বন্ধন থেকে মুক্তি দেবেন, তেমনি তাঁরা নিশ্চয় জানতেন—যাঁর আনন্দে তাঁরা আপনাকে অহমিকার বেষ্টন থেকে ভাসিয়ে দিতে পেরেছিলেন, তাঁরই আনন্দে মানুষের ভেদবুদ্ধি দূর হ'তে পারবে; বাইরের কোনও রফারফি থেকে নয়। তাঁরা এখনও কাজ করচেন। আজও যেখানে কোথাও হিন্দু-মুসলমানের আন্তরিক প্রেমের যোগ দেখি, সেখানে দেখতে পাই তাঁরাই পথ করে দিয়েছেন। তাঁদের জীবন দিয়ে গান দিয়ে সেই মিলন-দেবতার পূজার প্রতিষ্ঠা হয়েচে যিনি "সেতুর্বিধারণ-রেষাং লোকানামসম্ভেদায়।" তাঁদেরই উত্তর-সাধকেরা আজও বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে একতারা বাজিয়ে গান গায়, তাদের সেই একতারার তার ঐক্যেরই তার। ভেদবুদ্ধির পাণ্ডা শাস্ত্রজ্ঞের দল তাদের উপর দণ্ড উদ্যত করেচে। কিন্তু এতদিন যারা সামাজিক অবজ্ঞায় মরেনি তারা যে সামাজিক শাসনের কাছে হার মানবে, এ কথা বিশ্বাস করিনে।"

এই সামান্য প্রসঙ্গে এই সব মরমিয়া কবিদের কথা ও কাহিনীর আংশিক পরিচয় দেওয়াও সাধ্যাতীত। বিশিষ্ট একজনের বাণীর যৎসামান্য পরিচয় আর এই চিন্তাধারা কি ভাবে প্রসারিত হইয়াছিল তার আভাসমাত্র দেওয়া সম্ভবপর।

রামানন্দের দ্বাদশ প্রধান শিষ্যের মধ্যে কবীরের স্থান ও প্রভাব সর্ব্বোচ্চে। সেই যুগের ভক্তদের এই নিম্নোদ্ধৃত বাণী থেকেই বোঝা যায় তাঁর প্রভাব কত বিস্তৃত।

> ভক্তি দ্রাবিড় উপজি, লায়ে রামানন্দ
> প্রগট কিয়ো কবীরণে সপ্তদ্বীপ নওখণ্ড।

ভক্তি উপজিল দ্রাবিড়দেশে, এদেশে আনলেন রামানন্দ। কবীর তা সপ্তদ্বীপ নবখণ্ড পৃথিবীতে প্রকাশ করলেন।

কবীরের পর উত্তর-ভারতে সংস্কারমুক্ত যে কোন ধর্ম্মমত মধ্যযুগে হয়েছে, তার প্রত্যেকটীর উপর প্রত্যক্ষতঃ হোক্ অপ্রত্যক্ষতঃ হোক কবীরের প্রভাব অসামান্য। কবীরের সময়-কাল নিয়ে অনেক বাদবিসম্বাদ হয়ে গেছে। তিনি ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্মেছিলেন আর ১২০ বৎসর আয়ু লাভ করে ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেছিলেন—এইটেই অনেকের মত। তিনি মুসলমান জোলার ঘরে জন্মেছিলেন, আর সাধারণ জীবন যাপন করে তাঁত বুনে সংসার চালিয়েও যে পরমপদ লাভ করা যায় তার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বীয় জীবনে দেখিয়ে গেছেন। তিনি রামানন্দের কাছে নবচেতনা লাভ করে গুরুনির্দ্দিষ্ট সাধন-পথে চলতে লাগলেন। সমাজের কাছে তিনি অঋণী হয়ে অন্ত্যজ বংশে জন্মে জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা, তীর্থ, মালা-তিলক কিছুরই ধার তাঁকে ধারতে হয় নি। সমাজের কাছে কোন ধার ছিল না ব'লেই হিন্দু-মুসলমান সকল সমাজের মিথ্যা আচারকে আঘাত করবার অধিকার ও শক্তি তাঁর ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। ভগবৎকৃপায় দীর্ঘ আয়ু লাভ করে বহুদিন ধরে সম্পূর্ণ সংস্কারবর্জ্জিত নিছক ভগবৎপ্রেমের গাথা গেয়ে মোক্ষপথের নির্দ্দেশ করে আজিও অমর হয়ে রয়েছেন। গোরখপুর জেলার মগহরে তাঁর দেহান্ত হয়। ভক্তেরা বলেন—তাঁর মৃত্যুর পর হিন্দু-মুসলমান ভক্তদের মধ্যে তাঁর দেহের অধিকার নিয়ে বিবাদ হয়, শেষে কবীর নিজে দেখা দেন ও তাঁর শবের আবরণ উন্মোচন করতে নির্দ্দেশ করেন। ভক্তেরা তখন দেখলেন শবের পরিবর্ত্তে রয়েছে সেখানে একরাশ সুগন্ধি ফুল, তাই তাঁরা ভাগ করে নিলেন। যে সাধক মহা-পুরুষ এই দুটী সমাজকেই তাঁর জীবিতকালে পুণ্যময় করে গৌরবান্বিত করেছিলেন তাঁর এই উপযুক্ত অবসান নয় কি?

আজ এই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের দিনে তাঁর উপদেশ স্মরণীয়। এ উপদেশ হৃদয়ে গ্রহণ করলে ত আর বিরোধ থাকতে পারে না।

> "জোখোদায় মসজীদ বসতুহৈ ঔর মুলুক কেহিকেরা।
> তীরথ মূরত রাম নিবাসী বাহর কাহ কো হেরা॥
> পূরব দিশা হরি কো বাসা পশ্চিম অলহ মুকামা।
> দিলসেঁ খোজি দিলহিমে খোজো ইহৈ করীমা রামা॥
> জেত ঔরত মরদ উপানী সো সব রূপ তুমহারা।
> কবীর পোংগড়া অলহ রামকা সো গুরু পীর হমারা॥"

"খোদা যদি মসজিদেই বাস করেন আর সব মুলুক তবে কাহার? তীর্থ মূর্ত্তিতেই যদি রাম করেন বাস, বাহিরে তাহলে আমরা দেখি কি? পূর্ব্বদিকে হরির বাস, পশ্চিমে তোল আল্লার মোকাম, একবার হৃদয়ে খোঁজ করে দেখ, ঐখানেই রয়েছেন করীম রাম। যত নারী যত পুরুষ এসংসারে উৎপন্ন হয়েছে, তারা সবাই ত তোমার রূপ, কবীর আল্লা-রামের পুত্র। তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পীর।"

তাঁর প্রতি দোঁহায়, প্রতি উপদেশে অরূপের কি রূপই তিনি ধরে দিয়েছেন এমন সহজ ভাষায় অখণ্ড পরমানন্দের স্বরূপ বর্ণনা, আর ভক্তির শিক্ষা জগতের ভক্তিসাহিত্যে দুর্লভ।

> সীল সন্তোষ সদা সমদৃষ্টি রহনি গহনিমে পূরা।
> তাকে দরস পরস ভয় ভাজৈ হোই কলেস সব দূরা॥
> নিসি বাসর চরচা চিত চংদন অন কথা ন সোহাবৈ।
> করনী ধরনী সংগীত গাবৈ প্রেম রঙ্গ উড়াবৈ॥
> রাগ সরূপ অখংডিত অবিচল নির্ভয় বেপরোয়াই।
> কহে কবীর তাহি পগ পরসো ঘট ঘট সব সুখদাই॥

তাঁর দরশ পরশ যে পেয়েছে সর্ব্বদা শীল, সন্তোষ, সমদৃষ্টিতে, স্থিতিতে এবং গ্রহণে সে পরিপূর্ণ। তাঁকে দর্শন করলে স্পর্শ করলে ভয় পলায়ন করে, সব ক্লেশ দূর হয়ে যায়। নিশিদিন তাঁর চর্চ্চা করাই চিত্তের পক্ষে চন্দনলেপ স্বরূপ; অন্য কথা আর ভালই লাগে না। সকল কর্ম্মে, সকল বিশ্রামে একটি সঙ্গীত ধ্বনিত হয়ে উঠছে—সর্ব্বদাই সে প্রেমের আনন্দ সম্ভোগ করছে। যিনি সঙ্গীতস্বরূপ, যিনি অখণ্ডিত, যিনি অবিচল, যিনি নিরুদ্বেগ, কবীর কহেন তাঁরই চরণ স্পর্শ কর, তিনিই ঘটে ঘটে সর্ব্ববিধ আনন্দ বিধান করছেন।

কবীরের প্রতি বাণীটাই কত গভীর, কত মাধুর্য্য তাতে, আর দু' একটী উদাহরণ দিয়ে কবীরের প্রসঙ্গ শেষ করি।

> অখংড সাহবকা নাম ঔর সব খংড হৈ। খংডিত মের সুমের-খণ্ড ব্রহ্মাণ্ড হৈ।
> জাকা সাধু সোঁহেত মোই নির্ব্বন্ধ হৈ। উন সাধনকে সংগ সদা অনংদ হৈ।
> চংচল মন থির রাখ জবৈ ভল রংগ হৈ। তেরে নিকট উলটি ভরি পীর সো অমৃত গংগ হৈ।
> দয়া ভার চিত রাখ ভক্তিকে অংগ হৈ। কহে কবীর চেত চেত সো জগত পতঙ্গা হৈ।

"অখণ্ড কেবল সেই পরম স্বামীর নাম, তাছাড়া আর সবই খণ্ডিত। মেরু সুমেরু এমন কী ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত খণ্ডিত। পরম স্বামীর জন্য যার প্রেম কেবলমাত্র সেই বন্ধনের অতীত। সেই সাধুদের সঙ্গেই কেবল নিত্য আনন্দ বিরাজমান। চঞ্চল মন স্থির কর, তবেই দেখিবে কী অপূর্ব্ব রঙ্গ তোমার সম্মুখে যে উপুড় হোয়ে পরিপূর্ণ রয়েছে প্রিয়তম তাইতো অমৃত-গঙ্গা। চিত্তমধ্যে দয়া প্রীতি কর ধারণ, কারণ ইহাই তো ভক্তির অঙ্গ। কবীর কহেন, অন্তরে হও জাগ্রত, কারণ বিশ্বপতিই বিশ্বপ্রকাশ ভানু।

> দয়া কর জব মুক্তি দীনহো, গহো তত্ত্ব ঘনায় কে।
> পরম প্রীতম জান অপনে হৃদয় লিয়ো সমায় কে॥
> জরা মরণকো ভয় নসায়ো জব সাহেব দয়া করী।
> কর্ম্ম ভর্ম্মকো ছাড়ি জিয়েত সকল বাধা পরিহারী॥
> তুম মেরে পরম সনেহী হংসা ঘর চলো।
> ছাড়ি বিষয় ভবসাগর হংসা হংসন মিলো॥
> সুরত নিরত বিচার তত্ত্ব পদ সার হৈ।
> যেখো হংসা সন্ত লোক প্রেম আধার হৈ॥"

দয়া করে যখন তিনি দিলেন মুক্তি, তখন সেই তত্ত্বে আর

গভীর ভাবে ডুবলাম। তাঁকে পরম প্রিয়তম জেনে হৃদয়কে নিলেম সমাহিত করে। স্বামী যখন করলেন দয়া, তখন জরা-মরণের ভয় গেলো পালিয়ে। কর্ম্ম আর ভ্রমকে জীবন থেকে পরিত্যাগ ক'রে সকল বাধাকে করেছিল পরিহার। হে হংস, তুমি আমার পরম স্নেহের, চল ঘরে চল। বিষম ভবসাগরকে অতিক্রম করে, হে হংস, সব হংসদের সঙ্গে হও মিলিত। প্রেম আর বৈরাগ্য দিয়ে বিচার করে দেখ, তত্ত্ব পদই সার পদ। হে হংস সত্যলোকে কর উপবেশন, প্রেমই ত রয়েচে আধার।

রামানন্দের অপর অন্ত্যজ শিষ্য ছিলেন রবিদাস। তিনি জন্মেছিলেন কাশীর এক চামারের ঘরে। রামানন্দের কাছে নবজীবন লাভের পর তিনিও তাঁর ব্যবসা পরিত্যাগ করেন নি। কবীরের ন্যায় তাঁর স্বোপার্জ্জিত সামান্য অর্থে সরল জীবনযাত্রাই ছিল তাঁরও আদর্শ।

রবিদাসের ভজন প্রেম ও ব্যাকুলতায় পূর্ণ। ত্রিশটীর অধিক তাঁর ভজন শিখ গ্রন্থসাহেবে স্থান পেয়েচে। তাঁর একটী ছোট্ট বাণীতে তাঁর হৃদয়ে পরব্রহ্মের আবির্ভাবের কথা কত সরলতা কত মাধুর্য্যের সঙ্গে প্রকাশ করেচেন:

> 'চলত চলত মেরো নিজ মন থাকৈ অব মোসে চলা না জাই।
> জব কারণ মৈ দূর ফিরতো সো অব ঘটসে পাই॥'

তাঁর জন্যে চলে চলে আমার নিজ মন ক্লান্ত আর ত ঘুরে মরা যায় না। যার জন্যে দূরে দূরে ঘুরে মরেচি তাঁকে ত এখন এই ঘটেই পেলেম।

> বিমল একরস উপজৈ ন বিনসৈ উদৈ অস্ত দুহ নাহী।
> বিগতা বিগত ঘটৈ নহি, কবহু বসত রসৈ সব মাহী।

সেই বিমল একরসের উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। সেটী বিগতাবিগত, তার ক্ষয় নেই, এ বস্তু সকলের অন্তরে বিরাজিত।

রবিদাস ছিলেন নিতান্তই সেবাপরায়ণ। তীর্থে সাধু-সমাগমে সকলের সেবার ভার অক্লেশেই বহন করতেন তিনি। এই সেবার প্রসঙ্গেও রবিদাসের অনেক প্রার্থনা ও প্রণতি পাওয়া যায়, যা অতুলনীয়।

এই রবিদাসই ছিলেন চিতোরের রাণী ঝালির আর মীরাবাই-এর দীক্ষা-গুরু। বাংলাদেশে মীরাবাই-এর ভজন আজও ঘরে ঘরে গীত হচ্চে। তাঁর নূতন ক'রে পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। পশ্চিম ও উত্তর-ভারতে কৃষ্ণগাথা প্রচারে মীরাবাই-এর দান বড় কম নয়। ব্রজভাষার বহুল প্রয়োগও মীরাবাইএরই কৃতিত্ব। ব্রজভাষাই যে হিন্দির শ্রেষ্ঠ কাব্য-ভাষা, তা এই এক মীরাবাইএর ভজন থেকেই প্রমাণিত হয়।

কবীরের প্রধান শিষ্য শিখগুরু নানক (জন্ম খৃঃ ১৪৬৯)। কবীরের বৃদ্ধ বয়সে এই মহান্ শিষ্য লাভ হয় ও তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে কবীর বিশেষ তুষ্ট হয়েই বলেছিলেন "সমর্থ-মানুষ দেখে আমি চলে যাচ্চি, আর আমার খেদ নেই।" কবীরের ভাবেই নানক বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। গ্রন্থ-সাহেবে কবীরের অনেক বাণী গৃহীত হয়েচে। শিখ ধর্ম্মের বাঁধনেই পাঞ্জাবে শিখজাতি গোষ্ঠীবদ্ধ হ'য়ে শৌর্য্যে বীর্য্যে মহিমান্বিত হয়ে উঠেছিল, তারা মানুষ হয়েছিল। উত্তর-কালে পাঞ্জাবের উন্নতি শিখগুরুদের অপূর্ব্ব কাহিনী অসামান্য ত্যাগধর্ম্ম—সবারই মূলে ঐ কবীরপ্রভাবান্বিত গুরু নানকের শিক্ষা।

কবীরের পরবর্ত্তী সাধকদের আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই নাম করতে হয় দাদূর। শিষ্য-পরম্পরায় দাদূ কবীরের পর ষষ্ঠ স্থানীয়। তাঁর লেখাতেই প্রমাণিত হয়—তিনি জাতিতে তুলাধুনকর ছিলেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ত্যজ বংশে জন্মেও নিজ প্রতিভায় সাধুসঙ্গগুণে আর সাধনায় তাঁর অসামান্য দৃষ্টি খুলে যায়। ১৬০৩ খৃঃ তাঁর জন্মের প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৬৬০ খৃঃ রাজপুতনায় জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণাষ্টমীর দিন নারণায় তাঁর দেহত্যাগ হয়। এই নারণাতেই দাদূ-পন্থীদের প্রধান মঠ আজও বর্ত্তমান। হিন্দু-মুসলমান ও সকল ধর্ম্মকেই এক উদার মৈত্রীভাবের দ্বারা যুক্ত করাই ছিল তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। সকল ধর্ম্মের একত্রে মিলনের জন্য তিনি তাঁর ব্রহ্ম-সম্প্রদায় স্থাপন করেন। এই সম্প্রদায়ই পরে দাদূপন্থী নামে বিস্তৃত হয়।

তিনিও কবীরের ন্যায় সংস্কারবর্জ্জিত ছিলেন। আত্মা-নুভবকেই সার বলে মানতেন। অহামকা ত্যাগ করে এক পরব্রহ্ম ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়ে সকলকেই ভাইবোনের মত দেখাই ছিল তাঁর উপদেশ। অন্তরেই ভগবানের ধাম, প্রেমেই সেখানে তাঁকে পাওয়া যায়। এই সার মর্ম্ম তিনি শত-সহস্র গানে গেয়ে গেছেন। তাঁর গানে তাঁর অসামান্য কবিত্ব ফুটে উঠেছে।

ভক্তদের বিবরণে জানা যায়—আকবরের সঙ্গে তাঁর ৪০ দিনব্যাপী আলাপ হয়। তারই পরই না কি আকবর মুদ্রায় নিজের নাম না দিয়ে "অল্লহ আকবর" অঙ্কিত করেন।

দাদূর দু'একটী বাণী থেকে তাঁর উদারতা, তাঁর গভীরতার, তাঁর আত্মানুভবের আভাস পাওয়া যাবে।

> । কায়া মহলমে নিমাজ গুজরূ উহাঁ ঔর ন আবন পাৱৈ।
> । মন মাণকে তহ তসবী ফেরূ তব সাহিবকে মন ভাৱৈ।
> । দিল দরিয়ামে গুসল হামারা উজু করি চিত লাউ।
> । সাহেব আগে করুঁ বংদগী বের বের বলি জাউ।

কায়া মন্দিরে অন্তরের মধ্যে পূরা করি আমার নেমাজ, সেখানে আর ত কেহ পারে না আসতে, সেখানে মনের মানসের মণিকার করি জপ, তবেই ত প্রভুর মন হয় প্রসন্ন। হৃদয়নদীতে আমার স্নান, সেখানেই চিত্তকে ধৌত ক'রে তাঁর

কাছে আনি, স্বামীর কাছে করি প্রণতি, বার বার তাঁর চরণে নিজেকে করি উৎসর্গ ॥

সীমা ও অসীমের পরস্পর পূজার কথা কি চমৎকার বর্ণনা করেছেন এই দোহাটীতে :—

বাস কহে হম ফুলকো পাউঁ ফুল কহে হম বাস।
ভাস কহে হম সত্তকো পাউঁ, সত কহে হম ভাস॥
রূপ কহে হম ভাবকো পাউঁ, ভাব কহে হম রূপ।
আপস মেঁ দউ পূজন চাহৈ, পূজা অগাধ অনূপ॥

গন্ধ বলে আমি যেন পাই ফুলকে, ফুল কহে হায় আমি যেন পাই গন্ধকে। ভাস (প্রকাশ ভাষা) কহে আমি যেন পাই সৎকে (সত্তাকে), সৎ বলে আমি যেন পাই ভাসকে। রূপ বলে আমি যেন পাই ভাবকে, ভাব বলে আহা আমি যেন পাই রূপকে। দুই পরস্পরে এ ওকে করিতে চাহে পূজা, অগাধ এই পূজা, অনুপম এই পূজা।

আর একটী দোহায় অসীম প্রকাশের স্বরূপ কি অপূর্ব্ব ভাবেই তুলে ধরেছেন।

দাদু অলখ অলাহকা কহ কৈসা হৈ নূর।
বেহদ্ বাকোহদ্ নহীরূপ রূপ সব চুর॥
বার পার নহি নূরকা দাদু তেজ অনংত।
কীমতি নহি করতারকী ঐ সা হৈ ভগবংত।
নিরসন্ধি নূর অপার হৈ তেজ পুংজ সব মাহিঁ।
দাদু জোতি অনংত হৈ আগে পিছে নাহি।
খণ্ড খণ্ড নিজ না ভয়া ইকলস একই নূর।
জ্যো থা ত্যোঁ হি তৈজ হৈ জোতি রহী ভরপুর॥
পরম তৈজ পরকাশ হৈ পরম নূর নিবাস।
পরম জোতি আনন্দ মে হংসা দাদুদাস॥

বল ত দাদু সেই অলখ ভগবানের প্রকাশ কি প্রকার? অসীম তাঁর কোন সীমা নেই, রূপের পর রূপ সেই প্রকাশের তারে সব হ'য়ে যায় চূর্ণ। কূল-কিনারা নেই রে দাদু সে প্রকাশের, অনন্ত সেই তেজ, মূল্য হয় না সে 'করতারের' এমন তিনি ভগবান। অপার, নিঃসন্ধি সেই প্রকাশ, তাতে কোন জোড়াতাড়া নেই। সকলের মাঝেই তা সংহত তেজ হে দাদু, অনন্ত সেই জ্যোতিঃ, তার পূর্ব্বে পরে কিছু নেই। এই প্রকাশে তাঁর স্বরূপ খণ্ড খণ্ড হয় নি, বার বার এক ভাব এক রস সেই এক প্রকাশ; যেমন ছিল সেই স্বরূপ তেমনি এই প্রকাশ, ভরপূর সেই জ্যোতিঃ বিরাজমান। পরম তেজ এই প্রকাশ, এখানেই পরম দীপ্তির নিবাস; পরম জ্যোতির আনন্দের মধ্যে দাস দাদু রয়েছে হংস হয়ে॥

মধ্যযুগে একদিকে যেমন এই সব সংস্কারমুক্ত সাধকদের প্রভাব প্রসারিত হ'তে লাগল, সংস্কারযুক্ত শাস্ত্রবিশ্বাসী দলেও তার সাড়া যে পড়ে নি, তা নয়। তাঁদেরও আসন টলেছিল এঁদের প্রভাবে, তাঁদেরও মধ্যে নব চেতনা জেগে উঠেছিল। বৈষ্ণব মাধ্ব সম্প্রদায়, বল্লভাচার্য্য, অন্ধ কবি সুরদাস প্রভৃতি সংস্কারযুক্ত থেকেও বৈষ্ণবধর্ম্মের নব সংস্কার ক'রে গেছেন। এই সংস্কারযুক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা রাম ও কৃষ্ণকে পূর্ণ আদর্শরূপে ধরে ভারতীয় ধর্ম্মকে প্রাণবান শক্তিশালী আর পূর্ণাঙ্গ করতে চেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় ভক্ত তুলসীদাসের নাম। ভক্তি রসের পবিত্রতায় তাঁর রামচরিত মানস অতুলনীয়। তাঁর বিনয়-পত্রিকার প্রার্থনামালাও ভক্তদের অমূল্য ধন। তুলসীদাসের রামায়ণ আমাদের দেশে কৃত্তিবাস ও কাশীরামের মত যুক্তপ্রদেশে আজও ঘরে ঘরে পঠিত হচ্চে। একটা সারা যুগের অন্তরের বাণী এই ভক্তগ্রন্থে লিখিত রয়েচে—এ বিষয় প্রতীচ্যের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের অন্তরের কাহিনী-সম্বলিত দান্তের কাব্য তুলসীদাসের রামায়ণের সঙ্গে তুলনীয়।

ভারতের উত্তর-পশ্চিমে যখন কবীর নানকের প্রভাব বিস্তৃত হচ্চে, তখন আমাদের এই বাংলাদেশে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস তাঁদের সুললিত গানে সহজ বৈষ্ণবভাব ছড়িয়ে দিয়ে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিচ্চেন। বাংলার বৈষ্ণব প্রভাব বাংলারই নিজের গড়া জিনিষ। মহাপ্রভু চৈতন্য বাংলাদেশে নূতন ভক্তিধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ক'রে প্রেমের স্রোত ভাসিয়ে দিলেন, তার পরিচয় নূতন করে দেওয়ার চেষ্টা বৃথা।

মধ্যযুগের এই যে ভেদাভেদশূন্য বাণী, সে কি আবার উদ্ধৃত হয়ে আমাদের এই নির্ব্বীর্য্য তমসাচ্ছন্ন জাতিকে মহিমান্বিত করবে না? আশা ত হয়, ঘোর তমসার মধ্যেও ক্ষীণালোক যে দেখা যায় না তা ত নয়—এই সেদিনও ত যুগ-প্রবর্ত্তক রামমোহন রায়, ব্রহ্মানন্দ কেশব, যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ, যুগধর্ম্মাচার্য্য বিবেকানন্দ ভারতের সেই অনন্ত বাণীই ত শুনিয়ে গেছেন। বিশ্বকবির ঐক্যের গান সবেমাত্র স্তব্ধ হয়েছে— শ্রীঅরবিন্দ আজও আত্মান্বেষণের উপায় সর্ব্বসাধারণে ছড়িয়ে দেবার জন্যে উৎসুক, এ সবই কি ব্যর্থ হবে? না, তা হতে পারে না, ভারতের এ বাণী শোনবার আর শোনাবার দিন ত এগিয়ে আসচে বলেই মনে হয়।

পঞ্চাশের মন্বন্তর
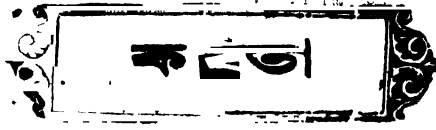
"মন্বন্তরে মরি নি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি"—
এ-কথা আমরা করিব প্রমাণ আজিকে ধৈর্য্য ধরি'।
এমনি মরণ করেছি দলন আমরা বাঙ্গালী জয়ী—
জলের প্লাবন, অন্ন-অভাব যুগে যুগে শিরে বহি'।
ভাসিয়া গিয়াছে বক্ষের শিশু, বৃদ্ধ ও নর-নারী;
আহার জোটেনি, ঝাপটি' ধরেছে নিদারুণ মহামারী।
সেই অনশন, সেই মারী জিনে আজিও বাঙ্গালী বাঁচে;
আজিও তাহার কণ্ঠ ধ্বনিছে জগৎ-মানব-কাছে।
তারি বঙ্কিম-স্বদেশচিন্তা ভারতে প্লাবন আনে;
তাহারি বিবেক, জগদীশ, রবি জগতে জীবন দানে।

*

আজ দামোদর, কাঁসাই, অজয় বানের দানব-গ্রাসে,
শান্ত শীতল কুটীরে কুটীরে প্রাণ লুটে নিয়ে হাসে।
অন্ন ছিল না, কাঙালী বাঙ্গালী বহু ছিল উপবাসে,
পাতা খেয়ে বাঁচে তিন চারিদিন, কেউ খেতেছিল ঘাসে।
ছেলে মেয়ে বেচে কেহ মাগে চাল, চাউল তবু না জোটে।
চোখের উপরে নিজ সন্তান অনাহারে মরে লোটে।
চোখে জল আর পেটে ক্ষুধা নিয়ে ছুটে যায় পিতামাতা।
ক্ষুধার অন্ন কে যেন বিলায়—তারি কাছে হাত পাতা।
দলে দলে ঘোরে শীর্ণ শিশুরা কুকুর বিড়াল মতো।
দলে দলে যায় কত নর-নারী কঙ্কাল শত শত।
কুড়ায়ে কুড়ায়ে যা পায় তা' খায়, রোগে লোটে ভূমি' পরে
মরিবার আগে শৃগাল-কুকুরে মারে দংশন ক'রে।
হাজার হাজার প্রতিদিন মরে সারা বাংলার বুকে
পথে ঘাটে শব, কে করে দাহন, মরে প্রাণঘাতী দুখে।
ওরে যারা আজ পথে পথে মরে তারা বাংলার নিধি,
তারা ছোট নয়; তারা অতি বড়, তাদেরও গড়েছে বিধি।

তারা চাষ করে ফসল ফলায়, গড়ে যে কাটারি ছুরি,
তারা মাটি কেটে সহর বানায়, বুনিছে মাদুর, ঝুড়ি।'
তাহাদের শ্রমে বেঁচে আছে জাত, তারাই গড়িছে জাতি,
তাদেরে বাঁচাও, বাঁচিবে বাঙ্গালী, উজলিবে যশোভাতি।

*

অন্ন, অর্থ দুই হাতে নিয়ে মাড়োয়ারী ভ্রাতা আসে,
পরম যতনে আজিকে তাহারা বাঙ্গালীর দুখ নাশে।
পাঞ্জাব আনে প্রচুর খাদ্য—বোম্বাই, নাগপুর,
ভিখারী বাঙ্গালী করুণ নয়নে করে তাহে ক্ষুধা দূর।
সুজলা সুফলা শ্যামলা মায়ের এ বাঙ্গালী সন্তান
আজিকে কাঙালী অন্নের তরে, মেগে রাখে নিজ প্রাণ।
কোন্ পাপ ওরে কোন্ অপরাধ আজিকে বুঝিতে নারি,
যার তরে আজ ধূলিতে বিলীন বাঙ্গালার নর-নারী।
এই মহাক্ষুধা, এই মহামারী জিনিয়া জাগিতে হবে,
নব উদ্যমে, নবতর রূপে, এই পণ কর সবে।
বাঙ্গলার মাটি শুষ্ক তো নয়, ফসলে বড়ই দড়;
আবার ফলিবে নূতন ফসল, নব জাতি দৃঢ়তর।
কাঁদিব না মোরা, লুকাব না মুখ, অভিশাপ শিরে লয়ে
হয়তো লুটায়ে পড়িব ক্ষণেক আবার জাগিব জয়ে—
দৈন্যের জয়ে, দুঃখের জয়ে, ব্যাধি ও বেদনা জিনে,
কাঙালী বাঙ্গালী হবে পুন' বীর ভৈরব দিনে দিনে।
তারি দেশ-প্রেম, কারু, সাহিত্য, তারি বিজ্ঞান-ভাতি,
আবার জাগিয়া অমল কিরণে দূরিবে দাসের রাতি।
এ দুখ-দাহনে পূত বিশুদ্ধ মহত্তেরো মহীয়ান'
নবীন বাঙ্গালী নব উৎসাহে করিবে রে অভিযান।

—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

লীলা-কমল

এ লীলা-কমল পরাব পরাব পরাব অলকে
শিথিল অলকে,
শিশির সিক্ত কুসুমে যেমন তপন ঝলকে
মধুর আলোকে।
আমার দিঠির মদির পরশে,
চপল কপোল ভাতিল হরষে,
যৌবন-সুরা-সিক্ত অধীর লীলার পুলকে।
এ লীলা-কমল পরাব পরাব পরাব মালিনী
নামিলে যামিনী।

নিশীথে লুপ্ত বিশ্ব-নিখিল সুপ্ত দামিনী
দয়িতা ভামিনী—
রজনীগন্ধা জাগিবে গোপনে
ভুবন মগন মদির স্বপনে,
কম্পিত চিতে নীরব চরণে গোপনে পলকে
দোলাব সোহাগে নব অনুরাগে আকুল অলকে।
এ লীলা-কমল পরাবে পরাবে পরাবে বল' কে?

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস

আহার্য্য লভিতে আজি ফসল ফলাও দেশে

পল্লী-গোষ্ঠে জড়তার আবেষ্টনে শ্রমহীন জনতার অজ্ঞ মনোভাব,
দেশের ললাটপ্রান্তে এঁকে দিল দারিদ্র্যের গ্লানিভরা চির-মনস্তাপ।
মাঙ্গল্যের নিদর্শনী জনপদে লুপ্তপ্রায় কমলারে করিয়া বর্জ্জন,
আলস্যের ছায়াতলে শোনা যায় শরতের শুষ্কগর্ভ মেঘের গর্জ্জন।
এদের শ্যামল-শ্রী-সমাধির স্তব্ধক্ষেত্রে শতাব্দীর তপ্ত অশ্রু ঝরে,
বণিকের গুপ্ত গৃহে দেশের আহার্য্য-নিধি-প্রত্যাশায়
বন্দী অগোচরে।

নাগরিক দৃশ্যকাব্যে স্বার্থোদ্ধত সম্ভাষণ মূর্ত্ত রহে ঘৃণ্য অর্থলোভে,
ভদ্রতার আবরণে সভ্যতার নাট্যমঞ্চে প্রতারণা প্রবঞ্চনা শোভে।

শ্মশান করেছে জাতি আপনার রাষ্ট্রভূমি,
বংশে কে বা দিবে পুণ্যবাতি,
ধরণীর পূর্ব্বতটে স্বদেশের যুগযাত্রী কর্ম্মদোষে হোলো আত্মঘাতী।
মহাকাল-শঙ্খরন্ধ্রে অতীতের বর্ষপুঞ্জ দেয় যদি বারেক ফুৎকার—
স্বপন-বিমুক্ত স্মৃতি-গৌরবের ধ্বনি পেয়ে সুপ্তোত্থিত বাঙালী-সংসার,

চলচ্চিত্র সম এসে দেখাইবে আপনার সর্ব্বোন্নত বিগত মহিমা।
মাঠে মাঠে বীজ রুই, সঞ্জীবাগে ঘেরা গেহ, ফসলের স্নিগ্ধ মধুরিমা,
যে-দেশে একদা ছিল, সেই দেশ ভিক্ষা করে
পরদেশী পথিকের কাছে।

দিক্ হতে দিগন্তরে শত শত উপেক্ষিত আকর্ষিত ভূমি পড়ে আছে,
তবুতো সে ভূমিপানে দেশের তরুণ কেহ যায় নাক বুনিতে ফসল।
যারা যায়, মুষ্টিমেয়! তাহাদের শ্রমলব্ধ অংশ হতে সম্ভোগীর দল।
কতটুকু আহার্য্যের করো আশা! লজ্জা হয়,
মান যাবে হল স্কন্ধে নিতে,
যে হল জনক রাজা স্কন্ধে নিয়া যেতো
নিজ শস্য তরে ভারত-ভূমিতে।

শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলায়ুধ রূপ ধরি চাষে দিত মন,
সেদিনের আর্য্যাবর্ত্ত আজিকার মত নহে, কৃষিধর্ম্ম করিতে লালন।

হায় ওরে মূঢ়মতি! কোথা তোর আভিজাত্য!
কৌলীন্যের মদ-গর্ব্ব আজি!
তোর চেয়ে সত্যচারী কৃষিজীবী বর্ণশ্রেষ্ঠ,
তারি জন্য মোরা বেঁচে আছি।
দেশ-প্রেমী তারে কহি, আহার্য্যসম্ভার দিয়া,
দিনে দিনে রচিতেছে ক্ষেম,
তাহারে প্রণাম করি, স্বদেশ-প্রেমিক সে যে,
জেল-খাটা নহে দেশ-প্রেম।
নরজন্ম বৃথা তব, পতিত জমিতে তুমি দিলে নাক ফসল বুনিয়া,
আকাশ-কুসুমে বদ্ধ! বিভোর হয়েছে কেন
নিরন্তর প্রলাপ শুনিয়া।

অন্ন লাগি কাড়াকাড়ি পথের কুক্কুরসম:
এর চেয়ে লজ্জা আছে কি বা!
ব্রত নিতে পারো নাকি—"ফসলে ভরাবো দেশ;
ফিরাইব জীবনের বিভা।"
ছিল আর্য্য-সভ্যতার চরম অমৃতবাণী—
"স্বর্গ পাবে কৃষিলক্ষ্মী সেবি—"
এ-ভারতে ঋষিবৃন্দ কয়ে গেছে একদিন কমলারে ধান্যরূপা দেবী।

সাম্প্রতিক সভ্যযুগে চেয়ে দেখ দূর পানে মরুস্থলী আফ্রিকার কূলে,
রুষিয়ার হেমক্ষেত্রে সাইবেরিয়ার প্রথপ্রান্তে শস্যশীর্ষ হর্ষে দুলে।
আর তুমি? উর্ব্বর দেশের প্রাণী শক্তিহীন,
বীর্য্যহীন ভীরু কাপুরুষ!
তোমার বিপুল কৃষি বিফল অরণ্যে কাঁদে স্বদেশের সাধিছ কলুষ।

কোথায় পুরুষকার! দৈবেরে করিছ দোষী, অদৃষ্টেরে দিতেছ ধিক্কার,
কত না অনর্থ বাক্য উন্মাদের মত কহ, ভাবো, বিশ্ব করে অবিচার,
এ-ভ্রম শোধিতে হবে, যোগ্যতম বাঁচিবার
একমাত্র জেনো অধিকারী,
অযোগ্যের উচ্ছেদের আছে শুধু সম্ভাবনা,
অযোগ্যেরা নিয়ত ভিখারী।
যে-ফসল হেরিতেছ আজিকার শস্যক্ষেত্রে,
সে ফসলে একবেলা করি,
এক বর্ষ যদি পাও খেতে, জেনো পুণ্য তব।
অন্যবেলা ভিক্ষাপাত্র ধরি
দাঁড়াইতে হবে ভিন্ন দেশের কুটির-দ্বারে, কতকাল আর্ত্তত্রাণ তরে
পরের সঞ্চিত ধন তোমাদের কর্ম্মদোষে দানছত্র হবে বঙ্গ 'পরে।
ক্ষুধার্ত্তের করে খাদ্য যদি দিতে নাহি পারো দুইবেলা স্বাবলম্বী হয়ে,

ধিক্ তব পরিচয়! সভ্যতা-গৌরবে ধিক্!
মৃত্যু আসে আত্ম-পরাজয়ে।
আহার্য্য লভিতে আজি ফসল ফলাও দেশে
প্রাচুর্য্যেরে করি পার্থ্যমাণ,
দেশের অঙ্গন তলে নিঃস্ব ভিক্ষুদল যেন
পায় ফিরে জীবনের দান।
কূটনীতি, ভেদনীতি ছেড়ে এসো একতায়,
মাঙ্গল্যের জ্বালি মোরা দীপ
আনন্দ-উজ্জ্বল আয়ু হউক আহার্য্য বৃদ্ধি,
সুস্থ স্বস্থ হোক্ লক্ষ জীব।
আজিকার অসন্তোষ, অক্ষমতা, অসম্মান, ভুল-ভ্রান্তি ক্ষয় ক্ষতি যত
মুছে ফেলো চিত্ত হ'তে, সৌভাগ্যের সিদ্ধি লভি
দুর্ভিক্ষেরে কর প্রতিহত।

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

জবাব-চিঠী

'প্রাথমিকা'র কবি
শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
সমীপেষু—

অভিন্নহৃদয়েষু—

সাতটি দিনের অবকাশে একটি দিনের ছুটি
কাজের বেলায় তাই ঘটে যায় অনেক কিছু ত্রুটি
পাওয়া যখন সহজ ছিল সুলভ ছিল সঙ্গ,
প্রতিজ্ঞা যা করেছিলাম, আজ মনে হয় রঙ্গ।
"অপমান ও জীবন নাটক" দুইটি বেলাই পড়ি,
কাগজখানা নেড়ে চেড়ে রোজ তোমারে স্মরি।
রোজই ভাবি আজকে হ'তে লাগব তোমার কাজে,
দিনের শেষে হঠাৎ দেখি দিনটা গেল বাজে।
হেথায় এসে ভাঙ্গা শরীর আজও হয় নি তাজা,
তার উপরে কাজের চাপে হচ্ছি ভাজা ভাজা।
আপিস করা, র‍্যাশন আনা, বাজার করা আর,
খুটি নাটি হাজার কাজে সময় পাওয়া ভার।
যে কাজ তুমি দিয়েছিলে হয় নি আজও তাহা,
যদি বলি সব হয়েছে, মিথ্যা কথা তাহা।
বলব না তা; আজও আমায় গন্ধটুকু আছে,
হঠাৎ গায়ে তুলতে গিয়ে তোমার স্মৃতি নাচে।
প্রিয়ার সাথে রোজই বসে তোমার কথা হয়,
মিষ্টি মুখের শেষ সমাদর মধুর হয়ে রয়।
বিদায় বেলায় কাতর চাওয়া ইচ্ছামতীর কূলে,
সে কি বন্ধু একটি দিনের? অমনি যাব ভুলে!
বাজে কথা মনে থাকে কাজের কথা ভুলি,
আমার জীবন-নাটকে ভাই সত্য এ-ভুলগুলি।
এবার বলি কাজের কথা; আগামী সোমবারে,
লেখা তোমার হাজির হবে কাজির দরবারে।
পুজা-সংখ্যা "বঙ্গশ্রী" আনব সেদিন আমি,
পাঠিয়ে দেবো ভি,পি, যোগে সবার অগ্রগামী।

অন্য বিষয়—বই ছাপানো, সবই আছে মনে,
সকল বিষয় আলাপ হবে ব্যারিষ্টারের সনে।
যথারীতি ফলাফলের খবর পাবে ডাকে,
বুঝলে এবার? তোমার মত রাবিস লোকও থাকে—
লিখতে চাই না চিঠী, তা নয়, লিখি লিখি ক'রে,
অনেক লেখার অনেক আশা মনে ওঠে ভরে।
ভেবে রাখি সকল কথা বলব একেবারে—
হঠাৎ দেখি কোন কিছুই হয় নি বলা, বাঃ রে!
বন্ধু যখন জবাব-চিঠী পাঠিয়ে দিল আগে,
না লেখার সে বেদনাটা বড়ই মনে লাগে।
'বিক্রমপুর' নিয়ে আজও চিন্তা অনিমেষ,
আশা করি শীঘ্র পাবে লেখা হ'লে শেষ।
'অবন্তিকায়' কী ছাপাল শান্তিতে বা কী?
"চাবুক" শেষে চাবুক মেরে ঘুম ভাঙাবে না কি?
দেশের কাগজ দেশের মগজ আমি কেবল দূরে—
জানি না তো আমার লেখা ফুটবে কি সেই সুরে?
প্রীতি নিও প্রীতি দিও কবির ঘরণীকে,
ঠেলে ঠুলে চালু রেখ আমার তরণীকে।
ভাঙা নায়ে জানি না ভাই জমবে কি না পাড়ি,
খোকা-খুকুর তরে দিলাম আশীর্ব্বাদের হাঁড়ি।
এ-বাজারে ওটাই জোটে সবার চেয়ে সস্তায়,
শুনতে ভাল কানে কিন্তু রসনা সে পস্তায়।
এবার তবে সাঙ্গ করি জলদি জবাব চাই,
পত্র দিতে দেরী হল, রাগ করো না ভাই।
আগামীতে জানানো চাই আসবে হেথায় কবে,
কবে তোমায় কাছে পেয়ে মনটি সুখী হবে।

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

শেষ দান

ধরণীর শেষ শয্যা ধূলিতলে আছে মোর পাতা
জানি তাহা, তবু এই মৃত্তিকার স্বল্পায়ু মুহূর্ত্তে
তুমি যা দিয়াছ মোরে, হাতে হাতে যা করেছ দান
তার মায়া, সে কি শুধু ব্যর্থ হাসি? অসমাপ্ত গান?
রূপে রসে স্পর্শে এই পৃথিবীর দু'কূল ভরিয়া
সে মধু উছলি ওঠে, যার ছায়া তোমার নয়নে
যৌবনে বসন্ত আনে, দেহঘ্রাণে পাই যে সুরভি
সে কি গো অমৃতহীন, মূল্যহারা মিথ্যা মায়া সবই?
আকাশের এই আলো, বাতাসের এই যে রোমাঞ্চ
নীলিমার এ প্রশান্তি, সৌন্দর্য্যের এই যে তিয়াসা
এ কি শুধু মূঢ় আকুলতা অর্থহীন অভিলাষে
সত্যই কি এ কামনা চিরন্তন সত্যের বিনাশে?
চোখে যা দেখি নি আজো, সে তো আছে আঁখির ওপারে,
দু'চোখে দেখেছি যাহা, তারই ছায়া পড়েছে নয়নে;
অতীন্দ্রিয় স্বপ্ন হ'তে, চাক্ষুষ এ পরম বিস্ময়
চরম দিনের তরে নহে কি তা, জীবনের যথার্থ সঞ্চয়?
একদিন শেষ হবে চাওয়া; স্তব্ধ হবে এই ধুক্ ধুক্
হৃদয়ের অশান্ত কম্পন, সাঙ্গ হবে পরিমিত আয়ু;
আমার দিগন্ত ঘিরি' দিনান্তের সেই সমাগমে
যত তৃষ্ণা, যত আশা, যত আলো ঢেকে যাবে ক্রমে।
পরিপূর্ণ স্তব্ধ অন্ধকারে; প্রাপ্তির সমাপ্তি হবে—
সান্নিধ্যের সুখ-স্পর্শ হয়ে যাবে একান্তে বিলীন
আমার সকল সত্তা, দেহ আর ইন্দ্রিয়ের স্বাদ
একমুঠী ধূলি-ভস্মে রেখে যাবে শেষের প্রসাদ
এ-বিশ্বের বিধাতার দ্বারে; যতদিন আছে আলো
অধরে রয়েছে হাসি, ভালবাসি তোমারে সবারে—

নিত্যের আড়াল হতে অনিত্যের যা পেয়েছি কাছে
সমাপ্তির শেষ ঘণ্টা শেষ হতে যতটুকু আছে
তাহারই মুহূর্ত্ত ভরি ক্ষণিকের এই আলো-ছায়া
নিমেষের এই স্বপ্ন, ক্ষণস্থায়ী হাসি ও কাঁদন
আনন্দ-বেদনা-ভরা প্রতিদিন প্রতিটি গোধূলী—
দৃশ্যলোকে এঁকে যাই অদৃশ্যের মর্ম্ম হ'তে তুলি।

* *

—আর বেশীদিন নয়, শুনি কানে শেষের ইঙ্গিত
সঙ্গীতের শেষ কলি' এইবার বুঝি হবে গাওয়া
অপরাহ্ণ ম্লান হ'ল দিনান্তের ধূসর সন্ধ্যায়
পাণ্ডুর জীবন-সূর্য্য, দেরী নাই অস্তে যায় যায়।
হঠাৎ জাগার মত হঠাৎ হারায়ে যাব আমি
হঠাৎ ফোটার মত হঠাৎ ঝরিবে ফুলদল,
তোমরা রহিবে যারা, আমার সে শেষের ধূলিতে
আমারে পাবে কি খুঁজে? তোমাদের ভাবনাগুলিতে
আমি কি রবনা বাঁচি? নানা রঙে স্মৃতির তুলিতে
আমার অতীত ছবি তোমাদের মনের পাতায়
রবে না কি আঁকা? আমার এ অসমাপ্ত ভালবাসা
জীবনের হাসি-অশ্রু পাবে না কি চিরন্তন ভাষা
তোমাদের কল-কাকলীতে নিত্য দিন-রাতের স্মরণে
চিন্তার সহস্র স্রোতে, ভাবনার জোয়ার-ভাটায়
হতাশার দীর্ঘশ্বাসে, বেদনায় ব্যথা-ভরা বুকে
আমি কি ছুলিব না গো? নিঃশেষে নীরবে যাব চুকে?
মিথ্যা কথা, তা কি হয়? তোমরা ক'রো না অভিমান
ব্যথা যদি দিয়ে থাকি ভুলে যাও রাখিও না মনে
সে ব্যথা প্রেমেরই কাঁটা, তারই শেষ ক্ষত রেখে যাই
পার যদি ভুলে যেও, ভুলে যেও কোন ক্ষোভ নাই ॥

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতীর আরতি

শুভ্র মেঘের ভেলায় চড়িয়া আকাশ-গঙ্গা স্রোতে
বঙ্গের বাণী ধরা-প্রাঙ্গণে এলো সুরলোক হ'তে।
দিব্য আলোকে ভরিয়া ধরণী
শিশিরে সিক্ত করিয়া সরণি,
চন্দনা শ্যামা বন্দনা গানে ভ্রমর গুঞ্জরণে
আসিল ভারতী ভারতের বন-গিরি-নদী-উপবনে।

শঙ্খ-ধবল অঙ্গ তোমার রিক্ত কেন মা আজ?
কোথা গেল তব পল্লব-ঘন তরুলতা শ্যাম-সাজ?
দেখি না কনক-ভূষণের লেশ,
কেন মা তোমার দীন-হীন বেশ?
কাঙাল ভক্ত আহ্বানে বুঝি টলেছে পদ্মাসন'
তাই কি জননি, সাজি কাঙালিনী দিলে আজি দরশন?

আমরা তোমায় রাণী-মা সাজা'ব বাণী মাগো নব সাজে,
সোনার চাঁপাটি পরাব তোমার কৃষ্ণ-কবরী মাঝে।
কর্ণে পরাব বান্ধুলী ফুল,
বর্ণে হারিবে স্বর্ণের দুল;
কৃষ্ণ কবরী মল্লিকাদলে গাঁথিব কণ্ঠহার,
হস্তে তোমার মৃণাল-বলয় মানাবে চমৎকার।

কাঞ্চন ফুলে রঞ্জিত করি' বসনাঞ্চলখানি
কটিতে অতসী-যূথীর মেখলা পরাব মা বীণাপাণি!
রঙ্গণ দলে চরণ রাঙাব,
শুভ্র হিমানী অঙ্গে মাখা'ব;
ইন্দু-কিরণে উজলিবে গিরি-শিখর কিরীট তব,
কপালে পরাতে সিঁদুরের টিপ তরুণ তপনে ক'ব।

মুগ্ধ হ'বে মা তোমার মূরতি হেরিয়া ভক্তজন,
পদ্ম-পলাশে রচিব জননি, তোমার সিংহাসন।
নভে নীলিমার চাঁদোয়া টাঙাব,
কাশবনে শ্বেত-চামর দোলাব;
নূতন ধানের মঞ্জরী দিয়া সাজাব বরণ-ডালা,
চন্দ্র-আলোকে সন্ধ্যায় হ'বে আরতির দীপ জ্বালা।

এতেও যদি মা তৃপ্তি না হয়, না পূরে আকিঞ্চন,
মোদের মানস-সরোবরে তব পাতিব পদ্মাসন।
বেদনার ধূপ-প্রদীপ জ্বালিয়া
সাধনার ফুল-চন্দন দিয়া
ভক্ত-হৃদয়-রক্তে করিব রঞ্জিত পদতল,—
বক্ষ নিঙাড়ি' অর্ঘ্য ঢালিব অশ্রু-গঙ্গাজল!

শ্রীনীলরতন দাশ, বি-এ,

কালনেমি

কালনেমি তুমি নাই বটে—তবু
চলিছে লঙ্কা ভাগ,
মানব মনের রেকর্ডে রেখেছ
এ কি অক্ষয় দাগ।
ত্রেতা হতে কলি দেখি বার বার,
বাড়িয়া চলেছে তব কারবার
বিধির বিধান দুর্জ্ঞেয় জানি,
কমে নাই অনুরাগ।

মুণ্ডিত শিরে অর্পিয়া কর
সরোষে নিঙাড়ে জট,
শূন্যে ভরিয়া মিছার সলিল
স্থাপন করিছে ঘট।
কল্পনা 'কাছি' প্রাণপণে টানে,
নিখোঁজ জাহাজ বন্দরে আনে,
দীপ্ত রবিরে দর্পণে ধরি
ভাবিছে সন্নিকট।

সূত্র ছিন্ন, ঘুরায়ে লাটাই
উড়ায় ধাউস ঘুড়ি,
অণ্ড হইতে অশ্ব ছুটায়ে
'ভকি' দিয়া যায় তুড়ি।
মিথ্যার 'ক্রেণে' ঘুরায়ে বৃহৎ
খনি থেকে তোলে হীরা জহরৎ,
স্বপনের বীজ বপন করিছে
দিয়ে সবে হামাগুড়ি।

সস্তায় ভূয়া বস্তা বস্তা
খাস্তার লুচি ভাজে,
ক্ষীরোদ সাগর মন্থন করে
দধি ভাণ্ডের মাঝে।
আয়োজন করে দক্ষযজ্ঞ,
কোন দেব কোথা বসার যোগ্য,
কাহার নিয়োগ মঞ্জুর হবে
কোথায় কিসের কাজে।

কে কোন বাহনে বাহিত হইবে,
কে কোন অস্ত্র লবে,
কোথায় মিলিবে অষ্টবজ্র
দণ্ডী কোথায় রবে।
কাহার সুমেরু, কুমেরু বা কার?
কি পরিধি হবে রথের চাকার?
চর্ব্ব্য, চোষ্য লেহ্য পেয় কি
দেওয়া হবে উৎসবে?

হাসেন বিধাতা—সাথে কালনেমি
নাহি কি এদের বোধ?
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ফলিবে
কে করিবে তাহা রোধ?
এ-যে আঁকা শুধু জলের 'এলুন'
শূন্য চাকীতে বুলানো বেলুন,
শুষ্ক রিক্ত হস্ত নাড়িয়া
করে দেওয়া ঋণ শোধ।

শুধু ধূম আর ধূলি উড়াইলে
হয় না দিগ্বিজয়,
মহাকাব্যের রচনায় চাই
প্রতিভা—কাগজ নয়!
বরযাত্রী ও খেয়ালীর দল
আসরই পারে এ করিতে দখল,
বলে বহু কথা, করে নাকো কিছু
বিনা শুধু অপচয়।

হইলে হয়ত ভালই হইত
কালনেমি চায় যাহা,
কালের চক্র-নেমির আঘাতে
ঘটিতে পায় না তাহা।
রঙ্গ-মঞ্চে বসি বিচিত্র
বিশ্বমিত্র—বিশ্বামিত্র
অলীক হোমের কুণ্ডে হাঁকিছে
বিকল স্বধা স্বাহা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

কল্যাণকারী কল্যাণকামী—
সত্যই হয় যদি,
আসিতে পারে না—আসিবেনা কভু
তাহাদের দুর্গতি।
আনে প্রশান্তি, আনে আরোগ্য,
ধরণীরে করে রসের যোগ্য,

সকল জীবের বন্ধু যাহারা
সবাকার হিত ব্রতী।
আসিতে পারে না আসিবেনা কভু
তাহাদের দুর্গতি।

জ্ঞানের আলোক বিতরে—ঘুচায়ে
মনের অন্ধকার,
মুক্ত করিয়া দেয় যারা আসি
সব মুক্তির দ্বার।

ন্যায় ও সত্যে করে নির্ভর,
ভগবানে করে মনে প্রাণে ভর,
লক্ষ্মীর পাজে লক্ষিত হয়
যাহাদের শুভ গতি।
আসিতে পারে না আসিবে না কভু
তাহাদের দুর্গতি।

বসুন্ধরাকে দোহন করিয়া
নিজেকে করে না ধনী,
দীনের রক্ত শোষণ করে না
পাতক তাহারে গণি।
দম্ভে যাহারা ফেলেনা চরণ,
হেলা করে নাকো জীবের মরণ,
সম্পদে যারা ব্যাকুল হৃদয়ে
ভগবানে করে নতি।
আসিতে পারে না, আসিবে না কভু
তাহাদের দুর্গতি।

যাদের প্রতাপ, অর্থ, প্রতিভা
নূতন আবিষ্কার,
সতত জগমঙ্গল তরে—
হইতেছে ব্যবহার।
যাহাদের নব উদ্ভাবনায়,
ক্লেশ যন্ত্রণা অভাব কমায়,
দেহে মনে সবে স্বাধীন করিতে
নিয়ত যাদের মতি
আসিতে পারে না, আসিবে না কভু
তাহাদের দুর্গতি।

যারা দুর্বলে পতিতে উঠায়
করে নাকো উপহাস,
মানুষকে যারা করিতে চাহে না
মানুষের ক্রীতদাস।
অহঙ্কারেতে নয় উঁচু শির,
রসনা যাদের সংযত, ধীর,
প্রগল্ভা নয় অমৃতক্ষরা
যাদের সরস্বতী।
আসিতে পারে না, আসিবে না কভু
তাহাদের দুর্গতি।

বিশ্বের মোহে যাহারা ভোলেনি
বিশ্বনাথের কথা,
পর পীড়নেতে ভয় পায় যারা
পর দুখে পায় ব্যথা।
করে ন্যায় তুলা দণ্ডে বিচার,
পক্ষপাত কি নাহি ব্যভিচার,
অতি দর্পের মোহেতে করে না
অহিংসকের ক্ষতি।
আসিতে পারেনা, আসিবে না কভু
তাহাদের দুর্গতি।

যারা কৃষ্টির রক্ষক সাজি
করে না সৃষ্টি নাশ,
সন্ধির নামে পরায় না গেঁথে
ফন্দীর নাগপাশ।
যারা করে গুণ, গুণীর আদর,
স্বার্থে কমায় বাড়ায় না দর,
হীনতার পথ এড়াইয়া যায়
সাধু সঙ্কোচে অতি।
আসিতে পারে না, আসিবে না কভু
তাহাদের দুর্গতি।

সব সঙ্কট কাটায়ে হইবে
জয়ী কল্যাণকৃৎ।
বিশ্ব তাহার বিরোধী হলেও
পরিণামে তারি জিৎ।
যুগের যুগের মহাত্মা দল—
বাহুতে তাদের জোগাইবে বল,
নিজে ভগবান বিধান করিবে
তাহাদের উন্নতি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তুমি এলে অন্তিম-লগনে

আজি মোর সন্ধ্যাকাশে তুমি এলে অন্তিম-লগনে—
হাতে লয়ে মুক্তিদীপ স্মিত-আঁখি নক্ষত্রের মত,
সকল নীলিমা যবে মূর্চ্ছাহত শ্রাবণ-গগনে,
মেঘের পল্লবে ঘেরা আঁখিপত্র ক্লান্তি-ভারানত।
যেদিন ফাল্গুন-বনে কিশলয়-মহোৎসব প্রাতে
তোমার চরণধ্বনি ক্ষীণতম বেজেছিল বুকে,
সেদিন দাওনি ধরা, রহিয়াছ সুদূর অজ্ঞাতে
একেলা কেটেছে দিন পরিতৃপ্ত কত সুখে দুখে।
সে-ক্ষণ জীবন হ'তে ধীরে ধীরে নিয়েছে বিদায়,
ছেয়ে গেছে বন-ভূমি ঝ'রে-পড়া শুষ্ক পত্রভারে,
পবনের দীর্ঘশ্বাসে কুসুমের সুরভি মিলায়,
যত বাণী সুরহারা এ-বীণার জীর্ণ তারে তারে।
তোমার প্রদীপখানি রাখো তবে মরণ-শয়নে,
পথভোলা-জীবনের ভ্রান্তিগুলি জ্বলুক নয়নে।

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীবীরেন ভট্টাচার্য্য কথা—শ্রীরণজিৎকুমার সেন

মিশ্র—কার্ফা

সে যে হোলো বহুদিন,
ব'লেছিলে ভুলিবে না;
আবার এলো যে ফিরে উতলা ফাগুন,
তুমি তবু কাছে এলে না।

ভুলা'তে শিখেছ জানি, তবু
ভুলিতে চাহি নি প্রিয় কভু,
বারেক হৃদয়-পাশে আসি'
সে ভুল আজি কি ভাঙিবে না?

কত না রজনী গেছে কাটি'
বাতায়নে চেয়ে চেয়ে,
তুমি তো আস নি তবু প্রিয়
হৃদয়ের পথ বেয়ে।

আজো যে র'য়েছি ভরা প্রাণে
গন্ধে আলোকে প্রেমে গানে,
সুদূর পথের সাথী মম
আজো কি সে ভুল ভুলিবে না?

—স্বরলিপি—

+				O				+				O			
সা	রা	জ্ঞা	পা	-া	ধা	র্সা	ধা	র্সা	-া	ণা	পা	সা	-জ্ঞা	জ্ঞা	-া
সে	যে	হো	লো	॰	ব	হু	দি	•	ন্	ব	লে	ছি	•	লে	•
রা	সা	রা	-ধ্‌া	ধ্‌া	-সা	-া	-া	রা	রা	-পা	মা	রা	সা	রা	-া
ভু	লি	বে	॰	না	•	•	॰	আ	বা	র্	এ	লো	যে	ফি	•
-সা	-া	-া	-া	ণ্‌া	ণ্‌া	ধা	ন্‌া	সা	-া	-া	-া	সা	রা	মা	পা
রে	•	•	•	উ	ত	লা	ফা	গু	•	•	ন্	তু	মি	ত	বু
ধা	পা	ধা	ণর্রা	র্সা	-া	পা	পণা	ণা	পা	-া	-া	-া	পা	পা	জ্ঞা
কা	ছে	এ	লে•	না	•	এ	লে•	না	•	•	•	•	ব	লে	ছি
								পা	-জ্ঞা	রা	সা	রা	ধ্‌া	ধ্‌া	-সা
								লে	•	ভু	লি	বে	•	না	•

ণা ণা ণা ণা ধা ধপা পা পা রসা -পধা পা -া -া -া -া -সা
ভু লা তে শি খে ছি॰ জা নি ত॰ ॰॰ বু ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

পা না পা না | -র্সা র্সা র্সা র্সা নর্সা র্রজ্ঞা র্সা -র্রা -া -া -া -র্সা
ভু লি তে চা | হি নি প্রি য় ক॰ ॰॰ ভু ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

র্রা র্রর্সা -র্রা র্রর্সা র্সা -া র্রর্সা র্সনা না -া -র্সা -া র্সর্রা র্রর্সা -ণা ণা
বা রে॰ ক্ হৃ॰ দ য় পা॰ শে॰ আ ॰ সি ॰ সে॰ ভু॰ ল্ আ

ণধা -পধা ধা -পা পধা পধপা মগা -রগা মা -া -া -া -া পা পা জ্ঞা
জি॰ ॰॰ কি ॰ ভা॰ ঙি॰॰ বে॰ ॰॰ না ॰ ব লে ছি

পা -হ্ রা সা রা -ধ্া ধ্া সা
লে ভু লি বে ॰ না ॰

{সা মা -জ্ঞা জ্ঞা -ঋ ঋা সা সা সা -ন্া সা -া সা রা জ্ঞা সা
ক ত না র জ নী গে ছে কা ॰ টি ॰ বা তা য় নে

মা সা জ্ঞা -পা মা -া -া পা পা পা ধা ণা র্সা ধা পা
চে য়ে চে ॰ য়ে ॰ তু মি তো আ স নি ত বু

মা -পা জ্ঞা -া সা জ্ঞা মা -পা মা জ্ঞা ন্া -সা | -রা -া -া -া}
প্রি ॰ য় ॰ হৃ দ য়ে র প থ বে ॰ | য়ে ॰ ॰ ॰

ণা ণা ণা ণা ধা ধপা পা পা রসা -পধা পা -া -া -া -র্সা
আ জো যে র য়ে ছি॰ ভ রা প্রা॰ ॰॰ ণে ॰

পা -না পা না | -র্সা র্সা র্সা র্সা নর্সা -র্রজ্ঞা র্সা -র্রা -া -া -া -র্সা
গ ন্ ধে আ | লো কে প্রে মে গা॰ ॰॰ নে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

র্রা র্রর্সা -র্রা র্রর্সা র্সা -া র্রর্সা র্সনা না -া -র্সা -া র্সর্রা র্রর্সা -ণা ণা
সু দূ॰ র্ প॰ থে র্ সা॰ থী॰ ম ॰ ম ॰ আ॰ জো॰ কি সে

ণধা -পধা ধা -পা পধা পধপা মগা -রগা মা -া -া -া -া পা পা জ্ঞা |
ভু॰ ॰॰ ॰ ল্ ভু॰ লি॰॰ বে॰ ॰॰ না ॰ ব লে ছি |

পা -জ্ঞা রা সা রা -ধ্া ধ্া -সা ||
লে ॰ ভু লি বে ॰ না ॰ ||

নট-গুরু গিরিশচন্দ্র

গিরিশ-সংখ্যা

—মঙ্গলাচরণ—

জয়তু—জয়তু—গিরিশচন্দ্র, 'ভৈরব'-নামধারী।
শ্রীরামকৃষ্ণার্পিত-প্রাণ, ভক্ত বীরাচারী॥
বঙ্গ-রঙ্গভূমির জনক,
সিদ্ধ মহাকবি নট-নায়ক,
প্রতিভা তব ভারতের সাধনা অনুসারি'
করিল ভাব-শুদ্ধ সৃষ্টি জনগণ-মনোহারী।
অদ্ভুত তব জীবন-রঙ্গ—
শান্ত সমাহিত, কভু তরঙ্গ,
সাগরে হোলো অরুণোদয়—তমসা-নাশকারী।
স্বরাট্ মূর্ত্তি, বিরাট্ কীর্ত্তি—মরণ-দর্পহারী॥

শ্রীশ্রীপদ মুখোপাধ্যায়

জন্ম—১২৫০, ১৫ই ফাল্গুন | গিরিশচন্দ্র | মৃত্যু—১৩১৮, ২৫শে মাঘ

গিরিশচন্দ্র

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

এক

১২৫০ সালের ১৫ই ফাল্গুনে গিরিশচন্দ্রের জন্ম হয়। ১৩১৮ সালের ২৫শে মাঘ তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। বত্রিশ বৎসর হইল, তাঁহাকে আমরা হারাইয়াছি। তাঁহার বিয়োগোপলক্ষে মিনার্ভা থিয়েটারের পক্ষ হইতে প্রচারিত 'হ্যাণ্ডবিলে' যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে শোকের উচ্ছ্বাস থাকিলেও গিরিশ-প্রতিভার এক অতি সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ সত্য পরিচয় আছে। বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর জন্য গিরিশচন্দ্র কি করিয়া গিয়াছেন, কেন যে পরমহংসদেব তাঁহাকে থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহা আধুনিক অধিকাংশ লেখকও পাঠক ঠিকমত জানেন না বলিয়া সেই দুষ্প্রাপ্য লেখাটুকু এখানে প্রথমেই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"বঙ্গীয় নাট্য-গগনের প্রদীপ্ত ভাস্কর, বঙ্গের নটগুরু, নটরাজ, আমাদের রঙ্গনায়ক, কর্ম্মকর্ত্তা, বন্ধু, সখা, সর্ব্বস্ব গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গত বৃহস্পতিবার রাত্রি দেড়টার সময় পুণ্যধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার লোকান্তর-গমনে আমরা শোকসন্তপ্ত, বাঙ্গালার নাট্য-গগন চিরতমিস্রা আবৃত।

এই কারণ আজ শনিবার ২৭শে মাঘ—মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে কোন নাটকের অভিনয় দেখান হইবে না। আজ আমরা সর্ব্বকর্ম্ম-বিরহিত হইয়া ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব মহোদয়ের শ্রীচরণে গিরিশচন্দ্রের পারলৌকিক কল্যাণ-কামনা করিয়া প্রার্থনা করিব।

কাঁদ ভাই নাট্যামোদী, রসপিপাসু বাঙ্গালী! আজ গিরিশচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানে কাঁদ! আজ বাঙ্গালার নাট্যমন্দিরের চূড়া ধরাশায়ী হইয়াছে বলিয়া কাঁদ—আমাদের অশ্রুধারার সহিত নয়নধারা মিশাইয়া কাঁদ! আজ বাঙ্গালী যে নিধি হারাইয়াছেন, তাহা আর হইবে না, আর পাইব না। যিনি বাঙ্গালার নাট্যকলার প্রবর্ত্তক, প্রচারক, পৃষ্ঠপোষক, গুরু ও নায়ক বলিয়া দেশমান্য ছিলেন—সেই বাঙ্গালার গ্যারিক, বঙ্গসাহিত্যের সেক্সপিয়র গিরিশচন্দ্র অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত!

যে স্বর্গীয়া বিভূতিমতী বাণী তাঁহাকে এতকাল মুখর করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাঁহার কৃপায় গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি নানাভাবের, নানা বিষয়ের নাটক রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমুজ্জ্বল করিয়াছেন, তিনি আজ নীরব, তাঁহার অবলম্বন ভস্মসাৎ। তাই আবার বলি, কাঁদ বাঙ্গালী সুধীজন! আজ তাঁহার জন্য কাঁদ। আর কাঁদ তোমরা কলিকাতার রঙ্গমঞ্চের নট-নটীগণ! তোমাদের গুরু, পিতা, শিক্ষক, অবলম্বন গিরিশচন্দ্র চিরদিনের জন্য তোমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। যাঁহার আশ্রয়ে তোমরা নাট্যকলার এতটা উন্নতি করিতে পারিয়াছ, যাঁহার নাটক সকল অভিনয় করিয়া, তোমরা যশের গৌরবে মণ্ডিত হইয়াছ, তাঁহার লোকান্তর গমনে তোমরাও প্রাণ ভরিয়া, পাঁজর ফাটাইয়া কাঁদ! আজ পঁয়তাল্লিশ বৎসরকাল যিনি বাঙ্গালার নাট্যমঞ্চে নানা অভিনয়-লীলা দেখাইয়া নটচাতুরীর পরাকাষ্ঠা করিয়াছেন, যাঁহার শতাধিক নাটক, প্রহসন প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যে নূতন যুগের উদ্ভব করিয়াছে, যাঁহার প্রেরণায় কলিকাতার প্রায় সকল রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই তোমাদের অন্নদাতা, উপজীবিকার স্রষ্টা গিরিশচন্দ্র স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, গুরুদেবের চরণাশ্রয় পাইয়াছেন, তোমরা সকলে সমবেত কণ্ঠে সমস্বরে রোদন কর। আজ বাঙ্গালার দুর্দ্দিন, বাঙ্গালী কাব্যামোদীর দুর্দ্দিন—হায় মা বঙ্গলক্ষ্মী! আজ তোমার কৃতী পুত্র স্বর্গে গমন করিয়াছেন। যে নিষ্কলঙ্ক পূর্ণশশী আজ অস্ত গেল, তেমন পূর্ণাঙ্গ পূর্ণাবয়ব কবিচন্দ্র বুঝি বা আর তোমার অঙ্ক শোভিত করিবে না। তাই তোমার দুঃখে আজ দিগ্-বধূগণ কাঁদিতেছেন। সে রোদনের প্রতিধ্বনি আজ বাঙ্গালার গগন পবনকে স্তম্ভিত করিয়াছে।"

দেশমাতার এ হেন বরণীয় ও স্মরণীয় সন্তানের শততম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে 'বঙ্গশ্রী'র কর্ত্তৃপক্ষ যে এই 'গিরিশ-সংখ্যা'-প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের কর্ত্তব্য-বুদ্ধিরই পরিচায়ক। এই সদনুষ্ঠানে আমরা লিপ্ত হইবার সুযোগ পাইয়াছি বলিয়া নিজেদের কৃত-কৃতার্থ মনে করিতেছি।

দুই

এ যুগের কোনও কোনও লেখক সাহিত্যের হাটে স্বৈরিণীকে সাবিত্রী-রূপে চালাইবার চেষ্টা করিয়া যেমন 'দরদী' বা 'বেদনার পুরোহিত' হইয়াছেন, গিরিশচন্দ্র বার রকমের বারটি বারাঙ্গনার চিত্র আঁকিলেও সেরূপ 'দরদী' ছিলেন না। পতিতাদের প্রতি তাঁহার "দরদ" কিরূপ ছিল, তাহা তাঁহার বিয়োগে ব্যথিত-চিত্তে অভিনেত্রীরা যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যায়। পাঠক-সাধারণের অবগতির জন্য তখনকার শুধু দুই জন সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রীর দুইখানি পত্র হইতে সামান্য অংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। একজন লিখিয়াছিলেন—"আমরা শুধু গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার কথা জানি না, তাঁহার ন্যায় জগতে আর কেহ অত পুস্তক লিখিয়াছেন কিনা জানি না, তাঁহার নাটকের দোষ-গুণের বিচার করিবার ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি আমাদের নাই। শুধু এইটুকু জানি, তিনি মহাপুরুষ ছিলেন—তিনি আমাদের গুরু, পিতা, শিক্ষাদাতা—তিনি আমাদের হৃদয়ে সামান্য একটু জ্ঞানালোক দিয়াছেন, তিনি আমাদের মাথার

যাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রম-লব্ধ অর্থে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার প্রবৃত্তি দিয়াছেন, আর তিনি আমাদের ঘৃণা না করিয়া যথাসম্ভব আদর করিয়াছেন, তাই তাঁর বিয়োগে আমরা পিতৃহারা—তাঁর জন্ম আমাদের এত হাহাকার।” ইত্যাদি (সুশীলাবালা)।

আর এক অভিনেত্রীর পত্রের একস্থানে আছে—“আমার জন্মের পর সাধুসমাজ আমায় বলিয়াছিলেন যে ‘পুণ্যের ছাপ-মারা কুলে যখন তোর জন্ম নয়, তখন তুই চিরদিন পাপই করিতে থাক্, আর আমরা পুণ্যের তেজে তোদের গাল দিতে, ঘৃণা করিতে থাকি’; কিন্তু গিরিশবাবু অতটা পুণ্যবান্ ছিলেন না, তিনি মহাপুরুষ ছিলেন, তাই তিনি আমার মত অভাগিনীর মুখ দিয়াও চৈতন্যলীলার নিতাইয়ের, বিল্বমঙ্গলের পাগলিনীর মধুময় কথা বলাইয়াছিলেন। গিরিশবাবুর কৃপায় আমি হরিনাম গাইয়াছি, তাই আজ সেই শুধু নাট্যগুরু নয়, সেই ধর্ম্মগুরুর দেবচরণে অবনত মস্তকে ভক্তিপূর্ণ কোটি কোটি প্রণাম করিতেছি।”—(নরীসুন্দরী)

ইহাকেই বলে পতিতাদের প্রতি প্রকৃত দরদ—তাহাদের প্রকৃত কল্যাণ-সাধন। ইহাতে সমাজ ভাঙ্গে না, বরং রক্ষা পায়; শিল্পেরও উৎকর্ষ সাধিত হয়। এজন্য অবশ্য তাঁহাকে অনেকের নিকট অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। এদেশে এখন নট-নটীদের যেরূপ আদর দেখা যায়, তাঁহার সময়ে ঠিক তাহার বিপরীত ছিল। তাঁহার লিখিত ‘নটের উক্তি’ই এ-কথার প্রমাণ। তিনি বলিয়াছিলেন—

“লোকে কয়, অভিনয় কভু নিন্দনীয় নয়,
নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতাগণ।
পরের বেদনা হায়, পরে কি বুঝিবে তায়,
হায়রে ব্যথার ব্যথী আছে কোন্ জন?

* * *

চির পর-আরাধনা, সহকারী বারাঙ্গনা,
কে কোথায় রাখে তার মান?
অনুগ্রহ-প্রার্থী জন, কে কোথায় পায় ধন,
রজনীর জাগরণ নিত্য হরে প্রাণ।
তিরস্কার পুরস্কার, কলঙ্ক কণ্ঠের হার,
তথাপি এ পথে পদ ক’রেছি অর্পণ;
রঙ্গভূমি ভালবাসি, হৃদে সাধ রাশি রাশি,
আশার নেশায় করি জীবন যাপন”।

—এ মর্ম্ম-বেদনার তীব্রতা এখনকার পাঠকগণের উপলব্ধি হইবে কি? দেশে থিয়েটার জিনিষটাকে ঠিকমত গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি যে কেবল অশেষ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও কুৎসা-কলঙ্ক সহ্য করিয়াছিলেন, এবং বেশী বেতনের ভাল চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহা নহে; সেই সঙ্গে ধনি-সন্তান গোপাল শীলের নিকট নিজেকে কতকটা বন্ধক-হিসাবে রাখিয়া তিনি যে অর্থলাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও ষোল হাজার টাকা তাঁহার শিষ্যগণের হস্তে নিঃস্বার্থভাবে অর্পন করিয়াছিলেন! এমন ত্যাগ-স্বীকারের দৃষ্টান্ত আর কাহারও কোথাও কেহ দেখাইতে পারিবেন কি?

তিন

গিরিশচন্দ্রের ‘চৈতন্যলীলা’ এ দেশের কি মহা-উপকার সাধন করিয়াছিল, তাহা এখন প্রায় সকলে ভুলিয়া গিয়াছেন। তাই রস-রাজ অমৃতলাল একবার লিখিয়াছিলেন—

“চৈতন্যলীলা কি করিয়াছে? এমন কিছু বেশী দিনের কথা নয়, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম ‘চৈতন্যলীলা’ অভিনীত হয়। ঐ সময়ের পূর্ব্বের ও পরের কেবলমাত্র ইংরাজী শিক্ষিত বঙ্গবাসী নয়, লোক-সাধারণের হৃদয়ে সনাতন ধর্ম্মের প্রেমময় ভাবের অবস্থা একবার ভাবিয়া তুলনায় সমালোচনা করিলেই উপলব্ধি হইবে। “বখাটে” নট ও অর্থাটী নটীবৃন্দদ্বারা দেশে ধর্ম্ম প্রচার হইল! ছি! ছি! এ কথা মনে আসিলেও, স্বীকার করিতে নাই, তাতে মহাপাপ আছে! কিন্তু কে জানে কেমন, তারিখে একটু গোলমাল ক’রে, মনে হয় যেন এই নগণ্য সম্প্রদায়কে “জঘন্য” বেদীতে শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা কীর্ত্তন করিতে শুনিয়াই ধর্ম্ম-বিপ্লবকারী বীরগণ অন্তরে ঈষৎ কম্পিত হইলেন, আর ধর্ম্মপ্রাণ নিদ্রিত হিন্দু জাগরিত হইয়া ব্রজরাজ ও নবদ্বীপচন্দ্রের বিশ্ব-বিমোহন প্রেম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন; নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল, গীতা ও চৈতন্য-চরিতের বিবিধ সংস্করণে দেশ ছাইয়া পড়িল, বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালী সন্তানও লজ্জিত না হইয়া সগর্ব্বে আপনাকে ‘হিন্দু’ ‘হিন্দু’ বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল!

সেই প্রথমে যখন দীনা অভিনেত্রী রঙ্গমঞ্চে শ্রীচৈতন্যের বেশে নদীয়ার ঈশ্বরাবতারের লীলা অভিনয় করিয়াছে, তখন আমাদিগের হীন রঙ্গালয়কে বৈকুণ্ঠে উন্নত করিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রকটিত ঈশ্বরের অন্য অবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই অভিনয় বসিয়া দেখিয়াছেন; আমরা ধন্য হইয়াছি, দর্শক ধন্য হইয়াছেন, বসুমতী ধন্যা হইয়াছেন।

আমাদিগের চৈতন্যলীলার অভিনয় সেই ঐশিক নয়ন-পাতে পুণ্যময় পবিত্র তীর্থে পরিণত হইয়াছে। এখন ‘চৈতন্যলীলা’র অভিনয়-দর্শন আর কেবল আমোদ-উপভোগ নয়, হৃদয়ের শিক্ষা নয়, সংকীর্ত্তন-শ্রবণের আনন্দ নয়—এখন তীর্থ-দর্শন।”

সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী-জীবনের ইতিহাসে “চৈতন্যলীলা”র প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা যে বিশেষরূপে উল্লিখিত হইবার যোগ্য, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। ‘চৈতন্য-লীলা’র অভিনয় রামকৃষ্ণদেবকে থিয়েটারে টানিয়া আনিয়া-

ছিল এবং কতকটা তাহারই ফলস্বরূপ তিনিও গিরিশচন্দ্রকে নিজের কাছে সাদরে টানিয়া লইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রও দর্শক-সমীপে গুরু-দত্ত অমৃত-বিতরণের কার্যাকে জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের ভাব ও আদর্শ প্রচার-কার্য্যে স্বামী বিবেকানন্দ ও মাষ্টার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ন্যায় তাঁহার চেষ্টা-যত্নও উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহার 'বিল্বমঙ্গল' হইতে আরম্ভ করিয়া 'তপোবল' পর্য্যন্ত প্রায় সকল গ্রন্থেরই ভিতর আর-বিস্তর রকমে পরমহংসদেবের মর্ম্মবাণী শুনিতে পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্রের শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে 'উদ্বোধন' ও 'প্রবুদ্ধ-ভারত' যে এ-পর্য্যন্ত একটিও কথা কহিলেন না, ইহাই আমাদের পরম দুঃখ।

নিবেদন

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

বিততবিপুলকীর্ত্তির্নাটবিদ্যাপ্রবীণো
নটগুরুরিতি যোঽভূদ্বঙ্গরঙ্গে প্রসিদ্ধঃ।
বিবিধরচনদক্ষো রামকৃষ্ণৈকচিত্তো
জয়তি গিরিশচন্দ্রো ভৈরবস্যাবতারঃ॥

বঙ্গাব্দ ১৩১৮ সালের ২৫শে মাঘ বৃহস্পতিবার বাঙ্গালার সাহিত্য জগতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন নটগুরু মহাকবি গিরিশচন্দ্রের তিরোভাব ঘটিয়াছিল। এই কারণেই "বঙ্গশ্রী"র মাঘ-সংখ্যাটিকে গিরিশচন্দ্রের পুণ্য-স্মৃতির বাহকরূপে সহৃদয় পাঠকবৃন্দের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইতেছে

গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি-কথা লিখিবার উপক্রম করিলেই বাল্যের একটি প্রভাতে দৃষ্ট একখানি অপরিম্লান স্মৃতিচিত্র চিত্তপটে আজিও উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে। এ অধম লেখকের অদৃষ্টে গিরিশচন্দ্রের রঙ্গাবতরণ প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ বা সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে নাই। মহাকবি যখন অসুস্থতাবশে রঙ্গপীঠ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তখন লেখক বালক মাত্র। কিন্তু লেখকের স্বর্গত পিতামহদেব মহাকবির সহিত সৌহার্দ্দের নিবিড় বন্ধনে সম্বদ্ধ ছিলেন। সে কারণে তিনি প্রায়ই প্রাতঃকালে রোগাতুর গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার বাগবাজার বসুপাড়ার গৃহে দেখিতে যাইতেন। বাল্যাবস্থায় একদিন এই লেখক তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিল। আর সে দিন যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহার স্মৃতি-রেখা আজিও তাহার চিত্ত হইতে অণুমাত্র বিলুপ্ত হয় নাই।

শয্যার উপর এক বিশালকায় পুরুষপ্রবরের বিরাট দেহ অর্দ্ধশায়িত—দুরন্ত শ্বাসরোগের তীব্র যন্ত্রণায় উহা ক্ষণে সঙ্কুচিত, ক্ষণে প্রসারিত। কিন্তু তাঁহার রোগক্লিষ্ট আনন পাণ্ডুর হইলেও অতি প্রশান্ত—ঔদাসীন্যের অপার্থিব মৃদুহাস্যে ঈষৎ উদ্ভাসিত—যেন জীবনে তিনি সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ। তাঁর নিষ্পলক অর্দ্ধস্তিমিত উজ্জ্বল আয়ত নেত্রদ্বয়ে দর-বিগলিত বারিধারা—যেন শ্রীগুরু চরণারবিন্দে শরণ-লোলুপ অন্তর উদ্বেল হইয়া অশ্রুরূপে উৎসারিত হইতেছে। মুখে অবিরাম শ্রীরামকৃষ্ণ নাম। দেখিয়া মনে হইয়াছিল যেন কোন মুমুক্ষু মহাসমাধিস্থ হইবার পূর্ব্বক্ষণে ইষ্ট-ধ্যানে নিরত।

বাল্যের একটিমাত্র প্রভাতে দৃষ্ট এই ছবি আজিও তেমনই উজ্জ্বল আছে। পরবর্ত্তী জীবনে গিরিশচন্দ্রের নানাবিধ ভাবাভিনয়ের আলোক-চিত্র দেখিয়াছি—তাঁহার বহু অন্তরঙ্গ ভক্তের মুখে নটগুরুর বিবিধ অভিনয়-ভঙ্গীর বিশদ বিবরণ শুনিয়াছি,—কিন্তু তাহাদের কোনটিই সেই অর্দ্ধসমাহিত-প্রায় ভৈরব-মূর্ত্তির বাল্য-স্মৃতিকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।

যৌবনে গিরিশচন্দ্রের পিতৃস্বস্রীয় ভ্রাতা সহৃদয় সাহিত্যিক বহুমানভাজন স্বর্গত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ভবনে নিত্য সন্ধ্যায় সমবেত হইলে প্রায়ই গিরিশ-প্রসঙ্গ উঠিত। তথায় গিরিশচন্দ্রের পুত্রাধিক প্রিয় সহচর শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্গত শ্রদ্ধেয় নাট্যাধ্যক্ষ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্বর্গত শ্রদ্ধাভাজন শ্রীশচন্দ্র মতিলাল, শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত-প্রমুখ গিরিশ-ভক্তগণ প্রায়ই মিলিত হইয়া গিরিশচন্দ্র-সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনায় মগ্ন হইতেন। বর্ত্তমান লেখকের সে সকল আসরে নির্ব্বাক্-শ্রোতৃরূপে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য ঘটিত।

আরও উত্তরকালে গিরিশচন্দ্রের অন্যতম অন্তরঙ্গ ভক্ত সুসাহিত্যিক ও প্রবীণ সমালোচক শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের সহিত গিরিশচন্দ্রের রচনা-সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার সুযোগ লাভেও বর্ত্তমান লেখক ধন্য হইয়াছে। কিন্তু ধারাবাহিক সমালোচনার কোন সুযোগ অদ্যাবধি তাহার ঘটে নাই।

গিরিশচন্দ্রের রচনার যথার্থ নিরপেক্ষ বিশ্লেষণাত্মক

সমালোচনা এ পর্য্যন্ত অতি অল্পই হইয়াছে। এ-যাবৎ-কাল তাঁহার বার্ষিক-স্মৃতি-বাসরে কেবল তাঁহাকে 'বঙ্গের গ্যারিক ও শেক্‌স্‌পীয়ার' বলিয়াই তাঁহার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইল ভাবিয়া আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া আসিতেছি। আবার ইহার বিপরীত একটা দিক্‌ও আছে। সে দিকের সমালোচকম্মন্য লেখক-ধুরন্ধর-বৃন্দ গিরিশচন্দ্রের রচনাকে সাহিত্যের করিতেও দ্বিধাবোধ করিয়া থাকেন।

গিরিশচন্দ্রের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে হইলে তাঁহার রচনাগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরপেক্ষ সমালোচনার একান্ত প্রয়োজন। তিনি স্বয়ং আজ সকল নিন্দা-স্তুতির অতীত, কেবল নিছক নিন্দা বা স্তুতিদ্বারা তাঁহার কোন ক্ষতি বা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যাঁহার রচনা একদিন একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব হইতে আরম্ভ করিয়া পণ্ডিতরাজ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন পর্য্যন্ত ও অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পর্য্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর সিদ্ধ-সাধক-মনীষিবর্গকে ও তৎসহ আবাল বৃদ্ধ-বনিতাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল,—যাঁহার রচিত পরমার্থ-গীতিগুলি শ্রীরামপ্রসাদ-কমলাকান্ত-প্রমুখ মহাজনগণের গীতাবলীর পরেই স্থান পাইবার উপযুক্ত বলিয়া ভাবুক ভক্তগণ বিশ্বাস করেন, তাঁহার রচনার নিরপেক্ষ দোষ-গুণ-বিচারের সময় আজ সমাগত—সন্দেহ নাই।

কিন্তু নানারূপ অবস্থা-বিপর্য্যয়ের ফলে আজ সে চেষ্টা হইতে আমরা বিরত হইতে বাধ্য হইয়াছি। "গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা" করিবার মতই গিরিশচন্দ্রের কয়েকটি লুপ্ত-প্রায় রচনা আলোচ্য গিরিশ-সংখ্যার শোভা ও গৌরব বর্দ্ধন করিবার উদ্দেশ্যে মুদ্রিত হইল। আরও কয়েকটি এইরূপ রচনা পরবর্ত্তী দুই এক সংখ্যায় প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা আছে। এ সকল রচনার সংগ্রহ-কর্ত্তা শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় যথাস্থানে তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আর 'বঙ্গশ্রীর' সহৃদয় কর্ত্তৃপক্ষগণ গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি-পূজার এ সুযোগ নষ্ট হইতে দেন নাই—একারণে তাঁহারা রসপিপাসু বঙ্গবাসিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের রচনাবলী

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের শেষজীবনের নিত্য সহচর ও আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ স্বর্গত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় গিরিশচন্দ্রের যাবতীয় অসমাপ্ত রচনা ও তাঁহার নাটকাবলীর বহু পরিত্যক্ত অংশ সযত্নে রক্ষা করিতেন। আমিই সেই রচনাগুলির প্রকাশে প্রথম উদ্যোগী হইয়াছিলাম। গিরিশচন্দ্র আমাকে স্নেহ করিতেন। সেই স্নেহের বশে—তাঁহারই অনুমতি ক্রমে অবিনাশবাবু গিরিশচন্দ্রের 'রাণা প্রতাপ' নামক একটি অসমাপ্ত নাটক ও মীরকাসিমের একটি পরিত্যক্ত অংশ আমার হস্তে প্রকাশার্থ সমর্পণ করেন। সেই দুইটি রচনা সেই সময়ে 'অর্চ্চনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের দেহাবসানের পর অবিনাশবাবু মহাকবির 'শাস্তি কি শান্তি' নামক নাটকের কয়েকটি পরিত্যক্ত অংশ মৎসম্পাদিত 'প্রবাহিনী' পত্রিকায় প্রকাশার্থ প্রদান করেন। সে গুলিও প্রবাহিণীতে যথাকালে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর অবিনাশবাবু ঐরূপ অনেকগুলি রচনা বিবিধ সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া তাহার অধিকাংশই গিরিশ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হয় নাই—এরূপ অবশিষ্ট রচনার কিয়দংশ অবিনাশবাবুর নিকট ও কতক অংশ আমার নিকট ছিল। অবিনাশবাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ মৃত্যুঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায় পিতার নির্দ্দেশানুযায়ী পিতৃ সংগৃহীত গিরিশ-রচনাগুলি আমারই হস্তে অর্পণ করেন।

"বঙ্গশ্রী"র গিরিশ সংখ্যায় এই রচনাগুলি প্রকাশার্থ দিবার সময় শ্রদ্ধাভাজন স্বর্গত অবিনাশচন্দ্রের কথাই বার বার আমাদিগের মনে পড়িয়াছে। তিনি এই রচনাগুলি সযত্নে রক্ষা না করিলে এগুলি বহুপূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইত। সুতরাং গিরিশ-ভক্তগণ এই রচনাগুলি পড়িবার সময় সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে একবার অবিনাশবাবুকে যেন স্মরণ করেন—ইহাই তাঁহাদিগের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। অবশ্য আজ স্বর্গত অবিনাশচন্দ্র জীবিত থাকিয়া বর্ত্তমান "গিরিশ-সংখ্যা"-খানির সম্পাদন-ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলে সংখ্যাটি আরও সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর হইতে পারিত—সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। অলমতি বিস্তারেণ—বিনীত নিবেদক—

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

আত্ম-কথা

অনেক সংবাদপত্রেই প্রায় রঙ্গালয়ের বিষয় কিছু-না-কিছু থাকে, ইহাতে প্রকাশ পায় যে, রঙ্গালয়ের কথা অনেকে জানিতে চান, তবে আপনার কথা আপনি যেমন বলা যায়, অপরের দ্বারা সেরূপ হয় না। আপনার কথা আপনারা যতদূর পারি বলিব, এই নিমিত্তই "রঙ্গালয়ের" আয়োজন। আমাদের সহিত সম্বন্ধ নাই, এরূপ ব্যক্তি ও বস্তু হইতে পারে না। কারণ, রঙ্গালয় জগতের একটী ক্ষুদ্র অনুরূপ। সুতরাং সমস্ত বিষয়ই রঙ্গালয়ের স্তম্ভে উল্লিখিত হইবে। তবে আমাদের অন্তর যেরূপ আলোকিত ও সে আলোকে সে বস্তু যেরূপ দেখিব, সেইরূপ বর্ণনা করিব। এক বস্তু দুই জনে, দুই ভাবে দেখেন, সন্দেহ নাই। কেরাণী, অফিসের সময় বৃষ্টি হইলে, বিধাতাকে নিন্দা করেন, কিন্তু কৃষকের আনন্দের সীমা থাকে না। কেহ-বা রঙ্গালয় উৎসন্ন না যাওয়াতে ক্ষুণ্ণ, কেহ বা সম্পূর্ণ উৎসাহ প্রদান করেন; অত্যাচারী ধনীর পক্ষে বিচারপতি ঘুঁষ খাইলে ভাল হয়, কিন্তু দরিদ্রের তাহাতে সর্ব্বনাশ। রাজশাসন না থাকিলে, চোরের ভাল—গৃহস্থের অমঙ্গল। এইরূপ সমস্ত বিষয়েই মতান্তর। আমাদের সহিতও অনেকের মতান্তর হইবার সম্ভাবনা।

আমাদের মতে স্বদেশ ধন-ধান্যে পূর্ণ হউক, সকলে নীরোগ হউন, ঘরে ঘরে আনন্দ-কার্য্য উপস্থিত হউক, আমরা পরম সুখে কালাতিপাত করিতে পারিব। দেশে সঙ্গীত, শিল্পের উন্নতি হউক, সুযোগ্য নাটককার জন্ম-গ্রহণ করুন, অরসিক ঘৃণিত হউন, সুরসিকের সম্মান হউক, আমাদের বিশেষ মঙ্গল। রাজপুরুষেরা সুখে থাকুন, নটকে উৎসাহ প্রদান করুন,—আমরা পরম আনন্দে থাকিব। হিংস্রক, নিন্দুক, কুৎসিৎ আচারী ব্যক্তি জগতে না থাকে, যে বস্তু যেরূপ, তাহার সেরূপ আদর হয়, জগতে মার্জ্জনাশীল ব্যক্তি অধিক হন, সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি আনন্দময় হন, আমরা শিল্পী, আমাদের পরম মঙ্গল। বাণিজ্য-বিস্তার এবং বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা নানাবিধ আবিষ্কারে রঙ্গালয় সুসজ্জিত হউক,—আমাদের পরম আনন্দ।

বলা হইল যে, সমস্ত বিষয়ের সহিত আমাদের সম্বন্ধ, সমস্ত বিষয়েরই চর্চ্চা রঙ্গালয়ে হইবে। আত্মরক্ষা পরম ধর্ম্ম। আমরা আত্মরক্ষার সর্ব্বদা চেষ্টা করিব। কুৎসিত-প্রকৃতি ব্যক্তিমাত্রেই রঙ্গালয়ের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন। মিথ্যা অপবাদ রঙ্গালয়ের প্রতি অর্পণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত নহেন; যে কথা বলিলে লোকে রঙ্গালয়কে ঘৃণা করিবেন, মন্দ কল্পনা-প্রভাবে সেই কথাই সৃষ্টি করেন। আমরাও 'রঙ্গালয়' হইতে তাঁহাদের প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিব।

সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই আমাদের সর্ব্বদা স্নেহ করেন—আশীর্ব্বাদ করেন—উপদেশ প্রদান করেন,—আমরাও তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞ, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ও উপদেশ আদরে মস্তকে ধারণ করি। যে সকল ব্যক্তি রঙ্গালয়ের প্রতিপালনের নিমিত্ত অনুকম্পা প্রদর্শনে রঙ্গালয়ে পদার্পণ করেন, তাঁহাদের আমরা সেবক। যথা-সাধ্য তাঁহাদের প্রতি-সাধনে আমরা চির যত্নবান্।

যাঁহাদের উৎসাহে, যত্নে ও আয়াসে বঙ্গবাসী রঙ্গালয় প্রথম দেখিয়াছিল; রাজপদে ও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও যাঁহারা অভিনয়-শিক্ষা দিয়াছিলেন, নব বঙ্গভাষার পুষ্টি-সাধনে নাটক সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাঁহারা আমাদের পথ-প্রদর্শক ও গুরু, গুরু-দক্ষিণাস্বরূপ আমরা তাঁহাদের পদে প্রণাম করি। আমাদের দৃষ্টিতে তাঁহারা দেবস্থানীয় ও পরম পূজ্য। আমরা তাঁহাদের দাসানুদাস। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বর্গগত হইলেও আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন, এই আমাদের ধারণা। সর্ব্বদাই তাঁহাদের স্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে।

রাজার প্রতি আমাদের পরম শ্রদ্ধা। বাল্য রঙ্গালয়—সকল দেশেই হতাদৃত হইয়া থাকে,—আমাদেরও সেই দুর্ভাগ্য, কিন্তু নিরপেক্ষ রাজার প্রভাবে আমাদের বিশেষ ক্ষতি করিতে কেহই সম্পূর্ণ সাহসী হন না। রাজদ্বারে আমাদের কার্য্য ব্যবসা বলিয়া গণ্য,—জঘন্য ব্যবসা নয়—অনেক রাজপুরুষ আমাদের উৎসাহ প্রদানার্থ আয়াস স্বীকারে রঙ্গালয়ে উপস্থিত হন ও মিষ্ট সম্ভাষণে আমাদের হৃদয় প্রফুল্লিত করেন। কৃতজ্ঞতা-সহকারে যদি কখনও কোন উপহার দিই, তাহা যত্নে গ্রহণ করিয়া আমাদের সম্মানিত করেন।

সাধুর প্রতি আমাদের অচলা ভক্তি। সাধু সন্ন্যাসী সদা সর্ব্বদা আমাদের রঙ্গালয়ে আসিয়া উপস্থিত হন। ঘৃণিতা অভিনেত্রীকেও পদধূলি দেন, দক্ষতার প্রশংসা করেন, ধর্ম্মমূলক পুস্তকের অভিনয় দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করেন—ভাব দশাপন্ন হন,—তাঁহাদের ভক্তগণকে অভিনয় দেখিতে উপদেশ দেন। কেহ ঘৃণা করিয়া আমাদের প্রতি কুবচন নিক্ষেপ করিলে, তাঁহাদের বুঝান ও যাহাতে আমাদের ধর্ম্মোন্নতি হয়, তাহা সর্ব্বদাই কামনা করেন।

আমরা তাঁহাদের চরণে শত শত প্রণাম করিয়া রঙ্গালয়-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমাদের আত্মকথা সংক্ষেপে বলিলাম। ক্রমে কার্য্যে আমাদের আরও পরিচয় পাইবেন। পরিশেষে বক্তব্য—আমরা নিরপেক্ষ, কাহারও তোষামোদ বা কাহারও প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিব না। মনে জানে যাহা সত্য জানি,—সত্যের দাস হইয়া তাহা প্রচার করিব। বলা বাহুল্য—আমরা সাধারণের উৎসাহ-প্রার্থী। *

১৭ই ফাল্গুন, ১৩০৭

* 'রঙ্গালয়' নামক সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম সংখ্যায় সর্ব্বপ্রথমেই মহাকবির এই লেখাটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

'মৃণালিনী'র একটি দৃশ্য

পশুপতি। রাজ্যনাশ, কারাবাস—কর্ম্মদোষে আমার সকলই উপস্থিত। কিন্তু আমি কেমন করে মনোরমাকে বিস্মৃত হব? মনোরমা, তোমার জন্য সব, তোমার কথা না শুনে আমি সব হারালুম। কিন্তু তোমা হারা হয়ে কি পশুপতি জীবন ধারণ করতে পারে? কে বলে, পৃথিবী দুঃখময়? পৃথিবীতে এমন কি দুঃখ আছে যে, পশুপতিকে পীড়িত করতে পারে? নরক-যন্ত্রণা, উদয় হও! পশুপতির পাপের শাস্তি বিধান কর। নরকে কি এরূপ শাস্তি আছে—পশুপতির উপযুক্ত শাস্তি কি নরকে আছে? আমার অন্তঃকরণ অপেক্ষা কি নরক ভীষণ?—শত শত নরক একত্রিত করো—আমার অন্তঃকরণের নিকট তারা পরাস্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন-শোণিতে চরণ প্রক্ষালন করেছি, তথাপি কি পশুপতির হৃদয়ে স্নেহের উদয় হয়! স্নেহ, তুমি বৃক্ষ-শাখা অবলম্বন করো, পাষাণে বাস করো—পশুপতির হৃদয়ে তোমার স্থান নাই।

(মহম্মদ আলীর প্রবেশ)

মুসলমান, আবার তুমি কি প্রিয় সম্ভাষণ করতে এসেছ? একবার তোমার প্রিয় সম্ভাষণে বিশ্বাস করে এই অবস্থাপন্ন হয়েছি, বিধর্ম্মীকে বিশ্বাস করবার প্রতিফল পেয়েছি,—এখন আমার মৃত্যু সঙ্কল্প—আর তোমাদের কোন প্রিয় সম্ভাষণ শুনবো না।

[তাহার পর পশুপতিকে মুসলমান-পরিচ্ছদ পরাইয়া যে সময়ে মহম্মদআলী ও মুসলমান সৈন্যগণ রাজপথ দিয়া চলিয়াছে সেই সময়ে বিকৃতমস্তিষ্ক পশুপতি বলিতেছেন]:—

পশুপতি। আকাশ আমার চন্দ্রাতপ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—রাজা জন্মেজয়ের মত আমার চন্দ্রাতপ কৃষ্ণবর্ণ হওয়া উচিত। মহাভারত-শ্রবণে তাঁর চন্দ্রাতপ শ্বেতবর্ণ হ'য়েছিল, আমার চন্দ্রাতপ কৃষ্ণবর্ণই থাকবে। শত মহাভারত-শ্রবণে শ্বেতবর্ণ হবে না।

মহম্মদ আলী। আপনি পাগলের মত কি বল্‌ছেন? যা হবার হ'য়ে গিয়েছে, দুঃখ করলে আর ফিরবে না।

পশুপতি। মন্ত্রিবর, বল দেখি—পা রাখি কোথায়? এই দেখ, ভ্রাতৃবর্গের শোণিতাক্ত চরণের ভার মেদিনী আর বহন করতে পার্চ্ছে না। মেদিনীরই বা অপরাধ কি?—চারি যুগ হ'তে মনুষ্যের বাস—এখন বৃদ্ধ হ'য়েছেন, আর বহন করতে অসমর্থ।

১ম সৈন্য। একি পাগল হ'ল নাকি?

পশুপতি। লক্ষ্মণ সেন, তুমি বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য। তোমাকে পদচ্যুত করায় আমার পাপ নাই। তিরস্কার করবে?—করো—সহ্য করবো। পশুপতির হৃদয়ে সব সয়,—পশুপতির হৃদয়ে অসহ্যও সহ্য হয়।

২য় সৈন্য। হা হতভাগ্য!

পশুপতি। মহারাজ! মহারাজ কে?—মহারাজ তো আমি! লক্ষ্মণ সেন, তোমার মুখকান্তি মলিন কেন? এতে কি আমার দয়ার উদ্রেক হয়? তোমার ন্যায় শত শত ব্যক্তির ছিন্ন মস্তক পদতলে দলিত করে সিংহাসন আরোহণ করতে পশুপতির হৃদয় কুণ্ঠিত হয় না। এই দেখ, চরণ দেখ—জানু পর্য্যন্ত শোণিত দেখ,—রাজপথে দেখে এস—শোণিত-স্রোত ভাগীরথীতে গিয়ে পড়ছে!

মহম্মদ। এই দুর্ভাগাকে কি ক'রে নিয়ে যাই?

পশুপতি। মন্ত্রিবর, ওঁকে ডাকো। লক্ষ্মণ সেন ফেরো—

কেরো—উপায় নাই, উপায় থাকলে কিরতাম। আমার মস্তক দিলে যদি উপায় হয়, এই দণ্ডেই দিতে প্রস্তুত আছি।

মহম্মদ। (স্বগত) কি করি! 'রাজা' বলে সম্বোধন করে দেখি, যদি আমার সঙ্গে আসে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, চলুন—নৌকা প্রস্তুত।

পশুপতি। কে ডাকে—কাকে ডাকে ?

মহম্মদ। আসুন, নৌকা প্রস্তুত।

পশুপতি। মন্ত্রিবর, বিশ্বকর্ম্মা আমার সিংহাসন আনচে। দেখ—দেখ—যম কেমন পুরোহিত—সেই আমার অভিষেক করবে। দেখ, মস্তকশূন্য প্রজাগণ কেমন আহ্লাদে নৃত্য কচ্চে! ছত্রধারী, ছত্র ধর। মনোরমা—মনোরমা—আহা সিংহাসনের বাম পার্শ্বে মনোরমা—কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ ক'রেছে।

১ম সৈন্য। বোধ হয় আমাদের কথায় বিশ্বাস কর্চ্ছে না।

মহম্মদ। (স্বগত) না, আমার কথায় বিশ্বাস করেই এর এই দশা হয়েছে। (প্রকাশ্যে) আমার কথা বিশ্বাস করুন, আপনার প্রাণরক্ষার জন্য নৌকা প্রস্তুত, চলুন।

পশুপতি। বিশ্বাস—কাকে বিশ্বাস ? জগতে কে বিশ্বাসের যোগ্য ? লক্ষ্মণ সেন আমাকে বিশ্বাস করেছিল,—পশুপতি কাকেও বিশ্বাস করে না।

মহম্মদ। মহাশয়, আপনি আপন অবস্থা ভুলে যাচ্চেন।

পশুপতি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—তুই কে ?—মুসলমান। রক্ষক, একে বধ করো। হাঃ হাঃ হাঃ—ঐ যে আমার সিংহাসন আসছে,—দেখ দেখ—সিংহাসন আমাকে ডাকছে।

মহম্মদ। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) এ কি!—পশুপতির গৃহে কে অগ্নি দিলে ? বোধ হয়—সৈন্যরা লুট করতে করতে অগ্নি দিয়েছে।

পশুপতি। মন্ত্রিবর, প্রজারা এদিকে আসছে কেন ? তাদের বলো—আজ অভিষেক নয়—অধিবাস। মনোরমা কোথায় ? মনোরমা যে আমার সঙ্গে অধিবাস করবে। মনোরমা কোথায় গেল ? এঁ্যা কোথায় গেল ? আমার গৃহে আছে। (গমনোদ্যোগ)

মহম্মদ। (পশুপতিকে ধরিয়া) তোমার গৃহ কোথায় ? ঐ দেখ, সৈন্যেরা তোমার গৃহে আগুন দিয়েছে।

পশুপতি। (সচকিতে) মনোরমা যে গৃহে আছে। ছাড়ো—ছাড়ো—(মহম্মদের ইঙ্গিতে সৈন্যদ্বয়ের পশুপতির উভয় হস্ত ধারণ)

মহম্মদ। তুমি বন্দী, তোমাকে কারাগারে নিয়ে যাব।

পশুপতি। এঁ্যা বন্দী! স্থির হও, ছাড়ো—আমি যাচ্ছি। জীবন স্বপ্নের ন্যায় স্মরণ হ'চ্ছে। ছেড়ে দাও—ছেড়ে

মহম্মদ। বোধ হয় জ্ঞান হ'য়েছে!

পশুপতি। (অদূরে স্বীয় ভবন দর্শন করিয়া) ঐ কি আমার গৃহ ?

মহম্মদ। হঁ্যা—তোমার গৃহ।

পশুপতি। হঁ্যা, আমারই গৃহ বটে! আগুন দিয়েছে। (সহসা উন্মত্তাবস্থায়) মনোরমা যে গৃহে আছে, ছাড়ো—ছাড়ো—

(সবলে হাত ছাড়াইয়া ধাবিত হইলেন)

'কপালকুণ্ডলা'র একটি দৃশ্য

বন—অদূরে কুটীর

কাপালিক আসীন

কাপালিক। মা ভৈরবী, বহুদিন নর-শোণিতে তোমাকে তৃপ্ত করতে পারিনি, সন্তানের অপরাধ নিও না মা!

(কাষ্ঠের হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করণ)

(অদূরে নবকুমারের প্রবেশ)

নব। শরীর অবসন্ন, আর তো পা চলে না! গাঢ় অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আবৃত এখনো যে ব্যাঘ্রের হস্তে পতিত কেন হই নি, বুঝতে পারছি না! প্রাণ স্থির হ'চ্চে না; উপত্যকা, অধিত্যকা, বালুকাস্তূপ-শিখর ভ্রমণ করলাম, কোথাও তো নরচিহ্নও নাই। কি করি, আর তো উপায় নাই। গ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, লোক নাই, আহার্য্য নাই,—নদীর জল পান করবো, তারও উপায় নাই—অতিশয় লবণাক্ত। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, দুরন্ত মাঘের শীতে আশ্রয় নাই, গাত্রবস্ত্র পর্য্যন্ত নাই। এ তুষার-শীতল বায়ু-সঞ্চারিত নদীতীরে, হিমবর্ষী আকাশতলে, নিরাশ্রয়ে, নিরাবরণে, গৃহের সুখ-শয্যায়

পরিবর্ত্তে আজ এই বালুকা-শয্যায় শয়ন ক'রে থাকতে হবে। প্রাণনাশ নিশ্চিত। ঐ না একটা আলোক দেখা যাচ্ছে—এ কি ভ্রম? আলোক তো ক্রমে বর্দ্ধিতায়তন উজ্জ্বলতর দেখছি—আগ্নেয় আলোক নিশ্চয়ই। অবশ্যই মনুষ্য-সমাগম আছে—এ সময় তো দাবানল হয় না? এ কি ভৌতিক আলো? শঙ্কায় নিরস্ত থাকলেই কোন্ জীবন রক্ষা হবে?—যাই হোক, দেখি!

(কাপালিকের কালীর স্তব-গান)

বিষমোজ্জ্বল-জ্বালা-বিভাষিত কপাল
খল খল করাল হাসিনী।
সদ্যচ্ছেদন নরমুণ্ড শোভিত কর
ঘোর গভীর কাদম্বিনী-বরণী
ভীমা ভুবনত্রাসিনী॥
অতি বিশাল বদনমণ্ডল
লক্ লক্ রুধির-লোলুপ রসনা,
রুধির-ধার-স্রুত-বিপুলদশনা
অস্থি-চর্ম্ম-সার কঙ্কাল-হার-
বিভূষিত দিবগ্‌সনা ব্যোমগ্রাসিনী॥
অতি-ক্ষীণ-কটি-বেষ্টিত-নর-কর-কিঙ্কিনী
মহাকাল-কামিনী,
উৎকট-আসব-পানমগনা,
রক্তনয়না শবাসনা বিভীষণা,
নিবিড়-মেঘজাল-লটপট-কেশী, নরমাংসাশী
শ্মশানমর্দ্দিনী, টল টল মেদিনী,
ভয়ঙ্করী ভীষণ-শ্মশানবাসনী॥

নবকুমার। (নিকটস্থ হইয়া) কে এ জটাজূটধারী? কোথা হ'তে দুর্গন্ধ আসছে? এই যে ছিন্ন-শীর্ষ গলিত শবের উপর যোগী উপবিষ্ট। নর-কঙ্কালে রক্তবর্ণ ও কি? ও কি আসব? চতুর্দ্দিকে অস্থিমালা—এ কি শ্মশান-ভূমি? এ যে দেখছি নরঘাতী কাপালিক! এর আশ্রয়ে কি জীবন রক্ষা হবে? নিরুপায়—উপায়ান্তর নাই। কাপালিকও মনুষ্য, যদি দয়া ক'রে প্রাণদান দেয়। কিম্বা কোন মহাপুরুষ হ'লেও হতে পারে। সকলেই যে নরঘাতী, তা নয়। জলমগ্ন ব্যক্তি তৃণ ধারণ করে। এ বিপদ-সাগরে আমার আর গত্যন্তর কি?

কাপালিক। কস্ত্বং?

নব। মহাশয় আমি ব্রাহ্মণ, গঙ্গাসাগরে এসেছিলেম। কাষ্ঠ আহরণ নিমিত্ত বনে প্রবেশ করি। কাষ্ঠ ল'য়ে কূলে ফিরে এসে দেখি—কূল প্লাবিত, যে নৌকায় এসেছিলাম, তার চিহ্নও নাই! নৌকা জলমগ্ন হয়েছে কি না, তার ঠিকানা নাই। এই নির্জ্জন বন-মধ্যে আমি একা পতিত,—মহাশয়ের শরণাগত।

কাপা। তিষ্ঠ।

নব। মহাশয়, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। কোথায় আশ্রয় পাব, কোথায় আহার্য্যসামগ্রী পাব—অনুমতি করুন।

কাপা। মামনুসর। ভৈরবীপ্রেরিতোঽসি, পরিতোষস্তে ভবিষ্যতি। অদূরে ঐ কুটীর-মধ্যে বিশ্রাম কর। ফল-মূল যাহা আছে, ভোজন ক'রো। কলসীতে জল আছে, পর্ণপত্র রচনা ক'রে পান ক'রো। ব্যাঘ্রচর্ম্ম আছে, অভিরুচি হ'লে শয়ন ক'রো। নির্ব্বিঘ্নে তিষ্ঠ—ব্যাঘ্রের ভয় ক'রো না। সময়ান্তরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। যে-পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ না হয়, সে পর্য্যন্ত কুটীর ত্যাগ ক'রো না।

কাপা। নিশা অবসানপ্রায়। কল্য অমাবস্যা।—মা, ত্বৎপ্রেরিত বলি দ্বারা তোমার তৃপ্তিসাধন করবো। ভৈরবী, মা, আমার প্রতি তোমার অপার করুণা।

[প্রস্থান]

পট পরিবর্ত্তন

সমুদ্রতট—বালিয়াড়ি সম্মুখস্থ শ্মশানভূমি।

নবকুমার।

নব। প্রাণ ক্ষুধায় আকুল; কুটীরের অল্প ফল-মূলে ক্ষুধা-নিবারণ হয় নি। ফল অন্বেষণে এসে তো পথহারা হয়েছি, কোন্ পথে কুটীর তাও দেখতে পাচ্ছি নি। কি উপায়ে দেশে যাব? সন্ন্যাসী নিশ্চয় কাপালিক, এর নিকটে থাকা কোনরূপে কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু পথহীন বন হ'তে কিরূপে নিষ্ক্রান্ত হব? কাপালিক অবশ্য পথ জানে। জিজ্ঞাসা করলে কি বলে দেবে? আমায় কুটীর ত্যাগ করতে নিষেধ করেছে; অবাধ্য হ'য়েছি—রোষান্বিত হবে। শুনেছি, এরা মন্ত্রবলে অসাধ্য সাধন করতে পারে, এর অবাধ্য হওয়া উচিত নয়। দেখছি—সমূহ বিপদ।

(কপালকুণ্ডলার প্রবেশ)

নব। এ কি অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি!

কপাল। পথিক, তুমি কি পথ হারিয়েছ?

নব। (স্বগত) এ কি মধুর ধ্বনি! এ কি সঙ্গীত-প্রবাহ! আমার হৃদয়-তন্ত্রী এক তানে বেজে উঠেছে। এ কি দেবী, মানুষী, না কাপালিকের মায়া? শ্যামলা, কানন-কুন্তলা ধরণী যেমন শোভাময়ী, অবেণীসংবদ্ধ সংসর্পিত কেশভাররাশি জড়িত কৌমুদীগঠিত প্রতিমা সেই রূপ মনোমোহিনী! সাগর-বক্ষে যেমন ফেনিল তরঙ্গরাশি আন্দোলিত,—লাবণ্যময়ী রমণীর সুবর্ণদেহ সেইরূপ নব নব মোহিনী তরঙ্গে তরঙ্গিত! গভীরনাদী নীল সলিলে, রবি-কিরণে যেরূপ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় শোভা,—কেশদামাবৃত রমণীদেহে দ্রবীভূত সুবর্ণ তরঙ্গে মনমোহিনী ছটা তদপেক্ষা শতগুণে হৃদয় মুগ্ধকর। মরি, মরি, কি মধুর ধ্বনি!

কপাল। পথিক, তুমি কি পথ হারিয়েছ?

নব। আ মরি—সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী—রমণী সুন্দরী; সুন্দর ধ্বনি হৃদয়-তন্ত্রী-মধ্যে প্রতিধ্বনিত!

কপাল। এস। [প্রস্থান]

(কাপালিকের প্রবেশ)

কাপা। তুমি কি নিমিত্ত কুটীর ত্যাগ করেছিলে?

নব। আহার অনুসন্ধানে।

কাপালিক। যদি ফল ভোজনে তৃপ্ত না হ'য়ে থাক, কুটীর-মধ্যে প্রবেশ করে দেখ, তণ্ডুলাদি সমস্তই আছে। তুমি আহারাদি সমাপ্ত কর। শীঘ্রই আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করবো। [নবকুমারের প্রস্থান]

কাপা। এ অতি সুলক্ষণ বলি। বোধ হয় অদ্যই মা ভৈরবী আমায় কৃপা করবেন। অদ্য পঞ্চ মকারে, সাধন সমাপ্ত করবো। মদ্যপান, মৎস্য, মাংস সুচারু মুদ্রাদি প্রসাদ গ্রহণ,—পঞ্চম কার্য্যে কুমারী। কপালকুণ্ডলা পিতা ব'লে সম্বোধন করে; কিন্তু নারীমাত্রেই ভৈরবী, পুরুষ-মাত্রেই ভৈরব। মাতৃযোনি পরিত্যাগ ক'রে সকল যোনিতেই তান্ত্রিক পরিভ্রমণ করবে। পশ্বাচারী মূঢ় ব্যক্তির এ ভাব কিরূপে উপলব্ধি হবে? মা ভৈরবি, তোমার কৃপায় আমার এ উপলব্ধি হ'য়েছে। সামান্য ব্যক্তির কিরূপে এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হবে? তন্ত্রের গুহ্য বচন—

"পঞ্চমে পঞ্চমং কৃত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।"

আজ ঘোর শ্মশানভূমে কপালকুণ্ডলা ভৈরবী, আর শিবোঽহং—ভৈরবোঽহং! আজ ভৈরবত্ব প্রাপ্ত হব। মা ভবানী আজ মনোবাসনা পূর্ণ করবেন।

[কাপালিকের প্রস্থান

(নবকুমারের পুনঃ প্রবেশ)

নব। মায়াবিনী কি আর আমায় দেখা দেবে? নিশ্চয়ই মায়া! মায়ামূর্ত্তি কি আর আমার দৃষ্টিপথে পতিত হবে? হতাশ হৃদয়ে আশারূপ কৌমুদী-গঠিত দেবীমূর্ত্তি আর কি দেখতে পাব? কোথায় অন্বেষণ করব? বনদেবীর আর কোথায় দেখা পাব? গভীরনাদী সমুদ্রতটে ক্ষীণ সন্ধ্যালোকে আগুল্ফ-লম্বিত নিবিড় কেশধারিণী বনদেবী মূর্ত্তি! মরি মরি! এ মূর্ত্তি কি কখন কারও অদৃষ্টে দর্শনলাভ হয়েছে? শুষ্কপত্র পতনে যেন সেই ধীর পদবিক্ষেপ অনুভব হচ্ছে। পত্র-মর্ম্মরে, বিহঙ্গ-সঙ্গীতে "পথিক তুমি কি পথ হারিয়েছ"—যেন আমার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে! কোথায় আর দেখা পাব? নিশ্চয় মায়া-সৃজিত মূর্ত্তি, ধ্যান-সৃজিত-মূর্ত্তি—আমার অদৃষ্টে আর দর্শন নাই।

(কাপালিকের পুনঃ প্রবেশ)

নব। প্রভু, এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? কি নিমিত্ত আপনার দর্শনে বঞ্চিত ছিলাম?

কাপা। নিজ ব্রতে।

নব। প্রভু, এ দুর্গম শ্বাপদসঙ্কুল বনে আপনি আশ্রয়দাতা; আপনার কৃপায় জীবন রক্ষা হ'য়েছে। এক্ষণে যাতে প্রত্যাগমন করতে পারি, তার উপায় বিধান করুন। পথ অবগত নই, পাথেয় নাই—প্রভু বিহিত বিধান করুন। আপনার কৃপায় বিপদ-সাগর হ'তে মুক্ত হব—এই ভরসা রাখি।

কাপা। আমার সঙ্গে আগমন কর। [কাপালিকের প্রস্থান

নব। (স্বগত) বোধ হয় আমায় পথ দেখিয়ে দেবে। আহা সে দেবীমূর্ত্তির আর দর্শন পাব না!

(কপালকুণ্ডলার প্রবেশ ও নবকুমারের পৃষ্ঠে হস্তস্পর্শ)

মরি, মরি, আবার সেই মায়া-গঠিত মূর্ত্তি! আমার আশা সফল হ'ল—আবার দেবী-দর্শন পেলেম। দেবী কথা কইতে নিষেধ কচ্চেন, অনিমিষ লোচনে দেখি।

কপাল। কোথা যাচ্ছ? যেও না! ফিরে যাও—পালাও।

[ভূপতিত বলির খড়্গ লইয়া কপালকুণ্ডলার প্রস্থান]

নব। আবার রমণী অন্তর্হিতা হলো। এ কার মায়া? আমার কি ভ্রম হচ্ছে? তান্ত্রিকেরা সকলই করতে পারে। পালাব কি? কাল রক্ষা পেয়েছি, আজও রক্ষা পাব। কাপালিক মনুষ্য বই আর দৈত্য নয়, তবে আর ভয় কি?

(কাপালিকের পুনঃ প্রবেশ)

কাপা। বিলম্ব কচ্ছ কেন?

(কাপালিকের সহিত নবকুমারের প্রস্থানোদ্যম, এমন

সময়ে পশ্চাৎ দিক হইতে কপালকুণ্ডলা পুনঃ প্রবেশ করিয়া নবকুমারের কাণে কাণে বলিল)

কপাল। এখনও পালাও। নরমাংস না হলে কাপালিকের পূজা হয় না, তা কি তুমি জান না?

কাপা। কপালকুণ্ডলে!

নব। (স্বগত) মেঘগর্জ্জনবৎ কি ভীষণ ধ্বনি!

(কাপালিক কর্তৃক নবকুমারের হস্তধারণ)

(স্বগত) নরঘাতি হস্তস্পর্শে আমার ধমনীতে শোণিত-প্রবাহ স্তম্ভিত হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) হস্ত ত্যাগ করুন। আমায় কোথায় লয়ে যাচ্ছেন?

কাপা। পূজার স্থানে।

নব। পূজার স্থান কোথায়?

(দৃঢ়হস্তে নবকুমারকে ধরিয়া কাপালিকের গীত)

নর-রুধির-তৃষাতুর নেহার ভূমি দূরে।
শত শিবানাদিনী, ভৈরবী সঙ্গিনী,
শিবানী-শ্রেণী 'কে' রবে ভুবন পূরে।
নরশির চূর্ণ কত গৃধিনী-চঞ্চু-বলে,
উন্নত তরুশির প্রভঞ্জন দলে,
ঘন-ঘন ঘোর গভীর রোলে,
যথা ভৈরব করতালে গায় বিকট সুরে॥
দাবানল-বলে, প্রবল বহ্নি জ্বলে,
ঘন ঘনাকারে ধূম গগন-মণ্ডলে,
হীনজ্যোতি শশধর-তারকা,—
অস্থি-গ্রন্থি কত শোভে মেদিনী-উরে।

নব। আমায় পূজার স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?

কাপা। বধার্থে।

নব। (হস্ত টানিয়া লইবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া স্বগত) এ কি! বৃদ্ধ বয়সেও কাপালিকের দেহে শত হস্তীর বল! আমার হস্তের অস্থি চূর্ণ হয়ে গেল। যে বলে হস্ত আকর্ষণ করেছি, সামান্য লোক হ'লে মাটিতে পড়ে যেত—কাপালিক টল্‌লো না। বলের দ্বারা এর হাত হ'তে উদ্ধারের উপায় নাই; কৌশলের প্রয়োজন, দেখা যাক কি হয়। এই তো তান্ত্রিক পূজার আয়োজন সমস্তই রয়েছে। নরকপালপূর্ণ আসব রয়েছে; কিন্তু কালকের সে গলিত শব নাই। বোধ হয় আমাকেই শব হতে হবে।

(কাপালিক নবকুমারকে বন্ধন করিবার উদ্যোগ করায় নবকুমারের বল প্রকাশ)

অসুরের বল ধারণ করে।

কাপা। মূর্খ, কি জন্য বলপ্রকাশ কর? তোমার জন্ম আজ সার্থক হ'ল। ভৈরবীর পূজায় আজ তোমার মাংসপিণ্ড অর্পিত হবে, এ হ'তে তোমার তুল্য লোকের আর কি সৌভাগ্য হ'তে পারে?

(নবকুমারকে দৃঢ় বন্ধন)

নব। মৃত্যু আসন্ন! আর জন্মভূমিতে ফিরে যাব না। মা, তোমার স্নেহময় মুখ আর দেখতে পাব না! ইষ্টদেব, অন্তিমকালে চরণে আশ্রয় দিও।

কাপা। পূজা সমাপ্ত, এক্ষণে খড়্গের প্রয়োজন! এই তো এই স্থানে অপরাহ্নে খড়্গ এনে রেখেছিলেম, তবে খড়্গ কোথা গেল? কই, স্থানান্তরিত তো করি নাই। কপালকুণ্ডলে, কপালকুণ্ডলে, কপালকুণ্ডলে!—দুর্ব্বিনীতা, দুশ্চারিণী কি আমার সঙ্গে প্রতারণা করলে? খড়্গ কি কুটীরে নিয়ে গেল? কখনো তাড়না করি নাই—তার কি এই প্রতিফল! কলির ব্রাহ্মণকন্যা কত ভাল হবে, তার আর কতদূর ধর্ম্মে মতি সম্ভব!

[খড়্গান্বেষণে কাপালিকের প্রস্থান]

নব। দৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করিবার কোন উপায় নাই। মৃত্যু নিশ্চিত, কেবল খড়্গ আনবার অপেক্ষা। এখনই স্পন্দহীন শব হব। আকাশের শোভা, চন্দ্র-নক্ষত্রের শোভা, তরুলতার শোভা আর নয়নপথে পতিত হবে না! আর সূর্য্যের আলোকে মা'র প্রফুল্ল মূর্ত্তি দেখতে পাব না—আর মা বলবো না—অভাগিনী—সন্তানহারা—পাগলিনী হবে! আর স্নেহময়ী ভগ্নী শ্যামাসুন্দরী 'দাদা' ব'লে কাছে আসবে না; শ্যামলা কুসুমকুন্তলা মেদিনী, ত্বরায় তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করবো। সপ্তগ্রাম, এইখানে তোমার নিকট বিদায় নিই। মা, উদ্দেশে সন্তানের প্রণাম গ্রহণ কর। ফুরাল—এত দিনে জীবন-লীলা সমাপ্ত হ'ল! (সচকিত হইয়া) এ কি! কার কোমল পদধ্বনি! এ তো কাপালিকের নয়।

(খড়্গ-হস্তে কপালকুণ্ডলার পুনঃ প্রবেশ)

এই যে—আবার সেই মোহিনী মূর্ত্তি! খড়্গধারিণী কেন?

কপাল। চুপ, কথা ক'ও না। আমি খড়্গ চুরি করেছিলুম, তাই তুমি রক্ষা পেয়েছ।

(খড়্গ দিয়া নবকুমারের বন্ধন মোচন)

পালাও, পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান]

(কাপালিকের পুনঃপ্রবেশ)

কাপা। কপালকুণ্ডলে!—বুঝেছি, তুই-ই আমার পূজায় ব্যাঘাত দিলি, তুই-ই খড়্গ অপহরণ করেছিস্—এর প্রতিফল পাবি। এ কি—বলির নর পলায়ন করেছে, —এও কপালকুণ্ডলার কার্য্য। দেখি কোথায় গেল —উপযুক্ত প্রতিফল দেব। [প্রস্থান]

মেয়ে (গল্প)

তিন বৎসরের বালিকা মমতাময়ীর প্রতি সকল মমতার ভার আমার উপর চাপাইয়া শরৎশশী যেদিন হঠাৎ ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইল, সেদিন প্রথমে বিশ্বাসই করিতে পারিলাম না যে সত্য সত্যই সে আমাদিগকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়াছে। ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, শূন্য গৃহ ততই ভীষণ হইয়া উঠিতে লাগিল। "মা যাব, মা যাব" করিয়া ননীর পুতলী মমতাময়ী শুকাইতে আরম্ভ করিল। এমন সময় হঠাৎ একদিন মর্ম্মস্থল পরীক্ষা করিয়া দেখি— বৃথা এতদিন পাড়া-প্রতিবাসীর বিস্ময়-জড়িত 'শোকজয়ী', 'ধৈর্য্যের অবতার' প্রভৃতি প্রশংসাধ্বনি শুনিয়া আসিতেছিলাম—অন্তঃস্থল নীরবে বেশ পুড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলে সাময়িক একটা সুখ হইত, যেন সেই সময় বুকটা একটু হাল্কা হইয়া যাইত। পূর্ব্বে ইহার অর্থ বুঝিতে পারিতাম না। এখন কারণ-অনুসন্ধানে আপনা-আপনি চমকাইয়া উঠিলাম। পূর্ব্বে গান শুনিয়াছিলাম— "পোড়া মন পোড়ে, কেউ দেখে না।" তখন ভাবিতাম, গান না গান! এখন সে গানের অর্থ হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিলাম। মনে মনে গান-রচয়িতাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। ভাবিলাম, কবি বোধ হয় আমারই মতন ধৈর্য্যের বাহ্যিক আবরণ দিয়া বাহিরে শোক-বিজয়ী নিশান তুলিয়াছিলেন, কিন্তু হৃদয়ের অন্তঃস্থল-নিহিত শোকাগ্নের গিরি জমিতে জমিতে একদিন উচ্ছ্বসিত হইয়া জগৎকে বলিয়া ফেলিয়াছে, "পোড়া মন পোড়ে, কেউ দেখে না।"

কালীপূজা আসিতেছে, আমাদের বাড়ীর সম্মুখেই আমাদের প্রতিবাসী আত্মীয়ের বাড়ীতে কালীপূজা হইবে। কুমারে প্রতিমার গঠন-কার্য্য শেষ করিয়া আনিয়াছে, কেবল রং দিতে বাকী, খড় মাটি হইয়াছে। সে সময় তথায় কেহ ছিল না। মাতৃহারা মমতা গিয়া প্রতিমাকে জড়াইয়া ধরিয়া জগন্মাতার স্তন পান করিতেছিল। ঠান্‌দিদি দেখিতে পাইয়া মমতাকে ধরিয়া আমাদের বাটীতে আনিলেন। দেখিলাম "মাই খাব, মাই খাব" বলিয়া মমতা কাঁদিতেছে। চোখের জল সামলাইতে পারিলাম না, তাড়াতাড়ি ঠান্‌দিদির নিকট হইতে মমতাকে টানিয়া লইয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলাম। পৃষ্ঠে মৃদু মৃদু স্নেহের আঘাত করিতে লাগিলাম। ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে, থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ক্রমে মমতা ঘুমাইয়া পড়িল।

বাড়ীতে বৃদ্ধা পিসীমা ছাড়া আর কেহ ছিলেন না। তিনিও রুগ্না। আমি সওদাগরি আফিসে পঞ্চাশ টাকা মাহিনায় একটি কার্য্য করি। বেলা ৯টার সময় বাহির হইয়া সন্ধ্যার পর বাটীতে ফিরি। দাস-দাসীর মধ্যে বাটীতে একটি মাত্র পরিচারিকা। আমি প্রাতে মমতাকে লইয়া থাকিতাম; পিসীমা সে সময়ে রন্ধন কার্য্যে এবং ঝি বাসন মাজা, বাজার করা ইত্যাদি সংসার-কার্য্যে ব্যস্ত থাকিত। অনেক সময় মনে হইত, মমতার নিমিত্ত স্বতন্ত্র একটি পরিচারিকা নিযুক্ত করি, কিন্তু অবস্থার কুলাইত না। একদিন অপরাহ্নে আমি তখন আফিসে—পিসীমার প্রবল জ্বর আসায় অজ্ঞানপ্রায় হইয়া শুইয়া আছেন। পরিচারিকা সময়ে শিকল দিয়া দোকানে গিয়াছিল। এমন সময়ে মমতা পিসীমার নিকট হইতে উঠিয়া কলতলায় আসিয়া খোলাজল পাইয়া খুব জল ঘাঁটিয়াছে। সেইদিন রাত্রে দেখি, মমতার গা একটু গরম হইয়াছে, প্রাতে সে সর্দ্দিতে হাঁসফাঁস করিতেছে। পীড়ার কারণ জ্ঞাত হইয়া পাড়ার এক হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের নিকট হইতে ঔষধ আনাইয়া তাহাকে খাওয়াইলাম। বস্তুতঃ মমতার নিমিত্ত বড়ই ভাবনায় পড়িলাম। অসহায় শিশুর সমস্ত ভার আমার উপর অর্পণ করিয়া তাহার অভাগিনী মাতা নিশ্চিন্ত হইয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু কৈ, আমি তো তাহার নিকট প্রতিশ্রুতির সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিতেছি না? একবার ভাবিলাম, অফিসের কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া মমতাকে দিনরাত চোখে চোখে বুকে বুকে রাখি। আবার ভাবিলাম, পৈত্রিক সম্পত্তি এমন কি আছে যে ঘরে বসিয়া সংসার চলিবে? মাঝে মাঝে খেলিতে খেলিতে হঠাৎ খেলা ফেলিয়া মমতা আসিয়া যখন আমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িত এবং তাহার ছোট দুইটি হাতে আমার মাথা ধরিয়া আমাকে চুমা দিত, তখন বলিতে কি আমার আত্মসম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। দেখিতাম, তাহার চোখের কোন্ একটু বসা, বুকের হাড় যেন দেখা যাইতেছে, যেন ঠিকমত যত্নের অভাবে ফুলটি ভাল করিয়া ফুটিতে পারিতেছে না। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকিতাম। বলিতাম, "হে অসহায়ের সহায়, এই অসহায়ের এই একমাত্র সম্বলটিকে রক্ষা কর প্রভু!"

একদিন দেখি যে, আর্ত্তের এই কাতর প্রার্থনা ভগবানের চরণে পঁহুছিয়াছে। বহুকাল পরে আমার ভগ্নী আসিয়া উপস্থিত। আমার ভগ্নীপতি কাশীধামে ব্যবসা করিতেন, তথায় বাড়ী করিয়াছেন। দেশে কয়েকবার আসিয়া ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া বড় একটা আর আসিতেন না। তবু দেশের মায়াবশে বহুকাল পরে এবার একবার দেশে আসিয়াছেন, আমাদের দুর্ঘটনা শ্রবণ করিয়া দেশে যাইবার মুখে দিদিকে আমাদের কাছে রাখিয়া গেলেন। দিদি আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রথমেই মমতাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। অপরিচিতা আগন্তুককে বহুকালের পরিচিতার ন্যায় কোলে লইতে দেখিয়া মমতাময়ী বিস্ময়ে একবার দিদির মুখ ও একবার আমার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

আদর ও সোহাগ করিয়া ধুইয়া পুছিয়া যত্নের সহিত খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া দুই দিনে দিদি মমতাময়ীর চেহারা

ফিরাইলেন। তারপর উৎসাহ-সহকারে আমার পুনরায় বিবাহের জন্য পাত্রীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি বহু কষ্টে দিদিকে বুঝাইলাম, আর বিবাহ করিব না এবং বিবাহ করিয়া সুখীও হইব না। দিদি আমার স্ত্রীকে বড়ই ভালবাসিতেন, তাহার উদ্দেশে চক্ষের জল ফেলিলেন, কয়েকদিন বিবাহের কথা আর উত্থাপন করিলেন না। কিন্তু শূন্য ঘর দেখিয়া এবং আমার স্ত্রীর ব্যবহৃত জিনিষপত্র দেখিয়া মাঝে মাঝে এমনি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন যে, দিদিকে প্রবোধ দিব কি—আমি নিজেই ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বাটী হইতে পলাইয়া যাইতাম।

যাহা হউক, মোটের উপর কয়েকদিন বেশ সুখেই কাটিতেছিল। হঠাৎ একদিন আমার ভগ্নীপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেশের বিশৃঙ্খল বিষয়-সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিয়া আসিতে তাঁহার প্রায় মাসাধিক বিলম্ব হইয়াছে; কার্য্যস্থানে আর না গেলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে। কর্ম্মচারীগণের উপর নির্ভর করিয়া বেশিদিন দেশে থাকা তিনি শ্রেয়স্কর বুঝিতেছিলেন না। তথাপি অনুরোধে পড়িয়া দুই দিন কলিকাতায় রহিলেন। অদ্য দিদিকে লইয়া তিনি কাশী যাইবেন। মমতাময়ী দিদিকে পাইয়া আমাকে পর্য্যন্ত আর চাহে না। দিদিকে সে চোখের আড়াল করে না। আমার আবার দুশ্চিন্তা হইল, দিদি গেলে মমতার আবার কি অবস্থা হইবে! তাহার এখন পূর্ব্বের সে চেহারা নাই—সুগোল চেহারায় সৌন্দর্য্য যেন উছলিয়া পড়িতেছে।

দিদি আসিয়া বলিল, "ভাই, মমতাকে আমি কাশী লইয়া যাইব। তুমি তোমার আফিসের কাজে ব্যস্ত, বৃদ্ধা ও রুগ্না পিসীমা তোমার সংসার লইয়া ব্যস্ত, বাছার আমার যত্ন হয় না। আমার কাছে এখন থাক, ছুটি পাইলে তুমি মাঝে মাঝে পিসীমাকে লইয়া কাশী বেড়াইয়া আসিবে ও মমতাকে দেখিয়া আসিবে।" দিদি আমার উত্তরের আশায় আমার মুখ-পানে চাহিয়া রহিলেন।

আমি ভাবিয়া দেখিলাম, দিদি যাহা বলিতেছেন, সবই সত্য। কিন্তু তবুও মমতাকে না দেখিয়া থাকিব কেমন করিয়া! এ যে সে অভাগিনীর একমাত্র স্মৃতি! সেই ঢলঢলে চোখ, সেই অধর, সেই নাসিকা। না, না, মমতাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না—তা'হলে আমি বাঁচিব না! আবার ভাবিলাম, যত্নাভাবে মমতা আমার শুকাইয়া যাইতে বসিয়াছিল—দিদি না আসিলে হয় তো সে এতদিন সংসার হইতে ঝরিয়া পড়িত। ভাবিবামাত্র শিহরিয়া উঠিলাম। না, না, দিদি তাকে লইয়া যাউন, সে বাঁচিয়া থাকুক—তাহার কুশল সংবাদের চিঠিখানি বুকে রাখিয়া আমি পরম শান্তিতে দিন কাটাইব। দিদির কথাতেই শেষে সম্মত হইলাম। সেইদিন রাত্রের ট্রেণে ইঁহাদিগকে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া চড়াইয়া দিয়া আসিলাম। শেষ ঘণ্টাধ্বনি হইল—হুশ হুশ শব্দে ষ্টেশন ছাড়িয়া গাড়ী চলিয়া গেল। আমার বুকটার মধ্যেও যেন ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল। শূন্য প্রাণে বেহুঁশ মাতালের মতন টলিতে টলিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। একটু তন্দ্রা আসিলেই বিছানা হাতড়াইয়া দেখি—পার্শ্বে আমার মমতা নাই। সে এতক্ষণ দিদির কোলে ঘুমাইতে ঘুমাইতে গাড়ীতে চলিয়াছে। বাবাকে দেখিতে না পাইয়া তাহার তো ঘুমের ব্যাঘাত হইতেছে না? ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সে তো চমকিয়া উঠিতেছে না? আর শুইয়া থাকিতে পারিলাম না। সমস্ত রাত্রি বিছানায় বসিয়া কাটাইলাম।

অতি অনিচ্ছাসত্ত্বে অফিসে গেলাম। কাজে মন লাগিতেছিল না। কেবল ভাবিতেছিলাম, আমার মমতাময়ী বোধ হয় এতক্ষণ কাশী পঁহুছিয়াছে। আমাকে দেখিতে না পাইয়া হয় তো সে কাঁদিতেছে। আবার ভাবিলাম—না, না, দিদির যত্নে সে হয় তো আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে। নূতন দেশে নূতন লোকজন নূতন পথ ঘাট দেখিয়া হয় তো তাহার ক্ষুদ্র প্রাণে কত আনন্দ হইতেছে। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া টেলিগ্রাম দিল, তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িলাম, আমার ভগ্নীপতি লিখিয়াছেন—

"Reached safely all right".

হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

কন্যাদায় (গল্প)

এক

হীরালালবাবু ক্লার্কশিপ পাস করিয়া গবর্ণমেণ্ট অফিসে চাকুরী পান। অধ্যবসায়-গুণে দিন দিন উন্নতি। ২৫০৲ টাকার গ্রেডে উঠিয়াছেন। আড়াই শ' টাকা বেতন পান না—বছর দুইএর মধ্যেই আড়াই শ' হইবে। অতি ধীর প্রকৃতির লোক; কোন বাক্ চাল নাই; কিঞ্চিৎ সংস্থান করিবারও চেষ্টা আছে; প্রায় হাজার টাকা জমিয়াছে। গৃহিণীর অঙ্গেও যথাযোগ্য অলঙ্কার। বাড়ীটি, বৈঠকখানাটি একরকম ফিটফাট—গৃহস্থভাবে একরকম সাজান-গোছান। এ-সময়ে তাঁহার তিনটি কন্যা ও একটী পুত্রসন্তান হইয়াছে। পুত্রটি সকলের ছোট। বড় কন্যাটি বিবাহের যোগ্যা। প্রথম দুইটি কন্যা যে পরমা সুন্দরী, তা নয়;—তবে স্নেহের চক্ষে সুন্দরী বটে! শেষ কন্যাটী পরিপাটী।

বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া ঘটক আসিতে লাগিল। বাবুর মনে মনে কল্পনা—কন্যাগুলিকে ভাল পাত্রে অর্পণ করিবেন। যত সম্বন্ধ আসে, একটা না একটা দোষ বাহির হয়—সম্বন্ধ বড় পছন্দ হয় না। কিন্তু সকল বরেরই পাওনার কামড় বড় কম নয়। একটি সম্বন্ধ কতক মনের মতন হইল। ছেলেটি বি-এ ক্লাসে পড়ে—দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়। এণ্ট্রান্সে জলপানি পাইয়াছিল; এক-এ-তে তেমন সুবিধা হয় নাই;

তাহার কারণও ছিল—যে বৎসর ছেলেটি সেকেণ্ড-ইয়ারে পড়ে, সে বৎসর ছেলেটির পিতৃবিয়োগ হয়। পাত্রেরা দু'টী ভাই; বাপ মিন্‌সে কৃপণ ছিল; প্রবাদ, বেশ কিছু রাখিয়া গিয়াছে; মা মাগীর হাতে স্ত্রী-ধনও যেমন তেমন নয়। ঘটকের মুখে এই রূপ নানান ব্যাখ্যা! কিন্তু ততদূর হোক না হোক, হীরালাল বাবু খবর লইলেন—কিছু আছে; মেয়েটির নেহাৎ অন্নবস্ত্রের ক্লেশ না হওয়ারই সম্ভাবনা। ছেলেটি জেনারেল এ্যাসেম্‌ব্লিতে পড়ে; একটু বাবু, ফিটফাট; তাহা সম্ভবতঃ মায়ের আদরে হইয়াছে। আর এন্‌ট্রান্সে যে জলপানি পাইয়াছিল, তাহার দরুণ একটু আত্মম্ভরীও হইয়াছে। ইংরাজি সাহিত্যে একটু পোক্ত; Mathematics-এ আস্থা নাই। বলে, মনে করিলে কি Mathematics যে পারি না, তা নয়—তবে কি না বড় puzzling.

হীরালালবাবু এই সম্বন্ধেই ভর দিলেন। কিন্তু পাওনার কামড় বড়ই বেশী। হীরালাল বাবুর কাছে ছেলের যে বাবুয়ানা দোষ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল, তাহা গিন্নীর কাছে গুণ হইয়াছে। জামাই ফিট্‌ফাট্ হবে, সে তো আহ্লাদের বিষয়। কর্ত্তা তত্ত্ব লইয়াছিলেন যে, সম্পত্তি মাঝামাঝি রকমের; কিন্তু গিন্নী ঘটকীর মুখের বর্ণনায় বুঝিয়াছিলেন যে, মেয়েটি রাজরাণী হবে। কর্ত্তা চাপা ছিলেন, গিন্নীও চাপা। এই জন্য লোকে ঠিক বিষয় ঠাওর পায় না; কিন্তু এক কলিকাতার বাড়ীভাড়ার আয়েতে তিন ঘর গৃহস্থ বাবুয়ানা ক'রে কাটাতে পারে। হীরালাল বাবুর এসম্বন্ধে মত আছে বটে, কিন্তু ক'নের মা একেবারে মুগ্ধ। কর্ত্তা যদি ওখানে বিয়ে না দেন, তাহা হইলে তিনি আর মেয়ের বিয়ে দিবেন না। স্ত্রী-পুরুষ কয়েক-দিন বাদানুবাদ কথাবার্ত্তা চলে। কর্ত্তা বলেন, "দেখ,দুই হাজার টাকা ধার করতে হবে। এ ছাড়া তোমার গহনাও কতক যাবে, বাজারে দেনাও কতক হবে।" গিন্নী বলেন, "ব্যাটা ছেলে অত ভাবনা কেন? শুন্‌ছি, এ বছর না আর বছর তোমার মাইনে বাড়বে। খরচপাতি একটু টেনে করবে, দেনা কি আর শোধ যাবে না? এ বর ছাড়লে আর এমনটি পাওয়া যাবে না।"

অনেক ভাবনা-চিন্তার পর কর্ত্তা গিন্নীর মতেই মত দিলেন। বাড়ী বাঁধা রাখিয়া দেড় হাজার টাকা কর্জ্জ করা হইল। গিন্নী চোখের জল মুছিয়া কন্যাকে বিদায় দিতে দিতে মনে করিতে লাগিলেন, "আট দিনের মধ্যে কন্যা জড়োয়া গয়না গায় দিয়ে বাড়ী ফিরে আসবে—যেন হরগৌরী মিলন। মেয়েরা বলছে যে, জামাই আমার চ্যাটা। কিন্তু তা নয়। একালের মেয়েরা বাসর ঘরে গিয়ে যেন খিঙ্গী হয়, তাই দু' একটা কথায় কথা উত্তর দিয়েছে।" কিন্তু মেয়েটীকে পছন্দ হয়েছে কি না, এ বিষয়ে গিন্নীর হৃদয়ে সন্দেহের ছায়া পড়েছে; মনকে প্রবোধ দিতেছেন—"পছন্দ হবে না কেন? মেয়ে কি আমার কুৎসিত!"—এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় মেয়ের সঙ্গে যে ঝি গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিল।

দূর হ'তে ঝির মুখ দেখিয়া গিন্নী মনে করিতে লাগিলেন, "ঝি মাগী,কি গোমড়ামুখী! মুখের ছিরি দেখ!—যেন তোলা হাঁড়ী!"—গিন্নী যখন এরূপ ভাবিতেছিলেন, সেই সময় সে আসিয়া ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

গিন্নী। কিরে ঝি!—কিরে?

ঝি। হাঁগা! খুঁজে পেতে ঘর বাড়ী বুঝি আর পাওনি?—ঐ হাবাতের ঘরে মেয়ে দিলে?

মাগী তো চীৎকার করে। সেই চীৎকারের ভাব গিন্নী বুঝিলেন।—বরের মাতা কনে দেখিয়া কপালে করাঘাত করিয়া বলিয়াছে,—"হায়! আমার নলিনীর কপালে কি এই কাল-প্যাঁচা ছিল! মিন্‌সেরা কি চোখের মাথা খেয়ে এই কনে দেখে এলো!" দেনা-পাওনা একটিও পছন্দ হয় নি। দুলে-বাগ্‌দীর বিয়েতেও এর চেয়ে বেশী পাওনা হয়। প্রতিবাসীরা,ক'নে দেখিতে আসিলে গিন্নী একচক্ষে শতধারা ফেলিয়া কর্ত্তাকে স্মরণ করিয়া মড়া-কান্না কাঁদিয়াছে! বরেরও ক'নে পছন্দ হয়নি। মায়ের উপর রাগ, সকলের উপর রাগ। দাসীকে বিদায় করিয়া দিয়াছে। বলে—"ওমা বুড়ো মাগীর সঙ্গে আবার ঝি কেন গো!" অধিকক্ষণ থাকিলে ঝাঁটা মারিত। মানে মানে ঝি চলিয়া আসিয়াছে।

ক'নের মার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। কর্ত্তাও সংবাদ শুনিলেন। তিনি সজ্জন ছিলেন, যাহা দেওয়া-থোয়ার কথা, তাহা ভাল করিয়াই দিয়াছেন, কিন্তু পরিণাম এই! বাবু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরব রহিলেন। পাত্র-পক্ষ ক'নে আটকাইয়াছিল। তবে অনেক অনুরোধ-উপরোধে বরের মা ক'নে পাঠাইল। বোধ হয়, এটাও বুঝিয়া থাকিবে যে, ক'নেকে আটক রাখিলে তত্ত্ব-তাবাস পাওয়ার ব্যাঘাত ঘটিবে। পূজা সামনে উপস্থিত। বন্ধু নামে একজন লোক হীরালাল বাবুকে শ্রদ্ধা করিত। সে কন্যার বিয়েতে কর্ত্তা-গিন্নীর মুহ্যমান ভাব দেখিয়া বরের মাকে কৌশলে বুঝায় যে, খুব তত্ত্ব-তাবাসের ধুম হইত—ফাঁকে পড়িয়া গেলে। অনেক গোলযোগের পর কন্যা গৃহে আসিল।

কন্যার বিবাহে এই বিড়ম্বনা ঘটায় হীরালালবাবু অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু কি করিবেন? মনকে বুঝাইলেন, বে'র ক'নে নিয়ে এইরূপ ঘোঁট হয়; তাঁর বিবাহেতেও এইরূপ কতকটা ঘোঁট হইয়াছিল। ক্রমে সব চুকিয়া যাইবে। যাই হোক্, কন্যা প্রদান করিয়াছেন, উপায় তো নেই। জামাই আনিবার দিন স্থির হইল। সে-দিন রবিবার। সোমবার দিনও King Emperor's Birth Day-এর ছুটী আছে। খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হইয়াছে, দু'একজন আত্মীয়ও

নিমন্ত্রিত। জামাই আর আসে না। জামাই-বাড়ী সন্ধ্যার সময় গাড়ী পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু তবু জামাই আসিল না কেন তত্ত্ব লইতে পুনর্ব্বার লোক গেল। গাড়ী লইয়া যে লোক গিয়াছিল, সে বাড়ীতেই বসিয়া আছে। জামাই বাড়ী নাই। লোক আসিয়া খবর দিল, এমন সময় জামাই গাড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত। জামাই থিয়েটার দেখিয়া আসিয়াছে। জামাই-এর নিমিত্ত সে-দিনকার আহারের আয়োজনও বৃথা। জামাই হোটেলে খাইয়া আসিয়াছে।

বেয়ানের সঙ্গে তো বনাবনি হইল না। জামাই-এর মন পাওয়ার নিমিত্ত গিন্নী নানাবিধ ফুল আনিয়া আদরে ক'নে সাজাইয়া কন্যাকে জামাই-এর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কি কথাবার্ত্তা হয়, আড়ি পাতিয়া শুনিবেন। কথাবার্ত্তা ভাল বোঝা গেল না, ক্রমে বমনের শব্দ উত্থিত হইল। গিন্নী ব্যাকুল হইয়া কন্যার নাম ধরিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে কি? জামাই-এর অসুখ করেছে না কি?" কন্যা কিছু বলিল না—দোর খুলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। জামাই মেঝের বিছানা বমনে ভাসাইয়া তথায় লম্বা হইয়া শুইয়া আছে। লম্বমান। বমনে পিঁয়াজ রসুনের গন্ধের সহিত একটা বিকট গন্ধ নির্গত হইতেছে। গিন্নী সভয়ে কর্ত্তাকে ডাকিলেন। কর্ত্তা দেখিয়া শিরে করাঘাত করিলেন। জামাইএর মাথায় জল দিতে ও বাতাস করিতে বলিয়া সরিয়া গেলেন।

দুই

কন্যাটি আর্ম্মাণীর বিবি নয়, থিয়েটারের এ্যাক্‌ট্রেসের ন্যায় রসিকতা সঙ্গীত প্রভৃতিতে নিপুণাও নয়, কাজেই জামাই প্রায়ই ঘরে থাকেন না। অনেক রাত্রে টলিতে টলিতে বাড়ী আসেন। প্রথম প্রথম মার কথায় একটু লজ্জা পাইতেন। তাহার পর বি-এ, পাশ করার পর ধরাকে সরা দেখিতে লাগিলেন। ধরা সরা দেখিতে দেখিতে ক্রমে রোগগ্রস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে সর্ষে ফুল দেখিতে হইল। পুনঃ পুনঃ রোগে পতিত হইয়াও কুৎসিত অভ্যাস গেল না। যুবতী পত্নী রাখিয়া অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

মেয়ের সম্পত্তি ত্যাগের নিমিত্ত নালিশ করিতে হীরালাল বাবু রাজী ছিলেন না। কিন্তু মেয়ের জেদ, মেয়ের মার জেদ, পল্লীস্থ লোকের জেদ, আত্মীয় উকিলের জেদ। আবার দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ উপস্থিত; কন্যা বিষয় পাইলে তাহারও কিছু সাহায্য হইতে পারে,—এই সমস্ত কারণে হাইকোর্টে সুট বাধিল। সকলেরই ধারণা ছিল—জামাই-এর বাপ বিস্তর বিষয় রাখিয়া গিয়াছেন। যাহা দিয়া রফার প্রস্তাব হইল, তাহা গ্রহণ করিতে উকিল কোন মতে মত দিল না। জেদের মকদ্দমা খুব জোরেই বাধিল। মকদ্দমা শেষ হওয়ার পর কন্যা যাহা পাইলেন, তাহা প্রায়ই উকিল খরচায় গেল। ধার করিয়া মকদ্দমা করিতে হইয়াছিল। সে-সমস্ত শোধ করিয়া অতি সামান্যই রহিল, তাহাতে খোর-পোষ চলে না। কন্যাটির ভরণ-পোষণের ভার হীরালালবাবুর উপরই পড়িল।

কন্যার বিবাহ দিবার সময় গিন্নীর সহিত তাঁহার পরামর্শ ছিল যে, কন্যার বিবাহে যাহা কর্জ্জ হইয়াছে, তাহা শোধ দিবার নিমিত্ত খরচ-পাতি কমাইয়া সংসার চালান হইবে। কিন্তু খরচ-পাতি কমান দূরে থাক, তত্ত্বের খরচা, তাহার উপর বড় মেয়ে ও জামাই-এর নিমিত্ত নানাবিধ দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় হইবে, আর ছোট দু'টি মেয়ে ও ছেলেটি কি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিবে! বড় বড় তত্ত্বের সময় তাহাদের নিমিত্তও কাপড়-চোপড় খরিদ হইতে লাগিল। ছেলেটিকে ভাল করিয়া মানুষ করিবেন এইরূপ সঙ্কল্প ছিল। আলস্যে সময় ব্যয় না করে, সেদিকেও পিতার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু দারুণ পাঠের ভারে—পিতার তাড়নায়—ছেলেটি রুগ্ন হইল। এমন মাস নাই যে ছেলের চিকিৎসার ব্যয় নাই। সুখের সংসার দুঃখের আগার হইল! এদিকে দুর্ভাবনায় গিন্নীরও শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। সুদে সুদে কর্জ্জ বাড়িতে লাগিল।

এ-দিকে আবার দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ না দিলেই নয়!

এবার ঠিক হইল, দ্বিতীয় পক্ষের পাত্রে দ্বিতীয়া কন্যা অর্পণ করিবেন। পাত্র স্থির হইল। পাত্রের প্রথম পক্ষের স্ত্রী দু'টি ছেলে ও একটি মেয়ে রাখিয়া গত হইয়াছে। অভিভাবিকা বিধবা ভগিনী! পাত্রটি ত্রিশ টাকা মাহিনার চাকুরে। বয়স আন্দাজ ত্রিশ-বত্রিশ। যদি চ বিবাহে অধিক ব্যয় হইল না, তবু একেবারেই যে কিছু খরচ হইল না, এমন নয়। ব্যয় প্রায় হাজার টাকা হইল। বাড়ী second mortgage দিয়া এ-টাকা সংগ্রহ করিতে হইল।

এ কন্যার বিবাহও সুখের হইল না। আর পক্ষের ছেলে মেয়ের পক্ষপাতিনী হইয়া বিধবা ননদ তাহাকে সর্ব্বদা তাড়না করে। ছেলেরা একরকম ধিঙ্গী। পিসির পরামর্শে বুঝিয়াছে —'সৎমা! এক রকম শত্রু বলিলেও হয়।' নিত্যই কলহ বিদ্রোহ; কন্যাটি সহ্য করিয়া থাকে। কিন্তু দিন দিন কত সহ্য হয়! নানাপ্রকার গৃহ-বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। স্বামী অনাদর করিতেন না বটে; কিন্তু নিত্য কলহের কথা শুনিয়া বিরক্ত হইতে লাগিলেন। কন্যাটির অসুখেই দিন কাটিত। প্রসবের সময় যথাযোগ্য যত্নের অভাবে দারুণ পীড়া উপস্থিত হইল। তেমন চিকিৎসাপত্র করিবার স্বামীর ক্ষমতা নাই, পিতাও সাহায্য করিতে অক্ষম। নেহাৎ পরমায়ু থাকায় কন্যা বাঁচিয়া উঠিল। কোনওরূপে দিন কাটিতে লাগিল। দুঃখের সংবাদ অবশ্যই পিতামাতা পাইতেন।

এমন সময়ে যে সাহেব হীরালালবাবুকে অনুগ্রহ করিতেন,

তিনি বদলী হইয়া গেলেন, তাঁহার স্থানে অপর একজন সাহেব কর্ত্তা হইয়া আসিলেন। এ-সাহেবের চির ধারণা বাঙ্গালীর একশত টাকার অধিক মাহিনা হওয়া উচিত নয়। যদি হীরালালের স্থানে একজন ফিরিঙ্গী আনিতে পারেন, ইহাই সাহেবের চেষ্টা। সাহেবের সহিত হীরালালবাবুর নিত্যই খিটির মিটির হয়। কিন্তু সরকারী চাকুরী—একটা অছিলা ব্যতীত সাহেব তাড়াইতে পারেন না। ক্রমে সাহেব সে সুযোগও পাইতে লাগিলেন। পুত্রের পীড়া, গৃহিণীর পীড়া, নিজেরও শরীর অসুস্থ—এই সকল কারণে হীরালালবাবুর প্রায়ই কামাই হইতে লাগিল। তাহার উপর পাওনাদারের নালিশের দৌরাত্ম্যে মাঝে মাঝে আদালতেও যাইয়া কৈফিয়তী করিয়া আসিতে হইত। সাহেব ফিকির খুঁজিয়া পাইলেন। বেতন কর্ত্তন, সাসপেণ্ড—ক্রমে হীরালালবাবুকে চাকুরীতে ইস্তফা দিতে বাধ্য হইতে হইল। এখন আর দুঃখের সীমা নাই, বাড়ীখানি গেল—ভাড়া বাড়ীতে বাস। আর নাই, চাকুরীও জোটে না। ক্রমে ক্রমে হীরালালবাবু দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত হইলেন।

তিন

এদিকে তৃতীয় কন্যা বড় হইয়াছে। বিবাহ না দিলে নয়। কিন্তু কোন উপায় নাই। বড় কন্যাটির যাহা কিছু ছিল, সব খরচ হইয়া গিয়াছে। গিন্নীরও আর অলঙ্কার একখানিও নাই। হীরালালবাবুর স্বভাবে দোষ ধরিয়াছে;—পেটের দায়ে নানারূপ কৌশলে রোজগার করিতে হয়—সদসৎ কার্য্য বিচার করা চলে না। যাহার নিকট ধার লন, তাহাকে আর শোধ দিতে পারেন না। দুঃখের চরম সীমায় পড়িয়া তাঁহার মস্তিষ্কও বিকল হইল।

পুত্রটির বিবাহ দিয়া সঙ্কুলান করিবেন, ভাবিলেন। কিন্তু খরচার অভাবে পুত্র স্কুল ছাড়িয়াছে। কাজেই গরীবের ঘর হইতেই সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। দু'একখানা গহনা দিয়া কন্যা পার করিতে পারে, এইরূপ সম্বন্ধ। ছেলেটি তো রত্ন ছিল। দুঃখের দশায় নানা অসৎ-সঙ্গে মিশিয়া এক রকম কদাকার হইয়াছে। এখন সে থিয়েটারের একজন অবৈতনিক অভিনেতা।

চারিদিকে নৈরাশ্যের বিকট বদন দেখিয়া হীরালালের মস্তিষ্কের দোষ বৃদ্ধি পাইল। কন্যাই তাহার শত্রু, মনে এই ধারণা জন্মিল। তৃতীয়া কন্যাটি পরমা সুন্দরী। ইহার বিবাহের দ্বারা কোনও উপায় হয় না?—এইরূপ কন্যা-পণের উৎকট চিন্তা উপস্থিত হইতে লাগিল। বিকল মস্তিষ্ক হিতাহিত বিবেচনা করিতে পারিল না।

এই সময় একবার যেন একটা সুবিধা উপস্থিত হইল। একজন ঘটক কন্যাটির একটি সম্বন্ধ আনিল। কিছুই ব্যয় হইবে না—দিব্য পাত্র, কেবল মেয়েটি চায়। কুলীনও বটে। হীরালালের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু যখন পাত্রের পরিচয় লইলেন, তখন তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। পাত্র কোনও এক পতিতার পুত্র; হীরালালেরই আফিসে পাত্রের বাপ সামান্য কার্য্য করিত। তাহার কুচরিত্রের জন্য হীরালাল বরাবর তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন। হঠাৎ হীরালালের বিকল মস্তিষ্কে দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইল। 'হা হা' শব্দে অট্টহাস্য করিয়া হীরালাল ভাবিল—'বাহবা! মন যা বলে, তা ঠিক! এত চিন্তা কিসের? কন্যা-বিক্রয়ে দোষ কি! বিকল মস্তিষ্কের প্রভাবে হীরালালবাবু গিন্নীর নিকট এই উৎকট সঙ্কল্প জানাইলেন। গিন্নী শুনিয়া স্তম্ভিতা, কিন্তু হীরালালের সঙ্কল্প দৃঢ়। অগত্যা গিন্নী কন্যাকে লইয়া একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন।

এই গৃহস্বামীর একটীমাত্র পুত্র—পূর্ব্বোল্লিখিত যদুর বন্ধু। ছেলেটি অতি সচ্চরিত্র, উদার প্রকৃতির। যদু যদি বা একটু বাচাল ছিল, কিন্তু তাহার প্রকৃতি অতি উচ্চ। একজন আধ-পাগলা লোক যদুকে বড় ভালবাসিত। সে বলিয়া বেড়াইত—"দোষ কাহারও নয় গো শ্যামা!" লোকটা কতকটা বাউণ্ডুলে। কিন্তু যদি কেহ তাহার কথা স্থির হইয়া শুনিত, তাহা হইলে বুঝিতে পারিত যে, পাগল মনোবিজ্ঞানে সুপণ্ডিত। যদু ও তাহার বন্ধু ধনিপুত্র—উভয়েই তাহার সহিত রসরঙ্গ করিত বটে, কিন্তু সে রহস্য-ছলে যে সব উপদেশের কথা বলিত, তাহা অমান্য করিত না। লেখা-পড়ায় যদু ও যদুর বন্ধু উভয়েই প্রায় সমকক্ষ—উভয়েই বরাবর ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হইয়া আসিতেছে। বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে যদিও পরস্পর বিষম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল,কিন্তু স্বপ্নেও ঈর্ষ্যার ছায়ামাত্র পড়ে নাই। ইহাও অনেকটা ঐ পাগলারই উপদেশ-প্রভাবে।

হীরালালের পত্নীর সমস্ত বিবরণ বন্ধুদ্বয় শুনিয়াছে। যদু হীরালালের স্বজাতি নয়; কিন্তু যদুর বন্ধু হীরালালের স্বজাতি। যদু বন্ধুকে বলিল, "শ্যাম, নানাবিধ বড় বড় বাক্যি তো শিখিয়াছি। বাঙ্গালী হীন বলিয়া জানি। কুসংস্কারে দেশ উচ্ছন্ন যাইতেছে বলিয়া চীৎকার করি। কিন্তু কাজের মত কাজ তো এ-পর্য্যন্ত একটাও করিনি। এই দেখ, একটা ভদ্র গৃহস্থ দেশের কুসংস্কারে নষ্ট হইতে বসিয়াছে। যাহা শুনিয়াছি—অতি ভীষণ। পিতা হইয়া কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধে এরূপ উৎকট সঙ্কল্প করিতে বাধ্য হইয়াছে। চক্ষুর উপর এই ঘটনা। আমরা কি এ-বিষয়ে উদাস থাকিব?"

বন্ধু বলিল, "না, উদাস থাকিব না। আমি এই কন্যাকে বিবাহ করিব।"

যদু বলিল, "দেখ, আমি অপর জাতি না হ'লে আমিই বিবাহ করিতাম। তোমায় অনুরোধ করিতাম না। তুমি

যাহা সঙ্কল্প করিলে তাহা যদি সিদ্ধ করিতে পায়, তুমি একটি অমূল্য রত্ন লাভ করিবে। তুমি কন্যাটিকে দেখ নাই, আমি দেখিয়াছি—পরমা সুন্দরী। এই কন্যাটি মোজা বুনিয়া, ছিন্নবস্ত্র সেলাই করিয়া অতি কষ্টে এই সংসারটি চালাইতেছে। রুগ্না জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সেবার ভার ইহারই উপর অর্পিত। আমি হীরেনকে চিকিৎসা করিতে লইয়া গিয়া দেখিয়াছি—অতি শিক্ষিতা, নার্সও এরূপ রোগীর শুশ্রূষা জানে না। মা বলেন—এমন রন্ধননিপুণা আর দুটি নাই। শ্যাম, যদি তোমার সাধু কল্পনা সিদ্ধ হয়, আমি আবার বলিতেছি—তুমি একটি অমূল্য রত্ন লাভ করিবে। কিন্তু বোঝ ভাই, তোমার পিতা তোমার জন্য কত বড় বড় ঘরে সম্বন্ধ করিতেছেন। কন্যা-পক্ষীয়েরা পঁচিশ হাজার পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ত্রিশ হাজার স্বীকার পাইলেই এখনই বিবাহ স্থির হয়। তোমার পিতার এই উদ্যম ভঙ্গ হইবে।”

বন্ধু বলিল, “যাহাই হউক, আমি আমার পিতা মাতাকে বুঝাইব। পিতার ধনের অভাব নাই—বিনা ব্যয়ে এ গৌরব কেন না ক্রয় করিবেন? আর নিতান্ত অসম্মত হন, আমি উচ্চ কার্য্যে কেন পরাঙ্মুখ হইব?”

কথাবার্ত্তা স্থির হইল। শ্যাম মাতাকে বুঝাইতে অন্তঃপুরে গেল। যদুও হীরালালের বাড়ীতে গেল।

হীরালাল বাটীতে নাই। যেদিন তাঁহার পত্নী কন্যা লইয়া যদুর বন্ধুর বাড়ী আসিয়াছেন, সেইদিনই হীরালাল কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। রুগ্না কন্যাটি কাঁদিতে কাঁদিতে এই সংবাদ দিল। হীরালালের মস্তিষ্ক বিকল হইয়াছে যদু জানিত। ভাবিল—এদিক্ ওদিক্ কোথায় চলিয়া গিয়া থাকিবে। সন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু সন্ধান পাইল না।

বহু কষ্টে যদুর বন্ধু পিতামাতাকে সম্মত করাইয়াছে। পাছে পিতা সম্মত না হন, এই আশঙ্কায় পিতামাতার চরণ স্পর্শ করিয়া শ্যাম প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—‘ঐ কন্যা না হইলে আর এ জীবনে বিবাহই করিব না’। এখানেও সেই পাগলাটা সহায়। পাগলার একটা গুণ ছিল—সকলকে আমোদে রাখিতে পারিত।

বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। পাত্র কন্যা-গৃহে উপস্থিত। পাত্রের পিতার ব্যয়েই ধূমধামে বরযাত্র ও কন্যাযাত্রদিগের ভূরিভোজনের আয়োজন হইয়াছে। কেবল কন্যার পিতা উপস্থিত নাই। হীরালালের একজন জ্ঞাতি, সুবাদে কন্যার খুড়া হয়, কন্যা সম্প্রদান করিতে বসিয়াছে। এমন সময় পাহারাওয়ালা ও পুলিশ সার্জ্জেণ্ট বন্দী-অবস্থায় হীরালালকে সেখানে লইয়া আসিল। ব্যাপার এই—কোন এক ধনাঢ্য ব্যক্তির সহিত কন্যার বিবাহ দিবে—এইরূপ কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া তাহার বায়নাস্বরূপে হীরালাল অগ্রিম পাঁচশত টাকা লইয়াছিল। এখন সেই টাকার দরুণ প্রতারণার অভিযোগে হীরালালের নামে পুলিশ হইতে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। কিন্তু পুলিশের সার্জ্জেণ্ট যদুর পরিচিত। এক ধনী ব্যক্তির পুত্রের সহিত হীরালালের কন্যার বিবাহ হইতেছে—এ-সংবাদ শুনিয়া ভাবিল—এ-অবস্থায় হীরালালকে বিবাহ সভায় লইয়া গেলে সেই ধনী নিশ্চয়ই হীরালালকে উদ্ধার করিবে। কিন্তু যে পাষণ্ড পাঁচশত টাকা দিয়াছিল, সে টাকা লইতে সম্মত হইল না। সে হীরালালকে জেলে দিবে—অন্ততঃ পুলিশে হাজির করিবে। এই সময় যদু কোথা হইতে একখানা চিঠি বাহির করিল। সেই চিঠিখানি হাতে লইয়া ফরিয়াদী, সার্জ্জেণ্ট ও একজন বন্ধু উকিলের সহিত এক পার্শ্বে গোপনে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। প্রথমে ফরিয়াদী তর্জ্জন করিল, পরে তর্জ্জন-গর্জ্জন থামিল; শেষে সে সার্জ্জেণ্ট ও যদুর পায়ে ধরিল।

যদু তখন চীৎকার করিতেছে, “এই দুরাত্মা, গৃহস্থের কন্যার সর্ব্বনাশ করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করিয়াছে। এই পত্রে প্রকাশ—টাকা কর্জ্জ দিয়াছে সত্য, কিন্তু পাগলাকে ভুলাইয়া তাহার কন্যার উপর অত্যাচার করিতে আসিয়াছিল, কন্যার মা কন্যাকে লইয়া পলাইয়া মান বাঁচান। এই দুরাত্মাকে যদি কেউ prosecute না করে আমিই করিব।”

ফরিয়াদীর সহিত দুই একজন গুণ্ডা ছিল। তাহাদের ঐ পাগলা এমন করিয়া শিখাইয়া হাত করিয়া ফেলিল যে তাহারা যদুর অর্থ-প্রভাবে ও পাগলার উপদেশে বলিতে লাগিল—‘এই বাবু আমাদের সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন, তাহার কারণ, তাঁহার শ্বশুর তাঁহার স্ত্রীকে পাঠান না; অতএব আমাদের সাহায্য চান। কাজে কাজেই আমরা আসিয়াছি। বলপূর্ব্বক কন্যাটিকে লইয়া যাইতাম।’

তখন ব্যাপার বেগতিক দেখিয়া ফরিয়াদী প্রাপ্য টাকা ফেলিয়াই পলাইতে চাহে। কিন্তু শ্যামের পিতা অতি ভদ্রলোক—তিনি সে টাকা ফেলিয়া দিলেন। তবে সে নীচাশয়কে নাকে খত না দেওয়াইয়া যদু ছাড়িল না। পাগলা গাহিতে লাগিল—“দোষ কারও নয় মা শ্যামা”! উলুধ্বনি সহ মহা সমারোহে বিবাহ সম্পন্ন হইল। উপস্থিত নিমন্ত্রিত রবাহূত ছোট বড় সকলেই ‘জয় জয়’ শব্দ করিয়া চর্ব্য চোষ্য আহারান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

—

সামাজিক চিত্র

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সারদা। দিদি! ন' বছরের বেলা যে হয়েছে, বাসর-ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমার মন অন্তর্য্যামী ভগবান্ই জানেন। আমি শয়নে স্বপনে একবারও স্বামীর মুখ ভুলি নি; আমি তাঁরে একবার দেখেছি, কিন্তু বল্‌তে পারি যদি তিনি লক্ষ লোকের মাঝখানে থাকেন, তা' হ'লেও চিনে নিতে পারি। দিদি, তুমি কাঁদ্‌তে বারণ কর; আমি কাঁদ্‌ব না তো কাঁদ্‌বে কে? যে অভাগী স্বামীতে বঞ্চিত হয়, তার জীবনে কান্না ছাড়া আর কি আছে?

বরদা। তুই ভেবে দেখ্ দেখি, আমারও কান্না বই আর কি আছে! কিন্তু তবু আমি হাসি-মুখে থাকি। একে বাপ-মার দুঃখের সংসার, রাতদিনই বাবা বিরক্ত হ'য়ে থাকেন, মার সঙ্গে কোঁদল করেন, তার উপর আমরা যদি রাতদিন কান্নাকাটি করি, তাহ'লে মা ভেবে-ভেবেই মারা যাবে!

সার। দিদি! মন বাঁধ্‌বার চেষ্টা করি, কিন্তু কি কর্‌বো, পারি নে। যে স্বামীধনে বঞ্চিত, তার কেন মৃত্যু হয় না দিদি? তা' হ'লে তো সকল জ্বালা মিটে যায়!

বর। সারদা, তুই নিরাশ হোস্ নি! যে পতিপরায়ণা, সে নিরাশ হয় না। তোর স্বামীর সোমত্ত বয়েস, সোমত্ত বয়সে অমন বাউণ্ডুলে হয়। একটু বুঝ্‌লেই তোকে নে ঘর কর্‌বে।

সার। দিদি, এই সাত বচ্ছর আশায় কাঁদ্‌ছি, আশায় নাচ্‌ছি! রোজ আমি ঘুমে থেকে উঠে মনে করি, আজ পাল্কি আস্‌বে; যত বেলা হয়, মনে হয়, এই আমায় নিতে এল; বাড়ীতে কোন লোক এলে মনে হয় আমার শ্বশুর-বাড়ী থেকে এসেছে, আমায় নিয়ে যাবার কথা বল্‌বে। সূর্য্যদেব অস্তাচলে মলিন হন, আমার আশাও মলিন হয়, কিন্তু তবু আশা ছাড়ি নি। বিছানায় শুয়ে কত ভাবি, যেন স্বামি আস্‌ছেন, তাঁর খাবার তয়ের করছি, তিনি খেতে বসেছেন, বাতাস কর্‌ছি—পা টিপে দিয়ে তাঁকে ঘুম পাড়াচ্ছি; আবার কেঁদে উঠি—দশদিক্ শূন্য দেখি, তবু দিদি আশা ছাড়ি নি, আমার সাত বচ্ছর এই রকমে যাচ্ছে।

বর। তোরে ভাই আমি কি বুঝাব, বোঝাবার তো কিছুই নাই; তবে যতদূর পারিস্ মার মুখ চেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে থাকিস্। তোরে আমি বল্‌বো কি—যে দিন সে বিদায় নিয়ে গেছে, সে দিন আমার চোখের উপর রয়েছে,—মুখে হাসি, চোখে জল, বলে গেল 'আমি আসি'। কিন্তু আর এলো না; শেষ সময় একটা কথা কইতে পেলুম না, বুঝে দেখ দেখি ভাই,—কি শেল আমার বুকে বিঁধে রয়েছে? কিন্তু কি করবো, মা কাঁদে—আমি পোড়ার মুখ নেড়ে তাঁকে বুঝাই। একবার মনে হয়, তাঁর কথা রেখে গহনা-গাঁটি পরি, কিন্তু অম্‌নি হাঁপিয়ে উঠি; মনে হয়—সে গেল, তাঁর সঙ্গে তো সবই গিয়েছে! আমার তো কপাল ভেঙ্গেছে, তোর কপালে তবু সিঁদুর আছে, তোর মুখ দেখেই মা প্রাণ ধারণ ক'রে আছে,—তুই অমন কর্‌লে মা জলে ডুবে মর্‌বে।

সার। দিদি! সকলি বুঝি; তবু না কেঁদে থাক্‌তে পারি নে।

বর। ভাই, তুই আর আমায় কাঁদাস্ নি, তোর এ কথার আমি কি উত্তর দেব?—

(বস্তিনাথের প্রবেশ)

বস্তিনাথ, কাঁদছো কেন?

বস্তি। Grief, grief, intense grief দুঃখ, দুঃখ, অতি দুঃখ, Twofold grief, ডবল দুঃখ! দিদি! আমার প্রাণ ফেটে গেল!

বর। কি হয়েছে? অমন করছো কেন?

বস্তি। স্থাথ, আমার প্রথম দুঃখ, আমার প্রেয়সীর সহিত আজও আমার মিলন হলো না! দ্বিতীয় দুঃখ তুমি; তুমি আমার দুঃখ আজও বুঝতে পার্‌লে না!

সার। তোমার আবার প্রেয়সী কে?

বস্তি। আহা, সেই চন্দ্রমুখী সরলা তাঁতি ঝি, যিনি চারটী কন্যাসন্তান ও পাঁচটী পুত্রসন্তান পালন ক'রে বিধবা হয়েছেন! আহা, প্রেয়সীকে কত দিনে পাব, আমি love-letter অর্থাৎ প্রেমের চিঠি লিখে কলম ক্ষয় কর্‌লেম। তথাপি হা-হতোস্মি হা-দগ্ধ হৃদয়! প্রিয়ার মন পেলেম না—আমি প্রিয়ার জন্যে বাড়ীতে খেতে আসি না। যদু বাবুর সঙ্গে হোটেলে খেয়ে আসি। আমি প্রিয়ার জন্যে science অর্থাৎ বিজ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়েছি। আর ঘাস থেকে সুতা বার ক'রে কাপড় করবার চেষ্টা করিনে, খেজুর-বিচিতে আটা তয়ের কর্‌বার চেষ্টা করিনি, এ সকল আমার জীবনের ব্রত ছিল। কেন না, দেশ অতি গরিব, কিন্তু সে চেষ্টা আমার আজ নাই। কেন? কারণ কি? কারণ এই, প্রিয়াকে পেলেম না।

বর। কি পাগলের মত বক্‌ছো, বেলা হয়েছে, ভাত খাওগে।

বস্তি। দিদি গো! আর আমি ভাত খাব না। আর আমি স্কুলের ছেলে ধ'রে Drill অর্থাৎ যুদ্ধ-শিক্ষা করাব না, আর আমি দেশের জন্যে কাঁদ্‌বো না; তবে কি একবারেই কাঁদ্‌বো না? তা নয়, কাঁদ্‌বো—দিনরাত কাঁদ্‌বো, চন্দ্রমুখী প্রিয়ার জন্যে কাঁদ্‌বো।

বর। চল সারদা যাই, বাবার খেতে আস্‌বার সময় হয়েছে।

বস্তি। দিদি গো! তুমি যেও না, আমি কাঁদ্‌বো, আর

কাঁদ্‌বো আমি তোমার জন্যে। তুমি বিবাহ কর্‌বে না ব'লে কাঁদ্‌বো। আহা তুমি বুঝ্‌তে পারছ না, বিবাহ না ক'রে তোমার কি দুঃখ! আজ আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, যদি ভাত না খেতে হয় সেও স্বীকার, তবু তোমায় বুঝিয়ে দেব যে বিবাহ না করলে কখনই তুমি সুখী হ'তে পার্‌বে না। তুমি মনে কর—গত স্বামীর জন্যে কাঁদি, কিন্তু তা নয়; তুমি কাঁদ—যে তোমার নূতন স্বামী হবে তার নিমিত্তে। যদি বল তারে দেখি নি, কিন্তু জান না, প্রেমের অসামান্য মহিমা। Love is blind—প্রেম অন্ধ! তাই তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না, কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, তুমি বিধুমৌলী মজুমদারের জন্য ব্যাকুলা, ইংরাজীতে যাকে বলে love-sick.

বর। বঙ্কি দাদা! পথ ছাড়, আমি যাই, বাবার খাবার সময় হয়েছে।

বঙ্কি। দিদি! দুঃখের বিষয়, তুমি ইংরিজী জান না, তা হ'লে আমি তোমায় এক course lecture দিতুম, অর্থাৎ বক্তৃতা করতুম; এবং সেই বক্তৃতার চোটে তুমি সম্পূর্ণ বুঝ্‌তে পারতে যে তোমার প্রেম নব অঙ্কুরিত হয়েছে কি না? আর ছোট দিদি, তোমার জন্য ভাবিনি; কারণ Divorce Law অর্থাৎ পতি-পত্নী-ভেদ আইন শীঘ্র যাতে দেশে প্রচলিত হয়, তার জন্যে বুকের রক্ত দে চেষ্টা করবো। তা হ'লেই তোমার স্বামীর সঙ্গে ফারখৎ হ'য়ে তুমি আবার বিবাহ কর্‌তে পারবে।

সারা। বঙ্কি দাদা! তোমাকে না ব'লে লেখাপড়া শিখেছ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আমরা না তোমার বোন, তুমি অকথা-কুকথা বল্‌ছো। লজ্জা হচ্ছে না!

বঙ্কি। দিদি! যদি মূর্খ হতেম তা হ'লে লজ্জা হ'তো। তোমাদের কত বোঝাব, আমার যে অবস্থা এ ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরিজী-শিক্ষার ফল।

(নদেরচাঁদের প্রবেশ)

নদে। দাদা, ওদের কি বোঝাচ্ছ? ওরা মেয়েমানুষ, ওরা কি তোমার বিদ্যার থৈ দিতে পারে! তুমি আমায় লেক্‌চার দাও, তোমার pathetic lecture শুনে আমি কেঁদে খুন হব।

বঙ্কি। কেও, নদেরচাঁদ?

নদে। হ্যাঁ দাদা, আমি তোমার সেই ভ্রাতা, যে তোমার লেক্‌চার শোন্‌বার জন্য লালায়িত।

বঙ্কি। তুমি লালায়িত বটে, কিন্তু আমার আর শক্তি নাই,—

I have seen the day when with this little arm and this good sword I have made my way through more impediments than twenty times your···

Oh vain boast—একটা কথা ভুলে যাচ্ছি,—'tis not so now.

নদে। Hear hear!

বঙ্কি। নদেরচাঁদ, এ লেক্‌চার নয়, তুমি hear hear বলো না। আমি কেবল তোমায় বল্‌ছি, আমার মনের বেগ জানাচ্ছি,—স্কুলে আমরা Othelo পড়েছিলুম, তাই মনে মনে quote ক'রে মনের বেগ জানাচ্ছিলুম। তুমি তো ইংরিজী জান না, আমি তোমার ভাব বুঝিয়ে দিচ্ছি। এমন এক সময় ছিল, যখন আমার লেক্‌চার-রূপ ছোট অস্ত্র দিয়ে তোমার মতন বিশ জন শ্রোতাকে বধ ক'রে যেতে পারতুম; কিন্তু—না, আর না—সে দম্ভ আর না! O Desdemona, O Desdemona, অর্থাৎ—ও তাঁতি ঝি, ও তাঁতি ঝি—

নদে। দাদা, তাঁতি ঝি কে?

বঙ্কি। কে? স্বর্গের বিদ্যাধরী যদি থাকে, তবে সে এই তাঁতি ঝি। কিন্তু Mill বলেছেন—স্বর্গ নাই; সুতরাং স্বর্গ যখন নাই, তখন বিদ্যাধরীও নাই। অতএব, মর্তিনী তাঁতি ঝি।

নদে। বলি—কোন্ তাঁতি ঝি?

বঙ্কি। কোন্ তাঁতি ঝি—তুমি জান না! হা অবোধ! যিনি ক্রমান্বয়ে পাঁচটী পুত্র-সন্তান ও চারটী কন্যা-সন্তান প্রসব ক'রে পদ্ধতিক্রমে মানুষ ক'রে আসছেন, এমন যে নয় সন্তানের জননী, তিনিই আজ বিধবা হয়েছেন।

নদে। আঃ ছিঃ ছিঃ! দাদা, সে যে বুড়ী!

বঙ্কি। ভাই নদে, ঠিক বলেছ, প্রেয়সী অসীমবয়স্কা।

A horse, a horse—

My kingdom for a horse (Richard III).

বুঝেছ নদেরচাঁদ, একটা ঘোড়া, একটা ঘোড়া, ঘোড়ার জন্য আমার রাজ্য! এ স্থলে ঘোড়া অর্থে তাঁতি ঝি! রাজ্য অর্থে প্রাণ, অর্থাৎ তাঁতি ঝি, তাঁতি ঝি, তাঁতি ঝি। তাঁতি ঝির জন্য আমার প্রাণ!

নদে। দাদা, তোমার কি প্রাণ যায় না কি? তোমার মুখে জল দেব? তুলসী-চারা আন্‌ব? দাদা, তোমার কি আছে—উইল করতে থাক, আমার নামে উইল করো; তোমার বই-বেচা টাকা শ' পাঁচ ছয় আছে তা আমি জানি। আমি তুলসী-চারা নিয়ে এসে তোমার মাথায় ধরি, আর মুখে জল দিই।

বঙ্কি। না ভাই নদেরচাঁদ, প্রিয়ার জন্য যদি মৃত্যু হয় তা হ'লে আমাকে coffin-এ শুইও। আর Ingersoll যে Chapter-এ বলেছেন God নেই, সেই Chapterটি আমায় শুনিও। হা তাঁতি ঝি!

নদে। দাদা গো, তোমার প্রিয়ার বিষয়-আশয় কি?

বঙ্কি। ভাইরে! বল্‌বো কি! শুনেছি মৃত তাঁতির কাপড়

রেখে দু' লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ রেখে গিয়েছে ; আমার প্রিয়ার নামে উইল করেছে।

নদে। আর যে ছেলে আছে দাদা।

বঙ্কি। তারা কেও কনসার্ট বাজায়, কেও থিয়েটার করে, তাই আমার প্রিয়ার নামে সম্পত্তি।

নদে। আহা দাদা গো, আমার চোখ দিয়ে জল আস্‌ছে। তুমি আর 'তাঁতি ঝি' 'তাঁতি ঝি' করো না—আমার বুক ফেটে যায়।

বঙ্কি। আমি তাঁতি ঝি, তাঁতি ঝি করবো—ঠোঁটে প্রাণ থাক্‌তে তাঁতি ঝি, তাঁতি ঝি করবো। ভাইরে, তুমি আমায় নিষেধ ক'রো না। "Poor Desdemona I am glad thy father's dead". এস্থলে father অর্থে স্বামী। হে তাঁতি ঝি, আমি সুখী হলেম তোমার স্বামী মরেছে ; কারণ, তা না হ'লে তোমার সহিত প্রেমের কথা কইতে পারতেম না।

নদে। কি বল্লে দাদা, দু' লাখ টাকা উইল ক'রে গেছে ? দাদা গো তুমিই ধন্য। তোমার প্রেমই ধন্য! দু' লাখ টাকা!

বঙ্কি। O my ducats! O my daughter, my ducats! হা দু' লক্ষ টাকা! হা তাঁতি ঝি!

নদে। দাদা, তবে কেন তাকে বে কর না ?

বঙ্কি। আমার কি অসাধ ? কিন্তু তার ছেলেগুলো আমি সে রাস্তা দিয়ে চল্‌লে মারতে আসে। আমি প্রিয়ার সঙ্গে দেখা করতে পারি না।

নদে। এই ভয় ? আমায় বাড়ীর নম্বরটা ব'লে দাও—আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

বঙ্কি। ৫৩ নম্বর সিক্‌দার পাড়ার গলী। ভাইরে, জিজ্ঞাস ক'রো না।

নদে। আমি সব ঠিক করছি। তোমার বিধুমৌলী মজুমদার খুঁজ ছিল।

বঙ্কি। O the love-sick swain—ওঃ! সেই প্রেমে জর-জর মেষপালক।

নদে। দাদা, তার কত টাকার প্রেম ?

বঙ্কি। তার হস্তে নগদ ত্রিশ হাজার টাকা আছে। আমাদের ভগিনী বরদাসুন্দরী বেওয়ার প্রেম-ক্ষুধায় তার হৃদয়-পাকস্থলী দগ্ধ হচ্ছে। এক চ'খে তাঁতি ঝির জন্য কাঁদি, আর এক চ'খে ভগিনীর জন্য কাঁদি। দিদি আমার সরলা। তার হৃদয়ে যে প্রেম অঙ্কুরিত হয়েছে, তা তিনি বুঝ্‌তে পারছেন না।

নদে। দাদা তুমি আর কেঁদ না, আমার উপর সকল ভার দাও,—

বঙ্কি। আচ্ছা ভাই, তোমায় ভার দিলাম। তোমার উপর সমস্ত ভার ; তথাচ আমার দৈহিক চক্ষু দ্বারা যদি সমস্ত পর্য্যালোচনা করবো।

নদে। দাদা ! আমি ভাবছিলেম যে কেন আমার প্রাণ কাঁদ্‌ছে—মাস্‌তুতো ভাইয়ের দুঃখে যে আমার হৃদয় জর-জর হচ্ছে—তা আমি এখন বুঝ্‌তে পারলেম।

বঙ্কি। Honest Iago—সৎ মাস্‌তুতো ভাই!

নদে। দাদা, এস, একবার আমরা সমস্বরে বলি—

"রণ-রঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা,
এ বিষম জ্বালা যদি পাসরিতে ভুলিতে।"

বঙ্কি। না না বাঙ্গালা নয়, একটা ইংরাজী কোট ক'রে বলি—

Arm arm, it is the cannon's opening roar.

অস্ত্র নাও, অস্ত্র নাও, প্রেম-রূপ কামান গর্জ্জন করছে।

নদে। অস্ত্র নাও, অস্ত্র নাও, প্রেম-রূপ কামান গর্জ্জন করছে—

বঙ্কি। দেখো ভাই, ভুলো না, আমার দু' লক্ষ টাকার প্রেমধন তোমার হস্তে সমর্পণ করছি।

নদে। আহা দাদা! এ কি ভোল্‌বার জিনিষ, এ কি ভোলা যায়!

বঙ্কি। My native land! Goodnight! প্রিয় ভ্রাতা, এক্ষণে বিদায়। (প্রস্থান)

নদে। আমি এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছি। [illegible] তাঁতি টাকা রেখে মরেছে। তার বাড়ীর পাশে আর এক মাগী বুড়ী তাঁতিনী আছে। উন্নত-নারী-সমিতির পরামর্শে সে মাগী বে-পাগ্‌লা হয়েছে। দাদা মনে করেছেন সেই বেটীই [illegible] পেয়েছে। এর ভেতরে এক মজা আছে। ঐ মজুমদার ব্যাটার টাকা ক'টা হাত করতে হবে। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বামাসুন্দরী ও যজ্ঞেশ্বর মিত্র

বামা। বরদা যে কিছু চায়।

যজ্ঞে। বরদা আবার কি চায় ?

বামা। সে—যে টাকা তোমার কাছে রেখেছে ব্রত করবে ব'লে—তাই থেকে কিছু চায়।

যজ্ঞে। আমার কাছে কি টাকা রেখেছে ?

বামা। ঐ যে বাড়ী বিক্রী ক'রে পাঁচ হাজার টাকা রেখেছিল, তুমি যে বলেছিলে সুদে খাটিয়ে দেবে।

যজ্ঞে। বটে, এত ? বুঁকে পাথরটী যে খাব, [illegible] কোত্থেকে এসে ? টাকা-কড়ি আমার কাছে কিছু নেই।

বামা। সে কি গো! পেটের মেয়ে গচ্ছিত রেখেছে।

যজ্ঞে। সে কি গো—গচ্ছিত রেখেছে! দুই মেয়ের

যে দিয়ে তো লাভ ভারি, বাড়ী গেল, বাগান গেল, জমি গেল, ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করছি। আমার নামে নালিশ করতে বল; আমি দিতে পারব না। টাকা,—টাকা অমনি খোলামকুচি! খোরাকি হিসাবে যদি পাওনা করি তো আজ বিশ হাজার টাকা পাওনা হয়। একুশ বছর খাইয়ে আসছি। দুবচ্ছর শ্বশুর-বাড়ী ছিল, দু হাজার টাকা বাদ দাও, তবু উনিশ হাজার টাকা পাওনা—উনি পাঁচ হাজার টাকা বাড়ী বেচে দিয়েছেন, তার আবার দাবী। উনিশের পাঁচ গেলে চোদ্দ হাজার টাকা আমায় দিন্, আর যেন আমার বাড়ী না খায়। ব'লো, আজ থেকে আমি আর তারে ভাত দিতে পারবো না। (বরদার প্রবেশ) হ্যাঁ রে! তুই না কি টাকা চেয়েছিস্? তোর লজ্জা করে না? তোকে একুশ বচ্ছর ভাত-কাপড় দিয়ে আসছি।

বর। আমি অনন্ত-ব্রত করবো মনে করেছিলুম, তাই চেয়েছি,—তুমি তো বলেছিলে আমার টাকা সুদে খাটিয়ে দেবে? তাই সুদ থেকে কিছু চেয়েছি, গোটা পাঁচ ছয় হ'লেই হবে। তা এখন হাতে না থাকে, নেই দেবে।

যজ্ঞে। তবে রে পাজী বেটী! তোমায় খতে কতে লিখে দিয়েছি যে তোমার টাকা সুদে খাটিয়ে দেব? তোর কিসের টাকা? তোর খোরাকীর টাকা হিসাব ক'রে দিয়ে চলে যা। আমি আর তোকে খাওয়াতে পারবো না।

বর। বাবা, তুমি আর কেন আমার মরার উপর খাঁড়ার ঘা দাও? টাকা না দাও নেই দেবে, আমি তো চাচ্ছি নি?

যজ্ঞে। দে, তুই লিখ্‌তে জানিস্—এখনি আমায় লিখে দে যে—আমার কাছে কিছু পাওনা নেই।

বর। তুমি না দাও, আমার পাওনা নেই।

যজ্ঞে। নচ্ছার বেটী! যত বড় মুখ তত বড় কথা—আমি না দিই পাওনা নেই! আজ এখনি লিখে দিবি যে—টাকা যে রেখেছিলেম ব'লেছিলি তা মিছে কথা। আমার কাছে আর দাবী-দাওয়া নেই, তবে তুই আজ আমার ভাত খাবি, নইলে আমার বাড়ী থেকে বেরো।

বর। আমি মিছে কথা লিখ্‌বো কেন? আমি লিখে দিচ্ছি—টাকা চাই নি।

যজ্ঞে। মিছে কথা! তুমি টাকা রেখেছিলে? বেরো তুই এখনি আমার বাড়ী থেকে।

বামা। না, না, রাগ করো না। ছেলেমানুষ বুঝ্‌তে পারে না—একটা কথা ব'লে ফেলেছে।

যজ্ঞে। বুঝ্‌তে পারে নি! টাকার বেলা বুঝেছে, আর খোরাকী দিয়ে খেতে হয় বোঝে না? আর মেয়ে বিইয়ে তো আমার লাভ ক'রে দিয়েছ, খরচ-পাতি ক'রে বে দিলুম। জামাই যদি ম'লো, থাক্‌বার মধ্যে এক নড়নড়ে বাড়ী। বাড়ী-ঘর-দোর বাঁধা দিয়ে ছোটটার বিয়ে দিলুম, তার ঢেটটা হাতে আসবে, আমি ম্যানেজার হব,—তা তো সে ব্যাটাও মেয়েটার মুখ দেখে না। ছোঁড়াটা ম'লেও বিষয়টা হাত করি! অমন ভুঁড়ি হাঁকে, একদিন প'ড়েও মরে না! তুই মেয়েতে ত আমার এই লাভ? বরদা! বাছা, ভাল কথা বল্‌ছি। আমি যা বল্‌লুম, তা যদি লিখে দাও, তা হ'লে খাও পর থাক। না হ'লে বেরিয়ে যাও।

বর। গয়না-বেচা টাকা ক'টা পাব না?

যজ্ঞে। তবে না-কি রে বোঝে না! সব পাবে, আমি কড়ায় গণ্ডায় হিসেব ক'রে দিচ্ছি, তুমি খোরাকীর টাকাগুলোর হিসাব ক'রে দাও। একুশ বচ্ছর তোমার বয়স হয়েছে দুবচ্ছর তুমি শ্বশুর-বাড়ী যে ছিলে বাদ দাও। উনিশ বচ্ছর, আমি বেশী ক'রে ধরছি না,—হাজার টাকা বছর,—ধর উনিশ হাজার,—আর তোমার বের খরচ সেও সাড়ে চার হাজার, খাতা দেখ্‌তে চাও, খাতা দেখাতে পারি,—এই সাড়ে তেইশ হাজার। তোমার বাড়ী-বেচা পাঁচ হাজার, আর গহনার এক হাজার ধর; সাড়ে সতর হাজার আমায় গুণে দিয়ে যেখানে ইচ্ছে চ'লে যাও। আজ থেকে বাছা তোমার খুঁড়ে-পাথর জোগাতে পারব না।

বর। হা পরমেশ্বর! আমার অদৃষ্টে এই লিখেছিলে? আমি ভাশুরপোদের রাঁধুনীগিরি ক'রে খেতুম সেও ভাল ছিল! আমি কেন তাদের সঙ্গে পৃথক্ হ'য়ে বাড়ী বেচে এলুম! আমার অন্ন-স্থল নষ্ট ক'রে এলুম!

যজ্ঞে। কেন! তুমি তো আপনার হিসাব বেশ জান! আমার হিসেবের বেলাই নাকে কাঁদ্‌ছ! যাওনা বাছা! তোমার ভাশুরপোদের কাছে, আমি গাঁট থেকে পাল্কী-ভাড়া দিয়ে পাঠাচ্ছি।

বর। বাবা! সে পথ তো তোমার কথায় বন্ধ ক'রেছি। তাদের উকীলের চিঠি দিয়ে বাড়ী বখরা ক'রে নিয়ে এসেছি।

যজ্ঞে। তা বুঝেছ—আমি একুশ বচ্ছর খাওয়ালেম। আর তাঁরা এক বচ্ছর খাওয়াতে পারেন না!

বর। হা বিধাতা! বিধবার কি মৃত্যু লেখ নি? পরমেশ্বর! বিধবার পক্ষে আত্মহত্যা কেন পাপ লিখেছিলে?

বামা। ওমা! তুই কাঁদিস্ নি। কর্ত্তা এখন রেগেছে, দুটো কথা বলেছে। আর বাছা ওঁর জ্বালাতনের শরীর, দেনায় দেনায় হায়রান হয়েছে, কিছু মনে করিস্ নি।

(সারদার প্রবেশ)

সার। দিদি! কাঁদ্‌ছিস্ কেন গা! মা! দিদি কাঁদ্‌ছে কেন?

বামা। ও বাছা, ওদের কি কথা হয়েছে।

যজ্ঞে। মা সারদা, আমি তোমার জন্যে ভেবে ভেবে সারা হচ্ছি; এতদিনে একটা উপায় করেছি। আমি তো তোমার নামে তোমার স্বামীকে উকীলের চিঠি দিয়েছি। এখন নালিশটে করলেই চার পাঁচ শ টাকা মাসে মুনফা এমন

একখানা তালুক তোমার খোরাকীর জন্যে পেতে পারি। আর তোমার গয়নাগাঁটী নিয়ে হাজার কুড়ি টাকার কম হবে না। পঞ্চাশ হাজার টাকার দাবি করবো। মোকর্দ্দমার শেষ পর্য্যন্ত যেতে হবে না, দেওয়ান বলেছে—মিটিয়ে দেবে। তা দেখ মা, কাগজখানায় সই ক'রে দাও দেখি।

সার। বাবা, নালিশ করছ কার নামে?

যজ্ঞে। তোমার স্বামীর নামে। চুপ ক'রে রইলে যে? তোমার খোরাকী দেবে না, নালিশ না করলে হয়? দাও, সই ক'রে দাও! দেরি হচ্ছে, আমায় এখনি বেরুতে হবে।

সার। মা, বাবা কি বল্‌ছেন!

যজ্ঞে। কি বল্‌ছি! অত বড় মেয়ে বুঝতে পারছ না? তোমার খোরাকীর টাকা আদায় করবো।

সার। বাবা, আমার খোরাকী কাজ নেই।

যজ্ঞে। লক্ষ্মী মা আমার! তুমি তো অবুঝ নও। আমি এই বাছা দেনায়-টেনায় জড়িয়ে পড়েছি, দাও, সই ক'রে দাও।

সার। মা!

যজ্ঞে। ওকে কি বল্‌ছো—ও কি সই করবে? দাও, দাও। এই নাও কলম নাও।

সার। মা, আমি কি করবো—বাবা কি বল্‌ছেন?

যজ্ঞে। বাছা আমার কথা শোন, তুমি সই দেবে কি না দেবে বল? আমার সোজা কথা, সই কর; যেমন আছ থাক, আর যদি না কর, আমার এখানে আর জায়গা হবে না।

বামা। না, গো না, তুমি মুখ-ঝাম্‌টানি দাও কেন? বাছা, একটা সই ক'রে দে না।

সার। মা, তুমিও এই কথা বল্‌ছো? তবে আমি আর দাঁড়াব কোথায়? আমি স্বামীর নামে নালিশ করবো, তুমিই না শিখিয়েছ স্বামী দেবতা, তুমি শিখিয়েছ স্বামী গুরু, স্বামীই সর্ব্বস্ব! আমি সেই স্বামীর নামে নালিশ করবো? মা, আমার ইহকাল তো গিয়েছে, আবার পরকাল খোওয়াব? মাগো! মার মতন কথা কও। স্বামী আমায় পর করেছে—আমি তো স্বামীকে পর করি নি!

যজ্ঞে। শোন—মেয়ের কথা শোন! অ্যাদ্দিন ভাত চলেছে, তাই স্বামী পর করে নি! আমি আছি—তাই অত লম্বাই চলেছে। আজ থেকে বাছা তোমার ভাত বন্ধ। দেখি তুমি সই কর কি না? আমি তোমার বাড়া বেচে বে দিলুম। বিষয় হাত লাগা চুলোর বাক্, দু-দুটো ধাড়ি মেয়ের খোরাক যোগাও! আমার লাভ তো ভারি! চোরের দায়ে ধরা পড়েছি! সই করবি তো কর, নয়, আমার বাড়ী থেকে বেরো।

সার। বাবা তুমি আমায় শ্বশুর-বাড়ী পাঠিয়ে দাও, আমি তাদের দাসীবৃত্তি ক'রে খাব।

যজ্ঞে। ইস্, আজ শ্বশুর-বাড়ী তোর আপনার হ'ল! যখন লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন থাকতে পারিস্ নি? তোর সঙ্গে আমার এত কথা-কাটা-কাটির দরকার নেই, হয় বেরো, নয় সই ক'রে দে।

বামা। ওগো! তুমি বকো না। ওকে আমি বুঝিয়ে সই ক'রে নেব এখন।

যজ্ঞে। বুঝিয়ে সই ক'রে নেব এখন! কেন? ও কি বোঝে না?—যেমন তোমায় নিয়ে আজন্ম জ্বলে মলুম, তেমনি দুই ধিঙ্গি মেয়ের জন্যে জ্বলুম। বোঝে না! ভাত গরাস বোঝে?

সার। পরমেশ্বর! দু'টা ভাতের জন্য বাপের কাছে এত লাঞ্ছনা? বাবা! মেয়েকে কি আর কেউ ভাত দেয় না? তাই তুমি অত বলছো—

যজ্ঞে। ভাল চাস্ সই কর্, নইলে দূর্ হ?

সার। মা, তুমি কেন আমায় শ্বশুর-বাড়ী পাঠিয়ে দাও না?—বের রাত্তিরে বাবা বল্‌লেন তাঁর বিষয়-আশয় দেখ্‌বেন, তাই শুনে তো আমার শাশুড়ী রাগ ক'রেছিলেন। এখন যেন নিতে আসেন না, প্রথম প্রথম তো কতবার নিজে এসেছেন। যদি ভাত কাপড় না দিতে পারবে, তখন কেন পাঠাও নি?

যজ্ঞে। তবে রে পাজী বেটী! তখন কেন পাঠাই নি। তখন পাঠালে যে তোমায় কেটে ভাসিয়ে দিত! শ্বশুর-বাড়ীর লোক এলে যে পাইখানার ভেতর লুকুতে,—তা কি মনে নাই? এখন ভাত দে পুষলেম ব'লে এই বেইমানি কথা! যা, তোর যেখানে দু চোখ যায় যা। আমার বাড়ীতে আর তোর জায়গা হবে না। যা, ওঠ্, বেরো।

বর। আয় সারদা আয়, বাবা রেগেছেন, এখন সামনে থেকে সরে আয়।

যজ্ঞে। যাচ্ছিস্ কোথায়, বেরো।...(বরদা ও সারদার প্রস্থান) দেখ্‌লে দেখ্‌লে, সর্ব্বনেশে মেয়েদের রকম দেখলে! তুমি যে কথায় কথায় নাক তুলে বল, 'তুমি অমন ক'রে মেয়েগুলাকে খিট খিট কর কেন? বাছারা আমার অনাথা, তুমি খিট্ খিট্ করলে কোথায় দাঁড়াবে।' শুনলে তো, স্বকর্ণে শুনলে তো? একজন ভাশুরপো দেখালে, একজন শ্বশুর-বাড়ী দেখালে। একটা ছেলে বিয়োবার যোগ্যতা নেই! দুই ধিঙ্গি মেয়ে বিয়িয়ে আমার নাকের জলে চখের জলে করলে!

বামা। হাঁগা! সে ধিৎকার তুমি বার বার দাও কেন? আমার অদৃষ্টের মুখে আগুন! আমি যদি বেটার মা হতুম, তা' হ'লে কি এই মেয়ে নিয়ে আমার এত খোয়ার হয়? তুমি ওর স্বামীর সঙ্গে কারখৎ সই নিতে এসেছ, তা কি আমি জানি? আমার পোড়ার মুখ দেখাতে লজ্জা করছে! আমি মা হ'য়ে বল্লুম সই দে, ধিক্ আমায়!

। বটে, এত্তো দূর—শোন ! এই দু'খানি কাগজ রইলো, বড় মেয়ে লিখে দেবেন যে আমার কাছে আর দাবী-দাওয়া নেই, আর ছোট মেয়ের কাছে এই কাগজে সই নিয়ে রাখবে। যদি পার ভাল, আর যদি না পার—

বামা। আমি পারবো না, আমি যে মেয়ের গচ্ছিত ধন হরণ করবো, জামাই মেয়ের কারখৎ লেখাব, আমা হ'তে হবে না ; তা তুমি মার আর কাট।

যজ্ঞে। অবিশ্যি হবে। হয় কি না, আমি দেখ্‌ছি। ভাত কোথা থেকে জোটে দেখ্‌ছি। ভাঁড়ারে চাবি দিচ্ছি। যদি বিকেল বেলা কাগজ সই পাই তো খুলে দেব, উনুন জ্বলবে। আমি চার গণ্ডা পয়সা খরচ ক'রে শ্যামবাজারের হোটেল থেকে খেয়ে আসব।

(নদেরচাঁদের প্রবেশ)

নদে। মামা ! কোথা যাচ্ছেন ? সর্ব্বনাশ !

যজ্ঞে। কি রে ?

নদে। মামা ! আমার কান্না আসছে—তোমার সর্ব্বনাশ এলো, সীতানাথ দত্ত তোমার নামে নালিশ করবে !

যজ্ঞে। কিসের নালিশ ? কে সে ? তার সঙ্গে আমার এলেকা কি ?

নদে। দিদির ভাশুরপো। নালিশ রুজু করবে।

যজ্ঞে। কেন ? কিসের নালিশ ! কে তার এলেকা রাখে ?

নদে। নালিশ, দিদির টাকা তুমি নিয়েছ, সেই টাকা আদায়ের নালিশ। গচ্ছিত ধন হরণ করেছ, না খেতে দে ঘরে চাবি দিয়ে পীড়ন ক'রে দিদির ঠেঙে লিখে নিয়েছ যে, দিদির টাকা তোমার ঠেঙে নেই। এই দাবি—মামা গো ! আমার কান্না আসছে ! সর্ব্বনাশ কর্‌লে।

যজ্ঞে। অ্যাঁ অ্যাঁ ! সত্যি না কি !

নদে। আর সত্যি না কি ! তোমার ছোট জামায়ের নামে খোরাকীর নালিস করছো তো ? উকিলের চিঠি দিয়েছ ! তোমার ছোট জামাই খরচা দিয়ে নালিশ করাচ্ছে।

যজ্ঞে। তুই এ সব শুন্‌লি কোথা থেকে ?

নদে। কেন, তোমার ছোট জামাইয়ের বাগানেতে উকিল মোক্তার কৌন্সুলি, সব জুটে পরামর্শ কর্‌ছিল, আমি যেতেই তোমার ছোট জামাই হাত-নাড়া দিয়ে বল্‌লে—'নদেরচাঁদ, এইবার তোমার মামাকে কালাপানি খাওয়াব !' দিদি নিয়ে যেতে চিঠি লিখেছে, লোক আজই আসুক কি কালই আসুক। পাল্কী আস্‌বে, সারজন আস্‌বে, উকিল আস্‌বে, এসে নিয়ে যাবে।

যজ্ঞে। অ্যাঁ সত্যি ! সর্ব্বনাশী চিঠি লিখেছে ?

নদে। চুপ-চুপ চেঁচিও না ! চারিদিকে গোয়েন্দা পুলিশে খপর দে রেখেছে যে—তুমি মার্‌-ধর্‌ আরম্ভ করেছ।

যজ্ঞে। বরদা চিঠি লিখেছে ? বরদা তো আমার তেমন মেয়ে নয়। বাচাল মেয়ে তো নয়।

নদে। তা তুমি বোঝ মামা। আমি যা শুন্‌লুম তা বল্‌লুম। কিন্তু একটা তোমায় প্রমাণ দিই, ব্রত করবার নাম ক'রে তোমায় ঠেঙে কিছু চেয়েছে—সত্যি কি না, বল।

যজ্ঞে। অ্যাঁ অ্যাঁ ! ব্রত করবার নাম ক'রে চেয়েছে ?

নদে। বটে, ঠিক। এই দেখ উকিল-শিখানোতে টাকার দাবি করেছে।

যজ্ঞে। উকিল শেখালে কি ক'রে ? কেউ তো আমার বাড়ী আসে না।

নদে। মামা ! তুমি একলা মানুষ—ক'দিক দেখ্‌বে বল ? ঐ ব'দে দাদা রাত-দিন বলে, স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, দিদির ফের বে দেবে। হয় না হয়,তুমি দিদিকে ডেকে জিজ্ঞেসা কর।

যজ্ঞে। ব'দে ব্যাটা ভেতরে ভেতরে এই সর্ব্বনাশ করেছে। উকিলের চিঠি তো দিইচি বটে, নদে তো মিছে বল্‌ছে না ! দেখ্‌লে গিন্নি, দেখ্‌লে কেমন শান্ত মেয়েগুলি দেখলে ? বেটীদের জুতো পেটা করতে পারি, তবে রাগ যায়।

নদে। মামা ! কর কি, কর কি, মামীকে সরিয়ে দাও একটা পরামর্শ আছে—বলি শোন ! যাও, মামী, যাও, এখানে তুমি কি করছো ? আমরা পুরুষমানুষ, একটা পরামর্শ করছি, স'রে যাও।

বামা। যাচ্ছি বাছা, আমি তোমাদের এখানে থাক্‌তে চাই নি। (প্রস্থান)

যজ্ঞে। কি পরামর্শ বল্‌ দেখি ?

নদে। আমি একদিন উকিলকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, সে বল্‌লে মেয়াদ তো হবেই, তোমার হাতে তো টাকা নেই যে টাকা দিতে পারবে ? ওরা বল্‌ছে বটে—ব্যাঙ্কে জমা রেখেছ, কিন্তু তাতো আর নয়।

যজ্ঞে। ইস্‌ ! সব সন্ধান নিয়েছে ? এখন পরামর্শ কি বল্‌ না ?

নদে। তুমি দিদিকে আর সারদাকে খুব যত্ন ক'রো। সারদাকে বল্‌বে যে—তোর পতিভক্তি কেমন দেখ্‌ছিলুম। আর দিদিকে বল্‌বে—বাছা, তোমার মন বুঝ্‌ছিলুম তোমার বাপকে প্রত্যয় কি না। তারপর আমি আ'ছি, সব ঠিক ক'রে দেব ; দিন পাঁচ ছয় এই রকম করলে দি'দি আর যেতে চাইবে না। তা' হ'লেই সীতানাথ দত্ত বুঝ্‌বে যে আর কিছু করতে পারলুম না। তুমি ব'দে-দাদাকে বাড়ী ঢুকতে দিও না। যা বল্‌বে, আমি—

(বরদার প্রবেশ)

বর্‌। নদেরচাঁদ ! তুমি বাবাকে কি বল্‌ছো; কে নালিশ

করবে? আমি নালিশও করতে চাই নি, আমায় পাঠিয়ে দাও, আমি ভাশুরপোদের রাঁধুনী-বৃত্তি ক'রে খাইগে।

নদে। মামা! কেমন বলেছি—সব ঠিকঠাক!

যজ্ঞে। মা! তুমি বাপকে অবিশ্বাস কর! আমি কি তোমার টাকা দেব না! ছেলেমানুষ—খরচ ক'রে ফেল্‌বে।

বর। বাবা! আমার টাকা চাই না। আমার বে'তে বল্‌ছো খরচ করেছ—আমাদের জন্ম তোমার বাড়ী গিয়েছে, বাগান গিয়েছে, আমি বিধবা মানুষ; আমার আর দরকার কি? আমায় ভাশুরপোদের ওখানে পাঠিয়ে দাও। আমি সেইখানে থাকিগে।

যজ্ঞে। এই খেপা মেয়ে দেখ! রাগ করতে আছে?

বর। বাবা, আমার আর রাগ কিসের! যখন সিঁদুর মুছেছি, তখন তার সঙ্গে সব ঘুচিয়েছি।

যজ্ঞে। ছি মা! অত বড় মেয়ে! মন বুঝ্‌ছিলেম—তা বুঝ্‌তে পার না?

নদে। মামা, তুমি আমার হাতে গোটা পাঁচেক টাকা দিয়ে স'রে যাও। আমি সব ঠিক করছি, তুমি আর কথা কাটিও না।

যজ্ঞে। যা জানিস্ বাবা কর্। পাঁচটা টাকা হাতে নেই, দুটো টাকা নে। বরদা মা, আমি আস্‌ছি। আমি তোমার টাকা সুদে খাটাচ্ছি কি না। টাকাটা আদায় ক'রে সবই তোমায় দেবো। এই চাবি নাও, ভাঁড়ার থেকে চাল-ডাল বা'র ক'রে নে খাওগে। [প্রস্থান]

বর। নদেরচাঁদ! তুমি বাবাকে কি বল্‌ছিলে? আমার তো যা সর্ব্বনাশ হবার হয়েছে, আবার বাবার নামে নালিস করবো? আমার পোড়ার মুখ! ধিক্ জীবন! ছি তুমি অমন কথা মুখে আন!

নদে। নদেরচাঁদ, অমন কথা মুখে আন! পোড়ার-মুখি না বল্‌লে হয়!—তিন মায়ে-ঝিয়ে তো একাদশী করতে হ'তো! এই তো চাবি দিয়ে যাচ্ছিল—আমি আড়াল থেকে শুন্‌লুম, দেখ্‌লুম—মিছে কথা না কইলে আর উপায় নাই। যা উনুন জ্বালাগে যা, আমারও ভাত রাঁধিস্, আমি যাই এক টাকার বাজার ক'রে আনিগে।—আর এক টাকার কিছু নেশা-ভাঙ ক'রে আসি।

বর। ওমা! তুমি করলে কি! বাবার কাছে মুখ দেখাব কেমন ক'রে বল্ দেখি?

নদে। মুখ দেখাব কেমন ক'রে! দু' দিন না খেলে যে মুর্দ্দফরাসে মুখ দেখ্‌তো। দিদি, তুই বুঝ্‌ছিস্ নি, টাকা ক'টা না চাস্—মামি-মার নামে ক'রে দে, তোরাও খেয়ে বাঁচ্। দিন-কতক দাঁড়া, আমি জোট-পাট ক'রে দিচ্ছি। দেখি শালা সুরেশে হাড়ী সারদাকে কেমন পায় ধ'রে না নিয়ে যায়!

বর। তুমি যাকে ব'লে যাও, তুমি মিছে ক'রে-ক'রে বলেছ, তা নইলে আমি মার কাছে মুখ দেখাতে পারব না। মা আমায় কত বল্‌লে—মেয়ে হ'য়েছিস্ এই করতে—বাপকে জেলে দিতে! শুনে আমার গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে করলে।

নদে। তা চল, চল, আমি বল্‌ছি। (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বস্থি। আমি আমার মামাকে ডেকে দিচ্ছি, আপনাকে আমি মিনতি কচ্ছি—I conjure you—যে দিনকতক অপেক্ষা করুন, খোরাকীর নালিশ করবেন না। উন্নত-নারী-সমিতি থেকে শীঘ্রই Divorce Law-র জন্ম দরখাস্ত হবে, সেই Law pass হ'লেই আপনি Divorce suit file করবেন; first Hindu Divorce case আপনার হাত দিয়েই হবে। যেমন হ্যাট-কোট প'রে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন, তেম্‌নি হিন্দুদের মধ্যে Divorce suit প্রচলিত ক'রে দেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে আপনার নাম রেখে যান,—উন্নত-নারী-সমিতিতে আপনার নামে tablet থাকবে; তাতে লেখা থাকবে—Mr. R. C. Bose, the great Hindu Reformer.

আর। Well! I agree with you. Divorce suit না থাকাতে আমাদের একদিক্‌কার business একেবারে বন্ধ আছে—matrimonial side-এ কিছু হবার যো নাই। আমি উন্নত-নারী-সমিতিকে ধন্যবাদ দেব, যদি Law প্রচলন করতে পারেন। যে দেশে Divorce নেই, সে দেশে case-ই নেই—sensation-ই হয় না।

বস্থি। মশাই! আর বলবেন না, pathetic language-এ আমার হৃদয় দ্রবীভূত হচ্ছে—হে Divorce Law! তুমি তোমার পাশ্চাত্য আসন হ'তে বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হও! মশাই! তবে আমি নিশ্চিন্ত হলেম, আপনি Divorce-এর জন্ম অপেক্ষা ক'রে রইলেন—খোরাকীর নালিশ আর করবেন না।

আর। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যখন আপনার মতন দেশ-হিতৈষী যুবকগণ জন্মগ্রহণ করেছেন, যখন উন্নত-নারী-সমিতি সংস্থাপিত হয়েছে, Divorce suit ছড়াছড়ি যাবে। এ খোরাকীর নালিশেতেও মন্দ sensation হবে না। বোধ করুন—other side unchastity-ই defence নেবে। কিন্তু, family secrets থাকুক না থাকুক, উকিলের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হ'তে অনেক stories ত'য়ের হবে। আমি আপনাকে assure করছি যে, অন্ততঃ দু' মাসের food for scandal স্বচ্ছন্দেই পাবেন।

বঙ্কি। আপনি যে কথা বলছেন, তাতে আর কিছু সন্দেহ নেই। আমি জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখ্‌তে পাচ্ছি যে ভবিষ্যতে Divorce suit—black berries—অর্থাৎ কাল-জামের মতন ছড়াছড়ি যাবে। কিন্তু আমার আপ্‌শোষ যে—যদি আপনি খোরাকীর suit file করেন, তা হ'লে আমার family থেকে Divorce suit হ'লো না। মশাই! আমি আপনাকে জোড়হাত ক'রে বল্‌ছি, আপনি দয়া করুন। আমার কেউ নেই। এক মা—তিনি আবার বিধবা! আমার আশা-ভরসার মধ্যে দুটী মামাতো ভগ্নী! আমার হৃদয়ে অপর উচ্চ আশা নাই, কেবল হৃদয়ে এই মাত্র ভরসা যে—বিধবা ভগ্নিটীর পুনরায় বিবাহ দেব, আর সধবাটীর দ্বারা Divorce suit file ক'রে জীবন সার্থক করবো। মশাই! আমি kneel down হ'য়ে মিনতি করছি—আপনি আমার সে আশালতার উচ্ছেদ করবেন না!

(নদেরচাঁদের প্রবেশ)

নদে। মশাই! আমিও দৌড়ে এসে মিনতি করছি—আমার বড় মাসতুতো ভাইকে বড় আশায় নৈরাশ করবেন না!

বঙ্কি। বঙ্গদেশের মিনতি—উন্নত-নারী-সমিতির মিনতি—দেশহিতৈষী যুবকবৃন্দের মিনতি, গরীব আমির মিনতি ও সৎ মাস্তুতো ভাইয়ের মিনতি—

নদে। হে man!

বঙ্কি। নদেরচাঁদ! হে man নয়, Ah man বল। তোমার memory বড় dull!

নদে। হে man নয়, Ah man! Ah man সাহেব মোহিত হ'ন—চ'খে রুমাল দিন, দাদা বড্ড pathetic বলেছে।

আর। Idiots! তোমার মামা কোথায় ডাক—আমি আর মিথ্যা সময় অপব্যয় করতে পারি নি।

বঙ্কি। আপনি গালাগাল দেন, গালাগাল দেন, আরও গালাগাল দেন—strike but hear—

নদে। Hear hear!

আর। What nonsense this!

নদে। দাদা! একবার চক্ষু মিলে দেখ—কি চমৎকার! সাহেবী ভঙ্গী দেখ—কি মনোহর দাড়ী আঁচ্‌ড়ান দেখ—কি হৃদিবিদারক রুমাল-বের-করা দেখ! দাদা! বাঙ্গালী-সাহেব-কুলচূড়ামণিকে দর্শন কর।

আর। তুমি কি বল্‌ছো?

নদে। প্রভু! সাহেব-চিন্তামণি! কালমণি! ঘাড়-রুমানি! করুণা ক'রে কোটের পকেটে হাত দিয়ে সরগরম ভাবে দাঁড়ান—আমরা দুটী মাস্তুতো ভাই আপনাকে দর্শন ক'রে জীবন সার্থক করি, দাদা! দাদা! চেয়ে দেখ—মর্ত্তে বাঙ্গালী সাহেব বিরাজমান!

বঙ্কি। নদেরচাঁদ! আমার ভাব আস্‌ছিল—তুমি বড় প্রতিবন্ধক করলে। তুমি যদি বাঙ্গালী সাহেব-মূর্ত্তি না দেখে থাক, আমি তোমায় একশ আট দেখাতে পারতেম। কিন্তু যে ভাবের স্রোতে তুমি বাঁধ বেঁধে দিলে—gone, gone for ever!

নদে। দাদা! এইবার তোমার সঙ্গে ঝগড়া হবে! সাহেব দেখেছ সত্য, কিন্তু এমন সাহেব দেখেছ? আমি শপথ ক'রে বল্‌তে পারি—তুমি কখনই দেখ নি।

বঙ্কি। শোন নদেরচাঁদ! উনি আপনিই স্বীকার করছেন যে ওঁর মতন অনেক সাহেবই আছেন।

নদে। সে ওঁর বিনয়—সে ওঁর সভ্যতা—সে ওঁর ক্ষমা।

আর। কেন কেন—আমায় কি এমন দেখ্‌লেন?

নদে। কি দেখ্‌লেম—একমুখে কত বল্‌বো?

বঙ্কি। নদেরচাঁদ! চুপ কর, আমায় ভাব আন্‌তে দাও। আমায় Divorce suit-এর জন্য বক্তৃতা করতে দাও।

আর। আপনি তো বড় অসভ্য! উনি কি দেখ্‌লেন বলুন না, বাধা দেন কেন?

নদে। মশাই! আমায় কৃপা ক'রে বলুন, আপনি কোন্ বিলেত থেকে সাহেব হ'য়ে এসেছেন?

আর। My good friend! আমি বিলেতে যাই নি। আমি passage engage করেছিলুম; কোন বিশেষ কারণবশতঃ যাওয়া হয় নি।

নদে। ধন্য! আপনি ধন্য! আপনি—দাদা—হে man না কে man—কি আপনি—passage engage ক'রেই এই! "স রামঃ কিং করিষ্যতি!" বিলেত গেলে না জানি কি করতেন! আহা!—গলায় কি চমৎকার রুমাল বেঁধেছেন!

আর। Well, my friend! তুমি ঠিক ঠাউরেছ—ও আমি dresser রেখে শিখেছিলুম। এ রুমাল নয়! এরে বলে—neck-tie, latest Paris fashion এই! আর কি দেখ্‌ছ?

নদে। ওই বুড়ো-আঙ্গুল-চোষা! একেবারে চমৎকার! দাদা, দেখ।

বঙ্কি। নদেরচাঁদ! তুমি মূর্খতা প্রকাশ করছো! বুড়ো আঙ্গুল অমন সকলেই চোষে।

আর। তুমি নিতান্ত অসভ্য!

(যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ)

যজ্ঞে। তবে রে ব'দে! তুমি আমার মেয়ের বিধবা-বে' দেবে?

বঙ্কি। মামা, জীবনের আমার একমাত্র আশা, আর এক আশা খোরাকীর নালিশ হ'তে দেবো না।

যজ্ঞে। তবে রে পাজী! বেরো আমার বাড়ী থেকে।

বঙ্কি। বেরুচ্ছি, আমি প্রস্তুত আছি, এই দণ্ডেই বেরুতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমার দুঃখিনী ভগিনীদিগের সঙ্গে ল'য়ে যাব, উন্নত-নারী-সমিতির মেম্বর ক'রে দেবো, দুই ভগ্নীর দুই নব স্বামী প্রদান ক'রে বঙ্গকুল-মহিলার মুখ উজ্জ্বল করবো!—এই আমার প্রতিজ্ঞা! যদি সুমেরু হতে কুমেরু পর্য্যন্ত একত্রিত হয়, তথাপি আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হবে না!

নদে। দাদা! থেমো না—বড় রকম বক্তৃতা ধর।

বঙ্কি। ধরছি, কোটেসনের সঙ্গে ধরছি।

Romans! Countrymen and friends!

যজ্ঞে। বেরো, পাজী ব্যাটা, বেরো। দরওয়ান, দরওয়ান—

নেপথ্যে। (মহারাজ)

যজ্ঞে। তুমি মনে করেছ বুঝি—বুড়ো মামা, বাড়ীতে যা মনে করবে, তাই করবে? আজ বাড়ীতে দরোয়ান বসিয়েছি, দেখ্‌বো কেমন কোরে বাড়ী ঢোকো?

বঙ্কি। Bleed bleed poor country!

(দরওয়ানের প্রবেশ)

যজ্ঞে। নিকাল দেও, পাজীকো নিকাল দেও।

দর। চল বাবু, বাহার চল।

বঙ্কি। Not in the legions of horrid hell can come a devil more damned! নদেরচাঁদ! দেখ, এখন আমি ম্যাক্‌বেথ থেকে কোট করছি। মামা! তুমি তাড়াও, তাতে আমার দুঃখ নাই। একটা লেক্‌চার শুনে তাড়ালে না—এতেই আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে, মামা! আমার কোটেসনের মানে বোঝ—নরকধামে তোমার মত একটীও ভূত নাই। (প্রস্থান)

যজ্ঞে। নচ্ছার বেটা!

আর। এটী আপনার কে?

যজ্ঞে। আমার ভগ্নীর তেলক ভাগ্‌নে।

আর। আপনাকে আমি ব'লে পাঠালুম যে—কেউ বাজে লোক না থাকে।

যজ্ঞে। আরে মশাই! আমি কি করবো শোনে নি তো! বেটা লুকিয়ে লুকিয়ে এসে আমার মেয়েকে বলে—বিধবা-বে দেবে। ছোট মেয়েটাকে ক্ষেপিয়েছে—সে সই করতে চায় না।

আর। আরে নেই সই করতে চাইলে। এটি কে?

যজ্ঞে। নদেরচাঁদ! তুমি এখন এস।

নদে। সাহেব! সেলাম। (প্রস্থান)

আর। এটি বড় শিষ্ট শান্ত! নেই সই করতে চাইলে—তাতে কি এসে গেল! একটা যার তার সই ক'রে দাও না—মোকদ্দমা ত চলুক।

যজ্ঞে। আমি সুরেশবাবুর দেওয়ানের ঠেঁয়ে আঁচ পেয়েছি, রফা করবে। তা হ'লে এতদিন আমি মোকদ্দমা চালাতুম। আর আমি কিছু বলি নি।

আর। বটে! তা বলেন নি কেন, আপনাকে এফি-ডেভিট্‌ ক'রে বল্‌তে হবে যে, এ মেয়ের সই।

যজ্ঞে। মশাই! এফিডেভিট্‌ করবো, পরে যদি প্যাঁচে পড়ি?

আর। তুমি ফুল! তোমার মেয়ে তোমার বাড়ীতে রয়েছে, রীতিমত উকিলের চিঠি দেওয়া হ'য়েছে, দস্তুর-মোতাবেক মোকদ্দামা চল্‌বে, কে জান্‌তে আস্‌ছে বল দেখি যে—তোমার মেয়ে সই করে নি? কায়েতের ছেলে মোকদ্দামা করবে—একটু বুদ্ধি চাই!

যজ্ঞে। যে আজ্ঞা, যে আজ্ঞা, আপনারা না মতলব দিলে আমরা মতলব কোথা পাব?

আর। আমি কোন মতলব দিচ্ছি নি। আমি কিছু জানি নি।

(নদেরচাঁদের প্রবেশ)

নদে। মামা, এদিকে তুমি ব'সে, ওদিকে সীতানাথ দত্তের মোক্তার এসেছে, তুমি এমন সময় বাড়ী থাকবে না মনে ক'রে দাদা তাকে ডাকিয়েছিল, চুপি চুপি দিদির সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যাবে।

যজ্ঞে। কোথায় সে?

নদে। এই ঘরেই আস্‌ছে, জানে না তো তোমরা আছ।

(বিধুমৌলি মজুমদারের প্রবেশ)

বিধু। মশাই! বঙ্কিনাথবাবু কি আছেন?

নদে মামা এই, উনিই যজ্ঞেশ্বরবাবু! তোমার শ্বশুর হবেন নমস্কার করগে। (প্রস্থান)

যজ্ঞে। কারে খুঁজছো?

বিধু। বঙ্কিনাথ বাবুরে, আপনারেও খুজি, আপনার কন্যারেও খুজি, এ বারীর সকলেরেই খুজি।

যজ্ঞে। বঙ্কিনাথ বাবুকে খুঁজছো কেন?

বিধু। খুজি,—কিছু কারণ আছে।

যজ্ঞে। বটে, আমার মেয়ের সঙ্গে দেখা করবে?

বিধু। হঃ! লাজে কেমনে বলি, হবু শ্বশুর মশাই! প্রণাম হই।

যজ্ঞে। তবে রে নচ্ছার পাজী! তোমার আমি শ্বশুর।

বিধু। হবেনই তো, আপনার বড় কন্যারে তো বিবাহ করবো।

যজ্ঞে। শুনুন, মশাই! শুনুন! বাড়ীতে ব'সে গালাগাল শুনুন।

বিধু। গাল কিসের? আপনার আমি সকরে জামাতা.—আপনার কন্যার আমি কোর্টসিপ করবার আইচি—

আর। আপনি কে?

বিধু। আজ্ঞা বিধুমৌলি মজুমদার student of ঢেকা আপনকাররা যেমন জেণ্টলমেনস্, এ শর্ম্মাও তেমনি জেণ্টল মেনস্, কম্‌তি কিসে? আমারও কোট-পেন্‌টুলেন আছে, নেটীভ লেডির কাছে আইচি, তাই—কামিজ এঁ্যাটে আইচি, আপনি চোখ দেখান কিসে?

আর। তুমি জান, তুমি জেন্‌টুলম্যানের বাড়ী trespass করছো? Breach of peace provoke করছো।

বিধু। স্পিচ? বক্তৃতা? আমিও স্পিচ দেবার পারি।

আর। তুমি ভদ্রলোকের বাড়ীতে ভদ্রলোকের কন্যার scandal কর্‌তে চাও? তুমি জান আমি যজ্ঞেশ্বরবাবুর legal representative.

বিধু। আপনিও কি যজ্ঞেশ্বরবাবুর কন্যার উমেদার? আপনার সাথে আমি ঘুসি লড়তে চাই, ডুয়েল লড়তে চাই।

আর। কি, তুমি আমায় মেরে ফেল্‌তে চাও?

বিধু। হঃ মেরে ফ্যালবারে চাই।

আর। আর আমাকে বা এঁরে কিছু গালাগালি দিতে চাও?

বিধু। উনি হবু শ্বশুর, ওরে প্রণাম করবার চাই। আপনারে পাজি বল্‌বার চাই।

আর। জোচ্চোর, বদমায়েস—এই সব বলতে চাও না?

বিধু। হঃ, বল্‌বার চাই।

যজ্ঞে। দরওয়ান, দরওয়ান, নিকাল দেও।

[দরওয়ানের প্রবেশ]

দর। খোদাবন্দ হাজির হো।

যজ্ঞে। পাজিকো গর্দানা দেকে নিকাল দেও!

বিধু। শ্বশুর মশাই, অপমান কর্‌বান্ না, আমি যাইচি, জেণ্টলম্যান্‌স্ সন্ জেণ্টলম্যান। অপমান কর্‌বান্ না, যাইচি। (প্রস্থান)

যজ্ঞে। দরওয়ান, তোমায় না আমি বারণ করেছি! ওকে বাড়ী ঢুকতে দিলে কেন?

দর। খোদাবন্দ, ও নে জামাই কহেলায়া, হামকো ক্যায়া মালুম?

যজ্ঞে। যাও।

[দরওয়ানের প্রস্থান]

আর। আপনি ভারি অন্যায় করলেন। ও আরও কিছু গালাগালি দিয়ে গেলে ভাল হ'তো, মারতে এলে আরও ভাল হ'তো। এতে বেশি damage হবে না।

যজ্ঞে। মশাই, damage কিসের?

আর। গালাগালি দিলে, খুন করতে চাইলে, এতে damage হবে না?

যজ্ঞে। আপনি কি তাই গালাগালি খাচ্ছিলেন?

আর। তা না তো কি? হাতে কাজ-কর্ম্ম নেই; কাজ-কর্ম্ম create করতে হবে, তবে চল্‌বে। নইলে আপনাকে মোকদ্দমা file করতে অত জেদ করছি কেন? আপনার জামাই ভারি রাগী; আমি মনে করছি, suit file-এর পর তাঁর মোসাহেবকে কিছু দিয়ে খুব রাগিয়ে দেব, যাতে তিনি তোমায় কি আমায় ধরে একদিন চাবুক মারেন। খুন করতে আসেন, তাহলে আরও ভাল হয়। attempt of murder charge হয়। অন্ততঃ লাখ টাকার কম রফা হবে না। আপনাকে এই শিখিয়ে দিচ্ছি, আপনারও হাত থাকতি, আর আমার হাতেও কাজ-কর্ম্ম নাই, গালাগালি খেয়ে, মার খেয়ে গোটাকতক criminal case সৃষ্টি করতে পারেন যদি তা হলে—আমাদের অবস্থা ফিরে যাবে। আপনি power of attorney'টা নিয়ে যেতেই যান। কিছু না, একটা ঢেরা দিয়ে এক এফি-ডেভিট করলেই চুকে গেল। [প্রস্থান]

যজ্ঞে। ওমা, বেটা বলে কি গো! টাকা ভালবাসি বটে, তাই বলে কি খুন হবার চেষ্টা করব?

বিল্বমঙ্গল—চিন্তামণি*

বিল্বমঙ্গল

এক

কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় তাঁহার 'নাটকত্ব' নামক প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন, "ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকের গল্প অগ্রসর হয়। নাটকীয় মুখ্য চরিত্র কখনও সরল রেখায় যায় না। জীবন একদিকে যাইতেছিল, এমন সময়ে ধাক্কা পাইয়া তাহার গতি অন্যদিকে ফিরিল; পুনরায় ধাক্কা পাইয়া আবার অন্যদিকে অগ্রসর হইল—নাটকে এইরূপ দেখাইতে হইবে। * * * ফলতঃ, সুখের ও দুঃখের বাধা ও শক্তি, চরিত্র ও বহির্ঘটনার সংঘর্ষণে নাটকের জন্ম। যুদ্ধ চাই, তা সে বাহিরের ঘটনাবলির সহিতই হউক কিংবা নিজের সঙ্গেই হউক। অন্তর্দ্বন্দ্ব যে নাটকে দেখানো হয়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক; এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সব মহানাটকে আছেই আছে। প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সংঘাতে তরঙ্গ না উঠাইতে পারিলে, কবি জমকালো রকম নাটকের সৃষ্টি করিতে পারেন না। যে নাটক বৃত্তি-সমূহের যুদ্ধ দেখায়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক। বিপরীত বৃত্তিসমূহের সমবায় দেখানো অপেক্ষাকৃত দুরূহ ব্যাপার; এখানে নাটককারের কৃতিত্ব বেশী। যিনি মনুষ্যের অন্তর্জগৎ উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে পারেন তিনিই প্রকৃত দার্শনিক কবি। বল ও দৌর্ব্বল্য, জিঘাংসা ও করুণা, জ্ঞান ও অজ্ঞান, গর্ব্ব ও নম্রতা, ক্রোধ ও সংযম—এক কথায়, পাপ ও পুণ্যের সমাবেশে প্রকৃত উচ্চ অঙ্গের নাটক হয়। ইহাকেই আমি অন্তর্বিরোধ বলিতেছি। মানুষকে একটি শক্তি ধাক্কা দিতেছে, আর একটি শক্তি ধরিয়া রাখিতেছে, অশ্ব-চালকের ন্যায় কবি এক হস্তে চাবুক মারিতেছেন, অপর হস্তে রশ্মি ধরিয়া টানিয়া রাখিতেছেন, এইরূপ কবিই মহাদার্শনিক কবি।" আমাদের আলোচ্য গিরিশচন্দ্রের—"বিল্বমঙ্গল ঠাকুর" নাটক প্রকাশের পঁচিশ বৎসর পরে রায় মহাশয়ের ঐ লেখাটি "সাহিত্য" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু রায় মহাশয়-বর্ণিত নাটকের ঐ সমস্ত গুণগুলিই যেন বিল্বমঙ্গল নাটকে হুবহু অনুস্যূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অতএব কেহ যদি এমন অনুমান করেন যে, দ্বিজেন্দ্রলাল বিল্বমঙ্গল নাটক পড়িয়াই তাহাতে মহানাটক এবং মহাদার্শনিক কবির সমস্ত পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া নাটকত্বের এরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইলেও খুব দৃঢ়তার সহিত তাঁহার অনুমান ভ্রান্ত বলিতে পারা যায় না। কিন্তু বাস্তবিক কথা উহা নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের বিবৃতি এমনই সত্য-সন্ধী যে, কোনও উৎকৃষ্ট মহানাটকের পক্ষেই প্রযোজ্য এবং সেইজন্য বিল্বমঙ্গল নাটক পড়িলেও পাঠকের ঐরূপ ধারণা হওয়া বিচিত্র নহে। বস্তুতঃ, আমাদের বিল্বমঙ্গল নাটকের এই আলোচনা যতই অগ্রসর হইবে, আমরা ততই দেখিতে পাইব যে, ইহাতে দ্বিজেন্দ্র-লাল-উল্লিখিত ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, চরিত্র ও বহির্ঘ-টনার সংঘর্ষণে অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সংঘাতে তরঙ্গ, বিপরীত বায়ুর সংঘাতে ঘূর্ণীঝটিকা, বৃত্তিসমূহের যুদ্ধ, বিপরীত বৃত্তিসমূহের সমবায় বা সমাবেশ এবং মনুষ্যের অন্তর্জগৎ উদ্ঘাটন করিয়া তাহার অন্তর্বিরোধের বিবিধ চিত্র প্রদর্শন—সমস্তই অবিকল যথাযথ ভাবেই আছে। অধিকন্তু ইহাতে আরও যাহা আছে তাহাতেই বিল্বমঙ্গল নাটককে সাহিত্য জগতে অতুলনীয় করিয়া রাখিয়াছে। বৈষ্ণব মহাভাব রসতত্ত্বের সারাংশ সংকলন করিয়া গিরিশ-চন্দ্র ইহার নাটকীয় চরিত্রের সহিত এমন মনোহরভাবে গাঁথিয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে নাটকীয় রসের কোনও রূপ অন্তরায় সৃষ্টি না করিয়া অতি উচ্চাঙ্গের এক অতীন্দ্রিয় বৈষ্ণব দর্শন যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। অন্তর ও বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাত মুখে এমন নাটকীয় আরম্ভ ও কৃষ্ণদর্শনে নাটকের এমন সার্থক পরিণতি অতি অল্প নাটকেই দেখা যায়। বিল্বমঙ্গল সেই যে প্রথম দর্শনেই মুখ দিয়া উচ্চারণ করিল—"আমি দেখে নোবো, দেখে নোবো, দেখে নোবো"—তাহার এই তিন সত্যের সার্থকতা সম্পাদন শেষ পর্য্যন্ত সে না করিয়া নিবৃত্ত হইল না। বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে দেখিয়া লইল, বণিক্ পত্নী অহল্যাকে দেখিয়া লইল এবং সর্ব্বশেষে রমণী-মোহন শ্রীশ্রীরাধামাধবকেও দেখিয়া লইল। চিন্তামণিকে দেখিল রমণীরূপে, অহল্যাকে দেখিল প্রথমে রমণী পরে জননীরূপে আর রমণী ও জননী দোঁহে মিশাইয়া যাঁহাকে দেখিল, তিনি রমণীমোহন—কাম-ভক্তি-প্রেমের ত্রিভঙ্গ শরীরিমূর্ত্তি অপূর্ব্বদর্শন শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ শ্যাম। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব একদা গিরিশচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা গিরিশচন্দ্র-চিত্রিত বিল্বমঙ্গল সম্বন্ধেও প্রযোজ্য—"ওর থাক্ আলাদা। যোগও আছে, ভোগও আছে, যেমন রাবণের ভাব—নাগকন্যা দেবকন্যাও লেবে, আবার রামকেও লাভ করবে।" বস্তুতঃ, গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্ম-জীবনের অনেকাংশ এবং তাঁহার অতুল গুরুভক্তি এই বিল্বমঙ্গল সৃষ্টিতে প্রতিফলিত হইয়াছে—আমরা যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব। এইখানে শুধু আর একটি কথা

* ছয়টি স্তবকে সম্পূর্ণ লেখকের "বিল্বমঙ্গল—চিন্তামণি" নামক আলোচনা-গ্রন্থের প্রথম ও শেষ স্তবক দুইটি এই স্মৃতি-সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। সমগ্র রচনা শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।

বলিয়াই আমরা নাটকের মূল আলোচনা আরম্ভ করিতেছি।

হিন্দুর পুরাণ পাঠের একটা শিক্ষা আছে। ভগবানকে দুইভাবে লাভ করিতে পারা যায়—এক মিত্র ভাবে, আর এক শত্রুভাবে! মিত্রভাবে লাভ করিতে হইলে সাতজন্ম লাগে, শত্রুভাবে লাভ করিতে তিনজন্মেই হইয়া যায়। মিত্রকে আমরা যতই ভালবাসি না কেন, শত্রুকে যেমন সর্ব্বক্ষণ ষোল আনা মনের আড় করিতে পারি না, মিত্রকে ততটা নহে। এই হরিকে সর্ব্বদা "অরি" "অরি" করিতে করিতে অনতিবিলম্বেই হরি মিলিয়া যায়। এই ভাবটাই গিরিশচন্দ্র নিরতিশয় নিপুণতার সহিত তাঁহার "প্রহ্লাদ-চরিত্র" নাটকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ষড়্‌রিপুর দ্বিতীয় রিপু ক্রোধ এমন করিয়াই হিরণ্যাক্ষ—হিরণ্যকশিপু, রাবণ—কুম্ভকর্ণ ও দন্তবক্র—শিশুপালকে তিনজন্মে বৈকুণ্ঠ-ধামে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। আর, প্রথম রিপু- কামের লীলাটাই এই বিল্বমঙ্গলে প্রকট হইয়াছে। কামের লীলায় যতটা আটু-বাটু হয়, যতটা নিবিড় ঘনিষ্ঠতা হয়, ততটা বুঝি ক্রোধের খেলাতেও জমিয়া ওঠে না। আবার পরকীয়াতে এই জমাট ভাব আরও জম্ জম্ করিয়া ওঠে। একদণ্ড ছাড়ান নাই—অনন্যমনে সেই চিন্তা, তাহারই লালন, তাহারই পালন, তাহারই মনন, "রন্ধনশালায় যাই, তুয়া বঁধু শোন গাই, ধুঁয়ার ছলনা করে কান্দি।" ক্রমে, এই কাম ঈশ্বরে অর্পিত হইলে, ভক্তির সঞ্চার হয়, আত্ম-চিন্তার বিলোপ হয়, আত্ম-বিসর্জ্জনে পরমাত্মার সাক্ষাৎ-কার হয়, "নাহম্ নাহম্" হইতে "তুঁহু-তুঁহু-তুঁহু" আসে — "মান-অপমান, সুখ-দুঃখ নাহি জ্ঞান, কৃষ্ণে চায় কিবা হেতু কিছু নাহি জানে। ব্রজের এ প্রেম, তুলনা নাহিক আর তার।" তবে স্বকীয়াতে কি এতটা হয় না? হয়, তবে একটু দেরী করিয়া হয়—"চুলে পাক" ধরিলে হয়। সে-কথাও এই নাটকে আছে—বণিক-বণিকপত্নীর চিত্রে। স্বকীয়া যেন মিত্রভাব, আর পরকীয়া শত্রুভাব—এইটুকুই তারতম্য। পরম ভাগবত গিরিশচন্দ্র এই সকল কথাই বিল্বমঙ্গল নাটকে কখনও বা স্পষ্টভাবে, কখনও বা ইঙ্গিতে অতি সুন্দরে মধুরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই নাটকের উপা-খ্যানভাগ যদিও ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তথাপি এই সকল মৌলিক ভাবসৃষ্টি নাট্যকার গিরিশ-চন্দ্রেরই কীর্ত্তি। ভক্তমাল গ্রন্থে বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি, বণিক, বণিক-পত্নী, সন্ন্যাসী সোমগিরি এবং রাখালবালক, সর্ব্বশুদ্ধ এই ছয়টী পাত্র-পাত্রীর ভিতর দিয়া "বিল্বমঙ্গল মহাশয়ের" জীবন-কাহিনী বিনা আড়ম্বরে সরল পয়ার ছন্দে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নাটকের সাধক, থাকমণি, ভিক্ষুক ও পাগলিনী গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব সৃষ্টি। শুধু "নিজস্ব" বলিলেও কিছু বলা হয় না, নাটকীয় সৃষ্টি হিসাবে ইহাদের তুলনা ইহারা নিজেই, অন্যত্র ইহাদের তুলনা পাওয়া ভার। ভাবের দিক দিয়া পাগলিনী আবার সকলকে উঁচাইয়া গিয়াছে। ভক্তমালের ছয়টী এবং নিজস্ব চারিটী এই মোট দশটি চরিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিরিশচন্দ্র যে নাট্যপ্রতিমা রূপে-রসে-ভাবে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন তাহার ছায়ামাত্রও মূল ভক্তমাল গ্রন্থে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

দুই

বিল্বমঙ্গল অভিভাবকহীন ধনাঢ্য যুবক। চিন্তামণি সাধারণ বারাঙ্গনা। থাকমণি চিন্তামণির বাটীর ভাড়াটিয়া। বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির প্রণয়ে আসক্ত। একদিন রাত্রিকালে থাকমণি বাটীতে ছিল না, চিন্তামণি খাইতে বসিয়াছে, বাটীর দ্বার খুলিয়া দিবার দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন উপস্থিত ছিল না বলিয়া বিল্বমঙ্গলকে বাহিরে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। বিল্বমঙ্গল মনে করিল, তাহার সেদিন আসিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া চিন্তামণি ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে বাহিরে দুপুর রাত্রি পর্য্যন্ত অযথা অপেক্ষা করাইয়া রাখিল। ইহা লইয়াই মনান্তর, প্রণয়-কলহ। প্রণয়ী সমস্ত রাত্রি জাগিয়া গজ গজ করিতে লাগিল কিন্তু প্রণয়িনী সেই যে পাশ ফিরিয়া শুইয়া রহিল, একটি মিষ্ট কথাও কহিল না। শেষ রাত্রে বিল্বমঙ্গল অভিমানে চিন্তামণিকে না বলিয়া চলিয়া আসিল; ইচ্ছা—আর তাহার মুখদর্শন করিবে না। কিন্তু চলিয়া আসিয়াও পরিত্রাণ নাই।—কে যেন তাহাকে গলায় গামছা দিয়া চিন্তামণির পানে টানিতেছে।

"বিল্ব। যদি কখন দেখা হয়, দুটো কথা শুনিয়ে দেবো, কড়া নয়, মিষ্টি! না ব'লে আসাটা ভাল হয় নি—মিষ্টি মুখে বিদেয় নিয়ে এলেই হোতো"...

"চিন্তামণি। ওলো থাকি, দেখ, পেছনের ঐ ঝোপের ভেতরে এসে মড়া লুকুচ্চে!"

"বিল্ব। দেখ, বেটীর মনে একটুও দুঃখ নেই, হাস্‌চে?...দেখা হোলো ত একটা কথা ব'লে যাই—যত হাসি তত কান্না, ব'লে গেছে রামশর্ম্মা!...দেখ, চিন্তামণি, মনে বড় দুঃখ রইল!"

"চিন্তা। থাকে থাক্, রাগ করিস্ নি; চল্, বাড়ী চল্।"

"বিল্ব। না আমার আজ বাপের শ্রাদ্ধ, বেলা হ'য়ে গেছে।"

চিন্তা। "তবে আর দেরী করিস্ নি যা; বলে যা, রাগ নেই।

বিল্ব। "না রাগ কিসের?

চিন্তা। "সন্ধ্যাবেলা আস্‌বি ত? না আজ আবার বুঝি নদী পেরুতে নাই?

বিল্ব। "না আজ আর আসছিনি; নদী পেরুতে নাই, তা আস্‌বো কেমন করে?

চিন্তা। "তা না আসিস্, কাল সকালবেলা একবার আসিস্, মাথা খাস্।

বিল্ব। "সকালে কি আর আসা হয়?

চিন্তা। "দেখ্‌চিস্ লা থাকি, তোর ভদ্দর লোক! আজ যাবেন, সমস্ত রাত্তির দেখা পাবো না, কাল সকালে আস্‌তে বল্‌চি, বলে—'সকাল বেলা কি আসা হয়?' আর ওঁর শরীরে রাগ নেই! রাগ নেই বটে আমাদের শরীরে, যখন যা হয় ব'লে ফেলুম।

বিল্ব। "সকালে কি করে আসি? এ কি রাগের কথা?"

[বিল্বমঙ্গল চলিয়া গেল

থাক। "বুঝি এখনও রাগ পড়ে নি। বাড়ী নে গেলে না কেন?

চিন্তা। "না করুক গে, বাপের শ্রাদ্ধ করুক গে। বাড়ী নিয়ে গেলে কি আর যেতো? আর বাছা একটা রাত জুড়ুই। যেন কয়েদখানা। কাছ থেকে নড়তে দেবে না; সমস্ত রাতটে ভ্যান্ ভ্যান্, মাথামুণ্ডু নেই—খালি, ভালবাসি, ভালবাসি, ভালিবাসি! আরে ভালবাসিস্ ত আমার কি মাথা কিনিছিস্?"

কথার পৃষ্ঠে সামান্য দুই চারিটা কথা—কাব্যি নাই, উচ্ছ্বাস নাই, জোছনা-মোছানো এলায়িত বাক্যির বাহার নাই, কিন্তু যাহা আছে তাহা অসামান্য। নাটকীয় চরিত্র-সৃষ্টির যাহা প্রাণ তাহা উদ্ধৃত ছত্রগুলির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। প্রতিমাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা না হইলে প্রতিমা জীবন্ত হইয়া পূজা গ্রহণ করিয়া কাম্য ফল প্রদান করেন না।

বিল্বমঙ্গলের জোরকরা রাগের তেজ চিন্তামণিকে দেখিবামাত্র ঘাড়ভাঙ্গা হইয়া পড়িতেছে, চিন্তামণি হাকিমের সম্মুখে যেন অপরাধী আসামী জীবন মরণ রায়ের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে, 'ভালবাসা' যাহার কাছে গালা-গালির নামান্তর মাত্র, সেই থাকমণির কাছে, চিন্তামণিও তাহার অনুরাগ ঢাকিতে গিয়া মাঝে মাঝে বে-সামাল হইয়া পড়িতেছে। নাটকীয় ক্রিয়া এইরূপ কথা কাটা-কাটির ভিতর দিয়াই নায়ক-নায়িকার স্বরূপ প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়াছে। রামশর্ম্মা নাট্যকার কিন্তু এবারেও বিল্বমঙ্গলের মুখ দিয়া চিন্তামণিকে শুনাইয়া রাখিলেন—'যত হাসি তত কান্না!' কথাটা ঠিক ফলে নাই কি?

[বিল্বমঙ্গল যাইতে যাইতে আবার ফিরিল]

চিন্তা। ওই দেখ, আবার আস্‌চে।

বিল্ব। দেখ, আজ রাত্তিরে আমি আর আস্‌তে পারিব না, আমার কাপড় ক'খানা গুছিয়ে রেখো।

চিন্তা। শুন্‌লি, শুন্‌লি? আমি কি কাপড় মাঠে ফেলে রাখি?

বিল্ব। তাই বল্‌চি। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর ঐ টিয়ে পাখীটাকে দু'টী ছোলা দিও। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর একদিকে একটু জল।

চিন্তা। না দেবো না; ঘাড়টা মুচ্‌ড়ে মেরে রাখবো।

বিল্ব। তা' তুমি পার, তাই বল্‌চি। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর, যদি সীস্ দেয় ত' দিতে বোলো।

চিন্তা। বলি যাও না, কখন শ্রাদ্ধ করবে? কখন খাওয়া-দাওয়া করবে? বেলা আর কি হয় না?

বিল্ব। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর ঐ ম্যাড়াটাকে দু'টি দানা দিও। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর, শিং ঘষে ত' বারণ কোরো না; আমি চল্লুম।

চিন্তা। দাঁড়াও না, আমিও নদীতে যাব। কাল সকালে আস্‌বে ত'?

বিল্ব। "দেখি।"

উপরি-উদ্ধৃত অংশ সমগ্র উদ্ধার করিয়া না দিলে নাটকের পটভূমির রং ধরা পড়ে না। যাহাকে চিন্তামণি-দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় দুরন্ত নদীতরঙ্গে ঝাঁপ দিতে হইবে, কাষ্ঠ-ভ্রমে গলিত শব আলিঙ্গন করিতে হইবে, রজ্জুভ্রমে কালসর্প অবলম্বন করিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে হইবে, পাঁচ-ছয় ঘণ্টা অদর্শনের পর চিন্তামণিকে অমন করিয়া দেখিতে ঘুরিয়া-ফিরিয়া তাহাকে পাঁচ-ছয় বার দেখিতে হইবেই ত'। "নয়ন না তিরপিত ভেল"—দেখিয়া-দেখিয়া-দেখিয়া-দেখিয়া আশা যে আর মেটে না। ইহা রূপোন্মাদের প্রথম স্ফুরণ। উদ্ধৃত অংশটি হাল্কাভাবে পড়িতে পড়িতে বা উহার অযোগ্য অভিনয় দেখিতে দেখিতে, সাধারণ পাঠক বা দর্শকের মনে হাস্যরসের সঞ্চার হইতে পারে—কিন্তু রসিকজনের চক্ষু উহার অনুধ্যানে অশ্রুসিক্ত হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা। চিন্তামণির হয় ত' বিল্বমঙ্গলের রকম-সকম দেখিয়া প্রথমে হাসি আসিতেছিল কিন্তু ক্ষণপরেই বুঝিল, ইহা হাসির বস্তু নহে। তাই সে বলিল,—"দাঁড়াও না, আমিও নদীতে যাব,"—নতুবা তাহাকে ফেলিয়া বিল্বমঙ্গল যে যাইতে পারিতেছে না—রমণী-হৃদয় বারাঙ্গনার আধারে বাস করিলেও তাহা বুঝিয়াছিল। শুনিতে পাই, বারাঙ্গণারা না কি প্রভাতসূর্য্যের প্রস্ফুট আলোকে অতি

বড় কামুকেরও উপর রূপের মোহ বিস্তার করিতে পারে না। কিন্তু তখন বোধ করি এক প্রহরেরও অধিক বেলা হইয়াছে, অথচ রূপ দেখিয়া বিল্বমঙ্গলের আঁখি আর ভরিতেছে না। ইহা কি শুধুই কামুকের রূপ-লালসা? পিতৃশ্রাদ্ধের ক্ষণ বহিয়া যাইতেছে—তাহাও স্মরণে আসিতেছে। কাম এখনও সর্ব্বগ্রাসী হয় নাই কিন্তু মহাভাবের পথে চলিতে আরম্ভ করে নাই কি? মহামায়া আর কি থাকিতে পারেন, এইবার মায়ার আবরণ ভেদ করিয়া পথ দেখাইতে তাঁহাকে আসিতে হইবে বৈ কি! তিনি আসেন, কিন্তু কেন আসেন, তাহা জানি না। বিদ্যাসুন্দরের বেলাতেও আসিয়াছিলেন, বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণির বেলাতেও আসিয়াছিলেন। বুঝি বা সব ছাড়িয়া শব হইলে, সতীর পদতলে পতিত পতিকে মনে পড়ে।

তিন

নাটকের প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক একটি ক্ষুদ্র দৃশ্য। পরবর্ত্তী দৃশ্যে রঙ্গমঞ্চের উপর নদীতরঙ্গ দেখাইতে হইবে, তাই রঙ্গমঞ্চের ভাষায় তৎপূর্ব্বে একটি ছোট-খাটো cover sceneএর প্রয়োজন। এই ক্ষুদ্র দৃশ্যটি সেই জন্য সংযোজিত হইয়াছে। কিন্তু দৃশ্য ক্ষুদ্র হইলেও ইহার ভিতর অদৃশ্য যাহা রহিয়াছে, তাহার নাটকীয় মূল্য ক্ষুদ্র নহে। বিল্বমঙ্গলের হৃদয় চাক্ষুষ হইল না বটে কিন্তু তাহার আলোড়ন হৃদয়-গোচর হইল।

পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে বসিয়া পুরোহিত ঠাকুরের মন্ত্র পড়াইবার ধূম তাহার ভাল লাগিতেছে না। সন্ধ্যা হয় হয়, সমস্ত দিন উপবাস কিন্তু চিন্তামণির জন্য প্রাণ আনচান করিতেছে। চিন্তামণি একটা রাত সময় দিয়াছে বটে, কিন্তু "মাথা খাস্" বলিয়া দিব্য দিয়াছে—সকালে যাইতে হইবে। সকাল বেলা যদি কোনও বাধা পড়ে, আর একটা রাতই বা কি কম? সে স্ত্রীলোক একলা থাকিবে, তারও প্রাণ এমনই আনচান করিবে। ওদিকে ব্রাহ্মণ-ভোজন হইতেছে, এইবার ছল করিয়া সরিয়া পড়িতে হইবে। এখন আর খাওয়া হইবে না, বিলম্ব হইয়া যাইবে—চিন্তামণির সঙ্গে একসঙ্গে খাইলেই হইবে। পাঁচ চেঙারী খাবার চাই—চিন্তামণির, থাক, থাকর মাসী, "চিন্তামণির আর একখানা—চার, ও তিনখানাই ধর, পাঁচ।" চিন্তামণি খাইবে! আশ আর মিটে না। নিজে সঙ্গে খাইবে বলিয়া তিন নহে, চিন্তামণি, "চিন্তামণি" বলিয়াই তিন। যাহাকে সর্ব্বস্ব দিয়াও আশ মিটে না, তাহাকে গুণিয়া গুণিয়া দেওয়াতে মন উঠিবে কেন? কিন্তু এদিকে যে পশ্চিমে মেঘখানা বড় হইয়া ঝড় উঠিল। হাঁা, চিন্তামণিকে দুই এক দিনের ভিতর একশত টাকা দিতে হইবে, তাহাতে বাড়ী বাঁধা পড়ে, কি আর হইবে? দেওয়ানকে বলা হইল—টাকা চাই-ই চাই। দাওয়ান অবশ্য বুঝিল বাবুর চাকরী আর বেশীদিন নহে। এইবার প্রবলবেগে বৃষ্টি নামিল—এখন না বাহির হইলে ত খেয়াঘাটে নৌকা পাওয়া যাইবে না। আজ নদী পার হইতে নাই কিন্তু মন ত সে-মানা মানিতেছেন না—যত তাড়া লাগে, নদী পার হইতেই হইবে। অতি ব্যস্ততায় সিন্দুকের চাবি সঙ্গে লইতে ভুল হইয়া গেল—গৃহভৃত্য ভাবিল, এই ত সুসময়, মনিবের কাছে মাহিনার আশা বড় নাই, যাহা পাই এইবার সরাই। একটি ক্ষুদ্র দৃশ্য বটে কিন্তু বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ের দৃশ্য ইহার দ্বারা বোধকরি কিছুই অদৃশ্য রহিল না।

হায়! হায়! নদীতীরে কি একখানাও জেলে-ডিঙ্গি, একখানা ভেলা, একখানা কাঠও থাকিতে নাই! "উঃ! মুষলের ধারে বৃষ্টি।" চিন্তামণি হয় ত এতক্ষণ বিল্বমঙ্গলের প্রতাক্ষায় নদীতীরে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে! রাগ দেখাইয়া আসাটা ভাল হয় নাই। নদীর দুই তীরে যেন দুই চক্রবাক-চক্রবাকী, মধ্যে কালস্বরূপ জলস্রোত—কাহারও মানা মানে না, চলিয়াছে। কি ভয়ঙ্কর তুফান, কি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন—যেন পিশাচ যুদ্ধ করিতেছে। বুঝি, এই তুফান, এই গর্জ্জন তাহারই হৃদয়ের প্রতিধ্বনিস্বরূপ! বুঝি তাহারই অন্তঃপ্রকৃতি বহিঃপ্রকৃতিতে প্রতিফলিত হইতেছে। ওই যে শ্মশানে চিতার আলো? এত বৃষ্টিতেও চিতার আগুন নিভিতেছে না? চিতার আগুন, চিন্তার আগুন, দুই-ই বুঝি বা ঝড়-বৃষ্টি-তুফানে নিভিবার নহে? প্রাণ অতি তুচ্ছ কিন্তু তাহার প্রাণ যে চিন্তামণির প্রাণ—সে প্রাণ ত তুচ্ছ করা চলে না। ওই যে ঝোপটার পাশে পেত্নী না কি? ওরা মনে করিলে পার করিয়া দিতে পারে। "ওগো, তোমায় আমি ষোড়শোপচারে পূজা দেবো, তুমি যদি আমায় পার করে দাও। মা, কৃপা করে কথা কও, চিন্তামণির জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েচে।" পার করিয়া দিবার জন্য তিনি যে আগে-ভাগে আসিয়া বসিয়া আছেন—পার করিয়া দিবেন বই কি? এতটা কপটতাশূন্য কাতর নিবেদন কি ব্যর্থ হয়? সহসা পাগলিনীর মুখ দিয়া "কই সই, কই চিন্তামণি?"—অনন্তকালের সেই অনাহত ধ্বনি ঝড়-বৃষ্টি, নদীতরঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া উত্থিত হইল! হৃদয়ে হৃদয়ে যুগযুগান্তর ধরিয়া, পর্ব্বত-গুহায়, নিবিড় কাননে, যাহার অন্বেষণে বিরাম নাই, গায়ে ভস্ম মাখিয়া যাহার বিরহ-জ্বালার নির্ব্বাণ নাই, বুকে বজ্র ধরিয়া, শূন্যে শূন্যে ফিরিয়া, যাহার সাক্ষাৎকার হয় না—কই সই, কই সেই চিন্তামণি? "মেঘ-গর্জ্জন, তোমায় ভয় করি না; তরঙ্গ, তোমারও কল-কল নাদে ভয় করি না; দেহ, তোরও মমতা রাখি না; কিন্তু চিন্তামণিকে যে আর দেখতে পাব না এই ভয়। নইলে তুমি নদী নও—গোখুর জল, আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত।"

"সাধে কি গো শ্মশানবাসিনী,
পাগলে ক'রেছে পাগল, তাই ত ঘরে থাকিনি।

সে কোথা একলা বসে, নয়নজলে বয়ান ভাসে,
আমাহারা দিশেহারা, ডাকছে কত না জানি !
ওই যেন সে পাগল আমার, দেখচি যেন মুখখানি তার,
ঘোর যামিনী একলা আছে প্রাণের চিন্তামণি।"

আর কি থাকা যায় ? ওই অসহায় বুকফাটা ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া আর কি থাকিতে পারা যায় ? "চিন্তামণি"—নাম মুখে করিয়া বিল্বমঙ্গল নদীতরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

তাহার পর—"ঘোর নিশা মহাঝঞ্ঝাবাতে,
তরঙ্গের সনে রণ,—
রহিল জীবন শবদেহ আলিঙ্গনে !
সর্পে রজ্জু ভ্রম—
হেন অন্ধ করেছে নয়ন !
পুরস্কার—বারাঙ্গনা-তিরস্কার !"

বিল্বমঙ্গল নদীতরঙ্গে ঝাঁপ দিয়া সাঁতার দিয়া নদী পার হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু নদীতে ভয়ঙ্কর তুফান, মাঝখানে আসিয়া ঢেউ লাগিয়া তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। এমন সময় একটা গলিত শবদেহ ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহাকেই কাষ্ঠভ্রমে আলিঙ্গন করিয়া সে নদী পার হইয়া কূলে পৌঁছিল। যে গলিত শবদেহের দুর্গন্ধে চিন্তামণি ও থাকমণি পরে বিকল হইয়া উঠিয়াছিল, বিল্বমঙ্গল তাহার বিন্দুবিসর্গ আভাষ পাইল না। তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম তখন চিন্তামণি-অভিমুখী, মন—শুধু তখন কেমন করিয়া চিন্তামণি দর্শন মিলিবে—এই চিন্তাতেই বিভোর, তাই অন্য পঞ্চেন্দ্রিয় তখন তাহাদের কাজ করিল না। রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর অতিক্রম করিয়াছে, তখনও পর্য্যস্ত অভুক্ত, পরিশ্রান্ত বিল্বমঙ্গল তথাপি চিন্তামণির দ্বারে আঘাত করিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিল না। আহা ! কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইলে চিন্তামণির যে কষ্ট হইবে ! "নিবিড় অন্ধকার, দিক নির্ণয় করা দুষ্কর।" সেই অন্ধকারে প্রাচীরে লম্বমান কালসর্পকে তাহার রজ্জু ভ্রম হইল, বিল্বমঙ্গল সেই কালসর্প অবলম্বনে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া চিন্তামণির বাটীর প্রাঙ্গণে লাফাইয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

জ্ঞান হইলে বিল্বমঙ্গল বলিল বটে যে, সে কাঠ ধরিয়া নদী পার হইয়া আসিয়াছে, দড়ি বহিয়া পাঁচীল টপকাইয়াছে, কিন্তু তথাপি চিন্তামণির বিশ্বাস জন্মিল না ! এই ঝড়-বৃষ্টিতে, ওই রণমুখী নদী পার হওয়া কি মানুষের সাধ্য ! সে ভাবিল, "শ্রাদ্ধ-কাণ্ড সব মিছে, এপারে কোথা বসেছিল। আর পাঁচীল টপকালেই বা কি ক'রে ? তেলপানা পাঁচীল···।"

চিন্তামণি স্বচক্ষে দড়ি দেখিতে চাহিল।

বিল্ব। এই দেখ, দড়ি দেখ।

চিন্তা। কৈ দেখি। ওগো, মাগো ! এ যে অজগর গোখরো সাপ !

বিল্ব। অ্যাঁ ! গোখরো সাপ ?

ভিক্ষুক। "ওগো ঠাকরুণ, হয়েচে ; সাপে যদি গর্ত্তে মুখ দেয়, লেজ ধরে টেনে মুখ বার করতে পারা যায় না। ভয় নেই, টানের চোটেই অক্কা পেয়েচে।" বিল্বমঙ্গল সেই প্রথম জানিতে পারিল যে, সে এতক্ষণ যাহা রজ্জু বলিয়া ভ্রম করিয়াছে তাহা রজ্জু নহে, কালসর্প। চিন্তামণির প্রণয়ও কি তাহাই ? সে নয়নময় হইয়া চিন্তামণিকে দেখিতে লাগিল। ওই এক থাব্‌লা নারীদেহ, উহার এত মোহ, এত আকর্ষণ ? যাহা সমস্ত ইন্দ্রিয় শুষ্ক করিয়া দেয়, নয়নকে অন্ধ করে, তাহা কি শুধুই ইন্দ্রিয়সঞ্জাত কামের দংশন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের পিপাসা ? না, ইন্দ্রিয়ের অতীত কোনও অপরূপ সৌন্দর্য্যের অপরূপ নিমন্ত্রণ ? উহার বীজ কি চিন্তামণির রক্তমাংসে নিহিত, না, তাহারও রক্তকণায় উহা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে ? ইহার জন্যে দায়ী কে ? রক্তমাংস, না, রক্তমাংসের ভিতর যিনি এই অপরূপ সৌন্দর্য্য-পিপাসার বীজ প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন তিনি ? শঠ-কপট-লম্পট-নটবর কেন যুগে যুগে হৃদয়ের এই লাম্পট্য-লীলা দেখিতে ভালবাসেন তাহা তিনিই ভাল জানেন। চিন্তামণি নিদ্রা যায়, বিল্বমঙ্গল সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকে, সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলে দশ দিক্ শূন্য মনে হয়, তাহার চক্ষে জল পড়িলে বুকে শেল বাজে। তাহার সর্ব্বস্ব ঋণে বিকাইয়া যাইতেছে, ভ্রূক্ষেপ নাই ; নিন্দা অঙ্গের আভরণ হইয়াছে ; ঘৃণা, লজ্জা, ভয়—এই তিনই ত সে পরিত্যাগ করিয়াছে ! অবশ্যই চিন্তামণি অতি সুন্দর, অতি সুন্দর ; নতুবা সে এই সকল দেবভোগ্য উপকরণ দিয়া এতদিন কি অসুন্দর রাক্ষসের পূজা করিয়াছে ? চিন্তামণি কি রাক্ষসী, না দেবী ! রাক্ষসী কি এত সুন্দরী হয় ? কিন্তু সে যদি দেবী হইত তাহা হইলে সে তাহার প্রাণ দিয়া প্রাণের ব্যথা বুঝিত, বুঝিত প্রাণ অতি তুচ্ছ, বুঝিত সাপেতে আর দড়িতে বিশেষ প্রভেদ নাই। নিশ্চয়ই সে রাক্ষসী—কিন্তু তথাপি সে অতি সুন্দর, অতি সুন্দর। কে সে সুন্দর যিনি ইহাকে এমন সুন্দরী করিয়া গড়িয়াছেন ? কে সে সুন্দর যাঁহার মোহন মায়ায় ইহাকে এমন সুন্দরী বলিয়া বোধ জন্মিতেছে ? টহলদারগণ এইবার গাহিল—"কি ছার আর কেন মায়া, কাঞ্চন-কায়া ত রবে না।" নাটকীয় গঠন-কৌশলের পরাকাষ্ঠা হইল। তখন সবেমাত্র অরুণোদয় হইতেছে। বিল্বমঙ্গলের হৃদয়েও বুঝি অরুণোদয় হইতে লাগিল।

"সত্য, সকলই মায়া ! কই, কেউ ত আমার আপনার দেখি নি ; যার জন্যে জলে ঝাঁপ দিলুম, সে ত আমার নয়। আর কেউ কোথাও কি আমার আছে ? একবার দেখলে হয়।" চিন্তামণির এখনও অবিশ্বাস—সে এখনও কি কাঠ ধরিয়া নদী পার হইয়া আসিয়াছি—দেখিতে চাহিতেছে। আমার প্রাণ চিন্তামণির কিন্তু চিন্তামণির প্রাণ আমার নয়,

নতুবা প্রাণের ভাবা বুঝিতে এত সাক্ষীর প্রয়োজন কিসের? চিন্তামণি দেখিল, বিল্বমঙ্গল যাহা অবলম্বন করিয়া রণমুখী নদীকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহা কাঠ নহে, গলিত শবদেহ। বিল্বমঙ্গলের কিন্তু সে-কথা শুনিয়া এবার আর চমক লাগিল না। তাহার ইন্দ্রিয়-গ্রাম তখন আর বাহিরের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের আয়ত্তে নাই! তাহার মনে বহুক্ষণ ধরিয়া যে চিন্তার প্রতিক্রিয়া চলিতেছিল তাহাই এইবার আত্মপ্রকাশ করিল। মন অন্তরমুখী হইয়া দেখিল, নারী-দেহ শবদেহেরই ন্যায় গলিবে, পচিবে অথবা পুড়িয়া ছাই হইবে! এই নশ্বর সংসারে সকলই অনিত্য—ওই অপচীয়-মান উষালোকের ন্যায় সকলই ছায়া, সমস্তই মিথ্যা। তবে

"আমি কার, কে আছে আমার?
কার তরে জীবনের উত্তাপ বহন?

দেখা দাও, যদি থাক কেহ—
জুড়াই প্রাণের জ্বালা
প্রাণ-মন করি সমর্পণ!"

পাগলিনী এমন সময়ে গাহিয়া বলিল, "কে বলে রে আপনার রতন নাই, সত্যি মিছে, দেখনা কাছে'
কচ্ছে কথা সোহাগ ভরে।'

সত্যই ত' আমার আপনার জন আমার কাছে কাছে রহিয়াছে, "নৈলে ঘোরতর তরঙ্গ মধ্যে কে আমায় শবদেহ ভেলা দিলে? করাল কালসর্পের দংশন হোতে কে আমায় বাঁচালে? কে আমায় বলে দিলে—সংসারে আমার কেউ নাই। কে আমায় এখনও বলচে—আমি তোর আছি। কে তুমি! তোমার কি রূপ? অবশ্যই তুমি পরম সুন্দর! দেখা দাও, কথা কও, আমার প্রাণ জুড়াও।" জন্মাবধি রূপের কাঙ্গাল, সুন্দরের কাঙ্গাল, অনিত্য রূপ-সৌন্দর্য্যের মায়া ছাড়াইয়া নিত্য চিরসুন্দরের শরণ লইতে চাহিল। এই চিন্তামণি অতি সুন্দর, অতি সুন্দর; কিন্তু এই নবজাগ্রত চিন্তামণি যেন আরও সুন্দর, আরও সুন্দর। ওই ক্ষুদ্র তড়াগের গণ্ডূষ বারিধারা ছাড়িয়া এই অনন্ত প্রেম-চিন্তামণি-পারাবারে অবগাহন করিলে কি হৃদয়ের প্রেমপিপাসা শান্ত হইবে না?

"স্বার্থশূন্য প্রেমলুব্ধ মন
প্রেমের কারণ
করেছিল বেশ্যা-উপাসনা;
বিফল কামনা!
ক্ষুদ্রাধারে প্রেম কোথা পাবে স্থান?
প্রেমে মত্ত প্রেমিক পুরুষ
প্রেমময়-আশে
সংসার দলেছে পায়!
অতি তীব্র বৈরাগ্য-সঞ্চার,
উন্মত্ত আকার—
একমনে ডাকে ভগবানে।"

বিল্বমঙ্গল সব ছাড়িয়া অখিল চিন্তামণি-প্রেম-প্রবাহে আপনাকে মিশাইয়া দিতে চলিয়া গেল।

চার

এইবার গিরিশচন্দ্রের নিজের ধর্ম্ম-জীবনের কিছু কিছু কথা এইখানে বলিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের কিছু কিছু আভাষ এই বিল্বমঙ্গল নাটকে প্রতিফলিত হইয়াছে। সেই আভাষের কিছু আভাষ এইখানে না দিয়া রাখিলে এই নাটক আলোচনা অসমাপ্ত হইয়া রহিবে এবং আমাদেরও বিল্বমঙ্গল নাটকের সম্পূর্ণ পরিচয় মিলিবে না। গিরিশচন্দ্রের সমুদ্রতুল্য হৃদয়ের সমুদ্রতুল্য ভক্তি-বিশ্বাসের গভীরতার কথা বুঝিতে না পারিলে বিল্বমঙ্গল-হৃদয়ের রূপান্তর তথা দ্রুত পরিবর্ত্তনের কথা আমরা বুঝিতে পারিব না। সর্ব্বোপরি গিরিশচন্দ্রের উত্তর জীবনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, গুরুকরণ ব্যতীত ঈশ্বরলাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই। বিল্বমঙ্গলের ঈশ্বর দর্শন হইয়াছিল কিন্তু তাহা সন্ন্যাসী সোমগিরি গুরুর কৃপায়। শুধু বিল্বমঙ্গলেরই বা বলি কেন, চিন্তামণি হইতে চোর ভিক্ষুককে পর্য্যন্ত সোমগিরিকে গুরুকরণ করিতে হইয়াছিল; তবেই না তাহাদের বিল্বমঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণদর্শন লাভ হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের এই "গুরুবাদ" বিল্বমঙ্গল নাটকে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে। সুতরাং গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্ম-জীবন ও গুরুবাদ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা এইখানেই যথাসম্ভব তাঁহার নিজের ভাষাতেই শুনাইয়া রাখি।

"যে সময়ে পরমহংসদেব আমায় আশ্রয় প্রদান করেন তখন আমি হৃদ্‌দ্বন্দ্বে বিকলিত। পূর্ব্বের শিক্ষা-দীক্ষা, বাল্যকাল হইতে অভিভাবকশূন্য হইয়া যৌবনসুলভ চপলতা, সমস্তই আমায় ঈশ্বর-পথ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছিল। সে সময়ে জড়বাদী প্রবল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা এক প্রকার মূর্খতা ও হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের পরিচয়। সুতরাং আস্তিককে উপহাস করিতাম এবং এপাত ওপাত বিজ্ঞান উল্টাইয়া স্থির করা হইল যে, ধর্ম্ম কেবল……সাধারণকে ভয় দেখাইয়া কুকার্য্য হইতে বিরত রাখিবার উপায়। কিন্তু ভগবানের রাজ্যে এ পাণ্ডিত্য বহুদিন চলে না। দুর্দ্দিন অতি কঠিন শিক্ষক। বন্ধু-বান্ধবহীন, চতুর্দ্দিকে বিপজ্জাল, দুর্দ্দান্ত শত্রু সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া ভাবিলাম ঈশ্বর ঠিক আছেন। একদিন প্রার্থনা করিলাম—ভগবান যদি থাকো, আমায় পথ নির্দ্দেশ করিয়া দাও। দেখিয়াছি অসাধ্য রোগ হইলে তারকনাথের শরণাপন্ন হইয়া থাকে, আমারও ত কঠিন বিপদ, একরূপ উদ্ধার হওয়া

অসাধ্য, এ সময় তারকনাথকে ডাকিলে কিছু হয় কি?” কেশশ্মশ্রু রাখিয়া প্রতি বৎসর পদব্রজে ৺তারকেশ্বরে গমন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সেই চেষ্টাই সফল হইল, বিপজ্জাল অচিরে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল-দেবতা মিথ্যা নয়। বিপদ হইতে ত মুক্ত হইলাম কিন্তু আমার পরকালের উপায় কি? তারকনাথের মহিমা দেখিয়াছি, তারকনাথকেই ডাকি। ক্রমে দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। এই সময়ে আমার মনে হয় এক শতাব্দীর উন্নতি আমার একদিনে হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র এই সময়ে প্রতি সপ্তাহে শনি-মঙ্গলবারে কালীঘাটে গিয়া কালী-মন্দিরে হাড়ি-কাঠের নিকট বসিয়া সমস্ত রাত্রি জগদম্বাকে ডাকিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, এই স্থানে কত প্রাণী কাতর প্রাণে মাকে ডাকিয়াছে, এই স্থানের উপর নিশ্চয় মায়ের দৃষ্টি আছে। কিছুদিন এইরূপ করিতে করিতে তাঁহার প্রাণে আশার সঞ্চার হইতে লাগিল। “কিন্তু সকলেই বলে যে, গুরু ব্যতীত উপায় নাই। বাবা তারকনাথের নিকট প্রার্থনা করি, যদি গুরুর একান্ত প্রয়োজন হয়, তিনি কৃপা করিয়া আমার গুরু হোন্। শুনিয়াছিলাম, নব বেশ ধরিয়া কখনো কখনো মহাদেব মন্ত্র দিয়া থাকেন। যদি আমার প্রতি তাঁহার এইরূপ কৃপা হয়, তবেই।” আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইল। ঘরে দোর বন্ধ করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। এ ঘটনার তিন দিন পরে আমি আমাদের পাড়ার চৌরাস্তার একটি রকে বসিয়া আছি, দেখিলাম চৌরাস্তার পূর্ব্বদিক হইতে দুই একটি ভক্ত সমভিব্যাহারে পরমহংসদেব ধীরে ধীরে আসিতেছেন। ইহা আমার চতুর্থ দর্শন; আমি তাঁহার দিকে চক্ষু ফিরাইবামাত্র তিনি নমস্কার করিলেন। সেদিন আমি নমস্কার করায় পুনর্ব্বার নমস্কার করিলেন না। তিনি যাইতেছেন, আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন কি অজানিত সূত্রের দ্বারা আমার বক্ষঃস্থল তাঁহার দিকে কে টানিতেছে। তিনি কিছু দূর গিয়াছেন, আমার ইচ্ছা হইল তাঁহার সঙ্গে যাই। এমন সময় তাঁহার নিকট হইতে একজন ডাকিতে আসিলেন, কে আমার স্মরণ হইতেছে না। তিনি বলিলেন—পরমহংসদেব ডাকিতেছেন। আমি চলিলাম। পরমহংসদেব ৺বলরামবাবুর বাটীতে উঠিলেন, আমিও তাঁহার পশ্চাতে গিয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম। * * * আমি জিজ্ঞাসা করিলাম গুরু কি? তিনি বলিলেন, গুরু কি জানো, যেন ঘটক। আমি ঘটক কথা ব্যবহার করিতেছি, তিনি এই অর্থে অন্য কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন। আবার বলিলেন—তোমার হ'য়ে গেছে। মন্ত্র কি? জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন—ঈশ্বরের নাম। তদবধি গুরু কি পদার্থ তাহার কিঞ্চিৎ আভাস হৃদয়ে আসিল, গুরুই সর্ব্বস্ব আমার বোধ হইল। মন তখন আনন্দে পরিপ্লুত। যেন নূতন জীবন পাইয়াছি।

পূর্ব্বের সে ব্যক্তি আমি নই, হৃদয়ে বাদানুবাদ নাই। ঈশ্বর সত্য, ঈশ্বর আশ্রয়দাতা—এই মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করিয়াছি, এখন ঈশ্বর লাভ আমার অনায়াসসাধ্য। এই ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া দিন-যামিনী যায়। শয়নে স্বপনেও এইভাব—পরম সাহস পরমাত্মীয় পাইয়াছি—আমার সংসারে আর কোনও ভয় নাই। মহাভয় মৃত্যু ভয়—তাহাও দূর হইয়াছে।”

“পরমহংসদেবের নিকট যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে শিষ্ট শান্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ। নরেন্দ্র প্রভৃতি যাঁহারা স্বজনের মধ্যে গণ্য, তাঁহারা নির্ম্মল বালক বয়সে প্রভুর নিকটে যান ও প্রভুর স্নেহে আবদ্ধ হইয়া পিতামাতা ভুলিয়া প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাঁহাদের প্রতি প্রভুর স্নেহ বর্ণনায় তাঁহার প্রকৃত স্নেহ হয় ত বুঝান যাইবে না। পবিত্র বালকবৃন্দ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শরণাপন্ন হইয়াছে, ইহাতে স্নেহ জন্মিবার কথা। কিন্তু আমার প্রতি স্নেহ অহেতুকী দয়াসিন্ধু' পরিচয়। ভগবানের একটি নাম পতিত-পাবন, মানবদেহে সে নামের সার্থকতা আমিই দেখিয়াছি। পরমহংসদেবের নিকট যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা চঞ্চল-প্রকৃতির থাকিতে পারেন, কিন্তু আমার তুলনায় সকলেই সাধু। কাহার কখনও বা পদস্খলন হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আমার গঠনই স্বতন্ত্র, সোজা পথে চলিতে জানিতাম না। পরমহংসদেবের স্নেহের বিকাশ আমাতে যেরূপ হইয়াছে, সেরূপ আর অন্য কোথাও হয় নাই। * * * যখন মনে হয় যে, অনেক অস্পর্শীয় ওষ্ঠ আমার ওষ্ঠে স্পর্শিত হইয়াছে, সেই ওষ্ঠে তিনি নির্ম্মল হস্তে পায়েস দিয়াছেন, মা যেমন চেঁচে পুঁছে খাওয়াইয়া দেন, সেইরূপ চেঁচে পুঁছে খাওয়াইয়া দিয়াছেন, আমি যে বুড়ো ধাড়ি তাহা তাঁহারও মনে হয় নাই, আমারও মনে হয় নাই, তখন যেন আত্মহারা হইয়া ভাবি—এ ঘটনা কি সত্য হইয়াছিল, না স্বপ্নে দেখিয়াছি।

* * * * আমি বর্ণনা করিতেছি মাত্র, কিন্তু আমি তাঁহার স্নেহ প্রকাশ করিতে পারিতেছি কি না জানি না। বোধ হয় আমার সম্পূর্ণ অনুভব হইতেছে না। সম্পূর্ণ অনুভব হইলে যাহা বলিতেছি, বলিতে পারিতাম না, ক্বচিৎ কখনও সে ভাব উদয় হইলে জড় হইয়া যাই। পরমহংসদেব আমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ অধিকারী, সে অধিকার তাঁহার স্নেহের। এ স্নেহ অতি আশ্চর্য্য।”

অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে, নাটক আলোচনায় গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্ম-জীবন ও গুরু-স্নেহ সম্বন্ধে এই আত্ত উদ্ধৃতির তাদৃশ প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু গিরিশচন্দ্র যদি তাঁহার স্বীয় জীবনে মানসিক পরিবর্ত্তনের এই প্রতিক্রিয়া অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে উপলব্ধি না করিতে পারিতেন, এই অপার কৃপাসিন্ধু গুরুদেবের স্নেহ মর্ম্মে মর্ম্মে অমন করিয়া না অনুভব

করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই বিল্বমঙ্গল জীবনের এইরূপ রূপান্তর ঐরূপ সহানুভূতির সহিত চিত্রিত করিতে পারিতেন না। কোনও ইংরাজি-শিক্ষিতাভিমানী পণ্ডিতম্মন্য লেখক ইহা পারিতেন না। বেশ্যার জন্য প্রাণ তুচ্ছ করিয়া দুরন্ত নদীতরঙ্গে বিল্বমঙ্গলের ঝাঁপ দেওয়া, দড়ি বলিয়া সাপ ধরা, কাঠ ভাবিয়া পচা মড়া ধরা—হয় ত তাঁহাদের সভ্যতায় বাধিত, বণিকপত্নী অহল্যাকে পত্নীভাবে যাচ্ঞা করা হয়ত তাঁহাদের সভ্যতায় বাধিত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ দর্শন করা—তাঁহাদের সাহসে কুলাইত না, হয় ত বা বিশ্বাসেও বাধিত। এইখানেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরণাশ্রিত পাঁচসিকা পাঁচআনা ভক্ত বিশ্বাসী "ভৈরব" গিরিশচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য। এই সকল কথা স্মরণ রাখিয়া এইবার আমরা বিল্বমঙ্গলকে অনুসরণ করিতেছি—পাঠক লক্ষ্য করিবেন, গিরিশচন্দ্রের উদ্ধৃত জীবনের অংশ বিল্বমঙ্গল-চরিত্রে কতখানি প্রতিফলিত হইয়াছে।

পাঁচ

সন্ন্যাসী সোমগিরি ৺ কাশীধাম হইতে বঙ্গদেশে মহাপুরুষ সাধুত্তম বিল্বমঙ্গল দর্শন-মানসে আসিয়াছেন। শিষ্য ইহার ভাব বুঝিতে পারিতেছেন না। বেশ্যা-প্রেমে আবদ্ধ লম্পট বিল্বমঙ্গলের বেশ্যাহস্তে লাঞ্ছনাজন্য ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে—ইহাতে কেন তাহার এত মাহাত্ম্য-গৌরব? সোমগিরি বুঝাইতেছেন—

"এ সংসার সন্দেহ-সাগর
বিভু নহে ইন্দ্রিয়-গোচর—
ঈশ্বর লইয়া তর্ক যুক্তি করে অনুমান,
যত করে স্থির,
সন্দেহ-তিমির ততই আচ্ছন্ন করে।
ঈশলুব্ধ প্রাণ—
ব্যাকুলিত জানিতে সন্ধান,
কি উপায়ে পুরাইবে মন আশ;
শ্রীনিবাস তার প্রতি সদয় হইয়ে—
দেন মিলাইয়ে বাঞ্ছিত রতন তার—
অকস্মাৎ কোথা হ'তে কেবা আসে,
তাঁর ভাবে হয় হৃদে আশার সঞ্চার,
বিশ্বাস বিকাশে প্রাণে,
মানে মনে জ্ঞানে, ঈশ্বরের বাক্য বলি—'।
সে হয় নিমিত্ত—গুরু তার,
যার কথা করিয়া প্রত্যয় জগদ্‌গুরু করে লাভ।
এই ক্ষুদ্র নিমিত্ত এ স্থানে আমি;
বিশ্বাস ঈশ্বর দাতা,—
বাক্যরূপে তিনি বিরাজিত।
কিন্তু শোন,
গুরু নহি তার, গুরু সে আমার,—
প্রেমিক সে মহাজন।"

পাঠকের বোধ করি এতক্ষণে হৃদিরন্ধ্রে বিকল গিরিশচন্দ্রের স্বীয় ধর্ম্মজীবনের কথার প্রতিধ্বনি কর্ণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিতেছে। অকস্মাৎ পথিমধ্যে বিল্বমঙ্গলের সহিত সোমগিরির সাক্ষাৎলাভ ঘটিল।

বিল্ব। হে ব্রহ্মচারি, কে আমার বল্‌তে পারেন? সংসারেও আমার বল্‌বার কেউ দেখ্‌চিনে। ব'লে দিন—আমার কে, ব'লে দিন্‌।

সোম। আপনি প্রেমোন্মাদ মহাপুরুষ, আপনাকে নমস্কার করি।

বিল্ব। আপনি যে হোন্‌, আমি হীন লম্পট, আমাকে নমস্কার ক'রবেন না; আপনার চরণে আমার নমস্কার—

*

সোম। আপনি ভাগ্যবান, প্রেমময়ী রাধা আপনাকে প্রেমপূর্ণ করেছেন—আপনার কৃষ্ণপ্রেম জন্মেছে।

বিল্ব। আপনি আমার গুরু; প্রেমময়ী রাধা কে, আমায় বলুন।

সোম। দেখুন, আমি রাধাকৃষ্ণের ছবি দেখেচি. প্রেমময়ীর অন্ত কিছুই পাই নি; আপনিও যদি রাধাকৃষ্ণের ছবি দেখে থাকেন, আপনি একবার ধ্যান করে দেখুন—যদি সেই প্রেমময়ীর মর্ম্ম কিছু বুঝতে পারেন।

বিল্ব। …রাধাকৃষ্ণের কি দর্শন পাওয়া যায়?

সোম। কৃষ্ণের কৃপায় সকলই হয়।

বিল্ব। কোথায় কৃষ্ণের দেখা পাব?

সোম। কৃষ্ণকে ডাকুন, তিনিই বলে দেবেন, কোথায় তাঁর দেখা পাবেন।

বিল্ব। আপনি কে? আমার মৃত হৃদয়ে আশার সঞ্চার হচ্ছে কেন? গুরুদেব! আমায় পদে আশ্রয় দিন।

ইহা কি পরমহংসদেবের সহিত গিরিশচন্দ্রের চতুর্থদর্শনের পর কথাবার্ত্তার অনুলিপি নহে? গিরিশচন্দ্রের মুমূর্ষু হৃদয়েও এইরূপ আশার সঞ্চার হইয়াছিল। বিল্বমঙ্গল গুরুবরণ করিলেন। তাঁহার গুরুবরণ হইল। এইবার গুরু "যুটাইয়া" দিবেন—শিষ্যকে কৃষ্ণ-দর্শন করাইবেন। বিল্বমঙ্গলকে তিনি রাধামন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন কিন্তু রাধা কে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। প্রশ্নের উত্তর এড়াইয়া গেলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহার গুরুদেবের শ্রীমুখে একবার শুনিয়াছিলেন যে, "রাধিকা বিশুদ্ধ-সত্ত্ব, প্রেমময়ী। যোগমায়ার ভিতরে তিন গুণই আছে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। শ্রীমতীর ভিতর বিশুদ্ধ সত্ত্ব বই আর কিছুই নাই। সচ্চিদানন্দ নিজে রসাস্বাদন করবার জন্য রাধিকার সৃষ্টি করেছেন। সচ্চিদানন্দ

কৃষ্ণের অঙ্গ থেকে রাধা বেরিয়েছেন। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণই আধার, আর তিনি নিজেই শ্রীমতী রূপে আধেয়, নিজের রস আস্বাদন ক'রতে, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দকে ভালবেসে আনন্দ সম্ভোগ ক'রতে।" গিরিশচন্দ্র বিল্বমঙ্গলের মুখ দিয়া "রাধা কে"—এই প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন বটে—কিন্তু সোমগিরির মুখ দিয়া রামকৃষ্ণদেবের ঐ উত্তর বোধ করি ইচ্ছা করিয়াই দেওয়ান নাই। রামকৃষ্ণদেব আর একদিন অন্য এক প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। তাঁর ইতি নাই, শেষ নাই—সব সম্ভবে। যদি জিজ্ঞাসা কর, ব্রহ্ম কেমন—তা বলা যায় না। সাক্ষাৎকার হোলেও মুখে বলা যায় না। যদি জিজ্ঞাসা কেউ করে, কেমন ঘি? তার উত্তর কেমন ঘি, না, যেমন ঘি। ব্রহ্মের উপমা ব্রহ্ম—আর কিছুই নাই। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্য্যন্ত কেহ মুখে বলিতে পারে নাই। ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই।" গিরিশচন্দ্র প্রকারান্তরে সোমগিরির মুখে এই উত্তরই বসাইয়াছেন। অন্যান্য অনেক লোক-প্রচলিত উত্তর তিনি দিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিয়াই তাহা দেন নাই। তিনি তাঁহার অসাধারণ ও প্রত্যক্ষ-লব্ধ বস্তুজ্ঞান দ্বারা অবশ্যই বুঝিয়াছিলেন যে কোনও মায়িক বিশেষণের দ্বারা প্রেমময়ীকে চিহ্নিত করিতে পারা যায় না। সত্যই ত আজ পর্য্যন্ত প্রেমময়ীর অন্ত পাওয়া যায় নাই। ভাষায় তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা হয় না। যে ভাষায় তাহা সম্ভব হইত—সে ভাষা বোধ করি আজও সৃষ্ট হয় নাই। প্রেমময়ী কেমন—এ প্রশ্নের উত্তর কেহই মনোমত দিতে পারেন নাই। উত্তর কাহারও মনোমত হয় না, কেন না, প্রকাশ করিয়া বলিতে যাইলেই বর্ণনা কেমন যেন অল্পজোর হইয়া যায়, প্রাণ পূর্ণ হয় না, বুক ভর্ত্তি হইয়া উঠে না, মুখে বলিয়া আশ মিটে না, শুনিয়া কাণ জুড়ায় না। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া কত মহাকবি, দার্শনিক, প্রেমিক ভক্তপুরুষ, বৈষ্ণব মহাজন, প্রেমময়ী কেমন বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু আজিও পর্য্যন্ত সে বুঝান শেষ হইল না। আধুনিক কালের কত ঔপন্যাসিক, কত সাহিত্যিক, কত নাট্যকার, কত লেখক জোর কলমে তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছে, কিন্তু কেহই তাঁহাদের প্রিয়তমাকে, প্রেমময়ীকে আজিও পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট করিতে পারিলেন না। সাধারণ প্রেমিক তাঁহার প্রিয়তমার অন্ত পাইলেন না, অ-সাধারণ প্রেমিক তাঁহার প্রেমময়ীর অন্ত পাইলেন না। তিনি শুধুই ধ্যানগম্যা হইয়া রহিলেন। মূকের মধুর রসাস্বাদনবৎ তাঁহার রসপান করিয়া গুণ কীর্ত্তন করা হইল না। তাঁহার চরণে—"নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ"—বলিয়া শরণ লইলেই বোধ করি সকল জিজ্ঞাসার শেষ হয়, সকল প্রশ্নের উত্তর হয়, রমণী-জননী দ্বন্দ্বের অবসান হয়, কাম-ভক্তি-প্রেমের সমন্বয় হয়, "রসো বৈ স" এর সাক্ষাৎকার হয়। ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় পন্থা নাই। তাই বোধ করি গুরু সোমগিরি অধিকারী ভেবে বিল্বমঙ্গলের মধুর রসসিক্ত হৃদয়-আধারে রাধামন্ত্র-বীজ বপন করিয়া দিলেন। সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি তাহাকে শক্তিমন্ত্র দিলেন না, শৈবমন্ত্র দিলেন না, বিষ্ণুমন্ত্র দিলেন না—রাধামন্ত্র দিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে স্মরগরল-খণ্ডনকারী, মুরারি শিরোমণ্ডনকারী সেই শ্রীরাধাপদ-পল্লবে একান্ত আশ্রয় লইলে রাধাবল্লভ সহজেই তাহাকে পদাশ্রয় দিয়া ধন্য করিবেন।

ছয়

কিন্তু, "ধন্য সংস্কার!
মন, পশু তুমি—
তোমাকে কি দিব দোষ?"

পূর্ব্ব সংস্কার ছাড়িয়াও ছাড়িতে চাহে না; গুরুকৃপা লাভ করিয়াও বিল্বমঙ্গলের আর একবার পতন হইল। নাট্যকার বিল্বমঙ্গলের এই পতনচিত্র অঙ্কিত না করিয়া তাহাকে যদি একবারেই উচ্চাঙ্গের সাধু করিয়া তুলিতেন, তাহা হইলে বিল্বমঙ্গল-চরিত্র সৃষ্টিতে নাটকীয় মর্য্যাদা রক্ষা পাইত না। কিন্তু মানব-চরিত্রে অসাধারণ অভিজ্ঞ এবং স্বয়ং ভুক্তভোগী গিরিশচন্দ্র তাহা করিলেন না। তিনি তাঁহার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে একস্থানে লিখিয়াছেন—"জন্মদাতা পিতা যে অপরাধে ত্যাজ্যপুত্র করেন, সে অপরাধ আমার পরম পিতার নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল না। এই যে পরম আশ্রয়দাতা, ইঁহার পূজা আমার দ্বারা হয় নাই। মদ্যপান করিয়া ইহাকে গালি দিয়াছি—শ্রীচরণ-সেবা করিতে দিয়াছেন, ভাবিয়াছি—এ কি আপদ্। কিন্তু এ সকল কার্য্য করিয়াও আমি দুঃখিত নই। গুরুর কৃপায় এ সকল আমার সাধন হইয়াছে।" গুরুর কৃপায় বিল্বমঙ্গলেরও পতন-পরম্পরা সাধনতুল্য হইয়াছিল।

বিল্বমঙ্গলের মন কিছুতেই স্থির হইতেছে না, সে এক বাপীতটে বসিয়া ধ্যানমগ্ন হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বণিকপত্নী অহল্যা এক সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গিনী বলিল—"দেখ্, দিদি, এই মড়া, কুকুরের এঁটো ভাতগুলো খাচ্ছিল। * * ওরে ও পাগলা, ও পাগলা দুটি ভাত খাবি!" কথায় বলে—"ওরে ও পাগলা, ভাত খাবি,—না, আঁচাবো কোথায়!" বিল্বমঙ্গলেরও তাহাই হইল, চক্ষু উন্মীলন করিয়া অসামান্যা সুন্দরী অহল্যার প্রতি দৃষ্টি পতিত হইবা মাত্র তাহার ভাবান্তর ঘটিল। "মন্মথের প্রধান সেনাপতি" নয়নের দাস মূঢ় মন বিল্বমঙ্গলকে অহল্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অহল্যার গৃহাভিমুখে টানিয়া লইয়া চলিল।

"মন, হাসি পায়—
হল তোর বৈরাগ্য উদয়,
চলে গেলি একবাসে গৃহবাস ত্যজি;
"কোথা কৃষ্ণ?" বলি হলি উতরোল—
যেন তোর কত প্রেম!

আরে রে পাগল মন,
ধ্যানমগ্ন বাপীতটে সাধুর আকার,
শুনি—কঙ্কন ঝঙ্কার
চাহিল নয়ন মেলি'—
দেখ পুনঃ নয়নের ছলে
কি উন্মাদ দশা তোর।"

বিল্বমঙ্গল অহল্যার পশ্চাদনুসরণ করিয়া বণিকের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহস্বামী গৃহে ছিলেন না, বিল্বমঙ্গল প্রভাত হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত গৃহস্বামীর অপেক্ষায় গৃহদ্বারে বসিয়া রহিল। অহল্যা দাসীর দ্বারা তাহাকে অন্নজল গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল কিন্তু বিল্বমঙ্গল অন্নজল স্পর্শ করিল না। অতিথি অভুক্ত, কাজেই অহল্যাও জল-স্পর্শ করিতে পারিল না। ক্রমে গৃহস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিল্বমঙ্গল গৃহস্বামীর নিকট আগমন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিল—

"নারী তব সুবেশা সুন্দরী,
বাপীকূলে হেরি তার রূপের মাধুরী,
আঁখির ছলনে, পূর্ব্ব সংস্কারে,
মুগ্ধ মম পাপ মন,
পশুমন কোন মতে না মানে বারণ—
সদা উচাটন,
দরশন কতক্ষণে পাবে পুনঃ;
সেই আশে আছি তব বাসে।
ইচ্ছা যদি হয় তব অতিথি সৎকারে,
কর অঙ্গীকার,
একা মম-সনে
দিবে আনি' পত্নীরে তোমার;
অলঙ্কারে ভূষিতা সুন্দরী
আজি নিশা হ'বে মম আজ্ঞাকারী।"

পতির নিকট এ হেন স্পষ্ট ভাষায় পত্নীকে ভিক্ষা করে—এ ত সামান্য নয়!

"মহাশয়, আসুন আলয়,
নারায়ণ নিশ্চয় আপনি,
কর ছল মূঢ় জনে ভুলাইতে।
হে অতিথি, পুরাইব বাসনা তোমার—
আজ রাত্রে পতি তুমি, পত্নীর আমার।"

বুঝি বণিকের দাতাকর্ণের পুত্রের মেদ-অস্থি-মাংস দান করিয়া অতিথি-সৎকারের কথা মনে পড়িতে লাগিল, বুঝি সত্য পালনের জন্য শ্রীভগবান রামচন্দ্রের সীতা নির্ব্বাসন, তথা "সীতা-হারা রামের-জীবন' "লক্ষ্মণ বর্জ্জনের" কথা স্মৃতিপথে উদিত হইতেছিল।

'ধর্ম্ম আর ধর্ম্মরক্ষা করিব নিশ্চয়।
যবে উচ্চাশয় ভাবি আপনায়,
দুইজনে গোপনে করিনু পণ—
অতিথি না ফিরিবে আবাসে,
আসিবে যে আশে, পুরাইব সে বাসনা—
ধর্ম্ম মাত্র সাক্ষী তার—
আজ যদি ভাঙ্গি অঙ্গীকার,
সত্যভঙ্গ না হ'বে প্রচার
কিন্তু—ধর্ম্ম সাক্ষী এখনও সুন্দরী।"

বণিক সমাদরে বিল্বমঙ্গলকে অন্তঃপুরে আমন্ত্রণ করিয়া ও সহধর্ম্মিণী পত্নীকে অতিথি সৎকাররূপ অগ্নি-পরীক্ষায় নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিল। অহল্যা বিল্বমঙ্গলকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"আপনি পালঙ্কের উপর উপবেশন করুন।" কামলম্পটের পক্ষে এই পালঙ্কে উপবেশনের আহ্বান অতিশয় অর্থপূর্ণ, নদীতরঙ্গে ঝাঁপ দেওয়ার অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর, রজ্জুভ্রমে কালসর্প অবলম্বন করার অপেক্ষাও দৃষ্টি বিভ্রান্তকারী, কাষ্ঠ ভ্রমে গলিত শবদেহ আলিঙ্গন করার অপেক্ষাও মোহকারী, একবাসে গৃহবাস ত্যাগ করার অপেক্ষাও কঠিন। কিন্তু বিল্বমঙ্গলের বোধ করি তখন কামলম্পটের অবস্থা কাটিয়া রূপলম্পটের অবস্থা, তাই সে বলিল—"না; আমি তোমায় দেখবো—এইখান থেকেই দেখবো।" বিল্বমঙ্গল নয়নময় হইয়া নয়নের চাতুরী দেখিতে লাগিল। কে সেই পরম রূপবান কারিগর, যিনি মানুষের অস্থি-মাংস-শোনিতে কামের অপেক্ষাও সর্ব্বজীব মুগ্ধকারী এই রূপ দর্শন তৃষ্ণা এমন করিয়া মিশাইয়া দিয়াছেন। কি ইহার উদ্দেশ্য, কি ইহার রহস্য? কে সেই অদ্ভুত কর্ম্মা কারিগর, যাহার কারিগরির উপর কারিগরি যে এই রূপ-দর্শন-লালসা জন্মজন্মান্তর ধরিয়া মিটিয়াও মিটে না। "পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষু" হইয়া এই রূপ-বহ্নির নিকট শুধুই পুড়িবার ইচ্ছায় পুড়িবার জন্য মরণান্তকর এত ব্যাকুলতা কেন? হে নিত্য-সুন্দরী শ্রীরাধে, তোমার রূপের এককণা লইয়া যে চিন্তামনি, যে অহল্যা, আজ আমার চক্ষে পরম রূপময়ী, না জানি তোমার সেই পরিপূর্ণ রূপমাধুরী কেমন? না জানি তোমার সেই মদনমোহন কেমন, যিনি তোমার সেই অপরূপ রূপ নিত্যকাল ধরিয়া বক্ষে ধারণ করিয়াছেন? চিন্তামণির অনিত্যরূপ পুড়িয়া ছাই হইবে, অহল্যার নশ্বর রূপরাজি চিতাভস্মে পরিণত হইবে, কিন্তু যাহার রূপ লইয়া ইহাদের গৌরব, সে রূপ কেমন? সে রূপ কোন চক্ষু দিয়া দেখা যায়? এই অনিত্য অসার বস্তু—দ্রষ্টা এই চক্ষুর বিনিময়ে কি সেই চক্ষু পাওয়া যায় না?

"বুঝ মন নয়ন তোমার—
অন্ধ কিবা নহে।

কিছু নাহি হেরে,
অসার যে বস্তু, তাহে কহে নিত্যধন ।
এর ছলে কতদিন রবে ভুলে ?”

বিল্বমঙ্গল অহল্যার অলঙ্কার হইতে দুইটা কাঁটা চাহিয়া লইল, বলিল—“মা, তোমার স্বামীকে বলগে আমি তোমার পাগল ছেলে ; যাও মা, তোমার পতি-আজ্ঞা—আমার কথা হেলন কত্তে নেই ।’ অহল্যা রমণী হইয়া আসিয়াছিল, জননী হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল, ভাবিল—“কে এ মহাজন ?” মহাজনের তখন কিন্তু চেতন-ভাব সমাধির অবস্থা—

“মন, এখন কি আঁখির মমতা কর
শত্রু তোর শীঘ্র কর’ বধ !
দিব আমি উত্তম নয়ন,
যেই আঁখি ব্রজের গোপালে
“আমার” বলিয়ে তুলে নেবে কোলে—
অন্য সব দেখিবে অসার ।
যাও যাও নশ্বর নয়ন ।”

বিল্বমঙ্গল নশ্বর নয়ন উৎপাটন করিয়া “উত্তম নয়ন” লাভ করিতে চলিয়া গেল । যে ইহা পারে, তাহাকে কৃষ্ণ কৃপা না করিয়া কি থাকিতে পারেন ? এইখানে একটি অতি গুহ্য কথা বলিয়া রাখি । কথাটি আমাদের নহে । পরমহংস দেবের নিজের কথা,—ভক্তচূড়ামণি বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল ১৩৪২ সালের আষাঢ়ে—“ভারত” নামক পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । “আবার অভিনয় আরম্ভ হইল কিন্তু এবার একটু মাত্রা চড়াইয়া । খেউড় আর রং কং খং কি আলাদা বলিয়া বিশ্বপ্রসবিনীর প্রসবদ্বারের নাম করিতে করিতে গভীর সমাধিস্থ হইলেন । বহুক্ষণ পরে বাহ্যাবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া আমাদিকে কহিলেন—“দ্যাখ ঐ নাম কল্লেই জগজ্জননী মা ব্রহ্মময়ীকে দেখেই তাঁতে ডুবে যাই । শিষ্ট শান্ত বালকের ন্যায় ভক্তিভরে ভগবৎ-স্তুতি করিতে করিতে অন্তরে দিব্যভাবের উদয় হয় বটে, কিন্তু দুষ্ট ছেলের মত অশ্লীল কথা বলিতে বলিতে যে সমাধি হয়, ইহা মানবে কখনও সম্ভব নহে ।” মানবে সম্ভব না হইলেও একটি অতি-মানবে যে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে, ইহাই যথেষ্ট । এই অতি-মানবের শ্রীচরণাশ্রিত দুষ্ট ছেলের শিরোমণি গিরিশচন্দ্র, আর এক দুষ্ট ছেলে বিল্বমঙ্গলের নাট্যকার । পাঠকের যদি অভিরুচি ও সহৃদয়তা থাকে, তাহা হইলে এই দুই দুষ্ট ছেলের জীবনে অতি মানব রামকৃষ্ণ মুখনিঃসৃত ওই অত্যাশ্চর্য্য মহতী উক্তির অমোঘতা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন ।

“ডুব ডুব ডুব রূপ-সাগরে আমার মন !
তলাতল পাতাল খুঁজিলে পাবি রে প্রেম-রত্নধন ॥
খোঁজ্ খোঁজ্ খোঁজ্ খুঁজিলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন ।
দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি, হৃদে জ্বলবে অনুক্ষণ ॥
ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙায় ডিঙ্গে চালায় বল সে কোন্ জন ?
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ ॥

বিল্বমঙ্গল অতঃপর তাহাই করিল—সে ঠেকিয়া শিখিয়া মনুষ্য-সমাগমশূন্য নির্জ্জন কাননাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া রূপ-সাগরে ডুবিয়া গেল, তলাতল পাতাল খুঁজিয়া হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন, প্রেম রত্নধন অন্বেষণে মনকে নিয়োগ করিল । গুরু-কৃপায় বার বার পতন তাহার সাধনতুল্য হইয়াছেই, এইবার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া অনন্যমনে শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইতে পারিলেই হয় । চিন্তামণির উপেক্ষায় তাহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল সত্য, কিন্তু এবার নয়ন বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে অতি তীব্র বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । গিরিশচন্দ্রকে পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন—“তীব্র বৈরাগ্য হ’লে তাঁকে পাওয়া যায় । প্রাণ ব্যাকুল হওয়া চাই । শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমন ক’রে ভগবানকে পাবো । গুরু বললেন, আমার সঙ্গে এসো—এই বলে একটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে তাকে চুবিয়ে ধ’রলেন । খানিক পরে তাকে জল থেকে উঠিয়ে আনলেন, বললেন—তোমার জলের ভিতর কি রকম হয়েছিল ? শিষ্য বললে, আমার প্রাণ আটু বাটু করছিল যেন প্রাণ যায় যায় ! গুরু বললেন, দেখ, এইরূপ ভগবানের জন্য যদি তোমার প্রাণ আটু বাটু করে, তবেই তাঁকে লাভ করবে ।” গিরিশচন্দ্র নাটকে এই “আটু বাটু”র ভাষা দিয়াছেন প্রথমে “প্রহ্লাদ চরিত্রে” হিরণ্যকশিপুর মুখে, পরে বিল্বমঙ্গল নাটকে বিল্বমঙ্গলের মুখে । পাঠক দেখিবেন ঈশ্বর দর্শনের জন্য এই যে প্রাণ আটু বাটু হইয়া বিল্বমঙ্গলে কি রূপ জীবন্তভাবে ফুটিয়াছে । কিন্তু যাঁহার জন্য এত “আটু বাটু” তিনি কি করিতেছেন, প্রথমে দেখা যাউক । রাখাল-রূপী শ্রীকৃষ্ণ বণিককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

“হাঁগা তোমরা বৃন্দাবনে যাবে ?”

বণিক । কেন, তুমি ‘বৃন্দাবনে যাবে’ জিজ্ঞাসা কচ্ছ যে ?

রাখাল । আমি অমন বাড়ী বাড়ী জিজ্ঞাসা করি । রাখালরাজ ত বাড়ী বাড়ী জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইয়া থাকেন, জনে জনে বৃন্দাবনে লইয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু আমরা বিষয়-বিষ-জর্জ্জরিত হইয়া সদাই অন্যমনে থাকি, তাহার সেই জিজ্ঞাসার মান রাখিতে পারি কৈ ?

বণিক । কেন, তোমার বৃন্দাবনে যাবার এত ইচ্ছা কেন ?

রাখাল । ওগো, আমি বড় মুস্কিলে পড়েছি ।

বণিক । তোমার আবার মুস্কিল কি ?

রাখাল । ওগো, তার জন্যে গরু চরাতে পাই নি, তার জন্যে খেলতে পাই নি, তার জন্যে আর বৃন্দাবনে যেতে পাই নি । এই তোমরা তাকে সঙ্গে নেবে, তবে বৃন্দাবনে যাব ।

বণিক । কেন ?

রাখাল। দেখ, সে দেখতে পায় না। সে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলে বুক চাপড়াতে থাকে, আমার প্রাণ কেমন করে! সঙ্গে যাই, কোথা কাঁটাবনে পড়বে; খেতে পারে না। আমি না দিলে আর খেতে পাবে না। কে দেবে বল? কাণা-মানুষ; আর, সে যার খেতেই চায় না, আমি কত ভুলিয়ে খাওয়াই।

বণিক। তিনি কোথায় আছেন?

রাখাল। ওগো, সে যেখানে বন-বাদাড় পায়, সেই খানেই যায়।

বণিক। কি করেন?

রাখাল। "কৃষ্ণ-কৃষ্ণ"—ওই করে, আর কি; কৃষ্ণ যেন তার সাতপুরুষের চাকর।

বণিক। আর কি করেন?

রাখাল। কখন মুখ রগড়ায়, কখন ঢিপ্ করে মাটীতে পড়ে, কখন চুল ছেড়ে। তুমি তাকে নে যাবে?

বণিক। তিনি যাবেন?

রাখাল। আমি ভুলিয়ে নে যাব—যাক্ বৃন্দাবনে যাক; "কৃষ্ণ—কৃষ্ণ" কচ্ছে, কৃষ্ণকে পাবে।

অহল্যা। তুমি কৃষ্ণকে পাবে?

রাখাল। তা কেন? আমি কি আর "কৃষ্ণ-কৃষ্ণ" কচ্চি? আমি ওই 'কাণা কাণা' কচ্ছি, কাণাকে পাব, যে যা চায়।"

তুমি তো বলিতে চাহিতেছ, সাত পুরুষের চাকরের মত তাহার খিদ্‌মদ্‌গার হইবে না, কিন্তু "সাত পুরুষের চাকর"—আর কাহাকে বলে? পতিতপাবন পতিতকে, ভগবান ভক্তকে এইরূপেই কৃপা করিয়া থাকেন। ভগবান ভক্তের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন—তাঁহাকে একান্ত নির্ভর করিলেই তিনি ভক্তের সকল ভার গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুরটি কিন্তু বড় শক্ত ঠাকুর। আশুতোষ শিব, জগন্মাতা দুর্গা বা কালী—ইঁহাদের অপেক্ষাকৃত সহজেই করুণার উদ্রেক হয়। কিন্তু বাঁকা ঠাকুরটি বার বার বাজাইয়া লন। এক ভক্ত আততায়ীর দ্বারা আক্রান্ত হইলে, নারায়ণ লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তাহাকে রক্ষা করিতে চলিলেন। কিন্তু কিছু দূর গিয়া ফিরিয়া আসিলেন দেখিয়া লক্ষ্মীদেবী কারণ জিজ্ঞসা করিলেন। নারায়ণ বলিলেন, তাঁহার যাইবার আর প্রয়োজন হইল না—কারণ লোকটি নিজেই লাঠি ধরিয়া আততায়ীকে বুঝিতে উদ্যত হইয়াছে। এই নিজে লাঠি ধরিলে, তিনি আর মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন বোধ করেন না। সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া স্রোতে তৃণ হইতে হইবে, তবে তিনি "সাত পুরুষের চাকর" হইয়া সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবেন। এমন কথা যিনি লিখিয়াছেন, তিনি কতকটা চোখে দেখিয়া, কতকটা অনুভব করিয়াই লিখিয়াছেন; নতুবা এমন জোরের কথা লিখিতে মাতৃভক্ত শ্রীরামপ্রসাদ ভিন্ন আর কাহাকেও ত দেখা যায় না।

এইবার নাটকীয় ভাষায় বিল্বমঙ্গলের "আটুবাটু" উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—"হা কৃষ্ণ! কোথায় তুমি? দেখা দাও। তুমি ত অন্তর্য্যামী, দেখ, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েচে। ব্যাকুল হ'লে ত দেখা দেও। দীননাথ, তুমি কোথায়—কোথায় তুমি? কোথায় তুমি? হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!" বিল্বমঙ্গল ভাবাবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। রাখাল বালক আসিয়া বিল্বমঙ্গলের কর্ণমূলে "কৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করিল। সম্বিৎ পাইয়া বিল্বমঙ্গল উচাটন হইয়া ডাকিতেছে—

"কই কৃষ্ণ?
কই শুনি বাঁশরী নিনাদ?
কই কালাচাঁদ?
সাধে বাদ কে সাধে এমন?
সে কি এতই নির্দ্দয়?
হ'ক, সয় স'ক, প্রাণে স'ক।
হায়,—হায়, বিফল যন্ত্রণা!
সেত কই আমার হ'লনা।
গেল দিন ব'য়ে,
ছার দেহে কিবা কাজ?
জেনেছি জেনেছি
মম ভাগ্যে দেখা নাই।
কে আমায় এনে দেবে হরি?
বংশী-ধারী,
এস, এস, বাজায়ে বাঁশরী,
পায় পায় দাঁড়াও সম্মুখে—
বামে হেলা শিখিপাখা!
দেখ, একা আমি,
এস, এস হে অনাথনাথ!

"কেন ভাই! একলা কেন ভাই! আমি যে তোমার সঙ্গে রয়েছি, ভাই!

"রাখাল, রাখাল, আবার এসেছ? তুমি আমার সর্ব্বনাশ করবে—তুমি আবার আমায় মোহে ডুবাবে! দেখ, তোমার কথা শুনলে, আমি কৃষ্ণকে ভুলে যাই—আমি কৃষ্ণকে ডাকতে পারি না!

তোর পায়ে ধরি—
এক জ্বলে মরি কৃষ্ণ বিনা,
কৃষ্ণধন আমার হ'লনা;
কত জ্বালা জান কি, রাখাল?
জান যদি, যাও কৃষ্ণ এনে দাও,
দাস হব, কেনা রব তোর।

একে অন্ধ মন,
তাহে তুমি কর না বিমনা।
দেখ, কৃষ্ণ আমার হ'ল না
দিন গেল, দিন যায়,

*

ওই শঙ্খ-ঘণ্টা-নাদে,
সায়ংসন্ধ্যা করে দ্বিজগণে।
ওই ত ফুরাল দিন ;
দিন গেল—কই দেখা হ'ল ?
এস, এস, কোথা গুণনিধি !
মরি যদি দেখা ত হবে না—
দেখা দাও, দেখা দাও দয়াময় !
প্রাণ করে আকুলি বিকুলি।
কোথা যাব ? কোথা দেখা পাব ?
এস, বাজায়ে মুরলী,
বনমালী রাধিকারঞ্জন।"

শুনিয়াছি, ইহা গিরিশচন্দ্রের গুরুদেব পরমহংসদেবেরই হৃদয়ের প্রতিধ্বনি। তিনিও তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্যাকুল হইয়া বলিতেন—"একটির পর একটি করিয়া দিন ত চলিয়া যাইতেছে কিন্তু কই এখনও তোমার দেখা পাইলাম না।" প্রাণের আকুলি বিকুলিতে তিনি কখনও কখনও মাটিতে মুখ ঘষড়াইয়া কাঁদিতেন।

কিন্তু বিল্বমঙ্গলের যাহার জন্ত এত আকুলি বিকুলি তিনি যে নরবেশ ধারণ করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন, তাহা এখনও তাহার অনুভবে আসিতেছে না। বিল্বমঙ্গল কিছুতেই রাখাল-বালককে মনের আড় করিতে পারিতেছে না। সপ্তাহ কাল সে অনাহারে আছে, রাখালের সঙ্গত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু ধ্যানমগ্ন হইতে যাইলেই রাখাল প্রাণের উপর আসিয়া দুরন্ত আধিপত্য করে। কৃষ্ণ দর্শন না মিলিলে সে আত্মহত্যা করিতেও কৃতসঙ্কল্প—আর এক পক্ষ কাল প্রায়োপবেশনে থাকিলে—কিন্তু রাখাল আসিয়া যদি মরিতে বারণ করে, তবে ত তাহার মরাও হইবে না। 'কৃষ্ণ' বলিয়া ডাকিতে মুখ দিয়া 'রাখাল' নাম বাহির হইয়া পড়ে, আর রাখাল আসিয়া সশরীরে উপস্থিত হয়। কিন্তু রাখাল-বালক ছায়ার ন্যায় কেন তাহার অনুসরণ করিতেছে ? সে নিজে সর্ব্বস্ব রিক্ত, অন্ধ, অশরণ, অনাথ, তাই কি অনাথনাথ শ্রীকৃষ্ণ রাখাল-বালকের বেশে অনাথকে কৃপা করিতে আসিয়াছেন ? তখন অকস্মাৎ তাহার অবচেতন মনোমধ্যে, প্রাক্তন সুকৃতিবলে, গুরুকৃপায় চৈতন্তের উদয় হইল, মন মনোময় পরমপুরুষকে চিনিতে পারিল, রাখাল রাখালরাজ মূর্ত্তিতে ধরা দিলেন। তখন ব্রজের বাল্যলীলা আরম্ভ হইল, চতুর চূড়ামণির সঙ্গে গোষ্ঠ-ভাবাপন্ন বিল্বমঙ্গল চাতুরী-লীলায় লুকোচুরি খেলায় যোগ দিল। সে ছল করিয়া রাখালের হাত ধরিল, রাখাল ছল করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া অদৃশ্য হইল। কিন্তু বিল্বমঙ্গলের একবার শ্রীঅঙ্গের স্পর্শলাভ হইয়াছে, তাঁহার আর চৈতন্ত হারাইবার আশঙ্কা রহিল না।

"ছলে হাত ছিনাইলে,
পৌরুষ কি তাহে তব ?
আরে রে গোপাল,
দেছ প্রেম বড় কাঁদাইয়ে ;
সেই প্রেমে হৃদয়ে হৃদয়ে রাখিব বাঁধিয়ে ;
পার যদি হৃদয় হইতে পলাইতে,
তবে ত তোমারে গণি।
অন্ধ আমি—পলাইবে কোন্ কথা
ধরিব তোমায়,
দেখি, পারি কিবা হারি, হরি।

তিনি বড় কাঁদাইয়াই প্রেম দিয়া থাকেন, কিন্তু একবার পাইলে আর হারাইবার ভয় থাকে না। বিল্বমঙ্গলকে আর হারাইতে বা হারিতে হইল না, এতদিনে তাহার জিত হইল—তিনি অবশেষে স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন। শ্রীভগবানের অঙ্গ যে স্পর্শ করিয়াছে তখন সেই সর্ব্বশক্তিমানের ইচ্ছা মাত্রেই যে তাহার নষ্ট নয়ন পুনরুদ্ধার হইবে, ইহা আর অধিক কি ? বিল্বমঙ্গল চাহিয়া দেখিল—

"নবীন জলধর শ্যামসুন্দর
মদনমোহন ঠাম।
নয়ন-খঞ্জন হৃদয়রঞ্জন
গোপিনী-বল্লভ শ্যাম।
শ্রীপদ-পঙ্কজ দেহি পদরজ
শরণ মাগিছে দীন,
প্রাণমাধব, সাধ রব রব
প্রেম-মাধুরী লীন !"

বিল্বমঙ্গলের এতদিনে শুধুই কৃষ্ণ দর্শন হইল কিন্তু তখনও একত্রে রাধাকৃষ্ণের দর্শন লাভ হইল না। তখনও উত্তরসাধিকা চিন্তামণি আসিয়া পৌঁছায় নাই, তাই যুগলমূর্ত্তি দর্শন হইল না। অনিত্যযুগলের লীলায় যে জীবন-নাটকের আরম্ভ, যুগল না জুটিলে নিত্যযুগল-লীলা দর্শন-মাধুরী উৎসবে সেই নাটকের অবসান ঘটে কেমন করিয়া ? সেই দর্শন-উৎসব আমরা এই গ্রন্থশেষে চিন্তামণিপ্রসঙ্গে করিব। এক্ষণে এই অতিপ্রাকৃত প্রত্যক্ষ-দর্শন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া বিল্বমঙ্গল-চরিত-চিত্রের উপসংহার করিতেছি।

সুসভ্য ইংরেজি-শিক্ষিত বিজ্ঞানসম্মত যুগে অলৌকিকের ধার ধারিতে আমরা বড় প্রস্তুত নহি। দেবতা মানিতে হয় মানো, ইংরাজরাও মানে, কিন্তু তাঁহাকে লইয়া বাড়াবাড়ি, চলাচলি করিও না। তিনি স্বয়ং ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া মানুষের সহিত সহজভাবে কথাবার্ত্তা কহিবেন, স্বরূপ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া মানুষের আবদার সকল রক্ষা করিবেন, যে যাহা বায়না ধরিবে, তিনি তাহাই মিটাইবেন—ইহা অন্যে বিশ্বাস করে করুক, কিন্তু ইংরেজি-শিক্ষিত পণ্ডিত কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবেন না। অবশ্য, গিরিশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মত কালেজে না পড়িলেও ইংরাজি ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, "এপাত-ওপাত" বিজ্ঞানও উল্টাইয়াছিলেন, নানা ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছিলেন, নানা ইউরোপীয় মতবাদের সহিত পরিচিত ছিলেন, বহু তর্কযুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দ ও "কেঠো" পণ্ডিত ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকারকেও হটাইয়াছিলেন এবং তাঁহার শত্রুরাও কখনও তাঁহার "অসাধারণ Intellect" সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েন নাই। তথাপি সেই গিরিশচন্দ্র যখন ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে ভগবানকে সশরীরে এই অধম মৃত্তিকার বুকে টানিয়া আনিয়াছেন, তখন তাঁহার সেই "অসাধারণ Intellect-এর" মুখ চাহিয়াই না হয় বড় জোর ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, বিল্বমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন একটা মানসিক ব্যাপার মাত্র, উহা তাহার মানস-রাজ্যে —মনোবৃন্দাবনে অনুভূত সূক্ষ্মদর্শন; নতুবা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রাখাল-বালকের বেশে আসিয়া তাহার সহিত "টু-টু" খেলিলেন, শিখিপুচ্ছ-চূড়া পরিয়া, বংশীধারী হইয়া, শ্রীরাধিকাকে বামে লইয়া আসিয়া তাহাকে স্থূলদর্শন দানে পুলকিত ও ধন্য করিলেন —ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু! কিন্তু গোল বাধাইয়াছেন স্বয়ং নাট্যকার গিরিশচন্দ্র। তিনি বলিয়াছেন, "নয় ত এ অনুভবে, দেখবে যখন নীরব রবে"—ইহা অনুভবের অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য সূক্ষ্ম দর্শন নহে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ দর্শন। গিরিশচন্দ্র রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-পড়া তাঁহার স্বদেশবাসীকে বিলক্ষণ চিনিয়াছিলেন, দেশের ধাতু বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, পরমহংসদেবের সাহচর্যে বহু অতিপ্রাকৃত দর্শনের স্বয়ং সাক্ষী ছিলেন, এই কলিযুগেও বহু অতি-মানব, ভক্ত, সাধু-সন্ন্যাসীর, অলৌকিক কার্য্যকলাপ কতক বা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, কতক বা শুনিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তাই তিনি হিন্দুর সংস্কারগত ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া এবং নিজের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে, যে বিল্বমঙ্গল আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত-প্রথা মত সামান্য এক বারাঙ্গণার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন না করিয়া তাহাকে একবার দেখিবার জন্য নদীতে ঝাঁপ দিতে পারে, দড়ি বলিয়া সাপ, কাঠ বলিয়া পচাঁমড়া ধরিতে পারে, "একবাসে গৃহবাস" ত্যাগ করিয়া বিবাগী হইয়া যায়, রূপ-দর্শন-লালসায় অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া নিজের দুই চোখ তুলিয়া ফেলিতে পারে এবং পরে কৃষ্ণদর্শনের জন্য আকুলি-বিকুলি করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়, সেই বিল্বমঙ্গলকে কৃষ্ণ আসিয়া সশরীরে স্বয়ং কোল দিবেন ইহাতে আর বিচিত্র কি! তাই তিনি অকুতোভয়ে দেবতাকে স্থূলদেহে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে নামাইয়াছেন এবং মানুষকে ধরণীর ধূলি হইতে স্বর্গরাজ্যে লইয়া গিয়াছেন। তিনি জানিতেন যে, এই অল্পপ্রাণ কলিযুগে অতি অল্প আয়াসেই দেবতা প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ইহা দেবতাদেরই মাহাত্ম্য। যাঁহাদের এ বিষয়ে হাতে কলমে একটু অভিজ্ঞতা আছে, যাঁহারা একটু আন্তরিক হইতে পারিয়াছেন—তাঁহারা উহার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু যাঁহাদের কতকগুলা অপরিক্রীত ফাঁকা বুলি মাত্র সম্বল, তাঁহাদের এ বিষয়ে আস্থা বা অবিশ্বাস প্রকাশ করিবার কতটুকু অধিকার আছে তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক এবং যে কারণেই হউক, যাঁহারা গিরিশচন্দ্রের এতটা বাড়াবাড়ি বরদাস্ত না করিয়া ইহাকে শুধুই মানসগম্য দর্শন ও অনুভব বলিয়া রফা করিতে চাহিয়া তাঁহাদের হৃদয়ের উদারতা ও বদান্যতা প্রকাশ করিবেন, তাঁহাদিগকেও আমরা সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইব। আমাদের নিজেদের বিশ্বাস যদিও নাট্যকারের দিকে, তথাপি আমাদের সেই বিশ্বাসের সহিত তাঁহাদিগকে একমত করাইতে চেষ্টা করিব না। আমরা জানি, চেষ্টায় ইহা হয় না। গিরিশচন্দ্রও সে চেষ্টা করেন নাই। তবে যাঁহাদের এই বিশ্বাস আসিবে না, তাঁহাদের নিকট বিল্বমঙ্গল নাটক মনস্তত্ত্ব হিসাবে বা নাটকীয় শিল্পচাতুর্য্য হিসাবেও ব্যর্থ হইয়া যাইবে। যাঁহারা বলিবেন, তাঁহারা বিল্বমঙ্গলের চক্ষু উৎপাটন-দৃশ্য পর্য্যন্ত মনস্তত্ত্ব হিসাবে পড়িয়াই ইহার নাটকীয় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পরিতৃপ্ত থাকিবেন এবং নাটকের অবশিষ্টাংশ সেকালের যাত্রাভিনয় বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন, আমরা তাঁহাদিগকে বিল্বমঙ্গল নাটকখানি না পড়িতেই অনুরোধ করি। এই নাটকে মনস্তত্ত্ব, নাটকীয় শিল্পচাতুর্য্য এবং বৈষ্ণবী ভক্তি-প্রেমতত্ত্ব অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত আছে। একটি ত্যাগ করিয়া আর একটি সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করা যায় না। বিশেষতঃ, ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রেম যে নাটকের প্রাণবায়ু, তাহার সার বস্তুটুকু উড়াইয়া দিয়া নিষ্প্রাণ কাঠামোখানা লইয়া ছেলেখেলা করিয়া লাভ কি? বিল্বমঙ্গল চিরদিনই এক বাঙ্গালী মহাকবির মহতী কীর্ত্তি বলিয়া সুরসিক সহৃদয়-সমাজে আদৃত হইবে এবং এতৎপ্রসঙ্গে ভারতবর্ষের আর এক মহাকবির মহতী উক্তি স্মরণ পথে আসিতেছে—

"প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্গ্রাহে
মণির্ন মৃদাং চয়ঃ॥"

(উপন্যাস)

ছয়

—"আরেঃ, অজয় যে, কোথায় চলেছো?" ট্রামে অজয়ের পাশের সিটে ব'সতে ব'সতে বিশ্বনাথ বল্‌লে। গম্ভীর ভাবে অজয় একটু সরে বসতে বসতে বল্‌লে, "ডাক্তারের হুকুম, ফাঁকা জায়গায় এবং নদীর ধারে বেড়াতে হবে, তবেই আমার শরীর নাকি ভাল হবে, তাই চলেছি বোটানিক্যাল গার্ডেন, চাঁদপাল ঘাট থেকে পেরিয়ে যাব। তুই কোথায় যাচ্ছিস?" "বুঝছিস তো ভাই উকিল মানুষ, মক্কেলের চেষ্টায়, আমার এক বন্ধুর একটা কেস্ আছে, তাই তার বাসায় যাচ্ছি। রোজই কি বেড়াতে যাস্?" অজয় ঘাড় নেড়ে জানালে—"হ্যাঁ।" বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করলে, "সমীরবাবুদের বাড়ী গেছলে? ভারি ভদ্রলোক কিন্তু, ওঁদের তোর প্রতি যা যত্ন দেখলুম—" বাধা দিয়ে অজয় বল্‌লে, "হবে নাই বা কেন? একে বনিয়াদি বংশ, তায় জমিদার। আভিজাত্যের দিক দিয়ে ওঁদের তুলনা হয় না, পয়সারও অভাব নেই, যখনই যা খুসি করতে পারেন।" কথায় কথায় এসপ্লানেডের মোড়ে এসে ট্রাম থাম্‌লো। বিশ্বনাথ এইখানেই নেমে গেল, কারণ তাকে ভবানীপুরের গাড়ী ধরতে হবে। অজয় বল্‌লে, "রবিবার সকালে আস্‌ছিস্ তো?" "নিশ্চয়ই", বলে বিশ্বনাথ গিয়ে ওধারকার গাড়ীতে উঠে বসলো।

অজয়ের শরীর এখনও ভালকোরে সারে নি, মাঝে মাঝে মাথা ঘোরে, লিখতেও মন যায় না, মা ও বিশ্বনাথের বিশেষ অনুরোধে সমীর তাকে ছেড়ে দিয়েছে। শোভা ও লীলা কিন্তু ওকে আরও কিছুদিন ওদের ওখানে থাকবার জন্যে অনুরোধ করেছিল, অজয় কিন্তু থাকতে পারে নি; কারণ সংসারে তো এক মা ছাড়া আর কেউ নেই, সুতরাং বেশীদিন বাইরে থাকা চলতে পারে না। তবে অজয়, শোভা ও লীলার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে প্রতি রবিবার বৈকালে সে ওদের বাড়ী যাবে। আসবার দিনকার কথাটি অজয়ের মনের কোণে যেন গাঁথা রয়েছে। লীলা বারান্দায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, দু'চোখ তার জলে পূর্ণ শুধু ছোট্ট দু'টি ঠোঁট নেড়ে বলেছিল, "আপনি চলে যাচ্ছেন অজয়দা, আমাদের কিন্তু খুব কষ্ট হবে"—সে কথাটি আজও যেন বাতাসের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে। আনমনা ভাবে ট্রাম থেকে নেমে অজয় ষ্টিমারে গিয়ে উঠলো।

সবে ভোর হয়েছে। গাছের মাথায় সোনালী ঊষার একটু ঝিক্‌মিকে আলো ঝরে পড়েছে সবেমাত্র, সন্ধ্যা বিছানা ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলো। তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় ছেড়ে পড়বার ঘরে ঢুকে অর্গ্যানটা খুলে গাইতে আরম্ভ করলে একখানি রবীন্দ্রনাথের গান। পাশের বাগানটায় অজস্র ফুল ফুটে উঠেচে। রঙবেরঙের প্রজাপতিদের মাতামাতি যেন একটা অভিনব সৌন্দর্য্যের রূপ ফুটিয়ে তুলছে। বড় বৌদি সন্ধ্যার পড়বার ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলো, "ও মা, তুমি কত সকালে উঠেছ, ও বলছিল, সন্ধ্যা আজকাল খুব সকালে ওঠে, ধীরাজই এ সব শিখিয়েছে।" অর্গ্যানের রীডের দিকে ফিরেই সন্ধ্যা উত্তর দিলে, "ধীরাজ বাবু শেখাতে যাবে কেন? আমি ত আর ছেলে মানুষটি নই বৌদি? সকালে ওঠা খুব ভাল, মন খুব ভাল থাকে।" "যাই চায়ের জলটা বসিয়ে দিই গে" বলে সুনীতি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, সন্ধ্যাও আবার গানের সঙ্গে মেতে উঠলো।

সন্ধ্যে বেলা ধীরাজ পড়াতে এলো, যাবার সময় সন্ধ্যাকে বলে গেল, "কাল তোমায় বোটানিকাল গার্ডেনে বেড়াতে নিয়ে যাব।" সন্ধ্যার বোটানিকাল গার্ডেন দেখা হয় নি, তাই খুসি হয়ে বল্‌লে, "বেশ তো, কখন যাবেন ধীরাজবাবু?" "কাল বিকেলে তুমি ঠিক হয়ে থেকো, বুঝলে?" সন্ধ্যা সানন্দে ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

পরের দিন বৈকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে ধীরাজের প্রকাণ্ড মোটরখানা এসে বীরেশ্বরবাবুর গেটের সম্মুখে দাঁড়ালো, সন্ধ্যা আগে থেকেই সাজগোছ শেষ করে রেখেছিল। সুতরাং গাড়ীর হর্ণ শোনবামাত্রই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সামনে বড় বৌদিকে দেখতে পেয়ে হাসতে হাসতে বল্‌লে, "যাচ্ছি বৌদি?" একটু হেসে সুনীতি বল্‌লে, "যেন রাত কোর না ভাই, তাড়াতাড়ি চলে এসো কিন্তু—"

"আচ্ছা—আচ্ছা"—বলতে বলতে সন্ধ্যা গিয়ে মোটরে উঠে বসলো। প্রথমে ধীরাজ কথা কইলে, বললে "আচ্ছা তুমি বোটানিক্যাল্ গার্ডেন কখন দেখ নি, না?" সন্ধ্যা উত্তর দিলে "এসেছিলাম একবার দাদুর সঙ্গে, তখন আমি খুব ছোট ছিলাম, কিছুই বুঝতে পারতুম না, তাইতো আপনার সঙ্গে চলেছি—" ধীরাজ আড়চোখে সন্ধ্যার দিকে চেয়ে একটু হাস্‌লে মাত্র।

গাড়ীখানা একটা গাছের পাশে রেখে ধীরাজ ও সন্ধ্যা গাড়ী থেকে নেমে পড়লো এবং গল্প করতে করতে এগিয়ে চললো গঙ্গার ধার দিয়ে বরাবর সোজা।

সারা বাগানটা ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যার পা আর চলে না। সে বল্‌লে, "একটু বসলে হয় না ধীরাজ বাবু?" ধীরাজও তাই চাইছিল, কারণ লোভযুক্ত মানসিক চিন্তায় সে পাগল হয়ে উঠেছিল। আর কিছুদিন পরেই এই সন্ধ্যা তার সহধর্ম্মিণী রূপে বিরাজ করবে। তার যেন আর অপেক্ষা সয় না—তাড়াতাড়ি সে উত্তর দিলে "হ্যাঁ-হ্যাঁ একটু ব'সতে হবে

বৈকি ? চল ঐ ঝোপের পাশে গিয়ে বসি।" দু'জনে সেইধারে এগিয়ে গেল এবং সুবিস্তির্ণ পুরু ঘাসের উপর রুমাল বিছিয়ে বসে পড়লো।

জাহ্নবী বক্ষে তখন সবে মাত্র সায়াহ্নের স্তিমিত ছায়া নেমে এসেছে ; বোটানিকাল গার্ডেন ভ্রমনার্থীদের দল ক্রমশই যে যার গন্তব্য স্থানে রওনা হয়ে যেতে সুরু করেছে। এই আধা আলো আধা ছায়ার মাঝে বসে সন্ধ্যা বললে, "চলুন এবার বাড়ী যাই, বৌদি বলে দিয়েছেন সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফিরতে হবে ?" বিস্মিত হয়ে ধীরাজ উত্তর দিলে, "যাবই তো, একটু আগে আর একটু পরে—এমন দিন ত আর হবে না সন্ধ্যা ? এই নির্জ্জন বন-বিথিতলে তুমি আর আমি পরস্পরের দিকে চেয়ে বসে থাকব। আজকের দিন আমার খুব ভাল লাগছে। তোমায় আজ কত সুন্দর দেখাচ্ছে সন্ধ্যা। আবেগ ব্যাকুল কণ্ঠে ধীরাজ সন্ধ্যাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলে।

"ওঃ—কি করছেন, আমায় ছেড়ে দিন, বলছি", বলে সন্ধ্যা নিজেকে ধীরাজের বাহুপাশ থেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে চেষ্টা করলে। ধীরাজ বললে, "আর তো দুদিন বাদেই তুমি আমার হবে, তবে কেন এমন করছ ?" ক্রুদ্ধা ব্যাঘ্রিণীর মত সন্ধ্যা ঘাড় বেঁকিয়ে উত্তর দিলে, "মনে রাখবেন, আপনি আমার প্রাইভেট্ টিউটর। ছেড়ে দিন বলছি আমাকে ?" হা হা করে হাসতে হাসতে ধীরাজ উত্তর দিলে, "আর তুমিও মনে রেখো সন্ধ্যা, তোমার দাদুর কথা অনুযায়ী দু'দিন বাদে তুমিও আমার স্ত্রী হতে যাচ্ছ।" "আচ্ছা,তখন দেখা যাবে—আপনি আমায় ছেড়েদিন বলছি ?" পরমুহূর্ত্তেই ঝোপের পিছন হতে একজনের আবির্ভাবে ধীরাজ তাড়াতাড়ি সন্ধ্যাকে ছেড়ে দিয়ে সরে বসলো এবং দু'জনেই ভয়ে ও লজ্জায় মুখ মাটির দিকে ফিরিয়ে রইলো। আগত যুবক অজয়। সে রোজই বৈকালে বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে আসে এবং আজও এসেছিল। অনেকক্ষণ পায়চারী করবার পর শ্রান্তি দূর করবার জন্যে সে একটি ঝোপের পিছনে বসেছিল এবং ক্ষণ পরেই উক্ত ঝোপের অপর পার্শ্ব হ'তে নারীকণ্ঠের ভয়চকিত স্বর শুনে তাড়াতাড়ি উঠে ওপাশে গিয়েই যা দেখতে পেলে তাতে সে প্রথমে তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারলে না। কিন্তু পরক্ষণেই তার মুখমণ্ডল অসম্ভব রকম গম্ভীর হয়ে উঠলো এবং ঘৃণায় ও রাগে সে ফুলতে লাগলো। একটু পরেই সে যেমন এসেছিল, তেমনি ভাবে আবার ঝোপের এপাশে ফিরে এলো এবং সোজা ষ্টিমারের জেটির দিকে দ্রুত এগিয়ে চললো।

ধীরাজের ভদ্রতার মুখোস আজ অজয়ের সম্মুখে খুলে গেল। সমীরদের বাড়ীতে সে তাকে দেখেছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের, কিন্তু আজ এ কি সে দেখল ? আর সন্ধ্যা যাকে অতি উচ্চ আসনে বসিয়ে ছিল, যার প্রতি শ্রদ্ধায় ও স্নায় সজাগ দাবিতে তার মন ও প্রাণ এমন কি প্রত্যেক রচনার অনুভূতি পর্য্যন্ত সে এক নব পর্য্যায়ে এনে ফেলেছিল, তাকে আজ এই নির্জ্জন বনবিথী তলে ধীরাজের পাশে এ অবস্থায় দেখবে এ কথা যেন তার বিশ্বাসই হয় না। রাগে ও দুঃখে অজয় জর্জ্জরিত হয়ে উঠলো।

এধারে খানিকক্ষণ উভয়ই চুপচাপ বসে থেকে সন্ধ্যা উঠে পড়ে কর্কশ কণ্ঠে বললে, "উঠুন, আমায় শিগ্‌গির বাড়ী পৌছে দিন।" লজ্জায় যেন তার মাথা কাটা যাচ্ছিল। ছিঃ ছিঃ কি কুক্ষণেই সে বেড়াতে বেরিয়ে ছিল, মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে আজ যেন সে সব হারিয়ে ফেলেছে। আবার রুক্ষ কণ্ঠে সে বললে, "সন্ধ্যে যে হয়ে গেল, উঠুন ? আমায় বাড়ী পৌছে দিন ?"

ধীরাজের মনে তখন প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের আলোড়ন উপস্থিত হয়েছে। অপ্রত্যাশিত ভাবে অজয়ের আবির্ভাব তাকে যেমনি বিস্মিত করে তুলেছে, তেমনি রাগ ও হিংসার একটা জ্বালাময়ি মূর্ত্তি ফুটে উঠেছে তার চোখে ও মুখে। একটা প্রচণ্ড লেলিহমান হুতাশনের তীব্র লক্লকে শিখার মতন। একটু চুপ করে থেকে সে উত্তর দিলে, "আর একটু পরে যাব, মোটরে যাব, কতক্ষণই বা লাগবে, একটু বসো।", বলে থপ করে সন্ধ্যার ডান হাতখানা ধরে তাকে জোর করে বসিয়ে দিলে সেইখানে।

সন্ধ্যার মনে ভয় হোলো—হঠাৎ রাগত ভাবকে সংযত করে সে মিনতি মাখা সুরে বললে, "সত্যি ধীরাজবাবু, উঠে পড়ুন, রাত হয়ে যাচ্ছে যে, আজ সমস্ত দিন পড়া হয় নি—গিয়ে আবার পড়া করতে হবে! উঠুন, উঠুন ধীরাজবাবু ?" একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধীরাজ এবারে উঠে পড়লো।

তখন আকাশের বুকে অসংখ্য তারা ফুটে উঠেছে। কাস্তের মত একফালি চাঁদ পূব আকাশের কোণ থেকে উঁকি মারছে। ধীরাজের মোটর চলেছে পূর্ণ বেগে। গাড়ীর ভেতর কারুরই মুখে কথা নেই। বাগবাজারে বাড়ীর সামনে গাড়ী দাঁড়াতেই দরজা খুলে সন্ধ্যা গট্‌মট্ করে বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেল, ধীরাজের সঙ্গে কথাটি পর্য্যন্ত কইলে না। ধীরাজও গাড়ী থেকে আর না নেমে গাড়ী ঘুরিয়ে বাড়ীর পথে চলে গেল। যেন একটা নির্ব্বাক চিত্র, সম্পূর্ণ নুতন ধরণের।

ধীরাজের যত রাগ গিয়ে পড়েছে অজয়ের উপর—ঠারে ঠোরে সে সন্ধ্যার মুখেই অজয়ের কথা শুনেছিল এবং তাকে যে সন্ধ্যা ভালবাসে এটাও ধীরাজ অনুমান করে নিয়েছে। সুতরাং সামনের পথ থেকে কিছু কালের মত অজয়কে সরাতে হবে, তবেই তার যাত্রা পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। ধীরাজ ফাঁন্দ খুঁজতে লাগলো।

সন্ধ্যা একদম সোজা উপরে উঠে গিয়ে ঢুক্‌লো অনিতার ঘরে, দেখলে নমিতা ও অনিতা গল্প করছে। সন্ধ্যাকে দেখেই নমিতা বলে উঠলো, "খুব যা হোক বাবাঃ, এর নাম তোমার বেড়ান। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখদিকি—আটটা যে বাজে।" যেন কিছুই হয় নি, এমনি ভাবে সন্ধ্যা হাসতে হাসতে উত্তর দিলে, "বোটানিক্যাল্ গার্ডেন কখন দেখি নি কি না, তাই ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে রাত হয়ে গেল—তার উপর ধীরাজ বাবু প্রত্যেক গাছের নাম ও গুণ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন কি না? তাই আরও বেশী দেরী হয়ে গেল।" এক নিঃশ্বাসে এই ক'টি কথা বলেই সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে কাপড় ছাড়তে যেতে যেতে বল্‌লে "বস ভাই নমিতা—আমি এখনই আসছি।"

সন্ধ্যা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই অনিতা বল্‌লে,"আজ ভারী আনন্দ, এরকম কখনও দেখি নি. যেদিন থেকে ধীরাজ বাবু ওকে পড়াতে আরম্ভ করেছেন, সেদিন থেকেই ওকে সর্ব্বদাই চুপচাপ থাকতে দেখি, মুখ খানাও যেন সব সময়ই ভার ভার। আজ কিন্তু ব্যতিক্রম হয়েছে, না ভাই?" একগাল হেসে নমিতা উত্তর দিলে, "না ভাই বৌদি, তুমি এখনও ওকে ভাল করে চিনতে পার নি। ওর ওপরকার ভাবের সঙ্গে ভিতরকার যথেষ্ট তফাত আছে। আমি ওকে খুব ভাল রকম চিনি।" তারপর অনিতার কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে বললে, "ও অজয় বাবুকে ভালবাসে বৌদি।" অনিতাও একগাল হেসে বললে, "আমিও তা জানি, কিন্তু দাদুর ইচ্ছে ধীরাজ বাবুর সঙ্গেই ওর বিয়ে হোক। আহা যেমন চেহারা তেমনি কথা বার্ত্তা—ওর চালের কথা শুনলে আমার আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে।" নমিতাও অনিতার কথায় সায় দিয়ে বল্‌লে, "সত্যি ভাই বৌদি—সেদিন সন্ধ্যা আমায় পড়বার ঘরে ডেকেছিল, ঢুকে শেষে পালিয়ে আসতে পথ পাই না—যে ড্যাবরা ড্যাবরা চোখ, যেন গিলতে আসছে"। এমন সময় সন্ধ্যা সেখানে আসতে উভয়েই চুপ হয়ে গেল এবং তিনজনেই ভিন্ন কথা আরম্ভ করে দিলে।

সাত

পরদিন সকাল বেলা ধীরাজ পড়াতে এলো এবং পড়বার ঘরে একলা বসে দু'টি ঘণ্টা কাটিয়ে দিলে কিন্তু সন্ধ্যার দেখা নেই। অরুণকে সামনে দেখতে পেয়ে ধীরাজ হাতছানি দিয়ে ডাক্‌লে, বল্‌লে, "দিদি কি করছে? অরুণ, "ডেকে দিচ্ছি", বলে বাড়ীর ভেতর চলে গেল। খানিক পরে ঘরে ঢুকে বল্‌লে, "আজ বড় মাথা ধরেছে আজ আর পড়বে না দিদি বল্‌লে!" অগত্যা ধীরাজকে উঠতে হলো। বৈঠকখানা ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বীরেশ্বর তাকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন। ধীরাজ ঘরে ঢোকবা মাত্রই তিনি মুখ থেকে গড়গড়ার নলটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বল্‌লেন "কই সন্ধ্যাকে পড়ালেন না?" বিনম্র সুরে ধীরাজ উত্তর দিলে, "আজ ওর শরীরটা ভাল নেই তার ওপর ভয়ানক মাথা ধরেছে তাই পড়বে না।" হাসতে হাসতে বৃদ্ধ উত্তর দিলেন "অভ্যেস নেই কি না, তার ওপর অত পায়ে হেঁটে ঘোরা মাথা ব্যথা করবেই ধীরাজ—বুঝলে না-হাঁঃ। ওকে আমি কক্ষণও কোথাও হেঁটে যেতে দিই নি, এই ধর না আমার গাড়ী, এতো ওরই জন্যে কেনা। এখান থেকে ওখানে যেতে হলেই গাড়ী করে যেতে বলি—যাক্ একটু বিশ্রাম করলেই সেরে যাবে'খন, তুমি বৈকালে এসো কিন্তু?" ঘাড় নেড়ে ধীরাজ চলে গেল।

ধীরাজ চলে যেতে সন্ধ্যা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো কিন্তু আড়াল হতে শুনতে পেলো দাদু ওকে বৈকালে আসতে বল্‌ল। তখন আবার মুস্কিলে পড়তে হবে—সুতরাং উপায় কি, কি করে পড়া বন্ধ করা যায়। অনেক চিন্তার পর ঠিক করলে দাদুকে বলে দিনকতক পড়া বন্ধ করা যাক্।

বীরেশ্বর বাবু খেতে বসেছেন, সন্ধ্যা পাখার হাওয়া করতে করতে বল্‌লে, "দাদু, আপনি ধীরাজবাবুকে আসতে বারণ করে দেবেন, আমি দিন কতক পড়ব না।" জিজ্ঞাসু নেত্রে বৃদ্ধ সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বল্‌লেন "কেন মা? তুমি পড়বে না কেন?" সন্ধ্যা ধীরে ধীরে উত্তর দিলে, "কেবলি তো নতুন পড়া হচ্ছে, এখন পুরাণ পড়াগুলো একবার পড়ব তাই।" বীরেশ্বর বাবু নাতনীকে বিলক্ষণ চেনেন তাই বল্‌লেন, "তুমিই বোলো না ভাই, মিছিমিছি আবার এই বুড়োকে নিয়ে টানাটানি কেন?" সন্ধ্যা বল্‌লে "না দাদু আমি পারবো না, আপনি বলে দেবেন—" হাসতে হাসতে বীরেশ্বর বাবু বল্‌লেন, "আচ্ছা ভাই তাই হবে।"

সন্ধ্যাবেলা ধীরাজ আসতেই বীরেশ্বর বাবু বল্‌লেন, "জানো ধীরাজ, সন্ধ্যা দু'একদিন পড়তে চাইছে না, বল্‌লে কি পুরাতন পড়া নাকি করবে, তাই নিরিবিলিতে একলাই পড়া করবে—চারপাঁচ দিন পরে আবার তোমাকে পড়াতে বল্‌লে, তোমাদের সব কথা তোমরাই জান ভাই। আমি বলি হোলোই বা পুরাণ পড়া, তুমি থাক্‌লেই বা—ও বলে একলা পড়লে শিগ্‌গির আয়ত্ত হয়ে আসে।" ব্যাপারখানা যে কি ধীরাজ সবই জানে তাই বিশেষ আর কোন কথা না বলে বল্‌লে, "আচ্ছা তাই আসবো। আমি এখন চলি দাদু, আমার এক বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্ন আছে।" বলে আর কোন কথার অপেক্ষায় না থেকে তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসে গাড়ী ঘুরিয়ে চলে গেল।

অজয় বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে সোজা বাড়ী চলে এল। পথে কয়েকটা বইয়ের দোকানে যাবার দরকার থাকা সত্ত্বেও সেদিকে গেল না। বাড়ীতে ঢুকেই দেখলে বিশ্বনাথ এসে মার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করে দিয়েছে এবং বাড়ীর বাইরে

একখানা মোটার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে বাড়ী ঢোকবার পথে একটু থমকে দাঁড়ালে এবং পরক্ষণেই জানতে পারলে এ সমীরের গাড়ী ছাড়া আর কারও নয়।

সমীর গাড়ী থেকে নাম্‌তে নাম্‌তে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করে বল্‌লে, "আমি আপনার জন্তে কখন থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, মা বল্লেন আপনি বেড়িয়ে ফেরেন সাত আটটার ভেতর।" একটু হেসে অজয় উত্তর দিলে, "হাঁা, আমি এই সময়ই ফিরি অনেকটা পথ কি না।" হেসে সমীর বল্‌লে, "এত কষ্ট করবার কি দরকার? আপনি আমার গাড়ী নিয়ে গেলেই পারেন। বলেন তো রোজ বৈকালে গাড়ী পাঠিয়ে দিই।"—"না না গাড়ী পাঠাতে হবে না. আমি এমনি করেই যাব—আর মনে করে'ছ দিন কতক বাইরে ঘুরে আসব।" জিজ্ঞাসু নেত্রে সমীর বল্‌লে, "কোথায় যাবেন মনে করেছেন?" "ঠিক কিছুই করিনি তবে পাহাড়ে দেশ অর্থাৎ নৈনিতাল যাব মনে করেছি।" সমীর সাগ্রহে বল্‌লে, "বেশ তো চলুন না আমরাও যাব। লীলাও বেড়াতে যাবার কথা বলছিল। আপনি আমাদের সঙ্গে গেলে বেশ আমোদেই দিনগুলো কাটবেখন।" অজয় বল্‌লে, "তবে আসছে রবিবার রাত্রের ট্রেণে যাওয়া যাবে, কেমন? ঘাড় নেড়ে সমীর সায় দিয়ে বল্‌লে, "কাল বৈকালে আমাদের বাড়ী আপনার নেমন্তন্ন। লীলা বলছিল, আপনার যাওয়া চাই কিন্তু এবং খুব ভাল গল্প একটা সে শুনবে বলেছে।" "তোমার বাড়ী যাব সে আর এমন কি বড় কথা, নিশ্চয়ই যাব—" সমীর একটী নমস্কার করে চলে গেল, অজয়ও বাড়ীর ভেতর ঢুকে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। বিশ্বনাথ বল্‌লে, "কোথায় যাবার ঠিক করলে?" গা থেকে জামাটা খুলতে খুলতে অজয় বল্‌লে, "নৈনিতাল পাহাড়। সমীররাও যাবে বল্‌ছে। বেশ ভালই হবে, তবু গল্প-গুজব করে বাঁচবো—তুমিও চলো না বিশ্বনাথ?" বিশ্বনাথ ঠোঁটের কোণে একটু হাসি এনে বল্‌লে, "আমি তো আর কবি নই যে এত জায়গা থাকতে নৈনিতালের জঙ্গলে গিয়ে হাজির হব? তুমি যাও ভাই—আমার অনেক কাজ আছে কলকাতায়।" অজয় বল্‌লে, "তবে মা রইল দেখো—কেমন?—"তা দেখবোখন তবে বেশী দিন দেরী যেন করো না, তা হলে আবার আমায় ছুটতে হবে—" "না হে না" বলে অজয় হাত পা ধুতে চলে গেল। বিশ্বনাথ চলে গেল নিজের বাড়ী।

পরের দিন যথা সময় অজয় সমীরদের বালিগঞ্জের বাড়ী এসে হাজির হোলো ঠিক ছয়টার সময়। ভিতরে তখন সমীর ও ধীরাজের কথা হচ্ছিল—ধীরাজ বলছিল "তা'হলে অজয়বাবুও যাবে" সমীর বল্‌লে "নিশ্চয়ই যাবেন, তিনিই তো আগে নৈনিতালের কথা বল্‌লেন। রবিবার রাত্রের ট্রেনে আমরা রওনা হব।" কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অজয় এসে ঘরের ভেতর প্রবেশ করলে।

সম্মুখে একটা কাল সাপ দেখলে যেমন শিউরে ওঠে—হঠাৎ সম্মুখে অজয়কে আসতে দেখে ধীরাজও তেমন শিউরে উঠলো। গত বৈকালের বোটানিকাল গার্ডেনের কথা মনে হওয়ায় তার মুখ দিয়ে আর একটা কথাও বেরুলো না। সমীর এগিয়ে এসে বল্‌লে, আসুন আসুন অজয়বাবু আমরা আপনারই অপেক্ষা করছিলুম।" ধীরাজের প্রতি একটি বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অজয় বল্‌লে, "তা'হলে আমি ঠিক সময়ই এসেছি বলুন?" সমীরের কথা বলবার আগে লীলা সেখানে দৌড়ে এসে বল্‌লে "রবিবার আমরা নৈনিতালে যাব, আমার এত আনন্দ হচ্ছে যে কি বল্‌বো, বৌদি বলছিলেন আপনাকে কিন্তু খানকতক গল্পের বই নিয়ে যেতে হবে, তা আগে থেকে বলে রাখছি।" হাসতে হাসতে অজয় বল্‌লে, "বেশ তো. তার আর কি?" ধীরাজ এধারে পাশ কাটাবার চেষ্টায় ছিল কিন্তু সমীর বল্‌লে "তা কি হয়, এত জিনিষ খাবে কে?" অগত্যা ধীরাজকে থাকতে হোলো এবং আহারাদিও করতে হোলো কিন্তু অজয়ের সঙ্গে সে কথা পর্য্যন্ত কইলো না। যাই হোক, অধিক রাত্রে অজয় বাড়ী ফিরে এলো।

স্তব্ধ নিশুতি রাত। সেদিন শনিবার। নূতন বাজারের পাশে একটি অপ্রশস্ত গলির ভেতর একটি ছোট্ট টিনের বাড়ী। তারই একটি কামরায় বসে ধীরাজ। সামনের টেবিলে অগোছাল ভাবে কয়েকটা গেলাস ও বোতল। আরও কয়েকজন অল্পবয়স্ক যুবক সেখানে বসে আছে। অতি নিম্নস্বরে ধীরাজ বল্‌লে, "কাল রাত ন'টার ট্রেনে ওরা যাবে, অজয়ের প্রতি একটু লক্ষ্য রেখ—যা বলেছি সব মনে আছে তো?" যুবকরা নিম্নস্বরে কথায় সায় দিলে। ধীরাজ আবার গম্ভীর কণ্ঠে বল্‌লে "যেমন করেই হোক ওকে সরাতেই হবে দিন কতকের জন্য, যেন কেউ টের না পায়—" তারপরে অতি ধীরে ধীরে বল্‌তে লাগলো, "বিয়েটা হয়ে গেলে তবে ওকে ছেড়ে দেবো।"

রবিবার রাত্রের ট্রেনে অজয়, সমীর, শোভা ও লীলা নৈনিতালের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল, আর সেই গাড়ীতেই গেল অলক্ষ্যে দু'জন যুবক ওদেরই পাশের কামরায়। তাদেরও টিকিট ছিল নৈনিতালের।

একটি ছোট বাংলো আগে থেকেই ভাড়া করা ছিল; সুতরাং ট্রেন থেকে নেমে সমীরদের কোন অসুবিধাতেই পড়তে হোল না—অজয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট হোলো বাইয়ের ঘরের পাশের ঘরটি। লীলা হাত মুখ নেড়ে জানিয়ে দিলে 'এই ঘরটিতেই অজয়দা থাকবে' কারণ এইটেই হচ্ছে বাড়ীর সবচেয়ে নিরিবিলি ঘর—আর এই ঘরটিতেই তার লেখার

সুবিধে হবে। ভিতরের চারখানা ঘরের একখানায় থাকবে শোভা ও সমীর, তার পাশের ঘরে থাকবে লীলা এবং দিন কতক পরে তার এক মাসতুতো বোন আসবে, সেও থাকবে এই ঘরে। আর দুটো ঘরে চাকর-বাকরেরা থাকবে।

তিন দিন পরে এসে জুটলো লীলার মাসতুতো বোন, অজয় তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। শুধু অবাক নয়, কি করে যে এটা সম্ভব হোলো তা সে কোন মতেই বুঝে উঠতে পারলে না। লীলার মাসতুতো বোনটি আর কেহই নয়, এ আমাদের সন্ধ্যার বান্ধবী ও সহপাঠী নমিতা। নমিতাও অবাক হয়ে গেল লীলাদের সঙ্গে অজয়কে দেখে। অজয়-বাবু এখানে কি করে এলো এবং কেমন করেই বা সমীরদাদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা হোলো, এই প্রশ্নই তার মনে বারবার জাগতে লাগলো। তারপরে যখন শোভার মুখে শুনতে পেলে কি করে শ্যামবাজারের মোড়ে সমীরের গাড়ীর ধাক্কায় পড়ে গিয়ে তিনি তাদের বাড়ীতে চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং সেরে উঠে এখানে বেড়াতে এসেছেন! তখন সে সব বুঝতে পারলে। কিন্তু লীলা যখন জিজ্ঞাসা করলে "আচ্ছা ভাই নমিতাদি, তুমি অজয়দাকে চিনলে কি করে?" নমিতা তখন হেসে উত্তর দিলে, "ও মা, অজয়বাবুকে কে না চেনে? কলকাতায় ওঁর কত নাম। ওঁর কত লেখা পড়েছি—আমাদের স্কুলে একবার উনি গেছলেন, তাই ওঁকে দেখেছি।" এবারে নমিতা চুপ করে গেল। সে লীলাদের ঘুণাক্ষরেও জানতে দিলে না, যে অজয়ের সঙ্গে তার পরিচয় কোথায় এবং এর মূল কোনখানে। লীলা অবশ্য নমিতার বন্ধু সন্ধ্যাকে বেশ চেনে, কারণ আগে আগে সন্ধ্যা প্রায়ই নমিতার সঙ্গে বালিগঞ্জে লীলাদের বাড়ী বেড়াতে যেত, তাই লীলা ভাল করেই সন্ধ্যাকে চেনে, সুতরাং সন্ধ্যা যে অজয়কে ভালবাসে একথা নমিতা একদম এদের কাছে চেপে গেল।

এধারে অজয়ও অবাক হয়ে গেল নমিতাকে দেখে। নমিতা যে সমীর বা লীলার মাসতুতো বোন কই এ কথা ত আগে কেহই তাকে বলে নি—যাই হোক, সে নমিতাকে এড়িয়ে চলতে আরম্ভ করলে—কারণ, পাছে আবার সন্ধ্যার কথা এসে পড়ে। যখনই সেই বোটানিক্যাল গার্ডেনের ব্যাপার তার মনে পড়ে, তখনই সন্ধ্যার প্রতি একটা বিরক্তি ও ঘৃণায় তার সমস্ত অন্তরটা রি রি করে ওঠে। নমিতাও তো তার বন্ধু, সুতরাং তার প্রতিও একটা বিদ্রোহ ভাব জেগে ওঠা স্বাভাবিক, অজয়ের প্রকৃতিও হয়েছে তাই। সে সর্ব্বদাই দূরে দূরে থাকতে চায় এদের কাছ থেকে। লীলা বলে "অজয়দা কবি কি না তাই তিনি সর্ব্বদাই যেন কি ভাবেন?" নমিতা শুধু মুখ টিপে টিপে হাসে, কোন উত্তর করে না।

এধারে যে দুইটি যুবক কলিকাতা হতে এদের অনুসরণ করেছিল তারাও সমীরদের বাংলো থেকে একটু দূরেই একটা বাড়ী ঠিক করে নিয়েছে এবং সদা সর্ব্বদাই পাল্টাপাল্টি ভাবে সমীরদের বাড়ীর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে। অজয় কখন কোথায় যায় এবং কোন সময় তাকে নিরিবিলিতে পাওয়া যায় এইটাই হচ্ছে তাদের অনুসন্ধানের বিষয়।

নমিতা ও লীলা রোজই বৈকালে ছাতে উঠে বেড়ায় এবং নমিতা রোজই লক্ষ্য করে—একটু দূরে সামনের বাড়ী থেকে একটা মোটা সোটা গুণ্ডা-প্রকৃতির যুবক তাদের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে। নমিতার ইঙ্গিতে লীলা হেসে বলে "দেখ নমিতাদি, লোকটাকে নিয়ে একটু মজা করলে হয় না?" হেসে নমিতা উত্তর দেয় "দূর! ও আমাদের দেখে না, দেখছিস না ওর চোখ দু'টো বাড়ীর দরজার উপর রয়েছে—ডাকাত টাকাত হবে, চ ভাই নীচে নেমে যাই।" নমিতা ও লীলা তাড়াতাড়ি জড়াজড়ি করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

সমীররা এ বাড়ীতে আসবার পরই কোথা থেকে একটি কাল কুকুর এসে জুটেছিল। বাড়ীর সকলে কুকুরটাকে আমল না দিলেও অজয় কিন্তু তাকে খুব ভালবাসতো এবং রোজই খাওয়া-দাওয়ার পর কিছু কিছু খাবার তাকে দিত। একদিন লীলা বল্লে "ওটি আপনার পুষ্যিপুত্তুর নাকি অজয়দা?" হেসে অজয় উত্তর দিলে, "তারও বাড়া। কষ্টে পড়ে স্বেচ্ছায় ও আমার আশ্রয় নিয়েছে, ওকে তো আমি তাড়িয়ে দিতে পারি না—তোমরা হয় ত পার?" নমিতার ডাকে লীলা সেখান থেকে সরে পড়ল।

সেদিন বৈকালে অজয় একলাই বেড়াতে বেরুলো। কুকুরটি কিন্তু সঙ্গ ছাড়লো না—অজয় তার মাথায় মৃদু আঘাত করে বল্লে 'তবে চল্ একটু বেড়িয়ে আসবি।'

অজয়ের বাড়ী থেকে বেরবার পরই অলক্ষ্যে সামনের বাড়ীর যুবক দু'টি তার পিছু নিলে। অজয় একদমই টের পেলে না। নমিতা ছাতে বেড়াতে বেড়াতে লক্ষ্য করলে—অজয়ের খানিকটা পিছু পিছু যুবক দু'টি গল্প করতে করতে এগিয়ে চলেছে। ক্ষণিকের জন্যে একটা অশুভ কথা নমিতার মনের কোণে উদয় হোলো কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলে ভয়ই বা কিসের? অজয়বাবু তো পুরুষ মানুষ—যদিই বা ওদের কিছু দুরভিসন্ধি থাকে—নাঃ তাই বা কি করে হবে? অজয়বাবু তো ওদের কোন অনিষ্ট করেন নি—হঠাৎ শোভার ডাকে নমিতার চমক ভাঙলো, চেঁচিয়ে উত্তর দিলে "যাই বৌদি?"

ছাত হতে বারান্দায় নেমে আসতেই সমীর বল্লে "চল্ নমি, একটু বেড়িয়ে আসি? লীলা, তোর বৌদি সকলেই যাবে" লীলা ও শোভার তখন কাপড়-চোপড় পরা হয়ে গেছে, নমিতাও সাজগোছ করতে চলে গেল। সমীর ড্রাইভারকে মোটর আনতে হুকুম দিলে।

বেড়িয়ে বাড়ী ফিরতে সমীরদের প্রায় আটটা বেজে

গেল। লীলা চাকর-বাকরদের কাছে খবর নিয়ে জানতে পারলে তখনও অজয় বেড়িয়ে বাড়ী ফেরে নি—সমীরের কানে একথা গেল। সমীর শোভা ও নমিতাকে ডেকে বল্‌লে, "অজয়বাবু এখনও বেড়িয়ে বাড়ী ফিরলেন না কেন বল্ তো?" লীলা পাশ থেকে গলা বাড়িয়ে বল্‌লে—"ও সব কবিদের খেয়াল, কখন যে কি করেন কিছুই ঠিক থাকে না—হয়তো অনেকদূর গিয়ে পড়েছেন। এত করে বল্লুম—আমাদের সঙ্গে চলুন, তা হোলো না—" এমন সময় বাড়ীর বাইরে কুকুরের ভীষণ চীৎকারে সমীর তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখে—সেই কাল কুকুরটা কেবল সামনের দু'পায়ে দরজা আঁচড়াচ্ছে আর চীৎকার করছে। নমিতা, লীলা, শোভা সকলেই বেরিয়ে এলো।

নমিতা বল্‌লে, "দেখ সমীরদা, কুকুরটা কিন্তু অজয়বাবুর সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিল—" লীলা ভয়-চকিত কণ্ঠে বল্‌লে, "কুকুরটা ত ফিরে এলো কিন্তু অজয়দা কই?" নমিতা বল্‌লে, "হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়েছে, দেখ সমীরদা—অজয়বাবু যখন বেড়াতে বেরুলেন তখন ঐ সামনের বাড়ী থেকে দু'টো লোক তাঁর পিছু পিছু গিয়েছে। সেই যে রে লীলা, সেই লোক দু'টো"। সমীর বল্‌লে, "কোন লোক দু'টো রে লীলা?" ভয়ে ও বিস্ময়ে বড় বড় দুটো চোখ বের করে লীলা উত্তর দিলে—"ঐ সামনের বাড়ী থেকে দু'টো লোক রোজই আমাদের বাড়ীর দিকে চেয়ে বসে থাকে" কুকুরটা তখনো লেজ আস্ফালন ও চীৎকারে সেখানটা কাঁপিয়ে তুলছিল। কর্কশ কণ্ঠে সমীর বল্‌লে এতদিন বলেন নি কেন?" তার পরই ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল এবং দেরাজ খুলে ছয়নলা পিস্তলটায় টোটা ভরে দু'টো টর্চ-লাইট হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে নেপালী চাকরটাকে বল্‌লে, "বাহাদুর, হামার সাথমে আও।" নমিতা ধরে বসলো আমিও যাব সমীরদা।" সমীর বল্‌লে, "তবে শিগ্‌গির চল্।" নমিতা তাড়াতাড়ি কোমরে কাপড় জড়িয়ে নিলে, সমীর আর একটা রিভলভার তার হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে লীলা ও শোভাকে ভাল করে দরজা বন্ধ করে রাখতে বলে কুকুরটার পিছু পিছু এগিয়ে চল্‌লো। নমিতা চল্‌লো তার পিছু এবং সব পিছনে নেপালী চাকরটা।

ক্রমশঃ পল্লী ছেড়ে তারা একটা ছোট পাহাড়ের গোড়ায় এসে হাজির হোলো। একে ঘোর অন্ধকার, তাতে আবার ঘন জঙ্গল। কম্পিত হস্তে সমীর রিভলভারটা চেপে ধরে বল্‌লে, "নমি সাবধান হয়ে টর্চটা ধরিস্?" কুকুরটার চীৎকারের বিরাম নেই। সামনে খানিকটা দূরে টর্চের আলোয় দেখা গেল, একটা ছোট একতলা বাড়ী। তার চারিধারে এত বন যে, বাইরে থেকে বাড়ীটাকে লক্ষ্য করা যায় না। কুকুরটা ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়লো সেই বাড়ীর দরজার উপর। নমিতাকে চাকরটার জিম্বায় সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে সমীর জঙ্গল ঠেলে বাড়ীর দরজাটা টর্চের আলোয় লক্ষ্য করে এগিয়ে চল্‌লো। কুকুরটা তখনও সামনের দুইপায় দরজাটা আঁচড়াচ্ছে। দরজায় ধাক্কা দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে সমীর ডাকলে "অজয়বাবু, অজয়বাবু," কোন সাড়াই পাওয়া গেল না, দূর হতে শুধু প্রতিধ্বনি ফিরে এলো। পাশের ঝোপের মাঝে হুড়মুড় করে কি একটা শব্দ হওয়ায় সেই দিক লক্ষ্য করে সমীরের রিভলভার গর্জ্জন করে উঠলো গুড়ুম্ গুড়ুম্।

একটা ভাবী বিপদের আশঙ্কায় নমিতা ও নেপালি চাকরটা তাড়াতাড়ি সমীরের কাছে এগিয়ে এলো। ব্যগ্র কণ্ঠে নমিতা বল্‌লে, "সমীরদা দরজাটা ভেঙ্গে ফেল্‌লে হয় না?" সমীর বল্‌লে, "ঠিক্ বলেছিস্" সঙ্গে সঙ্গে বাহাদুর ও সমীর গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে দরজায় ধাক্কা মারতে লাগলো। দু'চারবার ধাক্কা মারবার পরই দরজাটা হুড়মুড় করে ভেঙ্গে ভিতর দিকে হেলে পড়ল নমিতা চেঁচিয়ে উঠলো" অজয়বাবু?"

বাড়ীটিতে মাত্র তিনখানি ঘর। পাঁচ ব্যাটারী ডবল টর্চের আলোয় খুঁজতে খুঁজতে সমীর ও নমিতা এসে হাজির হোলো একেবারে শেষের দিকের ঘরখানায়। দরজা ভেজান ছিল। কুকুরটা ঝাঁপিয়ে পড়তেই দরজাটা একদম পড়ে গেল ভিতর দিকে। একলাফে সমীর ভিতরে ঢুকেই দেখতে পেলে অজয় কাঠের মত বসে আছে ঘরের এক কোণে, হাত পা ও মুখ বাঁধা। তাড়াতাড়ি নমিতা ও চাকরটার সাহায্যে সমীর অজয়ের সমস্ত বাঁধনগুলো ছুরি দিয়ে কেটে দিলে। তারপরে চাকরটাকে ইঙ্গিত করতেই সে অজয়ের অজ্ঞান দেহটাকে কাঁধের উপর ফেলে সমীরের আগে আগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চল্‌লো। গম্ভীর কণ্ঠে সমীর বল্‌লে, "নমি, তাড়াতাড়ি চল্।"

নমিতা ও লীলার শুশ্রূষার গুণে খানিক পরেই অজয়ের জ্ঞান ফিরে এলো। "মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সমীর বল্‌লে, 'কেমন আছেন অজয় বাবু এখন'?" ঘাড় নেড়ে অজয় জানালে 'ভাল আছি' তারপরে চল্‌লো প্রশ্নের পর প্রশ্ন। অজয় বল্‌লে, "বৈকালে তো বাড়ী থেকে বেড়াতে বেরুলুম। সবেমাত্র খানিকটা অর্থাৎ ঐ পাহাড়ের কাছ বরাবর গেছি, অমনি কে যেন পিছন হতে একখানা চাদর ঝপ্ করে আমার মুখের উপর ফেলে দিয়ে চেপে ধরলে। আমি ছাড়াবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ওরা দু'জন থাকায় আমি ওদের সঙ্গে পেরে উঠলুম না—জ্ঞান হারিয়ে ফেললুম, তারপর কি হোলো জানি না।" লীলা বল্‌লে, "আপনার পুষ্যিপুত্তুরটি না থাকলে আপনার যে কি হতো তা বলতে পারছি না—" অজয় বল্‌লে, "ঐ কুকুরটা না কি?"

অজয় আর সমীর পরদিনই কলিকাতায় রওনা হইয়া গেল।

[ক্রমশঃ]

শিশু-সংসদ

দুই স্যাঙাৎ

আনন্দবর্দ্ধন

দু'টি পাশাপাশি গ্রাম। দুই গ্রামে বাস করতো দুই ওস্তাদ। দু'জনেরই ছিল খুব নামডাক, দু'জনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। দুই গ্রামের মাঝখানে ছিল একটা বুড়ো বট, সেই বটের ছায়ায় ব'সে একসঙ্গে তামাক না খেলে তাদের দিন কাটতো না। একজনের নাম ছিল—বাক্যবীর। আর একজনের নাম ছিল—বাহুবীর। বাক্যবীর বচনের জোরে অঘটন ঘটাতে পারতো। বাহুবীর জিভের দৌড় একেবারে করতে জানতো না, সে গায়ের জোরে সমস্ত কাজ করতো। ভারী মোট বইতে, বড় বড় গাছ কাটতে, ডাকাত মারতে, চোর ধরতে, কোদাল পাড়তে, হাজার বারোশো ডিগবাজি খেতে আর পরিশ্রমের সকল রকম কাজ করতে সে ভীষণ ওস্তাদ ছিল।

একদিন সেই বুড়ো বটতলায় মিলবে ব'লে দুই গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়লো দুই বন্ধু।—দু'জনেই হনহন্ ক'রে চলেছে, হঠাৎ তাদের দেখা হ'য়ে গেল—ভূতপত্রীর জলার কাছে। এই জলা পেরিয়ে তবে তা'রা পৌঁছুতো বটগাছতলায়।—

দু'জনেই দু'জনকে সামনাসামনি দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

বাক্যবীর বললে—"আরে—স্যাঙাৎ যে! চলেছ বুঝি আমাদের সেইখানে?"

বাহুবীর মুখে কিছু না ব'লে তিনতুড়ি তিন লাফ দিয়ে কেবল হাত আর ঘাড়টি পাঁচবার ডাইনে-বাঁয়ে দুলিয়ে বন্ধুর কথায় সায় দিলে।

বাক্যবীর একেবারে বাহুবীরের হাত দু'টি ধ'রে বললে—"দেখো বন্ধু, আমার মাথায় একটা মতলব এসেচে। এই ক'দিন থেকে ভাবছি—শুধু কি বটগাছতলায় তামাক খেয়ে আমরা দুই ওস্তাদে দিন কাটিয়ে দোবো! লোকে ভাববে কি। বলবে—এরা নেশাখোর, নামেই ওস্তাদ, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা! তাই বলি, আমরা এমন এক অদ্ভুত কাণ্ড করবো—যা' দেখে-শুনে লোকের চোখে তাক্ লেগে যাবে। এসো—আমাদের দু'জনের ভেতর কে বড়, কে ছোট—তা'র একটা পরখ্ হ'য়ে যাক্।"

বাহুবীর মাথা নেড়ে বললে—"বেশ তো—এসো আমরা সকলকে সাক্ষী রেখে কুস্তি লড়ি, যে হারবে সে ছোট, যে জিতবে সে বড়।"—

বাক্যবীর একটু ফিক্ ক'রে হেসে ব'লে উঠলো—"খুব বলচো—স্যাঙাৎ! দুই বন্ধুতে কি লড়াই করতে আছে, লোকে নিন্দে করবে। আমার কথাটা আগে বোঝো। আমি বলচি—গায়ের জোর বড় না বচনের জোর বড়? কোনটা সেরা? যার জোর বেশী হ'বে সে হ'বে বড় ওস্তাদ, আর যার জোর হার মানবে—সে হ'বে তার সাকরেদ। এতে তোমার মত নেই?"

বাহুবীর অনেকক্ষণ ভেবে বললে—"তোমার কথাই রইলো—বন্ধু! আমরা দু'জনে পালা করি—এসো! মাসের পোনেরো দিন তুমি হ'বে বড়—আমি হবো ছোট, আবার বাকি পোনেরো দিন আমি হবো বড়—তুমি হ'বে ছোট। একবার তুমি ওস্তাদ, আমি সাকরেদ, আর একবার আমি ওস্তাদ—তুমি সাকরেদ। লোকেও কিছু বলতে পারবে না, আমাদেরও খেদ থাকবে না।"

বাক্যবীর বললে—"দূর, ওতো হোলো ফাঁকি, লোকের ওতে কি মন উঠে? সকলে বলবে—'ওরা দু'জনে স্যাঙাৎ কিনা, তাই আমাদের চোখে ধুলো দিতে পালা ক'রে 'ছোট-বড় সেজে লুকোচুরি খেলচে!' সত্যিকারের বড় কে—তা' তো প্রমাণ হ'বে না।"—

তখন বাহুবীর বললে, "কেমন ক'রে তা' হ'বে, স্যাঙাৎ? আমার মাথায় তো কিছু যোগাচ্চে না।"

বাক্যবীর বললে, "সেজন্যে ভাবনা কি? সময় যখন আসবে, তখন দুই বন্ধুর মধ্যে কা'র জোর বেশী, বোঝা যাবে। এখন চলো আমার বাড়ীতে। সেখানে কিছুদিন থাকবে। একসঙ্গে দু'জনে না থাকলে, কে বড়—কে ছোট, প্রমাণ হ'বে না।"

বাহুবীর বন্ধুর কথায় অমত করলে না। বাক্যবীরের বাড়ীতে গিয়ে বাহুবীর বাস করতে লাগলো। একসঙ্গে তা'রা কয়েক মাস নানা উৎসবে আমোদে দিন কাটিয়ে দিলে।

সেদিন ভূতচতুর্দ্দশী। বাহুবীরের সাধ হোলো মা কালীর কাছে একটা ছাগ বলি দিয়ে সেই মাংসের বেশ ভোজ করে। মনের ইচ্ছে আর চাপতে না পেরে সে তখুনি বাক্যবীরকে বললে—"স্যাঙাৎ, এই কালীপূজোয় মা-র নামে একটা পাঁটা বলি দোবো মনে করেচি। তারপরে মা-র প্রসাদ পাওয়া যাবে।" বাক্যবীর বললে, "তোমার ইচ্ছে হ'য়ে থাকে, পূরণ করো! আপত্তি কিছু নেই।" তখন বাহুবীর বন্ধুকে জানালে, "দেখো বন্ধু, আমরা দু'জনেই যখন এক এক দিকে ওস্তাদ, তখন পয়সা দিয়ে ছাগল কিনে মা-র কাছে নিবেদন করবো, এ

কথা মনে করতেও আমাদের লজ্জা। আমাদের উচিত বিনি-খরচায় একটা মোটাসোটা দেখে পাঁটা যোগাড় করা।"

বাক্যবীর উত্তর দিলে, "ঠিক বলেছ, স্যাঙাৎ! পয়সা খরচ ক'রে ছাগল কিনবো আমরা? তবে আমরা ওস্তাদ কিসের? কেমন ক'রে ছাগল যোগাড় করতে হয়—সে ফন্দি আমি জানি। সন্ধ্যে পর্য্যন্ত শুধু অপেক্ষা ক'রে থাকো।"

বাক্যবীরের বাড়ীর কিছু দূরে এক গোপাল থাকতো, তা'র এক পাল গরু আর ছাগল ছিল। গোপালের গোঠে পৌঁছুতে হ'লে পূরো একটি ঘণ্টা লাগতো। দুই বন্ধু মতলব করলে—রাত্রে লুকিয়ে গিয়ে ঐ গোপালের খোঁয়াড় থেকে একটা হৃষ্টপুষ্ট ছাগল চুরি ক'রে আনবে। আস্তে আস্তে চারিদিকে অন্ধকার ছেয়ে আসতে লাগলো। বাক্যবীর আর বাহুবীর রওনা হোলো গোঠের দিকে। গোঠের কাছে এসেই তা'রা দাঁড়িয়ে পড়লো। গোপাল সবেমাত্র গোঠের কাজ শেষ ক'রে ঘরে ফেরবার ব্যবস্থা করছিল। সারাদিনের খাটুনির পর সে বাড়ী গিয়ে গরম গরম ভাত খাবে—তাই ছিল তা'র তাড়াতাড়ি। কিন্তু গোঠে পাহারা দেবার মত তা'র আর বিশ্বাসী কোনো লোক ছিল না, তাই সে খেতে যাবার সময়ে চোর-তাড়ানো এক ফিকির বা'র করেছিল। প্রতিদিনকার মত গোপাল গোয়াল-ঘরের কাজ-কর্ম্ম সেরে ঝাঁপ বন্ধ ক'রে দিলে, তারপরে খোঁয়াড়ের সামনে তা'র পাঁচন-বাড়িটা মাটিতে পুঁতে তা'র ওপর একটা ধোঁয়া-রঙের কম্বল চাপা দিয়ে এমনটি সাজালে যে—দূর থেকে দেখলে মনে হয়—কে যেন কম্বল মুড়ি দিয়ে ব'সে রয়েছে। এই সমস্ত কাজ শেষ ক'রে সেই চোর-ঠকানো মেকি পাহারাটির দিকে চেয়ে গোপাল চেঁচিয়ে ব'লে গেল—"বাপ্ আমার, এখানে চুপটি ক'রে ঘুপটি মেরে ব'সে ব'সে পাহারা দে'। আমার বড় খিদে পেয়েচে, আমি তোকে রেখে এখন খেতে যাচ্ছি। আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত এই গরু-ছাগলের পালের দিকে নজর রাখিস্! কাছেই রয়েচে জঙ্গল, এই জঙ্গল বাঘ আর দুষ্ট ভূত-পিশাচে ভর্ত্তি!—আশেপাশে চোর ঘোরাঘুরি করচে,—তাই বলচি, খুব সাবধান! হয়তো অন্ধকারে ওৎ পেতে আছে কোনো পাজি চোর, না হয় ভূত—কি কুত, কেউ যদি ছাগল চুরি করতে আসে—অমনি বাটুল্ ছুঁড়ে মারবি। দেখিস্ বেটা, গরু-ছাগলের পালে চোখ রাখিস্!" এই কথা ব'লে গোপাল চ'লে গেল।

দুই বন্ধু একটা গাছের আড়ালে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল। তা'রা গোপালের কথাগুলো শুনতে পেলে। কিন্তু গোপালের সমস্ত চালাকি বাক্যবীর ধরতে পেরে মনে মনে হাসতে লাগলো। একটা কম্বলঢাকা লাঠি হয়েচে চোর-খেদানো পাহারা! বাহুবীর ঠিক উলটো বুঝলে, গোপালের ধাপ্পা তার চোখে পড়েনি। সেই কম্বল-মুড়ি-দেওয়া লাঠিকে সে মনে করলে—সত্যিই পাহারা ব'সে আছে। তখন বাহুবীর ভয় পেয়ে বন্ধুকে চুপি চুপি বললে, "এখন আমরা কি করি? এতদূর এসে শেষকালে সব মতলব যে পণ্ড হোলো! দেখো, ঐ খোঁয়াড়ের সামনে লাঠি হাতে একটা পাহারা ব'সে রয়েচে!"

বাহুবীরের ভয় দেখে বাক্যবীর খিলখিল্ ক'রে হেসে উঠলো, বললে, "স্যাঙাৎ, তোমার গায়ে তো খুব জোর, পা' টিপে টিপে গিয়ে পিছন দিক থেকে পাহারার মুণ্ডুটা একবার ঘুরিয়ে দিয়ে আসতে পারো? তবেই বুঝবো তোমার ভরসা আছে।" বন্ধুর কাছে এই অপবাদ—তার ভরসা নেই! বাহুবীর তখন মালকোঁচা বেঁধে তাল ঠুকে ঘুসি পাকিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরলে সেই চোর তাড়ানো লাঠির সেপাইকে। তখন সে বুঝতে পারলে—এ-সমস্ত লোক-ঠকানো ব্যাপার। বাক্যবীর মুচকি হেসে বললে, "কি হে বন্ধু, এবার বুঝেছ—ও কেমন পাহারা! কিলের চোটে বেটাকে খুব কাবু ক'রে দিয়েছ বুঝি—বেটা একেবারে লাঠির সেপাই ব'নে গেছে!" বাহুবীরের কাণে বন্ধুর ঠাট্টা বাজলো না, ওটা সত্যি মানুষ পাহারা নয় জেনে সে খুব খুসি, বললে, "দেখো স্যাঙাৎ, বেটা গোপলা যেমন ঠকাতে চেয়েচে, তেমনি ওকে হাতে হাতে ফল দিতে হ'বে। বেটার সেরা ছাগলটাকে চুরি ক'রে আমরা এর শোধ নোবো।" বাক্যবীর বললে, "চলো, এবার আস্তে আস্তে আগোড় সরিয়ে খোঁয়াড়ের ভেতর ঢুকি। দেরী করলে গোপাল বেটা এসে পড়বে, তখন আমরা পালাতে পথ পাবো না।" দুই বন্ধু যুক্তি ক'রে গোয়ালঘরে ঢুকে পড়লো।

সেদিন ভূতচতুর্দ্দশীর রাত্রি, যত সমস্ত দুষ্ট ভূত আর পিশাচ দামাল হ'য়ে উঠেচে। সে রাত্রে তাদের বড় আহ্লাদ। এইরকম একটা ভূত সেই রাত্রে খোঁয়াড়ের ভিতর একটা মোটা ছাগল চুরি করতে এসে ঘুপটি মেরে বসেছিল। গোপালের মুখে কুত্তের কথা শুনে অবধি সেই ভূতটা ভয়ে কাঁপছিল—ঠিক বাঁশপাতার মত। তার ভাবনা হোলো—"কুঁত কিঁরে, বাঁপ। নাঁম শুঁনিনিঁ তোঁ কঁখনোঁ। এঁ কুঁত্তেরা আঁবার কিঁ রঁকম। ভূঁতের চেঁয়ে আরোঁ বঁড় কোঁনো বঁদরাঁগী জাঁত নঁয় তোঁ। ওঁরে বাঁপ—দোঁবো নাঁকি লাঁফ্। বাঁচবো কেঁমন কোঁরে—যঁদি আঁসে কুঁত! আঁগে চিঁনি কেঁমন সেঁ—কোঁন্ নঁরকেঁর পুঁত। যঁদি বেঁটা ভূঁত-খোঁর হয়—তঁখন আঁমাঁয় এঁকলা পেঁয়ে দেঁবে গাঁলে পূঁরে, সেঁই নাঁড়িপঁচা পেঁটের ভেঁতঁর মঁরবো মাঁথাঁ খুঁড়ে? আঁর কাঁজ নেঁই বাঁপ—এঁখন গাঁ ঢাঁকাঁ দিঁই সাঁফ্।" এই ভেবে কুত্তের ভয়ে ভূতটা একটা ছাগল হ'য়ে সেই ছাগলের পালের মধ্যে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

এতোক্ষণে সেই দুই বীর গোয়ালঘরে ঢুকে প'ড়ে মনের মত একটা ছাগল খুঁজতে লেগে গেছে। একটার পর একটা দেখে চলেছে দুই বন্ধু—যেই কোনো খুঁৎ পায়, অমনি সে ছাগলটা আর তাদের পছন্দ হয় না। এই ভাবে দলকে দল বাতিল করতে করতে তা'রা শেষে দেখতে পেলে—সব চেয়ে সেরা কালো কুচকুচে একটা শিং, কোণের দিকে শিং নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেইটিকে তাদের খুব পছন্দ হোলো। কিন্তু সেটি সেই 'ভুতো ছাগল।' দুই বন্ধু বেশ করে সেই ছাগলটিকে পরখ করলে, তুলে দেখলে খুব ভারী। কারণ—তা'রা যখন সেই ছাগল-সাজা ভূতটাকে কোলপাজা ক'রে তুলতে চেষ্টা কচ্ছিল—ভূতটাও নিজেকে ততো ভারী ক'রে তুলছিল। বাহুবীরের গায়ে ভীষণ ক্ষমতা, তা'র লোহার মত শক্ত মুঠির দু'চারটি ঘা' খেয়ে আর দু'চারবার

নাড়া পেয়ে ভূতটা সেই দুই ওস্তাদকে কুত্ত ব'লে ধ'রে নিলে। মনে মনে সে বললে, "এঁই রেঁ কুঁত্তের পাল্লায় শেষকালে পোড়ে গেলুম। আঁমাকে এঁখন ধোঁরে নিঁয়ে যাঁচ্ছে ওঁরা। কঁরি কিঁ? লোঁভে পোড়ে পাঁটা চুরি কঁত্তে এসে নিজেই ধরা পড়লুম রে! কেঁন ছাই গোঁবর এই চুলোর খোঁয়াড়ে এলুম। হাঁয়রে বাঁপ—কেঁদে ফেলবোঁ নাকিঁ ডাক ছেড়ে, না চিঁচাবোঁ। আমি ভূতের বেটা সাচ্চা ভূত, আমায় কিনা ভূতে ধরেচে, আ্যা।" ভূত একেই তো কুত্তের ভয়ে মরে রয়েছে, তায় আরো এইসব কথা যত ভাবে, ততোই তার ভয় বেড়ে উঠতে থাকে। দুই বন্ধু ছাগল-ভূতের চার পায়ে খুব শক্ত করে দড়াদড়ি বাঁধলে, তারপরে বাহুবীর তাকে কাঁধে নিয়ে চললো বাড়ীর দিকে, পিছু পিছু চললো বাক্যবীর। ভূত দেখ্‌লে আর পালাবার উপায় নেই, তখন সে মরীয়া হ'য়ে ভূতুড়ে দুষ্টুমি শুরু করলে। বাহুবীর এক পা' এক পা' এগোয় আর তার বোধ হয় কাঁধের ওপর ছাগলটা ক্রমশঃ ভারী হ'য়ে উঠচে। ভারের চোটে তার সর্ব্বাঙ্গ যন্ত্রণায় টন্‌টন্ করতে লাগলো। যখন অসহ্য হ'য়ে উঠলো—বাহুবীর তার বন্ধুকে ডেকে বললে, "ভাই বাক্যবীর, এই ছাগলটা থেকে থেকে বেজায় ভারী হ'য়ে উঠ্‌চে, আমার সারা দেহ ব্যথায় ঝন্‌ঝন্ কর্‌চে, শিরগুলো যেন ছিঁড়ে যাবো যাবো হয়েচে, আর মাথা তুলে রেখে হাটতে পাচ্চি না। আমরা বোধ হয় ছাগল ভেবে ভুল ক'রে কোনো প্রেতকে ব'য়ে নিয়ে যাচ্চি। আজ আবার ভূত-চতুর্দ্দশী!"

বন্ধুর কথা শুনে বাক্যবীর ভয়ে শিউরে উঠ্‌লো, কিন্তু বাইরে এমন ভাব দেখালে যে—সে একটুও যেন ভয় পায় নি। সে তখন ভরসা ক'রে বচন ছাড়্‌লে, "আরে স্যাঙাৎ ভাব্‌না কেন? ছাগলটাকে খুব ভারী যদি মনে করো, ওটাকে আছাড় দিয়ে মাটিতে ফেলে দাও। তারপরে তোমার লোহার মত হাত দিয়ে ওর পেটটা চিরে দু'ফাঁক ক'রে ফেলো, তা' হ'লে আমরা দু'জনে আধাআধি ভাগ ক'রে ছাগলটাকে ব'য়ে নিয়ে যেতে পার্‌বো। নাও বন্ধু, আর দেরী নয়—দাও আছাড়্।"

যেই এই কথা শোনা, ভূত তো ভয়ের তাড়সে বাহুবীরের কাঁধের ওপর হাল্কা হ'তে হ'তে একেবারে গ'লে জল হ'য়ে গেল, তখন বাহুবীর সেই দুষ্ট বোঝার ভার থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলো, বললে, "যাক্—ভূত ঘাড় থেকে নেমে গেছে। এখন চলো, নিরাপদে বাড়ীতে ফেরা যাক্।" বাক্যবীর ভাব্‌লে, "যদি ভূতে তাড়া করে, তবেই তো বিপদ! ওকে এই তল্লাট-ছাড়া করা দরকার।" মনে মনে এই ভেবে বাক্যবীর চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো, "আরে করলে কি স্যাঙাৎ! ছাগলটা উবে গিয়ে পালালো নাকি? ধরো, ধরো। ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বেশ ক'রে তেলে নুনে জরিয়ে লঙ্কাবাটা মেখে খাওয়া যাবে। আমি ঝাল দিয়ে ভূতের দম খেতে বড্ড ভালোবাসি।"

ভূত কি আর সেখানে থাকে। কৌশলে ছাড়া পেয়ে পাই পাই ক'রে ছুট্‌লো সে নিজের বাসায়। সেখানে পৌছে হাঁফাতে হাঁফাতে তার দাদাভাই ভূতদের বললে, "উরে বাঁপ—কি বাঁচনটাই বেঁচে গেঁচি। দু দুটো ইয়া ইয়া কুঁত্ত আমায় পাঁকড়ে নিয়ে যাঁচ্ছিল, আমি কুঁদো কুঁত্তটার লোহার হাঁত কসকে খুঁব ভাগ্যিস ফুস কোঁরে পাঁলিয়ে এসিচিঁ। বাঁপ—আর একটু হোঁলেই গিঁয়ে-ছিলুম তাঁদেঁর পেটের ভেতঁর সেঁধিয়ে! বাঁপ, বাঁপ! কি পাঁজি কুঁত্তগুলো, ওঃ!"

বোকা ভূতের এই কথা শুনে ভূতের সমাজে বিকট হাসির একটা দম্‌কা ঝড় ব'য়ে গেল। তা'রা বললে, "তুঁই কিঁ মস্তো বোকাঁ রে! কুঁত্ত আবার কি? পৃথিবীতেঁ কুঁত্ত বোলে কিঁছু আছে নাকি? তাঁরা মানুষ, এই তোঁ তোঁর গাঁয়ে মানুষের গন্ধ ছাড়চে। আরে ছি, তুঁই এতোঁ মাথা মোটা যে, ভূতের পুত আসল ভূত হোঁয়ে মানুষের হাঁতে পোড়ে গেঁলি। মানুষের মিঠেকড়া ঘাড়ে চোড়ে তাঁর ঘাড় না মুটকে দিঁয়ে তুঁই ভয় তঁরাসের মতোঁ পাঁলিয়ে এলি? ভূতের কুলের কলঙ্ক তুঁই।" ঘা-খাওয়া সেই বোকা ভূত দাঁত খিঁচিয়ে ব'লে উঠলো, "তোঁমরা যদি কুঁত্তগুলোকে চোখে দেখতে, তঁবে এ বড়াই আর কোত্তে না।" তখন ভূতেরা ভীষণ রেগে গিয়ে সকলে মিলে চেঁচাতে লাগলো, "আচ্ছা, আচ্ছা, চল, তোঁর কুঁত্ত কেমন দেঁখিঁ। তোঁর এক একটা কুঁত্তকে ধরব্বো আর চোখের পাঁতা ফেলতেঁ না ফেলতেঁ গুড়িয়ে হাঁওয়ায় মিশিয়ে দোঁবো। চল, চল, কোথায় তোঁর কুঁত?" মার-খাওয়া ভূত বললে, "বেঁশ তোঁ, দল বেঁধে চলো সব্বাই। আমি রাজি আছি। তঁখন কিন্তু চিঁচিয়ো নি, বঁলে দিঁচ্চি।"

পরের দিন গভীর রাত্রে ভূতেরা দল বেঁধে চললো বোকা ভূতের সঙ্গে ওস্তাদদের বাড়ী। বোকা ভূত তাদের বাড়ীর একটু দূরে পৌছেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, বাড়ীটা দেখিয়ে দিয়ে বললে, "ঐ যেঁ ওঁদের বাড়ী। আমি আর এক পাও এগুবো না। তোঁমরা যাঁ ইচ্ছে তাঁই করো গেঁ। বাপ, কুঁত্ত কি চিঁজ, কিল-চাপোড়ের চোটে ভূতের বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ে।" অন্য সমস্ত ভূত তাদের সেই ভীতু ভাই-এর ভয় দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। তারা তখন ভীষণ প্রতিজ্ঞা করলে, "আমরা ভূতেরা মিলে শত্তুরদেঁর মুণ্ডুপাত করবো, তোঁর কুঁত-বংশের এক বেটাকেও বাচতেঁ দোঁবো না, দেঁখ তুঁই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেঁখ। ভূতের ছেলের এতোঁ ভয়। আমরা লজ্জায় মরি।" ভূতেরা গোল ক'রে ব'সে কিছুক্ষণ পরামর্শ করলে। তারপর তা'রা সদলবলে বীরদের বাড়ীতে গিয়ে পড়লো। একদল ভূত বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগলো, বাড়ীর ভিতর থেকে কোনো লোক যাতে না পালিয়ে যায়। একদল খাড়া রইলো বাড়ীর আদাড়ে পাদাড়ে, আর একদল বাড়ীর পিছন দিকে, শেষে একটা বড় দল পাচিল ডিঙিয়ে একেবারে উঠোনে গিয়ে হাজির হোলো।

উঠোনের পূব্‌দিকের একটা খোলা বারান্দায় বাহুবীর তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। দুপ্‌দাপ্ হুড়মুড় শব্দে তার হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলতেই সে যা দেখলে—তা'তে তার অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত কাঁপতে লাগলো। দেখলে, একদল বিকট আকার ভূত বাড়ীর উঠোনে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। আর কথাটি নেই, আস্তে

আস্তে গড়াতে গড়াতে যেখানে বাক্যবীর তার বউ ছেলেপুলে নিয়ে ঘুমোচ্ছিল—সেই ঘরের কাছে গিয়ে পৌঁছুলো। চারদিক ভয়ে ভয়ে একবার দেখে নিয়ে বাক্যবীরের ঘরের দরজায় খুট্‌খুট্‌ ক'রে আওয়াজ করতে লাগলো। বাক্যবীরের খুব সজাগ ঘুম, এই ডাকে সে দোর খুলে বাইরে এলো। বল্লে, "কি বন্ধু, ব্যাপার কি ?"

বাহুবীর কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে চাপা গলায় বল্লে, "আরে ভাই সর্ব্বনাশ হয়েচে! কাল্‌কে ভূত ঘাটানো হয়েচে—এখন ঠেলা সামলাও। এখন কি উপায় ? একদল ভূত আমাদের বাড়ীতে ঢুকে পড়েচে, আমাদের আর বাঁচবার আশা নেই।"

বাক্যবীর বন্ধুকে অভয় দিয়ে চুপি চুপি বল্লে, "স্যাঙাৎ, ভয় পেয়োনা! বুকে ভরসা আনো, ভয় পেলেই মরবে। তুমি যেখানে ঘুমোচ্ছিলে—সেখানে ফিরে গিয়ে আবার ঘুমোওগে যাও। আমি যা' কর্‌বার তাই কর্‌চি। কোনো ভাবনা নেই। আমি একটি বাক্য-বাণে ভূতদের খেদিয়ে দিচ্চি। যাও, নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোও গে!" বাহুবীর বন্ধুর কথা ঠিক বুঝতে পারলে না, কিন্তু আর তর্ক না করে, আবার গড়িয়ে গড়িয়ে যেখানে শুয়েছিল, সেখানে গিয়ে উঠলো। ঘুমের ভাণ ক'রে বিছানায় সে ভয়ে কাঠ হ'য়ে প'ড়ে রইলো।

বাক্যবীর আর সময় নষ্ট না ক'রে তা'র বউকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বল্লে—"দেখো বউ, আমি তোমাকে এখন্ একটা মন্ত্রণা দোবো, সেইমত তোমায় এখুনি কাজ কর্‌তে হ'বে। নইলে ভূতে এসে ঘাড় মট্‌কাবে।" বউ ভয়ে থতমত খেয়ে গেল। বাক্যবীর বউকে সাহস দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো—"যা' বলি—তাই করো, ভূতের সাতগুষ্টি পালিয়ে যাবে। যত উল্লুক ভূত আমাদের বাড়ীর আঙনে এসে ভিড় করেছে। কিন্তু আমার পরামর্শ মত যদি চলো—আমাদের আর কোনো আপদ-বালাই থাক্‌বে না, ভূতগুলোও কোনো অনিষ্ট না ক'রে স'রে পড়্‌তে পথ পাবে না। তোমায় কি করতে হ'বে, শোনো। এখুনি তুমি বড় দালানটায় গিয়ে একটা আলো জ্বালিয়ে দাও, তারপরে মেঝের ওপর কলাপাতা বিছিয়ে আমাকে খেতে ডাক্‌বার ছল্ ক'রে হাঁক্‌ডাক্ কর্‌তে থাকো, সেই সময়ে খানিক্‌টা হলুদ নিয়ে আগুনে পোড়াতে থাক্‌বে। আমি তখন তোমার ডাকে যেন খেতে উঠে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস্ কর্‌বো—আমাকে কি খেতে দেবার ব্যবস্থা করেচো ? তুমি উত্তর দেবে, কেবল ভাত আর মাছের ঝোল্ আছে। আমি রেগে হেঁকে উঠবো, তুমি সেই তিন্ তিন্‌টে ভূত নিয়ে কি কর্‌লে ? আমি জানি, খোকা পাঠশালা থেকে ঘরে ফের্‌বার সময় তিন্‌টে বেশ ডাঁসালো ভূত ধ'রে এনেচে। তোমার সোজা উত্তর হ'বে—দুষ্টু ছেলে বাড়ী এসেই মেঠাই খাবার জন্যে বায়না ধর্‌লে। ঘরে-তো মেঠাই ছিল না, তা'কে কিছুতেই ভোলাতে পারা গেল না। সে তখন সেই তিন্‌টে ভূতকেই বেগুনপোড়ার মত আগুনে ঝল্‌সে নিয়ে জলযোগ ক'রে ফেল্‌লে। হতভাগা ছেলে আমার কথা কাণেই তুল্‌লে না, 'মেঠায়ের বদলে ভূত খাবো,' ব'লে গপ্‌ গপ্‌ ক'রে ভূতগুলোকে একেবারে গিলে ফেল্‌লে!—বুঝলে বউ, এই কথাগুলো ঠিক মনে রেখো। দেখো তারপর—দুষ্ট ভূতগুলোর কি গতি করি।"

বউকে এই মতলব দিয়ে বাক্যবীর ঘুমোবার ভান্ ক'রে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। তা'র নাক ডাকার কি ধুম, যেন চৌকি হাঁক্‌চে। বউ দালানে গিয়ে তা'র স্বামীকে ডাক্‌তে শুরু ক'রে দিলে, "ও কত্তা ঘুম থেকে ওঠো—রাত হয়েচে, খাবে এসো।" বাক্যবীর ধড়মড়িয়ে উঠে দালানে এসেই হাঁকাহাঁকি কর্‌তে লাগলো। ভূতেরা যাতে শুন্‌তে পায় —তাই চীৎকার ক'রে তাদের সেই সাজানো কথাবার্ত্তা চললো। 'তাদের ছেলে তিন্‌টে জোয়ান ভূতকে আগুনে পুড়িয়ে মেঠাই ব'লে খেয়ে ফেলেচে'—এই কথা যেই শোনা অম্‌নি ভূতেদের কাঁপুনি আরম্ভ হোলো। ভূতেরা বলাবলি কর্‌তে লাগলো—"এঁ যে বেজায় আঁশ্চয্যি—একটা ছোট্ট ছেলের এতো ক্ষ্যেমতা ? বাপটা তাঁ হোলে কঁটা ভূত গিল্‌বে, যার পুত তিন্‌টে ভূত মেটাই বোলে টপ্পায় নোমো করে। বাঁপরে বঁড়াই—একি পেঁটেব ফাড়। চল চঁল ছুস্ কোরে আমরা পালিয়ে বাঁচি।"

ভূতের দল তখুনি হুর্ হুর্ ক'রে হাওয়ার বেগে ছুট্‌ দিলে। ভূতেদের সেই ছোট ভাইটা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে সকলে হাঁফাতে হাঁফাতে গিয়ে পৌঁছুলো। তখন তাদের দশা দেখে বোকা ভূত ব'লে উঠলো—"কি গোঁ দাঁদারা, কুত দেঁখলে কেমন ধারা ?" দাদা-ভূতেরা বল্‌লে—"আরে ভাই, তোকে মিথ্যে ঠাট্টা কোরেচি, সত্যিই কুত আছে। ঐ কুতগুলো আমাদের মস্ত শত্তুর। আর এ জায়গায় থাকা নয়, আমাদের নিয়ে টানাটানি চঁল্‌বে, বাঁচা দাঁয় হঁবে। কুতদের পুত কিনা জল খাবার খায় তিন্‌টে ভূত! বাঁপরে বড়াই কোন্ দিশে যাই।" এই ব'লে তা'রা ভীষণ কাঁপতে লাগলো। তা'র পরের দিন গোধূলির আবছায়া অন্ধকারকে আড়াল রেখে সমস্ত ভূত সেখান থেকে পালিয়ে পাশেই একটা ঘন বনের মধ্যে গিয়ে বাসা নিলে। এই উপায়ে কেবল বচনের জোরে বাক্যবীর দু'বার ভূতের হাত থেকে বন্ধুকে বাচালে, সে নিজেও নিস্তার পেলে।

কিছুদিন পরে দুই বন্ধু মিলে একটা দূর গ্রামে নিমন্ত্রণ খেতে গেল। বাড়ী ফের্‌বার সময় মাঝ-রাস্তায় আস্‌তে না আস্‌তেই সন্ধ্যা নেমে এলো। তবু সামান্য পথ তা'রা এগিয়ে গেল, কিন্তু আর চল্‌তে সাহস কর্‌লে না। তখন চারপাশে ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার ছেয়ে এসেছে। সাম্‌নেই ভয়ঙ্কর বন, সেই বন থেকে তখন বাঘ-ভালুক-নেকড়ে-চিতা শীকার খুঁজতে বেরুচ্চে। দুই বন্ধু কি করে। রাস্তা-চলা ভারী বিপদ। তা'রা অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক কর্‌লে, ঐ বনের ধারে একটা উচু গাছে চ'ড়ে সেই রাতটুকু কাটিয়ে দেবে দু'জনে, পরে সকাল হ'লে তা'রা ঘরে ফির্‌বে। দুই বন্ধুতে একটা বড় অশ্বত্থ গাছে গিয়ে উঠে বস্‌লো।

এখন—ভূতেরা যে-বনে পালিয়ে এসে বস-বাস কর্‌চে এ সেই বন। রাত-দুপুরে ছেনা-বুড়ো-জোয়ান সবভূত দলে দলে বন থেকে ঝুপ-ঝাপ ক'রে বেরুতে লাগলো। তা'রা এই

সময়ে চোখের মশাল জেলে শিয়াল, শুয়োর, খরগোস্, গন্ধ-গোকুল, ভাম্, কচি কচি বাঘ-ভালুক্, এই সমস্ত জন্তু ধ'রে খায়। হঠাৎ তা'রা মানুষের গন্ধ পেয়ে চন্‌মন্ ক'রে উঠলো। দু'চারজন ভূত তখন চেঁচিয়ে সকলকে সজাগ ক'রে দিয়ে বললে, "হ্যাঁরে এই বনে মানুষের গন্ধ কোথা' থেকে আসে! খোঁজতো সবাই চোখ জেলে, অনেক দিন মানুষের রক্ত খাইনি, তাঁদের একবার পেলে ঘাড় মটকাবো আর মিষ্টিরক্ত হাঁপুস্ হাঁপুস্ কোয়ে শুষবো! নে দেখ, খুজে দেখ!"

বাহুবীর আবার সেই ভূতের হাতে পড়েছে দেখে—ভয়ে তা'র প্রাণ উড়ে গেল। যে অশ্বত্থ গাছে দুই বন্ধুতে উঠেছিল, সেই গাছেরই নীচে ভয়ঙ্কর ভূতগুলো গণ্ডগোল করছে—সে দেখতে পেলে। থর্ থর্ করে তা'র হাত পা কাঁপতে লাগলো, ধড়াস্ ধড়াস্ ক'রে তা'র বুক উঠতে পড়তে লাগলো, তা'র সারা দেহে ভীষণ কাঁপন শুরু হোলো। গাছের ডাল থেকে তা'র হাত দু'টো খ'সে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে ডাল-পালা ভেঙে সর্ সর্ মড় মড় শব্দে সে মাটিতে প'ড়ে গেল। বাক্যবীর সব বুঝতে পারলে, সে দেখলে, ব্যাপার গুরুতর। তখনি তা'র মাথায় জোগালো ফন্দি, চেঁচিয়ে সে ব'লে উঠলো, "আহা-হা করো কি, করো কি, স্যাঙাৎ! আমি ভেবে রেখেছিলুম বেচারীরা ফূর্ত্তি করচে, ওদের এবাব কিছু আর বলবো না! কিন্তু তুমি নাছোড়বান্দা দেখছি, ওদের কিছুতেই রেহাই দিতে চাও না। ক্ষিদেতে তোমার পেটের নাড়ী টন্ টন্ করচে বুঝি, তা'তো হ'বেই, এখন তোমার কিছু পেট ভ'রে খাওয়া দরকার, তাই ঐ ভূতগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েচো জনকয়েককে ধরবে ব'লে! তা' বেশ করেছ, এখন্ দেখো দেখো যে ভূতটা খুব গোঁট্টা গোঁট্টা নাদুস-নুদুস সেই বেটাকে ধরতে ভুল কোরো না! দেখো হাত ফস্কে না পালায় আবার! ধরো ধরো, ধরেছ? আমারো পেটটা চুঁই চুঁই করচে, দু'চারটে ছাগল-মুখো ভুঁড়ি-ওলাদের বাগিয়ে ধরো। বেটাদের আগুনে ঝলসে গোটা গোটা মড়মড়ায়ে খাবো আমরা। যাচ্চি আমি।"

ভূতেরা বাক্যবীরের গলা শুনে চিন্‌তে পেরে চমকে উঠলো, ভয়ে ভয়ে কানাকানি করতে লাগলো, "এই সেই ধাড়ি ভূত, যাঁর পুত জল খায় তিন তিনটে ভূত। ওরে বাঁপ ভূতের বাপের নাম ভুলিয়ে দেঁবে এক্ষুনি, পালাই চ, পালাই চ! এই বনেতে এসেও বাচোঁয়া নেই, এখানেও শঁত্তুররা আমাদের তাড়া করেচে! বাপরে পালাই, কোনখানে যাই" এই বলতে বলতে ভূতেরা সেই বন ছেড়ে যে যেদিকে পারলে পালিয়ে গেল।

বাক্যবীর গাছ থেকে নেমে এসে দেখে ভূতের ভয়ে বাহুবীরের ভিম্মি লেগে গেছে।

বন্ধুকে সুস্থ ক'রে বাক্যবীর হাসতে হাসতে বলল, "কি স্যাঙাৎ, শুধু বুদ্ধি আর বচনের জোরে তিনবারের বার আমরা দু'জনে ভূতের হাত থেকে বাঁচলুম। এখন্ তা'রা এ-দেশ ছেড়ে পালিয়েচে, উঠে পড়ো। বাহুবীর তখন গা' ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালো। সকাল হোলো, সূর্য্যের আলো গাছের পাতায় পাতায় ঝিক্‌মিক্ ক'রে উঠলা। বাহুবীর কোনো কথা না ব'লে বনফুলের একটা মুকুট তৈরী করলে, সেই ফুলের মুকুট বাক্যবীরের মাথায় পরিয়ে দিয়ে সে তা'কে তিনবার ঘুরে এসে তিনবার গড় করলে! তারপর বললে, "বন্ধু, আমাদের দু'জনের ভেতর তুমিই সত্যি বীর—তুমিই বড়। বুদ্ধি-বচনের জোর না থাকলে শুধু গায়ের জোরে কোনো কাজ হয় না। কোনো লোকের যদি এই দু'টি গুণ সমান থাকে, তাহ'লে তা'র তুলনা নেই, সে ঠিক ফুলের দলে সুগন্ধি পদ্ম। আজকে এইখানেই শক্তিপরীক্ষার শেষ। তুমি আমার গুরু। এখন তোমার অনুমতি নিয়ে আমি আমার গ্রামে ফিরে যেতে চাই।"

বাক্যবীর বন্ধুর কথায় সন্তুষ্ট হ'য়ে তা'কে বললে, "না স্যাঙাৎ, আমরা যা' তাই, কেউ কারোর ঠিক বাধ্য নয়! তুমি যেমন একদিকে বড়, আমিও তেম্‌নি অন্যদিকে বড়।—আমরা দুই স্যাঙাৎ যদি এক হই, আমাদের মত বীর কে? এসো এখন ঘরে ফিরি। তারপর তুমি তোমার গ্রামে ফিরে যাবে।"

বাড়ীতে পৌছে বাক্যবীর বাহুবীরকে খুব আদর-যত্ন ক'রে ভোজ দিয়ে যোগাসম্মানে বিদায় দিলে।

বুদ্ধি ডাকিয়া বলে—"ওহে বাহু ভাই,
আমি ছাড়া তোমার যে কোনো গতি নাই।"
বাহু বলে—"জয় করি এই পৃথিবীরে—
সে শুধু আমার জোরে, বোঝো ধীরে ধীরে।'
বুদ্ধি তবে হেসে বলে—"বাহু করে কাজ,
সে সবই জানিহ তুমি বুদ্ধির প্রসাদ।"

(গোড়ার কাহিনী)

দ্বিতীয় পর্ব্ব

মহারাজ উদয়ন যখন বৎস-রাজ্যের রাজা, সেই সময় অবন্তিরাজ্যেও একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা রাজ্য চালাতেন তাঁর নাম 'মহাসেন'। তিনি সহজেই চ'টে উঠতেন ব'লে লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল 'চণ্ড মহাসেন'। মহাকবি কালিদাস তাঁর 'মেঘদূত' নামে খণ্ডকাব্যের এক জায়গায় ব'লে গিয়েছেন যে, মহাসেনের আর এক নাম ছিল—(প্রদ্যোত')

এই প্রদ্যোত চণ্ডমহাসেন বিন্ধ্যবাসিনী চণ্ডিকা দেবীকে অতি উগ্র তপস্যায় প্রসন্ন ক'রে দেবীর বরে একখানি দিব্য খড়্গ পেয়েছিলেন। দেবীর অন্য আর এক বরে তিনি অত্যাচারী অসুররাজ অঙ্গারকে নানা কৌশলে মেরে ফেলে তার পরমাসুন্দরী মেয়ে অঙ্গারবতীকে বিয়ে করেছিলেন। এই দিব্য খড়্গ আর সুন্দরী রাণী ছাড়া আরও একটি অপূর্ব্ব জিনিষ তিনি দেবীর বরে লাভ করতে পেরেছিলেন। সেটি হচ্ছে হিমালয় পর্ব্বতের চূড়ার মতই বিরাট একটি হাতী—নড়াগিরি তার নাম। এই হাতিটিই ছিল মহাসেনের প্রিয় বাহন।

হাতী ও খড়্গের জোরে মহাসেন হ'য়ে উঠেছিলেন শত্রুদের অজেয়। তাঁর উগ্র তপস্যা ও প্রচণ্ড বিক্রমের কথা লোকের মুখে মুখে ফির্‌ত। ইন্দ্রের কৃপায় চণ্ডমহাসেনের একটি পরমা সুন্দরী কন্যালাভও হয়েছিল। এই কন্যারত্নটির নাম দিয়েছিলেন তিনি—বাসবদত্তা—ইন্দ্রের দেওয়া মেয়ে।

বাসবদত্তার রূপগুণের খ্যাতি বৎসরাজ উদয়নের কাণে এসে পৌছেছিল। তিনি মেয়েটিকে নিজের রাণী কর্‌বার আশা মনে মনে পোষণ করতেন। কিন্তু মুখ ফুটে বল্‌তেন না কিছুই। কারণ, যেচে শত্রুর মেয়ে বিয়ে করতে তিনি ছিলেন নিতান্তই নারাজ। এটা তাঁর কাছে সম্মানের হানিকর বোধ হ'ত।

আবার ওপক্ষে মহাসেনও যে উদয়নকে জামাই করতে কম ইচ্ছুক ছিলেন, তা নয়। তবে ব্যাপার কি জানেন?—বৎসরাজ্য আর অবন্তিরাজ্যের মধ্যে ছিল চিরদিনের প্রবল শত্রুতা। তাই প্রদ্যোতও নিজে যেচে উদয়নের হাতে মেয়ে সঁপে দিতে মোটেই রাজি ছিলেন না। চণ্ডিকাদেবীর কাছে বহু আরাধনার পর একদিন দৈববাণী হয় যে, তাঁর উদ্দেশ্য সফল হ'বে। এই দৈববাণী শোন্‌বার পর থেকেই তিনি খুব আশান্বিত হ'য়ে উঠেন, আর ক্রমাগত ফন্দী আঁটতে থাকেন যে উদয়নকে কোন উপায়ে বন্দী ক'রে এনে তাঁর সঙ্গে বাসবদত্তার বিয়ে দেবেন। কিন্তু তাঁর মন্ত্রী বুদ্ধদত্ত পরামর্শ দিলেন যে প্রথমেই যুদ্ধ-বিগ্রহ বা ধর-পাকড়ের ফন্দী না ক'রে বৎসরাজের কাছে ভাল কথায় বিবাহের সম্বন্ধ-প্রস্তাব পাঠান ভাল। যদি সে প্রস্তাব বৎসরাজ অগ্রাহ্য করেন, তখন তাঁকে ছলে বলে কৌশলে ধরবার চেষ্টা করা সঙ্গত হবে।

মহাসেন বুঝলেন যে তাঁর মন্ত্রীর কথা খুবই যুক্তিযুক্ত। তাই তিনি বুদ্ধদত্তের কথামত বৎসরাজ্যে একটি দূত পাঠালেন, অবশ্য সোজাসোজি বিবাহের প্রস্তাব ক'রে নয়। দূত একটি কূট প্রস্তাব দিয়ে গেল, প্রস্তাবটি হচ্ছে এই, 'অবন্তিরাজের মেয়ে বাসবদত্তা শুনেছেন যে, বৎসরাজ নিজে খুব ভাল বীণকার, তাঁর একটি অদ্ভুত বীণা আছে; তাই রাজকুমারী উদয়নের কাছ থেকে বীণার বাজনা শিখতে চান; এখন বৎসরাজ যদি অনুগ্রহ ক'রে মহারাজ প্রদ্যোতের রাজধানী উজ্জয়িনীতে পদার্পণ করে বাসবদত্তার বীণাশিক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তা হ'লে অবন্তিরাজ বড়ই সুখী হবেন।

এই অপমানজনক প্রস্তাব শুনে বৎসরাজের রক্ত গরম হ'য়ে উঠল। তিনি ত তখনই যুদ্ধযাত্রার জন্যে তোড়জোড় করতে চাইছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বড় পাকা লোক। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, অবন্তিরাজ খুবই পরাক্রমশালী। তাই তাঁর বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধযাত্রা না ক'রে পাল্‌টা একটা প্রস্তাবে অপমানটা কৌশলে ফিরিয়ে দিলেই ভাল হয়। বৎসরাজও বুঝলেন—মন্ত্রীর কথা খুব ন্যায়সঙ্গত। তাই ঐ অপমানকর প্রস্তাবের উত্তরে বৎসরাজ তাঁর মন্ত্রি-মণ্ডলের সঙ্গে পরামর্শ এঁটে পাল্‌টা প্রস্তাব পাঠালেন, "বৎসরাজ অবন্তিরাজের প্রস্তাবে খুবই রাজি আছেন। তবে এখন তাঁকে সর্ব্বদাই খুব গুরুতর রাজকার্য্যে ব্যস্ত হ'য়ে থাকতে হয়। তাই তাঁর পক্ষে নিজের রাজ্য ছেড়ে অন্য কোথাও বেশী দিন থাকা সম্ভব হবে না। আরও একটা কথা, বিদ্যা শিখতে শিষ্যই গুরুর বাড়ী এসে বাস ক'রে থাকে, এই সনাতন নিয়ম। গুরু কখনও শিষ্যের বাড়ী গিয়ে শিক্ষা দেন না। তাই রাজকুমারী বাসবদত্তার যদি সত্যই তাঁর কাছ থেকে বীণা শিখবার আগ্রহ থাকে, তা হ'লে তিনিই যেন বৎসরাজের রাজধানীতে এসে বীণাশিক্ষার সাধ মিটান"।

চণ্ডমহাসেন এই অপমানজনক প্রস্তাব শুনে ভাবলেন, ঠিক হয়েছে। তিনি যে কৌশলে কাজ উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন, সেই ফাঁদে তিনি নিজেই প'ড়ে জব্দ হয়েছেন। অবশ্য এ প্রস্তাব শুনে' প্রথমটা তিনি খুবই রেগে উঠেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি উদয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা ভাল মনে করলেন না। তিনি অতি গোপনে তাঁর মন্ত্রীদের নিয়ে, আর রাণী অঙ্গারবতী ও দুই ছেলে গোপালক ও পালকের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন, কি উপায়ে উদয়নের দম্ভ চূর্ণ ক'রে কৌশলে তাঁকে বন্দী ক'রে আনা যায়!

অনেক পরামর্শের পর চণ্ডমহাসেনের মাথা থেকে বৎসরাজকে ধর্‌বার যে ফন্দীটি বেরুল, তা অতি চমৎকার। নিপুণ মিস্ত্রী ডেকে তিনি নীল রঙের একটি প্রকাণ্ড যন্ত্রের হাতী তৈরী করালেন। সে হাতী যন্ত্রের কৌশলে ঠিক সত্যিকারের জীবন্ত হাতীর মতই ন'ড়ে চ'ড়ে চ'লে ফিরে বেড়াতে পার্‌ত। আর তার পেটের ভিতরটা ছিল ফাঁপা। এই ফাঁপা পেটের মধ্যে জন কয়েক অস্ত্রধারী সেনা বেশ স্বচ্ছন্দে লুকিয়ে থাকতে পারত।

মহাসেন এই হাতীটিকে উদয়নের রাজ্যের সীমানার বিন্ধ্য

পর্ব্বতে জঙ্গলের মধ্যে এক লতায় ঝোপে লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করলেন। বলাই বাহুল্য যে, হাতীটার পেটের মধ্যে একদল খুব সাহসী ও চালক সেনা নানা রকম অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হ'য়ে লুকিয়ে রইল।

বৎসরাজের হাতী শিকারের ঝোঁক ছিল খুব বেশী। হাতীর খোঁজ আনবার জন্যে তিনি অনেক চর ও শিকারী মাইনে ক'রে রেখেছিলেন। প্রদ্যোতের একজন ছদ্মবেশী চর উদয়নের শিকারীদের দলে মিশে গিয়ে উদয়নের কাছে এই অদ্ভুত নীল হাতীর সন্ধান এনে দিলে। নীল হাতীর কথা শুনে উদয়ন আনন্দে মেতে উঠলেন; কারণ, নীল হাতী বড় সহজে মেলে না। তিনি নিজের মনে মনে স্থির করলেন, 'এ হাতীটাকে যেমন ক'রেই হোক্ জীয়ন্ত ধরতে হবে। প্রদ্যোতের যেমন নড়াগিরি নামে একটা প্রকাণ্ড হাতী আছে, আমার সে রকম বড় হাতী একটাও নেই। এই নড়াগিরির জন্যেই প্রদ্যোতের সঙ্গে সাম্‌না-সাম্‌নি যুদ্ধে কেউ পেরে ওঠে না। এবার যা শুনছি, তা যদি সত্য হয়, তা হ'লে এ নীল হাতীটা নিশ্চয় নড়াগিরির দর্প চূর্ণ করতে পারবে। তখন প্রদ্যোতের মেয়েকে জোর ক'রে কেড়ে এনে বিয়ে করা যাবে।

মন্ত্রীদের কাছে নীল হাতীর কথা জানাতে তাঁরা সকলে একবাক্যে রাজাকে হাতী ধরতে যেতে বারণ করলেন। যৌগন্ধরায়ণ বললেন, "মহারাজ! সেনাপতি রুমণ্বানকে আদেশ দিন যে, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে গিয়ে বন ঘেরাও ক'রে হাতীটাকে ধরে আনুক। আপনার নিজের গিয়ে কাজ নেই"।

তাই শুনে মহারাজ উদয়ন বললেন, "তা হয় না মন্ত্রিবর! সৈন্য-সামন্ত নিয়ে নীল হাতী ধরা যায় না। লোক জনের সাড়া পেলে হাতীটা বনের মধ্যে গা-ঢাকা দেবে, তাকে আর হাজার খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। কিংবা ধরা পড়লেও সে এমন যুঝবে যে, জীয়ন্ত আনাই যাবে না। সেনাদের অস্ত্রাঘাতে এমন দুষ্প্রাপ্য হাতীটা জখম হ'য়ে পড়বে। তাই সেনা-সেনাপতি অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে নিয়ে হাতী ধরতে যাব না। যে সব শিকারী আর চর হাতীটার খোঁজ এনেছে, তাদেরই দু'এক জনকে সঙ্গে নিয়ে আমি নিজে বনে যাব, আর ঘোষবতী বীণার আওয়াজে ভুলিয়ে হাতীটাকে রাজধানীতে নিয়ে আসব"।

রাজা উদয়ন যখন যাত্রা করেন তখন জ্যোতিষীরা গণনা ক'রে দেখলেন, মহারাজের যাত্রা-লগ্নের ফল ভাল—কন্যালাভ; তবে তার আগে বন্ধন-যোগও আছে কিছু দিনের জন্যে। কিন্তু উদয়ন জ্যোতিষীদের কথায় কাণ দিলেন না। তবে প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের কথা একেবারে ঠেলতে না পেরে প্রধান সেনাপতি রুমণ্বান্ আর কয়েকজন বাছাই করা সেনা সঙ্গে নিলেন।

কিছুদূর যাবার পর নর্ম্মদা নদী পেরিয়ে মহারাজ উদয়ন সসৈন্যে বিন্ধ্যপর্ব্বতের তলায় বেণুবনে ছাউনি গাড়লেন। এই বেণুবনের পরেই নিবিড় নাগবন। সেই অংশটাই বিন্ধ্যাটবীর সব চেয়ে ঘন বনে আচ্ছন্ন। আর ঐ নাগবনই ছিল হাতীদের প্রধান আড্ডা।

নাগবনে ঢোক্‌বার মুখেই যে ছদ্মবেশী চরটা তাঁকে প্রথম নীল হাতীর খোঁজ এনে দিয়েছিল সে আবার এসে জানালে, "মহারাজ, এখান থেকে ক্রোশখানেক দূরে শালবনের মধ্যে নীল হাতীটা বেশ নিশ্চিন্ত মনে পাতা খাচ্ছে দেখে এলুম। আপনি একাই আসুন, লোকজন সঙ্গে নেবেন না—সাড়া পেলেই গা-ঢাকা দেবে।"

মহারাজ আনন্দে নিজের গলার হার ছড়াটাই এই ছদ্মবেশী চরকে পুরস্কার দিয়ে তার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত হ'লেন। সেনাপতি রুমণ্বান্ সসৈন্যে সঙ্গ নিতে চাইছিলেন। কিন্তু মহারাজ দিব্যি দিয়ে তাঁকে নিরস্ত করলেন। তারপর নিজের শরীর-রক্ষী সেনাদের বললেন তোমরা ছাড়া ছাড়া হ'য়ে এগিয়ে গিয়ে শালবনটি ঘেরাও কর। আমি এই চরের সঙ্গে কেবল ঘোষবতী বীণা নিয়ে গিয়ে কি কৌশলে হাতীটাকে ধরি, দেখ!"

সকলকে ফিরিয়ে দিয়ে চরটার সঙ্গে ঘোষবতী বীণা বাজাতে বাজাতে মহারাজ উদয়ন গহন শালবনের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন। বুঝলেন না যে, শত্রুর গুপ্তচর তাঁর বিশ্বস্ত চরের ছদ্মবেশে তাঁকে কি ভীষণ বিপদের মুখে টেনে নিয়ে চলেছে! নিয়তি!

শুধু এক প্রভুভক্ত বিশ্বাসী অনুচর হংসক মহারাজকে ছাড়লে না। পাছে দেখতে পেলে মহারাজ বাধা দেন, এই ভয়ে প্রভুর অজ্ঞাতে বনের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে হংসক উদয়নের পিছু নিলে।

আর কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর ছদ্মবেশী চরটা দূর থেকে নীলহাতী দেখিয়ে দিয়ে বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। আর তাকে দেখা গেল না। মহারাজের সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। তিনি দূর থেকে হিমালয় পাহাড়ের চূড়ার মত সেই প্রকাণ্ড নীল হাতীর আবছা দেহটা দেখতে পেয়ে বীণা বাজাতে বাজাতে নিরস্ত্র একলা অতি সন্তর্পণে তার দিকে এগিয়ে চললেন। হাতীটাও যেন বীণার আওয়াজে খুব মুগ্ধ হয়েছে এই রকম ভাব দেখিয়ে কান দু'টো নাড়তে নাড়তে আরও গহন বনের মধ্যে মহারাজকে টেনে নিয়ে গেল। তারপর এক নিমিষে নকল হাতীর পেটে থেকে কয়েকজন সশস্ত্র সেনা হুঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে উদয়নকে ঘিরে ফেললে।

উদয়ন তখন নিজের বোকামীর কথা ভেবে নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিলেন। কিন্তু কাপুরুষের মত আত্মসমর্পণ করলেন না। তাঁর কোমরে ছিল ছোট একখানি ছুরি। তাঁর কিল চড় ছুরির আঘাতে অনেক সৈন্য মারা পড়ল। সেনাদলের নেতা প্রদ্যোতের মন্ত্রী শালঙ্কায়ন ত উদয়নের পদাঘাতে চেতনা হারালেন। এই সৈন্যদলের মধ্যে একজন সেনা ছিল উজ্জয়িনীর মহাকালের বরে সকলের অবধ্য অজেয়। সে বৎসরাজের যুদ্ধকৌশল ব্যর্থ ক'রে তাঁর হাতের ছুরিটা কেড়ে নিলে। তখন সব সেনারা মহারাজকে জাপটে ধ'রে ফেললে। তারপর জনকয়েক সেনা যাদের আত্মীয় স্বজন উদয়নের হাতে মারা পড়েছিল, উদয়নের মাথা কেটে নেবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় সেনাপতি ও মন্ত্রী

শালঙ্কায়নের চেতনা ফিরে এল। তিনি তাড়াতাড়ি তাদের কাজে বাধা দিয়ে বললেন—"মহারাজ! আমার অপরাধ নেবেন না। আমি প্রদ্যোতের আজ্ঞাবহ দাস মাত্র। তাই আপনাকে বন্দী করতে বাধ্য হয়েছি। তবে আপনাকে আঘাত দেবার বা আপনার অসম্মান করবার আদেশ আমার প্রভু দেন নি। কিন্তু আমি আপনারই পদাঘাতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ায় সেই অবসরে এই মূর্খ সেনারা আপনার গায়ে অস্ত্রাঘাত করেছে। সে কারণে আপনার কাছে নতজানু হ'য়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। মহারাজ! আপনি আহত, পরিশ্রান্ত। ঘোড়ায় বা হাতীতে চেপে চলবার সামর্থ্য আপনার নেই। তাই আপনাকে এই পাল্কীতে শুইয়ে আমি আমাদের প্রভুর রাজধানী উজ্জয়িনীতে নিয়ে যাব।

উদয়ন তখন অস্ত্রাঘাতে প্রায় মূর্চ্ছিত। একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন—"মন্ত্রিবর শালঙ্কায়ন! তোমার দোষ কি? আমি এখন তোমাদের বন্দী। তোমরা আমায় নিয়ে যা ইচ্ছা হয় করতে পার।"

তখন প্রদ্যোতের সেনাদল বৎসরাজকে বন্দী ক'রে মহানন্দে উজ্জয়িনীর দিকে এগিয়ে চলল। আর বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে উদয়নের প্রভুভক্ত ভৃত্য হংসক সব ব্যাপার দেখে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটল তার নিজের দেশে এই দারুণ বিপদের সংবাদ নিয়ে।*

---

* উদয়ন-কথা প্রকাণ্ড কাহিনী। এর গোড়ার মুখবন্ধই এখনও শেষ হ'তে অনেক বাকী। ধারাবাহিক ভাবে এ গল্পটি নিয়মিত রূপে বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত হবে।

খুকীর প্রশ্ন

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

আকাশ ভরা তারা দেখে শুধায় খুকী মা'কে—
বল দেখি মা, দিনের বেলা ওরা কোথায় থাকে?
মা হেসে কয়, "প্রথম যখন দিনের আলো জাগে,
টুকটুকে লাল সোনার কিরণ মুখখানিতে লাগে,
অমনি ওরা চমকে উঠে' চোখ দু'টিরে ঢাকে;
আলোর পরশ সয় না ওদের তাই লুকিয়ে থাকে।

অবাক কথা,—চোখ দু'টিরে বড় বড় ক'রে
আবার খুকী শুধায় মাকে দু'হাত দিয়ে ধ'রে,
বল্ তো মা এই রাঙা আলো
পূব আকাশে কে জাগালো,
তারার চোখে কে মাখালো এমন ধারা ভুল,
কে ফোটালো রাত্রে আবার চন্দ্র-তারার ফুল।

কেন হয় মা এমন ধারা দিন ও রাতের খেলা,
বেলা হ'য়ে আবার কেন গড়িয়ে পড়ে বেলা?
রাত পোহানোর লগ্নে কেন উদয়তারা জ্বলে
সন্ধ্যা-তারা দিনের শেষে ঘুমের কথা বলে!
আকাশ কেন অত বড়, বাতাস কেন মিঠা
তোর চুমোতে কেন এমন লাগে মধুর ছিটা?

মা হেসে কয়—বোকা মেয়ে, সূর্য্য আছেন দূরে,
পৃথিবীটা নিজেও ঘোরে, আবার যোজন জুড়ে'
তাঁরেও ঘিরি' আকুল বেগে
ঘুরছে দিন আর রাত্রি জেগে,
যেথায় যখন আলোক লাগে সেথায় তখন দিন;
বাকি সেটুক পায় না আলো—অন্ধকারে লীন।

চন্দ্র আছেন আকাশ জুড়ে, নেইকো নিজের আলো,
সাধেন কেবল সূর্য্যদেবে-"জ্বালো আমায় জ্বালো"।
কান্না শুনে আলোর রাজা আপন মহিমায়
মাঝে মাঝে দীপখানি তার জ্বালিয়ে দিয়ে যায়।
হারিয়ে যাওয়া রবির চেয়েও তার আলো হয় দামী,
ছায়া তখন ছবি হয়ে মর্ত্ত্যে আসে নামি'।

দুহিতা ও অন্যান্য পরিজন

জনৈক গৃহী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভ্রাতৃজায়া ও ভ্রাতৃবধূ—এই উভয় শব্দেরই অর্থ ভ্রাতার পত্নী। অথচ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে ভ্রাতৃজায়া—গ্রাম্যভাষায় ভাজ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে ভ্রাতৃবধূ—গ্রাম্যভাষায় ভাদ্রবৌ বলা হয়। সম্ভবতঃ আগ্রজ-দয়িতা ও অনুজ-দয়িতার মধ্যে পার্থক্য অবধারণের জন্য একজনকে পুত্রবধূ এবং অন্যকে ভ্রাতৃবধূ বলা হয়, কারণ শ্বশুর যেমন পুত্রবধূকে "বৌমা" সম্বোধন করেন, ভাসুরও তেমনি ভ্রাতৃবধূকে "বৌমা" বলিয়া থাকেন। যেমন শ্বশুর পুত্রবধূর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র, সেইরূপ ভাসুরও ভ্রাতৃবধূর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। ভাসুর ভ্রাতৃবধূর বড় ঠাকুর—গ্রাম্যভাষায় বট্‌ঠাকুর।

শ্বশুর ও ভাসুর উভয়েই গুরুজন-স্থানীয় হইলেও শ্বশুর ও পুত্রবধূ পরস্পরকে স্পর্শ করিলে কোন দোষ হয় না, কিন্তু ভাসুর ও ভ্রাতৃবধূ পরস্পরকে স্পর্শ করিতে পারে না, পরন্তু দৈবাৎ কোনক্রমে স্পর্শ সঙ্ঘটিত হইলে, উভয়ের না হউক, ভ্রাতৃবধূকে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ব্বযুগের এই নিয়মের কাঠিন্য বিদ্যমান থাকিলেও অধুনা অধিকাংশ স্থলে ইহার বন্ধন শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্বশুর ও পুত্রবধূর ত কথাই নাই, আধুনিক যুগে ভাসুর ও ভ্রাতৃবধূর মধ্যে অবগুণ্ঠনের বাঁধও ভাঙ্গিয়াছে, কথাবার্ত্তাও অবাধে চলিতেছে। এখন ভ্রাতৃবধূ ভাসুরকে দাদা সম্বোধন করেন, ইহাও শুনিতে পাওয়া যায়।

ভ্রাতৃজায়া ও দেবরের সম্বন্ধ অপেক্ষাকৃত মধুর। পরস্পরের আচরণের গুণে এ-সম্বন্ধ প্রকৃতই মধুর হইতে পারে। পূর্ব্বকালে বয়োজ্যেষ্ঠ দেবরের সহিত ভ্রাতৃজায়ার অবাধ কথাবার্ত্তার রীতি ছিল না। সে-কাল চলিয়া গিয়াছে। অধুনা ভাসুরের সঙ্গেই যেখানে ভ্রাতৃবধূর কথা-কহা নিষিদ্ধ নহে, সেখানে বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও দেবরের সহিত ভ্রাতৃজায়া অবাধে কথা কহিয়া থাকেন। ভ্রাতৃজায়া স্নেহপরায়ণা হইলে সুকুমারবয়স্ক দেবর তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং গ্রাম্যভাষায় তাঁহার 'ন্যাওটা' হইয়া পড়ে। নিতান্ত অল্পবয়স্ক দেবরকে নাম ধরিয়া ডাকিলেও ভ্রাতৃজায়া দেবরকে সাধারণতঃ "ঠাকুরপো" বলিয়া সম্বোধন করিতেন—ইহাই ছিল সে-কালের প্রথা। বর্ত্তমান যুগে অনেক স্থলে এ-প্রথার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। বোধ হয় আধুনিকা ভ্রাতৃজায়াগণ দেবরকে ঠাকুরপো-সম্বোধন করিতে লজ্জা বোধ করেন। অবশ্য আধুনিক যুগেও দেবর ভ্রাতৃজায়াকে বৌ-দিদি বা সংক্ষিপ্ত "বৌদি" বলিয়া ডাকে। এইরূপ সম্বোধন হইতে বুঝা যায় যে, ইহাদের মধ্যে ভ্রাতৃ ভগ্নী সম্বন্ধ স্থাপিত হয় ইহাই প্রকৃত উদ্দেশ্য।

ননন্দ ভ্রাতৃজায়ার মধ্যে প্রকৃত ভগ্নিত্ব সম্বন্ধ বাঞ্ছনীয়। ভ্রাতৃজায়া স্বামীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে দিদি এবং কনিষ্ঠা ভগ্নীকে ঠাকুর-ঝি বলিতেন—অবশ্য প্রাক্‌যুগে। এই দিদি-সম্বোধন অদ্যাপি প্রচলিত আছে, কিন্তু ঠাকুর-ঝি সম্বোধন লুপ্তপ্রায়। "ঠাকুর-পো"র মত "ঠাকুর-ঝি" শব্দও ভ্রাতৃজায়ার লজ্জাসমুদ্রে মগ্ন হইয়াছে এইরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না। এখন অধিকাংশ গৃহে, অন্ততঃ যেখানে আধুনিকতার আবির্ভাব হইয়াছে, ঠাকুর-ঝির নাম ধরিয়াই ডাকা হয়। পূর্ব্বকালে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যাকে ননদ-বৌ, বা বড় বৌ বা মেজ বৌ বা ছোট বৌ এইরূপ সম্বোধন করিতেন, অধুনা তাঁহাদের নাম ধরিয়া ডাকেন। অনেক গৃহে শ্বশুর-শাশুড়ীও পুত্রবধূকে নাম ধরিয়া সম্বোধন করেন। বয়সে জ্যেষ্ঠা অথচ সম্পর্ক হিসাবে কনিষ্ঠা অনেক ননদ ভ্রাতৃজায়াকে নাম ধরিয়া ডাকেন। নাম ধরিয়া সম্বোধন দোষাবহ বলিয়া মনে হয় না, পরন্তু, স্নেহের পরিচায়ক।

ননন্দকুলের নিন্দাবাচক একটি কথা বোধ হয়, বঙ্গভাষার সৃষ্টিকাল হইতে প্রচলিত আছে—"ননদিনী রাইবাঘিনী"। বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য কোথাও এতদর্থসম্বলিত কোন কথার প্রচলন আছে কি না অবগত নহি। যাহাই হউক, বাঙ্‌লার বহু গৃহে ননন্দগণের বিপরীত আচরণ দৃষ্টিগোচর হয়—ননন্দ-ভ্রাতৃজায়ার মধ্যে স্নেহের ও প্রণয়ের সঞ্চার লক্ষিত হয়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে উল্লিখিত বাক্য প্রয়োগ করিলে ননন্দগণের প্রতি অবিচার করা হয়। হয় ত, জটিলা-কুটিলার যুগ-সম্পর্কীয় কোন উপাখ্যানে কুটিলার উদ্দেশ্যে কোন কবি এই বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তীকাল হইতে ইহা ননন্দকুলের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। কাব্যাদিতে কুটিলার যেরূপ চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা বিচার করিলে কুটিলার প্রতিও এ-বাক্য প্রযোজ্য নহে, কারণ চরিত্র হিসাবে তিনি নীতি-মার্গাবলম্বিনী (moralist) ও শাসন-ব্যবস্থাকারিণী (disciplinarian) ছিলেন। ভ্রাতৃজায়া নীতিমার্গ হইতে স্খলিতা হইলে অথবা ধর্ম্মপথচ্যুতা কিম্বা অন্য বিষয়ে উন্মার্গগামিনী হইলে যদি ননদ তাহাকে শাসন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে "রাইবাঘিনী" বলা কোনক্রমেই সঙ্গত নহে। "রাই-বাঘিনীর" মত ননদ ও বৌ-কাঁটকী শাশুড়ী যে নাই তাহা বলিতেছি না, তবে আধুনিক যুগে তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। ইহা এ-যুগের গৌরবের বিষয় এবং হয় ত উচ্চ-শিক্ষার ফল, যদিও কেহ কেহ বলিবেন যে শাশুড়ী-আধুনিক বধূকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন না।

শিক্ষা ও আচরণ সম্বন্ধে ভ্রাতৃজায়া ও ভ্রাতৃবধূ দুহিতা ও পুত্রবধূর পর্য্যায়-ভুক্ত, সুতরাং দুহিতা ও পুত্রবধূর উদ্দেশ্যে ইতিপূর্ব্বে যে যে বিষয় বিবৃত হইয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। বিশেষতঃ, যিনি শ্বশুর-শাশুড়ীর পুত্রবধূ তিনিই তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণের ভ্রাতৃবধূ বা ভ্রাতৃজায়া।

জা—একান্নবর্ত্তী পরিবারে সাধারণতঃ জা এর সংখ্যাধিক্য হইয়া থাকে; যতগুলি ভ্রাতা ক্রমে ক্রমে ততগুলি জা-এর সমাবেশ হয়। ছোট জা সকল যুগেই বড় জাকে দিদি-সম্বোধন করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্ব যুগে বড় জা ছোট জাদিগকে মেজো বৌ, ছোট বৌ এইরূপ সম্বোধন করিতেন, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ছোট জাদিগকে নাম ধরিয়া ডাকিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ইহাতে কোন দোষ আছে বলিয়া মনে হয় না। যদি জা-এরা পরস্পরকে স্ব স্ব ভগ্নীর ন্যায় জ্ঞান করেন, পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব-সম্পন্না ও ঈর্ষাবিরহিতা হয়েন এবং স্বার্থসংরক্ষণকল্পে পরস্পরের সহিত অন্যের মত ব্যবহার না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সংসার শান্তিময় হইয়া উঠে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জা-গণের মধ্যে মনোমালিন্য ও কলহের ফলে তাঁহাদের ভর্ত্তৃগণের মধ্যে মনোমালিন্য ও কলহের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমশঃ

এইরূপে যৌথ সংসার ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। জাদিগের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব থাকিলে তাঁহারা সংসারের কার্য্যভার নিজেদের মধ্যে নির্ব্বিবাদে বণ্টন করিয়া লইতে অথবা পালাক্রমে সম্পন্ন করিতে পারেন এবং এইরূপে সুশৃঙ্খলভাবে ও সদ্ব্যবহারে সংসার চলিয়া যায়।

সাধারণতঃ যে-সকল কারণে জাদিগের মধ্যে মনোমালিন্য ও তাঁহাদের ঈর্ষ্যার সঞ্চার হয় তাহাদের কতকগুলি এই—(১) অন্য জা-এর সম্বন্ধে শ্বশুর-শাশুড়ীর পক্ষপাতিত্ব (২) সমদর্শিতার অভাব, (৩) স্বার্থপরতা, (৪) স্বীয় পুত্র-কন্যার অন্যায় আচরণ সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা ও তাহার সমর্থন চেষ্টা, (৫) স্বীয় পিত্রালয় সম্বন্ধে অপর জা-এর নিন্দোক্তি, (৬) পরস্পরের কার্য্য বা আচরণ সম্বন্ধে শ্লেষাত্মক প্রতিকূল সমালোচনা, (৭) পরস্পরের সৌভাগ্যে হর্ষের ও ভাগ্যবিপর্য্যয়ে সহানুভূতির অভাব এবং (৮) পুনঃ পুনঃ পরস্পরের দোষদর্শিতা বা ত্রুটিগ্রাহিতা। এই এই অবস্থায় সংসারে সচরাচর যে সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে সংক্ষেপে তাহার কতকগুলির উল্লেখ করিতেছি :

(১) যে শ্বশুর-শাশুড়ীর দুই বা ততোধিক পুত্রবধূ থাকে অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের "একচোখামি" দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা, বিশেষতঃ শাশুড়ী একটি বধূকে অপরটির বা অপরগুলির চেয়ে অধিক ভালবাসেন ও যত্ন করেন। যে-বধূর পিতা ধনবান এবং কন্যা ও জামাতাকে মূল্যবান উপ-ঢৌকনাদি প্রদান করেন তাহার ভাগ্যে এইরূপ ভালবাসা ও যত্নের আধিক্য হইয়া থাকে। যে বধূর পিতৃগৃহ হইতে এরূপ উপঢৌকন প্রভৃতি প্রেরিত হয় না তাহার ভাগ্যে গঞ্জনা ঘটিয়া থাকে, সর্ব্বসমক্ষেই তাহার জনক-জননীর নিন্দোক্তি হয়। বলা বাহুল্য পিত্রালয়ের নিন্দা কোন বধূ সহ্য করিতে পারে না। বধূর পিত্রালয় হইতে প্রেরিত উপঢৌকনাদি সম্বন্ধে শাশুড়ীর মন্তব্য কিরূপ হওয়া উচিত তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের গৃহিণী-শীর্ষক অংশে উল্লিখিত হইয়াছে।

বধূর নিজের স্বামীর অনুচিত আচরণের ফলেও তাহার গঞ্জনাভোগ হইয়া থাকে। শ্বশুর-শাশুড়ী ভুলিয়া যান যে, বধূর স্বামী তাঁহাদেরই আত্মজ। তাঁহারা মনে করেন যে, পুত্রের আচরণের জন্য পুত্রবধূই দায়ী—তাহারই পরামর্শের (curtain lectures) ফলে পুত্রের স্বভাব ও আচরণ বিকৃতি-প্রাপ্ত হয়। অনেক সময়ে পুত্রের দুর্নীতি ও উন্মার্গগামিতার জন্যও পুত্রবধূকে দায়ী করা হয়। অবশ্য পুত্রবধূর আচরণের উপরে শ্বশুর-শাশুড়ীর স্নেহযত্নের পরিমাণ নির্ভর করে। পুত্রবধূগণের প্রতি শ্বশুর-শাশুড়ীর আচরণের তারতম্য হইতে অনাদৃতা বা তিরস্কৃতা বধূর অন্তঃকরণে আক্ষেপ ও ক্রমশঃ ঈর্ষ্যার সঞ্চার হয়। ঈর্ষ্যা হইতে সাংসারিক অশান্তির সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী।

(২) যদি কোন জা পরিবারস্থ সকলকে বয়সনির্ব্বিশেষে সমান চোখে না দেখেন, সমান ভাবে যত্ন-আত্তি না করেন, অপর জা-এর পুত্রকন্যাগণকে নিজের পুত্রকন্যার মত যত্নসহকারে লালন-পালন না করেন, জা-গণের মধ্যে অথবা ভিন্ন ভিন্ন জা-এর পুত্রকন্যার মধ্যে আচরণ বিষয়ে ইতর-বিশেষ করেন, তিনি নিশ্চয় নিন্দাভাগিনী হইবেন। নিন্দা হইতে মনোমালিন্য সমুদ্ভূত হয়। সমদর্শিতার অভাব হইলে সংসারে শান্তির অভাব হয়।

(৩) স্বার্থপরতা জা-দিগের মধ্যে সম্প্রীতিস্থাপনের একটি অলক্ষ্য অন্তরায়। যাহারা কেবল "নিজের কোলে ঝোল টানিতে চাহে", অন্যের সুবিধা-অসুবিধার দিকে চাহিয়া দেখে না, তাহাদের সহিত কাহারও "বনিবনাও" সম্ভবপর নহে, আন্তরিক বন্ধুত্ব তো পরের কথা। স্বার্থপরতার ফলে সংসার অশান্তিপূর্ণ হয় এবং কত সংসার ভাঙ্গিয়া যায়।

(৪) বালক-বালিকা স্বভাবতঃ দুরন্ত ও বিচারবুদ্ধিহীন। কোন কোন বিষয়ে ন্যায়ান্যায় বিচারের কথঞ্চিৎ ক্ষমতা থাকিলেও, প্রবৃত্তিদমন তাহাদের সাধ্যাতীত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং মধ্যে মধ্যে তাহারা যে "অকর্ম্ম" করিবে ইহা বিচিত্র নহে। সে-জন্য কোন বালক বা বালিকা, তাহার কোন পিতৃব্য-পত্নী কর্ত্তৃক শাসিত বা তিরস্কৃত হইলে তাহার জননী ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত না হইয়া নির্ব্বাক থাকাই উচিত, কারণ, পুত্রকন্যার পক্ষাবলম্বন করিলে তাহাদিগকেও প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং দুই জা-এর মধ্যে মনোমালিন্যের ও ক্ষেত্রবিশেষে কলহের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। পুত্রকন্যাকৃত অকর্ম্ম সম্বন্ধে জননী নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিলেও জা-দিগের মধ্যে মনোমালিন্য সম্ভবপর। কোন পিতৃব্য-পত্নীর সম্মুখে এরূপ "অকর্ম্ম" সাধিত হইলে অথবা সর্ব্বপ্রথমে গোচরীভূত হইলে তাঁহার কর্ত্তব্য অকর্ম্মকারীর শাসন; তাহা না করিয়া অকর্ম্মকারীর নিন্দা করিলে ও তাহার জননীর স্কন্ধে দোষ চাপাইলে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের সঞ্চার হইতে পারে, কারণ, জননী মনে করিতে পারেন যে, জা তাঁহার পুত্রকন্যাকে পরের ছেলে জ্ঞান করিয়া শাসন-বিষয়ে বিরত হইলেন।

(৫) এ-প্রসঙ্গে একাধিকধার কথিত হইয়াছে যে, পিত্রালয় সংক্রান্ত কোন বিষয়ের নিন্দা রমণীগণের অসহ্য—বিশেষতঃ শ্বশুরগৃহে। কোন জা-এর পিত্রালয় হইতে কোন উপঢৌকন আসিলে তাহার বিরুদ্ধ-সমালোচনা অন্য জা-গণের অকর্ত্তব্য। একাধিক জা-এর পিতৃগৃহ হইতে যে সকল উপঢৌকন আসে অন্য জা-কর্ত্তৃক তাহাদের তুলনাও অনুচিত। পরন্তু যে-স্থান হইতে যেরূপ উপঢৌকনই আসুক তাহা সমান আদরের সহিত বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণীয়। জা-এর পিতা ও ভ্রাতাকে অন্য জা-গণ নিজ নিজ পিতা ও ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করেন এরূপ ভাব প্রকাশিত ও সে জা-এর বিদিত হইলে জা-দিগের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্য প্রগাঢ় হইয়া উঠে।

(৬) মানুষ মাত্রেরই ভুল হইতে পারে—to err is human। যদি কোন জা ভ্রম বা অজ্ঞানতাবশতঃ কিম্বা দূরদর্শিতার অভাব প্রযুক্ত কোন "অকর্ম্ম" করিয়া ফেলেন অথবা কার্য্যবিশেষ সুচারুরূপে বা অনুমতরূপে করিতে অসমর্থ হয়েন, তাহা হইলে অন্য জা-গণের কর্ত্তব্য তাঁহাকে তৎসম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদান—ব্যঙ্গ উপহাস বা শ্লেষ নহে। পুনঃ পুনঃ ব্যঙ্গোক্তি বা শ্লেষোক্তির ফলে বন্ধুত্ব বিনষ্ট হয়। সকল সংসারের কার্য্যপদ্ধতি ও আচার-ব্যবহার একরূপ হয় না। এমন কি, ডাল-ভাত প্রভৃতি মোটামুটি খাদ্যের কথা ছাড়িয়া দিলে, ভিন্ন ভিন্ন সংসারে খাদ্য সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন রুচি লক্ষিত হয়। কুমারী-অবস্থায় পিতৃগৃহে যে পদ্ধতি ও আচার-ব্যবহারে কন্যা অভ্যস্তা হইয়া উঠে, বিবাহের পরে শ্বশুরালয়ে প্রচলিত পদ্ধতি ও আচার ব্যবহার তাহা হইতে ভিন্ন হইলে বধূর অভ্যাসের পরিবর্ত্তন শিক্ষা ও সময়-সাপেক্ষ। এইরূপ পরিবর্ত্তনকল্পে যে সাহায্য ও শিক্ষার প্রয়োজন তাহা প্রথমতঃ শ্বশ্রূর এবং তৎপরে জ্যেষ্ঠা জা-এর নিকটে প্রাপ্তব্য।

(৭) পারস্পরিক সহানুভূতি জা-গণের মধ্যে সৌহার্দ্দ্যের সংস্থাপন, সংরক্ষণ ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সুহৃদের আনন্দে আনন্দ-প্রকাশ, দুঃখে ও শোকে সমবেদনা প্রকাশ, সম্পদে হর্ষপ্রকাশ ও বিপদে সহায়তা—এতদ্বারা সৌহার্দ্দ্য বদ্ধমূল হয়। বন্ধুত্ব অকৃত্রিম বা অকপট হইলে অন্তঃকরণে এই সকল ভাবের ও তৎপ্রণোদিত কার্য্যপ্রবৃত্তির সঞ্চার স্বতঃই হইয়া থাকে। কেবল মৌখিক কুশলপ্রশ্ন বন্ধুত্বের প্রতারণা মাত্র। কোন পরিচিত ব্যক্তির সহিত যেখানে-সেখানে সাক্ষাৎ হইলে আমরা কুশলপ্রশ্ন করিয়া থাকি—"নমস্কার! ভাল ত'?" ইহা সম্পূর্ণ মৌখিক—formal! রাস্তায় চলিতে চলিতে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াও আমরা উত্তরের প্রতীক্ষায় ক্ষণকাল দাঁড়াই না। ইহা সৌহার্দ্দ্যের রীতি নহে। কোন জা পীড়িতা হইলে দিনান্তে একবার তাঁহার ঘরে উঁকি মারিয়া "কেমন আছ" এরূপ প্রশ্ন আদৌ সৌহার্দ্দ্যের পরিচায়ক নহে। পীড়িতা জা-এর সহোদরা-নির্ব্বিশেষে শুশ্রূষা করিতে হয়। তাঁহার পুত্র পীড়াগ্রস্ত হইলে আত্মজনির্ব্বি-শেষে তাহার শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধান করিতে হয়। সূতিকাগারনিবদ্ধা জা-এর সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন যাহাতে ত্রুটিবিহীন ভাবে সিদ্ধ হয় এবং তাহার স্বামী ও পূর্ব্বজ সন্তানগণ কোন অভাব অনুভব করিতে না পান তৎসম্বন্ধে দৃষ্টিরক্ষা অপর জা-গণের কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য পালন করিলে অন্য জা-গণ

যে প্রহৃতির কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই। কোন জা-এর রুগ্ন অবস্থায় তাঁহার স্বামী ও পুত্রকন্যার সম্বন্ধে অন্য জা-এরা অনুরূপ ব্যবস্থা করিলেও রোগাতুরা জা-এর কৃতজ্ঞতাভাগিনী হইবেন। শ্বশ্রূ বা অন্য গৃহিণী বর্ত্তমান থাকিলেও জা-দিগের এই সকল কার্য্য করা উচিত, কারণ, কার্য্যের নির্দ্দেশ গৃহিণীর কর্ত্তব্য হইলেও, নির্দ্দেশপালন বধূগণের কর্ত্তব্য। এইরূপে জা-দিগের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত ও রক্ষিত হয় এবং স্থায়িত্ব লাভ করে। সৌহার্দ্দ্যের ফলে সংসার শান্তিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং তদভাবে সংসারে শান্তির অভাব হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি অবস্থার উল্লেখ করা হইল। সংসারে কতরূপ অবস্থার আবির্ভাব হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।

(৮) পদে পদে কাহারও দোষ ও ত্রুটী প্রদর্শিত হইলে স্বভাবতঃই তাহার বিরক্তি উপস্থিত হয়। জা-গণ এই নিয়মবহির্ভূতা নহেন। দোষ বা ত্রুটীর মূল কারণ কি—কি-কারণে উহা সঞ্জাত হইল, কি-পদ্ধতিতে কার্য্য করিলে কিম্বা কিরূপ আচরণ করিলে উহা উদ্ভূত হইতে পারিত না তাহা সম্যক্‌রূপে এবং মনঃক্ষুণ্ণকর বা অপ্রীতিকর না হয় এরূপ কথায় অভিযুক্তাকে বুঝাইয়া দিলে তাহার পুনঃসংগঠন নিবারিত হয়, অথচ অভিযুক্তার বিরক্তি উৎপাদিত হয় না। সাময়িক বিরক্তি হইতেই ক্রমশঃ অপ্রীতির উদ্ভব হয়। প্রীতির অভাবে সংসারে শান্তিরও অভাব হইয়া থাকে।

জা-দিগের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য ও সম্প্রীতি স্থায়ী হইবার ফলে একান্নবর্ত্তী পরিবার (কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষিত হইলেও) অটুট থাকে এরূপ ধারণা নিতান্ত ভিত্তিহীন বলা যায় না। জা-গণের মধ্যে কলহের সূত্রপাত হইলে পারিবারিক একতা-ভঙ্গের সূত্রপাত হয়। যাহার স্বামী দুর্ব্বলচিত্ত সে-জা পারিবারিক স্বাতন্ত্র্যের অভিলাষিণী হইলে যৌথ পরিবার অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না। ফলতঃ ভ্রাতাগণের মধ্যে মনোমালিন্য ও ক্রমশঃ বিরোধ উপস্থিত হইলে তাঁহাদের পত্নীগণকেই সাধারণতঃ দায়ী করা হয়। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এ-অপবাদ নিতান্ত মৎস্যরঙ্কের অপবাদের মত নহে। পিতামাতার অথবা ইঁহাদের একজনের জীবদ্দশায় ভ্রাতাগণকে প্রায় পৃথকান্ন হইতে দেখা যায় না। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, জনক জননীর মনোভাব-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে বা তাঁহাদিগকে মনঃক্ষুণ্ণ করিতে আধুনিক যুগের পুত্রগণও ইতস্ততঃ করেন এবং পুত্রবধূগণও তাঁহাদের সহিত প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ করিতে ভয় পাইয়া থাকেন।

জা-গণের বা জা-বিশেষের স্বার্থপরতা বা ঈর্ষ্যা প্রভৃতির দোষে অশান্তি ও কলহের সৃষ্টি না হইলে এজমালী সংসার বহুবিষয়ে সুবিধাজনক। পাঁচ ভ্রাতা একত্র বাস করিলে পরস্পরের আপদে-বিপদে সহায়তা সহজলভ্য। পাঁচজনে এক সংসারভুক্ত হইয়া থাকিলে যথেষ্ট ব্যয়সংক্ষেপ হয়। সামান্য দৃষ্টান্ত হইতে এ-সকল বিষয় সহজে বোধগম্য হইবে। যদি কোন কন্যার পাঁচটি মাতুল একান্নবর্ত্তী থাকেন, তাহার বিবাহকালে মাতুলালয় হইতে একটি আইবুড়োভাতের তত্ত্ব করিলেই চলে, কিন্তু প্রত্যেক মাতুল পৃথক বাস করিলে পাঁচদফা তত্ত্ব পাঠাইতে হয়। পাঁচজনের সংসারে কেহ কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলে তাহার শুশ্রূষা বা তাহার প্রতি দৃষ্টিরক্ষার জন্য লোকের অভাব হয় না, কিন্তু যে সংসার কেবল মাত্র স্বামী-স্ত্রী ও তাঁহাদের পুত্র-কন্যা লইয়া গঠিত সেখানে কেহ এরূপ পীড়াগ্রস্ত হইলে স্বামী-স্ত্রী ও রোগী বিশেষ অসুবিধা ভোগ করেন, কারণ, এ-দেশের লোক সহজে হাসপাতালে যাইতে বা আত্মীয় স্বজনকে পাঠাইতে চাহে না। যদি গৃহে ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হয়, তাহাও বহু ব্যয়সাপেক্ষ। পরন্তু, স্বামী বা স্ত্রী পীড়িত হইলে, হয় রোগীর যথোচিত শুশ্রূষার অবহেলা করিতে হইবে, নচেৎ পুত্রকন্যাগণকে "দেখিবার" লোক থাকিবে না। বিশেষতঃ স্ত্রী পীড়িতা হইলে সংসারই অচল হইয়া উঠিবে, পাচক ও দাসদাসী নিযুক্ত থাকিলেও সংসার নিয়মিতরূপে চলিবে না।

উল্লিখিত ও আনুষঙ্গিক অবস্থাগুলির পর্য্যালোচনা করিলে কোন বুদ্ধিমতী জা এজমালী সংসার ভাঙ্গিতে চাহিবে না এরূপ আশা করা যায়।

স্বামী—পুত্রবধূর প্রসঙ্গে তাঁহার স্বামীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে বটে কিন্তু তৎসম্বন্ধে যথাসম্ভব বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। অধিকাংশ সংসার গৃহস্বামী, গৃহিণী, পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া গঠিত। যৌথ সংসারে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূও অন্তর্ভুক্ত থাকেন, কিন্তু তাঁহারাও পুত্র ও পুত্রবধূর সমস্থানীয়। স্থূলতঃ গৃহস্বামীর আত্মজ যেমন তাঁহার স্নুষার স্বামী, অনুজ তেমনি ভ্রাতৃবধূর স্বামী। এই প্রবন্ধাংশে স্বামীই আলোচনার বিষয়।

ইতিপূর্ব্বে গৃহস্বামীর যে-সমস্ত কর্ত্তব্যের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার অনেকগুলি সকল স্বামীরই পালনীয়। আজ যিনি বধূর স্বামী কিছুদিন পরে তিনি গৃহস্বামী হইতে পারেন, এইরূপ উন্নয়নের পূর্ব্বেই গৃহস্বামীর সহায়তা-করে অথবা নির্দ্দেশানুসারে কোন কোন কার্য্য তাঁহার অবশ্যকরণীয় হয়।

স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই জীবন কর্ত্তব্যবহুল। বিবাহকাল হইতেই পত্নীর যাবতীয় ভারগ্রহণ পতির কর্ত্তব্য। শুধু তাহাই নহে, পত্নীর হৃদয়ের সহিত নিজের হৃদয় মিলাইয়া দিতে হয়। বিবাহের সময়ে বর কন্যাকে বলেন—"যদেতদ্ধৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥" ইহার অর্থ—তোমার এই যে হৃদয় তাহা আমার হৃদয় হউক (এবং) আমার এই যে হৃদয়, তাহা তোমার হৃদয় হউক। ইহা হৃদয়-বিনিময়ের প্রতিশ্রুতি, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য উভয় হৃদয়ের মিলন। কিন্তু দুইটি হৃদয় কিরূপ হইলে একটির সহিত অন্যটির মিলন হইতে পারে? দুগ্ধের সহিত শর্করা বা শর্করা-খণ্ড মিশ্রিত করিলে দু'টি পদার্থ এমন মিলিয়া যায় যে, আস্বাদ গ্রহণ না করিলে দুগ্ধ খাঁটি কিম্বা শর্করামিশ্রিত বুঝিবার উপায় থাকে না, অবশ্য শর্করা বা শর্করাখণ্ড (মিছরি) যদি ধবধবে সাদা হয়। তথাপি আলোড়ন বা ঘোণ্টন আবশ্যক। শীতল তৈলের সহিত গরম জলও মিশ্রিত হয় না, ঠাণ্ডা জলের ত' কথাই নাই। গরম ঝোলে কাঁচা তৈল ঢালিলে ঝোলের উপরে ভাসিতে থাকে ইহা প্রায় সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। বর-কন্যার একবার ক্ষণেকের জন্য শুভদৃষ্টি ও পাণিবন্ধন হইলেও তাহাদের হৃদয়বিনিময় বা হৃদয়মিলন হইবে এরূপ আশা যুক্তিযুক্ত নহে। রূপসী কন্যার মুখাবলোকন করতঃ বর তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে এবং সুরূপ বরের মুখ দেখিয়া কন্যার তাহার প্রতি আকৃষ্টা হওয়া সম্ভবপর, কিন্তু ইহা রূপের আকর্ষণ বা "চোখের নেশা" মাত্র। রূপের মোহ হইতেই হৃদয়বিনিময় বা হৃদয়মিলন সম্ভাব্য নহে।

যখন আমরা পাত্র-পাত্রী দর্শন করিতে যাই তখন পাত্রীর বর্ণ, মুখশ্রী, কেশদাম, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ, অঙ্গুলী নিরীক্ষণ করি এবং এই সকল দেখিয়া রূপের ও স্বাস্থ্যের বিচার করিয়া থাকি। সাধারণতঃ আমরা পাত্রের রূপের বিচার করি না, কিন্তু, তাহার দেহের গঠন ও স্বাস্থ্যের বিচার করি। বিশেষতঃ, পাত্রের বিদ্যার পরিমাণ নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী হইলেও, তাহার শিক্ষার প্রকৃষ্টতা সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর পরীক্ষা ও বিচার করিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন তাহার চরিত্র ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদের অনুসন্ধান করি। যদি পাত্র চাকরীতে ব্রতী থাকে তাহা হইলে চরিত্র ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশেষ আবশ্যক হয় না। আধুনিক যুগে আমরা পাত্রীরও বিদ্যা পরীক্ষা করি এবং গৃহাশ্রম ও সাংসারিক কার্য্যসম্বন্ধীয় জ্ঞানের পরিমাণ নির্ণয় করিতে চাহি। যতই পরীক্ষা করি না কেন, পাত্র বা পাত্রীর হৃদয় সম্বন্ধে কোন তথ্য নির্দ্ধারণ বা কোন জ্ঞান লাভ করিতে আমরা সমর্থ হই না। আমরা বাহ্যিক লক্ষণ দেখিয়াই পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচন করি। কোষ্ঠী থাকিলে বড় জোর তাহার বিচার করি। উভয়ের হৃদয় সমভাবাপন্ন ও মিলনের উপযোগী হইবে আমরা

এইরূপ আশা করি বটে, কিন্তু, সেজন্ত সম্পূর্ণরূপে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিতে হয়।

কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিলে সংসারে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না, পুরুষকারের পরিমাণের তারতম্য হয়। প্রবাদ আছে, কাশীধামে কেহ অভুক্ত থাকে না। ইহার কারণ এই যে, সেখানে দৈনিক অন্নসত্রের ব্যবস্থা আছে। শুনা যায়, অধিক রাত্রিতে এই সকল অন্নসত্র হইতে লোক বাহির হইয়া "কই ভুঁখা হায়" উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ প্রশ্ন করিত এবং কোন অভুক্ত লোক দেখিতে পাইলে তাহাকে ভোজন করাইত। এরূপ ব্যবস্থা অদ্যাপি প্রচলিত আছে কি না জানি না, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লইলে, যদি কোন ব্যক্তি অন্ধকারগৃহে নীরবে বসিয়া থাকে তাহা হইলে প্রশ্নকারী তাহার অস্তিত্ব-ও অভুক্ত অবস্থার কথা জানিতে পারিবে না, সুতরাং তাহাকে অভুক্ত থাকিতে হইবে। যদি সে নিজের অবস্থা প্রশ্নকারীকে জানাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার ভাগ্যে অন্ন জুটিবে। এই জানাইয়া দেওয়াই পুরুষকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে অধ্যয়নের প্রয়োজন হয়; এই অধ্যয়নই পুরুষকার-সম্ভূত।

পতি ও পত্নীর হৃদয় মিলনোপযোগী কি না বিবাহকালে বা বিবাহের অব্যবহিত পরে তাহা বোধগম্য হয় না; দ্বিরাগমনের পরে পত্নী যখন সংসারে প্রবেশ করেন তখন ইহার উপলব্ধি সম্ভব। যখন পতি বুঝিবেন যে, তাঁহার ও পত্নীর হৃদয় সমভাবাপন্ন নহে এবং উভয় হৃদয়ের মিলন সহজ নহে, তখন হইতেই পত্নীর হৃদয়কে সমভাবাপন্ন হইতে হইলে উভয়ের মধ্যে কলহ যেমন অবশ্যম্ভাবী, সাংসারিক অশান্তিও সেইরূপ অনিবার্য্য। স্বামীকে চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে কলহ না হয়। এজন্ত স্বামীর আত্মসংযম আবশ্যক। পত্নীর কার্য্যাবলীর ও আচরণ পর্য্যালোচনা করতঃ তাঁহার হৃদয়ে কি-গুণের অভাব তাহা অবধারণ করিতে হইবে। পত্নী কি বিষয়ের বা কোন্ বস্তুর অভাব অনুভব করেন তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে এবং সাধ্যাতীত না হইলে তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। কুমারী-অবস্থায় পিত্রালয়ে কন্সা যে-ভাবে লালিতা-পালিতা হয় শ্বশুরগৃহে কতক সাংসারিক ব্যবস্থার ও আচারের বা প্রথার বিভিন্নতা নিবন্ধন এবং কতক অন্যান্য কারণে বধূর সে-ভাবে লালন-পালন সম্ভবপর হয় না, সুতরাং তাহার অভাবের-ও অভিযোগের কারণ উপস্থিত হয়। অথচ অন্য লোক ত পরের কথা নববধূ স্বামীর নিকটেও স্বীয় অভাবের বিষয় ব্যক্ত করিতে বা তৎসম্বন্ধে কোন অভিযোগ করিতে চাহে না। গৃহিণী যদি ইহা বুঝিতে না পারেন, স্বামীকে বুঝিবার চেষ্টা করিতে এবং পাকে-প্রকারে গৃহিণীকে বুঝাইতে হইবে। এ-বিষয়ে স্বামী ভগ্নী বা বৌদিদির নিকটে কোন সাহায্য চাহিলে তাঁহারা অকাতরে তাহা দান করিয়া থাকেন।

পত্নীর হৃদয়ে যে-যে গুণের অভাব লক্ষিত হইবে সেই-সেই গুণ তাহাতে নিহিত করিবার জন্য স্বামীর চেষ্টা করা উচিত। সে-কার্য্যে স্বামীর অধ্যবসায়ের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সময়ের ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। সহিষ্ণুতার অভাব হইলে পত্নীর সহিত কলহ অবশ্যম্ভাবী। কলহের উৎপত্তি হইলে হৃদয়ের মিলন সুদূরপরাহত, হয় ত অসম্ভব হইয়া উঠিবে। পত্নী কটুভাষিণী ও মুখরা হইলে পতির প্রিয়ভাষিতা ও অবস্থাবিশেষে মৌনাবলম্বনের ফলে অনেক স্থলে পত্নীর সে-দোষ নিরাকৃত হয়। মৌখিক শিক্ষা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত অধিকতর ফলোপধায়ক।

দুইটি নির্জ্জীব পদার্থের মিলন ঘটাইতে হইলেও পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। কোন তালা বা বাক্সের চাবি হারাইলে অনেক মাজিয়া ঘষিয়া তাহার নূতন চাবি মিলাইয়া লইতে হয়। সমভাবাপন্ন না হইলে মানবহৃদয় মিলনোপযোগী করিতে ততোধিক মার্জ্জন ও ঘর্ষণের আবশ্যকতা হয়। পরন্তু, ইহা সময়সাপেক্ষ। দুই চারি দিনের মধ্যে এ-কার্য্য সম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে পত্নীর কার্য্যে ও আচরণে ক্রমাগত ত্রুটী প্রদর্শন করিলে অথবা গুরুমহাশয়ের মত শিক্ষাদান করিলে বা তিরস্কার করিলে তাঁহার হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে পারে। যাহাতে আদৌ বিদ্রোহের সঞ্চার না হয় সে-দিকে স্বামীর সতর্ক দৃষ্টি আবশ্যক। পত্নী অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলেও তাহা সহ্য করা উচিত। ফলতঃ, পত্নীর স্বভাবের সংস্কার করিতে হইলে পতির আত্মসংযম, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় বিশেষ প্রয়োজনীয়। অবশ্য, সহিষ্ণুতা আত্মসংযমের এবং ধৈর্য্য অধ্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত ইহা বলিতে পারা যায়। [ক্রমশঃ]

সেদিনের পৃথিবী ও আজকের মানুষ

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

দাসত্ব

দুই দলের মধ্যে বিরোধ হ'লেই বিজেতাদল যেমন বিজিত দলের মেয়েদের নিয়ে আসত বিবাহের জন্ত, তেমনই অনেককে বন্দী ক'রেও আনত'। এই বন্দীরা হ'ত দাস। কিন্তু এক দলের লোক সেই দলের কোন ব্যক্তির অধীনেও অনেক সময় দাসত্ব করত। কোন পরিবারের ব্যক্তিকে আহত করলে আঘাতকারীকে একটা নির্দ্দিষ্ট কাল সেই পরিবারের দাস হ'য়ে থাকতে হ'ত। কোন কোন ক্ষেত্রে ঈপ্সিতা নারীকে উপযুক্ত যৌতুক দিয়ে বিবাহ করার ক্ষমতা না থাকায় যৌতুকদানের পরিবর্ত্তে কিছুদিন শ্বশুরের পরিবারে দাসত্ব ক'রে পাত্র কন্সাকে বিবাহ করত। তবে দাসত্ব প্রথার বিশেষ স্বদলের মধ্যে প্রবর্ত্তন হ'য়েছিল কিছু উন্নতাবস্থায়, যখন পরস্পরের অধিকার স্বীকার ক'রে লওয়া হয়েছিল, সকল বিষয়ে একটা সম্বদ্ধ প্রণালী অনুসরণের ইচ্ছা যখন মানুষের মনে জাগছিল, শৃঙ্খলার প্রয়োজন যখন মানুষ অনুভব ক'রেছিল বিরক্তকর হাঙ্গামাকে এড়িয়ে চলবার জন্তে। তারপর ক্রমশঃ ধনবৈষম্যের ফলে দাস ও প্রভুর সৃষ্টি হয়েছে নানা রকমের, এবং বর্ত্তমানকালের সুসভ্য সমাজের মধ্যেও নানা দিকে প্রভু ও ভৃত্যের সম্বন্ধ আজও স্বার্থের ভিত্তিতে কায়েমী ভাবে বর্ত্তমান।

দলপতিত্ব

পরিবারের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষই ছিল কর্ত্তা, দণ্ডমুণ্ডের বিধানও ছিল তার হাতে। তারপর যখন একাধিক পরিবার

প্রকৃত অথবা বহুমূল ধারণাগত একই রক্তের সম্পর্কে বিজিত হ'ল, অথবা বিজিত হ'য়ে অপর গোত্র অথবা দলভুক্ত হ'ল, তখন নবাগত দলদের ত্যাগ করতে হ'ল নিজেদের সমস্ত পূর্ব্ব সংস্কার এবং সামাজিক পদ্ধতি, আর স্বভাবতঃই সেগুলো ছিল নিকৃষ্ট ধরণের। এই ভাবে দলবদ্ধ পরিবার গোত্রের মধ্য দিয়ে দলের সৃষ্টি করলেও আদিম অবস্থায় মানুষ যখন দলবদ্ধ ভাবে বাস করত, তখন দলে প্রত্যেকেই ছিল সমান—সকল জিনিষে অধিকারও তাদের সমান ভাবেই থাকত। তবে তাদের মধ্যে হঠাৎ একজন অমন বড় হ'য়ে গেল কেমন ক'রে? আদিম অবস্থায় নিয়ত হানাহানির যুগে যারা সমধিক শারীরিক শক্তির অধিকারী ছিল, স্বভাবতঃই অপরে তাদের ভয় করত, এবং দলের সকলে বিপদের সময় তাদের ওপরই নির্ভর করত বেশী। শক্তিমানরাও ক্রমশঃ নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা লাভের জন্য অপরের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিতে আরম্ভ করে। তারা খাদ্যের ভাগ নিতে লাগল বেশী, ভাল অস্ত্র রাখল নিজের অধিকারে—এই ভাবে দলের মধ্যে তারা নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করল। অধিকন্তু এদের মধ্যে আবার যাদের বুদ্ধি ছিল একটু বেশী, তারা প্রভুত্ব লাভ করল আরও সহজেই; এইভাবে দলপতির উদ্ভব হলেও দলপতিত্ব প্রথমে বংশগত ছিল না। যে যার নিজের ক্ষমতা অনুসারে এক একটা দলের ওপর কর্তৃত্ব করত। তারপর যখন সন্তানরা পিতৃ-বংশের নামেই পরিচিত হ'তে আরম্ভ করল, পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও হ'তে লাগল তারাই—তখন দলপতিত্বও বংশানুক্রমিক হ'য়ে দাঁড়াল। দলপতির সম্পত্তির মালিক হ'ল তার ছেলেরাই। এইখানেই প্রথম শ্রেণীবিভাগ আরম্ভ হ'ল। বিজিত দলের বন্দীরা দলপতির দাস হিসাবে পরিগণিত হ'তে লাগল। ক্রমোন্নতির সঙ্গে আইন কানুনের উদ্ভব হ'লে দলপতি কখনও নিজেই—কোন কোন ক্ষেত্রে বা অপর পাঁচজন প্রবীণদের নিয়ে—অপরাধীর বিচার করত, দোষীর জরিমানা হ'ত, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হ'ত। ক্রমশঃ যখন যাযাবরত্ব ত্যাগ ক'রে মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগল, এবং দলপতিই ক্রমশঃ তাদের সর্ব্বেসর্ব্বা হ'য়ে উঠল, তখন উদ্ভব হ'ল রাষ্ট্রের, আর সেই দলপতিই হ'ল রাজা। ক্রমশঃ সামন্ত প্রথার প্রবর্ত্তন হ'ল, শ্রেণী বিভাগ হ'ল স্পষ্টতর। রাজার অনুগ্রহভাজন আর একটা দলের উদ্ভব হ'ল।

রাষ্ট্র ও আইনের উদ্ভব

রাষ্ট্র সম্বন্ধে প্রথম চেতনা মানুষের মনে জাগে একতাবদ্ধ ভাবে দলের মধ্যে বাস করার জন্যে। অধ্যুষিত স্থান যে একার নয়, সমগ্রদলের—সকলেই এক দলপতির অধীন, আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্ম প্রত্যেকেরই এক, দলরক্ষার মধ্যেই আত্মরক্ষা নিহিত, সমান স্বার্থ, প্রভৃতি বোধের দরুণ তাদের মনে প্রথম রাষ্ট্রবোধের বীজ উপ্ত হয়। আইনের উদ্ভব হয় সম্পত্তির অধিকার ভেদ আসার সময় হ'তে। একনায়কত্বের স্থান নিয়েছিল দলপতি আর বিভিন্ন পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের নিয়ে ছিল এক একটা সভা, যারা বিচার করত অপরাধের, শাস্তি দিত দোষীকে। অধিকার ভেদ কেমন ক'রে এল আগেই বলা হয়েছে; আর অধিকার ভেদ আসার সঙ্গে সঙ্গেই এল অধিকার ভঙ্গের ক্ষেত্রে বিবিধ বিধান। কিন্তু এই অন্তর্দলীয় বিধি-নিষেধ সৃষ্টির পূর্ব্বেও দলপতি ও পরিবারের কর্ত্তাদের সভা অনেক সময় বসত, যখন এক দলের কেউ হত্যা করত অপর দলের কাউকে। বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান ছিল এই সময়ে যথেষ্ট। প্রবীণরাই ছিল সভার সভ্য, তাদের বিচারই ছিল চরম। তারপর রাষ্ট্র, রাজা, সম্পত্তি ও সাধারণের পারস্পারিক সম্পর্ক জটিলতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানারকম জটিল আইনেরও সৃষ্টি হ'তে লাগল। একদিকে যেমন এল একনায়কত্ব, সামন্ত প্রথা, সসীম রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ভোটাধিকার, অপরদিকে তেমনই তৈরী হ'ল জটিল আইন, কূটনীতি, রাজা ও প্রজা, মাল ও মালিকের মধ্যে সম্পর্ক নির্দ্ধারণের জন্য জটিল শাসনবিধি ও কূটনীতি। আর আদিম যুগে বিভিন্ন দলের মধ্যে হানাহানি যখন ছিল দৈনন্দিন ব্যাপার, তখন আত্মরক্ষার জন্য যে সামরিক বিভাগ ও সমর-পদ্ধতির উদ্ভব কেমন ক'রে হ'ল, এ প্রশ্ন যুক্তি দিয়ে বিচার ক'রতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র।

দ্বি-সত্তা

মানুষের এই জৈব দেহটাই যে সব নয়, আত্মা ব'লে যে তার আর একটা রূপ ও স্থিতি আছে, এ বোধ মানুষের মধ্যে প্রথম এল কেমন করে? এ ধারণা প্রথম মানুষের মনে জাগে যখন সে কল্পনা-নয়নে দেখতে শেখে। ঘুমের সময় যখন তার দেহটা নিশ্চল হ'য়ে পড়েছিল, তখন সে কি স্বপ্নে নিজেকে দেখে নি বনের মধ্যে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, অথবা পথে হারিয়ে যেতে? জাগ্রতাবস্থায় সে যে নারীকে পেতে চেয়েছে একান্তভাবে, যার মনোরঞ্জনের হাজার চেষ্টা সে করেছে প্রতি মুহূর্ত্তে দিনের পর দিন ধরে, স্বপনের মধ্য দিয়ে সে কি তাকে পায় নি, তার মধুর সঙ্গ সে কি নিবিড় ভাবে অনুভব ও উপভোগ করে নি? প্রথম মানুষ তখন অভিভূত হয়েছে বিস্ময়ে, শঙ্কায় এবং উৎকণ্ঠায়, আনন্দে এবং আবেগে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে তার সারা মন। প্রশ্ন করেছে তার সঙ্গীদের অবাক হ'য়ে। কিন্তু তারাও যে দেখেছে এই ধরণের স্বপ্ন। অথচ সমাধান করতে পারে নি এই রহস্যময় সমস্যার। তখনই মানুষের মনে নিজেদের দ্বি-সত্তা সম্বন্ধে জন্মেছে একটা ধারণা। সংশয়ের নিরাকরণের জন্য সে এইভাবে করেছে তার সমাধান। তা ছাড়া, দেহ হ'তে অবিচ্ছিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট ছায়া,

এবং চীৎকারের উত্তর শ্রুত প্রতিধ্বনিও হয় তো তার মনে কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল।

যে মুহূর্ত্তে মানুষের মনে আত্মা সম্বন্ধে একটা ধারণার সৃষ্টি হ'ল, সে মুহূর্ত্ত হতেই সে আর মৃত্যুকে পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্তি বলে গ্রহণ করতে পারল না। প্রথম প্রথম তারা মৃত্যুকে মনে করত দেহ হ'তে আত্মার দীর্ঘ-সাময়িক অন্তর্দ্ধান, যার জন্য আমরা দেখতে পাই প্রাচীন মিশরীয়দের 'মমি', আত্মা প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে যাতে আবার শরীরে প্রবেশ লাভ করতে পারে তার জন্য নশ্বর দেহকে ধরে রাখবার ঐকান্তিক চেষ্টা,—পরে এই অন্তর্দ্ধানকে তারা স্থায়ী বলে ধরে নিয়েছিল। দেহ হ'তে আত্মার এই বিদায় গ্রহণের ফলেই মানুষের সুখসন্ধানী মন সৃষ্টি করল আর একটা রাজ্য যেখানে আত্মার শুধু বসতি, দুঃখ-বিমুখ মন রাঙিয়ে তুলল তাকে কল্পনার রামধনু রঙে। ক্রমশঃ সভ্যতার দিকে মানুষ ধাপে ধাপে অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসু মানব-মন বিভিন্ন বর্ণনা এবং ব্যাখ্যায় এই দিকটাকেও সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে লাগল।

ধর্ম্ম এবং পৌরোহিত্য

যে ঘটনার কোন কারণ মানুষ নির্ণয় করতে পারে না, সেইটাই হয় তার কাছে রহস্যময়। আদিম অবস্থায় মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি যখন ছিল অপরিণত, অনেক ঘটনাই মানুষের মনে জাগাত বিস্ময়, জাগাত ভীতি। বৃষ্টি হয়, ঝড় উঠে কেন, ফলমূলাদি কোন বার বেশী আবার কখন বা কম হয় কেন,—মানুষ তখন পারত না বুঝতে। এগুলো তাদের কাছে ছিল অদ্ভুত, রহস্যময়। অসুখ যে কি বা কেন হ'ল, এ তারা ধারণাই করতে পারত না। মৃত্যু ছিল অতল রহস্যময়। চোখের সামনে তারা দেখত মানুষকে অসুস্থ হ'তে, মরতে,—অথচ এর কোন কারণই তারা দেখতে পেত না। এর ফলে তাদের বিশ্বাস করতে হয়েছিল অস্বাভাবিকত্বে। অতিপ্রাকৃত বিষয়ে। দেবতা এবং ভূতাদির অস্তিত্ব দু'টাই এসেছে এই থেকে। অসুখ, মৃত্যু প্রভৃতি যে সকল সমস্যার সমাধান তারা ক'রতে পারে নি, তারা ঠিক করেছিল সে সকল ঘটায় ঐ দেবতারা। ক্রমশঃ ডাইনি প্রভৃতিতে বিশ্বাসও মানুষের আসে এই ভাবেই। তাছাড়া, প্রতি পরিবার, তাদের যে সকল বয়োজ্যেষ্ঠ মারা যেত, বিপদের সময় তারা সাহায্য করবে এই ধারণায় তাদের নিকট প্রার্থনাও জানাত। এই ভাবে পূর্ব্বপুরুষের উপাসনার প্রচলন হয়।

যে-সকল লোকের বুদ্ধি একটু তীক্ষ্ণ ছিল, তারাই পুরোহিত হ'তে পারত। দলের অনেক পরিবারের খবর তারা রাখত। প্রশ্নের উত্তর তারা এমন ভাবে দিত সুবিধা-মত যার ব্যাখ্যা নানারকমভাবে করা চলতে পারে। প্রকৃতির নানা অবস্থাকে তারা শুভাশুভ চিহ্ন ব'লে গ্রহণ করত। লোকের মনে বিশ্বাস ও বিস্ময় উৎপাদনের জন্য নানা অদ্ভুত প্রক্রিয়ার সাহায্য তারা গ্রহণ করত। ক্রিয়াকর্ম্মাদি অনেক সময় করত গোপনে, লোকের মনে সৃষ্টি করত কৌতূহল। এইভাবে তারা প্রতিষ্ঠা লাভ করত। তা'ছাড়া রাজা বা শক্তিশালীদের সঙ্গে তারা সাধারণতঃ চলত সদ্ভাব রেখে, অনেক সময় জীবন যাপন করত কঠোর নিয়ম পালন ক'রে, পার্থিব সহজলভ্য ভোগ-সুখকে দূরে রেখে। ফলে, শাসন, শৃঙ্খলা দেশরক্ষার দিকে যেমন রাজাই ছিলেন সর্ব্বেসর্ব্বা, তেমনই সমাজের একটা বৃহৎ ক্ষেত্রে পুরোহিতরাও প্রতিষ্ঠা লাভ করল। যখন সমাজের বা দেশের একটা অংশের স্বার্থ বিপন্ন হ'লে তা' সমষ্টিগত ক'রে তোলবার প্রয়োজন হয়েছে, তখন নানাদিক দিয়ে সকলকে জাগাতে বা এক করতে গিয়ে বিফল হ'লেও একমাত্র সাধারণ যোগসূত্র ধর্ম্মের নাম দিয়ে আহ্বান ক'রে মানুষ কখনও বিফল হয় নি।

শ্রেণীবৈষম্য

আদিম মানুষের মধ্যে একেবারে প্রথম অবস্থায় কোন শ্রেণী বিভাগ ছিল না। কিন্তু তা' হ'লেও, মানুষে মানুষে একটা পার্থক্যের ভাব, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের ধারণা এসেছিল শৈশবেই! শিকারে যে দক্ষ ছিল, নাচতে বা গান গাইতে যে অপরের অপেক্ষা ভাল পারত, গায়ের শক্তি ছিল যার বেশী, যে যুদ্ধ করতে পারত ভাল, যুদ্ধের সময় যোদ্ধাদের মনে উদ্দীপনা জাগাবার ক্ষমতা ছিল যার বেশী—অপরে তাদের একটু সমীহের চক্ষে দেখত, অপর সকলের সঙ্গে তাদের একটু পার্থক্য ছিল বৈ কি। তারপর, যুদ্ধে পরাজিত দলের অনেককে দাস করার প্রথাও সে-দিনের মানুষের মধ্যে এসেছিল। এ-দিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আসার পর, পিতৃবংশধারায় পরিচিত হওয়ার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হ'লে, বিশেষ দলপতির সৃষ্টি হ'লে, শ্রেণী বিভাগ হ'য়ে উঠল স্পষ্টতর,—এ-কথা আগেই বলা হ'য়েছে! যাদের সম্পত্তির পরিমাণ ছিল বেশী, তারা বিবাহ করতে লাগল সমশ্রেণীর ঘরে! তারপর একদিকে যেমন হ'ল রাজবংশ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি, অপরদিকে তেমনই সাধারণ লোকদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হ'ল শ্রমবিভাগের ফলে। পুরোহিত সম্প্রদায় যোদ্ধৃদল, ব্যবসাদার, শিল্পী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হ'ল। কিন্তু এই বিভাগ কঠোর ও পীড়াদায়ক হ'য়ে উঠল যন্ত্রযুগের আবির্ভাবে। কলকারখানার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৈহিক শক্তি ও পরিশ্রমের মূল্য গেল ক'মে। প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীর উদ্ভব হ'ল: মালিক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত। অর্থনৈতিক ভিত্তিতে এই বিভাগের সৃষ্টি হ'লেও রাজনীতির সঙ্গে গেল জড়িয়ে; কারণ, সকল ক্ষমতা এবং সিংহভাগ স্বতঃই যেতে লাগল মালিকদের হাতে। গণতান্ত্রিক

শাসনপ্রথা চললেও গণ তাতে সন্তুষ্ট হ'তে পারল না। ভোটাধিকারের মধ্যেও তারা দেখতে লাগল অন্তর্নিহিত বৈষম্য। কিন্তু এত পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও কেন মানুষের অসন্তোষ যায় না, শাসন ও সামাজিক পদ্ধতি কেন বারবার বদলায়, এ-কারণ দেখতে গেলে আর একদিকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

সমাজের শক্তি সম্বন্ধে আগেই একবার উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে যে শক্তি সমাজকে চালাচ্ছে সেটা ভেতরের নয়, বাইরের। বিভিন্ন অনুপরমাণুর সংমিশ্রণেই বস্তুর উদ্ভব এবং বস্তু ও শক্তি দুটোরই ধ্বংস নেই। রূপান্তর হ'তে পারে, কিন্তু ধ্বংস হয় না। যতদিন বিশ্বের শক্তি একটা সমান অবস্থায় না আসে, যতদিন বিভিন্ন শক্তি একটা বিশেষ সমতা লাভ না করে, ততদিন বস্তু ও গতির রূপান্তর চলবেই। অজৈব পদার্থ সম্বন্ধে একথা যেমন সত্য, সমাজশক্তি সম্বন্ধেও একথা তেমনিই খাটে। সমাজের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ঠিক এই নীতি অনুসারেই।

জনসংখ্যার আধিক্য নির্ভর করে সেই স্থানে উৎপাদিত শস্যের পরিমাণের ওপর। খাদ্যের প্রাচুর্য্য যেখানে, জনসংখ্যা বৃদ্ধিলাভ করে সেখানেই। শিক্ষা, ধর্ম্ম, শিল্প, সাহিত্য, সবই নির্ভর করে একটা বিশেষ জনসংখ্যার ওপর। লোকসংখ্যা যেখানে বেশী, বিদ্যালয়, পাঠাগার সংবাদপত্র,—সকলের আধিক্য সেইখানে। এদের সংখ্যা যেখানে কমতে আরম্ভ করবে, বুঝতে হবে—লোকসংখ্যা সেখানে আগেই কমতে আরম্ভ করেছে। লোক সংখ্যা উৎপন্ন দ্রব্য এবং সমাজের উন্নতি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

বস্তু যখন স্থান পরিবর্ত্তন করে, তখন তার গতি হয় বাধা যেদিকে কম, বা আকর্ষণ যেদিকে বেশী। সমাজের ক্ষেত্রেও তাই। সমুদ্রের ধারে বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে জনসংখ্যার আধিক্যও সেই কারণে। আর্থিক লাভের সুবিধা যেখানে বেশী, লোকসংখ্যা বাড়ে সেইখানে। এই ভাবেই মানুষ জন্মভূমি ছেড়ে উপস্থিত হয় কর্ম্ম-ভূমিতে। শস্যোৎপাদক ও খাদ্যের পরিমাণ, চাহিদা ও সরবরাহ, যুদ্ধ এবং শান্তি, সাহিত্য বিজ্ঞান—সবই চলছে এই হিসাবে; ছন্দকে ভেঙে বেসুরে বা বেতালে চলবার উপায় কারও নেই।

(সমাপ্ত)
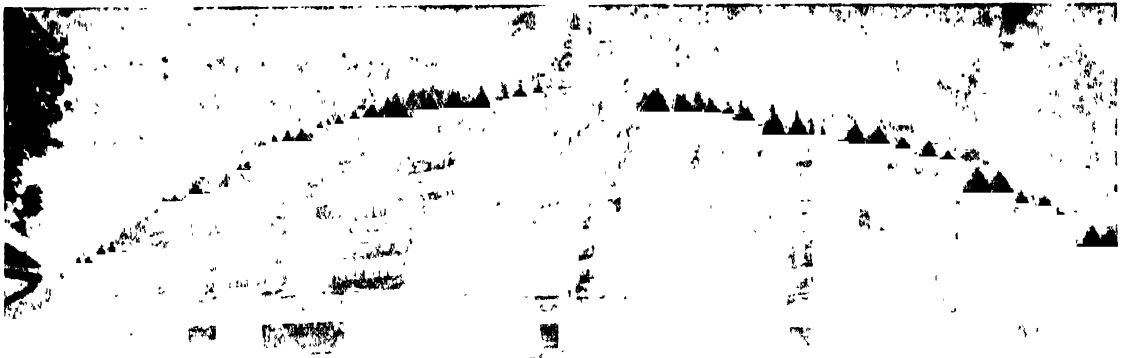
নটবরের চাকরী

শ্রীঅমলকুমার মুখোপাধ্যায়

বেলা আন্দাজ দুইটার সময় বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে শুষ্ক ও ম্লান মুখে নটবর বাসায় প্রবেশ করিল। বাসার ঝি ক্ষীরদা উঠানের এক কোণে তখন একগাদা বাসন জড় করিয়া মাজিতে সুরু করিয়াছিল। অদূরে বারান্দার উপর একটা বিড়াল সেইদিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। বোধ হয়, সকলের আহারের সময় রসনার দ্বারা ষোল আনা রস লইতে অকৃতকার্য্য হইয়া এক্ষণে 'ঘ্রাণেন অর্দ্ধ ভোজনং' দ্বারা অন্ততঃ আট আনা রসগ্রহণের চেষ্টা করিতেছিল। নটবর তাহাকে এক লাথি মারিয়া কহিল, "যা—দূর হ, বেরো সামনে থেকে।"

ক্ষীরদা অনন্তচিত্তে বাসন মার্জ্জনা করিতেছিল, হঠাৎ নটবরের রূঢ় তর্জ্জন শুনিয়া সেইদিকে চাহিয়া কহিল, "এই যে দাদাবাবু এসেচ। তোমার ভাত রান্নাঘরে ঢাকা আছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও গে, বাসনগুলো সব মাজতে হবে।"

আজ মাস তিনেকেরও বেশী হইল নটবর চাকুরীর চেষ্টায় দেশ হইতে কলিকাতায় তাহার মাতুলের কাছে আসিয়াছে। কিন্তু এই দীর্ঘদিনের অবিরাম চেষ্টায়ও কোন জায়গায় সে কিছু সুবিধে করিতে পারে নাই, উপরন্তু এই তিন মাস, দেশ হইতে আনীত পঞ্চাশটা টাকার মধ্যে প্রায় টাকা ১৫।১৬ ট্রাম বাস্ ও জুতা মেরামতকারী মুচিতে মিলিয়া মিশিয়া ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে।

নটবরের মাতুল কেবলবাবু কোন চাকুরী করিতেন না। তাঁহার কাপড়ের ব্যবসায়। কিন্তু দোকানে একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকায়, তাহারি উপর ভার দিয়া তিনি প্রায় বাড়ীতেই থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে এক একদিন গিয়া দোকানে বসিতেন। আজ তিনি বাড়ীতেই ছিলেন। নটবর সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে নট, কি হল? কিছু সুবিধে টুবিধে করতে পারলি?"

হতাশব্যঞ্জক স্বরে নটবর কহিল, "সুবিধে? সুবিধে আর এ জন্মে হবে না মামা!"

"কেন রে? লোকে যে বলে, আজকাল এই যুদ্ধের বাজারে চাকরী চারদিকে বাতাসে উড়ে বেড়াচ্চে, ধরে নিতে পারলেই হয়।"

"বাতাসে উড়ে বেড়াচ্চে! রেখে দাও দিকি লোকের কথা। আমি আজ তিন তিন মাস চাকরীর জন্যে নাকানী চোবানী খাচ্ছি, কিন্তু তবুও···

"কি আর করবি বল; যা' ভাগ্যে আছে তা' হবেই। তবে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকা ঠিক নয়।" খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কেবলবাবু আবার কহিলেন, "তবে, চাকরী তুই ঠিকই পাবি; এ কথা আমি জোর কোরেই বলচি। কেন না, তোর চেষ্টা আছে। চেষ্টা করলে ভগবান সন্তুষ্ট হন।" বলিতে বলিতে কেবলবাবু ট্যাঁক হইতে নস্যের ডিবাটা লইয়া একটিপ নস্য লইলেন এবং উঠিয়া বাথরুমের দিকে চলিয়া গেলেন।

*

দিন চারি পাঁচ পরে একদিন দুপুর বেলা ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে নটবর বাসায় প্রবেশ করিয়াই 'ইউরেকা' 'ইউরেকা' বলিয়া উচ্চৈস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল এবং তারপর উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া দুই হাত তুলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। সাত বছরের মামাতো বোন টুনী বারান্দার একধারে পুতুল লইয়া ঘর-সংসার পাতিয়া তাহার খোঁড়া ছেলের পায়ে ঔষধ—অর্থাৎ ইটের গুড়া আর জল—মালিস করিতেছিল। সে মুখ ফিরাইয়া হাত তালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "বাঃরে, নুটুদাদা ত বেশ নাচতে পারে।" ক্ষীরোদা কি একটা কাজে নীচে আসিতেছিল; নটবরের কীর্ত্তি দেখিয়া একহাত জিভ বাহির করিয়া কহিল, "অ মা, দাদাবাবুর একবার কাণ্ড দেখে যাও। ছিঃ! মাগো! বুড়োধাড়ী বয়সে লজ্জাও করে না দাদাবাবু তোমার? তোমার কাণ্ডখানা কি?"

নটবর নৃত্য থামাইয়া কহিল, "কাণ্ড কিছুই নয়, আর লজ্জাই বা করবে কেন, 'ইউরেকা' যে!"

এই 'ইউরেকা' কথাটা এরূপ বিকট চীৎকারের সহিত নটবর বলিয়া উঠিল যে, তাহার মামীর সুগভীর নিদ্রাও ছুটিয়া গেল।

নটবরের মাতুলানী স্বর্ণময়ীর চরিত্রে দুইটি প্রধান গুণ ছিল। একটি অতিরিক্ত ভূতের ভয়, আর দ্বিতীয়টি ঘুম। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ঘণ্টা সতের তাঁহার নিদ্রাতেই কাটিয়া যায়; এবং সে নিদ্রা তাঁহার এতই গভীর, এমনই গাঢ়, যে কাণের গোড়ায় ঢাক পিটাইলেও সহজে তাহা ভাঙে না। কিন্তু নটবরের এই বিকট 'ইউরেকা'র চীৎকারে তাঁহার সেই 'কুম্ভকর্ণী' নিদ্রাও ভাঙিয়া গেল।

কেবলবাবু ওদিককার কোণের ঘরে বসিয়া একরাশ খেরো বাঁধানো খাতাপত্র লইয়া হিসাব করিতেছিলেন। হাঁক ডাক শুনিয়া বারান্দায় উঠিয়া আসিয়া দেখিলেন, নটবর সিঁড়ি দিয়া উপরে আসিতেছে। কহিলেন, "কি রে নট, ব্যাপার কি বল্ ত।"

আনন্দোজ্জ্বল মুখে নটবর কহিল, "ইউরেকা। মামা, ইউরেকা।"

কেবলবাবু ইংরাজী নবিশ ছিলেন না; কহিলেন, "ই-উ রেকা। সে আবার কি ব্যাপর।"

নটবর পকেট হইতে ভাঁজ করা একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিল, "চাকরী। মামা, চাকরী।—এই দেখ।"

কেবল বাবু হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলে, "তাই বল, চাকরী পেয়েচিস্। তা বাংলা কোরে না বল্লে বুঝবো কেমন করে; আমরা হলুম মুখ্যু শুখ্যু দোকানদার লোক।"

নটবর কাগজখানা খুলিয়া বলিল, "এটা হচ্চে এপয়েন্ট-মেন্ট লেটার। বুঝলেন? কাল শুধু একবার হেল্থ এগ-জামিন হবে; তার পরেই ব্যাস—চাকরী।

কেবলবাবু তাহার ডিবা হইতে বড় একটিপ নস্য লইয়া পাশের আরাম কেদারাটার উপর বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, "ভাখ নট, ভাখ। ঠিক বোলেছিলুম কি না? দেখলি ত, চাকরী পেয়ে গেলি। তা কবে আয়োজনটা কচ্ছিস বল?"

"কিসের আয়োজন?"

"এই খাওয়ার রে। একদিন আমাদের সব ভাল কোরে খাওয়াবি ত, তাই বলচি।"

নটবর হাসিয়া কহিল, "দাঁড়াও আগে চাকরীটা পাই। তুমি দেখচি একেবারে—" বলিয়া জামা কাপড় ছাড়িবার জন্য নটবর ওঘরের দিকে চলিয়া গেল। কেবলবাবু কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু আর বলা হইল না। তার বদলে পুনরায় তিনি আর একটিপ নস্য নাকে গুঁজিয়া দিলেন।

পরের দিন ঠিক এই সময়ে, এই জাগায়, একই অবস্থায় আবার মামা ও ভাগিনা দুইজনকে দেখা গেল। প্রভেদের মধ্যে গতকল্যকার আলাপের মধ্যে কিছু রস, রঙ্গ, হাসি—অর্থাৎ একটা আনন্দের আভাস ছিল, আজকার আলাপের মধ্যে রস কস, হাসি আনন্দের বিন্দুমাত্রও আভাস মেলে না; বরং ঠিক তার বিপরীত ভাব—যেন উভয়েরই মুখে একটা বিষাদ, একটা নৈরাশ্যের ছায়া বর্ত্তমান।

কেবলবাবু ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "শেষকালে কিনা হেল্থ এগজামিনে ফেল করলি! এটা আমি মোটেই ভাবিনি, নট, যে তুই…নাঃ, তোর কপাল নেহাৎ খারাপ দেখচি।" একটু খানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "ওজনে কত বল্লি—মাত্র দু'পাউণ্ড কম?—দু' পাউণ্ডের জন্যে…"

"দু' পাউণ্ড কি? এক পাউণ্ড কম হ'লে বলে একজনের হ'ল না।"

"আর সব বিষয়ে পাশ হলি ত?"

"তুমি কিছু বুঝলে না কো। ডাক্তার সাহেব সর্ব্বপ্রথমে ওজনটা দেখতে চায়। একশ' পাউণ্ডের কম হ'লে, তাকে আর অন্য এগজামীন করেই না, বিদেয় কোরে দেয়। সেই জন্যে, একজন বাঙ্গালী ডাক্তার আগে সকলকে ওজন করে। ১০০ পাউণ্ড হ'লে তাকে সাহেবের কাছে পাঠায়, আর তার কম হ'লে, সেইখান থেকেই বিদেয় নিতে হয়।" বলিয়া নটবর গালে হাত দিয়া লক্ষ্যহীনের মত বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

কেবলবাবু এক টিপ নস্য লইয়া কহিলেন, "যাদের কপাল ভাঙা হয়, তাদের পাত্ থেকে ভাজা মাছও লাফ দিয়ে পালিয়ে যায়! এত কাণ্ডের পর কি না, তীরে এসে তরী ডুবলো! দু' পাউণ্ডের জন্যে……!"

অতঃপর কিছুক্ষণ উভয়ে চুপ করিয়া থাকার পর, সহসা নটবর খুব তাড়াতাড়ির সঙ্গে ঘর হইতে তাহার জামাটা লইয়া আসিল এবং তাহা গায়ে পরিতে পরিতেই সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল। কেবলবাবু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "কি রে, হঠাৎ খালি পায়ে কোথায় চল্লি?"

পায়ের দিকে দেখিয়া নটবর লজ্জিত হইয়া, "ওঃ! তাই ত'!" বলিয়া জুতা পরিবার জন্য ফিরিয়া আসিতেই, কেবল-বাবু আরও আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "জামাটাও ত' উল্টো পরেচিস্! তোর হ'ল কি রে নট?"

মাতুলের কথায়, জামার প্রতি তাকাইয়া, নটবর অধিক-তর লজ্জিত হইল; কহিল, "আরে, তাই ত'!"

কেবলবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "ব্যাপার কি বল্ ত'? খালি পা, উল্টো জামা গায়ে, এত তাড়াতাড়ি হঠাৎ চল্লি কোথায়? বলি, তোর মাথা ঠিক আছে ত' নট?"

নটবর জামাটা সোজা করিয়া গায়ে দিতে দিতে কহিল,

"হ্যাঁ, মাথা ঠিক আছে।...ডুবিচি, না ডুবতে আছি; দেখি একবার শেষ চেষ্টা ক'রে।......বেলা এখন একটা; সাহেব টিফিনের পর আসবে তিনটেয়। দেখা যাক্।" বলিতে বলিতে কেবলবাবুকে আর কোন প্রশ্ন করিতে অবসর না দিয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল। কেবলবাবু আর এক টিপ্ নস্য লইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "নট দেখচি চাকরী চাকরী কোরে মাথাটাই খারাপ করবে!"

*

"আপনি একবার ওজন হোয়ে গেছেন না?"

"আজ্ঞা না।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ওজনে ক' পাউণ্ড কম হোয়ে চ'লে গেলেন যে।"

"আজ্ঞে না। সে আর একটি ছোক্‌রা, অনেকটা আমারই মত দেখতে।"

বাঙ্গালী ডাক্তারবাবুটি কহিলেন, "তাই না কি?"

নটবর কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। ওজন হ'লেই বুঝতে পারবেন, সে আমি নই।"

নটবর ওজন হইল। পুরো একশো পাউণ্ড;—তারও কিছু বেশী!"

ডাক্তার কহিল, "ঠিক্ ঠিক্—সে তুমি নও বটে! তবে তোমারই মত অনেকটা দেখতে। আজ অনেককে এগজামিন করতে হোয়েচে। যাও, তোমার ওজন ঠিকই হোয়েচে; সাহেবের ঘরে গিয়ে বোসো। সাহেব তিনটের সময় আসবেন। তারপর সাহেবের এগজামিন হবে।"

"সাহেব আবার ওজন করবেন না কি?"

"না, ওজন আর হ'তে হবে না। তোমার এপয়েণ্টমেণ্ট লেটারখানা এইবার দাও, তোমার ওজনটা তাতে লিখে দেবো।"

নটবর পকেট হইতে এপয়েণ্টমেণ্ট লেটারখানা বাহির করিয়া ডাক্তারবাবুর হাতে দিল।

সন্ধ্যা হয়-হয়। নটবর প্রফুল্লমনে বাসায় প্রবেশ করিল; সঙ্গে একটা কালো রংয়ের পাঁঠা। নটবর তাহার দড়ি ধরিয়া টানিতে টানিতে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠাইতে লাগিল। টুনী শান্তিদের বাড়ী যাইবে বলিয়া নীচে নামিবার উপক্রম করিতেছিল; নটবরকে হঠাৎ এই অবস্থায় দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাবা, বাবা, দেখবে এস, নটদাদা একটা ছাগল নিয়ে ওপরে আসচে।"

কেবলবাবু বৈকালিক চা পানে রত ছিলেন। স্বর্ণময়ীও একটু আগে তাহার ঘুম হইতে উঠিয়াছিলেন। তিনিও একটা ছোট পিতলের মগ লইয়া স্বামীর সহিত চা-পানের উদ্যোগ করিতেছিলেন। টুনীর চীৎকার শুনিয়া কহিলেন, "ছাগল! ছাগল নিয়ে আসচে কি রে?"

টুনী চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া কহিল, "হ্যাঁ গো মা, ঐ যে ব্যাঁ ব্যাঁ কোরে ডাকচে!"

"তাই ত!" বলিয়া মামা-মামী দু'জনেই বারান্দায় আসিয়া দেখিল, সত্যই নটবর একটী ছাগলকে হিঁচড়াইয়া বারান্দা দিয়া লইয়া আসিতেছে আর সেই নিরীহ চতুষ্পদটি তাহার মাতৃভাষায় বারবার সকাতরে ছাড়পত্র চাহিতেছে।

কেবলবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "কি ব্যাপার, বল ত নট।"

"সব বলছি মামা, এই দড়িটা ধর দেখি আগে।"—বলিয়া নটবর পকেট হইতে রুমাল বাহির করিল এবং তাহা দিয়া ছাগলটার চার পায়ের কাদা মুছাইয়া দিয়া কহিল, "কাল খুব ভোরে রিক্‌শা কোরে একে নিয়ে কালীঘাট যেতে হবে। মা-কালীর 'মান্‌সিক'। খুব যত্ন করে রাখতে হবে।"

কেবলবাবু কহিলেন, "তোর এ-সব হেঁয়ালীর ব্যাপার আজকের কিছুই ত বুঝে উঠতে পাচ্ছি না, নট।"

নটবর ভক্তিভরে মামা-মামীর পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া কহিল, "কাল থেকে চাকরীতে বহাল হোয়ে গেলুম মামা। মাইনে ষাট, আর এলাউন্স ষোল, মোট ৭৬ টাকা।"

বিস্মিত হইয়া কেবলবাবু কহিলেন, "এই বোলে গেলি ওজনে দু'পাউণ্ড কম হ'য়েছিস্, আবার চাকরী হ'ল কি রকম?"

"ওজনে আবার ঠিক হয়ে গেলুম। বাঙ্গালী ডাক্তার খালি ওজনটা কোরে ছেড়ে দেয়। একশ পাউণ্ডের কম হোলে, এপয়েণ্টমেণ্ট লেটার আর কোন কাজে লাগে না; সেখানা নিয়ে বাড়ী চলে আসতে হয়। আর একশ পাউণ্ড বা তার ওপরে হলে, সাহেবের ঘরে অন্য সব এগজামিনের জন্য আসতে হয়। তাতে পাশ হোলে সাহেব পাশ হওয়ার স্লিপ্ লিখে দেয়। তাহোলেই চাকরী বেঁধে গেল আর কি।...এই দেখ আমার স্লিপ্।" বলিয়া নটবর পকেট হইতে তাহার পাশের স্লিপ বাহির করিয়া মামার হাতে দিল।

কেবলবাবু কহিলেন, "তা ত হোল, কিন্তু তোর ওজন হঠাৎ আবার বাড়লো কি করে?"

"হঠাৎ আবার তাড়াতাড়ি চলে গেলুম না? বুদ্ধিটা হঠাৎ একটু বেড়ে গেল। গিয়েই কুঁজিয়ে পোয়া পাঁচ জল খেয়ে নিয়ে বাঙ্গালী ডাক্তারের কাছে আবার ওজন হ'লুম। হানড্রেড্ এণ্ড্ হাফ পাউণ্ড্।"

হো হো করিয়া কেবলবাবু হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তা দু'বার করে ওজন হতে দিলে ?"

"তা কি দেয়। চালাকী করে কাজ গুছিয়ে নিলুম। উল্টে আধ পাউণ্ড বেশী হ'লুম। ব্যাস্—কেল্লা মার দিয়া, তারপর সাহেবের কাছে গেলুম। বুকটা দেখলে, পেটটা একবার টিপলে, আই সাইটটা এগজামিন করলে, তারপর... দাও, আর একবার পায়ের ধুলোটা দাও মামা।"

কেবলবাবু নস্যর কৌটা হইতে বড় একটিপ নস্য লইয়া আনন্দোজ্জ্বল মুখে একদৃষ্টে নটবরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দিশারী

শ্রীজনরঞ্জন রায়

আমায় দীক্ষা দাও—দীক্ষা দাও···ওগো দিশারী আমায় দীক্ষা দাও। আমার সব ত্যাগ তপস্যা নিষ্ফল হয়েছে—এত দিন যে আমার দীক্ষা হয় নি। আমার চোখের ঐ যে জল-স্রোত বয়ে চলেছে, উদাসীন প্রকৃতি তা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছে। নির্ম্মম পৃথিবীর পাথর ক্ষয়ে যায় সে জলপ্রপাতে—তবু আমি ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাসে কাউকে অভিশাপ দিচ্ছি না।—এতদিন আমি দীক্ষা পাই নি! প্রাণ আমার উন্মুখ দীক্ষা নিতে···তুমি দীক্ষা দাও। আজ দেহের কূলে কূলে গানের অনাহত সুর বেজে উঠেছে···শরতের বনশ্রীতে হিন্দোল বয়ে যাচ্ছে···কৈ দিশারী দীক্ষা দাও।

কৌস্তভ বলিল—কুসুম কি চমৎকার এই মাণিকছড়া নদী।···আমাদের এই পাহাড়ে ছোট নদীটী কেমন প্রেমিকার মতো লাফিয়ে পড়ছে ঐ পাথরটার বুকে···যেন আনন্দে কুটি-কুটি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তার প্রেম! ঐ যে নিউমা আসছে···।

নিউমা হইতেছে এই দেশবাসী মুণ্ড সর্দ্দারের মেয়ে।

কিরণশশি ওরফে কুসুমের কানে যেন এ কথাটা গেল না। সে বলিয়া যাইতে লাগিল,—আমায় দীক্ষা দাও—প্রকৃতির এই প্রাণ মাতানো আবেষ্টনীর মধ্যে আমায় দীক্ষা দাও। ঐ যে গাছগুলি হাওয়ায় দুলে দুলে জানাচ্ছে অভিনন্দন, পাখীরা ঠোঁটে ঠোঁট রেখে করছে ইসারা···হরিণ হরিণী গলার উপর গলা তুলে দিয়ে করছে কানাকানি! দাও আমায় দীক্ষা দাও। জীবনে যা অতি সত্যি তা গোপন করবো না—আমার দীক্ষা হয় নি। মন আমার তৈরি হয় নি—তাই এতদিন দীক্ষা হয় নি। মন্দিরে নয়···পুরুতের কাছে নয়···গুরুর কাছে নয়, দীক্ষা হবে এখানে তোমার কাছে। দীক্ষা দাও, দীক্ষা দাও···শুভক্ষণ যে বয়ে যায়!

ক্যামেরা-শিল্পী স্যুটিং নিতেছে ঠিক মতো। তার সঙ্গে আছে প্রয়োজক, শব্দযন্ত্রী ও গল্প লেখক।

কিরণশশি বিহ্বল হইয়া বলিয়া চলিয়াছে—সেন্টিমেণ্ট মানে কি ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস। ভালবাসা কি সেন্টিমেণ্ট, সেন্টিমেণ্ট ছাড়া কি ভালবাসা যায়? এজন্মে যে আমার প্রণয়ী সেই ছিল গত জন্মের প্রণয়ী, সেই হবে পরজন্মের প্রণয়ী—চির দিনের সেই একমাত্র প্রণয়ী। সে ছাড়া কেউ আমায় ভালবাসে না, তাকে ছাড়া কাউকে আমি ভালবাসতে পারি না। চিরদিন আমরা সেই রামানন্দের নাটকের পাত্র-পাত্রী···চিরদিন—"না সেহ রমণ, না হাম রমণী···দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি।"

বলিতে বলিতে কিরণশশি আবিষ্টের মতো পড়িয়া গেল। কৌস্তভ হাত উঠাইতে ক্যামেরা চালক ছবিতোলা বন্ধ করিল। কৌস্তভ বলিল—কিরণ তোমার ওভার একটিং হয়ে যাচ্ছে। আর এজায়গাটা আসামের মাণিকছড়ি গ্রাম, আমরা মাণিকছড়ি নদীর ধারে—হুডরু প্রপাতের কাছে নয়। হুডরুতে ছবি তোলার কথা ছিল, কিন্তু গল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে না সেখানে গেলে—তাই এখানে আসা হয়েছে। তুমি কি সব ভুলে যাচ্ছ?

কিন্তু ঠিক শিখানো মতো নিউমাবেশী অভিনেত্রী আসিয়া এই সময় কৌস্তভের গলা জড়াইয়া ধরিল। কাজেই ক্যামেরা-শিল্পী তার যন্ত্র চালাইতে লাগিল।

একটু পরেই এই দৃশ্যের ছবি লওয়া শেষ হইল। তখন সিনেমার গল্প লেখক হাসিতে হাসিতে বলিল—মিসেস্ কিরণশশির অভিনয় অতি-অভিনয় তো হয়ই নি বরং অতি স্বাভাবিক হয়েছে, একেবারে প্রাণের অনুভূতি কি না। ক্যামেরাচালক, শব্দযন্ত্রী, যায় নিউমা বেশী অভিনেত্রী সকলেই একথায় গা-টেপাটিপি করিতে লাগিল। কৌস্তভ তার ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া চাপাগলায় বলিল—চুপ্ চুপ্ কিরণ শুনতে পাবে।

সেদিন প্রাতে কাজ শেষ করিয়া সিনেমার পুরুষ-বন্ধুগণ মাণিকছড়ায় আপনাদের বাসায় আসিয়া বসিয়াছে। সকলের মনেই একটা রোমাঞ্চ ভাব। কিছু সামলাইয়া নিয়া কৌস্তভ বলিল—তোমরা ভাই কিরণকে অতি বেশি উৎসাহ দিচ্ছ, ফলে সে বুঝি সব ঘুলিয়ে ফেলে। স্বকীয়ার অভিনয় করতে হবে তাকে কিন্তু সে সুরু করলে পরকীয়া বসে। ছবিটাকে আবার নূতন করে তুলতে না হয়।

গল্পলেখক বলিল—মিসেস্ কিরণশশির মতো উচ্চ-শিক্ষিতা, স্বাধীনা, বৈধব্যব্রতচারিণী মহিলাও শাশ্বত সত্য··· মনের গোপন আবেগ রুখতে পারেন না—অভিনয়ের সময়ও পারেন না, এটা বেশ বুঝতে পারলাম। তাঁর অন্তরের রুদ্ধ প্রেম যেন আকৃতি নিয়ে উঠছে।—গল্পের ভঙ্গীটা এমনতর ছিল না।

ক্যামেরা-শিল্পী বলিল,—সর্ব্বপ্রথম তিনি যুগলে নামলেন কৌস্তভের সঙ্গে। প্রথম ছবিটা লোককে খুব আকর্ষণ করেছে, মনে হয় এটা আরো করবে। মিসেস কিরণ নাকি বালবিধবা, তার আত্মমর্য্যাদা বোধ আছে খুবই। কিন্তু কৌস্তভের প্রতি তাঁর অনুরাগ বাড়ছে—এটা কৌস্তভ নিজেও বোঝে, আমরাও বুঝছি। তাই মনে হচ্ছে প্রযোজক ভায়া হয় তো ভুল করেছেন মিসেস্ কিরণকে স্বকীয়ার পার্ট দিয়ে, পরকীয়ার পার্ট দিলে ভাল ছিল।

প্রযোজক বলিল—মিসেস্ কিরণ যে বাঙলা দেশের রূপালী পর্দ্দায় প্রথম প্রবেশ রজনী থেকে তারকার সম্মান পেয়েছেন, তা তোমরা ভুলে যাচ্ছ কেন? ছবি সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে যথেষ্ট আলোচনা কোরে সুটিং নেওয়া আরম্ভ হয়েছে। গল্পটা ফোটাবার ভার মিসেস্ কিরণের হাতে। আমার ইচ্ছা শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে এগিয়ে যেতে দেবো—কোনো বাধা না দিয়ে। তাতে গল্প লেখকের প্লটটা না থাকলেও আপত্তি নেই—যদি একটি নিখুঁত চিত্র মিসেস্ কিরণ ফুটিয়ে তুলতে পারেন।

গল্প লেখকের প্লটটা এইবার জানিয়া লওয়া যাক্। তাহা হইলে বোঝা যাইবে কিরণশশি অভিনয়মুখে তাহা রদ্‌বদল্ করিয়া বিষয়টির দাম বাড়াইল কি কমাইল।

গল্পলেখক প্রথমেই কলেজ হইতে চিন্ময় ও কুসুম নামে দুইটি প্রেমিক তরুণ তরুণীকে বাহির করিয়া নিয়া গেল একেবারে আসামের মাণিকছড়া গ্রামে। সেখানকার মগ-ঘেঁষা মুণ্ডজাতি অত্যন্ত বর্ব্বর। পুরুষদের পোষাক একহাত চওড়া লুঙ্গ। সভ্য পুরুষেরা তার উপর টাকা গাঁথা কোমর-বন্ধ লাগায়। তাদের সাধারণ নাম ভিক্ষা। সকলেই আফিমখোর ও মদ্যপ। বিবাহ হয় প্রধানভাবে মাসতুতো পিসতুতো ভাইবোনে। স্ত্রীলোকেরাও খুসী মতো এক পুরুষ ছাড়িয়া অন্য পুরুষকে গ্রহণ করে, পুরুষরাও খুসি মতো এক স্ত্রী ছাড়িয়া অন্য স্ত্রীলোককে গ্রহণ করে। মুণ্ড-সর্দ্দারের মেয়ে নিউমা। তারও বিবাহ হইয়াছে এক মাসতুতো ভায়ের সঙ্গে। সে ছোকরাও দারুণ মাদক সেবী। নিউমা লেখা-পড়া জানে ও বেশ সুন্দরী। তার যাহা কিছু খুঁত মণিপুরী-দের মতো নাক ও চোখ। সে নাচ গানও জানে। অল্প দিনের মধ্যেই চিন্ময়ের সঙ্গে নিউমার ঘনিষ্ঠতা হইল। তাতে নিউমার স্বামী রাগল কিন্তু ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া কুসুম দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ছড়া মানে নদী। মাণিক-ছড়া একটী ছোট নদী। মাণিকছড়ি গ্রামের পাশ দিয়া নদীটি উঁচুনীচু পাহাড় পথে বহিয়া চলিয়াছে। কয়মাস এই ভাবে যায়। মাঘের শীতে আসিল মহামুনির মেলা। বুদ্ধ-দেবকে ইহারা মহামুনি বলে। যে কাঠের মন্দিরে বুদ্ধদেবের নিত্য পূজা হয় তার নাম কিয়াঙ। ত্রিতল মন্দির। চারি-দিকে ছাদ দিয়া আঁটা প্রদক্ষিণের বারান্দা। মধ্যে সিমেণ্টের প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি। কুসুম সেই মন্দিরে পূজা দিতেছিল অত্যন্ত একাগ্রতার সঙ্গে। সেখানে বৌদ্ধ পাহাড়ীরা বনের ফুল ও মাটির কুণ্ডে কস্তুরীর ধুম দিয়া পূজা দিতেছে। একদিন কুসুমের পাশে দাঁড়াইয়া চিন্ময় এই বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতেছিল। কে তাহাকে পিছন হইতে টানিয়া নিয়া চলিয়াছে। ফিরিয়া দেখে সে নিউমা। সে বলিল—দিশারী তাড়াতাড়ি এস, আর এখানে নয়, আমরা চলে যাই ঐ পাহাড়ে মুরুংদের দেশে। চিন্ময়কে সে দিশারী বলিয়া ডাকিতে শিখিয়াছে। তারা মাণিকছড়ির হাটের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। সেখানে বাঁশের বড় বড় চোঙায় করিয়া স্ত্রীপুরুষ মদ খাইতেছে। মড়ুয়া, জার, রক্সি—এই সব মদের নাম। তার সঙ্গে প্রধান খাদ্য মোষের রক্ত ভাজা, আর কাণ শুদ্ধ পোড়া ছাগলের চামড়া। হাটে শুটকী মাছ ও মাহষের মাংস বিক্রি হইতেছে। সর্দ্দারের মেয়ে চলিয়াছে, সকলে পথ ছাড়িয়া দিতেছে। সঙ্গে আছে তার রামকুত্তা। পাহাড় পথে হরিণের ঝাঁক দেখিলেই কুকুরটা তাদের চোখে পায়ে করিয়া কাঁদা ছিটাইয়া দিয়া, দু'একটাকে মারিয়া আনে। তাহা পুড়াইয়া তিন জনে খায়। অভিসারের দিনগুলি কোথায় দিয়া কাটিয়া যাইতেছে। শীত গেল, গ্রীষ্ম আসিল। পাহাড়ীরা জঙ্গলে জঙ্গলে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। তারপর কতক খুঁড়িয়া কতক না খুঁড়িয়া চীনা (খরমুজা) মার্কা (শশা), ভুট্টা, শিম প্রভৃতির বীজ ছিটাইয়া দিল। চৈত্র মাসের শেষের দিকে নিউমা বলিল, আর মন টিকছে না, গাজন এসেছে, মাণিকছড়িতে যাবো। তোমার স্ত্রী মরে গিয়েছে, নৈলে এতদিন থাকবে কোথায়? পাহাড় থেকে নিউমা ও চিন্ময় মাণিকছড়ির কাছাকাছি নামিয়া আসিয়াছে। এক জায়গায় দেখিল মুরগীর ডিম ভাঙা দিয়া শিবের ভোগ দেওয়া হইতেছে। আর এক জায়গায় পাঁঠা দিয়া শিবপূজা হইতেছে। পাঁঠা কাটার যে রক্ত ছিটাইয়া পড়িতেছে, পাহাড়ীরা তাহা হাঁ করিয়া খাইতেছে। মাণিকছড়া নদীর ধার দিয়া শিব সাজিয়া চলিয়াছে একটা লোক, তার বুকে একটা আগুনের কুণ্ড। এইখানে আসিয়া নিউমা শুনিতে পাইল তার বাপ মৃত্যুশয্যায়। নিউমা ছিল মাতৃহারা। সে খুব তাড়াতাড়ি বাপের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু তখন তার বাপ মরিয়া গিয়াছে। পাশে বসিয়া কাঁদিতেছে কুসুম। নিউমার বাপ কুসুমকে এতদিন

মেয়ের মতো কাছে রাখিয়াছিল। রোগশয্যায় কুসুমই তাকে সেবা শুশ্রূষা করিয়াছে, আর অবসর মতো কিয়াঙ মন্দিরে গিয়া চিন্ময়ের জন্ত কাঁদিয়াছে। নিজের বাপের কাছে কুসুমকে দেখিয়া নিউমার ঈর্ষা হইল। সে সর্দারের শবযাত্রার সঙ্গে কুসুমকে যাইতে দিল না, বরং চিন্ময়কে সঙ্গে লইল। গিরিপৃষ্ঠে শব সমাহিত করা হইবে। মুণ্ডদের প্রথামতো সর্দারের মৃতদেহ টাটু ঘোড়ার উপরে নিয়া সমারোহে পাহাড় বাহিয়া শবযাত্রীরা উপরে উঠিতেছে। চিন্ময় তাদের সঙ্গে উঠিতে না পারিয়া পিছাইয়া পড়িতেছে। কুসুম মাণিকছড়ায় স্নান করিতেছিল। এমন সময় দেখিল উঁচু পাহাড় হইতে কে ধাক্কা খাইয়া গড়াইতে গড়াইতে নীচে পড়িতেছে। এখনি তাহাকে ধরিতে না পারিলে লোকটির মৃত্যু সুনিশ্চিত। পাহাড়ের উচ্চ চড়াই পথে কুসুম দৌড়িয়া উঠিতেছে। সে চিনিতে পারিয়াছে যে গড়াইয়া পড়িতেছে সে চিন্ময়। চিন্ময়কে শবযাত্রীদের পিছনে একা পাইয়া নিউমার মুণ্ড স্বামী তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। চিন্ময়ের কাছে গিয়া কুসুম যখন পৌঁছিল ভাগ্যক্রমে চিন্ময় তখন একটা পাহাড়ে ছোট গাছ জড়াইয়া ধরিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে। ছোট গাছটি ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, এমন সময় কুসুম গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। কুসুম তাহাকে ধরিয়া তুলিল পাশের একটা পাহাড়ে পথে। চিন্ময় ও নিউমার এই দীর্ঘ অভিসারের কালে কুসুমের কাছে সব পথ ঘাট পরিচিত হইয়া গিয়াছে। অতি সহজ গোপন পথ দিয়া তারা নদী পার হইয়া আসিল। আপনার আঁচল ছিঁড়িয়া জলে ভিজাইয়া কুসুম চিন্ময়ের ক্ষতস্থানগুলিতে জড়াইয়া দিল। তারপর আহত চিন্ময়ের হাত ধরিয়া সে দ্রুত পলাইতে লাগিল। চট্টলের এক বনপথ দিয়া। ...কুসুমই দিশারী।

গল্পলেখকের পরিকল্পনা মন্দ ছিল না। ছবিতোলার কাজও ঠিকমতো চলিতেছিল। কিন্তু মাঝপথে গোল বাধাইল কিরণশশি। মনে রাখিতে হইবে যে কিরণশশি অভিনয় করিতেছে কুসুমের পার্ট, আর কৌস্তভ অভিনয় করিতেছে চিন্ময়ের পার্ট। যখন চিন্ময় ও নিউমার মুরুংদের দেশে অভিসারের ছবি উঠিতেছে, তখন দেখা গেল কিয়াঙ মন্দিরে কুসুম নিত্যই বহুক্ষণ ধরিয়া যেন ধ্যানরত হইয়া বসিয়া থাকে। তার সম্মুখে থাকে একটি স্ত্রী-পুরুষের যুগল ফটো। ফটোটি সে ফুল দিয়া ঢাকিয়া গোপন করে। তাহ বোঝা যায় না যে এটা তার সঙ্গে কৌস্তভের ফটো অথবা অন্য কোন স্ত্রী-পুরুষের ফটো। প্রযোজকের কাছে এই পোজটা খুব দরকারী মনে হইল। যেন নিউমার প্রতি চিন্ময়কে আসক্ত দেখিয়া আহত প্রেমিকা কুসুম দেবতার কাছে দুঃখ নিবেদন করিতেছে—তাহার হাতে দয়িতের সহিত তাহার যুগল ছবি। ক্যামেরা-শিল্পী উৎসাহের সহিত কিরণের এই অবস্থার অনেকগুলি ছবি নিল।

শিক্ষিতা কিরণশশির জন্ত প্রযোজককে এই সুদূর পাহাড়ে দেশেও খবরের কাগজ আনাইবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। একদিন কিয়াং মন্দিরে বিরাট বুদ্ধের নিকট পূজা শেষে কিরণশশি যেন আনমনে বলিতে লাগিল—ফিরে যেতে হবে, দেবতার অভিশাপ লেগেছে সোনার বাঙলায়, সেখানে ফিরে যেতে হবে, তাদের দুঃখের ভাগ মাথায় তুলে নিতে হবে। চিরবুভুক্ষিমান বাঙলার যেখায় আজ পক্ষাঘাত হয়েছে, যার আছে সে আরও পুঁজি বাড়াচ্ছে, যার নেই সে আরও শুকিয়ে মরছে। সবারই অদৃষ্টে আসবে বিরামহীন ক্রন্দন, কি অভিশাপ।

অনুভূতির আকস্মিকতায় কিরণশশি শিহরিয়া উঠিল, তার চোখ দিয়া জলেরধারা গড়াইতে লাগিল, সে চোখ বুজিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিল। কলাকুশল ক্যামরা-শিল্পী এই ব্যাকুলতাময় কথা ও ছবি তাহার যন্ত্রে ধরিয়া নিতে বিলম্ব করিল না। কিরণ আবার বলিতে লাগিল—রাজপথে আজ যাদের শবদেহ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে তাদেরও শান্তিময় পল্লীতে ঘরদোর ছিল, যে লোকটি ওখানে শুকিয়ে পড়ে মরে গেল, সে তিন প্রহরে লাঙল কাঁধে হাসিমুখে তার কুটীরে ফিরে আসত, ঐ শবের কাছে অর্দ্ধনগ্ন বিবর্ণ কোঠরগত চোখ মাথা কুটছে ঐ যে স্ত্রীলোকটি,—ঐ ছিল ছ'মাস আগে ঐ চাষার শ্যামাঙ্গী ব্রীড়ানত কুলবধূ, তার কোলে ঐ যে অর্দ্ধমৃত কঙ্কালসার শিশুটি, সেদিনও সে তাদের আঙিনায় পুষ্টদেহে আদুল গায়ে উচ্ছ্বাসের কলধ্বনিসহ খেলা ক'রে বেড়িয়েছে, আর তাদের কাছে পড়ে ঐ যে মরণ পথের যাত্রী অসহায় বৃদ্ধটি, এক ফোঁটা তৃষ্ণার জলের জন্ত ঠোঁট দু'টি যার কুঞ্চিত হয়ে গিয়েছে—সে ঐ চাষার মা, ক'মাস আগে সেই গোয়াল কাড়া থেকে মাঠে কৃষাণদের ক্ষেতে দিয়ে আসা সব নিজের হাতে করেছে। আজ কোথায় গেল সে পল্লীশ্রী, আজ কোথায় চলেছে সব পল্লীবাসী! ঐ ছুটে আসছে মিলিটারীর যন্ত্রদানব, পরাধীনের অক্ষমতাকে পরিহাস ক'রে বুঝি বা ওদের বুকের উপর দিয়েই তার চাকা চালিয়ে নিয়ে যায়—ওঃ!

আবার কিরণশশি চমকিয়া উঠিল। তারপর আবার বলিতে লাগিল, আর এখানে নয়, এখানে নয়, অভিসার, প্রেম-নিবেদন, সুখস্বপ্ন এখন সাজে না, এখন নয়। আমার সকল শক্তির স্বেদবিন্দু দিয়ে এদের সেবা করতে হবে, দধীচির মতো অস্থি দিয়ে এদের বাঁচাতে হবে, আমি সেই কর্ম্মক্ষেত্রে যেতে চাই।

ক্যামেরা-শিল্পীর যন্ত্রের অবসর নাই।

প্রযোজক তারপর দিনই কিরণশশিকে বাঙলার রাজ-

ধানীতে ফিরাইয়া নিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। দলের মধ্যে গল্পলেখক, কৌস্তভ ও নিউমার পার্ট অভিনেত্রী তাহাদের সঙ্গে আসিল না। গল্পলেখকের এটা নিজের দেশ, সেখানে সে কিছুদিন থাকিয়া যাইবে বলিয়া অজুহাত দেখাইল। কিন্তু কৌস্তভ জোর গলায় শুনাইয়া দিল, এটা সিনেমার ছবি, কিরণশশির আত্মার শোনার স্থান এখানে নেই, তা' ছাড়া সে জেনে শুনে তার নাম খারাপ করতে চায় না এ-ছবিটায়। কিন্তু প্রযোজকের দৃষ্টিতে ছবির সূত্র ছিঁড়িল না, ব্যর্থ প্রেমিকা আপনাকে ঢালিয়া দিতে চায় জনসেবায়। পরদিন প্রাতেই তারা রওনা হইল।

সহরে পা দিয়াই কিরণশশি সেবাকার্য্যে ঝাপাইয়া পড়িল। দেশনেতা তাকে সসম্ভ্রমে সর্ব্ববৃহৎ অনাথাশ্রমের সেবকগণের কর্ত্তৃত্বভার দিলেন। ছবিটাকে সম্পূর্ণ করিবার একান্ত আগ্রহে প্রযোজক, শব্দযন্ত্রী ও ক্যামেরা-শিল্পী কিরণশশির অজ্ঞাত স্বেচ্ছাসেবকের বেশে যন্ত্রসহ তার কাছাকাছি ঘুরিতে লাগিল, আর চারিদিকের মর্ম্মন্তুদ ছবিগুলি তুলিতে লাগিল। মন্বন্তরের দৈত্য সারা বাঙলাদেশ লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতেছে। চরম বিপর্যয়ের মধ্যে বাঙালীর সুখ-সূর্য্য চির অস্তমিত হইতে বসিয়াছে। অসহ্য ক্ষুধায় সম্বিৎ হারাইয়া রাস্তায় পড়িয়া মরিয়া যাইতেছে কত লোক, কেহ কাঁদিবার নাই। মূর্ত্তিমান অরাজকতার মতো প্রকাশ্য রাজপথে শৃগাল কুকুর শবদেহ চিবাইতেছে। ভগবানের দূতের মতো অনাথাশ্রমে অর্দ্ধমৃত রোগীদের নিয়া চলিয়াছে স্বেচ্ছাসেবকেরা। তার মধ্যে কেহ ধুঁকিতেছে, কেহ হস্তপদ স্ফীত, কেহ অতিসারে মৃতপ্রায়, কোন উদরাময়ের রোগীর নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-যুবক, আত্মীয়-পর সব একত্রে। কে কোন দেশের, কোন পরিবারের, কাহার কি জাতিধর্ম্ম তাহা বুঝিবার উপায় নাই। ইহাদের সেবায় কিরণশশির দিন রাত্রি কাটিয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে সে দীর্ঘশ্বাসের সহিত বলিতেছে, আমায় পথ দেখাও, পথ দেখাও দিশারী।

একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটি বৃদ্ধাকে ষ্ট্রেচারে করিয়া আনিল স্বেচ্ছাসেবকগণ। তার কণ্ঠাগত প্রাণ, সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে, ষ্ট্রেচার হইতে নামাইতে গিয়াই বুঝি হৃদস্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়। কিরণশশি দৌড়িয়া আসিল তার পাশে। ধীরে ধীরে তার শুষ্ক কণ্ঠে একটু লেবুর রস দিল। বৃদ্ধা তার কম্পিত হাত দুইটি তার কণ্ঠলগ্ন মালার থলিটার উপর রাখিল। কি যেন বলিবার জন্য ওষ্ঠ নাড়িল, কিন্তু স্বর বাহির হইল না। কিরণ দুই চামচ তরল খাদ্য তাহার মুখে দিল। তারপর অভ্যাসমতো তার মুখ দিয়া বাহির হইল—পথ দেখাও, আমার হাত ধরে নিয়ে চল দিশারী।

চকিত কঠোর দৃষ্টিতে বৃদ্ধা চাহিল, তারপর সোৎসাহে বলিতে লাগিল, চেনো তুমি আমার দিশারীকে? সে তো নেই। আমার আঁধার ঘরের মাণিক চলে গেছে আজ পাঁচ বছর আগে। হাঁ দিশারী, সেই ছিল আমার দিশারী। স্বামী শোকে যখন আমি দিশাহারা তখন সে জড়িয়ে ধরেছে গিয়ে রাধামাধবকে·· দারিদ্রের পীড়নে যখন আমি পাগল হয়ে যেতাম সেই শিশু জড়িয়ে ধরতো গিয়ে দেববিগ্রহকে। তাই তার নাম দিয়েছিলাম দিশারী। সত্যিই সে ছিল আমার দিশারা। তুমি চিনতে আমার দিশারীকে, আমার মোহিতকে? নাও তবে এগুলো। বৃদ্ধার হাত দুইটি বুকের উপর পড়িয়া গেল।

● বৃদ্ধার হরিনামের ঝোলার মধ্যে কিরণশশি পাইল মোহিত কুমারের বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকখানি ফটো, মোহিত ও কিরণের একত্রে তোলা গ্রুপ ফটো—যার অনুরূপ একখানি ফটো কিরণ নিত্য গোপনে পূজা করে সেইরূপ একখানি ফটো।

বৃদ্ধার দেহ স্থির হইয়া গিয়াছে, কিরণের চক্ষু অশ্রুপ্লুত।

পরদিন মুণ্ডিত মস্তক শুভ্রবসনে পূর্ণ বৈধব্যের বেশে সমধিক আবেগে কিরণশশি সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। কণ্ঠে তাহার ঝঙ্কার উঠিতেছে, দীনের মাঝে সেবার কাজে তোমার পরশ পেল এ-ভিখারী, হে দিশারী।

বিদায়কালে প্রযোজক বলিল, শুধু ধন্য নয়, আমার ছবি আপনার নামের সঙ্গে অমর হয়ে থাকবে। আবিষ্টের মতো কিরণশশি আবৃত্তি করিল, "রায় কহে আমি নট তুমি সূত্রধর যেই মত নাচাও সেই মত নাচিবার"। তারপর সে ভক্তিভরে কাহাকে প্রণাম করিল।

ইসারা

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পিচ্ছিল পথের উপর পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের দাওয়ায় আসিয়া হাতের লণ্ঠনটা উঁচু করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতেই ভোলানাথের আবার নূতন করিয়া মনে পড়িল, একটুক্ষণ আগে প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছে! সাম্‌নে খানিকটা জমি উঠানের মত ফাঁকা, আর তাহার পরে নিস্তব্ধ দালানটা অস্পষ্ট ইসারার মত দাঁড়াইয়া আছে;—উঠানের এপাশে-ওপাশে একটু একটু জল জমিয়াছে,—দুই দিকের লম্বা তে-পলতার ঘন বেড়ায় ঝি-ইন্—ঝি-ইন্ করিয়া ঝিঁঝি ডাকিয়া চলিয়াছে,—এদিক-ওদিক দুই একটা বেঙের ঝপাৎ করিয়া লাফাইয়া পড়িবার শব্দ। ডাইনের বেড়াটা যেখানে দালানের সঙ্গে মিশিয়াছে, তাহারই মাত্র কয়েক হাত দূর পর্য্যন্ত মধুমতী আগাইয়া আসিয়াছে,—ঝড়ের বাতাস আর বৃষ্টির আস্বাদ পাইয়া তাহার অশান্ত উদ্বেলতা যেন আর বন্ধন মানিতে চাহে না, কলোকল্-খলোখল্ চলিয়াছে স্রোত,—আর তারই মাঝে ঝপ্-ঝপ্-ঝপাৎ পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িবার শব্দ!

দালানের কপাটে ঝন্ ঝন্ করিয়া মধ্যে মধ্যে শব্দ উঠিতেছে,—খালি ঘরগুলির মধ্যে অশান্ত বাতাসের দাপাদাপি! আকাশে মেঘের আনাগোণার এখনো বিরাম নাই, অন্ধকারে অন্ধকারে রাত্রি যে কতো হইয়াছে, বুঝিবার উপায় নাই। ভোলানাথ লণ্ঠনটা রাখিয়া একখানা পিঁড়ি লইয়া দাওয়াতেই বসিয়া পড়িল।

মধুমতীর রাক্ষুসী ক্ষুধা এখনও মেটে নাই। নিস্ফল আক্রোশে পাড়ের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে, ভাঙিতেছে, আগাইয়া আসিতেছে। খাওয়ার যেন বিরাম নেই,—কলোকল্-খলোখল্,—আরও আগাইয়া আগাইয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছে!

সকাল বেলায় ভিজা পাড়ের উপর ছোট এতটুকু পায়ের ছাপ আর ছোট্ট একপাটী যে জুতাখানা দেখা গিয়াছিল, সন্ধ্যার ঝড়ের পরে ভোলানাথ লণ্ঠন হাতে লইয়া কোনখানেই অনুসন্ধান করিতে ভোলে নাই, কিন্তু সর্ব্বনাশী মধুমতী আর এই বিরাট অন্ধকার রাত্রি সমস্তই একাকার করিয়া দিয়াছে,—ছোট পায়ের ছাপ একেবারে ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে!

সকাল বেলার যাত্রার আয়োজনে আর নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশও ছিল না। এমন সময় খবর আসিল, মধুমতীর পাড়ে ছোট্ট একখানি পায়ের ছাপ আর একপাটি ছোট জুতা পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু খুকীকে পাওয়া যায় নাই। সেই বুকফাটা ক্রন্দন আর হাহাকারকে স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে ভোলানাথ। প্রায় দুইমাসকাল পূর্ব্বে যে ভদ্রলোকটি তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা বছর চারেকের লীলাকে লইয়া এই বাংলায় আসিয়া স্থান লইয়াছিলেন, তাঁরই চলিয়া যাইবার কথা। সুতীব্র সঙ্কেতে ষ্টীমার ঘাটে আসিতেছে,—একরাশ গুল্লাফুল লইয়া ভোলানাথ দৌড়াইতে দৌড়াইতে বাড়ী ঢুকিল। মুটেরা মোট লইয়া ঘাটের দিকে গিয়াছে, ফটকের কাছে পৌছিতেই কর্ত্রীঠাকরুণ একেবারে তাহার উপরে আর্ত্তস্বরে ঝুকিয়া পড়িলেন,—"আমার লীলা কই? লীলা? দেখেছ তাকে? কই সে?"

আজ তিনদিন ধরিয়া ভোলাকে সে গুল্লাফুল আনিয়া দিবার জন্য বিরক্ত করিয়া ছাড়িয়াছে, এক-কোঁচড় ফুল লইয়া ভোলা নিরুত্তরে দাওয়ায় উঠিল। ষ্টীমার সিটি দিয়াছে, আর দেরী নাই, লীলাকে দাওয়াতে বসিতে বলিয়া একছুটে ফুল আনিতে গিয়াছিল সে।

"কই লীলা?"

এঘর-ওঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল। লীলা নাই। ষ্টীমার ঘাটে ভিড়িল বলিয়া। কর্ত্তাবাবু জন তিনেক লোক লইয়া রিক্ত হস্তে স্ত্রীর নিকটে ফিরিলেন। কই লীলা? নদীর পাড়ে জলের ঠিক উপরেই ছোট পায়ের ছাপ আর লীলার ছোট্ট একপাটি জুতা,—আর কোন দিকে কিছু নাই। মধুমতীর স্রোত সমানে ছুটিয়াছে। কর্ত্তা ও কর্ত্রীর উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের উত্তরে কিছুই বলে নাই। তেমনি করিয়া ঘড়িতে সাড়ে নয়টা বাজিয়াছে, সেও কিছু বলে নাই। আর তার পরেই ষ্টীমার ছাড়িয়া দিয়াছে।

যেমন হইয়া থাকে, তেমনি করিয়াই ভোলার চোখের সাম্‌নে দালানটা আবার খালি হইয়া গিয়াছে। মাত্র দুই মাসের জানাশোনা,—অতি সাধারণ ঘটনা, ভোলানাথের পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিবার কিছুই হয় নাই। চিরকালের অভ্যাস অনুসারে সে একবার ফাঁকা দালানটা ঘুরিয়া আসিয়াছে মাত্র,—কয়েক স্থানে চূণ নূতন করিয়া আবার ধ্বসিয়াছে, কোথাও বা দরজায় দরজায় পান খাওয়া চুণের দাগ, কোথাও বা ছোট্ট এতটুকু একখানা হাতের কালীর দাগ,—দেখিবার ও দেখাইবার আর কিছুই নাই। চুলে পাক ধরিয়াছে, কয়কুড়ি বয়স তার হিসাব করিবার সময়ও কোনদিন মেলে নাই, বাংলার লাগোয়া বাংলোরই দেখাশোনা করিবার এই ছোট্ট একখানি ঘর, এর মধ্যেই থাকিয়া তাহার দিন কাটিতেছে, কত লোক আসিল আর কতলোক গেল,—তারও কি হিসাব কষিবার সময় আছে?

বাংলার দালানটা একতলা, কিন্তু বেশ বড়ো, উঁচু মহাল। বড়ো বড়ো কয়েকটা থাম সম্মুখে। বাইরেটা নোনা ধরিয়াছে, স্থানে স্থানে অশ্বত্থের অত্যাচারেরও সীমা নাই। কোঠাটি নাকি সেকালের এক অতিথিশালা;

সেকালে যাহা জাঁকজমকের সহিত অতিথিশালারূপে ব্যবহৃত হইত, তাহাকেই সুসংস্কৃত করিয়া একালের বাবুরা নাম রাখিয়াছেন, বাংলা। অবশ্য এসব গল্প ভোলানাথই বা জানিবে কোথা হইতে? সবই শোনা ভৈরবদার কাছে। রাজা সীতারাম রায়ের আমলের এই দালান। কিছু দূরে, গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, মামুদপুরের ঐদিকটায় রাজা সীতারামের প্রকাণ্ড অট্টালিকা আজও চোখে পড়িবে। বন-জঙ্গল, আর তারি মধ্যে বিরাট রাজ-প্রাসাদের ভগ্নাংশ। শোনা যায়, এই যে বাংলাটা, রাজা সীতারামের ইহা একটি অতিথিশালা। আরও কয়েকটির অস্তিত্ব ছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে মধুমতীর কোলে গিয়া বিলীন হইয়াছে। সেকালের রাজত্ব। কতলোক আসিত, যাইত,—লোকজন, পাইক্, বরকন্দাজ, চারিদিক একেবারে যেন ভরিয়া থাকিত সর্ব্বক্ষণ! সরকারের রাজত্বে আজমাত্র দু' একবার জরিপের তাঁবু পড়ে বটে এখানে, কিন্তু সেকালের সঙ্গে একালের তুলনা? ভৈরবদা গল্প করিতে গিয়া দুঃখ করে,—হায় রে সেকাল!

ভৈরবদার মাছের ব্যবসা, সন্ধ্যা হইতে না হইতেই ডিঙি লইয়া মধুমতীর বুকের উপর দিয়া কোথায় কতদূরে ভাসিয়া যায়। বয়স তাহার বাড়িয়াছে, কিন্তু সামর্থ্য কমে নাই। সেই যা লোক্ একটু মাঝে মাঝে ভোলার খবরাখবর নেয়। ভালো কথা, ডাকিয়া একবার ভৈরবদার এখন সাড়া লইলে কেমন হয়? ঝড়ের রাত্রে আজ আর বাহির হয় নাই সে। কিন্তু থাক্, এই মাত্র সে তাহার বাড়ী হইতে আসিয়াছে। ভয়? নিজের মনের দিকে চাহিয়া নিজেই একটু হাসিয়া লইল ভোলানাথ। এই নির্জ্জনতা আর নিঃসঙ্গতাকে ভয় করিবার আবার কী হইয়াছে?

উঠিয়া দাঁড়াইল। ঝপাৎ করিয়া শব্দ, একটা ব্যাঙ্ লাফাইয়াছে বুঝি। বাংলাটা শুষ্ক কঙ্কালের মত দাঁড়াইয়া আছে। লণ্ঠনটা লইয়া নিজের ঘরে দরজাটা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল ভোলানাথ। পিছনে দালানের দরজায় ঝন্ ঝন্ করিয়া বাতাস বাজিতেছে। একবার দালানের ভিতরে গিয়া দরজাগুলি ভালো করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া আসিবে নাকি? না, থাক, কীই বা দরকার! তার চেয়ে এখন বসিয়া বসিয়া একটু রামায়ণ পড়িলে মন্দ হয় না। সেই যেখানে, সিন্ধুমুনির পুত্রকে অজ্ঞাতসারে বধ করিয়া রাজা দশরথ বিলাপ করিতেছেন। যায়গাটা পড়িতে ভারী ভালো লাগে। খোলাই রহিল দরজাটা। সামনে একখানি আসন পাতিয়া ভোলানাথ বহুদিনকার পুরাণো রামায়ণখানা টানিয়া বাহির করিল। অনেকদিন আর খোলা হয় নাই, ধূলা পড়িয়া পড়িয়া বইখানা যেন নষ্ট হইয়া যাইতে বসিয়াছে! ভোলানাথ পাতা উল্টাইতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া পড়িল। কেহ এখন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে না কি? সত্যই তো কে যেন ডাকিতেছে! কাণ পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিল। ভৈরবদা তাহার সাড়া লইতেছে। "ও, ভোলা-নাথ, ঘুমাও না কি? আমরা শুইলাম, দরকার বুঝলে ডাক দিও, কেমন?"

ভোলানাথ সম্মতিজ্ঞাপন করিতে সাড়া দিয়া উঠিল। আর তখনি মনে হইল, ঘরখানি যেন সন্ সন্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে,—আর ঐ ফাঁকা দালানটায় কে যেন অকস্মাৎ আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ভিতরে লুকাইয়া পড়িল। জলে খল্‌খল্, দুয়ারে ঝল্‌ঝল্, কাছের কী একটা গাছে শকুনের ঝটপট,—ভোলানাথের মনে হইল, কাহারা যেন আসিয়াছে! লণ্ঠনটা ভয়ার্ত্ত দৃষ্টির মত জ্বলিতেছে, তারই একটা তীর্য্যক্ ক্ষীণরেখা দাওয়ায় নামিয়া গিয়া অন্ধকারে বিলীন হইয়াছে,—আর এরই নিজের ছায়াটা দেয়ালে মৃতের মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে! মৃত-পাণ্ডুর তাহার এই উপস্থিতি, কেমন যেন অদ্ভুত আর ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হইল। ক্ষিপ্রহস্তে লণ্ঠনটা নিভাইয়া দিল একেবারে। অন্ধকার, অন্ধকার,—সমস্তই অন্ধকার একাকার হইয়া গিয়াছে!

"ভোলাদা?" মনে হইল, ঠিক কাণের কাছে হঠাৎ কে যেন কচিকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিয়াছে!

"ভোলাদা? আমার ফুল কই? গুঞ্জাফুল?" বুকের মধ্যে অকস্মাৎ কে যেন ধপ্ ধপ্ করিয়া জোরে জোরে পা ফেলিয়া কাহাকে খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছে! হাত দিয়া সজোরে কাণ চাপিয়া ধরিয়া ভোলানাথ একছুটে ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিল!

"কই ভোলানাথ, দাও, গুঞ্জাফুল দাও?" ছোট ছোট পায়ে দু'খানি ছোট্ট জুতা পরিয়া পিছন পিছন আসিতেছে। কোথায় পলাইবে ভোলানাথ, কোথায় পলাইবে? উঠানে পায়ের নীচে জল তর্‌তর্ করিয়া উঠিয়াছে। দালানের দরজায় অবিশ্রান্ত দাপাদাপি। কী এক অসহ্য অধীরতায় কাহারা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে যেন!

—খোলো, খোলো, সমস্ত খুলিয়া দাও! অশান্ত মধুমতী, অশান্ত বাতাস, অশান্ত আকাশ, চতুর্দ্দিকে তীব্র অশান্তির কোলাহল। স্থান নাই আর, অজনে অজনে যাত্রীতে যাত্রীতে ভরিয়া গিয়াছে! বহুদূর হইতে অতিথিরা আসিয়াছে,—দাও তাহাদের বিশ্রাম। লোকজন—পাইক-বরকন্দাজ—আত্মীয় পরিজন,—সমস্ত বাড়ীটা ভরিয়া গিয়াছে, কতক্ষণ বাহিরে রাখিবে তাহাদের? খোলো দরজা! দরজা খুলিয়া দাও!

একটা অস্পষ্ট রেখার মত ভোলানাথ আগাইতে লাগিল। দেয়ালে দেয়ালে সর সর শব্দ, বাতাসে বাতাসে ফিস্ ফিস্, ভোলানাথ আস্তে আস্তে দালানে আসিয়া উঠিল। প্রশস্ত বারান্দা, তার সামনে পাশে কয়েকটি কোঠা। চোরের মত নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে ভোলানাথ আরও অগ্রসর হইল,—আসিল

একটি ঘরে, তারপর মন্ত্রমুগ্ধের মত খুলিয়া ফেলিল দরজাটা, সর্ সর্ করিয়া একটা হাওয়া বহিয়া গেল, সেই কালো জমাট অন্ধকারের মধ্যে শুভ্র দেওয়ালগুলি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু ঘরের ভিতরে? ও—কে? একটা ইজি চেয়ারে চুপচাপ বসিয়া চুরুট টানিতেছে বুড়োর মতন কে একটি ভদ্রলোক। ভোলাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইলেন।

"ভোলা?"…

স্পষ্ট চিনিতে পারিয়াছে। ইনি আদিত্য বাবু। মাস ছয় সাত পূর্ব্বে এ অঞ্চলে শিকার করিতে আসিয়াছিলেন।

"কি রে ভোলা, নৌকা ঠিক করলি? আমি এখনই যাব যে?"

কি উত্তর দিয়াছিল ভোলা? বলিয়াছিল, "সে কি! এখনই যাবেন বাবু? এই এত রাত্রে! পথের বিপদ-আপদ, অশান্ত মধুমতী!"

কিন্তু শিকারী কথা রাখেন নাই, বলিয়াছেন, "স্ত্রী পারে নি, পুত্র পারে নি, আর টলাবি তুই? নে নে, পথ ছাড়, একটা নৌকা ঠিক করা থাক। ওপারে ভাটপাড়ার জঙ্গলে কয়েকটি চিতার আমদানীর খবর পাওয়া গেছে, তা' জানিস?"

আর ধরিয়া রাখিতে পারা যায় নাই। বন্দুকটা ঘাড়ে লইয়া শিষ দিতে দিতে অন্ধকারে রাত্রির পথে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন।

ভোলানাথ চোখ মেলিয়া পুনর্ব্বার দেখিতে চেষ্টা করিল। ঠিক সামনেই দাঁড়াইয়া এলোমেলো ভাবে সুট পরা এক যুবক। বড় বড় চুলগুলি উচ্ছৃঙ্খল, চোখ দুটি লাল, বলিষ্ঠ হাত দৃঢ়তায় পরিপুষ্ট, এক হাতে একটা বোতল। আদিত্য বাবুর আগে যে মদ্যপায়ী খেয়ালী যুবক বাংলায় আশ্রয় লইয়াছিল, এ সে-ই। নাম অজিত।

"ড্যাম্ সোয়াইন, তোমায় আমি গুঁড়ো ক'রে ফেলব!"

মাতালের অভিজ্ঞতা ইতিপূর্ব্বে ছিল না, ভোলানাথ আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া গিয়াছিল, বলিয়াছিল, "কেন বাবু?"

"আল্বৎ। আল্বৎ গুঁড়ো করব! সুশান্ত সরকার! সুশান্ত সরকার তোমার কে? খুন করব তা'কে!…লতিকা শুধু আমার, আর কারুর নয়। কোন্ ষ্টুপিড্ সুশান্ত সরকার তাকে কেড়ে নেয়, একচোট্ দেখে নেবো!" বলিয়া বোতলটা আবার মুখের কাছে টানিয়া নিয়াছিল। তারপর—মনে আছে, তাহারই কোলের উপর মাথা রাখিয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল, বলিয়াছিল,—"লতিকা আমায় ভালবাসে না। কিন্তু তুই, তুই আমায় ভালবাসিস্ ত?"

মাতালের কথা,—ভোলা কোন উত্তর দেয় নাই।

মনে হইল, শরীরটা অকস্মাৎ শির্ শির্ করিয়া উঠিয়াছে। চোখ বন্ধ করিয়া জোর করিয়া মুখ ফিরাইল ভোলা। কত লোক আসিয়াছে, কত লোক গিয়াছে,—কতো ধরণের কতো বিচিত্র!

আকাশের কালিমা ঘোচে নাই। বাতাসের সর্ সর্ বন্ধ হয় নাই এখনো। এপাশে ওপাশে অসংখ্য ফিস্ ফিস্! কত স্মৃতির কত বিস্মৃতির পথ পার হইয়া কাহারা যেন আসিয়াছে। ভোলানাথ চোরের মত ইহাদের কাছ হইতে পলাইয়া আসিতে চেষ্টা করিল।

কত লোক যে আসিয়াছে আর গিয়াছে তার কি সংখ্যা আছে? আমিনবাবু বৈকুণ্ঠ,—সেই ছটক্'টে বেঁটে-খাটো লোকটি—রতনগঞ্জের নায়েব মথুরবাবু—সেই চশমা-পরা রাশভারী লোক, সেই থাকহরি—নড়াইলের মোটাসোটা মোক্তার বাবুটি, মুন্সেফ্ বাবু, সার্কেল অফিসার, খাজাঞ্চিবাবু, কতলোক কতবার আসিয়াছে—কতবার গিয়াছে, সংখ্যা নাই—চিহ্ন নাই!

"ভোলাদা, আমার ফুল? গুঞ্জাফুল কই, ভোলাদা?"…

ঐ সেই ফুটফুটে চার বছরের লীলা! ভোলানাথের সারা শরীরে কেমন যেন একটা সির্-সির্ করা কাঁপুনী বহিয়া গেল। কত লোক, কতলোক আসিয়াছে! তাহারা খুঁজিতেছে, খুঁজিয়া ফিরিতেছে ভোলানাথকে!

কত লোকজন, সিপাই-লস্কর, পাইক্-বরকন্দাজ, আত্মীয়-পরিজন,—চারি দিকে লোকে আর লোকে ছাইয়া গিয়াছে!

"ভোলাদা? আমার ফুল কৈ? গুঞ্জাফুল?"

বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ,—চোখ জ্বালা করিতেছে,—সজোরে দুইহাতে কাণ চাপিয়া ধরিয়া ভোলানাথ ছুটিয়া আবার একেবারে বাহিরে আসিল। ভোলানাথ, ভোলানাথ,—সকলেই চায় ভোলানাথকে!

"ভোলাদা? ফুল কই, ভোলাদা?…

ঐ আবার! না, পলাইবে, পলাইয়া যাইবে সে বহুদূরে! একটা তীব্র আর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর তার পিছু লইয়াছে, সে পূর্ব্বের নিস্তব্ধ অস্পষ্ট বাংলাটা প্রেতের মতন আবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ডাকিতেছে, অনিবার্য্য অসহ্য তার ইসারা! ভোলানাথ জোর করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়া ছুটিতে লাগিল।

মধুমতীর অশান্ত উদ্বেল জলরাশি অনেকদূর আগাইয়া আসিয়াছে। ভোলানাথ একপাশে আসিয়া দাঁড়াইল। রাত এখন কত হইয়াছে, কে বলিবে? বাংলোটি ঠিক তেমনি আবিষ্টের মত দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু এ কী! মধুমতী যে তে-পলতার বেড়া ছাড়াইয়া দালানের গাঁথুনীর নীচেকার মাটিও কিছুটা ধ্বসাইয়া দিয়াছে! ভোলানাথ গাঁথুনীর একেবারে কাছে সরিয়া আসিল। এমনি করিয়া ধ্বসাইতে আরম্ভ করিলে আজ রাতারাতিই যে বাংলোটি একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে!

বাড়ীটার দিকে আর একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিল ভোলানাথ। সেই নোনাধরা বহুকালের পুরোণো দেওয়াল, বড়ো বড়ো সেকেলে থাম,—রাজা সীতারাম রায়ের অতিথিশালা!

আর সময় নাই। জলে টান দিয়াছে, হেলিয়া পড়িতেছে, রাজা সীতারাম রায়ের বিরাট অতিথিশালা হেলিয়া পড়িতেছে—রাক্ষসী মধুমতীর লোলুপ মুখগহ্বরে ধ্বসিয়া পড়িল বলিয়া! ভোলানাথ আর কিছু ভাবিতে পারিল না, একেবারে—একেবারে গাঁথুনীর নীচে আসিয়া আপনার পিঠটা সম্পূর্ণ চাপিয়া ধরিয়া শক্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। আসুক মধুমতী, রাক্ষসী মধুমতী কেমন করিয়া এই পুরাকালের অতিথিশালা গ্রাস করিয়া নেয়, দেখা যাইবে!

মাত্র ছয়খানি তাস লইয়া ছেলেরা যে খেলাঘর নির্ম্মাণ করে, তাহার ভিত্তিস্বরূপ একখানি তাস পড়িয়া গেলে খেলাঘরের যে শোচনীয় অবস্থা হয়, ভোর বেলায় ভৈরবমাঝি আসিয়া দেখিল, বাংলোটির ঠিক সেই দুরবস্থা হইয়াছে। গাঁথুনীর যে প্রান্তে উঁচু মাটি ধ্বসিয়া ঢালু হইয়া গিয়াছে, সেইখানে ভোলানাথ মাটি মাখিয়া এলাইয়া শুইয়া আছে, দেখা গেল। দেহ আতপ্ত, চক্ষু রক্তবর্ণ। ভৈরব মাঝি জাগাইল তাহাকে, তারপর শক্ত করিয়া ধরিয়া উঠাইয়া দিল, "চলো ভোলানাথ?"

"চলো।"

তাহারা চলিতে লাগিল।

সনেট

অনন্ত জীবন লয়ে করি শুধু ক্ষণিকের খেলা—
উতলা সাগর-বুকে কোথা হতে কোথা ভেসে যাই;
দিশেহারা লক্ষ্যহারা ভেসে যায় জীবনের ভেলা;
কালের বলাকা যেন—পিছনের কোন লোভ নাই।
এই কি জীবন তবে? এই তার সত্য পরিচয়!
এরি লাগি যুগে যুগে মানুষের এত অভিযান!
দিকে দিকে দেখি চেয়ে জীবনের এত অপচয়—
অর্থহীন শুধু বাঁচা; ব্যর্থতার মান অভিমান!
কেন কাঁদি নাহি জানি—তবু অশ্রু বাধা নাহি মানে;
মাটির পৃথিবী সে কি—মাটি ছাড়া আর কিছু নয়?
আদিম পিপাসা লয়ে চেয়ে থাকি ধু-ধু মরুপানে;
ইডেনের অভিশাপ! আদমের বুকে আজো ভয়!
অনার্য্য যৌবনভারে জমে ওঠে আঁধারের ভিড়;
মরণের বালুচরে তবু বাঁধি জীবনের নীড়।

শ্রীসুনীল ঘোষ

প্রজ্ঞা

প্রভু তথাগত আছেন বসিয়া বিশাখা-প্রাসাদ 'পরে—
দু'চোখ হইতে যেন সদা তাঁর করুণা ঝরিয়া পড়ে!
বিশ্বের ব্যথা হৃদয়ে তাঁহার মহা-আলোড়ন তুলে,
এ-হেন সময় বিশাখা আসিয়া ভিজা বাস ভিজা চুলে
কহিলা কাঁদিয়া—"ভগবন! মোর নাতনীটি গেছে মারা,
দাওগো বাঁচায়ে বাছারে আমার, দাও সাড়া, দাও সাড়া!"
"কত নাতি চাও?" কহিলা বুদ্ধ, "যত লোক এ-নগরে?"
"সেই সাধ প্রভু", "শ্রাবস্তীপুরে কত লোক রোজ মরে?"
"কোনদিন দশ"—কহিলা বিশাখা, "দুইজনা কোনদিন;
হেন দিন কভু দেখি নি, যেদিন বাজে না মরণ-বীণ!"
"শুকাবে তা' হ'লে কোনোদিন মাতা, তব বাস, তব কেশ?"
—বিশাখার চোখে পড়িল সহসা নূতন আলোক-রেশ,
ভেঙে গেল ভুল, টুটে গেল তার মনের অন্ধকার;
কহিলা সে কাঁদি'—"ভগবন, আমি চাহি না ক' নাতি আর!"

শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল

জীবনবীণা

শ্রীমতী প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

এক

একটি সুন্দর সার্থক জীবনের প্রতিকৃতি আমার লেখনীর মুখে ফুটাইয়া তুলিব। জীবনের অর্দ্ধপথ অতিক্রান্ত করিয়াছি। পদে পদে বাধা, পদে পদে লাঞ্ছনা, অপমান, পদে পদে ব্যর্থতা জীবনকে আমার পঙ্গু, ভারাক্রান্ত, ব্যর্থ করিয়া তুলিয়াছে। তাই আজ বৃদ্ধত্বের উপকূলে দাঁড়াইয়া প্রৌঢ়ত্বের সীমানা প্রায় অতিক্রম করিয়া আপনার স্তিমিত স্তম্ভিত জীবনের কথা স্মরণ করিয়া একটি সুন্দর সার্থক জীবনের আলেখ্য অঙ্কিত করিতে চাই। জীবনের নিয়মই তাই; মানবের মন চিরদিন সুদূর দুর্লভকেই কামনা করে। যাহা পাইব না তাহাকেই স্বপ্ন দেখিব, তাহাই অন্তরে রচনা করিব।

জীবনে প্রথম আসে কামনা, আকাঙ্ক্ষা, তাহার পর তাহারি আশা এবং সেই আশা সফল না হইলে তাহার পর চলে স্বপ্ন, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া স্বপ্ন রচনা, স্বপ্নবিলাস।

অধিকাংশ জীবন স্বপ্নবিলাসেই মাতিয়া থাকে, সার্থক সফল জীবন কয়টি আছে এই ধূলার ধরণীতে?

এই দুঃখ-শোকভরা ধূলার ধরণীতে স্বর্গ রচনা করিবার ক্ষমতা আছে মহামানবের, সে মানব এই ধরণীর সকল প্রভাবের ঊর্দ্ধে আপন পৃথিবী রচনা করিয়া তাহাতেই আপনার জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়া ল'ন। সেইরূপ মানব এই পৃথিবীতে কয়টি?

আমি তো তাঁহাদের দলভুক্ত নই। তাই ব্যর্থতায় চোখে আমার অশ্রু ঝরিয়াছে, শোকে আমি অভিভূত হইয়া গিয়াছি। ভালবাসার অভাবে জীবন আমার মরুভূমির মত বোধ হইয়াছে। সেই সকল অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া আমি চাহিতেছি এক সুন্দর জীবন। পৃথিবীতে তাহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়া ধরিবার মত স্রষ্টা আমি নই। এ আমার আপনার মনের খেলাঘরের সুন্দর সুসজ্জিত ক্রীড়নক। তাহাকে আমি মনের মত করিয়া গঠিত করিব। সুন্দর করিয়া আপন মনে সাজাইব, আপনি আনন্দিত হইব। পৃথিবীর কোন সমস্যাই আমার নায়িকাকে বিচলিত করিবে না। কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক সকল সমস্যা হইতে সে মুক্ত থাকিবে। বস্তি জীবন, কি মধ্যবিত্ত জীবন, কি ধনী জীবন কোনটাই বিশেষভাবে তাহার জীবনে আসিবে না; যাহা সহজ, যাহা সরল, যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, সেই স্বাভাবিক জীবন সে যাপন করিবে।

বিদ্যার সর্ব্বোচ্চ সোপান স্পর্শ করিয়াছি এমন গর্ব্বও তাহার থাকিবে না, আবার বিদ্যাহীনতার লজ্জায় মুসড়িয়া পড়িবে না। যাহা কিছু স্বাভাবিক, যাহা কিছু সত্য, তাহা দিয়া আমার নায়িকাকে সাজাইব। মানবসমাজে সে সত্যকার নারীর পরিচয় দিবার স্পর্দ্ধা রাখিবে। হায়! এ সকল কেবলমাত্র আমার কল্পনার ছবি, মনে মনেই ভাবিতেছি, কিন্তু তাহা কি সম্ভব হয়? এমন কেহ এমন কিছু লিখিতে পারিয়াছেন কি—যাহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের স্পর্শ কিছু মাত্র নাই? তাহা যদি হয়, তবে আমার বাস্তবের আগুনের ছোঁয়া তো আমার নায়িকার জীবনকে স্পর্শ করিবেই, তাহা হইতে তাহাকে আমি কেমন করিয়া রক্ষা করিব?

বার্দ্ধক্য আমার জীবন বেড়িয়া ধরিয়াছে, জরার স্পর্শ আমার সর্ব্ব দেহে। কিন্তু সেই দেহে, সেই জীবনে আমার মন কেমন করিয়া বয়সের কবল এড়াইয়া তরুণ রহিল, আমি তাহাই ভাবি। কেমন করিয়া এখনও সে স্বপ্ন দেখিয়া জাল বুনিয়া চলে? মনে হয় সঙ্গী-সাথিহীন, ভীত-ত্রস্ত মন আমার একা চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া থামিয়াছিল, সংসারের জটিলতার অতল তলে ডুবিয়া যায় নাই। কারণ, সত্যকার আপন বলিয়া সেই সংসারে তো তাহার কেহ ছিল না, শুধু মাত্র অভিনয়। অভিনয় মাত্র করিয়া গিয়াছে, মাতিয়া যায় নাই, তাই বোধ হয় মনের যৌবন অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে। যে বালিকা উৎফুল্ল মন লইয়া সংসারে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই বালিকা আজও আমার অন্তরে জীবিত রহিয়াছে। শুধু বহু আশা ভঙ্গে, বহু আঘাতে সে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। সে তাহার ব্যাকুল দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া থাকে অতীতের দিকে—বাল্যের মধুস্মৃতিমাখা অতীত। যাহার মধ্যে তাহার জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছিল। তাহার পর মধ্যকার জীবন শূন্য, সেখানে সে বাড়ে নাই। কারণ, তাহার জীবন মন প্রাণরসের উপাদান পায় নাই। তাই আজো সেই বালিকা, তাহার সংসারের সকল অভিনয়ের শেষে কোনও কোনও দিন গভীর রাতে ঘুম ভাঙিয়া ব্যাকুল পিপাসিত চিত্তে চাহিয়া থাকে অতীতের পানে।

তখন তাহার পুত্র নাই, কন্যা নাই, পুত্রবধূ নাই, পৌত্র-পৌত্রীও নাই, একা, নিঃস্ব।

আজ মনে চিন্তা করিলেই চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া ওঠে অতীত।

মাঘের প্রভাত। কুহেলী-আচ্ছন্ন শীতের প্রভাত। সবেমাত্র ভোর হইয়াছে। বাঙলার কোনও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের ছোট একটি পাড়া। সম্মুখে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের তৈরী অসংস্কৃত রাস্তার উপর সারি সারি কয়েকখানি দোতলা বাড়ী। পুরাতন, সংস্কার অভাবে জীর্ণ, চূণ, বালি খসিতেছে। এমনি একখানি বাড়ীর ভিতর মনে পড়িয়া যায়। সমস্ত বাড়ীখানি তখনও নিদ্রাঘোরে মগ্ন রহিয়াছে।

ঘরে ঘরে জানালার নিকট লণ্ঠনের মৃদুশিখা জ্বলিতেছে। ঊষার আলোয় সেই মৃদুশিখা আরো মৃদুতর বোধ হইতেছে। একটি ঘরের মধ্য হইতে একটি বালিকা বাহিরে আসিল অতি সন্তর্পণে। অতি সাবধানে খিল খুলিল, যেন আওয়াজ না হয়। আলনার উপর একটি ছোট ওভার-কোট রহিয়াছে, নিদ্রিতা মায়ের প্রতি ভীত চক্ষে চাহিয়া বালিকা কোটটি নামাইয়া লইয়া পরিল। তাহার পর ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

পাশের ঘরখানিতে মৃদু মৃদু শব্দ হইতেছে, বালিকা সেই দিকে চলিল। ঘরখানি তাহার ঠাকুরদার। ঠাকুরদা উঠিয়াছেন প্রাত্যহিক প্রভাত-ভ্রমণে বাহির হইবেন। বালিকা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ঠাকুরদা গলায় মাফলার বাঁধিয়াছেন, পায়ে মোজা জুতা, গায়ে গরম কোট, চেয়ারে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাধবী আমার সঙ্গে যাবি না কি?"

এমন সময় উঠিলে প্রায়ই মাধবী তাঁহার সহিত যায়। মাধবী আসিয়াছিল তাহার জুতাজোড়া খুঁজিয়া লইতে, বলিল, "না ঠাকুদ্দা আজ তোমার সঙ্গে যাব না, আজ দেখছ না কুয়াসা, অনেক সজনে ফুল পড়েছে, কুড়োবো। মলিনা আসবে, ননী আসবে আরো অনেকে আসবে। সবাই মিলে ফুল কুড়োবো।"

"ঠাকুমা কোথায়, ঠাকুদ্দা?" মাধবী ঠাকুরদার দিকে চাহিল। ঠাকুরদা বলিলেন, "গিন্নী নীচে গেছেন। তা এই ঠাণ্ডায় ফুল কুড়াতে যাব? রোগা শরীর, সেদিন যে অসুখ থেকে উঠেছিস, ঠাণ্ডা লাগবে না?"

"তা হোক", মাধবী জুতাটা পায়ে দিয়া দ্রুতপদে নীচে ছুটিল। ঠাকুরমার নিকটে ক্ষীর খাইয়া ঠাকুরমাকে দিয়া সদর দরজা খোলাইয়া বাগানে যাইতে হইবে। এতক্ষণ হয় ত' ওরা আসিয়া গেল। আবার ফুল কুড়াইয়া লুকাইয়া ফিরিতে হইবে, তাহা না হইলে মা বকিবেন। রোগা শরীর, মা ভাবেন, সবাই ভাবেন, কিন্তু মাধবী তো কিছু বুঝিতে পারে না।

নীচটা এখনও অন্ধকার আছে। বেরালটা দালানের কোণে গুটি গুটি হইয়া এখনও ঘুমাইয়া আছে। পাখীটা খালি আপন মনে দাঁড়ে বসিয়া দুলিতেছে। ঠাকুমা কই? মাধবী ব্যগ্র অধীর চোখে চাহিল। ওই ঠাকুরমা জল মুখে দিতেছেন। খর্ব্বাকৃতি ক্ষুদ্র মানুষটি। ঠাকুরমাকে মাধবীর খুব ভাল লাগে। মা মানা করেন ক্ষীর খাইতে, নারকেল নাড়ু খাইতে, পেট ছাড়িয়া যাইবে। কিন্তু ঠাকুরমা দেন, তিনি বলেন, "কিছু হইবে না।" মা দাদা ঠাকুরমার সম্মুখে বকিতে পারেন না, কিন্তু আড়ালে বকেন। তাই মাধবী ভোরে উঠিলেই মায়ের চোখের আড়ালে ঠাকুরমার কাছে ক্ষীর খাইয়া যায়।

রোগা শরীর কি না মাধবী তাহা বুঝিতে পারে না, তবে এটুকু বুঝিতে পারে যে, তাহার ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়াছে, সর্ব্বদাই খাইতে ইচ্ছা হয়।

উঃ! কি অসুখটাই তাহার হইয়াছিল। কি ভীষণ জ্বর, তাহার উপর মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, চোখ খুলিলেই দেখিত মা তাহার মাথার কাছে বসিয়া আছেন। যে মাকে ডাকিলেও পাওয়া যাইত না, সর্ব্বদা কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকেন, সেই মাকে দিবারাত্র নিকটে দেখিয়া মাধবীর যেমন ভাল লাগিত, তেমনি ভয়ও হইত, তবে কি তাহার অসুখ খুব বেশী?

পরে মায়ের মুখে সে শুনিয়াছে যে, অজ্ঞান অবস্থায় সে প্রায় ১৫ দিন ছিল। খুব কঠিন হইয়াছিল তাহার অসুখ। তাই মা সাবধান করেন, তাই ভয় পান, বেশী খাইলে আবার যদি অসুখ করে। কিন্তু মাধবী ভাবে, আবার অসুখ করিবে কেন? একবার তো অসুখ হইয়া গিয়াছে। মাধবী ঠাকুরমার নিকটে খাইয়া গিয়া যখন বাগানে উপস্থিত হইল, তখনও কেহ আসে নাই। মাধবী উৎফুল্ল হইয়া চারিদিকে একবার চাহিল, সকলের আগে মাধবীই আসিয়াছে আজ।

সজিনাগাছের তলা ফুলে ফুলে ছাইয়া গিয়াছে। সবুজ ঘাসের উপর দুগ্ধশুভ্র ফুলের আস্তরণ। ধীরে ধীরে মাধবী কুড়াইতে শুরু করে, ক্ষিপ্র হস্ত-চালনায় চুপড়ী তাহার ভরিয়া উঠিতে থাকে। দুই চারি মিনিট। পশ্চাতে কলহাস্যধ্বনি শুনা যায়, ওই, ওই ওরা আসছে, দল বাঁধিয়া তিন চারিটি বালিকা। মাধবী উঠিয়া দাঁড়ায়, তাহার মাথা মুখ বাহিয়া ফুলগুলি ঝরিয়া পড়ে। তাহার গায়ে মাথায় কাপড়ে ফুল। শীতের মৃদুমন্দ বাতাসে ফুল ঝরিতেছে। বালিকার দল সম্মিলিত হস্তে চুপড়াতে ফুল তোলে। তাহাদের মধুর হাস্যধ্বনি বাগানের বুক ভরিয়া দেয়। বাতাসের স্তর ভরিয়া ওঠে হাস্যধ্বনিতে। পুষ্করিণীর বক্ষে হংসের দল চকিত হইয়া ফিরিয়া চায়, ওরা কারা? বকের দল চঞ্চল হইয়া ওঠে। শিশিরসিক্ত ঘাসের ডগাগুলি পায়ের তলায় শুইয়া পড়ে।

বালিকাগুলির মুখে চোখে কুয়াসার আর্দ্রতা লিপ্ত হইয়া যায়। হাতে শিশিরভেজা মাটি, কাদা হইয়া লাগিয়া যায়। সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। আপন আনন্দে তাহারা ফুল তুলিতেছে, মধুর হাসি হাসিতেছে, উচ্ছ্বসিত গল্প করিতেছে। অনাবিল মধুময় শৈশবের নানা রং-এর দিনগুলি। সূর্য্য-করোজ্জ্বল নবীন প্রভাত।

দুই

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সারাদিন অসহ্য গরমের পর মৃদু মৃদু দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে।

রোয়াকে মাদুর পাতিয়া মা বসিয়া আছেন, মাধবী ও তাহার ছোট বোন্‌টি শুইয়া আছে। নিস্তব্ধ বাড়ী। মধ্যে মধ্যে ঠাকুরদা তামাক খাইতেছেন, তাঁহার হুঁকার আওয়াজ আসিতেছে। তিনি দোতলার ঘরে। বারাণ্ডায় পুরানো ঝি ভুতন দিদি বসিয়া বসিয়া চাল ডাল ঝাড়িয়া বাছিয়া রাখিতেছে। কাকীমা রন্ধনগৃহে রন্ধন করিতে ব্যস্ত। মা সকালে রন্ধন করেন, সন্ধ্যাবেলাটা তাহার ছুটি।

ঠাকুরমা আপনার শুইবার ঘরে শুইয়া আছেন, তাঁহার নিকট কাকীমার কন্যা কালী রহিয়াছে—বছর চারেকের হইবে। তাহার অনর্গল প্রশ্ন এবং ঠাকুরমার মধ্যে মধ্যে নিদ্রালস কণ্ঠের অবান্তর উত্তর শোনা যাইতেছে। সারাদিন পূজা ও শুচিবাই লইয়া ঠাকুরমা ব্যস্ত থাকেন, সন্ধ্যাকালে আহারাদি সারিয়া ক্লান্ত হইয়া ঠাকুরমা যে শুইয়া পড়েন—ওঠেন একেবারে ভোর পাঁচটায়। এই সন্ধ্যাকালটি নাতি-নাতনীগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া গল্প শোনে।

আগে মাধবী এই সময়টা ঠাকুরমার নিকট কাটাইত। তিনি ঘুমের ঘোরের মধ্যে যেমন করিয়াই রাজপুত্রের গল্প বলুন ,তাহাই মাধবীর ভাল লাগিত। কিন্তু এখন আর ভাল লাগে না—ওই ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া দশ মিনিট অন্তর একটি কথা শুনিতে তেমন ভাল লাগে না। তার চেয়ে মায়ের কাছে বসিয়া মায়েদের পুরাতন দিনের গল্প শুনিতে তাহার খুব ভাল লাগে। বলিতে বলিতে মা যেন সেই পুরাণো দিনের মধ্যে চলিয়া যান আর সেই দিনগুলি মাধবীর চক্ষুর সম্মুখে সজীব হইয়া ফুটিয়া ওঠে। আজকাল তাই মাধবী মায়ের কাছে সন্ধ্যাবেলায় আসিয়া বসে। তাহাকে দেখিয়া ছোট বোন্ শোভাও বসে।

আজও মাধবী মায়ের নিকট শুইয়া ছিল, বলিল, "বল না মা সেই আমার জন্মানোর গল্পটা ?"

মা হাসিতে লাগিলেন , বলিলেন, "তোর জন্মানো এমন একটা কি বিরাট ব্যাপার যে তা গল্প করে বলতে হবে ? তুমি জন্মেছিলে ওই মাঝের ঘরের কোণের দিকটায়, রাত্রি ১২টার সময়। খুব কষ্ট দিয়ে হলে কি না একটা মেয়ে, তাও আবার তেমনি ছোট আর তেমনি রোগা।"

মাধবী উঠিয়া বসিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "ও নয়, ও নয়, ওতো জানি। সেই কীর্ত্তন হচ্ছিল, কারা দেখতে এসেন আমাকে, সেইসব গল্প তুমি বল।"

মা হাসিলেন, "তাই বল্, তোর কীর্ত্তনের গল্পটা শোনবার ইচ্ছে, তা না……"

মা বলিতে লাগিলেন আর মাধবীর চোখের সম্মুখে ধীরে ধীরে দৃশ্যপট উন্মোচিত হইতে লাগিল—বহুবারের শোনা গল্প, তবু সুন্দর তবু ভাল লাগে মাধবীর।

শ্রাবণের বর্ষণাচ্ছন্ন রাত্রি, প্রবল অবিশ্রান্ত বর্ষণের আর বিরাম নাই। এ বাড়ীতে আসন্ন-প্রসবা মাধবীর মা গৃহের মধ্যে নীরবে আপনার ব্যথা ভোগ করিতেছেন, পাশের মিত্রদের বাড়ীতে মাসাবধি কীর্ত্তনের পালা সুরু হইয়াছে—তাহারা গাহিয়াই চলিয়াছে। বাহিরে প্রবল বারিবর্ষণের শব্দ উপেক্ষা করিয়া আসরশুদ্ধ লোক কীর্ত্তন শুনিতেই মগ্ন। মস্তবড় আসর, মিত্রদের অতবড় আঙ্গিনা জুড়িয়া আসর হইয়াছে। খোলা আঙ্গিনার উপর মোটা হোগলা দিয়া ছাওয়া ভিতরে সামিয়ানা দেওয়া। অঙ্গন জুড়িয়া পুরু করিয়া সতরঞ্চ ও গালিচা পাতা। পশ্চিম ধারে সারি সারি উৎকৃষ্ট গালিচার আসন পাতা, সম্মুখে জলচৌকি, সালুমোড়া জলচৌকির উপর মোটা মোটা পদাবলী ফুল দিয়া ঢাকা। গলায় মোটা মোটা যূঁয়ের গোড়ে পরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দল চৌকিগুলির সম্মুখে উপবিষ্ট। আসরের মধ্যস্থলে মস্তবড় বাঁধানো বেদী ; তাহারি উপর গালিচা পাতা, তাহারি উপর বসিয়াছেন মূল কীর্ত্তনীয়া। পাশে একটা মোটা ভেলভেটের তাকিয়া রহিয়াছে। কীর্ত্তনীয়ার পরণে গরদের জোড় ; গলায় ফুলের মালা, তাহারি সহিত শুভ্র উপবীতের গোছা দেখা যাইতেছে। মাথায় মস্ত টাক, মুখে একটি সৌম্যভাব ফুটিয়া আছে। চক্ষু দুটি জলে ভরা। ভাববিভোর কীর্ত্তনীয়া মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া গাহিতেছেন

"কোন পথে মা যেতে হবে সে পথ মা কেমন ধারা" ?

এ গানটি না কি তিনি অপূর্ব্ব গাহিয়াছেন। দেশের লোক এখনও ভুলিতে পারে নাই। কীর্ত্তনীয়ার সম্মুখে একখানি রূপার বড় থালা রহিয়াছে, তাহার উপর টাকা, সিকি, দু'-আনি পড়িয়া রহিয়াছে।

কয়েকদিন হইল মিত্রমহাশয় ইঁহার কীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া হাতের হীরার আঙটি খুলিয়া দিয়াছিলেন।

মাধবীর ঠাকুরদা দিয়াছিলেন পঞ্চাশ টাকা। মাধবীর ঠাকুরদার অবস্থা তখন খারাপ হইয়া আসিয়াছে। তবুও তিনি পঞ্চাশ টাকা দিয়াছিলেন, তবে সেটা গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া, কি মিত্র মহাশয়ের সহিত পাল্লা দিয়া তাহা বলা যায় না। এই সূত্রে মা বলিয়া চলেন, এই দুই প্রাচীন পরিবারের বহুকালব্যাপী মনোমালিন্যের ব্যাপার।

তখন মাধবীর ঠাকুরদা ছিলেন গভর্ণমেণ্ট আফিসের একজন বড় অফিসার—ডেপুটি-কন্‌ট্রোলার। বেতন পাইতেন ছয় সাত শত টাকা! আপনার জমিদারী বাড়ী, অত্যন্ত সম্পন্ন গৃহস্থ—দেশে দশে তাঁহাকে মান্য করিয়া চলে। পাশেই থাকিতেন মিত্র মহাশয়। তিনি তখন সামান্য বেতনে কাজ করিতেন ও থাকিতেন শ্বশুরবাড়ীর আশ্রয়ে। হঠাৎ মা-লক্ষ্মীর কৃপা-দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইল। একজন সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের সহায়তা পাইয়া তিনি আরম্ভ করিলেন কন্‌ট্রাক্টারী। তাহার পর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে যাহা হয়—ধূলিমুষ্টি তাঁহার সোণার মুষ্টি হইয়া গৃহে ফিরিতে লাগিল। অবশ্য প্রথম মূলধন কোথা হইতে আসিল সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কেহ বলে নরেশ মিত্র যক্ষের টাকা পাইয়াছিল, কেহ বা বলে অসৎ উপায়ের টাকা, সে যাহাই হউক।

মাধবীর ঠাকুরদা ততদিনে পেন্‌সন লইয়াছেন। দেশের বাড়ী সংস্কার করাইতেছিলেন। মিত্র মহাশয় বলিলেন, "দত্ত, তুমি তো আমার বন্ধুজন, তোমার বাড়ী আমি অল্প খরচে দোতালা করে দেবো, তুমি আস্তে আস্তে দাম দিও।"

দত্তমহাশয় সম্মত হইলেন। উত্তমরূপেই বাড়ী সংস্কার আরম্ভ হইল। সেই বৎসর কোন কারণে মাধবীর ঠাকুর-মায়ের সহিত মিত্রমহাশয়ের স্ত্রীর কলহ হয়। বাড়ী তখন সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

তাহার পর দুই বাড়ীর মধ্যে একটা গাম্ভীর্য্য আসিয়াছে। মিত্রমহাশয়ের বড় ছেলের বউ মাধবীর মায়ের সই। সেই সই পর্য্যন্ত দেখা হইলে মুখ ফিরাইয়া লয়। হঠাৎ একদিন রাত্রে দত্তমহাশয় মাধবীর মা ও কাকীমাকে তাঁহার গৃহে ডাকিলেন, ঠাকুরমাও তথায় উপস্থিত ছিলেন। বধূদ্বয় অবগুণ্ঠন টানিয়া আসিয়া দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইল। খানিক-ক্ষণ স্তব্ধতা।

তাহার পর দত্তমহাশয় গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "বউমারা, তোমাদের গায়ের গহনা, হাতের চুড়ী, গলার হার বাদে সব আমায় দিতে হবে, বড় প্রয়োজন।" শ্বশুরের আদেশ। দুই বধূ তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের যাবতীয় গহনা পিতৃদত্ত ও শ্বশুরের দত্ত সমস্ত আনিয়া শ্বশুরের সম্মুখে রাখিলেন।

দত্তমহাশয়—যিনি সহজে বিচলিত হন না, অন্ততঃ মাধবীর মা শোকে যাঁহাকে অবিচলিত দেখিয়াছেন, সেই দত্তমহাশয় কাঁদিতেছিলেন, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "মায়েরা, তোমাদের গহনা নিচ্ছি এই দুঃখ যতদিন না তোমাদের আবার সাজিয়ে দিতে পারব ততদিন যাবে না। নিতুম না মা, কিন্তু মিত্তির আমার বড় অপমান করেছে তাই—তোমরা মা, তোমাদের কাছে আজ হাত পাতলুম।" মাধবীর মা ও কাকীমা কথা কহেন না, তাই কিছু বলিতে পারেন নাই। কিন্তু শ্বশুরের অপমানে তাঁহাদের চোক্ষে কম অশ্রু ঝরে নাই সেদিন। টাকা দেওয়া হইয়া গেল। একদিনে দশ হাজার টাকা। কিন্তু দত্তমহাশয়ের সংসারে টানাটানি অস্বচ্ছলতায় আরম্ভ হইল। বধূরা গায়ের গহনা সংসারের সম্মানার্থে দিয়াছিলেন এবং সেইদিন হইতে বাড়ীর বাহির হওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। গ্রামের কোন নিমন্ত্রণে কোনও কাজে বধূ দুইটিকে বাড়ীর বাহির হইতে দেখা যায় নাই।

গহনা দেওয়ার কয়দিন পরে মিত্র বাড়ীর এক বধূ নানাবিধ গহনায় সাজিয়া ইঁহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, কথায় কথায় অজ্ঞতার ভাণ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, হাঁ গা, তোমাদের গায়ে গয়না দেখছি না যে? কি হ'ল সব?

ইহা মিত্রমহাশয়ের মস্তক-প্রসূত এক প্রকারে অপমান করিবার ফন্দী।

মাধবীর মা ম্লান হাসিয়া জবাব দিয়াছিলেন, গয়না থাকলেই কি সব সময়ে পরে? গহনা পরবার আবার ভাগ্য থাকা চাই।

বধূটি সগর্ব্ব হাসিয়া বাড়ী গিয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পরে মিত্রমহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ও দ্বিতীয় পুত্র অল্পদিনের ব্যবধানে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। অল্প-বয়স্কা বধূদ্বয় নিরাভরণা হইয়া গৃহে ঘুরিতে লাগিল। গৃহে ভরিয়া উঠিল শোকের দীর্ঘশ্বাস।

গহনা-ভরা বাক্স সিন্দুকে তোলা রহিল।

মাধবীর ঠাকুরমা সেইদিন হইতে রাগিলেই ক্রুদ্ধা সর্পিণীর ন্যায় গর্জ্জন করেন, হবে না? ধর্ম্ম আছেন। আমার বউরা খালি গায়ে ঘুরবে, আর ওর বউরা গহনা পরবে, অধর্ম্ম করে? তা হয় না। তা হয় না।

মাধবীর মা কিন্তু কাঁদিয়াছিলেন। সইয়ের বিষাদভরা ম্লান মুখখানি দেখিয়া আসিয়া নির্জ্জন ঘরে ব্যথাভরা চিত্তে কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন, এ ত আমি কোনোদিন ভাবি নি, ঠাকুর একি করলে! এ কেন করলে!

অদৃশ্য বিধাতাপুরুষ অদৃশ্য থাকিয়া অলক্ষ্যে অদৃষ্ট-সূত্রে মানবের ভাগ্য রচনা করিয়া চলেন, কি গড়িলেন কি ভাঙিলেন সে বিচার তাঁরই হস্তে!

মাধবীর মার মনের ভিতরে কে যেন ক'হয়াছিল, এ এক প্রকার শাস্তি। আঘাত দিলেই প্রতিঘাত আসে।

উঃ! কতদিনের কথা এসব। তাহার পর তাঁহার পুত্র হইল, মাধবী কোলে আসিল। সে সবও তো বহুদিনের কথা—যেন যুগ-যুগান্তর। মা চমকিয়া উঠিলেন, ও মাধু, ও শোভা ওঠ, ওঠ, দু'জনেই ঘুমোলি যে! ওঠ, ওঠ, ও মেজবৌ এদের ভাত দিয়ে দাও। স্তব্ধ নিশীথ থম্ থম্ করিতেছে। চাঁদের আলোয় অঙ্গন সাদা হইয়া গিয়াছে। রজনীগন্ধার সুগন্ধে গৃহ-প্রাঙ্গণ ভরিয়া উঠিয়াছে। ঝি আপনার কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া দালানের এক কোণে অঞ্চল বিছাইয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে। দূরে কেরোসিনের ডিবা ধূম বিকীর্ণ করিয়া জ্বলিতেছে। [ক্রমশঃ
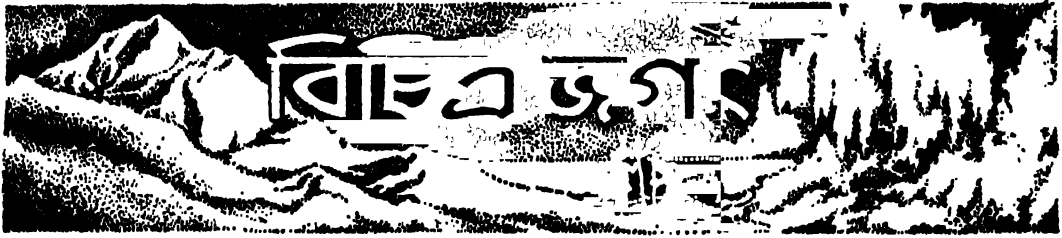
ত্রিবেণী

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল, প্রত্নতত্ত্ববিদ্

তীর্থস্থান ইহজগতের স্বর্গ। ভূমির অনির্ব্বচনীয় মহিমা, জলের অপূর্ব্ব পাপহারিণী শক্তি এবং মহাপুরুষের আশ্রয়— এই তিন কারণে তীর্থস্থান এতই পবিত্র! এই তীর্থস্থানে উপস্থিত হইলেই ইন্দ্রিয় সকল অসদ্বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়, মন শান্ত ও প্রফুল্ল হয়। সেই জন্য অনেকেই বিষয়-বিষে দগ্ধ হইয়া, শান্তি-সুখের প্রত্যাশায় তীর্থদর্শন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রকারগণ তীর্থদর্শন সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :—

"প্রভাবদদ্ভুতাদ্ভূমেঃ সলিলস্য চ তেজসা।
পরিগ্রহান্মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা॥
—ইতি কাশীখণ্ডে।

সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতে কাশী, মথুরা, শ্রীক্ষেত্র, প্রয়াগ, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সকল পুণ্যতীর্থের ন্যায় বঙ্গদেশের "ত্রিবেণী" হিন্দুগণের চিরদর্শনীয় ও চিরপবিত্র তীর্থ বলিয়া বিদিত।

এই পুণ্যময়ী ত্রিবেণীর বিষয় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীত "প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বে" উল্লিখিত আছে :—

"প্রদ্যুম্ন নগরাদ্‌যাম্যে সরস্বত্যাস্তথোত্তরে।
তদ্দক্ষিণপ্রয়াগস্তু গঙ্গতো যমুনা গতা॥
স্নাত্বা তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগ ইব লভ্যতে
দক্ষিণপ্রয়াগস্তু উন্মুক্তবেণী, সপ্তগ্রামস্তু দক্ষিণদেশে ত্রিবেণীতি খ্যাতে॥"

অর্থাৎ প্রদ্যুম্ন নগরের (পাণ্ডুয়া) দক্ষিণ ও সরস্বতীর উত্তর, দক্ষিণপ্রয়াগ; যথা হইতে গঙ্গার সঙ্গতি ত্যাগ করিয়া যমুনা নদী গমন করিয়াছে। ওইস্থানে স্নান করিলে প্রয়াগ তীর্থের ন্যায় পুণ্যসঞ্চয় হয়।

১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে রচিত মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে ত্রিবেণীর উল্লেখ আছে :—

"পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার
প্রভাকর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার।
অপার প্রতাপী রাজা যুদ্ধে বৃহস্পতি।
কলিযুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি।
সেই পঞ্চগৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল।
ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধাবে বহে জল।"

কবি বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গলে' ত্রিবেণীর সম্বন্ধে বর্ণিত আছে—

"দেখিয়া ত্রিবেণী গঙ্গা চাঁদরাজা মনে রাঙ্গা
কুলেতে চাপয়ে মধুকর।"

স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সম্পাদিত "কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মধ্যে ধনপতির সিংহলযাত্রায়" বর্ণিত আছে :—

"বামদিকে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি।
লক্ষ লক্ষ লোক এককালে করে স্নান।
বাস হেম তিল ধেনু দ্বিজে দেয় দান।
রজতের সিপে কেহ করয়ে তর্পণ।
গর্ভে বসি শিবপূজা করে কোন জন।
শ্রাদ্ধ করে কোন জন জলের সমীপে;
সন্ধ্যাকালে কোনজন দেয় ধূপ দীপে।"

উক্ত পুস্তকেই "ভাগীরথীর তটবর্ণন" মধ্যে লিখিত আছে :—

"ত্রিবেণী তীর্থের চূড়ামণি।
করিয়া আশ্রয় তথি, স্নান করে ধনপতি,
ভরীপুরে নানাধন কিনি।"

ত্রিবেণীর সম্মুখস্থ ভাগীরথীবক্ষ একটি প্রশস্ত দ্বীপ-পরিশোভিত! এই দ্বীপের দক্ষিণে সীমান্তের বিপরীত পার্শ্বে, ত্রিবেণীর অপরতটে যমুনার জলস্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিয়া ভাগীরথীর সলিল রাশির সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এ বিষয় Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol XIII, 1873, P. 214 এ লিপিবদ্ধ আছে—

"The island opposite Tribeni has a Conspicuous place on De Barros' Maps of Bengal and on that by Bleav (vide Pt. IV). The maps also agree with Abul Fazel's Statement in the Ain, that at Tribeni there are three branches, one the Saraswati on which Satgaon lies; the other the Ganga, now called the Hugli; and the third, the Jon on Jabuna (Jumna). De Barros and Bleav's maps shew the three branches of almost equal thickness, the Saraswati passing Aabigaon (Satgaon), and chowma (C• anmuha in Hugli District, north), and " the Jabuna flowing westward to Bu am (Borham, in the 24 Parganas)".

পাশ্চাত্ত্য ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতপ্রবর প্লিনির সময়ে যে সকল ইউরোপীয় বাণিজ্যপোত বাণিজ্যার্থে পণ্য দ্রব্যাদি লইয়া এ দেশে আগমন করিত এবং এ দেশের শস্য ও শিল্পসম্পদ পরিপূরিত হইয়া প্রতিগমন করিত, সেই সকল পোত গোদাবরীর নিকট একত্রিত হইত; তৎপরে বঙ্গোপসাগরের কূলস্থিত কতিপয় স্থান বহিয়া ত্রিবেণীতে আগমন করিত।(১)

ত্রিবেণী একদিকে যেমন চিরপ্রসিদ্ধ পুণ্যতীর্থ, অপরদিকে তেমনি প্রাচীন নিদর্শন বক্ষে ধারণ করিয়া বঙ্গের ইতিহাস সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার প্রভাবে যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে জাফর খাঁ গাজীর স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ একটি মসজিদ ও একটি সমাধিক্ষেত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মসজিদের দক্ষিণাংশে জাফরের লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়—তুরস্কদেশীয় জাফর খাঁ হিজিরার ৬৯৮ অব্দে (১২৯৮ খৃষ্টাব্দে) অবিশ্বাসিগণকে প্রভূত ধনরাশি দানে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন (২)।

উক্ত লিপি ব্যতীত মসজিদ গাত্রে আলাউদ্দীন হোসেন সাহের রাজত্বকালীন আরও চারিটি শিলালিপি পরিদৃষ্ট হইয়াছে। প্রথম শিলালিপি হইতে হোসেনাবাদের ও আর্শা সাজলা মকবন্দের উজীর উলগ মসনদ হিন্দু খাঁ কর্ত্তৃক এক মসজিদ নির্ম্মাণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই শিলালিপিটির তারিখ ১লা রাজাব ৯১১ হিজিরা (৩।১১০।১৫০৫ খৃষ্টাব্দ)। ইহা পাঠে আরও অবগত হওয়া যায়—হিন্দু খাঁ কর্ত্তৃক ত্রিবেণীতে ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে এক সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। আজিও সেই সেতুটির ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় শিলালিপি হইতে উলগ মসনদ হিন্দু খাঁর পরিচয় পাওয়া যায়।

তৃতীয় শিলালিপি হইতে আর্শা সাজলা মকবন্দের উজীর রুকনু উদ্দীন রুকন খাঁ কর্ত্তৃক একটি মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল (৩)।

চতুর্থ শিলালিপিতে বর্ণিত আছে—রুকনু উদ্দীন রুকন খাঁর সময়ে (অর্থাৎ ১৫১৮ খৃষ্টাব্দ) ইহা ক্ষোদিত হইয়াছিল। তিনি জাফরাবাদের উজীর ও ফিরোজাবাদের নগরাধ্যক্ষ ছিলেন (৪)। এই লিপি পাঠে স্বর্গীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে,—রুকনু উদ্দীন রুকন খাঁ হোসেন সাহের রাজত্বের প্রথম যুগে সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন (৫)।

অধ্যাপক ব্লকম্যান সাহেব এই মসজিদ বর্ণনাকালে জানাইয়াছেন—"ভূমি হইতে প্রায় চারি হস্ত উর্দ্ধে প্রাচীর-গাত্রে একটি লৌহশলাকা আছে। প্রবাদ আছে যে, উহা জাফর খাঁর যুদ্ধাস্ত্রবিশেষের মুষ্টি। এতদ্ভিন্ন তিনি এই স্থানের হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি বর্ণনা করিয়াছেন (৬)।

মসজিদ ব্যতীত জাফর খাঁর সমাধিক্ষেত্রে হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। এ বিষয়ে মিঃ এ মণি সর্ব্বপ্রথম অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন (৭)।

খৃষ্টীয় ১৫৩০ অব্দে উড়িষ্যার গজপতি বংশীয় শেষ নৃপতি মুকুন্দরাম হরিচন্দ্র ত্রিবেণী অধিকার করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নানের ঘাটের অনতিদূরে শ্রীশ্রী৺ বেণীমাধব জিউর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (৮)।

তৎপরে ত্রিবেণীতে অন্যান্য ঘাট প্রস্তুত ও দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অধুনা একটি ঘাটের উপরিভাগে একটি প্রস্তর শিবমূর্ত্তি ও একটি গণেশের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এইগুলি খৃষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর নিদর্শন বলিয়া অনুমিত হয়।

হিন্দু রাজত্বকালে এই ত্রিবেণীতীর্থ যে সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। আজিও প্রতিদিন গঙ্গাস্নানাভিলাষী বহু যাত্রীর সমাগম দেখা যায়। প্রতিবৎসর ১লা মাঘ উত্তরায়ণ-সংক্রান্তিতে এখানকার মহোৎসব বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

ত্রিবেণীর সন্নিকটে ভাগীরথীর নিম্নে একটি দহকে "কালীয় দহ" বলে এই কালীয় দহে মনসাদেবীর আজ্ঞায় চাঁদ-সদাগরের সপ্ততরী হনুমান্ কর্ত্তৃক জলমগ্ন হইয়াছিল। ক্ষেমানন্দ দাস ও কেতকানন্দ দাস কর্ত্তৃক রচিত "মনসার ভাসান" নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে—

"হনুমান্ বলবান পরাৎপর বীর।
কালীদহে কর গিয়া প্রবল সমীর।
পুষ্পপান দিয়া দেবী তার প্রতি বলে।
চাঁদবেণের সাত ডিঙ্গা ডুবাইবে জলে।"

(১) "Pliny mentions that the slips assembling near the Godabari sailed from thence to Cape Julinurus, thence to Tentigale opposite to Falta, thence to Tribeni, and lastly to Patna"—(vide, Calcutta Review article by Revd. J. Long.)"

(২) Journal of the Asiatic Society of Bengal vol. 7.

(৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal —July, 1919.

(৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal —Pt I, 1872.

(৫) Journal of the Asiatic Society of Bengal Pt. I, 1872.

(৬) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XXXIX, Part I—1870.

(৭) Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. XVI, Pt. I

(৮) Orissa—Sterling.

পুনরায় উক্ত পুস্তকে বর্ণিত আছে—

"চাপিয়া তরণি, হনুমান আপনি
হেলায় দোলায় নাচে।
করি হুহুঙ্কার, পবনে করিল ঝড়
হনুমান্ বাড়িল যে বলে।

[illegible] মনসা, মাজিয়া পরে মলা,
গাভজিয়া ডুবাইল জলে।"

কালীয়দহ ব্যতীত ত্রিবেণীর পার্শ্ববর্ত্তী চন্দ্রহাটীর "কপিলাশ্রম" ও ভূমুদহের "উত্তমাশ্রম" প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

মহানাদের প্রাচীন কীর্ত্তি

রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ হুগলী জেলার অন্তঃপাতী ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ মহানাদ নামক স্থানে প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ খননের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ জি, সি, ঘোষ ও মিঃ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোস্বামী মহানাদের মিঃ পি, সি, পালের সহিত তত্রস্থ প্রাচীন স্তূপাদি পরিদর্শন করিয়াছেন। মিঃ পাল জেলা বোর্ডের পার্শ্ববর্ত্তী বৃহত্তম স্তূপটিতে সর্ব্বপ্রথম খনন কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

পুরাতনী

সরস্বতী

উমেশচন্দ্র বটব্যাল

বঙ্গদেশে সরস্বতী দেবীর পূজামহোৎসব শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে। সরস্বতী সাহিত্য-সেবকের নিত্য-উপাস্য দেবতা। সাহিত্য-রসিকেরা সেই উপাস্য দেবতার ইতিহাসপর্য্যালোচনায় আনন্দলাভ করিবেন বিবেচনায় তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতে অগ্রসর হইতেছি।

দেবতার আবার ইতিহাস কি ?—আছে ; দেবতারও ইতিহাস আছে। মনুষ্যের উন্নতির সহিত মনুষ্যের উপাস্য দেবতারও উন্নতি, অবনতির সহিত অবনতি হইয়া থাকে। সরস্বতীদেবীরও তদ্রূপ ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস উন্নতির ইতিহাস কি অবনতির ইতিহাস, আমরা তাহার বিচার করিব না। পাঠকদের উপর তাহার বিচারের ভার রহিল। আমরা ইতিহসে লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিব।

সরস্বতী অতি প্রাচীন দেবতা। ভারতে আর্য্য-উপনিবেশ সংস্থাপনের পূর্ব্বেও সরস্বতী দেবতা বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল যেমন তাঁহার প্রতিমা গঠিত হয়, পূর্ব্বকালে তেমন প্রতিমা নির্ম্মিত হইত না। এক্ষণে সরস্বতী একটি বীণাপাণি স্ত্রীর মূর্ত্তিতে আমাদের চর্ম্মচক্ষের সমক্ষে উপস্থিত হয়েন। কিন্তু পূর্ব্বকালে তাঁহার তাদৃশী মূর্ত্তি কল্পিত হইত না।

সরস্বতী সম্বন্ধে এক্ষণে একটি কুৎসিত উপাখ্যান সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি যাঁহার কন্যা, তাঁহারই পত্নী। যে হতভাগ্য কবির কল্পনায় এই হতশ্রী আখ্যায়িকার জন্ম, সুরুচি ব্যক্তিগণ তাহাকে তিরস্কার না করিয়া থাকিতে পারেন না।

গণিকাগৃহে আজকাল সরস্বতীপূজার বড় ধুম। সরস্বতীকে কেহ কেহ বিশেষতঃ কলাবিদ্যার দেবতা বলিয়া মনে করেন। প্রাচীন সরস্বতী ঈদৃশী ছিলেন না।

ভদ্রলোকের গৃহেও এক্ষণে যে সরস্বতীর প্রতিমা নির্ম্মিত হয়, পুষ্পাঞ্জলী দিবার সময় তাঁহার শোভনীয় বক্ষঃস্থলের উল্লেখ করিয়া পূজা করা হয়। ইহাতে সরস্বতীদেবীর মনে কি ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা তিনিই জানেন।

জয়দেব, বিদ্যাপতি ও ভারতচন্দ্রের দেশে, সরস্বতীর এই পরিণাম ঘটিয়াছে।

প্রাচীন সরস্বতীকে হাতে গড়া হইত না, মন্দিরে বা মণ্ডপে বসান হইত না, এবং তিনি একটি রমণীয় কলাবিদ্যাবিশারদ অপ্সরা বলিয়াও উপাসকের পুষ্পাঞ্জলী পাইতেন না। বলিতে কি, প্রাচীন সরস্বতীর কোনও মূর্ত্তিই ছিল না।

এক্ষণে যে-সকল বৈদিক শব্দ অপ্রচলিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তন্মধ্যে "সরস্" একটি। "সরস" শব্দের আদিম্ অর্থ জ্যোতিঃ ; এবং সূর্য্যের একটি বৈদিক নাম "সরস্বান্"। সরস্বতী,—অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়ী দেবতা।

এই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবতার অপর নাম "বাগ্‌দেবী"। এ-স্থলে 'বাক' অর্থেও সাধারণ বাক্যমাত্র বুঝিলে ভ্রম হইবে। যাহা বেদাত্মিকা বাক, তাহাই এই বাক্ শব্দের অভিধেয়। বাক্‌দেবী—অর্থাৎ, বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

ঋষিরা সকল পদার্থেরই, বিশেষতঃ সর্ব্বপ্রকার উৎকৃষ্ট শ্রীসম্পন্ন বিস্ময়কর পদার্থমাত্রেরই অধিদেবতা কল্পনা করিতেন। অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম 'অগ্নি' বায়ুর

অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম 'বায়ু', সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম 'সূর্য্য', এইরূপ। তদ্রূপ বেদবাক্যরূপ উৎকৃষ্ট বাক্য-রাশিরও এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পিত হইয়াছিল,—এবং তাহা একটি অদ্ভুত জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া তাঁহার 'সরস্বতী' বা 'জ্যোতির্ম্ময়ী, এই নাম রক্ষিত হইয়াছিল।

এই নাম কল্পিত হইবার পরে, আর্য্যেরা যৎকালে ব্রহ্মাবর্ত্ত নামক জনপদে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, তৎকালে তথাকার এক নদীবিশেষেরও 'সরস্বতী' এই নাম সংরক্ষিত হইয়াছিল। এই জনপদে অঙ্গিরা ও অথর্ব্বা নামক ঋষিগণ, এবং মনু ও দধীচ প্রভৃতি আদিম প্রজা-পতিগণ, সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে 'যজ্ঞ' নামক উপাসনা-প্রণালীর প্রচার করেন। বেদবাক্য দ্বারা যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত, এবং বেদবাক্যের অপর নাম 'ব্রহ্ম' বলিয়া, এই জনপদ পরবর্ত্তী সময়ে 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' বলিয়া বিখ্যাত হয়। ব্রহ্মাবর্ত্তের একদিকে তৎকালে একটি সাগরগামিনী গভীর নদী প্রবাহিত ছিল। সেই নদীর তীরেই যাজ্ঞিক ঋষি-দের গ্রাম ও আবাসস্থান ছিল। তথায় তাঁহারা সংবৎসর-কাল স্থায়ী 'সত্র' নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। সম্বৎসর তথায় বেদধ্বনি হইত বলিয়া, তাহা বাগ্‌দেবীর বাসস্থান বলিয়া প্রতীত হইত, এবং কালক্রমে তাহাও 'সরস্বতী' এই নাম প্রাপ্ত হইল।

জ্যোতিঃস্বরূপিণী বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এইরূপে এক নদীবিশেষেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবতাতে পরিণত হইলেন। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দার সময়ে সরস্বতী বলিলে বাগ্-দেবীকেও বুঝাইত, এবং নদীবিশেষের অধিষ্ঠাত্রীকেও বুঝাইত। মধুচ্ছন্দা সরস্বতী বিষয়ে যে একটি মন্ত্র রচনা করেন,—তাহা অতি কৌশলে রচিত হইয়াছিল;—তাহার এক পক্ষে বাগ্দেবীকেও বুঝায়, অপর পক্ষে সরস্বতী নদীর অধিষ্ঠাত্রীকেও বুঝায়। সেই মন্ত্রটি এই:—

পাবকানঃ সরস্বতী চোদয়ন্তী সুনৃতানাম্ মহো অর্ণ সরস্বতী
বাজেভির্বাজিনীবতী চেতন্তী সুমতিনাম্। প্রচেতয়তি কেতুনা।
যজ্ঞং বষ্টু ধিয়া বসুঃ। যজ্ঞং দধে সরস্বতী। ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি।

"পবিত্রতোয়া (১) ধনাঢ্যজনপদবেষ্টিতা (২) যজ্ঞময়ী-রূপাহিনী (৩) সরস্বতী দেবী আমাদের যজ্ঞ কামনা করুন। মনোহর যেমন সকলের প্রেরণকর্ত্রী, সুন্দর স্তুতির উদ্বো-ধনকারিণী, (৪) সরস্বতী যজ্ঞকে ধারণ করিয়াছিলেন (৫)। তিনি সমুদায় যজ্ঞক্রিয়া শোভাময় করেন।"

বাগ্দেবীর পক্ষে ইহার অর্থ এই:—

"যিনি মনুষ্যের হৃদয়কে পবিত্র ও নির্ম্মল করেন, যিনি যজ্ঞশালিনী এবং অন্নদাত্রী, সেই সরস্বতী দেবী আমাদের যজ্ঞ কামনা করুন। তিনি সুন্দর ও সত্য বাক্যের প্রেরণকর্ত্রী, তিনি সুবুদ্ধির উদ্বোধনকারিণী যজ্ঞের ধারণকর্ত্রী। তিনি মহা-সমুদ্রের ন্যায় অসীম পদ্মমালার চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করেন; তিনি সমুদয় নরনারীর হৃদয়ে জ্যোতিঃ সঞ্চারিত করেন।"

যিনি বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ইহা অপেক্ষা তাঁহার আর মনোহর স্তুতি কি হইতে পারে?—তিনি "পাবকা"—আমাদের হৃদয়ের কামক্রোধাদিরূপ মল তিনি দূর করেন। তিনি আমাদের হৃদয়মন্দিরকে ঈশ্বরের অধিষ্ঠানের যোগ্য করেন। তিনি যজ্ঞশালিনী;—তিনি যজ্ঞকার্য্য দ্বারা বেষ্টিতা। তিনি অন্নদাত্রী,—কেন না, তাঁহার প্রসাদে মনুষ্যেরা দেবতার উপাসনা করিয়া দেবতার অনুগ্রহে অন্নলাভ করে বলিয়া ঋষিরা বিশ্বাস করিতেন। মনুষ্যের হৃদয়ের সুচিন্তা—মনুষ্যের জিহ্বায় মনোহর সত্য বাক্য—সরস্বতীরই কার্য্য। সুচিন্তা ও সত্যবাক্য বেদানুশীলনের ফল। সে কালে যজ্ঞই প্রধান সৎকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল। সুস্বাদু অন্নপানের দ্বারা জীবের তৃপ্তিসাধন করা যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। আজিও ভাষা কথায় 'যগ্যি' বা 'যজ্ঞ' বলিলে, বৃহৎ ভোজ বুঝায়। যজ্ঞ-শব্দে সৎকর্ম্ম বুঝিলে, বেদই সৎকর্ম্মের মূলাধার; কেন না, বেদে ঈশ্বরের প্রীতিকামনা করিয়া সৎকর্ম্মে অনুষ্ঠানের উপদেশ দেয়। আর বেদ হইতে আমরা মহাসমুদ্রের ন্যায় অনন্ত পরমাত্মা কি,—তাহা বুঝিয়া থাকি; কিরূপে,—'কেতুনা', চিহ্নের দ্বারা। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি-কৌশলের চিহ্ন আমাদের চারি দিকে জাজ্বল্যমান। সেই সকল চিহ্নের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বেদ বলেন, দেখ, এই বিস্ময়কর সংসার,—এক বিস্ময়কর বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্টি না হইয়া যায় না! এইরূপে সরস্বতী স্বাভাবিক অজ্ঞান-তিমিরে সমাচ্ছন্ন মনুষ্য-হৃদয়ে এক স্বর্গীয় জ্যোতির সঞ্চার করিয়াছেন।

সংস্কৃত 'বাক্' স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ; তাই তাহার অধিষ্ঠাত্রী স্ত্রী হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে আদিম সরস্বতী স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন, তিনি এক অদ্ভুত জ্যোতিঃ মাত্র। যেমন সূর্য্যের আলোকে বৃক্ষলতাদি প্রত্যক্ষ হয়—তদ্রূপ এই অদ্ভুত জ্যোতির আলোকে ঈশ্বর মনুষ্যের হৃদয়ে প্রত্যক্ষ হয়েন। এই জ্যোতিঃ বেদবাক্যের মধ্যে বাস করে। যখন সরস্বতীর উপাসনা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন এই নিরাকার জ্যোতিঃই দেবতা বলিয়া উপাসনাভাজন হইয়াছিল।—

১। মূল…"পাবকা।"
২। মূল…"বাজেভিঃ।" বাজেভিঃ অন্নৈঃ উপলক্ষিতা ইত্যর্থঃ।
৩। মূল—"বাজিনীবতী।"
৪। মূল—"সুমতিনাম্।" এখানে মতি শব্দের অর্থ স্তুতি।
৫। মূল—"যজ্ঞং দধে।" অর্থাৎ, সরস্বতীতীরেই প্রথমে আর্য্যবর্ত্তে যজ্ঞ-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

এখন কি আমরা মহাকবি কালিদাসের ভাষায় এরূপ আশা করিতে পারি যে, 'শ্রুতিমহতী সরস্বতী' তাঁহার প্রিয় আর্য্যাবর্ত্তে পুনর্ব্বার 'মহীয়সী' হইবেন ?

(সাহিত্য—১৩০১)।

৺সরস্বতীপূজায় মনোবেদনা

[শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ]

(১)

কারে বলিব ? শুনিতেই বা পারে কে ?
আর আছেই বা কে ? তুমিই না

বন্দিতা সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈরর্চ্চিতা সুরদানবৈঃ।
পূজিতা মুনিভিঃ সর্ব্বৈ ঋষিভিঃ স্তূয়তে সদা ॥

এই জগদ্ধাত্রী সরস্বতীকে প্রার্থনা যিনি করেন, তাঁহার "জিহ্বাগ্রে বসতে নিত্য ব্রহ্মরূপা সরস্বতী"।

সকল দেবতাই ত ব্রহ্মরূপ—সকল দেবীই ত ব্রহ্মরূপা। একমাত্র ব্রহ্মেরই উপাসক হয় এই ভারতে। লোকে বলে তেত্রিশ কোটি দেবতার উপাসনা করে এই ভারতবাসী। তেত্রিশ কোটি নয়—অসংখ্য। একই সকল সৃষ্ট বস্তুর মধ্য দিয়া প্রকাশ হইতেছেন বলিয়া সেই একই জগদাকারে দাঁড়াইয়া আছেন। জগৎকে রক্ষা করিতেছেন ইনিই, আর জগতের লয় সাধন কর তুমিই। এক তুমিই তোমার মূর্ত্তি অনন্ত। ভাগবতও বলিতেছেন—বিশ্বই তুমি আর বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ তোমারই লীলা।

আজ ভারতকে ভারত রাখিবে কে? যদি তুমি না রাখ। যাহারা বলে বলুক, তুমি পুতুল; তাহাদের সহিত বিবাদে কোন ফল নাই। এই তুমিই মহাসরস্বতি এই তুমিই মহালক্ষ্মী,—এই তুমিই মহাকালী। তুমিই আদ্যাশক্তি—তুমিই সতন্ত্র ঈশ্বরী। তোমার উপরে আর কেহ নাই। এই তুমিই একমাত্র শক্তি, আবার তুমিই শক্তিমান্,—তুমিই ব্রহ্ম—তুমিই ব্রহ্মরূপা।

মনোবেদনা জানাইব আর কাহাকে? তুমিই সকলের সকল কথা শ্রবণ কর—তাই তোমাকেই বলি।

আজ ব্যক্তি, পরিবাব, সমাজ, জাতি কোন পথে চলিয়াছে। এখন যাহা দেখিতেছি—এই জন্মে সেরূপ ত আর দেখি নাই? অনেক দুর্গতির কথা শুনিয়াছি—ইতিহাসেও অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু এমন মূল ঘাতকের কথা ত শুনি নাই—এমন কর্ম্মও ত আর দেখি নাই।

ভারত কি আর ভারত থাকিবে না? ইহা ত বিশ্বাস করি না। আজ সমস্ত জগতের সহিত ভারতের বৈষম্য স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে।

আমাদের এই ভারতবর্ষ ঋষিগণের এই ভারতবর্ষ মানব জাতির কোন উপকারকে উপকার বলে না—যদি সেই উপকার মানব জাতিকে ভগবানের নিকটবর্ত্তী করিয়া না দেয়। উপকার অর্থে তাঁহারা বলেন—উপ-সমীপে, কার—করিয়া দেওয়া। ভারত কোন উন্নতিকে উন্নতি বলে না, যদি সে উন্নতি ঈশ্বরের স্থানে অন্য কাহাকেও বসায়। ভারত অর্থকে বলে অনর্থ, যদি সে অর্থ ঈশ্বরকে অধঃকৃত করিয়া অর্জ্জিত হয়, আর যদি সে অর্থ ঈশ্বরের সেবায় ব্যয়িত না হয়। ভারত সে মনুষ্যত্বকে মনুষ্যত্ব বলে না, যদি মনুষ্যত্বের শীর্ষস্থানে ঈশ্বর না বসিয়া তাহাকে চরিত্রবান্ করেন। সে নারীত্ব ভারতের চক্ষে নারীত্বই নহে, যদি সেই নারীত্বের কণ্ঠহারের মধ্যমণি ভগবান্ না হন। বর্ব্বর বলিতে হয় বল, মূর্খ বলিতে হয়, অসভ্য বলিতে হয় বল—ভারত এই ছিল—এই থাকিতেই চায়—এই থাকিবেও। ভারতের শাস্ত্র যাহা সনাতন—যাহা চিরদিন সত্য ছিল, আছে, থাকিবে—সেই সনাতনকে ধরিয়াই ব্যক্তি, জাতি পরিবার সমাজ গড়িয়া দিয়া গিয়াছেন। ভারত সে শাস্ত্রকে শাস্ত্রই বলেন না—যে শাস্ত্র ভগবানকে ধরাইয়া দিতে না পারে। ভারতের বেদ শিক্ষা দিতেছেন কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান। সমস্ত শাস্ত্র এই তিন পথ লইয়া।

বেদে কাণ্ডত্রয়ং প্রোক্তং কর্ম্মোপাসনবোধনম্।
সাধনং কাণ্ডযুগ্মোক্তং তৃতীয়ে সাধ্যমীরিতম্।

মন্ত্রমহোদধি তন্ত্র।

বেদে কর্ম্ম, উপাসনা এবং বোধন অর্থাৎ জ্ঞান—এই কাণ্ডত্রয় উপদিষ্ট। আদ্যকাণ্ডদ্বয় অর্থাৎ কর্ম্ম ও উপাসনা সাধনকাণ্ড এবং জ্ঞান সাধ্যকাণ্ড।

তস্মাদ্বেদোদিতং কুর্য্যাদুপাসীত চ দেবতাঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণস্তেন লভতে জ্ঞানমুত্তমম্॥

মন্ত্রমহোদধি।

কর্ম্ম ও দেবতার উপাসনা চিত্তশুদ্ধির জন্য—এই সমস্তই জ্ঞানলাভের জন্য।

মনুষ্যদেহং সংপ্রাপ্য উপাসীত চ দেবতাঃ।
যো ন মুচ্যেত সংসারান্মহাপাপযুতো হি সঃ॥ ঐ

মনুষ্য দেহ পাইয়া, দেবতার উপাসনা করিয়া যে সংসার হইতে মুক্ত হইতে না পারিল, সে মহাপাপযুক্ত।

ভারতবর্ষ বুঝি মহাপাপযুক্ত হইয়াছে, তাই আর বেদবোধিত কর্ম্ম করিতে চায় না, আর বেদবোধিত দেবতার উপাসনাও করে না। তাই বলি মা জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমি কৃপা না করিলে ভারত আর ভারত বুঝি থাকে না।

(২)

কথা কওয়া ত ভারি সাধনা। অন্যের সঙ্গে কথা কওয়া বন্ধ করিয়া সেই একের সঙ্গে কথা কহিতে পারিলেই জীবন সফল হয়। একদিন ভারত সেই একের কথাই শুনিত, সেই একই সব বলিয়া বিশ্বাস করিত, সেই একই আছেন ভিতরে বাহিরে, ঊর্দ্ধে অধে, আশে পাশে, চন্দ্রে সূর্য্যে, শ্বাসে রক্তে, অস্থি-মজ্জায়, দর্শনে শ্রবণে—সর্ব্বত্র সর্ব্বস্থানে। একদিন ভারত আন কথা বন্ধ করিয়া সেই একেরই সঙ্গে কথা কহিত, আপনা আপনি সেই একেরই কথা কহিত—সর্ব্বদা বাক্যে, কর্ম্মে, ভাবনায় সেই একেরই সঙ্গে থাকিত। আজ ভারত সেই এক ছাড়িয়া ছুটিয়াছে—বহু সঙ্গে তাই এই দুর্গতি। এখন কিন্তু পথে ফিরিবার সময় আসিতেছে।

সকল নর-নারীর একটা সময় আসিয়াছিল, যখন সকলেই একবার তাঁহার স্মরণ করিয়াছিল—একবার তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিয়াছিল। এই স্মরণ—এই প্রার্থনা আসিয়াছিল—নিদারুণ যাতনা পাইয়া। শাস্ত্র ত অজ্ঞাতজ্ঞাপক। আসন্নচেতন যাহারা, তাহারা দৃষ্টির বাহিরের কোন কিছু বিশ্বাস করিতে চায় না। শাস্ত্র কিন্তু মানুষ যাহা জানে না—জানিতে পারে না—তাহাই জানাইয়া দেন।

মানুষ যখন মাতৃজঠরে থাকে, তখন একবয়র বিষম যাতনা পায়। অতিশয় যাতনা পাইয়া মানুষ বহু জন্মের কথা স্মরণ করে।

মানুষ তখন বলে, "কত সহস্র যোনি আমি দেখিলাম। কুক্কুর শূকরাদির ভোজ্য কত খাদ্যই খাইলাম। কত প্রকার জন্তু হইয়া কত প্রকার শুষ্ক দুগ্ধই পান করিলাম। জাত আমি, মৃত আমি, আমার পুনঃ পুনঃ কত জন্ম জন্মান্তরই হইল। অহো! আমি দুঃখ-সমুদ্রে মগ্ন হইয়া আছি। উদ্ধারের কোন উপায়ই পাইতেছি না; প্রতি জন্মে পুত্র-কলত্রাদি পরিজনের জন্য কত শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছি। আমি এখন একাই দগ্ধ হইতেছি। পরিজনেরা ফল ভোগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। হে ভগবান, আমাদের মুক্ত করিয়া দাও, আমি আর তোমাকে ভুলিয়া কোন কিছুই করিব না। অশুভের ক্ষয়কর্ত্তা একমাত্র তুমিই। মুক্তিফলপ্রদানে একমাত্র তুমিই সমর্থ। এই আদি প্রতিজ্ঞা করিয়া আসে—জন্মিয়া আবার সব ভুলিয়া যায়, তাই এই কষ্ট পায়। সকল কষ্ট দূর করিবার জন্যই আমাদের সকল পূজা।

তিন

শীত চলিয়া যাইতেছে, বসন্ত আসিতেছে। এই সন্ধিক্ষণে এই সরস্বতী পূজা! বাসন্তী পঞ্চমী হইতেই বসন্তকালের প্রারম্ভ বলিতে হয়।

বসন্তকালে তরুলতা রসে পূর্ণ হয়। এই রস কোথা হইতে আইসে? এই যে আম্রবৃক্ষে মুকুল দেখা দিল—এই যে কোকিলের স্বর বড় মিষ্ট হইল—ইহাতে কি কাহারও আগমনের সাড়া পাওয়া গেল? তুমি আমি সবাই ত আম্র-বৃক্ষে আম্রমুকুল দেখি, কিন্তু ইহাতে কি কিছু ভাবনা করি? কিন্তু যাঁহারা সেই এক লইয়া থাকিতেন, তাঁহারা ইহাতে আরও কিছু দেখিতেন।

বিজ্ঞান ত অনেক ব্যাখ্যা করেন, আর সত্য বলিয়া তাহা লোকে গ্রহণ করে। জল নিম্নগামী, কিন্তু জল বা রস বৃক্ষের উপরে উঠে কিরূপে? বিজ্ঞান ইহার কি উত্তর দেয়? বিজ্ঞানবিদ্ এখানে নিরুত্তর। ঋষিগণ কিন্তু বাহিরের প্রকৃতিকে সেই একের সাড়া পাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে দেখিতেন, তাঁহাকে পূজিতেন, আর পাইতেনও তাঁহাকে। এই পূজাও তাঁহারই জন্য।

সরস্বতী পূজা—সকল পূজার মত আত্মারই পূজা। নাম, রূপ, গুণ, কর্ম্ম ও স্বরূপ ভাবনার সুবিধার জন্যই এই মূর্ত্তিতে সেই একেরই পূজা।

জ্ঞানিগণ যে পরমপদ দর্শন করেন, তাহার উপায় এই সাকার পূজা। মূর্ত্তি ধরিয়া বিশ্বরূপে যাইতে হয়, আবার বিশ্বরূপ যিনি, তিনিই মূর্ত্তি ধরিয়া হৃদয়ে ইষ্টমূর্ত্তিতে পূজা গ্রহণ করেন।

এত করিয়া যাঁহার দর্শন পাওয়া যায়, তুমি যদি ভাব ইহা পুতুল পূজা—তুমি নিতান্ত বাতুল। রূপে, গুণে, কৃপা করিতে, অপরাধ ক্ষমা করিতে এমন আর কোথায় পাইবে? আহা বেদের প্রার্থনাও কত সুন্দর!

চতুর্মুখ মুখাম্ভোজ বনহংসবধূর্মম।
মানসে রমতাং নিত্যং সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী॥

আবার—

নমামি যামিনীনাথলেখালঙ্কৃতকুন্তলাম্।
ভবানীং ভব সন্তাপ-নির্ব্বাপণ-সুধানদীম্॥

এই রূপাধিপাত্রীকে দেখিয়া যে প্রার্থনা করিতে পারে না, সে প্রধান সুখেই বঞ্চিত; বৈষ্ণব কবিদের কথায় বলা যায় "সো সুখে বঞ্চিত গোবিন্দদাস।"

এই যে মূর্ত্তিটি সম্মুখে—এইটি যাঁহার কৃপায় তাঁহাদের হৃদয়ে প্রকটিত হইয়াছিল—এ যে তাঁহাদেরই দেখা মূর্ত্তি। ইহা কল্পনার পুতুল নহে। ভক্তচিন্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ। কেমন ধ্যানের মূর্ত্তি দেখ দেখি—

যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা
যা বীণা বরদণ্ডমণ্ডিতকরা যা শ্বেতপদ্মাসনা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা॥

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, লয়কর্ত্তা শঙ্কর যাঁরে ভজনা করেন, তিনি কি পুতুল না তিনিই আত্মা? ভারত কখন জড়ের পূজা করে নাই। ভারতের সকল পূজাই সেই একমাত্র চেতনের পূজা—সেই আত্মার পূজা।

ভগবান ভগবান করিয়া দেশটা যে ছারেখারে গিয়াছে—এই ত বল তোমরা। নিঃশেষ জাড্যাপহার পূজা করিয়া দেশটা এত জড় মারিয়া গেল কিরূপে? পূজা করিয়া ইহা হয় নাই—পূজা না করিয়াই ইহা হইয়াছে। এস এস—নাম, রূপ, গুণ কর্ম্ম বিশেষতঃ স্বরূপে এই বাগ্‌বাদিনীর পূজা করি এস—এই জ্ঞপ্তি দেবীর সঙ্গে নিরন্তর কথা কই এস—তবেই আমরা তাঁহার দিকে জাগিতে পারিব। এই সরস্বতী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বিদ্যায় জানা যায়, আমি দেহ নহি—আমি মন নহি, আমি আত্মা। যেখানে বিদ্যার উপাসনা নাই, যেখানে "বন্ধ কোলাহল" বড় বেশী, সেখানে ব্যভিচারের প্রকোপ ত হইবেই। দুষ্টা সরস্বতী যাহার স্কন্ধে আরোহণ করেন, তিনি বিদ্যা অভ্যাস করেন না—দেহই ইহাঁদের সর্ব্বস্ব—ইহাঁরাই শাস্ত্র মানেন না—শ্রাদ্ধতর্পণ মানেন না—আচার মানেন না—অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা বুঝেন না—আহারের মেধ্যতা অমেধ্যতা বিচার করেন না। ইঁহারাই এই দুঃখ আনিয়াছেন। আরও আসিবে—যদি পথে ফিরা না যায়।

এস এস সকলে মিলিয়া মা'র পূজা করি, এস। মা, আমরা যেন তোমার হইতে পারি—যেন তোমার আজ্ঞা পালন করিতে পারি। আমরা যেন সব অগ্রাহ্য করিয়া সকল দুঃখ তোমার মুখের দিকে চাহিয়া সহ্য করিতে পারি, আর সকলের সেবায় তোমার সেবা হইতেছে ভাবিয়া ধন্য হইতে পারি।

যে কালে যে পূজা হয়, তাহা সেই একেরই পূজা। সকল কালে সেই একের সকল পূজা করি এস, আর অন্য কালে সেই একেরই সঙ্গে সর্ব্বদা কথা কওয়ার অভ্যাস করি এস, তাঁহার কৃপা আমরা নিশ্চয়ই পাইব—আমাদের শুভ নিশ্চয়ই হইবে।

[—বঙ্গবাসী]

শ্রীপঞ্চমী

[উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব]

দুইটী উৎসব আছে বৈদিক,—তাহার মধ্যে একটী শ্রীপঞ্চমী। শ্রীপঞ্চমী—বাক্-বিভূতির আরাধনা। এ বাক্ কোন্ বাক্? ইনি ভগবচ্ছক্তি—যাঁহার রূপ এই সৃষ্টি কমল।—তাই ইনি কমলাসনা। ইনি শ্রী—হ্রী—তুষ্টি—পুষ্টি—ক্ষমা—লজ্জা—ধী—ইনি যে কি নহেন, তাহা তো জানি না। তবে জানি শ্রী রহিলে হ্রী থাকে, তুষ্টি পুষ্টি সবই থাকে। শ্রী হইতেই বিদ্যা, অপরা নহে—পরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যা তুচ্ছ ক্ষুদ্র মর্ত্ত্যমলিন—অমৃত হইতে দূরান্তর। পরাবিদ্যা অমৃতত্ব দান করে—তাই তাঁহার নাম শ্রী। শ্রী ব্যতীত অমৃত নাই,—অমৃত ছাড়িয়াও শ্রী রহিতে পারে না। পরাবিদ্যার শরণ লইলে জীব শিব হয়, অমৃতত্ব লাভ করে। তাই শ্রীপঞ্চমীর উৎসব—বাণী বীণাপানি বাক্‌দায়িনীর আরাধনা।

আমাদের দেশ সরস্বতী পূজা করিয়া পরাবিদ্যার অনুশীলন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিল। ভারতের শ্রী তাই—অনুপম অতুলন অমৃতময়। এখানে জ্ঞানে শ্রী—কর্ম্মে শ্রী—অন্তরে শ্রী—বাহিরে শ্রী। এই শ্রী জড়পুঞ্জের আবর্জ্জনা রাশি নহে, লালসার পূতিগন্ধ দুষ্ট নহে, এ শ্রী সম্পদ—অমৃতময়—অমৃতই ইহার কাম্য,—"যেনাহং নামৃতংস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম।"

সরস্বতী পূজায় সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে, পরাবিদ্যার সাধনা করিলে শ্রীভগবানের অনুকম্পা বর্ষিত হয়। অতীত ভারতের দিকে দৃষ্টি দিলে প্রমাণ মিলিবে। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন হইতে ভীষ্ম দ্রোণ পর্য্যন্ত, সনক সনাতন হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ পর্য্যন্ত ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যে দিন হইতে ম্লেচ্ছ বিদ্যার চর্চ্চা করিয়াছি, সেই দিন উৎসন্ন গিয়াছি। ম্লেচ্ছের শিখানো অপরা বিদ্যার জৌলস আছে, কিন্তু উহা অগ্নিগর্ভ কালান্তক বিস্ফোরক, জ্বালামালার শেষ ফল—ভস্মীভূত করিয়া দেওয়া।

শ্রীপঞ্চমীর পুণ্য ক্ষণে তোমায় আহ্বান করিতেছি—মা বাণী বিদ্যাদায়িনী! এস, আমাদের হৃদয়-কমলাসনে তোমার আরাধনা করি! তুমি আমাদের তুষ্টি ও পুষ্টি দাও, আমাদের শ্রীযুক্ত কর।

[—সন্ধ্যা]
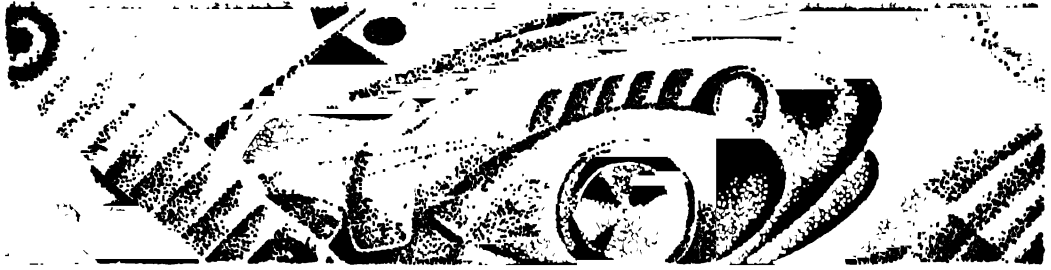
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ধারা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

তিন

নিয়ম আবিষ্কারের দ্বিতীয় পদ্ধতি—পর্য্যবেক্ষণ মূলক গবেষণা

এর বিশিষ্ট উদাহরণ পাই আমরা নিউটন কর্তৃক মহাকর্ষের নিয়মের আবিষ্কারে। এই নিয়ম একটা বিশিষ্ট পরীক্ষা বা পরিমাপকে ভিত্তি ক'রে আবিষ্কৃত হয় নি। এর মূলে রয়েছে সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ ও নিপুণ গবেষণা। এ ছাড়া গ্রহগণের সূর্য্য প্রদক্ষিণ সম্পর্কীয় কেপলারের নিয়ম এবং পতন্ত দ্রব্যের ভূ-পতন সম্পর্কীয় গ্যালিলিওর নিয়মও এ বিষয়ে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

প্রবাদ এই যে, আতাফল বিশেষকে মাটিতে পড়তে দেখে নিউটনের মনে ভূ-পতনের কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। একথা সত্য হোক বা না হোক, এই ঐতিহাসিক আবিষ্কারের মূলে যে, এক অলৌকিক পর্য্যবেক্ষণ শক্তি এবং অনন্যসাধারণ গবেষণা প্রবৃত্তি নিহিত ছিল সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। কত সহস্র বৎসর যাবৎ কত আম, জাম মাটিতে পড়ে আসছে, কত সহস্র লোকে তা' দেখেছে কিন্তু আর কারুর মনেই ত এ প্রশ্ন জাগে নি যে, যে নিয়মের বশবর্ত্তী হয়ে ক্রম-বর্দ্ধমান বেগে আতা ফলকে মাটিতে নেমে আসতে হয় আকাশের চাঁদকেও হয় ত ভূ-প্রদক্ষিণ ব্যাপারে সেই নিয়মের অধীন হয়েই ক্রমাগত পৃথিবীর অভিমুখে নেমে আসতে হচ্ছে। আর কেউ ত ভাবেনি যে, উভয় ঘটনাই হয় ত একই বিশ্বদৃশ্যের বিভিন্ন পটভূমিকা মাত্র। নিউটনের আত্মার আর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না কিন্তু মৃত্যুর বরণেও যে ঐ ফল-প্রবর অমর হয়ে রয়েছে এক চিন্তাবীরের মনোজগতে অবিনাশী ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল ব'লে তা' যাঁরা তার স্পন্দনানুভবে ধন্য হয়েছেন তাঁরা অস্বীকার করতে পারবেন না।

এইরূপ পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় পাই আমরা নিউটনের পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞানাচার্য্য গ্যালিলিওর ভেতরেও। এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, গ্যালিলিওর মৃত্যু ও নিউটনের জন্ম একই বৎসরের (১৬৪২ খৃষ্টাব্দের) ঘটনা, যেন একটি প্রদীপ নিবে গিয়ে আর একটি উজ্জ্বলতর আলো জ্বেলে দিয়ে গেল। বস্তুতঃ নিউটনীয় গতিবিজ্ঞানের এবং মহাকর্ষের নিয়ম আবিষ্কারেরও সূত্রপাত হয়েছিল গ্যালিলিওর গবেষণা থেকে। সুতরাং গ্যালিলিওর দু'একটা আবিষ্কারের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এর থেকে তখনকার যুগের বিজ্ঞানের আবহাওয়ার গতির দিকও কতকটা আন্দাজ করা যাবে।

কথিত আছে, একদা উপাসনা উপলক্ষে গ্যালিলিও যখন গির্জ্জায় উপস্থিত হয়েছিলেন তখন সেখানকার দোদুল্যমান ঘণ্টাটা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্যালিলিও ঘণ্টার দোলনে তালের সংগতি লক্ষ্য করলেন, এবং নিজের নাড়ীর স্পন্দনের সঙ্গে ঘণ্টার দোলন-কালের তুলনা ক'রে। বলাবাহুল্য আধুনিক কালের উন্নত ধরনের ঘড়ির আবিষ্কার তখনো হয় নি—পেণ্ডুলমের দোলন-কাল সম্বন্ধে একটা বিশিষ্ট নিয়ম, যা'কে বলা যায় 'তালের সংগতি নিয়ম' (Law of Isochronism) আবিষ্কার করেন। কিন্তু গ্যালিলিওর যে আবিষ্কার মহাকর্ষের নিয়ম আবিষ্কারে সহায়ক হয়েছিল সে হচ্ছে পতন্ত দ্রব্যের ভূ-পতনের কাল সম্বন্ধীয় নিয়ম সম্পর্কে। তখনকার দিনে লোকের বিশ্বাস ছিল, ভারী জিনিস মাটিতে পড়ে তাড়াতাড়ি, হাল্কা জিনিস পড়ে অপেক্ষাকৃত ধীরে। আজকের দিনেও আমরা অনেকে এইরূপ ধারণাই পোষণ ক'রে থাকি। কিন্তু গ্যালিলিও পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করলেন যে, এ ধারণা ভুল। একটা খুব উঁচু মন্দিরের চূড়া থেকে তিনি একটা খুব ভারী ও একটা হাল্কা জিনিস একসঙ্গে মাটিতে ছেড়ে দিলেন। নীচের জনতা সবিস্ময়ে দেখলো উভয় পদার্থ একসঙ্গেই ভূমিস্পর্শ করলো। যদিও বহু দিনের অন্ধসংস্কার নষ্ট হওয়ায় তারা খুসী হতে পারলো না, পরন্তু বলাবলি করতে লাগলো

"শয়তান বেশ একটা ভেল্কি দেখিয়েছে—যা' হোক" (The rascal has performed a miracle) তবু তখন থেকে লোকে জানতে পারলো যে, পতন্ত দ্রব্যের বেগ লঘু গুরু নির্ব্বিশেষে সকল পদার্থের পক্ষে সমান হারেই বেড়ে থাকে এবং এর জন্যই সমান উঁচু থেকে এক সঙ্গে ছেড়ে দিলে সকল পদার্থই যুগপৎ ভূমিস্পর্শ করে! এ ছাড়া গ্যালিলিওর অপর এক পরীক্ষা থেকে জানা গেল যে, পতন্ত দ্রব্যের বেগ বৃদ্ধির হারটা হচ্ছে সেকেণ্ড প্রতি, প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৩২ ফুট।

পরীক্ষামূলক পর্য্যবেক্ষণকে ভিত্তি ক'রে গ্যালিলিও আর একটা বিশিষ্ট মত প্রচার করেছিলেন যা'র গুরুত্ব কেবল মহাকর্ষের নিয়মের আবিষ্কারেই নয়, গতি বিজ্ঞানের ভিত্তি সংস্থাপনেও বিশেষভাবে নিউটনের সহায়তা করেছিল। এই বিশিষ্ট মতটা হচ্ছে স্থিতি ও গতি সম্পর্কে জড়-পদার্থের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিয়ে। জড় দ্রব্যকে কখনো স্থির কখনো চঞ্চল দেখা যায়। প্রশ্ন হলো ওর স্বাভাবিক অবস্থা কোন্‌টা—স্থিতি না গতি? তখনকার লোকের ধারণা ছিল এবং বর্ত্তমানকালেও অনেকের ধারণা এই যে, স্থিতিই জড়ের স্বাভাবিক অবস্থা এবং গতির অবস্থাটা ওর প্রকৃতি বিরুদ্ধ। ইট, কাঠ পাথরের 'স্থির' অবস্থার জন্য কোন কারণ খুঁজবার দরকার হয় না, অথবা তার একমাত্র কারণ ওদের জাড্য বা জড়ত্ব। আর বেগের অবস্থার জন্য চাই, ক্রমাগত ওদের ওপর চাপ, টান, ধাক্কা বা ঐ জাতীয় কিছুর প্রয়োগ! এই ধারণার সংশোধন ক'রে গ্যালিলিও এই নূতন মত প্রচার করলেন যে, স্থির পদার্থের পক্ষে স্থির হয়ে থাকা যেমন তার স্বভাব, সেইরূপ বেগবান পদার্থের পক্ষে বেগের দিক্ বরাবর, সোজা পথে সমান বেগে চলতে থাকাও ঠিক ততটাই তা'র স্বভাব সিদ্ধ। জড় দ্রব্যের বিশিষ্ট ঝোঁক হচ্ছে তার বেগের দিক ও পরিমাণ বজায় রাখবার দিকে এবং এতেই ওর জড়ত্ব। স্থিতির অবস্থা ও বেগের অবস্থার মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। যা'র বেগের মাত্রা 'শূন্য' তা'কেই আমরা বলি স্থির। বেগটা শূন্য পরিমিতই হোক বা ঘণ্টায় দশ মাইল, বিশ মাইল বা লক্ষ মাইলই হোক তা'র হ্রাস বৃদ্ধি ঘটানোর প্রবৃত্তি বা ক্ষমতা কোন জড়দ্রব্যেরই নেই। অল্প হোক বা বেশী হোক, যা'র যা'র বেগের সম্পদকে মূলধনরূপে রক্ষার চেষ্টাই জড় দ্রব্যের একমাত্র লক্ষ্য। জড়ের এই ধর্ম্মকে বলা যায় ওর জড়ত্ব বা Inertia এই ধর্ম্মই কখনো বা শূন্য বেগের নিথর মূর্ত্তিতে কখনো সমবেগের সসীম মূর্ত্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ ক'রে থাকে। জড় দ্রব্যের এই ধর্ম্মই জাড্যের নিয়ম-বা Law of Inertia নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

নিউটন গ্যালিলিওর এই নিয়ম মেনে নিলেন এবং আরও স্পষ্টভাবে এইমত প্রচার করলেন যে, কেবল বেগের অস্তিত্বের জন্য—ঐ বেগ অসীম ক্ষুদ্রই হোক বা অতি প্রকাণ্ডই হোক—জড়দ্রব্যকে বাইরের কোন কিছু মুখাপেক্ষী হতে হয় না। মুখাপেক্ষী হতে হয় শুধু বেগের দিক্ কিম্বা মাত্রার পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য—স্থির পদার্থ বেগ জন্মাবার জন্য বা বেগবান পদার্থে আরও খানিকটা বেগ উৎপাদনের জন্য! এই বাহ্য প্রভাবের সাধারণ নাম Force বা 'বল' এবং চাপ, টান, ধাক্কা, আকর্ষণ, বিকর্ষণ প্রভৃতি তার মূর্ত্তিভেদ। সংক্ষেপে এই উক্তিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায়—যতক্ষণ বাইরের থেকে কেউ কোন 'বল' প্রয়োগ না করে ততক্ষণ জড়দ্রব্য হয় স্থির থাকবে নয় ত' সমবেগে সোজা পথে চলতে থাকবে। এই উক্তিকে বলা যায় গতির প্রথম নিয়ম। গ্যালিলিওর Law of Inertia এবং গতির প্রথম নিয়ম একই তথ্য প্রকাশ করে থাকে।

এই নিয়মের সহজ সিদ্ধান্ত এই যে, 'বল'কে গ্রহণ করতে হবে 'বেগের' কারণ রূপে নয় 'বেগ-পরিবর্ত্তনের' কারণরূপে, এবং বেগের পরিবর্ত্তনকে গ্রহণ করতে হবে প্রযুক্ত বলের ফলরূপে। নিউটন এই কারণ ও কার্য্যের মধ্যে একটা পরিমাণগত সম্বন্ধ এবং উভয়ের দিক্ সম্পর্কে একটা ঐক্যের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করলেন—বেগটা যে দিকে বদলায় ঐটাই বলের দিক্ এবং যে-হারে বদলায় তা'র দ্বারাই পরিচয় পাওয়া যায় বলের মাত্রাটা। পদার্থের বেগ-পরিবর্ত্তনের হারকে সংক্ষেপে বলা যায় ওর ত্বরণ (Acceleration)। সুতরাং শেষোক্ত কথাটাকে সংক্ষেপে এইরূপে প্রকাশ করা যায়—পদার্থ বিশেষের ত্বরণ ওর ওপর প্রযুক্ত বলের দিক্ বরাবর এবং ওর সমানুপাতিক হয়ে থাকে। এই উক্তিকে বলা যায়, গতির দ্বিতীয় নিয়ম।

এ-ছাড়া, বলের আবির্ভাবের প্রণালী সম্পর্কেও নিউটন একটা নিয়ম, যা'কে বলা যায় গতির তৃতীয় নিয়ম, লিপিবদ্ধ করলেন; যথা—ক্রিয়ামাত্রেরই উল্টোদিকে একটা সমপরিমাণের প্রতিক্রিয়া রয়েছে। এর অর্থ এই:যে, বলের আবির্ভাব হয় জোড়ায় জোড়ায়, যারা মাত্রায় পরস্পরের সমান এবং দিক্ সম্পর্কে একটি অপরটির ঠিক বিপরীত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, 'ক' যদি 'খ'-এর ওপর (চাপ, টান, ধাক্কা, আকর্ষণ, বিকর্ষণ জাতীয়) কোনরূপ 'বল' প্রয়োগ করে তবে 'খ' ও 'ক'-এর ওপর উল্টোদিকে সমান

বল প্রয়োগ করবে। এদের একটাকে বলা যায় 'ক্রিয়া' এবং অপরটাকে বলা যায় তার 'প্রতিক্রিয়া'।

নিউটনীয় গতিবিজ্ঞানের প্রকাণ্ড সৌধ গড়ে উঠেছে এই সংক্ষিপ্ত সূত্রত্রয়কে ভিত্তি ক'রে। পরবর্ত্তীকালে ল্যাপ্লাস্, লেগ্রাঞ্জি, ডি-অ্যালেম্বার্ট, হ্যামিলটন, পয়সন্ এবং অন্যান্য গাণিতিকের গবেষণার ফলে এই সূত্র তিনটার প্রয়োগক্ষেত্র আশাতীতরূপে বিস্তৃতি লাভ করেছে। মহাকর্ষের নিয়মও এই সূত্র তিনটার ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। বৈজ্ঞানিকগণ আজ গর্ব্বভরে এইরূপ উক্তি করে থাকেন যে, বিশ্বের পরমাণুপুঞ্জের বর্ত্তমান অবস্থান এবং গতিবেগ দেওয়া থাকলে কোটি বৎসর পরের ব্রহ্মাণ্ড কি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করবে তা' তাঁরা অনায়াসেই হিসাব ক'রে ব'লে দিতে পারেন।

জড়ের গতি সম্পর্কে উক্ত নিয়মত্রয়কে ভিত্তি ক'রে এবং নিজের ও পূর্ব্ববর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণের পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফল সমূহকে সম্বল ক'রে নিউটন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত মহাকর্ষের নিয়ম আবিষ্কার করেন। পূর্ব্বেই বলেছি, নিউটনের নয়ন সমক্ষে দু'জন শ্রেষ্ঠ মনীষীর গবেষণার ফল বাস্তব রূপ গ্রহণ করেছিল—পতন্ত দ্রব্য সম্পর্কে গ্যালিলিওর নিয়ম এবং গ্রহগণের সূর্য্য প্রদক্ষিণ ব্যাপারে কেপ্লারের নিয়ম। উভয় ব্যাপারের মধ্যে নিউটন সাদৃশ্য দেখতে পেলেন। গতির প্রথম নিয়ম থেকে বলতে হয় বৃন্তচ্যুত আম, জামের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হবে শূন্যদেশে ঝুলে থাকা বা ওর বেগহীন অবস্থাটাকে বজায় রাখা। তবু সবাই ওরা বর্দ্ধিত বেগে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে কেন? অন্যপক্ষে বেগবান গ্রহগণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হবে যা'র যা'র বেগ বজায় রেখে সমবেগে সোজা পথে ছুট্ দেওয়া। তা' না ক'রে ওরা বাঁকা পথে সূর্য্যকে ঘুরে আস্‌ছে কেন? ওদের বেগের দিক্ ক্রমাগত বদ্‌লে যাচ্ছে কেন? বুঝতে হবে উভয় ক্ষেত্রে একই কারণ বিদ্যমান—বাইরের থেকে কোন না কোন জড় দ্রব্য ওদের ওপর 'বল' প্রয়োগ কর্চ্ছে। কে বল প্রয়োগ কর্চ্ছে। কি দিয়ে কর্চ্ছে? কোন ক্ষেত্রেই ত' কারুর সঙ্গে কারো কোন দড়াদড়ির বন্ধন দেখতে পাওয়া যায় না। যা' দেখতে পাওয়া যায় তা' হচ্ছে শুধু এই যে, আম, জামের বেগ উৎপন্ন হচ্ছে পৃথিবীর অভিমুখে আর গ্রহগণের হচ্ছে, হয় ত ঠিক সূর্য্যের অভিমুখে। সুতরাং গতির দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে সিদ্ধান্ত করতে হবে যে, কোন না কোন প্রণালীতে বসুন্ধরা আম, জাম প্রভৃতির ওপর স্বীয় কেন্দ্রাভিমুখে এবং সূর্য্যও হয় ত অনুরূপ প্রণালীতে গ্রহগণের ওপর স্বীয় কেন্দ্রাভিমুখে বল প্রয়োগ কর্চ্ছেন এবং এই বলের মাত্রা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ঐ সকল পদার্থের ত্বরণের সমানুপাতিক। নিউটন কল্পনা করলেন যে, রজ্জুর বন্ধন ব্যতিরেকেও দূর হতে একটি জড়দ্রব্য অপর একটিকে আকর্ষণ করতে পারে। আর করতে পার বললেই যথেষ্ট হয় না। এই আকর্ষণের প্রভাব যেমন পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী প্রদেশে সেইরূপ সৌরমণ্ডলে, সেইরূপ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এই বলের নাম হলো 'মহাকর্ষ-বল' (Force of Gravitation). বস্তুতঃ এই বিশ্বব্যাপী বলকে গ্রহণ করতে হবে নিউটনের একটি মানসপুত্র রূপে, বা কার্যের সঙ্গে কারণের সম্বন্ধ নির্দ্দেশের জন্য নিউটনের একটা বড় রকমের Hypothesis বা অনুমানরূপে, যা'র বাস্তব সত্তার একমাত্র প্রমাণ হতে পারে জাগতিক পরিবর্ত্তন-সমূহের ব্যাখ্যাদানে ওর ক্ষমতার পরিচয় দ্বারা।

এখন ভূ-পতন ব্যাপারে আম, জামের বেগ যে উৎপন্ন হয় পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। জিজ্ঞাস্য হয়, সূর্য্য-প্রদক্ষিণ ব্যাপারেও গ্রহগণের বেগ উৎপন্ন হয় কি ঠিক সূর্য্যের অভিমুখেই? তাই যদি হয় তবে সূর্য্যাভিমুখে ওদের ত্বরণের মাত্রাও কি সবার পক্ষে সমান, কিম্বা দূরত্ব ভেদে ভিন্ন ভিন্ন? যদি বিভিন্ন হয়, তবে ঐ সকল ত্বরণের সঙ্গে ঐ সকল দূরত্বের সম্বন্ধ কিরূপ? এইরূপ সকল প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া গেল কেপলারের নিয়মত্রয় থেকে। গ্রহগণের ভ্রমণ প্রণালী সম্পর্কে কেপলার তিনটা নিয়ম প্রচার করেছিলেন, যথা:—(১) যে সকল পথে গ্রহগণ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে সবাই তা'রা উপবৃত্তের (Ellipse) আকার বিশিষ্ট এবং সূর্য্য ঐ সকল উপবৃত্তের একটা নাভিদেশে (Focus) অবস্থিত। (২) গ্রহগণের সূর্য্য প্রদক্ষিণ ব্যাপারে, সূর্য্য ও গ্রহ বিশেষের সংযোগ রেখাটা এমন ভাবে ঘুরে আসে যে, তার ফলে ঐ রেখাটা সমান সমান কালে আকাশের গায়ে সমান সমান ক্ষেত্র (Area) অঙ্কিত করতে বাধ্য হয়। (৩) বিভিন্ন গ্রহের প্রদক্ষিণ কালের বর্গ, এবং সূর্য্য থেকে ওদের গড় দূরত্বের ঘন ফল পরস্পরের সমানুপাতিক। নিউটন প্রতিপন্ন করলেন- কেপ্লারের দ্বিতীয় নিয়ম থেকে এই সিদ্ধান্ত এসে পড়ে যে, সূর্য্য প্রদক্ষিণ ব্যাপারে প্রত্যেক গ্রহের বেগ উৎপন্ন হয় বস্তুতঃই সূর্য্যের অভিমুখে। আর প্রথম নিয়ম থেকে এইটা প্রতিপন্ন হয় যে, সূর্য্য থেকে গ্রহগণের দূরত্ব যে অনুপাতে বাড়তে থাকে সূর্য্যের অভিমুখে ওদের বেগবৃদ্ধির বা ত্বরণের মাত্রা তার বর্গের অনুপাতে কমতে থাকে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য নিউটনকে স্বরচিত গতির নিয়মত্রয় ছাড়া অপর কোন অনুমানের আশ্রয় নিতে হয় নি। কেপ্লারের তৃতীয় নিয়ম প্রথমোক্ত নিয়ম দু'টার corollary বা অনুসিদ্ধান্ত মাত্র। ফলে, মহাকর্ষ

বলকে গ্রহগণের বেগ বৃদ্ধির কারণ রূপে গ্রহণ ক'রে কেপ্‌লারের নিয়ম ক'টাকে নিউটন একটা মাত্র সূত্রের অন্তর্গত করতে সক্ষম হলেন এবং এর প্রয়োগ ক্ষেত্র কেবল সৌর-জগতেই সীমাবদ্ধ নয়, পরন্তু সুদূর নক্ষত্র জগত পর্য্যন্তও ওর ব্যাপ্তি; এইরূপ কল্পনা ক'রে সূত্রটাকে নিম্নোক্ত আকারে প্রকাশ করলেন—জগতের প্রতিজোড়া জড় পদার্থ দূর থেকে পরস্পরকে আকর্ষণ ক'রে থাকে এবং পরস্পরের দূরত্বের ব্যবধান যে অনুপাতে বাড়ে (বা কমে) পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ-বলের মাত্রা তার বর্গের অনুপাতে কমে (বা বাড়ে)। এই নিয়মই মহাকর্ষের নিয়ম। এই নিয়ম যেমন ব্যাপক তেমনি উদার।

কিন্তু প্রত্যেক সাধারণ নিয়মকেই ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োগ দ্বারা পরীক্ষা ও পরিমাপের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হয়। নিউটনও মহাকর্ষের নিয়ম প্রচারের পূর্ব্বে ওর সত্যতা পরীক্ষা করেছিলেন, চন্দ্রের ভূ-প্রদক্ষিণ ব্যাপারে নিয়মটার প্রয়োগ দ্বারা। পরীক্ষার অন্তর্গত যুক্তি এইরূপ। পতন্ত আতাফলের সঙ্গে আকাশের চাঁদের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, উভয়েই বর্দ্ধিত বেগে পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে নেমে আসে। তফাৎ এই যে, আতাফল নামতে সুরু করে বেগহীন অবস্থা থেকে, সুতরাং তা'র গতিপথটা হয় সরল—সোজাসুজি নীচের দিকে। অন্যপক্ষে চন্দ্রের ভূ-পতন সুরু হয়েছিল কবে থেকে সে ইতিহাস আমাদের জানা নেই। অনুমান এই যে সুদূর অতীতে চন্দ্র তার জড়ত্ব ধর্ম্ম বশত; আপন বেগে আপন মনে আকাশপথে ছুটে যাচ্ছিল এবং যাচ্ছিল পৃথিবীর পাশ কাটিয়ে কিন্তু পৃথিবীর আকর্ষণ বলে আটকা প'ড়ে চাঁদ পালাতে পারলো না; পরন্তু বর্দ্ধিত বেগে পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে ক্রমাগত নেমে আসছে এবং ফলে পৃথিবীর কেন্দ্রকে কেন্দ্র ক'রে একটা প্রায় বৃত্তাকার পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে বাধ্য হচ্ছে। সুতরাং মহাকর্ষের নিয়ম সত্য হ'লে বলতে হবে যে, পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে আতাফলের দূরত্বের তুলনায় চন্দ্রের যে অনুপাতে বড় পৃথিবীর অভিমুখে চন্দ্রের ত্বরণ (বা বেগ বৃদ্ধির হার) আতাফলের ত্বরণের তুলনায় তার বর্গের অনুপাতে ছোট হবে। পরিমাপের ফল এই যে, ভূ-কেন্দ্র থেকে চন্দ্রের দূরত্ব আতাফলের দূরত্বের (বা পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধের) প্রায় ৬০ গুণ। সুতরাং পৃথিবীর অভিমুখে চন্দ্রের ত্বরণের মাত্রা হওয়া উচিত আতার ত্বরণের ছত্রিশ শো ভাগের এক ভাগ। আতার ত্বরণ, গ্যালিলিওর সময় থেকেই জানা আছে, সেকেণ্ড প্রতি, প্রতি সেকেণ্ড ৩২ ফুট। সুতরাং চাঁদের ত্বরণটা হওয়া উচিত সেকেণ্ড প্রতি, প্রতি সেকেণ্ডে এক ইঞ্চির প্রায় ৯ ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই উক্তি সত্য কি না তা পরীক্ষার একমাত্র উপায় এই প্রশ্নের উত্তর দান—অতটা দূরের চাঁদকে একটা ত্বরণ নিয়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে হলে প্রতি প্রদক্ষিণের সময় লাগা উচিত কতটা এবং চন্দ্রের সত্যকার প্রদক্ষিণ কালের সঙ্গে তার মিল আছে কি?

হিসাবে পাওয়া যায় যে, ঐ সময়টা হওয়া উচিত প্রায় ২৭ দিন। বস্তুতঃ পৃথিবী থেকে পর্য্যবেক্ষণ ক'রেও আমরা তাই দেখতে পাই এবং সেই জন্যই ব'লে থাকি চান্দ্রমাসের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭ দিন।

এইরূপে মহাকর্ষের নিয়মের সত্যতা প্রতিপন্ন হলো। তখন থেকে জ্যোতির্বিদগণ এই নিয়মের প্রয়োগ দ্বারা গ্রহ-নক্ষত্র, ধূমকেতু এবং অন্যান্য ব্যোমচরগণের গতিবিধি পর্য্যালোচনায় রত রয়েছেন। কালক্রমে বৈজ্ঞানিক ক্যাভেণ্ডিসের লেবরেটরিতে বহুগুণেক্ষুদ্র জড়খণ্ড দ্বয়ের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ব্যাপারেও নিউটনের নিয়মের সত্যতা প্রতিপন্ন হয়েছে। বর্ত্তমান যুগে আইনষ্টাইনের মহাকর্ষের নিয়ম যাথার্থ্য ও ব্যাপকতায় নিউটনের নিয়মকেও অতিক্রম করেছে কিন্তু একথা স্বীকার্য্য যে, আইনষ্টাইনের নিয়মের জন্য নিউটনের নিয়মের আবিষ্কারের অন্ততঃ ততটা প্রয়োজন ছিল, যতটা ছিল নিউটনের নিয়মের জন্য গ্যালিলিও এবং কেপ্‌লারের নিয়মসমূহের।

সুষ্ঠু পর্য্যবেক্ষণের ফলে অনুসন্ধিৎসা আপনি বেড়ে যায় এবং বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নিরূপণে মন স্বতঃই অগ্রসর হয়। ঘটনার অভিব্যক্তির প্রণালী লক্ষ্য ক'রে এবং তা' নিয়ে গবেষণা ক'রে অনেক ক্ষেত্রে কারণ নির্ণয় অথবা অন্ততঃ এইরূপ মত প্রকাশ সম্ভব হয়—অমুক ব্যাপারটা খুব সম্ভবতঃ অমুক ব্যাপারের কারণ। মতটা তখনো থাকে পরীক্ষাধীন এবং তখন তা'কে বলা যায় অনুমান বা Hypothesis. তারপর উদার দৃষ্টি নিয়ে এই কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধকে একটা ব্যাপকরূপ দান করিতে হয়;—যে সম্বন্ধ এখানে খাটে, এখন খাটে এবং এই এই পদার্থের পক্ষে খাটে তা' সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালে এবং সমজাতীয় সকল পদার্থের পক্ষেই খাটবে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত অহেতুক নয়। এর মূলে রয়েছে প্রকৃতিমাতার সমদর্শিতা বা নিরপেক্ষতার প্রতি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ইংরাজীতে এই বিশ্বাসকে বলা হয় Principle of Uniformity of Nature. এইরূপে, বিশিষ্ট স্থানের ও বিশিষ্ট কালের পক্ষে আবিষ্কৃত সম্বন্ধটা একটা সাধারণ—সর্ব্বস্থানিক, সর্ব্বকালিন ও সর্ব্বজনীন রূপ গ্রহণ করে 'প্রাকৃতিক নিয়ম' আখ্যাপ্রাপ্ত হয়। আমরা দেখলাম, মহাকর্ষের নিয়মের আবিষ্কারে বিশেষভাবে এই পদ্ধতিই অবলম্বিত হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে এই পদ্ধতিই বোঝায় এবং এর গোড়া পত্তন করেন নিউটন। জড়-বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি সম্ভব হয়েছে এই প্রণালী অবলম্বন দ্বারা এবং পাশ্চাত্য তর্ক বিজ্ঞানের একটা বিভাগও—যা'কে বলা যায় আরোহমূলক তর্ক-শাস্ত্র (Inductive Logic) জন্মগ্রহণ করেছে এই পদ্ধতিকে আশ্রয় করেই। [ক্রমশঃ

চীন-জাপ্ যুদ্ধ

শ্রীতারানাথ রায় চৌধুরী

(ষষ্ঠ বর্ষ)

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই জাপ-সৈন্যগণ চীনের প্রতিবাদ সত্ত্বেও পিকিং-এর দক্ষিণস্থিত মার্কোপলো ব্রিজ দখল করিতে যায়, বর্ত্তমান চীন-জাপ যুদ্ধের উহাই সূত্রপাত। গত ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই পর্য্যন্ত সম-ভাবেই এই যুদ্ধ চলিতেছে। চীন সাম্রাজ্যের বহু স্থান দখল করিয়াও জাপ এই পর্য্যন্ত যুদ্ধ বিরামের কোন প্রস্তাব দেয় নাই। চীনের দক্ষিণ-প্রদেশ ইউনান্ প্রদেশটী এখন জাপান আক্রমণ করিয়াছে। এই প্রদেশটী ব্রহ্মরাজ্যের ঠিক উপরে-উত্তরে। এই প্রদেশটী নদ-নদী ও পর্ব্বত-বহুল। তবুও এই স্থানে চীনের সৈন্যগণ প্রবলভাবে জাপানকে বাধা দিতেছে। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী বন্দরগুলি জাপানের দখল হওয়াতে এবং ইন্দোচীন, শ্যাম এবং ব্রহ্মরাজ্য দখল করাতে জাপানের পক্ষে ইউনান্ প্রদেশ আক্রমণ করা সহজ হইয়াছে। এই প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে শ্যামরাজ্য। এবং ঠিক পশ্চিমে তিব্বতের মালভূমি। এই পথে ভারতবর্ষ আক্রমণ করা জাপানের পক্ষে সহজ। তিব্বত ও ব্রহ্মরাজ্য দিয়া ভারতের পূর্ব্ব-উত্তর সীমান্ত আক্রমণ করা সহজ কিন্তু, এই পথে বিপুল পর্ব্বতরাজি বাধাস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। যে সামান্য কারণে জাপান ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে, সেই কারণটী খুব সামান্যই বটে। মার্কোপলো ব্রিজের অভিযানে একজন জাপসৈন্য নিখোঁজ হয়। এবং কোন অজ্ঞাত স্থান হইতে একটী গুলিও জাপ-সৈন্যদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। জাপান প্রাকার বেষ্টিত চীন সাম্রাজ্যের রাজধানী পিকিং সহরে আততায়ীর সন্ধান করিতে খানাতল্লাসী করিবার দাবী করে। নগররক্ষী সৈন্যগণ জাপসৈন্যগণকে নগরে প্রবেশ করিতে দেয় না। ৯ই জুলাই অতি প্রত্যুষে জাপান নগরী আক্রমণ করে। নগরীর চৈনিক সৈন্যগণ যুদ্ধ করিবে কিনা তাহাই ভাবিতেছিল, কিন্তু জাপানের তাহাতে বিলম্ব সহে নাই। দেখিতে দেখিতে সমস্ত উত্তর চীন জাপসৈন্য ছাইয়া ফেলে। ইহাতে বুঝা যায়—চীন সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে উহা জাপানের পূর্ব্ব পরিকল্পনা ছিল, নহিলে এত দ্রুত সৈন্য-সমাবেশ করা সহজ হইত না।

প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধেও জাপান এই নীতিই গ্রহণ করিয়াছিল। জাপান সরকার চীন হইতে আপনাদের রাষ্ট্র-দূতকে চলিয়া আসিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে উপদেশ দেন। নানকিং হইতে চীন গভর্ণমেন্ট গোলমাল মিটাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু জাপান কোন প্রস্তাবেই কাণ দেয় নাই, বরং চীনকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য যুদ্ধ চালাইতে থাকে, জাপ-সেনাপতি মনে করিয়াছিল, এই অকস্মাৎ আক্রমণে চীন নতজানু হইয়া জাপানের নিকট দয়া ভিক্ষা করিবে। কিন্তু চিয়াংকাইসেক্-গভর্ণমেণ্ট পরিশেষে অস্ত্রবিনিময়েই জাপানের হঠকারিতার উত্তর দিতে প্রস্তুত হইল। সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিয়াছে। এশিয়ার শান্তির জন্য এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকা মধ্যপথে দাঁড়াইবার ফলে যুদ্ধ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

ইংরেজ ও আমেরিকা চীনকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিল, ব্রহ্মের পথে অস্ত্র সরবরাহ করিবার চেষ্টাও করিয়াছিল এবং জাপানও বুঝিতে পারিয়াছিল—যদি ব্রহ্মপথে ব্রিটিশ বা আমেরিকা চীনকে প্রচুর সমর-সম্ভার যোগাইতে পারে, এবং আধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে চীনা-সৈন্যগণকে প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা হইলে জাপানের চীন-বিজয় সফললাভ নাও হইতে পারে।

এশিয়ার জাপান একটি প্রথম শ্রেণীর শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়—ইহা ইউরোপীয় জাতিসমূহের ইচ্ছা নহে, বিশেষতঃ চীন-জাপানের মৈত্রী বন্ধন হইলে এসিয়াস্থিত ইউরোপীয় রাজ্যগুলি শুধু বিপন্ন হইবে না, হয় ত ইউরোপীয়কে এসিয়া ছাড়িয়াও যাইতে হইবে। চীনকে ব্রিটিশ-ও আমেরিকার সাহায্যের একমাত্র কারণও তাই।

বৃটিশ ও আমেরিকা অর্থনৈতিক দিক দিয়া চীনের উপরে আধিপত্য করিয়া আসিয়াছিল। চীনের চৌদ্দ আনা ব্যাবসা বাণিজ্য ইংরেজ ও আমেরিকার হাতেই ছিল। চীনকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে কেহই দেয় নাই। বিগত রুশো-জাপান যুদ্ধের মূলেও ছিল ইউরোপের চক্রান্ত। শক্তিশালী জাপান আক্রমান্ রুশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে ব্রিটেন মনে করিয়াছিল, এই যুদ্ধে যে পক্ষই পরাজিত হউক, তাহাতেই ব্রিটেনের লাভ।

তখন রুশিয়ার ভারত আক্রমণের স্বপ্ন ব্রিটিশ দেখিতে-ছিল, তাই মনে করিয়াছিল রুশ যদি পরাজিত হয়, তাহা হইলে ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা দূর হইবে, আর জাপান

যদি পরাজিত হয়, তাহা হইলেও এশিয়ার নব জাগ্রত শক্তি হ্রাস হইবে। এ কথাও ঠিক, সেই যুদ্ধে যদি রুশিয়ায়া জয়লাভ করিত, তাহা হইলে সমগ্র চীনসাম্রাজ্য রুশ জয় করিত। এবং ইংরেজ আদি জাতিকে রুশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইত।

মিত্র রুশ

আজ রুশ ইংরেজের মিত্র, মিত্র না হইলে রুশের উপায় ছিল না। জাপান এক সময় ইংরেজের পরম মিত্র ছিল, আজ জাপান ইংরেজের বৈরী। ইংরেজ হইতে যে জাপান অধিক চতুর—এবারকার যুদ্ধে বেশ বোঝা গিয়াছে, অপর দিকে রুশও জাপানের মিত্র। এই রুশমিত্র যদি আজ সাইবেরিয়ার পথে জাপানকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে চীন অভিযানে জাপান বিপদে পড়িত—কখনও মালয় ও জাপান দখল করিতে পারিত কিনা সন্দেহ।

জাপানে আজ মিলিটারী শাসন চলিতেছে। ১৯৩৫-খৃষ্টাব্দ হইতেই জাপানের রাষ্ট্র শাসন ব্যাপারে একটা উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছিল। ১৯৩৬ এবং '৩৭ খৃষ্টাব্দের সাধারণ নির্ব্বাচনের ফল দেখিয়া জাপানের সামরিক সঙ্ঘ বিচলিত হইয়া উঠে।

অবাধে হত্যা

নির্ব্বাচনের ফল দেখিয়া জাপানের সামুরাইগণ এত বিচলিত হয় যে, তখন তাহাদের দ্বারা যে কোন অন্যায়ই সম্ভব হইয়া উঠে। সৈন্যগণ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের প্ররোচনায় উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী ও সামরিক সঙ্ঘের বিরোধীগণকে হত্যা করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠে। এই ক্ষেপার ফলেই অকস্মাৎ টাকানসিও সহ চারিজন মন্ত্রীকে অতি নির্ম্মম ভাবে হত্যা করা হয়—সামরিক সঙ্ঘ অনেকদিন হইতেই জল্পনা কল্পনা করিয়া আসিতেছিল। সুযোগ পাইলেই তাহারা সোভিয়েট রুশিয়াকে আক্রমণ করিবে, কেন না রুশের বলসেভিক অতি দ্রুত চীনের সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা বাধা করিতেছিল। এই বলসিভিক ভাবধারার অবসান ঘটাইতে না পারিলে—জাপানে সাম্রাজ্য বিস্তারের বিষম বাধা উপস্থিত হইবে। টাকানসিও একজন ধনকুবের ছিলেন।

সমগ্র রুশ ব্যবস্থার উপরে তাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। জাপানে এই সামরিক সঙ্ঘও খুব প্রতিপত্তিশালী। সামরাইগণ ঠিক আমাদের দেশের রাজপুতনার মতন। ষ্টেট্ এই সামুরাইগণের নিকটে সর্ব্বপ্রকারে ঋণী। উহারাই যুদ্ধে সৈন্য যোগায়, যুদ্ধ পরিচালনায় সেনাপতি যোগায়। ইহাদিগকে উপেক্ষা করিলে জাপানের সাম্রাজ্য রক্ষাই দুষ্কর হইয়া উঠে। ইহারা আবার স্বদেশভক্ত, উগ্র সমরপ্রিয়। ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ মালিক টদেরা খুবই ঘৃণা করে। পৃথিবী-ব্যাপী ইউরোপের সাম্রাজ্য বিস্তার হয় ইহাই ইহাদের বাসনা। সে পথে বাধা—শ্বেতাঙ্গ জাতি। মন্ত্রানের যে কেহই এই শ্বেতাঙ্গ জাতির সহিত মিত্রতা করিতে যাইবে, তাহারই বিপদ। বিশেষতঃ সম্রাট পরিবার ত এই সমরদলকে খুব খাতির করিয়া থাকে।

নান্‌কাই বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসেই অতি দ্রুত গতিতে সর্ব্ব প্রকারের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চীন অধিকারে আবার ব্যস্ত হইয়া উঠে। যখন যে স্থানটী তাহারা দখল করিয়াছে, সেই স্থানেই অবাধে হত্যাকাণ্ড চালাইয়াছে; ২৯শে জুলাই জাপসৈন্য চীন নান্‌কাই বিশ্ববিদ্যালয়টী ধ্বংস করিয়া দেয়। প্রাচীন স্মৃতি পুঁথি পুস্তক, গবেষণাগার, সংগ্রহ পূর্ব্বক যাহা কিছু অমূল্য সম্পত্তি ছিল, সমস্তই নষ্ট করিয়া দেয়। মোগলেরা চীনে অত্যাচার করিয়াছে সত্য, কিন্তু কখনও চীনের ঐতিহাসিক বিষয় বস্তুগুলি তাহারা নষ্ট করে নাই।

চীনের ঐক্য

যে দিন নান্‌কাই বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হয়, চীনের নর-নারী অবাধে হত হইতে থাকে, সেই দিন কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি চীনে সমুত্থ হইয়া উঠে। সেই দিন চীন একতায় বদ্ধ হইয়া একই পতাকা নিয়ে দাঁড়াইয়া জাপানের বর্ব্বর আক্রমণ হইতে প্রিয় জন্মভূমিকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত হয়। চীনের কমিউনিষ্টগণ সেই দিনই জেনারেল চিয়াংকাইসেকের সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ হয়, যে সকল কমিউনিষ্ট নেতা বিশেষ যে সাতজন প্রসিদ্ধ চৈনিক নেতা এতদিন কারাগারে বদ্ধ ছিল, তাঁহারা তখনই মুক্তি পায়। এই নেতাগণ "Save The Nation Union" সঙ্ঘের দলভুক্ত নেতা। চীনজাতি রক্ষা ইউনিয়ান, একটী প্রাচীন সঙ্ঘ। বৈদেশিক প্রভাব হইতে চীনকে মুক্ত রাখাই এই সঙ্ঘের কাজ। জাপানের এই নির্ম্মম আঘাতে উত্তর চীন হইতে দক্ষিণ ইউনিয়ন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র জনগণ একত্র হইয়া জেনারেল চিয়াং কাইসেকের সহযোগিতা করিতে হইত না। চীনের ইতিহাসে সেদিনকার ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

সাংহাই অভিযান

একদিকে যেমন চীনের সকল শ্রেণী স্বদেশ রক্ষার জন্য প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করিল, অপরদিকে জাপানের বিপুল বল, প্রসিদ্ধ সাংহাই প্রদেশ আক্রমণ করিল। সাংহাই-ই চীনের অর্থনৈতিক ঐশ্বর্য্যশালী কেন্দ্র! নান্‌কিং সরকার যাহাতে

চীনে সাহায্য না পাইতে পারে, তজ্জন্যই সাংহাইকে সহসা আক্রমণ করে।

চীন-জাপ যুদ্ধের এই ষষ্ঠ বর্ষ অতীত হইল, জাপানের পরিকল্পনা কি? এটা বুঝা খুব শক্ত; অনেকেই মনে করিয়াছিল, ব্রহ্মদেশের পরেই জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে। তাহারা ভারতের পূর্ব্ব সীমান্ত আক্রমণ করিয়াছে সত্য, কিন্তু ভারত বিজয়ের কোন লক্ষণই এই পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। ব্রিটিশের বর্ত্তমান ভারত শাসননীতিজ্ঞ জাপানের সামরিক আর্য্যগণের পক্ষে সুবিধাজনক। এই ষষ্ঠ বর্ষের পরে চীন জাপ যুদ্ধের পরিণতি কোথায় গিয়া দাঁড়াবে, কেহ ইহা বলিতে পারে না। ইউনান প্রদেশ দখল হইয়া গেলে তবে জাপানের ভবিষ্যৎ রণনীতি কি—তাহা বুঝা যাইবে।

১৯৩৭ সালের ১১ই আগষ্ট তারিখে জাপান সাংহাই আক্রমণ করে; তিনমাস যুদ্ধের পরে সাংহাই দখল হয়। চাইনিজরা ভাল যোদ্ধা, কিন্তু আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র তাহাদের নাই সাংহাই-এর পরে নান্‌কিং-এর পতন হয়।

এই সময়ে জেনারেল চিয়াং-কাইশেখ বেতার যোগে সমগ্র জাতিকে বলিয়াছিলেন :—

"The basis of China's future success in prolonged resistance is not found in Nanking or big cities, but in villages all over China and the fixed determination of the people."

বর্ত্তমানে যে-যুদ্ধ দক্ষিণ চীনে হইতেছে, এখানকার জয় পরাজয়ের উপরে চীনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। চিয়াং প্রদেশের পর প্রদেশ হারাইয়াছে দুইটা রাজধানীই জাপান দখল করিয়াছে। তবুও চীন আমরা যুদ্ধ করিব। পাহাড়ে, পর্ব্বতে বনে, জঙ্গলে, আজ চীনবাহিনী সৈন্যগণ ও সাধারণ যোদ্ধাগণ নানা অসুবিধা সত্ত্বেও জাপানের প্রতি আক্রমণ বাধা দিতেছে! চুনকিং পুনঃ পুনঃ জাপানী বোমাতে বিধ্বস্ত হইলেও ভাল যুদ্ধ করিতেছে। চীনের আভ্যন্তরীন্ শাসন ব্যবস্থাও আজ কতকটা জাপানের হাতে! কাচা মাল ও অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম জাপান হস্তগত করিয়াছে। ব্রহ্ম ও মালয় জয় করিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের সন্ধি-স্থান সিঙ্গাপুর দখল করিয়া জাপান পূর্ব্বদেশে অতিশয় শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে বঙ্গ-সাগরও আন্দামান্ দ্বীপ-পুঞ্জ দখল করিয়া বঙ্গদেশের পক্ষে দুর্ভাবনার কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

চীনযুদ্ধের উপরেই আমাদেরও ভবিষ্যত নির্ভর করিতেছে, কেন না যদি জাপান ইউনানে পরাজিত হয়, তাহা হইলে সহজেই ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ আক্রমণ করিতে পারিবে এবং জাপ-মুক্তি করিতে পারিবে, আর যদি জাপান ইউনান্ প্রদেশ দখল করে, চীনের পতন ঘটে তাহা হইলে চীন-জাপ যুদ্ধের পরিণতির পরিনাম—আমাদের পক্ষে ভয়াবহ। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক গণ সেই ইতিহাস লিখিবার জন্য বসিয়া আছে

ভারতীয় প্রসঙ্গ

বাংলার জীবন-সমস্যা

ডাঃ মুঞ্জে কলিকাতা, তমলুক, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ মাদারীপুর প্রভৃতি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চল পরিভ্রমন করিয়া অনাহারক্লিষ্ট বাঙালীর যে দুর্গতি দেখিয়াছেন, বিভিন্ন জনসভায় তাহা বিবৃত করিয়া গভর্ণমেণ্টকে বার বার অবহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্ক প্রভৃতি স্থানে জনসভায় ডাঃ মুঞ্জে বলিয়াছেন: ভারতের চিন্তারাজ্যে বাঙলা চিরদিন শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছে; বাঙলা যদি আজ দুরবস্থায় পতিত হয়, তবে ভারতের চিন্তা-জগতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। কোনো জাতির মনীষা অনাহারে স্থির থাকে না। বাঙলার এই মন্বন্তর কেবল কয়েক সহস্র ভিক্ষুকের দুর্গতিই বৃদ্ধি করে নাই,—গোটা বাঙালী জাতিই, আজ বলিতে গেলে, ভিক্ষুক।···প্রদেশে দ্বৈত শাসন চলিতেছে। স্থায়ী আমলাতন্ত্র মন্ত্রিমণ্ডলকে যে তথ্য যোগান, তাহার উপরই তাঁহারা নির্ভর করেন। যদিও তাঁহারা অযোগ্য নহেন, তবু দেখা গেল—দুর্ভিক্ষ যখন বাঙলার নরনারীকে গ্রাস করিতে ছুটিয়া আসিল, তখন তাঁহাদের অপরিসীম শক্তি-সামর্থের গৌরব ম্লান হইয়া গেল। দেশবাসীকে শান্তি-শৃঙ্খলায় রক্ষা করিবার ষোলআনা গৌরব যাহারা স্ফীতবক্ষে বহন করেন, তাঁহারা ৬ কোটি বাঙালীর অন্ন সরবরাহের দায়িত্ব যথাসময়ে যথাযথ পালন করিতে পারেন নাই।

বস্তুতঃ মন্ত্রিমণ্ডলীর ক্ষমতা সম্পর্কে পদত্যাগ বিবৃতিতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতেই যথাযোগ্য প্রতীতি জন্মে। আসলে বাঙলা তথা ভারত গভর্ণমেণ্টের বিন্দুমাত্র সহানুভূতিশীল বিচারদৃষ্টি থাকিলেও সারা বাঙলায় এই মৃত্যুর বন্যা বহিত না। একদিকে লক্ষ লক্ষ নাগরিক ও ভিক্ষুকের প্রাত্যহিক অনাহার-ক্লিষ্টতা, আর একদিকে চোরাবাজারের ব্যবসায়িক গৃধ্নুতা ও গভর্ণমেণ্টের মুদ্রাস্ফীতি জনিত বিশিষ্ট শ্রেণীগত বাবুয়ানা, ইহার মধ্যে মন্ত্রিমণ্ডলীর যথার্থই করণীয় কর্ত্তব্য যথেষ্ট ছিল, যাহা তাঁহাদের আত্মধর্ম্ম রক্ষা করে কিছু একটা সংঘটিত হয় নাই। ডাঃ মুঞ্জের বক্তব্যের মধ্যে এ সম্পর্কে যথেষ্ট ভাবিবার রহিয়াছে।

সম্প্রতি বাঙলার কোন কোন অঞ্চলে আমনধান ফলিয়াছে। কিন্তু তৎসত্বেও মফঃস্বলের বহু ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে—চাউলের দর স্বল্প হ্রাস হইয়াছে মাত্র, কিন্তু এখনও লোকের ক্রয়-ক্ষমতায় আসিয়া দাঁড়ায় নাই। এদিকে গভর্ণমেণ্ট যথেষ্টই আইন করিতেছেন বটে, কিন্তু ততই চোরাবাজারের প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে ভিন্ন কমিতেছে না। গভর্ণমেণ্টের সেইদিকে কতখানি দৃষ্টি আছে, জানি না। মুন্সীগঞ্জে ৫০ হাজার এবং নোয়াখালিতে আড়াই লক্ষ লোকের মৃত্যু কেমন করিয়া এবং কি কারণে ঘটিয়াছে, ঢাকা সহরের গ্রামের পর গ্রাম কেমন করিয়া মহা শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, গভর্ণমেণ্টের তৈলদাতা মন্ত্রিমণ্ডলী তাহা কি আমাদিগকে বলিয়া দিতে পারেন!

গভর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, সরকারী পক্ষ এবারে আর নূতন ধান কিনিবেন না, এবং রেশন প্রবর্ত্তনে কলিকাতার খাদ্য বাঙলার বাহির হইতে আনিয়া নাগরীকদিগের নিরাপত্তা ও জীবন রক্ষা করিবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের এইদিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন—যাহাতে মফঃস্বল অঞ্চলগুলিতেও মানুষের ক্রয় ক্ষমতামূল্যে চাউলের দর হ্রাস পায়, এবং চোরাবাজার একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যায়।

বাঙলার এই কঠিন জীবন-সমস্যায় গভর্ণমেণ্ট যদি তাঁহার সুষ্ঠু পরিচালনা ও যথেষ্ট ত্যাগের দ্বারা এখনও বাঙলার নিরাপত্তার দিকে ফিরিয়া না তাকান, তবে শুধু বাঙলাই মরিবে না, বাঙলার শ্মশান-চুল্লীতে সমগ্র ভারতেরই আত্মাহুতি হইবে। আর ভারতের ধ্বংস মানে—বৃটিশ গভর্ণমেণ্টেরই সাম্রাজ্যলোপ!

নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলন

গত ১০ই জানুয়ারী সোমবার মাদ্রাজে নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 'বোম্বাই ক্রনিকেল' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভী সভার পৌরহিত্য করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় শতাধিক সম্পাদক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এতদ্ব্যতীত উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, মাদ্রাজের মেয়র ডাঃ সৈয়দ নায়ামতুল্লা, স্যার এন, গোপাল স্বামী আয়েঙ্গার, মিঃ টি, আর ভেঙ্কটরাম শাস্ত্রী, মিঃ টি, টি, কৃষ্ণমাচারী, স্বামী ভেঙ্কটেশ্বরাম প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিগত ১৯৪০ সালের ২৬শে অক্টোবর ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের উপর যে কঠোর আদেশ জারী করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিক্রিয়া ক্রমাগতই ঘটিতেছে। নির্ভীক মত পরিবেশনে ও জাতীয় বাণী প্রচারে সংবাদপত্রের যদি স্বাধীনতা না থাকে, তাহা দেশের ও গভর্ণমেণ্টের গঠন-শীলতার পক্ষেই অকল্যাণকর। এতদসম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার দ্বারা সম্মেলনে পাঁচটী দাবীর প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। যথা :

(ক) ভারতে সংবাদপত্র মুদ্রনের কাগজের আমদানী বৃদ্ধির দাবী।

(খ) সৈন্যদলের মধ্যে সংবাদপত্র বিলি করার সুযোগ সুবিধার দাবী।

(গ) প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট-বনাম প্রেস এ্যাডভাইসরি কমিটির সম্বন্ধ।

(ঘ) ভারতে আসার ও ভারত হইতে বিদেশে যাওয়ার সময় সংবাদ সম্পর্কে সেন্সর ব্যবস্থা।

(ঙ) শান্তি সম্মেলনে বিশ্বের সমস্ত সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ব্যবস্থা।

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সমস্যা

বিগত মহাযুদ্ধকালে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্পর্কে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কোনো পরিকল্পনা না করিবার ফলে যুদ্ধের পর যে ঘোর বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই বিষয়ে অবিহিত হইয়াই সম্ভবতঃ বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের গোড়াতেই ১৯৪১ সালে গভর্ণমেণ্ট পুনর্গঠন কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাহাও একরকম দুইবৎসর পূর্ণ হইয়া গেল, অথচ পুনর্গঠন সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের তেমন কোন চাঞ্চল্য বা ক্ষীণ প্রচেষ্টামাত্রও দৃষ্ট হইতেছে না।

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্ কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনে সভাপতি ডাঃ বি, ভি, নারায়ণ স্বামী তাঁহার অভিভাষণে গভর্ণমেণ্টের এই অহেতুক শৈথিল্যের উল্লেখ করিয়া বলেন : এ দেশে সরকারপক্ষ যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন বিষয়ে পরিকল্পনা প্রনয়ণ করিতে বিশেষউদ্যম দেখান নাই। ইহা নারায়ণ স্বামীর ব্যক্তিগত বক্তব্য নহে; ভারতের ইউরোপীয় বণিক-সঙ্ঘের পক্ষ হইতেও এমন অনুযোগ উঠিয়াছে, এমন কি মিঃ জে, এইচ বার্ডারও সম্প্রতি এ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্সের অধিবেশনে এই মন্তব্য ব্যক্ত করিয়াছেন।

ভারতে আজ যে বিশৃঙ্খলতা ও পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার সমাধান যদিও এখনই করা কর্ত্তব্য ছিল গভর্ণমেণ্টের, কিন্তু ইহাও সত্য যে, এই কঠিন সমস্যা একদিনেই মিটিবার নয়। তাহার পিছনে যথেষ্ট গুরুদায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। বিশেষতঃ বাঙলার সমাজ-জীবনে যুদ্ধজনিত যে বিপুল আগুন ধরিয়াছে, তাহা শুধু কথার দ্বারা পূর্ণ হইবার নয়।

সম্প্রতি বিলাতী শ্রমিকদলের এক ডেপুটেশন ভারতবর্ষ তথা বাংলার বর্ত্তমান অবস্থার জন্য ভারতসচিবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। উক্ত ডেপুটেশনের কার্য্যসূচীতে তিন প্রকার কর্ম্ম-পদ্ধতি অবলম্বন করিতে বলা হইয়াছে। যথা : (ক) বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন, (খ) লোকের দুর্দ্দশার প্রতিকারের জন্য সদ্য যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে হইবে, এবং (গ) এইরূপ সঙ্কট ভবিষ্যতে যাহাতে আর না ঘটে, তজ্জন্য দীর্ঘ কালোপযোগী প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

ভারত তথা বাঙলার নিরাপত্তার জন্য কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া কি পদ্ধতিতে চলিলে সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সূচিত হইতে পারে—গভর্ণমেণ্ট এখনও কি তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন? যে দেশের দুর্ভিক্ষ ও মহামারী পর্য্যন্ত সরকার পক্ষ কর্ত্তৃক যথেষ্ট নিষ্ঠার সহিত স্বীকৃত হয় নাই, সে দেশের প্রতি মমতার দাবী করা বাতুলতা মাত্র, তবে এখনও গভর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে তৎপর হউন, ইহাই আমাদের প্রধান বক্তব্য ও প্রার্থনা।

নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভা

গত ২৬শে ডিসেম্বর অমৃতসরে (তিলকনগরে) বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে নিখিল ভারত হিন্দু-মহাসভার রজত-জয়ন্তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অধিবেশনের সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তিলেকনগরে প্রবেশ করিলে জনৈক তরুণ ছাত্র তাঁহার ললাটে রক্ত-তিলক পরাইয়া দেয়। অতঃপর বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত ও বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রায় সহস্রাধিক সদস্য ও প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তাঁহাদের মধ্যে ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রবাসী ভারতীয় বিভাগের সচিব ডাঃ এন্, বি খারে, ডাঃ মুঞ্জে, কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী, রাওসাহেব গোকুলদাস, সিন্ধুর দুইজন মন্ত্রী, রাজা নরেন্দ্র নাথ, রাজা মহেশ্বরদয়াল শেঠ, ভাই পরমানন্দ, শ্রীযুত থাপার্দ্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত বার সাভারকার, শ্রীযুক্ত কে, এম, মুন্সী, চীন সাধারণ তন্ত্রের নয়াদিল্লীস্থ কমিশনার, ভারত গভর্ণমেণ্টের আইন সচিব স্যার অশোক কুমার রায়, স্যার রাধাকৃষ্ণণ

জ্ঞার সাদিলাল, কপূরতলার মহারাজা, সর্দার বলদেব সিং দেওয়ান বাহাদুর কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার, শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেহতা প্রভৃতি বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ অধিবেশনের সাফল্য কামনা করিয়া বাণী প্রেরণ করেন।

বৈদেশিক প্রসঙ্গ

পার্লামেণ্টের উপনির্ব্বাচন

ইয়র্কসায়ারস্থ স্কিপটন কেন্দ্র হইতে পার্লামেণ্টের সাম্প্রতিক উপনির্ব্বাচনে নবগঠিত কমনওয়েলথ্ পার্টির মিঃ ইউ, ম্যাকডোয়াল লসন্ রক্ষণশীল দলের প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দান এই নবগঠিত পার্টির অন্যতম নীতি। এই উপনির্ব্বাচনের দ্বারা শ্রমিক দলের ও পার্লামেণ্টের কমনওয়েল্থ্ পার্টির আসন (৩+৩) সমান হইল। উপনিবেশসমূহকে স্বায়ত্তশাসন দান, খনি এবং অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় শিল্পগুলিকে জাতীয় সম্পদে পরিণত করা, জাহাজ ও বিমান চলাচল এবং আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্বরাষ্ট্র পরিষদগঠন প্রভৃতি কমনওয়েল্থের অন্যান্য নীতি। আমরা ইহার ভবিষ্যৎ আশাপথ চাহিয়া আছি।

ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে মিঃ ষ্টিফেন্স ডুগান

ইনষ্টিটিউট অব ইণ্টারন্যাশনাল এডুকেশন প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর মিঃ ষ্টিফেন্স ডুগান সম্প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠানের মাসিক পত্রে ভারতের স্বাধীনতা দাবী সম্পর্কে এক আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন: যুদ্ধের পর ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশকে অধিক পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে তাহাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের পূর্ণাধিকার দেওয়া হইবে না। কেন না, তাহারা এখনও নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখে নাই। ভারতের সমস্যা সমাধান করা সর্ব্বদাই কঠিন হইবে, তবে খুব সম্ভব ভারতবর্ষকেও স্বাধীনতা দেওয়া হইবে না। যুদ্ধের প্রথম বৎসরে হিন্দুদের অহিংসাত্মক মনোভাব এবং মুসলমানদের ক্রমবর্দ্ধমান পাকিস্তানের দাবীতে বৃটিশ মনোভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে।

ষ্টিফেন্স ডুগান কোন্ শ্রেণীর লোক, তাহা তাঁহার উক্তি হইতেই প্রতীয়মান হয়। এমন অনেক ধুরন্ধরই বৃটিশ রাজ-তন্ত্রের আনাচে কানাচে নির্ভাবনায় বসিয়া বসিয়া মেদ বৃদ্ধি করিতেছেন—যাহার পরিচয় অন্ততঃ ভারতের চোখে আজ আর ঢাকা নাই।

স্বদেশ প্রেমের পরাকাষ্ঠা

দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট ভারতবাসীর জন্য যখন বৃটিশ মন্ত্রিসভায় এতটুকুও ক্ষোভ বা চিন্তার নিদর্শনমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, এবং রুজভেল্ট সাহেবের গণতান্ত্রিক প্রাণশীলতা পর্য্যন্ত সঙ্কোচনের পথ ধরিল, তখন যথার্থই আমরা এক অপরিসীম হৃদয়বত্তার পরিচয় পাইলাম তিন জন মার্কিন বালিকার নিকট হইতে। বালিকা তিনজন দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ভারতীয়দের সপক্ষে নিউইয়র্কের বৃটিশ কন্‌সালেটের সম্মুখে পিকেটিং করিতে যান। ফলে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। মার্কিন বিচারকের নিকট উপযুক্ত সময় তাঁহাদিগকে এই (গুরুতর?) অপরাধের জন্য আনায়ন করা হইলে বিচারক তাঁহাদিগকে রেড্ক্রশ বা অনুরূপ কোনো প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে বলিয়া এক উপদেশ প্রদান করিয়া বলেন, "বহু দূরবর্ত্তী ভারতের জন্য মাথা না ঘামাইয়া স্বদেশের জন্য মাথা ঘামাও।"

স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি মার্কিণ বিচারকের এই অনুরাগের যথার্থই তারিফ করিতে হয় বটে।

২য় খণ্ড—৩য় সংখ্যা　ফাল্গুন—১৩৫০　একাদশ বর্ষ

বি, সরকার এণ্ড সন্স

লিমিটেড

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কারাদি এবং রৌপ্যের বাসনাদি নির্ম্মাতা

আমাদের নামের সহিত অনেকটা নামগুপ্ত আছে এরূপ অনেকগুলি নূতন দোকান হইয়াছে তাহার কোনটিকে আমাদের দোকান বলিয়া ভ্রম না হয় এ জন্য আমাদের দোকান "গি নি হা উ স্‌" নামে অভিহিত ও রেজেষ্ট্রি করা হইয়াছে। একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানাবিধ অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত থাকে এবং অর্ডার দিলেও অতি যত্নের সহিত প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। ভিঃ পিঃ পোষ্টে সর্ব্বত্র গহনা পাঠাই। পুরাতন সোনা বা রূপার বাজার-দর হিসাবে মূল্য ধরিয়া নূতন গহনা দেওয়া হয়। জগদ্ব্যাপী অর্থ সঙ্কটপ্রযুক্ত আমাদের সমস্ত গহনারই মজুরি কম করা হইয়াছে। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

টেলিগ্রাম — গিনিহাউস
ফোন — বড়বাজার ৩০

১৩১, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা

আমাদের আর কোন ব্রাঞ্চ দোকান নাই।

আমাদের কোন অংশীদারদিগের ভিতর কেহ পৃথক্ গহনার দোকান করেন নাই।

RENOWNED JEWELLER of TASTE AND NOVELTY:

D. N. ROY & BROS.

Manufacturing Jewellers.

YOUR KIND PATRONAGE SOLICITED.

CATALOGUE SENT FREE ON APPLICATION.

153-5, Bowbazar Street, Calcutta.
(Near Sealdah Church)

Dutta & Co;
QUALITY SHOE MAKERS
CHEAPEST, BEST AND DURABLE
STOCKISTS: CAWNPORE -AND- AGRA SHOES.
16/1, SHYAMACHARAN DEY STREET,
COLLEGE ST, COLLEGE ROW & SHYAMACHARAN DEY ST, JUNC
CALCUTTA.
G.D.N.

TO GET FAITHFUL REPRODUCTION

A nice picture, True-To-Original solely depends on better blocks and neat printing. So many persons take excellent care of their advertisement pictures, but neglect the block-making and printing. To get better result of your advertisement campaign, you should rely on our skilled men who are always ready to help you with their expert advice and will do justice to the original in reproducing it to its proper tone value, depth of etching, neat but bright and charming prints.

Make us responsible for all your process works and colour printings

REPRODUCTION

PROCESS ENGRAVERS *Syndicate* COLOUR PRINTERS

7·1 CORNWALLIS STREET · CALCUTTA

TELEPHONE
B·B·601

ভগ্ন স্বাস্থ্য হইতে অটুট স্বাস্থ্য
সম্ভব-যদি আপনি
করেন
কল্পান
পূর্ব্ব নাম
কল্পতরু রসায়ন
২২৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

Gram—"SUCOO" Phone—CAL. 5733.

Balsukh Glass Works

Manufacturers of

QUALITY GLASS WARE

SPIRIT BOTTLES

A SPECIALITY.

S. R. DAS & CO.,

Managing Agents.

Factory :

4B, Howrah Road,

HOWRAH.

Office :

7, Swallow Lane,

CALCUTTA.

মহাসমর ! **মহাসমর !!**

ইউরোপের মহাযুদ্ধের প্রতিঘাত ভারতেও অনুভূত হইতেছে। এই দুর্দ্দিনে দেশের অর্থ দেশে রাখুন এবং দেশের সহস্র সহস্র নরনারীর অন্ন-সংস্থানের সহায়তা করুন। ভারতে উৎপন্ন তামাকে হাতে তৈয়ারী, ভারত বিখ্যাত

যাহা মোহিনী বিড়ি, মোহিনী ২৪৭ বা ২৪৭নং বিড়ি বলিয়া পরিচিত, সেবন করুন। ধূমপানে পূর্ণ আমোদ পাইবেন। আমাদের প্রস্তুত বিড়ি, বিশুদ্ধতার গ্যারাণ্টি দিয়া বিক্রয় করা হয়। পাইকারী দরের জন্য লিখুন। একমাত্র প্রস্তুতকারক ও স্বত্বাধিকারী—

মুলজী সিক্কা এণ্ড কোং

হেড অফিস—৫১, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ—১৬০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা ;

সরায়াগঞ্জ, মজঃফরপুর, বি-এন-ডবলিউ-আর।

ফ্যাক্টরী—মোহিনী বিড়ি ওয়ার্কস্,

গোণ্ডিয়া, (সি, পি) বি-এন-আর। আমাদের নিকট বিড়ি প্রস্তুতের বিশুদ্ধ তামাক ও পাতা খুচরা ও পাইকারী হিসাবে পাওয়া যায়।

দরের জন্য লিখুন

কি বল্‌ছেন ?

কেন ? আপনি কি কালা নাকি ?

নাক-আবার কি, একেবারেই যে ? বেশ, ত, আপনি আজই শ্যারম্যান "ডেফ্‌টোনো অয়েল" ব্যবহার করুন। ইহা সর্ব্বকারণজনিত বধিরতার অমোঘ মহৌষধ. প্র৺৵ শিশি নেট্‌ মূল্য ৭।০ টাকা। অর্শ ও ভগন্দর চিরতরে নির্ম্মূল করুন। "পাইলস্ ক্রু" ১ মাসের মূল্য ১২৸০। হাঁপানির জন্য আর ভাবেন কেন ? ৩০৲ টাকায় চুক্তি নিয়া আরোগ্য করা হয়। ধবল ও শ্বেতকুষ্ঠ যত দিনেরই হউক "লি উ কো ডা র মা ই ন" আপনাকে আরোগ্য করিবেই, বিফলে দ্বিগুণ মূল্য ফেরৎ দিয়া থাকি। নমস্কার।

ডাঃ শ্যারম্যান, এফ-সি-এস, বালিয়াডাঙ্গা, ফরিদপুর।

জীবন্তে সমাধি !

হাঁপানি কাশি ও যক্ষ্মার সমূলে নির্ব্বাসন

চিরায়ুষ্মতি ভব ওঁ তৎ সৎ ওঁ শাশ্বত দিব্যভাবে আছ তুমি প্রত্যক্ষ করিতে রসে, রূপে, গন্ধে শব্দে ও স্পর্শে মানবের প্রাক্তন কর্ম্মফল, রেখেছ গাঁথিয়া মণির মালার মত, দিবে নাকি হইতে সমাপ্ত ? গবেষণা যাঁর ভিত্তি, আনিয়াছে দিব্যশক্তি, মুক্ত করিতে মানবেরে চিরতরে কালের কবল হতে। "অ্যাজমা টিন" অধঃকরণ "রিলিভিং অয়েন্টমেণ্ট" করিবে বক্ষে লেপন ১ সপ্তাহ পরীক্ষার অভিনব ফল প্রত্যক্ষ করিবেন। মূল্য ৮৶০ অন্য যে কোন দুরারোগ্য ব্যাধি ৫৲ ফিঃ পাইলে ব্যবস্থা করি; ঔষধ মূল্য স্বতন্ত্র—

ডাঃ শ্যারম্যান, এফ-সি-এস, বালিয়াডাঙ্গা, ফরিদপুর।

Jagannath Pramanick

& BROS.

TAILORS

&

OUTFITTERS

DEALERS OF

GAUZE

&

BANDAGES

16, DHARAMTOLLA STREET,

CALCUITA.

PRICE 8 OZ PHIAL RS 2 4
16 OZ PHIAL R 3

FOR PARTICULARS APPLY TO:

L. H. EMENY

MERCANTILE BUILDINGS, LAL BAZAR, CALCUTTA.

IN THE MAKING OF
A NATION—
TAKES THE LEAD

"ERATONE"

The Ideal Nerve Food
&
Reconstructive Tonic.

Eastern Research Assn. Ltd.,
CALCUTTA.

Stockists :
A. C. COONDU & CO.,
RIMER & CO., CALCUTTA.

কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সংগ্রাম ও শান্তি
সকল অবস্থাতেই
আপনাদের
সেবা করিতে
প্রস্তুত।

— হেড অফিস-
৩ ও ৪, হেয়ার ট'
কলিকাতা।
ফোন : কলিকাতা ৬১১

—শাখাসমূহ—
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাওড়া (কলিকাতা), হেলুড চাপ, কালিম্পং, শিলিগুড়ি কৃষ্ণনগর শান্তিপুর রাণাঘাট, রাজসাহী ব,লী বগুড়া, তারকেশ্বর হুগলী ও ভদ্রক।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—মিঃ এস্. কে. চক্রব

২০, ১০, ৫, ২।।০ সের টীনে পাওয়া যায়

বঙ্গশ্রীর নিবেদন ও নিয়মাবলী

"বঙ্গশ্রী"র বার্ষিক মূল্য সডাক ৬॥০ টাকা। ষাণ্মাসিক ৩॥০ টাকা। ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য ॥/০ আনা। মূল্যাদি—কর্ম্মাধ্যক্ষ, বঙ্গশ্রী, c/o মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, হেড অফিস—১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

আষাঢ় হইতে "বঙ্গশ্রী"র বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া চলে।

প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠিপত্র সম্পাদককে ১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হয়। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট দেওয়া না থাকিলে পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

লেখকগণ প্রবন্ধের নকল রাখিয়া রচনা পাঠাইবেন। ফেরতের জন্য ডাক-খরচা দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত লেখা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে 'বঙ্গশ্রী' প্রকাশিত হয়। যে মাসের পত্রিকা, সেই মাসের ১০ তারিখের মধ্যে তাহা না পাইলে স্থানীয় ডাক ঘরে অনুসন্ধান করিয়া তদন্তের ফল আমাদিগকে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে না জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে আমরা বাধ্য থাকিব না।

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ও সিকি পৃষ্ঠা যথাক্রমে ২০৲, ১১৲, ৬৲। বিশেষ স্থানের হার পত্র লিখিলে জানানো হয়।

বাংলা মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পুরাতন বিজ্ঞাপনের কোনও পরিবর্ত্তনের নির্দেশ না আসিলে পরবর্ত্তী মাসের পত্রিকায় তদনুসারে কার্য্য করা যাইবে না। চলতি বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলে ঐ তারিখের মধ্যেই জানানো দরকার।

ওটীন স্নো

ব্যবহারে সারাদিন রূপ-লাবণ্য অম্লান থাকে।

ভারতীয় চিত্র-জগতের শিক্ষিতা ও সুন্দরী তারকা এবং খ্যাতনাম্নী নৃত্যশিল্পী ওটীন সম্বন্ধে কি লিখিতেছেন দেখুন—

I always use Oatine Cream before retiring. It is so pleasant and soothing and cleanses my skin from anything left by dust or make up. I recommend it to all my friends.

Jany. 28th 1939.

CREAM *for nightly massage*

SNOW *for daily protection*

বর্ম্মী তরুণী

কুমারী রেণুকা কর

১১শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা   ফাল্গুন—১৩৫০

[পর পৃষ্ঠায়

বিষয়-সূচী—২৬ পৃষ্ঠার পর

[২৮ পৃষ্ঠায়

বিষয়-সূচী—২৭ পৃষ্ঠার পর

গিরিশ-জন্ম-সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ ও আলোচনা

চিত্র-সূচী

ফাল্গুন, ১৩৫০
১১শ বর্ষ—২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা

"দুর্গা-পূজা"র প্রয়োজনীয়তা

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

(৬) কার্য্যকারণের শৃঙ্খলাযুক্ত বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়-বস্তু

মানুষের অভীষ্ট পদার্থসমূহের ও মানুষের ইচ্ছার উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা বিষয়ে মানুষের দায়িত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব কি কি তাহা স্থির করিতে হইলে নিম্নলিখিত দশটী আলোচনায় আমরা যে সমস্ত কথা উত্থাপন করিয়াছি সেই সমস্ত কথা স্মরণ রাখিবার প্রয়োজন হয় :—

(১) মানুষের সর্ব্ববিধ প্রয়োজনীয় ইচ্ছা পূরণ করিতে হইলে যে যে পদার্থ যে যে পরিমাণে প্রয়োজনীয় হয়, সেই সেই পদার্থ সেই সেই পরিমাণে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হওয়া সম্ভবযোগ্য কি না তাহার বিচার [১]

(২) মানুষের ইচ্ছাসমূহের পূরণ না হওয়ার দুইশ্রেণীর কারণ [২]

(৩) মানুষের ইচ্ছা, বুদ্ধি, জ্ঞান, কর্ম্ম-শক্তি ও কর্ম্ম-প্রবৃত্তিসমূহের উৎপত্তির কারণ নির্দ্ধারণ এবং ইচ্ছা-সমূহের শ্রেণীবিভাগ [৩]

(৪) মানুষের দেহস্থিত তেজ ও রসের এবং ইচ্ছা প্রভৃতির সমতা, অসমতা ও বিষমতার ব্যাখ্যা [৪]

(৫) মানুষের মন, বুদ্ধি ও জ্ঞানের সংজ্ঞা [৫]

(৬) মানুষের বুদ্ধি, জ্ঞান, কর্ম্মশক্তির ও কর্ম্ম-প্রবৃত্তির সমতা, অসমতা ও বিষমতার সংজ্ঞা [৬]

(৭) ইচ্ছা. বুদ্ধি ও জ্ঞানের সমতা, অসমতা ও বিষমতা কেন ঘটে [৭]

(৮) জমির উৎপাদিকা-শক্তির শ্রেণীবিভাগ [৮]

(৯) জমির ও তাহার উৎপাদিকা-শক্তির উৎপত্তি ও রক্ষার কার্য্যক্রম [৯]

(১০) জমি ও তাহার স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির রক্ষা বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব কি কি ?[১০]

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব কি কি তাহার উত্তর সংক্ষিপ্তভাবে দিতে হইলে বলিতে হয় যে, কোন একটী মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভব হয় তাহা করিতে হইলে প্রধানতঃ চারিশ্রেণীর ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, যথা :

(১) সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সমগ্র মনুষ সংখ্যার সর্ব্ববিধ ইচ্ছার পূরণ করিতে হইলে যে যে পদার্থ যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হয় সেই সেই পদার্থ সেই সেই পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ার যাহাতে কোন বাধা না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা।

(২) প্রত্যেক মানুষ যে সমস্ত পদার্থ অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন সেই সমস্ত পদার্থের কোনটী অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির অভাব যাহাতে কোন মানুষের না হয়, তাহার ব্যবস্থা।

(৩) প্রত্যেক মানুষ যে সমস্ত পদার্থ অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন সেই সমস্ত পদার্থের প্রত্যেকটী অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রাচুর্য্য যাহাতে প্রত্যেক মানুষের হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা।

(৪) সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার সর্ব্ববিধ ইচ্ছার পূরণ করিতে হইলে যে যে পদার্থ যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হয় সেই সেই পদার্থ সেই সেই পরিমাণে যাহাতে উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা।

১। বঙ্গশ্রী কার্ত্তিক সংখ্যা ২। বঙ্গশ্রী কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যা
৩-৪-৫-৬-৭। বঙ্গশ্রী অগ্রহায়ণ-সংখ্যা ৮। বঙ্গশ্রী পৌষ সংখ্যা
৯। বঙ্গশ্রী পৌষ সংখ্যা ১০। বঙ্গশ্রী মাঘ সংখ্যা

উপরোক্ত চারিটী ব্যবস্থা সাধিত হইলে যে প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সুনিশ্চিত হয়, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। ঐ সম্বন্ধে যুক্তিবাদের উল্লেখ করিয়া আমরা প্রবন্ধের কলেবর আর বৃদ্ধি করিব না।

উপরোক্ত যে চারিটী ব্যবস্থায় মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সুনিশ্চিত হয় সেই চারিটী ব্যবস্থা সমগ্র মনুষ্য-সমাজের অধিকাংশ মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কার্য্য-বিষয়ক গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির অবস্থানুসারে বিভিন্ন হইয়া থাকে।

সমগ্র মনুষ্য-সমাজের অধিকাংশ মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কার্য্যবিষয়ক গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি আপাত-দৃষ্টিতে অসংখ্য শ্রেণীর হইয়া থাকে। "সমগ্র মনুষ্য-সমাজের মানুষের সংখ্যা যত, মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির শ্রেণীর সংখ্যাও তত" ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আপাত-দৃষ্টিতে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কার্য্যবিষয়ক গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির শ্রেণীর সংখ্যা যতই হউক না কেন, উহা মূলতঃ তিন শ্রেণীর, যথা :

(১) সমগ্র মনুষ্যসমাজের সহিত মিলিত হইবার (অথবা মিলনাত্মক) গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি।

(২) সমগ্র মনুষ্যসমাজের কতকগুলি মানুষের সহিত মিলিত হইবার এবং কতকগুলি মানুষের সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার (অথবা বিচ্ছেদ-মিলনাত্মক) গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি।

(৩) মানুষের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহের, এমন কি মারামারি এবং যুদ্ধবিগ্রহ করিবার (অথবা বিচ্ছেদাত্মক) গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রতিক্ষণে বিদ্যমান থাকে। প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রতিক্ষণেই উপরোক্ত তিন শ্রেণীর গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে বটে কিন্তু প্রতিক্ষণেই যে উহারা সমান পরিমাণে বিদ্যমান থাকে তাহা নহে। কোন সময়ে মিলনাত্মকতা, কোন সময়ে বিচ্ছেদ-মিলনাত্মকতা এবং কোন সময়ে বিচ্ছেদাত্মকতা প্রাবল্য লাভ করে। প্রত্যেক মানুষের সারাজীবনের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মানুষেরই সারাজীবন গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির শ্রেণীভেদানুসারে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের একভাগ মিলনাত্মকতার প্রাধান্যে, পরবর্ত্তী ভাগ বিচ্ছেদ-মিলনাত্মকতার প্রাধান্যে, তাহার পরবর্ত্তী ভাগ বিচ্ছেদাত্মকতার প্রাধান্যে এবং তাহার পর আবার মিলনাত্মকতার প্রাধান্যে অতিবাহিত হয়। ইহারই নাম জীবনের চক্রবৎ পরিবর্ত্তন।

ব্যক্তিগত মানুষের যেরূপ, গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির শ্রেণীবিভাগানুসারে উপরোক্ত শৃঙ্খলাযুক্ত চক্রবৎ পরিবর্ত্তন বিদ্যমান আছে, সেইরূপ মনুষ্যসমাজের সমষ্টিগত জীবনের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির শ্রেণীর বিভাগানুসারে শৃঙ্খলাযুক্ত চক্রবৎ পরিবর্ত্তন বিদ্যমান থাকে।

মনুষ্যসমাজের সহস্র সহস্র বৎসর-ব্যাপী ধারাবাহিক ইতিহাসের সহিত নির্ভুলভাবে পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যায় যে, মনুষ্যসমাজে সমষ্টিগত ভাবে মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির কখন কখন মিলনাত্মকতার, তাহার পরেই বিচ্ছেদ-মিলনাত্মকতার ও বিচ্ছেদাত্মকতার এবং আবার মিলনাত্মকতার প্রাবল্যের উদ্ভব হয়।

মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উপরোক্ত চক্রবৎ পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা যে অনিবার্য্য, তাহা তেজ ও রসের দশটী * অবস্থার পরস্পরের সম্বন্ধের সহিত সম্যকভাবে পরিচিত হইতে পারিলে, নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানা যায়।

যে চারিটী ব্যবস্থায় মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সুনিশ্চিত হয় সেই চারিটী ব্যবস্থা মনুষ্য-সমাজের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির মিলনাত্মকতার প্রাবল্যের অবস্থায় যে-প্রণালীতে সাধিত হইতে পারে, বিচ্ছেদ-মিলনাত্মকতার অথবা বিচ্ছেদাত্মকতার প্রাবল্যের অবস্থায় সেই প্রণালীতে সাধিত হইতে পারে না।

ঐ চারিটী ব্যবস্থা সাধন করিবার প্রণালী মনুষ্য-সমাজের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির মিলনাত্মকতা, বিচ্ছেদ-মিলনাত্মকতা ও বিচ্ছেদাত্মকতার প্রভেদানুসারে তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে, যথা :

(১) মনুষ্য-সমাজের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির মিলনাত্মকতার প্রাবল্যের অবস্থায় মানুষের সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার চারিটী ব্যবস্থা সাধন করিবার প্রণালী ;

(২) মনুষ্য-সমাজের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির বিচ্ছেদ-মিলনাত্মকতার প্রাবল্যের অবস্থায় মানুষের সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার চারিটী ব্যবস্থা সাধন করিবার প্রণালী ;

(৩) মনুষ্য-সমাজের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির বিচ্ছেদাত্মকতার প্রাবল্যের অবস্থায় মানুষের

* তেজ ও রসের দশটী অবস্থার নাম—

১। অদ্বৈত-অবস্থা (Constant Condition) ;
২। মায়া-অবস্থা (Non-Variable Condition) ;
৩। দ্বৈত অবস্থা (Variable Condition) ;
৪। কাল-অবস্থা (Hyperbolic Condition) ;
৫। বিচ্ছেদ-অবস্থা (Parabolic Condition) ;
৬। তরল-অবস্থা [Liquid Condition] ;
৭। স্থূল-অবস্থা [Solid Condition] ;
৮। উদ্ভিদ-অবস্থা [Shooting Condition] ,
৯। জীব-অবস্থা [Organic Condition) ;
১০। মহাকাশ-অবস্থা [Atmospheric Condition] ;

সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার চারিটী ব্যবস্থা সাধন করিবার প্রণালী।

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার চারিটী ব্যবস্থা মনুষ্য-সমাজের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির মিলনাত্মকতার প্রাবল্যের অবস্থায় যে যে প্রণালীতে সাধন করিতে হয়, সেই সেই প্রণালী মনুষ্য সমাজের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির বিচ্ছেদ-মিলনাত্মকতার এবং বিচ্ছেদাত্মকতার প্রাবল্যের অবস্থাতেও অবলম্বন করিতে হয়। ঐ দুইটী অবস্থাতে (অর্থাৎ বিচ্ছেদ-মিলনাত্মকতা ও বিচ্ছেদাত্মকতার প্রাবল্যের অবস্থাতে) অধিকন্তু যাহাতে বিচ্ছেদ-মিলনাত্মকতার ও বিচ্ছেদাত্মকতার প্রাবল্য হইতে মিলনাত্মকতার প্রাবল্যের উৎপত্তি হয় তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়।

মনুষ্য সমাজের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির মিলনাত্মকতার প্রাবল্যের অবস্থায় মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার চারিটী ব্যবস্থা যে যে প্রণালীতে সাধন করিতে হয়, সেই সেই প্রণালীর কথা আমরা অতঃপর আলোচনা করিব।

মনুষ্য-সমাজের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির মিলনাত্মকতার প্রাবল্যের অবস্থায় সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সর্ব্ববিধ ইচ্ছার পূরণ করিতে হইলে যে যে পদার্থ যে যে পরিমাণে প্রয়োজন সেই সেই পদার্থ সেই সেই পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ার যাহাতে কোন বাধা হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা সাধন করিবার প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা

সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সর্ব্ববিধ ইচ্ছার পূরণ করিতে হইলে যে যে পদার্থ যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হয়, সেই সেই পদার্থ সেই সেই পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ার যাহাতে কোন বাধা না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে পাঁচ শ্রেণীর আলোচনা করিতে হয়; যথা:

(১) কয় শ্রেণীর পদার্থ মানুষের অভীষ্ট হইয়া থাকে?

(২) যে যে পদার্থ যে যে পরিমাণে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রুচি অনুসারে অভীষ্ট, সেই সেই পদার্থ মনুষ্য-সমাজের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার অভিলাষ পূরণ করিবার উপযুক্ত পরিমাণে এই ভূমণ্ডলে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য কি না?

(৩) যে যে পদার্থ যে যে পরিমাণে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রুচি অনুসারে অভীষ্ট, সেই সেই পদার্থ সেই সেই পরিমাণে উৎপাদনের ক্ষেত্র কি কি?

(৪) যে যে পদার্থ বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রুচি অনুসারে বিভিন্ন পরিমাণে অভীষ্ট হয়, সেই সেই পদার্থ সেই সেই পরিমাণে উৎপাদন করিবার কার্য্য-ক্রম কি কি?

(৫) যে যে পদার্থ বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রুচি অনুসারে বিভিন্ন পরিমাণে অভীষ্ট হয়, সেই সেই পদার্থ সেই সেই পরিমাণে উৎপাদন করিবার বাধা কি কি হইতে পারে—অথবা হইয়া থাকে?

যে যে পদার্থ বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রুচি অনুসারে বিভিন্ন পরিমাণে অভীষ্ট হয়, সেই সেই পদার্থ সেই সেই পরিমাণে উৎপাদন করিবার বাধা কি কি হইতে পারে অথবা হইয়া থাকে তাহা সঠিক ভাবে স্থির করিতে না পারিলে, ঐ সমস্ত বাধা যাহাতে উপস্থিত হইতে না পারে তাহা করিবার ব্যবস্থা কি হইতে পারে তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা সম্ভবযোগ্য হয় না। অন্যদিকে, যে যে পদার্থ বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রুচি অনুসারে বিভিন্ন পরিমাণে অভীষ্ট হয়, সেই সেই পদার্থ সেই সেই পরিমাণের উৎপাদন করিবার বাধা কি কি হইতে পারে অথবা হইয়া থাকে তাহা সঠিক ভাবে স্থির করিতে পারিলে, ঐ সমস্ত বাধা যাহাতে উপস্থিত হইতে না পারে তাহা করিবার ব্যবস্থা কি হইতে পারে তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা সম্ভবযোগ্য হয়।

যে যে পদার্থ বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রুচি অনুসারে বিভিন্ন পরিমাণে অভীষ্ট হয়, প্রথমতঃ, সেই সেই পদার্থের শ্রেণী-বিভাগ কয় রকমের? দ্বিতীয়তঃ, সেই সেই পদার্থ সেই সেই পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য কি না? তৃতীয়তঃ, সেই সেই পদার্থের উৎপাদনের ক্ষেত্র কি কি? চতুর্থতঃ, সেই সেই পদার্থের উৎপাদনের কার্য্যক্রম কি কি, এই চারিটী বিষয় জানা না থাকিলে, সেই সেই পদার্থের সেই সেই পরিমাণে উৎপাদন করিবার বাধা কি কি হইতে পারে অথবা হইয়া থাকে, তাহা সঠিক ভাবে স্থির করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

কাযেই, যে যে পদার্থ বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রুচি অনুসারে বিভিন্ন পরিমাণে অভীষ্ট হয় সেই সেই পদার্থ সেই সেই পরিমাণে উৎপাদন করিবার বাধা কি কি হইতে পারে অথবা হইয়া থাকে তাহা সঠিক ভাবে স্থির করিতে হইলে মানুষের অভীষ্ট পদার্থসমূহের শ্রেণী-বিভাগ প্রভৃতি উপরোক্ত চারিটী বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়।

মানুষের অভীষ্ট পদার্থ-সমূহের শ্রেণীবিভাগ

মানুষের অভীষ্ট পদার্থ সমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,

যথা: (১) দ্রব্য, (২) গুণ, (৩) শক্তি। "মানুষের ইচ্ছা, বুদ্ধি, জ্ঞান, কর্ম্মশক্তি ও কর্ম্ম-প্রবৃত্তিসমূহের উৎপত্তির কারণ-নির্দ্ধারণ এবং ইচ্ছা-সমূহের শ্রেণী-বিভাগ"-শীর্ষক আলোচনায়* মানুষের অভীষ্ট পদার্থসমূহের শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আমরা এখানে ঐ সমস্ত কথার পুনরুল্লেখ করিব না।

আপাতদৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষ বহুবিধ শ্রেণীর পদার্থের নানা রকম ভাবে অধিকারী হইবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় "দ্রব্য" "গুণ" ও "শক্তি" এই তিনটী কথায় কি কি বুঝায় তাহা স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে পারিলে দেখা যায় যে, যিনি যে শ্রেণীর পদার্থের যে ভাবেই অধিকারী হইবার ইচ্ছা করুন না কেন, ঐ পদার্থ হয় "দ্রব্য-শ্রেণীর," নতুবা "গুণ-শ্রেণীর", নতুবা "শক্তি-শ্রেণীর" অন্তর্গত।

মানুষের অভীষ্ট পদার্থ-সমূহের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেকটী সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যার প্রয়োজনানুরূপ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা—এই ভূমণ্ডলে সম্ভবযোগ্য কি না তাহার বিচার

আমাদিগের সিদ্ধান্তানুসারে এই ভূমণ্ডলের সমগ্র মনুষ্যসমাজের সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যার রুচিতে যতই বিভিন্নতা থাকুক না কেন, অভীষ্ট পদার্থ-সমূহ যতই বিভিন্ন রকমের হউক না কেন, মানুষ ও অন্যান্য জীবের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হউক না কেন, মানুষ ও অন্যান্য জীবের সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভীষ্ট পদার্থসমূহের অভীষ্ট পরিমাণ যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক না কেন, প্রাকৃতিক যে যে কার্য্যক্রমে ও যে যে কার্য্য পদ্ধতিতে এই ভূ-মণ্ডলের বিভিন্ন পদার্থের আকৃতি, গঠন, গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উৎপত্তি, রক্ষা ও পরিবর্ত্তনসমূহ স্বতঃই সাধিত হইয়া থাকে, প্রাকৃতিক সেই সেই কার্য্যক্রম ও সেই সেই কার্য্য-পদ্ধতি মানুষ যদ্যপি স্পষ্টভাবে বুঝিয়া লইয়া সেই সমস্ত কার্য্যক্রম ও কার্য্য-পদ্ধতির সহিত সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারে, তাহা হইলে মানুষের পক্ষে এই ভূমণ্ডল হইতেই মানুষের অভীষ্ট পদার্থ-সমূহের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেকটীর সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যার প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে উৎপাদন করা অনায়াসে সম্ভবযোগ্য হইয়া থাকে।

আমাদিগের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত যে সন্দেহের অযোগ্য তাহা অঙ্কশাস্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের সহায়তায় অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হইতে পারে।

কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত "মানুষের অভীষ্ট পদার্থের ও মানুষের ইচ্ছার উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত"-শীর্ষক আলোচনায়* আমরা আমাদিগের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। ঐ সমস্ত কথার পুনরুল্লেখ করিব না।

মানুষের অভীষ্ট পদার্থসমূহের উৎপাদনের ক্ষেত্র-নিচয়ের বিবরণ

যে সমস্ত দ্রব্য, গুণ ও শক্তি মানুষের অভীষ্ট তাহা হয় জমি নতুবা জল নতুবা মহাকাশ-ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যে সমস্ত দ্রব্য মানুষের অভীষ্ট, সেই সমস্ত দ্রব্য মানুষ হয় খাদ্য, নতুবা পানীয়, নতুবা পরিধেয়, নতুবা বাসগৃহ, নতুবা যানবাহন, নতুবা আসবাব, নতুবা বেশভূষার ও বিবিধ উপভোগের উপকরণরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকটী হয় জমির উপরিভাগ অথবা অভ্যন্তরজাত, নতুবা জলজাত, নতুবা অন্যান্য প্রাণিজাত কাঁচামাল হইতে উৎপন্ন হয়।

যে সমস্ত গুণ ও শক্তি মানুষের অভীষ্ট সেই সমস্তের উৎপাদন সম্ভবযোগ্য হয় মানুষের শরীরে, কর্ম্মেন্দ্রিয়ে, মনে এবং বুদ্ধিতে। মহাকাশ-ক্ষেত্রের গুণাগুণের সহিত ঐ সমস্ত গুণ ও শক্তি অঙ্গাঙ্গী ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে। জন্মভূমি এবং তন্নিকটবর্ত্তী জলাশয়সমূহও ঐ সমস্ত গুণ ও শক্তির সহিত অতি নিকটভাবে সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

মানুষের অভীষ্ট পদার্থসমূহ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিবার ও ব্যবহারযোগ্য করিবার কার্য্যক্রমের বিবরণ

যে সমস্ত পদার্থ মানুষের অভীষ্ট তাহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা:

(১) দ্রব্য;
(২) গুণ;
(৩) শক্তি;

যে সমস্ত পদার্থ মানুষের অভীষ্ট সেই সমস্ত পদার্থের শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করিয়াছি।

যে সমস্ত দ্রব্য মানুষের অভীষ্ট সেই সমস্ত দ্রব্যের ব্যবহার প্রধানতঃ নয় শ্রেণীর, যথা:

(১) খাদ্য ও পানীয়ের দ্রব্য;
(২) পরিধেয়ের দ্রব্য;
(৩) প্রসাধনের দ্রব্য;

*বঙ্গশ্রী, ১৩৫০, অগ্রহায়ণ—২৮, ২৯, ৩০ পৃঃ।

*বঙ্গশ্রী, ১৩৫০, কার্ত্তিক—২৩, ২৫, ২৯ পৃঃ।

(৪) বিদ্যার্জ্জন ও বিদ্যা প্রচারের কাগজ-কলমাদি বিবিধ দ্রব্য ;
(৫) বাসগৃহ, রাজপথ ও জননিবাসের দ্রব্য ;
(৬) যানবাহন নির্ম্মাণ ও পরিচালনার দ্রব্য ;
(৭) জীবিকার্জ্জনের জন্য নয় শ্রেণীর কার্য্য, সংসার-কার্য্য, আত্মরক্ষার কার্য্য এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কার্য্য পরিচালনার দ্রব্য ;
(৮) ঔষধ প্রস্তুত করিবার দ্রব্য ;
(৯) ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তি রক্ষার সাজসজ্জার ও প্রতিষ্ঠানের দ্রব্য ;

যে সমস্ত দ্রব্য মানুষের অভীষ্ট সেই সমস্ত দ্রব্য তাহাদের উৎপাদন-ক্ষেত্রের বিভেদ অনুসারে মূলতঃ চারি শ্রেণীর, যথা :

(১) জমিজাত দ্রব্যসমূহ ;
(২) খনিজাত দ্রব্যসমূহ ;
(৩) জলজাত দ্রব্যসমূহ ;
(৪) প্রাণিজাত দ্রব্যসমূহ ।

যে সমস্ত গুণ ও শক্তি মানুষের অভীষ্ট সেই সমস্ত গুণ ও শক্তি মহাকাশের অবস্থার সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত।

সেই সমস্ত গুণ ও শক্তি, শরীর ও মন প্রভৃতি আধার-ভেদে চারিশ্রেণীর হইয়া থাকে, যথা :

(১) শারীরিক গুণ ও শক্তি
(২) ইন্দ্রিয়সমূহের গুণ ও শক্তি ;
(৩) মনের গুণ ও শক্তি ;
(৪) বুদ্ধির গুণ ও শক্তি।

যে সমস্ত দ্রব্য মূলতঃ জমিজাত ও খনিজাত, সেই সমস্ত দ্রব্য অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিয়া মানুষের ব্যবহারযোগ্য করিতে হইলে প্রধানতঃ চতুর্ব্বিংশতি শ্রেণীর কার্য্যক্রমের আশ্রয় লইতে হয় ; যথা :

(১) জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির সমতার আতিশয্যের স্থলে যাহাতে অসমতার অথবা বিষমতার আতিশয্যের উৎপত্তি না হয়, তাহার কার্য্যক্রম ;
(২) জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির পরিমাণের যাহাতে হ্রাস না হয় তাহার কার্য্যক্রম ;
(৩) জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির পরিমাণের কোনরূপ হ্রাস হইলে তাহা যাহাতে অনতিবিলম্বে পূরণ করা হয় তাহার কার্য্যক্রম ;
(৪) কৃষি-বিদ্যা ও উদ্ভিদ্ বিদ্যা বিষয়ক কার্য্যক্রম ;
(৫) জমি-বণ্টন বিষয়ক কার্য্যক্রম ;
(৬) কৃষিকর্ম্ম-বিষয়ক কার্য্যক্রম ;
(৭) কৃষক-শিক্ষা-বিষয়ক কার্য্যক্রম ;
(৮) খনিজ বিদ্যা বিষয়ক কার্য্যক্রম ;
(৯) বিভিন্ন শ্রেণীর খনিজ কার্য্যের বণ্টন-বিষয়ক কার্য্যক্রম ;
(১০) খনন-কর্ম্ম বিষয়ক কার্য্যক্রম ;
(১১) খনন কার্য্যের শ্রমজীবিগণের শিক্ষা বিষয়ক কার্য্যক্রম ;
(১২) শিল্পবিদ্যা বিষয়ক-কার্য্যক্রম ;
(১৩) বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পের বণ্টন-বিষয়ক কার্য্যক্রম ;
(১৪) শিল্পকর্ম্ম-বিষয়ক কার্য্যক্রম ;
(১৫) শিল্পী শিক্ষা বিষয়ক কার্য্যক্রম ;
(১৬) কারুকার্য্য-বিদ্যা বিষয়ক কার্য্যক্রম ;
(১৭) বিভিন্ন শ্রেণীর কারুকার্য্যের বণ্টন-বিষয়ক কার্য্যক্রম ;
(১৮) কারুকার্য্য-কর্ম্ম বিষয়ক কার্য্যক্রম ;
(১৯) কারুকরগণের শিক্ষা-বিষয়ক কার্য্যক্রম ;
(২০) ক্রয়-বিক্রয় (অর্থাৎ বাণিজ্য)-বিদ্যা বিষয়ক কার্য্যক্রম ;
(২১) বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্য দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়-বণ্টন-বিষয়ক কার্য্যক্রম ;
(২২) ক্রয়-বিক্রয় কর্ম্ম বিষয়ক কার্য্যক্রম ;
(২৩) বণিকগণের শিক্ষা বিষয়ক কার্য্যক্রম ;
(২৪) সর্ব্বশ্রেণীর কর্ম্মিগণের বাসস্থান সন্নিবেশের কার্য্যক্রম।

যে সমস্ত দ্রব্য মূলতঃ জলজাত সেই সমস্ত দ্রব্য অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিয়া মানুষের ব্যবহারযোগ্য করিতে হইলে প্রধানতঃ সাত শ্রেণীর কার্য্যক্রমের আশ্রয় লইতে হয়, যথা :

(১) জলাশয়সমূহের (নদী, হ্রদ, সাগর, মহাসাগর সমূহের) স্বাভাবিক গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির সমতার আতিশয্যের স্থলে যাহাতে অসমতা অথবা বিষমতার আতিশয্যের উৎপত্তি না হয় তাহার কার্য্যক্রম ;
(২) জলাশয়সমূহের স্বাভাবিক বিভিন্ন গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের পরিমাণের যাহাতে হ্রাস না হয় তাহার কার্য্যক্রম ;
(৩) জলাশয়সমূহের স্বাভাবিক গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি সমূহের পরিমাণের কোনরূপ হ্রাস হইলে তাহা যাহাতে অনতিবিলম্বে পূরণ করা যায় তাহার কার্য্যক্রম ;
(৪) বারুণী বিদ্যা বিষয়ক কার্য্যক্রম ;
(৫) বিভিন্ন জলাশয়সমূহের বণ্টন-বিষয়ক কার্য্যক্রম ;
(৬) বারুণী কর্ম্মসমূহ বিষয়ক কার্য্যক্রম ;

(৭) বারুণী কর্ম্মসমূহের শ্রমজীবিগণের শিক্ষা বিষয়ক কার্য্যক্রম।

জলজাত দ্রব্যসমূহ যাহাতে অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে এবং মানুষের স্বাস্থ্য-সংরক্ষকভাবে ব্যবহারযোগ্য হইতে পারে তাহা করিতে হইলে একদিকে যেরূপ উপরোক্ত সাত শ্রেণীর কার্য্যক্রমের আশ্রয় লইতে হয়, সেইরূপ আবার জমিজাত দ্রব্যসমূহের মত শিল্প, কারুকার্য্য এবং বাণিজ্যের কার্য্যক্রমসমূহের আশ্রয় লইতে হয়।

প্রাণিজাত দ্রব্যসমূহ যাহাতে অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে এবং মানুষের স্বাস্থ্য-সংরক্ষক ভাবে ব্যবহারযোগ্য হইতে পারে তাহা করিতে হইলে প্রধানতঃ, সাত শ্রেণীর কার্য্যক্রমের আশ্রয় লইতে হয়, যথা:—

(১) প্রাণী সমূহের স্বাভাবিক গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির সমতার আতিশয্যের স্থলে যাহাতে অসমতা অথবা বিষমতার আতিশয্যের উৎপত্তি না হয় তাহার কার্য্যক্রম

(২) প্রাণীসমূহের স্বাভাবিক গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের পরিমাণের যাহাতে হ্রাস না হয় তাহার কার্য্যক্রম।

(৩) প্রাণীসমূহের স্বাভাবিক গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের পরিমাণের কোনরূপ হ্রাস হইলে তাহা যাহাতে অনতিবিলম্বে পূরণ করা যায় তাহার কার্য্যক্রম

(৪) প্রাণী-বিদ্যা যাহাতে সম্পূর্ণ ও নির্ভুলভাবে নির্দ্ধারণ করা যায় তাহার কার্য্যক্রম

(৫) বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর রক্ষার কার্য্য বণ্টন করিবার কার্য্যক্রম

(৬) প্রাণী রক্ষার কর্ম্ম-বিষয়ক কার্য্যক্রম

(৭) প্রাণী পালকদিগের শিক্ষা-বিষয়ক কার্য্যক্রম

প্রাণীজাত দ্রব্যসমূহ যাহাতে অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে এবং মানুষের ব্যবহার যোগ্য হইতে পারে, তাহা করিতে হইলে একদিকে যেরূপ উপরোক্ত সাত শ্রেণীর কার্য্যক্রমের আশ্রয় লইতে হয়, সেইরূপ আবার শিল্প, কারুকার্য্য এবং বাণিজ্যের কার্য্যক্রমসমূহেরও ব্যবহার করিতে হয়।

মানুষ তাহার শরীরের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের, এবং বুদ্ধির গুণ ও শক্তি যাহাতে ইচ্ছামত প্রচুর পরিমাণে অর্জ্জন করিতে পারে তাহা করিতে হইলে যে যে ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সেই ব্যবস্থার কথা আমরা "প্রত্যেক মানুষ যে সমস্ত পদার্থ অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন সেই সমস্ত পদার্থের কোনটী অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির অভাব যাহাতে কোন মানুষের না হয় তাহার ব্যবস্থা"—শীর্ষক আলোচনায় বিবৃত করিব। মানুষ তাহার শরীরের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের এবং বুদ্ধির গুণ ও শক্তি যাহাতে ইচ্ছামত প্রচুর পরিমাণে অর্জ্জন করিতে পারে, তাহা করিতে হইলে অনেক শ্রেণীর ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন করিতে হয়। সেই সমস্ত শ্রেণীর ব্যবস্থার মধ্যে মহাকাশ বিষয়ক ব্যবস্থা সমূহ একটী শ্রেণীর অন্তর্গত। মানুষের পক্ষে তাহার শরীরের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের এবং বুদ্ধির গুণ ও শক্তি যাহাতে ইচ্ছামত প্রচুর পরিমাণে অর্জ্জন করা সম্ভব হয়, তাহা করিতে হইলে অনেক শ্রেণীর ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয় বটে; কিন্তু মহাকাশ বিষয়ক ব্যবস্থাসমূহ সাধিত না হইলে মানুষের পক্ষে তাহার শরীরের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের এবং বুদ্ধির উপরোক্ত গুণ ও শক্তিসমূহ কোনক্রমে অর্জ্জন করা সম্ভব হয় না।

শরীরের, ইন্দ্রিয়সমূহের, মনের ও বুদ্ধির গুণ ও শক্তি যাহাতে ইচ্ছামত প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করা প্রত্যেক মানুষের পক্ষে সম্ভবযোগ্য হয়, তাহা করিতে হইলে মহাকাশ বিষয়ে যে সমস্ত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত ব্যবস্থার কার্য্যক্রম প্রধানতঃ সাত শ্রেণীর:—

(১) মহাকাশের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির সমতার আতিশয্যের স্থলে যাহাতে অসমতার অথবা বিষমতার আতিশয্যের উৎপত্তি না হয় তাহার কার্য্যক্রম

(২) মহাকাশের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির পরিমাণের যাহাতে হ্রাস না হয় তাহার কার্য্যক্রম

(৩) মহাকাশের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির পরিমাণের কোনরূপ হ্রাস হইলে তাহা যাহাতে অনতিবিলম্বে পূরণ করা হয়, তাহার কার্য্যক্রম

(৪) মহাকাশ বিষয়ে যাহা যাহা জ্ঞেয় ও জ্ঞাতব্য তাহার প্রত্যেকটী যাহাতে নির্ভুল ও সর্ব্বতোভাবে জানা সুনিশ্চিত হয়, তাহার কার্য্যক্রম

(৫) মহাকাশের বিভিন্ন অংশ বিষয়ে যে সমস্ত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করিতে হয়, সেই সমস্ত বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য বিভিন্ন অংশের বণ্টন করিবার কার্য্যক্রম

(৬) মহাকাশ বিষয়ে দায়িত্ব-পালন করিতে হইলে যে সমস্ত কার্য্য করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত কার্য্য নির্ভুল ও নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে করিবার কার্য্যক্রম

(৭) মহাকাশ বিষয়ে দায়িত্ব-পালন করিতে হইলে কর্ম্মীবৃন্দের যাহা যাহা শিক্ষা করিতে হয়, তাহার প্রত্যেকটী যাহাতে ঐ কর্ম্মীবৃন্দ শিক্ষা করিতে পারেন তাহা করিবার ব্যবস্থাক্রম

৮ মানুষের অভীষ্ট পদার্থসমূহ-প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন

করিতে ও ব্যবহারযোগ্য করিতে হইলে কি কি কার্য্য-ক্রমের আশ্রয় লইতে হয় তাহার বিবৃতিতে আমরা এতাবৎ নিম্নলিখিত আটটী বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি :—

(১) মানুষের অভীষ্ট পদার্থসমূহের শ্রেণী বিভাগ
(২) মানুষের অভীষ্ট-দ্রব্যসমূহের ব্যবহারের শ্রেণী বিভাগ
(৩) মানুষের অভীষ্ট দ্রব্যসমূহের শ্রেণী বিভাগ
(৪) মানুষের অভীষ্ট গুণ ও শক্তিসমূহের শ্রেণী বিভাগ
(৫) জমিজাত ও খনিজাত দ্রব্যসমূহ যাহাতে অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা ও ব্যবহার-যোগ্য করা মানুষের পক্ষে সুনিশ্চিত হয় তাহার কার্য্যক্রম
(৬) জলজাত দ্রব্যসমূহ যাহাতে অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা ও ব্যবহার-যোগ্য করা মানুষের পক্ষে সুনিশ্চিত হয় তাহার কার্য্যক্রম
(৭) প্রাণীজাত দ্রব্যসমূহ যাহাতে অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা ও ব্যবহারযোগ্য করা মানুষের পক্ষে সুনিশ্চিত হয় তাহার কার্য্যক্রম
(৮) মহাকাশ যাহাতে মানুষের ইচ্ছামত গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহ অর্জ্জন করিবার বিঘ্নপ্রদ না হয়, পরন্তু সহায়ক হয় তাহা করিবার কার্য্যক্রম

উপরোক্ত আটটী আলোচনার শেষোক্ত চারিটী আলোচনায় প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যায় যে মানুষের অভীষ্ট পদার্থসমূহ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতে ও ব্যবহারযোগ্য করিতে প্রধানতঃ আট শ্রেণীর কার্য্যক্রমের ব্যবহার করিতে হয়, যথা :—

(১) জমি, জল ও মহাকাশের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির সমতার আতিশয্যের স্থলে যাহাতে অসমতার অথবা বিষমতার আতিশয্যের উৎপত্তি না হয় তাহার কার্য্যক্রম
(২) জমি, জল ও মহাকাশের গুণ শক্তি ও প্রবৃত্তির পরিমাণের যাহাতে হ্রাস না হয় তাহার কার্য্যক্রম
(৩) জমি জল ও মহাকাশের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির পরিমাণের কোনরূপ হ্রাস হইলে তাহা যাহাতে অনতিবিলম্বে পূরণ করা হয় তাহার কার্য্যক্রম
(৪) জমি-তত্ত্ব, জল-তত্ত্ব ও মহাকাশ-তত্ত্ব সম্পূর্ণ ও নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে উদ্ধার করিবার কার্য্যক্রম
(৫) কৃষি-বিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিদ্যা, খনিজ পদার্থের খনন-বিদ্যা, বারুণী-বিদ্যা এবং প্রাণী-বিদ্যা সম্পূর্ণ ও নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে উদ্ধার করিবার কার্য্য-ক্রম
(৬) কৃষির জন্য জমি, খনন কার্য্যের জন্য খনি, জল-জাত দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য জল-ভাগ এবং প্রাণী-জাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রাণী বণ্টনের কার্য্যক্রম
(৭) কৃষিকর্ম্ম, খননকর্ম্ম, বারুণীকর্ম্ম এবং প্রাণী রক্ষা কর্ম্মের কার্য্য-ক্রম
(৮) কৃষিকার্য্য, খনন-কার্য্য, বারুণী-কার্য্য এবং প্রাণীরক্ষা কার্য্যের শ্রমজীবিগণের শিক্ষার কার্য্য-ক্রম।

মানুষের অভীষ্ট পদার্থ সমূহ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতে হইলে এবং ব্যবহার যোগ্য করিতে হইলে একদিকে যেরূপ উপরোক্ত আট শ্রেণীর কার্য্যক্রমের আশ্রয় লইতে হয় সেইরূপ আবার নয় শ্রেণীর শিল্পকার্য্য, নয়শ্রেণীর কারুকার্য্য এবং নয়শ্রেণীর বাণিজ্য কার্য্যের কার্য্যক্রমেরও ব্যবস্থা করিতে হয়, যথা—

(১) খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যসমূহের শিল্পকার্য্য, কারুকার্য ও বাণিজ্যকার্য্যের কার্য্যক্রম
(২) পরিধেয় দ্রব্যসমূহের শিল্পকার্য্য, কারুকার্য্য ও বাণিজ্য-কার্য্যের কার্য্যক্রম
(৩) প্রসাধন দ্রব্যসমূহের শিল্পকার্য্য, কারুকার্য্য ও বাণিজ্য-কার্য্যের কার্য্যক্রম
(৪) বিদ্যার্জ্জনের এবং পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও কর্ম্মক্ষেত্রগত সম্বন্ধ সংরক্ষণের দ্রব্যসমূহের শিল্পকার্য্য, কারুকার্য্য ও বাণিজ্য-কার্য্যের কার্য্যক্রম
(৫) বাসগৃহ ও রাজপথ-নির্ম্মাণ ও সংরক্ষণের দ্রব্যসমূহের শিল্পকার্য্য, কারুকার্য্য ও বাণিজ্যকার্য্যের কার্য্যক্রম
(৬) যান-বাহন-নির্ম্মাণ ও সংরক্ষণের দ্রব্যসমূহের শিল্পকার্য্য, কারুকার্য্য ও বাণিজ্য-কার্য্যের কার্য্যক্রম
(৭) কৃষিকার্য্য, খনিজ কার্য্য, পশুরক্ষা কার্য্য, জলজাত দ্রব্য সমূহের উৎপাদক কার্য্য, শিল্পকার্য্য, কারুকার্য্য, বাণিজ্যকার্য্য এবং সংসারকার্য্যের উপকরণসমূহের শিল্পকার্য্য, কারুকার্য্য ও বাণিজ্যকার্য্যের কার্য্যক্রম
(৮) ঔষধসমূহের শিল্পকার্য্য, কারুকার্য্য ও বাণিজ্যকার্য্যের কার্য্যক্রম
(৯) ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিপ্রদ উপকরণসমূহের শিল্পকার্য্য, কারুকার্য্য ও বাণিজ্যকার্য্যের কার্য্যক্রম।

উপরোক্ত নয় শ্রেণীর শিল্পকার্য্যের নয় শ্রেণীর কারুকার্য্য এবং নয় শ্রেণীর বাণিজ্য-কার্য্যের প্রত্যেক শ্রেণীতে আবার চারি শ্রেণীর কার্য্যক্রম আছে, যথা—

(১) বিদ্যাবিষয়ক কার্য্যক্রম ;
(২) কার্য্য-বণ্টন বিষয়ক কার্য্যক্রম ;
(৩) কর্ম্ম-বিষয়ক কার্য্যক্রম ;
(৪) কর্ম্মিগণের শিক্ষাবিষয়ক কার্য্যক্রম।

মানুষের অভীষ্ট পদার্থসমূহের প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিবার ও ব্যবহারযোগ্য করিবার কার্য্যক্রম সম্বন্ধে এতাবৎ যাহা যাহা বলা হইল, তাহা হইতে বুঝিতে হয় যে, ঐ কার্য্যক্রম সংক্ষেপতঃ নয় শ্রেণীর, যথা—

(১) জমি, জল ও হাওয়ার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির সমতার আতিশয্য অটুট রাখিবার কার্য্য,

(২) জমি, জল ও হাওয়ার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির পরিমাণ অটুট রাখিবার কার্য্য,

(৩) মানুষের খাদ্যাদি নয় শ্রেণীর ব্যবহারের দ্রব্যসমূহের কাঁচামাল উৎপাদন করিবার কৃষিকার্য্য,

(৪) মানুষের খাদ্যাদি নয় শ্রেণীর ব্যবহারের দ্রব্যসমূহের কাঁচা মাল উৎপাদন করিবার খনিজকার্য্য,

(৫) মানুষের খাদ্যাদি নয় শ্রেণীর ব্যবহারের দ্রব্যসমূহের কাঁচা মাল উৎপাদন করিবার বারুণী কার্য্য *

(৬) মানুষের খাদ্যাদি নয় শ্রেণীর ব্যবহারের দ্রব্যসমূহের কাঁচা মাল উৎপাদন করিবার জন্ত প্রাণী পালন ও রক্ষাকার্য্য,

(৭) মানুষের খাদ্যাদি নয় শ্রেণীর ব্যবহারের শিল্পজাত দ্রব্যসমূহের উৎপাদন করিবার জন্ত নয় শ্রেণীর শিল্পকার্য্য,

(৮) মানুষের খাদ্যাদি নয় শ্রেণীর ব্যবহারের কারুকার্য্যজাত দ্রব্যসমূহের উৎপাদন করিবার জন্ত নয় শ্রেণীর কারুকার্য্য

(৯) মানুষের খাদ্যাদি নয় শ্রেণীর ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যসমূহের ক্রয়-বিক্রয় করিবার জন্ত নয় শ্রেণীর বাণিজ্যকার্য্য।

উপরোক্ত নয় শ্রেণীর কার্য্যক্রমের প্রত্যেকটীতে আবার চারিটী করিয়া প্রত্যন্তর-শ্রেণীর কার্য্যক্রম আছে, যথা

(১) বিদ্যা উদ্ধার করা ও কার্য্যনিয়ম নির্দ্ধারণ করা বিষয়ক কার্য্যক্রম,

(২) ক্ষেত্র বণ্টন, কার্য্যবণ্টন, মুল্যবণ্টন এবং পারিশ্রমিক বণ্টন প্রভৃতি বণ্টন বিষয়ক কার্য্যক্রম,

(৩) কর্ম্মিগণের শিক্ষা ও সহায়তা-বিষয়ক কার্য্যক্রম,

(৪) কর্ম্মিগণের কর্ম্মবিষয়ক কার্য্যক্রম,

কাজেই ইহা বলা যাইতে পারে যে, মানুষের অভীষ্ট পদার্থসমূহের প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিবার ও ব্যবহারযোগ্য করিবার প্রধান প্রধান কার্য্যক্রমের সংখ্যা সর্ব্বসমেত ছত্রিশটী।

আনুষঙ্গিক ভাবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, উপরোক্ত ছত্রিশটী কার্য্যক্রম যাহাতে সুচিন্তিতভাবে নির্দ্ধারিত হয় এবং সুশৃঙ্খলিত ভাবে পরিচালিত হয় তাহার ব্যবস্থা মনুষ্যসমাজে বিদ্যমান থাকিলে, মানুষের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধরূপী হিংস্র প্রবৃত্তি ত' দূরের কথা দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিতে পারে না। অধিকন্তু সমগ্র মনুষ্যসমাজের সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবের মিলন-প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া অনিবার্য্য হয় এবং সমগ্র ভূমণ্ডল স্বর্গের মত সুখময় হইতে পারে।

উপরোক্ত ছত্রিশটী কার্য্যক্রম যাহাতে সুচিন্তিতভাবে নির্দ্ধারিত হয় এবং সুশৃঙ্খলিত ভাবে সমগ্র মনুষ্যসমাজে পরিচালিত হয় তাহা করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারে যে যে পদার্থ বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রুচি অনুসারে বিভিন্ন পরিমাণে অভীষ্ট হয় সেই সেই পদার্থ সেই সেই পরিমাণে উৎপাদন করিবার বাধা কি কি হইতে পারে অথবা হইয়া থাকে—তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন হয়।

কোন কার্য্য করিতে হইলে সেই কার্য্যের বিরুদ্ধে যে সমস্ত বাধা উপস্থিত হইতে পারে সেই সমস্ত বাধা অপসারিত করিবার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে যে ঐ কার্য্য সুচারুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

আমরা অতঃপর—"মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারে যে যে পদার্থ বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রুচি অনুসারে বিভিন্ন পরিমাণে অভীষ্ট হয় সেই সেই পদার্থ সেই সেই পরিমাণে উৎপাদন করিবার বাধা কি কি হইতে পারে অথবা হইয়া থাকে তাহার বিচার"-শীর্ষক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারে যে যে পদার্থ বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রুচি অনুসারে বিভিন্ন পরিমাণে অভীষ্ট হয় সেই সেই পদার্থ সেই সেই পরিমাণে উৎপাদন করিবার বাধা কি কি হইতে পারে অথবা হইয়া থাকে তাহার বিচার

মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারে যে যে পদার্থ বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রুচি অনুসারে বিভিন্ন পরিমাণে অভীষ্ট হয় সেই সেই পদার্থ সেই সেই পরিমাণে উৎপাদন করিতে হইলে প্রধানতঃ যে নয়টী কার্য্যক্রম প্রাকৃতিক কোন্ কোন্ কারণে অথবা মানুষের কোন্ কোন্ কার্য্যবশতঃ বিশৃঙ্খলাপ্রাপ্ত হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে, উপরোক্ত উৎপাদন-কার্য্যে কি কি বাধা হইতে পারে তাহা অনায়াসেই স্থির করা সম্ভব হয়।

প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম কোন্ কোন্ কারণে উপরোক্ত নয়টী কার্য্যক্রমে বিশৃঙ্খলা প্রবেশ লাভ করিতে পারে—আমরা এক্ষণে তাহার আলোচনা করিব।

প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম কোন্ কোন্ কারণে উপরোক্ত নয়টী কার্য্যক্রমে বিশৃঙ্খলা প্রবেশ লাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যায় যে, যাহাতে নয়টী কার্য্যক্রমই যুগপৎ সমান শৃঙ্খলিতভাবে প্রত্যেক দেশে পরিচালিত হয় তাহার ব্যবস্থা না করিয়া কোন একটীর প্রতি অথবা দুইটীর প্রতি, অথবা তিনটীর প্রতি, অথবা চারিটীর প্রতি, অথবা

* জল হইতে জলজাত বিভিন্ন কাঁচামাল: যথা, বিভিন্ন শ্রেণীর লবণ, বিভিন্নশ্রেণীর ঝিনুক, বিভিন্নশ্রেণীর মৎস্য, বিভিন্নশ্রেণীর শাক, বিভিন্নশ্রেণীর শঙ্খ, বিভিন্নশ্রেণীর মুক্তা, বিভিন্নশ্রেণীর ফেনা উৎপাদন করিবার কার্য্যকে সংস্কৃত ভাষায় "বারুণী" কার্য্য বলা হয়।

পাঁচটীর প্রতি, বাকী কয়টীর তুলনায় অধিকতর মনোযোগী হইলে বিশৃঙ্খলা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

উপরোক্ত কারণে ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, যে নয়টী কার্য্যক্রম মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারে যে যে পদার্থ বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রুচি অনুসারে বিভিন্ন পরিমাণে অভীষ্ট হয় সেই সেই পদার্থ সেই সেই পরিমাণে উৎপাদন করিবার ও ব্যবহারযোগ্য করিবার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়, সেই নয়টী কার্য্যক্রমের প্রত্যেকটীতে সমানভাবে মনোযোগ রক্ষা না করিয়া কোন একটীতে অপেক্ষাকৃতভাবে অধিক অমনোযোগী অথবা মনোযোগী হইলে প্রয়োজনীয় অথবা অভীষ্ট পদার্থসমূহের প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে উৎপাদন করা অসম্ভব হইয়া থাকে।

মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারে যে যে পদার্থ বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রুচি অনুসারে বিভিন্ন পরিমাণে অভীষ্ট হয়, সেই সেই পদার্থ সেই সেই পরিমাণে উৎপাদন করিবার ও ব্যবহার-যোগ্য করিবার জন্য যে নয়টী কার্য্যক্রম একান্ত প্রয়োজনীয়, সেই নয়টী কার্য্যক্রমের প্রত্যেকটীতে সমানভাবে মনোযোগ রক্ষা না করিলে যেমন অভীষ্ট পদার্থসমূহের প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে উৎপাদন করা অসম্ভব হয়, সেইরূপ আবার মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারে যে যে পদার্থ বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রুচি অনুসারে বিভিন্ন পরিমাণে প্রয়োজনীয়, সেই সেই পদার্থ ছাড়া অন্য কোন নিষ্প্রয়োজনীয় অথবা অস্বাস্থ্যকর পদার্থ উৎপাদনে অথবা ঐরূপ কোন কার্য্যে মনোযোগী হইলেও অভীষ্ট পদার্থসমূহ প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে উৎপাদন করা অসম্ভব হয়।

মানুষের অভীষ্ট পদার্থসমূহ প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে উৎপাদন করিতে হইলে যে নয়টী কার্য্যক্রম একান্তভাবে প্রয়োজনীয় সেই নয়টী কার্য্যক্রমের প্রত্যেকটীতে মানুষ সমানভাবে আকৃষ্ট না হইয়া কোন একটীতে অপেক্ষাকৃত অল্প-পরিমাণে অথবা অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয় কেন, তাহার অনুসন্ধান করিতে বসিলে দেখা যায় যে, উহার মূলে অনেক শ্রেণীর কারণ বিদ্যমান থাকে। ঐ সমস্ত কারণ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা :

(১) যে যে কার্য্যক্রমে সমগ্র মনুষ্যসমাজের সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যার সর্ব্ববিধ অভীষ্টপদার্থ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন ও ব্যবহারযোগ্য হইতে পারে, সেই সেই কার্য্যক্রমের দিকে লক্ষ্য না করিয়া মানুষের ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার দিকে এবং ধনলাভ করিবার দিকে অধিকতর প্রবৃত্তিশীলতা।

(২) মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারের সর্ব্ববিধ অভীষ্ট পদার্থ প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে উৎপাদন ও ব্যবহারযোগ্য করিতে হইলে যে নয়টী কার্য্যক্রম একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, সেই নয়টী কার্য্যক্রমের বিভিন্ন শ্রমিক অথবা কর্ম্মিগণের লভ্যাংশের অথবা পারিশ্রমিকের অল্পতা ও অসমতা।

প্রত্যেক মানুষ যে সমস্ত পদার্থ অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত পদার্থ অর্জ্জন করিতে হইলে ও উপভোগ করিতে হইলে যে সমস্ত গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি অর্জ্জন করা ও বর্জ্জন করা একান্ত প্রয়োজনীয়—সেই সমস্ত গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি যাহাতে প্রত্যেক মানুষ অর্জ্জন করিতে ও বর্জ্জন করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা মনুষ্যসমাজে বিদ্যমান থাকিলে মানুষের পক্ষে সমষ্টিগত স্বার্থ অবহেলা করিয়া ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার দিকে এবং ধনলাভ করিবার দিকে অধিকতর প্রবৃত্তিশীল হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না। এই সম্বন্ধীয় আলোচনা আমরা "প্রত্যেক মানুষ যে-সমস্ত পদার্থ অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন সেই সমস্ত পদার্থের প্রত্যেকটী অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রাচুর্য্য যাহাতে প্রত্যেক মানুষ লাভ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা"—শীর্ষক আলোচনায় বিবৃত করিব।

মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারের সর্ব্ববিধ অভীষ্ট পদার্থ প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে উৎপাদন ও ব্যবহারযোগ্য করিতে হইলে যে নয়টী কার্য্যক্রম একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, সেই নয়টী কার্য্যক্রমের বিভিন্ন শ্রমিক অথবা কর্ম্মীগণের লভ্যাংশের অথবা পারিশ্রমিকের অল্পতা ও অসমতার কারণ প্রধানতঃ নয় শ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা :

(১) মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারে যে সমস্ত দ্রব্যের প্রয়োজন হয় সেই সমস্ত দ্রব্য যাহাতে সর্ব্বতোভাবে মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির স্বাস্থ্যপ্রদ ও তৃপ্তিপ্রদ হয় তাহা করিতে হইলে যে যে শ্রেণীর কাঁচামালের প্রয়োজন হয়, সেই সেই শ্রেণীর কাঁচামাল উৎপাদন করিতে হইলে জমি, জল ও হাওয়ার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির যে শ্রেণীর সমতার আতিশয্যের প্রয়োজন হয়—সেই শ্রেণীর সমতার আতিশয্যের অভাব এবং তৎস্থলে অসমতা ও বিষমতার আতিশয্যের প্রভাব ;

(২) মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারে যে সমস্ত দ্রব্যের প্রয়োজন হয় সেই সমস্ত দ্রব্য যাহাতে সর্ব্বতোভাবে মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির স্বাস্থ্যপ্রদ ও তৃপ্তিপ্রদ হয় তাহা করিতে হইলে যে যে শ্রেণীর কাঁচামালের প্রয়োজন হয় সেই সেই শ্রেণীর কাঁচামাল যাহাতে স্বভাবতঃ অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় তাহা করিতে হইলে জমি ও জলের যে পরিমাণ স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির প্রয়োজন হয় জমি ও

জলের সেই পরিমাণ স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি রক্ষা করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির অভাব এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রভাব;

(৩) জমির উপরিভাগ হইতে মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারের যে সমস্ত দ্রব্যের কাঁচামাল উৎপাদন করা সম্ভব হয় সেই সমস্ত কাঁচামাল যাহাতে অস্বাস্থ্যপ্রদ অথবা অতৃপ্তিপ্রদ অথবা পরিমাণে অল্প না হয় এবং শ্রমিকগণের শ্রম ও পারিশ্রমিক যাহাতে অসমতা অথবা বিষমতা-আনয়ক না হয় তাহা করিতে হইলে, কৃষিকার্য্য যে যে প্রণালীতে সম্পাদিত হওয়ার প্রয়োজন সেই সেই প্রণালীর অভাব এবং তদ্বিরুদ্ধ প্রণালীর প্রভাব;

(৪) জমির অভ্যন্তর হইতে মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারের যে সমস্ত দ্রব্যের কাঁচামাল উৎপাদন করা সম্ভব হয় সেই সমস্ত কাঁচামাল যাহাতে অস্বাস্থ্যপ্রদ অথবা অতৃপ্তিপ্রদ অথবা পরিমাণে অল্প না হয় এবং শ্রমিকগণের শ্রম ও পারিশ্রমিক যাহাতে অসমতা অথবা বিষমতা-আনয়ক না হয়, তাহা করিতে হইলে খনিজ-কার্য্য যে যে প্রণালীতে সম্পাদিত হওয়ার প্রয়োজন হয়—সেই সেই প্রণালীর অভাব এবং তদ্বিরুদ্ধ প্রণালীর প্রভাব;

(৫) জল হইতে মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারের যে সমস্ত দ্রব্যের কাঁচামাল উৎপাদন করা সম্ভব হয় সেই সমস্ত কাঁচামাল যাহাতে অস্বাস্থ্যপ্রদ অথবা অতৃপ্তিপ্রদ অথবা পরিমাণে অল্প না হয় এবং শ্রমিকগণের শ্রম ও পারিশ্রমিক যাহাতে অসমতা অথবা বিষমতা-আনয়ক না হয় তাহা করিতে হইলে বারুণী-কার্য্য যে যে প্রণালীতে সম্পাদিত হওয়ার প্রয়োজন হয়—সেই সেই প্রণালীর অভাব ও তদ্বিরুদ্ধ প্রণালীর প্রভাব;

(৬) মনুষ্যেতর বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর দুগ্ধ, লোম, মাংস, অস্থি, চর্ব্বি প্রভৃতি হইতে মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারের যে-সমস্ত দ্রব্যের কাঁচামাল উৎপাদন করা সম্ভব হয় সেই সমস্ত কাঁচামাল যাহাতে অস্বাস্থ্যপ্রদ অথবা অতৃপ্তিপ্রদ অথবা পরিমাণে অল্প না হয় এবং শ্রমিকগণের শ্রম ও পারিশ্রমিক যাহাতে অসমতা ও বিষমতা-আনয়ক না হয় তাহা করিতে হইলে মনুষ্যেতর প্রাণী-পালনকার্য্য যে যে প্রণালীতে সম্পাদিত হওয়ার প্রয়োজন—সেই সেই প্রণালীর অভাব এবং তদ্বিরুদ্ধ প্রণালীর প্রভাব;

(৭) মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারের দ্রব্যসমূহ উৎপাদন করিতে হইলে কাঁচামাল হইতে যে-সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যসমূহের উৎপাদন করিবার প্রয়োজন হয় সেই সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যে যাহাতে কাঁচামালের স্বাভাবিক গুণ ও শক্তি যথাসম্ভব বজায় থাকে, ঐ সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্য যাহাতে অস্বাস্থ্যপ্রদ অথবা অতৃপ্তিপ্রদ না হয়, উৎপাদনের পরিমাণহার যাহাতে অল্প না হয়, এবং শ্রমিকগণের শ্রম ও পারিশ্রমিক যাহাতে অসমতা অথবা বিষমতা-আনয়ক না হয় তাহা করিতে হইলে শিল্প-কার্য্যের রাসায়নিক ও আবয়বিক কর্ম্মে যে যে সতর্কতার প্রয়োজন হয়—সেই সেই সতর্কতার অভাব এবং অসতর্কতার প্রভাব;

(৮) মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারের দ্রব্যসমূহের উৎপাদন সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ করিতে হইলে শিল্পজাত দ্রব্য হইতে যে সমস্ত কারুকার্য্যজাত দ্রব্যসমূহের উৎপাদন করিবার প্রয়োজন হয় সেই সমস্ত কারুকার্য্যজাত দ্রব্য যাহাতে কোনক্রমে অস্বাস্থ্যপ্রদ অথবা অতৃপ্তিপ্রদ না হয় পরন্তু সর্ব্বতোভাবে সুন্দর ও তৃপ্তিপ্রদ হয়, তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণ-হার যাহাতে অল্প না হয়, শ্রমিকগণের শ্রম ও পারিশ্রমিক যাহাতে তাহাদের অসমতা অথবা বিষমতা-আনয়ক না হয়, তজ্জন্য যে যে সতর্কতার প্রয়োজন হয়—সেই সেই সতর্কতার অভাব এবং অসতর্কতার প্রভাব;

(৯) মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারের দ্রব্যসমূহের প্রত্যেকটী যাহাতে প্রত্যেক মানুষ স্ব স্ব প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে পাইতে পারে, এবং ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের যাহাতে অসমতা ও বিষমতার আতিশয্যের উৎপত্তি না হয় তাহা করিতে হইলে এবং দ্রব্যসমূহের চালান কার্য্য, ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য নির্দ্ধারণ, মুদ্রা নির্দ্ধারণ ও নিয়ম নির্দ্ধারণ কার্য্যে যে যে সতর্কতার প্রয়োজন হয়—সেই সেই সতর্কতার অভাব এবং অসতর্কতার প্রভাব।

মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারের সর্ব্ববিধ অভীষ্ট পদার্থ প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে উৎপাদন ও ব্যবহারযোগ্য করিতে হইলে যে নয়টী কার্য্যক্রম একান্তভাবে প্রয়োজনীয় সেই নয়টী কার্য্যক্রমের বিভিন্ন শ্রমিক অথবা কর্ম্মিগণের লভ্যাংশের অথবা পারিশ্রমিকের অল্পতা ও অসমতা বশতঃ যেরূপ উপরোক্ত নয় শ্রেণীর কার্য্যক্রমে মনোযোগের অসমতা ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ আবার নিষ্প্রয়োজনীয় ও অস্বাস্থ্যকর পদার্থের উৎপাদনের এবং নিষ্প্রয়োজনীয় অস্বাস্থ্যকর কার্য্যের প্রবৃত্তিরও উৎপত্তি হয়।

যে নয় শ্রেণীর কারণে উপরোক্ত নয় শ্রেণীর কার্য্যক্রমে মনোযোগের অসমতার উৎপত্তি হয়, সেই নয় শ্রেণীর কারণ যাহাতে দূর হয় তাহা করিতে পারিলে নয় শ্রেণীর কার্য্যক্রমে মনোযোগের সমতা আনয়ন করা সুনিশ্চিত হইয়া থাকে।

নয় শ্রেণীর কার্য্যক্রমে মনোযোগের অসমতার কারণ যে নয় শ্রেণীর—সেই নয় শ্রেণীর কারণ দূর করিতে পারিলে যেমন নয় শ্রেণীর কার্য্যক্রমে মনোযোগের সমতার উৎপত্তি হওয়া সুনিশ্চিত হয়, সেইরূপ আবার ঐ নয় শ্রেণীর কারণ দূর করিতে পারিলে নিষ্প্রয়োজনীয় ও অস্বাস্থ্যকর পদার্থ উৎপাদনের এবং নিষ্প্রয়োজনীয় ও অস্বাস্থ্যকর কার্য্যের প্রবৃত্তিও দূর হইয়া যায়। যে নয় শ্রেণীর কারণে নয় শ্রেণীর কার্য্যক্রমের, বিভিন্ন শ্রমিকগণের লভ্যাংশের অথবা পারিশ্রমিকের অল্পতা ও অসমতা ঘটিয়া থাকে, সেই নয় শ্রেণীর কারণের উৎপত্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় কেন তাহার কারণ সন্ধান করিতে বসিলে দেখা যায় যে, উহার কারণ পাঁচ শ্রেণীর; যথা:—

(১) মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারের পদার্থসমূহ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন ও ব্যবহারযোগ্য করিতে হইলে যে নয় শ্রেণীর কার্য্যক্রমের আশ্রয় লইতে হয়, সেই নয় শ্রেণীর কার্য্য-বিষয়ক আদ্যোপান্ত বিদ্যার অভাব এবং তৎস্থলে বিকৃত বিদ্যার প্রভাব;

(২) মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারের পদার্থসমূহ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন ও ব্যবহারযোগ্য করিতে হইলে যে নয় শ্রেণীর কার্য্যক্রমের আশ্রয় লইতে হয়, সেই নয় শ্রেণীর কার্য্য-বিষয়ক সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলার অভাব এবং তৎস্থলে বিকৃত নিয়ম ও বিকৃত শৃঙ্খলার প্রভাব;

(৩) মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারের পদার্থসমূহ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন ও ব্যবহারযোগ্য করিতে হইলে যে নয় শ্রেণীর কার্য্যক্রমের আশ্রয় লইতে হয় সেই নয় শ্রেণীর কার্য্যের-সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র-বণ্টন, কর্ম্মি-বণ্টন, মূল্য-বণ্টন এবং পারিশ্রমিক বণ্টন প্রভৃতি বণ্টন-বিষয়ক সু-ব্যবস্থার অভাব এবং তৎস্থলে বিকৃত ব্যবস্থার প্রভাব;

(৪) মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারের পদার্থসমূহ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন ও ব্যবহার-যোগ্য করিতে হইলে যে নয় শ্রেণীর কার্য্যক্রমের আশ্রয় লইতে হয়, সেই নয় শ্রেণীর কার্য্য-সংশ্লিষ্ট কর্ম্মিগণের শিক্ষা ও সহায়তা-বিষয়ক সুব্যবস্থার অভাব এবং তৎস্থলে বিকৃত ব্যবস্থার প্রভাব;

(৫) মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারের পদার্থসমূহ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন ও ব্যবহার-যোগ্য করিতে হইলে যে নয় শ্রেণীর কার্য্যক্রমের আশ্রয় লইতে হয়, সেই নয় শ্রেণীর কার্য্যের প্রত্যেকটীতে শ্রম যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা কম ও সমতাযুক্ত হয় এবং উৎপন্ন পদার্থ-সমূহ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে স্বাস্থ্যপ্রদ হয়, তাহা করিতে হইলে যে যে শৃঙ্খলিত কর্ম্ম-প্রণালী নির্দ্ধারণের প্রয়োজন, সেই শৃঙ্খলিত কর্ম্ম-প্রণালীর অভাব এবং তৎসঙ্গে বিশৃঙ্খলিত কর্ম্ম-প্রণালীর প্রভাব।

মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারে যে যে পদার্থ বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রুচি অনুসারে বিভিন্ন পরিমাণে অভীষ্ট হয়, সেই সেই পদার্থ সেই সেই পরিমাণ উৎপাদন করিবার বাধা কি কি হইতে পারে অথবা হইয়া থাকে তৎসম্বন্ধে উপরে যাহা যাহা বলা হইল তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উপরোক্ত বাধা অষ্টাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—

(১) মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারে যে যে পদার্থ বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রুচি অনুসারে বিভিন্ন পরিমাণে অভীষ্ট অথবা প্রয়োজনীয় হয়, সেই সেই পদার্থ সেই সেই পরিমাণে উৎপাদন করিতে হইলে যে যে নয় শ্রেণীর কার্য্যক্রমে সমান ভাবের মনোযোগ একান্ত প্রয়োজনীয়, সেই সেই নয় শ্রেণীর কার্য্যক্রমে মনযোগের অসমতা;

(২) মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারে যে যে পদার্থ বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রুচি অনুসারে বিভিন্ন পরিমাণে অভীষ্ট অথবা প্রয়োজনীয় হয়, সেই সেই অভীষ্ট অথবা প্রয়োজনীয় পদার্থ ছাড়া নিষ্প্রয়োজনীয় অথবা অস্বাস্থ্যকর পদার্থ উৎপাদনে কিম্বা নিষ্প্রয়োজনীয় অথবা অস্বাস্থ্যকর কার্য্যে মনোযোগ;

(৩) যে যে কার্য্যক্রমে সমগ্র মনুষ্যসমাজের সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যার সর্ব্ববিধ অভীষ্ট পদার্থ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন ও ব্যবহারযোগ্য হইতে পারে, সেই সেই কার্য্যক্রমের দিকে লক্ষ্য না করিয়া মানুষের ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-পরতার দিকে এবং ধন লাভ করিবার দিকে অধিকতর প্রবৃত্তিশীলতা;

(৪) মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারের সর্ব্ববিধ অভীষ্ট পদার্থ প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে উৎপাদন ও ব্যবহারযোগ্য করিতে হইলে যে নয়টী কার্য্যক্রম একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, সেই নয় শ্রেণীর কার্য্যের বিভিন্ন শ্রমিক অথবা কর্ম্মিগণের লভ্যাংশের অথবা পারিশ্রমিকের অল্পতা ও অসমতা

(৫-১৩) মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারের সর্ব্ববিধ অভীষ্ট পদার্থ প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে উৎপাদন ও ব্যবহারযোগ্য করিতে হইলে যে নয়টী কার্য্যক্রম একান্তভাবে প্রয়োজনীয় সেই নয়টী কার্য্যক্রমের বিভিন্ন শ্রমিক অথবা কর্ম্মিগণের লভ্যাংশের অথবা পারিশ্রমিকের অল্পতা ও অসমতার নয় শ্রেণীর কারণ *

---

* বর্ত্তমান সংখ্যা বঙ্গশ্রী ৯৫ পৃঃ

(১৪-১৮) যে নয় শ্রেণীর কারণে উপরোক্ত নয়টী কার্য্যক্রমের, বিভিন্ন শ্রমিক অথবা কর্ম্মিগণের লভ্যাংশের অথবা পারিশ্রমিকের অল্পতার ও অসমতার উৎপত্তি হয় সেই নয় শ্রেণীর কারণের, পাঁচশ্রেণীর কারণ; *

উপরোক্ত অষ্টাদশ শ্রেণীর বাধা কোন্ কোন্ কার্য্যপন্থায় অতিক্রম করিতে হয়—তাহার কথা আমরা "সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সমগ্র মনুষ্য সংখ্যার সর্ব্ববিধ ইচ্ছার পূরণ করিতে হইলে যে যে পদার্থ যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হয়, সেই সেই পদার্থ সেই সেই পরিমাণে যাহাতে উৎপাদন হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা শীর্ষক"-আলোচনায় বিবৃত করিব।

ঐ আলোচনা সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে হইলে প্রত্যেক মানুষ যে-সমস্ত পদার্থ অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত পদার্থের কোনটী অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির অভাব যাহাতে কোন মানুষের না হয় তাহার ব্যবস্থা কি কি হইতে পারে তাহা পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হয়।

মনুষ্যসমাজের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির মিলনাত্মকতার প্রাবল্যের অবস্থায় প্রত্যেক মানুষ যে সমস্ত পদার্থ অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন সেই সমস্ত পদার্থের কোনটী অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির অভাব যাহাতে কোন মানুষের না হয় তাহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিচার

সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যার সর্ব্ববিধ ইচ্ছার পূরণ করিতে হইলে যে যে পদার্থ যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হয়, সেই সেই পদার্থ সেই সেই পরিমাণে যাহাতে উৎপন্ন ও ব্যবহারযোগ্য হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে যতই উৎকৃষ্ট গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিসম্পন্ন হউক না কেন, কোন মানুষের পক্ষে তাহার অভীষ্ট পদার্থসমূহ সর্ব্বতোভাবে অর্জ্জন করা অথবা উপভোগ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। যাহাতে মানুষ তাহার অভীষ্ট পদার্থসমূহ সর্ব্বতোভাবে অর্জ্জন এবং উপভোগ করিতে পারে, তাহা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন হয়—সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যার সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে যে যে পদার্থ যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হয় সেই সেই পদার্থ সেই সেই পরিমাণে যাহাতে উৎপন্ন হয় তাহার ব্যবস্থা।

কিন্তু ঐ ব্যবস্থা সাধিত হইলেই যে প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে তাহার ব্যক্তিগত সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সুনিশ্চিত হয়, তাহা নহে।

প্রত্যেক মানুষ তাহার ব্যক্তিগত সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে যাহাতে পূরণ করিতে পারেন তাহা করিতে হইলে, একদিকে যেরূপ সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যার সর্ব্ববিধ ইচ্ছার পূরণ করিতে হইলে যে যে পদার্থ যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হয় সেই সেই পদার্থ সেই সেই পরিমাণে যাহাতে উৎপন্ন হইতে পারে এবং ব্যবহারযোগ্য হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়; অন্যদিকে সেইরূপ আবার মানুষের ব্যক্তিগতভাবে যে যে গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকিলে মানুষের পক্ষে তাহার অভীষ্ট পদার্থসমূহ সর্ব্বতোভাবে অর্জ্জন করা ও উপভোগ করা সম্ভব হয়, সেই সেই গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি মানুষ যাহাতে লাভ করিতে পারেন তাহারও ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়।

ঐ সমস্ত গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি মানুষ যাহাতে লাভ করিতে পারে তাহা করিতে হইলে প্রত্যেক মানুষ যে-সমস্ত পদার্থ অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন সেই সমস্ত পদার্থের কোনটী অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির অভাব যাহাতে কোন মানুষের না হয়—তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

প্রত্যেক মানুষ যে সমস্ত পদার্থ অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন সেই সমস্ত পদার্থের কোনটী অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির অভাব যাহাতে কোন মানুষের না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার পন্থা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে তিনটী বিষয়ের বিচার করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। ঐ তিন শ্রেণীর বিচারের নাম—

(১) কোন্ কোন্ গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি মানুষের অন্তরে বিদ্যমান থাকিলে মানুষের পক্ষে তাহার অভীষ্ট পদার্থসমূহ অর্জ্জন ও উপভোগ না করা অসম্ভব হয়;

(২) কোন্ কোন্ গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি মানুষের অন্তরে বিদ্যমান থাকিলে মানুষের পক্ষে তাহার অভীষ্ট পদার্থসমূহ অর্জ্জন ও উপভোগ করা অসম্ভব হয় তাহার বিচার;

(৩) যে যে গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি মানুষের অন্তরে বিদ্যমান থাকিলে মানুষের পক্ষে তাহার অভীষ্ট পদার্থসমূহ অর্জ্জন ও উপভোগ করা, অসম্ভব হয় মানুষের অন্তরে সেই সমস্ত গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রবেশ লাভ করা সম্ভব হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহার বিচার।

* বঙ্গশ্রী বর্ত্তমান সংখ্যা—২৫ পৃঃ

আমরা অতঃপর উপরোক্ত তিন শ্রেণীর বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

কোন্ কোন্ গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি মানুষের অন্তরে বিদ্যমান থাকিলে মানুষের পক্ষে তাহার অভীষ্ট পদার্থসমূহ ঈপ্সিত পরিমাণে অর্জ্জন ও উপভোগ না করা অসম্ভব হয় তাহার বিচার

আমাদিগের সিদ্ধান্তানুসারে নয় শ্রেণীর গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকিলে মানুষের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে তাহার অভীষ্ট পদার্থসমূহ অর্জ্জন ও উপভোগ না করা অসম্ভব হয়। অবশ্য এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে যতই উৎকৃষ্ট গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি-সম্পন্ন হউক না কেন, সমগ্র মনুষ্যসমাজের সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যার সর্ব্ববিধ ইচ্ছার পূরণ করিতে হইলে যে যে পদার্থ যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হয় সেই সেই পদার্থ সেই সেই পরিমাণে যাহাতে উৎপন্ন ও ব্যবহারযোগ্য হয় তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে কোনক্রমেই কোন মানুষের পক্ষে তাহার অভীষ্ট পদার্থসমূহ সর্ব্বতোভাবে অর্জ্জন করা অথবা উপভোগ করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

যে নয় শ্রেণীর গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকিলে মানুষের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে তাহার অভীষ্ট পদার্থসমূহ অর্জ্জন না করা অসম্ভব হয়—সেই নয় শ্রেণীর গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির নাম—

(১) মানুষের পরস্পরের মধ্যে মিলনাত্মক আচরণ করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি ;

(২) অপর মানুষের সহিত ব্যবহারে অকৃত্রিম বিনয়-যুক্ত মনোভাব পোষণ করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি ;

(৩) মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারের পদার্থসমূহ সমগ্র মনুষ্যসমাজের সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যার প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে উৎপাদন করিতে হইলে এবং মানুষকে তাহা অর্জ্জন করিবার উপযুক্ত করিতে হইলে, এবং কোন মানুষের কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অথবা কোন প্রয়োজনীয় গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির কোন অভাব যাহাতে না হয় তাহা করিতে হইলে যে যে শ্রেণীর বিদ্যার প্রয়োজন, সেই সেই শ্রেণীর বিদ্যা অর্জ্জন করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি ;

(৪) প্রাকৃতিক অথবা স্বাভাবিক যে যে কারণে মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন অথবা বুদ্ধি ক্ষয়যুক্ত হইতে পারে—সেই সমস্ত কারণ পরিজ্ঞাত হইয়া কোন মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন অথবা বুদ্ধি প্রাকৃতিক অথবা স্বাভাবিক কারণে ক্ষয়যুক্ত না হইতে পারে এবং প্রত্যেক মানুষ যাহাতে নিজ নিজ পরিবার, আত্মীয় ও স্বজনের সঙ্গে নিজ নিজ জন্মভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জীবনযাপন করিতে পারেন তাহা করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি ;

(৫) মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির পরিশক্তি ও বৃদ্ধিসাধক যে সমস্ত গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে—সেই সমস্ত গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রত্যেকটীর কারণ যে "সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের পঞ্চবিধ কারণ-অবস্থা ও পঞ্চবিধ কার্য্যাবস্থা, তাহা সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি ;

(৬) মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অস্তিত্ব বজায় রাখিবার এবং কার্য্য করিবার যে সমস্ত গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে সেই সমস্ত গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রত্যেকটীর মূল কারণ যে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের পঞ্চবিধ কারণ-অবস্থা ও পঞ্চবিধ কার্য্যাবস্থা, তাহা সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি ;

(৭) যে যে শ্রেণীর কার্য্য বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিলে অথবা যে যে শ্রেণীর পদার্থ আহার্য্যরূপে ব্যবহার করিলে অথবা যে যে শ্রেণীর বিহারে প্রবৃত্ত হইলে অথবা যে পরিমাণের কার্য্য করিলে অথবা যে পরিমাণের আহার ও বিহার করিলে নিজের অথবা অপর কাহারও অন্তরস্থ সপ্তবিধ কার্য্যের সমতার আতিশয্যের স্থলে অসমতার অথবা বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব না হইতে পারে—সেই সেই শ্রেণীর বৃত্তি, আহার ও বিহার অবলম্বন করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি ;

(৮) মানুষ যাহাতে নিজের এবং প্রত্যেক পদার্থের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি বিষয়ে দোষ ও গুণ উভয়ই সর্ব্বতো-ভাবে বিশ্লেষণ করিতে পারে এবং ঐ বিশ্লেষণানুসারে নিজের ও অপরের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করিতে পারে, তাহা করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি ;

(৯) মানুষ যাহাতে অপরের নিকট নিজের মনোভাব সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করিতে পারে—তাহার বিদ্যা ও অভ্যাস সম্যক্‌ভাবে অর্জ্জন করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি।

উপরোক্ত নয় শ্রেণীর গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে অর্জ্জন করা যাহাতে সহজসাধ্য হয় তাহা করিতে হইলে কোন্ কোন্ সংগঠনের প্রয়োজন হয় তাহার কথা আমরা "প্রত্যেক মানুষ যে সমস্ত পদার্থ অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন সেই সমস্ত পদার্থের

প্রত্যেকটী অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রাচুর্য্য যাহাতে প্রত্যেক মানুষের হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা" শীর্ষক আলোচনায় বিবৃত করিব।

কোন্ কোন্ গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকিলে মানুষের পক্ষে তাহার অভীষ্ট পদার্থসমূহ অর্জ্জন ও উপভোগ করা অসম্ভব হয় তাহার বিচার

যে নয় শ্রেণীর গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকিলে মানুষের পক্ষে তাহার অভীষ্ট পদার্থসমূহ অর্জ্জন ও উপভোগ না করা অসম্ভব হয়, সময় সময় সেই নয় শ্রেণীর গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির বিপরীত নয় শ্রেণীর গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি মানুষের অন্তরে আশ্রয় লইয়া থাকে। উপরোক্ত বিপরীত নয় শ্রেণীর গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি যে-মানুষের অন্তরে আশ্রয় লইতে সক্ষম হয়, সেই মানুষের পক্ষে তাহার অভীষ্ট পদার্থসমূহ অর্জ্জন ও উপভোগ করা অসম্ভব হয়।

উপরোক্ত বিপরীত নয় শ্রেণীর গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির নাম—

(১) মানুষের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ-মিলনাত্মক ও ও বিচ্ছেদাত্মক আচরণ করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি;

(২) অপর মানুষের সহিত ব্যবহারে অহঙ্কারযুক্ত মনোভাব পোষণ করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি;

(৩) মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারের পদার্থসমূহ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতে হইলে এবং মানুষকে তাহা অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার উপযুক্ত করিতে হইলে এবং কোন মানুষের কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অথবা কোন প্রয়োজনীয় গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির কোন অভাব যাহাতে না হয় তাহা করিতে হইলে যে যে শ্রেণীর বিদ্যার প্রয়োজন হয়, সেই সেই শ্রেণীর বিদ্যার কোন শ্রেণীর বিদ্যা অর্জ্জন না করিয়া অথবা অর্জ্জন করিবার চেষ্টা না করিয়া যে শ্রেণীর বিদ্যায় কোন মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অথবা প্রয়োজনীয় গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির অভাব হইতে পারে সেই শ্রেণীর বিদ্যার্জ্জন করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি;

(৪) প্রত্যেক মানুষ যাহাতে জন্মভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার কার্য্য না করিয়া যাহাতে একটী মানুষও "ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে" এই ভাবে ভবঘোরার মত ঘুরিয়া বেড়াইতে প্রবৃত্তিযুক্ত হয়, তাদৃশ কার্য্য করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি;

(৫) মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির পরিণতি ও বৃদ্ধি-সাধক যে সমস্ত গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে সেই সমস্ত গুণাদির প্রত্যেকটীর কারণ যে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের পঞ্চবিধ কারণ-অবস্থা ও পঞ্চবিধ কার্য্য-অবস্থা তাহা বিস্মৃত হইয়া নিজেকে অথবা কোন মানুষকে অথবা কোন স্থানকে সেই সমস্ত গুণাদির কারণ বলিয়া ধারণা করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি;

(৬) মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির উপভোগ করিবার যে সমস্ত গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে, সেই সমস্ত গুণাদির প্রত্যেকটীর মূল কারণ যে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের পঞ্চবিধ কারণ-অবস্থা ও পঞ্চবিধ কার্য্যাবস্থা তাহা বিস্মৃত হইয়া নিজেকে অথবা কোন মানুষকে অথবা কোন বিদ্যাকে অথবা কোন দ্রব্যকে সেই সমস্ত গুণাদির কারণ বলিয়া ধারণা করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি;

(৭) যে শ্রেণীর কার্য্য বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিলে অথবা যে শ্রেণীর পদার্থ আহার্য্যরূপে ব্যবহার করিলে অথবা যে শ্রেণীর বিহারে প্রবৃত্ত হইলে অথবা যে পরিমাণের কার্য্য করিলে অথবা যে পরিমাণে আহার ও বিহার করিলে নিজের অথবা অপর কাহারও অন্তরস্থ সপ্ত-বিধ কার্য্যের সমতার আতিশয্যের স্থলে অসমতার অথবা বিষমতার আতিশয্যের উদ্ভব না হইতে পারে—তৎপ্রতি অবহিত না হইয়া যাহাতে নিজের এবং অপরের অন্তরস্থ সপ্তবিধ কার্য্যের অসমতার ও বিষ-মতার আতিশয্যের উদ্ভব হইতে পারে তাদৃশ বৃত্তি, আহার ও বিহারে প্রমত্ত হইবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি;

(৮) মানুষ যাহাতে নিজের এবং প্রত্যেক পদার্থের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি বিষয়ে দোষ ও গুণ উভয়ই সর্ব্বতোভাবে বিশ্লেষণ করিতে পারে এবং ঐ বিশ্লেষণানুসারে নিজের ও অপরের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করে—তাহা না করিয়া পল্লবগ্রাহী হওয়ার এবং বিচারহীন মতবাদ অথবা সংস্কার পোষণ করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি;

(৯) মানুষ যাহাতে অপরের নিকট নিজের মনোভাব সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করিতে পারে তাহার বিদ্যা ও অভ্যাস সম্যক্‌ভাবে অর্জ্জন না করিয়া অপরের নিকট নিজের মনোভাব প্রকাশ করিবার সামর্থ্যযুক্ত মনে করার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি।

যে যে গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি মানুষের অন্তরে বিদ্যমান থাকিলে মানুষের পক্ষে তাহার অভীষ্ট পদার্থ সমূহ অর্জ্জন ও উপ-

ভোগ করা অসম্ভব হয়—মানুষের অন্তরে সেই সমস্ত গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রবেশ লাভ করা সম্ভব হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহার বিচার

পূর্ব্বোক্ত যে যে নয় শ্রেণীর গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি মানুষের অন্তরে বিদ্যমান থাকিলে মানুষের পক্ষে তাহার অভীষ্ট অথবা প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহ অর্জ্জন ও উপভোগ করা অসম্ভব হয়, আমাদিগের মতবাদানুসারে, মানুষের অন্তরে সেই নয় শ্রেণীর গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রবেশ লাভ করা সম্ভব হয় প্রধানতঃ মানুষের ইচ্ছার বিকৃতির অথবা বৈকৃতিকতার জন্য।

আমাদিগের সিদ্ধান্তানুসারে প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীর তত্ত্বের * ও দুই শ্রেণীর ব্যবস্থার অভাব ও বিকৃতির জন্য মানুষের ইচ্ছাসমূহ বিকৃত হইয়া থাকে।

যে পাঁচ শ্রেণীর তত্ত্বের এবং দুই শ্রেণীর ব্যবস্থার অভাব ও বিকৃতির জন্য মানুষের ইচ্ছাসমূহ বিকৃত হইয়া থাকে, সেই পাঁচশ্রেণীর তত্ত্বের এবং দুই শ্রেণীর ব্যবস্থার নাম—

(১) মানুষের ও অন্যান্য চরজীবের এবং উদ্ভিদের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি-তত্ত্ব;
(২) মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতত্ত্ব;
(৩) সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের দশটী অবস্থা (অর্থাৎ অদ্বৈত, মায়া, দ্বৈত, কাল, বিচ্ছেদ, তরল, স্থূল, উদ্ভিদ, চরজীব এবং মহাকাশের অবস্থা)-তত্ত্ব;
(৪) উপলব্ধি-তত্ত্ব;
(৫) শিক্ষা-তত্ত্ব;
(৬) শিক্ষা-ব্যবস্থা;
(৭) উপলব্ধি-ব্যবস্থা।

প্রধানতঃ অথবা সাক্ষাৎভাবে ইচ্ছার বিকৃতি বশতঃই যে, যে-যে গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি মানুষের অন্তরে বিদ্যমান থাকিলে মানুষের পক্ষে তাহার অভীষ্ট অথবা প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহ অর্জ্জন ও উপভোগ করা অসম্ভব হয়—মানুষের অন্তরে সেই সমস্ত গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রবেশ লাভ করা সম্ভব হয়, তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইলে অথবা ঐ কথার সত্যতা স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে ইচ্ছার প্রাকৃতিকতা ও বৈকৃতিকতা কাহাকে বলে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হয়।

ইচ্ছার প্রকৃতি ও বিকৃতি কাহাকে বলে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে মানুষের ইচ্ছা কাহাকে বলে তাহা বৈজ্ঞানিকভাবে স্পষ্টরূপে ধারণা করিবার প্রয়োজন হয়।

মানুষের ইচ্ছা কাহাকে বলে তাহা বৈজ্ঞানিকভাবে স্পষ্টরূপে ধারণা করিবার পন্থা কি তৎসম্বন্ধে আমরা অতঃপর আলোচনা করিব।

"ইচ্ছা" কাহাকে বলে তাহার ব্যাখ্যা করিবার-পর ইচ্ছার প্রাকৃতিকতা ও বৈকৃতিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করা সহজসাধ্য হইবে।

মানুষের ইচ্ছা কাহাকে বলে তাহা বৈজ্ঞানিকভাবে স্পষ্টরূপে ধারণা করিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হয় যে, মানুষের শরীরের সহিত তাহার কতকগুলি (অর্থাৎ মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্ম) গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি জন্মাবধি অঙ্গাঙ্গী ভাবে সর্ব্বদা জড়িত থাকে। যে যে গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি মানুষের শরীরের সহিত তাহার জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত থাকে—সেই সেই গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি মানুষের শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই সর্ব্বতোভাবে অভিব্যক্তি লাভ করে না। যে গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহ মানুষের শরীরের সহিত তাহার জন্মাবধি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত থাকে সেই গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের উৎপত্তির কতকগুলি কারণ সর্ব্বদা এই ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান আছে। "মানুষের ইচ্ছা, বুদ্ধি, জ্ঞান, কর্ম্মশক্তি ও কর্ম্ম-প্রবৃত্তি-সমূহের উৎপত্তির কারণ নির্দ্ধারণ এবং ইচ্ছাসমূহের শ্রেণী-বিভাগ"-শীর্ষক আলোচনায়* আমরা ঐ সম্বন্ধে আংশিকভাবে আলোচনা করিয়াছি। আমাদিগের উপরোক্ত আলোচনা স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে পারিলে ইহা বুঝিতে হয় যে, মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের মূল কারণ আট শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—

(১) সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের অদ্বৈত-অবস্থা,
(২) " " " মায়া-অবস্থা,
(৩) " " " দ্বৈত-অবস্থা,
(৪) " " " কাল (অথবা অগ্নি)-অবস্থা,
(৫) " " " বিচ্ছেদ-অবস্থা,
(৬) " " " তরল অবস্থা,
(৭) " " " স্থূল-অবস্থা,
(৮) " " " মহাকাশ-অবস্থা।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের ঐ আট শ্রেণীর অবস্থা বশতঃ মানুষের শরীরের প্রত্যেক অংশে তাহার জন্মাবধি মরণ

* সংস্কৃত ভাষায় পদার্থ-বিশেষের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশ সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ ও নিঃসন্দিগ্ধ ইতিবৃত্তের নাম "তত্ত্ব"।

আজকাল অনেকে "তত্ত্ব" ও "বিজ্ঞান" এই দুইটী শব্দ একার্থে বুঝিয়া থাকেন এবং একার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমাদিগের মতে উহা ঠিক নহে। আমাদিগের মতে পদার্থ-বিশেষের উৎপত্তিই হউক, অথবা অস্তিত্বই হউক, অথবা পরিণতিই হউক, অথবা বৃদ্ধিই হউক, অথবা ক্ষয়ই হউক, অথবা বিনাশই হউক, কোন ভাবের কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ বিচার করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় সেই সিদ্ধান্তের নাম "বিজ্ঞান"।

পদার্থ-বিষয়ক বিজ্ঞান স্থির না করিতে পারিলে "তত্ত্ব" স্থির করা সম্ভবযোগ্য নহে; কিন্তু "তত্ত্ব" স্থির করিতে না পারিলেও বিজ্ঞান স্থির করা সম্ভব হয়।

* বঙ্গশ্রী—১৩৫০, অগ্রহায়ণ—২৮ পৃঃ।

পর্য্যন্ত সাত শ্রেণীর কার্য্য প্রতিনিয়ত স্বতঃই হইতে থাকে। যে সাত শ্রেণীর কার্য্য প্রত্যেক মানুষের শরীরের প্রত্যেক অংশে তাহার জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত স্বতঃই প্রতিনিয়ত হইয়া থাকে সেই সাত শ্রেণীর কার্য্যের নাম—

(১) পঞ্চবিধ (যথা, অণ্ডাকারের, উৎক্ষেপণ-আকারের আকুঞ্চন-আকারের, অবক্ষেপণ-আকারের ও প্রসারণ-আকারের) আবয়বিক কার্য্য (ক)

(২) ষড়্বিধ (যথা: শরীরমধ্যস্থ বায়বীয় অংশের তেজ-বৃদ্ধিকারক ও রস বৃদ্ধিকারক, বাষ্পীয় অংশের তেজ-বৃদ্ধিকারক ও রস-বৃদ্ধি কারক, তরল অংশের তেজ-বৃদ্ধিকারক ও রস-বৃদ্ধি কারক) রাসায়নিক কার্য্য (খ)

(৩) পঞ্চবিধ অগ্নির (যথা: শরীরমধ্যস্থ বায়বীয় অবস্থার অগ্নির, বাষ্পীয় অবস্থার অগ্নির, তরল-অবস্থার অগ্নির, স্থূল-অবস্থার অগ্নির, মহাকাশ-অবস্থার অগ্নির) কার্য্য…(গ)

(৪ পঞ্চবিধ অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতিমূলক (অর্থাৎ মানুষের শরীরমধ্যস্থ বায়বীয় অবস্থা হইতে বাষ্পীয় অবস্থার পরিণতি, বাষ্পীয় অবস্থা হইতে তরল-অবস্থার পরিণতি, তরল-অবস্থা হইতে স্থূল অবস্থার পরিণতি, স্থূল-অবস্থা হইতে মহাকাশ অবস্থার পরিণতি এবং মহাকাশ অবস্থা হইতে বায়বীয় অবস্থার পরিণতিমূলক) কার্য্য… (ঘ)

(৫) ত্রিবিধ (অর্থাৎ ঊর্দ্ধাধঃ, পূর্ব্ব-পশ্চাৎ এবং বাম-দক্ষিণাভিমুখী) চাপের কার্য্য…(ঙ)

(৬) শৃঙ্খলিত ভাবে বিবিধ ঘনত্ব-সমাবেশের কার্য্য…(চ)

(৭) তেজ ও রসের মিলিত ভাবে শৃঙ্খলাযুক্ত প্রবাহের কার্য্য…(ছ)

উপরোক্ত সাতশ্রেণীর কার্য্য প্রত্যেক মানুষের শরীরের প্রত্যেক অংশে তাহার জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত স্বতঃই প্রতিনিয়ত হইয়া থাকে বটে কিন্তু ঐ সাত শ্রেণীর কার্য্যের পরিমাণ অথবা বেগ যে সর্ব্বদাই এক রকমের থাকে তাহা নহে। ঐ সাতশ্রেণীর কার্য্যের পরিমাণ ও বেগ প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তনশীল হইয়া থাকে। মানুষের শরীরের সাতশ্রেণীর কার্য্যের পরিমাণ ও বেগ যেরূপ প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তনশীল হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার শরীরমধ্যস্থ ঐ সাতশ্রেণীর কার্য্যের পরিণতি (Resultant)-ও সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীলতার প্রবৃত্তি-যুক্ত হইয়া থাকে। কার্য্যের পরিমাণ ও বেগ পরিবর্ত্তনশীল হইলে যে ঐ কার্য্যের পরিণতিও পরিবর্ত্তনশীল হইতে বাধ্য হয়—ইহা সাধারণ বুদ্ধির বিষয়।

মানুষের শরীরের সাত শ্রেণীর কার্য্যের পরিমাণ ও বেগের পরিবর্ত্তনশীলতার জন্য উহাদের পরিণতি কখন কখন এক শ্রেণীর হয় এবং কখন কখন একাধিক শ্রেণীর হইয়া থাকে। মানুষের শরীরে যে সাতশ্রেণীর কার্য্য বিদ্যমান থাকে ঐ সাতশ্রেণীর কার্য্যের পরিণতির অভিব্যক্তি হয় তাহার দশশ্রেণীর ইন্দ্রিয়ের, মনের এবং বুদ্ধির কার্য্যে। যে মানুষের শরীরের সাতশ্রেণীর কার্য্যের পরিণতি সর্ব্বতো-ভাবে একশ্রেণীর অথবা একই রকমের হয়—সেই মানুষ সংস্কৃত ভাষায় "একনিষ্ঠ সাধক" অথবা "যোগী" অথবা "অতি-মানুষ" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। কোন মানুষের শরীরের সাতশ্রেণীর কার্য্যের পরিণতি একশ্রেণীর হইলে বিজ্ঞানের দিক হইতে ঐ মানুষকে "সমতাযুক্ত" মানুষ বলা হইয়া থাকে। সমতাযুক্ত মানুষ সর্ব্বদাই স্বাস্থ্যবান্, বুদ্ধিমান্ ও অপর মানুষের সহিত মিলন-প্রবণ ও সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়া থাকেন। সমতাযুক্ত মানুষ কখনও দলাদলি-প্রিয় অথবা দ্বন্দ্ব-কলহপ্রিয় হইতে পারেন না।

মানুষের শরীরের সাতশ্রেণীর কার্য্যের পরিণতি যখন একাধিক শ্রেণীর হয় তখন সাধারণতঃ দুই রকমের স্বভাব-যুক্ত হইয়া থাকে। কখন কখন সাতশ্রেণীর কার্য্যের পরিণতি একাধিক শ্রেণীর হয় বটে; কিন্তু ঐ একাধিক শ্রেণীর পরিণতির পরস্পরের মধ্যে কোন বিরোধ বিদ্যমান থাকে না। আবার কখন কখন ঐ একাধিক শ্রেণীর পরিণতির পরস্পরের মধ্যে নানা রকমের বিরোধ বিদ্যমান থাকে।

যে মানুষের শরীরের সাতশ্রেণীর কার্য্যের পরিণতি একাধিক শ্রেণীর হয় বটে; কিন্তু ঐ একাধিক শ্রেণীর পরি-ণতির পরস্পরের মধ্যে কোন বিরোধ বিদ্যমান থাকে না—সেই মানুষকে বিজ্ঞানের দিক হইতে সংস্কৃত ভাষায় "অসমতা-যুক্ত" মানুষ বলা হইয়া থাকে।

যে মানুষের শরীরের সাতশ্রেণীর কার্য্যের পরিণতি একাধিক শ্রেণীর হয় এবং ঐ একাধিক শ্রেণীর পরিণতির পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বিদ্যমান থাকে—সেই মানুষকে বিজ্ঞানের দিক হইতে সংস্কৃত ভাষায় "বিষমতাযুক্ত" মানুষ বলা হইয়া থাকে।

অসমতাযুক্ত মানুষ কোন বিষয়ে প্রায়শঃ সর্ব্বতোভাবে একনিষ্ঠ হইতে পারেন না। তাঁহারা প্রায়শঃ চঞ্চল এবং অস্থিরচিত্তের হইয়া থাকেন। তাঁহাদের স্বাস্থ্য কখনও সর্ব্বতোভাবে ব্যাধিমুক্ত হয় না। তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়সমূহ কখনও কোন বিষয় সম্পূর্ণ অথবা সর্ব্বতোভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে সক্ষম হয় না। তাঁহাদিগের বুদ্ধি কখনও ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য হইতে পারে না। তাঁহারা কখনও সমগ্র মনুষ্যসমাজের সহিত সর্ব্বতোভাবে মিলন-প্রবণ অথবা সহানুভূতি-সম্পন্ন হইতে পারেন না। কতকগুলি মানুষের সহিত তাঁহারা মিলন-প্রবণ এবং সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়া থাকেন; আবার কতকগুলি মানুষের প্রতি তাঁহারা বিরুদ্ধভাব পোষণ করিয়া

থাকেন। দলাদলি-প্রিয়তা তাঁহাদিগের মজ্জাগত হইয়া থাকে।

বিষমতাযুক্ত মানুষের স্বভাব অনেকাংশে অসমতাযুক্ত মানুষের স্বভাবের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত হইয়া থাকে। অসমতা-যুক্ত মানুষ ও বিষমতাযুক্ত মানুষের মধ্যে পার্থক্য এই যে, অসমতাযুক্ত মানুষ দলাদলি-প্রিয় হইয়া থাকেন বটে কিন্তু দ্বন্দ্ব-কলহকে ভয় করেন। বিষমতাযুক্ত মানুষ দ্বন্দ্ব-কলহে প্রবৃত্ত হইতে ভয় করেন না।

মানুষের শরীরের মধ্যস্থ সপ্তবিধ কার্য্যের পরিণতি একাধিক শ্রেণীর হইলে অথচ ঐ একাধিক শ্রেণীর পরিণতির পরস্পরের মধ্যে বিরোধিতা না থাকিলে সর্ব্বতোভাবের স্বাস্থ্য বজায় রাখা অসম্ভব হয় বটে কিন্তু প্রায়শঃ কঠিন পীড়া-গ্রস্ত হইতে হয় না। অন্য পক্ষে, ঐ একাধিক শ্রেণীর পরিণতির পরস্পরের বিরোধিতা উপস্থিত হইলে কঠিন পীড়াগ্রস্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে এবং এমন কি ঐ বিরোধিতার মাত্রা তীব্র হইলে জীবন-ক্রিয়ার বিরতি পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের মূল কারণ সর্ব্ব-ব্যাপী তেজ ও রসের যে আট শ্রেণীর অবস্থা, সেই আট শ্রেণীর অবস্থা মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের মৌলিক কারণ বটে কিন্তু সাক্ষাৎ কারণ নহে। মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের সাক্ষাৎ কারণ—তাহার শরীরের মধ্যস্থিত সাত শ্রেণীর কার্য্য। মানুষের শরীরের মধ্যস্থিত ঐ সপ্তবিধ কার্য্যকে সংস্কৃত ভাষায় বিজ্ঞানের দিক হইতে "সপ্ত-ব্যাহৃতি" নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। "সপ্ত-ব্যাহৃতি" যে কেবলমাত্র প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান আছে তাহা নহে; উহা এই ভূমণ্ডলের জলভাগের প্রত্যেক অংশে, স্থলভাগের প্রত্যেক অংশে, মহাকাশ-ভাগের প্রত্যেক অংশে, উদ্ভিদ-শ্রেণীর প্রত্যেকটীর প্রত্যেকাংশে, জল-জাত পদার্থের প্রত্যেকটীর প্রত্যেক অংশে, খনিজ-পদার্থ-শ্রেণীর প্রত্যেকটীর প্রত্যেক অংশে এবং জীব-শ্রেণীর প্রত্যেকটীর প্রত্যেক অংশে বিদ্যমান আছে। এই ভূমণ্ডলের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক অংশে সপ্ত-ব্যাহৃতি বিদ্যমান আছে বটে কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক অংশে উহা বিদ্যমান নাই। তাহা ছাড়া, এই ভূমণ্ডলের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক অংশে সপ্ত-ব্যাহৃতি বিদ্যমান থাকে বটে কিন্তু কোন দুইটী পদার্থের শরীরস্থ সপ্ত-ব্যাহৃতির পরিমাণ ও বেগ সাধারণতঃ সর্ব্বতোভাবে সমান হয় না এবং উহাদিগের পরিণতিও সর্ব্বতোভাবে এক রকমের অথবা একই শ্রেণীর হয় না।

বিজ্ঞানের দিক হইতে মানুষের "ইচ্ছা" কাহাকে বলে তাহা স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে হইলে, মানুষের সপ্ত-ব্যাহৃতি সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে ধারণা করিবার প্রয়োজন হয়।

মানুষের ইচ্ছার প্রাকৃতিকতা ও বৈকৃতিকতা কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে হইলে একদিকে যেরূপ মানুষের সপ্ত-ব্যাহৃতি সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে ধারণা করিবার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার মানুষের সমতা, অসমতা ও বিষমতা কাহাকে বলে তাহাও ধারণা করা আবশ্যক হইয়া থাকে।

যে-যে গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি মানুষের অন্তরে বিদ্যমান থাকিলে মানুষের পক্ষে তাহার অভীষ্ট পদার্থসমূহ অর্জ্জন ও উপভোগ করা অসম্ভব হয়, মানুষের অন্তরে সেই সমস্ত গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রবেশলাভ করা সম্ভব হয় কোন্ কোন্ কারণে—তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলেও মানুষের সপ্ত-ব্যাহৃতি সম্বন্ধে, মানুষের সমতা, অসমতা ও বিষমতা সম্বন্ধে এবং মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের মৌলিক কারণ সর্ব্ব-ব্যাপী তেজ ও রসের যে আট শ্রেণীর অবস্থা—সেই আট শ্রেণীর অবস্থা সম্বন্ধে—স্পষ্টভাবে ধারণা থাকিবার প্রয়োজন হয়।

মানুষের ইচ্ছাসমূহের উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কার্য্যক্রমে এবং ঐ ইচ্ছাসমূহ কোন কোন কার্য্যক্রমে বৈকৃতিকতা ও প্রাকৃতিকতা লাভ করিয়া থাকে, আমরা অতঃপর সেই সেই কার্য্যক্রমের কথা বিবৃত করিব।

এই আলোচনার প্রারম্ভেই আমরা বলিয়াছি যে, যে-যে গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি মানুষের শরীরের সহিত তাহার জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত থাকে—সেই সেই গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি মানুষের শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই সর্ব্বতোভাবে অভিব্যক্তি লাভ করে না।

মানুষের শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই তাহার শরীরের বাহিরে একদিকে যেরূপ কতকগুলি গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যদিকে আবার শরীরের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সাতশ্রেণীর কার্য্যের (অথবা সপ্ত-ব্যাহৃতির) * "লিঙ্গ" ও "লক্ষণ"সমূহ অভিব্যক্তি লাভ করে। মানুষের শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই তাহার শরীরের বাহিরে কতকগুলি গুণ এবং শরীরের ভিতরে পূর্ব্বোক্ত সাতশ্রেণীর কার্য্যের "লিঙ্গ" ও "লক্ষণ"সমূহ অভিব্যক্তি লাভ করে বটে; কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই কোন শক্তি ও কোন প্রবৃত্তির কোন লিঙ্গ অথবা কোন লক্ষণ অভিব্যক্তি লাভ করে না। শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের লিঙ্গের অভিব্যক্তি হয় ভূমিষ্ঠ হইবার কিছুক্ষণ ও কিছুদিন পরে।

* স্বাভাবিক কার্য্যপ্রকাশক যে সমস্ত চিহ্ন শরীরের স্থূলভাগে প্রকাশ পায় এবং যে সমস্ত চিহ্ন সাধারণ [অর্থাৎ সাধনা না করিয়া স্বভাব-লব্ধ] ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা যায় অথবা দেখা যায়, সেই সমস্ত চিহ্নকে সংস্কৃত ভাষায় "লিঙ্গ" বলা হইয়া থাকে।

স্বাভাবিক কার্য্য বশতঃ শরীরের যে সমস্ত অঙ্গ স্বতঃই প্রকাশিত হয়, সেই সমস্ত অঙ্গের কার্য্যের চিহ্নসমূহকে সংস্কৃত ভাষায় "লক্ষণ" বলা হয়।

"লিঙ্গ" ও "লক্ষণ" সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে। সেই সমস্ত কথা এখানে বলা সম্ভব নহে।

শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের বিভিন্ন লিঙ্গের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের মধ্যে ঐ সমস্ত লিঙ্গজাত লক্ষণসমূহের প্রকাশ যুগপৎ আরম্ভ হয় এবং ঐ সমস্ত লক্ষণানুযায়ী শরীরের বৃদ্ধি স্বতঃই সাধিত হইতে আরম্ভ হয়। মানুষের স্বাভাবিক শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের বিভিন্ন লিঙ্গকে সংস্কৃত ভাষায় "ইচ্ছা" এই নামে অভিহিত করা হয়।

কোন্ কোন্ শ্রেণীর কার্য্যকে সংস্কৃত ভাষায় "লিঙ্গ" ও "লক্ষণ" নামে অভিহিত করা হয়—তাহা স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে না পারিলে মানুষের "ইচ্ছা" কাহাকে বলে, তাহা স্পষ্টভাবে ধারণা করা যায় না। মানুষের "ইচ্ছা" কাহাকে বলে এবং মানুষের ইচ্ছার উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কার্য্য-ক্রমে তাহা মানুষকে নিজ নিজ কার্য্যে নিজ নিজ প্রযত্নের দ্বারা বুঝিয়া লইতে হয় এবং উপলব্ধি করিতে হয়। যে মানুষ নিজ কার্য্যে নিজ প্রযত্নের দ্বারা ইচ্ছা কাহাকে বলে তাহা বুঝিয়া লইবার জন্য এবং উপলব্ধি করিবার জন্য চেষ্টাশীল হ'ন, তাঁহার পক্ষে ইচ্ছার ব্যাখ্যা-সম্বন্ধীয় কথাসমূহ সর্ব্বতো-ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবযোগ্য হয়। নতুবা উহা সর্ব্বতো-ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা অথবা বুঝিয়া উঠা সম্ভবযোগ্য হয় না।

"ইচ্ছা" কাহাকে বলে তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য আমরা উপরে যে সমস্ত কথার উল্লেখ করিয়াছি, সেই সমস্ত কথা আমরা অতঃপর আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব।

মানুষের শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, পুরুত্ব ও বিভিন্ন আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া তাহার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন বর্ণ (যথা : মাথায় ও ভ্রূতে কাল চুল, চক্ষুগোলকে শাদা ও কাল বর্ণ, ওষ্ঠদেশে লাল বর্ণ, চর্ম্মে লাল অথবা শাদা অথবা কৃষ্ণবর্ণ ইত্যাদি) দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্তই মানুষের "গুণ"।

উপরোক্ত গুণসমূহ ছাড়া শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে তাহার শরীরে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য, মল-মূত্রত্যাগের কার্য্য, ক্রন্দনের কার্য্য প্রভৃতিও বিদ্যমান থাকে। এই সমস্ত কার্য্যকে মানুষের শরীরস্থ স্বাভাবিক সপ্তবিধ কার্য্যের (অথবা সপ্ত-ব্যাহৃতির) "লিঙ্গ" বলিয়া অভিহিত করা হয়।

শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীরে উপরোক্ত গুণ ও কার্য্যসমূহ দেখা যায় বটে কিন্তু ঐ সমস্ত গুণ ও কার্য্য ছাড়া কোন শক্তি অথবা প্রবৃত্তির কোন চিহ্ন দেখা যায় না! ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই কোন শিশুর শরীরের কোন অঙ্গ কিছু পাইবার উদ্দেশ্যে কোন কার্য্যে লিপ্ত হয় না বলিয়া ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই কোন শিশুর কোন শক্তির অথবা প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি হয় না।

কোন বিষয়ে শক্তির অথবা প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ইচ্ছার ও শক্তির এবং প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি হয় না।

এইখানে পাঠকগণকে মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষ তাহার জীবনে যে-যে বিষয়ে অথবা যে-যে কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকে, সেই-সেই বিষয়ের অথবা সেই-সেই কার্য্যের প্রত্যেকটীর সম্বন্ধে মানুষের অন্তরে কতকগুলি গুণ, শক্তি এবং প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে। মানুষ তাহার জীবনে যে-যে বিষয়ে অথবা যে-যে কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকে সেই-সেই বিষয়ে অথবা সেই-সেই কার্য্যে লিপ্ত হইবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি মানুষের অন্তরে বিদ্যমান না থাকিলে সেই-সেই বিষয়ে অথবা সেই-সেই কার্য্যে লিপ্ত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষ তাহার জীবনে যে-যে বিষয়ে অথবা যে-যে কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকে সেই-সেই বিষয়ে অথবা সেই-সেই কার্য্যে লিপ্ত হইবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি মানুষের অন্তরে বিদ্যমান না থাকিলে সেই-সেই বিষয়ে অথবা সেই-সেই কার্য্যে লিপ্ত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবযোগ্য হয় না বটে; কিন্তু কোন বিষয়ে অথবা কোন কার্য্যে লিপ্ত হইবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি যুগপৎ সমানভাবে অভিব্যক্তি লাভ করে না। মানুষ তাহার জীবনে যে-যে বিষয়ে অথবা যে-যে কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকে তাহার প্রত্যেক-টীতে লিপ্ত হইবার গুণ, সর্ব্বপ্রথমে মানুষের অর্জ্জন করিতে হয়। গুণ অর্জ্জিত হইবার পর শক্তি ও প্রবৃত্তি অর্জ্জিত হইয়া থাকে এবং অভিব্যক্তি লাভ করে। কোন বিষয়ে অথবা কোন কার্য্যে লিপ্ত হইবার গুণ অর্জ্জিত না হইলে সেই বিষয়ে অথবা সেই কার্য্যে লিপ্ত হইবার শক্তি অথবা প্রবৃত্তি অর্জ্জন করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবযোগ্য হয় না। বিষয়ে অথবা কার্য্যে লিপ্ত হইবার গুণ মানুষ যেমন স্বভাবতঃ অর্জ্জন করিয়া থাকে সেইরূপ আবার নিজনিজ কার্য্যের ফলেও অর্জ্জন করিতে সক্ষম হয়। বিষয়ে অথবা কার্য্যে লিপ্ত হইবার গুণ যেমন মানুষ উপরোক্ত দুই রকমে (অর্থাৎ (১) স্বভাবতঃ (২) নিজ নিজ সাধনা বশতঃ) অর্জ্জন করিয়া থাকে, শক্তি এবং প্রবৃত্তিও সেইরূপ দুই রকমে অর্জ্জিত হয়।

মানুষের শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই ইচ্ছা করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি হয় না বটে, কিন্তু তখনই ইচ্ছা করিবার গুণসমূহের অভিব্যক্তি শিশুর শরীরে লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই ইচ্ছা করিবার যে-সমস্ত গুণ শিশুর শরীরে লক্ষ্য করিতে পারা যায়, ইচ্ছা করিবার সেই সমস্ত "গুণ" শিশু স্বভাবতঃ লাভ করিয়া থাকে। ইচ্ছা করিবার অথবা ইচ্ছা বিষয়ে লিপ্ত হইবার বহু রকমের গুণ প্রত্যেক শিশু পরবর্ত্তী জীবনেও স্ব স্ব সাধনার দ্বারা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হয় এবং অর্জ্জন করিয়া থাকে।

শিশুর ইচ্ছা করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি যতদিন পর্য্যন্ত অভিব্যক্তি লাভ না করে, ততদিন পর্য্যন্ত শিশুর শরীরে ইচ্ছা

করিবার "গুণ" থাকা সত্ত্বেও শিশু ইচ্ছাহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

যখন কোন শিশুর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ বিভিন্ন বস্তু পাইবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভাবে ভঙ্গী করিতে (যথা হাসি, কান্না প্রভৃতি করিতে) সক্ষম হয়, অথচ কোন অঙ্গ নড়াচড়া করিতে অথবা স্থান-পরিবর্ত্তনের কার্য্যে লিপ্ত হইতে সক্ষম হয় না, তখন বুঝিতে হয় যে, ঐ শিশুর শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের বিভিন্ন লিঙ্গের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। শিশুর শক্তি ও প্রবৃত্তি-সমূহের বিভিন্ন লিঙ্গের অভিব্যক্তি ঘটিলেই তাহার ইচ্ছা করিবার শক্তি-বিষয়ক চিহ্ন-সমূহ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তখনও তাহার ইচ্ছা করিবার প্রবৃত্তি-বিষয়ক কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। শিশুর শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের বিভিন্ন লিঙ্গের অভিব্যক্তি ঘটিলেই তাহার ইচ্ছা করিবার শক্তি-বিষয়ক চিহ্নসমূহ পরিলক্ষিত হয় বলিয়া মানুষের স্বাভাবিক শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের বিভিন্ন লিঙ্গকে "ইচ্ছা" এই নামে অভিহিত করা হয়।

যখন কোন শিশুর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ বিভিন্ন বস্তু পাইবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভাবে ভঙ্গী করিতে, বিভিন্ন ভাবে নড়াচড়া করিতে এবং বিভিন্নভাবে স্থান-পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হয়, অথচ শিশু হাঁটিতে অথবা চলিতে সক্ষম হয় না, তখন বুঝিতে হয় যে—ঐ শিশুর শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের বিভিন্ন লক্ষণের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। এই অবস্থায় শিশুর ইচ্ছা করিবার প্রবৃত্তি-বিষয়ক চিহ্নসমূহ পরিলক্ষিত হয়।

যখন কোন শিশুর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ বিভিন্ন বস্তু পাইবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভাবে ভঙ্গী করিতে, বিভিন্নভাবে নড়াচড়া করিতে, বিভিন্ন ভাবে স্থান-পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হয় এবং শিশু হাঁটিতে ও চলিতে অভ্যস্ত হয়, তখন বুঝিতে হয় যে, ঐ শিশুর শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের বিভিন্ন লিঙ্গ ও লক্ষণসমূহের বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। এই অবস্থায় শিশু তাহার ইচ্ছা করিবার প্রবৃত্তিসমূহ চরিতার্থ করিবার জন্য প্রযত্নশীল হইয়াছে—ইহা বুঝিতে হয়।

প্রত্যেক মানুষের শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি মরণ পর্য্যন্ত তাঁহার ইচ্ছা করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি কোন্ কোন্ কারণে এবং কার্য্য-পদ্ধতিতে অভিব্যক্তি ও পরিবর্ত্তন লাভ করে—তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলে, মানুষের ইচ্ছা সম্বন্ধে সাত শ্রেণীর তথ্য অনুভব করা যায়; যথা:

(১) সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের আট শ্রেণীর অবস্থার (অর্থাৎ অদ্বৈত, মায়া, দ্বৈত, কাল, বিচ্ছেদ, তরল, স্থূল এবং মহাকাশ অবস্থার) বিদ্যমানতা বশতঃ প্রত্যেক শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই তাহার শরীরের মধ্যে সাত শ্রেণীর (অর্থাৎ আবয়বিক, রাসায়নিক, আলোক, অবস্থা-পরিবর্ত্তনমূলক, চাপ-মূলক, ঘনত্বের সমাবেশ-মূলক এবং তেজ ও রসের প্রবাহমূলক) কার্য্য চলিতে থাকে এবং কতিপয় গুণ অভিব্যক্তি লাভ করে। কোন শক্তি অথবা প্রবৃত্তি এই অবস্থায় অভিব্যক্তি লাভ করে না।

(২) সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের আট শ্রেণীর অবস্থার বিদ্যমানতা বশতঃ প্রত্যেক শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই তাহার শরীরের মধ্যে যে উপরোক্ত সাত শ্রেণীর কার্য্য চলিতে থাকে, সেই সাত শ্রেণীর কার্য্য-নিবন্ধন ক্রমে ক্রমে শিশুর বিভিন্ন-বিষয়ক ইচ্ছা করিবার গুণ হইতে এই সমস্ত ইচ্ছা করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের পরিপুষ্টি ঘটিয়া থাকে।

(৩) শৈশব অবস্থায় ইচ্ছাসমূহের বিষয় প্রথম প্রথম যাহা যাহা হইয়া থাকে, তাহার প্রত্যেকটী মানুষের শরীরের কোন না কোন গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির কোন না কোন প্রয়োজনের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। শরীরের কোন না কোন গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির কোন না কোন প্রয়োজন সাধন করা ছাড়া শৈশব অবস্থার প্রথম ভাগের ইচ্ছাসমূহের আর কোন বিষয় (object) বিদ্যমান থাকে না।

(৪) শরীরের কোন না কোন গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির কোন না কোন প্রয়োজন সাধন করা ছাড়া আর কোনরূপ শৈশব অবস্থার প্রথম ভাগের ইচ্ছা সমূহের বিষয়রূপে বিদ্যমান থাকে না বটে কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহ যতই পরিপুষ্টি ও তীব্রতা লাভ করিতে থাকে, ইচ্ছাসমূহের বিষয়েরও ততই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহ যখন পরিপুষ্টি ও তীব্রতা লাভ করিতে থাকে—তখন শরীরের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রয়োজন সাধন করা ছাড়া উহাদের বিভিন্ন রকমের তৃপ্তি সাধন করাও মানুষের ইচ্ছাসমূহের অন্যতম বিষয় হইয়া পড়ে।

(৫) মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির—শরীর, গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি-সমূহের প্রয়োজন সাধন করিবার ইচ্ছা যেমন সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের আট শ্রেণীর অবস্থার বিদ্যমানতা বশতঃ প্রত্যেক শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই তাহার শরীরের মধ্যে যে সাত শ্রেণীর কার্য্য চলিতে থাকে সেই সাত শ্রেণীর কার্য্য-নিবন্ধন স্বতঃই ঘটিয়া থাকে, মানুষের শরীরাদির গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের তৃপ্তি সাধন করিবার বিভিন্ন ইচ্ছাও সেইরূপ মূলতঃ সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের আট শ্রেণীর অবস্থার বিদ্যমানতাবশতঃ প্রত্যেক মানুষের শরীরের মধ্যে যে

সাত শ্রেণীর কার্য্য চলিতে থাকে সেই সাত শ্রেণীর কার্য্য-নিবন্ধন ঘটিয়া থাকে।

(৬) সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের আট শ্রেণীর অবস্থার বিদ্যমানতাবশতঃ প্রত্যেক মানুষের শরীরের মধ্যে যে সাত শ্রেণীর কার্য্য চলিতে থাকে—মূলতঃ সেই সাত শ্রেণীর কার্য্য-নিবন্ধন মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের প্রয়োজন ও তৃপ্তি সাধন করিবার ইচ্ছাসমূহের উৎপত্তি হয় বটে কিন্তু সময় সময় তৃপ্তিসম্বন্ধে ভ্রমপূর্ণ ধারণাসমূহের উদ্ভব হয়। নির্ভুল ও সম্পূর্ণ বিজ্ঞানানুসারে যে-কোন বিষয়ের সম্বন্ধে খাঁটী তৃপ্তি-লাভ করিবার একমাত্র উপায়—ঐ বিষয়ের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান লাভ করা। কোন বিষয় সম্বন্ধে উপরোক্ত জ্ঞান যত অধিক পরিমাণে লাভ করা যায়, ঐ বিষয়ে খাঁটী তৃপ্তি তত অধিক পরিমাণে পাওয়া সম্ভবযোগ্য হয়। খাঁটি তৃপ্তি সম্বন্ধীয় উপরোক্ত কথা বিস্মৃত হইলে বিভিন্ন উত্তেজনাকে তৃপ্তি বলিয়া পরিগণিত করা হয়।

এইরূপে তৃপ্তিসম্বন্ধে যখন ভ্রমপূর্ণ ধারণা-সমূহের উদ্ভব হয়, তখন মানুষের শরীরাদির গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের প্রয়োজন (অর্থাৎ স্বাস্থ্য ও পরিপুষ্টি) উপেক্ষা করিয়া কেবল মাত্র ভ্রমাত্মক তৃপ্তিসমূহ লাভ করিবার ইচ্ছাসমূহের চরিতার্থতার জন্য বিভিন্ন রকমের ইচ্ছার উৎপত্তি হয়।

(৭) মানুষের ইচ্ছার কারণসমূহ সাক্ষাৎভাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা :—

প্রথমতঃ, সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের আট শ্রেণীর অবস্থার বিদ্যমানতা বশতঃ প্রত্যেক মানুষের শরীরের মধ্যে যে সাতশ্রেণীর কার্য্য (অথবা সপ্ত-ব্যাহৃতি) চলিতে থাকে, সেই সাত শ্রেণীর কার্য্য এবং

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তেজনাকে তৃপ্তি বলিয়া পরিগণিত করিলে "তৃপ্তি" সম্বন্ধে যে ভ্রমাত্মক ধারণাসমূহের উদ্ভব হয়, সেই সমস্ত ভ্রমাত্মক ধারণাযুক্ত তৃপ্তিসমূহ চরিতার্থ করিবার জন্য যে-সমস্ত কার্য্য করিবার ইচ্ছা হয়—সেই সমস্ত কার্য্য।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের আটশ্রেণীর অবস্থার বিদ্যমানতা বশতঃ প্রত্যেক মানুষের শরীরের মধ্যে যে সাতশ্রেণীর কার্য্য (অথবা সপ্ত-ব্যাহৃতি) চলিতে থাকে, সেই সাতশ্রেণীর কার্য্য-বশতঃ মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের প্রয়োজন ও তৃপ্তি সাধন করিবার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত ইচ্ছার উৎপত্তি হয়—সেই সমস্ত ইচ্ছাকে সংস্কৃত ভাষায় "প্রাকৃতিক ইচ্ছা" বলা হইয়া থাকে।

বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তেজনাকে যখন তৃপ্তি বলিয়া পরিগণিত করা হয় তখন "তৃপ্তি" সম্বন্ধে যে সমস্ত ভ্রমাত্মক ধারণাসমূহের উৎপত্তি হয়—সেই সমস্ত ভ্রমাত্মক ধারণাযুক্ত তৃপ্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে তৃপ্তি সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক ধারণা বশতঃ যে সমস্ত ইচ্ছার উৎপত্তি হয়—সেই সমস্ত ইচ্ছাকে সংস্কৃত ভাষায় "বৈকৃতিক ইচ্ছা" বলা হইয়া থাকে।

মানুষের "প্রাকৃতিক ইচ্ছা"সমূহের মৌলিক কারণ সর্ব্ব-ব্যাপী তেজ ও রসের আট শ্রেণীর অবস্থা এবং সাক্ষাৎ কারণ মানুষের শরীরমধ্যস্থ সপ্তশ্রেণীর কার্য্য অথবা সপ্ত-ব্যাহৃতি। প্রাকৃতিক ইচ্ছাসমূহের উদ্দেশ্য—মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রয়োজন ও তৃপ্তি সাধন করা।

মানুষের "বৈকৃতিক ইচ্ছা"সমূহের মৌলিক কারণ—মানুষের শরীরমধ্যস্থ সপ্তশ্রেণীর কার্য্য অথবা সপ্তব্যাহৃতি এবং সাক্ষাৎ কারণ তৃপ্তিসম্বন্ধে ধারণাসমূহের ভ্রমাত্মকতা। বৈকৃতিক ইচ্ছাসমূহের উদ্দেশ্য সাধারণতঃ—ভ্রমাত্মক ধারণাযুক্ত তৃপ্তিসমূহের চরিতার্থতা সাধন করা।

ইচ্ছাসমূহের উপরোক্ত কারণ ও উদ্দেশ্যের সমবায়ে উহাদের (অর্থাৎ ইচ্ছাসমূহের) প্রাকৃতিকতা ও বৈকৃতিকতা নির্দ্ধারিত করিতে হয়।

প্রত্যেক মানুষের শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হওয়ার অব্যবহিত পরে তাহার শরীরে ইচ্ছাসমূহের যে সমস্ত গুণ দেখা যায়, ইচ্ছাসমূহের সেই সমস্ত গুণের মধ্যে যেমন প্রাকৃতিকতার বীজ বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ বৈকৃতিকতার বীজও বিদ্যমান থাকে।

প্রত্যেক মানুষের শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে যখন তাহার শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতে ইচ্ছাসমূহের শক্তি ও প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি ঘটে, তখন প্রথমতঃ স্বতঃই ইচ্ছাসমূহের একমাত্র প্রাকৃতিকতার উদ্ভব হয়। প্রথমতঃ স্বতঃই ইচ্ছা-সমূহের বৈকৃতিকতার উদ্ভব হয় না। ইচ্ছাসমূহের বৈকৃতিকতার উদ্ভব হয় শৈশবে উহাদের (অর্থাৎ ইচ্ছাসমূহের) প্রাকৃতিকতার উদ্ভব হইবার পরে। মানুষের কৈশোরে এবং পরবর্ত্তী জীবনে ইচ্ছাসমূহের প্রাকৃতিকতা ও বৈকৃতিকতা মিশ্রিতভাবে বিদ্যমান থাকে।

প্রত্যেক মানুষের কৈশোরে ও পরবর্ত্তী জীবনে ইচ্ছাসমূহের প্রাকৃতিকতা ও বৈকৃতিকতা মিশ্রিতভাবে বিদ্যমান থাকে বটে কিন্তু সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের পূর্ব্বোক্ত আট শ্রেণীর অবস্থার বিদ্যমানতাবশতঃ মানুষের শরীরে যে সাত শ্রেণীর কার্য্য (অথবা সপ্ত-ব্যাহৃতি) বিদ্যমান থাকে, সেই সাত শ্রেণীর কার্য্য যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত হইলে মানুষ তাহার ইচ্ছা-সমূহের বৈকৃতিকতা সর্ব্বতোভাবে দূর করিয়া সর্ব্বতোভাবে

ইচ্ছাসমূহের প্রাকৃতিকতা-যুক্ত হইতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের পূর্ব্বোক্ত আটশ্রেণীর অবস্থার বিদ্যমানতাবশতঃ মানুষের শরীরে যে সাতশ্রেণীর কার্য্য (অথবা সপ্তব্যাহৃতি) বিদ্যমান থাকে, সেই সাতশ্রেণীর কার্য্য যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত না হইলে মানুষের ইচ্ছাসমূহ সর্ব্বতোভাবে বৈকৃতিকতাযুক্ত হইয়া পড়ে।

মানুষের ইচ্ছাসমূহ যত অধিক পরিমাণে প্রাকৃতিকতা-যুক্ত হয়, মানুষের শরীরের সপ্তশ্রেণীর কার্য্যের পরিণতি তত অধিক পরিমাণে সমতাযুক্ত হইয়া থাকে এবং মানুষও তত অধিক পরিমাণে সমতাযুক্ত হয়।

মানুষের ইচ্ছাসমূহ যত অধিক পরিমাণে বৈকৃতিকতা-যুক্ত হয় মানুষের শরীরের সপ্তশ্রেণীর কার্য্যের পরিণতি তত অধিক পরিমাণে অসমতা ও বিষমতাযুক্ত হইয়া থাকে এবং মানুষও তত অধিক পরিমাণে অসমতা ও বিষমতা-যুক্ত হইয়া থাকে।

সমতা, অসমতা ও বিষমতাযুক্ত মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের মধ্যে কি কি প্রভেদ হইয়া থাকে তাহার আলোচনা আমরা ইহার আগেই করিয়াছি *। ঐ আলোচনার পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজনীয়। ঐ আলোচনায় স্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে যে, যখন মানুষ অসমতা ও বিষমতার আতিশয্যযুক্ত হয়, তখন মানুষের অন্তরে যে যে গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকিলে মানুষের পক্ষে তাহার অভীষ্ট অথবা প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহ অর্জ্জন ও উপভোগ করা অসম্ভব হয়, সেই সমস্ত গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির আতিশয্যযুক্ত হইয়া থাকে। যখন ইহা দেখা যায় যে, মানুষ অসমতা ও বিষমতার আতিশয্যযুক্ত হইলে মানুষের অন্তরের যে যে গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি বশতঃ তাহার পক্ষে তাহার অভীষ্ট অথবা প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহ অর্জ্জন ও উপভোগ করা অসম্ভব হয়, সেই সমস্ত গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির আতিশয্যযুক্ত হইয়া থাকে এবং মানুষের ইচ্ছাসমূহের বৈকৃতিকতা-নিবন্ধন মানুষ অসমতা ও বিষমতার আতিশয্যযুক্ত হয়, তখন ইহা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, মানুষের ইচ্ছাসমূহের বৈকৃতিকতাই মানুষের অভীষ্ট পদার্থসমূহ অর্জ্জন ও উপভোগ করিবার অক্ষমতার প্রধান কারণ।

উপরোক্ত কারণে আমরা মনে করি যে, "যে যে নয় শ্রেণীর গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি মানুষের অন্তরে বিদ্যমান থাকিলে মানুষের পক্ষে তাহার অভীষ্ট অথবা প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহ অর্জ্জন ও উপভোগ করা অসম্ভব হয়, মানুষের অন্তরে সেই নয় শ্রেণীর গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রবেশ লাভ করা সম্ভব হয় প্রধানতঃ মানুষের ইচ্ছার বিকৃতির অথবা বৈকৃতিকতার জন্য।"

প্রত্যেক মানুষ যে সমস্ত পদার্থ অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত পদার্থের কোনটী অর্জ্জন ও উপভোগ করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির অভাব যাহাতে কোন ক্রমে না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে মানুষের ইচ্ছা যাহাতে কোনরকমে বিকৃত অথবা বৈকৃতিকতা-প্রাপ্ত না হইতে পারে তদ্বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। মানুষের ইচ্ছা যাহাতে বিকৃত অথবা বৈকৃতিকতা-প্রাপ্ত না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে মানুষ তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য, গুণ ও শক্তি যাহাতে স্ব স্ব রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ-বোধের তৃপ্তি সাধনের উপযুক্ত পরিমাণে পাইতে পারে—একদিকে যেরূপ তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়, সেইরূপ আবার কোন শ্রেণীর উত্তেজনাকে মানুষ যাহাতে তৃপ্তি বলিয়া মনে না করে অথবা তৃপ্তি সম্বন্ধে মানুষের যাহাতে কোনরূপ ভ্রমাত্মক ধারণার উদ্ভব না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়। উপরোক্ত কথানুসারে মানুষের ইচ্ছা যাহাতে বিকৃত না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার সূত্র দুই শ্রেণীর, যথা—

(১) মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয় দ্রব্য, গুণ ও শক্তি যাহাতে প্রত্যেক মানুষ স্ব স্ব রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ-বোধানুসারে তৃপ্তিপ্রদভাবে প্রচুর পরিমাণে অনায়াসে পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা;

(২) উত্তেজনাকে মানুষ যাহাতে তৃপ্তি বলিয়া মনে না করে অথবা তৃপ্তি সম্বন্ধে যাহাতে মানুষের কোনরূপ ভ্রমাত্মক ধারণার উদ্ভব না হয় তাহার ব্যবস্থা।

উপরোক্ত দুইটী ব্যবস্থা যুগপৎ সাধিত হইলে মানুষের ইচ্ছা কোনক্রমে বিকৃত হইতে পারে না। উপরোক্ত দুইটী ব্যবস্থা যুগপৎ সাধিত হইলে যে মানুষের কোন ইচ্ছা কোন-ক্রমে বিকৃত হইতে পারে না, তাহা সাধারণ বিচার বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। আমরা ঐ সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত যুক্তির আলোচনা করিব না।

উপরোক্ত দুইটী ব্যবস্থা যুগপৎ সাধিত হইলে মানুষের ইচ্ছা কোনক্রমে বিকৃত হইতে পারে না বটে, কিন্তু দুইটী ব্যবস্থা যাহাতে যুগপৎ সাধিত হয় তাহা না করিয়া কোন একটী ব্যবস্থা পূর্ণ ভাবেই হউক অথবা অপূর্ণ ভাবেই হউক—সাধন করিলে মানুষের ইচ্ছার বিকৃতির পথ সর্ব্বতোভাবে প্রতিরুদ্ধ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয় দ্রব্য, গুণ ও শক্তি যাহাতে প্রত্যেক মানুষ স্ব স্ব রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ-বোধানুসারে তৃপ্তিপ্রদ ভাবে প্রচুর পরিমাণে অনায়াসে পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে, উত্তেজনাকে মানুষ যাহাতে তৃপ্তি বলিয়া মনে না করে অথবা তৃপ্তিসম্বন্ধে মানুষের যাহাতে কোনরূপ ভ্রমাত্মক ধারণার উদ্ভব

* বর্ত্তমান সংখ্যা বঙ্গশ্রী—১০৫-১০৭ পৃঃ

না হয়—তাহার ব্যবস্থা করা সম্ভবযোগ্য হয় না। সেইরূপ আবার উত্তেজনাকে মানুষ যাহাতে তৃপ্তি বলিয়া মনে না করে, অথবা তৃপ্তি সম্বন্ধে মানুষের যাহাতে কোনরূপ ভ্রমাত্মক ধারণার উদ্ভব না হয়—তাহার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে, মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয় দ্রব্য, গুণ ও শক্তি যাহাতে প্রত্যেক মানুষ স্ব স্ব রূপ, রস,গন্ধ ও স্পর্শ-বোধানুসারে তৃপ্তি-প্রদভাবে প্রচুর পরিমাণে অনায়াসে পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয় দ্রব্য, গুণ ও শক্তি যাহাতে প্রত্যেক মানুষ স্ব স্ব রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ-বোধানুসারে তৃপ্তিপ্রদ ভাবে প্রচুর পরিমাণে অনায়াসে পাইতে পারে তজ্জন্য কি কি ব্যবস্থা হইতে পারে—তাহা "সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যার সর্ব্ববিধ ইচ্ছার পূরণ করিতে হইলে যে যে পদার্থ যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হয় সেই সেই পদার্থ সেই সেই পরিমাণে যাহাতে উৎপন্ন হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা" শীর্ষক আলোচনায় আমরা বিচার করিব।

উত্তেজনাকে মানুষ যাহাতে তৃপ্তি বলিয়া মনে না করে, অথবা তৃপ্তি সম্বন্ধে মানুষের যাহাতে কোনরূপ ভ্রমাত্মক ধারণার উদ্ভব না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে কি কি করা প্রয়োজন—তাহা আমাদিগের বর্ত্তমান আলোচনার (অর্থাৎ "প্রত্যেক মানুষ যে সমস্ত পদার্থ অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত পদার্থের কোনটীর অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির অভাব যাহাতে কোন মানুষের না হয় তাহার ব্যবস্থা" শীর্ষক আলোচনার) অন্তর্গত। অতঃপর আমরা ঐ আলোচনা আরম্ভ করিব।

উত্তেজনাকে মানুষ যাহাতে তৃপ্তি বলিয়া মনে না করে, অথবা তৃপ্তি সম্বন্ধে মানুষের যাহাতে কোনরূপ ভ্রমাত্মক ধারণার উদ্ভব না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে আমাদিগের সিদ্ধান্তানুসারে মানুষ যাহাতে উত্তেজিত না হইতে পারে কিংবা না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। মানুষের মনস্তত্ত্ব যথার্থ ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যায় যে, কোন মানুষ উত্তেজনাকে যখন তৃপ্তি বলিয়া মনে করে অথবা তৃপ্তি সম্বন্ধে মানুষের যখন ভ্রমাত্মক ধারণার উদ্ভব হয়, তখন ঐ মানুষ হয় উত্তেজনা-প্রবণ, না হয় উত্তেজিত ভাবে বিদ্যমান থাকে। মানুষের স্বভাব উত্তেজনা-প্রবণ না হইলে অথবা মানুষ উত্তেজিত না হইলে কখনও উত্তেজনাকে তৃপ্তি বলিয়া মনে করিতে পারে না, অথবা তৃপ্তি সম্বন্ধে মানুষের ভ্রমাত্মক ধারণারও উদ্ভব হইতে পারে না।

মানুষ যাহাতে উত্তেজিত না হইতে পারে এবং না হয় তজ্জন্য কি কি ব্যবস্থা করার প্রয়োজন তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে দুইশ্রেণীর জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়; যথা :

(১) মানুষের উত্তেজনা কাহাকে বলে? এবং (২) মানুষ স্বতঃই উত্তেজনা-প্রবণ হয় কেন?

মানুষের 'উত্তেজনা' কাহাকে বলে স্পষ্টভাবে তাহার ধারণা করিতে হইলে প্রত্যেক মানুষের অন্তরে যে সপ্ত-ব্যাহৃতি অথবা *সপ্তশ্রেণীর কার্য্য বিদ্যমান আছে এবং এই সপ্ত-শ্রেণীর কার্য্যের ত্রিবিধ পরিণতি (অর্থাৎ সমতা, অসমতা ও বিষমতা মূলক পরিণতি) স্বতঃই বিদ্যমান থাকে তাহা স্মরণ রাখিতে হয়।

মানুষের অন্তরস্থিত সপ্ত-শ্রেণীর কার্য্যের অথবা সপ্ত-ব্যাহৃতির অসমতা ও বিষমতা-মূলক পরিণতিকে সংস্কৃত ভাষার বিজ্ঞানের দিক হইতে "উৎ-তেজনা" বলা হয়।

মানুষের উত্তেতজনা মূলতঃ তিন-শ্রেণীর অবস্থায় বিভক্ত, যথা :

(১) উত্তেজনার গুণ-অবস্থা,

(২) উত্তেজনার শক্তি-অবস্থা এবং

(৩) উত্তেজনার প্রবৃত্তি-অবস্থা।

মানুষের উত্তেজনার গুণ-অবস্থা অপরিহার্য্য। উহা প্রত্যেক মানুষের শরীরের (অর্থাৎ মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস ও চর্ম্মের) সহিত জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত থাকে। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের শেষোক্ত সাতটি অবস্থা (অর্থাৎ কাল-অবস্থা, বিচ্ছেদ-অবস্থা, তরল-অবস্থা, স্থূল অবস্থা, উদ্ভিদ্ অবস্থা, জীব অবস্থা এবং মহাকাশ অবস্থা) উহার কারণ। উত্তেজনার গুণাবস্থা যেরূপ প্রত্যেক মানুষের শরীরের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, সেইরূপ উত্তেজনার শক্তি-অবস্থা এবং প্রবৃত্তি অবস্থাও প্রত্যেক মানুষের শরীরের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত হইতে পারে। ইহার কারণ—কোন বিষয়ক গুণ থাকিলেই ঐ গুণের সেই বিষয়ক শক্তি ও প্রবৃত্তিতে স্বভাবের নিয়মানুসারে পরিণতি লাভ করিবার প্রবৃত্তিযুক্ত হওয়া অপরিহার্য্য হইয়া থাকে। এইরূপ ভাব উত্তেজনার গুণ-অবস্থা, শক্তি-অবস্থা ও প্রবৃত্তি-অবস্থা প্রত্যেক মানুষের শরীরের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত হইতে পারে বটে কিন্তু

---

* অর্থাৎ—(১) পঞ্চবিধ আবয়বিক কার্য্য (Physical work), (২) ষড়্‌বিধ রাসায়নিক কার্য্য (Chemical and biological work), (৩) ষড়্‌বিধ অগ্নি-কার্য্য (Heating work), (৪) শৃঙ্খলিত ঘনত্ব-সমাবেশের কার্য্য (Work owing to gradations of densities), (৫) ত্রিবিধ চাপের কার্য্য (Work due to pressure), (৬) তেজ ও রসের প্রবাহের কার্য্য (Flow of the mixture of heat and moisture) এবং (৭) পঞ্চবিধ অবস্থার শৃঙ্খলিত পরিবর্ত্তনের কার্য্য Changes of aerial condition into gaseous condition, of gaseous condition into liquid condition, of liquid condition into solid condition, of solid condition into atmospheric condition, of atmospheric into aerial condition.

উত্তেজনার ক্ষণ-অবস্থা যাহাতে উহার শক্তি ও প্রবৃত্তির অবস্থার পরিণতি লাভ করিতে না পারে তাহা করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত।

উত্তেজনার ক্ষণ-অবস্থা যাহাতে উহার শক্তি ও প্রবৃত্তির অবস্থার পরিণতি লাভ করিতে না পারে, তাহা করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত হয় বলিয়া মানুষ যেমন উত্তেজনা-প্রবণ হইতে পারে, সেইরূপ আবার উত্তেজনাশূন্যও হইতে পারে। মানুষের যাহাতে উত্তেজনাশূন্য হওয়া সম্ভব হয় সেইরূপ শিক্ষা ও সাধনার ব্যবস্থা থাকিলে মানুষের পক্ষে উত্তেজনাশূন্য হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়। আর সেইরূপ শিক্ষা ও সাধনার ব্যবস্থা না থাকিলে অথবা বিকৃত শিক্ষা ও সাধনার ব্যবস্থা থাকিলে মানুষের উত্তেজনা-প্রবণ হওয়া অনিবার্য্য হইয়া থাকে।

কোন্ শিক্ষা ও সাধনায় মানুষের পক্ষে উত্তেজনাশূন্য হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় তাহা স্থির করিতে হইলে, মানুষের উত্তেজনা-প্রবণতার উদ্ভব হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়োজন হয়। মানুষের উত্তেজনা-প্রবণতার উদ্ভব হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে মানুষের অন্তরস্থিত সপ্তশ্রেণীর কার্য্যের অথবা সপ্তব্যাহৃতির অসমতা ও বিষমতা-মূলক পরিণতি হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহা স্থির করা আবশ্যক হয়। ইহার কারণ মানুষের অন্তরস্থিত সপ্তশ্রেণীর কার্য্যের অথবা সপ্ত-ব্যাহৃতির অসমতা ও বিষমতামূলক পরিণতির নাম "উত্তেজনা।"

মানুষের অন্তরস্থিত সপ্তশ্রেণীর কার্য্যের অথবা সপ্ত-ব্যাহৃতির অসমতা ও বিষমতামূলক পরিণতিসমূহের যে সমস্ত কারণ সংযত করা অথবা দমন করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত, সেই সমস্ত কারণ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর কারণ মানুষের পিতামাতা কৃত। পিতামাতা কৃত যে সমস্ত কারণে মানুষের অন্তরস্থিত সপ্ত শ্রেণীর কার্য্যের অথবা সপ্ত-ব্যাহৃতির অসমতা ও বিষমতামূলক পরিণতিসমূহ ঘটা সম্ভবযোগ্য হয়, সেই সমস্ত কারণের বীজ রোপিত হয় মানুষ যখন গর্ভাবস্থায় ও শৈশব অবস্থায় থাকে, তখন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কারণ অন্যান্য মনুষ্যকৃত। এই সমস্ত কারণের উদ্ভব হয়—জমি, জল ও হাওয়া হইতে।

তৃতীয় শ্রেণীর কারণ মানুষের নিজকৃত। এই সমস্ত কারণের উদ্ভব হয় মানুষের খাদ্য, পানীয় প্রভৃতি নয় শ্রেণীর ব্যবহার হইতে।

মানুষের পিতামাতা কৃত যে সমস্ত কারণে তাহার অন্তরস্থিত সপ্তশ্রেণীর কার্য্যের অথবা সপ্তব্যাহৃতির অসমতা ও বিষমতামূলক পরিণতিসমূহের সম্ভাবনা ঘটিয়া থাকে, সেই সমস্ত কারণ দশ শ্রেণীর; যথা:

(১) পিতামাতার অযোগ্য মিলন;

(২) মাতার গর্ভাশয়ের দুষ্টতা;

(৩) গর্ভস্থিত ভ্রূণ যখন বায়বীয় অবস্থা হইতে যুগপৎ বাষ্পীয়, তরল, স্থূল ও মহাকাশ অবস্থায় পরিণতি লাভ করে তখন মাতার শারীরিক ও মানসিক কার্য্যের দুষ্টতা;

(৪) গর্ভস্থিত ভ্রূণের যখন ইন্দ্রিয়সমূহের অবয়বাত্মক পরিপূরণ হইতে থাকে, তখন মাতার ইন্দ্রিয়সমূহের দুষ্টতা;

(৫) মানুষ যখন শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হয় তখন তাহার শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত মহাকাশের সম্বন্ধ স্থাপনে দুষ্টতা;

(৬) ভূমিষ্ঠ হইবার পর মানুষের শরীরস্থ অস্থি যখন নূতন নূতন পরিণতি লাভ করিতে আরম্ভ করে, তখন খাদ্য ও পানীয়ের দুষ্টতা;

(৭) ভূমিষ্ঠ হইবার পর ক্রমিক পরিণতি বশতঃ মানুষের শরীরের যখন স্থূল (solid) খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তখনও ঐ স্থূল খাদ্যের ব্যবহার-প্রণালীর দুষ্টতা।

(৮) ভূমিষ্ঠ হইবার পর ক্রমিক পরিণতিবশতঃ শিশুর মনের যখন বিকাশ ঘটিতে থাকে, তখন ঐ মন যাহাতে চঞ্চল না হইতে পারে তাহা করিবার প্রণালী-সম্বন্ধে ঔদাসীন্য অথবা দুষ্টতা।

(৯) ভূমিষ্ঠ হইবার পর ক্রমিক পরিণতি বশতঃ শিশু যখন কৈশোর অবস্থায় উপনীত হয় এবং তাহার ইন্দ্রিয়সমূহের ও মনের যখন চাঞ্চল্যের সূচনা হয়, তখন ঐ চাঞ্চল্য যাহাতে শিশুর আয়ত্তের বহির্ভূত না হয় এবং উহা যাহাতে তাহার আয়ত্তাধীন হয়, তাহা করিবার প্রণালী-সম্বন্ধে ঔদাসীন্য অথবা দুষ্টতা।

(১০) ভূমিষ্ঠ হইবার পর ক্রমিক পরিণতি বশতঃ শিশু যখন যুবকের অথবা যুবতীর অবস্থায় পদার্পণ করে এবং তাহার অন্তরস্থিত সপ্তবিধ কার্য্য অথবা সপ্ত-ব্যাহৃতি যখন সর্ব্বতোভাবে পূর্ণতা লাভ করে, তখন ঐ সপ্তবিধ কার্য্য যে অসমতা ও বিষমতামূলক পরিণতিসমূহ লাভ করিয়া যুবক ও যুবতীর সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে এবং ঐ সপ্তবিধ কার্য্যের সর্ব্বতোভাবে সমতা রক্ষা করা যে যুবক-যুবতীর সাধ্যান্তর্গত, তাহা যাহাতে যুবক-যুবতী সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন এবং তাঁহারা যাহাতে দায়িত্বপূর্ণ জীবন যাপন করেন, তাহা করিবার প্রণালী সম্বন্ধে ঔদাসীন্য অথবা দুষ্টতা।

অন্যান্য মানুষ-কৃত যে-সমস্ত কারণে মানুষের অন্তরস্থিত সপ্তশ্রেণীর কার্য্যের অথবা সপ্ত-ব্যাহৃতির অসমতা ও বিষমতা-

মূলক পরিণতিসমূহের সম্ভাবনা ঘটিয়া থাকে, সেই সমস্ত কারণ তিন শ্রেণীর ; যথা—

(১) জমি, জল ও হাওয়ার সমতাতিশয্যের স্থলে অসমতা ও বিষমতার আতিশয্য ;

(২) উদ্ভিদ্‌শ্রেণীর সমতাতিশয্যের স্থলে অসমতা ও বিষমতার আতিশয্য ;

(৩) চরজীবশ্রেণীর সমতাতিশয্যের স্থলে অসমতা ও বিষমতার আতিশয্য।

(৪) শিল্পজাত দ্রব্যসমূহের সমতাতিশয্যের স্থলে অসমতা ও বিষমতার আতিশয্য ;

(৫) কারুকার্য্যজাত দ্রব্যসমূহের সমতাতিশয্যের স্থলে অসমতা ও বিষমতার আতিশয্য ;

(৬) বাণিজ্য-নিয়মসমূহের সমতাতিশয্যের স্থলে অসমতা ও বিষমতার আতিশয্য ;

(৭) শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির নিষ্প্রয়োজনীয় অথবা অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য অথবা কর্ম্মের প্রলোভন।

মানুষের নিজকৃত যে-সমস্ত কারণে তাহার অন্তরস্থিত সপ্তশ্রেণীর কার্য্যের অথবা সপ্তব্যাহৃতির অসমতা ও বিষমতা-মূলক পরিণতিসমূহের সম্ভাবনা ঘটিয়া থাকে—সেই সমস্ত কারণ মূলতঃ নয় শ্রেণীর ; যথা :

(১) খাদ্য, পানীয়, পরিধেয়, প্রসাধন প্রভৃতি আহার ও বিহারের দ্রব্যসমূহের নির্ব্বাচন ও ব্যবহার-প্রণালী সম্বন্ধে দুষ্টতা ;

(২) মানুষের পরস্পরের মধ্যে ব্যবহারের প্রণালী সম্বন্ধে দুষ্টতা ;

(৩) বিদ্যার বিষয় ও বিদ্যার্জ্জনের পন্থা নির্দ্ধারণ-বিষয়ক দুষ্টতা ;

(৪) বাসভবনের স্থান, নির্ম্মাণ-প্রণালী ও ব্যবহার সম্বন্ধে দুষ্টতা ;

(৫) যান-বাহনের নির্ব্বাচন ও ব্যবহারবিষয়ক দুষ্টতা ,

(৬) উপভোগ, আত্মরক্ষা, সংসার-রক্ষা ও চিকিৎসা প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান ও কর্ম্ম-প্রণালী বিষয়ক দুষ্টতা ;

(৭) জীবিকার্জ্জনের বৃত্তিনির্ব্বাচন-বিষয়ক দুষ্টতা ;

(৮) নিজের ও অপরের শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য এবং মনের ও বুদ্ধির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সম্বন্ধে বিচার করিবার প্রণালী-বিষয়ক দুষ্টতা ;

(৯) কথা ও বাক্য ব্যবহারের প্রণালী-বিষয়ক দুষ্টতা।

মানুষের অন্তরস্থিত সপ্ত-শ্রেণীর কার্য্যের অথবা সপ্ত-ব্যাহৃতির অসমতা ও বিষমতা-মূলক পরিণতিসমূহের যে সমস্ত কারণ সংযত করা অথবা দমন করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত, সেই সমস্ত কারণের শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে উপরে যে-সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত কথা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের ইচ্ছার বৈকৃতিকতার কারণ মূলতঃ তিন শ্রেণীর এবং এই তিন শ্রেণীর কারণ সর্ব্বসমেত ষড়্‌বিংশতি শ্রেণীতে বিভক্ত।

উপরোক্ত ষড়্‌বিংশতি শ্রেণীর কারণ অতিক্রম করিতে হইলে একদিকে যেরূপ সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবে ঐ ষড়্‌বিংশতি বিষয়ে কতিপয় শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয় সেইরূপ আবার সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে ঐ ষড়্‌বিংশতি বিষয়ের শিক্ষা যাহাতে পাইতে পারেন—সমষ্টিগত সংগঠনের দ্বারা তাহার ব্যবস্থা সাধন করিতে হয়। যে শ্রেণীর সমষ্টিগত সংগঠনের দ্বারা সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে ঐ ষড়্‌বিংশতি বিষয়ের শিক্ষা যাহাতে পাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইতে পারে, সেই শ্রেণীর সমষ্টিগত সংগঠনের কথা আমরা ইহার পরে "প্রত্যেক মানুষ যে সমস্ত পদার্থ অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন সেই সমস্ত পদার্থের প্রত্যেকটী অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রাচুর্য্য যাহাতে প্রত্যেক মানুষের লাভ করা সম্ভব হয় তাহার ব্যবস্থা" শীর্ষক আলোচনায় বিবৃতি করব।

যে যে ষড়্‌বিংশতি শ্রেণীর কারণে মানুষের ইচ্ছাসমূহ বিকৃতি লাভ করে সেই ষড়্‌বিংশতি শ্রেণীর কারণের উৎপত্তি যাহাতে না হয় তাহা করিতে হইলে মানুষের ব্যক্তিগত ভাবে যে যে বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে হয় সেই সেই বিষয় যাহাতে নির্ভুল ভাবে নির্দ্ধারিত হয় এবং সেই সেই বিষয়ের শিক্ষা মানুষ যাহাতে অনায়াসে শৃঙ্খলিত ভাবে লাভ করিতে পারে—তাহা করিতে হইলে শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষা-ব্যবস্থা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে।

এই ভূমণ্ডলের যে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশ স্বতঃই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সাধিত হয় সেই সমস্ত পদার্থের বিজ্ঞান অথবা তত্ত্ব সম্বন্ধে নির্ভুল ও নিঃসন্দিগ্ধ শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে লাভ করিতে হইলে এক দিকে যেরূপ আচার্য্যের উপদেশের প্রয়োজন হয় সেইরূপ আবার শিক্ষার্থীর নিজেরও কতকগুলি বিষয়ে উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হয়।

উপরোক্ত যুক্তি বশতঃ যে যে ষড়্‌বিংশতি শ্রেণীর কারণে মানুষের ইচ্ছাসমূহ বিকৃতি লাভ করে সেই ষড়্‌বিংশতি

শ্রেণীর কারণের উৎপত্তি যাহাতে না হয় তাহা করিতে হইলে মানুষের ব্যক্তিগত ভাবে যে যে বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে হয় সেই সেই বিষয় যাহাতে নির্ভুল ভাবে নির্দ্ধারিত হয়, এবং সেই সেই বিষয়ের শিক্ষা মানুষ যাহাতে অনায়াসে শৃঙ্খলিত ভাবে লাভ করিতে পারে তাহা করিতে হইলে এক দিকে যেরূপ শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষা-ব্যবস্থা একান্ত ভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার উপলব্ধি-তত্ত্ব এবং উপলব্ধি-ব্যবস্থাও একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়।

উপলব্ধি-তত্ত্ব ও শিক্ষা-তত্ত্ব আমূল ভাবে নির্দ্ধারিত হইলে এবং উপলব্ধি-ব্যবস্থা ও শিক্ষা-ব্যবস্থা সাধিত হইলে মানুষের ইচ্ছা যাহাতে বিকৃতিপ্রাপ্ত না হয়—তাহা করা সম্ভবযোগ্য হয় বটে, কিন্তু মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির তত্ত্ব আমূল ভাবে নির্দ্ধারণ করিতে না পারিলে উপলব্ধি ও শিক্ষা-তত্ত্ব আমূল ভাবে নির্দ্ধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

উপরোক্ত কারণে উপলব্ধি-তত্ত্ব, শিক্ষা-তত্ত্ব, উপলব্ধি-ব্যবস্থা ও শিক্ষা-ব্যবস্থা সঠিক ভাবে নির্দ্ধারণ করিতে হইলে মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়োজন হয়।

মানুষের শরীরতত্ত্ব, ইন্দ্রিয়তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে মানুষের উপলব্ধি-তত্ত্ব ও শিক্ষা-তত্ত্ব এবং উপলব্ধি-ব্যবস্থা ও শিক্ষা-ব্যবস্থা স্থির করা যায় বটে, কিন্তু মানুষের ও অন্যান্য চরজীবের এবং উদ্ভিদের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে না পারিলে মানুষের শরীরতত্ত্ব, ইন্দ্রিয়তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

সেইরূপ আবার মানুষের ও অন্যান্য চর-জীবের এবং উদ্ভিদ্ শ্রেণীর গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিতত্ত্ব আমূলভাবে নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে মানুষের শরীরতত্ত্ব, ইন্দ্রিয়তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব আমূলভাবে নির্দ্ধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় বটে, কিন্তু সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের দশ শ্রেণীর অবস্থা-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব আমূল ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলে মানুষের ও অন্যান্য চর-জীবের এবং উদ্ভিদ্ শ্রেণীর গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি-তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

কাজেই যে যে ষড় বিংশতি শ্রেণীর কারণে মানুষের ইচ্ছা-সমূহ বিকৃতিলাভ করে সেই ষড় বিংশতি শ্রেণীর কারণের উৎপত্তি যাহাতে না হয়, তাহা করিতে হইলে মানুষের ব্যক্তিগত ভাবে যে যে বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে হয় সেই সেই বিষয় যাহাতে নির্ভুলভাবে নির্দ্ধারিত হয় এবং সেই সেই বিষয়ের শিক্ষা যাহাতে মানুষ অনায়াসে শৃঙ্খলিতভাবে লাভ করিতে পারে—তাহা করিতে হইলে যথাক্রমে সাত শ্রেণীর নির্দ্ধারণ ও ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়; যথা—

প্রথমতঃ সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের দশ শ্রেণীর অবস্থা-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব আমূলভাবে নির্দ্ধারিত করিতে হয়;

দ্বিতীয়তঃ উদ্ভিদ শ্রেণীর, পশু-পক্ষি প্রভৃতি চর-জীব-শ্রেণীর এবং মনুষ্যজাতির গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব আমূলভাবে নির্দ্ধারিত করিতে হয়;

তৃতীয়তঃ মনুষ্য-জাতির শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব আমূলভাবে নির্দ্ধারিত করিতে হয়;

চতুর্থতঃ মানুষের উপলব্ধি-শক্তি ও উপলব্ধি-প্রবৃত্তি সম্বন্ধীয় তত্ত্ব আমূলভাবে নির্দ্ধারিত করিতে হয়;

পঞ্চমতঃ মানুষের শিক্ষা-শক্তি ও শিক্ষা-প্রবৃত্তি-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব আমূলভাবে নির্দ্ধারিত করিতে হয়;

ষষ্ঠতঃ উপলব্ধি-ব্যবস্থা-সম্বন্ধীয় কার্য্য-প্রণালী স্থির করিতে হয়;

সপ্তমতঃ শিক্ষা-ব্যবস্থা-সম্বন্ধীয় কার্য্য-প্রণালী স্থির করিতে হয়।

উপরোক্ত শৃঙ্খলিতভাবে শিক্ষা-ব্যবস্থা-সম্বন্ধীয় কার্য্য-প্রণালী নির্দ্ধারিত হইলে এবং তদনুসারে ব্যবস্থা সাধিত হইলে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে তাহার প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ আমূল ও অভ্রান্তভাবে শিক্ষা করা সম্ভব হয় এবং তখন যে যে ষড়বিংশতি কারণে মানুষের ইচ্ছাসমূহ বিকৃতি লাভ করে, সেই ষড়বিংশতি কারণের প্রত্যেকটি দমন করা সুনিশ্চিত হয়। ইচ্ছাসমূহের বিকৃতির ষড়বিংশতি কারণের প্রত্যেকটি দমন করার উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারিলে—যে যে গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি মানুষের অন্তরে বিদ্যমান থাকিলে মানুষের পক্ষে তাহার অভীষ্ট পদার্থসমূহের প্রত্যেকটি অর্জ্জন করা সহজসাধ্য হয়—সেই সমস্ত গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি অর্জ্জন করা সুনিশ্চিত হয়।

অন্যপক্ষে শিক্ষার ব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রণালী বিশৃঙ্খল হইলে, যে যে গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি মানুষের অন্তরে বিদ্যমান থাকিলে মানুষের পক্ষে তাহার অভীষ্ট পদার্থসমূহ অর্জ্জন করা অসম্ভব হয়—সেই সমস্ত গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রবেশলাভ করা দুর্দ্দমনীয় হয় এবং মানুষ বিকৃত ইচ্ছার দাস হইয়া থাকে।

উপরোক্ত কারণে আমরা এই আলোচনার প্রারম্ভেই বলিয়াছি যে, যে নয় শ্রেণীর গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি মানুষের অন্তরে বিদ্যমান থাকিলে মানুষের পক্ষে তাহার অভীষ্ট অথবা প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহ অর্জ্জন ও উপভোগ করা অসম্ভব হয়,

সেই নয় শ্রেণার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রবেশ লাভ করা সম্ভব হয়—প্রধানতঃ মানুষের ইচ্ছার বিকৃতির অথবা বৈকৃতিকতার জন্য এবং প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীর অন্নের ও দুইশ্রেণীর ব্যবস্থার অভাবে ও বিকৃতির জন্য মানুষের ইচ্ছাসমূহ বিকৃত হইয়া থাকে।*

"প্রত্যেক মানুষ যে-সমস্ত পদার্থ অর্জন করিবার উপভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত পদার্থে প্রত্যেকটি অর্জন করিবার ও উপভোগ করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রাচুর্য্য যাহাতে প্রত্যেক মানুষের হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা" শীর্ষক আলোচনা আমরা অতঃপর আর করিব।

---

* বঙ্গশ্রী বর্ত্তমান সংখ্যা ১০৩ পৃঃ।

'[illegible] ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

ফাল্গুন—১৩৫০

২১শ বর্ষ, ২য় খণ্ড—৩য় সংখ্যা

পাঠ্যপুস্তকে আদর্শ প্রচার

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম-এ, বি-টি

এক

সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর মানুষ আছে। এক শ্রেণীর মানুষ মানব-সভ্যতাকে একটি ক্রমোন্নতির ধারা বলিয়া স্বীকার করিয়া নিয়াছে। ইহারা কখনও পিছনে চাহে না, কারণ ইহাদের পিছনে গুহাবাসী অসভ্য বর্ব্বর মানুষ, সম্মুখে সুসভ্য সুশিক্ষিত প্রকৃতি জয়ী বীর মানুষ। ইহাদের সম্মুখে অনাগত স্বর্গ, যে স্বর্গের অভিমুখে পূর্ণতা-পিয়াসী মানুষের অবিচ্ছিন্ন গতি। ইহারা আশাবাদী, ইহাদের সম্মুখে জয়শ্রী, ভবিষ্যতে পরিপূর্ণ জীবন, তাই বর্ত্তমানে অনলস জীবনযুদ্ধ, বিঘ্নবিজয়ী কঠোর সংগ্রাম। সম্মুখের দীর্ঘপ্রসারী পথের পানে ইহাদের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি অস্তগত সূর্য্যের পশ্চাতে নব নব প্রভাতের দেশে দিগন্ত পার হইয়া ছুটিয়া চলে। ইহারা সংসারহীন মুক্ত মানুষ, ভগবান ইহাদের অনন্তকাল বাঁশি বাজাইয়া কেবলই সম্মুখে টানিতেছেন। তাই ইহাদের কণ্ঠে 'চরৈবেতি'র গান। ইহাদের সঙ্গে চলিয়াছে এই বিপুল সংসার যুগে যুগে নবোন্মেষিত পরিপূর্ণতার পানে—ধর্ম্মে ধ্যানে ও জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পকলায় নিত্য নব কর্ম্মের দ্যোতনায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ ঠিক ইহাদের বিপরীতপন্থী। ইহাদের বিশ্বাস মানুষ তার আদিম যুগের স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া ক্রমশঃ অধঃ-পাতের পথে চলিতেছে। লুপ্ত পুণ্যের ধিক্কার নিয়া ইহারা নিজেকে অসহায় জ্ঞান করে, জন্ম জন্মান্তর গত কর্ম্মফলের ঘূর্ণীচক্রে ঘুরিয়া মরে, মুক্তির পথ খুঁজিয়া না পাইয়া মৃত্যুর কালো যবনিকার অন্তরালে মানবজাতির নারকীয় পরিণতি টানিয়া লয়। ইহারা জগৎকে পশ্চাতে টানে, বর্ত্তমানকে অবমানিত করিয়া ভবিষ্যৎকে অস্বীকার করে। ধর্ম্মান্ধতা ও পারলৌকিক পুণ্যের দাবী দিয়া ইহারা সমাজে যাবতীয় কুসংস্কার সৃষ্টি করে, জীবনের স্বচ্ছ ধারায় অসংখ্য শৈবাল-দামের বিঘ্ন জঞ্জাল স্তূপীকৃত করিয়া তুলে। তৃতীয় শ্রেণী এই দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি একটি সুখবাদী, সুবিধাবাদীর দল। ইহারা সত্যযুগও মানে না, কলিযুগও মানে না, ইতিহাসকেও অস্বীকার করে, ভবিষ্যতের অজ্ঞাত স্বর্গের জন্যও লোভাতুর নয়। বর্ত্তমানে ঝুলন-দোলায় দুলিতে দুলিতে ইহারা যতখানি পারে আনন্দ উপভোগ করিয়া লয়, বলে—"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" দুঃখের মুহূর্ত্তগুলিকে কোনমতে এড়াইয়া গিয়া ইহারা জীবনের অসংখ্য তরঙ্গশীর্ষে সুখশুভ্র ফেনাটুকু মাত্র পান করিয়া লয়। ইহারা বিশ্ববৃত্তান্তের রহস্য বুঝে না, মানবজাতির কল্যাণচিন্তায় মাথা ঘামায় না। ইহলোক পরলোকের মধ্যে কোনো প্রকার সেতু রচনার চেষ্টাও করে না। ইহারা ধর্ম্মহীন, দ্বিধাহীন, অকুণ্ঠচিত্ত স্বার্থপর।

কোন শ্রেণীর মানুষ আমরা চাই? আজ আমাদের সমগ্র দেশের কল্যাণের জন্য কোন্ শ্রেণীর মানুষ আমরা সৃষ্টি করিব? ভারতবর্ষীয় আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নয়, পাশ্চাত্ত্য আদর্শকে গৌরবান্বিত করিবার জন্যও নয়,—শুধু এ দেশের সমাজ-সাধনার জন্য, পরাধীন জাতির মুক্তির জন্য আজ আমাদের কোন্ শ্রেণীর মানুষ আবশ্যক? এই প্রশ্নের সহজ উত্তর—চাই সংস্কারহীন মুক্ত মানুষ। শৈশব অবস্থায় এই মুক্ত মানুষ মুক্তিকামী যোদ্ধামাত্র—উল্লিখিত প্রথম শ্রেণীর সদা-সংগ্রামচারী, নব নব পথ-সন্ধানী, শৌর্য্য-শালী উদ্ধত মানব-সন্তান। এ দেশে বহুবর্ষ ব্যাপিয়া অসংখ্য বিদ্যালয়ে যে শিক্ষাধারা চলিয়া আসিতেছে, তাহার প্রভাবে এই প্রকার সংগ্রাম-প্রবণ বীর্য্যবান্ মুক্তিকামী মানবদলে সমাজ পরিপূর্ণ হইয়া যাওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তাহা হয় নাই। শিক্ষার প্রধান ক্রটী, নিকৃষ্ট কুফল ইহাই। এই সুবিশাল ভারতবর্ষে যুগে যুগে 'শিকল-দেবীর বেদী'-বিদারক বীরের দল জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অতীত ব্যবস্থার স্থাণুতা

ভাঙিয়া তাহারা কেবলই নূতন নূতন চলার পথ সৃষ্টি করিয়াছে,—কিন্তু যুগান্তরে আমরা তাহাদিগকে হারাইয়া বসিয়াছি,—পূর্ববর্ণিত দ্বিতীয় শ্রেণীর নৈরাশ্যবাদীদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। জাতির মজ্জাগত এই যে জড়ত্ব, ইহার স্তম্ভন-শক্তির করালগ্রাস হইতে এখনও আমরা পরিত্রাণ পাই নাই, বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এখনো ইহাকে সযত্নে লালন করিতেছি।

আমাদের হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের জন্যই হউক, অথবা বিজাতীয় কোনো দুরভিসন্ধির চাপেই হউক, আমরা এখনও পর্য্যন্ত আমাদের অজ্ঞাতসারেই ঐ শৌর্য্যসংহরণকারী জড়ত্বের আদর্শকেই স্বীকার করিয়া নিয়াছি,—এবং বিদ্যালয়ের শত-সহস্র ছাত্রকে ঐ আদর্শে শিক্ষাদান করিতেছি। সেইজন্যই আমাদের সমাজের উন্নতি এত মন্থরগতি, কুণ্ঠা-সংশয়-বিড়ম্বিত, পদে পদে পশ্চাদ্‌গামী। প্রথমতঃ, আমরা সুপরি-কল্পিত কোনো জাতীয়-শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে পারি নাই, যে হেতু পরাধীন রাষ্ট্রজাতির কোনো সুনির্দ্দিষ্ট জীবনাদর্শ গঠন করা সম্ভবপর হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, আমরা দেশের শিক্ষকগণ প্রকৃত মানুষ গড়িবার কোনো মহাদর্শ মানিয়া শিক্ষাদান করি না, যেহেতু শিক্ষকগণের লাঞ্ছিত দরিদ্র-জীবনে মহত্ত্ব-সঞ্চয় অপেক্ষা জীবিকার্জ্জনের উঞ্ছবৃত্তিই প্রবলতর সমস্যা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, বিদ্যালয়ের অসংখ্য পাঠ্য পুস্তকের মধ্য দিয়া আমরা সকল প্রকার জাতীয় উন্নতির বিরোধী আদর্শ-গুলি প্রচার করিয়া আসিতেছি, অথবা স্বাধীন মনন-শক্তির পরিপোষক কোনো আদর্শই প্রচার করিতেছি না। এই তৃতীয় ঘটনা যে কতখানি ভয়াবহ অনিষ্টকারী, কিরূপ অলক্ষিতভাবে যে ইহা সমাজের অগ্রগতিকে পিছনে টানিয়া রাখে, তাহা আমরা কোনোদিন বিচার করি নাই।

দুই

ছাত্রগণের চরিত্র গঠনের জন্য তাহাদের শিক্ষার মধ্যে যে কতকগুলি মহান্ আদর্শ তাহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরা আবশ্যক, এ বিষয়ে কাহারও মতান্তর নাই। কিন্তু প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকগুলির মধ্যে যে সকল আদর্শ প্রচারিত হয়, তাহা বর্ত্তমান জাতিকে বীর্য্যবান্ ও তেজস্বী করিয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সাধারণতঃ আদর্শগুলি উপস্থাপিত করা হয়—নীতি-বিষয়ক গল্প বা প্রবন্ধের সাহায্যে, মহাপুরুষগণের জীবনীর সাহায্যে, আবিষ্কার-অভিযানের রোমাঞ্চকর কাহিনী অথবা কাল্পনিক গল্পের সাহায্যে। সুখের বিষয়, বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষাদানের সমস্যা এখনও অমীমাংসিত বলিয়া পাঠ্য-পুস্তকে ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা স্থান পায় না। সেজন্য স্পষ্ট-ভাবে ধর্ম্মসংক্রান্ত অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কার বর্দ্ধিত করে, এরূপ রচনা কদাচিৎ দেখা যায়। ফলে, শিক্ষিত জনসমাজে দেবদেবীর উপাখ্যান, মঙ্গলকাব্য ও ব্রতকথাগুলির প্রভাব ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে যতদিন যাবৎ শীতলা, ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী, মনসাদেবী ও সত্যপীরের শাসনদণ্ড ভীরু হৃদয়ের কোমল মাটিতে খাল কাটিতে থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত অন্ধ-বিশ্বাসের শীর্ণ ধারাটি ফল্গু নদীর মতো ধীর-গতিতেও নিশ্চিতভাবেই বহিয়া চলিবে। ধর্ম-প্রবৃত্তির নিরুদ্ধ আবেগ পাঠ্য-পুস্তকের পাতায় আসিয়া নিছক নীতি-কথায় রূপান্তরিত হইয়াছে। বৌদ্ধ-জাতকের গল্প ও অন্যান্য নীতি-কথার মধ্যে প্রধানতঃ সত্যবাদিতা, সাধুতা, আত্মনির্ভর, অধ্যবসায়, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণ বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়। শৌর্য্য, সাহস ও স্বাধীনতা-স্পৃহা জাগরিত করিবার জন্য রচিত নীতিকাহিনী একান্ত বিরল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,—পরাধীন জাতির স্বাধীনতা চাই—এই কঠোর সত্যের স্পষ্ট ঘোষণা কোনো পাঠ্য-পুস্তকেই নাই। একটি পরাধীন জাতি কি করিয়া বহুবিধ সংগ্রামের দ্বারা স্বাধীনতা ফিরাইয়া পাইয়াছে, বা একটি দুর্গত পদদলিত মনুষ্য-সমাজ কি ভাবে তাহার জীবনের কলঙ্ক-মোচন করিয়াছে—সে বিষয়ে কোনো ঐতিহাসিক কাহিনীও কোথাও স্থান পায় নাই। প্রচলিত নীতি-কাহিনীগুলির কোনো মূল্য নাই, তাহা বলি না। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, ইহাদের মধ্যে একটি অতি-প্রয়োজনীয় আদর্শের অভাব পরিলক্ষিত হয়। পশুপক্ষী-বিষয়ক গল্পগুলিতে শিশু-পাঠকের মন কৌতুক-রসেই বিভোর হইয়া থাকে, তাহাকে অতিক্রম করিয়া নীতি পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। সেজন্য সদ্‌গুণ সকলের আদর্শ দিতে গেলে তাহা সর্ব্বদা মানুষের গল্পের সাহায্যেই দিতে হইবে। উপরন্তু নীতি-শিক্ষার জন্য যে সকল মানুষের গল্প দেওয়া হয়, তাহাদের ঘটনাগুলির অধিকাংশই শিশু-জীবনের অভিজ্ঞতার বহির্ভূত, শিশুর কল্পনাতেও অনধিগম্য। সে জন্য এই সকল নীতি-গল্প প্রায়ই নিরর্থক ও নিষ্ফল হইয়া থাকে।

পাঠ্যপুস্তকে যাঁহাদের জীবন-বৃত্তান্ত লেখা হয়, সে সকল মহাপুরুষের কয়েকজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কয়েকজন আধুনিক যুগের বিখ্যাত মানব। ঐতিহাসিক মহাপুরুষদের মধ্যে আমরা গৌতম বুদ্ধ, অশোক, হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতিকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছি। সিদ্ধার্থ ও দেবদত্তের গল্পে করুণা, অশোকের জীবনীতে অহিংসা, এবং হর্ষবর্দ্ধন ও সংযুক্তার কাহিনীতে বৈরাগ্য-মিশ্রিত আত্মত্যাগের আদর্শ ঘোষিত হয়। এই সব কাহিনী বালক-বালিকার মনে যে কারুণ্য ও শান্তরসের পরিবেশণ করে, তাহা শৌর্য্য-প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী, তাহা কৈশোর-কল্পনাকে কোনো বীরত্ব-ব্যঞ্জনাময় অশান্ত-পথ-যাত্রায় আকর্ষণ করে না। চণ্ডাশোক-কে সযত্নে পরিহার করিয়া ধর্ম্মাশোকের পরিচয়কে এমনধারা

গৌরবোজ্জ্বল রূপ দিয়া শিশু-মনকে সম্মোহিত করিবার সার্থকতা কি? মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের ভিখারী-মূর্ত্তিকে এত মহান্ করিয়া দেখাইবার কারণ কি? সন্দেহ হয়, এই সমস্তের পিছনে কোথায় যেন একটি প্রকাণ্ড অভিসন্ধি ইংরাজ-রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই কিশোর-জীবনের প্রাণ-শক্তিকে সমাধিস্থ করিবার গুপ্ত গহ্বর খনন করিতেছে। শিবাজী-কাহিনীতে আমরা মিষ্টান্নের ঝাঁকায় বসিয়া পলায়নের কৌশল ছাড়া আর যে কিছুই খুঁজিয়া পাই না! সুলতান সবক্তগিনের গল্পে মৃগমাতার প্রতি করুণার উচ্ছ্বাস অযথা স্ফীত হইয়াছে! প্রতাপসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের শৌর্য্য-গাথা খুব অল্পসংখ্যক পুস্তকেই স্থান পায়, পাইলেও তাহাদের প্রকৃত মূর্ত্তি প্রায় রক্তহীন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া দেখা দেয়। ফরাসী বিপ্লব বা আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রাণোন্মাদিনী কাহিনী বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের অনুপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়। অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি কেহ বা জোয়ান্-অব-আর্ক্-এর কাহিনী পড়িতে দেন ত তাহার মধ্যে নিষ্ঠুর অবিচার ও মর্ম্মন্তুদ অগ্নি-নিগ্রহের বীভৎস-কারুণ্যে পাঠকমন এতখানি অভিষিক্ত হয় যে, সেখানে বীররস পরিপাক করিবার আর প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য রহে না। এমনিভাবে আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমরা ভবিষ্যৎ জাতির সন্তানগণের ক্ষুধিত মনে শুধু কারুণ্য-রসের ছিটা দিয়া দিয়া তাহাদের পরিপাক-শক্তিকেই ধ্বংস করিতেছি।

আধুনিক যুগের মনীষিগণের মধ্য হইতে আমরা বাছিয়া নিয়াছি—হাজী মহম্মদ মহসীন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যর আশুতোষ, স্যর গুরুদাস, স্যর সৈয়দ আহম্মদ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ ব্যক্তিকে। কিন্তু জীবন-বৃত্তান্তে ইঁহাদের চরিত্রের ওজোগুণটিকে কৌশলে বর্জ্জন করা হইয়াছে। ইঁহাদের তেজস্বিতা ও বিদ্রোহি-প্রকৃতির হুল্ ছিঁড়িয়া সম্পূর্ণ শান্তশিষ্ট নিরীহ ভদ্রলোক করিয়া তবে ইঁহাদিগকে পাঠ্য-পুস্তকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মাতার জন্য বন্যাক্রান্ত দামোদর নদ সাঁতরাইয়া পার হওয়া রোমাঞ্চকর অভিযান বটে, কিন্তু বাঙ্গালী ছেলেকে বই পড়িয়া মাতৃভক্তি শিখিতে হয় না। বিদ্যাসাগর যে যুগান্তর-প্রবর্ত্তক সমাজ-দ্রোহী বিপ্লব-পন্থী ছিলেন, সে সত্যের অকুণ্ঠ ঘোষণা কোথায়? স্যর আশুতোষের ওজস্বী স্বাধীনচিত্তের অগ্নিদীপ্তি কি বাঙ্গালী বালক সহ্য করিতে পারে না? তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্ণধার ও হাইকোর্টের জজ ছিলেন,—শুধু এই সংবাদ দিবার জন্যই কি তাঁহাকে পাঠ্যপুস্তকে স্মরণ করিতে হইবে? তাঁহার স্বাধীনতা-স্পৃহার উদ্ধত মূর্ত্তি কয়খানি গ্রন্থে চিত্রিত হয়? দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্বদেশের মুক্তির জন্য যে প্রচণ্ড রুদ্র-তেজের বিদ্যুদাহে সমগ্র ভারত প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহার কণামাত্র স্ফুলিঙ্গ কখনো ছাত্রগণের প্রাণে সঞ্চারিত করা হয় না। এই ভাবে আমরা শিশু জাতিকে শাক্ত-দীক্ষায় বঞ্চিত করিয়াছি, শুধু ঘরে ঘরে বৈষ্ণবী-শান্তির কুহক-মন্ত্র প্রচার করিয়াছি, দয়া ও ত্যাগ-ধর্ম্মের জয়স্তুতি গাহিয়া কোমল রুচি প্রাণগুলিকে অশোভন ভাবে বেদনাতুর করিয়া তুলিয়াছি। ফলে,—ভীরু ভদ্র ভালো ছেলের দল বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু 'অযাত্রা-পথে যাত্রী যাহারা চলে'—তাহারা সকলেই এখনো নিরাপদ গৃহের কক্ষকোণে বসিয়া পাঁজির পাতায় শুভযাত্রার লগ্ন সন্ধান করিতেছে।

পাঠ্যপুস্তকে দুই চারিটা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও নিসর্গ বর্ণনার সঙ্গে দু'একটা গল্প দেওয়া হয়। এই সব গল্প সাধারণতঃ করুণ-রসাত্মক অথবা কৌতুক-রসাত্মক। অধুনা অভিমান-কাহিনী ও দুঃসাহসিকতার গল্পের প্রতি অনেকের ঝোঁক পড়িয়াছে! কিন্তু সংকলকের দূরদৃষ্টি "ইন্দ্রনাথের নৈশ অভিযান বা মাছ-চুরি" ছাড়াইয়া অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে না! বিলাতী স্কুলের জন্য লিখিত ইংরাজী পাঠ্যপুস্তক পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি যে, উহা ইংরাজ বালকের বীরত্ব কাহিনী ও যুদ্ধবিগ্রহের গল্প-গাঁথায় পরিপূর্ণ। অথচ কোনো বিলাতী কোম্পানী যখন ভারতীয় বিদ্যালয়ের জন্য "রীডার" প্রকাশ করেন, তখন তাহার রূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উহাকে ভারতীয় প্রলেপ দিবার জন্য তাঁহারা নারিকেল বৃক্ষ, গো-যান ও পল্লীর হাট ভিন্ন প্রবন্ধের বিষয় ভাবিয়া পান না। কবে কোন্ ভারতীয় সৈনিক তাহার ইংরাজ প্রভুকে রক্ষা করিয়া,অথবা কোনো বিদেশের জন্য যুদ্ধ করিয়া রাজসম্মান লাভ করিয়াছিল, বড় জোর তাহারই গল্প কল্পনা-কুসুমিত হইয়া লিখিত হইয়াছে। নতুবা সেই আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের গল্প ও রাম-সীতার পৌরাণিক কাহিনীই গ্রন্থের অর্দ্ধেক অবয়ব দখল করিয়া থাকে। বাছিয়া বাছিয়া পাথ্স্ অব পীস্' বা 'শান্তির পথ'গুলিই অতি গৌরবে ভারতীয় ছাত্রের সম্মুখে ধরিয়া রাখা হয়। আর বিলাতী বালকের জন্য আছে সংগ্রামের পথ! সম্প্রতি কোনো কোনো বিলাতী কোম্পানী বাংলায় লিখিত শিশুপাঠ্য গল্পের বই ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। যে সব অর্থহীন উদ্ভট গল্প ইংরাজী ভাষায় ইংরাজ বালক-বালিকারা আর পড়িতে চাহে না, সেই সব কিম্ভূত-কিমাকার বেঙাচি ও বিড়ালছানার গল্প এখন বাঙ্গালী ছেলে-মেয়েকে পড়িতে হইবে! এই গ্রন্থপ্রকাশের অযাচিত অনুগ্রহের হাত হইতে আমাদের কে রক্ষা করিবে? দুঃখের বিষয়, বেতনভুক্ উচ্চশিক্ষিত ভারতীয় অনুবাদকগণ এ কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। কোনো কোনো ইংরাজী রীডারের প্রারম্ভে 'আমাদের জন্মভূমি'র যে পরিচয় দেওয়া হয়, তাহাও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। লেখক অতি কৌশলে শিশুদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, এদেশে অসংখ্য জাতি, অসংখ্য সম্প্রদায়, অসংখ্য ধর্ম্ম; এ দেশের প্রদেশে প্রদেশে আচার বিভিন্ন, রুচি বিভিন্ন, মন্দির-মসজিদ বিভিন্ন; ভাষা, সাহিত্য বিভিন্ন। আমাদের শিক্ষকগণ এই

সব প্রবন্ধ পড়াইতে আজিও কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করেন না, এমনি আত্মবিস্মৃত এ জাতি !

কোনো বিখ্যাত বিলাতী কোম্পানীর গ্রন্থ-প্রচারকারী একজন বিদ্বান্ ভদ্রলোক (তিনি নাকি পূর্ব্বে শিক্ষক ছিলেন) একবার তাঁহাদের প্রকাশিত একখানি গ্রন্থের প্রশংসা করিয়া জানাইলেন যে, উক্ত গ্রন্থে মহাত্মা গান্ধীর ঋষি-জীবন-কথা ও 'প্লেন্ লিভিং হাই থিংকিং' অর্থাৎ 'ছোট ঘরে বড় মন' সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ আছে। সেদিন তাঁহার মুখের উপর জবাব দেওয়া হইল,—Why not high living, high thinking ? ভদ্রলোক বুঝিতে পারেন নাই, তিনি কতখানি নির্লজ্জ ;—তাঁহার স্বদেশের ছেলে-মেয়েদের কাণের ভিতর অহোরাত্র মন্ত্র দেওয়া হইতেছে—গরীবের মতো থাকো, দারিদ্র্যই পরম সম্পদ, শুধু মন বড় কর ;—আর তিনি আহ্লাদে আটখানা হইয়া ফাটিয়া পড়িতেছেন,—ভাবিতেছেন না জানি কি অপূর্ব্ব শিক্ষাই বিস্তার করিতেছি। অর্দ্ধাহারী, অর্দ্ধনগ্ন, রোগজীর্ণ শিশুগণকে সরল জীবন-যাপনের নীতি উপদেশ দেওয়ার মতো নির্ম্মম উপহাস আর নাই। ভারতবর্ষের চিরদরিদ্র জনসাধারণকে চিরকাল নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম করিয়া রাখিবার একটি অতি সূক্ষ্ম গভীর ষড়যন্ত্র চলিয়া আসিতেছে। সর্ব্বদাই শিখানো হইয়াছে যে, ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিক আদর্শের সহিত বিষয়-সম্পদের কখনই সামঞ্জস্য বিধান ঘটিতে পারে না। নিস্তেজ নিরীহ অভাব-জর্জ্জর কৃষক-সন্তানকে আজিও আমরা সোৎসাহে শিখাইয়া আসিতেছি—"অট্টালিকা নাহি মোর, নাহি দাস-দাসী"—ইহাই আমার পরম গৌরব। এ দেশে কবিদের কাব্য-কল্পনা বিদ্যালয়ের পুস্তকে পৌঁছিয়া আত্মসংকোচে এমন একটি সংকীর্ণ গিরিসঙ্কটে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, যেখান হইতে তাহাকে আর কোনোমতেই উদ্ধার করিয়া কোনো প্রবল প্রচণ্ড কলকল্লোলময়ী প্রবাহিণীর সৃষ্টি কেহ করিতে পারে না। প্রচলিত কবিতাগুলিতে তাই কোথাও কোনো পৌরুষ শৌর্য্যের তেজঃস্ফূর্ত্তি নাই। কৃষক-জীবনের তৃপ্তি, পল্লীবাসের সুখ, সন্তোষের আনন্দ, বিনয়ের গৌরব, ত্যাগের মহিমা, প্রভুভক্তির প্রাণোৎসর্গ, বৈরাগ্যের জয়, অহিংসার শক্তি এবং শিশুর ভালো ছেলে হওয়ার সঙ্কল্প প্রভৃতি ভাবাদর্শ অধিকাংশ কবিতার মর্ম্মমূল আচ্ছন্ন করিয়া আছে। বর্ষে বর্ষে পঞ্চমুখে ইহাদেরই ব্যাখ্যান করিতে করিতে শিক্ষকমণ্ডলী এমনি তদ্‌গত হইয়া আছেন যে, আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা নূতন কিছু বলিবার অবকাশ পান নাই, নূতন কিছু ভাবিবার 'দুর্ব্বুদ্ধি'ও কেহ পোষণ করেন নাই।

ইংরাজী কাব্যসাহিত্যে ওজস্বিনী কবিতার অভাব নাই। তথাপি সঙ্কলিত পুস্তকে নির্ব্বাচনকারীর ভীরুতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। 'লর্ড ইউলিন্স ডটার' একটি তরুণী হৃদয়ের কাহিনী, 'দি ভিলেজ ব্লাকস্মিথ' একটি নিরীহ কর্ম্মকারের নীরস জীবন-বৃত্তান্ত, 'দি বেটার ল্যাণ্ড' একটি কাল্পনিক স্বর্গের অবাস্তব ছায়া, 'দি সোলজার্স ড্রিম' একটি রণক্লান্ত গৃহপ্রত্যাশী অপদার্থ সৈনিকের স্বপ্ন, 'দি বেরিয়েল অব স্যর জন মূর' একটি মৃত সেনাপতির কবরস্থ হওয়ার করুণ-গাথা, 'দি হ্যাপি লাইফ' একটি সন্তোষ-সমাহিত ব্যক্তির আত্মবঞ্চনা মাত্র। এই গুলির পরিবর্ত্তে যদি কেবল প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা পড়ানো হইত, তাহা হইলে বুঝি আমরা আরও আশ্বস্ত হইতে পারিতাম। প্রচলিত কবিতার মধ্যে 'হোহেন লিণ্ডেন' একটি সুন্দর রণ-কবিতা, "ক্যাসাবিয়াংকা" কবিতায় আদেশানুবর্ত্তিতার একটি তেজস্বী পরিপূর্ণ রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই জাতীয় কবিতাকে আমরা পুরাতন একঘেয়ে বলিয়া আর তেমন আদর ক'রতেছি না। বাঙালী বালক শৌর্য্য-সাহসের যে প্রেরণা পাইয়াছে, তাহা বরং ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবেই পাইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী-সাহিত্যের পথে অধিকদূর অগ্রসর হইবার সৌভাগ্য যাহাদের নাই, সে সব লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ের মনোবিকাশের অবকাশ কোথায় ? তাহাদের মাতৃভাষা তাহাদিগকে কিছুমাত্র অনুপ্রেরণা দেয় না, সে ভাষা বিমাতার মতো সর্ব্বদাই তাহাদিগকে ভূত ডাকাতের গল্পের সঙ্গে চোখের-জলের কাব্য এবং শান্তি-সুখের ঘুমপাড়ানি গান শুনাইয়া নির্জীব নিষ্প্রাণ করিয়া রাখিয়াছে। সেই জন্যই এ বিশাল জাতির পাদমূলে থাকিয়া আজিও তাহারা সমাজকে কিছুমাত্র সম্মুখের পথে সঞ্চালিত করিতে পারে নাই। এই দুরবস্থার সংস্কার করিবার সময় আসিয়াছে, সন্দেহ নাই।

তিন

মানব প্রকৃতির এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে, যাহার পরিপুষ্টি কোনো গ্রন্থগত নীতি-উপদেশের অপেক্ষা রাখে না। মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা প্রণালী ও পরিপার্শ্বের প্রভাবে সেগুলি আপনা হইতেই বিকশিত হয়। মাতা পিতার প্রতি ভক্তি, ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি প্রীতি, আর্ত্তজনের প্রতি দয়া, দীন দুঃখীর প্রতি অনুকম্পা, বন্ধুবৎসলতা, শত্রুবিরোধ, আত্মরক্ষা—এই সমস্তই মানুষের সহজ সংস্কারের অঙ্গীভূত। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় মানুষে মানুষে বহুবিধ সম্পর্কের মধ্যে এই সকল গুণ মানব শিশুর চরিত্রে স্বতঃস্ফূরিত হয়। অতএব এই সব প্রবৃত্তি শিক্ষা দিবার জন্য প্রবন্ধ কাহিনী পরিবেশণ বাহুল্যমাত্র। গৃহাশ্রমের নানাবিধ কর্ম্ম অভ্যাসের সাহায্যে এগুলি আয়ত্ত হইতে পারে। সাধুতা, সত্যবাদিতা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, পরার্থপরতা প্রভৃতি গুণের অনুশীলনকেও আত্মীয়-স্বজনের আচরণের দৃষ্টান্তই অনুপ্রেরণা বেশী দেয়। তথাপি দৃষ্টান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য ও

দৃষ্টান্ত সকল উজ্জ্বলতর করিবার জন্য কাল্পনিক গল্প গাঁথার প্রয়োজন হয়। ধর্ম্মান্ধতা, অন্ধবিশ্বাস, ও অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কার দূর করিবার জন্য নিবন্ধাদি রচনার সাহায্যে নীতি উপদেশ না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ তাহাতে এগুলির উপর অযথা জোর দেওয়া হয়, এবং পাঠকের স্মরণে এগুলিকে অধিকতর জাগরূক করিয়া দেওয়া হয়। এ সমস্তের কুফল দূর করিবার জন্য এগুলিকে সর্ব্বদা শিশু-মনরাজ্যের বাহিরে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখাই সমীচীন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কার্য্যকারণ-বিচারশক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা আপনা হইতেই ম্লান হইয়া যাইতে পারে।

এ-দেশের বালক-বালিকাগণ স্বভাবতঃ ভীরু, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নৈরাশ্যবাদী ও গতানুগতিকপন্থী। জাতিগঠনের জন্য এবং তৎসঙ্গে দেশের গৃহে এক-একটি শক্তিকেন্দ্র সৃষ্টি করিবার জন্য আজ আমাদের প্রত্যেক বালক-বালিকার মনে সত্যনিষ্ঠা, যুক্তি-বিচার ও আত্মপ্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কৈশোরে যৌবনে ভাবাত্মক চরিত্র অপেক্ষা শারীর চরিত্র ও ক্রিয়াত্মক চরিত্র অধিক প্রয়োজনীয়। বার্দ্ধক্যে বা পরিণত বয়সে আধ্যাত্মিকতার উপযোগিতা থাকিতে পারে, কিন্তু যৌবন পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রবণতা, ভাবালুতা ও কর্ম্মকুণ্ঠতা হইতে সর্ব্বদা আত্মরক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেক গৃহে গড়িয়া তুলিতে হইবে—সাহসী, কর্ম্মপ্রবণ, বীর্য্যবান্, অকুণ্ঠচিত্ত, সুস্থ সবল মানুষ। পরাধীন জাতির কলঙ্কমোচনকারী এই অত্যাবশ্যক মানব-সন্তানের চরিত্র-গঠন ও মনঃশুদ্ধির জন্য আমরা তাহাকে যে পাঠ্যপুস্তক পড়াইব, তাহা অতি নিপুণ সতর্কতার সহিত রচনা করিতে হইবে। স্বাধীন দেশের সন্তানগণের যেমন সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু ভুঞ্জনের সৌভাগ্য আছে, তেমনি পুস্তকের পৃষ্ঠা হইতেও তাহাদের সকলপ্রকার রসোপভোগের অধিকার আছে। কিন্তু আমাদের দেশের সন্তানগণের সে-অধিকার নাই—এই নিষ্ঠুর সত্যটিকে স্বীকার করিলেই আমরা পাঠ্যপুস্তকগুলির সংস্কার সাধন করিতে পারিব। বিশুদ্ধ আর্ট ও সাহিত্যের দোহাই চলিবে না। আমাদের সন্তানগণের পক্ষে আজ করুণ-শান্ত-শৃঙ্গার-রস বিষবৎ পরিত্যাজ্য। বীররস ও রৌদ্ররসই এখন রুগ্নজাতির একমাত্র ঔষধ। ছাত্রগণকে সংগ্রাম-প্রবণ করিয়া তুলিতে হইবে। অবশ্য এ-কথার অর্থ এই নয় যে, তাহারা রাতারাতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ফেলিবে। জীবনের পথে পথে সর্ব্বদিকে যে অত্যাচার চলিয়াছে, তাহারই সহিত সংগ্রাম চাই। যে দারিদ্র্যের অত্যাচার, আচার-বিধির অত্যাচার, রোগশোকের অত্যাচার, অন্ধবিশ্বাসের অত্যাচার, ধর্ম্মের অত্যাচার, অন্যায়-অবিচারের অত্যাচার প্রত্যেক গৃহের বক্ষে পাষাণ চাপাইয়া নরনারীর জীবন নিষ্পেষিত করিতেছে,—তাহারি সহিত সংগ্রাম করিবার সৈনিক হইবে দেশের কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী। প্রযুক্ত মন, প্রচণ্ড শৌর্য্য, প্রবল কর্ম্মশক্তি—ইহাই হইবে ছাত্রগণের একমাত্র মূলমন্ত্র, এবং পাঠ্যপুস্তকের রচনার আদর্শ।

অতএব পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠায় যেন না থাকে—রোদন-বিলাপের করুণ-কাহিনী, দুঃখের বীভৎস চিত্র, সন্ন্যাসের প্রশংসা ও বিভীষিকার ছায়াছবি। রচনা নির্ব্বাচনের সময় এই কথাগুলি স্মরণ রাখিলে ভাল হয় যে,—কুকুরের প্রভুভক্তি বা ইংরাজ-ভৃত্য সিপাহীর প্রভুভক্তি অপেক্ষা ঝালাপতি মান্না, দুর্গেশ ডুমরাজ ও রঘুলালজী হাবিলদারের প্রভুভক্তি গরিয়সী, আরুণি-উপমন্যুর গুরুভক্তি বা একলব্যের গুরু-দক্ষিণাদান অপেক্ষা শিবাজীর গুরুভক্তি ও পিতৃভক্ত ক্যাসাবিয়াংকার মৃত্যুবরণ মহত্তর বীরত্বময়; ডাকাইতের হত্যাকাণ্ড অপেক্ষা রণক্ষেত্রের মৃত্যু-কাহিনী অধিকতর গৌরবময়; কাল্পনিক দৈত্য-বিজয় অপেক্ষা মেরু-অভিযানের কাহিনী অধিকতর শক্তি-সঞ্চারিণী; বৈরাগ্যের সম্পদ্‌ত্যাগ অপেক্ষা পরার্থে স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত অধিকতর উদ্দীপনাময়; অপার্থিব অলৌকিক বৃত্তান্তের চেয়ে মরুভূমি বা অরণ্য-পর্ব্বতের রহস্য-বৃত্তান্ত অধিকতর রোমাঞ্চকর; পল্লীর দুরবস্থা-বর্ণনার চেয়ে পল্লীসংস্কারের পরিকল্পনা অধিকতর প্রেরণাদায়ক। এইভাবে রচনার অন্তর্নিহিত ভাব-রস প্রকৃতপক্ষে কিশোরের প্রাণ-শক্তিকে সঞ্জীবিত করে কি না, তাহা বিশ্লেষণ করিলেই শিক্ষকগণ প্রত্যেক গুণাগুণ বিচার করিতে পারিবেন। ধনি-দরিদ্রের বৈষম্য, জমিদারে প্রজায় দ্বন্দ্ব, জাতি-সম্প্রদায়ের আচার-বিভেদ, ভারতবাসীর দৌর্ব্বল্য, ভারতীয় নৃপতির বিশ্বাসঘাতকতা, মাতৃজনের ত্রুটী-জনিত ব্যঙ্গ-কৌতুক, প্রভৃতির কাছে মানুষের পরাজয়, মানুষের উপর প্রেত-বেতাল অপ্সরো-দেবতার প্রভুত্ব, দারিদ্র্যের প্রতি অকারণ মমতা, মিথ্যা সন্তোষ, বিজাতি-প্রভুর প্রতি অযথা অনুরাগ, সরকারী-মহলে প্রতিপত্তিলাভে আত্মপ্রসাদ, চাকুরীর গৌরব—প্রভৃতি বিষয়গুলি রচনার মধ্যে স্থান পাওয়া উচিত নয়। জাতির প্রকৃত উন্নতির জন্য পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে কয়েকটি সুচিন্তিত সুপরিকল্পিত আদর্শের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। দারিদ্র্যমোচনের জন্য ধনোপার্জ্জনের যাবতীয় উপায় ও বিখ্যাত বণিক্-জীবনীর সাহায্যে তাহার জন্য প্রচুর উৎসাহ প্রচার করিতে হইবে। সমাজ-সেবায় ভীরুতা ও কাপুরুষতা দূরীকরণের জন্য অকুণ্ঠ কর্ম্মচেষ্টা ও বিদ্রোহভাবের ঘোষণা চাই। শারীর-শক্তি ও সাহসের অনুপ্রেরণার জন্য দৈহিক সাহস-শৌর্য্যের দৃষ্টান্ত আবশ্যক। জাতির স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা জাগাইবার জন্য উপযুক্ত ঐতিহাসিক-কাহিনী শুনাইতে হইবে। গৃহগত চিত্তের সংকীর্ণতা ঘুচাইবার জন্য বিপৎ-সঙ্কুল পথে অভিযান-কাহিনীর গৌরব-গাথা, আবশ্যক আচার-বিধি-সম্পৃক্ত কুসংস্কার দূর করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তথাকথিত সমাজদ্রোহী-

যের পরিচয় প্রকাশ করিতে হইবে। স্বদেশের জন্য আত্মোৎসর্গ, পরার্থে স্বার্থত্যাগ, কল্যাণের জন্য বিপদ্-বরণ, যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব-প্রকাশ, নিয়মানুবর্ত্তিতা, সৎসাহস, অন্যায়-অবিচারের প্রতিরোধ, গতানুগতিকতার শৃঙ্খল-মোচন, মহিমময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আনন্দানুভূতি—এই সমস্ত আদর্শ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সম্মুখে সর্ব্বদা তুলিয়া ধরিতে হইবে। যদি এ-সব বিষয়ে উপযুক্ত সহজভাষায় সুখপাঠ্য রচনা না পাওয়া যায় ত' নূতন প্রবন্ধ-কাহিনী রচনা করিয়া লইতে হইবে। শিক্ষকগণের মধ্যে যাঁহারা সুলেখক ও সাহিত্যিক, তাঁহাদের উপরেই এই গুরু-কর্ত্তব্য ন্যস্ত রহিয়াছে। যাঁহারা শিশু-সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও এ-বিষয়ে অবহিত হইবেন। বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া প্রত্যেক বিখ্যাত লেখকের রচনার নমুনা দিতে হইবে, অথবা রচনা-নির্ব্বাচনেও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে—এই কুসংস্কার যেন পাঠ্য-পুস্তক-সংকলকগণের না থাকে। লেখক, সংকলক ও শিক্ষকগণ সকলে একমতে সঙ্ঘবদ্ধ হইলে পাঠ্যপুস্তক-সংস্কারের পথে কোন বিরোধ-শক্তিই বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

সাসানীয় যুগের শিল্প ও সংস্কৃতি

শ্রীগুরুদাস সরকার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সুদীর্ঘকাল ধরিয়া শিরীণের প্রণয় কাহিনী কবি ও শিল্পিগণের নিকট সমভাবেই সমাদৃত হইয়াছে। সাসানীয় যুগের এই প্রণয়োচ্ছ্বাসের প্রতিধ্বনি এখনও একেবারে স্তব্ধ হইয়া যায় নাই। বঙ্গরঙ্গালয়েও যে শিরী-ফার্হাদ নাটিকা এক সময়ে সাদরে অভিনীত হইয়াছে, এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

শিরীণ যেরূপ ছিলেন সম্রাট খস্রুর প্রিয়তমা পত্নী, সেইরূপ সাব্‌দিস্ নামক একটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব ছিল, তাঁহার বাহকগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। এ অশ্বের কথাও পারসীক কাব্যে কীর্ত্তিত হইয়াছে। বিউসিফেলাস ও চৈতকের ন্যায় এ অশ্বটিও ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে।[১]

আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন—"ইতিহাসের ঘটনাগুলো পাথরের মত শক্ত জিনিষ, একচুল তার চেহারার অদল বদল করার স্বাধীনতা নাই ঐতিহাসিকের, আর ঔপন্যাসিক, কবি, শিল্পী, এঁদের হাতে, পাষাণও রসের দ্বারা সিক্ত হয়ে' কাদার মত নরম হয়ে যায়, রচয়িতা তাহাকে যথা ইচ্ছা রূপ দিয়ে ছেড়ে দেন। ঘটনার অপলাপ ঐতিহাসিকের কাছে দুর্ঘটনা, কিন্তু আর্টিষ্টের কাছে সেটা বড়ই সুর্ঘটন অর্থাৎ রূপগঠনের পক্ষে মস্ত সুযোগ উপস্থিত করে দেয়।" নিজামী কি ভাবে ঐতিহাসিক খস্রুকে কাব্যের নায়কে রূপান্তরিত করিয়াছেন, শিল্পীর রূপসৃষ্টির দিক দিয়া এ কাহিনী ক্ষুদ্রক চিত্রনিচয়ে কি ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা সম্যক অবধারণ করিতে হইলে খাম্‌সা কাব্যপঞ্চকের অন্তর্গত "খসরু ওয়া শিরীণ" এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের প্রয়োজন। উহা স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে।

প্রবাদমতে শিরীণ নিজবাসের জন্য যে স্থানে একটি সুরম্য ও সুরক্ষিত আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করান, তাহাই অদ্যাপি "কাস্‌র্-ই-শিরীণ" নামে অভিহিত হইতেছে। সে প্রাসাদ-দুর্গের কোন অংশই আর বিদ্যমান নাই। এ দুর্গের প্রবেশ-দ্বারের উপরিভাগে খস্রু নাকি একটি কবিতা উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এইরূপ—

> "হে সুন্দরী ! সুখে থাক চিরকাল, কামনা আমার,
> তব দৃষ্টি এ জগতে কি আনন্দ করে যে প্রচার !" ২

কাস্‌র্-ই-শিরীণে, জাগ্রস্ শৈলের পশ্চিমভাগস্থ ঢালু অংশে খস্রু যে প্রাসাদটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা ইমারৎ-ই-খসরু নামে বিখ্যাত। ইহার আনুমানিক নির্ম্মাণকাল সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদেই নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। যে বিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্যভাগে এই রাজপুরী নির্ম্মিত হয়, তাহার পারিধি ছয় সহস্র মিটার (১) হইবে। সম্মুখ ভাগে একটি প্রশস্ত জলাশয় অবস্থিত থাকায় রাজপ্রাসাদের শোভা সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পূর্ব্বদিকের সমতল ভূমি হইতে প্রধান প্রবেশদ্বারের সম্মুখস্থ সুবিস্তৃত চাতালে আরোহণ করার জন্য পাশাপাশি দুইটি ঢিবিপথ (ramp) অবস্থিত ছিল। চাতাল হইতে অপর একটি প্রবণভূমি (incline) অতিক্রম করিয়া তবে রাজপুরীর চতুর্বিংশতি স্তম্ভস্থিত সুবিশাল হলঘরে

১ কৃত্রিম যুগের পারসীক ক্ষুদ্র চিত্রে দেখা যায় এ অশ্বটির ললাটের নিম্নাংশে একটি শ্বেতরেখা বিলম্বিত এবং সম্মুখের পদদ্বয়ের নিম্নভাগও শ্বেতবর্ণ লোমরাজিতে আবৃত।

২ "Ah, Beauteous one ! Upon this earth, happy for aye do live !
Since to the world by thy mere glance such joyaunce thou dost give !"

(১) মিটারের মাপ ফরাসী দেশে প্রচলিত। ১০ মিটার প্রায় ১১ গজ ২½ ফিটের সমান।

পৌঁছান যাইত। এই পথ দিয়াই প্রাসাদের রাজ-অধ্যুষিত অংশে প্রবেশ করিতে হইত। স্তম্ভশ্রেণীর দ্বারা ত্রিধাবিভক্ত এই হলঘরের প্রান্তভাগে একটি সমচতুষ্কোণ প্রকোষ্ঠ অবস্থিত ছিল। আরব লেখকেরা এ উদ্যানের সৌন্দর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এক সময়ে যে স্থানে নানা সুদুর্লভ জীবজন্তু স্বেচ্ছায় বিচরণ করিত, এখন তাহা সম্পূর্ণ জনপ্রাণিশূন্য; কেবল খর্জ্জুর ও দাড়িম্ব বৃক্ষের শুষ্কমূল সমূহ খননকালে আত্মপ্রকাশ করিয়া এই বিখ্যাত উদ্যান-বাটিকার পরিচয় প্রদান করে। খস্রু মাশিট (Mashita) নামক স্থানে অপর যে একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও নয়নাভিরাম প্রসাধক-শিল্পের অলঙ্কারবৈভব শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল। ইহার ভিত্তিগাত্রে তক্ষিত গোলাপপুষ্পাকৃতি স্থাপত্য-অলঙ্কারের চতুষ্পার্শ্বে, ফল ও পুষ্পসমন্বিত মণ্ডন নক্সাদির মধ্যে, জীবজন্তুর প্রতিকৃতিরও অভাব ছিল না।

খস্রু পারভেজের স্থাপত্য কীর্ত্তির মধ্যে তাক্-ই-বোস্তান্ই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তাক্-ই-বোস্তান্ এর অর্থ উদ্যানের তোরণ। পাহাড়ের গায়ে দুইটি খিলান সুগভীর ভাবে কোদাই করা, একটি আর একটির উপরে অবস্থিত। ইহার মধ্যে যেটি বৃহত্তর সেটি উচ্চতায় ৩০ ফিট এবং ইহার গভীরতা ২২ ফিটের কম হইবে না। এই খিলানের মধ্য-ভাগের (Keystone এর) আকৃতি বালচন্দ্রমা (crescent) সদৃশ। তোরণের বক্রভাগের দুইপার্শ্বে, ত্রিভুজপ্রায় অংশ (Spandrel) দুইটিতে, দুইটি সপক্ষ দেবীমূর্ত্তি উৎকীর্ণ। ইঁহারা জয়ের প্রতীক। সাসানীয় শিল্পের প্রভাব যে মুসলমান যুগ পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল, তাহা বুঝা যায় ইস্পাহানের হারুণ অল্—ভালি—আৎদ্ নামক মস্জিদের কাষ্ঠফলকে উৎকীর্ণ দুইটি উড্ডীয়মান দেবদূতের চিত্র হইতে। এই মূর্ত্তিদ্বয়ের পরিকল্পনা তাক্-ই-বোস্তান্-এর সাসানীয় ভাস্কর্য্য হইতে অনুকৃত (১)।

কেহ কেহ মনে করেন, পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তি দুইটি এবং তোরণাকৃতি এই বিশাল ভাস্কর্য্য নিদর্শনের দুই পার্শ্বে যে সকল প্রসাধক অলঙ্কার বিদ্যমান, তাহার সবগুলিই কোনও অজ্ঞাতনামা গ্রীক ভাস্কর কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহা পাশ্চাত্য, মনোভাবমূলক ভিত্তিহীন অনুমান ব্যতীত আর কিছুই নয়। পারসীক শিল্পে স্থানে স্থানে যে য়ুনানী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা সকল ক্ষেত্রেই কিছু গ্রীক শিল্পীর নিয়োগ সূচনা করে না।

ভিতরের দিকে, তাক্-ই-বোস্তানের শৈলময় প্রাচীর দ্বিতল প্রকোষ্ঠাকৃতি দুইটি খাঁজে বিভক্ত। উপরের খাঁজে দুইপার্শ্ব হইতে দুইটি মূর্ত্তি নরপতি খস্রুকে মাল্যদান করিতেছে, আর নিম্নের খাঁজে রহিয়াছে শুধু অশ্বারোহী মূর্ত্তি। তোরণের উভয় পার্শ্বেই শিকারের চিত্র, এক পার্শ্বের চিত্রে রাজা বরাহহননে ব্যাপৃত, অন্য দিকের চিত্রটিতে তিনি শুধু মৃগ (হরিণ) বধেই নিরত রহিয়াছেন। হরিণ-গুলিকে হস্তীর সাহায্যে বিতাড়িত করিয়া একটি জালবেষ্টিত স্থানের মধ্যে আনা হইতেছে। তাক্-ই-বোস্তান্-এর যে স্থানটিতে সে যুগের এই ভাস্কর্য্যনিদর্শনগুলি সবে আরম্ভ হইয়াছে, ঠিক সেই স্থানটিতেই একটি স্বচ্ছসলিলা জলধারা গিরিগাত্র হইতে উৎসারিত হইয়া কারস (Karase) নদীতে নিপতিত হইতেছে (১)। স্থানটি যে নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে মনোরম, তাহা এ বর্ণনা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হইবে।
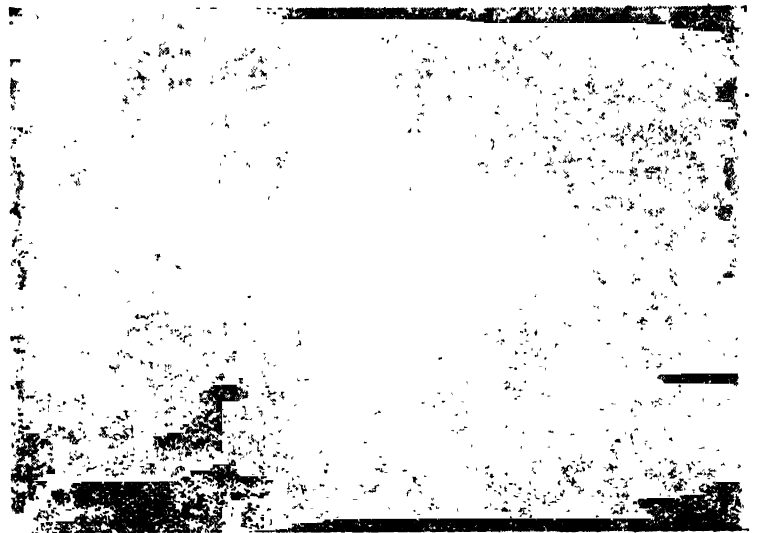
পশুগুলিকে বন হইতে তাড়া দিয়া বাহির করার কাজ হস্তী সাহায্যেই সাধিত হইতেছে…

শিকারের চিত্র দুইটির সূক্ষ্মাংশগুলি সংস্কৃতি ও শিল্পধারা এই উভয় দিক দিয়াই বিশেষ অনুধাবন যোগ্য। চিত্রপটের বিভিন্ন স্থানে নৃপতি খস্রু বিভিন্ন ভাবে পরিকল্পিত। কোথাও মৃগয়াভিলাষী রাজা অরণ্যাভিমুখে আগমন করিতেছেন, কোথাও বা তিনি শিকারে রত রহিয়াছেন, কোথাও বা তিনি মৃগয়ান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। চিত্র দৃষ্টে মনে হয়, এ মৃগয়া ফিরদৌসে অর্থাৎ 'রক্ষিত কান্তারে' অনুষ্ঠিত হইতেছে। এইপ্রকার কেতাদুরস্ত শিকারের অস্বাভাবিক কৃত্রিমতা

১ A. U. Pope, Intioduction to Persian Ait, p. 27.

১ Spiegel, Iranian Ait, p.41.

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় বাস্তকরবৃন্দের উপস্থিতি হইতে। বাহরামের সঙ্গে এক বীণাবাদিনী আজাদা সুন্দরী ব্যতীত অপর কেহই উপস্থিত থাকিত না। বরাহ শিকারের চিত্রটিতেও (৩ নং চিত্র) পশুগুলিকে বন হইতে তাড়া দিয়া বাহির করায় কাজ হস্তী সাহায্যেই সাধিত হইতেছে এবং রাজা নিরাপদে নৌকার উপর হইতে পলায়মান বরাহ-যুথের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতেছেন। এ শিকারে শক্তি ও পৌরুষের সেরূপ অবকাশ নাই। এখানেও দেখিতে পাই, শিকারের স্থানটি বৃত্তের দ্বারা বেষ্টিত। চিত্রের একটি স্থানে উপরাংশের বাম কোণে বেশ বাস্তব ভাবেই দেখান হইয়াছে যে, চর্ম্ম-লোমাদি বিমুক্ত করিয়া নিহত বরাহগুলি রাজকীয় রন্ধনশালায় প্রেরণের জন্য হস্তিপৃষ্ঠে বোঝাই দেওয়া হইতেছে। সুধী আর্ণল্ড্ বলিয়াছেন যে, তাক্-ই-বোস্তান্-এর ন্যায় এই একই প্রকার মৃগয়ার চিত্র সাত আট শতাব্দী পরেও পারসীক চিত্রশিল্পে বার বার অনুকৃত হইয়াছে(১)।

এই ক্ষোদিত চিত্রগুলি হইতে বুঝা যায় যে, সাসানীয় শিল্পী পৌর্ব্বপর্য্যাক্রম রক্ষা করিয়াই তাঁহার আদর্শ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং তখনও পূর্ব্বাগত একিমিনীয় শিল্পের ধারা একবারে অন্তঃসলিলা হইয়া যায় নাই। পূর্ব্বকালীন নমুনা-গুলির তুলনায় এ শিল্পাদর্শ যে কোনও অংশে হীন নহে বরং সূক্ষ্মাংশ বিন্যাস বিষয়ে অধিকতর উন্নত, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

ডাঃ অর্ণেষ্ট ডিয়েটস্ (E, Dietz) ভারতীয় প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন (২) যে তাক্-ই-বোস্তান্-এর শিকারচিত্রের বিভিন্নস্থানে হস্তীগুলির মুর্ত্তি যে ভারতবর্ষ হইতে আনীত হইয়াছিল এ ধারণা বদ্ধমূল হয়। চিত্ররচনার ভঙ্গীতেও ভারতীয় পদ্ধতির প্রভাব সুস্পষ্ট। চিত্র বিশ্লেষণ করিয়া এ তথ্য কিরূপে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

১। একই ঘটনার ক্রমবিকাশ ও অনুবৃত্তি বুঝাইতে গিয়া একই ব্যক্তির মূর্ত্তি চিত্রপটের বিভিন্নস্থানে একাধিকবার সন্নিবেশিত হইয়াছে। মৃগয়ার চিত্র দুইটিতে খসরুর মূর্ত্তি ঠিক এই ভাবেই বিন্যস্ত রহিয়াছে। লেখক (ডাঃ ডিয়েটস্) অনুমান করিয়াছেন যে, ইহা ইন্দো বাক্ট্রিয় শৈলীর অনুকরণ মাত্র (১)।

(১) Arnold, Painting in Islam p. 63.

(২) Eastern Art. (Philadelphia, U. S. A.), October 1928, p p. 118, 165

(১) ইন্দোবাক্ট্রিয় না বলিয়া ভারতীয় শৈলীর অনুকরণ বলাই উচিত ছিল। ইন্দোবাক্ট্রিয় প্রভাবযুক্ত সাঞ্চী ও ভারহুতের প্রাচীন ক্ষোদিত চিত্রাদির রচনাকালেও যে এ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, অদ্যাপি বিদ্যমান

২। তাক্-ই-বোস্তানের স্বল্পগভীর ক্ষোদিত চিত্রগুলি ভারতীয় দেওয়াল চিত্রেরই সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। ইহাও অনুমিত হইয়াছে যে, ভিত্তি-চিত্রের ন্যায় এগুলিও পূর্ব্বে বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত ছিল।

৩। চিত্রে দৃষ্ট হয়, ছত্রধর রাজার মস্তকের উপর রাজছত্র ধারণ করিয়া আছে। এ প্রথাটি ভারতীয়। অজন্তাগুহায় এরূপ ছত্রধরীর চিত্র নানা স্থানেই দৃষ্ট হয়।

৪। রাজার শিরোদেশ বেষ্টন করিয়া যে প্রভামণ্ডল বিদ্যমান, সাসানীয় শিল্পে তাহার আবির্ভাব এতৎপূর্ব্বে লক্ষিত হয় নাই। অজন্তাগুহায় চিত্রনিচয়ে এরূপ প্রভামণ্ডলের ব্যবহার যথেষ্ট দৃষ্ট হয়।

৫। চিত্রের বলদৃপ্ত হস্তীগুলি এরূপ দক্ষতার ও সজীবতার সহিত মূর্ত্ত হইয়াছে যে, তাহা বিশেষ করিয়া ভারতীয় শিল্পের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ভারতীয় ভাস্কর্য্যে হস্তীগুলি যেরূপ এক বাঁধা ছাচে পরিকল্পিত নহে, প্রত্যেকটির ভাবভঙ্গী ও স্বভাব-বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন, এ হস্তীগুলিও ঠিক সেইরূপ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া চিত্রে অর্পিত হইয়াছে।

৬। শিল্পী যে কৌশলের সহিত চিত্রপটে জনসঙ্ঘের সন্নিবেশ সাধন করিয়াছেন তাহা বিশেষ করিয়া সাঞ্চী তোড়-ণের ভাস্কর্য্যের সহিত উপমেয়।

এই সকল প্রমাণ হইতে ধারণা জন্মে যে, সম্রাট দ্বিতীয় খসরুর রাজত্বকালে ভারতে পারসীক শিল্পের প্রভাব অপেক্ষা পারস্যে ভারতীয় শিল্পের প্রভাবই বলবত্তর হইয়া-ছিল। এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, সাসানীয় যুগে ভারতের সহিত ইরাণের সম্পর্ক বহিঃপ্রভাবে ব্যাহত হয় নাই।

সাসানীয় ভাস্কর্য্যের আদর্শস্থানীয় দৃষ্টান্তগুলি নক্স্-ই-রুস্তমের গিরিগাত্রে বিদ্যমান। অবশ্য শাপুরে এবং আরও দুই একস্থানে যে এরূপ ভাস্কর্য্য নাই, তাহা নয়। গিরিগাত্রে ক্ষোদিত একিমিনীয় সম্রাটদিগের সমাধিগুহার নিম্নদেশেই সাসানীয় রাজগণ তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ ও শৌর্য্যবীর্য্যের স্মরণীয় কাহিনী উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। সঙ্গতির দিক্ দিয়া এ স্থানটির উপযোগিতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। মাত্র শতবর্ষপূর্ব্বেও পারস্যের জনসাধারণ এ সকল প্রতি-কৃতি বীর রুস্তমের সহিত সম্পর্ক যুক্ত বলিয়াই মনে করিত পাশ্চাত্যপ্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধিৎসা এখন এ ভ্রম অপ-নোদিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। সাসানীয় যুগের ক্ষোদিত চিত্রগুলির মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ রোমক সম্রাট ভ্যালেরিয়ান

নিদর্শনগুলি এই উক্তির যথার্থ্য সমর্থন করিতেছে। ইন্দোবাক্ট্রিয় ভাস্কর্য্য খৃঃ প্রথম হইতে তৃতীয় শতাব্দের মধ্যে ভারতে জীবন্ত শিল্পরূপে বিদ্যমান ছিল। ভারহুতের বেষ্টনী ও অমরাবতীর স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দে।

কর্তৃক সম্রাটের প্রথম শাপুরের নিকট নতজানু হইয়া ক্ষমা-ভিক্ষা চিত্রই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাসানীয় যুগে ধাতব-শিল্প যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং পারদজাতের সংস্পর্শ ফলে জান্তবমূর্ত্তির পরিকল্পনাও যে অনেকাংশে উন্নত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। লক্ষপ্রদানোন্মুখ পক্ষসংযুক্ত একটি রৌপ্যময় গেজেলের মূর্ত্তি এ কথার সত্যতা প্রমাণিত করিতেছে। সাসানীয় যুগের শিল্পে (২২৬-২৫২ খৃঃ অঃ) প্রাচীন ও নবীন, দেশী বিদেশী, বিভিন্ন শিল্পধারা সম্মিলিত হইলেও আসলে ছিল উহা দেশীয় শিল্পেরই বৈশিষ্ট্যগুণে অলঙ্কৃত। এই যুগেই পারস্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতি যশঃ-সম্পদের সমুচ্চ চূড়ায় আরূঢ় হইতে সমর্থ হয়। তৎকালীন শিল্প যে আশ্চর্য্য শক্তি, সংযম ও গাম্ভীর্য্যগুণে অলঙ্কৃত, তাহাতে কোথাও সাঙ্কর্য্যের (hybridity) মালিন্য ও দুর্ব্বলতা দৃষ্ট হয় না। অতি মাত্রায় উচ্ছল কল্পনার সূক্ষ্ম খেয়ালীপণা অথবা কবিসুলভ ভাবাতিশয্য এ যুগের শিল্প-শৈলীতে স্থান পায় নাই।

সাসানীয় রাজগণ রেশম শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা ও উৎসাহ-দাতা ছিলেন। বয়ন শিল্পের উন্নতির সহিত রেশমী বস্ত্রে নানারূপ শোভন অলঙ্কার ও চিত্রাদি স্থান পাইতে থাকে। কারুশিল্পে আলঙ্কারিক চিত্র প্রসাধক নক্সা হিসাবে যে তখন হইতেই আদরণীয় হইয়াছিল তাহা বুঝা যায় ডামাস্ক নামে পরিচিত খৃঃ ষষ্ঠ কিম্বা সপ্তম শতাব্দীর বিচিত্র কৌষেয় বস্ত্রের অদ্যাবধি বিদ্যমান নমুনাগুলি হইতে। খসরুর রাজত্বকালে কারুশিল্পের অপূর্ব্ব উৎকর্ষ সম্পর্কে টেসিফুনের চশমাসাহী প্রাসাদে রক্ষিত একখানি বিচিত্র কার্পেটের উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহাতে বসন্তকালীন উদ্যানের বিচিত্র পুষ্পশোভা মহামূল্য মণিরত্নের এবং রেশম, স্বর্ণ ও রৌপ্যময় সূত্রাদির সাহায্যে অদ্ভুত কৌশলে রূপায়িত হইয়াছিল। মুসলমান বিজয়ের পর ৬৩৭ খৃঃ অব্দে এই কার্পেটখানি আরবদিগের হস্তে নিপতিত হয় এবং বিজেতৃগণ উহার দুর্মূল্য উপকরণাদি হস্তগত করার জন্য এই অমূল্য শিল্পনিদর্শন হেলায় বিনষ্ট করিয়া ফেলে। এই কার্পেটের মত একখানি কার্পেট অদ্যকার দিনে বিদ্যমান থাকিলে তাহার কত যে মূল্য হইত তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে নির্ম্মিত আর্দেবিল কার্পেট নামে পরিচিত যে একখণ্ড বৃহদায়তন (৩৪"×১৭") কার্পেট দুই সহস্র পঞ্চশত পাউণ্ড মূল্যে সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়মের প্রাচ্য বিভাগের জন্য ক্রীত হয় তাহাতে আর জহরতের নামগন্ধও নাই।

কার্পেট বলিলেই আমরা শয়ন ও উপবেশনের জন্য বিছাইবার সামগ্রী বলিয়াই মনে করিয়া থাকি। বস্তুতঃ প্রাচীনকালে কার্পেট প্রবেশ মণ্ডপের পরদা ও ধর্ম্মমন্দিরের পবিত্র স্থানের আচ্ছাদনরূপে ব্যবহৃত হইত। ভিত্তি সজ্জার জন্য চিত্রসমন্বিত তিরস্করনীর (tapestry) ন্যায়ও যে ইহার প্রচলন না ছিল তাহা নয়। জনৈক লেখক বলিয়াছেন যে কার্পেটে ফুলের নক্সা আর্য্য-সংস্কৃতির পরিচায়ক এবং জ্যামিতিক নক্সাগুলি তুরাণীয় জাতির প্রভাবে উদ্ভূত (১)। টেসিফুন নগরে সম্রাট খসরু অনুসিরওয়ান্ আনুমানিক ৫৫০ খৃঃ অব্দে যে বিখ্যাত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন তাহারই সুবৃহৎ কক্ষের দ্বারদেশ আবৃত করিয়া—পরদার ন্যায় যে আচ্ছাদন বিদ্যমান ছিল তাহা চশমাসাহী প্রাসাদের ঠিক পূর্ব্বোক্ত কার্পেটখণ্ডটি না হউক, সে যুগের বিশিষ্ট শিল্প নিদর্শন, অনুরূপ একখানি মণিরত্নখচিত ও প্রসাধকচিত্রে অলঙ্কৃত কার্পেট বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। ঐতিহাসিক তবারির বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ইহাতে যে বাগানের নক্সাটি অলঙ্করণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার জমি স্বর্ণের, পথ রৌপ্যের, প্রান্তর মরকতের, নদী মুক্তার, বৃক্ষলতা ফুলফল হীরকাদি বহুমূল্য মণির (২)। একখানি ইংরাজী গ্রন্থে ইহা রেশম নির্ম্মিত কার্পেট বলিয়াই উক্ত হইয়াছে—এবং ইহার নক্সাটিও যে পুষ্পোদ্যান হইতে গৃহীত লেখকের উক্তি হইতে ইহাও জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন গালিচার উপর নক্সা হিসাবে উদ্যানের এই পরিকল্পনায়, পত্রগুলি সবই ছিল মরকতদ্বারা নির্ম্মিত, এবং পুষ্পনিচয় পদ্মরাগ, মুক্তা, ও নীল-কান্ত মণির সমবায়ে গঠিত (৩)। 'চৌবাগ' কার্পেট নামে পরিচিত এই শ্রেণীর পারস্যজাত কার্পেটগুলিতে মণ্ডনশিল্পে সুপরিচিত যে নক্সাটি স্থান পাইয়াছে, তাহা সাসানীয় যুগেই পরিকল্পিত হইয়াছিল। কুসুমাস্তৃত উদ্যানের আদর্শ হইতে পরিগৃহীত—এই বাঁধা ছাঁদের নক্সার ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি সরোবর, তথায় হংস মিথুন বিচরণ করিতেছে, আর এই সরোবরের চারিপার্শ্ব হইতে চারিটি 'নহর' বাহির হইয়া উদ্যানটিকে চারিখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। ইহা হইতেই "চৌবাগ" নামের উৎপত্তি। কিছুকাল পূর্ব্বে, রাজপুতানার কোনও করদরাজ্যে, রাজপ্রাসাদের একটি পরিত্যক্ত দ্রব্যাদির গুদামে, "চৌবাগ" নক্সাযুক্ত একখানি পারস্যদেশীয় পুরাতন কার্পেট পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতেই পারসীক শিল্পের, তথা প্রাচীনকাল হইতে প্রবর্ত্তিত এই আলঙ্কারিক নক্সার দূরদেশে ক্রমবিস্তারের কথা অনুমান করা যাইতে পারে।

এবার কৃষ্টির কথা ছাড়িয়া দিয়া কিছু ইতিহাসের কথা

(১) Daily Telegraph (London) August 8th, 1893.

(২) মাসিক বসুমতী, বৈশাখ, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৩০।

(৩) "designed in imitation of a garden with emeralds set so as to form leaves, and pearls and rubies and supphires arranged in the form of flowers." C. J. Finger, Life of Mahomet. p. 31.

আলোচনা করার প্রয়োজন। পিতৃহন্তারক কোবাদ কয়েক মাস মাত্র রাজ্যভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে পর, ৬২৯ খৃঃ অব্দে সাহরবরাজ নামক এক সৈন্যাধ্যক্ষ অবৈধভাবে রাজপথ অধিকার করেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই দেশে অরাজকতার বিস্তার ঘটে। এই অরাজকতা চলিতে থাকে ক্রমান্বয়ে ছয় বৎসর কাল ধরিয়া—খৃঃ অঃ ৬২৯ হইতে খৃঃ অঃ ৬৩৪ পর্যান্ত। ইহারই মধ্যে বোরান্ নামক খস্রুর এক কন্যা স্বল্পকাল সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। ৬৩৩ খৃঃ অঃ বেদুয়ীন আরব সৈন্যদল খলিদ নামক সেনাপতির অধিনায়কত্বে পারসীকদিগকে পরাজিত করে, কিন্তু তাহারা এ-অভিযানে ইরাণের কোনও অংশ খলিফার অধিকারভুক্ত করিয়া লয় নাই। আরব ধর্ম্মজাগরণের নেতা নবী মহম্মদ কিস্রা (পারসীক সম্রাট) কর্তৃক তাঁহার নব প্রচারিত ধর্ম্মগ্রহণের প্রস্তাব উপেক্ষিত হইয়াছে শুনিয়া সাসানীয় সাম্রাজ্যের পতন ও পারস্যে মুসলমান ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা খস্রুর পৌত্র তৃতীয় ইয়েজদিজর্দের রাজত্বকালেই ফলিয়া গেল। ইনিই সাসানীয় বংশের শেষ নরপতি। আক্রমণকারী আরবেরা প্রথমবার জয়লাভ করিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু তাহারা মোথান্না (Mothanna) নামক সেনাপতির অধীনে যখন পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইল তখন পারস্যরাজ তাহাদের সে দুর্দ্ধর্ষ শক্তি আর প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। ৬৪২ খৃঃ অঃ নিহবন্দের যুদ্ধে পারসীক সৈন্যদল শুধু ছত্রভঙ্গ নয় একবারেই বিনষ্টপ্রায় হইল। ইয়েজদিজর্দ নূতন সৈন্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে খোরাসান অভিমুখে গমন করিলেন বটে কিন্তু ভাগ্য বিমুখ হইলে সকলই বিফল মনোরথ হইতে হয়। তুস্ নামক স্থানে, পারস্যরাজ, তাঁহার মহ্ভী নামক এক সামন্ত কর্তৃক অভ্যর্থিত হইলেন বটে, কিন্তু শঠের এ অভ্যর্থনা শুধু সৌজন্য দেখাইয়া নিজ দুরভিসন্ধি সাধন করার জন্য। পয়োমুখ বিষকুম্ভের ন্যায় ক্রূরমতি মহ্ভি দুর্ব্বল পারস্যাধিপকে অপসারিত করিয়া সিংহাসন লাভ মানসে সমরকন্দবাসী বিঝান নামক তাহারই এক সম্পদস্থ দলপতির সহিত গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল, বাহিরে দেখাইতে লাগিল সাহের প্রতি পরম সৌহার্দ্দ। মহ্ভির প্ররোচনায় বিঝান সাহকে আক্রমণ করিলে মহ্ভির সৈন্যদল নৃপতি ইয়েজদিজর্দকে কোনওরূপ সাহায্য না করিয়া—বিনাযুদ্ধে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গেল। এই ঘটনাটি আমাদিগকে যেন পলাশীর যুদ্ধের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। সাহ বীরবিক্রমে কিছুকাল যুদ্ধ করিলেন বটে কিন্তু একাকী শত্রুসেনা নিবারণ করিতে সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। নিরুপায় হইয়া তিনি রণক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন কিন্তু পলায়নকালে তুর্ক অশ্বারোহীদল তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করায় তাঁহাকে কোনও পান্চাক্কীওয়ালার জাঁতাঘরে প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন করিতে হইল। আততায়ীগণ এই আশ্রয়স্থান হইতে ভাগ্যহীন ভূপতিকে তখন তখনই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না বটে কিন্তু সেই সিংহগ্রীব পুরুষের উন্নত দেহ, পলায়মান মৃগের ন্যায় আর্ত্তদৃষ্টি, এবং তাঁহার স্বর্ণসূত্রখচিত কিংখাবের পরিচ্ছদ ও মূল্যবান সাজসজ্জাদি লক্ষ্য করিয়া ঘরট্টস্বামী (১) সহজেই তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিল; ক্ষুৎপিপাসাক্লিষ্ট সাহকে কিছু খাদ্যসামগ্রী আনিয়া দিবে এই আশ্বাস দিয়া সেই দুরাশয় বহির্দ্দেশে গমন করিয়াই শত্রুসৈনিকের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিল, শুধু তাহাই নয়, মহ্ভির আদেশক্রমে সে স্বয়ং ছুরিকাঘাতে তৃতীয় ইয়েজদিজর্দ্দকে নিহত করিতেও পরাঙ্মুখ হইল না। বিপক্ষপক্ষীয় সৈনিকেরা গতপ্রাণ নৃপতির মুকুট, অঙ্গচ্ছদ ও স্বর্ণমণ্ডিত পাদুকাদ্বয় খুলিয়া লইয়া তাঁহার নগ্ন শবদেহ কূল্যার জলপ্রবাহে নিক্ষেপ করিল, কেহও উহা সৎকারের চেষ্টা করিল না। সঙ্গোপনে অনুষ্ঠিত হইলেও এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড জনসমাজে অবিদিত রহিল না। এই শোচনীয় ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই সাসানীয় রাজত্বকালের তথা সংস্কৃতিগুণভূয়িষ্ঠ সাসানীয় যুগের অবসান ঘটিল।

পাপাত্মা মহ্ভিকে অচিরেই তাহার এই বিশ্বাসঘাতকতার

রোমক সম্রাট ভ্যালেরিয়ান কর্তৃক সম্রাট প্রথম শাপুরের নিকট নতজানু হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে

(১) কাশ্মীর দেশে জলচালিত জাঁতার (water mill-এর) ব্যবহার আছে। চলিত কথায় সেগুলিকে পান্চাক্কী বলা হয়। ঘরট্টস্বামী (miller) পান্চাক্কীওয়ালা নামেই অভিহিত হইয়া থাকে।

ফলভোগ করিতে হইল। সিংহাসন লাভ করিয়া তাহাকে আর নিশ্চিন্ত হইয়া রাজ্যভোগ করিতে হইল না। তাহার প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়াইল তাহারই পূর্ব্বতন বন্ধু বিস্তান্। উভয়ই উভয়ের উৎসাদন করিতে বদ্ধপরিকর হইল। দেখিতে দেখিতে যুদ্ধ বাধিয়া গেল এবং কুচক্রী মহ্ভিই পরাভূত হইয়া শত্রুহস্তে নিপতিত হইল।

বিজয়ী বিস্তানের আদেশক্রমে মহভির হস্ত, পদ, কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিয়া, প্রাণবায়ু নিঃসারিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার বিকল দেহপুষ্টি রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপে উন্মুক্ত আকাশতলে ফেলিয়া রাখা হইল। তাহার সন্ততিগণকে প্রজ্জলিত চিতায় ভস্মীভূত করিয়া নৃশংস বিস্তান মহভির বংশের উচ্ছেদ সাধন করিল। অপর সামন্তগণ তাহাদিগের এই শোকাবহ পরিণামে ক্রোধ বা অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া মৃত মহ্ভির প্রতিই অভিশাপোক্তি বর্ষণ করিতে লাগিল।

ইতিহাসে দেখা যায় যে নিহ্বন্দের যুদ্ধের পর পারসীকেরা কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রাণপণে আরব আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু যুযুৎসু আরবসৈন্য সকল বাধা অতিক্রম করিয়া বর্ষাকালীন প্রবল স্রোতধারার ন্যায় পারস্যরাজের চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ৬৪১ খৃঃ অব্দে সমগ্র ইরাণ ওমিয়াবংশীয় (Omeyyad) খলিফাদিগের শাসনাধীনে আনীত হইলেও বিজীত রাজ্য সম্যক্ বশীভূত করিতে অষ্টাদশ বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছিল।

ইতিহাসের ঘটনা পরম্পরায় জাতীয় জীবন কি ভাবে প্রভাবিত হইয়া থাকে তাহা কেবল সদ্য ও গৌণ শুভাশুভ ফলের দ্বারাই নিরাকরণ করা যাইতে পারে। পারস্য জয়ের ফলে সঙ্ঘবদ্ধ মুস্লিম শক্তির অপূর্ব্ব সফলতা ও যশঃগৌরব জগতীতলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু আরবদিগের সহজ সরল জীবনধারায় যে বিলাসের আবিলতা স্পর্শ করিল তাহা আর দূরীভূত করা সম্ভব হইল না। পারস্যের রাজধানী মদেইন (টেসিফুন) নগরী হইতে আরবগণ যে বিপুল ধনরাশি ও রত্নসম্ভার লুণ্ঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা তৎকালে তাহাদিগের কল্পনার অতীত ছিল। প্রাসাদের ভূগর্ভস্থ কক্ষসমূহে রক্ষিত (kept in vaults) রাশীকৃত মসলা ও গন্ধদ্রব্য হস্তগত হওয়ায় জেতৃগণ বিলাসের যে সকল অভিনব উপকরণের সহিত পরিচিত হইল, তাহা কৃষ্ণবর্ত্মে হবিঃ নিষেকের ন্যায় তাহাদিগের নব সঞ্জাত ভোগাকাঙ্ক্ষা যে অচিরে অভিবর্দ্ধিত করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মদেইনের রাজপুরীর ভিতরকার ছাদ নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডলের অনুকরণে আলঙ্কারিক সজ্জায় সজ্জিত ছিল। প্রাকৃতিক জগতে গতিশীল গ্রহ ও নক্ষত্র সমুদায় গগনবক্ষে যেরূপ সঞ্চারিত হয় তাহাদিগের কৃত্রিম প্রতিরূপগুলিও ঠিক তাহারই অনুকরণে চালিত হইত (১)। মরুবাসী আরবগণ মাদাইনের রাজপুরী ধ্বংস করিয়া ফেলিলেও পারসীক স্থপতি ও কারুশিল্পীর অপূর্ব্ব কৃতিত্বের কথা বোধ হয় একেবারে বিস্মৃত হইতে পারে নাই।

আরবদিগের মধ্যে বিলাসিতার চরমোৎকর্ষ ও যান্ত্রিক শিল্পের অপূর্ব্ব পরিণতি প্রকাশ পাইয়াছিল আব্বাসীয় যুগে খলিফা মুক্তাদিরের রাজত্বকালে (৯০৮—৯৩২ খৃঃ অঃ)। তৎকালে আরব সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতা যেন সাসানীয় যুগকেও অতিক্রম করিয়াছিল। আবুল ফেদা কর্ত্তৃক লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে যুদ্ধে গৃহীত বন্দীদিগের বিনিময় সাধনার্থ গ্রীক সম্রাট কনষ্টাণ্টাইন পরফেরোজেনেট (porphyrogenete) মুক্তাদিরের নিকট যে দুইজন দূত প্রেরণ করেন, তাঁহারা খলিফার প্রাসাদে প্রবেশ কালে দেখিয়াছিলেন, যে অষ্টাত্রিংশৎ সহস্র স্বর্ণসূত্রে সংগ্রথিত কৌষেয় বস্ত্র এবং দ্বাবিংশতি সহস্র সুদৃশ্য কার্পেট (গালিচা) কক্ষগুলির ভিত্তিগাত্র আবৃত করিয়া বিলম্বিত। রাজপুরীর দুইটি বিভিন্ন পশুশালায় এক সহস্র করিয়া দ্বিসহস্র সিংহ সযত্নে পালিত হইতেছে। বিদেশী রাজদূতের এ দৃশ্যে চমৎকৃত হইবারই কথা। বৃক্ষাদি সমাচ্ছন্ন অপর একটি সুমনোহর পুর মধ্যে নীত হইলে পর, তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল অপূর্ব্ব একটি কৃত্রিম বৃক্ষ। উহার পত্রসম্ভার বিবিধ চারুবর্ণে রঞ্জিত। এ বৃক্ষের অষ্টাদশটি শাখায় স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত পক্ষিগণ অন্তর্নিহিত যন্ত্রবিন্যাস কৌশলে কলকণ্ঠ বিহগের ন্যায় মধুর স্বরে গান করিতেছিল। আব্বাসীয় যুগের প্রারম্ভ খ্রীঃ ৭৫০ অব্দ হইতে এবং ক্ষীয়মান আব্বাসীয় গৌরবরবি অস্তমিত হয় পারস্য বিজয়ের ছয় শতাব্দী পরে, খৃঃ ১২৫৮ অব্দে। কালের এই সুদীর্ঘ ব্যবধান সত্ত্বেও যে অনন্যসাধারণ সংস্কৃতি আব্বাসীয় যুগে আরবজাতিকে সভ্যতার উচ্চতম স্তরে উন্নমিত করিয়াছিল, তাহা যে বহুলাংশে ইরাণীয় ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত—এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। রণক্ষেত্রে পরাজিত হইলেও একাধিক জাতি যে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জেতৃদিগের উপর জয়লাভ করিয়াছে, সভ্যতার ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এ কথাও সত্য বটে যে, পারস্যের লালিত বিলাসিতা কবির ভাষায় 'গুলাব ও বুলবুল' আরবের ক্ষাত্রবীর্য্যে ম্লানিমার সঞ্চার করিয়াছিল।

(১) C. I. Finger's life of Mahomet, loc. cit.

আকবরের রাষ্ট্রসাধনা

এস, ওয়াজেদ আলি, বি, এ, (কেণ্টাব) বার-এট-ল

চৌদ্দ

সাম্রাজ্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন আকবর বিশেষভাবে অনুভব করেন। রাজস্ব আদায়ের সুশৃঙ্খলিত ব্যবস্থার প্রয়োজনও তিনি অনুভব করেন। মোগল সাম্রাজ্য সবেমাত্র স্থাপিত হয়েছিল। রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্ব্বত্রই তখন বিশৃঙ্খলা বিরাজমান। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের নিয়ন্ত্রণের ভার তিনি হিন্দুমন্ত্রী রাজা টোডরমল্লের হস্তে অর্পণ করেন। টোডরমল্ল রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে অতুলনীয় অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক বিভাগকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টায় সম্পূর্ণভাবে আত্ম-নিয়োগ করেন। টোডরমল্লের প্রচেষ্টা যে সাম্রাজ্যের কায়েমী স্বার্থবাদীদের মনে বিষম আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। আর এই কায়েমী স্বার্থবাদীদের অধিকাংশই ছিলেন আলেম সম্প্রদায়ের লোক অথবা তাঁদের সঙ্গে আত্মীয়তাবন্ধনে আবদ্ধ।

নিম্নশ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীদের অধিকাংশই ছিলেন আলেমদের আত্মীয়-স্বজন। ভারতবর্ষের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বংশানুক্রমে তাঁরা এই সব কাজ করে আসছিলেন। তাঁরা যা ইচ্ছা তাই করতেন, আর মর্জ্জিমাফিক সরকারী কাজ চালাতেন। তাদের কাজ কর্ম্মের পরিদর্শনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কারও কাছে তাঁদের জবাবদিহি করতে হতো না। যে কাজ একজনের দ্বারা সহজে সম্পন্ন হ'তে পারে, তার জন্য দশজন আমলা নিযুক্ত ছিল। অথচ কাজ যথোচিতভাবে সুসম্পন্ন হতো না। অসংখ্য লোক রাজসরকার থেকে নিয়মিতভাবে বৃত্তি বা ভাতা ভোগ ক'রে আস্‌ছিলেন। কেন যে তাঁরা সেই বৃত্তি বা ভাতার টাকা পেতেন, কেউ তা জান্‌ত না; জান্‌বার চেষ্টাও করতো না। রাজকোষ অর্থশূন্য, অথচ অনাবশ্যক বৃত্তিভোগীর সংখ্যা গণনার অতীত। বৃত্তিভোগীরা সাম্রাজ্যের দেহ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে খাচ্ছে, অথচ অর্থরূপ খাদ্যের অভাবে দেশ মরণাপন্ন। আকবরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অচিরে এই সমস্যার দিকে আকৃষ্ট হ'ল। বিচক্ষণ মন্ত্রী টোডরমল্লের সাহায্যে তিনি ব্যাধির প্রতিকারে দৃঢ় পাদক্ষেপে অগ্রসর হলেন।

পনরো

টোডরমল্লের সংস্কারের অনিবার্য্য ফল এই হল, যে, অসংখ্য অযোগ্য রাজকর্ম্মচারী তাঁদের চাকুরী হারালেন। বিনা কারণে অযথা অন্যায়ভাবে যাঁরা বৃত্তিভোগ ক'রে আস্‌ছিলেন, তাঁদের অনেকে সেই উপজীবিকা থেকে বঞ্চিত হলেন। বহু লোকের অযথা-লাভের পথ বন্ধ হ'ল, বহু লোকের পেটের ভাত মারা গেল। দেশময় অসন্তোষ এবং চাঞ্চল্য দেখা দিল। দুষ্টবুদ্ধি আলেমেরা ভাবলেন, হিন্দু-ঘেষা অনাচারী বাদশাকে সিংহাসন থেকে তাড়াবার এবার সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত হয়েছে।

আলেমেরা বাদশার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারকার্য্য সুরু করে দিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য জনসাধারণকে উত্তেজিত করতে লাগলেন। টোডরমল্লের সংস্কারের ফলে বহু সম্ভ্রান্ত আমীর ওমরাহও বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। আলেমদের এই আন্দোলনে তাঁরাও যোগ দিলেন। কাজী, মুফ্‌তি প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের অনেকে ধর্ম্মের গোঁড়ামীর তাড়নায় বাদশার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। অবস্থা সঙ্গীন হ'য়ে দাঁড়াল।

জোনপুরের প্রধান কাজী (কাজী-উল-কুজ্জাত) মোল্লা মোহাম্মদ ইয়াজদীকে লোকে ধর্ম্মের একজন ধুরন্ধর দিকপাল রূপে গণ্য করতো। তিনি প্রকাশ্য ফতওয়া (বিধান) জারী করলেন যে, বাদশা ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েছেন; তাঁর বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধ হচ্ছে প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্য। দেশময় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠ্‌লো। বঙ্গদেশে এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য পূর্ব্বাংশে মুসলমানেরা বাদশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সুরু করে দিলেন। বিদ্রোহ দমনের জন্য বাদশা ফৌজ পাঠালেন। মসজীদের এমামগণ এবং খানকার পীরেরা জনসাধারণকে জেহাদের জন্য উত্তেজিত করে বেড়াতে লাগলেন। কোরাণ এবং হাদিসের বাণী উদ্ধৃত করে তাঁরা তাদের ধর্ম্মান্ধতার আগুনে ইন্ধন যোগাতে লাগলেন। বাদশা তাঁদের আয়ের পথ বন্ধ করতে চেষ্টা করছেন, সুতরাং তিনি যে খোদা-দ্রোহী তাতে কি সন্দেহ থাকতে পারে?

ষোল

আলেমেরা তখনও বোঝেনান, কার সঙ্গে তাঁরা শক্তি-পরীক্ষায় অগ্রসর হয়েছেন। আকবর সব জানতেন, সব বুঝতেন, আর সবের জন্যই তিনি প্রস্তুত ছিলেন। প্রয়োজন মত অতুলনীয় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি সঙ্কল্প স্থির করতে পারতেন, আর সে সঙ্কল্পকে বিদ্যুৎ-গতিতে কাজে পরিণত করবার শক্তিও তাঁর ছিল। একাগ্র মনে তিনি বিদ্রোহ দমনে আত্মনিয়োগ করলেন। আকবরের আদেশে প্রধান কাজী মোল্লা মোহাম্মদ ইয়াজদী এবং তাঁর প্রধান প্রধান সহকর্ম্মীরা গ্রেফতার হলেন। বন্দী-অবস্থায় তাঁদের গোয়ালিয়ার দুর্গে পাঠান হল। আর সেখানে যমুনাজলে নিক্ষেপ করে তাহাদের ইহলীলা সাঙ্গ করা হল। অন্যান্য বিদ্রোহী নেতাদের অনেকের প্রাণদণ্ড হল। অনেককে দেশান্তরিত করা হল। অবশিষ্ট বিদ্রোহী পীর, মোরশদ, আলেম, বৃত্তিভোগী প্রভৃতিদের উপর সশরীরে শাহী দরবারে উপস্থিত হবার জন্য

কড়া হুকুম জারি করা হল। সুপ্তসিংহের নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছিল। সরোষ গর্জ্জনে তাঁর আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হতে লাগলো।

ধর্ম্মের ধ্বজাধারীরা এবার কম্পিত কলেবরে অজস্র ভাবে তসলিম এবং কুর্নিস করতে করতে শাহী দরবারে হাজির হতে লাগলেন। পূর্ব্বের সে দম্ভ, পূর্ব্বের সে হুঙ্কার, পূর্ব্বের সে আস্ফালন, পূর্ব্বের সে গর্জ্জন-তর্জ্জন তাঁদের আর নাই, তাঁরা এখন সাহিন-সাহের কৃপার অনুকম্পার ভিখারী।

উদারপ্রাণ বাদশা তাঁর স্বাভাবিক সৌজন্যের সঙ্গে তাঁদের সাথে আলাপ-আলোচনা করলেন; ধর্ম্মের, সত্যের কোন অভ্যাস তাদের মধ্যে যদি দেখতে পাওয়া যায় এই আশায়! আলাপ-আলোচনার ফলে সুক্ষ্মদর্শী আকবর স্পষ্টই বুঝলেন—এই পরশ্রী-কাতর ধর্ম্মান্ধদের মধ্যে ধর্ম্মের কিম্বা সত্যের গন্ধ মাত্র নাই। তুচ্ছ ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া এরা কিছুই বোঝে না, বোঝবার শক্তিও এদের নাই। উচ্চ আদর্শের সঙ্গে, প্রকৃত ধর্ম্মের সঙ্গে, খাঁটি সত্যের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নাই। বিরক্ত হয়ে তিনি তাদের বললেন, "আপনারা তো ধর্ম্মের রক্ষক নন; আপনারা হচ্ছেন দোকানদার, ধর্ম্মের কারবারী।" তিনি তাঁদের জাগীর, লাখেরাজ, মোশাহিরা প্রভৃতির দাবীর চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ভার, হিন্দু কর্ম্মচারীদের হাতে ছেড়ে দিলেন। বলা বাহুল্য, হিন্দু কর্ম্মচারীরা একান্ত সুক্ষ্ম ভাবেই তাঁদের দাবী দাওয়ার, তাদের সাক্ষী প্রমাণাদির যাচাই এবং পরীক্ষা করলেন। ফলে, অনেকে তাদের জাগীর, মোশাহিরা প্রভৃতি উপজিবিকা থেকে বঞ্চিত হলেন। অনেকে দেশান্তরিত হলেন। অনেকে তাঁদের গৃহকোণে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। আলেমদের প্রতিষ্ঠা, প্রভাব এবং প্রতিপত্তি কিছুদিনের জন্য দেশ থেকে বিলুপ্ত হল।

সতেরো

আকবর দার্শনিক আলোচনা সত্যই ভালবাসতেন। তিনি নিজেই বলেছেন, "দার্শনিক আলোচনা আমি এত ভালবাসি যে তাতে একবার মশগুল হলে কাজকর্ম্মের কথা একেবারেই ভুলে যাই! জোর করি তখন নিজেকে দৈনন্দিন কাজে ফিরিয়ে আন্‌তে হয়, তা' না হ'লে অবশ্য করণীয় কাজকর্ম্ম সব পড়ে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে এই দার্শনিক আলোচনা আকবরের বিলাসের বস্তু ছিল না। এরই সাহায্যে তিনি সত্যের স্বরূপ দেখবার চেষ্টা করতেন, আর এরই সাহায্যে নিজের ইতিকর্ত্তব্যের বিষয় সম্যক ভাবে অবহিত হবার চেষ্টা করতেন। রোম সম্রাট marcus Aupelius-এর মত নিজের অন্তরতম দেশেই তিনি তাঁর জীবনের প্রকৃত আদর্শের, প্রকৃত উদ্দেশ্যের সন্ধান করতেন।

আকবরের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে (১) খোদার প্রতি তাঁর অগাধ প্রেম এবং ঐকান্তিক বিশ্বাস (২) ন্যায় এবং যুক্তির প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা (৩) অন্যায় এবং অত্যাচারের প্রতি তীব্র আন্তরিক ঘৃণা, আর (৪) দুস্থ দরিদ্র অভাজনের প্রতি অপরিসীম দয়া-দাক্ষিণ্য। আকবর নিজেকে খোদার প্রতিনিধিরূপেই দেখতেন আর তাই মানুষের মঙ্গলের জন্য, অন্যায় এবং অত্যাচারের মূলোৎপাটনের জন্য তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতে কখনও তিনি কুণ্ঠিত হতেন না।

এ দেশের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণ ধর্ম্মের নামে অসংখ্য অযৌক্তিক এবং অমানুষিক আচার আবহমান কাল থেকে পালন এবং সহ্য করে আসছিল। পুরোহিত এবং আলেমদের ভয়ে কোন হিন্দু রাজা কিম্বা মুসলমান বাদশা সে সবে হস্তক্ষেপ করতে কখনও সাহস করতেন না। দার্শনিক আকবর কিন্তু হস্তক্ষেপ না করে থাকতে পারলেন না। বিভিন্ন রাজকীয় ফরমানের সাহায্যে তিনি রাষ্ট্র সাধনায় এক অভিনব আদর্শ স্থাপন করলেন। অগ্নি পরীক্ষা, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতির সাহায্যে ন্যায়, অন্যায় নির্ণয়ের প্রথা আবহমান কাল থেকে চলে আসছিল। শাহী ফরমান জারী করে তিনি সে প্রথা তুলে দিলেন। সতীদাহ প্রথা হিন্দুদের মধ্যে ধর্ম্মাচরণ রূপে গণ্য হতো। শাহী ফরমান জারি করে তিনি সে প্রথাকে যতদূর সম্ভব সংযত এবং নিয়ন্ত্রিত করলেন। বিবাহের ব্যাপারে বর কনের সম্মতির কথা কেউ ভাবতো না। তিনি ফরমান জারি করে বিবাহের বয়স নির্দ্দিষ্ট করে দিলেন, আর, বর কনের উভয়ের স্পষ্ট স্বীকৃতি ছাড়া বিবাহকে আইনের চক্ষে বাতিল রূপে ঘোষণা করে দিলেন। বিজয়ের গর্ব্বে সে যুগের মুসলমানেরা অনেক ব্যাপারে হিন্দু প্রতিবেশীদের মনে আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। আকবরের ন্যায় নিষ্ঠ করুণ প্রাণ স্বজাতীয়দের এসব বাড়াবাড়ি সহ্য করতে পারলেন না। শাহী ফরমানের সাহায্যে তিনি গো হত্যা বন্ধ করে দিলেন। যে সব হিন্দুকে বল প্রয়োগ পূর্ব্বক মুসলমান করা হয়েছিল তাদের তিনি স্বধর্ম্মে ফিরে যেতে অনুমতি দিলেন। তিনি হুকুম জারি করলেন, যার যা ইচ্ছা, সে সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করুক; ধর্ম্মের ব্যাপারে কোন বাধা বাধকতা থাকবে না। এই ভাবে বিভিন্ন রাজকীয় ফরমানের সাহায্যে আকবর আবহমান প্রচলিত অনাচার, অত্যাচার এবং কুসংস্কারের মূলোৎপাটনের জন্য ধারাবাহিক ভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। আকবরের প্রত্যেকটী ফরমানের, প্রত্যেকটী বিধি-নিষেধের সমর্থন করবার ইচ্ছা আমাদের নাই, আর তার প্রয়োজনও নাই। তবে এই মহাপ্রাণ বাদশার আন্তরিকতার বিষয়, তাঁর উদারতার বিষয়, তাঁর অন্তরের পবিত্রতার বিষয়, তাঁর ন্যায়-নিষ্ঠার বিষয়, তাঁর সুগভীর মানব প্রেমের বিষয় কোন সন্দেহই থাকতে

পারে না। আর এই সব গুণাবলী, গভীর দার্শনিক জ্ঞানের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে ধীরে ধীরে সৃষ্টি করেছিল আকবরের রাষ্ট্র দর্শন, যা ভারতবাসীর জন্য অনন্তকাল ধরেই পথবর্ত্তিকার কাজ করবে।

আঠারো

১৫৭৩ খৃঃ অব্দে যৌবন কালে আবুল ফজলের বৃদ্ধ পিতা শেখ মোবারকের সঙ্গে আকবরের সাক্ষাৎ হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে জন্য, মনের উদারতার জন্য এবং চরিত্রের বলিষ্ঠতার জন্য শেখ মোবারক, সে যুগের আলেমদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। সাধারণ আচার পন্থী আলেমদের তিনি অবজ্ঞার চক্ষেই দেখতেন। ভারতবর্ষে মুসলমানেরা যে সম্পূর্ণ নূতন এক বেষ্টনীর মধ্যে এসে পড়েছিলেন, তার উপযোগী অভিনব দৃষ্টি-ভঙ্গীর,অভিনব আদর্শের প্রয়োজন তিনি হাড়ে হাড়ে অনুভব করতেন। আর তার আভাস কোথাও পেতেন না বলে সমাজ থেকে দূরে, বিমর্ষ ভাবে তিনি জীবন যাপন করতেনা এহেন কালে আকবর ভারতের জীবনাকাশে মধ্যাহ্ন ভাস্কর রূপে আবির্ভূত হলেন। আকবরের বিস্ময়কর কার্য্য কলাপ, তাঁর অলোক সামান্য প্রতিভা তার উদার উচ্চ মনোবৃত্তি শেখ মোবারকের মনে আশার যোয়ার এনেছিল। সম্রাটকে সম্বোধন করে আবেগ কম্পিত কণ্ঠে তিনি তাই বলেছিলেন আপনার উচ্চাশা যেন কেবল পার্থিব রাজত্ব এবং আধিপত্য নিয়েই সন্তুষ্ট না থাকে। দেশ বাসীর মনের রাজ্যেও আপনার অপ্রতিহত রাজত্ব স্থাপন করুণ।" কথাগুলি শেখ মোবারকের অন্তরতম দেশ থেকে বেরিয়েছিল, আর তাই, সোজা আকবরের মরমে সেগুলি গিয়ে পৌছেছিল; আর উত্তর কালে, তাঁর জীবনে গভীর এবং ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল।

উনিশ

দার্শনিকশ্রেষ্ঠ প্লেটো (Plato) এক Philosophor King বা দার্শনিক নরপতির স্বপ্ন দেখেছিলেন। আকবরের সংস্পর্শে এসে ভারতীয় পণ্ডিত শেখ মোবারকের মনেও সেই স্বপ্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করেছিল। সরলপ্রাণ, উন্নতমনা, আদর্শের চিন্তায় বিভোর দার্শনিকের পক্ষে এহেন সুখ-স্বপ্ন দেখা মোটেই বিচিত্র নয়। জনসাধারণ, যে কোন দেশে, এবং যে কোন কালে, একটা ভেড়ার পালের চেয়ে বেশী বুদ্ধি কিম্বা উচ্চতর মনোবৃত্তি রাখেন। স্বাধীন ভাবে চিন্তা করবার, স্বাধীনভাবে মত স্থির করবার, স্বাধীনভাবে কোন সুচিন্তিত পথে চলবার ক্ষমতা আদৌ তাঁদের নাই; অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা, পুরোহিত এবং ধর্ম্মযাজকেরা, শাসক-সম্প্রদায়, স্বার্থ এবং প্রবৃত্তির নির্দ্দেশে যেদিকে এবং যেভাবে ইচ্ছা তাদের পরিচালিত করেন। ভয় এবং লোভ, হিংসা এবং অসূয়া, কুসংস্কার এবং অজ্ঞতা প্রভৃতি স্বাভাবিক মানবীয় দুর্ব্বলতার সাহায্যে সমাজের কায়েমী-স্বার্থবাদীরা জন-সাধারণের দ্বারা অতি সহজে সর্ব্ববিধ অনাচার এবং অত্যাচার অনুষ্ঠিত করিয়ে নেন। পার্থিব শক্তি এবং সম্বল-বিহীন আদর্শ-সর্ব্বস্ব মহাপুরুষেরা যুগে যুগে জনসাধারণকে ন্যায় এবং সত্যের পথে পরিচালিত করবার জন্য চেষ্টা করছেন। তারা কিন্তু তাঁদের কথায় কখনও কর্ণ-পাত করেনি। পক্ষান্তরে, আত্মসর্ব্বস্ব কায়েমী স্বার্থ-বাদীদের প্ররোচনায় তাদের প্রকৃত মঙ্গলকামী এই সব ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদের হয় তারা হত্যা করেছে, না হয় অশেষ লাঞ্ছনা এবং নিগ্রহের সঙ্গে সমাজ থেকে বিতাড়িত করেছে। অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের বলে মহাপুরুষের বাণীর সঙ্গে যেখানে রাজশক্তির সংযোগ ঘটেছে, সেইখানেই সে বাণী রাষ্ট্র কিম্বা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। রাজ-শক্তির সাহায্য লাভ না ক'রে, মহাপুরুষের বাণী কোথাও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। রাজশক্তির সাহায্য কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসেছে মহাপুরুষের, বাণী দাতার মৃত্যুর বহু পরে। আর রাজশক্তির অধিকারীরা সাধারণতঃ স্বার্থবুদ্ধির প্ররোচনাতেই মাহাপুরুষের পক্ষ গ্রহণ করেছেন। মহাপুরুষের বাণীকে অবলম্বন ক'রে তাঁরা নিজেদের স্বার্থ এবং আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টাই করেছেন। এর অবশ্যম্ভাবী ফল এই হয়েছে, যে মহাপুরুষের প্রচারিত বাণীর নামে,মহাপুরুষের আদর্শের পরিপন্থী সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জীবনাদর্শ, সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিকল্পনা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। মহাপুরুষের সাধনা বস্তুতঃ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। শয়তানের অট্টহাস্যে দিগন্ত মুখরিত হয়েছে। দৈবক্রমে যদি একই মহামানবের মধ্যে অজেয় রাজশক্তির এবং সুগভীর প্রজ্ঞার একত্র সমবেশ হয়, তা হলে তাহাতে যে বিশ্বের অশেষ কল্যাণ সাধিত হতে পারে, সে কথা স্বতঃসিদ্ধ বলেই আমাদের মনে হয়।

বিশ

শেখ মোবারক তথাকথিত ধার্ম্মিক এবং ধর্ম্মযাজকদের, তথাকথিত আলেম এবং সুফি-দরবেশদের বিষয় যথেষ্ট তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তিনি হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছিলেন যে, এ-সব লোক প্রজ্ঞার পিপাসী নয়, এরা ক্ষমতার পিপাসী, প্রভাব-প্রতিপত্তির পিপাসী; এরা জন-সাধারণের রক্ষক নয়, এরা হ'ল তাদের ভক্ষক; এরা সত্যের দীনসেবক নয়, এরা সত্যের হিংস্র শত্রু; এরা ধর্ম্মের প্রাকার নয়, এরা হ'ল ধর্ম্মের সমাধি। ধর্ম্মের একনিষ্ঠ সাধক, সত্যের একনিষ্ঠ সেবক, খোদার একনিষ্ঠ ভক্ত শেখ মোবারক বিশ্বের মঙ্গলের জন্য, মানবের মঙ্গলের জন্য, ভারতের মঙ্গলের

জ্ঞ, প্রজ্ঞার অধিকারী, শক্তিধর এক রাজর্ষির স্বপ্ন দেখেছিলেন—যিনি বিশ্বে আবির্ভূত হয়ে ধর্ম্মের গ্লানি নাশ করবেন; মিথ্যার বাহিনীকে দলিত মথিত করবেন, ন্যায় এবং সত্যের প্রতিষ্ঠা করবেন, মানুষের মনে যুগোপযোগী প্রেরণার সঞ্চার করবেন, জীবনের অভিনব সম্ভাবনার বিষয়ে তাকে অবহিত ক'রবেন। ভারতের হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোককে তিনি সত্য, শ্রেয়, সুন্দরের প্রশস্ত রাজপথে তুলে দেবেন। তাঁর কল্যাণপ্রসূ সাধনার ফলে প্রাচীন এই ভারতভূমিতে সত্যের অভিনব জয়যাত্রা সুরু হবে।

একুশ

আকবরের মধ্যে শেখ মোবারক যে দেশ এবং জাতির দৈবনির্দ্দিষ্ট পথপ্রদর্শকের স্বরূপ দেখতে পেয়েছিলেন, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই। আকবরের চেহারা সাধারণ মানুষের মত ছিল না। দেবতার বিভূতি তাঁর বদনমণ্ডল থেকে অনুক্ষণ বিচ্ছুরিত হত। তার সংস্পর্শে যে আসতো সেই মুগ্ধ হত। স্বতঃই সে বলে উঠতো এতো মানুষ নয়, এ যে স্বর্গের দেবতা। "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" তাই আজ ভারতবর্ষের প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে।

আকবরের মধ্যবয়সের এক আলেখ্য Lawrence Binyon তাঁর সুনিপুণ লেখনী দিয়া এঁকেছেন। তিনি লিখেছেন, "আকবরের দেহ মাংশপেশী-বহুল, সুগঠিত, নাতিউচ্চ নাতিখর্ব্ব। প্রশস্ত বক্ষ; নাতিকৃশ, নাতিস্থূল শরীর। সুপক্ক গোধূমের মত উজ্জ্বল বর্ণ—অটুট স্বাস্থ্যের পরিচায়ক। উজ্জ্বল চক্ষুযুগলের উপর সুদীর্ঘ পাপড়ি। চক্ষের জ্যোতি একান্ত তীক্ষ্ণ—যেন সমুদ্রের নীল তরঙ্গের উপর উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ খেলা করছে। গুম্ফশোভিত শ্মশ্রুবিহীন মুখমণ্ডল। কণ্ঠস্বর গম্ভীর এবং জড়তাবর্জ্জিত। কৃত্রিমতাহীন প্রসন্ন হাসি। একান্ত দ্রুতগতি, অত্যধিক অশ্বারোহণের ফলে পদদ্বয় ঈষদ্বক্র। মস্তকের ভার দক্ষিণ স্কন্ধের উপর একটু বেশী।...যে কোন জনসঙ্ঘের আকবরকে মানুষের রাজারূপে চিনতে বেগ পেতে হয় না। বৈদ্যুতিক তেজ তাঁর সমস্ত বদনমণ্ডল থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আকবরের ক্রোধ সত্যই এক প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার। চরিত্রের এই দুর্ব্বলতার বিষয় তিনি একান্তভাবে সজাগ, আর তাই, তিনি দৃঢ় আদেশ জারী করেছেন, কোন মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দ্বিতীয়বার পুনঃপ্রচারিত না হলে সেটীকে কার্য্যে পরিণত করা হবে না। ক্রোধ ভয়ঙ্কর হলেও সহজেই তিনি শান্তমূর্ত্তি ধারণ করেন। আকবরের কৌতূহলের সীমা-পরিসীমা নাই। সর্ব্বব্যাপারেই তিনি নূতনত্ব ভালবাসেন। দেহের মত মনও তাঁর অবিশ্রান্তভাবে কাজ করে যায়।"

[ক্রমশঃ

অর্বাচীন বা আধুনিক স্বরসপ্তক

শ্রীবিমল রায়

বৈদিক যুগের আর্চ্চিক, গাথিক, সামিক, অধ্যায় বৈজ্ঞানিকের মনোভাব লইয়া আলোচনা করিলে আমরা প্রাগ্-বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানকালের স্বরসমূহের উৎপত্তির ইতিহাস রচনা করিতে পারি। একস্বর আর্চ্চিক গবেষণা ও তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণের ফলে ধীরে ধীরে কি ভাবে দ্বিস্বর ইত্যাদি ভেদপ্রাপ্ত হইয়া সপ্তস্বরে পরিণত হইল, তাহা চিন্তা করিলে প্রাচীন সঙ্গীতস্রষ্টা ঋষিদিগকে শ্রদ্ধা না করিয়া উপায় নাই। অতি প্রাচীনকালে যাহাকে আমরা ষড়জ বলি, তাহা ছিল আদি একস্বর। ইহার কোনও স্থায়ী সংজ্ঞা ছিল না, ইহা কণ্ঠের গাম্ভীর্য্য বা কোমলতার অনুপাতে ভিন্ন প্রকারের হইত। এই একস্বর মানবের উচ্চস্বর, পশুর আহ্বান বা পক্ষীর গীতির অনুকরণে সৃষ্ট হয়। বৈদিক যুগের বহু পূর্ব্বে বৃক্ষ ও প্রস্তর ব্যতীত কিছু ব্যবহারিক দ্রব্য ছিল না, অতএব কণ্ঠসঙ্গীতের পূর্ব্বে কোনও যন্ত্রসঙ্গীত উদ্ভাবন সম্ভব ছিল না। একমাত্র বংশী একস্বররূপে প্রায় সমসাময়িক হইয়া হয় তো বিরাজ করিতেছিল, কিন্তু বংশীর স্বরনির্ম্মাণে যে পরিমাণ জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহাতে ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, একস্বরা বংশীর প্রচলনও কণ্ঠের বহু পরের ব্যাপার। মানুষ তার তৈয়ারী করিতে শিখিয়াছে তাহার বহু শত বৎসর পরে, (তন্তুর ব্যবহার-জ্ঞানও বহু পরের বলিয়া মনে হয়) এবং সেই সময় হইতে কণ্ঠের অনুকরণে একস্বর তারযন্ত্র দ্বিস্বর তারযন্ত্র নির্ম্মাণ করে। কিন্তু দ্বিস্বরের এই দ্বিতীয় স্বরটি কি? প্রত্যেকেই বলিবেন, পঞ্চম। সত্য, কিন্তু তুম্বুরার নিম্ন ষড়জটি শুনুন, সাধারণ ভাবে শুনিবেন, সঙ্গে গান্ধার বাজিতেছে, পঞ্চম প্রায় না বাজার মত। আমার মনে হয় এই দ্বিস্বর ষড়জ ও গান্ধার রূপে বাজিত। ত্রিস্বর উৎপাদনে পঞ্চম আসিয়া যোগ দিল। কেন মনে হয় তাহা অন্য প্রবন্ধে বলিব। পুরাবেত্তারা বলেন যে, এই ভাবে আবার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে করিতে পরবর্ত্তীযুগের মনীষীবৃন্দ স্বরসপ্তক লাভ করিলেন। এই ভাবে সৃষ্ট সরসপ্তক কিরূপ হয়, তাহা আমি অন্য প্রবন্ধে বলিব। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে পরবর্ত্তীকালে এই স্বরসপ্তক দ্বিমূর্ত্তি ধারণ করে, কি ভাবে, তাহা অবশ্য বলা সম্ভব নহে। যদি সত্যই তার যন্ত্রের (তৃতীয়) ও (পঞ্চম) স্বর সম্বন্ধে (harmonia) স্বরসপ্তক সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে কিরূপে কর্ণাটিক স্বরসপ্তক আধুনিক স্বর হিসাবে সঋরমপদধ ও হিন্দুস্থানী স্বরসপ্তক সরজ্ঞমপধণ গঠিল। পুরাতন যত গ্রন্থ আলোচনা করিবেন, এই দুই প্রকার স্বরসপ্তকই পাইবেন। প্রশ্ন হইতেছে, তাহা হইলে আধুনিক সংগনপধন কবে ও কোথা হইতে আসিল? অষ্টাদশখৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আমরা এই স্বরাবলী কোথাও পাই না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নবীন স্বরাবলী প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতিস্থান পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। প্রাচীনকালে শ্রুতিস্থান ছিল স্বরের পূর্ব্বে, অর্থাৎ ষড়জের শ্রুতি ছিল নিষাদ ও ষড়জের মধ্যে, এক্ষণে হইল উত্তরে অর্থাৎ ষড়জ ও ঋষভের মধ্যভাগে।

এইরূপ পরিবর্ত্তন হঠাৎ হইতে পারে না, ইহার নিশ্চয়ই কোনও কারণ ছিল। ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায়, যে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে ইয়ুরোপীয়গণ এদেশে তাহাদের বাদ্যযন্ত্রের প্রচার ভালরূপেই আরম্ভ করিয়াছে; হার্মোনিয়াম তখন ধনীর প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছে, বাদ্শাহ-প্রসাদে তখন ইহার প্রতিপত্তি অসীম। অতএব ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে, যে, ইয়ুরোপীয় যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীতের মূলসূত্র তখন আলোচিত হইবার অবকাশ পাইত, যাহার ফলে কিছুদিন পরে তাহাদিগের স্বরাবলী ও শ্রুতিস্থানরীতি আমাদিগের পুরাতন রীতির স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অবশ্য এই অধিকারকে বিজাতীয় ভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্যই শ্রুতিসংখ্যা, স্বরসংখ্যা ইত্যাদির কোনও পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। অনেকে বলিবেন পুরাকালে গুণীর ভাষা ও জ্ঞানীর ভাষা পৃথক ছিল। অর্থাৎ গুণী গাহিতেন সরগমপধন কিন্তু জ্ঞানী লিখিতেন সরজ্ঞমধণ হিসাবে। কর্ণাটিক সঙ্গীত কিন্তু তাহাতে সাক্ষ্য দেয় না, যে জ্ঞানী এবং গুণী উভয়ের পক্ষে একই প্রকার। দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থ প্রচলিত রীতি অনুসারেই রচিত হয়; গুণীগণ একরূপ গাহিলেন, লেখকগণ নূতন স্বর-প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া তাহাতে কবিত্ব দিয়া রাগ পরিচয় লিখিলেন, ইহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। তৃতীয়তঃ, যদি ধরিয়াও লই যে, স্বর আমরাই পরিবর্ত্তন করিয়াছিলাম, তথাপি বুঝিতে পারি না শ্রুতিসংস্থান পর্য্যন্ত একই সময়ে কি করিয়া পরিবর্ত্তন ঘটিল। কর্ণাটিক ও হিন্দুস্থানী স্বরসপ্তক ভিন্নপ্রকারের হইলেও শ্রুতিস্থান একই প্রকার আছে। অতএব স্বীকার করিতে হয় যে, বাহিরের কোনও প্রভাব নিশ্চয়ই ছিল। আজি বলিতে হয়, যে, যে ভারত একদিন সমস্ত জগৎকে সঙ্গীতের মূলসূত্র শিখাইয়াছিল, ইয়ুরোপকে শ্রুতি বিচারের জ্ঞান দিয়াছিল, সেই ভারত একদিন ইয়ুরোপের নিকট হইতে পুনরায় সপ্তস্বর ও শ্রুতির নূতন বিচার শিখিল। ইহাতে লজ্জার কিছু নাই। চিরদিন এই আদান প্রদানের ফলে মানুষ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ভারতের সঙ্গীত আজি আর সনাতন সঙ্গীত নাই; আরব্য, পারস্য ইত্যাদির দান গ্রহণ করিয়া সে নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, যেমন তাহাদের সঙ্গীতও আমাদের দানে সমৃদ্ধ হইয়াছে।

ললিত-কলা

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

তিন

মহর্ষি বাৎস্যায়নের সুস্পষ্ট অভিমত—রমণীর কাম-শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকার আছে—রমণীমাত্রেরই অধিকার না থাকিলেও কোন কোন বিশিষ্ট শ্রেণীর নারীর এ অধিকার আছে। তাঁহার এ সিদ্ধান্ত তিনি নিম্ন-লিখিত সূত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন—

শাস্ত্র-দ্বারা প্রহত-বুদ্ধি গণিকা, রাজপুত্রী ও মহামাত্র-দুহিতা যে বহু আছেন—ইহা অতি সুনিশ্চিত তথ্য ১।

যশোধরেন্দ্রপাদ উপক্রমে বলিয়াছেন—কোন কোন নারীরও যে (কাম)-শাস্ত্র-গ্রহণে অধিকার আছে ইহা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই মহর্ষি সূত্রটির অবতারণা করিয়াছেন।

যশোধরের মতে—'প্রহত'-শব্দের অর্থ খিন্ন অর্থাৎ আয়াস-প্রাপ্ত। 'শাস্ত্র-প্রহত-বুদ্ধি' অর্থে—যাঁহারা শাস্ত্রপাঠে নিজ বুদ্ধিকে বহু আয়াস প্রদান করিয়াছেন, অর্থাৎ—বহু আয়াস-সহকারে যাঁহারা শাস্ত্র-পাঠ করিয়াছেন। টীকাকারের মতে—'মহামাত্র'-শব্দের অর্থ সামন্ত বা মহাসামন্ত, অথবা মাহুত (হস্তিশিক্ষা-গ্রন্থে ইহাদিগের লক্ষণ দ্রষ্টব্য) ২।

পূজ্যপাদ তর্করত্ন মহাশয় অতি সুন্দরভাবে প্রসঙ্গটির অবতারণা-পূর্ব্বক বুঝাইয়াছেন—"যদি শাস্ত্রজ্ঞা রমণী না থাকে, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের অধ্যয়ন চলিতে পারে না। কারণ, এই শাস্ত্র কুলাঙ্গনা পুরুষের নিকট অধ্যয়ন করিতে পারে না। পক্ষান্তরে, এখন যদি সকল রমণীই শাস্ত্রাধ্যয়নহীনা হয়, তাহা হইলে এ শাস্ত্র স্ত্রীজাতির নিকট লুপ্ত হইয়াছেই, তাহাতেও যদি কার্য্য অচল না হইয়া থাকে ত ভবিষ্যতেও হইবে না; অতএব স্ত্রীজাতির এই শাস্ত্র পাঠ অনাবশ্যক।

১ "সন্ত্যপি খলু শাস্ত্রপ্রহতবুদ্ধয়ো গণিকা রাজপুত্র্যো মহামাত্রদুহিতরশ্চ" —(কাঃ সূঃ ১।৩।১২)

২ "অথবাস্ত্যেব শাস্ত্রগ্রহণং কাসাঞ্চিদিত্যাহ—সন্ত্যপীতি। শাস্ত্রেণ প্রহতা খিন্না বুদ্ধির্যাসামিতি। মহামাত্রেতি। মহতী মাত্রা যেষামিতি সামন্তা মহাসামন্তা বা। হস্তিশিক্ষায়াং বা তল্লক্ষণমনুসর্ত্তব্যম্"—টীকা।

"প্রহত শব্দের অর্থ 'মার্জ্জিত'। মহামাত্র শব্দের অর্থ—মন্ত্রী, সেনাপতি এবং ধনাঢ্য। মহামাত্র শব্দের অর্থ—প্রধান হস্তিপকও হয়। তাহাদিগের দুহিতৃগণ হস্তি-নিয়ন্ত্রণ-বিদ্যাতে শিক্ষিত। এই অর্থের আভাস টীকায় আছে; কিন্তু ইহা এ স্থলের উপযোগী নহে।"—তর্করত্ন মহাশয়ের ব্যাখ্যা, বঙ্গবাসী সং কামসূত্র, পৃঃ ৬০।

কবিরাজ রাজশেখরও তাঁহার কাব্যমীমাংসান্তর্গত কবিরহস্যের দশমাধ্যায়ে কবিচর্য্যা-রাজচর্য্যা-প্রকরণে অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন—

পুরুষের ন্যায় নারীও কবি হইতে পারেন; কারণ, সংস্কার আত্ম সমবেত—উহা স্ত্রী-পুরুষ-বিভাগের অপেক্ষা রাখে না। শোনা যায় ও দেখা যায় যে—রাজপুত্রীগণ, মহামাত্র-দুহিতৃগণ, গণিকাগণ, কৌতুকিভার্য্যাগণ শাস্ত্র-পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি ও কবি হইয়া থাকেন—"পুরুষবৎ যোষিতোঽপি কবীভবেয়ুঃ। সংস্কারো হ্যাত্মনি সমবৈতি, ন স্ত্রৈণং পৌরুষং বা বিভাগমপেক্ষতে। শ্রূয়ন্তে দৃশ্যন্তে চ রাজপুত্র্যো মহামাত্রদুহিতরো গণিকাঃ কৌতুকিভার্য্যাশ্চ শাস্ত্রপ্রহতবুদ্ধয়ঃ কবয়শ্চ"—কাব্যমীমাংসা, বরোদা সং, পৃঃ ৫৩।

ইহার উত্তর—কামশাস্ত্র অধ্যয়নে মার্জ্জিতবুদ্ধি বহু গণিকা, বহু রাজকন্যা এবং বহু মহামাত্র-দুহিতা নিশ্চয়ই আছেন" ৩।

অতএব, যখন ইহা সিদ্ধান্তে স্থির হইল যে—স্ত্রীজাতির পক্ষে প্রয়োগাধিকার ও শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকার এ উভয় প্রকার অধিকারই আছে, তখন বিশ্বাস-ভাজন ব্যক্তির নিকট হইতে নির্জ্জনে কামশাস্ত্র-প্রয়োগ ও কামশাস্ত্র অথবা উহার (যথাযোগ্য) একদেশ নারী শিক্ষা করিবে ৪।

যশোধর বলিয়াছেন—নারীর প্রয়োগাধিকার ও শাস্ত্রাধ্যয়নাধিকার উভয়ই সিদ্ধ হওয়ায় উভয়ই শিক্ষণীয়। বিশ্বাসযোগ্য জনের নিকট গোপনে অর্থাৎ নির্জ্জন প্রদেশে শিক্ষা করিবে—ইহা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তাহা হইলে আর লজ্জা পাইতে হইবে না। যে নারী দুর্মেধা—শাস্ত্র-গ্রহণে অসমর্থা, তাদৃশী রমণী কেবল প্রয়োগ শিক্ষা করিবে। যিনি মেধাবিনী—শাস্ত্রের পঙ্‌ক্তি-গ্রহণে সমর্থা, তিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন। আর যে রমণী মধ্য-মেধাবিনী, তিনি কামশাস্ত্রের একদেশ অর্থাৎ সম্প্রয়োগাধিকরণটি মাত্র শিক্ষা করিবেন ৫।

তর্করত্ন মহাশয়ও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—"গণিকাগণ বিশ্বাসপাত্র পুরুষের নিকটেও শিক্ষা করিতে পারে। কুলাঙ্গনাগণ বিশ্বাসপাত্র অভিজ্ঞ স্ত্রীলোকের নিকটই শিক্ষা করিবে। এই স্ত্রী-গুরুর কথা পঞ্চদশ সূত্রে বিবৃত হইবে। যে রমণীর শাস্ত্রগ্রহণে সামর্থ্য নাই, তাহার পক্ষে প্রয়োগ মাত্র শিক্ষণীয়; যে রমণী তাহাতে সমর্থা বুদ্ধিমতী, তাহার পক্ষে সমগ্র শাস্ত্র শিক্ষাও কর্ত্তব্য; বুদ্ধির প্রাখর্য্য তেমন না থাকিলে শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় অংশ শিক্ষা করিবে" ৬।

অতঃপর মহর্ষি উপদেশ দিয়াছেন—অভ্যাস ও প্রয়োগের যোগ্য চাতুঃষষ্টিক যোগ কন্যা নির্জ্জনে একাকিনী অভ্যাস করিবে ৭।

চাতুঃষষ্টিক—চতুঃষষ্টিপ্রকার, চতুঃষষ্টি অঙ্গবিদ্যা বা কলা। 'কন্যা'-শব্দের প্রয়োগে বুঝা যায় যে কন্যকাবস্থায় অর্থাৎ বাল্যে বা কৈশোরে উহাদিগের অভ্যাসানন্তর যৌবন প্রাপ্ত হইয়া উহাদিগের প্রয়োগ করিবে। 'নির্জ্জনে' বলার উদ্দেশ্য—উহাতে লজ্জা জন্মিতে পারিবে না। 'একাকিনী' অর্থে

৩ কামসূত্র, বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৬০।

৪ "তস্মাদ্বৈশ্বাসিকাজ্জনাদ্রহসি প্রয়োগাঞ্ছাস্ত্রমেকদেশং বা স্ত্রী গৃহ্ণীয়াৎ"—(কাঃ সূঃ ১।৩।১৩)

৫ "যস্মাৎ প্রয়োগগ্রহণং শাস্ত্রগ্রহণং চোভয়ং, তস্মাৎ। বৈশ্বাসিকাদ্বিশ্বাসার্হাৎ, লজ্জানিবৃত্ত্যর্থম্। প্রয়োগান্—যা শাস্ত্রগ্রহণাসমর্থা দুর্মেধা। শাস্ত্রম্—তদ্গ্রহণসমর্থা মেধাবিনী। শাস্ত্রৈকদেশং বা সম্প্রয়োগাঙ্গং—যা মধ্যমেধাবিনী, সা গৃহ্ণীয়াৎ"—টীকা।

৬ কামসূত্র, বঙ্গবাসী সং, পৃ পৃঃ ৬০-৬১

৭ "অভ্যাস (প্র) যোজ্যাংশ্চ চাতুঃষষ্টিকান্ যোগান্ কন্যা রহস্যেকাকিন্যভ্যসেৎ"—(কাঃ সূঃ ১।৩।১৪)

আচার্য্যের সাহায্যের অপেক্ষা না রাখিয়া নিজে নিজে।—ইহাই যশোধরের মন্তব্য ৮।

তর্করত্ন মহাশয় একটু অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"যে চতুঃষষ্টি অঙ্গবিদ্যা ১৬ সূত্রে কথিত হইবে, তন্মধ্যে যে সকল বিদ্যা অভ্যাসসাধ্য ও কর্ম্মাশ্রিত, যথা—নৃত্যাদি, তাহা কন্যা একাকিনী নির্জ্জনে অভ্যাস করিবেন" ৯।

কিন্তু মহর্ষির বাক্যে এরূপ বুঝায় না যে—যে সকল বিদ্যা অভ্যাস-সাধ্য ও কর্ম্মাশ্রিত কেবল সেই সকল বিদ্যারই অভ্যাস কন্যা নির্জ্জনে একাকিনী করিবে। চতুঃষষ্টি অঙ্গবিদ্যার প্রত্যেকটিই এইরূপে নির্জ্জনে অভ্যাস-যোগ্য—ইহাই বাৎস্যায়ন ও যশোধরের মত ১০।

বিশ্বাস-ভাজন পাত্র কে? এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—

কুলকন্যাগণের আচার্য্য হইবে—পূর্ব্ব হইতে পুরুষ-সঙ্গপ্রাপ্তা ও সহ-সংবর্দ্ধিতা ধাত্রী-কন্যা, পুরুষ-সঙ্গাভিজ্ঞা নির্ব্বাধ-সম্ভাষণ-যোগ্যা বিশ্বস্তা সখী সমবয়স্কা মাতৃষসা, মাতৃষস্-স্থানীয়া বৃদ্ধা দাসী, পূর্ব্ব হইতে পরিচিতা প্রীতিভাজন ভিক্ষুকী ও বিশ্বাস-ভাজন হইলে জ্যেষ্ঠা ভগিনী ১১।

এ ক্ষেত্রে ছয়জন স্ত্রী-গুরুর উল্লেখ করা হইয়াছে। যে পূর্ব্বে পুরুষের সহিত মিলিত হইয়াছে ও যাহার সহিত কন্যাটি একত্র লালিতা পালিতা হইয়াছে, সেই বিশ্বস্তা ধাত্রী-কন্যা হইবে কুলকন্যার প্রথম শিক্ষয়িত্রী। ঐরূপ—যে পূর্ব্বে পুরুষ-সঙ্গের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে—কন্যার সহিত একত্র বর্দ্ধিতা হইয়াছে—যাহার সহিত কন্যা সকল প্রকার বাক্যালাপ অসঙ্কোচে অবাধে করিতে পারে, এমন সখী দ্বিতীয়া শিক্ষয়িত্রী। মাতার ভগিনীর স্থানীয়া বিশ্বাস-যোগ্যা বৃদ্ধা দাসী চতুর্থী শিক্ষয়িত্রী ১২। পূর্ব্বে যাহার সহিত সংসর্গ (অর্থাৎ পরিচয়) হইয়াছে, সেইরূপ ভিক্ষুকী পঞ্চমী শিক্ষয়িত্রী। আর বিশ্বাস-ভাজন যদি হয় ১৩, তাহা হইলে জ্যেষ্ঠা ভগিনীও ষষ্ঠী শিক্ষয়িত্রীরূপে পরিগণিতা হইতে পারেন।

যশোধর প্রত্যেকটি পদের যেরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ এস্থলে প্রদত্ত হইল।

পুরুষের স্বাতন্ত্র্য আছে—তাহার পক্ষে উপযুক্ত একাধিক শিক্ষক লাভ করাও সুলভ। এ কারণে বিশেষ করিয়া কেবল কুলাঙ্গনাগণের আচার্য্য যোগ্যা স্ত্রী-গুরুগণের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রবৃত্ত-পুরুষ-সম্প্রয়োগা—পূর্ব্বে পুরুষের সহিত মিলনে প্রবৃত্ত হইয়াছে—পূর্ব্বে রসের অনুভব করায় অভিজ্ঞা। ধাত্রেয়িকা—ধাত্রীর কন্যা। সে একসঙ্গে বর্দ্ধিত হওয়ায় বিশ্বাস্যা।—এই এক আচার্য্য। তথাভূতা—প্রবৃত্ত-পুরুষ-সম্প্রয়োগা। নিরত্যয়-সম্ভাষণা—নির্দ্দোষ সম্ভাষণের যোগ্যা বলিয়া বিশ্বাস্যা। নির্দ্দোষ-সম্ভাষণ-যোগ্যা বলিতে বুঝাইতেছে—যাহার সহিত সম্ভাষণ করিলে কোন দোষ কেহ ধরিতে পারে না—যাহার সহিত অবাধে সকল প্রকার আলাপ করা যায়—অথচ যাহার সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিলেও উহাতে কেহ কোন প্রকার দোষারোপ করিতে পারে না—এমনই বিশ্বাসযোগ্যা সখী। —এই দ্বিতীয় আচার্য্য। সবয়াঃ—তুল্যবয়স্কা—প্রীতি ও বিশ্বাসের পাত্র। 'চ'-পদের দ্বারা বুঝাইতেছে এ ক্ষেত্রেও 'তথাভূতা' (অর্থাৎ—'প্রবৃত্ত-পুরুষ-সম্প্রয়োগা') বিশেষণটি প্রযোজ্য। মাতৃষসা—মায়ের বোন—মাসী। —এই তৃতীয় আচার্য্য। বিস্রব্ধা—বিশ্বস্তা। তৎস্থানীয়া—মাতৃষস্তুল্যা—মাতা যাহাকে নিজ ভগিনীরূপে গ্রহণ (অর্থাৎ স্বীকার) করিয়াছেন; অথবা—যাহাকে মাতার ভগিনী-স্থানীয়া বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে, এরূপ বিশ্বস্তা বৃদ্ধা দাসী; সে পারিবারিক বহু বৃত্তান্তই জানে। —এ চতুর্থ আচার্য্য। পূর্ব্বসংসৃষ্টা—যাহার সহিত পূর্ব্বে প্রীতি উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব বিশ্বাস্যা। —এরূপ ভিক্ষুকী—ভিক্ষাই তাহার স্বভাব বা জীবিকা—ভিক্ষাচ্ছলে বহু-দেশ-ভ্রমণে পটু—নানা দেশের রীতি-নীতিতে অভিজ্ঞা। —এ পঞ্চম আচার্য্য। স্বসা—জ্যেষ্ঠা ভগিনী। বিশ্বাস-সম্প্রয়োগাৎ (অথবা—বিশ্বাসপ্রয়োগাৎ)—(১) যখন জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সমক্ষেও বিশ্বাসের আতিশয্যবশে অন্য পুরুষের সহিত মিলিত হইতে পারে; অথবা (২) যখন কনিষ্ঠার সমক্ষেও জ্যেষ্ঠা অসঙ্কোচে পুরুষ-সহ মিলিত হইতে পারে—এই দুই প্রকার অর্থই হয়। তাৎপর্য্য এই যে—জ্যেষ্ঠা ভগিনী যদি এরূপ বিশ্বাস-ভাজন হয় যে, তাহার নিকটে কনিষ্ঠার কিছু গোপনীয় থাকিবে না, আর কনিষ্ঠার নিকটেও

---

৮ "চাতুঃষষ্টিকান্ চতুঃষষ্টিভবান্। কর্ম্মেতি। তদানীমভ্যস্তা যৌবনে প্রযুঙ্ক্তে। রহসীতি লজ্জানিবৃত্ত্যর্থম্। একাকিনী আচার্য্যনিরপেক্ষা।" —টীকা।

৯ কামসূত্র, বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৬১

১০ অবশ্য তর্করত্ন মহাশয়ের উক্তি একান্ত অযৌক্তিক নহে। অভ্যাস-সাধ্য ও ক্রিয়াশ্রিত কলাগুলি যতদিন না পূর্ণমাত্রায় আয়ত্ত হয়, ততদিন লোক-লোচনের অগোচরে সেগুলির অভ্যাস বাঞ্ছনীয়। তবে কলাগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই অভ্যাস-সাধ্য ও ক্রিয়াশ্রিত—এ কারণে উহাদিগের কোন্‌টিকে রাখিয়া কোন্‌টিকে বাদ দেওয়া যায়—তাহা বুঝা যায় না।

১১ "আচার্য্যাস্তু কন্যানাং প্রবৃত্তপুরুষসম্প্রয়োগা সহসম্প্রবৃদ্ধা ধাত্রেয়িকা, তথাভূতা বা নিরত্যয়সম্ভাষণা সখী, সবয়াশ্চ মাতৃষসা, বিস্র(শ্র)ব্ধা তৎস্থানীয়া বৃদ্ধা দাসী, পূর্ব্বসংসৃষ্টা বা ভিক্ষুকী, স্বসা চ বিশ্বাসপ্রয়োগাৎ" (প্রবৃত্ত-পুরুষসম্প্রয়োগসহসম্প্রবৃদ্ধা"—তর্করত্ন মহাশয়-কর্ত্তৃক ধৃত পাঠ। "বিশ্বাস-সম্প্রয়োগাৎ"—টীকা ও তর্করত্ন ধৃত পাঠ)। (কাঃ সূঃ ১।৩।১৫)

১২ "মাতার ভগিনীরূপে পরিচিতা বিশ্বস্ত বৃদ্ধা দাসী"—তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ, পৃঃ ৬১।

১৩ "সমক্ষে পুরুষসঙ্গেও অসঙ্কুচিতা বিশ্বাস্য জ্যেষ্ঠা ভগিনী"—তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ, পৃঃ ৬১। অনুবাদটি অস্পষ্ট—ইহার গূঢ়ার্থ যশোধরের টীকায় সুস্পষ্ট।

জ্যেষ্ঠায় কিছু গোপনীয় থাকিবে না,—তাহা হইলে সেরূপ জ্যেষ্ঠা ভগিনী কনিষ্ঠা ভগিনীকে কাম-শাস্ত্র-শিক্ষা দিবার যোগ্য আচার্য্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। নতুবা প্রায়ই দেখা যায় যে—স্বভাব-সিদ্ধ ঈর্ষ্যাবশে ভগিনী ভগিনীকে শিক্ষা দিতে চাহে না। —এরূপ বিশ্বাসযোগ্যা জ্যেষ্ঠা ভগিনী ষষ্ঠ আচার্য্য। এই ছয়জন স্ত্রী-গুরুর নিকট হইতে কুল-কন্যাগণের কাম-শাস্ত্র-শিক্ষা করা কর্ত্তব্য ১৪।

তর্করত্ন মহাশয় এ প্রসঙ্গে বিশেষ কিছু বলেন নাই। তাঁহার মতে—"ধাত্রীকন্যা প্রভৃতির নিকটে কন্যাগণের যে শিক্ষার উপদেশ প্রদত্ত হইল, ক্রম-নির্দ্দেশানুসারে তাহা গ্রহণীয়। প্রথম শিক্ষাস্থান—ধাত্রীকন্যা, দ্বিতীয় সখী, তৃতীয় সমবয়স্কা মাতৃস্বসা, চতুর্থ—বৃদ্ধদাসী, পঞ্চম—ভিক্ষুকী, ষষ্ঠ—জ্যেষ্ঠা ভগিনী। গণিকা ও পুরুষের শিক্ষক সুলভ বলিয়া তৎসম্বন্ধে বিশেষ নির্দ্দেশ নাই। তবে বিশ্বাসপাত্র ব্যক্তির নিকটেই শিক্ষা করিবে, ইহা রমণীমাত্রের পক্ষেই বিহিত" ১৫।

ইহার পরই ষোড়শসূত্রে চতুঃষষ্টি কলার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ধারাবাহিক আলোচনা পরে করা যাইবে। তৎপূর্ব্বে এই প্রকরণের ফলশ্রুতি-রূপে মহর্ষি বাৎস্যায়ন যে কথাগুলির অবতারণা করিয়াছেন, সেগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন।

এই চতুঃষষ্টি ললিত-কলায় সুশিক্ষিতা ও সুসংস্কৃতা শীল-রূপ-গুণ-বিশিষ্টা বেশ্যা 'গণিকা'-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় ও জন-সমাজে স্থান লাভ করে১৬।

যশোধর বলেন—এই সকল কলা-শিক্ষার ফলে বেশ্যার উৎকর্ষ (অর্থাৎ গুণের আতিশয্য-হেতু সংস্কার) ঘটিলে বেশ্যা 'গণিকা' নামে অভিহিত হয়। বেশ্যা—এই শব্দটি প্রায়ই এই শ্রেণীর নারীকে বুঝাইতে প্রযুক্ত হয় বলিয়া এস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। অবশ্য কেবল কলা-জ্ঞান জন্মিলেই চলিবে না। তাহার শীল-রূপ-গুণ থাকা প্রয়োজন। শীল সুস্বভাব। রূপ—আকৃতির সংস্থান (অর্থাৎ—সুগঠন) ও সুন্দর গাত্রবর্ণ। গুণ—বৈশিকাধ্যায়ে সবিস্তরে বিবৃত হইয়াছে১৭। এরূপ চতুঃষষ্টি-কলাভিজ্ঞা সুশীলা সুগঠনা সুবর্ণা ও বহুগুণবতী বেশ্যা 'গণিকা'-নাম প্রাপ্ত হয়।—সাধারণভাবে 'বেশ্যা'-শব্দ-বাচ্যা হইলেও বিশিষ্ট 'গণিকা'-নামে অভিহিত হয়; যেহেতু 'গণিকা'-নাম লাভ করিতে হইলে উক্ত লক্ষণ-সমূহ থাকায় একান্ত প্রয়োজন১৮। এতদ্ব্যতীত এরূপ গণিকা-শব্দ-বাচ্যা বেশ্যা জনসভায় আসন-ভূমি লাভ করে—অর্থাৎ এরূপ গণিকা আর বেশ্যা বলিয়া জনসমাজে অবজ্ঞাত হয় না—পক্ষান্তরে, গুণগ্রাহি-সমাজে বিশিষ্ট আসন ও যথোপযুক্ত সমাদর লাভ করে১৯।

এরূপ গণিকা সর্ব্বদা রাজ-কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া থাকে। গুণবান্ ব্যক্তিগণও তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। এ জাতীয়া গণিকা প্রার্থনীয়া, অভিগম্যা ও লক্ষ্যভূতা হইয়া থাকে২০।

---

১৪ "তুশব্দো বিশেষণার্থঃ। পুরুষাণাং স্বাতন্ত্র্যাৎ সুলভা উপদেষ্টারঃ। তত্র প্রবৃত্তপুরুষসম্প্রয়োগা, পুংসা চানুভূতরসম্বাদভিজ্ঞা। ধাত্রেয়িকা ধাত্র্যা অপত্যম্। সা হি সহসম্প্রবৃদ্ধত্বাদ্বিশ্বাস্যা। ইত্যেক আচার্যঃ। তথাভূতা চেতি। প্রবৃত্তপুরুষসম্প্রয়োগা সখী বা। নিরত্যয়েতি। নির্দ্দোষসম্ভাষণ-হাদ্বিশ্বাস্যা। ইতি দ্বিতীয়া। সবয়াশ্চেতি। তুল্যবয়াঃ প্রীতিবিশ্বাসয়োরাস্পদম্। চশব্দাত্তথাভূতেতি বর্ত্ততে। মাতৃস্বসা মাতুর্ভগিনী। ইতি তৃতীয়া। বিস্রব্ধেতি। বিশ্বস্তা। তৎস্থানীয়া মাতৃস্বসৃতুল্যা মাতৃভগিনীত্বেন গৃহীতা বৃদ্ধদাসী বিদিত-বহুবৃত্তান্তা। ইতি চতুর্থী। পূর্ব্বসংসৃষ্টা পূর্ব্বং যয়া সহ প্রীতিরুৎপন্না, সা বিশ্বাস্যা। ভিক্ষুকী ভিক্ষণশীলা যা কাচিৎ, সা দেশহিতন-কুশলা। ইতি পঞ্চমী। স্বসা চ জ্যেষ্ঠা ভগিনী। বিশ্বাসসম্প্রয়োগাদিতি। যথা তৎসমক্ষং বিশ্বাসাৎ পুরুষান্তরেণ সম্প্রযুক্তা স্যাৎ। অন্যথা স্বসা স্বসারমপি নের্ষ্যয়া শিক্ষয়তি। ইতি ষষ্ঠী।"—কামসূত্র-টীকা (১।৩।১৫)

১৫ অবশ্য সূত্রকার গণিকার কথা স্পষ্ট কিছু বলেন নাই। টীকাকার কেবল পুরুষের কথাই বলিয়াছেন—পুরুষ স্বাধীন, এ কারণে তাহার পক্ষে উপদেষ্টা সুলভ। অবশ্য গণিকার পক্ষেও এই কথাই সমভাবে প্রযোজ্য। গণিকা—স্বাধীনবৃত্তিকা—অতএব তাহারও উপদেষ্টার অভাব হয় না। উপদেষ্টার অভাব এক কুল-কন্যাগণের—সে কারণে এই বিধান—তর্করত্ন মহাশয়ের এ সিদ্ধান্ত খুবই যুক্তিযুক্ত।

১৬ "আভিরভ্যুচ্ছ্রিতা বেশ্যা শীলরূপগুণান্বিতা।
লভতে গণিকাশব্দং স্থানঞ্চ জনসংসদি" ॥ ২০ ॥
(কাঃ সূঃ ১।৩।২০)

১৭ বৈশিকাধিকরণ—কামসূত্রের বেশ্যা-সম্বন্ধীয় চতুর্থ অধিকরণ। উহার ষষ্ঠাধ্যায়ে বলা হইয়াছে—"কুম্ভদাসী পরিচারিকা কুলটা স্বৈরিণী নটী শিল্পকারিকা প্রকাশবিনষ্টা রূপাজীবা গণিকা চেতি বেশ্যাবিশেষাঃ" (কাঃ সূঃ ৪।৬।৫৪)। গুণাদির বর্ণনাও বিস্তৃতভাবে এই অধিকরণে বিবৃত আছে।

১৮ মেধাতিথি মনুভাষ্যে (৪ ২১১) বলিয়াছেন—গণিকা ও পুংশ্চলী ভিন্ন শ্রেণীর নারী। যাহারা জীবিকার্থ বেশ্যা-রূপে বাস করে, তাহারা 'গণিকা'; আর যাহারা ইন্দ্রিয়-চপলা, তাহারা পুংশ্চলী—"গণিকা বেশ্যাবেশেন জীবতি, পুংশ্চলী ত্বিন্দ্রিয়চপলা"।

১৯ "কলাগ্রহণে ফলমাহ—আভিরিতি। কলাভিরভ্যুচ্ছ্রিতা জাতোৎকর্ষা। বেশ্যেতি প্রায়শো গ্রহণমস্যা ইতি দর্শনার্থম্। শীলং স্বভাবঃ। রূপং সংস্থানং বর্ণশ্চ। গুণা নায়িকায়া বৈশিকে বক্ষ্যমাণাঃ। গণিকাশব্দমিতি। বেশ্যাসামান্যশব্দবাচ্যাপি বিশিষ্টং গণিকাভিধানং লভতে ইত্যর্থঃ, এবংলক্ষণত্বাদ্ গণিকায়াঃ। স্থানঞ্চ জনসংসদীতি। জনসভায়ামাসনভূমিং লভতে, ন বেশ্যেত্যবমন্যতে"—টীকা। তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ—"এই চতুঃষষ্টি কলায় সুশিক্ষিতা সুশীলা রূপবতী গুণবতী বেশ্যা গণিকা নামে অভিহিতা হইয়া থাকে। জনসমাজে মর্য্যাদাপ্রাপ্তাও হয়"—(পৃঃ ৭১) অভ্যুচ্ছ্রিতা—cultured, accomplished.

২০ "পূজিতা সা সদা রাজ্ঞা গুণবদ্ভিশ্চ সংস্তুতা।
প্রার্থনীয়াভিগম্যা চ লক্ষ্যভূতা চ জায়তে" ॥ ২১ ॥
(কাঃ সূঃ ১।৩।২১)

তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ—"গণিকা রাজার নিকটে সর্ব্বদা সম্মানিতা হয়। গুণবান্ নায়কগণ তাহার প্রশংসা করেন, তাহার প্রতি তাঁহাদিগের সর্ব্বদা লক্ষ্য থাকে; আর সেই গণিকাই গুণবান্ নায়কগণের প্রার্থনীয়া এবং অভিগম্যা হয়"—(পৃঃ ৭১)। এ প্রসঙ্গে বক্তব্য এই, যে—'লক্ষ্যভূতা' শব্দের অর্থ তর্করত্ন মহাশয় করিলেন—গুণবান্ নায়কগণের লক্ষ্যভূতা।

যশোধর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—রাজা ছত্র-ভৃঙ্গারাদি দান-দ্বারা এরূপ গণিকার সম্মান করিয়া থাকেন। 'অসাধারণ ইহার কলাকৌশল'—ইত্যাদি বাক্য-প্রয়োগ-দ্বারা গুণবান্ ব্যক্তিগণ এরূপ গণিকার প্রশংসা করিয়া থাকেন। এরূপ গণিকা কলাবিদ্যায় উপদেশ-প্রার্থিগণের প্রার্থনীয়া। এরূপ গণিকা বিদগ্ধ (অর্থাৎ—সুরসিক) মিলন-প্রার্থিগণের অভি-গমন-যোগ্যা। এরূপ গণিকা লক্ষ্যভূতা অর্থাৎ নিদর্শনভূতা—গণিকা-কুলের আদর্শ—দেবদত্তাদির ন্যায়২১। এ জাতীয় গণিকা প্রাচীন গ্রীসের Hetaera-দিগের সহিত তুলনীয়া। বর্ত্তমান যুগে পশ্চিমাঞ্চলের উচ্চ শ্রেণীর বাইজীরা প্রাচীন যুগের গণিকাদিগেরই ভগ্নাবশেষ-মাত্র।

কলাবিদ্যার প্রয়োগাভিজ্ঞা রাজপুত্রী ও মহামাত্র-সুতা সহস্রান্তঃপুরিকা-পতি নিজ স্বামীকে স্ববশে রাখিতে পারেন২২।

যশোধর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—'যোগজ্ঞা' অর্থে গীতাদির প্রয়োগে অভিজ্ঞা। 'সহস্রান্তঃপুর' বলিতে বুঝাইতেছে—বহু পত্নীর স্বামী২৩।

আর এরূপ কলাভিজ্ঞা নারী পতি-বিয়োগ ঘটিলে বা দারুণ বিপদ্‌গ্রস্তা হইলে দেশান্তরেও কলা-বিদ্যাগুলির সাহায্যে সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন২৪।

যশোধরের মতে—'পতিবিয়োগে' শব্দের অর্থ পতি প্রবাসী হইলে। দারুণ ব্যসন—বৈধব্যরূপ বিপদ্। পতির প্রবাসে বা মরণে কুলাঙ্গনার নির্ব্বেদ (বৈরাগ্য) উপস্থিত হইলে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যদেশে যাইয়াও কলাবিদ্যার উপদেশ দিয়া তল্লব্ধ অর্থে সুখে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারেন।২৫ যদি পতিবিরহ বা বৈধব্য উপস্থিত হয় ও স্বদেশে জ্ঞাতিগণের শত্রুতায় ২৬ দেশত্যাগ করিয়া বিদেশে আশ্রয় লইতেও হয়, তাহা হইলেও তাঁহার চিন্তার কিছু থাকে না। বিদেশে যাইয়াও কুলকন্যাগণকে কলাশিক্ষা দিয়া সেই শিক্ষার পারিশ্রমিক লাভে সদুপায়ে স্বাধীন ভাবে জীবন কাটাইবার পথ খোলা থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে,—মহর্ষি বাৎস্যায়নের যুগেও পতি-বিরহিণী বা বিধবা অসহায়া কুলাঙ্গনাগণ স্বদেশচ্যুত হইয়াও বিদেশে কলাবিদ্যার শিক্ষা দান-পূর্ব্বক নির্দ্দোষ স্বাধীন জীবন যাপন করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের চরিত্রে কোন দোষ বা কলঙ্ক স্পর্শ করিত না।

আর পুরুষগণের কলাবিদ্যা-শিক্ষার ফল সম্বন্ধে মহর্ষি বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—

কলা-কুশল নর বাচাল ও চাটুকার হওয়ায় অপরিচিত হইলেও অবিলম্বে নারীগণের চিত্ত জয় করিতে পারে।২৭

যশোধর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—নর—কলাবিদ্যা-সমূহে কুশল হইলে—পাছে 'অনাগর' বলিয়া নিন্দা হয়—এই আশঙ্কায় কলা-সম্বন্ধ-হেতু বাচাল অর্থাৎ বহুভাষী হইয়া থাকে। কলা সম্বন্ধ ব্যতীত বহুভাষিত্ব সম্ভবে না। তদ্ব্যতীত চাটুকার অর্থাৎ প্রিয়কারীও হইয়া থাকে। কলা-গ্রহণ-দ্বারা সংস্কার (culture) জন্মে—এই সংস্কার হইতেই নর প্রিয়কারী হইয়া থাকে। আর নারীর সহিত পূর্ব্ব-পরিচয় না থাকিলেও নারীর সহিত মিলনের ফলে কালক্ষেপ ব্যতীত অতি শীঘ্রই নারী-চিত্ত অধিকার করিতে পারে।২৮

কলা-গ্রহণমাত্রেই সৌভাগ্য জন্মিয়া থাকে। (কিন্তু এ সম্বন্ধে একটি কথা স্মরণে রাখিতে হইবে—) দেশ ও কালের অপেক্ষা করিয়া এই সকল কলার প্রয়োগ হইতেও পারে, আবার নাও হইতে পারে।২৯

যশোধর টীকায় বলিয়াছেন—সৌভাগ্য বলিতে অর্থ, অনর্থ-প্রতিকার, কামপ্রাপ্তি ও যশোলাভ বুঝিতে হইবে।

'গুণবান্ নায়কগণের প্রার্থনীয়া'—এই উক্তি-দ্বারাই ত ঐ অর্থেরও আভাস পাওয়া যায়; অতএব তর্করত্ন মহাশয়ের 'লক্ষ্যভূতা' পদের ব্যাখ্যা মনোমত হয় না। যশোধর ইহার অর্থ করিয়াছেন—'আদর্শ' বা 'নিদর্শন'—যেমন দেবদত্তা (হয় ত সে যুগের 'দেবদত্তা'—এ যুগের স্বর্ণবাই, গহরজান ইত্যাদির ন্যায় বিখ্যাতা গণিকা ছিল।)

২১ "রাজ্ঞা পূজিতা ছত্রভৃঙ্গারাদিদানেন। গুণবদ্ভিঃ সংস্তুতা অসাধারণমস্যাঃ কলাকৌশলমিতি প্রশংসিতা। প্রার্থনীয়া কলোপদেশার্থিনাম্। অভিগমনার্হা বিদগ্ধানাং রত্যর্থিনাম্। লক্ষ্যভূতা নিদর্শনভূতা দেবদত্তাবৎ" —টীকা।

২২ "যোগজ্ঞা রাজপুত্রী চ মহামাত্রসুতা তথা।
সহস্রান্তঃপুরমপি স্ববশে কুরুতে পতিম্"॥ (১।৩।২২)

২৩ "যোগজ্ঞা গীতাদিপ্রয়োগাজ্ঞা। সহস্রান্তঃপুরমিতি প্রভূতদারোপলক্ষণম্" টীকা।

২৪ "তথা পতিবিয়োগে চ ব্যসনং দারুণং গতা।
দেশান্তরেঽপি বিদ্যাভিঃ সা সুখেনৈব জীবতি"॥ (১।৩।২৩)

২৫ "তথা পতিবিয়োগে পত্যৌ প্রোষিতে, তথা ব্যসনং দারুণং বৈধব্যলক্ষণং গতা নির্ব্বেদাৎ ত্যক্তস্বদেশা অন্যস্মিন্নপি দেশে সুখেনৈব জীবতি বিদ্যোপদেশনাদাৎ" টীকা।

২৬ অথবা হয়ত এরূপও হইতে পারে যে, স্বদেশে কলাবিদ্যার শিক্ষা দান করিতে লজ্জাবোধ হওয়ায় বিদেশে যাইয়া শিক্ষাদান করিতেন।

২৭ "নরঃ কলাসু কুশলো বাচালশ্চাটুকারকঃ।
অসংস্তুতোঽপি নারীণাং চিত্তমাশ্বেব বিন্দতি"॥ (১।৩।২৪)

২৮ পুরুষমধিকৃত্যাহ নর ইতি। বাচাল ইতি কলাসম্বন্ধাদেবৈব বহুভাষী, নান্যথা। মা ভূদনাগরকত্বপ্রসঙ্গ ইতি। চাটুকারকঃ প্রিয়স্য কর্ত্তা। কলাগ্রহণেন হি সংস্কারবত্ত্বাৎ। অসংস্তুতোঽপি অপরিচিতোঽপি। চিত্তং বিন্দতি গৃহ্ণাতি। আশ্বেব ন কালমপেক্ষতে। সম্প্রয়োগাৎ স্ত্রীপুংসয়োঃ" —টীকা।

সংস্কার—শিক্ষাজনিত গুণাধান, culture বাচাল—Conversationalist [garrulous নহে]—বাগ্মী (তর্করত্ন)। চাটুকারক—accomodating, courteous; এক কথায়—ladies'man, প্রিয়ভাষী [তর্করত্ন]।

২৯ "কলানাং গ্রহণাদেব সৌভাগ্যমুপজায়তে।
দেশকালৌ ত্বপেক্ষ্যাসাং প্রয়োগঃ সম্ভবেন্ন বা"॥ [১।৩।২৫]

সে বিষয়েও দেশ-কালের অপেক্ষা বিদ্যমান। যথা,—এই দেশে নাগরিকগণ কলা-কুশল, অথবা উৎসবাদি-ব্যপদেশে কলা-কৌশল প্রদর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকে—এইরূপ জানিতে পারিলে সে দেশে কলা-প্রয়োগ সম্ভব। এ দেশ নাগরকশূন্য, অথবা এ দেশের জনগণ গুণদ্বেষী, অথবা এ দেশে নাগরকগণের বিপদকাল সমাগত - ইহা জানিতে পারিলে কলা প্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে না। শেষোক্ত স্থলে কলাজ্ঞানের ফলে দোষই উৎপন্ন হইয়া থাকে।৩০

কলা-বিদ্যার উপক্রমণিকা ও ফলশ্রুতি এই স্থলেই মহর্ষি-কর্তৃক সমাপিত হইয়াছে। বারান্তরে কলাগুলির পরিচয় ধারাবাহিক-ক্রমে দিবার ইচ্ছা রহিল।

---

৩০ 'গ্রহণাদেবাভিজ্ঞায়তে সৌভাগ্যম্। অর্থোঽনর্থপ্রতীঘাতঃ কামো যশশ্চেত্যর্থোক্তম্। তত্রাপি দেশকালাপেক্ষা। অস্মিন্ দেশে নাগরকাঃ কলাকুশলাঃ ঘটানিবন্ধনাদিকামা বেতি প্রয়োগঃ। নাগরকশূন্যো বা দেশঃ, গুণদ্বেষো বাত্র প্রাণিবসন্তি, ব্যসনকালো বা নাগরকাণামিতি ন বা প্রয়োগ-সম্ভবঃ, অন্যথা তৎপরিজ্ঞানং দোষফলং স্যাদিতি" - টীকা।

তর্করত্ন মহাশয় অনুবাদ করিয়াছেন "কিন্তু দেশ কাল বিবেচনায় এই সকল কলার প্রয়োগ হইবে অথবা হইবে না"—[পৃ: ১২]।

পক্ষান্তরে, যশোধরেন্দ্রের মতে অর্থ অন্যরূপ। যদি বুঝা যায় যে কোন দেশে বহু নাগরক [কাপ্তেন বাবু—কলার পৃষ্ঠপোষক] আছে—তাহারা সকলেই কলাকুশল, অথবা নানাপ্রকার উৎসবাদি উপলক্ষে তাহারা কলা-কৌশল দর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করে, তাহা হইলে সে দেশে কলা-প্রয়োগ করায় সুফল পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু, যদি বুঝিতে পারা যায় যে, কোন দেশে মোটেই কলা-কুশল নাগরক নাই, বা তাহাদের পরিবর্ত্তে কলা-বিদ্বেষী লোকগণ বাস করে, অথবা কলার পৃষ্ঠপোষক নাগরকগণ কালক্রমে অবস্থা-বিপর্য্যয়ে দারিদ্র্যরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে দেশে কলা-প্রয়োগের কোন সম্ভাবনা নাই। সে দেশে কলা-প্রয়োগ করিলে সুফল বা লাভের পরিবর্ত্তে নানারূপ দোষই ঘটিতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে আসরে সঙ্গীতজ্ঞ শ্রোতা একজনও নাই, সে আসরে যদি কোন উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতবিৎ ধ্রুপদ গান আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তথায় তাঁহার অদৃষ্টে প্রশংসার পরিবর্ত্তে অপমান—এমন কি শারীরিক উৎপীড়নও লাভের সম্ভাবনা আছে।

নাগরক—কলাকুশল ও কলার পৃষ্ঠপোষক কাপ্তেন বাবু। একটু সভ্য ভাষায়—Connoisseur of fine artsও বলা যায়।

"বিনিময়ে কিছু না পাইয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে দিবার সামর্থ্য ছিল একমাত্র আমাদের ভারতমাতার। আমাদের মা-র যে সামর্থ্য হইয়াছিল তাহা আর কোন দেশের হয় নাই। আমাদের মা-র সন্তানগণের উদরান্নের জন্য কোন দিন কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় নাই। অধিকন্তু মা আমাদের অন্যান্য দেশের সন্তানগণকে চিরদিন অন্ন বিতরণ করিয়া আসিতেছেন এবং সমগ্র জগতের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতেছেন। যদি তাহাই না হইত, তাহা হইলে এখনও জগতের প্রত্যেক জাতি ধনোপার্জ্জনের জন্য অন্যান্য দেশকে উপেক্ষা করিয়া ভারতবর্ষে আসেন কেন? অতি পুরাকাল হইতে যদি ভারতবর্ষ সমগ্র জগতের শ্রদ্ধাভাজন না হইত, তাহা হইলে নবম শতাব্দীতে যখন ইয়োরোপীয়গণ প্রথম অন্নাভাবগ্রস্ত হইয়া বিদেশে গমনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন, তখন জগতের অন্যান্য দেশের কথা স্মরণ না করিয়া একমাত্র ভারতবর্ষে আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন কেন?

ভারতবর্ষ যে জগতের সর্ব্বোচ্চ স্থান সর্ব্বতোভাবে অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহা একটু ভাবুকতার সহিত ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইলে অস্বীকার করা যায় না। ভারতবর্ষের এই সর্ব্বোচ্চতা কাহার দান অথবা কাহার সংগঠনের ফল, তাহা চিন্তা করিতে বসিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, পরবর্ত্তী তান্ত্রিকগণ অথবা সন্ন্যাসীগণ, অথবা ভট্ট, আচার্য্য, মিশ্র প্রভৃতি বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ভাষ্যকারগণ ভারতবর্ষের এতাদৃশ উন্নতি বিধান করেন নাই।"

বঙ্গশ্রী—অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

মিশ্র—দাদ্‌রা

কথা— দাশগুপ্ত

সুর—শ্রীবিশ্বনাথ মৈত্র

স্বরলিপি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এই পৃথিবীতে এসে'ছ খেলিতে
খেলাঘর বাঁধি ধূলাতে,
চাঁদের আলোক ফুলের সুবাস
র'য়েছে আমারে ভুলাতে।
স্বরগের প্রেম আসে যদি নামি',
ধরণীর ঋণে যায় সে যে থামি'—
এখনি কি হায় গোধূলি ছায়ায়
লুকাবো অজানা কুলাতে।

আঁখির আলোকে আছে কত আলো
স্বপনের গানে ভরিয়া
আমারে ঘিরিয়া সে যে মধুময়
স্মরণের বীণে ঝরিয়া।
এই ধরাতলে মোর গানখানি
স্বরগের সুরে ভরিবে না জানি,
অলখ হিয়ার বেদনারে তবু
রহিবে পরশ বুলাতে।

—স্বরলিপি—

স্থায়ী

৲				O				+				O		
গা	গা	মা	|	পধা	-র্সণা	ধা	|	পা-ধা	পা		|	মা	গা	প
এ	ই	পৃ	|	থি॰	॰॰	বী	|	তে ॰	এ		|	সে	ছি	খে
মা -া		মগা	|	-রগা	-রা	-া	|	রা পমা	পা		|	-ধা	মা	ধপা
লি ॰		তে॰	|	॰ ॰	॰	॰	|	খে লা	ঘ		|	র্	বাঁ	॰
ঋজ্ঞা	-া	-া	|	-া	সরা	ণ্‌া	|	সা	-া	-া	|	-মা	-া	-া
ধি ॰	॰	॰	|	॰	ধূ॰	লা	|	তে	॰	॰	|	॰	॰	॰
মা	মপা	পা	|	পা	পধা	র্সণা	|	র্সা	ণা	ণা	|	ধা	পধা-	মধপা
চাঁ	দে	র	|	আ	লো॰	ক্	|	ফু	লে	র	|	সু	বা॰	॰॰॰
পা	-া	-া	|	-া	-া	-া }	|	-া	-া	ধা	|	পা	মা	রা
স	॰	॰	|	॰	॰	॰ }	|	॰	॰	র	|	য়ে	ছে	আ
সণ্‌া	-া	সা	|	-রজ্ঞা	রা	ণ্‌রা	|	-সা	-া	-া	|	-মা	-া	-া ‖
মা	॰	রে	|	॰॰	ভু	লা॰	|	তে	॰	॰	|	॰	॰	॰ ‖

অন্তরা

+	O	+	O
‖ -া -া র্সা	না ধা নর্সা	ধনা র্রর্সা -া	-না -ধা -পা ‖
০ ০ স্ব	র গে র০	প্রে০ ০০ ০	০ ০ ০
-মা -া ধা	পা মা গা	রজ্ঞা সরা মা	-া -া -া
০ ম আ	সে য দি	না ০ ০০ মি	০ ০ ০
-া -া ম্	পা পা পা	পা া -া	ধা -পা -মা
০ ০ ধ	র ণী র	ঋ ০ ০	ণে ০ ০
ধা -া -া	-া -া -া	-া -া ধা	-র্সা র্রা র্গা
ষা য়্ ০	০ ০ ০	০ ০ যা	য়্ সে যে
র্গর্রা -র্সর্গা র্রা	-র্সা -া -া	-া -া র্সা	না ধা পা
থা০ ০০ মি	০ ০ ০	০ ০ এ	খ নি কি
মপা -ধপা -মা	ধা -া -া	-া -া ধা	ণা র্রা র্রা
ছা ০০০ ০	য়্ ০ ০	০ ০ গো	ধূ লি ছা
র্সা -া -া	-া -া -া	-া -া ধা	পা মা রা
য়া ০ ০	০ ০ ০	য়্ ০ লু	কা বো অ
সণ্া া ণ্	রজ্ঞা রা ণ্রা	সা -া -া	-মা -া -া ‖
জা ০ না	০ ০ কু লা০	তে ০ ০	০ ০ ০

ভোগ

+	O	+	O
পা পা পা	জ্ঞা সা সা	সা গা সা	মা -া জ্ঞা
আঁ খি র	আ লো কে	আ ছে ক	ত ০ আ
পমা -জ্ঞা -া	া -া া	রা গা মা	-া -া -া
লো ০ ০	০ ০ ০	স্ব প নে	ন্ ০ ০
ধ্া ণ্া সা	-া রগা -সরা	মজ্ঞা -া -া	-া মা দা
স্ব প নে	র্ গা০ ০০	নে০ ০ ০	০ ভ রি
পা -া -া	-া -া -া	দা পা মা	রা মা জ্ঞা
য়া ০ ০	০ ০ ০	আ মা বে	ঘি রি যা
ঋা সা ণ্া	ঋা সা -া	গা গা মগা	-রগা রা সা
সে যে ম	ধু ম য়্	স্ম র ণে০	০ব্ বী ণে
ণ্া রা সা	-া -া -া		
ঝ রি য়া	০ ০		

আভোগ

+			O			+			O		
মা	ধা	ধা	ধা	নর্সা	-ধনা	র্সা	-া	-া	-না	ধা	-পা
এ	ই	ধ	রা	.ত৹	৹ ৹	লে	৹	৹	৹	৹	৹
ধা	-পা	মা	গা	রজ্ঞা	-সরা	মা	।	-া	-া	-া	-া
মো	র্	গা	ন্	থা৹	৹ ৹	নি	৹	৹	৹	৹	৹
মা	পা	পা	-া	পধা	-ধপা	মা	-া	-া	-া	-া	-া
স্ব	র	গে	র্	সু ৹	৹ ৹	রে	৹	৹	৹	৹	৹
মা	ধা	পা	ধা	-া	-া	-া	।	ধা	র্সা	র্রা	র্গা
ভ	রি	বে	না	৹	৹	৹	৹	ভ	রি	বে	না
র্গর্রা	র্সর্গা	র্রা	র্সা	-া	-া	-া	-র্সণধা	র্সা	না	ধা	পা
জ্ঞা৹	৹ ৹	নি	৹	৹	৹	৹	৹ ৹	অ	ল	খ	ছি
ক্ষপা	ধপা	মা	-ধা	।	-া	-া	-া	ধা	না	র্রা	র্রা
য়া ৹	৹ ৹	৹	র্	৹	৹	৹	৹	বে	দ	না	রে
র্রর্রা	-র্সর্রা	-র্রর্সা	র্সা	-া	-া	-া	-া	ধা	পা	মা	রা
ত ৹	৹ ৹	৹ ৹	বু	৹	৹	৹	৹	র	ছি	বে	প
সণা	।	সা	-রজ্ঞা	রা	ণরা	সা	-া	-া	-মা	-া	-া
ব	৹	শ	৹ ৹	বু	লা৹	তে	৹	৹	৹	৹	৹

গান

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ফুল এনেছি মাগো আমার
পূজবো ব'লে তোমা,
নিরাশ মোরে করিস নে আর
চরণে ঠাঁই দে মা।

মন্দিরে মা জেলে আলো,
ধ্যানে কতই রাত পোহালো
এবারে তোর রূপের ভাতি—
আপনি জেলে দে মা।

হয় নি কো শেষ সাধনা মোর,
মন যে মোহে আছে বিভোর,
ঝরে' বুঝি যায় মা কুসুম,
চরণ পেতে নে মা॥

ফাল্গুনে

শীতের কুহেলীশেষে সহসা বিবশ তনুখানি
যৌবন-জোয়ারে যায় ভাসি';
বনানীর বুকে বুকে ফুলে ফুলে সাজাইল অলি
সুন্দরের প্রাণভোলা হাসি।
রক্তিম লালিমা ফোটে কিংশুকের শাখায় শাখায়,
সুরের মূর্চ্ছনা আনে মধুপের পাখায় পাখায়,
পাপীয়ার কুহুতানে অশোকের রক্তরাঙা প্রাণে
উঠে বাজি' মিলনের বাঁশী।
সৃষ্টির তরঙ্গ খেলে প্রাণময় অপূর্ব্ব সঙ্গীতে
পূর্ণ করি' খর্ব্ব দেহ-মন;
প্রাণের স্পন্দন খেলে নৃত্যময়ী চপল ভঙ্গীতে
জাগাইয়া নব শিহরণ।

কাজল মেঘের ফাঁকে গোধূলির রক্তিম গগনে
অনন্ত উৎসব বাজে প্রাণ-পাওয়া মধুর লগনে;
মরণের মাঝে তাই ফিরে পাওয়া প্রাণের স্পন্দন
আদি হ'তে নিত্য চিরন্তন—
অনাদি কালের স্রোতে ভেসে যায় যুগ যুগ ধরি'।
বিশ্বভোলা যৌবনের গানে—
যে বাণী বহিয়া আনে কুঁড়িরে ফুটায় পূর্ণ করি'
সেই বাণী নবীনের প্রাণে—
আনে নিত্য যৌবনের অচঞ্চল উদ্দাম প্রবাহ,
জাগাইয়া তোলে প্রাণে যৌবন-লহরী-অহরহ;
ধরণীর বুকে আনে জীবনের অপূর্ব্ব স্পন্দন
বসন্তের মুক্তি জয়গানে।

শ্রীনকুলেশ্বর পাল

'মায়াময়মিদং—"

তবুও থামে না হায় মর্শ্মের ক্রন্দন—
যদিও নিশ্চয় জানি অনিত্য সংসার!
ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাই মায়ার বন্ধন;
গীতামন্ত্র উচ্চারিয়া দেখি বারংবার,—
কোথা সে, অমৃতশ্লোকে হয় ক্লৈব্য দূর!
'মোহমুদ্গরের' বাণী শুনি' অবিশ্রাম—
এ দারুণ মোহ মোর হ'ল নাকো চূর!
শিখেছি অনেক কথা—'সকাম', 'নিষ্কাম',
"ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা", 'কৈবল্য', 'নির্ব্বাণ';
জানি—মৃত্যু নহে কভু আত্মার বিনাশ;
শ্মশানে নশ্বর দেহ হয় অবসান,
মহাশূন্যে দেহী করে সূক্ষ্মরূপে বাস।
তবু যেন মনে হয় মায়া নয় ভুল,—
বিশ্বেরে রেখেছে ধরি'—সৃষ্টির এ মূল!

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

কোথায় গেল?

আমাদের ধানের গোলায় ধান ছিল ভাই,
আমাদের বাউল সুরের গান ছিল ভাই।
পবনে বস্ত্র ছিল,
বাহুতে অস্ত্র ছিল।
আমাদের ধর্ম্ম ছিল,
শরীরে বর্ম্ম ছিল।
উত্তরে তুঙ্গ অভেদ্য হিমালয়,
দক্ষিণে উত্তাল তরঙ্গ জলময়।
করী হয় শার্দ্দূল হিংস্র সিংহ অহি,
দুর্ল্লভ রত্ন মাণিক্যময় মহী।
আমাদের মান ছিল ভাই—
দেশ-বিদেশে,
আমাদের দান ছিল ভাই,
কোথায় গেল?

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস

ফসল ফলাও

ফসল ফলাও ভাই
ফসল ফলাও।
কঠিন-করে জোরে
লাঙল চালাও।

বর্ষাজলে আর
রৌদ্রে ধুঁকে—
অসীম দুঃখে, তুমি
মাটির বুকে, সুখে
লাঙল চালাও।

তব নয়ন-জলে
গলে কঠিন মাটি,
ফসল আশায়, তারে
লাঙলে কাটি'
বীজ বপন কর'
নিজে আপন করে।
সফল কর'
তব স্বপনখানি।
আশার বাণী আনো
ঘরে ঘরে।

ধরার বুকে আনো
সবুজ সুধা;
বাঁচাও জীবে, তার
মিটাও ক্ষুধা।
আহার্য্যে পূর্ণ
কর বসুধা।

ফসল ফলাও ভাই
ফসল ফলাও—
আশার ভাষা বাণী
কণ্ঠে বলাও।
বিশ্ব পিতার তুমি
আসন টলাও,
পাষাণ গলাও।
ফসল ফলাও, ভাই
ফসল ফলাও।

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস

"দেনা-পাওনা"

বলে, "খাতাখানি ভ'রে দাও, শেষ ক'রে দাও মোর হাতে,
তোমার সকল গান মালা ক'রে দাও তার সাথে;
জড়ায়ে থাক্‌না ফুল সবগুলি একটি সূতায়,
সবার সুরভি থাক মিলে-মিশে পাতায় পাতায়।
তোমার তুলির রঙে রূপায়িত অতুল ছবির
সবগুলি থাক সেথা,—আর থাক্ আমার কবির
কামনা-রঙিন ফুল, ফুল্লদল কবিতার শোভা,
সব নিয়ে মোর খাতা পূর্ণ হোক্, হোক্ মনোলোভা।
অন্যায় বলি নি কিছু, না কি বল?"—বলে কাছে এসে,
"দেবে তো?"—শুধায় মোরে;—কথা কয় আঁখিপ্রান্তদেশে!
পরম তৃপ্তির সুখে চোখ দু'টি আসে যেন বুজে,
মনে হয় খাতাখানি এবার সে ঠিক্ নেবে খুঁজে।

আমি ভাবি গান মোর কলমের কালি তুলিকায়
যে লিখন-আলিপনা আঁকে বসি' কাগজের গায়;
তাদের বাঁচাব লাগি' এ তোমার সকরুণ মায়া,
তাহারই শীতল ছায়ে কাব্য মোর পাইয়াছে ছায়া।
স্মরণের চিহ্ন ক'রে তুমি যদি চাও তারে নিতে,
তোমায় চিঠির বাক্সে এ কবিতা লুকায়ে রাখিতে,
রাখ তুমি;—দেবো আমি পূর্ণ ক'রে তোমার লিপিকা,
তুমি ভালবাসিয়াছ আমার এ মূল্যহীন লিখা—
তারই প্রেমে বেঁচে থাক্ এ আমার মনের মঞ্জরী,
তাহারই অমৃত ডোরে গাঁথা তব হোক শতনরী।

প্রতিদিন তুমি শুধাইবে মোরে, কবে গো কখন দেবে?
আজও যে হ'লনা শেষ,—আরও কতকাল তুমি নেবে?
খাতা কি হবে না শেষ?—আমি কহি, কেন হইবে না!
প্রতিদিন বেড়ে ওঠে প্রতি দিবসের যত দেনা
তোমার আমার মাঝে; তারে কি মিটাতে পারি মোটে!
ঝরিলে একটি ফুল অমনি যে আর একটি ফোটে।
লেখা হবে খাতা—যবে ফুল ফোটা শেষ হবে,
তার আগে কি বলা যায় সেটি তুমি পাবে কবে?
তবু যে অমন করে খাতাখানি নিতে চাও,
যদি তুমি পেয়েই তা, টুপ করে চ'লে যাও!

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

বুঝিতে পারি নে, একি বিপরীত ? এই পৃথিবীর রীতি,
স্মরণের যাহা যোগ্য নহে কো, রেখে দেয় তার স্মৃতি।
রাহু, কেতু,—রবি শশীর সঙ্গে
সুধা ভুঞ্জন করিছে রঙ্গে
হ'লো পার্থেরে আড়াল করিয়া
কত শিখণ্ডী কৃতী।

কত কণ্টক পুষ্পগুচ্ছে বিঁধি পেলে সম্মান।
সমন্তকের সঙ্গে জড়িত রহিল জাম্ববান।
এ যেন নিশীথে পড়িল রে হায়—
মৃগের রক্ত শিবের মাথায়,
ব্যাধে দিল ঠাঁই দেবাদিদেবের
পুণ্য উপাখ্যান।

কত ছোট বড়, তুচ্ছ উচ্চ, আচার্য্য দিঙ্‌নাগ,—
লুপ্ত, গুপ্ত, হইত না পেলে কালিদাস-দেওয়া দাগ।
কে সে 'পাইলেট' ? চিনিত কি লোক ?
যীশু সাথে তার না থাকিলে যোগ,
ক্রূর, অখ্যাত, কেমনে পাইত
এই অমৃতের ভাগ ?

বিস্মরণীয় নাম যাহাদের, যারা হীন দুর্ব্বল,
উদ্বাহু সব বামন লভিল প্রাংশুলভ্য ফল।
বিস্মৃতি তলে তলাইত' যারা—
অমৃতের হ্রদে ঠাঁই পেলে তারা,
যাহা মসীময়, যাহা নিষ্প্রভ,
তাও হ'ল উজ্জ্বল।

সাধুসঙ্গের ফলে—মহতের পদরজ অভিষেকে,
দীপ্ত মণির অধিকারী করে অন্ধকূপের ভেকে।
চোর-কাঁটা রহি' কাশ্মীরী শালে
সহজেই ফাঁকি দেয় মহাকালে,
রহে অচূর্ণ জাঁতার নাভিতে
ব্রীহি ও নিরুদ্বেগে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

প্রণাম

ফেরারী মেঘেরে চোখ রাঙায়েছে মুখরা চাঁদ-
উড়ে যেতে যেতে অভিমান ক'রে থেমেছে মেঘ
নীল কুমকুমে অধর ফুলায়ে ধ'রেছে হাত,
আলুথালু চুল কাঁপিয়ে দেখেছে, অভ্রলেপ।

মুখচোরা তারা ঠোঁটে সরু হেসে পরস্পর—
ভীরু ইসারায় আঘাত ক'রেছে নিরুত্তাপ ;
উন্মাদ চাঁদ সরমের পালা শেষ ক'রেই—
মখমলি মেঘে মুখ লুকিয়েছে অকস্মাৎ।

দূরের গ্রহের হয় তো এখনো উদাসী বোন
শূন্য বাসরে দীপমালা ল'য়ে ভাবোন্মাদ ;
স্বপ্নের রাঙা মায়াজাল খুলে হয় তো শেষে
নরম ঘুমের আবেশে হ'য়েছে লুপ্ত-সাধ।

মেঘ স'রে গেছে, ফুলডোর ছিঁড়ে চাঁদের মেঘ,
অশ্রুর স্নেহে ঘাস জুড়ে বুঝি পড়েছে ডাক্ !
রিক্ত রাতের রূপবতী চাঁদ কবরী খুলে—
পলাতকা মেঘে প্রণাম ক'রেছে রুদ্ধবাক্।

শ্রীমণীন্দ্র গুপ্ত

কেন

যেতেই যখন হবে ফিরে
কেন তবে এসেছিলে ?
এমন ক'রে মায়ার জালে
কেনমোরে বেঁধেছিলে ?
যে ফুল ছিল ধূলায় পড়ি'
নিলে গো তায় বক্ষে ধরি'
জানোই যদি ক্ষণিক মোহ,
কেন ভালবেসেছিলে ?

আমি ফিরতেছিলাম পথে পথে
ভিখারিণীর মত
লজ্জা-মলিন রিক্ত হিয়া
ব্যথায় অবনত।
সেদিন কেন ধূলি হ'তে
নিলে তুলে স্বর্ণ-রথে ?
সেদিন কেন শুনালে গো
আশার বাণী শত ?

চাই নি আমি খাট-পালঙ্ক,
চাই নি সোণার থালা,
চাই নি আমি বহুমূল্য
মতির কণ্ঠ-মালা ;
কিছুই আমি চাই নি নিতে ,
চেয়েছিলাম সেবা দিতে—
ভিখারিণী হ'লেও ছিল
সেবায় ভরা ডালা।

দাসী হয়ে চেয়েছিলাম
রইতে তোমার ঘরে,
সেবা দিয়ে ভক্তি দিয়ে
তোমায় দিতে ভ'রে।
আমার প্রীতি আমার স্নেহ
নারীরে মোর চায় নি কেহ—
তাই তো আমি দিলাম তোমায়
সবই আমার ধরে।

বিফল হ'ল সকল দেওয়া—
কিছুই নাহি নিলে,
আদর ক'রে মিষ্টি হেসে
তুমিই শুধু দিলে।
স্বপ্নাতীত ছিল যাহা,
তুমি আমায় দিলে তাহা,
ঘুমিয়েছিল একটি কলি—
জাগিয়ে তারে দিলে।

পাত্র ভরি' দিলে সে স্বাদ
পাই নি যাহা কভু,
চাই নি আমি রাণীর মুকুট
পরিয়ে দিলে তবু।
বলেছিলাম পুলক-লাজে,
এ-সব কিগো আমায় সাজে ?
দাসী আমি, চরণতলেই
স্থান যে আমার প্রভু

জানতে যদি দু'দিন বাদেই
ফুরিয়ে যাবে গান,
কেন তবে দিলে আমায়
সিংহাসনে স্থান ?
বেশ তো ছিলাম ভিখারিণী
হারিয়ে যাওয়া স্রোতস্বিনী,
জল ঢেলে গো আবার কেন
জাগালে তায় বান ?

*

তাই তো আমি ভাবি ব'সে
এ কী ছেলে খেলা !
ভাঙা ঘাটে এমন ক'রে
বসাও কেন মেলা ?
ময়ূরপঙ্খী বাঁধা তীরে
জানো যখন যাবেই ফিরে,
কাঁদিয়ে গেলে অভাগীরে
কেন সাঁঝের বেলা ?

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শিশু-সংসদ

উদয়ন-কথা

প্রিয়দর্শী

(গোড়ার কাহিনী)

তৃতীয় পর্ব্ব

বৎসরাজ উদয়ন যখন অবন্তিরাজ প্রদ্যোতের সেনাদের হাতে বিনাযুদ্ধে কেবল ফন্দীতে বন্দী হ'লেন, তখন উজ্জয়িনীতে খুবই গোলমাল চল্‌ছে। নানা দেশের রাজারা অবন্তি-রাজকন্যা বাসবদত্তার অপূর্ব্ব রূপ-গুণের কথা শুনে দূতের পর দূতই পাঠাচ্ছিলেন প্রদ্যোতের কাছে—বাসবদত্তার সঙ্গে নিজের কিংবা নিজের ছেলের বা ভাই-এর বিয়ের প্রস্তাব ক'রে। কিন্তু এ সব সম্বন্ধ প্রদ্যোতের মোটেই পছন্দ ছিল না—তিনি মনে মনে উদয়নকে জামাই করার আশা পোষণ কর্‌ছিলেন। উদয়নকে ধরবার ফাঁদ তিনি পেতেছিলেন বটে, কিন্তু উদয়ন সে ফাঁদে পা দিলেন কি না—তার কোন খবর তিনি তখনও পর্য্যন্ত পান নি। এ অবস্থায় প্রদ্যোত অন্য রাজাদের দূতদের হাতে রেখেছিলেন—'আজ নয় কাল উত্তর দেব' —এই ভাব দেখিয়ে। তাদের একেবারে তাড়িয়ে দেওয়ার সাহস তাঁর ছিল না—কে জানে শেষ পর্য্যন্ত উদয়ন যদি তাঁর টোপ না গেলেন! এখন বৎসরাজের সম্বন্ধে একটা ভাল খবরের আভাসপেলেই তিনি অন্য দূতদের সব ভাগিয়ে দেবেন—এই ছিল তাঁর মনের ভরসা!

প্রদ্যোতের রাণী অঙ্গারবতী অবশ্য রাজার ভাব দেখে বড় চঞ্চল হচ্ছিলেন। কিন্তু রাজা তাঁকেও নানা কথায় ভুলিয়ে রাখছিলেন। ক্রমশঃ এমন অবস্থা হ'ল যে, কি রাণী কি রাজদূতেরা কেউ-ই আর অপেক্ষা কর্‌তে চান না। এমন সময় একদিন প্রদ্যোতের মনের কোণে লুকানো বাসনাটি পূর্ণ হবার উপক্রম হ'ল। রাণীর সঙ্গে অন্তঃপুরে মহারাজের কথা কাটা-কাটি চল্‌ছিল, হঠাৎ রাজবাড়ীর বুড়ো কঞ্চুকী লাঠি ঠক্ ঠক্ কর্‌তে কর্‌তে এসে খবর দিল, বৎসরাজ উদয়ন ধরা পড়েছেন মন্ত্রী শালঙ্কায়নের হাতে। মন্ত্রী তাঁকে সঙ্গে নিয়ে উজ্জয়িনীতে আস্‌ছেন। আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে প্রদ্যোত রাণীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পরম সমাদরে উদয়নকে অভ্যর্থনা কর্‌তে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে শালঙ্কায়নের রথ উদয়নের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত দেহ বহন ক'রে উজ্জয়িনীর প্রধান তোরণের সামনে এসে দাঁড়াল। উজ্জয়িনীর প্রজাপুঞ্জ উদয়নের সে দেবদুর্ল্লভ দেহকান্তি দেখে মুগ্ধ হ'য়ে মহাসেন প্রদ্যোতের কাছে একসঙ্গে প্রার্থনা জানাল যে, বৎসরাজকে যেন তিনি হত্যা বা কোনরূপ উৎপীড়ন না করেন।* মহাসেন প্রজাদের এই নির্ব্বন্ধ দেখে তাদের আশ্বাস দিলেন যে, বৎসরাজের কোন রকম অসম্মান তাঁর দ্বারা হবে না বরং বৎসরাজ্য ও অবন্তিরাজ্যের মধ্যে সম্মান-জনক সর্ত্তে সন্ধি স্থাপিত হবে।

এদিকে শালঙ্কায়ন রথ থেকে নেমে এসে বৎসরাজের অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিলেন সকলের সামনে। তাই শুনে মহাসেন উদয়নের শতমুখে প্রশংসা করে রাজবৈদ্য ভরতরোহককে ডেকে আন্‌বার ব্যবস্থা কর্‌লেন। আর আদেশ দিলেন যে—ময়ূর-প্রাসাদে সূর্য্যের তাপ বড় বেশী লাগে তাই সেখানে বৎসরাজকে নিয়ে না গিয়ে মণিভূমিকা-গৃহে যেন তাঁকে রাখা হয়—সেখানে ঠাণ্ডায় তিনি আরামে থাক্‌বেন।

উদয়ন মহাসেন ও অঙ্গারবতীকে সামনে দেখে সসম্ভ্রমে উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু রাজা-রাণী সস্নেহে তাঁকে ধ'রে পালঙ্কে শুইয়ে দিয়ে বল্‌লেন—'থাক্, থাক। ওসব আদব-কায়দা পরে দেখালেও চল্‌বে। এখন যতদিন আঘাতগুলি না সারে, রোগীর মত শুয়ে থাক্‌তে হবে'।

তারপর পরম সমাদরে রাজা ও রাণী বৎসরাজকে মণিভূমিকা-প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। প্রজারা তখন দুই রাজার জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করছিল।

বৎসরাজের প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ তাঁর অদ্ভুত বুদ্ধি-কৌশলে সারা ভারতবর্ষে খুব নাম করেছিলেন। পরের যুগের চাণক্য কৌটিল্যের সঙ্গে তাঁর তুলনা হ'তে পারে। এ-হেন যৌগন্ধরায়ণের গুপ্তচরদের কাছে কোন দেশের কোন খবর লুকান থাকত না। উদয়ন মৃগয়ায় যাবার পর একদিন তাঁর এক গুপ্তচর এসে তাঁকে খবর দিলে যে রাজা যে নীল হাতী ধরতে বেরিয়েছেন তা প্রদ্যোতের তৈরী যন্ত্রের হাতী—আসল নীল হস্তী নয়। কথাটা শুনে মন্ত্রীর মনে বড় দুর্ভাবনা হ'ল। তবে তিনি ভাবলেন যে, সঙ্গে ত' প্রধান সেনাপতি রুমণ্বান সসৈন্যে রয়েছেন—এখন আর ভয়ের কি কারণ ঘটতে পারে! তবু তিনি নিশ্চিন্ত না হ'য়ে রুমণ্বানকে সাবধান ক'রে দেবার উদ্দেশ্যে তাঁর বিশ্বস্ত দূত সালককে দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে

* প্রদ্যোত যেরূপ নিষ্ঠুর ছিলেন, তাতে প্রজারা সন্দেহ করেছিল যে, তিনি হয় ত' উদানকে গুপ্তহত্যা করতে একটুকুও ইতস্ততঃ করবেন না। ক্ষেমেন্দ্র তাঁর বৃহৎকথামঞ্জরীতে লিখেছেন—প্রজাদের এ-রকম সন্দেহ একেবারে যে ভিত্তিহীন ছিল তা নয়। প্রদ্যোতের অন্তরে এ-রকম একটা দুষ্ট অভিপ্রায়ের ছায়া যে মোটেই পড়ে নি তা বলা যায় না। তবে প্রজাদের নির্ব্বন্ধ দেখে লজ্জায় ও ভয়ে তাঁকে এ-দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ করতে হয়েছিল।

যাচ্ছেন, এমন সময় খালি গায়ে খালি পায়ে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে সাম্‌নে দাঁড়াল মহারাজের বিশ্বাসী অনুচর হংসক।

হংসকের ভাবগতিক দেখেই যৌগন্ধরায়ণ বুঝতে পেরেছিলেন যে বিপদ্‌ ঘটে গিয়েছে। তবু তিনি অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ ক'রে হংসককে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলেন। হংসকের তখন প্রায় উন্মাদের মত অবস্থা—কেঁদে কেঁদে তার চোখ দু'টি লাল হ'য়ে ফুলে উঠেছে—সারা পথ ছুটে আসায় ভীষণ হাঁফাচ্ছে—সারা গা ক্ষত-বিক্ষত, পা দু'টো কেটে রক্ত ঝরছে। তবু তাকে কিছু সুস্থ ক'রে যৌগন্ধরায়ণ তার মুখ থেকে সব খবর বার ক'রে নিলেন—কি ভাবে রুমণ্বানের কথা ঠেলে নিজের বোকামি আর একগুঁয়েমির ফলে তরুণ মহারাজ কূট-কৌশলী প্রদ্যোতের ফন্দীতে কত সহজে প্রায় বিনা যুদ্ধেই বন্দী হয়েছেন।

হংসক দূতের বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্য সব ঘটনা একে একে বর্ণনার পর বল্‌লে—'যখন প্রদ্যোতের সেনারা বন্দী মহারাজের মাথাটা কেটে ফেল্‌বার উদ্যোগ করছিল, তখন আমি আর লুকিয়ে থাক্‌তে পারি নি—ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলুম। তার ফলে জন-কয়েক সেনা আমার গলার আওয়াজ লক্ষ্য ক'রে ছুটে এসে গাছের আড়াল থেকে আমাকে টেনে বার করলে। আমাকেও তারা বেঁধে ফেলেছিল। এই সময় প্রদ্যোতের মন্ত্রী শালঙ্কায়নের চেতনা ফিরে আসায় তাঁরই কৃপায় মহারাজের প্রাণরক্ষা হ'ল। তিনি মহারাজকে বন্দী ক'রে নিয়ে যাবার সময় আমার হাত-পার বাঁধন খুলে দিয়ে বল্‌লেন—'হংসক! যাও তোমাদের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকে এই খবর দাও গে'! আমি তখন মহারাজের মুখের দিকে চাইলুম। তিনিও একটু ম্লান হাসি হেসে বল্‌লেন—"হাঁ হংসক! যাও। আর্য্য যৌগন্ধরায়ণকে সব কথা খুলে বল গিয়ে"। যৌগন্ধরায়ণ হংসকের এই কথায় এতদূর বিচলিত হলেন যে—মনে হ'ল যেন তাঁর হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরা-পোষাক প্রভৃতি ভেদ ক'রে বাইরে বেরিয়ে আস্‌বে।

ঠিক এই সময় রাজান্তঃপুর থেকে প্রতিহারী বিজয়া এসে মন্ত্রীকে জানালে—"প্রভু! গিন্নি-মা'র আদেশ* —আপনি তাঁর বড় ছেলেরই মত, আর মহারাজ তাঁর ছোট ছেলে—তাঁর ছোট ছেলের এ বিপদ্‌ থেকে তাঁকে রক্ষা ক'রে বড় ছেলে যেন তাঁকে অচিরে কৌশাম্বীতে ফিরিয়ে আনেন"।

বিজয়ার কথায় যৌগন্ধরায়ণ খানিক চুপ ক'রে থেকে বল্‌লেন—"বিজয়া! জল আন"। সোনার কমণ্ডলু ভ'রে জল এনে দিল বিজয়া। পূর্ব্বমুখে ব'সে সে জলে আচমন ক'রে হাতে পৈতা জড়িয়ে যৌগন্ধরায়ণ প্রতিজ্ঞা করলেন—'যদি শত্রুর হাত থেকে মহারাজ উদয়নকে জীবিত অবস্থায় মুক্ত ক'রে ফিরিয়ে আন্‌তে না পারি, তা হ'লে আমার নাম যৌগন্ধরায়ণ নয়'†।

ঠিক এই সময় নির্মুণ্ডক নামে যৌগন্ধরায়ণের আর এক চর ছুটে এসে খবর দিল যে—মহারাজের বিপদের শান্তি-কামনায় গিন্নী-মা ব্রাহ্মণভোজন করাচ্ছিলেন। বিপদের খবর শুনে ব্রাহ্মণদের মনে কোন ফূর্ত্তি ছিল না। তাঁরা কোন রকমে খাবারগুলি গিল্‌ছিলেন, এমন সময় কোথা থেকে এক পাগলা এসে তাঁদের বল্‌লে 'ঠাকুরম'শাইরা! তাড়াতাড়ি করবেন না বেশ তারিয়ে তারিয়ে সব খাবারগুলি খান, এ রাজবংশের খুবই কল্যাণ হবে'। এই কথা বল্‌তে বলতে পাগলা অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

নির্মুণ্ডকের কথা শেষ হ'তেই জনকয়েক ব্রাহ্মণ কতকগুলো ছেঁড়া কাপড়-চোপড় নিয়ে যৌগন্ধরায়ণের সাম্‌নে রেখে বল্‌লেন—"আমরা যখন খেতে বসেছিলুম, তখন ভগবান্‌ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব পাগ্‌লার বেশে এই কাপড়গুলো গায়ে জড়িয়ে এসেছিলেন। যাবার বেলা এগুলো তিনি ফেলে রেখে গেছেন"। যৌগন্ধরায়ণ এই সব ব্যাপার দেখে শুনে খুবই আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁর কি খেয়াল হ'ল—সেই ছেঁড়া ময়লা কাপড়গুলো তিনি নিজের গায়ে জড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। আর মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের পূর্ব্বরূপ রইল না। তাঁকে চেনে কার সাধ্য! আবার যেই তিনি ঐ কাপড়গুলো খুলে ফেললেন, অমনই তাঁর নিজের মূর্ত্তি প্রকাশ পেল। যৌগন্ধরায়ণ তখন বুঝতে পারলেন যে, মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব নিজের বংশের কল্যাণ কামনায় ‡ মহারাজ উদয়নের মুক্তির পথ এইভাবে সঙ্কেতে দেখিয়ে দিয়েছেন। তখন যৌগন্ধরায়ণ ব্যাসদেবের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বললেন "প্রভুর সঙ্কেতে আমার চোখ খুলেছে। তাঁর নির্দ্দেশিত পথ ধ'রেই আমি চল্‌ব। প্রভুর অনুগ্রহে তাঁর দেওয়া পাগ্‌লার ছদ্মবেশ ধ'রে উজ্জয়িনীতে গিয়ে আমি মহারাজকে মুক্ত ক'রে আন্‌ব—এতে আর কোন সংশয় নেই"।

এর পর অন্যান্য মন্ত্রীদের উপর রাজ্য চালাবার ভার দিয়ে প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ চুপি চুপি কৌশাম্বী ছেড়ে উজ্জয়িনীর দিকে রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে রইলেন শুধু মহারাজের আমুদে বন্ধু বসন্তক আর প্রধান সেনাপতি রুমণ্বান্‌। এ ছাড়া তাঁর অনেক চর তিনি আগে থেকেই উজ্জয়িনীতে পাঠিয়ে দিলেন যেন তারা আগে হ'তে উজ্জয়িনীতে নানারকম কাজের ছল ক'রে গিয়ে মন্ত্রী ম'শায়ের জন্য অপেক্ষায় থাকে। দেখতে দেখতে সমস্ত উজ্জয়িনী নগরীটাই যৌগন্ধরায়ণের পাঠান ছদ্মবেশী চরে সেমায় চাকরবাকরে ভ'রে উঠল। যৌগন্ধরায়ণ বসন্তক ও রুমণ্বান্‌ তখন হাঁটাপথে উজ্জয়িনীর দিকে চলা সুরু করেছেন। (ক্রমশঃ)

---

* মহাকবি ভাসের 'প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ' নাটকে আছে—উদয়নের জননীই এই আদেশ দিয়েছিলেন। অথচ 'কথাসরিৎ-সাগর' ও 'বৃহৎকথামঞ্জরী'তে বলা আছে—উদয়নের মা ও বাপ একসঙ্গে মহাপ্রস্থান করেছিলেন।

† কি ভাবে যৌগন্ধরায়ণ তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন, তার বিস্তৃত বিবরণ আছে ভাসের 'প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণে'। কথা-সরিৎসাগরে ও বৃহৎকথামঞ্জরীতে এ বিবরণ অতি সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে।

‡ ব্যাসদেবের ছেলে পাণ্ডু। পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র অর্জ্জুন। অর্জ্জুনের বংশধর উদয়ন। অর্জ্জুন—অভিমন্যু—জনমেজয়—শতানীক—সহস্রানীক—উদয়ন।

কুমারী বিজলী ধর

রাজপুরীতে মহা সোরগোল, মালঞ্চের সেরা ফুল নিত্যই চুরি যায়, কিন্তু চোর যে কে, সে ধরা পড়ে না। মালী হাত জোড় করে জানায়, "বাগানে পাহারার ব্যবস্থা হোক্।" কিন্তু কিছু ফল হয় না তাতে। চোর কারোর চোখে পড়ে না। অবশেষে একদিন খবর আসে—চোর পড়েছে ধরা। রাজার আদেশে প্রহরীরা নিয়ে যায় তাকে রাজসভায়। সকলেই অবাক্! একটী ছোট্ট ছেলে, ফুলের মতই কোমল তার সৌন্দর্য্য, চোখে ভীরু মৃগশিশুর অসহায় চাহনি।

মহারাজ বলেন, "তুমিই করেছো ফুল চুরি?"

সে ভালো বুঝতে না পেরে বলে, "চুরি কি? ফুল তো গাছে ফোটে, তা' নিলে কি চুরি করা বলে?" কিন্তু তার ক্ষীণ স্বর ডুবিয়ে দিয়ে পাত্রমিত্রেরা গর্জ্জন করে ওঠে "শুনুন মহারাজ, আপনার বাগানের ফুল নিয়ে ও বলে কি না চুরি করিনি! ও যত ছোটই হোক্ ও কালে চোর থেকে ডাকাত হ'য়ে দাঁড়াবে, ওকে সাজা দিন।"

ছেলেটি করুণ নয়নে চেয়ে থাকে। মন্ত্রী পরম পাকা লোক। বলেন, "এই বয়সেই ঝুনো হয়ে উঠেছে। চুরি ক'রে কেমন ভাল মানুষটীর ভাণ করছে দেখুন, মহারাজ!"

অন্তরাল থেকে অন্তঃপুরিকারাও বিচার দেখেন। ছেলেটীর মুখ দেখে রাজকুমারীর বুকে লাগে ব্যথা। রাণীকে বলে, "মা, ছেলেটিকে সকলে মিথ্যে আইনের পাকে ফেলে দুঃখ দিচ্ছে। ও-কে কি আইন বাঁধতে পারে? নীরস কি রসের মান দিতে জানে? ও তার অনেক ওপরে।"

রাণীর কোমল প্রাণ-ও আর্দ্র হয়। তিনি নিবেদন পাঠান রাজাকে। রাজা আসেন। রাণী বলেন, "মহারাজ ছেলেটিকে ভিক্ষা চাই।" রাজা উত্তর করেন, "সে কি। ও যে চোর। এখন থেকে শাসন না করলে, ও পরে ডাকাত হবে।"

রাজকুমারী এগিয়ে এসে বলে "কিন্তু বাবা, তোমার প্রহরীরাও তো মিথ্যা বলতে পারে। একে কি চুরি বলো? এ সব আইনের ফাঁকি। যিনি ফুল সৃষ্টি করেছেন তিনিই ঐ ছোট্ট ছেলেটিকে চিনিয়ে দিয়েছেন ফুল ওর মিতা। ওরই তো ফুলে অধিকার।"

রাজা চিন্তিত ভাবে ফিরে যান। সভায় এসে বলেন,—"ছেলেটির বিচার করা হোল না। রাণী ওকে ভিক্ষা চান। রাজকুমারীও আবেদন জানিয়েছেন।" সকলেই নিস্তব্ধ। মন্ত্রী মুখ গম্ভীর করে ব'সে থাকেন। কিন্তু রাজকুমারীর মুখে ফুটে ওঠে হাসি।

অন্তঃপুরে আনা মাত্রই রাজকুমারী ছেলেটির হাত ধরে বলে, "এসো ভাই, ফুলচোর।"

ছেলেটি রাজকুমারীর মুখের পানে ডাগর ডাগর চোখ দুটি মেলে চেয়ে দেখে। তার ভয় তখনো কাটেনি, সে চুপ করে থাকে।

রাজকুমারী আবার বলে, "চল ঘরে যাই।" তুমি ফুল খুব ভালবাসো, না?

এবার ছেলেটি কথা বলে' "হ্যাঁ ভালোবাসি। কিন্তু ফুল নিলে চোর হয়? ওরা বলে, আমি যে চোর!

রাজকুমারী দৃঢ়স্বরে বলে, "ওরা মিথ্যে কথা বলেছে। বাগানের ও ফুল তোমার, তুমি চোর নও, তোমাকে যারা ফুল নিতে দেয় না—তা'রা চোর!"

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পরে সে সরল চোখ দুটি মেলে বলে, "ওরা চোর, আমি নয়। ফুল আমার।"

রাজকুমারী তাকে আদর ক'রে বলে, "আমি তা জানি। ও রাঙা হাতে ফুলের শোভা খোলে। ফুল আর শিশু যে একই রূপে বাঁধা।"

শ্রীদীনেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

হয় তো কাঠের নয় তো টিনের মনে মনে ভাবছো তুমি
কোন কিছু কিছু সে নয়—কথাব ছোট ঝুমঝুমি;
হাত বাড়িয়ে যায় না পাওয়া, বায়না ক'রে মিলবে না
বুকে সবার আপনি বাজে,—বাজনাটি কি চিনলে না?
—শুনছ না ঐ ঝিঁঝিঁর সুরে মৌমাছিদের গানে গানে,
দু'পুরে সে উদাস ঘুঘুর সুর শুনিয়ে তন্দ্রা আসে,
পাতার ঝোপে কাজল কালো বন-কোকিলের কুহু ডাকে
"বৌ কথা কও" অচিন পাখীর কান্নাতে সে লুকিয়ে থাকে,
নতুন ফুলের মঞ্জরীতে ভিড়করা সব অলির সুরে
গুনগুনানি গানের ঝুমুর বনের ছায়ে বেড়ায় ঘুরে
সাতরঙা ঐ প্রজাপতির হালকা পাখার দোল খেয়ে
একলা সে তার গানখানিরে আপন মনে যায় গেয়ে

ফসলভরা মাঠের বুকে নিদ্‌জড়ানো শীতল হাওয়ায়
লতাব বুকে ফুলফুটানোর ভুলমাখানো মিঠে মায়ায়
পাতায় ভরা গাছের ছায়ায় সূর্য্যি ডোবার শেষ বেলায়
পতঙ্গের ঐ গুঞ্জরণের সুর শুনিয়ে সব ভোলায়।
বাজে আলোয়, বাজে ছায়ায়, রৌদ্রেতে আর মেঘলাতে
আকাশ বাতাস সকলখানে, সকাল হ'তে শেষ-রাতে
কারণে আর অকারণে মনে মনে সংগোপনে
একলা বাজা গানখানিরে শোনায় স্বপন জাগরণে
কাজের লোকেব কাজে লাগার তিলেক বালাই নেইক' এই
বাজে লোকের খেলার সাথী হবেজো মোর বন্ধুদের—
আপন ভোলা কিশোর যারা তাদের কচি মুখ চুমি'
ছোট্ট হাতে দিলাম তু'লে তাই তো আমার ঝুমঝুমি।

দাম কিছু নেই, হালকা বড় নিতান্তই ফেলনা সে
পথের মাঝে হঠাৎ পাওয়া খেয়াল-খুসীর খেলনা যে!

মাঘমণ্ডল

বাণীকুমার

[ব্রত-নাট্য]

[কথারম্ভ]

"মাঘমণ্ডল" অনুষ্ঠান পূর্ব্ববঙ্গের ঘরে ঘরে চ'লে আস্‌ছে। পশ্চিম বঙ্গের পল্লীতেও এই ব্রত-নাট্যের প্রচলন দেখা যায়। এই ব্রতটি পালা-নাট্য। "সূর্য্যের গান" এই পালার মূল বিষয়।

"মাঘ-মণ্ডল"-ব্রত পৌষসংক্রান্তি থেকে আরম্ভ ক'রে মাঘীসংক্রান্তি পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এই ব্রতের ছড়ার তিনটী বিভাগ।

প্রথম—শীতের কুয়াশা ভেঙে সূর্য্যের উদয় বা শীতের পরাজয়।

তারপর সূর্য্যের বাল্য-লীলার গান।

সূর্য্যঠাকুর কাঁসারীদের ঘরের আঙিনা দিয়ে,লাল ফুলগুলিকে আরও লাল ক'রে, বামুনদের ঘরের খোলা দরজায় উঁকি মেরে,কলুর বাড়ীর ঘানি-গাছটার ওপর চিক্‌মিকে আলোর তীর হেনে—পূবআকাশে উদয় হচ্চেন। বামুন-মেয়েরা তাঁকে পৈতা উপহার দিচ্চে, মালীর মেয়েরা ফুল যোগাচ্চে, কাঁসারী মেয়েরা দিচ্চে ফুলের মালা আর গৃহ বধুরা দিচ্চে ফলের ডালা। শিশু সূর্য্যঠাকুর অরুণ-অধরে হাস্‌তে হাস্‌ত সেই সমস্ত দান নিচ্চেন।

এর পরে সূর্য্যের অভিষেক।

চন্দনের বাটি নিয়ে সূর্য্যের মা উষা এলেন। কাঁসর, করতাল ও শাঁখ বাজিয়ে পাড়া-পড়সী দিগঙ্গনারা সূর্য্যকে অভিনন্দন দান কর্‌লে।

যে সূর্য্যদেব অনন্ত আকাশে কত দূরে রয়েছেন, তাঁকে প্রাণের ঠাকুর ক'রে ঘরের আঙিনায় এনে উপস্থিত করা হয়েছে। এ স্থলে কামনা হোলো সূর্য্যের অভ্যুদয়।

দ্বিতীয় কথা—সূর্য্যঠাকুর যুবাপুরুষ হলেন। মাধব-কন্যা চন্দ্রকলার সঙ্গে তাঁর বিবাহের পালা। আর সূর্য্যের প্রথমা স্ত্রী গৌরী বা সন্ধ্যার দুঃখ। —এস্থলে বাঙলার ঘরের কথা ফুটে উঠেছে।

তৃতীয় কথা—সূর্য্য ও চন্দ্রকলার পুত্র বসন্ত বা রাতুলের জন্ম ও মাটির সঙ্গে তার পরিণয়।—এ স্থলে পৃথিবীকে ফলে-ফুলে-শস্যে অপূর্ব্বশ্রী ক'রে তোল্‌বার কামনা।

এই পালাটির আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত সূর্য্য ও পৃথিবীর গৌরব-গাথায় পূর্ণ। ঋতু-পরিবর্ত্তনের সময় নবীনের আবির্ভাবে যে নূতন উৎসবের সাড়া প'ড়ে যায়,সেই উৎসব-চিত্রটি বিচিত্র কামনার রঙে অঙ্কিত হ'য়ে থাকে। এই পালাটি গ্রাম্যতটিনীর মত সাবলীল-গতি, ছন্দে ও রসে বিচিত্র।

*

পল্লীর দৃশ্য। শীতের ঘন কুয়াশায় বসুন্ধরা কৃষ্ণাম্বরীর ঘোমটা-পরা অজ্ঞানতমুখী ম্লান বধূর মত সেজে রয়েছে। গ্রামনী, ব্রতিনী ও ব্রতীগণ গ্রামের দীঘির ধারে সকলে শীতের বিদায় কামনা ক'রে সূর্য্যের অভ্যুদয় প্রার্থনা কর্‌ছে। সেই নাট্‌-লীলার মধ্যে রূপ ও রসের প্রকাশ।

নাট্‌ আরম্ভ

[শীতের প্রকোপ]

(ছন্দে ও সুরে)

গ্রামনী—ও শীত, ও শীত।

যাও যাও—আর রইবে কতক্ষণ?

এলো তোমার বিদায়-নেবার ক্ষণ।

(গান)

আজ শীতের শেষ রাতটি ঘন কুয়াশাতে ভারী।

ও শীত, তুমি যাবে কখন্,

থাক্‌বে হেথা' আর কতখন,—

হিমগিরিতে রয় যে তোমার তুহিন-ঘেরা বাড়ী।

সবুজ ঘাসের শীষ্‌গুলি আর রাতের দু'টি ফুল—

একটুখানি বাতাসে যে হোলো দোদুল্‌-দুল্‌।

ফুলবালারা শিশির-ভারে,

পড়লো ঝুঁকে দীঘির ধারে,—

সূর্য্যঠাকুর এসো এসো, শীত দেবে আজ পাড়ি।

[শীতের প্রভাব-সংজ্ঞা গম্ভীর সঙ্গীত]

(গান)

শীত, থামো থামো, এখনো যে হয়নি সময়,

এখনো যে রইবে আঁধার।

এই কুয়াশার তোরণ ঠেলি'

কর্‌বে কে গো আঁধার বিদায়!

গ্রামনী—সূর্য্য আলোর অসি-হাতে

ভাঙ্‌বে যে এই আঁধার-কারা।

শীত—না নাগো না, যায়নি প্রহর,

আমার শাসন হয়নি হারা।

গ্রামনী—সন্ন্যাসী গো, এ কি তোমার কঠিন ধারা!

ব্রতী-ব্রতিনীরা—জেনো জেনো, আস্‌বে যে রায়,

খুল্‌বে এবার পূবের দুয়ার।

আঁধার আলোর লাগ্‌বে সমর,

মান্‌তে তোমায় হ'বে যে হার।

শীত—সময় যখন আস্‌বে তখন

ভাঙ্‌বে জেনো এই কারাগার।

দিয়ে যাবো রায়ের হাতে

আমার গড়া এ-রাজ্যভার।

[সঙ্গীত-মন্ত্র—কিন্তু তা'র মধ্যে দূরাগত বাঁশীর মৃদুতান শ্রুত হোলো]

(ছন্দে ও সুরে)

ব্রতিনী—শীতের শেষ রাত্রি এলো,

যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায় কেন?

আর কতদিন রইবে ধরা

কালোবরণ বসন প'রে হেন?

গান

কুয়াশারি ঘোম্‌টা-ঘেরা ধরা নয়ন বোজে,

ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু-শিশির ঝরায় নিতি ও যে!

দূর থেকে যে বাজ্‌লো বাঁশী,

আস্‌বে কেগো আঁধার নাশি',

(এখন্) গুম্‌রে ওঠে কামনা-সুর সেই অচিনের খোঁজে।

চিনি আমি চিনি চিনি—

সে যে সোনার রায় গো!

ডাকি বসুন্ধরার সনে—আয়—আয়—আয় গো!

আলোর নায়ে অরুণ নেয়ে
আস্‌বে আকাশ-সায়র বেয়ে,
(কখন) লাগ্‌বে তরী পুবের ঘাটে,
আর না পরাণ বোঝে॥
[সঙ্গীতে আশার প্রকাশ—বাঁশীর তান উচ্চতর]

গ্রামনী—ও ব্রতিনী, আস্‌বে রায় আস্‌বে গো আস্‌বে।
সোনার বরণ তনুর আলোয়
আবার ধরা ভাস্‌বে।

ব্রতিনী—ও গ্রামনী, শোন্ গো তবে শোন্,—আমরা ঐ দীঘির ধারে যাই।—ঐ দেখ্,—ঐ মালীর বাগানে ছোট ছোট ফুলবালারা আর গ্রামের ব্রতীরা দীঘির পাড়ে সব পা' মেলে ফুলের আগায় দীঘির জল নিয়ে খেলা কর্‌তে লেগে গেছে।

গ্রামনী—হাঁ গো—তাই তো! পৌষের সংক্রান্তি থেকে মাঘের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত মাঘমণ্ডল ব্রতের নাট্ এই রকম চ'লেই থাকে।—আয় সব শুনি—দীঘির ওপার থেকে নাগেশ্বরের মন্দিরেব মালী কি বলে!

(গান)

ব্রতিনী—ফুলবালারা বল্‌বে,
ফুলেরা সব দুলে দুলে
সুরের সাড়া তুল্‌বে।
নাগেশ্বরের মালী গো
সাজিয়ে ফুলের ডালি গো—
গন্ধ-রঙের মালঞ্চ-দ্বার
চুপি চুপি খুল্‌বে॥
সোনার নূপুর রণিয়া
রায় আসে তাল গণিয়া,
আলোর নাচন হ'বে শুরু,—
সবাই বেদন ভুল্‌বে॥

ঘরণী—ঐ গো, নাট্ শুরু হয়েছে, ফুলবালারা কি শুধুচ্চে, পুষ্প কি উত্তর দিচ্চে, আর নাগেশ্বরের মালী গলা ছেড়ে কি জানতে চাইচে?

(ছন্দ-গীত-সংলাপ আরম্ভ)

(গীতসুরে)

ফুলবালারা—চোখে মুখে জল দিতে কি কি ফুল লাগে?
পুষ্প—ইতল বেতল সকয়া মকয়া দু'টি ফুল লাগে।
(দূর থেকে)
মালী—বলি, কি কি ফুলে মুখ পাখালি?
পুষ্প—কি বলোরে নাগেশ্বরের মন্দিরের ও-মালী!
(সামান্য অন্তর থেকে)
মালী—বলি, কি কি ফুলে মুখ পাখালি?
ফুলবালারা—ইতল বেতল দুই ফুলে।
সকয়া মকয়া দুই ফুলে।
মালী—সেই ফুলে খান্ কি?
পুষ্প—নল ভেঙে জল খান্!

মালী—এ-কি—এ-কি—এই কথাটি ব'লে—
ফুলবালারা, ফুলেরা, সব গায়ে পড়ে ঢ'লে।
ফুলবালারা—যে জল ছোঁয় না লো বগে কাগে,—
সে জল ছুঁই মোরা দুর্ব্বার আগে।

ঘরণী—দেখলো চেয়ে, কুয়াশার ঘোর কাটাবার জন্যে—ব্রতীরা, ফুলবালারা, ফুলেরা, সকলে অ-ছোঁয়া পুকুরের পরিষ্কার জল মুখে-চোখে দিচ্চে।—আর ঐ আসচে সাজি হাতে মালিনী। দেখো গো দেখো—এই কাণ্ড দেখে মালিনী রঙ্গ-ভঙ্গে হেসে লুটিয়ে পড়চে।

(হাস্‌তে হাস্‌তে মালিনীর আগমন)
(গীতসুরে)

মালিনী—ফুলেরি গন্ধজল দীঘির 'পরে ভাসে।
ফুলবালারা—তাই না দেখে মালিনী ওই চপল-সুরে হাসে।
(সহাস্যে)

মালিনী—এ কি! এ কি! আজ যে ফুলের গন্ধজল দীঘির বুকে ভাসচে! ও মা—এই শীতের রাত না পুইয়ে যেতে গেরস্তর মেয়ে তোমরা—এই আঘাটায় কেন গো?

ব্রতিনী—হেসো না গো—হেসো না। বলি—মালিনী, আমরা মাঘমণ্ডল ব্রত করচি, এখন মনের মত ঘাট পাবো কোথা'?

(গীতসুরে)

মেয়েরা—হাসিস্ না লো, খুসিস্ না লো, তুই তো মোদের সই।
মাঘমণ্ডল ব্রত করি, ঘাট পাবো কই?
মালিনী—আছে—আছে লো ঘাট, বামুন-বাড়ীর ঘাট!
মেয়েরা—রাত পোহালে বামুনগো পৈতে ধোয়নের ঠাট।

ঘরনী—সেখানে আমরা যাবো না লো মালিনী, জল ভালো নয়।

(সুরে)—পৈতে-কচ্‌লানো জল পুকুরেতে ভাসে।
মালিনী—আছে—আছেলো ঘাট, গোয়াল-বাড়ীর ঘাট।
মেয়েরা—গয়লা লো দই-ক্ষীরের হাঁড়ি-ধোওনের ঠাট।
মালিনী—নাপিত-বাড়ীর ঘাট?
মেয়েরা—নাপিতগো খুর-ধোওনের ঠাট।
মালিনী—ধোপা-বাড়ীর ঘাট?
মেয়েরা—ধোপাগো কাপড়-ধোওনের ঠাট।
মালিনী—ভূঁইমালির ঘাট!
মেয়েরা—ভূঁইমালি গো কোদাল-ধোওনের ঠাট।
মালিনী—(সহাস্যে) মেলেনী বুড়ির ঘাট?
মেয়েরা—মেলেনী-বুড়ির ফুল-ধোওনের ঠাট।

মালিনী—তা'হ'লে ব্রত কর্‌বার ঘাট খুঁজে পাবে কোথা'? এই পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালায় সাজিয়ে একটা নতুন ঘাট তৈরী কর্‌তে হ'বে। কিন্তু একটা কথা বলি, ব্রত করচো, ফুল-তোলার পালা কি সাঙ্গ হয়েচে? সবার হাতে সাজি, তা'তে নানান্ রকম ফুল কই গো?—সুর্‌যি-ঠাকুরকে তো অঞ্জলি দিতে হ'বে!

ঘরণী—আমরা ফুলের মালঞ্চে ঢুকলে মালী যদি কিছু বলে?

মালিনী—আমার সঙ্গে এসো গো তোমরা। ব্রত করবে, ফুল তুলবে না? ঐ এসেছে নাগেশ্বরের মন্দিরের মালী। ফুল-তোলার পালা শুরু করো। ঐ শোনো গো—মালী কি বলে!

(গান)

মালী—আধাগাজে কড়বিষ্টি, আধাগাজে মালী,—
মধ্যিখানে প'ড়ে রয়েচে জৈতিফুলের ডালি।

মেয়েরা—কৈ যাস্ লো মালিনী ফুলের সাজি লইয়া?

মালিনী—ফুল ফুটেচে নানারঙের, ডাল পড়েচে নুইয়া।

সকলে—আগের ফুল তুলিস্ না লো কলি-কলি।
গোড়ের ফুল তুলিস্‌নালো বাসি বাসি।

মালিনী—মাঝের ফুল তুইলা আনিস্ নাগেশ্বরের মালী।
নাগেশ্বরের মালীরে!
কোন্ কোন্ ডালে রাঁধিলি-বাড়িলি!
কোন্ কোন্ ডালে খাইলি-লইলি!
কোন্ কোন্ ডালে নিশি পোহাইলি!

মালী—জইতের ডালে রাধিলাম-বাড়িলাম,—
অতসীর ডালে খাইলাম-লইলাম,
গাঁদার ডালে নিশি পোহাইলাম।

সকলে— জইত্ গাছে কে!
ডাল নামাইয়া দে।
সুর্য্যিঠাকুর চাইচেন ফুল,—
সাজি ভরিয়া দে।

(মালিনীর ছন্দ-সুরে প্রতি উক্তির পর চার মাত্রা ছাড়)

মালিনী—অতসী ফুলে সাজি কর্…
গাঁদা ফুলে মালা কর্…
জইত্ ফুলে মুকুট কর্—
নাগেশ্বরে তোড়া কর্…
হয়েচে গো—হয়েচে ফুল-তোলা?—

(গান)

সকলে – ফুলতোলারি পালা এবার সাঙ্গ হোলো,
ফুলের সাজি রঙে রঙে ভ'রে তোলো।
ব্রতিনী—সকল জাতির ফুল নেবেগো সুরুয্ঠাকুর,
আকাশ-পারে রন্ গো তিনি আর কতদূর!
সকলে—কুয়াশা-দ্বার ভাঙো ভাঙো, আড়াল খোলো।
নাগকেশরের ডালে ঝুলন দোলো দোলো।

[কুয়াশা-ভাঙার প্রাকৃত সুর-বিস্তার]

ব্রতিনী—ফুল-তোলার পালা তো এইখানে সাঙ্গ হোলো। এবার ঐ নাগেশ্বর ফুলগাছের সামনে আমরা কুয়াশা ভাঙার অভিনয় শুরু করি আয়।—কুয়াশার দুয়ার না খুললে তো সূর্য্যঠাকুর আসতে পারবেন না!

(বেত্রলতা হাতে মেয়েরা জলে আঘাত ক'রে ছন্দে-তালে বাজাতে বাজাতে গান আরম্ভ করলে)

গান

মেয়েরা—কুয়া ভাঙুম, কুয়া ভাঙুম, বেত্‌লার আগে।
সকল কুয়া গেল ওই বরই গাছটির আগে।
ওরে রে বরই গাছ, ঝুলন দে ঝুলন দে।
দে দে বরইয়ে ঝুলন দে ঝুলন দে।
মালিনী—নাগকেশরের শিরের টোপর আকাশেতে লাগে
কুয়াশা-দ্বার খুলে বুঝি সুরুয্ঠাকুর জাগে।
সকলে—কুয়া ভাঙুম, কুয়া ভাঙুম, বেত্‌লার আগে—

(নিম্নসুরে বারংবার অনুবৃত্তি)

ব্রতিনী—বেত্রলতায় আগে জল ছিটিয়ে কুয়াশাভাঙার পালা অভিনয় হোলো। এবার সকলে মিলে সূর্য্যঠাকুরের স্তব করতে হ'বে। সূর্য্যঠাকুর উঠবেন আকাশের আঙিনায়, আলোর রথে আসবেন ধরার কোলে, আর অরুণ অধরে হাসতে হাসতে তুলে নেবেন আমাদের রাঙাফুলের ডালা।

(গান)

ওঠো ওঠো সূর্য্যঠাকুর রচি' আলোর মালা গো!
তোমার লাগি' সাজিয়ে তুলি রঙীন্ ফুলের ডালা গো।

(সকলে এই গানে যোগ দিলে—
—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বাশায় সঙ্গীত-বিবাশ)

মালিনী—সূর্য্যঠাকুরকে ডাকচি, সূর্য্যঠাকুর তো সাড়া দিচ্চেন না! এ কুয়াশা-ভরা অন্ধকার কি কাটবে না? একটু যেন পূব দিক্‌টা চিক্‌চিক্ ক'রে উঠেচে, নয়?

ব্রতিনী—সূর্য্যঠাকুর ঐ পূবের দুয়ার একটুখানি ফাঁক ক'রে মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্চেন। আশা আমাদের পূরবে, কুয়াশা এই ভাঙবে, সূর্য্য দেবেন সাড়া।

(গীতসুরে)

মেয়েরা—উঠো উঠো সূর্য্যঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া।
সূর্য্য—(দূর থেকে) না উঠিতে পারি আমি শিশিরের লাগিয়া।
মালিনী—ইয়লের পককোটি শিয়রে থুইয়া—
উঠিবেন সূর্য্য কোন্‌খান্ দিয়া?

ব্রতিনী—হলো মালিনী, সূর্য্য—আকাশ-পারাবারের ঐ পূবের কূল থেকে আলোর তরী চালিয়ে সেরা ভুবনের ঘাটে এসে উঠবেন। সে যে পৃথিবীর সোনার ঘাট, তা'র খোঁজটা আমরা কেমন ক'রে পাই

গান

মালিনী—সূর্য্যঠাকুর উদয় হ'বে কোন্ সে ভুবন ঘাটেরে!
অভ্র-বুকে আবীর আঁকি' আসবে মোহন নাটেরে!
ব্রতিনী—ওঠো ওঠো সূর্য্যঠাকুর রচি' আলোর মালা গো!
তোমার লাগি সাজিয়ে তুলি রঙীন ফুলের ডালা গো!
মালিনী—তোমার আসন রয় যে পাতা নতুন কুঞ্জ-বাটেরে!
ব্রতিনী—আকাশ-সনে হোলি খেলি' এসো নাটের ঠাটেরে।

(অস্ফুট সুদূরাগত বংশীরব)

মালিনী—দূর থেকে আলোর বাঁশী শোনা যাচ্চে—ওই! —আর কত দেরী, সূর্য্যঠাকুর এলেন ব'লে!

(গীতসুরে)

মেয়েরা—শীতের রচা' ইন্দ্রের আড়াল তুলিয়া—
উঠিবেন সূর্য্য গো কোন্‌খান্ দিয়া ?

মালিনী—উঠিবেন সূর্য্য বামুন-বাড়ীর ঘাটখান্ দিয়া।

মেয়েরা— উদয় হও উদয় হও,
সূর্য্যঠাকুর উদয় হও,
পুব্ আকাশে উদয় হও,
বামুন-ঘাটে উদয় হও,
রাঙা ফুলের ডালা লও,
অরুণ-রঙে উদয় হও।

সূর্য্য—(দূর থেকে) না না না না,
জাগ্‌তে যে পারি না !
যদি শিশির না যায়—
আমি জাগ্‌তে যে পারি না !

মেয়েরা—তবে উঠিবেন সূর্য্য কোনখান্ দিয়া ?
মালিনী—গোয়াল-বাড়ীর ঘাটখান্ দিয়া।
ব্রতিনী—যদি না ওঠে ?

মালিনী—উঠ্‌বে তবে পড়শী-ঘাটে,
তবু না হয় মৎস্য-ঘাটে,
না হয় যদি—পঙ্কঘাটে।

ব্রতিনী— তবু যদি না ওঠে গো
সূর্য্যঠাকুর ও-সব ঘাটে !

মালিনী—উঠবে জেনো স্নানের ঘাটে,
হয়তো ক'নে বউ-এর ঘাটে।

ব্রতিনী—মালিনী, অনেক ঘাটেরই তো নাম করলে, কিন্তু কোনো ঘাটে তো সূর্য্য উদয় হলেন না। আমার মন বলে—বুড়ি-মালিনীর ঘাটে সূর্য্য উঠ্‌বেন কুয়াশা ভেঙে, ওখানে ফুলের সুগন্ধি-জল দীঘির বুকে ভাসচে।

(দূর থেকে ক্রম-নিকটবর্ত্তী গান শোনা গেলো)

—চেয়ে দেখ্—বল্‌তে না বল্‌তেই ঐ দিকটা জবার মত রাঙা হ'য়ে উঠলো।—ঐ গো—সূর্য্যঠাকুর উঠলেন—নতুন আশার সুর শুনিয়ে দিয়ে।

(গান)

সূর্য্য—ওগো মালিনী !
আলোর খেয়া থাম্‌লো ঘাটে,
দ্বিধা মানিনি।
ফুলের কত দল
সুবাস করে সরোবরের জল,
বকুল বেথা' ঝরে' ঝরে'
ছোটায় পরিমল,—
তাই রইতে পারিনি।
থাম্‌লো খেয়া তোমার ঘাটে—ওগো মালিনী।

(বাঁশীতে আনন্দ তান)

ভ্রমর তোলে গুনগুনিয়ে আগমনী সুর,—
তাইতো ধরার সিঁথি রাঙায় অরুণ-সিঁদুর।
পাখীরা গান গায়,
আকুল হ'য়ে বইচে মধুর বায়
দোলে আমের মঞ্জরী ঐ বনের বীথিকায়,
যেন সুধা-শালিনী।
থাম্‌লো খেয়া তোমার ঘাটে, ওগো মালিনী।

মালিনী—ওলো, শুন্‌লি—পেলি বার্ত্তা! সূর্য্যঠাকুর উদয় হয়েচেন মালিনী-ঘাটে। শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়ে ওঁকে অভিনন্দন দে'। ব্রতিনীরা, সব শাঁখ বাজা'।—

(শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনি—
এর সহযোগে সূর্য্যোদয় মুহূর্ত্তের
সঙ্গীত-রাগিণী-ঝঙ্কার—)

ব্রতিনী—আয় গো—আমরা সবাই মিলে সূর্য্যঠাকুরকে প্রথম অঞ্জলি দিই…

(গান)

লও লও সুরুযঠাকুর, লও ফুলের পানি।

(ব্রতিনীদের সম্মেলক কণ্ঠে এই
অভিবন্দনা-গান গীত হোলো)

লও লও সুরুযঠাকুর, লও ফুলের পানি।
সাতজল পানির মাঝে একজল সোনা।
লও লও প্রাণের ঠাকুর বকুল-ফুলদানি।
কেশর-রেণু দিয়া পথে আঁকিনু আল্‌পনা।
বামুনমেয়ে পৈতা দিলাম লও হাসি' হাসি',
মালীর মেয়ে ফুল দিলাম লও রাশি রাশি,
ফুলের থালা দিলাম মোরা লও ভালোবাসি',—
যা' কিছু সব দিলাম পা'য়ে যায় না তা'রে গোনা।
লও লও সুরুযঠাকুর, লও আমের বউল !
কও কও সুরুযঠাকুর, নাচ্‌বে কবে লাউল !
আগুন-বরণ যানে তুমি আগুন-বরণ আইলে,
সোনার দু'টি হাতে তুমি কতই যে দান পাইলে,
রাঙা ঠোঁটে আলোর বাঁশী, সুরে সুরে গাইলে,
গানের সাজি দিলাম আজি, পুরাও গো কামনা।

(সূর্য্যোদয়ে আনন্দ-সঙ্গীত
ও মৃদু শঙ্খধ্বনি)

(গান)

সূর্য্য— আমি চরণ রাখি কাঁসারীদের ঘরের আঙিনায়।
মালীদের ঐ বাগানগুলি আমার ছোঁয়া পায়,
লালফুলের ঐ দলে আরো লাল করিয়া যায়,—
উকি মারি বামুনদের ঐ খোলা দরজায়।
কলুর বাড়ীর ঘানির 'পরে চিক্‌চিকে তীর হানি',
মুঠো মুঠো আলো ঝরায় আমার হিরণ-পাণি,—
অরুণ-রসে রাঙা করি মাটির পরাণখানি ;—
মাধুরী ঐ ফুটে ওঠে আমার মহিমায়।
মৌমাছিরা আলোর মধু ভর্‌লো পেয়ালায়।

(তিমির-জয়ের সঙ্গীত)

ব্রতিনী—ঐ দেখোগো, সূর্য্যের মা উষা চন্দনের বাটি হাতে আস্‌চে পাড়াপড়্‌শী দিগঙ্গনাদের সঙ্গে নিয়ে। সূর্য্যঠাকুরের বুঝি অভিষেক হ'বে !

ঘরণী—তাই বুঝি কাঁসর, করতাল, মন্দিরা, শাঁখ—সব বাজিয়ে পাড়াপড়শীরা সূর্য্যকে অভিনন্দন দিতে এলো! আয়লো, আমরাও অভিষেক-উৎসব করি।

(অভিষেক-উৎসব-সূচক সঙ্গীত-বাজনা)

[অভিষেক-আরতি]

আজি অরুণফাগের গুঁড়া ছড়িয়ে দে'—
আজি গন্ধ চন্দন গুঁড়া ছড়িয়ে দে'—
আজি শ্বেত-কর্পূর গুঁড়া ছড়িয়ে দে'—
আজি নানারঙের ফুলে ভরিয়ে দে'—

ব্রতিনী—ওলো—বাজা শাঁখ, বাজা কাঁসর, বাজা ঘণ্টা। চন্দন-জল ছিটিয়ে দে' সূর্য্যঠাকুরের গায়। পরিয়ে দে'—সূর্য্যের গলায় অরুণ-রাঙা মালা, সোনার বরণ পাটের কাপড়, আর অলঙ্কার-ভূষণ। তারপরে—আমরা তাঁকে মাঝে রেখে সাতবার ঘুরে আসি, আয়।

(করণ-কারণ)

(গান)

ও আমার সুরুযঠাকুর!
ধরো ধরো সোনার অঙ্গে
অরুণ-বরণ বাস।
আলোক-চোরায় করেচো নিরাশ।
আকাশ থেকে এলে তুমি
আলোর স্রোতে ভেসে,
হিরণ-পাণি বাড়িয়ে দিলে
ধরার হাতে—হেসে।
শ্যামল মাটি তোমার আসন
পাতে সকলখানে;
মৌমাছি আর পাখী মাতে
তোমার গুণ-গানে।
ও সুরুযঠাকুর—!
আজকে তুমি কিরণ-মালী
হয়েচো প্রকাশ,
বরণ-ডালা সাজিয়ে মোরা
করনু অধিবাস॥

(চন্দন-জল ছিটানো
পুষ্প-বিকীরণ প্রভৃতি,—
সঙ্গীতে ছন্দ-বিলাস)

ঘরণী—এবার অভিষেক-আরতি শেষ করি, আয়। সকলে মিলে সূর্য্যঠাকুরকে পুজো নিবেদন করি। সূর্য্যকে খুব আপনার ক'রে বরণ করতে না পারলে—আমরা প্রাণ পাবো কি ক'রে?—আয় প্রণাম করি।—

(আরতি শাঁখ-ঘণ্টা)

(গীতসুরে)

তোমার আলোর প্রসাদখানি
মাগিয়া নিই।
কত ফুলের মালা গেঁথে
অঞ্জলি দিই।

স্তব

"নম নম দিবাকর ভক্তির কারণ।
ভক্তিরূপে নাও প্রভু জগৎ-কারণ।
ভক্তিরূপে প্রণাম করিলে তুয়া পায়।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি করেন প্রভু দেবরায়।"—

(আরতি-শঙ্খ)

সূর্য্যের-অভিষেক আরতি ব্রতীগণ সম্পন্ন করলে।—

কিশোর সূর্য্য হ'য়ে উঠলেন তরুণ যুবক। সূর্য্য তখন দীপ্তি পেতে লাগলেন নবীন তরুণ রূপে। তাঁর রৌদ্রের অরুণ-রসে সকলে করলে স্নান, তাঁরই মোহন বিকাশে নিখিল-বিশ্বে অপরূপ হ'য়ে ফুটে উঠলো মাধুরী।

এবার বসন্তের কন্যা চন্দ্রকলার সঙ্গে সূর্য্যের প্রেমের ক্ষুদ্র একটি রূপক-চিত্র আঁকা হয়েছে। প্রকৃতির নিয়মে সূর্য্যের পূর্ণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রের বিমল কিরণ ফুটে ওঠে।—সূর্য্যের আলোর মিলনে চন্দ্রের প্রকাশ। তাই আমাদের তরুণ সূর্য্যঠাকুর ও মাধব-কন্যা চন্দ্রকলার বিবাহ-পর্ব্ব এখানে শুরু হোলো।—

সূর্য্য-সখা অরুণ সূর্য্যের সেই পূর্ব্বরাগের বার্ত্তাটি ঘোষণা করলেন।—

(গান)

সূর্য্যসখা—বামুনের মেয়েরা সব মেলে যে নীল শাড়ী,—
তাই দেখিয়া সুরুয্ বিয়ার সাধ করেচে ভারী।
গৌরী-মেয়ে ছড়িয়ে দেছে কোঁকড়া-কালো চুল,—
তাই দেখিয়া সুরুয্ বিয়ায় হয়েচে আকুল।
শ্যামল মেয়ে রাস্তা দিয়ে মল্ বাজিয়ে যায়,—
তাই দেখিয়া সুরুয্ঠাকুর বিয়া করতে চায়।
আলোর মালা হাতে নিয়া ফেরেন বাড়ী বাড়ী,—
সুরুয্ঠাকুর করবে বিয়া, সাধ হয়েছে ভারী।

বৈতালিক—ও সূর্য্যিঠাকুরের মিতে অরুণঠাকুর—তুমি কি খোঁজ পাওনি—সূর্য্যিঠাকুর কা'কে করবেন বিয়ে?

সূর্য্যসখা—কি হে বৈতালিক, তুমি আবার সূর্য্যের বাড়ীর সামনে কি এমন নতুন কথা শোনাতে এসেচো?

বৈতালিক—মধুমাসের চন্দ্রকলার কথা।

সূর্য্যসখা—ও—সেই মাধবের কন্যা রূপসী চন্দ্রকলা!

বৈতালিক—সূর্য্যিঠাকুর এই কন্যাকে দেখে পাগল হ'য়ে গেছেন।

সূর্য্যসখা—তাই বুঝি সূর্য্যঠাকুর দেশে দেশে ফিরে বেড়াচ্চেন—আলোর বর-মালা হাতে ক'রে?—দেখো বৈতালিক, সূর্য্যের সখা আমি, আমাকে তুমি সব খবর খুলে বলতে পারো। শুনিয়ে দাও দেখি—তোমার কথাটা!—

(গান)

বৈতালিক—চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া দিছেন কেশ।
তাই দেখিয়া সূর্য্যঠাকুর ফিরেন নানা দেশ॥
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া দিছেন শাড়ী।
তাই দেখিয়া সূর্য্যঠাকুর ফিরেন বাড়ী বাড়ী।
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা গোলখাড়ুয়া পা'য়।
তাই দেখিয়া সূর্য্যঠাকুর বিয়া করতে চায়॥

সূর্য্যসখা—তা' বিয়ে করতে চাইবেই তো—তরুণ সূর্য্য! তা'হ'লে আর দেরী কেন? শুভক্ষণে—এইবার মধুমাসের চন্দ্রকলার সঙ্গে সূর্য্যের বিয়ের পালাটা আরম্ভ হোক্। উৎসবের কোলাহল উঠুক্—।

(সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সূর্য্য ও চন্দ্রকলার মিলনের পূর্ব্বোল্লাস)

তরুণ সূর্য্যের সঙ্গে নবীনা চন্দ্রকলার মিলন হোলো।—

এর পূর্ব্ব থেকেই মধুমাসের চন্দ্রকলার সঙ্গে সূর্য্যের বিয়ের পালা আরম্ভ হ'য়ে গেছে। ব্রতীরা অনন্ত আকাশের দূর-দূরান্তরের সূর্য্যকে একেবারে ঘরের আঙিনায় এনে উপস্থিত করেছে।

এইখানে চন্দ্রকলাকে দীর্ঘকেশ গোল-খাড়ুয়া-পা'য় একটি রূপসী বউ—কল্পনা করা হয়েছে ও সূর্য্যঠাকুরকে রাজা-বর, আর সেই সঙ্গে সূর্য্যের মা উষা, চন্দ্রকলার মা ও বাপ গ'ড়ে নিয়ে মানুষের নিজের মনের মধ্যে শ্বশুর-বাড়ী ও বাপের বাড়ীর যে-সমস্ত ছবি আছে, সূর্য্যের রূপক-ছলে সেইগুলিকে মূর্ত্তি দেবার চেষ্টা দেখা যায়।—

এবার বিবাহ-উৎসবের নাট্ শুরু হোলো।

ব্রতী-ব্রতিনীরা (গীতারম্ভ)

(গান)

দীঘল তা'র কেশ,
আর পায়ে মোটা মল্,—
ক'নে চন্দ্রকলা—
আহা রূপে ঝলমল্।
রাজপুত্তুর বর—
কিবা আলো করে ঘর,
সূর্য্যের মা উষা—
আজ সাজায় কমল-দল॥
চন্দ্রকলার মা—
বরণ ক'রে যাও!
চন্দ্রকলার বাপ—
কি আছে দান দাও!
সূর্য্যে চায় চাঁদ—
তাই পাতলো আলোর ফাঁদ,
মিলন হোলো দোঁহে,
তায় সাগর টলমল্॥

(উৎসব সমারোহ—গাথা-সঙ্গীত)

সূর্য্য ও চন্দ্রকলার মিলন হোলো।

কুঞ্জ-বাসর ঘর। বাসর-ঘরে চন্দ্রকলা ও সূর্য্য ঠাকুর। বাসর-কুঞ্জে বিয়ের রাত পুইয়ে এলো। ঝলমলে আলোর রূপ নিয়ে কুঞ্জের দ্বারে এসে দাঁড়ালো প্রভাত।

ক'নে বউ চন্দ্রকলাকে বর সূর্য্যের সঙ্গে তাঁর গৃহে যেতে হ'বে এই কথা ভেবে—চন্দ্রকলা পল্লীর নব-বিবাহিতা সরলপ্রাণা কন্যার মত কেঁদে ফেল্লেন। তিনি প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন করতে লাগলেন স্বামীকে। স্বামী সকল রকম উত্তর দিয়ে বধূকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন। এই সূর্য্যের গানে দেবতারা মানুষের ঘরে এসে লীলা করছেন, তাঁদের যেন আমরা আপনার জনের মত কাছে পেয়ে থাকি। সেই চিত্রেরই প্রকাশ—

গান

চন্দ্রকলা (সনিশ্বাসে) কাউয়ায় করে কলমল্
কোকিল করে ধ্বনি।
কুঞ্জ-বাসর ঘরে তোমায়
নমি দিনমণি।

(ছড়ার সুরে আবৃত্তি)

তোমার দেশে যাবো সূর্য্য,
মা বলিব কারে?

সূর্য্য— আমার মা তোমার মা,
মা বলিও তা'রে।

চন্দ্রকলা— তোমার দেশে যাবো সূর্য্য,
বাপ বলিব কা'রে?

সূর্য্য— আমার বাপ তোমারো তাই,
বাপ বলিও তা'রে।

চন্দ্রকলা— তোমার দেশে যাবো সূর্য্য,
বোন্ বলিব কারে?

সূর্য্য— আমার বোন্ তোমার আপন,
বোন্ বলিও তা'রে।

চন্দ্রকলা— তোমার দেশে যাবো সূর্য্য
ভাই বলিব কা'রে?

সূর্য্য— আমার ভাই তোমার সোদর,
ভাই বলিও তা'রে।

(পাখীর কল-কাকলি)

(গীতসুরে)

চন্দ্রকলা—কাউয়ায় করে কলমল্,
কোকিল করে ধ্বনি।
কুঞ্জ-বাসর-ঘরে তোমায় নমি দিনমণি।

(ছন্দ-সুরে)

সূর্য্য—চন্দ্রকলা, ও ক'নে বউ, চোখে যে জল ঝরে!
নৌকা-যোগে নিয়ে তোমায় যাবোই আমার ঘরে।
ঐ এসেছেন মা গো তোমার, বাপ এসেছেন আর,
বিদায় চেয়ে নাওগো এবার, যাবে নদীর পার।

চন্দ্রকলা—পরের বাড়ী যেতে আমায় দিয়োনা গো মা!

মা—(কান্নার সুরে) কি করবো, মেয়ে যে তুই—শ্বশুর-ঘরে যা'।

চন্দ্রকলা—বাবা, আমায় পাঠিয়ো না গো পরের বাড়ীতে!

বাবা—আর কেমনে পারি তোরে ঘরে রাখিতে!
সভার মাঝে মন্ত্র প'ড়ে পরকে স'পিলাম,
তোর ও-কথা রাখতে মা-গো, আমি নারিলাম।

মা—খাও খাও চন্দ্রকলা 'নাইওরের ভাত,'—
সূর্য্যঠাকুর নিয়ে তোমায় যাবে সাথে সাথ।

বধূ চন্দ্রকলা গ্রাম্য মেয়ের মত 'নাইয়রের' অর্থাৎ বাপের বাড়ীর ভাত খেয়ে বাপ-মার কোল থেকে বিদায় নেবার সময় ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন। সূর্য্য নৌকাযোগে নদীর পারে তাঁর অরুণ-গৃহে বধূকে নিয়ে চললেন। পথের মাঝে তাঁর সমৃদ্ধির কথা শুনিয়ে বধূকে করলেন শান্ত।……………এই রূপকের অর্থ এই যে—শীতের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য যেমন নবীন কিরণে উদয় হন, সেইরূপ চন্দ্রও উজ্জ্বল-মহিমায় জেগে ওঠেন। মেঘের আড়ালে চন্দ্র লুপ্ত হ'য়ে ছিলেন, শীতের অবসানের পর সূর্য্য-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্র অপূর্ব্ব রূপে দীপ্ত হন। সূর্য্যের আলোর সঙ্গে চন্দ্রের অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ, তাই সূর্য্যের বধূরূপে কল্পনা করা হয়েছে চন্দ্রকলাকে। মেঘের নদী পার ক'রে সূর্য্য আকাশ 'পরে চন্দ্রকে বিকাশ ক'রে তোলেন। আর এই সময় শীতের জড়তা নাশ হয়, চারিদিকে কাজের সাড়া প'ড়ে যায়। দিকে দিকে আলোর পরিণয়ে আনন্দ-হিল্লোল বইতে থাকে।

সূর্য্যের প্রথমা স্ত্রী গৌরী বা সন্ধ্যার দিন ফুরিয়ে যায়। চন্দ্রকলাই হন কামনা'র বস্তু। সূর্য্য-সঙ্গিনী চন্দ্রকলার সেই গমনের চিত্রটি চোখের 'পরে বিকশিত হ'য়ে ওঠে।

(নদীতে তরণী-বাওয়া)

(ছন্দে ও সুরে)

চন্দ্রকলা—ও মাঝি ভাই, তাড়াতাড়ি নৌকা বেয়ো না।
মা কাঁদ্‌চেন, ধীরে ধীরে নৌকা চালাও রে!
ঐ কান্না যেন একটুখানি শুনতে কাণে পাই।
অচেনা আজ ঘরে যাবো, দরদ্ জানাও রে!

(মন্দগতিতে তরী-বাওয়া)

ও স্বামীগো সুরুষ ঠাকুর, যাচ্চি তোমার সাথ,
ক্ষুধা পেলে, কোথায় আমি পাবো বলো ভাত!

সূর্য্য— স্নেহের আমার চন্দ্রকলা, ভাবনা তোমার মিছে,—
শত শত চাষী আমি নিয়োগ করেছি যে!
মাঠে তা'রা খাটচে শুধু, গাইচে চাষের গান,—
তোমার তরে তৈরী করে সরুচালের ধান।

চন্দ্রকলা—ও স্বামীগো সুরুষ ঠাকুর, যাচ্চি তোমার সনে,
কোথায় আমি পাবো বলো পরণ-বসনে!

সূর্য্য— শত শত তাঁতি মিলে বুন্‌চে তোমার বাস,
চন্দ্রকলা, ও বধূ মোর, মিটবে সকল আশ।

চন্দ্রকলা—ও স্বামীগো সুরুষ ঠাকুর, যাচ্চি তোমার সাথে,
কে সেখানে পরিয়ে দেবে শাঁখা আমার হাতে!

সূর্য্য— রাজ্য জুড়ি' শাঁখারী সব বসিয়ে দিছি আমি,
তোমার লাগি' গড়চে তা'রা শাঁখা দামী দামী।

চন্দ্রকলা—(কান্না-সুরে) সত্যি তোমার মা কি আমায় নেবেন বুকে তুলি'!

সূর্য্য— দ্বিধা কেন, আদরে তাঁর সকল যাবে ভুলি'।

(তরী থাম্‌লো)

এসো এবার কূলে উঠি, চলো আমার গেহে।
তোমায় দেখে ঊষামাতা নেবেন কোলে স্নেহে।

(নব বর-বধূর বরণ—সঙ্গীত-বিলাস—
আনন্দ-কোলাহল—)

পড়শী— বিয়ে কর্‌লেন সূর্য্যঠাকুর, দানে পাইলেন কি?

(গানের সুরে)

বৈতালিক হাতী-ও পাইলেন, ঘোড়াও পাইলেন, আর মাধবের ঝি।
খাট পাইলেন, জাজিম পাইলেন, আর মাধবের ঝি।
লেপ পাইলেন, তোষক পাইলেন,
ঘটি পাইলেন, বাটি পাইলেন,
থালা পাইলেন, ঘোরা পাইলেন, আর মাধবের ঝি।

পড়শী— মায়ের জন্য আন্‌চেন কি?

বৈতালিক—শাঁখা সিঁদুর।

পড়শী— বাপের জন্য আন্‌চেন কি?

বৈতালিক—হাতী-ঘোড়া।

পড়শী— বোনের জন্য আনচেন কি?

বৈতালিক—খেলানের সাজি।

পড়শী— সূর্য্যের ঐ আগের স্ত্রী গৌরী ব'সে দুখী।
শোনো এবার বলি তোমায় একটু চুপি চুপি।
(চাপাগলায়) সতের জন্য আন্‌চেন কি?

বৈতালিক—কুঁইয়াপুঁটি।

(সন্ধ্যা-গৌরীর গেল কানে)

গৌরী— খাবো না লো, খাবো না লো, শিয়রে থোবো।
রাতখান্ পোহাইলে কাউয়ারে দোবো।

বৈতালিক—ব'য়েই গেলো, সন্ধ্যা-বধূর দিন নেই আর—!—

(শাঁখ ও হুলাহুলি)

ওই দেখো গো,—
শাঁখ বাজিয়ে, উলু দিয়ে,
ক'নে-বরণের ডালি নিয়ে,—
আস্‌চে যত পুরনারী কলকলিয়ে—
ঝুমুর ঝুমুর মল্ বাজিয়ে।

(উল্লাস-চিত্র)

মেয়েরা — উচু উচু দেখা যায় বড় বড় বাড়ী।
ঐ যে দেখা যায় সূর্য্যের মা-র বাড়ী।
আয়লো সব আমরা ঊষার বাড়ীর দ্বারে গিয়া—
ধাক্কা দিয়া জানাই কথা হুলাহুলি দিয়া।

[শঙ্খধ্বনি ও হুলাহুলি—

পুরনারী— সূর্য্যের মা লো, কি করো দুয়ারে বসিয়া?
তোমার সূর্য্য আস্‌তেচেন জোড়-ঘোড়ায় চাপিয়া।

ঊষা— ভালো কথা, শুভ কথা, জানি আমি সব।
আজকে তোরা পুরনারী কর্ লো কলরব।

[আনন্দ-ধ্বনি—

আস্‌চেন সূর্য্য বস্‌বেন খাটে,
নাইবেন ধুইবেন গঙ্গার ঘাটে,
গা' হেলাবেন সোনার খাটে,
পা'-মেলাবেন রূপার পাটে,
ভাত খাইবেন সোনার থালে,
বেন্নন খাইবেন রূপার পেয়ালে,
আঁচাইবেন ডাবর ভরা,
পান খাইবেন খিড়া খিড়া,
সুপারী খাইবেন ছড়া ছড়া,
*য়ের খাইবেন চাকা চাকা,
চুন খাইবেন খুচুরী ভরা,
পিক্ ফেলাইবেন লাখা লাখা।

[উৎসবানন্দ সঙ্গীত-বাজনা—

বৈতালিক—(গীত-সুরে)
ঐ গো আসেন সূর্য্যঠাকুর
মোহন বরের বেশে।
চন্দ্রকলা-বধূ লয়ে' ঢোকেন আপন দেশে।

[প্রাকৃত নৃত্য ও তদুপযোগী সঙ্গীত—

[নট-নটীর নৃত্য-গীত]

নট—সোনার বাটি ঝুমুর ঝুমুর মিষ্টি বাটির তৈল।
তাই লইয়া সূর্য্যঠাকুর নাইতে গেলেন কৈ লো।
নাইয়া-ধুইয়া বাটি থুইলেন কৈ লো॥
নটী—বাটি বাটি কুমার বাটি, সকল পুড়িয়া গেল।
লক্ষ টাকার বাটি আমার হারাইয়া গেল।
নট—গেছে গেছে ইহ বাটি আপদ-বালাই নিয়া।
আরেক বাটি গড়াম-নে চাকা সোনা দিয়া।
উভয়ে—সোনার বাটি ঝুমুর ঝুমুর মিষ্টি বাটির তৈল…॥

[নৃত্যের নাট্]

সূর্য্য ও চন্দ্রকলার মধুর মিলনের পালা এখানে শেষ হোলো। মানুষের দিন-রজনীতে সমান উজ্জ্বল রূপে দেখবার আকাঙ্ক্ষা পেলো পরিপূর্ণতা।

সূর্য্য বিশ্বজগৎকে নবীন প্রাণ-দানে ক'রে তুললেন সুন্দর। আকাশে, বাতাসে, সরোবরে, গ্রামে, বনে-বনান্তরে—জেগে উঠ্‌লো রঙের বিলাস। আনন্দ-লীলার সুর মুখরিত হোলো—পাখীর কলনে, মৌমাছির গুঞ্জনে।—

সূর্য্য জন্ম দিলেন বসন্তকে, নাম তাঁর ঋতুল বা লাউল। সূর্য্যই বসন্তকে প্রকাশ করেন। সেই সত্যটি ব্রতীর রূপক-তথ্যে পরিণত হয়েছে।… সূর্য্য বা রায়ের পুত্র বসন্তদেব বা লাউল এই পালায় মধুর-রূপে প্রকাশ পেয়েছেন। টোপরের আকারে লাউলের একটি মূর্ত্তি ব্রতী গড়ে, সেই মূর্ত্তিটিকে ফুলে সাজিয়ে মাটির পুতুল হালামালার সঙ্গে বিয়ের খেলা খেলে থাকে।—এখানে কল্পনার রাজ্য থেকে একেবারে বাস্তবের রাজ্যে বসন্তকে টেনে এনে মাটির সঙ্গে আর ঘরের নিত্যকাজ ও খুঁটিনাটির মধ্যে ধ'রে রাখা হয়।—রূপকটির মর্ম্ম এই যে—পৃথিবীতে বসন্তের আবির্ভাব, তা'র বিকাশ ও বিদায়।—

সূর্য্যপুত্র বসন্তের আবির্ভাব হয়েছে। লাউলের পালা আরম্ভ হোলো। লাউলের বিয়ে।—সূর্য্যের অন্তঃপুরে বিয়ের আয়োজন চলেছে। পৃথিবীতে বিবাহের বাসর বসবে—সেখানেও আনন্দ। চারিধারে আনন্দের লীলা চলেছে। সেই উৎসবের পটটি তুলে ধরা হ'ল।

[লাউলের পালা]

গায়েন—সূর্য্যের ছেলে ঋতুরাজ লাউল সাজে বর।
মাটির কন্যা হালামালা ক'নে মনোহর।
বিয়ের নানান্ আয়োজনে ব্যস্ত সবাই রন্।
সূর্য্যের বাপ হুঁকা হাতে চালা বাঁধায়ে মন্।
বাঁশ-দড়ি-খড় চারিদিকে ছড়ানো রয় প'ড়ে।
হাঁড়ি বাজিয়ে কাজের ফাঁকে ঘরামিরা গান ধরে।
সকলে—(হাঁড়ি বাজিয়ে—গান)

কাউয়া বলে কা,
রাত পোহাইয়া যা।
হাঁড়ি পাতিল ঠুকুর ঠুকুর কলসীর কাঁধা,
আজ লাউলের বড় বাড়ী বাঁধা।
হাঁড়ি পাতিল ঠুকুর ঠুকুর কলসীর কাঁধা,
আজ লাউলের কলাবাগান বাঁধা।
হাঁড়ি পাতিল ঠুকুর ঠুকুর কলসীর কাঁধা,
বড় বাড়ী বাঁধা।
কলা-বাগান বাঁধা।
- কাউয়া বলে কা—
রাত পোহাইয়া যা॥

গায়েন—কাদামাটির ঝুড়ি মাথায় মালি-মালিনী—
কর্‌লো প্রবেশ, সেইখানে সব ধর্‌লো রাগিণী।
মালিনী প্রভৃতি (গান)—কাদামাটির তলে লো কাদামাটি,
তা'তে ফেলাইলাম কাঁঠালখানি,—
কাঁঠালের আগে লো কুলাখানি,
তা-তে বসাইলাম বাবুঘাটি।

[গতি-তালে-ছন্দে সঙ্গীতানুসরণ—

[নিমন্ত্রিতদের আগমন—

সূর্য্যের বাপ—এই যে, আসুন, বসুন বসুন ঘটক বামুন ঠাকুর।
ওরে বিছায়ে দে' শীতলপাটি কিংবা একটা মাদুর।
ঘটক—সূর্য্যের পিতা মহাশয় তোমার নাতির বিয়ে।
নামটা বজায় রেখো ভালো দক্ষিণাটা দিয়ে।
সূর্য্যের বাপ—বামুন ভাইয়া, বামুন ভাইয়া, ভাদুলা তামুক খাইও।
আমার লাউয়ের বিয়ার সময় ফুল-মন্ত্র পড়িও।
আরে…আর…
হাঁড়ি-পাতিল লইয়া এসো, এসো কুমার ভাইয়া।
কুমোর—এনেচি এই হাঁড়ি-পাতিল বিয়ার খবর পাইয়া।
গোয়ালা—আন্‌লাম দই-ক্ষীর ভার-ভার।
আন্‌লাম সন্দেশ গোল্লা আর।
নাপিত—সূর্য্যের বাপ…এলাম নাপিত, তোমার লাউয়ের বিয়ে
বর-ক'নে আজ ছাতনাতলায় দাঁড়াবে কখন্ গিয়ে?
সূর্য্যের বাপ—আনন্দ আজ পেলাম আমি তোমাদের সব পাইয়া।
নাপিত-ভায়া, গোয়ালা-ভায়া, এসো সকল ভাইয়া।
পৃথিবীর ওই মেয়ে হালামালার সাথে বিয়ে।
লাউল আমার যাবে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।
মঙ্গল, শনি, বেস্পতি, বুধ—আস্‌ছে কুটুম্বরা।
আদর তাঁদের কর্‌তে হ'বে—তাই তো আমার ত্বরা।
এসো এসো চন্দ্র সাঙাত, আজ লাউলের বিয়া।
তুমি থেকো সাথে সাথ—আনবে বিয়া দিয়া।

[তামাক-সেবন ও পরিবেশন

ভাদুলা তামাক খাইও—
ভায়া, ভাদুলা তামাক খাইও।

[সঙ্গীতে প্রাকৃত-রূপ—

গায়েন— এবার হ'বে লাউলের বিয়ের ভোজন।
অন্দর-বাড়ীতে সূর্য্য করেন আয়োজন।
গামছা মাথায় ঘুরে ঘুরে করেন দেখাশোনা।
সিকদার আসে, সঙ্গে জেলে, পারনি সে রুই-পোনা॥
জেলেনীরা ঢোকে শেষে, হাতে মাছের ডালা।
খালুই ভ'রে নিল সে মাছ যতেক পুরবালা।

[ছন্দে-সুরে মৎস্য ও ভোজন-পর্ব্ব আবৃত্তি

সিকদার— সূর্য্যগো, পুকুরে ফেলাইলাম জাল,
তা'তে উঠিল না কিছু মাছ।
জেলেনী— উঠ্‌লো লো, উঠ্‌লো মাছ।
সিকদার— নিবে কে—নিবে কে—নিবে কে কে?
জেলেনী— ঐ আসচে বামুন-মেয়ে খালুই হাতে ক'রে।

[খালুই ভ'রে মেয়েরা মাছ নিলে—

সিকদার— নিলাম গো, নিলাম গো! মাছ কোটে কে?

যামুন-মেয়ে—ওই আস্‌চে মাছকুটুনী বঁটি হাতে ক'রে।

[মাছ-কুটুনী মাছ কুটতে ব'সে গেল—

সিকদার— কুট্‌লাম গো, কুট্‌লাম। মাছ ধোয় কে?

মাছকুটুনী—ওই যে আসে ধোয়নী ঘটি হাতে ক'রে।

[ধোয়নী মাছ ধুতে লাগলো

সিকদার— ধুলাম গো, ধুলাম। মাছ রাঁধে কে?

মাছধোয়নী—ওই যে আসে রাঁধুনী আগুন হাতে ক'রে।

[রাঁধুনীর রন্ধন আরম্ভ

সিকদার— ধোঁয়া ভারি, ধোঁয়া ভারি, চোখ বেয়ে জল ঝরে।
তাড়াতাড়ি কর্ রাঁধুনী, মাছ যেন না পোড়ে।...
আরে জান্‌তে যে চাই, জান্‌তে যে চাই,
খাইবে কে?

রাঁধুনী—ওই আস্‌চে খাউনী থালা হাতে ক'রে।

[গোলমাল—সকলে খেতে ব'সে গেল

সকলে—আয় আয় আয় খেতে বোস্—তপ্ত গরম মাছ।

সিকদার—(সনিশ্বাসে) এঁটো নেবে কে রে, ওরে এঁটো নেবে কে?

খাউনীরা—ওই আস্‌চে এঁটো-নেওনী গোবর হাতে ক'রে।

সিকদার—(রেগে গিয়ে—সকলকে ধাক্কা দিতে দিতে)
বটে—বটে—
সব ভাজা মাছ তোরাই শুধু খেলি চাকুম-চুকুম?
কি খাবে ওই লোকজনেরা আর যত সব কুটুম?
............যা নেওনি, মাছকুটুনি, আঁশ-ধোয়নী, মাছ-রাঁধুনী,
ভাত-খাওনী, পাত-কুড়োনি যা'—!

সিকদারনী—আমরা নিমো, ধুমো, রাঁধমো, কুটমো, খামো ফেল্‌মো—
যেমন-তেমন ক'রে——হা—হা—হা—!

সূর্য্যের বাপ— ব্যাপার কি, ব্যাপার কি, কি হয়েচে রে!
আহা—পান দিবে কে?

সিকদার—ওই আস্‌চে পান-খাওনী ডিবা হাতে ক'রে।

সূর্য্যের বাপ—আর-বিছানা পাতিবে কে?

সিকদারনী—ওই আস্‌চে বিছানা-পাতুনি তোষক হাতে ক'রে।

সিকদার—শুইবে কে?

সিকদারনী—ওই আস্‌চে শুয়নী বালিস হাতে ক'রে।

সিকদার—রাত পোহাইবে কে?

সিকদারনী—ওই আস্‌চে রাত-পোহানী কাউয়া হাতে ক'রে।

(এই পর্ব্ব-শেষে—সঙ্গীতে ছন্দ-বৈচিত্র্য)

গায়েন— ভোজন হোলো, বরণ হোলো, লাউল করে সাজ।
বরকে নিয়ে যাবে সবাই—তাই পড়েছে কাজ।
সুর উঠিল দিকে দিকে, শ্যামল-মাটি গায়।
সেই তানে যে বিভোল্ হ'য়ে বইলো মলয়-বায়।

(মধুর সুরের দোলন)

(শ্যামল মাটির কণ্ঠ তান)

মেয়েরা—(গান)

রাত পোহালে যাবে লাউল
হালামালার ঘর।
বসন্ত-ফুল ফুটবে—
রঙীন্ আঁচল লুটবে—
মৌমাছিরা জুটবে—
হাস্‌বে সেথায় মোহনিয়া মিলন-বাসর।

[বসন্তের আবির্ভাব-জ্ঞাপক সঙ্গীত

গায়েন— এবার হালামালার বাড়ী কতই আড়ম্বর।
পৃথিবীতে লাউল এলো সেজে মোহন বর।
ছাদ্‌নাতলায় জড়ো হোলো যত পুরবালা।
ক'নে-চন্দন প'রে সাজেন বধূ হালামালা।
ফুল ছিটায়ে গায় সকলে পুরুষ-নারী মিলে।
ঋতুরাজে জামাই পেয়ে আনন্দ অখিলে।

(আবির্ভাবে আনন্দ-সঙ্গীত-বিলাস)

সকলে—(গান)

এপারে লাউল, ওপারে লাউল, কিসের বাদ্য বাজে!
রাজার বেটা সওদাগর বিয়ে করতে সাজে।
সাজে সাজন্তি লাউল—মাথায় মুকুট দিয়া।
ঘরে আছে রাজকন্যা তুলিয়া দিব বিয়া।
সাজে সাজন্তি লাউল পায়ে নেপুর দিয়া।
ঘরে আছে সুন্দরী কন্যা তুলিয়া দিব বিয়া।

মালিনী—আমের বউল আসে লো লোচা লোচা।
আমের বউল আসে লো বাড়ী বাড়ী।

মালি— ফুল রুইলাম গাঁয় গাঁয়,—
সে ফুল গেল দখিন্-গাঁয়।

মালিনী—দখিন-গাঁইয়া মালিরে!

মালি—ফুলের ডালা লবিরে?

মালিনী— হাতে কলসী, কাঁখে পোলা,
কেম্‌নে লবো ফুলের ডালা রে!

[মিলনোৎসব সঙ্গীত

গায়েন— লাউল-হালামালার বিয়ের পালা হোলো শেষ।
ফুলে ফুলে উর্ব্বর রায় করলো সকল দেশ।
মিলন-রাতি গত হ'লে লাউল বিদায় মাগে।
মেয়েরা তাঁ'য় রাখতে ধ'রে কোমর বেঁধে লাগে।

মেয়েরা—কৈ যাও রে লাউল গামছা মুড়ি দিয়া?
তোমার ঘরে ছেইলা হইছে, বাজ্‌না জানাও গিয়া।
ময়রা জানাও গিয়া, নাপিত জানাও গিয়া,
পুরুত্ জানাও গিয়া।

লাউল—যা' দিয়ে যাই, তাই নিয়ে আজ—
ব্যস্ত থাকো সবে,
কাজ যে আমার শেষ হয়েচে
বিদায় নিতেই হ'বে।

[শ্যামলমাটির মিনতি

গান

হালামালা— ওহে ঋতুরাজ, কোথায় যাবে
কেমন্ রথে!

লাউল— আমার যেতেই হ'বে যেতেই হ'বে,
এক্‌লা পথে।

হালামালা— ওহে ঋতুরাজ, থাকো থাকো!

লাউল—থাকতে আমি পারবো নাকো!
শীতের ভিতর দিয়ে আবার
ফিরিব সাত-ঘোড়ার রথে।

গায়েন— মেয়েরা রায়-বিদায়-ভোজের করে আয়োজন।
চাল ধুইতে বস্‌লো তা'রা—সবাই ব্যাকুল-মন।
লাউলের ভাই শিবাইকে যে পাঠায় কাট্‌তে পাত।
খাইতে দেবে সেই পাতেতে আলোচালের ভাত।
আলোচালে কাঁচা-দুধে লাউল সিনান করে।
শ্বশুরবাড়ী বউ থুইয়া লাউল যাবে ঘরে।

মেয়েরা—চাউল ধুমু, চাউল ধুমু, চাউলের মালো পানি।
চাউল ধুইতে পড়্‌লো চাউল,
পাটি বিছাইয়া থলো চাউল—
যত বত্তিয়ে জানি।

[সঙ্গীত দূরাপসরণ…
(শিবাই কলাপাতা কাট্‌ছে)

মালি— লাউলের বাগানে কে-রে কাটে পাত?
শিবাই— লাউলের ছোট ভাই শিবাই কাটে পাত।
মালি—শিবাইরে, শিবাইরে! না কাটিও পাত।
শিবাই—বাইছা বাইছা কাটুমনে সব্‌রিকলার পাত।
মালি—সব্‌রিকলার পাতে না-'ক লাউলে খায় ভাত?
বাইছা বাইছা কাটো গিয়া চিনি-চম্পা কলার পাত।

গায়েন—এদিকে—লাউলের বউ হালামালা
ছেলেরে পাড়ায় ঘুম।
একটু পরে লাগ্‌বে ব'লে বিদায়-ভোজের ধুম।

হালামালা

(ঘুমপাড়ানী গান)

হালামালা　লাউলের ঘরে ছেইলা হইছে কি কি নাম থুমু!
আম দিয়া হাতে রাম নাম থুমু।
বরই দিয়া হাতে বলাই নাম থুমু।
কমলা দিয়া হাতে কমল নাম থুমু।
জল দিয়া হাতে জয় নাম থুমু।
রাজার বেটা রাজার ছেইলা রাজা নাম থুমু॥
লাউলের ঘরে ছেইলারে কি কি গয়না দিমু!
হাতজোখা বলয়া দিমু,
বুকজোখা পাটা দিমু,
কোমরজোখা টোড়া দিমু,
পাওজোখা গুজরী দিমু,
দুই চরণে নেপুর দিমু!
লাউলের ছেইলা নাচবে, রাজার রাজ্য হাস্‌বে॥

[দোলার দরদোলন
ও দোদুল তালে ঝিমিয়ে-পড়া
সঙ্গীত—

পুরনারী (গান)

লাউলের ঘরে ছেইলা লো দুধ খাইবে কিসে!
রাজার বেটা পাশা খেইলা বাটি জিনিয়া নিছে!
পাশা খেলিয়া জিন্‌লাম কড়ি,
কিনে আন্‌লাম কপিলেশ্বরী,
কপিলেশ্বরী কি-বা খায়?
পুকুর-পাড়ে দূর্ব্বা খায়।
দূর্ব্বা খাইয়া লো সই শুকাইল দুধ,
কি দিয়া পাল্‌বো মোরা লাউলের ঘরে পুত?
লাউলের ঘরে পুত নালো শক্ত বেড়ার মাটি,
বত্তি গো ভাই যেন লোহার কাটি।…

[সঙ্গীতে ছন্দ-দোলা

হালামালা (চাপা গলায়) ছন্দে-সুরে…
ঘুমিয়েচেরে খোকন এখন্।
চল্ চল্ সব নাইতে এবার,
জলকে গিয়ে কর্‌বো গাহন।………

আয়লো শত বইন্—জলেরে যাই,
জলেরে যাইয়া লো ঝাপটি খেলাই।
হাতের শাঁখা, টাকাকাড়ি, পায়ের নূপুর যত,
জলে মোরা ফেল্‌বো, আবার কুড়িয়ে খেলি তত।

[জল-খেলার নাট্—
গহনা প্রভৃতি জলে ছুঁড়ে ফেলা
আবার কুড়িয়ে তোলার পালা।
উপযোগী সঙ্গীত-প্রকাশ……

হালামালা— খেল্‌তে খেল্‌তে নালো দুপ্পুর বেলা।
ভাসিয়ে দেলো রায়ের নামে কলার ভেলা।

[সঙ্গীত উচ্চগ্রামে—
দুরন্ত বাতাস ও বৃষ্টি—

গায়েন— যখন জল থেকে উঠে এসে লাউলকে ডাক দিলে তা'রা, তখন মধুমাস শেষ। ঋতুরাজের যাবার সময় এসেছে, চলেছেন তিনি।……দেখা দিয়েছে বৈশাখের মেঘ। মেয়েরা দেখলো,—লাউলের যেখানে আসন পাতা—সেই-খানে ঝড়-বাতাসে ভেঙে পড়েছে ফুলে-ভরা জুইতের একটি ডাল।

মেয়েরা—(বিস্ময়ে) জুইতের মট্‌কা-ডাল ভাঙি' পড়্‌লো ঘরে।
লাউলের দুধ ভাত ছড়াইয়া পড়ে।……………

গায়েন— —তখন হালামালা আর তা'র শত বোন্ লাউলকে অপেক্ষা করতে বল্‌লে, কিছু খেয়ে যেতে কর্‌লে মিনতি।—

মেয়েরা—খাও খাও লাউল, গোটা চারি ভাত,
আমরা শত বইনে ফেলাম-নে পাত।

গায়েন— কিন্তু লাউল পেয়েছেন সূর্য্যের ডাক। আর তিনি অপেক্ষা কর্‌তে পারেন না। তখন সকলে তাঁকে উপহার দিলে বিদায় বেলার ফুলের মঞ্জরী, জানালে বিদায়-অভিনন্দন।—

সকলে—(গান)

লহো লাউল লহোরে—
ফুলের মালা লহোরে।
হালামালা বরণ করিল রে!
গলে বিদায়-রাঙা হার বহোরে॥

[বৈশাখী ঝড়ের প্রকোপ—

হালামালা—বৈশাখের কালোমেঘ করে গরজনি।
ঝড় বহে হু-হু করি' বৃথাই সাধনি।

গায়েন— উৎসবের সাজ-সরঞ্জাম লণ্ডভণ্ড ক'রে গরম বাতাসে ধুলো উড়লো। মলিন-মুখে হালামালা আর তা'র ভাই-বোনেরা সূর্য্যের ছেলে ঋতুরাজ লাউলকে দিলে বিদায়।

[বিদায়-অভিনন্দন—

হালামালা প্রভৃতি—(গান)

হালামালা—আজ যাও লাউল
কাল আসিও।
শীতের কুয়াশা ঠেলি'
দেখা দিও।
নিতি নিতি দেখা দিও!
বছর বছর দেখা দিও!

হালামালা—নতুন ফুলের মালা
আমার গলায় দিও।
মাটির মেয়ে হালামালায়
মনে রাখিও।
ঋতুরাজ লাউল ফিরে আসিও॥

[সঙ্গীতে ছন্দ ও তান-বৈচিত্র্য,
ক্ষণপরেই সঙ্গীত শুরু]

ব্রতিনী— ও গ্রামনী, আমাদের "মাঘমণ্ডল"—ব্রতের পালা শেষ হোলো,—এবার ব্রতের মন্তরটা ব'লে প্রার্থনা জানাতে তো হ'বে!

গ্রামনী—শাঁখ বাজা', ব্রতীরা!—আমি মন্তর পড়ি, শোন্!—

[শাঁখ—আরতি

(ছড়ার সুরে)

মাঘমণ্ডল সোণার কণ্ডল,—
সোণার কণ্ডলে ঢাইলা ঘি,—
আমি যেন হই বড় মানুষের ঝি।
মাঘমণ্ডল সোণার কণ্ডল,—
সোণার কণ্ডলে ঢাইলা মধু,—
আমি যেন হই বড় মানুষের পুত্রবধূ।
মাঘমণ্ডল সোণার কণ্ডল,—
সোণার কণ্ডলে থুইয়া ফুল,—
আমি যেন গো রাখি সকল কুল।

(গীত-সুরে)

ব্রতিনী—সূর্য্যের মত কিরণ-মালী বর পাবো।
রাতুলের মত অখিল-জয়ী ছেলে পাবো।
চন্দ্রকলার মত উজল রূপ পাবো।
ভুবন-মাঝে আলোয় ভরা ঘর পাবো॥

[শঙ্খধ্বনি প্রণতি প্রভৃতি
রীতি-বিধান

ইতি—এই পালানাট্যের শেষ। *

---

* এই ব্রত-নাট্যের পালায় প্রাকৃত রূপটি বজায় রাখতে বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছে। "মাঘমণ্ডল" সম্পর্কে প্রাচীন ছড়াগুলি ও নাট্যসজ্জা-রীতি অবলম্বন ক'রে বাঙলার এই নিজস্ব রূপকটিকে গ্রথিত করেছি—গান ও সংলাপের সূত্র-সঙ্গতি রচনা ক'রে। বাঙলার গীতিকা বা 'অপেরা'র প্রকৃষ্ট রূপ এই পালা-নাট্যে পাওয়া যায়। এই নাট্যটি সম্পূর্ণভাবে সুরে-তালে-লয়ে গীত হওয়া সম্ভব। নৃত্যে ও গানে এই নাট্যলীলার প্রয়োগ অতি মনোজ্ঞরূপে হ'তে পারে। বাণীকুমারের পরিচালনায় এই নাট্যের একাধিক বার অভিনয় হয়েছে। লেখক

প্রতিদ্বন্দ্বী

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

খুসিতে রেবার মুখ আরও সুন্দর দেখায়। দোতালা বাড়ীটার সমস্ত ঘরগুলি, ঘরের সমস্ত আসবাব-পত্র সে ঘুরে ঘুরে দেখে। কখনো বা জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে বাইরের চলন্ত জনস্রোত, কখনো বা ফুলের টবগুলি হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। সরোজিনী পিছনে পিছনে আসেন আর মুচকি মুচকি হাসেন। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে রেবা জিজ্ঞাসা করে, "সমস্ত বাড়ীটাই কি আমাদের মা? কোন ভাড়াটে এসে এখানে কোনদিন থাকবে না তো?"

সরোজিনী হেসে বলেন, "তুমি যদি চাও তো থাকতে পারে, সমস্ত বাড়ীই যখন তোমার।"

রেবা ঈষৎ গম্ভীর ভাবে বলে, "নীচের তলায় অবশ্য কেউ এসে থাকতে পারে। না হ'লে বাড়ীটা ভারি খালি খালি লাগবে।"

সরোজিনী সহাস্যেই জবাব দেন, "তা কি ক'রে হবে মা। গোটা নীচের তলাটাই যে অবিনাশের ষ্টুডিয়ো।"

রেবা আরও গম্ভীর হয়ে যায়, "ঠিক, তাই তো।"

ওর মুখের ওপর থেকে সহজে চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা করে না সরোজিনীর। পাথর কেটে কেটে অবিনাশ যে সব মূর্ত্তি গড়ে, তারই একখানা যেন হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। দীর্ঘকাল ধ'রে এর জন্যই যেন সে এতকাল প্রতীক্ষা করছিল। দেশ-বিদেশে কেবল রূপ খুঁজে বেড়িয়েছে অবিনাশ। কিন্তু কিছুতেই কোন মেয়েকে তার পছন্দ হয় নি।

সরোজিনী বলতেন, "তোর কপালে আছে কালো কুশ্রী মেয়ে। অত বাছাবাছির ফল কি কোনদিন ভালো হয়?"

শ্যামবাজারের এক অখ্যাত গলিতে নিম্ন মধ্যবিত্ত এক কেরাণীর ঘরে এমন রূপ যে এতদিন লুকিয়েছিল, তা অবিনাশের ছাড়া আর কার চোখে পড়বে,—সারাজীবন ধরে পৃথিবীতে যে কেবল রূপ খুঁজেছে আর সৃষ্টি করেছে।

অবিনাশের ষ্টুডিয়োতে ঢুকে রেবা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে, "সত্যি, কি অদ্ভুত মানুষ তুমি। আমি কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি মোটে টেরই পেলে না।"

কি একটা অসমাপ্ত মূর্ত্তির সামনে নিবিষ্ট মনে অবিনাশ কাজ ক'রে যাচ্ছিল, মৃদু হেসে ঘাড় ফিরাল, "আগে থাকতে টের পেলে অমন মিষ্টি হাসি কি শুনতে পেতাম?"

হাসি বন্ধ ক'রে রেবা জবাব দেয়, "মা গো, কি অসভ্য তুমি। কিন্তু অসাধারণ ক্ষমতা তোমার। এত বড় আর এমন সুন্দর বাড়ী আমাদের বিজয় কাকাও ক'রতে পারেন নি। তুমি যে এত বড়লোক, তা সত্যি আগে বিশ্বাস হয় নি।"

কেমন একটু ম্লান ছায়া পড়ে অবিনাশের মুখে, মৃদু হেসে বলে, "তাই না কি?"

জবাব না দিয়ে বড় বুদ্ধমূর্ত্তিটার দিকে রেবা একবার তাকায়। আর অবিনাশ অপেক্ষমাণ ভাবে তাকিয়ে থাকে রেবার দিকে, নিশ্চয়ই সুন্দর কোন মন্তব্য এবার তার মুখ থেকে বেরুবে। কিন্তু ততক্ষণে জানালা দিয়ে রেবার দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে রাস্তার ওপর।

"এই শোন, শিগগির এস, যদি দেখবে তো ছুটে এসো শিগগির।"

রেবার কলকণ্ঠ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। অনন্যোপায় হয়ে অবিনাশকে উঠে আসতে হয়।

"কি?"

রেবা বলে, "দেখ, ভিখারিটার দুটো পা-ই কাটা। তবু হামাগুড়ি দিয়ে কি ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে চেয়ে দেখ। পা নেই তবুও চলবে। যদি নিজেদের বাড়ীতে থাকতুম, চেঁচিয়ে ওকে আমি ঠিক এদিকে ডেকে আনতুম। কিন্তু এখানে তা করতে গেলে লোকে নিন্দা করবে। কিন্তু যাই বলো ভারি অদ্ভুত লাগছে আমার। একটা পাও নেই, তবু ওর চলা থামছে না।"

অবিনাশ এক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে থাকে, তারপর বলে, আর আমার তৈরি মূর্ত্তিগুলোর দুটো ক'রে পা থাকা সত্ত্বেও এক পাও কেউ নড়ছে না, তাই নয়? কিন্তু জানো রেবা, নড়ে ওরা ঠিকই, কেবল সকলের তা চোখে পড়ে না।

পুত্তলিকার চোখ আছে, দেখতে পায় না,—তেমন পুতুলের সংখ্যা আসলে মানুষের মধ্যেই বেশী।"

মূঢ় দৃষ্টিতে রেবা স্বামীর দিকে তাকায়। কথার অর্থ সবটা না বুঝতে পারলেও ক্রোধের আভাসটা তার কাছে অস্পষ্ট থাকে না। অবিনাশ তার ওপর রাগ করেছে, কিন্তু কেন? বড় বড় শিল্পীদের মেজাজ কি এইরকম? অবিনাশ যে তাকে পছন্দ করবে, একথা বাড়ীর কেউ ধারণা করতে পারে নি। বাংলাদেশের নামকরা শিল্পী অবিনাশ। অনেক নামকরা সুন্দরী সে অপছন্দ করেছে। রেবাকে যে তার পছন্দ হয়ে গেছে এটা রেবার ভাগ্য আর শিল্পীর খেয়াল। বড়দার মুখে এই ধরণের ব্যাখ্যাই সে শুনেছে। মা বলেছিলেন, "আর তো কোনদিক থেকে কোন আপত্তির কারণ নেই বিভূতি, তোদের মুখেই শুনছি বাংলাদেশের ইনি একজন নামকরা লোক, অবস্থাও খুব ভালো। কিন্তু আমার রেবার তুলনায় বয়সটা একটু যেন বেশী বলে মনে হয়, পঁয়ত্রিশ চল্লিশের কম কি হবে? আর—"

বাধা দিয়ে বিভূতি বলেছে, "পুরুষের পক্ষে ও আবার একটা বয়স? সবাই তো আর তোমার বড় ছেলের মত নয় যে বাল্যকালেই বিয়ের পর্ব্বটা শেষ ক'রে রাখবে। সমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জ্জন করে তবে আজকালকার ছেলেরা বিয়ে করে। আর যে দিন কাল, তাতে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হ'তে লোকের অতটুকু বয়সের প্রয়োজন হয়। এ তো আর বাপ-দাদার আমলের সম্পত্তি পেয়ে বড়লোক হয় নি, কিংবা পাট-রসুনের কারবারে সিন্দুক ভরে নি, শিল্পের সেবা ক'রেছে। একদিক থেকে এসেছে যশ, আর একদিক থেকে অর্থ, শুধু মূর্ত্তিকেই তো গড়ে নি, নিজের প্রতিষ্ঠাকেও গড়ে তুলেছে। হ্যাঁ, আর কি আপত্তির কথা বলছিলে—"

সৌদামিনী ভয়ে ভয়ে বলেছেন, "না না আমার আবার আপত্তির কি কথা থাকতে পারে। পাঁচুর মা বলছিল—ভদ্রলোকের চেহারাখানা দেখতে ঠিক ভদ্রলোকের ছেলের মত নয়। লক্ষ্মীপ্রতিমার মত রূপ আমার রেবার, তার বরের চেহারা যদি অমন হয়—পাঁচুর মা-ই বলছিল—"

বিভূতি কিছুক্ষণ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তারপর জবাব দিয়েছে, "বাড়ীর ঝিই বুঝি হয়ে উঠেছে তোমার পরামর্শদাতা। বেশ তো, সেই তোমার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করুক। আমরা তো জানতুম—পুরুষের রূপের প্রয়োজন হয় না। যশঃ আর ঐশ্বর্য্যই তার যথার্থ রূপ। 'কন্যা বরয়তে রূপম,' কথাটা বুঝি কন্যার জবানীতেই তুমি বললে? কিন্তু এক রূপ ছাড়া তোমার মেয়ের কি আছে বলো তো? ষোল-সতের বছর বয়স হয়েছে ভালো ক'রে বাংলা একখানা বই পর্য্যন্ত পড়তে পারে না। সংসারের কাজ-কর্ম্ম কি জানে না জানে তুমিই জানো। চেষ্টা কি আমি কম করেছি, এই অভাব-অনটনের সংসারেও দিয়েছিলাম তো ভর্ত্তি ক'রে। কিন্তু ফি বছরে ফেল। রূপের গরবেই অস্থির, আর পড়াশুনো।"

পাশের ঘর থেকে দাদা আর মায়ের কথোপকথন কান পেতে সব শুনেছে রেবা, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে; ভদ্রলোক এর চেয়েও যদি বুড়ো আর বিশ্রী চেহারার হোত তার সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় রেবার আপত্তি থাকত না। দাদার সংসারে তিলার্দ্ধ আর তার থাকতে ইচ্ছা নেই।

অবিনাশ অপলকে ওর দিকে চেয়েছিল। বিষণ্ণ, চিন্তিত ভঙ্গীতে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে রেবাকে। এই ভঙ্গীর একটি মূর্ত্তি গড়তে হবে ওর, অবিনাশ মনে মনে ঠিক করল।

কিন্তু মুহূর্ত্ত খানেক মাত্র, তার পরেই রেবার ঠোঁটে আবার হাসি ফুটে উঠেছে।

"হাসছ যে?" অবিনাশ একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

হাসি চাপতে চাপতে রেবা বলল, "ছোড়দার কথা মনে পড়ে গেল, দাদা হ'লে হবে কি, ভারি ফাজিল।"

"কেন, কি ফাজলামি করেছিলেন তিনি?"

হাসিতে রেবা একেবারে ভেঙে পড়ল। 'তিনি'? ছোড়দা হয়ে পড়ল 'তিনি'? আমার চেয়ে মাত্র দেড় বছরের বড়। আর সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে বলে তুমি তাকে তিনি বলবে?"

অবিনাশও হাসল, "আচ্ছা, তা না হয় নাই বললুম, কিন্তু হাসছিলে কেন?"

"ছোড়দা কি বলছিল জানো? তুমি আমাকে বিয়ে করেছ মডেল করবে বলে। প্রত্যেক আর্টিষ্টেরই নাকি দু' একটি ক'রে মডেল থাকে। অর্ডার মাফিক ঘণ্টার পর ঘণ্টা কি ভাবে তাদের কর্ত্তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কোমর বাঁকিয়ে, ছোড়দা তাই দেখাচ্ছিল। মাগো, এমন হাসাতেও পারে ছোড়দা। আর যাই কর, আমাকে কিন্তু তোমার মডেল হ'তে বোলো না, ছোড়দার ভঙ্গী আমার মনে পড়বে, আর হাসতে হাসতে আমি মারা পড়ব।

অবিনাশের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে, "আচ্ছা যাও, মারা তোমাকে পড়তে হবে না।"

দোরের বাইরে হঠাৎ চোখ পড়ে গেছে রেবার, "কে, মণিরাম? দাঁড়াও, দাঁড়াও তোমাকে আমি একটা জিনিষ কিনতে দেব," রেবা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়।

আসলে জিনিষ কিনতে দেওয়াটা ছল। মণিরামের বরিশালী ভাষা শুনতে এবং শুনে হাসতে ভালোবাসে রেবা। তার মুখের ওপরই তার অনুকরণ করে। বাড়ীর অন্য কেউ এমন করলে ভারি অসন্তুষ্ট হয় মণিরাম—কিন্তু রেবাকে দেখলে সে একেবারে খাস বরিশালের ভাষা আরম্ভ করে।

রেবা যত বেশী হাসে, উচ্চারণের টান মণিরাম তত বাড়িয়ে দেয়। ঘরের ভিতর থেকে তা শুনে অবিনাশের মনে হয় বরিশালী ভাষা জানা না থাকলে রেবাকে হাসাবার জন্য বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গীর সঙ্গে নৃত্য পর্য্যন্ত করতে পারত মণিরাম, ওর মত লোকের মনেও রূপোপভোগের সাধ আছে। রূপ, কিন্তু এই মূঢ় ছেলে মানুষীর রূপ দিয়ে কি করবে অবিনাশ? যার কেবল রূপই আছে, রূপবোধ নেই, রূপ-সৃষ্টির কোন কাজে যাকে লাগান যাবে না, তাকে দিয়ে কি হবে অবিনাশের?

যত দিন যায় বিরক্তি অবিনাশের তত বেড়ে ওঠে। রেবার চঞ্চল প্রাণবন্তা কিছুর মধ্যেই যেন ধরে রাখা যায় না। যত ব্যর্থ হয় অবিনাশ, তত তার ক্রোধ বাড়ে। ইতিমধ্যে অনেকবার চেষ্টা ক'রেছে রেবার মনে যাতে শিল্প-বোধ আসে, কিন্তু কোন লাভ হয়নি, এসব কথা তুললেই সে পালিয়ে যায়। কোন না কোন ছলে চলে যায় বাহিরে। ইদানীং সযত্নে বরং সে অবিনাশকে পরিহার ক'রেই চলতে চায়।

নতুন একটি দেবমূর্ত্তিতে হাত দিয়েছে অবিনাশ। ময়মনসিংহের কোন এক জমিদারের ষোড়শী কন্যা বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে। তাঁর জন্য মনে যাতে প্রবোধ মানে, ধর্ম্মভাব জাগে, তার আয়োজনের অন্ত নেই, দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবার দেবমূর্ত্তির প্রয়োজন। মদন-মোহনের মনুষ্যপ্রমাণ মর্ম্মরমূর্ত্তি অবিনাশকে গড়ে দিতে হবে।

খানিক পরে সরোজিনী ঘরে ঢুকলেন। এইমাত্র পূজার ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছেন। শ্বেত পাথরের রেকাবীতে দেবতার প্রসাদ। কয়েক খণ্ড শসা, আর দুটি নূতন গুড়ের সন্দেশ তাঁর নিজের হাতের তৈরী!

"হাত পাত অবিনাশ।"

কাজের সময় কারো বাধা অবিনাশ সহ্য করতে পারে না, ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে বিরক্তির সুরে বলে "কেন, হয়েছে কি?"

সরোজিনী প্রসন্ন হাসেন, "কিছুই হয়নি, প্রসাদ নে।"

"ওঃ, মিছামিছি কেন বিরক্ত করতে আসো বলোতো? প্রসাদের আমার দরকার হয় না। তোমার মত পৌত্তলিক আমি নই, তাতো জানোই।"

সরোজিনী হাসেন, "তুই-ই বা পৌত্তলিক কম কিসে! জীবন ভ'রে এত পুতুল আর কে গড়েছে?"

সরোজিনীর সস্নেহ ব্যবহারের স্নিগ্ধতায় নিজের আচরণের জন্য মনে মনে লজ্জাবোধ করে অবিনাশ। হাত বাড়িয়ে একখণ্ড শসা তুলে নিয়ে বলে, "তা ঠিক। পাথর কেটে কেটে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির চেষ্টাই কেবল করলুম, নিজের জীবনকে সুন্দর ক'রে গড়তে শিখলুম না।" বাৎসল্য-স্নিগ্ধ কণ্ঠে সরোজিনী জবাব দেন, "কেন, কার চেয়ে তুই কম? কিন্তু পরের মেয়ের সঙ্গে অমন রুক্ষ ব্যবহার করিসনে অবিনাশ। দেখিসনে মেয়েটা এ ক'মাসের মধ্যেই কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে। ওর মুখ ভার দেখলে আমার ভালো লাগে না। ওর ম্লান বিষণ্ণ মুখ দেখলে আমার বুকের ভিতর যেন কেমন ক'রে ওঠে।"

অবিনাশ জবাব দেয়, "কিন্তু সংসারে লোককে মাঝে মাঝে গম্ভীরও তো হ'তে হয় মা।

মানুষের সেও এক রূপ। আচ্ছা, ওকে একবার পাঠিয়ে দিওতো এখানে।"

একটু পরে রেবা এসে উপস্থিত হয়, "সত্যি ডেকেছ আমাকে?"

অবিনাশ বলে, "কেন, তোমাকে কি আমি ডাকতে পারি না। তুমিই তো আস্তে চাও না এ ঘরে।"

"আস্তে কি আর ইচ্ছা করে না আমার?"

"করে? কেন, বলতো?"

অর্থপূর্ণভাবে রেবা একটু হাসে, "আহা, কিছু যেন বোঝেন না।"

বোঝে, অবিনাশ সবই বোঝে। অবিনাশের আদর চায় রেবা, তার কাছ থেকে হাল্কা গল্প-গুজব শুনতে রেবা ভালো-বাসে, এ ঘরে আসে রেবা নিতান্ত অবিনাশের জন্যই; অবিনাশের সৃষ্টির দিকে বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য কি আগ্রহ নেই রেবার, কিন্তু ও ধরণের দৈহিক আরাম তো যে-কোন পুরুষই রেবাকে দিতে পারত, তার জন্য শিল্পী অবিনাশের কি প্রয়োজন ছিল। দেশ-দেশান্তর থেকে কত নরনারী অবিনাশের এই ষ্টুডিয়ো দেখতে এসেছে, দেখে মুগ্ধ হয়েছে, শুধু কোন মুগ্ধতা এলো না, বিস্ময় জাগল না রেবার মনে, তার শিল্পকে তার সৃষ্টিকে একটুও ভালোবাসল না রেবা! স্বামীর খ্যাতি আছে, ঐশ্বর্য্য আছে এটুকুই সে বোঝে, তার সৃষ্টির প্রতিভাকে উপলব্ধি করবার মত বোধশক্তি রেবার নেই।

"আচ্ছা রেবা, ষ্টুডিয়ো ভ'রে নানা রকমের এত যে মূর্ত্তি, এর কোনটিই কি তোমার মনে আনন্দ দিতে পারল না, এর কিছুই কি তোমার ভালো লাগে না, সত্যি বলো তো?"

রেবা জবাব দেয়, বাঃ! তোমার নিজের হাতের তৈরি জিনিস, আর আমার ভালো লাগবে না? সব আমার ভালো লাগে।" নৈরাশ্যের বিবর্ণ হাসি অবিনাশের ঠোঁটে কিছুক্ষণ লেগে থাকে।

ঝুলনের আগেই মূর্ত্তি সম্পূর্ণ ক'রে পাঠিয়ে দিতে হবে। দিনরাত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করতে হয় অবিনাশকে। মূর্ত্তি শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আশ্চর্য্য, জমিদারের তরফ থেকে কোন খোঁজ-খবর নেই। অবশেষে দু'দিন পরে সহরের ম্যানেজার

এসে উপস্থিত হলেন। অন্য কি কার্য্যোপলক্ষে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন, যাওয়ার পথে হয়ে গেলেন অবিনাশের বাড়ী। অবিনাশ বলল, "কি ব্যাপার? মূর্ত্তি কি নেওয়ার ইচ্ছা নেই আপনাদের?"

ম্যানেজার বললেন, "আমরা ভারি লজ্জিত মশাই, যার জন্য মূর্ত্তির দরকার ছিল, তার আর প্রয়োজন নেই।"

ম্যানেজার গোঁফের তলায় মুচকি হেসে বললেন, "সে সব বড় ঘরের বড় কথা মুখে সাজে না।"

অবিনাশ মহাবিরক্ত হয়ে উঠেছিল।

"বেশ, না সাজে না বলবেন। শুধু এইটুকু আমি শুনতে চাই, মূর্ত্তিটি আপনারা নেবেন, না আর কাউকে বিক্রি ক'রে দেবো?"

ম্যানেজার বললেন, "আহা শুনুনই না মশাই আগাগোড়া, তারপরে চটবেন।"

"বলুন।"

"বলব আবার কি মশাই, বড় ঘরের সব বড় বড় কথা। আমি কিন্তু আগে থাকতেই একটু একটু টের পেয়েছিলাম। পুরাণ মন্দিরের ঠিক সংলগ্নই আমার বাসা কি না। আসতে যেতে সব আমার চোখে পড়ত। কর্ত্তা আর গিন্নী অবশ্য বলাবলি করতেন—মল্লিকার ধর্ম্মে ভারি মতি হয়েছে, ঠাকুরের ওপর অচলা ভক্তি। আমি দেখতুম ঠাকুরের ওপরই বটে, তবে শালগ্রাম ঠাকুরের ওপর নয়, পুরোহিত ঠাকুরের ওপর। বুড়ো বাপের বাতব্যাধি হওয়ায় যজমানী কাজে ছোকরাই আসতো কি না।"

"তার পর।"

"তার পর আর বলবার মত কথা নয়। নানা কেলেঙ্কারী ব্যাপার। এই দুর্ঘটনার পর থেকে মেয়ে, মন্দির, মদনমোহন, সব কিছুর ওপরই কর্ত্তা ক্ষেপে গেছেন। কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে যে মূর্ত্তির কথা তাঁকে মনে করিয়ে দেয়?" ম্যানেজার আর একবার দেবমূর্ত্তিটির দিকে তাকালেন। "কিন্তু যাই বলুন, মূর্ত্তিটি ভারি চমৎকার হয়েছে আপনার। অবশ্য মুখে দেবভাবের কিছু অভাব আছে। যা হোক আমি তো আর জমিদার নই, তাঁর সামান্য কর্ম্মচারী মাত্র, তাঁর মত অত টাকা তো আর দিতে পারব না। শ'দুয়েক টাকার মধ্যে যদি দেন আমাকে, মূর্ত্তিখানি আমি নিয়ে যাই।"

ক্রোধে বিকৃত হয়ে ওঠল অবিনাশের মুখ। "আজ্ঞে না, ধন্যবাদ।"

পাশের ঘর থেকে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রেবা সব শুনছিল আর সকৌতুকে হাসছিল, অবিনাশের কর্কশ কণ্ঠে চমকে উঠল। রাগলে যেন আরও বেশী বিশ্রী দেখায় অবিনাশের মুখ। আর তারই পাশে চোখে পড়ল মদনমোহনের মূর্ত্তি, স্থির প্রসন্ন হাসি মুখটিতে অনুরূপ লেগে রয়েছে। সত্যিই ভারি সুন্দর হয়েছে তো মূর্ত্তিখানা। মনে মনে কথাটা রেবা আবৃত্তি করলে।

ম্যানেজার বিদায় নিলে রেবা ছুটে এল ঘরে, "এই শোন, মূর্ত্তিটি কাউকে বিক্রি করতে পারবে না কিন্তু ওটি আমি নেব, ভারি চমৎকার হয়েছে।"

অবিনাশ শ্লেষের হাসি হাসল, "ম্যানেজারের মুখ থেকে কথাটা মুখস্ত ক'রে নিয়েছ বুঝি?"

বাঃ! তা কেন? সত্যি আমার ভারি ভালো লেগেছে।"

অবিনাশ বলল, "তাই না কি? আমার অসীম সৌভাগ্য। কিন্তু দু'দিনের মধ্যে হাজার টাকায় মূর্ত্তিটি বিক্রি হয়ে যাবে দেখে নিয়ো।"

রেবা বলল, "হাজার টাকা তুমি আমার কাছ থেকে নিয়ো। গয়না বেচে শোধ দেব।"

সরোজিনী শুনে হাসলেন, "কথা শোন মেয়ের। বেশ তো অবিনাশ। সখ হয়েছে বৌমার, রাখুক না। তোর ষ্টুডিয়োতেও তো কত মূর্ত্তি তুই নিজে সখ ক'রে রেখে দিয়েছিস! আর খদ্দের যদি আসেই, তা হলে না হয় বিক্রি ক'রে দিবি, তাতে কি।"

রেবা মনে মনে বলল, "হুঁ! দিলেই হোল আর কি। একবার ঠাকুর-ঘরে নিয়ে যেতে পারলে এ মূর্ত্তি সেখান থেকে বার ক'রে আনবে সাধ্য কার। মা নিজেই আপত্তি করবেন তখন।"

অবিনাশ কি এক কাজে বাইরে গিয়েছে, সরোজিনী মেঝের উপর শীতলপাটি বিছিয়ে চৈতন্য-চরিতামৃত পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছেন, সেই ফাঁকে মণিরামের সাহায্যে মূর্ত্তিটি একেবারে ঠাকুরঘরে নিয়ে বসিয়ে রাখল রেবা।

একেই সকাল থেকে অবিনাশের মেজাজ খারাপ হয়ে আছে, তারপর তার বিনানুমতিতে রেবা এই কাণ্ড করেছে দেখে তার ধৈর্য্য একেবারে লোপ পেল। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করল রেবাকে, সরোজিনীকেও কসুর করল না, আর মণিরামকে ঘাড় ধরে বের করে দিল বাড়ী থেকে। রেবার চোখ ফেটে জল আসতে লাগল, আর সেই সঙ্গে বার বার মনে হ'তে লাগল রাগ করলে এত কুশ্রী দেখায় অবিনাশকে যে, তার দিকে একেবারেই চাওয়া যায় না।

সন্ধ্যার পর ক্রমেই অবশ্য মেজাজটা পড়ে এল অবিনাশের। পরিপাটি ভোজনের পর চিত্ত বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠল। সত্যি, এত কাণ্ড না করলেও চলত। মনে মনে বেশ লজ্জিতই হোল অবিনাশ। বিছানায় শুয়ে চুরুট টানতে টানতে মনে মনে অবিনাশ প্রতিজ্ঞা করল, মূর্ত্তিশিল্প আর না, এবার থেকে জীবন-শিল্পের দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। মার কাছে আগেই ক্ষমা চেয়েছে। রেবা এলে তার কাছেও মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'রে বলবে, 'মূর্ত্তিটা তোমাকে

দিয়ে দিলুম।' এতদিন পরে শিল্পবোধ জেগেছে, তা হ'লে রেবার, শিল্পকে সে ভালোবাসতে শিখেছে।

খাওয়া দাওয়া সেরে রেবা যখন ওপরে এল, অবিনাশ ততক্ষণে নাক ডাকা আরম্ভ ক'রেছে। রেবা মুহূর্ত্তকাল স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। এতদিন ভালো ক'রে চেয়ে দেখেনি। আজ মনে হোল, ঘুমালেও বড় বিশ্রী দেখা যায় অবিনাশের মুখ। প্রৌঢ় মুখে রুক্ষতার ছাপ পড়েছে। স্থানে স্থানে কুঁচকে গেছে চামড়া। এত অসুন্দর তার স্বামী, আর সত্যিই এত বুড়ো। নিশ্চয়ই বয়স পাঁচ সাত বছর তাদের কাছে কমিয়ে বলেছিল। পঁয়তাল্লিশের একটা দিনও কম হবে না কিছুতে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে চোখ ফিরিয়ে নিতেই দেয়ালের বড় আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছায়া ভেসে উঠল রেবার। সত্যিই এত সুন্দর সে দেখতে! অপলকে রেবা কিছুক্ষণ আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল। আর উগ্র আনন্দে অপূর্ব্ব হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। তার যৌবন, তার সৌন্দর্য্য অবিনাশের কুশ্রী ব্যবহারের একমাত্র প্রতিশোধ।

জানালার ফাঁক দিয়ে ঘুমন্ত সহরতলী চোখে পড়ে। নারিকেল গাছগুলোর মাথার উপর গোল হয়ে উঠেছে চাঁদ। সমস্ত পৃথিবী জ্যোৎস্নায় ভিজে উঠেছে। এখানে অবিনাশের কোন অস্তিত্ব নেই, তার কথা অনায়াসে বিস্মৃত হওয়া যায়।

অপূর্ব্ব আনন্দে সমস্ত মন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে রেবার। দেরাজ থেকে চাবি নিয়ে কাঁচের আলমারী খুলে একখানা স্কাই-ব্লু শাড়ী সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে নিল রেবা। ড্রেসিং-টেবিলের ওপর প্রসাধনের নানা টুকিটাকি আসবাব। কৌটো খুলে আঙুলের ডগায় ক্রীম নিয়ে সস্নেহে নিজের সুগৌর কপোলে বুলিয়ে দিল। দেশী বিদেশী নানা রঙের ফুলে ফুলদানীগুলি সাজিয়ে রেখেছে। তার ভিতর থেকে বেলকুঁড়ির মালাটা তুলে নিয়ে ঘনবদ্ধ কবরীতে রেবা জড়াতে লাগল।

পাশের ঘর থেকে সরোজিনী এই সময় ডেকে বললেন, "বউমা, ঘুমিয়েছ?"

এক মুহূর্ত্ত নিঃশ্বাস রোধ ক'রে রাখল রেবা, তারপর কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিল, "না।"

সরোজিনী বললেন, "ঠাকুরঘর বোধ হয় খোলা রেখে এসেছ। রাতে বিরাতে কিছু একটা ঘরে ঢুকবে, যাও বন্ধ ক'রে এসো।"

মদনমোহনের প্রসন্ন সুন্দর মুখ হঠাৎ রেবার চোখের সামনে ভেসে উঠল, স্নিগ্ধকণ্ঠে জবাব দিল, "যাই, মা!"

খানিক পরে ঘুম ভাঙল অবিনাশের। উজ্জ্বল আলোয় ঘরের সমস্ত আসবাব-পত্র সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কিন্তু বিছানা শূন্য, ঘরের কোন জায়গায়ও রেবা নেই। মনে মনে হেসে অবিনাশ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। নিশ্চয়ই রেবা কোথাও বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে অভিমানে। আজ অবিনাশের মানভঞ্জনের পালা। নিঃশব্দে পা টিপে টিপে বেরোল অবিনাশ। হঠাৎ পিছন থেকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে চমকে দেবে রেবাকে।

বাড়ীর সবগুলি ঘর দেখতে দেখতে তেমনি নিঃশব্দ পায়ে রেবাকে খুঁজে বেড়াল অবিনাশ। কিন্তু কোথাও রেবার দেখা মিলল না। হঠাৎ অবিনাশের চোখে পড়ল সরোজিনীর পূজায় ঘর থেকে নীলাভ আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এত রাত্রে কে ওখানে? রেবা কি শেষ পর্য্যন্ত ঠাকুরঘরে ঢুকেছে। অবিনাশ নিঃশব্দে এগিয়ে গেল।

ভেজানো দরজাটা আস্তে ঠেলে দিল অবিনাশ, তারপর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

নরম নীল আলোয় সমস্ত কক্ষটি অপূর্ব্ব রহস্যময় হয়ে উঠেছে। মদনমোহনের গলায় দুলছে বেল কুঁড়ির মালা। আর তার সামনে আর একটি মর্ম্মরমূর্ত্তির মত রেবা দাঁড়িয়ে। মাথার আঁচল খসে পড়েছে মাটিতে। হাতের মোমবাতি থেকে গলিত মোম ঝরে ঝরে পড়ছে সেই আঁচলের ওপর।

"রেবা!"

অবিনাশের কণ্ঠ করুণ আর্ত্তনাদের মত কক্ষময় প্রতিধ্বনিত হোল। চমকে উঠে মুখ ফিরে তাকাল রেবা। লজ্জায় শঙ্কায় অপূর্ব্ব সুন্দর দুটি চোখ। কিন্তু অবিনাশের বুকের মধ্যে জ্বলে যেতে লাগল। এই সৌন্দর্য্য কার সৃষ্টি, এই মাধুর্য্য কার জন্য?

ঘনশ্যামের কাহিনী

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

বর্দ্ধমান সহরের সাতক্রোশ দূরে অভয়পুর গ্রামখানি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ত্রিশক্তি-উপাসক শ্রীমৎ ঘনশ্যামের জন্যই গ্রামের এই প্রসিদ্ধিলাভ। সম্প্রতি অভয়পুরে ঘনশ্যামের ভিটাস্তূপের মধ্য হইতে যে তাম্রশাসন ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, অনেকেই হয়ত তদ্বিষয়ে অবগত নহেন। এই লেখার শেষাংশে তাহার উল্লেখ করা হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন—'উপন্যাস—উপন্যাস, তাহা ইতিহাস নহে'। সুতরাং এই 'ঘনশ্যামের কাহিনী' নামক গল্পও—গল্প, ইহা ইতিহাস নহে। তবে, যদি কোন পাঠক বা পাঠিকা ইহাকে ঐতিহাসিক গল্প বা গল্পিক ইতিহাস বলিতে চাহেন, তাহাতে কোন আপত্তি নাই।

খৃষ্ট-পর ১৯০১ সালে আষাঢ়ী কৃষ্ণচতুর্থীর দিন ঘনশ্যামের জন্ম হয়। যখনকার কথা বলিতেছি, তখন ঘনশ্যামের বয়ঃক্রম ৩০। পিতা রাধাশ্যাম বছর পাঁচ আগে পরপারের টিকিট কিনিয়া যাত্রা করিয়াছেন। মাতা তারও দু'বছর আগে গিয়াছেন। সংসারে ঘনশ্যাম আর বগলাসুন্দরী অর্থাৎ ঘনশ্যামের স্ত্রী।

মাঘ মাস। এবার ভাল বর্ষা না হওয়ায়—'ঊণো বর্ষায় দুনো শীত' পড়িয়াছে। প্রচণ্ড শীতের প্রকোপে লোকে কাবু হইয়া পড়িয়াছে। অভয়পুরের লোকেরা ফাল্গুনের অভয়বাণীর আশায় কাঁপিতে কাঁপিতে দিন কাটাইতেছে। প্রভাতে উঠানের রৌদ্রে কম্বলের উপর বসিয়া ঘনশ্যাম রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া একটু উঁচু গলায় কহিল—আর এক কাপ চা যদি কোরে দিতে পার, ত খুব ভাল হয়।"

সম্প্রতি কয়েকদিন হইল, নাক হইতে 'নপটা খুলিয়া রাখিলেও বগলার মুখঝামটায় ঘনশ্যাম চমকিয়া উঠিল। বগলা অপূর্ব্ব মুখভঙ্গীর সহিত কহিল—"আচ্ছা, একবার ত চা খেয়েচ, আবার খেতে হবে! তা হোলে রান্না বান্না থাক, খালি তোমার চা তৈরী করে দি, আর সারাদিন বোসে বোসে ঐ ছাই তুমি খাও।"

আট আনা ভয়, ছয় আনা লজ্জা এবং দুই আনা রসিকতার সহিত ঘনশ্যাম কহিল—"তা হোলে স্ত্রী হোয়ে তুমি আমার মুখে ছাই দেবে, আর আমি তাই বসে বসে খাব? এই তোমার.........................."

একটু থতমত খাইয়া বগলা কহিল—"ছাই নয় ত কি! ও বুঝি ভাল জিনিস? দু'বেলা দু' কাপ যে খাও, সেই ভাল; তার বেশী কি খেতে আছে। আমি এখন ভাতের হাঁড়ী নাবিয়ে আর চা কোরে দিতে পারব না।"—ঝনাৎ করিয়া রান্নাঘরের শিকলটা লাগাইয়া দিয়া বগলা একটা খালি ঝুড়ি হাতে, ঘুঁটে আনিবার জন্য খিড়কীর দিক চলিয়া গেল।

বৈশাখী অপরাহ্ণের নীলাকাশ যেমন দেখিতে দেখিতে হঠাৎ মেঘে ভরিয়া গিয়া ঝড়ের উৎপত্তি হয়, ঘনশ্যামের একটু আগেকার আট-আনী ভয়, ছয়-আনী লজ্জা ও দু' আনা ভোর রসিকতাপূর্ণ অন্তঃকরণও তেমনি নিমেষের মধ্যে ঘোর অভিমানে ভরিয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল—"আজ থেকে চা ত্যাগ! কিছুতেই আর চা করতে বলব না; তাতে মরি আর বাঁচি!"—বগলা খিড়কীর দিকে গিয়াছিল, ঘনশ্যাম তাহার বিপরীত—অর্থাৎ সদরের দিকে আসিয়া ভাঙ্গা চণ্ডীমণ্ডপের খুটী ঠেস্ দিয়া বসিল।

"নাঃ! চা আর কিছুতেই খাব না—। একটু চায়ের জন্য নিত্যি মুখনাড়া সহ্য হয় না। তবে কি না, অভ্যাসটা হোয়ে গেছে, তাই মনটা একটু ছুক্-ছুক্ করে! —এক কাজ করা যাবে; চা খাবার সময়টায় ঘন ঘন বার কতক তামাক খেলেই হবে। তা হোলেই চায়ের ঝোকটা কেটে যাবে।'

অতঃপর চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া নানারূপ চিন্তা করিবার পর ঘনশ্যাম তামাক খাইবার জন্য ভিতরে চলিয়া গেল।

* * *

সকালবেলাই ক্ষুদিরাম চক্রোবর্ত্তীর আড্ডা পূর্ণদমে চলিতেছিল। আড্ডাটা গাঁজার।

পাড়ার ছোকরার দল এই অড্ডার নাম দিয়াছিল—Galmanac Club। তাহারা বলে—'almanac অর্থে পঞ্জিকা, সুতরাং Galmanac হোল—গঞ্জিকা।' ক্লাবের সভ্যসংখ্যা দুই চারিজন মাত্র হইলেও, তাহারা এক একজন দিকপাল; ক্ষুদিরাম সেই দিকপালদের গুরু।

দোকান হইতে তামাক লইয়া ঘনশ্যাম বাড়ীর পথে ফিরিতেছিল। ক্লাব-ঘরের জানালা দিয়া ক্ষুদিরাম তাহাকে ডাক দিল—"ভাইপো, আছ কেমন? আরে, এস একবার। একেবারে যে ডুমুরের ফুল হোয়ে উঠলে, বাবা!"

ঘনশ্যাম ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

তারপর প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া নানা কথাবার্ত্তার পর ক্ষুদিরাম কহিল—"তা ভাইপো, চা ছেড়েছ ভালই কোরেছ; কিন্তু তার বদলে অতবেশী তামাক খেলে পেটের দোষ আর চোখের দোষ দাঁড়িয়ে যাবে। তার বদলে এই সকাল টাইমে স্রেফ একছিলিম করে 'বড় তামাক খাও, দেখবে—কী চিজ্, ক্ষিদে বাড়বে, হজম হবে, চা খেতে ইচ্ছ হবে না, 'ব্রেণ' সাফ থাকবে...........।"

চমকাইয়া উঠিয়া ঘনশ্যাম কহিল—"গাঁজা? গাঁজা খেতে বলচ, খুড়ো?"

"হ্যাঁ। সাত আট ছিলেম তামাক খাবে ত? তার বদলে একটি ছিলিম; তোমার গিয়ে এই 'বড় তামাক' যদি খাও তো…

এক ছিলিমে যেমন তেমন,
দু'ছিলিমে তাজা।
তিন ছিলিমে মদন মোহন
চার ছিলিমে রাজা।
(ও মন) দেখ্না খেয়ে গাঁজা।

আরে, স্বয়ং দেব-দেব মহাদেব এর পরম ভক্ত; বেশী আর কিছু বলিবার দরকার নেই।"

বেশী আর কিছু বলবারও দরকার হইল না। সেই দিন হইতে ঘনশ্যাম চা ছাড়িবার উদ্দেশ্যে Galmanac Club এর মেম্বার লিষ্টে নাম লিখাইল।

অপরাহ্ণ কাল।

শয়নঘরের মধ্যে ঘনশ্যাম চারিদিকে পাখার বাতাস দিয়া মশা তাড়াইবার মত ঘরের ধোঁয়াগুলা জানালা দিয়া বাহির করিয়া দিতেছিল। বগলা ঘরে ঢুকিয়া নাকমুখ সিঁট্কাইয়া কহিল—"পাখার বাতাসে কি আর এই চামসে গন্ধ যায়! ঠিক যেন মড়া পোড়ানো গন্ধ! ওয়াক্!—উঃ হুঁ হুঁহুঁ!"

একটু বিরক্তভাবে কপাল কুঁচ্কাইয়া ঘনশ্যাম কহিল—"মড়া পোড়ার গন্ধ!"

"তা নয় ত কি? রাম রাম! তা, আগে আমি মরি, তারপর না হয় এই ঘরের মাঝেই আমায় পুড়িয়ে নেশার ধোঁয়া ছেড়ো! এখন যে-কটা দিন আছি, আর জ্বালিও না; দোহাই তোমার!" বলিয়া দ্রুতপদে বগলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ঘনশ্যাম তার তল্পী-তলপা, সাঁপি, কলিকা প্রভৃতি লইয়া বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে আড্ডা ফাঁদিল। কিন্তু তাহাতেই ব্যাপরটা সহজে মিটিল না। সন্ধ্যার পর ইহা লইয়া উভয়ের মধ্যে বেশ একটু কথা কাটা সুরু হইল। কথা কাটা-কাটি শেষ যখন প্রায় মাথা ফাটা-ফাটির অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইল, তখন উভয়ে শ্রান্ত হইয়া ক্ষান্ত হইল।

পরদিন সকালে ঘনশ্যাম হাবুল স্বর্ণকারের দোকানে গিয়া বসিলে, হাবুল কহিল, "কাল ব্যাপারটা কি হয়েছিল গা?"

হাবুলের বাড়ী ঘনশ্যামের বাড়ীর গায়েই। বাহিরের একখানি ক্ষুদ্র চালাঘরে তাহার দোকান। হাবুল কিছু আগে তাহার নিত্য সেবনীয় আফিংয়ের বড়ীটি গলাধঃকরণ করিয়া দোকানে আসিয়া বসিয়াছিল। ঘনশ্যামের নিকট গতসন্ধ্যার ব্যাপার শুনিয়া কহিল, "বাস্তবিকই, ও দ্রব্যটার গন্ধ অতি বদ্; মড়া পোড়ার মতই বটে! যেখানে-সেখানে ও জিনিসটা খাওয়া চলে না।"

ঘনশ্যাম কহিল, "তা না চলে না চলুক; কিন্তু চা আমাকে ছাড়তেই হবে, ও আর আমি কিছুতেই খাব না। তার বদলে…

"তার বদলে…"—গলার স্বরটা একটু খাটো করিয়া হাবুল কহিল, "তার বদলে একটু কোরে 'কালাচাঁদ' খাও।"

"কালাচাঁদ! তার মানে আফিং?"

"হ্যাঁ। এতে তোমার মড়া পোড়ার গন্ধ নেই, ধোঁয়া নেই, আগুন, কল্কে, সাঁপি—এসব কিছুই লাগবে না। লাগবে—শুধু এক পয়সা দামের ছোট্ট একটা টীনের কৌটো; ব্যস্!…ঘরের মধ্যে খাও, সভায় গিয়ে খাও, বনের মাঝে খাও, লোকালয়ে খাও, ছুটতে ছুটতে খাও, বোসে বোসে খাও, গাড়ীতে খাও, পাল্কীতে খাও, ট্রেণে, নৌকোয়…

হাসিতে হাসিতে ঘনশ্যাম কহিল, "থাম-থাম, খুব হোয়েচে।"

"না না, যা' বলচি, এর এক বর্ণও মিথ্যা নয়। 'কালাচাঁদ'র কোনই হাঙ্গামা নেই। তোমার ভালর জন্যেই বলচি। চা না-ই খেলে। একটু কোরে খেয়েই দেখ দেখি; দেখবে একবার মৌতাতের কি মজাখানা!"

ঘনশ্যাম মনে মনে ভাবিতে লাগিল।

হাবুল তাহার ছোট কৌটা হইতে ছোট একটি গুলি পাকাইয়া ঘনশ্যামের হাতে দিল; কহিল, "যেন ছোট্ট একটি গোলমরিচের দানা! টুপ করে মুখের মধ্যে ফেলে দাও; দেখবে, ওই একরত্তি জিনিসটুকু তোমাকে স্বর্গের নন্দনে নিয়ে ঘোরাবে!…নাও, খেয়ে ফেল।"

ঘনশ্যাম এ কথার আর কোন প্রত্যুত্তর করিতে পারিল না, কোন প্রতিবাদও করিতে পারিল না; কলের পুতুলের মত গুলিটি মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সত্যই ঘনশ্যাম মর্ত্ত্য হইতে অমরায় পৌঁছিয়া ইন্দ্রপুরীর ঐশ্বর্য্যরাশী সন্দর্শন করতঃ কুসুমিত নন্দনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

হাবুল জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম মনে হচ্চে?"

প্রস্ফুটিত পারিজাতের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া ঘনশ্যাম কহিল, "সাবাস তোমার 'কালাচাঁদ'! যা বোলেছিলে হাবুল, ঠিকই তাই বটে!"

উল্লাসভরে হাবুল কহিল, "তা না হোয়ে কি যায়। দেখলে ত? খেয়ে যাও তুমি আজ থেকে; দেখবে ওর মৌতাতের কি মহিমা! পৃথিবীর যতকিছু সুখ-সৌন্দর্য্য, মনে হবে—ভগবান সে সব শুধু তোমারই জন্যে সৃষ্টি করেচেন। তা'ছাড়া জীবনে কোন অসুখ করবে না; আয়ু বেড়ে যাবে।"

সুতরাং সেইদিন হইতে নিত্য ঘনশ্যাম পৃথিবীর যতকিছু সুখ-সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিল। এই সুখ-সৌন্দর্য্যের মূলাধার 'কালাচাঁদ'কে বন্দী করিয়া রাখিবার জন্য, টীনের

নহে, ঘনশ্যাম হাবুলকে দিয়া সুন্দর একটি তামার কৌটা প্রস্তুত করাইয়া লইল। তবে বলা বাহুল্য যে, গোলমরিচের দানা ক্রমশঃ বড় হইয়া কিছুদিনের মধ্যেই কুলের আঁটির আকার ধারণ করিল।

কিন্তু Galmanac Club হইতেও ঘনশ্যাম তাহার নাম খারিজ করিল না। ভাবিল, দেব-দেব মহাদেবের প্রিয় দ্রব্য, সুতরাং তাহাকে ত্যাগ করা উচিত হইবে না। 'ত্বরিতানন্দ'ও বড় কেও-কেটা নয়। সুতরাং সকাল-টাইমে গাঁজা ও বৈকালে আফিং নিয়ম মত প্রত্যহই তাহার চলিতে লাগিল। এই দুই মহাশক্তির চাপে চা কাহিল হইয়া দূরে হটিয়া গেল। একবার সকালে গঞ্জিকার ধোঁয়া ছাড়িয়া আর একবার বিকালে আফিংয়ের গুলি চড়াইয়া ঘনশ্যাম বলে, "চা আমি আর কিছুতেই খাচ্চি না!"

*

ছয়মাস পরের কথা।

শিবকালী ডাক্তারের ডাক্তারখানা। শিবকালী গ্রামের সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার। তাহার বাবা ছিল ক্যাম্বেলে পাশ করা ডাক্তার; আর ঠাকুরদাদা ছিল তান্ত্রিক কর্ম্মী হিসাবে সুরাদেবীর ভক্ত। শিবকালী ক্যাম্বেলে না গিয়াও এবং তন্ত্র-মন্ত্রের ধার না ধারিয়াও উত্তরাধিকার সূত্রে বাপের ডাক্তারী এবং ঠাকুরদাদার সুরাকে অবলম্বন করিয়া সংসার সমুদ্রের পাড়ি জমাইয়া বসিয়াছিল।

সন্ধ্যার পর 'ধান্যেশ্বরী'র প্রসাদ পান করিয়া শিবকালী তাহার পুরাতন মক্কেল কেদার বাগ্দীর সহিত কথা কহিতেছিল।

কেদার কহিল, "তা'হোলে ডাক্তার, ছেলেটাকে যে আর বাঁচানো যায় না! একটু ভাল করে চিকিচ্ছে না করলে যে···

"ওরে বাবা, ভাল করে চিকিৎসে কচ্চি না ত কি আর মন্দ করে কচ্চি! ওর হোয়েচে 'ট্রিপল্ প্যাল্‌পিটেসান্'। বাঁচে যদি ত এই শিবকালী ডাক্তারের ওষুধেই বাঁচবে; নইলে শিবেরও সাধ্যি নেই যে···যাঃ, ঐ চারদাগ দু'ঘণ্টা অন্তর খাওয়া গে যা।···আরে ঘনশ্যাম যে! এস কি খবর?"

কেদার বাগ্দী চলিয়া গেল। ঘনশ্যাম সামনের বেঞ্চি খানার উপর বসিল।

"তারপর, কি খবর বল দেখি ঘনশ্যাম?"

ঘনশ্যাম একটু ঢোক গিলিয়া, একটু বিষণ্ণ বদনে কহিল, "খবর একটু আছে ডাক্তার; তোমার কাছে একটু উপদেশ নিতে এলুম।"

প্রায় মিনিট পনের-কুড়ি ধরিয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা চলিবার পর, শিবকালী কহিল, "বুঝিচি ঘনশ্যাম, চা ছাড়তে গিয়ে ধরেছ তুমি গাঁজা আর আফিং। তা গাঁজা রোজ ক'বার চলে?"

"তা বেশী নয়; ছিলিম তিন-চার।"

"আর আফিং?"

"আফিং ঐ বিকেলের ঝোঁকে একবার।"

"তা, তোমার বলবার কথা এই যে, আফিংয়ের মৌতাত জমলেই চা খাবার জন্যে প্রাণ ছটফট করে; তাই, আবার তোমায় চা ধরতে হয়েচে। তাই তোমার এখন দুঃখ যে, যার জন্যে গাঁজা আফিং খেতে সুরু করলে, সে চা আবার তোমায় ধরতে হোল। এই জন্যেই তোমার মনে সর্ব্বদাই একটা নিরানন্দের ভাব।"

"সর্ব্বদাই ঠিক নয়। আফিংএর মৌতাতটা একটু কমে এলেই, মনটা যেন কেমন নিরানন্দে···তাই বলচি, রাত্রে আর একটু কোরে আফিং আর একবার খাব? না, কি করব? কিছু বুঝতে পারচি না। সেই চা-ই আমায় খেতে হোল। মনটা—ডাক্তার, সন্ধ্যা থেকে এত খারাপ হয় যে, তা আর কি বলব!"

"কোন চিন্তা নেই। সন্ধ্যার পর একটু কোরে 'ধান্যেশ্বরী'। ব্যাস্—মনেরও ভাবটা কেটে যাবে; একেবারে চাঙ্গা হয়ে উঠবে! সাতটি দিন খাও দেখি, তারপর এসে বোলো।"

"আফিং-এর মত, এ-খেয়ে আবার চা খাবার দরকার হবে ত'?"

"দরকার হবে একটু, তবে 'চা'-এর নয়, 'চাট্'-এর। না হলেও চলবে।"

শিবকালীর ডাক্তারখানা হইতেই সে-দিন ঘনশ্যাম 'ধান্যেশ্বরী'র ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া ঘরে ফিরিল।

পরম ভক্ত ঘনশ্যামের গাঁজা, আফিং, মদ—এই ত্রিশক্তির আরাধনা বেশ ভালভাবেই চলিতে লাগিল।

গ্রামের ছেলে-ছোকরার দল তাহাকে M.A.—অর্থাৎ 'মাষ্টার অব আবগারী'—এই খেতাবে ভূষিত করিল এবং সে-কথা চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে প্রচারিত হইয়া ঘনশ্যামকে সুপ্রসিদ্ধ করিয়া তুলিল। তাহার ত্রিশক্তির আরাধনার 'দিন-পঞ্জিকা' তখন এইরূপ —

প্রাতে ৮টায়	···	এক কাপ চা
„ ৮॥০টায়	···	এক ছিলিম 'ত্বরিতানন্দ'
১বেলা টায়	···	ঐ
„ ৩টায়	···	আফিং
„ ৩॥০টায়	···	এক কাপ চা
সন্ধ্যা ৭টায়	···	'বোতলেশ্বরী'।

পূর্ব্বাহ্নে 'স্বস্তিভানন্দ' টানিবার ফলে মেজাজটা অতিমাত্রায় রুক্ষ হইয়া উঠে এবং তাহার যত তাল, গিয়া পড়ে বগলার উপর। নিত্য খিঁচুনী, ধমক আর গালি খাইয়া খাইয়া বগলার গা-সহা হইয়া গিয়াছিল; সে নীরবে সবই সহ্য করিয়া যায়। অপরাহ্নে আফিং-এর প্রসাদে ঘনশ্যামের সেই 'তিরিক্ষে' মেজাজ শান্ত এবং উদারভাব ধারণ করে। তখন আবার আদর করিয়া বগলাকে আকাশের চাঁদ হাতে আনিয়া দেয়। সন্ধ্যায় 'বোতলেশ্বরী'র পূজান্তে সে আর ঘরে থাকে না; তখন তাহার মিলিটারী মেজাজ হয় এবং ঘুসী পাকাইয়া বীরদর্পে পাড়ায় বাহির হয়। সে-সময়ে 'ট্রিপিল এম-এ'র দাপটে এবং অত্যাচারে পাড়ার লোক সন্ত্রস্ত এবং অতিষ্ঠ হইয়া উঠে।

সে-দিন সকালে স্বয়ং ক্ষুদিরাম চক্কোত্তি ঘনশ্যামের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া হাজির। গুরুকে ঘনশ্যাম অন্য সব বিষয়ে ছাপাইয়া গেলেও, তবু Galmanac Club-এর মেম্বার হিসাবে সে তাহারই শিষ্য। সুতরাং গুরুকে যথোচিত আদর-খাতির করিয়া অভ্যর্থনা করিল। ঘনশ্যামকে একটুকরা প্রস্তর-ফলকের উপর গাঁজা রাখিয়া কাটিতে দেখিয়া ক্ষুদিরাম কহিল—"বাঃ! আমরা কাঠের উপর রেখে কাটি, পাথরের উপর রেখে কাটা ত' দেখচি – ভাল! তোমার বেশ 'শুদ্ধি-বুদ্ধি' ভাইপো।

আত্মতৃপ্তিজনিত প্রফুল্লমুখে ঘনশ্যাম কহিল—"রোজ-কাটতে কাটতে কাঠখানা শেষকালে নষ্ট হয়ে যায়; পাথরের আর ক্ষয় নেই।"

অতঃপর 'মাল' তৈয়ার হইলে, গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে কলিকাটি কয়েকবার হাত-ফেরাফেরি হইয়া সারা চণ্ডীমণ্ডপ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইল। তাহার পর গুরু চলিয়া গেলে, ঘনশ্যাম বাটীর মধ্যে আসিয়া বগলার উদ্দেশ্যে হাঁকিয়া বলিল, "কোথায় গেলে তুমি?"—কথা কয়টা ঘনশ্যাম এমন চীৎকার করিয়া বলিল যে, বাড়ীর দেয়ালগুলা কাঁপিয়া উঠিল, চালা কয়খানা বাঁধন ছিঁড়িয়া খসিয়া পড়িবার মত হইল।

"আজ হাম্ খিচুড়ী খায়েগা। খিচুড়ী আউর বেগুন ভাজা। জল্দী বানাও।"

বগলা ভাত চড়াইয়া দিল। দুঃখে এবং রাগে তাহার বুকখানা চাপিয়া ধরিল; কহিল—"খালি ফরমাস্ করলেই ত' আর হয় না। ডাল নেই, মশলা নেই, ঘি নেই—খিচুড়ী করব কি দিয়ে?"

চীৎকারে বাড়ী কাটাইয়া ঘনশ্যাম কহিল—"নেই মাংতা; ও-সব কথা আমি শুনবো না। খিচুড়ী খাগা, জরুর খাগা, আলবৎ খাগা।"

বগলা দেখিল, ইহার উপর আর কথা কহিলে হয় ত' হাঁড়ী-কুঁড়ী, বাসন-পত্র সব ভাঙিতে আরম্ভ করিবে। সেজন্য আর কোন কথা না কহিয়া নীরবে উনানের পাশে বসিয়া রহিল।

বৈকালে আফিং-এর পর চা খাইতে খাইতে ঘনশ্যাম মৃদু মধুর সুরে কহিল—"বগলা, তুমি হয় ত' ঠিক বুঝতে পার না যে, আমি তোমাকে কি পরিমাণে ভালবাসি। এত বড় পৃথিবীতে, বগলা, আর কিছুই নেই—শুধু আছ তুমি, আর আছি আমি। আমাদের জন্যেই পাখী গান গায়, ফুল ফোটে, চাঁদ হাসে। আমরা কি—মনে কর শুধু এ জন্মের? আমরা জন্ম-জন্মান্তরের।"—একটু নীরব থাকিয়া ঘনশ্যাম গুণ গুণ করিয়া গান ধরিল—

'সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন-ফুলহার,
তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার।'

তারপর রামায়ণখানা লইয়া 'সীতার বনবাস' পড়িতে লাগিল। দুঃখে, মনোবেদনায়, চোখের জলে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সীতার বনবাস পড়িয়া ঘনশ্যাম বোতল এবং গ্লাস লইয়া বসিল। দুই চারি গ্লাস 'ধান্যেশ্বরী' উদরস্থ হওয়ার ফলে যখন বেশ একটু চন্‌-চনে নেশা হইল, মোটা লাঠি গাছটা হাতে লইয়া ঘনশ্যাম তাহার মিলিটারী ভ্রমণে বাহির হইল।

ও-পাড়ায় বিশ্বাসদের দোকানে পাড়ার পাঁচজনে বসিয়া গল্প-গান করে। ঘনশ্যাম সেইখানে আসিয়া আসন লইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া গল্প-স্বল্পের পর নগেন হাজরা ঘনশ্যামকে কহিল—"বাহাদুরী আছে বটে তোমার ঘনশ্যাম। স্কুল-কলেজে না পড়েও 'এম-এ' হয়ে গেলে!"

সুরাজড়িত কণ্ঠে ঘনশ্যাম তাহার হাতের লাঠিটা আস্ফালন করিয়া কহিল—"আলবৎ! ঘনশ্যাম বড় একটা "কেও-কেটা' নয়।"

জীবন প্রামাণিক কহিল—"অত করে সাধাসাধি করলুম, জমিটা আমায় বেচলে না, কিন্তু মেজবাবু একবার বলতেই সুড়সুড় করে বিক্রী-কোবালা করে দিলে।

দোকানের সামনেই ঘনশ্যামের পৈতৃক অনেকটা জমি পতিত অবস্থায় ছিল। সম্প্রতি জমিদারবাড়ীর মেজবাবুকে ঐ জমী ঘনশ্যাম বিক্রয় করিয়াছে। জীবন প্রামাণিক প্রথমে ঐ জমী কিনিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ মেজবাবু উহা কিনিতে চাওয়ায় ঘনশ্যাম ভয়ে ভয়ে আর দ্বিরুক্তি করিতে পারে নাই; অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যেই মেজবাবুকে উহা বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। মেজবাবু আজ কয়েকদিন হইল উহাতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট আমের কলম বসাইয়াছেন।

জীবন কহিল—"বাবা, কলিকাল! আমাদের কাছেই তোমার যত জারিজুরি, শক্তর পাল্লায়⋯

অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া ঘনশ্যাম লাফাইয়া উঠিল—শক্তর পাল্লা! মেজবাবুকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। "ও জমী হাম্ ফের লেগা।" জড়িত কণ্ঠের সহিত তাল রাখিতে ঘনশ্যাম তাহার মোটা লাঠিটা বারকতক মেঝেতে ঠুকিল। রাখাল

বলিল—"হাঁা ফিরিয়ে দেওয়াবে এখন তোমার মেজবাবু! ও জমীর ধারে আর তোমায় যেতে হচ্চে না, তা 'এম-এ'ই হও আর 'ওয়াই-জেড'ই হও!"

তুবড়ীর মত ফোঁস্ করিয়া উঠিয়া ঘনশ্যাম কহিল—"তাই নাকি! ঘনশ্যাম কারেও কেয়ার করে না। সব কলমের চারা এখনি আমি কেটেদিয়ে আসব!"—ঘরের একধারে একখানা দা পড়িয়াছিল। দ্রুতপদে টলিতে টলিতে ঘনশ্যাম সেই দা-খানা লইয়া বাহির হইয়া গেল এবং সেই জমীতে মেজবাবু যতগুলি আমের কলম পুঁতিয়াছিলেন, জোৎস্নার আলোকে একটি একটি করিয়া সমস্ত কলম কাটিয়া দিয়া আসিল। ব্যাপার দেখিয়া সকলেই চমকিত এবং হতবুদ্ধি হইয়া গেল এবং ঘনশ্যামের জন্য আতঙ্কিত হইয়া সকলেই তদ্দণ্ডে যে-যাহার গৃহে চলিয়া গেল।

দোকানের বাহিরে রোয়াকের খুঁটি ঠেস দিয়া ঘনশ্যাম বসিয়াছিল। নেশার ঝোঁকে কাজটা করিয়া ফেলিবার পরই তাহার নেশা ছুটিয়া গিয়াছিল। এ তল্লাটে সকলেই মেজবাবুকে যমের মত ভয় করে। ঘনশ্যামের বুকের ভিতরটা গুরু-গুরু কাঁপিতে লাগিল। কাল বর্দ্ধমান হইতে ফিরিয়াই যখন শুনিবেন যে ...., ঘনশ্যাম আর বসিয়া থাকিতে পারিল না; এক পা এক পা করিয়া বাটী ফিরিয়া গেল ও অনাহারে শয্যায় শুইয়া পড়িল। ... ...

গভীর রাত্রি। সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ। কেবল ঝিঁঝিঁর অবিশ্রান্ত ডাকে সেই গভীর নিস্তব্ধতা কতক পরিমানে ভঙ্গ হইতেছে মাত্র। ঘনশ্যামের বাটীর সদরের দুয়ার নিঃশব্দে খুলিয়া একটা ছায়া-মূর্ত্তি বাহির হইল। ধীরে ধীরে গ্রাম্যপথ অতিবাহিত করিয়া সেই ছায়ামূর্ত্তি মাঠের মধ্য দিয়া কাটোয়ার পাকা শড়কে আসিয়া পড়িল। ছায়ামূর্ত্তি ঘনশ্যামের। জন্মস্থান, সাত-পুরুষের ভিটা, স্ত্রী, গাঁজার কলিকা সাঁপি সবকিছু পরিত্যাগ করিয়া ঘনশ্যাম সেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল, কেহ জানিতে পারিল না।

পরদিন লোকে শুনিল যে, ঘনশ্যাম ইহ-জগৎ না হউক, ইহ-অভয়পুর ত্যাগ করিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে। অভয়পুরকে কানা করিয়া চলিয়া যাইবার পর হইতে একটি একটি করিয়া দিন কাটিয়া মাস গত হইল; একটি একটি করিয়া মাস কাটিয়া বৎসর গত হইল; বৎসর কাটিয়া আট দশ বৎসর অতিবাহিত হইল, তত্রাচ Galmanac Clubএর সভ্য, ত্রিশক্তি উপাসক ও ট্রিপিল্ এম-এ, শ্রীমৎ ঘনশ্যাম আর গৃহে ফিরিল না।

সম্প্রতি 'বঙ্গীয় ঐতিহাসিক সংসদে'র পক্ষ হইতে তাহার জীবনী লিখিবার উপকরণ সংগ্রহের জন্য একদল প্রত্নতাত্ত্বিক অভয়পুরে আসিয়াছিল। তাহারা দেখিল, ঘনশ্যামের লীলা-নিকেতন সেই চণ্ডীমণ্ডপখানি ভূমিসাৎ হইয়াছে। জীর্ণ শয়ন ঘরখানিকে কোন রকমে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া বগলা স্বামী-শ্বশুরের ভিটাতে এখনো 'সন্ধ্যা' দিতেছে এবং রামচন্দ্রের অপেক্ষায় শবরী যেমন বৎসরের পর বৎসর প্রতীক্ষা করিয়াছিল, সেইরূপ সে ঘনশ্যামের ফিরিয়া আসা প্রতীক্ষায় পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে।

প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ঘনশ্যামের ভাঙ্গা চণ্ডীমণ্ডপের স্তূপ হইতে তাহার সেই আফিংয়ের কৌটারূপ 'তাম্রশাসন' ও গঞ্জিকা ছেদনের সেই 'প্রস্তর লিপি' উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়াছেন, কিন্তু অনেক অনুসন্ধানেও তাহার 'ধান্যেশ্বরী'র বোতল ও গ্লাসের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

পট পরিবর্ত্তন

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

জীবনের চলতি পথে আকস্মিকই একদিন সমীরবাবুর সঙ্গে পরিচয়। এই পরিচয়ের পথ ধরেই আর একদিন সম্পূর্ণ অজানা এক সংসার-নাট্য-মঞ্চের অপরিচয়ের যবনিকা আমার চোখের সামনে উঠলো।

বছর চারেক আগের কথা।

নিবিষ্ট মনে অফিসে বসে প্রুফ দেখছি। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেই সামনের চেয়ার টেনে বসলেন। বললেন, এই যে আপনার চিঠি।

ন'দির পত্র। পত্রে দিদি তাঁর বড় ছেলের বিবাহ-ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে আমার মতামতের উপর নির্ভর করেছেন। বললাম, দেখুন আমি সংসারের সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখি না, এরূপ অবস্থায়—বিশেষ বে-থা সম্বন্ধে—কোন মতামত দেওয়া কি সঙ্গত হবে?

পরোপকার তো করা হবে: সমীরবাবু বলে চললেন: মেয়ে তাদের পছন্দ হয়েছে, শুধু দেনা-পাওনা বিষয়ে আটকে আছে। আপন পর অনেকগুলো কন্যাদায়; এই উপকার-টুকু আপনার করতেই হবে দেবব্রতবাবু।

ধীর শান্তপ্রকৃতির মানুষটি। চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। একই কথা বার বার ঘুরিয়ে বলার অভ্যাস হলেও সমীরবাবুর কথার মধ্যে কপটতার প্যাঁচ নাই। একটু গাম্ভীর্য্যের সঙ্গেই বললাম, আচ্ছা আপনি আজ যান, কাল মেয়েটি দেখে আমার শেষ কথা জানাবো।

সুলক্ষণা কন্যা; চলায় বলায় কোন আড়ষ্টতা নাই। মেয়েটি সমীরবাবুর ভাগিনেয়ী। পছন্দ হ'ল।

বিনা দ্বিধায় বললাম—বিয়ে তো ব্যবসা নয়, অক্লেশে আর অনায়াসে আপনার যা সাধ্য এবং অভিরুচি, তাই দিবেন।

লক্ষ্য করলাম, কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধায় যেন সমীরবাবু গলে গেলেন।

অনাড়ম্বরে উৎসব শেষ হল; কিন্তু যে পরম প্রীতির সম্বন্ধ বিশেষ করে এই মানুষটির সঙ্গে স্থাপিত হল, তা সত্যি অমূল্য। সংসার-যাত্রার পথে নিত্য-নৈমিত্তিক উপলক্ষ্যে এই পরিচয় ক্রমশঃ অকুণ্ঠ ও সহজ হয়ে উঠলো। উদার সামাজিকতা আর সহৃদয়তায় তিনি পরিজন-প্রতিবেশীর একান্ত প্রিয় ছিলেন। এমন আত্মীয়-স্বজনের প্রতিপালক ও পরিপোষক খুব কমই আজকাল চোখে পড়ে। বস্তুতঃ এই আদর্শ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ গৃহীকে কেন্দ্র করে বহু আশা-ভরসা আবর্ত্তিত হতে দেখেছি।

বছর দুই পরের ঘটনা। একদিন অপরাহ্নে সমীরবাবু হন্তদন্ত হয়ে আমার কাছে উপস্থিত। বুঝতে বাকী রইলো না যে, বিশেষ কিছু ঘটনা ঘটেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি?

বিনা ভূমিকায়ই সমীরবাবু উত্তর দিলেন, মিনতির পরশু দিন বিয়ে। বরপক্ষ 'তার' করেছে—আগামী কল্য রওনা হচ্ছে। অথচ মা, বৌ, বাড়ীর সকলের—এমন কি মিনতির পর্য্যন্ত এই বিয়েতে সায় নাই। নানা প্রতিকূল সংবাদে এদের মন কেঁচে গিয়েছে। এখন করি কি বলুন।

বললাম, আপনি গৃহস্বামী এবং কর্ম্মকর্ত্তা, আপনার যা মত তাই হবে।

তা হবে, কিন্তু সকলের অমতে জোর করে যদি এ কাজ করি এবং ভবিষ্যতে কিছু অকল্যাণ হয়, তবে চিরদিন এ গ্লানি আমায় একাকীই বহন করতে হবে। টেলিগ্রামে নিষেধই করে দি, কি বলেন?

একটু কঠিন ভাবেই বললাম, তা হলে নিষেধেরই সমর্থন আপনি আমার কাছে চান দেখছি। এ অবস্থায় আমার আর কি বক্তব্য থাকতে পারে, বিশেষ আমি যখন পাত্রপক্ষের কিছুই জানি না।

সমীরবাবু চোখ দু'টো বুজে একটু দম ধরে থাকলেন। তারপর ধীর কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, পাত্রপক্ষের আর সবই ভাল, শুধু ঘর আর বর সম্বন্ধে যা আপত্তি। ছেলেটি স্বাবলম্বী। স্বোপার্জ্জনে উত্তর-বঙ্গের এক সহরে দালান-বাড়ী করেছে এবং ভাল ব্যবসাও চালাচ্ছে; কিন্তু তেমন দর্শনধারী নয়।

তা নাই বা হ'ল: বললাম: একটা নারীর আটপৌরে ব্যবহারিক জীবনের ষোল আনা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আনুকূল্য আছে দেখছি। ভালবাসা আর মানসিক গঠনের সামঞ্জস্য বিধাতার হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। ওটা বাইরের বিচারে স্থির করা কঠিন।

তা' হলে আপনার মত আছে বলুন? সমীরবাবু প্রশ্ন করলেন।

এ গুরুতর বিষয়ে কোন চরম মতামত দিবার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। একটু পাশ কাটিয়ে বললাম, আপনিই ভেবে যা' হোক স্থির করুন।

তাই যদি করতে পারতাম, তবে এতটা পথ দৌড়ে আপনার কাছে আসব কেন বলুন: সমীরবাবু বলে' চললেন: আমি একান্ত বিভ্রান্ত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি। হ্যাঁ বা না, আপনি যা' বলবেন, তাই-ই আমি করবো।

সমীরবাবুর এই নির্ভরতা আমায় বড় ভাবিয়ে তুলল। বললাম, আচ্ছা, পনের মিনিট আমায় নীরবে ভাবতে দিন।

তরঙ্গায়িত চিত্ত-মনের বিচার-বিশ্লেষণে প্রত্যক্ষ উপাদান এখানে কিছু নাই। নিথর নিস্তরঙ্গ বৃত্তির ইসারা অনুসরণ করে নিঃসংশয় কণ্ঠেই বললাম, হ্যাঁ, মিনতির এই বিয়ে শুভই হবে। আপনার সম্মতিসূচক তার করে দিতে পারেন।

নির্ব্বাক্ সমীরবাবু উঠলেন। মনে হল যেন অন্তর্দ্বন্দ্বের দোলা তাঁর চোখে-মুখে আরও উৎকট হয়ে উঠেছে।

পরের দিন সমীরবাবুর ছোট ভাই সঞ্জীব এসে নিমন্ত্রণ করে' গেল, তার পরের দিন মিনতির বিয়েতে অতি অবশ্য যেন যাই।...

পরবর্ত্তী জীবনে মিনতি সত্যই পরম সুখী হয়েছে। সমীর বাবু বরাবর আমাকে বলতেন, সাধুবাক্য কোন দিন ব্যর্থ হয় না।

এমনি করেই তাঁর বিচিত্র সুখ-দুঃখের অংশভোগী তিনি আমায় করেছিলেন। অতি বড় প্রিয়জনের নিদারুণ মৃত্যুশোকেও আমি তাঁকে কখন টলতে দেখি নি। ধর্ম্মভীরু মানুষটিকে সাংসারিক কর্ত্তব্য পালনে সর্ব্বদাই উদ্যত দেখেছি। দু'টি ভাইয়ের যৌথ-পরিবার। কোনরূপ বাদ-বিসম্বাদ নাই। নাই কোথাও এতটুকু বিষাদ-মালিন্যের ছায়া। হাস্যময়ী বালিগঞ্জ-পল্লীর এই সন্তান-সন্ততিভরা আনন্দমুখর সংসারটিকে আমার ভারী ভাল লাগত। যখনই ওধারে গিয়েছি, একবার সমীরবাবু বলে হাঁক দিয়ে এসেছি। ছোট্ট বাড়ী। সামনেই সাদার্ণ এভেনিউ-এর খোলা প্রান্তর! ও মায়া-পুরীর সাবলীল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছোঁয়া মধ্যবিত্ত হলেও, এই পরিবারটির সংস্পর্শে বেশই মিলত।

কত উৎসব, উপলক্ষ, তিথিপালন-পার্ব্বণ, আসা-যাওয়ার

অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতার মধ্যে কোথা দিয়া কেমন করে' যে সাড়ে তিনটি বৎসর গড়িয়ে গেল, তা' যেন টেরই পাই নি!

কিন্তু একদিন হঠাৎ এক দমকা হাওয়া সব ওলট পালট করে দিয়ে গেল। এ যেন আনন্দে করতালি দিয়ে পথ চলতে চলতে আকস্মিক হোঁচট খেয়ে ভূপতিত হওয়া। আশ্চর্য্য মানুষের জীবনধারা; ততোধিক অদ্ভুত রহস্যময় এই সৃষ্টি!

ঠিক তেমনি সেই প্রথম পরিচয়ের দিনের মতই আফিসে বসে একমনে প্রুফ দেখছি, এমনি সময়ে সঞ্জীব এসে বিষণ্ণ মুখে বললে, এই দেখুন ডাক্তারের রিপোর্ট। সমীরদা আট মাসের মধ্যে অবধারিত মারা যাবেন।

বলেই সঞ্জীব ছোট বড় পাঁচখানানা এক্স-রে ফটো আর চার জন ডাক্তারের টাইপ-করা রিপোর্ট আমার সামনে টেবলের উপর রাখলে।

এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! শুধু বিস্মিতই হলাম না, দারুণ ব্যথিতও হলাম।

তবুও কিন্তু মনটা বিশ্বাস করতে চাইল না। একটা জলজ্যান্ত মানুষ—রীতিমত খায় দায়, অফিসে যায়। মরবার মত বৈলক্ষণ্য তো সমীর বাবুর কিছুই প্রকাশ পায় নি। গত পরশু হ্যাঁ, পরশু দিনই সমীর বাবু আমার অফিসে এসে কত গল্পসল্প ক'রে গেলেন। কিন্তু—কিন্তু কলকাতায় নাম-করা সার্জ্জেন ও ডাক্তারের এই রিপোর্ট উড়িয়েই বা কি ক'রে দেওয়া চলে! দোদুল চিত্তেই সঞ্জীবকে ভরসা দিলাম, চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই। হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী, বাইওকেমি, জলচিকিৎসা তো আছে!

সঞ্জীব বললে, হ্যাঁ, আমারও যেন বিশ্বাস হয় না। তবে এলোপ্যাথি জবাব দিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসার পরিবর্ত্তন করতে হবে। আর দাদা এক্স-রে রিপোর্ট দেখতে চাইছেন। এ সবের ব্যবস্থা আপনি আজ সন্ধ্যায় গিয়ে ক'রে আসবেন।

স্থির হল, মৃত্যুর এ আগাম-সংবাদ সমীর বাবুকেও দেওয়া হবে না, বাড়ীর আর কাকেও নয়।

কিন্তু আজকের সন্ধ্যা বিগত দিনের সন্ধ্যার মত নয়। সে হাল্কা মন নাই, না আছে চিত্তের সে উল্লাস। মুহূর্ত্তে মানুষ যেমন পরিবর্ত্তিত হয়ে যাচ্ছে, তেমনি যাচ্ছে তার পরিবেশ বদলিয়ে। সেই ট্রাম, বাস, সেই গড়ের মাঠ, সেই চলমান ব্যাপ্ত বিচিত্র নরনারীর ভীড়! কিন্তু নিজেকে কেমন বিষণ্ণ আর একাকী বোধ হতে লাগল। আশ্চর্য্য আমার এই মানসিক অবসাদ! সব আস্‌পাশের কিছুকে না লক্ষ্য করে তবুও কোন রকমে যেন পা টেনে চললাম।

আগের মতই তেমনি সমীর বাবু বাইরের দিকের ঘরটায় বসে আছেন, দেখলাম। মুখে একটুকুও আশঙ্কার ছায়া নাই। রাস্তার ধারের ছোট্ট বারান্দাটা রোজকার মতই বালক-বালিকার হুটোপাটির মধ্যে কলরব-মুখর হয়ে উঠেছে। অতি সন্তর্পণে ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করলাম, সমীর বাবু কেমন আছেন?

সহজ কণ্ঠেই তিনি উত্তর দিলেন, এমন বক্ষের ব্যথা আগেও দু' একবার হয়েছে, আবার সেরেও গেছে। এবারও যাবে। অনর্থক একশো পঁচিশ টাকা খরচ করে ফটো নেবার কি দরকার ছিল, সঞ্জীবের, বুঝি না!

রোগের শেষ রাখতে নাই: বললাম: আমূল নিরাময় যাতে হয়, সেইভাবে চিকিৎসা করুন। কালকেই তিন মাসের ছুটীর দরখাস্ত করুন।

হাতের ছুটীটা আগেভাগেই নষ্ট করব: সমীর বাবু যেন একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই বললেন: এক্স-রে-এর রিপোর্টটা তো আজ দু' দিন ধরেও সঞ্জীব আমায় জানালেই না।

বললাম, ডাক্তাররা জানিয়েছে, রোগটা একটু ক্রনিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্রাম আর সুচিকিৎসার প্রয়োজন। মনে হয়, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা এ ধরণের ব্যারামে বেশী উপকারী হবে।

বেশ, আপনারা যা মত করেন তাই হবে। কথাটা ব'লে সমীর বাবু নীরব হলেন।

সঞ্জীব নির্ব্বাক নেত্রে আমার মুখের দিকে চাইল। ভাল করাটাই যেন কেমন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। আমি আর সঞ্জীব এই সহজ পরিচিত পরিবেশের সহিত কোথায় যেন খাপছাড়া হয়ে পড়েছি। ভবিতব্যকে না-জানার আশীর্ব্বাদে-বঞ্চিত হয়ে আমরা আনন্দহারা হয়ে পড়েছি। এ যেন গীতার সেই 'পূর্ব্বমেব নতোঃ'-র মত। সমীর বাবুর বাঁচাটা যেন অর্থহীন হয়ে পড়েছে কাছে। আমাদের বললাম, এবার তা' হলে উঠি।

আরে, আর একটু বসুন না! এত তাড়া কিসের: সমীর বাবু হাঁকলেন: এরা সব গেল কোথায়? দেববাবুকে একটু জলখাবার এনে দে না?

জলখাবার এল। খেলামও। ইতিমধ্যে সমীর বাবু তাঁর আশা-ভরসার কথা বলে' চললেন। কোনটা বা কানে ঢুকল, কোনটা বা ঢুকল না।

সারা পথ কেবলই মনের পর্দ্দায় ধ্বনিত হতে লাগল, সমীর বাবু আট মাসের মধ্যে এ সুখের সংসার ছেড়ে' চলে' যাবেন। মৃত্যুর মুখোমুখি এসে তিনি দাঁড়িয়েছেন, অথচ তিনি তাই জানেন না। হয়তো না-জানাই ভাল। কিন্তু নাও তো মরতে পারেন। কতই বা বয়স! মাত্র—হ্যাঁ, মাত্র আটচল্লিশ বছর তো বয়স! এখনও সুস্থ—সবল।

মাস দেড়েক পরে। যকৃতের ও বক্ষের আশে পাশে শিবের অসাধ্য ক্যান্সার ব্যাধি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এলোপ্যাথি আগেই তার চরম অসমর্থতার সিদ্ধান্ত জানিয়ে

দিয়েছে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চলছে। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছেন সমীরবাবু? একটু ভালর দিকে তো?

বেদনার উপশম হয় নি। তবে আর এ দু'দিন বাড়েনি মনে হচ্ছে। বেদনাক্লিষ্ট সমীরবাবুর কণ্ঠস্বর: আজকের দিনটা দেখে ডাক্তার ওষুধ বদলে দিবে বলেছে।

স্বগতভাবেই মুখ দিয়ে যেন নিঃশব্দেই বেরিয়ে এল, আর ডাক্তার আর ওষুধ! নিরবচ্ছিন্ন ব্যথা নিয়ে এখনও সমীর বাবু উঠে হেঁটে বেড়ান, পেটে হাত বুলোতে বুলোতে বারান্দায় পায়চারী করেন। সংসারের ভাবী পরিকল্পনা তাঁর মুখে শুনি। মেয়েদের গান শেখার হারমোনিয়াম, ছেলেদের পরীক্ষায় পাস, কানুর চাকুরী, এমন কত কি! আমার কানে কিন্তু এ সবই ব্যর্থ বিলাপের মত শোনায়। বার বার স্মরণ হয়, সমীর বাবুর আয়ুর পরিধি আর মাত্র সাড়ে ছয় মাস। প্রার্থনা করি, হে ভগবান, ডাক্তারের ভবিষ্যদ্বাণী যেন মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

কিন্তু মিথ্যা আর হয় না। যত দিন যায়, যন্ত্রণা বেড়েই চলে। অসহ্য দিনগুলো অসম্ভব লম্বা হয়ে আসে, কিছুতেই কাটতে চায় না। এমনি করেই প্রায় তিন মাস ধীর-মন্থর গতিতে গড়িয়ে চললো।

কাজের ভিড়ে কদিন আর যেতে পারিনি। দেখা হতেই সমীর বাবু অনুযোগ করলেন, এখন আর কেউ আসে না। একটু দেখা-শুনা করলে মনটা ভাল থাকে। ঠোঁট-মুখ চেপে উদ্গত বেদনার বেগটাকে যেন একটু সামলে আবার বললেন, সঞ্জীব একা লোক, ক'দিকে ঠেকাবে! আফিস করবে, না চাল ও চিনি কয়লা—

কথা আর শেষ করতে পারলেন না। বালিস বুকে ধ'রে উপুড় হয়ে পড়লেন—উঃ, অ-স-হ্য!

দেখলাম, সমীর বাবুর সারা মুখে বেদনার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটু পরে ক্লিষ্ট কণ্ঠে তিনি আবার বললেন, ছোট ছেলেটির আবার টাইফয়েডের মত হয়েছে। কবে যে ভাল হয়ে উঠবে—ওরে কে আছিস্, দেববাবুকে একটু জল খাবারের ব্যবস্থা করে' দে না!

বাধা দিয়ে বললাম, এ অবস্থায় আপনি ব্যস্ত হবেন না। ভাল হয়ে উঠুন, আনন্দ করার ঢের দিন মিলবে।

আরও মাসখানেক পরে। হোমিওপ্যাথি ছেড়ে কবিরাজী চলছে। আস্তে ঘরে ঢুকে সামনের চেয়ারটায় বসলাম। সমীর বাবু ঘাড়টা একটু তুলে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কেবল বললেন, ওঃ—আপনি! বসুন।

যন্ত্রণায় নিজের ভিতর যেন সমাহিত হয়ে পড়েছেন। কথা বলারও অবসাদ লক্ষ্য করলাম। বললাম, কেমন আছেন?

আর কেমন! অসহ্য! এবার মরণ হলেই বাঁচতাম!

শরীরের সমগ্র শক্তি দিয়ে যেন অব্যক্ত ব্যথাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছেন। বুকে বালিস, মাথাটা সামনে ঝুলে পড়েছে। হাত-পায়ের নলা শুকিয়ে এসেছে। কপালের শিরগুলো স্ফীত।

একদৃষ্টে চেয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। ষাট বছরের বৃদ্ধা জননী পাশে বসে বাতাস করছেন। এক সময়ে বললেন, এ কি রকম আশ্চর্য্য বাবা, এতবড় কলকাতা সহরে কি এমন ওষুদ নেই যে, এই যাতনা একটু কমে!

উত্তর দিবার কিছু নাই। কেবলই মনে হতে লাগল, এই বিশ্ব-সৃষ্টির মাঝে সত্যিই মানুষ কত ক্ষুদ্র—কত অসহায়, বিজ্ঞান—সভ্যতা মরণের অবরুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে কেবলই যেন অন্ধের মত হাতড়াচ্ছে!

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সেদিন উঠলাম। মনে হল—বকরূপী ধর্ম্মের সেই সনাতন প্রশ্ন "কিমাশ্চর্য্যম্?" আর যুধিষ্ঠিরের সেই উত্তর, মানুষ প্রতিনিয়ত মারা যাচ্ছে কিন্তু এই নিশ্চিত মরণ জেনেও সে জীবনে এমন আচরণ করছে যেন কখনই মরবে না! আশ্চর্য্য সৃজনের এই রহস্য! একটা উদাসীন বৈরাগ্যে সারা চিত্ত-মন ভরে উঠলো।

প্রাত্যহিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে সমীর বাবুর তিল-তিল মরণ-চিত্র ভেসে উঠে। এই প্রাণ-চঞ্চল সুন্দর পৃথিবীর বুক থেকে সমীর বাবুর অস্তিত্ব একটু একটু ক'রে মুছে যাচ্ছে, এ আমি যেন সজ্ঞানে লক্ষ্য ক'রে চলেছি।

আবার ক'দিন পরেই গেলাম।

বাইরের দরজায় পা দিতেই দেখি, মালবিকা, ভারতী, আরতি, অরুণিমারা সব কিশোরীর দল মাথার খোঁপায় টাট্‌কা ফুল গুঁজে নৃত্যচঞ্চল ছন্দে পা ফেলে চলেছে লেকে বেড়াতে। বালক-বালিকা বিকালের উচ্ছল আনন্দে আঙিনায় ক্রীড়ারত। পাশের ঘরটি ছোট্টদের আনন্দ-কলরব-মুখর। এই স্ফুটোনোম্মুখ প্রাণস্পন্দনের পাশেই ও-ঘরে এক নির্ব্বাণোন্মুখ মুমূর্ষুর জীবন-প্রদীপ ক্রমে নিভে আসছে। আমার পরিপূর্ণ চেতনার পটভূমিতে এই যুগল চিত্র যুগপৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। এ এক অপূর্ব্ব অনুভূতি! মনে হ'ল, কোনটা সত্য! জীবন না মরণ? জ্ঞান না অজ্ঞান? হয়তো দু'টোই সত্য; হয়তো বা দু'টোই মিথ্যা! অথবা এক অদেখা সূত্রে মরণ-মালার মতই গ্রথিত এই জন্ম, এই জীবন আর মরণ, এমনি কত শত জিজ্ঞাসা জাগে। রহস্য—সৃজনের সত্যিই এ এক গভীর দুর্ভেদ্য রহস্য। অনির্ব্বচনীয় এক মানসিকতা নিয়ে ধীর পদবিক্ষেপে রোগীর ঘরে ঢুকলাম।

সমীর বাবু ফ্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে চাইলেন। অসহায় সে চাহনি। কোন কথা বলতে পারলেন না। মনে হ'ল, কত কথা যেন না-বলা রয়ে গেল; সমীর

বাবুর জীবনের উপর যে কালো যবনিকা দ্রুত নেমে আসছে, তার করাল চেহারা আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। অনিবার্য্য নিরুপায়তার মাঝে নিজেকে বড় অসহায় মনে হতে লাগলো।

শুশ্রূষারতা বৃদ্ধা জননী আর্দ্র কণ্ঠে কইলেন, বাবা, সমীর আর কিছু খেতে পারছে না, কি যে হবে কে জানে।

জবাব দিবার কিছু নাই। নির্ব্বাক নিরীক্ষণের মধ্য দিয়ে অনেকক্ষণ কাটিয়ে চুপচাপ উঠে পড়লাম।

দিন চারেক পরে। সঞ্জীব এসে বললে, গতকাল দাদার একটু হিক্কার ভাব হচ্ছিল। বাইওকেমিক চিকিৎসা চলছে। আজ যেন একটু ভাল মনে হচ্ছে।

সারা চিত্ত কিন্তু আমার দ্বিধায় দুলে উঠলো। দীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের হয় তো এই উজ্জ্বলতা। কাজের ভিড়ে কিছুতেই আর যাবার সময় করে উঠতে পারলাম না।

পরের দিন অপরাহ্ণেই রওনা হলাম। একটা অজানা আশঙ্কায় অকারণেই প্রাণটা গুমরে উঠতে লাগলো। বাড়ীটাকে ঘিরে একটা নীরব নিস্তব্ধ মুহ্যমান আবহাওয়া যেন ভয়ঙ্কর কঠিন হয়ে উঠেছে। শঙ্কিত পদক্ষেপে রাস্তার ধারের বারান্দায় উঠে দাঁড়ালাম। জানালা-ঘেঁষা সেই চৌকিটা শয্যাবিহীন অবস্থায় খাঁ-খাঁ করছে। শূন্য কোঠার এ-পাশে শোকবিহ্বলা বৃদ্ধা জননী ভূলুণ্ঠিতা। মুখে তাঁর মৃত্যুর পাণ্ডুরতা। আমাকে দেখেই অবগুণ্ঠন টেনে সারা মুখখানা লুকালেন, যেন তাঁর অস্তিত্বটাই একটা লজ্জাকর ব্যাপার। আর ও-পাশে সদ্য সাদা-থান-পরা নিরাভরণা সমীর বাবুর সহধর্ম্মিণী অবলুপ্ত-চেতনা। দুঃসহ বেদনার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রত্যাগমনোন্মুখ হতেই চোখে পড়লো, বারান্দার ঐ সরু কোণটার আলসে হেলান দিয়ে কাছা-গলায় আট-বছরের সমর আনমনে পশ্চিম-আকাশের পানে তাকিয়ে।

ঘুমভাঙার কমিডি

শ্রীরঞ্জনরঞ্জন রায়

মানুষকে ভূতে পায়, ডাইনীতে পায়-এসব শুনেছি। কিন্তু ঘুমেও যে পায়, তাহা শোনা নয়—একেবারে প্রত্যক্ষ। আমায় ঘুমে পাইয়াছিল একটী নদীর উপর, ষ্টীমার কেবিনে, সেই ঘুমভাঙ্গার যে কমিডি, এমনটি জীবনে আর কখনো ঘটে নাই। চোখ হইতে জল ফেলিয়া ছাড়িয়াছিল। সেটা খাঁটি কমিডি কি ট্রাজো-কমিক, তা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। খুব নাটকীয়। পাঁচবৎসর আগের কথা…কিন্তু একটুও ভুলি নাই।

যশোর জেলার একটি মহকুমা হাকিমের কাছে আসিয়াছিলাম সাক্ষী দিতে। কিষণগঞ্জের একখানা নৌকা থেকে কি সব মাল চুরি গিয়াছিল…তার কতক উদ্ধার হইয়াছে...আমাকে সনাক্ত করিতে হাকিম সমন দেন।...আমি তাঁকে জানাই—কোনো জিনিষ আমি নিজে কিনি নাই…এক বন্ধুর অর্ডার মতো কোনো দোকান-দারকে দিয়া জিনিষগুলি পাঠাইয়াছি।…কিন্তু হাকিম ওয়ারেণ্ট করিবেন ভয় দেখাইলেন। কাজেই যাইতে হইল। ওখানে এক শ্যালীর শ্বশুর বাড়ি…সেখানে উঠিলাম।

পূজার আগে…দিন ছোট। হাকিমের কাছে পাথেয় আদায় করিতে একটা খণ্ডযুদ্ধ হইল। আমি বিল করিলাম প্রায় পঞ্চাশ টাকার…চাকরসহ আসিতে সেকেণ্ড ক্লাশ রেল-মাশুল ও ফার্ষ্টক্লাশ ষ্টীমার ভাড়া। হাকিম দিতে চাহিলেন আট টাকা কয় আনা…এক জনের থার্ডক্লাশ ভাড়া। প্রায় সন্ধ্যা লাগিয়াছে। শ্যালীর বাড়িতে আসিয়াই ভৃত্য রামভজনকে বলিলাম তল্পি তল্পা গুটাইতে। তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া নিলাম। শ্যালী অনুযোগ করিল কলিকাতার লোকের সব 'অনাছিষ্টি', নৈলে জাহাজ ছাড়বে রাত চারটায়, এখনো সন্ধ্যে লাগেনি… জামাই বাবু যেন কি—। অনুযোগের প্রধান কারণ পিঠে, মাছের শুক্তো—এমনি ছয় সাতটা 'পদ' এখনো পাতেই ওঠেনি যে। তাইতো ছোট শ্যালী, সান্ত অমায়িক মেয়েটি, তার আগ্রহ। বলিলাম তোমাদের দেশের ঘুম যে ছিষ্টিছাড়া, এর মধ্যেই চোখ জড়িয়ে আসছে, এর পর তোমার সোনাহাতের চতুর্দ্দশ-পদাবলী খেয়ে যে ঘুম আসবে—তা চারটে কেন রাত পোহালেও ছাড়বে না। তা ছাড়া তোমার দিদির বিরহটা মনে করো; তিন রাত্রি কাছ ছাড়া, তুমি তো এক রাত্তিরও নাচুর বাপকে চোখের আড়াল হতে দাও না।, শ্যালী রণে ভঙ্গ দিল। বলিল, কি যে বলেন, মুখের কোনো আঁট নেই। আপনার নাম কোরে সব কোরেছিলাম …দিদি যে আপনার হাত দিয়ে কত খাবার পাঠিয়েছিলেন, আর আমি কিছু দিতে পারলাম না। আমি বলিলাম, সব ভরে দাও টিফিন কেরিয়ারে, ষ্টীমারে খাবো, দৌলত-পুরে খাবো, সেখানে তো আর শ্যালী নেই যে টাট্‌কা খাবার দেবে। শ্যালীর কোল হইতে নাচুগোপাল কেবলেই নামিতে চাহিতেছে। শ্যালীর ভাসুরের নাম পঞ্চানন

সে নাম এমন কি তার কাছাকাছি পাচু নামটাও সে মুখে আনে না। তাই নিজের ছেলে পাঁচুগোপালকে ডাকে নাচুগোপাল বলিয়া। বেশ কালো ডেলার মতো ছেলে, হুবহু বাপের চেহারা বসানো, মাথায় ঠাকুরের মানতের জটা।...আমার সেই তেল মাখিয়া 'রিকেট' সারিয়া গিয়াছে,—হাঁ আমার সেই তেল! নাচুর গায়ে দেখিলাম সঙ্গে আনা সিল্কের ফ্রক্, বিব্, মোজা। সে আমার সোপকেসটা নিতে চায়। সেটা তার হাতে দিলাম। কিন্তু সেটা ফেলিয়া দিয়া দু'চারবার সে আমার মুখের দিকে চহিয়া হামা দিয়া দৌড়িয়া মার কাছে গেল। আমি বলিলাম, মায়ে পোয়ে রেগে গেলে, আজ আমার ঘুমের অকল্যাণ না হয়!

আজ ঘুমানো চাই, তিন দিন ঘুমাই নাই। ষ্টীমারের কেবিনে আরামে ঘুমাইতে হইবে। ষ্টীমার হইতে কাঠের সিঁড়ি ফেলিয়া দেয় রাত দশটার পরেই। আমি তাহার আগেই হাজির হইয়াছি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে প্যাসেঞ্জার ভর্ত্তি হইয়া যায়, যদিও ছাড়ে রাত চারটায়, আমি ষ্টীমারের উপরে উঠিতেছি, চার দিকে পলাণ্ডুর গন্ধ, খালাসীরা সান্‌কি ধুইতেছে। শটকায় ধূমপানরত সারেঙ্ আমায় দেখিয়া একজন খালাসীকে বলিল, কেবিনের প্যাসেঞ্জার, ছোরাণ লাও। খলাসী কেবিনের চাবি খুলিয়া দিল। চাকরকে বলিলাম বেঞ্চিতে বিছনাটা পাড়িয়া দিতে, আর সুটকেশ টিফিন-কেরিয়ার জলের ব্যাগ—সব বেঞ্চির তলায় রাখিয়া দিতে। সে যেন জাগিয়া থাকে।

ঘুমের সময় কে ঘুমায়? দেহ না মন? আমার মন তো ঘুমায় নাই। তিন দিন পরে বিশ্রাম হইলে কি হয়, মনের মধ্যে চলিতে লাগিল তিন দিনের হিসাব নিকাশ। সেই কলিকাতা আসা—ট্রেণ হইতে দৌলতপুরে ষ্টীমারে ওঠা, অন্ধকার কচুবন বস্তা বোঝাই দৌলতপুর ষ্টেশন হইতে শেষ রাত্রে ষ্টীমার ছাড়িয়া পর দিন রাত বারোটায় মাগুরা পৌছানো, আসিয়া শ্যালীর বাড়ীতে শুক্তা দৈ, পায়েশ আদি বিংশপদ গুরুভোজনে রাত্রে অনিদ্রা, সকালে সামান্য ভোজনের পর কাছারীতে হাজিরা দেওয়া। মনে পড়িল—বারবরদারীর বিল দেখিয়া হাকিমের বিদ্রূপের উক্তি, আমি বলিলাম, আপনার দয়ার দান আট টাকা ক' আনা নয়, ঐ পঞ্চাশ টাকাই আদায় হবে কলিকাতার ছোট আদালত থেকে, বেঁচে থাক মাদ্রাজল রিপোর্ট। চলিয়া আসিতেছি, পেয়াদা ডাকিল। আবার হাকিমের কাছে। তিনি বলিলেন,আইনে আপনার পাওনা হয়, কিন্তু তহবিল ঘাঁটতি, কিছু কম দিতে চাই। আমি বলিলাম, ওয়ারেণ্টের ভয় দেখিয়ে টেনে নিয়ে এসেছেন, এখন রাস্তা খরচ কাটলে পরে চলবে কেন হুজুর? হুজুরের মুখ হইল তোলো হাঁড়ির মত। কিন্তু সব টাকাই পাইলাম। হাঃ হাঃ হাঃ! ওয়ারেণ্ট দেখানো হইয়াছিল। ঘুমের ঘোরেই হাসিতেছি, আবার শুনিতেছি নাকও ডাকিতেছে! নাচুগোপাল সোপকেসটা ফেলিয়া দিয়াছিল। আমার তেল মাখিয়াই তার রিকেট সারিয়াছে।...বিশ্বাসে কি না হয়? শ্যালী চাহিয়া পাঠায় পাঁচুঠাকুরের তেল। দুইখানি চিঠি আসিল, স্ত্রী তাগাদা দিলেন। বাজারের একটু ভাল সরষের তেল এক বোতল প্যাক করিয়া রেল পার্শ্বেলে পাঠাইয়া দিলাম। শ্যালী বলিল, তাহা মাখিয়াই পাঁচুর রিকেট সারিয়া গিয়াছে। ...স্ত্রীকে গিয়া বলিতে হইবে। না-না, অভিমানে ঠোঁট উল্টিয়া পড়িবে—লাল ঠোঁটের মাহাত্ম্য!...ঘুমটা কেন চমকিয়া উঠিতেছে? চোখ জড়াইয়া আছে তবু শুনিতে পাইতেছি!... রিজিয়া যেন বলিতেছে, 'বক্তিয়ার! স্বার্থত্যাগ প্রণয়ের মূল...;

অনেকবার রিজিয়া শুনিয়াছি। কিন্তু কাহাকে বলিতেছে, আমাকে না ওসমানকে? আবার যেন কানের কাছে বলিতেছে, 'পুরুষ-হৃদয়ে নিরন্তর ফুটিতেছে সহস্র বাসনা।'

হঠাৎ ওসমান আমার মধ্যে গর্জ্জিয়া উঠিল! হাতের কাছে ছিল মোটা লাঠিটা, তাহা দাবড়িয়া বলিয়া উঠিলাম, 'সাহাজাদি সম্রাটনন্দিনী মৃত্যুভয় দেখাও কাহারে? জান না কি তাতার-বালক মাতৃঅঙ্ক হতে ছুটে যায় সিংহশিশুসনে করিবারে মহারণ।'

চোখ মেলিয়া দেখি আমার দাবড়ানি আর চীৎকারের চোটে দারুণ হুটোপাটি লাগিয়া গিয়াছে, কেবিন হইতে সব পলাইতেছে। ঠিক ব্যাপার না বুঝিতে পারিয়া লাঠি নিয়া তাড়া করিলাম, চোর-চোর, আমার জিনিষ নিয়া পালায়। প্যাসেঞ্জাররা হাসিয়া আকুল। বলে—মারবেন না, মারবেন না, ও এ-ঘরের ছোকরা, নিশ্চয় রাত জেগে আর চা খেয়ে মাথা চড়ে গেছে, রিহার্সেল দিতে দিতেই এসে পড়েছে! আমি বলিলাম, তা আমার কেবিনে এল কেন? একটি ফাজিল যুবক প্যাসেঞ্জার বলিল, সম্ভব ওসমান ভ্রমে আপনাকে জাগাতে, আপনি ওসমানের অভিনয় কোরলেন কি এসপ্লেনডিড্!...সবাই বলিল, এসপ্লেনডিড্... এসপ্লেনডিড্।

সারেঙ চাকা ঘুরাইল ঢং' ঢং' ঢং';...কাঠের সিঁড়ি উঠাইয়া ষ্টীমার ছাড়িল। তখনো ঘাটের উপর সেই রিজিয়া ছোকরা বক্তৃতা করিতেছে—

দিল্লীশ্বরী সুলতানা রিজিয়া　　কুক্কুরের অঙ্কলক্ষ্মী হবে?
তার চেয়ে শানিত ছুরিকা—　　তুমিই নিভাও জ্বালা!

এই বলিয়া সে বুকে একটা কিল মারিয়া পরিয়া গেল। তাই তো মারিতে গিয়াছিলাম কাহাকে...এই ছোকরাকে? লজ্জা পাইল...হাসিও পাইল।

উন্মেষ

শ্রীমতী প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

তিন

দিন অগ্রসর হইতেছে। সূর্য্য কক্ষ পরিবর্ত্তন করিতেছেন। ছয়টি ঋতুর লীলা পৃথিবীর বুকে ক্রমান্বয়ে চলিতেছে। দিন ঘুরিয়া মাস, মাস কাটিয়া বর্ষ—ইহাই পৃথিবীর গতির কথা মানুষকে বুঝাইয়া দেয়।

মাধবী তাহার শৈশবের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া বাল্যের প্রাঙ্গণ প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মাধবীর চোখে পৃথিবীর রঙের লীলা বড়ই বৈচিত্র্যময় বোধ হয়। তবে সব দিন নয়। মাধবী স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছে, স্কুলের নাম মহিলা-বিদ্যালয়। তবে তাহার ছাত্রীগণ কেহ দশের ঘর অতিক্রম করে নাই। সেই স্কুলে হিন্দুনারীর আচার শিক্ষা দেওয়া হয়। সেলাই, বুনন, গান, শিব-পূজা, রন্ধন-পদ্ধতি সবই সকসঙ্গে চলে। শিবপূজার দিন সকালটি মাধবীর নিকট মোটেই মনোরম বোধ হয় না। যদিও আগের দিন সন্ধ্যায় কাপড় ছাড়িয়া গরদ পরিয়া ফুল তুলিয়া বিল্বপত্র বাছিয়া তামার থালিতে সব গুছাইয়া রাখিয়া ভিজা গামছা ঢাকা দিয়া রাখিয়া দেয়, কিন্তু পরদিন প্রাতে উঠিয়া মাধবীর সব গোলমাল হইয়া যায়। মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙ্গিয়াই মনে হয় তাহার উঠিতে ভয়ানক দেরী হইয়াছে। এতক্ষণে হয় ত পুরোহিত যুগলঠাকুর স্কুলে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এবং তাঁহার গামছায় বাঁধা ভাল ফুলগুলি অন্য মেয়েরা এতক্ষণে সব লইয়াছে।—ইত্যাদি চিন্তা যতই বাড়িতে থাকে, মাধবী ততই পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসে।

মা বকিতে থাকেন, কাকীমা সান্ত্বনা দেন, "বেশী দেরী হয় নি, চল্ স্নান ক'রিয়ে দিই। ঠাকুরমা চন্দন ঘসে রেখেছেন স্নান করে কাপড় পরে চলে যা।"

অনেক অনুরোধে অবশেষে মাধবী উঠিয়া পড়ে, তাহার পর কাকীমা স্নান করাইয়া চুল আঁচড়াইয়া দেন, মায়ের পুরানো বেগুনীরঙের বোম্বাই সাড়ীখানি পড়িয়া এলোচুলে একটি গ্রন্থি দিয়া পূজার থালিখানি হাতে তুলিয়া লয়। এমন সময় স্কুলের ঝি আসিয়া হাঁক দেয়? ও খুকী, চল ইস্কুলে।

মাধবীর মা কাকীমা বলিয়া ওঠেন, "এই তো ঝি এল, দেরী হল বলে কেঁদে সারা হচ্ছিলি।

মাধবীর মুখে হাসি ফোটে। দ্রুতপদে সে বাহির হইয়া পড়ে ঝি নীরোর মায়ের সঙ্গে। তাহার পর বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া মেয়ে ডাকিয়া লওয়ার পালা।—ননী, সোহাগী, অণু, বুড়ি, সুশীলা, কেষ্টমণি।

নির্জ্জন পল্লীর সুপ্ত পথগুলি মেয়েগুলির কলধ্বনিতে জাগ্রত হইয়া ওঠে। হাসিতে হাসিতে গল্প করিতে করিতে অশ্বত্থতলার মোড় ছাড়াইয়া বাচস্পতি পাড়ার গলি পার হইয়া মতিসর্দ্দারের নির্জ্জন মাঠ পাশে রাখিয়া রেললাইন পার হইয়া অগ্রসর হইয়া চলে।

স্কুলে পৌঁছিয়া শিব গড়ার পালা। মাধবী দলের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠা। অপটু হস্তে শিব গড়িতে যাইয়া বারবার শিব ভাঙ্গিয়া যায়, এলাইয়া পড়ে। সঙ্গিনীর দল উচ্চহাস্য করিয়া ওঠে, সেই বিদ্রূপপূর্ণ হাসিতে মাধবীর চক্ষে জল আসিয়া পড়ে। সংসারেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পালা এখন হইতে সুরু হয়।

এই শিবগড়ার ব্যাপার মাধবীর কাছে রোজই ভীতিপ্রদ বলিয়া বোধ হয়। সেই সময় তাহাকে সাহায্য করেন যুগল ঠাকুর। সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ, মৃদু একটু হাসি মুখে লাগিয়াই আছে। তিনি মাধবীকে বড় স্নেহ করেন। বালিকার অপটু হস্তের শিব অবশেষে তিনিই গড়িয়া দেন। সদ্যঃস্নাতা শুচিবসন পরিহিতা এই সরলা সুন্দরী বালিকাকে দেখিলে তাঁহার মনে হয় সাক্ষাৎ উমা। কথাচ্ছলে তিনি একদিন মাধবীর পিতাকে বলিয়াছিলেন, "মেয়ে নয় তো যেন সাক্ষাৎ গৌরী, যত্ন করবেন বিনয়বাবু। কন্যাটিকে যত্ন করবেন।"

বিনয়বাবু হাসিয়াছিলেন। এবং বাড়ী ফিরিয়া মাধবীর মাকে বলিয়াছিলেন, "শুনছ গা, তোমার সুন্দর মেয়ে দেখে যুগলঠাকুর প্রেমে পড়ে গেছে। হাজার হোক ঠাকুরদা সম্পর্ক কি না।" যুগলঠাকুর স্নেহের দুর্ব্বলতা বশে তাঁহার আনীত রাণী রাসমণির দেবসেবার বাগানের ফুল বালিকাদের মধ্যে যখন বাঁটিয়া দেন, বড় বড় তাজা স্থলপদ্মগুলি মাধবীর ভাগে যায়, অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত বেলাগুলি মাধবীর অঞ্চলে ঢালিয়া দেন। অন্যান্য বালিকাদিগের চোখে পড়িলে তাহারা তারস্বরে প্রতিবাদ করিয়া ওঠে, ওকি পুরুতঠাকুর সব যে

মাধবীকে দিচ্ছেন ? যুগলঠাকুর অপ্রস্তুত হাসিয়া যুক্তি দেখান, ও যে ছোট, দিদি ?

কোনো মুখরা বালিকা বলিয়া ওঠে, আর আমরা বুঝি বুড়ো ?

না না তোমরা বুড়ো কেন ? অপ্রস্তুত যুগলঠাকুর বলিয়া ওঠেন। কিন্তু তাঁহার মন ইহাতে সায় দেয় না, বোধ হয় মনে হয় যে, বয়সে তোমরা ইহার সমবয়সী বটে কিন্তু এই রকম শিশুসুলভ সারল্য তোমাদের মধ্যে নাই। বয়সে তোমরা ইহার সমবয়সী কিন্তু অভিজ্ঞতায় কলহে তোমরা ইহার অপেক্ষা অনেক বড়। কিন্তু তাঁহার মনের কথা মনেই রহিয়া যায়। অন্তরের সূক্ষ্মতম অনুভূতি প্রত্যেক মানুষের আছে কিন্তু তাহাকে প্রকাশ করিবার শক্তি অতি অল্প লোকের থাকে।

বৃদ্ধ যুগলঠাকুর রাণী রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত জগদ্ধাত্রীপ্রতিমার সেবক। বেতনভোগী। মাসিক পঞ্চমুদ্রা তাঁহার বেতন, পুষ্প উপাচার সাজাইয়া দিয়া তিনি খালাস। দেবোত্তর দান-জমি জ্যেষ্ঠপুত্রের উপার্জ্জনে তাঁহার দিন চলিয়া যায়। বিগ্রহকে সাজাইয়া অর্চনা করিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া তাঁহার শান্তিময় জীবন অতিবাহিত হইতেছে। বৃদ্ধ বলিয়াই এই স্কুলের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রতি সোমবারে এই স্কুলে তিনি পূজা করাইতে আসেন, তাহার দরুণ তাঁহার বেতনও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এই বালিকার দল তাঁহার নূতন মায়ার বন্ধন। মস্তবড় স্কুলের দালান জুড়িয়া পুষ্প-উপচার সাজাইয়া বালিকার দল যখন পূজা করিতে বসে ও মধ্যস্থলে বসিয়া তিনি মন্ত্রোচ্চারণ করেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়, যেন শুষ্ক প্রাচীন বটবৃক্ষ ঘেরিয়া সতেজ সবুজ কিশলয়ের মেলা বসিয়াছে। উচ্ছ্বসিত কলহাস্যের সহিত বৃদ্ধের স্তিমিত হাসি মিলিয়া যায়। শুভ্র নবীন ফুলের মতো মুখগুলির মধ্যস্থলে বলিরেখাঙ্কিত, জরালাঞ্ছিত দন্তহীন বৃদ্ধের মুখ এক অদ্ভুত সামঞ্জস্য আনে, জীবনের গতির প্রতীক প্রাচীন ও নবীন। আসা এবং যাওয়া, জোয়ার এবং ভাঁটা।

চার

মিত্রমহাশয়দের বাড়ীর পাশেই আর একখানি বাড়ী। এই বাড়ীর অধিবাসীরা মাধবীদের জ্ঞাতি। অবস্থা ইহাদের খুব ভাল নয়। পাঁচটি পুত্র ও দুই তিনটী কন্যা রাখিয়া এই বাটীর কর্ত্তা বিপিন মিত্র নিতান্ত অসময়ে মারা যায়। পাঁচটি পুত্রের মধ্যে দুইটি তখন নিতান্ত শিশু, অপর তিনটী স্কুলে পড়িতেছে। বড়টী সেই বছর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবে। তাহার আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না। চানকের নিকটস্থ ইছাপুর গ্রামে যে Gun-factory আছে তাহাতে একটি ক্লার্কের কর্ম্মে মাধবীর ঠাকুরদাদা সেই বালকটিকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ছেলেটির নাম নিতাই। নিতাই সংসারের ভার স্কন্ধে লইল। সেজভাই হরেন্দ্র পরবৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া মাধবীর ঠাকুরদাদার চেষ্টায় সওদাগরী আফিসে চাকরী পাইল। অপর ভাইগুলি পড়িতে লাগিল। নিতাইয়ের তিনটী ভগ্নীর বিবাহ পিতা দিয়া গিয়াছিলেন। বড় দুইটী বোন শ্বশুরালয়ে থাকিতেন। ছোটটী পিত্রালয়ে থাকিত। তাহার নাম নিভা। শ্যামবর্ণ ছোটখাট আঁটসাট বলিষ্ঠ-গঠনের স্ত্রীলোক। শান্ত-স্বভাব স্বল্পভাষিণী।

মাধবী দেখিত সকাল হইতে উঠিয়া নিভাপিসি সংসারের কাজ আরম্ভ করে এবং শুইবার সময় পর্য্যন্ত কেবল কাজ করিয়া যায়। বাসন মাজা, ঘর ধোয়া মোছা, গোয়ালে গরু-গুলির পরিচর্য্যা করা সবই নিভা পিসির কাজ। রন্ধনটী মা করেন। তবে সেই বৎসর নিতাইয়ের বিবাহ হইল। বধূও সংসারের কতক ভার স্কন্ধে লইল। তবে নিভাপিসির কর্ম্মভার বিশেষ কমে না, বধূ শাশুড়ীর সাহায্যেই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে।

মাধবীর নিভাপিসিকে ভাল লাগে। নিভাপিসি তাহা-দের গোয়ালে গিয়া যখন গোবর পরিষ্কার করেন, গরুর জন্য খড় কাটেন, বালতী বালতী জল আনিয়া যখন গরুর খাইবার গামলা ধুইয়া পরিষ্কার করেন, মাধবী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখে। খর রৌদ্রের উত্তাপ তাহার বোধ হয় না। নিভা-পিসি মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "কি দেখছিস্ মাধু।"

মাধবী বলে, "তোমার কাজ দেখতে ভাল লাগে পিসি।"

নিভা পিসি মৃদু মৃদু হাসেন, কাজ করিয়া যান, কিছু বলেন না। কিন্তু এই মাধবীর নিয়মিত দাঁড়ানোর ফলে আস্তে আস্তে দুই চারিটা কথা বলিতে নিভাপিসি সুরু করেন। এবং অল্পদিনের মধ্যেই নিভাপিসির সহিত মাধবীর দিব্য ভাব জমিয়া ওঠে, যদিও একজনের বয়স দশ কিম্বা এগারো, অপরজনের বয়স বাইশ কিম্বা চব্বিশ।

নিভাপিসি কথা প্রসঙ্গে তাঁহার শ্বশুরবাটীর কথা বলেন।

মাধবী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিয়াছে যে, নিভাপিসির মাথায় সিন্দুর আছে। তবে তো নিশ্চয় তাহার শ্বশুরবাটীও আছে ! নিভাপিসি শ্বশুরবাটীর কথা বলিতে বলিতে যেন তন্ময় হইয়া যান। তাঁহার শাশুড়ী আছে, শ্বশুর নাই, আর আছেন স্বামী। বিবাহের পর প্রথম প্রথম তাঁহার শাশুড়ী তাঁহাকে কত যত্ন করিতেন,স্বামীও তাঁহাকে কত যত্ন-আদর করিতেন। সে এক সুখের সংসার। তিনটী প্রাণী মিলিয়া ছোট সংসার, নিভাপিসি একাই সব কাজ করিতেন। শাশুড়ীর সেবা, স্বামীর যত্ন। তাঁহারাও তাঁহার প্রতি কত প্রসন্ন ছিলেন। এমনি সুখের জীবন নিভাপিসির দুই বৎসর মিলিয়াছিল। তাহার পর কি যে হইল। নিভাপিসি উন্মনা হইয়া যান। মাধবী ব্যগ্রভাবে তাকাইয়া থাকে. কি হল নিভাপিসি ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নিভাপিসি বলেন, তারপর ? তারপর মা-ছেলের পরামর্শ করে এখানে পাঠিয়ে দিলে, আর নিয়ে গেল না। তখন তো তাদের পায়ে ধরে কেঁদেছিলাম যে, তোমাদের ঝি হয়ে থাকবো, তা তো শুনলে না। জোর করে দিয়ে গেল। কণ্ঠস্বর তাঁহার কঠিন হইয়া ওঠে। মাধবী করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিত, কেন শুনলে না পিসি ?

নিভিপিসি বলেন, বুড়ী ছেলের বে দেবে বলে। তারপর সহসা প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়া বলেন, "তা ঝিয়ের মত করে রাখলে কি আর আমি সেখানে থাকতুম ?" আচ্ছা মাধু, তোমাদের ইস্কুলে কি শেখায় ?

অবান্তর প্রশ্ন। তবু মাধবী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিত। ভাবি দুঃখের কথা ওসব।

মনে মনে ভাবিত—নিভাপিসি তো ভারি ভাল, কত কাজের, তবে কেন তারা জোর করে পাঠিয়ে দিল ? তবে বোধ হয় ওরাই দুষ্টু।

মাধবী মাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—আচ্ছা মা, নিভিপিসি কেন শ্বশুরবাড়ী যায় না ?

মায়ের মুখ গম্ভীর হইয়া গিয়াছিল। স্পষ্ট উত্তর দিলেন না, নিভাপিসির দোষের কথা বলিলেন না, অথবা পিসেমহাশয়ের দোষও দিলেন না, বলিলেন, "এমনি"।

মাধবী বিস্মিত হইল, দশ এগারো বৎসরে এইটুকু বুদ্ধি তার হইয়াছে যে এমনি কেহ কাহাকেও কষ্ট দেয় না, কিছু কারণ থাকা চাই। তাই বলিল এমনি ? এমনি ওরা ওঁকে নিয়ে যায় না ? তবে তো তারা ভারি দুষ্টু।

মা কুটনা থামাইয়া মাধবীর মুখপানে চাহিলেন, বড় বড় কালো চোক দুটি সমুৎসুক দৃষ্টি মেলিয়া রহিয়াছে, প্রশ্নভরা বিস্মিত দুইটি আঁখি। কন্যা বড় হইতেছে ! কি বলিতে গিয়া মা নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইলেন। বলিলেন, তুমি ছোট মেয়ে, তোমার অত খোঁজে দরকার কি ? আর নিভির কাছেই বা অত যাও কেন ? "কেন মা, তাতে দোষ হয় ?" মাধবী জিজ্ঞাসা করিল। "দোষ হয় না, তবে বড়তে ছোটতে বেশী মেলামেশা করতে নেই, ওতে ছোটরা পেঁকে যায়, বুঝলে ?" মা বলিলেন—আর যেয়ো না।

মাধবী দুঃখিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। আর তাহার নিভাপিসির কাছে গোয়ালঘরে যাওয়া হইবে না।

মা যাহা নিষেধ করেন তাহা অলঙ্ঘনীয়। মার গম্ভীর স্বল্পবাকমূর্ত্তিকে মাধবী ভয় করে শ্রদ্ধা করে। মায়ের বিশেষ কোনও নিষেধ অন্তরের সহিত মানিতে চেষ্টা করে আজকাল। মাধবী বড় হইতেছে।

সে-দিন তাহার পরদিন মাধবী পলাইয়া রহিল। নিভাপিসি গোয়ালে আসিবার আগে সে চলিয়া গেল বাগানে।

বাগান বলিতে সুসজ্জিত মালীর হাতের কেয়ারী করা সীজন ফ্লাওয়ার ভরা উদ্যান নয়, মাধবীদের গৃহসংলগ্ন সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ড। সজিনা; বেল, লিচু, আমড়া, তাল, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী মস্তক উচ্চ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর জমির বুক ভরিয়া সতেজ শ্যামল পুষ্পে ভরা। দূর্ব্বার গোছা মালীর হাতে কাটা পড়ে নাই, লতাইয়া কোমল আস্তরণ বিছাইয়াছে।

বাগানের মধ্যস্থলে ছোট একটি পুকুর, চারিধারে বৃক্ষশ্রেণী ঘেরিয়া থাকায় জলটি তাহার ঠাণ্ডা।

মাধবী গিয়া বৃক্ষতলে বসিল, গাছের ছায়ায় রৌদ্রের উত্তাপ লাগে না, মৃদু মধুর বাতাস চোখেমুখে শীতল স্পর্শ বুলাইয়া দেয়। পাখীর অস্পষ্ট কাকলী। গাভীর হাম্বারব ঘুঘুর একটানা আওয়াজ মনে যেন একটা নেশার আমেজ আনে। এই সুগম্ভীর প্রকৃতির বক্ষে বালিকার শিশুমন নিমগ্ন হইয়া যায়।

স্তব্ধ হইয়া বসিয়া বসিয়া মাধবী দেখে—পুকুরের জলে মাছ ঘাই দিতেছে উৎক্ষিপ্ত জলধারা বৃত্তাকারের মধ্য হইতে পুকুরের কিনারা স্পর্শ করিতেছে। এও যেন বেশ সুন্দর। পরদিন, তার পরদিন, মাধবী বাগানে আসিতে লাগিল! ধীরে ধীরে নিভাপিসিকে ভুলিয়া বালিকা এক নূতন খেলায় নিমগ্ন হইল। নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল জগৎ ও তাহার প্রাণী। নিভাপিসিও দুই একদিন মনে মনে বালিকার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া আবার একাকী অভ্যস্ত কর্ম্মে নিমগ্ন হইয়া গেলেন।

পাঁচ

মিত্রমহাশয়ের কনিষ্ঠপুত্র শ্যামাচরণের কন্যা ও মাধবী প্রিয় বান্ধবী। দুইটি বাড়ীতে বিবাদ-সংঘাত মনোমালিন্য লাগিয়াই থাকে। তাহার কারণ মিত্র মহাশয় অর্থের আধিক্যে গ্রামের প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তির হৃদয় জয় করিয়াছেন। কন্যাদায়গ্রস্তের কন্যার বিবাহে সাহায্য করিয়াছেন, কাহারও ঋণ শোধ করিয়া তাহাকে চিরকৃতজ্ঞ করিয়াছেন। কাহারও পুত্রের পড়ার খরচ দিতেছেন। তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের তো অবধি নাই। এবং গ্রামশুদ্ধ লোক নিমন্ত্রিত হয়। ইত্যাদি কারণে মিত্রমহাশয়কে সকলে সমান শ্রদ্ধা করিয়া চলে এবং অনেকস্থলে তাহা চাটুকারিতায় রূপান্তরিত হয়।

কিন্তু গ্রামের মধ্যে একমাত্র দত্তমহাশয় মস্তক উচু করিয়া থাকেন, তিনি কোনও সাহায্য লন নাই কোনও দিন মিত্র মহাশয়ের নিকট। হয় ত' বাটী প্রস্তুত করিয়া দিয়া তাঁহাকে মিত্রমহাশয় চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিতে পারিতেন, কিন্তু কেমন করিয়া সে বিপদের সূত্রপাত হইল এবং মিত্র মহাশয় তাহাকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে অর্থ চাহিয়া বসিলেন, আজ যেন তাহা মনে হয় বিধাতার আশীর্ব্বাদ। তাঁহার উন্নতমস্তক নীচু করিতে হয় নাই!

মনে মনে মিত্র মহাশয় কি ভাবেন তাহা তিনিই জানেন। তবে তাঁহার পুত্র পুত্রবধূগণ সবাই মনে করেন—এই ব্যক্তি কেবল আমাদিগের অধীন নহে। আমাদের ব্যবহারে বিগলিত হয় না, আমাদিগকে গ্রাহ্যের মধ্যে গণ্য করে না। এই চিন্তা ক্রমে আক্রোশে পরিণত হইয়াছে। তাহা হউক, তবু মাধবী ও শ্যামাচরণের কন্যা লীলা দুইজনের বন্ধুত্ব অতি গভীর। শিশুমন দলাদলির উর্দ্ধে বলিয়া মাধবীর ভ্রাতা এবং লীলার ভ্রাতা তাহারাও পরস্পরের বন্ধু। মাধবী ও লীলা উভয়ে বিপরীত প্রকৃতি। মাধবী চঞ্চলা হাস্যময়ী সরলা। লীলা গম্ভীর-প্রকৃতি অত্যন্ত স্বল্পভাষিণী, এত অল্প বয়সে এত গম্ভীরতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। আকৃতিও দুইজনের বিভিন্ন। লীলা দীর্ঘাঙ্গী, কৃশা, শ্যামবর্ণা। মাধবী নাতিদীর্ঘা মধ্যমা আকৃতি গৌরাঙ্গী। খালি সাদৃশ্য আছে দুজনের কেশেতে। কোমল কালো মেঘের মত ঘন চুল প্রায় জানু ছুঁইতেছে।

দিনের বেলায় স্কুলে ক্লাশে উভয়ে পাশাপাশি থাকে। আর বৈকালে নির্জ্জন ছাদে দুই বন্ধুতে মিলিত হইয়া এত গল্প হয় যে, তাহার হিসাব রাখা চলে না।

এত বন্ধুত্বের মাঝে একবার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল একদিন একবেলার জন্য। ঘটনাটি সামান্য, কেবল দুই মায়ের অভিমান দুইটি বালিকাকে মিলিত হইতে দেয় নাই।

মাধবীদের বাগানের মধ্যবর্ত্তী পুষ্করিণীর জল বর্ষার আগমনে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে আগাছাগুলি নববর্ষার জলধারায় পুষ্ট হইয়া চারিদিক সবুজ করিয়া তুলিয়াছে। তারই মাঝে কচুর পাতাগুলি ঢল ঢল করিতেছে সতেজ শ্যামলতায়।

মাধবী, লীলা, মাধবী ও লীলার দাদারা পুকুরধারে দাঁড়াইয়া কচুপাতা জলে ভাসাইতেছিল। সন্ধ্যাবেলা। সামান্য কারণে মতভেদ ঘটিয়া কি হইতে কি হইয়া গেল, লীলার একটানে মাধবীর অনেকখানি জামা ছিঁড়িয়া গেল। মধবী প্রথমটা হতবুদ্ধি হইয়া গেল এবং তাহার পরেই ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া ঝাপাইয়া পড়িল লীলার উপর, একটানে মাধবীর হস্তে খুলিয়া আসিল লীলার হার। এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধা মাধবী তাহা ফেলিয়া দিল জলের ভিতর।

লীলা আর্ত্তকণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিল—আমার হার।

ইহার পর বকাবকি কোলাহলের মাঝখানে লীলার মা আসিয়া লীলাকে লইয়া চলিয়া গেলেন। বলিতে বলিতে গেলেন—এমন জাঁহাবেজে মেয়ে দেখি নি বাবা, ফের যদি লীলি ওর সঙ্গে খেলবি তো তোরই একদিন কি আমারি একদিন।...

মাধবীও তাহার মায়ের নিকট প্রহার লাভ করিল কম নয়। অবশেষে ঠাকুরমার মধ্যস্থতায় নিষ্কৃতি লাভ করিয়া শয্যা লইল। আজ আমি খাইব না। রাগ দেখাইবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। মাধবীর মার রাগ তখনও যায় নাই, তিনি বলিলেন—যা, খাস নি; কে খেতে বলছে তোকে।

নির্জ্জন শয়নকক্ষে আপনার ক্ষুদ্রশয্যাখানিতে শুইয়া শুইয়া মাধবী প্রতিজ্ঞা করিল, আর কোনদিন লীলার সহিত কথা বলিবে না। সাধিলেও না। কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইবে। মনশ্চক্ষে দেখিতে লাগিল—লীলা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়াছে, সে মুখ ফিরাইয়া আছে। এমনি কত কি। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অনেক রাত্রে একবার মনে হইয়াছিল—মা গরম হালুয়া ও লুচি খাওয়াইয়া দিতেছেন। পরদিন প্রভাতে আবার উভয়ের সাক্ষাৎ হইল শিউলিতলায়। কেহই কাহাকেও সম্বোধন করিল না। মায়েরা নিষেধ করিয়াছেন যে, ক্রমে উভয়ের মনে হইল যে,কথা না কহিলেও ডালায় ফুল তুলিয়া দিতে তো মানা করেন নাই। ক্রমে উভয়ে উভয়ের সাজিতে ফুল দিতে লাগিল। এবং কোন্ মুহূর্ত্তে কথা হইয়াছিল জানা নাই, একটু পরে দেখা গেল—দুই সখীতে সম্মুখের বেদীতে বসিয়া নিবিষ্টমনে গল্পে নিমগ্না।

তাহাদের বিচারে স্থির হইয়াছে যে, যখন হারও পাওয়া গিয়াছে, জামাও সেলাই হইয়াছে তখন কথা না কহিবার যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ নাই। অতএব তাহারা ভাব করিবে না কেন? মাধবী সুন্দর, মাধবী বুদ্ধিমতী, ক্রমে মাধবী বড় হইতেছে। ক্ষুদ্র দেহখানি কৈশোরে সুষমা-মণ্ডিত হইয়া উঠিতেছে, চোখে তাহার স্বপ্নাবেশ জাগিতেছে, শিশুর কৌতূহলী দৃষ্টি মুছিয়া আসিতেছে।

মাধবী বই পড়িতে ভালবাসে। অসংখ্য বই, অজস্র বই, পড়িয়া পড়িয়া তাহার তৃপ্তি হয় না। গ্রামের যে লাইব্রেরী, তাহার বাংলা বইগুলি মাধবী সব পড়িয়াছে। আবার পাড়ার লোকের বাড়ীর বইগুলিও মাধবীর কণ্ঠস্থ। স্নেহ করিয়া ভালবাসিয়া অনেকেই তাহাকে বই পড়িতে দেন। বুঝিয়া না বুঝিয়া মাধবী পুস্তকের রসপান করিয়া চলে। অজস্র মাসিক পত্র। তখন বাংলা সাহিত্যে প্লাবন আসিয়াছে—নারায়ণ, সবুজপত্র, প্রবাসী, ভারতী, মানসী ও মর্ম্মবাণী। সকলগুলিই মাধবী সুবিধাক্রমে কোন না কোন গৃহ হইতে পাইয়া যায়। নারায়ণে 'বেণের মেয়ে' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত ধারাবাহিক বাহির হইতেছে। তাহার সমারোহ আড়ম্বর মাধবীকে মুগ্ধ করে। 'গোরা' মাধবী বুঝিতে পারিলনা কিন্তু তাহার সুচরিতা তাহাকে মুগ্ধ করিল। মনে মনে চাহিল—আমি ঠিক ওই রকম হইব।

যাহার যে আদর্শ যে সৌন্দর্য্য, মাধবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, মাধবী ঠিক সেই রকমটি হইবে।

আবার বই পড়া লইয়া নিগ্রহও কম ভোগ করিতে হয় না। মা চাহেন—মাধবী বড় হইতেছে, মাধবী

তাঁহার প্রতিকর্ম্মে সাহায্য করিবে, কিন্তু মাধবী তাহার আনীত পুস্তকে এমনি নিমগ্ন হইয়া থাকে যে, মায়ের ডাক তাহার কর্ণেই প্রবেশ করে না। এবং কর্ণে যখন প্রবেশ করে, তখন মা সম্মুখে আসিয়া অনেক কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কাকীমা অবশ্য অনেকস্থলেই মাধবীকে বাঁচাইয়া চলেন,মা মাধবীকে ডাকিতেছেন, কাকীমা উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করেন, কি বলছ দিদি? মায়ের তাকাইবারও সময় নাই, আপনার প্রয়োজন বলিলে কাকীমা তৎক্ষণাৎ তাহা করিয়া দেন। তার জন্যও মধ্যে মধ্যে মাধবীর মা তিরস্কার করেন, এই করে তুমি মেয়েটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছ মেজবৌ। এর জন্যে ওকে অনেক দুঃখ পেতে হবে, তখন কি তুমি সঙ্গে যাবে?

কাকীমা নতমুখে দাঁড়াইয়া থাকেন এবং পরে মাধবীকে সতর্ক করেন—মাধবী, একটু খেয়াল রাখিস না কেন? দিদি যখন ডাকেন। মাধবী ইহার কি উত্তর দিবে? খেয়াল রাখিবার চেষ্টা সে করে, কিন্তু বই পড়িতে বসিলে খেয়াল তাহার থাকে কই? কাকীমা তাহাদের অত্যন্ত ভাল। ছোট হইতে কাকীমার নিকট এত অপর্য্যাপ্ত স্নেহ ভালবাসা লাভ করিয়াছে যে, মাধবীর মনে হয়, কাকীমা মাত্রেই ভাল, কাকীমারা কখন মন্দ হইতে পারে না। মাকে মাধবী সম্মান করিয়া চলে, তাহার স্বল্পবাক গম্ভীরমূর্ত্তি মনে শ্রদ্ধা ও ভয়ের সঞ্চার করে, কিন্তু কাকীমাকে মাধবী অন্তরের অন্তরজন মনে করে,তাঁহার কাছে কিছুই যেন গোপন করিবার নাই,তাঁহাকে ভাল মন্দ সব কথা বলিয়া মনে আনন্দ আসে। সকল দোষ গুণের মীমাংসা হইয়া যায়। এই শান্তপ্রকৃতি মৃদুস্বভাবা নারীটির জীবন দুঃখস্রোতেই চিরদিন বাহিত হইয়াছে। দরিদ্র পিতার গৃহে পঞ্চকন্যার একটি হইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবাহ হইল যাঁহার সহিত, তিনি আজন্ম রুগ্ন। চিরদিন পিতার অন্নে প্রতিপালিত। চিরদিন পরাশ্রয়ে থাকিয়া কাকীমার নিজস্ব কোন স্বাধীন সত্তা নাই, যাহা ছিল তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে যাহা বলিতেছে নতমস্তকে তাহাই পালন করিয়া চলেন। এবং ভগবানের ইচ্ছায় স্বভাবটি তাঁহার অতিশয় নম্র, কাজেই তাহা অবস্থার অনুকূল হইয়াছে। তাঁহার শান্ত স্নিগ্ধ সুমিষ্ট ব্যবহার সবাইকে মুগ্ধ করিয়াছে,সেইজন্য বাটীর সকলেই কাকীমাকে ভালবাসে। মাধবীর মাতা তাঁহাকে কনিষ্ঠা ভগ্নীর মতই দেখেন। আশ্বিনের প্রভাত। বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে খানিক আগে। চারিদিক জলে ভেজা। অন্ধকার, বাদল দিন। মাধবী তখনও ঘুমাইতেছিল। কাকীমা দ্রুতপদে উপরে আসিলেন এবং ডাকিলেন—মাধবী, ও-মাধবী, ওঠ তোকে দেখতে এসেছে, শীগ্‌গির ওঠ।

কাকীমার ডাকাডাকিতে মাধবী চোখ মেলিল বটে কিন্তু ব্যাপারটা তাহার হৃদয়ঙ্গম হইল না, সে জড়িতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল কেন? দেখতে এসেছে কেন কাকীমা?

কাকীমা হাসিলেন, পাগলমেয়ে দেখতে আসে কেন? বিয়ে হবে বলে। শীগ্‌গির ওঠ, তোকে সাজাতে হবে। মাধবীর আগে শোভা উঠিয়া পড়িল, ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, বিয়ে হবে কাকিমা? আজকে? আজকে দিদির বিয়ে হবে? কখন হবে? এখুনি?

ততক্ষণে মাধবীর দাদা ও কাকা আসিয়া পৌছাইল, ওরে ওঠ মাধবী শীগ্‌গির, বাবা ডাকছেন?

দাদা চুপি চুপি প্রশ্ন করিল—হ্যাঁ কাকীমা কবে বিয়ে হবে? কণ্ঠে তাহারও প্রবল ঔৎসুক্য।

নীচেকার বারান্দা হইতে মা হাঁকিলেন—ও মেজবৌ, সব গিয়ে জটলা করছ? মাধবীকে বল শীগগির মুখ-হাত ধুয়ে নিতে। দেরী হচ্ছে যে? তাড়া দিচ্ছে বাইরে।

ত্রস্তে কাকীমা মাধবীকে উঠাইয়া সঙ্গে লইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন—এই যে দিদি, হয়ে গেল।

সজ্জা বিশেষ কিছুই হইল না। মুখ-হাতে সাবান দিয়া ধোয়াইয়া গালে আলতার অল্প আভাস দিয়া একটি পান খাইতে দেওয়া হইল—ঠোঁটে লাল আভা ফুটিবে বলিয়া। কালাপাড় ধোয়া দেশী শাড়া, সাটিনের কাল একটি লেশ-ওয়ালা ব্লাউজ এবং চুল খুলিয়া দেওয়া হইল পিঠের উপর।

ইহার মধ্যে মাধবী একবার তিরস্কার লাভ করিল, পানটা গিলে খাওয়া হয়ে গেল, ঠোঁটে একটু রং ধরলো না, নাও মেজবৌ, অল্প একটু আলতার হাত দিয়ে দাও।

তবুও এই সজ্জায় সজ্জিত হইয়া মাধবী যখন বাহিরের ঘরে গিয়া দাঁড়াইল—তখন মনে হইল—হাঁ দেখিবার মত পাত্রী বটে। শুভ্র গৌরবর্ণে মেঘের মত ঘন কালো চুলে পরিচ্ছন্ন স্বল্প সজ্জায় অপরূপ দেখাইতেছে। স্বল্প সুন্দর মুখে প্রতিমার মত শ্রী।

দু'চারিটী কথা পাত্রপক্ষ প্রশ্ন করিলেন। তবে তাঁহাদের ভাবে বোঝা গেল, পাত্রী তাঁহাদের অতিশয় মনোনীত হইয়াছে। তবে হাতে রাখিয়া বলিতে হয়, তাই তাঁহারা বলিলেন—গৃহে ফিরিয়া সংবাদ দিবেন।

নববধূ মাধবীর প্রথম দুই তিন মাস যেন ঘুমঘোরে কাটিয়া গিয়াছে। কি যে ইহার মধ্যে হইয়াছে তাহা তাহার স্মরণও হয় না। খাওয়া শোওয়া চলাফেরা সবই অপরের হস্তে। মাধবী যেন একটি সাজানো পুতুল। তবুও তাহা মধুর। কারণ সেই সাজানো পুতুলটি লইয়া গৃহের অধিবাসীরা স্নেহের সহিত নাড়াচাড়া করিবেন।

পরে মাধবী স্মরণ করিত যে, তাঁহাদের স্নেহের পূর্ণপাত্র কেমন করিয়া শুষ্ক হইয়া গেল? দিনের পর দিন তাহার কাটিয়াছে যেন মরুভূমির মাঝে।

স্নেহ-স্পর্শহীন কতগুলি নরনারীর সহিত বাস এবং শুষ্ক নীরস কঠিন কর্ত্তব্য পালন। পৃথিবীর রূপ যে বদলাইয়া গিয়াছিল, ধূসর পৃথিবী। শ্যামলতার চিহ্ন যেন মুছিয়া গিয়াছিল। আজ তাহার মনে হয় কেন? পরম বিস্ময়ের সহিত মাধবী স্মরণ করে কেন? তাহারি অপরাধ? অথবা উহাদের? আজো তাহার অত্যন্ত পুরাতন ক্ষতে আঘাত দিয়া জাগিয়া ওঠে সেই পুরাতন কথা নূতন হইয়া।

তখন তাহার বিবাহ হইয়াছে প্রায় একবৎসর। তাহার স্বামী তাহাকে ভালবাসেন, তাহাই ছিল মাধবীর ধারণা। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। শ্বাশুড়ী-ঠাকুরাণী রন্ধনগৃহের সম্মুখস্থ অঙ্গনে মাদুর পাতিয়া বসিয়া আছেন, নিকটে মাধবীর ননদ গল্প করিতেছেন।

মাধবীর প্রতি বিশেষ মনঃসংযোগ কাহারো নাই। সকলের অলক্ষ্যে মাধবী দ্বিতলে আসিল। স্বামী ক্লাবে গিয়াছেন। শ্বশুরমহাশয় ভাদুড়ী মহাশয়ের গৃহে দাবা খেলিতে গিয়াছেন।

এই নির্জ্জন অবসরটুকু মাধবীর একান্ত নিজস্ব। মাকে চিঠি লেখা অথবা পুস্তক পাঠ এইগুলি লইয়া মাধবী থাকে। আবার রাত্রি হইলে কাজের পালা সুরু হইবে।

আপনার শয়নগৃহে আসিয়া মাধবী তাহার পরিচ্ছন্ন শয্যায় খানিকটা শুইয়া রহিল, এমনি শুইতে মাধবী বড় ভালবাসে। অনেকক্ষণ নানাকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া অথবা বই পড়িয়া হঠাৎ শুইয়া পড়া, চিন্তাবিহীন পরিপূর্ণ বিশ্রাম। যেমন চিলগুলো পাখা নাড়িয়া বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া সহসা দুই-পাখা ছড়াইয়া দিয়া অনুকুল বায়ুপ্রবাহে ভাসিয়া চলে—এও কতকটা তেমনি। তবে এ বিশ্রাম দেহের নহে, মনের।

একটু শুইয়া থাকিয়া ভাল লাগিল না বলিয়া মাধবী শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। উনি এখনও আসেন নাই। দক্ষিণের বড় বারান্দা ফুলের টপ দিয়া সাজানো এবং অনেক-গুলি ইজি চেয়ার পর পর সাজানো আছে। সেই ইজি চেয়ারে শুইলে রাস্তাও দেখা যায়।

আবার ওই সবুজের মধ্যে থাকিলে মনে আনন্দও পাওয়া যায়। বারান্দায় যাইয়া বসিবে বলিয়া মাধবী অগ্রসর হইল।

অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেছে। বারান্দার দুয়ারে দাঁড়াইতেই চোখে পড়িল কে যেন বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দাঁড়াইবার ভঙ্গি দেখিয়া মাধবী চিনিল—তাহার স্বামী; বিস্মিত হইল যে রেলিংএ ভর দিয়া অবিনাশ দাঁড়াইয়া নাই, সে যেন আপনাকে রাস্তার লোকের নিকট হইতে লুকাইয়া কি দেখিতেছে। চাহিয়া চাহিয়া মাধবী চিনিল যে তাহার স্বামী অবিনাশ মাধবীর। মাধবী বিস্মিত হইল—কখন তিনি ফিরলেন? তাহার নিকট না গিয়া তাহার স্বামী সঙ্গোপনে কি দেখিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন? কৌতূহল বশতঃ মাধবী নিঃশব্দে দুইপদ অগ্রসর হইয়া গেল স্বামীর দিকে। ইচ্ছা যে, তাহাকে বিস্মিত করিয়া দিবে। কিন্তু দুইপদ অগ্রসর হইয়া সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। সম্মুখের বস্তির খোলার ঘরে নূতন ভাড়াটিয়া আসিয়াছে তাহারা জাতিতে ধোপা। ধোপা, ধোপানী ও তাহার যুবতী কন্যা। মেয়েটি দেখিতে নেহাৎ মন্দ নহে এবং অত্যন্ত চপল। সে যে দেখিতে মন্দ নহে সে সম্বন্ধেও সে সচেতন। সেই মেয়েই এই সন্ধ্যায় রাস্তার কলে বসিয়া বাসন মাজিতেছে এবং তাহারই প্রতি লোলুপ ক্ষুধিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন তাহার স্বামী—তাহার সে দৃষ্টির অর্থ মাধবী বোঝে। মেয়েটি বুঝিয়াছে যে, তিনি চাহিয়া আছেন। তাহা তাহার চপল অশ্লীল ভঙ্গীতে পরিস্ফুট, মধ্যে মধ্যে সে হাসিতেছে। আর? আর? তাহার স্বামী তো তাহা জানিয়াই দাঁড়াইয়া আছেন? শুধু মাধবীর নিকট নম্র, তিনি যে ওই ধোপার মেয়েটার কাছেও ছোট হইয়া গেলেন? এ কি হইল? যেন অকস্মাৎ আঘাত খাইয়া মাধবী বিবর্ণ হইয়া গেল, যেন তাহার পা কাঁপিতেছে।

সামান্য শব্দে চকিত হইয়া অবিনাশ ফিরিয়া চাহিল এবং চাহিয়া দেখিল—মাধবী ফিরিয়া যাইতেছে। অবিনাশ ত্রস্তে মাধবীর নিকট অগ্রসর হইয়া গেল, ডাকিল, "এ সনা মাধবী, এখানে একটু বসি, বেশ হাওয়া আছে। তোমার কাজ নেই ত এখন?" তাহার স্বরে অপ্রতিভতার আভাস। কম্পিত কণ্ঠে মাধবী বলিল—হাঁ, আমার কাজ আছে, আমি নীচে যাই, ফিরিয়া না চাহিয়া ত্রস্তপদে মাধবী চলিয়া গেল। মাধবী বুঝিয়াছিল যে, সে বুঝিতে পারে নাই ভাবিয়া অবিনাশ যেন বাঁচিয়া গেল।

অবিনাশ নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু মাধবী? তাহার অম্লান প্রস্ফুটিত নির্ম্মল পুষ্পের মত হৃদয়ে যে সন্দেহকীট প্রবেশ করিল, তাহা যে পলে পলে তাহাকে কুরিয়া খাইবে? স্খলিত-পদে নির্জ্জন অন্ধকার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া মাধবী আপন শয্যায় শুইয়া পড়িল। মন যেন তাহার স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে—এ কি হইল? অকস্মাৎ তাহার দুই চক্ষু হইতে হু-হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাধবী কতক্ষণ কাঁদিয়াছিল এবং কখন ঘুমাইয়াছিল, মনে নাই। ঘুম ভাঙ্গল—অবিনাশের সস্নেহ কণ্ঠস্বরে, লাইট জ্বালিয়া দিয়া অবিনাশ শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। চক্ষে তাহার উদ্বেগ, তাহাকে হাসিতে দেখিয়া সস্নেহ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কি হয়েছে মাধু? মাথা ধরেছে"?

হাঁ, বলিয়া মাধবী পাশ ফিরিয়া শুইতেই আলো নিভাইয়া দিয়া অবিনাশ তাহার পাশে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। আর মাধবী, সে হাত না পারিল সরাইতে, না পারিল মানা করিতে, সেই অবাঞ্ছনীয় হাতের স্পর্শ অনুভব করিতে করিতে অশুচি স্পর্শের মতই আড়ষ্ট হইয়া শয্যায় শুইয়া রহিল। [ক্রমশঃ

দেব-অধ্যুষিত উপত্যকা

শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী

স্কুল-কলেজে শিক্ষকের রোলকলের উত্তর দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের স্ব স্ব উপস্থিতি ঘোষণা করে। অনেক সময় অনুপস্থিত ব্যক্তিরা প্রতিনিধি দ্বারা Proxy দেবার ব্যবস্থা ক'রে খাতায় উপস্থিতি মঞ্জুর করায় শিক্ষকের চোখে ধূলি দিয়ে। স্বর্গ-ধামে এর কি ব্যবস্থা আছে জানি না, তবে মর্ত্যের মাটিতে মানুষ দেব-দেবীর যে রোল-কল ক'রবার ব্যবস্থা করেছে—আমি তার কথাই বলতে যাচ্ছি।

হিমালয় পর্ব্বত-শ্রেণীর একটী উপত্যকার মধ্যবর্ত্তী স্থান,—নাম কুলু। কুলুতে যেতে হ'লে লাহোর থেকে নূরপুর হয়ে প্রথমে পালামপুর যেতে হয়; বরাবর মোটর চালানোর উপযোগী রাস্তা রয়েছে। পালামপুর ছোট একটী পাহাড়িয়া ষ্টেশন হ'লেও বেশ সুন্দর জায়গা। এখানে বিশ্রামাগার রয়েছে। নানারূপ পুষ্পশোভিত পাইন-বৃক্ষ-পরিবেষ্টিত এই

জনৈকা বৈদেশিক মহিলা পরিব্রাজক কুলুর নদীতে মাছ ধরছে।

স্থানটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। পালামপুর থেকে মুণ্ডি (মুণ্ডি-রাজ্যের রাজধানী)। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত-পরিবেষ্টিত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য এই মুণ্ডি। এই রাজ্যের প্রবেশদ্বারে একটী দোলায়মান সেতু। এই সেতুর ওপরে গাড়ী উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যাবে একটী লোক সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটী কলকাতার চৌরঙ্গী রোডের বুকে পিঠে 'stop'-লিখিত স্থাণুউইচ মাফিক পুলিশের মত। তবে তার বুকে লেখা থাকে "অনুগ্রহ করে চালিয়ে যান" আর পিঠে লেখা থাকে "ধন্যবাদ"। প্রথমে দাঁড়াবে সমুখ ফিরে, তারপর পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে তার পৃষ্ঠে দোলায়মান 'ধন্যবাদ"-লিখিত নির্দেশ প্লেট দেখিয়ে অতিথিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবে। এই রাজ্যের মধ্যেও বিশ্রামাগার আছে। দেখবার জিনিষগু'লির মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রাজপ্রাসাদ।

এই রাজ্য পেরিয়ে এলেই আর একটা নূতন জগৎ—আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার একটী অবদান—যোগীন্দ্রনগর। এটী পাঞ্জাবের নূতন হাইড্রো ইলেকট্রীক স্কিমের হেড-কোয়ার্টার। খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে রেল লাইন উঠে গেছে। এইখানে এলে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বের একটী প্রতিচ্ছবি—চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

এরপর কাহরা উপত্যকার দৃশ্য। এই দৃশ্য মিলিয়ে যেতে যেতেই দেখা যাবে গাড়ী কুলুর সীমান্তে প্রবেশ করছে। আঁকাবাঁকা উঁচুনীচু অথচ মনোরম দৃশ্য-সমন্বিত একটী সুন্দর রাস্তা নদীর তীর ধরে চলে গিয়েছে সুলতান-পুরের দিকে। সুলতান হচ্ছে এখানকার রাজধানী। বিদেশী পরিব্রাজকের থাকবার জায়গা খুব বেশী নেই……জায়গাটী ছোট হলেও চমৎকার। এর সুন্দর পাথরের রাস্তা এবং প্রস্তর গঠিত এবং প্রস্তরখচিত গৃহগুলি মন আকর্ষণ করে। একটী বিস্তীর্ণ ময়দানের চতুষ্পার্শ্বে এই গৃহগুলি দাঁড়িয়ে আছে। এখানে তিব্বত থেকে আনা অনেক জিনিষ বিক্রি হয়।

সুলতানপুরের অনুধারে বাস করবার মত অনেক হোটেল, বোর্ডিং এবং বাংলো আছে; এমন কি তাঁবু খাটিয়ে বাস করবার মত জায়গা পর্য্যাপ্ত। এখান থেকে উপত্যকা ক্রমশ: উঠতে উঠতে ৬,০০০ ফিটে গিয়ে পৌঁছেছে, যে জায়গায় তার নাম মুনালি। এইখানে পাইন বন শেষ হয়ে তৃণ-সমাচ্ছন্ন ভূমি আরম্ভ হয়েছে। অসংখ্য মন্দিরশ্রেণী শ্যামল তৃণ-ভূমি, মৎস্য শিকারের জলাশয়, বিচিত্র বর্ণের পুষ্পশোভিত এই স্থানটী স্বর্গের নন্দন কাননের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই

জন্যেই সম্ভবতঃ স্বর্গের দেবতাগণ মর্ত্ত্যের এই নন্দন-কাননে এসে বাসা বেঁধেছেন।

বিশেষ বিশেষ উৎসবের দিনে দেবতাগণ এই কুলু উপত্যকায় একটী স্থানে সকলে একত্রিত হন। সুলতানপুরের বিস্তীর্ণ প্রান্তর...সারি সারি সজ্জিত পালঙ্কে দেবমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত। যেমনি পালাক্রমে এক এক দেবতার নাম উচ্চারিত হল' অমনি সেই সমস্ত দেবতার ভক্তগণ এক এক করে উত্তর দিতে লাগলেন—"তিনি এইখানে আছেন"। কোন দেবতার উপত্যকায় বাস, কোন দেবতা গিরিপথের অধিবাসী, কোন দেবতা গ্রাম্য মন্দির থেকে এসেছেন, কোন দেবতা মুখর ঝর্ণাধারায় অবগাহন করে থাকেন, কোন দেবতার প্রতি বৎসর অনেক মণ মাখন দরকার হয়, কোন দেবতা কয়েক মুষ্টি তণ্ডুলকণাতেই সন্তুষ্ট থাকেন—এমনি অনেক ছোট বড় দেব, দেবী, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব, প্রাক্-সৃষ্টির যুগীয় দেবতা, স্থানীয় বীর দেবতা, দয়ালু দেবতা, ভীষণ দেবতা—সকলেই এসে জমা হন। প্রতি বৎসর উৎসবের দিনে এমনি করে দেবতার রোল-কল করা হয়ে থাকে।

ডেপুটী কমিশনার এক এক করে একহাজার এক সংখ্যক নাম-সম্বলিত তালিকা শেষ করেন। কোন দেবতাই অনুপস্থিত থাকে না। কিন্তু সর্ব্বশেষ নামটী উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে গুঞ্জন-ধ্বনি উঠে—"ঐ দেবী আসছেন।" একসঙ্গে সব কৌতূহলী চোখ উপত্যকা-শীর্ষে নিবদ্ধ হয়...কেউ প্রতিবাদ করে না...কারও মনে বিস্ময় জাগে না। উপত্যকার সর্ব্বাপেক্ষা সম্মাননীয়া দেবী সকলের শেষে আগমন করেন।

এই দেবীটীকে সকলেই ভয় করে......তাই এর সব ত্রুটীও গ্রাহ্য নয়। হিন্দুর দেবী কালীর মত করালবদনা নররক্ত-পিয়াসী দেবী...এর বেদীমূলে কত শত পূজারীর জীবন উৎসর্গীকৃত হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। জনৈক বৈদেশিক পর্য্যটক এই দেবী সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, তা উপভোগ্য —"The Hindus when they came to India, found her an honoured place in their hierarchy of gods and goddesses, the Muslims dared not molest her, even the British have granted her the right to come late to the roll call, though forbidding her to indulge longer her craving for human blood.

এখনও এই দেবীর মন্দির মানালিতে অবস্থিত আছে প্রস্তর-নির্ম্মিত কৃষ্ণবর্ণের এই মন্দিরটী একটী প্রেতাত্মার মত স্থান। তার বেদীমূলে কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও শত শত কুলু যুবক-যুবতী দেবীর নিষ্ঠুর পিপাসা চরিতার্থ করবার জন্য তাদের প্রাণ বলি দিয়েছে!

ভগবানের এই রোল-কল উৎসব সমাপন করা হয় মাদক দ্রব্য সহযোগে। এই মাদকদ্রব্য স্থানীয় ধান্য হইতে তৈরী করা হয়। এই মাদক দ্রব্য উপভোগ করিবার জন্য প্রত্যেককে মাত্র এক আনা পয়সা দিতে হয়। বর্ত্তমানে মানুষ নিজেরাই ভগবান্ হয়ে গেছে। মূক জড় পুত্তলি প্রান্তরের এক পার্শ্বে পড়ে থাকে, আর উৎসবে

দেবতাদের রোল্-কল উৎসবে সমবেত কুলুর অধিবাসী

উন্মাদিত মনুষ সেই সব দেবতার ভক্তবৃন্দ নৃত্য-গীতে মেতে ওঠে। আর রাত্রি পর্য্যন্ত এই নৃত্যগীত চলে।

দেব-অধ্যুষিত এই উপত্যকায়, যতগুলি উৎসব হয় তার মধ্যে এই একটীই বিশেষ উপভোগ্য। এ ছাড়া আরও দুই একটী বীভৎস উৎসব আছে। এইরূপ একটী উৎসবে একটী উন্মত্ত বৃষকে নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয়। নদীর তীরে শস্যক্ষেত্র, আগামী বৎসরের খাদ্যের ভাণ্ডার। ক্ষেত্রের মালিকেরা বর্শা, লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বৃষটী যেই তীরে উঠতে যাচ্ছে তাকে অমানুষিক প্রহার দ্বারা সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বৃষের দেহ-ক্ষরিত রক্তে নদীর জল রঞ্জিত হয়ে গেল, শেষে তার দেহ অসাড় হয়ে পড়ল, নদীর স্রোতে সে চললো ভেসে। নদীর উভয় তীরে মালিকেরা দাঁড়িয়ে আছে। স্রোতের টানে মৃতদেহটী একবার এ তীরে একবার অপর তীরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। সকলেই আনন্দের সঙ্গে সেই মৃত দেহ থেকে এক এক টুকরা মাংস কেটে নিচ্ছে। ঐ সব মাংসের টুকরো জমিতে পুঁতে দিলে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায় বলে এদের বিশ্বাস।

কুলুর এই সমস্ত অদ্ভুত উপভোগ্য উৎসবই শুধু বৈদেশিক পর্য্যটকের কাছে একমাত্র আকর্ষণীয় বস্তু নয়। কুলুর প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং সর্ব্বোপরি আরামপ্রদ ভ্রমণ অনুসন্ধিৎসু পর্য্যটকদের এ দেশে টেনে নিয়ে আসে।

পরাজয় (নাটক)

শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

[সুকান্তর ঘর : সুকান্ত ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় শুয়ে আছে, ঠোঁটে তার সিগারেট, শুয়ে শুয়ে কি ভাবছে ঘরে ঢুকল চাকর।]

চাকর। বাবু, আপনার একটা জরুরি চিঠি—

সুকান্ত। জরুরি চিঠি? কে দিয়ে গেল?

চাকর। একজন লোক—

সুকান্ত। দাঁড়িয়ে আছে না চলে গেছে?

চাকর। চলে গেছে।

সুকান্ত। ও, আচ্ছা তুই যা। হ্যাঁ আলোট জ্বেলে দে তো,

[চাকর আলোটা জ্বেলে বেরিয়ে গেল, সুকান্ত চিঠিখানা পড়তে আরম্ভ করল]

সুকান্ত!

কোন বিশেষ কারণে আমার কথা রাখতে পারলাম না। বিয়ে করতে সম্মতি দিয়েছিলাম; কিন্তু সে ক্ষণিকের দুর্ব্বলতা; জীবনে ভুল মানুষে করে, ক্ষমা কোরো। ইতি

চিত্রলেখা

চিত্রলেখা এমন চিঠি লিখল কেন? তবে কি বাবা—

[কি ভাবল, তারপর চিৎকার করে চাকরকে ডাকল]

বঘুয়া, বঘুয়া—

[দূর থেকে চাকর জবাব দিল, তারপর কাছে এসে—]

চাকর। আমায় ডাকলেন বাবু?

সুকান্ত। হ্যাঁ শোন, গাড়ীটা বের করতে বল ত—আর আমার ওভারকোটটা দে।

চাকর। একেবারে খেয়ে বেরোলে পারতেন।

সুকান্ত। যা বলছি কর, দেরী করিস না—

চাকর। তবু, খাবারটা তৈরী হয়ে গেছে, তাই বলছিলাম।

সুকান্ত। থাক্।

[চাকর পাশের ঘর থেকে কোট আনতে গেল, সুকান্ত কি যেন ভাবতে লাগল, চাকর কোট পরিয়ে দিল। সুকান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল]

[চিত্রলেখার বাড়ীর বাইরের ঘর, চাকর ঘর দোর পরিষ্কার করছে, ঘরে ঢুকল সুকান্ত]

সুকান্ত। দিদিমণি কোথায় রে—

চাকর। দিদিমণি, দিদিমণি ত বাড়ীতে নেই—

সুকান্ত। বাড়ীতে নেই?

চাকর। আজ্ঞে না—

সুকান্ত। নেই, কোথায় গেছে জানিস?

চাকর। আপনার বাড়ী থেকে ফিরে এসে দেখি ডাক্তারবাবু বসে আছেন, তাঁরই সঙ্গে কোথাও বেরিয়েছেন বোধ হয়।

সুকান্ত। ডাক্তারবাবু! রঞ্জন! আচ্ছা।

[সুকান্ত সবেগে বেরিয়ে গেল, চাকর কিছু না বোঝার এবং অবাক হবার অঙ্গভঙ্গী করে টেবিল গোছাতে আরম্ভ করল]

[রঞ্জনের বাইরের ঘর, চিত্রা টেবিলের ওপর মাথা নুইয়ে রেখে কাঁদছে, রঞ্জন টেবিলের ওপর বসে সিগারেট খাচ্ছে]

রঞ্জন। এত বিচলিত হয়েছো কেন চিত্রা? জীবনের এই চরম সন্ধিক্ষণে তোমাকে নিজেকে এ-সমস্যার সমাধান করতে হবে। মানুষ যত বড় হতে থাকে, সামান্য সামান্য সমস্যা তত জটিল হয়ে দেখা দিতে থাকে। ছেলেবেলায় খেলাচ্ছলে আমরা একে অন্যকে বিয়ে করবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারি, কিন্তু বড় হয়ে কি তা আমরা রাখতে পারি? যত আমাদের জ্ঞান বাড়তে থাকে, তত আমরা ভাল করে জীবনকে চিনতে পারি। আঘাত পাওয়া মানে ভেঙ্গে পড়া নয়, আঘাত পাওয়া মানে শক্ত হওয়া।

চিত্রা। আমি আর চাকরী করতে পারব না ডাক্তারবাবু, —দয়া করে আমায় ছেড়ে দিন।

রঞ্জন। পাগল! তোমার মাথার এখন কোন স্থিরতা নেই, থাকলে এই সামান্য আঘাতে তুমি এত বড় একটা কাণ্ড করতে বসতে না। সময় যাক্, আপনিই বুঝতে পারবে; কিন্তু আমি বলি এ-হ'ল মাটির খেলনা নিয়ে খেলা, যতক্ষণ খেলনাগুলো আস্ত থাকে, যতক্ষণ ইচ্ছামত তাকে নড়াতে চড়াতে না পারি, ততক্ষণ ভারি সুন্দর লাগে, আচমকা হাত থেকে পড়ে গিয়ে যখন ভেঙ্গে যায়—তখন মনে হয় কি করলাম, সময়ের আবর্ত্তে সব ভুলে গিয়ে সব ঠিক হয়ে যায়, অত চঞ্চল হতে নেই চিত্রা।

চিত্রা। জানেন ডাক্তারবাবু, দরিদ্র হয়ে বেঁচে থাকবার মত বিড়ম্বনা জীবনে আর কিছু নেই। সকলের দয়া, মায়া, মমতা ভিক্ষে নিয়ে জীবন বাঁচাতে হয়। সকলে ভাবে দরিদ্র বলে আমাদের হৃদয় নেই, ভালবাসা নেই, কিছু নেই।

রঞ্জন। সামান্য কথাটা যখন জান চিত্রা, তখন সুকান্তকে কথা দিয়েছিলে কেন? এতদূর যদি না এগিয়ে যেতে তা হ'লে পেছিয়ে আসতে তোমার এত কষ্ট হ'ত না। টাকাই যাদের প্রাণ, হৃদয় তারা চিনবে না—এ-আর এমন আশ্চর্য্য কথা কি? জানই ত' মানুষ দু'টো জিনিষ কখনও চেনে না, যারা অর্থ চেনে তারা হৃদয় চেনে না আর যারা হৃদয় চেনে তাদের অর্থ নেই। বামন হয়ে যখন জন্মেছ তখন চাঁদের প্রতি লোভ করা কি শোভা পায়? সাহসে হৃদয় বাঁধ চিত্রা, সমস্যার সমাধান কর। নিজের sentimentalismটা সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে পার্থিব দৃষ্টিতে জিনিষটা ভেবে দেখ। নিজের প্রতি বিশ্বাস হারিও না। এই অবস্থায় তোমার ভেঙ্গে পড়লে ত চলবে না। একবার পথে যখন পা বাড়িয়েছ, তখন গন্তব্য চাই বই কি। শুধু গতি থাকলে চলার শেষ কোন দিনও হবে না! সুকান্ত! সুকান্ত! সুকান্ত এত ছেলেমানুষ!

[রঞ্জন চেয়ারে বসে পড়ল, বাইরে মোটর গাড়ীর শব্দ, রঞ্জন লক্ষ্য করল না, চিত্রা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল]

রঞ্জন। কেউ এল নাকি?

চিত্রা। কেউ না!

[অচঞ্চল পদক্ষেপে ফিরে এল, রঞ্জনের হাত ধরে]

রঞ্জন! রঞ্জন! একদিন তোমার প্রতি ভয়ানক অবিচার করেছিলাম, তোমায় ভয়ানক ভুল বুঝেছিলাম, তোমার সরলতাকে অশ্লীলতার মুখোস ভেবে তোমায় ঘৃণার চোখে দেখেছিলাম—আজ তোমার কাছে সেই জন্যে ক্ষমা চাইছি—

রঞ্জন। একি পাগলামী চিত্রা—

চিত্রা। পাগলামী নয় রঞ্জন, সত্যই আজ ক্ষমা চাইছি—সেদিন পাগলের মতন তোমায় অপমান করেছিলাম—তখন বুঝিনি তুমি কত মহৎ, কত সুন্দর, কত উচ্চ তোমার হৃদয়—

রঞ্জন। চিত্রা—।

চিত্রা। আজ আর কোন কথা নয় রঞ্জন। জীবনে সকলের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়েই মানুষ—আজ আমি তার শেষ করব। রঞ্জন! রঞ্জন!

[ঘরের দরজায় দাঁড়াল সুকান্ত। ব্যাপার দেখে মুখ-চোখ তার লাল হয়ে উঠেছে, ক্রমেই এগিয়ে আসছে]

রঞ্জন। আমায় তুমি বিয়ে করবে? রঞ্জন, বল—আমায় তুমি বিয়ে করবে—আমি আর—

সুকান্ত। বাঃ চমৎকার! সুন্দর! ভদ্রলোকের উপযুক্ত স্ত্রীই বটে। Wonderful! জীবনে ক্ষণিকের ভুল—ক্ষমা করো। এখন বুঝতে পারছি তোমার চিঠির অর্থ। এত কবিত্ব করে চিঠি না লিখে স্পষ্ট বললেই ত পারতে—Congratulations রঞ্জন!

[সুকান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, রঞ্জন হতবাক্: চিত্রা সুকান্ত বেরিয়ে যেতেই।]

চিত্রা। সুকান্ত! সুকান্ত! [দরজার কাছে পড়ে গেল]

রঞ্জন। সুকান্ত চলে গেছে! ওঠ, কেঁদো না। এ ভালই হল। এখন তোমাকে বিয়ে করলে সুকান্তর কাছে আর জবাবদিহী করতে হবে না—আমি তোমায় বিয়ে করব।

[চিত্রা রঞ্জনের গালে সজোরে চড় মেরে]

অসভ্য বর্ব্বর!

[চিত্রা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল]

[চিত্রার বাড়ীর একটী ঘর, রাত্রির নিস্তব্ধতা দিকে দিকে। বাইরে গাঢ় অন্ধকার, চিত্রা জানালায় ভর দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চারিদিকে একটা অদ্ভুত আবহাওয়া: ঘরে ঢুকল চাকর]

চাকর। দিদিমণি! [কাছে এসে] দিদিমণি! [চিত্রা নিরুত্তর] দিদিমণি!

চিত্রা। কি? [চিত্রার চমক ভাঙল]

চাকর। একজন বুড়োবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান—

চিত্রা। কে বুড়োবাবু? বলে দে, আজ আমি দেখা করতে পারব না—

চাকর। বাবু তিন চার বার এসে ঘুরে গেছেন! আপনি তখন বাড়ী ছিলেন না—

চিত্রা। তিন চার বার এসে ঘুরে গেছেন?

চাকর। হ্যাঁ দিদিমণি, তাঁর কি এক জরুরী কাজ আছে—

চিত্রা। আচ্ছা, যা, এখানেই ডেকে নিয়ে আয়।

চাকর। আচ্ছা—

[চাকর চলে গেল, চিত্রা কাপড়টা গুছিয়ে নিল, চেয়ারে অপেক্ষা করতে লাগল, ঘরে ঢুকলেন এক প্রবীণ ভদ্রলোক, উকিল, সৌম্য শ্রী, সুঠাম দেহ]

উকিল। তুমিই কি মা চিত্রলেখা?

চিত্রা। হ্যাঁ, আপনি বসুন—

উকিল। এই যে বসি [বসিলেন]। আমি তিন বার তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসে ঘুরে গেছি—

চিত্রা। কি দরকার বলুন!

উকিল। আমার নাম অমূল্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি স্বর্গীয় মধুসূদনবাবুর সম্পত্তির ট্রাষ্টি। তাঁর প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্পত্তি তিনি উইল করে তোমাকে দিয়ে গেছেন। আমি তিনদিন আগেই আসতাম, কিন্তু কয়েকটা বিশেষ কারণে আসতে পারি নি।

চিত্রা। টাকা, পঞ্চাশ হাজার, মধুসূদন কাকা।

উকিল। কাল তুমি কোর্টে এলেই তোমার দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। কাল তুমি এস মা, কেমন? আজ আমি তাহ'লে আসি মা! নমস্কার।

চিত্রা। ওঃ হ্যাঁ! আচ্ছা! নমস্কার।

[উকিল ভদ্রলোকটি চলে গেলেন: চিত্রা তাঁর যাওয়ার পথে চেয়ে, নিজের মনেই বলে উঠল]

ঐশ্বর্য্য! সম্পত্তি! কি দরকার। কতটুকুই বা মূল্য আমার জীবনে। পারের কড়ি যে গুণতে বসেছে, ধারের কড়ি নিয়ে ছেলেখেলা করবার বয়েস কি তার আছে।

[ক্রমেই অন্ধকার ঘনিয়ে এল]

[বেবীদের বাড়ীর বাইরের ঘর। বেবী পিয়ানোয় বসে গান গাইছে। অনাদিবাবু আর বেবীর মা মন দিয়ে তাই শুনছেন]

বিজন নদীর তীরে
এস হে পীতম ফিরে
বিরহ সাগর পারাবে
ঘাটে ঘাটে ঐ ফিরেছে খেয়া
শেষ হয়ে গেল সব দেয়া নেয়া

হিসাব আমার মেলে নি শুধু
তুমি গেছ প্রিয় হারায়ে—
বাতাস গিয়াছে থেমে
ফুল ফোটা হ'ল সারা
আঁধার এসেছে নেমে
উঠেছে সন্ধ্যা-তারা
জ্বেলেছি ব্যথার প্রদীপখানি
এ-আলো তোমারে ফেরাবে জানি
নিয়ে যাবে তব সোণার তরীতে
আমারে দু'হাত বাড়ায়ে। *

[ঘরে ঢুকল সুকান্ত, গান তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে : বেবী গান থামিয়ে দিল, বেবীর মা সুকান্তকে দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন]

অনাদি। এস! এস! বাবা সুকান্ত! তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। ক'দিন থেকে তোমার কথাই ভাবছিলাম, কেমন আছ বাবা? তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হ'ল, তাঁর চেহারা বড্ড খারাপ মনে হ'ল, তোমার মার বড্ড অসুখ তাঁর কাছেই শুনলাম, কেমন আছেন জান? তোমাকেও বড্ড শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে, অসুখ-বিসুখ কিছু হয়েছিল না কি।

সুকান্ত। না কাকাবাবু, অসুখ বিসুখ কিছু হয় নি, তবে কলকাতায় আর ভাল লাগছে না!

অনাদি। না লাগবারই কথা! না লাগবারই কথা! আমার একদম ভাল লাগে না। খালি বেবীর জন্যেই থাকা, কি-রে বেবী, সুকান্তর সঙ্গে কথাই বলছিস না যে।

সুকান্ত। কেমন আছ বেবী?

অনাদি। বেবী-মা খুব ভালই আছে। বসে বসে শুধু বিয়ের দিন গুণছে।

সুকান্ত। তাই না কি? কৈ—।

অনাদি। আরে তাই না কি? শোন নি তুমি খবরটা, বেবীর যে বিয়ে, এই মাসেই। ভালই পাত্র পেলাম। I. C. S. Officer, মাসখানেক হ'ল বিলেত থেকে ফিরেছে, সে ত' দেখেই বিয়ে করবার কথা পাড়ে, বড় ভাল ছেলে, ঠিক তোমার মতন, আমার ভারি ইচ্ছে ছিল, [বেবী ঘর থেকে চলে গেল] তোমার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া, তোমার বাবারও খুব ইচ্ছে ছিল; আর তোমার মার কথা ত' ছেড়েই দাও, তিনি ত' সেই ছেলেবেলা থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন, আমরা ছেলেবেলা খেলাচ্ছলেই তা ঠিক করেছিলাম, তা তুমিই করলে না।

সুকান্ত। মানুষ যা ভাবে সব সময়েই কি তা হয়? বাবাই কি ভেবেছিলেন আমি তাঁর ছেলে হয়ে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করব, না আমিই কোনদিন ভেবেছিলাম তাঁর অবাধ্য হব। হয় ত' আমাদের বিয়ে হবার নয় বলেই আমি অবাধ্য হ'লাম।

* শ্রীযুক্ত অনিল ভট্টাচার্য্য রচিত

অনাদি। তা ত' বটেই। নিয়তির হাত কে কবে এড়িয়ে যেতে পেরেছে বল, বরাত বাবা সব বরাত, তা তুমি থাকছ ত'- বেবীর বিয়ের সময়ে। তোমার বাবাকে এত করে বল্‌লাম তা তিনি কাজের জন্যে থাকতেই পারলেন না। আর তা ছাড়া ভালই বা লাগবে কেন! কোথায় তাঁর পুত্রবধূ বলে ঘরে তুলবেন তিনি তা নয়—

সুকান্ত। বাবার বয়েস হয়েছে—মিল দেখাশোনা করবার জন্যে লোক দরকার, বাবা একলা সব দেখাশোনা করতে পারবেন না, তাই ভাবছি আজই ফিরে যাব।

অনাদি। সে কি কখনও হয়, না না সে হতেই পারে না, সে হতেই পারে না, তুমি থাকবে না, আর বেবীর বিয়ে হবে, না বাবা সুকান্ত তোমার এখন যাওয়া হতেই পারে না, কখনই নয়। তুমি বোস' আমি তোমার কাকিমাকে ডেকে দিই, তিনি তোমায় কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না।

সুকান্ত। না কাকাবাবু, সত্যিই আমি থাকতে পারব না।

অনাদি। তবু থেকে গেলে পারতে। বেবীর সঙ্গে বিয়ে না হলেও, চিরকাল তোমায় আমারা ছেলের মতন দেখি, আজও দেখব, তুমি থাকবে না, এও কি একটা কথা হ'ল।

সুকান্ত। না কাকাবাবু! মিথ্যা মোহে অনেক কর্ত্তব্যে অবহেলা করেছি, বাবার অবাধ্য হয়ে বাবার প্রতি যথেষ্ট অপরাধ করেছি, কিন্তু আর নয়; আর যে কয়দিন তিনি বেঁচে আছেন তাঁকে শান্তি দিতে চেষ্টা করব, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন কাকাবাবু, যেন জয়যুক্ত হই [ক্রমেই অন্ধকার হয়ে মিলিয়ে গেল]।

[এক বছর পরের ঘটনা : মিলের ভেতর একটী ঘর। পেছনে মিল চলার ঘর্ঘর-ধ্বনি : কালি ঝুলি মাখা অবস্থায় ঘাম পুছতে পুছতে সুকান্ত ঘরে ঢুকল, সঙ্গে এল কুলীর সর্দ্দার]।

সুকান্ত। দু'নম্বর shift আমি দেখে দিয়েছি, আপাততঃ কাজ চলবে, দরকার হলে আবার আমায় টেলিফোন কোরো, আমি বাড়ীতেই আছি।

সর্দ্দার। যে আজ্ঞে কর্ত্তা।

সুকান্ত। হ্যাঁ, আজ মিলে আসবার পথে মঙলুর সঙ্গে দেখা হ'ল, সে বলছিল তোমরা বস্তির মদের দোকানটা তুলে দিয়েছ?

সর্দ্দার। আজ্ঞে হ্যাঁ, মিছিমিছি ছাই-পাঁশ খেয়ে আমাদের অনেকের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে।

সুকান্ত। বাঃ চমৎকার, হ্যাঁ ৫৬ নম্বর বলছিল তার নাকি শরীরটা আজ খুব খারাপ, তাকে আজ না হয় ছুটি দিয়ে দাও! শরীর যখন খারাপ তখন কাজ করিয়ে কোন লাভ নেই, অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে হয় ত' হাতখানা জন্মের মতন

খুইয়ে বসবে। আর তোমার shift-এর সবাইকে বলে দাও কাল থেকে পূজোর ছুটী আরম্ভ। পূজোর সময়ে যারা ছুটী চায় তারা চারদিনের ছুটী পাবে, আর যারা কাজ করতে চায় তারা ডবল মজুরী পাবে।

সর্দ্দার। পূজোর ছুটী নিলে চারদিনের মজুরী—

সুকান্ত। নিশ্চয় পাবে।

সর্দ্দার। সেলাম হুজুর!

সুকান্ত। সেলাম!

[সর্দ্দার চলে গেল : সুকান্ত একটা Drawig sheet খুলে নূতন plant-এর diagram পরীক্ষা করতে লাগল : নূতন একটা shift বসবে তারই নক্সা : ঘরে ঢুকলেন বড়বাবু, হাতে খাতাপত্তর]।

সুকান্ত। কি ব্যাপার বড়বাবু?

বড়বাবু। আজ্ঞে রামসুকীয়ার চেকটা যদি সই করে দেন—

সুকান্ত। ও! যে-কুলীটার কাল হাত ভেঙ্গে গেছে, সে কি রকম আছে কোন খবর পেয়েছেন?

বড়বাবু। এইমাত্র Hospital থেকে daily roport এসেছে সে ভালই আছে, প্রাণের ভয় নেই।

সুকান্ত। C. M. O. তাকে দেখেছেন?

বড়বাবু। আজ্ঞে হ্যাঁ, কালই দেখেছিলেন।

সুকান্ত। সে এখন কোথায় আছে, হস্‌পিট্যালেই?

বড়বাবু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুকান্ত। [চেক্ সই করতে করতে] হ্যাঁ ৫০০৲ টাকাই এখন যথেষ্ট, বাকি ২০০৲ টাকা মাস তিন পরে দেবেন। রামসুকীয়ার বাড়ীতে আজই এটা পাঠিয়ে দেবেন, বেশী দেরী করা ভাল নয়। [চেক সই করা শেষ করে] নাইট স্কুলের জন্যে যে নতুন মাষ্টার appoint করা হয়েছে, তিনি join করেছেন।

বড়বাবু। করেছেন।

সুকান্ত। সব শুদ্ধ কত ছেলে হয়েছে স্কুলে?

বড়বাবু। তা ৫০ তো বটেই।

[এমন সময় ঘরে ঢুকল সর্দ্দার, হাতে তার লোহার একটা চাকতি]

সুকান্ত। এই যে সর্দ্দার, আচ্ছা সর্দ্দার, তোমরা স্কুলে যাও ত'।

সর্দ্দার। তা আর যাই না কর্ত্তা? আপনার জন্যে বস্তিতে মুখ্যু আর কেউ রইল না কর্ত্তা, সবাই গুরুম'শায় হয়ে উঠেছে।

সুকান্ত। হ্যাঁ, মন দিয়ে লেখাপড়া করে মানুষ হও, নিজেদের চিনতে শেখ।

সর্দ্দার। তাও পারি কর্ত্তা। ইন্‌জিরিতে নিজের নাম সই করতে বেশ পারি কর্ত্তা [টেলিফোন বেজে উঠল]।

সুকান্ত। হ্যালো, হ্যাঁ! তাই না কি? কালকে, মধ্যেই তিনশো বাণ্ডিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা, আচ্ছা বেশ তা হ'লে এক কাজ কর, না-না ডিউটি বাড়াবে কেন? তার কোন দরকার নেই, নতুন লোক বাড়াও—তাতে কি হয়েছে—লাভ নাই বা হ'ল, হ্যাঁ, হ্যাঁ,৫০ জন যে নতুন লোক নেবে সেটাই ত লাভ। আচ্ছা, আচ্ছা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক্ষুনি, [টেলিফোন রেখে দিল] হ্যাঁ বড়বাবু, নতুন যে মেসিন বসবে তার জন্যে লোক নেওয়া হয়েছে?

বড়বাবু। আজ্ঞে কাল হবে।

সুকান্ত। নতুন লোক নেবার সময় এই কথাটা মনে রাখবেন, আগে আমাদের বস্তির লোক, তারপর বাইরের লোক!

বড়বাবু। আজ্ঞে এত লোক ত আমাদের এখানে পাওয়া যাবে না!

সুকান্ত। দেখুন চেষ্টা করে কত পান, তারপর যা হয় করা যাবে—

[আবার টেলিফোন বেজে উঠল—

হ্যালো, হ্যাঁ, আচ্ছা, আচ্ছা! হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, আমি—না, না তোমাকে কিছু দেখতে হবে না, হ্যাঁ—না না, ওসব আমিই দেখে দেব, হ্যাঁ-হ্যাঁ—আচ্ছা বলছি [ফোন রেখে দিল]। বড়বাবু, কালকে Board of Directorsদের যে মিটিং হবে তার কাগজ-পত্তর সব তৈরী? বাবা জানতে চাইছেন—

বড়বাবু। আজ্ঞে হ্যাঁ, সব তৈরী, Balance sheetটা তো বড়কর্ত্তাকে পাঠিয়েই দিয়েছি—

সুকান্ত। ভুল করেছেন। বাবা কাল মিটিং করবেন না, আমিই করব। Balance sheetটা আপনি আনিয়ে নিন, এক্ষুণি লোক পাঠিয়ে দিন—[ঘড়িতে বাজল সাতটা] আপনার বোধ হয় ভয়ানক দেরী হয়ে গেল—Balance sheetটা আমায় দিয়েই আপনি বাড়ী যেতে পারেন—

বড়বাবু। আজ্ঞে কালকের মিটিংয়ের কয়েকটা কাজ এখনও—

সুকান্ত। থাক বাকী, কাল হবে এখন! আর যদি খুব বেশী থাকে আমায় দিয়ে যান, আমি আজ রাত্তিরে দেখে রাখব।

বড়বাবু। দরকারী কাজ, কাল পর্য্যন্ত ফেলে রাখা কি উচিত হবে!

সুকান্ত। তাতে কি হয়েছে, আমি আজ রাত্রেই দেখে রাখব।

[এমন সময়ে অদূরে বেজে উঠল বিপদের হুইসিল]

বড়বাবু। কর্ত্তা!

সুকান্ত। কোন দিক থেকে আসছে বলতে পারেন?

বড়বাবু। বোধ হয় নতুন কয়লার ঘর থেকে—

[সুকান্ত ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, বড়বাবু হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মুহূর্ত্তকাল, তারপর তিনিও ছুটে বেরিয়ে গেলেন]

[মিলের কোন একটী অংশের সম্মুখ ভাগ, ঘরখানি দাউ দাউ করে জ্বলছে, ঘরের সামনে একদল চেঁচামেচি করছে। এসে দাঁড়াল সুকান্ত, ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেল—]

সুকান্ত। সরে যাও, সরে যাও, সরে যাও তোমরা।

সর্দ্দার। আপনি? আপনি এখানে কেন কর্ত্তা? [সুকান্ত প্রজ্বলিত ঘরের দিকে এগিয়ে গেল] কোথায় যাচ্ছেন কর্ত্তা? যাবেন না—যাবেন না কর্ত্তা, কর্ত্তা! কর্ত্তা!

সুকান্ত। ঘরে কেউ আছে?

সর্দ্দার। বয়লার-কুলি ছাড়া কেউ নেই—[সুকান্ত ছুটে ভেতরে যাবে বলে পা বাড়াতেই সর্দ্দার হাতটা ধরে ফেল্ল] কর্ত্তা দোহাই আপনার, যাবেন না—

সুকান্ত। ছাড় সর্দ্দার! তোমাদেরই মতন একজন গরীব কুলী অসহায় অবস্থায় ঘরের মধ্যে পুড়ে মরবে আমি পুরুষ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখব?

সর্দ্দার। আমি যাই কর্ত্তা—আমরা মজুর মানুষ—

সুকান্ত। থাক্। মানুষ সব অবস্থায় সমান্—

[বলতে বলতে ঢুকে গেল, সবাই চেঁচিয়ে উঠল. কর্ত্তা-কর্ত্তা-এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে ঢুকলেন রামবাবু]

রামবাবু। সুকান্ত! সুকান্ত!—

সর্দ্দার। ছোটকর্ত্তা আগুনের মধ্যে ঢুকে গেলেন হুজুর—বয়লার-কুলিকে—

রামবাবু। তোরা কি করছিলি?—[সর্দ্দার ছুটে গেল আগুনের মধ্যে] সর্দ্দার—

সর্দ্দার। ছোট কর্ত্তাকে ফিরিয়ে আন্, হুজুর—

[সবাই চেঁচিয়ে উঠল, রামবাবুও ছুটে যেতে চাইলেন, সবাই মিলে ধরে রাখল---ছাড়! ছাড়! আমার সুকান্ত]

[চিত্রার বাড়ীর পরিপাটি বাইরের ঘর, চিত্রা সোফায় বসে কাগজ পড়ছে, রঞ্জন Hospital থেকে সবে ফিরেছে, সেও কাগজ পড়ছিল, চাকর চা দিয়ে গেল]

রঞ্জন। আজ তোমার নার্সিং-হোমের অপারেশন ওয়ার্ডে গিয়ে খালি সুকান্তর কথাই বার বার মনে পড়ছিল। —সে এটা দেখলে কত আনন্দই না করত।—আজ একবছর পরে তার কথাই বার বার মনে পড়ছে, কেন বল দেখি—

চিত্রা। কি জানি কেন!—

রঞ্জন। আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ছেলেটার—অত বড় লোকের ছেলে হয়েও ও যে অমনভাবে কুলীদের সঙ্গে মিশে কাজ করতে পারবে তা আমি ভাবতেও পারিনি—ওরই একান্ত পরিশ্রমে ওদের চারটের জায়গায় বারটা মিল হয়েছে—হাজার হাজার লোকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয়েছে—আজ এক বছর প্রায় হতে চললো—অথচ একদিনও তার কোন খবর পেলাম না—আমাদের বন্ধুত্ব এমনি ভাবে ভেঙ্গে যাবে তা কে জান্ত—[চা খেতে খেতে—] আচ্ছা চিত্রা সেদিন সুকান্তকে আস্তে দেখে তুমি অমন অদ্ভুত অভিনয় করলে কেন?

চিত্রা। আমার আত্ম-সম্মানকে রামবাবু আঘাত দিয়েছিলেন বলে—

রঞ্জন। সে কি তোমার আজও মনে আছে? সে কথা কি তুমি কোন দিনও ভুলতে পারবে না?

চিত্রা। সে কথা কোন দিনও ভুলতে পারবো না। নারীর কাছে তার আত্ম-মর্য্যাদা।

রঞ্জন। ভালবাসার চাইতে মহার্ঘ?

চিত্রা। বোধ হয়—[দু'জনেই নির্ব্বাক: খানিক পর]

রঞ্জন। জীবনে আর কাউকে তুমি ভালবাসতে পার না?

চিত্রা। না—

রঞ্জন। কখ্খনও না?

চিত্রা। অসম্ভব! তবে ভালবাসায় এবং ভাল লাগায় অনেক তফাৎ।

রঞ্জন। জানি চিত্রা! কিন্তু কথা কি জান, নারীর জীবন যখন বেয়ে চলে বিশ্বের দুকূল প্লাবনে ভাসিয়ে দিয়ে, তখন ভাল লাগার বাঁধ তার গতিকে রোধ করতে পারে না—তখন ভালবাসারই হয় প্রয়োজন!—এটা মানবে ত চিত্রা, যে ভালবাসাটা, কি পুরুষ, কি নারী, সকলের জীবনেই প্রয়োজন—আয়োজন নয়। তাই বলি চিত্রা, এমনি ক'রে আর কতদিন কাটাবে—পাগলাগারদ রোদনভরা সংসারের চাইতে স্বামী-পুত্রকন্যা-পরিবেষ্টিত সংসারেই তোমাদের মানায় বেশী—সেইখানেই নারীর স্থান। তাজমহল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের সম্মান পেয়েছে, তার বুকে নদীর ছোঁয়াচ আছে বলে। সাহারার মাঝখানে যদি তাজমহল গড়ে উঠ্ত, তা'হলে যুগ যুগ ওয়েসিস্ হয়েই তাকে থাকতে হ'ত। চিত্রা একলা ত জীবন কাটাতে পারবে না—অবলম্বন ত' তোমার একটা দরকার—

চিত্রা। তাই তো নার্সিং-হোমের সৃষ্টি!—

রঞ্জন। সেই নিয়েই কি জীবন কাটাতে পাবে? তুমি কি জীবনে কখনও বিয়ে করবে না?

চিত্রা। না!—

রঞ্জন। সে যদি বিয়ে করে?

চিত্রা। আমার ভালবাসা বেঁচে থাকবে চিরকাল।

রঞ্জন। সে যদি আবার তোমার কাছে ফিরে আসে?

চিত্রা। যে আমার আত্মসম্মানকে আঘাত করেছে—আমার আত্মমর্য্যাদাকে করেছে ক্ষুণ্ণ, সে সামান্য অভিনয় না বুঝে, সামান্য একটা জবাবদীহি পর্য্যন্ত দাবী না করে আমার জীবন থেকে সরে দাঁড়াতে না পারে—

রঞ্জন। চিত্রা, তুমি নিজের দিকটাই ভাবছ, তার দিকটা একবার ভাবছ কি? আঘাত কি তুমি একলাই পেয়েছ? সেও ত তোমার ব্যবহারে আঘাত পেয়ে থাকতে পারে।

চিত্রা। সুকান্ত যে এত সামান্য এত তুচ্ছ, এ ধারণাও আমার ছিল না!

রঞ্জন। সুকান্তকে তুমি বড় অবিচার করেছ চিত্রা! যা তুমি বললে তা তোমার আত্মসম্মানের কথা নয়, অভিমানের কথা! যা তোমাদের মতন দু'টী নরনারীকে উপলক্ষ্য করে গড়ে উঠেছিল তার মাঝখানে আমি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম মনে করে আজ আমার সত্যিই লজ্জা হচ্ছে। আমি জানি চিত্রা, তোমার ভালবাসার তুলনা নেই। সুকান্তকে সেখান থেকে কেউ সরাতে পারবে না! নিজেকে তার গ্রহণযোগ্য করে রাখবার যে সতর্ক সাধনা তুমি সুরু করেছ, তা আমার চোখে ধরা পড়ে গেছে। তোমার এই আত্মত্যাগের যে বিরাট সাধনা—এ যে কার অনুপ্রেরণায় তা কি আমি জানি নে চিত্রা? তাই বলি সংসারের মাঝে তুমি ফিরে যাও চিত্রা। ফাঁকি দিয়ে তুমি আমাদের ঠকাতে পারবে, কিন্তু মনের কাছে ত জবাবদীহি করতে পারবে না—সেখানে ত' হার মানতেই হবে চিত্রা—

চিত্রা। ত্যাগের মহামন্ত্র যেখানে মনের গতি এগিয়ে নিয়ে চলেছে, ভোগের বাসনা সেখানে কেমন করে থাকতে পারে? আর এ ক্ষেত্রে তাই যদি হয়ে থাকে তা হলে স্বার্থত্যাগের বিরাট সাধনাটা কোথা থেকে এল? আর নিজেকে তার গ্রহণযোগ্য করে রাখবার সতর্ক সাধনাই বা কি করে আসতে পারে?

রঞ্জন। বিবেকের কাছে পরাজয় স্বীকার করা মানে কি ভোগের বাসনাকে পরিতৃপ্ত করা? আদর্শকে না পাওয়ার ব্যথাও ত ব্যথা! তারপর—[টেলিফোন বেজে উঠল] দাঁড়াও দেখি কে টেলিফোন করছে—হ্যালো? হাঁা ডাঃ মুখার্জ্জী বলছি-ও রামবাবু, নমস্কার! কেমন আছেন—সুকান্ত? কোথায়? কয়েক ঘণ্টা হল? কোথায়? কোথায়? ও আচ্ছা, হাঁা আমি এখুনি আসছি—

চিত্রা। সুকান্তর কি হয়েছে? কি,—কেমন—কেমন আছে [কান্না প্রাণপণে চেপে আছে]...কোথায় আছে?

রঞ্জন। সুকান্ত গুরুতর ভাবে আহত—

চিত্রা। কি হয়েছিল তার?

রঞ্জন। মিলের বয়লার রুমে আগুন লেগে যায়, বয়লারকুলীকে বাঁচাতে গিয়ে—

চিত্রা। কোথায় আছে সে?

রঞ্জন। Walker Hospital-এ [চিত্রা ছুটে বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াল] একি! কোথায় যাচ্ছ চিত্রা?

চিত্রা। তাঁর কাছে, হাসপাতালে—

রঞ্জন। এই যে বললে—

চিত্রা। ভুল বলেছিলাম, তখন বুঝি নি যে নারীর অভিমানের চেয়ে ভালবাসাটা বড় জিনিষ!

[ছুটে বেরিয়ে গেল, রঞ্জন অবাক হয়ে তার চলে যাওয়ার পথের পানে চেয়ে রইল]

[হসপিট্যালের একটী কক্ষ, ঘরে মাত্র একখানি খাট, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায়, মাথার কাছে নার্স, মাঝখানটিতে ডাক্তার, রামবাবুও বসে আছেন]

রাম। ডাক্তারবাবু! আমার একমাত্র ছেলে—

ডাক্তার। আঃ—[সঙ্কেতে চুপ করতে বললেন]

রাম। ডাক্তারবাবু, [ডাক্তারের হাত ধরল, ডাক্তার বিরক্ত হয়ে হাত ছাড়িয়ে নিলেন, আর নার্সকে ইঙ্গিতে জানালেন বৃদ্ধকে বাইরে রেখে আসতে, নার্স কথা পালন করল হঠাৎ সুকান্ত একটু নড়ে উঠল, ডাক্তার উন্মুখ হয়ে চেয়ে রইলেন]

সুকান্ত। চিত্রা, তুমি আসবে আমি জানতাম। চিত্রা ওদের কাজকে আমি ঘৃণা করি, সত্যিকার মানুষ ওরা নয়, ওরা অর্থের পিশাচ, আমি চাই সত্যিকার মানুষ হতে, মানুষ হয়ে মানুষের অধিকারকে বুঝতে, কিন্তু, আচ্ছা চিত্রা তুমি নিশ্চয়ই অভিনয় করেছিলে, না—আমি জানতাম তুমি আবার আসবে, তুমি ত আমায় ত্যাগ করতে পার না, আমি তোমার জন্যেত আমার সমস্ত সম্পত্তি এমন কি মায় বাবাকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে পারতাম, তুমি আমায় বললে না কেন, ধনী পিতার একমাত্র পুত্র হয়ে আমি ত বাঁচতে চাই নি। বাঃ বেশ চমৎকার আজ বুঝতে পারছি তোমার চিঠির মর্ম্ম, চিত্রা তুমি ফিরে এলে আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সব ভুলে যাব। [নার্স ফিরে এসে তার জায়গায় দাঁড়াল] চিত্রা, চিত্রা আমার আদর্শকে তুমি এমনি ভাবে ভেঙ্গে দিও না, চিত্রা-চিত্রা [আস্তে আস্তে ওর কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল]

ডাক্তার। Delirium—Nurse, Oxygen দেবার ব্যবস্থা কর—patient sink করছে—[ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন]

[ডাক্তারের অফিস-ঘর, চিত্রা টেবিলের ওপর মাথা রেখে চুপ চাপ বসে আছে পাথরের মতন—ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন]

চিত্রা। ডাক্তারবাবু!—

ডাক্তার। আপনি?

চিত্রা। আমার নাম চিত্রা—বাঁচবার আশা আছে ডাক্তারবাবু?—

ডাক্তার। কার কথা বলছেন আপনি—

চিত্রা। সুকান্ত বাবুর,

ডাক্তার। ও হাঁা, তার অবস্থার খানিকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে, তবে সেটা খুব সামান্য, আজ তার একটা Major operation—আজ রাত্রের মধ্যেই সেটা সেরে ফেলতে না পারলে হয় ত চিরকালের মতন তিনি invalid হয়ে যাবেন—অথচ operation এর আগে যতটা

শক্তি সাধারণতঃ দরকার, তা এখনও হয় নি। তবে মাঝে মাঝে জ্ঞান হচ্ছে—

চিত্রা। বাঁচবার কি কোন উপায় নেই—

ডাক্তার। রামবাবু চান আজই operationটা সেরে ফেলি—কিন্তু patientএর যা অবস্থা আমার সাহস হচ্ছে না—

চিত্রা। তবে কি চিরজীবন উনি invalid হয়ে বেঁচে থাকবেন? কোন উপায়ই কি নেই?

ডাক্তার। আছে—প্রলাপের ঘোরে আপনার কথাই উনি বার বার বলছিলেন—আপনি যদি ওকে আশা দেন, ভরসা দেন তবে হয় ত কিছু হ'তে পারে—[নার্স ঘরে ঢুকল]

নার্স। Patientএর আবার জ্ঞান হয়েছে—

ডাক্তার। ও—আচ্ছা চল—

[ডাক্তার বেরিয়ে গেল, পেছন পেছন যাচ্ছিল নার্স, চিত্রাও উঠে যাচ্ছিল]

নার্স। কিছু মনে করবেন না—এখন তাঁর যে অবস্থা তাতে আমরা Visitors allow করতে পারি না—

[চিত্রা পাথরের মতন হয়ে গেল, মুখ দিয়ে উচ্চারণ করল, "Visitor" চেয়ারে বসে পড়ল, আবহ সঙ্গীত বেজে উঠল, ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকলেন রামবাবু, চিত্রা তখন টেবিলে মাথা দিয়ে বসে]

রামবাবু। চিত্রলেখা!—[চিত্রা চঞ্চল হ'য়ে উঠল]—মা তুমি আসবে আমি জানতুম। ঠিক একবছর আগে—এমনি একদিন যখন প্রথম তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়—সেদিন তুমি আমায় অনেক কথা বলেছিলে: ঐশ্বর্য্যের দম্ভে আমি তা শুনি নি—ভেবেছিলাম ছোট লোক অসভ্যের কথা কিন্তু আজ আমি বুঝি সে সব কত সত্য! সেদিন তোমার কাছে আমি আমার ছেলেকে কিনতে চেয়েছিলাম—তুমি যাতে তাকে বিয়ে না কর তার জন্যে তোমার নারীত্বকে পর্য্যন্ত অপমান করতে দ্বিধা বোধ করি নি—আজ—আজ আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি—আমার ছেলেকে তুমি বিয়ে কর—

চিত্রা। অসম্ভব—আমি তা পারব না—

রাম। আমায় বলা শেষ করতে দাও মা—আজ আমি ভয়ানক ক্লান্ত! আমি কি বলছি তা আমি নিজেই বুঝছি না—সেদিন বুঝি নি ঐশ্বর্য্যের দম্ভে—আজ বুঝছি না—পরাজয়ের আনন্দে। আমি বৃদ্ধ ব্যাকুল—অস্থির—তুমি যুবতী বুদ্ধিমতী—স্থির, আমি হয়ত তোমায় সব বুঝিয়ে বলতে পারবো না—তবে এইটুকু জানি—তুমি যদি সুকান্তকে বিয়ে করতে রাজি না হও, তা' হ'লে ও বাঁচবে না—

চিত্রা। ডাক্তার বাবুও তাই বলেছেন—

রাম। ওর জীবন আজ তোমার হাতে। সমস্ত দিন-রাত প্রলাপের ঘোরে সে তোমার কথা বলে। আমার ঐশ্বর্য্যের দম্ভকে সে ঘৃণা করে—যখনই তার সামান্য জ্ঞান হয় সে তোমার কথাই বলে—সে জানে আমিই প্রথম তোমার বিয়েতে বাধা দিই। আমি জানি সে সত্যি কথাই বলে—আমি সব বুঝি মা—আমার সহের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে।

তুমিই আজ তার জীবনে একমাত্র প্রয়োজন। তার এক বৎসরের নীরব সাধনা—তোমায় ভুলবার জন্যে পলে পলে কর্ম্মকোলাহল-মুখরিত জীবনের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে—বিশ্বের সকাশে প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ, মায়া, মমতার হাত এড়িয়ে দুঃখ ভোলবার নীরব উপকরণ: তিলে তিলে নিজের হৃদয়কে ফাঁকি আর যারই দৃষ্টি এড়াক না কেন—আমায় ভোলাতে পারে নি—আমি জানি, নিজেকে ফাঁকি দিয়ে দশজনকে সুখী করতে পারবে, কিন্তু অন্তিমের দ্বারে এসে নিজেকে সামলাতে পারবে না—

তোমার মুখের একটী কথা শুনে—আমি জানি সে বেঁচে উঠবে—মা—এই তোমার প্রতিশোধ নেবার চরম মুহূর্ত্ত—যদি নাও তা' হ'লে হয় ত আমার উচিত শিক্ষাই হবে—কিন্তু ক্ষুব্ধ পিতার ওপর প্রতিশোধ নিয়ে সুখী তুমি হ'তে পারবে না—যদি চাও আমার ছেলেকে মরণের মুখে ঠেলে দিয়ে তুমি প্রতিশোধ নাও—

চিত্রা। সত্যিই কি সে মরণের মুখে—

রাম। আমার জীবনে এমন সময় আসে যখন আমি মিথ্যা কথা বলতেও লজ্জা পাই—এও তেমনি মুহূর্ত্ত।

মা আজ তোমার কাছ থেকে আমার ছেলেকে ভিক্ষা চাইছি। আমার এ দায় থেকে, এ পাপ থেকে তুমি মুক্তি দাও—ব্যথিত পিতার মুখ চেয়ে তুমি তাকে গ্রহণ কর—তোমার কাছে পরাজয়েই হোক আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত! ঐশ্বর্য্য আজ স্নেহের কাছে স্বীকার করুক পরাজয়।

চিত্রা। কিন্তু অতীত—

রাম। আমরা সবাই সেদিনের কথা ভুলে যাব—আমরা আবার নতুন করে বাঁচব—মা, আমরা যখন তরুণ থাকি, তখন ভাবি মানুষ বুঝি দেবতা—কিন্তু যত বয়স বাড়তে থাকে তত বুঝতে পারি, মানুষ—মানুষ, দেবতা নয়। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমরা ভুল করি: এটা যখন বুঝবে, তখন এও বুঝবে যে মানুষের ভুল-ভ্রান্তি সব সময় ক্ষমা করতে হয়—এমন কি পিতাকে পর্য্যন্ত—

চিত্রা। বাবা—চলুন, এতক্ষণে হয় ত আবার জ্ঞান হয়েছে…

[ধীর পাদক্ষেপে দু'জনেই বেরিয়ে গেল]

যবনিকা

বিজ্ঞান জগৎ

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ধারা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

চার

নিয়ম আবিষ্কারের তৃতীয় পদ্ধতি—
সাদৃশ্যের পথ

বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাকৃত ঘটনার মধ্যে এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, ঘটনার বিষয়বস্তু ভিন্ন হলেও এবং এমন কি, ঘটনা প্রবাহ সম্পূর্ণ নূতন মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করলেও ঘটনার অন্তর্গত পরিবর্ত্তনশীল রাশি সমূহের সম্বন্ধটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই আকার ধারণ ক'রে থাকে। এর থেকে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, প্রকৃতির রাজ্যের বিভিন্ন আইন কানুনের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে এই সত্যটা ক্রমেই পরিস্ফুট হচ্ছে যে, প্রকৃতির মূর্ত্তি বহুধা বিভক্ত হ'লেও তার মূল কাঠামো এক; এবং ওর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব বিদ্যমান।

এর বিশিষ্ট উদাহরণ স্বরূপ আমরা ফুরিয়ার এবং ওমের নিয়মের তুলনা করবো। ফুরিয়ারের নিয়মটার আভাস আমরা পূর্ব্বেই দিয়েছি। এই নিয়মটা হচ্ছে তাপ-পরিচালক পদার্থের ভেতর দিয়ে তাপের সঞ্চালন সম্পর্কে, এবং তা আবিষ্কৃত হয়েছিল পরীক্ষা ও পরিমাপকে ভিত্তি ক'রে। ওমের নিয়ম হলো তড়িৎ-পরিচালক পদার্থের ভেতর তড়িতের সঞ্চালন সম্পর্কে, আর তার আবিষ্কার হয়েছিল সাদৃশ্যের পথ ধ'রে—তড়িৎ-সঞ্চালন ব্যাপারে সোজাসুজি ফুরিয়ারের তাপ-সঞ্চালনের-নিয়ম প্রয়োগ ক'রে। এখানে ঘটনা-প্রবাহের বিষয় বস্তু ভিন্ন ভিন্ন - একটা হচ্ছে তাপের প্রবাহ, অপরটা তড়িৎ প্রবাহ, এবং উভয় ঘটনার অন্তর্গত পরিবর্ত্তনশীল রাশিগুলিও ভিন্ন—একক্ষেত্রে তাপ ও তজ্জাত উষ্ণতা, অন্যক্ষেত্রে তড়িৎ ও তড়িতের প্রভব। এখানে 'প্রভব' শব্দটাকে আমরা ইংরাজী 'Potential' কথাটার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার কচ্ছি। ওম্ অনুমান করলেন, এই প্রভেদ সত্ত্বেও পরিবর্ত্তনশীল রাশিগু'লর মধ্যে একই আকারের সম্বন্ধ বিদ্যমান। লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতু তাপ এবং তড়িত উভয়েরই পরিচালক। ওম্ ভাবলেন, ওদের ভেতর তাপের প্রবাহ ঘটে যেমন স্থানভেদে উষ্ণতা ভেদের জন্য, তড়িত প্রবাহও ঘটে সেইরূপ স্থানভেদে তাড়িত-প্রভবের মাত্রা-ভেদের জন্য। ফুরিয়ারের নিয়মে বলে যে, তাপ-প্রবাহের মাত্রাটা তাপ-পরিচালক পদার্থের প্রত্যেক স্থানের পক্ষেই সেখানকার উষ্ণতা-প্রবণতার (Temperature gradientএর) সমানুপাতিক। ওম্ বললেন, সুতরাং তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রাটা তড়িৎ-পরিচালক পদার্থের প্রত্যেক স্থানের পক্ষেই, সেখানকার প্রভব-প্রবণতার (Potential gradientএর) সমানুপাতিক। এই উক্তিই ওমের নিয়ম। এখানে 'সুতরাং' শব্দ প্রয়োগের পক্ষে একমাত্র যুক্তি প্রাকৃতিক নিয়মের সার্ব্বভৌমিকতা ও একাত্মতার প্রতি আমাদের অগাধ বিশ্বাস। এ বিশ্বাস, আমরা বলেছি, মানুষের মজ্জাগত; তাই বহুত্বের ভেতর একত্বের প্রতিষ্ঠায় মানবচিত্ত স্বভাবতঃই লালায়িত। এইরূপে সাদৃশ্যের যুক্তি অবলম্বনে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ওমের নিয়ম আবিষ্কৃত হলো। তড়িত-বিজ্ঞানে এই নিয়মের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে এবং এর প্রয়োগ ক্ষেত্রও অত্যন্ত ব্যাপক। দেখা গেছে, কঠিন, তরল বা অনিল, যা'র ভেতরেই তড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হোক, প্রবাহটা সকল ক্ষেত্রেই ওমের নিয়ম মেনে চলে।

আম্পিয়ার, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, চুম্বক ও প্রবহমান তড়িতের ধর্ম্মের মধ্যে বিশিষ্ট ধরনের সাদৃশ্য দেখতে পেলেন। দেখা গেল, তড়িদ্বস্ত একটা তারের কুণ্ডলী—তারটা লোহার হোক, তামার হোক বা অন্য কোন ধাতুর হোক, কিছু আসে যায় না—ঠিক চুম্বকের মতই লোহাকে আকর্ষণ করে। এই ধরনের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে আম্পিয়ার এই মত প্রচার করলেন যে, চুম্বকের চুম্বকত্বটা বিশিষ্ট প্রণালীতে ঘূর্ণমান তড়িৎ-প্রবাহের ফল মাত্র। তিনি আরও বললেন যে, বাইরের কোন পদার্থের ওপর ক্রিয়া সম্পর্কে, একখানা চুম্বক এবং উপযুক্ত মাত্রার তড়িৎ প্রবাহ

সমন্বিত একটা বিশিষ্ট আকারের তারের কুণ্ডলীর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। কি আকারের কতটা শক্তিশালী চুম্বক কোন আকারের কতটা তড়িৎ-প্রবাহের ঠিক সমকক্ষ এ সম্বন্ধেও তিনি একটা নিয়ম প্রচার করলেন। তাড়িত ও চৌম্বক ধর্ম্মের মধ্যে এইরূপ সাদৃশ্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি ক'রেই ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক-শ্রেষ্ঠ ফ্যারাডে (১৭৯১-১৮৬৭ খৃঃ) তাড়িত-চৌম্বক-প্রভবন (Electro magnetic Induction) সম্পর্কীয় তাঁর বিখ্যাত নিয়মের আবিষ্কারে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই আবিষ্কারের ইতিহাস শিক্ষাপ্রদ, সুতরাং আমরা এর একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেবো।

ফ্যারাডে দেখলেন যে, একটা তারের কুণ্ডলীর ভেতর একখণ্ড লৌহ রেখে যদি কুণ্ডলীর বেষ্টনীর ভেতর দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চালিত করা যায় তবে লৌহখণ্ড চুম্বকে পরিণত হয়। ফ্যারাডে ভাবলেন, ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিক্রিয়া রয়েছে। কুণ্ডলী-বেষ্টনকারী তড়িৎপ্রবাহের প্রভাবে যদি ভেতরকার লৌহখণ্ডে চৌম্বক ধর্ম্মের আবির্ভাব হয় তবে একটা চুম্বকের প্রভাবেই বা সন্নিহিত তারের কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি না হবে কেন? ফ্যারাডে নিজের মনে প্রশ্ন করলেন—এই কুণ্ডলীর ভেতর এই লৌহদণ্ডটা রেখে দিয়ে কুণ্ডলীর তারে তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চালিত করলে লোহাটা চৌম্বক-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়; আর কুণ্ডলীকে প্রবাহ-মুক্ত ক'রে ওর ভেতর লোহার বদলে যদি একটা চুম্বক রাখা যায় তা' হ'লে কি হবে? ফ্যারাডের কল্পনা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলো, নিশ্চয়ই কুণ্ডলীতে তড়িৎ-স্রোত বইবে।

ফ্যারাডে পরীক্ষা করলেন। কুণ্ডলীর মধ্যে একখানা চুম্বক রাখলেন, তারপর কুণ্ডলীর প্রান্তদ্বয় তড়িন্মাপক যন্ত্রের (Galvanometerএর) প্রান্তদ্বয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করলেন; কিন্তু ওর কাঁটা একটুও নড়লো না। বোঝা গেল, কুণ্ডলীতে তাড়িৎ-প্রবাহের আবির্ভাব ঘটে নি। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা ক'রেও একই ফল পাওয়া গেল। ফ্যারাডে কুণ্ডলীর ভেতর অধিকতর শক্তিশালী চুম্বক রাখলেন। একখানার বদলে দু'খানা, পাঁচখানা, দশখানা রাখলেন। কিন্তু গ্যাল্‌বানোমিটারের কাঁটা একবারও সাড়া দিল না—চুম্বকের প্রভাব থেকে তড়িতের উৎপত্তি ঘটল না। বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হ'ল কিন্তু প্রত্যাশিত সাড়া পাওয়া গেল না। তবু পরীক্ষার নিবৃত্তি নেই। কি অদ্ভুত অধ্যবসায়, প্রাকৃতিক নিয়মের একাত্মতার প্রতি কি অবিচলিত বিশ্বাস! তারপর অকস্মাৎ একদিন গ্যাল্‌বানোমিটারের কাঁটা নড়ে উঠলো—কুণ্ডলীর বেষ্টনীতে তড়িতের আবির্ভাব ধরা পড়ল। ফলে, চুম্বক থেকে তড়িৎ-প্রবাহের উৎপত্তি প্রমাণিত হ'ল।

আগে কেন প্রবাহের অস্তিত্ব ধরা পড়েনি, এখন কেনই বা ধরা পড়লো তার কারণ আবিষ্কারে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। আর এর থেকে তাড়িত-চৌম্বক-প্রভবনের নিয়ম আবিষ্কারও সহজ হলো। ফ্যারাডে বুঝতে পারলেন, প্রবাহটা উৎপন্ন হয় শুধু নিমেষের জন্য—চুম্বকখানাকে যখন কুণ্ডলীর ভেতর ঢোকানো যায় কিম্বা যখন ওর থেকে বের করে আনা যায়, কেবল সেই দুই মুহূর্ত্তের জন্য; কিন্তু যত বড় শক্তিশালী চুম্বকই হোক, যতক্ষণ তা' স্থিরভাবে কুণ্ডলীর ভেতর অবস্থান করে, ততক্ষণ তা প্রবাহ-সৃজন ব্যাপারে একান্তই শক্তিহীন। এই সত্যটা ফ্যারাডে পূর্ব্বে কল্পনা করতে পারেন নি, তাই কুণ্ডলীর সঙ্গে গ্যাল্‌বানোমিটারের সংযোগ সাধন কার্য্যটা প্রতিবারেই তিনি সম্পন্ন ক'রে আস্‌ছিলেন চুম্বকখানাকে কুণ্ডলীর ভেতর স্থাপন করবার পরে—এক অশুভ মুহূর্ত্তে, যখন চুম্বকটা স্থিরভাবে অবস্থান কর্চ্ছিল, সুতরাং যখন তার অবস্থাটা তাড়িত-প্রভবনের আদৌ অনুকূল ছিল না। প্রবাহের অস্তিত্ব ধরা পড়লো তখনি, যখন অন্যমনস্কতা বশতঃই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, গ্যাল্‌বানোমিটারের সঙ্গে সংযোগটা কুণ্ডলীর ভেতর চুম্বক সংস্থাপনের পূর্ব্বেই সম্পন্ন হয়েছিল এবং ঐ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করবার পক্ষে কোন প্রয়োজন-বোধই তাঁর মনে জাগেনি। তখন দেখা গেল যে, যতক্ষণ চুম্বকখানা কুণ্ডলীর কাছাকাছি হ'তে থাকে বা ওর থেকে দূরে সরতে থাকে ততক্ষণ, এবং কেবল ততক্ষণই, কুণ্ডলীর তারের বেষ্টনীতে প্রবাহ উৎপন্ন হ'য়ে থাকে। আরও দেখা গেল যে, কাছাকাছি হবার সময় প্রবাহটা যে দিকে উৎপন্ন হয়, দূরে সরবার সময় হয় তার উল্টো দিকে এবং উভয় ক্ষেত্রেই প্রবাহের মাত্রা নির্ভর করে কত দ্রুত এগোনো পেছনো কার্য্য সম্পন্ন হচ্ছে তার ওপর। এই আবিষ্কার সম্বন্ধে কোন ইংরাজ কবির উক্তি এইরূপ:

> Around the Magnet Faraday
> Was sure Volta's lightnings play.
> But how to draw them from the wire?
> He took a lesson from the heart, —
> 'Tis when we meet 'tis when we part
> Breaks forth the Electric fire.

"He took a lesson from the heart." চৌম্বক ধর্ম্মের সাথে তাড়িত ধর্ম্মের, তাড়িত-ধর্ম্মের সাথে হৃদয়ের ধর্ম্মের সংযোগ ও সাদৃশ্য উপলব্ধি করার মত মনোবল ফ্যারাডের ছিল। তাই মিলনের উন্মাদনা ও বিরহের অবসাদকে তাড়িত-চৌম্বক-প্রভবনের সমশ্রেণী ভুক্ত করতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কারকের মনে লজ্জা বা কুণ্ঠার আবির্ভাব হয়নি।

পরীক্ষার ফলে যে নিয়ম আবিষ্কৃত হলো তা' ভাষায় প্রকাশ এবং তা'র অর্থ উপলব্ধির জন্য চুম্বকের পারিপার্শ্বিক অবস্থার

(বা চৌম্বক ক্ষেত্রের) চিত্রটাকে মনের ভেতর ফুটিয়ে তুলতে হয়। চৌম্বক-ক্ষেত্রের বিবরণ এইরূপ:

একটা চুম্বকের ওপর একখানা কাগজ রেখে তার ওপর লোহার গুঁড়া ছড়িয়ে দিলে দেখা যায় যে, লৌহচূর্ণগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হ'য়ে বিশিষ্ট আকারের কতকগুলি বক্ররেখাক্রমে চুম্বকখানাকে ঘিরে অবস্থান করে। এইরূপ অসংখ্য রেখা। প্রত্যেক রেখার একপ্রান্ত থাকে চুম্বকের উত্তর ধ্রুবের ওপর এবং অপরপ্রান্ত দক্ষিণ ধ্রুবের ওপর। এ-প্রান্ত হ'তে ও-প্রান্তে যেতে রেখাগুলি মধ্যপথে ছড়িয়ে পড়ে, আবার সবাই জোট বেঁধে অপরপ্রান্তে কেন্দ্রীভূত হ'য়ে থাকে। প্রত্যেক রেখার আকার ধনুকের মত—ছোট বড় ধনুক, কিন্তু সবারই সাধারণ জ্যা হচ্ছে উত্তর ধ্রুব থেকে দক্ষিণ ধ্রুব পর্য্যন্ত চুম্বকের দৈর্ঘ্যটা। কোন রেখাই অপর কোন রেখার সাথে কাটাকাটি করে না। স্পষ্ট বোঝা যায়, এই রেখাগুলি নিছক জ্যামিতিক রেখা নয়। ফ্যারাডের কল্পনা এই যে; প্রত্যেক রেখাই জ্যা-বাঁধা ধনুকের মত একটা টান-পড়া অবস্থা জ্ঞাপন করে; অধিকন্তু এই রেখাগুলি পরস্পরকে বিকর্ষণও করে। তাই চুম্বকের প্রান্তদ্বয় হতে নির্গত হয়ে ওরা পরস্পর থেকে যথাসম্ভব দূরে দূরে থাকতে চায় এবং ফলে, বাইরের আকাশে মুক্ত বেণীর মত ছড়িয়ে পড়ে। এই সকল বল-রেখাকে বলা যায় চৌম্বক-বল-রেখা (Magnetic Lines of Force) বা সংক্ষেপে চৌম্বক-রেখা এবং এদের লীলাভূমি স্বরূপ চতুষ্পার্শ্বস্থ শূন্যদেশকে বলা যায় চৌম্বক-ক্ষেত্র (Magnetic Field)। চুম্বকের ধ্রুবদ্বয় থেকে যতই দূরে সরা যায় চৌম্বক-রেখাগুলি ততই ফাঁক ফাঁক হতে থাকে এবং চৌম্বকক্ষেত্রের তীব্রতাও (Intensity of the Field) ততই—ঐ দূরত্বের বর্গের অনুপাতে—কমতে থাকে। এখানেও বলের মাত্রার সঙ্গে দূরত্বের সম্বন্ধটা মহাকর্ষের নিয়মেরই অনুরূপ এবং এ-ক্ষেত্রেও আকর্ষণ বিকর্ষণ ব্যাপারগুলির মধ্যে কোন দড়াদড়ির সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং এ-ব্যাপারেও আমরা মহাকর্ষের ব্যাপারের সাথে সাদৃশ্যের অস্তিত্ব অনুভব করি। এর প্রকৃত কারণ আজও আমরা জানতে পারি নি, তবে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা-বাদে এর ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা আছে। এ-সম্পর্কে এ কথাটাও মনে রাখার দরকার যে, এই চৌম্বকক্ষেত্র এবং চৌম্বক রেখাগুলির অস্তিত্ব ঐ বিক্ষিপ্ত লৌহচূর্ণগুলির ওপর আদৌ নির্ভর করে না। চূর্ণগুলি ঐ সকল রেখার বিন্যাস প্রণালী দেখিয়ে দেয় মাত্র। লোহার গুঁড়া না ছড়ালেও এবং ছড়ানো গুঁড়া মুছে ফেললেও চৌম্বক-রেখাগুলি ঠিক ঐ ভাবেই চুম্বকখানাকে ঘিরে অবস্থান করে,—যদিও লোকলোচনের অন্তরালে।

আনুষঙ্গিকভাবে আমরা এখানে তাড়িত-ক্ষেত্রেরও উল্লেখ করবো। যেমন চুম্বকের বেলায় সেইরূপ স্থির তড়িতের বেলায়ও আমরা কতকগুলি বল-রেখার সন্ধান পাই। এই সকল রেখাও ফ্যারাডের কল্পনা সম্ভূত। ধন ও ঋণ তড়িৎ বিশিষ্ট দু'টি পদার্থের অন্তর্গত ও চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশটা চৌম্বক-রেখার মতই কতকগুলি বল-রেখার আধারভূমি হয়ে থাকে। এদের বলা যায় তাড়িত-রেখা (Electric Lines of Force) এবং এদের আধারভূমিকে বলা যায় তাড়িৎ-ক্ষেত্র (Electric Field). এদের ধর্ম্ম অবিকল চৌম্বক-রেখা ও চৌম্বক-ক্ষেত্রের অনুরূপ। আকাশে বিদ্যুতের চমকানি ঘটে তাড়িত-রেখাগুলির পথ ধরেই। ওদের দিকে তাকিয়ে তাড়িত-রেখার এবং চৌম্বক-রেখার আকারেরও কতকটা আভাস পাওয়া যায়। তাড়িত ও চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কীয় এইরূপ চিত্রকে সম্বল ক'রেই ফ্যারাডের এবং ম্যাক্স্ওয়েল প্রমুখ পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণের তাড়িত-চৌম্বক-ক্ষেত্র সম্পর্কীয় গবেষণা সফলতা অর্জ্জনে সক্ষম হয়েছে।

বর্ত্তমানে আমাদের প্রয়োজন শুধু চৌম্বক-রেখাগুলির ক্রিয়াপদ্ধতি নিয়ে। অসংখ্য চৌম্বকরেখা ফ্যারাডের চুম্বকখানাকে ঘিরে রয়েছে। অসংখ্য হলেও কেশগুচ্ছের মত গোছায় গোছায় নিয়ে ওদেরকে একটা সসীম সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করা যেতে পারে—ধরা যাক্ দশ হাজার। চুম্বকখানা তারের কুণ্ডলীর বাইরে ও খুব দূরে থাকলে ওর একটা রেখাও (বা একটা গোছাও) কুণ্ডলীর ভেতর ঢুকবার সুযোগ পায় না। ফলে ওর ভেতর চৌম্বক-রেখার সংখ্যাটা বরাবর শূন্যই থেকে যায়। আবার চুম্বকখানা যখন কুণ্ডলীর মধ্যে স্থিরভাবে অবস্থান করে তখন ওর ভেতর চৌম্বক রেখার সংখ্যা দাঁড়ায় পুরোপুরি দশ হাজার। কিন্তু তখনো ভেতরের রেখাগুলির সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। ফ্যারাডের পরীক্ষা থেকে প্রতিপন্ন হল যে, এই দুই অবস্থার কোন অবস্থাতেই কুণ্ডলীর তারে প্রবাহের সঞ্চার হয় না; এবং তা হয়ে থাকে যখন চুম্বকটা কুণ্ডলীর কাছাকাছি হতে থাকে বা ওর থেকে দূরে সরতে থাকে—অর্থাৎ যখন ওর ভেতরে চৌম্বক-রেখার সংখ্যা বাড়তে বা কমতে থাকে। আর দ্রুত এগোনো বা পেছোনোর অর্থ হলো কুণ্ডলীর ভেতরকার চৌম্বক-রেখার সংখ্যার দ্রুত পরিবর্ত্তন সাধন। সুতরাং ফ্যারাডে সাব্যস্ত করলেন যে, কুণ্ডলীতে তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে ওর ভেতরকার চৌম্বক-রেখার সংখ্যা যে-হারে বদলায় তার দ্বারা। ফলে ফ্যারাডে নিম্নোক্ত নিয়ম প্রচার করলেন—যদি কোন কুণ্ডলীর ভেতর চৌম্বক-রেখার সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে তবে কুণ্ডলীতে তড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হয় এবং যে-হারে ঐ সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে প্রবাহের মাত্রাটা তার সমানুপাতিক। এই নিয়মকে তাড়িত-চৌম্বক-প্রভবনের নিয়ম (Law of Electromagnetic Induction) বলা হয়।

আমরা এই নিয়মের আবিষ্কারকে সাদৃশ্যের পদ্ধতির অন্তর্গত করেছি এই জন্য যে, এ-সম্পর্কে প্রাথমিক পরীক্ষাগুলি সম্পন্ন হয়েছিল সাদৃশ্যের পথ ধরে; কিন্তু নিয়মটা পূর্ণরূপ গ্রহণ করতে পেরেছে, আমরা দেখলাম, পরীক্ষা ও পরিমাপের ভেতর দিয়ে। সুতরাং ফ্যারাডের এই আবিষ্কারকে ওমের আবিষ্কারের ঠিক সমশ্রেণীভুক্ত করা যায় না। সেখানে একটা জানা নিয়মকে, ওর চেহারার কোন ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে নূতন সরঞ্জামে সাজানো হয়েছে। এখানে নিয়মের আকারটা জানা নেই, কি আকারের হ'তে পারে সে সম্বন্ধে কোন ধারণাও নেই এবং তা নির্ণীত হতে পেরেছে শুধু পরীক্ষা ও পরিমাপকে বিশেষ অস্ত্ররূপে গ্রহণ ক'রে।

ফ্যারাডের নিয়মের প্রয়োগক্ষেত্র অতি বিস্তীর্ণ। টেলিফোন মাইক্রোফোন থেকে ওয়্যারলেস্ ও রেডিও জাতীয় আধুনিক সভ্যতার বহু যন্ত্রেরই উদ্ভাবন হয়েছে এই নিয়মটাকে আশ্রয় করে। ম্যাগনেটিক ব্যাটারী এবং আধুনিক ডাইনামো যন্ত্রের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। উভয়ই তৈরি হয়েছে এই নিয়মের সোজাসুজি প্রয়োগ দ্বারা। একটা শক্তিশালী ও অশ্বনালাকৃতি চুম্বকের ধ্রুবদ্বয়ের কাছে একটা তারের কুণ্ডলী ঘুরতে থাকে। ফলে কুণ্ডলীর ভেতর যে-সকল চৌম্বক-রেখা প্রবেশ করে তাদের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হতে থাকে। সুতরাং কুণ্ডলীর তারে ক্রমাগত, এবং একবার এদিকে একবার ওদিকে, তাড়িৎ-প্রবাহ-উৎপন্ন হতে থাকে। রেখাগুলির হ্রাসটা বৃদ্ধিতে এবং বৃদ্ধিটা হ্রাসে পরিণত হয় অর্দ্ধ আবর্ত্তনের ব্যবধানে। সুতরাং প্রতি অর্দ্ধ আবর্ত্তনে প্রবাহের দিকটা উল্টে যায়। এইরূপ প্রবাহকে বলা যায় প্রত্যাবর্ত্তী প্রবাহ (Alternating Current বা A.C). সংশোধক বা Commutator যন্ত্রের সহযোগে এই প্রবাহকে আবার একমুখী-প্রবাহে (Direct Current বা D. C.তে) পরিণত করা যায়। কুণ্ডলীর উভয় প্রান্তের সঙ্গে দীর্ঘ তার সংযুক্ত ক'রে এই প্রবাহকে যথেচ্ছ দূরে এবং যথেচ্ছ দিকে চালিত করতে পারা যায়, এবং আনুষঙ্গিক শত শত তারের সাহায্যে প্রবাহটাকে বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত ক'রে ঘরে ঘরে এমনভাবে তাড়িত-শক্তির সরবরাহ করতে পারা যায় যা'তে ক'রে সুইচ্ টেপা মাত্র বিজলীবাতি জ্বলে ওঠে, পাখা ঘোরে, বেল বাজে; তাড়িত্তাপক (Electric Heater) ভাত রান্না করে দেয় এবং এমন কি, অনুগত ভৃত্যের মত ঐ শক্তি বাসন মাজা, কাপড় কাঁচা কাজগুলিও নিমেষে সম্পন্ন করে দিয়ে যায়। বস্তুতঃ বর্ত্তমান যুগ তাড়িত-শক্তিকে মানুষের একান্ত আজ্ঞাবহ ভৃত্যের কার্য্যে নিযুক্ত করেছে এবং ভবিষ্যতে ওর কর্ম্মক্ষেত্রকে আরও বহুগুণে বিস্তৃত করবার আশা রাখে। আর এ-সবারই মূলে রয়েছে উক্ত অতি ক্ষুদ্র নিয়মের আকারে ফ্যারাডের এক বৃহৎ আবিষ্কারের অমর কাহিনী।

এই জন্যই আমরা প্রথমে বলেছি যে, বস্তুবিশেষ বা স্থান বিশেষের তুলনায় প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কারের মূল্য বেশী এবং তাতে গৌরবও বেশী। বস্তু বা স্থান বিশেষের আবিষ্কার সার্থক হয় তখনি যখন আমরা ওদেরকে হিতকর প্রয়োজনে লাগাতে পারি—সুতরাং যখন ওদের ঠিকমত ব্যবহারের নিয়ম আবিষ্কারে সক্ষম হই। আমরা দেখলাম প্রাকৃতিক নিয়ম বলতে এই সকল নিয়মকেই বুঝায়। নিয়ম আবিষ্কার দ্বারা যেমন প্রাকৃত সম্পদের ওপর প্রভুত্বের সুযোগ ঘটে সেইরূপ প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সন্তান ব'লে আমাদের গৌরব করবারও অধিকার জন্মে। কিন্তু এ-কথা ভুললে চলবে না যে, জড়জগৎই বিশ্ব-প্রকৃতির সমগ্র অংশ এবং প্রধান অংশ নয়। মনোরাজ্যের মূল নিয়মগুলি সম্বন্ধে বলতে গেলে, আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যতদিন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঐ সকল নিয়মের আবিষ্কার সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন না হবে এবং যতদিন হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তি সমূহকে দেহধর্ম্মের সাময়িক ও ক্ষুদ্র প্রয়োজনের কাছে মাথা নত ক'রে চলতে হবে ততদিন আমরা উক্ত গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়ে রইবো। হয় ত' মূলে নিয়ম একটি মাত্র এবং অন্যান্য সহস্র নিয়ম তার বিভিন্ন ভঙ্গিমার আংশিক বিকাশ মাত্র। হয় ত' দেহে ও মনে, জড়ে ও চৈতন্যে এমন সকল সম্বন্ধ রয়েছে যে, জড়জগতের নিয়ম সমূহের শুধু ভাষা বদল ক'রে অন্তর্জ্জগতের খাঁটি নিয়ম সমূহের আবিষ্কার সম্ভব হবে। সে-দিন জড়বিজ্ঞানের আলোচনা পূর্ণ সার্থকতা লাভ করবে। কিন্তু সে-দিন লীন হ'য়ে রয়েছে ভবিষ্যতের কোন্ অতলগর্ভে কে জানে? [ক্রমশঃ

শ্রীকুমুদিনীকান্ত কর

(উপন্যাস)

ষোল

"এত কাণ্ডের পরও তিনি কি করলেন জান, দাদা?" নীরবে বাতায়ন-পথে উদ্দেশ্যবিহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া যাহার সম্বন্ধে এত কথা শুনিতেছিলাম তাহারই কথা ভাবিতেছিলাম। হঠাৎ 'দাদা' সম্বোধনে চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম—মীনা যেন অনেকটা নম্র অন্তঃকরণে তাহার অফুরন্ত কথা বলা পুনরায় আবার আরম্ভ করিয়াছে।

"...একটা জায়গায় এসে হঠাৎ পাল্কী থাম্‌ল। তিনি নেমে গেলেন। একটু পরে দেখ্‌লাম ভজুসর্দার তাঁর সঙ্গে দু'চার কথা কি কইবার পর গম্ভীর মুখে ধীরে ধীরে পাল্কার দরজার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "না, মা! হ'ল না। কর্ত্তা শম্ভুকেও সঙ্গে নেবেন না, একাই যাবেন বল্‌ছেন। কি করব, আমি ত' আর কোন উপায় দেখ্‌ছি না, মা... কর্ত্তার মতিগতির কিছুই স্থিরতা নাই। কখন যে তিনি কি করে বসেন আমার ভয় হচ্ছে! সব-কিছুর ভার থাক্‌ল মা, তোমার উপর। এ গোলাম তোমাদের আশে-পাশে পাগল হ'য়ে ঘুরে বেড়াবে তোমরা ফিরে না আসা পর্য্যন্ত। সামান্য প্রয়োজন হলেও আমায় আদেশ জানাবে। ভুলো না মা, খুব সাবধান।..."

"আমাদের একা ছেড়ে দিতে বৃদ্ধের প্রাণ কিছুতেই চাহিল না। আমাদের জন্য ঐকান্তিক স্নেহই তার এ-রকম অস্থিরতার একমাত্র কারণ ব'লে তখন মনে হয়েছিল কিন্তু এখন দেখ্‌ছি তা নয়। তার সূক্ষ্ম ভবিষ্যৎ দৃষ্টির কথা যতই এখন মনে হচ্ছে, ততই অবাক্ হয়ে যাচ্ছি।...আমি তাকে অনেক আশ্বাস দিয়ে বিদায় দিলাম। সে ছল্ ছল্ নেত্রে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে চলে গেল।...হঠাৎ সাম্‌নে চেয়ে দেখি আমার অগ্রজ আস্‌ছেন আমার দিকে; সঙ্গে তিনি। মন আমার আনন্দে নেচে উঠল! এত আনন্দ যে, তা আর প্রকাশ করা যায় না। আমার এই সামান্য মনটুকুতে তা যেন আর ধরছিল না। আমায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সে আনন্দের ধারা। আত্মহারা হয়ে গেলাম! কতকাল!...কতকাল পর আজ আবার দাদাকে দেখ্‌লাম!... সেই সদা-হাস্যময়, স্নেহময়, বীর্য্যবান মূর্ত্তি!—যুগপৎ কত স্মৃতি ছুটে এল মনে—কত স্মৃতি শৈশবের, কৈশোরের, অফুরন্ত তা...ইচ্ছা হচ্ছিল ছুটে যাই দাদার বুকে—কিন্তু তা পারলাম না। সামাজিক শাসন আমায় শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে রাখ্‌ল!..."

"ভাবতে ভাবতে আবিষ্ট হয়েছিলাম...'মীনা;' হঠাৎ আমার নাম ধরে এভাবে ডাকায় চম্‌কে উঠলাম। চেয়ে দেখি আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দাদা হাস্‌ছেন আমার দিকে চেয়ে চেয়ে। ওমা! আমি অবাক হয়ে গেলাম! কখন যে তিনি এসে সাম্‌নে দাঁড়িয়েছেন তা' জান্‌তেও পারি নাই! কি আশ্চর্য্য! অত্যন্ত আনন্দে রুদ্ধশ্বাসে বল্‌লাম, "দাদা এসেছ আমায় নিতে? মা, বাবা কেমন..." তিনি আমায় থামিয়ে দিয়ে বল্‌লেন, "সবাই ভাল আছে, ভেবো না।" ব্যস্ত হয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিতে উঠতে যাচ্ছিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ বারণ করে বল্‌লেন, "থাক্ এখন, মানু!" দূর থেকেই করজোড়ে তাঁকে প্রণাম জানালাম বটে, কিন্তু মোটেই আমার তৃপ্তি হ'ল না।

"মীনু!—দাদা হঠাৎ আমায় সম্বোধন করে বল্‌লেন, "মীনু! যাবি, সেই আগের মত? চল্ না একসঙ্গে এখান থেকেই? তোর ত' অভ্যাসই ছিল?"

"ভাল বুঝতে না পেরে বড় উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "কিসের জন্য বলছ দাদা?"

"তিনি হেসে বল্‌লেন, "এতক্ষণ লাগছে তোর এ কথাটা বুঝতে? চল্ এখান থেকে আমরা তিনজন ঘোড়ায় যাই। লোকজন সব পরে আসুক। কি বলিস্?"

"বুঝতে পার্‌ছিলাম কার এ কার্‌সাজি। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কোন জবাবই এল না মুখে। প্রস্তাবটা শোনামাত্র একটা অপূর্ব্ব আনন্দে মনটা এমন ক'রে তরঙ্গায়িত হতে লাগল যে, আমার সব এলোমেলো হয়ে গেল। স্বামীর আকাঙ্ক্ষা, অগ্রজের ইচ্ছা এবং তাতে আমার প্রাণের স্বাভাবিক সত্তা, এ সবগুলিই এমন অদম্য বেগ সঞ্চয় কর্‌ল আমার অন্তরে যে আমি একেবারে অস্থির হ'য়ে উঠলাম। ইচ্ছা হ'তে লাগল তখন টপ ক'রে ঘোড়ায় চ'ড়ে বসি; ছুটে যাই তাড়িদ্‌গতিতে ধরিত্রীর বুক দ'লে বায়ুপথ ভেদ ক'রে; আনন্দে ভেসে যাই তার সঙ্গে—যে আমার জীবনের সাথী—আমার সর্ব্বস্ব; মিশে যাই হাওয়ায় উল্লাসে তার সঙ্গে যে আমার শৈশবের সাথী, শৈশবের গুরু, যার দর্শনমাত্র, একটী কথা শোনা মাত্র আমার শৈশবের লুপ্ত স্মৃতি আবার মধুময় হ'য়ে ফিরে এসেছিল আমার মনে। কিন্তু নিগড়ে বাঁধা হাত-পা আমার—মনের সে আকাঙ্ক্ষা মনেই চেপে রাখতে গিয়ে অন্তরটাকে বড় নিষ্ঠুর ভাবে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেল্‌লাম..."

"কেন?" হঠাৎ আমার মুখ দিয়া এ প্রশ্ন বাহির হইল।

মীনা সবিস্ময়ে আমার প্রশ্নের দ্বিরুক্তি করিল, "কেন?" পরে প্রশ্নের উত্তর করিল, "সমাজের রীতি-নীতি, দেশাচার আমায় শৃঙ্খলে বেঁধে রাখল।"

একটু বিরক্তির সহিত কঠিন ভাবেই বলিলাম, "তোমার মনের সত্যানুভূতির চেয়েও বড় হল তোমার এ মিথ্যার ভান ?"

মীনা এতটুকুও বিক্ষুব্ধ না হইয়া সহজ ভাবে বলিল, "দেশের অবস্থানুযায়ী সমাজের রীতি, নীতি, নিয়ম গড়ে উঠে; কারুর বিশেষ কোন চেষ্টা ছাড়াও তা আপনা-আপনিই হয়ে যায়। সেই নিয়ম-বদ্ধ সমাজে নারীর স্থান নির্দ্দিষ্ট। নারী যদি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তবে সব বিশৃঙ্খলা হয়ে যাবে দেশময়। তার ফল নারীর উচ্ছৃঙ্খলতা। তার ফল অনিবার্য্য ধ্বংস। জান ত, দাদা! আজও তোমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ নারীই রক্ষা করছে ?"

"কোন নিয়মই চিরন্তন থাকতে পারে না।"

"নিশ্চয় না।"

"প্রয়োজন বোধ করলেও কি নিয়ম কেউ ভঙ্গ করবে না ?"

"নিশ্চয় করবে। তবে সময়ের অপেক্ষা করতে হবে।"

"আর কবে ?" আমার কণ্ঠে যেন হতাশার সুর বাজিয়া উঠিল। কিন্তু মীনা তেমনি সহজ কণ্ঠেই বলিল, "আর বেশী দেরী নাই। সময় হয়ে এসেছে !"

"তুমি কেন পথ দেখালে না ?"

"তখন তার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু একবার গুরুতর প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছিল। তখন আমি শৃঙ্খল দূরে ফেলে দিতে ভ্রূক্ষেপ করি নাই।"

আমি বিস্ময়ে নীরবে তাহার দিকে চাহিয়া ভাবিলাম, সে এ কিসের ইঙ্গিত করিতেছে।

সে বলিতে লাগিল,..."আমি মৃদু হেসে দাদাকে বললাম, 'তুমিও বুঝি দলে যোগ দিলে, দাদা ? কিন্তু তা কি ক'রে হয় ? তুমি কি আর এ সহজ কথাটা বুঝতে পারছ না ? ইচ্ছা হলেইত আর সব কিছু করা যায় না এখন ?—কথাটা তিনি কিছুতেই বুঝতে চান না।"

"দাদা আর এ-কথার প্রত্যুত্তর না ক'রে আমায় নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—"

"লোকজন সঙ্গে যাবে না তোদের ?"

"আমি মাথা নীচু ক'রে বললাম, "না।"

"কেউ না ?"

"না।"

"কেন ?"

"তাঁর ইচ্ছা।" হঠাৎ মাথা তুলে দেখতে পেলাম, দাদা মুচকে হাসছেন। তাঁর হাসি আমার ভাল লাগল না। জোর ক'রে বললাম,—রাস্তায় ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বহুলোকজন রয়েছে। কিন্তু তিনি বোঝেন না কাউকে। তাঁর ইচ্ছা।" কিন্তু তবুও সেই হাসি। মনে হইল, এ-কি বিদ্রূপ ? রাগে যেন আমার গা জ্বলতে লাগল। তিনি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দাদা তাঁর দিকে ফিরে বললেন, "থাকগে, হীরু ! ওর আর দরকার নাই। উঠে পড় তুমি পাল্কীতে।"

"ধ্যাৎ যত সব—" ব'লে তিনি বিরক্তি প্রকাশ ক'রে পাল্কীতে উঠে বসলেন।

তাঁর দিকে চেয়ে হেসে হেসে বললাম, "আবার বুঝি দাদাকে দিয়ে চেষ্টায় ছিলে রাস্তায় আর একটা কাণ্ড বাধাতে ?"

বিরক্তি তখনো তাঁর যায় নাই। বললেন, "হাঁ...বয়ে গেছে আমার কাণ্ড বাধাতে...যেমন বোন্ তেমন ভাই, মিলেছে ভাল, যত সব—"

"আমি ধীরে ধীরে তাঁর একখানি হাত আমার উভয় হাতের মধ্যে রেখে অঙ্গুলিগুলি নিয়ে খেলতে খেলতে মুখের দিকে চেয়ে হেসে হেসে বললাম, "এসে কিন্তু পড়েছি এবার—" তিনিও হেসে উঠে আমায় আদর করতে লাগলেন। অদ্ভুত মানুষ !"

"গৃহের সন্নিকটবর্ত্তী হইচ্ছিলাম। আমার চিরপরিচিত শৈশবের নিত্য সঙ্গী, পথ, ঘাট, মাঠ, গাছপালাগুলি যেন নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় বাহুপ্রসারণ করে তাদের নগ্নবুকে আমাকে ধারণ করবার জন্য অপেক্ষা করছিল। তাদের আকুল আহ্বান যেন শুনতে পাচ্ছিলাম। কি যেন জেগে উঠছিল ধীরে ধীরে আমার সারা অন্তর মন্থন ক'রে। কি তা ? বিস্মৃত ইতিহাস ? কিসের এমন অপূর্ব্ব শিহরণ আমার অন্তরময় ! আনন্দ ? তাই বুঝি ! কি অপূর্ব্ব ! সে আনন্দ অতুল ! আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠছিলাম। থেকে থেকে সর্ব্বাঙ্গ যেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠছিল ! আনন্দের উচ্ছ্বাসে আমার অন্তর-বাহির বোধ হয় এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল যে, তাঁরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল এদিকে। আনন্দ বোধ হয় সংক্রামক। তিনি আনন্দে আমায় জড়িয়ে ধরে বললেন, "মীনা ! মীনা ! এত আনন্দ হচ্ছে তোমার ?" আমি ভেসে গেলাম আনন্দের স্রোতে। বলে উঠলাম, "ওই যে দেখছ ত্রিতল অট্টালিকা, দেবদারুর উচ্চশিরও অতিক্রম করে উঠেছে আকাশ চুম্বন করবে বলে, অযত্নে মলিন, দারিদ্র্যের চিহ্নাঙ্কিত, ওই আমার পিতৃগৃহ। এই গৃহেরই এক নিভৃত কক্ষে জননীর গর্ভ থেকে নূতন অতিথিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলাম এই পৃথিবীতে। আমার জীবনের প্রভাত এখানেই পরম সুখে কেটেছিল। এই গৃহেরই অণু-পরমাণুতে আমার শৈশবের স্মৃতি জড়িত। আমি এরই সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ, আজ কতকাল পরে যাচ্ছি মায়ের বুকে ফিরে, সেই একদিন আর আজ একদিন, মা আজ ওই অন্তঃপুরের দ্বারে অপেক্ষা করছেন আমায় বুকে ধরবেন বলে, কত ছটফট করছেন দেরী হচ্ছে মনে ক'রে... কতকাল—কতকাল পর আজ পাব তাঁকে, আঃ ওই দ্যাখ, দ্যাখ, ওই যে ওই দেখা যাচ্ছে বেল, বকুল, নিম, তমাল,

নারিকেল, সুপারি, আম্র, পনস কুঞ্জে ঘেরা আমার রাধা-মাধবের মন্দিরের চূড়া! শুভ্র মন্দিরের মাথায় আমার পিতৃকুলের আদিম পুরুষের দেওয়া সোনার চূড়া—নারায়ণ-চক্র! পড়ন্ত রৌদ্রের ছটায় সুবর্ণময় নারায়ণ-চক্র যেন জ্বলে জ্বলে উঠছে! যেন দিব্যজ্যোতি! কি সুন্দর! কি সুন্দর! ছাখ, ছাখ,একবার ছাখ! একবার চেয়ে ওই মন্দিরে আমার প্রাণের দেবতা—আমার রাধা-মাধব···" অতি আনন্দে যেন অবসন্ন হয়ে ঢলে পড়লাম তাঁর বুকে, তিনি আমায় বুকে চেপে রেখে অধীর হয়ে ডাকলেন, "মীনা! মীনা!" মানুষের কণ্ঠস্বর একটু আধটু কর্ণপটহে আঘাত করছিল মাত্র, কিন্তু আমার অন্তরে প্রবেশ করছিল না। আমার মন যেন তখন লীন হয়েছিল রাধা-মাধবের ধ্যানে। আমার অন্তরে তখন কেবল ধ্বনিত হচ্ছিল—রাধা-মাধব! এসেছি, আমি এসেছি, কতকাল—কতকাল তোমায় দেখি নি দেব! কতকাল তোমার ঐ অনিন্দ্য-সুন্দর কণ্ঠে বকুলের মালা পরাই নি, যুঁই, কামিনী, বেলিতে তোমার চরণ পূজা করি নি! রাধামাধব! রাধামাধব! আমি এসেছি, আবার—আবার এসেছি তোমার চরণতলে! উঃ কতকাল—কতকাল পরে আজ!"

"আমার ললাটের উপর মুখ রেখে তিনি বললেন, "চল, মীনু! আমরা তবে আগে রাধামাধবের মন্দিরেই যাই···" আমি এক হাত তাঁর মুখের উপর রেখে তাঁর কথা বন্ধ ক'রে দিলাম। আমার তখন একমাত্র বাসনা তাঁর বুকে মাথা রেখে রাধামাধবের কথা ভাবি, আর কিছু না।"

মীনা বলিতে বলিতে হঠাৎ স্তিমিত নেত্রে নীরব হইল। তাহার কথা শুনিতে শুনিতে মনে হইতেছিল যেন কোন সুদক্ষ অভিনেত্রীর অভিনয় শুনিতেছি। কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই সে ভ্রম দূর হইল। মীনা এতক্ষণ যাহা বলিতেছিল তাহা যেন সত্য সত্যই অনুভব করিতেছিল, অভিনয় নয়, যেন প্রত্যক্ষ করিতেছিল।

একটু পরেই সে বলিতে আরম্ভ করিল, "তিনি জানতেন না যে সর্বাগ্রে মন্দিরে গিয়ে রাধামাধবের চরণ পূজা করাই আমার পিতৃকুলের প্রথা। কাউকেও কোনরূপ নির্দেশ না করা সত্ত্বেও আমরা মন্দির-প্রাঙ্গণে নীত হলাম। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। মন্দিরে, প্রাঙ্গণে, পথে বহু বাতি জ্বলছে। বহুলোক সেখানে জমা হয়েছিল। পিতাও ছিলেন তার মধ্যে। দাদা এসে তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি যখন সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে রত, তখন একটী স্ত্রীলোক ধীরে ধীরে পাল্কীর দরজার সামনে এসে হঠাৎ ডাকল, "রাণী-মা!"

"আমি চমকে তাকালাম তার দিকে। আঁধারে তার অবগুণ্ঠিত মুখ দেখতে পেলাম না। বিস্ময়ে নীরব হয়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। পুনরায় সে ডাকল, "রাণী-মা।"

এবার প্রশ্ন করলাম, "কে তুমি?"

আমার প্রশ্নের উত্তর না ক'রে সে বললে, "এই নিন্, ধরুন, হাত বাড়ান···"

"আমার বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। তার কথামত হাত বাড়াতেই হাতে একটা থলে ঠেকল। সে তা আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে বলল, "এতে মোহর আছে—"

"আমি সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, "মোহর—"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"কেন?"

"এখানে প্রণামী প্রভৃতি ব্যয়ের জন্য।"

"কিন্তু কে পাঠিয়েছে এ-সব?"

"বলবার আদেশ নাই। কিন্তু অর্থ আপনাদেরই।"

"আমাদের?"

"হাঁ,—বিলাসপুরের।"

"কিন্তু তুমি কে? এ-সব না বললে আমি এ-অর্থ নেব না।"

"আমি আপনাদেরই একজন সেবিকা। এর বেশী কিছু বলতে পারব না। আদেশ নাই। এ-অর্থ গ্রহণ না করলে আপনি শ্বশুরকুলের মর্যাদাহানির কারণ হবেন।"

"মোহরের থলে সমেত আমার হাত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হয়ে এল। বিলাসপুরের কোন কিছুর অমর্যাদার কারণ হওয়া আমার পক্ষে যে অসম্ভব। তৎক্ষণাৎ তাকে বললাম, "আমি গ্রহণ করলাম। কর্তাকে একবার ডেকে দাও।"

"দিচ্ছি! আমার অপরাধ নেবেন না—প্রণাম।" বলে সে দ্রুতবেগে চলে গেল। আমি তার উপর তীক্ষ্নদৃষ্টি রাখলাম। দেখলাম একটা লোককে মুহূর্ত্তে কি বলে সে দ্রুতগতি অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, কিছুতেই তার মুখ দেখতে পেলাম না! তার মুখ থেকে অবগুণ্ঠন কখনো এতটুকুও অপসারিত হ'ল না।

"তাড়াতাড়ি থলে থেকে কিছু মোহর বের ক'রে নিজের কাছে রেখে দিলাম। এর মধ্যেই তিনি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "ডেকেছ?'

"বললাম, "হাঁ—একটা মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছিল আমাদের।"

"কি?"

"টাকা এনেছিলে সঙ্গে কিছু?"

"টাকা! কেন? টাকা দিয়ে কি হবে?"

"কি বলছ তুমি? টাকার ত' এখনি দরকার হবে—বিগ্রহ প্রণাম করতে হবে, তারপর কুল-পুরোহিত রয়েছেন, বাবা, মা, আরো কত আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব—সব তাতেই প্রণামী দিতে হয়।"

"ঠাকুর-দেবতা বা গুরুজনকে প্রণাম করা—সে ত অন্তরের ভক্তির কথা, তাতে টাকার সম্বন্ধ কি? ও সব আমার দ্বারা হবে না।'

"আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বল্‌লাম, 'তা না করলে যে হয় না···'

"'খুব হয়—"

"'সমাজে থেকে সমাজের রীতি, লোকাচার, দেশ প্রথা কি উপেক্ষা করা যায়?'"

"'কিন্তু তা ব'লে এই জঘন্য প্রথার পরিপোষক আমি কিছুতেই হব না।'

"ভয় হচ্ছিল কথাটা এখনি হয় ত জানাজানি হয়ে যাবে। তখন যে লজ্জার অবধি থাকবে না? কিন্তু কি করি? আর উপায়ান্তর না দেখে আমি যেন মরিয়া হয়ে উঠলাম। বল্‌লাম, 'তবে কি তুমি তোমার কুলের অমর্য্যাদার কারণ হবে? যাঁর বংশধর তুমি তাঁর নামে কলঙ্কের ছাপ দেবে? তাঁর অপমান করবে, তোমার সামান্য একটা মতামতের জন্য? আমি প্রাণ থাকতে কিছুতেই তা হতে দেব না···'

"ক্ষণেক থম্ ধ'রে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি বল্‌লেন, 'কোথা সে-টা? দাও—যত সব'···"

"থলেটা তাঁর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। তোমায় কথাটা বলতে যতটা সময় লাগল, দাদা! তার চেয়ে অনেক কম সময়ে এত সব কাণ্ড হয়ে গেল।

সতের

"মন্দিরে গিয়ে রাধা-মাধবকে প্রাণভরে দেখতে দেখতে যুক্ত করে গলবস্ত্রে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে উদ্যত হয়েছি, এমন সময় পেছন থেকে কে ডাকল, 'মীনা!'

"বহুদিনের বিস্মৃতপ্রায় কণ্ঠস্বর! চমকে ফিরে, চেয়ে দেখলাম মাধবী—আমার শৈশব-সঙ্গিনী। বর্ত্তমান ভুলে 'মাধবী' ব'লে ডেকে ছুটে গিয়ে পড়লাম তার বুকে, তার প্রসারিত বাহুর মধ্যে। উভয়ে উভয়কে বুকে চেপে ধরে মুখ কাঁধের উপর রেখে নীরবে চ'খ বুজে পড়েছিলাম অনেকক্ষণ; হৃদয়ের স্পন্দনে যেন বহুদিনের সঞ্চিত অন্তরের গোপন কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। আনন্দের অশ্রু নিমীলিত চ'খ থেকে গণ্ড বেয়ে গ'ড়িয়ে পড়'ছিল আমাদের বুকে। রুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লাম, 'মনে আছে মাধু! এখনো সব?' সেও তেম্‌নি উত্তর করল, 'হাঁ, মীনু! সব—তোকে যে আর দেখব সে আশা ছিল না।' 'না, মাধু! সব তাঁর কৃপা! বড় আনন্দ হচ্ছে আজ আমার—'

"মাধবী ধীরে ধীরে তার কোমল অঙ্গুলিতে আমার চিবুক ধরে বল্‌ল, 'ওঠ, ওঠ, মীনু! আগে রাধামাধব—'

"'হাঁ, হাঁ, তাই ত, মাধু! চল্', ব'লে তাকে আলিঙ্গনচ্যুত করলাম। সে মৃদু মৃদু হেসে বল্‌ল, 'বল্ ত মীনু! কি এনেছি তোর জন্য? আমিও তেম্‌নি হেসে বল্‌লাম, 'কি এনেছিস রে, মাধু! দেখি?'

"মাধবী তৎক্ষণাৎ মেঝে থেকে কলাপাতায় মোড়া একটা জিনিষ হাতে তুলে নিয়ে বল্‌লে, 'এই ত্যাখ—'

"পাতার আবরণটা তুলে বিস্মিত হয়ে দেখলাম, দু'গাছা সুন্দর মোটা বকুলের মালা। একটু বাতাসেই তার গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মনটা যারপরনাই প্রফুল্ল হয়ে উঠল। আনন্দে তাকে বল্‌লাম, 'কি সুন্দর মালা!' সে হাসল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুই গেঁথেছিস এ মালা, মাধু?'

"হাঁ—তুই আসবি শুনে এত আনন্দ হল যে সারাদিন পাগলের ন্যায় ঘুরে বেড়ালাম। কি করলে তুই সুখী হবি ভেবে ভেবে ছটফট করতে লাগলাম। হঠাৎ মনে পড়ল, রাধামাধবকে তুই নিত্য মালা পরা'তে ভালবাস্‌তিস। বিকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি বকুলতলায় ফুল কুড়িয়েছি—কোন্ বকুল গাছটা জানিস? সেই যে যার তলায় তুই আর আমি সকাল-সন্ধ্যায় ফুল কুড়াতে কুড়াতে কত গান ক'রেছি আর মালা গেঁথেছি···বকুল গাছটা আজও সেই তেম্‌নিই আছে। ওখানে গেলে কেমন যেন লাগে, চারদিক কেমন শূন্য শূন্য অম্‌নি মনে হয়, তুই ত নাই···কেমন যেন হয়ে যায় মনটা··· চোখ জ্বালা ক'রে অম্‌নি জল ছুটে আসে··গোপনে অঞ্চলে চোখের জল মুছতে গেলে আরো জোরে তা বেরুতে থাকে··· বুকটা কেমন জ্বালা করতে থাকে··ছুটে তখন পালিয়ে যাই··· আর যেতে ইচ্ছা হয় না সেই বকুলতলার দিকে···রাধামাধবের গলায় পরিয়ে সুখী হবি বলে এই মালা গেঁথে এনেছি।··· সুখী হয়েছিস মীনু?'

"প্রাণ খুলে বল্‌লাম, 'হাঁ, মাধু! যারপরনাই! এর চেয়ে আনন্দ যে আর আমি কল্পনাও করতে পারি না?'

"মুখখানা তার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, চ'খ দুটী ছল্ ছল্ করতে লাগল। মালা একটা হাতে তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে বল্‌লাম, 'কি সুন্দর! কি সুন্দর এ মালা, মাধু!··তুই যেমন পবিত্র, তোর মন-প্রাণ দিয়ে গাঁথা এই মালাও তেম্‌নি! আমরা দু'জন রাধামাধবের গলায় মালা পরা'তাম, মনে আছে, তোর তা, মাধু?"

"গ্রীবা দুলিয়ে সে বলল, 'হাঁ—'

"'আয় মাধু! আজও আমরা তেম্‌নি ক'রে মালা পরিয়ে দিই—"

ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে দেবতার দিকে অগ্রসর হলাম। পা টলছিল। যুক্ত কর প্রসারিত ছিল সম্মুখে দেবতার দিকে; তা'তে ঝুলছিল মালা। দৃষ্টি স্থির হয়ে ছিল দেবতার শ্রীমুখে। অন্তরে অবিরাম সঙ্গীত হচ্ছিল—জয়তি জয়তি রাধামাধবো জয়তি। জয়তি জয়তি জয় জয় মাধব!— দেবতার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে অপলক দৃষ্টিতে

চেয়ে চেয়ে ব'লে উঠলাম, 'মাধু! ভাখ ভাখ চেয়ে, কি সুন্দর! চারদিকে যা দেখছি তারই পরিবর্ত্তন হয়েছে। কিন্তু রাধামাধব আমার সেই তেমনিই আছেন! মুখে সেই মধুর হাসি!—সেই জগত-ভুলানো, জ্বালা-জুড়ানো, মন-কেড়ে নেওয়া শান্তিময় অফুরন্ত হাসি! দক্ষিণ হস্তে সেই ইঙ্গিত!—"

"তদ্গত-চিত্ত মাধবী যেন স্বপ্নের আবেশে জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কোন্ ইঙ্গিত, মীনা?"

"'অভয়'—"

"'সত্যি সত্যি মীনা, রাধামাধবের দর্শনমাত্র মন থেকে ভয় দূর হ'য়ে যায়, মনে অসীম শক্তির আবির্ভাব হয়'!"

"আমরা উভয়ে পাশাপাশি দেবতার অভয় পদে প্রণতা হলাম। পরে উঠে দাঁড়িয়ে পর পর দেবতার গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে পুনরায় প্রণতা হলাম। যুক্তকরে জানু পেতে ব'সে উর্দ্ধ দিকে দেবতার দিকে চেয়ে থেকে থেকে বল্লাম, 'মাধু! দেবতার বুকে থেকে মালা দুলে দুলে হাস্‌ছে। মনে হচ্ছে ওরা যেন নিজের স্থান খুঁজে পেয়েছে'—"

"মাধবী গদ্‌গদ চিত্তে ব'লে উঠল, 'হাঁ, মীনা! আমার মালা গাঁথা সার্থক আজ'!"

"চেয়ে দেখলাম তার অশ্রু ভরা নয়ন পলকহীন দৃষ্টিতে দেবতাকে নিরীক্ষণ করছে। আমারও বুঝি তাই হয়েছিল। হঠাৎ ফোঁটা ফোঁটা তপ্ত অশ্রু আমার বুকের উপর ঝরে পড়ল। একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চম্‌কে চেয়ে দেখলাম মাধবী উঠে দাঁড়িয়েছে। সে বল্‌ল, 'চল্ যাই, মীনু'?"

"ফিরে চল্লাম। একটু দূরে স্বামী দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর নিকটবর্ত্তী হ'তেই মাধবী পেছন থেকে বল্লে, 'দাঁড়া একটু মীনু?' সে তাড়াতাড়ি তার বস্ত্রাঞ্চল থেকে কি একটা খুলছিল। অবাক হয়ে চেয়েছিলাম সেদিকে। একটা সুন্দর ফুলের মালা বের করে বল্ল, 'এই নে, ধর্, মীনু।' আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না! মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় তার আদেশমত হাত বাড়িয়ে মালাগাছটি গ্রহণ করলাম। তার আনন্দোজ্জ্বল চোখ দু'টী আমার উপর রেখে গম্ভীর কণ্ঠে সে বল্‌ল, 'মীনা! সম্মুখে তোর সাক্ষাৎ দেবতা। এই পুষ্পাঞ্জলি তাঁর পায়ে দে'!..."

"হাতে মালা নিয়ে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে থেকে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সেদিন সত্যি সত্যি স্বামীকে দেবতা বলে জ্ঞান হয়েছিল! আমার অন্তর, আমার সর্ব্বাঙ্গ কি জানি কিসের তাড়নায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল। কম্পিত হস্তে মালাও কাঁপছিল। তাঁকে দেখছিলাম প্রাণ ভরে'। কিন্তু সে-মূর্ত্তি নীরব, নিস্পন্দ, গম্ভীর, ভাবমগ্ন, যেন জ্যোতির্ম্ময়! তাঁর পলকহীন দৃষ্টি স্থির হয়েছিল আমার উপর। সে-দৃষ্টিতে যেন অন্তর্নিহিত ছিল তাঁর সমগ্র মন-প্রাণ! অমন মূর্ত্তি আর কখনো দেখি নি তাঁর!...

"মাধবী বলে উঠ্‌ল, 'মীনা! মীনা! পায় পায়, দেবতার পায়—"

"বৃদ্ধ পুরোহিত বলে উঠলেন, 'হাঁ মা, স্বামী ইহকাল পরকালের দেবতা—"

"সাক্ষাৎ দেবতার পায় অঞ্জলি দিলাম। পরে বৃদ্ধ পুরোহিতের পায় প্রণতা হ'তেই তিনি প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করলেন। মাধবী ব্যস্ত হ'য়ে বল্ল, 'মীনু! চল্ এবার, আর দেরী করিস্ নি। ওদিকে তোর মা কিন্তু তোদের জন্য পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করছেন'।

"আমি যাবার জন্য যারপরনাই ব্যস্ত হ'য়ে স্বামীর দিকে তাকালাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তখনো তিনি সেই একই ভাবে আমার দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন। মনে হচ্ছিল সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে কেবল আমায় দেখছেন, জগতের আর সব যেন ভুলে গেছেন। ইচ্ছা হচ্ছিল তাঁকে বুকে নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোথাও চলে যাই। এমন সময় দাদা ডাক্‌লেন, 'হীরু! চল এবার?'

"স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে একবার এদিক ওদিক, চেয়ে বল্লেন, 'অ্যা! হ্যা—এই হ'ল, আর একটু দাঁড়ান।' তাড়াতাড়ি বিগ্রহ এবং পুরোহিতকে প্রণামী দিয়ে প্রণাম ক'রে বল্লেন, 'চলুন—'

"আমরা মন্দির ত্যাগ করলাম।

"মন্দিরে ছিলাম আমরা এ কয় জন—আমি, মাধবী, তিনি, পুরোহিত এবং দ্বারের কাছে দাদা। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, আমরা তাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হ'য়েছিলাম! আমি মাধবী আর রাধামাধব ভিন্ন জগত আমাদের নিকট শূন্য হয়ে গিয়েছিল। যে-ভাবে আবিষ্ট হয়েছিলাম তার এক কণাও আজ প্রকাশ ক'রে বলা অসম্ভব। কথায় যে তা প্রকাশ করা যায় না, দাদা! আজ কা'রো হয় ত বিশ্বাস হবে না, কিন্তু আমাদের যে তা-ই হয়েছিল!"

মীনা বলিতে বলিতে হঠাৎ চক্ষু মুদিয়া নীরব হইল। তাহাকে দেখিয়া মনে হইল, ঘটনাগুলি যেন দৃশ্য-পটের ন্যায় পর পর তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে। সে ভাবে আবিষ্ট হইয়া নিস্পন্দ দেহে উপবিষ্ট রহিল। তাহাকে ডাকিয়া বা কোন কথা কহিয়া তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে আমার সাহস হইল না।

দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে চোখ মেলিয়া চাহিয়া সে বড় মর্ম্মস্পর্শী কয়টি কথা বলিল, "কেমন যেন হ'য়ে যাই সময় সময়! নিজেকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলি! জগৎ যেন শূন্য হ'য়ে যায়, আমার মন ও চোখের কাছে!"

"মন্দির থেকে আমাদের বাড়ী সামান্য একটু দূরে। কিন্তু এই সামান্য রাস্তাটুকুও হেঁটে যাওয়ার সাধ্য ছিল না। কারণ, তাতে আমাদের বংশের অমর্য্যাদা। সুতরাং আমাদের

পাল্কীতেই যেতে হ'ল। রাস্তার দু'ধারে লোকে লোকারণ্য। তাদের ফাঁকে ফাঁকে বরকন্দাজেরা প্রকাণ্ড মশাল হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। চারদিকে এত আলো হ'য়েছিল, যে দিন ব'লে মনে হচ্ছিল। বিলাসপুরের রাজা এবং কৈলাসপুরের জামাতা যিনি, তাঁকে দেখ্‌বার জন্য যারপরনাই একটা ব্যস্ততা লক্ষ্য ক'রেছিলাম। চারদিকে এত জন-কোলাহল, বাদ্যের শব্দ, ব্যস্ততা এবং হুড়াহুড়ির মধ্যে আমরা পাল্কীতে অনেকটা শান্তিতে ছিলাম। তবুও আমি নিঃশব্দে পাল্কীর দরজাটা আর একটু টেনে দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। তাঁর দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম, তিনি গম্ভীর। তাঁর সে ভাব যেন তখনো যায় নাই। তাঁর পলকহীন দৃষ্টি তখনো আমার চোখ-মুখের উপর তেমনি ভাবে নিবদ্ধ। সে দৃষ্টিতে তীব্রতা বা নিষ্ঠুরতা ছিল না, কিন্তু ছিল তাতে গভীর প্রেমের আভাস, অফুরন্ত প্রেমের মোহিনী শক্তির অদম্য আকর্ষণ, স্নেহ, স্নিগ্ধতা। সে দৃষ্টি আমার অন্তর মোহিত কর্‌ছিল। আমার প্রেমাকুল প্রাণ নিজ সত্তা হারিয়ে কেবল তাঁর দিকে আকর্ষিত হচ্ছিল। কণ্ঠ আমার শব্দ-শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত, স্পন্দিত, যেন তড়িৎ-প্রবাহে থেকে থেকে ঝঙ্কৃত হচ্ছিল। গভীর, প্রেমাকুল স্নেহাকাঙ্ক্ষী দুর্ব্বল দৃষ্টি আমার তাঁর দৃষ্টির নিকট থেকে থেকে নত হ'য়ে পড়্‌ছিল। দিনের আলোয় মুসড়ে-পড়া ফুলের ন্যায় আমি যেন মুসড়ে ঢলে প'ড়লাম তাঁর বুকে···আঃ! কত শান্তি সে বুকে!···চোখ মুদে এল! কিন্তু আমি যেন হঠাৎ অন্তর্দৃষ্টি পেলাম। তাঁর মন, প্রাণ, ভাব, স্নেহ, ভালবাসা—এক কথায় তাঁর অন্তর, তাঁর মূর্ত্তি, তাঁর দৃষ্টি সবই আমার চোখের সাম্‌নে জ্বল্ জ্বল্ ক'রে যেন ভাস্‌তে লাগল। পড়ে থাক্‌লাম রুদ্ধশ্বাসে স্পন্দহীন হ'য়ে সে বুকে! ···ভয় হচ্ছিল কেউ যদি আমার সে সুখ, সে শান্তি ভেঙ্গে দেয়!···

"···হঠাৎ আমার নাম ধ'রে ডাক শুনে চম্‌কে উঠলাম। চেয়ে দেখলাম প্রায় আমার মুখের উপর তাঁর মুখ নত হ'য়ে পড়েছে। তাঁর সেই আকুল স্নেহময় দৃষ্টি পলকহীন হ'য়ে স্থির হ'য়ে আছে আমার মুখের উপর। অন্তর তাঁর ভাবে ভরা। কিন্তু কণ্ঠ মূক। ভাব ভাষা না পেয়ে তাঁর অন্তরকে যেন উদ্বেলিত ক'রে তুলেছিল। ভাবলাম একটু আগে আমারও এই দশাই হয়েছিল। নীরবে কম্পিত অন্তরে, পিপাসিত প্রাণে তাঁরই বুকে থেকে তাঁর মুখের দিকে অপলক নয়নে শুধু চেয়ে থাক্‌লাম। ধীরে ধীরে আমার চিবুক ধরে তিনি ডাক্‌লেন, 'মীনা!' কি করুণ শুনাল সে কণ্ঠস্বর! ভাবে গদ্‌গদ, আবেগে কম্পিত! আমার হৃদয়ের সব তন্ত্রীগুলি যেন সে সুরে ঝঙ্কার দিয়ে সমতালে বেজে উঠল! অবশ হৃদয়ে তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে অধীর কণ্ঠে উত্তর কর্‌লাম, 'হীরু!'

"আমি তোমার কে মীনা?"

'অবাক হ'লাম তাঁর প্রশ্নে, তাঁর কণ্ঠস্বরে! কিন্তু রুদ্ধশ্বাসে স্পন্দিত অন্তরে আমার অন্তরের গূঢ় কথা তৎক্ষণাৎ বলে ফেল্লাম, "তুমি? তুমি আমার দেবতা!"

"আর তুমি আমার কে?"

"আমি? আমি তোমার চরণের দাসী!"—তাঁর পায়ের উপর মাথা রেখে পা দু'টী জড়িয়ে ধর্‌লাম।

"না না, মীনু! ওখানে নয়, ওখানে নয় তোমার স্থান, এখানে—তুমি আমার হৃদয়ের দেবী।'—আমায় তুলে বুকে চেপে ধরলেন। চুম্বন ক'রে বল্লেন, 'ভাবছি, সত্যিই কি আমি তোমার উপযুক্ত?—কত উঁচুতে রয়েছ তুমি; মীনা? আমাকে যে আজ বড় ক্ষুদ্র ব'লে মনে হচ্ছে?···

"হঠাৎ যেন মনে হ'ল একটা তড়িৎপ্রবাহ অদম্য গতিতে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ছুটে গেল! সর্ব্বাঙ্গ বার বার ঝঙ্কৃত কম্পিত হল! দৃষ্টি নিষ্প্রভ হয়ে চোখ মুদে এল! ভীতা, চকিতা কপোতার ন্যায় তাঁর বুকে পড়ে থেকেই ক্ষীণ কণ্ঠে বল্লাম, 'এত সুখ!···না না, তোমার বুকে নয়—বুকে নয়, তোমার পায়ে—শুধু তোমার পায়ে থাক্‌বার অধিকার দাও আমায়···

"তিনি অবাক হ'য়ে আমায় আরো বুকে চেপে ধ'রে বল্লেন, কেন—কেন মীনা?'

'ভয়—বড্ড ভয়—'

'ভয়? কিসের ভয়?'

'সুখের—এত সুখের—'

'সুখের ভয়? কি বল্‌ছ তুমি? সুখে আনন্দ না হয়ে ভয় হচ্ছে কেন, মীনা?'

"তুমি তা বুঝবে না। তোমরা ত তা বোঝ না?··· আমি যে বল্‌তে পার্‌ছি না তা?···এত সুখ! ···এত—এত সইবে না আমার···তোমায় যেন হারিয়ে ফেল্‌ছি···তুমি যেন চলে যাচ্ছ আমা থেকে দূরে—দূরে—বহুদূরে—সে চলার শেষ নাই···প্রত্যাবর্ত্তন নাই···

"আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। তাঁর কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে পুনঃ পুনঃ বল্লাম, 'চল, চল, ফিরে চল···চাই না যেতে আমি, তারা আমার কে যদি তোমায় হারাই, যদি তুমি দূরে চলে যাও, না না, যাব না, যাব না আমি, জানি না, জানি না কেন, বড় ভয়। বড় ভয় হচ্ছে! হীরু! হীরু! চল, ফিরে চল···ভয়ে তাঁকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলাম। আমার অবিরাম তপ্ত অশ্রুতে তাঁর বুক ভেসে গেল। কিন্তু তিনি শুন্‌লেন না আমার কথা। আমায় শিশুর ন্যায় মনে ক'রে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বল্লেন, "ছি"! এ কি পাগলামি কর্‌ছ, মীনা? তা কি এখন হয়? আর লোকেই

বা বল্‌বে কি? চোখের জল ফেলছ এ সময়, চারিদিকে লোকজন সব চেয়ে আছে এদিকে, ভাববে কি বল ত?

"হায়! তখন যদি তিনি আমার সে-কথা শুন্‌তেন। ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় সে কথাগুলি আমার ভাগ্যবিধাতা অজ্ঞাতসারে আমার মুখ দিয়ে বের করেছিলেন, সে-কথার ইঙ্গিত মেনে যদি আমি কাজ করতাম, যদি জোর ক'রেও তাঁকে নিয়ে ফিরে যেতাম, তবে আজ জগত আমার এমন ক'রে আনন্দহীন, অন্ধকার, শূন্য হয়ে যেত না। সঙ্গীহীনা আমি আজ! যাঁর পাশে দাঁড়ালে জগত জয় করবার মত শক্তি আমার হৃদয়ে সঞ্চিত হ'ত, গুরুভার বৃহৎ তরবারিও লঘু হয়ে ধরা দিত এ নারীর মুষ্টিতে, তাঁর অভাবে সেই শক্তিময়ী নারী আজ সত্যিই অবলা, আজ তার সেই অবলা নারীর শ্লথ মুষ্টি কৃপাণ ধরতে অক্ষম! সামান্য লোকনিন্দা লোকমতের জন্য আমার অধিকার—সত্যপথ ত্যাগ ক'রে তাতাই আজ অবলা, ভিখারিণী হয়েছি! উঃ!..."

বুঝিতে পারিতেছিলাম মীনার কাহিনী এবার এমন কোন বিশেষ দৃশ্যের সম্মুখীন হইতেছে যাহা তাহার বর্তমান জীবনের সূত্রপাত করিয়াছিল। কৌতূহলের বশবর্তী হইলেও তাহাকে কোন প্রশ্ন করিয়া আরো ব্যাকুল করিয়া না তুলিয়া নীরব হইয়া থাকিলাম। আমাকে অল্প একটু সময় মাত্র অপেক্ষা করিতে হইল। সে পুনরায় বলিতে লাগিল।

"হঠাৎ তিনি ব'লে উঠলেন, ছাখ, ছাখ, মীনা! ঐ যে ঐ দিকে, আমাদের বাঁ দিকে নহবৎখানার সামনের প্রাঙ্গণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বল্‌লেন, 'কত ঘোড়া, হাতী, সশস্ত্র শরীররক্ষী দেখছ?'

"আমায় অন্যমনস্ক করাই যেন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল। তাঁর নির্দিষ্ট দিকে চেয়ে বল্লাম, 'হাঁ, দেখছি।'

"কারা এরা?'

"এরা এ অঞ্চলের সম্মানী লোকদের অনুচর ব'লে মনে হচ্ছে।"

"কিন্তু এরা তোমাদের এখানে কেন?"

"এরা সব অভিজাতবংশীয়—বাবার সমান ঘর। তুমি আসবে বলে বোধ হয় এদের নিমন্ত্রণ হ'য়েছে।"

"অ—তাই নাকি! ভালই হয়েছে তবে, এদের সঙ্গে আলাপ হয়ে যাবে এই সুযোগে। দেখে মনে হচ্ছে, এরা খুব প্রতিপত্তিশালী লোক।'

"মোটেই না। যা দেখছ এটা শুধুই আবরণ। এরা একেবারে অন্তঃসার-শূন্য।

"সত্যি? তবুও এদের এত জাঁকজমক? আশ্চর্য! ছাখ দেখি, ঐ শরীররক্ষাগুলি আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে না?"

"চেয়ে দেখলাম সত্যিই তাই। মনে হ'ল ওরা যা দেখতে আশা ক'রেছিল তা যেন দেখতে পাচ্ছে না। বিলাসপুরের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী রাজার বিখ্যাত শরীররক্ষী দল মহা জাঁকজমক ক'রে প্রভুকে নিয়ে আসবে, তাদের পদভরে মাটি কাঁপবে, তাদের দাপটের কাছে তারা অতি ক্ষুদ্র হয়ে যা'বে, এই যেন তারা আশা করছিল। তা না দেখতে পেয়ে নিশ্চয়ই তারা প্রথমটা অবাক হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাদের এ হাসি! আমার তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাদের অন্তর ভেদ ক'রে দেখতে পেল তারা যেন ভাবছে "নূতন বড় হয়েছে—নূতন ঘর...এ সমাজে ওভাবে আসতে ওদের ভরসা হয়নি...তাদের সে-হাসির অন্তরালে লুক্কায়িত বিদ্রূপ যেন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। উঃ! কি মর্ম্মান্তিক সে হাসি!...তখনি আবার মনে পড়ল আমাদের সঙ্গে কেউ যাবে না শুনে দাদার সেই মুচকি হাসি, স্পষ্ট মনে হ'ল এ-দু'হাসির একই অর্থ।...এরা তবে আমাদের 'ছোট' ভাবছে? মনে হ'তেই রাগে আমার গা জ্বলতে লাগল! নিজের শরীর নিজে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা হ'ল। নিজের উপর, সকলের উপর রাগ হ'তে লাগল, কেন লোকজন নিয়ে আসি নাই। একটু আগের সেই কথা আবার আমার মনে তোলপাড় ক'রে উঠল—ফিরে যাই, ফিরে যাই তাঁকে নিয়ে!...না হ'লে কি জানি কি হবে!..

..."কাহারেরা হঠাৎ পাল্কী মাটিতে লাগিয়ে রাখল! চারিদিকে একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছিল—স্ত্রীকণ্ঠ! চমকে চেয়ে দেখলাম আমরা একেবারে অন্তঃপুরের দ্বারে এসে পৌঁচেছি। কখন যে আমরা এবাটীর চতুঃসীমায় প্রবেশ করেছিলাম তা মোটেই জানতে পারি নাই। মেয়েরা এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। কিন্তু যাঁকে দেখবার জন্য আমার নয়ন-মন-প্রাণ চির-তৃষিত কোথা তিনি? কোথা মা আমার? আমার অস্থির দৃষ্টি চারদিকে তাঁকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। হঠাৎ দেখতে পেলাম সকলের পশ্চাতে তখনি মাত্র অন্তঃপুরের দ্বার পার হয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন আমাদের দিকে। দু'হাতে কুলায় সাজানো মাঙ্গলিক দ্রব্য—জামাই-মেয়ে বরণের উপকরণ। সেই একদিন কৈশোরে বিবাহের সময় এ গৃহ ছেড়ে গিয়েছিলাম, আর এই আসছি! মা জামাই-মেয়ে বরণ ক'রে ঘরে তুলবেন। তাঁর ব্যাকুল দৃষ্টি থেকে থেকে আমার এবং স্বামীর মুখের উপর স্থাপিত হচ্ছিল। প্রাণের গভীর আকুলতা ব্যক্ত হচ্ছিল সে দৃষ্টিতে, চক্ষুতারকায় ক্ষণস্থায়ী অশ্রুতে, অবশ কম্পিত পদে! আমার সজল নয়ন স্থির হ'য়ে রইল সেই শান্তির প্রতিমূর্ত্তি গৃহলক্ষ্মী দেবীর দিকে! কেবলই ইচ্ছা হচ্ছিল ছুটে গিয়ে পড়ি মায়ের প্রশান্ত বুকে!...একটু আগের সঞ্চিত মনের সমস্ত গ্লানি আমার কোথা যেন দূর হয়ে গেল।" [ক্রমশঃ

দুহিতা ও অন্যান্য পরিজন

জনৈক গৃহী

স্বামী (পূর্ব্বানুবৃত্তি)—আত্ম-সংযম ও সহিষ্ণুতা যত্ন ও অধ্যবসায় বা অভ্যাস দ্বারা অর্জ্জন করা যাইতে পারে, অবশ্য মূলে কিঞ্চিৎ দৃঢ়গ্রাহিতার প্রয়োজন। অহিফেন-সেবী অল্পে অল্পে অহিফেন পরিত্যাগ করিতে পারে। মদ্যপায়ী একদিনেই পানে আসক্তিহীন হইতে পারে—এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। পঞ্চাশ পাউণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া কেহ কেহ আটশত পাউণ্ডের অধিক ভার উত্তোলন করিতে সমর্থ হয়। কথিত আছে—কতদূর সত্য জানি না—একটি গো-বৎসকে প্রতিদিন ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিতে থাকিলে সে বৎস যখন পূর্ণাবয়ব গরুত্বে উন্নীত হয়, তখনও তাহাকে উত্তোলন করা যায়। ধীবরগণ দিবারাত্রি জলে পড়িয়া থাকিলেও অসুস্থ হয় না, কিন্তু এ বিষয়ে অনভ্যস্ত কোন ব্যক্তি অধিকক্ষণ জলে থাকিলে সত্বরই পীড়াগ্রস্ত হইবে। কৃষকগণ প্রায় প্রত্যহ, বিশেষতঃ চাষের সময়ে, পর্য্যুষিত অন্ন ভোজন করে অথচ তাহাদের স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয় না। কেহ কেহ যোগী ও সন্ন্যাসীগণের মত দিনান্তে একবার আহার করেন। বর্ণ-হিন্দুগণের বিধবাগণ একাদশীতে নিরম্বু উপবাস করেন। কখন কখন দেখা যায় কোন যোগী-বেশধারী পুরুষ শরশয্যার মত ঊর্দ্ধমুখী পেরেক বা লৌহশলাকার শয্যাতে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, অভ্যাস দ্বারা স্বভাবের ও কর্ম্মধারার পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হয়। "Habit is the second nature"—অভ্যাস মানুষের দাস—এ কথা সত্য।

স্তন্যপায়ী শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা-কল্পে সন্তান-বৎসলা জননী স্বীয় আহার বিষয়ে সংযম অবলম্বন করেন। শরীরস্থ কোন কোন ব্যাধির দমনকল্পে রোগী নিজের ভোজন-প্রবৃত্তি সংযত করেন। অপরে কটুবাক্য বলিলে যাহারা কটুবাক্যেই প্রত্যুত্তর করে বা প্রহার করিলে প্রতিপ্রহার করে, কোন গুরুজনকৃত ভর্ৎসনা ও প্রহার তাহারা নীরবে সহ্য করে। পানরত বন্ধু-বান্ধবগণের সম্মেলনে উপস্থিত থাকিয়া এবং তাঁহাদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও অনেককে মদ্যপানে বিরত থাকিতে দেখা যায়। এবম্বিধ কার্য্য ও কার্য্য-বিরতিতে আত্ম-সংযমের অভাব ও বিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

যে ব্যক্তির পত্নীর কলহপ্রিয়তা, সংযমহীনতা ও অবাধ্যতা প্রভৃতি দোষ আছে, তাঁহার উভয় সঙ্কট। যদি তিনি পত্নীকে কঠোরভাবে শাসন করেন, লোকে তাঁহাকে অন্ত্যজ বলিয়া গালাগালি দিবে এবং বলিবে—"লোকটা পরের মেয়েকে ঘরে আনিয়া যন্ত্রণা দিতেছে"। যদি তিনি স্ত্রীর দোষ-নিরাকরণে ব্যর্থপ্রযত্ন হয়েন, শাসন বিষয়ে তাঁহার যত্ন ও ত্রুটীর অভাব না থাকিলেও, লোকে তাঁহাকে স্ত্রৈণ-আখ্যা প্রদান করিবে এবং বলিতে থাকিবে—"নিজের স্ত্রীকে যে শাসনে রাখিতে পারে না, সে মেয়ে মানুষেরও অধম, "রাশ একটু কষিলে মেয়ে মানুষ সহজেই জব্দ হয়" ইত্যাদি।

যে ব্যক্তি অশ্ব-চালনায় দক্ষ, তিনি অবগত আছেন যে, দুষ্ট ঘোড়াকে আয়ত্ত করিতে হইলে মধ্যে মধ্যে রশ্মি শিথিল করতঃ তাহাকে সাধ্যমত দৌড়াইতে দিয়া তাহার ক্লান্তি আনয়ন করিতে হয়। নূতন ঘোড়া ব্রেক (break) করিবার জন্য প্রথমতঃ তাহাকে একটি বলিষ্ঠতর অথচ শিক্ষিত অশ্বের সহিত গাড়ীতে সংযুক্ত করিতে হয়, যাহাতে নূতন অশ্ব সহজে উন্মার্গগামী হইতে না পারে—অশ্ব-ব্যবসায়ীর অশ্বশালায় (আড়-গড়ায়) এইরূপ বলিষ্ঠ ও সাধারণ অশ্ব অপেক্ষা বৃহদাকার অশ্ব এই উদ্দেশ্যেই রাখা হয়। নূতন অশ্বের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রথমোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। পত্নীকে এইরূপে ব্রেক করিতে হইলে স্বামীকে একাধারে বলিষ্ঠ অশ্ব ও নিপুণ চালকের স্থান অধিকার করিতে হয়। দৃষ্টান্তটি ঠিক সুরুচি-সঙ্গত হইল না, অনেকে এরূপ মনে করিবেন, কিন্তু কথায় বলে উৎকট ব্যাধির চিকিৎসা উৎকটই হয়।

উল্লিখিত অবস্থায় স্বামীর কার্য্য হইবে—ভদ্রতার সীমা অতিক্রম না করিয়া পত্নীকে কপট ক্রোধ, ছদ্ম অভিমান ও ভয়প্রদর্শন, পত্নীর স্বভাবজনিত বাক্য, কার্য্য, কার্য্য-বিরতি ও কর্ত্তব্যে উপেক্ষা ও অবহেলা প্রভৃতির ফলে স্বামীর নিজের স্বীয় পুত্রকন্যাগণের ও সংসারের কি অনিষ্ট ঘটিতে পারে তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া, সংসারে শান্তি সংস্থাপন ও শান্তিরক্ষার নিমিত্ত আত্মসংযম ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ এবং কি উপায়ে ও কিরূপ অবস্থায় ইহার অবলম্বন সম্ভব স্বীয় কার্য্যাদিদ্বারা তাহার প্রতিপাদন।

পত্নীর প্রতি সরল ও স্নিগ্ধ ব্যবহার বাঞ্ছনীয়, কিন্তু, রোগ-বিশেষে যেমন রোগীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া তিক্ত ঔষধ সেবন করাইতে হয় এবং অবস্থাবিশেষে যেমন মনুষ্যদেহে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়, রূঢ় বাক্যে তিরস্কার সময়বিশেষে তেমনি অনিবার্য্য হইয়া উঠে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোনকালে ও কোন কারণে পত্নীর প্রতি বা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কোন সম্পর্কবিরুদ্ধ বাক্যের প্রয়োগ, নারীধর্ম্মে দোষারোপ বা কলঙ্কক্ষেপ অথবা তৎপ্রতি কটাক্ষ করিয়া শ্লেষ, পিতা-মাতা-ভ্রাতা-ভগ্নীর সম্বন্ধে কুৎসা বা নিন্দা এবং কোন দৈহিক নির্য্যাতন সর্ব্বপ্রকার বিধির বহির্ভূত ও সকল নীতির, সকল ধর্ম্মের বিরুদ্ধ।

যে-বধূ স্বভাবতঃ দুর্ব্বলচিত্তা ও শৃঙ্খলা সৌষ্ঠব-জ্ঞান-বিরহিতা অর্থাৎ "আল্গা" বা "উদোমাদা" ও অগোছালো, তাঁহারও স্বভাবসংস্কারের প্রয়োজন হয় এবং সে-সংস্কারের ভার প্রধানতঃ, তাঁহার স্বামীর উপর। স্থূলভাবে সংসার চালাইবার উপযোগী এবং নিজের ও স্বীয় স্বামীর ও পুত্রকন্যাগণের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য যে হিসাব-জ্ঞান অপরিহার্য্য তাহার অভাব উপলব্ধ হইলে পত্নীকে তদ্বিষয়ে শিক্ষাপ্রদান স্বামীর কর্ত্তব্য।

বিবাহিত জীবন কর্ত্তব্যবহুল, সুতরাং দায়িত্ববহুল। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে বহু দায়িত্ব স্বামীর স্কন্ধে আরোহণ করে। বিবাহ যতই পুরাতন হয়, ততই দায়িত্বের সংখ্যাবৃদ্ধি ও পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে থাকে; বিশেষতঃ, যখন পুত্রকন্যার আগমন আরব্ধ হয়। অনেকে দায়িত্বগুলি এড়াইতে পারিলে বাঁচেন। তাঁহাদের প্রাতঃকাল ক্ষৌরকর্ম্ম, স্নানাহার ও বেশভূষা প্রভৃতিতে পর্য্যবসিত হয়, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন অর্থোপার্জ্জনকল্পে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) স্থানান্তরে অতিবাহিত হয় এবং সায়াহ্ন হইতে অন্যূন তিন ঘণ্টাকাল আমোদপ্রমোদে কাটিয়া যায়। কেহ কেহ সংসারজালে আপনাদিগকে এমন জড়িত করিয়া ফেলেন যে, ব্যায়াম বা বিশ্রাম বা আমোদ-প্রমোদের (recreation) সময় খুঁজিয়া পান না। দুইটি অভ্যাসই চরমসীমাবর্ত্তী (extreme)। ইহাদের মধ্যবর্ত্তী পন্থা অবলম্বন করাই যুক্তিসিদ্ধ। যিনি কথিত রূপে দায়িত্ব বর্জ্জন করেন তিনি পিতার কর্ত্তব্য, পুত্রের কর্ত্তব্য, স্বামীর কর্ত্তব্য, গৃহস্থের সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হয়েন। যদি বাটীর অপর কেহ তাঁহার পুত্রকন্যাগণের শিক্ষাবিষয়ে মনোযোগী না হয়েন, তাহা হইলে তাহাদের শিক্ষায় বহু ত্রুটী থাকিয়া যায়। কেবল মাষ্টার এর (private tutor) হস্তে যে-সকল বালক-বালিকার শিক্ষাভার ন্যস্ত থাকে তাহাদের শিক্ষা পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না। যে বালক সারাদিন গার্জ্জেন শিক্ষকের (Guardian tutor) শিক্ষাধীনতায় ও তত্ত্বাবধানে থাকে তাহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু কয়জন বালকের পিতা এরূপ শিক্ষক-নিয়োগে সমর্থ?

বধূর স্বামী, হয় ত, গৃহস্বামীর পুত্র। স্বামী, পিতামাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা-ভগ্নী ও অন্যান্য গুরুজনদের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ ও ভক্তিশ্রদ্ধাবান এবং কনিষ্ঠ সহোদর সহোদরা, ভ্রাতুষ্পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্রী ও ভাগিনেয়-ভাগিনেয়ী প্রভৃতি স্নেহ-পাত্রগণের প্রতি স্নেহশীল না হইলে এবং তদনুরূপ ব্যবহার না করিলে তাঁহার পত্নী শ্বশুর-শাশুড়ী ও অন্যান্য গুরুজনগণ সম্বন্ধে স্বীয় কর্ত্তব্য-পালন এবং স্নেহভাজন পরিজনদিগের প্রতি স্নেহপ্রকাশ করিবেন এবং সকলের সহিত যথোচিত ব্যবহার করিবেন এরূপ আশাও তাঁহার পোষণ করা উচিত নহে। যে পুত্র নিজে পিতামাতাকে আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন এবং তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষার ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের চেষ্টা বা ব্যবস্থা করেন না, অথবা তদ্বিষয়ে নিরপেক্ষতা (indifference) অবলম্বন বা অবহেলা করেন, তাঁহার বনিতা সে-সকল বিষয়ে কদাচিৎ যত্নবতী হইতে পারেন। "কদাচিৎ" বলিলাম এই জন্য যে কর্ত্তব্য-বিষয়ে সুশিক্ষিতা সহৃদয়া বধূ স্বতঃপ্রণোদিতা হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকেন। পরন্তু, এরূপ পত্নী কর্তৃক এরূপ বিষয়ে স্বামীর মনোবৃত্তির ও কর্ম্মপ্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়—এরূপ ঘটনাও কখন কখন শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে।

যখন কলেজে প্রথমবার্ষিক শ্রেণীতে (F A. 1st year) পড়িতাম, সেই সময় জনৈক মুসলমান সহাধ্যায়ীকে বলিতে শুনিয়াছিলাম, "Women as a class are inferior to men and are to be treated as such." অর্থাৎ স্ত্রী-জাতি পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্টতর শ্রেণীভুক্তা এবং তাহাদের প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করা উচিত। তাঁহার কথাগুলি অবিকল স্মরণ নাই, কিন্তু তাহাদের ভাবার্থ ঐরূপ—ইহা বেশ মনে আছে। মুসলমান সমাজে এইরূপ শ্রেণীবিভেদ ও এইরূপ ব্যবহার প্রচলিত ছিল কিনা অথবা কোন কোন স্থলে আছে কিনা তাহা সম্যক পরিজ্ঞাত না থাকিলেও আমার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা হইতে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, সে-সমাজের প্রথা অনুসারে পত্নী স্বামীকে আপনি বলিয়া কথা কহেন। পরন্তু, আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার যুগে, যখন মুসলমান নারীসমাজেও উচ্চশিক্ষা প্রবেশলাভ করিয়াছে এবং অনেক রমণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভ ও ক্রমশঃ পর্দ্দা পরিহার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তখন সেই পুরাতন প্রথার আংশিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে বিস্তারিত ভাবে পরিবর্ত্তন হইবে এরূপ অনুমান বা সিদ্ধান্ত অসঙ্গত বা কল্পিত হইবে না। হিন্দুসমাজে কথিত প্রথার প্রচলন নাই, বোধ হয়, কস্মিন্ কালে ছিল না।

প্রকৃত দাম্পত্যপ্রেম স্বর্গীয় বস্তু এবং সকল সংসারীর কাম্য। রূপের মোহ বা "চোখের নেশা" প্রেম নহে, কিম্বা বিবাহকালীন শুভদৃষ্টি হইতেই প্রেমের সঞ্চার হয় না। "চোখের নেশা" চিরস্থায়ী হইতে পারে না। পরন্তু, সকল

স্ত্রীও রূপসী হয় না এবং সকল স্বামীও রূপবান হয় না। সন্নিকর্ষ (proximity) হইতে ও সদাচরণের গুণে ক্রমে ক্রমে প্রীতি ও প্রেম সঞ্জাত হয়। উভয়ের চরিত্র নির্ম্মল এবং হৃদয় উদার, সরল, স্বভাব প্রফুল্ল ও কোমলবৃত্তি-সম্পন্ন হইলে অপেক্ষাকৃত সহজে অকৃত্রিম প্রেম ও "ভালবাসা" সঞ্জাত ও বদ্ধমূল হয়। রূপ হইতে গুণ শ্রেষ্ঠ এবং রূপের চেয়ে গুণের মোহিনী-শক্তির প্রভাব দীর্ঘকালস্থায়ী, ইহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করেন না। অর্গলাস্তোত্র পাঠকালে আমরা প্রার্থনা করি, "ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীম্।" জীবনের রমণ্যসত্তত্ব (Romanticism of life) বিবাহিত জীবনের প্রথম, কিন্তু নাতিদীর্ঘ অধ্যায়ে বিদ্যমান থাকে। যখন অপত্য-সমাগম আরব্ধ হয় তখন হইতে বাস্তবতা (Reality) ক্রমশঃ তাহার স্থান অধিকার করিতে থাকে। অপর দিকে অপত্য স্বামী ও স্ত্রীর বন্ধনী (bond)।

দাম্পত্যপ্রেমের অন্যতম উপাদান পরস্পরের প্রতি প্রশংসাসূচক শ্রদ্ধা (mutual admiration)। এই হিসাবে দম্পতীর স্থান একই স্তরে। অনুকম্পা হইতে প্রকৃত দাম্পত্যপ্রেম উদ্ভূত হইতে পারে না, কারণ,অনুকম্পা পাত্রের হীনতাজ্ঞাপক। বিশ্বজনীন প্রেম হইতে দয়া, অনুকম্পা, জনসেবা-প্রবৃত্তি ও তদনুরূপ প্রবৃত্তির সঞ্চার হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার সহিত দাম্পত্যপ্রেমের অনেক প্রভেদ। বিশ্বজনীন প্রেম দাম্পত্যপ্রেমের নিম্নস্তরবর্ত্তী একথা কেহ বলিবেন না এবং ইহার প্রতিপাদন আমার উদ্দেশ্য নহে। প্রত্যুত, বিশ্বজনীন প্রেমের স্থান অনেক উচ্চে। তবে যে হৃদয়ে অকৃত্রিম দাম্পত্যপ্রেম বদ্ধমূল হয় তাহাতে বিশ্বপ্রেম সহজে স্থানলাভ করিতে পারে। যে-সংসারে এইরূপ প্রেমমুগ্ধ দম্পতী বর্ত্তমান থাকে,সেখানে শান্তি ও সুখের অভাব হয় না। যৌথ সংসারে একাধিক দম্পতীর সমাবেশ হইতে পারে এবং সকল দম্পতী সমভাবাপন্ন না হওয়াই সম্ভব। তবে চোখের উপরে জীবন্ত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান থাকিলে অনেক নরনারীর চরিত্রে পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইতে দেখা যায়।

প্রেমসমৃদ্ধ দম্পতীর পুত্রকন্যার উপর জনকজননীর অজস্র স্নেহধারা বর্ষিত হয়। এক বিষয়ে কর্ত্তব্যসাধনে অভ্যস্ত হওয়ায় পিতামাতা তাহাদের শিক্ষা সম্বন্ধে উপেক্ষা বা অবহেলা করেন না। কর্ত্তব্যপরায়ণতা দাম্পত্যপ্রেমের মূলীভূত হওয়ায় এবং তাহাতে স্বার্থপরতার সংমিশ্রণ না থাকায়, প্রেমবদ্ধ স্বামী ও স্ত্রী কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া, সর্ব্বদা মুখোমুখি বসিয়া প্রেমালাপে সময়ক্ষেপ করেন না। তাঁহারা আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধার পাত্রের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা ও স্নেহ-পাত্রের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ অনুভব ও প্রকাশ করেন এবং যাহার প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা সাধ্যমত পালন করিয়া থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে স্বামী একাধারে পত্নীর গুরু ও সখা এবং পত্নী একাধারে পতির শিষ্যা ও সখী। "পতি পরম গুরু"—এই মনোভাব এক সময়ে এ-দেশের রমণীর মজ্জাগত ছিল। যে-দেশে পঞ্জিকার মতে অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে স্থান হইতে স্থানান্তরে যাত্রার দিন ও লগ্ন নির্ণীত হয়, সেই আমাদেরই দেশে পতি সহযাত্রী হইলে রমণী পঞ্জিকার মতবিরুদ্ধ লগ্নেও যাত্রা করিতে পারেন। এই দীর্ঘকাল প্রচলিত প্রথা স্বামীর গুরুত্বের পরিচায়ক। গুরু সকল দেশেই সম্মান লাভ করেন, কিন্তু বোধ হয়, হিন্দুসমাজে গুরুর বিশেষতঃ দীক্ষাগুরুর প্রতি যে পরিমাণে ও যে-ভাবে সম্মান, বিনয় ও ভক্তি প্রদর্শিত হয় তেমন আর কোন সমাজে বা সম্প্রদায়ের মধ্যে হয় না। স্বামী-স্ত্রীর সখিত্বই দাম্পত্যপ্রেম, আধুনিক সমাজের এ-ধারণাও ভ্রমাত্মক। তবে সখিত্ব যে দাম্পত্যপ্রেমের অন্যতম প্রধান উপাদান এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

কথিতরূপ প্রেম বদ্ধমূল হইলে পত্নী শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, ভাসুর, দেবর ও ননদ প্রভৃতিকে স্বীয় জনক, জননী ভ্রাতা ও ভগ্নী প্রভৃতির মত জ্ঞান ও তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি-সমন্বিত বা স্নেহ-বিশিষ্ট ব্যবহার এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যথাযথ কর্ত্তব্যসাধন করিয়া থাকেন; স্বামী ও নিজের শ্বশুর, শাশুড়ী, শ্যালক ও শ্যালিকা প্রভৃতির প্রতি স্বীয় পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভগ্নী প্রভৃতির তুল্য জ্ঞান ও তদনুরূপ ব্যবহার করেন। এইরূপে সংসারে শান্তি ও সুখের বৃদ্ধি হইতে থাকে।

দুশ্চরিত্র, কু-অভ্যাসগ্রস্ত ও আলস্য-পরায়ণ স্বামীর উপর পত্নীর শাসনাধিকার আছে। সুশিক্ষিতা রমণী (উচ্চ-শিক্ষিতা না হইলেও) মিষ্টভাষায় উপদেশ প্রদান ও দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতঃ (উপযুক্ত দৃষ্টান্ত বিরল নহে) স্বামীকে সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন। পত্নী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ভূষিতা হইলে এরূপ ক্ষেত্রে অধিক ফল লাভের সম্ভাবনা, কারণ, স্বামী মনে মনে বিদুষী পত্নীকে সম্মান ও ভয় করেন। উপদেশ ব্যর্থ হইলে স্বামী-শাসনের পরবর্ত্তী উপায় অভিমান, অশ্রুজল এবং অবশেষে প্রায়োপবেশন। ইহা ভিন্ন হিন্দু-সমাজে গত্যন্তর নাই। এরূপ অবস্থায় সময়ে সময়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাক্যালাপও রহিত হইয়া যায়। কিন্তু যে কোন অবস্থাতেই স্বামীর সহিত কলহ করিয়া কিম্বা তাঁহার প্রতি কুপিতা হইয়া পত্নীর স্বামি-গৃহ পরিত্যাগ কোন ক্রমেই সঙ্গত বা যুক্তিসিদ্ধ নহে। ইহাতে স্বামীর সংশোধন ত' দূরের কথা, উত্তরোত্তর অবনতিই হইতে থাকে এবং উভয়ের মধ্যে যে খাত খনিত হয় তাহা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া উঠে। অধিকন্তু, পুত্রকন্যাগণের শিক্ষা উপেক্ষিত এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। [ক্রমশঃ

(উপন্যাস)

আট

দিন কয়েক পরের কথা—বালিগঞ্জ লেকের ধারে বেড়াতে এসেছে সমীর, শোভা, লীলা, নমিতা ও অজয়।

নমিতা নৈনিতাল থেকে ফিরে এসে এখনও লীলাদের বাড়ী রয়েছে। শোভার জেদে—থাকতে হোলো নমিতাকে কিছুদিন। সুতরাং যখন থাকাই স্থির হোলো—তখন সে সমীরকে ধরে বসলো, "চলো সমীরদা, আজ আমরা লেকে বেড়াতে যাই! অজয়বাবুকেও খবর পাঠাও—কারণ নৈনিতালে ত ভাল করে বেড়ানই হোলো না, হৈ হৈ করে যাওয়া আর হৈ হৈ করে আসা।" সমীর রাজি হোলো, এবং তাই আজ সকালে দল বেঁধে বেড়াতে এসেছে। একটা বেঞ্চিতে বসে নমিতা অজয়কে বল্‌লে, "আজ আপনাকে একখানা গান গাইতে হবে অজয়বাবু!" হেসে অজয় উত্তর দিলে, "আজ আমার গলাটা ভাল নেই—তার ওপর এই লেকের ধারে কি কেউ গান গায়? এক্ষুনি অনেক লোক জমা হয়ে যাবে, তার চেয়ে বাড়ীতে একদিন গাইব খ'ন।" লোক জমে যাবে শুনে লীলা বল্‌লে, "তবে থাক অজয় দা। আসছে রবিবার আমার জন্ম-তিথি উৎসব, ঐ দিন কিন্তু আপনাকে অনেকগুলো গান গাইতে হবে"—শোভা ও সমীর অমনি ধরে বসলো—"হ্যাঁ হ্যাঁ অজয়বাবু ঐ দিন গাওয়া চাই।" অজয় বল্‌লে, "বেশ বেশ, তাতে আর কি হয়েছে, গান গাইব এ আর এমন কি বড় কথা।" খানিক রাত্রে লেকে বেড়ান শেষ করে সমীররা বাড়ী ফিরে এলো। অজয়কেও সমীর তার গাড়ী করে বাড়ী পৌঁছে দিলে।

পরদিন যথাসময়ে নেমন্তন্ন পত্র তৈরী হয়ে গেল এবং লীলার বন্ধু-বান্ধব সকলকেই নেমন্তন্ন করা হোলো, সন্ধ্যাও বাদ পড়ল না। নমিতা ও লীলার অনুরোধে সন্ধ্যা বল্‌লে, "নিশ্চয়ই যাব"। নমিতা বল্‌লে, "একটু সকাল সকাল যাস কিন্তু, সমীরদা তোর ওপর কি ভার দিয়েছে জানিস? লীলার বন্ধুবান্ধবদের অভ্যর্থনা তোকেই করতে হবে"—একগাল হেসে সন্ধ্যা উত্তর দিলে, "এতবড় দায়িত্ব আমি ঘাড়ে নিতে পারব না ভাই—শেষে কি আবার হিতে বিপরীত হবে।" ঘাড় বেঁকিয়ে লীলা বল্‌লে "তোমার ও বাজে ওজর রাখ, দাদা তোমাকে ছাড়া এ ভার আর কাউকে দিতে রাজি নয়। দাদা বলে তোমার মত ঠাণ্ডা মেয়েই নাকি এ সব দায়িত্ব বইতে পারে—"

আত্মপ্রশংসায় সন্ধ্যার গণ্ডদ্বয় লাল হয়ে উঠলো—বল্‌লে, "আচ্ছা ভাই সে তখন যা হয় হবে, আমি ঠিক পাঁচটার সময় যাব।" লীলা ও নমিতা চলে গেল।

নমিতা ভিতরে ভিতরে যা ফন্দি এঁটেছে তার কতকটা এখানে সফল হোলো দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। মনে মনে বল্‌লে, "দাঁড়াও আগে ওখানে চল, তোমায় নাস্তা-নাবুদ করে ছাড়বো।"

পাঁচটা বাজবার বহুপূর্ব্ব হতেই সমীরের বালিগঞ্জের বাড়ী শানাইয়ের মধুর সুরে ভরপুর হয়ে উঠেছে। সমীরের বন্ধু-বান্ধবেরা, লীলা ও নমিতার বন্ধুরা একে একে আসতে আরম্ভ করেছে। অজয় এসেছে অনেকক্ষণ। লীলা ধরে ব'সলো এইবার আপনার গান গাইবার পালা, মনে আছে লেকের কথা?" "হ্যাঁ, খুব মনে আছে" বলে অজয় অর্গ্যানটা খুলে গাইতে ব'সলো—রবীন্দ্রনাথের গান "ওগো সুন্দর মনের গহনে তোমার মুরতিখানি—ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায় মুছে যায় বারে বারে, বাহির বিশ্বে তাইতো তোমারে টানি"—এমন সময় শোভা এসে লীলাকে টানতে টানতে বল্‌লে, "শিগ্‌গির দেখবে এসো কে এসেছে।" লীলা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়েই বল্‌লে, "বাঃ রে! কই কে? মিছি মিছি আমায় ডাকলে কেন বৌদি?" "ঐ দেখ" বলে শোভা দূরে দরজার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে, নমিতার সঙ্গে সন্ধ্যা আসছে এই দিকে। একটু এগিয়ে এসেই সন্ধ্যা থমকে দাঁড়ালো, বল্‌লে, "কে গাইছে রে নমি?" "ও একজন ভদ্রলোক, সমীরদার বন্ধু, ভারি সুন্দর গায়, ওঁর কাছে লজ্জা করবার কিছুই নেই, চল্ না শুনবি"—সন্ধ্যা আর বিশেষ আপত্তি করলে না, সমানে এগিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকলো নমিতাও পিছন পিছন গেল। অজয় দরজার দিকে পিছন করে গাইছিল, তাই বাইরের থেকে তাকে চেনা যাচ্ছিল না।

ঘরে ঢুকেই নমিতা আস্তে আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে দিলে। সন্ধ্যা ঘরে ঢুকতেই লীলা বল্‌লে, "এস সন্ধ্যাদি, এঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই"—কানে 'সন্ধ্যা' এই নামটি যাবা মাত্রই চমকে অজয় অর্গ্যান বন্ধ করে ফিরে তাকিয়ে দেখল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্ফুট শব্দ করে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল সন্ধ্যার দিকে। সন্ধ্যারও অবস্থা তাই। এ কি সম্ভব এদের বাড়ী, এদের বাড়ী অজয়বাবু এলো কি করে? তবে কি ইনি এদের কেউ আপনার লোক?

নমিতা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে মুচকে মুচকে হাসতে লাগলো। ব্যাপার দেখে লীলা হতভম্ব হয়ে গেল। পরস্পরের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দিতে এসে একি ব্যাপার? কিছুক্ষণ কারুর মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুলো না। একটু সামলে নিয়ে নমিতা বল্‌লে, "তাহলে আমিই পরিচয়টা করিয়ে দিই—

জানলেন অজয়বাবু, ইনি হচ্ছেন আমার বান্ধবী সন্ধ্যারাণী, সম্প্রতি ফার্ষ্ট ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন। তারপর সন্ধ্যার দিকে ফিরে বল্‌লে, "বুঝলে সন্ধ্যা, ইনি হচ্ছেন কবি অজয় কুমার, আমাদের সম্মানীয় অতিথি।"

কোন কথা না বলে সন্ধ্যা আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর নমিতাকে ডেকে বল্‌লে, "আচ্ছা এভাবে আমাকে অপমান করে তোমাদের কি লাভ হোলো?" লীলা বুঝতে না পেরে বল্‌লে, "আমরা তো তোমায় কোন অপমান করিনি সন্ধ্যাদি।" তাড়াতাড়ি লীলার মুখে হাত চাপা দিয়ে নমিতা বল্‌লে, "আজকের দিনে রাগ করিস নি সন্ধ্যা, এ রকম সুযোগ হাতে পেয়ে কি করে ছেড়ে দিই বল? রাগ করিস নি ভাই।" বলে দু'হাতে সন্ধ্যাকে জড়িয়ে ধরলে।

লীলা তখন ফিরে গেছে আবার অজয়ের কাছে। অর্গ্যানের রীডে আঙুল দিয়ে অজয় চুপটি করে বসে আছে দেখে লীলা বল্‌লে, "ওকি অজয় দা থামলেন কেন? গানটা শেষ করুন।" আনমনা ভাবে অজয় আবার গেয়ে চল্‌লো।

—"আচ্ছা অজয় দা, আপনি সন্ধ্যাদি'কে চেনেন নাকি?" লীলার প্রশ্নে অজয় গান বন্ধ করে বল্‌লে, "একটু একটু চিনি —আচ্ছা লীলা, উনি তোমার কি রকম দিদি হলেন?" ঘাড় বেঁকিয়ে লীলা উত্তর দিলে, "নমিতাদির বন্ধু বলে আমি ওঁকে সন্ধ্যাদি বলে ডাকি—ও খুব ভাল মেয়ে অজয় দা, কারুর সঙ্গে বেশী কথা বলে না।"

লীলার কথায় অজয় ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলো তার মুখের দিকে, যেন সন্ধ্যার সম্বন্ধে আরও কিছু শুনতে চায়—কিন্তু লীলা এখানেই থেমে যাওয়ায় বল্‌লে, "তুমি একটা গান গাও লীলা, আমি শুনি।" ত্বরিত পদে লীলা অর্গ্যানের সামনে গিয়ে বসে গান আরম্ভ করে দিলে।

পাশের ঘরে তখন নমিতা সন্ধ্যাকে বোঝাচ্ছে কি করে অজয় বাবুর সঙ্গে এদের আলাপ হয়েছে এবং কেনই বা অজয় বাবু এদের বাড়ীতে এমন অবাধ গতি পেয়েছেন। কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘরে এসে হাজির হোলো সমীর ও ধীরাজ। "এই যে তোমরা সব এখানে, লীলা, অজয় বাবু, তাঁরা সব কই?" নমিতা আঙুল বাড়িয়ে পাশের ঘরের দিকে দেখিয়ে দিলে। সন্ধ্যা উঠে যাচ্ছিল, নমিতা তাড়াতাড়ি কাপড়টা টেনে ধরে বল্‌লে, "এই বস, যাচ্ছিস্ কোথায়?"

ধীরাজ সন্ধ্যার সঙ্গে কোন কথা না কয়ে সমীরের পিছু পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যা হাঁফ ছেড়ে বল্‌লে, "বাঁচলুম, কিন্তু এ বাড়ীতে আবার ধীরাজ বাবু এল কোথা থেকে? এ যে সবই ভেল্কিবাজি রে নমি?"

নমিতা একটু হেসে উত্তর দিলে "তবে শোন্—ধীরাজ বাবু সমীরদার বন্ধু এবং অজয়বাবু যখন গাড়ীর ধাক্কায় পড়ে গিয়েছিলেন তখন ধীরাজ বাবুই ওঁর চিকিৎসা করেছিল—কিন্তু যখন জানতে পারলে তুই অজয় বাবুকে ভালবাসিস, তখন থেকেই ও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। নৈনিতালে লোক পাঠিয়ে অজয় বাবুকে গুম্ করবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করেছিল। ভগবানের কৃপায় আবার আমরা অজয় বাবুকে ফিরে পেয়েছি—" ভয়ে সন্ধ্যা বিবর্ণ হয়ে গেল। নমিতা আবার বল্‌লে "তোকে ও অজয়বাবুকে আবার এ বাড়ীতে দেখে জ্বলে পুড়ে মরে যাচ্ছে—কি যে করবে আমি ভেবেই পাচ্ছি না।"

সমীর ও ধীরাজ পাশের ঘরে যখন ঢুকলো—তখন অজয় গান গাইছিল, আর লীলা বসে শুনছিল—ঠিক অর্গ্যানের ওপাশে একটা চেয়ারে। ধীরাজ যুক্ত কর কপালে ঠেকিয়ে বল্‌লে "নমস্কার অজয় বাবু!" গান বন্ধ করে অর্গ্যানের ঢাকাটা চাপা দিতে দিতে অজয় প্রতিনমস্কার জানালে। লীলা বল্‌লে "নমি'দির এক বন্ধু এসেছেন, দেখেছেন ধীরাজ বাবু?" হাঃ হাঃ করে হেসে ধীরাজ উত্তর দিলে "শুধু আজ নয়, বহুদিন হতেই দেখ্‌ছি—"

—"তার মানে" বলে লীলা ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইল ধীরাজের দিকে। ধীরাজ বল্‌লে "মানে হচ্ছে উনি আমারই কাছে পড়ে ম্যাট্রিকুলেসন্ পাশ করেছেন এবং আরও—" কথার মাঝে বাধা দিয়ে নমিতা ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে বল্‌লে "লীলা, সন্ধ্যা বাড়ী চলে যাচ্ছে—তুই একবার শিগ্‌গির এদিকে আয়।—" নমিতার সঙ্গে লীলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সমীরও চলল পিছন পিছন।

—"ওকি ভাই, চলে যাচ্ছ কেন?" বলে লীলা দৌড়ে সন্ধ্যার ডান হাতখানা চেপে ধরলে।" সন্ধ্যা উত্তর দিলে "শরীরটা বড় খারাপ লাগছে, আর এতক্ষণ তো রইলুম।" ব্যগ্রভাবে সমীর বল্‌লে "তাতো রইলেন কিন্তু এখনও যে খাওয়া হয়নি—আজকে লীলার এই জন্মদিন-উৎসবে আমরা তো কাউকে না খাইয়ে ছেড়ে দিতে পারি না—" এমন সময় ধীরাজ বল্‌লে—"না খেয়ে কি যেতে আছে নাকি? এস এস নেমে এস গাড়ী থেকে।" সন্ধ্যা কোন কথা কইলে না, শুধু কট্‌মট্ করে একবার চেয়ে দেখ্‌লে ধীরাজের দিকে। কিন্তু ধীরাজের একটু পিছনে অজয়কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি চোখটা নামিয়ে নিলে এবং চুপ করে গাড়ীর ভেতর বসে রইলো।

অজয়ের বুকের মাঝে তখন ঝড়ের বোঝা বইছে। কই ধীরাজের কথায় তো সন্ধ্যা গাড়ী থেকে নেমে এলো না, তবে কি আমার ধারণা সবই ভুল? আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে অজয় ধীর কণ্ঠে বল্‌লে "আসুন, নেমে আসুন, আপনি গাড়ীতে চেপে বসায় কি মুস্কিলেই না পড়েছি আমরা সকলে, উৎসব নিরুৎসাহে পরিণত হচ্ছে—শরীরের অসুস্থতা সত্ত্বেও

একটু এদের বাড়ী থাকলে যদি আনন্দটা বজায় থাকে তো তাতে দোষটা কি ? আসুন নেমে আসুন।"

মন্ত্রচালিতের মত সন্ধ্যা গাড়ী থেকে নেমে এলো এবং নমিতা ও লীলার সঙ্গে বাড়ীর ভেতর চলে গেল। ধীরাজ কোন কথা আর না বলে একবার অজয় ও একবার সন্ধ্যার দিকে চেয়ে দেখলে। রাগে তার সর্ব্ব শরীর জ্বালা করতে লাগলো। অজয়ের সামনে কিনা সন্ধ্যা তাকে এমনিভাবে অপমান করলে! সে এখান থেকে চলেও যেতে পারছে না —অথচ কিছু বলবারও ক্ষমতা তার নেই। মুখটি নীচু করে বৈঠকখানার এক কোনে গিয়ে সে বসে পড়লো।

শোভা তখন চপের মশলাগুলো মাখছিল; মুখ তুলে বললে, "কোথায় আমোদ করে সকলে মিলে হৈ চৈ করবো, না তুমি চলে যাচ্ছ ভাই সন্ধ্যা?" লীলা বললে—"সন্ধ্যাদি বলছিল—ওর শরীরটা আজ ভাল নেই বৌদি?" নমিতা হেসে পাশ থেকে বললে, "এখন শরীরটা ভাল হয়ে গেছে—কেমন রে সন্ধ্যা?"

শোভা ড্যাবা ড্যাবা চোখ দু'টো আরও বড় করে বললে "বা রে:—এই শরীর খারাপ হয়েছিল, আবার এরই মধ্যে ভাল হয়ে গেল?" মুখে কাপড় চাপা দিয়ে আড় চোখে সন্ধ্যার দিকে একটু চেয়ে নমিতা বললে, "ওষুধ পড়লেই রোগ সেরে যায় বৌদি—।" কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধ্যা নমিতাকে এক ঠেলা দিয়ে বললে "—ফের—।" "ভুল হয়ে গেছে ভাই" বলে হো হো করে হাসতে হাসতে নমিতা চলে গেল সেখান থেকে।·········

পরদিন সকাল বেলা সন্ধ্যা আবার লীলাকে ফোন করলে কিন্তু আজকে সমীর ধরলে টেলিফোন—বললে, "যতদূর সাধ্য করে যাচ্ছি, হাইকোর্টের যত বড় বড় ব্যারিষ্টার লাগিয়েছি এবং যতদূর পারি চেষ্টা করে যাব। আপনি সময় মত খবর পাবেন নিশ্চয়ই"--সন্ধ্যা নমস্কার জানিয়ে টেলিফোন নাবিয়ে রাখলে।

অজয় এ্যারেষ্ট হওয়ায় সাহিত্যিক মহলেও হুলুস্থূল পড়ে গেল। কাগজে কাগজে প্রতিবাদ চললো—সভা-সমিতি হোলো কিন্তু ফল কিছুই হোলো না, অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে অজয় আটক হয়ে রইল সরকার-বাহাদুরের কারা-প্রাচীরের পাশে।

ধীরাজের আনন্দ আর ধরে না—মোটার হাঁকিয়ে বেরিয়ে পড়লো অমলদের বাড়ীর দিকে। বৈঠকখানা ঘরেই অমল ছিল। ধীরাজ বললে, "এইবার দাদুকে বলে সব ঠিকঠাক করে ফেল, সামনের মাসের দশই তারিখে আমি একবার জার্ম্মানিতে যাব, ডাক্তারি সম্বন্ধে আরও কিছু গবেষণা করব সেখানে—তাই বে-টা করেই যাব ভাবছি, আর সন্ধ্যাও তো ম্যাট্রিক পাশ করেছে—সুতরাং দেরী করবার আর কি প্রয়োজন?" অমল বললে, "হ্যাঁ, দাদুও বলছিলেন দু'এক-দিনের মধ্যেই পাকা দেখা শেষ করতে, আমি এখনি দাদুকে ডেকে আনছি।' অমল চলে গেল বাড়ীর ভেতর, ধীরাজ বৈঠকখানা ঘরে পাইচারী করতে লাগলো।

"এই যে ধীরাজ, আমি ক'দিন ধরে তোমায় খুঁজছি, আর তোমার দেখা নেই—না হয় সন্ধ্যা পাশই করেছে, তা বলে কি পড়াশুনা একেবারে শেষ করে দিতে আছে? যাক, বিয়েটা আগে হয়ে যাক, তারপর তুমি ওকে আই-এটা পড়িয়ে দিও। আমি আগামী পরশুদিন তোমায় আশীর্ব্বাদ করতে যাব, তোমার বাবার সঙ্গে সে কথা হয়ে আছে হে"। বলে বৃদ্ধ হো হো করে হাসতে লাগলেন।

এতক্ষণে ধীরাজ বুঝলে তার পাকা দেখার দিন ঘনিয়ে এসেছে। সে মুচকি হেসে একবার অমলের দিকে চাইলে এবং বললে, "আজ চলি অমল, আবার আসব'খন, কেমন?" ধীরাজ চলে গেল।

বাড়ীর ভেতর সকলেই জানলে আগামী পরশু ধীরাজের পাকা দেখতে এঁরা যাবেন। অনিতার কথায় সন্ধ্যা হেসে বললে, "সব মিথ্যে কথা বৌদি, যা হবার নয় তা কখনও হতে পারে না—তোমরা দেখে নিও এ বিয়ে হবে না।' এমন সময় অলক সেখানে এসে বললে, 'হোতেই হবে সব, ঠিক হয়ে গেছে, পরশু পাকা দেখা"—"ইস্"। বলে সন্ধ্যা মুখখানা কাঁচু মাচু করে সেখান থেকে সরে পড়লো।

নমিতাও পরের দিন সন্ধ্যাদের বাড়ী বেড়াতে এসে সুনীতির মুখে সব কথা শুনলে—সন্ধ্যাকে জড়িয়ে ধরে বললে, "মত পরিবর্ত্তন কর" ম্লান মুখে সন্ধ্যা উত্তর দিল "তুই তো সবই জানিস, সে হবার নয়। আমার মনকে দ্বিধাচারিণী হতে বলিস্ নি—আমার মন আমারই থাক তাকে নিয়ে খেলা করবার অধিকার এক আমার ছাড়া আর কারও নেই—সে যেই হোক না কেন?" আর একটু থেকে আবার বললে, "আশার অপেক্ষা তো সকলেই করে থাকে, আমিও না হয়'—'বলে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগলো।

নমিতার চোখেও জল এলো। এই বাল্য-সখীটিকে সে ভাল রকমই চেনে, তার যে কোথায় ব্যথা তাও সে জানে, তাই বললে, 'কাঁদিস্ নি ভাই, আমি যেমন বলবো তুই সেই মতো কাজ করিস্—তবে নির্ব্বিঘ্নে পাকা দেখা হয়ে যাক্, মনকে অত উতলা করিস নি। আমি তোর কাছে প্রতিজ্ঞা করছি তুই আমায় বিশ্বাস কর—তোর জন্যে আমি আমার নিজের জীবনকেও তুচ্ছ মনে করি।" এমন সময় সেখানে এসে হাজির হলো; অনিতা অমনি দু'জনেই যে যার নিজেকে সামলে নিলে। অনিতার মোটেই ইচ্ছে ছিল না যে ধীরাজের সঙ্গে সন্ধ্যার বিয়ে হয় এবং মনে মনেও বিলক্ষণ জানত যে সন্ধ্যা ধীরাজকে একদম পছন্দ করে না, সুতরাং বললে, "আচ্ছা নমিতা, তুই বল না ভাই দেশে কি আর ভাল ছেলে নেই—

দাদুর কি যে খেয়াল এবং বড়ঠাকুরও তাতে আবার যোগ দিয়েছেন—ধীরাজের সঙ্গে ঠাকুর-ঝির বে দিতেই হবে। আহা যেমন চেহারা তেমন কথাবার্ত্তা, যেন 'নদে'র চাঁদ আর কি।' সাধে কি বলে 'কপাল গুণে গোপাল ঠাকুর?" সন্ধ্যার ভাল লাগছিল না তখন মোটেই তাই বল্‌লে, "দেখ নমি, আজ সিনেমায় গেলে মন্দ হয় না—যাবি?" নমিতা বল্‌লে, ছোট বৌদি, আপনিও তো যাবেন?" অনিতা হেসে বল্‌লে, আজ তোমরা যাও, আমি বরং আর একদিন যাব।" নমিতা টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে কানে দিয়ে ফোন করে দিলে বালিগঞ্জে সমীরকে। সন্ধ্যা বল্‌লে "সমীরদাও যাবে নাকি রে?" নমিতা বল্‌লে শুধু সমীরদা নয়, বৌদি ও লীলাকেও আসতে বলে দিলুম।" সন্ধ্যা নমিতার কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বল্‌লে, "ওঃ! তা হলে আজ যা মজা হবে।" নমিতা বল্‌লে, "তা হলে রেডি হয়ে থাকিস্, আমি ওদের নিয়ে ঠিক ছ'টার সময় তোকে তুলে নিয়ে যাব"। বলে নমিতা চলে গেল—সন্ধ্যাও চলে গেল নিজের কাজে।

উভয় পক্ষেরই পাকা দেখা একরকম শেষ হয়ে গেল—সন্ধ্যার মনে কিন্তু শান্তি নেই। যাকে সে চায় না তাকে পতিত্বে বরণকরে নিতেই হবে—এই রকম জুলুম তার পক্ষে ক্রমশঃই অসহ্য হয়ে উঠলো—সে এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলো।

অজয় কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। সমীরের অজস্র অর্থ ব্যয় ব্যর্থ হয়ে গেছে—বাল্যবন্ধু বিশ্বনাথের মনে আজ আনন্দের লেশ মাত্র নেই। প্রতি রবিবারের সকালটা তার কাছে বৈশাখের প্রখর দ্বিপ্রহরকেও ছাপিয়ে উঠেছে। তবুও সমীরের একান্ত অনুরোধে সে প্রতি রবিবারের সন্ধ্যাবেলা ওদের বাড়ী যায়। লীলা ও বিশ্বনাথের সঙ্গে নানারকম গল্প-গুজবের মধ্যে মেতে থেকে অজয়ের কথা কতকটা ভুলে গেছে।

দিক্-দিগন্তে সোণালী আলোর ঝরণা নেমেছে। নানা-জাতীয় পাহাড়ী পাখীর সুমধুর কাকলী ঝিরঝিরে হাওয়ার বুকে ভেসে যাচ্ছে। সুন্দর সকাল, যেন সদ্যস্নাত বসুন্ধরার ধ্যানময় মূর্ত্তি।

নমিতা বল্‌লে, "এইখানে বসো বৌদি" লীলা বল্‌লে, "হ্যাঁ, এই জায়গাটি বড় সুন্দর, ঝাপড়ি ঝাপড়ি গাছগুলো দেখেছো বৌদি? কে যেন সাজিয়ে সাজিয়ে পুতে রেখেছে।" অজয়ের মা বল্‌লেন, "এ-সব বিধাতার খেলা মা—ঈশ্বর যে আছেন এইখানেই তার প্রমাণ।" শোভা প্রভৃতি সকলে কাপড় গুটিয়ে সেখানে বসে পড়লো।

এ-ধারে সন্ধ্যা বিয়ের রাত্রে সকলে যখন বর দেখতে ব্যস্ত, সেই সময় খিড়কির দরজা খুলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লো। এধারে ওধারে একবার চেয়ে দেখ্‌লে—দেখতে পেলে একটু দূরে সামনেই তাদের মোটরখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে ভিতরে কেউ-ই নেই। আর মুহূর্ত্ত মাত্র দেরী করা চলে না, তাড়াতাড়ি বেনারসী শাড়ীখানার আঁচলটা মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে শুধু মুখটি মাত্র বের করে ত্বরিতপদে গাড়ীতে গিয়ে বসে ষ্টার্ট করে সাঁ করে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল। নমিতা অত করে যে-সব কথা বলে দিয়েছিল সব ভুলে গিয়ে পলাতক আসামীর মত সন্ধ্যা বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। দিক্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য, কোথায় যাবে কিছুই ঠিক নেই—ভয় ও ভাবনা পর্য্যন্ত মনের কোণে স্থান পায় নি। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে তারপর পি, ডব্লিউ রাস্তা পেরিয়ে সোজা বালীব্রিজ। গেটরক্ষক টিকিটের পয়সা চাইলে, সন্ধ্যার কাছে একটিও পয়সা নেই, কি দিবে সন্ধ্যা বিপদে পড়লো। হঠাৎ হাত থেকে একগাছা চুড়ি খুলে লোকটার হাতে দিতেই সে অবাক হয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল, তারপরে গেট তুলে ধরে মস্ত এক সেলাম করে পাশে সরে দাঁড়ালো, সাঁ করে সন্ধ্যার মোটর চলে গেল। ব্রিজের ওপার আবার গেটম্যান টিকিট চাইলে সন্ধ্যা আবার আর একগাছা চুড়ি খুলে তার হাতে দিলে। আট আনার টিকিটের পরিবর্ত্তে বহুমূল্য চুড়ি পেয়ে সেও সেলাম করে গেট খুলে পাশে সরে দাঁড়ালো, সন্ধ্যা আবার তীব্রগতিতে গাড়ী চালিয়ে চলে গেল।

শ্রীরামপুর, পেরিয়ে সন্ধ্যার মনে রাজ্যের ভয় ভাবনার উদয় হোলো; এতক্ষণে তার অবসর হ'ল চিন্তা করবার, সে কি করছে ও কোথায় যাচ্ছে। একে ব্লাক আউট চারিদিকে অন্ধকার মিশ মিশ করছে। রাত্রে একলা সে অনেকবার মোটার চলিয়াছে কিন্তু সে ক'লকাতার ভেতর। আজ যে সে কোথায় চলেছে তা নিজেও জানে না। একবার ভাবলে নমিতার কথা অনুযায়ী কাজ করলেই ভাল হ'ত কিন্তু বে'র রাত্রে পালিয়ে পরিচিতদের কাছে মুখ দেখাতে সে পারবে না। সে জানে অনেক কিছুই রটবে তার নামে কিন্তু বিধাতার কাছে সে নির্দ্দোষ। অন্ধকারের মরীচিকায় ভয় পেয়ে সন্ধ্যা চন্দননগরের গঙ্গার ধারে এসে মোটর থামালে।

কে আশ্রয় দেবে—কোথায় আশ্রয় পাব? গাড়ীতে বসে বসেই যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে সন্ধ্যা মনে মনে বল্‌লে, "তুমিই আমার স্বামী তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকে জানি না—আজ এই দুর্দ্দিনে তুমিই ত' আমার ভগবান্, আমায় শক্তি দাও রক্ষা কর—দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ল তার। হয় ত' এই মুহূর্ত্তে কারাপ্রাচীর কেঁপে উঠেছিল।

গাড়ীর সার্শিগুলো ভাল করে তুলে দিয়ে সে আবার ষ্টিয়ারিং ধরে বসলো। একটু দূরে একটা পুলিশকে আসতে দেখে সে আবার মোটরে ষ্টার্ট দিলে, গাড়ী পূর্ণবেগে এগিয়ে

চল্ল। দু'ধারে বড় বড় গাছ মাঝখানে সর্পিল গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, গাড়ী হু হু করে চলেছে। পাশের ঝোপের মধ্যে একপাল শেয়াল 'হুক্কো হুয়া' করে ডেকে উঠলো, সন্ধ্যা ভয় পেয়ে গাড়ীখানা পথের ধারে থামিয়ে ফেল্ল।

তখনও ঠিক ভোর হয় নি, শুকতারাটা অন্ধকার আকাশের বুকে জল্ জল্ করে তখনো জ্বলছে। দু'একটা পাখী ডেকে উঠল। চমকে উঠল সন্ধ্যা, এই বুঝি ভোর হয়ে গল—এখন উপায়? ক'নের পোষাক তার গায়ে, গা-ভরা হীরে-জড়োয়ার গহনা, তার ওপর কপালে ও গালে চন্দনের দাগ। লোকে মনে করবে কি?

পথের একটু দূরেই একটা বাগান—সাজসজ্জাহীন দেখে অনেক দিনের পোড়ো বলেই মনে হল, একটি পুকুরও রয়েছে তাতে, অল্প ঘোলাটে অন্ধকারে মোটরের ভিতর থেকে বেশ দেখা যাচ্ছিল। সন্ধ্যা আস্তে আস্তে গাড়ী থেকে নেমে পড়ল এবং হাত-মুখ ভাল করে ধোবার জন্যে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করে পুকুরের ঘাটে গিয়ে নামল। চারিদিকে সাদায় কালায় জড়ানো জড়ানো থমথমে অন্ধকার, ভয়ে সন্ধ্যার বুকের ভেতরটা আবার কেঁপে উঠল—পরক্ষণেই পিছন হতে সবল হাতে কে যেন তার মুখটা চেপে ধরলে, ভয়ে সন্ধ্যা জ্ঞান হারিয়ে ফেল্লে।

এরা ডাকাত, পাশের গ্রামখানার ওপরই ছিল এদের লক্ষ্য। কিন্তু সেখানে সুবিধা করতে না পেরে ফিরে যাচ্ছিল এই বাগানের ভেতর দিয়ে। হঠাৎ সর্দ্দারের নজর পড়ল অন্ধকারে মোটরখানার ওপর এবং যখন দেখলে একজন মাত্র নারী ছাড়া গাড়ীতে আর কেউ নেই, তখন তারা সুযোগের অবসর খুজতে লাগল এবং সন্ধ্যা পুকুরে নামবার মুখেই তার মুখ চেপে তাকে ধরে নিয়ে গেল।

জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধ্যা চেয়ে দেখলে—সে এক প্রকাণ্ড ভাঙ্গা কালীমন্দিরের মেঝেতে শুয়ে আছে আর মাথার কাছে বসে আছে একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ে। সন্ধ্যা আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে তার ডানহাতখানাকে টেনে নিয়ে বল্ল, "তুমি কে ভাই।"—"আমি আরতি—তুমি কথা কয়ো না ভাই, তোমার শরীর বড় দুর্ব্বল?" সন্ধ্যা একবার নিজের দু'টো হাতের দিকে চেয়ে দেখলে তারপর একবার মাথায় ও গলায় হাত দিয়ে বল্লে, "আমার গয়না?" "সব ডাকাত নিয়ে গেছে, তুমি ঘুমোও পরে সব বলব।" আরতি সন্ধ্যার মাথার চুলের ভিতর হাত বুলোতে লাগল—আস্তে আস্তে পাশ ফিরে সন্ধ্যা চোখ বুজল, সন্ধ্যার যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন দু'পুরের রোদ গড়িয়ে পড়েছে। আরতি বল্লে, "চল ভাই নেয়ে আসি তাহ'লে শরীরটা ঝর ঝরে হয়ে যাবে-খন।" সন্ধ্যা উঠে বসে বললে, "কিছু ভাল লাগছে না ভাই—তুমি যাও আমি এখানে শুয়ে থাকি।" মুখে বল্লে তুমি যাও কিন্তু ভয় ও ভাবনায় বুকের প্রত্যেকটী স্পন্দন তখন তার জোরে জোরে পড়ছিল।

আরতি শুনলে না, সন্ধ্যাকে টান্তে টান্তে পুকুর-ঘাটে নিয়ে গেল এবং জোর করে জলে নামিয়ে আঁজলা আঁজলা করে জল মাথায় থাবড়ে থাবড়ে দিতে লাগলো। নাওয়া শেষ হতেই মাথার চুল পোঁছাবার সময় সন্ধ্যা বল্লে "তুমি ছেড়ে দেও ভাই, আমি পুঁছছি?" আরতি সন্ধ্যার মুখ-খানি একটু তুলে ধরে বল্লে "তুমি বড় সুন্দর।" —"সুন্দর না ছাই" বলে সন্ধ্যা মুখখানা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে মুচকে হাস্লে।

সন্ধ্যার প্রশ্নে আরতি বল্লে—"এ কালী-মন্দিরটি ডাকাতদের। একমাস অন্তর তারা এখানে একবার করে আসে, তবে তাদের একজন অনুচর এই বনের ভেতর লুকিয়ে থেকে মন্দির পাহারা দেয় এবং আমাকে পালাতে দেয় না।" সন্ধ্যা বল্লে "তুমি এখানে কি ক'রে এলে ভাই?" ম্লান হাসি হেসে আরতি উত্তর দিলে, "আমাদের বাড়ী এখান থেকে ছয় ক্রোশ দূরে এক গ্রামে। এক বর্দ্ধিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-পরিবারে আমার বিবাহ হ'য়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে আমার স্বামী বিসুচিকা রোগে মারা যান। আমার শ্বাশুড়ী আমার অল্প বয়সেও আমাকে দেখে পুত্রশোক কিছুমাত্র ভুলবার জন্যে আমার সমস্ত গহনা ও শাড়ী-কাপড় ছাড়তে নিষেধ ক'রেছিলেন, আমিও তাঁর আদেশ মত গহনাগাটি পরে থাকতুম। কিছুদিন পরে এক-দিন অমাবস্যা রাত্রে আমাদের বাড়ী ডাকাত পড়লো ও আমাকে নিয়ে পালিয়ে গেল, আমার শ্বশুর আমাকে রক্ষা করতে গিয়ে ডাকাতদের হাতে প্রাণ হারালেন, আমি অজ্ঞান হ'য়ে পড়লাম। ডাকাতেরা আমাকে এই মন্দিরে নিয়ে এলো। আমার জ্ঞান হোলে ডাকাতদের সর্দ্দার আমাকে মা ব'লে সম্বোধন ক'রে বল্লে, "মা তোমায় এনেছি এই কালীমায় সেবার জন্যে, আজ থেকে এখানকার সমস্ত ভার তোমার, তুমি মায়ের সেবা কর। আমরা একমাস অন্তর অন্তর এখানে আসবো—তুমি কিন্তু পালাবার চেষ্টা করো না—তা হ'লেই বিপদে পড়বে।" সেই থেকে ভাই আজ সাতমাস আমি এই কালী-মন্দিরে আছি ও মায়ের সেবা করছি। আজ তোমায় পেয়ে কত যে আনন্দ হচ্ছে তা আর কথায় বল্তে পারছি না। আবার আশা হচ্ছে হয় তো মুক্তি পাবো।" আরতি চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগলো। সন্ধ্যা বল্লে, "কেঁদ না বোন—তোমার যে পুজোর সময় হ'য়ে গেল, চল ফুল তুলে আনি।" আরতি ও সন্ধ্যা সাজি নিয়ে বনে ফুল তুলতে চলে গেল।

অজয়ের শৈশবসাথী রাজেন। অজয়ের দেশ বলাগড়, সেইখানেই রাজেনের বাড়ী—অবস্থা খুবই ভাল,

বাপের এক ছেলে, কলকাতায় মেসে থেকে বি-এ, পড়ছে—পড়ার নামে অষ্টরম্ভা, কেবল আড্ডা ও মদ এবং পয়সার শ্রাদ্ধ। বহুদিন পরে বাল্যের গ্রাম্য সাথী রাজেনের দেখা পেয়ে অজয় বল্‌লে, "চল তোর মেসে যাই'।' টল্‌তে টল্‌তে রাজেন উঠে দাঁড়ালো এবং দু'জনে এসে ট্রামে উঠে পড়লো। কলেজ-ষ্ট্রীটের মোড় বরাবর এসে তারা ট্রাম থেকে নেমে সোজা একটী দোতালা বাড়ীর উপর তলায় উঠে এলো—এইটাই রাজেনের থাকবার আস্তানা।

নানান গল্পের মাঝে রাত বেড়ে চলেছে, অজয়ের সে-দিকে দৃষ্টি নেই। ঢং ঢং ক'রে বারটা বেজে গেল। একবার নিজের রিষ্টওয়াচটার দিকে তাকিয়ে দেখে সে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "অনেক রাত হয়ে গেল, আজ চলি রাজেন"। তারপর একটু থেমে আবার বল্‌লে, "মা হয় তো কত ভাবছেন।" রাজেন বল্‌লে, "আস্‌ছো তো? আমার কার্ড নিয়ে যাও"। বলে ডেস্ক খুলে নিজের একখানি কার্ড সে অজয়ের হাতে দিল। অজয় বাসা থেকে নেমে রাস্তায় গিয়ে একখানা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়লো।

অজয় ক্রমশঃ সব ছেড়েছুড়ে রাজেনের পিছু পিছু ঘুরতে আরম্ভ করে দিলে—পত্রিকার সম্পাদকরা জোর তাগিদ দিয়েও আর লেখা পায় না। পুস্তক-প্রকাশকেরাও নূতন বইয়ের জন্যে রোজই তাগিদ দিচ্ছে, দিনের পর দিন অপেক্ষা করে করে হতাশ হয়ে তারা ফিরে যাচ্ছে। যে সব বই দোকানে দেওয়া ছিল, তার প্রায় সব টাকাই অজয় নিয়ে নিয়েছে, বইও ফুরিয়ে এসেছে। রাজেনের সংস্পর্শে আজ মদ ধরেছে অজয়।

সে দিন শনিবার। সমীরের বৈঠকখানায় বিশ্বনাথ ও সমীর বসে গল্প কর্‌ছে, বিষয়-বস্তু অজয়ের প্রসঙ্গ। সমীর বল্‌লে, "অজয়বাবুকে মদ ছাড়াতেই হবে, অমন একটা ভ্যালুয়েবল লাইফ কি না নষ্ট হ'য়ে যেতে বসেছে!" বিশ্বনাথ বল্‌লে, "রাজেনের দোষ দেবো কি—তার মুখে শুন্‌লাম ওই ইচ্ছে করে মদ ধরেছে—অজয় আমাকেও বলেছে—'মদ খেলে আমি সব ভুলে যাই, বেশ থাকি বিশু!' কি বলব বলুন, তবে যদি সন্ধ্যাকে খুঁজে পাওয়া যায়, তা' হ'লে হয়-তো ও সব ছেড়ে দিতে পারে।" লীলা দু' কাপ চা নিয়ে এসে টেবিলের উপর রাখলে। সবে চায়ের কাপটি ধরে মুখে তুলতে যাবে—বিশ্বনাথ ও সমীর, এমন সময় অজয় দু'জনকে অবাক ক'রে সে ঘরে এসে হাজির হোলো। —"আরে অজয় বাবু যে—লীলা লীলা, চা নিয়ে আয়?" বলে সমীর একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলে।

—"মাকে নিয়ে দেশে যাচ্ছি বিশ্বনাথ!" অবাক হ'য়ে সমীর বল্‌লে, "দেশে?"— "হ্যাঁ, দেশে-জিরেট বলাগড় আমাদের দেশ—সেটাই আমাদের পৈতৃক ভিটে" বলে পকেট থেকে রুমালখানা বের ক'রে মুখখানা পুঁছে নিলে অজয়। বিশ্বনাথ বল্‌লে, "আমারও একবার দেশে যেতে ইচ্ছে করে কিন্তু পারি কই?" লীলা চা নিয়ে এলো। পাশ থেকে সে শুনতে পেয়েছিল—অজয় দেশে যাবে। সুতরাং বল্‌লে, "অজয়দা, আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন?" —"না লীলা, আমি দু' এক দিনের মধ্যেই ফিরে আস্‌বো—কি করব বল—মার জেদ্‌ অনেক দিন দেশে যাই নি, একবার যেতেই হবে, সুতরাং যেতেই হবে আগামী কাল।" সমীর বল্‌লে, "আগামী কাল?" —"হ্যাঁ আগামী কাল" বলে অজয় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলে—। লীলা চলে গেল বাড়ীর ভেতর। সুযোগ বুঝে সমীর বল্‌লে, "আচ্ছা অজয় বাবু, আপনি মদ খান কেন?" "মদ খাই কেন?" তারপর একটু হেসে বল্‌লে, "নিজেকে প্রকৃতিস্থ রাখবো বলে, মদ কি আমি খাই? মদে আমায় খায় সমীরবাবু"। তারপর আবার একটু থেমে বল্‌লে, "কিছু ভাল লাগে না ভাই, কেবলি যেন মনটা হু হু করে—কি করি মনটা তো অন্যমনস্ক রাখতে হবে তাই মদ খাই—বেশ থাকি।" সমীর বল্‌লে, "কবে আবার ফিরছেন তা'হলে? সিগারেটটা মুখে দিতে দিতে অজয় বল্‌লে, "এই তিন চারদিন বাদে—তুইও চল না বিশ্বনাথ।" একটু হেসে বিশ্বনাথ উত্তর দিলে, "আমার এখন যাওয়া হবে না, একটা কেস হাতে আছে।" এদিন নমিতা একবারও অজয়ের সামনে বেরুল না। এর পর আর কিছুক্ষণ থেকে অজয় ও বিশ্বনাথ উঠে পড়লো। সমীর দরজা অবধি এগিয়ে দিতে এসে বল্‌লে, "অজয়বাবু আপনি ক'লকাতায় ফিরে আমাদের এখানেই থাকবেন, বাড়ীতে আপনাকে থাকতে দেব না"। এমন সময় লীলাও সেখানে এসে পড়লো, বল্‌লে, "হাঁ, অজয়দা আপনাকে আমাদের বাড়ীতেই থাকতে হবে।" "আচ্ছা আচ্ছা" বল্‌তে বল্‌তে অজয় ও বিশ্বনাথ সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

পরের দিন বেলা এগারটায় অজয় ও অজয়ের মা হাওড়ায় ট্রেনে চেপে বস্‌লো। বিশ্বনাথ ও সমীর গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেল।

জিরেট ষ্টেশন থেকে প্রায় সাতমাইল গরুর গাড়ী করে গেলে তবে অজয়দের গ্রাম। জিরেটে নেমে অজয় গরুর গাড়ী ভাড়া করে মাকে নিয়ে তাতে উঠে বস্‌লো। দু'ধারে সবুজ ধানের ক্ষেত, মাঝখানে সরু আঁকা বাঁকা মেঠো পথ। দূরে রাখাল-বালকেরা বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে গান গাইছে।

"এই গাড়োয়ান, আর কতটা পথ বাকী আছে রে?" অজয় গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করলে। "এই মাঠটা পেরলেই হয় বাবু।" গাড়োয়ান উত্তর দিলে।

মাকে সব গোছগাছ করে দিয়ে দু'দিন বাদেই অজয় ক'লকাতায় যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মা বললেন,

"আর দুদিন থাক না বাবা।" "না মা, কাল আমায় কল্‌কাতায় যেতেই হবে"। মা আর আপত্তি করলেন না, কারণ, এদানীং তিনি ছেলেকে বেশ ভালরকমই চেনেন। পরের দিন আবার সেই গরুর গাড়ী করে অজয় ফিরে চল্‌লো কল্‌কাতায়। বুকের মাঝে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মনকে পাগল করে দিচ্ছে, আস্তে আস্তে সুটকেশটি খুলে অজয় মদের বোতল ও গেলাস বের করলে, তারপরে চল্‌লো গেলাস গেলাস মদ—একটু পরেই গাড়োয়ানকে ডেকে বল্‌লে, "এই গাড়োয়ান তুমি বে করেছ?" একগাল হেসে গাড়োয়ান উত্তর দিলে "বে আর করি নি বাবু।" তারপরে গাড়ী চালাতে চালাতেই হুঁকোয় একটি টান মেরে বল্‌লে, "এই গেল সনে খোকাকে সাড়ে চার বছরের রেখে বউ আমায় ছেড়ে চলে গেছে। কি সুন্দর বউ ছিল বাবু, আমি ক্ষেত থেকে কাম করে ফিরতে না ফিরতেই পান্তার থোরাটা আমার সামনে এনে হাজির করত—বড় ভাল বউ বাবু, বড় ভাল বউ"। তার পরে আবার জোরে হুঁকোয় একটা টান দিলে। গাড়ীর উপর বসে বসেই অজয় টল্‌তে টল্‌তে বল্‌লে, "হুঁ" তারপরে আবার এক গেলাস মদ ঢেলে ঢক্ করে খেয়ে ফেল্‌লে।

কোনরকমে কলকাতায় এসে টলতে টলতে একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করে সোজা বালিগঞ্জে সমীরদের বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করলে।

সমীরের বাড়ীর ফটকের সামনে গাড়ী থেকে নেমে ট্যাক্সি ড্রাইভারের হাতে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে টলতে টলতে অজয় গাড়ী-বারান্দার তলায় বেঞ্চিতে এসে বসে পড়লো। নমিতা উপর থেকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলো, বল্‌লে "একি, আপনি কখন এলেন, চলুন উপরে চলুন।" জড়িত কণ্ঠে অজয় উত্তর দিলে "সমীরবাবু কোথায়?"—"দাদা বেরিয়েছেন, চলুন আমি ধরচি উপরে চলুন।" "চলুন" বলে অজয় উঠে দাঁড়ালো। নমিতা হাত ধরতে যেতেই অজয় বল্‌লে, "ধরতে হবে না আমি মদ খেয়েছি কিন্তু মাতাল হই নি" হেসে নমিতা বল্‌লে "তাতো দেখতেই পাচ্ছি, তবু চলুন একটু ধরি—" অজয় আর প্রতিবাদ করলে না, নমিতা কোনরকমে অজয়কে ধরে উপরে নিয়ে এলো এবং একটা ঘরে এনে শুইয়ে দিলে।

আস্তে আস্তে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে নমিতা অজয়ের খাটের কাছে সরে এলো, তারপরে বল্‌লে, "আচ্ছা অজয় বাবু, আপনি মদ খান কেন?" হেসে অজয় উত্তর দিলে 'মদ খাই কেন? তুমি তো জান নমিতা, মদ খাই কেন? মদ না খেলে আমি বাঁচবো না—আমার জন্যে আজ একজন সমাজ, আত্মীয়, পরিজন সব ত্যাগ করেছে—আর আমি কি মদ খেয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে পারি না? পারি, সব পারি নমিতা।" শুষ্কমুখে নমিতা বললে "আমি আপনাকে মদ খেতে দেবো না, আপনার সুটকেশটা আমায় দিন।" তাড়াতাড়ি সুটকেশটা চেপে ধরে অজয় চেঁচিয়ে উঠলো—"মদ আমি নিশ্চই খাব বেশ করবো—দাও আগে আমার সন্ধ্যাকে এনে দাও, তবে মদ ছাড়বো।" নমিতা দেখলে হিতে বিপরীত হয়ে যাচ্ছে মদের নেশায় অজয়ের এখন জ্ঞান নেই সুতরাং উপস্থিত আর কিছু বলা সঙ্গত নয়, একটু চুপ করে থেকে বল্‌লে, "একটু চা খাবেন?" "চা—নিয়ে এসো" বলে পাশ ফিরে শুলো অজয়।

লীলা খবর পেলে অজয় এসেছে সুতরাং বল্‌লে "নমিদি অজয়দার চা-টা আমি নিয়ে যাচ্ছি—।" নমিতা বল্‌লে ভয়ানক মদ খেয়েছে আজ, তুই যাস্‌নি আমি যাচ্ছি—'তা থাক্ গে' বলে এককাপ চা ও কিছু হালুয়া নিয়ে লীলা এসে পা দিয়ে ভেজানো দরজাটা খুলে ফেলে ঘরে ঢুকে দেখলে অজয় ঘুমিয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে দু'বার ডাক্‌লে "অজয়দা অজয়দা" তার পরে সাড়া না পেয়ে টিপয়ের উপর চায়ের কাপ ও হালুয়ার ডিস্‌টি রেখে ভাল করে চাপা দিয়ে আস্তে আস্তে দরজাটি আবার ভেজিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নমিতা জিজ্ঞাসা করলে, "চা খেয়েছেন?" লীলা উত্তর দিলে—"না তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন; টিপয়ের উপরে চা-হালুয়া চাপা দিয়ে রেখে এসেছি।'

সমীর বাড়ীতে আসবামাত্রই লীলা বল্‌লে "দাদা, অজয়দা এসেছেন" "কোথায় রে"? বলে সমীর তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলো। লীলা বল্‌লে "বড় ঘরে ঘুমুচ্ছেন।" পা টিপে টিপে সমীর ঘরের দরজা খুলতেই নাকে এলো ভরভরে মদের গন্ধ। লীলাকে ইঙ্গিত করে বল্‌লে "মদ খেয়েছে নাকি রে?" "হ্যাঁ" বলে লীলা নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে, সমীরও গম্ভীর ভাবে চলে গেল নিজের ঘরে। [ক্রমশঃ
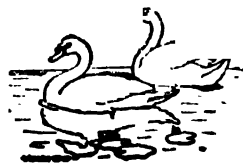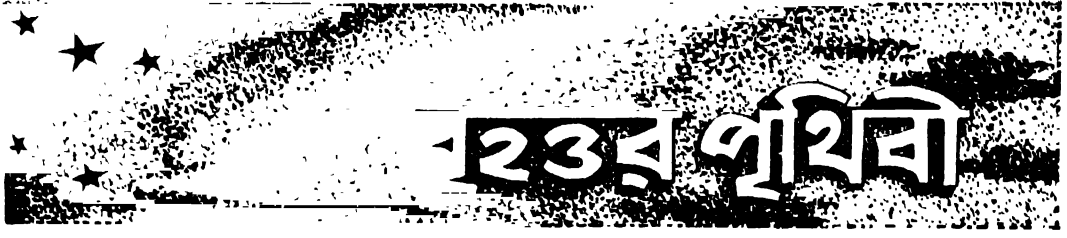
আমেরিকার জাগরণ

শ্রীতারানাথ রায় চৌধুরী

পারল্ হারবার আক্রমণ করিয়া জাপান যখন আমেরিকার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। তখন হঠাৎ দেশের সমগ্র সমাজ জীবনে একটা বিপ্লব জাগিয়া উঠে। লাটিন আমেরিকা কখনও ভাবে নাই, জাপান তাহাকে এমনভাবে আক্রমণ করিবে। এতদিন জাপান মিত্রতার ভান করিয়া আসিয়াছিল কিন্তু কি সাহসে জাপান খাস্ আমেরিকার রাষ্ট্র ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিল ইহাই ভাবিবার বিষয়। প্রসিদ্ধ মনরো ডক্ট্রিন (Monroe Doctrine) আজ হঠাৎ কোথায় ভাসিয়া গেল। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সমস্ত রাজ্যগুলি একযোগে এই সময় হঠকারিতার জন্য খেপিয়া উঠিল। জাপানের আক্রমণের তিন সপ্তাহের মধ্যেই কারেবিয়ান অঞ্চলের নয়টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ভেনিজুয়েলা, কলোম্বিয়া, এবং মেক্সিকো জাপানের সহিত রাষ্ট্রীয় সংস্রব ত্যাগ করিল। জাপান ও জার্ম্মানের যে সকল লোক ঐ সকল অঞ্চলে বাস করিতেছিল, তাহাদের কার্য্য-কলাপ বন্ধ করিয়া বসিল, দেখিতে দেখিতে সমগ্র আমেরিকায় একটা উত্তেজনা দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর অব্যাহত গতিকে বাধা দিবার জন্য পানামার পথে কড়া পাহারা বসিল। অল্প দিনের মধ্যেই মেক্সিকো এবং ব্রাজিলও যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বসিল।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জেম্স্ মনরো ঘোষণা করিল, দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনিশ উপনিবেশের বিদ্রোহে আমেরিকা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবে। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে রুষ-সম্রাট এক আদেশ জারী করিয়া জানান যে আমেরিকার উত্তর পশ্চিম সমুদ্রতীরের পূর্ব্বর্তী সমুদ্রে কোন জাতিই জলযান চালাইতে পারিবে না এবং মাছ ধরিতে পারিবে না। এই আদেশ বেরিং প্রণালীর দক্ষিণাংশেও প্রযোজ্য হইবে। কিন্তু ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মনরো এই আদেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া পরিষ্কার ভাবেই ঘোষণা করে—অন্য কোন দেশের ঔপনিবেশিক আইন-কানুনের মধ্যে তাহারা নাই।

অপর দিকে অষ্ট্রিয়া, রুশিয়া এবং প্রুসিয়ায় ফরাসীর সহিত যোগদান করিয়া স্পেনের উপনিবেশ গুলি দখল করিতে প্রয়াস করে, স্পেনের উপনিবেশগুলি তখন স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মনরো সাহেব মন্ত্রিসভায় স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন—

"As a principle in which the right and interests of the United States are involed, the American continent by the free and independent condition which they have assured and maintain are henceforth not to be considered subjects for future colonisation by any European power."

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মনরো সাহেব স্পষ্টই বলিয়াছেন ভবিষ্যতে কোন ইউরোপীয় শক্তিকেই আমেরিকার কোন অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিতে দেওয়া হইবে না।

তারপরও তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছিলেন আমাদের এই পশ্চিম গোলার্দ্ধের উপর যদি কেহ আক্রমণ চালায় বা কোন প্রকারে শান্তি ভঙ্গ করে তাহা হইলে আমাদের আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে কোন দ্বিধা থাকিবে না। তিনি পুনঃ পুনঃ ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন :—

"It is still the true policy of the United States to leave the parties to themselves, in the hope that the other powers will pursue the same course."

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্য (ইউনাইটেড ষ্টেট্স্) লাটিন আমেরিকার অন্যান্য প্রদেশগুলির সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয় এবং বাণিজ্য করিবার চুক্তি করে। সেই অবধি সেই চুক্তির শর্ত্তানুযায়ী আজও আমেরিকার রাষ্ট্রব্যবস্থা অটুট আছে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যুক্তরাজ্য আমেরিকার অন্যান্য প্রদেশগুলির সহিত মিত্রতা করিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

Keep hands অর্থাৎ দূরে থাক। যুক্তরাজ্য বরাবরই ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জকে বলিয়া আসিয়াছে, পশ্চিম গোলার্দ্ধ হইতে তোমরা দূরে থাক। কখনও কোনপ্রদেশে রাজ্য-বিস্তারের চেষ্টা করিও না। অনেকেই জানেন ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্পেনিস যোদ্ধা হার নেনডো কর্টিজ মেক্সিকো রাজ্য দখল করে, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে মেক্সিকো স্পেনিস উপনিবেশ বিদূরিত করিয়া স্বাধীন দেশে পরিণত হয়। ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ যখন যেখানে পারিয়াছে অস্ত্র বলে ও ছলে

বলে অন্যের দেশ দখল করিয়াছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মনরো সাহেব তীব্রভাবে উহার প্রতিবাদ করে।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট মনরো নীতির সমর্থন করিয়া কংগ্রেসকে এক গুরুত্বপূর্ণ বাণী প্রেরণ করে।

স্পেনিস আমেরিকান যুদ্ধে (Platt) চুক্তি অনুযায়ী যুক্তরাজ্য কিউবা দখল করে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন পানামা গঠিত হয়। যুক্তরাজ্য (U. S.) তাহাও সমর্থন করে। এই সময়েই পানামা রাজ্য যুক্ত রাজ্যকে পানামা খাল কাটাইতে অনুমতি দেয়। পানামা নিজের স্বার্থের জন্য ইহা করে নাই, সমগ্র লাটিন আমেরিকাকে রক্ষা করিবার জন্যই পানামা খালের প্রয়োজন হইয়াছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে Central American Peace Conference-এ স্থির হয় নিকরাগুর রাজ্যের ডিক্টেটারকে সরাইয়া যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দ হাইতি এবং ডোমিনিকানতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাজ্যের অধিকারে আসে। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে যুক্তরাজ্য সাম্রাজ্য বিস্তারে অধিকতর মনোযোগ দেয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে নিকারাগুর-রাজ্যে আমেরিকা যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ৫০০০ হাজার নৌসৈন্য ও নাবিক নিকারাগুয়ায় প্রেরণ করে। এই সময় দেখা যায় ধীরে ধীরে সমগ্র পশ্চিম গোলার্দ্ধের উপরে কি করিয়া যুক্তরাজ্যের প্রভাব বিস্তার হইতে থাকে। লাটিন আমেরিকা যুক্তরাজ্যের এই শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর নীতির প্রতিবাদ করে। ফলে আর্জেন্টাইন্‌, ব্রাজিল এবং চিলি মেক্সিকোর ব্যাপারে যুক্তরাজ্যের মধ্যে সালিশী করিয়া বিবাদ মিটাইয়া দেয়। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট উইলসনও মেক্সিকোর গোলমাল মিটাইতে মনোনিবেশ করে।

সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে যুক্তরাজ্য

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাস পাঠ করিলেই দেখা যায় গত ৫০।৬০ বৎসরে কি করিয়া যুক্তরাজ্য সাম্রাজ্যবাদীদের দলে ভিড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৯২৯-৩১ খৃষ্টাব্দের ইতিহাসে হেনরী, এল ষ্টিমসন, তদানীন্তন যুক্তরাজ্যের সেক্রেটারী অব্‌ ষ্টেট যুক্তরাজ্য ও লাটিন আমেরিকার সাম্রাজ্যগত স্বার্থের কিরূপ অদল বদল করেন। এই সময় মিঃ হুভার যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে নিকরোগুর হইতে যুক্তরাজ্যে সৈন্য সরাইয়া আনে। ১৯২৮ এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে নিকারগুয়াতে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হয়, যুক্তরাজ্য খুব মনোযোগের সহিত সেই নির্ব্বাচনের ফলাফল দেখে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে হাইতির শাসনভারও যুক্তরাজ্য পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়া সৈন্যসংখ্যা কমাইয়া ফেলে। দেনা পাওনা লইয়াও যুক্তরাজ্য আর কোন কথা তোলে নাই।

প্রথম হইতে দেখা যায়, সাম্রাজ্য বিস্তারের চেয়ে ব্যবসার প্রসারই যুক্তরাজ্যের অন্যতম নীতি। যদিও ঘটনা চক্রে যুক্তরাজ্যকে অনেকগুলি রাজ্য দখল করিতে হইয়াছিল তবুও যুক্তরাজ্য বলিতে চায় তাহারা সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষপাতী নহে। যুক্তরাজ্যই একদিন বলিয়াছিল, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অকস্মাৎ তাহাদের হাতে আসিয়াছে। বাণিজ্য নীতির মধ্যে রাজ্যবিস্তারের সঙ্কল্প না থাকিলেও আপনা হইতেই তাহা আসিয়া পড়ে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়া একদিন নবাব বাদসাহগণের পদতলে নতজানু হইয়া বসিয়াছিল, তারপর কোম্পানীর তুলাদণ্ড শেষে রাজদণ্ডে কিভাবে পরিণত হইল তাহা সকলেই জানেন। যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য বিস্তারের মধ্যেও সাম্রাজ্য বিস্তারের বীজ নিহিত রহিয়াছে, ফিলিপাইন অধিকারেও আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। বর্ত্তমান বিশ্বযুদ্ধেও যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মনরো-নীতির সমর্থক কিনা তাহা ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে কিন্তু মিত্র পক্ষের সহিত যোগ দিয়া আমাদের দেশেই আজ যে "Army occupation" সৈন্যসংরক্ষা চলিতেছে উহার পরিণাম কি ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

আমেরিকার জাগরণের ইতিহাসে পূর্ব্ব গোলার্দ্ধের সহিত পশ্চিম গোলার্দ্ধের সম্বন্ধ ঠিক কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে ভগবান জানেন। আমরা চঞ্চল চিত্তে খুব আশঙ্কার সহিত আজ এই যুক্তরাজ্য-সৈনিক পরিস্থিতির বিষয় চিন্তা করিতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছি।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট মিঃ রুজভেল্ট যুক্তরাজ্যের শাসন তরণীর প্রধান কর্ণধাররূপে নির্ব্বাচিত হন। আজ ইউরোপ ও রাসিয়ার "দরিয়া"সমূহে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধতরণী নানা সমর ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতেছে, এসিয়ার রণাঙ্গণে আজ যুক্তরাজ্যের সৈন্যগণই মিত্র পক্ষের প্রধান রক্ষক; আমাদের দেশ রক্ষার ভার আমাদের হাতে না দিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যুক্তরাষ্ট্রের সৈনিকদের হাতে আমাদের রক্ষার ভার তুলিয়া দিয়াছেন। নাবালক আমাদের রক্ষার ভার নিউইয়র্ক ও বোষ্টনের স্কুলের বালকদের হাতে দিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলাণ্ড এবং কানাডার জনসাধারণের হাতে দিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে নিশ্চিন্তে "রণপয়োধীর লহরী" গুণিতে অভ্যাস্ করাইতেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক জাগরণ তাই আমাদের পক্ষে উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিয়াছে

বিটোফেন

শ্রীসুধীর কুমার মজুমদার

সারা ইউরোপ যাঁর গানের প্রতিধ্বনিতে একদিন আলোড়িত হোয়ে উঠেছিল' সেই বিটোফেনের কথা আজকে আমি বোলব'।

রাইন নদীর তীরে বন্‌সহরের কোনও এক রাস্তার ধারে ছোট্ট একখানি বাড়ী। তারই ভিতরে ছোট্ট একটি ছয় কি সাত বছরের ছেলে বোসে পিয়ানো বাজাচ্ছে। পেছনে দাঁড়িয়ে তার বাবা; কোনও সময়ে তাকে হাতে ধরে শেখাচ্ছেন, কখনও শুধু নির্দ্দেশ দিচ্ছেন, আবার সময় বুঝে ধমকাচ্ছেন। ছয় কি সাত বছরের ছোট্ট ছেলের পক্ষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনি কোরে অনুশীলন নেওয়া সত্যিই খুব বিরক্তিকর। কিন্তু উপায় নেই। "লাডউইক কোথায়?" তার বাবা হয় তো জিজ্ঞাসা করেন, "আজকে পিয়ানোয় বসে নি কেন?" যেখানেই থাকত বেচারা, তাকে টেনে নিয়ে এসে পিয়ানোয় বসান হোত। এক্ একদিন এমনিও হোয়েছে বিটোফেনের বাবা হয় তো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প গুজব কোরছেন, রাত বহু হোয়ে গেছে; ছোট্ট লাডউইক্ চোখের পাতা টেনে রাখ্‌তে না পেরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছে কিন্তু পিতা ফিরে যখন দেখতে পেলেন যে লাডউইক্ পিয়ানোর আসনে নেই তখন তিনি ভীষণ চ'টে গিয়ে লাডউইককে ঘুম থেকে তুল্‌লেন। সে বেচারা ঘুম জড়ান চোখে শীতে কাঁপতে কাঁপতে পিয়ানোয় এসে বসলো। তারপর চল্‌ল গানের অনুশীলন একের পর এক, সুর পিয়ানোর এ পর্দ্দা থেকে ও পর্দ্দায় গিয়ে সারা বন্‌সহরের গভীর নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে তুলতে লাগল। সকলেই ভাববে বাঁধা ধরার মাঝে বিটোফেনের উৎসাহ হয় তো দু'দিন পরে নিভে যাবে। কিন্তু তাই কি? বড় যারা হয়; মানুষ বোলে পৃথিবীর বুকে যাদের ছাপ পবে তাদের উৎসাহ কি এত শীগ্‌গিরই নিঃশেষ হোয়ে যায়? তাদের উৎসাহের প্রস্রবন যে অনন্ত—অফুরন্ত। বিটোফেনের সঙ্গীত অনুরাগ তাই দিনের পর দিন বেড়ে চল্‌ল।

ছেলেবেলায় লাডউইকের দিনগুলো বড় কষ্টে কেটেছে। গানের অনুশীলন নিতেই তাঁর প্রায় সব সময় চলে গেছে, তাই অন্য কোনও শিক্ষার অবসর বা অবকাশ খুব কমই মিলেছে। সাধারণ পড়া, লেখা আর অঙ্ক শেখার পরে তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনা হোয়েছে। তাই শেষ বয়েসে তিনি বহুবার বহুক্ষেত্রে লজ্জায় পড়েছেন। বানান্ কোরতে পারতেন না ভাল কোরে। শোনা যায়, ৪৪কে তিনি ২২ দিয়ে গুণ কোর্‌তে পারতেন না, লম্বা কাগজে ৪৪কে ২২ বার লিখে তাকে যোগ কোর্‌তে হোত।

এই আঁধার ঘেরা এক ঘেয়ে দিনগুলোর ভিতর লাডউইকের মার জন্মদিন ছিল' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ফ্রাউ বিটোফেনকে সেদিন বেশী কাজ কোর্‌তে দেওয়া হোত না, তিনি যেন পরিশ্রান্ত এমনি ভাব সকলে দেখিয়ে তাঁকে তাড়াতাড়ি শুতে পাঠান হোত। ভদ্র মহিলাও সত্যি সত্যি তাড়াতাড়ি গিয়ে তার বিছানায় শুয়ে পড়তেন। তখন নীচের তলার লোকেরা বড় আরাম চেয়ারটা সিল্কে ঢেকে লাডউইকের ঠাকুরদার ছবির নীচে রাখতেন, ফুলদানিগুলোতে দেওয়া হোত টক্‌টকে লালফুল। সামনের দরজা খুব আস্তে আস্তে, খোলা হোত। তারপর আরম্ভ হোত ফ্রাউ বিটোফেনের জন্মদিন গাঁথা। ফ্রাউ বিটোফেন তাড়াতাড়ি নীচে নাবতেন, তারপর তাকে শোভা যাত্রা কোরে বড় Arm Chairএ বসান হোত। গানে গানে সারা সন্ধ্যা মুখরিত হোয়ে উঠত।

চৌদ্দ বছর বয়সে লাডউইক্ সহকারী অর্গান বাদক হিসাবে রাজসভায় স্থান পেলেন। বিটোফেন্ পরিবারে তিনি উপার্জ্জনক্ষম সভ্য হোলেন।

সতেরো বছর বয়সে তিনি তাঁর গানের কদর বোঝাবার জন্য ভিয়েনা সহরে উপস্থিত হন। বিশ্ববিশ্রুত সঙ্গীতজ্ঞ মোৎসার্ট তখন ভিয়েনায়। লাডউইক্ তারই কাছে গেলেন নিজের গানের ত্রুটি বিচ্যুতি ধরবার জন্য। মোৎসারট্ অল্প বয়সে সঙ্গীত অনুশীলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু বিটোফেন যখন সারা অন্তর দিয়ে সেই স্মরণীয় সন্ধ্যার গাঁথার পর গাঁথা রচনা কোরে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি কোরলেন তখন সেই বিশ্ব বিশ্রুত সঙ্গীতজ্ঞ মোৎসারট অন্য অন্য শ্রোতার দিকে চেয়ে প্রশংসা ভরা কণ্ঠে বোল্‌লেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, এই বালকের সঙ্গীতের প্রশংসায় সারা বিশ্ব একদিন কাকলী তুলবে।" মনীষীর বাণী উত্তরকালে সত্যিই সফল হোয়েছিল।

এরপর বিটোফেনের মনে শুধু একটি বাসনাই রইল মোৎসারটের কাছে গিয়ে সঙ্গীত শিক্ষা করা। কিন্তু যখন তিনি সত্যি ভিয়েনায় এলেন তখন মোৎসারট আর ইহজগতে নেই। এরপর তিনি জোসেফ্ হেডেনের কাছে শিক্ষা সুরু কোর্‌লেন। গুরুশিষ্যের বনিবনা হোল' না। হেডেন ছিলেন বৃদ্ধ আর তারপর নিজের কাজ নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাক্‌তেন, আর বিটোফেন তখন যুবা, গর্ব্বিত আর সহজে রেগে যেতেন। কিন্তু তাঁর ভিয়েনা জীবন সফল হোল। তাঁকে ভিয়েনাবাসী সম্মান জানাল, সারা ভিয়েনা সহরের অধিবাসীদের গৃহের দরজা সারাক্ষণ তাঁর জন্য উন্মুক্ত ছিল। খেয়াল মাফিক্ তিনি আসতেন, খুসীমত চলে যেতেন। রাজা, যুবরাজেরা তাঁর সঙ্গ কামনা করতেন, তাঁকে সম্মান জানাত, শ্রদ্ধা করত। প্রিন্সেস্ লিচোনোস্কি সম্বন্ধে তিনি একজায়গায় বোলেছেন, "পাছে অ-রসিকরা আমাকে ছুঁয়ে অশুচি কোরে ফেলে এই ভয়ে রাজকুমারী কাঁচের বাক্সে ভরে রাখ্‌তে চাইতেন।" কিন্তু লাডউইক্ একটু লাজুক ছিলেন। আর মাঝে মাঝে তাঁর শিক্ষার ফাঁক সম্বন্ধে বড় বেশী সচেতন হোয়ে গিয়ে এই সঙ্গ থেকে পালাবার চেষ্টা কোর্‌তেন। এর সঙ্গে অবশ্য তাঁর স্বাধীনতা যোগ কোরে দেওয়া যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর তখন শেষ ভাগ, সারা ফ্রান্স জুড়ে চ'লেছে বিপ্লবের আলোড়ন। বিখ্যাত সেনাপতি নেপো-লিয়ান রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা কোর্‌ছেন। বহু যুবক তখন নেপোলিয়ানের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন স্বাধীনতা ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। আমাদের বিটোফেন তার থেকে বাদ যান নি। তাই সেই মানসবীর নেপো-লিয়ানের উপর তিনি এক গাঁথা রচনা করেছিলেন, সেই গাঁথার নামকরণ হোয়েছিল "বোনাপার্টি গাঁথা।" কিন্তু "বোনাপার্টি গাঁথা" হিসাবে সেটা আমরা পাইনি, তার কারণ বিটোফেন যখন এই গাঁথা রচনা করেন তখন নেপোলিয়ান সবে First Consul ; কিন্তু পরে যখন বিদ্রোহী নেপোলিয়ন সাধারণ তন্ত্রকে অবজ্ঞায় দূরে সড়িয়ে সম্রাট হোয়ে রাজতক্তে বোস্‌লেন, সেদিন তাঁর সমস্ত শ্রদ্ধা ঘৃণায় পর্য্যবসিত হোল'। ব্যথাভরা কণ্ঠে তিনি বললেন, "এই কি বিদ্রোহী নেপোলিয়ন? এ যে মনুষ্যত্বের দাবীকে উপেক্ষা করে, মানুষকে অশ্রদ্ধা করে।" তিনি ছুটে গিয়ে সেই গাথাকে টুক্‌রো টুক্‌রো কোরে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। "বোনাপার্টি গাঁথা" আর রইল না, তার পরিবর্ত্তে আমরা পেয়েছি Heroic Symphony বা বীর গাঁথা।

এই সময়ে বিটোফেনের গাঁথার পর গাঁথা সৃষ্টি হোতে লাগল, সৃষ্টির নেশায় তিনি ভরপুর হোয়ে রইলেন। কিন্তু ঠিক এই সময়েই এল বিধাতার নিদারুণ অভিশাপ। সঙ্গীতজ্ঞ বিটোফেন বধির হোতে আরম্ভ হোলেন। প্রথমে অল্প তারপর মনের অস্বোয়াস্তি চেপে রাখতে না পেরে ঘন ঘন ডাক্তারের কাছে যাওয়া, শেষে সম্পূর্ণ ভাবে বধির হোয়ে গেলেন। কি নিষ্ঠুর পরিহাস! তিনি একদিন চীৎকার কোরে বোলেছিলেন, "হা ভগবান, যদি আমি এ নিদারুণ অভিশাপ থেকে মুক্ত হোতে পারতাম! বধিরতা থেকে তিনি মুক্ত হোতে পারেন নি ; কিন্তু এ বধিরতা সত্বেও তিনি সুন্দর সুন্দর গাঁথা রচনা কোরে গেছেন। সারা বিশ্বকে বিটোফেন গানে গানে ভরিয়ে দিয়ে গেছেন। সেক্সপিয়ার, হোমার মাইকেল এন্জেলোর মত তিনি কোনও নির্দ্দিষ্ট জাতির নন, তিনি সর্ব্বকালের সর্ব্বজাতির। শেষ বয়স তার বড় কষ্টে গেছে, সমস্ত অর্থ তিনি পরিবারের উপর নিঃশেষে দান কোরে গেছেন, একদিকে অর্থের অনটন অন্য দিকে বধিরতা। বন্ধু বান্ধবরা এলে এক টুকরো কাগজ আর পেন্সিল এগিয়ে দিয়ে তাদের বক্তব্য লিখে দিতে বোলতেন, আর সাধারণতঃ তার জবাব তিনি মুখে মুখে দিতেন। প্রশ্নের বহু টুকরোই সংরক্ষিত আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় বিটোফেনের উত্তর তাতে লেখা নেই। এক টুকরো কাগজ আজও আছে যার থেকে আমরা সত্যি মনের পরিচয় পাই ; সে মন নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে সচেতন। সেই কাগজের টুকারায় কেউ লিখেছিলেন, "শ্রোতারা কিন্তু আপনার কালকের concert ঠিক তেমনি ভাবে উপভোগ করেন নি।" তার উত্তরে তিনি বোলেছিলেন, "সময় এলেই তারা বুঝতে পারবে, নিজেকে আমি চিনি, আমি স্থির জানি যে আমি একজন শিল্পী।'' এ প্রতিভা বোধ হয় পৃথিবীতে একবারেই জন্ম গ্রহণ কোরেছে। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করি, এ প্রতিভা যেন আবার জন্ম গ্রহণ কোরে সারা বিশ্বকে রসের সন্ধান দেয়।

ভাগবত ধর্ম্ম—(শ্রীনবযোগীন্দ্র-সংবাদ)—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, অনূদিত ও ব্যাখ্যাত—'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক লিখিত 'গ্রন্থাভাস'-সংবলিত—প্রকাশক—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ, প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস্, ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা কাগজের বাঁধাই—ডবল-ক্রাউন ষোলপেজী—পৃষ্ঠ সংখ্যা ৪+১৮+১৭০—প্রথম সংস্করণ—দীপালী ১৩৫০—মূল্য—১৸০।

শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণের একাদশ স্কন্ধের প্রথমাংশ হইতে এই গ্রন্থখানির বিষয়-বস্তু সংগৃহীত হইয়াছে। মহারাজ নিমির সহিত ঋষভদেবের নয়জন আত্মজ্ঞানী পুত্রের যে অধ্যাত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল, বসুদেবের প্রশ্নে দেবর্ষি নারদ তাহা বিবৃত করেন। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৮ সংখ্যক শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চম অধ্যায়ের ৪৪ সংখ্যক শ্লোক পর্য্যন্ত সেই নিমি-নবযোগীন্দ্র-সংবাদ সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থকার উহাই এ গ্রন্থখানির প্রতিপাদ্য বিষয়-রূপে সংগ্রহ করিয়াছেন।

সাধারণতঃ, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকগণ যে ভাবে এই মহা-গ্রন্থের ব্যাখ্যাদি করিয়া থাকেন, তাহাতে বোধ হয় "দ্বৈততত্ত্বই" বুঝি "একমাত্র তত্ত্ব"; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে—শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তি-গ্রন্থ হইলেও অদ্বৈত-সিদ্ধান্তেরই আকর। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার বর্ত্তমান গ্রন্থখানিতে উহাই প্রতিপাদনের প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার এই ব্যাখ্যান-পদ্ধতি যথার্থ শাস্ত্র-সঙ্গত—এ কারণে আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে। তবে গ্রন্থকার গ্রন্থখানির ত্রয়োদশ পৃষ্ঠায় 'মিথ্যা' বলিতে 'অলীক' বুঝিয়াছেন—ইহা অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত-বিরোধী। মিথ্যার সাময়িক ব্যাবহারিক অস্তিত্ব আছে, পারমার্থিক অস্তিত্ব অবশ্য নাই। কিন্তু অলীকের কোনরূপ (ব্যাবহারিক বা প্রাতিভাসিক) সত্তাই নাই—পারমার্থিক ত দূরের কথা।

গ্রন্থ-মধ্যে প্রথমে মূল ভাগবতের শ্লোক, পরে অন্বয়-মুখে বঙ্গানুবাদ, পরে মূলানুবাদ ও তৎপরে গ্রন্থকার-রচিত 'অনুধ্যান'-নামক বঙ্গভাষা-ময়ী ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথমে 'গ্রন্থ-পরিচয়' ও 'গ্রন্থাভাস', আর গ্রন্থান্তে 'গ্রন্থের সারসঙ্কলন' নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। গ্রন্থখানিতে মুদ্রাকর-প্রমাদ কিছু কিছু দৃষ্ট হইল। এ সকল ক্ষুদ্র ত্রুটী বর্জ্জিত হইলে গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবে আশা করা যায়।

—"দেবানাং প্রিয়ঃ"

একটা কথা

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গশ্রী—শ্রীদুর্গা সংখ্যা—১৩৫০ হাতে পড়ল। বেশ মন দিয়ে পড়তে লেগে গেলুম। বেশ লাগছে। পড়তে পড়তে শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী ম'শায়ের "সমীপেষু"তে পৌঁছে গেলুম। ব্র্যাকেটে 'কৌতুক-চিত্র'। রোজকার কয়লা আর করলার হিসেব করতে করতে মন-টন বিগড়ে যায়। আসল একটু কৌতুক পেলে ভাত, ডাল, তরকারীর মধ্যে চাটনীর আমেজ আসে। সুতরাং বেশ আগ্রহান্বিত হয়েই সুরু করলুম "সমীপেষু"। শেষও করলুম। শেষ করবার আগেই, অনেক আগেই, ধরুন প্রায় সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে, মনে হয়েছিল ঠিক এমনি একটা গল্প কোথায় আগে পড়েছি। তাই শেষ করেই যখন ধরতে পারলুম গল্পটা প্রায় হুবহু নকল করা তখন ধোঁকা লাগল। অখিলবাবু পুরোনো লেখক, পাকা লেখক। সুতরাং 'ফুটনোটে' 'ছায়াবলম্বনে' ইত্যাদি একটা কিছু নিশ্চয় আছে। কিন্তু তাও নেই। অর্থাৎ অখিলবাবুর নিজের মৌলিক লেখা। কিন্তু তা ত' নয়! Decobra Manrile-এর "Crimson Smiles"-খানা তাকেই ছিল। পেড়ে বসলুম। রাশিয়ার রসস্রষ্টাদের উড়িয়ে দেওয়া কৌতুক-কণাগুলি তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন—পৃথিবীর লোকদের শোনাবার জন্যে। শক্তিশালী হাস্যরস পরিবেশক Anton Tchekhov-এর নাম জগৎ বিখ্যাত। "সমীপেষু" Anton Tchekhov-এর "Candelabra"-র নকল জিনিষ। অখিলবাবু ওটা লিখে জানালেই গোল মিটে যেত।

গিরিশ-জন্ম-সংখ্যা

ফাল্গুন—১৩৫০

সম্পাদক

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

গিরিশ-জন্ম-সংখ্যা

বিগত গিরিশ-সংখ্যার চিত্র-পরিচয়

বিগত গিরিশ-সংখ্যায় স্বর্গত মহাকবি গিরিশচন্দ্রের অর্দ্ধশায়িত অবস্থার যে চিত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ইহার পূর্ব্বে আর কোন গ্রন্থে বা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। উহার মূল আলোকচিত্রখানি গিরিশ-সংখ্যার সম্পাদক প্রবীণ সমালোচক ও সাহিত্যিক শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের নিকট আছে। তাঁহারই সৌজন্যে আমরা চিত্রখানি প্রথম প্রকাশ করিবার অবসর পাইয়াছি—এ কারণে তাঁহার নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

বর্ত্তমান সংখ্যার পরিচয়

ফাল্গুন মাস গিরিশচন্দ্রের জন্মমাস। এ কারণে ফাল্গুন-মাসের সংখ্যাতে আমরা অমরেন্দ্র বাবুর সঙ্কলন গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলীর "চরিতাভিধান" প্রকাশ করিলাম। এই সঙ্গে শ্রীপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'চিন্তামণি' প্রবন্ধ, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়দিগেরও গিরিশচন্দ্র-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইল।

"বঙ্গশ্রী"—সম্পাদক

গিরিশচন্দ্র

সমাজের মধ্যস্তরে যাহারা পেয়েছে ঠাঁই
বর্ণ জাতি কুলে,
বাণী বামা ন'ন বটে কমলা যাদের পানে
চান নাক' ভুলে,
শত শত গূঢ় ব্যথা তাদের জীবন-সত্তা
করেছে বিক্ষত,
সমাজের উৎপীড়নে শাস্ত্রের শস্ত্রের ঘায়
তাহারা বিব্রত।
সকল লাঞ্ছনা গ্লানি লোক-ভয়ে মুখ বুজে
লুকাইয়া রাখে,
ঢাকিবার সজ্জা নাই, যত ক্ষতি যত ক্ষত
লজ্জা দিয়া ঢাকে।
কে চায় তাদের পানে? কারো প্রাণ কাঁদে নি কো
তাহাদের দুখে,
মাপিয়া দেখে নি কেহ কত যে গভীর ব্যথা
তাহাদের বুকে।
তাহাদেরই একজন হে গিরিশ, পুণ্য-শ্লোক!
তোমার হৃদয়
কাঁদিল তাদের তরে আজ তারা প্রাণ ভ'রে
গাহে তব জয়।
যারা বক্ষে পুষে ব্যথা তাহাদের মূক মুখে
যোগাইলে ভাষা,
যারা দীন আশাহীন তাহাদের বুকে বুকে
সঞ্চারিলে আশা।

তাতাইলে মাতাইলে অলস জড়িমা মাঝে
দিলে উদ্দীপনা,
নিরানন্দ বঙ্গভূমে দিলে তুমি রসানন্দ
আশ্বাস, সান্ত্বনা।
অলস আনন্দ দিয়া ভুলায়ে রাখ নি শুধু,
লোক-গুরু তুমি,
তব রঙ্গমঞ্চ-মঠে অর্চ্চনা লভেছে নিত্য
মাতা বঙ্গভূমি।
দিলে পরমার্থ ধন মহান্ আদর্শ-ধারা
ধর্ম্ম-নীতি পথে,
আনন্দের সাথে সাথে যা দিয়েছ, নাই তার
তুলনা জগতে।
পরমহংসের বাণী লভেছে জীবন্ত রূপ
তব সাধনায়,
লক্ষ লক্ষ বক্ষ আজি হে গুরু, কৃপায় তব
নব দীক্ষা পায়।
যখন তোমার এই, অধ্যাত্ম-দানের কথা
ভক্ত-চিত্তে ভাবি
ভুলে যাই মহাপ্রাণ, কতখানি আছে তব
সাহিত্যের দাবি,
ভুলে যাই কত বড় তুমি কবি নাট্যকার
সে সব বিচার,
প্রণত হইয়া পড়ে আমার উদ্ধত শির
উদ্দেশে তোমার।

শ্রীকালিদাস রায়

মহাকবি গিরিশচন্দ্র

গিরিশচন্দ্র বহু নাটক, সঙ্গীত ও প্রহসন লিখিয়া বাঙ্গালী জাতির ধর্ম্ম, জাতীয়তা, দেশাত্মবোধ,কৃষ্টি সম্বন্ধে যে অসাধারণ হিতসাধন করিয়াছেন, অন্য বিষয়ে উপেক্ষা করিলেও কেবল এই জন্যই তাঁহার 'মহাকবি' উপাধি যোগ্যপাত্রে নিয়োজিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চ বাঙ্গালীর অমূল্য সম্পদ্ বাঙ্গালী রঙ্গমঞ্চ হইতে কতবার জাতির মুক্তির সন্ধান পাইয়াছে, ধর্ম্ম শিখিয়াছে, ইতিহাস বুঝিয়াছে, কর্ম্মের সন্ধান পাইয়াছে আজ তাহার হিসাব নিকাশ লইয়া একখানি বিরাট্‌গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চ বাঙ্গালীর একটা প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র —প্রকৃত-সাহিত্য মন্দির,জাতীয়তার মহা-বিদ্যালয়। আর এই বিদ্যালয়ের জনকই গিরিশচন্দ্র। কেবল সৃষ্টি করিয়াই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য সমাধা করেন নাই। ইহাকে উন্নতির উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

কিন্তু আজ রঙ্গমঞ্চের দুর্দ্দশার অবধি নাই। বিদেশীয় অনুকরণে এখন উহাতে নানারূপ কু-শিক্ষাই প্রচার হইতেছে। একদিকে সিনেমা-বায়স্কোপ, অন্যদিকে পাশ্চাত্ত্য তরল সাহিত্য—এই উভয়ের সংমিশ্রণে আজকাল নাটক অনুকৃত কদর্য্য সাহিত্য ভিন্ন আর কিছুই নয়। অভিনেতা এখনও বেশ আছে, কিন্তু অভিনয়োপযোগী নাটকের অভাব হইয়াছে। লোকে আমোদের জন্য নাটকাভিনয় দেখিতে যায়, কিন্তু ডোবায় অবগাহন করিয়া ফিরিয়া আসে। কোন উচ্চভাব লইয়া আসিতে পারে না, যাহা শিখিয়া আসে তাহা পাশ্চাত্ত্যের দুর্গন্ধ ভিন্ন আর কিছুই নয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎ-চন্দ্রের উপন্যাস লইয়া মারামারি চলিতেছে। কিন্তু এক সময়ে এই বঙ্কিমের উপন্যাস যখন নিঃশেষিত হইয়া যায়, তখনই নাটক লিখিবার গুরুভার গিরিশচন্দ্র নিজস্কন্ধে স্বয়ং গ্রহণ করেন। আজ নাটকের অভাব, তাই বঙ্কিমের উপন্যাস ভিন্ন নাট্যকারের কোন গত্যন্তর নাই। নাটক না থাকে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব নাট্যকারগণের ভাল ভাল নাটক অভিনয় করিতে দোষ কি? কিন্তু সে মনোভাব লইয়া অভিনয় করা কম সাধনার আবশ্যক হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান অভিনেত্রী-কুল সেরূপ সাধনায় ব্রতী হইবেন কি?

গত মহাযুদ্ধের পরে সোভিয়েট রুশিয়ায় যে নাট্য-শক্তি গড়িয়া উঠে, তাহাতে এক একটা অভিনয়ে হাজার হাজার লোক যে অপূর্ব্ব শিক্ষালাভ করিয়া গিয়াছে তাহাতেই সোভিয়েট শক্তি প্রভূত পরিমাণে পরিপুষ্ট হয়। এই জন্যই মস্কো আর্ট থিয়েটার এবং ক্যাচালভের নাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই ভাব কি বাঙ্গালা দেশে চলে? কখনও নয়। বাঙ্গালার সংস্কৃতি, সদাদর্শ ও শিক্ষার প্রচার হইয়াছে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের দ্বারাই। বাঙ্গালার মধ্যবিত্তগণ দারিদ্র্য বরণ করিয়াও দেশকে সাহিত্য, জাতীয়তা ও সদাদর্শ দিতে কখনও কার্পণ্য করে নাই। এই মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ত্যাগবলেই বাঙ্গালার শক্তি গড়িয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালার মনীষিগণ সকলেই মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর লোক। বিদ্যাসাগরই বল, ঈশ্বরগুপ্তই বল, মধুসূদনই বল, দীনবন্ধুই বল—সকলেই মধ্যবিত্ত। বাঙ্গালার বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র মধ্যবিত্ত—বাঙ্গালার ধর্ম্মসাধক রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, বিবেকানন্দ চিত্তরঞ্জন সকলেই মধ্যবিত্ত। বাঙ্গালার শরৎচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর সকলেই দারিদ্র্য ব্রত লইয়া জাতির হিত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং মধ্যবিত্তকে বাদ দিয়া বাঙ্গলার সাহিত্য চলে না, নাটকের উৎকর্ষ হইতে পারে না, উপন্যাস গড়িয়া উঠিতে পারে না। তাই বলি সোভিয়েটের অনুকরণ বাঙ্গালায় চলিতে পারে না। বাঙ্গালী-হৃদয় লইয়া বাঙ্গালার সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন করিতে হইবে।

এই ভাব লইয়াই গিরিশচন্দ্র "প্রফুল্ল" নাটকে গৃহস্থদের দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই ভাব লইয়াই কন্যাদায়-গ্রস্ত বাঙ্গালী পিতার সর্ব্বনাশের কাহিনী বিবৃত করিয়া মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের বাঁচিবার একটী উপায় বিধান করিয়াছেন। এই ভাব লইয়াই একান্ত ভ্রাতৃ-অনুরক্ত উপেন্দ্রের পরিবারে নানারূপ ঘাত-প্রতিঘাতে বিচ্ছেদ-সংঘটন করিয়া আমাদের চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছেন।

কিন্তু এই সমস্ত ভাব ফুটাইবে কে? আজকাল অভি-নেতৃ-কুল গিরিশচন্দ্রের নাটক অভিনয় করিতে কেন এত বীতস্পৃহ? বাতাস কি পুনরায় ঠিক্ দিকে প্রবাহিত হইবে না? মনে হয়—হইবে।

সম্প্রতি কলিকাতার কতিপয় মনীষীর উদ্যম ও সহানু-ভূতিতে 'গিরিশ-পরিষদ্' নামে একটী প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন হইয়াছে। গত ২৭শে অগ্রহায়ণ তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে এই পরিষৎ-কর্ত্তৃক গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক "বলিদানের" প্রথম অভিনয়, ও গত ২৮শে মাঘ তারিখে উহারই দ্বিতীয় অভিনয় হয়। বিশিষ্ট শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তিগণ ঐ দুই অভিনয়ে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিনয় দেখিয়া দর্শক-মণ্ডলী এত অভিভূত হয়েন যে, তাঁহারা একবাক্যে প্রকাশ করেন যে, গিরিশচন্দ্রের মহাপ্রস্থানের পরে এরূপ প্রাণস্পর্শী অভিনয় তাঁহারা কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই।

আজকাল পাশ্চাত্ত্য প্রথার অনুকরণে বা আর্ট দেখাইবার ছলে অভিনেতৃগণ সাধারণতঃ হাত-পায়ের বিকৃত চালনা এবং কথার অদ্ভুত ভঙ্গীর অনুকরণ করিয়া অভিনয় জিনিষ-টাকেই একেবারে অস্বাভাবিক করিয়া ফেলে। কিন্তু উক্ত পরিষদ্ এরূপ স্বাভাবিক ভাবে অভিনয় করিয়া গিরিশচন্দ্রের নাটকের অন্তর্নিহিত ভাব অপূর্ব্বরূপে ফুটাইতে সক্ষম হইয়াছেন যে, আমরাও উদ্যোগ-কর্ত্তাদের সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি, "স্বাভাবিক অভিনয়"ই নূতন যুগের একমাত্র

গ্রহণীয় বিষয় হউক। স্বাভাবিক অভিনয়ের জন্য আমরা এই উদ্যোগকারিগণের প্রচেষ্টায় বিশেষ সাধুবাদ প্রদান

করিতেছি এবং ভরসা করি তাঁহারা গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল, গৃহস্বামী, শাস্তি কি শান্তি, জনা, বিল্বমঙ্গল, চৈতন্যলীলা, শঙ্করাচার্য্য ও তপোবল প্রভৃতি নাটকের অভিনয় করিয়া থিয়েটারে আবার নবযুগ-প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হউন। এবিষয়ে আমরা সকলের সহানুভূতির জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

সাত্ত্বিক অভিনয় না হইলে যে গিরিশচন্দ্রের নাটক সফলতা-লাভ করিতে পারে না এবিষয়ে বলাই বাহুল্য। এক সময়ে সাত্ত্বিক অভিনয়ে কি ফলই না হইত! চৈতন্যলীলার অভিনয় দেখিয়া যে লোকে কিরূপ অভিভূত হইত—তাহা নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয়ই লিখিয়া গিয়াছেন—

"নাট্যশালা হ'ল তীর্থ—"

এ অভিনয় দেখিয়া কত ইয়ং বেঙ্গলের ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, বিলাত-ফেরতরাও কাঁদিয়াছেন এবং ব্রাহ্ম খৃষ্টান-ধর্ম্মাভিমুখী আবার পুনরায় হিন্দু-ধর্ম্মের কোলে আশ্রয় লইয়াছে।

বিল্বমঙ্গলে পাগলিনীর গানে কত পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হইয়াছে, কত সংশয়ী ব্যক্তি আবার ভক্তি-মার্গ আশ্রয় করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। 'বুদ্ধদেবের' অভিনয় দেখিয়া স্বয়ং স্যার এড্‌উইন আরনল্ড অভিনয়ের শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন। শুনিয়াছি—বাগবাজারের নন্দলাল বসু মহাশয় বুদ্ধদেবের অভিনয় দেখিয়া নিজ বাড়ীতে পূজার সময়ে বলি বন্ধ করিয়া দেন। জনার অভিনয় দেখিয়া কত মাতৃ-হৃদয় পুত্রের উচ্চকার্য্যে সহায় হইয়াছে। যুবকগণ মাতৃ-অঞ্চল সম্বল না করিয়া উচ্চব্রতে প্রাণ সমর্পণ করিতে দ্বিধা করেন নাই। কালাপাহাড় ও মায়াবসানের অভিনয় দেখিয়া রিলিজিয়াস্ ইউনিটি বুঝিয়া লইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের যোগেশের অভিনয়ে পাষাণও বিগলিত হইয়াছে। বলিদানের অভিনয় দেখিয়া অনেক বরকর্ত্তা বরপণ-গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়াছে, শাস্তি-কি-শান্তির অভিনয় দেখিয়া বিধবার ব্রহ্মচর্য্য এবং সৎ-কার্য্যে নিয়োজিত হইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের অভিনয় দেখিয়া বেদান্ত শিক্ষা করিয়াছে। সিরাজদ্দৌলা, মিরকাশিম এবং ছত্রপতির অভিনয় দেখিয়া জাতীয়তা শিখিয়াছে, ভ্রান্তি, মায়াবসান ও শাস্তি-কি-শান্তিতে সেবাব্রতে ব্রত করিয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের নাটকরাজি অমূল্য সম্পদ্। আজ নাট্যশালার প্রবর্ত্তকগণকে, দেশের যুব-সম্প্রদায়কে দেশের শিক্ষক-মণ্ডলীকে আমরা সাদরে অনুরোধ করি যেন তাঁহারা জাতির মঙ্গলার্থ, সমাজের হিতের জন্য, যুবকগণের চরিত্র-গঠনের জন্য আবার গিরিশের নাটকরাজির অভিনয় করিয়া রঙ্গভূমিকে কেবল আমোদের নিকেতন মনে না করিয়া জাতীয় শিক্ষা-মন্দিরে পরিণত করিতে পরাঙ্মুখ না হয়েন। জয় রামকৃষ্ণ! বন্দেমাতরম্!

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

গিরিশ-চিত্রিত-চরিত্রাবলীর তালিকা

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'পৌরাণিক নাটক' নামক প্রবন্ধের একস্থানে বলিয়াছিলেন—"মূর্খের সঙ্গে বলি রাজা স্বর্গে যান নাই, মূর্খ সমালোচকের সহিত আমরা নরকে যাইব না"—এই উক্তিরই বোধ হয় প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ এখনকার অনেক মূর্খ সমালোচকই তাঁহাকে নরকে নামাইবার ইচ্ছায় অনেক দিন হইতে অনেক রকম আবোল-তাবোল বকিয়া আসিতেছেন। কেহ বলিতেছেন—"তিনি আধা ভক্ত ও আধা ভাঁড় ছিলেন।" কেহ লিখিতেছেন—"তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা এবং পারিপার্শ্বিক অনেক সঙ্কীর্ণ ছিল।"—বলা বাহুল্য, এই সমস্ত মন্তব্যের মূলে যেমন অজ্ঞতা আছে, তেমনই ধৃষ্টতাও আছে। যিনি নানাপ্রকার পরীক্ষার পর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জীবনের সাধন-গুরু করিয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি সাধকগণ যাঁহার সহিত অন্তরঙ্গভাবে আলাপ-আলোচনা করিতেন, থিয়েটার-পরিচালনের জন্য যাঁহাকে বেশ্যা ও লম্পট, ধনী ও দরিদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে নিত্য ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে হইত, 'তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা ও পারিপার্শ্বিক সঙ্কীর্ণ ছিল' বা তিনি 'ভাঁড়' ছিলেন বলিলে, তাহা নিতান্ত প্রলাপের মতই শুনায়। অমন 'পারিপার্শ্বিক' আর কাহার ভাগ্যে কবে ঘটিয়াছে? অপূর্ব্ব ও অসামান্য অভিজ্ঞতার উপাদানে কল্পনা মিশাইয়া গিরিশচন্দ্র চরিত্র আঁকিতেন বলিয়াই তাঁহার নাটকাবলীর বিল্বমঙ্গল, শঙ্করাচার্য্য ও রঙ্গলাল হইতে আরম্ভ করিয়া সাধক ও থাকমণি পর্য্যন্ত প্রায় সকল প্রকার চরিত্রই সম্পূর্ণ ও সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ-বিষয়ে বাঙ্গালী লেখকগণের মধ্যে কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আছেন কি?

সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখিয়াছিলেন—"গিরিশচন্দ্রের জীবন অত্যন্ত বিচিত্র। বহু ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার 'নিজত্ব' গঠিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র বহু ভাবের আধার ছিলেন। পরস্পর-বিরোধী বহু ভাবের এমন একত্র সমাবেশ মানবজীবনে প্রায় দেখা যায় না। তাঁহার নাটকীয় প্রতিভা নিসর্গের মুকুর; জগৎ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইত। তাই গিরিশচন্দ্র অনায়াসে, অবলীলায়, বিশাল পটে স্বর্গের, মর্ত্ত্যের ও নরকের,—দেব, মানব ও দানবের,—বহিঃপ্রকৃতির ও অন্তঃপ্রকৃতির অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিতেন। গিরিশচন্দ্রের সৃষ্টি-শক্তি অতুলনীয়। তাঁহার সৃষ্ট মানব-পরিবার, দেব-পরিবার প্রভৃতি যেমন অসংখ্য, তেমনই বিচিত্র।"—গিরিশের জীবন-কথা ও রচনাবলীর সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে; তাঁহারা অবশ্য সুরেশচন্দ্রের ঐ-উক্তিকে সত্য বলিয়াই স্বীকার করিবেন। তবে যাঁহারা না পড়িয়া, না বুঝিয়া গিরিশের নাটক-সম্বন্ধে মুরুব্বিয়ানা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। যাহা হউক, গিরিশ-সৃষ্ট মানব-পরিবার, দেব-পরিবার প্রভৃতি কিরূপ বিশাল ও বিচিত্র, তাহা সহজে যাহাতে সকলে ধারণা করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহার নাট্য-সাহিত্যের চরিত্রাবলীর একটি বিবরণ বর্ণানুক্রমে এখানে সাজাইয়া দিলাম। প্রথমে পুরুষ-চরিত্র ও তৎপরে স্ত্রী চরিত্রের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। এই চরিত্রসমূহের সংখ্যা সাতশতেরও কিছু অধিক। পরে এই সকল চরিত্রের পরিচয় দিবার ইচ্ছা রহিল।

পুরুষ-চরিত্র

অ

চরিত্র	গ্রন্থের নাম
অগ্নি	জনা, নল-দময়ন্তী, তপোবল, রাবণবধ
অঘোর	হারানিধি
অঙ্গদ	সীতাহরণ, রাবণবধ
অচ্যুতানন্দ	মুকুলমুঞ্জরা
অদ্বৈত	চৈতন্যলীলা
অধীর	স্বপ্নের ফুল
অধ্যাপক	বাসর
অনিরুদ্ধ	পাণ্ডব-গৌরব
অনুশাল্ব	জনা
অভিনবগুপ্ত	শঙ্করাচার্য্য
অভিমন্যু	অভিমন্যু বধ, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
অমরনাথ	নসীরাম
অমার্ক	প্রহ্লাদ-চরিত্র
অমূল্য	পাঁচকনে
অম্বরীষ	তপোবল, অভিশাপ
অরুণ	হীরার ফুল
অর্জ্জুন	পাণ্ডব-গৌরব, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, অভিমন্যু-বধ, জনা
অলর্ক	বিষাদ
অশোক	অশোক
অশ্বত্থামা	অভিমন্যু-বধ

আ

চরিত্র	গ্রন্থের নাম
আওরঙ্গজেব	সৎনাম, ছত্রপতি শিবাজী
আকবর	আনন্দরহো
আকাল	অশোক
আগমবাগীশ	করমেতি বাঈ
আগড়ব্যোম	অভিশাপ
আত্মবোধ	বুদ্ধদেব-চরিত

চরিত্র	নাটক
আনন্দগিরি	শঙ্করাচার্য্য
আনন্দরাম	আয়না
আবুহোসেন	আবুহোসেন
আলাদিন	আলাদিন
আলোক	করমেতি বাঈ
আয়ান	নন্দদুলাল, প্রভাসযজ্ঞ
ই	
ইন্দ্র	পাণ্ডব-গৌরব, নলদময়ন্তী, হরগৌরী, ধ্রুবচরিত্র, তপোবল, অকালবোধন, রাবণবধ, সীতার বিবাহ, সীতাহরণ
ইন্দ্রজিৎ	সীতাহরণ
ঈ	
ঈশান	রূপ-সনাতন
উ	
উগ্রভৈরব	নসীরাম
”	শঙ্করাচার্য্য
উজীর	আবুহোসেন
উত্তমকুমার	ধ্রুব-চরিত্র
উত্তর	পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
উত্তানপাদ	ধ্রুব-চরিত্র
উদয় নারায়ণ	ভ্রান্তি
উদ্ধব	প্রভাসযজ্ঞ
উপগুপ্ত	অশোক
উপানন্দ	নন্দদুলাল
উপেন্দ্র	গৃহলক্ষ্মী
উলুক	জনা
ঊ	
ঊষা	মণিহরণ
ঋ	
ঋতুপর্ণ	নল-দময়ন্তী
এ	
এল্ফদল	[illegible]
এলমোহিন	ঐ
ক	
কংস	নন্দদুলাল
কঞ্চুকী	পাণ্ডব-গৌরব
”	রামের বনবাস
কন্থিদাস	অভিশাপ
করিম	সংনাম
করিমচাচা	সিরাজদ্দৌলা
করুণাময়	বলিদান
কর্ণ	পাণ্ডব-গৌরব, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, অভিমন্যু-বধ, বৃষকেতু

চরিত্র	নাটক
কলি	নল-দময়ন্তী
কল্মাষপাদ	তপোবল
কহ্লাটক	অশোক
কাউলফ	মনের মতন
কাঙ্গালীচরণ	প্রফুল্ল
কান্তিরাম	বেল্লিক বাজার
কাম	জনা, বুদ্ধদেব, চৈতন্যলীলা
কারতরফ খাঁ	সংনাম
কার্ত্তিক	হরগৌরী, পাণ্ডব-গৌরব
কালনেমি	সীতার বিবাহ
কালপুরুষ	লক্ষ্মণ-বর্জ্জন
কালাচাঁদ	পাঁচকনে
কালাপাহাড়	কালাপাহাড়
কালীকিঙ্কর	মায়াবসান
কালী ঘটক	বলিদান
কিশোর	বলিদান
কীচক	পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
কুণাল	অশোক
কুবের	হরগৌরী
কুমার	মণিহরণ
কুমারিল ভট্ট	শঙ্করাচার্য্য
কুশ	সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ-বর্জ্জন
কুসংস্কার	বুদ্ধদেব-চরিত
কুহকী	আলাদিন
কৃতবর্ম্মা	পাণ্ডব-গৌরব, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, অভিমন্যু-বধ
কৃপাচার্য্য	ঐ
কৃষ্ণধন	মায়াবসান
কেশব ভারতী	চৈতন্যলীলা, নিমাই সন্ন্যাস
কোণ্ডদেব	ছত্রপতি শিবাজী
ক্রকচ	শঙ্করাচার্য্য
খ	
খর	সীতাহরণ
খাণ্ডাধারী	চণ্ড
খুদিরাম	বেল্লিক বাজার
গ	
গঙ্গাজী	ছত্রপতি শিবাজী
গঙ্গাদাস	চৈতন্যলীলা, নিমাই সন্ন্যাস
গঙ্গাধর	বাসর
গঙ্গারক্ষকদ্বয়	জনা
গণক	অভিমন্যু-বধ
গণপতি	মায়াবসান

গণপতি — শঙ্করাচার্য্য
গণেশ — হরগৌরী
গবাক্ষ — সীতাহরণ
গয় — ঐ
গয়ারাম — ভ্রান্তি
গর্গমুনি — অভিমন্যু-বধ
গহন — দেলদার
গিরিরাজ — আগমনী
গুণনিধি — হারানিধি
গুহক — রামের বনবাস
গোবিন্দনাথ — শঙ্করাচার্য্য
গোরক্ষনাথ — পূর্ণচন্দ্র
গোলাম মহম্মদ — ভ্রান্তি
গৌরীশঙ্কর — আয়না

ঘনশ্যাম — বলিদান
ঘেঁচি — শাস্তি কি শান্তি
ঘেসেড়া — পাণ্ডব-গৌরব

চণ্ড — চণ্ড
চণ্ডগিরিক — অশোক
চন্দ্রধ্বজ — মুকুল-মুঞ্জরা
চরণদাস — সৎনাম
চিৎকুমার — ফণির মণি
চিৎসুখ — শঙ্করাচার্য্য
চিত্রভানু — মায়াতরু
চিনিবাস — আয়না
চিন্তামণি — কালাপাহাড়

ছত্রপতি — ছত্রপতি শিবাজী
ছন্দক — বুদ্ধদেব-চরিত

জগাই — চৈতন্যলীলা, নিমাই সন্ন্যাস,
জগৎ শেঠ — সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম
জগন্নাথ — বাসর
জগন্নাথ — শঙ্করাচার্য্য
জগন্নাথ মিশ্র — চৈতন্যলীলা
জটায়ু — সীতাহরণ
জনক রাজা — সীতার বিবাহ
জমাদার — কালাপাহাড়
জম্বু — পূর্ণচন্দ্র
জম্বুভয় — মোহিনী প্রতিমা
জয়দ্রথ — অভিমন্যু-বধ
জয়ধ্বজ — মুকুল-মুঞ্জরা
জাম্বুবান্ — সীতাহরণ, লক্ষ্মণ-বর্জ্জন, মণি-হরণ
জিৎ সিং — বিষাদ
জীবন চক্রবর্ত্তী — রূপ-সনাতন
জেল-দারোগা — কালাপাহাড়

ট

টাহার — মনের মতন
টুক্‌রো — করমেতি বাঈ

ডম্বর বাগীশ — অভিশাপ

ত

তম্বুর — সীতার বনবাস
তাল — রাবণবধ
তিলকদাস — অভিশাপ
তেজচন্দ্র — হারানিধি
তোটকাচার্য্য — শঙ্করাচার্য্য
ত্রিশঙ্কু — তপোবল

দ

দক্ষ — দক্ষযজ্ঞ
দধীচী — ঐ
দণ্ডী — পাণ্ডব-গৌরব
দমনক — মায়াতরু
দশরথ — সীতার বিবাহ, সীতার বনবাস
দামোদর — পূর্ণচন্দ্র
দারুক — অভিশাপ
দীননাথ — মায়াবসান
দুর্ব্বাসা — পাণ্ডব-গৌরব, মণি-হরণ
দুর্য্যোধন — অভিমন্যু-বধ, পাণ্ডব গৌরব, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
দুলাল — কালাপাহাড়
দুলালচাঁদ — বলিদান
দুঃশাসন — অভিমন্যু-বধ, পাণ্ডব-গৌরব, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
দূষণ — অভিমন্যু-বধ
দেলদার — দেলদার
দৈত্য — হীরার ফুল
দোকড়ি সেন — বেল্লিক বাজার
দোমা — করমেতি বাঈ
দ্বাপর — নল-দময়ন্তী
দ্রোণ — অভিমন্যু-বধ, পাণ্ডব-গৌরব, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস

ধ

ধনপতি — কমলেকামিনী
ধনীরাম — হারানিধি

ধন্বন্তরি	সীতার বিবাহ
	হারানিধি
ধর্ম্মরাজ	তপোবল
ধীর	স্বপ্নের ফুল
ধৃষ্টদ্যুম্ন	অভিমন্যু-বধ
ধ্রুব	ধ্রুব-চরিত্র
নকুল	পাণ্ডব-গৌরব, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, অভিমন্যু-বধ
নকুলানন্দ	গৃহলক্ষ্মী
নন্দ	নন্দদুলাল, প্রভাস-যজ্ঞ
নন্দী	আগমনী, দক্ষযজ্ঞ, সীতাহরণ, হরগৌরী
নব	হারানিধি
নল	নল-দময়ন্তী
নল	সীতাহরণ
নসির খাঁ	রূপ-সনাতন
নসীরাম	নসীরাম
	বেল্লিক-বাজার
	পাঁচকনে
নারদ	পাণ্ডব-গৌরব, প্রভাস-যজ্ঞ, দক্ষযজ্ঞ, প্রহ্লাদ-চরিত্র, অভিশাপ, হরগৌরী, অকাল-বোধন
নারায়ণ	হরগৌরী
নারায়ণ সিংহ	আনন্দরহো
নিতাই	গৃহলক্ষ্মী
নিত্যানন্দ	চৈতন্যলীলা, নিমাই সন্ন্যাস
নিধিরাম	পাঁচকনে
নিমাই	চৈতন্যলীলা, নিমাই সন্ন্যাস
নিরঞ্জন	ভ্রান্তি
নীরদ	গৃহলক্ষ্মী
নীল	সীতাহরণ
নীলধ্বজ	জনা
নীলমাধব	হারানিধি
নুরুদ্দিন	পারস্য-প্রসূন
নৃসিংহ	প্রহ্লাদ-চরিত্র
নেদা	দেলদার
নেহার	মনের মতন
ন্যগ্রোধ	অশোক
পবন	ধ্রুব-চরিত্র
পরশুরাম	সীতার বিবাহ
	করমেতি বাঈ
	সৎনাম
পর্ব্বত	অভিশাপ
পরাশর	তপোবল
পাগল	শান্তি কি শান্তি
পীতাম্বর	প্রফুল্ল
পুঁটিরাম	বেল্লিক-বাজার
পুরঞ্জন	ভ্রান্তি
পুরোহিত	বাসর
পুষ্কর	নল-দময়ন্তী
পূর্ণচন্দ্র	পূর্ণচন্দ্র
পূর্ণ রায়	চণ্ড
প্রকাশ	শান্তি কি শান্তি
প্রতাপ	আনন্দরহো
প্রতাপরুদ্র	চৈতন্যলীলা, নিমাই-সন্ন্যাস
প্রতিকামী	পাণ্ডব-গৌরব
প্রদ্যুম্ন	ঐ
প্রবীর	জনা
প্রবোধ	শান্তি কি শান্তি
প্রভাকর	শঙ্করাচার্য্য
প্রসন্নকুমার	শান্তি কি শান্তি
প্রসেন	মণি-হরণ
প্রহ্লাদ	প্রহ্লাদ-চরিত্র

ফ

ফকরে	ফণির মণি
ফকীর	মনের মতন
ফকীররাম	সৎনাম
	ছত্রপতি শিবাজী
ফেরেব খাঁ	কালাপাহাড়
বক্রেশ্বর	চৈতন্যলীলা, নিমাই-সন্ন্যাস
বটকৃষ্ণ	শান্তি কি শান্তি
বণিক্	বিল্বমঙ্গল
বরুণ	নল-দময়ন্তী
বরুণচাঁদ	মুকুলমুঞ্জরা
বলরাম	প্রভাস-যজ্ঞ, নন্দদুলাল, পাণ্ডব-গৌরব
বল্লভ	রূপ-সনাতন
বশিষ্ঠ	তপোবল, সীতার বিবাহ, রামের বনবাস, লক্ষ্মণ-বর্জ্জন
বসুদাম	নন্দদুলাল
বসুদেব	নন্দদুলাল, প্রভাস-যজ্ঞ
বাতুল	শ্রীবৎস-চিন্তা
বালী	সীতাহরণ
বাল্মীকি	সীতার বনবাস
বাসু (মিঃ)	শান্তি কি শান্তি

বাহার — ফণির মণি
বাহুরাজ — শ্রীবৎস-চিন্তা
বিকাশ — মলিনা-বিকাশ
বিক্রমাদিত্য — বাসর
বিদুর — পাণ্ডব-গৌরব
বিদুষক — জনা, নল-দময়ন্তী, ধ্রুবচরিত্র, বুদ্ধদেব-চরিত
বিন্দুসার — অশোক
বিভীষণ — সীতাহরণ, অকাল-বোধন, রাবণ-বধ, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ-বর্জ্জন
বিম্বিসার — বুদ্ধদেব-চরিত
বিরাগ — ফণির মণি
বিরাটরাজ — পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
বিলাস — মলিনা-বিকাশ
বিল্বমঙ্গল — বিল্বমঙ্গল
বিশ্বকর্ম্মা — হরগৌরী
বিশ্বামিত্র — তপোবল, সীতার বিবাহ
বিশ্বেশ্বর — পাঁচকনে
বিষণ সিং — সৎনাম
বিষ্ণু — বৃষকেতু, দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুবচরিত্র, অভিশাপ, বুদ্ধদেব
বিষ্ণুপদ — বাসর
বীতশোক — অশোক
বীরেশ্বর — কালাপাহাড়
বুদ্ধিমন্ত — রূপ-সনাতন
বৃষকেতু — বৃষকেতু, জনা
বেতাল — রাবণ-বধ, প্রভাস-যজ্ঞ
বেণীমাধব — শাস্তি কি শান্তি
বৈদ্যনাথ — গৃহলক্ষ্মী
ব্রজেন্দ্র — হারানিধি
" — আয়না
ব্রহ্মণ্যদেব — তপোবল

ভ

ভগদত্ত — অকালবোধন
ভজনরাম — মুকুল-মুঞ্জরা
ভজহরি — প্রফুল্ল
ভরত — সীতার বিবাহ, রামের বনবাস, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ-বর্জ্জন
ভামশা — আনন্দরহো
ভিক্ষুক — বিল্বমঙ্গল
ভীম — পাণ্ডব-গৌরব, জনা, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, অভিমন্যু-বধ
ভীমসেন — নল-দময়ন্তী
পাণ্ডব-গৌরব, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
ভৃঙ্গী — আগমনী, দক্ষযজ্ঞ, হরগৌরী, ধ্রুবচরিত্র
ভৈরবা — গৃহলক্ষ্মী

মট্‌কো — আয়না
মদন — হরগৌরী, জনা, ধ্রুবচরিত্র, হীরার ফুল
মদনঘোষ — প্রফুল্ল
মণ্ডনমিশ্র — শঙ্করাচার্য্য
মন্ত্রী — জনা, নল-দময়ন্তী, দক্ষযজ্ঞ, অভিশাপ, প্রহ্লাদচরিত্র, ধ্রুবচরিত্র, রাবণ-বধ, তপোবল, শ্রীবৎস-চিন্তা, বিষাদ, কালাপাহাড়, বুদ্ধদেব, করমেতি, —বাসর, মুকুল-মুঞ্জরা, পারিসানা
মন্মথ — গৃহলক্ষ্মী
মণ্ডর — আবুহোসেন
মহাদেব — আগমনী, হরগৌরী, ধ্রুবচরিত্র, পাণ্ডব-গৌরব, দক্ষযজ্ঞ, প্রভাসযজ্ঞ, সীতার বিবাহ, সীতাহরণ, রাবণ-বধ, জনা।
মহান্ত — সৎনাম
মহীন্দ্র — মোহিনী-প্রতিমা
মহেন্দ্র — অশোক
মাধব — বিষাদ
মায়াবসান
মাধাই — চৈতন্যলীলা, নিমাইসন্ন্যাস
মানসিংহ — আনন্দরহো
মার — অশোক
মার্কণ্ড — মায়াতরু
মির্জ্জান — মনের মতন
মিরজাফর — সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম
মীরকাসিম — মীরকাসিম
মীর সাহেব — সৎনাম
মুকুন্দ — চৈতন্যলীলা, নিমাইসন্ন্যাস
মুকুন্দদেব — কালাপাহাড়
মুকুল — মুকুল-মুঞ্জরা
মুকুলজী — চণ্ড
মনসুরুদ্দীন — কালাপাহাড়
মুক্তারাম — বেল্লিক বাজার
মুর্শিদকুলী — ভ্রান্তি
মেরোপন্থ — ছত্রপতি শিবাজী
মোহিনী — হারানিধি

শ্রীবাস	চৈতন্যলীলা, নিমাই-সন্ন্যাস
শ্রীমন্ত	কমলে কামিনী
শ্যামা	গৃহলক্ষ্মী
শ্যামাদাস	শাস্তি কি শান্তি

স

সখারাম	শঙ্করাচার্য্য
সত্রাজিৎ	মণিহরণ
সদানন্দ	তপোবল
সদাশিব	আয়না
সনন্দন	শঙ্করাচার্য্য
সনাতন	রূপ-সনাতন
সন্দেহ	বুদ্ধদেব-চরিত
সরফরাজ	ভ্রান্তি
সরল	দেলদার
সর্ব্বেশ্বর	শাস্তি কি শান্তি
সলিমান (গৌড়ের নবাব)	কালাপাহাড়
সহদেব	অভিমন্যু-বধ, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, পাণ্ডব-গৌরব
সাগর	সীতাহরণ
সাতকড়ি	মায়াবসান
সাত্যকি	অভিমন্যু-বধ, পাণ্ডব-গৌরব
সাধক	বিল্বমঙ্গল
সায়েদ খাঁ	মনের মতন
সারণ	রাবণ-বধ
সারথি	নল-দময়ন্তী
সার্ব্বভৌম	চৈতন্যলীলা, নিমাই-সন্ন্যাস
সিদ্ধার্থ	বুদ্ধদেব-চরিত
সিদ্ধেশ্বর	মায়াবসান
	পাঁচকনে
সিরাজ	সিরাজদ্দৌলা
সুগ্রীব	সীতাহরণ, অকালবোধন, রাবণ-বধ, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ-বর্জ্জন
সুপার্শ্ব	সীতাহরণ
সুবল	নন্দদুলাল, প্রভাস-যজ্ঞ
সুমন্ত্র	সীতার বিবাহ, রামের বনবাস, সীতার বনবাস
সুরত	মায়াতরু
সুরেশ	প্রফুল্ল
সুলতান মহম্মদ	পারিসান
সুশর্ম্মা	নন্দদুলাল, প্রভাস-যজ্ঞ, অভিমন্যু-বধ, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
সুসীম	অশোক
সূর্য্যদেব	শ্রীবৎস-চিন্তা, মণিহরণ
সৃষ্টিধর	আয়না
সেনজারা	পারস্য-প্রসূন
সেবাদাস	পূর্ণচন্দ্র
সেলিম	আনন্দরহো
সোনাউল্লা	হারানিধি
সোমগিরি	বিল্বমঙ্গল
সৌরভকুমার	ফণির মণি

হনুমান	সীতাহরণ, অকাল-বোধন, রাবণ-বধ, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ-বর্জ্জন
হরিদাস	চৈতন্য-লীলা, নিমাই-সন্ন্যাস
হরিশ	হারানিধি
হলধর	মায়াবসান
হস্তামলক	শঙ্করাচার্য্য
হামিদ খাঁ	সৎনাম
হারীত	মায়াতরু
হারুণ-অল-রসিদ	আবুহোসেন, পারস্য-প্রসূন
হিরণ্যকশিপু	প্রহ্লাদ-চরিত্র
হীরালাল	মোহিনী প্রতিমা
হীরু ঘোষাল	গৃহলক্ষ্মী
হীরে	পাঁচকনে
হেবো	শাস্তি কি শান্তি
হেমন্ত	মোহিনী প্রতিমা
হোসেন সা	রূপ-সনাতন

ক্ষিতিধর	মুকুল-মুঞ্জরা

স্ত্রী-চরিত্র

জনক-পত্নী	সীতার বিবাহ
জনা	জনা
জয়া	হরগৌরী, পাণ্ডব-গৌরব
জহরা	সিরাজদ্দৌলা
জাম্বুবতী	মণিহরণ
জিজা বাঈ	ছত্রপতি
জোবি	বলিদান
জ্যোতি	ঐ

ঝ

ঝি—	বলিদান

ত

তন্দ্রা	নন্দদুলাল
তপস্বিনী	দক্ষযজ্ঞ
তমঃ	অভিশাপ
তরঙ্গিনী	গৃহলক্ষ্মী
তরলা	মলিনা-বিকাশ
তরুণা	
তড়িৎসুন্দরী	আয়না
তারা	সীতাহরণ
"	মুকুলমুঞ্জরা
"	মীরকাসিম
তৃষ্ণা	অশোক
ত্রিজটা	সীতাহরণ, রাবণবধ

থ

থাকমণি	বিল্বমঙ্গল

দ

দময়ন্তী	নল-দময়ন্তী
দয়া	বুদ্ধদেব
দাই	আবুহোসেন
দীর্ঘিকা	ধ্রুবচরিত্র
দুর্গা	সীতাহরণ, রাবণবধ
দুষ্টা সরস্বতী	অভিশাপ
দুর্ব্বলা	কমলেকামিনী
দেবকী	নন্দদুলাল
দেবী	অশোক
দেলেয়া	মনের-মতন
দোলেনা	কালাপাহাড়
দ্রৌপদী	পাণ্ডব-.গৌরব, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস

ধ

ধারা	দেলদার

ন

নায়িকা	জনা
নিকষা	রাবণ-বধ
নিদ্রা	নন্দদুলাল
নির্ম্মলা	শাস্তি কি শান্তি
নিস্তারিণী	মায়াবসান
ঐ	পাঁচকনে
নীহার	মোহিনী প্রতিমা

প

পদ্মাবতী	বৃষকেতু
"	অশোক
পরিয়া	মনের মতন
পাগলিনী	বিল্বমঙ্গল
পান্না	মুকুল-মুঞ্জরা
পারিমানা	পারিসানা
পার্ব্বতী	শাস্তি কি শান্তি
পিয়াসা	দেলদার
পুতলা বাঈ	ছত্রপতি
পূর্ণা	বুদ্ধদেব
পৃথিবী	হরগৌরী
পৌর্ণমাসী	প্রভাস-যজ্ঞ
প্রতাপ-মহিষী	আনন্দরহো
প্রফুল্ল	প্রফুল্ল
প্রবাস	মলিনমালা
প্রবৃত্তি	বুদ্ধদেব
প্রমোদা	শাস্তি কি শান্তি
প্রসূতি	

ফ

ফকুরের মা	ফণির মণি
ফুলধূলা	মায়াতরু
ফুলহাসি	ঐ
ফুলা	গৃহলক্ষ্মী

ব

বদরা	তপোবল
বনফুল	স্বপ্নের ফুল
বনবিহারিণী	পাঁচকনে
বরুণা	মলিনমালা
বল্লরা	অভিশাপ
বসন্তকুমারী	জনা
বাদশাহ-কন্যা	আলাদিন
বামা ঘটকী	আয়না

বারি	ফণির মণি
বিজয়া	হরগৌরী
বিজয়া	চণ্ড
বিন্দু বৈষ্ণবী	মায়াবসান
বিমলা	ফণির মণি
বিম্বাবতী	বাসর
বিরজা	নসীরাম
বিরজা	গৃহলক্ষ্মী
বিশাখা	রূপ-সনাতন
"	নন্দদুলাল, প্রভাস-যজ্ঞ
বিশিষ্টা	শঙ্করাচার্য্য
বিষ্ণুপ্রাণা	নন্দদুলাল
বিষ্ণুপ্রিয়া	চৈতন্যলীলা, নিমাই-সন্ন্যাস
বৃন্দা	ব্রজবিহার, নন্দদুলাল, প্রভাস-যজ্ঞ
বেদমাতা	তপোবল
বৈষ্ণবী	সৎনাম
ব্রাহ্মণী	জনা
ব্রাহ্মণী	বাসর

ভ

ভদ্রা	শ্রীবৎস-চিন্তা
ভাবিনী	বলিদান
ভীমসেনের রাণী	নল-দময়ন্তী
ভুবন	শাস্তি কি শান্তি
ভৃগু-পত্নী	দক্ষযজ্ঞ

ম

মণি	গৃহলক্ষ্মী
মদনমঞ্জরী	জনা
মনথরা	স্বপ্নের ফুল
মনহরা	ঐ
মনিয়া	মনের মতন
মনোমোহিনী	পাঁচকনে
মন্থরা	রামের বনবাস
মন্দাকিনী	মায়াবসান
মন্দোদরী	সীতাহরণ
মলিনা	মলিনা-বিকাশ
মহামায়া	বুদ্ধদেব
মহামায়া	শঙ্করাচার্য্য
মহেশ্বরী	মলিনা-বিকাশ
মাতঙ্গিনী	বলিদান
মাধুরী	ভ্রান্তি
মাধুলী	নসীরাম
মুঞ্জরা	মুকুল-মুঞ্জরা
মুরলা	কালাপাহাড়
মেনকা	আগমনী, হরগৌরী
ঐ	তপোবল

য

যমুনা	আনন্দরহো
যশোদা	নন্দদুলাল, প্রভাস-যজ্ঞ
যশোমতী	বলিদান
যূথী	স্বপ্নের ফুল
যোগমায়া	নন্দদুলাল
যোধবাঈ	ছত্রপতি

র

রঙ্গিণী	মায়াবসান
রতি	জনা, হরগৌরী, সীতার বিবাহ, বুদ্ধদেব, হীরার ফুল
রমা	শঙ্করাচার্য্য
রম্ভা	তপোবল
রাজলক্ষ্মী	বলিদান
রাণী	বাসর
রামী-ঘটকী	বলিদান
রামেশ্বরী	আয়না
রেলা	দেলদার
রোশেনা	আবুহোসেন

ল

লক্ষ্মী	ধ্রুবচরিত্র, হরগৌরী, শ্রীবৎস-চিন্তা, সীতার বিবাহ
লক্ষ্মীদেবী	চৈতন্য-লীলা
লক্ষ্মীবাঈ	ছত্রপতি
ললিতা	ব্রজবিহার, নন্দদুলাল, প্রভাসযজ্ঞ
ঐ	ভ্রান্তি
ললিতের মা	বেল্লিক-বাজার
" পিসী	ঐ
লহনা	কমলে কামিনী
ঐ	আনন্দরহো
লুনা	পূর্ণচন্দ্র

শ

শচীদেবী	চৈতন্যলীলা, নিমাই-সন্ন্যাস
শশিকলা	হীরার ফুল
শিউলিনী	শঙ্করাচার্য্য
শিখা	ফণির মণি
শুচিমণি	ছটাকী
শৈবাল	মলিনমালা
শ্রীমতী	অভিশাপ
শ্রীরাধা	ব্রজবিহার, দোললীলা, নন্দদুলাল, প্রভাসযজ্ঞ

স

সইবাঈ	ছত্রপতি
সঙ্ঘমিত্রা	অশোক
সতী	দক্ষযজ্ঞ
সত্যভামা	প্রভাস-যজ্ঞ
সরমা	সীতাহরণ, রাবণবধ
"	শঙ্করাচার্য্য
সরস্বতী	বিষাদ
"	বলিদান
সরোজিনী	গৃহলক্ষ্মী
সাগর পত্নী	সীতাহরণ
সানিয়া	মনের মতন
সারী	পূর্ণচন্দ্র
সাহানা	মোহিনী প্রতিমা
সীতা	সীতাহরণ, সীতার বনবাস, রাবণবধ
সুজাতা	বুদ্ধদেব
সুদেষ্ণা	পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
সুনন্দা	নল-দময়ন্তী
সুনীতি	ধ্রুবচরিত্র
সুনেত্রা	তপোবল
সুন্দরা	পূর্ণচন্দ্র
সুভদ্রা	পাণ্ডব-গৌরব, অভিশাপ
সুভদ্রাঙ্গী	অশোক
সুমতি	বাসর
সুমিত্রা	রামের বনবাস
সুরুচি	ধ্রুবচরিত্র
সুশীলা	কমলে কামিনী
"	হারানিধি
সুষমা	অভিশাপ
সূর্পণখা	সীতাহরণ
সোনা	নসীরাম
সোহাগী	বিষাদ
সোহিনী	সৎনাম
স্বপ্ন	অভিশাপ, নন্দদুলাল
স্বাহা	জনা

হ

হরমণি	শাস্তি কি শান্তি
হিরণ	বলিদান
হেমাঙ্গিনী	হারানিধি
হৈমবতী	
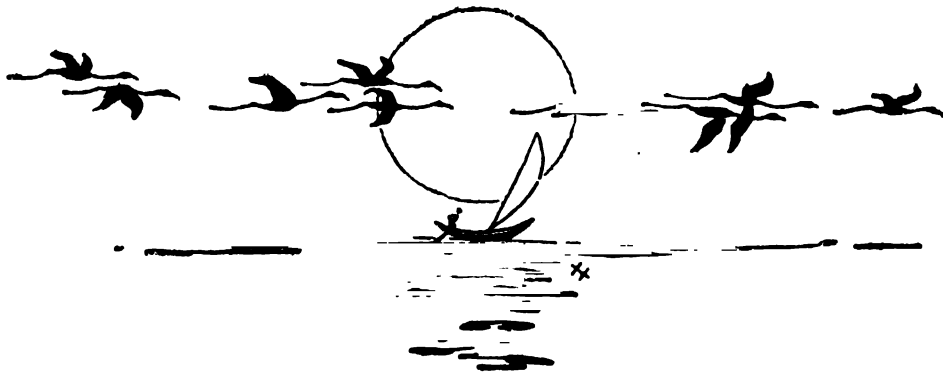
চিন্তামণি

সকলের জীবনেই 'চিন্তামণি' থাকে। কাহারও 'চিন্তামণি' কাঞ্চন, কাহারও যশ, কাহারও মান, কাহারও পদমর্য্যাদা, কাহারও বা কামিনী; বিল্বমঙ্গলেরও ছিল,—"দেখ্‌তে এমন কি, চিম্‌ড়ে ছুঁড়িপানা, তবে নজরে পড়েছিল, তাই" তাহার 'চিন্তামণি'। ওই চিন্তামণি-প্রেমতরঙ্গিণীতে পড়িয়া অনেককেই "ওঠা-নাবা করিতে করিতে" নাকানি-চোবানি খাইতে হয়, কিন্তু তথাপি এই প্রেমতরঙ্গে "ওঠা-নাবার" আর অন্ত নাই। এই চিন্তামণির ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া মানুষের দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, জীবনটা একটা অতলস্পর্শ বিরাট গহ্বরবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, তাহার হিতাহিত-জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, তথাপি ইহার এমন দুর্নিবার আকর্ষণ যে, ইহার গতিরোধ করিবার উপায় নাই।

"কোথাও বিষম ঘুরণ্‌ পাক্‌, চুবন খেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে
দুনিয়া দেখে ফাঁক্‌
কোথাও তরতরে বায় ভাসিয়ে নে যায়
টান্‌ পড়েছে কি টানে।"

কিন্তু এই "চিন্তামণি" ছাড়া মানুষের আরও এক 'চিন্তামণি' আছে, সেই—

"চিন্তামণি কভু এলোকেশী
উলঙ্গিনী ধনী,
বরাভয়-করা ভক্ত-মনোহরা
শবোপরে নাচে বামা।
কভু ধরে বাঁশী,
ব্রজবাসী বিভোর সে তানে
কভু রজত ভূধর
দিগম্বর, জটাজুট শিরে,
নৃত্য করে ববম্‌ বলি' গালে।
কভু রাসরসময়ী প্রেমের প্রতিমা,
সে রূপের দিতে নারি সীমা
প্রেমে ঢলে বনমালা গলে,
কাঁদে বামা—
"কোথা বনমালী" ব'লে।
একা সাজে পুরুষ প্রকৃতি,
বিপরীত রতি—
কেহ শব, কেহ বা চঞ্চলা।
কভু একাকার,
নাহি আর কালের গমন,
নাহি হিল্লোল-কল্লোল,
স্থির—স্থির—সমুদর;
নাহি—নাহি, ফুরাইল বাক্‌,
বর্ত্তমান বিরাজিত।"

একটি নকল 'চিন্তামণি' আর একটি আসল 'চিন্তামণি'। বিষয়ী জীবের সকল চিন্তামণিতেই "আধিক্যেতা" আদর বেশী, ইহারই চিন্তায়, ইহারই আরাধনায়, তাহার জীবন প্রায় শেষ হইয়া আসে—আসলের দিকে নজর দিবার তাহাই আর বড় অবসর হয় না। কিন্তু যিনি ভাগ্যবান্‌, তিনি নকলের আরাধনা করিতে করিতেই আসলে গিয়া পৌছান, 'মরা-মরা" করিতে করিতে 'রাম' নাম উচ্চারণ করেন, মৃন্ময়ী-'চিন্তামণি'-মন্ত্র জপ করিতে করিতে চিন্ময়ী-'চিন্তামণি'-চরণে লীন হইয়া যান। জীবনের এইরূপ পরিণতিকেই সাহিত্যে "রূপান্তর" বলে। বিল্বমঙ্গল-ভিক্ষুক-চিন্তামণির জীবনে এই রূপান্তর ঘটিয়াছিল। বিল্বমঙ্গল ও ভিক্ষুকের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; এইবার চিন্তামণির কথা বলিতে হইবে।

জীবনে সচরাচর ইহাই দেখা যায় যে, যাহাদের ভালবাসাটা একটু ফিকা রকমের, তখনও তেমন দানা বাঁধে নাই, প্রণয়িনী সম্বন্ধে লোকের কাছে তাহারাই যেন বেশী পঞ্চমুখ—প্রকাশের চেষ্টা, শব্দের ঘটাপটা যেন বড় বেশী রকমের, সকল তাতেই যেন একটু শফরীর ফরফরানি। কিন্তু যাঁহারা গভীর জলের মাছ, তাঁহাদের লম্ফ-ঝম্ফ-পট্‌পটানি কিছু কম, প্রকাশের চেষ্টা নাই বলিলেই হয়, বরং সময়ে সময়ে সোহাগ-অনুরাগ ঢাকিয়া রাখিয়া তাঁহারা লোকের চোখে ধুলা দিবার জন্য উল্টা সুরই গাহিয়া থাকেন। আমাদের বিল্বমঙ্গল ঠাকুরটি এই শেষোক্ত শ্রেণীর। তাই "আন্‌কা" একটা ভিক্ষুকের কাছে চিন্তামণির রূপের পরিচয়—"দেখ্‌তে এমন কি চিম্‌ড়ে ছুঁড়িপানা" হইলেও চিন্তামণি আসলে কিন্তু ততটা কুরূপা ছিল না। সে নিজে অন্ততঃ মনে-মনে জানিত—"যে রূপের দর্পে বিল্বমঙ্গলকে মর্ম্মে পীড়িত করেচ, সেই রূপই এখন তোমার শত্রু।" "তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর" উহা বিল্বমঙ্গলের অর্দ্ধেকটা কামদৃষ্টি এবং অর্দ্ধেকটা স্বরূপ-বর্ণনেরই আত্মপ্রকাশ। সে যাহা হউক, রূপ যদিও বা ছিল কিন্তু মুখ তাহার সমশ্রেণীর আর পাঁচজনেরই মত বদ্‌জবানে অভ্যস্ত—থাকমণির ভাষায় "মাসী হও আর যা হও বাছা, তোমার বড় আল্‌গা মুখ।" থাকমণির এ হেন সার্টিফিকেট,—ইহার উপর আর কথা নাই! তাই প্রথম দর্শনেই চিন্তামণির প্রতি দর্শকের একটা অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠে, যাহা বিল্বমঙ্গলের প্রতি-হেলায়, অবিশ্বাসে, লাঞ্ছনায়, বিল্বমঙ্গলের গৃহত্যাগ পর্য্যন্ত সমভাবে জাগাইয়া রাখে। কিন্তু দর্শকের এই অশ্রদ্ধায় লাভবান্‌ হয়, বিল্বমঙ্গলের প্রণয়—যাহা অন্ধকারের পার্শ্বে—আলোক-রেখার ন্যায় উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া দর্শকের চক্ষে প্রতিভাত হয়। তবে ইহাতে চিন্তামণির তত দোষ নাই—"তোমার গর্ভধারিণী তোমার এই কার্য্যে প্রবৃত্তি দিয়েছে; * * আমার ছেলেবেলার কথা মনে হয়—আমি কি বরাবরই এমনি? না পুড়ে পুড়ে কয়লা হ'য়ে আছি?" তাই বটে, যে হৃদয় দগ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, সে বোধ করি প্রেত হইয়া পূর্ব্ব-স্নেহবশে তাহার পরিত্যক্ত আয়তন দেখিতে মাঝে মাঝে ফিরিয়া আসিত। তাই গোড়ার দিকে

বিল্বমঙ্গল প্রণয়-কলহ করিয়া—কিছুক্ষণের জন্য—'গা ঢাকা' দিয়া থাকিলে, তাহার একটু'তর্' সয় না, বাড়ী থেকে 'ফর্-ফরিয়ে বেরিয়ে" আসে এবং পরে বিল্বমঙ্গলের দেখা পাইয়া বলে—"তুই—বলিস্ থাকি, আচরণ দেখলি! সকাল থেকে এখানে বসে আছে, আমি ভেবে মরি, কোথা গেল—কোথা গেল, তা একবার দেখাটি দিলে না!" এই প্রেত যদি না মাঝে মাঝে তাহার ঘাড়ে চাপিত, তাহা হইলে সেদিন সে কথকতা শুনিতে গিয়া কথক-ঠাকুরের সেই কথাটি মনে গাঁথিয়া আনিতে পারিত না এবং কখনই সেদিন আচম্বিতে বিল্বমঙ্গলকে বলিতে পারিত না—"এই মন, আমি বেশ্যা যদি আমায় না দিয়ে হরি-পাদ-পদ্মে দিতে তোমার কাজ হ'ত।" আমাদের সন্দেহ হয়, ঐ প্রেতটাই চিন্তামণিকে মাঝে মাঝে ভাবাইয়া তুলিত—সে তাহার কলুষিত শয্যায় শয়ন করিয়া—অনন্যমনে এক এক দিন ভাবিত—'এই মন, যদি হরি-পাদ-পদ্মে দিতাম, তাহা হইলে কাজ হইত।' চিন্তামণির গোপন হৃদয়াভ্যন্তরে, এই বীজমন্ত্রের নীরব ভজনাটুকু যদি দিনে দিনে সঞ্চিত না হইয়া উঠিত, তাহা হইলে এই মন্ত্র সজীব হইয়া সহসা বিল্বমঙ্গলের নিকট কখনই সেদিন অমন করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিতে পারিত না। মহাকবি এই বীজটুকু তাহার অন্ধকার মনের গহনে একদিন উপ্ত করিয়া রাখিয়া দিলেন বলিয়াই—চিন্তামণির পরে অমন দ্রুত "রূপান্তর" সম্ভবপর হইয়াছিল। বস্তুতঃ, মহাকবি-মাত্রেই এইরূপ প্রভূত সূক্ষ্ম-দৃষ্টি-সম্পন্ন। তাঁহারা তাঁহাদের সৃষ্টি মধ্যে এমন একটা—বীজ লুকাইয়া রাখেন যাহা কালক্রমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া ঈপ্সিত ফল প্রদান করে। গিরিশচন্দ্রের ভাষাতেই বলি—"প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির কোথা হইতে উদ্ভব, বেদব্যাস তাহা দেখাইয়াছেন। কীচক বধ করিতে হইবে। ভীম দ্রৌপদীকে বলিলেন—কোনওরূপে তাহাকে ভুলাইয়া নাট্য-শালায় লইয়া আসিতে পার? দ্রৌপদী অনায়াসে তাহা কার্য্যে পরিণত করিলেন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীকে এরূপ অনুরোধ করিলে, তাঁহারা প্রস্তাব শুনিয়াই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেন। কিন্তু যাহাকে পঞ্চ-স্বামীর মন রাখিতে হয়, কীচককে ভুলাইয়া আনা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্যই হইয়াছিল। মহাকবি কালিদাসও অতি সূক্ষ্মদৃষ্টি-সম্পন্ন। শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া তাঁহাকে 'অনার্য্য' বলিয়া গালি দিলেন। সীতা বা দময়ন্তী কখনই এরূপ দুর্ব্বাক্য স্বামীকে বলিতে পারিতেন না। কিন্তু শকুন্তলা যে স্বর্গবেশ্যা মেনকার গর্ভজাতা—এই দুর্ব্বাক্য প্রয়োগে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।" আর আদি কবি বাল্মীকির দৈবী সৃষ্টি মা জানকী সীতার ত কথাই নাই—তিনি যে সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর কন্যা, তাহা তাঁহার জীবনের প্রতি পদক্ষেপে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম, চিন্তামণির 'রূপান্তর' একটা আকস্মিক ফরমায়েসী ঘটনা নহে—উহা তাহার সৃষ্টি-কর্ত্তা সিদ্ধকবির অসামান্য কারিগরির ফল।

বিল্বমঙ্গল চিন্তামণি-কর্ত্তৃক লাঞ্ছনা ও ধিক্কারের ফলে, বৈরাগ্যের তাড়নায়, গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে—চিন্তামণির দিন আর কাটিতে চাহে না। অনুতাপের তীব্র অনুশোচনায় তাহার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, 'ভালবাসা' যে কি বস্তু তাহা এইবার ধীরে ধীরে বোধগম্য হইতেছে, বিল্বমঙ্গলের উপেক্ষিত প্রণয় যে কেমন, তাহা স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে। "থাকি, তুই তাকে চিনিস্ নি;—সে আমা ভিন্ন জান্‌তো না; সে যখন আমায় না দেখে তিন দিন আছে, সে ফাঁকি দে চলে গেছে।……আজ আমার চক্ষু খুলেচে; আমি জানতুম, ভালবাসা একটা কথার কথা।, তা নয়, ভালবাসা আছে। তারে একদিনের তরে আমি মিষ্টি কথা বলিনি; আমি ঘরে রাগ করে দোর দিয়ে শুয়েছি সমস্ত রাত ছাদে ব'সে আছে; আমায় একবার ডাকেও নি, পাছে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়; রাগ ক'রে যদি কখনো আমার চক্ষু দে জল পড়তো, শতধারে তার বুক ভেসে যেতো। আমি এত দিনে জানলুম, যে আমার ছিল—তাকে আমি দু'পায়ে ঠেলেছি।…থাকি, সত্যি বল্‌চি,আপনার মানুষ পেয়ে-ছিলুম।……কিন্তু এখন আর আমার কেউ নেই আমি রাজরাণী হোতে পাত্তুম; এখন আমি যে ঘৃণিত বেশ্যা ছিলুম, সেই ঘৃণিত বেশ্যা। ইহার উত্তরে থাকমণির মুখে এই একবার এবং শেষবার তোতাপাখীর বুলির ন্যায় 'হরি' নাম বাহির হইয়াছিল এবং এই পুণ্যটুকুর ফলেই বোধ করি-পরে বিষ খাইয়া—আত্মলোপ করিতে তাহার সৎসাহসে কুলাইয়া ছিল। থাকমণি বলিয়াছিল,—"কেউ নেই,কেউ নেই, ক'র না। হরি আছেন, ভাব্‌ছ কেন?" চিন্তামণির কিন্তু সে ভরসা তখনও হয় নাই—"হরি কি আমার মতন পাপীয়সীকে কৃপা কর্ব্বেন? শুনেছি তিনি প্রেমময়; আমি প্রেমহীনা বেশ্যা, আমি প্রেম কখনও দিতে জানি না, প্রেম কখনও নিতেও জানি না, আমি হরির প্রেম পেলেও ত নিতে পারব না…" কিন্তু পরক্ষণেই পাগলিনী আসিয়া তাহাকে আশ্বাস দিলেন—"মা, তুই ভাবিস্ নি, তোকে হরি কৃপা কর্ব্বেন।" পাগলিনীর আশ্বাসবাণী শুনিয়া, পাগলিনীর পরিচয় পাইয়া চিন্তামণির পাষাণ প্রাণে চেতনার স্পন্দন স্ফুরিত হইতে লাগিল—

"কেনরে পাষাণ হৃদি হতেছ কম্পিত?
পরের কথায়
কাঁপিতে ত দেখিনি তোমায়।
তুমি বারাঙ্গনা—বেশভূষা-পরায়ণা,
মলিন-বসনা বিভূষণা
পাগলিনী সম হ'তে চাও?"

পাষাণে বহ্নিসঞ্চার হইতেছিল, পাগলিনী এইবার তাহাতে ফুৎকার দিলেন, বলিলেন, "ওমা, তবে আসি মা! বেলা গেল, মা! বেলা গেল মা।" সত্যই ত, বেলা যে গেল, এইবার ত 'বাসনায়' আগুন দিবার সময় হইয়াছে! চিন্তামণি অঙ্গের আভরণ পাগলিনীকে দান করিয়া তাহার জন্মার্জ্জিত বাসনা-রাশিতে প্রথম অগ্নি-সংযোগ করিল। কিন্তু দিন একরকম করিয়া কাটে, রাত আর কাটিতে চাহে না। একা ঘরে শয়ন করিতে তাহার ভয় হয়। বেশ্যার পুরী, তাহার অর্থ আছে, অর্থের লোভে কেহ যদি তাহাকে হত্যা করে? বিল্বমঙ্গল নাই, কে এখন তাহাকে রক্ষা করিবে? তখন ইহকালের কথা ভাবিতে ভাবিতে পরকালের কথা মনে পড়ে। তাহার ন্যায় মহাপাতকিনীকে কে উদ্ধার করিবে? সে বিল্বমঙ্গলের কাছে যাইবে—সে সাধুব্যক্তি, তাহাকে ঘৃণা করিবে না, পরকালের উপায় করিয়া দিবে। কিন্তু একা স্ত্রীলোক, সে কেমন করিয়া তাহার কাছে যাইবে, কেমন করিয়া দিনের পর দিন উদরান্ন সংগ্রহ করিবে? পাগলিনী আসিয়া বলিলেন, "দেখ্ মা, দেখ্, ঐ শেয়ালটা খাচ্ছে দেখ, পেট ভ'রে খাচ্ছে। আমিও পেট ভ'রে খাই, পাখীগুলোও পেট ভ'রে খায়। আমি দেখেচি—মা, দেখেচি সে দেয়।" চিন্তামণি এই অভয়বাণী-ই শুনিতে চাহে, তাহারও আর ঘরে যাইতে মন সরে না। তাহার উপর পাগলিনী এইবার ইঙ্গিতে জানাইয়া দিলেন যে, সাধক ও থাকমণি বিষ-প্রয়োগে চিন্তামণির প্রাণনাশের চেষ্টা করিতেছে। ভিক্ষুকও এই কথারই সমর্থন করিল। চিন্তামণির অর্থের প্রতি, লোক-চরিত্রের প্রতি, গৃহবাসের প্রতি ধিক্কার জন্মিতে লাগিল। লক্ষ্মীকে না ছাড়িতে পারিলে, নারায়ণ কৃপা করেন না—জানি না, ইহা কেমন পরিহাস।

"থাকি মা তরুর মূলে,
হাত যুড়িনি কোন কালে।
বলি, মা লক্ষ্মী এলে,—
যাও বাছা, তুমি যাও চলে,
তুমি এলে, তারে পাব না কোন কালে।"

"তুই আয় মা, আয়; আর ঘরে থা'ক্‌ব না মা, থা'ক্‌ব না।" চিন্তামণি বুঝিল এই পাগলিনীকে সহায় করিয়া এই বিষময় সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে—

"কেন, কেন, কি হেতু না জানি,
প্রাণে জন্মে আশ—
বাসনা পুরিবে মোর।"

সে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এক বাসনায় আগুন দিয়া, অন্য এক অজ্ঞাত বাসনার পরিপূরণে যমুনাতীরের পথ ধরিল। সমুদ্র-মন্থনে যে হলাহল ও অমৃত উত্থিত হইয়াছিল, তাহারই কিয়দংশ আত্মসাৎ করিয়া বিধাতা বোধ করি অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি রমণী-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিধাতার এই সর্ব্ব-জীব-মুগ্ধকরী বিস্ময়করী সৃষ্টির পরিপূর্ণ মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে তাঁহার সৃষ্টি-প্রতিভা ও সৃষ্ট-সৌন্দর্য্যের প্রতি আপনা হইতেই প্রণাম আসে। সংসারে পতি-প্রাণা সতী রমণীরই বিধাতার সেই বিস্ময়করী সৃষ্টির চরম-সৃষ্ট সৌন্দর্য্য। এইখানেই বিধাতা তাঁহার স্বকীয় সৃষ্টির সৌন্দর্য্য-দর্শনে স্বয়ং আত্মহারা হইয়া গিয়া বিষ মিশাইতে ভুলিয়া গিয়াছেন। ইনিই ষোলআনা অমৃতের অধিকারিণী। ইনিই অন্নপূর্ণা হইয়া জননী, ভগিনী, কন্যা, ভ্রাতৃজায়া অন্যান্য সকল রমণীকে পরিমাণ-ভেদে তাঁহার নিজস্ব অমৃত বিতরণ করিয়া থাকেন। অন্য সকলে ইঁহারই বিভিন্ন রূপ। ইনি একাধারে সকল আধারেই অধিষ্ঠিতা আছেন। ইঁহার স্মরণে, অন্য সকল নারীকে স্মরণ করিয়া মুখে মাতৃস্তন্যের আস্বাদ আসে, ইঁহার সেবায় জ্বালা নাই, ইঁহার চিন্তনে কেবলই পুণ্য। অন্য সকল নারী ইঁহারই নিকট হইতে পৃথগ্‌ভাবে অমৃতের অংশ পাইয়া থাকেন। চিন্তামণিও ইহার নিকট হইতে বিধিদত্ত প্রাপ্য অংশ ছাড়া পৃথগ্‌ভাবে অমৃতের অংশ পাইয়াছিল। চিন্তামণি এতাবৎ কাল বিষভাণ্ড উজাড় করিয়া নিঃশেষ করিয়াছিল, এইবার অমৃতভাণ্ড বক্ষে লইয়া বিল্বমঙ্গলকে আগে-ভাগে তাহার ভাগ দিতে ছুটিল। এতদিন ধরিয়া যাহাকে সে শুধুই প্রণয়ের ছলে বিষ দিয়া আসিয়াছে, তাহার জীবনের এই পরমক্ষণে রমণী হইয়া সে তাহার প্রণয়কে ভুলিতে পারে না, ভুলিলও না। সে পরকালের পাথেয় অর্জ্জন করিতে চাহে বটে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে ইহকালের অধীশ্বরকে তাহার চাই-ই-চাই। বিল্বমঙ্গল প্রেমের দায়ে সংসার ত্যাগ করিয়াছিল বটে, কিন্তু চিন্তামণির সংসার-ত্যাগ, ত্যাগের গৌরবে উহার নিকট কোন অংশেই ন্যূন নহে, বরং চিন্তামণির পূর্ব্বাপর-পর্য্যালোচনা করিয়া ইহাই বলিতে হয় যে, তাহার ত্যাগ অধিকতর গৌরবের; নতুবা মহামায়া পূর্ব্ব হইতেই তাহার সহায় হইবেন কেন এবং কৃষ্ণই বা তাহাকে অবশেষে দর্শন দান দিয়া ধন্য করিবেন কেন?

চিন্তামণি বিষয়-বৈভব পরিত্যাগ করিয়া পাগলিনীর সঙ্গ লইয়াছে, বটে কিন্তু এখনও তাহার সর্ব্বস্ব-ত্যাগ হয় নাই। পাগলিনীর এই সঙ্গটুকুও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সংসার সমুদ্রে একা ভাসিতে হইবে, তবেই না ভব-সমুদ্রের কর্ণধার চরণ-তরী লইয়া তাহাকে পার করিয়া দিতে আসিবেন! পাগলিনী বলিল—"তুমি তোমার স্বামীর কাছে যাও, মা, আমি আমার স্বামীর কাছে যাই।" পাগলিনীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিতান্ত একা থাকিতে চিন্তামণির প্রাণ কাঁদিতে লাগিল।

"পাগলিনী। দেখ, পাখীটে একলা বেড়াচ্ছে, আর গান ক'চ্চে।"

চিন্তামণি। মাগো, বুঝেছি সকলই ;
কিন্তু প্রাণ বুঝেও না বুঝে !
মাগো, তুমি সর্ব্বত্যাগী, কৃষ্ণ-অনুরাগী।
মম হৃদে জাগে, মা, বাসনা
যাচিব মার্জ্জনা বিল্বমঙ্গলের পদে,
সে যদি না ক্ষমা করে মোরে,
কৃষ্ণ নাহি দিবেন আশ্রয়।
সাধু সদাশয়—
শত অপমান ক'রেছি তাঁহার ;
কিসে পাব কৃষ্ণের চরণ ?
আমি তাঁর কাছে যাব,
পদধূলি লব,
ক্ষমা চাব কৃতাঞ্জলি হ'য়ে—
তবে যাবে মালিন্য আমার,
তবে হবে কৃষ্ণ-পদে মতি।
যুক্তি তব লব,
একা আমি ধরায় ভ্রমিব।

পাগলিনী। যাই, মা, যাই ; আবার আসব। আমি মা পাগলদের ; তুইও পাগলী মা ; তোর কাছে আমি আসব। তবে যাই, মা, যাই ?"

পাগলিনী বৃন্দাবনের পথে চিন্তামণিকে একা নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলেন—বলিয়া গেলেন আবার তাহার কাছে আসিবেন ; কেন না তিনি পাগলদের, পাগল-পাগলী লইয়াই তাঁহার কারবার, ভাব-পাগলদের তিনি ভুলিতে পারেন না, ভাবের ভাবুক হইলেই, ভাব-চিন্তামণির কাছে লইয়া যাইবার জন্য তিনি গোপিনীদিগের প্রতি কাত্যায়নীর ন্যায় সর্ব্বদাই বরদাত্রী, সর্ব্বদাই সমুৎসুক। চিন্তামণি নিতান্ত অসহায় হইয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল—

"ওঠ বারি প্রস্তর ফাটিয়ে ;

* * *

কেন মোরে করেছ পাষাণ ?
ভগবান্, পতিত-পাবন, রক্ষা কর দয়াময় !
মরি, প্রভু মনের বিকারে—
অবলারে কর কৃপা।"

পতিত-পাবন সেই অসহায় আর্ত্ত কণ্ঠস্বর বোধ করি শুনিতে পাইলেন—ভিক্ষুক আসিয়া চিন্তামণিকে বুঝাইয়া বৃন্দাবন লইয়া চলিল।

বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া চিন্তামণির অপরাধী হৃদয় সর্ব্বাগ্রে বিল্বমঙ্গলের দর্শন কামনা করিতেছে ; কিন্তু কোন্ বেশে সে তাহার কাছে গিয়া কৃপা ভিক্ষা করিবে ? চিন্তামণি অঙ্গে বিভূতি লেপন করিল, ধূলি-ছাই মাখিয়া পূর্ব্বের ছার বাসনার মুখে ছাই দিতে চাহিল !

"এবে কেশের বিন্যাস।
কেশ তুমি অতি প্রতারক ;

* * *

পূর্ব্বভাগে—
সাধুত্তমে ভুলাতে পারিবি আর ?
তাঁর কৃপা হ'লে কৃষ্ণচন্দ্রে পাব।
আরে আমি বড়ই পতিত—
পাব আমি পতিত-পাবন।"

রমণীর সৌন্দর্য্য-বোধের পক্ষে যাহা অত্যাজ্য, যাহা রমণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিরোভূষণ, চিন্তামণি এইবার তাহাই, সেই ভুজঙ্গিনী-তুল্য কৃষ্ণ-কেশরাশি ছিন্ন করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু যিনি সর্ব্ব-সুন্দর, সকলের সকল সৌন্দর্য্য-স্থানের প্রতি যাঁহার নিত্য দৃষ্টি, তিনি এইবার আর নেপথ্যচারী হইয়া থাকিতে পারিলেন না, বৃন্দাবনের রাখাল-বালকের বেশ ধরিয়া আসিয়া চিন্তামণির হাতখানি ধরিলেন—"ছি ভাই, চুল কাটছ কেন ভাই ? চুল কি কাটতে আছে ? ছি—ছি, চুল কেট'না—। কেন, পতিহীনা নারীরা ত চুল কাটিয়া মস্তক মুণ্ডন করে ? তবে চিন্তামণির পক্ষে সেই বিধি অবৈধ কেন ? রসতত্ত্বের দিক্ দিয়া ইহার নিগূঢ় ফলিত অর্থ যে কতখানি, তাহা যুগল-রসে রসিক বৈষ্ণব মহাজনগণ অবশ্যই বুঝিবেন। সমাজ-নীতির দিক্ দিয়া ইহার বিচার করিলে চলিবে না। বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণির জীবন-নাট্যে গিরিশচন্দ্র যদিও সমাজ-নীতি কুত্রাপি উল্লঙ্ঘন করেন নাই, তথাপি তিনি রসতত্ত্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে আশ্চর্য্য কৌশলে উভয় দিক্ রক্ষা করিয়া, ইহা-দিগকে অতি সন্তর্পণে নাটকের শেষ পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছেন। পাগলিনীর অ-প্রাকৃত জীবন তাঁহাকে এই বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। নাট্যকার পাগলিনীর মুখে যেরূপ ভাষা মানান-সই হয়, সেইরূপ ভাষা ও ভাবের সাহায্য লইয়া বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণির যুগলভাব অবিকৃত রাখিবার জন্য পাগলিনীর মুখ দিয়া বিল্বমঙ্গলকে উদ্দেশ্য করিয়া চিন্তামণিকে বলাইয়াছেন—"তুমি তোমার স্বামীর কাছে যাও মা, আমি আমার স্বামীর কাছে যাই"—অথবা অন্যত্র,—"তুই যেন মা, আমার মেয়ে, তোর যেন স্বামীর কাছে রেখে আসতে যাব। এবং পুনশ্চ, বিল্বমঙ্গলের নিকটে লইয়া গিয়া—"তুমি যাও মা, আমি কি জামায়ের কাছে যেতে পারি" ? বিশেষতঃ, রসশেখর রসিক-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ যাহার সহিত সখী-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া—"ভাই" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, সে কি রসের রাজ্যে শ্রীমতীর অনুরূপা না হইয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া, যোগিনী সাজিয়া, দ্বন্দ্ব অর্থাৎ যুগল-ভাবের, ব্যভিচার করিতে পারে ?

রাখাল। তুমিও বুঝি "কৃষ্ণ-কৃষ্ণ" কর? উ, উ? ছি ভাই, কথা কইলে না? আমি তবে চল্লুম।

চিন্তামণি। আহা! তুই কে রে?

রাখাল। ছি ভাই, তুমি মিষ্টি কথা জান না; তুমি বল্‌বে—'তুমি কে ভাই?' আমি বল্‌ব—'কেন ভাই, তোমায় বল্‌বো কেন ভাই?'

চিন্তামণি। কেন ভাই, ব'ল্‌বে না ভাই? আহা! আমার যেন সকল জ্বালা জুড়াল!

রাখাল। এই বৃন্দাবনে এসেচ, ঠিক কথা বল—কৃষ্ণকে চাও, কি আমায় চাও?

চিন্তামণি। কৃষ্ণকে চাই; তোমায়ও ভালবাসি।

রাখাল। না ভাই, অমন ভাব আমি করি নি। যাকে হয়, একজনকে পছন্দ ক'রে নাও। আমি ত বল্‌চি নি যে, আমায় তোমায় নিতেই হ'বে।"

হায় মদনমোহন! আরও কি বলিবার বাকি আছে যে, চিন্তামণিকে তোমায় লইতেই হইবে? দুই নৌকায় পা দেওয়া তুমি পছন্দ কর না, বুঝি—সেই কথাটাই শুধু বলিবার বাকি ছিল?

এইবার সোমগিরিকে সঙ্গে লইয়া পাগলিনী আসিয়া দেখা দিলেন

"অকস্মাৎ কোথা হ'তে কেবা আসে
তাঁর ভাষে হয় হৃদে আশার সঞ্চার—
বিশ্বাস বিকাশে প্রাণে,"

'গুরু-করণ' করা চাই, নতুবা প্রত্যক্ষ ঈশ্বর সাক্ষাৎ হইবে না—গুরু-ভক্ত গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাসে বাধিবে।

চিন্তামণি। বোধ হয়, কৃষ্ণ আমায় কৃপা কর্ব্বেন; মা'র মুখ দেখে আমার বড় ভরসা হচ্চে। আহা! কাত্যায়নীর বরে গোপিনীরা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছেন, মা'র বরে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়! * * মা করুণাময়ী, মা, সত্যি তুই আমার মা! দয়াময়ী! আমায় ত ভোলনি?

পাগলিনী। ওমা, আমি নই মা; বাবাকে জিজ্ঞাসা কর, বাবা তোরে বলে দেবে।

চিন্তামণি। মা, তোমার কথায় দেশ ছেড়েছি; তোমার কথায় বাবাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছি—আশীর্ব্বাদ কর, যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। (সোমগিরির প্রতি) বাবা, আমার উপায় কি হ'বে? আমি মহাপাতকী, রাধাবল্লভ কি আমায় দয়া কর্ব্বেন?

সোমগিরি। মা, তোমার যে প্রেম, অবশ্যই দয়া কর্ব্বেন।

চিন্তামণি। বাবা, আমার প্রেম!—

প্রেমহীনা পাষাণী পাপিনী,
পিতা,
কৃপা ক'রে বল না উপায়।

সোমগিরি। মা, আমি হীন; আমি কি উপায় কর্ব্ব? বৃন্দাবনে বিল্বমঙ্গল নামে একজন সাধু আছেন, তাঁর শরণাগত হও, তোমার উপায় হবে।

চিন্তামণি। বাবা, তুমি আমার গুরু। যখন তুমি বল্লে, উপায় হবে—আমার প্রাণে স্থির বিশ্বাস হ'ল; * * বাবা, ব'লে দিন্, তিনি কোথায় থাকেন?

পাগলিনী। "তুই দেখা পাস্‌নি? আমি দেখিয়ে দোব।"

তখন মহামায়া রাখাল-রাজের সহিত সখীত্ব-বন্ধনে বদ্ধ, গুরু সোমগিরি-দত্ত আশীর্ব্বাদে পরিশুদ্ধ, ভক্তি-বিশ্বাস-প্রেম-পরিপ্লুত চিন্তামণিকে দ্বার ছাড়িয়া দিলেন; বৈরাগ্যের প্রত্যক্ষ চেতন-মূর্ত্তি, মহাভাবে সমাধিস্থ, কৃষ্ণ-দর্শন-রূপ-মুগ্ধ বিল্বমঙ্গলের পার্শ্বে উত্তর-সাধিকাকে পৌছাইয়া দিলেন :—

"চাও ফিরে বারেক সন্ন্যাসী,
দাসী তব মাগে পদাশ্রয়।
দয়াময় চিরদিন সদয় হে তুমি,
আজি হ'য়ো না নিষ্ঠুর।
কৃপা যদি নাহি কর, গুণধাম,
হেয় প্রাণ এখনই ত্যজিব—
নারী-বধ লাগিবে তোমায়।
এসেছি হে বড় আশে,
আকিঞ্চন, করিব হে কৃষ্ণ দরশন
তব কৃপা-বলে, প্রভু!"

স্বয়ং বাগ্দেবী যেন চিন্তামণির রসনায় অধিষ্ঠিতা হইয়া চিন্তামণির পূর্ব্বাপর, প্রথম হইতে তদানীন্তন কাল পর্য্যন্ত জীবনের গতি, নখদর্পণে নিরীক্ষণ করিয়া, সেই জীবনের অনুরূপ ভাব ও ভাষা তাহাকে বরদান করিলেন! পূর্ব্বের সেই রূপ-গর্ব্বিতা, মুখরা চিন্তামণি আজ সন্ন্যাসী বিল্বমঙ্গলের পদাশ্রয়-প্রার্থিনী দাসী, পূর্ব্ব প্রণয়ের দাবীর জোর এখনও মিটে নাই বটে, এখনও 'মরিব'—"নারীবধ লাগিবে" বলিয়া তাহার অধরোষ্ঠ স্ফুরিত হইতেছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বের সেই আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির আকিঞ্চন এখন কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতির আকিঞ্চনে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা বলি, ধন্য গিরিশচন্দ্র! তুমি নারী-হৃদয়ের সমস্ত রহস্য, স্থান-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে, কি স্বল্প পরিসরে ঐ কয়েকটি ছত্রে, কি নিখুঁত পরিপাটী ভাবে উদ্ঘাটিত করিয়াছ।

কৃষ্ণ-নাম কর্ণে যাইতেই বিল্বমঙ্গলের সংবিৎ ফিরিয়া আসিল, এবং চক্ষু উন্মীলন করিতেই 'চক্ষুরুন্মীলিতং যেন' সেই চিন্তামণিকে 'তস্মৈ শ্রী-গুরবে নমঃ' বলিয়া প্রণাম করিল—"একি গুরু! প্রেম-শিক্ষাদাতা! বিশ্বমোহিনী, আমায় কৃপা করুন।" আমরা আবার বলি, ধন্য গিরিশচন্দ্র! এই প্রণামের তুলনা নাই! এখানেও তুমি রসতত্ত্ব-সিন্ধুর সমস্ত রহস্য, তোমার রস-ঘন জীবনের অপূর্ব্ব ভাবুকতায় চরম

পরিচয়, চিন্তামণি-চরণে ঐ এক প্রণামের দ্বারা উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছ! সংস্কৃত-সাহিত্যে, প্রণয়ীর, প্রণয়িণী-চরণে পতিত হওয়ার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু তাহা কতকটা 'কেঁদে সেধে' পায়ে ধরার'ই অনুরূপ, প্রণাম নহে। ভক্ত রসিক-চূড়ামণি জয়দেব গোস্বামীর সেই—

"স্মরগরল-খণ্ডনম্
মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদ-পল্লবমুদারম্"—

ইহাও প্রণাম নহে, ইহাতেও কতকটা স্মর-গরলের মানভঞ্জনের গন্ধ রহিয়াছে। এই প্রণাম সাধক-শিরোমণি চণ্ডীদাসের রজকিনী-পদে সেই প্রণামের অনুরূপ—

"এক নিবেদন, করি পুনঃ পুনঃ
শুন রজকিনী রামি!
যুগল চরণ শীতল দেখিয়া
শরণ লইলাম আমি॥
রজকিনীরূপ, কিশোরী-স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন, করে উচাটন
দেখিলে পরাণ জুড়ায়॥
তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমার ভজন
তুমি বেদ-মাতা গায়ত্রী॥"

অথবা অন্যত্র—

"কিশোরী-চরণে পরাণ স'পেছি
ভাবেতে হৃদয় ভরা।
দেখ হে কিশোরী অনুগত জনে
কোরো না চরণ ছাড়া॥
কিশোরীর দাস আমি পীত-বাস
ইহাতে সন্দেহ যার।
কোটি যুগ যদি আমারে ভজয়
বিফল ভজন তার।"

চণ্ডীদাস-কৃত এই প্রণামের মহিমা বুঝিতে পারিলে বিল্বমঙ্গলের ঐ প্রণামের মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারা যায়। যিনি প্রেমের সাধনে, কখনও না কখনও কামগন্ধহীন না হইয়া উত্তর-সাধিকাকে মহাগরবিনী, মহামহিমময়ী, মাতা-পিতৃ-গায়ত্রী এমন কি, সকল অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অধিক জ্ঞানে তাঁহার দাসানুদাস না হইয়া তাঁহাকে "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ" উচ্চারণ দ্বারা প্রণাম-অর্চ্চনা না করিয়াছেন, তাঁহার বস্তুজ্ঞান হয় নাই, তিনি নিখিল-প্রেম-চিন্তামণি-চরণে পৌঁছিবার পাথেয় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, এবং তিনি বিল্বমঙ্গলের "গুরু, প্রেমশিক্ষা-দাতা, বিশ্বমোহিনী, আমায় কৃপা করুন"—এই আত্ম-নিবেদনের রস-মাধুরী সম্যক্ উপভোগ করিতে পারিবেন না। তুমি গুরু, তুমি না থাকিলে আমার প্রেমশিক্ষা হইত না, তুমি বিশ্ববিমোহিনী—তুমিই মোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া যোগীশ্বর মহাদেবকে বিচঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিলে, তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও,আমার মতি স্থির কর, তোমার রূপ ধরিয়া যিনি বিশ্ব-বিমোহন করিয়াছিলেন এবং এখনও করিতেছেন, যিনি তোমার প্রতি অঙ্গে, প্রতি কার্য্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সংসারস্থ সর্ব্ব-জীবকে মুগ্ধ করিতেছেন, তাঁহার নিকট আমাকে কৃপা করিয়া পৌঁছাইয়া দাও; কারণ, তুমি কৃপা না করিলে, তিনি কৃপা করিবেন না। বিল্বমঙ্গল এই প্রণাম পূর্ব্বের রমণী-চিন্তামণিকে করিতে পারেন নাই, জননী-জ্ঞানে অহল্যাকেও করিতে পারেন নাই, কিন্তু রমণী ও জননী ভাবের ঊর্দ্ধে অধিষ্ঠিতা এখনকার এই রূপান্তর-প্রাপ্তা ঠাকুরাণী-চিন্তামণিকে প্রণাম না করিয়া তিনি থাকিতে পারিলেন না। বহুভাগ্য-গুণে এই প্রণাম যাঁহার জীবনে কোনওদিন আসিয়াছে, তিনিই ইহার রস-মাধুর্য্য বুঝিতে পারিবেন।

চিন্তামণি কিন্তু নিজের মহিমা নিজে বুঝিতে পারিল না। তাই বিল্বমঙ্গলের ঐ প্রণামের উত্তরে বলিল, "প্রভু, অকিঞ্চনকে আর বঞ্চনা ক'র না। হে যোগিবর, হে প্রেমিক পুরুষ, প্রেমময় কৃষ্ণ তোমার,—আমায় বলেছিল, আমি যা চাই, তুমি দিতে পার; তোমার কৃষ্ণকে আমায় দাও; না দাও, তোমার কৃষ্ণ তোমার থাকবে—আমায় একবার দেখাও। আমি বড় পতিত, পতিত-পাবনকে একবার দেখি।"

"প্রেমময়ি, কৃষ্ণপ্রেমে তোমার হৃদয় পূর্ণ—কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে।" ইহা অবশ্যই পূর্ব্বের সেই চিন্তামণির প্রতি বিল্বমঙ্গলের শ্লেষোক্তি নহে। সন্ন্যাসী সোমগিরিও চিন্তামণিকে পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, তাহার যে প্রেম, তাহাতে অবশ্যই রাধাবল্লভ তাহাকে দয়া করিবেন। সাধু-সন্ন্যাসিগণ মন-রাখা মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করেন না,—তাঁহারা দিব্যদৃষ্টির দ্বারা অবশ্যই দেখিয়াছিলেন যে পঙ্ক হইতে এতদিনে পঙ্কজের উদ্ভব হইয়াছে। যে কাম-বিলাসিনী চিন্তামণি এককালে ঘৃণার পাত্রী ছিল, সে এখন সেই কামবস্তু সম্বল করিয়াই মহা-প্রেমধনের অধিকারিণী। বস্তুতঃ কাম নিজে কিছু ঘৃণার বস্তু নহে; কাম যদি সারা জীবনের সাধনে কাম-মাত্রেই পর্য্যবসিত থাকিয়া যায়, প্রেমের পদবীতে আরোহণ করিতে না সমর্থ হয়, তাহা হইলেই কাম ঘৃণার বস্তু। আর্য্য ঋষিরা এই গুহ্য তত্ত্বের সমস্ত রহস্য অবগত ছিলেন বলিয়াই বিবাহের মন্ত্রে কামকে বারংবার স্তুতি করিয়াছেন। "ক ইদং কস্মা অদাৎ, কামঃ কামায়াদাৎ, কামো দাতা, কামঃ—প্রতি-গৃহীতা, কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ, কামেন ত্বা প্রতিগৃহ্লামি, কামৈতত্তে।" কাম তোমাকে দান করিলেন, কাম তোমাকে প্রতিগ্রহণ করিলেন, কাম সমুদ্রে প্রবেশ করিল,

কামের জন্যই তোমাকে গ্রহণ করিলাম, তুমি কামের জন্যই উৎসৃষ্ট। কাম নিজেই সমুদ্রবিশেষ, কিন্তু এখন সে যে সমুদ্রে প্রবেশ করিল, তাহার নাম মহাপ্রেম। পারাবার। বস্তুতঃ প্রেম কুত্রাপি অযোনিসম্ভব নহে। পুরুষের প্রতি পুরুষের, নারীর প্রতি নারীর প্রেম জন্মে না। পুরুষের প্রতি নারীর এবং নারীর প্রতি পুরুষেরই প্রেম জন্মিয়া থাকে। এমন কি, পুরুষ-দেবতার প্রতি পুরুষের, নারী-দেবতার প্রতি নারীর ভক্তি পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে, কিন্তু প্রেম জন্মিবে না। অবশ্য ভক্তি ব্যতিরেকে প্রেম জন্মিতে পারে না, কিন্তু ভক্তির উপরোক্ত যে প্রেম-মহারাজ্য, সেই মহারাজ্যের মহারাজ এক কৃষ্ণচন্দ্র ব্যতীত—সেই এক প্রেমময় মহাপুরুষ ভিন্ন, অন্য কোনও পুরুষ-দেবতার প্রতি পুরুষের প্রেম জন্মিতে পারে না। কিন্তু তাহাও ব্রজ-গোপিনীদের গোপী-ভাব আশ্রয় করিয়া, পুরুষের গোপিনীদের ন্যায় নারী হইয়া ভজনার দ্বারা, অন্য কোনও প্রকার ভজনার দ্বারা নহে। সেই জন্যই প্রেমের রাজ্যে, রসের সাধনে, গোপী-ভাবের এতটা শ্রেষ্ঠত্ব। কামের অস্তিত্ব নাই, অথচ অকস্মাৎ প্রেম জন্মিল—ইহা কুত্রাপি সম্ভবপর হয় না, হইবারও নহে। প্রেমের প্রগাঢ়তা কামনা ভিন্ন সম্ভবে না। তাই কাম হইতে প্রেমে রূপান্তর, কামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি এবং বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণির জীবনে ইহা নিরতিশয় নিপুণতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। চিন্তামণির কিন্তু তখনও আশঙ্কার অন্ত নাই,—বিল্বমঙ্গলকে মিনতি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—"মহাপুরুষ, কৃষ্ণকে কি পাব?

বিল্বমঙ্গল। অবশ্যই পাবে।

চিন্তামণি। "কোথা কৃষ্ণ, দেখা দাও; ভক্তবৎসল! না দেখা দিলে, তোমার ভক্তের কথা মিথ্যা হবে"। চিন্তামণির কৃষ্ণদর্শন হউক আর না হউক, কিন্তু তাহার প্রণয়ী বিল্বমঙ্গল, কৃষ্ণভক্ত বিল্বমঙ্গলের কথা মিথ্যা হইবে—ইহা তাহার সহিবে না! কিন্তু ভক্তের কথা মিথ্যা হইল না, চিন্তামণির সেই পূর্ব্বের সখা রাখালরাজ অন্তরাল হইতে কৌতুক করিয়া বলিলেন—"কেন ভাই, তোমার সঙ্গে যে আমার আড়ি।" চিন্তামণির আনন্দের আর অন্ত নাই—সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিল—"হায়! আমি চিনেও চিনি-নি! প্রেমিক রাখাল; আমি প্রেম-শূন্য, তুমি জান ত; নিজগুণে দেখা দাও।

নেপথ্যে। "মা, দেখ।" তখন যুগলের নিকট শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তির দর্শন হইল। কিন্তু এই "মা দেখ" চিন্তামণির উক্তির পরে সন্নিবেশিত হইলেও ইহা সেই উক্তির প্রত্যুত্তরে নহে! নেপথ্যচারী রাখাল-বালক চিন্তামণিকে মাতৃ-সম্বোধন করেন নাই। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, এই "মা-দেখ" বণিকপত্নী অহল্যার প্রতি তাঁহার মাতৃ-সম্বোধন। চিন্তামণিকে 'ভাই' বলিয়া পরক্ষণেই রাখালরাজ তাহাকে মাতৃ-সম্বোধন করিতে পারেন না। তাহা করিলে রসের রাজ্যে ব্যভিচারী দোষ ঘটিত। গিরিশচন্দ্র এমন ভুল করেন নাই, করিতেও পারেন না। "কৃষ্ণ এলেই তোমায় বল্‌ব"—অহল্যার প্রতি রাখালের ইহা পূর্ব্ব প্রতি-শ্রুতির পালন। "বাবা, চাঁদ-মুখে আর একবার 'মা' বল। "অহল্যার এই উক্তি হইতে উহার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। চিন্তামণি যুগল-মূর্ত্তি-দর্শন-আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়াছে "দেখরে, প্রাণ ভরে দেখ।" ইহা ছেলেকে মায়ের দেখার আনন্দ নহে, প্রেমময়কে প্রেমিকার দেখার আনন্দ-উল্লাস। এই খানেই, এই রসের রাজ্যেই জননীর উপরে রমণী। তাই শ্রীরাধা এই রাজ্যের মহারাণী, তিনি জননী নহেন, কিন্তু রমণীর শিরোমণি। তাই এই নাটকে চিন্তামণি রমণী-রূপেই প্রধানা, অহল্যা জননীরূপেও অপ্রধানা।

"ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদল পদ্মে রূপের আশ্রয়।
ইষ্টে অধিষ্ঠাতা তার স্বরূপ লক্ষণ হয়॥
সেই ইষ্টে যাহার হয় গাঢ় অনুরাগ।
সেইজন লোক-ধর্ম্মাদি সব করে ত্যাগ॥
কায়মনো-বাক্যে করে গুরুর সাধন।
সেই ত করণে উপজয়ে প্রেমধন॥"

বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণির রূপজ মোহ আশ্রয় করিয়া, গুরু-কৃপায়, প্রেম-ধন উপার্জিয়াছিল, তাই সেই প্রেম-ধন হৃদয়ে লইয়া উভয়ের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হইল—যুগল-রসের রসিক, যুগল-রূপ-মাধুরী দর্শনে, জীবনের সাধ মিটাইল। এইবার—

"সহজ মানুষ হব, রসিক-নগরে যাব,
থাকিব প্রণয়-রস-ঘরে।
শ্রীরাধিকা হবে রাজা, হইব তাহার প্রজা,
ডুবিব রসের সরোবরে॥
সেই সরোবরে গিয়া, মন-পদ্ম প্রকাশিয়া,
হংস প্রায় হইয়া রহিব।
শ্রীরাধামাধব-সঙ্গে, আনন্দ-কৌতুক-রঙ্গে
জনমে মরণে তুয়া পাব॥"—

সোমগিরির শিষ্যের সঙ্গে আমরাও বলিতেছি—"যাঁকে লম্পট বলেছি, যাঁকে বেশ্যা বলেছি, তাঁদের চরণে আমার কোটী প্রণাম," এবং সোমগিরির সঙ্গে আমরাও বলিতেছি—"বেশ্যা ও লম্পটের কৃপায় আজ আমরাও কৃষ্ণদর্শন" করিলাম। কৃষ্ণদর্শনের ফল—কৃষ্ণদর্শন; কারণ কৃষ্ণ বই আর ইষ্ট নাই এবং কৃষ্ণদর্শন হইলে অন্য ফলের আর আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

এইবার প্রবন্ধ সমাপন-কালে কৃতাঞ্জলি-পুটে সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি—"বিল্বমঙ্গল ঠাকুর" তদ্‌ভাবে ভাবিত হইয়া, শ্রদ্ধানু-হৃদয়ে অত্যন্ত সাবধানে পাঠ করিতে হয় এবং নিরতিশয় নিষ্ঠা ও যত্নের সহিত ইহার অভিনয়ও করিতে হয়। এই

নাটকের প্রতি ছত্রে, প্রতি বাক্যে, সৌন্দর্য্য নিহিত রহিয়াছে, ভক্তের চক্ষে, রসিকের চক্ষে, শিল্পীর চক্ষে, সেই সৌন্দর্য্য অবশ্যই ধরা পড়িবে। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন —"বিল্বমঙ্গল সেক্সপীয়ারের উপর গিয়াছে। আমি এরূপ উচ্চ ভাবের গ্রন্থ কখনও পড়ি নাই।" যে দেশে শ্যাম নাই, শ্যামা নাই, শ্রীরাধা নাই, শ্রীচৈতন্য নাই, শ্রীরামকৃষ্ণ নাই, সেই দেশের সেক্সপীয়ার মহাকবি হইলেও, বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণির মহাভাবের সন্ধান পাইবেন কিরূপে? শ্রুতি বলিয়াছেন—'রসো বৈ সঃ"। তিনি রস স্বরূপ, রসময়। সকল রসের সেরা রস শৃঙ্গার বা আদিরসে তাঁহার পূর্ণ বিকাশ। গিরিশচন্দ্র চিন্তামণি চরিত্র-চিত্রণে আদি রসের নিকৃষ্ট অঙ্গ কাম-কলা হাব-ভাবের আশ্রয় না লইয়াও চিন্তামণি-বিল্বমঙ্গল-হৃদয়ে মধুর-রসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সেই জন্যই রসময় মদনমোহন যুগল-মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহাদের দর্শন-দানে ধন্য করিয়াছিলেন। এই চিন্তামণি শুধু নাট্যকারের কৃপায় নয়, স্বকীয় মধুর-রস-সাধনের দ্বারাই বিল্বমঙ্গল-নাটকের মধ্যমণি। এই চিন্তামণিরই কৃপায় শুধুই বিল্বমঙ্গলের নয়, সশিষ্য সোমগিরির, বণিকপত্নীর, ভিক্ষুকের এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও কৃষ্ণদর্শন হইল! বস্তুতঃ, নাটকের শেষ দৃশ্য পাঠ করিতে করিতে বা তাহার অভিনয় দেখিতে দেখিতে যদি এই "কৃষ্ণদর্শন" প্রত্যক্ষ না হইয়া উঠে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, নাটক পাঠ বা অভিনয় দর্শন ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, একটু সুকৃতি থাকিলে, একটু গুরু-কৃপা থাকিলে, একটু মধুর-রসের কণা হৃদয়ে থাকিলে, ভক্ত-কবি-গিরিশ-বাক্য কখনই নিষ্ফল হইবে না—নিত্যলীলা-মাধুরী প্রত্যক্ষ হইবেই হইবে।—

"বৃন্দাবনে নিত্যলীলা দেখ রে নয়ন।
যার সাধ থাকে, সে দেখ এসে,
রাধার পাশে মদন-মোহন!
নয়ন এ অনুভবে—
দেখবে যখন নীরব র'বে
এমন সাধের রতন সাধ কর নি,
না জানি রে তুই কেমন!"

শুধু অনুভবে নয়, মনকে আঁখি ঠারিয়া—ঠারে-ঠোরে নয়, যেমন তোমাকে আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেইরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন। 'পাঁচসিকা পাঁচ আনা' বিশ্বাসী, বীরভক্ত 'ভৈরব' গিরিশচন্দ্র না বলিলে এমন জোরের কথা বলে কাহার সাধ্য? শুধু নীরবে, কূর্ম্মের মত সঙ্কুচিত করিয়া মনকে হৃৎপদ্মে প্রতিষ্ঠিত কর, দেখিবে—

"তেমনি করে প্রেমের বাঁশরী,
তেমনি বামে ব্রজেশ্বরী প্রেমের কিশোরী,
তেমনি গোপী, তেমনি খেলা
শুনেছিলি রে যেমন।"

বস্তুতঃ, মানবের হৃদয়-বৃন্দাবনে সেই যুগলের লীলাই ত যুগে-যুগে চলিতেছে। দাম্পত্য-প্রেম, বাৎসল্য, স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, শোক, তাপ, বিরহ—সকলই ত' যুগলের লীলা-মাধুরীর প্রকাশ। তুমি না থাকিলে আমার অস্তিত্ব থাকে না। তোমার হৃদয়ের সহিত আমার হৃদয়ের যুগল-মিলন হয় বলিয়াই ত' আমার সুখ এবং আমার দুঃখ। তাই শ্রীরাধার পার্শ্বে নিত্য বিরাজিত মদনমোহন; নতুবা শুধুই মদনে বিশ্বসংসার জ্বলিয়া পুড়িয়া 'খাক্' হইত, রসের স্ফূর্ত্তি হইত না, স্বরূপ-চিন্তামণির দর্শন-মাধুরীর লোভে মানুষ গোপিনীর ন্যায় যুগে যুগে আকুলি-বিকুলি করিত না। তাই সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র—

"চেতন যমুনা, চেতন রেণু,
গহন কুঞ্জবন ব্যাপিত বেণু,
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!"

গিরিশচন্দ্র বিল্বমঙ্গলের মুখ দিয়া বলিয়াছেন—"গুরুর চরণে প্রণাম, ভক্তবৃন্দের চরণে প্রণাম, যাঁদের কৃপায় আমি গোপিনী-বল্লভ দর্শন পেলুম।" গিরিশচন্দ্র তাঁহার জীবনে অবশ্যই তাঁহার গুরুর কৃপায়, ভক্তবৃন্দের কৃপায় গোপিনী-বল্লভের দর্শন পাইয়াছিলেন। কিন্তু ভক্তবৃন্দের চরণে গিরিশচন্দ্রের সেই প্রণাম, ভক্তবৃন্দ, তথা তাঁহার সুশিক্ষিত স্বদেশবাসী কি নীরবেই গ্রহণ করিলেন? এই প্রশ্নের সমুচিত উত্তর অন্ততঃ এতাবৎকাল পর্য্যন্ত, এমন কি গিরিশচন্দ্রের শতবার্ষিকী উৎসবেও, পাওয়া যায় নাই। তবে কাল নিরবধি এবং পৃথিবী বিপুলা, তাই আশা করা মহাকাল স্বয়ং একদিন এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।

গিরিশচন্দ্রের জীবনের একটি শুভদিনে

শ্রীকুমুদিনীকান্ত কর

ঊনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গালী জীবনের সন্ধিক্ষণ। বাঙ্গালী এই যুগে তাহার নিজ সাধনা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া স্বীয় বৈশিষ্ট্য ভুলিয়া স্বেচ্ছাচার-প্রণোদিত জীবন যাপন করিয়া সত্য সত্যই আত্মঘাতী হইয়াছিল। সেই মরণের দিনে যাঁহাদের অতুল প্রতিভায় ও প্রেরণায় বাঙ্গলার তমোময় নিশা প্রভাত হইয়াছিল, যাঁহাদের জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তি নানাভাবে বাঙ্গালীর মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করিয়া পরম কল্যাণ সাধন করিয়াছিল, গিরিশচন্দ্রকে তাঁহাদের অন্যতম বলিয়া আমি মনে করি। মহাভাগ্যবান্ গিরিশচন্দ্র সদ্‌গুরু লাভ করিয়াছিলেন। সদ্‌গুরুর কৃপায় কঠোর তপস্যা করিয়া বুঝি বা জগতের অতি দুর্লভ সত্যের সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন। তাঁহার সাধনাক্ষেত্র রঙ্গমঞ্চ; সেখানেই তাঁহার সিদ্ধিলাভ। সেখানে যেন যোগাসনে সমাসীন হইয়া তাঁহার

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

অমর-লেখনীর সিদ্ধ-বীণায় যে গান তিনি গাহিয়াছিলেন, তাহা চিরকল্যাণময়, আনন্দময়; তাহা আত্মভোলা মানুষকে মানুষ হইবার জন্য চিরদিন উদ্বোধিত করিবে।

যাঁহার রচনা—যাঁহার সঙ্গীত জাতির প্রাণের কথা কয়, জাতির অসাড় দেহে প্রাণ সঞ্চার করে, প্রাণে আনন্দ আনে, মন নাচাইয়া তোলে, আদর্শ নির্দ্দেশ করে, নীতি উপদেশ করে, ব্যক্তি বা জাতির মুক্তির সন্ধান দেয়, মানুষকে মর্য্যাদা দান করে, সর্ব্বোপরি মানুষকে মানুষ হইতে উদ্বুদ্ধ করে, তিনিই মহাকবি—জাতীয় মহাকবি। গিরিশচন্দ্র এই সমস্তই জাতিকে দান করিয়াছেন, তাই ত তিনি মহাকবি। মহাকবি গিরিশচন্দ্রকে আজও আমরা সর্ব্বতোভাবে চিনিতে পারিয়াছি বলিয়া ত' মনে হয় না। তাঁহার রচনামৃত-রসাস্বাদ করিবার অধিকারী হইয়াও আমরা ভাগ্যদোষে বঞ্চিত রহিয়াছি! এমন দিন হয় ত' বেশী দূরে নয়, যেদিন দেশ-বিদেশের ভাবুকরা বাঙ্গালার দ্বারে আসিয়া নতজানু হইয়া শিষ্যের ন্যায় গিরিশচন্দ্রের সাহিত্য এবং ভাব-ধারার সঙ্গে পরিচিত হইয়া কৃতার্থ হইবেন।

গিরিশচন্দ্র ছিলেন ভগবৎপ্রেম এবং স্বদেশপ্রেমের মহাপ্রেমিক। ভগবৎপ্রেমের প্রেমিক না হইলে সত্যিকার স্বদেশ-প্রেম বুঝি ধরা দেয় না। যিনি একবার এই প্রেম-সাগরে ডুব দিয়াছেন একমাত্র তাঁহারই কাছে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' মন্ত্র মহাসত্য; একমাত্র তিনিই 'বন্দে মাতরম্' মহামন্ত্রের দ্রষ্টা এবং তাঁহারই উহা উচ্চারণ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার। তাঁহার রচনায়—তাঁহার সঙ্গীতে দেশমাতৃকা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কথা কহেন, সন্তানদের প্রাণে আশার সঞ্চার করেন।

এই ভগবৎপ্রেমিকের প্রেমের টানে সমসাময়িক দুইজন মহাপ্রেমিক মহাপুরুষ আকৃষ্ট হইতেন। তাঁহার রঙ্গমঞ্চ-রূপ সাধনা-ক্ষেত্রে যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান সময়ে সময়ে তিনি করিতেন, এই মহাপ্রেমিকদ্বয় হোতার আমন্ত্রণে সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইতেন। তাঁহাদের পদরজে যজ্ঞস্থল পবিত্র হইত। মহাযজ্ঞ দর্শন করিতে করিতে মহাপুরুষদের অশ্রু ঝরিত, রোমাঞ্চ হইত, দেহ কাঁপিত, ভাব-সমুদ্র উথলিয়া উঠিত। তাঁহারা সমাধিস্থ হইয়া পরমানন্দ ভোগ করিতেন। তাঁহারা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ। গোস্বামী প্রভুর কথাই আজ এখানে একটু বলিবার চেষ্টা করিব।

১২৯১ সন। শ্রাবণ মাস। ষ্টার-থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যলীলার অভিনয় চলিতেছিল। একদিন গিরিশচন্দ্র অভিনয় দেখিবার জন্য সশিষ্য ঠাকুরকে (শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুকে) নিমন্ত্রণ করিলেন। সন্ধ্যার পর যথাসময়ে ঠাকুর সকলকে সঙ্গে লইয়া নাট্যশালায় উপস্থিত হইলেন। থিয়েটারের অধ্যক্ষ ৺অমৃতলাল বসু মহাশয় সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া সকলকে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে বসাইলেন। অভিনয় আরম্ভ হইল। ঠাকুর তন্ময় হইয়া অভিনয় দেখিতে

দেখিতে ভাব-মুগ্ধ হইয়া রহিলেন। এই সময়ে গান হইল—

"কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জ-কাননচারী।
মাধব মনোমোহন, মোহন-মুরলী-ধারী।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার।
ব্রজকিশোর কালিয়-হর কাতর-ভয়-ভঞ্জন,
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা,
রাধিকা-হৃদি-রঞ্জন,
গোবর্দ্ধন-ধারণ, বন-কুসুম-ভূষণ,
দামোদর কংস-দর্পহারী,
শ্যাম রাস-রস-বিহারী,
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার।

গান শেষ হইল না। গানের আরম্ভ হইতেই ঠাকুর ভাবাবেশে ঢলিতেছিলেন। এইবার বিদ্যুদ্গতিতে আসন ত্যাগ করিয়া লাফাইয়া উঠিলেন। 'জয় শচী-নন্দন, জয় শচী-নন্দন' বলিতে বলিতে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভাবে বিভোর ভাগ্যবান্ শিষ্যগণ দিশাহারা হইয়া মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি করিতে করিতে ঠাকুরের চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভাবের তরঙ্গ উঠিল! সব গেল স্তব্ধ হইয়া! কেবল রহিল বায়ু-তরঙ্গে মধুর হরিনামের ধ্বনি!

'গোলমাল হচ্ছে—গোলমাল হচ্ছে, থেমে যাও—থেমে যাও' ইত্যাদি বহু কঠিন কথা নাট্যশালার স্থানে স্থানে শুনা গেল। এই সময় ধীরে ধীরে নিঃশব্দে রঙ্গমঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইলেন অমৃতলাল। গলবস্ত্রে করজোড়ে গদ্গদকণ্ঠে 'আজ আমার থিয়েটার করা সার্থক হইল—আজ আমি ধন্য হইলাম' প্রভৃতি বিনীত বাক্য পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। পরে করতালি দিয়া নিজেই 'হরিবোল—হরিবোল' বলিয়া গাহিয়া উঠিয়া অভিনেত্রীদের উৎসাহিত করিলেন। আবার গান আরম্ভ হইল—

"...চন্দ্রকিরণ অঙ্গ, নম বামন-রূপধারী।
গোপীগণ-মনোমোহন, মঞ্জুকুঞ্জচারী।
জয় রাধে, শ্রীরাধে।
ব্রজবালক-সঙ্গ, মদন-মানভঙ্গ,
উন্মাদিনী ব্রজকামিনী, উন্মাদ-তরঙ্গ।
দৈত্যদলন, নারায়ণ, সুরগণ-ভয়হারী,
ব্রজবিহারী গোপনারী-মান-ভিখারী,
জয় রাধে, শ্রীরাধে।

ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ নৃত্য-গীতে দর্শকদের চিত্তও অভিভূত হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে নাট্যমন্দিরে মহাহুলুস্থূল পড়িয়া গেল। স্বামীজি (হরিমোহন-গোস্বামী—প্রভুর শিষ্য) ভাবাবেশে উর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তপ্রবর শ্রীধর (আর একজন শিষ্য) উচ্চনাদে 'হরিবোল হরিবোল'

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

বলিতে বলিতে নানারূপ নৃত্যে সকলকে মাতাইয়া তুলিলেন। ঠাকুরের বাহুসঞ্চালন-পূর্ব্বক মধুর হরিধ্বনির তড়িৎ-ঝঙ্কারে সকলের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। অভিনয় বন্ধ হইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া এইরূপে কীর্ত্তনোৎসব হইল। *

সেদিন ষ্টার-রঙ্গমঞ্চের মহানাম-যজ্ঞধূম আকাশে-বাতাসে দিকে দিকে দিল ছড়াইয়া গিরিশের জয়-গাথা। গিরিশচন্দ্র রহিলেন অমর হইয়া এ-মরধামে।

* ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ।

ভারতীয় প্রসঙ্গ

ভারতের আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনা

সম্প্রতি স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস, মিঃ জে, আর, ডি, টাটা প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পপতিবৃন্দ একটি আর্থিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাতে পাঁচ বৎসর করিয়া তিন দফায় পনর বৎসরের জন্য দশ হাজার কোটী টাকা ব্যয়ে ভারতের আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনা করা হইয়াছে। দেখা যায়, এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে পনর বৎসর পরে ভারতবাসীর মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পাইয়া বার্ষিক ১৩০৲ টাকা হইতে পারে। বিগত ১৯৩১ সালে জনৈক বিশেষজ্ঞের হিসাবে দেখা যায়— ভারতের মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ বার্ষিক ১৭০০ কোটি টাকার অধিক নহে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মাথা পিছু আয় ৬৫৲ টাকা মাত্র। এই পরিকল্পনায় নানা কেন্দ্রিক উৎপাদনের ব্যবস্থা যেরূপ আলোচিত হইয়াছে, বণ্টন সম্পর্কে সেইরূপ হয় নাই। পরিকল্পনায় এই বিষয়ে স্বীকার করিয়া বলা হইয়াছে—"Neither the problem of distribution which is vital to any scheme for raising the standard of living, nor the allied question of the control to be exercised by the state over economic activities are discussed...." তবে অদূর ভবিষ্যতেই এতৎসম্পর্কে আলোচনা হইবে বলিয়া পরিকল্পনাকারিগণ আশ্বাস দিয়াছেন।

এক সময় কংগ্রেসের "ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি" যখন এ দেশের আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়নে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাঁহারা শিল্প, যান-বাহন, কৃষি প্রভৃতি উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে বণ্টন-ব্যবস্থার কথাও বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন। কমিটির চেয়ারম্যান পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলিয়াছিলেন—"কংগ্রেসের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইতেছে সাম্যনীতির ভিত্তিতে সমাজ গঠিত করা, যাহাতে সকলেই সভ্য মানব হিসাবে বাঁচিবার জন্য আর্থিক সম্বল লাভ করে ও উন্নতির সমান অধিকার পায়।"

আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, শুধু মাথা পিছু টাকা হিসাবে আয় বৃদ্ধি হইলেই কি আমাদের সকল সমস্যার সমাধান হইবে?

বাংলার শিক্ষকসমাজ

আমরা ইতিপূর্ব্বে বাংলার দরিদ্র শিক্ষকসমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। তৎপর বিগত দুই মাসের মধ্যে বাংলার নানা অঞ্চল হইতে নানা শিক্ষাকেন্দ্রের সংবাদ আমাদের দপ্তরে আসিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখিয়াছি, আর্থিক দুরবস্থায় পড়িয়া শিক্ষকেরা স্কুল ত্যাগ করিয়া বেশী মাহিয়ানায় 'ওয়ার সার্ভিসে' আসিয়া যোগ দিয়াছেন। ফলে, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে অনেক স্কুল বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, অনেক স্কুলে ছাত্রদের সু অধ্যয়ন হইতেছে না। ইহার মূল কারণ হইয়াছে, শিক্ষকসাধারণের দারিদ্র্য। প্রাইভেট্ স্কুলসমূহের শিক্ষকদের মাহিয়ানা ২০৲ বা ২৫৲ টাকা হইতে অধিক উচ্চে হইলে ৭৫৲ টাকা। তন্মধ্যে সাধারণতঃ ৩০৲ টাকা হইতে ৪৫৲ টাকার অধিক বেতন অনেকের ভাগ্যে মাপিয়া উঠে না। অথচ তাঁহারই উপর একটা বিরাট সংসার নির্ভর করিয়া আছে। এদিকে যুদ্ধের দরুণ সারা দেশময় দুর্ভিক্ষ। বাধ্য হইয়া শিক্ষকবৃন্দকে অধিক বেতনের আশায় যুদ্ধ-সংক্রান্ত কাজে কিম্বা অন্য কোনো কোথাও আসিয়া যোগ দিতে হইয়াছে। ফলে স্কুলসমূহে সম্প্রতি রীতিমত শিক্ষকের অভাব দেখা দিয়াছে। আজ দেশের শিক্ষা-সঙ্কটের দিনে ইহার আশু প্রতিকারের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আজ শিক্ষানীতিরও আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আশাকরি, দেশের জনসাধারণ এ বিষয়ে আগ্রহশীল হইবেন।

বাংলার নূতন গভর্ণর

মিঃ রিচার্ড গার্ডিনার কেসি সম্প্রতি বাংলার নূতন গভর্ণর হইয়া আসিয়াছেন। যদিও তিনি ভারতীয় সংযোগ-বিচ্ছিন্ন অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসী, তথাপি আশা করা হয় তো অযৌক্তিক হইবে না যে, তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা, বিচারশীল দৃষ্টি ও প্রাণশীলতা দ্বারা অনায়াসে বাংলার মাটিকে চিনিয়া বাংলার নিরাপত্তা, জীবন-সমস্যা ও সুশৃঙ্খলার জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা

করিতে পারিবেন। একদিকে কঠিন দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ প্রাণনাশ, সমগ্র দেশময় অশান্তি, বুভুক্ষা, অসন্তোষ—অন্যদিকে শত সহস্র দেশ-সেবকের কারারুদ্ধতা,—বাংলার এই মুমূর্ষুতার সত্যই যদি অবসান সম্ভব হয়, তবে মিঃ রিচার্ড কেসির মহানুভবতার তুলনা হইবে না। তাঁহার নিকট সেই শুভবুদ্ধি ও প্রাণশীলতার দাবী করিয়াই তাঁহাকে আজ আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

স্বাধীনতা-দিবস

বিগত ২৬শে জানুয়ারী ভারতের সর্ব্বত্র 'স্বাধীনতা-দিবস' উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ১৯২৯ সালের লাহোর-কংগ্রেসে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে ভারত প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব করে। তদবধি প্রতি বৎসর উক্ত তারিখে 'স্বাধীনতা-দিবস' অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে এবং এ বৎসরও হইয়াছে।

তপশীলী জাতি সম্মেলন

বিগত ৩০শে জানুয়ারী কানপুরে রাও বাহাদুর শিবরজি, এম-এল-এ'র সভাপতিত্বে নিখিল ভারত তপশীলী জাতি-সমূহের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ আম্বেদকর বিশেষভাবে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন, এবং বলেন: তপশীলী জাতিসমূহকে সঙ্কল্প করিতে হইবে যে, ভবিষ্যৎ ভারতে তাহারা শাসক জাতি হইবে। ভৃত্যের পদে তাহারা আর থাকিবে না। হিন্দুধর্ম্মই তাহাদের জাতির দুর্গতির আসল কারণ। অতএব তাহাদিগকে হিন্দুধর্ম্ম বর্জ্জন করিতে হইবে, এবং যে কোনো অবমাননাকর প্রথায় আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকার করিতে হইবে।··· সভাপতি রাও বাহাদুর ডাঃ আম্বেদকরের প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলেন: তপশীলী জাতিসমূহ হিন্দু-সম্প্রদায় হইতে পৃথক ও বিশিষ্ট, এবং তাহারা ভারতের জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

বৃটিশ ভারতের ব্যবচ্ছেদ-প্রথার মতো হিন্দু-শক্তিরও আজ ক্রমাগত খণ্ডন চলিতেছে। ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে দূরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, তপশীলী সমাজের মধ্যেও আজ স্বাতন্ত্র্যাপনার বিরাট আন্দোলন শুরু হইয়াছে। হিন্দু-ধর্ম্মের মূলমন্ত্র ছিল গণতন্ত্র। এখন তাহা গণ-স্বাতন্ত্র্যে দাঁড়াইতে চলিয়াছে। বিপন্ন হিন্দুসমাজের দুঃখ-দারিদ্র্যের দিনে হিন্দু-শক্তির ক্রম-বিলুপ্তির আসল কারণটি আজ সম্মিলিত হিন্দু জাতিরই অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার অত্যন্ত প্রয়োজন।

কলিকাতায় 'রেশনিং'

গত ৩১শে জানুয়ারী হইতে কলিকাতায় সরকারী 'রেশন' ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্তও দেখা যাইতেছে, অনেক ক্ষেত্রে অনেক ব্যক্তিই রেশন-কার্ড পান নাই। এতদ্ব্যতীত সরকারী রেশন ব্যবস্থায় অধিকাংশ অঞ্চলে যে আতপ চাউল দেওয়া হইতেছে, তাহা তুষ, কুঁড়া ও কাঁকরে পরিপূর্ণ। এতৎসম্পর্কে পূর্ব্ব হইতেই গভর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছে যে, সহরবাসীর জন্য আনীত চাউল, আটা যাহাতে সহর-বাসীর ব্যবহারযোগ্য হয়, গভর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে তাহা দেখিতে হইবে। অনেক কণ্ট্রোল-দোকানে অখাদ্য বস্তু খাদ্যরূপে বিক্রীত হইয়াছে, এবং এখনও বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতে সরকারী সরবরাহ-বিভাগ কর্ত্তৃক প্রেরিত চাউলের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ শোনা যাইতেছে! কলিকাতার খাদ্য রেশনিং-এ সেই শ্রেণীর বস্তু সরবরাহ করা হইলে পরি-কল্পনার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না।

ইহার কিছুদিন পরেই যখন খাদ্য রেশন প্রবর্ত্তন করা সুরু হইল, তখনও দেখা গেল—অধিক ক্ষেত্রেই চাউলের অবস্থা ভীতিপ্রদ। এই সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট যথাশীঘ্র তৎপর না হইলে সারা কলিকাতায় যে অচিরেই সংক্রামক রোগের সৃষ্টি হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহাতে সর্ব্ব-সাধারণ তাহাদের উপযুক্ত রেশনকার্ড এবং খাদ্যোপযোগী চাউল পাইতে পারেন, আশাকরি, গভর্ণমেণ্ট অচিরেই তাহার যথাযথ ব্যবস্থা করিবেন।

ভিজাগাপট্টমে ও উড়িষ্যার উপকূলে শত্রুবিমানের হানা

বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী প্রত্যূষে উড়িষ্যার উপকূলে ও রাত্রিতে ভিজাগাপট্টমে পুনরায় শত্রু-বিমান হানা দিয়া বোমাবর্ষণ করে। তবে কোনো ক্ষতি বা কেহ হতাহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

বৈদেশিক প্রসঙ্গ

বিলাতে শ্রমিকসভায় ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে মিঃ সোরেনসেনের বক্তৃতা

সম্প্রতি উত্তর লণ্ডনে প্রায় ৪৪ হাজার শ্রমিক প্রতিনিধি-বর্গের এক সভায় পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ সোরেনসেন ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে বিগত ২৩শে জানুয়ারী যে বক্তৃতা দান করেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের প্রণিধানযোগ্য। মিঃ সোরেনসেন বলেন: প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলের এ-কথা বলিতে রাজী থাকিতে হইবে যে, আমরা কেবল সিরিয়া, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও অধিকৃত ইউরোপের অপরাপর পরাধীন দেশের স্বাধীনতাতেই আস্থাশীল নহি, ভারতের অধিবাসীদেরও

সেইরূপ স্বাধীনতা দাবীতে আস্থাশীল। ভারতের যে-সকল নেতা কারারুদ্ধ আছেন, তাঁহাদের মুক্তি দেওয়া কর্ত্তব্য। স্যার অসোয়াল্ড মোস্‌লে মুক্তি পাইলেন, অথচ ভারতের বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এখনও কারাগৃহের অন্তরালে আছেন। তথায় দশ কোটি লোক স্থায়ীভাবে অর্দ্ধাশনে কাল কাটায়; এ-দেশের লোকের গড়পড়তা আয়ু ৬০ বৎসর, আর ভারতে উহা মাত্র ২৩ বৎসর। আমাদের গণতন্ত্রের আদর্শ হয় সর্ব্বজাতি সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে, অথবা মোটেই হইবে না। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কংগ্রেসের সহিত পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন করিয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করাই কর্ত্তব্য।…

মিঃ সোরেনসেনের এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার মধ্যে গভর্ণমেণ্টের প্রতি যে ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহা কি চার্চ্চিল সাহেব ও আমেরী সাহেবের মর্ম্মে যাইয়া প্রবেশ করিবে?

'প্রাভদা'র সংবাদ

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের মুখপত্র 'প্রাভদা'য় নিতান্ত আকস্মিকভাবেই এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, কাইরো সহরে দুইজন বৃটিশের সঙ্গে (যদিও তাঁহাদের নাম অজ্ঞাত) রিবেণ্ট্রপের এক সন্ধির আলোচনা হইয়াছে। ফলে 'প্রাভদা'র উক্ত সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কোনও মার্কিন সংবাদপত্র এই ব্যাপারের পিছনে সোভিয়েটের কূট রাজনৈতিক চাল রহিয়াছে অনুমান করিয়া ইতিমধ্যে মন্তব্যও করিয়াছে।

বস্তুতঃ, মস্কো হইতে কাইরো, এবং কাইরো হইতে তেহেরান—পর পর রাশিয়ার সঙ্গে সম্মিলিত পক্ষের প্রতিনিধিবর্গের তিন দফা বৈঠকে এবং সর্ব্বশেষ তেহেরাণ বৈঠকে পরস্পরের মধ্যে সংযুক্তভাবে কাজ করিবার স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তের পর এই আকস্মিক সংবাদে বাস্তবিকই বিস্মিত হইবার কারণ রহিয়াছে। এতৎসম্পর্কে রয়টার বলেন যে, বৃটিশ পররাষ্ট্র-বিভাগ 'প্রাভদা'র প্রকাশিত সংবাদ অস্বীকার করিয়াছেন। এমন কি, কর্ডেল হাল এবং লর্ড হ্যালিফাক্সও ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

নানা মুনির নানা মতে পড়িয়া বিষয়টা রীতিমত গোলকধাঁধাঁয় পরিণত হইয়াছে। এখন সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ইহার কিছু একটা প্রতিবাদ তুলিলেই বিষয়টার নিষ্পত্তি হইতে পারে বলিয়াই মনে হয়।

স্বস্তি

লণ্ডনস্থ "ডেলী ওয়ার্কার" পত্রিকার কূটনৈতিক সংবাদদাতার এক বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, পার্লামেণ্টের যে সকল সদস্য ভারতবর্ষের অবস্থার ক্রমিক অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে ভারতসচিবের দপ্তর কর্ত্তৃক দুইটি উন্নতিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। যথা—(ক) আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কংগ্রেসী বন্দীদের সম্পর্কে পুনর্ব্বিবেচনা, এবং (খ) ইংরাজ ও ভারতীয় সদস্য লইয়া গঠিত একটি মিশ্র কমিশনকে ভারতবর্ষের আর্থিক পুনর্গঠন সম্পর্কে বিবেচনার জন্য শীঘ্রই ভারতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা।

অবশ্য ভারতসচিবের দপ্তরে এই সংবাদের সমর্থন পাওয়া যায় নাই। শেষ পর্য্যন্ত প্রস্তাব দুইটির শেষ সুরাহা হয় কি না, সে সম্বন্ধে স্বভাবতঃই সন্দেহ করা চলে।

ইউরোপীয় যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে হের হিটলারের বক্তৃতা

জার্ম্মাণ রাষ্ট্রনায়কের ক্ষমতা-অধিকার অর্জ্জনের একাদশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে হের হিটলার তাঁহার হেড কোয়ার্টার্স হইতে সমগ্র জার্ম্মানজাতির উদ্দেশে সম্প্রতি এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার মতে—জার্ম্মানী এই যুদ্ধে কেবল মাত্র নিজের স্বার্থেই লড়িতেছে না, সমগ্র ইউরোপের জন্য সে সংগ্রাম করিতেছে। আজ যুদ্ধ যে পথেই চলুক না কেন, এই যুদ্ধের বিজয়ী হইবে একটি শক্তিই, হয় সে সোভিয়েট-রাশিয়া নয়, জার্ম্মানী। জার্ম্মানীর বিজয়ের অর্থ ইউরোপের রক্ষা, আর রাশিয়ার বিজয়ের অর্থ ইউরোপের ধ্বংস।

হের হিটলার চিরকালই তাঁহার আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিষয়টা দাঁড়াইয়াছে অহি-নকুল সম্বন্ধ লইয়া। সমগ্র ইউরোপের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রক্ষার্থে হিটলারের সমরায়োজন ও কর্ম্মসম্পাদনের প্রচেষ্টা কোন্ গোপন আদর্শ-সম্ভূত, তাহা অদ্যাবধি আমাদের নিকট অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। রাশিয়ার কৃষ্টি যে ইউরোপীয় কৃষ্টির প্রতিকূল, তাহাও জোর গলায় বলা চলে না।

আমরা শান্তিকামী ভারতবাসী, আমাদের আদর্শ ও কাম্য—শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং শান্তি ও শৃঙ্খলার উপর ভিত্তি করিয়া সভ্যতা ও কৃষ্টি। আমাদের মতে, ইউরোপীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে মূলতঃ ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির কোন প্রভেদ থাকিতে পারে না এবং নাই।

শিলং-সিলেট্ লাইনের টিকেট্ সমূহ আমাদের শিলং অফিস এবং সিলেট্ অফিসে পাওয়া যায়। সিলেট্ লাইনে শিলং যাইবার থ্রু টিকেট্ এ. বি. জোনের ষ্টেশন-সমূহ হইতে পাওয়া যায়। শিলং হইতে সিলেট্ লাইনে এ. বি. জোনের ষ্টেশনসমূহের থ্রু টিকেট্ শিলং অফিসে পাওয়া যায়।

দি ইউনাইটেড্ মোটর ট্র্যান্সপোর্ট

কোম্পানী লিমিটেড্

দি মেট্রোপলিটন্ ইন্সিওরেন্স হাউস্ লিমিটেড্

ক্লাইভ স্কো, কলিকাতা

চাই-ই...

শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে হ'লে প্রত্যহ ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা চাই-ই। খোলা মাঠে ব্যায়াম, বিশুদ্ধ হাওয়া ও সূর্য্যের আলো বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের পক্ষে অমূল্য সম্পদ। সেই সঙ্গে ভাল আহার্য্যও চাই। পুষ্টিকর খাদ্যে তাদের শরীর সুদৃঢ়, সবল ও কর্ম্মঠ করে—সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক সৌন্দর্য্যও বাড়ায়।

ঘি- ... ও খাদ্য

২য় খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা
চৈত্র—১৩৫০
একাদশ বর্ষ
সুরভিত
আয়ুর্ব্বেদীয় কেশতৈল
জুয়েল অব্ ইণ্ডিয়া

কেশের
বাথগেটের
BEWARE OF IMITATION

এক চুমুকেই বোঝা যায়
টসের চা

ভগ্ন স্বাস্থ্য হইতে অটুট স্বাস্থ্য
?
ব-যদি আপনি
করে
পূর্ব্ব নাম
কল্পতরু রসায়ন
কল্পতরু প্রাসাদ
২২৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

আস্তাবল — শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জি

FOR Graceful
ORNAMENTS INSIST ON
Mira MOOKHERJEE & CO.
• RENOWNED SINCE 1884 •
BANKERS and JEWELLERS
35, ASHUTOSH MUKERJEE ROAD, CALCUTTA
SOUTH 1278 • GRAM. METALITE

ব্যা[illegible] বরো[illegible]া
লিমিটে[illegible]

১৯০৮ সালে বরোদায় সংগঠিত, সভ্যগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ।

বরোদার মাননীয় মহারাজা গায়কোয়াড়ের গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত।

অনুমোদিত মূলধন		...	২,৪০,০০,০০০৲ টাঃ
বিলিকৃত মূলধন		...	২,০০,০০,০০০৲ "
বিক্রীত মূলধন	(৩১-১২-৪৩)	...	১,৯৯,৮৮,২০০৲ "
তাগিদ দেওয়া মূলধন	"	...	৮৩,৯৬,৪৬০৲ "
আদায়ীকৃত মূলধন	"	...	৮৩,৮৮,১৪০৲ "
মজুত তহবিল	"	...	৯৮,৯৩,৫১০৲ "

হেড অফিস :
শ্যা[illegible] রোড, বরোদা।

কলিকাতা অফিস :
১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

-অন্যান্য শাখাসমূহ-

আমেদাবাদ (ভদ্রা), আমেদাবাদ (পাঁচকুভা), আমরেলি, ভবনগর, বিলিমোরা, বম্বে (ফোর্ট), বম্বে (ভাণ্ডারিবাজার), দাভয়, দ্বারকা, হারিজ, কাঁদি, কালল, কপদ্বঞ্জ, কাম্রজ, মেসানা, মিঠাপুর, নবসারি, পাটন, পেট্‌লাদ্‌, পোর্টওথা, সাংখেদা, সিদ্দপুর, সুরাট্‌, উন্‌ঝা (এন. জি.), ভিস্‌নগর, ভায়ারা।

কলিকাতার লো[illegible]াল কমিটী

শেঠ বৈজনাথ জালান (সুরজমল নাগরমল)
ডাঃ সত্যচরণ লাহা, এম. এ., বি. এল., পি. এইচ. ডি. (প্রাণকিষণ লাহা এণ্ড কোং)

শেঠ সুরযমল মেটা, (জুট এণ্ড গানি-ব্রোকার্স লিঃ)
মিঃ কে. এম. নায়েক, জি. ডি. এ., আর. এ. (ম্যানেজার, ন্যাশন্যাল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ)

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়

ডব্লিউ. জি. গ্রাউণ্ডওয়াটার,
জেনারেল ম্যানেজার, বরোদা

এস. এইচ. জোখাকার,
এ্যাক্টিং ম্যানেজার, কলিকাতা
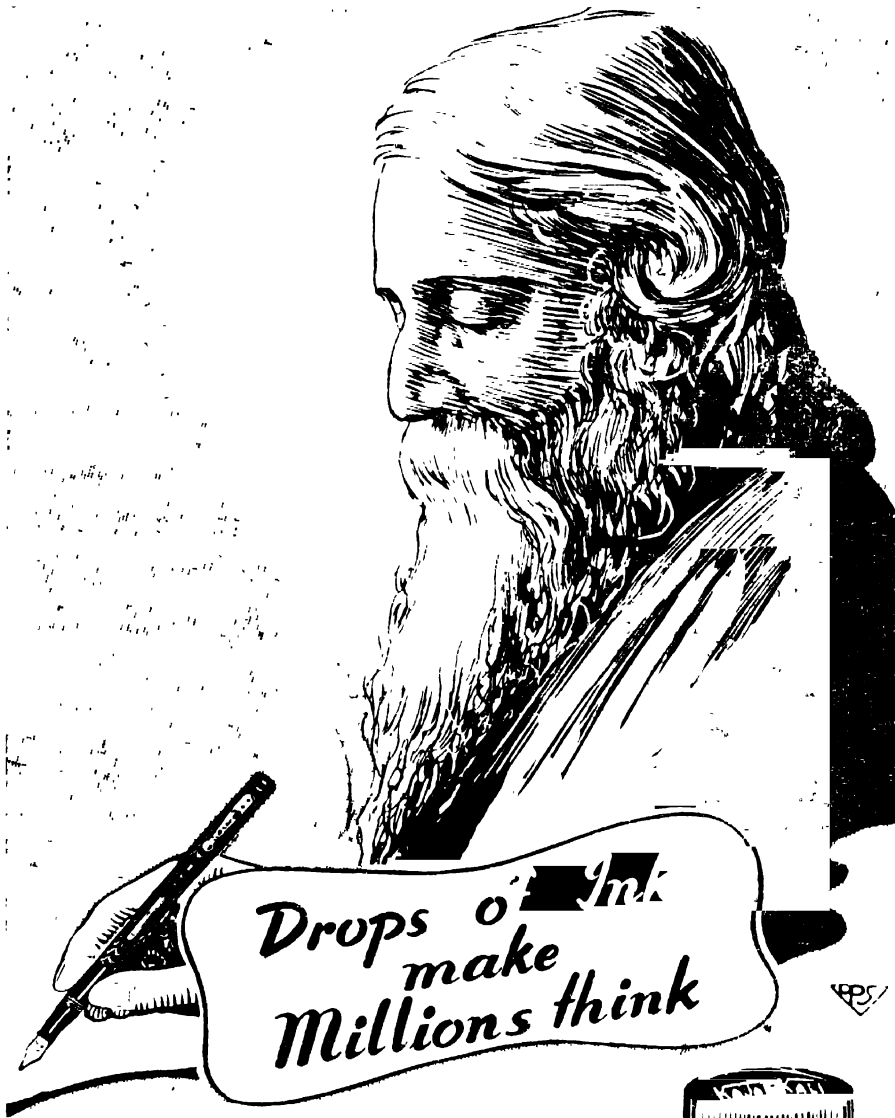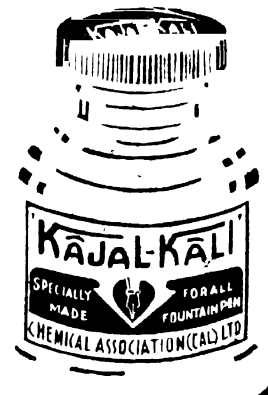
Drops o
make
Millions think

KAJAL-KALI
LEADING SINCE 1924

"ডিওডার"

বস্ত্র, খাদ্যদ্রব্যাদি সংরক্ষণের প্রকোষ্ঠ ও স্নানাগার প্রভৃতি দুর্গন্ধমুক্ত করিবার জন্য "ডিওডার" বিশেষ শক্তিসম্পন্ন উপাদান। বস্ত্র, পুস্তক, কাগজ প্রভৃতি কীটদষ্ট হইতে রক্ষা করিবার পক্ষে "ডিওডার" অমূল্য ও অপরিহার্য্য।

এল, এইচ্, এমেনি

মার্কেণ্টাইল বিল্ডিংস্

লালবাজার, কলিকাতা

কান্তা

সদ্যস্ফুট-পুষ্প-সুবাসের মতো এই গন্ধ নির্য্যাস সুন্দরীর বেশবাসে কি যেন এক মদির-মকরন্দের মাধুর্য্য এনে দেয়।

তনু-দেহের রূপ-লাবণ্যকে মনোহর করে তোলে

মার্গো সোপ

মোহন সুগন্ধ-যুক্ত নিমের উদ্ভিজ্জ টয়লেট সাবান শীতের রুক্ষতা দূর করে দেহের মসৃণতা আনে।

এই সুরভিত তুষার-শ্রী সুন্দর মুখখানিকে আরও সুন্দরতর করে তোলে লাবণ্যের পরশ দিয়ে।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল ঃ কলিকাতা

বঙ্গশ্রীর নিবেদন ও নিয়মাবলী

"বঙ্গশ্রী"র বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।০ টাকা। ষাণ্মাসিক ৩।০ টাকা। ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য ॥/০ আনা। মূল্যাদি—কর্ম্মাধ্যক্ষ, বঙ্গশ্রী, C/o মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, হেড অফিস—১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

আষাঢ় হইতে "বঙ্গশ্রী"র বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া চলে।

প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠিপত্র সম্পাদককে ১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হয়। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট দেওয়া না থাকিলে পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

লেখকগণ প্রবন্ধের নকল রাখিয়া রচনা পাঠাইবেন। ফেরতের জন্য ডাক-খরচা দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত লেখা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে 'বঙ্গশ্রী' প্রকাশিত হয়। যে-মাসের পত্রিকা, সেই মাসের ১০ তারিখের মধ্যে তাহা না পাইলে স্থানীয় ডাক-ঘরে অনুসন্ধান করিয়া তদন্তের ফল আমাদিগকে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে না জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে আমরা বাধ্য থাকিব না।

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ও সিকি পৃষ্ঠা যথাক্রমে ২০৲, ১১৲, ৬৲। বিশেষ স্থানের হার পত্র লিখিলে জানানো হয়।

বাংলা মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পুরাতন বিজ্ঞাপনের কোনও পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশ না আসিলে পরবর্ত্তী মাসের পত্রিকায় তদনুসারে কাষ্য করা যাইবে না। চলতি বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলে ঐ তারিখের মধ্যেই জানানো দরকার।

১১শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

বিষয়-সূচী

চৈত্র—১৩৫০

[পর পৃষ্ঠায়

বিষয়-সূচী—৩১ পৃষ্ঠার পর

চিত্র-সূচী

চৈত্র, ১৩৫০
১১শ বর্ষ—২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।

"দুর্গা-পূজা"র প্রয়োজনীয়তা

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

(৬) কার্য্যকারণের শৃঙ্খলাযুক্ত বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়-বস্তু

মানুষের অভীষ্ট পদার্থসমূহের ও মানুষের ইচ্ছার উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা বিষয়ে মানুষের দায়িত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

প্রত্যেক মানুষ যে সমস্ত পদার্থ অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন সেই সমস্ত পদার্থের প্রত্যেকটী অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রাচুর্য্য যাহাতে প্রত্যেক মানুষের হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা

প্রত্যেক মানুষ যে সমস্ত পদার্থ অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত পদার্থের প্রত্যেকটী অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রাচুর্য্য যাহাতে প্রত্যেক মানুষের হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করার অপর নাম "মানুষকে মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিযুক্ত করিবার সাধনা ও শিক্ষার ব্যবস্থা।"

প্রত্যেক মানুষ যাহাতে প্রকৃতির দেওয়া গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি সর্ব্বোচ্চ পরিমাণে লাভ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে কোন্ কোন্ কারণে মানুষের প্রকৃতির দেওয়া গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের অপকর্ষতা সাধিত হয় তাহা সর্ব্বপ্রথমে নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়োজন হয়।

প্রকৃতির দেওয়া মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহ কোন্ কোন্ কারণে অপকর্ষতা লাভ করে তাহার কথা আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ে* বিস্তৃতভাবে পাঠকবর্গকে শুনাইয়াছি।

ঐ আলোচনা অনুধাবন করিতে পারিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতির নিকট হইতে মানুষ যে সমস্ত গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি পাইয়া থাকেন, সেই সমস্ত গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি যদ্যপি মানুষের অক্ষুণ্ণ থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক মানুষ এক একটী অতিমানুষ হইতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতির দেওয়া মানুষের ঐ সমস্ত গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি স্বতঃই কখনও অক্ষুণ্ণ থাকে না। প্রকৃতির দেওয়া মানুষের ঐ সমস্ত গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে মানুষের শিক্ষার ও সাধনার ব্যবস্থা করিতে হয়।

কোন্ কোন্ কারণে মানুষের প্রকৃতির দেওয়া গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহ ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা সঠিকভাবে নির্দ্ধারিত না হইলে মানুষের শিক্ষা ও সাধনা কোন্ কোন্ উদ্দেশ্য-মূলক হওয়া উচিত তাহা কোনক্রমেই স্থির করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

কোন্ কোন্ কারণে প্রকৃতির দেওয়া মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহ অপকর্ষতা লাভ করে অথবা ক্ষুণ্ণ হয়—তৎসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ে যে সমস্ত কথা বলিয়াছি, সেই সমস্ত কথা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ঐ ক্ষুণ্ণতার প্রধান কারণ দুইটী, যথা :

(১) বৈকৃতিক ইচ্ছার প্রবৃত্তি, এবং
(২) অভিমানের প্রবৃত্তি—

* "যে যে গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি মানুষের অন্তরে বিদ্যমান থাকিলে মানুষের পক্ষে তাহার অভীষ্ট পদার্থসমূহ অর্জ্জন ও উপভোগ করা অসম্ভব হয়, মানুষের অন্তরে সেই সমস্ত গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি প্রবেশ লাভ করা সম্ভব হয় কোন্ কোন্ কারণে, তাহার বিচার"-শীর্ষক আলোচনায়।

বঙ্গশ্রী—১৩৫০, ফাল্গুন—১০৪, ১০৫ পৃষ্ঠা

কোন্ কোন্ দ্রব্যাদিতে মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই চারিটীর স্বাস্থ্য ও তৃপ্তি যুগপৎ সাধিত হইতে পারে তাহা বিচার না করিয়া উত্তেজনা অথবা বিষাদ বশতঃ পল্লবগ্রাহী হইয়া কোন পদার্থ-বিশেষের উপভোগ করিবার ইচ্ছার নাম **বৈকৃতিক ইচ্ছা**।

প্রত্যেক মানুষের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকে সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন হয় কোন্ কোন্ কার্য্যধারায় এবং সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মানুষের নিজের কেরামতী কতখানি তাহার বিচার না করিয়া সংস্কার বশতঃ নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গৌরব অনুভব করিবার নাম **অভিমান**।

প্রকৃতির দেওয়া মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির অপকর্ষতার অথবা ক্ষুণ্ণতার অভিব্যক্তি হয় মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়ের, মনের ও বুদ্ধির ব্যাধিতে, ক্ষয়ে ও অকর্ম্মণ্যতায় এবং মানুষের অকালমরণে।

বাস্তব জীবনে একটু সতর্ক হইয়া লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে, যে সমস্ত কার্য্যবশতঃ মানুষের শরীরের অথবা ইন্দ্রিয়ের অথবা মনের অথবা বুদ্ধির ব্যাধি অথবা ক্ষয় অথবা অকর্ম্মণ্যতার উদ্ভব হয় এবং মানুষের অকাল মৃত্যু হয় সেই সমস্ত কার্য্যের প্রত্যেকটীর মূলে কোন না কোন রকমের বৈকৃতিক ইচ্ছার এবং অভিমানের প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে। বৈকৃতিক ইচ্ছার এবং অভিমানের প্রবৃত্তি যদ্যপি মানুষের আদৌ না থাকে তাহা হইলে মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির কোনরূপ ব্যাধি অথবা ক্ষয় অথবা অকর্ম্মণ্যতার এবং এমন কি কোনরূপ অভাবের পর্য্যন্ত উদ্ভব হইতে পারে না। ইহার কারণ বৈকৃতিক ইচ্ছার এবং অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব যাহাতে না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে প্রকৃতির দেওয়া মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহের অপকর্ষ হওয়া অথবা ক্ষুণ্ণতা লাভ করা অসম্ভবযোগ্য হয়। প্রকৃতির দেওয়া মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়ের, মনের এবং বুদ্ধির গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি সমূহ যাহাতে অপকর্ষতা অথবা ক্ষুণ্ণতা লাভ না করে তাহা করিতে পারিলে প্রকৃতির দেওয়া মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়ের, মনের এবং বুদ্ধির গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি সমূহ স্বতঃই উৎকর্ষতা লাভ করে এবং প্রত্যেক মানুষের পক্ষে এক একটী 'অভিমানুষ' হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়।

উপরোক্ত কারণে, পরমারাধ্য ব্যাসদেবের সিদ্ধান্ত এই যে, বৈকৃতিক ইচ্ছার এবং অভিমানের প্রবৃত্তি প্রকৃতির দেওয়া মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি সমূহের অপকর্ষতার অথবা ক্ষুণ্ণতার মূল কারণ। মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি সমূহের অপকর্ষতার কারণ অনেক শ্রেণীর অনেক রকমের হইতে পারে বটে; কিন্তু বৈকৃতিক ইচ্ছা এবং অভিমান ছাড়া অন্য কোন কারণ মূল কারণ হইতে পারে না।

প্রত্যেক মানুষ যে সমস্ত পদার্থ অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন সেই সমস্ত পদার্থের প্রত্যেকটী অর্জ্জন করিতে ও উপভোগ করিতে হইলে মানুষের যে সমস্ত গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, সেই সমস্ত গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি যাহাতে প্রত্যেক মানুষ সর্ব্বতোভাবে অর্জ্জন করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে যে শিক্ষা ও সাধনায় মানুষের বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া অসম্ভব হয়—সেই শিক্ষা ও সাধনার ব্যবস্থা করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে।

যে শিক্ষা ও সাধনায় মানুষের বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া অসম্ভব হয় সেই শিক্ষা ও সাধনার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে মানুষের বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। একবার মানুষের শরীর অথবা ইন্দ্রিয় অথবা মন অথবা বুদ্ধি বৈকৃতিক ইচ্ছার অথবা অভিমানের প্রবৃত্তির আশ্রয়-স্থল হইলে ঐ বৈকৃতিক ইচ্ছার অথবা অভিমানের প্রবৃত্তি দূর করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে, অনেকস্থলে একরূপ অসম্ভব হয়।

অন্যদিকে, যে শিক্ষা ও সাধনায় মানুষের বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া অসম্ভব হয়, মনুষ্য সমাজের প্রত্যেক দেশে সেই শিক্ষা ও সাধনার ব্যবস্থা সাধিত হইলে, মানুষের বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমানের উদ্ভব হওয়া অনেক স্থলেই অসম্ভব হয়। কোন কোন স্থলে সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব না হইলেও কষ্টসাধ্য হয়; কিন্তু উহার প্রতিবিধান করা সহজসাধ্য হইয়া থাকে। বৈকৃতিক ইচ্ছার এবং অভিমানের প্রবৃত্তি মানুষের না থাকলে মানুষের ক্ষয়, ব্যাধি, অকর্ম্মণ্যতা অকালমরণ এবং কোন শ্রেণীর অভাবের উদ্ভব হওয়া অসম্ভব হয়।

যে শিক্ষা ও সাধনায় মানুষের বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া অসম্ভব হয়, মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশে সেই শিক্ষা ও সাধনার ব্যবস্থা সাধিত হইলে, মানুষের ক্ষয়, ব্যাধি, অকর্ম্মণ্যতা, অকালমরণ এবং কোন শ্রেণীর অভাবের উদ্ভব হওয়া একদিকে যেরূপ অসম্ভব হয়, সেইরূপ আবার, মানুষের পুষ্টি, স্বাস্থ্য, কর্ম্মক্ষমতা, দীর্ঘায়ুঃ এবং প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বস্তুর প্রাচুর্য্য স্বতঃই প্রকৃতির নিয়মানুসারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

যে শিক্ষা ও সাধনায় মানুষের বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া অসম্ভব হয়, মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশে সেই শিক্ষা ও সাধনার ব্যবস্থা সাধিত হইলে

মানুষের পুষ্টি, স্বাস্থ্য, কর্ম্মক্ষমতা, দীর্ঘায়ুঃ এবং প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বস্তুর প্রাচুর্য্যের স্বতঃই বৃদ্ধি হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয় বটে; কিন্তু ঐ শিক্ষা ও সাধনার ব্যবস্থা করা মানুষের সহজাত বুদ্ধি-শক্তির দ্বারা সম্ভবযোগ্য নহে। ঐ শিক্ষা ও সাধনার ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে মনুষ্যসমাজের অন্ততঃপক্ষে একজন মানুষকে "অনুভব ও উপলব্ধিতত্ত্বে" প্রবিষ্ট হইবার জন্য প্রযত্নশীল হইতে হয়। "অনুভব ও উপলব্ধিতত্ত্ব" বড়ই দুরূহ। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে উহাতে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। পরমারাধ্য ব্যাসদেবের কথানুসারে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের আগে উহাতে প্রবিষ্ট হওয়া যায় না। পঞ্চাশ বৎসরের ঊর্দ্ধ-বয়ষের হইলেও যাহারা বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমানের প্রবৃত্তির জন্য আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হইতে শিক্ষা ও অভ্যাস করেন না এবং যাহারা নিজদিগকে বড় জাতির, বড় বংশের, বড় প্রতিষ্ঠার, বড় বুদ্ধির, বড় ঐশ্বর্য্যের, বড় বিদ্যার এবং অপরকে ছোট জাতির, ছোট বংশের, ছোট প্রতিষ্ঠার, ছোট বুদ্ধির, ছোট ঐশ্বর্য্যের এবং ছোট বিদ্যার মানুষ বলিয়া মনে করিতে ইতস্ততঃ করেন না, তাঁহাদিগের পক্ষে "অনুভব ও উপলব্ধি-তত্ত্বে" সর্ব্বতোভাবে প্রবিষ্ট হওয়া কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না।

চলতি সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে "যোগের" কার্য্য বলা হয় তাহাতে নৈপুণ্য লাভ করিতে না পারিলে "অনুভব ও উপলব্ধিতত্ত্বে" প্রবিষ্ট হওয়া যায় না। উপরোক্ত "যোগের" কার্য্য "সমাধি-তত্ত্বের" উপর প্রতিষ্ঠিত। "সমাধি-তত্ত্বের" উপর যোগের কার্য্য প্রতিষ্ঠিত বটে; কিন্তু যোগের কার্য্যে (অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান ও ধারণার কার্য্যে) কিয়ৎপরিমাণে নৈপুণ্যলাভ করিতে না পারিলে "সমাধি-তত্ত্বে" আদৌ প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না। ব্যাসদেবের ভাষানুসারে "অনুভব ও উপলব্ধিতত্ত্বে"র নাম "গায়ত্রীতত্ত্ব"। "যোগের" কার্য্যে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত নৈপুণ্যলাভ করিতে পারিলে "সমাধি-তত্ত্বে" প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়। "সমাধি-তত্ত্বে" প্রবিষ্ট হইতে পারিলে "যোগ-তত্ত্ব" অথবা "সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের দশবিধ অবস্থা-তত্ত্বে" প্রবেশলাভ করিবার সক্ষমতা হয়।

"সমাধি-তত্ত্বে", "যোগ-তত্ত্বে" অথবা "সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের দশবিধ অবস্থা-তত্ত্বে" প্রবেশলাভ করিবার সক্ষমতা অর্জ্জিত হইলে "গায়ত্রী-তত্ত্বে" প্রবেশলাভ করা সম্ভবযোগ্য হয়। "গায়ত্রী-তত্ত্বে" প্রবেশ লাভ করিবার সক্ষমতা অর্জ্জিত হইলে যে শিক্ষা ও সাধনায় মানুষের বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া অসম্ভব হয়, সেই শিক্ষা ও সাধনার উদ্দেশ্যে কি কি ব্যবস্থা হওয়া উচিত তাহা নির্দ্ধারণ করিবার সক্ষমতা অর্জ্জন করা সম্ভবযোগ্য হয়।

ভারতবর্ষের আধুনিক তথাকথিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ "গায়ত্রী-তত্ত্বে" প্রবিষ্ট বলিয়া অনেকের মনে হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ভারতবর্ষের আধুনিক এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ ব্যাসদেবের "গায়ত্রী-তত্ত্বে" আদৌ প্রবিষ্ট নহেন। ইঁহারা "গায়ত্রী" অথবা "তত্ত্ব" অথবা "গায়ত্রী-তত্ত্ব" এই তিনটী শব্দের মৌলিক অর্থ যে কি তাহা পর্য্যন্ত আদৌ পরিজ্ঞাত নহেন। ব্যাসদেবের ভাষানুসারে ইঁহাদিগকে "ব্রাহ্মণ" অথবা "পণ্ডিত" বলা চলে না। ব্যাসদেবের ভাষানুসারে যাঁহারা বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমানের প্রবৃত্তির জন্য আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হইতে শিক্ষা ও অভ্যাস করেন না এবং নিজদিগকে উচ্চতর জাতির, উচ্চতর বংশের, উচ্চতর প্রতিষ্ঠার, উচ্চতর বুদ্ধির, উচ্চতর ঐশ্বর্য্যের, উচ্চতর বিদ্যার এবং অপরকে নিম্নতর জাতির, নিম্নতর বংশের, নিম্নতর প্রতিষ্ঠার, নিম্নতর বুদ্ধির নিম্নতর ঐশ্বর্য্যের এবং নিম্নতর বিদ্যার মানুষ বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে "চণ্ডাল" অথবা "পঞ্চম-শ্রেণীর" মানুষ বলা হয়। ব্যাসদেবের সিদ্ধান্তানুসারে "চণ্ডাল-প্রবৃত্তি" মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণার বস্তু। চণ্ডাল-প্রবৃত্তি-যুক্ত মানুষগণ যে সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণার যোগ্য তাহা সর্ব্বসাধারণের দ্বারা আন্তরিকভাবে গৃহীত না হইলে যে শিক্ষা ও সাধনায় মানুষের বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া অসম্ভব হয় সেই শিক্ষা ও সাধনার ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব হয়। ব্যাসদেবের ভাষানুসারে আমাদিগের বিচারে, যাঁহারা জাতি, বংশ, প্রতিষ্ঠা, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য অথবা বিদ্যা প্রভৃতি কোন বিষয়ে কোন অভিমানগ্রস্ত তাঁহাদিগের প্রত্যেকে "চণ্ডাল" বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য এবং তদনুসারে ভারতবর্ষের আধুনিক তথাকথিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য হওয়া ত' দূরের কথা বাস্তবিকপক্ষে "চণ্ডাল-শ্রেণীর" অন্তর্ভুক্ত। বঙ্গদেশে যে সভাটী "ব্রাহ্মণ-সভা" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, সেই সভাটী বাস্তবিকপক্ষে উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে "চণ্ডাল-সভা"। "চণ্ডালসভাসমূহ" এবং "চণ্ডালগণ" যাহাতে প্রশ্রয় না পায় তাহা করিতে না পারিলে—যে শিক্ষা ও সাধনায় মানুষের বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া অসম্ভব হয়, সেই শিক্ষা ও সাধনার ব্যবস্থা সমাজ মধ্যে সাধিত করা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না।

"চণ্ডাল-সভাসমূহ" এবং "চণ্ডালগণ" যাহাতে প্রশ্রয় না পায় তাহা করিতে হইলে "চণ্ডালগণের" মধ্যে যাহারা তথাকথিত ব্রাহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পরের স্পৃষ্ট খাদ্য গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া থাকে এবং "কাহারও ছোঁয়া খাই না" বলিয়া গৌরব অনুভব করে; অথচ স্বভাবতঃ ভিক্ষা অথবা প্রতারণা যাহাদিগের উপজীবিকা, তাহারা প্রত্যেকে যাহাতে প্রত্যেক

মানুষের স্পৃষ্ট খাদ্য খাইতে বাধ্য হয় এবং অন্য কোন মানুষ যাহাতে তাহাদিগের স্পৃষ্ট কোন খাদ্য না খান তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

সমাজের মধ্যের প্রত্যেক মানুষ যাহাতে প্রত্যেক মানুষের ছোঁয়া খাদ্য খাইতে অযথাভাবে অথবা অযৌক্তিকভাবে বিরক্তি প্রকাশ না করিতে পারেন, একমাত্র তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলেই যে চণ্ডাল-প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ব্যবস্থা সাধিত হয়—তাহা নহে। চণ্ডাল-প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে যে সমস্ত মানুষ নিজ নিজ বিদ্যার অথবা বুদ্ধির অথবা ধনের অথবা প্রতিষ্ঠার অথবা অপর কোন বিষয়ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অভিমানযুক্ত হইয়া অন্যান্য মানুষকে হয় প্রকাশ্যতঃ নতুবা অপ্রকাশ্যতঃভাবে নিম্নতর বলিয়া মনে করিয়া থাকে এবং অবজ্ঞা দেখাইয়া থাকে সেই সমস্ত মানুষ যাহাতে নিজ নিজ অভিমান সংযত করিতে বাধ্য হয় এবং অন্য কোন মানুষকে অবজ্ঞা দেখাইয়া অভিমান-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে না পারে—তাহার ব্যবস্থা করিবারও প্রয়োজন হয়।

যে শিক্ষা ও সাধনায় মানুষের বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া অসম্ভব হয় সেই শিক্ষার ও সাধনার ব্যবস্থা করিতে হইলে একদিকে যেরূপ চণ্ডাল-প্রবৃত্তিযুক্ত মানুষের চণ্ডাল-প্রবৃত্তি যাহাতে কোনক্রমে প্রশ্রয় না পায় ও সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মূল হয় তাহা করিবার প্রয়োজন হয়; সেইরূপ আবার মানুষের বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় কোন্ কোন্ কারণে তাহাও নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়োজন হয়। মানুষের বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় কোন্ কোন্ কারণে তৎসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। ঐ আলোচনানুসারে মানুষের বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়ার কারণ সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর, যথা :

(১) মাতৃগর্ভার্জ্জিত ও শৈশবার্জ্জিত;

(২) পরবর্ত্তী অথবা পরিণত জীবনার্জ্জিত।

মাতৃগর্ভার্জ্জিত ও শৈশবার্জ্জিত যে সমস্ত কারণে মানুষের বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব হইয়া থাকে সেই সমস্ত কারণ প্রধাণতঃ দশশ্রেণীর, যথা :

(১) পিতা-মাতার অযোগ্য মিলন;

(২) মাতার গর্ভাশয়ের দুষ্টতা;

(৩) গর্ভস্থিত ভ্রূণ যখন বায়বীয় অবস্থা হইতে বাষ্পীয়, তরল, স্থূল ও মহাকাশ অবস্থায় পরিণতি লাভ করে তখন মাতার শারীরিক ও মানসিক কার্য্যের দুষ্টতা;

(৪) গর্ভস্থিত ভ্রূণের ইন্দ্রিয় সমূহের যখন তরল ও স্থূল অবয়বাত্মকতার পরিপূরণ হইতে থাকে তখন মাতার ইন্দ্রিয় সমূহের দুষ্টতা;

(৫) মানুষ যখন শিশুরূপে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তাহার শরীর ও ইন্দ্রিয় সমূহের সহিত মহাকাশের সম্বন্ধ স্থাপনে দুষ্টতা;

(৬) ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশুর শরীরস্থ অস্থি যখন নূতন নূতন পরিণতি লাভ করিতে আরম্ভ করে, তখন খাদ্য ও পানীয়ের পরিণতি বিষয়ক দুষ্টতা;

(৭) ক্রমিক পরিণতি বশতঃ শিশুর শরীরে যখন স্থূল খাদ্যের প্রয়োজন হয় তখন ঐ স্থূল খাদ্যের নির্দ্ধারণ ও ব্যবহার প্রণালীর দুষ্টতা;

(৮) শিশুর মনের উন্মেষ অবস্থায় অর্থাৎ মন যখন বিভিন্ন পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইতে আরম্ভ করে তখন মন যাহাতে চঞ্চল ও অস্থির না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবহেলা ও দুষ্টতা;

(৯) ইন্দ্রিয় সমূহের বিকাশের অথবা তীব্রতা লাভের অবস্থায় ইন্দ্রিয় সমূহ যাহাতে চঞ্চল অথবা অসংযত ভাবে তীব্র না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবহেলা ও দুষ্টতা;

(১০) পূর্ণ যৌবনের বিকাশের অবস্থায় যুবকগণ যাহাতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার সমূহ ন্যস্ত হন, তাহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবহেলা ও দুষ্টতা।

পরবর্ত্তী অথবা পরিণত জীবনার্জ্জিত যে সমস্ত কারণে মানুষের বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব হইয়া থাকে সেই সমস্ত কারণ প্রধানতঃ নয় শ্রেণীর, যথা :

(১) খাদ্য, পানীয়, পরিধেয়, প্রসাধন প্রভৃতি আহার ও বিহারের দ্রব্য-সমূহের নির্ব্বাচন ও ব্যবহার প্রণালী সম্বন্ধে দুষ্টতা;

(২) মানুষের পরস্পরের মধ্যে ব্যবহারের প্রণালী সম্বন্ধে দুষ্টতা;

(৩) বিদ্যার বিষয় ও বিদ্যার্জ্জনের পন্থা নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে দুষ্টতা,

(৪) বাস-ভবনের স্থান, নির্ম্মাণ-প্রণালী ও ব্যবহার সম্বন্ধে দুষ্টতা;

(৫) যান-বাহনের নির্ব্বাচন ও ব্যবহার সম্বন্ধে দুষ্টতা;

(৬) উপভোগ, আত্মরক্ষা, সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহ ও চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান ও কর্ম্ম-প্রণালী সম্বন্ধে দুষ্টতা;

(৭) জীবিকার্জ্জনের বৃত্তি নির্ব্বাচন বিষয়ে দুষ্টতা;

(৮) নিজের ও অপরের শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য এবং মনের ও বুদ্ধির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সম্বন্ধে বিচার করিবার প্রণালী সম্বন্ধে দুষ্টতা ;

(৯) কথা ও বাক্য ব্যবহারের প্রণালী সম্বন্ধে দুষ্টতা।

মাতৃগর্ভার্জ্জিত যে সমস্ত কারণে মানুষের বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় সেই সমস্ত কারণের জন্য মানুষ নিজে দায়ী হইতে পারেন না এবং হন না। সেই সমস্ত কারণের জন্য দায়ী হইয়া থাকেন মুখ্যতঃ মানুষের পিতামাতা। সমাজ-সংগঠন-প্রণালীর দুষ্টতাবশতঃ অথবা রাষ্ট্র-সংগঠন-প্রণালীর দুষ্টতাবশতঃ অথবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুষ্টতা ও মাতৃগর্ভার্জ্জিত এবং শৈশবার্জ্জিত যে সমস্ত কারণে মানুষের বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়—সেই সমস্ত কারণের উদ্ভব হওয়ার জন্য দায়ী হইয়া থাকে।

পরবর্ত্তী অথবা পরিণত জীবনার্জ্জিত যে সমস্ত কারণে মানুষের বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়, সেই সমস্ত কারণের জন্য মুখ্যতঃ মানুষ নিজে দায়ী হইয়া থাকেন। সমাজ-সংগঠন-প্রণালীর দুষ্টতা অথবা রাষ্ট্র-সংঠন-প্রণালীর দুষ্টতা অথবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুষ্টতাও ঐ সমস্ত কারণের জন্য গৌণভাবে দায়ী হইয়া থাকে।

উপরোক্ত দুই শ্রেণীর কারণ ছাড়া মানুষের বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়ার তৃতীয় শ্রেণীর আর কতকগুলি কারণ বিদ্যমান থাকিতে পারে। এই কারণ-গুলি সাধারণতঃ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনের দুষ্টতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুষ্টতাবশতঃ উদ্ভূত হইয়া থাকে। তৃতীয় শ্রেণীর উপরোক্ত কারণসমূহ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। মাতৃগর্ভার্জ্জিত ও শৈশবার্জ্জিত যে সমস্ত কারণে এবং পরবর্ত্তী জীবনার্জ্জিত যে সমস্ত কারণে মানুষের বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় সেই সমস্ত কারণ যাহাতে উদ্ভূত না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে উপরোক্ত তৃতীয় শ্রেণীর কারণসমূহের উদ্ভব হওয়াও অসম্ভব হইয়া থাকে। উপরোক্ত কারণে তৃতীয় শ্রেণীর কারণ সমূহের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজনীয়।

মাতৃগর্ভার্জ্জিত ও শৈশবার্জ্জিত যে দশ শ্রেণীর কারণে মানুষের বৈকৃতিক ইচ্ছা ও অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় সেই দশ শ্রেণীর কারণ দশ শ্রেণীর আবয়বিক ও রাসায়নিক কার্য্য এবং তদনুযায়ী শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা অনায়াসে দুর করা সহজসাধ্য হইয়া থাকে।

পরবর্ত্তী অথবা পরিণত জীবনার্জ্জিত যে নয় শ্রেণীর কারণে মানুষের বৈকৃতিক ইচ্ছা ও অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় সেই নয় শ্রেণীর কারণ দুর করিবার একমাত্র উপায় মানুষকে নয় শ্রেণীর শিক্ষা ও অভ্যাসে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত করান।

উপরোক্ত দশ শ্রেণীর আবয়বিক ও রাসায়নিক কার্য্য এবং উনবিংশ শ্রেণীর শিক্ষা, সাধনা ও অভ্যাস যাহাতে প্রত্যেক মানুষ পাইতে পারেন তাহার সংগঠন ও ব্যবস্থা করিতে পারিলে যে মানুষের বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া অসম্ভব হয় তাহা বলা বাহুল্য।

কোন্ ব্যবস্থায় ও সংগঠনে উপরোক্ত দশ শ্রেণীর আবয়বিক ও রাসায়নিক কার্য্য এবং উনবিংশ শ্রেণীর শিক্ষা, সাধনা ও অভ্যাস প্রত্যেক মানুষের পক্ষে লাভ করা সুনিশ্চিত হয়—তাহার কথা আমরা "সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দুর করিবার সংগঠন ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত"—শীর্ষক আলোচনায় বিবৃত করিব।

সংক্ষেপতঃ, পাঠকগণকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক মানুষ যে সমস্ত পদার্থ অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত পদার্থের প্রত্যেকটী অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রাচুর্য্য যাহাতে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে লাভ করা সহজ সাধ্য হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রকৃতির দেওয়া মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি যাহাতে কোন মানুষের হ্রাস প্রাপ্ত না হইতে পারে প্রথমতঃ তাহার ব্যবস্থা সাধিত করিতে হয়।

প্রকৃতির দেওয়া মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি যাহাতে কোন মানুষের হ্রাসপ্রাপ্ত না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা সাধিত করিতে হইলে দুই শ্রেণীর সংগঠন ও ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, যথা :

(১) মাতৃগর্ভজাত ও শৈশবার্জ্জিত যে দশ শ্রেণীর কারণে মানুষের বৈকৃতিক ইচ্ছা ও অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় সেই দশ শ্রেণীর কারণ যাহাতে উদ্ভূত না হয় তাহা করিতে হইলে যে দশ শ্রেণীর আবয়বিক ও রাসায়নিক কার্য্য এবং দশ শ্রেণীর শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন হয় সেই দশ শ্রেণীর আবয়বিক ও রাসায়নিক কার্য্য এবং দশ শ্রেণীর শিক্ষা ও সাধনা যাহাতে প্রত্যেক মানুষ লাভ করিতে পারেন তাহার সংগঠন ও ব্যবস্থা ;

(২) পরবর্ত্তী অথবা পরিণত জীবনার্জ্জিত যে নয় শ্রেণীর কারণে মানুষের বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমানের প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়, সেই নয় শ্রেণীর কারণ যাহাতে উদ্ভূত না হয় তাহা করিতে হইলে, যে নয় শ্রেণীর শিক্ষা, সাধনা ও অভ্যাসের প্রয়োজন হয়—সেই নয় শ্রেণীর শিক্ষা, সাধনা ও অভ্যাস যাহাতে প্রত্যেক মানুষ লাভ করিতে পারেন তাহার সংগঠন ও ব্যবস্থা।

প্রত্যেক মানুষ যে সমস্ত পদার্থ অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত পদার্থের প্রত্যেকটী অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রাচুর্য্য যাহাতে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে লাভ করা সহজসাধ্য হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রকৃতির দেওয়া মানুষের গুণ, শক্তি, ও প্রবৃত্তি যাহাতে কোন মানুষের হ্রাস প্রাপ্ত না হইতে পারে, একদিকে যেরূপ তাহার ব্যবস্থা সাধিত করিতে হয় সেইরূপ আবার জীবিকার্জ্জনের কোন না কোন বৃত্তি যাহাতে মানুষ সর্ব্বতোভাবে শিক্ষা করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা সাধিত করিতে হয়।

জীবিকার্জ্জনের বৃত্তি কত শ্রেণীর তাহার কথা আমরা পরে "সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার সংগঠন ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত" শীর্ষক আলোচনায় বিবৃত করিব।

সমগ্র মনুষ্যসমাজের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার সর্ব্ববিধ ইচ্ছার পূরণ করিতে হইলে যে যে দ্রব্য যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হয় সেই সেই দ্রব্য যাহাতে সেই সেই পরিমাণে উৎপন্ন হয় তাহার ব্যবস্থা

সমগ্র মনুষ্যসমাজের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার সর্ব্ববিধ ইচ্ছার পূরণ করিতে হইলে যে যে দ্রব্য যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হয়, সেই সেই দ্রব্য সেই সেই পরিমাণে যাহাতে উৎপন্ন হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে দুইটী বিষয়ের নির্দ্ধারণ করিতে হয়, যথা :—

(১) মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ উৎপাদন করিবার ও বণ্টন করিবার কার্য্যধারা কয় শ্রেণীর এবং কি কি ?

(২) প্রয়োজন ভেদে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ কয় শ্রেণীর এবং কি কি ?

উপরোক্ত দুইটী বিষয়ই আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। পাঠকগণের সুবিধার জন্য আমরা ঐ দুইটী বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিতেছি।

মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ উৎপাদন করিবার ও বণ্টন করিবার কার্য্যধারা সাত শ্রেণীর, যথা :—

(১) কৃষি ;

(২) খনিজ-কার্য্য (mining works) ;

(৩) বারুণী-কার্য্য (works for the collection of water products) ;

(৪) পশু-পালন কার্য্য ;

(৫) শিল্পকার্য্য ;

(৬) কারু-কার্য্য ;

(৭) ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য্য অথবা বাণিজ্য-কার্য্য।

প্রয়োজন ভেদে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ নয় শ্রেণীর, যথা :—

(১) খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যসমূহ ;

(২) পরিধেয় দ্রব্যসমূহ ;

(৩) বিদ্যার্জ্জন ও বিদ্যাপ্রচারের কাগজ, কলম ও পুস্তকাদি দ্রব্যসমূহ ;

(৪) বাসভবন ও গমনাগমনের রাস্তা নির্ম্মাণের দ্রব্যসমূহ ;

(৫) যান-বাহন নির্ম্মাণের ও পরিচালনার দ্রব্যসমূহ ;

(৬) প্রসাধনের ও ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তিসাধনের দ্রব্যসমূহ এবং ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তিসাধক প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্ম্মাণ ও পরিচালনা করিবার দ্রব্যসমূহ ;

(৭) আত্মরক্ষা করিবার ও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার দ্রব্যসমূহ ;

(৮) চিকিৎসা-কার্য্যের এবং ঔষধাদি উৎপন্ন করিবার দ্রব্যসমূহ ;

(৯) মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ উৎপাদন করিবার ও বণ্টন করিবার সাতশ্রেণীর কার্য্যধারা পরিচালনা করিবার দ্রব্যসমূহ।

সমগ্র মনুষ্যসমাজে সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার সর্ব্ববিধ ইচ্ছার পূরণ করিতে হইলে, যে যে দ্রব্য যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হয় সেই সেই দ্রব্য সেই সেই পরিমাণে যাহাতে উৎপন্ন হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে দ্রব্যোৎপাদন ও বণ্টন করিবার জন্য কৃষি প্রভৃতি সাতশ্রেণীর কার্য্যধারার আশ্রয় লইতে হয় বটে ; কিন্তু যেমন তেমন ভাবে অথবা যথেচ্ছভাবে ঐ সাতশ্রেণীর কার্য্য পরিচালিত হইলে সমগ্র মনুষ্যসমাজের সমগ্র মনুষ্য সংখ্যার সর্ব্ববিধ ইচ্ছার পূরণ হওয়ার মত প্রচুর উৎপাদন ত দূরের কথা, কোন মানুষের কোন শ্রেণীর ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়ার মত প্রচুর উৎপাদন করা পর্য্যন্ত সম্ভবযোগ্য হয় না। দ্রব্যোৎপাদনের ও বণ্টন করিবার জন্য কৃষি প্রভৃতি যে সাত শ্রেণীর কার্য্যধারা মানব সমাজে আবহমানকাল হইতে প্রচলিত আছে সেই সাতশ্রেণীর কার্য্যধারার প্রত্যেকটির সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষভাবে সতর্ক হইবার প্রয়োজন হয়। উপরোক্ত সাতশ্রেণীর কার্য্য-ধারার প্রত্যেকটির সম্বন্ধে যে যে শ্রেণীর সতর্কতার প্রয়োজন হয় সেই সেই শ্রেণীর সতর্কতা যাহাতে অবলম্বিত হয় তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে একদিকে যেরূপ যে কোন মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছার সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়ার মত প্রচুর উৎপাদন করা সহজসাধ্য হয়, সেইরূপ আবার সমগ্র মনুষ্যসমাজের

সর্ব্ববিধ ইচ্ছাও সর্ব্বতোভাবে পূরণ করার মত প্রচুর উৎপাদন করাও সহজসাধ্য হইয়া থাকে।

উপরোক্ত কৃষি প্রভৃতি সাতশ্রেণীর কার্য্যধারার প্রত্যেকটির সম্বন্ধে যে যে শ্রেণীর সতর্কতা অবলম্বন করিলে সমগ্র মনুষ্য সমাজের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার উপযুক্ত প্রচুর ব্যবহার-যোগ্য দ্রব্য উৎপাদন করা সহজসাধ্য হইয়া থাকে আমরা অতঃপর সেই সেই শ্রেণীর সতর্কতা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

কৃষিকার্য্য, খনিজ-কার্য্য, বারুণী-কার্য্য, পশুপালন-কার্য্য, শিল্প-কার্য্য, কারু-কার্য্য এবং বাণিজ্য-কার্য্য—এই সাত শ্রেণীর কার্য্য সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কোন্ কোন্ শ্রেণীর সতর্কতার প্রয়োজন হয় তাহা সঠিকভাবে নির্দ্ধারিত করিতে হইলে ঐ সাত শ্রেণীর কার্য্যধারা যাহাতে যথাযথ ভাবে পরিচালিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয় এবং কোন্ কোন্ শ্রেণীর শ্রম একান্তভাবে প্রয়োজন হয় তাহা সর্ব্বাগ্রে নির্দ্ধারণ করিতে হয়।

উপরোক্ত সাত শ্রেণীর কার্য্যধারা যাহাতে যথাযথভাবে পরিচালিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রত্যেক শ্রেণীর কার্য্যধারায় চারিশ্রেণীর শ্রমের প্রয়োজন হইয়া থাকে, যথা:

(১) প্রত্যেক শ্রেণীর কার্য্যধারার সংশ্লিষ্ট উৎপাদন করিবার কার্য্য-প্রণালী ও কার্য্য-ব্যবস্থা সম্পর্কীয় পরিকল্পনা স্থির করিবার শ্রম;

(২) উপরোক্ত পরিকল্পনানুসারে সংগঠন করিবার শ্রম;

(৩) উপরোক্ত পরিকল্পনানুযায়ী কর্ম্মপ্রণালী ও কর্ম্মব্যবস্থা শ্রমিকগণকে বুঝাইবার ও শিখাইবার এবং শ্রমিকগণের কর্ম্মে সহায়তা করিবার শ্রম;

(৪) কায়িক কর্ম্মদ্বারা উৎপাদন করিবার শ্রম।

কৃষি-কার্য্য, খনিজ-কার্য্য, বারুণী-কার্য্য, পশুপালন-কার্য্য, শিল্পকার্য্য কারুকার্য্য এবং বাণিজ্যকার্য্য—এই সাত শ্রেণীর কার্য্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে ছয় শ্রেণীর সতর্কতার প্রয়োজন হয়, যথা:

(১) প্রত্যেক দেশে এবং দেশান্তর্গত দেশ সম্পর্কীয় প্রত্যেক বিভাগে যাহাতে দ্রব্যোৎপাদন করিবার ঐ সাত শ্রেণীর কার্য্যধারা যথাসম্ভব সমানভাবে পরিচালিত হয়—তৎসম্বন্ধে সতর্কতা;

(২) প্রয়োজন ভেদে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ যে নয় শ্রেণীতে বিভক্ত সেই নয় শ্রেণীর কোন শ্রেণীর কোন দ্রব্যের জন্য যাহাতে কোন দেশের অন্য কোন দেশের উপর নির্ভরশীল অথবা মুখাপেক্ষী না হইতে হয়—তৎসম্বন্ধে সতর্কতা;

(৩) দ্রব্যোৎপাদন ও বণ্টন করিবার সাত শ্রেণীর কার্য্যধারার কোন শ্রেণীর কার্য্যধারায় কোন শ্রেণীর শ্রমের পারিশ্রমিক হার যাহাতে অন্য কোন কার্য্যধারার সেই শ্রেণীর শ্রমের পারিশ্রমিক হারের তুলনায় কম অথবা বেশী না হয়—তৎসম্বন্ধে সতর্কতা;

(৪) দ্রব্যোৎপাদন ও বণ্টন করিবার সাত শ্রেণীর কার্য্যধারার কোন শ্রেণীর শ্রমের পারিশ্রমিক হার যাহাতে সংসারযাত্রার প্রয়োজন নির্ব্বাহে কোনক্রমের অভাব উৎপাদক না হয়—তৎসম্বন্ধে সতর্কতা;

(৫) প্রয়োজন ভেদে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ যে নয় শ্রেণীতে বিভক্ত সেই নয় শ্রেণীর দ্রব্য ছাড়া আর কোন শ্রেণীর কোন নিষ্প্রয়োজনীয় দ্রব্য, দ্রব্যোৎপাদনের সাত শ্রেণীর কার্য্যধারার কোন শ্রেণীর কার্য্যধারায় যাহাতে উৎপন্ন না করা হয়—তৎসম্বন্ধে সতর্কতা;

(৬) দ্রব্যোৎপাদন ও বণ্টন করিবার সাত শ্রেণীর কার্য্যধারার কোন শ্রেণীর কার্য্যধারায় যে যে কার্য্যপ্রণালীতে দ্রব্যের স্বাভাবিক গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির হ্রাস ঘটিতে পারে—সেই সেই কার্য্যপ্রণালী যাহাতে অবলম্বিত না হয়—তৎসম্বন্ধে সতর্কতা।

কৃষি-কার্য্য সম্বন্ধে দশ শ্রেণীর সতর্কতার প্রয়োজন হয়, যথা:

(১) প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক প্রত্যন্তর বিভাগের জমির সর্ব্বাংশ যাহাতে রস-সিঞ্চিত থাকে তদুদ্দেশ্যে নদীসমূহের স্বাভাবিক গতিকে অনুসরণ করিয়া যাহাতে দেশময় খাল খনন করিবার ব্যবস্থা করা হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা;

(২) কোন দেশের কোন প্রত্যন্তর বিভাগে যাহাতে ঐ দেশস্থ নদীসমূহের স্বাভাবিক গতির বিরুদ্ধে কোন কৃত্রিম খাল খনন করা না হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা;

(৩) স্বাভাবিক স্রোতস্বিনীসমূহের অভিমুখী ভূমির যে সমস্ত স্বাভাবিক গ'ড়েন (slope) বিদ্যমান থাকে, সেই সমস্ত গ'ড়েনের বিঘ্নকারী কোন বাঁধ অথবা স্থলপথ যাহাতে নির্ম্মিত না হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা;

(৪) কৃষি-কার্য্য প্রণালী যাহাতে কুত্রাপি জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির, কৃষকের স্বাস্থ্যের, জল ও হাওয়ার সমতাতিশয্যের এবং কৃষিজাত দ্রব্যের গুণ ও শক্তির অপকর্ষ সাধক না হয়; পরন্তু উৎকর্ষসাধক হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা;

(৫) কৃষিজাত কোন শ্রেণীর প্রয়োজনীয় কাঁচামালের কোন অভাব, কোন দেশে যাহাতে ঘটিতে না পারে তদনুযায়ী কৃষি-কার্য্যের পরিচালনা বিষয়ে সতর্কতা;

(৬) কৃষি-কার্য্য বিষয়ে যে চারিশ্রেণীর শ্রমের প্রয়োজন হয়, সেই চারিশ্রেণীর কোন শ্রেণীর শ্রম যথাযথভাবে না করিয়া যাহাতে কেহ কৃষি-কার্য্য হইতে কোনরূপ লভ্যাংশ উপভোগ করিতে না পারেন—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(৭) কৃষকগণ যাহাতে যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে কৃষি-কার্য্যের পরিচালনা করিতে পারেন এবং উহার লভ্যাংশ উপভোগ করিতে পারেন—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(৮) প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক কৃষক যাহাতে নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী কর্ষণ করিবার উপযুক্ত প্রচুর পরিমাণের জমি এবং অপর তিন শ্রেণীর শ্রমিকের সাহায্য পাইতে পারেন—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(৯) কোন দেশের কোন কৃষক যাহাতে নিজ কর্ষণ করিবার সামর্থ্যাতিরিক্ত কোন জমি পাইতে না পারেন—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(১০) জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকাশক্তির অসমতা ও বিষমতা সাধক কোন বীজ যাহাতে কোন জমিতে রোপিত না হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা।

খনিজ-কার্য্য সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য ভাবে যে যে সতর্কতার প্রয়োজন হয় তাহা সাধারণতঃ চারি শ্রেণীর, যথা :

(১) খনিজ পদার্থসমূহের উত্তোলন পদ্ধতি যাহাতে কুত্রাপি জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকাশক্তির উত্তোলিত খনিজ পদার্থসমূহের গুণ ও শক্তি, খনিজ পদার্থের সঞ্চিত ভাণ্ডারের শ্রমজীবিগণের স্বাস্থ্যের, জল ও হাওয়ার সমতাতিশয্যের অপকর্ষ সাধক না হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(২) কোন প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের কোনরূপ অভাব যাহাতে সমগ্র দেশমধ্যস্থ কাহারও না হইতে পারে—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(৩) কোন খনিজ পদার্থের উত্তোলন যে পরিমাণে সাধিত হইলে জমির স্থিতিস্থাপকতার অথবা বিচ্ছেদ—মিলন শক্তির (Tensile strength-এর) হ্রাস প্রাপ্তি ঘটিতে পারে সেই পরিমাণের উত্তোলন যাহাতে কোনক্রমে হইতে না পারে—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(৪) প্রত্যেক খনিজ-কার্য্যে যাহাতে চারি শ্রেণীর শ্রম বিধিবদ্ধ ভাবে প্রয়োগ করা হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা।

বারুণী-কার্য্য সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য ভাবে যে যে সতর্কতার প্রয়োজন হয়, তাহা সাধারণতঃ চারি শ্রেণীর, যথা :

(১) বারুণী-কার্য্যসমূহের কোন প্রণালী যাহাতে কোন জলজাত দ্রব্যের স্বাভাবিক গুণ ও শক্তির অপকর্ষ সাধক না হয়, পরন্তু উৎকর্ষ সাধক হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(২) বারুণী-কার্য্যসমূহের কোন প্রণালীতে যাহাতে কুত্রাপি জলভাগের স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির, শ্রমজীবিগণের স্বাস্থ্যের, জমি ও হাওয়ার সমতাতিশয্যের অপকর্ষ সাধক না হয়, পরন্তু তৎকার্য্য সাধক হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(৩) কোন প্রয়োজনীয় জলজাত পদার্থের কোনরূপ অভাব যাহাতে কোন দেশের কাহারও না হইতে পারে—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(৪) প্রত্যেক শ্রেণীর বারুণী-কার্য্যে যাহাতে চারি শ্রেণীর শ্রম বিধিবদ্ধ ভাবে প্রয়োগ করা হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

পশুপালন-কার্য্য সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য ভাবে যে যে সতর্কতার প্রয়োজন হয়, তাহা সাধারণতঃ ছয় শ্রেণীর, যথা :

(১) পশুপালন কার্য্যসমূহের কোন প্রণালী যাহাতে কুত্রাপি গৃহপালিত পশুসমূহের স্বাভাবিক গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির অপকর্ষ সাধক না হয়, পরন্তু উৎকর্ষসাধক হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(২) বন্য-পশুসমূহের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির এবং বনজাত উদ্ভিদসমূহের স্বাভাবিক গুণ ও শক্তির যাহাতে কোনক্রমে অপকর্ষ না হইতে পারে, পরন্তু উৎকর্ষ লাভ করা অনিবার্য্য হয়—তদুদ্দেশ্যে যাহাতে বনরক্ষা করিবার ব্যবস্থা হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(৩) পশুজাত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের এবং বনজাত প্রয়োজনীয় উদ্ভিদসমূহের কোনটীর কোন অভাব যাহাতে কোন মানুষের না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে সতর্কতা ;

(৪) যে শ্রেণীর পশুপালন-কার্য্যে কোন মানুষের অথবা জমি, জল ও হাওয়ার কোন রকমের অস্বাস্থ্যের উদ্ভব হইতে পারে—সেই শ্রেণীর পশুপালন-কার্য্য যাহাতে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(৫) যে শ্রেণীর পশুজাত দ্রব্যের যে শ্রেণীর ব্যবহারে কোন শ্রেণীর মানুষের অস্বাস্থ্য অথবা অতৃপ্তির উদ্ভব হইতে পারে—সেই শ্রেণীর পশুজাত দ্রব্য এবং সেই শ্রেণীর পশুজাত দ্রব্যের ব্যবহার যাহাতে সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জিত হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(৬) প্রত্যেক শ্রেণীর পশুপালন কার্য্যে যাহাতে চারি শ্রেণীর শ্রম বিধিবদ্ধভাবে প্রয়োগ করা হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা।

শিল্প-কার্য্য সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্যভাবে যে যে সতর্কতার প্রয়োজন হয়, তাহা সাধারণতঃ ছয় শ্রেণীর, যথা—

(১) কোন শ্রেণীর শিল্প-কার্য্যের কোন প্রণালী যাহাতে কাঁচামালসমূহের কোন স্বাভাবিক গুণ ও শক্তির এবং শিল্প-

জাত দ্রব্যসমূহের প্রয়োজনীয় গুণ ও শক্তির কোনরূপ অপকর্ষসাধক না হয়, পরন্তু উৎকর্ষসাধক হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(২) কোন শ্রেণীর শিল্প-কার্য্যের কোন প্রণালী শিল্পীগণের স্বাস্থ্যের এবং জমি, জল ও হাওয়ার সমতাতিশয্যের যাহাতে কোনরূপ অপকর্ষসাধক না হয়, পরন্তু উৎকর্ষ-সাধক হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(৩) মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারের জন্য যে সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, কোন শ্রেণীর ব্যবহারের কোন শ্রেণীর শিল্পজাত দ্রব্যের অভাব যাহাতে কোন দেশে না হইতে পারে, পরন্তু প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যবহারের প্রত্যেক শ্রেণীর শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য্য যাহাতে প্রত্যেক দেশে বিদ্যমান থাকে—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(৪) শিল্প কার্য্যের যে শ্রেণীর প্রণালীতে কোন মানুষের কোন-রূপ অস্বাস্থ্যের অথবা জমি, জল ও হাওয়ার কোন রকমের অসমতার ও বিষমতার উদ্ভব হইতে পারে, শিল্প-কার্য্যের সেই শ্রেণীর প্রণালী যাহাতে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(৫) যে শ্রেণীর শিল্পজাত দ্রব্য অথবা শিল্পজাত দ্রব্যের যে শ্রেণীর ব্যবহার যুগপৎ মানুষের তৃপ্তি ও স্বাস্থ্য-সাধনে অক্ষম, সেই শ্রেণীর শিল্পজাত দ্রব্য এবং শিল্পজাত দ্রব্যের সেই শ্রেণীর ব্যবহার যাহাতে প্রত্যেক দেশে সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জিত হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(৬) প্রত্যেক শ্রেণীর শিল্প-কার্য্যে যাহাতে চারি শ্রেণীর শ্রম বিধিবদ্ধভাবে প্রয়োগ করা হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা।

কারু-কার্য্য সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্যভাবে যে যে সতর্কতার প্রয়োজন হয়, তাহা সাধারণতঃ ছয় শ্রেণীর, যথা—

(১) কোন শ্রেণীর কারু-কার্য্যের কোন প্রণালী যাহাতে শিল্প-জাত দ্রব্যসমূহের অথবা কারু-কার্য্য জাত দ্রব্যসমূহের কোন স্বাভাবিক গুণ ও শক্তির কোনরূপ অপকর্ষ-সাধক না হয়, পরন্তু উৎকর্ষ-সাধক হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(২) কোন শ্রেণীর কারু-কার্য্যের কোন প্রণালী কারুকরগণের স্বাস্থ্যের অথবা জমি, জল ও হাওয়ার সমতাতিশয্যের যাহাতে কোনরূপ অপকর্ষ-সাধক না হয়, পরন্তু উৎকর্ষ-সাধক হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(৩) মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারের জন্য কারু-কার্য্য-জাত যে সমস্ত দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, কোন শ্রেণীর ব্যবহারের কোন শ্রেণীর কারুকার্য্যজাত দ্রব্যের অভাব যাহাতে কোন দেশে না হইতে পারে ; পরন্তু প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যবহারের প্রত্যেক শ্রেণীর কারু-কার্য্য-জাত দ্রব্যের প্রাচুর্য্য যাহাতে প্রত্যেক দেশে বিদ্যমান থাকে—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(৪) কারু-কার্য্যের যে শ্রেণীর প্রণালীতে কোন মানুষের কোন-রূপ অস্বাস্থ্যের অথবা জমি, জল ও হাওয়ার কোন রকমের অসমতার অথবা বিষমতার উদ্ভব হইতে পারে, কারুকার্য্যের সেই শ্রেণীর প্রণালী যাহাতে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(৫) যে শ্রেণীর কারু-কার্য্যজাত দ্রব্য অথবা কারুকার্য্যজাত যে শ্রেণীর ব্যবহার যুগপৎ মানুষের তৃপ্তি ও স্বাস্থ্যসাধনে অক্ষম সেই শ্রেণীর কারুকার্য্যজাত দ্রব্য এবং কারুকার্য্য-জাত দ্রব্যের সেই শ্রেণীর ব্যবহার যাহাতে প্রত্যেক দেশে সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জিত হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(৬) প্রত্যেক শ্রেণীর কারুকার্য্যে যাহাতে চারি শ্রেণীর শ্রম বিধিবদ্ধভাবে প্রয়োগ করা হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা

বাণিজ্য-কার্য্য সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্যভাবে যে যে সতর্কতার প্রয়োজন হয় তাহা প্রধানতঃ যোড়শ শ্রেণীর, যথা—

(১) ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের যাহাতে কোন শ্রেণীর প্রতারণার অথবা লোভের অথবা কুরুচির প্রবৃত্তিযুক্ত হওয়া সম্ভব না হয়, তাদৃশ বাণিজ্য-পদ্ধতি প্রচলন বিষয়ে সতর্কতা ;

(২) প্রত্যেক শ্রেণীর ক্রেতা যাহাতে তাহার নয় শ্রেণীর ব্যবহারের প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যবহারের প্রত্যেক দ্রব্য, প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে অনায়াসে পাইতে পারেন—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(৩) নয় শ্রেণীর ব্যবহারের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক বিক্রয়ের দ্রব্য যাহাতে কোনক্রমে স্বাস্থ্য অপহারক ও অস্বাস্থ্য-সম্পাদক না হয়, পরন্তু অস্বাস্থ্য অপহারক এবং স্বাস্থ্য-সম্পাদক হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(৪) কোন শ্রেণীর ক্রেতা যাহাতে নিজ নিজ অভীষ্ট অথবা প্রয়োজনীয় সর্ব্ববিধ দ্রব্য ক্রয় করিতে উপার্জ্জনাতিরিক্ত পরিমাণে ব্যয় করিতে বাধ্য না হ'ন্—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(৫) প্রত্যেক শ্রেণীর ক্রেতা যাহাতে নিজ নিজ অভীষ্ট অথবা প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য নিজ নিজ বাসস্থান হইতে অতিরিক্ত শ্রমসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ ব্যবধানে যাইতে বাধ্য না হ'ন্—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(৬) কোন ক্রেতার যাহাতে অন্য ক্রেতার তুলনায় নিজ নিজ অভীষ্ট অথবা প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার ব্যাপারে অধিকতর সুবিধা অথবা অসুবিধাযুক্ত বলিয়া মনে করিতে না হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(৭) কোন দেশ অথবা কোন গ্রাম, অন্য কোন দেশ অথবা অন্য কোন গ্রামের তুলনায় যাহাতে কোন দ্রব্যমূলক প্রয়োজন নির্ব্বাহের ব্যাপারে অধিকতর সুবিধা অথবা অসুবিধাযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে না পারে—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(৮) কোন দেশের কোন এক গ্রাম হইতে অন্য কোন গ্রামে মানুষের অভীষ্ট অথবা প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্য বহন করিয়া লওয়া যাহাতে মানুষের ক্ষমতাতিরিক্ত শ্রমসাধ্য অথবা ব্যয়সাধ্য না হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(৯) সমগ্র মানব-সমাজের প্রত্যেক দেশে তদ্দেশীয় মানুষের অভীষ্ট অথবা প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের কোন্‌টীর কিরূপ উৎকর্ষ সাধিত হয়—তাহা যাহাতে প্রত্যেক দেশের বণিকগণের জানা, দেখা এবং সর্ব্বতোভাবে বুঝা অল্প ব্যয়ে এবং অনায়াসে সাধিত হয়—তাহার ব্যবস্থা বিষয়ে সতর্কতা ;

(১০) কোন শ্রেণীর বণিক্ কোন শ্রেণীর বাণিজ্যে যাহাতে কোনরূপে লোকসানগ্রস্ত অথবা অযৌক্তিকভাবে অতিরিক্ত লাভবান্ না হইতে পারেন—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(১১) মানুষের নয় শ্রেণীর ব্যবহারে যাহা যাহা প্রয়োজনীয় তাহা ছাড়া অন্য কোন দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় যাহাতে না হইতে পারে—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(১২) দ্রব্য বহন করিবার জন্য যে সমস্ত রাস্তা ও খালের প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত রাস্তা ও খালের কোনটী যাহাতে জমি, জল ও হাওয়ার অসমতা ও বিষমতা-সাধক না হয়, পরন্তু সমতা-সাধক হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(১৩) ক্রয়-বিক্রয়ের দ্রব্য বহন করিবার জন্য যে সমস্ত যান-বাহনের প্রয়োজন হয়, তাহার কোনটী যাহাতে মানুষের অথবা জমি, জল ও হাওয়ার কোনক্রমে অসমতা ও বিষমতা-সাধক না হয়, পরন্তু সমতা-সাধক হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(১৪) আন্তর্দ্দেশিক ও আন্তর্গ্রাম্য ক্রয়-বিক্রয় যাহাতে অযথা বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হয়, পরন্তু ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(১৫) ক্রয়-বিক্রয়ে মুদ্রার ব্যবহার যাহাতে ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, পরন্তু ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

(১৬) একমাত্র দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে অথবা ব্যক্তিগত ও জাতিগত মুদ্রার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোন কারণে কোন মুদ্রার ব্যবহার যাহাতে না হয়—তদ্বিষয়ে সতর্কতা ;

কৃষি কার্য্য, খনিজ-কার্য্য, বারুণী-কার্য্য, পশুপালন-কার্য্য, শিল্প-কার্য্য, কারু-কার্য্য এবং বাণিজ্য-কার্য্য—মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সমূহ উৎপাদন করিবার ও বণ্টন করিবার এই সাত শ্রেণীর কার্য্যধারা বিষয়ে উপরোক্ত সতর্কতার সহিত পরিচালনা, সংগঠন ও ব্যবস্থা সাধিত হইলে সমগ্র মনুষ্য সমাজের সমগ্র মনুষ্য সংখ্যার সর্ব্ববিধ ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য ব্যবহারযোগ্য যে যে দ্রব্য যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হয়, সেই সেই ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য সেই সেই পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হয়। উহা সম্ভবযোগ্য হয় বটে ; কিন্তু কৃষিজাত কাঁচামাল, খনিজাত কাঁচামাল, জলজাত কাঁচামাল এবং পশুজাত কাঁচামালের উৎপাদন প্রচুর না হইলে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন প্রচুর হইতে পারে না এবং হয় না।

কৃষি-কার্য্য, খনিজ-কার্য্য, বারুণী-কার্য্য এবং পশুপালন-কার্য্য বিষয়ে যে যে সতর্কতার কথা বলা হইয়াছে সেই সেই সতর্কতার সহিত কৃষি-কার্য্য, খনিজ-কার্য্য, বারুণী-কার্য্য এবং পশুপালন-কার্য্য পরিচালনা করিবার সংগঠন ও ব্যবস্থা সাধিত হইলে কৃষি-জাত, খনি-জাত, জল-জাত এবং পশু-জাত কাঁচামাল সমূহ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিবার সহায়তা করা হয় বটে, কিন্তু জমি, জল ও হাওয়ার অসমতা ও বিষমতা যাহাতে না হয়, এবং প্রাকৃতিক সমতাতিশয্য যাহাতে রক্ষিত হয়, তাহার সংগঠন ও ব্যবস্থা সাধিত না হইলে কৃষিজাত, খনি-জাত, জলজাত এবং পশুজাত কাঁচামালসমূহ সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যার প্রয়োজন নির্ব্বাহোপযোগী প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না।

জমি, জল ও হাওয়ার সমতা, অসমতা ও বিষমতা কাহাকে বলে তাহা পাঠকবর্গকে আমরা আগেই শুনাইয়াছি। পাঠকবর্গের বুঝিবার সুবিধার জন্য আমরা এই কথার পুনরুল্লেখ করিতেছি।

এই ভূ-মণ্ডলের স্বভাবজাত প্রত্যেক শ্রেণীর পদার্থের অন্তরে স্বতঃই সাতশ্রেণীর কার্য্য* চলিতে থাকে।

স্বভাবজাত প্রত্যেক পদার্থের অন্তরস্থিত নিম্নলিখিত সপ্তবিধ কার্য্যের পরিণতি কখন কখন এক শ্রেণীর হইতে পারে আবার কখন কখন একাধিক শ্রেণীর হইতে পারে। কোন পদার্থের অন্তরস্থিত উপরোক্ত সপ্তবিধ কার্য্যের

* (১) পঞ্চবিধ আবয়বিক কার্য্য,
(২) ত্রিবিধ চাপ অথবা বিচ্ছেদ-মিলনের কার্য্য,
(৩) বিবিধ ঘনত্বের শৃঙ্খলিত ও বিশৃঙ্খলিত সমাবেশ জনিত বিবিধ ভার বহনের কার্য্য,
(৪) ষড়বিধ রাসায়নিক কার্য্য,
(৫) পঞ্চবিধ অগ্নির কার্য্য,
(৬) তেজ ও রসের মিলন ও বিচ্ছেদমূলক প্রবাহের কার্য্য,
(৭) অবয়বস্থ পঞ্চবিধ অবস্থার অর্থাৎ বায়বীয়, বাষ্পীয়, তরল, স্থূল ও মহাকাশ-অবস্থার শৃঙ্খলিত ভাবে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিবর্ত্তনের কার্য্য। বঙ্গশ্রী—১৩৫০, ফাল্গুন, ১০৬ পৃষ্ঠা

পরিণতি যখন এক শ্রেণীর হয়, তখন ঐ পদার্থকে "সমতাপন্ন" অথবা "সমাবস্থাপন্ন" বলা হইয়া থাকে। উপরোক্ত পরিণতি যখন একাধিক শ্রেণীর হয়, তখন ঐ পরিণতি সমূহ পরস্পরের প্রতি অবিরোধী হইতে পারে, বিরোধীও হইতে পারে। কোন পদার্থের অন্তরস্থিত সপ্তবিধ কার্য্যের পরিণতি যখন একাধিক শ্রেণীর হয় অথচ ঐ পরিণতি সমূহ পরস্পরের প্রতি অবিরোধী থাকে, তখন ঐ পদার্থকে "অসমতাপন্ন" অথবা "অসমাবস্থাপন্ন" বলা হইয়া থাকে। যখন কোন পদার্থের অন্তরস্থিত সপ্তবিধ কার্য্যের পরিণতি একাধিক শ্রেণীর হয়, এবং ঐ পরিণতি সমূহ পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করে, তখন ঐ পদার্থকে "বিষমতাপন্ন" অথবা "বিষমাবস্থাপন্ন" বলা হইয়া থাকে।§

জমি, জল ও হাওয়ার অসমতা ও বিষমতা যাহাতে না হয় এবং উহাদের প্রকৃতিক সমতাতিশয্য যাহাতে রক্ষিত হয়, তাহার সংগঠন ও ব্যবস্থা সাধিত না হইলে, কেন যে কৃষি-জাত, খনি-জাত, জল-জাত এবং পশু-জাত কাঁচামালসমূহ সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার প্রয়োজন নির্ব্বাহোপযোগী প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভবযোগ্য হয় না, তাহা বুঝিতে হইলে জমি, জল ও হাওয়ার স্বাভাবিক উৎপাদনের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির স্বতঃই উদ্ভব হয় কোন্ কোন্ কার্য্যধারায় তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিবার প্রয়োজন হয়।

জমির স্বতঃই উৎপাদন করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির সাক্ষাৎকারণ তাহার অন্তরস্থ পঞ্চবিধ অবস্থার এক অবস্থা হইতে শৃঙ্খলিতভাবে অন্যাবস্থায় পরিবর্ত্তনের গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি ও কার্য্য। জমির স্বতঃই উৎপাদন করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির গৌণ কারণ তাহার অন্তরস্থিত অপর ছয়টি কার্য্য (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ আবয়বিক কার্য্য প্রভৃতি ছয় শ্রেণীর কার্য্য) জমির অন্তরে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ আবয়বিক কার্য্য প্রভৃতি ছয় শ্রেণীর কার্য্য স্বতঃই বিদ্যমান থাকে বলিয়া তাহার অন্তরস্থিত পঞ্চবিধ অবস্থা (অর্থাৎ বায়বীয়, বাষ্পীয়, তরল, স্থূল ও মহাকাশাবস্থা) শৃঙ্খলিতভাবে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় স্বতঃই পরিবর্ত্তনের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিযুক্ত হইয়া থাকে। জমির অন্তরস্থ পঞ্চবিধ অবস্থা শৃঙ্খলিত ভাবে এক অবস্থা হইতে অন্যাবস্থায় স্বতঃই পরিবর্ত্তনের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি যুক্ত হয় বলিয়া স্বতঃই জমির উৎপাদনের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উদ্ভব হইয়া থাকে।

জমির অন্তরস্থিত পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ আবয়বিক কার্য্য প্রভৃতি ছয় শ্রেণীর কার্য্যের সাক্ষাৎ কারণ সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের পাঁচটি অবস্থার* বিদ্যমানতা। স্থূল-অবস্থার সাক্ষাৎ কারণ তরল-অবস্থা। তরল-অবস্থার সাক্ষাৎ কারণ বিচ্ছেদ-অবস্থা অথবা বাষ্পীয় অবস্থা। বিচ্ছেদ-অবস্থা অথবা বাষ্পীয় অবস্থার সাক্ষাৎ কারণ কাল অবস্থা অথবা বায়বীয় অবস্থা। কাল অবস্থা অথবা বায়বীয় অবস্থার সাক্ষাৎ কারণ ব্যোম অবস্থা অথবা দ্বৈতাবস্থা।

সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের ব্যোম অবস্থার সাক্ষাৎ কারণ সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মায়া অবস্থা (Non-variable condition)। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের মায়া অবস্থার সাক্ষাৎ কারণ সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের অদ্বৈতাবস্থা (Constant condition)

জমির স্বতঃই উৎপাদন করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি সাক্ষাৎভাবে কোন কারণে স্বতঃই উদ্ভূত হয় এবং ঐ সাক্ষাৎ কারণ কোন্ কোন্ কার্য্যধারায় উদ্ভূত হইয়া থাকে ও চলিতে থাকে, তৎসম্বন্ধে আমরা উপরে যে কথা কয়টি চুম্বকভাবে বিবৃত করিলাম, সেই কথা কয়টি খুবই নুতন বলিয়া আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রতীত হয়। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ঐ কথা কয়টি মোটেই নুতন নহে; পরন্তু ঐ কথা কয়টি অতীব পুরাতন। ঐ কথা কয়টি চারটি বেদের সংহিতাংশ, ব্রাহ্মণাংশ, আরণ্য-কাংশ, প্রাতিশাখ্যাংশ, এবং উপনিষদাংশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

কৃষি প্রভৃতি সাত শ্রেণীর কার্য্যের সংগঠন, ব্যবস্থা ও পরিচালনা যথাযথভাবে সাধিত করিতে হইলে যে চারি শ্রেণীর শ্রমের প্রয়োজন হয় বলিয়া ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই চারি শ্রেণীর শ্রমের প্রথম শ্রেণীর শ্রমে নৈপুণ্য লাভ করিতে না পারিলে বেদের সংহিতাংশ, ব্রাহ্মণাংশ, আরণ্যকাংশ, প্রাতিশাখ্যাংশ এবং উপনিষদাংশে আদৌ প্রবিষ্ট হওয়া যায় না। বেদের সংহিতাংশ, ব্রাহ্মণাংশ, আরণ্যকাংশ এবং উপনিষদাংশে সর্ব্বতোভাবে প্রবিষ্ট না হইতে পারিলে জমি, জল ও হাওয়ার স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির সাক্ষাৎ কারণ কি কি এবং ঐ সাক্ষাৎ কারণের উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন হয় কোন্ কোন্ কার্য্যধারায় তাহা স্পষ্টভাবে বুঝা সম্ভবযোগ্য হয় না।

জমি, জল ও হাওয়ার স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির সাক্ষাৎকারণ কি কি এবং ঐ সাক্ষাৎ কারণের উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন হয় কোন্ কোন্ কার্য্যধারায়, তাহা যাঁহারা আদৌ বিদিত নহেন, অথচ বৈজ্ঞানিক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা উপরোক্ত কথাগুলি হয়ত না বুঝিতে পারিয়া উহাদিগকে অলীক (utopian) বলিয়া মনে করিবেন। আধুনিক প্রসিদ্ধিযুক্ত বৈজ্ঞানিকগণ যে

§ বঙ্গশ্রী—১৩৫০, পৌষ—৪২ পৃষ্ঠা, এবং ফাল্গুন—১০৬ পৃষ্ঠা।

* (১) ব্যোম-অবস্থা অথবা দ্বৈতাবস্থা,
(২) কাল-অবস্থা অথবা বায়বীয় অবস্থা,
(৩) বিচ্ছেদ-অবস্থা অথবা বাষ্পীয় অবস্থা,
(৪) তরল-অবস্থা,
(৫) স্থূল-অবস্থা।

সমস্ত কথা বুঝিতে পারেন না, সেই সমস্ত কথার প্রত্যেকটি যে অলীক, তাহা মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ আমাদিগের মতে নাই। আমাদিগের মতে ভারতবর্ষে যে কয়টি মানুষ আধুনিক জগতে বৈজ্ঞানিক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটি এক একটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কুলাঙ্গার এবং মনুষ্যোচিত লজ্জার অভাবযুক্ত আত্মপ্রতারক। আজ ভারতের মনুষ্যসমাজ আত্মবিস্মৃত এবং মোহাচ্ছন্ন বলিয়া উপরোক্ত লজ্জাহীন আত্মপ্রতারক কুলাঙ্গারগণের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ করিয়া থাকেন—ইহা আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

আমাদিগের মতে ভারতে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক থাকিলে ইয়োরোপ হইতে বিজ্ঞান, কৃষি, খনিজ-কর্ম্ম, বারুণী-কর্ম্ম, পশুপালন-কর্ম্ম, শিল্প, কারু-কার্য্য ও বাণিজ্যের কথা কর্জ্জ করিয়া আনিতে হইত না। ইয়োরোপ হইতে বিজ্ঞান, কৃষি, খনিজ-কর্ম্ম, বারুণী-কর্ম্ম, পশুপালন-কর্ম্ম, শিল্প, কারু-কার্য্য ও বাণিজ্যের কথা কর্জ্জ করিয়া না আনিলে সোনার ভারতের মানুষ আজ পশুপক্ষীর তুলনায় হীনাবস্থাপন্ন হইয়া অকালমৃত্যুর করাল কবলে নিপতিত হইতেন না। ভারতে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক থাকিলে শুধু ভারতের মানুষের দুরবস্থা কেন, জগতের সর্ব্বত্র হাহাকার ত' দূরের কথা কুত্রাপিও দুরবস্থার উদ্ভব হইতে পারিত না।

বাস্তবিক পক্ষে বেদের মন্ত্রাংশ অনুভব ও উপলব্ধি করিবার বিষয়। যাঁহারা বৈকৃতিক ইচ্ছা ও অভিমানযুক্ত তাঁহাদিগের পক্ষে বেদের মন্ত্রাংশ অনুভব ও উপলব্ধি করা আদৌ সম্ভবযোগ্য নহে। যাঁহারা অন্ততঃপক্ষে সাময়িকভাবে বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমানের প্রবৃত্তি সংযত করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে বেদের মন্ত্রাংশ অনুভব ও উপলব্ধি করা সম্ভবযোগ্য হয়। বেদের মন্ত্রাংশ অনুভব ও উপলব্ধি করিতে অভ্যস্ত হইলে সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের দশটী অবস্থার কোন্ কোন্টী কোথায় কিরূপভাবে বিদ্যমান আছে, তাহা স্বচক্ষে দেখা সম্ভব হয়। সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের দশটী অবস্থার কোন্ কোন্টী কোথায় কিরূপভাবে বিদ্যমান আছে, তাহা স্বচক্ষে দেখিবার সক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারিলে জমির স্বাভাবিক উৎপাদনের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির সাক্ষাৎকারণ এবং ঐ সাক্ষাৎকারণের উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তনের কার্য্যধারা সম্বন্ধে যে যে কথা বলা হইয়াছে, সেই সেই কথার প্রত্যেকটী যে সর্ব্বতোভাবে সত্য তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়।

জমি, জল ও হাওয়া প্রভৃতি প্রত্যেক স্বভাবজাত জীবিত পদার্থের অন্তরে যে বিবিধ আবয়বিক কার্য্য, বিবিধ চাপ অথবা বিচ্ছেদ-মিলনের (Tension-এর) কার্য্য, বিবিধ ঘনত্বজনিত সমাবেশ, বিবিধ ভার বহনের কার্য্য, বিবিধ রাসায়নিক কার্য্য, বিবিধ অগ্নির কার্য্য, তেজ ও রসের প্রবাহের কার্য্য বিদ্যমান থাকে, তৎসম্বন্ধে যে কেহ সহজাত বুদ্ধির দ্বারা যে কোনো স্বভাবজাত পদার্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারেন। পদার্থের অন্তরে উপরোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কার্য্য বিদ্যমান থাকিলে ঐ সমস্ত কার্য্যের এক বা একাধিক পরিণতি (Resultant) যে অবশ্যম্ভাবী তাহাও সহজাত বিচারশক্তির দ্বারা অনুমান করা যায়। কোন পদার্থের অন্তরাস্থিত সর্ব্ববিধ কার্য্যের পরিণতি এক শ্রেণীর হইলে উহার স্বাভাবিক উৎপাদনের যে শ্রেণীর গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি হওয়া অবশ্যম্ভাবী, অন্তরাস্থিত সর্ব্ববিধ কার্য্যের পরিণতি একাধিক শ্রেণীর হইলে যে স্বাভাবিক উৎপাদনের সেই শ্রেণীর গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে,—তাহাও সহজাত বিচার-বুদ্ধির দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে।

উপরোক্ত কারণে কৃষি-জাত, খনি-জাত, জল-জাত এবং পশু-জাত কাঁচামালসমূহ যাহাতে প্রত্যেক দেশের সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যার প্রয়োজন নির্ব্বাহোপযোগী প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সহজসাধ্য হয়, তাহা করিতে হইলে প্রত্যেক দেশের জমি, জল ও হাওয়ার অসমতা ও বিষমতা যাহাতে উদ্ভূত না হয় এবং উহাদের প্রাকৃতিক সমতাতিশয্য যাহাতে রক্ষিত হয়—তাহার সংগঠন ও ব্যবস্থা সাধন করা একান্ত ভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে।

জমি, জল ও হাওয়ার অসমতা ও বিষমতা দুই শ্রেণীর কারণে উদ্ভূত হইয়া থাকে। এক শ্রেণীর কারণ, প্রাকৃতিক; আর এক শ্রেণীর কারণ, মনুষ্যকৃত।

প্রাকৃতিক কারণে জমি, জল ও হাওয়ার অসমতা ও বিষমতা যেমন উদ্ভূত হয়, সেইরূপ আবার সমতাও উদ্ভূত হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক কারণে জমির জল ও হাওয়ার যে অসমতা ও বিষমতার উদ্ভব হয়, সেই অসমতা ও বিষমতা অনিবার্য্য। প্রাকৃতিক কারণে জমি, জল ও হাওয়ার অসমতা ও বিষমতা অনিবার্য্য বটে; কিন্তু প্রাকৃতিক কারণেই পুনরায় উহাদের সমতা ঘটিয়া থাকে বলিয়া প্রাকৃতিক কারণগত অসমতা ও বিষমতা অনিবার্য্যরূপে মানুষের অনিষ্টপ্রদ হয় না। প্রাকৃতিক কারণে জমি, জল ও হাওয়ার অসমতা অথবা বিষমতা ঘটিলে জমির স্বাভাবিক উৎপাদনের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির পরিমাণ কিয়ৎপরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ঐ হ্রাসপ্রাপ্তির পূরণ করা প্রাকৃতিক কারণেই মানুষের সাধ্যান্তর্গত হইয়া থাকে।

মানুষের যে যে কার্য্যবশতঃ জমি, জল ও হাওয়ার অসমতা ও বিষমতা ঘটিয়া থাকে, সেই সেই কার্য্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্য্য দশ শ্রেণীর, যথা:

(১) স্থলযায়ী যানবাহনের অনিয়ন্ত্রিত গমনবেগ;

(২) স্বাভাবিক স্রোতস্বিনী সমূহের বিরুদ্ধ গতিযুক্ত কৃত্রিম নালা ও খাল ;

(৩) স্বাভাবিক স্রোতস্বিনীসমূহের অভিমুখে ভূমির যে সমস্ত স্বাভাবিক গড়েন (slopes) বিদ্যমান থাকে, সেই সমস্ত গড়েনের বিঘ্নকারী বাঁধ ও স্থলপথসমূহ ;

(৪) বন্দর ও সহরাদি নির্ম্মাণে ঘর বাড়ীর অনিয়ন্ত্রিত ও পুঞ্জীভূত বোঝাসমূহ ;

(৫) খনিজ পদার্থের সাহায্যে কৃত্রিম অগ্নির (যথা : বৈদ্যুতিক, বাষ্পীয় ও কয়লার অগ্নির) উৎপাদন ও পরিচালনাজনিত রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ;

(৬) অনিয়ন্ত্রিত ভাবে খনিজ পদার্থের উত্তোলন জনিত জমির অন্তরস্থ সপ্তবিধ কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ;

(৭) বার্ত্তাবহনের জন্য তারযুক্ত অথবা তারহীন সরঞ্জামের অনিয়ন্ত্রিত তরঙ্গবেগ ও রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ;

(৮) সমুদ্রযায়ী অর্ণবপোতসমূহের অনিয়ন্ত্রিত গমনবেগ ও রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াসমূহ ;

(৯) স্বভাবিক স্রোতস্বিনীসমূহের স্রোতের বাধাপ্রদ বাঁধ ও পুলসমূহ ;

(১০) আকাশযায়ী বাষ্পপোতসমূহের অনিয়ন্ত্রিত গমনবেগ ও রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াসমূহ।

প্রত্যেক দেশের কোন মানুষের কার্য্যবশতঃ জমি, জল ও হাওয়ার অসমতা অথবা বিষমতা যাহাতে উদ্ভূত না হয়, তাহার সংগঠন ও ব্যবস্থা করিতে হইলে উপরোক্ত দশশ্রেণীর কার্য্য কোন দেশের কোন মানুষে যাহাতে না করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা সাধিত করিতে হয়।

উপরোক্ত দশশ্রেণীর কার্য্যের কোন শ্রেণীর কার্য্য যাহাতে কোন দেশের কোন শ্রেণীর মানুষ না করেন, তাহার ব্যবস্থা ও সংগঠন সাধিত হইলে মানুষের কার্য্যবশতঃ জমি, জল ও হাওয়ার অসমতা ও বিষমতা উদ্ভব হওয়া অসম্ভব হয়।

মানুষের কার্য্যবশতঃ জমি, জল ও হাওয়ার অসমতা অথবা বিষমতার উদ্ভব যাহাতে না হয় তাহার সংগঠন ও ব্যবস্থা সাধিত হইলে জমি, জল ও হাওয়ার স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির ও প্রবৃত্তির হ্রাস প্রাপ্তির কারণ অনেক পরিমাণে দূরীভূত হয়। উহা অনেক পরিমাণে দূরীভূত হয় বটে ; কিন্তু সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত হয় না। তাহার কারণ—প্রাকৃতিক যে সমস্ত কারণে জমি, জল ও হাওয়ার অসমতা ও বিষমতা ঘটিয়া থাকে সেই সমস্ত কারণ অনিবার্য্য এবং প্রাকৃতিক কারণে জমি, জল ও হাওয়ার অসমতা ও বিষমতা ঘটিলে উহাদের উৎপাদিকাশক্তির এবং উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির হ্রাসপ্রাপ্তিও অনিবার্য্য।

প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ জমি, জল ও হাওয়ার অসমতা ও বিষমতা এবং তন্নিবন্ধন উহাদের উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তির হ্রাসপ্রাপ্তি অনিবার্য্য বটে ; কিন্তু ঐ হ্রাসপ্রাপ্তি উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির পরিপূর্ণতা সাধন করা মানুষের সাধ্যান্তর্গত।

প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ জমি, জল ও হাওয়ার উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির যে হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে তাহার পরিপূরণ করিবার সঙ্কেতসমূহকে ব্যাস-দেবের সংস্কৃত ভাষায় **যাজ্ঞিক কর্ম্ম** বলা হইয়া থাকে।

উপরোক্ত "যাজ্ঞিক কর্ম্ম"সমূহ ছয় হাজার বৎসরকাল সারা ভূমণ্ডলময় প্রচারিত ছিল। ঐ যাজ্ঞিক কর্ম্মসমূহ যে একদিন সারা ভূমণ্ডলময় প্রচারিত ছিল তাহার অকাট্য প্রমাণ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বিবিধ গ্রন্থে এখনও পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত প্রমাণ বর্ত্তমানকালের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণকে বুঝান সম্ভব নহে। তাঁহারা সংস্কৃতভাষা পড়িবার রীতি সর্ব্বতোভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছেন।

যাজ্ঞিক কর্ম্ম যথাযথভাবে সাধিত হইলে প্রাকৃতিক কারণ-বশতঃ জমি, জল ও হাওয়ার স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির যে হ্রাস-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে সেই হ্রাস-প্রাপ্ত স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তির পরিপূরণ হওয়া অনিবার্য্য হয়।

যাজ্ঞিক কর্ম্মের মূলসূত্র—এই ব্রহ্মাণ্ডের যে যে ক্ষেত্রে স্বভাবতঃ বায়ু হইতে বাষ্পের উদ্ভব হয় এবং বাষ্প হইতে তরলের অথবা মহাসমুদ্রের উদ্ভব হয় এবং তরল হইতে স্থূলের অথবা পৃথিবীর উদ্ভব হয়—সেই সেই ক্ষেত্রের কার্য্যবেগ সাময়িকভাবে বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া। উহা করিতে হয় বায়ুর অভ্যন্তরস্থ সপ্তবিধ কার্য্যের সহায়তায়। উহা করা সাধক মানুষের পক্ষে যে সর্ব্বতোভাবে সম্ভব তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণকে বুঝান সম্ভব নহে। বায়ু, জল ও স্থূলের উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন স্বতঃই প্রাকৃতিক ও ঐশ্বরিক যে যে কারণ বশতঃ হইয়া থাকে, সেই সেই কারণ অনুভব ও উপলব্ধি করিতে না পারিলে, যাজ্ঞিক কর্ম্মের সর্ব্বতোভাবের বৈজ্ঞানিকতা বুঝিয়া উঠা সম্ভবযোগ্য হয় না। যাজ্ঞিক কর্ম্মের বৈজ্ঞানিকতা আধুনিক তথাকথিত বৈজ্ঞানিকগণের পক্ষে বুঝিয়া উঠা সম্ভবযোগ্য নহে বলিয়া উহা যে সর্ব্বতো-ভাবের বৈজ্ঞানিক নহে অথবা কোনক্রমে কাল্পনিক (utopian) তাহা মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ বিদ্যমান নাই।

যাজ্ঞিক কর্ম্ম যখন তখন সম্পাদিত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। উহা প্রতি বৎসর পাঁচ দিন মাত্র সম্পাদিত হইতে

পারে। মানুষের যে যে কার্য্যবশতঃ জমি, জল ও হাওয়ার অসমতা ও বিষমতার উদ্ভব হইয়া থাকে, সেই সেই কার্য্য দ্বারা ভূমণ্ডলের কুত্রাপি যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে যান্ত্রিক কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে সাধিত হওয়া কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না।

উপরোক্ত কথা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কৃষি-জাত, খনি-জাত, জল-জাত এবং পশু-জাত কাঁচামালসমূহ যাহাতে প্রত্যেক দেশের সমগ্র মনুষ্য সংখ্যার প্রয়োজন নির্ব্বাহোপযোগী প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সহজসাধ্য হয় তাহা করিতে হইলে দুই শ্রেণীর সংগঠন ও ব্যবস্থা একান্ত ভাবে প্রয়োজনীয় হয়, যথা :—

( ) মানুষের যে যে দশ শ্রেণীর কার্য্যবশতঃ জমি, জল ও হাওয়ার অসমতা ও বিষমতার উদ্ভব হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে উহাদের স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তির হ্রাস প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে—সেই সেই দশ শ্রেণীর কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি যাহাতে প্রত্যেক মানুষ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া পরিত্যাগ করেন—তাহার সংগঠন ও ব্যবস্থা ;

(২) প্রাকৃতিক কার্য্যবশতঃ জমি জল ও হাওয়ার স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তির যে হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে তাহা যাহাতে যান্ত্রিক কর্ম্মের দ্বারা পরিপূরণ করা হয়, তাহার ব্যবস্থা ও সংগঠন।

সমগ্র মনুষ্যসমাজের সমগ্র মনুষ্য সংখ্যার সর্ব্ববিধ ইচ্ছার পূরণ করিতে হইলে যে যে দ্রব্য যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হয় সেই সেই দ্রব্য সেই সেই পরিমাণে যাহাতে অনায়াসে উৎপন্ন করা ও বণ্টন করা সহজ সাধ্য হয় তাহা করিতে হইলে সর্ব্বসমেত নয় শ্রেণীর সংগঠন ও ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, যথা :

(১) মানুষের যে যে দশ শ্রেণীর কার্য্যবশতঃ জমি, জল ও হাওয়ার অসমতার ও বিষমতার উদ্ভব হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে উহাদের স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তির হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে সেই সেই দশ শ্রেণীর কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি যাহাতে প্রত্যেক মানুষ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া পরিত্যাগ করেন তাহার সংগঠন ও ব্যবস্থা ;

(২) প্রাকৃতিক কার্য্যবশতঃ জমি, জল ও হাওয়ার স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তির ও উৎপাদিকা প্রবৃত্তির যে হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, তাহা যাহাতে যান্ত্রিক কর্ম্মের দ্বারা পরিপূরণ করা হয় তাহার ব্যবস্থা ও সংগঠন ;

(৩) পূর্ব্ব উল্লিখিত প্রয়োজনীয় সতর্কতার সহিত বিধিবদ্ধ ভাবে কৃষিকার্য্য করিবার সংগঠন ও ব্যবস্থা ;

(৪) পূর্ব্ব উল্লিখিত প্রয়োজনীয় সতর্কতার সহিত বিধিবদ্ধ ভাবে খনিজ-কার্য্য করিবার সংগঠন ও ব্যবস্থা ;

(৫) পূর্ব্ব উল্লিখিত প্রয়োজনীয় সতর্কতার সহিত বিধিবদ্ধভাবে বারুণী-কার্য্য করিবার সংগঠন ও ব্যবস্থা ;

(৬) পূর্ব্ব উল্লিখিত প্রয়োজনীয় সতর্কতার সহিত বিধিবদ্ধভাবে পশুপালন-কার্য্য করিবার সংগঠন ও ব্যবস্থা ;

(৭) পূর্ব্ব উল্লিখিত প্রয়োজনীয় সতর্কতার সহিত বিধিবদ্ধভাবে শিল্পকার্য্য করিবার সংগঠন ও ব্যবস্থা ;

(৮) পূর্ব্ব উল্লিখিত প্রয়োজনীয় সতর্কতার সহিত বিধিবদ্ধভাবে কারু-কার্য্য করিবার সংগঠন ও ব্যবস্থা ;

(৯) পূর্ব্ব উল্লিখিত প্রয়োজনীয় সতর্কতার সহিত বিধিবদ্ধভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য্য অথবা বাণিজ্য-কার্য্য করিবার সংগঠন ও ব্যবস্থা।

আগামী সংখ্যায় "মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত"—শীর্ষক আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিবার আশা রহিল।

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

চৈত্র—১৩৫০

১১শ বর্ষ, ২য় খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা

হে ভগবান বজ্র হানো

সৃষ্টি বুঝি লুপ্ত হয়
হে ভগবান বজ্র হানো।
প্রলয়-শিখা জ্বালাও পুনঃ
শান্তির ধরা ফিরিয়ে আনো
অত্যাচারী রক্ত চোখে
দৈত্যসম অট্ট হাসে,
মানুষ যারা লক্ষ্যহারা,
শমন বুঝি ঘনিয়ে আসে।

লক্ষপতি করাল গ্রাসে
দুর্ব্বলেরি ছিঁড়ছে টুঁটি।
সভ্যযুগের অন্তরালে
অসভ্যতা উঠছে ফুটি'।
ঐক্য নাহি, সখ্য বৃথা,
স্বার্থ নিয়ে টান্‌ছে সবে,
ধ্বংস কর সৃষ্টি প্রভু,
নূতন ধরা গ'ড়তে হবে।

শ্রীপ্রিয়লাল দাশ

খাণ্ডব দাহন

খাণ্ডব বন দহন কর, দহন কর খাণ্ডব বন,
দোহন কর কামদুঘারে কর ভূমণ্ডলকে শোধন।
তৃপ্ত কর, তৃপ্ত কর, সর্ব্বভুক্ ওই বৈশ্বানরে,
দগ্ধ কর ভয়াল যারা, উদ্বেজিত ধরায় করে।

জ্বালাও তরু-গুল্ম-লতা, বৃহৎ বৃহৎ বনস্পতি,
অস্বাস্থ্যকর আওতা ঘুচুক, যথেষ্ট লাভ, কমই ক্ষতি।
ধ্বংস হউক বাঘের বিবর, উগ্র অজগরের বাসা।
জ্বলুক ভালুক-সিংহের ঘর, বিষের আগার সর্ব্বনাশা।

হিংস্র আর ঐ বিষাক্তকে দহন কর দহন কর।
পার্থ, তোমার অগ্নিবাণে মৃত্যুশিখা বহন কর।
ধ্বংস কর পশুত্বকে, অসত্য ও জিঘাংসাকে।
নষ্ট কর পিষ্ট কর অগ্নিময় ও-রথের চাকে।

আনো আলো, অধিক আলো, আলো প্রখর, প্রখরতর,
মালিন্য সব পুড়িয়ে ঘুচাও, বিশুদ্ধ ও উজল কর।
খাণ্ডব বন—গেলই বা সে, স্থান দিয়ো না কারুণ্যকে,
দেখবে তাহার ভস্ম দিবে জন্ম মহৎ আরণ্যকে।

বিস্তৃতি তার বিরাট বিপুল—সুদীর্ঘ কাল তাহার স্থিতি,
বিলুপ্ত তার বিশিষ্টতা—শ্রদ্ধা নয় সে জাগায় ভীতি।
জ্বলুক শিখা, জ্বলুক শিখা, সলিল-কণা দিও না কেউ,—
ধ্বংস করুক বিভীষিকা আসি' অনল-সমুদ্র-ঢেউ।

নূতন বীজ আর নূতন তরু নূতন জীবের সূচনা হোক,
না হোক পড়ে থাকুক মরু—ভীতির ক্ষিতি চাহে না লোক
গড় আবার নূতন জগৎ, নূতন কানন নূতন প্রাণী,
আসুক যা সৎ বৃহৎ মহৎ শ্রেষ্ঠ যাহা তার আমদানী।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কালক্রম

সব চেয়ে আমার খারাপ লাগে এই যে
তোমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই ;
কিছুমাত্র তাড়া নেই কোনো কিছুতেই তোমার।
কত যুদ্ধ-বিগ্রহ অশান্তি উপদ্রব—
কত হাহাকার মড়ক আর মন্বন্তর—
কতো চক্র আর চক্রান্ত,
ফুলের মত যারা ফুটতে পারত—
হয়ত বা ফুটেছিল—
কতো যে তাদের দলে দলে ঝ'রে পড়া—
অকাতরে ব্যর্থ হয়ে যাওয়া কত না!
কিন্তু তোমার কোনো গরজ নেই গর্জ্জন করে'
আসবার।
আমরা দুশ্চিন্তায় জড়ো জড়ো,
ক্ষুধাতৃষ্ণায় মরো মরো—
কিন্তু তুমি একটির পর একটি দল মেলে চলেছ
মহাজীবন-পদ্মের
নিজের মনে—আপনার লীলায়।
অফুরন্ত সময় তোমার হাতে, অনন্ত তোমার
অবকাশ—
তোমার হাতের চাকা ঘুরছে ধীর মন্থর গতিতে।

কিন্তু—কিন্তু কী তার ঘূর্ণাবেগ!
দেখতে না দেখতে উড়ে যাচ্ছে শতাব্দীরা—
মিলিয়ে যাচ্ছে সম্রাটদের মুকুট—
কতো নক্ষত্রের আলো যাচ্ছে ফুরিয়ে—
আর তোমার হাতের মহাপদ্ম—
পৃথিবীর এই মানুষ—
মানুষের এই জীবন—
সম্পূর্ণ হয়ে উঠছে দলে দলে।
আর, এক জন্মে লক্ষ জন্ম যাপন করছি—
এক জীবনে অযুত জীবন—
এক মুহূর্ত্তে সহস্র চেতনা—
পলকের পরমায়ুজীবী আমরা।

তোমার এই অফুরন্ত কালস্রোত—
বলো, এ কি আমারো সময়?
তোমার এই সীমাহীন পরিবেশ—
এ কি হতে পারে আমারো অবকাশ?
তুমিই জানো।

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

কে লবে সেবার ভার?

আত্মকলহে মত্ত এ জাতি কে লবে সেবার ভার?
সবাই নায়ক, সবাই চালক, পূজারী নাহিক মা'র।
চাই জননীর শ্রেষ্ঠ সেবক
অচল পথের অটল সাধক,
কল্যাণময়ী পূজারিণী কই স্বদেশ-মাতৃকার,
বক্ষে সুধার কুম্ভ কক্ষে প্রীতির ঝর্ণা যার।

অঞ্চলতলে না রাখি' তনয়ে আপনার ছোট ঘরে
দুর্লভ মণি সন্ধানে তারে পাঠাবে দেশান্তরে।
সত্যাশ্রয়ী সত্য-পূজারী
সাম্য-মিলন-মন্ত্র প্রচারি'
হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য আনিবে পুনর্ব্বার।
কর্ম্মী সাধক ন্যায়-প্রচারক, কে লবে সেবার ভার?

দু'মুঠো ক্ষুধার অন্ন জোটে না হাহাকার দেশময়,
জাপানী বোমারু-প্রতাপে হৃদয়ে জাগিছে মরণ-ভয়।
শান্তি-মন্ত্র কণ্ঠে কাহার,
কোথা সন্তান স্বদেশ-মাতার?
পীত-ভীত দেশে আনিবে বহিয়া বাণী কে সান্ত্বনার?
বিপদে দৈন্যে অভয়চিত্তে কে লবে সেবার ভার?

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস

কৃত্তিবাস

মহাকাব্য-সুরধুনী সাধনার জটাজালে করেছিলে একদা বন্ধন,
ধ্যানের নীরব রাত্রে বঙ্গের মানসক্ষেত্রে বহায়েছ তারে।
অতীতের চিত্তাচলে যোগাসনে চন্দ্রচূড়সম তব পুণ্য উদয়ন
জীবনপ্রান্তরপথে সুরধ্বনি-কলস্বনা আনন্দ বিথারে।
কুটীর-প্রাসাদে কত মুখরিত ছন্দোগীতি,—
মর্ম্মে জাগে রামায়ণী মোহ,
উৎসাহে উল্লাসে আসে অশ্রুহাসিসমন্বয়ে স্বর্গপ্রেম ভাব;
লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভরতের ত্যাগনিষ্ঠা, রাঘবের রণ-সমারোহ
সীতার সতীত্ব-দীপ্তি, সরমার আর্ত্তনাদ, তারার বিলাপ।
শক্তিবলে দিয়ে গেছ শিক্ষাধর্ম্ম জয়ন্তীরে বাঙ্গালীর
এ সংসারে তুমি,
ব্রতচারী মানবের আদর্শের দেখায়েছ বিচিত্র মহিমা।

বাল্মীকির বিপঞ্চিকা বাজায়েছ নবসুরে মুগ্ধ করি' তব জন্মভূমি
দেশের আলেখ্য রচি' দিয়ে গেলে তারি মাঝে
অপূর্ব্ব গরিমা।
অমৃত-সলিলে তব গাহন করিয়া জাতি উঠিতেছে
জীবন-সোপানে,
প্রশান্তি প্রণতি তার তোমারি উদ্দেশে রাখে
যুগে যুগে নব,
তোমার কুসুম-গন্ধে লুপ্ত লোক-লোকান্তের স্মৃতি জাগে
অনন্ত পরাণে
তোমারি অর্চ্চনা করি হৃদয়-ভৃঙ্গার ভরি তীর্থবারি তব।
এসেছিলে নদীয়ার পল্লীপথে জাহ্নবীর তটভূমে কবি কৃত্তিবাস!
স্বদেশের দেবালয়ে বঙ্গভাষা-জননীর করে গেলে কীর্ত্তি-
অধিবাস।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

গান

যে-পথের কড়ি নাহিক আমার,
সেই পথে তুমি আনিলে।
শক্তিহীনেরে তুলি' হাতে ধরি'
গৃহ হ'তে তুমি টানিলে॥

নিভানো যে দীপে ছিল ধূম কালি,
মঙ্গল করে দিলে তাহা জ্বালি';
মোর দীন বেশ দিলে ঘুচাইয়া—
নবরূপ মোরে দানিলে॥

জীবনে কখনো ভাবি নি তোমারে,
না ডাকিতে তুমি এলে মোর দ্বারে!
যত-না দৈন্য, যত অশান্তি,
জীবনের যত ভয় ও ভ্রান্তি,—

সকলি ঘুচা'তে—ওগো মহারাজ!
কৃপার কৃপাণ হানিলে।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

ধর্ম্মমঙ্গল

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর

রাঢ়দেশের গ্রামে গ্রামে অশ্বত্থবটের তলে যে সিন্দূর-লিপ্ত প্রস্তরগুলি গ্রামবাসীদের পূজা লাভ করিয়া আসিতেছে তাহারাই ধর্ম্মঠাকুরের শিলাময় রূপ। এই দেবতা বেদ-পুরাণের দেবতা নহেন—ইনি গ্রাম্য দেবতা। প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসীরা এক-একটি প্রস্তরখণ্ডকে তাহাদের ভাগ্য-নিয়ন্তা দেবতায় পরিণত করিয়াছে। প্রত্যেক গ্রামের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মঠাকুর আছেন। ইনি আপন গ্রামের শুভাশুভ-বিধায়ক—গ্রামেশ্বর।

অসহায় গ্রামবাসীরা তাহাদের প্রার্থনা কোথায় নিবেদন করিবে—তাহা স্থির করিতে না পারিয়া নিজেরাই এই দেবতা খাড়া করিয়াছে। মৃতবৎসা এই দেবতার কাছে প্রার্থনা করে—"এইবার আমার সন্তান হইয়া যেন বাঁচে।" বন্ধ্যা তাহার কাছে সন্তান কামনা করে। চিররোগীরা রোগমুক্তির জন্য মানসিক করে।—যাহার চোখে ছানি পড়িয়াছে সে দৃষ্টিশক্তির জন্য প্রার্থনা করে, গ্রামে মহামারী আরম্ভ হইলে গ্রামবাসীরা রোগের উপদ্রব নিবারণের জন্য আবেদন জানায়, অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টির জন্যও তাহারা তাঁহার কৃপা দৃষ্টি চায়। এমনি বহুপ্রকারের আবেদন নিবেদন জানাইবার জন্য এই দেবতা কল্পিত হইয়াছে।

এই দেবতা সাধারণতঃ আপন গ্রামেরই পূজা পাইয়া থাকেন। তবে কোন বিশিষ্ট মঙ্গল সাধনের জন্য যদি তাঁহার প্রতিষ্ঠা বাড়ে, তবে অন্যান্য গ্রামের লোকেরাও নিজ গ্রামের দেবতা ছাড়িয়া তাঁহার কাছে মানত-মানসিক করিতে আসে। বৎসরের কোন-না-কোন সময়ে এই দেবতার উৎসবে মেলা বসে—তখন বহু গ্রাম হইতে ভক্ত জুটে। বৎসর বৎসর এই দেবতার গাজন হয়—তখনও বহু গ্রামের ভক্তেরা গাজনে যোগ দেয়।

এই দেবতার পূজারী সাধারণতঃ নিম্ন জাতির লোকেরা। ইঁহার পূজার প্রথাও বর্ণাশ্রমধর্ম্মসম্মত নয়। এগুলি Fetish মাত্র, হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম্মসম্মত কোন মূর্ত্তি নয়, শিল্পীর ছেদনী বা হৃদয়াবেগের সঙ্গে এগুলির কোন সম্বন্ধ নাই। মনে হয়—এই গ্রাম্য দেবতাগুলি ছিল অনার্য্য অথবা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের এবং ইহাদের নামও প্রথমে ধর্ম্মঠাকুর ছিল না। ভিন্নভিন্ন গ্রামের দেবতার নাম ছিল ভিন্ন ভিন্ন। মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস-লেখক শ্রীমান আশুতোষ ভট্টাচার্য্য বলেন—'রাঢ় দেশ ছাড়া অন্যত্র ধর্ম্মরাজের পূজা নাই—সেজন্য বলা যাইতে পারে—এ দেবতা মূলতঃ বৌদ্ধ দেবতা নয়। রাঢ় দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদেরই গ্রাম্য দেবতা—রাঢ় দেশে বৌদ্ধপ্রভাব সঞ্চারের পর ঐ দেবতা ধর্ম্মঠাকুরে পরিণত হইয়াছেন।'

বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের পর এই শিলাময় দেবতাগুলি সাধারণ ধর্ম্ম ঠাকুর নামে পরিচিত হইয়াছে। ধর্ম্মঠা'কুর নামে পরিচিত হওয়ার পর ইহার পূজা-পদ্ধতিতে বৌদ্ধ রীতিনীতিও প্রবেশ করিয়াছে। বুদ্ধপূর্ণিমার দিন এই দেবতার উৎসব হয়। গাজন উপলক্ষে বলিদান দেওয়ার পূর্ব্ব প্রথা থাকিয়া গেল বটে, কিন্তু বৌদ্ধ শ্রমণ-ভিক্ষুদের অনুকরণে সন্ন্যাসী ভক্তের দল দেবতাকে লইয়া উৎসব করিতে লাগিল। বৌদ্ধতন্ত্র-বিহিত আত্মনিগ্রহের দ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল—তাহা হইতে শালে ভর দেওয়া, কাণ ফোঁড়া, চড়কে ঘুরপাক খাওয়া, আগুনের মধ্য দিয়া হাঁটা, খাদ্য পানীয় বর্জ্জন ইত্যাদির দ্বারা কৃচ্ছ্রসাধন ধর্ম্মপূজার সহিত জড়িত হইল। তখন কেবল মানসিক আর প্রার্থনা নয়—নিজ দেহকে পীড়ন করিয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া ভক্তেরা দেবতার কাছে আপন কাম্য বস্তুর অগ্রিম মূল্য দান করিতে লাগিল। ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকের কল্যাণই তাহাদের কাম্য। সম্ভবতঃ রাঢ় দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সে জন্য নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই আজিও অনেকস্থানে ধর্ম্মঠাকুরের ভক্ত ও পূজারী। বৌদ্ধ-ধর্ম্মে জাতিভেদ নাই, বরং ব্রাহ্মণ্য শাসনের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ আছে। সেজন্য হাড়ী, ডোম, পূজারী হওয়াতেও কাহারও আপত্তি ছিল না। ধর্ম্মঠাকুরে পরিণত হওয়ার পর এই দেবতা নিরাকার নিরঞ্জন মহাশূন্যের প্রতীক-স্বরূপ হইলেন। তারপর বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপ সাধনের পর যখন এ দেশের সমস্ত আচার অনুষ্ঠানই হিন্দুত্বের সহিত সন্ধি স্থাপন করিল, তখন দেশের সাধারণ লোক বৌদ্ধ প্রথাপদ্ধতির কতক রক্ষা করিল, কতক বর্জ্জন করিল, হিন্দুত্বের আদর্শে কতক অংশের

শুদ্ধি সংস্কার করিয়া লইল। এই বিপ্লবে ধর্ম্মঠাকুর প্রধানতঃ শিবঠাকুরে পরিণত হইল। দেবতার ত মৃত্যু নাই—দেবতা রূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। বৌদ্ধ পূজাপদ্ধতি ও উপাসনা-সম্পর্কীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলির অধিকাংশ থাকিয়া গেল—দেবতাই বদলাইলেন। গণ্ডার, অশ্ব ইত্যাদি বলিদানের প্রথা নাই বটে, অনার্য্যদের প্রবর্ত্তিত হাঁস, পারাবত ইত্যাদি বলিদানের প্রথা—মুখোষ পরা সঙের খেলা—মড়ার মাথা লইয়া খেলা—শ্মশান নৃত্য ইত্যাদি আজিও থাকিয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের কোন কোন প্রথা—বৌদ্ধ শ্রমণ ভিক্ষুদের আত্মনিগ্রহ—ধর্ম্মক্ষেত্রে জাত্যভিমান-বর্জ্জন—বুদ্ধপূর্ণিমার উৎসব চড়ক গাজনের উৎসব ইত্যাদিও থাকিয়া গিয়াছে। আবার এদিকে ধর্ম্মঠাকুর শিবমন্দিরের মত অনেকস্থলে মন্দির লাভ করিয়াছেন—বিল্বপত্র ধুতরার অঞ্জলিও লাভ করিতেছেন—শিবপূজার মন্ত্রে "নমঃ শিবায়" বলিয়া পূজিত হইতেছেন—ব্রাহ্মণ পূজারীও লাভ করিয়াছেন, ধর্ম্মঠাকুরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হারিতী, শীতলা ইত্যাদি বৌদ্ধ দেবীগণও মা দুর্গায় পরিণত হইয়াছেন। শিব সর্ব্বত্যাগী শ্মশানচারী নিঃস্ব নিঃসম্বল দেবতা, তিনি বিশ্বের কোন সম্পদই গ্রহণ করেন না—কোন কামনা তাঁহার নাই—তিনি নিষ্কাম, তাঁহার কাছে কোন কাম্য বস্তু প্রার্থনার কথা নয়। তাঁহার প্রতি ভক্তি অহৈতুকী ভক্তি—পরাজ্ঞান ছাড়া কিছুই তাঁহার কাছে প্রার্থনীয় নাই। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে কামনা-পূরণের দেবতা চণ্ডী। যাঁহার দিব্যজ্ঞান ছাড়া অন্য কোন কাম্য নাই তিনিই শিবের ভক্ত। কিন্তু এই শিবরূপে রূপান্তরিত ধর্ম্মঠাকুরের কাছে গ্রামবাসীদের প্রার্থনার অন্ত নাই—ধনং দেহি, পুত্রং দেহি, আরোগ্যং দেহি, সৌভাগ্যং দেহি—ইত্যাদি দেহি-দেহি রব।[১] ইহার কারণ এই,—গ্রামবাসীরা চিরকাল বৌদ্ধ প্রভাবের আগে হইতে যে মানত মানসিক করিয়া আসিয়াছে—তাহাই হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে আজিও চালাইতেছে। প্রার্থনাই যদি বন্ধ হয়, তবে দেবতার প্রয়োজন কি? এ দেবতা যে দুর্ব্বলতা, অসহায়তা, নিরুপায়তা, অভাব, দৈন্য-দুঃখ-দুর্দ্দশারই সৃষ্টি। দেশবাসী তাহা ভুলে নাই।

ধর্ম্মঠাকুরের শিবে পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক। প্রথমতঃ ধর্ম্মঠাকুর ছিলেন শিলাখণ্ড—শিবলিঙ্গও শিলাখণ্ড। দ্বিতীয়তঃ—অনার্য্যদের দেবতা, হাড়ী ডোম পুরোহিতদের দ্বারা পূজিত। বর্ণাশ্রমের বহির্ভূত, নিঃস্ব নিঃসম্বলদের দেবতা সর্ব্বসংস্কার-মুক্ত মহাদেব ছাড়া আর কোন রূপ ধরিবেন? তৃতীয়তঃ—আত্মনিগ্রহরত ভিক্ষু সন্ন্যাসীদের উপাস্য, নাথযোগীদের আরাধ্য, বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ধ্যানমগ্ন দেবতা শ্মশানচারী মহাযোগী মহাসন্ন্যাসী শিবের রূপ ধরিবেন ইহাইত স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ নাথযোগীরাই ধর্ম্মঠাকুরকে শিবে পরিণত করিবার প্রবর্ত্তনা দান করেন।

কিন্তু ধর্ম্মঠাকুর একবারেই বাবা বুড়ো শিব হইয়া উঠেন নাই—অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য দেবতার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া শেষে শিবত্ব পাইয়াছেন। অনেকস্থলে ইনি বিষ্ণুরূপ লাভ করিয়াছিলেন—কোন কোন ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যে তাহার পরিচয় আছে। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে তিনি বিষ্ণুরূপে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ধরিয়া ভক্তকে দেখা দিতেছেন। রাঢ়দেশে এই বিষ্ণুরূপী ধর্ম্মরাজ এখন আর দেখা যায় না। উড়িষ্যায় ধর্ম্মঠাকুর প্রায় সর্ব্বত্র বিষ্ণুরূপ ধরিয়াছেন। রাঢ়বঙ্গে ধর্ম্মঠাকুরের বিষ্ণুত্ব মঙ্গলকাব্যে থাকিলেও গ্রামেশ্বর ধর্ম্মরাজগুলিতে সঞ্চারিত হইতে পারে নাই। তাহার একটি কারণ, বলিদান। বলিদানের সহিত বিষ্ণুত্বের সামঞ্জস্য হয় নাই। তাই রাঢ়পল্লীর লোকেরা অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত বলিদান প্রথা ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মরাজের বিষ্ণুত্ব স্বীকার করিতে পারে নাই।

কোথাও কোথাও ধর্ম্মঠাকুর ধর্ম্মরাজ যমের সহিত একাত্মক হইয়াছেন। কেবল শিব, বিষ্ণু ও যম কেন অন্যান্য বহু দেবতার সহিত ধর্ম্মঠাকুর এক সময় একাত্মক হইয়াছিলেন। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস লেখক শ্রীমান আশুতোষ ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন—"তখন (হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সময়) লৌকিক ধর্ম্মঠাকুরের সামাজিক অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, একটী কিছু আবরণ পাইলেই তিনি আত্মগোপন করিয়া ফেলেন। অবশ্য পরবর্ত্তী কালে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ব্যাপক প্রভাবের ফলে তাঁহাকে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন কল্পনা করা খুবই স্বাভাবিক হইয়াছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে সম্ভবতঃ পৌরাণিক ধর্ম্মরাজ বা যমরাজ বলিয়াও একটা ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা হইয়াছিল। হিন্দু প্রভাবের পর হইতে হিন্দু দেবদেবীর পূজা-বিধানের অনুকরণে নব্য রঘুনন্দন কর্ত্তৃক ধর্ম্মপূজারও বিধান রচিত হইল। এই পূজাবিধানে ধর্ম্মঠাকুরের মৌলিক বৈশিষ্ট্য

---

১ যে দেশে বহু দেব দেবীর পূজা লইয়া নানা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, সে দেশের জনসাধারণ এমন একটি দেবতা চাহিয়াছিল যাহার পূজা করিলে সব দেবদেবীর পূজা করা হয়, সকল দেব দেবীর যে দেবতায় সমন্বয় হইয়াছে। সেই দেবতা এই ধর্ম্মঠাকুর। ইনিই সর্ব্ব দেব দেবীর আদি দেব, অনাদ্যন্ত, নিরঞ্জন।

বৌদ্ধপুরাণ মতে চণ্ডী ইঁহারই কন্যা, মনসা ইঁহার নাতনী, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইঁহারই দৌহিত্র। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গণ্ডীর বাহিরে যত লোক সকলেই তাই এই দেবতার পূজা করিয়া সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মদ্বন্দ্ব হইতে নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিল।

শ্যামপণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গলে আছে—

ধর্ম্মপূজা কৈলে শমনের নাহি ভয়। একান্ত হইয়া যদি পূজে পদদ্বয়।
অধনীর ধন হয় বন্ধ্যা পুত্রবান্। অন্ধজনা যদি পূজে পায় চক্ষুদান।
কুঁজা খোঁড়া কুষ্ঠব্যাধি ধর্ম্ম সেবা করে। কন্দর্প সমান হয় নিরঞ্জনের বরে।
অহঙ্কারে ধর্ম্মঘট লঙ্ঘে যেইজন। অষ্টাঙ্গে ধবল হয় বংশের নিধন।
যাগমতী করিয়া যেবা ধর্ম্ম সেবা করে। পুনরপিগতায়াত না করে সংসারে।
যত দেখি মদমত্ত সমুদ্রকে যায়। নিরঞ্জন পূজা কৈলে সর্ব্ব দেবে পায়।

হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার হিন্দু পরিণতি পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্তরগুলির স্পষ্ট সন্ধান করিতে পারা যায়। ইহাতে ধর্ম্ম-ঠাকুরের আবরণ দেবতারূপে মহাযান বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের প্রায় সকল প্রধান প্রধান দেবতাদিগকেই স্থান দেওয়া হইয়াছে, ধর্ম্মঠাকুরের পূজা সম্পর্কে তাহাদেরও পূজা করিতে হয়। ইহার মধ্যে মগর পণ্ডিত, কালু ঘোষ, ভট্ট ধরাধর, ভাস্কর নৃপতি, মন্তির ঘোষ, সাধু পুরন্দত্ত, তাম্বলী আশোয়া চণ্ডাল, আদিনাথ, মীননাথ, চৌরঙ্গীনাথ, গোরক্ষনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্ঠী, বিষহরি, বাসুলী, বিশালাক্ষী, চামুণ্ডা, গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মী প্রভৃতিরও পূজার নির্দ্দেশ হইয়াছে।" ২

রাঢ়দেশে ধর্ম্মরাজ এখন শিবে পরিণত হইয়াছেন—কিন্তু যে কালে ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থগুলি রচিত হয়,সে কালে তিনি পূর্ণরূপে হিন্দু দেবতায় পরিণত হন নাই। ধর্ম্মমঙ্গলের কবিগণ তাই বলিয়াছেন—"যদি ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গ্রন্থ লিখি—তাহা হইলে জাতি যাইবে, লোকে উপহাস করিবে। দেশময় অখ্যাতি হইবে।" নিম্ন জাতিদের দেবতা বলিয়াই হউক, আর বৌদ্ধ দেবতা বলিয়াই হউক, কবিরা তাঁহার মঙ্গল গান করা দুঃসাহসের কার্য্য মনে করিতেন। কবিরা যে ধর্ম্ম-ঠাকুরের ভয়ে কিংবা তাঁহার প্রসাদের প্রলোভনে গীত রচনা করিয়াছেন—দেব-নির্দ্দেশ-বর্ণনায় ও স্বপ্ন-বিবরণে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। সে সকল দুঃসাহসী কবি তাঁহার মঙ্গল গান রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে বিষ্ণুর সহিত একাত্মক করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতে চাহিয়াছেন ধর্ম্মঠাকুর ত বিষ্ণু ঠাকুরেরই একটি অভিনবরূপ। বৌদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্বে আছে—নিরঞ্জন ধর্ম্ম প্রভুর দৌহিত্র ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব। কাজেই কেহ কেহ তাঁহাকে অনাদি-নিধন শিবেরও জন্মদাতা বলিয়া অভিনব পৌরাণিক প্রতিষ্ঠা . দান করিয়াছেন।

এইখানে ধর্ম্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলিয়া লই—আদিতে রূপ, বর্ণ, রবি, শশী, স্থল, জল ইত্যাদি কিছুই ছিল না—ছিল শুধু মহাশূন্য। এই মহাশূন্যে প্রভু নিরঞ্জন একাকী ভাসিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার মনে জাগিল সিসৃক্ষা বা সৃজন-বাসনা। তাহা হইতে প্রথমে জন্মিল পবন—পবন হইতে অনিল দুইজন—তাহা হইতে বুদ্বুদ জন্মিল। এই বুদ্বুদের উপর প্রভু সমাসীন হইলেন। কিন্তু বুদ্বুদ ভার সহিতে না পারিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। তখন প্রভু নিজেই হস্তপদহীন এক মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ইহাই ধর্ম্মকায়। তিনি চতুর্দ্দশ যুগ ধরিয়া ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। ইহাই তাঁহার তপস্যা। এই তপস্যার ফলে প্রভুর হাই হইতে এক উলূকের জন্ম হইল। এই উলূকের পৃষ্ঠে চড়িয়া প্রভু আবার তপস্যায় মগ্ন হইলেন। তৎপরে প্রভুর মুখামৃত হইতে জলের জন্ম হইল। এই জলে উলূক সন্তরণ করিয়া প্রভুকে বহন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু ভার অসহ্য হওয়ায় তাহার পাখা খসিয়া গেল। সেই পাখা হইতে জন্মিল পরমহংস। প্রভু হংসের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন—হংসও ভার বহন করিতে পারিল না। তখন প্রভু কচ্ছপকে সৃষ্টি করিলেন। প্রভু কচ্ছপের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। কচ্ছপও ভার সহ্য করিতে পারিল না—সেও পলাইল। তখন প্রভু জলে ভাসিতে লাগিলেন। তার পর প্রভু নিজের স্বর্ণোপবীত ছিঁড়িয়া জলে ফেলিয়া দিলেন। তাহা হইতে বাসুকির জন্ম হইল। তিনি কর্ণের কুণ্ডল ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তাহা হইতে ভেকের জন্ম হইল। বাসুকি এই ভেক ভক্ষণ করিয়া বাঁচিয়া রহিলেন। প্রভু নিজের অঙ্গের এক বিন্দু মলা বাসুকির ফণার উপর রাখিলেন, তাহাই হইল পৃথিবী। প্রভু পৃথিবীর সীমার সন্ধানে বাহির হইলেন। সীমা খুঁজিয়া না পাইয়া পরিশ্রান্ত হইলে তাঁহার ঘর্ম্ম হইতে আদ্যা শক্তির জন্ম হইল।

ইহার পর প্রভু বল্লুকা নদী সৃষ্টি করিয়া তাহার তীরে যোগমগ্ন হইলেন। এই ভাবে চৌদ্দ বৎসর কাটিয়া গেল। এদিকে আদ্যা যৌবনপ্রাপ্তা হইলেন। আদ্যার মন হইতে মনসিজের জন্ম হইল। এই মনসিজ বা কামদেবকে আদ্যা ধর্ম্ম প্রভুর সন্ধানে পাঠাইলেন। কামদেব তাঁহার তপস্যাভঙ্গ করিলেন। তপোভঙ্গের পর প্রভু গৃহে ফিরিলেন। গৃহে ফিরিয়া আদ্যাকে বিবাহযোগ্যা দেখিয়া তাহার বরের সন্ধানে বহির্গত হইলেন। আদ্যার জন্য রাখিয়া গেলেন এক পাত্রে মধু, এক পাত্রে বিষ।

আদ্যা মনের দুঃখে বিষপান করিলেন। তাঁহার ফলে তিনি গর্ভবতী হইলেন। কিছুকাল পরে তাঁহার গর্ভে তিন পুত্রের জন্ম হইল ইহারাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। ইঁহারা জন্মের পরই তপস্যা করিতে গেলেন সমুদ্রতীরে। ধর্ম্মপ্রভু ইঁহাদের তপঃশক্তির পরীক্ষার জন্য গলিত শবরূপে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু নিরঞ্জনের মায়া উপলব্ধি না করিয়া ঘৃণায় সরিয়া গেলেন। মহাজ্ঞানী মহেশ্বর এই শব স্কন্ধে করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে শিব দিব্যচক্ষু লাভ করিলেন, তাঁহার মুখামৃতে তাঁহার দুই ভাইয়েরও দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইল। ইহার পর ব্রহ্মা সৃষ্টির, বিষ্ণু পালনের এবং রুদ্রদেব সংহারের ভার পাইলেন। এদিকে শিব নিরঞ্জনের আদেশে আদ্যা-শক্তিকে বিবাহ করিলেন। এই বিবাহের ফলে নরলোকের সৃষ্টি হইল।

এই সৃষ্টি তত্ত্বের আলোচনা করিলে মনে হয়, নানা মত ও কাহিনীর সমবায়ে এই অদ্ভুত সৃষ্টি কাহিনীর উৎপত্তি

(২) এই প্রবন্ধ রচনায় অনেকস্থলে বাংলার মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস হইতে এইরূপ সহায়তা পাইয়াছি।

হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, ধর্ম্মদেবতাও নানা মতের সমবায়ে উৎপন্ন। এই সৃষ্টিকাহিনী ধর্ম্মমঙ্গল ছাড়া অন্যান্য মঙ্গলকাব্যেও অংশতঃ প্রবেশ করিয়াছে।৩ ইহার মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে আজগুবি। এই আজগুবি অংশ সম্ভবতঃ হিন্দু-বৌদ্ধপ্রভাবমুক্ত অনার্য্য লোকধর্ম্ম হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। মহাশূন্যই যে জগতের আদি নিদান ইহাই বৌদ্ধ মত। মহাশূন্য নিরঞ্জন যে নিষ্ক্রিয় কায় গ্রহণ করিলেন তাহাই ধর্ম্মকায়। মহাযানীদের ধর্ম্মকায়ের পরিকল্পনা এইভাবে ধর্ম্মমঙ্গলে গৃহীত হইয়াছে। মহাযানমতে ধর্ম্মকায় সকল প্রকার বাসনাবর্জ্জিত, পবিত্র, সার্ব্বভৌম, বিশ্বাত্মক, বিরুদ্ধশক্তি হইতে মুক্ত মৌলিক শক্তি। ধর্ম্মকায়ই বেদান্তের ব্রহ্ম (absolute ultimate reality)। ইহার সম্ভোগকায়ই উপনিষদের হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর এবং তাঁহার নির্ম্মাণ কায়ই বুদ্ধ এবং অন্যান্য অবতার।

বৌদ্ধগণ হিন্দুদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরকে এই নিরঞ্জন ধর্ম্মেরই বিভিন্নরূপ বলিয়া মনে করিত। ইঁহারা ধর্ম্মবুদ্ধের অধীন। সৃষ্টিতত্ত্বের এই অংশ বৌদ্ধধর্ম্মসম্মত।

ইহার অনেকাংশই আর্য্যহিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্ব ও পুরাণের অনুযায়ী।

অসীম ব্রহ্ম আত্মবিকাশ ও আত্মোপলব্ধির জন্য নিজকে সীমায় ও ভূমায় প্রকট করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার মায়া, আমাদের কাছে তাহাই অবিদ্যা। এই সৃষ্টি ঊর্ণনাভের জাল বিস্তারের ন্যায়। বিশ্ব যে মায়ারই সৃষ্টি—হিন্দুর দর্শন ও বৌদ্ধদর্শনে এ বিষয়ে মতভেদ নাই। এই মায়াকে হিন্দু-পুরাণে আদ্যাশক্তি মহামায়া বলা হইয়াছে। ইনিই এই সৃষ্টি-তত্ত্বের আদ্যা। এই মায়া বা আদ্যাকে বাদ দিলে ব্রহ্মে ও শূন্যে বিশেষ প্রভেদ থাকে না। সাংখ্যদর্শন ব্রহ্মের সহিত শূন্যের একাত্মকতাকে পরিহারের জন্য ব্রহ্মের দ্বৈতভাব কল্পনা করিয়াছে, এবং পুরুষ ও প্রকৃতি এই দ্বৈতরূপ ধরিয়া লইয়াই সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলিয়াছে।

বৈষ্ণব মতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ—কিন্তু তিনি আনন্দকে উপলব্ধি করিবার জন্য নিজের হ্লাদিনী শক্তিকে প্রকৃতিতে রূপায়িত করিয়াছেন। এই হ্লাদিনী শক্তিই আদ্যাশক্তি। এই শক্তির বিকাশই এই সৃষ্টি। ব্রহ্মের আনন্দোপলব্ধির পরাকাষ্ঠা মানব দেহ-ধারণ এবং হ্লাদিনী শক্তিকে মানবীরূপে লাভের দ্বারা পরিকল্পিত হইয়াছে।

নিরঞ্জন প্রভুরও আনন্দ উপলব্ধির জন্য আত্মবিস্তার ও আত্মবিকাশের কথা এই সৃষ্টি-তত্ত্বের মধ্যে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে।

বিষ্ণুর প্রলয়পয়োধিজলে প্লবমান অবস্থা, অনন্তনাগের ফণাচ্ছায়ায় বিশ্রাম, কামদেবের দ্বারা শিবের তপস্যা ভঙ্গ, শিবের দ্বন্দ্বাতীত মহাজ্ঞান, সর্ব্বসংস্কারমুক্তি, সদানন্দময়তা হিন্দুপুরাণের এসমস্ত কথা এই সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

সকল সৃষ্টির মূলে দুঃখ ও আত্মনিগ্রহ অর্থাৎ তপস্যা। এই বিশ্বও স্রষ্টার তপস্যারই সৃষ্টি। সৃষ্টির আনন্দ বিনা তপস্যায় লাভ করা যায় না। উপনিষদের এই কথারও ইঙ্গিত ইহাতে আছে। নিরঞ্জন প্রভু বহু তপস্যার ফলে এই সৃষ্টিকে লাভ করিয়াছেন।

এই সৃষ্টিতত্ত্বের আজগুবি কাহিনীর মধ্যে ক্রমোদ্বর্ত্তন (Evolution) তত্ত্বেরও ইঙ্গিত আছে। ব্যোম, অনিল, জল, পৃথিবী—এই ক্রমধারা এবং নানা জীবজন্তু হইতে ক্রম-পর্য্যায়ে মানবত্বের অভিব্যক্তি—ইহা বিবর্ত্তনবাদের অনুগত।

এই সৃষ্টিতত্ত্ব যেমন নানা ধর্ম্মমতের মিশ্ররূপ—ধর্ম্মঠাকুরও তাহাই।

হিন্দুকবিগণ বহুদিন পর্য্যন্ত ধর্ম্মঠাকুরের কথা লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। ময়ূরভট্টের৪ ধর্ম্মমঙ্গলেই সর্ব্বপ্রথম লাউসেন রঞ্জাবতী কাহিনীর প্রবর্ত্তন। ময়ূরভট্টকেই ধর্ম্মমঙ্গলের আদিকবি বলা হয়। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন কিনা জানা যায় না। ধর্ম্মঠাকুরের কৃপাতেই লাউসেনের যত বিক্রম—যত অলৌকিক শক্তি। অতএব লাউসেনের কাহিনীই ধর্ম্মঠাকুরেরই মহিমার গান। ময়ূরভট্টের ধর্ম্মমঙ্গলে ধর্ম্ম হিন্দুর

(৩) এই সৃষ্টিতত্ত্ব ধর্ম্মমঙ্গল ছাড়া অন্যান্য মঙ্গলকাব্যেও গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গলে—

জল হৈতে হৈল আদ্য পুরুষের জনম। তার পুত্র হৈল প্রভু অনাদ্য ধরম।
শূন্যেতে আসন প্রভুর শূন্যেতে বৈসন। শূন্যে ভর কর্যা প্রভু ভ্রমে নিরঞ্জন।
শূন্যেতে থাকিঞা প্রভু পাতিঞাছে মায়া। আপনে সৃজিল প্রভু আপনার কায়া।
চাপড় হানিঞা জিনে জলের বিম্বুক। তায় ভরা কৈল দেখ অনাদ্য সিন্দুক।
বিন্দু হৈলা বিম্বুক সহিতে নারে ভর। ভাঙিল পানির বিম্বু উথলিল জল।
চক্ষের ময়লা প্রভু নিছিঞা ফেলিল। তাহাতে আসিঞা পক্ষ উলুক জন্মিল।

... ...

কাঁধের ছিঁড়িয়া ফেলে কনক পইতা।
এককোটি নাগের হৈল সহস্রগোটা মাথা।

নাগের নাম বাসুকি থুইল নিরঞ্জন। তায় সমর্পিল প্রভু এ তিন ভুবন।
অঙ্গের ময়লা পাইয়া তিলেক প্রমাণ। বাসুকির চক্রে পৃথিবী হৈল নবখান।
তারপর প্রভু হাক্রি তুলিলেন—তাহা হইতে চণ্ডিকার জন্ম হইল। সেই চণ্ডিকার গর্ভে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর জন্মিলেন—ইত্যাদি ইত্যাদি।

৪ ময়ূর ভট্টের গ্রন্থ অবলম্বনে পঞ্চদশ শতাব্দীতে হিন্দু গোবিন্দরাম ধর্ম্ম মঙ্গল রচনা করেন। তারপর ক্রমে রূপরাম, মাণিক গাঙ্গুলী, সীতারাম, রামচন্দ্র, রামনারায়ণ, ঘনরাম, নরসিংহ, সহদেব ইত্যাদি হিন্দু কবিগণ ধর্ম্মমঙ্গলের পালা লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকলের মধ্যে ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলই বিখ্যাত।

পুরাণের হরিশ্চন্দ্র রোহিতাশ্বের কাহিনী, বৈদিক শুনঃশেফ-বিশ্বামিত্রের কাহিনী, দাতাকর্ণের কাহিনী এইরূপ বহু কাহিনীর মিশ্ররূপ আছে ইহাতে। লাউসেনের কাহিনীর আবির্ভাবে বাঙ্গালী আপন শৌর্য্যের আদর্শ পাইয়া পৌরাণিক আত্মোৎসর্গের কাহিনীকে একপ্রকার ভুলিয়াই গেল।

সহিত একাত্মক। ময়ূরভট্টের আগে রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানই ধর্ম্মমঙ্গলের প্রধান উপজীব্য ছিল। ধর্ম্মঠাকুর ছদ্মবেশে আসিয়া হরিশ্চন্দ্রের পুত্রের মাংস খাইতে চাহিলেন। হরিশ্চন্দ্রের ভক্তির পরীক্ষা হইল। রাজা কর্ণের মত পুত্রের মাংস রাঁধিয়া ধর্ম্মঠাকুরকে খাইতে দিলেন। ধর্ম্ম-ঠাকুর পুত্র 'লুয়ে'কে শেষে বাঁচাইয়া দিলেন। ইহা সম্পূর্ণ পৌরাণিক উপাখ্যানের মত। এই পুত্রবলিদান ত্যাগ ধর্ম্মের চরম দৃষ্টান্ত।

অর্ব্বাচীন বৌদ্ধমতে আত্মনিগ্রহই প্রধান ধর্ম্ম। এই আত্মনিগ্রহই ধর্ম্মদেবতার প্রধান উপাসনায় দাঁড়াইয়াছিল। এই আত্মনিগ্রহের কাহিনীতে ধর্ম্মমঙ্গল পরিপূর্ণ। আত্মদেহ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের উদ্দেশে নিবেদন—চরম আত্মনিগ্রহ। ধর্ম্মমঙ্গলে আছে,—রঞ্জাবতী নিজের শিরশ্ছেদন করিয়া ধর্ম্মঠাকুরকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে নিজের জীবনও ফিরিয়া পাইলেনই—উপরন্তু লাউসেনের ন্যায় সর্ব্বগুণময় মহাপরাক্রান্ত পুত্রও লাভ করিলেন। আমাদের দেশে চড়ক গাজনে সন্ন্যাসী সাজিয়া ভক্তেরা দারুণ কৃচ্ছ্রসাধন করে—ইহাই ধর্ম্মঠাকুরের উপাসনা। এই গাজনের কয়দিন এদেশে ধর্ম্মমঙ্গলের গান হইত।

ধর্ম্মঠাকুরের ভক্তগণ লৌহশলাকার শালের উপর শয়ন করিয়া কৃচ্ছ্র সাধন করিত। ইঁহাদের বিশ্বাস ছিল ইহাতে অলৌকিক শক্তি লাভ করা যায়। লাউসেন এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধনা করিয়া পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠাইয়াছিলেন।

লাউসেনের কাহিনীর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ডাঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন—"লাউসেন বলিয়া কোনকালে কেহ ছিলেন বলিয়া মনে করিবার কোন হেতু নাই। ধর্ম্মমঙ্গল কাহিনীকে ইংরাজিতে Adventures and exploits of Lousen বলা যাইতে পারে। লাউসেনের কাহিনীগুলি প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের বাংলার উপকথা মাত্র। ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য খুঁজিতে গেলে ঠকিব"। *

ধর্ম্মমঙ্গলের প্রধান কবি ঘনরাম ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের আদেশে তিনি কাব্য রচনা করেন। গ্রন্থখানি ২৪টি পালায় বিভক্ত—চব্বিশ হাজার পংক্তিতে সমাপ্ত।

এই কাব্যখানি বিরাট। অনেক আজগুবি ঘটনার সমাবেশ থাকিলেও ইহা একখানি উপন্যাসের মত। ইহার মধ্যে নানারসের সমাবেশ আছে—বীররসেরই প্রাবল্য। বাঙ্গালী নারী ঘোটকে চড়িয়া যুদ্ধে যাইতেছে—ইহা বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের পক্ষে অদ্ভুত ও অসাধারণ দৃশ্য। বাঙ্গালী বীরাঙ্গনা নিজের আরাধ্য বীরের নিকট প্রেম নিবেদন করিতেছে—পাণিপ্রার্থী রাজার দূতকে কুমারী নিজে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া দূর করিয়া দিতেছে। নারীর স্বাধীনতার দিক হইতে ইহাও অপূর্ব্ব কল্পনা।

ধর্ম্মমঙ্গলে বৌদ্ধদের সহিত শাক্তদের দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত আছে। একদিকে ধর্ম্ম—অন্যদিকে চণ্ডী। শেষ জয় ধর্ম্মেরই। দ্বন্দ্বের সন্ধিরও ইঙ্গিত আছে। চণ্ডীর ঘট-কালিতে ধর্ম্মঠাকুরের আশ্রিত লাউসেনের সঙ্গে চণ্ডীর অনুগৃহীতা কাণড়ার বিবাহই দ্বন্দ্বের সন্ধি। কাণড়া লাউসেনকে শরে বিদ্ধ করিতে উদ্যত। চণ্ডী আসিয়া রক্ষা করিতেছেন। চণ্ডীর মারফতে হিন্দুদের উদারতাই ইহাতে সূচিত হইয়াছে।

এই কাব্যে বাঙ্গালী বীরদের যুদ্ধের বর্ণনা আছে—ইহা রাজকোটালের সঙ্গে দক্ষিণ মশানের মা কালীর যুদ্ধ নয়।

* ধর্ম্মমঙ্গলের কাহিনীটি ঘনরাম পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের গ্রন্থ হইতে পাইয়াছেন, কিন্তু কাহিনীর গৌরব তিনি বাড়াইয়াছেন। এই কাহিনীর মূলে হয় ত সামান্য একটু ঐতিহাসিক সত্য আছে। কাহিনীটি এই—গৌড়েশ্বর (সম্ভবতঃ ধর্ম্মপাল) যখন বঙ্গভূমি শাসন করিতেছিলেন, তখন অজয়তীরবর্ত্তী ঢেকুরের রাজা ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হইয়া গৌড়েশ্বরের রাজস্ব বন্ধ করিয়া দিলেন। গৌড় হইতে সৈন্য লইয়া রাজা যুদ্ধে আসিলেন, কিন্তু ইছাই ঘোষের কাছে পরাজিত হইলেন। গৌড়পতির লজ্জার অবধি থাকিল না। ইছাই ঘোষ চণ্ডীর সেবক। ময়নাগড়ের সামন্ত রাজা কর্ণসেন ইছাই এর সঙ্গে যুদ্ধে ছয় পুত্র হারাইলেন—পত্নীও শোকে আত্মহত্যা করিল। কর্ণসেন সন্ন্যাসী হইতে চাহেন।

গৌড়পতি তাঁহার অপূর্ব্বসুন্দরী শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সহিত কর্ণসেনের বিবাহ দিয়া তাহাকে আবার সংসারে বন্দী করিলেন। এই রঞ্জাবতী শালে ভর দিয়া ধর্ম্মকে প্রসন্ন করেন। ধর্ম্ম লাউসেনরূপে তাঁহার জঠরে জন্মগ্রহণ করেন। গৌড়পতি বহুবার চেষ্টা করিয়াও চণ্ডীর অনুগৃহীত ইছাইকে বধ করিতে পারিলেন না। লাউসেন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে গৌড়েশ্বর তাঁহাকে ইছাই দমনের ভার দিলেন। এদিকে মহামদ গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী, লাউসেনের মাতুল, কিন্তু লাউসেনকে দুচোখে দেখিতে পারিতেন না। লাউসেন রাজার প্রীতিপাত্র, কবে যে সে তাঁহার মন্ত্রিপদ কাড়িয়া লয়, এই ভয়ে লাউসেনের বিপক্ষতা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই ধর্ম্মরক্ষিত লাউসেনের কোন ক্ষতি করিতে পারিল না। লাউসেন অজেয়, সে ব্যাঘ্র, হস্তী, সিংহ ইত্যাদির সহিত লড়াই করিয়া জয়ী হইয়াছে। লাউসেন ইন্দ্রিয়জয়ী, কঠোর তপস্বী, এবং অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। সে মৃতসৈন্যগণকে পুনর্জ্জীবিত করে, পূর্ব্বের সূর্য্যকে পশ্চিমে উঠায়। সে অবলীলাক্রমে ইছাই ঘোষকে বধ করিয়া আসিল। চণ্ডী তাহাকে বাঁচাইতে পারিলেন না। রণক্ষেত্রে চণ্ডী আসিয়া ইছাই-এর কাটামুণ্ড কোলে করিয়া 'কোথা গেলি রে বাপ' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। লাউসেনের এই জয়জয়কারই ধর্ম্মের জয়জয়কার। এদিকে চণ্ডীর মহিমাও অল্প নয়। গৌড়েশ্বর হরিপালের রাজকন্যা কাণড়াকে বিবাহ করিতে চাহিলেন, রাজার নিকট দূতও পাঠাইলেন। চণ্ডীর উপাসিকা কাণড়া বৃদ্ধ রাজাকে বিবাহ করিতে চাহিল না। তাহার উপদেশে হরিপাল-রাজ গৌড়ের দূতকে তাড়াইয়া দিল। ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। হরিপালের শক্তি যৎসামান্য—গৌড়রাজের নয় লক্ষ সৈন্যের আক্রমণে হরিপালের সৈন্য পলাইতে লাগিল। কাণড়া নিজে ধনুর্ব্বাণ হস্তে ঘোড়ায় চড়িয়া রণক্ষেত্রে আসিল। চণ্ডীদেবী নিজের উপাসিকাকে রক্ষা করিবার জন্য ধূমসী ডাকিনীকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন—গৌড়পতির পরাজয় হইল। কাণড়া সেনাপতি লাউসেনকে পতিত্বে বরণ করিলেন। লাউসেন মেসোর নিজের জন্য মনোনীত পাত্রীকে বিবাহ করিতে চাহিলেন না। চণ্ডী আসিয়া বিবাহ দিলেন। এখানে চণ্ডীরই জয়।

ইহা বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালীর যুদ্ধ। এই কাব্যে ঘটনার পর ঘটনার প্রতিঘাতে নায়ক-নায়িকার চরিত্র কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। পুরুষ ও নারী উভয়ের পক্ষ হইতে প্রলোভন জয় করিয়া চরিত্রের বিশুদ্ধি রক্ষার একাধিক দৃষ্টান্ত এই কাব্যে আছে। অনেক দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়—এই কাব্যখানি চারিদিকের কাব্যজনতার মধ্যে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য ও গৌরব রক্ষা করিয়াছে।

ঘনরামের কাব্যে ঘটনা-ঘনতা এত বেশী যে, কোন কোন বিষয় লইয়া ইনাইয়া বিনাইয়া কাব্যবিলাস করিবার অবসর তাঁহার ছিল না—এমন কি নিদারুণ শোকের ক্ষেত্রেও কবি দুই একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া দুই-একটি বিলাপের কথা বলিয়াই সাহিত্যের দায়িত্বভার বহন করিয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়াছেন। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত দীর্ঘ বিলাপ কোথাও নাই। এ যেন রাজপুতদের বা স্কটল্যাণ্ডের মধ্যযুগের বীরগণের সামরিক জীবন-যাত্রার সম্বরতা। নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্র কাব্যে অভিমন্যু শোকে অবসন্ন অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—'—বীরশোক অশ্রু নয়—অসির ঝঙ্কার।' —ঠিক এই বাণীরই প্রতিধ্বনি এই কাব্যের সকল শোক-ক্ষেত্রেই শুনিতে পাওয়া যায়।

দুর্ম্মুখা দাসী কলিঙ্গার শোকে আত্মবিস্মৃতা বীরাঙ্গনা কাণড়াকে বলিতেছে—

শোকের সময় নয় শত্রু আসে পুরে।
সংহার সংগ্রামে শক্তি-শোক ত্যজ দূরে।

ভ্রাতৃশোকে ব্যথিত লখাইকে জননী শুকা বলিতেছে—

শোক তেজে সমরে ভাইয়ের ধার শোধ। ৬

মহাভারতের মহাপ্রস্থান-যাত্রী ভ্রাতৃগণের চরিত্র-দৃঢ়তা, এ সকল স্থলে দেখা যায়।

অন্যান্য ধর্ম্মমঙ্গলের তুলনায় ৭ ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল ধর্ম্মের মহিমা প্রচার অপেক্ষা কাব্য-সৌন্দর্য্য সৃষ্টির দিকে অধিকতর দৃষ্টিপাত করিয়াছে। তিনি গ্রন্থ রচনায় কোন দেবাদেশেরও উল্লেখ করেন নাই।

৬ "যে যুদ্ধে পুত্র নিহত হইয়াছে সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই আত্মাহুতি প্রদান করিয়া জননী পুত্র শোক ভুলিতেছে। ভ্রাতা মৃত ভ্রাতার পরিত্যক্ত যুদ্ধাস্ত্র গ্রহণ সেই যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পাড়য়া ভ্রাতৃশোক ভুলিতেছে। অতএব এই কর্ম্মচঞ্চলতার মধ্যে ধর্ম্মমঙ্গলের কবিরা কোন চরিত্রের জন্যই আর অলস বিলাপের দীর্ঘ অবকাশ রচনা করেন নাই। কিন্তু কোন চরিত্রকেই যে তাঁহারা হৃদয়হীন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন তাহাও নহে।"—বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস।

৭ ঘনরামের পর হুগলী জেলার রাধানগর গ্রাম নিবাসী সহদেব চক্রবর্ত্তী অষ্টাদশ শতাব্দীতে কালুরায় নামক দেবতার স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। বহুদিন পরে ইনি বৌদ্ধ প্রভাবকে সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইঁহার কাব্য ধর্ম্মমঙ্গলের প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত নয়।

ঘনরামের কাব্যে ছন্দোবৈচিত্র্য আছে। স্থলে স্থলে সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ আছে। ঘনরামের ভাষা অনুপ্রাসাঢ্য।

এই কাব্যের ভাষা সর্ব্বত্রই ললিত মধুর নয়, স্থলে স্থলে বীররসের উদ্দীপনায় বেশ পৌরুষ-ব্যঞ্জক। বাংলা কবিতার ভাষায় যে ওজস্বিতার সৃষ্টি করিতে পারা যায়, কবি ঘনরাম তাহা দেখাইয়াছেন। এই সকল গুণ থাকা সত্ত্বেও কাব্যখানি দুষ্পাঠ্য। প্রয়োজনাতিরিক্ত বাগ্‌বিস্তারে ও একটানা সুরে রচিত ক্লান্তিকর পয়ারের মাঝে মাঝে ত্রিপদী ছন্দের অবতারণা আছে বটে, কিন্তু তাহাতেও বিশেষ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় নাই। ঘনরামের কবি-প্রতিভার শক্তি থাকিলে ইহাকে একখানি মহাকাব্যে পরিণত করিতে পারিতেন। লাউসেনের

সহদেবের ধর্ম্মপুরাণ বা ধর্ম্মমঙ্গলে লাউসেনের কাহিনী নাই। ইঁহার কাব্য সাহিত্যাংশে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল। সাহিত্য সৃষ্টি ইঁহার উদ্দেশ্য ছিল না ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্ণনাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য।

ইহাতে ধর্ম্মের শুভঙ্কর মাহাত্ম্য অপেক্ষা অশুভঙ্করী মহাশক্তির কথাই বেশী। সহদেব ভয় দেখাইয়া লোককে ধর্ম্ম পূজায় প্রবর্ত্তিত করিতে চাহিয়াছেন। ইঁহার কাব্যে জয়বানগরের অধিপতি ভূমিচন্দ্র, শ্রীধর, জাজপুরের ব্রাহ্মণগণ, ও হরিশ্চন্দ্র রাজা ধর্ম্মনিন্দার ফলে ধনপতি চাঁদ সদাগরের মত অশেষ নিগ্রহ ভোগ করিতেছেন। ধর্ম্মের নিষ্ঠুর মূর্ত্তি ইঁহার কাব্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। নিরঞ্জনের রুষ্মা ধর্ম্মের প্রতিহিংসিকা প্রবৃত্তি দেখাইবার জন্যই রচিত।

হিন্দু দেবদেবীর উপাখ্যানের সহিত কানুপা, হাড়িপা, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ ইত্যাদি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদের কাহিনী তাহাদের অলৌকিক শক্তির বিবরণ ইত্যাদি তাহার কাব্যে আছে। হিন্দু দেবদেবীর সহিত ধর্ম্মঠাকুরের মিলাইবার প্রয়াস আছে। গোরক্ষবিজয় কাব্যের মত ইহাতে নারীর মোহিনী শক্তির নিন্দা করা হইয়াছে এবং আত্মসংযমের গুণ কীর্ত্তন করা হইয়াছে। নারীর মোহিনী মায়ায় আবদ্ধ হইয়া বহু মহাপুরুষের পদস্খলন হয়, সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে হইলে কি করিয়া মায়াজাল এড়াইয়া চলিতে হইবে তাহার যথেষ্ট উপদেশ আছে। কোন কোন উপদেশ গোরক্ষ বিজয়ের মত প্রহেলিকার ভঙ্গীতে রচিত। এই প্রহেলিকাগুলিতে ব্রত-ভঙ্গজনিত একটা বেদনার সুর আমাদের চিত্তকে উদাস করিয়া দেয়।

গুরুদেব, নিবেদি তোমার রাঙা পায়।
পুতকীর দুধে সিন্ধু উথলিল, পর্ব্বত ভাসিয়া যায়।
শুষ্ক কাষ্ঠ ছিল পল্লব মুঞ্জরিল পাষাণ বিন্ধিল ঘুণে।
গুরুহে, বুঝহ আপন গুণে।
হের দেখ বাঘিনী আসে।
নেতের আঁচলে চর্ম্মমণ্ডিত করি ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।
এ বড় বচন অদ্ভুত
আকাট বাঁঝিয়া প্রসব হইল ছেলে চায় পায়রার দুধ।
অনেক যতনে নৌকা বাঁধিনু কাঁকড়া ধরিল কাঁচি।
মশার লাথিতে পর্ব্বত ভাঙিল ক্ষুদ্র পিপীলিকার হাসি।
তৈল থাকিতে দীপ নিবাইনু আঁধার হইল পুরী।
সহদেব গায় ভাবি কালুরায় শরীর বর্ণন চাতুরী।

মীননাথের মত কঠোর তপস্বী কতকগুলো 'নেতের আঁচল মোড়া বাঘিনীর' বশীভূত হইয়া জীবনের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিল—এই বেদনার কথাই এই প্রহেলিকার ইঙ্গনা। গোরক্ষনাথ প্রহেলিকার দ্বারা গুরুকে ধিক্কার দিয়া তাঁহার চৈতন্য উদ্বোধনের চেষ্টা করিতেছেন।

মত একটা মহাবীর চরিত্র পাইয়াছিলেন—তাঁহার প্রতিযোধ ইছাই ঘোষও একজন মহাবীর ছিলেন। কর্পূর, মহামদ, কালু ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকৃতির চরিত্রের দ্বারা উপাখ্যানের বৈচিত্র্য সৃষ্টিও হইয়াছিল। রঞ্জাবতী ও কাণড়া চরিত্র দুইটিতে প্রচুর Romance এর অবসর ছিল। এত সব আয়োজনে একখানি সম্পূর্ণাঙ্গ কাব্য কেন যে হইল না, তাহাই ভাবিয়া দুঃখ হয়। পুরাণের ভঙ্গীতে লাউসেনের অলৌকিক কাহিনী বিবৃতিতেই কবি আনন্দ পাইয়াছেন। ইহার মধ্যে নানা শাস্ত্রীয় যুক্তি, ব্রাহ্মণ-ভক্তির আতিশয্য, নানা দেবদেবীর প্রসঙ্গ, হনুমানের কৃতিত্ব, কামাখ্যার মন্ত্রতন্ত্র, বশীকরণ ইত্যাদি আসিয়া উপাখ্যানের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। *

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ধর্ম্মঠাকুর রাঢ় দেশের ঠাকুর। রাঢ়ের বাহিরে ইঁহার প্রতিপত্তি ছিল না বা নাই। সে জন্য মনসা-মঙ্গল চণ্ডীমঙ্গলের মত ধর্ম্মমঙ্গল রাঢ় দেশের বাহিরে রচিতও হয় নাই, বিশেষরূপে প্রচারিতও হয় নাই। ধর্ম্মঠাকুরের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে তিনি রাঢ় দেশের দেবতা। কারণ, রাঢ় দেশ কবির দেশ। এদেশের উপাস্য হওয়ার জন্য সংকীর্ণ গণ্ডীর দেবতা হইয়াও তিনি সৌভাগ্যবান্। কারণ, অসংখ্য ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও শক্তি ধর্ম্মের প্রাবল্যে ধর্ম্মদেবতা একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিলেন। কবিরাই তাঁহার মঙ্গলগান করিয়াই তাঁহার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। কবিদের কাব্যের গুণেই ধর্ম্মঠাকুর লোকসমাজে রাঢ় দেশের বাহিরেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সহযোগী মঙ্গলকাব্যের কবিরাও মঙ্গলাচরণে গণেশাদি পঞ্চদেবতার সঙ্গে ধর্ম্মঠাকুরের বন্দনা করিয়াছেন। যে আসরে মঙ্গলকাব্য গীত হইত, সে আসরে শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব ইত্যাদির সঙ্গে ধর্ম্মঠাকুরের ভক্তও থাকিত। সম্ভবতঃ সর্ব্বশ্রেণীর শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জনের জন্য এই প্রথা অবলম্বিত হইত।

যে কালে ধর্ম্মঠাকুরের প্রভাব মন্দীভূত, সেই কালেই প্রধান প্রধান ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচিত হইল কেন? এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। মোট কথা, দেবতার স্বপ্নও নয়, দেবতার ভয় বা ভক্তিও নয়, দেবতার প্রভাব-প্রতিপত্তিও নয়, লাউসেনের কাহিনীটিই এমনই বৈচিত্র্যময়, উদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক যে কবিরা এই জনবল্লভ কাহিনীটি লইয়া নূতন নূতন কাব্য রচনায় উৎসাহিত হইয়াছেন। বাঙ্গালীরা বৈশ্য-সমাজের কাহিনী শুনিয়া শুনিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ক্ষত্রিয় সমাজের কাহিনী সহজেই তাহাদের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল। তাহা ছাড়া সাহিত্যে দৈব নির্য্যাতন ও তজ্জনিত করুণ রসের প্রবাহ বড়ই একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যের বিরহ মিলনের কথা সম্বন্ধেও ঐ কথাই খাটে। শৌর্য্যবীর্য্য ত্যাগ তিতিক্ষার আদর্শ ধর্ম্মমঙ্গলের কাহিনীতে পাইয়া বাঙ্গালী সাগ্রহে উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহারা অভিনব রসও উপলব্ধি করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

অন্যান্য মঙ্গল কাব্যে দেবতাই বড়, মানুষ ছোট এবং নিতান্ত অসহায়। ধর্ম্মমঙ্গলে অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের তুলনায় মানুষের মহিমা অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। মানুষের তুলনায় দেবতা অনেকটা নিষ্প্রভ। সতীত্বে নারী এবং বীরত্বে ও মহত্ত্বে নর দেবতাকে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছে। জানি না এ জন্য বাঙ্গালী ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যকে ভালবাসিত কি না। বৈচিত্র্যের গুণে ধর্ম্মমঙ্গলের আদর যতটুকুই হউক, ধর্ম্মমঙ্গলের গান কোন দিন সর্ব্বজন-বল্লভ হয় নাই। শৌর্য্যবীর্য্য বা বীর রৌদ্র রসের অভিব্যক্তি বাঙ্গালী জাতির চরিত্র ও প্রকৃতির সহিত সুসমঞ্জস নয়। আদি ও করুণ রসের সহিত ভক্তির সংমিশ্রণই তাঁহার মর্ম্ম স্পর্শ করে বেশী। তাই অন্যান্য মঙ্গল কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্য-সাহিত্য ইত্যাদির তুলনায় ধর্ম্মমঙ্গল এদেশের জন-বল্লভতা লাভ করে নাই। তাই মাণিক রাম, ঘনরাম ইত্যাদি কবিরা এদেশে বিস্মৃতপ্রায় হইয়াই আছেন।

অন্যান্য প্রাচীনকাব্যের সহিত তুলনায় নানাভাবে ধর্ম্ম-মঙ্গলের স্বাতন্ত্র্য যেমন আছে, তেমনি অনেক বিষয়ে মিলও আছে। মোহিনীবেশে দেবতার ছলনা এবং জিতেন্দ্রিয় বীরের চিত্তসংযম রক্ষার কথা গোরক্ষনাথ, চাঁদসদাগর, এমনকি কালকেতুকেও স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্লেষের দ্বারা দেবতার আত্মপরিচয় মঙ্গলকাব্যের একটা কবিপ্রথা। সতীত্বের মহিমা কীর্ত্তন অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত ধর্ম্মমঙ্গলেও দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব নাথ-সাহিত্য ও অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে সম ভাবেই দেখা যায়। ধর্ম্মমঙ্গলের নারী-রাজ্য ও নারীগণের মোহন জাল বিস্তার, গোরক্ষ বিজয়ের কদলীপত্তন ও মীননাথের পতনের কথা মনে পড়ায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের হনুমান, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও ধর্ম্ম-মঙ্গলেও আছেন। লাউসেনের মায়ামুণ্ড, ইছাই ঘোষের কর্ত্তিত বার বার ছিন্ন মুণ্ডের সংযোজন, সুরিক্ষার নাসাচ্ছেদ ইত্যাদি রামায়ণ হইতেই গৃহীত। ধর্ম্মমঙ্গলেও অন্যান্য মঙ্গলকাব্য ও চরিত কাব্যের মত মানুষ, বৃক্ষলতা, পশু পক্ষী ও দ্রব্যাদির দীর্ঘ তালিকা দেখা যায়। মঙ্গল কাব্যের শ্মশান মশানের বর্ণনায় ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে রণক্ষেত্রের বর্ণনায় যে বীভৎসতার চিত্র আছে, ধর্ম্মমঙ্গলেও বিশেষ প্রয়োজন না হইলেও সেই রূপ চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে।

* দীনেশবাবু ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলের সমালোচনায় ইহার বৈচিত্র্যহীনতার কথাই বেশি করিয়া বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্যাখ্যানিতে ঘটনা-বৈচিত্র্যের, দৃশ্য-বৈচিত্র্যের ও চিত্র-বৈচিত্র্যের অভাব নাই। সেগুলিকে যে ভাবে, ভাষায় ও ভঙ্গীতে উপস্থাপিত করিলে চিত্তাকর্ষক হইত—সেই ভাব, ভঙ্গী ও ভাষা কবির ছিল না।

ধর্ম্মঠাকুরকে কোন কোন কাব্যে বিষ্ণুর সহিত অভেদাত্মা বলিয়া ঘোষণা করিলেও প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মমঙ্গল ব্রাহ্মণ্য শাসনের বহির্ভূত রাজ্যেরই কাব্য। ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্ম্ম ঠাকুরের মহিমা কীর্ত্তন করিলে জাতি যাইত। মাণিকরাম সেই ভয় করিয়া স্বপ্নাদেশ পাইয়াও ইতস্ততঃ করিতেছে। তাহাকে প্রবোধ ও সাহস দিয়া

জগৎঈশ্বর কন আমি তোর জাতি। তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাতি।
আমি যার সহায় এতেক ভয় কেন? ময়ূর ভট্টের কথা মন দিয়া শুন।
বৈকুণ্ঠে রেখেছি তারে বিষ্ণু ভক্তি দিয়া। অদ্যাপি অপার যশ অখিল ভরিয়া।

ধর্ম্মমঙ্গলের—রঞ্জাবতী, কাণড়া, কলিঙ্গা, সুরীক্ষা, লাউসেন, শাফুলা, মাহুদ্যা, ইছাই, ধুমসী, গোহাটা, কালু, শুকা, লখা ইত্যাদি নামগুলিও ব্রাহ্মণ্যসমাজ-বহির্ভূত।

নিরঞ্জনের উষ্মা (রুষ্মা) নামক কবিতায় সহদেব চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—মুসলমানেরা যে হিন্দুর বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করিয়া জাতি নাশ করিতেছে—তাহা ধর্ম্ম-দেবতারই প্রতিহিংসা-সাধন। ধর্ম্মই সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লইয়া সদ্ধর্ম্মদ্রোহী ব্রাহ্মণকে দণ্ড দিবার জন্য মুসলমান মূর্ত্তি ধরিয়াছেন। ইহাতে কবি বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

নিরঞ্জনের রুষ্মা রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণে মুদ্রিত হইলেও ইহা পরবর্ত্তী কোন কবি সম্ভবতঃ সহদেব চক্রবর্ত্তীরই রচনা। কারণ, তাঁহার রচিত অনিলপুরাণে ইহা আছে।

যে ধর্ম্মঠাকুরকে ব্রহ্মা বিষ্ণু পুরন্দরের উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে (ব্রহ্মা বিষ্ণু পুরন্দর পূজা করে নিরন্তর) সে দেবতাকে ব্রাহ্মণ সমাজ স্বীকার করে নাই বটে, কিন্তু ধর্ম্ম-ঠাকুর বৌদ্ধমুক্ত বাংলার এক শ্রেণীর হিন্দুদেরই দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেন। সেই শ্রেণীতে ব্রাহ্মণও যথেষ্ট ছিলেন। তাই ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্য-রচয়িতাদের মধ্যে ব্রাহ্মণই বেশী। যাঁহারা ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্য রচনা করিয়াছেন তাঁহারা বৌদ্ধ ত নহেনই—ধর্ম্মঠাকুরের সেবক বা ভক্তও সকলেই যে ছিলেন তাহাও নয়। ধর্ম্মমঙ্গলের কাহিনীটি চিত্তাকর্ষক বলিয়াই সম্ভবতঃ তাঁহারা কাব্য রচনা করিয়াছেন। ধর্ম্মমঙ্গল লিখিতে হইলে গ্রন্থারম্ভের যে মামুলি প্রথা প্রচলিত ছিল—সেই প্রথা অবলম্বন করিতে তাঁহারা বাধ্য হইয়াছিলেন। সেজন্য বোধ হয় প্রত্যাদেশ ও "তোমা বই দেবতা নাই আর" ইত্যাদি উক্তির সমাবেশ করিয়া থাকিবেন। আর ধর্ম্মমঙ্গলের শ্রোতা সকলেই হইতে পারিত—ভক্তের ভক্তিতৃষ্ণা হইতে নিবারিত হইত, অভক্ত সাহিত্য-রস ও সঙ্গীত-রস উপভোগ করিত।

ধর্ম্মমঙ্গলে কেবল নিম্নশ্রেণীর পুরুষদের চরিত্র তেজস্বিতা, শৌর্য্য, নির্ভীকতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, স্বামিধর্ম্মনিষ্ঠা ইত্যাদি সদ্‌গুণে মণ্ডিত হয় নাই—নিম্ন শ্রেণীর বাঙ্গালী নারীদের চরিত্রেও রাজপুত বীরাঙ্গনাদের আদর্শ সঞ্চারিত হইয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্যে ইহা সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার। ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে এইরূপ নারীচরিত্রের পরিকল্পনা দেখা যায়। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের আদর্শ নারীচরিত্র বলিলে আমরা বুঝি—মেনকা, যশোদা, শচীমাতা, খুল্লনা, সনকা, বেহুলা। এইগুলি সবই হৃদয়-মাধুর্য্যের সমতলে প্রবাহিতা তরঙ্গিণী—গৈরিক দৃঢ়তা ইঁহাদের মধ্যে নাই।

ধর্ম্মমঙ্গলের কবিরা নূতন নারীচরিত্রের আদর্শ দিয়াছেন এবং এই আদর্শ গতানুগতিক সভ্য বর্ণাশ্রমী সমাজের অনুপ-যোগী মনে করিয়া নিম্ন শ্রেণীর বাঙ্গালী সমাজ হইতেই এইরূপ নারী চরিত্র আহরণ করিয়াছেন। এই চরিত্র কালুডোমের পত্নী লখাই ডোমী—শাকা ডোমের পত্নী ময়ূরা।

গৌড়েশ্বরের শ্যালিকা রঞ্জাবতী পুত্র লাউসেনকে যুদ্ধে বিদায় দিতে গিয়া মাতৃস্নেহে বিগলিত হইয়া বলিতেছে—

বরঞ্চ এমন কেহ মহামল্ল থাকে। বিক্রমে বাছারে মোর খোঁড়া করি রাখে।
চরণ ভাঙিলে ঘুচে গমনের আশ। ঘরে বসে চাঁদ মুখ দেখি বার মাস।

রঞ্জাবতী এখানে যশোদা, শচীমাতা, খুল্লনার সগোত্রা।
আর শাকার মা লখাই বলিতেছে—

মোর দুধ খেয়ে বেটা রণে ভীত হলি। তু বেটা তখনি কেন হয়ে না মরিলি।

তাহার স্ত্রী ময়ূরা বলিতেছে—

মহাগুরু বচন রাজার নুণ খেলে। পাতক সঞ্চয় কেন কর বুক হেলে।

শাকা যুদ্ধ করিতে গিয়া প্রাণ হারাইল। তাহাতে লখাই কাতর না হইয়া একে একে সকল পুত্রকে রণক্ষেত্রে পাঠাইল। তাহাদের পতনের পর নিজে গেল যুদ্ধে প্রাণ দিতে।

এই চিত্র সৃষ্টিতে আতিশয্য দোষ হয় ত একটু হইয়াছে কিন্তু নারীচরিত্রের এই আদর্শ বঙ্গসাহিত্যে অভিনব প্রবর্ত্তন।

লাউসেন, ইছাই ও কালুডোমের চরিত্র ছাড়া বাকি চরিত্রগুলি বাস্তবতার অনুগামী—কাজেই এইগুলির মধ্যে যথাযথতা আছে—কিন্তু মনুষ্যত্বের অভাব।

কর্ণসেন যুদ্ধে ছয় পুত্র হারাইল। তাহার পুত্রবধূগণ সহমৃতা হইল—রাণী শোকদুঃখে প্রাণত্যাগ করিল। বৃদ্ধ বয়সে কর্ণসেন আবার সুন্দরী রাজশ্যালিকা রঞ্জাবতীকে বিবাহ করিল। রঞ্জাবতী লাভই হইল শোকজীর্ণ বৃদ্ধ রাজার সান্ত্বনা। ইহাতে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই।

গৌড়েশ্বরের চরিত্রে মেরুদণ্ড নাই—সে তাহার অমাত্য শ্যালক মহামদের হাতের পুতুল। বৃদ্ধ বয়সে সে রাজা হরিপালের কন্যা কাণড়ার রূপের খ্যাতি শুনিয়া তাহাকে হরণ করিয়া আনিয়া বিবাহ করিবার চেষ্টা করিল।

মহামদ নিষ্ঠুর কুচক্রী হীনচেতা ও প্রজাপীড়ক। লাউ-সেনের মহত্ত্বের ও উদারতার মর্ম্ম সে কিছুতেই বুঝে নাই।

লাউসেনের মহিমার ধারা শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিবার জন্যই কবি এই চরিত্রটিকে সর্ব্ব বিপদ ও সর্ব্ব দণ্ড হইতে রক্ষা করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। সর্ব্বশেষে তাহার দণ্ডবিধান হইয়াছে। মহত্ত্বের উদ্দীপক হিসাবে এই চরিত্রটির বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

কর্পূর লাউসেনের ভাই—কিন্তু ভীরু কাপুরুষ, বিপদের সময় ভাইকে ত্যাগ করিয়া সে পলায়ন করিত। কর্পূর আদর্শ চরিত্র নয়—কিন্তু কবির চরিত্র সৃষ্টির দিক হইতে বিচার করিলে এই চরিত্র সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও জীবন্ত—ইহাতে অলৌকিক স্পর্শ নাই—অদ্ভুত কল্পনার মিশ্রণ নাই। এই চরিত্র দেবতার হাতের পুতুলও নয়—দেবীর মন্দিরে বলির ছাগও নয়—দোষেগুণে জড়িত রক্ত-মাংসের মানুষ।

এই চরিত্র সম্বন্ধে ডাঃ দীনেশ চন্দ্র বলিয়াছেন—

"একমাত্র কর্পূর চরিত্র বাঙ্গালীর খাঁটি নক্সা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। কর্পূর জ্যেষ্ঠভ্রাতা লাউসেনকে খুব ভালবাসে। কিন্তু সে দাদাকে যত ভালবাসে নিজেকে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ভাল বাসে।"

লাউসেনের শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী ঐতিহাসিক বীরের মত নয়—কতকটা রূপকথার রাজপুত্রের মত—কতকটা পৌরাণিক বীরের মত।

আবার লাউসেন ধর্ম্মঠাকুরের হাতের মানবাকার যন্ত্র মাত্র। লাউসেন চরিত্রের বাস্তবতার অভাব সত্ত্বেও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের তৃণলতা-সমাচ্ছন্ন সমতল ক্ষেত্রে লাউসেনকে একটি মহীরুহ বলিয়াই মনে হয়। যে যুগের সাহিত্যে সকল চরিত্রেই বাস্তবতার অভাব—এমন কি ঐতিহাসিক চরিত্র শ্রীচৈতন্য পর্য্যন্ত অবাস্তব ভাববিগ্রহ ধারণ করিয়াছে, সেযুগের সাহিত্যে বাস্তবতার কথা বাদ দিয়াই চরিত্র বিচার করিতে হইবে।

দেবসেনাপতি কুমারের জন্মের মূলে যেমন উমার কঠোর তপস্যা বর্ত্তমান—লাউসেনের জন্মের মূলে তেমনি রঞ্জাবতীর কঠোর তপস্যা। সাহস, ধৈর্য্য, ক্ষমা, দয়া, সংযম, বিচক্ষণতা দৈহিক বল, কর্ত্তব্যবোধ, সত্যনিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতায় লাউসেন আদর্শ ধীরোদাত্ত-প্রকৃতির বীর—মহাকাব্যের উপযুক্ত নায়ক। বঙ্গ সাহিত্যে এরূপ চরিত্র দুর্ল্লভ। জিতেন্দ্রিয়তায় লাউসেনের চরিত্র একমাত্র গোরক্ষনাথের সহিত তুলিত হইতে পারে। আর একনিষ্ঠতা ও তেজস্বিতায় এই চরিত্রকে চাঁদসদাগরের চরিত্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। রামায়ণের রামচন্দ্র চরিত্রের সঙ্গে লাউসেন চরিত্রের অনেক বিষয়ে সাম্য আছে। এইরূপ চরিত্রকে দেবানুগৃহীত এবং দেবতার হাতের পুতুল বলিয়া ঘোষণা করিয়া নষ্টই করা হইয়াছে—চাঁদ সদাগরের চরিত্রের মর্য্যাদাও এইরূপ দেবতার দোহাই দিয়া ক্ষুন্ন করা হইয়াছে। দেবতার অনুগ্রহকে Poetic & religious Convention মাত্র বলিয়া বাদ দিলে লাউসেনের চরিত্র বঙ্গসাহিত্যে আদর্শবীর-চরিত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এই চরিত্রটির কলাসম্মত ক্রমোন্মেষ কবি দেখান নাই। সে কলাকৌশল সেকালের কবিদের অজ্ঞাত ছিল। নানা প্রকার শৌর্য্য ও মহত্ত্বের দৃষ্টান্তই কবি দিয়াছেন—সেইগুলিকে একসূত্রে গাঁথিয়া চরিত্রটিকে মনের শ্রদ্ধা মাধুরী দিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে।

রঞ্জাবতী ছিলেন রাজপুত-রমণীর মতই বীরাঙ্গনা—তেজস্বিনী, তপস্বিনী, মহাসতী। সন্তান লাভ করিয়া ইনি হইলেন খাঁটি বাঙ্গালী জননী—বাংলা সাহিত্যের যশোদা মেনকা খুল্লনা সনকার সঙ্গে সমশ্রেণীভুক্তা। বীরপুত্রের সুযোগ্যা জননী, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে নাই। কাশীরামের মহাভারতে জনা, কাশীরামের সৃষ্ট চরিত্র না হইলেও একমাত্র দৃষ্টান্ত। মধুসূদন ও গিরিশচন্দ্র এই চরিত্রটির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া ইহার সম্পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করিয়াছেন। রঞ্জাবতী যে তপস্যা ও আত্মনিগ্রহের দৃঢ়তা বলে লাউসেনের মত পুত্রলাভ করিয়াছিলেন—সেই দৃঢ়তা যদি তাঁহার চরিত্রে বরাবর অক্ষুণ্ণ থাকিত, তাহা হইলে তিনি বীরপুত্রের যোগ্যা জননীর মর্য্যাদা লাভ করিতে পারিতেন এবং সেই মর্য্যাদায় প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোকিত হইতে পারিত। স্নেহাতিশয্যের দুর্ব্বলতা থাকিলেও রঞ্জাবতী চরিত্রটি বঙ্গসাহিত্যে উপেক্ষণীয় নয়।

অপ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে হরিহর বাইতির চরিত্র চমৎকার। লাউসেন পূর্ব্বের সূর্য্যের পশ্চিমে উদয় দেখাইলেন। তাহার সাক্ষী ছিল হরিহর বাইতি। সে যাহাতে গৌড়েশ্বরের সভায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় সে জন্য সে মহামদ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইল। মিথ্যা না বলিলে তাহার প্রাণ যাইবে। হরিহর প্রাণ ভয়ে ও মহামদের তাড়নায় মিথ্যা বলিতে স্বীকৃত হইল। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু সে রাজদরবারে দাঁড়াইয়া কিছুতেই মিথ্যা বলিতে পারিল না, সত্যই বলিয়া ফেলিল। সে একজন নিম্নশ্রেণীর লোক। কিন্তু তাহার ধর্ম্মজ্ঞান সকলকেই লজ্জা দিল। অথচ সাধারণ মানুষের দুর্ব্বলতা হইতেও তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হয় নাই। সে সারারাত্রি ধরিয়া বিবেকের সহিত সংগ্রাম করিয়াই শেষে সত্যের পথে বিজয়ী হইয়াছে অর্থাৎ তাহাকে জীবন্ত বাস্তবানুগ মানুষই করা হইয়াছে। সে শূলে আরোপিত হইয়া যে কথা বলিল—তাহার তুলনাও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে দুর্ল্লভ।

শূলিতে পরাণ যায় আমি নাহি কাঁদি তায়,
কাঁদিয়া কাতর এই শোকে।
তোমার দাসের দাস মিথ্যাবাদে হয় নাশ,
ধর্ম্ম মিথ্যা পাছে কহে লোকে।

আকবরের রাষ্ট্র-সাধনা

এস্, ওয়াজেদ আলি, বি-এ (কেণ্টাব) বার-এট-ল

বাইশ

কিশোর আকবরের একখানি আলেখ্য আমার সম্মুখে আছে। ছবিখানি সম্ভবতঃ তাঁর শিল্পগুরু আবদুল সামাদের আঁকা। এই চিত্রে আকবরের যে কমনীয় কান্তি আমরা দেখতে পাই, কুসুম পেলব অথচ বজ্রকঠিন যে দৈব্যমূর্ত্তি আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হয়, তার বর্ণনা লেখনীর সাহায্যে করা কঠিন। প্রশস্ত, উন্নত ললাটদেশ থেকে বিদ্যুৎশিখার মত প্রতিভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। নয়নযুগলের তীক্ষ্ণ, সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি সজাগ, সজীব, সর্ব্বদর্শী, অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় দিচ্ছে। পেস্তার মত সূক্ষ্ম, সুসম্বদ্ধ ওষ্ঠাধর এবং দৃঢ় সুগঠিত চিবুক অটল সঙ্কল্পের আভাস দিচ্ছে। গভীর প্রশস্ত বক্ষ, সূক্ষ্ম কটিদেশ, আজানুলম্বিত বাহু সিংহের বিক্রম সূচিত করছে। সুগঠিত হস্তের চম্পক বিনিন্দিত অঙ্গুলি শ্রেণী স্বভাব শিল্পীর মার্জ্জিত রুচির সংবাদ দর্শককে দিচ্ছে। দেবদুর্ল্লভ মুখমণ্ডলের করুণ কমনীয়তা, দয়া দাক্ষিণ্যের মহিমা ঘোষণা করছে। এ যেন পৃথিবীর মানুষের ছবি নয়! প্রতিভাশালী চিত্রকর ধ্যানযোগে কোন দুর্ল্লভ মুহূর্ত্তে যেন ইষ্টদেবতার দর্শন পেয়ে নিপুণ তুলিকার সাহায্যে তাঁকে চিত্রপটে রূপায়িত করেছেন।

তেইশ

এ ত' গেল দেহকান্তির কথা, অঙ্গশ্রীর কথা, আকবরের চরিত্রে যে সব দুর্ল্লভ গুণাবলীর একত্র সমাবেশ হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত সত্যই বিরল। আকবরের নির্ভীকতা, তার সংযম বিক্রম, দুর্ল্লভ কর্ম্মকুশলতা, অসীম ধৈর্য্য এবং অতুলনীয় রণকৌশল, সৈন্য পরিচালনায় বিস্ময়কর দক্ষতা, ঐতিহাসিকের বিস্ময়ের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। ক্ষাত্র শক্তিতে অপরাজেয় এই সুরবীরের মত শত্রুর প্রতি কয়জন নরপতি উদারতা দেখাতে পেরেছেন? দুর্ব্বল, আর্ত্ত অসহায়ের জন্য কয়জন নরপতির অন্তর আকবরের মত কেঁদেছে? ভিন্ন ধর্ম্মের প্রতি, ভিন্ন আদর্শের প্রতি কয়জন নরপতি আকবরের মত শ্রদ্ধা সহানুভূতি দেখিয়েছেন? ধর্ম্মতত্ত্বের, রাষ্ট্রতত্ত্বের, সমাজতত্ত্বের মূল সূত্র কয়জন নরপতি আকবরের মত আয়ত্ত করতে পেরেছেন, আর ব্যবহারিক জীবনে তাঁর মত প্রয়োগ করতে পেরেছেন? আকবরের উদার, মহান, মঙ্গলময় স্বপ্ন কয়জন নরপতি দেখেছেন, আর সেই স্বপ্নকে রূপায়িত করবার জন্য কয়জন নরপতি আকবরের মত জীবন ব্যাপী সাধনা করেছেন? দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই মহাপ্রাণ বাদশার চরিত্রকে পাঠকের চক্ষে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করা যাক।

চব্বিশ

Lawrence Binyon লিখেছেন—

হঠাৎ সংবাদ এল গুজরাট দেশে বিদ্রোহের আগুন পুনরায় জ্বলে উঠেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে এই রাজ্য অনায়াসে হস্তগত হয়েছিল। আকবর তৎক্ষণাৎ গুজরাট দেশে নূতন করে অভিযান করবার সঙ্কল্প করলেন। প্রথম বারের অভিযান আকবরের রণ-কৌশলের মহিমা ঘোষণা করেছিল। বিশ্ববিজয়ী আলেকজেণ্ডারের মতই, ভয়-ভীতি হীন দুঃসাহসিকতার সঙ্গে তিনি সেবার তার বাহিনীকে পরিচালিত করেছিলেন। তার দ্বিতীয় অভিযান অবিসম্বাদিতরূপে প্রমাণ করে দিলে, যে, মানুষের উপর আধিপত্য করবার জন্যেই আকবর জন্মগ্রহণ করেছেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে এই বিপদ এসে উপস্থিত হয়েছিল। আকবর স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে, সাফল্যলাভের জন্য কালবিলম্ব না করে শত্রুকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করা একান্ত প্রয়োজন। তবু কিন্তু কোন কাজই তিনি দৈবের হাতে ছাড়েন নি। প্রত্যেকটী ব্যবস্থার তন্নতন্ন করে স্বয়ং তিনি দেখাশোনা করেছিলেন। অনেক রকম অভাবিত খরচের প্রয়োজন হতে পারে বলে নিজের খাস-তহবিল থেকে তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন।

নিদাঘ-তাপ-দগ্ধ আগষ্ট মাসে তিন সহস্র অশ্বারোহীর ক্ষুদ্র এক বাহিনী নিয়ে তিনি অভিযান সুরু করলেন। প্রত্যহ পঞ্চাশ মাইল হিসাবে রাজপুতানার বৃক্ষছায়াহীন উত্তপ্ত মরুপ্রান্তর অতিক্রম করে তিনি অগ্রসর হতে লাগলেন। একাদশ দিনে দীর্ঘ ছয় শত মাইল পথ অতিক্রম করে পুনরায় তিনি আহামদাবাদ নগরে এসে উপস্থিত হলেন। বিদ্রোহী দলপতি মোহাম্মদ হোসেন মির্জ্জার অধীনে বিশ সহস্র দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা সমবেত হয়েছিল। শাহী ফৌজের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে তারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। পরস্পরের মধ্যে তারা বলাবলি করতে লাগলো "এও কি সম্ভব? এত শীঘ্র বাদশা কি করে এখানে আসতে পারেন? আমাদের চরেরা তো সংবাদ এনেছে মাত্র পনেরো দিন পূর্ব্বে তাঁকে তারা শিকরীতে দেখে এসেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর পক্ষে এখানে আসা একেবারেই অসম্ভব।"

বলা বাহুল্য, শত্রুর বিস্ময় অচিরে ভীষণ সন্ত্রাসে পরিণত হল। আকবর তাঁর চিরাচরিত প্রথানুযায়ী মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করে শত্রুকে ভীম বেগে আক্রমণ করলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে নদী অতিক্রম করে তিনি পর পারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। শত্রু বাধা দেবার চেষ্টা করলে। আকবরের অগ্রগামী ফৌজ, সংখ্যায় বহুগুণ বেশী শত্রুর আক্রমণে, পিছু হটতে সুরু করলে। এই সঙ্কটের মুহূর্ত্তে আকবর স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন। সিংহ বিক্রমে তিনি শত্রু বাহিনীকে আক্রমণ করলেন। তাঁর অশ্ব আহত হল। চারিদিক থেকে কলরব উঠল বাদশাহ নিহত

হয়েছেন। মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করে আকবর নূতন অশ্বে আরোহণ করলেন, আর যেখানে যুদ্ধের অবস্থা সব চেয়ে সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেইখানেই সশরীরে গিয়া উপস্থিত হলেন। বাদশাকে দেখে সাহসী ফৌজ নূতন উৎসাহ পেলে আর জয়ধ্বনি করতে করতে নূতন উদ্যমে যুদ্ধ করতে লাগল। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় যুদ্ধের গতি একেবারে বদলে গেল। শত্রু বাহিনী রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়নপর হল। তাদের নেতা মোহাম্মদ হোসেন মির্জ্জা আহত এবং বন্দী হলেন। শাহী ফৌজ যুদ্ধে জয় লাভ করলে।

শত্রুবাহিনী কিন্তু তখনও সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয় নি। এক ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হতে না হতেই, আর একজন বিদ্রোহী নেতা, নগরের অপর প্রান্ত থেকে পাঁচ সহস্র সৈন্য নিয়ে শক্তি পরীক্ষায় অগ্রসর হলেন। পরাজয়ের গ্লানি বিদূরিত করবার জন্য, জীবন পণ করে তিনি যুদ্ধ করতে লাগলেন। তবে প্রধান বাহিনীর আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত পরাজয়ে শত্রুর মনে আতঙ্ক এবং নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। বিজয়ী সম্রাটের আবির্ভাবে তারা ছত্রভঙ্গ হল। "যঃ পলায়তি স জীবতি"—পরাজিতের এই চিরন্তন নীতিও তারা ভুলে গেল। ভয়ে এমনই তারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল, যে শাহী ফৌজের সৈনিকেরা তাদেরই তূণ থেকে তীর বার করে, তাদেরই অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ চালাতে লাগলো। এবার বিদ্রোহী বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত হল। বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত হল। একুশ দিনে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আকবর দিল্লীতে ফিরে এলেন। মাত্র তেতাল্লিশ দিনের মধ্যে তিনি সসৈন্যে গুজরাটে গিয়েছিলেন, শত্রুবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করে বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত করেছিলেন, আর উদ্দেশ্য সাধন করে রাজধানীতে ফিরে এসেছিলেন।

পঁচিশ

বজ্রকঠিন এই অমিত পরাক্রম যোদ্ধার অন্তর উদারতা, ক্ষমাশীলতা, গুণগ্রাহিতা প্রভৃতি সুকোমল সদ্‌গুণরাজিতে কিরূপ ভরপুর ছিল তার একটি দৃষ্টান্ত পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করছি।

১৫৫৬ খৃঃ অব্দের নভেম্বর মাসে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়। এর অব্যবহিত পূর্ব্বে উক্ত সনের জানুয়ারী মাসে এক অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার ফলে আকবরের পিতা হুমায়ুন দিল্লীতে দেহ ত্যাগ করেন। আকবরের বয়স তখন মাত্র চতুর্দ্দশ বৎসর। বিশ্বাসী এবং সুদক্ষ যোদ্ধা, পরলোকগত পিতার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ সেনাপতি বায়রাম খাঁন, নাবালক বাদশার অভিভাবকরূপে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ তিন শতাব্দীর জন্য ভারতবর্ষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করে।

এই যুদ্ধে বাইরাম খাঁনই মোগল বাহিনীর পরিচালনা করে ছিলেন। পাঠান বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন হিন্দুবীর হীমু। যুদ্ধে হীমু সাংঘাতিক ভাবে আহত হন। তাঁর স্থান গ্রহণ করবার যোগ্যতা পাঠান বাহিনীতে কারও ছিল না। উপযুক্ত নেতার অভাবে পাঠানের বিধ্বস্ত এবং ছত্রভঙ্গ হয়। মোগলেরা যুদ্ধে জয়লাভ করে। পাঠান বাহিনীর আহত সেনাপতি হীমুর হস্তী তাঁকে নিয়ে সোজা নাবালক বাদশা আকবরের সম্মুখে উপস্থিত হয়। আকবরকে সম্বোধন করে বাইরাম খাঁন বলেন, "বিধর্ম্মীকে তরওয়ালের আঘাতে হত্যা করুন।"

তরুণ বাদশা দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "মরণাপন্ন শত্রুকে আমি আঘাত করতে পারি না।"

আকবরের আপত্তি দেখে বায়রাম খাঁন স্বহস্তে হীমুকে হত্যা করেন।

ছাব্বিশ

রাজপুতানার মিবার রাজ্যের বিরুদ্ধে আকবর অনেক দিন ধরে যুদ্ধ চালিয়ে ছিলেন। মেবারের যোদ্ধাদের মধ্যে জয়মল্ল এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা পট্ট, অসাধরণ বীরত্ব দেখিয়ে এই যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। আকবর তাঁহার বীর শত্রুদের প্রতি যথোচিৎ সম্মান দেখিয়ে বীরত্বের গৌরব রক্ষা করেছেন। এই দুই রাজপুত যোদ্ধার বীরত্ব কাহিনী চিরস্মরণীয় করবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁদের পাষাণ প্রতিমা দিল্লীর প্রাসাদের প্রধান তোরণের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করেন। ফরাসী পরিব্রাজক Bernier এই দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, "দুইটি অতিকায় প্রস্তর নির্ম্মিত হস্তীমূর্ত্তি প্রাসাদের প্রধান তোরণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, তাদের একটীর পৃষ্ঠে মিবারের বিখ্যাত যোদ্ধা রাজা জয়মল্লের মূর্ত্তি সমাসীন। দ্বিতীয়টীর পৃষ্ঠে বসে আছেন তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পট্ট। এই দুই যোদ্ধা আর তাঁদের চেয়েও বেশী গৌরবের অধিকারিণী তাঁদের গর্ভধারিণী মাতা, মোগল-বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমরত্ব লাভ করেছেন। মোগল সম্রাট যখন চিতোর অবরোধ করেন, তখন তাঁরা অদম্য সাহস এবং অমিত পরাক্রমে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধকার্য্য চালিয়ে যান। শত্রুর প্রতিরোধ করা যখন একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তখন এই বীর ভ্রাতৃদ্বয়, তাঁদের গর্ভধারিণীর সঙ্গে ভীমপরাক্রমে শত্রুবাহিনীকে আক্রমণ করেন, এবং তরবারি হস্তে সমরানলে আত্মাহুতি দেন। গর্ব্বিত শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করার চেয়ে যুদ্ধে আত্মবিসর্জ্জন করাকেই তাঁরা অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেছিলেন। তাদের এই অলৌকিক বীরত্ব এবং স্বদেশ-প্রীতির প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই উদারচেতা শত্রু তাঁদের পাষাণ প্রতিমা প্রাসাদ তোরণের সম্মুখে

ষ্ঠিত করেছেন। অতিকায় হস্তী পৃষ্ঠে সমাসীন এই বীর ভ্রাতৃ যুগলের পাষাণ প্রতিমার মধ্যে এমন এক মহিমা বিরাজ করছে; আর তাঁদের দেখে আমার অন্তরে, এমন এক ভক্তি এবং সম্ভ্রমের ভাব জেগে উঠলো, যে, লেখনীর সাহায্যে তা প্রকাশ করা অসম্ভব।"

সাতাশ

পশু পক্ষীর সহজাত বুদ্ধি বলে দেয়, কে তাদের বন্ধু আর কে তাদের বন্ধু নয়। আকবরের জীবন কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি বন্যজন্তুরা নির্ভয়ে এসে তাঁর হাত থেকে আহার গ্রহণ করতো। বন্য জন্তুদের এই আচরণে অনুচরেরা বিস্ময় প্রকাশ করেন। আকবর তাদের বলেন, "এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই। মানুষ যদি বন্য জন্তুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা না দেখায়, তাদের যদি অকৃত্রিমভাবে স্নেহ প্রদর্শন করে, তা হলে তারাও তার প্রতি স্নেহ দেখাতে কুণ্ঠিত হবে না।"

আকবর আমিষ আহার যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করতেন, এবং সকলকে তা করতে উপদেশ দিতেন। আইনে আকবরিতে আবুল ফজল লিখেছেন, "মহামান্য সম্রাট মাংস খাওয়া মোটেই পছন্দ করেন না। প্রায়ই তিনি বলেন, বিধাতা মানুষের জন্য বিভিন্ন রকমের সুস্বাদু খাদ্য সৃষ্টি করেছেন। কেবল অজ্ঞতা এবং লোভের বশবর্ত্তী হইয়েই মানুষ জীবজন্তুকে হত্যা করে, আর নিজের দেহকে জীবজন্তুর কবরে পরিণত করে। আমি যদি বাদশা না হতুম, তা হলে মাংস আহার সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করতুম। তবে এও আমার স্থির সঙ্কল্প যে, ধীরে ধীরে আমিষ খাদ্য আমি একেবারেই ছেড়ে দেবো।"

আকবর শিকার বড় ভালবাসতেন। জীবজন্তুর দুঃখের চিন্তা কিন্তু শেষ বয়সে শিকারের প্রতি তাঁর মনে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করেছিল। Lawrence Binyon লিখেছেন:

১৫৮৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আকবর পাঞ্জাবে বিরাট এক শিকার অনুষ্ঠানের আদেশ দেন। এই অনুষ্ঠানকে "কমরগাহ" বলা হতো। কখনও কখনও পঞ্চাশ হাজারেরও বেশী লোক এই অনুষ্ঠানে শিকারের জন্তুদের খেদাইয়ের কাজে নিযুক্ত হতো। প্রায় পঞ্চাশ মাইল পরিমিত জঙ্গলকে ঘেরাও করা হতো, আর তাড়িয়ে তাড়িয়ে সেই বিস্তীর্ণ জঙ্গলের জন্তুদের শিকারীদের দিকে আনা হতো। বর্ণিত শিকার অনুষ্ঠানে একাদিক্রমে প্রায় পনের দিন ধরে, খেদাইকারীরা বন্য জন্তুদের তাড়িয়ে বনের মধ্যভাগে নিয়ে আসছিল, —বিরাট এক হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠানের জন্য। হঠাৎ সমস্ত দাপাদাপি, সমস্ত হাঁকাহাঁকি বন্ধ হয়ে গেল। শহিনশাহ দৃঢ় আদেশ জারি করেছেন "কেউ একটা চড়ুই পাখির পালক পর্য্যন্ত স্পর্শ করবে না। জীব জন্তুদের পালিয়ে আত্মরক্ষা করবার সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হোক।

... ...

বহুকাল পূর্ব্বে কিশোর বয়সে আকবর যেমন একবার সবেগে ঘোড়া চালিয়ে অন্তহীন প্রান্তরে অদৃশ্য হয়েছিলেন, আর সেই সীমাহীন নিস্তব্ধতার মধ্যে স্বর্গীয় আলোকের বিমল জ্যোতি দর্শন করে, মনে প্রাণে মুগ্ধ হয়েছিলেন, এবার কার শিকারের সময়ও তেমনি, নিদাঘতাপদগ্ধ জ্যৈষ্ঠ মাসের এক শুভ মুহূর্ত্তে, সেই স্বর্গীয় আলোক আবার এসে তাঁকে দেখা দিয়েছিল। এ আলোক যে করুণাময় বিশ্বপ্রভুরই অমল অলৌকিক জ্যোতি, সে বিষয় আকবরের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। সত্য স্বরূপের দিব্য জ্যোতি আকবরের সমস্ত অন্তরকে আলোকিত করেছিল। সেই স্বর্গীয় আলোকের প্রভাবে, ক্ষণিকের তরে, ভারতেশ্বর তাঁর কর্ম্মবহুল জীবনের কথা, তাঁর অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা, তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের কথা ভুলে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক লোকে প্রয়াণ করেছিলেন। ব্যথাহত প্রাণে তখন তিনি ভেবে ছিলেন, ঐশ্বর্য্য শৃঙ্খলেরই নামান্তর মাত্র! এই সোনালী শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করে, অন্তরের আলোক মাত্রকে সম্বল করে, দরবেশের মত কোন জনহীন স্থানে, চিরসুন্দরের ধ্যানে মগ্ন থাকা কত বেশী কাম্য, কত বেশী প্রশংসনীয়। এই বিরল উজ্জ্বল মুহূর্ত্তে আকবরের মনে হয়েছিল, নিরীহ প্রাণীদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের এই যে আয়োজন চলেছে, সে সত্যই এক বিভৎস ব্যাপার; নির্ব্বোধ ছেলেদের নিষ্ঠুর খেলা, যার অনিবার্য্য ফল হবে, শত শত নিরীহ প্রাণীর অবর্ণনীয় দুঃখ, অশেষ যন্ত্রণা! করুণাময় বিশ্ব প্রভু এ নিষ্ঠুর খেলার কখনও সমর্থন করতে পারেন না। নিদাঘ তাপদগ্ধ এমনই এক শুভ দিনে, সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, এমনি এক ছায়াঘন বৃক্ষতলে, ভারতের আর একজন মহামানবের, গৌতম বুদ্ধের অন্তর লোক, স্বর্গীয় আলোকের অমল আভায় উদ্ভাসিত হয়েছিল।"

আটাশ

আকবর যে কেবল দার্শনিক আলোচনা ভালবাসতেন, তা নয়। সাহিত্য, চিত্র-কলা, সঙ্গীত, স্থাপত্য শিল্প, এবং বিভিন্ন চারু ও কারু শিল্পকে তিনি কান্ত স্নেহের চক্ষে দেখতেন, আর এ সবের উন্নতির জন্য, অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। তাঁর দরবারে সাহিত্য এবং চারুশিল্পের শ্রেষ্ঠ সাধকদের যে অপূর্ব্ব সমন্বয় হয়ে ছিল, তার তুলনা পাওয়া সহজ নয়। আবুল ফজল, আব্দুর রহমান, উরফি শিরাজী, ফায়জী প্রভৃতি কবি এবং লেখকেরা ফার্সি সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছেন। চিত্রকলায় আবদুলসামাদ, মীর সইয়েদ আলি তবরেজ, কেসু, বারওয়ান, দাসওয়ান্ত প্রভৃতি শিল্পে

অক্ষয় খ্যাতি লাভ করেছেন। আকবর ওস্তাদ আবদুসসমাদের কাছে নিজে ছবি আঁকতে শিখে ছিলেন। চিত্রকলাকে তিনি একান্তভাবে ভালবাসতেন। সাধারণ মুসলমানেরা চিত্রাঙ্কনকে অধর্ম্মাচরণ বলেই মনে করতেন। তাঁদের প্রতি লক্ষ্য করে আকবর আবুল ফজলকে বলেছিলেন, "অনেক লোক চিত্রকলাকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখে। আমি তাদের পছন্দ করি না। আমার তো মনে হয়, খোদাকে চেনবার সুযোগ সাধারণ মানুষের চেয়ে চিত্রকর অনেক বেশী পেয়ে থাকে। সে যখন কোন জীবন্ত প্রাণীর ছবি আঁকে, সেই প্রাণীর একটী একটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে যখন সে তুলিকার সাহায্যে পটে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করে, তখন স্পষ্টই সে বুঝতে পারে যে, ছবিতে প্রাণ দেবার শক্তি তার নাই, ছবির বিষয় বস্তুকে ব্যক্তিগত-স্বাতন্ত্র্য-পূর্ণ একটী জীবন্ত প্রাণীতে পরিণত করা, তার ক্ষমতার অতীত। তখন খোদার কথা স্বতঃই তার মনে আসে, কেননা, একমাত্র তিনিই শরীরের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করতে পারেন।"

মোগল চিত্রকলা (Mughal Painting) শিল্প-জগতের অন্যতম গৌরবের বস্তু। আকবরের প্রেরণা এবং পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই এই বিশিষ্ট চিত্রকলা জন্মলাভ করে। একজন আমেরিকান লেখক লিখেছেন—From the end of 16th Century onwards, portraiture constituted one of the most prominent forms of artistic activity not only in Persia, but also in India. The Emperor Akbar (1556-1605) kept up a large establishment of over 100 painters, and employed them to illustrate his manscripts, especially the translations which he had made for his use of works of Sanskrit literature into Persian. The Emperor himself often sat for his portrait, and also ordered the portraits of the grandees of his Court to be taken of the Painters···Abdus Samad was especially noted for his skill in portrature and he was entrusted with the training of some of the other Court-painters." Vide Painting. Publishers—Garden City Publishing Company inc. উক্তকালে জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানের যুগ, মোগল চিত্রকলা ভারতবর্ষে সবিশেষ বিস্তার লাভ করেছিল, এবং ভারতীয় চিত্র শিল্পকে যথেষ্ট ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল।

ঊনত্রিশ

আকবর স্বয়ং সঙ্গীত রসজ্ঞ ছিলেন আর সর্ব্বতোভাবে সুরশিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং উৎসাহ বর্দ্ধন করতেন। আবুল ফজল লিখেছেন: "বাদশা সঙ্গীত বড় ভাল বাসেন, সুরশিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।" আকবরের দরবারে অসংখ্য পুরুষ এবং নারী সুরশিল্পী প্রতিপালিত হতেন। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুরশিল্পী তানসেন আকবরের দরবারেরই একটী উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। এখনও তানসেনকে ভারতীয় সুরশিল্পের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট রূপে সকলেই স্বীকার করেন।

স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা এক শাহজাহান ছাড়া কোন ভারতীয় নরপতি আকবরের মত কখনও করেন নি। স্থাপত্য শিল্পে তিনি যে অতুলনীয় কীর্ত্তি রেখে গেছেন তার আলোচনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিষদ ভাবে করা যাবে। বলা বাহুল্য যে, এই সব বিভিন্ন শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে, অসংখ্য আনুসঙ্গিক চারু এবং কারুশিল্প আকবরের যুগে, যথেষ্ট উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছিল। শিল্পদ্রব্যের চাহিদা সে যুগে অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। বাদশার গুণগ্রাহিতা এবং পৃষ্ঠপোষকতা, আমীর ওমরাহ, রাজা মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং চাহিদা, সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি, দেশের অদৃষ্টপূর্ব্ব শান্তি এবং শৃঙ্খলা, শিল্পের উন্নতি এবং বিস্তারের জন্য যে এক সুবর্ণ-সুযোগের সৃষ্টি করেছিল, সহজেই তা অনুমান করা যায়।

ত্রিংশ

রক্ষণশীলতার লীলাভূমি এই ভারতবর্ষে, আকবর উন্নতিশীলতা এবং নূতনত্ব প্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় আদর্শে নূতনত্ব, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নূতনত্ব, রাজস্ব আদায়ে নূতনত্ব, রাজস্বের বিলি-ব্যবস্থায় নূতনত্ব, যুদ্ধ-পরিচালনায় নূতনত্ব, যুদ্ধ বিভাগের ব্যবস্থায় নূতনত্ব, শিক্ষায় নূতনত্ব, সর্ব্ব ব্যাপারেই আকবর নূতনত্ব প্রীতির, উন্নতিশীলতার, এবং অদম্য গতিশীল মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সুযোগ্য মন্ত্রী টোডারমল্লের সাহায্যে, আকবর যে ভূমির কর আদায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, সে ব্যবস্থা এখনও চলে আসছে। আকবরের পূর্ব্বে চন্দ্রের তিথি অনুসারে (Lunar System) বৎসর গণনা করা হতো। আকবর সূর্য্যের গতি অনুসারে (Solar System) বৎসর গণনার রীতি প্রবর্ত্তন করেন। সেই রীতি ইলাহীসন বা ফসলী সন নামে বঙ্গদেশে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এখনও প্রচলিত। ভারতবর্ষের সম্রাটদের মধ্যে, আকবরই প্রথম নৌ-সামরিক বিভাগের সৃষ্টি করেন। নৌ-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর উপাধি ছিল আমীর উলবাহার বা Admiral, নৌ-বাহিনীর জন্য, বৎসরে ৮,৪০,০০০ টাকা বরাদ্দ ছিল। জাহাজ নির্ম্মাণ শিল্প আকবরের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। আকার, বহন শক্তি, গতি প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে শাহী বহরের জাহাজগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হতো। যুদ্ধের জন্য জাহাজে তোপের

ব্যাটারি রাখার ব্যবস্থাও ছিল। আকবর প্রায়ই বলতেন "সব ভাল জিনিষই, নিশ্চয় এককালে নূতন ছিল।" আকবরের সময়ই ভারতবর্ষে তামাকের পাতার আমদানী হয়। এই নূতনত্ব প্রিয় বাদশা পরীক্ষাচ্ছলে ধূম্র পানের চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এ চেষ্টা তিনি পরিত্যাগ করেন। আকবরের বিষয় একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক Dr. Holden সত্যই বলেছেন "He experimented in all departments, from religion to metallurgy." আকবরের নূতনত্ব প্রীতি, পরীক্ষা স্পৃহা এবং উন্নতিশীলতার বিষয় চিন্তা করলে, স্বতঃই আমাদের মনে হয় যে, যদি ভাগ্য নক্ষত্রের নির্দ্দেশে আমাদের যুগে তিনি ভারতের রাষ্ট্র জীবনের কর্ণধার হতেন, তাহলে, তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের মতই, তিনিও ভারতের সামাজিক, ব্যবহারিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনকে আধুনিক যুগের প্রয়োজন মত, সম্পূর্ণ নূতন এক ধাঁচে গঠন করতেন। প্রগতির পথে ভারতবর্ষের অভিনব জয়যাত্রা সুরু হতো।

(একত্রিশ)

শাহিন শাহের উপযোগী জাকজমকের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে জীবনযাপন করেও, আকবর সহজ, সরল, নিরাড়ম্বর, কর্ম্মবহুল জীবনই পছন্দ করতেন। জাকজমক ছিল তাঁর বাহিরের আবরণ, সম্রাটের গৌরব অক্ষুন্ন রাখার জন্যই সে আবরণ ব্যবহার করা হতো। কিন্তু এই আবরণের আড়ালে কাজ করতেন এক অক্লান্ত কর্ম্মী মহামানব, বিশ্বে নিজের আদর্শের প্রতিষ্ঠাই ছিল যার একমাত্র সাধনার বস্তু, সুখ দুঃখের একমাত্র উৎস। Elphinstone লিখেছেন :

In the midst of all his splendour, Akbar appeared with as much simplicity as dignity. He is thus described by two European eye witnesses, quoted by Purchas: After remarking that he had less show or state than others Asiatic Princes, and that he stood or sat below the throne to administer justice, they say, "He is affable and majestical, merciful, and severe; skilful in mechanical arts, as making guns, casting ordnance, etc; of sparing diet, sleeps but three hours a day, curiously industrious, affable to the Vulgar, seeming to grace them and their presents with more respective ceremonies than the grandees, loved and feared of his own, terrible to his enemies."

আকবরের মহত্ব স্পষ্ট করে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে সে যুগের পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রাষ্ট্র নেতাদের কথা স্মরণ করতে হয়। আকবরের যুগে, ষোড়শ শতাব্দীতে, অনেক অসাধারণ শক্তি এবং প্রতিভাশালী রাষ্ট্র-নেতা বিশ্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ, স্পেনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপ প্রভৃতির কথা আমরা জানি। এই সব সুসভ্য রাজ্যে, সে যুগে রাজার ধর্ম্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম্মের অনুসরণ করার জন্য অতি কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। ধর্ম্মের মতভেদের জন্য মানুষকে তখন ফাঁসি কাষ্ঠে চড়ান হত, আগুনে পোড়ান হত। বিজ্ঞানে নূতন মত প্রচারের জন্য Galilioকে যে ভীষণ শাস্তিভোগ করতে হয়েছিল, সে কথা পাঠক জানেন। পরাজিত শত্রুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা তখন অচিন্তনীয় ব্যাপার বলে গণ্য হ'ত। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ছিল তখনকার যুগের মানুষের কল্পনারও অতীত। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোক বঞ্চিত সেই ষোড়শ শতাব্দীতে, আকবর যে সংস্কার মুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন, অনাবিল সত্যের সন্ধানে তিনি যে ঐকান্তিকতা দেখিয়েছেন, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি তিনি যে উদার ব্যবহার করেছেন, পরাজিত শত্রুর প্রতি তিনি যে মহত্ব দেখিয়েছেন, জটিলতম রাষ্ট্রিয় সমস্যার সমাধানে তিনি যে অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র জীবনের ভিত্তি তিনি যে লোকাতীত জ্ঞানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সে সবের কথা ভাবলে, জ্ঞান বিজ্ঞানে সমুজ্জ্বল এই বিংশ শতাব্দীতেও আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই। এই বিরাটকায় মহাপুরুষের সম্মুখে মস্তক আমাদের শ্রদ্ধায় স্বতঃই নত হ'য়ে যায়। আমাদের অন্তরেও Sir William Slee-man-এর কথা: "Akbar has always appeared to me among sovereigns what Shakespeare was among poets" প্রতিধ্বনিত হয়।

ক্রমশঃ

লোক-সঙ্গীত

শ্রীমতিলাল দাশ

কাব্য ও সঙ্গীত মানুষের জীবনের প্রাচুর্য্যের পরিচয়। ক্ষুধা মানুষের শক্তির ক্ষয় করে কিন্তু মানুষকে জয় করে না, মানুষ তাই ফল ও তণ্ডুল লইয়াই তৃপ্ত নহে, ফুলের ফসল ও ফলায়। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে যে সাহিত্য গড়িতেছি তার ভাব ও পরিবেশ বিদেশের ধার করা। ইংরেজি-পড়া পাঠকদের জন্য তাহা লেখা, লেখকও আপন অজ্ঞাতে ইংরেজির মারফতে বিশ্ব জগতের ভাবধারায় নিজেকে ডুবাইয়া ফেলেন। শক্তিমানের কাছে তাহা হয় সৃষ্টি, অধমের কাছে অনুকৃতি।

দেশের যারা নর-নারায়ণ তাহাদের মনের ও ভাবের উপযোগী লেখা দুর্ল্লভ। অথচ পল্লী-সঙ্গীতের সরল অনাড়ম্বর মাধুর্য্য দেশের কৃষ্টি ও সাধনার পরিচয়ের পক্ষে অমূল্য সম্পৎ। কবি, জারি, তরজা, ভাসান, বাউল প্রভৃতি নানারকম নামের মাঝ দিয়া এই সকল সঙ্গীত আত্মপ্রকাশ করে।

ইহাদের প্রত্যেকের এক একটি বৈশিষ্ট্য আছে, আজ তাহার আলোচনা করিব না। কুষ্টিয়ায় লালন ফকিরের অনেক গান সংগ্রহ করিয়াছি তাহা হইতে লোক-সঙ্গীতের বিশিষ্ট প্রকৃতির পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

লোক-সঙ্গীতের যে আবহাওয়া—সেখানে হিন্দু ও মুসলমান বলিয়া ভেদ নাই। সেখানে উভয় সাধনার ভাব হইতে ধন আহরণ করিয়া এক মরমী সাধনার অভিব্যক্তি হইয়াছে। ফকির, বাউল, বৈষ্ণব ও দরবেশ যে সাধনা করেন, তাহার মূল মর্ম্ম অনুভূতির মধ্য দিয়া অলৌকিকের সহিত গভীর পরিচয়।

এই সাধনায় গুরুবাদের অতিশয় প্রাবল্য। গুরু মুক্তি-পথের পথ-প্রদর্শক। গুরুকে ধরিয়া রাখিলেই সহজে বৈতরণীর খেয়া পার হওয়া যাইবে। গুরুবাদ ভারতীয় সাধনায় অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছে—যুক্তিবাদী আমরা ইহাকে অবজ্ঞা করি, কিন্তু মরমী সাধনার ইহা ভিত্তি ও শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। লালন বলেন—

> গুরু বিনে কি ধন আছে।
> কি ধন খুঁজিস ক্ষ্যাপা কারও কাছে ?
> বিষয় ধনের ভরসা নাই, ধন বলতে ধন গুরু গোঁসাই
> সে ধনের দিয়ে দোহাই ভব তুফান যাবে বেঁয়ে
> পুত্র পরিবার বড় ধন ; পেয়েছ এই ভবের ভূষণ
> মায়ার ভুল হয়ে অবোধ মন, গুরু ধনকে ভাবাল মিছে।
> কোন ধনের কি গুণপণা, অন্তিমকালে যাবে জানা
> গুরুধন এখন চিনলে না অন্তমে পস্তাবি পাছে।
> গুরুধন অমূল্য ধন রে ; বুঝালে বুঝিস নারে,
> সিরাজ সাই কয় লালন তোরে, নিতান্ত পেঁচোয় পেয়েছে।

গুরুবাদের পরে আত্মতত্ত্ব এই সমস্ত বাউল গানের বিশেষত্ব। নিজেকে বিশ্বশক্তির সহিত অভিন্ন মনে করিয়া সেই অভিন্নতা লাভ করিবার যে বৈদান্তিক সাধনা, বাউলগণ তাহা সরল ও সহজ ভাষায় জন সাধারণের সম্পদ করিয়া দিয়াছেন।

> না জেনে ঘরের খবর, তাকাই আসমানে
> চাঁদ রয়েছে চাঁদে ঘেরা ঘরের ঈশাণ কোণে
> প্রথমে চাঁদ উদয় দক্ষিণে, কৃষ্ণপক্ষে আধা হয় বামে
> আধার দেখি শুক্ল পমে, কিরূপে যায় দক্ষিণে।"

খুঁজিলে আপন ঘরখানা,	নাই যে সকল ঠিকানা
বারমাসে চব্বিশ পক্ষ	অধর ধরা তার সনে।
স্বর্গ চন্দ্র, মণি চন্দ্র হয়,	তাহাতে বিভিন্ন কিছুই নয়,
এ চাঁদ ধরলে সে চাঁদ মেলে,	লালন কয় নির্জ্জনে।

ঘরের খবর জানিতে পারিলেই ব্রহ্ম জ্ঞানের উদ্ভব। এই জ্ঞানের পথে সহায় প্রেম ও অনুরাগ। অনুরাগ সাধনায় বৈষ্ণব তত্ত্ব যে পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া দেন, তাহার চেয়ে সুন্দর প্রকাশ মানুষের ভাষায় সম্ভব নহে। এই জন্য দেখি মুসলমান ফকিরগণও গোপী-প্রেমের সোনা লাভের জন্য হৃদয়-খনি খুঁড়িতে সদা সচেষ্ট।

> ব্রজের সে প্রেমের মর্ম্ম সবায় কি জানে ?
> শ্যাম অঙ্গ গৌরাঙ্গ হল যে প্রেম সাধনে।
> সামান্য বিশ্বাস রতি, মৃণাল চলে যুগল গতি,
> বিশ্বাস সাধিতে বাদী হয় গো সামান্তে।
> প্রেমময়ী কমলি রাই কমলাকান্তের কামরূপ সদাই
> কামী প্রেমী সে দুজন হয়, প্রণয় কেমনে ?
> সহজে দেয় রাই রতি দান, শ্যাম রতির কৈ হয় সে প্রমাণ,
> লালন বলে তার কি সন্ধান, পায় গুরু বিনে।

এই প্রেম অনুভূতির সামগ্রী, বিচার ও তর্কের নয়। গুরুর নির্দ্দেশ মত সে সাধনা করিতে হয়।

আমরা অবিশ্বাসী, সে সাধনার খবর জানিনা, তবে গানে সে সাধনায় যে বহিরঙ্গের পরিচয় পাই তাহারই কথা বলিতেছি।

> জেল দরিয়ায় ডুবিলে সে দরের খবর পায়,
> নইলে পুথি পড়ে পণ্ডিত হলে কি হয় ?
> স্বয়ং রূপ দর্পণে ধরে মানবরূপে সৃষ্টি করে হে,
> দিব্য জ্ঞানী যারা, ভাবে বোঝে তারা
> মানুষ ভজে কার্য্য সিদ্ধি করে যায়।
> একেতে হয় তিনটি আকার, আপনি সহজ সংস্কার হে
> যদি ভব তরঙ্গে তরো মানুষ চিনে ধরো,
> দিনমণি গেলে কি হবে উপায় ?
> মূল হতে হয় জ্ঞানের সৃজন, ডাল ধরলে হয় মূলের
> অন্বেষণ হে,
> তেমনি রূপ হইতে স্বরূপ, তারে জেনে বিরূপ
> অবোধ লালন সদাই নিরূপ, ধরতে চায়।

মানুষের মধ্যেই বিশ্বের কর্ত্তার আবির্ভাব দেখা সম্বন্ধে তান্ত্রিক সাধনা যে দেহ তত্ত্বের কথা প্রচার করিয়াছিল, জননারায়ণ সেই দেহতত্ত্বকে একান্ত নিজস্ব করিয়া তুলিয়া-

ছিল। আমাদের দেশের কামনাকুশলী মন দেহভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাবের তত্ত্বকে অতি সহজে হজম করিতে পারিয়াছিল।

কি এক অচিন পাখী পুষলাম খাঁচায়
না হলো জনম ভরে তার পরিচয়।
পাখী রাম-রহিম বুলি বলে, ধরে সে অনন্ত লীলে,
বল তারে কে চিনিলে বলরে নিশ্চয়।
আঁখির কোণায় পাখীর বাসা দেখতে নারে কি তামাসা,
আমার এই আঁদলা দশা কে আর ঘুচায়?
যারে সাথে সাথে নিয়ে ফিরি, তারে যদি চিনতে নারি,
লালন কয় অধর ধরি কোন ধরজায়?

অচিন পাখীকে চিনিবার যে পিপাসা সে অফুরন্ত। মানুষের জগতে যুগ যুগান্তর এই যে চেষ্টা চলিয়াছে, তাহাকে অবজ্ঞা করি কোন দুঃসাহসে? কিন্তু এই সাধনার রূপ ও পরিচয় আমাদের কাছে একান্ত আবছায়া। রসের খোঁজ না জানিয়া রস-পরিচয় করিতে বসিয়াছি। সাধকের হয় ত মর্ম্মপীড়া হইতে পারে, কিন্তু পীড়া দিবার দুর্ম্মতি নাই। লালনই বলেন :—

রসের রসিক না হলে কে গো জানতে পায়।
কোথা সে অটল অরূপে বারাম দেয়।
শূন্য ঘরে শয্যা করে, পাতালপুরে শয়ন দেয়,
অরসিক বেড়ায় ঘুরে ঘোর ধাঁধায়?
মন চোরা চোর সেই সে নাগারে।
তলে আসে তলে যায়, উপর উপর খুঁজি জীব সবায়।
মাটি ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে আসমানে হাত বাড়ায়।
ও মন পড়ে সে কাকের শেষ থানায়।
তাল পর তাল ধর, তবে সব জানতে পায়
লালন বলে উঁচা মনের কার্য্য নয়।

এই রসতত্ত্বের সাধনার ব্যভিচার হইয়াছে। নিষ্কাম হইবার জন্য যে তপস্যা তাহা মানুষকে অনেক ক্ষেত্রে লালসার পঙ্কে ডুবাইয়া ফেলিয়াছে। আগুন নিয়া খেলা সহজ নহে। কিন্তু সেই সাধনাকে সহজিয়ারা সহজ করিতে গিয়া দেশের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছেন। কিন্তু রস সাধনা ও অনুরাগ সাধনার মধ্যে এই ব্যভিচার ও ইন্দ্রিয় প্রসক্তির বিরুদ্ধেই সাধকের বিশেষ নিষেধ দেখিতে পাই।

মন আমার! তুই করলি এ কি ইতরপানা
দুদ্ধেতে যেমন রে মন তোর মিশলো চুণা।
শুদ্ধ রাগে থাকতে যদি, হাতে পেতে অটল নিধি,
বলি মন তাই নিরবধি বাগ মানে না
কি বৈদিকে ঘিরলো হৃদয়, হলনা সুরাগের উদয়
নয়ন থাকিতে সদয় হলি কানা
বাপের ধন তোর খেল সাপে,
জ্ঞান চক্ষু নাই দেখবি কারে
লালন বলে হিসাব কালে যাবে জানা

যে অনুরাগে রসতত্ত্ব মিলে সে অনুরাগ শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ হওয়া চাই। কামনার কলুষে তাহা কলুষিত হইলে সাধনা চলে না। সাধনার জন্য, রসের লীলা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে হইবে কিন্তু সে রস কামনার নয়, কামনা জয়ের।

মন আমার না জেনে মজনা পিরীতে,
জেনে শুনে করগে পিরীত, শেষ ভাল যাতে।
এক পিরীতের বিভাগে, চলল কেউ স্বর্গে কেউ নরকে
জেনে শুনে বলছে লালন এই জগতে।
ভবের পিরীত ভূতের কীর্ত্তন, ক্ষণেক বিচ্ছেদ ক্ষণেক মিলন,
অবশেষেতে হবে মরণ তেমোসা পথে।
পিরীতির হয় বাসনা, সাধুর কাছে কর আনাগোনা,
লোহা যেমন পরসো সোনা হবে সে মতে।

এ প্রেম অসীম তত্ত্ব। ইহার কূল কিনারা নাই। এ প্রেম যে পায়—সে জাগতিক ধনকে তুচ্ছ করিয়া অনন্ত আনন্দরসে ডুবিয়া যায়।

শুদ্ধ প্রেমের প্রেমিক মানুষ যেজন হয়,
মুখে কথা ক'ক বা না ক'ক নয়ন দেখলে চেনা যায়,
মণিহারা ফণি যেমন প্রেমরসিকের দুটি নয়ন,
কি দেখে কি করে সে জন, কে তাহার অন্তরায়?
রূপে নয়ন করে খাটি, ভুলে যায় সে নামমন্ত্রটি,
চিত্রগুপ্ত তার পাপপুণ্য কিরূপ লেখে খাতায়
গুরুত কি কয় বারে বারে লালন বলি তোকে,
তুমি মদন সে বেড়াও ঘুরে সে প্রেম মনে কৈ দাঁড়ায়?

এই সমস্ত কবিতার বিশেষত্ব—ইহাদের স্বচ্ছতা। স্বাভাবিকতা ও আন্তরিকতায় ইহারা সমুজ্জ্বল। উপমা ও অলঙ্কার, শব্দচয়ন ও গঠন একান্তই সাধারণ জীবনের। সাধারণ বিষয়ের দ্বারা যে ইঙ্গিত করা হয় আশ্চর্য্যের বিষয় দেশের নিরক্ষর শ্রোতারা তাহা অবলীলাক্রমে বুঝিতে পারেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নলিখিত গানটি তুলিতেছি।

রংমহালে সিদ কাটে সদাই কোথায় সে চোরের বাড়ী?
পেলে তারে কয়েদ করে পায়ে দিতেম মন বেড়ী।
সিঁদ-দরজায় চৌকিদার একজন
অহর্নিশি আছে সে চেতন
কিরূপে তারে ভেলকি মেরে চুরি করে কেনা ঘড়ি!
ঘর বেড়িয়ে ষোলজন সেপাই তার এক একজনার গুণের সীমা নেই,
তারাও চোরের না পেল টের কার হাতে দিবদড়ি?

উপমাগুলি সাধারণ চোর ও চুরি হইতে লওয়া হইয়াছে বলিয়া সাধারণ শ্রোতা ইহাতে যথেষ্ট আমোদ পায়। রূপক অলঙ্কারের প্রচারকরা এই সমস্ত ভাব দিয়া অবোধ্য তত্ত্ব সুগম করিবার চেষ্টা করিয়াছে। নিম্নের গানে এইরূপ তত্ত্বপূর্ণ সাধনার কথা বলা যায়। হেঁয়ালির ভাব আছে কিন্তু মর্ম্ম কথাটি হেঁয়ালির মধ্য হইতেও বোঝা যায়।

হায়! কি কলের ঘরখানি বেঁধে তাহে বিরাজ করে সাঁই আজার,
দেখবি যদি সে কুদরতি দেল দরিয়ায় খবর কর।

জলে জোড়া সকল সেই ঘরে,
তার খুটির গোড়া শূন্যের উপরে
আবার শূন্যের উপর তার সন্ধি করে চার যুগ আছে অধর।
তিন পরিমাণ যায়গা বলা যায়, আছে শত শত কুঠুরি কোঠা তায়,
ও তার নীচে উপর নয়টি দুয়ার নয় ভাবে সাঁই দিচ্ছে বায়।
ঘরের মালিক আছে বর্ত্তমান। একদিন তারে দেখলিনারে,
দেখবি আর কখন?
সেরাজ সাঁই কয় লালন তোমায় বলবো কি সাঁইর কীর্ত্তি আর।

অনেকে হয় ত বলিবেন এই সমস্ত গানে দেশের বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের ও বিভিন্ন সাধনার জগা খিচুড়ি করা হইয়াছে। কোথাও কোথা তাহা হইয়াছে বটে। কিন্তু তাহা হইলেও এই সমস্ত লোক সঙ্গীত দেশের সাধারণ মানুষের দ্বারে দ্বারে আমাদের দেশের ধর্ম্মসাধনার কঠিন তত্ত্বের অমৃত পরিবেশন করিয়াছে এবং সমস্ত সাধনা সেই এক অদ্বয় অখণ্ড রসে নিয়া যায় একথা বুঝাইয়াছে।

সাধন জ্ঞানহীন আমরা এই সমস্ত তত্ত্বকে ও রসকে অবজ্ঞা করি, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যাহারা এই দেশে এই পারমার্থিক রসের জন্য তপস্যা করিয়াছেন তাহারা পুনঃ পুনঃ তারস্বরে বলিয়াছেন যে পথের তারতম্য কিছুই নয়। সকল পথই অনুভূতিবেদ্য সেই অমৃতরসে পৌঁছাইয়া দেয়।

অবজ্ঞাত লোক সঙ্গীতের মধ্যে আমাদের দেশের এই mystic inspiration আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সেইজন্য এগুলির সংগ্রহ বাংলা সাহিত্যের নামে একান্তই প্রয়োজনীয়। আমাদের ভাষা, ভাব ও ভঙ্গী ক্রমশঃ ইংরেজি হইয়া উঠিতেছি—ইংরেজি কথন রীতিকে আমরা কেবলই মনে মনে অনুবাদ করিয়া ভাষা রচনা করি। এই জন্যই দেখা যায় দুজন শিক্ষিত বাঙালী, এক ঘণ্টা কথাবার্ত্তা কহিলে অন্ততঃ—বার পঁচিশ ইংরেজি বুকনি ব্যবহার করেন! এই সমস্ত লোকসঙ্গীত আমাদের পরিবেশের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত ভাবগর্ভ যে সমস্ত imagery ব্যবহার করিয়াছে, তাহা হইতে আমরা সাহিত্যকেও পুষ্ট করিতে পারিব।

মানুষের মধ্যেই সমস্ত সত্য ও জ্ঞান বর্ত্তমান। সহজ সাধনায় এই কথাই চণ্ডিদাসের

শুনরে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

এই গানে কল্পিত হইয়াছে। ঐ গানের ব্যাখ্যায় মানবত্তার জয়গান হয় নাই। দেহতত্ত্বের জয় গান করা হইয়াছে। দেহতত্ত্বের একখানি সুন্দর গান দিয়াই এই দীর্ঘ প্রবন্ধের শেষ করিব।

এই মানুষে সেই মানুষ আছে,
কত মুনি ঋষি যার যুগ ভরে বেড়াচ্ছে খুঁজে,
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়, ধরতে গেলে হাতে কে পায়
তেমনি সদাই আছে আলোকে বসে।
অচিন দলে বসতি ঘর, ছিদল পথে বারাম তার
ও সে দল নিরূপণ হবে যাহার দেখবি অনায়াসে।
আমার হলো কি ভ্রান্তি মন, আমি বাইরে খুজি ঘরের ধন,
দরবেশ সেরাজ সাই কয় ঘুরবি-লালন আত্মতত্ত্ব না বুঝে।

বাংলার পল্লীতে পল্লীতে এইরূপে শত শত সুন্দর গান আছে। সাধক ও রসিক, মরমী ও ভাবুকগণ এই সমস্ত মণির সন্ধান করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করুন।

বঙ্গভাষায় রাগ-সঙ্গীত

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

বাংলা ভাষায় আধুনিক বাংলা গান ব'লে যে সঙ্গীত বর্ত্তমানে প্রচলিত র'য়েছে, তার প্রবর্ত্তক কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ও নটরাজ দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁদের প্রদর্শিত পথে নানা বৈচিত্র্য এনে অন্যান্য কবিরা আধুনিক বাংলা গানের নানা দিক্ খুলে ধরেছেন। আধুনিক বাংলা গান কাব্যপ্রধান ও ভাবপ্রধান, কেননা বাংলায় কবিতার উৎকর্ষ ভারতের সব সংস্কৃতিকে ছাপিয়ে উঠেছে। তবে কাব্যপ্রধান সঙ্গীত ছাড়া রাগপ্রধান সঙ্গীত রচনাতেও রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ও তাঁদের পরে দিলীপকুমার, নজরুল প্রভৃতি কবিগণ বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কাব্যপ্রধান গান বলতে আমরা বুঝি সেইসব গান, যাতে কাব্যরস ও কাব্যছন্দই প্রধান এবং সুর ও সঙ্গীত কবিতাকে অধিকতর সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত ক'রবার জন্য কবিতার অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হ'য়েছে। এই সব গানে বিশেষ বিশেষ রাগের প্রকাশ লক্ষ্যনীয় নয়—কাব্যোপযোগী বিচিত্র সুরের সমাবেশে এ সব গান সমৃদ্ধ। আমাদের প্রাচীন পদাবলী কীর্ত্তনকেও এই কাব্যসঙ্গীতের মূল উৎস রূপেই আমরা সহজেই চিন্‌তে পারি।

পক্ষান্তরে রাগ-সঙ্গীতে বিশেষ বিশেষ রাগ ও সেইগুলির সমাবেশে সুর ও রাগের রসকে প্রকাশ করাই আসল কথা—এ ক্ষেত্রে রাগ কবিতার বাহন নয়—কবিতাই রাগের বাহন। বলা বাহুল্য, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ও কর্ণাটী সঙ্গীত রাগ-সঙ্গীত রচনার প্রধান দুইটী আদর্শ রূপে বহু শতাব্দী ধ'রে ভারতীয় সঙ্গীত-সংস্কৃতির অনুপ্রেরণা দান ক'রেছে। এই দুই সঙ্গীত পদ্ধতির মধ্যে বাংলা দেশ হিন্দুস্থানী সঙ্গীত রাগসকলের দ্বারাই প্রভাবিত—কর্ণাটী সঙ্গীতের প্রভাব এ দেশে আসেনি।

বৈষ্ণব মহাজনগণ ও বাংলার প্রধান প্রধান কবিগণ হিন্দুস্থানী রাগসমূহ থেকে অনেক সম্পদ গ্রহণ ক'রে বাংলার কাব্য-সঙ্গীতকে চিরদিনই সমৃদ্ধ ক'রেছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার কোনো সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে রাগের সম্পদ অপার—কিন্তু বাংলার

কবিত্বসম্পদও অন্যদিকে উন্নতির শেষ চূড়ায় উঠেছে। তাই বাংলা গানে বাংলা কবিতার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সম্পদ হারালে চ'লবে না—কবিতার সৌকুমার্য্য, সৌন্দর্য্য ও রস অক্ষুণ্ণ রেখেই যতটা সম্ভব হিন্দুস্থানী সঙ্গীত থেকে রাগের সুষমা আহরণ ক'রতে হবে।

রাগ-সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রেও তাই দেখি, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, দিলীপকুমার ও নজরুল বাংলা কবিতার বিশেষ দান ও বিশেষ রূপ রক্ষা ক'রেই নানা রাগের গান রচনা ক'রেছেন। বাংলা রাগসঙ্গীত রচনা তাই হিন্দুস্থানী গানের নকল হ'লে চলবে না—এতে বাংলার কবিতার নিজস্ব ছন্দ, নিজস্ব ভাব ও রূপ থাকা চাই। পূর্ব্বোক্ত চারি কবির বিরচিত নানা রাগমূলক গানের ছন্দ ও সুর আলোচনা ক'রলে সবাই এ কথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারবেন।

বর্ত্তমানে অনেক প্রতিভাশালী বাঙালী গায়ক বাংলা রাগসঙ্গীত উচ্চসঙ্গীতের আসরে গাইছেন—এঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত জ্ঞান গোঁসাই ও অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র অগ্রগণ্য—এঁদের কণ্ঠস্বর ও রাগবিকাশ অনুপম, অথচ বাংলা গানে এঁরা সঙ্গীত-প্রতিভার নতুন ধারা এ দেশে নিয়ে এসেছেন। এঁদের গান, শিক্ষার্থীদের পক্ষে অবশ্য অনুকরনীয় এবং রেডিও ও রেকর্ডযোগে শিক্ষনীয়। এঁরা সঙ্গীতের রূপও যেমন বিস্তারিত রূপে বিকশিত ক'রেছেন, তেম্‌নি গানের কবিত্ব সম্পদেও এঁদের উপলব্ধি যথেষ্ট; তাই গানের সময় গীতপদের উচ্চারণে বাংলা গানের বিশেষ ছন্দ ও বিশেষ ঢং এঁদের কণ্ঠে পরিষ্কার হ'য়ে ফুটে ওঠে। দিলীপকুমারের কণ্ঠসঙ্গীতও অতুলনীয় এবং তিনি কাব্য ও রাগ—এ সকলের আবেদনে অশেষ বৈচিত্র্য দান করেন।

বাংলার ভবিষ্যৎ রাগ-সঙ্গীত গায়কগণ এদের উদাহরণ থেকে বাংলা গান গাইবার প্রেরণা শুধু নয়—অনেক শিক্ষাও লাভ করবেন। রাগ-সঙ্গীতে বাংলা গানের ধারার সূত্রপাত শুধু হ'য়েছে, এর পূর্ণ বিকাশ এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। বাংলা গানে রাগ-সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ বিকাশ কি হবে, তা বহু পরীক্ষা সাপেক্ষ। এ বিষয়ে যারা অগ্রণী বর্ত্তমানে, তাঁদের জনসমাজের কাছে নানা ভাবেই উপহসনীয় হ'তে হবে—কেন না কোনো নূতন সৃষ্টিই গোড়াতেই দোষ, ত্রুটী ও প্রমাদের বহির্ভূত হ'তে পারে না। বিশেষ দৈব প্রেরণার সৃষ্টির কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। আমাদের ঋষিরা গোড়াতেই দিব্য অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। ঋষিদের পরেও অনেক মহাকবি সরস্বতীর আশীর্ব্বাদে প্রথম শ্লোক বা কবিতাতেই অনবদ্য কাব্য-প্রেরণা লাভ করেছিলেন। কিন্তু আমরা সবাই ঋষি বা মহামনীষী নই, তাই আমাদের রচিত রাগ-সঙ্গীতে প্রথম প্রথম এমন অঙ্গহীনতা বা দোষ চোখে প'ড়বেই, যা হিন্দুস্থানী রাগ-সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনায় হাস্যকর। কিন্তু অগ্রণীদের তাই ব'লে নিরুৎসাহ হ'লে চলবে না—সৃষ্টির পথে, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই বাংলায় রাগ-সঙ্গীতের নূতন দোষলেশহীন সুন্দর রূপায়ন সম্ভব হবে।

বাংলা রাগ-সঙ্গীতের ছন্দ ও সুরের কায়দা হিন্দুস্থানী রাগ-সঙ্গীতের চেয়ে নিশ্চয়ই তফাৎ হ'বে। তার কারণ—বাংলা ভাষার শব্দোচ্চারণ ও বাংলা কবিতার ছন্দ-বন্ধন হিন্দুস্থানী হ'তে স্বতন্ত্র। রাগ-প্রধান গীতেও বাহন-রূপী ভাষার বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করা চলে না। তাই দেখি, রাগ-রূপের বিস্তারে সুরের যে সব গমক ও অলঙ্কার রাগ-সঙ্গীতকে সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত করে, বাংলা গানে সে সব অলঙ্কার ভারস্বরূপ হ'য়ে ওঠে। বাংলা গানে বাংলা কবিতাকে আশ্রয় ক'রে সুরের গতি লীলায়িত হয়। বাংলা কবিতার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে বা পার্থক্য আছে—যার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হ'লে বিশেষ বিশেষ স্বর-গমক্‌ অধিক উপযোগী হয়। কোন্‌ কোন্‌ স্বরালঙ্কার বা গমক বাংলা গানের উপযোগী—তা কোনো নির্দ্দিষ্ট আইনে বেঁধে দেওয়া চলে না। এ সবই গীতকারের রাগ-রস সম্বন্ধে নিবিড় সহানুভূতি, সৃষ্টি-প্রেরণা ও পরীক্ষালব্ধ দৃষ্টির উপরে নির্ভর করে। ছন্দ, অলঙ্কার, স্বরগমক প্রভৃতির ব্যবহার বাংলা গানে হিন্দুস্থানী অপেক্ষা বিভিন্ন হলেও হিন্দুস্থানী রাগ সব সম্পূর্ণ রূপেই বাংলা রাগপ্রধান গানে প্রকাশিত হ'তে পারে। বাংলা গানের পদের মধ্য দিয়ে রাগের সমগ্র রূপ নিশ্চয়ই ফুটতে পারে, এমন কি বাংলা কথায় রাগালাপ পর্য্যন্ত গাওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে কীর্ত্তন ও কথকতার মধ্য দিয়ে কিছু কিছু চেষ্টা বাংলায় অনেক পূর্ব্ব থেকেই হ'য়ে আসছে। কথকেরা একটি কাহিনী বা কথার মধ্য দিয়ে তালবর্জ্জিত রাগালাপের ব্যবহার অনেক সময় দেখিয়ে আসছেন, তা এখনও বিশেষ ভাবেই অনুসরনীয়।

ভাষার প্রভেদে শুধু কাব্য সঙ্গীতে নয়, রাগপ্রধান সঙ্গীতেও সুরের ঢং ও অলঙ্কারের কিরূপ তফাৎ হয়, তা আমরা সংস্কৃত ছন্দপ্রবন্ধাত্মক সঙ্গীত ও হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ খেয়ালের আলোচনাতেও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়া হিন্দুস্থানী রাগপদ্ধতি অবশ্য সংস্কৃত হ'তে অনেক স্বতন্ত্র, কিন্তু রাগপদ্ধতির কথা বাদ দিলেও একই রাগে একটি সংস্কৃত মার্গ হয় দেশী গান ও একটি হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ বা খেয়ালে সুরের চালচলন তফাৎ হ'য়ে পড়ে। তেমনি কর্ণাটী সঙ্গীতেও হিন্দুস্থানী রাগের অনুরূপ কর্ণাটী রাগের গানে ও তানে এমন অনেক বিশেষ লক্ষণ আছে, যা হিন্দুস্থানীতে নেই। বাংলা রাগপ্রধান গানও তাই হিন্দুস্থানীর হুবহু নকল হ'তে পারে না। বাংলার যত রাগাত্মক সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ হ'তে থাকবে, বাংলা রাগ-প্রধান সঙ্গীতের নিজস্ব বিশেষত্ব তাই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যদিও তাতে থাকবে প্রধানতঃ হিন্দুস্থানী রাগমালার মূর্ত্ত অবদান।

গান

দুর্গা-জয়জয়ন্তী মিশ্র—একতাল

কথা—শ্রীরণজিৎকুমার সেন   সুর ও স্বরলিপি—শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

সুর যদি জেগে ছিল,
প্রাণ কেন তবে ঢাকা ?
দেখ নি কি ছিল নভে
আধখানি চাঁদ বাঁকা ?

ছিল বনে ফুলদল
জ্যোছনায় ঝলমল,
আঁখি দু'টি ছিল কি গো
ঘুমের আবেশ মাখা ?

ফুরালো সে মধু বেলা,
হোলো রাত্তি অবসান ;
সুর কেঁদে ফিরে যায়,
প্রাণ কোথা হে পাষাণ ?

আর কি গো মায়া-চাঁদ
ফাঁদিবে রূপালী ফাঁদ,
কুঞ্জে র'বে কি বলো
রাতের মাধুরী আঁকা ?

—স্বরলিপি—

স্থায়ী

০			১			+			৩		
সা	-রা	মা	পা	ধা	মা	-র্সা	-া	-ধা	-া	-া	-া
সু	র্	য	দি	জে	গে	ছি	•	ল	•	•	•
ধা	-র্রা	র্সা	ধা	পা	ধা	মা	-রা	রা	-র্সা	-ণা	-া
প্রা	ণ্	কে	ন	ত	বে	ঢা	•	কা	•	•	•
ধা	ধর্সা	র্রর্সা	ধা	পা	ধা	মা	-রা	-গা	গা	-সা	-া
দে	খ•	নি•	কি	ছি	ল	ন	•	ভে	ভে	•	•
গমা	-গরা	সা	রা	ণা	-ধা	সা	-মা	সা	-সা	-গা	-পা
আ•	ধ•	খা	নি	চাঁ	দ্	বাঁ	•	কা	•	•	•

অন্তরা

০			১			+			৩		
ধা	মা	পা	-রা	মা	পা	র্সা	-ধা	-র্সা	-া	-া	-া
ছি	ল	ব	নে	ফু	ল	দ	০	ল্	০	০	০
ধা	র্সা	র্রা	-র্মর্জ্জা	র্রা	র্সা	র্সা	-নর্সা	-র্বর্সা	-র্সা	-ণা	-ণা
জ্যো	ছ	না	য়	ঝ	ল	ম	০০	০০	০	০	ল
ধা	ণা	র্সা	র্সা	-পা	পা	মগা	-রগা	পধপা	পা	-মা	-া
আঁ	খি	ছু	টি	ছি	ল	ক্বি০	০০	০০০	গো	০	০
সরা	সরা	রা	ণ্া	ধ্া	প্া	-জ্ঞা	-া	রা	-গা	-া	-া
ঘু০	মে০	র	আ	বে	শ	মা	০	খা	০	০	০

ভোগ ও আভোগ

০			১			+			৩		
না	সা	রা	সা	ণ্া	প্া	ণ্া	-প্া	-রা	-া	-া	-া
ফু	রা	লো	সে	ম	ধু	বে	০	লা	০	০	০
রা	গা	রা	গা	মধা	পা	মা	-গা	-রা	-মজ্ঞা	-া	-া
হো	লো	রা	তি	অ০	ব	সা	০	০	০	ন্	০
রা	-জ্ঞা	পা	জ্ঞপা	ধা	-র্সা	ধধা	পপা	-জ্ঞজ্ঞা	-রা	-া	-া
সু	র্	কেঁ	দে০	ফি	রে	যা০	০০	০০	০	য়্	০
ধা	-া	রা	রা	ণ্া	প্া	পা	-সণ্া	-সা	-রা	-গা	-মা
প্রা	ণ্	কো	থা	হে	পা	ষা	০	০	০	০	ণ্
পা	-া	রা	রা	ণ্া	-জ্ঞা	রা	-া	-া	-া	-া	-া
প্রা	ণ্	কো	থা	হে	পা	ষা	০	০	০	০	ণ্
ধা	-া	মা	মা	পা	ধসা	ধা	-র্সা	-া	-া	-া	-া
আ	র্	কি	গো	মা	য়া০	চাঁ	০	দ্	০	০	০
ধা	র্সা	র্রা	র্সা	ধা	-মা	মা	-ধা	-া	-া	-া	-া
কাঁ	দি	বে	রূ	পা	লী	কাঁ	০	দ্	০	০	০
ধা	-ণা	র্সা	পা	ধা	পা	মগা	-রগা	পধপা	পা	-মা	-া
কু	০	ঞ্জে	র	বে	কি	ব০	০০	০০০	লো	০	০
সা	গা	পা	গা	পা	ধা	গপা	ধর্সণা	ধা	-া	-া	-া
রা	তে	র	মা	ধু	রী	আঁ০	০০০	কা	০	০	০

'আধখানি চাঁদ.........' ইত্যাদি।

চীনে জাপ অভিযান

শ্রীতারানাথ রায় চৌধুরী

মর্ম্মান্তিক আঘাত না পেলে আঘাত দেবার শক্তি অর্জ্জন করা কোন জাতির পক্ষেই সহজ নহে। জাপান একদিন বৈদেশিক ইউরোপীয় জাতি কর্ত্তৃক মর্ম্মান্তিক আঘাত পেয়েছিল, তার সামুদ্রিক বন্দর হঠাৎ শ্বেতাঙ্গ জাতির যুদ্ধ জাহাজ হতে নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে যখন ধ্বংস হতে চলেছিল, তখন জাপানের চৈতন্য হয়। সে আজ অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার কথা, জাপানের বিচ্ছিন্ন শক্তি সম্প্রদায়গত বিবাদ জাপানকে শক্তি সংগঠনে বাধা দিয়েছিল, জাপান আঘাত পেয়ে হঠাৎ জেগে উঠে, আজ সে দুর্ব্বার অজেয় শক্তি নিয়ে পাশ্চাত্য জাতিগুলিকে সমরে আহ্বান করে এসেছে, তার ভয় নেই, ভাবনা নেই, চীনও গৃহযুদ্ধে, প্রাদেশিক স্বার্থ সংঘর্ষে এমনই করে তিল তিল করে ধ্বংস হতে চলে ছিল, এমন সময়ে চীন নব প্রেরণা পেয়ে জেগে উঠে চীনের ঋষি সান্-ইয়াৎ-সেন চীনকে নবমন্ত্রে দীক্ষা দেয়। আজ তারই সাধন লব্ধ শক্তি পেয়ে চীন জাপানের বর্ব্বর আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য পঞ্চ বর্ষব্যাপী মহাসমরে লিপ্ত আছে, চীনের ভবিষ্যৎ যাহাই থাকুক, চীন যে প্রতি পদে পদে জাপানের সামরিক শক্তিকে বাধা দিতেছে, তাহাতেই চীনের বর্ত্তমান সমর-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই পঞ্চ বর্ষব্যাপী যুদ্ধ এবং মিত্রশক্তির সহিত যোগ দিয়ে চীন আজ আত্মরক্ষার জন্য মরণ পণ করেছে। কি করে চীন এই শক্তি অর্জ্জন করল, সেইকথাই আলোচনা করা উচিত।

চীনের বর্ত্তমান সামরিক নেতা চীয়াং-কাইশেক, সমগ্র চীনকে একই পতাকাতলে দাঁড় করাতে পেরেছে, চীনের প্রত্যেক নরনারী আজ মৃত্যু পণ করে দেশ রক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েছে. বিপুল দেশের প্রত্যেক পল্লীর নর নারী বিপুল বিক্রমে জাপানকে বাধা দিতেছে, এমনকি চীনের সৈন্যগণ আজ ভারতবর্ষেও এসে জাপানকে বাধা দিতে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের সহিত একই সমর প্রাঙ্গণে দাঁড়ায়েছে, এই দৃশ্য শ্রদ্ধার সহিত দেখার দরকার।

চীনের লোকবল যথেষ্ট থাকিলেও এই প্রাচীন প্রাচ্য জাতি আধুনিক অস্ত্রে শস্ত্রে আপনাকে শক্তিমান করে নাই, বিদেশে কোন জাতিকে বা কোন দেশকে আক্রমণ করা চীনের বৈদেশিক নীতির অঙ্গীভুত নয়, কাজেই দেশ রক্ষার প্রয়োজনানুরূপ শক্তি তাহার ছিল, কিন্তু পুনঃ পুনঃ বৈদেশিক আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চীন আধুনিক সমর বিজ্ঞানে আপনাকে গড়িয়ে তোলে. দেশের সর্ব্বত্র সামরিক বিদ্যা শিক্ষার জন্য শিক্ষা কেন্দ্র খুলে দেশের আপামর জন-সাধারণকে সমর বিজয়ী সেনারূপে গড়ে তুলেছে। প্রতি প্রদেশে সমর বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, যুদ্ধের পূর্ব্বে মাত্র বারটী স্কুলে সমর বিদ্যা শিখান হোত। তারপর বিপদে পড়ে সমর বিদ্যা শিক্ষার জন্য একটী বোর্ড গঠন করে, এখন সে স্থলে ২৬টী বিদ্যালয়ে সমর বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। চুংকিংএর সন্নিকটে এই বিদ্যালয়ের প্রধান কেন্দ্র। অশ্বারোহী সৈন্য প্রস্তুতের জন্যও বিরাট শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ইহা ব্যতীত আধুনিক [মিকানাইজড্ সৈন্যদল] গঠনের জন্যও সমর বিভাগের "যোগান" দিতে বহু কেন্দ্রে শিক্ষালয় খোলা হয়েছে। চীনের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে পদাতিক বাহিনী গঠনের জন্যও শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছে, আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র শিক্ষা করবার জন্য, গরিলা যুদ্ধ শিক্ষার জন্য৫ কেন্দ্রে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, এই সকল বিদ্যালয়ে যাহাতে অধিকসংখ্যক বিদ্যার্থী প্রবেশ করতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা আছে, এখন প্রত্যেক শিক্ষা-কেন্দ্রে ন্যূনপক্ষে দশ হাজার অফিসার তৈরীর বন্দোবস্ত হয়েছে।

প্রচারকদল এই সকল বিদ্যালয়ের জন্য সর্ব্বত্র ঘুরে ছাত্র সংগ্রহ করছে, প্রত্যেক শিক্ষা কেন্দ্রের সহিতই যুদ্ধক্ষেত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে, অভিজ্ঞ সমর শাস্ত্র বিশারদ ব্যক্তিগণ এই সকল শিক্ষা কেন্দ্রের ভার গ্রহণ করেছেন, প্রচারের জন্য শিক্ষার সৌকার্য্যার্থে প্রচার-পত্রও সর্ব্বদা ছাপান হইতেছে।

সামরিক বিদ্যালয়ের প্রধান কেন্দ্রে গ্যাস নিরোধক বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের শীতকালে উত্তর সুজুয়ান প্রদেশের পালিংময়াওর সংগ্রামে এই গ্যাস নিরোধক বিদ্যার স্বার্থকতা প্রমাণিত হয়েছে। শত্রুপক্ষ অর্থাৎ জাপান সৈন্য এখানে যুদ্ধে গ্যাস ব্যবহার করেনি, কিন্তু শিক্ষিত চীনা সৈন্য জাপানের এই বর্ব্বর আক্রমণ প্রতিহত করে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে জাপানীরা ১০০০ এক হাজার বার গ্যাস আক্রমণ করে। চীনা সৈন্যগণ এই আক্রমণ ও বীরত্বের সহিত প্রতিহত করে।

জাতিকে বৈদেশিক আক্রমণ হতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৪০ খৃঃ অব্দে চীন ৬৫ পঁয়ষট্টি লক্ষ চীনাকে সমর বিদ্যায় নিপুণ করে তোলে, ১৯৪১ খৃঃ অব্দে আরও ৬০ ষাট লক্ষ সৈন্য যুদ্ধ বিদ্যায় শিক্ষিত হয়। চীনের প্রত্যেক ছাত্রকে স্কুল ও কলেজে সামরিক কুচ কাওয়াজ শিক্ষা করতে হয়, এবং সৈনিকের পোষাক পড়তে হয়, স্থানীয় সেনাচারিকের অফিসারগণ ছাত্রদিগকে সামরিক কুচ কাওয়াজ শিক্ষা দেয়, এখানেই তাহারা মাত্র চালনায় পারদর্শী হয়ে উঠে। যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করা অস্ত্র চালনায় অভ্যস্ত হওয়া প্রত্যেক ছাত্রের নাগরিক কর্ত্তব্য হিসাবে সম্পন্ন হয়। সমর বিদ্যায় নিপুণ ব্যক্তিগণ চীনা যুদ্ধেও পুরুষ মাত্রেরই শিক্ষার জন্য ৬২৭খানি যুদ্ধ বিষয়ক পুস্তকও নকসা প্রকাশ করে। ২০ লক্ষ এই ছাপান পুস্তক সৈন্য বিভাগে ও বিদ্যালয়ে বিতরিত হয়েছে, যুদ্ধ সম্পর্কীয় সাজ সরঞ্জাম প্রদর্শনীতে ১৯৪২ সালে যে বিপুল সমারোহ হয়েছিল তাতেই বুঝা যায় চীনা আধুনিক সমর বিদ্যালয় কতটা পারদর্শী হয়ে উঠেছে।

চীনের আত্মরক্ষা আন্দোলনের দ্বারা আজ যে অপরিমিত বল সঞ্চয় করে জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়েছে তা-দেখে বেশ মনে হয় একদিন জাপানকে এই সমরাঙ্গন হতে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফিরে যেতে হবে। যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় চীনের মাত্র ২০০ দুই শত ডিভিশান সৈন্য ছিল এখন সেই ক্ষেত্রে ৩০০ তিনশত ডিভিশান সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত। উহাদের পশ্চাতে ১৫০ এক কোটী পঞ্চাশ লক্ষ সৈন্য শিক্ষা কেন্দ্রে সমবেত আছে, ৮ আট লক্ষ গরিলা জাপানকে বিব্রত করে তুলেছে, ৬ লক্ষ নিয়মিত সৈন্য জাপানের সৈন্যদলের পশ্চাতে যুদ্ধ করছে, ইহা ব্যতীত ৫ পাঁচ কোটী সৈন্য যখন তখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে বলে চীনের সমর-নায়কগণ স্থির করেছেন, এ ক্ষেত্রে জাপান কুরিয়ান্ ও ফর মোজাড় সৈন্যদল নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ১ এক কোটী সৈন্য উপস্থিত করতে পারে।

সকল দিক দিয়েই দেখা যাচ্ছে যে জাপান অপরাৎ চীনকে বিধ্বস্ত করতে পারবেনা, লোকবলে ও মিত্রশক্তির সহযোগিতায় অস্ত্রবলেও চীন আজ অজেয় হয়ে উঠেছে, জাপানের চীন্ অভিযান্ ভারতবর্ষকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করতে হবে।

শিশু-সংসদ

আলোক-কমল

শ্রীমতী অরুণলেখা ভট্টাচার্য্য

(রূপ-কথা)

এক রাজা, তাঁর ছিল এক রাণী। রাজার রাজত্বে সুখের অবধি ছিল না। রাজার একটি কন্যা ছিল, নাম তার কমলকলি। তবু রাজার মনে বড় দুঃখ ছিল। তাঁর পুত্র ছিল না। কিন্তু কন্যাকে তিনি পুত্রের মত পালতে লাগলেন। ছেলের মতন সাজ-পোষাক ক'রে দিলেন, ছেলের মতন গুরুমশায়ের কাছে লেখা-পড়া শেখালেন। এমনি ভাবে কন্যা কমলকলিকে রাজা গ'ড়ে তুলতে লাগলেন। সখ ক'রে তিনি কন্যার নাম দিলেন কমলকুমার।

রাজ্যের সকলে জানলে কন্যা কমলকলি রাজপুত্র।

এমনি ক'রে দিন যায়। একদিন রাজা মন্ত্রী-পাত্রমিত্রদের নিয়ে সভা ক'রে বসেছেন, এমন সময় এক বুড়ি লাঠিতে ভর দিয়ে সেখানে এসে হাজির। বুড়ি দেখতে ঠিক তাপসীর মত, মাথার পাকা চুলগুলি ঠিক শাদা চামরের মত দুলছে, গায়ের রং ঠিক শাঁখের মত, টিকোলো নাক, টানা টানা চোখ, পরনে একটা শাদা পাটের কাপড়, দেখলে ভক্তি হয়। রাজা এই তাপসীকে হঠাৎ সভায় আসতে দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। তিনি বললেন, "কে তুমি? কি চাও?" বুড়ি তখন মৃদু হেসে মাথা নেড়ে বললেন, "রাজা, তুমিই তো আমাকে ডেকেছ, এখন বলছ—কেন আমি এসেছি?" রাজা বুড়ির কথা শুনে বললেন, —"তোমায় আমি কখন ডাকলুম? তুমি কি স্বপ্ন দেখছ?"

বুড়ি আবার মুচকি হেসে উত্তর দিলেন, "সে কথা তোমার মনে পড়বে না। যাই হোক্, আমি তোমার মঙ্গলের জন্যে তোমার পুরীতে এসেছি।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার পরিচয় কি? তুমি আমার কি মঙ্গল করতে পারো? কি চাও, বলো?

বুড়ি বললেন, "যদি মঙ্গল তোমার করতে পারি, তবে সেই মঙ্গলের ফলকেই চাইবো। আমি তোমার রাজ্যের এক কোণে একটা মন্দিরে বাস করি। আমাকে তুমি চেনো না বটে, কিন্তু অনেকেই আমাকে চেনে। তোমার সঙ্গে আমার কোন দরকার নেই। আমি একবার রাণীর মহলে যাবো।"

বুড়িকে দেখে রাজার মনে ভক্তি হয়েছিল, তাঁর কথায় অমত করতে পারলেন না, রাণীর মহলে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন।

বুড়ি সাত মহল পার হ'য়ে রাণীর মহলে পৌঁছিলেন। রাণী তখন শোবার ঘরে কমলকে নিয়ে ব্যস্ত। কমল নাচছে গোপালের মত, আর রাণী হাসতে হাসতে কমলের নাচের তালে তালে হাত-তালি দিচ্ছেন। এমন সময়ে বুড়ি সেই ঘরের সুমুখে এসে ব'লে উঠলেন, "রাণী-মা কই গো?" রাণী সেই ডাকে সামনে চেয়ে দেখেন, হাসিমুখে এক সন্ন্যাসিনী দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর রূপে যেন ঘর আলো হ'য়ে যাচ্ছে। রাণী তখুনি ধড়মড়িয়ে উঠে বুড়িকে আদর ক'রে ঘরের মধ্যে ডেকে এনে আসন পেতে বসতে দিলেন। বুড়ি আপ্যায়িত হ'য়ে রাণীকে বললেন, "বাছা, আমি অনেক দূর থেকে আসছি। আমার বড় ক্ষিদে-তেষ্টা পেয়েছে। আমাকে ফলমূল খেতে দাও, তেষ্টার জল দাও।" রাণী বুড়িকে বসতে ব'লে নিজের হাতে আয়োজন করতে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে স্ফটিকের থালায় ফল সাজিয়ে, সোনার থালায় মিষ্টান্ন সাজিয়ে, রূপোর গেলাসে জল নিয়ে, রাণী ফিরে এলেন। সন্ন্যাসিনী হঠাৎ তাঁর ঘরে এসেছেন, এই দেখে রাণীর মনে তখন পুত্র-সাধ জেগে উঠেছে। সন্ন্যাসিনীকে সন্তুষ্ট করতে পারলে হয়তো তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'তে পারে। এই ভেবে রাণী সেই বুড়িকে যত্ন ক'রে খেতে দিলেন। বুড়ি খেতে ব'সে রাণীকে জিজ্ঞেস্ করলেন, "হ্যাঁগো বাছা, তোমার হাত শুদ্ধ তো?"

রাণী কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে বুড়ির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। বুড়ি আবার বললেন, "হাত শুদ্ধ কিনা বলো? সন্তান না হ'লে তো মেয়েদের হাত শুদ্ধ হয় না।"

রাণী তখন কমলকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "ঐ আমার একটি মাত্র সন্তান।"

বুড়ি ব'লে উঠলেন, "কিন্তু ও ছেলে না মেয়ে?"

রাণী সমস্যায় প'ড়ে গেলেন, কি বলবেন ভেবে উঠতে পারলেন না। বুড়ি তখন খাবার থালা সরিয়ে ফেলে দিয়ে উঠে পড়লেন। লাঠিটি হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, আর রাণীর চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ ক'রে জল ঝরে' পড়ছে, এমন সময় কমল ছুটে গিয়ে সেই বুড়ির পথ আগলে দাঁড়াল। বুড়ি লাঠি উঁচিয়ে বললেন, "পথ ছাড়্, না হ'লে বিপদে পড়বি।" রাণী চমকে উঠলেন, কমলকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিলেন। বুড়ি চ'লে যায় দেখে কমল মায়ের হাত ছাড়িয়ে ছুটল। বুড়িকে আবার ধরলে, তাঁর পা দু'টি জড়িয়ে ধ'রে কমল বললে, "বুড়ি ঠাকরুণ, তুমি যে হও সে হও, তোমাকে ছাড়ছি না, আগে ব'লে যাও আমার মাকে কাঁদালে কেন? খেতে চেয়ে খেলে না, এ কেমন গো?"

বুড়ি কমলের মাতৃভক্তি দেখে মনে মনে খুসি হলেন, তবু মুখে বল্লেন, "দেখ, আবার দুষ্টুমি করে? পথ ছাড় বলছি।"

কমল মাথা নেড়ে বললে, "না কখনই ছাড়ব না। যেতে চাও তো আমাকে মাড়িয়ে চ'লে যাও। আগে বল্তে হ'বে, কেন তুমি কিছু না খেয়ে আমার মাকে কষ্ট দিলে?"

বুড়ি এই কথা শুনে তাকে উঠতে বললেন। কমল উঠে দাঁড়াতেই শুনলে, "তোর মা-র ছেলে নেই, তুই মেয়ে। আগে তোর মা আমাকে যদি প্রার্থনা জানাতো, আমি রাগ করতুম না। তোর মা মেয়েকে ছেলে ব'লে চালিয়ে আমার চোখে কি ধুলো দিতে পেরেছে? যা' এখন, শুনলি তো।"

কমলের তখন বোঝ্বার বয়স হয়েছে। সে বল্লে, "আমার ভাই হয় নি, সে জন্যে আমার মা-র কি দোষ? মা কত মানত করেছে, কত পূজো করে, তবু একটাও ভাই মা-র কোলে এলো না। তুমি রাগ করতে পারে না। আমি একটা জিনিস চাইবো, আমাকে তা' দিতে হ'বে। তা' না হ'লে পথ ছাড়বো না।"

বুড়ি বল্লেন, "কি চাস্, বল্?"

কমল বল্লে, "একটা সুন্দর ভাই।"

বুড়ি ভুরু কুঁচকে বল্লেন, "ভাই কোথা থেকে পাবো? ভাই কি গাছের ফল? ভাগ্যে না থাক্লে ভাই হয় না।"

কমল তখন ব'লে উঠ্লো, "তুমি তা' হ'লে কেন এসেছ? তুমি মুনি-ঋষির মেয়ে, তুমি ইচ্ছে করলে, আমার মা ছেলে পাবে। যদি এর একটা কিছু না ক'রে যাও, তোমার সামনে আমি মাথা খুঁড়ে রক্ত-গঙ্গা হবো।"

বুড়ি আর উপায় না দেখে, তাঁর কাপড়ের ভিতর থেকে একটা শাঁখের প্রদীপ বা'র করলেন। সেই প্রদীপটি যখন কমলের হাতে তিনি দিতে যাচ্ছেন, তখন রাণী কমলকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এসে পড়লেন। বুড়ি রাণীকে দেখতে পেয়ে বললেন, "রাণী, তোমার আ'র দুঃখ করবা'র কিছু নেই এই শঙ্খ-প্রদীপ দিচ্ছি, তোমার মেয়ের পুণ্যে তুমি পেলে এই প্রদীপ তিন দিন তিন রাত্রি নিজের বুকের রক্ত দিয়ে জ্বালিয়ে মহাদেবীর আরতি করতে হ'বে। প্রদীপের শিখা যদি তিন দিন তিন রাত্রি সমানভাবে জ্বল্তে থাকে, তা' হ'লে তুমি পুত্র-বর পাবে। দেবীর বরে যে ছেলে পাবে, তা'র তুলনা নেই। আর এক কথা জেনে রাখো, যে ছেলে তোমার কোলে আস্বে, সে ছেলেকে সময় হ'লে আমি ডাক দিয়ে আমার কাছে নিয়ে যাবো। দৈত্যের সঙ্গে তা'কে যুদ্ধ করতে হ'বে।" এই ব'লে সন্ন্যাসিনী বুড়ি তাদের চোখের সাম্নে থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

রাণী সেই শঙ্খ-প্রদীপটি মাথায় ঠেকিয়ে যত্ন ক'রে নিয়ে গিয়ে একটি পবিত্র জায়গায় তুলে রেখে দিলেন। তখনি রাণীর ডাক পৌঁছুল রাজার কাছে, বিশেষ দরকারে রাণী তাঁর পরামর্শ চান্। রাজা সভা ভেঙে দিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন রাণীর মহলে, এসেই জিজ্ঞেস্ করলেন, "কি রাণী, কি হয়েছে? এমন জোর তলব কেন?"

রাণী তখন রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বল্লেন। রাণীকে বুক চিরে রক্ত দিতে হ'বে শুনে রাজা ভয় পেয়ে গেলেন, রাণীকে বল্লেন, "কাজ নেই রাণী! অতো রক্ত দিলে তোমার প্রাণ বাঁচানো শক্ত হ'য়ে উঠবে। ভগবানের যদি দয়া হয়, আমরা কমলকে যেমন ক'রে পেয়েছি, তেম্নি একটি ছেলেও পাবো।"

রাণীর মন রাজার কথায় সায় দিলে না। রাণী বললেন, "আমাকে মানত রক্ষা করতেই হবে। দেবতার পায়ে নিজেকে সঁপে দোবো, সেখানে ভয় কিসের? এ শঙ্খপ্রদীপ জ্বল্বে—তিন দিন তিন রাত্রি, আমারই বুকের রক্তে। আমার মন বলছে দেবীর বরে আমি বুকের ধন পাবো—সেই সাতরাজার ধন এক মাণিক। তুমি আর মনে কোনো সন্দেহ রেখো না।"

রাণী শুভক্ষণে শুদ্ধ মনে দেবীর আরতি আরম্ভ করলেন। মায়ের বুকচেরা রক্তে কামনার ছেলের জীবন-শিখা জ্বল্ জ্বল্ ক'রে জ্বলে উঠলো। রাণী এক মনে এক প্রাণে পুত্রের আশায় সমস্ত নিয়ম পালন করলেন। দেবী তাঁর ভক্তিতে সন্তুষ্ট হ'য়ে বর দিলেন, "তোমার ইচ্ছা পূরণ হোক্।" রাণী সুস্থ দেহে সুস্থ মনে মন্দির থেকে প্রসাদী ফুল হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। সু-খবর পেয়ে রাজার আনন্দ আর ধরে না। সেই ফুলের কবচ তৈরী ক'রে রাণী শুভদিনে গলায় ধারণ করলেন।

এক ছেলে জন্মালো। বাজনায় বেজে উঠলো,—শাঁখ, ঢাক, ঢোল, কাড়া, নাকাড়া। রাজা সোনা-রূপো প্রজাদের দান করতে লাগলেন।

রাজার মন আনন্দে নাচে, রাণীর মন সুখের সাগরে ভাসে। রাজপুত্তুরের দৌলতে—যে যা চায়, সে তাই পায়।

দিনে দিনে রাজপুত্তুর বড় হ'তে লাগলো। যে দেখে কুমারকে, তা'র চোখের পাতা আর পড়তে চায় না। সে যে দেবীর দান, যেন দেবদূত মানুষের ঘরে এসে জন্ম নিয়েছে।

দিন যায়, বছর যায়; রাজপুত্তুর বেড়ে ওঠে। লেখাপড়া শেষ হোলো, অস্ত্র-শিক্ষা হোলো। রাজা ও রাণী রাজপুত্তুরের নাম রাখলেন আলোকসুন্দর।

আলোকসুন্দর আর কমলকলি দুই ভাইবোনে সব সময়েই একসঙ্গে খায়, একসঙ্গে ঘুমোয়, একসঙ্গে পড়ে, ঘোড়ায় চড়ে, তীর ছোঁড়ে, অসি খেলে। কমল কিন্তু ছেলের সাজে থাকে। আলোক তা'কে দাদা ব'লেই জানে। এম্নি ক'রে বারো বৎসর কাট্লো।

একদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে রাজপুত্তুর কমলকে বল্লে, "দাদা, আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখেছি। আমরা দু' ভায়ে চলেছি ঘোড়ায় ক'রে, পিঠে আমাদের তীর-ভরা তূণ বাঁধা, কোমরে বাঁধা তলোয়ার। কত দেশ, কত নদী, কত পাহাড়, কত জঙ্গল, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে আমরা চলেছি। শেষে আমরা পৌঁছুলুম এক মন্দিরে। সেই মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন এক সন্ন্যাসিনী। আমাদের দেখে বললেন, 'এসেছিস্? আমার ডাক তা' হ'লে পৌঁচেছে? জেনে রাখ্, এ দৈত্যপুরী।' তারপর আমার ঘুম ভেঙে গেল। চলো দাদা, বাবা-মার মত নিয়ে আমরা সেই দৈত্যপুরীতে যাই।"

কমল বললে, "ও স্বপ্ন। ও কি সত্যি হয় ?"

আলোক বল্লে, "নাই হোক্, তবু ঘরে ব'সে থাকৃতে ভালো লাগে না। আমি যাবোই, যাবোই যাবো।"

কমলের তখন মনে প'ড়ে গেল সেই তাপসী বুড়ির কথা। সে বললে, "বেশ, আমার কোনো অমত নেই। বাবা-মার মত হ'লেই আমরা বেরিয়ে পড়্বো।"

রাজা ও রাণী পুত্র-কন্যার কথা শুনে অত্যন্ত ভাবনায় প'ড়লেন। রাজার মনে পড়লো সেই বুড়ির কথা—'তোমার মঙ্গল যদি করতে পার, সেই মঙ্গলের ফলকেই চাইবো।' রাণীরও মনে পড়লো তাঁর কথা, 'যে ছেলে তোমার কোলে আস্বে, সে ছেলেকে সময় হ'লে আমি ডাক দিয়ে আমার কাছে নিয়ে যাবো। দৈত্যের সঙ্গে তা'কে যুদ্ধ করতে হ'বে।' রাজা ও রাণী মাথায় হাত দিয়ে ব'সে ব'সে ভাব্‌ছেন, আর এদিকে আলোক ও কমল 'সাজো সাজো' রব তুলেছে, ভীষণ তাদের উৎসাহ। পাছে দেবতার কোপে পড়তে হয়, এই ভয়ে রাজা ও রাণী ইচ্ছা না থাকলেও মত দিলেন, কিন্তু তাদের সঙ্গে দিলেন লোকজন, সৈন্য-সামন্ত।

যাত্রা আরম্ভ হোলো। কত দেশ, কত নদী, পাহাড়, পর্ব্বত, কত বন-জঙ্গল পার হ'য়ে তা'রা চল্লো। শেষে তাদের থাম্‌তে হোলো তেপান্তরের মাঠের সাম্‌নে এসে। ধূ ধূ করছে মাঠ, সেই মাঠ দেখে সকলের বুক শুকিয়ে গেল। এই মাঠ পেরিয়ে যেতে চায় আলোক আর কমল, কিন্তু লোকজন আর এগোতে চায় না। সকলে হাত জোড় ক'রে বল্লে, "রাজপুত্রেরা, ফেরো ফেরো।" আলোক-কমল বল্লে, "আমরা স্বপ্ন-মন্দির না দেখে ফিরবো না। আমরা দৈত্য মারবো, তবে ফিরবো। তোমরা যদি আর যেতে না চাও, ফিরে যাও। আমরা দু'জনে যাবো সেই দৈত্যপুরীতে।" অনেক অনুরোধেও যখন তা'রা ফিরলো না, তখন সকলে তাদের কাছে বিদায় নিয়ে চ'লে গেল। আলোক আর কমল তেপান্তরের মাঠ বেয়ে চললো।

তেপান্তরের মাঠ পার হ'তেই তাদের সুমুখে পড়্লো এক ভীষণ বন। যখন এগোতেই হ'বে, তখন আর ভেবে ফল নেই। আলোক আর কমল সাহসে ভর ক'রে সেই গভীর বনের মধ্যে ঢুক্‌লো। তা'রা অতি কষ্টে সরু বনপথ ধ'রে চল্‌তে লাগলো। আশে পাশে বিষধর সাপ, চারিধারে হিংস্র জন্তু, এই সমস্ত দেখে দুই ভাই-বোনের মনে ভয় হোলো। তারা ঘোড়াও খুব জোরে চালাতে পারে না, কাঁটা গাছ ঝোপ-ঝাড় ভেঙে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলাও শক্ত।

কমল বল্লে, "ভাই আলোক, এই বনে ঢুকে কি আমরা প্রাণ দিতে এলুম ? কেমন ক'রে আমরা বন পার হবো ? আশা তো দেখছি না।"

আলোকের ছিল খুব সাহস, সে বললে, "কেন দাদা, ভয় কিসের ? আমাদের কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। মা'র মঙ্গল-কবচ আমাদের বুকে রয়েছে। ভরসা হারিয়ো না, তা হলে বিপদে পড়বে। ছোটাও ঘোড়া, বনের শেষ আছেই।"

আলোক আর কমল প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে, তারা অনেক দূর এগিয়ে গেল। যেতে যেতে তারা হঠাৎ কার যেন কাতর কান্না শুনতে পেলে, কে যেন দূর থেকে বল্‌ছে, 'আমাকে রক্ষে করো, আমাকে রক্ষে করো!'

সেই বনের মধ্যে জন মানবের চিহ্ন নেই, অথচ কে কাঁদে ? যেদিক থেকে শব্দটা আস্‌ছিল, সেইদিক পানে তারা ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে ছুট করালে। শেষে এক সরোবরের কাছে এসে তারা দেখতে পেলে যে—এক পরমাসুন্দরী মেয়ে সরোবরের মাঝখানে একটা বড় পদ্মপাতায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর একটা বড় অজগর সাপ মেয়েটিকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধ'রে তার মাথার ওপর মস্ত বড় ফণা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি নড়েও না চড়েও না, কেবল দুটি কথা তার মুখ থেকে বেরুচ্ছে, 'রক্ষে করো, রক্ষে করো।' আলোক ও কমল এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। কেমন ক'রে মেয়েটিকে ঐ ভীষণ সাপের হাত থেকে উদ্ধার করবে, তারা ভেবে উঠতে পারলো না। সেই অজাগরের কাছে যায় কার সাধ্য। মেয়েটির কান্না শুনে তাদের নরম মন গলে গেল। তারা কি করবে ভাবছে, এমন সময় তাদের চোখে পড়ল—ঘাটের ধারে একটা মস্ত বড় রাজহাঁসের ওপর পদ্ম-পাতার নৌকো। আলোক বললে, "দাদা আমি ঐ নৌকোয় ক'রে সরোবরের মাঝখানে গিয়ে তীর দিয়ে অজাগরকে মারবো, তাহ'লে ঐ পরমাসুন্দরী মেয়েটি রক্ষা পাবে।"

কমল বললে, "না ভাই আলোক—দরকার নেই, অজাগরের বিষের নিঃশ্বাসে যদি তোর প্রাণ যায়।"

আলোক কোন কথা শুনলে না, নাকে স'তপুরু কাপড় বেঁধে হাতে তীর ধনুক নিয়ে সেই পদ্মপাতার নৌকোর ওপর ছুটে গিয়ে উঠে পড়লো। নৌকোটা অজাগরের প্রায় কাছাকাছি গিয়ে পৌঁচেছে, এমন সময় আলোক তীর ছুঁড়তে গেল, হাতের তীর হাতেই রইল। আর চোখের পাতা ফেল্‌তে না ফেলতে নৌকো-সুদ্ধ আলোক ভুস্ ক'রে ডুবে গেল, সেই অজাগর আর মেয়েটিও জলের ভেতর ডুবলো।

কমল চোখের সামনে যা দেখলে—তার মনে হল এ-সব যেন ভোজবাজি। সে হতভম্ব হয়ে গেল, কি করবে ভেবে পেল না। এখন সে একলা, তার স্নেহের ভাই সরোবরে হঠাৎ ডুবে তলিয়ে গেছে। ডাক ছেড়ে তার কান্না এল। তার মনে সন্দেহ হ'ল—'এই যে ব্যাপার ঘটলো, নিশ্চয়ই কোনো রাক্ষস বা যক্ষের মায়ার খেলা।' কমল আর দাঁড়িয়ে না থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে চল্‌লো, কিছুক্ষণ পরে বন পার হয়ে পৌঁছল একটা খুব বড় মন্দিরে। সেখানে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে পইঠার ওপর ব'সে ব'সে কাঁদতে লাগলো। এমন সময় সেই আদ্যিকালের বুড়ি কমণ্ডলু হাতে নিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন। কমল তাঁকে দেখ্‌বামাত্রই চিন্‌তে পারলে—এই সেই বুড়ি, যাঁর বরে তার মা ভাই আলোককে কোলে পেয়েছে। কমল ছুটে গিয়ে বুড়ির পায়ের তলায় কেঁদে লুটিয়ে পড়্‌লো। বুড়ি তাকে হাতে ধ'রে বুকের কাছে তুলে নিয়ে বল্লেন, "কি হয়েছে কমলমণি ? তোমার ভাই হারিয়ে গেছে ?" কমল চোখের জল ফেলতে ফেলতে বল্লে, "তুমি কেমন ক'রে

জানলে? বনের ভিতর দিয়ে আসতে গিয়ে এই বিপদ ঘটলো। আমার ভাইকে এতো বারণ করলুম, 'যাসনি আলোক সবোবরের মাঝখানে,' সে কথা শুনলে না-মাঝ বরাবর পদ্মপাতার হাঁসনৌকোয় যেই পৌঁচেছে—অমনি হঠাৎ নৌকোসুদ্ধ সে ডুবি হ'য়ে গেল। এখন কি হবে? আলোককে কি আর ফিরে পাবো না, বুড়ি মা?"

বুড়ি বললেন "ফিরে পেতে পারো, কিন্তু সে শক্ত ফাঁদে পড়েছে। যে বনে তোমরা গিয়েছিলে—সে হচ্ছে রাক্ষুসে বন, আর যে সরোবর সেখানে তোমরা দেখেছ—সেই হ'ল মায়াসরোবব, সেথায় যা ঘটে সব মায়ারাক্ষসীর খেলা। অনেক রাজপুত্তুর এই রাক্ষসীর মায়ার ফাঁদে প'ড়ে প্রাণ হারিয়েছে। তুমি ভয় কোরো না। তিন দিন তিন রাত তোমার ভাইকে মায়ারাক্ষসী বাঁচিয়ে রাখবে। তোমাকে যা বলি তা যদি করতে পারো, তা হলে হয়তো তোমার ভাই উদ্ধার পাবে। তবে সাহস চাই।"

কমল বলে উঠল, "যা বলবে তাই করবো, প্রাণ যদি যায় তাতেও আমি ডরাই না।"

কমলের কথায় বুড়ি তখন বললেন, "দেখো—কমলমণি, তোমাকে আবার সেই সরোবরের ধারে যেতে হ'বে। আজকে নয়, কাল ভর দুপুরবেলাতে। যা' দেখেছ, ঠিক ঐ রকম আবার দেখবে, শুনবে মায়ারাক্ষসীর কান্না। তুমিও পদ্মপাতার হাঁস-নৌকোয় চ'ড়ে সরোবরের মধ্যিখানে এগিয়ে গেলেই তোমার ভায়ের মত ডুবে যাবে। ডুবতে ডুবতে একেবারে মায়ারাক্ষসীর জল-পুরীতে গিয়ে পৌঁছবে। সেই পুরীর সামনে দেখতে পাবে দু'টো বেঁটে রাক্ষসকে, তারা তোমাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে হাজির করবে এক পরমাসুন্দরী কন্যার কাছে, সে-ই মায়ারাক্ষসী। তোমাকে সে তখন বসতে বলবে তা'র সিংহাসনের পাশের একটা সিংহাসনে। তুমি সে সিংহাসনে না ব'সে বলবে, 'আমি তো রাজপুত্তুর নই, কেমন ক'রে সিংহাসনে বসতে হয় আমাকে শিখিয়ে দাও।' যেই সে সিংহাসনে বসবে—অমনি তুমি তা'র খালি সিংহাসনে ব'সে পড়বে। মায়ারাক্ষসী তখন তোমাকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করবে—যা' সে বলবে সবেতেই তুমি বলবে, 'না'। বিয়ে করবার জন্যে কান্নাকাটি করবে, তুমি বলবে, 'বিয়ে করতে পারি, যদি জিভে এই ত্রিশূলটা রাখতে পারো।' স্ফটিক পাথরের ত্রিশূল আমি তোমার সঙ্গে দোবো। সেই ত্রিশূল সে যেই জিভে রাখবে, অমনি তুমি তাড়াতাড়ি সেটা চেপে ধরবে, তা'র জিভ ফুঁড়ে বুকে গিয়ে বিঁধবে। সেই সময়ে তোমাকে যে মায়া-আরশী দিচ্ছি—সেই আরশী তা'র মুখের সামনে ধ'রে ধমক দিয়ে বলবে, 'এখুনি ফিরে দে' আমার রাজপুত্তুর ভাইকে—নইলে এই ত্রিশূল ফুঁড়ে মেরে ফেলবো।' সে ভয়ে ভয়ে রাক্ষসীর ভীষণ চেহারা ধ'রে পেটের ভেতর থেকে তোমার ভাইকে বা'র ক'রে দেবে।—তারপরে দু'জনে যদি তাকে মারতে পার, তোমাদের জয়জয়কার হ'বে। নইলে সব যাবে।" এই ব'লে বুড়ি কমলের চোখে সেই মন্দিরের দেবতা শিবের হোমের কাজল পরিয়ে দিলেন—চোখের বাঁধ কেটে যাবে ব'লে, হাতে দিলেন—স্ফটিকের ত্রিশূল, আর মায়া-আরশী।

তার পরদিন দুপুরবেলায় কমল রাক্ষুসে বনের মধ্যে সরোবরের ধারে গিয়ে পৌঁছুলো। গিয়েই দেখে—সেই মেয়ে, সেই অজাগর; শোনে, সেই রব—'রক্ষা করো, রক্ষা করো।' এলো ঘাটের কাছে সেই পদ্মপাতার হাঁসনৌকো। কমল তা'তে চ'ড়ে বসলো।—একটু যেই এগিয়েছে অমনি ভুস্ ক'রে ডুবে গেল। বুড়ি যা বলেছেন, সব মিলে যাচ্ছে দেখে কমলের ভয় হোলো না, বরঞ্চ খুব আনন্দ হ'ল।

কন্যা-সাজা মায়ারাক্ষসীর কাছে দুই বেঁটে রাক্ষস কমলকে ধ'রে নিয়ে গেল। তাকে দেখেই রাক্ষসী বললে, "রাজপুত্তুর, বোসো ঐ সিংহাসনে।"

কমল বললে, "আমি রাজপুত্তুর নই, আগে শিখিয়ে দাও কেমন ক'রে বসতে হয়।"

রাক্ষসী কোনো রকম সন্দেহ না ক'রে পাশের সিংহাসনে উঠে গিয়ে বসতেই কমল রাক্ষসীর সিংহাসনে ব'সে পড়লো।

রাক্ষসী ঠ'কে গিয়ে একটু দমে গেল। কিন্তু রাক্ষসীর মায়া তো কম নয়। তখুনি একটা সোনার থালা হাতে ক'রে বললে, "পান্ খাও।"

কমল বুড়ির শেখানো মত ঘাড় নেড়ে বললে, "না আমি পান খাই না।"

অমনি সোনার থালা রাক্ষসীর হাত থেকে প'ড়ে গেল, আর পানগুলো সব ইঁদুর হ'য়ে পালাল।

তারপরে রাক্ষসী একটা মুক্তোর ঝালর-দেওয়া হীরের মুকুট হাতে নিয়ে বললে, "এসো রাজপুত্তুর, তোমার মাথায় মুকুট পরিয়ে দিই। তোমার ও খালি মাথা মানায় না।"

কমল সেই মুকুটটাকে ত্রিশূল দিয়ে মেরে ফেলে দিলে, যেই ফেলে দেওয়া অমনি দেখা গেল, সেই মুকুট সাপের মুকুট, আসলে মণি-মুক্তোর মুকুট নয়। এবার রাক্ষসীর চোখ কপালে উঠল, কাঁদতে কাঁদতে বললে, "রাজপুত্তুর, তুমি যাদু জানো। তুমি আমাকে বিয়ে করো, নইলে আমি বাঁচবো না।"

কমল সেই ত্রিশূল তা'র জিভের ওপর রাখতে ব'ললে। রাক্ষসী আর উপায় না দেখে ত্রিশূলটা জিভের ওপর যেমনি রেখেছে, কমল লাফিয়ে উঠে ত্রিশূল ধরলে চেপে, ত্রিশূল জিভ ফুঁড়ে গিয়ে লাগল রাক্ষসীর বুকে। তখন মায়া-আরশী তার সামনে ধ'রে কমল জোর গলায় ব'লে উঠলো, "আমার রাজপুত্তুর ভাইকে দে ফিরিয়ে, নইলে এখুনি তোকে মেরে ফেলবো।"

রাক্ষসী তখন বিপদ বুঝে নিজ মূর্ত্তি ধরেছে। দু'বার ভয়ানক ওয়াক্ ওয়াক্ ক'রে তিনকুড়ি রাজপুত্তুর বমি ক'রে ফেললে, তাদের মধ্যে আলোকও একজন। রাক্ষসী সকলকে মারতে চেষ্টা করলে, কিন্তু শিবের ত্রিশূলের ঘায়ে সে আড়ষ্ট, মায়া-আরশীর যাদুতে তা'র রাক্ষসী-মায়া নষ্ট।

তবু রাক্ষসী কি সহজে হার মানে! তা'র মূলোর মত বড় বড় দাঁত দিয়ে জিভটা কেটে ফেলতেই ত্রিশূলটা প'ড়ে গেল। এই সুবিধে পেতেই রাক্ষসী কমল আর রাজপুত্তুরদের মারতে ছুটলো।

রাজপুত্তুরদের তখন সাহস ফিরে এসেছে। তা'রা সকলে তুমুল যুদ্ধ শুরু ক'রে দিলে। রাক্ষসী রাজপুত্তুরদের ওপর যখন পড়ে পড়ে, সেই সময় কমল চেঁচিয়ে বললে, "আলোক, তীর মারো।" সঙ্গে সঙ্গে আলোকের একটা তীর শন্ ক'রে ছুটে এসে

রাক্ষসীর কপালে লাগ্‌লো, আর কমল ত্রিশূলটা ছুঁড়ে মারলে রাক্ষসীর বুকে। রাক্ষসী বিকট ডাক ছেড়ে ম'রে গেল। তখন আর সমস্ত রাক্ষসের মাথা টন্ টন কর্‌তে লাগ্‌ল—তারা 'আঁই—মাঁই—খাঁই—করে ছুটো এলো। আলোক রাজপুত্তুর আর কমলকে পিছনে নিয়ে তীরের পর তীর ছুঁড়ে সকলকে মেরে ফেললে। আলোক আর কমলকে সকলে ধন্য ধন্য কর্‌তে লাগ্‌লো।

কমলের চোখে দেবতার হোমের কাজল, তা'র দৃষ্টির বাধা নেই। সেই পাতালপুরীতে একটা সুড়ঙ্গ দেখতে পেলে। সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে কমল সকলকে পথ দেখিয়ে রাক্ষাসপুরী থেকে মাটির ওপরে নিয়ে এলো।

তারপরে সকলে মন্দিরে গিয়ে পৌঁছুলো। তাপসী বুড়ি সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আলোক কমলকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌লেন, "ধন্য মেয়ে তুমি। ধন্য রাজপুত্তুর। তোমাদের জন্যেই আমার এতোদিনের ইচ্ছা পূরণ হোলো। রাজা-রাণী তোমাদের খোঁজে এসেছেন। এসো তোমরা তাঁদের সঙ্গে দেখা কর্‌বে।"

আলোক অবাক্ হ'য়ে কমলকে বল্‌লে, "তাহ'লে তুমি আমার দিদি?"

কমল হেসে বল্‌লে, "হ্যাঁ ভাই আলোক, আমি তোমার দিদি।"

দেবতার আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে রাজারাণী রাজপুত্র ও রাজ-কন্যাকে সঙ্গে ক'রে মনের আনন্দে বাড়ী ফিরলেন।

শুভদিন দেখে রাজারাণী কমল আর আলোকের বিয়ে দিলেন। সুখে-শান্তিতে চারিদিক ভ'রে উঠল।

সন্ধ্যাবেলায়

শ্রীপ্রসাদ দাস মুখোপাধ্যায়

সন্ধ্যাবেলায় ব'সেছিলাম নদীর তীরে চুপ করে,
গান গেয়ে ঐ চ'লছে মাঝি দাঁড় ফেলে ঝুপ ঝুপ ক'রে।
রং খেলিছে গগন-কোণে পিঙ্গলে আর জর্দ্দাতে,
কোন পটুয়া টানছে তুলি পর্দ্দাতে?
ছুটছে নদী কুল্‌কুল্‌ই,—
শূন্য দিয়ে জমায় পাড়ি ঘরমুখো সব বুলবুলি।
বইছে হাওয়া মন্দ মধুর প্রাণমাতান ঝিরঝিরে,
চখাচখী ডাকছে বসি কোথায় যেন দূর তীরে।
টুপ ক'রে ঐ ডুব দিতেছে জলহাঁসেরা খুব দেখি,
ওরা আমায় দেখাচ্ছে রে ভেল্কী কি?
ঘূর্ণী হাওয়ার ঢেউ লেগে,
বাঁশের বনের বংশীখানি উঠল বুঝি ঐ জেগে।
ডাকছে মাঝি উচ্চে হাঁকি—'এবার আমার শেষ পাড়ি,
সে যাবি আয় যে এসেছিস্ ভোরের মুখে দেশ ছাড়ি'।
নদীর ঘাটে হাস্য-মুখর কোলাহলের নেই ধ্বনি—
নাইক চুড়ীর শিঞ্জনী কি রুনঝুনী!
অন্ধকারের আবছায়ে—
শঙ্খ এবং ঘণ্টা বাজে বোধ হয় কোন দূর গাঁয়ে।
হঠাৎ ও কি! পূব গগনে মারছে উঁকি চাঁদ যে রে,
টুক্‌রো সাদা মেঘগুলিরই ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক ক'রে।
নদ-মুকুরে রূপ-বিভা তার উঠল যেন ঝকমকি'—
অন্ধকারে ঠুক্‌লো কে রে চকমকি'?
ঝ'রছে আলোর ফুলঝুরী,
স্বপনভরা মদির মোহে আসছে চোখে ঢুল ধরি'।

গৌড়ের কাহিনী]

তৃতীয় পর্ব্ব

মহারাজ উদয়ন প্রদ্যোতের ছলে বন্দী হয়েছেন—এ সংবাদে বৎসরাজ্যের প্রজারা খুবই উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিলেন। যৌগন্ধরায়ণ অনেক ক'রে তাঁদের বুঝিয়ে শান্ত ক'রে উজ্জয়িনীর দিকে রওনা হলেন হাঁটা পথে। রাজ্য চালাবার ভার রইল অন্য মন্ত্রীদের উপর।

কিছুদূর পায়ে হেঁটে চল্বার পর তিন বন্ধুতে এসে ঢুক্লেন বিন্ধ্যাটবীর মধ্যে। এই বিন্ধ্য-বনের পূর্ব্বদিকে পুলিন্দ (ব্যাধ) জাতির রাজা পুলিন্দক বাস করতেন। এই পুলিন্দক ছিলেন বৎসরাজের এক মিত্র রাজা। তিন বন্ধুতে প্রথমেই গিয়ে উঠ্লেন পুলিন্দকের বাড়ীতে। তাঁকে বৎসরাজের বিপদের কথা জানিয়ে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বল্লেন—"রাজা! যদি আমাদের মহারাজকে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারি, তা হ'লে ছাড়া পেয়ে মহারাজ এই পথ দিয়েই দেশে ফিরে যাবেন সেই সময় প্রদ্যোতের সেনারা যদি তাঁকে ধরতে তাঁর পিছু পিছু ধাওয়া করে, তা হ'লে আপনাকে সসৈন্যে ততক্ষণ তাদের গতিরোধ করতে হবে, যতক্ষণ না মহারাজ নির্ব্বিঘ্নে নিজের রাজ্যের সীমানায় পৌঁছে যান।" পুলিন্দক শশব্যস্তে ব'লে উঠ্লেন—"যে আজ্ঞে মন্ত্রী ম'শায়! আমি এখনই সৈন্যদের সাজসজ্জা করতে হুকুম দিচ্ছি"।

পুলিন্দকের রাজবাড়ীতে পরম সমাদরে অতিথিসেবা নেবার পর তিনবন্ধু আবার পায়ে হেঁটে বিন্ধ্যাটবীর ভিতর দিয়ে উজ্জয়িনীর দিকে রওনা হ'লেন। বিন্ধ্যাটবীর ভিতরটা দিনের আলো সত্ত্বেও বেশ অন্ধকার। কিছুদূর যেতেই সাম্‌নে পড়ল নর্ম্মদা নদী। নদী পার হ'তেই সাম্‌নে বেণুবন। সেনাপতি রুমণ্বান্ বললেন—"এইখানেই মহারাজ প্রথমে তাঁর সৈন্যদের ছাউনি গাড়তে আদেশ দিয়েছিলেন"। আরও কিছুদূর চলবার পর এল নাগবন। এখানেই মহারাজ নীলহাতী প্রথম দেখতে পেয়েছিলেন। আরও একটু এগিয়ে যেতেই বনপথটি ক্রমশঃ যেন ফুরিয়ে এল। এখানে বন এত ঘন আর অন্ধকার এত বেশী, যে দশহাত দূরেও মানুষ চেনা যায় না। এক পাশের একটা ঝোপের মধ্যে দেখা গেল—কাঠের তৈরী নীলরঙের একটা মস্ত বড় হাতী কাত হ'য়ে প'ড়ে আছে। যৌগন্ধরায়ণ কাছে গিয়ে হাতীটাকে বেশ ক'রে পরীক্ষার পর বল্লেন—"যাই বল, বন্ধুরা! প্রদ্যোতের কৌশল অসাধারণ। এ হাতীটাকে এই বনের মধ্যে দেখ্‌লে আমিও ঠ'কে যেতুম। মহারাজ ত' নীল হাতীর জন্যে পাগল। তিনি হয়ত চোখ-কান বুজেই এগিয়েছিলেন। কাজেই তিনি যে ঠকেছেন—এজন্যে তাঁকে বড় একটা দোষ দেওয়া যায় না"। রুমণ্বান্ আর একটা দিক্ দেখিয়ে বল্লেন—"ঐ দেখুন! ওখানে কটা পচা মড়া প'ড়ে রয়েছে। আশপাশের গাছগুলোর ডাল-পালা ভাঙ্গা। খুব সম্ভব এখানেই যুদ্ধে মহারাজ বন্দী হন"।

বিদূষক বসন্তক তখন এধার-ওধার খুঁজছিলেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল বন থেকে বেরুবার একটি গুপ্ত পথ—লতা-পাতায় ঢাকা। মন্ত্রী ও সেনাপতি দেখে বুঝ্লেন—এটাই উজ্জয়িনী যাবার পথ। তাঁরা আর দেরী না ক'রে সেই পথে রওনা হলেন।

প্রায় দিন দশেক চলবার পর বন পার হ'য়ে তিন বন্ধুতে গিয়ে হাজির উজ্জয়িনীর কাছে এক প্রকাণ্ড শ্মশানের ধারে। শ্মশানে তখন প্রায় একশ' চিতা জ্বলছে। এক কথায় শ্মশান বেশ গুলজার।

এই শ্মশানের একধারে ছিল একটা পুরণো বেলগাছ। তিন বন্ধুতে একটু বিশ্রামের আশায় সেই গাছটার তলায় বস্লেন। শ্মশানের বীভৎস দৃশ্য দেখে তাঁদের গা-বমি-বমি করছিল। সে জায়গায় থাক্‌তে তাঁদের বিন্দুমাত্রও প্রবৃত্তি ছিল না। কিন্তু না থেকেও কোন উপায় ছিল না। কারণ, প্রথমতঃ গভীর নিশীথ রাতে রাজধানীতে প্রবেশের দ্বার খোলা পাওয়া যেত না। দ্বিতীয়তঃ, ক'দিন ধ'রে একটানা পথ চ'লে চ'লে তাঁদের পা এত ভার হয়েছিল যে একটু না ব'সে তাঁদের আর পথ চল্‌বার শক্তি মোটেই ছিল না।

তাঁরা সবে একটু আরাম ক'রে বসেছেন, এমন সময় বেলগাছটার উপর থেকে কে যেন গম্ভীর গলায় হেঁকে ব'লে উঠলেন—"মন্ত্রী ম'শায়! আমার আশ্রয়ে সবান্ধব আপনাদের স্বাগত"! সেই বাজখাই আওয়াজে তিন বন্ধুতে এমন চম্‌কে উঠলেন যে তাই দেখে কে যেন গাছের উপর থেকে খল্-খল্ ক'রে অট্টহাস্য হেসে বলল—"ভয় নেই, মন্ত্রী ম'শায়! আমি প্রদ্যোতের গুপ্তচর নই! এই যে শ্মশানে আপনারা এখন এসে বসেছেন—এ সেই বিখ্যাত মহাকাল-শ্মশান—সারা ভারতের লোক এর নাম জানে। রাজধানী উজ্জয়িনী এর পাশেই। উজ্জয়িনীর যিনি আসল অধিপতি দেবাধিদেব মহাকাল—তাঁরই একজন নগণ্য সেবক আমি। আমার নাম যোগেশ্বর—আমি একজন ব্রহ্মরাক্ষস। আমি সদা-সর্ব্বদা এই শ্মশানটার পাহারা-দারী ক'রে থাকি। দেবাধিদেবের কৃপায় ভূত ভবিষ্যৎ কিছু কিছু আমার চোখের সাম্‌নে ভেসে থাকে। তাই আপনাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম আপনি কে—আপনার সঙ্গেই বা কে কে আছেন—আর কি উদ্দেশ্যেই বা আপনারা ছদ্মবেশে এই গভীর নিশীথে এই মহাভয়ানক শ্মশানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তবে আমি আপনাকে চিনে ফেলেছি ব'লে মনে ভাব্‌বেন না যে আপনার ছদ্মবেশটি নিখুঁৎ হয় নি। মহর্ষি বেদব্যাস আপনাকে যে ছদ্মবেশ দিয়েছেন, তার আবরণ ভেদ ক'রে আপনাকে চিন্‌তে পারে এমন শক্তি কোন মানুষের নেই। তবে দেবাধিদেবের কাছে সব ছদ্মবেশই ধরা প'ড়ে যায়। তাঁর কৃপা না পেলে আমিও আপনাকে কখনই চিন্‌তে পারতাম না। তাই বলছি—আমি আপনাকে চিনে ফেলেছি ব'লেই আপনি *ছদ্মবেশ বৃথা হ'ল ভেবে হতাশ হবেন না।"*

যৌগন্ধরায়ণ ব্রহ্মরাক্ষসের কথা শুনতে শুনতে ক্রমশঃ মনে সাহস সঞ্চয় করছিলেন। এখন ব্রহ্মরাক্ষসের বন্ধুভাবের পরিচয় পেয়ে উপর দিয়ে চেয়ে জোড়হাতে নমস্কার জানিয়ে বললেন—"হে মহাপুরুষ! আপনি একে দেবাধিদেব মহাকালের অনুচর, তায় আবার নিজেও একজন নানারকম মন্ত্র-তন্ত্র-সিদ্ধ অলৌকিক-শক্তিমান্ ব্রাহ্মণ। আপনাকে প্রথমেই আমার যথাযোগ্য নমস্কার জানাচ্ছি। আপনি যখন কৃপা ক'রে যেচে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন, তখন এ ভরসা আমার খুবই আছে যে আপনার কাছ থেকে আমাদের ইষ্ট বই অনিষ্ট হবে না"।

যোগেশ্বরও গাছের উপর থেকে সেই রকম খল্-খল্ হাসি হেসে বললে—"মন্ত্রিবর! সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হোন। আপনার অসাধারণ প্রভুভক্তি, আর অদ্ভুত বুদ্ধি ও নানারকম গুণপণার কথা সারা ভারতে কে না জানে! তাই আপনাকে প্রথম দেখা অবধি আপনার সঙ্গে মিতালী পাতাবার জন্যে মনটা আমার বড় চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে, তা হ'লে আসুন প্রভু মহাকালের নাম নিয়ে দু'জনে দুজনকে 'মিতে' ব'লে ডেকে সম্বন্ধটা পাকা ক'রে ফেলি"।

এইভাবে যোগেশ্বর আর যৌগন্ধরায়ণের মধ্যে বন্ধুত্ব পাতান হ'ল তারপর যোগেশ্বর বললেন—বন্ধু! ভগবান্ ব্যাসদেবের দেওয়া ছদ্মবেশটি আপনার অতি চমৎকার বটে, কিন্তু এতে আপনার চেহারার কোন বদল হয় না। যদি আপনি কখনও এ বেশটি খুলে রাখেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার স্বরূপ প্রকাশ হ'য়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে। যদি এ বেশটি ছিঁড়ে নষ্ট হ'য়ে যায়, তা হ'লে আপনার পরিচয় প্রকাশ হ'তে আটকাবে না তাই আমি ভগবান্ বেদব্যাসের অনুমতি নিয়ে আপনাকে চেহারা বদলের কয়েকটি কৌশল ও মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি। এতে কেবল আপনি কেন, আপনার বন্ধুরাও ইচ্ছামত নিজেদের চেহারা বদ্‌লাতে পারবেন। এ ছাড়া আরও অনেক কলা-কৌশল মন্ত্র-তন্ত্র আপনাকে আমি শেখাব, যার ফলে আপনাকে বা আপনার এই দুই বন্ধুকে কোন কারাগারে কখনও আটক রাখা যাবে না"।*

যোগেশ্বরের কৃপায় নানা রকম তন্ত্র-মন্ত্র শিখে তিন বন্ধু আবার উজ্জয়িনীর দিকে হাঁটা সুরু করলেন।

ওদিকে এ কয়দিনে মহারাজ উদয়ন বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠেছেন। সুযোগ দেখে প্রদ্যোত একদিন তাঁর এক মন্ত্রীকে দিয়ে উদয়নের কাছে প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন যেন তিনি রাজকন্যা বাসবদত্তাকে তাঁর বিখ্যাত ঘোষবতী বীণা কি ভাবে বাজাতে হয় তার শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন। প্রস্তাব শুনে ত উদয়ন চ'টে লাল। মন্ত্রীকে ত এই মারেন আর কি! প্রদ্যোতকেও যা-তা গালাগাল দিতে ছাড়লেন না। মন্ত্রীর মুখে এ সংবাদ পেয়ে প্রদ্যোতের মুখ হ'ল গম্ভীর। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ বেরুল—যার ফলে উদয়নকে রাজপ্রাসাদ থেকে সঙ্গীতশালায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে তিনি আর রাজার আদর পেলেন না—হলেন পুরাদস্তুর বন্দী। হাতে শেকল বাঁধা—পায়ে বেড়ী। বাড়ীটার বাইরে বেরোবার উপায় রইল না।

এই ভাবে ক'দিন যায়। হঠাৎ একদিন সকালে রাজপথে খুব গোলমাল—অনেক লোকের ভিড় হয়েছে—রাজকন্যা বাসবদত্তা খোলা পালকীতে চ'ড়ে যক্ষিণীর মন্দিরে পূজা দিতে চলেছেন। তাই দেখতে রাস্তার দু'ধারে বহু লোক জমেছে। উদয়নের পাহারায় যিনি ছিলেন, সেই শিবক বৎসরাজকে মনে মনে একটু ভাল বাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বৎসরাজের পায়ের বেড়ী খুলে দিয়ে তাঁকে সঙ্গীতশালার দোরে উদয়নের একবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়। অবশ্য এর ভিতরে প্রদ্যোতের একটু ইঙ্গিতও ছিল।

এর ফল ঠিক ফল্‌ল। বৎসরাজ বাসবদত্তার পরস্পর চোখোচোখি হ'ল—দুজনেই দু'জনকে দেখে মুগ্ধ হ'লেন। বৎসরাজের অভিমান আর রইল না। সে দিনই শিবকের হাত দিয়ে প্রদ্যোতকে চিঠি পাঠিয়ে দিলেন—যে তিনি রাজকন্যাকে বীণা শেখাতে রাজী আছেন।

---

*মহাকবি ভাসের প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণে আছে যে উন্মত্তবেশী ব্যাসদেবের কৃপায় যৌগন্ধরায়ণ পাগলার ছদ্মবেশ পেয়েছিলেন। ব্রহ্মরাক্ষসের কথা ভাসের নাটকে নাই—আছে কথাসরিৎসাগরে ও বৃহৎকথামঞ্জরীতে।

ক্রমশঃ

টুক্‌রো স্মৃতি

শ্রী জ্যোতির্ম্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

[কথিকা]

সাধু যখন আমাদের বাড়ীতে কাজ ক'রতে এলো, তখন ওর বয়স মাত্র চৌদ্দ। ফুট্‌ফুটে গায়ের রঙ, ড্যাবা ড্যাবা চোখ, সারা বাড়ীর মধ্যে আমাকেই যেন ওর সব চেয়ে বড় আত্মীয় বলে' মনে করে নিলো। বড় ভালো লাগ্‌তো সাধুকে আমার। ছোট ভাইয়ের মত ভালো বাস্‌তাম তাই ওকে। কিন্তু কেন যে দাদার কাছে দিনরাত ওকে লাঞ্ছনা ভোগ ক'রতে হোতো; আজও আমি তা ভাবতে পারি না। বড় দুঃখী ছিল সাধু। তাই সেই দুর্ভাগ্যের সুযোগ নিয়েই হয় ত একদিন দাদা ওকে 'চোর' ব'লে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল! অথচ আমি জানি, সাধুর মতো নির্ম্মল স্বভাবের ছেলে আমাদের ক্লাসেও হয় ত তখন একটিও ছিল না।...

বাড়ীতে অতিরিক্ত বাক্স-পেটারার অভাবে দাদার জামা কাপড়ের সাথে তাঁর সুটকেশেই আমারও জামা কাপড় থাকতো।

একদিন স্নানের সময় কি মনে করে' হঠাৎ সুটকেশটা হাতে নিয়ে নিচে এসে ব'ল্‌লাম, "সাধু, এর থেকে আমার জামা কাপড়টা বের করে' রাখ তো, আমি ততক্ষণে চট করে স্নানটা সেরে আসি।" কিন্তু স্নান করে' ফিরে আস্‌তে না আস্‌তেই দেখতে পেলাম সাধুর উপর দাদার রীতিমত অত্যাচার আরম্ভ হ'য়েছে।—"পাজি, শুয়োর, হতভাগা, সাধু-নামে চোরের আড্ডা গেড়ে বসেছ? ঘরে এসে দেখি, জামা কাপড়-শুদ্ধ শুটকেশ উধাও, আর দিব্বি এদিকে একেবারে হজম করার স্বপ্ন দেখছো? পুলিসে দিয়ে তবে তোমাকে সায়েস্তা ক'রব, দাঁড়াও। হারামজাদা, চোর কোথাকার।"—

ঠিক মনে আছে দাদার রক্তচক্ষুর কাছে নিজেকে তখন আড়ালে রেখেছিলাম। অথচ দুঃখে, অনুশোচনায় নিজের মধ্যে মরে' যাচ্ছিলাম। সেদিন সারাদিন আর সাধুর খাওয়া হোলো না, শুধু কাঁদলো। সন্ধ্যায় গোপনে ডেকে নিয়ে সাধুর হাতে দু' আনা পয়সা দিয়ে ব'ল্‌লাম, "লক্ষ্মীটি, রাগ করিস নে। যা, কিছু কিনে কেটে খেয়ে আয় গে।"

এর পর থেকে ক্রমাগতঃ লক্ষ্য করে' দেখেছি, নানা কাজে নানা ভাবে দাদার কাছে সাধুকে লাঞ্ছনা সহ্য ক'রতে হ'য়েছে।

সেবার পূজোর সময় দাদা সখ করে' একটা সোনার আংটি গড়ালো। কয়েকদিন বাদে ভাত খাবার সময় মা ব'ল্‌লেন, "হাঁরে বিজু, তোর আংটি কি হোলো?"

সাথে সাথে দাদাও নিজের হাতের আঙুলের দিকে লক্ষ্য করে' চ'মকে উঠলো—"তাই তো, কোথায় গেল আংটিটা? নিশ্চয়ই এ সাধুর কাজ।"—আর কথা নেই। সাধুর উপর একেবারে চড়াও হয়ে' উঠলো দাদা; যথেষ্ট মারধর ক'রলো সাধুকে। অথচ একটী কথারও প্রতিবাদ ক'রলে না সাধু। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে' চেয়ে থেকে অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রতে লাগলো। আড়াল থেকে বুকখানি আমার ফেটে যেতে চাইলো, অথচ এতটুকুও সুযোগ পেলাম না যে, সাধুর গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিই।—দাদাকে ভয় ক'রতো বাড়ীতে সবাই।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি—সাধু বাড়ী নেই। ভাবলাম—বাড়ীর কাজেই হয় ত বাইরে গেছে, কিন্তু একে একে সময় কেটে গেল, সাধু আর ফিরলো না। দাদা ব'ল্‌লে, "আপদ দূর হ'য়েছে।" কিন্তু সাধুর জন্যে মনটা অনবরত এত অস্থির করছিল—যা বলে' শেষ ক'রবার নয়।

হঠাৎ বিকেলের দিকে সাধুদের গ্রামের কে একজন সাধুর খোঁজ ক'রতে এসে ব'ল্‌লে, "সংসারে একমাত্র বুড়ো মা সাধুর, অসুখে আজ ম'রতে প'ড়েছে।" শুনে ছ্যাঁৎ করে' উঠলো বুকটা। আড়ালে চোখ দু'টি একবার মুছে নিলেম।

এর পর কত বছরই না কেটে গেছে। দাদার আংটিটা টেবিলের ড্রয়ার থেকে একসময় আবিষ্কার হোলো, কিন্তু সারা সহর খুঁজে বেড়িয়েছি, সাধুকে তবু আর ফিরে পেলাম না।
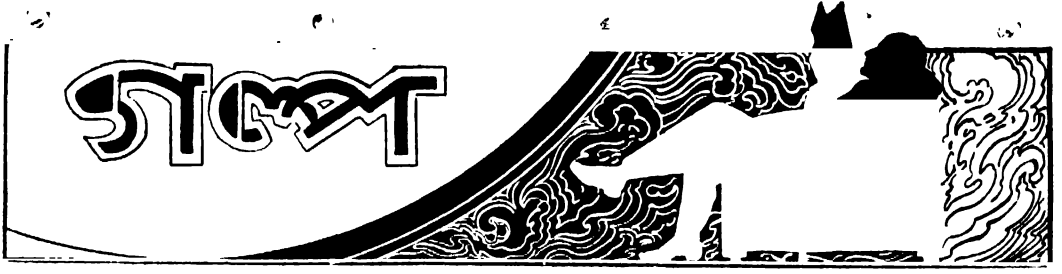
আশীর্ব্বাদ

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

ছোট্ট সংসার ভাই আর বোন।

বিরাট বাড়ীখানাতে অসংখ্য ঘর—ফ্লাট সিষ্টেমে ভাড়া দেওয়া—সেখানে উকিল, ডাক্তার, কেরাণী লেখক, সবকিছুই মিলবে! যাকে বলে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়! সকাল থেকে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের লাগে ঝগড়া হয় ছাদের রোদ নিয়ে, নয় কলের জল নিয়ে নয়ত ছেলেদের ব্যাপার নিয়ে।

ওদেরই মাঝে একটা ছোট্ট সংসার গড়ে উঠেছে! রমেন আর রেখা। সকাল সকাল চাট্টি রান্নাবাড়া করে দু' ভাই বোন বার হয়ে যায়। রেখা যায় স্কুলে, রমেন মেডিকেল কলেজে।

ভাই বোনের ঝগড়াও কম হয় না আবার মিটতেও দেরী হয় না। দু'জনেই দু'দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে—কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে উভয়ে চোখাচোখি হতেই আবার ভাব হয়ে যায়! রেখা তাড়াতাড়ি করে উঠে পড়ে—দাদার আবার কলেজ আছে।

আপন ভোলা রমেন, সে আছে তাই, না হলে কি যে হ'ত রেখা তা ভেবেই পায় না। এমন খেয়ালী ভোলামানুষ যে কেন ডাক্তারী পড়তে যায়।

রেখার ক'দিন জ্বর গেছে, উঠে দেখে বাড়ীর শ্রীবদলে গেছে চারিদিকে ময়লা কাপড়, সার্ট, চাদর, বই ছেঁড়া কাগজের টুকরো ছড়ান—যা ভেবেছিল ঠিক তাই। রেখা বলে ওঠে,—ধোপা রয়েছে কাপড়গুলো দিলেই ত হয়, ধোপার জন্যে ত আর তিন ক্রোশ যেতে হবে না?"

"তাত বটেই, বাড়ীতেই ধোপা রয়েছে দিনদুপুরে ঘরের সামনে দিয়ে উপর নীচে করছে বিশবার—রমেনের কথা শেষ হ'ল না একজন ভদ্রলোক জামার আস্তিন গুটিয়ে ঢুকলেন একেবারে মারমূর্ত্তি, রমেন যত বলে তাকে কিছু বলেন নি কিন্তু কে কার কথা শোনে।

বার বার সেই এক কথা বলে চলেছেন তিনি, "ডাইং ক্লিনিং আছে বলে আমি ধোপা হব নাকি। আমরা উগ্র ক্ষত্রিয়, একে উগ্র তায় ক্ষত্রিয়।"

বিরক্ত হয়ে রমেন বলে ফেলে, "না-না ধোপা নন, ধোপার বাহন।"

আর যায় কোথায়! মহা হৈচৈ, তিনতলা থেকে বিজয় বাবুর (ডাইংক্লিনিং বাবু) মেয়ে অনিতা নেমে এসেই বাবাকে কোন রকমে থামাল, আশ্চর্য্য মানুষ একটু পরে এসে একগাল হেসে বলে ওঠে, "মনে কিছু করবেন না ইয়ে ইয়ে রমেনবাবু। আমার মাথার ঠিক থাকে না, আচ্ছা নমস্কার।"—ঝড়ের বেগে নেমে গেলেন।

রমার ক্লাস থেকে ফিরতে দেরী হয়ে গেছে, সুতরাং রমেনই ঘরের গিন্নী যুতপাতকরে ষ্টোভ ধরাতে গিয়ে একেবারে লঙ্কাকাণ্ড। ভাতে ভাত ফুটিয়ে নিয়ে কোন রকমে কায সারবার মতলবে হাত দিয়ে জলন্ত স্প্রিটএ হাত পা ছেয়ে যায়। চাল ডাল আলু ঘরময় ছড়ান, নিজে ছুটোছুটি করছে। অনিতা এসেছিল নীচে কি একটা কাযে, তাড়াতাড়ি এসে কম্বল চাপা দিয়ে হাতের আগুনটা নেভাল কোনমতে! চুণ লাগিয়ে দিয়ে নিজেই নূতন করে ষ্টোভটা জ্বালাল, সেদিন অনিতা না এলে রমেনের একমুটো ভাত জুটতই না, কি একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে বসত। যাবার সময় অনিতা সাবধান করে দিয়ে যায়, আগুন নিয়ে খেলবেন না ওতে বিপদ আছে।

কথাটা হুকুম করে যায় নীরবে!

দুপুর বেলা চারিদিক নির্জ্জন হয়ে আসে, অলস রোদ ছাদের আলসের উপর লুটিয়ে পড়ে দিনের প্রহর গণনাকরে, কানপেতে শোনে মরমী বাতাস কখন দিনান্তের রক্তিম সূর্য্য তাকে চুমো দেবে।

অনিতা সাসির সামনে এসে দাঁড়ায়, রমেনের আজ ক্লাস নেই এক মনে অ্যানাটমিটা পড়ে চলেছে, বন্ধ দরজায় দুটো টোকা পড়তেই চেয়ে দেখে—অনিতা উপরের দিকে মুখটা তুলে আপন মনে একটা রাগিণী ভাজছে যেন দেখতেই পায় নি ও ঘরের মধ্যে কেউ রয়েছে! রমেন বার হয়ে যেতেই একটু হাসির লহরী তুলে সে সরে গেল ক্ষিপ্রগতিতে। দূরে সিঁড়ির কাছে গিয়ে হাতের নরম একটা আঙ্গুল তুলে শাসাতে ছাড়ে না—আগুন নিয়ে খেলা করবেন না বিপদ আছে।

পাশের বাড়ীতেই একটা মেস। মেস শাবকরা এবাড়ীর মেয়েদিগকে দেখলেই সুরু করে মীরার ভজন, কেউ বা দাশু-রায়ের পাচালী, নয় ত গোপাল উড়ের টপ্পা, নয় ত সিনেমার

গান, হেড়ে গলায় নিজেকে জাহির করবার যতগুলি ফন্দী জানা থাকতে পারে সবগুলোই সুরু করে।

ছাদে ওঠা এবাড়ীর মেয়েদের একরকম বন্ধ! রেখা এসব জানত না, কারণ বৈকালের দিকে সে কাজে বেরিয়ে যেত নয় ত দাদার সঙ্গে বাইরে যেত, একদিন ব্যাপারটা দেখে বেশ কতগুলো কথা শুনিয়ে দিতেই তারা সুড় সুড় করে নেমে গেল, মেসশাবক কি না প্রকৃতিটা একেবারে নিরীহ।

এ বাড়ীতে আবার এক নূতন ভাড়াটে এসে জুটেছে সুরেন উকিল—হালেপাশ করে কোর্টে যাতায়াত সুরু করেছে, মোটা ভোঁদামার্কা চেহারা, থ্রি কোয়াটার প্যাণ্ট পরে থালি যাতায়াতই করে, পকেট থাকে সেই গড়ের মাঠ। কিন্তু বিধবা দিদির গল্প থামে না—আমাদের সুবো চার চারটে পাশ ও নিশ্চয় হাকিম হ'ত! তা গান্ধী গান্ধী করেই সব গেল। নাহোক ওকালতি যা করে ফাষ্ট কেলাস। কোর্টের সেরা! হাজার হোক কার নাতি দেখতে হবে ত—গোষ্ঠ উকিলের নাতি।—বাবা যাবে কোথায়!

কেউ শুনুক বা না শুনুক কলতলায়, ছাদে। বোস গিন্নীর মজলিসে অপ্রতিহত গতিতে বকে চলেন। প্রতিবাদ করতে সাহস করে না, কারণ ঝগড়া Champion এবাড়ীর মধ্যে।

সুরেন বাবু কোর্ট থেকে ফিরেছেন, আড়চোখে রেখার দিকে চাইতে চাইতে চৌকাঠে ঠোক্কর খেয়ে বারান্দায় একেবারে চিৎপাত। ওদিক থেকে তরুণ কবি কল্পনা দে (পুং) রেখার জানলার দিকে নিবিষ্ট মনে চেয়ে আসছিলেন, ধরাশায়ী উকিলসাহেবের বিশাল বপুখানিতে টোক্কর খেয়ে প্যাকাটির মত জীর্ণশীর্ণ শরীর ছিটকিয়ে গিয়ে পড়ল তিনহাত দূরে, হরিণশিং-এর ছড়িখানা একেবারে সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে চলেছে। উকিল সাহেব তো উঠে পড়ে শাসাতে সুরু করেছেন—কল্পনাবাবু-ও গতিক খারাপ বুঝে বিনাবাক্যব্যয়ে যঃ পলায়তি স জীবতি নীতি অবলম্বন করলেন।

এদের দু'জনকেই ছাড়িয়ে গেছে বিটপী বটব্যাল। কালো মুসকো চেহারা পানের ছোপ লাগান বিশাল মুখটা আধহাত হাঁ করে তান ভাজেন।···তিনি এগিয়ে আসতে সাহস করেছেন, রেখা দেবীকে গান শেখাবেন। রেখা তার মাথা-নাড়া আর চীৎকার দেখেই ত হেসে অস্থির। রমেন ঘরে ঢুকতেই শশব্যস্তে যন্ত্রপাতা গুছিয়ে বগলদাবা করে পথ ধরলে।

"বসুন, বসুন।" আর বসুন! দড়বড় করে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে চলেছে। সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে কবি আর উকিল পাকড়াও করে সব কিছু শুনে নিল। এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে কবি, "ওর যণ্ডামার্কা ভাইটা কি বল্লে?"

রমেন রেখা দুজনেই পড়ে চলেছে। হঠাৎ কবি কল্পনা দে পিছনথেকে কার ঠেলা খেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল; আমতা আমতা করতে থাকে, "আমি আমি, সুরেন বাবু পাঠালেন—আমাদের ক্লাবে," বারকতক ঢোক গিলে নিয়ে ঘামতে থাকেন "আপনাদের নেমন্তন্ন।" "আচ্ছা"। কোন-রকমে লম্বা সেমিজের মত পাঞ্জাবীটা তুলে নিয়ে ছুটল। বাইরে যেতেই গায়ক আর উকিলের দাঁত খামচানী, "কাওয়ার্ড কোথাকার। হোপলেস। নেমন্তন্ন করতেও জান না।"

রমেনের বন্ধুদের মধ্যে বিনয়ই ছিল প্রধান, তার সঙ্গে বিনয় এবাড়ীতে যাতায়াত করত প্রায়ই; প্রথম দিন থেকেই রেখার বেশ ভাল লেগেছিল ওকে। তাছাড়া ছেলে হিসেবে বিনয় মন্দ নয়, বাড়ীর অবস্থাও বেশ, সুতরাং ডাক্তারী লাইনে ও উন্নতি করবে।·· ইদানীং তার যাতায়াতটা বেড়েছে একটু। কারণটা আমি জানি না।

বিনয়ের গতিবিধি দেখে কবি, গায়ক আর উকিল সাহেবের চক্ষু চড়ক গাছ। তারা কিছুই করতে পারল না—আর বাইরে থেকে কে না কে এসে বাজী মাৎ করে দিলে। আজ সিনেমা, কাল বেড়াতে যাওয়া নানা ধান্দা। কবি লিখে ফেল্লে সাতপাতা মর্ম্মভাঙা কবিতা, বিটপী বাবু কড়ামিঠে সুরে তিনখানা "মিয়া কি তোড়ী" আলাপ করে ফেল্ল সেই দিন রাত্রে। আর উকিলসাহেব রুদ্ধদ্বার কক্ষে "ইলোপমেণ্ট" কেসের মহলা দিচ্ছে।

বাড়ীময় কথাটা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ল, রেখার নাকি চালচলন বেশী ভাল নয়। বাড়ীর মেয়েদের উকিলের দিদি, বোসগিন্নী, অন্নদাপিসীর মজলিসে ঠিক হ'ল, বাড়ীওয়ালাকে বলে নুটিশ দেওয়াতে হবে। এখানে হাসির হর্‌রা চলবে না। উকিলের দিদি ত ভেবেই অস্থির, সুবো আমাদের পড়তেই পারছে না—এত গোলমাল হচ্ছে। ভারিভারি বই পড়তে হয় তো।

সকলকে অবাক করে উকিলকে শয্যাশায়ী করে, গায়ককে কঁাদিয়ে আর কবিকে ন'পাতা বিরহগাথা লিখিয়ে রেখার বিয়ে হয়ে গেল বিনয়ের সঙ্গে। বিনয় বাবার মত নেয় নি।···তাছাড়া রমেনের অসুবিধা হবে সুতরাং রেখা থাকল রমেনের কাছেই। গায়ক ছাড়ে আড়াই হাত দীর্ঘ-শ্বাস, কবি দিনরাত বুকে হাত বুলোয় আর উকিল কালীয়দমন মূর্ত্তির সামনে দাঁড়িয়ে জোরহাতে আবেদন জানায়—"Your honour"···

···বছরখানেক পরের কথা বলছি। রেখা এখনও রমেনের কাছেই রয়েছে···ও না থাকলে কে দেখবে রমেনকে, কোনদিন খাওয়াই হবে না হয় ত।

উকিলের দিদি মাঝে মাঝে দুঃখ করেন, সুরেনের আজ কাল শরীরটা ভাল নাই—যে বক্তৃতা দিতে হয়। গায়কের রাগিনীর চোটে পাড়ার লোক অস্থির—সারাদিনই কাঁদছে। কবির হয়েছে সবচেয়ে বিপদ—গলায় রেশমী চাদর

বেঁধে আত্মহত্যা করতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছে, বার হলেই পাড়ার ছেলেরা রাগাতে সুরু করে।

রেখার সারা দেহ মনে এসেছে পরিবর্ত্তন। শিরায় শিরায় তার ধ্বনিত হয় অনাগত কোন নূতন অতিথির আগমন—সে সুন্দর হয়েছে আরও বেশী অনেকগুণে। নারী জনম হবে তার সার্থক। সরলতার বাণী ফুটে বের হয় ভীরু সলাজ চাহনিতে, পদে পদে রমেনের খবরদারি। রেখা ভাবে দাদা যেন কি! হুস জ্ঞান কি কোনদিনই হবে না দাদার। বড় লজ্জা করে ওর।

হঠাৎ বিনয়কে ক'লকাতার বাহিরে যেতে হবে। বাবার সঙ্গে দেখা করে সে রেখাকে নিয়ে যাবে, রেখার সারাটা মনে রঙ্গীন আশা হালকা মেঘের মত ভেসে বেড়ায়। রচনা করে কোন স্বর্গের। বিনয় যাত্রা করল।

...দিন মাস চলে গেল বিনয়ের পাত্তা নাই। রেখা ভাবে, রমেনও খোঁজ খবর সুরু করল। যা খবর পেল তা না পাওয়াই ছিল ভাল। এতদিন বিনয় যে পরিচয় দিয়ে এসেছে তার সবটাই ছিল মিথ্যা, কোন পরিচয়ই তার নেই—আর সে হয় ত ফিরবে না। সে রেখার সর্ব্বনাশ করে গেছে। আর সে হয় ত ফিরবে না। রেখাকে আশ্বাস দেয় রমেন, আসল খবরটা চেপে।

রেখার হয়েছে একটী ছেলে, ফুলের মত সুন্দর; দেখে রেখার আশ মেটে না। মনটা ভরে ওঠে একদিকের নিরাশায়...মুখ খুলেই একদিন জিজ্ঞাসা করে বসে বিনয়ের কথা। রমেনকেও বলতে হল সব কিছুই। রেখা পাষাণের মত স্তম্ভিত হয়ে নীরবে শুনে গেল সে সব কাহিনী।

রমেণ তখনও Practise জমাতে পারেনি—ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসে সংসারে অভাবের কালোছায়া।

ছেলেকে অনিতার কাছে খানিকক্ষণের জন্য রেখে রেখা আজকাল বার হয় চাকরীর সন্ধানে—কেউ আশা দেয় কেউবা নিরাশ করে। অনেক খোঁজাখুজির পর একটা মেয়ে স্কুলে offer পেল। মাইনে সে যাই হোক মন্দ নয়। তারাই Taxi ডেকে বাড়ী পাঠিয়ে দিল। বলে দিল ২।১ দিনের মধ্যেই গাড়ী পাঠাবে তাকে আনতে। রেখার আনন্দ দেখে কে?

পরদিন দুপুরে ট্যাক্সিওলা এসে হাজির।

স্কুল থেকে ডাকতে এসেছে, অন্যদিনের মত খোকাকে অনিতার কাছে রেখে দিয়ে বার হল। বাড়ীটার পিছন দিকটা নির্জ্জন, Taxi খানা সেখানে ব্যাক করিয়ে নিয়ে গিয়ে ড্রাইভারটা ক্ষিপ্ত পশুর মত রেখার মুখখানা টিপে ধরল, হাত পা মুখ বেধে সিটের নীচে ফেলে তীর বেগে গাড়ী নিয়ে বার হয়ে গেল।

রমেন ফিরে এসে দেখে রেখা নাই! রাত্রি গেল সকাল এল, বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়ল নানা রংএ। অবশেষে পুলিশে খবর গেল, কোন সন্ধান নেই! ছেলেটা চীৎকার করে চলছে অনিতাই ওকে নিয়ে গেল! রমেনের একটা বন্ধন ভার জুটে গেল।

অনিতা আর রমেনের হাতে মানুষ হয়ে ওঠে ছেলেটা। কচি কচি হাত পা ছুড়ে আপন মনে হাসে, রমেনের দিকে ডাগর চোখ দুটো চেয়ে দেখে অবাক হয়ে।

রেখা এখন বাংলার বাইরে, দূরে অনেকদূরে। কঠিন মাটিতে চারিদিকের আকাশসীমা রচিত হয় যেখানে, তাম্রাভ রোদ, রিক্ততার দীর্ঘশ্বাসে কাঁপতে থাকে যেখানে ছায়াময় দূর দিগন্তে। কতকগুলো বদমাইসের গুপ্ত আড্ডায়। তবে উদ্দেশ্য তাদের অন্য রকমের! চারিদিকে পাড়াগাঁ—সহর থেকে লুকিয়ে নানা ফন্দী ফিকিরে অনেক ভদ্র ভদ্র ঘরের ছোট ছেলে চুরি করে আনে, তাদের হাত পা বিকৃত করে—চোখ কানা করে আরও নানা উপায়ে তাদিকে বিকৃত করে...বিক্রী করে। তাদেরই তদারক করবার জন্য রেখাকে নিয়ে গিয়েছিল তারা। রেখার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত ওদের অমানুষিক অত্যাচার দেখে—চোখ বুজে প্রাণপণে সামলাত নিজেকে। লোকগুলো যেমন বদমাইস চেহারাও তেমনি বিভীৎস! একটা মোটা কাল কুচকুচে লোক সারা মুখে চোখে শয়তানীর ছাপ সে আবার রসিকতা করতে ছাড়ে না রেখার সঙ্গে।

তার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে রেখা বার হয়ে পড়ল, এক রাত্রি ভোরে আবার পথে! গা ঢাকা দিয়ে ট্রেণে উঠে রওনা হ'ল ক'লকাতায়! অজানা আশঙ্ক বুকটা দুলে যায়! জানলায় মাথা রেখে রক্তিম সূর্য্যের দিকে চেয়ে মাথা নত করে—ঠাকুর! দাদাকে, আমার খোকাকে ফিরিয়ে দিও ঠাকুর। আর আমি কিছু চাই না, কিছু চাইব না! ভোরের শিশিরের মত শুভ্র গণ্ডদেশে গড়িয়ে পড়ে বাধনহারা অশ্রু।

দেবতা বোধহয় হেসেছিল তার প্রার্থনা শুনে। সিড়ি দিয়ে ছুটতে ছুটতে উঠে এসে দেখে তাদের ঘরে দাদা নেই অন্য এক নূতন ভাড়াটে!

বুকটা ধক্ করে ওঠে! রেলিংএ মাথা রেখে কেঁদে ফেল্ল! বাদাম গাছটার আড়ালে নীল আকাশ কাঁপছে থর থর করে, চারিদিকে দেখা দেয় কৌতুহলী চোখ। উকিলের দিদি এগিয়ে এসে মজাটা দেখতে লাগলেন।

দাদা এখানথেকে উঠে গেছে মাস ৫।৬ আগে! কোথায় গেছে কেউ জানে না! উকিলের দিদি বলতে ছাড়েন না—অমন মেয়ের মুখে নুড়ো জেলে দিতে হয় না!

নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে রেখা এসেছে বেগমপুরে, মেয়ে স্কুলে একটা দরখাস্ত করেছিল—ভাগ্যক্রমে একটা অবলম্বন জুটে গেছে। রেখা আজকাল পরিচিত সুনীতি বলে।

দীর্ঘদিন কেটে গেছে। রমেন হয়েছে প্রৌঢ়! সারা জীবনে ঐ ছেলেটাকে মানুষ করেছে হৃদয়ের সব কিছু ভালবাসা স্নেহ উজাড় করে। সুনীল আজ মানুষ হয়ে উঠেছে! বেগমপুর হসপিটালের ইনচার্জ্জ!

সুপুরুষ চেহারা অর্থও নেহাৎ কম নেই—ভাল চাকুরী, ফাক দেখে বিলাত দেশের মাটিটা মাড়িয়ে আসতে পারলেই সিভিল সার্জ্জন। সুতরাং ওখানকার মধ্যে একটা নামজাদা লোকই হয়েছে সুনীল! প্রবোধবাবু এমন চান্সটা হারাতে রাজী নয়। তাইই হয়ত স্বাতীর সঙ্গে সুনীলের মেলা-মেশাটা, সিনেমায় যাওয়া, বেড়াতে বার হওয়া কিছুই খারাপ চোখে নেয় নি। স্বাতীর মা ত দূরের কথা। সুনীলের বাসাতে স্বাতী এলে সুনীলের ছুটোছুটি বেড়ে যায়! ঠাকুর চাকরকে ধমকাবার শেষ নাই। ওরা অতিথি সম্মান করতে জানে না কচু। স্বাতীর হাসি পায়—সুনীলের কায দেখে। শেষ অবধি নিজেই চা খাবার করবার ভার নেয়—ঠাকুর চাকর রেহাই পায়। আড়ালে গিয়ে মালীকে ফুল বেশী করে দেবার পরামর্শ দেয়।

সুনীতিদি স্কুলের মধ্যে মেয়েদের সবচেয়ে প্রিয়! তার সরল মধুর ব্যবহার, সব বিষয়েই মেয়েদিকে নিকটে এনে দেয়। সবতাতেই তাকে থাকতে হবে! সহকর্ম্মীনিদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত তার জীবনের অতীত কাহিনী স্মরণের চেষ্টা করেছে সুনীতি কিন্তু মলিন হাসিতে সব কিছু ঢেকে দেয়!

স্বাতী সুনিলের বাসাতেও আসে—তার নাকি সময় কাটে না। রমেন গেছে দিন কয়েকের জন্য সুনীলের ওখানে! বাড়ী ঢুকবার আগে উপর থেকে বামা কণ্ঠের গান শুনে অবাক হয়ে থেমে যায়। পরক্ষণেই সুনীল বেরিয়ে এসে সহজভাবেই মামাবাবুকে নিয়ে গেল; স্বাতীর সঙ্গে আলাপ হতে দেরী হল না—স্বাতীও ক্ষণিকের মধ্যে চা খাবার খাইয়ে রমেনের সঙ্গে বেশ জমিয়ে ফেল্ল, রমেন আপন-ভোলা মুগ্ধহাসির লহরীতে স্বাতীর তরল হৃদয়ে একটা সম্মানের স্থান অধিকার করে নিল!

তাহাকে ছেড়ে আবার ক'লকাতায় ফিরে আসতে রমেনের কষ্ট হয়। কি আনন্দই না হ'ত যদি ওদের মাঝে বাসা বাধিতে পারত। আবার ফিরতে হয় রমেনকে ক'লকাতায়।

হঠাৎ একদিন রাত্রে বোর্ডিংএ আগুন জ্বলে উঠল! শোবার সময় কে আলোটা নিভোয় নি! কোন রকমে কাৎ হয়ে বিছানার পড় মশারীতে ধরা মাত্র ঘরের চালে ধরে গেছে। চারিদিকে আগুনটা ছড়িয়ে পড়েছে। সুনীতির পাশের ঘরে কয়েকজন ছোট মেয়ে ধোয়ায় পথ হারিয়ে চীৎকার করে চলেছে। বার হতে পারছে না, সুনীতি ব্যাকুল হয়ে ওঠে! তার মনে পড়ে যায়, ফেলে আসা দিনগুলোর কথা :—সেও যে মা! এ শূন্য জীবন তার কাছে মূল্যহীন তুচ্ছ। আগুনের লেলিহান জিহ্বা চারিদিকে শত বুভুক্ষার দীপ্তি নিয়ে ছুটে চলেছে..জ্বলন্ত দরজার মধ্য দিয়ে ছুটল সুনীতি ঘরের মধ্যে জ্ঞানহীনের মত।

জ্ঞান ফিরে এল হাসপাতালে। সুনীতিকে আর চেনা যায় না! পুড়ে গিয়েছে যায়গায় যায়গায়! শূন্য অর্থহীন দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে কি যেন মনে করতে যায়! পারে না! স্কুলের বা অন্য কেউ পরিচিত দেখতে গেলে চিনতে পারে না! কোন কিছু মনে করবার চেষ্টা করলেই জ্ঞানহীন হয়ে যায়! সুনীল এরকম কেস বড় একটা দেখে নি! বেশ মন দিয়ে Study করতে লাগল কেসটা! বেশীর ভাগ সময় কাটে এই নূতন রোগিণীর পাশে! বড় বড় বইগুলো আবার মন দিয়ে ঘাটতে সুরু করেছে!

এত ঘেটেও কিছু করতে পারে না—ব্রেণে শক লেগে এরকম একটা change এসেছে। ওষুধে ভাল হবার কোন আশা নেই। আবার ঐরকম একটা শক লাগলে হয় ত ভাল হতে পারে নয় ত হার্টফেল করবে! সুনীলের ঐ রোগিণীকে দেখলে সত্যিই বড় কষ্ট হয়, শূন্য অর্থহীন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে—সুনীলকে বড় বিচলিত করে তোলে!

স্বাতীর কানেও গেছে এ কেসের খবর! স্বাতীও আর একজনকে শোনাবার সুযোগ পায়, রমেন আবার গেছে ওদের ওখানে! বুড়ো বয়সে শান্তির সন্ধান কালে...মানুষ সেইটাকে বড় করে দেখে...ছাড়তে পারে না। সেখানে যাবার জন্যই ব্যাকুল হয়ে ওঠে!

স্বাতী দম দেওয়া মেসিনের মত এতদিনের সেই যাবার পর থেকে দিনগুলোর কাহিনী শুনিয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে পাকা-চুল তোলা, তার পরই সুনীলের নূতন কেসটা।

রমেনও ডাক্তার মানুষ! সুতরাং একটা কৌতুহল বশেই সেদিন বৈকালে স্বাতীর সঙ্গে গেল হাসপাতালে! ছোট হাসপাতালটা ছবির মত সাজান। সবুজ ঘাসের বুক চিরে লাল সুরকী ঢালা পথগুলো চলে গিয়েছে, মাঝে মাঝে ফুলের কেয়ারী।

পিছন দিয়ে মুখ ফিরিয়ে সুনীতি অসীম শূন্যে কি যেন দু'চোখ দিয়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। সামনে বজ্রাঘাত হলেও এত আশ্চর্য্য হত না—'একি! রেখা কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে চীৎকার করে ওঠে, 'দাদা-দাদা!' রমেন ছুটে গিয়ে তাকে ধরল, না হলে অসুস্থ শরীর নিয়েই নেমে পড়ত! রেখার চোখ দিয়ে দর দর করে জল গড়িয়ে পড়ে, কান্নার আবেগে ফুলে ফুলে ওঠে তার দেহ!

ওপাশের দরজায় কতকগুলো জুতোর শব্দ শোনা যায়। নূতন সিভিল সার্জ্জন মিঃ নাগ সবে কাল এসেছেন। তাকে হাসপাতাল সম্বন্ধে নানা কথা বলবার পর সুনীল নূতন রোগিণীর কথা বলে বসে। মিঃ নাগও আশ্চর্য্য হয়ে যান। তারই জন্য আজ বৈকালে তাদের অভিযান এই হাসপাতালের দিকে।

সিভিল সার্জ্জন, সুনীল, আরও দু একজন ডাক্তার প্রবেশ করলেন। সুনীল মামাবাবুকে রোগিণীর সঙ্গে কথা বলতে দেখে অবাক হয়ে যায়। পরক্ষণেই রমেন বিস্মিতকণ্ঠে বলে ওঠে—'বিনয়-তুমি!'

মিঃ নাগ বুঝতে পারেন না, এ স্বপ্ন না সত্য! হারান বিনয় আজ সিভিল সার্জ্জন হয়ে ফিরে এসেছে!

তারপর! তারপর রেখা ফিরে পেল তার স্বামী, পুত্র দাদাকে আর রমেন ফিরে পেল সবাইকে!

সুনীল মায়ের দিকে চেয়ে থাকে, মধুর হাসিতে মুখখানা রঞ্জিত করে তার কাছে বসল!

রেখা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, তবে দুর্ব্বলতা যায় নি! রমেনের চেষ্টাতেই সুনীলের বিয়ের ঠিক হয়ে গিয়েছে! তার মতে বিয়ে না করলে নাকি কাজে কর্ম্মে মন বসে না! বিনয় বিয়ে করেছিল বলেই সিভিল সার্জ্জন আর সে করেনি তাই আজও ডাক্তার বাবু!

বিয়েবাড়ীর গোলমাল রমেন মহা ব্যস্ত! বর কনেকে আশীর্ব্বাদ করতে হবে! বিনয় রেখা করেছে; রমেনকে পাওয়া যাচ্ছে না! এক হাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে ছাদে পারবেশন করতে যাচ্ছে! রেখার ডাকাডাকিতে হাঁড়িটা নামিয়ে গামছায় রসটা মুছে সুনীল আর শ্বাতীর মাথায় দুটো ধান দুর্ব্বা ছিটিয়ে বলে ওঠে—নে বাপু, তোরাই আশীর্ব্বাদ কর, এতটুকু থেকে আমিই আশীর্ব্বাদ করে আসছি ওকে, ও আমার পুরোণো হয়ে গেছে! সকলে হেসে ওঠে।

মিষ্টির হাঁড়িটা তুলে নিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল রমেন।

অববুদ্ধ

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

মরুভূমির রুক্ষতার উপর বিছিয়ে থাকে ওয়েসিসের করুণা, তারই শ্যামলিমা যেন জেগে উঠেছে আশ্রমটীর মাঝে। পৃথিবীর দুঃখ-শোক বিস্মৃত হয়ে এক মহান প্রশান্তিকে উপলব্ধি করার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে এই আশ্রমের। পরিবেশে তারই স্বীকৃতি।

উপাসনা কক্ষে সন্ন্যাসীর স্তিমিত নেত্রে এক অদ্ভুত প্রশান্তি। সংসারের মর্ম্মোত্থিত ক্রন্দন-বেদনার দোলায়িত চঞ্চলতার সঙ্গে তার কি বিরাট ব্যবধান!

সংবাদ এলো এক রমণী সন্ন্যাসীর দর্শনপ্রার্থী! বাইরের ঘরে যেতেই রমণী তার শিশু সন্তানকে নিয়ে লুটিয়ে পড়ল সন্ন্যাসীর পায়ে।

"কি হয়েছে মা?" সন্ন্যাসীর কোমল কণ্ঠ রমণীর ক্রন্দনের তীক্ষ্ণতার উপর একটা ক্ষণিক অনুলেপ দিয়ে গেল।

"বাবা, তোমরা আশ্রম করেছ, ধর্ম্মকর্ম্ম করেছ—আমার ছেলেকে কিছু খেতে দাও, নইলে ওকে বাঁচাতে পারব না।"

"মা, কেবলমাত্র ঈশ্বরই আমার সম্বল, সংসারের ধন-সম্পত্তি সবই আমি ত্যাগ করে এসেছি। অর্থ দিয়ে সাহায্য করবার ক্ষমতা তো আমার নেই। আমি যে নিঃস্ব।"

"আমি কিছু খাবার চাইছি।"

"সামান্য খাবার দিয়ে কি ক্ষুধা ঘুচানো যাবে মা? আবার ক্ষুধা পাবে—আবার খাবারের প্রয়োজন হবে। ভগবানকে স্মরণ কর, তিনিই সব ক্ষুধা ঘুচাবার মালিক।"

"ঈশ্বরের নামে পেট ভরে না, বাবা। তাঁকে অনেক ডেকেছি, কিন্তু ক্ষুধা তাতে বেড়েছে বই কমে নি।"

"মা, মানুষের দুঃখের মূল তার আত্মাহঙ্কার। ভগবানের পায়ে আত্মসমর্পণ কর, পৃথিবী তোমার ক্ষুধা ঘুচাতে পারলেও দুঃখ ঘুচাতে পারবে না।"

"শিশুকে চোখের সামনে উপবাসে কাঁদতে দেখে অন্নের চিন্তা না করে ভগবানের চিন্তা করা কি সম্ভব?"

"এছাড়া আর কোন উপায়ই নেই মা। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি দুর্ব্বল হয়ো না। নির্ভীক হও, এই আমাদের শাস্ত্রের উপদেশ।"

রমণী আর কিছুই বললে না। শিশুপুত্রকে কোলে তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে আশ্রম ত্যাগ করলে।

সন্ন্যাসী আবার তাঁর উপাসনা কক্ষে ফিরে গেলেন। নারীসেবাশ্রমের এক ব্রহ্মচারিণী দ্বারের কাছে তাঁর জন্তে অপেক্ষা করছিল, দেখা হতেই নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলে।

এই সর্ব্বত্যাগিনী নারীর পানে চেয়ে সন্ন্যাসীর মনে হ'ল আর এক নারীর কথা—যে এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে শিশুপুত্রকে নিয়ে তাঁর কাছে আহার্য্য প্রার্থনা করতে এসেছিল। সে মা। সংসারের সহস্র বন্ধনকে সাগ্রহে সে স্বীকার করে নিয়েছে। তার সংসার, তার সন্তান, এদের বাদ দিয়ে কল্পনাই করা যায় না তাকে। সেখানেই তার নারীত্ব, কিন্তু যে নারী তাঁর সম্মুখে বসে আছে সে ত' সংসারকে এমন করে স্বীকার করে নি। সংসারকে সে কি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছে। সন্ন্যাসী-জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছে যে নারী শুধু তখনই সংসারকে অস্বীকার করে, যখন সংসার আর তাকে স্বীকার করতে চায় না। এর এই ব্রতচারিণীরূপের আড়ালেও হয় ত' প্রচ্ছন্ন আছে তেমনি কোন করুণ ইতিহাস। কৌতুহলী সন্ন্যাসী সুমিষ্ট কণ্ঠে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

ব্রহ্মচারিণী উত্তর করলেন, "আমি সেবিকা—এই আমার পরিচয়। আপনি সন্ন্যাসী, অন্ত কোন পরিচয়ের মোহ ত' আপনার নেই।"

মৃদু হেসে সন্ন্যাসী বল্লেন, "পরিচয় না-ই দিলে, নাম বলতেও কি আপত্তি?"

সেবিকা সুস্নিগ্ধকণ্ঠে বল্লে, "নামের সঙ্গে বহুদিন পরিচয় নেই। সংসারের অন্যান্ত সামগ্রীর মত তাকেও পেছনে ফেলে এসেছি। সে নাম ছিল 'শিখা'।"

—"ব্রহ্মচারিণীর উপযুক্ত পবিত্র উজ্জ্বল নামই ত' ছিল, তাকে ত্যাগ করলে কেন?"

—"এ নূতন জীবন আমার ফেলে-আসা জীবনের কোন দ্রব্যই চাইলে না প্রভু, এমন কি—তুচ্ছ নামও নয়।"

—"আমি তোমায় ও-নামেই ডাকব। কিন্তু আমার উপাসনার সময় হয়ে গেছে। তোমার কথা ত' কিছু শোনা হ'ল না।"

—"উপাসনা শেষ করে এলে আপনার কাছ থেকে কয়েকটী উপদেশের বাণী শুনব বলে ভেবেছি। সুযোগ কি হবে না?"

—"কেন হবে না শিখা? 'জ্ঞানযোগ' সম্বন্ধে দেশবাসীকে কিছু বলব বলে আমিও ভেবেছিলাম।"

সেবিকা মৃদুকণ্ঠে বল্লে,—"সে তো সকলের জন্তে। আজ ব্যক্তিগতভাবে আপনার কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করব বলে ভেবেছি। নিজের সম্বলও ত' কিছু চাই।"—সেবিকার কণ্ঠ বিচলিত।

সন্ন্যাসী সস্নেহে সেবিকার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "বেশ ত' শিখা, আমি উপাসনা শেষ করে আসি। তুমি ততক্ষণ ভগবানকে স্মরণ কর, তোমার মন যেন বিচলিত বলে মনে হচ্ছে।"

সেবিকা নীরব রইল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা ভজন গান শেষ করে বাইরে এসে সন্ন্যাসী দেখলেন দ্বারের কাছে লুটিয়ে পড়ে শিখা তাঁকে প্রণাম করছে। তিনি শুধালেন, "তুমি কখন এলে শিখা?"

—"অনেকক্ষণ, এখানে বসে আপনার ভজনগান শুনছিলাম।"

সেবিকা এই মাত্র স্নান করে এসেছে। পরণে একখানা খদ্দরের গেরুয়া, বহুদিনের অসংস্কৃত চুলগুলো জটার মত সারাটা পিঠে ছড়িয়ে আছে। চোখ দু'টী ম্লান, মুখখানি চিন্তাক্লিষ্ট।

সন্ন্যাসী বল্লেন, "আজও কি উপদেশ শুনতে এসেছ শিখা?"

সেবিকা স্খলিত আঁচলটিকে কাঁধের উপর তুলে দিয়ে বল্লে, "কাল আমার পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরিচয় আমি দেই নি।"

সন্ন্যাসী বল্লেন, "পরিচয় ত' তুমি দিয়েছিলে শিখা, বলেছিলে তুমি সেবিকা, সত্যিই কি ওই তোমার সবচেয়ে বড় পরিচয়।"

সেবিকার মস্তক লজ্জায় ঈষৎ অবনত হ'য়ে পড়ল। আনত দৃষ্টিতে সে বললে, "সেদিন বুঝতে না পেরে বড় অহঙ্কারের কথাই বলেছিলাম প্রভু। আজ বুঝতে পারছি পরিচয় না দিলে স্বস্তি আমি পাব না।"

সন্ন্যাসী লজ্জানতার পানে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "পরিচয় কি না দিলেই নয়?"

"না। আমার সকল কথা আজ আপনাকে শুনতেই হবে প্রভু।"

সন্ন্যাসী বসলেন, সেবিকা ধীর-কণ্ঠে তার কাহিনী সুরু করলে।

সেবিকার পরিচয় সন্ন্যাসীর মনের ওপর থেকে যেন একটা গাঢ় আবরণকে উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে গেল। মনে পড়ল আজ তাঁরও পরিচয়টা। এতদিন তাকে তো তিনি ভুলেই ছিলেন। আজ শিখার পরিচয় মনে করিয়ে দিলে তাঁরও একটা অতীত জীবন ছিল—ছিল পরিচয়। মন আজ ফিরে যাচ্ছে সে জীবনেরই অভিমুখে—স্মৃতির পাখায় ভর করে।

অন্ধকার রাত্রি বহুবার অতীনের জীবনে এসেছে, কিন্তু এমন নিঃসীম প্রগাঢ়তা নিয়ে আর কোন দিন আসেনি। অতীনের একমাত্র বন্ধন ছিল তার মা। সেদিন প্রভাতে তাঁরও ব্যাধিগ্রস্ত জীবনের অবসান ঘটেছে। আজ অতীনের জীবনে প্রথম একক রাত্রি—সাথীহীন—আশ্রয়হীন। ঘরের মাঝে অন্ধকারের পটভূমিকায় অতীনের বিনিদ্র চোখ দু'টী যেন আকাশের তারার মতই কোন এক মর্ম্মদাহকে স্ফুরিত করছিল। নিস্তব্ধ রাত্রির গভীর ঘন অন্ধকারে তারই মনের ব্যাকুলতা বুঝি জমাট বেঁধেছে! পাগল-হাওয়া জলের বুকে যেমন ঘূর্ণি জাগায় অতীনের মনে তেমনি এলোমেলো চিন্তার ঘূর্ণি।

এই তো সংসার! এখান থেকে সে কি পেয়েছিল? খ্যাতি পায় নি—অর্থ পায় নি—ভালবাসা পায় নি, এমন কি ঘৃণা অবজ্ঞাও পায় নি,—পেয়েছে উদাসীনতা—উপেক্ষা। মায়ের অপরিমিত স্নেহ তাকে ঘিরে ছিল সত্য, কিন্তু তাও তো আজ রহস্যময় অতীতের পানে পাড়ি জমিয়েছে। সংসারে আজ আর তার পাবারও কিছু নেই—দেবারও কিছুই নেই। তবে আর কেন? সংসার অতীনকে উপেক্ষা করেছে, অতীনও করবে তাকে উপেক্ষা।

রাত্রির আকাশে একটী নক্ষত্র দিক পরিবর্ত্তন করলে।

* *

পূর্ব্বাকাশে উষার আভাস জেগে উঠেছে। সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়ালেন,—রাত্রির চিন্তাকে রাত্রির কালিমার মতই ঝেড়ে ফেলতে চাইলেন চিত্তাকাশ থেকে, কিন্তু এ যে ছায়ার মত আঁকড়ে ধরেছে তাঁর দেহটাকে।

ভগবানকে প্রণতি জানিয়ে তিনি ভজন গান ধরলেন।...

গান যখন শেষ হ'য়ে গেল, তখন নূতন সূর্য্যের প্রথম আলোর আভাস সন্ন্যাসীর ভজনাগারে এসে উঁকি মেরেছে। প্রাতঃ সূর্য্যকে প্রণাম করবার জন্যে তিনি বাইরে পা বাড়ালেন। আশ্রমের দুয়ারের কাছে কি যেন একটা পড়ে রয়েছে না? দ্রুতপদে সেদিকে এগিয়ে গেলেন সন্ন্যাসী। কাছে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক্ হলেন। শিশির বারিতে অভিষিক্ত সবুজ কোমল ঘাসের বুকে উপুর হ'য়ে পড়ে আছে একটী শিশু—এক রাশি ঝরা শিউলীর মত, কাছে বসে গায়ে হাত দিতেই সন্ন্যাসী বুঝতে পারলেন, মৃত্যু তার হিমশীতল স্পর্শ বুলিয়ে গেছে ওর দেহে। করুণাভরে তাকে তুলে নিয়ে মুখের পানে তাকাতেই চমকে উঠলেন সন্ন্যাসী। এই শিশুরই জন্যে কাল এর অসহায়া জননী তাঁর কাছে আহার্য্য ভিক্ষা করতে এসেছিল। তিনি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন কিছুটা আধ্যাত্মিক উপদেশ দান করে। তাকে কি বঞ্চনা করেন নি তিনি? উপবাসী শিশুর জন্যে তিনি যে পরম পথ্য দান করেছিলেন, তাতে তো এর কোনই লাভ হয়নি। সেই কথা জানাবার জন্যেই শোকাতুরা মাতা মৃত শিশুকে ফেলে গেছে তাঁর আশ্রমদ্বারে। ভাষাহীন নিষ্ঠুর অভিযোগ।

এই শিশুর জীবনের সম্ভাবনাকে তিনিই কি নষ্ট করে ফেলেন নি? পরমাত্মার পাদপদ্মে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছেন, কিন্তু এইসব শিশুর জীবনকে সফল করে—সার্থক ক'রে তুলবার কাজে তিনি কি আপনাকে নিয়োজিত করতে পারতেন না।

মৃতের জন্যে চঞ্চলতা প্রকাশ করা সন্ন্যাসীর অনুপযুক্ত। কিন্তু অতীতের স্মৃতি-সলিলে অবগাহিত তাঁর অন্তর আজ সেই চঞ্চলতাকে কিছুতেই রোধ করতে পারছে না। সন্ন্যাসীর মনে জেগে উঠল বহু বছর আগেকার অতীনের কথা। অতীন ভেবেছিল, সংসারে তার দেবার কিছুই নেই—পাবারও কিছুই নেই। কিছুটা ভুল করেছিল সে। আজ এ মৃতশিশুর মুখের পানে চেয়ে সন্ন্যাসী বুঝতে পারছেন, সংসারে অতীনের পাবার কিছু না থাকলেও দেবার ছিল অনেক কিছুই। সংসারের লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত্ত শিশু যেন তাদের দাবীর আবেদন মেলে ধরেছে তাঁর ভ্রান্ত হৃদয়ের কাছে। সন্ন্যাসীর মাঝখানে বারো বছর পরে আজ আবার হারানো অতীন জেগে উঠেছে।

ঘরে ফিরে এসে সন্ন্যাসী দেবতার কাছে অভিযোগ জানালেন—'প্রভু, সংসারে আমার যে অনেক কিছুই দেবার আছে সে কথা এত দেরী করে কেন জানালে? সংসারের দুঃখ বেদনাকে প্রশান্তির মাঝে টেনে আনবার জন্যেই এ আশ্রমের সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু মাটির মানুষের দুঃখের অভিযোগ-এর নির্লিপ্ততার প্রাচীরে আহত হয়েই ফিরে গিয়েছে শুধু। আমি তো সংসারকে ত্যাগ করি নি—এ আশ্রমের নির্ব্বাসনে সংসারই আমায় ত্যাগ করেছিল।'

সন্ধ্যাতারার মত করুণ দু'টী চক্ষু নিয়ে সেবিকা এসে কাছে দাঁড়াল। প্রণাম করে কোমলকণ্ঠে বললে, "চলে যাবার আগে আপনাকে আমার শেষের প্রণাম জানাতে এসেছি প্রভু।"

সন্ন্যাসী বললেন, "আশীর্ব্বাদ করি জীবনে যে ব্রত গ্রহণ করেছ তা সম্পূর্ণ সফল হোক।"

সন্ন্যাসীর পানে দু'টী সজল চোখ তুলে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে শিখা বললে—"আপনার এ আশীর্ব্বাদের উপযুক্ত আমি নই প্রভু। ভেবেছিলাম অতীত জীবনকে আমি অতিক্রম করে এসেছি, কিন্তু আজ বুঝতে পারছি অতীতের বাসনাময় মনটী এতদিন আমার মাঝে গোপন হয়ে ছিল—বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। আমায় ক্ষমা করুন।"

—"কি বলছ শিখা? আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে।"

একটু নীরব থেকে সেবিকা বললে, "আমি অপরাধী

প্রভু। আপনাকে প্রথম দর্শনের দিনে আমার মনে যে অনুভূতি জেগে উঠেছিল, সে তো শুধু ভক্তি নয়—শ্রদ্ধা নয়। আজ আমার এই বেদনাতুর হৃদয়টা আপনার চরণে যা অর্পণ করতে চাইছে, আপনি তার চেয়ে অনেক উর্দ্ধে।"

চোখ তুলে সন্ন্যাসীর প'নে চ'াইতেই সেবিকা বিস্মিত হ'য়ে গেল। তাঁর চিরশান্ত দৃষ্টির মাঝে আজ একটা নিবিড় করুণ ছায়া। এ দৃষ্টি সেবিকা আর কথনো দেখে নি। কিছুক্ষণ উভয়ের দৃষ্টি মিলিত রইল, তারপর দৃষ্টি অবনত করে সেবিকা সন্ন্যাসীর পায়ে বিদায় প্রণতি জানাল।

তিনি বললেন, "আশর্ব্বাদ আর তোমাকে করতে পারবো না শিখা, আশাকরি জীবনে সুখী হবে।"

ক্ষণকালের জন্যে সন্ন্যাসী চোখ মুদলেন, যখন তাকালেন শিখা তখন চলে গিয়েছে।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন সন্ন্যাসী। অন্তর ছিল তাঁর কুলহারা চির স্থির জলধির মত, আজ অকস্মাৎ একটা ঝঞ্ঝাবায়ু এসে তার মাঝে তরঙ্গের কম্পন তুলে গেছে। আত্মহারা হ'য়ে ভাবতে লাগলেন তিনি। সেবিকার কণ্ঠে যে কথা অব্যক্ত রয়ে গেল কি সে? কী তাঁকে দিতে চেয়েছিল শিখা? সে কি প্রেম—ভালবাসা?

বারো বছর আগে অতীন কি তবে একেবারেই ভুল করেছিল? সংসারে যে শুধু তার দেবারই আছে তাই নয়, পাবারও তো তার কিছু আছে। যে সংসারে লক্ষ কণ্ঠ পেতে চাইছে ক্ষুধার অন্ন—চাইছে সহানুভূতি—বিপন্ন চাইছে সহায়তা, যে সংসার দিতে চাইছে হৃদয়ের অযাচিত উপহার—মহামূল্য অবদান, সেই সংসারকে সন্ন্যাসী এমনভাবে উপেক্ষা ক'রেছিলেন কি ক'রে? এতদিনকার কারাগার থেকে কে যেন আজ মুক্তি চাইছে—চাইছে আলো, হাওয়া, জীবন।

সন্ন্যাসীর আবরণ ভেদ করে। বেড়িয়ে এল সত্যিকারের অতীন—আরও উজ্জ্বল আরও প্রাণময় হয়ে; গেরুয়াবসন শুধু নির্ম্মোকের মত পড়ে রইল তাঁর পশ্চাতে।

সুখ না শান্তি?

শ্রীঅপরাজিতা দেবী

নির্ম্মল সত্তর টাকার কেরাণী।

নির্ম্মল সদা অসুখী—বিরক্ত ও অস্বচ্ছন্দ চিত্ত। কত উচ্চ আশা ছিল কলেজ জীবনে,—দশের এক হইবে... সমাজের মুকুট হইবে—হইল কি না সত্তর টাকার কেরাণী।—ধিক্ জীবনে!

রঙ্গপুর সহরের সীমান্তে নির্ম্মলের ছোট্ট মেটে বাসা। মা, স্ত্রী—রেবা, বোন—রেণু, ভাই—অমু—এই লইয়া সংসার। বাসা ভাড়া চার টাকা—ঠিকা ঝি দু' টাকা।

সংসারে নির্ম্মল রাজা। মা নিত্য নূতন টুকি টাকি খাবার ক'রিয়া রাখেন; রেবা জামা কাপড় সাফ করে—ঘর দুয়ার গুছাইয়া রাখে—হাতে হাতে পান জল যোগায়। ভাই বোন নির্ম্মলের ফরমাস খাটিতে পা'লে কৃতার্থ হয়।

তবু নির্ম্মলের সুখ নাই। মুখে হাসি নাই। দিবানিশি এক চিন্তা—টাকা—টাকা!

"আচ্ছা—মা, তোমার কষ্ট হয় না?"

"কষ্ট কি রে?"

"এই সামান্য মাইনে—এই গরীবানা ভাবে থাকা"—

"বালাই, সত্তর টাকা কম হলো? বৌ আমার লক্ষ্মী, মাস মাস পনের টাকা বাঁচায়—ওই ঢের। দিব্যি খা'চ্ছ পরছ, অভাব কি বাবা?"

"তোমার তীর্থে ধর্ম্ম করতে ইচ্ছে হয় না? বার-ব্রত-দান ধ্যান?"

"সে কি সবাই পারে? ভগবান যাকে দিয়েছেন সে করুক। মন যদি খাঁটি থাকে—গুরুর চরণে ভক্তি থাকে—সেই তীর্থ।"

বিরক্ত হইয়া নির্ম্মল চুপ করিল। নিতান্ত অশিক্ষিতা বাঙ্গালী মা, উচ্চ ধারণা থাকিবে কি করিয়া?

"এই রেণু—অমু—তোরা কি চাস?"

"অঙ্কটা একটু দেখিয়ে দিয়ো দাদা, ক্লাসে যেন ফাষ্ট হই।"

ফাষ্ট হয়ে রাজা হবেন! আমিও কি বছর ফাষ্ট হয়েছি। বলি চাস কি? কোন জিনসটা নিতে ইচ্ছে হয়?

"তবে নার্সারী থেকে কিছু ফুলের বীচি এনে দাও—বাগান করবো মার জন্যে।"

"রেণু তুই?"

"দু' পয়সার চুলের কাঁটা এনো দাদা, বৌদিরও হবে আমারও হবে—"

ধেৎ,—হীনমতি বালকবালিকা। নব জগতের প্রাণ স্পন্দন ইহাদের অন্তরে সাড়া-ই দেয় নাই।

"আচ্ছা, সব সময়ে হাসি? এত দুঃখেও হাসি আসে তোমার?"

রেবা সচকিত হইয়া বলিল, "কিসের দুঃখ ? কি হয়েছে ?"

"ও,—কি দুঃখ—সেটা আমিই বলে দেবো ? তুমি বুঝতেও পার না ? সারাদিন ঝিয়ের মত খাটুনী—না আছে গহনা, না আছে ভাল কাপড়।"

রেবা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, "ওমা, এই দুঃখ ? আমি বলি না জানি কি হয়েছে। তোমার ঐ এক চিন্তা ঢুকেছে মাথায়! দু'বেলা দুটো রান্না এরই নাম খাটুনী ? আর গয়না কাপড় নেই কে বল্লে ? বাবা দু'খানা ভাল কাপড় দিয়েছেন, পাঁচ টাকা সাত টাকা দাম, তুমি একটা ছ' টাকা দিয়ে কিনলে আর কত চাই ? নাও, শোও, মশারী ফেলে দি, না বই পড়বে ? মাসে চার আনা চাঁদা দি রোজ একটা বই পাই—কত সুবিধে বল দিখি ? হ্যাঁ, দেখ মশারীটা আমি সেলাই করেছি ভাল হয় নি ?"

ধিক্—ধিক্ হীনমনা বাঙ্গালীর বৌ, চিন্তা-সীমা-সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র মনে উচ্চ আশার স্থান কোথা ?

স্বামীর গম্ভীর মুখ দেখিয়া রেবা আর কিছু বলিল না। কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া টুকিটাকি কাজ করিল, একবার শাশুড়ীর কাছে গিয়া খানিক গল্প করিয়া আসিল, শেষে দুয়ার বন্ধ করিয়া শুইল। নীরোগ দেহ, নিশ্চিন্ত মন যেমন শয়ন অমনি ঘুম !

নির্ম্মলের চক্ষে ঘুম নাই,—জ্যোৎস্নালোকে রেবার প্রফুল্ল ঘুমন্ত মুখ দেখিয়া বিরক্ত চিত্তে পাশ ফিরিয়া শুইল।

টাকা চাই—টাকা ! টাকা ! দিনরাত নির্ম্মলের টাকার চিন্তা, বছরে খুব কম দশ টাকার টিকিট কেনে লটারীর।

এই দীন জীবন—খড়ো ঘরে বাস—তেমনি প্রতিবেশীরা ! সমাজে উচ্চ স্থান নাই,—কেহ ডাকে না, কেহ মানে না, কি মূল্য এই অসার জীবনের ? যারা ধনী-মানী, কোন্ গুণে নির্ম্মলের চেয়ে তারা শ্রেষ্ঠ ? তবু এই পার্থক্য কেন ? অদৃষ্ট ? নির্ম্মল অদৃষ্ট মানে না। একটা ক্ষুব্ধ দুর্ব্বহ জ্বালা তাহার মনে আগ্নেয়গিরির আগ্নেয় প্রবাহের মত, সেই জ্বালায় জ্বলিয়া নির্ম্মল বিদ্রোহী। কারও সঙ্গে মনের মিল নাই—মেশামেশি নাই,—দশটা পাঁচটা কলম পিষিয়া আসে,—বাকী সময়টা হয় চুপ করিয়া ঘরে শুইয়া কাটায়—নয় কোন মাঠে কিংবা ডেয়ারী ফার্ম্মের এক নির্জ্জন গাছ তলায় একা গিয়া বসিয়া থাকে।

"বাবা, টাকা টাকা করিস নে, টাকায় সুখ নেই।"

"টাকায় সুখ নেই ? মেটে ঘরে দেড় টাকা জোড়ার কাপড় পড়ে খুব সুখ, কেমন ?"

"কতজনার যে এও জুটছে না ! আমাদের অভাব কি ? দিব্যি শান্তিতে রয়েছি।"

"শান্তি চাই নে, সুখ চাই।"

ভাগ্য বুঝি প্রসন্ন হইল, লটারীতে নির্ম্মলের নামে পাঁচ হাজার টাকা উঠিল।

"পাঁচটা টাকা দে,—পূজার জন্যে—"

"পাঁচটা কেন, দশটা নাও—"

"তা দে, পাঁচজনকে বল্‌তে হবে। আর শোন্ নিমু, ও টাকাটা জমা রেখে দে পোষ্টাপিসে, সময় অসময়ের জন্যে।"

"রাখ তোমার সময় অসময়—কলকাতা চল্‌লাম—ব্যবসা করবো।"

"ব্যবসা করবি ? কল্‌কাতা হেন সহর—! শুনি জোচ্চোরে ভরা—"

"যে পারে সে দাঁড়ায়,—না পারে ভেসে যায়,—এই হলো কল্‌কাতার গুণ। সব রকম ভেবেছি—সব বুদ্ধি আছে, মিছে দিন কাটাই নি, ছিল না শুধু টাকা। যাক্ তোমরা থাক, আমি চল্‌লাম, শেষ অবধি না দেখে ফিরছি নে জেনো।"

টাকা লইয়া নির্ম্মল একা কলিকাতা আসিল। এবং উন্মাদের মত কর্ম্ম-সাগরে ঝাঁপ দিল।

দশ বৎসর পরে।

ব্যবসায়ে নির্ম্মল হটে নাই—দাঁড়াইতে পারিয়াছে, সমস্ত বাধা-বিঘ্ন দুঃখ-কষ্ট দুই হাতে ঠেলিয়া পাড়ি দিয়াছে। দৈবের চেয়ে পুরুষকার হইল বলবান এবং উদ্যোগীর লক্ষ্মী লাভ !—বিজয়ীর মত নির্ম্মল নিশ্বাস ফেলিল তৃপ্তি ও গৌরবের সঙ্গে।

ভবানীপুরের দিকে বাড়ী তৈরি শেষ হইল।

"মা, এবার চল, এখানে আর না," উৎসাহী হাসি মুখ নির্ম্মল, দশ বছর আগের সে রুক্ষভাষী রুক্ষ চেহারা নির্ম্মল নয়।

"বেশ, বাবা বেশ, তুই সুখী হলেই আমার সুখ—"

"সুখ কি মা ? সুখকে ধরে বেঁধে ফেলেছি, আর যায় কোথা "

"অসুখ কবে ছিল বল্ দেখি ? শুধু তোকে যে এই দশ বছরে পাঁচ বারের বেশী দেখিনি, এই দুঃখই আমার বেশী—"

"সব ভুলে যাও, দুঃস্বপ্ন কেটেছে মা, দিন কিনেছি—"

"পাগ্‌লা ছেলে ! অমন বল্‌তে নেই।"

"ওগো রেবা রাণী, এবার কলকাতা, মাসে একদিন চার আনার টিকিটে খাঁচায় বসে থিয়েটার দেখেছ, এবার রোজ, ফাষ্ট ক্লাস বক্স, যা খুসী !—

"আচ্ছা গো, আচ্ছা—তবু হেসে কথা কয়েছ ! দশ বছরে দশটি দিন দেখা দিয়েছ তার আবার এত ! কে চেয়েছিল তোমার ফাষ্ট ক্লাস ? এখানে কত জানা শোনা, কত আলাপ, সেখানে কে আছে আমাদের ?"

"সব হবে গো, সব হবে। জানা শোনা হয়েই আছে, শুধু—গিয়ে বসা ! সেখানে যাদের সঙ্গে জানা শোনা হবে,

এখানকার কেউ তাদের গেটের সামনে দাঁড়াতে সাহস পায় না।"

"ও বাবা! তবে তুমি সব বলে ক'য়ে দিয়ো। আমি কিন্তু কিছু জানি নে, কক্ষনো কলকাতা দেখিনি, শুনেই ভয় করে।"

"ওরে অমু রেণু, এবার চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, বোটানীক্যাল গার্ডেন—"

"দাদা, আমার টেষ্টটা হয়ে যাক্ না?—সবাই বল্‌ছে ফার্ষ্ট ষ্ট্যাণ্ড করবো"—

"রেখেদে, লেখা পড়ার কি দাম আছে? ওতে কিছু হয় না, যারা বোকা তারাই লেখা পড়া নিয়ে সময় নষ্ট করে।"

রেণুও মনঃক্ষুণ্ণ হইল, 'দাদা, আমার বাগানটা, কত ফুল ফুটেছে,—'

নির্ম্মলের উচ্চ হাসিতে রেণু জড়সড় হইয়া গেল।

"বাগান? কটা ফুলের নাম জানিস? কটা গাছ চিনিস? বাগান কাকে বলে দেখবি চল্ না–'

"আমার কুকুর ছানা টা—"

"দূর-দূর! ঐ বিচ্ছিরি কুকুর? বিলিতী কুকুর ছানা কিনে দেবো, দেখিস ঠিক যেন তুলোর বস্তা।'

নির্ম্মল সুখী, সম্পূর্ণ সুখী। আশা পূর্ণ হইলেই মানুষে সুখী হয়।

—সেই জীবন আর এই জীবন! বিগত দিনের স্মৃতি নির্ম্মলকে পীড়া দেয় না, আনন্দ দেয়, গর্ব্বিত করে।

সাজানো নূতন বাড়ী, সাজানো বৈঠকখানা, মান্য-গন্য সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশীরা যখন-তখন আসে, খবর নেয়, নিমন্ত্রণ করে। নির্ম্মল তাদেরই একজন, অর্থের দিক দিয়া বুঝি বা উপরেই।

সেই কেরাণী জীবন, ছোট গৃহ কোণ, দরিদ্র মাষ্টার মোক্তার প্রতিবেশী, যাদের সঙ্গে নির্ম্মল কখনো মেশে নাই, দিনের অবসরে যাদের তুচ্ছ তাস খেলা বা চায়ের ভাগ ঘৃণায় উপেক্ষা করিয়াছে। মা ও স্ত্রীর হীনতায় (একটি লাউমাচা, দুটি বেল ফুলের গৌরবে যারা খুসী থাকিত) জ্বলিয়াছে। জীর্ণ ঘরের লণ্ঠনের মিট্ মিটে আলোকে লাইব্রেরীর চার আনার মেম্বার রেবার প্রফুল্ল মুখ তাহার মনে আগুন ধরাইয়াছে।

এখন নির্ম্মল সদা সন্তুষ্ট, একা দশ বছর খাটিয়াছে, আহার নিদ্রা ভুলিয়া। এবার সুখ ভোগের সময়।

এ দিকে মা ও রেবা পদে পদে বিপন্ন! এত বড় বাড়ী, বিজলী বাতি, পাখা, নূতন গাড়ী, দারোয়ান, দাস-দাসী। বেচারা জীবনে কলিকাতা দেখে নাই, এ তাদের কি বিড়ম্বনা!

নির্ম্মলের নূতন বন্ধুদের স্ত্রীরা আসিয়া রেবাকে নির্ম্মলের যোগ্য স্ত্রী করিয়া তুলিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

"কেমন রেবা? পছন্দ হয়েছে ত? তোমারই সব, তোমার জন্যেই করা—"

"হ্যাঁ, যাও! রঙ্গপুর আমার ভাল ছিল, আমার বকুল মালতীর জন্যে কষ্ট হচ্ছে, কত কাঁদলে আসবার সময়–"

"বকুল মালতী? কুছ পরোয়া নেই রেবা, ও বকুল মালতী জঙ্গলেই থাকে। এখানে তুমি পদ্ম গোলাপ পাবে, দাঁড়াও দিন কয়েক যেতে দাও—"

রেবা চুপ করিয়া জানালার কাছে সরিয়া গেল। নির্ম্মল মনে মনে হাসিল।

এই ত জীবন, সার্থক, পূর্ণ, কর্ম্মব্যস্ত জীবন! কি কাজের ভিড়, দিন রাত্রি অনুগ্রহপ্রার্থীদের আনা-গোনার বিরাম নাই, কত পরামর্শ, কত যুক্তি, কত উপদেশ দিতে হয়। নির্ম্মলের একটু হাসি, একটি কথা বহু জনের কাছে পরম সম্পদ। রঙ্গপুরে নদীর ধারে কিম্বা ডেয়ারী ফার্ম্মের নিরালা গাছতলায় হাঁ করিয়া আকাশ মুখে চাহিয়া থাকিবার অখণ্ড অবসর ফুরাইয়া গিয়াছে। তাই নির্ম্মল সুখী ও তৃপ্ত। কত নিমন্ত্রণ, কত সভা সমিতি, অহরহ নির্ম্মলের ডাক পড়ে, তাহার সঙ্গে পরিচিত হওয়া বা কথা বলা অনেক সম্ভ্রান্ত লোকও ভাগ্য বলিয়া মানে।

"মা কেমন লাগছে এবার? সত্যি বল—"

"কি জানি বাবা, আমাদের সব মণিহারী গঙ্গাস্নান করতে যেতে কথা ছিল, দাসুর দিদি, ননীর মা—"

"মণিহারী? গঙ্গা কি তোমার মণিহারী ছাড়া কোথাও নেই? যদি বল, মুঙ্গের হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান করবে—এখুনি গাড়ী রিজার্ভ করে দিচ্ছি—"

"সে থাক্ এখন। কত কাল রঙ্গপুরে ছিলাম, মায়া ধরে গেছে, যাই বলিস্ নিমু, ছিলাম বড় শান্তিতে, মিলে মিশে–"

নির্ম্মল উচ্চহাস্য করিল।—'শান্তি? সেই যদি শান্তি হয়—তবে আমি শান্তি চাই নে মা—সুখ চাই।'

আরো পাঁচ বৎসর পরে—।

চেয়ারে বসিয়া নির্ম্মল বিশ্রাম করিতেছে।

—"নিমু! এমন সময়ে ওপরে যে?"

—"মাথা ধরেছে মা, সবাইকে বিদেয় করে এলাম।—একটু শোবো, অমু কই?"

—"সেই দুপুরে বেরিয়েছে, কোন্ পাড়াগাঁয়ে না কি চড়িভাতি করবে—বলে গেছে আজ আসবে না।"

রঙ্গপুরের স্কুলে অমু ছিল সেরা ছাত্র। কলিকাতা আসিয়া আর মাস কয়েকের মধ্যে স্কুলে ভর্ত্তি হওয়া হইল না। সাধ মিটাইয়া কলিকাতা দেখা যখন শেষ হইল, তখন অপক্ক-বুদ্ধি বালকের মনে কলিকাতার সর্ব্বনেশে

নেশা ধরিয়া গিয়াছে। আলাদা একটা ছোট গাড়ী আছে তার—সেইটা লইয়া সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়ায়—বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক বড় নাই।

—"রেণু চিঠি দিয়েছে রে—"

—"কি লিখেছে ? সব পছন্দ হয়েছে ত' ?"

—"শাড়ী পছন্দ হয় নি—"

—"সে কি মা ? নিজে কিনে আন্‌লাম একশ' টাকা দামের শাড়ী···পছন্দ হ'লো না ?—"

—"কি জানি বাছা—বৌমা তো পরলে না—একই জোড়ার কাপড় ত' ? বল্‌লে শালের শাড়ী একশো টাকায় হয় না। নিজের আর একখানা ফরমাস দিলে আবার—"

—"তা সামনের বার রেণুকে দেওয়া যাবে,—এবারকার শীত তো গেল—"

—"সে থাকগে,—এখন আমার যাবার যোগারটা—"

মা বছরে ছয়মাস স্বাস্থ্যকর তীর্থবাস করেন। এক-একবার—এক এক জায়গায়। মাস তিনেক পরে সবে দিন কয়েক হইল আসিয়াছেন। এবার জন দুই প্রিয় প্রতিবেশিনী সঙ্গে লইয়া যাইবার ইচ্ছা,—একা-একা বিদেশে ভাল লাগে না।

—"ওর আর যোগার কি ? যে-দিন বলবে,—তবে বাড়ীতে থাকনা কিছু দিন—"

—"না বাপু—কলকাতা আমার ভাল লাগে না। তা ওরা বলছিল—'দিদি, তুমি তো সেকেন কেলাসে যাও, একসঙ্গে যাবার সুখটা তা'হলে কি হ'ল ?—"

—"ওঁরা কোন ক্লাশে যাচ্ছেন ?"

—"ইণ্টারে—সে-দিন তো নেই ওদের দেনায় জড়ানো। তা আলাদা গাড়ীতে রইল যদি—কি সুবিধে হ'লো আমার ? সমস্ত পথ মুখ বুজে কাটানো।"

—"তুমি কি ওঁদের সঙ্গে এক গাড়ীতে যেতে চাইছো ?"

—"হ্যাঁরে—ইণ্টারে মানুষে যায় ? যত ছোট লোকের ঘেঁসাঘেঁসি,—না বাপু সে হবে না, অত কষ্ট সয়ে যাওয়ার চেয়ে না যাওয়া ভাল—"

—"তবে কি করতে বল ?"

—"বলি কি একখান্ সেকেন ক্লাসই রিজার্ভ করে দে,—কতই লাগবে ? ওরাও যাবে—ঝিয়েরা—জিনিষ-পত্তর সবই ঐ একখান গাড়ীতেই হবে। কম পথ ত' নয়, ঝিয়েরা থাকে আলাদা গাড়ীতে, সে বড্ড অসুবিধে হয়। কি বলিস্ ?"

—'তা বেশ,—কবে যাওয়া ঠিক হ'ল।'

রাত্রি প্রায় আটটা—। নির্ম্মল তেমনি বসিয়া আছে,—ঘরের অপর দিকে মশারী ফেলা বিছানা, উঠিয়া গিয়া শুইয়া পড়িতে বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে। কিছু দিন হইতে ডায়েরী লেখা অভ্যাস,—অবশ্য প্রতিদিন নয়, মাসে মাসে লেখে। টেবিলে খাতাটা রহিয়াছে—একটি লাইনও এ পর্য্যন্ত লেখা হয় নাই। বাঁ-হাতে সিগারেট ধরিয়া অলস ভাবে চেয়ারে পড়িয়া রহিয়াছে।

রেবার প্রবেশ। রেবা সদা ব্যস্ত,—বাড়ীতে যে-সময়টুকু থাকে ব্যস্ততার মধ্যেই কাটে।

—"আজ যে বড় এ-ঘরে ?"

নির্ম্মল মাথাটা ঘুরাইয়া চাহিল। রেবার গায়ে কালো ওভারকোট,—পায়ের জুতার উপর রেশমী শাড়ীর চওড়া জড়িপাড় লুটানো,—মাথার চুল ফ্যাশনে কোঁকড়া করা,—আগে এমন কোঁকড়া চুল ছিল না রেবার। দুই কাণে বড় বড় লম্বা গড়ণের কাণবালা।

—"শরীরটা ভাল নেই—"

—"কি হয়েছে ?"

—"মাথা ধরা—"

—"মাথা ধরা ? ও আর এমন কি! একটা অ্যাস্‌প্রিন খাও।"

—"অ্যাস্‌প্রিন আছে কি ?"

—"কি জানি,—ড্রয়ারটা দেখ,—না হয় আনাও।—দেখ, গাড়ীটা বড্ড পুরানো হয়ে গেছে—চড়তে লজ্জা করে—"

—"নতুন গাড়ী—ছ'মাস হয় নি,—পুরনো হবে কেন ?"

—"তোমার খেয়ালও নেই—পছন্দও নেই। ছ'মাস হলে কি হয় ? রাণ করেছে ছ'বছরের বেশী···"

ঝি কয়েকটা কাগজের বাক্স হাতে পাশের ঘরে চলিয়াছে,—রেবা ডাকিল—"আন্ এখানে।"

বাক্সগুলি টেবিলে রাখিয়া খুলিয়া রেবা বলিল,—"শাড়ী ছিল না মোটে—"

—"শাড়ী ছিল না ?—" নির্ম্মলের চোখ একবার পর্দ্দার ফাঁকে পাশের ঘরে রেবার গোটা তিনেক আলমারীর উপরে ঘুরিয়া আসল।

—"না,—আট পৌরে সব ছিঁড়ে গেছে,—আজ কাল করে কেনা হয় না—"

—"দোকানে গেছলে ?"

—"হ্যাঁ—'ম্যাটিনী'র পরে ফেরবার পথে,—কাপড় চোপড় বেশ সস্তা হয়েছে,—দশ থেকে আঠারো টাকায় জোড়ার বেশী নয়—ছ'জোড়া এনেছি।"

—"ভাল একখানাও আন নি ?"

—"না—সে ত' সব রকমই আছে। তবে এক রকম কাপড় দেখালে—ঢাকাই, আগাগোরা জমিতে জরির চওড়া বাঁকা টানা দেওয়া—খাঁটি জরি,—ভারি সুন্দর—বায়ান্ন টাকা করে দাম। ফরমাস দিলে আরো ভাল করে দেবে বল্‌লে।

দু'রঙের দু'খানা অর্ডার দিয়ে এসেছি—ঐ যাঃ—লেট হয়ে গেলাম।—”

—“আবার কোথাও যাবে না কি ?”

—“হ্যাঁ—পরশু যার বিয়ের নিমন্ত্রণ খেলে—আজ তার ফুলশয্যা। আমি না গেলে হয় ? উষা পথ চেয়ে থাকবে বলেছে.—ওদের কিন্তু মিলেছে ভাল, না ? মাষ্টারনী কনে, প্রফেসার বর—”

ব্যস্ত হইয়া রেবা পাশের ঘরে গেল। ঝি বাক্সগুলি উঠাইয়া লইয়া তাহাকে সাহায্য করিতে গেল। একদিন যার পোষাকী শাড়ী ছিল সবশুদ্ধ খান তিনেক এবং সাত আট টাকার বেশী দামী নয়, আজ আঠারো টাকা জোড়ার শাড়ী তার আটপৌরে!—এ-যদি সুখ না হয় তবে পৃথিবীতেই সুখ বলিয়া কিছু নাই।

আধ ঘণ্টা পরে হাল্‌কা রঙের শাড়ী, জামা ও চিকন ছাঁদের সৌখীন গহনা পরিয়া রেবা বাহির হইল—বাঁ-হাতে একটা ছোট এটাচে কেস্- ডান হাতে একছড়া মাঝারী মুক্তার মালা—

—“তোমায় দেখাই নি এখনো, এই দেখ এইটে আমি উষাকে দেবো,—ওই ত আমায় হাতে ধরে শিখিয়ে পরিয়ে গড়ে তুলেছে,—তোমার বন্ধুনীরা ত' শুধু ঠাট্টাই করতো—হারছড়া বাক্সে বন্ধ করিয়া এবং দামী এসেন্সের মিষ্ট মৃদু সুগন্ধে ঘর ভরিয়া দিয়া রেবা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। দরজার ও-পাশ হইতে বলিয়া গেল,—“তুমি খেয়ে-দেয়ে শুয়ো—আমার ফিরতে দেরী হবে—”

নির্ম্মল শুইয়াছিল, ঘুম হয় নাই। উঠিয়া আবার সিগারেট ধরাইয়া বসিয়াছে।

শীতের রাত্রি—রাত্রি এগারটা। রেবা ফেরে নাই। জানালা খোলা, নির্ম্মল চাহিয়া আছে। তাহার মনটা যেন ঐ কালো আকাশ, অসংখ্য চিন্তার ঢেউ অসংখ্য তারা।

বড় দিনের ভেটে ঘর ভরা, আজ চারিটা নিমন্ত্রণ ছিল চায়ে ও ডিনারে। অসুখ বলিয়া নির্ম্মল সেগুলি কাটাইয়া দিয়াছে।

হঠাৎ কেন রঙ্গপুরের কথা মনে হইল ? সেই মা, সেই রেবা—সেই প্রতিবেশীরা,—পনের বৎসর আগের তুচ্ছতম কথা ? দিনান্তে মায়ের হাতে নারিকেল সন্দেশ, আলুর ফুলুরী, চিড়ে ভাজা, মিলের সাড়ী পরা হাস্যমুখী রেবার হাতে নূতন কেনা পেয়ালাটিতে চা—

বড় দিনের ছুটিতে সেই গরীব পড়সীরা বনভোজন করিতে যাইত দূরে নদীর ধারে, মাঠের কিনারে - নির্ম্মলকে তারা ভালবাসিত আন্তরিক—নিমু একাটি থাকবে ? চল না ? ডাক্তার বাবু যে চমৎকার রাঁধুনী, কি খিচুড়ী পাকান একবার দেখো, সব্বার গিন্নীই ওঁর কাছে ফেল। এসো ভাই এক সঙ্গে যাই সবাই মিলে।

“নিমু, তোর ও বাড়ীর পিসী কেমন রেঁধে পাঠিয়েছে দেখ, নেমন্তন্ন করলে যাসনে, ঐ আমার বড় দুঃখ ধরে বাপু।”

“শুনেছ ? ওগো শুনেছ ? হাঁড়িমুখটি তুলে একবার শোনই না, সার্কাশ এসেছে বুঝলে, সার্কাশ ? আমি সব চেয়ে সার্কাশ দেখতে ভালবাসি জানো ? দশ পয়সা তিন আনার টিকিটও আছে, তবে দশ পয়সা মাটীতে, সে ভাল না। তিন আনার টিকিটে আমরা বস্‌ব কেমন ? ওরা আট আনার চেয়ারে বসবে। কেন বাপু পয়সা জলে ফেলা ? ও গ্যালারীও যা চেয়ারও তাই, নয় কি ? আসল কথা হচ্ছে দেখা—তা যেখানে খুসী বসলেই হোলো—”

সেই ছাপ দেওয়া সস্তা সাড়ী পড়া প্রফুল্ল স্বভাবা রেবা, কই সে রেবা কই ? মা কই ? পনের বছর পরে কি আর তাদের খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ? আজ কি একবার সেই মাষ্টার মোক্তারেরা ডাক দিবে না—“নিমু এসো এক হাত খেলা যাক—”

নির্ম্মল আজ রঙ্গপুরের স্বপ্ন দেখিল কেন ?

শ্রান্তি, শ্রান্তিই বা আসে কেন ? কেনই বা সেই গরীব প্রতিবেশীদের তুচ্ছ উপহারের কথা মনে পড়ে ?— ঘরে যার অসংখ্য ফুলের মালা, তোড়া, পেস্তা, বাদাম, কিসমিস দামী জিনিসে বোঝাই ডালি, বড় দিনের অসংখ্য ডালি তেমনি অনাদৃত পড়িয়া রহিয়াছে।

কর্ম্মক্লান্ত নির্ম্মলের কপালে চিন্তারেখা।

নিরিবিলি জীবন চাই, অন্ততঃ নিজেকে অনুভব করিবার মত একটু অবসর। কিন্তু সময় নাই—সময় নাই! ভোর ছ'টা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কই সময় ? বিশ্রাম নাই। বিন্দুমাত্র বিশ্রামের সময় নাই, শত আবেদন সহস্র দাবী লক্ষ প্রার্থনা। চাকরী প্রার্থী, দয়া প্রার্থী, সাহায্য প্রার্থী। কৈ রঙ্গপুরে তো এমন জোঁকের মত কেহ নির্ম্মলের পিছনে লাগিয়া থাকিত না ?

রাত্রেও নিশ্চিন্ত ঘুম নাই। আগামী কাল কি কি কাজ, কোথায় কোন এনগেজমেণ্ট আছে তন্দ্রার ফাঁকে ফাঁকে সেই চিন্তা।

অর্থের সঙ্গে আবদার, অভিমান ও অফুরন্ত আশা জাগিয়াছে নির্ম্মলের সংসারে, তাহার জুড়াইবার স্থান কৈ ?

সেই পেয়ালাটিতে এক পেয়ালা চা যদি আজ এই সময় রেবা নির্ম্মলের হাতে দিয়া অকারণ এক ঝলক হাসিত পনের বছর আগেকার মত! ,

পনের বছর পিছাইয়া যাক—সত্তর টাকার দিন কি আর ফিরিয়া আসে না ?

আগমন

শ্রীকাশীনাথ চন্দ্র

শেষ পর্য্যন্ত ষ্টীমার আবার শেষ রাত্রে ঘাটে আসিয়া লাগল।

প্রতি সপ্তাহেই আসে, নূতনত্ব কিছুই নাই। দিগন্ত-প্রসারী নক্রসমাকুল ব্রহ্মপুত্র নদ, তাহারই একটা ক্ষুদ্রকায় শাখা এই চা-বাগানটার কোল ঘেঁসিয়া চলিয়া গিয়াছে—নাম 'কপিল'। চা-বাগান হইতে চা চালান যায় কত দূর-দূরান্তরে। তাই প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া ছোট ছোট মালবাহী ষ্টীমার আসে। আসে দিনের আলোতে, গর্ব্ব-ভরে চা-বাগানের বাসিন্দাদের নিজের আগমন সংবাদ ঘোষণা করিতে করিতে। আর এ ষ্টীমার আসিল, প্রকাণ্ড দোতালা ষ্টীমার, রাত্রিশেষে গভীর অন্ধকারে, নিঃশব্দে চোরের মত।

চা-বাগানের বাসিন্দারা আজ কয়েক দিন ধরিয়া অস্থির হৃদয়ে ইহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু ঘাটে আসিয়া ষ্টীমারখানা যখন সুগম্ভীর রবে সকলকে চমকিত করিয়া সকলের কাছে নিজের আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিল, তখন সকলে আতঙ্কে অস্থির হইয়া আগে আকাশের পানে চাহিল, ওই বুঝি আসে জাপানী বম্বার!

ব্রহ্মদেশ, ব্রহ্মদেশের পর আসাম। ভারতের পূর্ব্বপ্রান্ত আজ শত্রুর হুঙ্কার রবে প্রকম্পিত। ব্রহ্মদেশ নিষ্ঠুর পীড়নে করে হাহাকার, আসামের পূর্ব্বাঞ্চলে ক্ষণে ক্ষণে আসিয়া পড়িতেছে শত্রুর রোষবহ্নির স্ফুলিঙ্গ। চা-বাগানের মালিক ডায়লান গ্রীক্ত খাঁটি ইংরেজ। তাই প্রথম প্রথম শত্রুর ভ্রূকুটি-কুটিল চোখের হিংস্র দৃষ্টিকে উপেক্ষাই করিল। বাগানের মধ্যে বড় বড় ট্রেঞ্চ কাটিল, এ, আর, পি' ব্যবস্থা করিল, কিন্তু শত্রুর আক্রোশ ক্রমবর্দ্ধমান দেখিয়া আদেশ দিল, "ধন চাই বটে, কিন্তু প্রাণ চাই না। ষ্টীমার কোম্পানীর সহিত ব্যবস্থা করিয়াছি, যাহার ইচ্ছা হয়, সে বাগান ত্যাগ করিতে পার।"—

কুলীরা পূর্ব্ব হইতেই বাগান ত্যাগ করিবার জন্য ক্ষেপিয়া ছিল, এখন যে সব বাঙালী স্ত্রী-পুত্র লইয়া সুখে ঘর করিতেছিল, তাহারাও ক্ষেপিয়া উঠিল।

ক্ষেপিবার কোন কারণ ছিল না, এমন কথা বলা চলে না। চা-বাগানের কুলী, চা-বাগানটাই তাহাদের সমস্ত পৃথিবী, কুলী লাইনটাই তাহাদের সংসার, সমাজ। আদিম অসভ্যতা ও বর্ব্বরতাই তাহাদের সমাজ-বিধি। চা-বাগানের বাহিরে যে আর একটা ভিন্ন প্রকৃতির বৃহত্তর পৃথিবী আছে, তাহার অস্তিত্বের কল্পনা পর্য্যন্ত ইহারা করিতে পারে না।

চা-বাগানে এ সময়ে বসন্ত নামে। শুষ্ক, রুক্ষ, পিঙ্গল চা-বাগানটা অকস্মাৎ ভরিয়া যায় শ্যামল শোভায়, বনে বনে ফোটে অজস্র বুনো ফুল, বাতাসে ভাসিয়া আসে তাহারই মদির গন্ধ। বড় বড় শাল গাছগুলি মাথা দোলাইয়া দোলাইয়া শোনায় ঝরা পাতার গান। দূরান্তের ধূমল শৈল-শ্রেণী অকস্মাৎ পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করিয়া বিরহতাপদগ্ধা বিরহিণীর মত নব বসন্তকে জানায় সাদর-সম্ভাষণ।

চা-বাগানের কুলী, কিন্তু কুলী হইলেও তাহারা মানুষ। তাই এ সময়টায় তাহারা মত্ত হয় বসন্ত-উৎসবে। বড় বড় কলসীতে ঢালাই ক'রে 'পচাই' মদ, পুরুষেরা বনে বনে শিকার করিয়া বেড়ায় খরা, হরিণ, বুনো মুরগী, ঘুঘু, হরিতাল, মেয়েরা সহসা "মেখলা" ত্যাগ করিয়া দলে দলে পরে বাসন্তী রং-এর ঘাগরা, মাথায় গোঁজে লাল, নীল, সাদা রকমারী রং-এর রকমারী ফুল, গায়ে দেয় ওড়না। সে ওড়নার অন্তরাল হইতে কারণে অকারণে কোষমুক্ত শাণিত তরবারির মত ঝিলিক মারিয়া যায় সর্ব্বনাশা নারী দেহ, চোখে দেয় সুরমা, মাথায় ঝোলায় লম্বা বেণী, ইরাণী-দের মত করিয়া কপাল চাপিয়া বাঁধে বেগুনী রং-এর রুমালের ফেট, সন্ধ্যা বেলা শোনা যায় মত্ত নর-নারীর আনন্দোচ্ছল কলরব।

ইহাই চিরন্তন, এমনি করিয়াই বসন্ত আসে প্রতিবার। কিন্তু এবার আসি আসি করিয়াও যেন আসিল না, কিংবা হয়ত আসিল, মানুষই লইল না তাহাকে বরণ করিয়া, জানাইল না সাদর সম্ভাষণ। বসন্তের সমাগমে এবার আনন্দের ঝঙ্কারের বদলে উঠিল আর্ত্তনাদ।

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িতেছে। একটি একটি করিয়া সারাদিন চা-পাতা তোলার ফলে একটি মানুষ সারাদিনে যাহা উপার্জ্জন করে, তাহা তাহার নিজের জন্যই যথেষ্ট নয়, সুতরাং হাহাকার তো উঠিবেই। হয় ত এতদিন সব না খাইয়াই মরিত, কিন্তু ডায়লান গ্রীক্ত নিজে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও এতদিন সস্তা দরে খাদ্যদ্রব্য জোগাইয়াছে।

শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, সকলে পলাইয়া যাইবে।

একজন উত্তর দেয়, "যাবি কোথ—যুয়ার জাগা আছে নাকি (যাবি কোথায়—যাবার জায়গা আছে নাকি)*

আর একজন হুঙ্কার দিয়া উঠে "কিয়—কিয়—যাব নোয়ারু কিয় (কেন—যেতে পারি না কেন)—"যেতিয়াই যাম—খাবলৈ নপোম—" (যেখানেই যাব, খেতে পাব না)

—বারু, দেখা যাব (আচ্ছা—দেখা যাবে)

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে আর একজন বলিল, "কিন্তু সাহাবটু ভাল মানু আছিল"—মুহূর্ত্তে সবাই একসঙ্গে গর্জ্জন করিয়া উঠে ভাল, "মানু ন হয় আকৌ—সা গৈ কনকিক্ (ভাল মানুষ নয় আবার—যা কনকিকে দেখ গে)।

*চা বাগানের কুলীরা প্রায়ই অসমীয়া ভাষায় কথা বলে। যদিও তাহাদের মধ্যে অনেকেই অসমীয়া নয়।

...ীর মেয়ে কনকি—আসল নাম কনক চাঁপা। সারা দেহে তার যৌবনের উচ্ছল তরঙ্গ…সে নয় দরিদ্র, নয় অসভ্য… সুবিধাবাদী। ঈশ্বরদত্ত রূপ ও যৌবনের সুযোগ সে গ্রহণ করিয়াছে পরিপূর্ণ রূপে। রূপ যৌবনের শুল্কে জীবনে আনিয়াছে স্বাচ্ছন্দ্য, তৃপ্তি…গর্ব্বে তাহার দিনে দিনে পুষ্টি লাভ করিতেছে আর্য্য-অনার্য্যের মিলনসম্ভূত বর্ণ-শঙ্কর মহামানব…

তাহাই তাহার অভিশাপ। পাপ যত আনন্দদায়কই হউক না কেন, তাহার ফল ভোগ করিতে কেহই চাহে না। তাই কনকি বড় সাহেবের বাংলো হইতে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে কুলী লাইনে। তাই সকলের কনকির উপর এত রাগ। নিজেদের শিক্ষা, সভ্যতা সামাজিক আইন-কানুন, যত প্রাগৈতিহাসিক যুগেরই হউক না কেন, অপর কেহ যে তাহার সুযোগ গ্রহণ করিবে, তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। বীর্য্যশুল্কা নারীকে নিজেরা পারে না বীর্য্য বলে জয় করিতে, মাঝে হইতে শুধু নিস্ফল আক্রোশে নিজেরাই মনে মনে করে গর্জ্জন।

এতদিন হয়ত সব চলিয়া যাইত। যাইতে পারে নাই শুধু পথের জন্য। দূরে দেখা যায় বামন গোঁহাই থান পাহাড। সে পাহাড় ও চা বাগানের মধ্যে পাঁচশ ত্রিশ মাইল বিস্তৃত নিবিড় বিশাল অরণ্য, গভর্ণমেণ্টের 'রিজার্ভ ফরেষ্ট'। বনের ভিতর দিয়া মানুষ চলিবার মত পথ আছে বটে, কিন্তু সে পথ শ্বাপদ-সঙ্কুল, হিংস্র বাঘের রাজত্ব। সে পথের মাঝে শুঁড় উঁচু করিয়া পথিককে অভ্যর্থনা জানায় দাঁতাল গুণ্ডা হাতী, দখিণা মলয়ের আবেগমত্তা বাঘিনী ফিরে ব্যাঘ্ররাজের সন্ধানে। মানুষ ভয় পায় সে পথে পা দিতে।

মনের মধ্যে অসন্তোষের আগুন লইয়াও এত দিন কোন গতিকে সকলে টিঁকিয়াছিল, কিন্তু রক্তলোলুপ হিংস্র জাপানের দৃষ্টি পড়িল এই দিকে। একদিন নয়, একবার নয়, কয়েক দিন, কয়েক বার। নিকটেই কোথায় একটা তেলের খনি আছে, লক্ষ্য সেইটাই। ব্রিটিশ প্লেনের তাড়া খাইয়া হয় লক্ষ্যভ্রষ্ট। সাইরেনের তীক্ষ্ণ আওয়াজে বনভূমির নিস্তব্ধতা যায় বিদীর্ণ হইয়া। লোকগুলা ট্রেঞ্চের ভিতর লাফাইয়া পড়ে আর চেঁচায়, মরিলু বোপাই (বাবারে মারা গেলাম)।

কিন্তু মরিল না, বাঁচিয়াই রহিল। একদিন ষ্টিমার আসিল। ডায়লান গ্রীজ হুকুম দিল, "যাহার ইচ্ছা হয়, সে বাগান ত্যাগ করিতে পারে—"

কয়েকদিন ধরিয়া ক্রমাগত ইভ্যাকুয়েশান চলিতেছে, বাগান প্রায় খালি। কুলীর দল হাঁড়ুগুঁড়ির (চিঁড়ার) পোঁটলা লইয়া ছুটিতেছে। বলে, আর কিছু লব না, লাগে হাঁড়ুগুঁড়ির টোপলাটুক লই লড় মারিবোলম্বুন (আর কিছু নিতে হবে না, চিঁড়ের পোঁটলাটা নিয়ে ছুটে চল)।

অজয় ষ্টিমার-ঘাটের দিকে যাইতেছিল। পিছন হইতে হেড ক্লার্ক কিশোরী বাবু ডাক দিলেন "কি রকম ডাক্তার—চললে নাকি—তিনি স্ত্রী-পুত্র মাল-পত্র লইয়া ষ্টিমারঘাটের দিকে চলিয়াছেন। অজয়ের ইচ্ছা হইল বলে, "কেন যাব না মশায়; আপনাদের প্রাণের ভয় থাকতে পারে; আর আমার থাকতে পারে না।" মুখে বলিল, "আপনিও তো দেখছি চলেছেন—

না—আমি নয়, আমি থেকেই যাচ্ছি। তবে এদের সব ভায়ার সঙ্গে বাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি। রইলাম শুধু আপনি আর "কপনি"। দরকার হয়, তখন পরে গেলেও চলবে, কি বল—। অজয় অন্ধকারের মধ্যে আপন মনে হাসিতে থাকে। ভদ্রলোক প্রাণের ভয়ে অস্থির হইয়াছেন। প্রাণ বাঁচাইবেন, কিন্তু কোথায় গিয়া প্রাণ বাঁচাইবেন। ভদ্রলোকের বাড়ী তো চট্টগ্রাম জিলায়, যেখানে প্রায় প্রত্যহই বোমা পড়িতেছে।

কিশোরী বাবু বলিলেন, "নিজেও যেতে পারতুম—শাস্ত্রেও বলচে—আত্মানং সততং রক্ষেৎ। দেশে আমার অভাবও কিছু নেই। বাড়ী, বাগান, পুকুর, দু'দশ বিঘে ধানের জমিও আছে—তারপর ঈষৎ চাপা সুরে বল্লেন, "তা-ছাড়া আমরা হচ্ছি বাঙালী, এ ভূতের দেশে আমাদের মরে লাভ। চলেই যেতাম, তবে কি না একেবারে ঝট্ করে চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে যাব, তাই"—

অজয় মনে মনে ভাবে—এতই যদি অভাব নাই, তবে এই বন-জঙ্গলের মধ্যে মরিতে আসিয়াছিলে কেন বাপু। মুখে বলিল, "তবে আর কি চলে যান।"

কিশোরী বাবু বলিলেন, "আর তুমি? তোমার মালপত্র কই হে ডাক্তার?"

"আমার এ দফায় আর যাওয়া হল না। তেমন বুঝি তো পরে যাব।"

টর্চ লাইটটা হাতে করিয়া অজয় অগ্রসর হইতে থাকে; চতুর্দ্দিকে পুঞ্জীভূত ঘন অন্ধকার, ব্লাক আউট, সে অন্ধকার ভেদ করিয়া কোলের মানুষ চেনা যায় না। বহু দূরে নিস্তব্ধ বনভূমির অন্তরালে শুধু একটা বন-বিড়াল মাঝে মাঝে ডাকিতেছে, থং থং তুষ ভুষ।

কুলীলাইনের পাশ দিয়া চলিতে থাকে অজয়। অতবড় কুলীলাইনটা যেন একেবারে শ্মশান। সব প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছে। ক্বচিৎ দু'একখানা ঘর মানুষের সাড়া পাওয়া যায়। দূরে যেন কে কাঁদিতেছে। শব্দ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া টর্চের আলো ফেলিয়া অজয় জিজ্ঞাসা করিল, "কনে ঔ" (কে রে)

উত্তর আসিল, "ময় ঘিনলগা"

"কাঁদিস কিয়" (কাঁদিস কেন)

মুক যাবলৈনে দিলে (আমাকে যেতে দিলে না)

অঃ! তারি লাগি কাঁদিস ধেৎ বেণ্ডা, ময়ওতো যুয়া নাই, সাহাবও যুয়া নাই (তারি জন্যে কাঁদচিস? বোকা কোথাকার আমিওতো যাইনি—সাহেবও যায়নি)। লোকটা সে কথায় শান্ত হয় না, বরং আরও জোরে কাঁদিতে সুরু করে। অজয় আশ্চর্য্য হইয়া যায়। মানুষের প্রাণের মায়া এমনিই বটে। লোকটার সর্ব্বাঙ্গে অ্যানেসথেটিকলেপ্রসির দাগ। সমস্ত দেহটা যেন গিরগিটির দেহ অসমতল কর্কশ কুৎসিত। রোগের প্রভাবে চোখ দুইটা সর্ব্বদা ময়লায় ভর্ত্তি হইয়া জবা-ফুলের মত লাল হইয়া থাকে। হাত দুইখানা বিকৃত, পা' দুইখানা নুলো, সেও বাঁচিতে চায়। মৃত্যু যাহার অনিবার্য্য সেও ভয় করে মৃত্যুদূতকে।

ষ্টীমারের বাঁশী বাজে ভোঁ ভোঁ, বাগানের বসিন্দাদের দেখায় ভয়। বলে "আসিবে তো এস, নয়ত আমি চলিলাম। আর আমার সাক্ষাৎ পাইবে না।"

অন্যমনস্ক ভাবে মুহূর্ত্তকাল অজয় কি ভাবে, তার পর আপন মনেই বলে, "দুত্তোর, যেতে হলে পরে গেলেও চলবে।"

ষ্টীমার চলিতে সুরু করিয়াছে। রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া এখানে পর্য্যন্ত আসিতেছে জলের শব্দ 'ছলাৎ ছলাৎ'—

কুলী-লাইনের ভিতরে নারীকণ্ঠে ব্যথা-কাতর অস্পষ্ট গোঙানীর আওয়াজ। অজয় সেইদিকে অগ্রসর হয়। ঘরের মধ্যে রাশিকৃত ছেঁড়া ন্যাকড়া ও মাদুরের মধ্যে পড়িয়া কাতরাইতেছে কনকি। তাহার প্রসবকাল উপস্থিত। অজয় আগাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করে, "কি হল রে—" উত্তর দিতে গিয়া কনকি লজ্জায় লাল হইয়া উঠে। অজয় তাহাকে একবার পরীক্ষা করিয়াই বলে, "ভয় নাই, তয় শুই থাক—ময় দরবর বাকস লই লড় মারি আহিমু। (তুই শুয়ে থাক, আমি ওষুধের বাক্স নিয়ে ছুটে আসচি)।—সে দ্রুত পদে বাংলোর দিকে চলিতে থাকে।

এই এক ফ্যাসাদ। কম্পাউণ্ডার তো প্রাণের ভয়ে পলাতক, এখন সে একা কি করে। দেখা যাক কি করা যায়।

বাংলোর কাছাকাছি আসিতেই কে একজন জিজ্ঞাসা করে "কে যায়—"

অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট রমণী বাবু। অজয় উত্তর দেয়—আমি—ডাক্তার। আপনি এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কি করচেন—

—মানুষের প্রাণ নিয়ে পালান দেখচি—তা আপনি গেলেন না—

না; চলে গিয়ে উপোস করে মরতে হবে তো। মরণ ভাগ্যে আছেই হয়, বোমার ঘায়ে, নয় না খেয়ে। তা, না খেয়ে আর মরি কেন। তার চেয়ে এখানেই যা হয় হ'ক। আচ্ছা শুনুন তো, ওই শব্দটা হচ্ছে কিসের—

ঘন বনের অন্তরাল হইতে একটা এক টানা শব্দ উঠিতেছে—পিক্—পিক্—কিছুক্ষণ শুনিয়া অভ্যাসের বশে অজয় বলিল—গাহরি মাতিছে হবলা। (হরিণ ডাকছে বোধ হয়) —না মশায় না। ডাক শুনলে হরিণ বলেই বোধ হয় বটে, কিন্তু আসলে ওটা বাঘ—বিস্মিত হইয়া অজয় বলিল, 'বাঘ'? —হ্যাঁ; মেয়ে-হরিণগুলো ওই রকম আওয়াজ করে।* কাছে এলেই বাস্! তা আপনি এ সময়ে হনহনিয়ে চলেছেন কোথায়—

—আর বলেন কেন দাদা, কনকিটা আবার এই রাত্রে জ্বালাল। চলে গেলেই দেখচি ভাল করতাম—

ভদ্রলোক বলিলেন "তা যখন যাননি, তখন ওই বড় সাহেবের পাপ ঘাঁটুন গে—অকস্মাৎ রুদ্ধ আক্রোশে অজয়ের মন গর্জ্জন করিয়া উঠে। পাপ, যুগযুগান্তর হইতে ভারত সহিয়াছে বৈদেশিক আক্রমণ, সে আক্রমণের স্রোতে আসিয়াছে শক, হূণ, পাঠান, মোগল, জন্মলাভ করিয়াছে শত শত, সহস্র সহস্র "ওয়ার বেবীজ,..."

বর্ণ-শঙ্কর জাতিতে পূর্ণ সারা দেশ, পরশুরামের পরশুর আঘাতে নিঃক্ষত্র হয়েছে ক্ষিতি তিন সপ্তবার। ব্রাহ্মণ ঔরসে জন্মলাভ করিয়াছে ক্ষত্রিয় প্রজাপালক, তিমিরজাল-আচ্ছন্ন দ্বীপে আর্য্য-অনার্য্যের মিলনে জন্মলাভ করিয়াছেন ত্রি-কালের সীমা নির্দ্ধারক বর্ণ-শঙ্কর মহামানব কৃষ্ণদ্বৈপায়ন; এও সেই আর্য্য-অনার্য্যের মিলন, হয় ত আসিতেছে কোন যুগ-প্রবর্ত্তক মহামানব,...সে দ্রুতপদে চলিতে থাকে।

কুলী-লাইনটার কাছে আবার ফিরিয়া আসিতে না আসিতে সহসা সাইরেনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ শোনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পাওয়া যায় প্লেনের। বম্বার, জাপানী বম্বার, অজয় ভাবিবার সময় পায় না, আত্মরক্ষার জন্য সামনে যে ট্রেঞ্চটা পায়, সেইটার ভিতরেই লাফাইয়া পড়ে।

বুম্-বুম্ শব্দে বোমা পড়ে। কোথায় তা জানা যায় না, বাতাসে ভাসিয়া আসে কর্ডাইটের বিশ্রী গন্ধ। সারা পৃথিবী কাঁপিতেছে, মহা-প্রলয়ের সূচনায় বাসুকি নাগের ফণা তুলিয়া উঠিয়াছে।

আর একখানা প্লেনের সাড়া পাওয়া যায়। ক্রুদ্ধ দানবের মত গর্জন করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। অজয় একবার আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল। ফ্লাশ লাইটের আলোয় সারা আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। পিছনের প্লেনখানা আগের খানাকে তাড়া করে। সাঁ সাঁ করিয়া আগুনের গোলার মত কি যেন ছুটিয়া যায়। অজয় সংক্ষেপে শুধু

*গল্পকথা নয়, বাঘ সত্যই ওই ভাবে স্বর নকল করে। আসামের গভীর অরণ্যে বাস করবার সময় আমি নিজে বহুবার সে ডাক শুনেছি—লেখক

বলে, "কাউন্টার অ্যাটাক, ব্রিটিশপ্লেন, উঃ!" পরমুহূর্ত্তে অগ্রবর্ত্তী প্লেনখানায় আগুন ধরিয়া গিয়া সেখানা ডিগ্‌বাজী খাইয়া বনান্তরালে প'ড়িতে থাকে। অজয় আনন্দে আত্মহারা হইয়া হাততালি দিয়া উঠে। বলে, "জাপপ্লেন! বেশ হয়েছে। কেন, এস চালাকি করতে।" অন্য প্লেনখানা বিজয়োল্লাসে গর্জ্জন করিতে করিতে অজয়ের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যায়।

সে নিশ্চেষ্ট ভাবে ট্রেঞ্চের ভিতর বসিয়া থাকে। কে জানে কতক্ষণে অলক্লীয়ার সিগন্যাল দিবে। সহসা টর্চ্চ জ্বালাইতেই দে'খতে পায়, তাহার সম্মুখে একটু দূরে ঘিনলগা পড়িয়া রহিয়াছে। বেচারা। প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাড়াতাড়ি ট্রেঞ্চের মধ্যে আশ্রয় লইতে গিয়া কেমন করিয়া বেকায়দায় পড়িয়া মারা গিয়াছে। বাঁচিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই হইয়াছে তাহার মৃত্যুপথ!

অজয় কনকির কুটীরমধ্যে গেল। ডাকিল—"কনকি"—সাড়া নাই। টর্চ্চ জ্বালিয়া দেখিল নীরব নিস্পন্দ ভাবে কনকি প'ড়িয়া রহিয়াছে, ঘরে রক্তের ঢেউ খেলিতেছে। অজয় অবাক হইয়া গেল। কনকি মরিয়াছে, কিন্তু এত রক্ত আসিল কোথা হইতে। কোন বন্য জন্তু আসিয়া কনকিকে আহত করিল নাকি।

কনকির পায়ের দিকে কি যেন একটা নড়িতেছে। টর্চ্চ জ্বালাইয়া অজয় আগাইয়া যায়। রক্তমাখা এক ক্ষুদ্র মানবক দুইহাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মুদিত চক্ষে যেন সমস্ত পৃথিবীটাকেই যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে, বর্ণশঙ্কর মহামানব, ভাবী কালের শিশু এশিয়া···

অজয় আর দেরী করিল না। এ শিশুর প্রাণ রক্ষা তাহাকে করিতেই হইবে। ক্ষিপ্র হস্তে শিশুর দেহের সমস্ত ক্লেদ মুছাইয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। শুভ্র নিষ্কলঙ্ক নিষ্পাপ শিশু, ভবিষ্যতের মহামানব, তাই এই মহাপ্রলয়, তাই দুলিয়াছিল বাসুকি নাগের ফণা। এই ছায়া-ঘেরা লুম্বিনী উদ্যান, পার্শ্বে মৃতা জননী, জন্মলাভ করিয়াছে ভাবী কালের গৌতম···

বাহিরে আসিয়া দেখে দূরে বামন গোঁহাই থান পাহাড়ের চূড়ায় কে যেন আবীর ছড়াইয়া দিয়াছে, ঘন দুর্য্যোগময়ী রজনীর শেষ হইয়াছে,—হাস্যময়ী রক্তাম্বরা উষার আবির্ভাব, মহাপ্রলয়ের শেষে উদিত হইতেছে যুগান্তের নবীন সূর্য্য, সে ধীরে ধীরে বাংলোর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

বিপর্য্যয়

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

কলিকাতার কাছাকাছি ছোট সহরের ক্লাব। ক্লাবের মেম্বরগণ সকলেই কলিকাতার মার্চেণ্ট ও রেল অফিসের কর্ম্মচারী। দিনে ডেলি-প্যাসেঞ্জার, রাত্রে ক্লাবে তাস, পাশা, গান-বাজনা, সাহিত্য-চর্চ্চা ও থিয়েটারের রিহার্সেল সাধক।

ক্লাবের সরস্বতীপূজায় এবার একটা শক্ত রকমের বীর-রসাত্মক নাটকের অভিনয়-ব্যবস্থা হচ্ছে। সখের থিয়েটারের সুদক্ষ অভিনেতা অভয়কুমার বল্লেন, "দর্জ্জিপাড়ায় আমার কাকার বাড়ীর পাশে পাব্লিক ষ্টেজের একজন নামজাদা অভিনেতা আছেন। যদিও আমার সঙ্গে আলাপ নাই, তা সেটা ঠিক করে নেব। তাঁকে এনে আমাদের মোশন মাষ্টার করা যাক। তোমাদের মত আছে?"

সমস্বরে সকলে সোৎসাহে বললে, "নিশ্চয়, নিশ্চয়! একজন নামজাদা আর্টিষ্ট, তাঁকে নিজেদের মধ্যে পাওয়া তো সৌভাগ্য।"

হরেন ভীরু স্বভাবের লোক। ভয়ে ভয়ে বললে, "কিন্তু যদি মদের বায়না ধরেন?"

বিভূতি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে চলে না। তদ্দণ্ডে সদর্পে বললে, "তা সে ব্যবস্থাও করতে হবে। যার যা নেশা অভ্যাস, তাকে তা না দিলে কাজ পাওয়া যাবে কেন?"

অভয় চিন্তিত হয়ে বললেন, "কিন্তু সেক্রেটারী প্রাণকৃষ্ণ-দাকে ভয় করছে। তিনি সে সব বায়নাক্কায় রাজী হবেন কি?"

"নেভার!"—অকস্মাৎ বজ্রকঠিন কণ্ঠ ধ্বনিত হোল!

সকলে চমকে দুয়ারের দিকে চেয়ে দেখলে প্রাণকৃষ্ণবাবু ঘরে ঢুকছেন। দলের সভ্যদের মধ্যে একমাত্র তিনিই চল্লিশের কাছাকাছি পৌঁছেছেন, অতএব সকলের দাদা। সম্প্রতি মার্চেণ্ট-আফিসে কার্য্যদক্ষতা গুণে বড়বাবু হয়েছেন। খোস-মেজাজী দিলদরিয়া মানুষ। ক্লাবের উন্নতির জন্য সবচেয়ে বেশী খরচ দেন তিনিই। ক্লাবের প্রধান প্রতিষ্ঠাতাও তিনি।

আসন গ্রহণ করে প্রাণকৃষ্ণবাবু বললেন, "তোমাদের পরামর্শ শুনতে পেয়েছি। পাব্লিক ষ্টেজের অভিনেতার কাছে অভিনয় শিখ্‌তে চাও? তার ঝক্‌মারি কত জানো?"

ভয়ে সবাই চুপ।

প্রাণকৃষ্ণবাবু বললেন, "স্কুল কলেজে তোমরা জানো বোধ হয়—আমি ভাল ছাত্র ছিলাম। ম্যাট্রিকে জলপানি পেয়েছি। কলেজে সখের থিয়েটারে 'হিরো' হতে গিয়ে ঐ পাব্লিক ষ্টেজের এক অভিনেতার শিষ্যত্ব নিয়েই গোল্লায় গেলুম। আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট হোল। প্রসন্ন চাটুজ্যে মরতে মরতে বেঁচে গেল,—তাও সে ভবেশের মত দস্যি ডানপিটে ছেলেটা সঙ্গে ছিল বলে। উঃ, সে কি ভয়ঙ্কর লোকের পাল্লাতেই পড়েছিলাম! বাপ্!

প্রাণকৃষ্ণবাবুর এই আকস্মিক উষ্ণতায় সবাই হতবুদ্ধি!

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে আত্ম-সংযম করে প্রাণকৃষ্ণবাবু বললেন, "তোমাদের থিয়েটার করার সখ নিজেদের স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত ভাবভঙ্গি প্রকাশে পরিতৃপ্ত কর। সেটা বাঁদরনাচ হোক, ভালুকনাচ হোক—আমরা খুশী হয়ে দেখ্‌ব। কিন্তু যদি পাব্লিক ষ্টেজের লোক এনে তাঁদের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী পদে বরণ কর, তা হলে—"

অভয় তাড়াতাড়ি বল্‌লেন, "থাক দাদা মাপ করুন, আর ওকথা তুলব না। আপনি এতটা রুষ্ট হবেন জানলে—"

"কেন রুষ্ট হয়েছি, তার কারণ ব্যাখ্যা করতেও আমি প্রস্তুত। বুঝতে পারছি, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, সেজন্ম আমি দুঃখিত। তোমরা আমার ছোট ভাইয়ের মত। তোমাদের মঙ্গলের জন্ম বল্‌ছি—মনে রেখো, থিয়েটারের অভিনেতাদের প্রতি অতিভক্তির আতিশয্যে, জীবনে একদিন এমন মূঢ়তা করেছি, যে দিনের কথা মনে পড়লে আজও আমার নিজেকে নিজে জুতো মারতে ইচ্ছে হয়। ব্যাপারটা শুনবে?"

"তা হলে সংশয় মিটে যায়।"

ক্ষণেক গুম্ হয়ে থেকে প্রাণকৃষ্ণবাবু বল্‌লেন, "তোমরা হাস্য, করুণ, বীর, অদ্ভুত রসের গল্প অনেক শুনেছ। আজ বীভৎস রসের গল্প নয়, প্রকৃত সত্য ঘটনা শোন।

মফঃস্বলের একটা কলেজে আমরা তখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি। পূজার ছুটিতে কলেজের ছেলেরা থিয়েটারের আয়োজন করলে। আমাকেও তারা দলে টান্‌লে।

বহুকাল আগে সে সহরে পাব্লিক থিয়েটার ছিল। তাতে পয়সা দিয়ে অভিনয় করতেন জন কয়েক ধনী সন্তান। তাঁদের বাপ ঠাকুর্দ্দারা কেউ খেটে খুটে সত্পায়ে ধন অর্জ্জন করেন নি। তাঁরা বিধবা মা, মাসি, পিসি, খুড়ি, জ্যাঠাই, ভাজ, ভ্রাতৃবধূ ইত্যাদির দলকে হিন্দু-আইনের অসীম ঔদার্য্যে ঠকিয়ে সর্ব্বস্বান্তঃ করে তাদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে মদ-বেশ্যা সম্ভোগ করতেন। ভদ্র বিধবাগুলি কেউ আত্মীয়গৃহে রাঁধুনী বৃত্তি, কেউ দাসীবৃত্তি করে পেট চালাতেন। কেউ অনশনে মরতেন। কেউ এক পয়সার মটর ভিজিয়ে খেয়ে অর্দ্ধাশনে আধমরা হয়ে ক্ষুধার জ্বালায় ভুগে ভুগে মরে যেতেন। হিন্দু-সমাজের লোকেরা জানতেন—এইটে তাঁদের জীবনের পক্ষে সুব্যবস্থা। অন্যথা তাঁরা যদি নিজের ঘরে সসম্মানে স্থানলাভ করে দু'বেলা পেট ভরে নির্ব্বিঘ্নে খেতে পান, তাহলে সমাজধর্ম্ম রসাতলে যাবে।

অতএব সমাজধর্ম্ম রক্ষার জন্য বিধবা বধের অর্থে পুরুষদের মদ-মাংস-বেশ্যা-উপভোগের জন্য বহু বিচিত্র রকম আয়োজন অনুষ্ঠান হোত। তার পর মদ-বেশ্যার হুল্লোড় নিয়ে উৎকট কুৎসিত ব্যাধি ধরিয়ে সখের মরণে মরে তাঁরা মহৎ হতেন। বংশধরগণ পিতৃপুরুষদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতেন। অভিনেত্রীদের সান্নিধ্যে পরমার্থ লাভ করবার জন্য তাঁদেরই বংশধর ক'জন সে থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন। যথাকালে তাঁরা সর্ব্বস্বান্ত হলেন। থিয়েটারও বন্ধ হোল।

আমাদের কলেজের থিয়েটারে মোশন-মাষ্টারী করবার জন্য সেই সর্ব্বস্বান্ত বড়লোকের ছেলেদের মধ্য থেকে একজন প্রৌঢ় অভিনেতাকে ধরে আনা হোল। প্রসিদ্ধ অভিনেতা ধনকৃষ্ণ বাবুর নাম তোমরা বোধ হয় শুনেছ?"

অভয় বললেন "তিনি?" খুব ছোট বেলায় তাঁর অভিনয় যে আমিও দেখেছি। গ্র্যাণ্ড চেহারা! যখন রাজপুত্র বাদশাপুত্র সেজে ষ্টেজে এ্যাপিয়ার হতেন,—তখন দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে যেত। আজকাল গুলীখোরের মত বীভৎস কদর্য্য চেহারা হয়েছে। চোখ দু'টো যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে, দেখলে ভয় করে। বিশ্রী কুৎসিত চেহারা দেখলে বিশ্বাস হয় না, ইনি সেই লোক।"

প্রাণকৃষ্ণ বাবু বললেন, "তুমি জান তাঁকে? ভাল, কি করে সেই দেবপুত্রের মত চেহারা পিশাচগ্রস্তের মত কদাকার হোল—শোন।

থিয়েটারের নট-নটী মাত্রকেই সে বয়সে স্বর্গের দেবদেবী বলে ভ্রম হয়, আমাদের তখন সেই তারুণ্যের ইন্দ্রজাল-মুগ্ধতার বয়স। সুতরাং ধনকৃষ্ণ বাবুকে পেয়ে আমরা প্রবল শ্রদ্ধাভরে তাঁর পাদপদ্মে শির সমর্পণ করলুম। তাঁর শিক্ষকতায় অভিনয় আমাদের ভাল ভাবেই উৎরে গেল। কিন্তু আমাদের অভিভাবকদের গতর-খাটানো পয়সা—যা তাঁরা অতি কষ্টে সঞ্চয় করে আমাদের পড়ার খরচের জন্য দিয়েছিলেন, তার দু'মাসের সমস্তটাই বিশ্বাসঘাতকতা করে ধনকেষ্ট বাবুর পারশ্রমের মূল্য বাবদ মদের দোকানে চলে গেল।

অভিনয় চুকল, কিন্তু আসক্তি চুকল না। পাব্লিক ষ্টেজের অভিনেতাদের ব্যক্তিগত জীবনে যে সব মুদ্রাদোষ—অর্থাৎ মদ-বেশ্যা ইত্যাদি উপসর্গ থাকে, তাঁর তখনও সে সব পুরামাত্রায় ছিল। তবু জিনিয়াস আর্টিষ্ট,—অতএব আমাদের কাছে তিনি দেবতা! প্রায়ই মেসে এসে আমাদের

কাছ থেকে হাওলাৎ বলে দু'চার দিনের কড়ারে ২।১০ টাকা নিতেন। বলা বাহুল্য, ফেরৎ কখনই দিতেন না। আমরাও চাইতাম না। এমন কি, তাঁকে টাকা দিতে পেরেছি বলে মনে মনে গর্ব্ববোধ করতুম!

এম্নি করে ২।৩ মাস কাটল।

পৌষ মাসে বড় দিনের ছুটি আরম্ভ হোল। কাল বাড়ী যাব বলে তল্পীতল্পা বেঁধে রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর আমরা শোবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় অভিনেতা ধনকৃষ্ণ বাবু শোকাকুল মূর্ত্তিতে উপস্থিত! এসেই হৃদয়-বিদারক ভঙ্গিতে মেঝেয় লুটোপুটি খেয়ে কান্না।

আমরা শশব্যস্ত হয়ে উঠলাম। ব্যাপার কি?

আকুল ক্রন্দনে আমাদের হৃদয় দ্রবীভূত করে তিনি জানালেন, সন্ধ্যার দিকে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ার মৃত্যু হয়েছে। সৎকারের জন্য টাকা চাই এবং আমাদের মধ্য থেকে জন চার লোক চাই। শীতের রাত বলে পাড়ার স্বার্থপর লোকগুলা কেউ যেতে চাইছে না। অতি ইতর, ছোটলোক তারা। যেদিন তিনি ধনী ছিলেন, সেদিন তারা ইত্যাদি!

রেলের টিকিট ও কুলিভাড়ার টাকা রেখে মনিব্যাগ ঝেঁটিয়ে যার যা ছিল, বের করে দিলাম। পঞ্চান্নটাকা হোল। কিন্তু শীতের রাত, সর্দ্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, দাঁতের গোড়ায় ব্যথা ইত্যাদিতে সবাই কিছু কিঞ্চিৎ অসুস্থ ছিল। ভোরে ট্রেণ ধরার তাগাদাও ক'জনের ছিল। অতএব তাদের বাদ দিয়ে আমি, ফুটবল-ক্লাবের ক্যাপ্টেন ভবেশচন্দ্র, আর প্রসন্ন—তিনজনে গায়ে কোট ও মাথায় র‍্যাপার জড়িয়ে, তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। নিঃস্বার্থ পরোপকারের দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছি, একজন মস্ত আর্টিষ্টের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ পেয়েছি মনে করে অহঙ্কারে বুক ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

অনেক অলি-গলির ভিতর দিয়ে তিনি আমাদের এক অজানা পল্লীতে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলেন। একটা বাড়ীর রোয়াকে আমাদের বসিয়ে রেখে কোথায় অদৃশ্য হলেন।

বসে বসে অস্বস্তি ধরতে লাগল। রাস্তা দিয়ে নানা শ্রেণীর মাতাল আনাগোণা করছে, সাজগোজ করে অদ্ভুত হাবভাব সহকারে মেয়েরা যাওয়া-আসা করছে, এ কোথায় এলুম রে বাবা! এ পল্লী তো ভদ্রপল্লী নয়!

ভবেশ চটে বললে, "গুরুভক্তি ওই পর্য্যন্ত থাক। চল কেটে পড়ি।"

কিন্তু অন্ধ ভক্তির প্রাবল্যে মন তখনও বিগলিত। সসঙ্কোচে বললাম, "ভদ্রলোককে কথা দিয়েছি। কথার খেলাপ করা উচিত নয়। তাতে যাক প্রাণ, থাক মান!"

প্রসন্নও সে কথা অনুমোদন করলে।

কিছুক্ষণ পরে তিনি ফিরলেন। সঙ্গে দু'জন লোক ও একটা মুটে। মুটের মাথায় ঝাঁকাভর্ত্তি মালপত্র। ভাবলাম— শবদাহের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ।

ক্ষিপ্রহস্তে বাঁশ কেটে, চৌদল বেঁধে লোক দু'টি মড়া বের করে আনলে। আমরা তিনজন ও সেই লোক দু'টির একজন কাঁধে করে মড়া নিয়ে চললুম। মুটেটা মোট নিয়ে সঙ্গে চলল। ধনকেষ্ট বাবু ও অপর লোকটি পিছনে আসতে লাগলেন। ধনকেষ্ট বাবু তখন অনর্গল বক্‌ছেন শোনা গেল। কি বলছেন বোঝা গেল না। কারণ, মৃতদেহ কাঁধে করে আমরা তখন রুদ্ধশ্বাসে ছুটছি।

সহরের বাইরে অনেক দূরে শ্মশান। কৃষ্ণপক্ষের রাত। শ্মশানে এসে মড়া নামিয়ে আমরা বামুন ও মুর্দ্দফরাসকে ডেকে আনলাম। ফিরে এসে দেখি, মৃতার মাথা কোলে নিয়ে তখন ধনকেষ্ট বাবু কখনো ঝলকে ঝলকে অশ্রু বর্ষণ করছেন, কখনো বা জামার হাতায় চোখ মুছে দৃপ্ত স্বরে "বেশ্যার প্রেম যে কত বড় স্বর্গীয় ব্যাপার, ব্যাভিচার যে কি মহান্ ঔদার্য্যজ্ঞাপক মহাপ্রাণতার পরিচয়," সে সম্বন্ধে চমৎকার চমৎকার বক্তৃতা দিচ্ছেন। কি মর্ম্মস্পর্শী সে ভাব ও ভাষা!

স্থানটা যে শ্মশান, তা ভুলে গেলাম। মনে হোল— প্রকাণ্ড রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখছি।

ভবেশের কটমটে চাউনি লক্ষ্য করে উদ্গত অশ্রু সম্বরণ করে সচেতন হলাম। সে ইসারা করে আমায় দেখালে— বিলাপ-পরিতাপের ফাঁকে ফাঁকে ধনকেষ্ট বাবু মাংসের চপ-কাটলেট চিবুচ্ছেন। মাঝে মাঝে বোতল ধরে মদ খাচ্ছেন। আর তার সঙ্গী দু'জন গম্ভীর নির্ব্বিকার ভাবে একাগ্র মনোযোগে অতিতৃপ্তির সঙ্গে কাটলেট খাচ্ছে। প্রত্যেকের হাতে এক এক বোতল মদ।

এতক্ষণে নজর পড়ল, মুটেটা ঝুড়ি রেখে সরে পড়েছে। ঝুড়িতে শব-সৎকারের জিনিস নাই। রয়েছে শুধু গাদা খানেক চপ, কাটলেট আর বোতল বোতল মদ।

সর্ব্বাঙ্গ রি-রি করে উঠল। উঃ কি ঘৃণ্য রুচি! রাগও হোল। আমাদের পড়ার খরচের শ্রাদ্ধ করে এসেছে মদ!

ধনকেষ্ট বাবু মুরুব্বিয়ানা সুরে বললেন, "শ্মশান অতি পবিত্র স্থান। এখানে কোন বাছ-বিচার নাই। পচিশ টাকার মদ এনেছি। তোমরাও এক এক বোতল নাও। না খেলে খাটতে পারবে কেন?"

ভবেশ মোলায়েম ভাবে বল্লে, "খুব পারব আগে চিতাটা জ্বালানো যাক।"

চিতা জ্বালিয়ে দিয়ে আমরা তিনজন একটু তফাতে এসে বসলাম। ধনকেষ্ট বাবু ও তাঁর বন্ধুদ্বয় মদ ও চপ কাটলেট খেতে খেতে শোক-বিলাপ সহ দাহ-কার্য্যের তদারক করতে লাগলেন। প্রসন্ন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বললে, "এঁরা কি কাপালিক? না পিশাচসিদ্ধ?"

দূর থেকে শুনতে লাগলাম, মদের ঝোঁকে তিনজনেরই মুখ সমান তোড়ে ছুটতে আরম্ভ হয়েছে।

সে সব থিয়েটারী ভঙ্গির বিলাপ-পরিতাপ গুলো ছন্দোবন্ধে গাঁথলে স্বচ্ছন্দে একটা মেঘনাদবধ কাব্য হতে পারে। হাতে কায নাই, পলায়নের পথ নাই, অতএব নিরুপায় হয়ে বসে শুনতে লাগলাম। কথা শুনে জানা গেল, ধনকেষ্ট বাবুর এই বন্ধুদ্বয়ও সেই ভূতপূর্ব্ব পাব্লিক-থিয়েটারের অভিনেতা। যিনি চিতায় পুড়ছেন, তিনিও সেই থিয়েটারের এক নামজাদা অভিনেত্রী—মিস অমুক দেবী! একদিন এই সব অভিনেত্রী-দের নিয়ে প্রমোদ-রঙ্গে মেতে অভিনেতারা নিঃস্ব হয়েছেন, কিন্তু এই অভিনেত্রীর এবং আরও ক'জনের হৃদয় এমন মহৎ যে, এখন নিজেদের উপার্জ্জন থেকে তাঁরা ওঁদের মদ-মাংস খাওয়াতেন। অবশ্য সেজন্য পয়সা দেবার উপযুক্ত খ'রদদার সংগ্রহ করে আনতে হোত ওই অভিনেতাগণকে। আজ একজন অন্নদাত্রী দেহ ত্যাগ করলেন, অতএব আর্থিক ক্ষতির জন্য শোকের মাত্রাটা সকলেরই প্রচণ্ড হয়েছে। তবু যে ওঁরা দু'জন সৎকার করতে আসবেন না বলে ঝেড়ে জবাব দিয়েছিলেন, তার কারণ মদ-মাংস না পেলে ওঁরা খাটতে পারেন না। এখন মদ-মাংস পেয়েছেন, অতএব···কুছ পরোয়া নাই। মড়া শুধু নয়, জীবন্তকেও ওঁরা পোড়াতে প্রস্তুত! ইত্যাদি।

মাতালরা সর্ব্ববাদিসম্মত ভাবে স্বীকার করলে,—অভিনেত্রীটি যদিও অনেক খরিদদারকে দেহ বিক্রয় করে পয়সা উপার্জ্জন করেছেন সত্য, কিন্তু তিনি যথার্থই সাধ্বী সতী বারাঙ্গণা ছিলেন। এই তিনজন মাতালের প্রত্যেকের কাছেই তিনি একনিষ্ঠা প্রণয়িনী ছিলেন। এ কথা তাঁরা শপথ করে বল্‌তে পারেন। এঁদের চোখের সামনে বহু ব্যভিচার করেছেন সত্য, তবু তিনি স্বর্গের দেবকন্যা, পরম পবিত্রা!—

এ সব দুর্ব্বোধ্য হেয়ালির মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করবার সামর্থ্য ছিল না। তত্ত্ব যতই দুরূহ হয়ে ওঠে, তার ঝলকানির দীপ্তি ততই চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। মূঢ় বিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম। ভাবলাম, আমরা না বুঝতে পারলেও নিশ্চয়ই এগুলো উচ্চশ্রেণীর আর্ট!

হঠাৎ শুনি একজন মাতাল স্খলিত কণ্ঠে বলছে, "ধন-কিষ্টো, এত তো ভালবাসা ছিল—বা—ও—য়া,— একদেহ, একপ্রাণ ছিলে। এখন ওর ওই রোষ্ট করা মাংস খেতে পার? তাহলে বুঝি ভালবাসা বটে!"

ভালবাসার এমন অত্যুৎকট প্রমাণ দাখিলের প্রস্তাবে আমরা স্তম্ভিত! ভাবলাম এও বুঝি অভিনেতাদের অত্যাশ্চর্য্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব-সূচক অসাধারণ রসিকতা!

ধনকৃষ্ণ বাবু উত্তেজিত হয়ে সদম্ভে বল্লেন "আলবৎ পারি।"

সঙ্গে সঙ্গে চিতার কাছে বাঁশে করে ঠেঙিয়ে মৃতার এক-খানা জলন্ত হাত ছিঁড়ে নিলেন। ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে হাতের পোড়া মাংসগুলা বেগুন পোড়ার খোসা ছাড়ান'র মত ছাড়িয়ে ফেললেন। তারপর ভিতর থেকে খাব্‌লে খাব্‌লে মাংস নিয়ে মুখে পুর্‌তে লাগলেন!

মাতালদ্বয় সোল্লাসে বলে উঠল, "ব্রাভো!"

আমাদের তখন আপাদমস্তক ত্রাসে কণ্টকিত! পাক-স্থলী প্রচণ্ড বেগে মুচড়ে উঠল, পা পাক দিতে লাগল, মাথা ঘু'রে উঠল, সর্ব্বাঙ্গে কালঘাম ছুটল! ম্যাজিসিয়ানদের ষ্টেজে অপরের ইচ্ছাশক্তির বশীভূত হয়ে মানুষকে "নর রাক্ষস" সেজে জ্যান্ত ছাগল, মুর্গী সাপ খেতে দেখে'ছি।——অমানুষিক কাণ্ড হলেও জানা ছিল,—প্রকৃতপক্ষে সেটা খেলা! কিন্তু এ কি বীভৎস ব্যাপার দেখছি! এ যে সত্য সত্য শ্মশানে জলন্ত চিতা থেকে মৃতের হাত ছিঁড়ে নিয়ে গোগ্রাসে গিলছেন।

শ্রদ্ধেয় গিরিশ চন্দ্র, অমৃত লাল দলের Born Actor দের বহুমুখী নাট্য-প্রতিভাকে ভালবাসি বলে এমন বিকট নাট্য-প্রতিভা দর্শনের শাস্তি ভোগ করব, তা-তো জানা ছিল না। প্রণয়িনী অভিনেত্রীর প্রতি অপার্থিব ভালবাসার প্রমাণ দেখবার জন্য তার পার্থিব মৃৎদেহ থেকে মাংস ছিঁড়ে খেতে হবে, এমন রাক্ষসী লালসা—উন্মাদ ——পৈশাচিক ভালবাসার কথা তো কখনো কল্পনাতেও আনতে পারি নি! চোখের সামনে অভিনেতা মশায়ের এ কি সাংঘাতিক নাট্য-প্রতিভা দেখছি? আমরা কি স্বপ্ন দেখছি? না, পাগল হয়ে গেছি?

অসহনীয় উদ্বেগ, আতঙ্কে, উৎকণ্ঠায় আমাদের সংজ্ঞা-লোপের উপক্রম হোল! ভবেশ চট করে উঠে আমাদের দু'টোকে টেনে নিয়ে শ্মশান ছেড়ে দৌড় দিলে। শেষ রাতে তখন আকাশে চাঁদ উঠেছে।

বাড়ী গিয়ে প্রসন্নর হোল মেনিঞ্জাইটিস্। আমার হোল ব্রেণ-ফিবার। ডাক্তাররা বললেন, ভয়ঙ্কর মেণ্টাল শক্ লেগে রোগ হয়েছে।

দু'জনেই মর্‌তে মর্‌তে বাঁচলাম। কিন্তু আধমরা হয়ে রইলাম। কলেজে পড়ার সামর্থ্য আর রইল না।

দীর্ঘকাল বিদেশে বায়ুপরিবর্ত্তন করে সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে শুনলাম, আমাদের অভিনয়-শিক্ষাগুরু পরদিন শ্মশান থেকে ফিরে ছ' মাসের জন্য উৎকট রোগে শয্যাশায়ী

হয়েছিলেন। অতি কষ্টে বেঁচে উঠেছেন, কিন্তু চেহারায় ঘটেছে বীভৎস কদর্য্য পরিবর্ত্তন। মস্তিষ্কে ঘটেছে আংশিক বিশৃঙ্খলা। আর মনের স্বাস্থ্য যে কতটা আর্টিষ্ট-মাফিক সুস্থ সুন্দর আছে, তা আর সাহস করে গিয়ে খোঁজ নিতে পারিনি।

হয়ত পাব্লিক থিয়েটারে নৈতিক চেতনাসম্পন্ন সুস্থচেতা বুদ্ধিমান্ ভদ্ররুচির অভিনেতাও অনেক আছেন, তাঁদের পরিচয় আমি জানি না। আমি জীবনে ঐ একটি এবং তাঁর বন্ধু চুটি, মোট তিন মূর্ত্তির পরিচয় পেয়েছি। সেই পরিচয়ই আমার পক্ষে যথেষ্ট। মনে হয়, ক্রমাগত অতিরিক্ত মদ-মাংস খেয়ে নকল অভিনয়ের চর্চ্চা করতে করতে এরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে মনুষ্যত্ব, ভদ্ররুচি, কাণ্ডজ্ঞান পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেন। আর তাঁদের বিষাক্ত সংস্রবে সমাজ-জীবন পর্য্যন্ত কলুষিত, ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলেন।—অন্ততঃ আমি মহাক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি।"

হরেন ইতস্ততঃ করে বললে, "আমার পিসতুত ভাইয়ের এক বন্ধু সখের থিয়েটারে চমৎকার হিরোইনের পার্ট করতেন, প্রায়ই বলতেন, "আত্মহত্যা করে মরা, সেও একটা মস্ত অভিনয়। তারপর হঠাৎ একদিন অকারণে আত্মহত্যা করলেন।"

অভয় সবিস্ময়ে বললেন, "অর্থাৎ? মস্ত অভিনয়ের বাহাদুরী হোল? আচ্ছা অন্তঃসারশূন্য, অপদার্থ লোক তো? নাঃ, আমাদের মধ্যে কোন্ দুর্ব্বলচেতা আবার অভিনয়ের বাহাদুরীর ঝোঁকে কবে কি করে বসবে, তার ঠিক নেই। ক্লাব থেকে অভিনয় উঠিয়ে দেওয়া হোক, তা হলে তার চেয়ে অভিনয়ের টাকায় চাল-ডাল কিনে দুর্ভিক্ষের বাজারে কাঙ্গালী ভোজন করানো হোক।"

সাগ্রহে অভয়ের করমর্দ্দন করে প্রাণকৃষ্ণবাবু বললেন, "জয়স্তু। মঙ্গল হোক তোমার। চাল-ডালের ভার আমার উপর, খাটবার ভার তোমাদের। ক্লাবে এবারকার অভিনয় হোক—নিরন্নকে অন্নদান।"

প্রাণকৃষ্ণবাবুর পায়ের ধূলা মাথায় তুলে নিয়ে অভয় আবেগভরে বললেন, "আর তাতেই আমাদের প্রাণে আসুক পবিত্রতর আনন্দ

জীবনাবর্ত্ত

শ্রীমতী- প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

আট

মাধবী তাহার শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিল, অসামান্য রূপের জোরে। তাঁহারা প্রথমদিকে নূতন সুন্দর পুতুলটির মতই তাহাকে দেখিতেন। স্নেহের সহিত, আপনাদের পছন্দের আনন্দ মিশ্রিত বিস্ময়ের সহিত। ক্রমে তাহাতে মিশিতে লাগিল অনুকম্পা। দরিদ্র, অশিক্ষিত, পল্লীগ্রামের কন্যা মাধবী। তাহার পিতা সামান্য বেতনে চাকুরী করেন। বিদ্যা তাঁহার ম্যাট্রিকুলেশনের গণ্ডী বাহির হয় নাই। আর্থিক দুরবস্থা তাঁহাদের খুবই। আর ইঁহারা সহরবাসী ধনবান।

পড়তি অভিজাতগৃহের মর্য্যাদা কেহ রাখিল না। সেই অনন্যসাধারণ হৃদয়বান, তেজস্বী দত্ত মহাশয়ের প্রতি পরিহাসচ্ছলে অপমানও তাহার সহ্য হয় না। সেই একনিষ্ঠ তেজস্বী নিষ্ঠাবানের পৌত্রী কাহারো অনুকম্পা গ্রহণ করিতে জানে না। তাহার পিতৃকুলের প্রতি অবজ্ঞাসূচক ইঙ্গিতে মাধবী কঠিন হইয়া ওঠে। হইতে পারে ইহারা ধনে বড়, বিদ্যায় বড়, কিন্তু তাহার পিতা পিতামহ ইহাদিগের অপেক্ষা কম কিসে? তাঁহাদের খ্যাতি তাঁহাদের মান নৈহাটী হইতে দমদম পর্য্যন্ত জুড়িয়া আছে যে। পিতা পিতামহের তেজপূর্ণ সৌম্য বদনমণ্ডল স্মরণ করিয়া মাধবী কঠিন হইয়া বসিয়া থাকে, তাঁহাদের পরিহাসে সে হাসে না; কালোচক্ষে যেন অগ্নিবৃষ্টি হয়। তাঁহারা মাধবীর প্রতি বিরূপ হইয়া ওঠেন "পাড়াগেঁয়ে বুদ্ধিহীন মেয়ে।" রসিকতা বোঝে না।

স্বামী কোর্ট হইতে ফিরিয়া ক্লাবে যান। সিনেমায় যান। মাধবীকে সঙ্গে প্রায়ই লন না। কারণ, মাধবী ইংরাজী বোঝে না, এবং ইঁহারা বাংলা ফিল্ম দেখেন না। একদিন অবিনাশের বাহির হইবার কালে তাহার মাতা বলিয়াছিলন মাধবীকে সঙ্গে লইতে। পাইপে তামাক ভরিতে ভরিতে অবিনাশ হাস্যচ্ছলেই উত্তর দিয়াছিল, "সঙ্গে নিয়ে কি করব? তুমি তো খালি রূপ দেখেই এনেছ, আমার দিকে তো দেখো নি, সমাজে যে বার করা দায়। আজ আমার সঙ্গে আবার মিসেস মুখার্জ্জি থাকবেন তাঁর সামনে বের করবো কি করে?"

মাধবীকে তাহার বিদ্যাহীনতার অপমান অত্যন্ত বাজিয়াছিল। মাধবী অত্যন্ত সূক্ষ্ম মার্জ্জিত হৃদয়বৃত্তি-সম্পন্না। সামান্য আঘাত সামান্য ত্রুটীও তাহার চক্ষে অমার্জ্জনীয়।

সেইদিন হইতে মাধবী লুকাইয়া ইংরাজী শিখিতে সুরু করিল। মাধবীর শাশুড়ী যে সেদিন মাধবীকে লইয়া যাইবার

জন্য পুত্রকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে যে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ নিহিত ছিল মাধবী তাহা বুঝিয়াছিল।

তাহার নিহিত অর্থ ছিল এই যে, "তুমি যে আমাদের অনুকম্পার বস্তু কেন, তাহা আমার পুত্রের নিকট হইতেই শুনিয়া লও।" ধীরে ধীরে মাধবীর স্বাভাবিক প্রফুল্লতা মুছিয়া যাইতে লাগিল। স্বল্পভাষী শুষ্ক গম্ভীর নির্জ্জনতাপ্রিয় বধূ। কেহই তাহাকে পছন্দ করে না। স্বামীও যেন ভয়ে ভয়ে থাকেন আপন অপরাধ স্মরণ করিয়া। এত আত্মসম্মান-জ্ঞান শ্বাশুড়ী পছন্দ করেন না; তিনি মাধবীর সহিত খুব কঠিন ব্যবহার করেন।

স্বামী রূপের জন্য চাহিলেও সে চাওয়া তাঁহার মনের যতটা, তাহার চাইতে দেহের দাবীই অধিক।

মাধবী ধীরে ধীরে স্বামীকে বুঝিতেছিল। স্বামী তাহাকে ভালবাসেন, তবে সে ভালবাসা কুলহারা নহে—যাহা মাধবী মনে প্রাণে চাহিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, স্বামীর লোলুপতা তাহার মনকে যেন ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিত।

তাঁহার ভালবাসা একত্রে থাকিবার ফলে যে স্নেহ, তাহাই। ইহা প্রেম নহে। কামুকতায় অবিনাশের দেহ-মন আচ্ছন্ন হইয়া আছে। নারী দেখিলে যেন অবিনাশের জ্ঞান থাকেনা, সে উন্মাদ হইয়া ওঠে, তাহাদের পিছু পিছু ঘোরে। অবশ্য স্ত্রীর চক্ষু বাঁচাইয়া। কিন্তু কি ঘরে কি বাহিরে অবিনাশের এই কাঙ্গাল বৃত্তি মাধবীর অগোচরে থাকে না। অন্তর তাহার ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়। প্রথমদিকে মাধবী ভাবিয়াছিল কেমন করিয়া এইরূপ স্বামীর সহিত সে বাস করিবে? যাহাকে দেবতার মত ভক্তি করিবার কথা, তাহার ব্যবহারে যদি ভক্ত দানবত্ব দেখে, তবে তাহার মনের যে অবস্থা হয়, মাধবীর তাহাই হইয়াছিল।

চিরদিন মায়ের নিকট সে শুনিয়াছে যে, স্বামীকে ভক্তি করিতে হয়, তিনি গুরু, পতিই নারীর দেবতা। তাঁহার মত পূজনীয় কেহ নাই। বালিকা মাধবী সেই নারীর দেবতার পূজার অর্ঘ্য বহিয়া প্রেমপরিপূর্ণ চিত্তে আসিয়াছিল এবং অসীম বিশ্বাসের সহিত আপনার হৃদয়-মন স্বামীর নিকট সঁপিয়া দিয়াছিল।

কিন্তু ধীরে ধীরে তাহার বিশ্বাস স্খলিত হইতে লাগিল। এরিষ্টোক্র্যাট সমাজের মধ্যমণি মিসেস্ মুখার্জ্জি, ইংরাজীতে কথা বলিতে ... ... সমাজের সকল বিষয়ে তিনি অগ্রণী। এমন বদনাম নাই, যাহা তাহার নামে হয় নাই। মাধবী জানে, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অবিনাশের তাহার সহিত কাটে। সামান্য পানদোষও আছে। তবে শুনিয়াছে যে, ব্যারিষ্টারদিগের পক্ষে ইহা দোষ নহে। আর যাহাই হউক, স্বামী তাহার দেবতা নহেন। মাধবী ভাবে প্রজ্ঞার কথা। কেমন করিয়া তিনি বেশ্যার গৃহে স্বামীকে পৌছাইয়া দিতেন? কিরূপ তাঁহার পতিভক্তি ছিল? আপনার চাইতে যে চরিত্রবলে নিকৃষ্ট, তাহাকে কি ভক্তি করা যায়? কিন্তু তিনি সতী ছিলেন মনে-প্রাণে, যাহাতে তাঁহার বাক্যে মাণ্ডব্য মুনির অভিশাপ বিফল হইয়াছিল। মাধবী কি সতী নয়? মাধবী স্বামীকে ভক্তি করিতে পারিবে না। মাধবীর চিন্তা-ধারা অসংলগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু স্বামীর সঙ্গ সে পরিহার করিতে পারে না। স্বামীকে তাহার সহ্য করিতে হয়। কিন্তু এইখান হইতেই মাধবীর জীবনে যেন শূন্যতা অতৃপ্তি আসিতে লাগিল। মাধবী পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

তাহার একমাত্র সান্ত্বনাস্থল শান্তির আশ্রয় ছিল পিতৃগৃহ। সেইখানে সে যে কয়দিন থাকিত, যেন সমস্ত গ্লানি তাহার ধুইয়া মুছিয়া সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। যেন কুমারী মাধবী। মা তৃপ্তির সহিত নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিতেন, কন্যা তাঁহার পরম সুখী।

নয়

বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হইতেছে। জগতে ভাঙ্গা-গড়ার আর শেষ নাই। দ্রুত-বিবর্ত্তনশীল জগত এবং তাহার প্রাণী। মাধবীর জীবনেও বহু পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। মাধবী উপস্থিত চারি-পুত্র ও একটী কন্যার জননী।

শ্বশুর-শ্বাশুড়ী বৃদ্ধ হইয়াছেন। সংসারের কর্ণধার মাধবী। অবিনাশও সংযত হইয়াছে। পশার তাহার বৃদ্ধি পাইয়াছে। কর্ম্ম লইয়াই অধিকাংশ সময় ব্যস্ত সে থাকে। তবে স্বভাবের পরিবর্ত্তন খুব বেশী হয় নাই এবং পানদোষ প্রকাশ্যে সুরু হইয়াছে। তবে মারাত্মক কি অসহনীয় দোষ কিছু নাই। প্রায় বৎসর চারেক পিত্রালয়ে যায় নাই। মনে মনে সে যেন হাঁপাইয়া উঠিত। কিন্তু তবুও সংসারের নানা প্রয়োজনে তাহার যাওয়া ঘটিয়া ওঠে নাই।

কন্যার ম্যাট্রিক পরীক্ষা, দ্বিতীয় পুত্রের তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষা সন্নিকট, জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিলাতে যাওয়ার গোছগাছ সুরু হইয়াছে। সে আই-সি-এস পরীক্ষা দিতে যাইবে।

মাধবী সভয়ে জ্যেষ্ঠপুত্রের পানে তাকায়। কান্তিমান্ সুন্দর সচ্চরিত্র পুত্র তাহার। তাহারই শিক্ষায় বাড়িয়া উঠিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত কোনও দোষ তাহার চরিত্রে লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু যদি তাহার চক্ষুর অগোচরে থাকিয়া স্বর্ণকমল মন্দ হইয়া যায়? তাহার রক্তে বিকৃতি আছে কিনা তাহা কে জানে?

মনে আসে তাহার ইবসেনের "ঘোষ্টের" কথা। কোন সময়ে যে রক্তে উন্মাদনা আনিবে, তাহা বলা যায় না। সে আঘাত মাধবীর পক্ষে আরও অসহ্য। কি বলিয়া কেমন করিয়া স্বর্ণকমলকে সে সাবধান করিবে? মধ্যে মধ্যে মাতা-পুত্রে নিম্নলিখিত রূপ কথাবার্ত্তা হয়।

"হা রে স্বর্ণ, শুনেছি বিলেত ভারি পাজি জায়গা, তুই বাপু সাবধানে থাকিস, বুঝলি ?"

স্বর্ণ বিস্মিত হইয়া বলে—"সে কি মা, তুমিই তো কত সুখ্যাতি করতে যে, মস্তবড় জায়গা, আমাদের দেশে যারা বড় হয়েছেন, দেশের জন্য ভেবেছেন, সবাই বিলাতফেরত। আমাকে কত গল্প বলেছ যে, অরবিন্দ, সুরেন বাঁড়ুয্যে, গান্ধী, সুভাষ, জহরলাল, এঁরা সকলে বিলাতে গেছেন। একটা সুপিরিয়র জাতের সঙ্গে না মিশলে কখনো আমাদের মত আত্ম-বিস্মৃত জাতের উন্নতি হবে না। ওদের সঙ্গে মেশা চাই, ওদের সদ্‌গুণগুলি গ্রহণ করা চাই, আপনার জাতীয় জীবনে তাহার প্রচার চাই, ব্যবহার চাই, তবেই হবে। আজ সেই দেশে যাবার সুযোগ এসেছে, মিশতে যাচ্ছি—আজ কেন এ কথা বলছো মা" ?

প্রশ্নভরা নয়ন তুলিয়া মায়ের পানে স্বর্ণকমল তাকায়। মাধবী বলে, "সে সব কথাই সত্যি রে, সে সব ঠিক কিন্তু কি মনে হয় জানিস ? বড় প্রলোভনভরা জায়গা, যদি আপনার উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে তুই এত ভাল ছেলে যদি মন্দ হ'য়ে যাস তো সে যে আমার মরার বাড়া শাস্তি হবে।" তবু স্বর্ণকমল বুঝিতে পারে না, বলে—"তুমি ভাবছ তো, যে আমি এখানে বেশী সিনেমা দেখি, ক্রিকেট খেলি ব'লে সেগুলো ওখানে গিয়ে বেশী ক'রে করবো ? পড়াশুনা অবহেলা করবো ? তা করবো না মা।" তাহার পর আপনা আপনিই মাকে সান্ত্বনা দিয়া বলে,—না মা, তুমি ভেবো না, আমি খুব ভাল ছেলে হ'য়ে থাকব। পাশ আমি করবই, তুমি যে আমার কাছে অনেক আশা কর। এখানেও যেমন ফার্ষ্ট হ'য়েছি, ওখানেও তাই হব।" আবার হাসিয়া বলিল, "এখানে তুমি বকো, আবার পয়সা দাও, সিনেমা যাই, র‍্যাকেট কিনি, সুট করাই। কিন্তু ওখানে তো তুমি থাকবে না, আবদার করা চলবে না। অথচ তোমার আদেশের বাধা আমার মনে থাকবে। কাজেই আমি পড়াশুনা ঠিক করব, সিনেমা বেশী দেখব না। তুমি কিছু ভেবো না মা।" মাধবীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসে। তাহার এই শিশুর মত সরল নির্ভরশীল পুত্রকে সে কেমন করিয়া বুঝাইবে—সে কি ভয় তাহার অন্তরকে সারাক্ষণ উদ্বিগ্ন করিতেছে।

ইহার পর তাহাদের অন্য কথা সুরু হইয়া যায়।

ইহারই মধ্যে মাধবীর একটি ভ্রাতার বিবাহ স্থির হইয়া গেল। পুত্র-কন্যা কেহই যাইতে পারিবে না। কেবল স্বর্ণকমল তাহার মাতুলালয়ে বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে দেখা করিয়া আসিবে এবং মাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে। ইহা স্থির হইয়া গেল।

পিত্রালয়ে যাইবার পূর্ব্বে মাধবী যেন পূর্ব্বের ন্যায় নববধূ হইয়া যায়। আনন্দব্যাকুল অন্তরে দিন গণিতে থাকে—কবে যাইবে।

সেই উদার উন্মুক্ত নীলাকাশতলে স্নিগ্ধ শষ্পাচ্ছাদিত ভূমি, তাহাদের চিক্কণ নধরকান্তি গরুগুলি মনের আনন্দে চরিয়া বেড়াইতেছে। সেই তাহার জন্মভূমি, তাহার দেশ, তাহাদের পূজার মন্দিরে স্নানার্থিনীগণ স্নান সারিয়া পূজা দিয়া যাইতেছে। শঙ্খ-ঘণ্টারোলে ধূপের গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। পুরোহিতের গামছায় বাঁধা ভিক্ষা চাল-কলা-বাতাসার লোভে গ্রাম্য বালক-বালিকাগুলি দাঁড়াইয়া আছে। মাধবীরাও এমনি থাকিত। পুরোহিত দাদার ভিক্ষা চাল-কলার স্বাদ যে কি মধুর লাগিত তা বলা যায় না। ভাগ লইয়া শোভার সহিত কলহ হইত। সে দিনগুলি গিয়াছে, কিন্তু তাহার স্মৃতি অন্তরে মধুর হইয়া আছে। তবে এখনকার দিনগুলিও কম মধুর নহে। নিজে মা হইয়া সে নিজেকে বৃদ্ধা ভাবে। কিন্তু ওই ইচ্ছাপুরার আবহাওয়ায় আপন মায়ের কোলে সে আবার বালিকা হইয়া যায়। বড় সুন্দর দিনগুলি ! সেখানে শিক্ষার উত্তাপ আর তর্কের ঝাঁঝ দিন-রাত্রিকে ঘেরিয়া রাখে নাই। স্নিগ্ধ ছায়াঘেরা নিবিড় বৃক্ষগুলির নিম্নে স্বচ্ছ শীতল পুষ্করিণীর মতই সব ঠাণ্ডা, সবুজের মাখামাখি আলিঙ্গন সবখানে।

দশ

মাধবীকে পৌঁছাইয়া দিয়া স্বর্ণকমল কয়দিন থাকিয়া ফিরিয়া গেল। ১৫।২০ দিন পরে পুনরায় আসিবে মাকে লইতে। পিত্রালয়ে আসিয়া মাধবী দেখিল, পরিবর্ত্তন সবখানেই আরম্ভ হইয়াছে। মা তাহার এই চারিবৎসরে অনেকটা বৃদ্ধা হইয়াছে। মুখের হাসিতে সেই সতেজ দীপ্তি নাই, কেমন যেন অসহায় করুণ শান্ত হাসি। রগের কাছে চুলে পাক ধরিয়াছে। মা যেন বদলাইয়া যাইতেছেন। কাকীমার অমন লক্ষ্মীর মত শান্তশ্রী-সমন্বিত কোমল মূর্ত্তিতে থান যেন মানায় না, ও যেন আর কেহ। তাহার সেই লালপাড় শাড়ীপরা শাঁখা-চুড়ী হাতে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনমণ্ডিতা ধীরস্থিরমূর্ত্তি কাকীমা কই ? মাধবী চোখের জল রাখিতে পারে না। কাকীমার বুকে মুখ লুকায়। কাকীমার নিঃশব্দ ক্রন্দনের অশ্রু মাধবীর মাথায় ঝরিয়া পড়ে। কত কথাই আজ মাধবীর মনে হয়। যে কাকা তাহার আজন্ম রুগ্ন, পঙ্গু সবাইকার অনাদৃত হইয়াও আপনার স্ফূর্ত্তিতে বাড়ী সরগরম রাখিয়া সবাইকার বিরক্তিভাজন হইতেন ; আজ তাঁহার অভাব যেন সবখানে। ওই যেন শোনা যায় তাঁহার উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর—"আমার মা এসেছে রে, বড় মা শোভা কবে আসবে ?" আবার মনে হয় তাঁহার সাধা ওস্তাদি গলায় গানের একটা টুকরা কলি—

"গাওয়ে বাগীশ্বরী"

না না, সব ভুল। আর ফিরিবে না তাহার স্নেহময় কাকা। আজ যেন সব অবজ্ঞা সব অনুযোগ নালিশের মূর্ত্তি ধরিয়া অভিযোগ করে। মনে হয় কাকা তো কখনও একটা দিনের জন্তও তাহাদের কোনও কঠিন বাক্য বলেন নাই? আদর, শুধু যত্ন, শুধু স্নেহ তাহারা পাইয়াছে কাকার নিকট, কাকীমার নিকট। ইহার মূল্য কি অর্থ দিয়া নিরূপণ হয়? নাই বা আনিলেন তাহার কাকা অর্থ। যাহা তাহাদের দিয়াছেন তাহা অমূল্য। মায়ের নিকট গল্প করিতে করিতে শুনিল নিভাপিসির মৃত্যুর কথা।

কেমন আশ্চর্য্য লাগে, নিভাপিসি নাই? ওই তাদের বাড়ী, ওই গোয়ালঘর সব রহিয়াছে। নিভাপিসি চলিয়া গিয়াছে—সামান্ত কয়দিনের জ্বরে। মৃত্যুকালে তেমন যত্নও পায় নাই। খালি মরিবার কালে বড় হৃদয়বিদারী প্রার্থনা করিয়া গিয়াছে, বলিয়াছে "এবার যেন সত্যকার মানুষ হয়ে জগতে আসি, আর কিছু নয়।" বিকারের ঘোরে এই ছিল তার প্রলাপবাক্য। "ওগো যেন মানুষ হয়ে জন্মাই।" মাধবী এখন যেন নিভাপিসির অসংলগ্ন বাক্যের অর্থ খুঁজিয়া পায়।

নিভাপিসি নপুংসক ছিল। ভদ্রঘরের কন্যা বলিয়া সে গৃহেই চিরদিন ছিল। প্রথমে কেহই বুঝিতে পারে নাই যে, নিভা নপুংসক। দশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়, এবং শ্বশুরালয়ে প্রায় চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সে ছিল। ক্রমে শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী বধূর অস্বাভাবিক দৈহিক আকৃতি দেখিয়া সন্দেহ করিতে থাকেন এবং সে সন্দেহ যখন সত্য হয়, তখন নিভাপিসিকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়া পুত্রের আবার বিবাহ দেন। তাঁহার পুত্র এখন সুখে সংসারধর্ম্ম পালন করিতেছে। নিভাপিসি দেহে স্বাভাবিক মানবী না হইলেও মন তাহার স্বাভাবিক নারীর মতই ছিল। স্বামীর প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মিয়াছিল। কত আকুলি-বিকুলি করিয়াছে। সতীনের সহিত ঘর করিতে চাহিয়াছে। দাসীর মত থাকিবে বলিয়াছে। কিন্তু দুই পক্ষের কেহই রাজী হয় নাই। ফলে তাহার ব্যর্থ অশ্রু ঝরিয়াছে। কয়টি বৎসরের মধুস্মৃতি সম্বল করিয়া পিত্রালয়ে তাহার দাসীজীবন অতিবাহিত হইয়াছে প্রায় ৩০ বৎসর। এতদিনে মুক্তি মিলিয়াছে। তাই তাহার কামনা যে, যে কামনা তাহার এজন্মে বিফল হইল, পরজন্মে তাহা যেন সার্থক হয়। মাধবী শুনিতে শুনিতে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে।

আরো কত লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ওপাড়ার ভট্টাচার্য্য মশাই। তাহাদের স্কুলের সেলাইয়ের টিচার বৌদি। কুঞ্জদের বড় ছেলে, ছোট জ্যাঠাই মা। প্রতিটি জীবনের পিছনে একটি করিয়া ব্যর্থতার ইতিহাস পুঞ্জীভূত হইয়াছে। তথাপি তাহারা জীবনকে বহন করিয়াছে। খাইয়াছে, শুইয়াছে, হাসিয়াছে, মিশিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিতে যাহা প্রয়োজন সবই করিয়াছে।

এইটা মাধবীকে ভারি আশ্চর্য্য করে। শোকে মানুষ মরে না, ব্যর্থতায় মানুষ মরে না, অভাবে মানুষ মরে না। যতক্ষণ না মৃত্যু আপনি আসিবে ততক্ষণ যতবড় সংঘাত-সমস্যা মানুষের জীবনে আসুক না কেন, তাহাকে সে সহ্য করিয়া লইবে। ইহাই বাঁচিয়া থাকা, ইহাই জীবন। কেহ জীবনকে বোঝার ন্তায় বহন করে, কেহ জীবনের আনন্দ-স্রোতে বাহিত হয়।

মাধবী আপনার জীবনটা ভাবিয়া দেখে। অল্প বয়সে তাহার জীবন খুব আনন্দের হয় নাই, তাহার প্রধান ও মুখ্য কারণ স্বামী তাহার প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছিলেন এবং অসম গৃহে তাহার বিবাহ হইয়াছিল।

প্রথমদিকে স্বামীর দুশ্চরিত্রতার প্রমাণ তাহাকে অত্যন্ত কাতর করিয়াছিল। তাহার স্বাভাবিক প্রফুল্ল মূর্ত্তির পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। কিন্তু অবশেষে সেইটাই তাহার স্বাভাবিক মূর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। এমন কি, নিজের কাছেও। আপনার অন্তরের যে গোপন ব্যথা, তাহা সে একাই ভোগ করিয়াছে একান্ত গোপনে। বাহিরের সমাজে সে ধনীর পুত্রবধূ; খ্যাতনামা ব্যারিষ্টারের পত্নী হিসাবে অত্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় হাসিমুখে সে থাকিয়াছে। ক্রমে সে পুত্রের জননী, সংসারের গৃহিণী হইয়াছে, স্বামীও তাহার প্রতি সাংসারিক সকল বিষয়ে অত্যধিক নির্ভর করেন, সংসারের সকল দায়িত্ব তাহাকে দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত। এই সকল গুরু কর্ত্তব্য সে পালন করিয়া আসিতেছে হাসিমুখে। অথচ সে হাসিমুখের পশ্চাতে কতখানি প্রাণ আছে, তাহার খবর কেউ করে না। আত্মীয়-পরিজন সকলেই জানেন—সে পরম সুখী। অনেকে তাহার প্রাসাদসম অট্টালিকা, যান-বাহন, পরিচারক-পরিচারিকা প্রভৃতি হিংসা, ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখিয়া থাকে। কিন্তু মাধবী? সে আপনার অন্তরের অন্তরে সঙ্গী—সাথীহীন একাকী। কি বোঝা বহন করিয়া চলিয়াছে, কত দীর্ঘ সে পথ, তাহা তাহার অজানা।

ওঃ! প্রথমে স্বামীর নীচতা ক্ষুদ্রতা তাহাকে কি আঘাতই না করিয়াছে! মাধবী একেবারে নীরব হইয়া গিয়াছিল। তাহার মনের সম্বন্ধ অবিনাশের সহিত একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। অবিনাশ তাহা বুঝিয়াছিল, হয় ত লজ্জাবোধও করিয়াছিল, কিন্তু তবু স্বভাব, অভ্যাস সে দূর করিতে পারে নাই। লোভী বালক যেমন সন্দেশ দেখিলে সব ভুলিয়া হাত বাড়ায়, কোন শাসনেই তার স্বভাব শোধরায় না, অবিনাশ ছিল সেই প্রকৃতির। তাহার চরিত্রে অজস্র গুণ থাকিলেও এই একটি মাত্র মহৎ দোষ তাহার চরিত্রের ভিত্তিমূলকে শিথিল করিয়া দিয়াছিল। মাধবীকে সে শ্রদ্ধা করিত, তাহা মাধবী জানিত। কিন্তু কোনদিন সে ত্যাগের

যারা মাধবীর প্রেম অর্জ্জন করিতে চাহে নাই। সেইটাই মাধবীর প্রধান ক্ষোভ। তবু তাহারই দান, তাহার পুত্র-কন্যাগণ এবং তাহারই মধ্যে সর্ব্বোত্তম তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্ণকমল। মায়ের মনের প্রথম নিষ্কলুষ কামনার ধন সে। দীর্ঘাকার, কান্তিমান, বলিষ্ঠ, শিশুর মত সরল; বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে পরিণত, রত্নের মত উজ্জ্বল, গৌরব করিবার মত শ্রেষ্ঠ সন্তান তাহার! স্বর্ণকমলের পানে চাহিয়া সে মনে মনে অবিনাশকে ক্ষমা করিয়াছে। তাহাকে জীবনে মানিয়া লইয়াছে।

তাহার বাল্যের যে আশালতিকা সাগ্রহে অবিনাশের প্রেমকে অবলম্বন করিয়া উঠিতে চাহিয়াছিল এবং অবিনাশের উপেক্ষায় যাহা মর্দ্দিত ছিন্ন হইয়া ধূলিসাৎ হইয়াছিল, আজ তাহা নূতন প্রশাখা মেলিয়া সন্তানের মধ্যে সান্ত্বনা চাহিতেছে।

স্বর্ণকমলকে দেখিলেই তাহার মনে হয়—

"ইচ্ছা হ'য়ে ছিলি মনের মাঝারে।"

এগার

আষাঢ়ের প্রথম বর্ষণ-সিক্ত দিন। তাপদগ্ধা ধরণী সমস্ত দেহ দিয়া এই সান্ত্বনাবারি গ্রহণ করে। অসহ্য খরতর রৌদ্রতাপের পর যখন বর্ষা নামে, তখন বড় আনন্দের দিন মনে হয়। রৌদ্রকরোজ্জ্বল তীক্ষ্ণ উত্তাপ ভরা পিঙ্গল আকাশ ঘেরিয়া যখন নব-বর্ষার ঘন নীল মেঘ ছাইয়া আসে, ধূলা মলিনতা মুছিয়া লইয়া যখন বর্ষণ সুরু হয়, স্নিগ্ধ সজল বাতাসে দেহ, মন জুড়াইয়া দেয়, আনন্দে সারা শরীর, মন যেন উল্লসিত হইয়া ওঠে। কিন্তু শ্রাবণ ও ভাদ্রের বর্ষা যেন বিষণ্ণ ভারাক্রান্ত প্রহর। ঘন কৃষ্ণ মেঘে আকাশ ঢাকা, টিপ টিপ বৃষ্টি, মনকে যেন উদাস করিয়া দেয়। কি এক অনির্দ্দেশ্য ক্ষোভে মন চঞ্চল হইয়া ওঠে, কি নিরাশা যেন সমস্ত মনে পরিব্যাপ্ত হইয়া আক্ষেপ করিতে থাকে, কি যেন পাইবার ছিল, ইহ জীবনে তাহা পাওয়া গেল না।

স্বর্ণকমল বিলাত গিয়াছে, এক বৎসর ঘুরিয়া আসিতে চলিল। মাধবীর মন প্রথমে বড়ই অশান্ত হইয়াছিল। স্বর্ণকমল তাহার মাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। তার বিষণ্ণ গম্ভীর স্বল্পভাষী মায়ের অন্তরে কোন অজ্ঞাত ব্যথা লুকাইয়া আছে, তাহা সে বুঝিত—তাই মায়ের প্রতি তাহার ভালবাসার অন্ত ছিল না। ভালবাসা দিয়া সে মায়ের ব্যথা মুছিতে চাহিত। তাহার সকল আলোচনা মায়ের সহিত করিয়া সে তৃপ্তি পাইত। অধিকাংশ সময় সে মায়ের নিকটে থাকিত।

তাই প্রথমটা মাধবী তাহার অভাব অনুভব করিত খুবই। স্বর্ণকমল তাহার বাসস্থানের বিস্তৃত বিবরণ দিয়া মাকে, ভাইবোনদিগকে পত্র দিত। বিলাতে তোলা তাহার ফটো মাধবী পাইয়াছিল। আর বৎসরখানেক পরে মাধবী স্বর্ণকমলকে নিকটে পাইবে। প্রতি পত্রে স্বর্ণকমল লিখিত "মা, আর এই কয়টা মাস সবুর কর, তারপর তোমাদের কাছে ফিরে যাব। আর এই ক'টা মাস একটাও সিনেমা না দেখে কোনও আমোদ-প্রমোদে যোগ না দিয়ে যে রকম মেতেছি, তাতে সাফল্যলাভ সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমার প্রতিশ্রুতি মনে আছে তো? ফিরে গেলে ভাল ক'রে রেঁধে খাইয়ে মোটা ক'রে দেবে, আর অনেকগুলো লেটেষ্ট ষ্টাইলের সুট, আর ক্রিকেটের সরঞ্জাম।"

মাধবী পত্র পড়িয়া হাসিত ও তাহার অন্য পুত্রকন্যাদিগকে দেখাইত। তাহারা আনন্দে কলরব করিত। এইবার দাদা আই, সি, এস, হইয়া ফিরিবে। দাদা কাহার জন্য কি আনিবে সেই জল্পনা-কল্পনা চলিত তাহাদের প্রত্যহই।

অবিনাশ মাধবীকে বলিত, "তুমি ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের মা, তোমায় খাতির ক'রে চলতে হবে এবার।"

আনন্দপূর্ণ স্মিতহাস মাধবীর মুখে ফুটিয়া উঠিত।

অধীর ব্যগ্র প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত মাধবী,—আর এই কয়টা মাস। ধীরে ধীরে বর্ষার ক্লান্তিকর দিনগুলি শেষ হইয়া গেল। মা দুর্গাকে লালপাড় গরদ দিয়া শরৎকালে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া মাধবী তাহার একটিমাত্র কামনাই জানাইল। স্বর্ণ আমার সকল বিষয়ে সফল সুখী হক মা, যেন দুঃখের ছোঁয়া তার না লাগে।

স্বর্ণকমলের পত্র আসিল, "মা পূজায় আমার জন্য ভাল ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবী করে রেখো।"

কিন্তু নিদারুণ শীতের রাত্রি বহন করিয়া আনিল নিদারুণ দুঃসংবাদ। স্বর্ণকমল ইহজগতে নাই। হর্স ট্রেনিংএ এ্যাক্সিডেণ্ট হইয়া স্বর্ণকমল ব্যাক্‌বোনে দারুণ আঘাত পাইয়া হস্‌পিটালে যায় এবং একদিন অচেতন অবস্থায় থাকিয়া সেই দূর বিদেশে মাধবীর কোল ছাড়িয়া সে জন্মের মত চলিয়া গিয়াছে।

মুহূর্ত্তে গৃহ যেন স্তব্ধ পাথর হইয়া গেল। কোন পাশব শক্তি দানব আসিয়া যেন পৈশাচিক শক্তিবলে গৃহস্থদিগকে নীরব করিয়া দিল। গৃহের আনন্দময় প্রাণশক্তি নিঃশেষ হইয়া গেল একনিমেষে।

অন্ধকার হর্ম্যতলে উপবিষ্টা প্রস্তরীভূতা মাধবীর সম্মুখে অবিনাশ ও চতুঃপার্শ্বে পুত্রকন্যা আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত বাক্যহারা হইয়া বসিয়া রহিল। কি সান্ত্বনা তাহারা এই নির্ব্বাক্‌ শোকাচ্ছন্না নারীকে দিবে? আর বলিবার কিইবা অবশিষ্ট আছে?

মাধবী ভাবিত, এও সহ্য হইয়া যাইবে। যে কোনও দুঃখ, যে কোন শোক মানুষকে শেষ করিতে পারে না। আজ যে আঘাত অসহ, কাল সে আঘাত সহনীয় হইয়া যাইবে।

তাহা না হইলে মাধবী এখনও বাঁচিয়া আছে ? হে ভগবান, হলাহল মন্থন করিয়া যে সুধাপাত্র পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিলে, কোন্ পাপে আবার তাহা শূন্য হইয়া গেল ? একবার, একবার সেই সত্য বুঝাইয়া দাও, হে অদৃষ্টনিয়ামক অদৃশ্য বিধাতা।...

আবার মনে হয়,সেই সত্যই তো তাহাকে ভগবান তাহার হৃৎপিণ্ড নিঙড়াইয়া বুঝাইয়া দিলেন। এখনও কি বুঝিতে তাহার বাকী থাকা উচিত ? সে তো কলুষিত কামনাময় জগতের ধন নহে। তাহার প্রথম যৌবনের যে কামনা বিকশিত স্বর্ণকমল হইয়া তাহার জীবনের সকল অন্ধকার বিদূরিত করিয়া নির্ম্মল প্রভাত-আলোকের মতই ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সে আপনি আলোকিত হইয়া সৌরভ বিলাইয়া সকলকে সুখী করিয়া আপনি মিলাইয়া গেল।

এই যে সূর্য্যের সপ্তরশ্মিচ্ছটা, ইহা মানুষকে মুগ্ধ করে, তবে স্থায়ী হয় না। কেবল বর্ণচ্ছটায় সমগ্র ধরণীকে রাঙাইয়া দিয়া মাতাইয়া দিয়া যায়। সত্য, ইহা পরম সত্য। কেবল মাত্র জীবনে তাহার সত্য হইয়া রহিল এই মন্থন, সুখে-দুঃখে, আঘাতে-সংঘাতে জীবন-মন্থন।

বার

এইখান হইতে খাতার কয়টা পাতা শূন্য হইয়া রহিয়াছে। জীর্ণ, কীটদষ্ট, বিবর্ণ পাতা কয়টা।

অদ্রি চক্ষু মুছিয়া মুখ তুলিল। রিটায়ার্ড I.M.S. Officer I. N. Debএর বিশাল প্রাসাদসম অট্টালিকা রাত্রির ঘন অন্ধকারে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ত্রিতলের আপনার পাঠকক্ষে বসিয়া I. N. Deb এর দ্বিতীয় পুত্রের প্রথমা কন্যা অদ্রি দেবী সিক্সথইয়ারের ছাত্রী পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্ত্তে এই পুরাতন খাতাখানি পড়িতেছিল। আজ ছয়দিন হইল তাহার স্নেহময়ী পিতামহী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার শয়নকক্ষ হইতে তাঁহার পালঙ্কের সর্ব্বনিম্ন গদির তলা হইতে অদ্রি এই খাতাখানি পাইয়াছে। ভৃত্যগণ ঘর ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিবার সময় ইহা পাইয়াছিল।

শোকসন্তপ্ত ঠাকুরদাদাকে সান্ত্বনা দিতে, পিতা মাতা পরিজনকে দেখিতে, বিশৃঙ্খল সংসারের মাঝখানে এ কয়দিন শোকাভিভূতা অদ্রি খাতাখানি দেখিতে সময় পায় নাই। ঠাকুর্মা তাহার চলিয়া গিয়াছেন ; ঠাকুমা তাহাদের হাস্যাধরা, প্রফুল্লাননা, শ্রীমতী অনিন্দিতা দেবী। রক্ত বেনারসী পরিহিতা, পুষ্প-চন্দনে সুশোভিতা সৌম্যমূর্ত্তি প্রসন্নবদনা সহস্র লোকের শোভাযাত্রা জয়ধ্বনি মাঝে চিরদিনের মত এই সেদিন চলিয়া গেলেন।

শোকসন্তপ্ত স্বামী, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, পৌত্রী, পৌত্র, দৌহিত্রী, দৌহিত্র ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া শোকাশ্রুতে তাঁহার যাত্রাপথ নিষ্কল করিয়া দিয়াছে। সে আননে—এতটুকু বিষাদ এতটুকু অতৃপ্তি তো ফুটিয়া ছিল না ! রাজ-সমারোহে রাণীর মতই তো তিনি চলিয়া গেলেন ! তবে ?

তবে এই মাধবী কে ?

সমাপ্ত।

বিয়োগান্ত

রমেন্দ্রনাথ মৈত্র
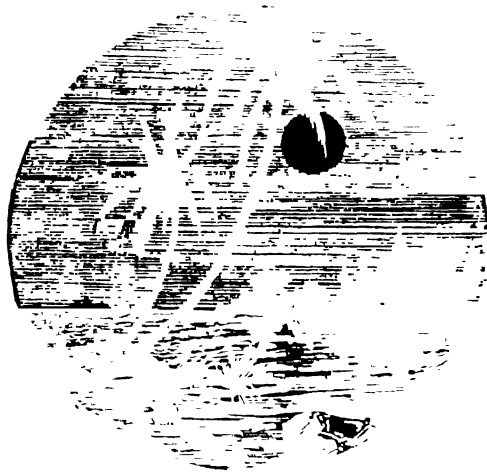
তরুবালা মরিতে যাইতেছে। ঘরে বসিয়া তাহাই দেখিতেছি। সে কিন্তু আমায় দেখিতে পায় নাই। আমিই কেবল তাহাকে দেখিতে পাইতেছি। তাহার ঘরে আলো জ্বলিতেছে। আমার ঘর অন্ধকার। আমার দিকের জানালাটা তাহার ঘরের শুধু খোলা, অন্য সব জানালা ও দরজা বন্ধ। আমার দিকের খোলা জানালাটার নিকট আসিয়া তরুবালা দাঁড়াইল। আকাশটা জ্যোৎস্নামুখরিত। রাত্রে বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। তরুবালা অনেকক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। তারপর ঘরের ভিতর চেয়ারটাতে বসিয়া কাগজ কলম লইয়া কি লিখিতে বসিল। বোধ হয় একখানি চিঠি। সে লিখিয়া চলিল এবং আমি বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতে লাগিলাম।

তরুবালা কেন যে মরিতে যাইতেছে তাহা জানি। কারণ তাহার অতি বাল্যকাল হইতে তাহাকে আমি দেখিয়া আসিয়াছি। চোখের উপর দেখিলাম—ফ্রক পরিয়া যে তরুবালা ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত, একদিন সে বড় হইল, স্কুলে পড়িতে গেল, সহসা একদিন দেখিলাম স্কুল ছাড়িয়া তরুবালা ঘর-সংসারের কাজে মন দিয়াছে এবং তাহাতে সমস্ত দিনই সে ব্যস্ত। বিমাতার নির্য্যাতন ও অপমান নীরবে সহ্য করিয়া অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া সংসারের সহিত তরুবালার প্রথম পরিচয়। তাহাকে কতদিন উল্লাসে উল্লসিত দেখিয়াছি, আর কতদিন লাঞ্ছনায় নিপীড়িত হইতে দেখিয়াছি। আজ জীবনের ক্লেদ ও গ্লানির বোঝা লাঘব করিবার জন্যই বোধ হয় তরুবালা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া মরিতে চলিয়াছে। আজ বাড়ীতে কেহ নাই। বিমাতা কোথায় গিয়াছেন। তরুবালাও যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে যাইতে দেওয়া হয় নাই। তরুবালার আজ মরিবার অপূর্ব্ব সুযোগ মিলিয়াছে। বিমাতা গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিবে তরুবালা গলায় দড়ি লাগাইয়া ঘরের মধ্যে ঝুলিতেছে। কিন্তু সে কি ভাবিয়া দেখিয়াছে, অন্ধকার হইতে আর একজন লোকও তাহার সমস্ত গতিবিধি অনেকক্ষণ ধরিয়াই নিরীক্ষণ করিতেছে। গলায় দড়ি দিয়া মরিলেই হইল। উদ্ধার করিতে কতক্ষণ! তারপর পুলিশের কাছে···। তখন? যাক্ গে, তরুবালা কি করে শেষ পর্য্যন্ত দেখিব, তারপর নিতান্তই যদি দুর্গা বলিয়া ঝুলিয়া পড়ে, তখন না হয়—।

সহসা দেখিলাম, লেখা কাগজখানি হাতে লইয়া তরুবালা জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সে কাঁদিতেছে। স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া সে কাঁদিতেছে। বিপুল বেগে হাসি ও কাসি আসিল। দুইটাকেই সামলাইলাম। তরুবালা টের পায় নাই। পাইলে তাহার মরিবার সকল চেষ্টা বিফল হইত। এতখানি উৎসাহ লইয়া সে যদি মরিতে চাহে তাহা হইলে তাহাকে মরিতে দিব। তারপর উদ্ধার করিয়া তাহাকে শাসাইব। পৃথিবীতে মরিয়া যাওয়াটা আশ্চর্য্য নয়, বাঁচিয়া থাকিতে পারাই আশ্চর্য্য। পরন্তু তোমার বিবাহ, আর তুমি আত্মহত্যা করতে যাইতেছ? তোমার লজ্জা নাই, পাপপুণ্যের ভয় নাই, এমন কি পুলিশের ভয় নাই? ভাবী স্বামীর না হয় বয়সই হইয়াছে, তাই বলিয়া মরিবে কোন দুঃখে। যাট্ বৎসর বয়স এমন কিছু বেশী নয়। তা'ছাড়া বিমাতার এরূপ কদর্য্য আশ্রয় ছাড়িয়া যাট বৎসর বয়স্ক স্বামীর সহিত তাহার গৃহে যাওয়া তো অনেক ভাল।

কিন্তু তরুবালা এ-কি করিতেছে। টেবিলের উপর চেয়ার তুলিয়া তাহার উপরে সে দাঁড়াইল তারপর একখানি কাপড় কেমন করিয়া কড়িকাঠের সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিল। আলোটা জ্বলিতেছে। তরুবালা চেয়ার ও টেবিল হইতে নামিল এবং চেয়ারটাকে নামাইয়া লেখা কাগজখানি তাহার উপর চাপা দিয়া রাখিল। তারপর টেবিলের উপর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। রুদ্ধনিঃশ্বাসে দেখিয়া চলিয়াছি। একবার গলায় কাপড় বাঁধিয়া ঝুলিলে হয়। কিন্তু ঝুলিয়া পড়িল না, দাঁড়াইয়া রহিল।

কোন বাড়ী হইতে কে যেন করুণস্বরে বেহালা বাজাইতেছিল। ভারী সকরুণ সুর। তরুবালা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বোধ হয় তাহাই শুনিতে লাগিল। এক সময়ে সে কাপড়খানির ফাঁস করিয়া গলায় পরাইয়া দিল।···মাথা ঘুরিতেছে। কাপড় গুটাইয়া, কোটের বোতাম আঁটিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি।

তরুবালা ঝুলিয়া পড়িল। উঃ বীভৎস!

একবারে বাহিরের ফুটপাথের উপর আসিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু তরুবালাকে উদ্ধার করিবার জন্যও নহে কিংবা লোক ডাকিবার জন্যও নহে। ট্রাম ধরিবার জন্য—।

পিছনে চাহিয়া দেখিলাম তখনও সিনেমাগৃহ হইতে লোক বাহির হইতেছে। বইখানি মন্দ নয়।

মুখোস

কুমারী অলকা মুখোপাধ্যায়

(একাঙ্কিকা)

[সভ্যতার বাইরে সহর থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত ছোট্ট মাইন-টাউন। এখানে আছে কুলীর বস্তী ; কয়েকটা ছোট ছোট বাংলো, আর মিলের চোঙা।

এখানে লোকালয়ের কোলাহল নেই ; যন্ত্রের একটানা শব্দ...

আজ দ্বিতীয়া। সূর্য্য অস্ত গেছে অনেকক্ষণ। চাঁদ ওঠে নি। ছোট্ট একটি বাংলোর ঘরে বসে আছে দুটি প্রাণী—পুরুষ ও নারী, যতিন ও অনিতা। যতিনের মুখখানা কালো একটি মুখোসে ঢাকা। তাতে দুটি মাত্র ছিদ্র ; একটি মুখ ও নাকের জন্যে, অন্যটি ডান চোখের জন্যে।

যতিন আনমনা,...অন্যমনস্ক, চিন্তায় ভারাক্রান্ত।

জানলা দিয়ে দেখা যায় অন্ধকার আকাশ আর অসংখ্য তারা...আর দেখা যায় অদূরে মিলের চিমনি। জানলার চৌকাঠ ধরে অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনিতা।

দু'জনের গাম্ভীর্য্যে ঘরখানা থমথমে। রাত্রি বেড়ে চলেছে...

নিস্তব্ধতার বুক চিরে বেজে উঠল মিলের হুইসিল্...]।

অনিতা। আজ তুমি কিছু খেলে না ?

যতিন। না, ক্ষিদে নেই...

[আবার নিস্তব্ধতা]

অনিতা। তোমার যাবার সময় হ'ল...মিলের হুইসিল্ বেজে গেছে।

যতিন। শুনেছি...

অনিতা। অন্ধকার ক্রমেই বেড়ে উঠছে...বেশী দেরী করলে অন্ধকারে পথ চিনে যেতে কষ্ট হবে। অন্ধকারে তোমার দৃষ্টি...

যতিন। বাঁ চোখ আমার নেই ; কিন্তু তা ব'লে দৃষ্টি-শক্তি আমার দুর্ব্বল নয়।...অনেকে দু' চোখে যা দেখতে পায়, এক চোখে আমি তার চেয়ে অনেক ভাল দেখতে পাই!

অনিতা। তা জানি! অদ্ভুত তোমার ক্ষমতা...চোখ গিয়ে তোমার যেন কিছুই যায় নি। [থেমে] তোমার কি বড্ড দেরী হবে ফিরতে ?

যতিন। হয় ত'।

অনিতা। ডাক্তারের কাছে যাবে ?

যতিন। হ্যাঁ, আগে ডাক্তারের কাছে গিয়ে চোখটা পরীক্ষা করাব।

অনিতা। শুনেছি ডাক্তারবাবু না কি খুব নামকরা লোক!

যতিন। হওয়া ত' উচিত ; তা না হ'লে আমার দৃষ্টি আর আমি ফিরে পাব না।...[মুখোসটা তুলে]...এই নাও অনিতা...[বলতে বলতে অনিতার কাছে সরে গিয়ে]... আমি মুখোসটা তুলে ধরলাম, শেষবারের মতন দেখে নাও... আর হয়ত আমার এই চেহারা দেখবার সুযোগ নাও হতে পারে...হয়ত' এই শেষ।

অনিতা। [ভয়ে সরে গেল চাৎকার করে]...তুলো না, তুলো না তোমার ঐ মুখোস!—আমার ভয় করে।

যতিন। [কর্কশভাবে হেসে উঠল] তোমার স্বামীর মুখের দিকে চাইতেও তোমার ভয় করে...না!...[তার কর্কশ হাসি থামতেই চায় না...প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ফিরে আসে...]...আমার সঙ্গে বিয়ে যে তোমার পক্ষে কত বড় অভিশাপ—তা আজ বুঝতে পারছি।...তুমি চেয়েছিলে সুপুরুষ স্বামী ; কিন্তু আমার এই দুর্ঘটনা...

অনিতা। আর ঐ দুর্ঘটনার কথা তুলো না।

যতিন। তোমার দুর্ভাগ্যের কথাই ভাবছি।...কিন্তু তুমি যাই বল অনিতা, বিয়ের সময় আমার চেহারা খুব সুন্দর ছিল...অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলাম।—হ্যাঁ, সত্যি, আমি তোমায় চেয়েছিলাম...জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে। আমি তোমায় কামনা করেছিলাম ; মনে ছিল আশা, গর্ব্ব ছিল, সুপুরুষ আমি তোমার মতন সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে ঘর বাঁধব!...প্রদীপ তোমায় ভালবাসত'...তার কাছ থেকে আমি তোমায় ছিনিয়ে নিয়েছিলাম...বিধাতা তখন অলক্ষ্যে হেসেছিলেন... আজ যদি প্রদীপের...

অনিতা। প্রদীপের কথা কেন ?...তার সঙ্গে আমাদের বিয়ের কি সম্বন্ধ ?

যতিন। আমি কি জানি না অনিতা, যে সে তোমায় ভালবাসত'—আর তুমিও তাকে ভালবাসতে...

অনিতা। থাক প্রদীপের কথা...

যতিন। হ্যাঁ, থাক প্রদীপের কথা...প্রদীপ...প্রদীপ ...[হেসে উঠল]।

অনিতা। তোমার আজ কি হয়েছে ? অমন করছ' কেন ? [থেমে কথা ঘোরাবার জন্যে] আচ্ছা ডাক্তার তোমায় ভাল ক'রে দিতে পারবে না ?

যতিন। হ্যাঁ,, যাতে কাজ করতে পারি সে ব্যবস্থা নিশ্চয় ক'রে দেবে!

অনিতা। কাজ!...কাজ ছাড়া কি তুমি কিছু জান না ?

যতিন। তা'ছাড়া জীবনে আর কি আছে ?

অনিতা। আমি তা জানি যতিন ; তাই মাঝে মাঝে ভাবি তুমি আমায় কেন বিয়ে করেছিলে ? স্ত্রীর তোমার কি প্রয়োজন ছিল ? তোমার কাজকেই ত' তুমি বিয়ে করেছ! ...কাজই ত' তোমার জীবনে সব।

যতিন। হ্যাঁ, কাজই আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। আমি যখন Glasgow থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে ফিরলাম, তখন আমার একমাত্র চিন্তা ছিল কাজ। কি করে পৃথিবীর বুক চিরে বের করব ঐশ্বর্য্য...কয়লা, সোনা,

টিন, মাইকা···ওঃ সেদিন সেই রাত্রে আমি প্রায় বের করে ফেলেছিলাম আর কি।

অনিতা। কবে, সেই দুর্ঘটনার রাত্রে?···

যতিন। [আত্মহারা হয়ে]···হ্যাঁ, সেই ভীষণ রাত্রে···আজকে মনে পড়ে যায়, ম্যানেজারকে বলে আমি নেবে গেলাম নিচে···আশা ছিল আমি এমন খনি আবিষ্কার করব যাতে মাইকা পাওয়া যাবে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে।···আর কাজ···সেই খনিতে আমি হাজার হাজার লোককে দেব কাজ···হাজার হাজার লোকের হবে অন্নসংস্থান। হাজার হাজার বছরের স্তূপীকৃত ঐশ্বর্য্য আমার পরশ পেয়ে আবার প্রাণ পাবে, মাটির বুক থেকে তারা বেরিয়ে আসবে পৃথিবীর উপকারে—লোক অন্ন পাবে, অর্থ পাবে, আর আমি পাব কাজ;···কাজ, কাজ শুধু কাজ···[হঠাৎ থেমে, একটু পরে···] ···যাক্ সব শেষ হয়ে গেছে···সব শেষ।···এবার সমস্ত জীবন আমি আমার স্ত্রীর পাশে বসে থাকব···শুধু তোমার দিকে চেয়ে, কি বল অনিতা?···হয়ত' সমস্ত জীবন আমায় কাটাতে হবে এই মুখোস পরে···তাতে কি হ'য়েছে! তবু আমি দেখতে পাব' ত' আমার আছে এক অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রী···সমস্ত বাংলা দেশে যার দোসর নেই! আমার কাজকে তুমি ঘৃণা করতে, এবার নিশ্চয় তুমি খুসী হয়েছ! [অনিতার কাছে যেতে যেতে]···আবার তুমি আমায় তেমনি করে ভালবাসবে, না অনিতা?···[অনিতা সরে গেল: যতিন হেসে উঠল] ও কি, ভয় পেয়ে স'রে গেলে কেন?···

অনিতা। না না, ভয় নয়!

যতিন। [আবার আপন মনে] সবাই বলবে তোমার মতন স্ত্রী আর হয় না! তুমি তোমার স্বামীর সেবা কর···তোমার অন্ধ স্বামীকে তুমি আলো দাও! আমার আজও মনে আছে সেই রাত্রির কথা। মাটির নিচে দুর্ঘটনায় আমি চোখ হারালাম আর হারালাম জ্ঞান; তারপর মাসের পর মাস বিছানায় শুয়ে রইলাম অবোধ জ্ঞানহীন শিশুর মতন! প্রতি মুহূর্ত্তে ডাক্তার আশঙ্কা করল আমার মৃত্যুর···তুমি আমার পাশে রইলে···দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। ঘুম নেই, খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই···শুধু আমিই ছিলাম তোমার একমাত্র চিন্তা—আমি যতিন, তোমার স্বামী···সত্যি অনিতা, কি সেবাটাই না তুমি করলে!

অনিতা। ও কথা যাক!

যতিন। থাক্ কেন? যদি মরে যেতাম তা'হ'লে ত' এত' কথা বলতেই পারতাম না!—আচ্ছা অনিতা, তুমি নিশ্চয় ভাবতেও পার নি যে, আবার আমি বেঁচে উঠব, আবার তোমার সঙ্গে কথা বলব···

অনিতা। তোমার যাবার সময় হ'য়েছে!

যতিন। জানি, মনে আছে···তুমি যেন আমায় তাড়াতে পারলেই বেঁচে যাও! একলা ভয় করবে না ত'?

অনিতা। ভয়?···ভয় কেন?

যতিন। আজকের রাতটা যেন বেশী অন্ধকার, নিশাচর পাখীরা আজ যেন বেশী করে চীৎকার করছে; ওদের শব্দে মনে হচ্চে—যেন হাজার বছরের বিক্ষুব্ধ আত্মা গুমরে গুমরে কাঁদছে। আজ কোথায় যেন অশুভ একটা কিছু গোপন ষড়যন্ত্র চলছে···আর তাছাড়া এমনি করে রাত্রে একলা ত' তুমি কখনও থাক' নি···চাকরগুলোও আজই গেল!

অনিতা। খনিরমেশিন ঘরে সাবধানে যেও, আমার ভয়ানক ভয় করে ঐ হতভাগা জায়গাটা!

যতিন। [হেসে] হ্যাঁ, ভয় করবারই কথা! ঐ মেশিনের তলায় একবার যদি কেউ পড়ে তা'হলে তার চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না!···হ্যাঁ, আমি সাবধানেই থাকব!...সত্যি কথা বলতে কি, ওর ভেতর কত লোক যে প্রাণ দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই! কেউ কাজ করতে করতে পড়ে গেছে ···কেউ আত্মহত্যা করেছে...আর কাউকে খুন করা হ'য়েছে···কারো চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি!...যাক্ গে, ওসব কথা···আমি চলি, তুমি সাবধানে থেক!

অনিতা। ফিরে জোরে কড়া নেড়', নইলে, আমি ঘুমিয়ে থাকব, হয়ত' শুনতেই পাব' না!

যতিন। [অনিতার মুখের দিকে একবার ভাল ক'রে চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল, যাবার সময় বলে গেল] আচ্ছা!

[যতিন চলে গেল।···অনিতা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। কিছুক্ষণ ও জানলা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। যতিনের চলে যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে··· উদ্‌গ্রীব হ'য়ে কি যেন দেখল। তারপর, সরে এসে কি যেন ভাবল, তারপর সাদা শাড়ী বদলে পরে এল' কাল একটা শাড়ী···

অন্ধকার, তমসাবৃত রাত্রি। নীরবতা যেন নিষ্ঠুরভাবে নীড় রচনা করেছে রাত্রের বুকের ওপর···

এই নিস্তব্ধতা, বিদীর্ণ ক'রে কার যেন শীষ্ বেজে উঠল...প্রথমে মনে হয়—যেন কোন নিশাচর পাখীর হৃদয়-মথিত কান্না—কিন্তু দ্বিতীয় বারেই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, ওর সাঙ্কেতিক মূল্য—অনিতা টেবিল ছেড়ে জানলার ধারে ছুটে যায়···উদ্‌গ্রীব হ'য়ে শোনে...বিফল হ'য়ে আবার ফিরে আসে চেয়ারে!···আবার সঙ্কেত; এবার শিষ্ নয়, দরজায় মৃদু আঘাত···অনিতা চমকে দাঁড়িয়ে ওঠে!...]

অনিতা। কে?···

[সরে যায় দরজার ধারে; দরজার ওপর কান দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়ায়···]

[জানালায় কার যেন ছায়ামূর্ত্তি উঁকি মেরে স'রে গেল...]

[অনিতা জানলার ধারে এসে দাঁড়াল: দরজায় আবার মৃদু আঘাত... প্রথমবারের চেয়ে এবার একটু জোরে...নেপথ্যে কে যেন চাপা গলায় ডাকল...]

অনিতা!···অনিতা···অনিতা!···

অনিতা। কে?

প্রদীপ। আমি প্রদীপ···দরজা খোল!···

অনিতা। দাঁড়াও।···

[দরজা খুলে দিল ; কেউ নেই দরজায়···অনিতা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল। বাইরে পৈশাচিক অন্ধকার। প্রদীপ জানলা টপকে চুপি চুপি এসে অনিতার চোখ টিপে ধরল···অনিতা ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠল। প্রদীপ উঠল সমতালে হেসে]

প্রদীপ। ভয় পেলে অনিতা ?

অনিতা। সত্যি, তুমি ভয়ানক দুষ্টু,···আমার বুকটা এখনও ধড়ফড় করছে···প্রথমে ভেবেছিলাম যতিনই বুঝি ফিরে এল'। তুমি কোনদিন আমায় বিপদে ফেলতে··· কেন এমন পাগলামি কর, বল' ত'···সে হয় ত' এখনও বাড়ীর গেট্ পার হয় নি !

প্রদীপ। আমি জানলার তলায় শিউলি ঝাড়ের আড়ালে বসেছিলাম। স্পষ্ট দেখলাম যতিন গেট্ খুলে চলে গেল···এস' অনিতা, অত দূরে দাঁড়িয়ে কেন ? ব্যবধান ত' আছেই জীবনে, মিলনের ক্ষণ-বসন্তকে এড়িয়ে যাও কেন ?

অনিতা। অত ব্যস্ত কেন ?···তোমার জন্যে একটা সুন্দর জিনিষ রেখেছি···

প্রদীপ। ভোলাতে চাও ? নিজেকে ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ভোলাতে পারবে না !···[উঠে এল' ; অনিতার ঠিক পাশটিতে দাঁড়িয়ে বললে···] বাঃ, চমৎকার মানিয়েছে তোমায়। যেন কৃষ্ণ অমাবস্যার মূর্ত্তিমতী অন্ধকার ! ওপর থেকে কাল' আকাশ যেন মাটির বুকের ওপর নেমে এসেছে !

অনিতা। তাই নাকি ?·· তোমার খালি ঠাট্টা !

[দু'জনে পাশাপাশি সোফায় বসে পড়ল]

প্রদীপ। তাই ত' তোমার মনে হবে ! চাঁদ যখন আকাশে ওঠে, তখন সে ভাবতেও পারে না, মাটির বুকের ওপর হাজার হাজার কবি তারই পানে চেয়ে আকণ্ঠ অমৃত পান করছে, আর কবিত্বের সরোবরে ডুব-সাঁতার দিয়ে জগৎ জোড়া নাম কিনছে ! Skylarkকে উদ্দেশ্য ক'রে Shelly যখন কবিতা লিখেছিল, তখন আকাশের বুকের ওপর দিয়ে স্বাধীনভাবে উড়ে যাওয়া ঐ পাখী কি একবারও ভেবেছিল যে সে নিজে কত সুন্দর !

অনিতা। থামলে কেন ? আরও বল !

প্রদীপ। আর বল্‌বার ক্ষমতা যদি থাকৃত তা' হ'লে ত' নিবারণ চক্রবর্ত্তী হ'য়ে বাংলার বুকে কবি আর কামিনীর কেলি জুড়ে দিতাম। যাক গে, তারপর অনি, আজকে ওরকম কাল পোষাক কেন ?—কালোটা বিলিতী মতে অশুভ চিহ্ন !

অনিতা। আজ আমার বিবাহ-বার্ষিকী ; চার বছর আগে ঠিক এই দিনটিতে আমার বিয়ে হ'য়েছিল।

প্রদীপ। আজ ত' তা' হ'লে সাদা পোষাক পরা উচিত ছিল !

অনিতা। উচিত ছিল, যদি বিবাহ-বার্ষিকীটা বিবাহ-বার্ষিকীর মতন আসত,···আজ আমার বিবাহের মৃত্যু-বার্ষিকী ! তাই আজ শুভ্র চন্দ্রালোকিত রাত্রির মতন সাদা নয় ; অমাবস্যার ঘন অন্ধকারের মতন কালো ! দাঁড়াও, পর্দ্দাটা টেনে দি···

[অনিতা জানলার পর্দ্দাটা টেনে দিল : প্রদীপ পকেট থেকে মদের বোতল বের করে এক ঢোক খেয়ে নিল—]

অনিতা। ও কি ?

প্রদীপ। কিছু না, ওষুধ। শরীরটা আজ খারাপ, মন চঞ্চল। এ রকম পৈশাচিক রাত্রে সমস্ত পৃথিবীর অবস্থাই বোধ হয় এ রকম হয় !

অনিতা। হ্যাঁ, আকাশটাও যেন পুত্রহারা জননীর দৃষ্টির মতন থম্‌থমে !

প্রদীপ। যতিন কখন ফিরবে ?

অনিতা। জানি না।

প্রদীপ। আজ অনেক দিন পর প্রথম কাজে গেল, না ! ও যেন কি রকম হ'য়ে গেছে আজকাল !

অনিতা। হ্যাঁ, পৈশাচিক, নিষ্ঠুর !···প্রদীপ···

প্রদীপ। কি নিতা ?

অনিতা। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে, হেসে] না, থাক্, কিছু নয়।

প্রদীপ। বল, নিতা··

অনিতা। [চঞ্চল হ'য়ে উঠল : নিজেকে যেন সাম্‌লাতে পারল না] প্রদীপ, আমি···আমি হয় ত' পাগল হ'য়ে যাব··· ওর ঐ মুখোস, ঐ মুখোস আমার অসহ্য ; দিনের পর দিন, রাতের পর রাত···

প্রদীপ। কিন্তু ঐ মুখোসের তলায় যে আরও বীভৎস দৃশ্য···আরও ভয়ঙ্কর···

অনিতা। হ্যাঁ, জানি···সে দৃশ্য দেখার মতন ক্ষমতাও আমার নেই···একদিন, এমনি এক অন্ধকার রাত্রে, যতিন অঘোরে ঘুমোচ্ছিল, আমি জেগেছিলাম, অপলক···অন্ধকারে মনে হ'ল ঐ মুখোসটা যেন আমায় গ্রাস করতে চায়···যেন পৈশাচিক এক রূপ নিয়ে ও আমার দিকে ক্রমেই এগিয়ে আসছে···ধীরে ধীরে একটা বিরাটকায় দৈত্যের মতন ! আমি চীৎকার করে ওর মুখের ওপর থেকে মুখোসটা তুলে ফেল্‌লাম ; কিন্তু সে দৃশ্য যেন আরও ভয়ঙ্কর—আরও পৈশাচিক ! আমি পারলাম না থাকতে, ও-ঘর ছেড়ে নিচে নেমে এলাম !···[একটু থেমে আবার বলে চলে]

আর একদিনের কথা মনে আছে। যতিন বাগানে কাজ করছিল। হঠাৎ হাওয়া উঠল, বাতাস সজোরে এসে পড়ল যতিনের মুখের ওপর···সমস্ত মুখোসটা যেন যতিনকে আঁকড়ে ধরল···দূর থেকে মনে হ'ল মুখ ত' নয়, যেন কাল কঙ্কাল।

প্রদীপ। নিতা, চুপ কর।

অনিতা। তুমি কি বুঝবে প্রদীপ···দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আমায় দেখতে হবে ঐ মুখোস···ভয়ে চীৎকার করতে পারব না। সেবা করতে হবে···ঐ মুখোসের দিকে চেয়ে আমায় হাসতে হবে···ভালবাসতে হবে, যত্ন করতে হবে; কারণ আমি স্ত্রী···আমার কর্ত্তব্য···

প্রদীপ। নিস্তার পাবার কি কোন উপায় নেই নিতা?

অনিতা। [আপন মনে বলে চলে] তার জন্যে দুঃখ করিনে· মমতা হয় না, সে ভয়ানক শক্ত; অদ্ভুত তার সহ্য করবার ক্ষমতা।···আমার ভয় করে···ভয়ানক ভয় করে! ···এক এক-সময় সে যখন তার ঐ বীভৎস মুখ নিয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকে, তখন ভয়ে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে···মনে হয় যেন পাথর হয়ে গেছি·· আমি ওকে তখন ঘৃণা করতে আরম্ভ করি! আগে ও কাজের মধ্যে আমায় ভুলে থাকত', তখন ভাবতাম ও আমায় অবহেলা করে··· আমি নির্জ্জনে কাঁদতাম ওকে এক মুহূর্ত্ত কাছে পাবার জন্যে ···এখন ও কাজ হারিয়ে আমায় আশ্রয় করেছে···কিন্তু আমি ওকে করি ঘৃণা!

প্রদীপ। আর আমায়?···আমায় নিতা?

অনিতা। তুমি ত' কোনদিন সে-কথা জানতে চাও নি।

প্রদীপ। আমি তোমায় চিরদিন ভালবাসি।

অনিতা। এ-কথা ত' আগে আমায় কোনদিন বল নি!···যখন বললে, তখন সব শেষ হয়ে গেছে।

প্রদীপ। আমি সুযোগের অপেক্ষা করছিলাম···

অনিতা। অপেক্ষা করছিলে?···আর সে এসে আমায় ছিনিয়ে নিয়ে গেল! আমার মনে আছে বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম মাইন দেখতে। মেশিন-রুমের কাছে যখন এলাম তখন সন্ধ্যা নেমেছে দিকে দিকে। যতিন তখন সবে ফিরেছে বিলেত থেকে! মেশিন-রুমের উপর দাঁড়িয়েছিল! সন্ধ্যার গোধুলি-লগ্নে ঘন নীল আকাশের তলায় ওকে মনে হ'ল যেন স্বপ্নলোকের হীরককুমার···আমি মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে রইলাম···

প্রদীপ। তারপর?

অনিতা। তারপর কি? কার কথা বলব?···ওর, না আমার?···ও আমার দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়াল, ওর নির্ব্বাক্ দৃষ্টি যেন বললে একটি মাত্র কথা, "পেয়েছি।"

প্রদীপ। তার পর?

অনিতা। তারপর থেকে প্রায়ই ও আসত' আমাদের বাড়ী···কত গল্প করত'।

প্রদীপ। তুমি ওকে ভালবাসতে?

অনিতা। হয়ত'···হয়ত' সে চাইত যে, আমি ওকে ভালবাসি...প্রাণ দিয়ে···

প্রদীপ। সে তোমার জন্যে পাগল হ'য়ে ওঠেনি? বিয়ে করতে চায়নি?

অনিতা। হ্যাঁ, একদিন বাবাকে বলে বাবার মত নিলে; সে চেয়েছিল তার অন্যান্য সৌখীন সম্পত্তির মতন আমাকেও নিজস্ব করে নিতে।

প্রদীপ। তুমি বিয়েতে রাজী হ'লে কেন?

অনিতা। কিসের জোরে আমি অস্বীকার করতাম··· তুমি ত' তখন আসামের জঙ্গলে···

প্রদীপ। ভেবেছিলাম চাকরি নিয়েই আবার ফিরে আসব···বনে বনে যখন কাজ করতাম, তখন ভাবতাম তোমারই কথা। প্রতিমুহূর্ত্তে মনে হ'ত তুমি যেন আমারই পাশে দাঁড়িয়ে···কল্পনায় তোমার সঙ্গে কথা বলতাম। গাছের ঝ'রে পড়া পাতার শব্দে মনে হত—যেন তুমি আমায় ডাকছ···ধীরে অতি সন্তর্পণে আমার কানের কাছে মুখটি এনে···তুমি যেন চাপা দীর্ঘনিশ্বাসের অন্তরালে ডাকছ···

অনিতা। প্রদীপ···প্রদীপ···আমি আজও তোমায় তেমনি ভাবে ডাকি···আজও আমি তোমায় তেমনি করে ডাকি···তুমি, তুমি আমার জীবনে ফিরে এস।

প্রদীপ। আবার আসব···নিতা, তোমার জীবনের স্রোতে আমি আবার ভাসব···অনাদি অনন্তকাল পর্য্যন্ত, আচ্ছা নিতা, তোমার সেদিনের কথা মনে আছে?—যেদিন খনিতে দুর্ঘটনা ঘটে।

অনিতা। চিরদিন মনে থাকবে!

প্রদীপ। আমি সেদিন প্রথম ফিরলাম আসাম থেকে, ছুটিতে···তোমার বিবাহিত জীবনের অবহেলার কথা শুনতে শুনতে হেঁটে আসছিলাম ধান-ক্ষেতের ওপর দিয়ে···আকাশে তারার দল ছিল নির্ব্বাক চেয়ে, হঠাৎ গগনভেদী শব্দ হ'ল, খনির দুর্ঘটনা, আমার মনে হল—বুঝি আমাদের মাথার ওপর বাজ পড়ল···মনে হয়ত' ছিল পাপ।

অনিতা। পাপ কেন?

প্রদীপ। পরের স্ত্রীকে নিয়ে নির্জ্জন রাত্রে প্রান্তর ভেদ করে অনন্তের পানে ছুটে যাওয়া পাপ বলেই আমি জানতাম।

অনিতা। আর আজ?—আজও ত' আমি পরস্ত্রী!

প্রদীপ। কিন্তু আজ তা পাপ নয়—অন্যায় নয়, আজ আয়োজন নয়—আজ আমাদের প্রয়োজন। আজ ভালবাসার প্রবল স্রোতে আমরা ভেসে যাব···

অনিতা। আমিও, আমিও তাই চাই···আমি চাই আমায় কেউ ভালবাসুক। ঘৃণায় আমি স্বামীকে হারিয়েছি, কিন্তু সেই সঙ্গে হারাতে পারিনি আমার নারীত্বকে···

প্রদীপ। শুধু কি তাই আমায় চাও?

অনিতা। না না, প্রদীপ—সমস্ত জীবন আমি তোমায় চেয়েছি···কে?

[বাতাসে পর্দ্দাটা দুলে উঠল...কিন্তু বাতাস নয়···একটা কাল' মুখোসের একটা অংশ ··চকিতের জন্যে উদিত হ'য়েই সরে গেল...]

প্রদীপ। [হেসে] ভয় পেলে অনিতা? বাতাসে পর্দাটা নড়ছে—একি নিতা, তুমি যে কাঁপছ! এত ভয়? ভয় কিসের?

অনিতা। তুমি কি বুঝবে প্রদীপ! [কথাটা ঘোরাবার জন্যেই হাসতে হাসতে আবার বললে] আমরা কী ভীতু… আমার হঠাৎ মনে হ'ল যতিন ফিরে এসেছে! তোমারও নিশ্চয় ভয় করছে?

প্রদীপ। কেন, আমার ভয় করবে কেন?

অনিতা। তার স্ত্রীকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছ—অথচ তার কথা ভেবে তোমার মন চঞ্চল হবে না, আমায় বিশ্বাস করতে বল? যতিন হয় ত' জানে যে, তুমি এখানে প্রায়ই আস!

প্রদীপ। জানুক, জানুক সে—জানুক সে যে তুমি তাকে আন্তরিক ঘৃণা কর—আর এও জানুক যে আমি তোমায় ভালবাসি। নিতা, বল বল, আজ থেকে তুমি আমার? বল…

অনিতা। প্রদীপ, আমি, আমি তোমার—আমি তাকে ঘৃণা করি…

[জানলা টপ্‌কে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে যতিন অট্টহাস্যে যেন বাড়ীটাকে কাঁপিয়ে তুলল…] [অনিতা চীৎকার ক'রে উঠল]

যতিন। আমি তা জানি, আমি জানি যে তুমি আমায় ঘৃণা কর,—আর এও জানি যে প্রদীপ তোমায় ভালবাসে। কিন্তু এমন ঘৃণ্যভাবে, কাপুরুষ চরিত্রহীনের মতন, তা আমার জানা ছিল না। আমি জানতাম না, তুমি এমন হীন, শয়তান, এত নীচ—আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে…

প্রদীপ। সাবধান, সাবধান যতিন! শয়তান!

যতিন। [হেসে উঠল]…শয়তান! শয়তান আমি না তুমি?

অনিতা। যতিন!

প্রদীপ। শয়তান কে তার প্রমাণ আমি দেব।

অনিতা। প্রদীপ!…যতিন!…[প্রদীপকে বাধা দিতে উদ্যত…]

প্রদীপ। [অনিতাকে ধাক্কা দিয়ে] সরে যাও অনিতা! শয়তান! শয়তান…[একলাফে যতীনের গলা ধরে] শয়তান আমি না তুমি? অসহায় অবলা নারীকে ভুলিয়ে বিয়ে করে তাকে চিরজীবনের মতন অশান্তিতে রেখেছ…তাকে কোন-দিনও জানতে দিয়েছ' যে তুমি তার স্বামী!…কোন দিনও দিয়েছ তাকে তার প্রাপ্য?…কোন দিনও তুমি তাকে ভাল-বেসেছ' তোমার স্ত্রীর মতন?

অনিতা। প্রদীপ দোহাই তোমার, ওকে ছেড়ে দাও… [প্রদীপকে জড়িয়ে ধরলে…]

প্রদীপ। স'রে যাও অনিতা…শয়তান কে তার প্রমাণ আমি ওকে দেব…[গলাটা চেপে ধরল…আরও…আরও] শয়তান, পিশাচ…[ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ঠেলে ফেলে দিল…যতিন ঠিকরে পড়ল দেওয়ালের ওপর—মুখ গুঁজে পড়ল মাটিতে]

[অনিতা, প্রদীপ, দু'জনে দাঁড়িয়ে রইল যতিনের দিকে চেয়ে…অনিতা ছুটে যেতে চাইল যতিনের দিকে, প্রদীপ হাতখানা ওর চেপে ধরল ・ ও নিজে কাঁপছে]

[অন্ধকার ক্রমেই বাড়ছে। যতিন পড়ে আছে নিশ্চল পাথরের মতন …মুখ দিয়ে ওর পড়ছে রক্ত, প্রদীপের হাতেও রক্ত। প্রদীপের দৃষ্টি পড়ল সে দিকে]

প্রদীপ। এ কি…রক্ত?…রক্ত! অনিতা, আমার হাতে রক্ত!

[যতিনের কাছে গিয়ে ওকে নেড়ে নেড়ে দেখল, যতিন পড়ে আছে জ্ঞানহীন; অনিতা ছুটে গেল যতিনের দিকে, মুখের ওপর হাত বুলিয়ে… হঠাৎ চীৎকার করে উঠল…]

অনিতা। প্রদীপ…প্রদীপ…রক্ত…আমার হাতেও রক্ত…

প্রদীপ। আমি ত' তা চাইনি অনিতা…আমি ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলাম, আমি…আমি・আমি খুন করতে চাইনি, আমি…তোমার জন্যে…আমি…ও ত' নিজেই আমার সঙ্গে…ওই ত' আমায় হত্যা করতে চেয়েছিল …আমি ত' আত্মরক্ষা করবার জন্যে…আমি খুন করতে চাই নি…ওরা আমায়…ফাঁসি…আমি…আমি বরং একটা ডাক্তার নিয়ে আসি!

অনিতা। [অবিচলিত ভাবে] না থাক, আমাদের আজকের এই বিবাহ-বার্ষিকীতে ডাক্তার, লোকজনের কোন প্রয়োজন নেই!

প্রদীপ। তা হ'লে…তা হ'লে কি করবে?

অনিতা।…ঐ মুখোস!

প্রদীপ। মুখোস???

অনিতা। হ্যাঁ, শোন, তোমার আর যতিনের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই, তোমার কথা বলা, হাঁটা, বসা সমস্তই প্রায় ওর মতন, শুধু মুখখানা বাদে…তুমি ঐ মুখোস পরে হও যতিন!

প্রদীপ। আমি?

অনিতা। হ্যাঁ, তুমি।

প্রদীপ। আমি পারব না, লোকে ধরে ফেলবে, বুঝতে পারবে!

অনিতা। পারবে না; দুর্ঘটনার পর থেকে যতিন কারো সঙ্গে কথা বলেনি, এক আমি ছাড়া!

প্রদীপ। কিন্তু অনিতা আমি না হয় যতিন হলাম, কিন্তু লোকে যখন প্রদীপকে খুঁজবে?

অনিতা। লোকে জানবে—সে আসামের জঙ্গলে চাকরিতে ফিরে গেছে! সেখানে কিছুদিন পরে না হয় সে দুর্ঘটনায় মরবে—এ কথা আমিই না হয় প্রচার করব!

প্রদীপ। কিন্তু আমি ত' সমস্ত জীবন মুখোস প'রে কাটাতে পারব না!

অনিতা। সমস্ত জীবন তোমায় প'রে থাকতে হবে না। আমিও তোমার সঙ্গে যাব! লোককে বলব আমি স্বামীকে নিয়ে চেঞ্জে যা'চ্ছি।

প্রদীপ। আমি পারব' না অনিতা; আমি পারব না!

অনিতা। কেন তুমি শেষ চেষ্টা করবে না…কাপুরুষ কোথাকার?

প্রদীপ। [চীৎকার করে] না না আমি পারব' না!

অনিতা। [মিনতির সুরে] দীপ…আমার জন্যে… তোমার নিতার জন্যেও তুমি বাঁচতে চাও না?

প্রদীপ। কিন্তু যতিনের মৃতদেহ?

অনিতা। সে কথাও আমি ভেবেছি…মেশিন-ঘরে ওকে ফেলে আসব!

প্রদীপ। মেশিন-ঘর?

অনিতা। হ্যাঁ, মেশিন-ঘরে…যতিন বলেছিল ওর মধ্যে হাজার হাজার মানুষ নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে, সেইখানে যতিনকে ফেলে আসব…ওর কাজের মধ্যে ও ঘুমিয়ে থাকবে। চাঁদ উঠবার আগেই অন্ধকারে কাজ সারতে হবে…তুমি মুখোস পরে নাও! [অনিতা যতিনের দিকে অগ্রসর হল।]

প্রদীপ। [চীৎকার করে উঠল] ওটা নয়; ওটা নয়! যতিনের মুখোস খুলো না, ওটা আমি পরতে পারব না। ওর চোখের গহ্বর আমি সহ্য করতে পারব না!

অনিতা। আমি তা হ'লে অন্য একটা নিয়ে আসি!

প্রদীপ। [চেয়ারটায় বসে পড়ল হতাশ ভাবে]… আচ্ছা!

অনিতা। না না, তুমি এই দরজাটার ধারে দাঁড়াও, একলা আমার ভয় করবে!

[প্রদীপ চেয়ার ছেড়ে দরজার পাশে দাঁড়াল]

[অনিতা চলে গেল। প্রদীপ ওর পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, দরজার চৌকাঠের ওপর মাথা রেখে…ও আজ বিচলিত। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল যতিন, মুখের ওপর থেকে রক্তটা মুছে ফেলল…টেবিল ধরে দাঁড়িয়ে উঠল। খাবারের ছুরিটা টেবিলের ওপর থেকে হাতে তুলে নিল। সন্তর্পণে এগিয়ে গেল ঠিক প্রদীপের পেছনে…প্রদীপ পাথরের মতন নিশ্চল, উদ্যত ছুরিকাটি যতিন আমূল বিদ্ধ করল প্রদীপের কাঁধের ওপর…অস্পষ্ট চীৎকার করে প্রদীপ পড়ে গেল]

অনিতা। [ও ঘর থেকে]…কি হল প্রদীপ?

যতিন। কিচ্ছু না!

[অনিতা ওঘর থেকেই ছুঁড়ে দিল মুখোস, বললে…]

অনিতা। [ও ঘর থেকেই]…তুমি মুখোস পরে তৈরী হ'য়ে নাও, আমি কাপড়টা ছেড়ে আসছি!

যতিন। আচ্ছা!…

[যতিন নিজের মুখোসটা প্রদীপকে পরিয়ে দিল আর নতুনটা নিজে পরল]

অনিতা। প্রদীপ, কোথায় তুমি?…অন্ধকারে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না, কোথায় তুমি?…

যতিন। এই যে, এখানে!

অনিতা। চল প্রদীপ, এই বেলা বেরিয়ে পড়ি!

যতিন। চল…

[এমনি করে নির্জন অন্ধকার রাত্রে যতিন আর অনিতা প্রদীপের মৃতদেহ নিয়ে গেল মেশিন রুমের বুভুক্ষু অন্তরে: সেইখানে রইল প্রদীপের অতৃপ্ত আত্মা…ওরা ফিরে এল']

অনিতা। [যতিনের কাছে এসে] আমার ভয়ানক ভয় করছে প্রদীপ…

যতিন। ভয়?…[বিকট অট্টহাস্য করে উঠল]…ভয়!!…

অনিতা। অমন পিশাচের মতন হেসো না…আমার ভয়ানক ভয় করে…

যতিন। আমি যে হত্যাকারী…হত্যাকারী…[আবার হেসে উঠল]…এই মুখোসই এই দুর্ঘটনার মূল…

অনিতা। প্রদীপ…ঐ মুখোস তুমি খুলে ফেল…আমি সহ্য করতে পারছি না!

যতিন। যদি কেউ দেখে ফেলে!

অনিতা। প্রদীপ, আজ রাত্রের মতন তুমি খোল' ঐ সর্বনেশে মুখোস…শুধু আজ রাত্রের জন্যে…দয়া কর প্রদীপ, দয়া কর…আমি সহ্য করতে পারি না…দয়া কর!…

যতিন। খুলব??

অনিতা। তোমার পায়ে পড়ি প্রদীপ…

যতিন। এই নাও! [খুলে ফেলল মুখোস—]

[অনিতা চীৎকার করে উঠল ভয়ে] [যতিন বিকট অট্টহাস্যে হেসে উঠল: দিকে দিকে অন্ধকারে হল তার প্রতিধ্বনি…মিলের হুইসিল আবার উঠল বেজে…]
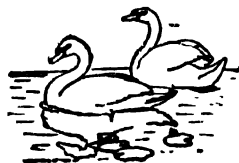
[১৩০০ সালের চৈত্র মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোভাব ঘটে। সেই জন্য এই সংখ্যার 'পুরাতনী'তে বঙ্কিমের রচনা ও তাঁহার কথা প্রকাশিত হইল]

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্য-রচনা

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মন্তব্য

"বঙ্কিমচন্দ্রের বিরচিত কবিতার সুবঙ্কিম ভাব-কৌশল সকল অতিশয় সন্তোষজনক, ইনি রূপক-বর্ণনা-স্থলে নায়ক-নায়িকার কথোপকথনচ্ছলে যে সমস্ত প্রগাঢ় ভাব ব্যক্ত করেন তদ্দৃষ্টে সুপণ্ডিত ভাবুকমাত্রেই প্রীত হইয়া থাকেন। ইনি অতি তরুণ বয়সে অতি প্রবীণ সুরসিক জনের ন্যায় মন হইতে অতি আশ্চর্য্য নূতন নূতন ভাব সকল উদ্ভূত করিতেছেন। এ অংশে ইঁহার প্রশংসা-বর্ণনে বর্ণাবলী বলহীনা। ফলে এই স্থলে একটি অনুরোধ এই, যে, বঙ্কিম পদ্য-রচনায় আর সমুদয় বঙ্কিম করুন, তাহা যশের জন্যই হইবে, কিন্তু ভাবগুলীন প্রকাশার্থ যেন বঙ্কিম-ভাষা ব্যবহার না করেন, যত ললিত-শব্দে পদ-বিন্যাস করিতে পারিবেন ততই উত্তম হইবেক; এবং "এবে, করয়ে, ছেনু, গেনু" ইত্যাদি প্রাচীন কবিগণের প্রিয় শব্দগুলীন পরিহার করিতে পারিলে আরো ভাল হয়। অপিচ প্রতিনিয়তই আদিরসের সেবা না করিয়া এক একবার অন্য রসের উপাসনা করা কর্ত্তব্য হইতেছে। তাঁহার পদ্য অস্মদাদির অন্তঃকরণকে প্রেমাভিষিক্ত করিয়া থাকে; এজন্য অবিলম্বে আদ্য ছাড়িয়া অপর কোন রসের এক প্রবন্ধ প্রেরণ করিবেন"।

শিশির-বর্ণনাচ্ছলে স্ত্রী-পতির কথোপকথন

লঘু ললিত

স্ত্রী

হইয়াছে জল, বড়ই শীতল,
ছুঁইলে বিকল, হইতে হয়।
আগে যে জীবন জুড়াত জীবন,
সে বন এখন, নাহিক সয়॥
সুগন্ধ মলয়, হইলেক লয়,
এলো হিমালয়, শীতল অতি।
পদার্থ সকল, সমীরণ জল,
কি কাল শীতল, হলো সম্প্রতি॥
সকল শীতল, করয় বিকল,
কিন্তু অপরূপ, নিরখি তায়।
সমস্ত শীতল, প্রতপ্ত কেবল,
বোধ হয় প্রাণ, তোমার গায়॥

পতি

মোরে নিরন্তর, তব নেত্রকর,
পাবক প্রখর, দাহন করে।
মম দেহোপর, বহ্নি খর তর,
তাই উষ্ণভাব, এ দেহ ধরে॥

কেন বিভাবরী দীর্ঘ দেহ ধরি,
ধরায় বিহরি, রহে এখন।
ত্যজিতে ধরণী, না চায় রজনী,
বল গুণমণি, শুনি কারণ॥

পতি

নয়ন মুদিয়ে, থাক ঘুমাইয়ে,
তখনি হেরিয়ে তোমার মুখ।
সতী বিভাবরী, শশী জ্ঞান করি,
হেরি প্রাণপতি, পায় কি সুখ॥
আছে যতক্ষণ, শশী প্রাণধন,
পাইয়ে রতন, না ত্যজে তায়।
তাই বিভাবরী, পতি বোধ করি,
বহুক্ষণ ধরি, রয় ধরায়॥
কিন্তু লো যেক্ষণে, নিদ্রার ভঞ্জনে,
চাহিয়া নয়নে, উঠ প্রভাতে।
হেরি ও নয়নে, নিশা ভাবি মনে
কুমুদী সতিনী পালায় তাতে॥

স্ত্রী

অতিশয় ঘন, বল কি কারণ,
নিরখি প্রভাতে, এ কুজ্ঝটিকা।
কেন সব হয়, ধূমাকার-ময়,
কি ধূম হইল ধরা-ব্যাপিকা॥

পতি

এবে আর দর্প, না করে কন্দর্প,
তাহার কারণ, শুন ইহায়।
তব নিকেতন, আসিল মদন,
আপন যাতন, দিতে তোমায়॥
কি তব স্থান, হরের সমান,
যে বহ্নি নয়নে, সে ভস্ম হয়।
তাই ধনি তার, শক্তি সে প্রকার,
অবনীতে আর, নাহিক রয়॥

ভস্ম হৈল শর, তার কলেবর,
প্রবল দহনে, দাহন হয়।
দাহনের ধূম, ব্যাপে নভোভূম,
ভ্রমেতে কুয়াশা, লোকে কয়॥

স্ত্রী

কি কারণ প্রাণ, শঙ্কর সমান,
মোরে কর জ্ঞান, উন্মত্ত-প্রায়।
কোথায় কি মম, হের হর সম,
তোমারে বুঝাতে হইল দায়॥

পতি

বিবেচনা করি, তোরে প্রাণেশ্বরী,
বলি ত্রিপুরারি, প্রলাপ নয়।
হরের ভূষণ, সব বিলক্ষণ,
তোমার অঙ্গেতে তুলনা হয়॥
হরের ইন্দুর, সমান সিন্দূর,
শিরে লো তোমার, কি শোভা পায়।
সদা, শিরোপরি, আছ সিঁথিপরি,
তিন ধারা ধরি, গঙ্গা খেলায়॥
স্কন্ধ শিরোপরে, হরের বিহরে,
সদা ফণিবরে, ভীষণ অতি।
বেণী ফণিবর, তব নিরন্তর,
স্কন্ধ শিরোপর, রয় তেমতি॥
যেই মত হরে, কণ্ঠে বিষ ধরে,
তেমতি গরল, তুমিও ধর।
কিন্তু কণ্ঠে নয়, কিছু অধো রয়,
বিশেষয়া বলি, ও পয়োধর॥
যে গরল হরে, কণ্ঠদেশে ধরে,
কাছে না এনে সে নাশিতে নারে॥
কিন্তু পয়োধরে, যে গরল ধরে,
দূর হইতেই, মানবে মারে॥
যদি বল প্রিয়ে, কণ্ঠে না রহিয়ে,
অধোভাগে কেন, গরল রয়।

কণ্ঠে রৈলে তবে, মুখ কাছে রবে,
সুধামৃতে বিষ, নিস্তেজ হয়॥

স্ত্রী

কি মূঢ় মানব, কোলে নিজ সব,
দুরন্ত পাবক, লয়েছে টানি।
বিশ্বাসঘাতক, সেই সে পাবক,
করিবে দহন, তাহা না জানি॥

পতি

দোষ দাও পরে, নিজ দোষোপরে,
দৃষ্টি নাহি কর, কি অপরূপ।
আপনি কেমনে, আপন নয়নে,
রেখেছো অনল, কহ স্বরূপ॥

স্ত্রী

তব প্রেমাধার, রাখিব না আর,
নয়নে আমার, কাল অনল।
দেখ প্রাণধন, মুদিয়া নয়ন,
তাড়াই আগুন, শয্যায় চল॥

পতি

যদি তুমি প্রাণ, নাহি দিলে স্থান,
কোথায় অনল যাইবে আর।
পৃথিবীতে আর, স্থান নাহি তার,
তাহে বলী শীত, বিপক্ষ তার॥
যাইবে যথায়, যাইবে তথায়,
দুরন্ত শাত্রব, শীত ধাইয়ে।
এমতে ধবায়, নাহি স্থান পায়,
শেষে জলে যায়, রয় ডুবিয়ে॥
তাই দেখ কাল, নিশা শেষকাল,
উঠে জল হোতে, ধূমের রাশি।
তাই বলি প্রিয়ে, স্থান না পাইয়ে,
হয়েছে অনল, সলিলবাসী॥

'সংবাদ-প্রভাকর'
হইতে উদ্ধৃত

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
হুগলি কলেজের ছাত্র।

বঙ্কিম-কথা

পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের নৈহাটী-ষ্টেশনের অতি সন্নিকটে কাঁঠালপাড়া নামে যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি। এক্ষণে গ্রামখানি যেরূপ দুর্দ্দশাপন্ন, পূর্ব্বে উহা এ প্রকার ছিল না। তখন উহা বড়ই প্রীতিকর, নয়ন-স্নিগ্ধকর, মনোরম স্থান ছিল।

একদিন এক সন্ন্যাসী মস্ত এক ঝুলি কাঁধে ফেলিয়া চেলার সহিত এই গ্রাম দিয়া যাইতেছিলেন—কোথায় যাইতেছিলেন, কে জানে। ঝুলির ভিতরে কাপড়-গামছা, চাল-ডাল, আর কৃষ্ণ প্রস্তরের এক মস্ত রাধাবল্লভ। গ্রীষ্মকাল, প্রখর রৌদ্র-সন্ন্যাসী ঠাকুর রৌদ্রতেজ সহ্য করিতে না পারিয়া এক দীর্ঘিকার তীরে বটবৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রামাশায় উপবেশন করিলেন। দীর্ঘিকার নাম "অর্জ্জুনা"। সেখানে ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর পুনরায় যাইবার নিমিত্ত উঠিলেন। উঠিয়া ঝুলি তুলিতে গেলেন, তুলিতে পারিলেন না; অনেক চেষ্টা করিলেন—কিছুই হইল না। শেষে তিনি চেলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রঘুদেব! বুঝ্‌তে পাচ্চ ব্যাপারখানা কি? আমি ত অনেক দেশ—অনেক তীর্থ এই ঠাকুর লইয়া বেড়াইলাম, কোথাও ত এরূপ ঘটে নাই। বোধ হয়, ঠাকুরের আর আমার কাছে থাকিবার সাধ নাই। আচ্ছা ঠাকুর! তোমার যখন থাকিতে ইচ্ছা হইয়াছে, তখন থাক"। এই বলিয়া সেই চেলাকে ঠাকুরের পাহারায় নিযুক্ত করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। এই রঘুদেব ঘোষালই কাঁঠালপাড়ার কুলীন ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষ। রঘুদেব মহাশয় সন্ন্যাসীর কৃপায় ও রাধাবল্লভের আশীর্ব্বাদে ঠাকুরকে সেইখানে স্থাপনা করিলেন ঠাকুরের এক অতি রমণীয় মন্দির প্রস্তুত করাইলেন ও জায়গা সম্পত্তিও করিলেন।

রঘুদেব ঘোষাল মহাশয়ের তিন কন্যা। কনিষ্ঠা কন্যার সন্তানাদি হয় নাই, তিনি অকালে মারা যান। অপর দুই কন্যাকে তিনি কুলীন করেন। হুগলীর অন্তঃপাতী দেশমুখো-শেয়াখালা-বন্দিপুরের নিকটে এক শ্রেণীর ফুলিয়া কুলীন ছিলেন। তাঁহারা অবসথী সদানন্দের সন্তান। তাঁহাদিগের বংশের রামহরি ও রামজীবন চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ঘোষাল মহাশয়ের দুই কন্যার বিবাহ হয়। রঘুদেব মহাশয় উইল করিয়া জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী রোহিণী দেবীকেই সমস্ত বিষয় লিখিয়া দিয়া যান। রোহিণী দেবীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে, তিনি মাতামহের পিতামহ,—স্বর্গীয় প্রাতঃস্মরণীয় যাদবচন্দ্রের পিতা। যাদবচন্দ্র পিতার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার আর তিন সহোদর ছিল। তাঁহার মধ্যম সহোদর সমস্ত বিষয় নষ্ট করিয়া ফেলেন। যাদবচন্দ্র কপর্দ্দক-শূন্য নিরুপায় অবস্থায় বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়েন এবং একটি ৫৲ টাকা মাহিনার মুন্সীগিরিতে ভর্ত্তি হন। ক্রমে ইনি নিজের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে ৫০০৲ টাকা বেতনের ডেপুটি কালেক্টার হইয়াছিলেন। ইনিই পুনরায় সমস্ত বিষয়-আশয় ক্রমে ক্রমে উদ্ধার করেন। ইহার চারিপুত্র—শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। এক শ্যামাচরণ বাদে সকলেই সাহিত্যানুরাগী। বাংলা ১২৪৫ অব্দে আষাঢ়মাসে বঙ্কিমচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্বে এক অদ্ভুত শঙ্খধ্বনি হইয়াছিল। সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণে গ্রামের অনেকেই পুত্র হইয়াছে মনে করিয়া দেখিতে যান। কিন্তু যাইয়া দেখেন, তখনও পুত্র কি কন্যা, কিছুই হয় নাই। আর শঙ্খধ্বনিও যে কোথা হইতে হইয়াছিল বা কে করিয়াছিল, কেহই বুঝিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মেধাশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল,—একদিনেই তিনি বাঙ্গালা বর্ণমালা সমস্ত শিখিয়া ফেলেন। কুল-পুরোহিত বিশ্বম্ভর ঠাকুর তাঁহার হাতে-খড়ি দিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিপত্নীক অবস্থা ও পুনরায় দারপরিগ্রহ

বাল্যাবস্থাতেই মাতামহদেবের বিবাহ হয়। নারাণপুর-নিবাসী একজন মধ্যবিত্ত লোকের এক সুন্দরী কন্যার তিনি পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের এক অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছিল কারণ কন্যা ও বর এক বাটিতেই শিক্ষিত হইতেন,—তাহাতে অতি শৈশব হইতেই দুই জনের সৌহার্দ্দ জন্মে। বঙ্কিমচন্দ্র হাকিম হইলেন। এদেশ-ওদেশ ঘুরিয়া নগোয়ানে

(Nagoan) বদলি হইলেন। গৃহে যুবতী সুন্দরী স্ত্রী রাখিয়া কর্ম্মস্থলে যাইলেন। এখানে আর একটি ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। মাতামহদেব বলিতেন, বিবাহের পর যতদিন তিনি গৃহে ছিলেন (অর্থাৎ হাকিম হন নাই), স্ত্রী পিত্রালয়ে থাকিলে তিনি একটু গভীর রাত্রে শুধু দোছুট লইয়াই শ্বশুরালয়ে যাইতেন। নগোয়ানে থাকিতেই তিনি বিপত্নীক হইলেন। তখন তাঁহার বয়স ২২ বৎসর। যথাসময়ে স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ তাঁহার নিকটে পঁহুছিল।* তিনি কর্ম্মস্থান হইতে বাটী আসিলেন। প্রথমা স্ত্রীর মাথার সোণার কাঁটা ও ফুল ও ফিতে নিজের বাক্সে তুলিয়া রাখিলেন। বাটীতে পিতৃদেব, অগ্রজদ্বয়, মাতা এবং গ্রামের বহুলোকই তাঁহাকে পুনরায় বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। এদিকে তখন সুরসিক কবি দীনবন্ধুও আসিয়া পড়িয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র এবং আরো ২।১ জন বন্ধু-বান্ধব একত্র হইয়া নৌকা-যোগে পাত্রীর অন্বেষণে চলিলেন। এক জায়গায় তাঁহারা পাত্রী দেখিতে উঠিলেন। পাত্রীর পিতা অত্যন্ত ধনবান্। পাত্রীটিও সুন্দরী। বাটীটি প্রকাণ্ড। "বিষবৃক্ষের" নগেন্দ্র দত্তের বাটীর বর্ণনা সকলেই পড়িয়াছেন—আমার বোধ হয়, দাদাবাবু ঐ বাটী সমস্ত দেখিয়া—নগেন্দ্র দত্তের বাটীর বর্ণনা লিখিয়াছিলেন। যথাসময়ে পাত্রী আসিল। সঞ্জীববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি" ?

পাত্রী। আমার নাম মনোরমা।

স। তোমার মামার বাড়ী কোথায়—কখনও কি সেখানে গিয়াছ ?

পা। (ভ্রূভঙ্গী-সহ উচ্চৈঃস্বরে) মামার বাড়ী আবার কোথায়" ।

ঐ কথা শুনিয়া কাহারও মুখে আর অন্য কোন কথা নাই—কেবল উচ্চ হাস্য। বরটি পর্য্যন্ত হাসিতেছেন। তাঁহারা আর কোন কথা-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই দেখিয়া সকলেই উঠিলেন। দীনবন্ধুবাবু "বাঁশবেড়ে"য় নামিলেন, সুতরাং সকলেই সেইখানে নামিলেন। সেখানে আবার তারাপ্রসন্নবাবু—বঙ্কিমবাবুর অতি নিকট আত্মীয়—আসিয়া জুটিলেন। এ-কথা সে-কথার পর তিনি জানিলেন, তাঁহারা পাত্রীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার সন্ধানে এক ভাল পাত্রী আছে। যেমন সুশ্রী, তেমনি নম্র; তেমনি লজ্জাশীলা। ইত্যাদি। সঞ্জীববাবু জিজ্ঞাসিলেন, "পাত্রীটি কোথায় এবং অদ্য দেখিতে পাওয়া যায় কি না" ?

তারা। পাত্রী আমাদের হালিসহরের—বিখ্যাত চৌধুরী মহাশয়দের বাটীর কন্যা। পাত্রীর মাতামহ কন্যাকে কুলীনে করিয়াছেন, সেইজন্য পাত্রীর মাতা বৎসরের অধিকাংশ দিনই পিত্রালয়ে থাকেন। অদ্যই দেখিতে পাওয়া যাইবে। আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁদের সংবাদ দিই গে। আপনারা পশ্চাতে আসুন।

আর তাঁহাদের বিশ্রাম করা হইল না—সকলেই পাত্রী দেখিতে ছুটিলেন। পাত্রী দেখিয়া পছন্দ হইল, দিন ধার্য্যও হইল। বিবাহের আর ১০।১১ দিন বাকী রহিল। কন্যাপক্ষ হইতে একটু আপত্তি উঠিল যে, "এত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা সব গুছাইতে পারিব না"।

সঞ্জীব। আপনাদের কিছুই গুছাইবার প্রয়োজন নাই—শুধু হরীতকী দক্ষিণা দিয়াই কন্যার বিবাহ দিবেন। আমরা অনেক কন্যা দেখিয়াছি—কিন্তু এরূপ সুলক্ষণা, সর্ব্বগুণ-সম্পন্না, সুন্দরী কন্যা কোথাও পাই নাই; সেইজন্যই এত ব্যস্ত। আরো এক কথা—ভ্রাতার ছুটি আর বেশী দিন নাই, সেইজন্যও তাড়া।

যথাসময়ে,—সুদিনে, সুক্ষণে, সুলগ্নে বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিলেন। বিবাহ করিয়াই তিনি পত্নী (দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা) সমভিব্যাহারে কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়াই তিনি সর্ব্বপ্রথমে বাক্স হইতে প্রথমা পত্নীর ফুল, কাঁটা ও ফিতা (যাহা তিনি এতদিন অতিযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন) বাহির করিয়া নব-পরিণীতা পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। পত্নী শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী—যথার্থই "রাজলক্ষ্মী"।

দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

*একবার চন্দ্রশেখরের "উপক্রমণিকা" দেখুন—"বুঝি বাল্যপ্রণয়ে কিছু অভিসম্পাত আছে।" এটা যে কবির বুকের ভিতরের কথা, কেহ কি কখনও লক্ষ্য করিয়াছেন? কবি কি হৃদয়-যন্ত্রণায় ঐ কথা লিখিয়াছিলেন, তাহা ঈশ্বর ভিন্ন কেহই বুঝিতে সক্ষম নহেন।

যদি কেহ তাঁহার প্রথমা পত্নীর সৌন্দর্য্য জানিতে ইচ্ছুক হন, তবে তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক "দুর্গেশনন্দিনীর" তিলোত্তমার রূপবর্ণনা পাঠ করুন।

কুশী নগর

শ্রীপ্রভাস চন্দ্র পাল, প্রত্নতত্ত্ববিদ

বর্ত্তমান বি, এন, ডব্লু রেলপথে তহসিল-দেওরিয়া (Tahsil Deoria) ষ্টেশন হইতে প্রায় ২১ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে গমন করিলে কাশিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। এই কাশিয়াই সুপ্রাচীন মল্লগণের রাজধানী এবং ভগবান বুদ্ধের পরম পবিত্র মহানির্ব্বাণ ক্ষেত্র।

কুশী এক সুসমৃদ্ধ প্রাসাদ নগর। ইহার পার্শ্ব দিয়া কলনাদিনী হিরণ্যাবতী (বর্ত্তমান ছোট গণ্ডকী) প্রবাহিত হইতেছে। নদীকূলে বিশাল রম্যোদ্যান। কোথাও শালবৃক্ষরাজি উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া চন্দ্রাতপের ন্যায় সুশীতল ছায়া দান করিতেছে; কোথাও বা অশোক, কদম্ব, কুটরাজ, শেফালি, কৃষ্ণচূড়া, যাঁতি, যুথি প্রভৃতি বৃক্ষলতা ফলপুষ্পে সজ্জিত হইয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে, কোথাও বা অলিকুল দলবদ্ধ হইয়া মধুর গুঞ্জন করিতে করিতে উড়িয়া বেড়াইতেছে; কোথাও বা ময়ূর পুচ্ছবিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে; কোথাও বা মৃগকুল শ্যামল তৃণক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে। সমগ্র উদ্যানটি শীতলতায়, সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে, গুঞ্জনে ও শান্তিতে যেন এক আদর্শময় স্থান।

খৃঃ পূঃ ৪৮৭ অব্দে বৈশাখ মাসে ভগবান বুদ্ধদেব বৈশালীর লিচ্ছবিগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সশিষ্য কুশীনগরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শুভ বৈশাখী তিথিতে সায়াহ্নকালে তিনি কুশীর প্রান্তস্থিত সেই রম্যোদ্যানে উপনীত হইলেন। অতঃপর ভগবান বুদ্ধ মহানির্ব্বাণের সময় উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া এক শালবৃক্ষ মূলে উপবেশন পূর্ব্বক ধ্যানমগ্ন হইলেন। সংবাদ পাইবামাত্র মল্লরাজ, রাজপুরুষগণ পুরবাসিগণ ও ভিক্ষুগণ সমবেত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শেষ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। উদ্যানের কুসুমরাশি বৃন্তচ্যুত হইয়া বায়ুভরে তাঁহার পাদপদ্মে পতিত হইতে লাগিল। পূতবারি—পরিবাহিনী কুল-কুল-নাদিনী হিরণ্যাবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইতেছে; কোথায় আদি, কোথায় অন্ত তার। আর পূর্ণচন্দ্র অপূর্ব্বভাবে সহস্র ধারায় কিরণ বর্ষণ করিতে লাগিল;—গগনে চন্দ্র, বৃক্ষে চন্দ্র, জলে চন্দ্র, বুদ্ধের সর্ব্বাঙ্গে চন্দ্র! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ত্রাণকর্ত্তার এ কী অলোক-সামান্য বিচিত্র খেলা।

যোগীচূড়ামণি তপঃপ্রভাবশালী অতুল-কীর্ত্তিকুশল বুদ্ধের পবিত্র তনু হইতে সহসা এক দিব্যজ্যোতিঃ নির্গত হইয়া সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে উদ্ভাসিত করিয়া বিলীন হইয়া গেল। তদ্দর্শনে ক্ষণকাল বিস্ময়ে নির্ব্বাক থাকিয়া সমবেত সকলেই ভগবান বুদ্ধের স্তুতি গান করিতে লাগিলেন। আজ সকলেরই নয়ন যুগল হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইয়া হৃদয় ভাসাইতে লাগিল। ভগবান বুদ্ধ একবার লুম্বিনী উদ্যানের এক শালবৃক্ষমূলে মধুর আনন্দ প্রমাণ করিয়াছিলেন। আবার নির্ব্বাণ লাভ করিয়া সকলকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিলেন।

কালের প্রভাবে কি না সম্ভব! সত্যই মহাকবি ভবভূতি বলিয়াছেন,—

> "পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাং
> বিপর্য্যাসং যাতো ঘনবিরলভাবঃ ক্ষিতিরুহাম্।"

পরে মল্লরাজ, ভিক্ষুদল ও পুরবাসিবৃন্দ সৎকার্য্যের জন্য সচেষ্ট হইলেন। যে প্রাসাদে মল্লরাজগণের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইত তথায় মহাসমারোহে সৎকার করা হইল। এই পরম পবিত্র সৎকার্য্যের বিবরণ বিগত ১৯০৪ হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কুশীর প্রাচীন স্তূপ খননের ফলে আবিষ্কৃত মৃন্ময় শীলমোহর পাঠে অবগত হওয়া যায়। শীল মোহরগুলির মধ্যে কতকগুলিতে "মহাপরিনির্ব্বাণে চতুষ্পার্শ্ব হইতে ভিক্ষুগণ সমবেত হইয়াছিলেন" এবং অপরগুলিতে "মল্লরাজগণের রাজ্যাভিষেক ভবনে" লিখিত আছে। বর্ত্তমানে উক্ত শীলমোহর এবং আবিষ্কৃত অন্যান্য প্রত্নদ্রব্য তত্রস্থ জনৈক আরাকানী ভিক্ষুকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক ধর্ম্মশালায় সংরক্ষিত আছে। ধর্ম্মশালাটি পরিচালনার্থে একজন ভিক্ষু নিযুক্ত আছেন।

খৃঃ পূঃ ২৪৯ অব্দে ধর্ম্মাশোক কুশী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় একটি উচ্চ স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সন্নিকটে একটি প্রস্তর স্তম্ভ স্থাপন করিয়া উহার গাত্রে তথাগতের নির্ব্বাণ কাহিনী ক্ষোদিতাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ৬৪০ অব্দে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ কুশীনগর পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন—কুশীনগরের অর্দ্ধ মাইল

উত্তর-পশ্চিমে হিরণ্যাবতী নদীর তীরে একটি বৃহৎ বৌদ্ধ মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার অভ্যন্তরে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্ত্তিটি দর্শন করিলেই মহানির্ব্বাণের দৃশ্য সম্যকরূপে উপলব্ধি হয়। তাঁহার বিবরণ হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে—এই মন্দিরের সন্নিকটেই পূর্ব্বোক্ত অশোক স্তূপটি সমতল ভূমি হইতে ২০০ ফিট উচ্চ ছিল এবং স্তম্ভটিও তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। তৎকালীন কুশী-নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া এক জনশূন্য স্থানে পরিণত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১৮৭৬ অব্দে মিঃ কার্লাইল (Mr. Carlleyle) একটি সুপ্রাচীন বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মূর্ত্তিটি দৈর্ঘ্যে ২০ ফিট। ইহা একটি বিশাল প্রস্তর সিংহাসনের উপর শায়িত; শিরদেশ উত্তরদিকে, শ্রীমুখ পশ্চিমদিকে হেলান, দক্ষিণ চিবুক দক্ষিণ বাহুর উপর এবং বাম বাহু বাম-পার্শ্বে বরাবর বিস্তৃত হইয়া বামপদের উপর স্থাপিত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন গুল্‌ফদ্বয়ের মধ্যে একটি পদ্ম ও চরণ-যুগলের নিম্ন-দেশে চক্রচিহ্ন আছে। বর্ত্তমানে মূর্ত্তিটি বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণের প্রদত্ত অর্থে সুবর্ণমণ্ডিত হইয়া অশোক স্তূপের পশ্চিমদিকস্থ একটি নব প্রতিষ্ঠিত মন্দিরাভ্যন্তরে স্থাপিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ইহা বলা একান্ত আবশ্যক যে—সিংহাসনটির পশ্চিম কোণের স্তম্ভগাত্রে তিনটি মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে; তন্মধ্যে বামপার্শ্বে একজন আলুলায়িতকেশা নারী ভূমি-লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিতেছে, মধ্যস্থলে একজন পুরুষ শোকে মুহ্যমান হইয়া করযুগলে আবৃত করিয়াছে, এবং দক্ষিণ পার্শ্বে আর একজন শোকাভিভূতা নারী দক্ষিণ হস্তের উপর মস্তক স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে মনে হয়, যেন শিল্পী মহানির্ব্বাণের ভাব অপূর্ব্বভাবে প্রকাশ করিয়া তাঁহার শিল্প সাধনা সার্থক করিয়াছেন। এই স্তম্ভের পাদদেশে দ্বিতীয় শতাব্দীর ভাষায় দুইছত্রে এক লিপি উৎকীর্ণ আছে। লিপিটির নিম্নলিখিতরূপ পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে :—

"The religious gift, to the Great Vihar, of the Lord Haribal. The Colossal Statue was presented to the first united Assembly by Sura."

অদূরে একটি বিরাট স্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা "মত-কুন্‌য়ার-কা-কোট" অর্থাৎ মৃত রাজকুমারের দুর্গ নামে অভিহিত। ইহার মধ্যস্থলে একটি ইষ্টক নির্ম্মিত অশূন্যগর্ভ স্তূপ দৃষ্ট হয়, তাহা নির্ব্বাণ স্তূপ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

এই ধ্বংস স্তূপের পূর্ব্বদিকে একটি মন্দিরের চত্বর দৃষ্ট হয়। তত্রস্থ মন্দিরাভ্যন্তরে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মূর্ত্তিটি বুদ্ধগয়ার কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। সমগ্র প্রস্তর ফলটি উচ্চতায় ১০½ ফিট এবং প্রস্থে ৪½ ফিট। কিন্তু মূর্ত্তিটির উচ্চতা ৫ ফিট ৪½ ইঞ্চি। মূর্ত্তিটির ভাব যেন—মহাযোগী সিদ্ধার্থ গয়ার বোধিদ্রুমতলে সাধনায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। মূর্ত্তিটির তলদেশে একাদশ শতাব্দীর একটি লিপি রহিয়াছে। লিপিটির উপর স্থানীয় অধিবাসীরা কুঠারাদি যন্ত্র শান দেওয়ার ফলে এতই অস্পষ্ট হইয়াছে যে, তাহার পাঠোদ্ধার করা সম্ভবপর নহে।

বর্ত্তমান কাশিয়া হইতে প্রায় ১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 'রামভার ঝিলের' পশ্চিম তীরে একটি প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ দৃষ্ট হয়। ইহা সাধারণতঃ 'রম্ভার টিলা' নামে বিদিত। এতদ্ভিন্ন এই টিলার উপরিভাগে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষের সন্নিকটস্থ এক মন্দিরে এক দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দেবীকে উক্ত টিলার নামানুসারে 'রম্ভার ভবানী' বলা হয়।

মত-কুন্‌য়ার-কা-কোট এবং রম্ভার টিলার মধ্যবর্ত্তী এবং অনুরুধা নামে এক পল্লীর পার্শ্ববর্ত্তী প্রায় ৫০০ ফিট বিস্তৃত একটি ধ্বংসস্তূপ রহিয়াছে। এই স্থানের কোন কাহিনী বা কিংবদন্তী প্রচলিত নাই। এই মল্লরাজগণের সময়কালীন এক নিদর্শন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

হিমাদ্রী—হিরণ্যাবতী—বিশোভিত কুশীনগর মহামুণি শাক্যের পবিত্র দেহাবশেষ বক্ষে ধারণ করিয়া আজিও ভারতের মহাক্ষেত্র, পুণ্যক্ষেত্র। এই মহাক্ষেত্রে আসিলে মনে হয়—যদি একবার অতীতের ইতিহাসের জীবন্ত প্রতি-কৃতি তুলিতে পারিতাম!—তবে অবশ্যই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতাম, কেমন করিয়া কুমার সিদ্ধার্থ জগতের কল্যাণ বিধানার্থে রাজসুখ, পুত্র-পরিবার একাধারে সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া অরণ্যে গমন করিলেন; অরণ্যের নির্ঝর বারি পান করিয়া, অরণ্যের ফল ভক্ষণ করিয়া ও কঠোর সাধনায় নিমগ্ন থাকিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন; আবার তাঁহার সেই মহামন্ত্র দেশে দেশে প্রচার করিয়া অবশেষে কুশীর পবিত্র-ক্ষেত্রে মহানির্ব্বাণ লাভ করিলেন। তাঁহার পরম পবিত্র নির্ব্বাণস্তূপ দর্শনে মনে হয়,—যোগীই হউন, সংসারীই হউন, এ জগতে সকলকেই মহানিদ্রায় নিদ্রিত হইতে হইবে। ধনের অহঙ্কার, বিদ্যার অহঙ্কার, মায়া, বাসনা সবই বৃথা। কর্ম্মফল ভোগের জন্য মানুষকে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। মোক্ষ বা চিরমুক্তির জন্য যোগসাধনাই একমাত্র উপায়। মহামুণি তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহার সাধনার প্রভাব যেন কুশীর বক্ষে বিরাজ করিতেছে, পাপী-তাপীকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতেছে। বৈশাখ পূর্ণিমা রজনীতে কুশীর সুনীল গগনে যখন শশধর আপনার প্রভা বিকীর্ণ করিতে থাকে তখন সেই মহাযোগীর মহানির্ব্বাণের কথা স্মরণ হয়। প্রতি বৎসর কুশীক্ষেত্রে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে ভগবান বুদ্ধের মহা-নির্ব্বাণোৎসব হওয়া একান্ত আবশ্যক।

পদ্ম ও পদ্মবাদ

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

সৃষ্টপদার্থপুঞ্জের মধ্যে কুসুমের মত কোমল ও কমনীয় আর কিছুই নহে। যে বিস্ময়কর বিন্যাস-কৌশল ও চিত্রন-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রস্ফুটিত পুষ্পের ভিতর বিদ্যমান, তেমন আর কোন প্রাকৃতিক পদার্থে আমরা পাই না, এই সত্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বা অপূর্ব্ব ও অনুপম অবদান সুগন্ধি পুষ্প। ইহার সঙ্গে শুধু সুললিত সঙ্গীতের নাম যোগ করা চলে। প্রথমটা নেত্র-তর্পণ পদার্থের মধ্যে প্রধান। দ্বিতীয়টা শ্রুতিরসায়ণ সামগ্রীর ভিতর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই দুইটি বস্তু সেই চিরসুন্দর, আনন্দসাগর, রসিক-শেখর ভগবানের স্মৃতি যত জাগ্রত করে তত আর কোন জিনিষেই করে না, এই সত্য সংশয়াতীত। অর্পিতচিত্ত ভক্তবৃন্দ বা অনন্যমনা ব্রজাঙ্গনাগণকে লইয়া ভগবান যোগমায়া আশ্রয় করিয়া যুগে যুগে যে ললিত লীলা করিয়া থাকেন তাহা 'শারদোৎফুল্লমল্লিকা' এবং 'অনঙ্গবর্দ্ধন' গীত না হইলে সম্ভব হয় না। মধুর গন্ধভরা এক একটি কমনীয় কুসুমকে এক একটি ছন্দ-সুন্দর রমণীয় সঙ্গীত বলিয়া কল্পনা করিলেও ভুল হয় না। তবে এই সঙ্গীত শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তে দর্শনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য। ফুলের ভিতর শুধু মধুর গন্ধ নাই, সুন্দর ছন্দও আছে। একটি পূর্ণ-প্রস্ফুটিত পুষ্প হস্তে লইয়া উহার গ্রন্থন, অঙ্কন ও রঞ্জনকৌশল পর্য্যবেক্ষণ করিলে সেই ছন্দ-সৌন্দর্য্য ধরা পড়ে। সুরভিভরা, কৌমুদী-স্নাত কমনীয় কুসুমরাজি দেখিলে এই জ্বালানাজর্জ্জরিত জড়জগতের অতীত এক চিন্ময় আনন্দলোকের কথা মায়ামলিন মর্ত্ত্য মানবের মনে পড়িতে পারে। স্বর্গের কথা মনে হইলে সর্ব্বাগ্রে স্মৃতি পথে জাগে মন্দাকিনী তীরবর্ত্তী নন্দনকাননের দিব্যগন্ধি পারিজাত পুষ্পপুঞ্জ। বৈষ্ণবের চির-বাঞ্ছিত চিদানন্দময় বৃন্দাবন ধ্যান করিতে বসিলে তাহার (সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোপেতং) সর্ব্ব-প্রকার পুষ্পপুঞ্জে পূর্ণ মঞ্জুলমূর্ত্তি বা প্রকৃতিটি সকলের আগে চিন্তা করিতে হয়। প্রস্ফুটিত পুষ্পপুঞ্জের পানে নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া অনেক নাস্তিক আস্তিক হইয়াছেন। অন্ধ জড় প্রকৃতির সাধ্য নাই এইরূপ আশ্চর্য্য কারুকার্য্য করিতে, এইরূপ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে। এই অপূর্ব্ব রূপসম্পন্ন পুষ্পের প্রণেতা যিনি তিনি অদ্বিতীয় শিল্পী তো বটেনই তাহা ছাড়া তিনি পরম সুন্দর—তিনি আনন্দময়—তিনি রসস্বরূপ, এই সত্য আমরা ক্রমশঃ উপলব্ধি করি।

আদিম নরনারী কেবল কুসুম-সজ্জাই জানিত। নানা দেশের আদিবাসীরা আজিও পুষ্প পত্র প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থে শরীরকে সজ্জিত করিতে ভালবাসে। আমরা আমাদের দেশের সাওতাল প্রভৃতি আরণ্য জাতিদের ভিতর পুষ্পানুরাগ যেরূপ প্রবল দেখিয়াছি, আফ্রিকার চিররহস্যাবৃত দুর্গম বক্ষের অধিবাসী অসভ্য নরনারীদের মধ্যেও সেইরূপ পুষ্পপ্রীতিই লক্ষিত হইয়াছে। পুষ্পের সমাদর সভ্যসমাজেও স্বল্প নহে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশের সভ্য সমাজের বিলাসী ও বিলাসিনীদের ভিতর ফুলের অত্যন্ত আদর আবহমানকাল রহিয়াছে। যোগী ও ভোগী, ভক্ত ও পাপাসক্ত ফুলের সমাদর সকলের কাছে। সকল কালে এবং সকল দেশে পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ পুষ্প। পুষ্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতাও এইখানে। যেখানে কেহই উঠিতে পারে না ফুল সেখানে অনায়াসে উঠিয়া যাবে 'গন্ধপুষ্প'রূপে দেবতার মস্তকে ইহা স্থান পায়। দেবার্চ্চনায় অপরিহার্য্য উপকরণ পুষ্প। পঞ্চোপচার হইতে চতুঃষষ্ঠি উপচার পর্য্যন্ত সর্ব্ব-প্রকার পূজাতেই পুষ্প প্রয়োজন। মল্লিকা, মালতী, জাতি,

কাশ্মিরী পদ্ম

যুথী, চম্পক, অশোক, পদ্ম, পুগ, পুন্নাগ, কুহরী, কহ্লার—প্রধানতঃ ইহারাই পূজার উপকরণরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মধ্যে পুষ্পরাজ পদ্মই শ্রেষ্ঠ। পুষ্পরাজ্যে পদ্মের স্থান—পদ্মের গৌরব শুধু অদ্বিতীয় নয় অতুলনীয়। সেই জন্য আমরা পদ্মের বিষয় কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে বলিব।

ভারতের ভাষা ও সভ্যতার সহিত পুষ্পরাজ পদ্ম ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট এই সত্য আমরা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি। ভারতের কাব্যে ও সঙ্গীতে আমরা পদে

পদে পদ্মের উল্লেখ দেখিতে পাই। এমন কি ভারতের ধর্ম্ম ও আধ্যাত্ম সাধনার সঙ্গেও পদ্মের অপূর্ব্ব সম্পর্ক। আমরা এই সম্পর্কের কথা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে পদ্মের সহিত অন্যান্য দেশের সম্বন্ধের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে চাই।

পদ্মের গ্রীক নাম লোটস (Lotos) ল্যাটিন নাম লোটাস (Lotus) এবং সাধারণ বৈজ্ঞানিক নাম নেলাম্বো (Nelumbo)। গ্রীক লোটস শব্দের দ্বারা শুধু পদ্মপুষ্পকেই বুঝাইত তাহা মনে হয় না। গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীগুলি পড়িলে মনে হয় তাহারা বিভিন্ন বৃক্ষকে—ফুল ও ফলকে লোটস আখ্যায় অভিহিত করিত। লোটস নামক একপ্রকার ফল গ্রীকগণের দ্বারা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। এই ফলের ল্যাটিন নাম 'জিজিফাস লোটাস।' দক্ষিণ ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকায় এই ফল আজিও জন্মায়। এই ফল হইতে একপ্রকার রুটি ও মদ্য তৈয়ারী করা যায়। প্রাচীনকালে দক্ষিণ ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকার দরিদ্রদিগের খাদ্য-তালিকায় ইহা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিত বলিলে ভুল হয় না। মহাকবি হোমার যে 'লোটাসইটার'দিগের কথা কহিয়াছেন তাহারা পদ্মপুষ্প খাইত না, এই ফল খাইত বলিয়া আমাদের মনে হয়। 'ওডিসি'তে আছে, লোটাস ইটাররা অতিথি-অভ্যাগতকে এই ফল খাইতে অনুরোধ করিত—যাহারা খাইত তাহারা গৃহ-পরিবার সব ভুলিয়া যাইত এবং আরও খাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িত। অনেকে অনুমান করেন লোটাস ফল হইতে প্রস্তুত মদ্য তাহাদিগকে পান করান হইত বলিয়াই তাহাদিগের স্মৃতিভ্রংশ জন্মিত।

এই জিজিফাস জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ ভারতেও জন্মায়। ইহাকে জুজুবে বৃক্ষ বলা হয়। ইহার ল্যাটিন নাম 'জিজিফাস জুজুবা।' বিশেষ শক্ত বলিয়া ইহার কাষ্ঠে লাঙ্গল প্রস্তুত করা হয়। ইহা হইতে প্রস্তুত কাঠ-কয়লা দীর্ঘকাল স্থায়ী আহারের জন্য আদৃত হয়। প্রকৃত পক্ষে ইহা একপ্রকার বন্যবদর বৃক্ষ বা বুনো কুল গাছ। প্রসিদ্ধনামা প্রাচীন পর্য্যটক মার্কো পোলো ইহাকে 'পোমাম্ আদামি' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। দক্ষিণ ইউরোপের জিজিফাস-লোটাস-বৃক্ষের ফলের মত এই গাছের ফলকেও চূর্ণ করিয়া রুটি ও মদ্যে রূপান্তরিত করা চলিতে পারে এবং কোন কোন প্রদেশের অধিবাসীরা করিয়াও থাকে। 'ডিয়সপাইরস লোটাস' নামক বৃক্ষের ফল ডেট-প্লামও ইউরোপে 'লোটাস' আখ্যায় অভিহিত হয়।

যে জলজ পুষ্পকে আমরা পদ্ম বলি তাহা ইউরোপীয় ভাষায় লোটাস নামে অভিহিত হয়, ইহা বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ইউরোপীয়রা কোন কোন পদ্মকে 'ওয়াটার লিলি'ও বলিয়া থাকে। একপ্রকার নীলোৎপলকে ইহারা 'ব্লু ওয়াটার লিলি' বলে। ইহার ল্যাটিন নাম 'নিমফাইয়া ষ্টেল্লাটা'। এই নীলবর্ণ পদ্ম পুষ্পের পাপড়ি বা দলগুলি তারকার ন্যায় আকার বিশিষ্ট বলিয়া বিশেষ চিত্তাকর্ষক। মিশর দেশের জলজ-লিলিকেও লোটাস বলা হয়। ইহাও একপ্রকার পদ্ম। ল্যাটিন নাম 'নিমফাইয়া লোটাস'। নীলনদে এবং মিশরের অন্যান্য নদ-নদীতেও ইহা জন্মায়। এই মিশরীয় পদ্মপুষ্পগুলির আকার বৃহৎ এবং বর্ণ শুভ্র। ইহারা জল হইতে প্রায় দুই ফিট উচ্চে ফুটিয়া থাকে। মিশরের মান্‌জালেহ্‌ নামক হ্রদের তীরবাসী নরনারী এই পদ্মের মূলগুলি খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। ডামিয়েটার নিকটবর্ত্তী ছোট ছোট নদীগুলিতেও এই পদ্মের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরের প্রসিদ্ধ পদ্ম ইহারাই। মৃদু মধুর মনোমদ গন্ধের জন্য এই পদ্ম প্রাচীন মিশরে বিশেষ সমাদৃত ছিল। শুধু যে মিশর-বাসী বিলাসী-বিলাসিনীরা এই পদ্ম-পুষ্পের মালা গলায় দোলাইত তাহা নহে, জনসাধারনও সুবিধা পাইলেই ইহা ধারণ করিত। মিশরীয় মহিলারা পদ্মপুষ্পের মাল্যে মস্তক মণ্ডিত করিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিত। মিশরের প্রাচীন চিত্রলিপি বা হায়রো গ্লিফিক্সের ভিতর আমরা প্রায়ই পদ্মের চিত্র অঙ্কিত দেখি। প্রাচীন স্তম্ভশ্রেণীর গাত্রেও প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্প উৎকীর্ণ দেখা যায়। কোন কোন স্তম্ভের ক্যাপিটাল বা শীর্ষদেশের সমস্তটাই পদ্মাকার। প্রাচীন মিশরের দেববাদের সঙ্গেও পদ্মের সম্পর্ক আছে। ইহা নেফেরতুম (Nefertum) নামক দেবতার প্রতীকরূপে পূজিত হইত। মিশরীয় সৌরবাদ বা সূর্য্যার্চ্চনার সহিত পদ্মের সম্বন্ধের কথা উল্লেখযোগ্য। এই সৌরবাদ সম্রাট আখেনেটনের সময়ে এক অপূর্ব্ব পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তেল-এল-আমার্ণা নামক স্থানে আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষের ভিতর আমরা সেই অধ্যাত্ম প্রধান সূর্য্য পূজার যে অপূর্ব্ব নিদর্শনসমূহ দেখিতে পাই তাহা ভারতীয় প্রভাবের বার্ত্তাই বিজ্ঞাপিত করে। সবিতৃমণ্ডলকে প্রস্ফুটিত শতদল কল্পনা করা ভারতের নিকট হইতেই মিশর শিখিয়াছিল সে বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না।

পশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা এ বিষয়ে উল্টা কথাই কহিয়াছেন। তাঁহাদের মতে মিশরের নিকট হইতে ভারতবর্ষ শিল্পে পদ্মের ব্যবহার শিখিয়াছিল। পদ্মকে দেবতার প্রতীক কল্পনা করার প্রথার প্রবর্ত্তক প্রাচীন মিশর, ইহাও প্রতীচ্য পণ্ডিতদের একান্ত ভ্রান্ত ধারণা। ভারতের ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম সাধনার সহিত প্রকৃত পরিচয় নাই বলিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছেন। পদ্ম এবং পদ্মবাদের বিচিত্র লীলাক্ষেত্র ভারতবর্ষ এই সত্য সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

পদ্ম শীতপ্রধান দেশের পুষ্প নয়। তবে লোটাস নাম ধারী কোন-কোন ফুল বৃটেন প্রভৃতি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল বা

টেম্পারেট জোনের অন্তর্গত দেশেও দেখা যায়। বৃটেনের লোটাসকে বৃক্ষতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতরা লেগুমিনোসি জাতীয় বৃক্ষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার লাটিন নাম 'লোটাস-কর্ণিকুলাটাস।' ইংরেজরা এই জাতীয় গাছগুলিকে বার্ডস্ ফুট, ক্রোজ ফুট প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া থাকে। পীতাভ-পুষ্পশালী এই উদ্ভিদ বালুকাবহুল জমিতে জন্মায়। ইংলণ্ডের গল্‌ফ খেলার ময়দানে, গোচারণের মাঠে এবং পল্লী-গ্রামের পতিত জায়গায় এই ফুলের গাছ প্রায়ই দেখা যায়।

এশিয়ার উষ্ণ দেশগুলিতে যে সকল পদ্মপুষ্প জন্মায় তরুতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতরা তাহাদিগকে 'নেলাম্বোনুসিফেরা' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। ইহা বোটানী অনুসারে 'নিম্ফাইয়াসাইয়া' শ্রেণীর বৃক্ষ। এই পরম-রমণীয় পুষ্পগুলি প্রকৃত পদ্ম সে বিষয়ে সংশয় নাই। এই পুষ্পতরুর পাতা-গুলি অনেকটা পূর্ব্ববর্ণিত জলজ লিলির পা[illegible] মত। ভারতীয় পদ্মও এই শ্রেণীভুক্ত। উত্তর [illegible]ফ্রিকায় এবং উত্তর অষ্ট্রেলিয়াতেও এই জাতীয় পুষ্প-বৃক্ষ জন্মায়। এই বৃক্ষের অতি প্রাচীনতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুদূর প্রাগৈতিহাসিক সময়ে—এমন কি টার্শারী (Tertiarey) যুগে এই বৃক্ষ বিকাশ ও বিস্তার বা প্রচার লাভ করিয়াছিল। প্রসিদ্ধনামা প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক পীথাগোরাস ইহাকে 'বীন' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। চীনবাসীরা ইহাকে 'লিয়েন হোয়া' আখ্যা দিয়াছে। ভারতীয় ভাষায় বা সংস্কৃতে ইহার অসংখ্য নাম। পদ্মের এত প্রতিশব্দ কোন দেশের কোন ভাষায় নাই। এই অগণিত নাম হইতে ভারতবর্ষের সহিত পদ্মের নিবিড় সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরে পদ্ম শুধু সূর্য্যের প্রতীকরূপে নয়, উর্ব্বরতা বা জনন-শক্তির প্রতীকরূপেও পূজিত হইত। এ বিষয়েও ভারতবর্ষই পথ-প্রদর্শক বলিয়া আমাদের মনে হয়। প্রাচীন মিশরের শস্য-দেবতা অসিরিস ও আইসিসের মূর্ত্তির মস্তকে আমরা উৎকীর্ণ পদ্মপুষ্পে মণ্ডিত দেখি। কিন্তু ভারতে দেবতাদের শিরোভূষণরূপে পদ্মের ব্যবহার দেখা যায় না, পদ্ম এদেশে দেব-দেবীদের পাদ-পীঠ ও উপবেশনের আসনরূপেই অধিক ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

আমরা উপরে 'নেলাম্বো নুসিফেরা' শ্রেণীর পদ্মের কথা কহিলাম। ইহা ছাড়া (নেলাম্বো বৃক্ষের) আর একটি শ্রেণীও রহিয়াছে। ইহার নাম নেলাম্বো লুটিয়াম। ইহা প্রধানতঃ উত্তর আমেরিকায় দেখা যায়। ইহাদের পুষ্পগুলি পীত বা হরিদ্রাবর্ণবিশিষ্ট। উত্তর আমেরিকার আদিবাসীরা এই পদ্মকে খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিত 'নেলাম্বো নুসিফেরা'ও কোন কোন দেশে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষেও পদ্মকন্দ অর্থাৎ পদ্মের মূল বা শালুক খাওয়ার প্রথা প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আয়ুর্ব্বেদে ফুল ও মূল উভয়ের গুণই বর্ণিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রমতে পদ্মপুষ্প কষায় মধুর রস, শীতল ও বর্ণ-বর্দ্ধক এবং পিত্ত, কফ, তৃষ্ণা, দাহ, বিস্ফোট, বিসর্প ও বিষ-দোষনাশক। পদ্মের মূল বা শালুক—শুক্র বর্দ্ধক, স্তন্য বর্দ্ধক, মলরোধক, পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা প্রশমক এবং রক্তস্রাব নবারক। বৈজ্ঞানিকগণ ভারতীয় পদ্মকে 'নেলাম্বিয়াম-স্পেশিয়োসাম' বা 'স্যালভাডোরা ইণ্ডিকা' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। ভারতে শ্বেতপদ্ম অপেক্ষা লোহিতাভ পদ্মই অধিক। অবশ্য গাঢ় লাল নয়, গোলাপী লাল।
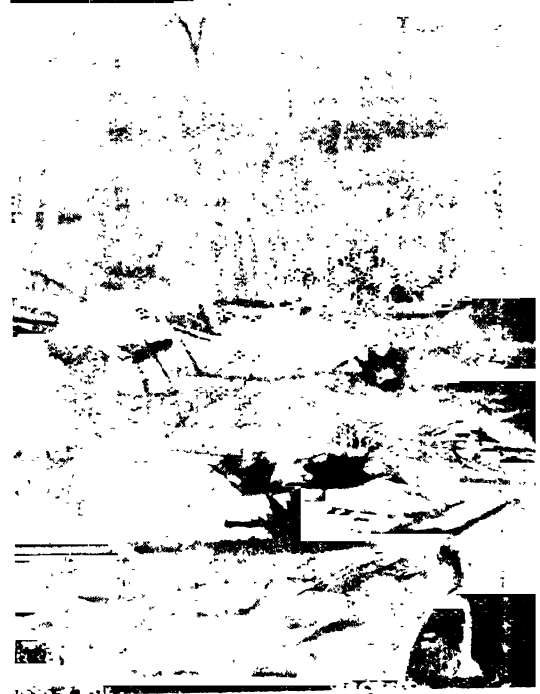
কাশ্মীরের প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্পপুঞ্জের একটি দৃশ্য

পদ্ম-পুষ্প ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই স্বল্প-বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু যাঁহারা এই কুসুমের কমনীয়তম মূর্ত্তি দেখিতে চান তাঁহাদিগকে ভূস্বর্গ কাশ্মীরে যাইতে হইবে। কাশ্মীরী কমলের কমনীয় কান্তি একবার দেখিলে বিস্মৃত হইবার নহে। মন্দ মন্দ আন্দোলিত নির্ম্মল নীল জলের উপর বিস্তৃত প্রশস্ত পদ্ম-পত্রগুলিকে ঈষৎ-কম্পিতকায় কমনীয় কার্পেট বলিয়া মনে হয়। সেই নিসর্গ-নির্ম্মিত নিরুপম

কার্পেটের উপর ক্রীড়া করে নানাবর্ণের জলচর বিহঙ্গম। সেই নেত্ররঞ্জন পত্রপুঞ্জ হইতে উত্থিত কান্তদর্শন বৃন্তের উপর প্রস্ফুটিত এক একটি পুষ্প যেন এক একটি স্বতন্ত্র বস্তু। যেন কোন দিব্যদ্যুতি ভাস্বর দেবতার পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিবার জন্য ইহারা ব্যগ্র-আগ্রহে দিব্য লোকের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। ব্যষ্টিভাবে দেখিলেও ইহারা পরমসুন্দর কিন্তু ইহাদের সমষ্টিগত সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত। সেরূপ চিত্তরসায়ন নেত্রোৎসব দৃশ্য পৃথিবীতে অল্পই দেখা যায়। কাশ্মীরের হ্রদাবলীর বক্ষে মনোমদ কোকনদ-কানন যিনি না দেখিয়াছেন তাঁহার পক্ষে কাশ্মীর ভ্রমণ সম্পূর্ণ সার্থক হয় নাই, আমরা ইহাই মনে করি। স্নিগ্ধকর বলিয়া গ্রীষ্মকালে কাশ্মীরীরা পদ্মের পত্র ও মূল অর্থাৎ শালুক খাইয়া থাকে। কাশ্মীর এবং পশ্চিম ভারতের অন্যান্য প্রদেশে পদ্ম কম্বল বা কম্বল (অর্থাৎ কমল) আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। কাশ্মীরীরা পদ্মের পাতা ও নাল হইতে যে সুস্বাদু তরকারী তৈয়ারী করে তাহা সত্য সত্যই উপভোগ্য। আমরা কাশ্মীরের সকল শ্রেণীর লোককেই এই তরকারী খাইতে দেখিয়াছি।

পদ্মের শিকড়ও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। সিদ্ধ করিলে এই শিকড় ঈষৎ হরিদ্রাভ হইয়া থাকে। তখন ইহা খাইতে মিষ্ট। কতকটা শালগমের মত। কাশ্মীরীরাও পদ্মের সিদ্ধ শিকড়কে খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। ইহা ছাড়া শিকড়কে চূর্ণ করিলে শটী বা এরারুটের ন্যায় যে পদার্থ পাওয়া যায় তাহা ফুটাইয়া দুগ্ধ ও চিনি যোগে উপাদেয় আহার্য্যে পরিণত হয়। মলরোধক গুণ আছে বলিয়া এই শ্বেতসার প্রধান পদার্থ উদারাময়ে বার্লি ও এরারুটের পরিবর্ত্তে পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। নুন এবং ভিনিগারের সাহায্যে (আচারের ন্যায়) সংরক্ষিত সিদ্ধ শিকড় ভাতের সহিত খাওয়ার প্রথাও কাশ্মীরে প্রচলিত।

পদ্মের একটি নাম শতদল। এই বহুদল বা পাপড়িই ইহার শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। সেই জন্য ইহা পুষ্পরাজ। ইহার ভিতর আমরা স্রষ্টার পুষ্প-সৃষ্টি-কৌশলের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। এক একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্প যেন পুষ্প-জগতের এক একখানি এপিক বা মহাকাব্য। অন্যদিকে ছোট ছোট জুইগুলি যেন কুসুমলোকের এক একটি সনেট বা চতুর্দ্দশ-পদী। আমরা দূর অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রাচীন সভ্যতার লীলাস্থলী দেশসমূহের শিল্প-সংসারে পদ্মের প্রবল প্রভাব দেখিতে পাই। অবশ্য ভারতবর্ষ এ বিষয়ে অগ্রণী। ভারতের নীচে মিশর, মিশরের নীচে পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতার অভিনয়ভূমি দেশসমূহ—যেমন বাবিলন, আসীরিয়া, ফিনিসিয়া, মিত্তানী এবং হিত্তাইতদের দেশ। আমরা মিশরীয় শিল্পে পদ্মের প্রভাবের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মিশরে নীলনদ জীবনী শক্তিদায়ক বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। সেই নীলনদে জন্মানর জন্য পদ্মও প্রাণদ শক্তির প্রতীকরূপে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছে। আসীরিয়ায় পদ্ম বৃক্ষ পবিত্র-পাদপরূপে পূজিত হইত এবং পদ্মপুষ্প দিব্যশক্তির প্রতীক বলিয়া গণ্য হইয়াছে। নিনেভে প্রভৃতি নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতে আসীরিয়ান শিল্পে পদ্মের প্রভাব কতখানি তাহা আমরা জানিতে পারি। মিশরের ন্যায় ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ববর্ত্তী দেশসমূহের প্রাচীন শিল্পীরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্তম্ভশীর্ষে পদ্মচিত্র উৎকীর্ণ বা অঙ্কিত করিয়াছে। কোথাও পূর্ণ বিকশিত পদ্ম, কোথাও পদ্মকোরক, কোথাও অর্দ্ধ পদ্ম রচিত রহিয়াছে। বিস্ময়কর সমীকরণ শক্তিবলে গ্রীকগণ মিশরাদি দেশের শিল্পকলাকে আয়ত্ত করিয়া নিজস্ব সম্পদে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রাচীনতর দেশসমূহে যাহা প্রধানতঃ ভাস্কর্য্যের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত গ্রীকরা তাহাকে চিত্রকলাতেও প্রকাশিত করিয়াছে। গ্রীকের স্থাপত্য কীর্ত্তিসমূহের মধ্যে আমরা যে পদ্মচিত্র অঙ্কিত দেখি তাহা অনুকরণ হইলেও অঙ্কননৈপুণ্যের পরিচায়ক। পরে গ্রীক ও ভারতীয় শিল্পাদর্শের সম্মেলনে গান্ধার আদর্শ (Gandhar School) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কুশান বংশীয় সম্রাট কনিষ্কের সময় এই আদর্শ বিশেষ প্রসার বা বিকাশ লাভ করিয়াছিল। এই সময় প্রাচীন পদ্মবাদ বুদ্ধ-বাদের মহাযান মতের সহিত সম্মিলিত হইয়া অভিনব পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিলে ভুল হয় না। মধ্য এশিয়ায় আবিষ্কৃত অবলোকিতেশ্বর, পদ্মপাণি প্রভৃতি বুদ্ধমূর্ত্তির মধ্যে আমরা ভারতীয় পদ্মবাদের প্রভাবই দেখিতে পাই। পরে রোমানরা গ্রীকদিগের নিকট হইতে পদ্মপুষ্পকে শিল্পাদর্শ রূপে গ্রহণ করিতে শিখিয়াছিল। এইরূপে শিল্পে পদ্মের প্রভাব দেশ দেশান্তরে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতে অন্যূন ৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিশরদেশে পদ্মবাদ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্য নহে। খৃষ্টাবির্ভাবের ৪ হাজার বৎসর অথবা তদপেক্ষাও পূর্ব্বে রচিত প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্যেও আমরা পদ্মের উল্লেখ দেখিতে পাই। আমাদের বিশ্বাস পদ্মবাদ সবিতৃবাদের সমবয়সী। ভাবপ্রবণ আদিম বৈদিক ঋষিগণ পূর্ব্বাকাশে প্রকাশমান রমণীয় রক্তবাসে রঞ্জিত সবিতৃমণ্ডলকে মহাশূন্যে অকস্মাৎ অভিব্যক্ত অপরূপ রক্তপদ্ম বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। এই কল্পনাই পদ্মবাদের জন্মক্ষেত্র। সভ্য মানবের পক্ষে সর্ব্বপ্রথম সূর্য্যকেই ভগবদ্বিগ্রহ রূপে অর্চ্চনা করা স্বাভাবিক। সূর্য্যবাদ ক্রমশঃ বিষ্ণু বাদে পরিণতি পায়। উভয় মতবাদের সঙ্গেই পদ্মের অপূর্ব্ব সম্পর্ক। ক্রমশঃ সমগ্র দেববাদের ও অধ্যাত্মতত্ত্বের সঙ্গে জড়িত হইয়া পদ্মবাদ ভারতবর্ষে বিস্ময়কর বিকাশ ও পরিণতি লাভ করে।

ভারতবর্ষীয় সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত পদ্মের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা পৌরাণিক আখ্যায়িকা সমূহের সহিত পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। প্রথমে ছিল অনন্ত জলরাশি। সেই কারণ-সমুদ্রে সৃষ্টি পদ্মের ন্যায় ফুটিয়া উঠিল। অথবা সেই অনন্ত কারণার্ণবে ফুটিয়া উঠিল একটি প্রকাণ্ড পদ্ম। সেই পদ্মই এই জগৎ। আর একটি অপূর্ব্ব পরিকল্পনা—অনন্ত সলিল রাশিতে নারায়ণ শয়ন করিয়া আছেন—তাঁহার নাভি হইতে উত্থিত হইয়াছে একটি কমনীয় কমল—সেই কমল হইতে জন্ম লইলেন বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা। সেইজন্য বিষ্ণু বা নারায়ণ পদ্মনাভ— ব্রহ্মা পদ্মযোনি এবং এই সৃষ্টি পদ্ম-সম্ভবা। বিষ্ণু শুধু পদ্মনাভ ন'ন, তিনি পদ্মপাণিও বটেন। তাঁহার এক হাতে শঙ্খ, অন্য হাতে পদ্ম। দুটিই জলজ। পূর্ব্বাকাশে প্রকাশমান দিব্যদর্শন দ্যুতিচক্র বা জ্যোতির্ম্মণ্ডলকে রক্তপদ্ম কল্পনা করার কথা আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছি। সূর্য্যের সহিত পদ্মের সম্বন্ধ এইখানেই শেষ নহে। সেই রক্তপদ্মোপম সবিতৃমণ্ডলের মধ্যে 'সরসিজাসনে'-আসীন নারায়ণ আমাদের দৈনন্দিন ধ্যানের সামগ্রী। সূর্য্যকে ভূলোক-প্রাণ দ্যুলোক-চারী আলোক-গোলক না ভাবিয়া যখন তাঁহাকে আমরা কর চরণ বিশিষ্ট দিব্য দেহ দেবতা মনে করিয়া ধ্যান করি তখন শুধু তাঁহার 'রক্তাম্বুজাসন' মূর্ত্তি আমাদের মানস-নয়নের সম্মুখে আনিতে চেষ্টা করি না তাঁহার কর কমলযুগলে দুইটি কম-কান্তি বিকচ কমল কল্পনা করিতেও হয় (পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈ)। নারায়ণের পত্নী বা শক্তি যিনি সেই লক্ষ্মী দেবীকে আমরা পদ্মা, পদ্মজা, পদ্মাসনা ও পদ্মালয়া বলিয়া জানি। এমন কি তিনি পদ্মপাণিও বটেন। 'বিভ্রাণাং বরমব্জযুগ্মম্' অর্থাৎ তাঁহার দুই হস্তে দুইটি সুন্দর অরবিন্দ।

যিনি বাক্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সেই শুভ্রকান্তি সরস্বতীর ধ্যান-মূর্ত্তি 'সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে' (শ্বেতপদ্মে সমাসীনা) সকলেরই সুবিদিত। শুধু তাহাই নয়, সরস্বতীর হস্তেও পদ্মদ্বয় (করৈর্জ্জপ বটিং পদ্মদ্বয়ং পুস্তকং) এইরূপে আমরা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব ভারতের অধিকাংশ দেবতাই পদ্মাসীন ও পদ্মপাণি। ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে শুধু ব্রহ্মা ও বিষ্ণুই পদ্মাসন নন, শঙ্করও পদ্মাসীন (পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈ র্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং)। দেবরাজ ইন্দ্রেরও 'বজ্র পদ্ম-করং' মূর্ত্তি ধ্যান করিতে হয়। আমরা পদ্মানুসন্ধানে ভারতের বিচিত্র ও বিরাট দেববাদের বক্ষে যতই প্রবেশ করিব ততই পদ্মের সহিত ইহার অপূর্ব্ব সম্পর্ক আমাদিগকে বিস্ময়াভিভূত করিবে। প্রাকৃতিক পদার্থ পুঞ্জের মধ্যে এই পরম রমণীয় পুষ্পই সর্ব্বাপেক্ষা দিব্যভাবাপন্ন দ্রব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। ইহার এই অতুলনীয় গৌরব বা মর্য্যাদা বৃহত্ত্ব ও বর্ণরাগের জন্য ন পৃথিবীতে পদ্ম অপেক্ষাও বৃহত্তর পুষ্প আছে। যাহাদের বর্ণৈশ্বর্য্য পদ্ম অপেক্ষা অধিক এরূপ ফুলও রহিয়াছে। পদ্মের বৈশিষ্ট্য—ইহার চক্রের ন্যায় চমৎকার আকার, পরম্পর সুন্দর সুসমঞ্জসভাবে গ্রথিত কোমল ও কমনীয় দলগুলি, ইহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় তর্পণ অনুগ্র মৃদু মধুর স্নিগ্ধ গন্ধ। দেব দেবীদের দেহ হইতে পদ্মগন্ধ বাহির হয়। নরনারীর মধ্যে যাহারা দিব্যভাবাপন্ন তাঁহাদের দেহেও পদ্মগন্ধ। আদি কবি বাল্মীকি রাম ও সীতার সৌন্দর্য্য প্রসঙ্গে পদ্মগন্ধি শব্দ বহুবার ব্যবহার করিয়াছেন। অপরূপ রূপের উপমানরূপে কাব্যে ও পুরাণে পদ্মই পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। পদ্মের ন্যায় মুখ, পদ্মের ন্যায় চোখ, পদ্মের ন্যায় হস্ত, পদ্মের ন্যায় পদদ্বয়—যেন কবিরা প্রকৃতির বুকে পদ্মাপেক্ষা সুন্দরতর আর কিছু পান
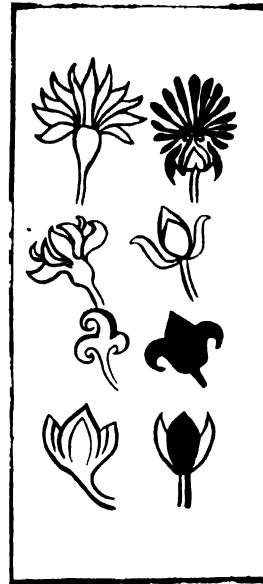
অজন্তার চিত্রের প্রতিচ্ছবি ও আল্পনা

অজন্তার পদ্ম

নাই। যাহা পবিত্র প্রেমলীলার পরাকাষ্ঠা বলিয়া পরিগণিত হয় সেই রাস লীলার সময় কৃষ্ণবিরহ-বিহ্বলা ব্রজগোপিকারা যখন কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতেছেন তখন কৃষ্ণের 'কান্তকর সরোরুহ', 'নলিন-সুন্দরপদ', 'চারুজলরুহানন', 'পদ্মচর্চ্চিত চরণ-পঙ্কজ' তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ মনে পড়িতেছে।

হিন্দুর দৈনন্দিন জীবনের সহিত পদ্মের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। পদ্ম ও পদ্মার্থবাচক অন্যান্য শব্দসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা ভগবানের নাম ধ্যান ও পূজা করিতে পারি না। নিত্য স্নানের সময় আমাদিগকে শারীরিক ও মানসিক শুচিতা কামনা করিয়া 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং' ইত্যাদি বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পরমদৈবত বিষ্ণুকে স্মরণ করিতে হয়। এই বেদমন্ত্রের পরে পবিত্র হইবার জন্য অপর যে মন্ত্রের আবৃত্তি

অবশ্য করণীয় উহাতেই আছে—'যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যান্তরঃ শুচিঃ। প্রত্যেক পূজার পূর্ব্বে এই পুণ্ডরীকাক্ষ শব্দযুক্ত পাবন-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পদ্মনেত্র নারায়ণকে স্মরণ না করিলে পূজা করিবার যোগ্যতা জন্মে না। মন্ত্র শব্দময়। মন্ত্রের শক্তি স্বীকার করিতে হইলে শব্দের শক্তিও স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং যদি বলা যায় 'পুণ্ডরীকাক্ষ' এই শব্দটির শারীরিক ও মানসিক মালিন্য নাশের শক্তি আছে তাহা হইলে বোধ হয় ভুল বলা হইবে না। নিত্য প্রাতঃ সন্ধ্যাকলে 'ওঁ নত্বা তু পুণ্ডরীকাক্ষং' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করার কথাও অনেকেই জানেন। এখানেও উদ্দেশ্য অন্ত বা পাপ নাশ এবং ব্রহ্মবর্চ্চ বা ব্রহ্মতেজ লাভ। আমরা একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম। পদ্মার্থবাচক শব্দবিশিষ্ট অসংখ্য মন্ত্র ভারতবর্ষের অপূর্ব্ব ভাবসম্ভার ভূষিত ভাণ্ডারে রহিয়াছে। পদ্ম ভারতীয় ভাষার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যও বিশেষভাবে বাড়াইয়াছে। এমন শতাধিক শব্দ ভারতবর্ষীয় ভাষায় আছে যাহাদের অর্থ পদ্ম। এত প্রতিশব্দ বোধ হয় কোন শব্দেরই নাই। সাধারণ নাম ছাড়া বর্ণভেদে নাম ভেদের কথা উল্লেখযোগ্য। যেমন শ্বেতপদ্মকে পুণ্ডরীক, রক্তপদ্মকে কোকনদ ও নীলপদ্মকে কুবলয় বলা হয়। সেইজন্য পুণ্ডরীকের ন্যায় পদতল বলা চলে না। পদতলের সহিত কেবল কোকনদের তুলনা করা চলে।

পদ্মপুষ্পের ন্যায় পদ্মপত্রও উপমানরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন কবিরা সাধারণতঃ আয়ত নেত্রের সহিত পদ্মপত্রের তুলনা করিয়াছেন। আমরা আদিকবি বাল্মীকিকে 'পদ্মপত্রায়তেক্ষণ' শব্দ বহুবার ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। এই পবিত্র ও বিচিত্র পুষ্পের পত্র ছাড়া অন্যান্য প্রধান অঙ্গগুলিও কাব্যে ও কলায় স্থান লাভ করিয়াছে। পদ্মের ডাঁটা বা মৃণাল, বীজকোষ বা কর্ণিকা, কেশর (পরাগ বা রেণু) বা কিঞ্জল্ক, পাপড়ি বা দল ও বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সৃষ্টিকুশলী শিল্পীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে। সকল কমলই শতদল নহে—এই সত্যও উল্লেখযোগ্য। শিল্পীরাও বিভিন্নদলশালী পদ্ম অঙ্কিত ও উৎকীর্ণ করিয়াছেন।

আমরা দুই প্রকার পদ্ম দেখিতে পাইতেছি—প্রাকৃতিক ও দিব্য। যে পদ্ম এই নিত্য প্রত্যক্ষ অনিত্য জড়জগতের জলরাশিতে ফুটিয়া উঠে তাহাই প্রাকৃতিক পদ্ম। বিশ্বজগতের অধিবাসী দেবদেবী যে অপ্রাকৃত চিন্ময় পদ্মের উপর উপবেশন করেন বা যে পদ্ম তাঁহারা কমনীয় করকমলে ধারণ করেন তাহাই দিব্যপদ্ম। এই দুই প্রকার পঙ্কজের মধ্যে অগ্রজ কে, এইরূপ জিজ্ঞাসা জাগ্রত হওয়া অসম্ভব নয়। অপ্রাকৃত না প্রাকৃত, কে আগে? আমরা একটু গভীরভাবে ভাবিলেই বুঝিতে পারিব অপ্রাকৃত চিন্ময় লীলা-পদ্মই পূর্ব্বজ। পৃথিবীর পদ্ম অপার্থিব লীলাপদ্মের অনুকৃতি।

এইবার আমাদিগকে পদ্মের সন্ধানে তত্ত্ব বা অধ্যাত্ম জগতে প্রবেশ করিতে হইবে। আমাদের অধ্যাত্ম-সাধনা বা ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতির সহিত অপ্রাকৃত বা দিব্য পদ্মের বিস্ময়কর সম্পর্ক। এই পদ্মরহস্য পূর্ণভাবে প্রকাশ বা প্রচার করিয়াছেন তন্ত্রাচার্য্যগণ তন্ত্রনামক গ্রন্থসমূহে। আত্মতত্ত্ব জানিতে হইলে নিগম ও আগম বেদান্ত ও তন্ত্র উভয় শ্রেণীর গ্রন্থই অধ্যয়ন প্রয়োজন। আমাদের দেশে 'দেহতত্ত্ব' বলিয়া একটা কথা আছে। এখানে আত্মতত্ত্বই দেহতত্ত্ব। আমাদের এই জরামরণশীল জড়দেহের অভ্যন্তরে বিস্ময়কর রহস্যসমূহ বিরাজিত রহিয়াছে। এই দুর্ভেদ্য রহস্যরাজ্যের দ্বার তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্র সম্পর্কীয় সাধনার সাহায্যে বা পতঞ্জলি প্রদর্শিত পথে চলিলে উন্মুক্ত হয়। আসন ভিন্ন সাধন হয় না। আসনের মধ্যে পদ্মাসন শ্রেষ্ঠ। আমরা শঙ্কর বুদ্ধাদি যোগিগণাগ্রণ্যকে পদ্মাসনে বসিয়া সমাধি-সমুদ্রে নিমগ্ন দেখি। পদ্মাসন পদ্মপুষ্পের উপর উপবেশন নয়—একপ্রকার বসিবার প্রণালী। ইহাতে দক্ষিণ পদকে বাম উরুর উপর এবং বাম পদকে দক্ষিণ উরুর উপর রাখিতে হয়। যোগিগণের অবলম্বিত এই আসন রোগীরা অভ্যাস করিলে আরোগ্য লাভ করে বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে। সর্ব্বদা সোজা হইয়া বসিতে হয়। মেরুদণ্ড ঋজু না থাকিলে সুষুম্নার কাজ ঠিকভাবে হয় না।

আমাদের দেহে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই ত্রি-নাড়ী রহিয়াছে। মেরুদণ্ডের বামে ইড়া, ডাহিনে পিঙ্গলা এবং মধ্যস্থলে সুষুম্না। এই সুষুম্না মার্গের সাহায্যে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়। জীবের সহিত শিবের সংযোগ-সাধক এই বিস্ময়কর সূক্ষ্মাদানসূক্ষ্মবর্ত্ম যেখানে আরম্ভ হইয়াছে উহাকে মূলাধার বলা হয়। এই মূলাধারে একটি পদ্ম আছে। এই মূলাধার পদ্মের চারিটি দল। মলদ্বারের চার আঙ্গুল উপরে এই পদ্ম। এই পদ্মের কর্ণিকা বা বীজকোষের অভ্যন্তরে একটি ত্রিকোণাকৃতি চক্র আছে। এই চক্রের ভিতর কুল-কুণ্ডলিনী শক্তি সুষুপ্ত সর্পাকারে বিরাজিতা রহিয়াছেন। মূলাধার পদ্মের বর্ণ স্বর্ণের ন্যায়। ইহার পর এই সুষুম্নামার্গে স্বাধিষ্ঠান নামক ষড়-দল পদ্ম। এই পদ্মের বর্ণ বিদ্যুতের ন্যায়। স্বাধিষ্ঠান স্থানটি ঠিক লিঙ্গ-মূলে অবস্থিত। সুষুম্নাবর্ত্মে আরও আগাইয়া যাইলে নাভিদেশস্থ নীল-নীরদনিভ মণিপূরক নামক পদ্মে পৌঁছান যায়। এই পদ্ম দশ-দল। ইহার পর হৃদয় প্রদেশে অবস্থিত প্রবালকান্তি দ্বাদশ-দল অনাহতপদ্ম। কণ্ঠদেশে 'বিশুদ্ধ' নামক ষোড়শদলপদ্ম। ইহা ধূম্রবর্ণ। ইহার পর ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে চন্দ্রকান্তি আজ্ঞাপদ্ম। ইহা দ্বি-দল। তদনন্তর মস্তকস্থ সহস্রার নামক সহস্রদল-কমল-মূলে আসিয়া সুষুম্না-মার্গ শেষ হইয়াছে। এই তুষারশুভ্রকান্তি সহস্রদল কমলের

কণিকার অভ্যন্তরে পরমাত্মা বা পরমশিব বা পরমগুরু বিরাজিত রহিয়াছেন। সুষুম্নাস্থ ষড়পদ্ম বা ষট্‌চক্র (পদ্ম-গুলিকে চক্রও বলা হয়) ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনীশক্তি বা জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হন। এই সম্মিলনের জন্যই প্রাণায়াম, যোগ, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি সাধনা। অবশ্য প্রথমে সুষুপ্ত কুণ্ডলিনীকে প্রবুদ্ধ করা প্রয়োজন। ইহাই সাধনের প্রথম স্তর বোধন। মস্তকস্থ সহস্রদলকমল হইতে অমৃতোপম এক প্রকার রস নির্গত হয় বলিয়া যোগী যোগমগ্ন অবস্থায় দীর্ঘকাল না খাইয়া থাকিতে পারেন। এই নাড়ী ও পদ্মগুলি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মবস্তু—স্থূল চক্ষুর সম্পূর্ণ অগোচর—সাধক শুধু সমাধির সাহায্যে ইহাদিগকে দেখিতে পান। তন্ত্রে অকারাদি বর্ণের সহিত এই সকল পদ্মের নিগূঢ় সম্পর্কের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

মাতৃকাযন্ত্রের নাম অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। দীক্ষা লইবার সময় স্বর্ণ কিম্বা অন্য কোন ধাতুতে নির্ম্মিত পাত্রের গাত্রে এই যন্ত্র অঙ্কিত করিতে হয়। প্রথমে চারিটি দ্বার বিশিষ্ট একটি চতুষ্ক বা চতুষ্কোণ ক্ষেত্র অঙ্কিত করা প্রয়োজন। এই চতুষ্কের অভ্যন্তরে একটি অষ্টদলপদ্ম আঁকিতে হয়। পদ্মের কেন্দ্রস্থিত কণিকায় "হে সোঃ" এই মন্ত্র লিখিতে হয়। এই অষ্টদলপদ্মের এক একটি কেশরে দুইটি করিয়া স্বরবর্ণ এবং এক একটি দলে ব্যঞ্জনবর্ণের এক একটি বর্ণ লিখিবার প্রথা প্রচলিত। সপ্তদলে সপ্ত বর্গ এবং অবশিষ্টগুলিতে 'ল' ও 'ক্ষ' এই দুইটি অক্ষর লিখিতে হয়। চতুষ্কের চারিটি দ্বারে 'বং' এবং চারিটি কোণে 'ঠং' লেখা হয়। এই তান্ত্রিক যন্ত্র ও দীক্ষা-প্রণালীর ভিতর যে নিগূঢ় রহস্য ও উহার উদ্দেশ্য বিরাজিত রহিয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য। আমরা যাঁহাকে জগন্মাতা বলিয়া অর্চ্চনা করি—আদ্যাশক্তি, দুর্গা, কালিকা প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করি, শরৎ আসিলে প্রতিমা গড়িয়া গৃহে গৃহে যাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হই, তিনি সর্ব্ব-ব্যাপী ব্রহ্ম-শক্তি ব্যতিরেকে অন্য কিছু নহেন। সেই জন্য তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়া আমরা বলি—

"নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্য-পাদারবিন্দে।
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।"

মা বিশ্বব্যাপিনী তাই সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—

"নগরে ফির মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা-মা'রে।
যত শোন কর্ণ-পুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।"

আমরা মায়ের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছি এবং যাহা কিছু বলিতেছি বা শুনিতেছি সবই মায়ের নাম, ইহা অপেক্ষা উদার মতবাদ কি হইতে পারে জানি না। ইহাই তন্ত্রের মত। যেমন যিনি 'ব্যাবেষ্টি বিশ্বং ব্যাপ্নোতি' তিনিই বিষ্ণু, তেমনই দুর্গা জগদ্ব্যাপিকা ও বিশ্ব-রূপা। ব্রহ্ম ও শক্তি, কৃষ্ণ ও কালী অভিন্ন। তান্ত্রিক সাধনার সহিত গুরুবাদের সম্পর্ক আদিম বৈদিক সাধনা অপেক্ষা অধিক। অনেকে মনে করেন তান্ত্রিক মতবাদ বৌদ্ধধর্ম্মের পরিণতি বা বিকৃতি কিন্তু তাহা নহে। তন্ত্র নামে অভিহিত একশ্রেণীর গ্রন্থ আছে যাহাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃত সংস্করণ বলিলে ভুল হয় না। কিন্তু বিশুদ্ধ তন্ত্র

বুদ্ধবাদ ও পদ্ম

বেদান্তের রূপান্তর। বেদান্তের 'সোঽহমবাদ' তন্ত্রে স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। আমার চিৎ সত্তা বা চিৎ শক্তিই মূলাধার পদ্মে বিরাজিতা কুল-কুণ্ডলিনী। সুতরাং আমি এবং আমার উপাস্য দেবতা অভিন্ন। সমাধি বা সাধনার সাহায্যে এই সাম্য উপলব্ধি করা যায়। মস্তকস্থ সহস্রদল পদ্মে যিনি বিরাজিত তাঁহাকে পরমাত্মা, ব্রহ্ম, শিব বা গুরু সবই বলা যায়। যেমন তন্ত্রের দিক দিয়া কুণ্ডলিনী শক্তি ও আমি অভিন্ন তেমনই শিব ও গুরুর মধ্যে ভেদ নাই। সাধনার সহায়তায় আমিও শিবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারি। চিৎশক্তি বা কুণ্ডলিনীকে যোগবলে জাগাইয়া সমাধির সাহায্যে মূলাধার

হইতে সুষুম্না মার্গ দিয়া সহস্রারে লইয়া যাইতে পারিলে আমি শিবত্ব লাভ করিতে পারি। তখনই আমার বলিবার অধিকার জন্মিবে—চিদানন্দরূপঃ শিবোহম্ শিবোহম্। জীবের এই শিবত্ব প্রাপ্তিই তান্ত্রিক সাধনায়—তান্ত্রিক ষট্‌চক্র বা ষড়্‌পদ্ম ভেদের উদ্দেশ্য। বেদান্তের ব্রহ্ম তন্ত্রের কালীতে পরিণত হইয়াছে, এই সত্য রামপ্রসাদের সঙ্গীতে এবং যুগাবতার রামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক লীলায় যেমন জানা যায় তেমন আর কিছুতেই নহে। রামকৃষ্ণদেব একদিকে যেমন অদ্বিতীয় বৈদান্তিক, অন্যদিকে তেমনই অতুলনীয় তান্ত্রিক।

●

হয় তো কেহ মনে করিতে পারেন এই সকল কথা পদ্ম-প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু তাহা নহে। জীব-ব্রহ্মের শিব-শক্তির পুরুষ প্রকৃতির গুরু-শিষ্যের মহামিলন ভূমি 'কিঞ্জল্কগণ শোভিত সহস্রার-মহাপদ্ম'। এই আধ্যাত্ম পদ্মতত্ত্ব রামকৃষ্ণদেব অন্তরস্থ ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আধ্যাত্ম সাধনা সৌধের উচ্চতম তলে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চিৎসত্তা বা কুণ্ডলিনী শক্তি অতি সামান্য কারণেই মূলাধার হইতে সহস্রারে উঠিত। এই আরোহণই সমাধি। ঠাকুর বলিতেন মূলাধার হইতে ভ্রূমধ্যবর্ত্তী দ্বিদল পদ্ম পর্য্যন্ত আরোহণের অনুভূতি হয় তো বাক্যে প্রকাশ করা যায়, কিন্তু তার পরের 'অবস্থা অবাঙ্মনসোগোচরম্'—বাক্য মনের অগোচর। ঠাকুর কুণ্ডলিনীর আজ্ঞা চক্র হইতে সহস্রারে আরোহণ সময়ে অনুভূতির কথা বলিতে গিয়া অনুপম উপমার আশ্রয় লইতেন। যদি কোন পরিণিতা তরুণীকে তাহার সহচরী জিজ্ঞাসা করে, 'সখী! স্বামীসঙ্গের সময় কি প্রকার আনন্দ তুমি অনুভব কর' তাহা হইলে সেই তরুণী যেমন স্বামীসঙ্গসুখ বর্ণনার জন্য কোন প্রযত্ন না করিয়া বলিবে, স্বামীসঙ্গসুখ সম্ভোগ করিবার সময় তোমরাও উহা বুঝিবে, তেমনই সহস্রারে সঙ্ঘটিত এই মিলনানন্দ বাক্যে বুঝান যায় না। বুঝিতে হইলে সাধনা বা সমাধির সাহায্যে সেইরূপ অবস্থায় পৌঁছান প্রয়োজন। সাধক কবি রামপ্রসাদ কালীতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া গাহিয়াছেন—

"কে জানে কালী কেমন,
ষড় দর্শনে না পায় দরশন।
সে যে পদ্মবনে হংস সনে, হংসী হয়ে করে রমন।"

অতএব যিনি পরাপ্রকৃতিরূপা মাকে দেখিতে কামনা করেন তাঁহাকে অপ্রাকৃত পদ্মবনে সন্ধান করিতে হইবে। হৃদয়কে পদ্মের সহিত তুলনা পুনঃ পুনঃ করা হইয়াছে। সেই হৃদয়পদ্মকে পূর্ণ-প্রস্ফুটিত করিতে হইবে। তবেই হৃদয়-কমল মধ্যে নির্ব্বিশেষং, নিরীহং ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া ধন্য হইতে পারিব। হৃদয়স্থ অনাহত পদ্ম হইতে সহস্রবেণু বীণার ন্যায় অপূর্ব্ব ঝঙ্কার অবিশ্রান্ত নির্গত হইতেছে। অনন্যমনা যোগীই এই সঙ্গীত শুনিতে পায়। কৃষ্ণের উন্মাদনাময় ভুবন-মোহন বেণু অনাহত পদ্মেই বাজে। ব্রজাঙ্গনারা উচ্চাঙ্গের যোগী, তাই তাঁহাদের হৃদয়স্থ অনাহত পদ্ম পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

শারদীয়া শক্তিপূজা এক বিস্ময়কর বিরাট ব্যাপার। বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় মতেই এই প্রকাণ্ড পূজা সম্পাদিত হয়। বৈদিক অপেক্ষা তান্ত্রিক পূজা অধিকতর বিস্তৃত ও জটিল। যাঁহার মূলাধারবাসিনী কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়াছেন সেইরূপ সাধক পূজক ও তন্ত্রধারক না হইলে প্রকৃত পূজা হয় না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। দুর্গাপূজায় পদ্মপুষ্প পরম প্রয়োজনীয় উপাচারের অন্যতম। সকলেই জানেন আট প্রকার জলে দেবীকে স্নান করাইতে হয়। ইহাদের অন্যতম পদ্মপরাগ মিশ্রিত জল। পদ্মের সহিত দুর্গাপূজার নিগূঢ় সম্পর্ক 'সর্ব্বতো ভদ্রমণ্ডলে' যেমন অভিব্যক্ত তেমন আর কিছুতেই নহে। এই সর্ব্বতো ভদ্রমণ্ডলকে সর্ব্ব দেবতার বাসস্থল বলা চলে। এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যমণ্ডিত বিচিত্র মণ্ডলটিকে কেন্দ্র করিয়াই পূজা সম্পাদিত হয়। দীক্ষাকালে আবশ্যক তন্ত্রোক্ত মাতৃকাযন্ত্র অপেক্ষা এই মণ্ডল বহুগুণ জটিলতর ও বৃহত্তর ব্যাপার সন্দেহ নাই। এই মহিমামণ্ডিত মহামঙ্গলময় মণ্ডল চিত্রকলা ও আধ্যাত্মতত্ত্ব অভয়ের অপূর্ব্ব সমন্বয়। হরিদ্রা, তণ্ডুল প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট পাঁচটি পদার্থকে চূর্ণ করিয়া সেই পঞ্চ চূর্ণের সাহায্যে আল্‌পনার ন্যায় ইহা অঙ্কিত করিতে হয়। মোটামুটি ইহাতে একটি বড় চতুষ্ক ক্ষেত্র থাকে, সেই চতুষ্কের ভিতর আর একটি ক্ষুদ্রতর চতুষ্ক আঁকিতে হয়, তারপর আরও একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্র দ্বিতীয় চতুষ্কের অভ্যন্তরে অঙ্কণ প্রয়োজন। এই তৃতীয় চতুষ্কের মধ্যস্থলে একটি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিতে হয়। দ্বিতীয় চতুষ্কটির গাত্রে কল্পলতায় আল্পনাও আঁকা হয়। মণ্ডলের মধ্যভাগ কতকটা মাতৃকাযন্ত্রের অনুরূপ। তবে মাতৃকাযন্ত্রের এত বর্ণরাগ ও বৈচিত্র্য থাকে না। তন্ত্রোক্ত মন্ত্রোময় মাতৃকাযন্ত্রে অকারাদি সর্ব্ববর্ণবিশিষ্ট, আর এই মহা-মঙ্গলময় মণ্ডল সর্ব্বদেবাত্মক। মাতৃকাযন্ত্রে যাহা বীজাকারে বিরাজিত, এই মণ্ডলে তাহা মহামহীরুহে পরিণত। এই মণ্ডলের আটদিকে আটটি এবং মধ্যস্থলে একটি এই নয়টি ঘট স্থাপন করিতে হয়। ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে মন্ত্রশক্তি বলে আকর্ষণ করিতে হয় এই অষ্টদল পদ্মমণ্ডিত মহান্‌মণ্ডলে। চতুঃষষ্ঠী যোগিনীগণ এবং অন্যান্য শক্তিসঙ্ঘসহ দেবীর আবির্ভাব হয় এই অপূর্ব্ব-শোভা-সদ্ম অষ্টদল পদ্মে। সত্যই অত্যাশ্চর্য্য এই শারদীয়া শক্তিপূজা। ভারতবাসীর বিশেষ বাঙ্গালীর প্রদীপ্ত প্রতিভার অপূর্ব্ব পরিকল্পনার প্রকৃষ্ট পরিচয় এই দশভুজা প্রতিমার পূজা। আদ্যাশক্তিকে কেন্দ্র করিয়া এখানে সকল শক্তির, সকল দেবতার, এমন কি সকল পদার্থের পূজা করা হয় বলিলেও ভুল হয় না। শস্যশ্যামা বঙ্গভূমির সুনিপুণ শিল্পী যে অপ্রতিম প্রতিমা প্রস্তুত করে

তাহাকে সর্ব্বশক্তি বা বিশ্বপ্রকৃতির প্রতীক বলিলেও চলিতে পারে। সৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর—সুমধুর—সমুজ্জ্বল সমস্তই সংগৃহীত হয় এই বিরাট অর্চ্চনার উপাচাররূপে। এই বিস্ময়কর বিশাল প্রতীকোপসনার সহিত সকল প্রকার সুকুমার শিল্পকলার সম্পর্ক ইহাকে আরও চমৎকার ও কল্যাণাকর করিয়া তুলিয়াছে। মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলে পদ্মের সহিত এই পূজার অপূর্ব্ব সম্পর্ক অবিলম্বে উপলব্ধি করা যায়।

হিন্দুর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গেও পদ্মের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। প্রভাতে প্রবুদ্ধ হইয়াই আমাদের কর্ত্তব্য হৃদয়পদ্মে পদ্মাসন ব্রহ্মা, পদ্মনাভ বিষ্ণু ও পদ্মাসীন শঙ্করের পাদপদ্ম ধ্যান করা। যিনি তন্ত্র গ্রন্থোক্ত পন্থার অনুবর্ত্তী হইয়া শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত নিত্য প্রাতে মূলাধার পদ্মে বিরাজিতা কুণ্ডলিনীকে চিন্তা করা তাঁহার কর্ত্তব্য। হিন্দুর বিশেষ বাঙ্গালী জীবনে পদ্মপুরাণের প্রভাব প্রবল সে বিষয়ে সংশয় নাই। পদ্মপুরাণোক্ত আখ্যান-সমূহের আদর্শ আমাদিগকে যেমন অনুপ্রাণিত করিয়াছে তেমন আর কিছুই নহে। আমরা বালক ধ্রুবের ন্যায় ভগবানকে পদ্মপলাশলোচন বলিয়া ডাকিতে ভালবাসি। কোটি কোটি হিন্দু কমলাক্ষ কৃষ্ণ ও রাজীবলোচন রামের উপাসনা করে। আমরা পূজ্যজনকে পত্র লিখিতে "শ্রীচরণ-কমলেষু" পাঠ ব্যবহার করি। আমরা পুত্রের নাম রাখি পদ্মলোচন, নীরজবরণ, সরোজকুমার, অরবিন্দ। আমরা শয়নের সময় স্মরণ করি পদ্মনাভকে। কোন পূজা না হোক পদ্মজার পূজা প্রতিগৃহেই হয়। আমরা হস্তিনীর পরিবর্ত্তে 'পদ্মিনীকে' পত্নীরূপে পাইতে চাই, কারণ রমণীর মধ্যে পদ্মিনীই শ্রেষ্ঠ। আমরা সুন্দর চক্ষুকে পদ্মের সহিত তুলনা করিয়াই ক্ষান্ত হই না, চক্ষুতে রোগ হইলে আরোগ্য কামনায় পদ্মমধু ব্যবহার করি। আমরা পদ্মাতীরে বাস করি এবং পদ্মার উদার বিস্তার ও উত্তাল তরঙ্গমালা দেখিয়া ভাবে বিহ্বল হই। আমাদের কবিরা পার্থিব জীবনের অনিত্যত্ব জানাইয়া হরিপাদপদ্মের প্রতি আমাদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্য গাহিয়া থাকেন—

"কমল-দল-জল জীবন-টল-মল ভজহু হরিপদ নিত্যরে।"

প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্যে পদ্মের কথা উল্লেখ থাকার বিষয় আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন অথর্ব্ব বেদে পদ্ম খাদ্যরূপে ব্যবহারের উল্লেখ আমরা প্রাপ্ত হই। সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত পদ্মের ঘনিষ্ট সম্পর্কের আভাষ আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। দেবতাদের দ্বারা পদ্ম ভূষণরূপে ব্যবহৃত হইবার কথা পুরাণে আছে। অশ্বিনীকুমার নামক তরুণ দেবতাদ্বয় নীলোৎপলের মালা পরিয়া থাকেন। বেদের ব্রাহ্মণাংশে সৃষ্টিপ্রসঙ্গে পদ্মের কথা আছে। এখানে আমরা কারণ সলিলে ভাসমান পদ্মপত্রের উপর মৃন্ময়ী মেদিনী মাতার উদ্ভবের দৃশ্য দেখিতে পাই। এই ধরণের উপাখ্যান আমরা মিশরের পৌরাণিক কাহিনীসমূহের মধ্যেও প্রাপ্ত হই। বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার জন্ম কাহিনী মহাভারতে আছে। মহাভারতে যক্ষপতি কুবেরের কৈলাসপর্ব্বতস্থ বাসস্থানের বর্ণনা আছে। তথায় বিরাজিত নলিনী নামক হ্রদ ও মন্দাকিনী নাম্নী নদী পদ্মে পরিপূর্ণ বলিয়া বর্ণিত। পুরাণে যে মানস-সরোবরের কথা আছে, উহাও পদ্মে পূর্ণ বলিয়া বর্ণিত। বর্ত্তমানে আমরা যে মানস-সরোবর তিব্বতে দর্শন করি উহার বক্ষেও পরম প্রীতিপদ পদ্মপুষ্পপুঞ্জ লক্ষিত হয়।

পদ্মবাদ হিন্দুধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া প্রবল প্রভাব প্রসারিত করিয়াছে। বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য কীর্ত্তিগুলির ভিতর আমরা এই প্রবল প্রভাবের পরিচয় পদে পদে পাই। এমন কি খৃষ্টাবির্ভাবের দুইশত বৎসর পূর্ব্বের বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য কীর্ত্তিতেও পদ্মমূর্ত্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। সাঁচির অপরূপ স্তূপ ও তোরণগুলির গাত্রে পদ্মচিত্র প্রায়ই দেখা যায়। ভারহুট অমরাবতী ও বুদ্ধগয়াতেও আমরা দেখিতে পাই। পশ্চিম ভারতের গিরি-গাত্র উৎকীর্ণ করিয়া প্রস্তুত বৌদ্ধ মঠ-মন্দিরগুলির স্তম্ভশ্রেণীতে, ছাদ-নিম্নে ও প্যানেলে বা কপাটের খোপে ভাস্কর্য্য সম্পর্কীয় অলঙ্কাররূপে প্রায়ই পদ্মমূর্ত্তি ক্ষোদিত করা হইয়াছে। এখানে স্থানে স্থানে আমরা পদ্মার্দ্ধও দেখি। সিংহলে অর্দ্ধ-পদ্মাকৃতি শিলাখণ্ডসমূহ প্রাচীন মন্দির সমূহের সোপানতলে প্রায়ই দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধযুগে গান্ধার ও মথুরা ভাস্কর্য্য শিল্পসাধনার দুইটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। আমরা উভয় স্থানের ভাস্কর্য্য কীর্ত্তিগুলির বক্ষেই পদ্ম দেখিতে পাই তবে ইহাদের বৈশিষ্ট্য ইহারা মৃণালবিশিষ্ট বা বৃন্তযুক্ত। সাঁচির স্তম্ভেও অমরাবতীর প্যানেলে (কপাটের খোপে) ও এইরূপ পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়।

দেব-দেবী বা দিব্য-জীবন মহাপুরুষদেহ পাদপীঠ বা বসিবার আসনরূপে পদ্মের ব্যবহারের বিষয়ও আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পদ্মের এই ব্যবহার হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মের ভিতরেই দৃষ্ট হয়। এই ব্যবহারের নিদর্শন আমরা প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য কীর্ত্তিগুলির মধ্যে প্রায়ই প্রাপ্ত হই। ভারহুটের নিকটবর্ত্তী উদয়গিরির গুহাগৃহগাত্রে লক্ষ্মীর যে পদ্মাসনা মূর্ত্তি উৎকর্ণ রহিয়াছে তাহাই শিল্পে এই প্রকার পরিকল্পনা প্রাচীনতম নিদর্শন। সাঁচির বৃহত্তম স্তূপটির তোরণদেশে পদ্মের উপর দণ্ডায়মানা ও উপবিষ্টা উভয় প্রকার লক্ষ্মীমূর্ত্তিই আমরা খোদিত দেখি। শুধু তাহাই নহে এখানে আমরা 'কমলে-কামিনী' নামক বিচিত্র পরি-কল্পনাকে উৎকীর্ণ চিত্রে প্রকাশিত দেখি। লক্ষ্মীর উভয় করকমলেও কমনীয় লীলা কমল। দুই দিক হইতে দুইটি হস্তী শুণ্ড তুলিয়া পদ্মজার হস্তস্থিত পদ্মদ্বয়কে সলিলসিক্ত

করিতেছে। এই বিচিত্র পরিকল্পনার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমরা সিংহলের অন্যতম প্রাচীন রাজধানী পুলস্ত্যপুর বা পোলোনারুয়ার অতীত কীর্ত্তির অবশেষগুলির ভিতর এই জাতীয় উৎকীর্ণ আলেখ্য লক্ষ্য করিয়াছি।

বুদ্ধদেবের বহুপ্রকার মূর্ত্তি পরিকল্পিত হইয়াছে। পদ্ম-পুষ্পের উপর পদ্মাসনে (আসন বিশেষ) বসিয়া নিবিড় ধ্যানে নিমগ্ন—এইরূপ বুদ্ধবিগ্রহ বা বুদ্ধচিত্র শুধু ভারতে নয় অন্যান্য দেশেও দেখা যায়। বিহার প্রদেশের পুরাকীর্ত্তিসমূহের মধ্যে, বোম্বাই-এর নিকটবর্ত্তী কানহেরি গুহাগৃহে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আবিষ্কৃত বৌদ্ধযুগের ভাস্কর্য্য-কীর্ত্তিগুলিতে পদ্মাসন বুদ্ধ দৃষ্ট হয়। ভারতীয় ও গ্রীক ভাস্কর্য্য প্রণালীর সম্মেলনে সম্ভূত গান্ধার-প্রণালী সম্রাট কনিষ্ক ও তাঁহার বংশধরগণের সময়ে বিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এই প্রস্তুত প্রণালীর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে পদ্মের প্রভাব চৈনিক তুর্কীস্থান, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে বিস্তার লাভ করে এ-বিষয়ে সংশয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম মহাযান ও হীনযান দুইটি প্রধান শাখায় বিভক্ত। ভারতবর্ষের পশ্চিমস্থ ও উত্তরস্থ দেশসমূহে মহাযানমত এবং সিংহলাদি দক্ষিণস্থ দেশগুলিতে হীনযান প্রচলিত। পদ্মবাদের প্রভাব উভয় মতবাদের মধ্যেই আছে বটে কিন্তু ইহা মহাযান মতের মধ্যে অনেক অধিক সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। শুধু পদ্মাসন নয় পদ্মপানি বুদ্ধ নেপালে, তিব্বতে, চীনে এবং চৈনিক তুর্কীস্থানে (সার অরেলের দ্বারা আবিষ্কৃত ভারতীয় প্রভাবের পরিচায়ক ধ্বংসাবশেষ সমূহের ভিতর) আমরা দেখিতে পাই। কোন কোন স্থানে বুদ্ধবিগ্রহের পদ্মময় পাদপীঠ দৃষ্ট হয়। কোন কোন বিগ্রহ বা উৎকীর্ণ চিত্রে পুরোভাগে দুইটি বা তিনটি পদ্ম রচিত রহিয়াছে। এইরূপ পদ্মের কোনটি চতুর্দ্দল, কোনটি ষড়দল। বোধিসত্ত্ব-দিগকে 'পদ্মাসন' মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সিদ্ধার্থরূপে পূর্ণপ্রজ্ঞাপ্রাপ্তির পূর্ব্ববর্ত্তী জন্মসমূহের বুদ্ধকে বোধিসত্ত্ব বলা হয়। বারাণসীর পার্শ্ববর্ত্তী সারনাথে, তিব্বতে ও যবদ্বীপে পদ্মাসন বোধিসত্ত্ব দৃষ্ট হয়। যিনি মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় ও বৌদ্ধপ্রভাবের বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ আবিষ্কার করিয়া বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন সেই সার অরেল ষ্টীন তাঁহার প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানে একটি পারসিক বোধি-সত্ত্ব চিত্র প্রাপ্ত হন। চিত্রটি কাষ্ঠফলকের গাত্রে অঙ্কিত। বোধিসত্ত্ব পদ্ম ভূষিত আসনে বসিয়া আছেন।

নেপালে পদ্মাকৃতি পাদ-পীঠে দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্ব দেখা যায়। আমাদের ব্রহ্মার ন্যায় বোধিসত্ত্ব পদ্ম হইতে জাত বলিয়া বর্ণিত। বোধিসত্ত্বের একটি নাম পদ্মপানি। সকল সময়েই তাঁহার হস্তে একটি পদ্ম বিদ্যমান থাকে। বৌদ্ধ মহাযানমতের মহামুক্তি মন্ত্র "ওম্ মণি পদ্মে হুম্" পদ্ম বা দেব প্রবল প্রভাবের বার্ত্তাই বিজ্ঞাপিত করে। আমাদের মনে হয় শেষের হুম্‌টাও ওম্‌ই অথবা বিরাজিত এই অর্থে ব্যবহৃত। ওম্ বা প্রণব বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে সন্দেহ নাই। 'পদ্মের অভ্যন্তরে মণি' এই মন্ত্রের মর্ম্মসম্বন্ধে নানামুনির নানামত। অবশ্য এই বৌদ্ধ মুক্তিমন্ত্র রহস্য আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে আমাদের আলোচ্য পদ্মের প্রভাব। তবে পদ্ম এখানে মায়ামলিন মানুষের বিবেক-বৈরাগ্যবলে মালিন্যমুক্ত দিব্যজীবনের প্রতীকরূপে পরিকল্পিত সে-বিষয়ে সংশয় নাই। ইহা অমরত্ব বা মৃত্যুর অতীত শাশ্বত জীবনেও প্রতীক। পদ্ম হইতে জগতের জন্ম এবং পুষ্প হইতেই ফল হয় সুতরাং ইহা সৃজনী বা জনন-শক্তিরও প্রতীক। আমাদের প্রত্যেকের ভিতর বিদ্যমান মূলাধার পদ্ম এই জনন-শক্তির আধার। যেমন পরম মনোরম শুদ্ধ সুন্দর পদ্ম জন্মায় পঙ্কিল পল্বলের বক্ষে তেমনই পাপপঙ্কিল পৃথিবীর বুকে জন্মিয়াও আমাদিগকে পূর্ণপ্রস্ফুটিত পদ্মের মত সকল আবিলতার ঊর্দ্ধে শুদ্ধ-সুন্দর জীবন যাপন করিতে হইবে—আমরা এই শিক্ষাও পদ্ম হইতে প্রাপ্ত হই।

শুধু সূর্য্যের সঙ্গে পদ্মের তুলনা করা হইয়াছে তাহা নহে, উভয়ের অপূর্ব্ব সম্পর্কে আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করি। স্বর্ণসম বর্ণবিভায় সমুদ্ভাসিত রবি বর্ণনাতীত শোভায় পূর্ব্বা-কাশে যেমন প্রকাশিত হন অমনই সরোবরে সরোবরে কমনীয় রাজীবরাজি বিকশিত হইয়া উঠে, আবার পশ্চিমাকাশকে অপরূপ রক্ত চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া একটি প্রকাণ্ড কোকনদ বা রক্তকমলের মত তিনি যখন অস্তাচলে চলিয়া যান তখন পদ্মের দলগুলি একে একে নিমীলিত হয়। এই জন্যই সূর্য্যদেবকে পদ্মিনী-বল্লভ বলা হয়। অন্যদিকে চন্দ্র উদিত হইলে কুমুদ-কুসুম ফুটে বলিয়া চন্দ্রের নাম কুমুদবন্ধু বা কুমুদিনীনায়ক।

পদ্মবাদের সহিত বুদ্ধবাদের সম্বন্ধ কিরূপ নিবিড় হইয়া পড়িয়াছিল তাহা যবদ্বীপের বোরোবুদর নামক বিস্ময়কর প্রাচীনকীর্ত্তির বক্ষেও লক্ষিত হয়। অসংখ্য পদ্মাকার চৈত্য এই মহান মন্দিরে আমরা দেখিতে পাই। এই সকল চিত্ত চমৎকারী চৈত্যের ভিতর বিভিন্ন ভঙ্গীতে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তি। পদতলে বেদীর উপর পাদ-পীঠরূপে অপূর্ব্ব শিল্প নৈপুণ্যের পরিচায়ক প্রস্ফুটিত পদ্ম। ব্রহ্মদেশে শোয়ে ডাগন প্রভৃতি মন্দিরে বুদ্ধপাদপদ্মে পদ্মাদি পুষ্প অর্ঘ্যরূপে প্রদান করার প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত। জাপানী, বর্ম্মীজ, শ্যামিজ প্রভৃতি অন্য জাতিদের ধর্ম্মজীবনের সহিত পুষ্পের সম্পর্ক লক্ষ্য করিবার বিষয়।

চার

অতঃপর চতুঃষষ্টি অঙ্গবিদ্যা বা ললিত-কলার তালিকা কামসূত্রানুসারে প্রদত্ত হইতেছে—(১) গীত, (২) বাদ্য, (৩) নৃত্য, (৪) আলেখ্য, (৫) বিশেষকচ্ছেদ্য (৬) তণ্ডুল-কুসুম-বলি-বিকার, (৭) পুষ্পাস্তরণ, (৮) দশান ও বসনে অঙ্গরাগ, (৯) মণি-ভূমিকা-কর্ম্ম, (১০) শয়ন-রচনা, (১১) উদকবাদ্য, (১২) উদকাঘাত, (১৩) চিত্র-যোগ-সমূহ, (১৪) মাল্যগ্রথন-বিকল্প, (১৫) শেখরকাপীড়-যোজন, (১৬) নেপথ্য-প্রয়োগ, (১৭) কর্ণ-পত্র-ভঙ্গ, (১৮) গন্ধযুক্তি, (১৯) ভূষণ-যোজন, (২০) ইন্দ্রজাল, (২১) কৌচুমার-যোগ, (২২) হস্তলাঘব, (২৩) বিচিত্র-শাক-যূষ-ভক্ষ্য-বিকার-ক্রিয়া, (২৪) পানক-রস-রাগাসব-যোজন, (২৫) সূচী-বান-কর্ম্ম (২৬) সূত্রক্রীড়া, (২৭) বীণা-ডমরুক-বাদ্য, (২৮) প্রহেলিকা, (২৯) প্রতিমালা, (৩০) দুর্ব্বাচক-যোগ, (৩১) পুস্তক-বাচন, (৩২) নাটকা-খ্যায়িকা-দর্শন, (৩৩) কাব্যসমস্যা-পূরণ, (৩৪) পট্টিকা-বেত্র-বান-বিকল্প, (৩৫) তর্ক্ কর্ম্ম, (৩৬) তক্ষণ, (৩৭) বাস্তুবিদ্যা, (৩৮) রূপ্য-রত্ন-পরীক্ষা, (৩৯) ধাতুবাদ, (৪০) মণিরাগাকর-জ্ঞান, (৪১) বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ-যোগ, (৪২) মেষ-কুক্কুট-লাবক-যুদ্ধ-বিধি, (৪৩) শুক-সারিকা-প্রলাপন, (৪৪) উৎসাদনের সংবাহনের ও কেশ-মর্দ্দনের কৌশল, (৪৫) অক্ষর-মুষ্টিকা-কথন, (৪৬) ম্লেচ্ছিতক-বিকল্প, (৪৭) দেশ-ভাষা-বিজ্ঞান, (৪৮) পুষ্প-শকটিকা, (৪৯) নিমিত্ত-জ্ঞান, (৫০) যন্ত্র-মাতৃকা, (৫১) ধারণ-মাতৃকা, (৫২) সম্পাঠ্য, (৫৩) মানসী, (৫৪) কাব্য-ক্রিয়া, (৫৫) অভিধান-কোষ, (৫৬) ছন্দোজ্ঞান, (৫৭) ক্রিয়া-কল্প, (৫৮) ছলিতক-যোগ, (৫৯) বস্ত্রগোপন, (৬০) দ্যূতবিশেষ (৬১) আকর্ষ-ক্রীড়া, (৬২) বালক-ক্রীড়নক, (৬৩) বৈনয়িকী, (৬৪) বৈজয়িকী, (৬৫) বৈয়ামিকী।

যশোধরেন্দ্রপাদ জয়মঙ্গলা-টীকায় (২৩) নং বিচিত্র-শাক-যূষ-ভক্ষ্য-বিকার-ক্রিয়া ও (২৪) নং পানক-রস-রাগাসব-যোজন—এই দুইটিকে একসঙ্গে করিয়া ধরিয়াছেন। পক্ষান্তরে, (৫৩) নং মানসী ও (৫৪) নং কাব্যক্রিয়াকে এক-সঙ্গে ধরিয়া স্বর্গত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় চতুঃষষ্টি সংখ্যা মিলাইয়াছেন১। সুষঙ্গের মহারাজ ৺কুমুদচন্দ্র সিংহ মহোদয় তাঁহার 'কৌমুদী' নামক গ্রন্থে (৬৪) নং বৈজয়িকী ও (৬৫) নং বৈয়ামিকী—এই দুইটি কলাকে একসঙ্গে ধরিয়া চৌষট্টি সংখ্যা পুরাইয়াছেন২।

অতঃপর এক এক করিয়া কামশাস্ত্রোক্ত এই চতুঃষষ্টি কলার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে—

(১) গীত—'গীত' বা 'গান' এরূপ সর্ব্বজন-পরিচিত কলা যে, ইহার কোনরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। তবে প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত-কলার বিশদ বিবরণ দিতে হইলে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতে হয়—এ প্রকার ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উহার কোন পরিচয় দেওয়াই সম্ভব নহে। এ কারণে সে প্রয়াস হইতে বিরত হওয়া গেল। তবে প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে কতগুলি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল—তাহার অল্প একটু আভাস নিয়ে দেওয়া যাইতেছে।

বরোদা হইতে প্রকাশিত 'গাইকোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিস্'-এর অন্তর্গত নারদ-রচিত 'সঙ্গীত-মকরন্দ' সঙ্গীত-শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিশিষ্টে প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের নামের একটি তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই তালিকাটি অখণ্ড নহে—ভগ্নাংশ মাত্র। পাঠকবর্গের কৌতূহল-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে নিম্নে উহার কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে—

	গ্রন্থ-নাম		গ্রন্থ-কর্ত্তৃনাম
১।	অনূপ-সঙ্গীত-বিলাস	...	ভাবভট্ট
*২।	অভিনয়দর্পণ	...	নন্দিকেশ্বর
৩।	অভিনয়-প্রকরণ		(শিবতত্ত্বরত্নাকরান্তর্গত)
৪।	অভিনয়-মুকুর	...	—
৫।	অভিনয়-লক্ষণ	...	—
৬।	অভিনয়-শাস্ত্র	...	কোহল
৭।	অভিনব-ভরত-সার-সংগ্রহ	...	মুম্মডিচিক্কভূপাল
৮।	অর্জ্জুন-ভরত	...	অর্জ্জুন
৯।	অষ্টমাতৃকা-প্রবন্ধ	...	—
১০।	অষ্টোত্তরশত-তাল লক্ষণ	...	—
১১।	আদিভরত	...	ভরতাচার্য্য
১২।	আনন্দ-সঞ্জীবন	...	রাজা মদনপাল
১৩।	ঔমাপত্য	...	উমাপতি
১৪।	কল্পতরু	...	গণেশদেব
১৫।	কীর্ত্তন	...	—
১৬।	গীত-প্রকাশ	...	—

১। কামসূত্র, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৺পঞ্চানন-তর্করত্ন-কৃত বঙ্গানুবাদ, পৃঃ ৬৩

২। কৌমুদী, পৃঃ ৩৫। স্বর্গত পণ্ডিতপ্রবর ৺কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় "বার্ত্তাশাস্ত্র বা জীবিকাতত্ত্ব" প্রবন্ধে 'শিল্প'-শব্দের ব্যাখ্যায় চতুঃষষ্টি ললিত-কলার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সহিত কামশাস্ত্রোক্ত চতুঃষষ্টি ললিত কলার অল্প বিস্তর তারতম্য আছে। ১২৯২ সালে প্রকাশিত 'শিল্প-পুষ্পাঞ্জলি' নামক সাময়িক-পত্রিকার প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ৫-৮) বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের প্রবন্ধটি উদ্ধৃত হইয়াছে। স্বর্গগত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় তাঁহার কল্কি-পুরাণের-সংস্করণ মধ্যে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বিবরণ ও শুক্রনীতিসারের বর্ণনা মিলাইয়া চতুঃষষ্টি ললিত-কলার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। ডক্টর প্রসন্নকুমার আচার্য্য মহাশয় ১৩৩৫ সালের চৈত্র মাসের মাসিক বসুমতীতে চতুঃষষ্টি কলা সম্বন্ধে 'শিল্পকলা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। যথাস্থানে এ সকল মত উদ্ধৃত ও আলোচিত হইবে।

	গ্রন্থ		গ্রন্থকার
১৭।	গীতালঙ্কার		অনন্তনারায়ণ
১৮।	তাল-দশ-প্রাণ-দীপিকা		গোবিন্দ
১৯।	তাল দীপিকা		টিপ্প ভূপাল
২০।	তাল-প্রস্তার		
২১।	তাল-প্রস্থ		
২২।	তাল-লক্ষণ	…	নন্দিকেশ্বর
২৩।	তাল-লক্ষণ	…	কোহলাচার্য্য
২৪।	তালাদি-লক্ষণ	…	—
২৫।	তালাভিনয়-লক্ষণ	…	নন্দিকেশ্বর
২৬।	দত্তিল-কোহলীয়	…	দত্তিল-কোহল
২৭।	ধ্রুবপদ-টীকা	…	ভাবভট্ট
২৮।	নন্দিভরত	…	নন্দী
২৯।	নর্ত্তন-নির্ণয়	…	পুণ্ডরীক বিঠ্ঠল
৩০।	নাটক-দর্পণ-সূত্র	…	—
৩১।	নাট্যচূড়ামণি	…	সোমনার্য্য
৩২।	নাট্য-লক্ষণ	…	—
৩৩।	নাদ-দীপিকা	…	ভট্টাচার্য্য
৩৪।	নারদী শিক্ষা	…	নারদ
৩৫।	নৃত্যরত্নাবলী	…	গণপতি দেবসেন
৩৬।	নৃত্যাধ্যায়	…	অশোকমল্ল
৩৭।	পঞ্চম-সার-সংহিতা	…	নারদ
৩৮।	ব্যান্ধব্য-হস্ত-লক্ষণ	…	—
*৩৯।	বৃহদ্দেশী	…	মতঙ্গমুনি
*৪০।	ভরত-নাট্যশাস্ত্র	…	ভরত
৪১।	ভরত-ভাষ্য	…	ন্যায়দেব
৪২।	ভরত-লক্ষণ	…	—
৪৩।	ভরত-শাস্ত্র	…	রঘুনাথ
৪৪।	ভরত-শাস্ত্র-সঙ্গীত	…	—
৪৫।	ভরত-সার-সংগ্রহ	…	চন্দ্রশেখর
৪৬।	ভরতার্ণব	…	সুমতি
	(ইহা নন্দিকেশ্বর-কৃত ভরতার্ণবের সার-সংক্ষেপ)		
৪৭।	ভরতার্থচন্দ্রিকা	…	নন্দিকেশ্বর
৪৮।	ভরতীয়-নাট্য-লক্ষণ	…	—
৪৯।	ভাব-প্রকাশন	…	শারদাতনয়
৫০।	মতঙ্গ-ভরত	…	লক্ষ্মণভাস্কর
৫১।	মান-কৌতুহল (হিন্দী)	…	—
৫২।	মান-মনোরঞ্জন	…	ময়াশঙ্কর
৫৩।	মুক্তাবলি-প্রকাশিকা	…	—
৫৪।	মুরলী-প্রকাশ	…	ভাবভট্ট
৫৫।	মৃদঙ্গ-লক্ষণ		
৫৬।	মেলাধিকার-লক্ষণ		
৫৭।	রাগকৌতুহলে নৃত্য-প্রকরণ	…	রামকৃষ্ণ ভট্ট
৫৮।	রাগচন্দ্রোদয়		বিমল
৫৯।	রাগতত্ত্ব-বিবোধ		শ্রীনিবাস
৬০।	রাগধ্যানাদিকথনাধ্যায়		—
৬১।	রাগ-নিরূপণ		নারদ
৬২।	রাগ-প্রস্তার		—
*৬৩	রাগমঞ্জরী		পুণ্ডরীক বিঠ্ঠল
৬৪।	রাগমালা		”
৬৫।	”		জীবরাজ দীক্ষিত
৬৬।	রাগমালা (বা রত্নমালা)		ক্ষেমকরণ
৬৭।	রাগ-রত্নাকর		গন্ধর্ব্বরাজ
৬৮।	রাগ-লক্ষণ		
৬৯।	রাগ-বর্ণ-নিরূপণ		
৭০।	রাগ-বিচার		শ্রীরাম
*৭১।	রাগবিবোধ		সোমনাথ
৭২।	রাগবিবেক		
৭৩।	রাগসাগর		
৭৪।	রাগাদি-স্বর-নির্ণয়		রঘুনাথদাস প্রসাদ
৭৫।	রাঘব-প্রবন্ধ		
৭৬।	রুদ্রডমরুদ্ভবসূত্র-বিবরণ		
৭৭।	বীণা-বাদ্য-লক্ষণ		
৭৮।	বীরপরাক্রম		বাসুদেব
৭৯।	শ্রুতিভাস্কর		ভীমদেব
৮০।	ষড়্-রাগ-চন্দ্রোদয়		—
৮১।	ষাড়বিত		ডুণ্ডব্যাস
৮২।	সপ্তাঙ্গলক্ষণ		—
*৮৩।	সদ্রাগচন্দ্রোদয়		পুণ্ডরীকবিঠ্ঠল
৮৪।	সঙ্কীর্ণরাগাধ্যায়		
৮৫।	সঙ্গীত-কল্পতরু		
৮৬।	সঙ্গীত কৌমুদী		নারায়ণ
৮৭।	সঙ্গীত-চিন্তামণি		কমললোচন
৮৮।	সঙ্গীত-চূড়ামণি		হরিপাল মহীপাল
৮৯।	”		কবিচক্রবর্ত্তী
*৯০।	সঙ্গীতদর্পণ		দামোদর
৯১।	”		হরিবল্লভ
৯২।	সঙ্গীত-দামোদর		শুভঙ্কর
৯৩।	সঙ্গীত-দীপিকা		নিম্বভূপাল
৯৪।	সঙ্গীত-নারায়ণ		—
৯৫।			নারায়ণ
৯৬।			পুরুষোত্তম মিশ্র
৯৭।	সঙ্গীতনৃত্য		শারঙ্গদেবসূরি

৯৮। সঙ্গীত-নৃত্যাকর ভরতাচার্য্য
৯৯। সঙ্গীত-পদ্যাবলী —
১০০। সঙ্গীতপাঠ —
*১০১। সঙ্গীত-পারিজাত অহোবল
১০২। সঙ্গীতপুষ্পাঞ্জলি —
*১০৩। সঙ্গীত-মকরন্দ নারদ
১০৪। „ বেদ
১০৫। সঙ্গীত-মীমাংসা কুম্ভকর্ণমহীমহেন্দ্র
১০৬। সঙ্গীত-মুক্তাবলী দেবান্নাচার্য্য
১০৭। „ দেবেন্দ্র
১০৮। সঙ্গীতমেরু কোহল
১০৯। সঙ্গীতরঙ্গ রাধামোহন সেন
১১০। সঙ্গীতরত্ন „
১১১। সঙ্গীত-রত্নাকর লক্ষ্মণাচার্য্য-পুত্র বুনবক
১১২। সারঙ্গদেব (শাঙ্গদেব হইতে ভিন্ন ব্যক্তি)
১১৩। শ্রীশার্ঙ্গদেব
১১৪। টীকা কল্লিনাথ
১১৫। (প্রথমাধ্যায়) সিংহভূপাল
১১৬। কুম্ভকর্ণমহেন্দ্র
১১৭। হংসভূপাল
১১৮। „ „ (হিন্দী) গঙ্গারাম
১১৯। „ „ (আন্ধ্র-ভাষা-টীকা) —
১২০। সঙ্গীত-রত্নাবলী … সোমদেবপরমদ্দী
১২১। সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম … —
১২২। সঙ্গীতরাঘব … বোমভূপাল
১২৩। সঙ্গীতরাজ … কুম্ভকর্ণ

[ইহা প্রায় ষোড়শ-সহস্র গ্রন্থাত্মক সঙ্গীত-মীমাংসা-গ্রন্থ। ইহা পঞ্চখণ্ডে বিভক্ত—(১) পাঠ্যরত্নকোশ, (২) গীত-রত্নকোশ, (৩) বাদ্য-রত্নকোশ, (৪) নৃত্য-রত্নকোশ ও (৫) রস-রত্নকোশ। ইহাদিগের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম—সমগ্র পুস্তকের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। তবে ইহার অদ্যাপি সন্ধান মিলে নাই।]

১২৪। সঙ্গীতলক্ষণ … —
১২৫। সঙ্গীত-লক্ষণ-দীপিকা … গৌরণাচার্য্য
১২৬। সঙ্গীত বিনোদ … —
১২৭। সঙ্গীত-বৃত্ত-রত্নাকর … বিঠ্‌ঠল
১২৮। সঙ্গীত-শিরোমণি … —
*১২৯। সঙ্গীত-সময়-সার পার্শ্বদেব
১৩০। সঙ্গীত-সর্ব্বার্থসার-সংগ্রহ —
১৩১। সঙ্গীত-সার … —
১৩২। সঙ্গীত-সার-সংগ্রহ … পার্শ্বদেব
১৩৩। সঙ্গীত-সারামৃত … তুলজেন্দ্র
১৩৪। সঙ্গীত-সারাবলী … —
১৩৫। সঙ্গীত-সারোদ্ধার … হরিভট্ট
১৩৬। সঙ্গীতসুধা … —
১৩৭। „ … ভীমনারীন্দ্র
১৩৮। সঙ্গীত-সুধাকর … সিংহভূপাল
১৩৯। সঙ্গীতসুধাকর (সঙ্গীত-রত্নাকর-ব্যাখ্যা) সিংহভূপাল(৩)
১৪০। „ … হরিপাল
১৪১। সঙ্গীত-সুন্দর … সদাশিবদীক্ষিত
১৪২। সঙ্গীতসুধামৃত … তুলাজি মহারাজ ভোঁসলে (তাঞ্জোর-নিবাসী)
১৪৩। সঙ্গীতসূত্র … মনোমধধনদি (তি ?) (কোন মতে—মম্মট কৃত)
১৪৪। সঙ্গীত-সূত্রধার … হরিজীবন ব্রাহ্মণক
১৪৫। সঙ্গীতসেতু … গদারাম
১৪৬। সঙ্গীতামৃত … কমললোচন
১৪৭। সঙ্গীতোপনিষৎ … সুধাকলশ
১৪৮। সঙ্গীতোপনিষৎসার „
১৪৯। সারসংহিতা … নারদ
১৫০। সুবোধিনী (কল্পতরু-ব্যাখ্যা)… গণেশদেব
১৫১। স্বরপ্রস্তার … —
১৫২। স্বরমঞ্জরী … —
১৫৩। স্বরমেল-কলানিধি … —
*১৫৪। স্বরমেল-কলানিধি … রামামাত্য
১৫৫। স্বর-রাগ-সুধারস … (তালদশপ্রাণপ্রকরণ)— (তেলগু-ভাষান্তর সহ)
১৫৬। হস্ত-মুখাবলী … —
১৫৭। হস্ত-মুক্তাবলী … শুভঙ্কর
১৫৮। হস্ত-রত্নাবলী … রাঘব
১৫৯। হস্তলক্ষণ … —
*১৬০। হৃদয়-কৌতুক হৃদয়নারায়ণ দেব
*১৬২। হৃদয়-প্রকাশ „ (৪)

৩। তালিকায় এই দুইটি গ্রন্থ পৃথক্ পৃথক্ উল্লিখিত হইলেও মনে হয় ১৩৮ ও ১৩৯ সংখ্যক গ্রন্থ ভিন্ন নহে—একই।

৪। প্রাচীন সঙ্গীতগ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের এই নাম-তালিকা সম্পূর্ণ বলিয়া যেন কেহ মনে না করেন। এ পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাদেরই নাম এই তালিকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এমন কি তাহাদের মধ্য হইতেও দুই চারিখানি গ্রন্থের নাম বাদ পড়িয়া থাকিতে পারে। যে গ্রন্থগুলির পার্শ্বে তারকা চিহ্ন (*) দেওয়া হইল, সেগুলি মুদ্রাপিত হইয়াছে। তালিকার গ্রন্থগুলি কেবল গীত-কলা-বিষয়ক নহে। নাম দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় উহাদের কোন কোনটি বাদ্য-বিষয়ক আবার কোন কোনটি বা নৃত্য-বিষয়ক। তবে অধিক-সংখ্যক গ্রন্থই কেবল গীত-বিষয়ক। আর অল্প কয়েক-

উক্ত তালিকার মধ্যে মহর্ষি ভরত-কৃত নাট্যশাস্ত্রই গীত-বাদ্য-নৃত্য-নাট্য-কলা-সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কিন্তু

খানিতে নৃত্য-গীত-বাদ্য—এই তিনটি কলারই সমানভাবে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে।

উক্ত তালিকাটি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত উপাদানের উপর। করিতে হইয়াছে—

(১) Mss. Catalogues and Reports, Central Library, Baroda, (২) Dr. Bhandarkar's Report 1887—91, (৩) India Office Library Catalogue—Tawney and Thomas, (৪) Buhler's Catalogue—Gujarat, Kathiawad, etc., (৫) Oudh Catalogue, (৬) Bodleian Library Catalogue, (৭) India Office Catalogue—Burnell, (১০) Mysore and Coorg Catalogue—Rice, (১১) Mysore Catalogue, (১২) Rajendralaia Mitra's Notices of Sanskrit Mss., (১৩) Bikaner Catalogue, (১৪) Madras Oriental Library ও (১৫) মাদ্রাজের "হিন্দু" পত্রিকায় প্রকাশিত Mr. T. C. Krishnaswami Iyer (of Mylapore) কর্তৃক রচিত প্রবন্ধ।

[বরোদা হইতে প্রকাশিত--নারদ কৃত' সঙ্গীত মকরন্দ' গ্রন্থের পরিশিষ্ট ৰ দ্রষ্টব্য।]

(৫) "যত্তু তন্ত্রীগতং প্রোক্তং নানাতোদ্যসমাশ্রয়ম্।
গান্ধর্ব্বমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতালপদাশ্রয়ম্॥ ৮॥
অত্যর্থমিষ্টং দেবানাং তথা প্রীতিকরং পুনঃ।—
গন্ধর্ব্বাণামিদং যস্মাৎ তস্মাদ্ গান্ধর্ব্বমুচ্যতে"॥ ৯॥
—ভরত-নাট্যশাস্ত্র কাশী সং।
অষ্টাবিংশ অধ্যায় (আতোদ্য-বিধি)।

দুর্ভাগ্যের বিষয়—নাট্যশাস্ত্রে যে-ভাবে গীত-কলার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে—সে-ভাবে গীত-শিক্ষার সম্প্রদায়ই বহুদিন উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সঙ্গীতের উপর সর্ব্বজন-মান্য ও সুবৃহৎ গ্রন্থ শ্রীশার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত-রত্নাকর'। উহাতেও গীত-বাদ্য-নৃত্য-নাট্যের সবিস্তর বিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়। সঙ্গীত-রত্নাকরে শার্ঙ্গদেব বহু স্থলেই ভরত-নাট্যশাস্ত্রের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন, আবার বহু পুরাতন ও নূতন মত সংগ্রহ-পূর্ব্বক গ্রন্থখানিকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন। অহোবলের 'সঙ্গীত-পারিজাত' বিশেষ প্রাচীন বা সুবৃহৎ গ্রন্থ না হইলেও লোক-সমাজে সুপরিচিত। ইহা ছাড়া নারদের 'সঙ্গীত-মকরন্দ' দামোদর মিশ্রের 'সঙ্গীত-দর্পণ', মতঙ্গমুনির 'বৃহদ্দেশী', 'দত্তিল', পার্শ্বদেবের 'সঙ্গীত-সময়সার', পুণ্ডরীক বিঠ্ঠলের রাগমঞ্জরী ইত্যাদি সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

মহর্ষি ভরত সঙ্গীত-কলার একটি বিশিষ্ট বিভাগকে 'গান্ধর্ব্ব' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তন্ত্রী-বাদ্য-সমন্বিত যে 'গীত' তাহারই নাম 'গান্ধর্ব্ব'। এ-প্রসঙ্গে মহর্ষি ভরত বলিয়াছেন—নানাপ্রকার আতোদ্য-সমাশ্রিত—স্বর-তাল-পদাশ্রিত তন্ত্রীগত সঙ্গীতের সংজ্ঞা গান্ধর্ব্ব। যে-হেতু ইহা দেবগণের অত্যন্ত'প্রিয় ও গন্ধর্ব্বগণের প্রীতিকর, এ-কারণে ইহাকে 'গান্ধর্ব্ব' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ এরূপ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অবান্তর বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

বিজ্ঞানের স্বরূপ

কোন্ বিজ্ঞান প্রকৃত অথবা বিকৃত তাহা বুঝিবার নাম বিজ্ঞানের "স্বরূপ" দেখা। যে বিজ্ঞানের ফলে মানুষের সর্ব্ব রকমের অর্থসিদ্ধি হয়, তাহাকে বিজ্ঞানের সংজ্ঞানুসারে প্রকৃত বিজ্ঞান বলিতে হইবে, আর যাহার ফলে মানুষ বিভ্রান্ত হইয়া নানা রকমের দুঃখ-যাতনা ভোগ করিতে আরম্ভ করে, তাহাকে বিকৃত বিজ্ঞান অথবা কুজ্ঞান বলিতে হইবে।

ভারতীয় ঋষির বিজ্ঞানের ফলে এক সময়ে সমগ্র জগতের সমস্ত মানুষের অর্থসিদ্ধি সাধিত হইয়াছিল, ইহা মনে করা যুক্তিসঙ্গত......কাজেই ভারতীয় ঋষির বিজ্ঞানকে প্রকৃত বিজ্ঞান বলিতে হইবে।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইয়োরোপে মহাযুদ্ধ দেখা গিয়াছে এবং তাহার পরে সারা জগতের সর্ব্বত্র বেকার, অস্বাস্থ্য, অকালমৃত্যু এবং অন্নকষ্ট দেখা যাইতেছে। কাজেই বর্ত্তমান বিজ্ঞানের ফলে মানুষের ভিতর নানারকম দুঃখ-যন্ত্রণার উদ্ভব হইয়াছে—ইহা বলিতেই হইবে এবং তদনুসারে বর্ত্তমান বিজ্ঞানকে আমরা "কুজ্ঞান" বলিতে বাধ্য। বঙ্গশ্রী, আশ্বিন—১৩৪২

দুহিতা ও অন্যান্য পরিজন

জনৈক গৃহী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভ্রাতা—"ভাই" সম্বোধন মধুরতায় পূর্ণ। "মায়ের পেটের ভাই" আসল ভাই, সেই জন্যই ভাই-সম্বন্ধ এত মধুর। মা স্নেহ ও স্নিগ্ধতার প্রতিমূর্ত্তি। হিন্দুর মতে জনক-জননী প্রত্যক্ষ দেবতা। আমরা দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করি, কিন্তু সে সকল কল্পিতমূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। শাস্ত্রোক্ত ধ্যানে দেবদেবীর যে যে মূর্ত্তির যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, অধিকাংশ স্থলে তদনুরূপ মূর্ত্তি গঠিত হয় না। শুনা যায়, দেবদেবীর প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকৃত সাধকের নয়নগোচর বা অন্তর্দৃষ্টি গোচর হয়। একথা যথার্থ হইলেও সাধারণ লোকের দেবতার মূর্ত্তি চাক্ষুষ দেখিবার সৌভাগ্য হয় না। অবশ্য আমি প্রকৃত মূর্ত্তির কথা বলিতেছি, মানব গঠিত প্রস্তর মূর্ত্তির বা দারুমূর্ত্তির বা মৃন্ময় মূর্ত্তির নহে। পরন্তু, হিন্দুস্থানের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। মনে হয় মানব নির্ম্মিত মূর্ত্তির প্রকৃতত্ব বিষয়ে সন্দেহ পরবশ হইয়াই লোকে পিতা-মাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা কহিয়া থাকে এবং সেইরূপ জ্ঞান করে। যাহার ধারণা বা জ্ঞান যেরূপই হউক, 'মা'-শব্দে ও 'মা'-সম্বোধনে যে-মিষ্টতা আছে, তাহা অন্য কোন শব্দে বা সম্বোধনে নাই। একই পিতামাতার সন্তানগণের সম্বন্ধ অপেক্ষা নিকটতর সম্বন্ধ আর নাই। সর্ব্বসম্পর্কবিরহিত বাহিরের লোককে ভাই সম্বোধন সদ্ভাব ও সহৃদয়তার পরিচায়ক। ইহা সত্ত্বেও লোকে বলে, "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই"। ভাই যখন স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া ভ্রাতৃস্নেহ বিসর্জ্জন দিয়া সুকুমার বয়সে শিশু ভাইকে বুকে টানিবার সেই তীব্র অথচ অকপট আকাঙ্ক্ষা ও আকিঞ্চন বিস্মৃত হইয়া "নিজের কোলে ঝোল টানিতে" থাকেন, তখন হইতেই ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইতে আরম্ভ করে। যে মা ছেলে মানুষ করিবার জন্য স্বার্থ ও সত্তা মুছিয়া ফেলেন, তাঁহার গর্ভে, একই গর্ভে যে তাহারা জন্মলাভ করিয়াছে এবং তাঁহারই—একই জননীর—বক্ষশোণিতে যে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহাও তাহাদের স্বার্থাচ্ছন্ন স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হয়। যে পিতৃত্যক্ত ধনসম্পত্তির বিহিত অংশ "কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইবার' নিমিত্ত বিরোধের সূত্রপাত হয়, যাহার ফলে সময়ে সময়ে একাধিক অংশ আদালতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই একই পিতার শ্রমলব্ধ অর্থে, সেই একই পিতার পক্ষপাতশূন্য ও নিঃস্বার্থ যত্নে, চেষ্টায় ও শিক্ষাগুণে যে তাহারা মানুষ হইয়াছে এবং তাহাদের চক্ষু ফুটিয়াছে, ইহাও তাহাদের স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হয়। তখন সেই প্রাগ্‌জাত ভ্রাতৃস্নেহ ঘোর বিদ্বেষে পরিণত হয়। তাহারা এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া পড়ে যে, কথঞ্চিৎ স্বার্থপরিহার ও আপোস-মীমাংসার ফলে বিবাদের নিষ্পত্তি হইলে স্বল্পমাত্র এবং বিবাদ পাকিয়া উঠিলে প্রভূত ক্ষতির সম্ভাবনা ইহা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না।

ভ্রাতৃ বিরোধের উৎপত্তিস্থান প্রধানতঃ অন্তঃপুর:, সেইজন্যই এ প্রবন্ধে ইহার উল্লেখ প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক মনে করিলাম।

পিতৃব্য ও পিতৃব্য-পত্নী—পিতৃব্য পিতৃস্থানীয় এবং পিতৃব্য-পত্নী মাতৃতুল্যা। অনেক স্থলে জ্যেঠাই-মা ও কাকীমার দিকে বালক বালিকাগণকে সমধিক আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। মাতা গৃহকর্ত্রী হইলে অনেক সময়ে তাঁহার পুত্রকন্যা তাহাদের খুল্লতাত-পত্নীর হাতে তাঁহারই পুত্রকন্যার সহিত "মানুষ" হয় এবং তাঁহার প্রচুর স্নেহ লাভ করে। গৃহকর্ত্রী সংসারের অপেক্ষাকৃত গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকেন বলিয়া কাকীমাই বাটীর ছোট ছোট বালক-বালিকাগণকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দেন। তাহারা যাঁহার কাছে খাবার ও স্নিগ্ধ ব্যবহার পায়, তাঁহারই "ন্যাওটা" হইয়া পড়ে। এইরূপে যাহারা বাল্যকালে পিতৃব্য-পত্নীকে ভালবাসিতে শিখে, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহাদের অন্তঃকরণে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি উদ্রিক্ত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যে বালক দুর্ভাগ্যক্রমে মাতৃহীন হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতৃব্য-পত্নীর অঙ্ক তাহার স্নেহময় আশ্রয়। তখন স্নেহময়ী পিতৃব্য-পত্নী জননীর স্থান অধিকার করেন।

এক সময়ে একটি একাদশবর্ষবয়স্ক বালক টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়। ঘটনাটি কলিকাতার অদূরবর্ত্তী কোন পল্লীগ্রামে ঘটিয়াছিল। গ্রামের যে পল্লীতে বালকটির বাস ছিল, তাহা প্রধানতঃ তাহার জ্ঞাতিবর্গকে লইয়া গঠিত, আর যে দুইটি গৃহস্থের বাস সে পল্লীতে ছিল, তাঁহারা জ্ঞাতি না হইলেও নিকট সম্পর্কীয়। জ্ঞাতিগণের মধ্যে কখনও

কোন মামলা-মোকদ্দমা হয় নাই—কথিত ঘটনার পূর্ব্বেও হয় নাই এবং এ-পর্য্যন্ত হয় নাই। জনপ্রবাদবৎ জ্ঞাতিবিবাদ এ বংশে কদাপি প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, যদিও ইঁহাদের একমালী সম্পত্তির বিভাগ-বাঁটোয়ারা আদালতের ও উকীলের বিনা সাহায্যে হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ ভাই-সম্পর্কীয় জ্ঞাতিগুলি সহোদর কি না বাহিরের নূতন লোকের পক্ষে ইহা বুঝিয়া উঠা দুরূহ। কথিত বালকটির পিতা ও মাতা উভয়েই বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু, সহোদর ভ্রাতা ছিলেন না। একমাত্র পুত্রের পিতা হইলে সাধারণতঃ যেরূপ ঘটিয়া থাকে, বালকের পিতা উৎকণ্ঠায় এমন অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার দ্বারা কোন কার্য্য বা কার্য্যবিধান অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। রোগীর শুশ্রূষা ও তাঁহার প্রতি নজররক্ষা জ্ঞাতিগণই দিবারাত্রি করিতেন। দিবাভাগে মাতা রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিতেন ও যথাসাধ্য তাহার শুশ্রূষা করিতেন, কিন্তু, রাত্রিকালে সে মাতাকেও চাহিত না, পিতাকেও চাহিত না—চাহিত যে এক জ্ঞাতি জ্যেষ্ঠতাত তাহার শয্যা-পার্শ্বে শুইয়া থাকেন। কোন রাত্রিতে জ্যেষ্ঠতাতের আসিতে বিলম্ব হইলে রোগী মুহুর্মুহু প্রশ্ন করিত—"জ্যেঠাম'শায় কোথায়?" "জ্যেঠাম'শায় কই?" যখন তিনি আসিয়া বলিতেন, "এই যে বাবা, আমি এসেছি", তখন রোগী নিস্তব্ধ হইত। অথচ এই জ্যেষ্ঠতাত কোপন-স্বভাব বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং পল্লীর ছেলেরা এমন কি তাঁহার নিজের ছেলেরাও তাঁহাকে যথেষ্ট ভয় করিত। তবে শান্ত মুহূর্ত্তে তিনি যেরূপ "বাবা," ও "বাপ" প্রভৃতি সাদর আহ্বান করিতেন, অন্য কোন পিতৃব্যের মুখে তেমনটি শুনা যাইত না। সেই জন্য, যদিও সময়ে সময়ে তিনি বালকগণকে তাহাদের সাধ্যাতিরিক্ত কার্য্য করিতে আদেশ দিতেন, সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। কঠিন-রোগশয্যায় শায়িত কথিত বালকের আচরণে ইহাও স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলে ঐ জ্যেঠাম'শায়ের জন্য যথেষ্ট ভালবাসা সঞ্চিত ছিল। ফলতঃ, বালকেরাও বুঝিত যে, তাহার বহিরাবরণ দৃঢ় হইলেও অভ্যন্তর স্নেহকোমল ছিল।

কত মাতৃপিতৃহীন স্বল্পবয়স্ক সন্তান ভ্রাতৃজায়াকর্ত্তৃক এরূপ স্নেহে ও যত্নে লালিত-পালিত হয় যে, তাহারা পিতা-মাতার অভাব অনুভব করিবার অবকাশ পায় না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার এক উপন্যাসগ্রন্থে দেবর-ভ্রাতৃজায়ার এইরূপ একটি স্নেহময় চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। এই চিত্রটি কল্পনা প্রসূত হইলেও, বাস্তব জীবনে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের "নাট্যশালার ইতিহাস"-শীর্ষক প্রবন্ধে স্বর্গীয় পণ্ডিত চূড়ামণি রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের "আত্ম-চরিত" হইতে উদ্ধৃতাংশ—"বড় ভাজ যদি আমায় পুত্রের ন্যায় স্নেহ না করিতেন, তবে আমি কোথায় থাকিতাম!"—ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পিতৃব্য ও জ্যেষ্ঠ সহোদর "রক্তের টানে" ভ্রাতুষ্পুত্র ও অনুজের প্রতি স্নেহপরায়ণ হইয়া থাকেন কিন্তু, যে পিতৃব্যপত্নী ও ভ্রাতৃজায়া "পরের মেয়ে" হইয়াও, ভাসুরপুত্র, দেবরপুত্র ও দেবরের সস্নেহ লালনপালনে আত্ম-নিয়োগ করেন, তাঁহারা দেবীস্থানীয়া এবং রমণিকুলের অনুকরণীয়া।

"জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা"—দেশপ্রচলিত এই বাক্য যদি অনুসরনীয় হয়, তাহা হইলে ভ্রাতুষ্পুত্রমাত্রেরই শ্রদ্ধাভাজন ও গুরুজন-পর্য্যায়ভুক্ত পিতৃব্যকে "সম পিতা" জ্ঞান করা উচিত, ইহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং পিতৃব্য-পত্নী যে মাতৃস্থানীয়া এবং অবস্থাবিশেষে বউ-দিদিও যে মাতার প্রতীক ইহা স্বতঃই প্রতিপন্ন হয়।

ভালবাসা যে পর্য্যায়ের হউক, পারস্পরিকতার উপর নির্ভরশীল। সন্তানবাৎসল্যও এক প্রকারের ভালবাসা, সুতরাং এ নিয়মের বহির্ভূত নহে। যদিও স্নেহ নিম্নগামী এবং স্নেহপাত্রের নিকট পূর্ণ প্রতিদান আশা করা যায় না, তথাপি স্নেহপাত্র ক্রমাগত বিদ্রোহমূলক বা বিরুদ্ধ আচরণ করিলে বাৎসল্যও ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে। ইহা প্রকৃতির নিয়ম; স্বয়ং গর্ভধারিণী জননীও এ নিয়মের বশীভূতা। পুত্রকন্যাগণের প্রতি জননীর স্নেহের ও আচরণের তারতম্যের বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

[ক্রমশঃ]

বিজ্ঞান জগৎ

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ধারা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পাঁচ

নিয়ম আবিষ্কারের চতুর্থ পদ্ধতি—
পূর্ব্ববর্ত্তিগণের পন্থানুসরণ

পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে বা তাঁদের পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ সত্য থেকে সার সংগ্রহ ক'রে নূতন নিয়মের আবিষ্কার সম্ভব এবং অপেক্ষাকৃত সহজ। এ পদ্ধতি সাধারণ এবং উত্তরাধিকারসূত্রে এ রীতি অবলম্বনের অধিকারও রয়েছে মানব মাত্রেরই। এযাবৎ শত শত বৈজ্ঞানিক এই পন্থা অনুসরণ ক'রে তাঁদের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সফলতা অর্জ্জন করেছেন। আমরা দেখেছি নিউটন কর্তৃক মহাকর্ষের নিয়মের আবিষ্কারেও অল্পবিস্তর এই রীতি অবলম্বিত হয়েছিল। কিন্তু এর বিশিষ্ট উদাহরণ পাই আমরা কেপলারের নিয়মের আবিষ্কারে। এ বিষয়ে কেপলার তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতিষী টাইকোব্রাহীর নিকট পূর্ণমাত্রায় ঋণী।

বলতে গেলে আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করেন টাইকোব্রাহী (১৫৪৬-১৬০১ খৃঃ) এবং তার মূলে রয়েছে গগন পর্য্যবেক্ষণ ব্যাপারে টাইকোর অলৌকিক অধ্যবসায়। এই অক্লান্তকর্ম্মা জ্যোতিষী মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর আকাশমার্গে সৌরজগতের গ্রহগণের অবস্থান নিরূপণে পরম নিষ্ঠার সহিত আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যন্ত্রের যুগ তখনো দেখা দেয় নি, সুতরাং বলতে গেলে, একরকম খালি চোখেই এই মনীষীকে প্রতিরাত্রে পর্য্যবেক্ষণ করতে হতো, নক্ষত্রখচিত আকাশপটে কোন্ গ্রহ কতক্ষণে, কোন্ দিকে, কতটা পথ সরে গেল। টাইকোর অধ্যবসায়ের ফল তাঁর গ্রহপঞ্জীতে লিপিবদ্ধ হলো, কিন্তু তার অর্থ আবিষ্কার এবং সুফল ভোগ করলেন তাঁর শিষ্য কেপলার। কেপলার দেখলেন যে, টাইকো-বর্ণিত গ্রহগণের ভ্রমণ প্রণালী অত্যন্ত জটিল—কখনো এ-দিকে কখনো ও-দিকে, আবার কোন কোন গ্রহের বেলায় নানাপ্রকার ঘূর্ণন বিঘূর্ণনের এমন অদ্ভুত সংমিশ্রণ যে, তার থেকে একটা সহজ এবং সকলের পক্ষে সাধারণ গতির নিয়ম আবিষ্কার আদৌ সম্ভব হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সূর্য্য থেকে এই সকল গতি পর্য্যবেক্ষণ করলে (অর্থাৎ পৃথিবী সম্পর্কে সূর্য্যের অবস্থান হিসাব ক'রে তদনুযায়ী গ্রহগণের গতির দিক ও পরিমাণ সংশোধন ক'রে নিলে) দেখা যায় যে, সৌরজগতের সকল গ্রহই সুনিয়ত মণ্ডলাকার পথে এক একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সূর্য্যকে একবার ক'রে প্রদক্ষিণ ক'রে আসছে। এইরূপে টাইকো-ব্রাহীর পর্য্যবেক্ষণ ও পরিশ্রমের ফল কেপলারের গবেষণা দ্বারা সংস্কৃত হয়ে তিনটি বিশিষ্ট নিয়মের আকার ধারণ করলো। এই নিয়মত্রয়ের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলেছি এবং এও দেখেছি যে, এই নিয়ম ক'টাই আবার মহাকর্ষের নিয়ম রূপে একটি মাত্র নিয়মের অন্তর্গত হ'য়ে সমগ্র জগৎকে একসূত্রে গেঁথে রেখেছে। এইরূপে টাইকোব্রাহীর পর কেপলার, কেপলারের পর নিউটন, নিউটনের পর আইনষ্টাইনের আবির্ভাব ঘটলো। এর থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই যে, সত্যের আবিষ্কারে যিনি যতটুকুই দান করুন তা' নিষ্ফল হয় না।

এই প্রণালীর আর একটা বিশিষ্ট উদাহরণ হচ্ছে তাড়িত-চৌম্বক-ক্ষেত্র সম্বন্ধে ম্যাক্স্ওয়েলের গাণিতিক গবেষণা। তাড়িত-চৌম্বক-ক্ষেত্র সম্পর্কে ফ্যারাডের আবিষ্কারের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলেছি। ম্যাক্স্ওয়েল ফ্যারাডে-বর্ণিত তাড়িত-চৌম্বক-ক্ষেত্রের চিত্রটাকে সম্মুখে স্থাপন ক'রে এবং এ সম্পর্কে ফ্যারাডে ও আম্পিয়ার আবিষ্কৃত নিয়মদ্বয়ের সংযোগ সাধন ক'রে ওদের নূতন রূপ দান করলেন। ফলে পাওয়া গেল, উক্ত তাড়িত-চৌম্বক-ক্ষেত্র সম্পর্কে ম্যাক্স্ওয়েলের সমীকরণ ক'টাকে যা' Maxwell's Electromagnetic Equations নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ম্যাক্স্ওয়েলের সূত্রগুলি থেকে একটা বড় তথ্য আবিষ্কৃত হোলো এই যে, তাপালোকের বিকিরণ ব্যাপারে জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের কণাগুলির অতিদ্রুত স্পন্দনের ফলে যেমন শূন্যব্যাপী ইথর-সাগরে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক-তরঙ্গ

উদ্ভূত হ'য়ে থাকে, সেইরূপ কোন তড়িৎ-বিশিষ্ট পদার্থের ধন কিম্বা ঋণ-তাড়িতে মৃদু আন্দোলনের ফলে ইথর-সাগরে তাড়িত চৌম্বক-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়ে থাকে—যদিও আকারে শেষোক্ত তরঙ্গগুলি আলোক এবং তাপ-তরঙ্গের তুলনায় বহু গুণে বড়। ম্যাক্স্ওয়েলের সূত্র থেকে প্রমাণিত হলো যে, এই সকল বৃহদাকারের তরঙ্গগুলিও আলোক-তরঙ্গের সমান বেগেই (সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে) সকল দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর থেকে ম্যাক্স্ওয়েল এই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, আলোক-তরঙ্গে ও তাড়িত-তরঙ্গে প্রকৃতিগত কোন ভেদ নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, জলের ভেতর কলসী দোলালে যেমন নানা আকারের ঢেউ ওঠে—মৃদু আন্দোলনে বড় বড় এবং দ্রুত আন্দোলনে ছোট ছোট ঢেউ—কিন্তু আকৃতি বৈষম্য সত্ত্বেও যেমন ওদের মধ্যে প্রকৃতিগত বৈষম্য নেই—ওদের গতিবেগ সমান, তীর থেকে প্রতিফলিত হয় ওরা একই নিয়মের অধীন হ'য়ে এবং ফিরবার পথে ঐ সকল প্রতিফলিত ঢেউয়ের সঙ্গে যখন অগ্রসরমান ঢেউগুলির সংঘর্ষ (Interference) ঘটে, তা' ঘটে থাকে, সকল শ্রেণীর তরঙ্গের পক্ষেই একই নিয়মের নির্দ্দেশ মেনে, সেইরূপ আলোক-তরঙ্গ ও তাড়িত-তরঙ্গ সম্পর্কীয় প্রতিফলন, প্রতিসরণ প্রভৃতি ব্যাপারগুলিও সম্পন্ন হ'য়ে থাকে একই নিয়মকে মূল নিয়মরূপে আশ্রয় ক'রে।

ম্যাক্স্ওয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করলেন জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক হার্টজ্—তাঁর নির্ম্মিত তড়িতোৎপাদক ও গ্রাহক-যন্ত্রের সাহায্যে। ইংরাজীতে এদের বলা হয় Oscillator এবং Receiver. এই যন্ত্রের সাহায্যে হার্টজ প্রতিপন্ন করলেন যে, প্রতিফলন (Reflection), প্রতিসরণ (Refraction), সমবর্ত্তন (Polarisation) ব্যাপারগুলি যেমন আলোক-তরঙ্গ সম্পর্কে সেইরূপ তাড়িত-পক্ষেও এবং একই নিয়মের অধীন হ'য়েই ঘটে থাকে। এইরূপে ম্যাক্স্-ওয়েলের গাণিতিক সিদ্ধান্তের সত্যতা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হলো। বিংশ শতাব্দীতে অলিভার লজ, মার্কণি এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণের চেষ্টায় হার্টজের যন্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং আমাদের দেশেও এ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে-ছিলেন তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রথম যুগে—আচার্য্য জগদীশচন্দ্র। এই তাড়িত তরঙ্গই আজকের দিনে ওয়ার্-লেস্ এবং রেডিও যন্ত্র থেকে নিঃসৃত হয়ে দূর দূরান্তরের সংবাদ বহন কার্য্যে এবং এমন কি, শব্দ-তরঙ্গের রূপ গ্রহণ ক'রে গান বাজনার আকারে দূর প্রবাসী অপরিচিত বন্ধুর মনোরঞ্জন ব্যাপারে রত রয়েছে। সুতরাং আমরা আবার বলবো, ফ্যারাডের পর ম্যাক্স্ওয়েল, ম্যাক্স্ওয়েলের পর হার্টজ, হার্টজের পর লজ, মার্কনি, জগদীশচন্দ্র এইভাবে জ্ঞানের প্রদীপগুলি আপনি নিবে গিয়ে একটি একটি ক'রে যাদের জ্বালিয়ে দিয়ে যায়, তাদের ভেতর দিয়েই তারা অমরত্ব লাভ ক'রে থাকে।

পঞ্চম পদ্ধতি—ব্যর্থ পরীক্ষার কারণ বিশ্লেষণ

অতঃপর আবিষ্কারের বিশিষ্ট পদ্ধতিরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে ব্যর্থ পরীক্ষার ব্যাখ্যাদানের প্রয়াসকে। নিষ্ফল পরীক্ষার উদাহরণ স্বরূপ লোহাকে সোনা করার প্রচেষ্টার উল্লেখ করা যেতে পারে। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে যখন আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞান জন্মগ্রহণ করে নি তখন অ্যাল্কেমিষ্ট নামধারী এক শ্রেণীর লোক এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, ঔষধ প্রয়োগে যেমন রুগ্ন ব্যক্তিকে সুস্থ ও সবল করা যায়, লৌহ প্রভৃতি হীন ধাতুকেও সেইরূপ উপযুক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা সোনা কিম্বা অন্য কোন মহার্ঘ ধাতুতে পরিণত করা যেতে পারে। কিন্তু তাদের চেষ্টা কোন দিন সফল হয় নি। ব্যর্থতার কারণ আবিষ্কৃত হলো রসায়ন বিজ্ঞানের আবির্ভাবের ফলে—যখন বোঝা গেল যে, সোনা, রূপা, লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতুগুলি মূল পদার্থ এবং ওদের বাইরের মূর্ত্তি যেমন ভিন্ন ভিন্ন, সেইরূপ পরমাণুরূপে ওদের ক্ষুদ্রতম অংশগুলির গুরুত্ব এবং অন্যান্য ধর্ম্মও ভিন্ন ভিন্ন। বস্তুতঃ ড্যাল্টনের (১৭৬৬—১৮৪৪ খৃঃ) পরমাণুবাদ এইরূপ কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো যে, মূল পদার্থের বিভাজ্যতার একটা সীমা আছে। এই সীমায় পৌছলে পদার্থ টার যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি পাওয়া যায়, তারা সর্ব্বাংশে পরস্পরের সমান; কিন্তু দু'টা পদার্থের (যেমন সোনা ও লোহার) ক্ষুদ্রতম অংশদ্বয় সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এই সকল ক্ষুদ্রতম অংশের নাম Atom বা পরমাণু। Atom অর্থে বোঝায় যা'কে কাটা বা ভাঙ্গা যায় না। এই মতবাদ থেকে অ্যাল্ক্যামিষ্টদের চেষ্টার ব্যর্থতার কারণ বোঝা গেল। লৌহ পরমাণুর ধর্ম্ম—ওর গুরুত্ব, আয়তন এবং আকৃতি প্রকৃতি—আপনা থেকে কিম্বা কোন বাহ্য প্রক্রিয়ার ফলে বদলে যাবে তার কোন সম্ভাবনা নেই, সুতরাং লোহার পরমাণুতে পরিণত করার চেষ্টাও বাতুলতা মাত্র। কিন্তু উভয় পরমাণুর মধ্যে এরূপ জাতিভেদ কেন—তার কোন মীমাংসা হলো না। সুতরাং পরমাণুবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও বৈজ্ঞানিকগণের মনের কোণে একটা খট্কা রয়ে গেল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি ড্যাল্টনের পরমাণুবাদ একটা কঠিন আঘাত প্রাপ্ত হলো। ইউরেনিয়ম ও রেডিয়ম ধাতুর আবিষ্কারের ফলে বৈজ্ঞানিকগণ দেখতে পেলেন যে, পরমাণুর রূপান্তর গ্রহণ সম্ভব এবং কোন কোন পদার্থ, বিশেষতঃ রেডিয়মে এই ব্যাপার স্বতঃই এবং বেশ দ্রুতই সম্পন্ন হয়ে থাকে। দেখা গেল—এসকল পদার্থ স্বভাবতঃ কয়েক প্রকার

তেজ বিকিরণ করে এবং তার ফলে ওদের রূপান্তর ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, রেডিয়ম ধাতু, যা'র পরমাণুর গুরুত্ব ২২৬, ক্রমাগত তেজ বিকরণের ফলে পোলোনিয়ম নামক ধাতুতে পরিণত হয়, যা'র পরমাণুর গুরুত্ব ২১০ এবং আরো খানিকটা তেজ বিকিরণ ক'রে শেষ পর্য্যন্ত সীসকে পরিণত হয়, যা'র পরমাণুর গুরুত্ব আরো কম—২০৬। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ড্যাল্টনের মতবাদে পদার্থের যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ অ্যাটম্ নাম গ্রহণ ক'রে অবিভাজ্যতার দাবী জানিয়ে এসেছে এবং রাসায়নিক সংযোগ বিশ্লেষণ ব্যাপারে যা'রা এখনো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাপ নিয়ে পরস্পরের সাথে আনাগোনা করে, বস্তুতঃ তারা অচ্ছেদ্য বা অভেদ্য নয়, পরন্তু ক্ষয়শীল এবং নানা জাতীয় ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাজ্য। এই সকল ক্ষুদ্রতর কণাগুলির মধ্যে আবার দু'দল বিশিষ্ট শ্রেণীর কণা রয়েছে যা'রা অন্যান্যের তুলনায় প্রাধান্য দাবী করে। এদের বলা যায় ইলেকট্রন্। এদের বস্তুমান ও আয়তন ভিন্ন এবং উভয় শ্রেণীর কণাই তড়িৎ-বিশিষ্ট। ইলেক্ট্রনের তড়িৎ- ঋণ-তড়িৎ এবং ওর বস্তুমান ক্ষুদ্রতম প্রোটন ধনতড়িৎ বিশিষ্ট এবং ওর বস্তু তুলনায় অত্যন্ত বৃহৎ। পরমাণুর ওজন সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগের আর একটা মস্ত আবিষ্কার এই যে, একই ধর্ম্ম বিশিষ্ট একই পদার্থের (যেমন ক্লোরিণের) বিভিন্ন পরমাণুর ওজনও ভিন্ন হয়ে থাকে, সুতরাং রাসায়নিক পরীক্ষার ফলে পদার্থ বিশেষের পরমাণুর যে গুরুত্ব নির্ণীত হয়ে থাকে, তা' ওর বহু সংখ্যক পরমাণুর গুরুত্বের গড় মূল্য নির্দ্দেশ করে মাত্র। একই মূল পদার্থের বিভিন্ন গুরুত্ব বিশিষ্ট পরমাণুগুলিকে আইসোটোপ (Isotope) বলা যায়। ডক্টর অ্যাস্টন্ এই সকল পরমাণুর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। এই সকল উদাহরণ থেকে আমরা দেখতে পাই যে, বিজ্ঞানের কোন মতবাদকেই অপরিবর্ত্তনীয় বা ধ্রুব সত্য ব'লে গ্রহণ করা নিরাপদ নয়। তবু পরীক্ষার নিষ্ফলতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সাময়িকভাবে একটা মতবাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং এ যাবৎ বহুক্ষেত্রে হয়ে আসছে।

এই পদ্ধতির দ্বিতীয় উদাহরণ রূপে আমরা বিরামহীন যন্ত্র (Perpetual-motion-machine) আবিষ্কার সম্পর্কীয় প্রচেষ্টার উল্লেখ করবো। শক্তির নিত্যতা সম্বন্ধে নিয়ম আবিষ্কারের পূর্ব্বে বহুদিন যাবৎ এইরূপ একটা যন্ত্র নির্ম্মাণের চেষ্টা চলে আসছিল, যা' একবার চালিয়ে দিলে আর থাম্‌বে না—এমন একটা ঢেঁকি যাকে একবার পাড় দিয়ে দিলে চিরদিনই ধান ভাঙবে। এমন একটা জাতা যাকে একবার ঘুরিয়ে দিলে চিরকালই কলাই ভাঙবে, কিম্বা এমন একটা এঞ্জিন— যা'তে একবার মাত্র খানিকটা তাপ প্রয়োগ করলে চিরদিনই চল্‌তে থাকবে। কিন্তু এরূপ সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হলো এবং তার কারণ স্বরূপ আবিষ্কৃত হলো—শক্তির নিত্যতার নিয়ম (Principle of conservation of Energy)। তখন একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হলো যে, কোন যন্ত্র থেকে ক্রমাগত কাজ আদায় করতে হ'লে তাপ মূর্ত্তিতেই হোক বা অন্য কোন মূর্ত্তিতেই হোক, এ যন্ত্রের ক্রমাগত শক্তির যোগান দিতে হবে। অন্যথায় ঘর্ষণ-বলরূপ বাধা প্রাপ্তির ফলে ওর থামা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

কিন্তু এ সম্পর্কে সব চেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে মাইকেলসনের নিষ্ফল পরীক্ষা (১৮৮১-১৮৮৭ খৃঃ) সম্পর্কে আইনষ্টানের ব্যাখ্যা দান যা' বর্ত্তমানকালে 'আপেক্ষিকতাবাদ' নাম গ্রহণ করে বিজ্ঞানের ইতিহাসে নবযুগের সৃষ্টি করেছে। মাইকেলসন্ শূন্যের ভেতর পৃথিবীর বেগ, যাকে বলা যায় ওর নিরপেক্ষ বা নিজস্ব বেগ (Absolute Velocity) নির্ণয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছিল এই যুক্তির ওপর নির্ভর ক'রে যে, ভূপৃষ্ঠে একটা আলো জ্বালালে বিভিন্ন দিগ্‌গামী আলোকরশ্মির বেগ, পৃথিবীর নিজস্ব বেগের জন্য, পার্থিবদ্রষ্টার মাপে, ভিন্ন ভিন্ন বলে' ধরা পড়বে এবং তা'র থেকে পৃথিবী কত বেগে কোন্ দিকে ছুটে চলেছে তা' নির্ণীত হতে পারবে। কিন্তু শত চেষ্টাতেও ঐরূপ পার্থক্য ধরা পড়লো না। আইনষ্টাইন্ এর ব্যাখ্যা দিলেন এই বলে' যে, পৃথিবী বা অপর কোন জড়দ্রব্যের নিজস্ব বেগ ব'লে কোন বেগই নেই, বা জড়দ্রব্যের বেগমাত্রই আপেক্ষিক। সুতরাং এই সকল বেগ আলোর বেগের ওপর এবং এমন কি কোন খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মের আকারের ওপরেই কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এই মতবাদই আপেক্ষিকতাবাদ নাম ধারণ করে' বিজ্ঞানজগতের বর্ত্তমান চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ নূতন পথে টেনে নিয়ে চলেছে।

আকস্মিক আবিষ্কার

এই শ্রেণীর আবিষ্কারের একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছে এক্‌স্-রে বা রঞ্জন-রশ্মির আবিষ্কার। এর বর্ণনা দানের জন্য গোড়াতে ক্যাথোড-রশ্মি সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলার দরকার। প্রথমেই কল্পনা ক'র্‌তে হবে একটা বন্ধ কাচের নল, যার ভেতরটা ফাঁপা ও বেশ চওড়া। বন্ধ করবার আগে বায়ু-নিষ্কাসন যন্ত্রের সাহায্যে ওর ভেতরকার প্রায় সবটা বাতাসই বের ক'রে নেওয়া হয়েছে এবং নলের দু' প্রান্তে দু'টা ছুঁচ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাদের ছিদ্রমুখ দুটী বেরিয়ে এসেছে নলের বাইরে—ছিদ্রমুখে তামার তার পরিয়ে তড়িতোৎপাদক যন্ত্রের (Induction Coil-এর) সঙ্গে যোগ ক'রে দেবার জন্য। এইরূপ কাচের নলকে বলা যায় নিবাত-নল (Vacuum Tube) এবং ছুঁচ দু'টাকে বলা যায় অ্যানোড্ ও ক্যাথোড্। যে ছুঁচটা তড়িতোৎপাদক যন্ত্রের ঋণ-প্রান্তের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, তাকে বলা যায়

ক্যাথোড্ এবং অপরটাকে বলা যায় অ্যানোড্। বর্ত্তমান আলোচনায় ক্যাথোড প্রান্তেরই গুরুত্ব বেশী। যখন তড়িতোৎপাদক যন্ত্র থেকে নিবাতনলে তড়িৎ সঞ্চালিত হ'তে থাকে, তখন প্রবল চাপ সম্পন্ন তড়িৎ শক্তির প্রভাবে নলের ভেতরের অবশিষ্ট বায়ুকণাগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে, এমন কি ইলেক্‌ট্রনরূপে পরমাণুর ক্ষুদ্রতম অংশে বিশ্লিষ্ট হ'য়ে, নলের ক্যাথোড্ প্রান্ত হ'তে সবাই দল বেঁধে ভীমবেগে সাম্‌নের দিকে ছুটতে থাকে। এই ইলেক্‌ট্রন্ প্রবাহ ক্যাথোড-রশ্মি নামে পরিচিত। এদের ধর্ম্ম অতি বিচিত্র। এদের বেগ অতি ভীষণ এবং আলোর বেগের সঙ্গে তুলনীয়। এরা চলে সোজা পথে। নলের গায়ে ধাক্কা দিয়ে এরা জোনাকির আলোর মত এক প্রকার অনুরঞ্জক আলো (Phosphorescent Light) সৃষ্টি করে। নলের কাছে একখানা চুম্বক রাখলে রশ্মিগুলির-গতিপথ বেঁকে যায় এবং ওদেরকে কেন্দ্রীভূত ক'রে একটা ধাতুর পাতের ওপর ফেললে পাতখানা এত গরম হয় যে, তার থেকে উজ্জ্বল আলো-বিকীর্ণ হ'তে থাকে এবং ধাতুটা হয় ত গলে যায়।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি রঞ্জন সাহেব একটা নিবাত-নলের ভেতর তড়িৎ প্রবাহ সঞ্চালিত ক'রে ক্যাথোড্-রশ্মি সম্পর্কীয় পরীক্ষা কার্য্যে রত ছিলেন। অদূরে একখানা ফটোগ্রাফীর প্লেট একটা মোড়কের ভেতর বন্দী হ'য়ে আপন মনে অবস্থান কচ্ছিল। ফটোর প্লেটখানাকে যখন 'ডেভেলপ্' করা গেল, তখন ওর ওপর কতগুলি চিহ্ন দেখা গেল। রঞ্জন সাহেবের মনে হলো কোন না কোন উপায়ে মোড়কের ভেতর আলো ঢুকেছিল, অথচ সাধারণ আলো যে মোড়ক ভেদ ক'রে ভেতরে ঢুকতে পারে না, তাতেও কোন সন্দেহ ছিল না। কারণ অনুসন্ধান ক'রে রঞ্জন বুঝতে পারলেন যে, আলোটা এসেছিল ঐ নিবাত-নলের অংশ বিশেষ থেকে—ওর যে স্থানটা ক্যাথোড-রশ্মি দ্বারা আহত হয়েছিল, সেখান থেকে। রঞ্জন এই নবাবিষ্কৃত আলোর নাম দিলেন এক্‌স্-রে। এর বিশিষ্ট ধর্ম্ম দেখা গেল এই যে, সাধারণ আলো যাদের ভেদ করতে পারে না, এইরূপ অনেক পদার্থের ভেতর দিয়েই এই রশ্মি অনায়াসে চলে যেতে পারে। কাগজ, কাঠ, কাপড়চোপড় রঞ্জন-রশ্মির পক্ষে অত্যন্ত স্বচ্ছ, কিন্তু ধাতব পদার্থ বেশ অস্বচ্ছ। মানব দেহের মাংসপেশীসমূহ স্বচ্ছ কিন্তু হাড়গুলি অস্বচ্ছ। সুতরাং রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে মানুষের ফটো তুললে শুধু কঙ্কাল মূর্ত্তিরই ছবি পাওয়া যাবে। রঞ্জন-রশ্মি যে ক্যাথোড্-রশ্মি নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির তা' বুঝতে বৈজ্ঞানিকগণের বিশেষ বেগ পেতে হলো না। রঞ্জন-রশ্মির মত ক্যাথোড্-রশ্মির অত ভেদ ক্ষমতা নেই এবং রঞ্জন-রশ্মির গতিপথ ক্যাথোড্-রশ্মির মত চুম্বকের প্রভাবে বেঁকে যায় না। সুতরাং এই রশ্মি যে একটা নূতন আবিষ্কার—সে বিষয়ে সন্দেহ রইলো না। এখন জানা গেছে যে, ক্যাথোড-রশ্মির মত রঞ্জন-রশ্মি ইলেক্‌ট্রন-প্রবাহ বা জড়াকণা বিশেষের প্রবাহ নয়, পরন্তু আলোক-তরঙ্গের মত তরঙ্গ-ধর্ম্মী—যদিও রঞ্জন-রশ্মির তরঙ্গগুলি আলোক তরঙ্গের তুলনাতেও বহুগুণে ক্ষুদ্র। এইরূপে বৈজ্ঞানিকগণ অদৃশ্য তরঙ্গ-রাজ্যের নানা আকারের তরঙ্গের সঙ্গে পরিচিত হ'তে লাগলেন যাঁরা, দৃশ্য আলোক তরঙ্গ থেকে আরম্ভ ক'রে এদিকে যেমন তাপ-তরঙ্গ, তড়িৎ-তরঙ্গরূপে অতি বৃহদাকারের তরঙ্গের অস্তিত্ব ঘোষণা করতে লাগলো, ওদিকে সেইরূপ এক্‌স্-রে তরঙ্গরূপে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তরঙ্গসমূহেরও বিজয়বার্ত্তা প্রচার করলো।

রঞ্জনের আবিষ্কার আকস্মিক হলেও, আমরা দেখলাম যে, তা' হঠাৎ আকাশ থেকে নেমে আসে নি। বিশিষ্ট পরীক্ষা কার্য্যে রত থাকার সময় এবং অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে আকস্মিক ঘটনার কারণ নির্ণয়ে আত্ম-নিয়োগের ফলে এ আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। আমরা প্রথমেই বলেছি, যারা ও পথের পথিক নন, তাদের কাছে প্রকৃতি তাঁর ভাণ্ডারের দুয়ার মুক্ত করেন না এবং করেন শুধু তাদের কাছে যারা ক্ষুদ্র ঘটনাকেও ক্ষুদ্র ব'লে তুচ্ছ না ক'রে, ঘটনাময় জগতে তার সত্যকার স্থান, অর্থ ও উদ্দেশ্য নির্ণয়ে দৃঢ়পদে অগ্রসর হন।

সমাপ্ত

(উপন্যাস)

নয়

সন্ধ্যার দিন আর কাটে না। তবু আরতির মত সঙ্গী পেয়ে সময়টা একরকম করে কাটিয়ে দেয়—বে'র রাত্রে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে কি বিপদ যে টেনে নিয়ে এসেছে—আজ হাড়ে হাড়ে সে বুঝতে পারছে। হয় তো জীবনে আর সে বাড়ী ঢুকতে পাবে না—কেউ হয় তো আর তাকে তেমন আদর করে ডাকবে না। আজকাল কেবলি বৌদিদের কথা মনে পড়ে দাদাদের, দাদুর ও ছোট ভাই অরুণের কথা তাকে কত কষ্ট দেয়। এই অরুণকে দিদিভাই খাইয়ে না দিলে তার খাওয়া হোতো না। তার পর শৈশব সাথী নমিতা তাকে যে প্রাণের চেয়েও ভালবাসতো। আড়ালে আবডালে গেলেই সন্ধ্যার চোখের জল আর বাধা মানতো না। কোন কোন দিন আরতির কাছে ধরাপড়ে যেত সে। আরতি কত বুঝাতো; কিন্তু কিছুতেই চোখের জল রোধ করতে পার তো না।

পাশের গ্রামের যোগেশ চাটুয্যে ও মাধব ভট্টাচার্য্য এরা যেন দুটি মাণিকযোড়; যে কাজই এদের থাকুক না দুজনে একসঙ্গে থাকা চাই—শলা-পরামর্শ যাকিছু এই দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কয়েকদিন ধরে নানা রকম জল্পনা কল্পনা করে এরা জমিদার বাড়ী এসে হাজির হোলো।

কালীনাথ সরকার পাকা নায়েব—কারুর তোয়াক্কা রাখে না। তিনখানা গ্রাম কালীনাথের দোর্দ্দাণ্ড প্রতাপে সর্ব্বদা শঙ্কিত হয়ে থাকে। কালীনাথকে ডিঙ্গিয়ে কেউই জমিদার পর্য্যন্ত অগ্রসর হতে পারে না।

যোগেশ চাটুয্যে ও মাধব ভট্টাচার্য্য এসে জোড়া প্রণাম করে পাশের বেঞ্চিতে বসে পড়লো। নাকের ডগায় চশমাটা টিপে বসাতে বসাতে কালীনাথ জিজ্ঞাসা করলে, "ভালো আছেন তো যোগেশ বাবু তারপর গাঁয়ের খবর কি বলুন?"

একবার আড়চোখে ভট্টাচার্য্যের দিকে চোখদিয়ে যোগেশ চাটুয্যে বললে—"হুঁ। গাঁয়ের খবর একরকম সব ভাল, তবে কিনা—তার পর একবার এধারে ওধারে চেয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বললে, "একটা গোপনীয় খবর ছিল, তাই আপনাকে জানাবার জন্মেই আমরা এসেছি।"

কালীনাথ নায়েবের চোখ দুটো অসম্ভব রকমের উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললে, "আচ্ছা দাঁড়ান"। তার পর সেখানে উপবিষ্ট যারা ছিল তাদের বাইরে যেতে বলে নিজে একদম বেঞ্চির কাছে সরে এসে বললেন, "তারপর এই বারে ব্যাপার কি বলুন তো।"

"কেউ নেই তো", বলে যোগেশ আর একবার চারিদিকে ভাল করে দেখে নিল। উত্তেজিত ভাবে কালীনাথ বললে, "আরে না না কেউ নেই।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে যোগেশ বললে, "ডাকাতের হাত থেকে অবিনাশ ঘোষালের সেই মেয়েটা ফিরে এসেছে"—বড় বড় চোখ বের করে কালীনাথ বললে, "সেই আরতি না কি?" "হ্যাঁ হ্যাঁ আরতি," বলে মাধব ঘোষাল যোগেশের গায়ে অল্প একটু ধাক্কা দিলে। যোগেশ বললে, "শুধু আরতি আসে নি সঙ্গে আর একটা ছুঁড়ি এসেছে তার চমৎকার দেখতে। শুনলুম না কি বে'র রাত্রে পালিয়ে এসেছে।"

কালীনাথ বললে, "এঁ্যা বল কি যোগেশ বাবু?"

মাধব তাড়াতাড়ি অম্নি বললে, "একেবারে নিছক সত্যি কথা নায়েব মশাই।"

যোগেশ বললে, "চলুন না একদিন দেখিয়ে দেবো, রোজ সন্ধ্যেবেলা দীঘিতে কাপড় কাচতে আসে।" "বেশ, তা হলে একদিন দেখিয়ে দিন—তারপর যা হয়," বলে কালীনাথ চোখের কোণে একটা ইঙ্গিত করলে। যোগেশ ও মাধব কার্য্যসিদ্ধি দেখে নায়েব মশাইকে নমস্কার করে উঠে পড়লো।

আরতি যখন বার তের বছরের মেয়ে তখন থেকেই কালীনাথ, যোগেশ ও মাধবের মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র চালাতোছিল। এমন কি এই কু-অভিপ্রায় জানতে পেরে অবিনাশ ঘোষাল যোগেশ ও মাধবকে রীতিমত অপমান করেন এবং তাড়াতাড়ি মেয়ের বিবাহ দেন কিন্তু বিধি বাদ সাধলেন আরতি বিধবা হোলো। আজ আবার আরতিকে গাঁয়ে ফিরে আসতে দেখে যোগেশ ও মাধব পূর্ব্ব অভিসন্ধি অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করে দিলে।

দশ

কয়েক মাস কেটে গেছে। সকালে চায়ের টেবিলে বসে বিশ্বনাথ, অজয় ও সমীর—লীলা ট্রেতে করে তিন কাপ চা ও কিছু জল খাবার দিয়ে গেল সেখানে। সমীরের পাশের খবর বেরিয়ে গেছে। বিশ্বনাথ বললে, "ব্রিলিয়ান্ট বয় আপনি সমীর বাবু—এম, এ-তে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট গোল্ড মেডেলিষ্ট—সত্যি আজ আমাদের আনন্দ করবার দিন বটে।" অজয় নির্ব্বাক যেন কত কি চিন্তা তার মাথায় বাসা বেঁধেছে।

সমীর বললে, "বাবার চিঠি এসেছে দুই একদিনের মধ্যে বাঁকীপুর যেতে হবে।"

বিশ্বনাথ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বললে, "সকলকে নিয়ে যাচ্ছেন না কি ?"

হেসে সমীর বললে, "পাগল হয়েছেন, বাবা সেরকম কিছু লেখেন নি, ওরা অজয়বাবুর চার্জ্জে থাকবে।" অজয় একটু মুচকি হাস্‌ল মাত্র। এমন সময় লীলা সেখানে এসে হাজির হোলো—"এই যে লীলা, দাদা তো চলে যাচ্ছেন, তোমরা বাড়ী যেতে পেলে না—এখানে তোমাদের কত কষ্ট হবে !"

গম্ভীরভাবে উত্তর দিলে লীলা, "মোটেই নয়—অজয় দা রয়েছে, কষ্ট কিসের।" পরক্ষণেই ভাবল কথাটা তো ভাল বলা হোলো না, সুতরাং পালাবার ফন্দি খাটিয়ে বললে, "যাই, বৌদি ডাকছে"—তার পর দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। বিশ্বনাথ আড়চোখে একবার অজয়ের দিকে চেয়ে বললে, "ভারি আমুদে মেয়ে !" সমীর বললে, "অজয়বাবুকেও বড় ভালবাসে ; দেখুন না, বাবা মার জন্যে ওর এতটুকুও মন কেমন করে না।"

বাড়ী ফেরবার পথে গেটের কাছ বরাবর এসে বিশ্বনাথ সমীরকে বললে, "রাজেনটা দেশে গেছে সমীরবাবু।" সমীর উত্তর দিলে, "তা জানি সেই জন্যে মদখাওয়াটা আজকাল একটু কমেছে, এই বেলা সন্ধ্যার খবরটা পাওয়া যেতো তা হলে বড় ভাল হোতো। বিশ্বনাথবাবু, এত বড় একটা প্রতিভা এমন ভাবে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে দেখে বড় কষ্ট হয়।"

বিশ্বনাথ বললে, "বীরেশ্বরবাবু তো নাতনির শোকে কেঁদে কেঁদে পাগলের মত হয়ে গেছেন আর খোঁজ খবরের এখনও বিরাম নেই।" সমীর বললে, "বোধ হয় সুইসাইড করেছে—তা না হলে এত খোঁজ করা সত্ত্বেও পাওয়া যাচ্ছে না"—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিশ্বনাথ বললে, "বড় স্যাড্‌ সমীর বাবু"—তারপর বিশ্বনাথ চলে গেল।

পরদিন একটা বিশেষ কাজে আরতির বাবাকে একটু দূরে যেতে হোলো। যাবার সময় আরতিকে ডেকে বললেন "আজ রাত্তিরে বোধহয় আসতে পারবো না মা, অনেকটা পথ কি না তোমরা ; একটু সাবধানে থেকো, সদরের দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে রেখো—কেমন ?" আরতি ঘাড় নাড়লে, সন্ধ্যার বুকের ভেতরটা দুর দুর করে উঠলো—আরতির বাবা গলায় চাদরটা ফেলে একটা ছাতি বগলে করে বেরিয়ে গেলেন বাড়ী থেকে।

আন্দাজ বেলা বারটা তখন হবে, কালীনাথ নায়েবের পাল্কী এসে যোগেশ চাটুয্যের চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে দাঁড়ালো। আগে থেকেই মাধব ভটচাজ্‌ ও যোগেশ সেখানে অপেক্ষা করছিল। নায়েব মশাইকে দেখে উভয়েই একসঙ্গে নমস্কার করে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "আসুন আসুন নায়েবমশাই আমরা এই আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম"—আনন্দে উৎফুল্ল নায়েব বল্‌লে, "সব ঠিক আছে তো,—আজ রাত্রেই, কেমন ?" মুরুব্বিয়ানা চালে মাথা নেড়ে মাধব বল্‌লে, "আজ্ঞে হ্যাঁ—আজ রাত্রেই—সব ঠিক আছে—কিন্তু"—বলে মাথার টিকিতে হাত বুলাতে লাগলো।—গম্ভীরভাবে কালীনাথ নায়েব বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমারও সব ঠিক আছে"—বলে একতাড়া নোট যোগেশ ও মাধবের সামনে বের করে বল্‌লে, "কিন্তু যেন মনে থাকে আজ রাত্রে শেষ করতে হবে—কাল দুপুরের ট্রেনে খোকাবাবু আসছে, আমায় সর্ব্বদাই সদর বাড়ীতে উপস্থিত থাকতে হবে।" যোগেশ চাটুয্যে বল্‌লে, "সে আর বল্‌তে হবে না নায়েব মশাই—দুলে পাড়ার মেথোর দল ঠিক হয়ে বসে আছে শুধু একটু ইঙ্গিত করলেই হয়।" "বেশ বেশ"—বলে নায়েবমশাই সুবিস্তির্ণ ফরাসের উপর গা হেলিয়ে দিলেন।

—"দরজাগুলো একটু ভাল করে দিস ভাই," বলে সন্ধ্যা একটা আলো ধরে দাঁড়ালো; আরতি সদর দরজায় খিল এঁটে দিয়ে ঘরের দরজাও বন্ধ করে দিলে। রাত তখন দেড়টা কি দু'টো হবে ; সন্ধ্যা ও আরতি অনেকক্ষণ গল্প করে করে এই সবে ঘুমিয়ে পড়েছে। চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ, শুধু ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা কড়াসুর ও দু একটা শিয়ালের হুক্কা-হুয়া আওয়াজ ভেসে আসছে, এমন সময় একটি কাল মূর্ত্তি এসে আরতিদের ঘরের দাওয়ায় উঠে দাঁড়ালে, তার পরে আর একটা এমনি করে তিন চারজন যমদূতের মত ষণ্ডামার্কা লোক এসে একসঙ্গে দরজায় ধাক্কা দিলে। জীর্ণ কাঁঠাল কাঠের দরজা মড় মড় করে ঘরের ভিতর হেলে পড়তেই সন্ধ্যা ও আরতি জেগে উঠলো। চীৎকার করবার অবসর না দিয়ে একজন গিয়ে সবলে সন্ধ্যার মুখ চেপে ধরে তাকে টেনে নিয়ে এলো এবং কাঁধে ফেলে সদর দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। আরতি আবছা আলোয় চিন্‌তে পেরে চীৎকার করে উঠলো—"যোগেশ কাকা"—সঙ্গে সঙ্গে একটা মোটা লাঠির আঘাতে দাওয়া থেকে দশহাত দূরে কলাবাগানের ভেতর ছিটকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। খানিক পরেই অবিনাশ ঘোষালের ঘরগুলো জ্বলে উঠলো। গাঁয়ের লোক আগুন দেখে দৌড়ে এলো কিন্তু বাতাসের বেগ থাকায় আগুনের হাত থেকে একখানি ঘরও নিস্তার পেলে না।

পরদিন আরতি ও সন্ধ্যা যে আগুনে পুড়ে মরেছে, এ কথাটা এক খুঁদি পীসিই গাঁয়ের সকলকে জানিয়ে দিলে—কিন্তু যখন খোঁজা খুঁজির ফলে পাশের কলা বাগান থেকে আরতির অচৈতন্য দেহটাকে খুঁজে পাওয়া গেল তখন সকলেই একরকম ঠিক করে ফেল্‌লে সন্ধ্যাকে যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন সে নিশ্চয়ই পুড়ে মরেছে।

বেলা নাগাত সাড়ে দশটার সময় অবিনাশ ঘোষাল গাঁয়ে ফিরে এলো। বাড়ীর কাছ বরাবর আসতে না আসতেই পথে খবর পেল বাড়ী ঘর দোর সব পুড়ে গেছে। এবং সন্ধ্যাই নিজে কাপড়ে আগুন লাগিয়ে এই কাণ্ড বাধিয়েছে। আরতি তাকে বাঁচাতে গিয়ে আগুনে ঝল্‌সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। অবিনাশ ঘোষাল পাগলের মতন হয়ে বাড়ীর দিকে দৌড়ে আসতে লাগলেন।

প্রায় বাড়ীর কাছ-বরাবর এসে হাজির হয়েছেন এমন সময় পিছন দিকে মোটারের তীব্র হর্ণ বেজে উঠলো—পিছন ফিরেই দেখলেন জমিদারের মোটার। তাড়াতাড়ি রাস্তার একদম ধারে নেমে দাঁড়ালো অবিনাশ ঘোষাল। গাড়ীখানা একটু এগিয়ে গিয়ে ব্রেককসে দাঁড়ালো—এবং গাড়ীর দরজা খুলে জমিদারপুত্র, আমাদের খোকাবাবু, নেমে এসে বল্‌লে, "এত হন্ত-দন্ত হ'য়ে চলেছেন কোথায় ঘোষাল মশাই ?"

"সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে কুমার বাহাদুর, আমার আরতি অজ্ঞান হয়ে গেছে"—বলে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো অবিনাশ ঘোষাল।

বিস্মিত হয়ে খোকাবাবু বল্‌লেন, এ্যাঁ, আরতি অজ্ঞান হয়ে গেছে, আসুন আপনি আমার মোটারে আমিও যাব আরতিকে দেখতে"—জোর করে গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেলেন জমিদারপুত্র—খোকাবাবু।

কয়েক বছর আগে নায়েবমশাই, যোগেশ চাটুয্যে ও মাধব ভট্‌চায্যের চক্রান্তে আরতির বিবাহ বন্ধ হয়ে যেতে বসেছিল। আরতির বাবা জমিদার বাড়ী গিয়ে অনেক কাঁদা-কাটা করায় খোকাবাবুর মধ্যস্থতায় আরতির বে' হয়। সেই আরতি আবার আজ অজ্ঞান হ'য়ে গেছে—কলিকাতা হ'তে বাড়ী ফেরবার পথে এই সংবাদ পেয়ে খোকাবাবু স্থির থাকতে পারলে না

আরতির এখনও জ্ঞান হয় নি। আরও একটি মেয়ে পুড়ে মরেছে। জমিদারপুত্রের কাছে ব্যাপারটা যেন ঘোরাল হয়ে দাঁড়ালো। তিনি বল্‌লেন, "আরতিকে আমি নিয়ে যাচ্ছি, আশা করি সুস্থ করে আবার পাঠিয়ে দেবো আপনার কাছে অবিনাশবাবু।"

মস্ত বড় জমিদার বাড়ী। তারই ত্রিতলের ঘরে আরতি আছে—এখনও সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নি। দেয়ালের ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। খোকাবাবু ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে নার্শকে জিজ্ঞাসা করলেন, "জ্ঞান হয়েছে ?" নার্শ উত্তর দিলে, "না এখনও জ্ঞান হয় নি।" আবার দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

গ্রামে ভালো ডাক্তার পাওয়া যায় না। যা দু'একজন কবিরাজ আছেন তাঁরা কোন রকমে হাতে-হেতুড়ে, রোগী দেখেন তাতে শতকরা প্রায় পঁচানব্বইটি রোগীই ভবজ্বালা থেকে রেহাই পায়। খোকাবাবু নায়েবমশাইকে ডেকে পাঠালেন বারবাড়ীতে। প্রজার রক্ত-শোষণে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নায়েবমশাই একটা আশু বিপদের সম্ভাবনায় ভয়ে ভয়ে এসে বারবাড়ীতে হাজির হোলো। খোকাবাবু বল্‌লেন, "আপনাকে এখনই কলকাতায় রওনা হ'তে হবে নায়েব-মশাই, একজন ভাল ডাক্তার আন্‌তে—বারটা একচল্লিশের ট্রেনে, বুঝলেন ?"

কালীনাথ নায়েব জোড় হাতে নমস্কার করে বল্‌লে, "যে আজ্ঞে।"

যোগেশ চাটুয্যের ভিতরকার ঘরে বন্দী হয়ে আছে সন্ধ্যা। সমস্ত দিন ঘরের দরজা জানালা বন্ধ। অন্ধকার ঘরে থেকে থেকে এবং নানান রকম ভয় ও ভাবনায় সে যেন আধমরা হয়ে গেছে। মেঝেয় আঁচলখানা বিছিয়ে শুয়ে পড়লো সন্ধ্যা। বাইরের থেকে ডাক এলো, "যোগেশবাবু বাড়ী আছেন নাকি ?"

সবে আহ্নিকে বসেছিল চাটুয্যে, নায়েবমশাইয়ের গলা পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে বল্‌লে, "আসুন আসুন—।"

চণ্ডমণ্ডে ভাবে নায়েবমশাই বাড়ীর ভেতর ঢুকে দরজটা আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দিলেন। আস্তে আস্তে চাটুয্যেমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "খোকাবাবু টের পায় নি তো ?"

"আরে না না টের পেলে কি এতক্ষণ কাঁধে মাথা থাকতো—যাক একটা সুখবর—আমি এখনই কলিকাতায় যাচ্ছি—আরতির জন্যে ডাক্তার আনতে—" বড় বড় চোখ করে ক'রে যোগেশ চাটুয্যে বল্‌লে "আরতির জন্যে ডাক্তার"—"হ্যাঁ-হ্যাঁ, না গেলে কাঁধে মাথা থাক্‌বে না যোগেশবাবু—তবে একটা কাজ করলে হয়, আমি কলকাতায় গিয়ে একটা বাড়ীর সন্ধান ক'রে আসি —আগামীকাল আমি ফিরে এলে আপনি ছুঁড়িকে নিয়ে কল্‌কাতায় চলে যাবেন—কি জানি আরতির জ্ঞান হোলে সব কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়তে পারে—"যোগেশ চাটুয্যে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে বল্‌লে, "ওরে বাবা বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা—আপনি নিশ্চয়ই একটা বাড়ী ঠিক ক'রে আস্‌বেন—আমি কালই ওকে নিয়ে যাব।" নায়েব মশাই যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একবার এধার ওধার চেয়ে নিয়ে দরজাটা খুলে বেরিয়ে পড়লেন, যোগেশ চাটুয্যে গিয়ে দরজায় খিল এঁটে দিলে ভাল ক'রে।

বন্ধ দরজার ভিতর থেকে সন্ধ্যা সব শুনলে এদের ষড়যন্ত্র, একবার শিউরে উঠলো, তারপরে দু' হাতে মাথাটা চেপে ধরে বসে পড়লো মেজের ওপরে। মুক্তির প্রশ্ন আর উঠতে পারে না আজ—নায়েব তাকে কল্‌কাতায় বন্দী করবার মতলব ক'রেছে, তারপর সুবিধেমত নিজের কুৎসিৎ

লালসা চরিতার্থ করবে—সে আর ভাবতে পারে না। যে কোন উপায়ে মুক্তি পেতে হবে—সন্ধ্যা তার ফন্দী খুঁজতে লাগলো।

ক'দিন হোলো অজয়ের মদ খাওয়ার বিরাম নেই—খালি মদ আর মদ—। বিশ্বনাথ বুঝিয়ে আর পারে না—নমিতা, লীলা হার মেনে গেছে—মা কেবলি দেশে যাবার জন্যে তাগিদ দিচ্ছেন, সে দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ নেই অজয়ের। আবার রাজেনটা কল্‌কাতায় ফিরে এসেছে সুতরাং তাকে আর কে পায়। বাহ্যিক আচরণ শিথিল হ'য়ে পড়লেও, ভিতরকার প্রবৃত্তি তার হার মানে নি। সমীরদের বাড়ীতে অজয় সর্ব্বদাই সংযম রক্ষা করে চলেছে, এইখানেই তার বৈশিষ্ট। মানুষ জীবনে ভুল করে অনেকবার কিন্তু লক্ষ্যবস্তু তার একই থাকে—তাই সন্ধ্যাকে অজয় ভুলতে পারে না।

তখনও সন্ধ্যা হয় নি, রজনী-গন্ধার ঝাড়ে ঝাড়ে অজস্র ফুল ফুটে উঠেছে, লীলা একলা বেড়িয়ে বেড়িয়ে গাইছে—

"আমি বন ফুল গো,
ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে
আমি বন ফুল গো।"

পিছন থেকে নমিতা এসে দু' হাতে লীলার চোখ দু'টো টিপে ধর্‌লে—"আঃ ছেড়ে দিন না অজয় দা" ব'লে ঝটকা মেরে চোখ ছাড়িয়ে পিছন ফিরে দেখে নমিতা—"নমিদি আমার ভারি লেগেছে কিন্তু" খিল খিল করে হাসতে হাসতে নমিতা বল্‌লে "অত ক'রে ভাবিস্ নি, খয়ে যাবে যে—" ভাল ক'রে বুঝতে না পেরে লীলা উত্তর দিলে, "যায় যাবে তোমার তাতে কি—" "নিশ্চয়ই একশো-বার—নিশ্চয়ই—" বলে হো হো ক'রে হাসতে হাসতে নমিতা বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেল।

"—কি হচ্ছে লীলা?" চম্‌কে লীলা পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে অজয় দাঁড়িয়ে রয়েছে—দুটো চোখ জবা ফুলের মত লাল। লীলা বল্‌লে "কোথায় গেছলেন, রাজেন বাবুর ওখানে নিশ্চয়ই"—অজয় উত্তর দিলে "হ্যাঁ, তাতে হয়েছি কি?" লীলা বল্‌লে "নমিদি খুঁজছিল কিনা, তাই বল্‌ছি"—"ও—আচ্ছা—যাচ্ছি" বলে অজয় বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেল। লীলার পিছনে পিছনে চলে গেল।

নায়েব মশাই কল্‌কাতায় এসে নিজের কাজ শেষ ক'রে আবার ফিরে এসেছে—একজন ভাল ডাক্তার ও একজন নার্শও এসেছে জমিদার বাড়ী।

খোকাবাবু রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ডাক্তার-বাবুকে সঙ্গে করে আবার রোগীর ঘরে প্রবেশ করলেন—আরতির বাবা অবিনাশ ঘোষালও পিছন পিছন ঢুকলো।

অনেকক্ষণ রোগীকে পরীক্ষার পর গম্ভীরভাবে ডাক্তারবাবু বললেন, "চোট খুব জোরেই লেগেছে এখনও কিছু দেরী হবে জ্ঞান হতে, কিন্তু—"

তাড়াতাড়ি খোকাবাবু বললেন, "কি ডাক্তারবাবু?"

মাথা চুলকাতে চুলকাতে ডাক্তারবাবু বল্‌লেন,"জ্ঞান হবে; কিন্তু হয় তো ব্রেনটা খারাপ হয়ে যেতে পারে—" "খারাপ হয়ে যেতে পারে" বলে অবিনাশ ঘোষাল বড় বড় চোখ বের করে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে রইলো। ডাক্তার-বাবু বল্‌লেন "এই ধরুন না—আবোল তাবোল বকা আর কি—বড্ড লেগেছে কিনা একটা শির ছিড়ে গেছে।"

দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল নায়েব মশাই—যেই শুনলে মাথা খারাপ করে হয়ে যেতে পারে অমনি তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেবে গেল। মনে মনে বল্‌লে "দোহাই ভগবান, জ্ঞান যেন আর না ফিরে আসে।"

ওধারে যোগেশ ও মাধব ভট্টাচার্য্যের যেন ঘুম হচ্ছে না কতক্ষণে রাত হবে—নায়েব মশাইয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র অনুযায়ী শেষ রাত্রে সন্ধ্যাকে গ্রাম থেকে সরাতে হবে সোজা ক'লকাতায়, সেখানে আগে থেকেই নায়েব মশাই ছোট একখানি বাড়ী ভাড়া করে রেখে এসেছে।

বন্ধ ঘরে সমস্তদিন বসে বসে সন্ধ্যার চিন্তার বিরাম নেই—আজ রাত্রি শেষে তাকে কলকাতায় বন্দী করা হবে—ঘরে মটকার দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লে—"মুক্তি পাবার কোন উপায় কি নেই ভগবান!" তারপরে নিজের দিকে চোখ ফেল্‌তেই লক্ষ্য করলে ঘরের এককোণে একটা কেরোসিনের ল্যাম্প রয়েছে; তাড়াতাড়ি সেটা তুলে ধরে একবার নেড়ে দেখলে তারপর খানকটা যেন আশ্বস্ত হয়ে মনে মনে বললে, "দোহাই ভগবান—এতে তো কোন পাপ হবে না। যাকে এ জন্মে পেলাম না, পরজন্মে যেন তাকে কাছে পাই—" আর কোন কথাই বলতে পারলে না সে, শ্রাবণের ধারার মত দুচোখ ছাপিয়ে জলের ধারা নেমে এলো।

সমস্ত দিনই রোগীকে নিয়ে পরীক্ষা চলে না—বেলা পাঁচটা নাগাত ডাক্তার আরতিকে ইন্‌জেকসন্ দিলে, বল্‌লে, বোধ হয় ঘণ্টা তিন চারেকের মধ্যে জ্ঞান ফিরে আসতে পারে। পাশের ঘরে আরতির বাবা অবিনাশ ঘোষাল বসেছিলেন, খোকাবাবু চিন্তাযুক্ত ভাবে সে ঘরে প্রবেশ করে বল্‌লে,"মেয়েটি যে পুড়ে মরেছে একথা আপনার বিশ্বাস হয়?"

"মাথা নেড়ে ঘোষাল মশাই বল্‌লেন, "কি করে বলি বলুন—এক আরতির জ্ঞান হলে জানতে পারা যাবে"

খোকাবাবু বল্‌লেন, "ডাক্তারবাবু বল্‌ছিলেন প'রে গিয়ে ওর মাথায় চোট লাগে নি, কেউ কোন শক্ত জিনিষ দিয়ে

আঘাত করার ফলেই মাথাটা কেটে গেছে" অবাক হয়ে ঘোষাল মশাই খোকাবাবুর দিকে চেয়ে রইলেন।

পাশের ঘর থেকে নার্শ বেরিয়ে এসে খোকাবাবুকে রোগীর ঘরে যাবার জন্তে ইঙ্গিত করলে, খোকাবাবু ভিতরে চলে গেলেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, "সেন্‌স ফিরে এসেছে।" একটু পরেই আরতি চীৎকার করে উঠলো, "যোগেশ কাকা, যোগেশ কাকা ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ছেড়ে দিন।"

খোকাবাবু তাড়াতাড়ি বাইরে এসে অবিনাশ ঘোষালকে ঘরের ভেতর ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, "শুনুন কি বলছে?"

খানিকটা দম নিয়ে আরতি আবার বললে, "তোমরা ধর, যোগেশকাকা ওকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে—"

উত্তেজিত ভাবে খোকাবাবু বললেন, "শিগগির বলুন ব্যাপার কি—"

অবিনাশ ঘোষাল বললে, "আরতি ঐ মেয়েটিকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল বলে আমাদের গাঁয়ের যোগেশ চাটুয্যে ও মাধব ভট্টাচার্য্য আমাকে অনেকবার শাসিয়ে ছিল।"

আর কোন কথা শোনবার অপেক্ষায় না থেকে খোকাবাবু ডাক্তারবাবুকে বললেন, "আমি এখনই আসছি আপনি রোগীর দিকে একটু বিশেষ করে লক্ষ্য রাখবেন" তারপর বারান্দায় গিয়ে হাঁক পাড়লেন—"নায়েব মশাই?" কালীনাথ নায়েব সবে শোবার যোগাড় করছিল, খোকাবাবুর গলা পেয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে বললে "আজ্ঞে যাই" হাতের রিষ্টওয়াচটা একবার দেখে নিয়ে খোকাবাবু ঘরের বাইরে দণ্ডায়মান একজন দরয়ানকে বললে "ড্রাইভারকে বোলো জল্‌দি মোটার লে আনে।"

পাশের ঘরে প্রবেশ করে ডেস্ক খুলে পিস্তল ও একগাছি চাবুক নিয়ে খোকা বাবু বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন নায়েব মশাই দাঁড়িয়ে। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "যোগেশ চাটুয্যের বাড়ী আমায় নিয়ে চলুন—।" ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নায়েব মশাই উত্তর দিলেন "রাত অনেক হয়ে গেছে, কাল সকালে গেলেই হোতো"—খোকাবাবু তিরস্কার সূচক কণ্ঠে বললেন "না এমনই।" খোকা বাবুর মুর্ত্তি দেখে নায়েবের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুলো না নির্ব্বাকে পিছু পিছু নেমে গিয়ে মোটারে উঠে বসলো—খোকাবাবু নিজেই মোটার হাঁকিয়ে চললেন।

যোগেশ চাটুয্যের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে এসে খোকাবাবু মোটার থামালেন। গাড়ীর দরজা খুলে নেবেই দেখতে পেলেন একটু দূরে একটা ছই ওয়ালা গরুর গাড়ী রয়েছে এবং পাশের আমগাছটায় দুটো বড় বড় গরু বাঁধা—গাড়োয়ান তাদের ঘাস জল খাওয়াচ্ছে—দরজায় ধাক্কা দিয়ে খোকাবাবু ডাকলেন, "যোগেশ বাবু বাড়ী আছেন?" নায়েব মশাইয়ের হাঁক মনে করে যোগেশ চাটুয্যে তাড়াতাড়ি দরজার খিল খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো এবং পরক্ষণেই নায়েব মশাইয়ের পাশে স্বয়ং জমিদার পুত্রকে দেখে ভয়ে ভয়ে বললেন, "এতরাত্রে হুজুর কি মনে করে এসেছেন?" গম্ভীর কণ্ঠে খোকাবাবু বললেন, "অবিনাশ ঘোষালের ঘরে আগুন লাগিয়ে যাকে নিয়ে এসেছো তাকে কোথায় রেখেছো—" আমতা আমতা করে যোগেশ চাটুয্যে উত্তর দিলে, "আজ্ঞে কি বলছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—" "আচ্ছা এই বুঝিয়ে দিচ্ছি" বলে ডান হাতে চাবুক দিয়ে সপাসপ করে যোগেশের পিঠে মারতে মারতে বললেন, "এক মুহূর্ত্ত দেরী নয় এখনই বল আজ গুলি করে তোমায় মেরে ফেলবো—" যন্ত্রনায় কাতরাতে কাতরাতে যোগেশ চাটুয্যে বললেন "নায়েবমশাই সব জানেন হুজুর।" বিস্মিত হয়ে খোকাবাবু পিছন ফিরে দাঁড়াতেই নায়েব জোড় হাতে বললে, "দোহাই হুজুর আমি কিছুই জানি না।" আবার চললো যোগেশের পিঠে প্রহার।

এদিকে রাত ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে আর একটু পরেই সন্ধ্যাকে কলিকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে—সেদিন দরজার পাশ থেকে সে সবই শুনেছে। মেঝে থেকে উঠে ভাল করে আঁচলটা বেড় দিয়ে কোমরে পরে নিলে সন্ধ্যা, তারপরে আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে ঘরের কোন থেকে জ্বলন্ত কেরসিন ল্যাম্পটা তুলে নিয়ে এক মুহূর্ত্ত কি ভাবলে তারপরে ল্যাম্পের সব তেলটা নিজের কাপড়ে ঢেলে দিয়ে তাতে ল্যাম্পের আলোর আগুন ধরিয়ে দিল।

"শিগগির বল তাকে কোথায় রেখেছো—?" জমিদার পুত্রের হাতে টোটা ভরা রিভালভর দেখে যোগেশের প্রাণ উড়ে গেল, বললে "বলছি হুজুর—রান্নাঘরের পিছনদিককার ঘরে আছে" নায়েব মশাই পিছন থেকে সরে পড়বার চেষ্টায় ছিলেন! খোকাবাবু বললেন, "নায়েব মশাই এগিয়ে চলুন" ঘরের কাছ বরাবর আসতে না আসতে কেরসিনের গন্ধ এসে নাকে লাগলো, একলাফ দিয়ে একধাক্কা মারলেন দরজায়। খোকাবাবুর ধাক্কায় দরজা ভেঙ্গে গেল, ভিতরে আগুন জ্বলছে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে খোকাবাবু সেই জ্বলন্ত দেহটাকে বাইরে টেনে এনে নিবিয়ে ফেললেন তার আগুন। ভগবানকে ধন্যবাদ সবে জ্বলে উঠেছিল কাপড়ে! খোকাবাবু চীৎকার করে উঠলেন "সন্ধ্যা" ক্ষীণকণ্ঠে সন্ধ্যা উত্তর দিলে "সমীরদা তুমি এসেছো" তার পরে অজ্ঞান হয়ে পড়লো সমীরের কোলের ওপর! সামনেই যোগেশ ও নায়েব পরস্পরের দিকে চাওয়াচায়ি করছিল উত্তেজিত ভাবে সমীর বললে, "ধর গাড়ীতে নিয়ে চল—" গাড়ীতে উঠে সমীর বললে—"ওঠো পিছনের সিটে।" নায়েব ও যোগেশ চাটুয্যে ভয়ে ভয়ে গাড়ীর পিছনে উঠে বসলো।

গাড়ীতেই সন্ধ্যার জ্ঞান ফিরে এলো একটু একটু করে। বাড়ী ফিরে সমীর, বললে "ভগবানকে ধন্যবাদ যে তোমায় খুঁজে পেয়েছি", ম্লান হাসি হেসে সন্ধ্যা উত্তর দিলে—"আমার ভাগ্য বিধাতা হচ্ছে আরতি, তার অক্লান্ত সেবা যত্ন ও তত্ত্বাবধান না পেলে হয় তো আর আমায় খুঁজে পেতেন না।" কথায় কথায় সন্ধ্যাকে সঙ্গে নিয়ে সমীর আরতির ঘরে এসে হাজির হলো। ডাক্তার বাবু বললেন, "উপস্থিত রোগীর কাছ থেকে একটু দূরে থাকাই ভাল হঠাৎ হার্টফেল করতে পারে।

পরদিন সকালেই সমীর টেলিগ্রাম করে দিলে বালিগঞ্জের বাড়ীতে ও বাগবাজারে বীরেশ্বরবাবুর বাড়ীতে। বাগবাজারে লিখলে, "সন্ধ্যাকে খুঁজে পেয়েছি শীঘ্র আসুন" বালিগঞ্জে অজয়কে লিখলে, "ভীষণ এক্‌সিডেণ্ট, বাড়ীর সকলকে এবং বিশ্বনাথ বাবুকে নিয়ে শীঘ্র আসুন।" সন্ধ্যা কিছুই টের পেলে না।

অজয় চা খাচ্ছিল বারাণ্ডায় চেয়ারে বসে, লীলাও পাশে বসেছিল; এমন সময় ভজু সিং এসে সেলাম দিয়ে বল্‌লে, "টেলিগ্রাম আছে"—"কই দেখি" বলে লীলা তাড়াতাড়ি উঠে গেল। পরক্ষণেই একখানি টেলিগ্রাম নিয়ে এসে অজয়ের হাতে দিয়ে বল্‌লে, "দাদার টেলিগ্রাম—আরজেন্ট—ব্যাপারটা কি বলুন তো অজয়দা?" গম্ভীর ভাবে অজয় উত্তর দিল "কিছুই বুঝতে পারছি না, বৌদিকে জিজ্ঞাসা কর কখন যাওয়া হবে!" সমীরের আর্জেন্ট টেলিগ্রামে বাড়ীতে হুলুস্থুল পড়ে গেল। নমিতা বল্‌লে, "কি হবে বৌদি?" শোভা বল্‌লে, "অজয় বাবুকে বল একখানা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী রিজার্ভ করতে।"

খবর পেয়ে বিশ্বনাথ এসে হাজির হোলো, বল্‌লে, "ব্যাপার কি হে এত জরুরী তলব কেন?" "এই দেখ" বলে অজয় সমীরের টেলিগ্রাম খানা এগিয়ে ধরলে। বিশ্বনাথ একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বল্‌লে, "তারপর কি ব্যবস্থা করেছো?" অজয় বল্‌লে, "গাড়ী রিজার্ভ করা হয়েছে আজই রাত্রের ট্রেনে যেতে হবে"—সিগারেট কেশটা খুলে একটা সিগারেট মুখে দিতে দিতে বল্‌লে, "ব্যাপারটা কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলুন না—যাই হোক যখন বিপদের কথা লিখেছে তখন যেতেই হবে—চলো!"

ওধারে বাগবাজারের বাড়ীতে টেলিগ্রাম পেয়ে অনিতার আনন্দ আর ধরে না, তাড়াতাড়ি টেলিফোনটা তুলে ধরে বালিগঞ্জে নমিতাকে ফোন করলে। দারওয়ান ভজু সিং টেলিফোন ধরে উত্তর দিলে; "বাড়ী মে কৈ নেই হায়—সব চলা গিয়া মুল্লুক মে"—বীরেশ্বরবাবু অরুণকে নিয়ে পরের দিন সকালের ট্রেনে বাঁকিপুর রওনা হইয়া গেলেন।

এগার

ডাক্তারবাবুর বিশেষ নির্দ্দেশে আরতির ঘরে কারুর ঢোকবার অধিকার নেই, কেবলমাত্র সমীর মাঝে মাঝে খবর নেবার জন্যে রোগীর ঘরে যাওয়া আসা করছে—সকাল দশটা বারমিনিটের ট্রেনে অজয় প্রভৃতি এসে হাজির হোলো—

প্রকাণ্ড সাত মহল জমিদার বাড়ী। শেষ মহলের তিন তলার ঘরে রোগী আছে, তৃতীয় মহলের একখানি সুন্দর বড় ঘরে অজয়ের ও বিশ্বনাথের থাকবার জায়গা হোলো এবং বীরেশ্বরবাবু ও অরুণের জন্যে ব্যবস্থা হোলো বার বাড়ীতে সুতরাং কারুর সঙ্গে কারুর দেখা-শুনা হবার উপায় নেই—এ সমস্ত ব্যবস্থা সমীর নিজেই করেছে।

রোগীর ঘরের পাশের ঘরে সন্ধ্যার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে—কারণ আরতির সেবা শুশ্রূষার ভার নার্শ ও সন্ধ্যা উভয়েই ভাগ করে নিয়েছে। সমীর সন্ধ্যাকে বল্‌লে "তোমার খাবারদাবার ঠাকুর এখানেই দিয়ে যাবে, তুমি সর্ব্বদা এখানে থেকে রোগীর অবস্থা লক্ষ্য করবে আর আমি তো মাঝে মাঝে আসছি, কেমন?" সন্ধ্যা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

অনেক চিন্তার পর সমীর ঠিক করেছে—অজয়ের কাছে সন্ধ্যার কথা এবং সন্ধ্যার কাছে অজয়ের কথা সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে, এমন কি নমিতা, শোভা, লীলাও যেন সন্ধ্যার উপস্থিতি টের না পায়—সুতরাং অতি সাবধানে সেই রকমই ব্যবস্থা হয়েছে।

রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে আসতেই দারওয়ান সেলাম দিয়ে জানালে—"বাড়ীর ভেতর দিদিমণি ডাকছেন।"

সমীর ভিতর বাড়ীতে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "লীলা ডাকছিলে আমায়?"—

"আমি নয়, বৌদি ডাকছেন।"

শোভা এগিয়ে এসে বল্‌লে, "মেয়েটি কে, যে তার অসুখের জন্যে কলকাতা থেকে ডাক্তার এসেছে, তারপর দেখাটি পাবার উপায় নেই। কেবল সেই রোগীর পাশেই রয়েছে আবার ডাক্তার সেখানে কাউকে যেতে দিচ্ছে না—ব্যাপারটা কি, বল তো?"

হো হো করে হাসতে হাসতে সমীর বললে, "ওঃ এই কথা, আমি মনে করেছিলাম না জানি হঠাৎ আবার কি বিপদের সম্মুখীন হতে হবে—শোন তবে, উনি হচ্ছেন আমাদের খুব নিকট আত্মীয়া"—লীলা, শোভা, নমিতা সকলেই বড় বড় চোখ বের করে এক সঙ্গেই বলে উঠলো, "তার মানে?"

"তার মানে সময় হ'লেই টের পাবে" বলে আর কোন উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে সমীর একপ্রকার ছুটে সেখান থেকে চলে গেল।

বারবাড়ীতে অরুণ দিদির সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছে, এমন সময় দারওয়ান এসে বল্‌লে "আপনারা একটু অপেক্ষা করুন কুমার বাহাদুর আসছেন।"

অরুণ বল্‌লে, "দাদু, বাড়ীটা কত বড় দেখেছো ?"

বীরেশ্বরবাবু অরুণের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন "এরা খুব বড় বনেদী জমিদার, তার ওপর অনেক পয়সা, তাই এত বড় বাড়ী।" অরুণ অবাক হ'য়ে চুপ ক'রে রইলো দাদুর মুখের দিকে চেয়ে।

অজয়ের সঙ্গে লীলাদের আর দেখা হয় না—নমিতা আড়-চোখে লীলার দিকে চেয়ে বল্‌লে, "সমীরদাকে বলে অজয়বাবুকে ভিতরে আসতে বল্ না!"

লীলা উত্তর দিলে, "ওটা বৌদি বল্‌লেই ভাল হয়।"

শোভা বললে—"যায় 'শত্তুর পরে পরে' আমি বলে খিঁচুনি খাই আর কি—তোমরা বল না!"

একমাত্র সন্ধ্যা আরতির সেবা করে চলেছে—সমীর ঘরে ঢুকে বললে, "এখন কেমন আছে ?"

ম্লানমুখে সন্ধ্যা উত্তর দিলে, "ভাল বলে মনে হচ্ছে না। আপনি একবার ডাক্তারবাবুকে ডাকুন।"

সমীর তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলে গেল ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে।

খানিকক্ষণ পরীক্ষা করার পর ডাক্তারবাবু সমীরকে ঘরের বাইরে ডেকে নিয় গিয়ে বললেন, "খারাপের দিকে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, একটা ইন্‌জেক্‌শন দেবো হয় তো, তাতে টালটা সামলে যেতে পারে। আপনি ওঁর কাছে কিছু বলবেন না, কারণ যখন রোগীকে দেখতে আসি দেখি মাথার দিকে বসে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছেন। আর অবিনাশববুকে এখন এ ঘরে আসতে দেবেন না।"

সমীর যেন খানিকটা চিন্তিত হয়ে পড়্‌লো, পরে বললে, "যা হয় করুন, সবই তো আপনার হাতে দিয়েছি ডাক্তার-বাবু!" নির্ব্বাকে ডাক্তার রোগীর ঘরে চলে গেল—ইন্‌জেক্‌শন করতে।

টিক্ টিক্ করে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যাচ্ছে—চিন্তাকুল চিত্তে সন্ধ্যা আস্তে আস্তে এসে আরতির মাথার কাছে দাঁড়ালো। ডাক্তার নার্শকে বল্‌লেন "সমীর বাবুকে ডেকে আনো।"

একটু পরেই সমীর এসে সে ঘরে ঢুক্‌লো। ডাক্তার বাবু ইন্‌জেক্‌সন করলেন আরতির বাঁ হাতে। সব চুপচাপ, শুধু শোনা যাচ্ছে দেয়ালে টাঙানো ঘড়িটার অবিশ্রান্ত টিক্ টিক্ শব্দ। ডাক্তারবাবু নাড়ি দেখলেন, আরতি আস্তে আস্তে চোখ চাইলো—মুখের উপর সন্ধ্যা হুমড়ি খেয়ে পড় পড় হয়ে আরতির কপালে হাত বুলাতে লাগলো—ধীরে ধীরে আরতি কথা কইলে, বল্‌লে "এসেছো তুমি—"তারপর একটু থেমে বল্‌লে—"আমার প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষা করতে পারলাম না—ভাই, তু—মি আমায় ক্ষমা করো—" সন্ধ্যা কাঁদতে লাগলো চোখে আঁচল চাপা দিয়ে, পিছন দিককার দরজা দিয়ে সমীর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে—হতাশ ভাবে ডাক্তার বল্‌লে "পারলুম না সমীরবাবু বাঁচাতে—" সমীর দাঁড়ালো না ঝড়ের মত নিচের বারাণ্ডায় নেমে এসে চাকরদের দিয়ে ভিতর বাড়ী মাঝের বাড়ী ও বারবাড়ীতে খবর পাঠিয়ে দিলে সকলকে উপরে রোগীর ঘরে শিগ্‌গির আসবার জন্যে। সমীর আবার উপরে রোগীর ঘরে চলে গেল।

হঠাৎ সমীরের জোর তাগিদে সকলে বিস্মিত হয়ে গেল, নমিতা বল্‌লে 'ব্যাপার কি বলতো বৌদি ?—"

অজয় বিশ্বনাথকে বল্‌লে "কিছুই বুঝতে পারলুম না" বিশ্বনাথ বল্‌লে "গিয়েই দেখতে পাবো"—

বীরেশ্বর বাবু অরুণকে নিয়ে তাড়াতাড়ি চাকরের সঙ্গে ভিতর বাড়ীর উপরে চলে গেলেন।

সন্ধ্যা বসেছিল আরতির মাথার কাছে দরজার দিকে পিছন করে, লীলারা পায় পায় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। অজয়, বিশ্বনাথ, বীরেশ্বর বাবু অরুণ সব এলো ঘরের ভেতর কিন্তু সন্ধ্যার পিছন দিক দরজার দিকে থাকায় কেউই তাকে চিন্তে পারছিল না। শোভা এগিয়ে যাচ্ছিল রোগীর দিকে, ডাক্তার বাবু হাত নেড়ে বারণ করলেন। ঘরের ভেতর টুঁ শব্দটি নেই শুধু মাঝে মাঝে ডাক্তার বাবু রোগীর নাড়ী দেখছেন।

হঠাৎ আরতি আবার চোখ চাইলে—আস্তে আস্তে থেমে থেমে বল্‌লে—"তাকে তোমার হাতে দিতে পারলুম না—আমায় ক্ষমা কোরো ভাই—" হঠাৎ সমীর পাশ থেকে এসে অজয়ের হাত একপ্রকার টেনে নিয়ে গেল রোগীর সামনে, ঝুঁকে পড়ে বল্‌লে, "আরতি—এসেছেন এই তো তোমার সামনে চেয়ে দেখ—?" আরতি আবার চোখ চাইলে—"এসেছেন—আপনিই অজয় বাবু—ভগবান, তোমায় ধন্যবাদ! —তারপর আস্তে আস্তে সন্ধ্যার হাতখানি এক হাতে ধরে অপর হাত বাড়াতেই সমীর অজয়ের ডান হাতখানা এগিয়ে ধরলে। দু'জনের দু'টি হাত বুকের উপর চেপে ধরে আবার ক্ষীণকণ্ঠে বল্‌লে—"আজ তোমার ব্রত উদ্‌যাপন হোলো বোন—তোমরা সুখী হও—।" ধীরে ধীরে আবার চোখ বুঝলেন, দু ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়লো চোখের দু' কোণ বেয়ে—মাথাটা বালিসের বাঁ দিকে হেলে পড়লো। ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি নাড়ী দেখলেন এবং গম্ভীর ভাবে হাত নামিয়ে রেখে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

বাইরে থেকে অবিনাশ ঘোষাল—"মা-মা-রে" বলে চীৎ-কার করে ঘরে ঢুকে আছাড় খেয়ে পড়লো মেয়ের বুকের ওপর—

প্রকাণ্ড জমিদার বাড়ীর দেবালয়ে তখন সন্ধ্যা-আরতির শঙ্খ বেজে উঠেছে—।

— সমাপ্ত

শিশুদের জীবনে রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রের প্রয়োজনীয়তা

শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজের দেশকে যদি সত্যই ভালবাসিতে হয়, তবে শিক্ষা ও সংস্কৃতির মানদণ্ডে জাতীয় শিল্পকলাকেও বিশেষভাবে ক্রম-প্রসারের পথ দিতে হইবে। শিল্পকলাও যে জাতীয় শিক্ষার একটি অপরিহার্য্য অংশ, তাহা প্রকৃতই আজ বুঝিবার দিন আসিয়াছে। আর তেম্‌নি করিয়া দিন আসিয়াছে আমাদের প্রতিঘরের প্রত্যেকটি ছেলে-মেয়েকে অন্যান্য বহুবিধ শিক্ষার সাথে সাথে এই শিল্প-শিক্ষাতেও জীবনের প্রথম হইতে ধীরে ধীরে পারদর্শী করিয়া তুলিবার।

শিল্পকলা ক্ষেত্রে নৃত্য, নাটক, রঙ্গমঞ্চ, ছায়া-ছবির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য বলিয়া আজ সুধী সমাজ মানিয়া লইয়াছেন। বাংলা তথা ভারতে রবীন্দ্রনাথই ইহার প্রথম উদ্‌গাতা। দেশ ও জাতির উন্নতির মূলে বয়স্ক লোকের শিক্ষার তুলনায় শিশুশিক্ষা ও শিশুদের সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠাই প্রয়োজনীয় অধিক। কারণ, আজ যে শিশু, কাল সে সমাজের কর্ণধার। অথচ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, শিক্ষার নামে বাঁধা-ধরা মুষ্টিমেয় কয়েকখানি গ্রন্থ ভিন্ন শিল্পচেতনা এ-দেশে আজও বড় একটা তেমন জাগে নাই।

লোকশিক্ষার জন্য যতরকম আয়তন আছে, রঙ্গমঞ্চ ও ছায়াচিত্র তাহাদের অন্যতম। একথা পরাধীনতার চাপে পড়িয়া শিক্ষায়তার নির্ব্বুদ্ধিতা বাংলা তথায় ভারতীয় সমাজ না বুঝিলেও চীন, জাপান, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশগুলি রাষ্ট্র সংগঠনের মূলে তাহাদের শিশুশিক্ষার ভিতর রঙ্গমঞ্চ, নাটক, ছায়াচিত্র প্রভৃতিকে যথেষ্ট প্রয়োজনের তাগিদে সাদরে স্থান দিয়াছে। তাই কাল যাহারা শিশু ছিল, আজ জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিপূর্ণতা লইয়া তাহারা সমস্ত চীন, জাপান আর সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ঘিরিয়া বিরাট ব্যক্তিত্ব লইয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশে আজ ছায়াছবি বা রঙ্গমঞ্চ-অভিনয়ের অন্ত নাই। কিন্তু প্রধানতঃই তাহা বয়স্ক জনসাধারণকে কেন্দ্র করিয়া, এবং যাহা একমাত্র গতানুগতিক প্রেমের ভিত্তিতে আদিম মনোবৃত্তির কাঠামোর উপরেই খাড়া হইয়া আছে। এই সম্পর্কে বিগত শ্রাবণ সংখ্যা বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত "সমাজ-সাহিত্য-চলচ্চিত্র" বিভাগের কয়েকটি ছত্র প্রনিধানযোগ্য। যথা—"নিছক নরনারীর প্রেম ও যৌন সম্বন্ধ লইয়া আমাদের তথাকথিত পরিচালক ও প্রযোজকবৃন্দ ব্যবসায়িক উত্তেজনায় যেরূপ ভাবাতিশয্যে বিভোর হইয়া আছেন, তাহা যে এই পরাধীন দেশ ও জাতির পক্ষে কতবড় কলঙ্কের, তাহা প্রকাশের বাহিরে। আমাদের দেশের প্রযোজক তথা পরিচালকবৃন্দ যখন ছবির কাজে হাত দেন, তখন স্বভাবতঃই হয়ত এই কথাটা ভুলিয়া যান যে, শুধু চিত্তের আনন্দ ও দর্শনেন্দ্রীয়ের তৃপ্তির জন্যই ছবি নয়, দেশের পক্ষে, সমাজের পক্ষে চলচ্চিত্রের একটা বৃহৎ কর্ত্তব্য রহিয়া গিয়াছে, এবং সেই কর্ত্তব্য হইতেছে দেশের উন্নতির মূলে জাতির অন্তরে বিশেষ করিয়া পরিমার্জ্জিত জ্ঞান, চিন্তা ও মানবতার সৃষ্টি করা।"—একপক্ষে এই নির্ব্বুদ্ধি ও ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিই এই দেশের শিশু-সমাজকে যে শিল্পচেতনা তথা শিক্ষার আনন্দের বাহিরে একেবারে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছে, তাহা দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে বিন্দুমাত্র লজ্জা নাই।

ইউরোপে বিশেষতঃ সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি শিক্ষনীয় বিষয়কে কেন্দ্র করিয়াই নাটক ও রঙ্গমঞ্চ গড়িয়া উঠিয়াছে। শিশুশিক্ষার প্রতি সচেতনতা তাহাদের প্রতি-দিনের। তাই দেখিতে পাই, শিল্পকলার ভিত্তিতে রঙ্গমঞ্চ, নাটক ও ছায়া-ছবির মধ্য দিয়া ইউরোপের শিশুরা একদিকে যেমন খাঁটী বিজ্ঞান শিক্ষায় মেধাবী হইয়া উঠিয়াছে, অন্য-দিকে কারুশিল্প ও ললিত-কলায়ও বিশেষ পারদর্শী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাঁচখানি গ্রন্থের চাপ মাথায় না লইয়া পাঁচ-খানি ছবি ও নাটকের আনন্দ-পরিবেশের মধ্য দিয়া তাহারা যখন জয়ধ্বনি তুলিয়া শোভাযাত্রা বাহির করে, আমাদের দেশের শিশুরা তখন রুগ্ন দেহে ভগ্ন মন লইয়া আত্ম-কলহে ব্যস্ত।

কালের রুচি ও অগ্রগতির সাথে সাথে অভিনয়জগৎ ও অভিনয়শিল্প আজ উন্নতির উচ্চশিখরে দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশের প্রত্যেকটি অভিভাবক ও পরিচালক তথা প্রযোজকবৃন্দের তাই আজ আশু কর্ত্তব্য হইতেছে জাতীয় শিক্ষার নামে গ্রন্থ অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চ ও ছায়া-চিত্রে নাটকেরও ব্যবস্থা করিয়া দেশের ছেলেমেয়েদিগকে একটা সুস্থ ও প্রশান্ত আবহাওয়ার মধ্য দিয়া জাগাইয়া তোলা। সংস্কারের কঠিন রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া ঘুমাইয়া থাকিবার দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। আজ এই পরিপুর্ণ চেতনার যুগে আমাদের শিশুরা যদি যথার্থই শিক্ষায় অপূর্ণ থাকিয়া যায়, তাহা হইতে অতিবড় পরিতাপের কথা আর থাকিতে পারে না। আশা করি দেশের সুধীসমাজের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হইবে।

বাঙ্গলার ঘরোয়া প্রবাদ

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

জগতের সর্ব্বদেশেই প্রবাদ বাক্যের প্রচলন আছে। বাঙ্গলা দেশেও বহু প্রবাদ আবহমান কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এই প্রবাদবাক্যগুলি বাঙ্গালী গৃহস্থঘরের—তথা বাঙ্গালী জাতির একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সম্পদ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গলার এই ঘরোয়া প্রবাদবাক্যগুলি ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে বসিয়াছে। সংস্কৃতে বহু প্রবাদবাক্য বিভিন্ন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়া আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে, কিন্তু বাঙ্গলার নিজস্ব প্রবাদগুলি ছাপার অক্ষরে গ্রন্থবদ্ধ না থাকায় অদূর ভবিষ্যতে ইহার লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

প্রবাদবাক্য জাতীয় সাহিত্যেরই একটা অঙ্গ। দেশের অনেক কিছু লুপ্তপ্রায় জিনিসের পুনরুদ্ধার হইয়াছে ও হইতেছে কিন্তু লুপ্তপ্রায় বঙ্গীয় প্রবাদবাক্যগুলির এখনও উদ্ধার সাধন হয় নাই। এইগুলির পুনরুদ্ধার এবং একত্র সমাবেশে বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা আবশ্যকায় দিক পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিবে এই উদ্দেশ্যে বাঙ্গলার ঘরোয়া প্রবাদগুলির সংগ্রহ ও প্রকাশ করা হইল।

প্রবাদবাক্যগুলি স্বল্পকথার দ্বারা রচিত হয়, কিন্তু তাহার ভাব ও অর্থ গভীর। সুতরাং আবশ্যকস্থলে প্রবাদবাক্যের অন্তর্নিহিত ভাব ও অর্থ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যারূপে বাক্যের নীচে লিপিবদ্ধ করা হইল।

অতি-বড় ঘরণী না পায় ঘর,
অতি-বড় রূপসী না পায় বর।

যে নারী সংসারকর্ম্মে অত্যন্ত অভিজ্ঞ, সাংসারিক শৃঙ্খলা সম্বন্ধে যাহার শিক্ষা ও জ্ঞান অনন্যসাধারণ, সে নারী তাহার অভিজ্ঞতা এবং গুণাবলী প্রকাশ করিবার উপযুক্ত কোন ভাল ঘরে পড়ে না। সেইরূপ, অত্যন্ত রূপসী কন্যাও উপযুক্ত পাত্রের অভাবে পাত্রস্থা হয় না। তাহার বিবাহে অযথা বিলম্ব হইয়া পড়ে।

অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

এ বিষয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে। খুব বেশী লোভের ফলে তাঁতি তাহার সর্ব্বস্ব হারাইল। সুতরাং বেশী লোভ সর্ব্বদাই পরিত্যজ্য। সাধারণতঃ লোভশূন্য মানুষ সংসারে বিরল। তবে লোভের একটা সীমা আছে; সেই সীমা যেখানে ছাড়াইয়া যায়, সেখানে অনর্থ ঘটে।

অভাগা যেদিকে চায়,
সাগর শুকায়ে যায়।

অর্থ সুস্পষ্ট। যার অদৃষ্ট মন্দ, তার কিছুতেই সুখ নাই। হতভাগ্য জনের তৃষ্ণা পাইয়াছে, কিন্তু তাহার দুরাদৃষ্টবশতঃ তাহার নিকটস্থ অগাধবারিপূর্ণ সমুদ্রও তাহার আগমনে জলশূন্য হইয়া যায়। দুর্ভাগ্যের মত দুঃখদায়ক আর কিছুই নাই।

অতি বাড় বেড়ো না, ঝড়ে পড়ে যাবে,
অতি ছোট হোয়ো না, ছাগলে মুড়িয়ে খাবে।

সব ব্যাপারেই 'অতি' শব্দটি খারাপ। মাঝা-মাঝিই ভাল। আগে থাকিবার একটা বিপদ আছে, পিছনে পড়িয়া থাকারও বিপদ আছে। গাছ যদি খুব বড় হইয়া গগনস্পর্শী হয়, তাহাতেই যত ঝড় ঝাপটা লাগে। আবার যদি খুব ছোট হয় তাহা হইলেই শুধু ছাগলই নয়—ছাগল, গরু, বাছুর এমন কি দুষ্টু ছেলের দলও তাহার ক্ষতি করিবে।

অন্ধের কিবা রাত্র কিবা দিন।

দিনের আলো বা রাতের অন্ধকার—অন্ধের কাছে এ দুয়ের কোনই মূল্য নাই। যে জন্মান্ধ সে এ দু'য়েরই রূপ হইতে বঞ্চিত। এই প্রবাদবাক্যটি শুধু যে অন্ধের বিষয়েই প্রযুজ্য তাহা নহে, অনেকবিষয়েই ইহা খাটে। যেমন, যে জন্মাবধি বধির, তাহার কাছে তাহার প্রশংসা বা নিন্দার কোনই মূল্য নাই। যে কখনো পরের দাসত্ব করে নাই, সে প্রভুর তিরস্কার বা পুরস্কারের আস্বাদ জানে না। এইরূপ নানা-বিষয়ে এই প্রবাদটি বলা চলে।

অনভ্যাসের ফোঁটা
কপাল চড় চড় করে।

অর্থাৎ কোন বিষয়ে যদি নিত্যকার অভ্যাস না থাকে, তাহা হইলে হঠাৎ সেই কাজে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। কোন-দিনই কপালে চন্দন বা অন্য কোন দ্রব্যের ফোঁটা দেওয়া অভ্যাস নাই, হঠাৎ একদিন ঐরূপ ফোঁটা কপালে পড়িলে

অস্বচ্ছন্দতা আসে। চিরকাল ধুতি চাদর পরা অভ্যাস, একদিন কোট-প্যাণ্টালুন পরিলে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। চিরকাল খালি পায়ে চলা-ফেরা করা অভ্যাস, হঠাৎ জুতা পায়ে দিলে চলিতেই পারা যাইবে না। এইরূপ সব কাজেই হইয়া থাকে।

আমি বেহায়া পেতেচি পাত,
কোন্ বেহায়া দেবে না ভাত ?

আমি যদি এরূপ বেহায়া হই যে, বিনা আমন্ত্রণে কাহারো বাড়ীতে গিয়া নিজেই একখানা পাতা লইয়া বসিয়া পড়ি, তাহা হইলে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, দু'টি ভাত তাহারা আমাকে দিবেই। আমাকে এ অবস্থায় দুটি ভাত না দিয়া বেহায়াগিরীর চূড়ান্ত কেহ দেখাইতে পারে না। কিন্তু বাঙ্গলার এই ঘোর অন্নসঙ্কটের দিনে এ কথা খাটে না। এখন পাতা দূরের কথা, আস্তগাছ শুদ্ধ লইয়া দিনের-পর-দিন বসিয়া থাকিলেও আমরা ভাত—এমন কি ভাতের কণাটি পর্য্যন্ত দিতে পারিব না।

আমি যাই বঙ্গে,
আমার কপাল যায় সঙ্গে।

ভাগ্য সঙ্গে সঙ্গেই থাকে; স্থান পরিবর্ত্তনে ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হয় না। আমার ভাগ্যে সুখ থাকিলে, দরিদ্রের ঘরে গিয়াও আমি সুখ পাইব; আর ভাগ্যে যদি দুঃখ ভোগ থাকে, তাহা হইলে রাজবাড়ীর পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিলেও তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইব না! ভাগ্যে যদি দুধ-ক্ষীর-ননী খাওয়া থাকে, তাহা হইলে বনের মধ্যে গিয়াও তাহা আমার মিলিবে, আর যদি ভাগ্যে তাহা না থাকে, তাহা হইলে গয়লাপাড়ার বড় গয়লার শ্যালক হইলেও তাহা মিলিবে না।

আপ্ ভালো ত জগৎ ভালো।

যে ভাললোক, সে সকলকেই ভাল মনে করে; যে দুষ্ট, সে সকলকেই নিজের মত দুষ্ট জ্ঞান করে। সাধুজন সকলকেই সাধুজ্ঞানে বিশ্বাস করে; চোর কাহাকেও বিশ্বাস করে না, সে ভাবে, জগতের সকলেই চোর। ভাললোক সকলের সঙ্গেই ভাল ব্যবহার করে; সুতরাং জগতের লোকও তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করিয়া থাকে।

আপন চেয়ে পর ভাল,
পর চেয়ে নিস্পর ভাল।

প্রায়ই দেখা যায়, আপনার জনদ্বারা ভালও যেমন হয়, মন্দও তেমনি হয়। 'জ্ঞাতিত্ব-সাধা' কথাটা আমাদের সমাজে খুব প্রচলিত। আপনার জনদ্বারা সহজে এবং সাংঘাতিক রূপে অনিষ্ট সাধিত হয়; বাহির হইতে পরের দ্বারা ততটা হইতে পারে না। সেজন্য আপনার জন অপেক্ষা পর ভাল। প্রায়ই দেখা যায় যে, নিজের লোক অপেক্ষা পর বা একবারে 'নিস্পর' লোক কর্ত্তৃক উপকার আশাতীত পাওয়া যায়। 'নিস্পর' বলিয়া কোন কথা হয় না; কথাটা ঘরোয়া প্রচলিত। এই অর্থে ব্যবহৃত হয় যে—খুব বেশী পর।

আদার ব্যাপারী—জাহাজের খবর কি ?

অর্থাৎ ক্ষুদ্র হইয়া মহতের সংবাদ লইবার আবশ্যক নাই। আমার একটা পিতলের আংটী কিনিবার সামর্থ্য নাই, সে স্থলে সোনার দর কত তাহা জানিয়া আমার কাজ কি? আমার একটি লোক নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইবার অর্থাভাব, আমি সেস্থলে যদি একহাজার লোক খাওয়াইতে কত ব্যয় হয় তাহার হিসাব কষিতে থাকি, তাহা হইলে তাহা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নহে।

আমার নাম যমুনাদাসী,
আমি পরের খেতে ভালবাসি।

যমুনাদাসীর মত স্বভাব সম্পন্ন জীব সমাজে বহু দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা পরের নিকট হইতে লইতে বা পরের নিকট হইতে খাইতে খুব পটু। চলিত কথায় যাহাকে 'মাথায় হাত বুলানো' বলে, সেই কাজে এই শ্রেণীর নর-নারীরা বেশ ভালরকম পটু। এখানে স্বয়ং যমুনাদাসীই আপন গুণের পরিচয় দান করিতেছে। তাহাকে ধন্যবাদ!

আষাঢ়ে পান, চাষাড়ে খায়।

আষাঢ় মাসে যখন নূতন পান ওঠে, তখন অত্যন্ত সস্তা হয়; সে পান দরিদ্রেরাও খাইবার সুবিধা পায়।

আঙুল ফুলে কলাগাছ

মট্‌কাইয়া গেলে বা একটু-আধটু আঘাত লাগিয়া আঙ্গুল সামান্য-কিছু ফুলিতে পারে; তাই বলিয়া কলাগাছের আকার প্রাপ্ত হয় না। ইহা অসম্ভব এবং বিস্ময়কর। সামান্য অবস্থা হইতে কেহ যদি হঠাৎ উন্নতির শিখরে আসিয়া পৌঁছায়, তবে লোকে তাহার স্কন্ধে উপরোক্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। তবে অধিকাংশস্থলে কথাটার মধ্যে একটা ঈর্ষার ভাব থাকে। হঠাৎ উন্নতি করিয়াছে এরূপ ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়াই বাক্যটি প্রযুক্ত হয়।

আটে পিঠে দড়—
(তবে) ঘোড়ার ওপর চড়।

ঘোড়ায় চড়া সহজ কাজ নয়। আনাড়ীতে পারে না, তাহা হইলে তাহার বিপদ অনিবার্য্য। ঘোড়ায় চড়িতে হইলে 'আটে পিঠে দড়' হওয়ার—অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গে শক্তিযুক্ত হওয়ার আবশ্যক। সুতরাং কোন শক্ত কাজে হাত দিতে হইলে, নিজেকে শক্তিশালী হইতে হয়, নতুবা সে কাজ সম্পন্ন হয় না।

আহার, নিদ্রা, ভয়—
যত বাড়াও ততই হয়।

ইহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। উপরোক্ত তিনটি জিনিষ অভ্যাসের দ্বারা বাড়ানো এবং কমানো যায়।

আছে গরু, না বয় হাল্,
তার দুঃখ চিরকাল।

যে কৃষকের হাল অর্থাৎ লাঙ্গল আছে, হালের গরু আছে অথচ সে-গরু হাল বয় না, তেমন কৃষকের দুর্দ্দশার অন্ত থাকে না। উপযুক্ত পুত্র আছে, অথচ সে-পুত্র বসিয়া বসিয়া ভোজনের কাজ ছাড়া কোনরূপ অর্থোপার্জ্জনের কাজ করে না, সে সংসারে চিরকাল দুঃখ বাসা বাঁধিয়া থাকে। উচিত, ঐরূপ গরু এবং পুত্রকে 'পিঁজরাপোলে' পাঠানো। তবে মানুষ-রাখা 'পিঁজরাপোল' আছে কি না বলা যায় না!

উদরী, ভাতুরী যক্ষ্মা,—
এই 'তিন'-এ নাই রক্ষা।

খুব সহজ বাক্য। উপরোক্ত রোগ তিনটি মারাত্মক। অবশ্য এক সময়ে খুবই মারাত্মক ছিল, এখন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতি হওয়ায় কিছু পরিমাণে সুবিধা হইয়াছে। 'ভাতুরী' ভগন্দরজাতীয় কুৎসিৎ এবং যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি।

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।

অর্থাৎ একজনের কাজ আর একজনের উপর চাপানো—জ্ঞাতসারেই হউক না অজ্ঞাতসারেই হউক। সম্ভবতঃ এই অর্থেই এই বাক্য প্রযুক্ত হয়। যে কাজ 'উদো'র করিবার কথা, সে কাজ পড়িল—'বুধো'র ঘাড়ে!

উন আহারে দুনো বল।

কম আহারে শরীরর ভাল থাকে। বৈদ্যশাস্ত্রের বিধি—উদরের অর্দ্ধেক খাদ্যদ্বারা এবং একচতুর্থাংশ পানীয় জলের দ্বারা পূর্ণ করিবে; বাকী এক-চতুর্থাংশ বায়ু চলাচলের জন্য শূন্য রাখিবে। মোট কথা পরিমিত আহার আবশ্যক। অপরিমিত আহারে পরিপাকশক্তি হীন হইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ।

কেহ উন্মুক্ত পাত্রে খৈ লইয়া যাইতেছিল; বাতাসের ঝাপ্টা লাগিয়া খৈগুলা উড়িয়া গেল। তখন সে ভাবিল, "বৃথা যায় কেন; উড়ো খৈ নারায়ণকে নিবেদন করে দেওয়া যা'ক, পুণ্য সঞ্চয় হইবে।"—যেখানে কোন জিনিষ নষ্ট হইয়া যাইতেছে, চেষ্টার দ্বারা ফিরাইয়া পাইবার কোনই উপায় নাই, সেস্থলে উহা "গোবিন্দায় নমঃ করিয়া লোকে মনকে প্রবোধ দেয়।

উঠন্ত মূলো পত্তনেই চেনা যায়।

বাক্যটি সাধারণের মধ্যে খুবই প্রচলিত। ইহার অর্থও সুস্পষ্ট। "The morning shows the day"—এই ইংরাজী প্রবাদবাক্যও এই শ্রেণীভুক্ত।

উন বর্ষায় দুনো শীত।

বাঙ্গলাদেশে বর্ষা কম হইলে, সে-বছর দ্বিগুণ শীত পড়ে। ইহার মধ্যে প্রাকৃতিক বা ভৌগলিক তত্ত্ব আছে। বর্ষাকালে বঙ্গোপসাগর হইতে উত্থিত মেঘরাশি যদি বাঙ্গলাদেশে অল্প বর্ষণ করিয়া উত্তরে চলিয়া যায়, তাহা হইলে হিমালয়ে গিয়া উহারা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং সেইখানে তুষারাকারে উহা সঞ্চিত থাকে। তাহার ফলে, উত্তর-হাওয়ায় ঐ সকল বরফের শৈত্য প্রবলভাবে বাঙ্গলায় অনুভূত হয়। অপর পক্ষে, বর্ষাকালে বাঙ্গালায় প্রচুর বর্ষণ হইয়া গেলে, বেশী মেঘ গিয়া হিমালয়ে জমিতে পারে না, সুতরাং বাঙ্গলায় শীতও বেশী পড়ে না।

সম্ভবতঃ এইটি খনার বচন। খনার বচনের সংখ্যা বহু। সমস্ত খনার বচন দিতে গেলে স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ হয়। সে-জন্য খুব বেশী প্রচলিত দুই চারিটি মাত্র বচনের আমরা উল্লেখ করিব।

এক মাঘে শীত যায় না।

অর্থাৎ ইহা চিরকালের। প্রতি বৎসরেই মাঘ মাস এবং তৎসহ শীত আসিবে। বহু বিষয়েই বাক্যটি খাটে।

হরি কোন একটা বিপদে পড়িয়া রামের শরণাপন্ন হইল। রাম তাহাকে বিপন্মুক্ত করিল। বিপদ হইতে মুক্তি পাইয়া হরি কিন্তু আর রামের কাছে আসে না—এমনি সে অকৃতজ্ঞ। তখন রাম বলিয়া থাকে—'এক মাঘে শীত যায় না।' অর্থাৎ হরির বিপদ ভবিষ্যতে যে আর কখনো হইবে না, ইহা সম্ভব নয়। সংসারে থাকিতে হইলে, কোন না কোন দিন আবার তাহাকে বিপদে পড়িতে হইবে এবং সাহায্যের জন্য আবার তাহাকে আসিতে হইবে।

একদিন রোদ উঠবেই

চিরকাল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিতে পারে না। হাজার বর্ষা হউক, একদিন বর্ষণ ক্ষান্ত হইয়া রৌদ্র দেখা দিবেই। আজ একজনের সংসার ও জীবন দুঃখের, কিন্তু চিরকালই যে সে-দুঃখ স্থায়ী হইবে, তাহা নহে। একদিন তাহার সুখের দিন আসিবেই।

এখন না বুঝলে তুমি যৌবনের ভরে,
এর পরে বুঝবে তুমি অজ্‌ঝোর ঝরে।

যৌবনে সকলের স্নায়ুমণ্ডল সতেজ এবং উত্তেজিত থাকে। তখন তাহাদের নিজেদের যাহা বিশ্বাস সেইমত সব কাজে চলে। তখন তাহারা অন্যায় বা ভুল পথে চলিলেও কাহারো সৎপরামর্শ গ্রহণ করে না। কিন্তু ভবিষ্যৎকালে, তাহাদের পরিণত বয়সে—যখন জগতের,

সংসারের এবং জীবনের সত্যকার ছবিটি তাহাদের চোখের সামনে ফুটিয়া ওঠে, তখন গত জীবনের সেই অন্যায় এবং হয় ত' ভুলের জন্য অজস্র ধারে কাঁদিয়া দিন কাটাইতে হয়।

এক কান্‌-কাটা গাঁয়ের বাইরে দিয়া যায়,
দু'কান-কাটা গাঁয়ের মধ্যে দিয়া যায়।

কোন অন্যায়ের ফলে যে এক কান-কাটা, সে লজ্জায় জনসমাজে মুখ দেখাইতে না পারিয়া গাঁয়ের বাহির দিয়া চলাফেরা করে। কিন্তু বার বার অন্যায় করার শাস্তিস্বরূপ যার দুই কানই কাটা গিয়াছে, তার মত নির্লজ্জ আর বেহায়া জগতে নাই।

ওঠবার সময় কোটবার মাছ।

যাহাদের খুব মাছ ধরিবার সখ এবং অভ্যাস আছে, বাক্যটি তাহাদের সম্বন্ধে। সারাদিন ফাত্‌নার দিকে বৃথা চাহিয়া থাকিবার পর আশা করিতেছেন যে শেষ সময়ে অর্থাৎ 'ওঠবার সময় কোটবার মাছ' হইবে। অথবা সমস্ত দিনের মধ্যে দু'চারিটা ক্ষুদ্র আকারের মাছ হইয়াছে, উঠিবার সময় তাঁহাদের আশানুযায়ী বেশ বড় গোছের, অর্থাৎ কুটিবার মত মাছ হইবে। ভিন্ন বিষয়েও বাক্যটি খাটে। কোন দোকানদার ব্যবসায়ী—সারাদিনের মধ্যে কোন বেচা-কেনা হইল না। রাত্রে দোকান বন্ধ করিবার সময় অর্থাৎ উঠিয়া গৃহে আসিবার সময় একটা মোটা খরিদ্দার আসিয়া বহু দ্রব্যাদি ক্রয় করিল। এইরূপ আরও নানাবিষয়ে ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে।

[ক্রমশঃ

বিল্বমঙ্গলের পাগলিনী

শ্রীশ্রীপদ মুখোপাধ্যায়

গিরিশচন্দ্রের জীবনী-লেখক বন্ধুবর স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"পাগলিনী-চরিত্র গিরিশচন্দ্রের সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি এবং বঙ্গ-সাহিত্যে ইহা তাঁহার একটি অপূর্ব্ব দান। সাংসারিক স্থূল ঘটনার মধ্যে অধ্যাত্ম-চরিত্র সৃষ্টি করিয়া এবং তাহার দ্বারা নাটকের অন্যান্য চরিত্র বিশ্লেষণে গিরিশচন্দ্র যে কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহা জগতের যে কোন সাহিত্যে সুদুর্লভ। পাগলিনীর পর পর গানগুলি সাধকের সাধন-অবস্থার ক্রমবিকাশ—ইহা একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট বহু পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণী ভৈরবী আসিয়াছিলেন। তাহার অনেক পরে এক পাগ্‌লী যাতায়াত করিত। শুনিয়াছি ইঁহাদের অদ্ভুত চরিত্র সম্বন্ধে নানারূপ গল্প শুনিয়া গিরিশচন্দ্র এই পাগলিনী-চরিত্র পরিকল্পনা করিয়াছিলেন"। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের একস্থানে আছে—"পাগ্‌লী তাঁহাকে দেখিবার জন্য বড়ই উপদ্রব করে। পাগ্‌লীর মধুর ভাব। বাগানে প্রায় আসে ও দৌড়ে দৌড়ে ঠাকুরের ঘরে এসে পড়ে। ভক্তেরা প্রহারও করেন, কিন্তু তাহাতেও নিরস্ত হয় না"।

নাটকে থাকমণির মুখ দিয়া পাগলিনীর সংসারাশ্রমের পরিচয় এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে—"ও একটা গেরস্তর বৌ; বাবা মা কেউ ছিল না—; মাসী মানুষ করেছিল, বিয়ে দিয়েছিল, বিয়ের রাত্রিতেই ভাতার ছোঁড়া মরে গেল; তারপর মাগী পাগল হ'য়েছে"।

আবার ভিক্ষুক যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"হ্যাঁ গা, তুমি কে গা?" তখন পাগলিনী উত্তর দিয়াছিল—"আমি বাছা পাগলের মেয়ে।" ভিক্ষুক—"হ্যাঁ গা, তোমার বে হয়েচে"? পাগলিনী—"হুঁ, পাগলদের বাড়ী। আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা। আমি তাদের পাগ্‌লী মেয়ে, আমার মায়ের নাম শ্যামা"।

পরমহংসদেব বলিতেন—"যোগমায়ার ভিতর—তিন গুণই আছে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। শ্রীমতীর ভিতর বিশুদ্ধ—সত্ত্ব বৈ আর কিছু নাই।" রাধিকা যোগমায়া, কিন্তু—"রাধিকা বিশুদ্ধ সত্ত্ব—প্রেমময়ী"।

এই সঙ্গে আমরা যদি আবার শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ড, পঞ্চদশ অধ্যায় এবং শ্রীবিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ অষ্টম অধ্যায় হইতে নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি শ্লোকের মর্ম্মার্থ স্মরণ করি, তাহা হইলে পাগলিনী সৃষ্টির গোড়ার কথাটা আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিবে:—

"কৃষ্ণং বদন্তি মাং লোকাস্ত্বয়ৈব রহিতং যদা।
শ্রীকৃষ্ণস্তু তদা তে হি ত্বয়ৈব সহিতং পরম্॥
ত্বং স্ত্রী পুমানহং রাধে নেতি বেদেষু নির্ণয়ঃ।
ত্বঞ্চ সর্ব্বস্বরূপাসি সর্ব্বরূপোঽহমক্ষরে॥
সর্ব্ববীজস্বরূপোঽহং যথা যোগেন সুন্দরি।
ত্বঞ্চ শক্তিস্বরূপাসি সর্ব্বস্ত্রীরূপধারিণী॥
মমার্দ্ধাংশস্বরূপা ত্বং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী"।

... ...

"নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।
যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম॥

কিঞ্চাতিবহুনোক্তেন সংক্ষেপেনেদমুচ্যতে।
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদৌ পুংনাম্নি ভগবান্ হরিঃ।
স্ত্রীনাম্নি লক্ষ্মীর্মৈত্রেয়! নানয়োর্বিদ্যতে পরম্॥"

"হে রাধে, আমি যখন তোমা ব্যতীত থাকি তখন লোকে আমাকে কৃষ্ণ বলে; তোমার সহিত থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বলে। হে রাধে! তুমি স্ত্রী, আমি পুরুষ; বেদও ইহা নির্ণয় করিতে পারে না। হে অক্ষরে! তুমি সর্ব্বস্বরূপা, আমি সর্ব্বরূপ। হে সুন্দরি! আমি যখন যোগ-দ্বারা সর্ব্ববীজ-স্বরূপ হই, তখন তুমি শক্তি-স্বরূপ, সর্ব্বস্ত্রী-রূপধারিণী হও। হে রাধে! তুমি আমার অর্দ্ধাংশ-স্বরূপ, মূল প্রকৃতি ঈশ্বরী"।

"বিষ্ণুর শ্রী সেই জগন্মাতা, অক্ষয় এবং নিত্য। হে দ্বিজোত্তম! বিষ্ণু সর্ব্বগত, ইনিও সেইরূপ। অধিক উক্তির প্রয়োজন নাই, সংক্ষেপে বলিতেছি—দেব তির্য্যক্ মনুষ্যাদিতে পুংনাম বিশিষ্ট হরি, এবং স্ত্রী-নাম বিশিষ্টা লক্ষ্মী, হে মৈত্রেয়! এই দুই ভিন্ন আর কিছুই নাই"।

অতএব, দেখা যাইতেছে—কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন যে, তুমি না থাকিলে, আমি কৃষ্ণ এবং তুমি থাকিলে আমি শ্রীকৃষ্ণ অথবা রাধা-কৃষ্ণ। বিষ্ণুপুরাণ-কথিত এই শ্রী লইয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণ এবং বিষ্ণুর সেই শ্রীই জগন্মাতা, দেব, তির্য্যক্ মনুষ্যাদিতে পুংনাম-বিশিষ্ট হরি এবং শ্রীনাম-বিশিষ্টা লক্ষ্মী। এই দুই বই আর কিছুই নাই, তাই হরি ও হর, শ্রী ও জগন্মাতা অভিন্ন, তাই হরি কখনও শ্রীরাধা এবং কখনও জগন্মাতারূপে মহামায়া বা যোগমায়া। আমাদের মনে হয়, গিরিশচন্দ্র তাঁহার গুরুদেবের উক্তি এবং পুরাণ-বর্ণিত উদ্ধৃত কথাগুলির গূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াই পাগলিনীকে মূল প্রকৃতির দুই বিভিন্ন রূপে, কখনও শিব-সীমন্তিনী জগন্মাতৃ-রূপে কখনও কৃষ্ণপ্রিয়া রাধারূপে চিত্রিত করিয়াছেন। আমরা নাটক হইতে এইবার প্রাসঙ্গিক অংশ-বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক ফল মিলাইয়া লইবেন:—

পাগলিনী (চিন্তামণির প্রতি)—"মা, তুই ভাবিস্ নি, তোকে হরি কৃপা করবেন। সে সকলকে কৃপা করে, আমার ওপর বড় নির্দ্দয়। ওমা, লজ্জা করে মা—লজ্জা করে, সে আমায় দেখতে পারে না"!

বাঙ্গালী গৃহস্থ-ঘরের স্ত্রীলোক সেকালে সমবয়সী স্ত্রী-লোকের নিকট স্বামীকে সে বলিয়া উল্লেখ করিতেন। এখানে পাগলিনীর কথা-কয়টির মধ্যে 'হরি'র প্রতি স্বামী-ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। "সকলের পতি তেঁই পতি মোর বাম"—পাটনীর নিকট ভারতচন্দ্রের অন্নদার এই উক্তিও এই স্থলে স্মরণীয়। বাঙ্গালী গৃহস্থ-ঘরের বধূ স্বামীর "নাম ধরিতে" পারেন না। যেখানে স্বামী-প্রসঙ্গ, সেইখানেই পাগলিনী বলিয়াছে—"লজ্জা করে মা, লজ্জা করে"।

কিন্তু পাগলিনীর ঐ উক্তির পরেই গিরিশচন্দ্র তাহার মুখে যে গানখানি দিয়াছেন—

"আমায় বড় দাগা।
সারারাত কি পাগলা নিয়ে যায় গো মা জাগা?
সারারাতই সিদ্ধি বাঁটি, ভূতে খায় মা বাটি বাটি,
বল্‌ব কি বল্ বোঝে না মা, তার ওপর মিছে রাগা!
কাছে এসে ছাই মেখে বসে, মরি গো মা ফণীর তরাসে,
কেমন ক'রে ঘর করি মা, নিয়ে এই ন্যাংটা নাগা"?

তাহা শুনিয়া চিন্তামণি অতি প্রাসঙ্গিক-ভাবেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"মা গো, তুই কে? তুই সাক্ষাৎ জগদম্বা"?

"হ্যাঁ মা, আমি সেই আবাগী মা, সেই আবাগী। দেখ না মা, সব সেই—সব সেই। কিছু বলিস্ নি মা, চুপ ক'রে থাক্; লজ্জা করে, লজ্জা করে।…"

"তুইও পাগ্‌লী মা, আমিও পাগ্‌লী মা"। এখানে চুপ ক'রে থাক্, আরও লজ্জা, বোধ করি, চিন্তামণির কাছে পাগলিনীর জগদম্বা বা মহামায়ার রূপ ধরা পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া।

অন্যত্র চিন্তামণির প্রতি—

"তোর সে পাগ্‌লা জামাই, মা, সে ঘরে নেই, সে শ্মশানে থাকে; আর ঘরে যাব না মা, আমার ঘর শূন্য হ'য়ে রয়েচে।… …

ওরে পতি মোর ভুলায়ে এনেছে ভবে।
ধরা মাঝে উন্মাদিনী ধাই,
তার দেখা নাই।
কোথা পাই, কে আমারে ব'লে দেবে?
যথা সন্ধ্যা হয়, তথায় আলয়,
শয্যা-শ্যামা মেদিনী সুন্দরী;
ব্যোম আচ্ছাদন, নাহিক মরণ!
কত আর আছে তার মনে।

চিন্তামণি। তোমার স্বামী কে মা?

পাগলিনী। আমি মা পাঁচভাতারী—এই দুর্গা, কালী, শিব, কৃষ্ণ—না মা, আমি একভাতারী এয়ো—আমার ভাতার সেই মা, সেই;—

সে চিনা আর নেই, মা, নেই।
আমি তার দাসী, মা, দাসী,—

সে বাঁকা হ'য়ে বাজায় মোহন বাঁশী, মা বাঁশী। আমার লজ্জা করে, মা, লজ্জা করে"।

*

"ব'স মা, ব'স। আমি ত' বসতে পারব না, সে যে পথে দাঁড়িয়ে আছে; সে দেরী হ'লে আমায় কি বল্‌বে। তুমি

তোমার স্বামীর কাছে যাও, মা, আমি আমার স্বামীর কাছে যাই। তোমার মতন তোমার, আমার মতন আমার, এক কৃষ্ণ ষোলশ'। তুমি তোমার কৃষ্ণের কাছে যাও, আমি আমার কৃষ্ণের কাছে যাই। সে এক বই আর দুই নয়—তোমার মতন তোমার কাছে, আমার মতন আমার কাছে, শঠ, লম্পট, কপট"।

আবার অন্যত্র সোমগিরির প্রতি—

"বাবা, চল যাই, আর কেন বাবা? অনেক দিন ঘর ছেড়ে এসেছি।"

সোমগিরি। "মা আর ত' কাজ বাকী নাই; চল, যে-কাজে এসেছি, সেরে যাই"।

পাগলিনী। "বাবা, আর থাকৃতে পারি নে, বাবা, আমার মন কেমন করে, বাবা; দেখ দেখি কত দিন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার এমন লাঞ্ছনা করে গা! আমায় ভুলিয়ে বনে পাঠিয়ে দিলে"!

তাহার পর চিন্তামণিকে বিল্বমঙ্গলের নিকট লইয়া গিয়া বলিলেন—

"তুই যা মা, আমি কি জামায়ের কাছে যেতে পারি"? এবং সবিশেষে সকলকে কৃষ্ণদর্শন করাইয়া সোমগিরিকে বলিলেন—

"বাবা, আমার কান্না পাচ্ছে; বাবা, দেখ দেখি, কত ঘোরালে! চল্, বাবা, যাই"।

পাগলিনীর পাগলামী অব্যাহত রাখিয়া ভাবভক্ত গিরিশচন্দ্র কখনও ইঁহাকে আদ্যাশক্তির শ্রী বা রাধাভাবে, কখনও বা জগন্মাতার মহামায়াভাবে পরিকল্পিত করিয়াছেন। মূলে,—"দেখ্‌না মা, সব সেই"। অথবা, "এক কৃষ্ণ ষোলশ'! সে এক বই আর দুই নয়"। অতি উচ্চাঙ্গের মহাভাবের কথা, রসতত্ত্বের অতি সুমধুর নিগূঢ় মর্ম্মকথা, বাঙ্গালীদের ঘরোয়ানায় মাধুরী-মণ্ডিত করিয়া এমন সহজ সরলভাবে প্রকাশ করিতে আর কাহাকে দেখিয়াছি বলিয়া ত' মনে হয় না। পাগলিনীর ভাব বজায় রাখিবার জন্য নাট্যকার ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে কখনও ছন্ন, কখনও চৈতন্য, কখনও হরি, কখনও হরের মহাশক্তিরূপে, এলোমেলো উল্টা পাল্টাভাবে পাঠক-সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন—পাগলিনী কখনও বা শিবকে, কখনও বা কৃষ্ণকে, পতি নির্দ্দেশ করিয়া গৃহস্থ বাঙ্গালীর ঘরের বধূর ন্যায় মান-অভিমান-অনুযোগ করিতেন। বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণির জন্য, তাঁহাকে যে "ভুলিয়ে বনে পাঠিয়ে" দেয়, যাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার "কান্না পাচ্ছে, কত ঘোরালে" বলিয়া সোমগিরির কাছে অভিযোগ, তিনি "অবশ্যই সেই এক বই, আর দুই নয়"! সংসারাশ্রমে 'বিয়ের রাত্তিরে ভাতার ছোঁড়া মরে গেল—' ইহা জানাইয়া দিয়াও, নাট্যকার তাঁহাকে সীমন্তে সিন্দুর পরাইয়া, পরিধানে লাল-পাড় শাড়ী দিয়া, পতি-সোহাগিনী সধবার সমস্ত বেশভূষায় সাজাইয়া দর্শকের চক্ষের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়াছেন। ছোট-খাট নাট্যকারের হয় ত' ইহাতে খট্‌কা লাগিত; কিন্তু যিনি নাটকীয় গুণপনায় এবং সাধন-রসতত্ত্বে—সমভাবেই বহু অগ্রগামী—তাঁহার কাছে এই অপূর্ব্ব পরিকল্পনা ভাব-রসে সমৃদ্ধ হইয়া সহজেই ধরা দিয়াছে। "মা মা। কোথায় তুমি? শ্মশানভূমি আলো ক'রে এস মা।"—ইহা পাগলিনীর কণ্ঠ হইতে উত্থিত হইলেও, ইহা ভক্ত-সাধক গিরিশচন্দ্রেরই কণ্ঠস্বর। বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণি-ভিক্ষুকের শ্মশান-হৃদয়ভূমি আলোকিত করিতে মহামায়া না আসিলে ইষ্ট-সাক্ষাৎকার ত হইবার নহে? মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে, তাঁর দর্শন হয়; মহামায়ার দয়া চাই"—গিরিশচন্দ্র তাঁহার গুরুদেবের এই উক্তি বিস্মৃত হন নাই—তাই পাগলিনীর রূপ ধরিয়া ভক্তের আহ্বানে তাঁহাকে আসিতে হইয়াছে। পাগলিনী আসিলেন—তাঁহার আবির্ভাবে শুধুই ভাবরাজ্যে নহে, নাটকের প্রয়োজনীয় অংশেও অতি মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইল—নাটকীয় ঘটনা-স্রোতের সহিত নাটকীয় চরিত্রের উন্মেষ-সাধনে অপূর্ব্ব সৃষ্টি কুশলতা ফুটিয়া উঠিল। বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ভূমি পূর্ব্ব হইতেই কতকটা মহাপ্রেমের ভাবরসে আর্দ্র, কর্ষণযোগ্য হইয়াছিল—সেই কর্ষণযোগ্য ভূমিতে কৃষ্ণ আসিয়া বিচরণ করিলেন, তাহা কতকটা ধারণায় আসিতে পারে। বিল্বমঙ্গল প্রথমে কতকটা বাঁকা পথে চলিতে থাকিলেও, তাঁহার হৃদয়ে ততটা বাঁক্ বা আড় ছিল না—তাই তাহার মনকে কৃষ্ণাভিমুখী করিতে মহামায়া-রূপিণী পাগলিনীকে তেমন আয়াস-স্বীকার করিতে হয় নাই। বিল্বমঙ্গলের নিকট প্রথম দর্শনে, "হায়! সে মনচোরা কোথায়? চল সখি, দু'জনে দু'দিকে যাই, তারে খুঁজি"—বলিয়া প্রথমবার পথ-নির্দ্দেশ এবং দ্বিতীয় অথবা শেষ দর্শনে বিল্বমঙ্গলের, "কোথা, কে আছ আমার? দেখা দাও যদি থাক কেহ…কে দেখাবে আলো? খুঁজে ল'ব আমার যে জন"। এই কাতরোক্তির প্রত্যুত্তরে পাগলিনীর সেই অতুলনীয় সঙ্গীত লহরী—

"আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে;
যেখানে যাই, সে যায় পাছে, আমায় ব'ল্‌তে হয় না
জোর করে।
মুখখানি সে যত্নে মুছায়, আমার মুখের পানে চায়,
আমি হাস্‌লে হাসে, কাঁদলে কাঁদে, কত রাখে আদরে,
আমি জান্‌তে এলাম তাই, কে বলেরে আপনার
রতন নাই,
সত্যি মিছে দেখনা কাছে, কচ্ছে কথা সোহাগ ভরে"।

—এইখানেই বিল্বমঙ্গল সম্বন্ধে তাঁহার পথ-নির্দ্দেশের পরিসমাপ্তি। বিল্বমঙ্গলকে অতি মধুর করিয়া বলিয়া দিলেন

যে, আপনার জন তাহার কাছে কাছেই রহিয়াছে—একবার মনে তদভিমুখী চিন্তা জাগ্রত হইলেই হইল, সেই মনোময় পুরুষ তাহার হাত ধরিয়া বেড়াইবেন, হাসিলে হাসিবেন, কাঁদিলে কাঁদিবেন, হৃদয়ের অস্ফুট কাকলীতে তাঁহার সোহাগের কথা শুনিতে শুনিতে বলিতেই হইবে—

"শ্রীপদ পঙ্কজ, দেহি পদ-রজঃ
শরণ মাগিছে দীন
প্রাণ মাধব সাধ, র'ব র'ব
প্রেম-মাধুরী লীন ?"

বিল্বমঙ্গল-সম্বন্ধে পাগলিনী নাট্য-সৃষ্টির প্রয়োজন এইরূপে শেষ হইলেও, চিন্তামণি—ভিক্ষুক-পক্ষে তাহার প্রয়োজন তদপেক্ষাও অধিকতর। চিন্তামণি ও ভিক্ষুক উভয়েই প্রথম হইতে রীতিমত বাঁকা পথে চলিতে অভ্যস্ত, পূর্ব্ব সংস্কারের আধিপত্য তাহাদের মনে অত্যন্ত প্রবল। তাই প্রতিপদে তাহাদের পাগলিনীকে প্রয়োজন! চিন্তামণির যেখানেই সংশয় জাগিতেছে, যেখানেই হতাশা আসিতেছে, যেখানেই সে দ্বন্দ্বদ্বন্দ্বে বিকল হইয়া উঠিতেছে যেখানেই তাহার মোহ—আসিতেছে, ভয় হইতেছে সেইখানেই পাগলিনী আসিয়া তাহার সংশয়চ্ছেদ করিতেছেন, আশ্বাস দিতেছেন, মোহ দূর করিতেছেন, অভয় দিতেছেন, তাহাকে সর্ব্বস্ব-রিক্ত, সর্ব্বস্ব সমর্পণ,—একান্ত নির্ভর—করাইবার জন্য সাধন পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন। ভিক্ষুকের জন্যও তাহাই করিতেছেন—তবে পন্থা স্বতন্ত্র—অধিকারিভেদে, দুই জনের পক্ষে, দুই রকমের সাধন-পদ্ধতি। একজনকে বলিতে-ছেন—"ছাড়, ছাড়, সব ছাড়"; আর একজনকে বলিতেছেন "নে, নে, কাঞ্চন নে"। পাকা হাতের বড় মজার সৃষ্টি—যিনি একটু মজিতে চাহিবেন, তিনিই মজিবেন!

অবিনাশবাবু বলিয়াছেন—"পাগলিনীর পর পর গানগুলি সাধকের সাধন-অবস্থার ক্রমবিকাশ—ইহা একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়।" অবিনাশবাবুর এই উক্তির ভিতর ষোল আনা সত্য নিহিত আছে কি না তাহা ভক্ত-সাধকগণের বিচার্য্য; কিন্তু ইহা সত্য যে, পাগলিনীর অতুলনীয় সঙ্গীত-লহরী নাটকীয় প্রধান চরিত্রগুলির উন্মেষ-সাধনে অপূর্ব্ব সহায়তা করিয়াছে, বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি, ভিক্ষুকের বাঁকা মনের 'আড়' ভঙ্গিমা দিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বর-দর্শন-পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ বিল্বমঙ্গল-নাটকের বারখানি গানই মণি-মাণিক্যের ন্যায় নাটকের সঙ্গে ঝকমক্‌ করিতেছে—'এ বলে, আমায় শোন্, ও বলে, আমায় শোন্'! এক ভিক্ষুকের "বসেছিল বঁধু হেঁসেলের কোণে—" গানখানি হয়ত দর্শকের মুখ চাহিয়া রচিত বলা যাইতেও পারে; কিন্তু বাকি এগারখানি নাটকের মুখ চাহিয়াই রচিত। ইহার একখানিও বাদ দেওয়া চলে না; বাদ দিলে নাটকের অঙ্গহানি হয়, নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর চরিত্রবিকাশে বাধা পড়ে। বিশেষ করিয়া, পাগলিনীর সর্ব্বশেষ গানখানির তুলনা নাই; শুনিয়াছি পণ্ডিতাগ্রগণ্য স্বর্গীয় হরিনাথ দে মহাশয় ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। সেই—

"যাই গো ওই বাজায় বাঁশী, প্রাণ কেমন করে!
একলা এসে কদমতলায় দাঁড়িয়ে আছে আমার তরে।
যত বাঁশরী বাজায়, তত পথপানে চায়,
পাগল বাঁশী ডাকে উভরায়—
না গেলে সে কেঁদে কেঁদে চলে যাবে মানভরে"।

সঙ্গীত-ঝঙ্কার এখনও যেন "কাণের ভিতর দিয়া—মরমে পশিতেছে! পাগলিনী শুধু চিন্তামণিকে নহে, আমাদের মত সংসার-বিষ জর্জ্জরিত জীবদেরও বলিয়া দিয়া গেলেন যে, সকলেরই হৃদয়-বৃন্দারণ্যে দাঁড়াইয়া সেই দ্বিভুজ, মুরলীধর অহরহঃ বংশীধ্বনির ফুৎকারে তাঁহার চরণে শরণ লইবার জন্য—'আয়-আয়' বলিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। "অদ্যাপি সে বাঁশী বাজে বৃন্দাবনে, কেহ কেহ শুনে বহু ভাগ্যগুণে"! সেই অপূর্ব্ব দৈবী বংশীর ঝঙ্কার হৃদয়মধ্যে আমরা বহু ভাগ্যগুণে—কেহ কেহ শুনিতে পাই, কখনও কখনও শুনিতে পাই। তাঁহার কাছে যাই যাই করি, কেহ বহু ভাগ্যগুণে যাইতে পারি, কেহ যাইতে পারি না। পাগল বাঁশী উভরায় ডাকিতে থাকে—"আয়, আয়—সব ছাড়িয়া চলিয়া আয়—এই অনন্ত রস-সায়রে ডুবিয়া মজিয়া মিশিয়া যাইবি আয়"। আমরা যাইতে না পারিলে, তিনি অভিমান-ভরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া চলিয়া যান, কিন্তু বংশীধ্বনির ত বিরাম নাই! বঙ্কিমচন্দ্রের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আমাদেরও বলিবার সাধ হয়—"আবার আসিবে কি মা,—তোমার অকৃতী, অধম, অবিশ্বাসী—সন্তান-গণকে সেই অভয় দৈবী বংশীধ্বনি শুনাইতে, আবার আসিবে কি মা" ?

(উপন্যাস)

আঠারো

"পরদিন আমার জীবনের সন্ধিক্ষণ !

"প্রত্যূষে উঠেই আমার শৈশবের খেলা-ধূলার স্থানগুলির মধ্যে একাকী ঘুরে' বেড়াচ্ছিলাম। কত কথাই যে মনে উঠ্‌ছিল তার শেষ নাই। বুক-ভরা আনন্দ নিয়ে ফল্গু হাওয়ার ন্যায় ফুল, ফল, গাছপালা, পুকুর, বাগান সকলের কাছেই ছুট্‌ছিলাম। মনে মনে কত কথাই তা'দের কাছে প্রাণ খুলে বল্‌ছিলাম। তারা মূক, কিন্তু প্রাণবন্ত ! আমার প্রত্যেক কথায় তা'দের প্রাণের যেন সাড়া পাচ্ছিলাম—আনন্দ, হাসি, অশ্রু, সমবেদনা, সবই যেন তারা প্রকাশ কর্‌ছিল ! তা'দের সঙ্গে যে আমার নিত্যকার সম্বন্ধ ছিল। মায়ের বুকের মতই যে তা'দের অনন্ত অদম্য আকর্ষণ। তা'দের ছেড়ে' আমি কিছুতেই আস্‌তে পার্‌ছিলাম না !

"নূতন জামাতার সুখ-সাচ্ছন্দ্যের বিধান করতে গিয়ে মা'র ব্যস্ততা এতদূর বেড়ে' গিয়েছিল যে তিনি অনবরত কেবল ছুট্‌ছিলেন চারিদিকে। অদ্ভুত অদ্ভুত আদেশ এবং প্রশ্ন ক'রে বাড়ীর সকলকে অস্থির ক'রে তুলেছিলেন। অন্যকে উপলক্ষ ক'রে আমাকেও কতবার জামাতার কাছে যাবার জন্য বল্‌ছিলেন। তাঁ'র ভাব দেখে অনেকেরই হাসি আস্‌ছিল, কিন্তু বে-আদবী হবার ভয়ে দাঁতে ঠোঁট চেপে ধরে জোর ক'রে হাসি চেপে রাখ্‌ছিল। আমি কিন্তু প্রকাশ্যেই মৃদু মৃদু হাসছিলাম। শিশুর ন্যায় মায়ের আঁচল ধরে না থাক্‌লেও তাঁ'র পেছনে পেছনে কেবল ঘুর্‌ছিলাম। মুহূর্ত্তও তাঁর কাছ ছাড়া হ'তে ইচ্ছা হচ্ছিল না।

"সকাল থেকেই অতিথিশালার দিকে একটা গোলমাল শুন্‌ছিলাম। যে আনন্দে এতক্ষণ ডুবেছিলাম, সে আনন্দের কাছে অন্য সবকিছুরই অস্তিত্ব লোপ পেয়েছিল। হঠাৎ নহবৎ খানার দিক থেকে হাতীর চীৎকার শুনে আবার তা' স্মরণ হ'ল। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওদিকে এত গোলমাল কিসের মা ?'

"মা বল্লেন, 'জানিস না বুঝি তুই ? ওমা ! এরা সব এ অঞ্চলের জমিদার। এদের সঙ্গে এত লোক জন, হাতী, ঘোড়া এসেছে যে তার ইয়ত্তা নেই ! এরা এসেছে আজ দুদিন। হাতীর লড়াই, তা'দের প্রাণ-কাঁপানো ভীষণ চীৎকার, শরীর-রক্ষীদের কৃত্রিম যুদ্ধ, তাদের অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, লাঠির ঠকাঠক্ শব্দ, সারারাত গান-বাজনা, রাতদিন এ গোলমালে আর কান পাতা যায় না।'

"ব্যাপারটা মনে মনে বুঝতে পার্‌লেও জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'জমিদাররা সব এসেছে কেন ?'

" 'তাও বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্ না ? তোর বিয়ের সময় থেকেই জমিদাররা সব বল্‌ছিল জামাইকে নিয়ে আস্‌তে, তারা দেখ্‌বে। তা' ত' নানান গোলমালে এ পর্য্যন্ত আর হ'য়ে ওঠে নাই। এবার তো'দের আসা যখন সুস্থির হ'য়ে গেল তখন তা'দের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে।'

" 'কিন্তু তা'দের এমন আগ্রহ কেন ?'

" 'কি যে বল্‌ছিস্ তুই তার ঠিক নাই ! তোদের বংশটা কি যে-সে বংশ ? সম্মানী ব্যক্তি মাত্রই তোর বাপ-ভাই-এর কাছে মাথা নোয়ায়। তারপর তোর শ্বশুরেরও ত' নাম-কাম বড় কম নয়। যদিও তার—'

"হঠাৎ আমি তাঁ'র কথার মাঝখানে বাঁধা দিলাম। আমার মনে হ'ল তিনি এমন কিছু একটা বল্‌তে যাচ্ছেন যা' আমার নিকট অত্যন্ত অপ্রিয় শুনাবে।

"বাঁধা দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'যে-রকম সোরগোল শুন্‌ছি ওদিকে মনে হচ্ছে খুব ঘটা ক'রে কিছু একটা হচ্ছে।'

" 'হ্যাঁ, তাই ত'। আজ আহারাদির পর একটা সভা হবে।'

"একটু বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'সভা ! সভা কিসের ?'

" 'এসব সম্মানী লোকেরা সভায় বসে' তাঁকর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়াদি করবে।'

" 'কিন্তু তার জন্য একটা সভার কি প্রয়োজন হ'ল তা' ত' বুঝ্‌তে পার্‌ছি না ?'

" 'হ্যাঁ, এদের এই-ই দস্তুর। অভিজাতবংশীয়দের এরকম সভায় নানারূপ শিষ্টাচারের আদান-প্রদান হ'য়ে থাকে।। হ্যাঁ, দ্যাখ্ এসব আদব-কায়দা তাঁকর ভাল জানা আছে ত' ?'

"ঠিক্ এমনই একটা কথা আমার মনে উঁকি-ঝুঁকি মার্‌ছিল। হঠাৎ মা'র প্রশ্নে আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম। নীরবে চোখ বিস্ফারিত ক'রে তাঁর দিকে কেবল চেয়ে' থাক্‌লাম। আমার ভাব দেখে' একটু বিস্মিত হ'য়ে তিনি পুনরায় প্রশ্ন করবার জন্য মুখ খুলবামাত্র আমি উত্তর কর্‌লাম, 'হ্যাঁ, তিনি ওসব জানেন।'

"তবুও তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, 'কি ভাব্‌ছিস্ তুই বল্ ত' ?'

"একটু ছোট্ট ক'রে উত্তর কর্‌লাম, 'না, কিছু না।'

"একটু পরে আবার তিনি প্রশ্ন কর্‌লেন, 'তোদের সঙ্গে একটা সামান্য বরকন্দাজ বা একটা দাসীও কেন আনিস নি বল্‌তে পারিস্ ?'

"বল্‌লাম, 'ইচ্ছা ক'রেই উনি আনেন নি।'

" 'ইচ্ছা ক'রে। এমন লোকানির কথা ত' কোথাও শুনি নি। যা'র যেমন পদ সে সেভাবেই চলবে, এই-ই নিয়ম। অত বড় ঘরে তোকে বিয়ে দিয়েছি, কত জাকজমক ক'রে আস্‌বি বাপের বাড়ী, এই প্রথম আস্‌ছিস্ তা' না, এসেছিস্ একটা দীন-দুঃখীর মত, ন্যাড়া ন্যাড়া হ'য়ে ওরা সব কত কি বল্‌ছে। জমিদারগুলি তোর শ্বশুরের কথা তুলে হাসাহাসি কর্‌ছে। তা'দের অনুচরেরা অলক্ষ্যে টিটকারি দিয়ে অতি কষ্টে হাসি চাপ্‌ছে। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।...'

"রাগে আমার আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। রাস্তায় আসতে আস্‌তে যে সন্দেহ আমার মনে জেগেছিল, দেখ্‌লাম ব্যাপার সত্যিই তাই। রাগ ক'রে বল্‌লাম, 'কত লোকজন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে থানা ক'রে অপেক্ষা কর্‌ছে রাস্তায়, কৈলাসপুরের জমিদারীর

সীমানার বাইরে। লোকজন আনেন নি, ওঁর ইচ্ছা। কিন্তু তা'তে লোকের কি আসে যায়?'

" 'কাজ করেছিস্ নির্ব্বোধের ন্যায়, লোকে এখন বলবেই।' এই ব'লে তিনি চুপ করলেন। আমিও নীরবে অন্যদিকে চেয়ে থাক্‌লাম। বুঝতে পার্‌লাম মা'র মনে বড্ড লেগেছে। লোকেরা জামাইকে ওরকম ক'রে বলায় তাঁর অসহ্য হয়েছে। কিন্তু এসব কথা ছাপিয়ে আমার মনে সেই সভার কথাটা পুনরায় জেগে উঠল। তখন খুবই একাকী হ'তে ইচ্ছা হচ্ছিল। মাকে অন্যত্র পাঠাবার জন্য হঠাৎ একটা মিথ্যা কথা বললাম, 'মা। তোমায় বোধ হয় ওরা ডাক্‌ছে, দ্যাখ গিয়ে একবার রান্নাঘরের দিক্‌টা।'

" 'হ্যা ঠিকই ত বলেছিস্? আমি যাচ্ছি এখনি ওখানে।·· তোর শরীরটা তেমন ভাল ব'লে মনে হচ্ছে না, মীনু! যা, একটু শুয়ে' থাক্ গে।'

" 'হ্যা, তাই যাচ্ছি।'

"তিনি চলে গেলেন। আমি একাকী সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভাবলাম। তার পর দ্রুতপদে আমার শোবার ঘরের দিকে চলে গেলাম।

"কিন্তু যা উদ্দেশ্য ক'রে সেখানে গিয়েছিলাম, তা' হ'ল না। স্বামী সেখানে ছিলেন না। আমি ঘরে ঢুক্‌তেই একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোক এসে আমাকে প্রণাম করে হাসিমুখে আমার সাম্নে একটু তফাতে দাঁড়াল। আমি একটু অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে তুমি?'

"সে তেম্নি হেসে উত্তর করল, 'আমি এ বাড়ীর একজন দাসী।'

" 'তা এখানে তোমার কি কাজ?'

" 'মা পাঠিয়েছেন আপনার কাজ কর্‌বার জন্য।'

''আমি নিজে ব'সে তাকে বস্‌তে বল্‌লাম। সে দাঁতে জিব কেটে' লজ্জায় জড়সড় হয়ে মুখখানি নত ক'রে দাঁড়িয়েই থাক্‌ল। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'নাম কি তোমার?'

'' 'আমার নাম মালতী।'

" 'তোমায় এ বাড়ীতে আর দেখেছি ব'লে ত' মনে হচ্ছে না?'

" 'আমি এই কিছুদিন আগে মাত্র এখানে এসেছি।'

" 'ও—ও—তাই। তোমার বাড়ী কোথায়, মালতী?'

" 'আমরা বিলাসপুরের প্রজা।'

বিলাসপুরের প্রজা! আমার বিস্ময়ের সীমা থাক্‌ল না। সে বল্‌ল, 'হ্যা, রাণী-মা, আমরা আপনাদেরই আশ্রিত।'

বহুদিনের পর আমার জন্মস্থান দেখে, শৈশবের স্মৃতির মধ্যে দাঁড়িয়ে, মা-বাপকে নিকটে পেয়ে আমার যে আনন্দ হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ হ'ল বিলাসপুরের নামটি মাত্র শুনে এবং বিলাসপুরের লোক দেখে। স্বামীর সম্পর্কিত সব-কিছুর সঙ্গে নারীর প্রাণের কেমন একটা সত্যিকার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তা'দের সুখ, দুঃখ, মান, অপমান—সব অবস্থাতেই তার প্রাণ সাড়া দিয়ে উঠে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে তার সদ্য পরিচিত নূতন গৃহের অণুপরমাণুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে যায়! তার প্রতি শিরায় শিরায় যেন নূতন রক্ত প্রবেশ ক'রে তা'কে নূতন ক'রে গড়ে' তোলে! আর সেই পুরাতন গৃহ, যেখানে সে জগতের আলো প্রথম দেখেছিল, তার পর হ'য়ে যায়! কেন বা কেমন ক'রে এমন হয় তা বলা যায় না। কিন্তু এ রকম সর্ব্বদাই হয় এবং অতি স্বাভাবিক উপায়েই হ'য়ে থাকে। এ সবের জন্যই বোধ হয় তোমরা পুরুষরা বলে থাক' নারী প্রহেলিকা! তবে এ পর্য্যন্ত বলা যায় যে, বিধাতা যে উপাদানে নারীকে গড়েছিলেন তার প্রকৃতিই হচ্ছে এই!"

পুরুষ তাহার কল্পনা দ্বারা নারীকে বহু রূপেই প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু নারীর মুখে নারীর কথা যেমন সত্যি করিয়া শুনা যায় এমন আর কোথায়ও না! অনেক কথাই মীনাকে জিজ্ঞাসা করিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই সে বলিতে আরম্ভ করিল, "·· হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলাম—মনটা আনন্দে এমন ক'রে ভরে গেল যে কোন কথাই বল্‌তে পার্‌লাম না। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তা'কে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'কর্ত্তা কোথা' আছেন, মালতী, বল্‌তে পার?'

'আজ্ঞে না। আমি দেখে আস্‌ছি।' ব'লে মালতী যে'তে উদ্যতা হ'লে আমি তাকে বাধা দিয়ে বল্লাম, 'দাড়াও একটু, ভাল ক'রে শুনে' যাও—যদি সুযোগ পাও তবে তাঁকে এখনি একবার এখানে আস্‌তে বলবে। আর যদি তা' না পাও তবে ভাল ক'রে দে'খে আস্‌বে আমি সেখানে যেতে পারি কিনা। বুঝলে?'

"মালতী গ্রীবা ভঙ্গিতে সম্মতি জানিয়ে চলে' গেল। আমি একাকী ব'সে ব'সে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলাম। সভার কথাটা থেকে থেকে আমাকে অস্থির ক'রে তুল্‌ছিল।

''কতক্ষণ এভাবে চিন্তামগ্ন ছিলাম তা' মনে নাই। হঠাৎ যেন একটা ডাক শুনে' চমকে উঠে চে'য়ে দেখলাম, মালতী আমার সাম্নে দাঁড়িয়ে মুখে কাপড় দিয়ে হাস্‌ছে। আমি একটু অপ্রতিভ হয়ে তা'কে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'কখন এসেছ, মালতী?"

''সে বল্‌ল, অনেকক্ষণ হ'ল এসেছি, রাণী-মা। কতবার ডেকেছি আপনাকে রাণী-মা, রাণী-মা ব'লে।"

"ও—ও—তাই নাকি। আমি বড্ড আন্‌মনা হ'য়ে ছিলাম একটা কথা ভাবতে ভাবতে·· হ্যাঁ, দেখা হয়েছে? বলেছ?

''না। তিনি মা'র মহলে আছেন। বাড়ীর মেয়েরা সব ঘিরে আছে তাঁকে। আত্মীয় পুরুষরাও অনবরত যাতায়াত কর্‌ছে সেখানে—'

"মা, বাবা, দাদা?

"তাঁ'রাও। সেখানে আমার ঢোকাই অসম্ভব, কর্ত্তাকে কথা বলা ত দূরের কথা।'

''তা'কে আর প্রশ্ন না ক'রেও আমার বুঝতে দেরী হ'ল না যে ওখানে আমারও যাওয়া মুস্কিল। একেবারেই তা' শোভা পাবে না। কিন্তু কাজটা যায়-পর-নাই গুরুতর। অবিলম্বে যে তা' করা কর্ত্তব্য তা' বেশ বুঝতে পার্‌ছিলাম। কিন্তু লজ্জা এসে আমায় দুর্ব্বল ক'রে দিল। আমার জীবনের মস্ত বড় ভুল এখানেই হ'ল। সে-ভুলের পরিণাম আজ আমায় যা দেখেছ তা-ই। আজ বুঝতে পারছি চক্ষুলজ্জা এবং লোকলজ্জার ন্যায় মানুষের, বিশেষ ক'রে নারীর মহাশত্রু আর দ্বিতীয় নাই। যে লজ্জা নারীর শিরোভূষণ এ তা' নয়। এটা শুধুই সঙ্কোচ, ভীরুতা, কাপুরুষতা, সত্যপথের কণ্টক!

উনিশ

যে ভুলের জন্য মীনার এই বর্ত্তমান দশা, যে ভুলের কথা বলিতে গিয়া তাহার এত কথার অবতারণা, এত অনুতাপ, এত মনোবেদনা, কি সে ভুল ? উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহার শেষ কথাগুলি শুনিবার জন্য রুদ্ধশ্বাসে নীরবে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিলাম।

মীনা বলিতে লাগিল, "...একটু পরে তা'কে জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁ, মালতী! তুমি অতিথিশালা চেন ?

" 'হ্যাঁ, রাণী-মা, চিনি।'

" ওখানে কি হচ্ছে আজ তা' কিছু জান ?'

" 'শুনেছি অনেক বড়লোক সব এসেছে, কর্ত্তাকে দেখতে রাতদিন খুব সমারোহ চল্‌ছে।'

" 'মালতী! ওখানে গিয়ে' একবার দেখে' এস ত সত্যি সত্যি কি হচ্ছে, আর কা'রাই বা এসেছে ? খুব ভাল ক'রে জেনে আসবে, খুব গোপনে, সাবধান, বুঝলে ?'

"সে চলে গেল। তা'র গতি ক্ষিপ্র, বক্র, কিন্তু নম্র, নিঃশব্দ। তা'কে দেখেই মনে হয় সে সুচতুর, বুদ্ধিমতি। মনের কথা সে যেন টেনে নেয়। স্বতঃই একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে এমনই তার আকৃতি এবং প্রকৃতি। এবার অনেক বিষয় জান্‌তে পারব মনে ক'রে তার অপেক্ষায় থাক্‌লাম।

"একাকী ব'সে থে'কে থে'কে যখন বড় চিন্তাকুল হয়ে উঠছিলাম তখন মালতী ফিরে এল। তাকে খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। আমি তার কথার প্রতীক্ষায় নীরবে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি দেখে এলে মালতী ?'

"সে যেন আমার প্রশ্নেরই প্রতীক্ষা করছিল। প্রশ্ন শুন্‌বা-মাত্র সে উত্তর করল,'এ অঞ্চলের জমিদাররা প্রায় সবাই এসেছেন। তাঁদের লোকজনেরা জমকালো পোষাক পরে, কোমরে কেউ ছোরা কেউ তলোয়ার ঝুলিয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অহঙ্কারে যেন তাদের পা মাটীতে পরছে না, এত দেমাক।'

" 'জমিদারদের পরিচয় জানতে পারলে ?'

" 'হ্যাঁ—ও দেমাকে লোকগুলোর কাছ দিয়েও আমি যাইনি। যেখানে আমার জানা-লোক থাকার কথা সেখানে গেলাম—সেই রান্না ঘরে। ওখানে আজ মস্ত ভোজের আয়োজন হচ্ছে—স্তূপাকার পাঠার মাংস, মাংসের মধ্যে একটা মাথা-কাটা আস্ত হরিণের বাচ্চাও রয়েছে দেখলাম, নানান রকমের সব পাখী এনেছে বন থেকে শিকার ক'রে জমিদাররা, ওদের বন্দুকগুলোও পড়ে আছে আশে পাশে এলোমেলো হয়ে; চারদিকে রক্তের ছিটা, জায়গায় জায়গায় তাজা রক্ত জমাট বেঁধে আছে; একটা লোক তারি মধ্যে সচ্ছন্দে ব'সে পাখীগুলির -পাখা ছিঁড়ছে, তার পর ছুরি দিয়ে তাদের গলা কাট্‌ছে! মুখে তার হাসি! কাপড়ে চোপড়ে হাতে পায়ে সর্ব্বাঙ্গে রক্তের ছিটা! গা আমার ঘিন্ ঘিন্ করতে লাগল। ঝি'দের কাছে গিয়ে বস্‌লাম। তারা সব এ বাড়ির লোক। বামুন-গুলো সব ওদের সঙ্গে এসেছে! লাল টক্‌টকে চোখ ওদের যেন রক্ত ফেটে বেরুচ্ছে। ওদের ছিষ্টি ভাল নয়, কথারও মাত্রা নাই। কি করি সয়ে সয়ে থাক্‌লাম খবরগুলি নেবার জন্ত। মনিবের কথা বল্‌তে গিয়ে কত দেমাকই যে দেখাল ওরা তা আর কি বল্‌ব—হুঁ—জান্‌তে পার্‌লাম মধুপুরের মজুমদার ঝুনঝুনপুরের ভুইয়া, মাধব নগরের চৌধুরী, মহেশগঞ্জের রায়বাবুরা সব এসেছেন।"

"মালতীর অবান্তর কথা ক্রমশঃ অসহ্য হ'য়ে উঠছিল। এবার কাজের কথা শুনে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর কিছু শুনলে ?'

"হ্যাঁ—শুনলাম আজ নাকি মস্তবড় একটা সভা হ'বে। সেখানে কর্ত্তার সঙ্গে বাবুদের পরিচয় হ'বে। সভা হবে বৈঠক-খানায়। আমি আস্তে আস্তে উঠে ওখানে গেলাম। প্রকাণ্ড লম্বা ঘর, এক দৌড় হবে। দুধারে কেবল দরজা আর জানালা। দেয়ালের গায় গায় রাজা জমিদারদের ছবি—কেউ ঘোড়ায়, কেউ হাতীতে, কেউ হাওদায় দাঁড়িয়ে বন্দুক দিয়ে শিকার করছে। ঠাকুর দেবতার ছবি কিন্তু একখানাও চোখে পড়্‌ল না, আশ্চর্য্য! চারদিকের দেয়ালে বেশ ক'রে সাজানো নানারকমের অস্ত্র শস্ত্র—ঢাল, তলোয়ার, বর্শা, সড়কি, বল্লম, রামদা—ঝক্‌ঝক্ করছে মাজা ঘসা ইস্পাত। ধব ধব করছে সাদা ফরাস্। মাঝে মাঝে সোণা-রূপার কাককাম করা সুন্দর সুন্দর গুটি তিনচার ফরসী। ফরসীর মাথায় তামার তারের ছাউনি দেওয়া বড় বড় কলকে, নলগুলি বিচিত্র। ফরাসের উপর চমৎকার পাঁচটী তাকিয়া। এ-বাড়ীর জনকয়েক শিকদার পাহারা দিচ্ছিল ওখানে। তাদের একজনকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, মাঝের তাকিয়াটি এবাড়ীর বড় বাবুর জন্য, আর বাকী চারটী অতিথি বাবুদের জন্য। কিন্তু আমাদের বিলাসপুরের বাবুর জন্য তাকিয়া নেই কেন? আশ্চর্য্য! কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও ইচ্ছা হ'ল না এবিষয়ে, এমন বিরক্তি ধরেছিল আমার। রাগ ক'রে ফিরে আসছি আর একটা ছোট কামরার পাশ দিয়ে, হঠাৎ একটা গোলমাল শুনে চমকে উঠ্‌লাম। চেয়ে দেখ্‌লাম কামরার বাইরে দাঁড়িয়ে একজন শিকদার, মুখে তার হাসি নেই,রা ও নেই; ভিতরে সেই সব বাবুরা হল্লা করছেন, বোতল থেকে লাল লাল কি সব ঢালছেন গেলাসে আর খাচ্ছেন। একটা তীব্র গন্ধ বেরুচ্ছিল। নাক বুক যেন আমার জ্বলে যাচ্ছিল সে গন্ধে। একবার উঁকি মেরেই অমনি চ'লে আস্‌ছিলাম, এমন সময় বাবুরা জড়ানো জড়ানো স্বরে চীৎকার করে শিকদারটাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'এ কে রে ?'

"শিকদারটা হাতজোর ক'রে বল্‌ল, 'আজ্ঞে, বিলাসপুরের রাণী-মার ঝি মালতী।

"ওরা সব হো হো ক'রে হেসে উঠল। একজন পরিহাস ক'রে বল্‌ল, 'বিলাসপুরের রাণী-মা!—হা-হা-হা—'

" 'আর একজন তার ধুয়া ধ'রে হেসে বলে উঠল, 'রাণী-মার ঝি মালতী দেবী স্বয়ং! ওরে বাপরে!—হা-হা-হা—'

" 'আর একজন জড়ানো স্বরে বল্‌ল, 'ভারি চমৎকার ত দেখতে!"...সে শিকদারটাকে কি ইঙ্গিত করল।

" 'অপমানে রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। আমি যেন মরিয়া হ'য়ে তাদের দিকে মুখ ক'রে ফিরে দাঁড়ালাম। শিকদারটা এক পা এগিয়ে আমার দিকে একবার চেয়েই থমকে দাঁড়াল। তা' দেখে বাবুরা হো-হো ক'রে

হেসে উঠলেন। একজন জড়ানো স্বরে ব'লে উঠ্‌লেন, 'দূরর্‌ কাপুরুষ! একটা মেয়েকে এমন ভয় করছিস্? দাঁড়া আমিই নিয়ে আস্‌ছি ওকে···আর একজন তাঁকে বাধা দিয়ে বল্লেন, 'এই, করছ কি?' কিন্তু তিনি বাধা না মেনে টল্‌তে টলতে কাম্‌রা থেকে বেরিয়ে আমায় নানারূপ কুৎসিৎ সম্ভাষণ করতে করতে আমার দিকে এগিয়ে এলেন, তৎক্ষণাৎ আমার দক্ষিণ হস্ত কটিবদ্ধ লুক্কায়িত ছুরির বাট দৃঢ় মুষ্ঠিতে ধারণ করল। সেই উত্তেজনার মুহূর্তে আমার বস্ত্রাঞ্চল দূরে সরে' যাওয়ায় এদিকে তাঁদের দৃষ্টি পড়ল। কাপুরুষরা তৎক্ষণাৎ সব নীরব হ'য়ে গেল।···তারপর ছুটে আসছি আপনাকে সব বলতে···'

" 'শুনতে শুনতে আমি এমন উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিলাম যে হঠাৎ কখন উঠে গিয়ে মালতীর সাম্নে দাঁড়িয়ে চখাচখি চেয়ে দৃঢ়কণ্ঠে তা'কে প্রশ্ন করলাম, 'মালতী! যদি সত্যি সত্যি সে পশু তোমাকে অপমান করতে উদ্যত হত তবে তুমি কি করতে?

"সে অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর করল, 'এই ছুরি আমূল তার বুকে বসিয়ে দিতাম।'

" 'তাতে তোমার বুক কাঁপত না? তুমি যে নারী?'

" 'এতটুকুও না। নারীত্বের অবমাননা সইবার ক্ষমতা আমার নাই। আমার পিতা, আমার স্বামী আমায় সে শিক্ষা দেন নাই।'

"কে এই নারী? বিবাহিত। স্বামী, পিতা বর্ত্তমান। এ ত যে সে মেয়ে নয়? এখানে এভাবে তবে থাকার উদ্দেশ্য কি তবে? কে এই মালতী? বিস্মিত হ'য়ে একথাগুলি ভাবতে ভাবতে তা'র দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কে, মালতী? সত্য পরিচয় দাও।'

"মালতী মাথা নত করে শুধু বলল, আমি আপনার দাসী —একজন বাঁদী মাত্র—আপনার আশ্রিতা।' তারপর সে নীরব হয়ে রইল।

" 'বুঝতে পেরেছি, বলবে না। হয়ত তোমার তা বলবার উপায় নাই। আমিও একথা আর কখনো জিজ্ঞাসা ক'রে তোমায় বিব্রত করব না।···মালতী! নারীকে তুমি সত্যিই বুঝতে পেরেছ। ··আজকের মত এমন আনন্দ যে জীবনে আর কখনো পাইনি, মালতী! ইচ্ছা হচ্ছে তোমায় চিরসঙ্গিনী করে রাখি।···'

"সে আমার পায়ের দিকে নতদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বল্‌ল, 'আমি ত আপনারই আশ্রিতা।—'

"তার কথার অর্থ বুঝেও জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু তোমার স্বামী?—'

" 'সেও আপনারই আশ্রিত।—'

"বিস্ময় দমন করতে না পেরে' ব'লে উঠ্‌লাম, 'আমার আশ্রিত! কে সে, মালতী? কিন্তু তখনি আমার ভুল সংশোধন ক'রে বল্লাম, 'না না থাক্‌ · ও প্রসঙ্গ আর তুলব না···'

"মালতী নীরবে মাথা হেট ক'রে দাঁড়িয়ে থাকল।

"মনে তখন এত আনন্দ হচ্ছিল যে আবেগ আর চাপ্‌তে না পেরে মালতীকে বুকে চেপে ধরলাম। সে লজ্জায় বিব্রত হ'য়ে দাতে জিব্‌ কেটে জড়সড় হ'য়ে একটা জড়পিণ্ডের ন্যায় মাটির উপ- পরে আমার পায়ের উপর মাথা রাখল।

"কথাগুলি যতই মনে হচ্ছিল ততই আমি যেন পাগল হয়ে উঠছিলাম। মনের মধ্যে রাগের আগুন্ জ্বল্‌ছিল। সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে যেন আগুনের তাপ বেরুচ্ছিল। অপমানের জ্বালায় আমি কেবল ছটফট করছিলাম। মনে হচ্ছিল এ অপমান তা'রা আমায় করেছে। মালতী আমার লোক। একজন সে কথা তা'দের জানিয়েওছিল।...কি স্পর্দ্ধা! এই কুকুরগুলি সব আমার শ্বশুরের আজ্ঞাবহ ছিল। কোন দিন তা'রা মাথা উঠিয়ে' তা'র মুখের দিকে চে'য়ে একটা কথা বলতে সাহস করে নাই, চিরদিন তাঁর পদানত হ'য়ে ছিল। তিনি খে'তে দিলে তা'রা খেত, খেতে না দিলে উপবাস করত। আর আজ তাঁরই পুত্রবধূকে তার পিতৃগৃহে বসেই এমন অপমান করতে তারা সাহস করল? কোথা থেকে এল তা'দের এ সাহস? আশ্চর্য্য।···তিনি যদি শুনতে পান, তবে? . স্বামীর কথা মনে হ'তেই আমার ভয় হ'ল তিনি যদি কিছু ক'রে বসেন!···তখ'ন আবার মনে হল সেই সভার কথাটা —এই পশু প্রকৃতি লোকগুলি সভা ক'রে বস্‌বে, আর তিনি যা'বেন সেখানে। বিরুদ্ধ প্রকৃতির লোক তিনি এবং তা'রা। আলাপ পরিচয় হ'বে। আভিজাত্যের নমুনা সেকেলে জমিদারী আদব কায়দার সঙ্গে তিনি পরিচিত নন্। তার ধারও তিনি ধারেন না। হয়ত কোন ব্যবহারে, কোন কথায় তারা তাঁকে অপমান ক'রে বসবে। আর অমি দপ ক'রে আগুন জ্বলে' উঠবে! অভিমানী তিনি। কি করা যায়! ভেবে ভেবে আর কুল পাচ্ছিলাম না।···

···"হঠাৎ মালতীকে বল্লাম, 'মালতী! দাদাকে ডেকে আনতে পার?

'সে এতক্ষণ একই ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল আমাকেই লক্ষ্য করছিল। আমার কথা শোনা মাত্র গ্রীবাভঙ্গিতে সম্মতি জানিয়ে সে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"ভাল ক'রে কোন কথা ভেবে দেখবার পূর্ব্বেই দাদা এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে খুবই ব্যস্ত দেখাচ্ছিল। আমার কিছু বলার পূর্ব্বেই মালতী বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। দাদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ডেকেছিস্ আমায়, মীনু?'

"বল্লাম, 'হ্যা।'

" 'কেন? খুব শিগগির ক'রে বল দেখি?'

" 'বলছি। কিন্তু তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন বল ত?

" 'ওরা সব এসেছে কিনা, তাই আমায় সাবধান হ'য়ে দেখা শোনা করতে হচ্ছে। বদনামের ভয় আছে যে'—

" 'ওরা কা'রা?'

" 'শুনিস্‌নি কিছু বুঝি? জমিদাররা সব এসেছেন যে? তোদের আসা উপলক্ষ ক'রে আমরা ওদের নিমন্ত্রণও করেছিলাম। ওরা হীরুর সঙ্গে দেখা করবে ব'লে বহুদিন থেকেই আগ্রহ জানাচ্ছিল।'

" 'ও—ও—তাই তোমার এত ব্যস্ততা? তোমাদের নাকি একটা সভা হবে আজ?'

" 'হ্যাঁ। এখবর কি করে পেলি?'

" 'পেয়েছি যা ক'রেই হ'ক না কেন? সভায় কি হ'বে?'

" 'এই ওরা সব বস্‌বে, হীরুর সঙ্গে আলাপ পরিচয়াদি করবে—এই সভা। আবার কি?'

" কিন্তু তার জন্য একটা রীতিমত সভা করার প্রয়োজন ত কিছুই দেখছি না।'

" 'সম্ভ্রান্ত লোকদের ত ওরকম ক'রেই হয়। তোর শ্বশুরের দেশে বুঝি তা হয় না? তা না হবারই ত কথা।···তিনি রেগে উঠলেন। সে হাসি তাঁর তীব্র বিদ্রূপে ভরা। চোখা চোখা বাণের ন্যায় এসে তা যেন আমার সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ করছিল। অন্তর বিদ্রোহী হ'য়ে উঠছিল। অতিকষ্টে ভাব ও

স্বর সংযত ক'রে তাঁকে বল্লাম, 'কিন্তু আমি বলছি এ সভার কোন প্রয়োজনই নাই।'

"'তুই বল্লেই ত হবে না। আমরা যা ভাল বুঝছি করছি। স্ত্রীলোকের সব বিষয়ে অত মাথা দেবার দরকার কি?'

"'তা তোমার যা খুসী তা বল্‌তে পার। কিন্তু আমি বার বার বলছি সভার দরকার নাই।'

"'বার বার ঐ একই কথা। তোর কি কোন ভয় আছে নাকি?'

"এবার আমি দৃঢ়কণ্ঠে বল্লাম, 'আছে।—' এবারও তিনি কথার গুরুত্ব বুঝতে পারলেন না। বল্লেন, 'কি ভয়, শুনি? হীরুর জন্য?'

"'শুনে' তোমার দরকার নেই। কিন্তু আবার তোমায় সাবধান ক'রে দিচ্ছি, সভা ক'র না।'

"'হীরু কি তোর হুকুমেই চলে নাকি? হা-হা-হা—কোন ভয় নাই, নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্ তুই—' তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে চলে গেলেন।

'তিনি যে কেবল আমার সহোদর তা নয়, আমার আবাল্য বন্ধুও। তাঁকে না জানাতে পারি এমন কিছু জগতে আমার ছিল না! আমার অসময়ে তাঁর সহানুভূতি এবং সাহায্য প্রত্যাশা করা কি আমার পক্ষে অন্যায় কিছু হয়েছিল? না। কিন্তু আমি তাঁর কাছ থেকে পেলাম কি? শুধুই বিদ্রূপ, তাচ্ছিল্য, অন্তঃসারশূন্যতা এবং বিষয়ের গুরুত্ব বুঝবার অক্ষমতার পরিচয়! কত লঘুই না দেখাচ্ছিল তখন তাঁকে আমার চোখে! তাঁর প্রতি একটা বিজাতীয় ঘৃণায় যেন আমার সারা অন্তরটা ছেয়ে গেল! যার-পর-নাই অভিমান হ'ল তাঁর উপর। চোখে জল এল!"

কুড়ি

ম্রিয়মান হ'য়ে ছিলাম। হঠাৎ মনে হ'ল এমন একজনের কথা যে আভাসেই আমার সমস্ত কথা বুঝে নেবে, এবং প্রাণ দিয়ে আমার সাহায্য করবে। সে মাধবী। সেই যে দেখা তার সঙ্গে, তারপর আর সে আসে নাই। তার কারণ, তারা গরীব, এ বড় বাড়ীতে ঢোকা তার পক্ষে হয় ত সহজ নয়। সুযোগ ও সাহায্য বিনা তা হয়ত সম্ভবই নয়। তখনি তাকে ডেকে আন্‌তে অস্থির হয়ে উঠলাম। মালতী এমন স্থানে এমন ভাবে দাঁড়িয়েছিল যেন সে আমাদের কিছুই দেখেও নাই শোনেও নাই। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল তার মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নারী ঐ দূর থেকেই সমস্ত দেখেছে, শুনেছে এবং অনুভবও করেছে, কেবল বাহিরে তার কিছুই প্রকাশ পাচ্ছে না। হঠাৎ সে একবার আমার দিকে তাকাতেই আমি হাঙ্গিতে তাকে ডাক্‌লাম। সে কাছে এলে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'মুস্তফিদের বাড়ীর মাধবীকে চেন, মালতী?'

"মালতী একটু চিন্তা করে' বল্ল, 'হ্যাঁ, চিনি।'

"তাকে একবার এখনি ডেকে আন্‌তে হবে।'

"'এখনি যাচ্ছি তবে আমি,' ব'লে সে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু তখনি আবার হাস্‌তে হাসতে ফিরে এল। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'একি! ফিরে এলে যে হাস্‌তে হাস্‌তে?'

"সে পুনরায় মৃদু হেসে বল্ল, 'তিনি যে নিজেই আস্‌ছেন এদিকে?'

'সে নিজেই আস্‌ছে শুনে' আরো বিস্মিত হয়ে গেলাম। তা'কে দেখতে দরজা পর্য্যন্ত না পৌঁছতেই সে এসে ঘরে ঢুক্‌ল। 'মাধু! এসেছিস্? এইমাত্র যে তোকে ডাক্‌তে পাঠাচ্ছিলাম?' ব'লে তাকে জড়িয়ে ধর্‌লাম। সে বল্ল, 'কত চেষ্টাই যে করেছি তোর কাছে আরো আগে আস্‌তে, তা আর কি বলব।...এই মাত্র নিজের মানের দিকে আর না চেয়ে কোনরকমে ঢুকে পড়েছি তোদের বাড়ীতে।'

"তা বুঝতে পেরেছি অনেক আগেই।'

"আমার চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে হঠাৎ বুঝি তা'র দৃষ্টি পড়েছিল। সে সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বল্ল, 'কি যেন একটা হয়েছে তোর মীনু? বল্ দেখি কেন আমায় ডাক্‌তে পাঠাচ্ছিলি?

"'অনেক কথা বল্‌বার আছে তোকে মাধু, আয়।' ব'লে তা'কে হাতে ধ'রে নিয়ে গিয়ে পাশাপাশি দুজনে বস্‌লাম। মালতী আমাদের নির্জ্জনে কথা বলবার অবসর দেবার জন্য এবারও নিজে থেকেই ঘরের বাইরে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। মাধবীকে এ বিষয়ে সব কথা ব'লে যখন আমি নীরব হ'লাম তখন সে বল্ল, 'কিন্তু মীনু! সত্যিই কি এ বিষয়টা এমন ক'রে চিন্তা করবার কোন গুরুতর কারণ রয়েছে?'

"'হ্যাঁ নিশ্চয়।'

"'আর মালতীর কথা সবই তোর বিশ্বাস হয়? সাধারণতঃ এরা যে শ্রেণীর লোক তা'তে—'

"'মালতী সে শ্রেণীর নয়।...জানিস্ না কি মাধু, আমার পিতৃকুলের একটা গর্ব্ব আছে?'

"'কিসের?'

"'তাদের আভিজাত্যের।'

'হ্যাঁ, সত্যই তাদের তা আছে—এত গর্ব্ব যে তার পরিমাণ হয় না। এতেই তাদের সব গেছে।'

"'এদের চ'খে তা'দের তুল্য জগতে আর কেউ নাই। সকলেই তাদের চেয়ে ছোট। এরা মানুষকে মানুষ ব'লে জ্ঞান ক'রে না, মনুষ্যত্বের দাম দিতে চায় না। দুনিয়াটাকে এরা এত ক্ষুদ্র ক'রে দেখে।...

"'আর হীরু ঠিক তার বিপরীত। সুতরাং এদের প্রকৃতির সঙ্গে তার প্রকৃতির খাপ খাবে না। কেমন, এই ত?'

"হ্যাঁ, ঠিক তাই।...তা'দের গর্ব্বিত প্রকৃতি অনায়াসে হয়ত এমন অপমানজনক ভাব কথায় বা অঙ্গ-ভঙ্গিতে প্রকাশ করবে যা'তে দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠবে।'

"মাধবী কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা ক'রে বল্ল,—"হ্যাঁ, মীনু! তোর কথাই হয়ত ঠিক।...কিন্তু কা'কেও কি তুই বলিস নি একথা আভাসেও?'

"হ্যাঁ, বলেছি, মাকে ও দাদাকে।'

"তারা কি কিছুই কর্‌ল না?'

"না।—তাদের অবহেলা, হাসি, বিদ্রূপ আমার অভিমানে বড় আঘাত করেছে, মাধু। এত অপমান যে তা আর সহ্য হচ্ছে না।'

"'আশ্চর্য্য!...তবে আর একমাত্র উপায় হচ্ছে যে কোন রকমে হীরুকে সে-সভায় যেতে না দেওয়া। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তাকে একথা বলামাত্র সেখানেই যাবার জন্য তার জেদ আরো বেড়ে যাবে।'

"তা-ই। কোন রকমে ভালয় ভালয় এ দিনটা কেটে গেলে কালই চ'লে যাব।"

"আচ্ছা দাঁড়া দেখি আমি কি করতে পারি। বেশী ভাবিস্ নি।'— ব'লে সে চলে গেল। আমি চিন্তিত হ'য়ে একা বসে থাক্‌লাম।

"মাধবীর ফিরে আস্‌তে বেশী দেরী হ'ল না। যা ভেবেছিলাম তাই। মাধবী অনেক চেষ্টা ক'রেও তাঁকে বুঝাতে পারে নাই। সে তাঁকে বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে যতই বল্‌ছিল তিনি ততই হেসে তা উড়িয়ে দিচ্ছিলেন। মাধবী বল্ল, "অনেক কষ্টে তাঁকে নেহাৎ দু'মিনিটের জন্য নির্জ্জনে পেয়ে যখন কথাটা বল্লাম তখন তিনি হেসেই খুন। আমি প্রথমটা একটু অপ্রস্তুত হয়েছিলাম। কারণ এই প্রথম তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ। তুইও অনুপস্থিত। পরিচয় করিয়েও কেউ দেয় নাই। কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলাম তাঁর আচরণে বিন্দু মাত্র অশ্রদ্ধার ভাব নাই, সরল শুদ্ধ অন্তঃকরণ। তিনি হাস্‌তে হাসতে বল্লেন, "মীনার ঐ এক পাগলামি আমাকে নিয়ে। পাগল সে—বিষম পাগল...আমি যে যাব একটু মীনার কাছে তারও ত উপায় দেখ্‌ছি না। এখানকার আদব-কায়দা সব মেনে চল্‌তে হচ্ছে। তাও ত মানারই হুকুম।'...এই ব'লে তিনি আরো কিছুক্ষণ হাস্‌লেন।'

"বল্‌লাম, 'আমি গেলেও এই একই ফল হ'ত। বিষয় ওজন করে' নেবার স্বভাব তাঁর নয়।'

"মাধবী পুনরায় বল্‌লে, "তিনি আরো বল্‌লেন, হ্যাঁ—ওসব কিছু নয়,, ভাববেন না। থেকে থেকে মীনার মাথায় কত কি যে আসে তার ঠিক নাই।...অপমান! দূর দূর!...তা ছাড়া আমি কি কাপুরুষ? হা-হা হা?...' ভয়ানক হাস্‌তে লাগলেন। আমার ও মনে হচ্ছে মীনা, তুই খামাকা এত অস্থির হয়েছিস্‌।...আমি যাচ্ছি এখন বুঝলি? জানিস্‌ ত—এসেছেন আজ বহুদিন পর?'

"'বহুদিন পর এলেন তিনি? কেন মাধু?'

"এটা আর বুঝতে পারছিস না? মাঝে মাঝে বিরহ দিয়ে প্রেম জিনিষটাকে একটু পাকিয়ে নিতে হয়, ত'' না হ'লে কবিরা বলেছেন প্রেম নাকি গাঢ় হয় না। তাঁর ও কবি-প্রাণ কি না?'

"সে হাস্‌ল। আমিও হেসে তার গালে আঙ্গুলের খুব মৃদু আঘাত করে বল্লাম, 'তোর কথায় মরা মানুষও হাসে। এখনো সেই রসিকাটিই!.. হ্যাঁ, মাধু! তিনি দেখতে কেমন রে? মনে তোর...?'

"'দেখতে কেমন? শোন্‌, এইরূপ—

'কি পেখিনু যমুনার তীরে।

'কালিয়া বরণ এক, মানুষ আকার গো,

* * *

'চিকণ কালার রূপে, আকুল করিল গো,

'ধরণে না যায় মোর হিয়া।...'

* * *

"'দূর! আগেই কি বিকিয়েছিলি তাঁর পায়? সে কোন্‌ যমুনার তীরে, অ্যাঁ?'

"'না, দূর্‌ তা হবে কেন? আগে বুঝি কেউ...'

"'তবে যে বল্‌ছিস্‌? জিজ্ঞাসা কর্‌লাম দেখতে কেমন, তুই বল্লি কি সব?'

"কেন ঐ যে বলেছি 'কালিয়া বরণ এক?' তুই তা হলে বুঝতে পারিস্‌নি ভাল ক'রে? আচ্ছা এবার তবে শোন্‌ ভাল ক'রে।—

'কত চাঁদ নিঙ্গারিয়া, মুখানি মাজিল গো,

—কহে কত সুধা দিয়া।'

এবার বুঝেছিস্‌?' "হ্যাঁ—তাই বুঝি নিজেকে জন্মের মত হারিয়েছিস্‌?...

হ্যাঁ মাধু! তিনি তোকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন ত?'

"'হ্যাঁ—খুব...তবে তাও শোন্‌ কি রকম—

'পিয়াক পীরিতি হাম কহিতে না পার।

'লাখ বয়ান বিধি না দিল হামার।'

'রঙ্গ রাখ্‌। ভাল ক'রে বল্‌ দেখি সত্যি কথা?'

"শোন্‌ তবে এবার একবারে খাঁটি কথা—'

'হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া, মধুর কথাটি কয়।

ছায়ার সহিতে, ছায়া মিশাইতে, পথের নিকটে রয়।...'

"'তবে তুই জীবনে সুখী হয়েছিস, মাধু?'

"'হ্যাঁ।'

"সে যে বাস্তবিক সুখী, তার মন যে আনন্দে তরঙ্গায়িত, তা তার মুখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম। প্রফুল্ল মনে বল্লাম, 'মাধু! তোর জন্য যে আজ আমার কি আনন্দ হচ্ছে তা কি আর বল্‌ব?'

"'তাকে জড়িয়ে ধর্‌লাম। সে আদর ক'রে ধীরে ধীরে আমার চিবুক ধ'রে স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে চোখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন কর্‌ল, 'কিন্তু তুই?'

"বল্লাম, 'আমিও সুখী।'

"আমার স্তায় মুখে সে আনন্দ প্রকাশ কর্‌ল না বটে, কিন্তু তার চোখ মুখ, প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতি স্পষ্ট ভাবেই তা করতে লাগল। সে আমার দিকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে থেকে থেকে বল্ল, 'তা তাঁকে একবার দেখেই বুঝতে পেরেছি।'

"হঠাৎ আমরা উভয়েই কেমন যেন স্তব্ধ, নিস্পন্দ, নির্ব্বাক হয়ে গেলাম। শুনেছি মানুষ কোন বিশেষ অবস্থায় আনন্দের সাগরে মগ্ন হয়ে জগত ভুলে যায়! আমাদেরও যেন ঐ রকমই কিছু একটা অবস্থা হয়েছিল! এত আনন্দ, এত রস উপভোগ করছিলাম যে নিজেদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যেন ভুলে গিয়েছিলাম! হঠাৎ মাধবীর কণ্ঠশব্দ শুনে চমকে উঠ্‌লাম। সে বল্‌ছিল, 'মনে আছে তোর মীনু! সেই গানটা—'সখিরে! কুঞ্জে এলেন বনমালী?'

"সোৎসাহে বল্লাম, 'হ্যাঁ—'

"'কিন্তু বনমালা আমায় কে গেঁথে দেবে এখন? সখি যে আমার আনমনা?'

"সে আমার চিবুক তুলে ধ'রে, ললাটের উপর ললাট রেখে প্রেমাপ্লুত মৃদু কণ্ঠে বল্ল,...যা বি না আমার কুঞ্জে একবার, মীনু?..."

"সে হাস্‌ল। বড় মধুর সে হাসি—আনন্দে ভরা! কি আকর্ষিণী শক্তি তার! আমি ও তার গলা জড়িয়ে ধরে' হেসে বল্লাম, 'নিশ্চয়! নিশ্চয়!.. আমি গিয়ে যেন দেখতে পাই—ব'স কুঞ্জে মাধবী—জড়িত তনু বনমালী!'

"'না না, হ'ল না তোর, গিয়ে দেখ্‌বি 'মেঘ-মালা সঙ্গে তড়িত লতা জনু...'

"সে প্রাণ খোলা হাসি হাস্‌ল। তার মোহন হাসি আমাকেও হাসা'ল। কিন্তু আমার হাসি ফুট্‌ল না। মন খুলে যে হাস্‌তে পারলাম না তা আমি নিজেই উপলব্ধি কর্‌লাম। বড় দুঃখ হ'তে লাগ্‌ল। মাধবী বুঝি তা লক্ষ্য ক'রেছিল। হঠাৎ সে আমার গণ্ডে একটী গভীর চুম্বন করে বল্ল, 'এই চুম্বনে তোর মনের সমস্ত চিন্তা আমি সঙ্গে নিয়ে চল্লাম...যাই মীনা! কাল আবার আস্‌ব..ভাবিস্‌ না তুই কিছু অনর্থক...আর আমায় না জানিয়ে কিন্তু কিছু করিস্‌ না?'

"সে চ'লে গেল।

"মুগ্ধ হ'য়ে তার দিকে চেয়ে থাক্‌লাম। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের আধার তার অঙ্গ। সে যেন চারদিকে রূপের ঢেউ তুলে' পথ আলো ক'রে চল্‌ছিল। যতক্ষণ তাকে দেখা গেল ততক্ষণ আমার চোখ তার দিক্‌ থেকে আর ফির্‌ল না। যেতে যেতে সে কতবার তর্জ্জনীর নীরব ইঙ্গিতে আমায় কত সাবধান করে গেল।

"কি সহজ, সরল, সুন্দর ভাব মাধবীর! কি মোহিনী প্রকৃতি, অনাড়ম্বর স্বভাব! আমায় চিন্তামুক্ত করতে তা'র কি আ-প্রাণ চেষ্টা! তার চেষ্টা ফলবতীও হয়েছিল। স্বামীর স্নেহ, ভালবাসা বা প্রেমের কথা বলতে বা শুন্‌তে নারী যেমন অ-জ্ঞান হয়, নিজেকে ভুলে যায়, জীব-জগতে এমন আর কেউ নয়। স্বামীর কথায় আমরা দুই বন্ধু অতি আশ্চর্য্যরূপে বিভোর হয়ে ছিলাম! একটু আগেই যে চিন্তায় আমি অস্থির হ'য়ে উঠেছিলাম, সে চিন্তা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। একটা বিষম অসামঞ্জস্য! অথচ তাই কিন্তু হয়!

"তুমি যদি তোমাদের কল্পিত মনোবিজ্ঞান দ্বারা নারী-মনের গতির ধারা নির্দ্ধারণ করতে যাও তবে অত্যন্ত ভুল করবে।"

আমারও তাহাই মনে হইল। কোনরূপ বিশ্লেষণ দ্বারাই বোধ হয় এর কোন বিশিষ্ট নীতি পাওয়া যায় না।

মীনা বলিল, 'মাধবীর সঙ্গে ঐ দেখাই আমার শেষ দেখা। কিন্তু তাকে আজও ভুলতে পারি নাই।'

একুশ

"মূর্চ্ছাভঙ্গের পর অসার দেহ যেমন সাড়া দিয়ে চমকে ওঠে, আমারও ঠিক তা-ই হ'ল। মাধবী চলে যাওয়ার কিছুকাল পরই আমার যেন একটা

মোহ কেটে গেল। আমি চমকে উঠলাম। দেখতে দেখতে পুনরায় সেই সন্ধ্যার কথায় মন আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠল। সেই সঙ্গে স্বামীর সেই মারাত্মক উক্তি '...আমি কি কাপুরুষ?...' মনে পড়ল। এবার সত্যি আশঙ্কায় আমার অন্তর কেঁপে উঠল! উৎকট চিন্তা আমাকে যার-পর-নাই চঞ্চল ক'রে তুলল। তারপর ধীরে ধীরে একটা সঙ্কল্প মনে দৃঢ় হ'য়ে উঠল। হঠাৎ মালতীকে ডাকলাম। সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করতে করতে যেন আমার এই ডাকের জন্যই উদগ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা করছিল। সে চঞ্চল পদে আমার নিকটে এসে দাঁড়াল। সে নীরব ছিল বটে, কিন্তু তার গম্ভীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুর্জ্ঞেয় ভাষায় অফুরন্ত জিজ্ঞাসা! অবিলম্বে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মালতী! বৈঠকখানার ডানদিকে যে একটা ছোট কামরা আছে, তা জান?'

'মালতী গ্রীবা দুলিয়ে বলল, 'জানি।'

'কামরাটি একটী সুন্দর বসবার ঘর। বৈঠকখানা এবং এই কামরার মাঝের দে'য়ালে কোন দরজা বা জানালা নাই। কিন্তু গুটি কয়েক বড় বড় ছিদ্র আছে। কামরার ভিতরের দিক দিয়ে এই ছিদ্রগুলির মুখ এক প্রকার সূক্ষ্ম জালে ঢাকা। দে'য়ালের এবং এই জালের রং এক হওয়ায় জালগুলি যেন অদৃশ্য হ'য়ে থাকে, না জানলে ধরা শক্ত। এসব তুমি দেখেছ?'

"'না'।

"'অন্দর-মহল থেকে মেয়েরা সেখানে গিয়ে যা'তে বৈঠকখানার আমোদ-প্রমোদের দৃশ্য দেখতে পারে, তারি জন্য এত সব ব্যবস্থা। কিন্তু অন্দর-মহল থেকে সেখানে যাবার পথ জান?'

"'না।'

"'এটা গুপ্ত পথ। খিড়কী পার হ'য়ে বাগান ঘুরে' তবে যেতে হয়। সে অনেক কাণ্ড। আচ্ছা এস, তোমাকে সমস্ত পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছি—'

"তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এবার পারবে?'

"সে দৃঢ়কণ্ঠে বল্ল, 'হ্যাঁ, পারব।'

"আচ্ছা, তবে দেখে এস একবার জায়গাটা?'

"সে এক পা বাড়াতেই তা'কে বাঁধা দিয়ে বললাম 'দাঁড়াও।—'

"সে অবাক হ'য়ে ফিরে দাঁড়াল।'

''বল্লাম, 'যদি তোমার কিম্বা আমার কোন বিপদ হয়, তবে আত্মরক্ষা করতে পারবে, মালতী?'

'গর্ব্বে তার গ্রীবা দুলে উঠল। বলল, 'নিশ্চয়!—আত্মরক্ষার জন্য আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত। আপনার দাসী মালতী আত্মরক্ষা করতে পারে। প্রয়োজন হ'লে প্রাণও দিতে জানে।'

"'তার সেই দৃঢ়কণ্ঠস্বর আজও যেন আমার কানে বাজছে। পুনরায় তা'কে প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু আত্মরক্ষা করবে কিসে?'

"'মালতী একবার তা'র কটিতে কোষবদ্ধ ছুরিকার পানে তাকিয়ে সে দিকে যেন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পরে হঠাৎ তার প্রকাণ্ড খোঁপা থেকে এক টানে কি একটা বের ক'রে আমার চোখের সামনে ধরল। চেয়ে দেখলাম তার হাতের মধ্যে থেকে এক তীক্ষ্ণ, দো-ফলা, বক্র, ক্ষুদ্র ইস্পাতের ছুরিকা ঝক্ ঝক্ করছে! তার ক্ষুদ্র কলেবর কৌশলে খোপার মধ্যে বেণীর বনে আত্মগোপন ক'রে থাকে, এবং তার ততোধিক ক্ষুদ্র কারুকাজ করা রূপার বাঁট-টি খোঁপার মাথায় অলঙ্কাররূপে শোভা পায়। ভাবছিলাম আমি অভিজাত বংশের মেয়ে হ'য়েও যা জানি না, দেখিও নাই, সাধারণ ঘরের মেয়ে হ'য়ে সে কি ক'রে তা জানল? আশ্চর্য্য! বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে চোখ বিস্ফারিত ক'রে চেয়েছিলাম তার দিকে!

"'তাড়াতাড়ি সে ছুরিকাটি পূর্ব্বের ন্যায় খোঁপায় লুকিয়ে রেখে বল্ল, 'এ ছাড়াও আছে—'

"'এই ব'লে সে ছুটে গিয়ে ঘরের এক কোণ থেকে একটা প্রকাণ্ড ধনুক আর গুটি দুই তিন তীর হাতে ক'রে নিয়ে এল। ধনুকের এক মাথা পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে চেপে ধ'রে অপর মাথা বা হাতের চাপে বেঁকিয়ে এনে ডান হাতে ছিলা লাগিয়ে দিল। এমন অনায়াসে সে এটা করল যে আমার বিস্ময়ের আর সীমা থাকল না!

"সে বা হাতে ধনুক এবং ডান হাতে একটা তীর নিয়ে বলল, 'দরকার হ'লে দূর থেকেই—' এই ব'লে ধনুকে তীর যোজনা ক'রে সামনের দে'য়ালের দিকে মুখ ক'রে ধনুকের ছিলাটা এত জোরে টেনে ধরল যে, ধনুকের দু'টী মাথাই প্রায় তার বুকের কাছে বেঁকে এল। হঠাৎ সোঁ ক'রে একটা ভয়ানক শব্দ হ'ল! সামনের দিকে চেয়ে সবিস্ময়ে দেখলাম তীরটা দে'য়ালে অনেকটা বিঁধে গেছে, আর ঠিক তার নীচেই মেঝের উপর চূণ, শুরকি এবং ইটের টুকরা সব প'ড়ে আছে! আশ্চর্য্য শক্তি এই মেয়েটীর। তার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে বললাম, 'তুমি কি সাওতালের মেয়ে, মালতী?'

"আমার নিজের প্রশ্ন নিজের কাছেই কেমন একটু অদ্ভুত ঠেকল! কিন্তু তবুও তার উত্তরের প্রতীক্ষায় মালতীর দিকে চেয়ে থাকলাম। সে ঈষৎ হেসে বলল, 'আমি অতি সাধারণ বাঙ্গালীর মেয়ে।...কিন্তু কেন, রাণী-মা! বাঙ্গালীর মেয়ে কি হেয়?'

'বাঙ্গালীর মেয়ে এমন হ'তে পারে তা চোখে না দেখলে যে বিশ্বাসই হ'ত না?'

"বাঙ্গালীর মেয়ে কি না পারে? শৈশবে বাবা নিজে হাতে ধ'রে এ বিদ্যা আমায় শিখিয়েছিলেন। তিনি বলতেন আপদে-বিপদে, সম্পদে মেয়েদের এ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে।...রাণী মা কি নিজেকেও ভুলে যাচ্ছেন?...'

"তার ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট। কিন্তু কি ক'রে সে আমার অস্ত্রশিক্ষার পরিচয় জানতে পারল, তা ভেবে ঠিক করতে পারলাম না! আশ্চর্য্য! কে এই মালতী? পুনরায় সেই প্রশ্ন আমার মনে জেগে উঠল। কিন্তু কৌতূহল দমন ক'রে রাখলাম। বোধ হ'ল সে যেন এটা বুঝতে পেরে নীরবে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে থাকল।

"বললাম, 'এ সবের প্রয়োজন হয়ত হবে না মালতী। তোমাকে শুধু এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলাম।—হ্যাঁ—আচ্ছা, তবে তুমি সে কাজটা ক'রে এস, মালতী। আমি একটু অন্যত্র যাব এখন। তুমি যদি আমার পূর্ব্বেই এখানে ফের তবে এখানেই আমার জন্য অপেক্ষা ক'র।'

"মালতী গ্রীবা ভঙ্গিতে সম্মতি জানিয়ে দ্রুতপদে আদিষ্ট কাজে চ'লে গেল। আমি মার সন্ধানে চলে গেলাম।

অনেকক্ষণ ধ'রে বাড়ীর চারদিকে ঘুরে বেড়ালাম। অনেকের সঙ্গেই দেখা হ'ল। বহুকালের পর সাক্ষাৎ তারা হাসিমুখে আদর ক'রে আমায় কত ডাকল। কিন্তু তা'দের কা'রো ডাকে আমার প্রাণ সাড়া দিল না। কেবল লোক দেখানো হাসি হেসে একটী কথাও না ক'য়ে তাদের এড়িয়ে চলে গেলাম। দাদাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে থাকলাম। তিনি হেসে কতবার ডাকলেন, কিন্তু এমনি একটা বিতৃষ্ণা এসেছিল আমার তাঁর উপর যে তাঁর দিকে একবার ফিরে চেয়েও দেখতে ইচ্ছা হ'ল না। এই সময় মাকে নিকটে পেতে বড় ইচ্ছা হচ্ছিল। বিবাহিত জীবনের সবগুলি দিনই যাঁর জন্য চির উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা অনুভব করেছি তাঁর জন্য—ধরিত্রীরই ন্যায় সর্ব্বংসহা আমার শান্তিরূপিণী মায়ের জন্য—যার-পর-নাই আকুল হ'য়ে উঠলাম। দ্রুতপদে চলেছি তাঁর উদ্দেশ্যে, হঠাৎ পিছনে আমার নাম ধ'রে ডাক শুনলাম, 'মীনা!—'

"ফিরে চেয়ে দেখলাম, মা ডাকছেন। ছুটে গিয়ে তাঁর বুক ঘেসে দাঁড়ালাম। তিনি এক হাতে আমায় বুকের কাছে চেপে ধ'রে বললেন,

'তোকে খুঁজে খুঁজে যে হয়রান্ হ'লাম! কোথা ছিলি তুই এতক্ষণ, মীনু?'

"আমি তাঁর গলা জড়িয়ে ধ'রে, কাঁধের উপর মুখ রেখে আনন্দে হেসে বল্‌লাম, 'বাঃ! আমিও যে তোমায় কত খুঁজেছি, মা?'

"খুঁজেছিস্? কেন, আমি ত ঐ মাথামুণ্ডু সব কর্‌ছি ওদের জন্য রান্না-ঘরে ব'সে। দু দণ্ড যে তোকে নিয়ে বস্‌ব, তারও উপায় নাই, এম্‌নি ক'রেছেন ঈশ্বর আমায়?'

"আমার চিবুক ধ'রে আদর ক'রে বল্‌লেন, 'সকাল বেলা সেই যা একবার মাত্র একটু দেখেছি, তারপর এই এত বেলা হ'ল এর মধ্যে আর তোর দেখা নাই! কেন মা? খাওয়াও বুঝি কিছু হয়নি তোর, অ্যা?'

"থাক্ গে, এখন আর কিছু খাব না মা।'

"না, চল্, এখনি খাবি। মুখ তোর শুকিয়ে কালো হ'য়ে গেছে।... যার জন্য এত আয়োজন তার-ই খোঁজ নেবার কেউ নেই! ইচ্ছা হচ্ছে কি করি!...'

"তিনি আমায় নিয়ে চল্‌লেন। যেতে যেতে কতবার আমার মুখের দিকে চেয়ে', মুখ মুছে দিয়ে কত স্নেহ-সম্ভাষণ, কত স্নেহ-মাখা কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন! তা অফুরন্ত! এমন ভাব, এমন ভাষা মা ভিন্ন আর কার আছে? মা এবং সন্তান ভিন্ন সে-ভাব, সে ভাষা আর কে বোঝে? আর কা'র অন্তর স্পর্শ ক'রে?...আবার এমন মা-কেও একদিন ছেড়ে যেতে হয় সন্তানকে, তাঁকে কত সময় কত নির্যাতিত ক'রে! মানুষের বিধিলিপি অতি বিস্ময়কর! ..'

'মনে ছিল একটা উৎকট উদ্বেগ - ভয়ানক অশান্তি! একটু সামান্য কিছু মুখে দিয়ে মাকে কোন রকমে সন্তুষ্ট ক'রে আমার ঘরে ফিরে গেলাম।

"মালতী আগেই ফিরে এসে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি যেতেই সে বল্‌ল, 'কেউ সেখানে নাই। পথেও কেউ আমায় লক্ষ্য করেছে ব'লে মনে হয় না...কামরার একপাশে একটা ক্ষুদ্র দরজাও আছে দেখলাম। এমন ভাবে মিশে আছে সেটা দেয়ালের সঙ্গে যে, তা একটা দরজা ব'লেই মনে হয় না। হঠাৎ আমার নজরে পড়ে গেল। একটু খুলে দেখলাম এই দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটা বাঁক ঘুর্‌লেই একেবারে বৈঠকখানার সাম্‌নে এসে পড়া যায়।'

"দেখলাম, মালতীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া সামান্য তৃণটিরও সাধ্য নাই। আমার ত্রুটি পর্য্যন্ত সে সংশোধন ক'রে যাচ্ছিল। এই দরজার কথাটা আমার মোটেই স্মরণ ছিল না। মনে মনে খুব সন্তুষ্ট হলাম। একটু পরে যে কথাটা আমার মনের মধ্যে অবিরাম ঘুরে ঘুরে আমাকে বড় চঞ্চল ক'রে তুল্‌ছিল তার আভাস মাত্র নিয়ে তা'কে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'ওখানে কি তাঁরা এসে বসেছেন, মালতী?"

"সে উত্তর করল, 'না, বাবুরা এখনো বৈঠকখানায় আসেন নি। তবে চাকর-বাকরদের ব্যস্ততা দেখে মনে হ'ল তাঁরা হয় ত এখনি আসবেন'।'

"একটু চিন্তা ক'রে তা'কে বল্‌লাম, 'তুমি গোপনে সেই ঘরে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা কর। আমি একটু পরে যাচ্ছি ওখানে। আর কা'রো সেখানে যাওয়া নিষেধ জেনো, তা সে যে-ই হ'ক। বুঝলে'?'

"'হাঁ বুঝেছি, রাণী মা!' ব'লে সে অবিলম্বে কক্ষত্যাগ কর্‌ল। তার রঙীন বস্ত্রাঞ্চল দৃঢ়বন্ধনীরূপে ক্ষীণ কটিতে শোভা পাচ্ছিল। তার দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হস্তহীন ধনুকটী একটী সুন্দর যষ্টির ন্যায় দেখাচ্ছিল। স্বচ্ছন্দ গতিতে চ'লে যাচ্ছিল সে। তার প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি অঙ্গ-ভঙ্গিতে, চাহনীতে যেন একান্ত নির্ভয়তা, আত্ম-নির্ভরতা প্রকাশ পাচ্ছিল! মনে হচ্ছিল অনন্ত শক্তির আধার এই নারী! নিজেকে কত ক্ষুদ্রই না মনে হচ্ছিল তখন তার কাছে! পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাক্‌লাম কিছুক্ষণ যে-পথে এই অদ্ভুত মেয়েটী গেছে সেই পথের দিকে!

"দেখতে দেখতে অজ্ঞাতসারে এক সময় গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়লাম। ক্রমশঃ চিত্ত আমার লঘু না হয়ে অভাবনীয়রূপে ভারাক্রান্ত হ'ল। স্বচ্ছ নীল আকাশের গায় আপন মনে ভেসে-যাওয়া বিচ্ছিন্ন মেঘ যেমন হঠাৎ ভাবী প্রলয়ের তাড়নায় বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ক্রমে ঘনীভূত হয়ে আকাশ আচ্ছন্ন ক'রে পৃথিবীর বুক ঢেকে ফেলে অন্ধকারে, আমার অন্তরেও তেমনি কালো মেঘের সমাবেশ হ'ল, দেখতে দেখতে যেন তার চারিদিকে ঘিরে এল একটা জমাট অন্ধকার! দুর্ভেদ্য গাঢ় অন্ধকার!—দৃষ্টি চ'লে না! বায়ু-পথ যেন রুদ্ধ! সব স্তব্ধ! মন আমার স্তম্ভিত! কিসের এ সূচনা! এ ছায়াপাত কিসের! এ কি ভাবী প্রলয়ের ছায়া আমার জীবনের! এ প্রলয়ে যুঝ্‌বে কে আমার হ'য়ে! কেউ না! আমি একা! কে আমার সাথী? কে আমার সহায়? হঠাৎ যেন বজ্রনির্ঘোষে কে আমার কানের কাছে চীৎকার ক'রে বল্‌ল, 'কেউ না! তুই একা—তুই একা! সাবধান—সাবধান! অন্তর আমার আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল—একা, আমি একা! .. ভয়ঙ্কর প্রলয় তেড়ে আস্‌ছে ফণা তুলে'! রক্ষা নাই—রক্ষা নাই আর! তবে—তবে কি সত্যি যাব ভেসে ঐ প্রলয়ের খরস্রোতে? সত্যি যাবে ধ্বংস হ'য়ে আমার সর্ব্বস্ব?...

"আমার সর্ব্বাঙ্গ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল! অন্তর কেঁপে কেঁপে যেন স্তব্ধ হ'য়ে রইল।"

"তখন মনে পড়ল নারীর একমাত্র সহায় তার ইষ্টদেবতা—অবলার একমাত্র বল। মনে মনে কাতরে তাঁ'কে জানালাম, রাধামাধব! তুমিও কি বিপদে এ অভাগীকে ছেড়ে যাবে? রাধামাধব! আমি যে তোমারই সেবিকা, চিরদিন আমি যে তোমারই!...

"বড় জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চোখে জল এল! অশ্রু? অশ্রু কেন? জানি না...সেই মুহূর্ত্ত থেকে এই অশ্রুই বুঝি আমার জীবনের সম্বল হ'য়ে রইল।...

"সর্ব্বাঙ্গ আমার ঘর্ম্মাক্ত হ'য়ে যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল। অভিভূত মনে হঠাৎ যেন জ্ঞান ফি'রে এল—এ কি! এ কি ভাবছি আমি! কেন এ সব কথা এমন ক'রে মনে উঠছে আজ! এ সব ভাববার কারণ কি হয়েছে?...কই? কিছুই ত দেখতে পাচ্ছি না? তবে?...অনর্থক এ সব কি ভাবছি আমি? দূর!...

"জোর ক'রে মনকে দৃঢ় কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লাম। জোর ক'রে পুনঃ পুনঃ মনকে দিয়ে বলালাম, এ সব কিছু না—কিছু না। একা বসে থেকে থেকে যা তা সব মনে আসছে! ও কিছু না...দূর্-দূর্? ..

"পাছে আবার আমায় পেয়ে বসে, পাগল ক'রে তোলে এই সব চিন্তা, এই ভয়ে হঠাৎ উঠে পড়লাম। কোন একটা কাজে খুব ব্যস্ত থাক্‌বার জন্য ঘরময় পায়চারি কর্‌তে লাগলাম।...তারপর এক সময় হঠাৎ অন্যের অলক্ষ্যে সেই কক্ষ ত্যাগ ক'রে গোপনপথে আমার উদ্দিষ্ট স্থান অভিমুখে দ্রুতপদে চল্‌তে থাকলাম।"

বাইশ

"মালতী সেই কক্ষের দ্বারেই আমার জন্য নীরবে অপেক্ষা করছিল। তার সতর্ক দৃষ্টি আমার গন্তব্য পথের উপরই ন্যস্ত ছিল। আমি নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে সেই কক্ষে প্রবেশ করেই তার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়িয়ে চোখের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে রইলাম। সে আমার চোখের ইঙ্গিত বুঝে তৎক্ষণাৎ নিম্ন-স্বরে বল্ল, 'আসেন নি এখনো।—'

"আমি প্রায় তার কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আর তারা?'

"মালতী এবার কথায় জবাব না দিয়ে চোখের ইঙ্গিতে বৈঠকখানার দিকটা দেখিয়ে দিল। আমি ধীরে ধীরে সেই দেয়ালের একটী ছিদ্রের

সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বৈঠকখানার দৃশ্য দেখতে থাক্‌লাম। আমার পিছনে মালতী। সে এমনিই দাঁড়িয়ে থাক্‌ল। কিছু দেখবার বা শুনবার জন্য তাকে মোটে উৎসুক দেখলাম না। অতিথিরা অতিরিক্ত ভোজনের পর বসতে না পেরে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় যার যার তাকিয়ার উপর প'ড়ে ছিল। প্রত্যেকের ডান হাতের কাছেই এক একটা ফর্‌সি। ফর্‌সির মাথায় বড় বড় কল্কে থেকে তামাক-পোড়া ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। তারা পান চিবুতে চিবুতে মাঝে মাঝে ফর্‌সির নল মুখে দিয়ে ধূমপান কর্‌ছিল। প্রত্যেকের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে, অথচ তাদের সম্ভ্রম বা সম্মান বজায় থাকে এমন একটু ব্যবধান মধ্যে রেখে শিকদারেরা দু'হাতে ধ'রে বড় বড় পাখায় হাওয়া করছিল। পান, তামাকের মসলার সুগন্ধ এবং জমিদারদের পরিহিত বস্ত্রে ব্যবহৃত গোলাপ আতরের সুবাস পাখার হাওয়ায় চারিদিকে উড়ছিল। সারা ঘরখানি সে সুগন্ধে ভরপুর। তাদের মুখে ভোগবিলাস, লম্পটতা এবং অমানুষকতার কালিমা সুস্পষ্ট। অলসতা এবং অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় তাদের সারা দেহে। তারা খুব হাসাহাসি করছিল। দু' একটা কথা আমার কানে আসতেই তাদের উপভোগের বিষয় অনেকটা বুঝতে পার্‌লাম। বিষয়টা যেমন জঘন্য তার ভাষাও তেমনি কুৎসিৎ। মালতীকে নিয়েই তাদের পরিহাস চল্‌ছিল। বড়ই অপমান বোধ হচ্ছিল। ইচ্ছে হোলো তখনি এর একটা প্রতিবিধান করি। কিন্তু অনেকটা উপায়হীনারই ন্যায় রাগ ক'রে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যখানে চ'লে এলাম। দাদা কিম্বা বাবা তখনও সেখানে আসেন নি। সময়ের প্রতীক্ষা করে থাকলাম। মালতী ইতিমধ্যে সরে গিয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তার পানে একবার তাকিয়ে দেখলাম, সে গম্ভীর। দেখে মনে হ'ল সে জানেও সব বোঝেও সব। কিন্তু ভাবটি যেন তার নির্লিপ্ত।

"কক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত মেয়েটির কথা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ বৈঠকখানার দিকে একটা শব্দ হল। ছুটে গিয়ে সেই ছিদ্র দিয়ে চেয়ে দেখলাম দাদা এসেছেন, সঙ্গে তিনি—আমার স্বামী। অতিথিরা তাদের দেখে ফর্‌সির নল মুখে রেখেই চীৎকার করে তাদের অভ্যর্থনা করেছিল। তাতে একটা অদ্ভুত শব্দ হয়েছিল, যা শুনে আমি ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের অর্দ্ধশয়নাবস্থার তিলমাত্রও পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাদের অবসন্ন দেহ সেই একই ভাবে তাকিয়ার উপর পড়ে ছিল। অদ্ভুত অভ্যর্থনা বটে! তাঁর—আমার স্বামীর মুখে তাঁর সেই স্বাভাবিক হাসি। দাদা আনন্দে তরঙ্গায়িত, অন্তরের মধুর ভাবের পরিচয় তাঁর সর্ব্বাঙ্গে। আর আমার অগ্রজের বক্র কুটিল দৃষ্টির নীচে ক্রূর হাসি অত্যন্ত কুৎসিত দেখাচ্ছিল।

"তিনি এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন, বোধ হয় বসবার জন্য। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাঁকে কেউ বসতে বল্‌ছিল না। কেউ যেন তাঁকে গ্রাহ্যই করছিল না। আমি যারপরনাই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। এমন সময় হঠাৎ ওদের মধ্যে একজন হো হো ক'রে হেসে উঠল। বাকী তিনজন তাঁর প্রতিধ্বনি করল। আমার অগ্রজও অবশ্য তাতে যোগদান করেছিল। তবে তাঁর হাসি মুচকি, উচ্চ নয়। প্রথম্ মনে হয়েছিল, লোকগুলি কি অসভ্য, এরূপ অভদ্রভাবে হাসছে কেন অনর্থক! কিন্তু তারপর তাদের আচরণ দেখে আমার সে ভুল ভেঙ্গে গেল। তাদের সে হাসির সম্পূর্ণ অর্থই ছিল।

"তিনি অপ্রতিভ হ'লেন। প্রথমটা একটু নীরবে হেসেছিলেন ওদের সঙ্গে সঙ্গে, কৌতুক মনে ক'রে, কিন্তু একটু পরেই তাদের দৃষ্টিতে, আচরণে বিসদৃশ কিছু দেখে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। মুখ চোখ তাঁর দেখতে দেখতে এমন লাল হয়ে উঠল যে ছুটে পড়ে। হঠাৎ যেন তাঁর ইতস্ততঃ ভাব ছুটে গেল। ফরাসের উপর অতিথিদের মধ্যে যে স্থানটি তখনও শূন্য ছিল, তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে সেদিকে অগ্রসর হলেন। পেছন থেকে দাদা বলে উঠলেন, 'হীরু, একটা কাজ যে এখনও বাকী আছে।

"তিনি ঝটকে দাঁড়িয়ে বিরক্তিভরা কণ্ঠে বললেন, 'বাকীটা আপনিই সেরে ফেলুন।'

"সেটা যে কেবল তোমারই কাজ। আমার দ্বারা যে তা হবার যো নাই। বুঝতে পারছ না?"

"আবার তারা অসভ্যের ন্যায় হেসে উঠল। দাদাও তাদের মধ্যে একজন, হঠাৎ একজন বলে উঠল, 'কি করে বুঝবে বল? সবে ত এই বয়েস। তারপর সে সব হবেই বা কোথা থেকে? সে-শিক্ষা দীক্ষা দেবে কে?

"দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, আরে রাজত্ব থাকলেই ত আর সত্যি সত্যি রাজা হয় না?

"তৃতীয় ব্যক্তি বলল, 'আঃ! কেন তোমরা মিছামিছি এই নিয়ে এত হাঙ্গামা করছ? এই ত সেদিনকার ওরা, এর ভিতরেই কি করে আশা করছ এসব ওর কাছ থেকে? আগে যেতে দাও কয়েক পুরুষ, তবে ত?

"চতুর্থ ব্যক্তি ব'লে উঠল', জানবে কোথা থেকে? বলি বংশটা কি? চিন্ময় রায়েরই ছেলে ত? হা-হা-হা—"

'আমি যেন জড়ের ন্যায় স্তব্ধ হয়েছিলাম। যা শুনছিলাম, যা দেখছিলাম তা যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমারই পিতৃগৃহে, আমারই অগ্রজের চোখের উপর আমার স্বামীর অপমান! এ যে বিশ্বাসের অযোগ্য! রুদ্ধশ্বাসে কম্পিত অন্তরে দুই হাতে পুনঃ পুনঃ চোখ ঘসে ও পরিষ্কার করে আর একবার চাইলাম। সেই ত সব—সেই একই দৃশ্য! তবে—তবে—হঠাৎ ঝন্ ঝন্ করে একটা শব্দ হ'ল! চমকে উঠলাম। বুকটা দুর দুর ক'রে উঠল। চেয়ে দেখলাম, তিনি খাপ থেকে তলোয়ার টেনে বার করছেন। তারা প্রাণভয়ে শুষ্ক মুখে চীৎকার ক'রে উঠে' দেয়ালের দিকে ছুটে যাচ্ছে। মুখে তাঁর একটা কথা কিম্বা কোন কুৎসিত সম্ভাষণ নাই। কিন্তু মারাত্মক আগুন যেন জ্বলছিল তাঁর চোখে মুখে! এ সেই আগুন, যে আগুনে মানুষ পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়! এমন সময় বাবা বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেন। তিনি কিছু বুঝতে না পারলেও আসন্ন বিপদ দেখে' 'এ কি! এ কি!' ব'লে ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালেন। অন্য সকলেও যেন স্তম্ভিত হয়ে নীরব হয়েছিল। ঘরময় একটা বিরাট নিস্তব্ধতা! বাবা অত্যন্ত বিস্ময়ে একবার প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকালেন। পরে তাঁকেই প্রথমে প্রশ্ন করলেন, 'হীরু। এ কি সব? আমারই বাড়ীতে আমার অজ্ঞাতসারে এ কি সব?'

"তিনি কোন উত্তর করলেন না।

"বাবা পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'বল্‌তে যদি কোন আপত্তি না থাকে তো আমায় বল্ সব।'

"তিনি শুধু বললেন, 'জিজ্ঞাসা করুন একে।' দাদাকে দেখিয়ে দিলেন।

'আচ্ছা আমি জেনে আসছি সব। তুমি বস ত বাবা?' ব'লে বাবা তাঁকে ধ'রে বসালেন। পরে অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে চঞ্চল পদে ছেলের নিকট উপস্থিত হ'য়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বল্লেন, 'তুমি এখানেই ছিলে, অথচ এমন একটা ঘটনা ঘটেছে যার ফলাফল এই...কি হয়েছে খুলে বল এখনি আমায়?...'

"দাদা খুব নিম্নস্বরে বাবাকে ব্যাপারটা অল্প কথায় বুঝিয়ে দিলেন। খুব মনোযোগের সঙ্গে কান পেতে থেকেও আর কোন কথাই ধরতে পার্‌লাম না। বাবা ধীরে ধীরে নীরবে তাঁর নিকটে ফিরে গেলেন। এই সুযোগে অতিথিদের একজন অসভ্যের ন্যায় চীৎকার ক'রে বলে উঠল, 'রায় ম'শায়! আমাদের কি এমন ক'রে অপমান করবার জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছিলেন?'

'থামুন আপনারা একটু।' তাদের একথা ব'লে বাবা তাঁকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'হীরু! আমার অতিথিরা বংশ-গরিমায় শ্রেষ্ঠ। সামাজিক

রীতি অনুযায়ী তোমার সম্মান নাই। এই সম্মান দেখাবার প্রথা অনেক প্রকার রয়েছে। সম্মান করবার পর তাদের অনুমতি নিয়ে তাদের সঙ্গে সভায় বসবারই নিয়ম। তুমি তার ব্যতিক্রম ক'রে—'

"অন্যায় করেছি—এই ত? আপনিও কি তবে তাই? মনে হ'ল যেন অত্যন্ত অসহ্য হওয়ায় হঠাৎ তিনি এ কথা ব'লে উঠলেন।

"বাবা অত্যন্ত কঠিন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, 'আমি কি?—

"তিনি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে একদিকে একটু কাত হ'য়ে ছিলেন। হঠাৎ উঠে ব'সে বাবার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন। তাঁর ললাটের শিরাগুলি ফুটে উঠেছিল। ভ্রূ কুঞ্চিত হ'য়েছিল। চোখ মুখ অস্বাভাবিক-রূপে লাল হ'য়ে উঠল। সর্ব্বাঙ্গ তাঁর থেকে থেকে বার কয়েক কেঁপে কেঁপে উঠল। আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ল। তাঁর অন্তর্বিপ্লবের চিহ্ন ক্রমে অতি সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠল। ভয়ে আমার বুক কাঁপতে লাগল। দুই হাতে বুক চেপে ধ'রে রুদ্ধশ্বাসে সেইদিকে চেয়ে রইলাম।

"এই সময় অন্য একজন অতিথি দূরে থেকেই চীৎকার ক'রে বলল, 'থাকত আমাদের সে-দিন, তবে এতক্ষণ সুদে আসলে আজ এ অপমানের প্রতিশোধ নিতাম। কৈলাসপুরের রায়বাড়ীর চিহ্ন রেখে যেতাম না—'

"আমার বৃদ্ধ পিতার কথা ছেড়ে দিই। কিন্তু ভাই আমার যুবক। কথাগুলিতে তার সামান্য অপমান বোধ হ'য়েছিল ব'লেও মনে হল না। সে ম্লান বদনে যেমনি দাঁড়িয়েছিল, তেমনিই দাঁড়িয়ে রইল। আশ্চর্য্য কাপুরুষতা তার! আমারও এ অপমান অসহ্য হ'য়ে উঠছিল।

"পুনরায় সেই ধৃষ্ট ব্যক্তি ব'লে উঠল...'শোন অর্ব্বাচীন! তোমার পিতা চিন্ময় রায় আমাদের সমাজে এলে আমাদের এই সব শিকদারদের শ্রেণীতে দাঁড়িয়ে থাকত, এই ত এসব সেদিনের কথা; আজও আমাদের বৈঠকখানায় তার পায়ের চিহ্ন মুছে যায় নাই। আর আজই তোমার এত বড় সাহস যে আমাদের সঙ্গেই—

"মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন একটা ভয়ঙ্কর প্রলয় হ'য়ে গেল! তিনি লাফিয়ে উঠে খাপ থেকে তলোয়ার খুলে সেই লোকটাকে লক্ষ্য ক'রে ছুড়ে' মারলেন। মধ্যপথে একটা প্রকাণ্ড ঝাড়ে লেগে তলোয়ারটা ঝন্ ঝন্ ক'রে মেঝের উপর পড়ল। ঝাড়টা চুরমার হ'য়ে চা'রদিকে ফরাসের উপর ছড়িয়ে পড়ল।...

"মুহূর্ত্ত—শুধু এক মুহূর্ত্ত মাত্র আমি স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সম্পূর্ণ জ্ঞান যেন আমার ছিল না। শুধু ঐ এক মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র। তারপর—তারপর হঠাৎ যেন সচেতন হ'য়ে উঠলাম। ডাকলাম, "মালতী! মালতী!—মনে হ'ল খুব জোরে চীৎকার ক'রেছি। কিন্তু কণ্ঠস্বর যেন বেশী জোরে ফুটল না। কক্ষমধ্যে একবার প্রতিধ্বনি হ'ল মাত্র। কক্ষের চতুর্দ্দিকে, দরজার দিকে বারম্বার চেয়ে দেখলাম মালতী নাই। সেও এ সময় আমায় ছেড়ে গেল! মনে বড় ব্যথা পেলাম। এ সমস্তই আমার দুই এক মুহূর্ত্তের চিন্তা মাত্র। হঠাৎ দেখতে পেলাম, পাশের গুপ্তদ্বার খোলা। পাগলের ন্যায় ছুটে গেলাম সেদিকে—

"তারপর কি হয়েছিল কিছুই মনে নাই। হঠাৎ একটা প্রশ্ন আমার কানে এল, 'একি! মীনা! তুমি এখানে! এখানে তুমি কেন এলে?'

"হঠাৎ চমকে উঠলাম। চেয়ে দেখলাম, বাবা আমায় এ প্রশ্ন করছেন। আমার স্বামী সেই বর্ব্বরদের পানে রুখে যাচ্ছিলেন, বাবা তাঁর পথ রুদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সকলেরই বিস্মিত দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ ছিল। আমার দৃষ্টি চা'রদিকেই ঘুরছিল। দেখলাম বৈঠকখানার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমার পরিধানের বস্ত্রাদি এলোমেলো হ'য়ে পড়েছিল। মাথার বেণী খুলে গিয়ে একরাশ চুল পিঠে, আসে-পাশে মুখে চোখে ছড়িয়ে পড়েছিল। মুখের চুলগুলি সরিয়ে দিয়ে নীরবে দাঁড়ালাম। বাবার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার অগ্রজের দিকে চেয়ে ছিলাম। সে হঠাৎ ক্রুদ্ধস্বরে ব'লে উঠল, 'মীনা! তুমি কেন এখানে এসেছ? অন্দর মহলে শীঘ্র ফিরে যাও। তুমি কি বুঝতে পারছ না এ তুমি কোথা এসেছ?'

'চুপ কাপুরুষ! তুমি আমার ভাই হ'বার অযোগ্য—

'এত জোরে এ কথাগুলি আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে ছিল যে, সকলেই যেন স্তম্ভিত হ'য়ে রইল। আমার নিজের কণ্ঠস্বরে আমি নিজেও বিস্মিত হ'লাম। আমি স্বামীর দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। তাঁর বিস্মিত দৃষ্টির সহিত আমার দৃষ্টির মিলন হ'ল।

"এমন সময় হঠাৎ কে একজন ব'লে উঠল, 'কর্ত্তা! আমরা এসেছি।'

'তিনি সবিস্ময়ে ব'লে উঠলেন, 'ভজু সর্দ্দার?'

"সকলেই বিস্ময়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি বাইরের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলাম ব'লে কিছুই দেখতে পাই নাই। কিন্তু ভজু সর্দ্দারের নাম শুনবামাত্র ফিরে চেয়ে দেখলাম সত্যি তারা সব—তিনজন এক সারিতে দাঁড়িয়ে, এক পাশে ভজু, অন্য পাশে শম্ভু, মধ্যে মালতী। মালতীকে ওভাবে ওদের সঙ্গে দেখে প্রথমটা আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। নাম ধ'রে তাকে ডাকলাম, 'মালতী!'

"সে আমার দিকে চেয়ে নম্রস্বরে উত্তর করল, 'মা!'

'তুমি...'

'মালতীর মুখ রাঙা হয়ে উঠল, মাথা বুকের উপর নত হ'য়ে পড়ল। এবার ব্যাপার বুঝতে আমার বিলম্ব হ'ল না।

"তিনি পুনরায় ব'লে উঠলেন, 'শম্ভু?'

কণ্ঠে তাঁর বিস্ময়ের সুর।

"শম্ভু তার খোলা তলোয়ারখানা কাঁধের উপর থেকে মাটির উপর নামিয়ে রেখে হাত জোড় ক'রে উত্তর করল, 'কর্ত্তা! নফরকে মাফ করবেন, বিনা হুকুমে এসেছি আপনাকে ফিরিয়ে নিতে।'

"অবাক হ'য়ে ভাবছিলাম, এরা ঠিক সময়ে কি ক'রে এসে উপস্থিত হ'ল এখানে? কি ক'রে জানতে পারল এরা এ সব কথা? তবে কি মালতীর এ কাজ? মালতীর কথা মনে হ'তেই মনটা এ বিপদের মধ্যেও বড় প্রসন্ন হ'য়ে উঠল। তার দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় দাদা চীৎকার করে উঠল, 'মালতী! হারামজাদ! তুই ওদের সঙ্গে কি ক'রে এলি? আমার বাড়ীর দাসী হ'য়ে আমারই...যা বলছি এখনো অন্দরে ফিরে, নতুবা তোকে...'

শম্ভু দৃঢ়-মুষ্টিতে তলোয়ার ধ'রে টান্ হ'য়ে দাঁড়াল। বৃদ্ধ ভজুর প্রকাণ্ড বাঁশের লাঠি হাতের মধ্যে কেঁপে উঠছিল। মালতীর কাঁধের উপর তার সেই ধনুক ঝুলছিল। ধনুকটী তার দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হ'ল। তাদের দৃষ্টি সেই ধৃষ্টের মুখের উপর স্থাপিত হল। তাদের ক্রোধোদ্দীপ্ত নয়ন থেকে যেন আগুনের ফুলকি ছুটছিল। অপমানের অসহ্য বেদনায় নারীর মর্য্যাদা আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল। মালতী চীৎকার ক'রে উঠল, 'মা!—

"আমিও নারী। তাঁর অপমানে আমারও ত অপমান? তা আমি যেমন বোধ করব, পুরুষ কি তা পারবে? না। মালতীর সে আহ্বানের অর্থ আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করলাম। সেই নির্ব্বোধ ছেড়ে অগ্রসর হ'লাম মালতীর দিকে। আমি তার দিকে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ ক'রে গর্জ্জন ক'রে বললাম, 'সাবধান! যেখানে আছ সেখানেই থাক। কাপুরুষ!...'

'সে থমকে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়াল। এ যে সত্যি তার অপ্রত্যাশিত।

"আর না...আর না...এ পাপের স্থানে আর থাকা নয়, যত শীঘ্র ত্যাগ ক'রে যাওয়া যায়। অন্তরে এ ভাব নিয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকালাম। আমার দৃষ্টির অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে তাঁর মুহূর্ত্ত বিলম্ব হল না। তিনি তৎক্ষণাৎ মেজের উপর পতিত তলোয়ারখানা কোষবদ্ধ করে বৈঠকখানা

ত্যাগ ক'রে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। আমি ধীর পদক্ষেপে পিতার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললাম, বাবা!...'

"আমার আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বর আমার নিজের কানেই বড় করুণ হয়ে বেজে উঠল। নারী যে কি উপাদানে গঠিত তা আমি নারী হয়েও আজও বুঝলাম না। প্রহেলিকাই বটে! একটু আগেই কি কঠিনই না হয়েছিলাম। কিন্তু যেই স্নেহময় জনকের সম্মুখীন হয়েছি কোথায় ভেসে গেল সে দৃঢ়তা! যেন পুতুলটি হয়ে গেলাম তাঁর কাছে!...

"...বিদায় নিতে এসেছিলাম তাঁর কাছে, বিদায় মেগে বললাম, "বাবা! চললাম...আর আসব না..."

'কথা কয়টি আমার এক মুহূর্ত্তে বলা হয়ে গেলেও তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলাম। দেখতে দেখতে তাঁর সারামুখখানি যার-পর-নাই কঠিন হয়ে উঠল। ঘৃণা-ভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে তীব্রকণ্ঠে বললেন, 'এখনি—এখনি—এই মুহূর্ত্তে দূর হয়ে যা এখান থেকে...আর কখনো যেন তোর মুখ আমার দেখতে না হয়—আমার মান-সম্মান আজ সব গেল!..."

"উঃ! কি নিষ্ঠুর কথা! কথাগুলি যেন বজ্রের ন্যায় এসে আমার বুকের উপর পড়ল! উঃ! কি দারুণ ব্যথা পেলাম প্রাণে! সে-ব্যথা আজও যায় নাই। শুধু নিষ্ঠুর হওয়া, অন্যের প্রাণে ব্যথা দেওয়াই কি পৌরুষ? যে-চরিত্রে স্নেহ, মাধুর্য্য, কোমলতা থাকবে না তাই কি পুরুষের? আপন সন্তান লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়ে সম্মুখে পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে চির-বিদায় মাগছে, তার জন্যও একটুকুও দুঃখও হ'ল না, একবারও প্রাণ কাঁদল না, মুহূর্ত্তের জন্যও মন কেমন করে উঠল না? এই সেই পিতা যাঁর স্নেহের জন্য অহর্নিশি চিত্তে আকাঙ্ক্ষা জেগে থাকত, যাঁকে শুধু একবার দেখবার জন্য রাত্রিদিন বুকে বাসনা নিয়ে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকতাম? তবে কি দুনিয়ায় সত্যিই কিছুই কিছু না? ভাবতেও বুকটা যেন কেঁপে উঠল। বুক চিরে' বড় জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছুটে এল!...

"এই সময় মনে পড়ল আমার মায়ের কথা। যিনি মূর্ত্তিমতি স্নেহ, যাঁর আত্মত্যাগ অতুলনীয়, সন্তানকে যাঁর অদেয় কিছুই নাই। অহর্নিশি যিনি সন্তানের মঙ্গল চিন্তা করেন—মুহুর্মুহু তাঁকে মনে হতে লাগল। আমার মনের মধ্যে উভয়কে, আমার জনক-জননীকে, যখন পাশাপাশি দেখতে পেলাম, তখন জনক যেন ছোট হয়ে গেলেন জননীর কাছে। পিতার মূর্ত্তি নিষ্প্রভ হতে হতে এক সময় মুছে গেল মন থেকে। কিন্তু মাতৃমূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময়ী হ'য়ে আলো ক'রে রইল আমার অন্তর দেশে। বাবা যা পেরেছেন, মা কি তা পারতেন? পারতেন কি আমায় ও-ভাবে বর্জ্জন করতে? না, কখনও না, তাঁর জীবন গেলেও না। সেই মা আমার আজ এত বড় বিপদের কিছুই জানতে পারছেন না—এ-কথা মনে হ'তেই মনটা কি রকম ক'রে উঠল। মন আমার গুমরে' কেঁদে উঠল মায়ের জন্য। চোখ দু'টী সজল হ'ল!

"—দেখতে দেখতে আমার বিষম ভাবান্তর উপস্থিত হ'ল। একটা দুর্দ্দমনীয় ভাব আমার সমগ্র অন্তর-দেশ আলোড়িত ক'রে বিপ্লব উপস্থিত করল। মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠল! আমার তীব্র দৃষ্টি পিতার মুখের উপর রেখে' স্থির হ'য়ে দাঁড়ালাম! বিদায়কালে তাঁর পায়ের তলায় আমার মাথা নত হয়ে পড়ল না, শির গর্ব্বে উন্নত হ'য়ে থাকল। তুমি বলবে এটা তোমার ঘৃণা। বল, তা'তে ক্ষতি নাই। সত্যিই ত' আমার ঘৃণা এসেছিল—তীব্র ঘৃণা, বুঝলে? আমার স্বামীর অপমানকারী যে, তাঁর প্রতি আমার ঘৃণা হবে না ত' কি হবে? আমার দেহ, মন, আমার আমিত্ব, আমার সর্ব্বস্ব যার পায় অঞ্জলি দিয়েছে, সে আমার স্বামী, আমার দেবতা, ঈশ্বর। যে আমার সেই দেবতাকে অশ্রদ্ধা ক'রে অপমান ক'রে, সে যেই-হ'ক, সে আমার কেউ নয়, সে আমার শত্রু! সেই পুরুষটিকে যে-নারী এ-ভাবে দেখে নাই সে স্বামীও পায় নাই, তার দেবতা কে তাও সে জানে নাই, বোঝেও নাই। এ-ভাবে উদ্বুদ্ধ, এ-মন্ত্রে দীক্ষিতা, এ সাধনায় সিদ্ধা নারী কত শক্তি ধারণ করে তা তার বুদ্ধির অগম্য। সে-নারী নামের অযোগ্যা, সত্যিই অবলা।...

চাহিয়া দেখিলাম আমার সম্মুখে সত্যই এক জ্যোতির্ম্ময়ী নারী। নারীর নিকট স্বামিত্বের এ-চিরন্তন ভাব বা আদর্শ অসীম শক্তির উৎস। এ-জন্যই বুঝি পতিব্রতা নারী এমন শক্তির আধার। এই শক্তিময়ী নারীর কাছে বর্ত্তমান নারীর উচ্ছৃঙ্খল আদর্শ কেমন মলিন, কত ক্ষুদ্র, কত হেয় তাহা সে-দিন স্পষ্ট উপলব্ধি করিলাম।

"...মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বৈঠকখানা ত্যাগ ক'রে দ্রুতপদে বাইরে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ালাম। ঠিক সেই সময় একটা লোক উর্দ্ধশ্বাসে এসে বৈঠকখানার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তার প্রভুর দিকে চেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ হয়েছে বাবু! বিলাসপুরের ঘোড়সওয়ারেরা খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে বাড়ী ঘেরাও করেছে ...'

কথাটা শোনামাত্র আমার এবং আমার স্বামীর দৃষ্টি একই সময়ে ভজু, শম্ভু ও মালতীর উপর স্থাপিত হ'ল। আমাদের দৃষ্টিতে যে প্রশ্ন ছিল তাদের দৃষ্টিতে আমি তার এই উত্তর পাঠ করলাম—আমাদের সহ্য হয় নাই। প্রভু এবং প্রভুপত্নীর মান, সম্মান ও জীবন রক্ষার জন্য তাই এ-সব করেছি, এখন মার কাট যা-ইচ্ছা তা-ই কর আপত্তি নাই, আমরা তোমাদেরই। ক্রোধ, গর্ব্ব, বীরত্ব, অভিমান, প্রভুভক্তি, সম্মানবোধ, আত্মত্যাগ—এ-সবই তাদের চোখে মুখে পাঠ করছিলাম।

"বাবা উন্মত্তের ন্যায় একটা বিকট চীৎকার ক'রে বললেন, কি!... এত অপমান!...আজ আমি অসহায়—কোষে অর্থ নাই, বাহুতে বল নাই—। আমায় অসহায় পেয়ে আমারই নিজের বাড়ীর উপর এত—এত অপমান!... এত সাহস! কা'র এত বড় বুকের পাটা!...উন্মাদের ন্যায় ঘরময় ছুটাছুটি করতে লাগলেন। হঠাৎ এক সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আপন মনে বলতে লাগলেন, '...আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে পিতৃপুরুষের মান সম্মান বজায় রেখেছিলাম। আজ তাও গেল! তাই যদি গেল তবে থাকল কি? '—চীৎকার করে উঠলেন, '—থাকল কি আর? কিছুই না—কিছুই না।'

"পরে আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন। সে-দৃষ্টি যেন হলাহল ঢেলে দিচ্ছিল, অগ্নি বর্ষণ করছিল আমার উপর।

এক মুহূর্ত্ত মাত্র চেয়েছিলেন। তার পরে বললেন, '...তুই—তুই ক'রেছিস—ইচ্ছা ক'রে, ষড়যন্ত্র ক'রে এ-অপমান করেছিস্ আমায়...তুই—তুই!...এত গর্ব্ব তোর!... তবে শোন, এ-গর্ব্ব তোর শীঘ্র শেষ হয়ে যাবে... শুনছিস্ শীঘ্র—শীঘ্র...'

"উঃ! কি ভীষণ কথা। বুক কেঁপে উঠল। দুই হাতে বুক চেপে ধরলাম।" "উঃ! কি ভীষণ সে মূর্ত্তি তাঁর।—রাগে সর্ব্বাঙ্গ থর থর ক'রে কাঁপছিল, ললাট, গ্রীবা এবং মুষ্টিবদ্ধ হাতের শিরাগুলি ফুলে' টান হয়ে উঠেছিল। নাসাগ্রে, ললাটে, বুকে স্বেদবিন্দু ফুটে' বেরিয়েছিল। চোখ-মুখ, সারা গৌরবর্ণ অঙ্গ লাল হয়ে যেন ফেটে পড়ছিল। উঃ! ভয়ঙ্কর! ভয়ঙ্কর সে দিনের স্মৃতি! আজও মনে হ'লে বুক কেঁপে উঠে।

" আজ থেকে থেকে কোন্ কথাটা কেবলই মনে হচ্ছে তা জান দাদা?"

একমনে তাহার কথা শুনিতেছিলাম। হঠাৎ দাদা সম্বোধনে চমকিয়া উঠিলাম। বলিলাম, 'কি কথা, মীনা?'

" মনে হয় আমার এই বর্ত্তমান দশা পিতার সেই অভিসম্পাতেরই ফল। মনে প্রাণে তিনি যে অভিসম্পাত ক'রেছিলেন আমায়। কিন্তু কি দোষে? তা ত' আজও খুঁজে পেলাম না। তুমি বলবে এ আমার

দুর্বল মনের কথা, আরো কত কি যুক্তি-তর্ক দিয়ে আমায় বুঝাতে চেষ্টা করবে, ও কিছু নয়, ও অবস্থায় ও রকমই হ'য়ে থাকে। কিন্তু আমি যে তখন অনুভব করেছিলাম তিনি সত্যিই মনে-প্রাণে যে অভিসম্পাত ক'রলেন, আমার প্রাণ যে তখন কেঁপে উঠেছিল, মনের আর্ত্তনাদ যে আমার কাণে এসে পৌঁছেছিল। আমি যত দৃঢ়ই হই, আর যত কঠিনই হই, আমি যে নারী, আমি তা কি ক'রে ভুলতে পারি? হায়! পিতা সন্তানকে এমন অভিসম্পাত করলেন! বিশ্বাস হয় তোমার? না, এর কোন কারণ ত দেখছি না। চেয়ে দেখ আমার দিক, আমিই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দুনিয়ায় কি না হয়? সব হয়-সব সব বিবিলিপ! হা-হা-হা—"

সে হাসিয়া উঠিল। বড় মর্ম্মান্তিক দুঃখের হাসি। তাহার সারা মূর্ত্তি যেন একখানি করুণ ছবি। শুধু চেয়ে থাকলাম তার দিকে।

হঠাৎ আবার শুনতে পেলাম তিনি আপন মনে বলছেন, 'মান ইজ্জৎ সব গেল—আমারই নিজের সন্তান আমারই পূর্ব্বপুরুষের মুখে এমন ক'রে কালি দিয়ে গেল, অপমান ক'রে গেল—উঃ।' মুখ তুলে আর একবার তার পানে চেয়ে দেখলাম, তাঁর গণ্ডে অশ্রু-ধারা, দৃষ্টি লক্ষ্যহীন। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকালাম।

"না না, আর দেরী নয়, এখনি এখনি দেখতে হ'বে এই মনে ক'রে অস্থির হ'য়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকালাম। তিনি সে দৃষ্টির অর্থ বুঝে' তৎক্ষণাৎ বললেন 'চল।' আমরা অগ্রসর হ'লাম—আগে ভজু, পরে তিনি, তারপরে আমি, মালতী ছায়ার ন্যায় আমার পেছনে, সকলের পশ্চাতে শম্ভু। আর ফিরে তাকালাম না। মন আমার বারম্বার পিতার অভিশাপ-অশ্রুসিক্ত মুখ দেখতে চাচ্ছিল। কিন্তু তখনি সবলে তাকে চেপে রাখছিলাম। দু'চার পা মাত্র অগ্রসর হয়েছি এমন সময় পশ্চাতে বৈঠকখানার দিকে একটা হাসির রোল্ শুনতে পেলাম। বুঝতে পারলাম অতিথি জমিদারদের এ বিদ্রূপের হাসি। একজন অতি চড়া গলায় বলছিল, 'দেখলে ত চোখের উপর ছোটলোকের ব্যবহারটা একবার? ছোটলোকের ঘরে জন্ম, এর বেশী আর কি আশা করা যায়? রায়-ম'শায়ের যেমন কাজ, গিয়েছিলেন এমন একটা জঘন্য ঘরে মেয়ে দিতে, তার ফল ফলছে হাতে হাতে। ছ্যাঃ, যাচ্ছে যে একটুও লজ্জা নেই—হা-হা-হা'—"

"তার পরক্ষণেই বাবার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'এখনি আপনারা আমার বাড়ী ছেড়ে চলে যান'।"

"তৎক্ষণাৎ সেই অসভ্যরা তিক্ত কণ্ঠস্বরে ব'লে উঠল, এ অপমানের প্রতিশোধ আমরা নিশ্চয় নেব, জানবে।"

"আমার সেই কাপুরুষ ভাইটি কিন্তু সেই একই অবস্থায় নির্ব্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়েছিল। একটী প্রতিবাদ বা একটী রাগের কথাও তার মুখ থেকে শুনতে পেলাম না। এত বড় অপমানে আমাদের গা যেন জ্বলে উঠল। ইচ্ছা হ'তে লাগল এর একটা প্রতিবিধান ক'রে আসি। আমরা উভয়েই উভয়ের দিকে একবার তাকালাম। আমাদের চোখাচোখি হ'ল। কিন্তু উভয়েই মনের কথা চেপে রেখে আবার নীরবে পথ চলতে থাকলাম।"

তেইশ

"সদর দরজা মাত্র পার হয়েছি, এমন সময়ে পেছনে একটা আর্ত্তনাদ শুনে' ফিরে তাকালাম। দেখলাম অন্দর মহলের সমস্ত স্ত্রীলোক আমাদের দিকে ছুটে আসছে। সকলের আগে ছুটে আসছিলেন এক উন্মাদিনী নারী! এলো কেশে, এলোমেলো বেশে কে এই পাগলিনী তা বুঝতে পারছ, দাদা? তিনি আমার মা।

"স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালাম। মন আমার আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল। ভুলে গেলাম স্থান, কাল, সব কিছু। 'মা' ব'লে' মনে প্রাণে ডেকে ছুটে গেলাম মায়ের প্রসারিত বাহুর দিকে দিশাহারা জ্ঞানশূন্য হয়ে। হঠাৎ সম্মুখের দৃশ্য দেখে মধ্যপথে থমকে দাঁড়ালাম। সদর দরজার ওপাশেই মায়ের পথ রুদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন আমার পিতা ও ভ্রাতা। পিতা তাঁকে শাসিয়ে বলছিলেন, 'সাবধান! তুমি তার অঙ্গস্পর্শ পর্য্যন্ত করতে পারবে না। সে আমার পবিত্র কুলকে অপবিত্র করেছে, অপমান করেছে। তাকে দেখলেও পাপ। মীনা নামে যে আমাদের মেয়ে ছিল তার মৃত্যু হয়েছে।"

"অগ্রজ আমার মায়ের মুখের সামনে তর্জ্জনী হেলিয়ে বললে, 'যেতে পারবে না মা তুমি তার কাছে। সে আমাদের ত্যাজ্য।"

"মা আমার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে কেবল ডাকছিলেন, 'মীনা! মীনা!' আয়, আয় আমার বুকে আয়, যাসনে মা আমায় ফেলে। আর কেউ না থাকে তোর আমি আছি, প্রাণ দেব তোর জন্য। আয়—আয়, ওরে আয়—মীনা! মীনা!...বসুন্ধরার বুকে লুটিয়ে প'ড়লেন জ্ঞানহারা মা আমার বাবার পায়ের কাছে। কেউ তাঁকে একটু ধরলও না। আমার দুঃখিনী মাকে কেউ বুকে তুলে নিল না...উঃ! নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর! মানুষ কি নিষ্ঠুর!

'মন আমার মুহুর্মুহুঃ ডাকতে লাগল—মা, মা, মা, মাগো মা বুক আমার ভেসে গেল চোখের জলে। 'মা' ব'লে আর্ত্তনাদ করে উঠলাম। সর্ব্বাঙ্গ আমার থর থর ক'রে কেঁপে উঠল। কাঁপতে কাঁপতে যেন পড়ে যাচ্ছিলাম। মালতী ছায়ার ন্যায় সঙ্গিনী—আমায় জড়িয়ে ধরল। তার বাহুবেষ্টনীর মধ্যে আমার অবশাঙ্গ হেলে পড়ল। মুহূর্ত্তকাল...একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হ'য়ে দাঁড়ালাম। আর ফিরে তাকালাম না সেদিকে, যেখানে আমার মা তখনো ধূলায় পড়ে'...ফিরে চল্লাম· ·উদ্দেশ্যে মার চরণে প্রণতা হ'য়ে শেষ বিদায় নিলাম। মন আমার মা মা ব'লে আর্ত্তনাদ করতে থাকল। 'মীনা মীনা' ব'লে মায়ের আর্ত্তনাদ কানে যেন অবিরত বাজতে লাগল।...ফিরে চল্লাম...একটু দূরেই স্বামী দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারলাম তাঁর দৃষ্টি নীরব ভাষায় যেন ইঙ্গিত করছে, আর কেন? চল শীঘ্র এস্থান ত্যাগ ক'রে যাই...হঠাৎ পা দু'টা যেন খুব দ্রুত নিয়ে চল্ল আমায়।...যেখানে এসে আমরা থামলাম সেখানে তিনটি বলবান্ সুসজ্জিত ঘোড়া অপেক্ষা করছিল। তার একপাশে একটু দূরে বিলাসপুরের ঘোড়সওয়ারেরা ঘোড়া থেকে নেমে যার যার ঘোড়ার পাশে হাতিয়ার নিয়ে সারি বেঁধে প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল।

তিনি একটা ঘোড়ায় উঠে বল্লেন, 'ওঠ এটায়'—একটা ঘোড়া দেখিয়ে দিলেন। সেই সাদা ঘোড়াটা, যেটায় আগের দিন চড়েছিলাম। ঘোড়ার দিকে চেয়ে চেয়ে একটু ইতস্ততঃ করলাম। তারপর সে-ভাবটা চ'লে গেল। ঘোড়ায় উঠলাম। সঙ্গে-সঙ্গে মালতী টপ্ ক'রে আর একটা ঘোড়ায় উঠে আমার বাঁ পাশে এসে দাঁড়াল। আমি অবাক হ'য়ে গেলাম।

"ভজু সর্দ্দার গম্ভীর স্বরে কি একটা হুকুম করতেই ঘোড়-সওয়ারেরা প্রস্তুত হ'য়ে নীরবে একদল আমাদের সামনে এবং এক দল পিছে দাঁড়াল। সামনের লোকদের পরেই সর্দ্দার নিজে, তারপর তিনি, তারপর আমি, আমার পাশে মালতী, তারপর শম্ভু। আমরা চলতে আরম্ভ করব, এমন সময় হঠাৎ একটা গোলমাল শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে আহতের আর্ত্তনাদ। আমরা সকলেই বিস্মিত হ'য়ে চেয়ে দেখলাম, সেই সব কাপুরুষ জমিদারদের

একজন কাপুরুষ শরীররক্ষী চীৎকার করছে, গায় তার রক্তের ধারা। জানতে পারলাম যে লোকটা কি টিট্‌কারি দিয়েছিল, তার ফলে আমাদেরই একজন শরীররক্ষী বর্শার খোঁচায় তার রক্তপাত করেছে। সে ক্ষেপে গিয়ে অন্য লোকজনদেরও আক্রমণ করতে ছুটেছিল। শম্ভু তীরবেগে ছুটে গিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনল। আমরা চলতে আরম্ভ করলাম··

"মন্দিরের নিকটে এসে উপস্থিত হ'লাম। প্রাণে বড় ইচ্ছা হ'ল দেবতাকে প্রণাম ক'রে আসতে। কিন্তু তার উপায় ছিল না। একটা দারুণ অস্বস্তিতে যেন ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলাম। বিক্ষুব্ধ মন কত কি-ই না চাচ্ছিল তখন। ··হুঁঃ·· মনে মনে দেবতার চরণে লুটিয়ে প'ড়ে পুনঃ পুনঃ শুধু এই প্রার্থনা করেছিলাম, 'রাধামাধব! মীনা আজ বিদায় নিচ্ছে, বড় দুঃখে, · আর সে আসবে না তোমার চরণে ফুল দিতে দাসীকে চরণে রেখো...রাধামাধব ! রাধামাধব !...'

"ঘোড়া মন্থর গতিতে চল্‌তে চল্‌তে কখন মন্দিরের সম্মুখে আমাদের সেই বকুলতলায় এসে দাঁড়িয়েছিল, তা জানতেও পারি নাই। নিমীলিত চোখে জ্বালা ক'রে জল এল। হঠাৎ কে একজন আমার নাম ধ'রে ডাক্‌ল, 'মীনা!' পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে চেয়ে দেখলাম, সম্মুখে মন্দিরের দ্বারে দাঁড়িয়ে মাধবী। তার গৌর অঙ্গে জড়ানো রক্তাম্বরী, সিঁথিতে সিন্দুর, ললাটে চন্দনের ফোঁটা, পায়ে অলক্তকরাগ, মুখে গাম্ভীর্য্য, একটা স্বর্গীয় জ্যোতিঃ, দৃষ্টিতে কোমলতা, দৃঢ়তা, স্নেহ। হাতে দুটী ফুল নিয়ে ঠিক যেন একটা সুন্দর চিত্রিত পটের ন্যায় স্থির হ'য়ে পলকহীন দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। দেবতার গৃহে পবিত্র দেবকন্যার ন্যায় তাকে দেখছিলাম। আকুল প্রাণে তাকে ডেকে উঠলাম, 'মাধু!' আমার কণ্ঠস্বর নিজের কানেই যেন আর্ত্তনাদের মত শুনা'ল। বহুকালের সঞ্চিত রুদ্ধ অশ্রু এবার ঝর্‌ ঝর্‌ ক'রে বুকের উপর ঝ'রে পড়ল।

"মাধবী সেখানে দাঁড়িয়েই বল্ল, 'মীনা! নির্ম্মাল্য এনেছি তোর জন্য।' সে ধীরে ধীরে কাছে এসে বল্ল, 'মীনা! ধর্‌ নে, রাধামাধবের আশীর্ব্বাদ মাথায় তুলে নে।—'

"নীরবে মাথা পেতে দেবতার নির্ম্মাল্য গ্রহণ করলাম। মাধবী বল্ল, "চোখে জল কেন বোন্‌?...সব জানতে পেরেছি... ধন্যা তুই...যা ক'রেছিস্‌ তার জন্য সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে তোকে আশীর্ব্বাদ করছি...যদি তা তুই না করতি, তবে তোকে ঘৃণা করতাম...ছিঃ! চোখে জল কেন, মীনা!...'

"আমার অবিরাম চোখের জল তার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল।

"...আবার যাত্রা সুরু হ'ল···এবার গতি দ্রুত। আর ফিরে তাকা'ব না ব'লে মনে মনে কত সঙ্কল্প ক'রেছিলাম। কিন্তু কতক্ষণ চেপে রাখব অন্তরের তীব্র আকুলতা! হৃৎপিণ্ডটা যেন কেউ উপড়ে নিয়ে যাচ্ছিল! ফিরে চাইলাম আমার শৈশবসঙ্গিনীর দিকে। দেখলাম দৃঢ়তার বাঁধ ভেসে গেছে স্নেহের বন্যায়; বৃথা গাম্ভীর্য্য, বৃথা দৃঢ়তার পরাজয় ঘটেছে হৃদয়ের অমূল্য ধন সহানুভূতির নিকট, চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে তার। আরো বেগে আমার অশ্রু ছুটল। যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণ সেই অশ্রুমুখীর দিকে বারম্বার ফিরে ফিরে তাকালাম।···মনের মধ্যে আবার হঠাৎ মায়ের ভূ-লুণ্ঠিতা মূর্ত্তি ভেসে উঠল। মনটা অমনি 'মা' 'মা' ব'লে আর্ত্তনাদ ক'রে আছাড় খেয়ে পড়ল।·· প্রাণের মধ্যে একটা হাহাকার জেগে রইল···'

"...গ্রাম ছেড়ে এবার প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চল্‌ছিলাম। মুক্ত প্রান্তর এবং মুক্ত বাতাসে এসে মনটা আমার ক্রমশঃ হাল্কা হ'য়ে এসেছিল। চতুর্দ্দিকে আমার দৃষ্টি ঘুরছিল। সম্মুখে ধূ ধূ ক'রে মাঠ। মাঠের ওপারে গ্রামের প্রান্তরেখায় গাছপালাগুলি ক্ষুদ্র এবং অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল। দৃষ্টি যতদূর চলে এবং যতক্ষণ পারি চেয়ে ছিলাম সেদিকে। পেছনের গ্রামের দিকে একটুও তাকাচ্ছিলাম না। মনে কেমন একটা আতঙ্ক হচ্ছিল!...যখনই এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলাম তখনই দেখছিলাম মালতী আমার প্রায় গা ঘেসে চলেছে। তার সতর্ক দৃষ্টি অবিরাম আমার মুখের উপর। আমি ছাড়া যেন তার অন্য চিন্তা নাই, তার চোখ-মুখ যেন শুধু এই কথাটা প্রকাশ করছিল। এই অদ্ভুত মেয়েটির কথা অবাক হ'য়ে কেবলই ভাবছিলাম। কোন একটা কিছু নিয়ে সব কিছু ভুলে থাকবার জন্য কেমন যেন ব্যস্ত হ'য়ে উঠলাম। হঠাৎ মালতীর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মালতী! ভজু সর্দ্দার তোমার কে?

"মালতী নম্রকণ্ঠে উত্তর করল, 'আমার পিতা।'

"হঠাৎ মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগল। তৎক্ষণাৎ তাকে প্রশ্ন করলাম, 'শম্ভু?'

"মালতীর সারা মুখখানি অমনি লজ্জায় আরক্ত হ'য়ে নত হ'য়ে পড়ল। তার সলজ্জ দৃষ্টির নীরব ভাষায় আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম। শম্ভুই যে তার স্বামী এ কথা বুঝতে বিলম্ব হ'ল না। তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, 'এ বাড়ীতে দাসী হ'য়ে ছিলে কেন?'

"আপনার কাছে থাকতে। আপনাকে দেখাশোনা করতে।'

বুড়োরা গোপনে পরামর্শ ক'রে চুপি চুপি এ কাজটি করেছে, না মালতী?

মালতী একটু হাসল।

মালতী! তোমার অস্ত্রশিক্ষা অতি চমৎকার। অশ্বচালনাও অতি সুন্দর। কে তোমায় এ সব শিখিয়েছে?"

"বাবা।"

"শম্ভু তোমায় কিছুই শেখায় নাই? সত্যি ক'রে বল।"

"আবার সে হাসল। কিন্তু কোন উত্তর করল না।

"তা হ'লে আমি শম্ভুকে ডেকে জিজ্ঞেস করছি সব।"

মালতী গ্রীবাভঙ্গিতে জানাল—'না'। সারা মুখখানি তার আবার রক্তে রাঙ্গা হয়ে উঠল। এবার আমিও তার দিকে চেয়ে হাসলাম।

তার পর ফস করে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, মালতী হাতে অস্ত্র নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে রাস্তায় বেরুতে তোমার কি লজ্জা হয় না কখনো? এ সব ত আর মেয়েদের কাজ নয়, পুরুষের।"

এ প্রশ্ন তার গর্ব্বে যেন আঘাত করল। সে স্ফীত বক্ষে টান হয়ে ঘোড়ার উপরে বসে গম্ভীর স্বরে বলল, "জানি রাণীমা, এ কাজ সত্যি পুরুষের, নারীর নয়। নারীর স্বর্গ, নারীর তীর্থ, নারীর রাজত্ব গৃহে। সে গৃহলক্ষ্মী। সেখানেই সে অধিষ্ঠাত্রী দেবী জগজ্জননী। কিন্তু প্রয়োজন হ'লে সে কি কৃপাণ ধরবে না? সে যে মহাশক্তি দুর্গা! পুরুষ যদি কাপুরুষ হয়ে তার কর্ত্তব্যে বিমুখ হয়, অসুর যদি নারীর যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করতে প্রলুব্ধ হয়, তবুও কি সে নীরবে গৃহকোণে তার মিথ্যা সম্ভ্রম নিয়ে লুকিয়ে থাকবে? না, তা সে পারে না, মহাশক্তির অংশে যে তার জন্ম। লজ্জা? লজ্জা কি রাণী-মা? এ অবশ্য কর্ত্তব্য কাজ যে করে না, করতে পারে না, তারই ত' লজ্জা, সে নারীই নয়। শৈশব থেকে এ শিক্ষাই ত পেয়েছি পিতার নিকট।"

"তোমার ঐ কোমরের ছুরিকা আমূল বসিয়ে দিতে পার মানুষের বুকে দরকার হ'লে?"

"পারি।"

"জ্যান্ত মানুষটা যখন তোমার পায়ের কাছে পড়ে ছট্‌ফট্ করতে থাকে তার বুকের তাজা তপ্ত রক্ত ঝলকে ঝলকে উঠে যখন তোমার পা রাঙ্গা করবে তখনও কি তোমার বুক কাঁপবে না?"

"না।"

"তোমার ঐ নারীর কোমল প্রাণ কি স্তব্ধ হয়ে যাবে না?"

'না।"

"আশ্চর্য্য!"—তাকে পরীক্ষা করতে করতে সত্যি সত্যি তার উত্তরে যারপর নাই বিস্মিত হয়েছিলাম। সে বলল, 'ধর্ম্মবক্ষায় আশ্চর্য্য কি মা? নারীর সম্মান, নারীর সম্ভ্রম কি সকলের উপরে না?'

বিস্মিত নেত্রে তার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলাম, 'আর এদেরই আমরা এত ছোট করে দেখি। কোন্ শিক্ষা মালতীর শিক্ষার চেয়ে বড? গুণে লক্ষ্মী, বুদ্ধিতে সরস্বতী, বিক্রমে চণ্ডিকা—একাধারে সব—মহাশক্তি নারী!

তোমার হয় ত' মনে হচ্ছে কোন্ যুগের কোন্ রাজপুতাঙ্গনা'র কাহিনী শুনাচ্ছি তোমায়, না দাদা? কিন্তু বঙ্গ-ললনার পক্ষেও তা সম্ভব, যদি সে শিক্ষা তার থাকে।"

নারীজাতিকে সকল বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া করিয়া আজি আমাদের এমন দশা উপস্থিত হইয়াছে যে এসব চোখে দেখলেও বিশ্বাস হয় না। নারী সম্বন্ধে এ সব চিন্তা মনেও কখনো উপস্থিত হয় না। এমনি কাপুরুষ হয়েছি আমরা। নারী তেজ, বীর্য্য, মর্য্যাদা-বিহীনা হইলে দেশের সন্তান কাপুরুষ হইবে না ত' কি হইবে? কেবলই মনে হইতে লাগিল মীনার মত, মালতীর মত মেয়ে হয় না সব এদেশে?

চব্বিশ

"দেখতে দেখতে কথাটা দাবানলের ন্যায় দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। বিলাসপুরের প্রভুভক্ত প্রজারা প্রভুর অপমানে অপমান বোধ ক'রে প্রতিশোধ নেবার জন্য ক্ষেপে উঠল। আমাদের প্রত্যাবর্ত্তনের পর থেকে তিনদিন পর্য্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ সশস্ত্র প্রজারা দলে দলে এসে বাড়ী ভরে' ফেল্ল। তাদের আস্ফালনে বাড়ী যেন গরম হয়ে উঠ্‌ল। দিনরাত কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে সে-সমস্ত খবরই মালতী এসে আমায় জানাচ্ছিল। শুনলাম প্রতিহিংসার জ্বালায় অ- প্রজারা দলে দলে এসে দেওয়াল ধরে' সামনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে কেবল বল্‌ছিল, "হুজুর, আমরা এর প্রতিশোধ নেব। একবার হুকুম দিন। আমরা কৈলাশপুর, মধুপুর, ঝুমঝুমপুর, মাধবনগর, মহেশগঞ্জ শেষ ক'রে দিয়ে বাবুদের বাড়ী সব লুট ক'রে নিয়ে আসি।" একজন কৈবর্ত্ত মোড়ল এমন কথাও মুখ দিয়ে বের ক'রেছিল যে, তার লোকেরা এর প্রতিশোধ না নিয়ে কিছুতেই ছাড়বে না। হুকুম যদি তাদের নাও মিলে তবুও তারা গোপনে পুড়িয়ে সব ছারখার ক'রে দিয়ে লুটপাট ক'রে নিয়ে আস্‌বে বাবুদের বাড়ী। বৃদ্ধ দেওয়ানজী অবশ্য তাকে শাসন করতে অবহেলা করেন নাই। কিন্তু তাঁর নিজের চাঞ্চল্যেরও অবধি ছিল না। সেই সব জমিদারদের ন্যায় পিপীলিকা চিন্ময় রায়ের বংশধরকে—সিংহশিশুকে অপমান কর্‌ল, এ তাঁর কিছুতেই সহ্য হচ্ছিল না। তিনি অপমানের জ্বালায়, প্রতিহিংসার তাড়নায় ছট্‌ফট্ কর্‌তে কর্‌তে উত্তেজিত প্রজাদের মধ্যে কেবল ছুটাছুটি করেছিলেন।

"প্রজারা যতই বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত, প্রভুর ব্যথায় ব্যথী হউক, প্রভুর অপমানে অপমান বোধ করুক, প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হউক, তাতে আমরা অন্তরে যত খুসীই হই, কিন্তু তারা যে আমার পিতার অপমানজনক ব্যবহার করবে এ আমার ভাল লাগছিল না। আমার স্বামীরও মানসিক অবস্থা তাই। সাধারণ লোক আমাদের পারিবারিক বিবাদ নিয়ে আলোচনা করুক, একটা হৈ চৈ করুক, এ তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। 'আমার ব্যাপার, আমি তার যেমন বিহিত করতে হয় করব, তা'তে এ সব লোকের মাথা দেবার দরকার কি? আমি কি কাপুরুষ?' এই রকম হ'ল তাঁর মনের ভাব। অভিমানী তিনি, অভিমানে তাঁর আঘাত করছিল। ভজু সর্দ্দারকে ডেকে এনে বল্‌লেন, 'এরা সব কেন এসেছে, ভজু কাকা?'

বৃদ্ধ সর্দ্দার বিনীতভাবে বল্‌ল, 'কথাটা প্রচার হওয়ায় প্রজারা সব ক্ষেপে উঠেছে। বহু মণ্ডল ছুটে এসেছে এখানে দলবল নিয়ে। দেওয়ানজীর কাছে হুকুম চাচ্ছে প্রতিশোধ নেবার জন্য।

" 'আমি কি ভীরু যে আমারটা আমি করতে পারব না? তুমি তাদের ফিরে যেতে বল।—'

"তারা মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে গেল।

"একদিন একাকী ব'সে ভাবছিলাম এমন সময় দেওয়ানজী এসে গম্ভীরমুখে বললেন, 'জান্‌তাম এরকম কিছু একটা ঘটতে পারে। কর্ত্তারও নিষেধ ছিল। কিন্তু ঠাকুর কিছুতেই বাধা মানল না। তার বিশ্বাস দুনিয়ার সকলেই তারই মতন, সব পথই সোজা, বাঁকা কিছু নাই। সে শিক্ষা তার হল, কিন্তু এমন ক'রে হ'ল, যা হজম করা যায় না। তবুও আমি গোপনে তোমাদের দেখবার শুনবা'র অনেক বন্দোবস্ত করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না, যা হবার তাই হল, কিন্তু মা, তোমার বাপ, ভাই যদি এর মধ্যে না থাকতো তবে—হুঃ কি বলব মা—

তবে ঐ ধৃষ্টদের রক্তে এতক্ষণ মা বসুন্ধরার বুক রাঙ্গা হয়ে যেত, চিন্ময় রায়ের বংশধবকে, বিলাসপুরের রায়কুলবধূকে অপমান! তাও আমি থাকতে। এত সাহস তাদের? কিন্তু—কিন্তু কি করব, হাত-পা বাঁধা আমার···

"বৃদ্ধ অত্যধিক উত্তেজনায় চঞ্চল পদে কক্ষে পদচারণা করতে লাগলেন। প্রভু থেকে অভিন্নহৃদয় বৃদ্ধ দিবারাত্র অপমানের জ্বালায় জর্জ্জরিত হচ্ছিলেন। সেই অপমানের গভীর ক্ষত কোন দিন নিরাময় হবে, তা তাকে তখন দেখে একেবারেই মনে হচ্ছিল না।

"নীরবেই বসেছিলাম। বল্‌বার তো কিছুই ছিল না আমার। মনে হচ্ছিল এই বৃদ্ধ এই বংশের কত আপনার। এই পরিবারের এমন এক সম্পদ্ যা অমূল্য। প্রভুবংশের সেবায় অর্পিত জীবন তাঁর, লুপ্ত তাঁর স্বার্থ, তাঁর নিজ অস্তিত্ব। চেয়েছিলাম তাঁর দিকে। হঠাৎ আমার সাম্নে এসে তিনি দাঁড়ালেন। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম প্রতিহিংসার বিষাক্ত দংশনে কালো মুখখানা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একটু বিস্মিত হ'লাম! হঠাৎ এ আনন্দ কিসের তাঁর। তাঁর আনন্দোজ্জ্বল স্নেহময় দৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে হাসি-হাসি মুখে বল্লেন, "এত জ্বালার মধ্যেও আজ আনন্দ হচ্ছে, মা লক্ষ্মী। সে তোমার জন্য। যে ভাবে তুমি আত্ম-সম্মান বজায় রেখে ফিরে এসেছ, তা চিন্ময় রায়ের কুলবধূরই উপযুক্ত। তা স্মরণ মাত্র আমার আনন্দ আর ধরছে না। আজ সত্যি সত্যি মা দুর্গাকে যেন সাক্ষাৎ দেখতে পাচ্ছি।···কিন্তু মা, যা করেছ তা যদি না করতে তবে—তবে তোমায় আর মা ব'লে ডাক্‌তাম না, তোমার মুখ দেখতাম না, তোমায় ঘৃণা করতাম, আর আমি—লোকালয়ে মুখ দেখাতাম না, প্রাণ দিতাম।"

"অদ্ভুত এই বৃদ্ধ! তাঁর কথা শুন্‌তে শুন্‌তে অবাক্ হয়ে ছিলাম। কিছুক্ষণ তিনি নীরব হয়ে থাক্‌লেন। দেখতে দেখতে তাঁর আনন্দোজ্জ্বল মুখের উপর গাম্ভীর্য্যের ছায়া ঘনিয়ে এল। মনে হ'ল, এবার তিনি যে-কথা বল্‌তে এসেছিলেন সে-কথা বল্‌বেন। বল্‌লেন, "মা! ভীরু যে উপাদানে গঠিত, সংসারে তা নিয়ে চলা কঠিন, পদে পদে বিপদ। এরূপ প্রকৃতির মানুষের মনে একবার কোনরূপে একটা দাগ পড়লে তা শীঘ্র মুছে যায় না। অভিমান তার সব চেয়ে বেশী। এখন তার মনের যে অবস্থা তার উপর যদি কোনরকমে দুর্জ্জয় অভিমান তার মনে স্থান পায়, তবে বিপদ হ'তে পারে। সুতরাং তাকে চোখে চোখে রাখবে মা। এমন কোন কিছু হতে দেবে না যা'তে সে-বিপদের সম্ভাবনা আছে। সবই তোমার। তোমাকেই সব করতে হবে।" একথা ব'লে আমাকে ভাবনার জালে জড়িয়ে তিনি চ'লে গেলেন।

"সত্যিই তাই, আমার স্বামীর সম্বন্ধে বৃদ্ধ যা যা বলেছিলেন তা বর্ণে বর্ণে সত্য। এদিকে আমারও যে দৃষ্টি পড়েছিল না তা নয়। দিনের পর দিন আমি তাঁর ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে আসছিলাম। কৈলাশপুরের সেই শোচনীয় ঘটনার পর থেকে তাঁর যে ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছিল, তা ক্রমশঃ বেড়েই যাচ্ছিল। কর্ম্মের ব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে আমি সে-সব ভুলতে চেষ্টা করেছিলাম এবং সক্ষমও হয়েছিলাম কতক পরিমাণে তা'তে। কিন্তু তিনি সব কাজ ছেড়ে দিয়ে একাকী নির্জ্জনে থাক্‌তেন। কাজেই তা ভোলা দূরে থাক্ অহর্নিশি কেবল সেই কথাই তাঁর মনে জেগে থাক্‌ত। অপমান সহস্র ফণা তুলে' প্রতি মুহূর্ত্তে তীব্র দংশনে তাঁর অন্তরে হলাহল ঢেলে দিয়ে তাঁকে জর্জ্জরিত করতে করতে যে পাগল ক'রে তুলত, তা তাঁকে দেখলেই বোঝা যেত। দেখা যেত তাঁর চোখে রোষ-বহ্নি যেন জ্বলছে; দৃষ্টিতে যেন ছুটে বেরুচ্ছে আগুনের ফুল্‌কি; ভ্রূ এবং ললাট কুঞ্চিত হচ্ছে; থেকে থেকে কুঞ্চিত ললাট ফুরে' ফুরে' শিরাগুলি দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে; মুখে তাঁর অভাবনীয় বিরক্তি। মুখখানি তাঁর ক্রমে কঠিন হ'তে হ'তে এক সময়ে ঘৃণায় ছেয়ে যেত। দেখতাম সব, বুঝতামও তাঁর এই ভাবান্তর বা অন্তর্বিপ্লবের অর্থ। কিন্তু কথায় বা ভাবে কখনো ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করতাম না কিছু। পাছে সে-সব কথা এসে পড়ে; আলোচনা, সমালোচনা হয়; আবার আর একটা কিছু হয়, তাঁর মনে আরো দুঃখ হয়; অভিমানী সে, আবার তাকে কোন কিছু ক'রে মর্ম্মান্তিক আঘাত করি, এই ভয়ে নীরবে সব স'য়ে থাকতাম, বুক ফেটে গেলেও আমার মুখ ফুটত না। সময়ের প্রতীক্ষায় ছিলাম। আশা ছিল, পূর্ব্বে সব যেমন ছিল সময়ে আবার তেমনি হবে। কিন্তু—কিন্তু সে-দিন আর ফিরে এল না।"

নীনা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরবে মুক্ত বাতায়ন-পথে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর পুনরায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমার দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিল,

"···কিন্তু কতদিন আর চলে এভাবে? কতদিন আর তাঁকে কেবল চোখে চোখে দূরে দূরে রাখব? তিনি শান্তি পাচ্ছেন না, নিঃসঙ্গ হ'য়ে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করছেন, কতদিন আর দূর থেকে তাঁর এই অশান্তি দেখব? তাঁর সহধর্ম্মিণী আমি, তাঁর সুখ-দুঃখের ভাগী, তাঁকে সুখ শান্তি দিবার চেষ্টা না ক'রে আর কতদিন দূরে দূরে থাক্‌ব? আমার অসহ্য হ'য়ে উঠল। তারপর একদিন তাঁকে এই ঘরে—এখানে, যেখানে ব'সে আজ তাঁর কথা বল্‌ছি—নির্জ্জনে একাকী পেয়ে আকুল হ'য়ে বল্‌লাম, "ওগো, কেন তুমি এমন করছ? আজ কতদিন হ'য়ে গেল তবুও তুমি সে-সব কথা ভুলতে পারছ না? আমার মত ভুগছ কি তুমি? আমার মত বিপদ কি তোমার? একদিকে তুমি, আর একদিকে মা, বাপ, ভাই, বুঝতে পারছ না কি আমার দুর্ভাগ্য? তবুও আমি—চেয়ে দেখ একবার আমার দিকে—তবুও আমি সে-সব ভুলতে চেষ্টা করছি, কর্ত্তব্য করবার চেষ্টা করছি···"

"তিনি আমার দিকে চেয়ে শুধু একটী মাত্র শব্দ করলেন, 'হুঁ—'

"এবার দৃঢ়কণ্ঠে বল্লাম, 'প্রতিশোধ নিতে চাও?'

"হঠাৎ এমন কথা শুনে' তিনি চমকে ফিরে তাকালেন আমার দিকে।

" '···নেও প্রতিশোধ। আমি তোমার সঙ্গে যাব। তবু তুমি অমন ক'রে থেক না।'

" 'তাঁর বিস্মিত নয়ন এবং জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপিত হ'ল। বল্লেন, 'তুমি যাবে?'

" 'হাঁ।'

"একটু হেসে বল্লেন, 'পারবে না মীনা। তুমি স্ত্রীলোক, তোমার পক্ষে এ কাজ অসম্ভব।'

" 'আমি স্ত্রীলোক, কিন্তু সহ-ধর্ম্মিণী, অবলা নই।'

" 'জান, প্রতিশোধের অর্থ কি?'

" 'জানি।' আমার অবিচলিত কণ্ঠস্বরে তিনি যেন বিমূঢ় হ'য়ে নীরবে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। অনেকক্ষণ অতীত হ'লেও যখন তিনি আর কোন কথা বল্লেন না, তখন আমি অধীর হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ভাব্‌চ?'

"তেম্নি ভাবেই আমার দিকে চেয়ে থেকে বল্লেন, 'ভাব্‌চি তোমার জন্ম এমন ঘরে কি ক'রে হল।'

"হঠাৎ এমন একটা অপ্রত্যাশিত কথায় আমি যেন কেমন স্তব্ধ হ'য়ে নীরব হ'য়ে গেলাম।

"কি নীচ প্রবৃত্তি! হীন—কত হীন এরা!'

"আমার মাথায় যেন কে গুরুতর আঘাত করল। স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম।

" 'ষড়যন্ত্র ক'রে এরা একাজ ক'রেছে, জান, ষড়যন্ত্র ছিল একটা।'

" 'ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, ওসব কথা আর তুল না'। মিনতি ক'রে হাত ধরে তাঁকে এ কথা বল্লাম। তবুও তিনি বল্লেন, '—এরা যদি নীচ, হীন, জঘন্য না হয় তবে আর কারা?—তোমার বাপ, মা, ভাই সব—সব—'

"আমার মাথার ভিতরে কি যেন চন্ চন্ ক'রে উঠল, অন্তরের কোন তার ছিঁড়ে গিয়ে যেন বড় বেসুরে বেজে উঠল। কিসের তাড়পুড়ে যেন অভিভূত হয়ে পড়লাম। তবুও ধৈর্য্য রেখে বল্লাম, 'আমার ভাইকে যা বলতে হয় বল, কিন্তু আমার মা-বাপকে জড়িওনা এমন করে, ওগো ও কথা আর তু'লনা এমন ক'রে—।

"—'নিশ্চয়—নিশ্চয় তারা এর মধ্যে ছিল। জগতের এমন কিছু জঘন্য আমি মনে করতে পারছি না, যার সঙ্গে তাদের জঘন্য প্রবৃত্তির তুলনা করা যায়। নিশ্চয় নীচতম কুলে এদের জন্ম—'

"আমার অন্তর থেকে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত সব কিছু যেন আলোড়িত হয়ে উঠল। একটা বিক্ষোভ, একটা বিপ্লব, একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হ'য়ে আমার সব বিপর্য্যস্ত ক'রে দিয়ে গেল। আমার লোপ পেয়ে গেল সে বিপ্লবে। দেশ, কাল, পতি ভুলে গেলাম। রিপু আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, অন্তর্দ্দৃষ্টি, দূরদৃষ্টি, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সমস্ত লোপ করে দিয়ে দিশাহারা পাগল ক'রে দিল। আমাকে অন্ধ করে দিয়ে ধ্বংসের লীলা-ক্ষেত্রে ছেড়ে দিয়ে গেল। চীৎকার করে বল্লাম, 'কি, ছোট মুখে বড় কথা! নীচকুল কাদের? তোমাদের, না তাদের? তোমাদের নীচকুল কৈলাসপুরের রায়বংশের পায়ের নীচে মাথা রাখতে পেয়ে পবিত্র জ্ঞান করে নাই কি? তোমাদের পিতৃপুরুষ উদ্ধার পায় নাই কি?—

"আরও কি বলতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তাঁর চীৎকার শুনে স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম। সে চীৎকার আর্ত্তনাদের মতই শুনিয়েছিল। তিনি বলছিলেন' 'মীনু! মীনু! তুমি বলছ আমায় একথা! তুমিও? তবে—তবে আর কি!—

"তার পর যেন একটু দূরে ক্রমে আরো দূরে এই কথাগুলি শুনতে শুনতে হাওয়ায় মিশে গেল—'তুমিও মীনা, তুমিও।' তার পর শুনতে পেলাম একটা দীর্ঘশ্বাস, হতাশার ভগ্ন কণ্ঠস্বর, ভগ্ন কণ্ঠে ব্যথিত প্রাণের আকুল রোদন। তার পর দ্রুতপদে অবরোহণশব্দ। তার পর আর কিছু না—সব শান্ত!—

"কতক্ষণ স্তব্ধতা আমার ছিল জানি না। হঠাৎ যেন চমকে জেগে উঠলাম, মনে হল কি যেন ছিল, কি যেন নাই; এইমাত্র যেন আমার সর্ব্বস্ব হারিয়ে ফকির হ'য়ে গিয়েছি। তাঁকে সেখানে না দেখতে পেয়ে চমকে উঠলাম। উঠে এদিকে ওদিকে, এ জানালায় ও জানালায় উকি মেরে মেরে তাঁকে খুঁজলাম। নাম ধরে কত ডাক্‌লাম। নাই কোথাও তিনি নাই, কেউ উত্তর দিল না। প্রথমে অনুতাপ হ'ল, দুঃখ হ'ল অশ্রু ঝরে পড়ল, পায়ে ধরে তাঁকে ফিরিয়ে এনে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে হ'ল। কিন্তু তারপরই রাগ অভিমান উর্দ্ধে উঠল—দোষ তাঁর, দোষ তাঁরি আমার অপরাধ কি, কেন আমি তাঁর পায়ে ধরব? গেছে গেছে, না থাক্‌ল, না এল সে, আমি কি মানুষ নই? আমার কি মন নাই, প্রাণ নাই, মান-অপমান নাই?—

"রিপুর তাণ্ডব লীলা-ক্ষেত্রে উন্মাদের ন্যায় বিচরণ করতে করতে এক সময় আমার সব শেষ হ'য়ে গেল। অজ্ঞান, অন্ধ আমি সর্ব্বনাশের কিছুই বুঝতে পারলাম না, দেখতেও পেলাম না। আর তাঁকে ফিরে পাই নাই। সেই দেখাই শেষ দেখা, সেই কথাই শেষ কথা।

[ক্রমশঃ]

ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের নূতন উপন্যাস "মর্ম্ম ও কর্ম্ম" এবং শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী" আগামী বৈশাখ সংখ্যা হইতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে। বঃ সঃ

শোক সংবাদ

পরলোকে শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধী

বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা ৩৫ মিনিটে পুণায় আগা খাঁ প্রাসাদে শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্র হীরালাল ও দেবদাস গান্ধী, শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধীর পৌত্রী হীরালাল গান্ধীর-কন্যা এবং গান্ধী-পরিবারের একটি আত্মীয়া শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধীর মৃত্যুকালে তাঁহার শয্যাপার্শে ছিলেন।

মহাত্মাজীর আদর্শ সহধর্ম্মিণীর লোকান্তর গমনে দেশবাসী আজ ব্যথিত।

পরলোকে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (এস্, এন্, ব্যানার্জ্জি) গত ২০শে ফাল্গুন শুক্লা দশমী তিথিতে পরলোকগমন করিয়াছেন। যে কয়জন বাঙ্গালী ব্যবহারজীবীর কীর্ত্তি সমগ্র ভারত-বর্ষের চোখে বাঙ্গলার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে, শৈলেন্দ্র নাথ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। একাধারে অসামান্য প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের এরূপ মণি-কাঞ্চন যোগ অতি বিরল। আইনের সূক্ষ্ম-বিচারে তাঁহার অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ অসাধারণ ধী-শক্তির পরিচায়ক। শিষ্টা ও দুষ্টা সরস্বতীর সংযোগে তাঁহার বাগ্মিতা প্রতিপক্ষকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিত। বিচার-যুদ্ধে সেই পুরুষ-সিংহের সমযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশে ছিল কিনা সন্দেহ। সে হিসাবে শৈলেন্দ্র নাথ বাঙ্গালীর গৌরব। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্বের আসল রূপ ইহার মধ্যে আবদ্ধ নয়। "মৃদূনি কুসুমাদপি" একটি অনবদ্য, সরল সুন্দর, স্নেহপ্রবণ হৃদয় তাঁহার ছিল—সেইখানেই আসল মানুষটির নিরাবরণ পরিচয়। প্রভূত অর্থ এবং পদগৌরব কখনো তাঁহার চরিত্রের স্বাভাবিক মাধুর্য্যকে ম্লান করিতে পারে নাই—অর্থ এবং স্নেহদানে তিনি নিজেকেই কৃতার্থ-জ্ঞান করিতেন; অতিথি-অভ্যাগত আত্মীয় আতুর কেহ কখনো তাঁহার নিকট গিয়া বিমুখ হয় নাই। তাঁহার দানের মধ্যে হিসাবের স্থান ছিল না, পরোপকারের মধ্যে প্রতিদানের আশা ছিল না, আঘাত পাইলেও প্রতিঘাতের প্রবৃত্তি ছিল না। তাঁহার অকৃত্রিম সহৃদয়তার সঙ্গে এক অপূর্ব্ব বালকসুলভ সরলতা ছিল এবং সেই গুণে তিনি বয়স, পদ-মর্য্যাদা এবং জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকেই আপনার করিতে পারিতেন; দূরকে নিকটে টানিয়া তাঁহার বিশাল বক্ষে স্থান দিতে পারিতেন। আইন ব্যবসায়ের অসংখ্য কাজের মধ্যেও শৈলেন্দ্রনাথ সাধ্যমত জনসেবায় মনোনিয়োগ করিয়াছিলেন—হিন্দু-মহাসভা এবং বিভিন্ন ক্রীড়া অনুষ্ঠানে তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন। দুর্ভিক্ষ, বন্যা উপলক্ষে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত এবং তাঁহার নামে পৃথিবীর দূর-দূরান্তর হইতে অর্থ সাহায্য আসিয়া পড়িত।

১৮৮৩ সালে আগষ্ট মাসের ৩১শে তারিখে শৈলেন্দ্রনাথ শিবপুরবাসী এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺মহেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দার্জ্জিলিং-এর খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। বালক শৈলেন্দ্রনাথ দার্জ্জিলিং-এ সেণ্ট জোসেফ স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া প্রথম জীবনে বাঙ্গলার মাটীর সহিত যোগসূত্র হারাইয়াছিলেন। তারপর স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার চরিত্র গঠনে প্রাচ্য প্রভাব ফুটিয়া উঠিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িবার সময়ে তিনি বহুদিন বেলুড় মঠের আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন। একদিকে স্বামীজী সম্প্রদায়ের প্রভাব, তারপর বিলাতের অভিজ্ঞতা এবং কর্ম্ম-জীবনের নানাবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁহার চরিত্র এবং মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল; বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্ব আপনার গতি-পথ বাছিয়া লইয়াছিল। বাহ্যজীবনে হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত আচার-নিষ্ঠা তিনি পালন করিতেন না, কিন্তু অন্তরে অন্তরে সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের সার সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের যাহা কিছু খাঁটি, তাহার যথাযোগ্য সমাদর করিবার মতন মনের উদারতা তাঁহার ছিল।

শৈলেন্দ্রনাথের পরলোকগমনে বাঙ্গলাদেশে এবং বাঙ্গলার বাহিরে তাঁহার অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব শোকার্ত্ত হইয়াছেন। সকলের সমবেত প্রার্থনায় পরলোকগত আত্মার কল্যাণ হউক।

ভারতীয় প্রসঙ্গ

বাঙ্গলা-গভর্ণমেণ্টের বাজেট

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের বাজেট পেশ করেন। নিম্নে আগামী বৎসরের আনুমানিক হিসাব, চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাব এবং গত বৎসরের চূড়ান্ত হিসাব প্রদত্ত হইল :

সাল	আয়	ব্যয়	ঘাটতি
১৯৪৪-৪৫	২১৯৭৪৪০০০	৩০৪৩৭৮০০০	৮৪৬৩৪০০০৲
১৯৪৩-৪৪	২১৩৪০৯০০০	৩.৫৩৬০০০০	১.১৯৫১০০০৲
১৯৪২-৪৩	১৬৪৬৪২০০০	১৬৭৯১৮০০০	৩২৭৬০০০৲

অর্থসচিব বাজেট-বক্তৃতায় বলেন : প্রধানতঃ দুর্ভিক্ষের দরুণই এত ঘাটতি হইয়াছে। বৎসরের প্রথম দিকে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট কাজ চালাইবার জন্য প্রধানতঃ ভারত-গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। ভারত-গভর্ণমেণ্ট ঋণ ও ধার-বাবদ ১২ কোটি টাকা দেন। কিন্তু পরে তাহারা বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টকে নিজের চেষ্টায় অর্থের সংস্থান করিতে বলেন। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহের মধ্যে যে আর্থিক ব্যবস্থা বর্ত্তমান আছে, তাহা সুদিনে করা হইয়াছিল। বাঙ্গলার বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে সেই ব্যবস্থায় বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে নিজ পায়ে দাঁড়ান অসম্ভব। যাহা হউক, গত দুই বৎসর অপেক্ষা অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকা আয় করা যাইবে। ইতিমধ্যে যে কর বৃদ্ধি করা হইয়াছে, বা নতুন কর ধার্য্যের প্রস্তাব হইয়াছে, এই বৎসরেই তাহা ছাড়া আরও কর ধার্য্য করার প্রয়োজন হইতে পারে।

বর্ত্তমান ১৯৪৩-৪৪ ও আগামী ১৯৪৪-৪৫ সালে গভর্ণমেণ্টের বাজেটের উপর দুর্ভিক্ষজনিত ও জরুরী অবস্থার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন। 'ভারতে অসাধারণ ব্যয়', 'দুর্ভিক্ষ', ও 'কৃষি' এই তিন খাতে ব্যয়ের পরিমাণ দেখা যায়—১৯৪২-৪৩ সালে প্রথম খাতের ব্যয় ৪ লক্ষ টাকারও কম ছিল, তাহা ১৯৪৩-৪৪ সালে ১ কোটি টাকা ও ১৯৪৪-৪৫ সালে ১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমিত হয়। দুর্ভিক্ষখাতে ১৯৪৩-৪৪ সালের সংশোধিত বাজেটে মোট ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে ৫ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা, যাহা ১৯৪৪ ৪৫ সালে ২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা হিসাব ধরা হইয়াছে। কৃষি সম্পর্কেও ব্যয়বৃদ্ধির হিসাবে দেখা যায়—'গ্রো মোর ফুড' আন্দোলনে গভর্ণমেণ্টকে স্বতন্ত্র ব্যয় করিতে হইয়াছে, যাহার হিসাব : ১৯৪৩-৪৪ সালে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে ৫০ লক্ষ টাকা।

এতদ্ব্যতীত খাদ্যশস্য প্রভৃতি দ্রব্য সম্পর্কে চলতি বৎসরে গভর্ণমেণ্টের ব্যয় হইবে ৭৬ কোটি টাকা। ইহাতে ক্ষতি দাঁড়ায় সারে তিন কোটি টাকা। আগামী বৎসরে খরচ দাঁড়াইবে ৮১ কোটি টাকা। পণ্য বিক্রয়ে ক্ষতির পরিমাণ ৫ কোটি টাকা।

বাজেটের সম্পূর্ণাংশ আলোচনা করিয়া দেখা যায়, বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা এমন নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে বাঙ্গলার জন্য খরচ মিটানো রীতিমত দুঃসাধ্য। শ্রীযুক্ত গোস্বামীর আশা আছে, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট গত নভেম্বর মাসে সাহায্যের দাবী অনুযায়ী ভবিষ্যতে হয়ত সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে এবং জানা গিয়াছে, খরচের হিসাবে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বেশী পাইবেন বলিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন। সেই হিসাবে দেখা যায়, বর্ত্তমান বৎসরে বাংলা গভর্ণমেণ্টের মোট ঘাটতি দাঁড়াইবে ১০ কোটি ১০ লক্ষ টাকায় - যাহা ১৯৪৪-৪৫ সালে ৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

চা, কফি ও সুপারী

ভারত-গভর্ণমেণ্ট এই যুদ্ধের বাজারে আরও অধিক টাকা তুলিবার জন্য চা, কফি ও সুপারীর উপরে নূতন কর ধার্য্য করিয়াছেন। ইহা ন্যায্য বা অন্যায্য হইয়াছে তৎসম্পর্কে বলিবার আমরা কেহই নই। যাহারা বিদেশ হইতে আসিয়া দেশবাসীকে সর্ব্বপ্রকারে শোষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহারা যে আরও অধিক শোষণের ব্যবস্থা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিবেন না, তাহাতে আর কি সন্দেহ আছে! এক সের সুপারীর উপর নূতন ধার্য্য কর চারি আনা। ভারতবর্ষে সুপারী বিলাসের জিনিষ নহে। ইহা আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম

জিনিষ এবং ধর্ম্মকার্য্যে সুপারী হিন্দুদিগের বিশেষ প্রয়োজন। পান-সুপারী ছাড়া কোন পূজাই এ-দেশে হয় না। এই সুপারীর উপরে প্রতি সেরে চারি আনা কর ধার্য্য করিয়া ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে আরও বিস্মিত করিয়াছেন। বাঙ্গলার দরিদ্র গৃহস্থ, বিশেষতঃ নোয়াখালী, ত্রিপুরা, বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি স্থানের বাড়ীর গৃহস্থদের সুপারী হইতে সামান্য আয় হইয়া থাকে। এবার গভর্ণমেণ্ট সেই আয়ও কি বন্ধ করিবেন?

বাঙ্গলার চাউল-সম্পদ্

এইরূপ অনুমান করা যাইতেছে যে, এই বৎসর (১৯৪৩-৪৪) বাঙ্গলায় শীতকালীন চাউলের ফলন স্বাভাবিক ফলনের তুলনায় শতকরা ১০৩ ভাগ ফলিয়াছে। গত বৎসর এই ফসলের ফলন ছিল ৬৮ ভাগ। বাঙ্গলা সরকারের কৃষি-বিভাগ কর্ত্তৃক প্রচারিত চাউলের ফলন সম্পর্কিত তৃতীয় ও শেষ পূর্ব্বাভাষে উপরোক্ত হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে। এবারে সাতটি জেলায় অতিরিক্ত এবং অন্যান্য জেলায় ষোল আনা ফলন হইয়াছে।

রেলযাত্রীর ভাড়া বৃদ্ধি

বিগত ১৬ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে রেলপথে বাজেট পেশ করিয়া স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল (যানবাহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব) ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৪ সালের ১লা এপ্রিল হইতে রেলযাত্রীর ভাড়া শতকরা ২৫৲ টাকা বৃদ্ধি হইবে।

যখন যুদ্ধজনিত সর্ব্ববস্তুর অসাধারণ মূল্যবৃদ্ধি এবং দুর্ভিক্ষ ও হাহাকারে জীবন-রক্ষা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তখন সর্ব্বদেশের উপর রেলকর্ত্তৃপক্ষের এই নূতন বিধানের যে কোনো যথার্থতা থাকিতে পারে না, তাহা বক্তব্যের বাহিরে।

যুদ্ধ বাঁধিবার পূর্ব্বে কোনো কোনো বৎসর যদিও রেলকর্ত্তৃপক্ষের অনেক ক্ষেত্রে অসাধারণ ঘাটতি পড়িয়াছে, কিন্তু সাম্প্রতিক হিসাবে যে উদ্বৃত্ত আয়ের সংখ্যা দেখা যায়, তাহাতে দেশের প্রতি এই ভাড়া বৃদ্ধির বিধান সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা যে যাত্রী জনসাধারণের কাছে অত্যন্ত নৃশংসতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

তিন বৎসরে রেলের উদ্বৃত্ত আয় দাঁড়ায় এইরূপ :—

১৯৪২-৪৩ সাল	৪১'০৭	কোটি টাকা
১৯৪৩-৪৪ „	৫৩'৭৭	„ „
১৯৪৪-৪৫ „	৫২'২১	„ „
মোট	১৪৭'০৫	কোটি টাকা

শতকরা ২৫ টাকা বৃদ্ধিতে উদ্বৃত্ত আয় দেখা যায় ১০ কোটি টাকা, যাহা নিম্নশ্রেণীর যাত্রীদের সুখ-সুবিধার জন্য ব্যয়ের উদ্দেশ্যে পৃথকভাবে সঞ্চিত রাখা হইবে বলিয়া বেন্থল সাহেব ঘোষণা করিয়াছেন।

কিন্তু নিম্নশ্রেণীর যাত্রীদের সুখ-সুবিধার এতকাল ধরিয়া যে নমুনা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে আর সাধুবাদ শুনিবার মতো প্রবৃত্তি নাই। সর্ব্বদিক হইতে সাম্প্রতিক এই ভাড়া বৃদ্ধি যে যাত্রী-জনসাধারণের উপর অন্যায় প্রয়োগ, তাহা বাহিরে অনভিব্যক্ত রাখিয়া অন্তরে অন্তরে বেন্থল সাহেবও স্বীকার করিবেন।

বস্তুতঃ ভাড়া-বৃদ্ধিতে আমাদের আপত্তি করিবার কিছুই থাকিত না—যদি দেখিতাম যে, যাঁহারা সহস্র অসুবিধা ভোগ করিয়াও রেলে যাতায়াত করিতে বাধ্য হন, তাঁহারা ঘরে বসিয়া যাহাতে দুইবেলা দুই মুঠা খাওয়ার জোগাড় করিতে পারেন, এমন ব্যবস্থা সরকার করিয়া দিয়াছেন।

লর্ড ওয়াভেল ও পাকিস্তান

'ভারতবর্ষ ভৌগোলিক দিক দিয়া অখণ্ড এবং কেহই এই ভূগোলের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে না,' লর্ড ওয়াভেল দিল্লীর আইন সভায় উপরি-উক্ত মন্তব্য প্রকাশ করায় ভারতের লীগপন্থী মুসলমানদের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে; ধর্ম্ম ও কৃষ্টির দিক দিয়াও ভারতবর্ষ অবিভাজ্য—এই কথাও লর্ড ওয়াভেল বলিয়াছেন। পাকিস্তানের কথাই এখানে উঠিতে পারে না। তের শ' বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষ ছিল, পরেও থাকিবে। আগন্তুক মুসলমানগণ মিঃ জিন্নার ইঙ্গিতে আজ যে ভারতের ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন সাধন করিতে উৎসাহী হইতেছেন, উহা নিছক পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নহে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকার সলিমুল্লা সাহেবও বাঙ্গলা দেশকে বিভক্ত করার হুজুগে নাচিয়াছেন, কিন্তু পরিণাম কি হইল? লর্ড ওয়াভেল পাকিস্তানের কবর দিয়াছেন বলিয়াই আমাদের মত। রাজা গোপালাচারীর মতন এখনও যে-সকল ব্যক্তি অন্ধের ন্যায় মাঝে মাঝে পাকিস্তান সমর্থন করিতে হিন্দুদিগকে প্ররোচনা দেন, লর্ড ওয়াভেলের কথায় তাঁহাদের মস্তিষ্ক স্থির হওয়ার প্রয়োজন। এ দেশে পাকিস্তান হইবে না, হইতে পারে না—ইহাই আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস।

মুসলমান সমাজ ও 'সত্যার্থ প্রকাশ'

আর্য্য-সমাজের ধর্ম্মগুরু স্বামী দয়ানন্দ 'সত্যার্থ প্রকাশ'-এর লেখক। ভারতীয় আর্য্য-সমাজের উক্ত গ্রন্থকে শিখগণ তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায়ই শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। এক শ্রেণীর মুসলমান এই সত্যার্থপ্রকাশের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করিয়াছেন। সত্যার্থপ্রকাশের আপত্তি তুলিলে হিন্দুদের পক্ষ হইতেও আপত্তি উঠিতে পারে, "কোরান ও হদিস" প্রকাশ বন্ধ করা হোক, কারণ ঐ দুইটী গ্রন্থেও হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী কথা

রহিয়াছে, আমরা মুসলমান-সমাজের এই গোঁড়াদিগকে অনুরোধ করিতেছি, ধর্ম্মের প্রতি গোড়ামী মানব-সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নহে। এই সকল মিথ্যা আন্দোলন দ্বারা শক্তিক্ষয় না করিয়া কি উপায়ে মুসলমান-সমাজের আর্থিক উন্নতি হয়, প্রকৃত ধর্ম্মে মতি হয়, কি করিয়া সমগ্র মানব-সমাজকে ভালবাসিতে হয়, আশা করি, গোঁড়া মুসলমানগণ মুসলমান-সমাজকে এই শিক্ষা দিবেন।

আমেরিকান ষাঁড়

সাম্প্রতিক এক সংবাদে প্রকাশ যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দয়াপরবশ হইয়া গো-জাতির উন্নতির জন্য ৬টি ষাঁড় আমাদের এই দেশে পাঠাইতেছেন। দয়া বটে! এই চতুষ্পদ ষাঁড় বোধ হয় এবার নূতন রেকর্ড স্থাপন করিবে। দেশের সার ত' সব জনবুল ও ইয়াঙ্কিতে মিলিয়া খাইয়া ফেলিলেন, দেশ-বাসীর জন্য যৎসামান্য উদ্বৃত রহিল। যে-ভাবে এ-দেশে গোধন-নাশের প্রাচুর্য্য বাড়িয়া গিয়াছে, এবং ইংরেজ, আমেরিকার নিগ্রো, এবং কাফ্রি যে অনুপাতে গো-মাংস ভক্ষণ করিতেছেন, তাহাতে ভবিষ্যতে ছয়টী কেন শত শত আমেরিকান্ বা ব্রিটিশ বা কাফ্রি ষাঁড় এ-দেশে আমদানী হইলেও এ-দেশে গরু পাওয়া যাইবে না। ভগবান্ এ-দেশের গো-ধনের প্রতি কবে মুখ তুলিয়া চাহিবেন?

বৈদেশিক প্রসঙ্গ

মিঃ চার্লস্ হোয়াইট্ ও ভারত সম্পর্কে বৃটিশ-মনোভাব

সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি ও ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া পশ্চিম ডার্বিশায়ার উপনির্ব্বাচনে ইণ্ডি-পেণ্ডেণ্ট্ সোশ্যালিষ্ট পার্টির মিঃ চার্লস্ হোয়াইট্ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পক্ষের প্রার্থী লর্ড হার্টিংটনকে ৪৫৬১ ভোটে পরাজিত করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন। মিঃ চার্লস্ হোয়াইট্ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে জানান যে, বিলাতের নির্ব্বাচকমণ্ডলী ভারতের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন।

কিন্তু বিষয় দাঁড়াইয়াছে এই যে, রাজ্যশুদ্ধ লোকের ক্রমাগত এইরূপ দাবীতেও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের রাজলক্ষ্মীর কান বধির হইয়া আছে। মিঃ সোরেন সেন এবং শ্রমিক-দলের সদস্যবৃন্দ ও বৃটেনের বিশিষ্ট নীতিশীল ব্যক্তিবৃন্দ এতকাল ধরিয়া ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে দাবী জানাইয়া কম যুক্তি দর্শান নাই। কিন্তু পার্লামেণ্টের অবিবেচক চিত্তে তাহা অদ্যাবধি এতটুকুও রেখাপাত করিতে দেখা যায় নাই। ভারতের স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার রেজিনাল্ড ম্যাক্স্‌ওয়েল স্পষ্টই বলিয়াছেন: ভারতে অচল অবস্থার চিহ্নমাত্র নাই। শাসনের রথ পুরাপুরিই চলিতেছে। সুতরাং ভারতের আমলাতন্ত্রের মতে অচল অবস্থা দূর করিবার প্রশ্নই উঠে না।

ম্যাক্স্‌ওয়েল সাহেবের এ কথা মিঃ চার্চ্চিল-আমেরীর কথারই প্রতিধ্বনিমাত্র, তাহাতে ক্ষুব্ধ হইবার কিছু নাই। কিন্তু সমগ্র দেশের বিশিষ্ট জনমতকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদের এই যে অটল শাসন-চক্র, তাহাতে একদিন অবশ্যই মরিচা পড়িয়া আসিবে। সেদিন কি মিঃ চার্লস্ হোয়াইট্, মিঃ সোরেন সেন প্রভৃতির কথা বৃটিশ-সরকার পুনরায় একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন? পৃথিবী ক্রমান্বয়ে বার্দ্ধক্যের পথে চলিয়াছে। সম্ভবতঃ তখন আর সময় থাকিবে না।

মিঃ চার্লস্ হোয়াইটকে ভারতবাসীর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

প্যালেষ্টাইন সমস্যা

কিছুদিন হয় প্যালেষ্টাইন লইয়া এক কঠিন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। ইহা নতুন নয়, ইহুদিদের দাবী লইয়া বহু পূর্ব্ব হইতেই এই সমস্যা মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়া উঠে। সম্প্রতি মিশরের প্রধান মন্ত্রী নাহাস পাশা দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী জেনারেল স্মাট্‌সের নিকট ইহুদিদের বাসভূমি সম্পর্কে এক প্রতিবাদমূলক বিবৃতি জ্ঞাপন করেন। অতঃপর বিগত ৭ই মার্চ্চের কায়রো সংবাদ হইতে জানা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রী মিঃ আলেকজাণ্ডার কার্ক নাহাস পাশার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং প্যালেষ্টাইন সমস্যা সম্পর্কিত মিশরীয় স্মারকলিপির মৌখিক উত্তর প্রদান করেন। সংবাদপত্রে ইহা লইয়া তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছে। 'আহরম' সংবাদপত্রে জেনারেল স্মাটসের ঘোষণাসম্পর্কে আলোচনা করিতে যাইয়া মহমা দা লায়ালোবা লিখিয়াছেন যে, তাঁহার মতো বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে ইজরেলদের বাসভূমির উল্লেখ শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছেন। প্যালেষ্টাইন কোনোদিনই ইহুদিদের ছিল না। খৃষ্টপূর্ব্ব ১১০০ অব্দে ইহুদিরা তথাকার অধিবাসীদের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক উহা অপহরণ করে এবং খৃষ্টপূর্ব্ব ৯৩০ অব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৭০ বৎসরকাল উহা ইহুদিরা নিজেদের রাজ্য হিসাবে ভোগ করে। মিঃ লায়ালোবার প্রশ্ন হইতেছে এই যে, প্যালেষ্টাইন ন্যায়সঙ্গত ভাবে কাহাদের দ্বারা শাসিত হওয়া উচিত? যাহারা ১৪ শতাব্দী ধরিয়া তথায় বাস করিতেছে—তাহাদের, না যাহারা খৃষ্টের হাজার বৎসর পূর্ব্বে উক্ত দেশ জয় করিয়াছে—তাঁহাদের?

মহমা দা লায়ালোবা আরও খানিকটা আত্মস্থ হইয়া চিন্তা করিলে দেখিতে পারিতেন যে, বিশ্বরাষ্ট্রের গতি আজ ভিন্ন পথে চলিয়াছে। নীতি মানিয়া আজ খাস ইংরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া জাপান পর্য্যন্ত কাহাকেও ধর্ম্মের

রুদ্রাক্ষ মালা হাতে করিয়া বসিয়া থাকিলে চলে না। প্যালেষ্টাইন তো খণ্ডরাজ্য মাত্র। তবে ধর্ম্মের জয় হউক—ইহাই সর্ব্বতোভাবে অভিপ্রেত।

গণতন্ত্র-বিরোধী "পেগিং" এ্যাক্ট

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ডারবানের সংবাদে প্রকাশ, প্রাদেশিক ভারতীয় কংগ্রেসের সাম্প্রতিক অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকার ও মর্য্যাদা যদি তদানীন্তন বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, শুধু তাহা হইলেই কংগ্রেস জুডিশিয়াল কমিশনের সহিত সহযোগিতা করিতে পারেন।—কমিশনের নিকট বক্তব্য পেশ করিবার সময় নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস পূর্ণ ভোটাধিকারের উপরই বিশেষ জোর দিবেন। প্রতিনিধিগণও ভারতীয় সম্প্রদায়ের উন্নতির পরিপন্থী সর্ব্বপ্রকার দমনমূলক আইন, বিশেষ করিয়া 'পেগিং এ্যাক্ট' সংশোধন কিম্বা ঐগুলি প্রত্যাহারের দাবী উত্থাপন করিবেন। 'পেগিং এ্যাক্ট'-এর বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিবার উদ্দেশ্যে সাধারণ সভার ব্যবস্থা এবং ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত দাখিল করার ভার সম্মেলনে কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির উপর অর্পণ করা হয়। 'পেগিং এ্যাক্ট'কে মানুষের মৌলিক অধিকার সঙ্কোচক আইন এবং উহাকে গণতন্ত্রের নীতি ও কেপ্ টাউন চুক্তির বিরোধী বলিয়া বর্ণনা করিয়া ইউনিয়ান গভর্ণমেণ্টকে অবিলম্বে এই 'হীন আইন' প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পুস্তক ও আলোচনা

Enduring Success—By S. Samsher Ali, Calcutta Insurance World Office, 15, Chittaranjan Avenue, Price Rs. 5/- only.

কয়েকটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধের সমষ্টি লইয়া Enduring Success-এর পরিধি। রচনাগুলি বিশেষভাবে বীমাকারিকগণের জন্য লিখিত হইলেও উপন্যাস বা রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীর মতই পাঠকের চিত্তকে তৃপ্ত দেয়। লেখক তাঁহার জীবনের গভীর অভিজ্ঞতার বিষয় বর্ণনা করিয়া রচনার প্রতি ছত্রে মানব-জীবনের এক গভীর আদর্শ ও কৃতকার্য্যতার ভূমিকা সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহা সহজেই সকল মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিবে। মিঃ আলী ধনীর সন্তান। পিতার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়া স্বাচ্ছন্দ্য-সুখে দিন কাটাইতেন; কিন্তু অকস্মাৎ সেই ব্যবসায় নষ্ট হইল। আলী সাহেব একেবারে কপর্দ্দকহীন অবস্থায় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমান্বয়ে তিনি বীমাকারকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া উন্নতির চরম শিখরে উঠিতে সক্ষম হইলেন। Mr. R. G. Baker বলিয়াছেন যে, আজ তিনি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সফল বীমাকারক, এবং তাঁহার এই অসাধারণ উন্নতির মূল কারণ তাঁহার মানব-চরিত্র সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, উদার দৃষ্টি-ভঙ্গী এবং যে কোনো উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গভীর আন্তরিকতা।

পুস্তকে তাঁহার এই বাস্তব অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে আমরা এই গুণাবলীর সম্যক পরিচয় পাই। তাঁহার জীবনের আদর্শই হইল: Only keep your conscience clear with regard to the part you are playing, for therein is your salvation.

অতঃপর আলী সাহেব এই গ্রন্থের যদি একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন, তবে বাঙালী সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যে তাঁহার আদর্শের আরও প্রচার হইবে, তাহা স্বতঃই মনে করি।

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল।

প্রহত উপলঃ আলোকতীর্থ সিরিজ কবিতার বই। লেখক—দিলীপ দাশগুপ্ত, প্রদীপ দাশগুপ্ত, নীতিশ দাশগুপ্ত, রেবা দাশগুপ্তা। দাশগুপ্ত পাব্লিশার্স। দাম—চারি আনা মাত্র।

লজ্জাবতীর দেশঃ রূপক নাটিকা। নাট্যকার—দিলীপ দাশগুপ্ত। দীপালী গ্রন্থমালা। দাম—ছয় আনা মাত্র।

প্রহত উপলে অন্যূন চৌদ্দটি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। অধিক স্থলেই রচনা প্রাচীনতায় ও নবীনতায় মিশ্রিত। দিলীপ দাশগুপ্তের কবিতা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য রচনায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি আছে।

লজ্জাবতীর দেশে নাট্যকার প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের 'মিষ্টিক'-ভঙ্গীতে আবহ চিত্রের ও বাক্-শিল্পের অবতারণা করিয়াছেন। যুবরাজ সুমিত্র ও রাণী লজ্জাবতীর কাহিনী গ্রন্থের চাতুষ্পার্শ্বিক চরিত্রাবলীর মধ্য দিয়া পাঠকের মনে যে রসোন্মাদনার সৃষ্টি করে, তাহা বাস্তবিকই যাদুপূর্ণ। গ্রন্থ আকারে সঙ্কীর্ণ হইলেও লেখকের বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে শক্তিশালী লেখনীরও প্রশংসা করিতে হয় বটে।

শ্রীঅমূল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাসের আগে

পাঁচ হাজার বৎসর বা তার চেয়েও আগের মেসো-পটেমিয়ার প্রাচীন নগর 'সুমের' বা 'আক্কড়' এর কথা যখন শুনি, মিশরের নীল নদীর বন্যা-প্লাবিত দুই তীরে মানুষের সুশৃঙ্খল সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের পরিচয় পাই, প্রাচীন সিন্ধুর লুপ্তধারার কোলে 'মহেঞ্জদারো'র মত ভূগর্ভলীন নগর-স্তূপের সন্ধান লাভ করি, তখন মানুষের সভ্যতার প্রাচীনত্বের কথা ভেবে বিস্মিত হওয়া স্বাভাবিক। সেই সুদূর অতীতেও দেখা যায়, বর্ত্তমান নাগরিক জীবনের সমস্ত মূল বৈশিষ্ট্যেরই আভাস আছে। এখনকার মরুভূমি নয়, তখনকার ইউফ্রেটিসের উর্ব্বর উপকূলে নাতিগৌর দ্রাবিড়াত্মক 'সুমের'বাসীরা গৃহ-নির্ম্মাণ থেকে আরম্ভ ক'রে বয়ন পর্য্যন্ত অনেক বিদ্যা আয়ত্ত ক'রেছে, মৃৎ-শিল্পে তাদের নিপুণতা, সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠবের নাগাল পেয়েছে, লিপি-চিহ্নের ব্যবহার পর্য্যন্ত তাদের অজ্ঞাত নয়। তাদের লিখনের আধার অবশ্য ছিল স্থূল মাটির টালি মাত্র। কিন্তু সেই মৃৎ-ফলকে খোদিত নাতিস্ফুট লিপিই সভ্যতার প্রথম কাহিনী সংগ্রহ ক'রে রেখেছে ভাবী-কালের জন্য।

সে কাহিনীর পুরানত্ব আমাদের বিস্মিত করে বটে, কিন্তু সত্যই আমাদের সভ্যতার বয়স এমন কিছুই নয়। সৌর-মণ্ডল বা এই পৃথিবীর কল্পাতীত আয়ুর তুলনায় বল্‌ছি না। সৃষ্টি-প্রভাতের ঘন বাষ্পাচ্ছাদিত আকাশের তলায় উষ্ণ, উদ্বেলিত আদি সাগরে প্রথম যেদিন অপূর্ব্ব ঘটনা-সমাবেশে আদি প্রাণ-কলিকার আবির্ভাব হ'য়েছিল, সেই দিনকার অন্তহীন দূরত্ব স্মরণ ক'রেও নয়; জীব-জগতের বিশিষ্ট ধারা হিসাবে মানুষ যতদিন পৃথিবীতে পদার্পণ ক'রেছে, তারই হিসাবে এ সভ্যতা ক্ষণকালের; মানুষের উদ্বর্ত্তনের সুদীর্ঘ ইতিহাসের শেষের ক'টি লাইনে মাত্র এ সভ্যতার সূচনা দেখা যায়।

পৃথিবীর বর্ত্তমান রূপ ভূ-তত্ত্বের হিসাবে বেশী দিনের নয়। দুই মেরুর তুষারাবরণ নির্ম্মমভাবে অভিযান ক'রে সমস্ত পৃথিবীকে একাধিক বার মরণ-আলিঙ্গনে বেষ্টন ক'রে ধ'রেছে। আমাদের বর্ত্তমান পৃথিবী না কি শেষ-তুষার-আলিঙ্গন থেকে এখনও সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয় নি। প্রথম পৃথিবীর তুষার-বেষ্টন অপসৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষই অরণ্য ছেড়ে বেড়িয়েছিল, না অরণ্যই মানুষের আদি পূর্ব্বপুরুষকে অসহায়ভাবে ফেলে স'রে গেছল, সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে; কিন্তু অরণ্য-আবেষ্টন থেকে মুক্ত আদি-মানুষকে নাগরিক-জীবনে প্রবেশ কর্‌বার আগে, হাজার নয়, বহু অযুত বর্ষ ধ'রে যে ভবিষ্যৎ নিয়তির জন্য আর সমস্ত বন্য প্রাণীর সহচররূপে প্রস্তুত হ'তে হ'য়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে-দিনকার অতিকায় গুহা-ভল্লুক আর বিশাল অসি-দন্তী শার্দ্দূলকে এড়িয়ে বিলুপ্তপ্রায় লোমশ হস্তীর বিচরণ-ক্ষেত্রে সে তৃণভোজী পশুপালের পিছু পিছু শিকার ক'রে ফিরেছে। যে পশু-যূথকে সে মৃগয়ার জন্য অনুসরণ করেছে, তারাই ক্রমশঃ আশ্রিত হ'য়ে উঠে তাকে নিশ্চিন্ততার স্বাদের সঙ্গে সভ্যতার প্রথম সুযোগ দেবে—এ কথা তখন কে জান্‌ত?

যন্ত্র-বিজ্ঞান-মুখরিত বর্ত্তমানের মধ্যে বাস ক'রে আমরা সে সুদূর অতীতের কথা ভুল্‌তে পারি, কিন্তু আমাদের দেহ এখনও তা' ভোলে নি। সত্য কথা ব'ল্‌তে কি, এখনও এ সভ্যতাকে সে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করে নি। আদিম আরণ্য শিকারীর জীবনের ধারার সঙ্গেই এখনও তার সঙ্গতি। সভ্য-জীবনের সঙ্গে সেই জন্যে সব সময়ে তার বনিবনাও হয় না। আমাদের বৃহদন্ত্রের দীর্ঘতা এমনি ছিল, আরণ্য-জীবন ও আহার সম্বন্ধে তার অনিশ্চয়তার উপযোগী। সভ্যতার খাদ্যের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সে বদলায় নি ব'লেই অনেক সময়ে গোলযোগ বাধে, শরীরের আবর্জ্জনা যথারীতি নিষ্কাষিত হয় না, এবং বিবাদ এড়াবার জন্য আমাদের উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান ক'র্‌তে হয় বেঙ্গল ইমিউনিটির "বাই-আগার্ অয়েল" ব্যবহার করে।

BLOCKS
DESIGNS
PRINTING
SLIDES
TAGS

বর্ত্তমান কালে যুদ্ধ জয় ও ব্যবসায় উন্নতির একমাত্র উপায় সুন্দর ব্লক ও নিখুঁৎ প্রিণ্টিং

আমরা অভিজ্ঞ কারিকর দ্বারা লাইন, হাফ্‌টোন, কালার, ষ্ট্রিও, ইলেক্‌ট্রো, সেলাইড, ডিজাইন এবং কালার প্রিণ্টিং করিয়া থাকি।... ... ...

DAS GOOPTA & Co

PROCESS ENGRAVERS. COLOUR PRINTERS

PHONE B.B. 5437

DAS GOOPTA & CO

42-HURTOOKI BAGAN LANE. CALCUTTA

শিলং-সিলেট্ লাইনের টিকেট্ সমূহ আমাদের শিলং অফিস এবং সিলেট্ অফিসে পাওয়া যায়। সিলেট্ লাইনে শিলং যাইবার থ্রু টিকেট্ এ. বি. জোনের ষ্টেশন-সমূহ হইতে পাওয়া যায়। শিলং হইতে সিলেট্ লাইনে এ. বি. জোনের ষ্টেশনসমূহের থ্রু টিকেট্ শিলং অফিসে পাওয়া যায়।

দি ইউনাইটেড মোটর ট্র্যান্সপোর্ট

কোম্পানী লিমিটেড্

দি মেট্রোপলিটন্ ইন্সিওরেন্স হাউস্ লিমিটেড্

১৭, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা
চাই-ই...
শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে হ'লে প্রত্যহ ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা চাই-ই। খোলা মাঠে ব্যায়াম, বিশুদ্ধ হাওয়া ও সূর্য্যের আলো বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের পক্ষে অমূল্য সম্পদ। সেই সঙ্গে ভাল আহার্য্যও চাই। পুষ্টিকর খাদ্যে তাদের শরীর সুদৃঢ়, সবল ও কর্ম্মঠ করে সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক সৌন্দর্য্যও বাড়ায়
ঘি-ই শ্রেষ্ঠ খাদ্য
স্বাস্থ্য ও শক্তি দান করে

কে. ভি. আপ্পারাও কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ—৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

২য় খণ্ড—৫ম সংখ্যা বৈশাখ—১৩৫১ একাদশ বর্ষ

কেশের
যত্ন লইতে
ভুলিবেন না
বাথগেটের
সুগন্ধি কাষ্টর অয়েল
কেশ-প্রসাধনে শ্রেষ্ঠ।
ইহা বাবহারে—
CASTOR OIL
BEWARE OF IMITATIONS
Bathgate & Co.
CHEMISTS
CALCUTTA

বি, সরকার এণ্ড সন্স

লিমিটেড

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কারাদি এবং রৌপ্যের বাসনাদি নির্ম্মাতা

আমাদের নামের সহিত অনেকটা সামঞ্জস্য আছে, এরূপ অনেকগুলি নূতন দোকান হইয়াছে তাহার কোনটীকে আমাদের দোকান বলিয়া ভ্রম না হয় এ জন্য আমাদের দোকান "গি নি হা উ স্" নামে অভিহিত ও রেজেষ্ট্রি করা হইয়াছে। একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানাবিধ অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত থাকে এবং অর্ডার দিলেও অতি যত্নের সহিত প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। ভিঃ পিঃ পোষ্টে সর্ব্বত্র গহনা পাঠাই। পুরাতন সোনা বা রূপার বাজার-দর হিসাবে মূল্য ধরিয়া নূতন গহনা দেওয়া হয়। জগদ্ব্যাপী অর্থ-সঙ্কটপ্রযুক্ত আমাদের সমস্ত গহনারই মজুরি কম করা হইয়াছে। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

টেলিগ্রাম / ফোন — বড়বাজার

গিনি হাউস

১৩১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আমাদের আর কোন ব্রাঞ্চ দোকান নাই।

আমাদের কোন অংশীদারদিগের ভিতর কেহ পৃথক্ গহনার দোকান করেন নাই

RENOWNED JEWELLER *of* TASTE AND NOVELTY:

D. N. ROY & BROS.

Manufacturing Jewellers.

YOUR KIND PATRONAGE SOLICITED.

CATALOGUE SENT FREE ON APPLICATION.

153-5, Bowbazar Street, Calcutta.
(Near Sealdah Church)

আশ্চর্য্য ঔষধ

গাছ-গাছড়া জাত ঔষধের বিস্ময়কর ক্ষমতা

(নিষ্ফল প্রমাণ হইলে ১০০৲ টাকা খেসারত দিব)।

'পাইলস কিওর'

যন্ত্রণাদায়ক বা দীর্ঘকালের পুরাণো সর্ব্বপ্রকার অর্শ—অন্তর্ব্বলি, বহির্ব্বলি, শোণিতস্রাবী ও বলিহীন অর্শ সত্বর আরোগ্য করে। সেবনের ঔষধ মূল্য ২৲ টাকা, মলম ১৲ টাকা।

"গনোরিয়া কিওর"

পুরানো বা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক গনোরিয়া সারাইয়া হতাশ ব্যক্তিকে নবজীবন প্রদান করে। বয়স বা রোগের অবস্থা যেরূপই হউক না কেন, সর্ব্ব অবস্থায়ই কাজ দিবে। একদিনে যন্ত্রণা কমায়, পূঁজ বন্ধ করে, ঘা সারায়, প্রস্রাব সরল করে এবং প্রস্রাব সংক্রান্ত সমস্ত উপদ্রবের উপশম করে। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র

"ডেফ্‌নেস্ কীওর"

সর্ব্বপ্রকার কর্ণরোগ, শ্রবণশক্তি হানি ও ভোঁ ভোঁ শব্দের চমৎকার ঔষধ। পূঁজ পড়া ও কাণের বেদনা প্রভৃতি সারায়। শ্রবণশক্তি বাড়ায় ও শ্রবণশক্তি হানি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে। মূল্য ২৲।

"পরীক্ষিত গর্ভকারক যোগ" (বন্ধ্যাত্ব দূর করার ঔষধ)

জীবনব্যাপী বন্ধ্যাত্ব দূর করিয়া হতাশ নারীকে সন্তান দেয়। সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ, বিশেষতঃ মৃত-বৎসায় উপকার দেয় এবং সন্তান-সন্ততিকে দীর্ঘজীবি করে। এই ঔষধ ব্যবহারেচ্ছু ব্যক্তিদের রোগের বিস্তৃত বিবরণ পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। মূল্য ২৲ টাকা।

শ্বেতকুষ্ঠ ও ধবল

এই ঔষধ মাত্র কয়েকদিন ব্যবহার করিলে শ্বেতকুষ্ঠ ও ধবল একেবারে আরোগ্য হয়। যাহারা শত শত হাকিম, ডাক্তার, কবিরাজ ও বিজ্ঞাপনদাতার চিকিৎসায় হতাশ হইয়াছেন, তাহারা এই ঔষধ ব্যবহার দ্বারা এই ভয়াবহ রোগের কবলমুক্ত হউন। ১৫ দিনের ঔষধ ২॥০ টাকা

জন্ম নিয়ন্ত্রণ

জন্ম নিয়ন্ত্রণের অব্যর্থ ঔষধ। ঔষধ ব্যবহার বন্ধ করিলে পুনরায় সন্তান হইবে। মাসে ২।৩ বার এই ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে। এক বৎসরের ঔষধের দাম ২৲ টাকা। সমস্ত জীবন সন্তান বন্ধ রাখার আর এক রকমের ঔষধ ২৲ টাকা। স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয়।

স্তম্ভন পিল

সন্ধ্যায় একটী বড়ী সেবনে অফুরন্ত আনন্দ পাইবেন। ইহা হারানো পৌরুষ ফিরাইয়া আনে ও অবিলম্বে ধাতুশক্তির সৃষ্টি করে। একবার ব্যবহারে ইহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা কখনো বিস্মৃত হইবেন না। মূল্য ১৬টী বড়ি ১৲ টাক

পাকা চুল

কলপ ব্যবহার করিবেন না, আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় সুগন্ধি তৈল ব্যবহার দ্বারা পাকা চুল কৃষ্ণবর্ণ করুন। ৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত উহা বজায় থাকিবে। আপনার দৃষ্টিশক্তি বাড়িবে এবং মাথা ধরা আরোগ্য হইবে। কয়েক গাছা চুল পাকিয়া থাকিলে ২৲ টাকার শিশি ও বেশী পাকিয়া থাকিলে ৩॥০ টাকার শিশি এবং প্রায় সব চুল পাকিয়া থাকিলে ৫৲ টাকার শিশি ক্রয় করুন। নিষ্ফল হইলে দ্বিগুণ মূল্য ফেরত দিব।

আশ্চর্য্য গাছড়া

কেবলমাত্র চোখে দেখিলেই অবিলম্বে সাংঘাতিক রকমের বৃশ্চিক, বোলতা ও মৌমাছির দংশনজনিত বেদনা সারে। লক্ষ লক্ষ লোক এই ঔষধ ব্যবহারে সুফল পাইয়াছে। শত শত বৎসর রাখিয়া দিলেও ইহার গুণ নষ্ট হয় না। মূল্য—প্রতি গাছড়া ১ টাকা এবং একত্রে তিনটী ২॥০ টাকা মাত্র।

বাবু ব্রিজনন্দন সহায়, বি-এ, বি-এল, এডভোকেট, পাটনা হাইকোর্ট—আমি "বৃশ্চিক দংশন সারানোর" গাছড়া ব্যবহারে খুব ফল পাইয়াছি। একটা ছোট মূলে শত শত লোক আরোগ্য হয়। এই গাছড়া নির্দ্দোষ এবং অতি প্রয়োজনীয়। জনসাধারণের ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

বৈদ্যরাজ অখিল কিশোর রাম

আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ ভিষক-রত্ন

৫৩নং পোঃ অঃ কাটরী সরাই (গয়া)

এক চুমুকেই বোঝা যায়
সের চা

PROMPT
IN
Service

ভগ্ন স্বাস্থ্য হইতে অটুট স্বাস্থ্য
?
যদি আপনি
কল্পতরু প্রাসাদ
২২৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

প্রাণের আনন্দ
পূর্ণ স্বাস্থ্যেই
সম্ভব!
যদি আপনি
ম্যালেরিয়ার হাত
হইতে মুক্তি চান
ম্যালেরিয়ার
শ্রেষ্ঠ মহৌষধ
কল্পতরু
অমৃতান
পান করুন
কল্পতরু
আয়ুর্বেদ ভবন
কল্পতরু প্রাসাদ
২২৩, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ
কলিকাতা

Drops of Ink make Millions think
KĀJAL-KĀLI
LEADING SINCE 1924
KĀJAL-KĀLI
SPECIALLY MADE FOR ALL FOUNTAIN PEN
CHEMICAL ASSOCIATION (CAL) LTD

বঙ্গশ্রীর নিবেদন ও নিয়মাবলী

"বঙ্গশ্রী"র বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।০ টাকা। ষাণ্মাসিক ৩।০ টাকা। ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য ॥/০ আনা। মূল্যাদি—কর্ম্মাধ্যক্ষ, বঙ্গশ্রী, c/o মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, হেড অফিস—১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

আষাঢ় হইতে "বঙ্গশ্রী"র বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া চলে।

প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠিপত্র সম্পাদককে ১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হয়। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট দেওয়া না থাকিলে পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

লেখকগণ প্রবন্ধের নকল রাখিয়া রচনা পাঠাইবেন। ফেরতের জন্য ডাক-খরচা দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত লেখা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে 'বঙ্গশ্রী' প্রকাশিত হয়। যে-মাসের পত্রিকা, সেই মাসের ১০ তারিখের মধ্যে তাহা না পাইলে স্থানীয় ডাক-ঘরে অনুসন্ধান করিয়া তদন্তের ফল আমাদিগকে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে না জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে আমরা বাধ্য থাকিব না।

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ও সিকি পৃষ্ঠা যথাক্রমে ২০৲, ১১৲, ৬৲। বিশেষ স্থানের হার পত্র লিখিলে জানানো হয়।

বাংলা মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পুরাতন বিজ্ঞাপনের কোনও পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশ না আসিলে পরবর্ত্তী মাসের পত্রিকায় তদনুসারে কার্য্য করা যাইবে না। চলতি বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলে ঐ তারিখের মধ্যেই জানানো দরকার।

স্বপ্নের আবেশ
রঞ্জোর ক্যাষ্টর অয়েল
ফ্রাঙ্ক রস্ এণ্ড কোং লিঃ
কলিকাতা

শ্রীশ্রীচণ্ডী শিল্পী—শ্রী রেণুকা কর

১১শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

বিষয়-সূচী

বৈশাখ- -১৩৫১

বিষয়-সূচী—২৫ পৃষ্ঠার পর

চিত্র-সূচী

বৈশাখ, ১৩৫১
১১শ বর্ষ—২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

"দুর্গা-পূজা"র প্রয়োজনীয়তা

ভট্টাচার্য্য

(৬)

কার্য্যকারণের শৃঙ্খলাযুক্ত বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়-বস্তু

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত

কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান সংগঠন করিলে এবং কোন্ কোন্ অনুষ্ঠান সাধন করিলে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয় তাহার আলোচনা করা আমাদিগের বর্ত্তমান আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমাদিগের বর্ত্তমান আলোচনা **চারিভাগে** বিভক্ত হইবে।

সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া যাহাতে স্বতঃসিদ্ধ হয় তাহা করিতে হইলে প্রধানতঃ যে যে প্রতিষ্ঠান সংগঠন করা এবং যে যে অনুষ্ঠান সাধন করা একান্ত-ভাবে প্রয়োজনীয় হয়, সেই সেই প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের বর্ণনা আমরা এই আলোচনার **প্রথমভাগে** বিবৃত করিব।

সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া যাহাতে স্বতঃসিদ্ধ হয় তাহা করিতে হইলে প্রধানতঃ যে যে প্রতিষ্ঠান সংগঠন করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয় সেই সেই প্রতিষ্ঠানের সংগঠনসমূহের ব্যাখ্যা থাকিবে এই আলোচনার **দ্বিতীয়ভাগে**।

সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া যাহাতে স্বতঃসিদ্ধ হয় তাহা করিতে হইলে প্রধানতঃ যে যে অনুষ্ঠান সাধন করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয় সেই সেই অনুষ্ঠান সাধন করিবার সঙ্কেতসমূহের কথা বিবৃত হইবে এই আলোচনার **তৃতীয়ভাগে**।

সমগ্র মনুষ্য সমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া যাহাতে স্বতঃসিদ্ধ হয় তাহা করিতে হইলে প্রধানতঃ যে যে অনুষ্ঠান সাধন করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয় সেই সেই অনুষ্ঠান সাধন করিতে হইলে যে যে বিধি ও নিষেধ পালন করিবার আবশ্যক হয় সেই সেই বিধি ও নিষেধের কথা বিবৃত হইবে এই আলোচনার **চতুর্থভাগে**।

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের——

প্রথমভাগ

সমগ্র মনুষ্য সমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বোতোভাবে পূরণ হওয়া যাহাতে স্বতঃসিদ্ধ হয় তাহা করিতে হইলে **ছয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান-এর** প্রয়োজন হয়, যথা :—

(১) **"কেন্দ্রীয় মহাসভা"** নামক প্রতিষ্ঠান। ইহা সমগ্র মনুষ্যসমাজের সমগ্র জনসাধারণের প্রত্যেকের প্রতিনিধিগণের এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধারকগণের মিলিত প্রতিষ্ঠান ;

(২) **"দেশীয় জন-সভা"** নামক প্রতিষ্ঠান। ইহা প্রত্যেক দেশের সমগ্র জনসাধারণের প্রত্যেকের প্রতিনিধিগণের এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধারকগণের মিলিত প্রতিষ্ঠান ;

(৩) **"গ্রাম্য জন-সম্মেলন"** নামক প্রতিষ্ঠান। ইহা প্রত্যেক গ্রামের জনসাধারণের প্রত্যেকের প্রতিনিধিগণের মিলিত প্রতিষ্ঠান ;

(৪) **"গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য প্রতিষ্ঠান"**। প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ অভাবের আশঙ্কার বীজ নির্ম্মূল করিয়া প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা স্বতঃসিদ্ধ হয় তাহা করিতে হইলে যে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন প্রত্যেক গ্রামে করিবার প্রয়োজন হয় সেই সেই অনুষ্ঠানের সমন্বয়ের নাম "গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য প্রতিষ্ঠান" ;

(৫) **"গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের তত্ত্বাবধারণের প্রতিষ্ঠান"**। গ্রামস্থ সামাজিক উপরোক্ত অনুষ্ঠানসমূহ যাহাতে নিয়মিতভাবে পরিচালিত হয় তাহা করিবার জন্ম গ্রামস্থ সামাজিক তত্ত্বাবধারকগণ মিলিত হইয়া যে প্রতিষ্ঠানের রচনা করিয়া থাকেন সেই প্রতিষ্ঠানের নাম "গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের তত্ত্বাবধারণের প্রতিষ্ঠান"।

(৬) **"গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান"**। গ্রামস্থ সামাজিক তত্ত্বাবধারকগণের কার্য্য যাহাতে নিয়মিতভাবে নির্ব্বাহ করা হয় তাহা করিবার জন্ম প্রত্যেক গ্রামের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মিগণের মিলনে যে প্রতিষ্ঠানের রচনা করিবার প্রয়োজন হয় সেই প্রতিষ্ঠানের নাম "গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান"।

উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের কোন্‌টীর দ্বারা কি কি অনুষ্ঠান সাধিত হইয়া থাকে, কোন্ শ্রেণীর অনুষ্ঠানে কোন্ শ্রেণীর গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তিযুক্ত মানুষ নিযুক্ত হইয়া থাকেন, কোন্ কোন্ শ্রেণীর শিক্ষায় মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীর গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি অর্জ্জন করিয়া থাকেন এবম্বিধ কথাগুলি জানা না থাকিলে উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের কার্য্য দ্বারা যে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছার সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয় তাহা বুঝা যায় না। তাহা ছাড়া, উপরোক্ত কথাগুলি জানা না থাকিলে, উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের কোন্‌টীর যে কি কি দায়িত্ব, কোন্‌টী যে কোন্ পন্থায় গঠিত ও রক্ষিত হয় এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সংশ্রব ও পার্থক্য যে কি কি—তাহাও বুঝা যায় না। উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের কোন্‌টীর যে কি কি দায়িত্ব, কোন্‌টী যে স্বতঃই কোন্ পন্থায় গঠিত ও রক্ষিত হইতে পারে, উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের পরস্পরের মধ্যে সংশ্রব ও পার্থক্য যে কি কি, এবং উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের গঠন ও রক্ষা করিবার ব্যবস্থা সাধিত হইলে যে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়, এবম্বিধ-কথার ব্যাখ্যা করিতে হইলে যে যে কথার আলোচনা করার প্রয়োজন হয় সেই সমস্ত কথার প্রত্যেকটী আমরা একে একে আলোচনা করিব।

সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা যাহাতে স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহা করিতে হইলে উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের কোন্‌টীর দ্বারা কোন্ কোন্ অনুষ্ঠান সাধিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহার কথা আমরা অতঃপর আলোচনা করিব। উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের কোন্‌টীর দ্বারা কোন্ কোন্ অনুষ্ঠান সাধিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহার কথা জানা থাকিলে উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের কোন্‌টীর যে কি কি দায়িত্ব তাহা অনায়াসে বুঝা যায়।

পাঠকগণকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঐ ছয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সংগঠন যে কোন্ কোন্ পন্থায় সাধন করা যাইতে পারে, তাহার কথা আমরা এই আলোচনার প্রথম ভাগে ব্যাখ্যা করিব না। উহা আমাদের এই আলোচনার দ্বিতীয় ভাগে বিবৃত করিব।

সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা যাহাতে স্বতঃসিদ্ধ হয় তাহা করিবার উদ্দেশ্যে—উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের কোন্‌টীর দ্বারা কোন্ কোন্ অনুষ্ঠান সাধিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হয় তাহার কথা আলোচনা করিতে হইলে, সর্ব্বসমেত কয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধিত হইলে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা স্বতঃসিদ্ধ হয়—তাহার কথা পরিজ্ঞাত হইতে হয়।

সর্ব্বসমেত কয়শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধিত হইলে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা স্বতঃসিদ্ধ হয় তাহা ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে গত ফাল্গুন ও চৈত্রের সংখ্যায় আমরা **চারিশ্রেণীর ব্যবস্থা** সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, যথা :

(১) সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যার সর্ব্ববিধ ইচ্ছার পূরণ করিতে হইলে যে যে দ্রব্য যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হয়, সেই সেই দ্রব্য সেই সেই পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ার যাহাতে কোন বাধা না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা ;

(২) প্রত্যেক মানুষ যে সমস্ত পদার্থ অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন সেই সমস্ত পদার্থের কোনটী অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির অভাব যাহাতে কোন মানুষের না হয় তাহার ব্যবস্থা ;

(৩) প্রত্যেক মানুষ যে সমস্ত পদার্থ অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত পদার্থের প্রত্যেকটী অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রাচুর্য্য যাহাতে প্রত্যেক মানুষের হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা ;

(৪) সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যার সর্ব্ববিধ ইচ্ছার পূরণ করিতে হইলে যে যে দ্রব্য যে যে পরিমাণে প্রয়োজন হয়, সেই সেই দ্রব্য সেই সেই পরিমাণে যাহাতে উৎপন্ন হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা।

উপরোক্ত চারি শ্রেণীর ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় আলোচনায় যে যে কথা বলা হইয়াছে, সেই সেই কথা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যার সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান যাহাতে সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক অংশে সাধিত হয়—তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়।

সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যার সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে প্রধানতঃ যে তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান যাহাতে সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক অংশে সাধিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়, সেই **তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠানের নাম—**

(১) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধন-প্রাচুর্য্য সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ;

(২) মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্ম-ব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ;

(৩) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ।

(১)
মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ

এই সমস্ত অনুষ্ঠান, প্রধানতঃ, সাতাশ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা:—

(১) খাল খনন ও রক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ;১

(২) স্থলপথ নির্ম্মাণ ও রক্ষাবিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ;

(৩) জলযান পরিচালনা-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ;

(৪) স্থলযান পরিচালনা-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ;

(৫) বন ও বাগান-নির্ম্মাণ ও রক্ষা-বিষয়ক অনুষ্ঠান-সমূহ।২

(৬) বনজাত উদ্ভিদাদি উৎপাদন ও রক্ষা-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ;

(৭) বাগানজাত উদ্ভিদাদি উৎপাদন ও রক্ষা-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ;

(৮) পশুপালন বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ।৩

১। খাল-খননের প্রয়োজন, প্রধানতঃ, চারি শ্রেণীর, যথা:—
(১) জমি, জল ও হাওয়ার সমতা ও উৎপাদিকা-শক্তি রক্ষা করা;
(২) যাতায়াত আরামপ্রদ ও সুগম করা;
(৩) ধৌত জল ও মল-নিকাশের রাস্তা প্রস্তুত করা;
(৪) মৎস্য, ঝিনুক প্রভৃতি জলজাত দ্রব্যের সঞ্চয় করা।

২। নয় শ্রেণীর প্রয়োজন সাধন করা, বন ও বাগান নির্ম্মাণ ও রক্ষা-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যথা:—
(১) গৃহপালিত পশু ও পক্ষীগণের স্বাস্থ্য বজায় রাখা,
(২) স্বাস্থ্যপ্রদ ফল-মূলাদির উৎপাদন করা;
(৩) ঔষধাদি প্রস্তুত করিবার লতা-গুল্মাদি উৎপাদন করা;
(৪) উপভোগের গন্ধ ও বর্ণ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার কাঁচা মাল উৎপাদন করা,
(৫) বাসভবনের দরজা-জানালা প্রভৃতি উপকরণের কাঁচা মাল উৎপাদন করা
(৬) যান-বাহনের উপকরণের কাঁচা মাল উৎপাদন করা,
(৭) বিশুদ্ধ পানীয়জলাশয়ের রক্ষা করা,
(৮) কাগজ-কলমাদি উপকরণের কাঁচা মাল উৎপাদন করা,
(৯) শ্রমক্লিষ্ট মানুষের বিশ্রামস্থানের ব্যবস্থা করা।

৩। প্রধানতঃ, আট শ্রেণীর প্রয়োজন সাধন করা পশুপালন-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যথা:—
(১) পশুগণের দ্বারা কৃষি, শিল্প ও গমনাগমনের প্রয়োজন সাধন করা;
(২) পশুগণের মাংসের দ্বারা মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন সাধন করা;
(৩) পশুগণের দুগ্ধ দ্বারা মানুষের পানীয় ও স্নেহ দ্রব্যাদির প্রয়োজন সাধন করা,
(৪) পশুগণের যকৃৎ-পিত্তাদি হইতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন সাধন করা;

(৯) পক্ষীপালন-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ।৪

(১০) কীট-পতঙ্গ-সরীসৃপ পালন বিষয়ক অনুষ্ঠান-সমূহ।৫

(১১) ভবন-নির্ম্মাণ ও রক্ষা-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ।৬

(১২) মল ও ধৌত জল নিকাশের পথ নির্ম্মাণ, রক্ষা ও পরিচালনা-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ;

(১৩) পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা, নির্ম্মাণ ও পরিচালনা-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ;

(১৪) গমনাগমনের পথ আলোকিত রাখিবার কার্য্য-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ;

(১৫) গমনাগমনের পথ পরিষ্কৃত রাখিবার কার্য্য-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ;

(১৬) প্রতারণা, চৌর্য্য, লুণ্ঠন, লাম্পট্য প্রভৃতির আশঙ্কা নিবারণ-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ;

(১৭) বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষিকার্য্য-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ;

(১৮) বিভিন্ন শ্রেণীর খনিজ কার্য্য-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ;

(১৯) বিভিন্ন শ্রেণীর জলজাত দ্রব্য উৎপাদন ও সংগ্রহ-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ;

(২০) বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পকার্য্য-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ;

(২১) বিভিন্ন শ্রেণীর কারুকার্য্য-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ;

(২২) ক্রয়-বিক্রয়-স্থল পরিচালনা-বিষয়ক অনুষ্ঠান-সমূহ;

(২৩) বিবিধ শ্রেণীর কাঁচামাল, শিল্পজাত মাল, কারু-কার্য্য-জাত মাল, ক্রয়-বিক্রয় করিবার কার্য্য-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ।৭

(২৪) পরিচর্য্যা করিবার কার্য্যবিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ;

(২৫) মানুষের পরস্পরের সংবাদ আদান-প্রদানের অনুষ্ঠানসমূহ।৮

(২৬) বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন বিষয়ক সংবাদ প্রচার করিবার অনুষ্ঠানসমূহ।৯

(২৭) অবশ্য প্রয়োজনীয় ধননীতি-বিষয়ক কতিপয় কথার প্রচার ও তদ্বিষয়ক পরিদর্শন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ।

ধননীতির প্রচার ও পরিদর্শন-বিষয়ক উপরোক্ত অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা:

(১) একান্ত প্রয়োজনীয় এবং অবশ্য পালনীয় ধননীতি বিষয়ক আটটী সূত্রের প্রচার কার্য্য;

(২) উপরোক্ত আটশ্রেণীর প্রচারের যাহা যাহা উদ্দেশ্য তাহার কোনটী যাহাতে কোন মানুষ উপেক্ষা করিতে প্রবৃত্তিশীল না হন অথবা না হইতে পারেন, তাহা পরিদর্শনের কার্য্য।

একান্ত প্রয়োজনীয় এবং অবশ্য পালনীয় ধননীতি-বিষয়ক যে আটটী সূত্রের প্রচার করিতে হয়, সেই আটটী সূত্রের প্রচার কার্য্যের নাম—

(১) ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিতে হইলে প্রত্যেক গ্রামে প্রধানতঃ যে সপ্তবিংশতি শ্রেণীর সামাজিক কার্য্যের প্রয়োজন হয় সেই সপ্তবিংশতি শ্রেণীর কার্য্য যথাসম্ভব সমান ভাবে না চালাইয়া অসমান ভাবে চালাইবার দুষ্টতা সম্বন্ধে প্রচার কার্য্য;

---

[৫] পশুগণের শৃঙ্গাদি ও অস্থি প্রভৃতি হইতে শিল্পদ্রব্যের প্রয়োজন সাধন করা,

[৬] পশুগণের রোম হইতে পশম প্রভৃতির প্রয়োজন সাধন করা;

[৭] পশুগণের চর্ম্ম হইতে পাদুকা প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্যের কাঁচামাল উৎপাদন করা;

[৮] পশুগণের চর্ব্বি হইতে ঔষধ ও আলোকের কাঁচামাল উৎপাদন করা।

৪। প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর প্রয়োজন সাধন করা পক্ষীপালন বিষয়ক অনুষ্ঠান সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যথা:—

[১] ঔষধ প্রস্তুত করা,

[২] খাদ্যরূপে ব্যবহার করা;

[৩] রোমাদি পশম প্রভৃতি শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন করা।

৫। প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর প্রয়োজন সাধন করা কীট-পতঙ্গ-সরীসৃপ পালনবিষয়ক অনুষ্ঠান সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যথা:—

[১] বিভিন্ন শ্রেণীর পশমাদির কাঁচামাল উৎপাদন করা;

[২] বিভিন্ন শ্রেণীর ঔষধ প্রস্তুত করা,

[৩] সরীসৃপের চর্ম্ম হইতে বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের কাঁচামাল উৎপাদন করা।

৬। ভবন প্রধানতঃ সাত শ্রেণীর হইয়া থাকে, যথা:—

[১] বাসভবন,

[২] ক্রীড়া-ভবন;

[৩] আমোদপ্রমোদ ভবন,

[৪] শিক্ষা-ভবন;

[৫] শিল্প-ভবন;

[৬] কৃষি-শিল্পাদি কার্য্য-পরিচালনা-ভবন;

[৭] ক্রয়-বিক্রয়-ভবন।

৭। বিভিন্ন শ্রেণীর মাল ক্রয়বিক্রয় করিবার কার্য্য প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা:—

[১] তরল ও স্থূল দ্রব্যসমূহের গুরুত্ব ও লঘুত্ব পরিমাণ করিবার পরিমাপক কাঠি (weighing units) নির্দ্ধারণ করিবার কার্য্য,

[২] ক্রয়-বিক্রয় করিবার মুদ্রা নির্দ্ধারণ করিবার কার্য্য;

[৩] বিভিন্ন তরল ও স্থূল দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার কার্য্য;

[৪] বিভিন্ন তরল ও স্থূল দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিবার শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্য।

৮। ডাক বিভাগ, তার বিভাগ এবং বেতার বিভাগ এই সমস্ত অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত।

৯ সংবাদ-পত্র পরিচালন এই সমস্ত অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত।

(২) প্রত্যেক গ্রামের সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যার প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিবার জন্য যে যে দ্রব্য যে যে পরিমাণে উৎপাদন করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সেই দ্রব্য যাহাতে সেই সেই পরিমাণে গ্রামের মধ্যে উৎপন্ন হয় এবং অন্য কোন গ্রামের মুখাপেক্ষী হইতে না হয় তাহার জন্য প্রযত্নশীল না হওয়ার দুষ্টতা সম্বন্ধে প্রচার-কার্য্য ;

(৩) যে যে দ্রব্য গ্রামের মধ্যে উৎপন্ন হয় সেই সেই দ্রব্যের দ্বারা যাহাতে গ্রামবাসিগণের সর্ব্ববিধ উপভোগের অভিলাষ পরিতৃপ্ত হয় তাহার জন্য প্রযত্নশীল না হইয়া, অন্যান্য গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল হওয়ার দুষ্টতা সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য ;

(৪) একই শ্রেণীর শ্রমের[১০] পারিশ্রমিক হার বিভিন্ন কার্য্যে সমান না হইয়া অসমান হওয়ার দুষ্টতা সম্বন্ধে প্রচার কার্য্য ;

(৫) কোন শ্রেণীর শ্রমিকের পারিশ্রমিক হার ঐ শ্রেণীর শ্রমিকের সর্ব্ববিধ প্রয়োজন নির্ব্বাহ পক্ষে অপ্রচুর হওয়ার দুষ্টতা সম্বন্ধে প্রচার কার্য্য ;

(৬) যে-শ্রেণীর দ্রব্য মানুষের তৃপ্তি অথবা স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে অক্ষম পরন্তু অতৃপ্তির অথবা অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়া থাকে, সেই শ্রেণীর দ্রব্য উৎপাদন করিবার দুষ্টতা সম্বন্ধে প্রচার-কার্য্য ;

(৭) উপার্জ্জনযোগ্য বয়সপ্রাপ্ত প্রত্যেক মানুষ যাহাতে সাত শ্রেণীর শ্রমের কোন না কোন শ্রেণীর শ্রমে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকার্জ্জনের জন্য প্রযত্নশীল হন্ এবং শ্রমের দ্বারা উপার্জ্জন ছাড়া যাহাতে ধনের দ্বারা কোন ধন উপার্জ্জন সম্ভবযোগ্য না হয় তাহা না করিবার দুষ্টতা সম্বন্ধে প্রচার-কার্য্য ;

(৮) মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ উৎপাদনের জন্য যে-সমস্ত কার্য্যধারার আশ্রয় লওয়া হয় সেই সমস্ত কার্য্যধারার কোনটী যাহাতে ঐ সমস্ত কার্য্যধারার উৎপন্ন দ্রব্যের কোনটীর কাঁচা মালে স্বাভাবিক গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উৎকর্ষকারিতার অপহারক না হয় এবং জমি অথবা জল অথবা বাতাসের অসমতা অথবা বিষমতা সাধক না হয়, তৎসম্বন্ধে সতর্ক না হওয়ার দুষ্টতা সম্বন্ধে প্রচার।

যে-সমস্ত অনুষ্ঠান সাধন করিলে মানুষের ধনাভাব নিবারিত হইয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধিত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়—সেই সমস্ত অনুষ্ঠান প্রধানতঃ সপ্তবিংশতি শ্রেণীতে বিভক্ত বটে ; কিন্তু ঐ সাতাশ শ্রেণীর অনুষ্ঠান পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, অসংখ্য শ্রেণীর অনুষ্ঠান ঐ সাতাশ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। শিল্পকার্য্য-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ, কারুকার্য্য-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ, ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য্য-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ মূলতঃ এক একটী শ্রেণীর বটে ; কিন্তু, কার্য্যতঃ, যে অসংখ্য শ্রেণীর তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

ভূমণ্ডলের প্রত্যেক অংশে যতশ্রেণীর কাঁচামাল উৎপাদন করা স্বভাবতঃ সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, মানুষ যদ্যপি জমি, জল ও হাওয়ার স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি ও উৎপাদিকা-প্রবৃত্তি রক্ষা করিয়া, শৃঙ্খলিতভাবে তত শ্রেণীর কাঁচামাল উৎপাদন করিবার জন্য প্রযত্নশীল হয় এবং ঐ কাঁচামাল-সমূহ হইতে যত শ্রেণীর শিল্প, কারুকার্য্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য্য চলিতে পারে, তত-শ্রেণীর শিল্প, কারুকার্য্য ও ক্রয়-বিক্রয় কার্য্য চালু রাখিবার ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে এই ভূমণ্ডলের কোন অংশেই বেকার অথবা ধনাভাবের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব হয়। পরন্তু ভূমণ্ডলের প্রত্যেক অংশে প্রত্যেক মানুষের কর্ম্মব্যস্ততা এবং ধনপ্রাচুর্য্য অনিবার্য্য হইয়া থাকে।

———

(২)

মানুষের অলস ও বেকার-জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জন-শীল জীবন সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ

এই অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ, সাত শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা :—

(১) দশ বৎসরের উর্দ্ধ-বয়স্কা এবং তের বৎসরের অনূর্দ্ধ-বয়স্কা বালিকাগণের গৃহিণীপনা শিক্ষা-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(২) পনর বৎসরের উর্দ্ধ-বয়স্ক এবং আঠার বৎসরের অনূর্দ্ধ-বয়স্ক বালকগণের সামাজিক-কার্য্যের চতুর্থ

---

[১০] উপার্জ্জনের যোগ্যতাযুক্ত শ্রম প্রধানতঃ আট শ্রেণীর, যথা :—
(১) কেন্দ্রীয় মহাসভার রাষ্ট্রকার্য্যের শ্রম ;
(২) দেশীয় জনসভার রাষ্ট্র-কার্য্যের শ্রম ;
(৩) গ্রামস্থ রাষ্ট্রকার্য্যের শ্রম ;
(৪) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের তত্ত্বাবধারণের শ্রম ;
(৫) গ্রামস্থ সামাজিক প্রথম শ্রেণীর কার্য্যের শ্রম ,
(৬) গ্রামস্থ সামাজিক দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্য্যের শ্রম .
(৭) গ্রামস্থ সামাজিক তৃতীয় শ্রেণীর কার্য্যের শ্রম ;
(৮) গ্রামস্থ সামাজিক চতুর্থ শ্রেণীর কার্য্যের শ্রম।

শ্রেণীর শ্রমযোগ্যতা শিক্ষা-বিষয়ক এবং চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমযোগ্য কর্ম্মে নিয়োগ-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৩) আঠার বৎসরের উর্দ্ধ-বয়স্ক পুরুষগণের মধ্যে যাঁহারা সামাজিক-কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর শ্রম-যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার উপযুক্ত, তাঁহাদিগের ঐ তৃতীয়-শ্রেণীর শ্রমযোগ্যতা শিখাইবার এবং তৃতীয়-শ্রেণীর শ্রম-সাধ্য কর্ম্মে নিয়োগ করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৪) ত্রিশ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক পুরুষগণের মধ্যে যাঁহারা সামাজিক তৃতীয় শ্রেণীর কার্য্যের ন্যূনপক্ষে আট বৎসরের অভিজ্ঞতাযুক্ত এবং যাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমযোগ্যতা অর্জ্জন করিবার উপযুক্ত, তাঁহাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমযোগ্যতা শিখাইবার এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমসাধ্য কর্ম্মে নিয়োগ করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৫) চল্লিশ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক পুরুষগণের মধ্যে যাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর সামাজিক কার্য্যে অন্ততঃপক্ষে আট বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং প্রথম শ্রেণীর শ্রমযোগ্যতা অর্জ্জন করিবার উপযুক্ত তাঁহাদিগকে ঐ প্রথমশ্রেণীর শ্রমযোগ্যতা শিখাইবার এবং প্রথম শ্রেণীর শ্রমসাধ্য-কর্ম্মে নিয়োগ করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৬) পঞ্চাশ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক পুরুষগণের মধ্যে যাঁহারা প্রথম শ্রেণীর সামাজিক কার্য্যে ন্যূনপক্ষে আট বৎসরের অভিজ্ঞতাযুক্ত এবং সামাজিক কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ-সম্বন্ধীয় শ্রমযোগ্যতা অর্জ্জন করিবার উপযুক্ত, তাঁহাদিগকে সামাজিক কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ সম্বন্ধীয় শ্রমযোগ্যতা শিখাইবার এবং সামাজিক কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ-কর্ম্মে নিয়োগ করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৭) ষাট বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক পুরুষগণের মধ্যে যাঁহারা সামাজিক কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ কর্ম্মে ন্যূনপক্ষে আট বৎসরের অভিজ্ঞতাযুক্ত এবং রাষ্ট্রীয় কার্য্যের শ্রমযোগ্যতা অর্জ্জন করিবার উপযুক্ত, তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রীয় কার্য্যের শ্রমযোগ্যতা শিখাইবার এবং রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে নিয়োগ করিবার অনুষ্ঠানসমূহ।

সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক অংশে যখন ধনাভাব নিবারণ করিবার ও ধন প্রাচুর্য্য সাধন করিবার সাতাশ শ্রেণীর অনুষ্ঠান নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থা থাকে, তখন উপরোক্ত সাত শ্রেণীর অনুষ্ঠানসমূহ যথাযথ ভাবে সাধিত হইলে যে মানুষের অলস ও বেকার-জীবনের আশঙ্কা দূর হইয়া যায় এবং কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন অনিবার্য্য হয়, তাহা সহজাত বুদ্ধিদ্বারাও বুঝিতে পারা যায়। শুধু যে কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন অনিবার্য্য হয় তাহা নহে, সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষ খুব উচ্চ ধরণের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া থাকেন এবং উচ্চস্তরের চরিত্রে চরিত্রবান্ হইয়া থাকেন। আমাদিগের এই কথা যে যুক্তিযুক্ত তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে হইলে, বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষা-ব্যবস্থাতে কোন্ কোন্ বিষয়ে শিখান হয় তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের অলস ও বেকার জীবন দূর করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন স্বতঃসিদ্ধ করিবার জন্য যে যে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব যাহাতে স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহা করিবার জন্য কি কি অনুষ্ঠান সাধন করা হইয়া থাকে তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়।

(৩)

মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ

এই সমস্ত অনুষ্ঠান প্রধানতঃ বার শ্রেণীর, যথা :

(১) তরুণ ও তরুণীগণের বিবাহ-বিষয়ক অনুষ্ঠান-সমূহ।

এই অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে সাত শ্রেণীর অনুষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যথা :

(ক) প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্কা তরুণী ও সপ্তদশ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক যুবক পরস্পরের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির যোগ্যতানুসারে যোগ্যভাবে বিবাহের সম্বন্ধে যাহাতে মিলিত হন, তদ্বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(খ) কোন চতুর্দ্দশ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্কা তরুণী এবং দ্বাবিংশতি বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক যুবক যাহাতে অবিবাহিতা অথবা অবিবাহিত না থাকেন, তাহা সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(গ) দ্বাদশ বৎসরের নিম্নবয়স্কা কোন তরুণী ও সপ্তদশ বৎসরের নিম্নবয়স্ক কোন তরুণ যাহাতে বিবাহিতা অথবা বিবাহিত না হইতে পারেন অথবা না হন, তদ্বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(ঘ) গ্রামের মধ্যে কুত্রাপি যাহাতে কোন পৈশাচিক প্রবৃত্তি, যথেচ্ছ অথবা অসবর্ণ-বিবাহ অথবা যৌন-সম্বন্ধ না হইতে পারে, তাহা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(ঙ) প্রত্যেক বিবাহিতা তরুণী ও বিবাহিত যুবক যাহাতে বিবাহের সময় পরস্পরের প্রতি অবশ্য কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য সম্বন্ধে এবং বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য সম্বন্ধে কার্য্য-কারণের যুক্তি সহকারে

আদ্যোপান্ত স্বভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন এবং স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ঐ সমস্ত কর্ত্তব্য করেন এবং অকর্ত্তব্য না করেন তাহা শিখাইবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(চ) বিবাহিত জীবনে যাহাতে যুবতী ও যুবকগণের কাম-প্রবৃত্তি কখনও অতৃপ্ত অথবা অসংযত হইতে না পারে, তজ্জন্য যে সমস্ত আবয়বিক ও রাসায়নিক কার্য্য করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা যাহাতে প্রত্যেক যুবক-যুবতী শিখিতে ও অভ্যাস করিতে পারেন, তাহা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(ছ) প্রত্যেক বিবাহিত যুবক ও বিবাহিতা তরুণীকে গর্ভাশয়, গর্ভধারণ, প্রসব, গর্ভাবস্থায় কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(২) **গর্ভধারণযোগ্যা তরুণীগণের গর্ভাশয় যাহাতে কোনরূপে বিকৃত না হইতে পারে ও না হয় তদুদ্দেশ্যে তাঁহাদিগের গর্ভাশয়-সম্বন্ধীয় আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানসমূহ ;**

(৩) **গর্ভিণীগণের গর্ভস্থ শিশু যাহাতে কোনরূপ বিকৃত না হইতে পারে এবং না হয় এবং প্রসবে কোনরূপ ক্লেশ না হইতে পারে ও না হয়, তদুদ্দেশ্যে গর্ভস্থ শিশু-সম্বন্ধীয় আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানসমূহ। গর্ভস্থ শিশু সম্বন্ধীয় আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানসমূহ দুই শ্রেণীর, যথা :—**

(ক) গর্ভাশয়স্থিত বায়বীয় অবস্থা যখন শিশু-শরীরে বাষ্পীয় তরল ও স্থূল অবস্থায় পরিণতি লাভ করিতে আরম্ভ করে, তখন শিশুর শরীর যাহাতে কোনরূপ ব্যাধিগ্রস্ত না হইতে পারে, অথবা ভবিষ্যৎকালে কোনরূপ বৈকৃতিক ইচ্ছার অথবা অভিমান প্রবৃত্তির উৎপাদক না হইতে পারে, অথবা প্রসবকালে প্রসূতির কোনরূপ ক্লেশপ্রদ না হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানসমূহ ;

(খ) গর্ভস্থ শিশুর শরীরের অস্থিসমূহ এবং ইন্দ্রিয়সমূহ যখন শক্তিযুক্ত হইতে আরম্ভ করে, তখন শিশুর শরীর যাহাতে কোনরূপ ব্যাধিগ্রস্ত না হইতে পারে, অথবা ভবিষ্যৎকালে কোনরূপ বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমান প্রবৃত্তির উৎপাদক না হইতে পারে, অথবা প্রসবকালে প্রসূতির কোনরূপ ক্লেশপ্রদ না হইতে পারে, তজ্জন্য প্রয়োজনীয় আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৪) **এক বৎসরের অনধিকবয়স্ক শিশুগণের শরীর যাহাতে কোনরূপ ব্যাধিগ্রস্ত না হয়, অথবা ভবিষ্যৎকালে বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমান-প্রবৃত্তির আধার না হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে এক বৎসরের অনধিকবয়স্ক শিশুগণের পালন-সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানসমূহ। এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুগণের পালনসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানসমূহ পাঁচ শ্রেণীর, যথা :—**

(ক) এক বৎসরের অনধিক-বয়স্ক শিশুগণের পালন সম্বন্ধে তাহাদিগের মাতা-পিতাগণের যাহা যাহা জানিবার ও শিখিবার প্রয়োজন, তাহা যাহাতে প্রত্যেক গ্রামস্থ এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক প্রত্যেক শিশুর প্রত্যেক পিতা-মাতা জানিতে পারেন এবং করিতে পারেন তাহা শিখিবার ও অভ্যাস করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(খ) ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরে নূতন আকাশ-বাতাসের সহিত সংস্রব বশতঃ শিশুগণের শরীরে ব্যাধির, বৈকৃতিক ইচ্ছার এবং অভিমান-প্রবৃত্তির যে সমস্ত আশঙ্কা থাকে—সেই সমস্ত আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য যে সমস্ত আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্মের প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্ম করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(গ) কোন শ্রেণীর খাদ্য, পানীয় ও চালচলন কোন শিশুর শৈশব অবস্থায় অথবা ভবিষ্যৎকালে হিতকারী অথবা অহিতকারী তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে প্রত্যেক শিশুর রূপ, শক্তি ও প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে যে বিষয় যে যে প্রণালীতে পর্য্যবেক্ষণ করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সেই বিষয় সেই সেই প্রণালীতে পর্য্যবেক্ষণ করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(ঘ) শিশুগণের মন ভবিষ্যৎকালে যাহাতে অশান্ত অস্থির না হইতে পারে, তাহা করিবার জন্য শৈশব অবস্থায় যে সমস্ত আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন হয় সেই সমস্ত আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্ম করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(ঙ) শিশুগণের ভবিষ্যৎকালে খাদ্য, পানীয় ও চাল চলনের রুচি যাহাতে বিকৃত না হইতে পারে, তাহা করিবার জন্য শৈশব অবস্থায় যে-সমস্ত আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্ম করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৫) **এক বৎসরের অধিকবয়স্ক এবং পাঁচ বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুগণের পালন-বিষয়ক অনুষ্ঠান-সমূহ ; এই অনুষ্ঠানসমূহ দুই শ্রেণীর, যথা—**

(ক) শিশুগণের খাদ্য, পানীয়, চাল চলন প্রভৃতি যাহাতে তাহাদের ভবিষ্যৎকালে উত্তেজনা অথবা বিষাদের উদ্ভবকর হইতে না পারে তাহা করিতে হইলে

এই শিশুগণের মাতা-পিতাকে যে যে বিষয় শিক্ষা-দান করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সেই বিষয়ে শিক্ষাদান করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(খ) উপরোক্ত শিক্ষানুযায়ী শিশুগণের খাদ্য, পানীয় ও চাল-চলন প্রভৃতি সম্বন্ধে সতর্কতা রক্ষা করা হয় কি না এবং শিশুগণের মনে উত্তেজনা অথবা বিষাদের বীজ রোপিত হইতেছে কি না, তাহা পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ,

(২) পাঁচ বৎসরের অধিকবয়স্কা এবং তের বৎসরের অনধিকবয়স্কা বালিকাগণের শিক্ষা-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ ; এই অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ ছয় শ্রেণীর, যথা :—

(ক) প্রত্যেক পাঁচ বৎসরের অধিকবয়স্কা এবং তের বৎসরের অনধিকবয়স্কা বালিকাগণের প্রত্যেক মাতাকে অথবা প্রত্যেক অভিভাবিকাকে দশ শ্রেণীর অভ্যাস১১ দশ-শ্রেণীর নীতি১২ এবং দশ শ্রেণীর পদার্থ-বিজ্ঞান১৩ বালোচিত প্রণালীতে১৪ বালিকাগণকে শিখাইবার শিক্ষা-প্রণালী অন্তঃপুর-মধ্যে অভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠানসমূহ।

১১। দশশ্রেণীর অভ্যাসের নাম :—

(১) লিখন, পঠন, দর্শন, শ্রবণ, মনন, কথা বুঝা, কথা বলা, বাক্য বুঝা, বাক্য বলা, লিখিত রচনা বুঝা এবং লিখিত রচনা করার প্রণালী-বিষয়ক শিক্ষা ও অভ্যাস ;

(২) মানুষের নিজের মনকে অনুভব করিবার প্রণালী এবং নিজের মনকে অনুভব করিয়া নিজের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির দোষ গুণ পরীক্ষা ও নির্দ্ধারণ করিবার প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা ও অভ্যাস ,

(৩) অপর মানুষের শরীর অথবা চেহারা দেখিয়া তাহার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উৎকর্ষ, অপকর্ষ পরীক্ষা ও নির্দ্ধারণ-প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা ও অভ্যাস ;

(৪) অপর মানুষের কাষ্য দেখিয়া তাহার প্রবৃত্তির ও বাহ্যশক্তির উৎকর্ষ, অপকর্ষ পরীক্ষা ও নির্দ্ধারণ প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা ও অভ্যাস ,

(৫) একাগ্রতা অথবা একনিষ্ঠ থাকিবার প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা ও অভ্যাস ;

(৬) মানুষের নিজের দোষ এবং অপরের গুণ নির্দ্ধারণ করিবার প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা ও অভ্যাস ,

(৭) প্রকৃতি ও স্বভাবের স্বপক্ষতা ও বিরুদ্ধতা নির্দ্ধারণ করিবার প্রণালী এবং ঐ বিরুদ্ধতা হইতে নিজেকে বজায় রাখিবার প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা ও অভ্যাস ;

(৮) কি কি জ্ঞেয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার এবং জ্ঞেয় বস্তু পরিজ্ঞাত হইবার প্রণালী বিষয়ক শিক্ষা ও অভ্যাস ,

(৯) মানুষের পরস্পরের সহিত ব্যবহার করিবার প্রণালী বিষয়ক শিক্ষা ও অভ্যাস ;

(১০) খাদ্য, পানীয়, পরিধেয়, প্রসাধন, উপভোগ প্রভৃতি আহার ও বিহারের যাবতীয় দ্রব্য নির্ব্বাচন ও ব্যবহার-প্রণালী সম্বন্ধীয় শিক্ষা ও অভ্যাস।

১২। দশ শ্রেণীর নীতির নাম :—

(১) বাসভবন-নির্ব্বাচন ও ব্যবহার-প্রণালী সম্বন্ধীয় নীতি ;

(২) যানবাহন-নির্ব্বাচন ও ব্যবহার-প্রণালী সম্বন্ধীয় নীতি ;

(৩) উপভোগ-পদার্থ নির্ব্বাচন ও ব্যবহারপ্রণালী সম্বন্ধীয় নীতি ;

(৪) আত্মরক্ষার পন্থা ও উপকরণ-নির্ব্বাচন ও ব্যবহার-প্রণালী সম্বন্ধীয় নীতি ,

(৫) সংসার-যাত্রার উপকরণ ও সাংসারিক সম্বন্ধ-নির্ব্বাচন ও ব্যবহার-প্রণালীসম্বন্ধীয় নীতি ,

(৬) চিকিৎসালয়, চিকিৎসক ও ঔষধ নির্ব্বাচন ও ব্যবহার-প্রণালী সম্বন্ধীয় নীতি ;

(৭) জীবিকার্জ্জন-বৃত্তি নির্ব্বাচন এবং ঐ বৃত্তিতে সিদ্ধিলাভ করিবার প্রণালী সম্বন্ধীয় নীতি ,

(৮) মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানসমূহের ক্রমযোগ্যতার শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধীয় নীতি ,

(৯) মানুষের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, শিল্পজাত দ্রব্য এবং কারু-কার্য্যজাত দ্রব্য উৎপাদন করিবার ও ক্রয়-বিক্রয় করিবার নীতি ,

(১০) বিভিন্ন গ্রামের ও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিষয়ের এবং মানুষের পরস্পরের সংবাদ আদান-প্রদান করিবার নীতি।

১৩। দশ শ্রেণীর পদার্থ-বিজ্ঞানের নাম :—

(১) ভূমণ্ডলের কারণ ও কার্য্যপদার্থ-বিষয়ক অথবা অখণ্ড ও খণ্ডপদার্থ-বিষয়ক অথবা সম্পূর্ণত্ব ও সংখ্যাত্ব-বিষয়ক অথবা নিশ্চলতা ও চলৎশীলতা-বিষয়ক বিজ্ঞান ;

(২) ভূমণ্ডলের খণ্ডপদার্থসমূহের স্বাভাবিক আকৃতি অথবা স্বাভাবিক অঙ্কন-বিষয়ক (যথা : ঈক্ষণমিতি ত্রিকোণমিতি ও জ্যামিতি-বিষয়ক) বিজ্ঞান ;

(৩) ভূমণ্ডলের খণ্ডপদার্থ সমূহের বীজ ও শ্রেণী-বিভাগ (যথা : বীজগণিত ও পাটীগণিত)-বিষয়ক বিজ্ঞান ,

(৪) ভূমণ্ডলের চলৎশীলতার গাণিতিক নিয়ম সম্বন্ধীয় এবং দিনরাত্রি প্রভৃতি কালগত বিভাগ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ;

(৫) জমি, জল ও বাতাসের অথবা স্থূল, তরল ও বাষ্পীয় অবস্থার প্রাকৃতিক গুণ-শক্তি-প্রবৃত্তি সমতা-অসমতা-বিষমতা, এবং উৎপাদিক গুণ-শক্তি-প্রবৃত্তি, সম্বন্ধীয় এবং তাহাদের প্রাকৃতিক গুণ-শক্তি-প্রবৃত্তিগত ও দেশগত শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধীয় পদার্থ বিজ্ঞান ,

(৬) উদ্ভিদসমূহের প্রাকৃতিক গুণ-শক্তি-প্রবৃত্তি, সমতা-অসমতা বিষমতা ও উৎপাদিক গুণ-শক্তি-প্রবৃত্তি সম্বন্ধীয় এবং তাহাদের দেশগত ও প্রাকৃতিক গুণ-শক্তিগত শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ;

(৭) বিচারশক্তিহীন চরজীবসমূহের প্রাকৃতিক গুণ-শক্তি-প্রবৃত্তি, সমতা-অসমতা-বিষমতা, ও উৎপাদিক গুণ-শক্তি-প্রবৃত্তি সম্বন্ধীয় এবং তাহাদের দেশগত ও প্রাকৃতিক গুণ-শক্তিগত শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ;

(৮) মনুষ্য জাতির শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির-প্রাকৃতিক গুণ-শক্তি-প্রবৃত্তি, সমতা-অসমতা-বিষমতা ও উৎপাদিক গুণ-শক্তি-প্রবৃত্তি সম্বন্ধীয় এবং তাহাদের দেশগত, প্রাকৃতিক গুণ-শক্তি-প্রবৃত্তিগত ও সাধনাগত শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ;

(খ) প্রত্যেক পাঁচ বৎসরের অধিকবয়স্কা এবং তের বৎসরের অনধিকবয়স্কা বালিকাগণের প্রত্যেক মাতাকে অথবা প্রত্যেক অভিভাবিকাকে নৃত্য-গীত, দুই শ্রেণীর শিল্প-কার্য্য (যথা, খাদ্যসম্বন্ধীয় শিল্প-কার্য্য ও পানীয় সম্বন্ধীয় শিল্পকার্য্য) ও চারি-শ্রেণীর কারুকার্য্য (যথা, খাদ্যসম্বন্ধীয় কারুকার্য্য, বস্ত্র-সম্বন্ধীয় কারুকার্য্য, প্রসাধন-দ্রব্য-সম্বন্ধীয় কারুকার্য্য ও উপভোগের উপায় সম্বন্ধীয় কারুকার্য্য) বালোচিত প্রণালীতে শিখাইবার শিক্ষা-প্রণালী অন্তঃপুর মধ্যে অভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠানসমূহ,

(গ) প্রত্যেক দশ বৎসরের অধিকবয়স্কা এবং তের বৎসরের অনধিকবয়স্কা বালিকাগণের প্রত্যেক মাতাকে অথবা প্রত্যেক অভিভাবিকাকে সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ছয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সংগঠন বালোচিতভাবে শিখাইবার শিক্ষা-প্রণালী অন্তঃপুর মধ্যে অভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(ঘ) প্রত্যেক দশ বৎসরের অধিকবয়স্কা এবং তের বৎসরের অনধিকবয়স্কা প্রত্যেক বালিকার প্রত্যেক মাতাকে অথবা প্রত্যেক অভিভাবিকাকে মানুষের

---

(৯) মনুষ্য জাতির শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-শক্তির ও প্রবৃত্তির ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-বিষয়ক এবং উহাদের শ্রেণীবিভাগ (অর্থাৎ উৎকর্ষ ও অপকর্ষ) সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। মনুষ্যজাতির প্রকৃতিগত ও স্বভাবগত উত্থান-পতনের ইতিহাস এই বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ;

(১০) মনুষ্যজাতির শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির স্বাস্থ্যরক্ষার দ্রব্যসমূহের উৎপাদন ও ব্যবহার এবং ব্যাধিসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান।

১৪। বালোচিত প্রণালী—অভ্যাস, নীতি ও পদার্থ-বিজ্ঞান শিখাইবার বালোচিত প্রণালী বলিতে কি বুঝায় তাহা ধারণা করিতে হইলে—দশ শ্রেণীর অভ্যাস, দশ শ্রেণীর নীতি এবং দশ শ্রেণীর পদার্থ বিজ্ঞান শিখাইবার সর্ব্বসমেত কয়শ্রেণীর প্রণালী হইতে পারে—তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হয়।

সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সমগ্র মনুষ্য সংখ্যার সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণের যে শ্রেণীর শিক্ষা-প্রণালী একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে সেই শ্রেণীর শিক্ষা-প্রণালীতে দশ শ্রেণীর অভ্যাস, দশ শ্রেণীর নীতি ও দশ শ্রেণীর পদার্থ-বিজ্ঞান শিখাইবার প্রণালী; প্রধানতঃ নয় শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা :—

(১) পাঁচ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্কা এবং দশ বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্কা বালিকাগণকে তাহাদিগের যোগ্যতার ও প্রয়োজনের বিচার করিয়া তদনুরূপ ভাবে উপরোক্ত দশ শ্রেণীর অভ্যাস, নীতি ও বিজ্ঞান শিখাইবার ও অভ্যাস করাইবার প্রণালী,

(২) দশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্কা এবং তের বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্কা তরুণীগণকে তাহাদিগের যোগ্যতার ও গৃহিণীপনা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিচার করিয়া তদনুরূপ ভাবে দশ শ্রেণীর অভ্যাস, দশ শ্রেণীর নীতি ও দশ শ্রেণীর বিজ্ঞান শিখাইবার ও অভ্যাস করাইবার প্রণালী,

(৩) পাঁচ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক এবং পনর বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্ক বালকগণকে তাহাদিগের যোগ্যতার ও প্রয়োজনের বিচার করিয়া তদনুরূপ ভাবে দশ শ্রেণীর অভ্যাস, দশ শ্রেণীর নীতি ও দশ শ্রেণীর পদার্থ-বিজ্ঞান শিখাইবার ও অভ্যাস করাইবার প্রণালী ;

(৪) পনর বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক ও সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর শ্রম-যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার উপযুক্ত যুবকগণকে তাহাদিগের যোগ্যতার ও প্রয়োজনের বিচার করিয়া তদনুরূপ ভাবে দশ শ্রেণীর অভ্যাস, দশ শ্রেণীর নীতি ও দশ শ্রেণীর বিজ্ঞান শিখাইবার ও অভ্যাস করাইবার প্রণালী ;

(৫) আঠার বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক ও সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর শ্রম-যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার উপযুক্ত যুবকগণকে তাহাদিগের যোগ্যতার ও প্রয়োজনের বিচার করিয়া তদনুরূপ ভাবে দশ শ্রেণীর অভ্যাস, দশ শ্রেণীর নীতি ও দশ শ্রেণীর বিজ্ঞান শিখাইবার ও অভ্যাস করাইবার প্রণালী,

(৬) ত্রিশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক ও সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রম-যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার উপযুক্ত যুবকগণকে তাহাদিগের যোগ্যতার ও প্রয়োজনের বিচার করিয়া তদনুরূপ ভাবে দশ শ্রেণীর অভ্যাস, দশ শ্রেণীর নীতি, ও দশ শ্রেণীর বিজ্ঞান শিখাইবার ও অভ্যাস করাইবার প্রণালী ;

(৭) চল্লিশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক ও সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর শ্রমযোগ্যতা অর্জ্জন করিবার উপযুক্ত যুবকগণকে তাহাদিগের যোগ্যতার ও প্রয়োজনের বিচার করিয়া তদনুরূপ ভাবে দশ শ্রেণীর অভ্যাস, দশ শ্রেণীর নীতি ও দশ শ্রেণীর বিজ্ঞান শিখাইবার ও অভ্যাস করাইবার প্রণালী ;

(৮) পঞ্চাশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক ও সামাজিক কার্য্যের তত্ত্বাবধারণের শ্রমযোগ্যতা অর্জ্জন করিবার উপযুক্ত যুবকগণকে তাহাদিগের যোগ্যতার ও প্রয়োজনের বিচার করিয়া তদনুরূপ ভাবে দশ শ্রেণীর অভ্যাস, দশ শ্রেণীর নীতি ও দশ শ্রেণীর বিজ্ঞান শিখাইবার ও অভ্যাস করাইবার প্রণালী,

(৯) ষাট বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক ও রাষ্ট্রীয় কার্য্যের শ্রমযোগ্যতা অর্জ্জন করিবার উপযুক্ত প্রৌঢ়গণকে তাহাদিগের যোগ্যতার ও প্রয়োজনের বিচার করিয়া তদনুরূপ ভাবে দশ শ্রেণীর অভ্যাস, দশ শ্রেণীর নীতি ও দশ শ্রেণীর বিজ্ঞান শিখাইবার ও অভ্যাস করাইবার প্রণালী।

দশ শ্রেণীর অভ্যাস, দশ শ্রেণীর নীতি, ও দশ শ্রেণীর বিজ্ঞান শিখাইবার ও অভ্যাস করাইবার প্রণালী যেরূপ নয় শ্রেণীর হইয়া থাকে, সেইরূপ দশ শ্রেণীর অভ্যাস-বিষয়ক দশ শ্রেণীর গ্রন্থ, দশ শ্রেণীর নীতি-বিষয়ক দশ শ্রেণীর নীতিগ্রন্থ, এবং দশ শ্রেণীর বিজ্ঞান-বিষয়ক দশ শ্রেণীর বিজ্ঞান গ্রন্থেরও প্রত্যেক শ্রেণীর গ্রন্থ নয় শ্রেণীতে রচিত হইয়া থাকে।

উপরোক্ত দশ শ্রেণীর অভ্যাস, দশ শ্রেণীর নীতি ও দশ শ্রেণীর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান—পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিবার জন্য অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়। ঐ ত্রিশ শ্রেণীর জ্ঞান অত্যন্ত বিস্তৃত এবং উহা সম্পূর্ণ ও সর্ব্বতোভাবে অর্জ্জন করা দীর্ঘ-সময়-সাপেক্ষ। ইহার জন্য কৈশোর অবস্থা হইতেই যাহাতে ঐ ত্রিশ শ্রেণীর জ্ঞানার্জ্জন আরম্ভ করা হয় এবং বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বিষয়ের প্রত্যেক শ্রেণীর জ্ঞান যাহাতে প্রসারতা লাভ করে এবং নিষ্প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ের নীতি অথবা বিজ্ঞান যাহাতে শেখানো না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ছয়চল্লিশ শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানের বিধি নিষেধ বালোচিত ভাবে শিখাইবার শিক্ষা-প্রণালী অন্তঃপুরমধ্যে অভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(ঙ) প্রত্যেক দশ বৎসরের অধিক-বয়স্কা এবং তের বৎসরের অনধিকবয়স্কা প্রত্যেক বালিকার প্রত্যেক মাতাকে অথবা প্রত্যেক অভিভাবিকাকে বালোচিত ভাবে গৃহিণীপনা শিখাইবার শিক্ষা-প্রণালী অন্তঃপুর-মধ্যে অভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(চ) দশ শ্রেণীর অভ্যাস, দশ শ্রেণীর নীতি, দশ শ্রেণীর পদার্থ বিজ্ঞান, দুই শ্রেণীর শিল্পকার্য, চারি শ্রেণীর কারুকার্য, নৃত্য-গীত, গৃহিণীপনা সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন এবং ছয়চল্লিশ শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানের বিধি-নিষেধ বালোচিত ভাবে, পাঁচ বৎসরের অধিক-বয়স্কা এবং তের বৎসরের অনধিকবয়স্কা বালিকাগণকে তাহাদিগের মাতা অথবা অভিভাবিকাগণের দ্বারা অন্তঃপুরমধ্যে শৃঙ্খলিত ও নিয়মিতভাবে শেখান ও অভ্যাস করান হয় কি না তাহা পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ।

(৭) পাঁচ বৎসরের অধিকবয়স্ক এবং পনর বৎসরের অনধিকবয়স্ক বালকগণের শিক্ষা-বিষয়ক অনুষ্ঠান-সমূহ। এই অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ **পাঁচ শ্রেণীতে** বিভক্ত, যথা :—

(ক) পূর্ব্বোক্ত দশ শ্রেণীর অভ্যাস বালকের যোগ্যতা ও প্রয়োজন বিচার করিয়া তদনুরূপ ভাবে শিখাইবার ও অভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(খ) পূর্ব্বোক্ত দশ শ্রেণীর নীতি বালকের যোগ্যতা ও প্রয়োজন বিচার করিয়া তদনুরূপভাবে শিখাইবার ও অভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(গ) পূর্ব্বোক্ত দশ শ্রেণীর পদার্থ-বিজ্ঞান বালকের যোগ্যতা ও প্রয়োজন বিচার করিয়া তদনুরূপভাবে শিখাই-বার ও অভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠানসমূহ ,

(ঘ) মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ছয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সংগঠন-বিজ্ঞান বালকের যোগ্যতা ও প্রয়োজন বিচার করিয়া তদনুরূপভাবে শিখাইবার ও অভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(ঙ) মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার অনুষ্ঠানসমূহের বিধি-নিষেধ-বিজ্ঞান বালকের যোগ্যতা ও প্রয়োজন বিচার করিয়া তদনুরূপভাবে শিখাইবার ও অভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠানসমূহ ।

(৮) **দশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্কা এবং তের বৎসরের অনূর্দ্ধ বয়স্কা বালিকাগণের ইন্দ্রিয়ের তীব্রতা ও দৌর্ব্বল্য নিবারণ করিবার অনুষ্ঠানসমূহ।** এই অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ **দুই শ্রেণীর** হইয়া থাকে, যথা :

(ক) কোন দশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্কা বালিকার কোন ইন্দ্রিয়ের কোনরূপ অতিরিক্ত তীব্রতা অথবা কোন-রূপ দৌর্ব্বল্যের আশঙ্কা আছে কি না তাহা স্থির করিতে হইলে বালিকাগণের শরীর ও কার্য্য সম্বন্ধে যাহা যাহা লক্ষ্য করিতে হয় সেই সমস্ত লক্ষণীয় বিষয় যাহাতে প্রত্যেক মাতা অথবা অভিভাবিকা শিক্ষা ও অভ্যাস করিতে পারেন তাহা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(খ) কোন দশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্কা বালিকার কোন ইন্দ্রিয়ের কোনরূপ অতিরিক্ত তীব্রতা অথবা কোন রূপ দৌর্ব্বল্যের আশঙ্কার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ঐ লক্ষণসমূহের কোনটী যাহাতে অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারে তজ্জন্য বালিকাগণের যে সমস্ত রাসায়নিক অথবা শারীরিক অথবা মানসিক অভ্যাসের প্রয়োজন হয় সেই সমস্ত রাসায়নিক, শারীরিক ও মানসিক অভ্যাস বালিকাগণকে শিখাইবার ও অভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠানসমূহ ।

(৯) বার বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক বালকগণের ইন্দ্রিয়ের তীব্রতা ও দৌর্ব্বল্য নিবারণ-বিষয়ক অনুষ্ঠান-সমূহ এই অনুষ্ঠানসমূহও **দুই শ্রেণীতে** বিভক্ত, যথা :—

(ক) কোন বার বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক বালকের কোন ইন্দ্রিয়ের কোনরূপ অতিরিক্ত তীব্রতা অথবা কোন-রূপ দৌর্ব্বল্যের আশঙ্কা আছে কি না তাহা পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(খ) কোন বার বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক বালকের কোন ইন্দ্রিয়ের কোনরূপ অতিরিক্ত তীব্রতা অথবা কোন-রূপ দৌর্ব্বল্যের আশঙ্কার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ঐ লক্ষণসমূহের কোনটি যাহাতে অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারে, তজ্জন্য বালকগণকে যে-সমস্ত রাসায়নিক অথবা শারীরিক অথবা মানসিক অভ্যাস শিখাইবার প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত রাসায়নিক, শারীরিক ও মানসিক অভ্যাস বালকগণকে শিখাইবার অনুষ্ঠানসমূহ ।

(১০) **জনসাধারণের চিকিৎসা-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ। এই অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা :—**

(ক) জমি, জল ও বাতাসের যে যে অবস্থা ঘটিলে, মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধির কোনরূপ অস্বাস্থ্যের অথবা ব্যাধির আশঙ্কার উদ্ভব হয়, জমি, জল ও বাতাসের সেই সেই অবস্থার কোনটী ঘটিতেছে কি না তাহা পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(খ) জমি, জল ও বাতাসের যে যে অবস্থা ঘটিলে মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধির কোনরূপ অস্বাস্থ্য অথবা ব্যাধির আশঙ্কার উদ্ভব হইতে পারে; জমি, জল ও বাতাসের সেই সেই অবস্থা দূর করিতে হইলে যে যে সঙ্কেতের ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সেই সঙ্কেত ব্যবহার করিবার অনুষ্ঠানসমূহ;

(গ) গ্রামের কোন মানুষের শরীরের অথবা ইন্দ্রিয়ের অথবা মনের অথবা বুদ্ধির কোনরূপ ব্যাধি ঘটিলে ঐ ব্যাধি যাহাতে কোন চিকিৎসকের বিনা পারিশ্রমিকে আমূলভাবে চিকিৎসিত হয় তাহা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ;

(ঘ) সর্ব্বরকমের ব্যাধির চিকিৎসার জন্য যত রকমের ঔষধের প্রয়োজন হয়, তাহার প্রত্যেকটি যাহাতে গ্রামের মধ্যে প্রস্তুত হয় এবং প্রত্যেক ব্যাধিগ্রস্ত যাহাতে বিনামূল্যে প্রত্যেক প্রয়োজনীয় ঔষধ পাইতে পারেন, তাহার অনুষ্ঠানসমূহ।

(১১) যান্ত্রিক কার্য্য বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ।১৫

(১২) পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার প্রচারকার্য্য-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ। এই অনুষ্ঠানসমূহ, প্রধানতঃ **তিন শ্রেণীতে** বিভক্ত, যথা:

(ক) ছয়টী অবশ্য পালনীয় এবং একান্ত প্রয়োজনীয় নীতিসূত্রের প্রচার-বিষয়ক অনুষ্ঠান, যথা:

(১) মানুষের যে-সমস্ত কার্য্যে জমি অথবা জল অথবা বাতাসের কোনরূপ অসমতা অথবা বিষমতার উদ্ভব হইতে পারে, সেই সমস্ত কার্য্যের নাম ও অনিষ্টকারিতা-বিষয়ক প্রচার;

(২) প্রত্যেক মানুষ যে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের এক একটি অংশ এবং সমগ্র মনুষ্য-সংখ্যায় যে মানবসমাজের পূর্ণতা, তাহা বিস্মৃত হইয়া দেশগত অথবা বিদ্যাগত অথবা বংশগত অথবা ধনগত অথবা প্রতিষ্ঠাগত অথবা সাধনাগত অথবা অন্য কোন শ্রেণীর কারণ-প্রসূত কোনরূপ অভিমান অথবা অহংকার পোষণ করিবার অনিষ্টকারিতা-বিষয়ক প্রচার;

(৩) সমতা ও স্বাবলম্বনের প্রবৃত্তির স্থলে আত্ম-সম্মানের ছলে উচ্চনীচ ভাব এবং স্বাধীনতা ও জাতীয়তার নামে দলাদলির ও উচ্ছৃঙ্খলার ভাব পোষণ করিবার অনিষ্টকারিতা-বিষয়ক প্রচার;

(৪) কার্য্য-কারণের বিচার-বিশ্লেষণযুক্ত বিজ্ঞান, নীতি ও বিধি-নিষেধ শাস্ত্রের স্থলে কাল্পনিক সংস্কার অথবা মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-নীতি ও বিধি-নিষেধ শাস্ত্রের অনিষ্ট-কারিতা-বিষয়ক প্রচার;

(৫) প্রথমতঃ, স্বাভাবিক গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির নিশ্চয়েই যে মানুষের প্রকৃত ধর্ম; দ্বিতীয়তঃ, যাহাতে মানুষের গুণশক্তি ও প্রবৃত্তির অপকর্ষ হয় তাহাই যে ধর্ম্মের অপকর্ষ এবং তৃতীয়তঃ, যাহাতে মানুষের গুণশক্তি ও প্রবৃত্তির উৎকর্ষ হয় তাহাই যে ধর্ম্মের উৎকর্ষ—এই তিনটী কথা বিস্মৃত হইয়া সংস্কারমূলক ধর্ম্মে বিশ্বাসী হওয়ার এবং ধর্ম্ম-সংস্কার লইয়া রাগ-দ্বেষ পোষণ করার অথবা দ্বন্দ্ব-কলহ করার অনিষ্টকারিতা-বিষয়ক প্রচার,

(৬) যাহাতে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির স্বাস্থ্য ও তৃপ্তি যুগপৎ সম্পাদিত তাহাই যে প্রকৃত উপভোগের—তাহা বিস্মৃত হইয়া, কেবলমাত্র শরীরের অথবা ইন্দ্রিয়ের অথবা বুদ্ধির তৃপ্তিজনকতা অথবা স্বাস্থ্যজনকতা উপভোগ্য মনে করার অনিষ্টকারিতা-বিষয়ক প্রচার;

(খ) ছয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সংগঠনসমূহের পরিবর্ত্তনের প্রচার-কার্য্য;

(গ) ছয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের বিধি-নিষেধসমূহের পরি-বর্ত্তনের প্রচার-কার্য্য।

মনুষ্য-জাতির সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে সর্ব্বসমেত কতগুলি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়, তৎসম্বন্ধে উপরে যাহা যাহা বলা হইয়াছে সেই সমস্ত কথা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মনুষ্য-জাতির সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে, প্রধানতঃ, তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়, যথা:

(১) মনুষ্য-জাতির ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধন-প্রাচুর্য্য সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ;

(২) মনুষ্য-জাতির অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন-সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ;

১৫। যান্ত্রিক কার্য্য—

জমি, জল ও বাতাসের প্রাকৃত অসমতা ও বিষমতা বশতঃ উহাদের উৎপাদিকা শক্তির উৎপাদিকা প্রবৃত্তির এবং মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার শক্তির ও প্রবৃত্তির স্বভাবতঃ যে হ্রাস ঘটিয়া থাকে, সেই হ্রাস পূরণ করিতে হইলে, কৃত্রিমভাবে সাধনা-নিরত শক্তি দ্বারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাতাসের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য যে সমস্ত কার্য্য করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত কার্য্যকে "যান্ত্রিক কার্য্য" বলা হয়।

(৩) মনুষ্য জাতির পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান, প্রধানতঃ, ছয়চল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠানে বিভক্ত। প্রধানতঃ, সাতাশ-শ্রেণীর অনুষ্ঠান মনুষ্য-জাতির ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধন-প্রাচুর্য্য সাধন করিবার অনুষ্ঠান-সমূহের অন্তর্ভুক্ত। প্রধানতঃ, সাত শ্রেণীর অনুষ্ঠান মনুষ্য-জাতির অলস ও বেকার-জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহের অন্তর্ভুক্ত। প্রধানতঃ, বার শ্রেণীর অনুষ্ঠান মনুষ্যজাতির পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

যে তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান মনুষ্য জাতির সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়, সেই তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান, প্রধানতঃ, ছয়চল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠানে বিভক্ত বটে; কিন্তু ঐ ছয়চল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠানকে পুনরায় অসংখ্য শ্রেণীর অনুষ্ঠানে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

যে তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান মনুষ্য-জাতির সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়, মনুষ্য-জাতির সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে, সেই তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান যাহাতে **যুগপৎ** সাধিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়। মনুষ্য-জাতির ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করা স্বতঃসিদ্ধ করিতে হইলে যে যে শিক্ষা ও সাধনার ব্যবস্থায়, মানুষের অলস ও বেকার জীবন নিবারিত হইয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন স্বতঃসিদ্ধ হয়, সেই শিক্ষা ও অভ্যাসের ব্যবস্থা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। যে যে শিক্ষা ও অভ্যাসের ব্যবস্থায় মনুষ্য-জাতির অলস ও বেকার-জীবন নিবারিত হইয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন স্বতঃসিদ্ধ হইয়া থাকে, সেই শিক্ষা ও অভ্যাসের ব্যবস্থা করিতে হইলে যে যে শিক্ষা ও অভ্যাসে মনুষ্য-জাতির পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করা স্বতঃসিদ্ধ হয় সেই সেই শিক্ষা ও অভ্যাসের ব্যবস্থা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে।

যে যে অনুষ্ঠানে মনুষ্যজাতির পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করা স্বতঃসিদ্ধ হয়, সেই সেই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা সাধিত না হইলে, যে যে অনুষ্ঠানে মনুষ্য জাতির অলস ও বেকার জীবন নিবারিত হইয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন স্বতঃসিদ্ধ হয়—সেই সেই অনুষ্ঠান সাধিত হইতে পারে না।

যে যে অনুষ্ঠানে মনুষ্যজাতির অলস ও বেকার জীবন নিবারিত হইয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন স্বতঃসিদ্ধ হয়, সেই সেই অনুষ্ঠান সাধিত না হইলে, যে যে অনুষ্ঠানে মনুষ্যজাতির ধনাভাব নিবারিত হইয়া ধন-প্রাচুর্য্য সাধিত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়, সেই সেই অনুষ্ঠান সাধিত হইতে পারে না।

মনুষ্যজাতির সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে উপরোক্ত তিন-শ্রেণীর অনুষ্ঠান যুগপৎ সাধন করিবার ব্যবস্থা করা যেরূপ অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে; সেইরূপ আবার, প্রধানতঃ, যে ছয়চল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠান ঐ তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত, সেই ছয়চল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠানও **যুগপৎ** সাধন করা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়। ঐ ছয়চল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের কোন এক শ্রেণীর অনুষ্ঠান বাদ দিয়া বাকী অপর সমস্ত অনুষ্ঠান সাধন করিলে, মনুষ্যজাতির সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা স্বতঃসিদ্ধ হয় না, পরন্তু সন্দেহজনক হইয়া থাকে।

উপরোক্ত তিন-শ্রেণীর অনুষ্ঠান এবং যে ছয়চল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠান ঐ তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত সেই ছয়চল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠান **যুগপৎ** সাধন করিবার ব্যবস্থা হইলে যে, সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা স্বতঃসিদ্ধ হয়—তাহার যুক্তিবাদ আমরা এই আলোচনার শেষভাগে লিপিবদ্ধ করিব।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান এবং যে ছয়চল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠান ঐ তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত সেই ছয়চল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠান যুগপৎ সাধন করিবার ব্যবস্থা সম্পাদিত হইলে, সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয় বটে; কিন্তু আরও সাত শ্রেণীর অনুষ্ঠান যাহাতে যুগপৎ সাধিত হয় তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত না হইলে উপরোক্ত তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান অথবা যে ছয়চল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠান ঐ তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত—সেই ছয়চল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠান যুগপৎ করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে একদিকে যেরূপ পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান১৬ অথবা তদন্তর্ভুক্ত ছয়চল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠান যাহাতে যুগপৎ সাধিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়; সেইরূপ আবার, ঐ তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান যাহাতে সর্ব্বতোভাবে ও নিয়মিতরূপে পরিচালিত হয়—তাহা করিবার জন্ত আরও **সাত শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন** আয়োজন করিতে হয়, যথা :

(১) বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন গ্রামের পরস্পরের সীমানা-সংক্রান্ত বিবাদ নিবারণ করিয়া দেশ-গত, জাতীয় ও গ্রাম-গত সাম্প্রদায়িক সৌখ্য সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ;

(২) মানুষের পরস্পরের সর্ব্ববিধ ব্যক্তিগত বিবাদের বিচার করিয়া ব্যক্তিগত সৌখ্য সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ;

(৩) সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানসমূহের বিধি-নিষেধের অমান্ত-জনিত অপরাধ বিচার করিবার ও দণ্ড-প্রদান করিবার অনুষ্ঠানসমূহ;

(৪) কোনও শ্রেণীর কর স্থাপন না করিয়া কেন্দ্রীয়, দেশীয় এবং গ্রাম্য সঙ্ঘগত প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিকগণের বেতন প্রদান করিবার ও অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার অনুষ্ঠানসমূহ;

(৫) কেন্দ্রীয়, দেশীয় এবং গ্রাম্য সঙ্ঘগত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ম্মী নিয়োগ করিবার এবং ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের জনসম্মেলন-শাখায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অনুষ্ঠানসমূহ;

(৬) দশ শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিতে হইলে যে যে বিষয়ের বিজ্ঞান ও তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিবার ও গ্রন্থ রচনা করিবার আবশ্যক হয়, সেই সেই বিষয়ে বিজ্ঞান ও তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিবার ও গ্রন্থ রচনা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ;

(৭) সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ও তৎসংক্রান্ত সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানের বিধি-নিষেধ নির্দ্ধারণ করিবার অনুষ্ঠানসমূহ।

উপরোক্ত কথা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে, প্রথমতঃ, ছয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সংগঠন করিতে হয় এবং ঐ ছয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সর্ব্বসমেত দশ শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিবার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়। উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রধানতঃ যে দশ শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধিত করিবার প্রয়োজন হয়; তেপ্পান্ন শ্রেণীর অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্যভাবে সেই দশ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। ঐ তেপ্পান্ন শ্রেণীর অনুষ্ঠান অসংখ্য শ্রেণীর অনুষ্ঠানে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

ছয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের কোন্‌টির দ্বারা প্রধানতঃ কোন্ কোন্ অনুষ্ঠান সাধিত হইয়া থাকে তাহার কথা

এই আলোচনায় সর্ব্বপ্রথমে, **গ্রাম্য-জন-সভায়** কি কি অনুষ্ঠান সাধিত হয় তাহার কথা; তাহার পর, **দেশীয় জন-সভার** অনুষ্ঠানসমূহের কথা; এবং সর্ব্বশেষে, **কেন্দ্রীয় মহাসভার** অনুষ্ঠানসমূহের কথা বিবৃত হইবে।

(১) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য প্রতিষ্ঠান;
(২) গ্রামস্থ সামাজিক তত্ত্বাবধারণ-কার্য্যের প্রতিষ্ঠান;
(৩) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং
(৪) গ্রাম্য জনসম্মেলন-প্রতিষ্ঠান।

এই চারিটি প্রতিষ্ঠান গ্রাম্য জন-সভার চারিটি শাখা।

(১)

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যসমূহের প্রতিষ্ঠানের কথা

এই প্রতিষ্ঠান দ্বারা সাধারণতঃ, তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধিত হইয়া থাকে, যথা :

(১) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার **সাতাশ শ্রেণীর** অনুষ্ঠানসমূহ;

(২) মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার **সাত শ্রেণীর** অনুষ্ঠানসমূহ;

১৬। (১) মনুষ্যজাতির ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার সাতাশ শ্রেণীর অনুষ্ঠান;

(২) মনুষ্যজাতির অলস ও বেকার-জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার সাত শ্রেণীর অনুষ্ঠান,

(৩) মনুষ্যজাতির পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বার শ্রেণীর অনুষ্ঠান।

(৩) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার **বার শ্রেণীর** অনুষ্ঠানসমূহ।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-প্রতিষ্ঠানের উপরোক্ত ছয়চল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধিত করিতে হইলে **চারি শ্রেণীর শ্রমের** প্রয়োজন হয়। ঐ চারি শ্রেণীর শ্রমকে যথাক্রমে সামাজিক কার্য্যের **চতুর্থ, তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর** শ্রম বলা হইয়া থাকে। **সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর শ্রম**, সাধারণতঃ, এক শ্রেণীর, যথা :

ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার সাতাশ শ্রেণীর অনুষ্ঠানসমূহের প্রত্যেক শ্রেণীর অনুষ্ঠানের শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্য করিবার শ্রম।

সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর শ্রম যথা :—

(১) ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার সাতাশ শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের প্রত্যেক শ্রেণীর অনুষ্ঠানের অবস্থা-ভেদে তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য-প্রণালী-ভেদ নির্দ্ধারণ করিবার শ্রম ;

(২) সাতাশ শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রত্যেক শ্রেণীর অনুষ্ঠানের কার্য্যপ্রণালীর উপরোক্ত ভেদ-তৎসংক্রান্ত চতুর্থশ্রেণীর শ্রমিকগণকে বুঝাইবার ও শিখাইবার শ্রম ;

(৩) ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার সাতাশ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের প্রত্যেক শ্রেণীর অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে—তৎসংশ্লিষ্ট চতুর্থশ্রেণীর শ্রমিকগণের কোনরূপ বাধা অথবা অসুবিধা যাহাতে না হয়—তাহার সহায়তা করিবার শ্রম।

সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রম এক শ্রেণীর, যথা :

মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার সাতাশ শ্রেণীর অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটী তৎ-সংশ্লিষ্ট তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমিকগণের দ্বারা প্রয়োজনানুরূপ-ভাবে ও বিধিবদ্ধনিয়মে সম্পাদিত হইতেছে কিনা—তাহা প্রদর্শন করিবার শ্রম।

সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর শ্রম চারি শ্রেণীর যথা :

(১) মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার সাত শ্রেণীর অনুষ্ঠানে যে যে শ্রেণীর শিক্ষা ও অভ্যাস শিখাইতে ও অভ্যাস করাইতে হয়, সেই সেই শ্রেণীর শিক্ষা ও অভ্যাস করাইবার শ্রম ;

(২) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বার শ্রেণীর অনুষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষা-বিষয়ক অনুষ্ঠানে যে দুই শ্রেণীর শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হয়, সেই দুই শ্রেণীর শিক্ষা সাধন করিবার শ্রম ;

(৩) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বার শ্রেণীর অনুষ্ঠানের মধ্যে চিকিৎসা-বিষয়ক অনুষ্ঠানে, ব্যাধিগ্রস্তের যে চিকিৎসার-কার্য্য আছে, সেই চিকিৎসা-কার্য্য করিবার শ্রম ;

(৪) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বার-শ্রেণীর অনুষ্ঠান-মধ্যে শিক্ষা ও চিকিৎসার অনুষ্ঠান ছাড়া, বিবাহ-বিষয়ক এবং আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্ম-বিষয়ক যে আর নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিবার প্রয়োজন হয়, সেই নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিবার শ্রম।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-প্রতিষ্ঠানের ছয়চল্লিশ শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধিত করিতে হইলে উপরোক্ত যে যে চারি শ্রেণীর শ্রমের প্রয়োজন হয়, তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান সাক্ষাৎভাবে সাধিত হয়, সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ, তৃতীয় ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমিকগণের দ্বারা। আর, মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার এবং মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান সাক্ষাৎ-ভাবে সাধিত হয়, সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর শ্রমিকগণের দ্বারা।

(২)

গ্রামস্থ সামাজিক তত্ত্বাবধারণ কার্য্যের প্রতিষ্ঠানের কথা

গ্রামস্থ সামাজিক তত্ত্বাবধারণ-কার্য্যের প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানসমূহ, প্রধানতঃ, **ছয় শ্রেণীর**। ঐ ছয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান **ছয়টী কার্য্যবিভাগের** দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, যথা :

(১) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার সামাজিক কার্য্যসমূহের সংগঠন

ও পরিদর্শন করিবার কার্য্য-বিভাগ। এই কার্য্যবিভাগের কার্য্য প্রধানতঃ **চারি শ্রেণীর,** যথা :

(ক) গ্রামের অবস্থাভেদে মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার সপ্তবিংশতি শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানের কোন্ কোন্ শ্রেণীর কোন কোন্ অনুষ্ঠান গ্রামের মধ্যে সম্পাদিত হইতে পারে —তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কার্য্য ;

(খ) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার সপ্তবিংশতি সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক অনুষ্ঠানের স্থানীয় সুবিধা অসুবিধা ভেদে এবং প্রয়োজন ভেদে কার্য্য-প্রণালী স্থির করিবার কার্য্য ;

(গ) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার সপ্তবিংশতি শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সামাজিক শ্রমিকের বন্দোবস্ত করিবার কার্য্য ;

(ঘ) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার সপ্তবিংশতি শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক অনুষ্ঠান দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সামাজিক শ্রমিকগণের দ্বারা প্রয়োজনানুরূপ ভাবে এবং বিধিবদ্ধ নিয়মে (অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মহাসভার নির্দ্ধারিত বিধি-নিষেধ অনুসারে) সম্পাদিত হইতেছে কি না, তাহা পরিদর্শন করিবার কার্য্য।

(২) মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার সামাজিক কার্য্যসমূহের সংগঠন ও পরিদর্শন করিবার কার্য্যবিভাগ। এই কার্য্য-বিভাগের কার্য্যও প্রধানতঃ **চারি শ্রেণীর,** যথা :

(ক) মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিতে হইলে যে সাত শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় সেই সাত শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠান গ্রামের মনুষ্য-সংখ্যার প্রয়োজনানুরূপ ভাবে সম্পাদিত করিতে হইলে, গ্রামের কোথায় কোথায় এবং কত সংখ্যক "অনুষ্ঠান আগারে"র প্রয়োজন, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কার্য্য ;

(খ) উপরোক্ত "অনুষ্ঠান আগার" নির্ম্মাণ ও রক্ষা করিবার কার্য্য ;

(গ) মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার সাত শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানের কর্ম্মী বন্দোবস্ত করিবার কার্য্য ;

(ঘ) মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার সাত শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানের কর্ম্মিগণ প্রয়োজনানুরূপভাবে এবং বিধিবদ্ধ নিয়মের অনুষ্ঠান-সমূহ সম্পাদন করেন কি না তাহা পরিদর্শন করিবার কার্য্য।

(৩) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বার শ্রেণীর সামাজিক কার্য্য-সমূহের সংগঠন ও পরিদর্শন করিবার কার্য্য-বিভাগ। এই কার্য্য-বিভাগের কার্য্য সাধারণতঃ **আট শ্রেণীর,** যথা :

(ক) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বার শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষাবিষয়ক দুই শ্রেণীর অনুষ্ঠান গ্রামের মনুষ্য-সংখ্যার প্রয়োজনানুরূপভাবে সম্পাদন করিতে হইলে কোথায় কোথায় এবং কতসংখ্যক শিক্ষাগারের প্রয়োজন তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কার্য্য ;

(খ) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বার শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত চিকিৎসা বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ গ্রামের মনুষ্য-সংখ্যায় প্রয়োজনানুরূপভাবে সম্পাদন করিতে হইলে কোথায় কোথায় এবং কত-সংখ্যক চিকিৎসাগারের প্রয়োজন তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কার্য্য ;

(গ) উপরোক্ত শিক্ষাগার ও চিকিৎসাগারসমূহ নির্ম্মাণ ও রক্ষা করিবার কার্য্য ;

(ঘ) উপরোক্ত শিক্ষাগার ও চিকিৎসাগারসমূহের উপযুক্ত কর্ম্মী সমাবেশ করিবার কার্য্য ;

(ঙ) উপরোক্ত শিক্ষাগারের কর্ম্মিগণ প্রয়োজনানুরূপ ভাবে ও বিধিবদ্ধ নিয়মে অনুষ্ঠানসমূহ সম্পাদন করেন কি না তাহা পরিদর্শন করিবার কার্য্য ;

(চ) উপরোক্ত চিকিৎসাগারের কর্ম্মিগণ প্রয়োজনানুরূপ-ভাবে এবং বিধিবদ্ধনিয়মে অনুষ্ঠানসমূহ সম্পাদন করেন কি না তাহা পরিদর্শন করিবার কার্য্য।

(ছ) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বার শ্রেণীর অনুষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষা ও চিকিৎসা-বিষয়ক তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান সম্পাদন করিবার কর্ম্মী সমাবেশ করিবার কার্য্য ;

(জ) উপরোক্ত অন্যান্য নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান কর্ম্মিগণের দ্বারা যথোপযুক্তভাবে ও বিধিবদ্ধনিয়মে সম্পাদিত হইতেছে কি না তাহা পরিদর্শন করিবার কার্য্য ;

(৪) গ্রামস্থ সামাজিক তত্ত্বাবধারণ কার্য্যের কর্ম্মি নিয়োগ করিবার এবং গ্রাম্য জন-সম্মেলন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার কার্য্য-বিভাগ;

(৫) কোন শ্রেণীর কর ধার্য্য না করিয়া সামাজিক কার্য্যের কর্ম্মিগণের এবং সামাজিক কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ-কার্য্যের কর্ম্মিগণের অর্থ-প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিবার কার্য্য-বিভাগ।

(৬) মানুষের পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তিগত বিবাদের সামাজিক ভাবে বিচার করিবার এবং পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তিগত সৌখ্য স্থাপন করিবার কার্য্য-বিভাগ।

---

(৩)

গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানসমূহের কথা

এই প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ নয় শ্রেণীর, যথা:

(১) সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানসমূহের বিধি-নিষেধের অমান্যজনিত অপরাধ রাষ্ট্রীয় ভাবে বিচার করিবার ও দণ্ডপ্রয়োগ করিবার কার্য্য-বিভাগ;

(২) মানুষের পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তিগত বিবাদসমূহ রাষ্ট্রীয় ভাবে বিচার করিবার ও দণ্ড প্রদান করিবার কার্য্য-বিভাগ;

(৩) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ সামাজিক কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মিগণকে শিখাইবার ও বুঝাইবার এবং ঐ বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ উপরোক্ত কর্ম্মিগণ বিধিবদ্ধ ভাবে পালন করেন কি না, তাহা পরিদর্শন করিবার কার্য্য-বিভাগ;

(৪) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ, সামাজিক কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মিগণকে শিখাইবার ও বুঝাইবার এবং ঐ বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ উপরোক্ত কর্ম্মিগণ বিধিবদ্ধ ভাবে পালন করেন কি না—তাহা পরিদর্শন করিবার কার্য্য-বিভাগ;

(৫) মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ সামাজিক কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মিগণকে শিখাইবার ও বুঝাইবার এবং ঐ বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ উপরোক্ত কর্ম্মিগণ বিধিবদ্ধ ভাবে সাধন করেন কি না—তাহা পরিদর্শন করিবার কার্য্য-বিভাগ;

(৬) কোন শ্রেণীর কর ধার্য্য না করিয়া গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মিগণের বেতন প্রদান করিবার এবং অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার কার্য্যবিভাগ;

(৭) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী নিয়োগ করিবার এবং দেশীয় জনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণের কার্য্য-বিভাগ;

(৮) গ্রাম্য ভাষায় বিজ্ঞান ও তত্ত্বের গ্রন্থ রচনা করিবার এবং গ্রাম-গত বিভিন্ন বিষয়ের অথবা ব্যাপারের বিজ্ঞান ও তত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণ করিবার এবং প্রয়োজনানুসারে দেশীয় জনসভাদ্বারা ঐ সমস্ত বিজ্ঞান ও তত্ত্বের পরিবর্ত্তন সাধন করাইবার কার্য্য-বিভাগ;

(৯) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান-সমূহের সংগঠন ও বিধি-নিষেধ-বিষয়ক গ্রামগত বৈশিষ্ট্যসমূহ দর্শন করিবার এবং প্রয়োজনানুসারে দেশীয় মহাসভাদ্বারা ঐ সমস্ত সংগঠন ও বিধি-নিষেধের পরিবর্ত্তন সাধন করাইবার কার্য্যবিভাগ।

(৪)

গ্রাম্য জন-সম্মেলন-প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও অনুষ্ঠানের কথা

গ্রাম্য জন-সম্মেলন-প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব এক শ্রেণীর, যথা:

গ্রামস্থ জনসাধারণের[১৭] কাহারও কোন ইচ্ছার অপূরণজনিত কোন অভাব অথবা দুঃখ আছে কি না—তাহা সামাজিক কার্য্যের তত্ত্বধারণ-প্রতিষ্ঠানকে এবং গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয়-প্রতিষ্ঠানকে জানান।

১৭। সামাজিক কার্য্যে চতুর্থ শ্রেণীর শ্রম-নিযুক্ত শ্রমিকগণকে এবং তাহাদের ললনা ও সন্তান-সন্ততিগণকে এবং অন্যান্য শ্রেণীর শ্রমিকগণের ললনা ও বালক-বালিকাগণকে "গ্রামস্থ জনসাধারণ" নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

গ্রাম্য জন-সম্মেলন শাখা প্রধানতঃ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর শ্রম-নিযুক্ত শ্রমিকগণের প্রতিনিধিগণের মিলনে সংগঠিত হয়। অন্যান্যশ্রেণীর শ্রমিকগণও গ্রাম্য জন-সম্মেলনে যোগদান করিতে পারেন এবং যোগদান করেন বটে; কিন্তু গ্রাম্য জন-সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য **দুই শ্রেণীর**, যথা:

(১) জনসাধারণের কোন শ্রেণীর অভাব, অস্বাস্থ্য, অসন্তুষ্টি এবং অশান্তি সম্বন্ধে কোনরূপ অভিযোগ আছে কি না এবং থাকিলে কোন্ কোন্ শ্রেণীর অভিযোগ আছে—তাহা সামাজিক তত্ত্বাবধারণ-কার্য্যের কর্ম্মিগণের এবং রাষ্ট্রীয় কর্ম্মিগণের পরিজ্ঞাত হইবার ব্যবস্থা করা;

(২) জনসাধারণ যাহাতে অকৃত্রিমভাবে মিলিত হইতে পারেন এবং তাঁহাদের মনের অভিযোগসমূহ যাহাতে অভিব্যক্তি লাভ করিতে পারে—তাহার ব্যবস্থা করা।

গ্রাম্য জনসম্মেলন-শাখায়, সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর শ্রম-নিযুক্ত শ্রমিকগণ ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর শ্রমিকগণও উপস্থিত থাকিতে পারেন বটে এবং থাকেন বটে কিন্তু তাঁহারা কেবল পরিদর্শক ও শ্রোতাভাবে উপস্থিত থাকেন। গ্রাম্য জনসম্মেলন-শাখার যে-সমস্ত অনুষ্ঠান সাধিত হয়, সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রধান কর্ত্তা থাকেন **জনসাধারণ** অথবা সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর শ্রম-নিযুক্ত শ্রমিকগণের প্রতিনিধিগণ।

গ্রাম্য জনসম্মেলন-শাখা—প্রধানতঃ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমনিযুক্ত শ্রমিকগণের প্রতিনিধিগণের দ্বারা সংগঠিত হয় কেন—তাহার কথা আমরা এক্ষণে আলোচনা করিব।

গ্রাম্য সংগঠনের চারি শ্রেণীর সামাজিক কার্য্য, সামাজিক কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ-কার্য্য এবং রাষ্ট্রীয় কার্য্যের বিবরণ স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে পারিলে দেখা যায় যে, গ্রামের কোন মানুষের কোন প্রয়োজনীয় অথবা অভীষ্ট দ্রব্যের কোন প্রকার অভাব যাহাতে না হইতে পারে তাহার সর্ব্ববিধ শারীরিক শ্রম-সাধ্য কার্য্য করিবার দায়িত্বভার সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমিকগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে। এই কার্য্য যাহাতে সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর মানুষগণের শিখিতে অথবা করিতে সাক্ষাৎভাবে কোনরূপ অসুবিধা অথবা ক্লেশ না হয়—তাহা করিবার দায়িত্বভার ন্যস্ত থাকে সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমিকগণের হস্তে। গ্রামের কোন মানুষের কোন প্রয়োজনীয় অথবা অভীষ্ট দ্রব্যের কোন প্রকার অভাব যাহাতে না হইতে পারে তাহার জন্য যে সমস্ত অনুষ্ঠান সাধন করিবার প্রয়োজন হয় সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের সংগঠন করিবার ও পরিদর্শন করিবার দায়িত্বভার ন্যস্ত থাকে সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমিকগণের হস্তে এবং সামাজিক কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ-কার্য্যের শ্রমিকগণের হস্তে। কোন গ্রামের কোন মানুষের কোন প্রয়োজনীয় অথবা অভীষ্ট দ্রব্যের কোন প্রকারের অভাব যাহাতে না হয় তাহা করিতে হইলে কোন্ কোন্ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় এবং ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান সাধিত হইতে পারে কোন্ কোন্ কার্য্যপন্থায়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার দায়িত্বভার ন্যস্ত থাকে কেন্দ্রীয় মহাসভার কর্ম্মিগণের হস্তে।

কোন্ কোন্ অনুষ্ঠান সাধন করিলে গ্রামের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ প্রয়োজনীয় ও অভীষ্ট দ্রব্যের সর্ব্ববিধ অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর হইতে পারে, তাহার কথা কেন্দ্রীয় মহাসভার কর্ম্মিগণ দেশীয় জনসভার কর্ম্মিগণের মারফত গ্রামের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মিগণকে জানাইয়া দেন।

গ্রামের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মিগণ ঐ সমস্ত কথা গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ-কার্য্যের কর্ম্মিগণকে জানাইয়া দেন এবং বুঝাইয়া দেন।

গ্রামের কোন মানুষের কোন প্রয়োজনীয় অথবা অভীষ্ট দ্রব্যের কোনরূপ অভাব যাহাতে না হইতে পারে তাহা করিতে হইলে, কোন্ কোন্ অনুষ্ঠান সংগঠন করিবার প্রয়োজন তাহা যেরূপ কেন্দ্রীয় মহাসভার কর্ম্মিগণ নির্দ্ধারণ করিয়া দেশীয় জনসভার কর্ম্মিগণের মারফত গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মিগণকে জানাইয়া দেন; সেইরূপ আবার, কোন মানুষ যাহাতে অলস অথবা বেকার অথবা কোনরূপ পশুভাবাপন্ন না হইতে পারেন তাহা করিতে হইলে, কোন্ কোন্ অনুষ্ঠানের সংগঠনের প্রয়োজন, তাহার কথাও কেন্দ্রীয় মহাসভার কর্ম্মিগণ নির্দ্ধারণ করিয়া দেশীয় জনসভার কর্ম্মিগণের মারফত গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মিগণকে জানাইয়া দিয়া থাকেন।

কোন মানুষ যাহাতে অলস অথবা বেকার অথবা কোনরূপ পশুভাবাপন্ন না হইতে পারে তাহার জন্য যে যে অনুষ্ঠানের সংগঠনের প্রয়োজন হয় বলিয়া কেন্দ্রীয় মহাসভার কর্ম্মিগণের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, সেই সেই অনুষ্ঠানের সংগঠনের কথা গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মিগণ সামাজিক কার্য্যের তত্ত্বাবধারক কর্ম্মিগণকে

জানাইয়া দেন ও বুঝাইয়া দেন। সামাজিক কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ কার্য্যের কর্ম্মিগণ সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণের সহায়তায় ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান যাহাতে সাধিত হয় তাহার ব্যবস্থা করেন এবং ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান অনুসারে গ্রামস্থ প্রত্যেক নরনারীকে যে সমস্ত শিক্ষা ও অভ্যাস করাইবার প্রয়োজন হয়—সেই সমস্ত শিক্ষা ও অভ্যাসের দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়—সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর শ্রমিকগণের হস্তে।

গ্রাম্য সংগঠন স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে পারিলে ইহা দেখা যায় যে, গ্রামস্থ শিশুগণ, নারীগণ এবং সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমিকগণ—গ্রামের মেরুদণ্ডস্বরূপ এবং তাঁহারা প্রত্যেক গ্রামের সাড়ে পনের আনা অংশ। তাহাদের শুভাশুভের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন সামাজিক কার্য্যের তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণ, গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ-কার্য্যের শ্রমিকগণ, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যের শ্রমিকগণ, দেশীয় জনসভার শ্রমিকগণ এবং কেন্দ্রীয় মহাসভার শ্রমিকগণ।

গ্রামস্থ শিশুগণ, নারীগণ এবং সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমিকগণের কাহারও কোনরূপ ধনাভাব না থাকিলে এবং বয়ঃপ্রাপ্ত কেহ অলস অথবা বেকার অথবা কোনরূপ পশুভাবাপন্ন না থাকিলে, ইহা বুঝিতে হয় যে, ঐ গ্রামের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার অনুষ্ঠানসমূহ সিদ্ধিলাভ করিয়াছে এবং কেন্দ্রীয় মহাসভার শ্রমিকগণ হইতে আরম্ভ করিয়া সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমিকগণের মিলিত শ্রম সাফল্য লাভ করিয়াছে।

উপরোক্ত কারণে, গ্রাম্য জনসম্মেলন-শাখা প্রধানতঃ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমনিযুক্ত শ্রমিকগণের প্রতিনিধিগণের মিলনে সংগঠিত হইয়া থাকে।

গ্রাম্য সংগঠনের গ্রাম্য জনসম্মেলন-শাখায় গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমিকগণের প্রত্যেকের প্রতিনিধিত্ব কোন্ প্রণালীতে সাধিত হয় এবং গ্রাম্য জনসম্মেলন-শাখা কিরূপভাবে সংগঠিত হয় তাহার কথা আমরা এই আলোচনার দ্বিতীয়াংশে বিবৃত করিব।

দেশীয় জনসভা

এই প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ নয় শ্রেণীর নয়টি কার্য্যবিভাগের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, যথা:

(১) বিভিন্ন গ্রামের পরস্পরের সীমানা-সংক্রান্ত বিবাদ নিবারণ করিয়া গ্রামগত সাম্প্রদায়িক সৌখ্য-বিধান করিবার কার্য্য-বিভাগ;

(২) মানুষের পরস্পরের সর্ব্ববিধ বিবাদের বিচার করিয়া ব্যক্তিগত সৌখ্যবিধান করিবার কার্য্য-বিভাগ;

(৩) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ কেন্দ্রীয় মহাসভার নিকট হইতে পরিজ্ঞাত হইয়া গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মিগণকে জানাইবার ও বুঝাইবার এবং প্রত্যেক গ্রামে তদনুসারে কার্য্য হইতেছে কি না—তাহা পরিদর্শন করিবার কার্য্য-বিভাগ;

(৪) মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ কেন্দ্রীয় মহাসভার নিকট হইতে বিদিত হইয়া গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মিগণকে জানাইবার ও বুঝাইবার এবং প্রত্যেক গ্রামে তদনুসারে কার্য্য হইতেছে কি না—তাহা পরিদর্শন করিবার কার্য্য-বিভাগ;

(৫) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধিনিষেধ কেন্দ্রীয় মহাসভার নিকট হইতে বিদিত হইয়া গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মিগণকে জানাইবার এবং বুঝাইবার এবং প্রত্যেক গ্রামে তদনুসারে কার্য্য হইতেছে কি না—তাহা পরিদর্শন করিবার কার্য্য-বিভাগ;

(৬) কোন শ্রেণীর কর ধার্য্য না করিয়া দেশীয় জন-সভার শ্রমিকগণের বেতন প্রদান ও অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার কার্য্য-বিভাগ;

(৭) দেশীয় জনসভার শ্রমিক নিয়োগ করিবার এবং কেন্দ্রীয় মহাসভায় প্রতিনিধি প্রেরণের কার্য্য-বিভাগ;

(৮) দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞান ও তত্ত্বের গ্রন্থ রচনা করিবার এবং দেশগত বিভিন্ন বিষয়ের বিজ্ঞান ও তত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণ করিবার এবং প্রয়োজনানুসারে কেন্দ্রীয়

মহাসভা দ্বারা ঐ সমস্ত বিজ্ঞান ও তত্ত্বের পরিবর্ত্তন সাধন করাইবার কার্য্য-বিভাগ;

(৯) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান-সমূহের সংগঠন ও বিধিনিষেধ-বিষয়ক দেশগত বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিবার এবং প্রয়োজনানুসারে কেন্দ্রীয় মহাসভা দ্বারা ঐ সমস্ত সংগঠন ও বিধি-নিষেধের পরিবর্ত্তন সাধন করাইবার কার্য্য-বিভাগ।

কেন্দ্রীয় মহাসভা

এই অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ নয় শ্রেণীর। ঐ নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠানও কেন্দ্রীয় মহাসভার নয়টী কার্য্য-বিভাগের দ্বারা সাধিত হয়, যথা:

(১) বিভিন্ন দেশের পরস্পরের সীমানা-সংক্রান্ত বিবাদ নিবারণ করিয়া দেশগত জাতীয় সৌখ্যবিধান করিবার কার্য্য-বিভাগ;

(২) সর্ব্ববিধ ব্যক্তিগত বিবাদ নিবারণ করিয়া মানুষের ব্যক্তিগত সৌখ্য সাধন করিবার কার্য্য-বিভাগ;

(৩) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ দেশীয় জনসভাকে জানাইবার ও বুঝাইবার ও তদনুসারে কার্য্য হইতেছে কি না তাহা পরিদর্শন করিবার কার্য্যবিভাগ;

(৪) মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ দেশীয় জনসভাকে জানাইবার ও বুঝাইবার এবং তদনুসারে কার্য্য হইতেছে কি না তাহা পরিদর্শন করিবার কার্য্যবিভাগ;

(৫) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধিনিষেধ দেশীয় জনসভাকে জানাইবার ও বুঝাইবার এবং তদনুসারে কার্য্য হইতেছে কি না তাহা পরিদর্শন করিবার কার্য্যবিভাগ;

(৬) কোন শ্রেণীর কর ধার্য্য না করিয়া কেন্দ্রীয়, দেশীয় এবং গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিকগণের পারিশ্রমিক প্রদান করিবার ও অন্যান্য আর্থিক প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিবার বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধিনিষেধ দেশীয় জনসভাকে জানাইবার ও বুঝাইবার এবং তদনুসারে কার্য্য হইতেছে কি না তাহা পরিদর্শন করিবার কার্য্য-বিভাগ;

(৭) সর্ব্ববিধ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক প্রস্তুত করিবার ও নিয়োগ করিবার বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধিনিষেধ দেশীয় জনসভাকে জানাইবার ও বুঝাইবার এবং তদনুসারে কার্য্য হইতেছে কি না তাহা পরিদর্শন করিবার কার্য্য-বিভাগ;

(৮) সর্ব্ববিধ বিজ্ঞান ও তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিবার এবং তৎসম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ কেন্দ্রীয় ভাষায় রচনা করিবার কার্য্য-বিভাগ;

(৯) সর্ব্ববিধ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান-সমূহের সংগঠন ও বিধিনিষেধ নির্দ্ধারণ করিবার এবং তৎসম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ কেন্দ্রীয় ভাষায় রচনা করিবার কার্য্যবিভাগ।

আগামী সংখ্যায় "মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের" পরবর্ত্তী অংশের আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিবার আশা রহিল।

শুভ নববর্ষ

শুভ নববর্ষে আমরা আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষক ও সর্ব্বসাধারণ দেশবাসীকে সদিচ্ছা ও সম্প্রীতি জ্ঞাপন করিতেছি এবং মঙ্গলময়ের নিকট সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল কামনা করিতেছি।

বঙ্গশ্রী

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বৈশাখ—১৩৫১

১১শ বর্ষ, ২য় খণ্ড—৫ম সংখ্যা

বর্ষ-বোধন

বাণীকুমার

জীর্ণ-খিন্ন বরষের ক্লান্ত রাতি হোলো অবসান
পুরাতন অস্তাচলে করিল প্রয়াণ—
তিমিরের যবনিকা টানি';—
ঈশান নূতন ধ্বনিয়া তুলিল দীপ্তবাণী।

*

উদয়-দিগন্তে রবি
বাজায় রে উন্মত্ত ভৈরবী:—
আবর্তির সুরে চিরজয়ী নবীনের
অতৃপ্ত বিরহ-বাঁশী যেন মিলনের
বাণীর নির্ঘোষ বাজে
নিখিলের বক্ষোমাঝে।

*

অনন্তের বিরাট সঙ্গীতে শঙ্খ ভরিল অন্তর,
ঊষার শোণিমা-দীপ্ত অমল সুন্দর
পারিজাত দলে নব লেখা লিপিখানি
সাথে আনি'
নববর্ষ করিল আহ্বান,—
দিগন্তে বাজিল তীক্ষ্ণ ভৈরব বিষাণ।

*

বৈশাখের দীপ্তমঙ্গলক্ষণে
নবীনের বদ্ধ আলিঙ্গনে
জরার জীর্ণবেশ ঝরে' পড়ে' যায়,
তাই বুঝি হায়—
পুরাতন দিন ক্লান্ত মনে
বিলাপ-নিঃস্বনে
গেয়ে চলে বিদায়ের গান নন্দিত ধরায়
দিবসশেষ গোধূলি-বেলায়।

*

এসেছে নামিয়া আজি তরুণ বরষ,
ধরণীর বক্ষে ভরি' বিপুল হরষ
নবীনের ঝড় তুলি',—
হাতে ল'য়ে বাগ্র তুলি
করুণা-লেখায়
নীলাঞ্জন আঁকি' দিল কুঞ্জে কুঞ্জে বন-বীথিকায়।
প্রকৃতির ধ্যান ভঙ্গ করি'—জল-স্থল ঘেরি'
বাজিয়া উঠিল তীব্র বিজয়ের ভেরী।

হে কিশোর, দিনে দিনে কত যুগ ধরে'
আসিতেছ অবনীর 'পরে
মরণের মাঝখানে অমৃতেরে চিনে?
প্রকৃতির বীণে
মিলন-বিচ্ছেদ সুর হয় একাকার,
পূর্ণ তুমি নানারূপে রসে-গন্ধে—আসো বারংবার।

*

হে নবীন—
বৈশাখের এই শুভদিন
এলে তুমি অশান্ত চরণে—
কত যে বিচিত্ররূপে সজীব বরণে—
উড়াইয়া দিয়া তব শ্যামল উত্তরী।
শঙ্খরণে দিগন্তের প্রাণ তাই উঠিল মুঞ্জরি',—
অসীমের পাঞ্চজন্য ফুকারিল নীলসিন্ধু চুমি',
শিহরিল শ্যামা ভূমি,
কাঁপিল সঘনে যত ফুলের মঞ্জরী
চিত্তের আনন্দ গান নীরবে গুঞ্জরি'
নীলকান্ত আকাশের তলে
যৌবনের মায়া-মন্ত্রে পবন-হিন্দোলে।

*

হে অমর অক্লান্ত নূতন—
এনেছ কি সাথে ক'রে জীবনের আদি শুভক্ষণ?
ভৈরব আনন্দে আজি প্রদীপ্ত প্রভাতে
শঙ্খহাতে এসেছ কি আবার জাগাতে?
তোমার এ নবীন যৌবন
ধরণীরে দিক আজি নব জাগরণ।

এ ধরার চিত্তবীণা তন্ত্রে তন্ত্রে উঠুক্ রণিয়া—
চির সত্যসুন্দরের বাণী উন্মথিয়া।
হে তরুণ, হে বিজয়ী, দুর্জ্জয় তরুণ,—
কোথা' তব যুগান্তের অস্ত্র-পূর্ণ তূণ ?
বরষের এ মাহেন্দ্র উষার জ্যোতিতে
যাচে হিয়া ছন্দ-মুক্ত রাগিণী গাহিতে ;
তাই প্রাণ করিছে প্রার্থনা
"নবীন যুগের আজি করো প্রবর্ত্তনা—
মাতায়ে নিখিল-চিত্ত ওঙ্কারে ওঙ্কারে—
প্রকাশিয়া সৃষ্টি-সুর উদাত্ত ঝঙ্কারে।"

*

অম্বুধির উচ্ছলিত তরঙ্গ-কল্লোলে
অশান্ত প্রবাহ-ভঙ্গ-নর্ম্মের হিল্লোলে
যে-গান বাজিছে পলে পলে,—
নদীর সলীল-গতি যে তান উছলে,
ওই যে নীলিমা-তৃপ্ত সুনিখিল ব্যোমে
নক্ষত্রে নক্ষত্রে প্রতি জ্যোতিঃ অর্ক-সোমে
যে বাণী বিকাশি' রয়,—
যেন মনে হয়—
বীতনিদ্র যৌবনের জয়মন্ত্রময়।
কুজ্ঝটিকা বিদারিয়া দীপ্ত রবি
প্রকটিয়া স্বর্ণছবি
যে-বাণী প্রকাশ করে কাঞ্চনী শিখায়,—
আবীর-রঞ্জিত মহা নভোনীলিমায়
যে-তান তুলিছে নিতি সূর্য্য অস্তগামী,
কাল বৈশাখীর নৃত্য কভু দিন-যামী
নটেশের তাণ্ডবের সাথী—
আকাশ পঞ্জর-ভেদী ঝঞ্ঝার গর্জ্জন উঠে মাতি',
যেন জাগাবার ছলে
যে সুর ভরিয়া দেয় শূন্যে জলে স্থলে,
প্রকাশিছে যে ইঙ্গিত বিদ্যুতের ভ্রূকুটির তলে,—
বসন্তের জয়ন্ত ধ্বজায় রয় যাহা লেখা—
উদ্দীপ্ত অক্ষরে আঁকা অরুণার্চ্চি-রেখা,
সেই বাণী ব্যক্ত করে তব জন্মদিন,—
"হ'বে জয়, হ'বে জয়, সে লগন ধ্রুব ক্ষয়হীন।"

*

দিগ্বিজয় লগ্নে আজি এসো ওহে বীর,
বাজায়ে বোধন-শঙ্খ, তুলি' উচ্চশির।
ধ্বনিয়া তোলো হে রুদ্র শঙ্করের সে নিঃশঙ্ক গান—
উদ্দামের প্রমত্তের উদ্বোধন তান।
তোমার জয়ন্তী বাণী অক্ষয় হউক্,
আলোর অসীম গান ঝরিয়া পড়ুক্—
তোমার বাঁশরী হ'তে বেদগাথা সম—
অনন্ত তমির-হরা চির দীপ্ততম।

হে কুমার, অমর প্রসাদী তব প্রীতি বিতরিয়া
বিশ্বজিৎ ললাটিকা দাও উ'জলিয়া
নবজীবনের ভালে
পরিপূর্ণ মহাশুভকালে।
হে চির নবীন,
উন্মত্ত দীপক তোলো ঝঙ্কারিয়া বীণ,,
ঈশানের মত্ত-করা বিষাণের সুরে।
ভীমবেগে দূরে কোন্ অচিন্ত্য সুদূরে
ভেসে যাক্ জীবনের সব অবসাদ—
যুগান্তের নিষ্ফল অর্জ্জন যত আতঙ্ক-প্রমাদ।
হে প্রমুক্ত—তমোঘন জীবনের হৃদি-তারে-তারে
হানো হানো গভীর ঝঞ্ঝনা হানো বিদ্যুৎ-ঝঙ্কারে,—
জাগাইয়া তোলো আজি পুরাতন প্রাচীন গরিমা—
বিস্মৃত মহিমা।

*

উড়াও হে বৈজয়ন্তী বিজয়-গৌরবে,
অমৃত-সৌরভে—
বহে' যাক্ আনন্দের মৃগনাভি-ধারা,
বিস্মৃতির মরুতলে হ'য়ে যাক্ হারা—
ক্লেশ-ক্লিষ্ট জীবনের সহস্র লাঞ্ছনা,
কালের কুটিল পুঞ্জ ধিক্কার গঞ্জনা।
হে মধুমাধব, ওহে সদা মহীয়ান্,
এ-বিশ্বে বিথারি' দাও অনন্তের দান,
ভেঙে দাও হীনতার দাসত্ব-শৃঙ্খল—
স্বাধীন জীবন দাও—করো শান্তি সদা অচঞ্চল।
হাতে দাও শক্তি, দাও খড়্গ ক্ষুরধার—
অন্যায়কারীরে আর অন্যায়ভোগীরে বধিবার।

*

তোমার কিশোর মুক্ত হাসির আড়ালে
যুগে যুগে কালে কালে—
বাজে আগুনের গান,
সেই গান মাতায়ে তুলুক সুপ্ত প্রাণ,—
ও উদার উদ্বোধন দুন্দুভির তান
যেন সাম-মন্ত্র গীতি সম উদাত্ত ঘোষিয়া
মাতাইয়া তোলে নিত্য ত্রিংশ-কোটি হিয়া,
সে-যে ব্যক্ত করে অসীমের অনন্ত বিস্ময়,
ব্যক্ত করে নবীনের জীবনের জয়!
সে ঘোষণ-বজ্রমন্ত্রে শুনিছে আহ্বান—
নব-মন্ত্রে উদ্বোধিত জাগ্রত পরাণ।
দুর্নিবার তেজে এসো বাহিরিয়া সবে
মুক্তির আহবে,
স'পে দাও অকুণ্ঠিত প্রাণ,
তব ত্যাগ-রক্ত রাগে বিজয় নিশান
শোভিবে বিমান।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকজন কবি*

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাঙ্গালীর মনীষা ও প্রতিভার যে অপূর্ব্ব বিকাশ ঘটিয়াছিল, উহার মূলে ছিল প্রতীচীর শিক্ষা ও দীক্ষার প্রভাব। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে তখন যে নব জাগৃতি দেখা দিয়াছিল, প্রতীচ্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলেই সেই জাগরণ ঘটিয়াছিল। সে যুগে বঙ্গ-জননীর কৃতী সন্তানগণ পাশ্চাত্য জাতির নিকট স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্য বোধের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নিজেদের গৌরবময় অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছে এবং গৌরবোজ্জ্বল ভবিতব্যের স্বপ্ন দেখিয়াছে, জীবনের নানাক্ষেত্রে—সাহিত্য সেবায়, রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে, সমাজ-সংস্কারে ও ধর্ম্মসাধনায় বহুমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টার পরিচয় দিয়াছে। নব প্রবুদ্ধ জাতি দেহে ও মনে বিপুল কর্ম্মশক্তি ও উদ্দীপনা অনুভব করিয়াছে। এ জাগরণ ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালীর জাগরণ নহে, ইহার গতি-প্রকৃতি অতি বিচিত্র। এ জাগরণ নৈসর্গিক নিয়মে বাঙ্গালীর অন্তর-পুরুষের জাগরণ নয়, ইহা পলাশীর যুদ্ধে বাঙ্গালীর ভাগ্যবিপর্য্যয়ের অবশ্যম্ভাবী শুভ ফল। বাঙ্গালীর বিশেষ সৌভাগ্যের ফলে সে যুগে সাহিত্য-ক্ষেত্রে এমন প্রতিভাশালী পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে যাহারা প্রতীচীর ভাবধারাকে আত্মসাৎ করিয়া স্বকীয় সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছে এবং স্বল্পবুদ্ধি, স্বধর্ম্মভ্রষ্ট, পরানুকরণপ্রিয় স্বদেশবাসীদিগকে মোহপ্রবুদ্ধ করিয়াছে। সে যুগ প্রধানতঃ মধু-বঙ্কিমের যুগ; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র শুধু যুগ নহেন, তিনি যুগ-স্রষ্টা ও মন্ত্রদ্রষ্টা, আর মধুসূদন একটি যুগ ও যুগাবসান।

বাংলার সেই গৌরবময় যুগে পূর্ব্ববঙ্গেও এমন অনেক কৃতী সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন যাঁহারা সাহিত্য-সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। সেই যুগেই কবি নবীনচন্দ্রের আবেগময়ী কবিতা সহস্রধারে উৎসারিত হইয়া রসিক সমাজের চিত্ত বিনোদন করিতেছিল। মহিলা-কবি কামিনী রায় (স্বনামধন্য লেখক চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা) মহিলা-কবিগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ কবি কায়কোবাদের কাব্য-সাধনাও এই যুগেই আরম্ভ হয়।

সাহিত্যক্ষেত্রে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দানও উপেক্ষণীয় নহে। সেই যুগেই স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসের কলগানে বাংলার কাব্যকুঞ্জ মুখরিত হইয়াছিল। যাঁহারা বাগ্‌দেবীর করুণামসৃণ কটাক্ষপাতে দেশবাসীর অন্তরে এখনও বিরাজমান রহিয়াছেন, তাঁহারা বর্ত্তমান নিবন্ধের বিষয়ীভূত নহেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর এমন কয়েকজন কবির সম্পর্কে আলোচনা করিব, যাঁহারা বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়াছেন অথবা যাহাদের কাব্যের সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পরিচয় অতি অল্প। কোন জীবিত কবির সম্বন্ধেও আমরা আজ আলোচনা করিব না। আমরা যে সমস্ত কবির সম্পর্কে আলোচনা করিব তাঁহাদের নাম—(১) দীনেশচরণ বসু (২) আনন্দচন্দ্র মিত্র (৩) গোবিন্দচন্দ্র রায় (৪) নবীনচন্দ্র দাস (৫) শশাঙ্কমোহন সেন ও (৬) জীবেন্দ্রকুমার দত্ত। কবি দীনেশচরণ বসু ও আনন্দচন্দ্র মিত্রের নাম এ দেশের কাব্যামোদিগণও প্রায় ভুলিয়া গিয়াছেন। গোবিন্দচন্দ্র রায় ও নবীনচন্দ্র দাসের রচনার সঙ্গেও সাহিত্য-রসিকগণের পরিচয় অতি সামান্য। কবি শশাঙ্কমোহনের কাব্য-গ্রন্থগুলিও ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। জীবেন্দ্রকুমারের কবিতা ক্বচিৎ কোন পাঠ্যপুস্তকের সম্পাদক তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া পরলোকগত কবির প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমরা যাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করি নাই, এমন অনেক কবির রচনাও বাংলার সাময়িক পত্রসমূহের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। বর্ত্তমান নিবন্ধে কোন কবির সম্বন্ধেই বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর নহে। ইহা পূর্ব্বগামীদিগের ঋণ পরিশোধের সামান্য প্রয়াস মাত্র।

(১) দীনেশচরণ বসু

উনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত কবি কবি-যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, দীনেশচরণ তাঁহাদের অন্যতম। ইনি "কবি-কাহিনী" "মানস বিকাশ" ও "মহাপ্রস্থান" নামে তিনখানি কাব্যগ্রন্থ ও "কুলকলঙ্কিনী" নামে একখানি উপন্যাস রচনা করেন। তাঁহার আদর্শ ছিল কবি হেমচন্দ্র। তাঁহার কবিতার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য আছে। তিনি হাস্যরস সৃষ্টি করিতে সুদক্ষ এবং ব্যঙ্গ-কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার কোন কোন কবিতায় দার্শনিক-সুলভ ভাবুকতা আছে, কোন কোন কবিতায় স্বদেশপ্রেম মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রেম বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে সংযম, সুরুচি ও শালীনতার পরিচয় আছে। এক কালে তাঁহার "তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা" কবিতাটী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পতিহীনা নারী তাঁহার সখার নিকট অন্তরের গভীর বেদনা ব্যক্ত করিতেছেন—

"তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে অনল দগ্ধ করে
তুই কি দেখিবি তার অন্তে তাহা দেখে না,

---

* ঢাকা 'জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে' পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য-সমাজের অধিবেশনে পঠিত।

যে জন অন্তর-যামী তিনি আর জানি আমি
এ বহ্নির শত শিখা কে করিবে গণনা ?
তুঃ কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা।
এ পোড়া মনের কথা বলিবার নয় লো,
বিধবার চিত্ত হায় ঘোর মরুভূমি প্রায়
বায়ুশূন্য, ছায়াশূন্য; সদা ধু ধু করে লো,
একদিন, দুইদিন নহে শ্যামা, চিরদিন
যতদিন ধূলায় না এ দেহ মিশায় লো ,
এ পোড়া মনের কথা বলিবার নয় লো।"

কবি হেমচন্দ্রের 'ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অই রে' অথবা 'হয়ে আর্য্যবংশ অবনীর সার রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে' প্রভৃতি কবিতাগুলির সঙ্গে এই কবিতাটির তুলনা করিলেই ইহার উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইবে। বাস্তবিক কবিতাটির মধ্যে যে অনুভূতির গভীরতা ও আন্তরিকতা আছে এবং সাবলীল গতিভঙ্গিমা আছে, উহা আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে।

কবি দীনেশচরণের কোন কোন কবিতায় উচ্চাঙ্গের দার্শনিকতার দ্বারা কাব্য-রস আচ্ছন্ন হইয়াছে। 'কাল' কবিতাটি ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। অনন্ত অজেয় কালের তরঙ্গ সর্ব্বদা উন্মত্ত মাতঙ্গের মত ছুটিয়া চলিয়াছে, এই কথার উল্লেখ করিয়া কবি বলিতেছেন—

'যেমন শিশুরা হাসিয়া হাসিয়া,
মাটির পুত্তলী স্বকরে গড়িয়া,
বসনভূষণে সবে সাজাইয়া,
ভাঙ্গিয়া ফেলে,
সেইরূপ কাল নিরত নিয়ত,
গড়িছে ভাঙ্গিছে নিমিষেতে কত,
আপন মনের অভিরুচি মত
অবনী তলে ;
মহোচ্চ ভূধর, গভীর জলধি,
কাঁপে থর থর, পূজে নিরবধি,
পদ যুগলে' !

'ভালবাসা' কবিতায় কবি বলিতেছেন—এই ভালবাসার দ্বারা সমস্ত পৃথিবী বিধৃত। অপরিসীম ইহার শক্তি, অনন্ত ইহার মহিমা। ইহার আবির্ভাবে বালুকা-ধূসর মরুভূমিতে স্বচ্ছ কল্লোলিনী প্রবাহিত হয়, প্রকৃতি কমনীয় কান্তি ধারণ করে।

'তব আবির্ভাবে, ভুবনমোহিনী,
মরুভূমে বহে গভীর বাহিনী,
ফোটে পারিজাত আসিয়া আপনি
ধরণী-তলে।
আঁধার আকাশে হিমাংশু-কিরণ,
হাসি হাসি করে কর বিতরণ,
ভাসে যেন মরি অখিল ভুবন,
সুখ-সলিলে'।

গঙ্গাজলে কোন্ হতভাগ্য ব্যক্তির শব ভাসিয়া চলিয়াছে, কবি তাহা দর্শন করিয়া চিন্তা-সাগরে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। জগতের অনিত্যতার কথা, ঐশ্বর্য্য-সম্পদের অসারতার কথা চিন্তা করিয়া কবির মন যেন বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। 'গঙ্গাজলে গলিত শব দর্শনে' কবিতাটির মধ্যে একটি বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত হইতেছে।

কবি দীনেশচরণ ১৮৫০ সালে মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত শ্রীবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে স্বগ্রামে দেহত্যাগ করেন।

(২) আনন্দচন্দ্র মিত্র

'হেলেন কাব্য' ও 'মিত্র কাব্য'

কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র এক সময়ে 'হেলেনা কাব্যের' লেখকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই কাব্যখানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ইহা সে যুগের সুধী-সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছিল এবং ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সে যুগে একমাত্র 'বঙ্গদর্শন' ভিন্ন আর সকল সাময়িক পত্রেই কাব্যখানি উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। তাঁহার 'মিত্র কাব্য'ও সে যুগের রসিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামের একটি পুরাতন গৌরবময় ঐতিহ্য আছে। এই গ্রামেই 'হেলেনা কাব্যের' কবি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ব্রাহ্ম-সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন। ১৩১০ বঙ্গাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার একটি সঙ্গীত সে যুগে প্রায় গৃহে গৃহে গীত হইত—'ভারত শ্মশান মাঝে আমি রে বিধবা বালা' ইত্যাদি।

কবি আনন্দচন্দ্রের কোন কাব্যগ্রন্থ অধুনা দুষ্প্রাপ্য। কোন বালক-পাঠ্য পুস্তকে পর্য্যন্ত তাঁহার কোন কবিতা স্থানপ্রাপ্ত হয় না। আমরা বাল্যকালে তাঁহার রচিত 'মাতৃদেবী' নামে একটি কবিতা পড়িয়াছিলাম, তাহার কোন কোন পংক্তি এখনও স্মরণ আছে। যথা—

'মা কথা মধুর কিবা আরামদায়িনী
রোগশয্যা 'পরে কিংবা দূর পরবাসে,
উদ্দেশে 'মা' বলে আমি ডাকি গো যখনি
শান্তি-সমীরণ বহে হৃদয়-আকাশে'।

অথবা—

'প্রেমময়ী বিশ্বমাতা জগত-জননী
প্রতিনিধি তার তুমি থাকিয়া সংসারে'।
ইত্যাদি

'হেলেনা কাব্য' আনন্দচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। তিনি গ্রীক মহাকাব্য হইতে বিষয়বস্তু গ্রহণ করিলেও শ্রীমধুসূদনের মেঘনাদ-বধ কাব্যেরই অনুসরণ করিয়াছেন। এই কাব্যের স্থানে স্থানে উচ্চাঙ্গের কবিত্ব ও ভাবুকতার

নিদর্শন সুস্পষ্ট। শ্রীমধুসূদনের ন্যায় অনন্যসাধারণ কবি-প্রতিভা তাঁহার ছিল না, ভাব কল্পনার তেমন মৌলিকতাও ছিল না, তথাপি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনায় তিনি যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, মধুসূদনের পরবর্ত্তী কোন কবি সে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। তথাপি মনে হয় বিদেশী মহাকাব্য হইতে বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়া কবি ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। কবিও এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ সচেতন ছিলেন; এইজন্য যাবনিক অর্থাৎ গ্রীক শব্দগুলির পরিবর্ত্তে প্রায় অনুরূপ ধ্বনিযুক্ত সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কাব্যটির স্থানে স্থানে শব্দের অপ-প্রয়োগও পরিলক্ষিত হয়। তথাপি তাঁহার কাব্যখানি পাঠ করিলে এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয় যে, তিনি যথার্থ কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। 'বঙ্গ-দর্শনে' হেলেনা কাব্যের প্রতিকূল আলোচনা প্রকাশিত হইলে কবি নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার লেখনী বন্ধ হইয়া যায়।

কবি আনন্দচন্দ্র মিত্রের প্রসঙ্গে সমালোচক শশাঙ্ক মোহন যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য।—'সাহিত্য-জগৎ যে মৌলিকতা এবং কৃতিত্বের বিচার করিতে বসিয়া পরবর্ত্তীর প্রতি, বিশেষতঃ শিষ্য কিম্বা অনুকরণকারীর প্রতি নিদারুণ অবজ্ঞা ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং এ ক্ষেত্রে অনেক সময় যে অবিচারও ঘটিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কালের এই নির্ম্মমতা সকলকেই বেশী কম সহ্য করিতে হয়; অনেক সময় প্রকৃত কবি-প্রতিভাও বাদ পড়ে না। এইরূপে মহাকাল নিদারুণভাবে কাটিয়া ছাঁটিয়া পূর্ব্ব সূরিবৃন্দেরও অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। এককালের বহুমূল্য সম্পত্তির সংখ্যা, পরিমাণ বা ওজন কমাইয়াও নবাগতের জন্য স্থান করিতেছেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে অনেক অমর-যোগিকেও এইরূপে ব্যাধি-বিপত্তি, ব্যবচ্ছেদ-বিধি, এবঞ্চ মৃত্যু-নিয়তির বশীভূত হইতে দেখা যায়।

(বঙ্গবাণী পৃঃ ১২৬-১২৭)।

(৩) গোবিন্দচন্দ্র রায়

কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় যথার্থ কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি ছন্দঃ-কুশলী এবং শব্দ-চয়নে নিপুণ ছিলেন। তাঁহার 'যমুনা-লহরী' কবিতায় যেমন শব্দ-ঝঙ্কার আছে, তেমনি স্বদেশ-প্রেম ও জাতীয়তার নিদর্শন আছে। কবি ভারতের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ কিন্তু ব্যক্তির ন্যায় জাতির পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া কবির হৃদয় বিষাদে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। সলিলা যমুনাকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন—

'নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা
তটশালিনী সুন্দরী যমুনে ও!
কত কত সুন্দর নগরী তীরে
রাজিছে তটযুগ ভূষি ও।
পড়ি জল নীলে ধবল সৌধ-ছবি
অনুকারিছে নভ অঙ্গন ও।
শ্যাম সলিল তব লোহিত ছিল কভু
পাণ্ডব-কুরুকুল শোণিতে ও;
কাঁপিল দেশ তুরগ-গজ-ভারে
ভারত স্বাধীন যেদিন ও।
তব জল তীরে পৌরব যাদব
পাতিল রাজসিংহাসন ও;
শাসিল দেশ অরিকুল নাশি
ভারত স্বাধীন যেদিন ও।
দেখিলে কি তুমি বৌদ্ধ পতাকা
উড়িতে দেশে বিদেশে ও—
তিব্বত চীনে ব্রহ্ম তাতারে
ভারত স্বাধীন যেদিন ও'।

'Elegy written in a country church-yard যেমন কবি Greyকে অমর করিয়া রাখিয়াছে, 'যমুনা-লহরী' তেমনি কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়কে অমরতা-দান করিয়াছে। তোটক ছন্দে কবি একটি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, উহা এক সময়ে লোকের মুখে মুখে গীত হইত। 'কতকাল পরে বল ভারত রে, দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবি,' অথবা 'পর-দীপশিখা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে' প্রভৃতি পংক্তিগুলি বাঙ্গালী এখনও ভোলে নাই, বোধ হয় কোন দিন ভুলিবে না।

কবি গোবিন্দচন্দ্র বরিশাল জেলার একটি পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ্যচক্রে ইঁহাকে প্রবাসে বাস করিতে হইলেও ইনি বাংলা দেশকে ও বাঙ্গালী জাতিকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। ইনি আজীবন সাহিত্য-সাধনা করিলেও, শুধু দুইটি কবিতার দ্বারা কবিযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

সংস্কৃতের ছন্দগুলি বাংলা সাহিত্যে অচল, তথাপি গোবিন্দ চন্দ্র তোটক ছন্দে যে কবিতাটি রচনা করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এ বিষয়ে তিনি বাংলার একজন খ্যাতনামা কবিকেও অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার কবিতাটি পাঠ করিলে—কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের একটি অনুরূপ ছন্দে লিখিত কবিতা মনে পড়ে—

'কত রত্ন বিলুণ্ঠিত পদতলে
কত কাচ শিরের বিভূষণ রে।
কত ভূমিপ-আসন-যোগ্য জন
উটজে করিছে দিন যাপন রে'।

গোবিন্দ রায়ের রচিত 'গীতি-কবিতা' (১ম হইতে ৪র্থ

খণ্ড পর্য্যন্ত) এক সময়ে সাহিত্য-রসিকগণের আদরের বস্তু ছিল। 'পল্লব' ও 'আলোচনা' নামক সাময়িক পত্রে তাঁহার বহু কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী তাঁহার সমগ্র রচনাবলী (প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত) সংগ্রহ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে কাব্যামোদী বাঙ্গালীগণ তাঁহার প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় লাভ করিবে।

(৪) নবীনচন্দ্র দাস

এক হিসাবে কবিগুণাকর নবীনচন্দ্র দাসের স্থান বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। সংস্কৃত নানা কাব্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। কালিদাসকৃত রঘুবংশ, ভারবি-রচিত কিরাতার্জ্জুনীয়, সোমেন্দ্র প্রণীত চারুচর্য্যাশতক এবং মাঘ-বিরচিত শিশুপাল বধের কিয়দংশ সুললিত ছন্দে অনুবাদ করিয়া তিনি কবিযশ অর্জ্জন করেন। ইনি যে শুধু সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষাতেই সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহা নহে ; যথার্থ কবি-প্রতিভারও অধিকারী ছিলেন।

১৮৫৩ সালে প্রকৃতির লীলাভূমি চট্টলে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। বাণীর সাধনায় তিনি চিরদিন অনলস ছিলেন এবং অনন্য-সুলভ সিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

মহাকবি কালিদাস কৃত রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতীর স্বয়ংবরের একটি চমৎকার বর্ণনা আছে। এই সর্গের বঙ্গানুবাদ হইতে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

বাজিল মঙ্গল বাদ্য মধুর নিক্কণ,
উঠিছে শঙ্খের ধ্বনি ব্যাপি দিগম্বর ;
মেঘের গর্জ্জন ভ্রমে পুর-উপবনে,
নাচিছে উল্লাসভরে ময়ূর-নিকর।

অথবা—

যে যে রাজগণে ছাড়ি চলিলা যুবতী
মলিন তাদের মুখ দুঃখের আঁধারে ;
গেলে চলি দীপশিখা নিশায় যেমতি
রাজপথে হর্ম্ম্যরাজি ডুবে অন্ধকারে।
নিকটে আইল বালা—রঘুর নন্দন
বরে কি না বরে তাঁরে ভাবিয়া আকুল,
কাঁপিল দক্ষিণ ভুজে কেয়ূর-বন্ধন,
ঈষৎ ফুটিল তাহে আশার মুকুল।
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হেরি রঘুর কুমার
দাঁড়াইলা রাজবালা, না চলিলা আর ;—
মঞ্জরিত সহকারে পাইলে যেমতি
না যায় অপর বৃক্ষে ভ্রমরের পাঁতি।

অনুবাদে যে মূলের সৌন্দর্য্য অনেকটা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, উপরি-উদ্ধৃত অংশগুলি হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। নবীনচন্দ্র 'বান্ধব' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন।

(৫) শশাঙ্কমোহন সেন

শশাঙ্ক মোহনের কৃতিত্ব প্রধানতঃ সমালোচনায়। কিন্তু তিনি 'সিন্ধু-সঙ্গীত', 'শৈল-সঙ্গীত', 'সাবিত্রী' 'স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে', 'বিশ্বামিত্র বা জয়-পরাজয়' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া কবি-খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। চট্টগ্রামের অন্তর্গত ধলঘাটে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয় ও ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি এক সময়ে অধুনালুপ্ত 'প্রতিভা' পত্রিকায় 'বাণী-পন্থা—সাহিত্যের অভিব্যক্তি' নামে যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন, উহাতে গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে। 'বঙ্গবাণী', 'বাণী-মন্দির' এবং 'মধুসূদনের কবি-প্রতিভা ও অন্তর্জীবন' সমালোচনা-সাহিত্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান। কিন্তু আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে কবি শশাঙ্ক মোহনের সম্বন্ধেই সংক্ষেপে আলোচনা করিব—সমালোচক শশাঙ্ক মোহনের সম্বন্ধে নহে।

শশাঙ্ক মোহন বাংলার দার্শনিক কবি ; তাঁহার কবিতায় ভাবের গভীরতা যেমন দেখা যায়, ভাষার স্বচ্ছতা ও সাবলীল গতি-ভঙ্গিমা তেমন দেখা যায় না। তাঁহার একটা কবিতা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

আজিকে ঊষার মত হৃদয় আমার
সৌন্দর্য্যে উঠেছে ফুটি', আলোকে গলিয়া
সবিতার পানে যেন রয়েছে চাহিয়া।
আজি বসন্তের রসে হৃদয় আমার
রোমাঞ্চ পুলকভরে উচ্ছল আবহে
আপনার সীমা লঙ্ঘি' বিশ্বপ্রাণে বহে।
আজি আকাশের সম পরাণ আমার
ঘেরিয়া—বেড়িয়া বুকে অখিল সৃষ্টিরে।
—কে তুমি দাঁড়ায়ে ওই বিশ্ব-পরতীরে।

শশাঙ্কমোহনের 'সিন্ধুসঙ্গীতে' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'অকৃত্রিম সহৃদয়তা ও কবি প্রতিভার' পরিচয় পাইয়াছিলেন ; কোন একটী বিখ্যাত সাময়িক পত্র লিখিয়াছিলেন—'কবির মৌলিকতা আছে, কল্পনার বৈচিত্র্য আছে, লিখিবার শক্তি এবং ভাবুকতাও আছে।' 'শৈলসঙ্গীত' সম্বন্ধে নব্যভারত লিখিয়াছেন—'গ্রন্থকার প্রতিভাশালী, শিল্পসম্পদে ধনী…সৌন্দর্য্যবোধের সহিত গ্রন্থকারের সাত্ত্বিকভাবের পরিচয়।…তাঁহার কবিতায় দেব-আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।' নাট্যকাব্য 'সাবিত্রী' সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—'আপনার ভাষা ও কাব্যকলা সম্বন্ধে কিছু বলাই বাহুল্য। কাব্যের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মী স্ত্রীর যেই আদর্শ খাড়া করিয়াছেন, তাহাও আপনার লেখনীরই উপযুক্ত, 'স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে' বৈষ্ণবপ্রেম

গাঁথা-মুখরিত বাংলা সাহিত্যে এক দিব্য প্রেমগাথা। এই কাব্যে পাই স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের পরিণয়-বন্ধনের কাহিনী। তাই কোন মুগ্ধ সমালোচক কাব্যখানাকে 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমগাথা' বলিয়াছেন। ইহা হয়তো ভক্তের অতিশয়োক্তি, কিন্তু কাব্যখানি পাঠ করিলে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, শশাঙ্কমোহন শুধু কবি নন, তিনি তত্ত্বদর্শী ঋষি, তিনি ভারতীয় সাধনার মর্ম্মের মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছেন। একটি সুগভীর দার্শনিক তত্ত্ব কাব্যের মধ্যে রসরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে। 'ব্যোম-সঙ্গীত' মহাকাশের গান, ইহার উৎস দিব্যানুভূতি। 'বিশ্বামিত্র' বা 'জয়-পরাজয়' নামক নাট্যকাব্যের বিষয় বস্তু ব্রহ্মতেজ ও ক্ষাত্রশক্তির দ্বন্দ্ব, পরস্পর বিরুদ্ধ আদর্শের সংঘর্ষ ও সমন্বয়। এই কাব্যে প্রাচীন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল আলেখ্য অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে।

শশাঙ্কমোহন জীবিতকালে কবি-যশ লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলি ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছে। শশাঙ্ক মোহনের দৃষ্টিভঙ্গীতে বাস্তবিকই একটি অভিনবত্ব আছে এবং বাংলার কাব্য-সাহিত্যে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। তপোলোকের স্নিগ্ধ জ্যোতি ও শান্ত সুষমা তাঁহার কাব্যের সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া আছে।

(৬) জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

জীবেন্দ্র কুমারের কবিতাগুলি যেন 'ভক্তি-বিলসিত হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস।' চট্টলের এই পঙ্গু কবি আজীবন বাণীর সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। 'দেশবন্ধু-সম্পাদিত 'নারায়ণ,' পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র 'প্রতিভা' প্রভৃতি সাময়িক পত্রের তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। 'প্রহ্লাদ-উপাখ্যান,' 'ধ্যান-লোক' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের তিনি রচয়িতা, তাঁহার অনেক কবিতায় ভগবানের প্রতি আত্ম-নিবেদনের ভাব পরিস্ফুট। ভক্ত কবি বলিতেছেন—

> জীবনের যেইটুকু তোমার ইচ্ছায়,
> হইয়াছে ব্যয় প্রভু, আসি এ ধরায়,
> লভিয়াছি আয় শুধু সেইটুকু থানি,
> অন্য সব বৃথা ব্যয় ধূলি আর গ্লানি।

এই ভাগ্যহীন কবি আজীবন নীরবে সাহিত্য-সাধনা করিয়াছেন। এরূপ সাহিত্য-নিষ্ঠা বর্ত্তমান যুগে দুর্লভ। 'প্রতিভা'য় প্রকাশিত তাঁহার একটি কবিতায় ('ধুতুরা কুসুম আমি বড় ভালবাসি' ইত্যাদি) আপাত দৃষ্টিতে বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত হইতেছে, কিন্তু কবিতাটির অন্তরালে যেন কবিরই মর্ম্ম-বেদনা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। ভক্ত কবি জীবেন্দ্র কুমারের আর একটি উৎকৃষ্ট কবিতা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

> আজি মোর জীবনের মাঝে
> 　　পড়িয়েছে প্রভাতের আলো;
> সাধ যায় অবসরে কাজে
> 　　বাসিবারে সবাকারে ভালো।
> আজি মোর হৃদয়-গগনে
> 　　গাহিতেছে প্রভাতের পাখী;
> সাধ যায়, সবাকার সনে
> 　　মিলেমিশে চিরদিন থাকি।
> আজি মোর মানস-সরসে
> 　　খেলিতেছে প্রভাত সমীর;
> সাধ যায়, সবার হরষে
> 　　মুছে দিই নয়নের নীর।
> আজ মোর সাধনা-নিকুঞ্জে
> 　　ফুটিতেছে প্রভাতের ফুল;
> সাধ যায়, তুলি পুঞ্জে পুঞ্জে
> 　　পূজি তাঁর চরণ রাতুল।

শিশু-সাহিত্য

শিশু-সাহিত্যে পূর্ব্ববঙ্গের দানের কথা উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধ অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। পদ্য-সাহিত্যে যেমন 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত' প্রভৃতির রচয়িতা উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য, তেমনি সুললিত কবিতার রচয়িতা হিসাবে মনোমোহন সেনের নাম স্মরণীয়। ইনি বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোনারঙ্গ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'খোকার দপ্তর', 'শিশুতোষ,' 'বাসন্তী', 'মোহন ভোগ' প্রভৃতি গ্রন্থ বহু দিন শিশুগণের মনোরঞ্জন করিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনেও ইনি অমায়িক ও পরিহাস রসিক ছিলেন।

আর একজন লেখকের নাম এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, তিনি পরলোকগত অক্রূরচন্দ্র সেন। মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত বায়রা গ্রাম তাঁহার পৈতৃক নিবাস। ইনি যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে একখানা শিশুদের জন্য লিখিত হয়। পুস্তকখানির নাম—'ছেলেখেলা'। ইনি শিক্ষা-বিভাগে কার্য্য করিতেন এবং অবসর সময়ে সাহিত্য সেবা করিতেন। তাঁহার 'ছেলেখেলা' শিশু-সাহিত্যের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য।

বাংলা উপন্যাসের গোড়ার কথা*

শ্রীমনোমোহন ঘোষ, এম-এ, পি-এইচ, ডি, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

আধুনিক কালে গদ্য-সাহিত্য যে জনপ্রিয়তায় পদ্যকে হার মানিয়েছে, তার কারণ গল্প উপন্যাসের অজস্র প্রসার। ঈশ্বর গুপ্তের 'প্রভাকর' পত্রিকার সময় পর্য্যন্তও পদ্যলেখার প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী সমাদর ছিল; দেশের অধিকাংশ লোক এ কাগজে প্রকাশিত পদ্য পড়বার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকত, কিন্তু এখনকার দিনে কবিতার পাঠক খুব বেশী নয়। পাঠকসাধারণকে যে জিনিষ বিশেষভাবে আকর্ষণ করে, তা হচ্ছে গল্প-উপন্যাস। কিন্তু এ জন্য আক্ষেপ করবার কোনো কারণ নেই। পাঠকদের চাহিদা বুঝে লেখকরা যতই গল্প-উপন্যাসের রচনায় মনোযোগ দিচ্ছেন এবং তাঁদের সর্ব্বোত্তম শক্তি প্রয়োগ করতে বাধ্য হচ্ছেন, ততই এ-জাতীয় সাহিত্য নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠবার কারণ ঘটছে।

গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে একটা মৌলিক সম্পর্ক থাকলেও এ দুটি কথা পুরোপুরি সমার্থক নয়। উপন্যাস হচ্ছে কোনো এক বিশেষ ধরণে বর্ণিত গল্প। গল্প উপাদান, আর উপন্যাস হচ্ছে সেটিকে বলবার বিশেষ পদ্ধতি। লোকে যখন সত্য ঘটনাকে অতিরঞ্জিত ক'রে বা একটু বাদ সাদ দিয়ে বিকৃত ক'রে বলে, তখনই তা হয়ে দাঁড়ায় গল্প। সে যাই হোক, মানব-সভ্যতার অতি প্রাচীন যুগে যে গল্প-উপকথাদি প্রচলিত ছিল, তার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় উপন্যাসের বীজ। সেকালের আখ্যান গীতি অথবা দেবমহিমার গান (তথাকথিত মঙ্গলকাব্য) যাঁরা রচনা করতেন, তাঁরাই ছিলেন বাংলা-সাহিত্যের আদি গল্প-লেখক। মুখ্যত ইতিহাসের নানা ভাঙ্গা টুকরো-টাকরাকে একত্রে জুড়ে গেঁথে তৈরী হয় গল্প। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর আদি অন্ত দুইই দুজ্ঞের্য়, কিন্তু গল্পেতে দুটিকেই জানা চাই। ইতিহাসের বিবিধ ও বিচিত্র ঘটনা-পর্য্যায়ের সবগুলিকে গুছিয়ে ব'লে শ্রোতাদের খুশী ক'রে তোলা কারুর পক্ষেই সুসাধ্য নয়। কাজেই গল্প-রচক বিরাট দেশকালে বিক্ষিপ্ত ঘটনা ও চরিত্রগুলি থেকে উপাদান নির্ব্বাচন ক'রে সেগুলিকে স্বল্পপরিসরে এবং সহজ-বোধ্য পরিবেশের মধ্যে গল্পরূপে ফুটিয়ে তোলেন। অলংকার-শিল্পী যেমন গয়না গড়তে গিয়ে জহরতাদির কাট-ছাঁট ও মাজাঘসা করে, তেমনি লেখকও ঘটনাগুলির এক-আধ অংশ বাদ দেন বা চরিত্রগুলিকে খানিক খানিক নূতন রূপ দেন—যাতে তারা কল্পিত পরিবেশের মধ্যে মানানসই ভাবে বসে। এই ছিল আদি যুগের গল্প। গোপীচন্দ্রের গান এ জাতীয় গল্পের একটি প্রাচীন দৃষ্টান্ত! এ গল্পের কোনো অংশ, যেমন রাজার ছেলে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ ও তাঁর মায়ের গুরুভক্তি—এগুলি খুব সম্ভব ঐতিহাসিক ঘটনা, কিন্তু এগুলিকে একত্র মিলিয়ে তার উপর কল্পনার রঙ্ চড়িয়ে রচয়িতা সমস্ত জিনিষটিকে নূতন রূপ দিয়েছেন। বাংলা-সাহিত্যের আদি যুগে আখ্যান-গীতি (তথাকথিত 'ব্যালাড' বা গীতিকা) রচকেরা প্রায়শঃ ঐতিহাসিক মাল-মশলা নিয়েই কাজ চালাতেন ও মহাপ্রভু চৈতন্যের কাল পর্য্যন্ত তাঁদের রচনার সমাদর ছিল। বৃন্দাবন দাসের উল্লিখিত যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপালের গীতগুলিই তার প্রমাণ। এ সকল গীত হয়ত চিরতরে লুপ্ত হয়েছে, তাই তাদের রূপ সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা করা যায় না। তবে পরবর্ত্তী কালে রচিত রামায়ণ, মহাভারত ও নানা মঙ্গলকাব্য ও গীতিকা যে তাদের দ্বারা প্রভাবিত, হয়েছিল একথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। এ সকল কাব্যের রচনায় আধুনিক গল্পসাহিত্যের সম্ভাব্যতার আভাস পাওয়া যায়। কারণ শ্রোতাদের ক্লান্তিপরিহারের জন্য এ সকল কাব্যের রচয়িতারা তাঁদের অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা-সংবলিত আখ্যানের মাঝে মাঝে সমসাময়িক জীবনের আচার-ব্যবহারাদির বর্ণনা ঢুকিয়ে দিতেন, যদিও সেগুলি সর্ব্বত্র আরব্ধ গল্পের সঙ্গে পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যযুক্ত নয়। স্থানে স্থানে রন্ধনের ও ভোজনের বর্ণনা এ জাতীয় চেষ্টার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ ছাড়াও, যে চরিত্র-চিত্রণ আধুনিক গল্প-সাহিত্যের এক প্রধান অঙ্গ, তাও মাঝে মাঝে বেশ সুন্দররূপে মঙ্গলকাব্যে দেখা দিয়েছে। যেমন কবিকঙ্কণের ভাঁড়ু দত্ত, মুরারি শীল, দুর্ব্বলা দাসী এবং ভারতচন্দ্রের হীরামালিনী চরিত্র নির্ম্মাণের দৃষ্টান্ত হিসাবে মোটেই নিন্দনীয় নয়।

অন্যান্য দেশের মত বাংলা দেশেও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গদ্য-রচনার প্রসার বেড়ে গেছে, আর বাংলা গদ্যের পুষ্টিসাধনে গল্প উপন্যাসের কৃতিত্ব খুবই বেশী। কিন্তু উপন্যাসের বীজ এদেশের প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে আবিষ্কার করা গেলেও আধুনিক বাংলা-উপন্যাসের জন্ম মুখ্যত ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে এবং এর পুষ্টি সাধনের ব্যাপারেও সহায়ক ইংরেজী উপন্যাসের আদর্শ! এজন্য বাংলা উপন্যাসের সাহিত্যরূপটির ক্রমবিকাশ বুঝতে হলে সংক্ষেপে ইংরেজী উপন্যাসের গোড়ার ইতিহাসটা আলোচনা করতে হয়।

ইংরেজী উপন্যাস-সাহিত্যের বয়সও আড়াইশ' বছরের চেয়ে খুব বেশী নয়। সেখানেও প্রেরণা এসেছিল বিদেশী (ইতালীয়) সাহিত্য থেকে। Lyly রচিত Euphues

* ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনায় ইংরেজী পুস্তকাদি থেকে সাহায্য লওয়া হয়েছে।

নামক গল্পগ্রন্থে দেখা দেয় উপন্যাসের সর্ব্বপ্রথম সূচনা। কারণ এ পুস্তকেই গ্রন্থকার সেকেলে অদ্ভুত কাহিনী বা রোম্যান্স না লিখে ইতালীয় নবেলের অনুকরণে সমসাময়িক লোকচরিত্র ও আচার-ব্যবহারের দাবি এঁকেছিলেন। এতে নায়কের কার্য্যক্ষেত্র ছিল আশেপাশের সমাজ, বিদেশ বা স্বদেশের যুদ্ধক্ষেত্র নয়। তাঁর আগেকার দিনের য়ুরোপে গল্পের নায়কমাত্রই ছিলেন যোদ্ধা, যেমন প্রাচীন বাংলা মঙ্গলকাব্যের অধিকাংশ নায়ক ছিল দেবভক্ত বা দেবতা-বিদ্বেষী সওদাগর বা যোদ্ধা। Lylyর গ্রন্থে দেখা গেল তিনি সেকলে যুদ্ধ-বিগ্রহের বা তারই মতো চমকপ্রদ বিষয়ের বর্ণনা ছেড়ে সমসাময়িক জগৎ সম্বন্ধে পাঠকদের কৌতূহল জাগাতে চেষ্টা করেছেন। বর্ত্তমান সামাজিক রীতি-নীতির যে সমালোচনা একালের উপন্যাসের অপরিহার্য্য অঙ্গ ব'লে বিবেচিত হচ্ছে, তারও সূচনা রয়েছে তাঁর গ্রন্থে। কিন্তু এ পুস্তকের কতকগুলি মারাত্মক দোষ ছিল; যথা বিরক্তিকর অনুপ্রাস ও অন্য অলংকারের বাহুল্য এবং গল্পের মাঝে মাঝে বহু পৌরাণিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ।

এঁর পরে যিনি ইংরেজী উপন্যাস-সাহিত্যের ক্রমিক বিকাশে সাহায্য করেছেন তাঁর নাম Daniel Defoe। তাঁর সুপরিচিত Robinson Crusoe উক্ত সাহিত্য বিকাশের প্রথম ধাপ। উপন্যাস হিসাবে এর ত্রুটি আছে। কারণ পাঠকদের কাছে ঔপন্যাসিক কেবল গল্পের স্রষ্টা মাত্র নন, পরন্তু সর্ব্বজ্ঞ স্রষ্টা। যে হেতু তিনি যে পাত্রপাত্রীদের সৃষ্টি ক'রে কেবল তাদের রূপ-গুণ, আচারব্যবহারের বর্ণনা মাত্র দেবেন তা নয়, তারা কি ভাবছে বা কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে চলছে, এ সকলও তাঁকে জানতে হবে। বাস্তবপন্থীদের পুরোবর্ত্তী Defoe যদিও পারিপার্শ্বিক বস্তুগুলিসহ মানুষকে আঁকতে নিপুণতার পরিচয় দিয়ে গেছেন, তবু সে মানুষের অন্তর্নিহিত চিন্তা বা হৃদয়াবেগকে বিশ্লেষণ করবার কোনো প্রয়াস তিনি করেন নি। এদিকে চেষ্টা না করলে মানবচরিত্রের বর্ণনা সম্পূর্ণ বা তৃপ্তিদায়ক কদাপি হয় না।

নিছক গল্পের চেয়ে উপন্যাস পৃথক; এখানে গল্প ত আছেই, তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক আরো কিছু আছে। গল্পোক্ত ঘটনাপর্য্যায়ের আবর্ত্তনের মধ্যে যে সকল চরিত্র এসে পড়ে, তাদের মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও নিয়তির বিধান সম্পর্কে তাদের অন্তর্লোকের প্রতিক্রিয়া, এ সকলকে ভাষায় ফুটিয়ে তোলাই হ'ল সে আনুষঙ্গিক বস্তু। এ আনুষঙ্গিক বস্তুর সঙ্গে গল্পের সম্বন্ধ অনেকটা গানের সুরের সঙ্গে কথার সম্পর্কের মতো। গল্পের সংখ্যাও গানের কথার মতই সীমাবদ্ধ, কিন্তু তাতে নানা রকমের আনুষঙ্গিক বস্তু যোজনা করা যায়। এজন্যেই দেখা যায় যে, একই গল্পবস্তু নিয়ে দুজনে গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তাঁদের গ্রন্থদ্বয়ে রসের তারতম্য থাকলেও মৌলিকতার অভাব নেই।

Defoeর রচনায় যে ত্রুটি আছে, সে ত্রুটি তাঁর পরবর্ত্তী বিখ্যাত লেখক Fieldingএর রচনায়ও বর্ত্তমান। Defoe সৃষ্ট Crusoeর জীবন একটানা বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার কোনো আন্তরিক প্রতিক্রিয়া নেই। Fielding ও তাঁর পাত্রপাত্রীদের বর্ণনা ক'রে যান কিন্তু তাঁর কল্পনা কখনো সে উর্দ্ধ লোকে পৌছে না যেখান থেকে ঈশ্বরের ন্যায় লেখক তাঁর হাতে-গড়া পাত্র-পাত্রীদের সুখ-দুঃখকে পূর্ণ জ্ঞান ও করুণার সঙ্গে অবলোকন করতে পারেন। কিন্তু Crusoeতে বাস্তবতা অনুসরণ ক'রে যে সুস্পষ্ট নিখুঁত ছবি আঁকা হয়েছে তা লোককে মুগ্ধ করবার মতো। তবে Defoeর পুস্তক পড়ে একটি প্রশ্ন মনে জাগে—গল্পটি কার নামে বলা উচিত? নিঁখুত বর্ণনা করতে হ'লে তাঁর অবলম্বিত পন্থা অর্থাৎ নায়কের দ্বারা গল্প বলানোই উত্তম। কিন্তু এতে কতকগুলি অসুবিধাও আছে। গল্পের নায়কের মুখে সমস্ত কাহিনী ব্যক্ত করবার ব্যবস্থা করলে অনেক কথার বর্ণনা বাদ পড়তে বাধ্য; কারণ গ্রন্থকার তৃতীয় ব্যক্তি রূপে বক্তার আসন নিলে তিনি যেমন সর্ব্বজ্ঞের মতো সকল ঘটনা বলতে পারেন, নিতান্ত সর্ব্বগুণসম্পন্ন গল্পের নায়কও সে রকম সর্ব্বজ্ঞতার দাবী করতে পারেন না। নায়কের জ্ঞান বুদ্ধির অগোচরে যে সকল ঘটনা ঘটতে পারে এবং বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর হৃদয়-মনে যে সকল বিচিত্র ভাবোদয় হয়, সেগুলি যথাযোগ্য ভাবে বর্ণনা করতে পারেন কেবল গ্রন্থকারই। তার উপর মাঝে মাঝে যথোচিত মন্তব্য যোগ করেও তিনি বর্ণনাকে অধিকতর উপভোগ্য ক'রে তুলতে পারেন।

যদি নায়কের মুখে গল্প বিবৃত হয় তবে সেটি প্রামাণ্য ইতিহাসের মতো বিশ্বাসযোগ্য বিবেচিত হতে পারে। এ বিশ্বাসযোগ্যতা গল্পের একটি বিশেষ গুণ। লেখক নিজে বর্ণনা করলেও গল্পের বিশ্বাসযোগ্যতার হানি হয় না—যদি তিনি খুব সতর্কভাবে লেখনী চালনা করেন। তবে তর্কের খাতিরে তাঁকে সর্ব্বজ্ঞ বলে মেনে নিতে হবে, এখানেই এসে যেতে পারে অবিশ্বাস্যতা। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সাহিত্য সৃষ্টির বেলায় মানুষ নিজ সৃষ্টি কর্ত্তার সমশ্রেণীস্থ। এ স্বতঃসিদ্ধ সত্যটি স্বীকার না করলে কোনো সাহিত্যেরই রসাস্বাদন সম্ভবপর নয়।

Defoeর পরবর্ত্তী লেখক Richardson (যাঁকে বলা হয় ইংরেজী উপন্যাসের জন্মদাতা) তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী অনুসৃত পথ ছেড়ে দিলেন। পত্র গল্প তাঁর

হাতে দেখা দিল এক নূতন রূপ নিয়ে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল Defoe-র চেয়ে আলাদা রকমের। যে কোনো রূপ বাস্তব ঘটনাই Defoe কে আকর্ষণ করত, কিন্তু Richardson-এর কৌতূহল ছিল কেবল লোকজনের চাল-চলন, অভ্যাস, চরিত্র আদির সম্বন্ধে। তাঁর এ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী সমসাময়িক (১৮শ শতাব্দীর) প্রায় সকল গদ্যলেখককেই প্রভাবিত করেছিল। এ জন্যে Defoe-র গল্প ছিল বাস্তবতামূলক চমৎকৃতি-উৎপাদক (romantic) উপন্যাস আর Richardson-এর সৃষ্টি ছিল রসবহুল (sentimental) উপন্যাস। প্রথম গ্রন্থকারের দৃষ্টি পারিপার্শ্বিক ও সমসাময়িক জগৎ থেকে দূরে, আর দ্বিতীয়ের দৃষ্টি নিকটতর দেশকালে নিবদ্ধ।

প্রথমোক্ত গ্রন্থকারের রচনায় ছিল প্রাচীন যুগের অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত কাহিনীর (romance) প্রভাব, কারণ তাঁর বর্ণিত গল্পাদি সে সব কাহিনীর মতোই পাঠক-পাঠিকাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা বা হৃদয়াবেগ থেকে ছিল বেশ দূরবর্ত্তী। কিন্তু Richardson এমন গল্প বললেন—যা তাঁর পাঠকমণ্ডলীর হৃদয় সহজেই স্পর্শ করল। তাঁর বর্ণিত দৃশ্যগুলি ছিল প্রায় সকলেরই পরিচিত, আর পাত্র-পাত্রী তাঁর নিজের সময়েরই লোকজন। তিনি যে জগতের দিকে দৃষ্টি দিলেন, তা হল অল্প-পরিসর কিন্তু বিচিত্র ভাবময় মানবহৃদয়। মানুষের দৈনিক জীবন-যাত্রার ও কর্ম্মকোলাহলের ভিতর দিয়ে তাদের ভাবনা, অনুভূতি ও সংকল্প কিরূপে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করে সে সব এঁকে তোলাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। Richardson উপন্যাস রচনায় যেটুকু সাফল্যলাভ করলেন তার ফলে স্পষ্ট জানা গেল যে, চমৎকৃতি-উৎপাদক অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী (romance) সকল হয়ে গেছে পুরাণো এবং অচল এবং তাদের স্থানে দেখা দিচ্ছে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ সম্বন্ধে সত্যিকারের সর্ব্বজনীন কৌতূহল।

কিন্তু মানুষের হৃদয়-মনের বিশ্লেষণ খুব কঠিন কাজ। Richardson এতে কখনো পারদর্শিতা দেখাতে পারেন নি। এ কাজের জন্যে তিনি এত খুঁটিনাটি ও সুদীর্ঘ বর্ণনা উপস্থিত করতেন যে, পাঠকদের মনোযোগ স্থানে স্থানে শিথিল হয়ে পড়ত। তা সত্ত্বেও তাঁর উপন্যাস-রচনার প্রতিভা স্বীকার কর্ত্তে হবে। তিনি যে কেবল বিষয়গত বৈচিত্র্য আনলেন তা নয়; তাঁর গল্প বলার ভঙ্গীটিও নূতন। পাত্রপাত্রীদের লেখা নানা চিঠিপত্রের ভিতর দিয়েই তাঁর গল্পগুলি বিবৃত। এ পদ্ধতির এক সুবিধা এই যে, প্রত্যেক পাত্রপাত্রীর মনের নিগূঢ় কথা বেশ সহজ ভাবে জানা যায় এবং সেটি জানানোই এ জাতীয় উপন্যাসের প্রাণবস্তু। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ পদ্ধতির কিছু গুরুতর অসুবিধাও আছে। এতে উপন্যাসটির স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়; কারণ সাধারণ ব্যক্তিগত জীবনের কোনো পত্রে কেউ নিজ চিন্তা ও কর্ম্মের এমন নিখুঁত খতিয়ান প্রকাশ করেন কিনা সন্দেহ।

Richardson এর বিশ্লেষণাত্মক গল্পবর্ণন-পদ্ধতিতে নানা ত্রুটি থাকলেও তিনি তাঁর উপন্যাসগুলিতে আঙ্গিক ঐক্য বেশ বজায় রেখেছেন। এই আঙ্গিক ঐক্য কেবল প্রথম শ্রেণীর রচনাতেই পাওয়া যায়। বর্ণিত গল্পের মধ্যে একটা ঐক্য থাকবে, প্রত্যেক অবান্তর ঘটনা একটি কেন্দ্রাভিসারী স্রোতপথ বয়ে চলবে। চরিত্রাঙ্কন ব্যাপারেও থাকবে ঐক্যবোধ। গল্পের আদি থেকে অন্ত পর্য্যন্ত একটি ব্যক্তি বা কয়েকটি ব্যক্তি গল্পের রঙ্গমঞ্চে কেন্দ্রস্থল অধিকার ক'রে থাকবে বা তদনুরূপ আচরণ করবে। গল্পোক্ত ঘটনাগুলির মূলে রয়েছে পাত্র-পাত্রীদের নিজ নিজ স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য; কাজেই যে জগতে তারা বিচরণ করবে, নিজেদের আনন্দ-বেদনা প্রকাশ করবে, সেটি সৃষ্টি করবার আগে তাদেরই বিশেষভাবে গ'ড়ে তোলা ঔপন্যাসিকের কাজ। একবার তাদের যে রূপ যে চরিত্র-স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়, তাদের কোনো আচরণে যেন তার সঙ্গে কোনো অসঙ্গতি না ঘটে; তারা সর্ব্বত্র বুদ্ধিমানের মতো আচরণ না করলেও এমন কিছু যেন না করে, যা তাদের পক্ষে অসম্ভব ব'লে বিবেচিত হবে। গল্পের পাত্রপাত্রীকে যদি খুব নিপুণ ভাবে রূপ দেওয়া হয় তবে তারা ঔপন্যাসিকের অভিপ্রায় অনুসারে বিশেষ বিশেষ অবস্থার মধ্যে পড়েও নিজেদের ব্যক্তিত্বকে যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে। মোট কথা চরিত্রসৃষ্টি ও চরিত্র-বিকাশের মধ্যে ঔপন্যাসিকের একটা ঐক্য রক্ষা ক'রে চলতে হয়। সেরূপ ঐক্য বজায় থাকলেই তাঁর সৃষ্ট পাত্র-পাত্রীদের বাস্তব জগতের মানুষ ব'লে মনে হতে পারে। Richardson যদিও Defoe-র চেয়ে ভিন্ন পদ্ধতিতে লিখেছিলেন, তবু তাঁর উপন্যাসগুলিতে উল্লিখিত রকমের ঐক্য ছিল। এজন্যে এবং তাঁর বিষয়বস্তু তথা বর্ণন-পদ্ধতির জন্যে তাঁকে খুব শক্তিশালী লেখক ব'লে গণ্য করতে হবে।

তাঁর পরে উপন্যাস লিখলেন Fielding; তিনিও বাস্তব জীবনের চিত্র আঁকলেন। তাঁরও লেখায় ফুটে উঠল সমাজের দশজনের সুখদুঃখময় ভাবনা ও আচরণের কাহিনী। কিন্তু তিনি সমাজকে Richardson-এর মনোভাব নিয়ে দেখলেন না। তাঁর মতে Richardson-এর দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ ও অস্বাভাবিক রূপে গম্ভীর। সাহিত্য-শিল্পের, বিশেষ করে নাটক-উপন্যাসের আলোচনায়, লেখকের মনোভাবের কথাটি খুবই প্রয়োজনীয়। কারণ, এসব ক্ষেত্রে চরিত্র সৃষ্টির উপরেই সব কিছু নির্ভর করে।

যদি লেখক সূক্ষ্মদৃষ্টি না নিয়ে তাঁর পারিপার্শ্বিক জগতের দিকে তাকান, তবে তাঁর সৃষ্ট পাত্র-পাত্রীগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে না, তাদের কার্য্যকলাপের বিশ্বাস্যতাও হয়ে ওঠে দুর্ঘট, এক কথায়, সে সব চরিত্রের সম্বন্ধে কেউ আকর্ষণ অনুভব করেন না। Richardson এই মনোভাব নিয়ে আরম্ভ করে ছিলেন যে, এজগতে সংকাজের পুরস্কার মিলে। এ কথাটি যে সম্পূর্ণ সত্য নয়, তা বলাই বাহুল্য। Fielding তার চেয়ে স্বাভাবিক মনোভাব নিয়ে লিখেছিলেন। Richardsonএর প্রথম উপন্যাসের বিষয় ছিল Pamela নামে চাকরাণীর আখ্যান—সে কি ক'রে তার মনিবের প্রলোভন এড়িয়ে বুদ্ধি-কৌশলে তার বিবাহিতা পত্নী হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। Fielding এই গল্পকে হাস্যকর প্রতিপন্ন করার জন্যে Joseph Andrews নামে তাঁর প্রথম উপন্যাস লিখলেন। এ বইতে তিনি দেখিয়েছেন যে Andrews খুব সাধু চরিত্রের ভৃত্য হয়েও শেষ পর্য্যন্ত তার নষ্টচরিত্রা এবং কূটবুদ্ধি সম্পন্না প্রভুপত্নীর প্রেমে জড়িত হয়েছিল।

Fielding সমাজকে দেখেছিলেন এক হাস্যময় দৃষ্টিতে। এ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই ছিল Richardson এর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। Fielding এর আর এক বিশেষত্ব ছিল সমাজের উপর এক সামগ্রিক দৃষ্টি। তাঁর দৃষ্টি প্রায় কাউকে এড়াত না। এজন্যে তাঁর উপন্যাসে এত পাত্র-পাত্রীর বাহুল্য এবং ঘটনা-বিন্যাসের অজস্র বৈচিত্র্য। তার ফলে তাঁর এক একখানি উপন্যাস যেন এক একখানি ছোটখাটো মহাভারত। ছোট বড মাঝারি নানা চরিত্রে পরিপূর্ণ তাঁর উপন্যাস অনেকাংশে বাস্তব জীবনের নিখুঁত চিত্র বলে গণ্য হতে পারে। এর থেকেই বোঝা যায় যে, Fieldingএর চরিত্র-চিত্রণের ক্ষমতা খুব উঁচুদরের। তাঁর চরিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি Richardson থেকে আলাদা রকমের এবং বেশী ফলপ্রসূ। মনস্তত্ত্ববিদের মতো পাত্রপাত্রীদের মানসিক গঠন ও প্রবণতা আদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়াতে তাঁর কোনো উৎসাহই নেই। গল্পের যে স্থানে তারা প্রথম দেখা দেয় সেখানেই তিনি তাদের চিন্তা-প্রণালী ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। তার পর স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে তারা নিজেরাই নিজেদের পরিচয় দিয়ে চলে।

Fieldingএর বর্ণনাপদ্ধতিও তাঁর কৃত চরিত্র-চিত্রণকে সার্থক করেছে। নানা চিঠি-পত্রের মধ্য দিয়ে গল্প বলতে গেলে তাতে ঘটনা-পর্য্যায়কে ঠিকঠাক রূপ দেওয়া ততটা সম্ভবপর হয় না। আর ঘটনা পর্য্যায় বিবৃত হলেই পাত্র পাত্রীরা তার মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বরূপ নিখুঁতভাবে না হলেও বেশ সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ ক'রে যেতে পারে। Fielding নিজেই গল্পের বক্তা, কাজেই তিনি সে সকল ব্যাপারকে বেছে নিতে পেরেছেন—যেগুলির বর্ণনার দ্বারা চরিত্রবিশেষকে অপেক্ষাকৃত ভাল ভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। কোনো লোকের লেখা এক রাশি চিঠি দ্বারা বা তার মনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দ্বারা ততটা সম্ভবপর না হতে পারে।

Fieldingএর পরে নাম করবার মতো ঔপন্যাসিক Smollit; বিশেষ শক্তিমান্ লেখক না হ'লেও উপন্যাস নির্ম্মাণ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খুব সুস্পষ্ট ছিল। তিনি বলতেন যে, উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাগুলিকে ঐক্য দান করবার মতো একজন উচ্চশ্রেণীর নায়ক থাকা দরকার।

উপন্যাস রচনা বা উপন্যাস সমালোচনা প্রসঙ্গে এ কথাটি সর্ব্বত্র স্মরণীয়। চরিত্র চিত্রণ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন Fieldingএর অনুগামী। আর তিনি নিজ অভিজ্ঞতা থেকে চরিত্র-সৃষ্টির উপযোগী মাল-মশলা সংগ্রহ করতেন। তিনি নিজ চোখে যে সকল স্থান, কাল বা পাত্র দেখেছেন উপন্যাসে যথাযোগ্য ভাবে তাদেরই সন্নিবেশ করতেন। তারই ফলে তাঁর উপন্যাসগুলি অনেকটা জীবন্ত বর্ণনায় পূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে উপন্যাসের সম্পর্কে ইংরেজ পাঠকদের রুচিতে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল; রুচির পরিবর্ত্তন বিশেষভাবে প্রকট হ'ল কাব্য-সাহিত্যে 'রোম্যান্টিকতা'র (Romaticism) পুনরভ্যুত্থানে। এ রোম্যান্টিকতার অর্থ হচ্ছে—যা কিছু অভ্যস্ত, প্রথাবদ্ধ ও সুনির্দ্দিষ্ট, তাকে অতিক্রম ক'রে চলা। কোন্ ঐতিহাসিক কারণে ইংরেজী সাহিত্য এ যুগবিবর্ত্তনের পথে অগ্রসর হল, তা সংক্ষেপে বলা শক্ত, কিন্তু এ সত্ত্বেও উক্ত পরিবর্ত্তনের মূলনীতি দুর্ব্বোধ্য নয়। সাহিত্য যে পরিমাণে জীবনের প্রকাশক্ষেত্র, পরিবর্ত্তন সে পরিমাণ তার পক্ষে অপরিহার্য্য। ক্রমাগত বাস্তব জীবনের কাহিনী পড়ে' পড়ে' ক্লান্ত জনসাধারণের পাঠস্পৃহা পরিতৃপ্তির নূতনতর ক্ষেত্র খুঁজল। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজী সাহিত্যে অত্যাশ্চর্য্য ঘটনামূলক (Romantic) কাহিনী দেখা দিল। একেও উপন্যাস ব'লে গণ্য করতে হবে, কিন্তু একটা বিশেষণ দিয়ে। এ গল্পে বিশ্বাস উৎপাদনের কোনো চেষ্টা নেই। এর সমস্ত শক্তি হচ্ছে অবিশ্বাস্য ব্যাপারের বর্ণনাকে সরস ও চিত্তাকর্ষক ক'রে তোলায়। যে সকল পাঠক ক্রমাগত সুপরিচিত সাধারণ জীবনের গল্প পড়ে' ক্লান্ত হবার পর অত্যদ্ভুত কাহিনী থেকে উত্তেজনা সংগ্রহের জন্যে উৎসুক, মুরুব্বিয়ানা চালে তাঁদের মনোভাব এবং রুচি সম্বন্ধে সমালোচনা করা সহজ, কিন্তু

তাঁদের দাবীর ন্যায্যতা সম্বন্ধে কোনো আপত্তি চলে না। এরূপ উত্তেজনাদায়ক কাহিনী নিয়ে উপন্যাস রচনা করলেন Walpob, Mr Radcliffe আদি লেখক-লেখিকা-গণ। কিন্তু এঁদের রচনায় কলা-কৌশল উচ্চাঙ্গের ছিল না বলে সেগুলি প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। তবে তাঁরা প্রায় সকলেই তাঁদের গল্পে ভয়মূলক রসকে ফোটাতে চেয়েছিলেন এবং এ জন্যে অতিপ্রাকৃত ব্যাপারের বর্ণনাকে আশ্রয় করেছিলেন কিন্তু এ কার্য্যে সফল হতে হলে যে পরিমাণ ভাবাবেগকে রূপ দেওয়া দরকার, গদ্যের পক্ষে তা দেওয়া সম্ভবপর নয়। Coleridge এর Ancient Marinerএর মতো অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য গল্প রচনার ক্ষমতা আছে শুধু পদ্যেরই, কারণ পদ্য ছন্দের উপর ভর করে উড়ে চলতে পারে এবং এতে যে পরিমাণ ভাবাবেগ চাপানো যায় তাতে গল্পটি হয়ে পড়ে অবাস্তব। কিন্তু এরূপ গল্প যদি গদ্যের উপর ভর দিয়ে চলতে যায় তবে নিতান্ত অসম্ভব কিছু বলবার মুহূর্ত্তে গদ্য তার কর্ত্তব্য পালন করতে অক্ষম হয়।

সে যাই হোক, ইংরেজী উপন্যাস চমৎকৃতি-উৎপাদনের সোজা রাস্তা খুঁজে পেল ইতিহাসের ভিতর দিয়ে। তার ফলে এমন এক জগৎ সৃষ্টি করতে পারল, যার বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য অথচ চোখের উপর বর্ত্তমান নয়। এ ঐতিহাসিক পদ্ধতির উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন Sir Walter Scott আর Waverly হল তাঁর প্রথম সেরা বই।

Scott যে তাঁর নিজ দেশের কাহিনী নিয়ে উপন্যাস লিখেছিলেন এ ঘটনাটি বেশ অর্থপূর্ণ। তিনি Fielding বা Smollet এর মতো নিজের জানাশোনা অন্তরঙ্গ লোকদের জীবনকথা বর্ণনা করতে না পারলেও তার চেয়ে কিছু কম ভাল কাজটিই ক'রে গেছেন; তিনি বর্ণনা করেছেন সে সব ঘটনা ও নরনারীর, যাঁরা ইতিহাস পাঠের ভিতর দিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। আর স্কটল্যাণ্ডের নানা দৃশ্য ও চরিত্রাদর্শের সম্বন্ধে তাঁর যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল, তাকে ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি তাঁর উপন্যাসগুলিকে নিজের দেখা ও অনুভব করা জিনিষের মতো ক'রে তুলেছিলেন।

কিন্তু স্কটল্যাণ্ডেরই বা অন্য যে দেশেরই ইতিহাস নিয়ে তিনি লিখেছিলেন, সে লেখাই ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারাকে সৃষ্টি করল এবং এ বিষয়ে তাঁর প্রদর্শিত পদ্ধতিই একমাত্র ফলপ্রদ পদ্ধতি। তিনি কখনো ইতিহাসের মৃত কঙ্কালকে পুনরুজ্জীবন ক'রে তাকে ঐতিহাসিক বাস্তবতাদানের দুঃসাধ্য চেষ্টা করেন নি। চেষ্টা-চরিত্র করে জোড়াতাড়া দিয়ে প্রাচীন যুগের কোনো স্থাপত্য কীর্ত্তিকে পুনর্নিম্মাণ বা সংস্কার করা যায় কিন্তু Elizabeth তাঁর কালে যে ভাষায় কথা কইতেন আধুনিক উপন্যাসে যদি তাঁর মুখে সে কথা বসানো যায় তবে তার ফল হবে মারাত্মক। মানুষের চরিত্র যে যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ বদলায় না, এ সত্যটি জানতেন বলে Scott তাঁর নিজের জানাশোনা লোকদের আদর্শ নিয়ে এমন নিপুণ ভাবে প্রাচীনকালের নানা দৃশ্য এঁকেছেন যাদের মধ্যে আমরা বহু জীবন্ত নরনারীকে বিচরণশীল দেখতে পাই।

ইংরাজী উপন্যাস Scottএর যুগ পর্য্যন্ত যতখানি অগ্রসর হয়েছিল, তারই আদর্শ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখতে আরম্ভ করলেন বাংলা-উপন্যাস। তাই তাঁর রচনার কৌশলও অন্তর্নিহিত মনোভাব আদিতে Scott প্রভৃতি ঔপন্যাসিকের প্রভাব আবিষ্কার করা যেতে পারে। বঙ্কিম প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক ছিলেন ব'লে এ প্রভাব সহজে সাধারণ পাঠকের লক্ষ্য-গোচর হয় না, তবু তা অস্বীকার করা অন্যায় হবে। এদিক দিয়ে ইংরেজী সাহিত্য ও ইংরেজ জাতির কাছে আমাদের ঋণ অপরিসীম।

ধর্ম্ম ও অনুভূতি

এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, যাঁহারা বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের মধ্যে এমন অব্যক্ত কর্ম্ম অথবা ধর্ম্ম চলিতেছে, যাহার ফলে তাঁহাদের উদ্ভব, বিকাশ এবং রক্ষা সাধিত হইতেছে। তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করেন যে, আভ্যন্তরীণ ঐ অব্যক্ত কর্ম্মের অথবা ধর্ম্মের স্বাভাবিক গতি রক্ষিত হইলে কিছুতেই মানুষের দুঃখ-কষ্টের উদ্ভব, অথবা অকালে তাহার বিনাশ সাধিত হইতে পারে না। এই শ্রেণীর মানুষের অভিমতানুসারে, মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে যেরূপ উপরোক্ত অব্যক্ত কর্ম্ম, অর্থাৎ ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইরূপ তাহার ইন্দ্রিয়াদি (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি) ও বিদ্যমান রহিয়াছে। মানুষ যেরূপ তাহার উপরোক্ত আভ্যন্তরীণ অব্যক্ত কর্ম্মের দ্বারাও পরিচালিত হইতে পারে সেইরূপ আবার ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাও পরিচালিত হইতে পারে। যাঁহারা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ ঐ অব্যক্ত কর্ম্মের অথবা ধর্ম্মের স্বাভাবিক গতি পরিরক্ষিত হয় না।···

[বঙ্গশ্রী—পৌষ—১৩৪৩]

আকবরের রাষ্ট্র-সাধনা

এস, ওয়াজেদ আলি, বি, এ (কেণ্টাব), বার-এট-ল

বত্রিশ

মানুষের আত্ম-প্রকাশের প্রধান উপায় হচ্ছে শিল্প। মনের আশা-আকাঙ্খা, জীবনের সুখ-দুঃখ, এসবকে মানুষ শিল্পের সাহায্যেই প্রকাশ করে। সমাজ-জীবনে অমরত্ব লাভের প্রচেষ্টা সাধারণতঃ মানুষ শিল্পের সাহায্যেই করে থাকে। মিশরের ফেরোয়া (Pharoahs) কবে চলে গেছেন। তাঁদের রচিত পিরামিড, মন্দির, প্রাসাদ প্রভৃতি কিন্তু তাঁদের কীর্ত্তি, সভ্যতা এবং ঐশ্বর্য্য, এখনও বিশ্ববাসীর কাছে উচ্চ-কণ্ঠে ঘোষণা করছে। যে কয়টি জাতি পৃথিবীতে বড় হয়েছে, তারা সকলেই স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি শিল্পের সাহায্যে তাদের কীর্ত্তি কলাপ, চিন্তা এবং ভাবকে চিরস্থায়ী রূপ দেবার চেষ্টা করেছে।

ভারতের মুসলমানেরা, তাঁদের গৌরবের যুগে, স্থাপত্য শিল্পের সাহায্যে তাঁদের জীবনাদর্শকে, তাঁদের কীর্ত্তি কলাপকে অমরত্ব দেবার চেষ্টা করেছেন। পাঠান যুগের কুতুবমিনার, পুরাতন দিল্লীর কেল্লা এবং বিভিন্ন মসজীদ এবং সমাধি মন্দির প্রভৃতি সে যুগের মুসলমানদের অভ্রচুম্বী উচ্চাশার, বিস্ময়কর সামরিক শক্তির, অটুট আত্ম বিশ্বাসের পরিচয় দেয়। পাঠান শক্তি মোগলদের হাতে বিধ্বস্ত হয়। মোগলেরাও স্থাপত্য শিল্পের সাহায্যে তাঁদের বিশিষ্ট আদর্শকে, তাঁদের কীর্ত্তি কলাপকে চিরস্থায়ী রূপ দেবার চেষ্টা করেন।

মোগল বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান বাবর মাত্র পাঁচ বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করেন। একান্ত ভাবে শিল্পগত প্রাণ হলেও, স্থাপত্যের কোন উচ্চাঙ্গের নিদর্শন সৃষ্টি করবার অবসর তিনি পান নি। তাঁর পুত্র হুমায়ুন অল্পকাল রাজত্ব করবার পরই পাঠানবীর শের খাঁ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। প্রায় ষোল বৎসর পর তিনি পিতৃ সিংহাসনের পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তার কয়েক মাস পরই আকস্মিক এক দুর্ঘটনার ফলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। স্থাপত্য শিল্পের কোন স্থায়ী নিদর্শন তিনিও রেখে যেতে পারেন নি। তারপর আসি আমরা আকবরের যুগে। সর্ব্ব বিষয়ে যেমন তিনি তাঁর মনের অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন, স্থাপত্য শিল্পের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

তেত্রিশ

স্থাপত্যকে বিশেষ ভাবে জাতীয় শিল্প বলা যেতে পারে। ছবি একজন চিত্রকরই আঁকেন, মূর্ত্তি একজন চিত্রকরই গড়েন। কোন রচনা বা রাগিনী একজন সুরশিল্পীই রচনা করেন। স্থাপত্য শিল্প কিন্তু এরকম ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। সে হচ্ছে বিরাট এক সামবায়িক প্রচেষ্টা। একটা যুগের, একটা জাতির জীবনাদর্শ, তাদের ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য, তাদের জীবনধারণ প্রণালী, একথায় তাদের সভ্যতা, তাদের culture সমস্তই বড় একটা স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে প্রকাশ পায়। মুসলমানদের আসবার পূর্ব্বে হিন্দুদেরও উচ্চাঙ্গের নিজস্ব স্থাপত্য শিল্প ছিল। সে স্থাপত্যে পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর আদর্শ, হিন্দুর মন, এক কথায় হিন্দুর সভ্যতা। তারপর মুসলমানেরা এসে যে স্থাপত্য সৃষ্টি করলেন, তাতে প্রকাশ পেলে মুসলমানদের ধর্ম্ম, মুসলমানদের আদর্শ, মুসলমানদের মন, এক কথায় মুসলমানদের বিশিষ্ট সভ্যতা। দক্ষিণত্যের প্রাচীন এক হিন্দু মন্দিরের সঙ্গে দিল্লীর পাঠানযুগের এক মসজিদের তুলনা করলেই এই দুই সভ্যতার পার্থক্য পাঠকের মনে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। আকবরের সৃষ্ট স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য এবং গৌরব এই যে, তিনি হিন্দু এবং মুসলমানের স্থাপত্যের মধ্যে মিলন স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন, আর এই দুই স্থাপত্যের আদর্শকে সম্মিলিত করে, তাদের সাহায্যে নিজের ব্যাপকতর মানসিকতাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। স্থাপত্য শিল্পের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক শাহজাহানও এ বিষয় তার কাছে হার মেনেছেন। শাহজাহানের কথা বলতে গিয়ে আর একটী বিষয় আমাদের মনে এল।

চৌত্রিশ

স্থাপত্য শিল্পী তাঁর সৃষ্ট শিল্প নিদর্শনে জাতীয় ভাবকে, জাতীয় আদর্শকে অবশ্য প্রকাশ করেন। তবে এও সত্য যে উৎকৃষ্ট কোন শিল্প নিদর্শনে, শিল্পস্রষ্টার মনের ভাব, তার নিজস্ব ব্যক্তিগত আদর্শও প্রকাশ পায়। শাহজাহানের সৃষ্ট শিল্পে যেমন আমরা তাঁর নিজস্ব মনের, তাঁর নিজস্ব আদর্শের পরিচয় পাই, আকবরের সৃষ্ট শিল্পে তেমনি আকবরের নিজস্ব মনের, তাঁর নিজস্ব আদর্শের পরিচয় পাই। স্থাপত্য শিল্পের এই দুই শ্রেষ্ঠ সাধকের নিজ নিজ মানসিক বৈশিষ্ট্য চরিত্রগত এবং রুচিগত বৈশিষ্ট্য তাদের শিল্প সাধনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। শাহজাহান যে সব শিল্প নিদর্শন রেখে গেছেন তা' থেকে তাঁর বিষয় আমাদের মনে কি ধারণা হয়? স্বধর্ম্মের প্রতি যে তাঁর একান্ত ভক্তি ছিল, দিল্লীর জামে মসজীদ দেখলে স্পষ্টই তা প্রতীয়মান হয়। মসজিদ প্রাঙ্গণে যে চৌবাচ্চা আছে, তার ধারের একটী অংশ শ্বেত প্রস্তর দিয়ে ঘেরা আছে, আর তাতে লেখা আছে, বাদশা স্বপ্নে স্বর্গের

যে মসজীদ দর্শন করেছিলেন, জামে মসজিদ তারই প্রতিচ্ছবি, আর সেই স্বর্গের মসজিদের চৌবাচ্চার যেখানে হজরত মোহম্মাদকে বাদশা অজু (হস্ত মুখ প্রক্ষালন) করতে দেখেছিলেন, সেই অংশকেই এই পাথরের বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে। তারপর মস্‌জীদের প্রধান দ্বারকে বেষ্টন করে আছে,, অনিন্দ সুন্দর "নাস্তালিক" অক্ষরে লিখিত বিরাট এক আরবী লিপিকা—সমস্ত কোরাণ গ্রন্থটী সেই লিপিকায় উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এই সব নিদর্শন দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, শাহজাহান একান্ত ভাবে স্বধর্ম্মভক্ত ছিলেন। তারপর শাহজাহান যে একজন আদর্শ প্রেমিক ছিলেন, তার প্রমাণের জন্য, তাঁর রচিত তাজমহলই যথেষ্ট ইতিহাস সাক্ষ্যদেয়, এই তাজমহলের দিকে দৃষ্টি রেখেই শাহজাহানের প্রাণ তার নশ্বর দেহ ত্যাগ করেছিল।

দাম্পত্য প্রেমের এই অতুলনীয় কীর্ত্তি প্রস্তুত করতে অষ্টাদশ বৎসর সময় লেগেছিল। অতি ধীরে, অতি যত্নে, অতি সন্তর্পণে, অন্তরের অনাবিল প্রেমের সমস্ত রস, সমস্ত মাধুর্য্য পাথর আর মসলায় ঢেলে আদর্শ প্রেমিক শাহজাহান মমতাজ বেগমের উদ্দেশ্যে তাঁর স্মৃতি তর্পন রচনা করেছিলেন। কত গভীর, কত করুণ, কত ঐকান্তিক, জীবন-মরণের কত উর্দ্ধে যে তাঁর ভালবাসা, তাজমহলের প্রত্যেকটী প্রস্তর খণ্ড তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। একজন ইংরাজ মহিলা তাজমহল দর্শন করে মনের আবেগে অভিভূত হয়ে, তাঁর স্বামীকে বলেছিলেন, "তুমি যদি আমার জন্য তাজমহলের মত সমাধি মন্দির রচনা করতে পার, তা'হলে প্রিয়তম, এখনই আমি মৃত্যুকে বরণ করি।" একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক শাহজাহান কর্ত্তৃক তাজমহল রচনা উপলক্ষে বলেছেন,—"The supreme masterpiece dedicated to a supreme love, and there was to be no haste, but yet no rest about its elaborate and stately growth."

শাহজাহান যে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হয়ে থাকতে ভালবাসতেন, সুন্দর উপকরণের সুরুচি সম্মত, সুনিয়ন্ত্রিত, নয়ন-মন মুগ্ধকর প্রকাশ যে একান্ত ভাবে তাঁর প্রিয় ছিল, তাঁর প্রস্তুত আগরার দুর্গ, দিল্লীর "দিওয়ানে খাস," "দিওয়ানে আম" প্রভৃতি স্পষ্টই তার সাক্ষ্য দেয়। শাহজাহানের হর্ম্মাবলীতে আমরা মানুষ শাহজাহানের সাক্ষাৎ পাই, একান্ত ভাবে ধর্ম্মনিষ্ঠ এক মুসলমান, অনাবিল প্রেমের প্রভাব যিনি অন্তরের পরতে পরতে অনুভব করেছেন, খোদার প্রতি ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতার যার সীমা পরিসীমা নাই, সৌন্দর্য্যানুভূতি যার একান্ত তীক্ষ্ণ, একান্ত নিভু্ল, জীবনে রেখা এবং রংএর সামঞ্জস্যের দিকে যিনি সর্ব্বদাই সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেন, আর এ-সবের সঙ্গে, ঐশ্বর্য্য এবং সেই ঐশ্বর্য্যের গৌরবময় প্রকাশ যার একান্ত প্রিয়; ধর্ম্ম সাধনা, প্রেমের নির্ম্মল রস, এবং সৌন্দর্য্যময় বেষ্টনী যার জীবনের প্রধান কাম্য। এ-সবের বাইরে যেতে তিনি যেন অনিচ্ছুক, এ-সবের বাইরের জিনিষ যেন তাঁর মনে কোন রেখাপাত করে না।

পঞ্চত্রিংশ

শাহজাহানের পুত্র আলমগীর তার পিতার যে ছবি এঁকেছেন, তাতে এই ধরণেরই এক মানুষের আমার সাক্ষাৎ পাই। আলমগীর তার পুত্রকে সম্বোধন করে লিখেছেন: আমার ভাগ্যবান মহামহিম পুত্র—

মহা সম্মানিত বাদশা (শাহজাহান) বলতেন, শিকার অলস লোকেদের কাজ। মানুষ যদি পরলোকের জন্য মঙ্গল প্রসূ কর্ম্মে আত্মনিয়োগ না করে, তা'হলে ইহলোকে কি করে তাঁর উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি হতে পারে? ইহলোক হচ্ছে পরলোকের বপন ক্ষেত্র! তিনি স্বয়ং রাত্র শেষে চার ঘটিকার সময় শয্যাত্যাগ করতেন, এবং স্নানাগারে বিধিসম্মত ভাবে প্রাত্য কৃত্যাদি সম্পন্ন করতেন। তারপর জপতপে আত্মনিয়োগ করতেন, এবং সূর্য্যোদয়ের আজান বা নামাজের আহ্বানের পর জ্ঞানী এবং ধার্ম্মিক লোকদের সঙ্গে প্রাভাতিক নামাজ পড়তেন। নামাজ শেষ করে তিনি দর্শন গবাক্ষে যেতেন এবং উপস্থিত জনসাধারণকে দর্শন দিতেন। দর্শন অভিলাসীরা তখন তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করবার সৌভাগ্য লাভ করতেন। এই কাজ শেষ করে বেলা চার ঘটিকার সময়, (আধুনিক হিসাবে সকাল আট ঘটিকার সময়) বাদশা "দেওয়ানে আমে" অর্থাৎ সাধারণ দরবারে উপস্থিত হতেন। আমীর ওমরাহ এবং বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারীরা এখানে তাঁকে সালাম এবং কুর্নিস করতেন। অভিবাদনাদি শেষ হবার পর প্রধান মন্ত্রী এবং রাজস্ব সচীব রাজকর্ম্মচারীদের বিভিন্ন ব্যবস্থার সংক্ষিপ্তসার, তাঁদের কর্ম্মপটুতার আলোচনা এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, দেওয়ান প্রভৃতির কাজকর্ম্মের বিবরণী বাদশার সকাশে উপস্থিত করতেন। জাঁহাপানা বিশেষ বিবেচনার পর প্রার্থীদের অভিলাসপূর্ণ করতেন এবং অন্যান্য সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করতেন। এই সব কাজ শেষ করে তিনি হস্তিশালায় হস্তি, এবং অশ্বশালায় অশ্ব এবং অন্যান্য জীবজন্তু পরিদর্শন করতেন। তার পর, বেলা দেড় প্রহরের সময়, তিনি "দেওয়ানে আম" ছেড়ে, খাস দরবারে গিয়া উপস্থিত হতেন। সেখানে প্রধান প্রধান বখ্‌শীগণ, নব নিযুক্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের কার্য্য-বিবরণী পেশ করতেন। বাদশা সর্ব্ববিষয় সমুচিৎভাবে অবহিত হবার পর শেষ আদেশজারী করতেন। এই কাজ শেষ হলে প্রত্যেক প্রদেশের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্তবিবরণী এবং শাসন কর্ত্তা, দেওয়ান, ফৌজদার প্রভৃতির

কার্য্যাবলীর রিপোর্ট বাদশার সকাশে পেশ করা হতো। বাদশা যে সব হুকুম দিতেন, কর্ম্মচারীরা তা' লিপিবদ্ধ করতেন। বেলা দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত এই ভাবেই কাজ চ'লতো। এখান থেকে তিনি মধ্যাহ্ন ভোজনে যেতেন।

বাদশাহের আহার্য্য দ্রব্যাদি সম্পূর্ণ বিধি সম্মত ভাবে প্রস্তুত হতো। তিনি সেই সব জিনিস খেতেন, যা থেকে শরীরে শক্তি আসে এবং যে সব জিনিস দেহকে রাজকার্য্য পরিচালনার জন্য সক্ষম রাখে। আহার শেষ করে তিনি আশ্রিত ব্যক্তিদের খবরাখবর নিতেন। এই আশ্রিতদের আহার বিহারের ব্যবস্থা প্রাসাদেই হতো। এদের অধিকাংশই ছিলেন পণ্ডিত, ধার্ম্মিক, বিদ্যার্থী, বিত্তহীন, অনাথ, আশ্রয় হীন এবং রোগাতুর লোক। বাদশাহ তাদের প্রায় প্রত্যেককেই চিনিতেন। তাদের সুখ দুঃখের বিষয় তাদের সঙ্গে আলাপাদি করে তিনি বিশ্রাম কক্ষে যেতেন এবং প্রশান্তমনে নিদ্রামগ্ন হতেন।

বেলা তিন প্রহরের সময় বাদশা বিশ্রাম কক্ষ ত্যাগ করতেন। অজু (হস্ত মুখ প্রক্ষালন) করে তিনি কোরাণ পাঠে মনোনিবেশ করতেন। তার পর জোহরের নমাজ (আহ্নিক) শেষ করে ধর্ম্মমন্ত্র পড়তে পড়তে জপমালা হস্তে তিনি "আসদ বুরুজ" প্রাসাদে যেতেন। মন্ত্রীগণ সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে রাজনীতি এবং রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপার সমূহের সমাধানে আত্মনিয়োগ করতেন এবং কাগজ পত্রাদিতে প্রয়োজনীয় স্বাক্ষরাদি করতেন। এ সব কাজ শেষ হলে পর পুনরায় তিনি "দেওয়ানে আম" বা সাধারণ দরবার গৃহে যেতেন। এখানে প্রধান বখশী এবং গৃহস্থালীর দিওয়ান নবনিযুক্ত মনসাদার এবং জায়গীর প্রার্থীদের তাঁর সকাশে উপস্থিত করতেন। একান্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রার্থীদের অবস্থা, চরিত্র, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, কর্ম্মপটুতা, বংশমর্য্যাদা প্রভৃতির বিষয় যথোচিত তল্লাস তদন্ত করে তিনি প্রত্যেকের যোগ্যতানুযায়ী পদ, জায়গীর প্রভৃতি দান করতেন। এ কাজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলতো। সন্ধ্যা হলে পর বাদশা মগরবের (সূর্য্যাস্তের) নমাজ পড়তেন। তার পর তিনি খাস কামরায় গিয়ে বসতেন। সেখানে বিজ্ঞ ঐতিহাসিকগণ, সুনিপুণ কথকগণ, সুকণ্ঠ গায়কগণ এবং বহুদর্শী পরিব্রাজকগণ এসে উপস্থিত হতেন। স্ত্রীলোকেরা পর্দ্দার আড়ালে গিয়ে বসতেন আর পুরুষেরা বাদশার সম্মুখে আসন গ্রহণ করতেন। এই সব গুণী ব্যক্তিরা বাদশার আদর্শ এবং অভিলাস মত অতীতের মহাপুরুষদের কীর্ত্তি কাহিনী, পরলোকগত নরপতিদের বিবরণী, দেশ বিদেশের পুরাতত্ত্ব, আচার ব্যবহার, বিস্ময়কর এবং কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনাবলীর বিষয় বাদশাহকে অবহিত করতেন। মোট কথা, সমস্ত দিন এবং অর্দ্ধ রাত্র পর্য্যন্ত বাদশাহ এইরূপ সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে তাঁর সময়ের সদ্ব্যবহার করে সাম্রাজ্যের প্রতি, প্রজাবর্গের প্রতি এবং নিজের প্রতি তার কর্ত্তব্য পালন করতেন।"

ছত্রিশ

আকবর সৃষ্ট স্থাপত্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের এক মানুষের আমরা সম্মুখীন হই। আমরা প্রথমেই বলেছি, তিনি ফতেহপুর শিকরীর প্রধান মসজিদের তোরণে প্রভু ঈসার বাণী উৎকীর্ণ করেন। এই থেকেই তার বিস্ময়কর উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমানের মসজিদে এক জন মুসলমান বাদশা উৎকীর্ণ করলেন, যিশু খৃষ্টের বাণী। এ দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যায় বলে আমার জানা নাই। তার পর আকবর তার শত্রু রাজা জয় মল্ল এবং পট্টের পাষাণ মূর্ত্তি স্থাপন করলেন তার প্রাসাদ তোরণের সম্মুখে। পাঠক বিষয়টী একবার বিবেচনা করে দেখুন। প্রতিমা গড়া মুসলমান সমাজে নিষিদ্ধ। মুসলমানেরা একাজকে ধর্ম্ম-বিগর্হিত আচরণ বলেই মনে করেন। মুসলমানেরা স্থাপত্য শিল্পের বিভিন্ন বিস্ময়কর নিদর্শন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে রেখে গেছেন। সে সবের মধ্যে মানুষ কিম্বা জীব জন্তুর প্রতিমূর্ত্তি কিন্তু কোথাও স্থান পায়নি। প্রকৃতপক্ষে, প্রতি-মূর্ত্তি গড়াকে মুসলমানেরা পৌত্তলিকতার নিদর্শন বলেই মনে করতেন। অথচ এই উদার প্রাণ, সংস্কারমুক্ত বাদশাহ, বিরাট দুটি প্রতিমূর্ত্তি, তাও আবার তাঁর হিন্দু শত্রুদের, স্থাপন করলেন তাঁর প্রাসাদের তোরণে. এ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে সত্যই বিরল।

আকবরের অনন্যসাধারণ প্রতিভা ভারতের স্থাপত্য শিল্পেও নূতন এক যুগের সৃষ্টি করেছিল। আগ্রার প্রাসাদ দুর্গ হচ্ছে স্থাপত্য শিল্পে তাঁর অন্যতম প্রাথমিক প্রচেষ্টা। এই দুর্গের নির্ম্মাণ কার্য্যেই তিনি, অতীতের সংস্কার এবং পদ্ধতি অনেকাংশে বর্জ্জন করে, অভিনব আদর্শের আমদানী করেছিলেন। শিল্পী Percy Brown লিখেছেন—"Within this fortified wall at Agra are the two gate ways, the one on the Southern side being intended for private entry but that on the west known as the Delhi Gate was the main entrance and accordingly designed in keeping with the noble ramparts on its flanks This gateway, although Akbar's earliest architectural effort, as it was finished in 1566, is one of the most considerable achievements of his period. It displays an originality and sponteneity denoting the beginning of a new era in the building art and one in which its

creators were clearly imbued with a fresh spirit, free and unrestrained." এই ফাটকের দেয়ালের প্রান্তদেশে পাখীর ছবির পাড় আছে। এও ভারতীয় ইসলামিক স্থাপত্যে এক বিপ্লবাত্মক নূতনত্বের আমদানী।

সাইত্রিশ

আকবরের পিতা হুমায়ুন পাঠান বীর শেরখাঁ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ হতে বিতাড়িত হয়ে পারস্য দেশে গিয়ে আশ্রয় নেন। দীর্ঘ ষোড়ষ বৎসর কাল তাঁকে পারস্যের রাজদরবারের আশ্রয়ে কাটাতে হয়। পারস্যে তখন বিখ্যাত সাফাভী বংশ রাজত্ব করতেন। তাঁদের যুগ পারস্যের মস্ত এক গৌরবের যুগ। সামরিক শক্তিতে, ধনে, ঐশ্বর্য্যে, শিল্পে, সাহিত্যে, সর্ব্ববিষয়ে পারস্য তখন সমুন্নত। সিংহাসন চ্যুত হুমায়ুন এবং তাঁর দুর্দ্দশাগ্রস্থ পলাতক সহচর-অনুচরেরা যে এই সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের গৌরবমণ্ডিত সভ্যতার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, সেকথা বলাই বাহুল্য। দীর্ঘ প্রবাসের পর তাঁরা যখন ভারতবর্ষে ফিরে এলেন, মন তাঁদের তখন ইরাণী হয়ে গিয়েছিল। ইরাণের আদর্শকে তাঁরা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। সে যুগের স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হচ্ছে, হুমায়ুনের বিধবা হাজী বিবি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বামীর সমাধি মন্দির। এই বিরাট সৌধে ইরাণী স্থাপত্য আদর্শের একাধিপত্য দেখতে পাওয়া যায়। মনে হয় যেন, ইরাণের কোন গুল বাগিচা থেকে, আরব্য উপন্যাসের দৈত্যেরা সুন্দর এই ইমারতটীকে ভীত্তিসমেত উঠিয়ে, ভারতবর্ষের রাজধানীতে বসিয়ে দিয়েছে।

আটত্রিশ

দেশ প্রেমিক আকবর কিন্তু ইরাণী সভ্যতার মোহে মাতৃভূমির নিজস্ব শিল্পের দাবীর কথা ভোলেন নি। ইরাণী আদর্শের কুহক থেকে নিজেকে মুক্ত করে, যতদূর সম্ভব ভারতীয় আদর্শের অনুসরণ করেই তিনি তাঁর স্থাপত্য কীর্ত্তিরাজি রচনা করেছিলেন। আকবর যে মসজীদ প্রথম নির্ম্মাণ করেন, তার নাম হচ্ছে "খায়রুল মানাজীল।" এই ইমারত থেকেই আকবরের স্থাপত্য আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। Percy Brown লিখেছেন—

"The architectural treatment of this structure is similar to that of the building produced at the imperial capital during the rule of the Surs, and therefore, provides a small but useful link between the architectural achievements of that dynasty, and those of the Mughal ruler Akbar. For it was this form of the building art, that the emperor selected, to fulfil his own purposes in preference to appropriating the ready made style from Persia, as was being done in the case of Humayun's tomb. Such a course was typical of this monarch's policy as a whole, the first principles of which were the encouragement of the indigenous systems of his subjects, and only when these prove ineffective, did he lay under contribution the experiences of other countries."

স্বদেশ প্রেমিক আকবর দেশের শিল্পকে যথোচিত ভাবে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করেছিলেন, অথচ শিল্পের উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য রেখে, প্রয়োজন মত বৈদেশিক প্রভাবের আমদানী করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। এক কথায়, দেশ প্রেম এবং উন্নতিশীলতার সমন্বয়, তাঁর শিল্প সাধনায়, রাষ্ট্র সাধনায় এবং জীবন সাধনায় হয়েছিল। এ হিসাবে তাঁকে আদর্শ দেশ প্রেমিক বললে অত্যুক্তি হবে না।

ঊনচল্লিশ

মানুষের মনই তাঁর শিল্পের জনক। শিল্পীর মন যত বড় হয়, তার শিল্পও তত উচ্চ শ্রেণীর হয়। মিলটন মানুষ হিসাবে মহাপুরুষ না হলে Paradise Lost লিখতে পারতেন না। ফেরদৌসী তেজস্বী দেশ প্রেমিক না হলে, "শাহনামা" লিখতে পারতেন না। আকবরের শিল্পসাধনাও তাঁর চরিত্রের অনুপাতে মহত্ব লাভ করেছে; তার মনের অনুপাতে বিরাটত্ব লাভ করেছে। আকবরের শিল্প সাধনায় যে উদার, ব্যাপক, বিরাট মনের পরিচয় পাই, সাহজাহান বা অন্য কোন নরপতির শিল্প সাধনায় আমরা তা পাই না। স্থাপত্য শিল্পের বহুমুখীতার সাহায্যে আজীবন আকবর আত্ম প্রকাশের চেষ্টা করেছিলেন। আবুল ফজলের ভাষায় "মহামান্য বাদশা, বিরাট অট্টালিকা সমূহের পরিকল্পনা করতেন, আর প্রস্তর এবং ইষ্টকের সাহায্যে তাঁর মনের আদর্শকে রূপায়িত করতেন।" আকবরের শিল্প সাধনা সার্থক হয়েছে। তাঁর মানস-নগরী ফতেহপুর শিকারীর বিষয় দরদী শিল্প সমালোচক Fergusson বলেছেন, "এ নগর হচ্ছে সেই মহামানবের মনের প্রতিচ্ছাব, যিনি একে বাস্তব রূপ দান করেছেন।"

চল্লিশ

আকবর তাঁর অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপীরাজত্বে (১৫৫৬--১৬০৫) অসংখ্য হর্ম্যাবলীর সৃষ্টি করেছিলেন। সেই সব হর্ম্যাবলী তাঁর অদ্ভুত কর্ম্মী ব্যক্তিত্বের, তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্রের, তাঁর বহুমুখী প্রতিভার অনিন্দ্য সুন্দর ব্যঞ্জনা করেছে। আমরা

পূর্ব্বেই বলেছি, আকবরের যতদূর সম্ভব ভারতীয় রীতি এবং আদর্শকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করেছিলেন। আর যতদূর সম্ভব বৈদেশিক প্রভাব বর্জ্জন করেছিলেন। তাঁর সৃষ্ট স্থাপত্যে যেমন হিন্দু এবং মুসলিম শিল্পের সুবর্ণ মিলন ঘটেছিল, উভয় জাতির আদর্শেরও তেমনি অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হয়েছিল, আর উভয়ের সাহায্যে প্রকাশিত হয়েছিল আকবরের অতুলনীয় মানসিকতা—স্বাধীন ভারতের গৌরবময় প্রতীক।

আমরা পূর্ব্বেই বলেছি, আকবর তাঁর শত্রু রাজা জয়মল্লের প্রতিমূর্ত্তি দিল্লীর প্রাসাদতোরণে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। জয়মল্লের বিধবা পত্নী জহরব্রত পালন করে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। এই সতী নারীর স্মৃতি চিরস্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে আকবর সুন্দর এক স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই স্মৃতিস্তম্ভ এখনও দাঁড়িয়ে আছে, "সতী বুরুজ" নাম বহন করে, মহাপ্রাণ আকবরের উদারতার উজ্জ্বল এক কীর্ত্তিস্তম্ভ রূপে। হিন্দু প্রজাদের তুষ্টি বিধানের জন্য, এবং তাদের ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আকবর চারটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করেন, আর সেগুলিকে ব্রজদুলাল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত করেন। একটী মন্দির গোবিন্দ দেবের মন্দির রূপে কীর্ত্তিত, দ্বিতীয়টীর নাম মদনমোহনের মন্দির, তৃতীয়টীর নাম যুগল-কিশোর মন্দির, আর চতুর্থটীর নাম গোপীনাথ মন্দির। আকবরের উদারতা সত্যই আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করে। বরাহ অবতার হিন্দুধর্ম্মের অন্যতম অবতার—ভগবানের অন্যতম রূপ। আকবরের প্রাসাদের রাজপুত মহিলারা সেই হিসাবে শুকরের সম্মান করতেন। তাদের তুষ্টি বিধানের জন্য আকবর প্রাসাদে একটী বাতান তৈরী করে অনেকগুলি শুকর পালন করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে পাঠকের মনে রাখা দরকার যে মুসলমানদের কাছে শুকরের তুল্য ঘৃণ্য প্রাণী দ্বিতীয়টী নাই।

একচল্লিশ

আকবরের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্ত্তি হচ্ছে ফতেহপুর শিকরী, তাঁর নব প্রতিষ্ঠিত রাজধানী—যার মধ্যে তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন তার উদার মনের সমস্ত চিন্তা, তাঁর প্রেমপ্রবণ অন্তরের সমস্ত ভালবাসা, তাঁর গগনবিহারী কল্পনার সমস্ত ঐন্দ্রজালিক আলপনা, আর তাঁর অন্তহীন আশার সমস্ত রঙীন স্বপ্ন। Stanley Lane Poole লিখেছেন:

সমস্ত ভারতবর্ষে এই পরিত্যক্ত রাজধানীর চেয়ে সুন্দর, এর চেয়ে করুণ রসাত্মক কিছু নাই।—বিলীন এক স্বপ্নের এই নগরী হচ্ছে নির্ব্বাক সাক্ষী। সাত মাইল জমি ঘিরে এখনও এই নগরী দাঁড়িয়ে আছে। এই নগরীর সাতটী কারুকার্য্য-খচিত বুরুজ সম্বলিত ফাটক দর্শকের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। এই নগরীর হর্ম্ম্যাবলী, কল্পনার মহত্ত্বে এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের পারিপাট্যে যাদের তুলনা ভারতবর্ষে মেলে না, এখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। নগরীর অতুলনীয় মসজিদ, সংসার বিরাগী দরবেশের শুভ্র মর্ম্মর নির্ম্মিত সমাধি মন্দির, প্রস্তরের বিভিন্ন সূক্ষ্ম কারুকার্য্য, দেয়ালের চিত্রাবলী, সবই অক্ষত অবস্থায় বর্ত্তমান। আকবরের সময় যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। কিন্তু এই সুন্দর দেহ এখন প্রাণহীন। সুদূর প্রসারী চিন্তা, এবং অশেষ যত্নের সঙ্গে রচিত এই নগরীকে, চতুর্দ্দশ বৎসর পর আকবর পরিত্যাগ করেন। আকবরের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে William Finch এই নগরী দর্শন করতে আসেন। তিনি লিখেছেন, "স্থানটী ধ্বংসোন্মুখ, জনমানবহীন, পরিত্যক্ত।" পরবর্ত্তী কোন নরপতি আকবরের এই পরিত্যক্ত রাজধানীতে বাস করবার চেষ্টা করেন নি, পরবর্ত্তী কোন নরপতি আকবরের বিরাট আদর্শকেও মনে স্থান দিতে পারেন নি। পরিত্যক্ত হর্ম্ম্যাবলী, বিরাট মসজিদ, শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত দরবেশের সমাধি মন্দির, প্রাসাদের স্নানাগার, এবং ঝীল, সবের মধ্যেই ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাটের কোন না কোন স্মারক চিহ্ন আমাদের নয়ন গোচর হয়। আমরা তাঁর শয়ন কক্ষে, তাঁর "স্বপ্ন-পুরীতে," এখনও দেখতে পাই প্রস্তর নির্ম্মিত, অপূর্ব্ব কারুকার্য্য সম্বলিত সেই সব ফার্সি কবিতা, সোনালী এবং সাগর-নীল রংএর নয়ন-মন-মুগ্ধকর সেই সব মীনাকারী, নিদাঘ তাপ-দগ্ধ দিনে যার দিকে তন্দ্রালস চক্ষে চাইতে তিনি ভাল বাসতেন। এখনও আমরা ফায়জীর এবং আবুল ফজলের মহলে প্রবেশ করতে পারি ফায়জী যিনি আকবরের সভা-কবি ছিলেন; আবুল ফজল যিনি তাঁর রাজত্বের কাহিনী আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এখনও আমরা সেই দরবার গৃহের দালানে দাঁড়াতে পারি, যেখানের থামের গায়ে রচিত সিংহাসনে বাদশা বসতেন, আর সিংহাসনের চারিদিকের গ্যালারীতে পর্দ্দার অন্তরালে বেগমেরা আসন গ্রহণ করতেন; যে দালানে একদিন মুসলমান দার্শনিক, ক্যাথলিক পাদরী, অগ্নিপূজক পার্সি, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, এবং বৌদ্ধ গুরু নিজ নিজ ধর্ম্ম এবং মতবাদের সমর্থনে তুমুল তর্ক চালাতেন, যে তর্ক শেষে কলহ এবং গালাগালিতে পর্য্যবসিত হ'ত, আর বিদ্রূপ প্রিয় বদায়ুনীর মুখে তীব্র পরিহাসের হাসি ফুটিয়ে তুলতো; যে দৃশ্য দেখে সত্যসন্ধ বাদশার মন, দুঃখ আর বিতৃষ্ণায় ভরে যেতো।

ফতেহপুরের অনাড়ম্বিত সৌন্দর্য্য Heber-এর মত কবির প্রতিভার প্রেরণা যুগিয়েছে, আর ভারতীয় শিল্প-কলার সবচেয়ে সমজদার সমালোচকের ভক্তি-অর্ঘ্য আহরণ ক'রেছে। তুর্কি সুলতানার মহলের বিষয় কিম্বদন্তি আছে, যে, আকবর এই মহলে সুন্দরী বাঁদীদের ঘুটি বানিয়ে চককাটা মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত মেঝেতে সুলতানার সঙ্গে

দাবা খেলে অবসর বিনোদন করতেন। শিল্প সমালোচক Fergusson, বলেন এই মহলের মত সুন্দর কোন হর্ম্মের কল্পনাই করা যায় না। এ মহলের রেখার ছন্দ নিখুঁত, এর কারুকার্য্য সুখ্যাতি-সূক্ষ্ম, অথচ কোথাও আতিশয্য বা রুচি-বিকারের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া যায় না। পঞ্চতল বিশিষ্ট পাঁচ মহল (কতকটা বৌদ্ধ বিহারের অনুরূপ আকৃতি বিশিষ্ট) এবং আকবরের সু-রসিক হিন্দুপ্রিয় পাত্র, রাজা বীরবলের মহল, এই দুই অট্টালিকারও নিজস্ব বৈশিষ্ট আছে। মরিয়মের মহলের দেয়ালের চিত্রাবলী, ভারতীয় চিত্র-শিল্পের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ অধ্যায়ের এক অমূল্য নিদর্শন। আকবরের উদারতায় আকৃষ্ট হয়ে যে সব Jesuit পুরোহিত আগ্রায়, এসেছিলেন তাঁদের প্রভাব এই-সব ছবিতে অনুভূত হয়। এই সব ছবিতে Angel বা দেবদূতদের দেখতে পাওয়া যায়, তাঁদের মস্তকের আলোক-চক্রের বেষ্টনীও দেখতে পাওয়া যায়। এর কিছুকাল পরে, জাহাঙ্গীর যে বাগানবাড়ী নির্ম্মাণ ক'রেছিলেন, তাতে আমরা কুমারী মাতা—Virgin Mary-কেও দেখতে পাই। খৃষ্টান সাধুদের জীবন কাহিনী, মোগল শিল্পীদের কাছে ছবির বিষয়-বস্তু হিসাবে বিশেষ আদর লাভ ক'রেছিল। Annunciation অর্থাৎ যীশুর আসন্ন জন্মের যে শুভবার্ত্তা দেবদূতেরা কুমারী মাতা Virgin Maryকে শুনাতে এসে-ছিলেন, সে দৃশ্যও এই মহলের দেয়ালের গাত্রে অঙ্কিত আছে বলে আমাদের মনে হয়। আর একটী ছবি দেখে ধারণা হয়, সেটী আদি পিতা আদমের। আকবরের শয়ন-কক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মমূলক যে সব ছবি আছে, তাদের দেখে বোঝা যায় যে, চীনা শিল্পীরাও এখানে এসে তাঁদের শিল্প নৈপুণ্য দেখিয়ে গিয়েছেন। এই ভারতীয় পম্পেয়াই (Pompeii) একবার চোখ দিয়ে দেখলে, এই নগরীর একঘেয়েমি বর্জ্জিত শিল্প নিদর্শনগুলির প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে, সত্যই মনে হয়, বিচিত্র শিল্পপ্রতিভার এ স্থান হচ্ছে অমূল্য এক প্রদর্শনী।"

বিয়াল্লিশ

আকবরের সাধের রাজধানী ফতেহপুর-শিকরী আজ জনমানব শূন্য নীরব, নিস্তব্ধ। দিনের বেলায় রাখাল বালকেরা এখানে গরু চরাতে আসে, আর কৌতুহলী দর্শকেরা আসে হর্ম্ম্যাবলীর বিষাদ-মণ্ডিত সৌন্দর্য্য দেখতে। সন্ধ্যা সমাগমের সঙ্গে তারা নিজ নিজ আশ্রয়ে চ'লে যায়। রাজধানীতে মানুষের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। মনে হয় যেন, আরব্য উপন্যাসের কোন যাদুকর, ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রবলে অপূর্ব্ব সুন্দর এই নগরীর অধিবাসীদের বাতাসে মিলিয়ে দিয়েছেন। হর্ম্ম্যরাজির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে তাদের তিনি অক্ষত অবস্থাতেই ছেড়েছেন। সেই হর্ম্ম্যরাজি, অতীতের অতুলনীয় এক সভ্যতার মুক সাক্ষীরূপে দাঁড়িয়ে আছে, আর বিগত গৌরবের কথা ভেবে নিঃশব্দে শোকাশ্রু মোচন করছে।

নিকটস্থ গ্রামবাসীদের মুখে শোনা যায়, গভীর নিশুতি রাতে, এই সব পরিত্যক্ত প্রাসাদে এখনও মানুষের পদশব্দ, মানুষের কলরব শোনা যায়। মোগল এবং রাজপুত সৈনিকদের প্রেতাত্মারা নগরীর বিরাট চত্বরে এখনও কুচ কাওয়াজ করে, ধার্ম্মিক মুসলমানদের প্রেতাত্মারা এখনও গভীর রাতে জামে মসজিদে এসে নামাজ পড়ে। অশ্বারোহী আমীর ওমরাহ এবং রাজা মহারাজারা সদলে এই শ্মশান নগরীর রাজপথ দিয়ে যাতায়াত করেন। সুন্দরী বেগমদের মধুর হাস্যে, সুন্দরী বাঁদীদের নুপুর নিক্কণে বেগমমহল মুখরিত হয়। গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে ক্ষণেকের তরে এই প্রেত নগরীতে জীবনের কোলাহল ফিরে আসে। উষার আগমনের সঙ্গে সব আবার স্তব্ধ হ'য়ে যায়। কবরস্থানের স্মৃতি মন্দিরের মত মহলগুলিই কেবল নয়নগোচর হয়।

তেতাল্লিস

এ সব হয়তো কুসংস্কারাচ্ছন্ন পল্লীবাসীদের ধারণা। পাঠক, আসুন একবার কল্পনার চ'ক্ষে আমরা ফতেহপুর শিকরীর সেই গৌরবময় যুগ একবার দেখে আসি, যখন ভারতেশ্বর আকবর উজীর-নাজির, পাত্র-মিত্র, সৈন্য-সামন্ত প্রভৃতির দ্বারা পরিবৃত্ত হ'য়ে এই নগরে সগৌরবে বিরাজ করতেন। অপূর্ব্ব কারুকার্য্য খচিত ঐ যে স্বর্ণ-সিংহাসন, কক্ষের প্রধান স্তম্ভের গাত্রের সঙ্গে সংলগ্ন দেখতে পাচ্ছেন, ওখানে কে বসে আছেন জানেন? দেবতুল্য কান্তিই ওর পরিচয় দিচ্ছে। উনি হচ্ছেন ভারতেশ্বর আকবর। নিকটের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য খচিত পর্দ্দার অন্তরালে সহচরীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে সম্রাজ্ঞীরা রত্নমণ্ডিত সিংহাসনে ব'সে আছেন; তুর্কি সুলতানা আছেন, যোধাবাই আছেন, মরিয়ম বেগম আছেন; রূপে অতুলনীয়া, তাদের এক এক জনের অঙ্গাভরণ সাত রাজার ধন, তাঁদের সহচরীরা হলেন ভারতের, ইরাণের, তুরাণের সেরা সুন্দরীর দল। তাদের রূপের কাছে, তাদের বেশ-ভূষার কাছে স্বর্গের হুরীদের রূপ আর বেশভূষাও হার মানে।

নিচের দিকে একবার চেয়ে দেখুন। কার কবিতার মধুর ঝঙ্কার ভারতেশ্বরের মুখে আনন্দের মৃদুহাসি ফুটিয়ে তুললে? সভা কবি ফৈজী স্বরচিত কবিতা প'ড়ে বাদশাকে শোনাচ্ছেন। ঐ দেখুন! দেখতে দেখতে দার্শনিক আলোচনায় সভামণ্ড গরম হ'য়ে উঠল। ভারতের শ্রেষ্ঠ হিন্দু পণ্ডিত, শ্রেষ্ঠ মুসলমান আলেমের সঙ্গে পরস্পরের ধর্ম্ম নিয়ে তর্ক করছেন। বাদশা মীমাংসার জন্য আবুল ফজলের

দিকে চাইলেন। জ্ঞানগর্ভ যুক্তির সাহায্যে আবুল ফজল দেখিয়ে দিলেন, উভয় আদর্শের মধ্যেই অনেক মূল্যবান জিনিষ আছে, আবার উভয় আদর্শেই অনেক অবাস্তর বস্তুও প্রবেশ করেছে।

বাদশার যুক্তিতর্ক আর ভাল লাগলো না, সঙ্গীত শোনার ইচ্ছে হলো। একি স্বর্গের উদ্যানের কোন পাখী গান করছে, না এ মানুষের কণ্ঠস্বর? ঐ দেখুন গানের সঙ্গে তাল রেখে প্রাসাদের দেয়াল, বাগানের গাছ, বসন্তের মলয় বাতাস, নীল-মেঘমুক্ত আকাশ, সবই নাচতে সুরু করেছে। গায়ক আর কেউ নন, ভারতের সুরশিল্পের চিরন্তনী ওস্তাদ তানসেন। গানের স্বর্গীয় তানের সঙ্গে ভারতেশ্বরের মন তাঁর প্রাসাদ ছেড়ে, তাঁর সাধের রাজধানী ছেড়ে, তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে গেল আলোকের অফুরন্ত উৎসের সন্ধানে। তিনি যা শুনলেন, তিনি যা দেখলেন, কল্পনার সাহায্যে পাঠক তা বুঝে নেবেন। আমার লেখনী আপনাকে সাহায্য করতে পারবে না।

এবার চলুন, বাদশার শয়নকক্ষ একবার দেখে আসি। এ হচ্ছে তাঁর স্বপ্নপুরী—এখানে তিনি স্বপ্ন দেখেন। ঐ দেখুন বাদশা পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন। দেহে তাঁর বিদ্যুতের প্রবাহ চলে, বসে থাকতে তিনি পারেন না। আজ তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন। কিসের চিন্তা? সাম্রাজ্যের কথাই তিনি ভাবছেন। খোদা তাঁকে বিশাল এক সাম্রাজ্যের ভার দিয়েছেন। কত রকম রাজ্য, কত রকম ধর্ম্ম কত রকমের মানুষ তাঁর এই সাম্রাজ্যে! তিনি কেবল মুসলমানের বাদশা নন, তিনি হিন্দু, খৃষ্টান, পারসিক, জৈন সকলেরই বাদশা, সকলেরই পালক, সকলেরই রক্ষক, সকলেরই পিতা। তিনি তো কেবল মোগলের নেতা নন, রাজপুত, পাঠান, বেণিয়া, ব্রাহ্মণ, তাদেরও তিনি নেতা, তাদের বিষয়ও তাঁর চিন্তা করা দরকার, তাদেরও দুঃখ কষ্ট নিবারণ করা দরকার! তিনি তো কেবল দিল্লীর বাদশা নন, তিনি পাঞ্জাবেরও বাদশা, বাঙ্গালারও বাদশা, গুজরাটেরও বাদশা, মালয় দেশেরও বাদশা, আরও কত কত দেশের বাদশা। এই সব দেশের প্রজাপুঞ্জের সুখ, তাদের শান্তি তাঁরই চেষ্টার উপর, তাঁরই সুশাসনের উপর, তাঁরই সুব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। কোটি কোটি প্রজার—তাঁর বেশীর ভাগই অমুসলমান। কি চরিত্রে, কি জ্ঞানে কি ভগবৎ প্রেমে মুসলমানদের চেয়ে কোন অংশে তারা কম নয়। কেবল কলমা পড়ে নি বলে কি সকলে তারা নরকে যাবে? এও কি সম্ভব? খোদার সন্ধানে, সত্যের সন্ধানে মানুষ শত শত ধর্ম্ম স্থাপন করেছেন। শত শত ধর্ম্মের লোক তাঁর রাজ্যে আছে। প্রত্যেকে নিষ্ঠার সঙ্গে তার নিজস্ব ধর্ম্ম পালন করছে। এক ইসলাম ছাড়া সব ধর্ম্মই কি মিথ্যা? এও কি সম্ভব? শত শত মহাগ্রন্থ তাঁর সাম্রাজ্যে ভক্তির সঙ্গে পঠিত হচ্ছে। তাদের প্রত্যেকটী জ্ঞানের বৃহৎ এক একটী খনি। এক কোরাণ ছাড়া তাদের সবগুলিকে কি বর্জ্জন করতে হবে? এও কি সম্ভব, এওকি বাঞ্ছনীয়? নিত্য পরিবর্ত্তনশীল জগতে নিত্য নূতন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। শত শত বৎসর পূর্ব্বে, কোন বিশেষ এক বেষ্টনীর লোকেরা তাদের প্রয়োজনের তাগিদে যে সব বিধি-নিষেধ, আইন কানুন রচনা করেছিল, তার সবই কি অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় এখনও চলতে পারে? এও কি সম্ভব? পুরোহিত এবং ধর্ম্মযাজক, মন যাদের এত সংকীর্ণ এত অনুদার, সংস্কার যাদের এমন শক্ত বেড়া জালে আবদ্ধ করে রেখেছে, শিক্ষা এবং স্বার্থ যাদের অনিবার্য্যভাবে অতীতের সংকীর্ণ এক চিন্তাধারার মধ্যে টেনে নিয়ে যায়, তাদের পরামর্শে তাদের বিধানের উপর নির্ভর করে ভারতবর্ষের মত বিশাল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সমাজ নৈতিক সমস্যার সমাধান কি করা যেতে পারে? এও কি সম্ভব? কত ধর্ম্মের লোক আমার এই সাম্রাজ্যে বাস করে তাদের সকলেরই নিজ নিজ আচার, বিচার নিজ নিজ বিধি নিষেধ, নিজ নিজ ক্রিয়াকর্ম্ম, নিজ নিজ শিক্ষা সংস্কার আছে। যেন এক একটী বদ্ধ জলাশয়! তাদের মধ্যে জীবনের সত্যিকার প্রবাহ আনতে হলে, তাদের মধ্যে মিলনের সৃষ্টি করতে হলে, তাদের সাহায্যে বিরাটতর এক উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে, পার্থক্যের বাঁধগুলিকে ভেঙ্গে দিতে হবে, বিরাট এক সামবায়িক প্রবাহের সৃষ্টি করতে হবে। কি করে তা করা যায়? দুর্নিবার রাজশক্তির সাহায্যে দেশের খণ্ড খণ্ড অংশকে একতার সূত্রে গ্রথিত করতে হবে। তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে তাদের বিরাট এক রাষ্ট্রীয় দেহের এক একটী অঙ্গরূপে ব্যবহার করতে হবে। তা যদি করতে পারা যায়, তা হলে দেশে শান্তি আসবে, শৃঙ্খলা আসবে, ঐক্য আসবে, ঐশ্বর্য্য আসবে। কাজটা পরিপূর্ণ ভাবে করতে হলে, বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে বিরাটতর কোন আদর্শের সাহায্যে ঐক্যতাসূত্রে বাঁধতে হবে। সে বিরাটতর আদর্শ কি হতে পারে? খোদা প্রেম—খোদাকে সকলেই মানে; মানব প্রেম—মানবের মঙ্গল সব ধর্ম্মই চায়; দেশপ্রেম—দেশের ডাক প্রত্যেকেরই অন্তর শুনতে পায়। যাক, এ ত গেল খোস খেয়াল, কল্পনা জল্পনা! এ সবকে কার্য্যে পরিণত করার, বাস্তবরূপ দেবার উপায় কি?

আসুন পাঠক, আমরাও খোস খেয়াল আর কল্পনা জল্পনা ছেড়ে বাস্তবতার জগতে ফিরে আসি। আকবর কি ভাবে তার আদর্শকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন, তারই এখন আলোচনা করা যাক।

[ক্রমশঃ

মাধবীলতার বিয়ে

(গল্প)

শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু

অবশেষে মাধবীলতাও হাল ছেড়ে দিয়েছে। কেন যে তার বিয়ে হচ্ছে না—এর সরল কারণ কি, কেউ তা' অনুসন্ধান করে আবিষ্কার করতে পারল না। দূর সম্পর্কের আত্মীয় পরিজনেরা কেবল মেয়েটিকেই দোষারোপ করছে। মাধবীলতার বাবা কমলাপতিবাবু অবশ্য সস্তা ও জোলো সান্ত্বনা লাভের চেষ্টায় ভাগ্যের দোহাই দেন। আর মাধবীলতা নিজে ত' হাল ছেড়েই দিয়েছে। এ-ছাড়া উপায়ান্তর নেই। জীবনে সাফল্যের ফসল আহরণের দুরূহ চেষ্টা এবং অকারণ প্রযত্ন ব্যয় করাটা যে মূর্খতার চরম ধাপ—একদিনে সেটা উপলব্ধি হয়েছে।

মাধবীলতা বাবার একমাত্র কন্যা নয়। তার ত' বয়স পার হয়ে গেছে বহুদিন; মেজ মেয়েটি বিবাহযোগ্যা, উত্তীর্ণ-কৈশোর, নাম কনকলতা। ছোটটি সবে তারুণ্যের স্পর্শে এসে দাঁড়িয়েছে। সামান্য কলমপেশা কুলীর কাজ করে তিনটি মেয়ের বিবাহ দেওয়ার সাধ্য কমলাপতিবাবুর নেই। সভ্যদেশের কোন সভ্য কেরাণীরই থাকে না। তাই তিনি হতাশ হয়ে ভাগ্যকে স্মরণ করেন। এ-ছাড়া তাঁর আর গত্যন্তর নেই। ছেলে দু'টি, কিন্তু কোনটিই কাজের নয়। বড় লোভজিৎ সেটি আধপাগলা; আর ছোট মোহজিৎ, সেটি চিররুগ্ন।

দু'বার সংবাদপত্রে বিবাহের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে পয়সা খরচ করে, মাধবীলতা আর কনকলতার জন্যে। বহুস্থান হতে পত্র আর লোক এসেছে। কিন্তু কিছুতে কিছু হয়নি,—শুধু লৌকিকতা রাখবার অমায়িক এবং অসাধারণ প্রচেষ্টা ছাড়া।

মসলন্দপুর হতে হরকিশোর একেবারে পাকা কথা দিয়ে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন—মাধবীর মত এমন সুন্দর মেয়েটীকে তাঁর গৃহলক্ষ্মী করতে না পারলে মনে তিনি তিল-মাত্র শান্তি পাবেন না। জমিদার তাঁরা, পণ তেমনধারা না পাওয়া গেলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু হরকিশোরের পুত্র অর্থাৎ পাত্র স্বয়ং মেয়েটীকে পছন্দ করতে পারেনি নাকি। সৌন্দর্য্যের দিক থেকে নয়, মেয়েটীর বিদ্যার পরিচয় পেয়ে। সে নিজে আই. এম, এস। তার বউ সামান্য ফোর্থক্লাশ পড়া মেয়ে হবে, হাতের লেখা যার সমান নয়, সোজা করে দু'লাইন লিখে যেতে বল্লে হাত কাঁপায় যে, হোক না সে সুন্দরী আর রূপবতী, এটা সে সহ্য করতে পারবে না বলে দিয়েছে। অভিজাত সভ্যসমাজে কৃষ্টি বলে একটা শব্দের চলন যখন আছে—তখন সেটা অস্বীকার করা শোভন নয়। বিয়ের বাজারে সৌন্দর্য্যের পসরা অনেকখানি বটে, কিন্তু শিক্ষাটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আই, এম, এস-এর বধূ হতে হলে আই, এ, কি আই, এস-সি পাসটা ত' নির্ব্বিবাদে অনিবার্য্য। হরকিশোর অবশ্য ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন যথেষ্ট, কিন্তু কমলাপতিবাবু বিষণ্ণ হননি আদৌ; মাধবীলতাও না। এ রকম ত' আরও কতবার ঘটে গেছে। জীবনের ঘটনাকে অস্বীকার করবার বাজে মোহ পোষণ করার কোন মানে নেই। দৈবের দোহাই দিয়ে নিজের মননশীলতাকে গড়ে নিয়েছে মাধবীলতা। নিশ্চল হতে জানে সে—অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াবার যথেষ্ট শক্তি তার আয়ত্তে আছে। সুতরাং ভয় নেই—আর তা ছাড়া ক্ষতিই বা কি?

সে জানে বিয়ে তার একদিন হবেই। নহবত বসবে গেটের ওপর মাচা বেঁধে, বাজবে শাঁখ, উলু উলু রব উঠবে চারিদিকে। সে নূতন রূপ নিয়ে, নূতন সজ্জা করে অহঙ্কারে এবং মর্য্যাদায় চলে যাবে—ধরা যাক কোনও এক রাজকুমারের সঙ্গে। অথবা রাজকুমারী হয়তো রয়েছে বন্দিনী।—(কল্পনাটা একটু বেশী প্রসারিত এবং ব্যাপক হয়ে পড়ে যেদিন) দূরদেশের অপরিচিত এক রাজকুমার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে আসবে। এক হাতে তার অস্ত্র, অন্য হাতে অভয়-মন্ত্র; রাজকুমারী কুমার দেখতে পেল না প্রথমে, কিন্তু করুণ কান্না শুনতে পাবে অকস্মাৎ। রাজ-কুমারের হলো ভয়। কৌতূহলের সঙ্গে মনে কিছু দুঃসাহসও জাগল। সে চললো ঘোড়ায় চেপে কান্নার সুর লক্ষ্য ক'রে ক'রে। রাজকুমারী সেখানে বসে। পাশে একটি ঝরণা। ঝরণার ওদিকে পাহাড়ী জমি—ইতস্ততঃ উঁচু নীচু; ছোট ছোট কচি কচি গাছপালা আর পুষ্টযৌবন উন্নতশীর্ষ মহুয়ার বন। গাছে বসে আছে পাখী, আর ফুলে রয়েছে সৌরভ। কিন্তু রাজকুমারীর বেদনায় প্রকৃতি স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, ভাষা হারিয়ে একেবারে বোবা। (কল্পনা এখানে শ্লথবল্গা অশ্বের মত ধাববান হয়ে ওঠে।) মুখর পাখীরা নির্ব্বাক হয়ে পড়েছে যেন, পুষ্পবিতানও ম্রিয়মাণ। রাজকুমার তখন রাজকুমারীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। কপালের ঘাম মুছে কুমার ঘোড়ার পিঠ হতে পড়লো লাফিয়ে, রাজকুমারীর কাছে গিয়ে বললে —ওঠো, চলো, আমি এসেছি। আর ভয় নেই। আমি, আমি এসেছি, তোমার প্রিয়তম। পাখীরা উঠলো ডেকে চঞ্চল হয়ে মুখর হয়ে। ফুল বিলালো সৌরভ, বন-বনানী উঠলো জেগে, উঠলো হেসে। রাজকুমারের স্পর্শ পেয়ে বন্দিনী রাজকুমারীর বুকে এল বন্যা, মনে জোয়ার। কুমারী আত্ম-সমর্পণ করলে রাজকুমারের কাছে। একলা প্রকৃতি শুধু সাক্ষী—এই স্বপ্নকে মাধবীলতা বানিয়ে রেখেছে যত্ন করে অবচেতন সম্রাজ্যের কোনো প্রদেশে মেয়ে মানুষের সাধ

আহ্লাদ উল্লাস, উৎসব, গর্ব্ব, অহঙ্কার—সব কিছুর মূলে যে বস্তু, মাধবীলতা তা থেকে বঞ্চিত হতে চলেছে বটে, কিন্তু তা বলে সে নিজের মনকে স্বপ্নহীন এবং রুক্ষ করে আরও বেদনাতুর এবং বিরক্ত করে তুলতে পারবে না। সত্যের রূঢ় সংঘর্ষের মধ্যেও সে এই ছায়াময় স্বপ্নের শ্যামলতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে—অনেক কষ্ট করে অনেক যত্নভরে। এই অনুভূতি অথবা এই কল্পনা-বিলাস না থাকলে মাধবীলতা এই বৈচিত্র্যহীন সংসারে কি করে বেঁচে থাকবে? দিনগুজরাণো ত পথ অতিক্রম করা, সুতরাং পাথেয় সেখানেও প্রয়োজন হয় বৈকি! জীবন রুক্ষ হোক কিন্তু পথকে একটু মসৃণ করা গেলে দোষের কি?

কনকলতার জন্যেও দুঃখ হয় মাঝে মাঝে। মা নেই, তাই। নইলে মেয়ের এইভাবে অনূঢ়া হয়ে থাকার যন্ত্রণা তিনি কখনো সহ্য করতে পারতেন না। মাধবীলতা এখন তা বুঝতে পারে। কমলাপতিবাবুর অবশ্য বেদনা-বোধ আছে সত্য, কিন্তু সে তত তীব্র নয়, কেমন যেন ভোঁতা হয়ে পড়েছে। নইলে তিনি এইভাবে হাল ছেড়ে দিতে পারতেন না। একদিন ত' স্পষ্টই বললেন, ভাগ্যদেবীর হাতেই তোদের সঁপে দিলাম মাধবী। বরাতে তোদের যা আছে হোক। এখন থেকে তোরা স্বাধীন হলি।

লোভজিৎ আধপাগলা হলেও পিতার এই কথা ক'টি সমর্থন করে নি। অবশ্য মাধবীলতার বিয়েতে তার করণীয় কিছু নেই। এখানে ওখানে ছন্নছাড়া যত্ন কিছু ব্যয় করেছে—তার বন্ধুবান্ধবদের বলেছে। আগ্রহশীল হয়ে যারা এসেছে মাধবীলতাকে দেখতে, তাদের অনেকেই মাধবীলতাকে সিনেমায় নিয়ে যেতে চায়, বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করে না। লোভজিৎ কমবুদ্ধি বটে, কিন্তু তার চেতনা ততটা শ্লথ নয় যে, সে ওই বন্ধুগুলোকে চিনতে পারে নি। তবু বাবার দুশ্চিন্তা দেখে সে কাতর হয়, নিজে থেকে চেষ্টা ক'রে হয়রাণ হয়।

মোহজিতের এ সব চিন্তা নেই। বয়স বেড়েছে কিন্তু অবকাশ নেই। মাসের তেইশটা দিন বিছানায় শুয়ে দূরের আকাশ দেখে, চিল ওড়ে, ঘুরপাক খায় শূন্যে, বিকালে মেঘের ঐশ্বর্য্য, রাত্রে তারকা—এই সব দেখে লোভার্ত্ত দৃষ্টি মেলে, আর রোগ-যন্ত্রণায় কাতর হয়। বাকী যে কটা দিন সুস্থ থাকে, সে ক'দিন পাড়ার একটি সরকারী ডাক্তারখানায় বসে খবরের কাগজ প'ড়ে কাটিয়ে দেয়। কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে কত ভীষণ ভাবে, কোথায় মাছবৃষ্টি হয়ে গেছে খুব, কোন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে ধ্বংস হল কোন কোন সহর, আর ফুটবল খেলায় জিতল কোন দল—এই সব খবর। এর পরেও তার সময় পাওয়া দুষ্কর, সুতরাং সংসারের কথা ভাববার অবকাশ নেই।

পত্নীর মৃত্যুর পর যে ব্রাহ্মণ-মহিলাটিকে রাখা হয়েছিল রান্নার কাজে, এখন তাকে জবাব দিতে বাধ্য হয়েছেন কমলাপতিবাবু মাধবীলতার অনুরোধে। দশটাকা করে মাসে মাসে সঞ্চিত হয় হোক। মাধবীলতা এখন গৃহস্থালীর কাজ বেশ গুছিয়ে উঠতে পারে, আর তা' ছাড়া কনকলতা রয়েছে। অনর্থক অর্থব্যয়ের প্রয়োজন নেই।

আবার সম্বন্ধ আসে একটি। কনকলতার জন্য অবশ্য। পাত্র নিজে দেখতে এসেছে। বি, এস্-সি, ফেল ক'রে ভদ্রলোক ষ্টেশনারী দোকান দিয়েছেন আসামে। পাত্রী দেখলেন, মাধবীলতাকেও দেখলেন তিনি, অবশ্য যেটিকে হোক বিয়ে করতে রাজী আছেন। পণ নেবেন না, তবে একটি কথা তিনি পূর্ব্বেই ব'লে রাখলেন—মেয়েকে তিনি আসামে নিয়ে যাবেন, আর বাপের বাড়ী পাঠানো হবে না মোটেও। মেয়েকে তিনি চিরদিনের মতই দেশ ছাড়া করতে চান, কেন না বাংলাদেশ তিনি চিরতরে পরিত্যাগ করবেন সঙ্কল্প করেছেন। এ দেশ বেইমানের দেশ। তিনি একদা যাদের উপকারের জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করে নিজের ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন, সেই সব দুগ্ধপোষ্য ভায়েরা আজ বড় হয়ে তাঁরই সর্ব্বনাশ সাধন করছে। সুতরাং এ দেশ বড় সাংঘাতিক দেশ—ভাই ভাইয়ের রক্ত খেয়েছে—ইত্যাদি—

কমলাপতিবাবু বললেন—মা-মরা মেয়ে আমার, বছরে এক আধবার, এই ধরুন পুজোর সময়, কি বাড়ীতে অন্যান্য কাজের সময়, এখানে না আনলে শোভন দেখাবে কেন বলুন?

ভদ্রলোকটি বেশ রূঢ়, বল্লেন—শোভন অশোভন বুঝি না মশাই, আমার বউ আমি পাঠাবো না।

কমলাপতিবাবু বললেন—কিন্তু—

—না, এর মধ্যে আর কিন্তু টিন্তু ঢোকাবেন না। আমি বউকে এক মিনিটের জন্যে কোথাও পাঠাতে পারবো না। সমস্ত স্বত্ব ত্যাগ করে আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। এই নচ্ছার দেশে—

কমলাপতিবাবু বললেন—নমস্কার, আসুন। ভেবে দেখি যদি সম্মত হই। আপনার ঠিকানা ত রইল—সংবাদ দেব।

সংবাদ নিজে যেচে দিতে হ'ল না। সেই ভদ্রলোকই আগ্রহভরে রিপ্লাই কার্ডে সংবাদ চেয়ে পাঠালেন।

কমলাপতিবাবু জানালেন—দু'টী মেয়েরই বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেছে। আপনার ব্যস্ত হ'বার কারণ নেই।

লোভজিৎ আবার একটা সম্বন্ধ এনেছে। চেষ্টাশীল সে, সন্দেহ নেই। বাবার দায়িত্বের কিছু অংশ সৎপুত্রের মতো নিজের স্কন্ধে তুলে নিতে চায় স্বেচ্ছায়—এতে প্রশংসা

পাওয়া তার উচিত, কিন্তু সকলে তাকে বিদ্রূপ করে কেন, সেইটে তার পক্ষে নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য ঠেকে সর্ব্বদা। যত পাত্র সে এনেছে, তাদের কেউই সুবেশ বা সুশ্রী নয়—এটা বোনেদের তরফ থেকে প্রতিবাদ হিসাবে বরাবর আসে। বাবা তার আনীত পাত্রের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন না মোটেই। হয়তো কারণটা একই। কিন্তু এ বারের বরটি দেখতে শুন্‌তে বেশ। নধর দেহ। ভুঁড়ি হয়তো থাকলেও থাক্‌তে পারে একটু পোষাকের আড়ালে। তবে সাধারণ বরের বয়সের চেয়ে এ পাত্রটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। কমলাপতিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি করেন ?

জগবন্ধুবাবু হাসলেন—হেসে জবাব দিলেন, আজ্ঞে কিছু না।

—পড়েছেন কতদূর ?

—পড়িনি মোটেও, তবে নামটা সই কর্‌তে পারি বাংলায়।

কমলাপতিবাবু উত্তর শুনে বিস্মিত হলেন, বল্‌লেন—আপনার কে আছেন ? বাড়ী কোথায় আপনাদের !

জগবন্ধুবাবু ইতস্ততঃ উঁকিঝুঁকি দিলেন একবার, পরে বললেন—আমার মা-বাবা, দাদা-দিদি—সবাই আছে। আমাদের দেশ উত্তর-বঙ্গে। থাকি বৌবাজারে।

কমলাপতিবাবু পুনরায় প্রশ্ন করলেন—আপনি ত' বললেন কিছু করেন না—কিন্তু সংসার চলে কি করে, জানতে পারি কি ?

বিলক্ষণ! জগবন্ধুবাবু বিস্মিত হয়ে উত্তর করলেন—সে কি মশায় ? আমাদের সাত পুরুষ কেউ খেটে খেয়েছে নাকি ? কয়লার খনি আছে আমাদের—লোহা-লক্কড়ের কারবার আছে আমাদের।

কমলাপতিবাবুও বিস্মিত হলেন। কোনো ধনী সন্তান যে এ ভাবে মেয়ে দেখতে আসে—এবং শুধু তাই নয়, এতটা নির্ব্বোধ হয়, তা তাঁর পূর্ব্বে জানা ছিল না।

জগবন্ধু বাবু বললেন—মেয়ে এবার দেখান মশাই, আমার আবার দেরী হ'য়ে যাবে।—ও কি, জলখাবার আমি খাবো না, আমার অম্বলের ব্যামো আছে—মাপ করবেন।

কমলাপতিবাবু বললেন—বিয়ের কথা মা-বাবাকে জানিয়েছেন ত ? তাঁরা সঙ্গে এলেন না যে ?

—আপনার একটুও বুদ্ধিসুদ্ধি নেই স্যার। তাঁরা আসবেন কি ? আমি তাঁদের জানিয়েছি নাকি যে আমার বিয়ে হবে ; জানালেই হয়েছিল আর কি ? জানেন মা-বাবার ইচ্ছে—আমি যাতে বিয়ে না ক'রে সন্ন্যাসী হ'য়ে চ'লে যাই কোথাও।

দরজার ও পাশ হ'তে কনকলতা আড়ি পেতে সব কথা শুনছিল। এ কথা শুনে তারা পর্য্যন্ত চাপা গলায় হেসে ফেললে। কনকলতা বললে—দিদি, তোর বর ভাখ—সরল আর কেমন সাদাসিদে। মাধবীলতা পাল্‌টা আক্রমণ করলে—আমার কেন, দাদা তোর সম্বন্ধ এনেছে—জিজ্ঞাসা করিস।

জগবন্ধুবাবু বললেন—আমার একটা দোষ ছিল স্যার ; মদটদ আগে খেয়েছি বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে। একবার অসুখ হ'ল—ডাক্তার এসে বললে—অবিবাহিত থাকতে হ'বে। মা-বাবা অমনি ব'লে উঠলেন—তাই থাক্ চিরকুমার, সন্ন্যাসী হোক। এখন আর মদটদ খাই না ; অথচ—

অথচ'র পরের অংশ কমলাপতিবাবু বুঝলেন, এবং বুঝলেন বলেই কৌশলে পাত্রটি বিদায় কর্‌তে পার্‌লেন।

এর পর দ্বিতীয়বার দার গ্রহণের জন্য উমাপতিবাবু এসে কমলাপতিবাবুকে ধ'রে ক'রে পড়লেন। চুলে পাক ধরেছে বলেই যে বয়স বেশী, এ কথা যেন কমলাপতিবাবু মনে না করেন। মেয়ে দেখার পর বললেন—মেয়ে দেখে ত খুব খুসীই হ'য়েছি কমলবাবু ; পণ আমি নেব না। বরং বিয়ের খরচ যদি দিতে হয় কিছু—আমি তাতেও রাজী। আপনি দিন ঠিক করুন—এই আস্‌ছে সোমবারে দিন আছে—

এতটা আগ্রহ এর আগে কেউ দেখায় নি, কমলাপতি বাবুর কেমন সন্দেহ হ'ল। তিনি বললেন—আচ্ছা, আপনার ঠিকানা ত' রইল—আমরা একটু খোঁজ-খবর নিই। বিয়ে বলে কথা,—

উমাপতি বাবু বললেন—কি জানতে চান, বলুন না ? আমি সব কথাই খুলে বলবো আপনাকে।

কমলাপতিবাবু আগ্রহের কারণটা জান্‌তে চান, কিন্তু লজ্জায় তিনি তা জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারলেন না। অবশেষে উমাপতিবাবু নিজেই বললেন—হ্যাঁ, তবে একটা কথা আপনাকে বলে রাখি। আমি বিবাহিত, আমার প্রথম পত্নী আমাকে পরিত্যাগ করেছে। আমার সম্পত্তি ও কাজ-কারবারের ওপর তার কোন দাবীদাওয়া নেই। এবং আমি আর একটি বিয়ে করতে চাই শুধু আমার প্রথম পত্নীকে জব্দ করবার জন্য। আপনার মেয়ের খাওয়া দাওয়ার কোন চিন্তা থাকবে না।

কমলাপতিবাবু তবুও সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর্‌তে পারলেন না। তিনি উমাপতি বাবুর দেশ হ'তে সংবাদ সংগ্রহ ক'রে ভেবে দেখে পাকা কথা দেবেন, এর আগে তিনি কিছু বলতে পারছেন না।

ধৈর্য্যের সীমা আছে একটা। কত দীর্ঘকাল আর ধৈর্য্য ধ'রে বসে থাকা যায় এ ভাবে ? মাধবীলতার সহিষ্ণুতা ক'মে আস্‌ছে ধীরে ধীরে, অত্যুষ্ণ ধাতব কোনো পদার্থ যেমন নিরুত্তাপ হয় আস্তে আস্তে, তেমনি ভাবে। কনকলতা ত'

বহু পূর্ব্বেই ধৈর্য্যহারা হ'য়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, এত লোক আসছে আর যাচ্ছে, শুধু পীড়ন হচ্ছে তাদের দু' জনের ওপর। কেউ এল বাড়ীতে, মাধবীলতা আর কনকলতা, বসো তোমরা আয়নার সাম্‌নে। পাউডার ঘ'সে নাও একটু, শাড়ীটা পরো এভাবে ঘুরিয়ে, কোমরের কাছটা আবার ঈষৎ কুঁচিয়ে দিতে হয়। তারপর নিজেদের সৌন্দর্য্য, রূপ, দেহ-সৌষ্ঠব—সব কিছুর বিজ্ঞাপন নিয়ে এসে দাঁড়াতে হচ্ছে দিনের পর দিন,—জানা অজানা সকল লোকের সম্মুখে, ক্ষুধিতচিত্ত কতকগুলি নিষ্প্রাণ পুরুষের খোলা দৃষ্টির সাম্‌নে। এর বিরুদ্ধে বাবার কাছে নালিশ করা যেমন অযৌক্তিক, তেমনি অর্থহীন। অথচ এ শাস্তিও আর সহ্য করা যায় না।

কেউ আসে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করতে। ব্যাধির জন্যে ডাক্তার বিবাহ না করার উপদেশ দিয়েছে যাকে, সেও আসে গোপনে বিবাহ করতে। কাকেও বা জলযোগের লোভে আসতে দেখা যায়, আর নতুন যুবকেরা এসেছে শুধু মেয়ে দেখার উৎসাহে, পুঙ্খানুপুঙ্খ করে পৌনঃপুনিক দৃষ্টিতে মেয়েলোকের তনুলালিত্য পান করার আগ্রহে। রাস্তায় চলা মেয়েদের একটুকরো গতিভঙ্গিমা দেখে যে সব অশান্ত এবং অপূর্ণ লালসার জন্ম হয়েছিল, এখানে এসে তাদের দু'বোনকে দেখে সে সব লালসার পূর্ণ লালন করে গেছে শুধু। মাধবীলতা সবই বুঝতে পেরেছে তা, তবুও বাবার কথামত তাকে ক্রীড়নক সাজতে হয়েছে। কেউ বলেছে এইবার হাঁটো ত দেখি সোজা হয়ে, পায়ের পাতা সম্পূর্ণ ফেলে। কেউ বা দিয়েছে শ্রুতি লিখন। সেই আই, এস, এস পাস করা ছেলেটাই ত, লিখতে দিয়েছিল একপাতা ইংরাজী। কেউ জিজ্ঞাসা করেছে কত জোরে জলপটী আর পাখার বাতাস চালাতে হয়? বি, এস, সি ফেল করা আমাদের সেই ভদ্রলোক ত পায়ের কাপড়ই একটু তুলতে বলে বল্লেন, "যদিও অভদ্রতা হয়, তবু গায়ের রঙ্‌টা দেখতে হবে বৈকি! কি বলেন,—বিয়ে বলে কথা। মুখ দেখে মেয়ে মানুষের গায়ের রঙ ধরা যায় না। পাউডার স্রোতে মেয়েদের আসল রঙ ডুবে যায়। আজকালকার বাজার যা মশাই—আর বিশেষ করে বাংলা দেশ, যত সব চোর জোচ্চোরের দেশ এটা। আমার কাছে স্পষ্ট কথা মশাই। মেয়ের রঙ্‌ ফর্সা কি কালো—বিচার করতে হলে ওদের শ্রীমুখ দেখলে চলে না। গায়েই মেয়েদের খাঁটী রঙ,—অকৃত্রিম। কেউ আবার জানতে চেয়েছে দই পাততে হয় কি ভাবে অথবা মাংস সিদ্ধ করার অত্যন্ত সহজ এবং অত্যন্ত আধুনিক উপায় কি? গান কিন্তু শুনে গেছে সবাই।

স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি মাধবীলতা যে গানগুলি তার এভাবে একটির পর একটি করে ঝরে পরে। অর্থহীন ভাবেই তাকে গান করতে হয়, লোকের মনোরঞ্জনের জন্যেই ত? এই সভ্য জগতেও কি ভাবে বিজ্ঞাপন দিয়ে তাতিয়ে রাখতে হয় সকলকে, রাস্তায় যারা রূপকে উপজীবিকা করে ঘোরে, তাদের সঙ্গে অভিজাত মানুষের পার্থক্যের একটা অহঙ্কার হয়তো আসে মনে মনে, কিন্তু বেশ করে তলিয়ে ভাবতে গেলেই মাধবীলতা কাতর হয়ে গেছে। তফাৎ অবশ্যই আছে, কিন্তু সে তফাৎটা সমুদ্রপ্রমাণ নয়, নদীর মত বিস্তৃতও নয়, নিতান্ত নালানর্দ্দমার প্রশ্ন—হয়তো দারিদ্র্যের অভিশাপ, কিন্তু দরিদ্র বলে তাদের সম্মানও কি থাকা উচিত নয়! কনকলতা বলে, "ভাগ্যিস আমি গান শিখিনি। নইলে তোর মত আমারও ওই দশা হতো। তবু তুই পারিস ওসব সহ্য করতে, আমার একেবারেই অসহ্য দিদি।

দুই বোনের জীবন একমুখী হয়ে গেছে। ভিন্ন স্রোত-ধারা করদ নদীর মতো দু প্রান্ত থেকে এসে একত্রিত হয়ে গেছে মানসপৃথিবীর একই তীর্থক্ষেত্রে। দুঃখ কারো কম, কারো বেশী নয়। মাধবীলতা গম্ভীর, বয়সের নম্রতা আসছে ক্রমে ক্রমে, আর কনকলতা—তার নূতন যৌবন, একটু চঞ্চল আর উদ্দাম ত হবেই। এজন্যে আভাস-ইঙ্গিতে ছোট বোনটিকে তিরস্কার করতে হয় কত, কত বুঝিয়েছে মাধবীলতা কিন্তু কিছুই হয়নি তাতে। বয়সের উত্তাপ যুক্তির সংযমকে দিয়েছে পুড়িয়ে।

বাড়ীর সামনে সরকারী ডাক্তারখানা যেটা ছিল, সর্ব্বনাশটা সে কোণ থেকেই এল।...একদা মাধবীলতা এখানের ডাক্তারবাবুটিকে সন্দেহের চোখে দেখে কনকলতাকে সাবধান করেছিল। ডাক্তারবাবুটি কনকলতাকে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। মাধবীলতা তার সন্ধান পায়। একজন অবিবাহিত যুবক, একটি তরুণী অনূঢ়াকে পত্র দিয়েছে—সে যে ধর্ম্মতথ্য নয়, এ কথা মাধবীলতা বুঝে পেরে পিতার কাণে তুলেছিল ব্যাপারটিকে। কনকলতা ধমকে উঠলো—দেখ দিদি, আমার কোন ব্যাপারে তোর হস্তক্ষেপ আমি উচিত মনে করি না। তুই নিজের সুখ সুবিধা ডুবিয়ে দিয়ে আমার স্বাচ্ছন্দ্যে হিংসে করতে আসিস কেন বলতো? ঐজন্যে তোর এই দশা। নিজে জ্বলে পুড়ে মরছিস।

মাধবীলতা আঘাত পায় বটে, কিন্তু সহ্য করতে শিখেছে ও। কোথা দিয়ে কী ঘটে গেল বোঝা গেল না। কিন্তু একদিন শোনা গেল কনকলতার সঙ্গে ওই ডাক্তারটির বিবাহ না হলে চলবেই না। এমন একটা অশোভন ঘটনা ঘটেছে যাকে সামাজিক পর্য্যায় এনে কৌলীন্য দান করতে গেলে অন্ততঃ ওদের দু'জনের আশু মিলনের প্রয়োজন। মাধবীলতা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের কাজে মনঃসংযোগ করল। কমলাপতিবাবু মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন।

বড় মেয়েটীর বিবাহ এখনও হয়নি, অথচ কনকের সম্বন্ধ হয়ে গেল, এ যেমন বিসদৃশ, তেমনই অসামাজিক। মেয়েদের দিক থেকে ত' বটেই, পিতার পক্ষেও একান্ত গর্হিত। কমলাপতিবাবু বড় মুসড়ে পরলেন। খোলাখুলি ভাবে মাধবীলতাকে তিনি জানালেন সব কথা। তিনি বল্লেন, একি কলঙ্কের কথা বলতো মা? আমাদের বংশ-মর্য্যাদায় আমরা কারো চেয়ে এতটুকু খাটো ছিলাম না। এখন কি যে করি!

এতদিন পরে মাধবীলতার চোখে জল নামলো। সহানুভূতির স্পর্শে তার অন্তরের সকল কাঠিন্য গেল ঘুচে। মেয়ে-জন্মের আসল রূপটি মূর্ত্ত হলো। মাধবীলতা কাঁদলে, অকালবর্ষায় মাঝে মাঝে উষ্ণপৃথিবীতে যেমন বৃষ্টিপাত ঘটে, তেমনি ভাবে। কমলাপতিবাবু কি যেন বললেন—শোনা গেল না।

মাধবীলতা উত্তর করলে, "তুমি কনকের বিয়ের ব্যবস্থা করো বাবা। তোমার পায়ে পড়ি। ওদের দু'জনের আর অবিবাহিত থাকা ভালো দেখায় না। আমি? আমার কথা যদি ধরো ত' বলবো তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি ত' তোমার বিধবা মেয়ের সামিল বাবা; আমার কথা ছেড়ে দাও। আশীর্ব্বাদ করো, তোমাকে যেন সেবা করতে পারি সারাজীবন।

নাটকের নায়িকার মত কথা,—হাজার চেষ্টা করেও কষ্টের স্পর্শকে গোপন করা যায় নি।

কমলপতি বাবু একটুখানি কাজ করে নিজের বেদনা-প্রবাহকে পথ ছেড়ে দিলেন—জানিস মা, আমি এতদিন সৌভাগ্যের আকাশে চোখ তুলে বসেছিলাম। আমি তোদের কল্যাণের স্বপ্নই দেখেছি, পথ খুঁজিনি।

আফিসের এক বন্ধুর কাছে নিজেদের বাড়ী বাঁধা রেখে কিছু টাকা সংগ্রহ করে আনলেন কমলাপতি বাবু। মেয়ের বিয়ে দিতে হলে প্রত্যেক কেরাণীর অপরিহার্য্য এবং অনিবার্য্য পরিণতি যা—তাই হবে কমলাপতি বাবুর। কিন্তু তা' বলে মাধবীলতাকে তিনি ভাসিয়ে দিতে পারেন না। কনকলতা নিজের পথ নিজেই নির্ব্বাচন করে নিয়েছে। সংসারের বিধি-নিয়ম কর্ত্তব্যের ধর্ম্মধ্বতি, সামাজিক শৃঙ্খলা, ব্যবস্থা, এ সব তার কাছে মূল্যহীন। কিন্তু মাধবীলতা তো পিতার মুখা-পেক্ষী ছিল বাধ্যতার গণ্ডীর মধ্যে সংযমের রজ্জু টেনে। এক মিনিটের জন্য সে উচ্ছৃঙ্খল হয় নি, অবাধ্য হয় নি। পিতার কাছে শিশুই আছে সে সব সময়। তার জন্যে সর্ব্বস্বান্ত যদি হন কমলাপতিবাবু—কি করবেন?

অবশেষে মাধবীলতার সম্বন্ধ হল—পাকা দেখা হল। টাকা ঢাললে বাংলা দেশে বরের অভাব হয় না। উদার মনুষ্যত্বপ্রবণ মহানুভব বাংলা দেশ কি না।

বাসি বিবাহের দিন মাধবীলতাকে আর একবার কাঁদতে দেখা গিয়েছিল, এ ক্রন্দন পূর্ব্বেকার সেই বেদনাজাত নয়—তখনকার মত নিবিড়ও নয়। এ ব্যথা অন্যধরণের। তার পিতৃপুরুষের আর বাবা, ভাই বোন, প্রাচীন স্বপ্নময় জীবন-ধারা,—সব কিছুর থেকে সে বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে, মাধবী-লতা আড়ষ্ট হয়ে চোখের জল ফেলতে লাগলো।

এখানে উপবাস আছে, দারিদ্র্য আছে, বৈচিত্র্য ছিল না সত্য, কিন্তু নিস্ফল কোনো প্রত্যাশা ছিল না এখানে, উদ্বেগ ছিল না একবিন্দু, সহজ ও সরল অনুভূতির মধ্যে নিজের মনকে খুঁজে পাওয়া যেত অনায়াসে। সব চেয়ে এখানে মহিমান্বিত অহঙ্কার এবং স্বপ্নের অসম্মান হয় নি এতটুকু। তাই মাধবীলতার চোখে জল কি না কে বলতে পারে?

বাঙ্‌লায় যত নদনদী আছে

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস, এম-এ, ব্যারিষ্টার-এ্যাট্-ল

বাঙ্‌লায় যত নদনদী আছে সে নদীর বারি স্বাদু হোক্,
বাঙ্‌লায় যত নরনারী আছে এ দেশের লোক সাধু হোক্!
ভগবান্ ভগবান্
নদী-মাতৃকা বাঙ্‌লারে তুমি ধনে জনে কর সুমহান!

বাঙ্‌লার পাখী বাঙ্‌লার ফুল, করুক আমার চিত্ত আকুল,
মন্দিরে শুভ শঙ্খ বাজুক মস্‌জিদে হোক্ শুভ আজান!
ভগবান্ ভগবান্
শস্য-শ্যামলা বাঙ্‌লারে তুমি ধনে জনে কর সুমহান।

মাঠে মাঠে ধান সোনার ফসলে হাসিবে পল্লীরাণী,
নীল নভোতলে তৃণ-প্রান্তরে বিছাব আসনখানি।

যত অশান্তি হোক্ বিদূরীত, শুভ-ব্রতে হোক্ মন উন্নীত,
স্থলে জলে আর গগনে পবনে হোক্ মঙ্গল গান—
ভগবান্ ভগবান্
বারুদের ভয়ে ভীত বাঙ্‌লারে ধনে জনে কর সুমহান।

কমরেড ইন্‌স্পেক্টর

(গল্প)

শ্রীমালবিকা দত্ত, বি-এ

সি. আই. ডি. ইন্‌স্পেক্টর মিঃ কানাইলাল চন্দ ওরফে আমি সন্ধ্যাবেলা টেবিলে বসিয়া কতকগুলি কাগজপত্র দেখিতেছিলাম ; আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়া একটি লোককে খুঁজিতেছি—লোকটি যে কলিকাতাতেই আছে, তাহার অকাট্য প্রমাণ আমার হাতের কাগজপত্র, তথাপি তাহার হাতে হাতকড়া দিতে পারিতেছি না। এদিকে পুলিশ-কমিশনার সাহেবের সন্দেহে আমি ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে ধরিতেছি না, বা সহজ কথায় পলায়ন করিবার সুযোগ দিতেছি। সেই সন্দেহের পরিণাম পাছে আমার বেকারত্ব ঘোষণা করে—এরূপ একটা ভয়ও আছে।

কতক্ষণ কাটিয়াছে এই ভাবে, বলিতে পারি না ; হঠাৎ ভৃত্যপ্রবরের আহ্বানে খেয়াল হইল ; শুনিলাম, কে যেন বলিতেছে,—"এই ঘরে তোমার বাবু থাকেন ? ওঃ আচ্ছা, তুমি যাও।"

ইহার পরই যিনি আমার ঘরে ঢুকিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলাম ; ওই মুখ যে আমার চেনা, কিন্তু কবে কোথায় দেখিয়াছি, কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না। ভুল হইবার কথা নয় :—গোয়েন্দাবিভাগে চাকুরী করিতেছি, আমাদের পক্ষে একখানা মুখ একবার দেখিলে ভুলিয়া যাওয়ার অর্থ বেকার হইবার পূর্ব্বলক্ষণ।

—"নমস্কার কমরেড ইন্‌স্পেক্টর, অমন করে তাকিয়ে আছেন কেন ? চিনতে পারছেন না—না ?"—অসীম নির্লিপ্ততায় প্রশ্ন করেন আমার অভ্যাগতা।

—"আজ্ঞে না ?"—প্রতিনমস্কার করিয়া আমি বলি। কানের মধ্যে বাজিতে থাকে 'কমরেড ইন্‌স্পেক্টর'-এর সুর।

একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া তিনি বলিয়া যান—"আমি কিন্তু শুনেছিলাম যে, পাঁচ বছর ধরে আপনি ক্রমাগতঃ আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন।"

চমকিত হই কিছুটা, কিন্তু বিমূঢ়ভাবেই মুখ হইতে বাহির হয় : "আপনাকেই আমি জানি না তো খুঁজে বেড়াব কি ? আপনি ভুল শুনেছেন।"

এইবার তাঁহার চোখেমুখে চাপাহাসি ফুটিয়া উঠিল ; ঈষৎ ব্যঙ্গের স্বরে বলিলেন—"আজ্ঞে না, কমরেড ইন্‌স্পেক্টর, ভুল খবর নিয়ে আমাদের ব্যবসা নয়, ওটা আপনাদেরই একচেটে। কিন্তু—ওই বুদ্ধি নিয়ে গোয়েন্দাবিভাগের কর্ত্তা সেজেছেন ?

আমার বিস্ময় ক্রমেই বাড়িতে থাকে ; একটু রাগত ভাবেই বলি—'দেখুন, যাদের চাকুরী করছি তারাই বুঝবে আমার বুদ্ধি আছে কি নেই। আমার সমালোচনা ছাড়া আর কিছু বলবার থাকে তো বলুন।"

—"বলবার কিছু না থাকলে কি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি, ভাবেন ? নিশ্চিন্ত থাকুন যে, আমার কাজ শেষ হবার পর এক মিনিটও আপনার বাড়ীতে আমি থাকব না।"—এই বলিয়া ব্যাগ হইতে কয়েক তা' কাগজ বাহির করিয়া কহিলেন, "দেখুন, আমি ভাবছি একটা গল্প লিখব ; প্লটও প্রায় গুছিয়ে এনেছি ; কিন্তু শেষ করতে পারছি না। আপনি তো বছর পাঁচেক আগেও সাহিত্যচর্চ্চা করেছেন, দয়া করে যদি একটু সাহায্য করেন আমায়।"—কথা শেষ করিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলিয়া ধরিলেন আমার মুখের উপর।

এতক্ষণে বুঝিলাম মাথায় একটু গোলমাল আছে ; না হইলে গোয়েন্দা-কর্ম্মচারীকে দিয়া প্লট ঠিক করাইতে আসে। মনে একটু করুণার উদ্রেক হইল, এতক্ষণ রূঢ় ব্যবহার করিয়াছি ভাবিয়া খারাপও লাগিল। শান্তভাবেই বলিলাম, —"আমার সম্বন্ধে অতো খোঁজ যখন রাখেন, তখন এ-ও তো জানেন নিশ্চয়ই যে সাহিত্যচর্চ্চা আমি ছেড়ে দিয়েছি।

—"তা' জানি। কিন্তু তাতে কি আসে যায় ; আপনারা তো কতো রকম ঘটনার সংস্পর্শে আসেন এবং তাতে করে' অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন আমাদের চাইতে বেশী ; কাজেই দয়া করে শুনুন—আমি পড়ছি।"—তাঁহার চোখের দৃষ্টি ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠিতে থাকে।

আচ্ছা বিপদে পড়িয়াছি ! রাতদুপুরে এখন এক পাগলের প্রলাপ শুনি ! কিন্তু না শুনিলে হয় তো নড়বেই না ; অগত্যা বলিলাম—"আচ্ছা পড়ুন।" তিনি আরম্ভ করিলেন—

"পূর্ব্ববঙ্গের বন্যা বিধ্বস্ত এক গ্রাম। বন্যাপীড়িতদের সাহায্য করিবার জন্য সরকারী বে-সরকারী চেষ্টার অন্ত নাই। কংগ্রেস-স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর নেতা সলিল। ঘটনাচক্রে সেখানে তাহার সহিত কানাই নামধারী জনৈক অনাথ বালকের সাক্ষাৎ এবং সলিলের সঙ্গে তাহার কলিকাতায় আগমন। ক্রমে কানাইর স্কুল প্রবেশ এবং অদূর ভবিষ্যতে বি-এ ডিগ্রী লাভের পর ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশলাভ।"

"এই সময় স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ উঠিল। সলিল কর্তৃক এক গুপ্ত-বিপ্লবীদল গঠন। কানাইরও তাহাতে যোগদান, কিন্তু অত্যাল্পকালের মধ্যেই গতিবিধির সন্দেহজনক পরিণতি লাভ। সলিলের সহকারী কর্তৃক অনুসন্ধান এবং কানাইর প্রকৃত পরিচয়।"

"কানাই গোয়েন্দাবিভাগে যোগ দিয়াছে ! জরুরী সভা ডাকিয়া আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সকলকে সচেতন ও সতর্ক

করিয়া দল ভাঙ্গিয়া দেওয়া ; এবং নেতার শেষ নির্দ্দেশ—বিশ্বাসঘাতক যেন সমুচিত দণ্ড পায়।"

"তারপরের ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত ; সলিলের সহকারী ব্যতীত অপর সকলেই আন্দামানবাসী। কানাই আজ গোয়েন্দাবিভাগের অন্যতম কর্ত্তা—আরও পদোন্নতির আশায় সলিলের সহকারীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় এক সন্ধ্যায় কানাইর গৃহে তাহার অপ্রত্যাশিত প্রবেশ—

এইখানে তিনি থামিলেন ; কহিলেন—"এর পর কি ভাবে শেষ করলে প্লটটা Simply marvellous হবে, তাই আপনাকে দেখিয়ে দিতে হবে।"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের সুর—আমার কান এড়াইল না ; কিন্তু এমন যে দুর্দ্দান্ত গোয়েন্দা আমি, আমিও ইহার পর মাথা তুলিয়া তাঁহার দিকে তাকাইতে পারিলাম না। বুঝিতে পারিলাম, আমার জীবনের ইতিহাস জানিতে পারিয়া প্লটের ছায়ায় তাহাই শুনাইয়া তিনি আমাকে উপহাস করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু কি দুঃসাহস। আমার বাড়ী আসিয়া আমাকেই অপমান করিয়া যান। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল পরম স্নেহাস্পদ সলিলদার কথা—যার স্নেহদৃষ্টিই আমার প্রথম জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। হয়তো একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম, চমক ভাঙ্গিল তীব্র কণ্ঠস্বরে—

"রাত্রি হয়ে যাচ্ছে কমরেড ইনস্পেক্টর, একটু তাড়াতাড়ি করুন।"

সহ্যের সীমা আর ছিল না—তাই কটু কণ্ঠেই বলিয়া উঠিলাম, "বাড়ী বয়ে এসে আপমান করতে যখন বাঁধে নি, তখন প্লটও আপনিই শেষ করতে পারবেন ; তবে একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই—সে যদি সত্যই কোনদিন আমার বাড়ীতে আসে, তবে তাকে আর ফিরে যেতে হবে না।"

"সেটা জানা কথা ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আপনি কি তাকে চেনেন যে ওরকম গর্ব্ব করছেন ?"

"চিনি না ! দু'মাস এক সঙ্গে কাটিয়ে এলাম আর আমি তাকে চিনি না ?"—সমস্ত শরীরে জ্বালা ধরিয়া যায় আমার।

এইবার তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "না কমরেড ইনস্পেক্টর, তুমি তাকে চেনো না। সত্যিই যদি চিনতে তবে এতক্ষণ হাতকড়া না পড়িয়ে তুমি তার সঙ্গে বসে গল্প করছ ?"

"গল্প করছি?" রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করি আমি।

"হ্যাঁ কমরেড, তুমি যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ—আমিই সেই সলিল মিত্রের সহকারী।"

উত্তপ্তভাবে বলিয়া ফেলিলাম, "পাগলামী করবার আর জায়গা পেলে না ? সলিল মিত্রের সহকারী তো অম্লান বসু ?"

"সেই জন্যেই আজও দ্বীপান্তর বাস ঘটে নি বন্ধু ! কমরেড প্রেসিডেণ্ট তোমায় যতই বিশ্বাস করুন—আমি প্রথম হতেই তোমার সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করতাম। তাই মেয়ে হয়েও ছেলের পরিচয়ে দলে যোগ দিই ; আবার যখন তোমার বিশ্বাসঘাতকতায় দল ভেঙ্গে গেল, তখন ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে গেলাম।"—উদ্দীপ্ত কণ্ঠ, কঠিন তাঁহার বলার ভঙ্গী !

এবার সত্যই অবাক হই—মনে একটু ভয়ও হয় বৈ কি, তবু যতদূর সম্ভব নিরুদ্বিগ্ন ভাব দেখাইতে চেষ্টা করিলাম, বলিলাম—"আচ্ছা তাই না হয় হলো ; কিন্তু এখানে কি মনে করে ? ধরা দিতে ?"

"তোমার ঋণ শোধ করতে ! দলত্যাগের শাস্তি তোমার পাওনা রয়েছে। কমরেড প্রেসিডেণ্টের শেষ আদেশ ছিল তোমার ঋণ যাতে শোধ করে দেওয়া হয়,—তাই দিতে এসেছি। তোমার প্রাপ্য তুমি গ্রহণ কর—আমার প্লটও শেষ হোক। ক্ষিপ্রগতিতে তিনি রিভলভার বাহির করিয়া পরপর তিনবার গুলি ছুড়িলেন। কোথায় লাগিল ঠিক বুঝিতে পারিলাম না ; শুধু মনে হইল মাথায় যেন একটা প্রবল ঝাকুনি অনুভব করিলাম। চীৎকার করিয়া উঠিলাম···

আবার ঝাকুনি···

চোখ খুলিয়া দেখি সম্মুখে স্বয়ং শ্রীমতী ; বলিলেন, "কখন থেকে ডাকছি একটু হুঁস নেই। বসে বসে কি ঘুমটাই দিচ্ছ, খেতে-টেতে হবে না নাকি ?"

নিঃশব্দ হাস্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া গৃহিণীর পশ্চাদনুসরণ করিলাম ; কিন্তু কানে তখনও বাজিতেছে—"কমরেড ইন্‌স্পেক্টর"।

মনসামঙ্গল

শ্রীকালিদাস রায়

বাংলা সর্পসঙ্কুল দেশ। বৎসর বৎসর বহু লোক সর্পের দংশনে এ-দেশে প্রাণ-ত্যাগ করে। এই অমঙ্গল বারণের জন্য বাঙ্গালী সর্পের দেবতা মনসার পূজা করিয়া থাকে। বাঙ্গালী কেবল মনসা পূজা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মনসার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের জন্য ছড়া গান পাঁচালী বহুদিন হইতেই রচনা করিয়া আসিয়াছে।*

মনসার দাক্ষিণ্য অপেক্ষা মনসার প্রতিহিংসা-সাধনের ও অনিষ্ট করিবার শক্তি যে কত তাহাই বুঝাইবার জন্য মনসা-মঙ্গল রচিত। এ বিষয়ে মনসামঙ্গল অন্নদামঙ্গলের বিপরীত। পদ্মাপুরাণে পদ্মার মাহাত্ম্য ততটা পরিস্ফুট হয় নাই যতটা পরিস্ফুট হইয়াছে চাঁদ সদাগরের মাহাত্ম্য। চাঁদ সদাগর বঙ্গ সাহিত্যের একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এক গোরক্ষনাথ ছাড়া এমন সংযম-দৃঢ় তেজোদীপ্ত চরিত্র বঙ্গ সাহিত্যে আর নাই। সত্যের জন্য, মনুষ্যত্বের জন্য, মানবধর্ম্মের জন্য, পৌরুষ মর্য্যাদার জন্য চাঁদ সর্ব্বস্ব পণ করিয়া যে আত্মনিগ্রহ সহ্য করিয়াছিল, তাহার আদর্শ যদি বঙ্গ সাহিত্যে প্রচুর থাকিত অথবা বাঙ্গালী জাতির কল্পনাতেও থাকিত, তাহা হইলে বাংলার এই দুর্দ্দশা হইত না। কবি শেষ পর্য্যন্ত চাঁদের পরাভব দেখাইয়াছেন। তাহা না দেখাইলে দেবীর দৈবী-শক্তির পরাজয় হয়, আত্মশক্তির উপরে নিয়তি বা দৈবীশক্তির শ্রেষ্ঠতা দেখানো হয় না। এই পরাভবেও চাঁদের চরিত্র ম্লান হয় নাই। অর্দ্ধ রাহুগ্রস্ত হইলেও চাঁদই প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের আকাশে চিরসমুজ্জ্বল হইয়া আছে।

নিম্নলিখিত কবিতায় চাঁদ সদাগরের চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইয়াছে।

দেবতা-মন্দিরে ভরা, সিন্দুর-চন্দনে গড়া, কাব্য-তীর্থে উচ্চে তুলি শির,
তুমি দেবতারো বড়, আমার এ অর্ঘ্য ধরো, শৈব সাধু চন্দ্রধর বীর!
এ বঙ্গের সমতলে, তৃণ-লতা-গুল্মদলে, বজ্রজয়ী তুমি বনস্পতি,
জ্ঞানায়ুধ শাপজিৎ, হে অমর পরীক্ষিত, শালপ্রাংশু মহাভুজ রথী।
সাঁওালী পর্ব্বত' পরে, হিন্তালের যষ্টি করে, চির-দীপ্ত তোমার পৌরুষ,
তোমা ঘেরি চারিপাশে, বাঁচে মরে কাঁদে হাসে, কোটিকোটি ভীরু অমানুষ।
মানুষে করিয়া খর্ব্ব, যাহারা করিল গর্ব্ব, তাদের ক্লীবতা দলি পায়,
অবিচল তুমি শৈব, কৃতাঞ্জলি হ'য়ে দৈব, মার্জ্জনা তোমার পদে চায়।

*মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে হইলেই উপাখ্যানের সৃষ্টি করিতে হয়। একটি উপাখ্যানেরও সৃষ্টি হইল – এই উপাখ্যানের মূলে কিছু সত্যও থাকিতে পারে। কবিকঙ্কণ চণ্ডী ও অন্নদামঙ্গলে চান্দ সদাগরের উল্লেখ আছে। এই উপাখ্যান লইয়া প্রথম গ্রন্থ লিখিলেন কানা হরিদত্ত। ইঁহাকে মুসলমান অধিকারের আগের লোক বলিয়া মনে করা হয়। তারপর হোসেন শাহের সময়ে বরিশালের বিজয়গুপ্ত কবিকর্ণপুর পদ্মা পুরাণ লেখেন। পদ্মা মনসার আর একটি নাম। গুপ্তকবির গ্রন্থই বঙ্গদেশে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল— গ্রামে গ্রামে গীত হইত। মনসামঙ্গলের গানকে মনসার ভাসানও বলে। ডাঃ দীনেশ চন্দ্র ৬২ জন ভাসান গান-রচয়িতার নামোল্লেখ করিয়াছেন। আরও কত যে ছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী যুগে ক্ষেমানন্দ কেতকাদাসের মনসা মঙ্গল সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মনসার আর একটি নাম কেতকা। অতএব ক্ষেমানন্দের উপাধি কেতকাদাস। ইঁহার কাব্যে বেহুলা চরিত্র অত্যুজ্জ্বল হইয়া পরিস্ফুট হইয়াছে। চাঁদ সদাগরের চরিত্র-মাহাত্ম্য ইনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই—সে জন্য ঐ চরিত্রের গৌরব রক্ষা করিতেও পারেন নাই। চান্দের পরাজয়ে ইনি বিজয়ানন্দ উপভোগ করিয়াছেন।

বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল একখানি উল্লেখযোগ্য কাব্য। দ্বিজবংশীবদনের মনসামঙ্গলে ভাষায় বৈশিষ্ট্য আছে। ইনি সংস্কৃতশব্দবহুল সমৃদ্ধ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ১৮শ শতাব্দীর মনসামঙ্গল-রচয়িতৃগণের মধ্যে যষ্ঠীবর ও গঙ্গাধর সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মনসার ভাসানের প্রভাব এমনি প্রবল হইয়াছিল যে বাঙ্গালীরা অন্য সকল দেবতাকে ভুলিয়া গিয়াছিল। মঙ্গল কাব্যের উপাখ্যানগুলির মধ্যে মনসা-মঙ্গলের কাহিনীই সবচেয়ে পুরাতন। সর্পপূজার সহিত এই কাহিনীর যোগ আছে। সর্পপূজা দ্রাবিড় জাতি হইতে আর্য্য সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সর্পভয়ে প্রপন্ন বঙ্গদেশেই এই পূজার প্রাধান্য। সর্পদেবতাকে রুদ্রাণী মহাশক্তির একটি রূপ বলিয়া মনে করা হইয়াছে। প্রত্যেক ব্রত পার্ব্বণের সহিত কোন না কোন কাহিনী জড়িত করা হইয়া থাকে। সর্পরূপা মহাশক্তির পূজা পার্ব্বণের সহিত বেহুলা চান্দ সদাগরের কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে।

আমাদের দেশের ধর্ম্মসভ্যতা দ্রাবিড় ও আর্য্যসভ্যতার মিশ্রণে উৎপন্ন। এই মিশ্রণটা বিশেষভাবে ঘটিয়াছিল বৌদ্ধযুগে। বৌদ্ধদের ধর্ম্ম-সভ্যতায় প্রথম প্রথম ইন্দ্র(শক্র) ছাড়া অন্য দেবদেবীর স্থান ছিল না। ক্রমে বৌদ্ধ সভ্যতা ও হিন্দু সভ্যতার মধ্যে যখন সমন্বয় ঘটিতে থাকিল—তখন আর্য্য দেবদেবী বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্থান পাইতে লাগিলেন। অবশ্য ইঁহাদের স্থান হইল বুদ্ধদেবের শাসনাধীনে। বৌদ্ধ শাসনে এই দেবদেবীগণের আদিম আর্য্যরূপ আর থাকিল না। নানা দেবদেবীর মিশ্রণে নূতন নূতন দেবদেবীর আবির্ভাব হইল। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘের রূপের সঙ্গে আর্য্য দেবদেবীর রূপের মিলনে নবনব দেবতার সৃষ্টি হইল। এই সকল দেবতার পূজা এখন আর বড় প্রচলিত নাই, কিন্তু তাহাদের মূর্ত্তি আর্য্যাবর্ত্তের নানা স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেবল আর্য্যদেবদেবীর নয়, বহু অনার্য্য ও দ্রাবিড় দেবদেবীর সহিত বৌদ্ধ দেবদেবীর রূপের মিশ্রণও ঘটিয়াছিল—বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানে।

মহাযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানই উত্তর ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে এইরূপ দেবদেবীর পরিকল্পনা করিয়া তাঁহাদের পূজা প্রচার করিয়াছিল। দ্রাবিড় সভ্যতার সর্প দেবতা ও আর্য্য সভ্যতার সরস্বতী—'এই দুই দেবীর মিশ্রণে বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ 'চতুর্ভুজা জটামুকুটিনী, শুক্লোত্তরীয়া, শুক্লসর্প-বিভূষিতা, চন্দ্রাংশুমালিনী, বীণাবাদয়ন্তী,' জাঙ্গুলী দেবীর পরিকল্পনা করিয়াছিল।

এই জাঙ্গুলী দেবীই "নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরা ফণিময়ী, হংসারূঢ়া, শশধর-বদনা, সাষ্টনাগা, কামরূপা-যোগিনী শঙ্কর-পুত্রিকা" মনসাদেবীতে পরিণত হইয়াছেন।

একটি ধ্যানমন্ত্রে স্পষ্টই আছে—"বন্দে শঙ্কর-পুত্রিকাং বিষহরীং পদ্মোদ্ভবাং জাঙ্গুলীং।" ইহাতেই প্রমাণিত হয় যিনি জাঙ্গুলী, তিনিই বিষহরী, তিনিই পদ্মা।

বঙ্গদেশে সম্পূজিতা এই মনসা দেবীর ক্রমোদ্বর্ত্তনের ইতিবৃত্ত শ্রীমান আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—তাঁহার মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে সবিস্তারে বিবৃত করিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক তাহা পড়িয়া দেখিতে পারেন

তব শিরে যমদণ্ড, ভেঙ্গে হলো সাত-খণ্ড, পণ তব প্রাণেরো অধিক,
সাত পুত্র-শব' পরি, শিব শূলী শম্ভু স্মরি' বামাচারী তুমি কাপালিক।
সনকায় আর্ত্তনাদে, চম্পকনগর কাঁদে, ডুবে যায় সপ্ত-মধুকর,
কৌপীন করিয়া সার, তোমার পুরুষকার, পথে পথে ফিরে দিগম্বর।
অশ্রুবিন্দু নাই চোখে, দুর্বিষহ মহাশোকে, নেত্র তব উগারে অনল,
শুধু তব জগদীশ, কণ্ঠে ধরেছেন বিষ, সর্ব্ব অঙ্গে তোমার গরল।
বিষে তনু নীলরুচি, আত্মা তব শুভ্র শুচি, নীলাম্বরে পূর্ণচন্দ্রোপম।
সহস্র ফণার মাঝে, তোমার পৌরুষ রাজে, মহাবীর্য্য গরুড়ের সম!
হরিয়া নশ্বর ধন, তোমা নিঃস্ব আকিঞ্চন, কে করিবে? এত স্পর্দ্ধা কার?
পুরুষার্থ-শিরোমণি, শাশ্বত ধনে যে ধনী, বিশ্বে সেই নমস্য সবার।
তোমারে করিতে বন্দী, ব্যর্থ দেবতার ফন্দী, মানুষের সনে সন্ধি যাচে,
সর্ব্ব দৈব দণ্ড-ভয়, যে জন করেছে জয়, দণ্ড-দাতা প্রার্থী তারি কাছে।
সারা বিশ্ব অসহায়, নিয়তির জয় গায়। দাসীত্বে নোওয়াতে তার শির,
একাই করিলে রণ, স্তম্ভিত দেবতাগণ, কম্পমান পাষাণ-মন্দির।
যুগ যুগ ধরি যত, মূক জীব অবিরত, দৈব দণ্ড আসিয়াছে সহি,
তোমার মাঝারে সবি, পুঞ্জীভূত রূপ লভি, রুদ্রকণ্ঠে হলো কি বিদ্রোহী?
সহস্র বৎসর ধরি, ভয়ে কাঁপে থরহরি, নরনারী যূপবদ্ধ ছাগ,
বজ্রমন্দ্রে তার মাঝে, শুনাইলে দেবরাজে, "মানুষেরো চাই যজ্ঞভাগ।"
শিখাইলে এই সত্য, তুচ্ছ নয় মনুষ্যত্ব, দেব নয়, মানুষই অমর,
মানুষই দেবতা গড়ে, তাহারই কৃপার 'পরে, করে দেব-মহিমা নির্ভর।
হে ব্রহ্মজ্ঞ মহাযোগী, হইতে চাহনি ভোগী, সত্য-ব্রহ্মে করি সঙ্কোচন
সুখদুঃখ-দ্বন্দ্বাতীত, পান করি চিদমৃত, জিনেছিলে মৃত্যুর শাসন।
উচ্ছ্রিত-কনকঘট, সহস্র দেউল মঠ, কালদণ্ডে হ'য়ে গেছে গুঁড়া,
গরল সিন্ধুর মাঝে তোমার গৌরব রাজে চিরদিন মৈনাকের চূড়া। (বৈকালী)

চাঁদ ছিলেন শিবের উপাসক অর্থাৎ ব্রহ্মবাদী। তৎকালীন সমাজের লোকেরা পরংব্রহ্মকে ছাড়িয়া মূর্ত্তিমতী প্রকৃতিকে পূজা করিত। যুগধর্ম্ম কেমন করিয়া যুগযুগান্তরের ধর্ম্মকে কবলিত করে, ভয়ের ধর্ম্ম কেমন করিয়া জ্ঞানের ধর্ম্মকে অভিভূত করে, চাঁদের পরাভবে তাহাই দেখিতে পাই। সেকালের জনসাধারণের মুখপাত্ররূপে কবি দেখাইয়াছেন—নিষ্কাম ধর্ম্মের কোন মূল্য নাই, সকাম উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা। চাঁদের পরাভবে বাঙ্গালী জাতির মনুষ্যত্বেরই যে পরাভব হইয়া গেল, সেকালের কবিরা তাহা ভাবিয়া দেখিতেন না।

সতী ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তনের জন্য বেহুলা চরিত্র অনেকটা সাবিত্রীর আদর্শে অঙ্কিত হইয়াছে। স্বামীর জীবনের জন্য শোকজীর্ণা মৃতকল্পা বেহুলা যে দেবসভায় নৃত্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন—এইটুকুর মধ্যে বেশ বৈচিত্র্য আছে। স্বর্গে ত আর বেদনা নাই—সেটা চোখের জলের ঠাঁই নয়। সেখানে চোখের জলে কি ফল হইবে? স্বর্গ আনন্দধাম—সেখানে আনন্দ দিয়াই পুরস্কার পাইতে হইবে। শোকাহতা বেহুলার দেবসভায় এই নৃত্য স্বামীর জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসর্গ। এত বড় পরীক্ষা সাহিত্যে কোন সতীর জীবনে হয় নাই।

এক হিসাবে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব হইতে এই সাহিত্যের সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। মনসা দেবী মহাশক্তিরই একটি রূপ। তাঁহার উপাসনা শক্তিরই উপাসনার নামান্তর। মহাশক্তি মহামায়াকে শিবেরই অর্দ্ধাঙ্গিনী মনে করা হইলেও শাক্ত ও শৈবদের মধ্যে বিবাদের অন্ত ছিল না। মনসারূপা মহাশক্তির পূজা দেশময় প্রচারের জন্য ও তাঁহার মহিমা ঘোষণার জন্য এই সাহিত্য রচিত হইয়াছে। শক্তিপূজা প্রচারের জন্য মনসা দেবীর নির্ব্বাচনে সার্থকতা আছে। সর্পভয়-ভীত বাঙ্গালী চিত্তের ভয়জাত ভক্তি আকর্ষণের পক্ষে শক্তির মনসারূপই প্রশস্ত মনে করা হইয়াছে। মনসা পূজা প্রবর্ত্তনই প্রাচীন কবিদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—তাহার উপসৃষ্টি-স্বরূপ (By-product) একটি সাহিত্যেরও সৃষ্টি হইয়াছে। তারপর ইহার সঙ্গে একটি চমৎকার লৌকিক উপাখ্যান পাইয়া পরবর্ত্তী কবিরা তাহা অবলম্বনে কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। আমাদের দেশের কবিরা নূতন আখ্যানবস্তু আবিষ্কার করিতে পারিতেন না—একটা কোন উপাখ্যান পাইলেই তাঁহারা দলে দলে তাহাই অবলম্বন করিয়া কবিশক্তির প্রয়োগ করিতেন।

শক্তিপূজা ও দেবতাবাদের সহিত অদৃষ্ট-বাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যাহারা নিরীশ্বর, তাহারা নিজের পৌরুষ শক্তির উপর আর কোন দৈবী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না। প্রাকৃতিক শক্তিকে অবশ্য তাহাদেরও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া স্তব বা উপাসনার দ্বারা প্রাকৃতিক শক্তিকে প্রসন্ন করা যায় একথা তাহারা মানে না। যাহারা ব্রহ্মবাদী, যাহাদের আস্তিকতার একটা দার্শনিক ভিত্তি আছে—তাহারা ভাগবতী শক্তিকে স্বীকার করে, কিন্তু সে-শক্তির সহিত পৌরুষের কোন বিরোধ আছে তাহা মনে করে না। দেবতার শক্তি বা দৈবীশক্তিই দৈব বা নিয়তি। এই নিয়তিকে অস্বীকার করিয়া যে-শক্তি আপনার সাধনার উপর নির্ভর করে—তাহাই পুরুষকার। মনসামঙ্গলে প্রকারান্তরে দৈবী-শক্তির প্রাধান্য দেখাইতে গিয়া কবি নিয়তিরই প্রাধান্য দেখাইয়াছেন। মনসাদেবী এই নিয়তির প্রতীক। আর চাঁদ সদাগর পুরুষকারের প্রতীক। মনসামঙ্গলে এই নিয়তির সহিত পুরুষকারের সংগ্রাম দেখানো হইয়াছে। মনসার কাছে চাঁদের পরাজয়ই নিয়তির কাছে পুরুষকারের পরাজয়। চাঁদের দশাবিপর্য্যয়, সহস্র সাবধানতা সত্ত্বেও সাঁতালী পাহাড়ের লৌহদুর্গের ছিদ্র দিয়া সর্পপ্রবেশ এবং লখীন্দরের মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনার দ্বারা নিয়তির লীলাই দেখানো হইয়াছে। সর্পদংশনকে রীতিমত নিয়তির দণ্ডই মনে করা হয়। কথায় বলে 'সাপের লেখা', কপালে লেখা থাকিলে সর্পদংশন হয়। সহস্র সতর্কতা সত্ত্বেও সাপের কবল বা ছোবল হইতে রক্ষার উপায় নাই। কাজেই ইহা নিয়তি ছাড়া আর কি?

মনসামঙ্গলে পুরুষকারের পরাজয় দেখিয়া দৈবীশক্তির

ভক্তেরা আনন্দই পাইতেন। অদৃষ্টবাদী দেশে তাই এই সাহিত্যের আদর হইয়াছিল অসাধারণ।

কেবল প্রাচীনযুগের ঘরসংসারের পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া এবং সতীত্বের অলৌকিক আদর্শ দেখানো হইয়াছে বলিয়া ইহা সৎসাহিত্যের পদবীতে আরোহণ করিতে পারেনা। সনকা বিনাইয়া বিনাইয়া অনেক কথা কহিয়াছেন বলিয়াও ইহা সৎ সাহিত্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। একমাত্র চাঁদ সদাগরের চরিত্রই ইহার প্রধান সম্বল। মনসামঙ্গলের কবিগণ চাঁদ সদাগরের চরিত্রাদর্শের মর্য্যাদা সম্পূর্ণ না বুঝিলেও ইহাই তাঁহাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে।

মনসামঙ্গলের শেষে চাঁদের সন্তানগণের পুনর্জীবন লাভ এবং চাঁদের লক্ষ্মীশ্রীর পুনরুদ্ধারের কথা আছে। তাহা সত্ত্বেও ইহা ট্র্যাজেডি। লখীন্দরের মৃত্যুতেই লৌকিক দিক হইতে কাব্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যে ইহাই একমাত্র ট্র্যাজেডি এবং গ্রীক আদর্শের ট্র্যাজেডি। এই হিসাবে মনসামঙ্গলের একটা উচ্চ ধরণের স্বাতন্ত্র্য আছে। যে বাঙ্গালী বৃন্দাবনলীলার মাধুর্য্য উপভোগে অভ্যস্ত, বিলাসকলাসু কুতূহল চরিতার্থতার জন্য উৎকর্ণ, সেই বাঙ্গালী যে এই শোকঘন বীভৎস ও ভীষণ আখ্যানবস্তু উপভোগ করিত কি করিয়া, ইহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহাতেই মনে হয়, বাঙ্গালী চিত্ত পরবর্ত্তী যুগের মেঘনাদ বধ কাব্যের রস উপভোগের পক্ষে অনুপযুক্ত ছিল না।

সংস্কৃত সাহিত্যের মত বাংলা সাহিত্যেও মিলনান্ত পর্য্যবসান একটি বৈশিষ্ট্য। গান শুনিয়া শ্রোতা বেদনা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে গৃহে ফিরিবে, পাঠান্তে গ্রন্থে ডোর দিয়া পাঠক দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে ইহা প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের কবিদের অভিপ্রেত ছিল না। রচনার মধ্যে বিচ্ছেদ, বিরহ, মৃত্যু, ইত্যাদির অবতারণা করিয়া কবিরা পাঠকের চিত্তে বেদনানুভূতির সঞ্চার করিতেন—তাহা রস সৃষ্টির অঙ্গীভূত। দুর্ব্বিষহ বেদনা রসসৃষ্টির অন্তরায়। কবিরা বেদনার প্রখরতা ও দুর্ব্বিসহতা হরণ করিতেন পুনর্মিলন বা পুনর্জীবনের আশ্বাস দিয়া। এই আশ্বাস মনে পূর্ব্ব হইতে বিরাজ করিত বলিয়াই পাঠক অতিতীব্র দুর্ব্বিষহ বেদনার মধ্যেও সাহিত্যের রস সম্ভোগ করিতে পারিত।

পদাবলী সাহিত্যে শ্রীরাধাকে ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রাই শেষ কথা। রাধার বেদনায় ব্যথাতুর শ্রোতা ও পাঠককে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এবং এইরূপ সান্ত্বনার দ্বারা সাহিত্যের পর্য্যবসান প্রথার অনুবর্ত্তনের জন্যই ভাবসম্মিলন ঘটানো হইয়াছে।

ঠিক ঐ প্রথার অনুবর্ত্তনের দ্বারা শতশত ব্যথিত চিত্তকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য লখীন্দর ও তাহার ভ্রাতাদিগকে পুনর্জীবিত করিয়া বেহুলার স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন। প্রকৃত-পক্ষে বেহুলার পতির শবদেহ লইয়া কলার ভেলায় চড়িয়া অনন্তের পথে যাত্রাতেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি। অনিত্যের মায়ায় মুগ্ধ ব্যথিত চিত্তগুলিকে প্রবোধ দেওয়ার জন্যই তাহার প্রত্যাবর্ত্তন।

আর একটা আশ্বাস মঙ্গল কাব্যের কাহিনীর পর্য্যবসানে জড়িত আছে। আমরা যাহাদের বেদনায় এত ব্যথিত—তাহারাত আমাদের মত মানুষ নয়। তাহারা দেবতার কার্য্য সিদ্ধির জন্য স্বর্গলোক হইতে অবতীর্ণ অথবা শাপভ্রষ্ট। দেবতার কার্য্যসিদ্ধি হওয়ার পর পৃথিবীতে তাহাদের থাকিবার প্রয়োজন নাই। অতএব তাহাদের জন্য ব্যথায় বিগলিত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। শাপভ্রষ্ট নরনারীর মুক্তিলাভে বেদনার কারণ নাই, বরং আনন্দলাভ করিবারই কথা।

মনসার পাঁচালীতে কবিরা বেহুলাকে লখীন্দরের সঙ্গে ফিরাইয়া আনিয়াছেন বটে কিন্তু আর ঘরসংসার করিতে দেন নাই। বেহুলা সনকাকে দেখা দিয়াই স্বামীর সঙ্গে স্বর্গে চলিয়া গেলেন। নারায়ণদেব এই প্রথার অনুবর্ত্তন করিয়াছেন, আবার দেবকার্য্য-সিদ্ধির আশ্বাসও একটু স্পষ্ট-ভাবেই দিয়াছেন। তাহা ছাড়া পরাতত্ত্বের ইঙ্গিতও আছে। বেহুলা যেন পুত্রহারা কিসা-গোতমীর মত ব্যথাতুরা জননীকে কেবল একটি কথা বলিতে আসিয়াছিলেন—"মা, মিথ্যা মায়ায় বদ্ধ হইয়া কেন শোক করিতেছ? কাহাকেও চিরদিনের জন্য ধরিয়া রাখিবে এ দুরাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর। আমাকে জন্মদান করিয়া তুমি দৈবকার্য্যে সহায়তা করিলে—এই সান্ত্বনা লাভ করিয়া জীবনকে ধন্য মনে কর।"

মিলনান্ত পর্য্যবসান যেমন মঙ্গল কাব্যের কবি-প্রথা, যে দেবতার মহিমাকীর্ত্তনের জন্য কাব্য রচিত সেই দেবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীকে তেমনি দেবতার চরণতলে শেষ পর্য্যন্ত নতশীর্ষ করাইয়া তাহার দর্পহরণও তেমনি একটি কবিপ্রথা। কবিরা যে ভাবে চাঁদ সদাগরের চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন—তাহাতে তাহার "জোড়হাতে মনসার করয়ে স্তবন" স্বাভাবিক পরিণতি হইতে পারে না। কেবল কবিপ্রথা-রক্ষার জন্যই যেন কবিরা এই অসঙ্গত ব্যাপারের যোজনা করিয়াছেন।

কবিরা শেষ পর্য্যন্ত চাঁদ সদাগরের দ্বারা মনসার পূজা করাইয়া ছাড়িয়াছেন। এজন্য অনেকে কবিদের অপরাধী করিয়াছেন এবং কাব্যের দিক হইতে তাঁহারা সাহিত্যিক মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন বলিয়া দোষারোপও করিয়াছেন। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে চাঁদ সদাগরের মত সত্যনিষ্ঠ বীরত্ব-মণ্ডিত মনুষ্যত্বের আদর্শ আর নাই। এই আদর্শের ক্ষুণ্ণতা দেখিয়া পাঠক মাত্রেই ক্ষুণ্ণ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু আর একদিক দিয়া দেখিলে বোধ হয় ইহাতে সাহিত্যিক মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। চাঁদ চরিত্র আদর্শ স্থানীয়—

কিন্তু অস্বাভাবিক। শৌর্য্যেরও একটা সীমা আছে। মনসার দেবত্বের কাছে চান্দের মনুষ্যত্বের শোচনীয় পরাভবের দিক হইতে দেখিলে চাঁদ চরিত্রের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিতে হয়। কিন্তু আর একটী দিক আছে—তাহা কাব্যেরই উপজীব্য। চাঁদ কেবল মনসার সঙ্গেই দ্বন্দ্ব করে নাই—চাঁদের জীবনে কেবল স্বধর্ম্মের সহিত পরধর্ম্মেরই সংঘর্ষ হয় নাই, স্নেহের সঙ্গে স্বকীয় ধর্ম্মাদর্শেরও দারুণ সংগ্রাম হইয়াছে। এই দ্বন্দ্বে যদি শেষ পর্য্যন্ত স্নেহেরই জয় হইয়া থাকে তবে কাব্যের দিক হইতে দোষ দেওয়া যায় না। চাঁদের যে পুরুষকার নিয়তির সঙ্গে সমগ্র জীবন ধরিয়া নিদারুণ সংগ্রাম করিয়া দুর্ব্বিষহ নিগ্রহ সহ্য করিয়াছে—সেই পুরুষকার যদি শেষ পর্য্যন্ত স্নেহের কাছে পরাজিত হইয়া থাকে, তবে কাব্যের দিক হইতে অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত হয় নাই। চাঁদের চরণ তলে পড়িয়া সনকা, লখীন্দর, বেহুলা, অন্য ছয় পুত্র ও পুত্রবধূগণ যখন গড়াগড়ি দিয়া প্রার্থনা করিয়া বলিতেছে—"আমাদের জন্য একবার মনসাকে তুমি পুষ্পাঞ্জলি দাও, আমাদের রক্ষা কর।" তখন চাঁদের অন্যোপায় কি ছিল? তাহা ছাড়া, চাঁদ তাহার পুত্রবধূর অলৌকিক শক্তির ক্রিয়া লক্ষ্য করিল। যে বেহুলা এমন অসাধ্য সাধন করিল সে যদি দেবতার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়া থাকে—তবে সে প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদারক্ষাও বীরের ধর্ম্ম। চাঁদ যদি পূর্ব্ব মুখে বসিয়া শিবপূজা করিয়া পশ্চিম-মুখী হইয়া বামহস্তে মনসাকে পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া থাকে—তবে মনসার জয় হয় নাই, তাহার স্নেহবিগলিত পিতৃত্বেরই জয় হইয়াছে। মা মনসা বিজয় ডঙ্কা বাজাইতে পারেন, কিন্তু পিতৃত্বের অন্তরালে অন্তর্যামী মনে মনে হাস্যই করিয়াছেন। সাতপুত্রের মৃত্যুতেও চাঁদ বিচলিত হয় নাই—পুনর্জীবিত সাত পুত্রের কাকুতিতেই চাঁদের হৃদয় টলিয়াছে। তাই মনে হয়, কাব্যের দিক হইতে চাঁদের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই খানেই রাবণচরিত্রের সহিত চাঁদের চরিত্রের পার্থক্য। ভীষ্মের মত মহাবীরের, যুধিষ্ঠিরের মত ধর্ম্মসর্ব্বস্ব মহাপুরুষের, রামের মত আদর্শ পুরুষের, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের মত কঠোর তপস্বীরও দুর্ব্বলতা দেখাইতে মহাকবিগণ ইতস্ততঃ করেন নাই। ইহাতে আদর্শের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বরং অবাস্তব ভাবাদর্শে মানবিকতা আরোপিত হইয়াছে। তাহার ফলে ঐ সকল চরিত্র মানুষের রক্তমাংসে জীবন্ত আদর্শ হইয়া উঠিয়াছে এবং কাব্যের পক্ষেও পরম সত্য হইয়া উঠিয়াছে। যে চাঁদ সদাগর একদিন ছদ্ম-বেশিনী মনসার রূপে মুগ্ধ হইয়া পরম সম্পদ মহাজ্ঞান হারাইয়াছিলেন—সেই চাঁদ সদাগর বৃদ্ধ বয়সে স্নেহে বিগলিত হইয়া হৃদয়ের অনুরোধে মনসা দেবীর চরণে অর্ঘ্য দিবেন তাহাতে অসামঞ্জস্য কিছু নাই। এই পুষ্পাঞ্জলি দান কাব্যের চির প্রচলিত মিলনান্ত পর্য্যবসানেরই অঙ্গীভূত ও পরিপোষক। চাঁদের চরিত্রের এই দুর্ব্বলতা কাহারো মনে নাই—মনে থাকিবেও না—চিরদিন অক্ষয় অমর হইয়া দীপ্যমান থাকিবে তাঁহার মহাসংগ্রাম।

মনসামঙ্গল আগাগোড়াই ভাবাত্মক—ইহার মধ্যে বাস্তবতা অতি অল্প। ভাবাত্মক কাব্য বলিয়া কবিরা নিরঙ্কুশ ভাবে সর্ব্বত্রই আতিশয্যের প্রশ্রয় দিয়াছেন। ইংরাজিতে ইহাকে বলে Emphasis দেওয়া, বাংলায় বলে "রঙ চড়িয়ে বলা।" চণ্ডীমঙ্গল ধর্ম্মমঙ্গল বা শিবমঙ্গল কাব্যে যেমন অনেক স্থলে যথাযথতা রক্ষা করা হইয়াছে—মনসামঙ্গলে তাহাও হয় নাই। মনসার নির্য্যাতন, চাঁদসদাগরের আত্মনিগ্রহ, বেহুলার রূপ, বেহুলার পরীক্ষা, চাঁদের ধনসম্পদ, সর্পবাহিনীর অভিযান, উৎসবের ঘটা ও আড়ম্বর, প্রাকৃতিক উপদ্রবের প্রখরতা, সাঁতালী পর্ব্বতের বাসর ঘর রচনা ও প্রতিষেধের ব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্তই চোখ ঝলসানো গাঢ় বর্ণে অভিরঞ্জিত—সমস্তই বাচ্যার্থের অভিমুখী, রূপকার্থের অভিদ্যোতক।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ—চাঁদ পুত্র লখীন্দরের জন্য পাত্রী দেখিতে যাইতেছেন—ষষ্ঠীবর তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। এই অভিযান ভারত সম্রাটের পক্ষেও আতিরিক্ত।

সর্ব্ব সৈন্য লইয়া সাধু করিল পয়ান। বাসুকীর ঠাট সব হৈল আগুয়ান॥
তেলেঙ্গার ঠাট সভে বত্রিশ হাজার। নর্ত্তক নর্ত্তকী চলে নাই ওর পার।
বেয়াল্লিশ বাদ্য বাজে কাংস্য করতাল। পঞ্চশব্দ বাদ্য বাজে ঢাকবে বিশাল।
গজ কান্ধে সওয়ার চলিল লখীন্দর। কনক চৌদল চড়ি চলে সওদাগর।

কবিকঙ্কণের কথায় "বাহির মহলে যার সাত মরাই টাকা"—সেই চাঁদসদাগরের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক।

মোট কথা এই সমস্ত অতিরঞ্জন—প্রাচীনকালের কাব্যের অলঙ্করণ মাত্র—ইহার সহিত যথাযথ সামাজিক অবস্থার কোন মিল নাই—ইহা কবিপ্রথা মাত্র। এই প্রথা প্রাচীন কাব্যগুলিকে বাস্তব স্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবলোকে বা স্বপ্নলোকে মুক্তি দান করিয়াছে। কবিরা যেন বলিতে চাহিয়াছেন—

"কবিভাব-বিজৃম্ভিতং সখে পরমার্থতয়া ন গৃহ্যতাং বচঃ।"

এই অতিভাষণ কতকটা প্রথার অনুবর্ত্তন, কতকটা কবির নিজস্ব। অতিভাষণের দ্বারা অলঙ্করণ অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের তুলনায় মনসামঙ্গলে একটু বেশি বেশি।

মনসামঙ্গলের অন্যতম লক্ষ্য সতীত্বের মহিমা কীর্ত্তন। বেহুলার মহিমার কাছে মনসার মহিমা ম্লান হইয়া গিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ইহাতে মনসার কৃতিত্বকে বেহুলার সতীত্ব অতিক্রম করিয়া তাহার জয় ঘোষণা করিয়াছে। পদ্মাপুরাণকে মনসামঙ্গল না বলিয়া বেহুলামঙ্গল বলিলেই যেন যথাযথ হয়। ইহাতে দেখানো হইয়াছে দৈবীশক্তিকে এক প্রেমের শক্তি—

সতীত্বের শক্তি ছাড়া মানুষের অন্য কোন শক্তি বশীভূত করিতে পারে না। আমাদের পুরাণে সাবিত্রী, অনসূয়া ইত্যাদির জীবনে দেখানো হইয়াছে সতীত্বের শক্তি দৈবী শক্তিকে পরাস্ত করিতে পারে—অঘটন ঘটাইতে পারে। পদ্মাপুরাণে এই ব্যাপারটায় অতিরিক্ত রঙ চড়ানো হইয়াছে। বেহুলার স্বর্গযাত্রার সমস্ত পথটি দৈবীশক্তির সহিত প্রচণ্ড সংগ্রামের ও মুহুর্মুহু বিজয় লাভের কাহিনী। সতীত্বের গৌরবকে এতবেশী অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা আর কোন কাব্যে দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে শক্তিরই প্রয়োজন হয়। দৈবীশক্তির সহিত মানুষের শক্তি সৃষ্টির আদি-কাল হইতে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে—এসংগ্রামে মানুষ আজো সম্পূর্ণ জয়লাভ করে নাই—কোন কোন স্থলে সে আংশিক ভাবে বিজয়ী হইয়াছে। আজিও সে সংগ্রাম চলিতেছে—কিন্তু সে আজিও মৃত্যুঞ্জয় হয় নাই, মৃত্যুকে সে বশীভূত করিতে পারে নাই। মানুষের সেই শক্তি চাঁদসদাগরে রূপ লাভ করিয়াছে।

মানুষের উপর প্রেমের শক্তির ক্রিয়া অসাধারণ ও দুর্জ্জয় সন্দেহ নাই। কিন্তু দৈবশক্তির সহিত প্রেমও সংগ্রাম করিতে পারে না। প্রেম তাহাকে শিরোধার্য্য করিয়াই লয়। পতির মৃত্যু হইলে সতী তাহার সহিত অনুমৃতা হইয়া অথবা চির-জীবন মৃতপতির ধ্যান করিয়াই প্রেমের বিজয় ঘোষণা করে। সে মৃতপতির জীবন ফিরাইতে পারে না।

সতীত্বের আদর্শকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য—সতীধর্ম্মকে সকল ধর্ম্মের উপরে স্থান দিবার জন্য এবং সতীত্বের শক্তিকে অপরাজেয় করিয়া দেখাইবার জন্যই কবিদের এই অঘটন-ঘটনার পরিকল্পনা। অতিরিক্ত রঙ-চড়াইয়া বা emphasis দিয়া ইহাকে অত্যুজ্জ্বল করিয়া দেখানো কবিদের উদ্দেশ্য। যে সমাজ সতীত্বের আদর্শকে অত্যুজ্জ্বল করিয়া দেখিত—সে সমাজের পক্ষে এই অতিরঞ্জন কিছুমাত্র অসঙ্গত মনে হইত না—রসসৃষ্টির পক্ষেও কিছুমাত্র অন্তরায়ও হইত না। যে সমাজ এই আদর্শকে অত বড় করিয়া দেখে না সে সমাজের লোক উহাকে কাব্যরসসৃষ্টির এবং আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীভূত অভিসন্ধি বলিয়াই মনে করিবে।

সীতার বনগমনে তেজস্বিতা, সাবিত্রীর পতিবরণে তেজস্বিতা, সতীর পিতৃগৃহগমনে তেজস্বিতা ইত্যাদির কথা পুরাণে আছে। পতির অনুমরণে তেজস্বিতার আদর্শ ভারতের সহস্র সহস্র নারী যুগে যুগে দেখাইয়া আসিয়াছে। পতির মৃতদেহ লইয়া বেহুলার জলযাত্রার যে তেজস্বিতা দেখানো হইয়াছে—তাহাতেও পদ্মাপুরাণে কবি অতিরিক্ত রঙ চড়াইয়াছেন। অনুমরণ ইহার কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। সদ্যঃপরিণীতা একটি বালিকা চরিত্রে যে নির্ভীক তেজস্বিতা, স্বাধীনচিত্ততা ও একনিষ্ঠতা আরোপ করা হইয়াছে তাহা অতিরঞ্জনের তুলিকায় সঞ্চারিত। বাঙ্গালী কবি এই ব্যাপারে সংস্কৃত কবিদের অতিক্রম করিয়াছেন। সেকালের পৌরাণিক কাব্যপদ্ধতির পক্ষে ইহা অসঙ্গত হয় নাই। বিশেষতঃ মনসামঙ্গল এক শ্রেণীর পুরাণ—নামও ইহার পদ্মাপুরাণ। পুরাণে কিছুই অসম্ভব নয়। মনসামঙ্গলকে পুরাণের আদর্শেই বিচার করিতে হইবে।

সতীর জীবনে যতপ্রকারের পরীক্ষা পুরাণ ও লোকসাহিত্যে প্রচলিত ছিল—পদ্মাপুরাণের কবিগণ তাহাদের প্রায় সমস্ত-গুলিকে পরপর সাজাইয়া বেহুলার সতীত্বের শক্তিতে emphasis দিয়াছেন। পুরাণে সতীত্বের তেজ দেখাইবার জন্য স্থলে স্থলে সতীর অভিশাপের অমোঘতা দেখানো হইয়াছে। যেখানে গল্পের জন্য সতীর পরাভব দেখানোর প্রয়োজন হইয়াছে—সেখানে অভিশাপের অবতারণা করা হয় নাই। পদ্মাপুরাণের কবিরা বেহুলার সতীত্ব তেজে অভিশাপ দেওয়ার শক্তি প্রচুর পরিমাণে সঞ্চারিত করিয়াছেন। বেহুলা তাহার জলযাত্রায় আততায়ীদের অভিশাপ দিয়া পরাস্ত করিয়া চলিয়াছে। এক কথায় বেহুলার সতীধর্ম্মকে সর্ব্বজয়ী করিয়া দেখানো হইয়াছে। পাতিব্রত্যের মহিমার বিজয়গীতি জগতের কোন সাহিত্যে ইহার চেয়ে উচ্চতর কণ্ঠে ঘোষিত হয় নাই। তাই মনে হয় পদ্মাপুরাণকে সাধ্বী পুরাণ, মনসামঙ্গলকে বেহুলামঙ্গল নাম দিলেও দোষ হইত না।

দূরের স্বপন

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

একটি ছোট নদীর ধারে করবো রচন কুটিরখানি
তোমায় নিয়ে, ছিল আশা। গহন মনের প্রণয়-বাণী
রইবে লেখা আলোছায়ায় সবুজ গাছের ডালের ফাঁকে
সকাল বেলায় মিষ্টি রোদে। ফুলের বনে ঝাঁকে ঝাঁকে
মৌমাছিদের চিকণ পাখায় সরল প্রাণের হাল্কা ভাষা
ঝিক্‌মিক্‌ ক'রে উঠবে আমার। ভেবেছিলেম বাঁধবো বাসা
এই জীবনের রঙীন দিনে একটি ছোট গাঁয়ের পাশে।
রইবো ব'সে নদীর তীরে, পায়ের তলায় কলোচ্ছ্বাসে
জলের ধারা উঠবে মাতি' কূল-ছাপানোর মুখর গীতে
রাখাল ছেলের সহজ খেলার ছন্দ সম। আচম্বিতে
শুনবো গাভীর হাম্বারবে ঘরের মায়া। ঘাটের বুকে
ক্লান্ত গাঁয়ের শেষ পিপাসা মিটবে নীরব শান্ত সুখে
পল্লী বধূর ভরা-ঘটে। মাঠের পারে দূরের দেশে
ঘরে-ফেরা পাখীর ডানায় সাঁঝের আলো চল্‌বে ভেসে
বিদায় নিয়ে মেঘের কাছে। কাশের বনে উঠবে দুলে
ঝাপ্‌সা রাতের স্বপনখানি। নীল আকাশের পর্দ্দা খুলে
তারার আঁখি রইবে চেয়ে মোদের বুকের মধ্যিখানে—
যেথায় নাচে বিশ্বভুবন অজানা কোন্ গানের তানে
রক্তধারার চঞ্চলতায়। ঘুমিয়ে র'বো ঘাসের 'পরে,
প্রহরগুলি চল্‌বে চুপে অন্ধকারের আঁচল ধ'রে
অস্তাচলের শিখর হ'তে উদয়গিরির আলোর ডাকে।
এম্নি ক'রেই দিন যাবে আর কাটবে রাতি নদীর বাঁকে।
মোদের মনের সকল খেলা গুটিয়ে নিয়ে ছোট্ট ক'রে
একটি ছোট কুটির মাঝে জীবনটিকে রাখবো ধ'রে
খাঁচায় পোষা পাখীর মতো। রাখবো ঘিরে সোহাগ-জালে
শিস্ দিয়ে আর গান গেয়ে তায় নাচিয়ে দেবো ছন্দে তালে।
হায়, সখী গো, তোমায় পেলেম রুক্ষ কঠোর নগর মাঝে,
ইঁট পাথরের কঠিন ঘরে বিলাস ভরা রূপের সাজে
বাদলবেলার ইন্দ্রধনুর রঙের মতো। রূপের তাড়া
নিমেষগুলির দুয়ার ভেঙে হুম্‌কি মেরে দিচ্ছে নাড়া
দৈত্য সম। পাণ্ডুরোগীর রক্তবিহীন মুখের মতো
শীর্ণ তোমার সত্বখানি মিলায় লাজে কুণ্ঠানত
ক্ষণিক অবকাশের কোণে। রান্নাবাড়ী ভাড়ার দেখা,
ঝি চাকরের তত্ত্বতালাস, দূরের জনে পত্র লেখা,
কাঁথা সেলাই, মোজা বোনা, হরেক রকম ঝক্কি নিয়ে
দিব্যি আছো পরম সুখে নির্ভাবনায় তুমি, প্রিয়ে,
দুঃখ সুখের ঠুলি চোখে। আমি বসি মাদুর পেতে,
পাওনা-দেনার হিসেব কষি, পাইনে সময় নাইতে খেতে
গণ্ডা কড়ার শাসন ছেড়ে। বাইরে চলে বাঁধা পথে
কর্ম্মরথের বিপুল চাকা। নানাজনের নানা মতে
ওঠে বিকট চেঁচামেচি ছন্দোহারা। চিম্‌নি-ধোঁয়া
আকাশটারে মাখায় কালী। রুদ্ধবুকের কলজে-চোঁয়া
রক্ত মেখে মুমূর্ষু দিন নেতিয়ে পড়ে পশ্চিমেতে।
তড়িৎ আলোর লাস্য নিয়ে পিশাচ পুরী জাগে মেতে
ব্যসন মদে। হর্ম্ম্য-চূড়ায় নাচে মলিন চাঁদের আলো
প্রেতের মতো। গলির মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে ছায়া কালো।
তুমি কখন্ শ্রান্তদেহে ঘুমিয়ে পড়ো বারান্দাতে।
আমি শুয়ে তোমার পাশে, তন্দ্রা নামে নয়ন পাতে—

স্পষ্ট ধ্বনি শুনিতে পাই—তোমার বুকে রক্তধারায়
একটি ছোট গাঁয়ের নদী চল্‌ছে নেচে ; কোথায় হারায়
স্রোতের রেখা বনের পথে ; তোমার কালো আঁখির ছায়ে
একটি ছোট কুটির জাগে, নদীর বাঁকে ঘাস বিছায়ে
আমরা দুজন ব'সে আছি পারে যাবার তরীর তরে,—
বহুদূরের স্বপনখানি বাজে জলের কলস্বরে ॥

পার্ব্বত্য প্রদেশের পত্র

কথা-শিল্প-বিশারদ বন্ধুবর 'বনফুল'

করকমলেষু—

বন্ধু !

তোমাদের আসা হ'ল না এবার দুঃখিত বড় জেনে—
মোদেরি ভাগ্য ভাল নয় তাই নারিনু আনিতে টেনে।
ছেলে, মেয়ে মোর মোরে করে দোষী, বলে, তোমারি ত ভুল,
শরীর খারাপ লিখেছিলে তাই আসিল না বনফুল।
ভাবছি আমিও সত্য কথাটা চেপে গেলে হ'ত ভাল,
তোমাদের শুভ আগমনে হ'ত আমাদের গৃহ আলো।
মাঝখান থেকে ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ শরীরটা সাধে বাদ,
শরীর বামন নাগাল না পায়, মন চাহিতেছে চাঁদ।
দুর্ব্বল দেহ, দুর্দ্দম মন, চির-সংগ্রাম করে !
মোক্ষ ভিক্ষু পক্ষী কাঁদিছে চর্ম্মের পিঞ্জরে !
চিত্ত আমার বিশ্ববাসীরে আপন করিতে চায়,
শরীর কৃপণ করিয়াছে পণ, হইতে দিবে না তায়।
লিখিয়াছ তুমি, আশ্রম পীড়া জন্মাতে নাহি চাও,
জাননা বলিয়া বলেছ এ কথা, আশ্রম কোথা পাও ?
বক্ষে যাহার লক্ষ কামনা ভিক্ষুক সম ফিরে
আশ্রম সে কি ? স্বার্থ-প্রাচীর রয়েছে যাহারে ঘিরে,
অহমিকা-শিখা যথা সদা জ্বলে, উঠে আমি আমি রব—
মুনি-মনোরম পূত আশ্রম সেখানে কি সম্ভব ?
উচ্চ প্রাচীব ঘেরা এ ভবনে বলা চলে কারাগার,
শান্ত ও শুচি আশ্রম রুচি হেথা কোথা দেখা তার ?
সত্য এ বটে প্রাচীর নিকটে সুচির রুচিব কায়া
দিগন্তব্যাপী কান্তার রচে মধুর মেদুর মায়া !
কামনা কুশ্রী আমরা হ'লেও সুশ্রী উশ্রী কাছে,
ললিত লীলায় শিলায়-শিলায় লাফায়ে লাফায়ে নাচে।
কুণ্ডলী করা ভুজগের মত খণ্ডলী কিছু দূরে,
ইচ্ছা করিলে মহেশ মণ্ডা হ'তে আসা যায় ঘুরে।
বর্ত্তুলাকার চিনি ও ছানার সুমধুর সংযোগ—
তাই দিয়ে হেথা প্রদানের প্রথা শ্রীভোলানাথের ভোগ—
নাম তাই হ'ল মহেশ মণ্ডা ? না, না, ভাই, তাহা নয়,
মণ্ডার মানে মণ্ডপ জেনো, অর্থাৎ শিবালয়।
কিন্তু কোথায় শিবালয়, ভাই, শূল-মণ্ডিত-শির—
স্বর্গ সমান নিসর্গ বটে মহেশের মন্দির !
ধূম্র-ধূসর গিরি-রাজি যেন ভস্ম-ভূষিত শূলী !
ওঙ্কার নাদে ঝঙ্কারে সদা গিরি-নির্ঝরগুলি !
অর্চ্চনা-রত বন-পাদপেরা মন্ত্র করিছে জপ !
সত্যই হেথা নিত্য বিরাজে মহেশের মণ্ডপ !
মোদের গৃহের সমুখে দাঁড়ায়ে করিলে দৃষ্টিপাত—
দেখিবে মেঘের মুকুট মাথায় বিরাজে পার্শ্বনাথ।
চব্বিশজন তীর্থঙ্কর জৈন-সমাজ মানে—
বিশজন তার সম্বোধি লাভ করেছিলা ঐখানে।
জৈনের কাছে পবিত্রতম তীর্থ এ গিরিবর,
যাত্রীরা আসে গৃহ যাহাদের বোম্বাই, গুর্জ্জর।
একবার এল পাঁচশত সাধু—দিগম্বরের দল—
বস্ত্রবিহীন—হস্তেই তারা খাইত অন্ন-জল।
পাছে কোন প্রাণী মরে ব'লে যারা সতর্ক সদা পথে—
পদব্রজে তারা এসেছিল, ভাই, দূর মহীশূর হ'তে।
দু'জন এদের গিরিডি শহরে আহুত হইয়া আসে,
মেমদের দল 'শেম' 'শেম' করে, দেখি দুইদিক্ বাসে।
'কোট-পাতলুন ব্লাউস-গাউন কৃষ্টি যাদের ঘোষে,
স্বাভাবিক এটা, লেংটা দেখিলে গজ্জিবে তারা রোষে।
যে দেশের রাজা লেংটার পায়ে লুণ্ঠিত হ'ত ধূলে
সেই দেশে এরা এসেছে এ কথা যায় বোধ হয় ভুলে।
সাধু শুধু নয়—শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক দেশের যিনি—
জেতার জাতির নেতাব নিকটে লেংটা ফকির তিনি।
হিন্দুধর্ম্ম বিরাট বিটপী—'জৈন' তাহারি শাখা,
হিন্দু ঋষভ স্রষ্টা ইহার এটা চাই মনে রাখা।
জরা থুস্ত্র ও যীশু-হজরৎ হিন্দু সবারে মানে,
হিন্দুই জানে সর্ব্ব জীবেরে সেবিতে ব্রহ্ম-জ্ঞানে।
মোদের গৃহেব অদূরে দাঁড়ায়ে ক্রিশ্চান ছিল একা,
পদতলে তার বুকে বালুকার জলরেখা যায় দেখা।
জলরেখা নয়, উশ্রী ইনিই দুরন্ত গিরিবালা,
বর্ষা-শরতের অপূর্ব্ব যার নৃত্য-গীতের পালা।
'ক্রিশ্চান হিল' নামে ভাবিও না স্বধর্ম্মে আছে হেলা,
খাঁটি সনাতনী হিন্দু এ গিরি পতঞ্জলির চেলা,
নির্ব্বিকল্প সমাধি-সাগরে ডুবে আছে দিন-রাত,
ভাঙ্গিতে সমাধি তটিনী নটিনী করে কত করাঘাত।
পচম্বা হ'তে মাইল আষ্টেক দূরেতে উশ্রী ফল—
উচ্চ হইতে নিম্নে নামিছে উশ্রী নদীর জল !
পাথরে পাথরে প্রতিহত হ'য়ে গর্জ্জিছে নদী ক্রোধে !
নির্ভীকা অভিসারিকার গতি কোন্ কালে কে বা রোধে ?
ঝম্পের পর কোথা যায় জল—পেঁজা তুলা রাশি রাশি !
মুহূর্ত্তে তারা হীরা-জহরৎ রবিকরে উদ্ভাসি !
অতি অপূর্ব্ব উশ্রীর এই অভিসারিকার বেশে
শিলায়-শিলায় বেগে লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া পড়া শেষে !
দুইদিকে বন নীরব-গহন, আধখানি চাঁদ নভে !
অতীতের দেখা সেই ছবিখানি মনে চির আঁকা রবে।
কথায় কথায় কথা বেড়ে যায় স্বভাব আমার এই,
বলিতে বলিতে কখন কখন হারাইয়া ফেলি খেই।
সময়ে সময়ে ধান্ত ভাঙ্গিতে শিব-সঙ্গীত গাই,
সে যাহাই হোক্—অচিরে তোমার কুশল-বার্ত্তা চাই।

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

চির-পান্থ

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ

কাব্যকলা-কুশলেষু—

হে বন্ধু, জীবন-পথে
দুর্নিবার দ্রুতগামী রথে
চলিয়াছি অনিবার্য্য বেগে।
চোখে পড়ে আকাশেতে রঙ লাগে মেঘে,
স্তবকে স্তবকে ফুল ফোটে বনে,
লক্ষ কোটী মানবের মনে
জাগে লক্ষ কামনা বাসনা—
অনুভব করি সব, তবু অন্যমনা

ছুটিয়াছি আমি—ছুটিয়াছি, ছুটিয়াছি শুধু।
কখনও আলেয়া জ্বলে, কভু মরু ধূ ধূ,
শ্যাম স্নিগ্ধ কখনও প্রান্তর,
ছুটিয়া চলেছি নিরন্তর।
কিবা লক্ষ্য তাও নাহি জানি,
ছুটিয়া চলেছি শুধু অজানা-সন্ধানী,
নাহি দ্বিধা—নাহি কোন ভয়,
দাঁড়াবার নাহিক সময়।

"বনফুল"

শেষ পসরা

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

বেচিতে এসেছি পণ্য
অবেলার হাটে,
অকাজে কেটেছে দিন,—
শেষ বেলা কাটে
অকারণে, পথ চেয়ে
অচেনার লাগি'
পণ্যের পসরাখানি
বিকাইতে মাগি।
ফিরে যাওয়া দূরে চাওয়া
অব্যাপারি জন
নূতন পণ্যের আর
নাহি প্রয়োজন।
লেনা দেনা বেচা কেনা
চুকায়েছে যারা,
নূতন পণ্যের পানে
চেয়ে হাসে তারা।

পার ঘাটা পার হয়ে
পায়ের পথিক
না মানে সে দিন ক্ষণ
সময় অধিক।
অতর্কিতে অসময়ে
অনায়াসে আসে,
হাঁটুজলে হেঁটে চলে,
ডুবো জলে ভাসে।
খতায় না লাভ ক্ষতি,
শুধায় না কারে
মূল্য দেয়, পণ্য নেয়
চলে যায় পারে।
চিনি, চিনি, চিনি তারে
অচেনা সে নয়।
এপারে ওপারে ধন
করে বিনিময়।

পণ্য যার বিকালো না
পথে পড়ে আছে,
শেষের পসরাখানি
সেই কিনিয়াছে।

সম্ভাবনা

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

সেইখানে আছে সম্ভাবনা—
আমাদের সকলের—
তোমার আমার।
যে অদ্ভুত আশ্চর্য্য কলায়
আলকাতরা বদ্‌লায় রঙে,
রঙে আর সুরভি-নির্য্যাসে,
সেইরূপ কোনো এক বিশেষ নিয়মে
তোমার আমার রূপান্তর
হয়তো রয়েছে।
অক্লান্ত চেষ্টায় আর অপনার বলে—
ক্রিয়ায়, কৌশলে,
আর সাধ্য-সাধনায়—
আজকের কাতরতা থেকে
হয়তো আমরা যেতে পারি—
এই আমরাও—
সুরভিত প্রভার জগতে
কোনো এক অপূর্ব্ব প্রভাতে।

এ ছাড়াও আরেক বিস্ময়
আছে বুঝি তোমার আমার।

কোনো চেষ্টা, কর্ম্মকলা, সাধনায় নয়—
যোগে নয়, উদ্যোগেও নহে,
ক্ষুরধার দূর পথে দুঃখভোগে নয়,
নয় কোনো ঐকান্তিক উগ্র তপস্যায়—
ভাবনার সীমানার পারে—
নিয়ম লঙ্ঘন করা কোন্ এক নিয়মে
রয়েছে আরেক সম্ভাবনা—
(সে কার অভীষ্ট ভবিষ্যৎ ?)
হয় তো বা মোদের সবার।
আপনার কণ্টকিত পথে
ছন্দহীন বাধবাধ-গতি
বিশ্রী বাহানার
শুঁয়োপোকা যেই অকৌশলে
হয় প্রজাপতি
ঝলমলে উড়ন্ত ডানার :
কোনো বিধি—কিছু না মানার—
একান্ত নিজের অগোচরে।
অপ্রার্থনার
অত্যন্ত সহজে, আর
কোন্ অজ্ঞাত রহস্যের বরে।

অযোনি-সম্ভব-রূপান্তর—
সেই যে পরম সম্ভাবনা
সকলের—তোমার আমার ?

অতিথি

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

এখনো আমার সন্ধ্যাপ্রদীপ
জ্বলেনিক প্রাঙ্গণে,
সঙ্গীহীনের সাধনা তুমি যে
এসেছ সঙ্গোপনে।
অতীত কালের মানসী আমার নতুন কালের পথে
অচেনা লোকের আলো পার হয়ে গানের তরণী হতে
নেমেছ নীরবে স্বপনের আয়োজনে,
তোমার ছন্দ মঞ্জীরধ্বনি মুখরিত সমীরণে।

বহুদূরে তব খুঁজিছে আপনজনে,
ঘর ছাড়া কোন জন !
ফেলে এলে কোথা বাদল দিনের ঝরা কুসুমের স্মৃতি !
বিহ্বলবায়ে দেখেছিনু যার চঞ্চল বিচরণ

আমার জীবনে ছায়া তুমি আজ মায়ারূপ ধরে এলে,
চির প্রবাসের বীণাখানি ধরো সুরের প্রদীপ জেলে।
আসিবে তুমি যে এ কথা ছিল না মনে,
নিষ্ফল আশা গোপনে কেঁদেছে আশাতীত বন্ধনে।

এখনো আমার নামেনি কুটিরে চাঁদ,
গগনের তারা শুধু চেয়ে থাকে,
হয়নি এখনো রাত !
দিবসের শেষ সোপানের পরে সন্ধ্যা মেঘের রাগে
তোমার গানের গুঞ্জনগীতি আমারি মর্ম্মে লাগে।
হাস্‌নাহানার গন্ধ বেড়ায় বনে,
প্রাণের অতিথি ফাল্গুনে মোর আসিয়াছে নির্জ্জনে।

ক্ষমা কোরো অপরাধ

বন্দেআলী মিয়া

তোমার পথের ধারে
আমি নামহারা ফুল,
জানি মনে একদা গো
মোরে তব হবে ভুল।
সমীরণ গীত গায়,
স্মরণে কে রাখে তায়!
ফাগুন ফুরায়ে গেলে
উড়ে যায় বুলবুল্।

এসেছিনু ক্ষণ তরে
ক্ষমা কোরো অপরাধ,
চকোরী না ডাকিলে গো
নভে কি ওঠে না চাঁদ?
ওগো প্রিয় চিরচেনা
মোরে গলে পরিলে না—
ঝরণা যে নেমে আসে
সে কিরে পায় না কূল!

আমার ভুবনে কভু আলো কভু ছায়া

তোমার কাননে আমি
একটি অচেনা পাখী,
তব বাতায়ণ পানে
দূর হতে চেয়ে থাকি।
একা বসি' নিরজনে
গান গাই আনমনে,
মোর সুর কভু প্রিয়
শুনিবারে পাও নাকি!

আমার ভুবনে আসে
কভু আলো কভু ছায়া,
ফুলের নয়নে তাই
বেদনার নীল মায়া।
যে-দিন রবো না আমি,
আমারে স্মরিবে স্বামী,
দ্বার হতে ফিরে যাবে
মোর নাম ডাকি' ডাকি'।

গান*

ফুল হয়ে কেন প্রিয়
ফুটিলে না বনে,
মালা গেঁথে পরিতাম
বুকে সযতনে!
চাঁদ হতে তুমি যদি,
আমি হয়ে ভরা নদী
সারা নিশি রাখিতাম
নয়নে নয়নে॥

তুমি নহো ফুল—নহো আকাশের চাঁদ,
তব লাগি' কাঁদে মম স্বপনের সাধ,
ভালোবাসে যে যাহারে,
কভু সে পায় না তারে,
চাতকী কাঁদিয়া মরে
নিশীথ শয়নে॥

* গানটি কুমারী উৎপলা ঘোষ ও কুমারী বরুণা রায় কর্তৃক হিন্দুস্থান রেকর্ডে গীত হইয়াছে।—বন্দেআলী

চন্দ্র

শ্রীমমতা ঘোষ

যখন তুমি ছিলে সাগর তলে
রাত্রি ছিল শিথীল অন্ধকারে,
দিনের আলো করেছে সন্তাষ
ক্ষুব্ধ মনে রাতের তমসারে।
এমনি করে কেটেছে দিন কত—
রাতকুমারী করেছে তপ কার,
কেমন করে কালো মেয়ের বর
মিল্‌বে ভেবে স্বর্গে বিধাতার
টল্‌ল আসন,—সৃষ্টি টলমল;
সমুদ্রে কী লাগল ভীষণ টান।
সংগ্রামেতে হার মেনে কি শেষে
সাগর এসে করেছে বর দান।

ষোড়শ কলায় ত্রিলোক আলো করে
স্ত্রী-আচারে দাঁড়ালো বর এসে,
তারা আঁচল মাথায় টেনে দিয়ে
নিশীথিনী সীমন্তিনীর বেশে
হাত মেলালো, মালা বদল হ'ল;
প্রিয়ের পাশে পেল পরম ঠাঁই,
রূপবানের ঘরবসতের ফলে
আজকে তারে বলব সুরূপাই।
সাতাশ তারা করে চাঁদের ঘর—
এমন কথা মানতে নারাজ মন,
শর্ব্বরী যে শশাঙ্কেরি প্রিয়া;
তারার পাঁতি রাতির সখীগণ।

গল্পে শুনি কোন সে রাজার মেয়ে
কপাল দোষে পেল বালক বর,
ধৈর্য্যশীলা যতন করে তারে
মানুষ করে, করে তাহার ঘর—
কবে বালক বাল্যেরি নির্ম্মোক
ছেড়ে দিয়ে বসবে বরাসনে—
ডাক্‌বে পাশে,—এই আশাটি নিয়ে
রাজকুমারী কালেরি ঢেউ গণে।

আকাশ গায়ে তোমায় দেখে দেখে
হঠাৎ মনে সেই কাহিনী জাগে,
বিভাবরী প্রতিপদের শিশু
চাঁদকে পালন করছে অনুরাগে
গল্পে শোনা রাজার মেয়ের মত—
ঠিক তেমনি সারাটি মন ঢেলে,
কলায় কলায় ষোড়শ কলা হ'লে
জাগবে সে বর ঘুমন্ত চোখ মেলে।
যৌবনে তার জোয়ার আসবে জোরে—
পূর্ণিমা সেই প্রেমেরি উচ্ছ্বাস;
নিশীথিনীর কৃচ্ছ্র সাধন 'পরে
সার্থকতার লাগবে সুবাতাস।
মৃগাঙ্কেরি স্নিগ্ধ কিরণ-ধারে
রাত্রি-বধূর বিমুগ্ধ অন্তর,
রসাবেশে উঠবে উছল হ'য়ে—
সে কথাটি জানবে শুধু বর।
দুটি পক্ষ অন্তরেতে এই
মিলন ক্ষণটি পাবার লাগি' তার
চলছে ব্রত, চলেছে দিন গোণা—
শেষ নাহি তার নীরব তপস্যার।

মর্ত্ত্য মাঝে আমরা যত মেয়ে
জাগতে বাসর ঘরের বাইরে আসি,
ভাবি বরের কেমন কোমল রূপ,
মুখটি সদাই কেমন হাসি হাসি।
হাস্‌লে কেমন মিষ্টি জ্যোৎস্না কুচি
রাশি রাশি মুক্তো সমান ঝ'রে
আমাদের এই ভিতর বাহির সবই
আলোয় আলোয় দিচ্ছে কেমন ভ'রে।
শিব পূজো নয়, যামিনী যে জানি
বরুণ দেবের করল পূজারতি,
তাইতো পেল সভা-উজল বর,
অঙ্গ হতে ঝরছে যাহার জ্যোতি।

পল্লীবাসীর ব্যথা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বঙ্গপল্লী, সোনার পল্লী
পল্লী থাকুক খাঁটি,
চাহি না সে হোক 'ফিলাডেল্‌ফিয়া'
অথবা 'সিন্‌সিনাটি'।
থাকুক তাহার কুটীর পুঞ্জ,
আম নারিকেল কদলী কুঞ্জ,
ধানের ক্ষেত্র পানের বরোজ
উর্ব্বর পলি মাটী।

থাকুক তাহার পগার পাহাড়
ডহর, ডাঙা ও বন,
গোচারণ মাঠ, দরগা, দেউল,
মণ্ডপ প্রাঙ্গণ।
থাকুক আখড়া, প্রাচীন পুকুর,
তার পশু পাখী, শিয়াল, কুকুর,
থাকুক তাহার তরু দেবতারা,
বাঁধাঘাট পুরাতন।

ফুলে ফলে ভরা থাকুক ভূতল,
আকাশ থাকুক নীল,
পাষাণ কঠিন ক'রো না ও মাটি
আনিয়া 'মেশিন' 'মিল'।
মোদের গঙ্গা পদ্মা অজয়,
নয় 'হাড্‌সন্', 'মিসিসিপি' নয়
'ঘোষ পাড়া' এসে কি করিবে বল
'রিপ ভ্যান্ উইনকিল্'?

স্নিগ্ধ বঙ্গ পল্লীর রূপ
দিও না কো বদলিয়ে,
চালায়ো না রূঢ় ট্রাক্‌টার তার
ভিটার উপর দিয়ে।
থাকুক আবরু, সরম, ভরম,
তাহার আচার তাহার করম,
সবার আঁখির আড়ালে সে থাক্
ছোট সুখ দুখ নিয়ে।

সরায়ে সারঙ, খোল করতাল
একতারা মধুবীণ,
এনো না প্রবল কল কারখানা
ডায়নামো ইঞ্জিন।
এ জগতে লোক মিলিবে প্রচুর;
কর না কর্ম্মী, কর না মজুর,
থাকুক অকেজো ভিখারী বাউল
দরবেশ উদাসীন।

এ নয় 'ওহিও' নয় 'কেরোলিনা'
'কেন্‌টাকী' 'টেক্‌সাস্'
ধনী বণিকের বিপণি কানাচে
করিতে পারিনে বাস।
পুণ্যি পুকুর, সাঁজপূজানীর,
এ যে আমাদের শান্তির নীড়,
হীনতা বিহীন দীনতা মোদের
সহেনা কো উপহাস।

যন্ত্র দানব প্রতিবেশী হতে
মনে নাহি সাধ কোনো,
মুক্ত বাতাস কৃষ্ণ বাষ্পে
দেখিতে চাই না ঘন।
দূরে সুখে থাকো, খেদ নাই তিল্,
থাকুক মোদের খাল্ ঝিল, বিল্,
পল্লীবাসীরে 'কলের মানুষ'
ক'রো না মিনতি শোনো

বিপুল পৃথিবী রয়েছে পড়িয়া
সসাগরা বসুমতী,
আশার মোহানা মিশাও সাগরে
তাহাতে নাহিক ক্ষতি।
বিশাল বিরাট শিল্প নগরী,
যেখানে ইচ্ছা তোলো সাধে গড়ি,
পল্লীর এই একপাদ ভূমি
ত্যাগ কর মহামতি।

শ্রীকুমুদিনীকান্ত কর

(উপন্যাস)

পঁচিশ

"পরদিন তিনি এলেন না। কোথায় গেলেন, কি করলেন না করলেন, তা' কিছুই জানতেও পারলাম না। রাগ ক'রে কোন খোঁজও নিলাম না। রাত্রে একাকী এই ঘরে শিশুটিকে বুকে ক'রে পড়ে' থাক্‌লাম। তার পরদিনও তাই। বুদ্ধিমতী মালতী বোধ হয় সমস্তই গোড়া থেকে লক্ষ্য করেছিল। সে ব্যাপার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েই যেন সন্ধ্যায় নির্জ্জনে এসে জিজ্ঞাসিত না হ'য়েও কোন ভূমিকা না ক'রেই গম্ভীর মুখে বল্‌ল, 'কর্ত্তা দীঘির ঘাটে একা,আজও খাননি কিছু।'"

"এক মুহূর্ত্ত তার মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌লাম। দাস-দাসীরাও আমাদের কথা নিয়ে আলোচনা করবে, উপদেশ দিতে আসবে? এত সাহস! এমন ধৃষ্টতা! অসহ্য হ'য়ে উঠল! রাগ ক'রে ধমক দিয়ে তা'কে বল্‌লাম, 'চুপ থাক্—'

তবুও সে মাথা হেট করে আমার পায়ের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ল। সর্ব্বাঙ্গ তার স্থির, অচঞ্চল। কেবল তার বুক শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে উঠ্‌ছিল নাম্‌ছিল। এবার রাগে আগুন হ'য়ে তাকে বললাম, 'যাও—'

দেখ্‌লাম আমার কঠিন কথাটার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখখানা যেন অন্তরের সত্যিকার ব্যথায় কালো হয়ে গেল। সে একটিবার মাত্র তার বেদনা-কাতর মুখখানা তুলে আমার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল। যাক্, তা'তে আমার কিছু আসে যায় না! কারোর অন্তর দেখবার আমার প্রয়োজন নাই। ক্রোধ, অভিমান এই আমার কাম্য! এই ভাব নিয়ে কঠিন হ'য়ে ব'সে থাক্‌লাম।

আবার রাত্রি এল। লোক-দেখানো আহারে বসেছিলাম। কিন্তু কিছু না খেয়েই উঠে পড়লাম। সবাই দেখে অবাক হল। কি মনে করল তারা, তা'রাই জানে। আমি ভ্রূক্ষেপও করলাম না। শিশু-পুত্রটিকে বুকে ক'রে এঘরে একাকী ছুটে এলাম। দেখতে দেখতে মনটা কিবকম অস্থির হ'তে লাগল। এই এত ক্রোধ, অভিমান, বিচ্ছেদ, মান, অপমান আমার বাহিরে প্রকাশ পাচ্ছিল, কিন্তু তবুও মনের এক নিভৃত কোণে আশা লুকিয়ে থেকে নিরন্তর কেবলই বল্‌ছিল, আস্‌বেন তিনি, এখনই আস্‌বেন! আমার বাহিরের যা-কিছু সবই যেন ছিল অভিনয় মাত্র। কিন্তু তা' স্বীকার করেছি কি? না। যতক্ষণ এই অভিনয় চলত ততক্ষণ যেন আমার মৃত্যু হ'ত। কিন্তু যেই সেই গুপ্ত আশার বাণীটি শুনতে পেতাম, অমনি যেন মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হ'ত, প্রাণ উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠত!

"তিনি এলেন না। ঘরের নির্জ্জনতা এবং মনের অস্থিরতায় আমি যেন পাগল হ'য়ে উঠলাম। তিনি এলেন না। ছট্‌ফট করতে করতে ঘর-ময় ছুটাছুটি করলাম। এ জানালা ও জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে বাহিরে চেয়ে থাক্‌লাম। বাহিরের বিরাট অন্ধকার আমার দৃষ্টিপথ অবরোধ করে দাঁড়াল। আকাশের দিকে তাকালাম। আকাশের গা-ভরা তারা। তারাগুলি মিট্ মিট্ করতে করতে যেন ঝলমল করছিল। অন্যদিন এব কত শোভাই না চ'খে পড়ত, আনন্দে মন ডুবে যেত। কিন্তু সেদিন কিছুই ভাল লাগল না। ভাল কিছুই চ'খে ঠেক্‌ল না। বিরক্তি এল। মনে হ'ল—ওরা যেন আমায় ঠাট্টা করছে। বিরক্ত হ'য়ে আকাশ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে আবার নীচের দিকে তাকালাম। কত খুঁজলাম তাঁকে, কিন্তু পেলাম না। মন কেবল বলছিল, কোথায় তিনি? এলেন না তবে?...হঠাৎ দেখতে পেলাম নীচে একটু দূরে এককোণে, নিভৃতে দাঁড়িয়ে একটা লোক। বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ ক'রে উঠল। লোকটার পশ্চাদ্ভাগ ছিল আমার দিকে। অদূরে এক কোণে একটা প্রদীপ মিট্‌মিট্ করছিল। তার ক্ষীণালোকে স্পষ্ট কিছুই দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছিল না। অবাক্ হ'য়ে রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে থাক্‌লাম সেদিকে। হঠাৎ লোকটা একটু নড়ে'-চড়ে'স্থান পরিবর্ত্তন করায় তার সম্মুখবর্ত্তী আর এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। সে স্ত্রীলোক। কৌতূহলী হ'য়ে আরো একটু তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দেখতেই বুঝতে পারলাম কা'রা তা'রা—মালতী এবং তার স্বামী শম্ভু। অতি সঙ্গোপনে তারা মুখামুখী দাঁড়িয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা বল্‌ছিল। ভাবলাম শম্ভু এখানে কেন, অন্দর-মহলে? এত রাত্রে তাদের কি এত গোপন পরামর্শ? কি এমন কথা তা'দের, যা দিনের বেলায় হ'তে পারল না? অত্যন্ত বিরক্ত হ'লাম তখনি আবার মনে হ'ল ওরা কি আমাদেরই কথা আলোচনা করছে? ওরা কি সবই বুঝতে পেরেছে তবে?...বুঝুক যেমন ইচ্ছা ওদের' বলুক্ যা' খুসী ওদের। তা'তে আমার কি? তা'রা অন্দর-মহলে আস্থক্, বস্থক্, থাকুক্, যাউক্, তা'তে আমার কি? মালতী বা শম্ভু কে আমার?...হঠাৎ দেখতে পেলাম বর্শা হাতে শম্ভু হন্ হন্ ক'রে ফটকের দিকে ছুটে চলেছে। দেখতে দেখতে তা'র দীর্ঘ দেহ অদৃশ্য হ'য়ে গেল। খট্ ক'রে একটা শব্দ হ'ল। বুঝতে পার্‌লাম শম্ভু ফটক পার হ'য়ে গেছে। সদর দরজা বন্ধ হ'ল। মালতী একা এই ঘরের চারদিকে পায়চারী করতে লাগল। কোমবে তার কোষবদ্ধ ছুরিকা ঝুল্‌ছিল। থেকে থেকে এই কক্ষের দিকে সে দৃষ্টিপাত কর্‌ছিল। বুঝ্‌লাম আমার পাহারায় সে নিজেকে নিযুক্ত করেছে। শম্ভু কোথায় কি কর্ত্তব্য পালন করতে গেল, তা'ও এবার অনুমান করতে পার্‌লাম। কেন? কি দরকার ছিল তা'দেব এ সবে?...বিরক্ত হ'য়ে জানালা থেকে সরে গেলাম।...

"রাত গভীর হ'য়ে এল। মন কেমন শূন্য শূন্য বোধ হ'তে লাগল। শূন্য প্রাণে যেন একটা হাহাকার জেগে উঠল। নৈশ প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য, স্তব্ধতা, নির্জ্জনতা, বিরাট বৈচিত্র্য এবং মৃদু-মন্দ বায়ুর তরঙ্গে তরঙ্গে, উদ্ভিদেব কানে কানে, সরসীর বুকে মৃদু হিল্লো-

লিত ক্ষুদ্র বীচিমালায়, পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে মধুর সঙ্গীত আমার প্রাণের শূণ্যতা আরো শতগুণে বাড়িয়েই দিল। সত্যি, সত্যি তবে এলেন না? আসবেন না? বেশ তবে!...আমিও তবে··· রাগে যেন পাগল হ'য়ে গেলাম। সাম্নে যা পেলাম তাই ছুড়ে' ছুড়ে' চার্‌দিকে ছড়িয়ে ফেল্লাম। প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম, তাঁর নাম গন্ধ যেখানে আছে, থাক্‌ব না সেখানে, ছুঁব না তাঁর কিছু···এক টানে খাটের বিছানা থেকে ঘুমন্ত শিশুকে বুকে তুলে' নিলাম। মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে শিশুকে বুকে ক'রে শুয়ে পড়লাম। পাষাণের ন্যায় কঠিন প্রাণ হ'বার জন্য মনে মনে বল্লাম, মুছে ফেলে দেবো তাঁকে মন থেকে, আর কোন দিন এক দণ্ড, এক মুহূর্ত্তের জন্যও আর তাঁর কথা মনে কর্‌ব না, তাঁর মূর্ত্তি আর কখনো আমার মনে স্থান দেবো না, কখনো না—কখনো না—না না না তাঁকে নিঃশেষে ভুলে যাব—যাব—যাব।...

"কিন্তু যতই তাঁকে ভুল্‌তে চাইলাম, মনকে যতই নিষ্পেষিত ক'রে বল্লাম, 'ভুলে যা', ততই আমার সমগ্র মন জুড়ে দৃঢ়রূপে তিনি বসলেন, অনুক্ষণ তাঁকে মনের মধ্যে দেখতে পেলাম, আরো নিকটে তাঁকে পেলাম—এত নিকটে বুঝি তাঁকে আর কখনো পাই নাই...অশ্রুধারায় বুক ভেসে গেল...খোকার মুখচুম্বন কর্‌লাম, তাকে বুকে চেপে ধর্‌লাম···ঐ ত' ছিল শেষ সম্বল—তার পর এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।···

"তার পরদিন খুব ভোরে, তখন মাত্র দোয়েল্ শিশ্ দিচ্ছিল, ঘুমন্ত শিশুকে বুকে ক'রে নিঃশব্দ পদে নীচে নেমে এলাম। শেষ সিঁড়িতে পা দিয়েই দেখলাম সাম্নে মালতী। আমার চেহারায় বুঝি তখন এমন একটা কিছু ছিল যা' তার বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল। নিদ্রাহীন চ'খে তার অসীম বিস্ময়! কিন্তু শুষ্ক মলিন বিষণ্ণ মুখ তার নীরব। খোকাকে নেবার জন্য আমার দিকে সে হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু আমি তাকে সে অবসর না দিয়ে একটী কথাও না ক'য়ে তার পাশ কাটিয়ে হন্ হন্ ক'রে চলে গেলাম। সে ধীরে ধীরে আমার পেছনে পেছনে এল। নীচের তলায় আমার একটা নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গিয়ে ঢ়ুক্‌লাম। মালতী এসে দরজায় দাঁড়াল। তাকে বল্লাম, 'আমার এ ঘরে কাউকে আস্‌তে দিও না।' দরজাটা দিয়ে দিলাম তার মুখের উপর। সে চলে গেল।

"যেখানে ব'সে উষার সূর্য্যোদয় দেখেছিলাম, সেখানে ব'সেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে সূর্য্যাস্ত দেখছিলাম, আর আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম। পশ্চিমাকাশের দিকে আমি চেয়ে থাকতে থাকতেই ধরার বুকে আঁধার ঘনিয়ে এল। এমন সময় দরজায় করাঘাত শব্দ হ'ল। তারপর মালতীর পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে এল। সে ডাকছিল, 'রাণী-মা! রাণী-মা!' বিরক্তি বোধ হ'লেও তাকে ভিতরে আস্‌তে বল্লাম। সে ভিতরে এসে ভয়ে ভয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে ব্যাকুল হ'য়ে বল্‌ল, 'কর্ত্তা ফিরে এসেছেন, উপরের ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করেছেন, কারুর যাবার হুকুম নেই ওখানে। দেওয়ানজিও পাবেন নি কিছু কর্‌তে···রাণী-মা! সকলে বল্‌ছে আপনি যদি...'

"তার উদ্দেশ্য বুঝে তাকে এখানেই বাধা দিয়ে বল্‌লাম, 'যাও এখন, মালতী···'

"তাকে বিদায় ক'রে নিশ্চিন্ত হ'লাম কি? না, তা' নয়। সেই নিভৃত কক্ষে একাকী পায়চারী কর্‌তে কর্‌তে ভাবছিলাম, এলেন তিনি, কিন্তু আমায় ত' ডাক্‌লেন না, এতই ঘৃণ্য কি আমি?···আর কি, আর ত' জানাজানির কিছুই বাকী নাই। দেওয়ানজিও জান্‌তে পেরেছেন, এসেছিলেনও, কিন্তু বিফল মনোরথ হ'য়ে ফিরে গেছেন, হয় ত' আস্‌বেন এখনি আবার আমায় নিয়ে যেতে তাঁর কাছে। আসুন তিনি, আমি যাব না—না-না-না, কিছুতেই না···কেন যাব? কিসের জন্য যাব? আমার কি—আমার···

"···পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ আমার ঝিম্ ঝিম্ ক'রে উঠ্‌ল। আর দাঁড়াবার শক্তি ছিল না। কোন প্রকারে অবসন্ন দেহ টেনে নিয়ে বিছানায় প'ড়ে থাকলাম।

"কতক্ষণ প'ড়ে ছিলাম বেহুঁসের ন্যায় তা মনে নাই। মনে হ'ল রাত্রি গভীর। হঠাৎ মনে পড়্‌ল তিনি নিকটেই রয়েছেন কিন্তু আমায় এখনো একবারো ডাকেন নি। প্রাণটা বড় দুঃখে যেন উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌ল।···হতাশার সুর বেজে উঠ্‌ল প্রাণে—আমার দোষ? কি করেছি আমি? অপমান করেছি তাঁকে? অপমান? অপমান তাঁকে করতে পারি কখনো? এ যে অসম্ভব! এ অসম্ভব কথা তাঁর মনে কি ক'রে বদ্ধমূল হ'য়ে র'ল? যদি—যদি সত্যিই আমি কিছু ক'রে থাকি, সত্যি যদি আমার কোন দোষ হ'য়ে থাকে, তবে তিনি শাসন কর্‌লেন না কেন? আমায় যেমন ইচ্ছা তেমন ক'রে সংশোধন কেন কর্‌লেন না? আমায় মেরে কেন ফেল্‌লেন না? কিন্তু—কিন্তু এমন ঘৃণা, তাচ্ছিল্য যে অসহ্য?...

"এ চিন্তা আর সহ্য কর্‌বার ক্ষমতা ছিল না, অস্থির হ'য়ে ছুটে বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে। বাইরে এসে যেখানে দাঁড়ালাম তার ঠিক সাম্‌নেই তাঁর দোতলার শয়নকক্ষ। আলো জল্‌ছিল তখনো সে-ঘরে। সতৃষ্ণ নয়নে রুদ্ধশ্বাসে সেদিকে চেয়ে থাক্‌লাম। হঠাৎ ঘরের ভিতরকার একটা দেয়ালে মানুষের ছায়া পাত হ'ল। পাগল হয়ে সব ভুলে গিয়ে তাঁর নাম ধ'রে চীৎকার করে ডাক্‌তে গিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। চ'খের জল গড়িয়ে পড়্‌ল গণ্ড বেয়ে বুক ছাপিয়ে। তবুও কিন্তু মন বল্‌ছিল, একবার ডাকুন তিনি আমায়, শুধু একবার—শুধু একবার ডাকুন নাম ধ'রে...মীনু মীনু ব'লে···কিন্তু কই, একই স্থানে স্থাণুর ন্যায় দাঁড়িয়ে সেদিকে চেয়ে থেকে থেকে প্রহরের পর প্রহর কাটালাম, তবুও ত' তাঁকে দেখতে পেলাম না, তাঁর ছায়াটুকুও না...অশ্রুজলে চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে যেন অন্ধ হয়ে গেল। কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না, চোখ বুজে এল... হঠাৎ একটা কাক মাথার উপর দিয়ে কর্কশ কণ্ঠে কা-কা ক'রে চীৎকার ক'রে উড়ে গেল। ভোর হল।···পা টল্‌ছিল, এ অসার দেহ বহন করবার মত শক্তি তার ছিল না। টল্‌তে টল্‌তে অন্তের অলক্ষ্যে কক্ষে ফিরে এলাম···অবসন্ন দেহ মৃতের ন্যায় বিছানায় ঢলে পড়্‌ল...

"তার পরদিন আমার জীবন-মরণের চতুর্থ দিন—আমার পরাজয়ের দিন! ধীরে ধীরে একটা সঙ্কল্প এসে আমার দুর্ব্বল মনকে দৃঢ় করে তুল্‌ল। মনের অবস্থা সহজ হ'য়ে এল। সেদিন যা হারিয়েছি আজ তা উদ্ধার করে আন্‌ব। আমার—আমার তিনি। তিনি আমার ছিলেন, তিনি আমার থাক্‌বেন। এর অন্যথা কি করে হয়? হ'তে পাবে না। এমন মানুষ কে আছে যে এর বিপরীত ভাবে আমাদের ভিন্ন ক'রে দেগে? কেউ না। কেউ যে তা পারে না!···স্ত্রীলোক আমি, নারীজাতি। আমার আবার মান অপমান, ক্রোধ, অভিমান কি? আমার আলাদা সত্তা কোথায়? কি প্রয়োজন তার? বৃথা এ সম্মান-বোধ আমার।··· আজ আমার সম্পূর্ণ পরাজয়!...

"পারব না তাঁকে ফিরিয়ে আনতে? আজ নিজের সর্ব্বস্ব তাঁর পায়ে বলি দেব···আস্‌বেন না তিনি? আমার একমাত্র মাণিক এই শিশুকে দেখেও কি হেসে তাকে বুকে ক'রে আস্‌বেন না ফিরে'? আস্‌বেন, আসবেন, না এসে পারেন কি?...এসব ভাবতে ভাবতে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম ক'রে বল্‌লাম, রাধা-মাধব! আমার বুকে বল দাও, যেন আমি পারি এ সবই করতে··· সারাদিন ধ'রে সেই শুভ মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় উদ্বিগ্ন হয়ে থাক্‌লাম।

"ক্রমে সন্ধ্যা হ'ল, রাত্রি এল। নিস্তব্ধ গভীর নিশির তৃতীয় যামে ঘুমন্ত শিশুটিকে বুকে তুলে নিয়ে নিঃশব্দে দ্বার খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। কোথাও জীবজন্তুর চিহ্নমাত্র নাই। গাছের মাথায় একটা পাতাও নড়ছিল না! দূরে বা নিকটে কোথাও নিশাচর পশুর সাময়িক চীৎকার বা পাখীর প্রহর-জ্ঞাপক কূজন ছিল না। জীবনের সাড়া যেন ছিল না কোথাও! কেউ যেন জগতের চৈতন্য হরণ ক'রে নিয়েছিল! শুধুই একটা বিরাট গাম্ভীর্য্য চতুর্দ্দিকে। পাছে এই বিরাট গাম্ভীর্য্য এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয়, এই ভয়ে পদক্ষেপ পর্য্যন্ত করিনি, শ্বাস-প্রশ্বাস পর্য্যন্ত অতি সন্তর্পণে ত্যাগ করছিলাম! গা-টা কি রকম ছমছম ক'রে উঠল। সভয়ে চারদিকে একবার তাকালাম। এই বিরাট অচৈতন্যের মাঝে একমাত্র জীবনের চিহ্ন এই কক্ষেই দেখা যাচ্ছিল। আলো জ্বল্‌ছিল এখানে পূর্ব্বেরই ন্যায়। চেয়ে থাক্‌লাম পলকহীন সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সেদিকে, যদি তাঁকে দেখতে পাই। সময়ের মনে সময় উড়ে চল্‌ল, কিন্তু দেখা পেলাম না তাঁর।

"...একটা দীর্ঘশ্বাস ছুটে আস্‌ছিল, কিন্তু তাকে সবলে চেপে রাখলাম। ধীরে ধীরে সিঁড়ির দিকে গেলাম। আর একবার উপরের দিকে তাকালাম। তারপর প্রথম সিঁড়িতে পদার্পণ কর্‌লাম। বুকটা অমনি ধড়াস্ ধড়াস ক'রে উঠল। খোকাকে বুকে আরো চেপে ধরলাম। না, না, আর পশ্চাদ্‌পদ হওয়া নয়, দৃঢ় হ'তে হবে, কঠিন—কঠিন ক'রে নিতে হবে প্রাণটাকে—এই সঙ্কল্প নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। এই ত দরজা, আমার সামনে, দু'হাত মাত্র ব্যবধানে! করব করাঘাত? করব? ভাবছি, এমন সময় খোকা অস্ফুট, ক্ষীণকণ্ঠে একটু কেঁদে উঠল—একবার একটীমাত্র শব্দ...থমকে দাঁড়ালাম। কান পেতে থাক্‌লাম শুনতে কোন শব্দ হয় কিনা—কারুর পদশব্দ, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ, কারুর কথা! কিন্তু কই, কোথাও কিছু না। খোকা ওই সামান্য একটু শব্দ করেই আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল, আমার বুকের সঙ্গে একেবারে যেন লেগে ছিল। তার মুখের দিকে শুধু চেয়ে থাকলাম। হঠাৎ মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠল—করব না দরজায় করাঘাত, যাব না ও ঘরে। তিনি কি শুনতে পান নি শিশুর রোদন-শব্দ? আমার পদশব্দ? ঘরে আলো, দেখতে পান নি আমায়? নিশ্চয় শুনেছেন সব, দেখেছেনও সব। তবুও দরজা খুলে আদর করে একবারও ডাকলেন না, হাতে ধ'রে তুলে নিয়ে যেতে এলেন না···এত অনাদর, তাচ্ছিল্য, ঘৃণা, অপমান! কেন? কিসের জন্য? মানুষ নই আমি?···যাব না—যাব না তাঁর কাছে আর—না না না...দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কোথায় ভেসে গেল। অভিমান আমায় আবার পাগল ক'রে দিল, আমায় এবার নিশ্চিত মৃত্যুর পথে নিয়ে গেল! অভিমানে ফিরে এলাম নিজের ঘরে। আমার দ্রুত পদশব্দ নিশ্চয়ই তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। হায়, তখনো যদি একবার তিনি ডাকতেন!···হায়, বিধিলিপি!

"স্বপ্ন দেখছিলাম—তাঁকে যেন হারিয়ে ফেলেছি, কত খুঁজেও পাচ্ছি না। কোথায় কোন্ অ-জানা দেশে গেছেন চ'লে আমাদের ফেলে, আর আসছেন না! খোকা ও আমি তাঁকে পাবার আশায় পৃথিবীময় পাগল হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছি। তবুও তাঁর দেখা নাই। ভাবছি, কি নিষ্ঠুর তিনি, কেমন ক'রে ভুলে থাকলেন তা'দের, যাদের তিনি জীবনের চেয়েও অধিক মনে করতেন। খোকার জন্যও কি তাঁর প্রাণে এতটুকুও মমতা জাগে না? সত্যি সত্যিই কি এত নিষ্ঠুর হ'তে পারেন তিনি? এমন সময় একদিন তাঁর দেখা পেলাম! কিন্তু দূরে—বহুদূরে তিনি, নাগাল পাওয়া যায় না তাঁকে এতদূর। সেখানে ঘর-বাড়ী নাই; গাছপালা নাই; মানুষ, পশু, পাখী নাই; তাদের কোলাহল নাই; শুধু সাদা সাদা মেঘ চারদিকে; মেঘের কোলে তিনি; সব অঙ্গ তাঁর মেঘে ঢাকা; শুধু মুখখানি তাঁর বাইরে; প্রশান্ত মুখে আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। তাঁকে কাছে না পেয়ে চোখে জল এল। ক্ষোভ ক'রে বল্‌লাম, "না ব'লে না ক'য়ে কোথায় চলে গেলে, আর তোমার দেখা নাই। আমরা আকুল হ'য়ে খুঁজছি তোমায় কত। এম্নি ক'রে কাঁদাচ্ছ আমাদের? একটুও কি দয়া-মায়া নাই তোমার?··

"খোকাকে উঁচু ক'রে তুলে' ধ'রে তাঁকে দেখিয়ে বল্‌লাম, "এর জন্যও কি প্রাণে মমতা নাই একটু তোমার? ও যে তোমারই অংশ? কি কঠিন তুমি! এস, কাছে এস আরো, ওকে বুকে তুলে' নাও···আসবে না? আসবে না? আস্‌বে না বুঝি আর? রাগ ক'রে, আমার উপর অভিমান ক'রে বুঝি চলে গেছ এতদূরে, না ব'লে না ক'য়ে? এস, এস, ফিরে এস, আর কোনদিন তোমার অভিমান হ'তে দেবো না, তোমার পায়ের নীচে প'ড়ে থাকব, নিজের অস্তিত্ব আর রাখব না, সম্পূর্ণ তোমার হ'য়ে যাব···ফিরে এস।

"প্রফুল্ল মুখ তাঁর বিষণ্ণ হ'য়ে উঠল। বল্‌লেন, 'মীনু! আর যে তা হয় না! আর যে ফিরে যাওয়া যায় না এখান থেকে!

সে-শক্তি যে আমার নাই! তুমি এস খোকাকে নিয়ে আমার কাছে! খোকাকে বুকে করব, তোমায় আলিঙ্গন করব, কত সাধ হচ্ছে, কতদিন—কতদিন যে তা করিনি! বড় কষ্ট হচ্ছে তোমাদের জন্য, প্রাণে সদাই একটা হাহাকার—হায়, কি করেছি! বড় অনুতাপ—অনুতাপের আগুনে বুক যেন ছারখার হয়ে যাচ্ছে! বড় অভিমান হয়েছিল। সহ্য করতে পারি নি! বড় ভুল—বড় ভুল ক'রেছি, অন্যায় ক'রেছি, মহাপাপ করেছি, কিন্তু প্রতিকারের ত পথ নেই আর! মীনু! মীনু! বড় জ্বালা—বড় জ্বালা!

"আমি যেন সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'ভেবো না, ভেবো না, আমি যাচ্ছি খোকাকে নিয়ে, তোমাকে আর জ্বালা পেতে দেব না···কিন্তু থেকো তুমি ওখানেই, যেখানে আছ সেখানে। আবার যেন নিষ্ঠুর হ'য়ে চোখের আড়ালে যেও না···এই আসছি—আসছি আমি···'

"স্পষ্ট দেখতে পেলাম, তাঁর মুখখানা অমনি আশার আলোতে ফুল্ল হ'য়ে উঠল। কিন্তু তখনি যেন আবার কোন্ নিরাশার আঁধারে ম্লান হ'য়ে গেল। এই আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে মুখখানি তাঁর এমন এক ভাব ধারণ করল যা' মানুষমাত্রেরই মনে মমতা জন্মায়। বড় আকুল হ'য়ে উঠলাম তাঁর জন্য। ইচ্ছা হ'তে লাগল ছুটে' গিয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরি! কিন্তু তার উপায় ছিল না, তিনি শুষ্কমুখে করুণ দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে চেয়ে বললেন, 'হাঁ, মীনু! তুমি এস। তোমার জন্য অপেক্ষা করব, যতকাল, যতজীবন দরকার হয় ততকাল, ততজীবন প্রতীক্ষায় থাকব তোমার, এখানেই···

"হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দ শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করছিল। বিছানায় উঠে বসলাম। নিদ্রালস চোখ টেনেও খুলতে পারছিলাম না, শব্দটা যেন পর পর দু'বার হয়েছিল—দুম্ দুম্ ক'রে, স্পষ্ট বন্দুকের আওয়াজ! ভাবলাম এত রাত্রে বন্দুকের আওয়াজ কেন? কোন্‌দিক থেকে এল তা? এই দিক থেকে এসেছে বলে মনে হচ্ছে—এই দিক। এই দিকে ত তাঁর ঘর। তবে—ঠিক সেই সময় স্বপ্নের কথাটা স্পষ্ট মনে হ'তেই বুকটা কেঁপে উঠল।·· তবে?·· এই দিকে—এই দিকেই ত শব্দ শুনেছি! তবে—তবে? ভাবতে ভাবতে দু'হাতে বুক চেপে ধ'রে রুদ্ধশ্বাসে ঘরের সেই অন্ধকারের মধ্যেই সেদিকে তাকিয়ে থাকলাম।··

"·· হঠাৎ কবাটে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করতে করতে প্রাণপণে চীৎকার ক'রে একজন ডাকল, 'রাণী মা। রাণী মা!—' মনে হচ্ছিল এ ত সাধারণ স্বাভাবিক ডাক নয়! এ ত আর্ত্তনাদ! কিন্তু কোন শব্দ বেরুল না আমার মুখ দিয়ে। স্তম্ভিত, স্তব্ধ হ'য়ে ছিলাম! কোন শব্দ যেন আমার কানে প্রবেশ ক'রেও করছিল না।

"যে ডাকছিল সে পুনরায় বলল, 'খুলুন খুলুন কপাট শীঘ্র, সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশ হ'ল!'···এবার তার কথাগুলি স্পষ্ট শুনতে পেলাম। মালতীর কণ্ঠস্বর। এ কি বলছে সে? সর্ব্বনাশ। কিসের সর্ব্বনাশ! কার সর্ব্বনাশ। বেহুঁস ছিলাম, চৈতন্য ফিরে এল। মুহূর্ত্তে উঠে' দাঁড়ালাম। গায়ের কাপড় কোথায় খ'সে পড়ে' গেল। পাগলের ন্যায় ছুটে গিয়ে কপাট খুলে দিলাম। সম্মুখে মালতী। আমার মুখের দিকে চে'য়ে একবার শুধু সে ডাকল, 'রাণী-মা!—চোখে তার জল। মুখ তার তখনি নত হ'য়ে পড়ল। উৎকণ্ঠায় সন্দেহে অস্থির হ'য়ে ডাকলাম, 'মালতী!—' সে পুনরায় মুখ তুলে তাঁর ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলল·· ওখানে বুঝি গেল সর্ব্বনাশ হ'য়ে আজ!···'

"সে-দিকে চেয়ে দেখলাম ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। সিঁড়ি এবং উঠান ভরা লোক। দোতলার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ দেওয়ান, তারপর ভজু, তারপর শম্ভু। আমি মালতীর বাহু সবলে চেপে ধ'রে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে চীৎকার ক'রে বললাম, 'কি!—কি!—সর্ব্বনাশ হয়েছে? কা'র—কার? কোথায়? ওখানে?'· উন্মাদের ন্যায় ছুটে' গেলাম সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ি দিয়ে ছুটে' উঠলাম উপরের দিকে। পায়ে হঠাৎ ভিজা কি লাগল। মধ্যপথে থমকে দাঁড়ালাম। মুহূর্ত্তে সেই পদার্থ হাতে তুলে নিয়েই প্রাণভেদী আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলাম। মুখ দিয়ে শুধু বেরুল, তা' হ'লে স্বপ্ন সত্য!· তাঁরই দেহের তপ্ত শোণিতের উপর অচেতন হ'য়ে পড়ে' গেলাম· তারপর আর কিছু মনে নাই·

"আর ফেলব না চ'খের জল কোনদিন তাঁর উদ্দেশে! তিনি প্রতীক্ষা করছেন আমার জন্য, তাঁর যদি কষ্ট হয় আবো আমার চ'খের জল দে'খে। তিনি ত' দেখতে পাচ্ছেন সব···কাঁদব না আর। দীর্ঘশ্বাস? তা-ও পড়তে দেবো না। তবুও যদি আসে, তবে বুক চিরে ফেলে দীর্ঘশ্বাসের উৎস চিরদিনের জন্য বন্ধ ক'রে দেবো।···"

মীনার কথা শেষ হইল। সে হীরুর ছবির দিকে নীরবে পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সত্যই তাহার চোখে অশ্রু ছিল না। দেহেও যেন স্পন্দন ছিল না। তাহার চিন্তাবিষ্ট কোটর-প্রবিষ্ট চোখের করুণ দৃষ্টির নিম্নে রক্তহীন শুষ্ক মুখখানি সত্যই মৃতের ন্যায় দেখাইতেছিল। তাহার দীর্ঘ কাহিনী শুনিতে শুনিতে করুণ দৃশ্যগুলির মধ্যে আমার মন বিচরণ করিতেছিল। উদ্বেলিত অন্তর আমায় পাগল করিয়া তুলিতেছিল। আমি হঠাৎ আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলাম, 'কিন্তু সেই লেখাটা? হীরুর হাতের সেই শেষ লেখা, যা তার পাশে জমাট রক্তের মধ্যে পড়ে'ছিল?···কোথা', কোথা' তা'?···মীনা! মীনা! সেই লেখাটা?···'

মীনার দীর্ঘশ্বাস পতিত হইল। সে মৃতারই ন্যায় তার সেই নিষ্ঠুর নীরবতা অক্ষুন্ন রাখিয়া কম্পিত হস্তে অঞ্চল হইতে একখানি শোণিতলিপ্ত কাগজ খুলিয়া আমার সম্মুখে ধরিল। আমিও তাহার অস্বাভাবিক বিবর্ণ মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া নীরবে উহা হাতে লইলাম। হঠাৎ তাহার সারা অঙ্গ ঝঙ্কার দিয়া পুনঃ পুনঃ কাঁপিয়া উঠিল। তাহার জ্যোতিহীন দৃষ্টি আর একবার স্বামীর ছবির উপর স্থাপিত হইল। তারপর একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনিলাম! তারপর তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ মেঝেতে লুটাইয়া পড়িল।

অভাগিনী নারী! মনে হইল এটুকুই বুঝি তাহার শাস্তি। তাহাকে ডাকিলাম না, ধরিলাম না, কিছু বলিলামও না, শুধু চাহিয়া থাকিলাম অভাগিনীর পানে।

ছাব্বিশ

হীরুর জীবনের শেষ কয়টা দিনের দুঃখময় কাহিনী সেই কাগজখানিতে এইরূপ লেখা ছিল—

আজ কেবলই মনে পড়ছে পিতার অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার কথা। তাঁর সতর্ক বাণী এবং নিষেধাজ্ঞা কতই না মূল্যবান্ ব'লে বোধ করছি এখন! আগে মনে হ'ত তাঁরা সে-কেলে, তাঁদের সে-কেলে ভাব, তাঁরা বর্ত্তমান বোঝেন না, বর্ত্তমান নিয়ে চলতে জানেন না, পারেন না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তাঁরা সবই জানতেন, বুঝতেন, করতেও পারতেন, কিন্তু তাঁরা সময় বুঝে চলতেন, সময়ের প্রতীক্ষায় থাকতেন। তাঁদের জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা তাঁদের সংযম শিক্ষা দিয়েছিল। তাদের নিকট আমার জ্ঞান, বুদ্ধি কত সীমাবদ্ধ, বর্ত্তমান শিক্ষার অভিমান কত অর্থহীন, নিজেকে কত ক্ষুদ্র ব'লে মনে হচ্ছে।

তিনি চেয়েছিলেন এমন একটা মেয়েকে তাঁর পুত্রবধূ করতে যার কুল, শীল, মর্য্যাদা, শিক্ষা শ্রেষ্ঠ। অনেক খুঁজে তিনি পেয়েছিলেনও তাই। বাকী শিক্ষাটুকু তিনি নিজে দিয়ে তাকে সত্যই রাজরাণীর ন্যায় শক্তিশালিনী ক'রে তুলেছিলেন। বর্ত্তমানের শিক্ষিত আমি, আমায় জিজ্ঞাসা না ক'রে একটা গ্রাম্য মেয়েকে আমার জীবন-সঙ্গিনী করতে যাওয়ায় তাঁর প্রতি কত অশ্রদ্ধাই না প্রকাশ ক'রেছিলাম, কত ক্ষুব্ধই না হয়েছিলাম। কিন্তু তার পর আমার মত সুখী কেউ হয়েছিল কি? মীনার মত যার জীবনসঙ্গিনী তার মত ভাগ্যবান্ কে আছে এই পৃথিবীতে? আদর্শ স্ত্রীর যতগুলি ভাব আমার অন্তরে মালার ন্যায় গাঁথা ছিল, তার সবগুলিই মীনার চরিত্রে জীবনে প্রতিফলিত দেখেছি। এত সুখ, এত আনন্দের অধিকারী হয়েও আমি তা জীবনে ধ'রে রাখতে পারলাম না কেন?...হয় ত এইই বিধিলিপি!...

পিতার কুলমর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য ছিল না, এমন নয়। কৈলাশপুরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত ক'রে হয় ত তিনি নিজকুলের সামাজিক গৌরব বৃদ্ধির আশা মনে মনে পোষণ করতেন। কিন্তু তা' ব'লে তাঁ'র আত্মসম্মানকে কখনো খর্ব্ব হ'তে দেন নি। যা' তার দরকার তা' তিনি পেয়েছিলেন। তার অধিক কিছুর জন্য তাঁর মোটেই কোন স্পৃহা ছিল না। কৈলাশপুরের আভিজাত্যের পরিচয় তিনি খুব ভাল ক'রেই জানতেন। তাদের মনোবৃত্তি কোন্ পথে চলে, তা'ও তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল। তাঁর দূরদৃষ্টির সাম্নে ভবিষ্যৎ যেন ছবির ন্যায় ভেসে বেড়া'ত। দুর্ভাগ্য আমার এসবের মূল্য তখন বুঝিনি! তাঁর আদেশ ছিল, 'কৈলাশপুর যেও না, কারণ নিজেই পরে বুঝবে'। আর কাজেও হ'লও তাই। তাঁর নিষেধের কারণ এখন ভাল ক'রেই বুঝতে পারছি। কিন্তু সময়ে তা বুঝবার চেষ্টাও করিনি, অগ্রাহ্য ক'রেছি তাঁর সতর্কবাণী। বৃদ্ধ দেওয়ানজির নিষেধ বাতুলের উক্তি ব'লে উড়িয়ে দিয়েছি। নিষেধ না মেনে গিয়েছিলাম কৈলাশপুর, পরম আত্মীয়দের মধ্যে আনন্দ পা'বার জন্য। কিন্তু তার ফল? তার ফল আজ কোন্ পথে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদের? দোষ কার?

আশ্চর্য্য ধৃষ্টতা এদের! আমায় তা'দের মধ্যে নিয়ে এমন অপমান করল তারা? এমন সাহস তারা কোথা পে'ল? আর আমার শ্যালকও তাদের সঙ্গে? হাসছিল সে থেকে থেকে। প্রথমটা বুঝি নি। কিন্তু যখন বুঝলাম তখন...উঃ!...তার বিদ্রূপের হাসি, তার ঘুরানো ফিরানো অপমানজনক কথা আমার গায়ে যেন কাঁটার ন্যায় বিঁধছিল...তাদের ষড়যন্ত্র এটা। নিশ্চয়! নিশ্চয়!...উঃ! অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল একেবারে, ক্ষেপে উঠেছিলাম, কিছুই খেয়াল ছিল না। অপমানে প্রতিশোধ নিতে মাত্র যাচ্ছিলা ...ওরা যদি হাতের কাছে থাকত তবে সেদিনই ওদের শেষ হ'য়ে যেত'। নিক্ষিপ্ত তলোয়ারটাও মাঝখানে একটা ঝাড়ে আটকে গেল, ঝাড়টা চুরমার হয়ে মেঝের উপর ছড়িয়ে পড়ল...এমন সময় মীনা এসে যদি আমার সাম্নে না দাঁড়াত, তবে না জানি সেদিন আরো কি হ'ত! কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কোথা থেকে সে ছুটে এসেছিল ওভাবে ওখানে! নিশ্চয়ই সে বুঝতে পেরেছিল কিছু। তার সন্দেহ হয়েছিল, সেজন্য সে যথেষ্ট সতর্কও হয়েছিল। আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনার উপর সে লক্ষ্য রেখেছিল। মনে হচ্ছে কোন গুপ্ত স্থান থেকে সমস্তই সে দেখছিল। কিন্তু তা'র সমস্ত সতর্কতাই শেষ পর্য্যন্ত নিষ্ফল হয়েছিল। ভবিতব্য খণ্ডাতে তার সাধ্য হয় নাই।...

সব চেয়ে আশ্চর্য্য মীনার তখনকার মূর্ত্তি, তার ভাব। তার মুখে চোখে পিতার প্রতি স্নেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ক্রোধ ও অভিমানের দ্বন্দ্বের ছাপ! ভ্রাতার প্রতি তার চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণা, ক্রোধ, আগুনের ফুলকি! স্বামীর মর্য্যাদার জন্য তার ইহজীবনের সর্ব্বস্ব ত্যাগ! তৎক্ষণাৎ সেই অভিশপ্ত গৃহত্যাগের জন্য আমার প্রতি তার নীরব দৃষ্টির কাতর আহ্বান! তার ভাসা-ভাসা চোখের মণির উপর টলটলায়মান অশ্রুজল! সেই অশ্রুর অন্তরালে কত কথা, কত ব্যথা, কত মমতা!...

আশ্চর্য্য দৃঢ়তা তার! সব ছেড়ে যাচ্ছিল জন্মের মত, তবুও যেন তার বুক কাঁপছিল না, পা' দুলছিল না একবারো।...ফটকের সাম্নে বাপ ভাইয়ের পায়ের কাছে ধুলায় লুণ্ঠিতা মাকে দেখে, কাতরকণ্ঠে মীনা মীনা ব'লে তাঁর ডাক শুনে' তার ধৈর্য্যের বাঁধ একবার ভেঙ্গেছিল। মা মা ব'লে একটা মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ তার কণ্ঠ ভেদ ক'রে বেরিয়েছিল। কিন্তু সেই একটীবারই মাত্র, আর নয়! পিতার মুখে স্বামীর মর্ম্মান্তিক নিন্দা শুনে', মায়ের কাছে যাওয়ার পথ বন্ধ দেখে' তার কণ্ঠ, তার গতি রুদ্ধ হয়েছিল। স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে করুণ দৃষ্টিতে বোধ হয় জন্মের মতই একবার শেষ দেখা মাকে দেখে নিয়েছিল। আর একটী মাত্র দীর্ঘশ্বাস তার প্রাণের গভীর বেদনা নিয়ে বায়ুতে মিশেছিল। তা'র অন্তরকে সে নির্ম্মম হ'য়ে ক্ষত বিক্ষত ক'রে ফেলেছিল, কিন্তু তাও স্বামীর বা শ্বশুরকুলের মর্য্যাদার অণু-পরমাণুও ক্ষুণ্ণ হ'তে দেয় নাই। আশ্চর্য্য মনের বল মীনার! আমার পাশেই ঘোড়ায় তাকে দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, কি অসীম শক্তিশালিনী এই নারী! তার কাছে কত ক্ষুদ্র, কত বলহীন না নিজেকে মনে হচ্ছিল

তখন! তার গর্ব্বে গর্ব্বিত হয়ে সেই কঠোর অপমানও ভুলে গিয়েছিলাম, মনে হয়েছিল আমার মত সুখী, আমার মত ভাগ্যবান্ এ দুনিয়ায় আর কে? কিন্তু তবুও এ দশা কেন হ'ল আজ আমার?

কিন্তু সেই অপমান ভুলতে পারি নি। অপমানের জ্বালায় জ্বলে মরেছি, ছটফট করেছি রাতদিন। ভেবেছিলাম দূরে থাক্‌লে, ব্যস্ত থাক্‌লে, ওবিষয়ের আলোচনা না শুনলে সময়ে ভুলে যা'ব। তাই বনে বনে, মাঠে মাঠে, ঘোড়ায় বন্দুক হাতে শিকারের পেছনে পেছনে ছুটেছি, খামকা খামকা গ্রামে গ্রামে প্রজাদের মধ্যে গিয়ে সামান্য বিষয় নিয়ে বিচারে ব'সে নিন্দা, প্রশংসা, পুরস্কার, অকাতরে দান ক'রেছি। তারা দেখে শুনে' অবাক হয়েছে। আনন্দে তাদের মুখে কথা ফোটে নাই। নীরবে তারা আনন্দ ভোগ করেছে। হঠাৎ আবার একসময় তাদের কিছু না বলে না ক'য়ে ঘোড়ায় চড়ে' গ্রাম ছেড়ে চ'লে গেছি। ছুটেছি, কেবল ছুটেছি, হাওয়ার আগে, বিদ্যুদ্বেগে, লক্ষ্যহীন উন্মাদের ন্যায়! ঘোড়ার বুক পৃথিবীর বুক ছোঁ'র ছোঁ'র করেছে। ওভাবে ছুটবার অক্ষমতা জানিয়ে ঘোড়া চীৎকার ক'রে উঠেছে। কিন্তু তবুও বিরাম ছিল না সে ছুটার। কেবল বায়ুর হন্‌ হন্‌ সন্ সন শব্দ আমার কানে প্রবেশ করেছে। কেবল আমি আমার ঘোড়া আর ওই মাটি ছাড়া আমার চোখে আর কিছু পড়ে নাই। অন্য কিছু দেখতে চাই নাই, শুনতে চাই নাই, ভাবতেও চাই নাই কিছু। শুধু চেয়েছি সব—কিছু ভুলে থাক্‌তে। কিন্তু কই, তবুও ত' তা মন থেকে দূর হয় নি? মীনার কাছে থেকে দূরে দূরে থেকেছি, রাত্রেও ঘরে আসি নি, পাছে মীনার সঙ্গে দেখা হয়, ও বিষয়ের কথা হয়, আলোচনার বেড়াজালে পড়ে পাছে আমাদের দু'জনের মধ্যে অভাবনীয় কিছু একটা ঘটে? কিন্তু তবুও সেই অপমানের তীব্র দংশনে আমি থেকে থেকে পাগল হ'য়ে উঠেছি। তবুও সেই অভাবনীয় কিছুর হাত এড়া'তে পারি নি। অবশ্যম্ভাবী রূপে তা' আমার জীবনকে হৃতসর্ব্বস্ব ক'রে ধ্বংসের মুখে এনে ছেড়ে' দিল! তারপর একদিন হঠাৎ এখানে—এই ঘরে সব শেষ হ'য়ে গেল, সবকিছুর মীমাংসা হ'য়ে গেল! জীবনের পথের সীমা অদূরে স্পষ্ট দেখতে পেলাম! সেই দিকে—সেই দিকে ছুটে চলেছি আজ, বড় দ্রুত—বড় দ্রুত! এ-গতি অদম্য! ধেয়ে যাচ্ছি সেই লক্ষ্যের দিকে!.. বিধিলিপি! বিধিলিপি!...

অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারতাম না কি? খুব পারতাম। কিন্তু আমি চাই নি তা'। প্রজারা এসেছিল ক্ষেপে প্রতিশোধ নিতে। আমি তাদের দূর ক'রে দিয়েছি। কেন আমি কি পারি না তা? আমার বাহুতে কি বল নাই যে তারা আসবে সাহায্য করতে? আমার তা ভাল লাগে নাই, আরো যেন অপমান মনে হয়েছে! আমি চেয়েছিলাম ভুলতে। হয় ত' ভুলতেও পারতাম সময়ে। কেবল সময়ের প্রতীক্ষা করছিলাম। কিন্তু সে-সময় আর এল না। বিধিলিপি অন্যরূপ!

আর ক'দিন থাকব দূরে দূরে লুকিয়ে লুকিয়ে এমন ক'রে। আর যে পারা যায় না! অসহ্য হ'য়ে উঠল। আমার প্রাণ যে ফেলে এসেছিলাম তা'দের কাছে! তা'দের না দেখলে যে অস্থির হ'তাম, এক মুহূর্ত্ত না দেখে যে পারতাম না! আর ক'দিন ছেড়ে থাক্‌ব তা'দের? খোকার কথা মনে হ'তেই মনটা কি রকম দুলে উঠত, তাকে বুকে করতে ইচ্ছা হ'ত। ভাবতাম মীনা না জানি কি করছে, কত কি ভাবছে আমার বিষয়। হয় ত' সে ভাবছে আমি নিষ্ঠুর, ইচ্ছা ক'রে এ-সব করছি!— কিন্তু সত্যিই কি সে বুঝ্‌তে পারছে না আমার মনের অবস্থা?... দূর থেকে লুকিয়ে তা'দের দেখব ব'লে একদিন চুপি চুপি অন্যের অলক্ষ্যে এই ঘরে এসে দাঁড়ালাম। নীরবে এই জানালা দিয়ে উঁকি মেরে চেয়ে থাকলাম নীচের দিকে তাদের অপেক্ষায়! আমার বুভুক্ষিত মন প্রাণ তাদের খুঁজছিল, তাদের চাচ্ছিল বুকের কাছে! এক এক মুহূর্ত্ত এক এক যুগ ব'লে মনে হচ্ছিল! কিন্তু কোথায় তারা?

হঠাৎ পিছনে শ্বাস-প্রশ্বাস পতনের শব্দ শুনে' চমকে ফিরে তাকালাম। এ-কি! এই ত' তারা, যাদের জন্য প্রাণ আমার কাঁদছিল! খোকাকে বুকে ক'রে আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে মীনা! চোখে তার জল। গণ্ডে অশ্রু-চিহ্ন। মুখখানি গভীর অব্যক্ত বেদনায় কাতর, মলিন। তার পলকহীন করুণ দৃষ্টিতে কত অভিমান, কত ভর্ৎসনা! সে-দৃষ্টি ভর্ৎসনা ক'রে যেন আমায় বলছিল, 'কি নিষ্ঠুর! কি নিষ্ঠুর তুমি!' আমার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ ক'রে উঠল! ইচ্ছা হচ্ছিল খোকাকে বুকে নিয়ে চুম্বনে চুম্বনে তার কচি গণ্ড রক্তে রাঙ্গা ক'রে দিই, তার মুখের খল্‌খলে হাসিটুকু বের ক'রে এনে দেখে বুক ঠাণ্ডা করি! মীনাকে আলিঙ্গন করি, চুম্বনে চুম্বনে তার গণ্ডের, চোখের অশ্রু মুছে নিই, মুখের মলিনতা দূর ক'রে দিয়ে উজ্জ্বলতা ফুটিয়ে তুলি! তারা যে আমার—আমার—আমার প্রাণ, আমার সর্ব্বস্ব!...কিন্তু কই! কিছুই ত' পারলাম না! পা এগুল না, হাত উঠল না! কে আমায় এমন পাষাণ ক'রে দিল? কে সে? কিন্তু পাষাণের ত' প্রাণ নাই, সে কিছু বোঝে না। আমার ত' প্রাণ ছিল। সবই বুঝতে পারছিলাম। আমার অন্তরে তবে কিসের খেলা? কি তা?...

...পাতলা ঠোঁট দু'খানি তা'র কেঁপে কেঁপে বেঁকে উঠল। নাকের পাতা দু'টি ফুলে' উঠল। আবেগভরা অন্তর তার। কাঁপা কাঁপা স্বরে সে বলল, 'এখনো ভুলতে পার নি সে-কথা! আমি—আমার সে...' আর তার বলা হ'ল না কিছু অভিমানের অশ্রু ঝর্ ঝর্ ক'রে তার বুকের উপর ঝ'রে পড়ল।

...সেই কথা—সেই কথা! যে-কথা শুনব না ব'লে, আলোচনা করব না ব'লে আমার প্রিয়তম জন থেকেও দূরে বনে বনে লুকিয়ে ফিরেছি, যে-কথা ভুলবার জন্য নিশিদিন প্রতি মুহূর্ত্ত মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ ক'রেছি, এ-সেই কথা! আমার বিদ্রোহী অন্তর সুযোগ খুঁজছিল, এবার অবসর বুঝে' আক্রমণ করতে উদ্যত হ'ল। আমি প্রাণপণে সব ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ ক'রে কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তার মিনতি, প্রার্থনা, সহানুভূতি, সান্ত্বনা, প্রেরণা, মান, অভিমান, ভালবাসার কত কথা আমার কানে প্রবেশ ক'রে অন্তর স্পর্শ করছিল। তার কোন উত্তর

তাকে দিতে পারি নাই। আমার উদ্বেলিত অন্তরকে চাপতে গিয়ে কি ভীষণ যন্ত্রণাই না ভোগ করছিলাম! উঃ!...কিন্তু তবুও শেষ পর্য্যন্ত চেপে থাকতে পারি নাই। কি ক'রে তা পারব? অন্তরভরা যে বিষ ছিল। বিষের জ্বালা কি ক'রে নিবারণ হ'বে? তার ক্রিয়া কি ক'রে বন্ধ হ'বে? মীনার সঙ্গে দু'এক কথার পর হঠাৎ তাদের কুল তুলে কথা কইলাম! তবুও সে সহ্য করেছিল। পায়ে ধ'রে কত মিনতি তার ও কথা আর না তুলতে। উঃ!—মানুষের অমন মিনতি আর কখনো জীবনে দেখি নাই! তার কায়-মন-বাক্য যেন এক যোগে সে-মিনতি জানাচ্ছিল! কিন্তু আমি তখন পাগল—বিষের জ্বালায় মরিয়া হ'য়ে ক্ষেপে উঠেছি! যত কথা তাকে বলছিলাম তার প্রত্যেক অক্ষরে আমি প্রতিহিংসা চরিতার্থতার আনন্দ উপভোগ করছিলাম! দুনিয়ার আর সব কিছু ভুলে গিয়েছিলাম। পাগলের আর কি থাকে!...তার পিতৃকুল তুলে অতি কুৎসিত ভাষায় গাল দিলাম, যার পর-নাই তার অপমান করলাম।...প্রথমটা সে বজ্রাহতের ন্যায় স্পন্দনহীন দেহে স্তব্ধ হ'য়ে রইল।...এক মিনিট, দুই মিনিট, তিন মিনিট...তার পর তার দেহ হঠাৎ সাড়া দিল—একটা ঝঙ্কার দিয়ে কেঁপে উঠল। মুহূর্ত্তে বুকের শিশুকে দূরে মাটীর উপর ফেলে দিয়ে টান হ'য়ে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। চোখে যেন তার আগুনের ফুল্‌কি! রাগান্বিত স্ত্রীকে ফণিনীর সঙ্গে তুলনা করতে দেখেছি, কিন্তু এবার তা চোখের সামনেই দেখলাম। ফণিনী যেন গর্জ্জে উঠল। সেও তার প্রতিহিংসা নিল—হীন, নীচ কুল ব'লে আমার পিতৃকুলকে গাল দিল।

ইহার পর হীরুর মৃত্যুর পূর্ব্ব দিনের দৈনিক লিপিতে এই লেখা রহিয়াছে—

ফিরে এসেছি। শান্তি পাচ্ছি না। বুকে আগুন। পুড়ে যেন যাচ্ছে সব! উঃ! উন্মাদ হয়ে যতই দূরে ছুটে গেছি ততই বুকের আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠেছে! কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। তবে কি কিছুতেই নিববে না এ আগুন?...মীনা—মীনা আমায় বল্লে এমন কথা? মীনাও? সেও তবে দেখে ছোট ক'রে আমাদের বংশকে? মীনাও? যে আমার জীবনের চেয়ে অধিক—আমার সর্ব্বস্ব, সেও দেখে এমন হেয় ক'রে আমাদের? পারল সে একথা মুখ দিয়ে আনতে? কে তবে আমার?...

...অপমান! অপমানের উপর অপমান! স্ত্রীর কাছে! কি কাপুরুষ আমি! স্ত্রীর কাছে অপমানিত হ'য়ে অনাহারে অনিদ্রায় রাতদিন পথে পথে পাগলের ন্যায় ছুটে' ফিরেছি। কা'র ভয়ে? স্ত্রীর? শ্বশুর-বংশের? এদের ভয়? আমি ভয় করছি এদের?—হা হা হা—কিন্তু আর না। দাঁড়াও। অপমানের প্রতিশোধ নিচ্ছি। এমন ক'রে নেব যে মানুষ তা শুনেই যেন আতঙ্কে শিউরে উঠে...হা হা হা...মীনার রক্তে—তার বুকের কলিজার রক্ত...হাঁ হাঁ, তার ওই বুকের রক্তই চাই, বুকের ওখানেই সে—অপমানের জন্ম...তাজা তপ্ত রক্তে আমার হাত রাঙ্গিয়ে দেখব কেমন দেখায়,—তারপর যে-রক্তে তার জন্ম সে-রক্তের চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত পৃথিবীর বুক থেকে মুছে' দেব।...হা হা হা...এই যে এই বন্দুকেই হ'বে সে-কাজ... না না, বন্দুকে নয়, বন্দুকে নয়, আমার কোমরের এই তলোয়ার দিয়ে, একটু একটু ক'রে, একবারে অনেক রক্তপাত হ'তে দেব না, বিন্দু বিন্দু পড়বে; তাদের রক্তে পৃথিবীর বুক ভেসে যাবে, আমার সর্ব্বাঙ্গ রাঙ্গা হ'বে; তা'দের করুণ আর্ত্তনাদে মানুষ-পশু-পাখীর অন্তর, আকাশ, বাতাস কেঁপে উঠবে! আমার অন্তর কিন্তু কাঁপবে না একটুও। আমি কেবল তা'দের রক্তপাত এবং চোখের জল দেখে' হাসব...হা হা হা...অপমান!—অপমানের প্রতিশোধ চাই—প্রতিশোধ।...

...কিন্তু তার দোষ কি? সে ত আগে কিছু ক'রে নি? আমিই ত আগে তার অপমান ক'রেছি, যার-পর-নাই অপমান। মানুষ তা সহ্য করতে পারে না। সে তার প্রত্যুত্তরে করেছে মাত্র। স্ত্রীলোক সে। পিতৃকুলের নিন্দা যে স্ত্রীর অসহ্য! ওরূপ উত্তর ত' তার পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। তবে কি দোষ তার? সে আমার স্ত্রী বটে, কিন্তু তার রিপু ত সবগুলিই বর্ত্তমান! যে-কথায় আমার রাগ হয় সে-কথায় তার রাগ হবে না কেন? সেও ত মানুষ। স্ত্রী ব'লে কি তার আত্ম-সম্মান, আত্ম-মর্য্যাদা বোধ নাই? নিশ্চয়ই আছে।...কিন্তু তবুও সে আমার—আমার স্ত্রী। তার কাছে অপমান! এ যে অসহ্য...সে আমার, জীবনে মরণে! তার পৃথক্ অস্তিত্ব কোথায়? মুখে নারীর সমান অধিকার স্বীকার করলেও মন ত সে-কথায় সায় দেয় না। স্ত্রী পুরুষের অধীন, পুরুষের প্রভুত্ব চিরকালের। নারীর পৃথক সত্তা? অসম্ভব তা। তা' হ'তেই পারে না।...মীনা—আমার স্ত্রী, তার কাছে অপমান! এ যে অসহ্য!—অসহ্য।—এ জ্বালা যে সহ্য হচ্ছে না আর! এমন অপমানিত জীবনের ভার বহন ক'রে লাভ?...

...মীনা কি দেখে নাই, জানে না আমি এসেছি ফিরে এ ঘরে? তবে? সে ত এল না কাছে? ডাকল না আমায় আদর ক'রে আগে যেমন ডাক্‌ত? এত অহঙ্কার তার? এত তাচ্ছিল্য? পিতৃকুলের এত গর্ব্ব তার? আর সেই জন্যই আমায় এমন ছোট ক'রে দেখা?...উঃ!...ভুল! ভুল! কি ভুলই হয়েছিল হিসাবে! মানুষ বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ হিসাব করে কত সাবধান হয়। কিন্তু যতই সে সাবধান হয় ততই সে ভুল করে—মারাত্মক ভুল! বাবা বংশের মান বাড়া'তে বড় বংশের মেয়ে এনে পুত্রবধূ ক'রেছিলেন! তিনি এর দোষগুণ জান্‌তেন। তাই দোষের দিক্‌টায় নিজে সাবধান হ'য়েছিলেন, আমাদেরও ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কথা শুনি নাই। তাই এ দুর্ভাগ্য...অসম্ভব! কিছুতেই তা দূর হয় না। আভিজাত্যের অভিমানের বিষ মানুষের রক্তের সঙ্গে মিশে থাকে! ফণিনীর ন্যায় হঠাৎ দংশন ক'রে হলাহল ঢেলে দেয়! বড় অসহ্য জ্বালা তার! আজ বুঝতে পারছি তার স্ব-রূপ।...কিন্তু ভুল হয়েছিল, বড় ভুল...আমাদের বিয়ে যদি সমান ঘরে হ'ত তবে ত আজ... আমি আমার বংশধরকে ঐ আভিজাত্যের ধার দিয়েও যেতে দেবো না...না না, কিছুতেই না। বড় বংশ কিন্তু কে বড়?

কিসে বড়? কে তার বিচার করছে? মানুষগুলোর কি একরকমের দুর্ব্বলতা এটা—একটা ব্যাধি, পাগলামি!...বড় বংশ! বড়!…হা হা হা…

...না না, অহঙ্কার তার কোথায়? রাত এখন ক'টা? বোধ হয় দু'টা। এখন সে জেগে আছে। ওই ত বাতি জ্বলছে টিম্ টিম্ করে তার ঘরে। জেগে আছে কেন সে এত রাত? বোধ হয় —বোধ হয় কেন—নিশ্চয়ই, আমার কথা ভাবছে—ওই ত ওই ত সে বেরিয়ে এসেছে! খোকা তার বুকে! খোকার ঘুমন্ত ক্ষুদ্র দেহটুকু এলিয়ে পড়েছে মায়ের বুকের উপর! ওই ত, ওই ত চেয়ে আছে সে এঘরের দিকে—এই আমার সাম্নের জানালা দিয়ে আমায় দেখবে ব'লে। আমায় দেখতে না পেয়ে এদিকে ওদিকে কত উঁকি ঝুঁকি মারছে, ছট্‌ফট্ করছে যেন! চোখ দুটি তার অশ্রু-ভরা, দেখা যাচ্ছে টল্‌টল্ করছে! বুকটা তার হঠাৎ উঁচু হ'য়ে উঠে ধীরে, ধীরে নীচু হ'য়ে পড়ল না? হাঁ হা তাই, তার দীর্ঘশ্বাস বুঝি ধীরে ধীরে বায়ুতে মিশে গেল! কিন্তু কই, সে ত ডাকছে না আমায় একবারো? ওই যে—ওই যে সে আমায় দেখতে না পেয়ে ঘুমন্ত শিশুকে তুলে ধরেছে দু'হাতে এই জানালার দিকে, আমি যেন তাদের দেখতে পাই। সত্যিই তাদের দেখতে পাচ্ছি আমি এখান থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে। কিন্তু সে জানতে পারছে না আমি যে তাদের দেখছি…বিড়ম্বনা! বিড়ম্বনা! এত কাছে তারা অথচ পাচ্ছি না তাদের আমি বুকের কাছে, হায় অদৃষ্ট!…ওই যে—ওই যে রয়েছে তারা দাঁড়িয়ে এখনও সেই একই স্থানে, একই ভাবে আমার প্রতীক্ষায়। আমার প্রতীক্ষায় থেকে থেকে হতাশায় মুখখানা তার আরো ক্লান্ত, মলিন, প্রাণহীন দেখাচ্ছে, না? তা-ই তা-ই, যাচ্ছি, যাচ্ছি আমি এখনি, ওই খোলা জানালায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি তার মুখের দিকে চেয়ে। উঃ! প্রাণটা যে কি করছে! ইচ্ছা হচ্ছে প্রাণ-ভরে ডাকি তাকে নাম ধ'রে চীৎকার ক'রে। প্রাণটা আমার আছাড় খেয়ে পড়ছে 'মীনা! মীনা! খোকা! খোকা!' ব'লে আর্ত্তনাদ ক'রে! আমার প্রাণের সে আকুল রোদন যেন আমার কানে এসে বাজছে, দেহে ঝঙ্কার তুলছে, আমায় পাগল ক'রে তুলছে, কিন্তু কে যেন আমায় ধ'রে রাখছে, পাষাণ ক'রে ফেলছে! প্রাণটা যেন আমার কণ্ঠে এসে পড়েছে। কে যেন আমার কণ্ঠে চেপে' ধরেছে তাকে। উঃ! গেলাম, গেলাম। আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে' আসছে। চোখে আঁধার দেখছি। শরীর ঝির্ ঝির্ করছে। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে! আর তাদের দেখতে পাচ্ছি না। উঃ! বড় কষ্ট

যাচ্ছে—যাচ্ছে সে চ'লে। ফিরে ফিরে ওই শেষবার দেখে যাচ্ছে এই জানালার দিকে। ওই যে ঝ'রে পড়ছে তার চোখের জল—পড়ছে পড়ছে, অবিরাম পড়ছে তার অশ্রু, বিন্দু বিন্দু, গণ্ডে, বুকে, ঘুমন্ত শিশুর মুখে। গতি তার দ্রুত—বিরক্তি, অভিমান, ক্রোধে জড়িত। চ'লে গেল সে! তার কক্ষের দ্বার সশব্দে রুদ্ধ হল। ..উঃ!…আবার—আবার আমায় পাগল ক'রে তুলছে… সেই অপমান, অভিমান। ভুলতে পারছি না তা। অবিরাম তার দংশন! অসহ্য—অসহ্য। কি করব—কি করব আমি?...

নাঃ! এমন জীবনে দরকার? নাঃ! তাকে—কাউকে আর এ মুখ দেখাব না। তবে আর কি! আর থেকে কি হ'বে? আজই—আজই তবে, এখনি—এখনি।…

হঠাৎ হীরুর লিপিতে এখানে মস্তবড় একটা ফাঁক। হঠাৎ যেন তার ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

তাহার শেষদিনের লিপি এই—

পারি নাই—পারি নাই শেষ করতে জীবনটা নিজহাতে। চোখ বুজে বন্দুকের মুখটা আমার মুখে পুরে দিতেই জিবে বড় ঠাণ্ডা লাগল। গা-টা শিউরে উঠল। চোখটা হঠাৎ খুলে গেল। ডান হাতের তিনটি আঙ্গুল ঘোড়াটাকে কেবল ছু'য়েছিল। আঙ্গুলের চাপ দিলেই ঘোড়াটা গিয়ে হাতুড়ির ন্যায় ওই বারুদের উপর আঘাত করত, আর অমনি ঠিক তখনি চ'খের সাম্নে মীনার ছবি ভেসে উঠল—বিষণ্ণ, মলিন, অশ্রুমুখী! তার পাশে দেবশিশুর ন্যায় খোকার পবিত্র কচি মুখখানি। মায়ের বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল শিশু অবাক হ'য়ে। মুখের চপল হাসি তার কে যেন কেড়ে নিয়েছিল। জননীর কি করুণ ছবিই না ভেসে বেড়াচ্ছিল আমার চোখের সাম্নে। সর্ব্বাঙ্গ আমার থর থর ক'রে কেঁপে উঠল, বুকটা ধড়াস্ ধড়াস করতে লাগল—বুকের কাঁপনি আর থামছিল না, প্রাণটা যেন বেরুব বেরুব করছিল! শরীরটা অবসন্ন হ'য়ে এল। বন্দুকের ঘোড়ার উপর থেকে হাতটা খ'সে পড়ল। বন্দুকের নলটা মুখ থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল! ধড়াস ক'রে বন্দুকটা মেঝেতে পড়ে' গেল! এতরাত্রে শব্দটা খুব জোরে শুনাল। যেখানে বসেছিলাম সেখানে ব'সেই একদৃষ্টে বন্দুকটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কি রকম ভয় হ'তে লাগল—ঐ বারুদের উপর ঘোড়াটা একবার কোন রকমে পড়লেই উঃ! ভাবতেও পারছি না, ভয়ে চোখ বুজলাম।

পারি নাই ওভাবে চলে যেতে। তাকে মনে পড়তেই সব যেন কেমন ওলট্ পালট হয়ে গেল। সব ভুলে গেলাম। কি যেন কেবল টানছিল আমায় তার দিকে। এমন টান যে রোধ করা যায় না তা। কিসের এ টান? তাই তাকে ছেড়ে যেতে পারি নাই।…বড় ভালবাসি তা'কে। এত ভালবাসা কেউ বুঝি কখনো বাসে নাই, তা দেখে নাই, শোনেও নাই। তা ব'লে বুঝাবার ক্ষমতা আমার নাই, তার পরিমাণ জানি না। তা যেন অপরিমেয়, অতল! না না, এতেও বুঝি তা বলা হচ্ছে না। তার সঙ্গে বিচ্ছেদ? চিরতরে? তা যে কল্পনায়ও আনতে কষ্ট হচ্ছে এখন। না, না—তাও কি সম্ভব! মীনা, মীনা!

আচ্ছা হঠাৎ এমন একটা কিছু ঘটছে না কেন যা'তে এসব দূর হ'য়ে যায়? যা'তে আমরা আবার সেই—সেই আগের মতন হ'য়ে যাই? কেবল মীনা আর আমি, আমি আর মীনা, এ দুনিয়ার বুকে, ওই আকাশের পাখীর ন্যায় কেবল ঘুরে বেড়াই! আর কেউ নয়—আর কেউ নয়! হাসি, খেলা আনন্দ, কৌতুক দিয়ে জীবনটাকে ডুবিয়ে রাখি সেই আগের মতন! তা হয় না কেন? কত ত শুনেছি, পড়েছি হঠাৎ একটা—কিছু হয়ে' মানুষের সব ওলট পালট হয়ে যায়, আবার আগের দিন ফিরে আসে আবা

বেশী আনন্দ নিয়ে, পুনর্মিলনকে মধুময় ক'রে দিয়ে যায়! এক্ষেত্রে তা হচ্ছে না কেন? কেউ কি নাই সে পরিবর্ত্তন এনে দেয়? আছে—আছে সবাই, কিন্তু নাই কেউ-ই। কেমন ক'রে বুঝবে তারা এ অন্তরের কি কথা, কি ভাব, কোথা ব্যথা, কি ব্যথা? মানুষ যদি তা না পারে তবে দৈবও কি পারে না? সর্ব্বনিয়ন্তা স্বয়ং না:···বৃথা ভাবছি আমি ওসব, তা হবার নয়। সবই বিধিলিপি!·

···এক মুহূর্ত্তও কাটতে চাচ্ছে না আমার! এক পলকে মনে হচ্ছে যেন এক যুগ!···উঃ! অসহ্য যন্ত্রণা!·· কি ক'রে দিন যাবে আমার?···ওই যে বিদায়ের পালা সুরু হয়েছে—দিন-দেব বিদায় নিচ্ছেন নিজের গরিমায় নিজেই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে। চারদিকে তাঁর গরিমার ছটায় যেন তাঁর বিদায়ের ম্লান হাসি! পশ্চিমের সারা আকাশ, তার গায় স্তরে স্তরে সাজানো সাদা সাদা মেঘগুলি ধূসর রংএ রাঙ্গা হ'য়ে উঠেছে। বড় বড় গাছের মাথায় সে-ছটা এসে পড়েছে, মনে হচ্ছে মাথায় যেন সোণার মুকুট ঝলমল্ করছে! ...এই ত' ওই গোপালভোগ আমগাছটার ফাঁকে ফাঁকে এ-ঘরের পশ্চিমের জানালাগুলি দিয়ে এসে মেঝেতে কিরণ লুটাচ্ছে আমার পায়ের গোড়ায়! কি সুন্দর অথচ কি গভীর বেদনাদায়ক এ দৃশ্য: বৃক্ষলতা সবাই যেন স্তব্ধ হ'য়ে দেখছে তা!...দেখে নেই ভাল ক'রে। আর যদি দেখবার সৌভাগ্য না হয়? আর যদি দিনের আলো না দেখি? কে জানে কি হবে?...তাঁর যেন তর্ সইছে না, ক্রমাগত চলেছেনই চলেছেন, কারো জন্য অপেক্ষা নাই, কারো মনের সুখ-দুঃখের দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই!...ঐ ত' একটা আধ-কালো মেঘের আড়ালে পড়ে'গেলেন!—আঃ! কি বিশ্রী এই মেঘটা! যেন একটা নিষ্ঠুর দৈত্য!···যা'ক, ওই যে বেরিয়েছেন ফুটে আবার!—ওই যে তালগাছটার মাথা থেকে নেমে পড়েছেন—তারপর ওই সুপারি, নারকেল গাছগুলির মাথা থেকেও নীচে এসে পড়লেন—তারপর আমগাছগুলির মাথার নীচে—তারপর গ্রামের প্রান্ত রেখায় যেন স্থির হয়ে আছেন—এক মুহূর্ত্ত!—শুধু এক মুহূর্ত্ত!—এইবার—এইবার যাচ্ছেন—এই শেষ বার—এই এই—যাঃ! টুক্ ক'রে ডুবে গেলেন!—

—কি কঠিন এই বিদায় নেওয়া! কি ভয়ানক পীড়াদায়ক! কি নির্ম্মম এই বিদায়ের দৃশ্য! প্রাণে এমন একটা গভীর ক্ষত রেখে যায়, যা জীবনেও যায় না! অথচ বিদায় নিচ্ছে সবাই—পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, মানুষ, এমন কি চন্দ্র-সূর্য্যও। মানুষ দেখে, শোনে, জানে সব, তবুও ভাবে, বিদায়ের কালে ভাবী বিচ্ছেদ-যন্ত্রণার ভয়ে পাগল হ'য়ে যায়!—কিছুই বোঝা যায় না—প্রহেলিকা!—দিন-দেব যাচ্ছেন, কিন্তু আমার যাওয়া? সীমানায় ত' এসে পৌঁছেছি, বিলম্ব তবে কিসের? কিসের আশায়? কা'র প্রতীক্ষায়? কি বন্ধন আর?—না না,, আর না, আর না, আর দেরী না—

—এ-কি! আমার অন্তরে এ-কি হচ্ছে আজ। যেন বাঁশীর সুরের প্রতিধ্বনি হচ্ছে আমার অন্তরে। কোন্ সুদূরে বাজছে যেন সে বাঁশী! সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় আমার অন্তর দুলে উঠছে! সে মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় কা'র যেন ডাক শোনা যাচ্ছে—আয়, আয়, ওরে আয়, আর কেন? সে-ডাক আমায় পাগল ক'রে তুলছে। কে ডাকছে আমায় এমন ক'রে? সে-ডাকে যেন অভয় বাণী! কা'র এ-গান? কি সুর বাজছে বাঁশীতে? বিদায়ের গান? আমার অন্তর প্লাবিত ক'রে, সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত ক'রে উঠছে সে-গান—ওহে দীন দুনিয়ার মালিক! কোথা তুমি ব'সে? আমি আশায় আশায় ব'সে আছি খেয়া-ঘাটে এসে!—

—এ-কি! এমন করছে কেন মন?—এ কি সব হচ্ছে মনে আমার! যেন চলেছি এক অজানা দেশে, অজানা পথে, অজানার উদ্দেশে!—চলেছি একা শূন্যে শূন্যে। চলেছিই চলেছি, সে-পথের যেন শেষ নাই—কারা যেন ডাকছে আমায় পেছন থেকে, অশ্রু-রুদ্ধ করুণ কণ্ঠে! পরিচিত কণ্ঠস্বর! কা'রা—কারা এরা?—মীনা, খোকা না? হাঁ-হাঁ, তা'রাই ত', তা'রাই!—ডাকছে-ডাকছে তা'রা করুণ কণ্ঠে—এস, এস, ফিরে এস, কোথা যাচ্ছ তুমি?—ছুটে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে তাদের কাছে, কিন্তু উপায় নাই! সেখান থেকে যে আর ফেরা যায় না!—প্রাণ আমার আর্ত্তনাদ ক'রে উঠছে—মীনা! মীনা! খোকা! খোকা!—কিন্তু পাচ্ছি না তাদের, পাচ্ছি না!—উঃ! দম ফেটে যাচ্ছে আমার!—উঃ! উ.!—

—এ-কি হ'ল আমার!—সর্ব্বাঙ্গ আমার ঘর্ম্মাক্ত। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম পড়ছে কপাল থেকে। শরীরটা হিম হ'য়ে গেছে, থেকে থেকে কাঁপছে। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। সারা অঙ্গ অসার, অবশ, যেন মৃত আমি!—মনে আজ এ-সব হচ্ছে কেন? স্বপ্নেই ত' কেবল তা' সম্ভব। কিন্তু আমার জাগ্রত অবস্থায়ই তা' হচ্ছে কেন?—উঃ! কি বিষম যন্ত্রণা! উঃ!—জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হচ্ছে আজ বিধাতাকে, তোমার মৃত্যু-যন্ত্রণা কি এ-যন্ত্রণার চেয়েও অধিক?—

—আমি একা, এই অন্ধকারে। গা-টা ছম্ ছম্ করছিল! বাতি জ্বেলেছি। আমার চারদিকে এই সামান্য বাতির আলোটুকু নিয়ে ব'সে আছি। তার বাইরেই ঘুটঘুটে অন্ধকার, দৃষ্টি চলে না। কখন সূর্য্য অস্ত গেছে, কখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে, কখন সন্ধ্যার ছায়া ঘন হ'য়ে হ'য়ে আঁধার হ'য়েছে, কখন আকাশের গা, পৃথিবীর বুক বিরাট আঁধারে ঢেকেছে, কখন আঁধার আকাশের গায়ে ব'সে অগণিত তারা জোনাকীর ন্যায় মিট্ মিট্ করছে, তা কিছুই জানতে পারি নি। সেই একই জায়গায়ই ত' ব'সে আছি। একটুও ত' নড়ি-চড়ি নাই। মনে হচ্ছে এই ত' সূর্য্য পশ্চিমে হেলে প'ড়েছিল, পড়ন্ত রোদ এসে আমার গায়ে মাথায় কাপড়ে জড়িয়েছিল, এই ত' এই একটু আগেই। আর এরই মধ্যে সন্ধ্যা পার হ'য়ে রাত এসেছে, সঙ্গে আঁধার নিয়ে!—উঃ! কি ভীষণ অন্ধকার! কোন দিকেই কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বিশ হাত দূরের ওই বকুল গাছটা পর্য্যন্ত না! বকুল ফুলের সুবাস মৃদু বায়ুতে ভেসে এসে ভুরভুর ক'রে আমার গায়ে লেগে নাকে প্রবেশ করছে। কিন্তু গাছটা দেখতে পাচ্ছি না!—নিঝুম রাত। সাড়া শব্দ কিছুই নাই

কোথাও। জীব জন্তু কা'রো যেন চেতনা নাই। যেন আঁধারের রাজ্যে এক ঘুমন্ত পুরীর মধ্যে মাত্র আমি জাগ্রত, আর কেউ না। নিশীথ রাতের বায়ুর মোহন স্পর্শে যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল ঢলে প'ড়েছে। কেবল আমিই জেগে আছি। জ্বল্‌ছি ধিকি ধিকি তুষের আগুনে, বিষের ক্রিয়া চলছে নিশিদিন অবিরাম। নিশার বাতাস অঙ্গে লেগে [illegible]'র মন পুলকে শান্তিতে ভবে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তা'তে আ[illegible]র কি? আমার আগুন নিবছে কি সে-শীতল বাতাসে?—মর[illegible] তুমি কত দূরে?—

...রাত বোধ হয় অনেক হয়েছে। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে। শরীরটা ভেঙ্গে আস্‌ছে।·· ওটা আলো নয়? হাঁ, তাই ত! এতক্ষণ আলোটা চোখে পড়ে নাই? এইমাত্র বোধ হচ্ছে কেউ জ্বেলেছে। কিন্তু এত রাত্রে?...ওটা ত মীনার ঘর! আশ্চর্য্য! কি করছে সে এত রাত্রে আলো জ্বেলে? তার ঘরের ওই খোলা জানালাটা দিয়ে তার ছায়া স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ঘরের এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত সে যেন ধীর পদক্ষেপে পা[illegible]চারী করছে। নিশ্চয় ঘোর চিন্তায় সে মগ্ন, তা' না হ'লে পদক্ষেপ ওরকম হয় না।...কিন্তু চিন্তা। কি তার চিন্তা এমন? সে কি অপমান ভুগেছে? যার বিষের জ্বালায় মানুষ পাগল হ'য়ে যায়? অস্ত্র-গুলি খুলে ফেল্‌লেও যার ক্রিয়া বন্ধ হয় না?···হয়ত সে ভাবছে···না না, ও কিছু নয়, কিছু নয়!...একটা শব্দ হ'ল না? যেন কেউ কবাট খুল্‌ছে, ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে।...ওই ত বেরিয়ে আস্‌ছে সে ঘর থেকে, বেরিয়ে আস্‌ছে, খোকা বুকে তার, আজও শিশু ঘুমন্ত দেবতার পবিত্র চিহ্ন খোকার শান্ত মুখে, ইচ্ছা হচ্ছে ওর মুখে একটা চুম্বন করি—অতি সন্তর্পণে যেন সে না জাগে। কিন্তু পারছি কই তা? পিপাসিত প্রাণটা আমার কেমন করছে! উঃ! . আজও ঠিক সেদিনের মতনই মীনা আমার জানালার দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। আজ তার চোখে জল নাই। মুখখানা তার ফ্যাকাসে, এক ফোঁটাও রক্ত নাই, যেন, ঠিক যেন মৃতের মুখ! এলোমেলো চুল, আলুথালু বেশ! কিন্তু তার ওই রক্তহীন চোখে-মুখেও যেন একটা দৃঢ়তা! বড় অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে তা!... হঠাৎ তার শরীরটা যেন দুলে উঠ্‌ল, যেন ভিতরের কি একটা তরঙ্গ এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে চঞ্চল ক'রে তুল্‌ছে। ...হঠাৎ মীনা যাচ্ছে কোথা? পদক্ষেপ তার দ্রুত কিন্তু দৃঢ়।...এই যে—এই যে সে চ'খের আড়াল হ'য়ে যাচ্ছে! উঃ! তাকে দেখতে না পেলে প্রাণটা কেমন ছটফট্ ছটফট্ করতে থাকে! ডাকি তাকে—ডাকি খুব জোরে, চীৎকার ক'রে, আমার মনের চিন্তা, ভাবনা, ভয়, সব যেন তা'তে ঢেকে যায়!... না;...ডাক্‌ব না...

...সিঁড়ির দিকটায় তাকে যেতে দেখলাম না? দেখি, কান পেতে শুনে' কিছু শোনা যাচ্ছে কি না?...হাঁ, হাঁ, শোনা যাচ্ছে পায়ের শব্দ, ধাপে ধাপে উঠছে কে যেন সিঁড়ি বেয়ে! মীনা? হাঁ, হাঁ, নিশ্চয়ই সে, আর কে হবে? আসছে সে!...সত্যি সত্যিই তবে আস্‌ছে সে? এতদিন—এতকাল পরে? মনে হচ্ছে কত যুগ আসেনি সে আমার কাছে, পাইনি তাকে বুকের কা'ছে?...শুন্‌তে পাচ্ছি তার পায়ের শব্দ। বড় আস্তে আস্তে আস্‌ছে সে। এত আস্তে কেন? আরো তাড়াতাড়ি জোরে আসছে না কেন? এ রকম ত তার অভ্যাস নয়? এত ধীর মন্থর গতি আমার যে সহ্য হচ্ছে না! সে কি জানে না আমি তার জন্য...বোধ হচ্ছে যেন সে দরজার কাছে কাছে এসেছে। খুল্‌ব তবে দরজা?...না, না, আগে খুল্‌ব না। সে দরজায় যখন টুক্ ক'রে একটু শব্দ করবে তৎক্ষণাৎ আমি ছুটে গিয়ে দরজা খুলে' দিয়েই তাকে জড়িয়ে ধরব, আমার বুকে—বুকের মধ্যে তা'কে ধরে রাখ্‌ব, চুম্বনে চুম্বনে তার চোখের জল, গণ্ডের অশ্রু-ধারা মুছে নেব, অজস্র চুম্বনে তার মুখে পূর্ব্বের সেই হাসি ফুটিয়ে তুলে তা'কে পাগল ক'রে দেব...উঃ! আমার বুকের ভিতর কি হচ্ছে!···এমন ধড়াস্ ধড়াস্ ত কখনো করেনি! এমন কাঁপুনি ত কখনো কাঁপেনি আমার বুক! বুকের উপর হাতটা চেপে রেখেছি, প্রাণটা আমার ছট্‌ফট করতে করতে যেন হাতটার উপর আছাড় খেয়ে পড়ছে, স্পষ্ট অনুভব করছি তা...

...এত দেরী হচ্ছে কেন তার? কই আর ত কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না? তবে কি এ সে নয়? নিশ্চয়—নিশ্চয় সে-ই! তবে?···ওইত—ওইত, শিশুর কণ্ঠস্বর নয়? হাঁ হাঁ, তাই, আমি স্পষ্ট শুনেছি তা। খোকা বোধ হয় ঘুমের চোখে কেঁদে উঠেছে। তার বোধ হয় এই গভীর রাতের এমন ঠাণ্ডা হাওয়া সহ্য হচ্ছে না, তাই সে কাঁদছে। মীনার কি আক্কেল! এত রাত্রে খালি গা ছেলেটাকে বুকে ক'রে.. ছিঃ!...

···অনেকক্ষণ হ'য়ে গেছে। এখনো ত সে দরজায় ঘা দিচ্ছে না? কি করছে তবে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মীনা? · একি! এ কিসের শব্দ! পায়ের শব্দ ব'লে মনে হচ্ছে! কে যেন সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে, দ্রুত—অতি দ্রুত, চঞ্চল পদে! কে—কে এ? মীনা?···হাঁ, হাঁ, নিশ্চয় সে-ই। কাছে এসেও গেল চ'লে সে!...সত্যি—সত্যিই সে গেল?...যা'ক্·· এ[illegible] অহঙ্কার তার? এখনো? সেই অপমানের পরেও এত তাচ্ছিল্য তার?... হয়ত' ভুল্‌তে পারতাম কোনদিন পূর্ব্বের সে-কথা—সে অপমান। কিন্তু এর পর? এই অপমানের উপর অপমানের পর?— স্ত্রী সে আমার, স্ত্রী·· নিজে—সে নিজে করেছে আমার এই অপমান!···প্রতিশোধের উপা[illegible] নাই, অসম্ভব তা'—স্ত্রী সে আমার!·· এ অপমানের জীবন নিয়ে আমি কেমন ক'রে যাব লোকের মাঝে? না, না, অসম্ভব তা', অসম্ভব!...

···অপমান আরো তীব্র হ'য়ে উঠ্‌ছে আমার অন্তরে! আগুন জ্বল্‌ছে যেন! কি ভয়ঙ্কর জ্বালা! উঃ! পাগল ক'রে তুল্‌ছে আমায়? আর ত সহ্য হচ্ছে না! আর যে সহ্য করা যায় না! তবে কি করব আমি? কি করব? পথ কোথায়—পথ?...উঃ! মাথার ভিতর কি যেন কট্‌কট্ করছে! নাক দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে! পাগল বুঝি হ'য়ে যাচ্ছি আমি—পাগল, পাগল...অপমান—সেই অপমান যেন গ্রাস করছে আমায়! উঃ!...

···এই ত পথ রয়েছে আমার, খোলা, আমার সাম্নেই অবারিত...এই [illegible] আমার পায়ের কাছেই রয়েছে পড়ে' সে প্রশস্ত পথ! বড় সুন্দর পথটি। এ পথের যাত্রী হ'লে আর ঘুরতে ফিরতে হয় না—একটানা পথ! পথের সুরুতে শুধু একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য যা একটু কষ্ট! কষ্ট? বোধ হয় একটু!...কিন্তু তারপর আর কিছু না—শুধু চির বিশ্রাম, চিরশান্তি'... বন্দুকটা দেখে ত আজ ভয় হচ্ছে না একটুও? প্রাণ ত কাঁপ্‌ছে না? তা[illegible] আজ মনে হচ্ছে চিরবন্ধু! এক অচ্ছেদ্য বন্ধন যেন রয়েছে তার সঙ্গে! আরো মনে হচ্ছে এবার বন্দুকের মুখটা আমার মুখে পুরে' দিলে গা শিউরে উঠ্‌বে না। বন্দুকের ঘোড়াটা টিপে ধরলেও বুক কাঁপ্‌বে না, মুখ দিয়ে আর্ত্তনাদ বেরুবে না, প্রাণ কাঁদবে না একটুও আর জগতের কারো জন্য?···তবে আর কি? সে যদি এসে ফিরেই গেল, তবে আর কা'র জন্য প্রতীক্ষায় থাকা?... তবে এস বন্ধু?—এস আমার শেষের দিনের বন্ধু! তোমায় আমায় গাঢ় শেষ আলিঙ্গন!···আজই···এখনি তবে খেলার শেষ!···

হঠাৎ এখানে লিপিটির পূর্ণচ্ছেদ! ঐ শেষ কথাটির সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইতেছে হীরুরও সব শেষ হইয়াছে '...রক্তের ছিটা লিপিটুকুর শেষ পৃষ্ঠা ভরা! স্থানে স্থানে রক্তের চাপে লেখা অস্পষ্ট! বন্দুকের গুলি তাহার ব্রহ্মতালু ভেদ করিয়া বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে ফোয়ারার ন্যায় রক্ত ঝরিয়া পড়িয়াছিল তাহার চতুর্দ্দিকে। তাহার চিহ্ন আজও রহিয়াছে। সেখানে আজ সংজ্ঞাহীনা মীনা পড়িয়া আছে। আমার মনে হইতেছে এখানে বসিয়াই হীরু স্ব-হস্তে তাহার সমস্ত যন্ত্রণার অবসান করিয়াছিল। তাহার চারিদিকে

ছিটকাইয়া-পড়া রক্ত সামের ঐ দেয়ালটার গায়ে গিয়াও পড়িয়াছিল, সে-চিহ্ন আজও মুছিয়া যায় নাই।

ভূলুণ্ঠিতা মীনার পানে একবার তাকাইয়া হীরুর ছবিটির দিকে চাহিলাম। তৎক্ষণাৎ মন আমার এই প্রশ্ন করিল, হীরু তুমি কোথায় গেছ কি ভাবে আছ, তা জানি না, কিন্তু এদের এভাবে ফেলে গিয়ে তুমি যে শান্তি চেয়েছিলে সে শান্তি পেয়েছ কি?

তারপর দৈনিক লিপিতে লেখা তাহার শেষের দিনের যন্ত্রণার কথা মনে হইতেই প্রাণের ভিতর একটা হাহাকার জাগিয়া উঠিল! একটা দীর্ঘশ্বাস, অবিরাম নীরব অশ্রু তাহার তর্পণ করিল! আমার প্রাণে জাগিয়া থাকিবে চিরদিন আমার সেই হতভাগ্য, অভিমানী, অপমানিত বন্ধুর জীবনের শেষের ক'দিনের বেদনা-জড়িত স্মৃতি, তাহার জন্য একটা হাহাকার!

[সমাপ্ত]

মন

শ্রীগৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

'আব্রহ্মস্থাবরান্তঞ্চ সর্ব্বদা সর্ব্বজাতয়ঃ।
সর্ব্ব এব জগত্যস্মিন্ দ্বিশরীরাঃ শরীরিণঃ॥ যোঃ উঃ ২২৯

সমস্ত দেহধারীই দ্বিশরীরী, তন্মধ্যে এক শরীর মনোময় অন্য শরীর মাংসময়। মনোময় শরীর সতত চঞ্চল এবং ক্রিয়াশীল, মাংসময় শরীর স্থূল এবং মনোময় শরীরের ক্রীড়নক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মনোময় শরীর আয়ত্ত করা আয়াসলভ্য হইলেও মনোময় সূক্ষ্ম শরীরের যে যেরূপ প্রযত্ন করে, সে তদনুরূপই ফল লাভ করে। মনোময় দেহের চেষ্টাই সফল হয়, কেবল মাংসময় শরীরের কোন চেষ্টাই সফল হয় না।

মানসিক বৃত্ত্যাদির প্রাবল্যে দৈহিক দুঃখ-কষ্টাদি কষ্ট-দায়ক বলিয়াই মনে হয় না। দেশপ্রাণতায় যুদ্ধে প্রাণদান, কামাদির মোহে রাজ্য ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সর্ব্বস্ব ত্যাগ এবং সর্ব্ব প্রকার শারীরিক কষ্টে উপেক্ষা সহজেই সম্ভব হয়; কারণ, তখন মনোময় দেহ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। মানসিক কোন একভাবে অভিনিবিষ্ট হইলে স্থূল শরীরের চিন্তাই থাকে না। কোন প্রবল বাসনার উদ্রেক হইলে পূর্ব্ববাসনার বিষয় মন হইতে অপসৃত হয়।

সলিল যেমন স্পন্দন মাত্রেই চঞ্চল হইয়া উঠে, মনও সেইরূপ নিমেষের মধ্যে নবভাবে উৎফুল্ল হয় এবং পূর্ব্বভাব ত্যাগ করে। কল্পনানুযায়ী ফল প্রাপ্ত হইয়া মন হর্ষ বা বিষাদের সহিত সেই ফল ভোগ করে। কোন বিষয় মনে প্রতিভাত হওয়ামাত্র নিমেষের মধ্যে তাহা স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয় এবং উপভোগক্ষম হইয়া পড়ে। বাসনার প্রাবাল্যে হেয়ও উপাদেয় বোধ হয়, অমৃতও বিষবৎ হইয়া উঠে; সমস্তই কিন্তু কল্পনার ফল।

কল্পনা মন হইতে উদিত হয়। সেই মন অনন্ত আত্ম-তত্ত্বের সঙ্কল্পশক্তিরচিত। পরমাত্মতত্ত্বের সঙ্কল্পশক্তি হইতে প্রথমে মনস্তত্ত্ব অর্থাৎ আত্ম প্রজাপতি ব্রহ্মার আবির্ভাব হয়। সেই ব্রহ্মাই মন ("তেন রাম যোহয়ং পরমেষ্ঠী তন্মনস্তত্ত্বং বিদ্ধি" যোঃ উঃ ৯৩।৪)। তাহার পাঞ্চভৌতিক দেহ নাই। তাহার দেহ আতিবাহিক। জন্মমৃত্যুহীন শান্তরূপী মহান্ চিদাকাশ, চিত্তের বা মনের কল্পনায় জগদাকারে বিবর্ত্তিত হন। এই চিত্ত যথেচ্ছাচারী; মনোভাব অনুসারে অশরীরকে শরীর বলিয়া কল্পনা করে। চিত্ত যেমন সম্বিদের অনুসারী সেইরূপ চেষ্টাও চিত্তের অনুসারিণী। যাহার জ্ঞান-সংস্কার যেরূপ থাকে, উদ্বুদ্ধ হইলে ঠিক সেইরূপ অনুভূতি জন্মায়। চিত্ত যখন আতিবাহিক ভাব অনুভব করে, তখন আতিবাহিক ভাবই সত্য এবং আধিভৌতিক ভাব অসত্য; যখন আধিভৌতিক ভাব সত্য, তখন আতিবাহিক ভাবকে কল্পিত জ্ঞান করে; কারণ জ্ঞানের রূপ এক।

আত্মচেতন চিত্তসমাক্রান্ত হইয়া সংসার দর্শন করে। চিদাকাশে চিৎস্বভাবের বিরোধী যে আবরণরূপ—প্রথম বিবর্ত্ত, বা বিশেষ অবস্থায় স্থিতি, আপনিই উদিত হয়, তাহাই অধ্যাত্মশাস্ত্রে মন। মনের সবিকল্পজাল দ্বারা জগৎ উদ্ভাসিত হইতে থাকে, নামরহিত আত্মার চেতোন্মুখতা হেতু চিত্ত, পরে চিত্ত হইতে জীবত্ব, জীবত্ব হইতে অহম্ভাব, অহম্ভাব হইতে চিত্তের বিষয়তন্মাত্রা, তাহা হইতে ইন্দ্রিয়াদি—ইন্দ্রিয়াদি হইতে দেহ, দেহ হইতে দেহগত মোহ, তাহা হইতে কর্ম্ম, কর্ম্মানুযায়ী বন্ধ, মোক্ষ ইত্যাদি বিস্তৃত হইতেছে। চিদাত্মা ব্রহ্ম ও জীব একই। অভ্যাসবশে চিত্ত বিষয়দর্শনের অভাবে উপশান্ত হইয়া যায়। চিত্তের প্রাণ কল্পনা। সেই কারণেই কল্পনাক্ষয়েই চিত্ত বা মন অন্তর্হিত হয়। কল্পনা-রূপ চিত্তের আবরণ হইতে মুক্ত হইলেই আদ্যন্তরহিত অজ, স্বপ্রকাশ চিন্মাত্র পরমাত্মাই শুদ্ধজ্ঞানে প্রকাশিত হন।

মনই স্বয়ং চিত্তবিভাগ দ্বারা জগৎ-স্বরূপে পুরোভাগে লক্ষিত হইতেছে। অসীম পরমাত্ম-সমুদ্রে লহরীর মত মন উত্থিত ও বিলীন হয়। এই কল্পনাবরণ দেহীর অন্তরাত্মাকে কোন প্রকারেই বিকৃত করিতে পারে না। মনোরূপ লৌহাবরণ চূর্ণ না করিলে সেই অন্তরাত্মার নিকট জ্ঞান

পৌঁছিতে পারে না। চিত্তের ভাবনামাত্রই কল্পনাজাত; সকল মানসিক অনুরাগ ও বিরাগই মনের কল্পনা-প্রসূত। জীবচৈতন্য সাধনাদি দ্বারা কখনও নির্ম্মল কখনও কল্পনার মোহ-মালিন্যযুক্ত হইতেছে। এক অবস্থায় বিমল আনন্দ লাভ এবং অন্যাবস্থায় সাংসারিক দুঃখকষ্টাদি ভোগ অবশ্যম্ভাবী।

আকাশে স্পন্দাস্পন্দ-স্বভাব বায়ুর মত স্পন্দাস্পন্দস্বভাব চৈতন্য ব্যতীত এই দৃশ্যবিশ্বে অন্য কিছুই নাই। চিতি আপনাকে মন বলিয়া কল্পনা করেন অর্থাৎ আপনিই আপনার দৃশ্য হন। তাহাই চিৎস্পন্দন এবং সেই স্পন্দনই সংসার। স্পন্দস্বভাব প্রকটিত হইলে তিনি সৃষ্ট্যুন্মুখী হন, নচেৎ শান্ত বা শুদ্ধ থাকেন। এই স্পন্দহীন অবস্থাই নিত্য, পরমসুখদ জ্ঞানমূর্ত্তি, তিনি অনুভূতিস্বরূপ কিন্তু নিজে কাহারও অনুভবগম্য নহেন; অথচ তাঁহারই সাহায্যে অপরাপর পদার্থসমুদায় অনুভূত হয়। বাহ্যিক দর্শন ও অন্তরস্থ বিজ্ঞান সকলই তিনি, তদতিরিক্ত কিছুই নাই। তাঁহাকে বাদ দিলে জীবত্ব, বুদ্ধিত্ব—ইন্দ্রিয়ত্ব এবং বাসনাদির কিছুই থাকে না। জ্ঞেয়, জ্ঞান, জ্ঞাতা এই ত্রিপুটী তাঁহাতেই প্রতিবিম্বিত হইতেছে। চিত্ত যতদূরই ধাবিত হউক না কেন, চিদাকাশই সেই চিত্তবৃত্তিকে প্রকাশ করে, সেই যে প্রকাশ তাহারই নাম সম্বিৎ বা জ্ঞান। সর্ব্বজীবেই তিনি বোধ, জ্ঞান বা অনুভূতিরূপে বিদ্যমান।

জগতের প্রকৃত কর্ত্তা মন; মনে যাহা করা হয় তাহাই প্রকৃতপক্ষে কৃত; শরীর কেবল মানসিক প্রেরণায় কার্য্য করে। মন যে দৃশ্য সৃজন করে তাহাই দৃশ্য হয়, চর্ম্মপাদুকাবৃত পদ সর্ব্ব স্থানই চর্ম্মাচ্ছাদিতের মত বোধ করে। বর্ত্তমান জ্ঞান কল্পনার গণ্ডী পার হইতে পারে না। সেই জন্য চিত্ত বা মনের বিলাস কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। চিত্তে বা মনে বিষয়ের যে মূর্ত্তি কল্পিত হয় দৃশ্যদর্শন তদনুরূপই হইয়া থাকে। চিত্ত বিষয়ে যে মূর্ত্তি যোজনা করে বা কল্পনায় বিষয়ের বা দৃশ্যের যে মূর্ত্তি স্থির করে তাহা নষ্ট করিতে কেহই পারে না। জীবের মনে যে নিশ্চয় বদ্ধমূল হইয়া যায়, সে নিশ্চয় নিরোধ করিবার ক্ষমতা সেই জীব ভিন্ন অন্য কাহারও নাই।

জীবের স্বরূপ চৈতন্যে স্মরণকারী অন্তরকরণ রূপ যে উপাধি আবির্ভূত হয় সেই অন্তঃকরণ সৃষ্টিদর্শনের মুখ্য কারণ। সাধারণ জীব যাহা দেখে বা শুনে তদ্বিষয়ই সঙ্কল্প করে। আত্মা দৃষ্টও নহেন, শ্রুতও নহেন, সুতরাং ইন্দ্রিয় বা মনের বিষয়ীভূত নহেন। কিন্তু তিনি অন্তর্যামী। তিনি সকলের মনে সন্নিহিত এবং মননশক্তি-সম্পন্ন, এই জন্য সর্ব্ববিষয়ের মননকারী। তিনি একমাত্র নিত্য, সত্য; অন্য সমস্তই নশ্বর, কারণ কল্পনাজাত।

কল্পনার ঘনতা বশতঃ মনোময় দেহও সাধারণের চিন্তার বিষয় হয় না। মনোজাত স্থূল দেহই বর্ত্তমান জ্ঞানে সর্ব্বস্ব হইয়াছে। যোগবাশিষ্ঠের লীলাসরস্বতী উপখ্যানে জ্ঞানের এই বর্ত্তমান অবস্থা নির্দ্দেশের জন্য "অয়ং তদ্দর্শনদ্বারে দেহো হি পরমার্গলম্." দেবীর মুখ হইতে এই উক্তি নিঃসৃত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান জ্ঞানের রূপ এত স্থূল হইয়া পড়িয়াছে যে, দেহাতিরিক্ত অন্য কিছু যে আছে তাহা জ্ঞানে কদাচিৎ উদয় হয়। সেই দেহাত্মিকা বুদ্ধি মনোময় দেহের চিন্তারও অবকাশ দেয় না। শরীর ও মনের প্রকৃত অবস্থার জ্ঞান হইলেই কল্পনামেঘ-উন্মুক্ত হইয়া চৈতন্যস্বরূপ শুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তি আপনিই উদ্ভাসিত হন।

জগৎকে যে সত্য বলিয়া বোধ হয় সে সত্যানুভূতি জগতের নহে, সে সত্যতা চিদাত্মার। পঞ্চকোষান্তর্গত চিদাত্মার সত্যতাই জগতে প্রতিফলিত হয়। মনই আদ্যশরীর। এই দেহসমূহ পরে মন দ্বারা কল্পিত হয়। এই মনঃশরীরই আত্মার আদ্য ভোগায়তন। এই মন সর্ব্বত্র অহম্ভাবে আবির্ভূত হইয়া অস্মিত্বের বিচিত্র কল্পনানুযায়ী দৃশ্য বিশ্বের নানা বৈচিত্র্য কল্পনা করে। এই কাল্পনিক মূর্ত্তির উৎপাদিকা শক্তি মন ব্যতীত আর কাহারও নাই। মনই আদিতে জীবের অঙ্কুরাকারে আবির্ভূত হয়। পরে ঐ মনোরূপ অঙ্কুর হইতে তরুপল্লবের মত দেহসমূহ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পল্লব নষ্ট হইলে যেমন অঙ্কুর নষ্ট হয় না দেহ নষ্ট হইলে তেমনি মন বা চিত্তের নাশ হয় না। চিত্ত পুনরায় নানাবিধ নব দেহ সত্বর উৎপাদন করিয়া লয়, কিন্তু যদি চিত্তক্ষয় হয় দেহের ক্ষমতা আর কিছুই থাকে না। প্রতিভাসপ্রাপ্ত আত্মাই চিত্ত। সেই প্রতিভাসই মন ও দেহ প্রভৃতি। চিত্ত ভিন্ন অপর কিছুতেই দেহপ্রতীতি হয় না।

যে কিছু ভোগ্য সমস্তই মনোময়; সকল দৃশ্যের স্থিতিই মনে এবং সেই মনও স্বকারণের অনতিরিক্ত। ভাবনা মাত্রই মন।

এ জগতে এমন কিছুই নাই যাহা শুভকর্ম্মানুসারী পুরুষকার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া না যায়, চিত্তই কামকর্ম্মাদি বাসনার অনুসারী হইয়া আত্মাতে জগদ্বৈচিত্র্য দেখায়। চিৎ যে আপনার বিচিত্র শক্তি প্রদর্শন করিতেছে, বিস্তার করিতেছে—তাহা প্রকৃত জ্ঞানের দৃঢ়তা ভিন্ন উপশান্ত হইবার নহে।

মনোরূপ দেহ আতিবাহিক, স্পন্দ-ধর্ম্ম প্রাণের; স্পন্দন বা কর্ম্ম বিরত হইলে মনও ক্ষীণ হইয়া যায়। কর্ম্মনাশে মনোনাশ ও মনোনাশে কর্ম্মনাশ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু এই মনোলয়মূলক অকর্ম্মতা মুক্তপুরুষেই সম্ভব, অন্যত্র নহে; কারণ তখন আত্মা অন্তঃকরণরূপ উপাধিশূন্য হইয়া পড়েন; এই উপাধিই দ্বিত্ববুদ্ধি ও সর্ব্বকর্ম্মের কারণ। ঐ উপাধি মন,

বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, কর্ম্ম, কল্পনা, স্মৃতি, বাসনা, বিদ্যা, ইন্দ্রিয়, প্রকৃতি ও ক্রিয়ারূপে মানসিক বৈচিত্র্য ঘটাইতেছে।

আছে কি নাই, এই অবস্থাদ্বয়ের মধ্যে যখন মন দোদুল্যমান হয় অর্থাৎ উভয় পক্ষের মধ্যে থাকিয় কোন একভাবে অবস্থিত হইতে পারে না, অর্থাৎ সংশয়াত্মিকা অবস্থা, তাহাই মনের সঙ্কল্পারূঢ় অবস্থার রূপ। আত্মা সদা চিদ্রূপ হইলেও "আমি জানি না" এতদ্রূপ প্রত্যয় যাহা দ্বারা উপস্থিত হয়, এবং কর্ত্তা না হইলেও যে অহঙ্কর্ত্তা এবম্প্রকার প্রতীতি যাহা দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাই মন বলিয়া কথিত। পরা সম্বিৎ যখন স্বাশ্রিত অবিদ্যা দ্বারা কলঙ্কিতপ্রায় হইয়া উন্মেষরূপিণী হন 'ইহা এই' 'তাহা সেই' ইত্যাদি প্রকার কল্পনা করেন, তখন সম্বিৎ মন হইয়া অবস্থিতি করেন। মিথ্যা বিকল্প কল্পনা দ্বারা আপনার পরমত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্বাদি যখন কল্পনাচ্ছাদিত হয়, তখন সেই চৈতন্যই মন বলিয়া কথিত হন।

বিবিধ কল্পনার মধ্য হইতে কোন এক কল্পনাকে নিশ্চয় করিয়া চিদ্ যখন সুস্থিরভাবে অবস্থান করেন তখন তাহার নাম বুদ্ধি। এই বুদ্ধিই বস্তু নিশ্চয় করে।

উক্ত সম্বিৎ যখন মিথ্যাভিমান অবলম্বনে আপনার সত্তা কল্পনা করেন, তখন তিনি অহংকার সংজ্ঞায় প্রথিত হন। এই অহংকার সর্ব্বপ্রকার অনর্থের বীজ ও বন্ধনের কারণ।

যখন তিনি পূর্ব্বাপর প্রতিসন্ধান ত্যাগ করিয়া বালকের ন্যায় এক বিষয় পরিত্যাগ ও অন্য বিষয় স্মরণ করেন তখন তিনি চিত্ত নামে কথিত।

যখন শরীর সাহায্যে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার জন্য প্রযত্নযুক্ত হন, তখন তিনি কর্ম্ম নামে উদাহৃত।

যখন অনির্দ্দিষ্ট আকস্মিক কারণে নিজ পূর্ণতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাঞ্ছিত বিষয়ের কল্পনা করেন তখন তিনি কল্পনা নামে অভিহিত হন।

সেই সম্বিৎ যখন সূক্ষ্ম পদার্থশক্তিরূপে অবস্থিতি করেন তখন তিনি বাসনা নামে উদাহৃত হন। বাসনা বিষয়ের স্থায়িত্ব ভাবনার অনুগামী।

যখন কেবল বিমল আত্মতত্ত্বই আছে, দ্বৈতদৃষ্টি তদীয় অবিদ্যা-কলঙ্কের ফল বা প্রভাব, সুতরাং মিথ্যা—এবংবিধ জ্ঞানে প্রস্ফুটিত হন, তখন তিনি বিদ্যা নামে অভিহিত হন।

ঐ মনোভূতা সম্বিৎ শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, ঘ্রাণ ও ভোজনাদি দ্বারা জীবভাবাপন্ন ইন্দ্রকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে আনন্দিত করে বলিয়া ইন্দ্রিয় নামে কথিত হন।

তিনি স্বয়ং কর্ত্তা এবং উপাদান হইয়া এই দৃশ্য-বিশ্ব নির্ম্মাণ করেন বলিয়া প্রকৃতি নামে অভিহিত হন।

মন জড় নহে, চেতনও নহে, চেতন ভাব-প্রাপ্তও নহে; চিদ্বস্তু যখন সংসার দশায় আরূঢ় হইয়া উপাধি-মালিন্য বহন করেন, তখন তিনি মন আখ্যায় অভিহিত হন। প্রত্যেক প্রাণীতে অবস্থিত জগৎ-কারকের যে আবিল বা অবিদ্যা-গ্রস্ত রূপ তাহাই চিত্তনামে কথিত।

চিত্ত ব্রহ্মদৃষ্টিতে ব্রহ্মময় ও চিত্তদৃষ্টিতে চিত্ত। মনন-শক্তির উদ্রেকে ব্রহ্মই মনঃপ্রাপ্ত হন। মনের তন্ময়তা যেরূপ, বস্তু দর্শনও তদ্রূপ। জগতের কথা দূরে থাকুক, জগৎ-কারক জীবও ব্রহ্ম। স্বকল্পনার আবরণে তিনি আপনাকে জীব বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। বালকের নিকট মিথ্যা উপকথার মত এই জগৎ প্রপঞ্চ অজ্ঞের নিকট সত্য-স্বরূপ প্রতীত হইতেছে।

কল্পনা কোন বস্তু নহে, এজন্য কল্পনাকে কল্পনা বলিয়া বুঝিলেই আপনা হইতেই তাহা স্থান হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। কল্পনা-ভাবভাসিত—প্রতিভাসিকাত্মিকা সংসার-রচনা কল্পনার শক্তিতেই প্রকাশিত হইতেছে, বস্তুতঃ ইহা সঙ্কল্প ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। পরমাত্মার প্রথম সঙ্কল্প হইতে এই জগৎ সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল, পরে জীবের কল্পনায় স্পষ্টভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। রূপপ্রতীতির কারণ আলোকের মত অর্থ-প্রতীতির কারণ মন, অজড় মন সংসারের কারণ নহে এবং প্রস্তরের মত জড়-মনও বিশ্বের কারণ নহে; জড় বা অজড়—এই প্রতীতি কেবল মাত্র মনোমূলক বা কল্পনামূলক, আকারবিহীন হইয়াও মন অভ্যাসবশে বিবিধ-ভাবে পরিবর্দ্ধিত হয়। মনন-বৃত্তি বাসনা বিস্তৃত করিয়া ভয়াবহ যোনি-প্রাপ্ত হয়, এবং সুখ-দুঃখ অনুভব করে, মন যখন আমি শরীরী এই দৃঢ় সঙ্কল্প করে—তখন স্থূল শরীরী হইয়া তথাবিধ ব্যবহার করে—। অন্তঃপুরমধ্যে সাধ্বী স্ত্রীর মত স্বীয় সঙ্কল্প রচিত বিবিধভাবে মন দেহের মধ্যে বিচরণ করিতেছে। যেহেতু মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত মন বিদ্যমান থাকে, প্রকৃত পক্ষে তাহা মরে না—। ইহলোকে ইহলোকের ভাবে বিচরণ করুক বা পরলোকে পরলোকের ভাবেই বিচরণ করুক, চিত্ত মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিবেই করিবে, চিত্তোপশম ব্যতীত মায়ামালিন্যহীন পরম-পদ পাইবার অন্য কোন উপায় নাই—। যে মুহূর্ত্তে মন লয় হয়—সেই মুহূর্ত্তেই পরম বিশ্রান্তি জন্মে।

বিষ্ণু-পুরাণে মনকেই বন্ধ-মোক্ষের কারণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

> "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ।
> বন্ধস্য বিষয়াশক্তিমু'ক্তৈনির্ব্বিষয়ং তথা॥"

মন, বাসনা বা কেবল আশার দ্বারা—সজীব থাকে।

বিষয়তৃষ্ণার শান্তি হইলেই চিত্ত বা মন শীর্ণ হইয়া যায়। কল্পনা সীমাহীন, সেই জন্য চিত্তের অবস্থাও অনন্ত। মন বা চিত্ত আপনার কুকল্পনায় আপনাকে ব্যথিত করে—; স্বকীয় বাসনা দ্বারা আপনিই আপনাকে প্রহার করে। পরে

অনুতপ্ত হইয়া সংসার হইতে পলায়নপর হয়—। জাগতিক বিষয়ের স্বকল্পিত কাল্পনিক মূর্ত্তিতে মন বদ্ধ হইয়া আছে—, ভবিষ্যৎ পর্য্যালোচনা না করিয়াই নিয়ত—নিজেই নিজের দুঃখের কারণ হইতেছে।

এই কল্পনামুগ্ধ জ্ঞানে তাহার আধার আত্ম-চৈতন্য প্রকাশ পাইবে না—। মনের কল্পনা জগতের প্রকৃত রূপ দেখিতে দেয় না, তাহার কল্পনাচ্ছাদিত মূর্ত্তি সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, চৈতন্য বা ব্রহ্ম আপনাকে গোপন করিতে অসমর্থ হইয়া চিত্তরূপ অণু বিস্তার করতঃ তদ্দ্বারা জগৎ আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছেন। চৈতন্য নিজে কল্পনামুগ্ধ নহেন। তাহার পক্ষে কল্পনা কল্পনাই। জীবের পক্ষে কল্পনা সত্য। চৈতন্য আত্ম চৈতন্যরূপ লোচনেই দেখেন; সেই চৈতন্যই প্রকৃত লোচন, চক্ষু বা ইন্দ্রিয়াদি তাহার দ্বার মাত্র। সেই চিত্তরূপ কল্পনাবরণ ছিন্ন না করিলে জীবের পক্ষে স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন কখনই সম্ভব হইবে না।

আখ্যাহীন মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর চিন্মাত্র পরমাত্মা আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম, বীজের মধ্যে বৃক্ষের অবস্থানের মত পরমাত্মরূপ অণু এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের আধাররূপে বিদ্যমান। তাঁহারই সত্তায় এই জগৎ সত্ত্বপ্রাপ্ত। জগতের প্রত্যক্ষানুভূতি—সেই চিৎ-সত্তার শক্তিতেই হইতেছে, জগৎ আছে—এই যে অনুভূতি বা উপলব্ধি তাহা কেবল আত্মচৈতন্যমূলক। ইন্দ্রিয়াতীত বলিয়া বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব জ্ঞানে সেই আত্ম-চৈতন্য অস্তিত্ববিহীন হইয়া পড়িয়াছে। মানসিক কল্পনার প্রাবল্যে তাঁহার স্বীকারোক্তি—কেবল কথায় থাকিয়া যায় মাত্র,—প্রকৃত পক্ষে কিন্তু সেই অনন্ত চিদণু সর্ব্বাত্মক, তাহাই বক্তা ও মন্তা। তাহাই সর্ব্বস্বরূপ এবং সর্ব্বজীবে মনোরূপে বিদ্যমান। বাহ্যদৃষ্টি-সম্পন্ন ইন্দ্রিয়ের ও মনের অতীত হইলেও তিনিই জগৎ-রত্নের কোষ। কল্পনায় জগতের সহিত একাত্ম-ভাব প্রাপ্ত হইলেই জড়, নচেৎ চেতন চিন্মাত্র, সুতরাং তিনি উভয়ই। আশ্রয়হীন পরমাকাশে সেই চিদণুকর্ত্তৃক বিচিত্র জগৎ চিত্রিত হইতেছে। বহ্নির মত সর্ব্ব প্রকাশ হইলেও তিনি অদাহক। চিতি বা চৈতন্য বলিয়াই তিনি আছেন, ইন্দ্রিয়ের বা কল্পনার অতীত বলিয়া তিনি নাই। চিদ্রূপ বলিয়াই তিনি অতিনিকটে, ইন্দ্রিয়ের বা কল্পনা-প্রাণমনের অলভ্য বলিয়া তিনি বহু দূরে অবস্থিত। দৃশ্যরূপে প্রস্ফুটিত হন বলিয়া তিনি প্রত্যক্ষ। এই মন বা চিত্ত স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তনের একমাত্র প্রতিবন্ধক। সেই কারণে স্বরূপোপলব্ধির জন্য একমাত্র মনই বিচার্য্য, মনোমূলক জগদ্-বৈচিত্র্য বিচার্য্য নহে।

কে বলে ভাই নিরেট ওরা

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

কাস্তে হাতে ঐ যারা ভাই চ'লছে মাঠে রৌদ্রে ধুঁকে,
নয়রে চাষা, জাতির আশা…অন্ন জোগায় দেশের মুখে।
রিক্ত প্রাণে দৈন্য নিয়ে স্বর্ণ দিয়ে সাজায় বেদী,
দুঃখ এলে ছিন্ন বাসে শক্তি ধরে ঝঞ্ঝা ভেদি'।
কে বলে ভাই নিরেট ওরা আস্তাকুড়ের আবর্জ্জনা?
হোক্ না চাষা, জাতির আশা, ওরাই জাতির আপনজনা।

লক্ষপতি না হোক্ ওরা—কী তাতে ভাই এলো গেল,
ছিন্নবাসের গর্ব্ব ওদের সূর্য্যপ্রাণের প্রসাদ পেল।
জাতিশ্বরের মুকুটমণি·· পবিত্রতার পদ্মরাগে
সূর্য্যশোভায় বিশ্ববাসীর ভাগ্যে ওরা নিত্য জাগে।
উচ্চকুলের গর্ব্ব মিছে—অর্থশালার দম্ভ ছাই;
আয় ছুটে আয়, ওদের পায়ে প্রণাম করি আজকে ভাই

মর্ম্ম ও কর্ম্ম

ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

এক

একটা বিরাট প্রাসাদের মত বাড়ী। ঝর্ ঝর্ করে তার তিনটী তলার মেঝে, তক্ তক্ করে তার দোর-জানালা। সন্ধ্যা না হ'তেই জ্বল্ জ্বল্ ক'রে ওঠে তার খোপে খোপে বিজলির বাতি।

এটি একটি কলেজের ছাত্রাবাস।

তার পাশে বিস্তীর্ণ বস্তী। খোলার চালের পর খোলার চাল ঢেউ খেলে চ'লেছে, তার মাঝে মাঝে ঢেউ টিনের চাল যেন আশে-পাশে চারদিককার খোলার চালের দৈন্যকে সগর্ব্বে অবজ্ঞা ক'রে মাথা উঁচু ক'রে তুলে প্রকাণ্ড তেতলার দিকে চেয়ে র'য়েছে কিঞ্চিৎ ঈর্ষার সঙ্গে ও কিঞ্চিৎ প্রসাদ কামনায়।

এই বস্তীর প্রত্যেকটি ঘরে বা খোপে থাকে এক একটি পরিবার, তাদের অনেকেরই সন্তানের বেশ বাহুল্য দেখা যায়।

হষ্টেলের তেতলার জানালা খুললে দেখতে পাওয়া যায় এই বস্তীর গর্ভের অনেকটা—যেখানে বস্তীবাসীদের জীবন তার সকল দৈন্য নিয়ে অসঙ্কোচে আত্মপ্রকাশ ক'রে থাকে দিনরাত।

এর একটি জানালার কাছে ব'সেছিল বিকাশ—সে'দিন সন্ধ্যাবেলায়।

সে-দিন খুব একটা ভারী ফুটবল খেলা হ'য়ে গেছে। ইলিয়ট শীল্ডের সেমি-ফাইনাল। বিকাশদের টীম এতগুলি খেলায় এমন চমৎকার খেলে এসেছে যে, সবাই নিশ্চিত জেনেছিল যে, তারাই এবারকার শীল্ড পাবে। কিন্তু আজকার খেলায় তারা একটি গোলে হেরে এসেছে।

বিকাশ ছিল গোল-কীপার—সে বহুদিন ধ'রে খুব ভাল গোল-কীপার ব'লে খ্যাতিলাভ ক'রে এসেছে, অথচ আজ যে গোলটি হ'ল, সেটা ব'লতে গেলে সম্পূর্ণ তার দোষেই।

বলটা এসে প'ড়েছিল গোলের তিন চার হাত দূরে ঠিক বিকাশের পায়ের সামনে। বিকাশ অনায়াসে তাকে ফাষ্ট টাইম স্যুট ক'রে অনেক দূরে পাঠাতে পারতো। কিন্তু তা' না ক'রে সে তাকে ধ'রতে গেল হাত দিয়ে, মতলব এই যে, বলটা নিয়ে একটু পাশে স'রে গিয়ে লম্বা স্যুট ক'রে দেবে।

কিন্তু বলটা তার হাত থেকে পিছলে প'ড়ে তার পিছনে দু'তিন হাত স'রে গেল। সেটার কাছে আবার যেতে না যেতে অপর দলের দু'তিন জন খেলোয়াড় ভিড় ক'রে এলো, ঠেলাঠেলিতে বলটা একরকম আপনিই গড়িয়ে গেল গোলের লাইন পেরিয়ে।

ফের বলটি নিয়ে সেণ্টার ক'রতে না ক'রতেই রেফারীর খেলাশেষের বাঁশী বেজে উঠলো। বিজয়ী দল উল্লাসে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল, বিকাশের দলের সবাই এসে বিকাশকে কেবল খেতে বাকী রাখলে। বহু কষ্টে বিকাশ দলের ভিড় ঠেলে পাশ কাটিয়ে তার সাইকেল নিয়ে লম্বা ছুট দিয়ে এলো হষ্টেলে। তাড়াতাড়ি স্নান ক'রে কাপড়-চোপড় ছেড়ে তার ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে জানলার ধারে ব'সে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সে ভাবতে লাগল, কি মূর্খের মত ভুলটা সে ক'রে ব'সেছে, আর কি সর্ব্বনাশটাই এতে হ'য়ে গেল। হাতের মুঠো থেকে শীল্ডটা ফস্কে গেল। নিদারুণ আত্মগ্লানিতে ভ'রে গেল তার চিত্ত।

আর কোন কথাই তার মনে এলো না। তার বন্ধুদের গালাগালি ও টিট্‌কারী তার কানে আসতে লাগলো—আর কেবলই সেই খেলার চিত্র বাস্তব ও কাল্পনিক, তার চোখে ভাসতে লাগলো। যা হ'ল তার পাশে যা' হ'তে পারতো তার উজ্জ্বল চিত্র উদ্ভাসিত হ'য়ে তাকে একেবারে পাগল ক'রে দিলে। সে যদি হাত দিয়ে না ধ'রে স্যুট করে বলটা পাঠিয়ে দিত রাইট আউটের কাছে! তার কাছে কোনও লোক ছিল না—সে অনায়াসে বল ঠেলে ঠেলে কেউ পৌঁছুবার আগেই গোলের কাছে গিয়ে সেণ্টার করতে পারতো, আর সেণ্টার

ফরওয়ার্ডে দুর্দ্ধর্ষ খেলোয়াড়, সে তাকে পরিষ্কার ভাবে নেটে ফেলে দিতে পারতো। কিম্বা যদি—

কত চমৎকার সম্ভাবনা এমনি মাথার ভিতর খেলে গেল তার সীমা সংখ্যা নেই। তাতে সে যতই উত্তেজিত হ'ল, ততই লজ্জায় তার মাথা হেট হ'য়ে গেল।

নীচের বস্তীতে ঠিক তার ঘরের নীচের উঠানে একটা কোলাহল শোনা গেল। বিকাশ তার খেলার স্বপ্ন থেকে জেগে চাইলো সে বস্তীর দিকে।

বেশী কিছু নয়, স্বামীস্ত্রীর নিত্যনৈমিত্তিক ঝগড়া। তাদের কথাগুলো হচ্ছিল বেশ উচ্চ কণ্ঠে, কাজেই তার অনেকটাই বিকাশের কাণে প্রবেশ করলো।

স্বামীটি সকাল আটটায় কাজে বের হয়। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে এসে সন্ধ্যাবেলায় স্নান ক'রে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে তামাক সেজে পরম তৃপ্তির সঙ্গে আরাম ক'রে হুঁকো টানতে টানতে স্ত্রীকে বল্লে এক পয়সার চা কিনে আনতে। স্ত্রী বল্লে—পয়সা তার কাছে নেই, যা ছিল তা দিয়ে সে চারটি চাল কিনে এনেছে। ধার করে আনবার কথায় স্ত্রী বল্লে যে এই তো সেদিন সে তার রূপোর নোলক বাঁধা দিয়ে এসেছে দোকানে, আবার ধার করলে সে নোলক আর পাওয়া যাবে না।

স্বামী বল্লে, এবারে হপ্তা পেলেই সে নোলক খালাস করে দেবে।

স্ত্রী বল্লে যে, এমন প্রতিশ্রুতি অনেক হ'য়ে বাসি হ'য়ে গেছে।

এইবারে স্বামীর মেজাজ চড়ে গেল। সে বল্লে, সারাদিন হাড় কালী ক'রে খেটে এসে এক খুঁটি চা—তাও পাব না! এতবড় হারামজাদী স্ত্রীটা যে এক খুঁটি চা চাইতে একনঙ্গা কথা শোনাতে আসে—কি না তার নোলক গেছে। ঝাড়ু মার তার নোলকে। তার গেলবার জন্য মিন্সেটা হাড় কালী ক'রে যে পয়সা আনছে চোখখাকী তা চোখ মেলে দেখতে পায় না—ইত্যাদি।

কিছুক্ষণ বচসার পর চটে-মটে স্বামী তার ট্যাঁক থেকে একটা টাকা বের করে টন্ করে ফেলে দিলে উঠানের উপর।

সঙ্গে সঙ্গে উঠানে এক মূর্ত্তির আবির্ভাব হ'ল; তাকে দেখে দুজনেই হকচকিয়ে গেল, টাকাটা আর কেউ তুলে নিতে পারলে না।

সে এক কাবলীওয়ালা।

একগাল হেসে স্বামী বল্লে, "এই যে খাঁ সায়েব, তা' আজ কেন? এখনো তো হপ্তা মেলে নি আমার।"

কাবলীওয়ালা তার ভাঙ্গা হিন্দীতে যা বল্লে, তার মর্ম্ম এই যে, অনেক হপ্তার দিন সে এসে ঘুরে গেছে, কেন না লোকটি হপ্তা পেলেই পথে খরচ করে আসে। আর গত তিন হপ্তার দিন এমনি ক'রে সে ফিরে গেছে। আজ সে অন্য তাগাদায় এসেছিল, পাশের এক ঘরে শুনে এসেছে যে, আজ টাকা আছে, তাই এসেছে।

তখনো চকচকে রূপার টাকাটা উঠানেই পড়েছিল। কাবলীওয়ালা তার দিকে চেয়ে দাঁত বের করে বল্লে, "এত তো একটাকা—বস্ আর একটাকা দেও, তবেই আজকের মত খালাস।"

স্বামীটি মাথায় হাত দিয়ে বল্লে, "আর কোথায় পাব একটাকা, ওটা আজ আমাদের ছোটবাবু আমায় বকশীস্ দিয়েছিলেন, ও দিয়ে ভাই চাল না কিনলে এই আণ্ডা-বাচ্চার খোরাক চলবে না। মেহেরবাণী করে ও টাকাটা নিও না খাঁ সাহেব।"

খাঁ সাহেব মেহেরবাণী ক'রে আর বেশী তাগাদা না ক'রে টাকাটা তার বিপুল পকেটে পুরে হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

অনেকক্ষণ স্বামী-স্ত্রী দু'জনে হাঁ করে চেয়ে রইলো। তারপর স্বামী নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে, "যাক গে!" বলে ফুড়ুক ফুড়ুক করে তামাক টানতে লাগলো।

স্ত্রীটি উঠান থেকে কোলের ছেলেটাকে কোলে তুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

এই দৃশ্য দেখে বিকাশের বুকের ভিতর কি একটা মোচড় দিয়ে উঠলো। তার মনে হল, "আহা, বেচারা দু'টো পেটের অন্ন রোজগারের জন্য হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে এসে এক পেয়ালা চা খাবে, তাও সে পেলো না। আর সে নেহাৎ সখের খাটুনী খেটে, মাঠের ভিতর মিথ্যে ছুটোছুটি করে সেই ক্লান্তি দূর করছে আরাম করে গরম চায়ের পেয়ালা নিয়ে।

পেয়ালাটা আর মুখে তুলতে তার প্রবৃত্তি হল না। মনে হ'ল—তার উচিত তখনি এক পেয়ালা চা তৈরী ক'রে লোকটাকে পাঠিয়ে দেওয়া, নিদেন দোকান থেকে এক খুটি চা কিনে ওকে পাঠিয়ে দেওয়া। হাত-পা একটু নিস্‌পিস্ করে উঠলো। কিন্তু এমন একটা কাণ্ড করতে গেলে সারা হষ্টেলের ছেলেরা যে তাকে ঠাট্টা করে অস্থির করবে, সেই ভয়াবহ কল্পনায় তার এই অর্দ্ধস্ফুট কামনাকে মনের ভিতর নিষ্পেষিত ক'রে ফেললো।

কিন্তু চায়ের পেয়ালা মুখে তুলতে রুচি হ'ল না।

জানালা থেকে উঠে যাবে—এমন সময় দেখতে পেলো, স্ত্রীটি ইতিমধ্যে দোকান থেকে এক খুঁটি চা—নিশ্চয় ধার করে নিয়ে এসেছে। স্বামীটি পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে চা'টা খেয়ে শেষে একটা মাদুরে লম্বা হয়ে তামাক টেনে এমন বাদশাহ আরামের পরিচয় দিলে যে, তাতে বিকাশের মন খুসীতে ভরে

উঠলো। সেও তার চা-টুকু খেলে এতক্ষণে বেশ ক'রে।

হঠাৎ ও-পাশের একটা ঘরে ক্রুদ্ধ চীৎকার ও আর্ত্তনাদের শব্দ শোনা গেল।

এতে ব্যস্তে দুয়ার খুলে বিকাশ ছুটে গেল।

বিকাশ এসেছিল খেলার পরেই সোজা মাঠ থেকে ছুটে, তার দলের আর সবাই একটু বিশ্রাম ক'রে কিছু খেয়ে দেয়ে এবং কিছুক্ষণ ধ'রে খেলার সমালোচনা ক'রে হট্টগোল ক'রে ফিরেছিল। কিছুক্ষণ হ'ল তারা এসেছে। তাদের টীমের ক্যাপ্টেন সুবোধ চ্যাটার্জ্জী মন্থরগমনে আট-ন' বৎসর ধ'রে ছাত্রজীবন কাটিয়ে এখন ছাত্রত্বের অন্তিম দশায় এসে পৌঁছেচেন। এই দীর্ঘ ছাত্রজীবনে পড়াশুনায় কোন সুকৃতি অর্জ্জন করতে না পারলেও, খেলায় তিনি বিস্তর প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছিলেন। ক'লকাতায় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের মধ্যে তিনি একজন এবং যদিও কলেজ-টীমে ইলিয়ট শীল্ড প্রভৃতি ছোটখাট খেলায় তিনি খেলেন, তবু ক্রেগুলী ম্যাচে তিনি প্রথম ডিভিসনের খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলে তাঁর উৎকর্ষের খ্যাতি অম্লান রেখেছেন। ইচ্ছা ক'রলেই তিনি যে কোনও ফার্ষ্ট ডিভিসন টীমে সমাদরের সহিত যেতে পারেন, কিন্তু এখনো তিনি সে প্রলোভনে ধরা পড়েন নি, কেন না ছাত্রজীবনটাকে একটা যা' হ'ক ডিপ্লোমা নিয়ে শেষ করা সম্বন্ধে তাঁর স্ত্রীর মাথার দিব্য দেওয়া আছে।

সুবোধ চ্যাটার্জ্জী এ-হষ্টেলে থাকেন সামান্য যে কোনও ছাত্রের মত নয়, অনেকটা প্রভুর মত। হষ্টেলের ছেলেরা এবং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও কলেজের প্রিন্সিপাল পর্য্যন্ত তাকে প্রচুর সমীহ করেন।

তাঁর ঘরটি তেতলার এক কোণায়—সব চেয়ে বড় ঘর। সেখানে হষ্টেলের আসবাবের অতিরিক্ত দু'খানা ডেক চেয়ার টিপায়া প্রভৃতি আছে, টেবিলের উপর ফুলদানী এবং একটি টুলের উপর একটা লম্বা নলওয়ালা গড়গড়া আছে। এক কথায় তিনি থাকেন আমীরি চালে আর আশে-পাশে সবার উপর অবিসম্বাদিত প্রভুত্ব পরিচালন করেন।

সুবোধ লোকটি মন্দ নন। বেশ মিশুক, হষ্টেলের সব ছেলের সঙ্গে তাঁর ভাব আছে, সবার ঘরেই তিনি যান, আর তাঁর ঘরে আড্ডার জন্য সবার অবারিত দ্বার। —অবশ্য সবার সঙ্গে কথা কইবার বেলায় যতই সদয় হোক তাঁর ব্যবহার, তিনি যে আর সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এ কথাটা তিনিও ভোলেন না এবং আর কাউকেও সে কথা ভোলবার অবসর দেন না। তিনি করেন সবার সঙ্গে আত্মীয়তার চাইতে বেশী মুরুব্বিয়ানা। আর খেলোয়াড়-সর্দ্দার হওয়ায় সবাই তাঁর এ প্রতিপত্তি নির্ব্বিবাদে মেনে নেয়।

আজকের খেলার গতিতে সুবোধের মনটা গিয়েছিল ভয়ানক খিঁচড়ে। রাইট ইনের অনিল আজ একেবারে গোলের সামনে একা বলটি পেয়ে এমন একটা কিক্ করলে যাতে বলটা কিনা ডিঙিয়ে গেল গোল-পোষ্ট—সাত বছরের ছেলেও যে গোলটা ক'রতে পারতো, সেটা গেল নষ্ট হ'য়ে! তারপর অবশেষে বিকাশ কিনা অমন সর্ব্বনাশ করলে! যতই খেলাটার কথা সে ভাবে, ততই তার মনটা খিঁচড়ে ওঠে!

খুব বিরক্ত ভাবে হষ্টেলে ফিরলে সে। স্নান ক'রে বিস্তীর্ণ প্রসাধন সেরে ডেক-চেয়ারে লম্বা হ'য়ে শুয়ে সে অন্যমনস্ক ভাবে গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে একটা টান দিয়ে চেয়ে দেখে পুরোণো পোড়া ক'ল্কে তাতে চড়ান র'য়েছে, চাকর নতুন তামাক দেয়নি। সে ফিরে আসতে না আসতে চাকর নতুন ক'ল্কেয় আগুন দিয়ে গড়গড়ায় চড়িয়ে দেবে এবং সে ব'সতে না ব'সতে চায়ের বাটী নিয়ে আসবে— এ সব এমন স্বাভাবিক এবং স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার যে এর কোনও ব্যতিক্রমের কল্পনাও তার মাথায় আসে না কোনও দিন। আজ সেই ব্যতিক্রম হ'য়েছে এবং আরও ভীষণ ব্যাপার এই যে, চাকর সত্যচরণও সে তল্লাটে নাই।

মুখ-চোখ লাল ক'রে সুবোধ ডাকলে "সত্য!" ডাকে কোনও সাড়া না পেয়ে সে উঠে গিয়ে চীৎকার ক'রে ডাকতে লাগলো। কোথাও তাকে না দেখতে পেয়ে সুবোধ শেষে গেল যেখানে তামাক-টিকে থাকে সেখানে। দেখতে পেলো, ক'ল্কে সাজান আছে, সুধু আগুন দিতে বাকী। ততক্ষণ একটা সিগারেট মুখে দিয়ে সুবোধ নিজেই ক'ল্কেটা ধরিয়ে গড়গড়ায় বসালে, তারপর ডেক-চেয়ারে ব'সে সিগারেট ফেলে নলটা মুখে দিলে।

এতক্ষণে সত্য ছুটে এলো চায়ের জলের কেটলী হাতে ক'রে।

তাকে দেখে সুবোধের মাথায় খুন চ'ড়ে গেল।

"এতক্ষণ কোথায় ছিলি রে শালা নবাব-পুত্তুর!" ব'লতে ব'লতে সে সত্যকে দমাদম এমন দু'টো কীল দিলে যে, সে বেচারা একেবারে মেজেয় শুয়ে প'ড়ে কাতরাতে লাগলো।

সেই চীৎকার শুনে বিকাশ ও আর সব ছেলেরা ছুটে এলো।

বিকাশ এসে দেখলে সত্য তার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে কেটলীটা নিয়ে ছুটে গেল চা ক'রতে। সে ব'লতে ব'লতে গেল, "আমি কি ক'রবো বাবু, সুপারটেন বাবু ডেকে পাঠিয়েছিলেন"—

গর্জ্জন ক'রে সুবোধ ব'ল্লে, "সুপারটেন ডাকুক কি তোর বাবা ডাকুক, তুই আমার কাজ না ক'রে গেলি কি ব'লে শালা?"

আর কথা না ক'য়ে সত্য চ'লে গেল।

বিকাশের মনের ভিতর অবার একটা বিষম মোচড় দিয়ে উঠলো। গরীব সত্য পেটের দায়ে তাদের কাজ করে, প্রাণ দিয়ে খেটে সে দশজন বোর্ডারের কাজ করে নিপুণ ভাবে, আর সব চেয়ে বেশী সেবা করে সুবোধের, অবশ্য তার কাছে বক্‌শীসও পায় প্রচুর। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তার মনিব, তাঁর ডাকে গিয়ে যদি তার একটু দেরী হ'য়েই থাকে, তবে সেটা দোষের কিছু নয়। আর যদি বা দু'চার মিনিট দেরী হওয়াটা দোষের হ'য়েই থাকে, তাই ব'লে তাকে মার-ধোর করবার কোনও অধিকার সুবোধের নেই, আর সে কী মার! সুবোধের ঐ গুণ্ডার মত হাতের কীল! এতে ক্ষীণকায় সত্য যে গুঁড়ো হ'য়ে যায় নি, এই তো আশ্চর্য্য।

বস্তীবাসী পরিবারের যে দুঃখ সে আজ দেখেছে, তাতে বিকাশের মনটা দারিদ্র্যের দুঃখের অনুভূতিতে বেশ টন্‌টনে' হ'য়ে ছিল। তার উপর দরিদ্রের এই নির্য্যাতন দেখে তার আর সহ্য হ'ল না। সে ঝাঁঝের সঙ্গে ব'লে ফেললে, "ওকে মারলেন কেন সুবোধ বাবু? গরীবের গায় হাত তোলা কি ভদ্রলোকের কাজ?" সত্যকে প্রহার ক'রে সুবোধের রাগটা প'ড়ে গিয়েছিল, আর, রাগের মাথায় তাকে মেরে এখন তার নিজের মনেও একটু সঙ্কোচ হ'চ্ছিল। বিশেষতঃ সত্য ইতি-মধ্যেই অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত চায়ের পেয়ালা এনে ফেলেছিল, তাই সে বিকাশের কথায় না চটে তাকে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টায় বল্লে, "গরীবকে ভদ্রলোকেই মেরে থাকে। চাকর-বাকরকে মারা ভদ্রলোকের সনাতন ধর্ম্ম।"

বিকাশের রাগ এতে বেড়েই গেল, সে ব'ল্লে, "আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি যে আপনি হাসছেন, লেখাপড়া শিখে এমন কাজ ক'রে একটুও অনুশোচনা হ'চ্ছে না আপনার।"

"কেন হবে বল? কর্ত্তব্য কাজ করাই আমার অভ্যাস, যে কর্ত্তব্য কাজে অবহেলা করে, তাকে শাস্তি দেওয়াও আমার তেমনি অভ্যাস। তা ছাড়া, জান তো,—

A servant, a dog and a chestnut tree,
The more you be at them the better they be.

ওটা woman সম্বন্ধে খাটে না, servant সম্বন্ধে খাটে। ব'লতে পার, তুমি যে আজ গোলে দাঁড়িয়ে কর্ত্তব্য কর নি তারও এমনি শাস্তি দেওয়া উচিত। স্বীকার করি, এবং যদি বল তবে সে শাস্তি দিতে প্রস্তুতও আছি।" বলে সুবোধ হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

লজ্জায়, রাগে বিকাশের মুখ-চোখ লাল হ'য়ে উঠলো। কিছুক্ষণ সে কোনও কথা ব'লতে পারলে না, শেষে সে ব'ল্লে, "আপনার মারার পিছনে এই callous ভাব, এইটাই আমাকে বেশী আশ্চর্য্য ক'রছে, জানবেন সুবোধবাবু, এই যে গরীব, ছোটলোক, এরাও আপনারই মত মানুষ—তাদের মারবার আপনার কোনও অধিকার নেই।"

"দু'শোবার আছে। মানুষকে মারবার মানুষেরই অধিকার আছে, গরু-ভেড়ার নেই। জগতের আদি থেকে এই আইনই চ'লে আসছে, তাই বাপ ছেলেকে মারে, স্বামী স্ত্রীকে মারে, প্রভু চাকরকে মারে, সৈনিক সৈনিককে মারে।"

উত্তেজিত হ'য়ে বিকাশ ব'ল্লে, "সে আইনের দিন ফুরিয়েছে, সুবোধবাবু। যারা দুর্ব্বল তারা সব জায়গায় মাথা তুলতে আরম্ভ ক'রেছে। আর দু'দিন বাদে আপনার তাদেরকে মারবার চেয়ে তাদের হাতে মার খাবার সম্ভাবনাই বেশী হবে।"

"বেশ, তাই যদি আইন হয় তাই হবে—কিন্তু তাতে মানুষকে মানুষের মারবার আইন বদলাবে না। যে মারবে আর যে মার খাবে তাদের স্থান বদলে যাবে শুধু। কবে সেইটে হবে, সেই জুজুর ভয়ে কাবু হওগে তুমি, আমি হ'ব না। আমি মরদের বাচ্ছা, কাপুরুষ নই।"

"দুর্ব্বলকে মেরে মর্দ্দানি ফলানটা কাপুরুষত্বের পরাকাষ্ঠা।"

এইবার সুবোধ একটু উত্তেজিত হ'য়ে বল্লে, "দেখ, বিকাশ, আজ সত্যর হ'য়ে লম্বা লেকচার ঝাড়ছো তুমি, উপযুক্ত provocation পেলে তুমিও ঠিক আমার মতই বেয়াদব গরীবকে দু'ঘা' অনায়াসে লাগাবে। স্রেফ কেদারা হেলান দিয়ে লম্বা লম্বা কথা ব'লে বাহবা নেবার নেশায় সখের দরদী সাজছ, এ কেবল তোমার মুখের শেখা বুলি, প্রাণের নয়। এক কথায়, তুমি একটি এক নম্বরের হাম্বাগ।"

এই ব'লে সুবোধ বিকাশকে অগ্রাহ্য ক'রে আর সবার সঙ্গে কথা কইতে আরম্ভ করল, বিকাশও দম দম ক'রে গিয়ে নিজের ঘরে দোর বন্ধ ক'রে বসলো।

দুই

জানালার ধারে ব'সে বিকাশ নীচে বস্তীর স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্ত্তা শুনতে পেলো।

ফুড়ুক ফুড়ুক করে হুঁকোয় টান দিতে দিতে স্বামী বললে, "দেখ, তোর নোলকটা গেলই বুঝি এবার। ভেবেছিলাম এই টাকা দিয়ে সেটা খালাস করবো, তা' শালা পাঠান এসে নিয়ে গেল।"

স্ত্রী বললে, "নোলক তো পরের কথা, এখন চালও যে বাড়ন্ত।—তোমার হপ্তা পেতে তো আরও দু'দিন;"

স্বামী রুখে বললে, "কেন এই পরশু দিন দশ পো' চাল এনে দিলাম, আজই চাল বাড়ন্ত! তুই কি দানছত্র খুলে বসেছিস নাকি?"

"শোন কথা! দানছত্র! বলে আপনার পেটে দু'মুটো দিতে পারি না, আবার দানছত্র। দশ পো' চাল কবে

এনেছ, হিসেব আছে ? পরশু নয় আজ নিয়ে পাঁচদিন হল। কতগুলি চাল রোজ গেলা হয় হিসেব রাখো ?—বলে দানছত্র। ক'দিন ধরে আধপেটা খেয়ে তবে এদ্দিন তোমার আর ছেলে-পিলের মুখে দু' দানা দিতে পেরেছি ; বলে কি না দানছত্র।"

স্বামী বোধ হয় মনে একটা হিসাব ক'রে দেখলে যে, স্ত্রীর কথাটা ঠিক। তাতেই আরও বেশী রাগ হ'য়ে গেল তার।

সে বললে, "তা কি আর করবো ? না চলে, খাবো না, ছাই খাব। চাল পাবো কোথা আর। ঐ যে হপ্তা হপ্তা করছিস, শুনিস নি ঐ পাঠান শালার কথা। ও এবার ঠিক হপ্তার দিন কারখানার দোরে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর যা' পাব সব গাঁ্যাড়া দেবে। তা এই বাড়ীওয়ালী মুক্কিয়ে আছে। তার পর খাবে কি ? ছাই খাবে আর কি ?"

তার পর কিছুক্ষণ মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা হল। তার ভিতর থেকে দু'জনেই রেগে উঠতে লাগলো। একবার একটা বেশ জোর চড়মারার শব্দ পাওয়া গেল, কেঁদে উঠলো একটা ছেলে, আর ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো তার মা।

তার পর স্বামীটি গামছা কাঁধে ফেলে তেড়ে ফুড়ে বেরিয়ে গেল।

তার জানালার তলায় এই যে একটা ছোট্টখাট্ট ট্রাজেডীর অভিনয় হ'য়ে গেল, এতে বিকাশের মনটায় ভারী তোলপাড় লাগিয়ে দিলে। সে মনে মনে কল্পনা করলে যে, এমনি ছোটখাট দৈনন্দিন ট্রাজেডী এই বস্তীর প্রতি খোপে হয় তো হচ্ছে। স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে ভালবাসে এরা-তাতে সন্দেহ নেই ; কাবুলীওয়ালা টাকাটা নিয়ে যেতেই মেয়েটা ছুটে গিয়ে তার নোলকের মায়া ভুলে স্বামীর জন্যে চা নিয়ে এলো, এতে তার প্রচুর দরদ প্রকাশ হল। টাকাটা খোয়া যেতে তার স্বামীরও সবার আগে মনে পড়লো স্ত্রীর ঐ ছোট্ট নোলকটির কথা ! তবু যে দু'দণ্ড তাদের কথা হ'ল তার মধ্যে বারো আনা হল খিটিমিটি ঝগড়া, শুধু অভাবের জন্য।

এমনি ভাবে দারিদ্র্যে কত স্নেহশীল নরনারীর হৃদয় শুষ্ক হ'য়ে জীবন জ্বালাময় মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে, তার ঠিকানা আছে কি ? অথচ এই দারিদ্র্যের মাঝখানেই মাথা ফুড়ে উঠছে কত ধনীর প্রাসাদ, যেখানে মুহূর্ত্তের বিলাসে যে অর্থ অপচয় হয়ে যাচ্ছে, তাতে এমনি বহু পরিবারের আঁধার ঘরে আলো হেসে উঠতে পারে।

এই কথা ভেবে বিকাশ তার প্রাণের ভিতর একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করলো, আর সঙ্গে সঙ্গে তার কানের ভিতর ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠলো সুবোধের তীব্র বিদ্রূপ—'কেদারা হেলান দেয়া 'সখের দরদী।' 'মুখের শেখা বুলি, প্রাণের কথা নয়—'

বিকাশ জানে—এ তিরস্কার কত মিথ্যা। জানে তার অন্তরে কি ব্যথা, কি আকুলতা। কিন্তু কি করতে পারে সে ? এই সাগরের মত বিশাল দুঃখ এর প্রতিকার সে কি করতে পারে ?

তখনি মনে হ'ল, কিছুই কি পারে না ? ঐ যে পরিবার, ওদের একটি মাত্র টাকার জন্য এখনকার যে দুঃখ এ তো সে দূর করতে পারে। চাই কি দশ বিশটা টাকার জন্য কাবুলীওয়ালার অত্যাচার দূর করা ত' তার সাধ্যের অতীত নয়।

তাতে কিছুই হবে না বিশেষ, কিন্তু তবু একটু সাময়িক দুঃখ তো দূর হবে ! একটা টাকা যদি বিকাশ ওদের দিয়ে আসে।

ভাবতে ভাবতে বিকাশ উঠে বসলো। দোর খুলে বের হ'ল, মতলব এই যে, এখনি পাশের গলির ভিতর দিয়ে ওই ঘরের সামনে গিয়ে টাকাটা দিয়ে আসে।

এতটা রাত যে হ'য়ে গেছে, বিকাশের তা খেয়াল ছিল না। ঘর থেকে বের হতেই সে শুনতে পেল রাতের খাবার ঘণ্টা।

কাজেই তখন সে খাবার ঘরে গেল। টাকাটা পকেটেই রইলো। ভাবলে, খেয়ে উঠে এক দৌড় মেরে দিয়ে আসবে।

খেতে খেতে কথাটা মনের মাঝে উল্টে পাল্টে ভেবে দেখলে। ক্রমে তার মনে হ'ল যে তার সঙ্কল্পটা একটা অবাস্তব খেয়াল। সবারই জানা ছিল যে গলির ভিতর বস্তীর কোনও কোনও ঘরে কতকগুলি খারাপ মেয়ে থাকে। বিকাশকে হঠাৎ রাত্তিরে ঐ গলির ভিতর যদি কেউ যেতে দেখে, তবে নিশ্চয়ই মনে ক'রবে—সে ঐ মেয়েদের বাড়ী চলেছে ! ও বাবা ! এমন কাজও করে ?

ভেবে চিন্তে সে ঠিক করল আজ রাতটা থাক, কাল ভোরে উঠে বস্তীর বাইরে দাঁড়িয়ে যখন ঐ স্বামীটা আফিসে যাবে, সেই সময় তাকে টাকাটা দিয়ে দিলেই হবে।

কিন্তু সে যদি বলে, 'তুমি কেন আমায় টাকা দিচ্ছ ?' তখন কি জবাব দিবে বিকাশ ? কি জানি কেন তার মনে হ'ল সব কথা খুলে বলাটা কিছুতেই চলবে না। তা ছাড়া, স্বামীকে টাকাটা দিলে সে যে স্ত্রীকে না দিয়ে বাজে খরচ করবে না তাই বা কে জানে ?

তার পর ভাবলে সতাকে দলে টেনে তাকে দিয়ে গোপনে টাকাটা পাঠিয়ে দিলে হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল টাকা-পয়সা বিষয়ে সতার সত্যপরতায় সন্দেহ করবার প্রচুর হেতু আছে। সে টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজে অম্লানবদনে এসে ব'লতে পারে দিয়ে এসেছি।

ভাবতে ভাবতে খাচ্ছিল সে, এদিক সেদিক চাইতে পারে নি, কি খাচ্ছে তাও ভাল ক'রে দেখে নি।

তাতে একটা কেলেঙ্কারী হয়ে গেল। বিকাশ দুধ খায়। তার দুধের বাটী ঠাকুর তার থালার পাশে দিয়ে গিয়েছিল। বিকাশ তখন মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে অন্যমনস্ক ভাবে দুধের বাটী তুলে পাতে অর্দ্ধেকটা দুধ ঢেলে ফেললে, তখন তার হুঁস হ'ল।

পাশে যারা বসেছিল তারা হেসে উঠলো। বিকাশ অপ্রস্তুত হয়ে বাকী দুধটা চুমুক দিয়ে খেয়ে, জল খেয়ে উঠে প'ড়লো।

যারা এ কাণ্ড দেখলো তারা ভাবলে যে আজকের খেলায় বিকাশের সামান্য ভুলে গোল হ'য়ে যাওয়ায় সে উন্মনা হ'য়ে উঠেছে। তাদের ভিতর থেকে শরৎ তাকে গিয়ে ব'ল্লে, "ওকি ভাই! খেলার একটা accident নিয়ে অতটা মন খারাপ করতে আছে? Be a sportsman, হারজিত, কি সাময়িক ত্রুটি-বিচ্যুতিকে অতটা বেশী ক'রে ভেবো না।"

বিকাশ হেসে বল্‌লে, "ক্ষেপেছ? একটা খেলা, তার জন্য আমি হব মন-মরা? কিছুই হয় নি আমার; শুধু একটা প্রব্লেম নিয়ে ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়েছিলাম একটু।"

শরৎ কিন্তু তাকে ছাড়লো না। তার সঙ্গে তার ঘরে গিয়ে অনেকক্ষণ ব'সে হাসি-তামাসা ক'রে বিকাশের মনটা হাল্কা ক'রে দিয়ে তবে তার নিজের ঘরে গেল।

তখন রাত্রি দশটা। বাইরে গিয়ে টাকাটা দিয়ে আসবার ইচ্ছে থাকলেও এখন তা সম্ভব হ'ত না; কেন না হষ্টেলের ফটক বন্ধ হ'য়ে গেছে। তা ছাড়া কথাটা মনের ভিতর উল্টে পাল্টে দেখে বিকাশ স্থিরই করেছিল যে, এ কাজ করা চলে না।

এখন সে বাতি নিবিয়ে শোবার উদ্যোগ ক'রলে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে সে দেখলে। কিছু দেখা যায় না।

বোধ হয় স্বামী-স্ত্রী ছেলেপুলে নিয়ে খেয়ে দেয়ে শুয়ে প'ড়েছে।

তার মনে হ'ল, এখন যদি সে চুপচাপ একটা টাকা তাগ ক'রে ঠিক ঐ ঘরের দাওয়ার উপর ফেলতে পারে, তবে কাল সকালে উঠে ওরা টাকাটা পাবে, কোনও সোরগোলও হবে না, কেউ জানতেও পারবে না।

টাকাটা বের ক'রে সে হাতে নিলে। খানিকক্ষণ আবার ভাবলে। ভাবতে ভাবতে সে ফস্ করে টাকাটা ফেলে দিলে।

তাগ্‌টা বড্ড বেশী ঠিক হ'য়ে গেল। ওরা স্বামী স্ত্রী শুয়ে ছিল ঐ দাওয়াতেই; অন্ধকারে তেতালা থেকে দেখা যায় নি। টাকাটা টন্ ক'রে এসে প'ড়লো স্বামীটার মাথায় ঠিক রগের উপর।

ঘুম ঠিক তার তখনও আসে নি, একটু তন্দ্রামত হ'য়েছিল। টাকাটার ঘা' খেয়ে সে অমনি হাউমাউ ক'রে লাফিয়ে উঠলো। ভাবলে, কেউ ঢিল ছুঁড়েছে। চীৎকার ক'র উঠলে, "কেরে শালা? জাল্‌তো লণ্ঠনটা।"

স্ত্রী উঠে কাঁপতে কাঁপতে লণ্ঠন জ্বাললে। স্বামী ততক্ষণ লাঠি নিয়ে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত।

লণ্ঠনের আলোতে দেখা গেল—ঢিল নয়—টাকা!

স্ত্রী বল্‌লে, "ওগো, চেয়ে দেখ—কি?" বেশ উল্লসিত কণ্ঠে। কিন্তু হিতে বিপরীত হ'ল।

টাকাটা দেখেই স্বামীটির মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠলো। সে অনেকক্ষণ ধ'রে টাকাটাকে উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলো, যেন তার ভিতর কোথাও লেখা আছে তার সমস্যার উত্তর, শুধু পাঠ উদ্ধার ক'রলেই হয়।

তারপর—টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজে—দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ ক'রে দাঁত কিড়মিড় ক'রতে ক'রতে সে স্ত্রীর কাছে গিয়ে তার চুল ধ'রে টেনে দমাদম প্রহার দিতে দিতে ব'ল্‌লে, "তবে রে হারামজাদী, এই কর্ম্ম করিস তুই, হোটেলের বাবুদের সঙ্গে পীরিত—"

এখন স্ত্রীটি যদিও যথোচিত কদাকার তবু তার বয়স আছে। আর স্বামীটি স্ত্রীকে খুব বেশী কদাকার ব'লে হয় তো মনেও করে না। তাই মনে মনে তার একটু ভয়, একটু সন্দেহ বরাবরই ছিল। কাজেই সে নিশ্চয় ক'রলে যে, রাত দু'পুরে এই টাকার ঢিল ছোড়া—এ একেবারে হাতেনাতে ধরা।

কাতর আর্ত্তনাদের সঙ্গে স্ত্রী ব'ল্‌লে, "হোটেলের বাবুদের কাউকে সে চোখেও দেখে নি—"এটা একটু অত্যুক্তি হ'লেও মূলতঃ সত্যি।

স্বামী ব'ল্‌লে, 'চ'খে দেখিস নি, পীরিত করিস নি, তবে রাত দুপুরে তোকে টাকা ছুড়ে দেয় কেন রে পোড়ারমুখী?"
—আর এক ঘা।

চেঁচামেচী আর্ত্তনাদ চলতে থাকলো, পাশের ঘরের লোক ছুটে এলো। তারা তাদের ছাড়িয়ে দিলে কিন্তু স্বামীটা স্ত্রীকে শাসাতে লাগলো যে, তাকে কুচো কুচো ক'রে কেটে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেবে, আর হষ্টেলের জানালার দিকে চেয়ে চেঁচাতে লাগলো যে, কাল সকালেই সুপারটেন বাবুর কাছে নালিশ ক'রে এর সুবিচার চাইবে।

তার হিতাকাঙ্ক্ষার এই বীভৎস পরিণতি দেখে বিকাশ ধপ ক'রে বিছানায় শুয়ে প'ড়লো। তার বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ ক'রতে লাগলো, কণ্ঠতালু শুষ্ক হ'য়ে গেল।—তার সব ভাবনা-চিন্তা আচ্ছন্ন ক'রে এই চিন্তাটাই তাকে অভিভূত ক'রলে যে কাল সকালে কেলেঙ্কারীর আর শেষ থাকবে না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে নালিশ হ'লেই

তদন্ত হবে, আর তদন্ত হ'লেই সবাই জানবে যে বিকাশই টাকাটা ফেলেছিল। কেন যে সে টাকাটা ফেলেছিল, সে সম্বন্ধে সত্য কথাটা কেউ বিশ্বাস ক'রবে না।—কেন ক'রবে? এমন জলজ্যান্ত প্রমাণ থাকতে অমনি একটা গাঁজাখুরী গল্প কে বিশ্বাস ক'রবে?

তার পর? বিকাশ আর মুখ দেখাতে পারবে না কাউকে। রাষ্টিকেট তো হবেই সে, তার পর বাড়ীতে উঠে যে কারও কাছে দাঁড়াবে, সে পথও থাকবে না।

বিকাশের বাবা-মা নেই; তার মাসিমা তাকে স্নেহ করেন এবং তাঁর পরিবারেই সে মানুষ। মেসোম'শায় বড় উকীল। তিনিই বিকাশের পড়ার খরচ দেন।

বাপ-মা নেই—এখন বিকাশের মনে হ'ল সেটা একটা লাভ। বাপ-মার কাছে মাথা হেঁট হবার অবসরটা নেই। মাসিমা—মেসোমশায়, সেখানকার ভাই বোনেরা—তাঁদের সঙ্গে আর জন্মে দেখা হবে না!

যখন পাশের বস্তীতে গোলমাল থেমে গেল, তখন বিকাশ একটু সুস্থির হ'য়ে ভাবতে পারলে। ভাববে আর কি ছাই, ভাবলে অপমান ও লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তি পাবার কোনও উপায়ই নাই।

অতএব, লম্বা দিতে হ'বে।

কোথায়?—সে কথা পরে ভাবা যাবে।

এখন আর বিলম্ব নয়!

ভোর হ'তেই সে উঠে সেই সর্ব্বনেশে জানালার পাশে ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখলে। দেখা গেল স্বামী স্ত্রী সপরিবারে নিদ্রিত।

এই সুযোগ!

সামান্য কিছু তল্পী তল্পা গুছিয়ে, টাকা কড়ি যা কিছু ছিল নিয়ে সে ফটকে গিয়ে দ্বারোয়ানকে ব'ল্লে, "ভয়ানক জরুরী দরকারে দেশে যাচ্ছি—ফার্ষ্ট ট্রেণ ধরতে হবে।...

[ক্রমশঃ

নৈশ-চাষী

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

"যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ"—গীতা

দিবসের কৃষিকার্য্য হলায়ুধ কৃষকে বলদে—
জলে ও জঙ্গলে চলে সুধা করে সুস্নিগ্ধ জলদে,—
নিশীথের চাষী মোরা চষি ক্ষেত্র কৃষ্টি কলাচারে—
উর্ব্বর বরেন্দ্র ভূমে বঙ্গবাণী পীঠ গ্রন্থাগারে।
ছন্দে গীতে পদামৃতে পুরাণ দর্শন সংহিতায়
শ্রুতি স্মৃতি সাম ঋকে আরণ্যকে মন্ত্রে ও গীতায়—।
ধরণীর গর্ভে মণি ক্ষেত্রজ্ঞের দৃষ্টি সুদর্শন
সুগভীর নিষ্ঠাবলে হৃষ্ট চেষ্ট কার আকর্ষণ,

মণি কাঞ্চনের মালা ভারতীর কণ্ঠে পরাইয়া—
আসি যাই হাসিমুখে জননীর পাদ-পুষ্প নিয়',
পুনরায় স্বেদ-বৃষ্টি হ'ল কৃষি ক্ষেত্র সুবিস্তার
স্মরণের স্যমন্তক মিলে মণি ঐতিহ্যের সার।
মহাজন যেই পথে চলিয়াছে পদ চিহ্ন ধরি'—
চলি মোরা সেই পথে তারকারে দীপ বর্ত্তি করি',
অন্ধকারে হাসে ফুল ঋজুবৃন্ত রজনীগন্ধায়—
কুমুদ কৌমুদী সিক্ত সঞ্চয়ন করিয়া সন্ধ্যায়—

'এতে গন্ধ পুষ্পে'—পত্রে উপঢৌকনের অর্ঘ্য ডালি
অম্লান আনন্দ অশ্রু মুকুতার প্রস্রবণ ঢালি—'
প্রক্ষালন করি পদ পরিতৃপ্ত চিত্তে গাহি গান
স্মিত হাস্যে ভারতীর বিস্মৃত সকল দুঃখ প্রাণ।
প্রভাতের পূর্ব্ব তমঃ গাঢ় তম হয় প্রতিদিন
দিবসের শেষ সন্ধ্যা—অনবদ্য আশায় রঙীণ
অস্তোদয় বারোমাস প্রতি রাত্রি কৃষিকর্ম্ম করি'
মনোমন্থ নবনীত তুলি কভু গোপধর্ম্ম ধরি'
কর্ষণ মন্থন করি ধৈর্য্য রজ্জু—ধরি শ্রদ্ধাভরে
দিবাভাগে নিদ্রা লাগে ঘুমাইয়া পড়ি অকাতরে।

বিজ্ঞান জগৎ

খাদ্য তৈরীর গোপন কথা

অধ্যাপক শ্রীদীনেন্দ্র কুমার মিত্র, এম্. এস্-সি

নাৎসী জার্ম্মাণীর লোলুপ দৃষ্টি আজ সোভিয়েট রুশিয়ার ইউক্রেনের শস্যক্ষেত্রে—পক্ক গোধূম···শীর্ষের প্রতি আবদ্ধ। পূর্ব্বের "উদীয়মান রবি" জাপানের লক্ষ্য বস্তু, "অবরুদ্ধ" বর্ম্মার হরিৎ ধান্যক্ষেত্র। "স্বর্ণলঙ্কার" অধিবাসীরা খাদ্যাভাবে ম্রিয়মান। ভারতেও দুর্ভিক্ষের করালছায়া পতিত হইয়াছে।

*

শ্বেতসার, প্রোটীন, স্নেহ-পদার্থ, শর্করা আমাদের খাদ্যের প্রধান অঙ্গ। প্রোটীন আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টিসাধন করে। শ্বেতসারাদি পদার্থ দেহের তাপ রক্ষাকারক; কর্ম্মশক্তির আধার। চাউল, আটা, ময়দা, আলু, চিনিতে পাই আমরা শ্বেতসার ও শর্করা; ডালে প্রোটীন; তৈলে স্নেহ-পদার্থ। এইগুলি সঞ্চিত রহিয়াছে—ধান্যকণায়, যব ও গমের দানায়; ছোলা-মটরে; তৈলবীজে; বিবিধ ফলমূলে। পরিপূর্ণ মাত্রায় সব খাদ্য আহরণ করিতে হইলে আমাদিগকে নির্ভর করিতে হয় মানুষের শ্রম ও অধ্যবসায়-সম্ভূত কৃষিপ্রণালীর উপর। ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য আবার চাই বিজ্ঞান-সম্মত উন্নত প্রণালীর কৃষি।

আমাদের আদিম পূর্ব্বপুরুষগণ বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত ও বনজ ফলমূলে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। তারপর তাহারা খাদ্যদ্রব্য বাছাই করিতে লাগিল এবং যুগ যুগান্ত চেষ্টার ফলে আজ তাহারা তাহাদের রুচি অনুযায়ী বিবিধ শস্য উৎপাদন করিতেছে কৃষি প্রণালীর সাহায্যে। প্রাচীন পদ্ধতির যায়গায় কি করিয়া আজ আধুনিক যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক প্রথার প্রচলন হইয়াছে—ইহা ক্রমঃ-বিকাশের এক চমকপ্রদ ইতিহাস। কিন্তু, ধান, গম, আলুর মধ্যে কি করিয়া শ্বেতসারের দানা গড়িয়া উঠিল, তৈলবীজে তৈল, ছোলা-মোটরে প্রোটীন, এ-কথা কি তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর মনে স্বতঃই উদিত হয় না? কেমন করিয়া কোটী কোটী মানবের জন্য, সমস্ত জীবিত প্রাণীর জন্য, উদ্ভিদের দেহে এই বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী সঞ্চিত হইল? এখানে সৃষ্টির আদিকাল হইতে চলিতেছে একই প্রথার পুনরাবর্ত্তন। অনন্তকাল-প্রবাহিনী এই সনাতন প্রথা মানববুদ্ধির অপরিজ্ঞাত। বহু বৈজ্ঞানিক প্রতিভার দীর্ঘকাল-গবেষণা-লব্ধ জ্ঞান হইতে আমরা সেই অপরূপ প্রথার সামান্য কিছুমাত্র তত্ত্ব আহরণ করিতে পারি। তাহাতে প্রকৃতির গোপন রহস্যের একটু আভাষ মাত্র পাই আমরা। মানবচক্ষুর অন্তরালে প্রকৃতির নিভৃত কক্ষে অতি সঙ্গোপনে যুগ যুগ ধরিয়া যে বিরামহীন রচনা চলিয়াছে তাহার আদি অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া ভার।

এই রহস্য বুঝিতে হইলে প্রথমেই আমাদিগকে জানিতে হইবে শ্বেতসার, শর্করা, তৈলাদি এবং প্রোটীনের রাসায়নিক অবয়ব। শ্বেতসার, শর্করা এবং তৈলজাতীয় পদার্থ কার্ব্বন (অঙ্গার) হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক তিনটী উপাদানে গঠিত। তাহাদের মধ্যে শ্বেতসার ও শর্করার গঠন প্রণালী একছাঁচের এবং তৈলাদি পদার্থের অন্য ছাঁচের। শ্বেতসারের রাসায়নিক উপাদানসূচক সাঙ্কেতিক চিহ্ন—$C_6H_{10}O_5$(starch), সাধারণ চিনি অর্থাৎ ইক্ষুচিনির—$C_{12}H_{22}O_{11}$ (cane sugar), আর আঙ্গুর চিনির—$C_6H_{12}O_6$ (Grape sugar)। প্রোটীন মোটামুটি ছয়টি মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত—যথা কার্ব্বন ও হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, গন্ধক, এবং ফস্ফোরাস্। কিন্তু কি করিয়া উদ্ভিদের ভিতর এই সব পদার্থের সমাবেশ হইল এবং শ্বেতসার, প্রোটীনাদিতে পরিণত হইয়া উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে জড় হইল?

শিকড়, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পাতা, ফুল, ফল নিয়াই উদ্ভিদের দেহ গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের যেমন বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে এবং তাহাদের প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন কাজ রহিয়াছে—সেইরূপ শিকড়, কাণ্ড, পাতা ইত্যাদি উদ্ভিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং তাহাদেরও ভিন্ন ভিন্ন কাজ আছে। শিকড় গাছকে মাটীতে "নোঙ্গরাবদ্ধ" করিয়া রাখে এবং মাটী হইতে

রস টানিয়া গাছকে সজীব ও সতেজ রাখে। সবুজ পাতা উদ্ভিদের জীবনধারণোপযোগী খাদ্য তৈরীর প্রধান কারখানা।

শ্বেতসার, শর্করা, প্রোটীনাদি, উদ্ভিদেরও খাদ্য। এই খাদ্যগুলি উদ্ভিদকে জোগায় কে? আমরা উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগৎ হইতে এইসব পদার্থ একেবারে তৈরী অবস্থায় আহরণ করি। কিন্তু উদ্ভিদের এমন কোন বান্ধব নাই এ-জগতে যে তাহার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিবে তাহার খাদ্য। স্বাবলম্বী উদ্ভিদ তাই নিজেই নিজের খাদ্য, শ্বেতসার, শর্করাদি প্রস্তুত করিয়া লয়। কিন্তু তাহাদের উপাদানগুলি তো তাহার চাই। সেইগুলি জোগায় কে?

মাটী খুঁড়িলে জলের সন্ধান মিলে। সেই জল নিছক জল নহে। উহাতে বহু ধাতব ও লবণক পদার্থ দ্রব থাকে, যথা ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, নাইট্রোজেন, গন্ধক,ফস্‌ফোরাস ঘটিত পদার্থ, এবং আর ও অনেক কিছু। এই জলীয় "দ্রব" খুবই পাতলা, প্রায় ষোল আনাই জল। পৃথিবীর গভীর তলদেশে মৃত্তিকাস্তরের ফাঁকে ফাঁকে এই জলস্রোত আমাদের দৃষ্টির বাহিরে নিরন্তর বহিয়া চলিয়াছে কত অজানা, অচেনা দেশে—পাতাল পুরীতে। সেই জলের পেছন পেছন আবার ধাইয়া চলিয়াছে উদ্ভিদের শিকড়—বহুদূর পর্য্যন্ত বহুশাখা প্রশাখা মেলিয়া। জলের প্রতি শিকড়ের একটা অদমনীয় আকর্ষণ,—যেখানে জলের সন্ধান মিলিবে সেখানেই উহা ছুটিয়া গিয়া হাজির হইবে। তাহাকে তাহার চাই—নতুবা তাহার প্রাণ বাঁচে না। কিন্তু সাধারণের চক্ষে এই গতি নজরে পড়ে না। এইখানেই এই গোপন অভিসারের পরিসমাপ্তি নয়।

শিকড়ের অত্যগ্র ভাগে অবস্থিত অতি সূক্ষ্ম লোমের সাহায্যে নানারূপ রহস্যজনক জটিল প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকাস্থিত জল, শিকড়, তাহার দেহের অভ্যন্তরে টানিয়া নেয়। এই একের মধ্যে অন্যের সমাধি, পরিসমাপ্তি ও মিলন ঘটাইল প্রকৃতির অদৃশ্যহস্ত,—এক অপূর্ব্ব প্রথায়। উহা বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

উদ্ভিদের আভ্যন্তরিক গঠন প্রণালী বিচিত্র কারুকার্য্যময় —প্রকৃতির স্থপতিবিদ্যার কলাকৌশলের অত্যাশ্চর্য্য নিদর্শন! শিকড়ের ভিতর রহিয়াছে অতি ক্ষুদ্রায়তন অসংখ্য কুঠরী—কোষ। মানুষের চর্ম্মচক্ষে তাহাদের স্বরূপ ধরা পড়ে না। অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিক অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সেই কোষবিন্যাসের অপূর্ব্ব শৃঙ্খল আবিষ্কার করিয়া প্রকৃতির এক গোপন প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষগুলির কী বিচিত্র রূপ! বিচিত্র কার্য্য-কলাপ! কী বিচিত্র তাহাদের কাহিনী! এক ইঞ্চির হাজার, দুহাজার ভাগের চেয়েও ক্ষুদ্র আয়তন এই কোষগুলির ভিতর রহিয়াছে আবার কতই না সামগ্রী—অণু পরমাণু প্রমাণ কত সচেতন ও অচেতন পদার্থের সমষ্টি। প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের ন্যায় প্রাণের স্পন্দনে, নৃত্য-দোদুল ছন্দে তাহারা সদাচঞ্চল। অদ্ভুতকর্ম্মা এই চঞ্চল কোষগুলি মাতা বসুন্ধরার অন্তঃপ্রবাহিনী জলস্রোত হইতে এক আশ্চর্য্য শক্তিবলে জলরাশিকে কণা কণা করিয়া টানিয়া তাহার অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করাইয়া লয়। আমরা উহাকে বলি বৈজ্ঞানিক উপায়—নামকরণ করিয়াছি অস্‌মসিস্ (osmosis)। তালে তালে নাচিয়া চলে সেই জলকণা কোষ হইতে কোষান্তরে, ক্রমে পৌঁছায় শিকড়ের অন্তঃস্থলে,—কেন্দ্রস্থিত জল-

শিকড়ের আনবীক্ষণিক প্রতিকৃতি(আংশিক)
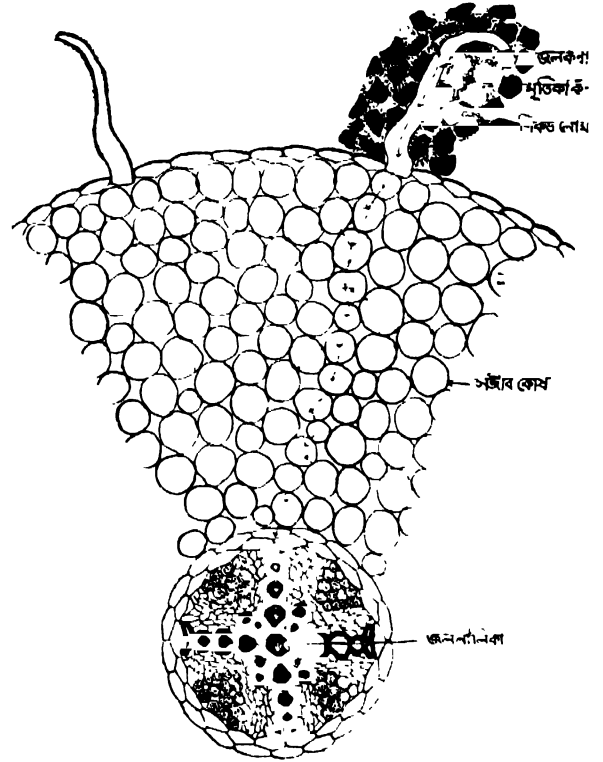
নালিকায়। নালিকাগুলি উর্দ্ধে প্রসারিত হইয়া কাণ্ডের ভিতর দিয়া বিভিন্ন শাখায় ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রশাখায় প্রবেশ করিয়া পাতায় পাতায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ঐ সব নল বাহিয়া জল উর্দ্ধে উঠিতে থাকে,—সহরের জল নালিকার মতই। জলবাহী ঐ নালিকাগুলির গঠন চাতুর্য্য অতীব আশ্চর্য্য—অতি সরু, সুদৃঢ় দেওয়ালে আবৃত, শিকড় হইতে পাতা পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে লম্বমান। কোন্ যাদুমন্ত্র বলে ঐ নলগুলির মধ্য দিয়া জলধারা, মাধ্যাকর্ষণের অমিত শক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া, নিরন্তর উর্দ্ধে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে—শিকড়ের অন্তঃস্থল হইতে পাতার ডগা পর্য্যন্ত? উর্দ্ধ-জল-প্রবাহ পরিচালক সেই শক্তিমান্ যন্ত্রের অবস্থান স্থল কোথায়?

দুইতিন শত ফিট উঁচু বৃক্ষের শীর্ষদেশেও এই জল অনায়াসেই পৌঁছায়। কী অপরিসীম শক্তির প্রকাশ! সেই পুঞ্জীভূত শক্তির ক্ষমতা বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে ফেলিলে দেখা যায়,—হাজার হাজার ফিট উর্দ্ধেও এই জলরাশিকে উহা টানিয়া নিতে পারে। নিশ্চল উদ্ভিদের ভিতর চলমান শক্তির অদৃশ্য
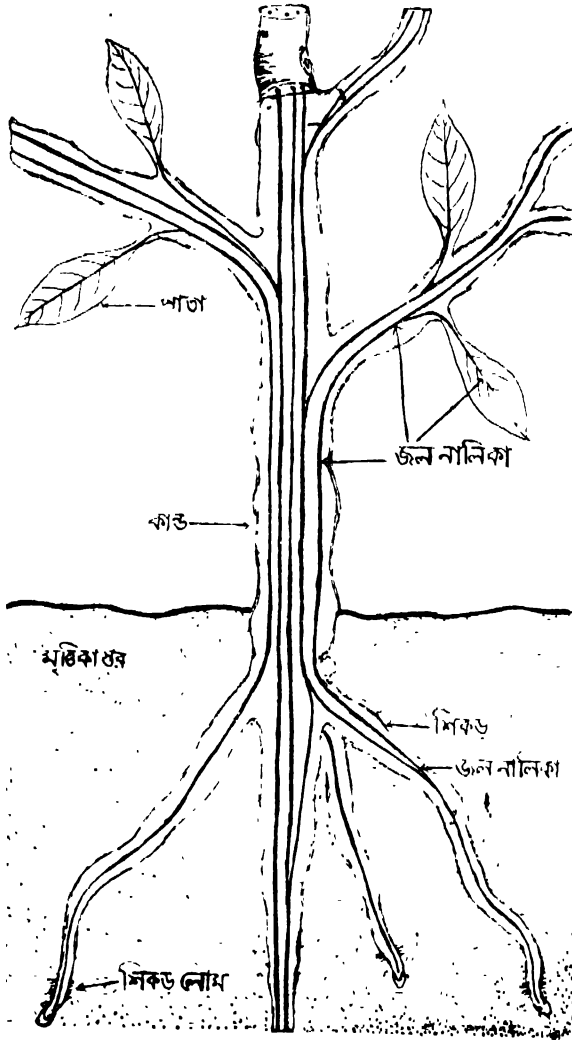
লীলাখেলার এক চাঞ্চল্যকর ইতিহাস! সেই শক্তির ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের এক জটিল সমস্যা।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এত টানাটানিতেও সেই তরল "জল-ডোর" ছিঁড়িয়া যায় না। জলকণার পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ এত দৃঢ়।

পৃথিবীময় অগণিত উদ্ভিদের গায়ে কোটী কোটী সবুজ পাতার আভ্যন্তরিক কৌশল এবং কার্যকলাপ অনুরূপ চমকপ্রদ। অসংখ্য কোষের সমাবেশে সৃষ্ট হইয়াছে তাহাদের আণুবীক্ষণিক প্রতিকৃতি। বহির্ভাগে সব রক্ষী কোষ,—তাহার মাঝে মাঝে বায়ু ও জলীয় বাষ্প চলাচলের জন্য অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র দ্বার। অন্তর্ভাগে আবার অসংখ্য বিভিন্নাকৃতি কোষ-সমূহ সজীব ও কর্ম্মচঞ্চল। সেই সজীব কোষগুলি আবার সবুজ কণায় পরিপূর্ণ। এক আশ্চর্য্য সবুজ রঙ্গের—বৈজ্ঞানিকের "ক্লোরোফিল্" (Chlorophyll)-এর সংমিশ্রণে সবুজ কণায় ফুটিয়া উঠিয়াছে সবুজ রূপ। তাহাদের মধ্যেও সজীবতার পূর্ণ লক্ষণ বিদ্যমান। পত্রাভ্যন্তরে, আমাদের অদৃশ্য জগতে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের জগতে—এক এক করিয়া, এই সবুজকণার অধিবেশনে পাতার দৃশ্য হইয়াছে সবুজ। এই মনোহর বর্ণের বৈচিত্র্য ও রূপের সুসমাবেশে প্রকৃতি হইয়াছে সুন্দরী—শ্যামাঙ্গিনী, কবি-সোহাগিনী। কি বা লালিত্য সেই শ্যাম অঙ্গের! কি বা নয়নাভিরাম সেই স্নিগ্ধ-শ্যামল রূপ।

মৃত্তিকা হইতে যে জল শিকড় প্রাণ ভরিয়া পান করিয়াছিল উহা ক্রমে পাতায় আসিয়া পৌঁছিল—জল নালিকার ভিতর দিয়া। পাতার তৃষ্ণার্ত্ত কোষগুলি অঞ্জলি পুরিয়া সাগ্রহে গ্রহণ করিল সেই জলরাশি। জলের অঙ্গ বাহিয়া আসিয়াছে কত হাইড্রোজেন, অক্সিজেনের পরমাণু! কত ধাতব ও লবণক পদার্থ! কিন্তু শ্বেতসার, শর্করা তৈরীর প্রধান উপাদান কার্ব্বন (অঙ্গার) সেই সূত্রে মাটী হইতে আসে না। উহার একমাত্র ভাণ্ডার পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলী। এই বায়ুমণ্ডলীতে অক্সিজেন ও অন্যান্য গ্যাসীয় পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে কার্ব্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস, অতি সামান্য মাত্রায়, ১০০০০ ভাগের প্রায় চার ভাগ। ইহার রাসায়নিক গঠন CO_2 অর্থাৎ এক পরমাণু কার্ব্বনের সহিত দুই পরমাণু অক্সিজেনের সমন্বয়। জীবদেহে ইহার ক্রিয়া বিষের মত। জীবের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে, এবং নানারূপ দহন ক্রিয়ায় নিরন্তর এই গ্যাস পৃথিবীতে উৎপন্ন হইতেছে। সবুজ উদ্ভিদ জীব প্রাণ-বিনাশক এই বিষ-বাষ্প পান করিয়া "নীলকণ্ঠ" সাজিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সেই জীবন-যাত্রা প্রণালী; কঠোর তপস্যা সৃষ্টিকে বাঁচাইবার জন্য। কতটুকু খোঁজ রাখি আমরা তাহার? কতটুকু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি আমরা তাহার জন্য? জড়বাদের মোহ কাটাইয়া কতটুকু বা আমাদের আগ্রহ উহা জানিবার জন্য? এই অকাতর পরার্থপরতাই উদ্ভিদ জীবনের মূল তত্ত্ব-বিজ্ঞান—আসল স্বরূপ।

পাতার বহির্ভাগে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্ধ্রগুলির ভিতর দিয়া বায়ু চলাচল করে উহার অন্তর্ভাগে এবং তথায় অবস্থিত সবুজ কোষ সমূহে একটু একটু করিয়া গলাইয়া পড়ে। এই উপায়ে বায়ুমণ্ডলীস্থ কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস আশ্রয় পায় সবুজ কোষের ভিতরে। কোষাভ্যন্তরে অবস্থিত জলে দ্রব কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে আমরা বলি কার্ব্বনিক এ্যাসিড (বা অঙ্গারাম্ল)। অঙ্গারাম্ল বড় ক্ষণভঙ্গুর, ক্ষণস্থায়ী

পরেই ইহা ভাঙ্গিয়া যায় এবং উহার দেহ হইতে এক অণুপরিমান অক্সিজেন (O_2) উদ্ভিদের বহির্দেশে নির্গত হইয়া যায়, এবং সেখানে সবুজ কোষের ভিতরে—পড়িয়া থাকে ফরম্যালডিহাইড (বা ফরম্যালিন) নামক এক তীব্র রাসায়নিক বিষ। এই দ্রব্যের সংঘর্ষে সজীব কোষের মৃত্যু ঘটিতে পারে অনায়াসে, মুহূর্ত্ত মধ্যে। তবে কি স্ব-ক্রিয়া-সঞ্জাত এই গরল পান করিয়া উদ্ভিদ আত্মঘাতী হইবে? অদ্ভুত কৌশলে মৃত্যুকে এড়াইয়া তৎক্ষণাৎ সেই কোষেই উদ্ভিদ ঘটায় এক আমূল পরিবর্ত্তন। উগ্র ফরম্যালডিহাইড মুহূর্ত্ত মধ্যে পরিবর্ত্তিত হয় শর্করা জাতিয় পদার্থে, সুমিষ্ট আঙ্গুর চিনিতে। আঙ্গুর চিনির অনুপরমাণুর অন্তরে আবার চলিতে থাকে ঘাত প্রতিঘাত! ঐ চিনির অবয়ব হইতে খানিকটা জলীয় অংশ নিঃসরণ হইয়া যায়। এবং সর্ব্বশেষে উহা রূপান্তরিত হয় শ্বেতসার জাতীয় পদার্থে। রাসায়নিক সাঙ্কেতিক চিহ্নদ্বারা প্রকাশ করিলে ঘটনা প্রবাহ সংক্ষেপে নিম্নোক্ত-ভাবে বর্ণনা করা চলে।

CO_2 + H_2O ——> H_2CO_3
(কার্ব্বণ-ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলী হইতে) + (জল— মৃত্তিকা হইতে) ——> (অঙ্গারাম্ল—পাতার সবুজ কোষে—)

H_2CO_3 ——> H_2CO + O_2
(অঙ্গারাম্ল) ——> (ফরম্যালিন— তীব্র বিষ।) + (অক্সিজেন— বাহির হইয়া যায়।)

$6 \times (H_2CO)$ ——> $C_6H_{12}O_6$
(ফরম্যালিন) ——> (আঙ্গুর চিনি)

$C_6H_{12}O_6 - H_2O$ ——> $C_6H_{10}O_5$
(আঙ্গুর + চিনি) —(জল) ——> (শ্বেতসার—সবুজ কোষের ভিতর।)
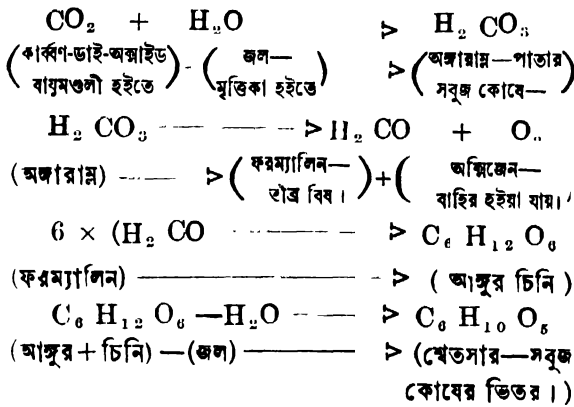
কিন্তু এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ স্বরূপ মানুষের জ্ঞান-দৃষ্টির বহির্ভূত। কোন কোন ধারা তাই নিছক কল্পনাত্মক,—আনুমানিক।...অদৃশ্য আলোর মরণাস্ত্র তৈরী করিয়াই মানুষের গর্ব্বের সীমা নাই!

প্রত্যেক কর্ম্ম-সম্পাদনের জন্য চাই একটা "শক্তি," এমন কি জড় রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্যও। তাপ, আলো, বিদ্যুৎ-প্রবাহ শক্তির মূল আধার। তাপ প্রভাবে অমিত বেগে বাষ্পীয়-শকট ছুটিয়া চলিয়াছে দেশ হইতে দেশান্তরে; অর্ণবপোত পাড়ি দিতেছে ঊর্ম্মিমালা—বিক্ষুব্ধ বিশাল বারিধি। আলোর খেলায় ক্ষুদ্র কাঁচের ফলকে মানুষের প্রতিকৃতি আটকাইয়া পড়ে; ঘুমন্ত শিশু জাগিয়া উঠে; পাখীরা কলরব করিয়া ওঠে; গভীর রাত্রে জ্যোৎস্না-লোকে কাক ডাকিয়া উঠে। বিদ্যুৎ-প্রবাহে মুহূর্ত্ত মধ্যে পাখা ঘুরিয়া যায়, আলো জ্বলিয়া উঠে। এ তো আমাদের নিত্য-দেখা জগৎ। উদ্ভিদের অদৃশ্য জগতেও চলিয়াছে তাপ ও আলোর অনন্ত-শক্তির ক্রিয়াকলাপ। সূর্য্য কিরণ স্পর্শে পৃথিবী যখন জাগিয়া ওঠে, মানুষ যখন কর্ম্ম-চঞ্চল হইয়া ওঠে, উদ্ভিদ জগতেও তখন "জাগো, জাগো" রব পড়িয়া যায়। গাছে গাছে, পাতায় পাতায়, প্রতিফলিত সূর্য্য-রশ্মি শিহরণ লাগায় তাহাদের দেহে,—পুলকে জাগিয়া ওঠে সবুজ কোষগুলি, নাচিয়া ওঠে সবুজ কণাগুলি অপরূপ ছন্দে। এই পুলকিত স্পন্দনের উত্তেজনা সৃষ্টি করে অদ্ভুত কর্ম্ম-চাঞ্চল্য। অতি সূক্ষ্ম, আনুবীক্ষনিক সবুজ কণাদ্বারা সূর্য্যের "তেজ" হরণ করাইয়া উদ্ভিদ অলক্ষ্যে অতি গোপনে আপন কার্য্য সমাধা করাইয়া লয়। সূর্য্যালোক—উত্তেজিত সবুজ কণাগুলিই উদ্ভিদকোষে রহস্যময় রাসায়নিক সংযোগ ও বিয়োগ ঘটাইয়া সৃষ্টি করে শর্করা, শ্বেতসার। অন্ধকারে
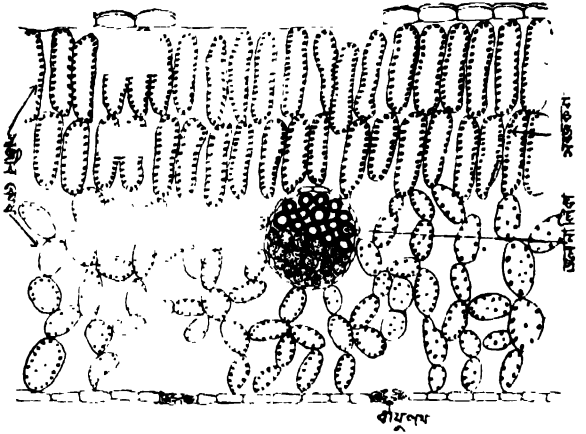
পাতার আভ্যন্তরিক প্রতিকৃতি (আনুবীক্ষনিক)

তাহারা ঝিমাইয়া পড়ে—নিস্তেজ, নিষ্ক্রীয়, অসাড়। এক-টানা নিগূঢ় আঁধার হরণ করে সবুজ-কণার সবুজ রং "ক্লোরোফিল", পাতার চেহারা হইয়া যায় "রক্তহীন"—ফ্যাকাশে। পাথর চাপা পড়া ঘাসের চাপড়ার এই "রূপ" পরিবর্ত্তন আমাদের প্রায়ই নজরে পড়ে। "ক্লোরোফিল"—পাতা একবারে অকর্ম্মণ্য। সূর্য্যের আলোই "ক্লোরোফিল" উৎপত্তির মূল কারণ; তার সঙ্গে চাই একটু লৌহ-ঘটিত লবণক পদার্থের সমন্বয়—রক্তকণিকার "হিমো-গ্লোবিনের" মত। সূর্য্যের সঙ্গে বিরহ ঘটিলে ম্রিয়মান "ক্লোরোফিলের" কর্ম্ম-প্রবণতা একেবারে ডুবিয়া যায়।·· ক্রিয়াশীল "ক্লোরোফিলই" শর্করা ও শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ তৈরীর মূল কেন্দ্র। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাহারা নিজেরা থাকিয়া যায় সম্পূর্ণ অবিচলিত, অবিকৃত। কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে না তাহাদের দৈহিক প্রকৃতিতে। অথচ অতি জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত করাইয়া ঘটায় আমূল পরিবর্ত্তন। একাধারে তাহাদের আলোক-প্রিয়তা, যোগবাহী-ক্রিয়া-সহায়ক কার্য্য, উত্তপ্ত কণাসমূহের কম্পনজনিত গতি-শক্তির

রজোগুণ "আলোক-রসায়নের" রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার এক বিপ্লবাত্মক অধ্যায়। বৈজ্ঞানিক মানুষ ইহার নামকরণ করিলেন—ফটোসিন্থেসিস্ (Photo-Synthesis) (Photos—আলো, Synthesis=সংশ্লেষণ)। কিন্তু এইখানেই যবনিকা পতন নয়।

দিবা-অবসানে সূর্য্যের বিদায়-পটভূমিকার অন্তরালে, আঁধার যখন নামিয়া আসে ধরণীর বুকে, রজনীর ঘন তমিস্রা যখন কালো ছায়া মেলিয়া চরাচরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, পৃথিবীর কলগুঞ্জন তখন থামিয়া আসে। দিগ্‌বলয়ে সূর্য্যের শেষ স্মৃতিটুকু মুছিয়া যাইবার পূর্ব্বেই পাখীরা ফিরিয়া চলে আপন নীড় পানে; পশুরা লুকায় গুহায়; রাখাল বেণু বাজাইয়া "বেলা শেষের" গান গাইয়া চলে তাহার কুটীর পানে।···প্রহেলিকাময় প্রদোষ-অন্ধকার ঘোষণা করে—

আলুর আভ্যন্তরিক কোষ
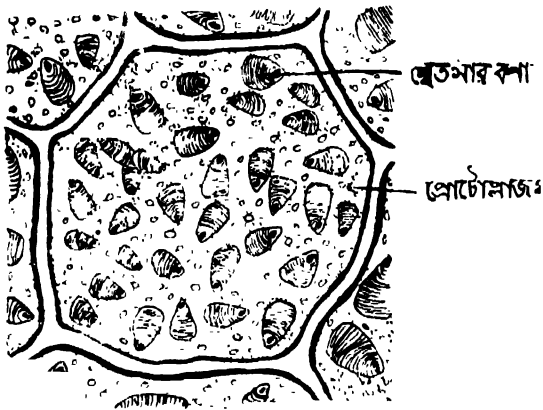
কর্ম্ম-বিরতি।···মায়াময় ইন্দ্রজাল ছড়াইয়া পড়ে আলোহীন জগতে।··কর্ম্মক্লান্ত জীব অবসাদে ঢলিয়া পড়ে অসাড় হইয়া।

আলোহীন জগৎ—ঘুমন্ত পৃথিবী—অপরূপ রূপ নিয়া দাঁড়াইয়া থাকে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের এক নিভৃত কোণে—নীরব, নিথর, নিস্তেজ। আলো-বিরহে নিশ্চল মূক উদ্ভিদ কি ভাবে, কি ভাষায় জানায় তাহার নিবেদন? ক্লান্ত উদ্ভিদও কি ঘুমাইয়া রয় নিশাযোগে? হায়! সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি উদ্ভিদের চির-জাগরণের পালা যেন আর শেষ হয় না! তাহার যেন ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই। বিরামহীন! বিশ্রামহীন! রজনীর অন্ধকারেও প্রত্যেক পাতা, শাখা-প্রশাখা, কাণ্ড, শিকড়ের কোষে কোষে চলে আবার কত সংযোগ বিয়োগ, ভাঙা-গড়া! হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ কোষের অন্ধকার কুঠরীতে আলোর খেলার কত চিহ্ন, কত সংলাপ, কত পরিবর্ত্তনের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে! ধীরে ধীরে আবার আবর্ত্তন সুরু হয় তাহাদের ভিতর। পাতার সবুজ-কোষে বহুল শক্তি ব্যয়ে যে শ্বেতসার তৈরী হইয়াছিল, উহা ভাঙিয়া যায়—পরিবর্ত্তিত হয় চিনিতে। সেই চিনি কোষস্থিত জলে দ্রব হইয়া আবার বহিয়া চলে উদ্ভিদের নিম্ন প্রদেশে—সম্পূর্ণ ভিন্ন রাস্তায়—খাদ্য নালিকা দিয়া। ক্রমে ছড়াইয়া পড়ে শাখা-প্রশাখায়, কাণ্ডে ও অবশেষে শিকড়ে। সেই চিনি ভাঙিয়া আবার উৎপন্ন হয়—"তেজ," উদ্ভিদের কর্ম্ম-শক্তি, জীবনী শক্তি, সৃজনি শক্তি। সৃষ্ট হয় নূতন নূতন সজীব কোষ। বৃদ্ধি হয় উদ্ভিদের কলেবর।···

চিনির উপাদানগুলি পরিণত হয় উদ্ভিদের দৈহিক উপাদানে, "রক্ত-মাংস অস্থিতে"।···চিনি আর চিনি রহিল না, উদ্ভিদের সারা দেহে কোষে কোষে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গেল। সমাধা হইল উদ্ভিদের খাদ্য শ্বেতসার শর্করার পরিপাক ও সমীকরণ ক্রিয়া।

কোন কোন উদ্ভিদে তার 'খাওয়ার" পরও অনেক চিনি উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায়। সেই চিনির পসরা নিয়া উদ্ভিদ কোন হাটে যাইবে? রাত্রির অন্ধকারে আবার চলিতে থাকে জীব-রসায়ণের কাজ। উদ্বৃত্ত চিনি পুনরায় শ্বেতসারে পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু এবার সবুজ কণার সাহায্যে নয়। সে যে আলো-বিরহে অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এবারকার কর্ম্মক্ষেত্রের প্রধান কর্ম্মী কতকগুলি শ্বেতকণিকা—অন্ধকারেই তাহাদের প্রতিপত্তি, আনাগোণা। এই তমঃজাত নব শ্বেতসার উদ্ভিদ বিশেষে উহার বিভিন্ন অংশে দানা দানা করিয়া জমিতে থাকে এবং তার প্রাচুর্য্য আমরা দেখিতে পাই আলুর ভূগর্ভস্থ স্ফাতকন্দে, ধানের কণায়, গম, যব ভুট্টার দানায়, আর ও কত কিছুর মধ্যে—লতায় পাতায় ফল মূলে।···

শ্বেতসার ও শর্করাকে কেন্দ্র করিয়াই নানা রূপ রাসায়ণিক সংযোগ, বিয়োগ, ও অতীব জটিল সংশ্লেষণে উদ্ভিদের যায়গায়-যায়গায় সৃষ্টি হয় বিচিত্র তৈলাদি পদার্থ, রাশি রাশি প্রোটীন। শ্বেতসার, শর্করার কার্ব্বন, হাইড্রোজেন অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে মৃত্তিকার জল-স্রোতে প্রাপ্ত (আগত) নাইট্রোজেন, গন্ধক, ও ফস্‌ফোরাস পরমাণুর রাসায়নিক সংস্বয় ঘটিলেই সৃষ্টি হয় প্রোটীন।···

স্বাবলম্বী উদ্ভিদ কত পরিশ্রম, কত ক্লেশে, কত রাত্রি জাগিয়া, কী অধ্যবসায়ের সহিত তিল তিল করিয়া বিবিধ খাদ্যরাশি প্রস্তুত করিয়া প্রকৃতির ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিল। দেবী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিমতী হইলেন। সমগ্র মানবজাতি, জীবিত প্রাণী প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে এই সংরক্ষিত খাদ্যকে ভরসা করিয়াই বাঁচিয়া আছে।···সৃষ্টি রক্ষা পাইতেছে।

শিশু-সংসদ

উদয়ন-কথা

প্রিয়দর্শী

(গোড়ার কাহিনী) তৃতীয় পর্ব্ব

বৎসরাজের চিঠি যখন প্রদ্যোতের কাছে এসে পৌছ্‌ল তখন তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। মনের আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে তিনি অন্তঃপুরে গিয়ে মহিষী অঙ্গারবতীকে ডেকে বল্‌লেন—"রাণি! এতদিনে মা ভগবতী বোধ হয় মুখ তু'লে চাইলেন। মেয়ের যক্ষিণী দেবীকে পূজা দিতে যাওয়া সফল হয়েছে। এই দেখ উদয়ন চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে তিনি বাসবদত্তাকে বীণা শেখাতে রাজি—তবে তিনি রাজপ্রাসাদে আস্‌বেন না—মেয়েকেই সঙ্গীতশালায় শিখ্‌তে যেতে হবে"। রাণীর ত মনের আনন্দে কথা বেরু'চ্ছে না মুখ দিয়ে। একটু পরে তিনি বল্‌লেন—"মহারাজ! তাই হোক। আপনি আর আপত্তি করবেন না। রাজপ্রাসাদের চেয়ে সঙ্গীতশালাই ভাল। সেখানে দু'জনের দু'চা'রদিন দেখা-শোনা হ'লেই বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হবে, আর আপত্তি হবেনা"।

প্রদ্যোত বল্‌লেন, "রাণি! তোমার কথাই সত্য হোক"।

পরের দিন সকালে শুভলগ্নে বাসবদত্তার বীণা-শিক্ষার হাতে-খড়ি হ'ল উদয়নের কাছে। সেদিন রাজা-রাণী দু'জনে মিলে মেয়েকে সঙ্গে ক'রে বৎসরাজের কাছে গিয়ে বল্‌লেন—"আমার এই একটি মাত্র মেয়ে, বড়ই আদরের। এ নানা রকম কলাবিদ্যা শিখেছে। কিন্তু গান-বাজনা এখনও বেশী আয়ত্ত করতে পারে নি। সেই ভারটা আপনি নিলেই আমরা নিশ্চিন্ত হব। কাল থেকে মেয়ে আমার তার ধাইমাকে সঙ্গে নিয়ে রোজ দু'বেলা আপনার এখানে আস্‌বে। আর যতক্ষণ বল্‌বেন—ততক্ষণ আপনার কাছে অভ্যাস করবে"।

এই ভাবে বাসবদত্তা ও উদয়নের প্রথম পরিচয় সুরু হ'ল। দিন দশেকের মধ্যেই দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব দেখা দিল। রোজই উজ্জয়িনীর রাজপথের পথিকরা সঙ্গীতশালার জান্‌লার বাইরে থেকে দেখ্‌ত বৎসরাজ উদয়নের কোলের উপর ঘোষবতী বীণাটি রয়েছে—তিনি চক্ষু মুদে সঙ্গীতের আলাপ করতে করতে যেন আত্মহারা হ'য়ে পড়েছেন। আর তাঁর সাম্‌নে ব'সে রাজকুমারী বাসবদত্তা তার অনুকরণ অভ্যাস ক'রছেন।

দিন দশ বার এইভাবে যাবার পর একদিন সকাল বেলা বৎসরাজের প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ, সেনাপতি রুমণ্ব'ন্ আর বিদূষক বসন্তক এসে উজ্জয়িনীতে প্রবেশ করলেন। ব্রহ্মরাক্ষস যোগেশ্বরের মন্ত্রবলে যৌগন্ধরায়ণ ও বসন্তকের চেহারা এমন বদ্‌লে গিয়েছিল যে, যৌগন্ধরায়ণের যে সব চর আগে থাক্‌তে এসে উজ্জয়িনীতে ছদ্মবেশে বসবাস করতে লেগেছিল, তারাও তাঁদের দু'জনকে প্রথমটা চিন্‌তে পারল না। এতে যৌগন্ধরায়ণ মনে মনে খুবই আনন্দিত হলেন। সেনাপতি রুমণ্বানের চেহারার কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। তিনি শুধু বৌদ্ধ শ্রমণের ছদ্মবেশ ধরেছিলেন। এদের তিনজনের মধ্যে পরস্পর এইরকম সঙ্কেত ছিল যে যখনই কেউ কোন নতুন খবর পাবেন, তিনি দুপুরবেলা গিয়ে নগরীর বাইরে রক্তচামুণ্ডার মন্দিরের পাশে যে খালি শিবমন্দির আছে তার দোরে গিয়ে বস্‌বেন। রোজ দুপুরে তিন জনে ঐ শিবমন্দিরে এসে মিল্‌বেন, আর যা করবার তাই নিয়ে গুপ্ত পরামর্শ হবে।

যৌগন্ধরায়ণ রাজধানীতে ঢোক্‌বার আগেই রুমণ্বান্‌কে বল্‌লেন, "সেনাপতি! তুমি আগে সারা নগরটা ঘু'রে আমাদের চরগুলির সন্ধান নাও। তাদের বোলো—ঐ শিবমন্দিরে এসে সকলে যেন কাল দুপুরে আমাদের সঙ্গে দেখা করে। আর বসন্তক! তুমি রাজপথে খুব ভাঁড়ামি ক'রে বেড়াও। যদি রাজবাড়ীর মেয়েরা তোমার মুখে রসিকতা শোন্‌বার জন্য রাজপ্রাসাদের ভিতর তোমায় নিয়ে যেতে চায়—নিশ্চয়ই যাবে—তবে খুব সাবধানে। সেখানে ঢুকে ঠিক খবরটা জেনে আস্‌বে, মহারাজ কোথায় কি ভাবে বন্দী আছেন, তাঁর উপর প্রদ্যোত কি রকম ব্যবহার করছে। আর আমিও পাগ্‌লা সেজে পথে পথে একটু ঘুরে দেখি মহারাজের কোন হদিশ পাই কি না। কাল দুপুরে আমরা সকলে ঐ শিব-মন্দিরে এসে মিলে পরামর্শ করব"।

তিনজনে দল ভেঙে তিন দিকে ছিটকে বেরিয়ে গেলেন।

রুমগ্বানের মাথা নেড়া, পরণে বৌদ্ধ শ্রমণদের ছোপান কাপড়, হাতে ভিক্ষাপাত্র। বসন্তকের গলায় একটা প্রকাণ্ড ঢাক ঝোলান। তাই বাজাতে বাজাতে তিনি পথে বেরুলেন। আর যৌগন্ধরায়ণের ত পাগ্‌লার বেশ—একপাল ছেলে তাঁকে খেপাতে খেপাতে তাড়িয়ে নিয়ে চল্‌ল। এইভাবে তিনি রাজপথে কিছুদূর যেতে যেতে হঠাৎ এসে পড়লেন সঙ্গীতশালার সামনে। যেই জান্‌লার দিকে মুখ ফিরিয়েছেন আর দেখ্‌লেন—কি আশ্চর্য্য! মহারাজ উদয়ন ঘরের ভিতর ঘোষবতী বীণা বাজিয়ে সঙ্গীতের আলাপে মত্ত। পাশে ব'সে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে সেই গান শুন্‌ছে। অনুমানে বুঝ্‌লেন—এই হয়ত প্রদ্যোতের মেয়ে বাসবদত্তা। যৌগন্ধরায়ণ জানলার সামনে দাঁড়াতেই ছেলের পাল ছুটে এসে তাঁর গায়ে ধুলো-কাদা ছুড়ে দিতে লাগ্‌ল। তিনিও এক একবার তাদের তাড়া ক'রে যেতে লাগ্‌লেন। এইভাবে খানিকক্ষণ হৈ হৈ করতেই রাস্তায় বেশ লোকের ভিড় জমে গেল। এমন সময় দূর থেকে দেখা গেল হাতীর মত বিপুল চেহারার একটা লোক তার গোদা পা দুটো থপ্‌ থপ্‌ ক'রে ফেল্‌তে ফেল্‌তে ভুঁড়ি দুলিয়ে দুলিয়ে একটা প্রকাণ্ড ঢাক বাজাতে বাজাতে সেই দিকে আস্‌ছে। যৌগন্ধরায়ণ বিদূষককে চিন্‌তে পেরেই ইসারায় তাঁকে জানালেন—আর এগিয়ো না।

ইতিমধ্যে সঙ্গীতশালার জান্‌লায় বাসবদত্তা ও তাঁর সখীরা এসে মজা দেখ্‌তে লেগেছেন। অদ্ভুত এক পাগল দেখে তাঁদের খেয়াল হ'ল পাগলটাকে ভিতরে এনে তার পাগলামী দেখ্‌বেন। আর যায় কোথায়! জন কয়েক প্রহরী এসে যৌগন্ধরায়ণকে ধ'রে সঙ্গীতশালার ভিতরে নিয়ে গেল। যৌগন্ধরায়ণও এই চাইছিলেন। রাজার সামনে গিয়ে তিনি একটু পাগ্‌লামী দেখাতে দেখাতে হঠাৎ অদৃশ্য হবার মন্ত্রবলে একেবারে লোপ পেয়ে গেলেন। কেবল এক উদয়ন তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্ছিলেন। তা ছাড়া বাসবদত্তা, তাঁর ধাই-মা, সখীরা, চেড়ীরা, প্রহরীরা, কেউই আর তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্ছিলেন না। এই ব্যাপারে সবাই অবাক! বাসবদত্তা ত' ব'লেই উঠলেন—'এই ত' ছিল পাগ্‌লা এই উঠোনে—এর মধ্যে চোখের পলক না ফেল্‌তে গেল কোথায়?! চারদিকে পাহারা—পালাল কোথা দিয়ে—ভেল্‌কি জানে না কি! তাই শুনে রাজা বুঝ্‌লেন—পাগলটি যে সে-লোক নয়; কারণ তিনি বেশ তাকে দেখ্‌তে পাচ্ছেন, অথচ আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না—এ-ত' সাধারণ পাগলার কর্ম্ম নয়। ভাব্‌তে ভাব্‌তে দেখেন যে তাঁর সামনে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ দাঁড়িয়ে। বুঝ্‌লেন যে ঐ পাগ্‌লাই যৌগন্ধরায়ণ—নিশ্চয় কোন অলৌকিক শক্তি বা মন্ত্রের বলে অন্যের অদৃশ্য হ'য়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। যৌগন্ধরায়ণ ইসারায় উদয়নকে বল্‌লেন বাসবদত্তা ও তাঁর দলবলকে সরিয়ে দিতে। বৎসরাজও আর সময় নষ্ট না ক'রে রাজকুমারীকে বল্‌লেন—"দেখুন, ভদ্রে! আজ ত' আমাদের সরস্বতী পূজা দেওয়ার কথা! আপনি খুব তাড়াতাড়ি প্রাসাদে গিয়ে পূজার জিনিষ সব গোছ ক'রে কাপড় চোপড় ছেড়ে স্নান ক'রে আসুন। আমিও ততক্ষণ স্নান ক'রে তৈরী হ'য়ে নিই। এখন ও-সব পাগ্‌লা-টাগ্‌লার তামাসা বন্ধ থাক্‌। নইলে পূজার সময় উৎরে যাবে"। বাসবদত্তা এই কথা শুনে দলবলে সঙ্গীতশালা থেকে চ'লে গেলেন। প্রহরীরাও যে যার জায়গায় স'রে গেল।

তখন যৌগন্ধরায়ণ বল্‌লেন—"মহারাজ! বেশী কথা বল্‌বার সময় নেই। আপনাকে আমি লোহার শিকল ভাঙ্‌বার আর উঁচু পাঁচিল ডিঙাবার কৌশল ও মানুষ বশ করবার মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে যাই। এখনই ঢাক ঘাড়ে বসন্তককে এখানে দেখ্‌তে পাবেন। কোন রকম ফন্দী ক'রে তাকে সর্ব্বদা আপনার কাছে রাখ্‌বেন। যখন আপনার আমাদের খবর দেবার দরকার হবে, তখন তাঁর মারফৎ খবর পাঠাবেন। আমিও কখন কি করতে হবে বসন্তকের মুখেই খবর পাঠাব। দু'চার দিন এই ভাবেই চলুক। ইতিমধ্যে আমি দেখি কি উপায়ে আপনাকে মুক্ত করা যায়। এখন আমি চলি। ঐ রাজকন্যা আবার আস্‌ছেন"। এই ব'লে যৌগন্ধরায়ণ অদৃশ্যভাবেই সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাবার আগে অবশ্য কৌশল ও মন্ত্রগুলি রাজা শিখে নিলেন।

বাসবদত্তা স্নান সেরে পট্টবস্ত্র প'রে সখীদের হাতে পূজার জিনিষ সব যোগাড় ক'রে দিয়ে এসে হাজির হলেন সঙ্গীতশালায়। ঠিক সেই সময় দমা-দম্‌ শব্দে ঢাক বাজাতে বাজাতে ছদ্মবেশী বসন্তকও এসে হাজির ঐ বাড়ী দোরগোড়ায়। ঢাকের শব্দে মেয়েরা আবার জানলার ধারে গিয়ে দেখেন—আবার এক অদ্ভুত দৃশ্য! এক জালাপেটা হাতীর মত মানুষ এক বিরাট ঢাক গলায় ঝুলিয়ে বাজাচ্ছে! তাই দেখে বাসবদত্তা সখীদের বল্‌লেন—"আচ্ছা! আজকের সকালটায় এত অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যাচ্ছে কেন বল দেখি! এই একটু আগে ছিল এখানে এক পাগ্‌লা। নাচ্‌তে নাচ্‌তে হঠাৎ সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আবার সেই জায়গায় এক হাতী-মানুষ এসে উপস্থিত। এ ব্যাপারটা কি! দেখ দেখ, লোকটা উপর দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ছে! ও বাবা! কি বিকট মুখখানা!"

বিদূষক ততক্ষণ বাসবদত্তার দিকে তাকিয়ে জোড়হাতে বল্‌তে সুরু করছেন—"জয় হোক্‌ রাজকুমারী! জয় হোক্‌ দিদিমণিদের! আমি পাগল নই—গরীব বামুন—সর্ব্বাঙ্গে গোদ হ'য়ে এ-রকম ফুলে উঠেছি। এই ঢাক বাজিয়ে

ভাঁড়ামি ক'রে লোক হাসিয়ে কোনো রকমে দু'পয়সা রোজগার করি। আজ আমার একটা গতি কর দিদিমণিরা! আমি আর নড়তে পারছি না। এই ব'লে তিনি ধপাস্ ক'রে পথের উপর ব'সে পড়লেন।

উদয়ন পাশের জানলা দিয়ে বিদূষককে লক্ষ্য করছিলেন। চেহারা দেখে চিন্‌তে না পারলেও যৌগন্ধরায়ণের কথামত তিনি বুঝেছিলেন—এই তাঁর প্রিয় বন্ধু বসন্তক। তিনি তখন বাসবদত্তাকে উদ্দেশ ক'রে বল্লেন—"ভদ্রে! আজ সরস্বতী পূজায় ত' ব্রাহ্মণভোজন দরকার। একেই নিমন্ত্রণ করুন। দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা ও ব্রাহ্মণভোজন এক সঙ্গে দুই কাজই হবে"। বাসবদত্তাও বৎসরাজের কথায় রাজি হ'য়ে সখীদের পাঠিয়ে বিদূষককে বাড়ীর ভিতর আনালেন।

বিদূষক রাজার সামনে উপস্থিত হ'য়ে প্রথমটা নিজের মনের আবেগ চেপে রাখ্‌তে পারলেন না—ঝর্‌ঝর্ ক'রে কেঁদে ফেল্লেন। উদয়নেরও চোখে জল আস্‌ছিল। তিনি কোনও রকমে তাড়াতাড়ি নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন—"দাদা ঠাকুর! ভয় কি! তুমি আমার কাছেই থাক্‌বে। আমি রাজবৈদ্যকে দিয়ে চিকিৎসা ক'রে তোমার রোগ সারিয়ে দেব!" বিদূষকও তখন অনেকটা নিজেকে সাম্‌লে নিয়েছেন। চোখের জল মুছে হাত জোড় ক'রে বল্লেন—"রাজা দাদা! তোমার অনেক দয়া"!

বিদূষকের বিকট আকৃতি দেখে রাজকন্যার সখী আর চেড়ীরা হাসি চেপে রাখ্‌তে পারছিল না। তারা সব দূরে সরে গিয়ে মুখে কাপড় দিয়ে হাসাহাসি করছিল। বাসবদত্তারও মনে মনে যে হাসির ভাব আস্‌ছিল না, তা নয়। তবে পাছে গরীব রুগ্‌ণ ব্রাহ্মণ মনে কষ্ট পায় এই ভেবে তিনি অনেক কষ্টে হাসি চেপে মুখের গম্ভীর ভাব বজায় রেখেছিলেন। মহারাজ উদয়ন তা বুঝতে পেরে বিদূষককে বল্লেন—"দেখ! দা' ঠাকুর! আমাদের এই রাজকুমারীর দয়ায় তোমার ত একটা হিল্লে হ'য়ে গেল। এখন তুমি যদি রোজ সকাল-সন্ধ্যা ওঁকে একটু আমোদ দিতে পার, তবে তোমার অন্ন এ দেশের রাজবাড়ীতে বাঁধা হ'য়ে যাবে।"

বিদূষক খুব উৎসাহ ক'রে ব'লে উঠলেন—"নিশ্চয়! দিদি ঠাক্‌রুণ! আমি অনেক মজার মজার গল্প জানি—যা শুনলে আপনি হাসি চাপতে কিছুতেই পারবেন না।" শুনে রাজকন্যার মনে খুব কৌতূহল হ'ল। তিনি বল্লেন—তবে আপনি এই সঙ্গীতশালায় এঁর কাছেই থাকুন। আমি রাজবাড়ী থেকে আপনার থাক্‌বার খরচার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। আর আজই সন্ধ্যার সময় এসে আমরা সকলে শুনব আপনি কেমন হাসির গল্প বল্‌তে পারেন।"

মেঘ না চাইতে জল! বিদূষক যা খুঁজছিলেন, তাই আপনি বিনা চেষ্টায় মিলে গেল। সেই দিন থেকেই তিনি নানারকম আজগুবি কাহিনী ব'লে রাজকন্যার খুব প্রিয় হ'য়ে উঠলেন। আর যখন বাসবদত্তা বাড়ী যেতেন, তখন একলা একলা মহারাজ উদয়নের সঙ্গে বিদূষকের আলোচনা হ'ত—কি ক'রে পালান যায়। একদিন বসন্তক বল্‌তে লাগলেন—"শুনুন মহারাজ! প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ পাগল সেজে উজ্জয়িনীতে আছেন—এ ত আপনি জানেন। প্রধান সেনাপতি রুমণ্বান্‌ও এখানে আছেন বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশে। আর আমি ত আছিই। এ ছাড়া মন্ত্রী ম'শায়ের বিস্তর চর আর সেনাপতি ম'শায়ের বহু দেহরক্ষী সৈন্য ছদ্মবেশে এই নগরের প্রায় অর্দ্ধেক জায়গা জুড়ে বাস করছে। আমরা তিনজনে মাঝে মাঝে নগরের বাইরে এক পোড়ো দেবমন্দিরে গিয়ে মিলি—সেখানে আমাদের পরামর্শ হয় কি ক'রে আপনাকে উদ্ধার করা যাবে। কাল মন্ত্রী ম'শায় যে যুক্তি খাটিয়েছেন তা' আপনার কাছে নিবেদন করতে বলেছেন। আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনে বিচার ক'রে বল্‌বেন, পালাবার ফন্দীটা আপনার মনের মত হয়েছে কি না—অন্ততঃ আপনি নিজে সেই ফন্দী অনুসারে কাজ করতে পারবেন কি না"?

রাজা খুব আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—"বল বল ফন্দীটা কি শুনি।"

বিদূষক একটু হেসে একটু কেসে দু'চারবার এদিক্ ওদিক্ উঁকি মেরে দেখে যখন নিশ্চিন্ত হলেন যে প্রদ্যোতের গুপ্তচর কোথাও থেকে আ'ড় পেতে তাঁদের কথাবার্ত্তা শুনছে না, তখন তিনি আরম্ভ করলেন চাপা গলায়—"মহারাজ! প্রদ্যোতের একটা পাগড়ে হাতী আছে, তার নাম নড়াগিরি। কেউ কেউ তাকে নলাগিরিও ব'লে থাকে। হাতীটা যেন ইন্দ্রের ঐরাবত, কিংবা দশ দিগ্‌গজের একটা। যাই হোক হাতীটা ছুটতেও পারে যেমন, তার গায়ের জোরও তেমনই। হাতীটাকে একটা মাহুতে বাগ মানাতে পারে না—শুধু তার জন্যেই অন্ততঃ চার পাঁচ জন মাহুত আছে। আর তাদের সর্দ্দার একজন মহামাত্র আছে—প্রদ্যোতের কাছ থেকে সে খুব মোটা মাইনে পায়। হাতীটা পাছে কোনদিন ক্ষেপে গিয়ে অনর্থ বাধায় এই ভয়ে মহামাত্র নিজে রোজ হাতীটার পরিচর্য্যা করে। লোকটা গজশাস্ত্রে খুব পণ্ডিত। হাতীর থাক্‌বার জায়গায়, শোবার জাগায় এমন সব ঠাণ্ডা জিনিস রাখে, স্নানের জলে, খাবার-জিনিষের সঙ্গে রোজ সে এমন সব লতা-পাতা গাছ-গাছড়া মিশিয়ে দেয় যার ফলে হাতীটার মাথা গরম হ'তে পারে না। এ ছাড়া নানারকম মন্ত্র-তন্ত্র প'ড়ে তুক্-তাক্ ক'রে হাতীটাকে সে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখে। অন্য হাতীর মদগন্ধ * পেলে পাছে সে খেপে উঠে, এজন্য তাকে একটা হাতীশালায় একলা রাখা

* মদ্দা হাতীর কপালের পাশে ছেঁদা দিয়ে এক রকম চড়া-গন্ধ রস বেরোয় তার নাম মদ।

হয়—অন্য কোন মদ্দা বা মাদী হাতী তার ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পায় না। তার গজশালার কাছে চড়া-গন্ধ কোন ধূপ-ধুনো জ্বালাবার হুকুম নেই—কাছাকাছি কোন দেব-মন্দিরে জোরে শাঁখ-ঘণ্টা-ঢাক বাজান হয় না। রাত্রে তার গজশালার সামনে দিয়ে মশাল পর্য্যন্ত জ্বেলে যেতে দেওয়া হয় না। এমনই সাবধানে রাখা হয় হাতীটাকে। কিন্তু আমাদের মন্ত্রী ম'শায় ত বড় কম পাত্র নন। তিনি এর মধ্যেই তার মাহুতগুলোকে হাত ক'রে ফেলেছেন ঘুষ খাইয়ে। তারা আজই তাদের সর্দ্দার মহামাত্রকে সন্ধ্যা থেকে খুব ক'সে মদ খাইয়ে নেশায় চুর ক'রে রাখবে। মহামাত্র যখন জ্ঞান হারিয়ে ফেল্‌বে, তখন তারা হাতীটার স্নানের জলে ও খাবার সঙ্গে এমন সব গাছের পাতা মিশিয়ে দেবে যাতে তার মাথা গরম হ'য়ে ওঠে। তার পর তার থাক্‌বার জায়গায় ও শোবার জায়গায় এমন সব চড়া-গন্ধ গাছ-গাছড়া বিছিয়ে রাখবে আর এমন সব উগ্র ধূপ-ধুনো জ্বেলে দেবে যে হাতীটা যাতে এক রাত্রেই খেপে যায়। তার পর অন্য সব মদ্দা হাতী নিয়ে কেবল তার সাম্‌নে ঘোরা ফেরা করবে। তাদের মদগন্ধে এর মেজাজ যাবে বিগ্‌ড়ে। ভোর রাত্রে আশে পাশের দেবমন্দিরগুলোতে মঙ্গল আরতির সময় খুব জোরে জোরে কাঁসি-ঘণ্টা-শাঁখ-জয়ঢাক বাজান হ'তে থাকবে। আর মাহুতেরা একটা ছোট চালা তুলে রেখেছে ঠিক নড়াগিরির গজশালার সাম্‌নে। সেইটেয় সময় বুঝে আগুন ধরিয়ে দেবে। আগুনটা জ্বলে উঠলেই নড়াগিরির পায়ের শেকল দেবে তারা খুলে। মহামাত্র থাক্‌বে তখন নেশায় বেহুঁস হ'য়ে শুয়ে। কাজেই নড়াগিরি কাল ভোরে খেপে হাতীশালা থেকে বেরিয়ে পড়বে। কেউ তখন আর তাকে আটকাতে পারবে না"।

[ক্রমশঃ

ক্ষীরের পুতুল

(গল্প)

শ্রীকানাইলাল সাহা

রথের কয়েকদিন পরে।

সারাদিন ঝিম্ ঝিম্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। বিকেলবেলা ঘরের ভেতর বসে থাকতে আর ভালো লাগলো না। রেন্-কোটটা কাঁধে ফেলে ছাতাটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

উদ্‌ভ্রান্তের মত খানিক পথে পথে ঘুরে চৌমাথার ওপর গিয়ে দাঁড়ালাম। মানুষ-বোঝাই বাসগুলো গঁক্ করে সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়, আবার খানিক বাদে হুস্ করে ছুট দেয়। মোটরের ধক্‌ধকানি যেন বুকের ভেতর হাতুড়ি পিটছিল। ভীড় দেখে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছিল—কোনটাতেই উঠতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু বেরিয়েছি তো কোথাও যাবার জন্যেই!

কোথায় তা জানি না। আধ ঘণ্টা পথের ওপর দাঁড়িয়েও স্থির করতে পারলাম না আমার গন্তব্য স্থানটি। তবু কোথাও যাওয়া চাই, নইলে মনের অসুস্থতা কাটবে না যে!

চঞ্চল দৃষ্টিকে দূরে বিছিয়ে দিয়ে দেখি ৩৬নং বাসখানা হু হু শব্দে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। তার সশব্দ গতিই আমায় স্মরণ করিয়ে দিলে—'নিমু'দের বাড়ী যেতে হবে। অনেকদিন দেখি নি ছেলেটাকে, কি জানি কেমন আছে!

বাস থেকে নেমে দেখি সারা পথটি কাদায় ভরা। কোন রকমে পরনের কাপড়টিকে কাদার হাত থেকে বাঁচিয়ে নিমুদের বাড়ীর দিকে চললাম।

সন্ধ্যার তখন অনেকটা বাকি। সিদে রাস্তায় খানিকটা চলে বাঁ দিকে একটু মোড় ফিরলে প্রকাণ্ড একটি মাঠের পশ্চিম দিকে নিমুদের বাড়ী।

দূর থেকেই দেখতে পেলাম, সদর ঘরটি খোলা। নিশ্চয়ই ওদের বাড়ীর কেউ আছে সেখানে। বাইরে থেকে আর চেঁচামেচি না করে সটান সদর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখি – আবছা আলোয় একটি চেয়ারে বসে ছবিরাণী পুতুল খেলায় মেতেছে। সামনে আর একটি চেয়ারে চ্যাপ্টা একটি ক্রিম ক্রেকার বিস্কুটের টিনে পরিপাটী করে বিছানা পেতে ছবি শুইয়ে রেখেছে তার ছোট বড় কাচের পুতুলগুলি। কোনটার গায়ে ঘাঘরা পরানো, কোনটাকে আবার কুঁচি করে কাপড় পরানো। কারো গলায় পুঁতির মালা, আবার কারো গলায় পদ্মবিচির মালা।

একটি জাপানী পুতুলকে বুকের কাছে তুলে নিয়ে ছবি আদর করছে। দরজার পাশ থেকে আমি তার খেলা দেখছিলাম।

ছবির বয়েস হবে বছর পাঁচেক। তার সঙ্গে আমার খুব ভাব। তার ছোট্ট পুতুলের সংসারের যাবতীয় খবর সে

অনর্গল আমায় বলে যায়। তার সংসারের সুবিধে অসুবিধে মায় ছেলে-মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারটিও অসঙ্কোচে সে আমায় বলে যায়। ও বুঝে নিয়েছে আমাকে তারই একজন সাথী হিসেবে এবং প্রয়োজন হলে নতুন ধরনের পুতুল ও বিয়ের কিছু কিছু খরচ বহন করবার ক্ষমতাও যে আছে, কি জানি কেমন করে এ ধারণাটুকু তার মনে গেঁথে গেছে।

ছবির তন্ময় ভাবটুকু বেশ ভালই লাগ্‌ছিল। জাপানী পুতুলটিকে মুখের কাছে তুলে ধরে তার মুখে একটি চুমু খেয়ে অস্ফুট স্বরে কি যেন একটা বলে উঠলো।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। বসবার ইচ্ছে হলো বলে তাকে ডেকে বললাম: পুতুল খেলছো ছবু রাণী?

অপ্রস্তুত হয়ে হাতের পুতুলটি চেয়ারের ওপর চিৎ করে ফেলে দিয়ে ছবি উঠে দাঁড়ালো। তারপর বললে: ওমা, অরুণ-দা, কখন এলেন?

তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললাম: এই তো এলাম। নিমু কোথায়?

'কি জানি, তার ম্যাচ ট্যাচ্ আছে বোধ হয়।'

'আমি আসবো তিন মাইল দূর থেকে তোমাদের দেখতে, আর তোমরা সব পালিয়ে বেড়াবে? আর আসবো না তোমাদের বাড়ী।'

ছট্‌ফট্ করে উঠে ছবু বলে: আমার কি দোষ বলুন অরুণ-দা'? আপনি একটু বসুন, খেলাগুলো গুছিয়ে এক্ষুনি মাকে জিজ্ঞেস করে আসছি।

সামনের চেয়ারখানিতে বসে পড়লাম। ছবি আপন মনে পুতুল গুছোতে ব্যস্ত।

চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না বলে ওর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম।

'রথের দিন তোমায় যে 'মা-মা' ডলটি দিয়েছিলাম সেটি কোথায় ছবু?

'ও অরুণ-দা, আপনি জানেন না বুঝি? সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

আশ্চর্য্যের ভান করে চোখ দু'টি কপালে তুলে বললাম: কি হয়েছে সেটার? আমি কিছু শুনিনি তো।

ঘাড়টি বেঁকিয়ে পা দোলাতে দোলাতে ছবি বলতে লাগলো: অসীমাকে চেনেন? আমাদের পাশের বাড়ীতে থাকে। আমার চেয়ে বয়েসে একটু বড়ো। রথের পরদিন সকালে ও আমাদের বাড়ী এলো।

আমার পুতুলটি দেখে তো ভারি পছন্দ। আমায় বল্লে: ছবু ভাই, তোর পুতুলের সঙ্গে আমার পুতুলের বিয়ে দে।

আমি বললাম: হাঁ দোবো, আমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের।

অসীমা বল্লে: না ভাই, তোমারটা মেয়ে।

'শুনুন না অরুণ-দা', কি চালাক মেয়ে। আমার যদি মেয়ে হয়, তা' হলে আমার ভাল পুতুলটি তো ও নিয়ে রেখে দেবে। তাই আমি বিয়ে দিতে চাইলাম না। আর কী রাগ, ফর্ ফর্ করে অমনি বেরিয়ে গেলো আমাদের বাড়ী থেকে।

বিকেলে স্কুল থেকে ফিরচি এমনি সময় অসীমা ছুটতে ছুটতে এসে বল্লে: ছবু, তোর পুতুলটা আমায় একবার দেনা ভাই, মা আমায় ওই রকম একটা কিনে দেবেন বলেচেন।

আমার দেবার ইচ্ছে ছিল-না। তাই কোন কথা না বলে বাড়ীর ভেতর চলে গেলাম। ও-মেয়ে কিন্তু ভারী অসভ্য অরুণ-দা'। পিছু পিছু চললো আমাদের বাড়ীর ভেতর। মা বললেন: ছবু, অসীমা কি বলছে?

আমি জবাব দেবার আগেই ও বল্লে: ছবুর পুতুলটা একবার দিতে বলুন না মাসীমা, মা-কে একবার দেখিয়ে এক্ষুনি ফেরৎ দিয়ে যাবো।

মা-ও তেমি। দিতে বললেন। খানিক পরে আমি আর ছোড়দাদা খেতে বসেছি, অসীমা সদর ঘরের দরজার কাছ থেকে চেঁচিয়ে উঠলো: ছবু, তোমার পুতুলটা টেবিলের ওপর রেখে গেলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমি আর ছোড়দাদা সদর ঘরে এসে দেখি আমার পুতুল টেবিলের ওপর উল্টে পড়ে আছে, আর তার মুণ্ডুটা গড়িয়ে পড়েছে মেঝের ওপর।

অসীমা কি হিংসুটে মেয়ে অরুণ-দা'! 'মা-মা ডলে'র মাথাটাতো রবারের ফিতে দিয়ে আট্‌কানো থাকে? বিয়ে দোবো-না বলেছি বলে টেনে ছিঁড়ে দিয়ে গেছে।

পুতুলের অবস্থা দেখে আমি চীৎকার করে কেঁদে উঠলাম। ছোড়-দা' তো রেগেই খুন। বল্লে, "তুই কাঁদিস না ছবু, অসীমা-র মাকে বলে এক্ষুণি তোর পুতুল আদায় করে দিচ্ছি।

চেঁচামেচি শুনে মা এসে হাজির। ছোড়দাদাকে বকে উঠলেন, "ছি: নিমু, সামান্য একটা পুতুলের জন্যে পরের বাড়ী গিয়ে ঝগড়া ক'রতে নেই।"

ধমক খেয়ে ছোড়দাদা চুপ করে খানিকক্ষণ বসে রইলো। মা আমায় বললেন, "চুপ কর ছবু, পূজোর সময় ওর চেয়ে একটা বড় পুতুল কিনে দোবো।"

আমার কান্না কিন্তু থামতে চায় না। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে চেয়ারে বসে কাঁদতে লাগলাম। মা কখন চলে গেছেন

জানি না। ছোড়দা আমার মাথাটা তুলে ধরে বল্লে, "চুপ কর ছবু। এখনি তোর পুতুল আঁঠা দিয়ে জুড়ে দিচ্ছি।"

একবার মুখ তুলে তার দিকে চেয়ে বল্লাম, "তা আবার হয় বুঝি?"

"খুব হয়, তুই দেখিস্" বলে ছোড়দা' ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।"

আমি তেমনি ভাবেই বসে থাকলাম। খানিক পরে ছোড়দা' আমার মুখ থেকে আঁচল ছাড়িয়ে জোর করে দু'-হাত দিয়ে মুখখানি তুলে ধরে বল্লে, "দেখ ছবু, মুণ্ডুটা এঁটে ফেলেছি। এখন আর হাত দিস্ না। শুকিয়ে গেলে ঠিক হয়ে যাবে। তারপর একটা ঘাঘ্‌রা-টাগ্‌রা পরিয়ে দিস, কেউ তা'হলে বুঝতে পারবে না ওর মুণ্ডুটা ভাঙ্গা।"

ছোড়দা'-র কারিগরি দেখে মনে হোলো—ও ঠিকই বলেছে। কত আর কাঁদবো বলুন, আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে ফেললাম।

পুতুলটাকে বইয়ের তাকের ওপর রেখে দিয়ে ছোড়দা' বল্লে, "এইখানেই থাক এটা, কাল সকালে দেখিস্ ঠিক হয়ে যাবে।"

পরদিন সকালে ছোড়দাদা আমায় ঘুম থেকে তুলে সদর ঘরে নিয়ে এলো পুতুল দেখবার জন্যে। ঘরে ঢুকে পুতুলের অবস্থা দেখে দু'জনেই কেঁদে বাঁচিনা। ময়দার আঁঠার গন্ধে ইঁদুরে পুতুলের মুখখানি কুরে কুরে খেয়ে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে।

মা এসে বল্লেন, "সকালেই আবার কান্নাকাটি কিসের?

আমাদের দু'জনের কারো মুখে কথা নেই। পুতুলের অবস্থা দেখে তিনি ছোড়দা-কে বললেন, "বোকা ছেলে কোথাকার! শুধু ময়দার আঁটা, ইঁদুরে খাবেই তো। ওতে একটু তুঁতে গুলে দিলে এ কাণ্ডটি আর হোত্যো না।"

ছোড়দা' রেগে উঠে মা-কে বললে, "আপনিও-তো সব জানেন মা, আমাদের বিজ্ঞান বইতে লিখেছে তুঁতে বিষ। আঁঠায় তুঁতে গুলে দিলে ইঁদুরটা মরে ওখানে পড়ে থাক আর কি!"

ছোড়দা'-র কথা শুনে মা হেসে উঠে বললে, "ইঁদুর তোমার চেয়েও বুদ্ধিমান নিমু। তুঁতের গন্ধ পেলে সে আর পুতুলের মুণ্ডপাতের চেষ্টা করতো না।

রাগে মুখখানা ভার করে ছোড়দা বসে রইলো।

ছবুর পুতুলের গল্প আমার বেশ ভালই লাগছিল। আবছা আলোয় তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম—সে গল্প বলছে বটে, চোখের জলে তার বুকখানা কিন্তু ভেসে গেছে।

তাকে কোলে তুলে নিয়ে রুমাল দিয়ে মুখখানি মুছিয়ে দিয়ে বললাম, "একটা সেলুলয়েডের পুতুলের জন্যে এত কান্না কেন ছবু? চল, তোমায় একটা ক্ষীরের পুতুল কিনে দোবো।"

আমার মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, "সে-কি অরুণদা?"

আমি বললাম, "যাও, তুমি মা-কে ব'লে এসো। তারপর তোমায় নিয়ে যাবো ক্ষীরের পুতুল কিন্‌তে।"

ছবি বাড়ীর ভেতর চলে গেল। মিনিট দশ পরে আবার সে হাজির। পরনে পায়জামা, গায়ে ফুল-হাতা ছিটের সার্ট।

তার হাত ধরে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লাম।

আমরা চলেছি বাসে চড়ে। খানিক পরে একটি ক্ষীরের দোকানের সামনে নেমে পড়লাম। পছন্দ মত একটি ক্ষীরের আহ্লাদী পুতুল কিনে তার হাতে দিলাম। পেয়ে সে খুব খুসি। পুতুলের কোমরটি মুটিয়ে ধরে সে আমার হাত ধরে বললে, "বাড়ী চলুন অরুণ-দা।"

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঝাঁপিয়ে এসেছে পৃথিবীর বুকে। বৃষ্টি কখন থেমে গেছে আমাদের অজান্তে। বাতাস বইছে ঝির্ ঝির্ করে। আমরা একটা রিক্‌সায় চেপে বসলাম।

রিক্‌সাওয়ালা ছুটেছে তার হাতের ঘণ্টাটি ঠিন্ ঠিন্ করে বাজাতে বাজাতে। হঠাৎ এক সময় সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। এতক্ষণ আমি অন্যমনস্ক হয়েছিলাম। গাড়ীর ঝাঁকানিতে সজাগ হয়ে ছবুকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ডাকলাম, "ছবু!"

এক অসংর্ক মুহূর্ত্তে ছবু পুতুলের মাথাটি কামড়ে মুখে পুরেছে। সবটুকু ক্ষীর তখনও তার গলা থেকে নামেনি। তাই ধরা গলায় বললে, "কি বলছেন অরুণদা'?"

"ক্ষীরের পুতুল কেমন ছবু?"

আড় চোখে একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে কোলের ওপর লুটিয়ে পড়ে বল্লে, "ক্ষীরের পুতুলই ভাল অরুণদা'!"

যাদের গায়ে জোর আছে

শ্রীউমেশচন্দ্র মল্লিক, বি-এ

লণ্ডন নগরী। ধূমে ধূসরিত আকাশ, কলের ঝন্ ঝনানিতে সারা সহর মুখরিত। যন্ত্র-যুগের জয়ধ্বজা-স্বরূপ বিরাট চিমনিগুলি সহরের বুকে সদর্পে দাঁড়িয়ে আছে সৃষ্টির কোন আবহমান কাল থেকে অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ। এই এক দেশ—যেখানে মানুষের উপর মানুষের অগাধ বিশ্বাস। প্রত্যুষে দ্বারপ্রান্তে রুটীওয়ালা রেখে যায় রুটী, মাখনওয়ালা মাখন, দুধওয়ালা দুধ, কাগজওয়ালা কাগজ, নড়চড় হবার যো-টী নেই। দরিদ্র সংবাদপত্রওয়ালা ভাঙ্গা টেবিলের উপর সংবাদপত্রের স্তূপ রেখে অন্যত্র কাজে যায়। নিঃশব্দে একটির পর একটি বিক্রীত হয়ে যায়। একটি পয়সার গোল-মাল হবার যো-টী নেই। কিন্তু এখানেও কালাধলার বৈষম্য অমানুষিক।

তখন সবেমাত্র লণ্ডনের একটী স্কুলের ছুটি হোলো। সার বেঁধে নিষ্ক্রান্ত ছাত্রগুলিকে দেখলে মনে হয়—যেন একটি চঞ্চল তরঙ্গ। প্রত্যেকের মুখে হাসি, দেহে স্বাস্থ্য, অন্তরে আশা। এদেরই মধ্যে একজন সঙ্গীহীন অবস্থায় সকলের পিছনে আসে—যেন তার প্রাত্যহিক ঘটনা। পরাধীনতার অসহনীয় যাতনা মলিন করে তুলেছে তার কৈশোরের সোনার দিনগুলিকে। এই বিদেশী ছাত্রটির উপর সুসভ্য দেশের ছাত্রগুলির নিত্য-নূতন দুরন্ত-পনা অসহায় শিশু-মনটিকে করে তুলেছে বিষণ্ণ বিষাদগ্রস্ত। এর যেন শেষ নেই—চলেছে তো চলেছে, বিরাম বিহীন অবিশ্রান্ত। কর্ত্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদ জানাতে গিয়েও যখন সে হ'ল উপেক্ষিত-তখন তাহার মণি-কোঠায় প্রতিহিংসা চরিতার্থের তীব্র দহন-জ্বালা জ্ব'লে উঠেছে। ভুলে গেছে সে—এ তার দেশ নয়। সে অসহায় অবলম্বনহীন। জেগে উঠেছে তার মনে পুরুষের দৃঢ়তা, সিংহের বিক্রম।

সুযোগ বুঝি মানুষের একবারই আসে। কর্ত্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদ করায় বিদেশী ছাত্রগুলি তাকে যখন পুনরায় দল বেঁধে আক্রমণ করলো তখন ছাত্রটি সুবর্ণ-সুযোগের অপব্যবহার না কোরে আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য সামনের হাই-বেঞ্চগুলি সবলে সজোরে নিক্ষেপ কোরতে লাগলো একটির পর একটি। জনতাকে এ ভাবে ছত্রভঙ্গ কোরে সে ছুটে চল্লো প্রতি-আক্রমণ কোরতে। একটির পর একটি আহত ছাত্রদের আক্রমণ কোরে মস্তকে মস্তক-ঘর্ষণে পদাঘাতে ও মুষ্ট্যাঘাতে বিপর্য্যস্ত কোরে তুল্লো! এ-ভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের পর স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষের অলক্ষিতে সে যখন স্কুল থেকে নিষ্ক্রান্ত হোলো, তখন অন্ধকারময় লণ্ডনের আকাশে নিকষ ঘন কালো মেঘ জমা হয়েছে। সহরের বুকে ঝিপ ঝিপ ঝিপ কোরে বর্ষা নাম্লো।

দ্বিপ্রহরে আকস্মিক অপ্রত্যাশিত কয়েকটি অপরিচিত পদ-ধ্বনিতে বিদেশী ছাত্রটি আবার সচকিত হোয়ে উঠলো। পরিশ্রম-ক্লান্ত ছাত্রটির বুঝতে আর বাকী রইলো না এদের কিসের প্রয়োজন। তারই কক্ষ যখন পদাঘাত, গালি-গালাজে ধ্বনিত হোয়ে উঠলো, তখন তার চঞ্চল মন অজানা ভবিষ্যতের আশঙ্কায় আশঙ্কিত।

প্রহৃত জনতার প্রতিহিংসা চরিতার্থের অদম্য উৎসাহ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা শিশুমনে এমন এক আলোড়নের সৃষ্টি কর্লো, যাতে মুক্তিলাভের শেষ চেষ্টা করার জন্যে সে দ্বি-তলের উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে লম্ফ প্রদান করতে বাধ্য হোলো। সেখানেও তার বিপদের সীমা নেই। শুভানুধ্যায়ী ছাত্ররা সেখানেও প্রহরীর কাজে ব্যস্ত। বিদেশী ছাত্রটির অদ্ভুত সাহসে তারাও হোলো নির্ব্বাক নিস্পন্দ-গতি। যখন প্রাণ-ভয়ে বিদেশী ছাত্রটি ছুটে চলেছে—নিকটবর্ত্তী টেমসের উদ্দেশ্যে তখন অন্ধকারময় লণ্ডনের বুকে সূর্য্যদেব মেঘের স্তর ভেদ কোরে শেষ রশ্মি ছড়িয়ে দিয়েছেন। প্রাণবন্ত হোয়ে উঠেছে লণ্ডনের নিঝুমপুরী সোনার কাঠির পরশ পেয়ে। একপক্ষকাল পরে লণ্ডনে আজ সূর্য্যদেবের শুভা-গমন। রৌদ্রকরোজ্জ্বল লণ্ডনে দেশবাসীদের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠলো। সকলের মুখে সেই একই কথা—কি সুন্দর, কি সৌভাগ্য। এই আলোক-মালার উৎসবে যোগদান করার উদ্দেশ্যে ধনী-নির্ধন-নির্ব্বিশেষে সকলে পথে মাঠে বেরিয়ে পড়েছে।

তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমল। শত সখীসনে তিনিও পথে নিষ্ক্রান্ত। সহসা তাঁহার একজন পরিচারিকা টেমসের বুকে ভাসমান একটী মৃতবৎ মনুষ্যদেহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কোরলো। অবশেষে মহারাণীর আদেশে উদ্ধার-কার্য্য সম্পন্ন হোলো। শত চেষ্টায় দেহে প্রাণ ফিরে এলো। মহারাণী স্বকর্ণে শুনলেন তার অভাব-অভিযোগ। নিরপত্তা রক্ষা ব্যবস্থা হোলো। দুর্জ্জয় সাহসের জন্য বিদেশী ছাত্রটী হোলো পুরস্কৃত। দুর্য্যোগপূর্ণ তমসার হোলো অবসান।

আমার ছোট ভাই-বোনেরা, জানো কি এ যুবকটি কে? তিনি হ'চ্ছেন স্বর্গগত ক্যাপ্‌টেন—জিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি বাংলা-দেশে শরীর-চর্চ্চা কল্লে তাঁর সমগ্র সম্পত্তি দান করে গেছেন।

গান

মিশ্র বেহাগ—কাহারবা

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ

এস শ্যামল সুন্দর নন্দ-কিশোর !
জাগো অন্তরে অন্তরে চন্দ্রিত কলেবরে
মোহন-চিত্ত-চকোর !
এস ভব-ভয়-ভঞ্জন,
মানস-নিরঞ্জন,
গোপীজন-চিত-মনোচোর ;
হে চির কিশোর ! কর বিশ্ব বিভোর।

—স্বরলিপি—

সা ন্‌া || সা -গা গা ঋা | গা -মা পা ধা | পা -জ্ঞা গা মা | গা -া গা গা |
এ স || শ্যা ০ ম ল | সু ০ ন্দ র | ন ০ ন্দ কি | শো র্‌ জা গো |

গা -পা পা জ্ঞা | পা -পা পা পা | গা -মা পা ধনা | ধর্সা নধা পজ্ঞা পধা |
অ ০ ন্ত রে | অ ০ ন্ত রে | চ ০ ন্দ্রি ত০ | ক০ লে০ ব০ রে০ |

মা -মা মা মপা | গা -সা ঋগা পমা | গা -া -া -া | -া -া -া -া |
মো ০ হ ন০ | চি ০ ত্ত০ চ০ | কো র ০ ০ | ০ ০ ০ ০ |

গা গা || পা -গা গা -জ্ঞা | ধা -ধা পা ধা | নর্সা র্সা র্সা র্সা | না র্ঋা র্সা র্সা |
এ স || ভ ব ভ য় | ভ ০ ঞ্জ ন | মা০ ন স নি | র ০ ঞ্জ ন |

ধা না র্সা র্ঋা | র্সা না ধা না | জ্ঞা -ধা -া -া | -া -া -া -া |
গো পী জ ন | চি ত ম নো | চো ০ র ০ | ০ ০ ০ ০ |

র্সা না ধা নর্সা | র্গা -র্গা -র্ঋা -র্সা | র্সা না ধা নর্ঋা | র্সা -া -া -া |
হে চি র কি০ | শো ০ ০ র্‌ | হে চি র কি০ | শো ০ ০ র্‌ |

পা পা পা পা | জ্ঞা -পা ধা না | গা -পা মা গা | সা -া সা ন্‌া |
হে চি র কি | শো র ক র | বি ০ শ্ব বি | ভো র এ স |

শিল্পী

(গল্প)

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়

রাত বারোটা।

রাস্তায় লোকের চলাচল একরকম নেই বললেও চলে। ট্রাম বাসগুলো সমস্তদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর এই সময়টায় ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে বিশ্রাম নেয়। পাহারাওয়ালা ছাড়া রাস্তায় অন্যলোকের দেখা মেলা ভার। বৈদ্যুতিক বাতিগুলো মিট্ মিট্ করে জ্বলছে, ওরা বুঝি আকাশের তারার সাথে সমতা রেখে চলতে চেষ্টা করে। ছোট ছোট গলিগুলো এই নিশুতি রাতে আপনা থেকে ঘুমিয়ে পড়ে।...বাতাস বয়ে যায় ঝির ঝির করে আপন মনে।

প্রণব রাস্তা দিয়ে চলছিল আপন খেয়ালে। মাথার এলোমেলো চুলগুলোর সাথে ওর প্রকৃতির কোনখানটার যেন একটা মিল পাওয়া যায়,যেটা সবার চোখেই ধরা পড়ে। হঠাৎ প্রণব রাস্তার পাশের বড় বাড়ীটার কাছে এসে দাঁড়ায়। অনেক দিনের পরিচিত বাড়ী। কতদিনের জানাশোনা! ভেতর থেকে গানের টুকরো টুকরো সুর ভেসে আসছে। প্রণব কান পেতে শুনতে থাকে। পরিচিত কণ্ঠস্বর মনে হতেই প্রণব গম্ভীর হয়ে যায়। মনে মনে ভাবতে থাকে—এমিলি গান গায়,—এত রাতে—আজ কি ওদের বাসায়?... গান থেমে যায়, হাসির শব্দ ভেসে আসে। অজিত ও সুধীরের হাসি প্রণব স্পষ্ট শুনতে পায়। এ হাসির ধ্বনি প্রণবের মনে আজ নানা সুরে বাজে।...আবার সে পথ চলতে সুরু করে।

*

অজিত ও সুধীর চলে গেলে এমিলি হলঘরে বসে কি যেন ভাবে। চাকর এসে দিদিমণিকে রাতের পরিমাণটা জানিয়ে দিয়ে গেল। এমিলি তক্ষুনি উঠে গিয়ে ওর বিছানায় শুয়ে পড়ল। মা আনন্দময়ী মেয়ের মশারী ফেলতে গিয়ে দেখেন যে ঘুমের মাঝে, এমিলির মুখে বেদনার একটা ছাপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কারণটা অনুমান করতে না পেরে বাতিটা কমিয়ে ওখান থেকে তিনি চলে আসেন।

*

বাসায় এসে প্রণব কত কি ভাবে বসে। ঘুমাতে চেষ্টা করে, কিন্তু ঘুম আসে না। বিছানা থেকে উঠে প্রণব সামনের বাগানে পায়চারী করে, নীরব প্রকৃতি ক্লান্তিতে সুপ্তির নিঃশ্বাস টানছে। এই নীরবতাটুকু আজ ওর কাছে অসহ্য বলে মনে হয়। প্রণব দ্রুতপদে ওর কোঠায় ফিরে আসে। কিছুতেই মনটাকে বাগে আনতে পারে না। কি মনে করে প্রণব ওর বহুদিনের পরিত্যক্ত বাঁশীটা তুলে নিয়ে পুরাতন স্মৃতিকে কেন্দ্র করে সুর ভাজতে চেষ্টা করে। কিন্তু বাঁশীর সুরে আর পূর্ব্বের সেই মাদকতা নেই। বাঁশীটা রেখে তাচ্ছিল্য ভরে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। কিছু পরে ঘুম আপনা থেকে এসে পড়ে।

আজ এমিলির জন্মদিন। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবে বাড়ী পরিপূর্ণ। সবাই আজ এমিলিকে present দেয়।

সুধীর সওদা করেই সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দেয়। অজিত নবাগত হলেও present-এর বেলায় নবাগত নয়। মেয়েরা দেয় হালফ্যাসানের মূল্যবান জিনিষ যা শুধু এমিলিকেই মানায়। নিমন্ত্রিত সবাই এসেছে, আসে নি শুধু প্রণব।

উৎসবান্তে একে একে সবাই বিদায় নেয়। অভিনয়ের পালা শেষ হলে এমিলি বাঁচে। ওর পক্ষে সবার সাথে তালে তালে চলা অভিনয় ছাড়া আর কি? এমিলি ভাবতে থাকে ওর জীবনটা কি শুধু অভিনয়? ভাবতে ভাবতে এমিলি নিজেকে হারিয়ে ফেলে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের সত্তা অনুভব করতে পারে না।

প্রণব এসে কখন ওর কাছে বসে, এমিলির সেদিকে হুঁস নেই। চমক ভেঙ্গে দিয়ে প্রণব হেসে বলে, "আজ তোমার মুখে হাসি দেখব বলে—ওকি! অমন করছ কেন?"

এ কথায় এমিলির অভিমান হয়, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গোঁ ধরে বসে থাকে। নিজেকে সামলে নিয়ে এমিলি বলে, "কি প্রয়োজন ছিল আমায় এভাবে অপমান করবার?" এমিলির চোখের কোনে দুফোঁটা জল দেখা যায়। প্রণব এ কথায় অপ্রস্তুত হয়ে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললে, "তুমি বলেছ তাই এসেছি, এতে যদি তোমার অপমান হয়ে থাকে—আর আসবো না।"

প্রণব এমিলির কথাটাকে সত্য বলে গ্রহণ করবে এমিলি তা স্বপ্নেও ভাবেনি। দুঃখের বেগ সংবরণ করতে না পেরে ওর সমস্ত শরীর ঘামিয়ে ওঠে। ঠোঁট দুটো রুদ্ধ বেদনায় কাঁপতে থাকে, অস্থির হয়ে মেঝেতে পড়ে যায়।

...অনেকক্ষণ ধরে মাথায় জলের ধারা দেওয়ায় এমিলি কিছুটা সুস্থবোধ করে। হাত পাখাটা রেখে প্রণব বলে, "এমিলি দুধটুকু খেয়ে ফেল।" এমিলি অপলক নেত্রে প্রণবের পানে চেয়ে থাকে। সেই চেয়ে থাকার মাঝে ওর বেদনা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। প্রণব আবার বলে, "খেয়ে ফেলো। কিছু না খেলে আরো অসুস্থ হয়ে পড়বে যে।"

—"আজ আমি খাব না।" বলে এমিলি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে।...প্রণবের অনুরোধে শেষ পর্য্যন্ত এমিলি দুধটুকু খেয়ে ফেলে।

*

প্রণব একখানা খামে করে এমিলিকে present দেয়।

এমিলি তা রেখে দেয় সযত্নে। প্রণব এমিলির সঙ্গে কত কথা বলে। প্রথম দর্শকের কাছে প্রণব স্বাভাবিক, কিন্তু প্রণবের এ হাসিতে এমিলি সায় দিতে পারে নি। কিছুক্ষণ পূর্ব্বের কথা মনে করে নিজের ব্যবহারে নিজেই লজ্জিতা। মনটা কেবল খুত খুত করে। প্রণব চলে গেলে পর এমিলি খামখানা ছিড়ে ফেলে। ছোট্ট একখানা চিঠি।

"এমিলি, আজ তোমার জন্মদিন।...এই দিনটী আমার কাছে কত পবিত্র তা কেমন করে জানাব। যুগ যুগ ধরে এই দিনের প্রতীক্ষায় থাকব। আমার পক্ষে এর চেয়ে শুভদিন আশা করা বৃথা।...তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই, তোমার কাছে সবই ফাঁকি হয়ে দাঁড়াবে। তাই জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যের পূর্ণ প্রতীকস্বরূপ দু'ফোঁটা অশ্রু সুদূর-পিয়াসা বাসনার তরে চোখের কোণে এসে হানা দেয়। এই দু'ফোঁটা জল আজ এই শুভদিনে তোমায় উপহার দিলাম।

ইতি

প্রণব।"

এমিলির আজ আপনা থেকে প্রণবের কাছে মাথা নত হয়ে আসে। প্রণব আজ অসহায়, সে দিকে ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। আপন খেয়ালে শুধু চল্‌ছে—শুধু চল্‌ছে। প্রণবের সাথে সুধীরের কথা মনে হতেই এমিলি গম্ভীর হয়ে যায়। প্রণবের এই পরিবর্ত্তনের জন্যে সুধীর দায়ী। সুধীর এমিলি ও তার মার কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে নিরীহ প্রণবের বিরুদ্ধে হানছে কত বান—যার জন্যে প্রণব মধ্য পথে আধফোটা ফুলের মত ফুটে আছে।

এমিলি সেদিনকার কথা না ভেবে থাকতে পারলে না—যে দিনটায় প্রণব এসেছিল তার কাছে নিজের ভালবাসা জানাতে। এমিলির প্রথমে বিরক্তি ধরেছিল, এ অসময়ে কেন আসা? প্রণবের কাছে কোনটা সময় কোনটা অসময় প্রণব নিজেই তা জানে না।...এমিলির মনে ছিল তখন গর্ব্ব, ভালবাসাকে রঙীন চশমা দিয়ে দেখেছিল সে। তাই ওর সুধীরের কাছে ধরা দিতে মোটেই বাঁধল না।

প্রণবের কথা শেষ না হতেই এমিলি বল্‌লে, "সে কথায় আর কাজ কি?"...

—"কেন? কেন এ কথা বলছ?"

—"শুনেছ বোধহয় মার একান্ত অমত; প্রথমতঃ তোমার অবস্থা স্বচ্ছল নয়"...

দ্বিতীয় কারণ শুনতে প্রণবের আর প্রবৃত্তি ছিল না, কে যেন তাকে সমুদ্রের মাঝে ফেলে দিল। নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লে, "এমিলি, আমি তোমায়..."প্রণব আর কিছুই বলতে পারলে না, কণ্ঠস্বর আটকে আসছে। এমিলি প্রণবের চোখে জল দেখতে পেল। প্রণবের চেহারা দেখে এমিলির মন কেঁদে ওঠে। "আমায় ক্ষমা কর, না জেনে তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি।" এমিলির চোখের জল বাঁধ মানলে না। "এমিলি, তোমায় আমি ভালবাসি।" বলেই প্রণব টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। ক্লান্ত মন নিয়ে এমিলি প্রণবের কথা চিন্তা করতে করতে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

তিন

প্রণব শিল্পী।—ছ বছর আগে জাপান, ইটালী থেকে দু'একটা পাশ করে এসেছে। নাম হয়েছে বেশ, কিন্তু তদুপযুক্ত অর্থ সমাগম হয় নি। প্রায় সব সময়েই প্রণব ছবি আঁকে আর বাকী সময়টা সাহিত্যচর্চ্চায় কাটিয়ে দেয়। সারারাত বসে প্রণব শুধু পড়ছে, রাত যে কখন ফুরিয়ে যায় সেদিকে ওর মোটেই ভ্রূক্ষেপ নেই। নিজেকে নগ্ন বাস্তবতার রূঢ় আবরণ থেকে ভুলে থাকতে প্রণব উঠে পড়ে লেগে যায়। প্রিয়জনকে না পাওয়ায় দুঃখ হয় সত্য, সে জন্যে কারো পথের বাধা হয়ে প্রণব দাঁড়ায় না। ......উপায়, কাজে লিপ্ত থেকে নিজকে ভুলিয়ে রাখা। শিল্প ও সাহিত্যের ভিতর দিয়ে প্রণব জীবনটাকে নির্ভাবনায় কাটিয়ে দেবে। এখানেও যে এমিলি তার রূপ যৌবন নিয়ে তার কাছে এসে উঁকি মারচে তা কে জানত?

বাইরে থেকে কে যেন কড়া নাড়ছে। দোর খুলতেই নিখিলেশ এসে ঘরে প্রবেশ করে। নিখিলেশ ওর বাল্যবন্ধু। বর্ত্তমানে একজন ব্যারিষ্টার। নিখিলেশ এসেই বল্লে "প্রণব, তোমার কাছে একটী জরুরী কাজে এসেছি ভাই।—কাল দেশবন্ধু পার্কে আমার অভিভাষণ পাঠ। তুমি আমার খসড়াটা দেখে দাও ভাই।"

অভিভাষণটী পাঠ হলে পর প্রণব ও নিখিলেশের মাঝে ওদের ছেলে বেলাকার স্মৃতি মনে করে অনেক কথা হয়।

নিখিলেশ বলে, "প্রণব, বর্দ্ধমানের যুবরাজের ছবি এঁকে কি রকম পেলে?"

প্রণব ছোট একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলে—"শ পাঁচেক।"

"মাত্র পাঁচশ?"—বলে সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে, "প্রণব এখানে যে শিল্পপ্রতিযোগিতা হবে, তার কোন খোঁজ রাখো?"

"খোঁজ রাখি বই কি ভাই!" বলে প্রণব গম্ভীর হয়ে যায়।

"এই প্রতিযোগিতায় তুমি যোগ দেবে না?"

"নাম দিয়ে কি-ই বা লাভ? যেখানে কত বড় বড় শিল্পী যোগ দেবে, আমার সেখানে কোন পাত্তা মিলবে না।"

"দেখ প্রণব, নিজকে এত হেয় মনে করো না। এতে তোমার যোগ দিতেই হবে।"

বন্ধুর অনুরোধে প্রণম অগত্যা রাজি হয়ে যায়।

চার

এমিলি কোনদিন সুধীরকে আপন করে ভাবতে পারে নি, গ্রহণ করা তো দূরের কথা। এমিলি স্বভাবতঃ শান্ত ও গম্ভীর, সুধীর হল ওর একেবারেই উল্টো—অস্থির ও উগ্রপ্রকৃতির। এমিলির সাথে সুধীরের মনের অমিল হওয়া মোটেই আশ্চর্য্য নয়।……মন সাড়া দেয় না, তবু মেনে নিতে হবে সংস্কার বোধে। সুধীরের স্থান বাইরে—আর প্রণবের স্থান কর্ম্মক্লান্ত জীবনের মাঝে। ব্যথা যেখানে অনন্ত, ভাষা সেখানে মূক। প্রণবকে ও দেখতে পায় প্রতিক্ষণে ভাষার নীরবতায়—মনের ব্যাকুলতায়।

এমিলি খবরের কাগজটা দেখছিল বসে, তপেশ ছুটে এসে বল্লে—"দিদি, তোমাকে সুধীরবাবু ডাকছে।"

এমিলি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করলে—"যাও, তাকে বসতে বলো গে—আমি আসছি।

তপেশ ছুটে চলে যায়।

চাকরটাকে চা ও খাবার দিতে বলে এমিলি সুধীর যে কোঠায় বসেছিল সেই কোঠায় গিয়ে উপস্থিত হল।

সুধীর বল্লে—"এমিলি, আমাদের মিলনের দিন এগিয়ে আসছে। চল যাই, একদিন দুজনে মোটরে বেড়িয়ে আসি।"

সুধীরের কথা শুনতেই এমিলির চমক ভেঙ্গে যায়। কে যেন এমিলিকে চাবুক মারছে। সত্যি এমিলির সাথে সুধীরের বিয়ে। রবিঠাকুরের দুটো লাইন ওর মনে পড়ে,

"পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি—
আমরা দু'জনে চলতি হাওয়ার পন্থী।"

ভাবতেই এমিলির মনটা কেমন হয়ে যায়। ও আর ভাবতে পারে না।

এমিলি কতকটা স্বাভাবিক হয়ে বললে—"আজ কাল আমার অনেক কাজ।"

সুধীরের উৎসাহ এতে ভেঙে যায়।

সুধীর বিরক্ত হয়ে বল্লে—"এমিলি কি এত তোমার কাজ বলতে পার আমায়? যখনই আসি তখনই শুনি কাজে বেড়িয়ে গেছ।"

"কাজে লিপ্ত থেকে আনন্দ পাই," বলে এমিলি জোর করে হেসে ফেলে।

"তোমার শুধু কাজ আর কাজ। এ ছাড়া তোমার মুখে আর কোন কথা নেই।"

"আমাদের বিয়ের পর এ সব কাজ ছেড়ে দিতে হবে।"
এমিলির মনে মনে খুব রাগ হয়। একবার ইচ্ছে হয় প্রতিবাদ করে। পর মুহূর্ত্তেই নিজকে সামলে নিয়ে চুপ থেকে যায়।

"তোমার এ কাজ কবে শেষ হবে?"

"তার মানে?"

"মানে—কবে আমরা দুজনে একত্রে ঘরে আসব?"
এমিলি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে—"যেদিন হয় ঠিক করবে।"

সুধীর এমিলির কথায় সন্তুষ্ট হয়ে নরম সুরে বললে, "এমিলি, আসছে সোমবার চল বেড়িয়ে আসি। court বন্ধ আছে, তোমার মার এতে কোন অমত নেই।"

এমিলি উদাসভাবে বলে—"হ্যাঁ, যাবো।"

সুধীর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বল্লে—"You are a good girl. আজ আসি তবে।"

এমিলি মনে মনে বলে, "অভিনয়, আমার জীবনটা একটা অভিনয়।"

সুধীর ও এমিলি আজ মোটরে বেরিয়ে পড়ে সমস্ত কলকাতা সহরটা ঘুরে দেখতে। এই দেখার মাঝে রয়েছে কত আনন্দ! রঙীন্ কল্পনা এসে বাস্তবকে ছাপিয়ে মনের আনাচে কানাচে উঁকি মারবে—এতে আর আশ্চর্য্য কি! …সুধীরের মনটা আজ বেশ প্রফুল্ল। এমিলি ওর পাশে বসে। সুধীর বলে—"এমিলি, লেকের দৃশ্য আজ তোমার কাছে কেমন লাগছে?" এমিলি এতক্ষণ ধরে কি ভাবছে কে জানে! সুধীরের কথায় ওর হুঁস হ'ল। সুধীরকে দুঃখ দিতে আজ ওর বড় লাগছে। তাই সুধীরের মতে মত দিয়ে উদাসীন ভাবে বল্লে—"বেশ লাগছে।"…সুধীর মনের আনন্দে বলে যায়—"এমিলি, আমাদের মিলনের পর আর একখানা মোটর গাড়ী ভাল দেখে কিনব, তুমি সে-খানায় চড়বে, আর…।" সুধীর এমিলির পানে চেয়ে অবাক হয়ে যায়। এমিলির মন আজ কোথায়? কি এত ভাবছে বসে? ওর মুখের চেহারা আন্দামান বন্দীর মুখের চেহারার থেকেও ভীষণ মনে হয়। সুধীর এমিলির হাত ধরে বলে—"এমিলি তোমার কি কোন…?"

সুধীরের কথা শেষ না হ'তেই এমিলি হেসে বললে—"কি এত আকাশ পাতাল ভাবছ বসে, আমার কিছুই হয়নি।" সুধীরকে এভাবে দেখতে ওর বড় লাগছে। তাই হেসে বললে—"চলো, এবার আমরা শিল্প-প্রদর্শনীতে যাই।" সুধীর ওর কথামত প্রদর্শনীতে যাবার জন্যে মোটর চালায়।

মোটর প্রদর্শনীর কাছে আসতেই ওরা নেমে ভিতরে চলে যায়। সেখানে পরিচিত অনেক মেয়ের সাথে দেখা হল। —এলা, বেলা, মিলি, নন্দা—ওরা সবাই এসেছে। এমিলি ওদের দলে মিশে যায়। সুধীরও ওদের পিছু পিছু চলতে থাকে। ঘুরে ঘুরে কত সুন্দর সুন্দর চিত্র দেখছে, না দেখে এর কিছুই কল্পনা করা যায় না। লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, পাটনা—নানাস্থান থেকে নামকরা শিল্পী এই প্রতিযোগিতায় ছবি পাঠিয়েছে।…ছবি দেখে সবাই আশ্চর্য্য হয়ে যায়।…

এলা বলে—"প্রণববাবু ছবি পাঠায়নি বুঝি এমিলি ?"

প্রণবের নাম শুনতেই এমিলি গম্ভীর হ'য়ে যায়। কোন কথা বলে না।

—"প্রণব বাবু কি এখানে খেলো ছবি পাঠাতে পারবেন"—বলে সুধীর হো হো করে হেসে ওঠে।

প্রণব সম্পর্কে এসব হাসি ঠাট্টা এমিলির মোটেই ভাল লাগে না। এমিলি কারো দিকে না চেয়ে গম্ভীর হয়ে ওদের সাথে চলতে থাকে।

চিত্র দেখতে দেখতে ওরা সবাই একখানা চিত্রের কাছে এসে দাঁড়ায়। এলা অনেকক্ষণ ধ'রে চিত্রখানা দেখে অবাক হ'য়ে বললে—"ছবিখানা যেন হুবহু এমিলির সাথে মিলে যায়। মুখের তিলটীও নিখুঁত ভাবে মিলে গেছে।" এলার কথায় সবাই এমিলির সাথে চিত্রের নিখুঁত সামঞ্জস্য দেখে অবাক হয়ে যায়। মিলি এলাকে বলে—"কে এঁকেছে রে এই ছবি ?"

নন্দা নীচের দিকে চেয়ে বললে—"পি, কে, রয়।"

সুধীর ওদের সবার পেছনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুকছিল। পি, কে, রায়ের নাম শুনতেই তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। দ্বেষ ও হিংসায় ওর সমস্ত শরীর জ্বলে যায়। এলা, বেলা ওরা সবাই সুধীরের পানে চেয়ে বললে—"সুধীর বাবু, প্রণব বাবুর চিত্রই কিন্তু প্রথম স্থান পেল।"

সুধীর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে—মনে হয় যেন ধ্বংসের প্রতিমূর্ত্তি। কোন কথা সে বলে না।...

এলা, বেলা, নন্দা ওরা সবাই একত্রে চ'লে যায়। এমিলি, শুব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে পি, কে, রায়ের চিত্রখানার দিকে চেয়ে।

প্রণব যে এমিলির একনিষ্ঠ প্রেমিক—যুগ যুগ ধরে এমিলির প্রতীক্ষায় থাকবে এমিলি তা কেমন করে জানবে। সুধীর এমিলিকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনে মনে রেগে ওঠে। সিগারেটের ধুম্রা ছেড়ে কঠিন হয়ে বলে—"এমিলি তোমার এ রকম ক'জন প্রণয়ী আছে বলতে পার ?"

এমিলি শিউরে ওঠে। ঘৃণায় সমস্ত শরীর রী রী করছে ; একটু সংযত হয়ে বলে—"তার মানে ?"

—"দেখতেই পাচ্ছ।" ব'লে সুধীর শুষ্ক হাসি হাসে, —"ভিতরে এত আর বাইরে একেবারে মাকাল ফল, এ যদি জানতেম তা' হ'লে...।

এমিলি এবার ধৈর্য্য হারিয়ে ফেললে। ওর চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। কঠিন হয়ে বললে—"সুধীর, কাকে কি বলতে যাচ্ছ জান না। তোমার সাথে এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে আমি ঘৃণা বোধ করি। যাক্, আর নয়, চললেম আমি।" —বলে এমিলি তক্ষুনি বেরিয়ে যায়।

এই সামান্য কয়টা কথায় যে এমিলি এ রকম লঙ্কাকাণ্ড করে বসবে, এ কথা কি সুধীর জানত ? তাই এ ভাবে এমিলিকে একা যেতে দেখে সুধীর অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।...

প্রণব শিল্প-প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পায়। চিত্রখানির ক্রেতা অনেক জুটেছিল। প্রণব তা বিক্রয় করতে দেয়নি। কেন দিবে সে ? যে মত্ততায় প্রণব অনাবিল স্রোতে ভেসে চলেছে তার সুদূর পিয়াসী মন নিয়ে তারই সঞ্চিত ভালবাসা অর্ঘ্য হয়ে প্রণবের হৃদয়ে স্থান পায়। প্রণব তার কিছুটা প্রকাশ করতে প্রয়াস পায় সামান্য তুলির আঁচরে। আজ সে অসামান্য শিল্পী বলে খ্যাতি অর্জ্জন করেছে। এই ছবি আঁকার পর প্রণব আর কোন ছবি আঁকে নি। চারিদিক থেকে অবসাদ এসে প্রণবকে ঘিরে ফেলেছে। প্রণব আজ রিক্ত, নিঃস্ব, দেনা পাওনার মাঝে প্রণব ওর স্থান খুঁজে পায় নি।

নিখিলেশ এসে যখন বললে—"প্রণব, এত বড় সম্মান পেয়ে আজ অমন করে বসে আছ কেন ? আবার তুলি ধর, কত টাকা পাবে।"

প্রণব মুচকি হেসে উত্তর দেয়—"আর কেন ?" বলেই উদাস ভাবে চেয়ে থাকে।...নিখিলেশ বললে—"আজ তুমি ভারতের একজন শ্রেষ্ঠতম শিল্পী। কতবড় সম্মান পেয়েছ, আরো কত পাবে। তোমার এ ভাবে বসে থাকা সাজে না।"

প্রণব বলে—"নিখিল, তুমি তো সব জান, মন যে সাড়া দিচ্ছে না, তবে কেন বারবার এ কথা বলছ ? সম্মান তো আমি কোন দিন চাইনি।" প্রণব আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নিখিলেশের চোখে দু'ফোটা জল দেখা দেয়। চোখের জল গোপন করে নিখিলেশ বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যায়।...নিখিলেশ চলে গেলে প্রণবের চোখে তন্দ্রার মত আসে। কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত দেহটাকে টেনে প্রণব দেওয়ালে সংলগ্ন চিত্রখানির দিকে দৃষ্টি রেখে প্রথমটা চুপ থেকে কি যেন ভাবে বসে। তারপর আপনা থেকেই বলে যায়—

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।"

তখনই বাহির থেকে খটমট শব্দ হয়। প্রণবের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কিছু পরে এমিলি ঝড়ের বেগে ঘরের ভিতরে এসে পড়ে। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে এমিলি প্রণবের ভাব লক্ষ্য করছিল, আর পারলে না। প্রণবের কাছে আসতেই প্রণব চমকে উঠে এমিলির পানে চায়।

—"প্রণব আমি এসেছি, আমায় ক্ষমা কর—" বলেই এমিলি প্রণবের পানে চেয়ে থাকে। "প্রণব, জীবনে বহু ভুল করেছি, তোমার কাছে এসেছি, সে ভুলের ক্ষমা চাইতে।" বলেই এমিলি সহসা প্রণবের পায়ের কাছে বসে অশ্রু বিসর্জ্জন করে।

প্রণব প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে যায়। পরমুহূর্ত্তেই সস্নেহে হাত দু'খানি ধরে প্রণব তাকে টেনে তুলে বল্‌লে—"ও কি হচ্ছে মিলি, ওঠো।"

—"বল, ক্ষমা করেছ আমায়?"

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।

প্রণবের মুখে অনেকক্ষণের মধ্যে কথা ফুটলো না। পরে বল্‌লে—"এমিলি!" আর কিছু বলতে পারলে না, বহু দিনের পরিত্যক্ত তুলিটা তুলে নিল।

এমিলি এক দৃষ্টে প্রণবের পানে চেয়ে থাকে, দেখে ওর চোখে দু' ফোঁটা জল।

অন্তঃপুর

দুহিতা ও অন্যান্য পরিজন

জনৈক গৃহী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভগ্নী—দুহিতার সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে ভ্রাতা-ভগ্নীর সম্বন্ধ-বিষয়ের কোন উল্লেখ করা হয় নাই। ভ্রাতায় ভ্রাতায় যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ভ্রাতা-ভগ্নীর সম্বন্ধও তদ্রূপ। বরং পৈতৃক সম্পত্তির ভোগাধিকার ও বিভাগবণ্টন সম্পর্কে ভ্রাতৃবিরোধের সম্ভাবনা থাকে, ভগ্নীর সম্বন্ধে সে-বালাই থাকে না, কারণ, পুত্রবান হিন্দুর সম্পত্তিতে অবিবাহিতাবস্থায় ভরণ-পোষণ ও বিবাহের ব্যয়নির্ব্বাহের দাবী ভিন্ন কন্যার কোন অধিকার নাই ইহাই বহুশতাব্দী প্রচলিত ঋষিপ্রণীত হিন্দু আইন। সম্প্রতি হিন্দুকন্যাগণের প্রতি সহসা দয়াপরবশ হইয়া ভারত সরকার এই অবিচারের প্রতিষেধকল্পে এবং পিতৃত্যক্ত সম্পত্তিতে হিন্দুকন্যার অধিকার স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক নূতন আইন প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অধিকারলোলুপা কতিপয় আধুনিকা সঙ্ঘবদ্ধা হইয়া এই ব্যবস্থার সমর্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এরূপ আইনের প্রয়োজনীয়তার অথবা ইহার প্রবর্ত্তন সমীচীন বা সঙ্গত কি না এ-বিষয়ের আলোচনা এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য-বহির্ভূত। যদি কেহ ইহার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা দেখিতে চাহেন। প্রসঙ্গসঙ্গতি রক্ষা করিয়া এইমাত্র বলিতে পারি যে, এই আইন প্রবর্ত্তনের ফলে কতকগুলি নূতন মামলা মোকদ্দমার উদ্ভব হইবে, ভগ্নী কোমর বাঁধিয়া (এতদিন যাহা ঘটে নাই ও ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না) ভ্রাতার বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করিতে ছুটিবেন, পৈতৃক সম্পত্তির অবধারণযোগ্য অপচয় হইবে এবং তাহার ফলে ভ্রাতা-ভগ্নীর শান্তিময় সম্পর্ক বিষম বিকারগ্রস্ত হইয়া উঠিবে।

অল্পবয়স্ক, বিশেষতঃ পিঠোপিঠি ভাইবোনের মধ্যে সময়ে সময়ে কলহ বা আড়ী হইলেও ভগ্নী স্বভাবতঃ ভ্রাতার প্রতি স্নেহশীলা হইয়া থাকে। তাহার সঞ্চিত ভ্রাতৃ-স্নেহের প্রস্রবণ উন্মুক্ত হয় যমপুকুর পূজায়, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় এবং বিবাহান্তে শ্বশুরালয়ে ভ্রাতৃসন্দর্শনে। ভ্রাতাভগ্নীর স্নেহবন্ধন স্থায়ী করিবার পক্ষে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া একটি চমৎকার উৎসব। বস্তুতঃ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ও জামাইষষ্ঠীর মত উৎসব অন্য কোন দেশে নাই। ভগ্নীকর্ত্তৃক ভ্রাতার অর্চ্চনার এবং শ্বশ্রূ কর্ত্তৃক জামাতৃ-অর্চ্চনারও প্রথা আর কোথাও নাই।

বালক বালিকা—ইহারাও পরিজনের মধ্যে গণ্য। যে-গৃহে বালকবালিকার অভাব তাহা অরণ্যবৎ। গৃহী ও গৃহিণীর অন্তর হইতে যে স্নেহস্রোত শৈলনিঃসৃতা স্রোতস্বিনীর ন্যায় পুত্র-কন্যার প্রতি স্বভাবতঃ প্রবাহিত হয়, পুত্রকন্যার অভাবে তাহা উৎপত্তিস্থলেই রুদ্ধ হইয়া যায়। নিঃসন্তান ব্যক্তি সাধারণতঃ রুক্ষপ্রকৃতি হইয়া থাকেন—ছেলেপিলের গোলমাল বা "দৌরাত্ম্য" সহ্য করিতে পারেন না। যদি অধিক বয়সে কোন দম্পতির সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাঁহারা সন্তান-বাৎসল্যে এমন বিহ্বল হইয়া পড়েন এবং তাহাকে এমন অপরিমিত আদর দেন যে শিক্ষা ও শাসনের অভাবে পুত্র-সন্তান সারা জীবনের জন্য উচ্ছৃঙ্খল এবং কন্যা হইলে পরিণয়ান্তে বধূত্বের অযোগ্যা হইয়া উঠে। অত্যধিক আদরের ফলে সে-সন্তান নিরতিশয় উদ্দাম হইয়া উঠে, তাহার উপদ্রবে প্রতিবেশীগণের ছেলে-মেয়েরা সন্ত্রস্ত হয় ও তাহাদের পিতা-মাতারা বিরক্ত হইয়া পড়েন এবং তাহাকে "অশ্বমেধের ঘোড়া", "মানোয়ারীর গোরা", "ধিঙ্গী" প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিতে থাকেন। এইরূপে প্রতিবেশীগণের সহিত

তাহার জনকজননীয় মনোমালিন্য ও ক্রমে ক্রমে কলহের সূত্রপাত হয়। পুত্রকন্যালাভ অধিক বয়সে হইলেও তাহাদের যথোচিত শিক্ষা ও শাসন ব্যবস্থাপিত হওয়া উচিত। যে-পিতামাতা এ-বিষয়ে অবহেলা করেন তাঁহারা কর্তব্যচ্যুত হয়েন এবং যাহাদিগের প্রতি বাৎসল্যজনিত এই অবহেলা ও কর্তব্যচ্যুতি, তাহাদের ভবিষ্যৎ অকল্যাণ ও অপায়ের জন্য দায়ী হয়েন। কন্যার জন্য পাত্রান্বেষণকালে, প্রধানতঃ ইঁহারাই পাত্রের গৃহে দাসদাসী ও পাচক বা পাচিকা নিযুক্ত আছে কি না তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। পুত্রকন্যার শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সহিত অধিকাংশ স্থলে ইঁহাদের মত লোকেরই মনোমালিন্য সঞ্চারিত হয়।

বালকবালিকা স্বভাবতঃ উদ্দামপ্রকৃতি। সহিষ্ণুতা ও সংযম তাহাদের থাকে না, কারণ, এ-জাতীয় গুণ মানবের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ে জন্ম পরিগ্রহ করে না, এ-সকল গুণ বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ আর্জ্জিত হয়। যদি বলা যায় যে পিতামাতার গুণরাজি পুত্রকন্যা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে জন্মকালে সে-গুণের অঙ্কুর নিতান্ত প্রচ্ছন্নভাবে সন্তানের প্রকৃতিতে অবস্থান করে এবং তাহার বয়ঃক্রমবৃদ্ধির সহিত শিক্ষা ও অভ্যাসরূপ সলিল-সিঞ্চনের ফলে ক্রমশঃ তাহার স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ সঙ্ঘটিত হয়। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে এইরূপ জলসিঞ্চনের ফলে যেরূপ জমি প্রস্তুত হয় এবং তাহার যেরূপ উৎকর্ষ সাধন হয় তাহারই অনুপাতে অঙ্কুর স্ফূর্ত্তিলাভ করে ও ক্রমশঃ মহীরুহে পরিণত হয়। আবার সেই মহীরুহ ফল প্রসব করে জমির বৈশিষ্ট্যের অনুপাতে।

যে শিশু বা বালক উদ্দামভাববিরহিত, বুঝিতে হইবে তাহার স্বাস্থ্যবিকৃতি ঘটিয়াছে। লোকে এরূপ ছেলেকে শান্ত-প্রকৃতি ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, অধিকন্তু, তাহার সুখ্যাতি করে কিন্তু, কারণানুসন্ধান করিলে ও তলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে তাহার স্বাস্থ্যের কোন না কোনরূপ বিকৃতি সঙ্ঘটিত হইয়াছে। যে-ছেলে ক্রন্দননিরত নহে, অনেক সময়ে তাহাকে শান্ত বলা হয়, কিন্তু কম কাঁদিলেই ছেলেকে উদ্দামভাববিহীন বলা যায় না। হয়ত, তাহার অন্তর্নিহিত সহিষ্ণুতার বীজ তাহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্ফুটনোন্মুখ হইয়াছে, সেইজন্য সে "কাঁদুনে" নয়, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে উদ্যম। পরন্তু, শিশু অধিক কাঁদুনে হয় অনেক সময়ে স্বাস্থ্যবিকৃতির ফলে। উভয় ক্ষেত্রেই অবিলম্বে কারণের অনুসন্ধান ও প্রয়োজন হইলে প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত।

স্বাস্থ্য মানবজীবনের মূলধন। সকল অবস্থায়, সকল বয়সে, সকল বিষয়ে ও সকল কার্য্যে অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির মেজাজ খিটখিটে হয় এবং তাহার মানসিক বৃত্তি ও মস্তিষ্ক স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে না। সে ব্যক্তি নিজের কাজ করিতেও অসমর্থ, পরের কাজ বা সাধারণের কাজ ত দূরের কথা। শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ পরিশ্রমই তাহার সাধ্যাতীত। তাহার জীবনে চিরদিনই শান্তির অভাব।

শৈশব হইতে যাহার স্বাস্থ্যের প্রতি পিতামাতার সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে এবং স্বাস্থ্যের কোনরূপ বিকৃতি সঙ্ঘটিত হইলে যথাসময়ে প্রতীকারের ব্যবস্থা হয়, আশা করা যায় যে এরূপ সতর্কতা ও ব্যবস্থার অভাব না ঘটিলে বাল্যে ও কৈশোরে তাহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং "স্বখাত সলিলে ডুবিয়া না মরিলে" তাহার যৌবন, এমন কি জীবনের অবশিষ্ট কাল স্বাস্থ্যসম্পন্ন অবস্থায় অতিবাহিত হইতে পারে। যাহারা মাদকদ্রব্যসেবন ও ইন্দ্রিয়লালসার একান্ত বশবর্ত্তী হইয়া যথেচ্ছাচার করে তাহাদের স্বাস্থ্যলোপ অনিবার্য্য এবং তাহারাই স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরে।

সকল বিষয়ে মিতাচার স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরিমিত আহার মিতাচারের প্রধান অঙ্গ। বাল্যাবস্থা হইতে কাহাকেও এই নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত করিয়া তুলিলে সে সারাজীবন সে-অভ্যাসের বশবর্ত্তী থাকিবে এরূপ আশা অসঙ্গত নহে। সন্তান সবল ও স্থূলকায় হইবে এই আশায় অনেক জনক জননী তাহাকে অপরিমিত আহার করাইয়া থাকেন; অবিলম্বে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কাঁদিবে এই আশঙ্কায় অনেকে শিশুকে অতিরিক্ত পরিমাণে দুগ্ধাদি খাওয়াইয়া দেন। এইরূপ অতিরিক্ত আহারের ফলে শিশুর অসুস্থতা অনিবার্য্য এবং মধ্যে মধ্যে অসুস্থ হইতে হইতে তাহার infantile liver-এর উৎপত্তি হয়। শিশুর এরূপ লিভার দুরারোগ্য ইহা অনেকেই অবগত আছেন এবং প্রতীকার অপেক্ষা প্রতিষেধক ভাল (Prevention is better than cure) ইহাও অনেকে জানেন ও মানেন, তথাপি সাবধানতা অবলম্বন করেন না। বালকবালিকার পাঁচ বৎসর অতীত হইলেও পরিবারস্থা কোন রমণী স্বহস্তে তাহাদিগকে খাওয়াইতে বসেন এবং এমন "গাণ্ডেপিণ্ডে" খাওয়ান যে তাহাদের উদর অতিরিক্তরূপে স্ফীত হইয়া বর্ত্তুলার্দ্ধের আকার ধারণ করে। যাহাদের পরিপাক শক্তি ন্যূন সে-সকল বালকবালিকার উদরটিই স্থূলতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দৈহিক শক্তির বৃদ্ধি হয় না, বরং স্বাস্থ্যের অবনতিই হইতে থাকে। আকণ্ঠ ভোজনের পরিণাম অম্লরোগ ইহা অনেকেই বুঝেন, তথাপি ছেলেকে যদৃচ্ছা আহার করাইয়া তাঁহারা যে আপাত আনন্দ উপভোগ করেন তাহারই মোহে অন্ধপ্রায় হইয়া থাকেন।

যিনি যাহাকে প্রকৃত ভালবাসেন, তিনি তাহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ কল্যাণকামনা ও কল্যাণসাধনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহাই প্রকৃত

ভালবাসার লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য। যিনি নিজে সন্তোষলাভের বা আনন্দ-উপভোগের বাসনায় অপরকে (সে অপত্যই হউক বা ভ্রাতাই হউক বা অন্য কোন আত্মীয় হউক) ভালবাসেন এবং ভালবাসার পাত্রকে কেবল মাত্র আদর দেন, পাছে তাড়না করিতে হয় এই ভয়ে শিক্ষা দেন না, তাঁহার ভালবাসার কোন মূল্যও নাই, সার্থকতাও নাই। পরন্তু সে ভালবাসা স্বার্থজড়িত বলিতে হয়। "আদুরে ছেলে" সমাজের কণ্টক হইতে পারে এবং তাহার ভবিষ্য জীবন নিদারুণ দুঃখময় হইতে পারে ইহা ভাবিয়াও পুত্রের যথোচিত শিক্ষার ব্যবস্থা সকল পিতারই কর্ত্তব্য। ধনবান পিতা মনে করিতে পারেন যে তিনি পুত্রের জন্য প্রভূত ধনসম্পত্তি রাখিয়া যাইবেন, সুতরাং তাহার জীবন সুখস্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হইবে। অর্থসঞ্চয় অপেক্ষা অর্থব্যয় কত সহজ এবং বহুদিনে ও বহুক্লেশে সঞ্চিত অর্থ কত অল্পকালে ও স্বল্প আয়াসে ব্যয়িত হইতে পারে এ-বিষয়ে যে-পিতার কথঞ্চিৎ জ্ঞান আছে অথবা যে-পিতা চিন্তা করেন, তিনি পুত্রের শিক্ষা বিষয়ে উপেক্ষা বা অবহেলা করিবেন না। যে-কন্যার বিবাহ দিতে হইবে, যদি তাহাকে যথোচিত শিক্ষা দেওয়া না হয়, প্রত্যুত, "আদুরে" করিয়া তুলা হয়, শ্বশুরালয়ে তাহার ভাগ্যে তিরস্কার ও লাঞ্ছনা এবং তাহার ফলে কন্যার পিতামাতাও শ্বশুর-শাশুড়ীর মধ্যে মনান্তর অবশ্যম্ভাবী। ছেলে যতই আদুরে হউক, রোগের সময়ে চিকিৎসকের উপদেশে তাহাকে প্রয়োজন মত তিক্ত ঔষধ সেবন করাইতে হয়। তদ্রূপ পুত্রকন্যার শিক্ষার ও তাহাদের অভ্যাস-আদির নিয়ন্ত্রণের জন্য তাহাদিগকে শাসন ও প্রয়োজন বোধে সে-বিষয়ে কঠোরতা-অবলম্বন অবশ্য-কর্ত্তব্য।

আকণ্ঠভোজন যেমন স্বাস্থ্যের অনিষ্টকর, যে-কোন বিষয়ে অমিতাচারের ফলে সেইরূপ স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ এবং ক্রমশঃ ভগ্ন হয়। বাহিরে মুক্তবায়ু সেবন ও বয়সের পরিমাণ হিসাবে নির্ম্মিত ব্যায়াম স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে আবশ্যক। ব্যায়ামের আধিক্যও স্বাস্থ্যহানিকর। ব্যায়াম বা পরিশ্রমজনিত দৈহিক উষ্ণতার হ্রাস হইবার পূর্ব্বে শীতল জল পান, দীর্ঘকাল জলাশয়ে অবস্থান, শূন্যপদে জলসিক্ত স্থানে বিচরণ, নগ্নদেহে শীতল বা আর্দ্র বায়ু সেবন এ-সমস্তই মানবদেহে অসুস্থতার বীজ বপন করে, বালকবালিকার ত কথাই নাই। স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে বালকবালিকার জ্ঞান নিতান্ত সামান্য, সুতরাং তাহারা স্বভাবতঃই অসাবধান; এ-বিষয়ে তাহাদের প্রতি জনকজননীর সতর্ক দৃষ্টি একান্ত আবশ্যক। বিদ্যালয়ে যেমন পদ্ধতি বা রুটিন (Routine) অনুসারে শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয়, যদি গৃহেও বালকবালিকাদিগের সকল কার্য্য শিক্ষার ফলে সেইরূপ প্রণালীবদ্ধ হয় তাহা হইলে তাহাদের সারাজীবন সুনিয়ন্ত্রিত ও সুব্যবস্থিত হইয়া থাকে। কোন কোন বালক বৎসরে নয় দশ মাস পাঠে অবহেলা করিয়া পরীক্ষার পূর্ব্ববর্ত্তী দুই তিন মাস দিবারাত্রি অধ্যয়ন করে এবং তাহার ফলে অসুস্থ হইয়া পড়ে। রাত্রিজাগরণ স্বাস্থ্যভঙ্গের একটি প্রধান হেতু।

অতিরিক্ত আদর ও প্রশ্রয় বা আব্দারার ফলে যেমন বালকবালিকাদের জীবন উচ্ছৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা, অতিরিক্ত কঠোরশাসনের ফলেও সেইরূপ তাহাদের বিমর্ষতা, স্ফূর্ত্তিহীনতা ও চরিত্রদোষ জন্মিতে পারে। তাহারা যদি পিতাকে বাঘের মত ভয় করে ও তাঁহার কাছে স্বেচ্ছায় ঘেঁসিতে না চায়, কার্য্যের বা আচরণের কোন ত্রুটী হলে তাহারা তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করে এবং এইরূপ করিতে করিতে ক্রমশঃ শঠ, প্রতারক ও মিথ্যাবাদী হইয়া উঠে। যদি তাহারা জননীর কাছে কিছুমাত্র আদর, অন্ততঃ, মিষ্ট কথা না পায় এবং ক্ষুধার সময়ে খাবার না পায়, প্রথমোক্ত কারণে তাহাদের বিমর্ষতার আবির্ভাব এবং দ্বিতীয় কারণে চৌর্য্যপ্রবৃত্তির সঞ্চার হয়—তাহারা যেখানে যাহা পায় তাহাই চুরি করিয়া খায়; অখাদ্য খাইয়া তাহারা অসুস্থ হইয়াও পড়িতে পারে। বলা বাহুল্য সকল বালক বালিকা স্বভাবতঃ পিতামাতার কাছে, বিশেষতঃ মাতার কাছে, আদর ও মিষ্টকথা আশা করে এবং ক্ষুধার উদ্রেক হইলে মায়ের কাছে আসিয়া খাবার চায়। যদি প্রণালী শৃঙ্খলিত ভাবে সংসার চালিত হয়, সে-সংসারের বালক বালিকাদিগকে ক্ষুধার তাড়না সহ্য করিতে হয় না

বালকবালিকাদিগকে যখন তখন প্রহার করিতে নাই—প্রহার না করিলেই ভাল হয়, ভয়প্রদর্শনই যথেষ্ট। তাহাদের সাধ্যাতিরিক্ত কোন কার্য্যের আদেশ প্রদান অনুচিত এবং এরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিতে না পারিলে তাহাদিগকে তিরস্কার ও লাঞ্ছনা করা অন্যায়। পাঠাভ্যাসবিষয়েও এই নিয়ম প্রতিপাদ্য। পিতার মত শিক্ষক ও মাতার মত শিক্ষয়িত্রী কেহই হইতে পারে না, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই পিতার শিক্ষাদান প্রবৃত্তির অভাব লক্ষিত হয়। কেবল তাড়না ও ভর্ৎসনা কিম্বা প্রহার করিয়া কোন বিষয় কাহারও হৃদয়ঙ্গম করান সম্ভব নহে, বরং এ-প্রণালীতে হৃদয়ঙ্গম করাইতে বিলম্ব হয়। তাড়না বা ভর্ৎসনা বা প্রহারের ফলে মানসিক স্ফূর্ত্তি কিছুক্ষণের জন্য দূরীভূত হয়, কাজেই তখনকার মত কোন বিষয়ের মর্ম্মগ্রহণশক্তিও বিলুপ্ত হয়। শিক্ষার্থীর ধ্যান ও ধারণা প্রধানতঃ এই দুই গুণ আবশ্যক। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকার ধ্যান বা চিন্তা করিবার ক্ষমতা নিতান্ত সামান্য, ধারণাশক্তিও সীমাবদ্ধ। কোন দ্রব্য স্বহস্তে স্থানান্তরিত করিলেও কয়েক ঘণ্টা পরে তাহারা সহজে খুঁজিয়া পায় না এবং কোন্ জিনিষ কোথায় রাখিয়াছে বিস্মৃত হয়। বয়োবৃদ্ধির সহিত স্মৃতিশক্তির যতদিন পুষ্টিলাভ না করে ততদিন বর্ষীয়ান ব্যক্তির ন্যায় তাহাদের সময়ে সময়ে বিস্মৃতি

ঘটে। ভৎর্সনাদির ফলে চিত্তবিকার সঙ্ঘটিত হইলে তাহাদের উপলব্ধি ও স্মৃতির কার্য্য ব্যাহত হয় এবং চিত্ত যতক্ষণ প্রকৃতিস্থ না হয়, ততক্ষণ শিক্ষার বিষয় অনধিগম্য হইয়া থাকে। ফলতঃ এরূপ অবস্থায় পাঠ্য বিষয় আয়ত্ত করিতে এবং তৎসম্বন্ধীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে বিলম্ব হয়। সস্নেহে মধুর বচনে শিক্ষাপ্রদান অধিকতর ফলোপধায়ক। কোন বিষয়ের অর্থবোধ না হইলে তাহা স্মৃতিনিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলে স্মরণশক্তি প্রপীড়িত হয়। যাহাতে বালক-বালিকাগণ অর্থোপলব্ধি না করিয়া তোতাপাখীর মত কোন বিষয় মুখস্থ করিতে চেষ্টা না করে পিতা বা শিক্ষকের সে-দিকে দৃষ্টি আবশ্যক। উহাদিগকে যে-কোন বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে উহারা সমস্ত সাধারণ বিষয় বুঝিতে চাহে এবং বুঝিতে পারিলে আনন্দলাভ করে। জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা উহাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, তজ্জন্য উহারা সময়ে সময়ে নানাবিধ প্রশ্ন করে। প্রশ্নের উত্তর পাইলে উহারা সুখী হয়। প্রশ্ন উপেক্ষিত বা অবজ্ঞাত হইলে উহাদের মনোভঙ্গ হয়।

গৃহে (বাজারে বা দোকানে নহে) প্রস্তুত যে-খাবার খাইলে বালকবালিকারা তৃপ্ত হয়, সম্ভব হইলে এবং নিতান্ত গুরুপাক না হইলে তাহাই উহাদিগকে খাওয়াইতে পারিলে ভাল হয়। বালকবালিকাগণ স্বেচ্ছায় দুগ্ধ পান করে না; জবরদস্তী করিয়াও ইহাদিগকে কিছু কিছু দুগ্ধ পান করান উচিত। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে অনাবশ্যক হইলেও বালক-বালিকাদিগের দেহের ও সাধারণতঃ, স্বাস্থ্যের গঠন ও উৎকর্ষ সাধনকল্পে দুগ্ধ এক প্রকার অপরিহার্য্য। অনেক বালক-বালিকা স্বভাবতঃ ফল খাইতে ভালবাসে। ফল-ভোজনের প্রবৃত্তি সকলেরই মনে সঞ্চারিত করা উচিত।

যদিও মনুষ্যজীবনকে শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য এই ছয়টি স্তরে বিভক্ত করা হইয়াছে তথাপি সাধারণ আচার ব্যবহারে ও ভাষায় বাল্য কৈশোরের মধ্যে কোন প্রভেদসূচক রেখাঙ্কন করা হয় না। যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বে আমরা ছেলেকে বালক ও মেয়েকে বালিকাই বলিয়া থাকি এবং তদনুরূপ সম্বোধন করি। যতদিন তাহারা স্কুলে পড়ে ততদিন তাহাদিগকে School boy অর্থাৎ স্কুলের বালক বা School girl অর্থাৎ স্কুলের বালিকা বলা হয়; যখন তাহারা কলেজে প্রবেশ করে তখন তাহারা College student অর্থাৎ কলেজের ছাত্রছাত্রী কথিত হয়। কখন কখন তাহাদিগকে কলেজের ছেলে বা কলেজের মেয়ে বলা হয়, কিন্তু কেহ কিশোর-কিশোরী বলে না—গ্রন্থ ও প্রবন্ধের কথা স্বতন্ত্র। বয়সের পঞ্চম বর্ষ অতীত হইবার পর বালকবালিকা যে-সকল গুরুতর বা আড়ম্বরপূর্ণ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বা যাহা যাহা তাহাদের নিজের জীবনে সঙ্ঘটিত হয় তাহার কতকগুলি তাহাদের স্মৃতিপটে স্পষ্ট বা অর্দ্ধস্পষ্টরূপে অঙ্কিত হয় এবং যাবজ্জীবন বর্ত্তমান থাকে। একবার বর্ণপরিচয় হইলে তাহাও কাহাকে ভুলিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ সকল ভাষার অক্ষর এক একটি চিত্রবিশেষ। সেই জন্য বালকবালিকা-দিগের পাঠ্য পুস্তকে বর্ণিত বা চিত্রিত বস্তু বা জীবগুলি যদি তাহারা দেখিতে পায় তাহা হইলে তাহাদের স্মৃতিশক্তি যথেষ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত হয় এবং সেই সকল বস্তু ও জীব তাহাদের চিরপরিচিত হইয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে বালকবালিকাদিগের মধ্যে মধ্যে যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, সজ্জিত বাজার ও দোকান এবং প্রদর্শনী প্রভৃতি দেখাইয়া আনিলে তাহাদের শিক্ষার সৌকর্য্য হইয়া থাকে। অবশ্য দর্শনীয় বস্তু ও জীবগুলিকে উত্তমরূপে চিনাইয়া ও তাহাদের বিষয় বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতে হয়; তাহাদিগকে কেবলমাত্র নয়নগোচর করিলেই বিশেষ শিক্ষালাভ হয় না।

স্বাবলম্বন বা আত্মনির্ভরতা সকলেরই অর্জ্জনীয় গুণ—বালকবালিকারও বটে। ইহাদিগকে আত্ম-নির্ভরশীল করিয়া তুলিতে হয়। বালিকাগণ স্বভাবতঃ অল্প বয়স হইতে এই গুণ অর্জ্জন করে। পুতুলখেলা, রাঁধাবাড়া-খেলা প্রভৃতি হইতে তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাংসারিক কার্য্য শিক্ষা করে এবং জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিতে শিখে। শিবপূজা ও অন্যান্য পূজা করিবার জন্য তাহারা নিজেই দন্তধাবন, স্নান ও বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিয়া প্রস্তুত হয়। যে-বালিকা বিদ্যালয়ে যায় সে নিজের পাঠ্য পুস্তক, খাতা, পেন্সিল, সেলাইয়ের সরঞ্জাম প্রভৃতি গুছাইয়া রাখে এবং নিজেই গমনোপযোগী বেশবিন্যাস করে। বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে সে নিজের বই, কাগজ, কাপড়, জুতা প্রভৃতি আবার গুছাইয়া রাখে। এইরূপে গৃহসৌষ্ঠবের দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বালকগণ স্বভাবতঃ এ-বিষয়ে অভ্যস্ত হয় না। দেখা যায় যে অনেক বালক বিদ্যালয়ে যাইবার সময় পুস্তকাদি ও জুতা প্রভৃতি খুঁজিয়া পায় না। তাহারা বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে না করিতে জামা জুতা খুলিতে আরম্ভ করে এবং বাটীর দ্বার অতিক্রম করিয়াই পা ছুড়িয়া দুই পায়ের জুতা দুইদিকে নিক্ষেপ করে, পুস্তকাদি যেখানে-সেখানে ফেলিয়া রাখে, এবং হয় "মা, মা, ক্ষিদে পেয়েছে" বলিতে বলিতে আহারের চেষ্টায়, নতুবা খেলা করিতে ছুটে। পিতা মাতা কথঞ্চিৎ যত্ন করিলেই বালকগণের এই কু-অভ্যাস নিরাকৃত হইতে পারে। পরন্তু, ধীরে ধীরে শিক্ষাপ্রদান করিলে তাহাদেরও দৃষ্টি সৌষ্ঠব-সৌন্দর্য্যের দিকে প্রসারিত হয়। বালকবালিকা-গণ যে স্বভাবতঃ কাজ করিতে অনিচ্ছুক তাহা নহে। অধি-কাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের কর্ম্মবিরতি শিক্ষার অভাবে সংঘটিত

হয়। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহে তাহারা অনেক কার্য্যনির্দ্দেশ পালন করে এবং খেলার বা (কোন কোন ক্ষেত্রে) পাঠাভ্যাসের সময়ে কাজ করিতে না হইলে বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হয় না। ক্রিয়া-কলাপের সময়ে তাহারা যত্নসহকারে অনেক কার্য্য সম্পন্ন করে এবং ভোজের সময়ে সাগ্রহে পানীয় ও লবণ পরিবেশনে প্রবৃত্ত হয়। সমুচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে ইহারা নিজেদের বস্ত্রাদি অপরিষ্কার স্থানে নিক্ষেপ করতঃ মলিন করিবে না, বরং, পরিচ্ছন্ন অবস্থায় সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিবে, স্ব স্ব জুতা স্বহস্তে পরিষ্কার ও পালিস করিবে এবং যথাস্থানে রাখিয়া দিবে, স্বীয় পাঠ্যপুস্তক, খাতা, পেন্সিল প্রভৃতি গুছাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিবে। এই প্রসঙ্গে বালকবালিকাদের একটি বিপজ্জনক কু-অভ্যাসের উল্লেখ করিতেছি: তাহারা কমলালেবু, আম, আতা ও কলা প্রভৃতি ফল খাইতে পাইলে তাহাদের খোসা, "ছিবরা" ও বীজগুলি বাড়ীর চারিদিকে ছড়ায়, কারণ যাহা হাতে লইয়া খাইবার সুবিধা থাকে, তাহা উহারা বেড়াইতে বেড়াইতে খায়। যদি এ-গুলি সিমেণ্টের বা অন্যবিধ মসৃণ মেঝের উপর পড়ে, অনবধানতা প্রযুক্ত যাহার পা উহার উপর পড়িবে সেই পিছলাইয়া কঠিন মেঝের উপর পড়িবে এবং হয় ত' প্রচণ্ড আঘাত পাইবে। এতৎসম্বন্ধে বালকবালিকাকে উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া ও সাবধান করা কর্ত্তব্য।

যাহাতে সর্ব্বদা সকল বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী না হয়, নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য নিজেরাই নিষ্পন্ন করে, বালক-বালিকাগণকে এইরূপ শিক্ষা প্রদান কর্ত্তব্য। এইরূপ শিক্ষা-লাভ করিতে করিতে এবং স্ব স্ব কার্য্য স্বহস্তে সাধন করিবার ফলে তাহাদের কার্য্যনিরতি ও আত্মনির্ভরশীলতা অবশ্যই সঞ্জাত হইবে।

যে পিতার কিছু সঙ্গতি আছে, তিনিই পুত্রের জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। ইহার ফল হয় এই যে অপরের সাহায্য ব্যতীত পুত্রের পাঠাভ্যাস সুচারুরূপে হয় না এবং অনুসন্ধিৎসা ও পরিশ্রমপ্রবৃত্তি ক্রমশঃ লোপ প্রাপ্ত হয়। স্কুলশিক্ষকের কর্ত্তব্য অধ্যাপনকালে পাঠ্য বিষয়গুলির বিশদ ব্যাখ্যা বা অর্থপ্রকাশ করিয়া সেগুলি ছাত্রগণকে, তাহাদের বোধগম্য হয়, এরূপভাবে বুঝাইয়া দেওয়া এবং লিখিয়া লইবার মত সময় দেওয়া। যদি স্কুল-শিক্ষক এ-কর্ত্তব্য পালন করেন এবং ছাত্র লিখিয়া লইবার পরিশ্রম স্বীকার করে, তাহা হইলে অধ্যাপিত বা অধ্যাপ্য বিষয়ের আবৃত্তি ও অর্থবোধ সম্বন্ধে অপরের সহায়তার প্রয়োজন হয় না। পরন্তু, অভিধানের সাহায্যে অনেক দুরূহ শব্দের অর্থনির্ণয় সম্ভব। যাহার গৃহশিক্ষক থাকে সে-বালক অভিধানের সাহায্য লইতে হইলে যে-পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা এড়াইতেই চেষ্টা করে। অধিকন্তু, গৃহশিক্ষক কোনদিন অনুপস্থিত হইলে সে-বালকের সেদিন অধ্যয়ন বন্ধ থাকে, ইহাও প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায়। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, যে-সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলে প্রথম হইতে দশম স্থান অধিকার করিয়াছে তাহাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন গৃহশিক্ষক কর্ত্তৃক অধ্যাপনার সৌভাগ্য লাভ করে নাই। নিতান্ত ছোট বালকবালিকার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যখন লিখিতে সমর্থ হয়, তখন হইতে তাহাদের জন্য গৃহশিক্ষক না রাখিলে এবং অভিধান হইতে শব্দার্থসংগ্রহের অভ্যাস বদ্ধমূল হইলে অধ্যয়ন বিষয়ে তাহারা আত্মনির্ভরশীল ও তাহাদের জ্ঞানের সীমা প্রসারিত হইতে পারে।

কলিকাতার ন্যায় বড় সহরে, যেখানে রাজপথে গাড়ী-ঘোড়ার যাতায়াত অধিক, রাস্তায় কী প্রণালীতে চলিতে হয় সে-বিষয়ে বালকবালিকাদিগকে উপদেশ প্রদান আবশ্যক। প্রধান প্রধান রাজপথের (দুই-একটি ভিন্ন) উভয় পার্শ্বে পথিকদিগের জন্য পাদমার্গ বা ফুটপাথ থাকে। মানুষের গমনাগমনের জন্য ফুটপাথ, সর্ব্বোতোভাবে না হইলেও, গাড়ীঘোড়া সম্পর্কীয় বিপদ এড়াইবার পক্ষে নিরাপদ। একপার্শ্বস্থ ফুটপাথ হইতে অন্য পার্শ্বের ফুটপাথে যাইতে হইলে প্রশস্ত রাজপথ অতিক্রম করিতে হয়; সেই সময়ে বিশেষ সতর্কতা-অবলম্বন বিধেয়। রাস্তায় পদক্ষেপ করিবার সময়ে সম্মুখে, দক্ষিণে ও বামে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কোন গতি-শীল শকটের, বিশেষতঃ মোটর-গাড়ীর সম্মুখ দিয়া রাস্তা-অতিক্রমের চেষ্টা বিপজ্জনক। মোটর-গাড়ীর গতিবেগের পরিমাণ-নির্ণয় বয়ঃস্থ ব্যক্তিরও দুঃসাধ্য, বালকবালিকার ত কথাই নাই। বিলাতের বড় বড় সহরে, বিশেষতঃ লণ্ডনে যে-সকল রাস্তায় অবিরত গাড়ী চলে, তাহাদের মধ্যস্থলে দ্বীপের মত একটি স্থান নির্ম্মিত থাকে এবং সেখানে একটি পুলিস-কনষ্টেবল দাঁড়াইয়া গাড়ী প্রভৃতির চলাচল নিয়ন্ত্রিত করে। যখন রাস্তা পার হইবার জন্য একদিকের ফুটপাথে কতকগুলি পথিক জমা হয় তখন সেইদিকে গাড়ীর গতি-নিরোধ করতঃ কনষ্টেবল সেই পথিকগুলিকে দ্বীপে উঠিবার অবসর প্রদান করে এবং অপর পার্শ্বে গাড়ীর গতি নিরুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সেই পার্শ্বস্থিত ফুটপাথে উঠিবার সুযোগ করিয়া দেয়। ইহাতে কিঞ্চিৎ সময় নষ্ট হয় বটে কিন্তু দুর্ঘটনার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। অপ্রশস্ত রাজপথে ফুটপাথ থাকে না; তাহার বামদিক অর্থাৎ পথিকের দক্ষিণ পার্শ্ব অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়, কারণ, এ-দেশে প্রচলিত রীতি অনুসারে গাড়ীঘোড়া নিজের বামদিক দিয়া চালিত হয়, সুতরাং পথিকের চক্ষুর সম্মুখেই আসিয়া পড়ে; নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে না চলিলে অথবা চালকের বিশেষ দোষ না থাকিলে পথিকের অনিষ্ট-সম্ভাবনা থাকে না। বালক ও বালিকা উভয়কেই এ-বিষয়ে শিক্ষাপ্রদান পূর্ব্বক অভ্যস্ত

করিয়া তুলিলে তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার বা তথা হইতে আনিবার জন্য দ্বারবান বা ভৃত্য নিয়োজিত করিতে হয় না। বর্ত্তমান যুগে বালিকাকেও একাকিনী স্কুলে যাইতে দেখা যায়। পূর্ব্বে সহরে ইহা সম্ভব ছিল না, কারণ কোন বালিকাকে রাজপথে একাকিনী দেখিতে পাইলে দুশ্চরিত্র ও অশিক্ষিত যুবকগণ তাহাকে শুনাইয়া নানারূপ রুচিবিগর্হিত মন্তব্য প্রকাশ করিত। এ বিষয়ে অধুনা যথেষ্ট পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়—সুখের বিষয়! অবশ্য ছোট ছোট বালক-বালিকাকে একাকী রাজপথে চলিতে দেওয়া বিধেয় নহে।

বালকবালিকাদিগকে কোন পুরস্কারের বা অন্য কোনরূপ প্রলোভন দেখাইয়া বা প্রতিশ্রুতি প্রদান করতঃ কোন কার্য্য করাইয়া লইলে প্রতিশ্রুতিপালন অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা তাহাদিগকে প্রকারান্তরে প্রতারণা ও মিথ্যাবাদিতা শিক্ষা দেওয়া হয়। সুতরাং যে-প্রতিশ্রুতির পালন অসম্ভব সেরূপ প্রতিশ্রুতিপ্রদান অকর্ত্তব্য। মানবকর্ত্তৃক চাঁদের স্থানচ্যুতির অসম্ভাবিতা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা যাহাদের নাই, চাঁদ ধরিয়া দিবার লোভ দেখাইয়া তাহাদিগের প্রতি কোন কার্য্যনির্দ্দেশ অনুচিত। যদি কোন ক্রীড়নক বা অন্য কোন পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দান করা হয়, তাহা অবশ্য দেয়—ইহা স্মরণ রাখা বিধেয়। [ক্রমশঃ.

সমস্যা

(গল্প)

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চৌধুরী

ভাবিতেছিলাম জীবন-রহস্যের কথা।

কত লোক মরিয়া বাঁচে, আবার কত লোক বাঁচিয়াও মৃত।

দার্শনিক বলিবেন যে, বিনা প্রয়োজনে কোন কাজই নাকি হয় না পৃথিবীতে। ভাল; কিন্তু, প্রয়োজন কার? স্ত্রী-পুত্রকে কাঁদাইয়া, তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন ব্যবস্থা পর্য্যন্ত না রাখিয়া বা রাখিতে সমর্থ না হইয়া যে হতভাগ্য অমরধামে (?) গেল, সে কার প্রয়োজনে? নিত্য সকাল-সন্ধ্যায় অসহায়া বিধবার তপ্ত অশ্রুজল-বরিষণে, ক্ষুধাতুর অসংখ্য মানব-শিশুর কাতর ক্রন্দনে—কার প্রয়োজন? আবার, অশীতিপর বৃদ্ধ—জগতে যাহার সব প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, তাহারও কাহাকে প্রয়োজন হয় না, তাহাকেও কাহারও প্রয়োজন নাই—শত আঘাতের পরেও দুঃসহ জীবনভার বহিয়া চলিতে বাধ্য হয় কাহার প্রয়োজনে?

এই তো, আমাদের পাড়ার নিত্যহরি ভট্টাচার্য্য।

বয়স ৬০ পার হইয়া গিয়াছে; স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন, কেহই তাঁহার নাই। আছে শুধু অতি পুরাতন, জীর্ণ-শীর্ণ, পৈতৃক একতলা বাড়ীখানি, এবং ততোধিক জীর্ণ, কঙ্কালসার দেহ। পাড়ার পুরুষদের তিনি সর্ব্বজনীন "দাদা" এবং গৃহিণীদের "হরি ঠাকুর"। অতি সরল, শিবতুল্য লোক। যদি একদিনও পাড়ার কোন বাড়ীতে উপস্থিত না হইতেন, অন্দর হইতে মেয়েরা খবর লইতেন:—"যা তো শিবু, দেখে আয় তো, হরি ঠাকুর এল না কেন?"

এ বাড়ী হইতে চাল, ও বাড়ী হইতে আলু, সে বাড়ী হইতে তেল, নুন, ইত্যাদি, তিনি না চাহিতেই প্রত্যহ তাঁহার গৃহে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইত। সদা হাস্যময় দাদা কোনদিন কাহারও উপকার ছাড়া যে অপকার করিয়াছেন ইহা কেহ ধারণাই করিতে পারে না।

সেদিন রবিবার। সকালে উঠিয়া সামনের রকে বসিয়া আছি;—সর্ব্বাঙ্গে রবিবারের প্রাতঃকালোচিত আলস্য। কথা বলিবার বা শুনিবার কোন আগ্রহই ছিল না। এমন সময় দাদা আসিয়া বসিলেন।

পাড়ার মধ্যে আমার সঙ্গে দাদার ভাব একটু বেশী ছিল। কি কারণে জানি না, তিনি সর্ব্বদাই পরম স্নেহে আমার খোঁজ-খবর লইতেন, মেয়েটাকে কোলে করিয়া বেড়াইতে লইয়া যাইতেন। কাজেই একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলাম এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রথম আলাপ করিলাম:—"কি দাদা, কোথায় চল্লেন?

একগাল হাসিয়া দাদা কহিলেন: "তোমার কাছেই এলুম ভাই; আর কোথা যাব বল?"

কি জানি হঠাৎ কি খেয়ালে সহসা প্রশ্ন করিয়া বসিলাম:—"আচ্ছা, দাদা, আপনি তো বৌদি'র সম্বন্ধে কোন দিনও কোন কথা বলেন নি আমাদের কাছে?"

আনন্দে বৃদ্ধের মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; ব্যগ্র উৎসাহে কহিলেন: "দেখবে তাঁর ছবি, ভাই?" বলিয়া শত ছিন্ন ফতুয়াটির ভিতরের পকেট হইতে অতি যত্নে কয়েকখানি জীর্ণ কাগজ বাহির করিলেন এবং অতি সাবধানে একখানি ফটো বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন।

ফটোখানি দেখিয়া সত্যই চমকাইয়া গেলাম। চওড়া পাড় শাড়ী পরিয়া সিন্দুর-সীমন্তিনী সৌভাগ্য-গর্ব্বে মৃদু মৃদু হাসিতেছেন; একখানি হাত বাহিরে, হাতে একগাছ শাঁখা! বাস্তবিকই অপূর্ব্ব!

দাদা কহিলেন:----"ঐ যে শাঁখা দেখছ, ও ছাড়া আর কোনও গয়না তিনি পরতেন না, গয়না তো বড় কম ছিল

না ভাই, কিন্তু তিনি কিছুতেই পারতেন না। আমি কত বলতাম…"

বৃদ্ধ অনর্গল বলিয়া চলিলেন—তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবনের ছোটখাট, অবান্তর কত কথা ; যার কোন দাম হয়ত তাঁহাদের কাছে ছাড়া আর কাহারও কাছে ছিল না। বহু দিনের জমান স্মৃতির ভাণ্ডার উজাড় করিয়া দিতে লাগিলেন। বুঝিতে পারিলাম যে, আমার মত ধৈর্য্যশীল শ্রোতা বোধ হয় তিনি কোনদিন পান নাই।

অন্য সময় বা অন্য কাহারও মুখে এই রকম বাজে কথা শুনিবার ধৈর্য্য আমার কখনও থাকিত না। কিন্তু সেই রবিবার সকালে—কি জানি কেন—বৃদ্ধের অনর্গল বাক্য-স্রোতে বাধা দিতে মন চাহিল না ; শুনিতে বড় ভাল লাগিতেছিল।

বহুক্ষণ পরে বোধ হয় বৃদ্ধের চেতনা হইল যে, আমি কিছু না বলিয়া শুধু শুনিয়াই যাইতেছি। লজ্জিত হইয়া তিনি থামিয়া গেলেন এবং মলিন বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু দুইটি ভাল করিয়া মুছিয়া, ম্লান হাসিয়া কহিলেন : "কিছু মনে করো না ভাই ; বুড়ো মানুষ, কত বাজে কথা বললুম্ !"

আমি বাধা দিয়া কহিলাম :—"না, দাদা, আপনি বলুন ! এই কলকোলাহলময় সংসারে স্বর্গের ছায়া বড় কম পড়ে, তাই আপনার স্বর্গ রচনার কাহিনী বড় মধুর মনে হচ্ছে !"

বৃদ্ধ সহসা আমার হাতখানি ধরিয়া 'হু হু' করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। চুপ করিয়া রহিলাম—আর কিই বা করিব ? ইচ্ছা হইতেছিল, ফটোখানি একবার মাথায় ছোঁয়াই ; যাঁর স্পর্শের স্মৃতি এই মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ আজও এত সযত্নে মনে করিয়া রাখিয়াছে, তিনি না জানি কেমন ছিলেন।

কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া দাদা তাঁহার কাগজপত্তর গুছাইয়া লইয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু অনবধান বশতঃ একখানি খাম ফেলিয়া গেলেন। আমি খামখানি উঠাইয়া দেখি, দাদার নামে চিঠি—বিলাতের ডাকের ছাপ! অদম্য কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া চিঠিখানি পড়িলাম।

পত্রখানি দাদার ছোটভাই বিলাত হইতে লিখিয়াছে। নানাবিধ সুমিষ্ট বিশেষণে দাদাকে অভিহিত করিয়া পরে লিখিয়াছে যে, সে কাজের মানুষ, সুতরাং দাদাকে খরচের টাকা পাঠাইয়া অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া সে অন্যায় মনে করে ; আর তা' ছাড়া, মার্গারিটা নাকি আপত্তি করে। তবে, দাদা যদি ওখানে যাইতে রাজী থাকেন, সে চেষ্টা করিয়া দেখিবে কোন কাজ জুটাইয়া দিতে পারে কিনা।

চিঠিখানি পড়িয়া বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। 'দাদার' যে কোন 'ভাই' আছে, তাহা কোন দিনও জানিতাম্ না। আমার প্রতি দাদার স্নেহের কারণ কতকটা বুঝিতে পারিলাম।

সহসা দেখি দাদা ব্যস্তভাবে পুনরায় আসিতেছেন। কাছে আসিয়া কহিলেন, "একখানা খামের চিঠি দেখেছ ভাই—এইখানে ফেলে গেছি বলে' মনে হচ্ছে ?"

আমি চিঠিখানি তাঁহার হাতে দিলাম ; মনে হইল—দাদা হারাধন ফিরিয়া পাইলেন। তাঁহাকে পুনরায় বসাইয়া প্রশ্ন করিলাম, "আচ্ছা, দাদা, আপনার যে ভাই আছেন, তা' তো কোনদিন বলেন নি ?"

দাদা যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন, কহিলেন, "এমনিই, বুঝলে কি না।"

আমি কহিলাম, "আপনার ভাই বিলেতে চাকরি করে ?"

দাদা উৎসাহের সহিত বলিলেন,"হাঁ্যা, হাঁ্যা,বিলেতে,বুঝেছ ? খুব বড় চাকরি। কত সাহেবের বাচ্চা তার নীচে কাজ করে।"

দাদা তাঁর ভ্রাতার গুণাবলীর মস্ত বড় ফিরিস্তি দাখিল করিলেন।

আমি বিরক্ত হইলাম, আবার হাসিও আসিল। হাসিয়া কহিলাম, "কিন্তু দাদা, সে তো আপনার মোটেই প্রশংসা করেছে বলে মনে হল না ?"

দাদা হঠাৎ বিব্রত হইয়া আমতা আমতা করিয়া কহিলেন, "না না ভাই, তা নয়, তা নয়। তার কোন দোষ নেই, বরং আমিই তাকে বছর দুই এর পর আর টাকাকড়ি পাঠাতে পারি নি ; বিদেশে টাকার অভাবে কত কষ্ট হয়েছে, ভাব তো ?"

অবাক্ হইয়া বলিলাম, "আপনি তাকে বিলেত পাঠিয়েছিলেন ? টাকা কোথায় পেলেন ?"

দাদা কহিলেন, "তোমার বৌদির গয়নাগুলো বেচে! ভাবলাম, যার গয়না সেই নেই, হোক হতভাগাটা মানুষ। আর সেও বড় ভালবাসত তার ঠাকুরপোকে ; একরকম কোলে-পিঠে করে' মানুষ করেছিল কি না ?"

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলাম, "এত কষ্ট করে যাকে মানুষ করেছেন, সে আপনার নিন্দে কচ্ছে ; আর আপনি তার সাফাই গাইছেন ?"

দাদা "এতটুকু" হইয়া গিয়া বলিলেন, "না, না ভাই, তার কোন দোষ নেই ; বড় কষ্ট পেয়েছিল বিদেশে ; তা' না হোলে …বুঝলে না ?"

বিরক্তি সত্ত্বেও হাসিয়া ফেলিলাম ; আশ্চর্য্য লোক! কহিলাম, "আপনার ভাই খুব বিদ্বান, না দাদা ?"

আনন্দে প্রায় আত্মহারা হইয়া দাদা কহিলেন,"হাঁ্যা গো, মস্ত বিদ্বান, ছ' সাতটা পাশ দিয়েছে। সেখানে মেমসাহেব তাকে যেচে বে' করেছে ; খাঁটি মেমসাহেব, তোমাদের চুনো-গলির ট্যাস নয়, বুঝলে ?"

বৃদ্ধ চলিয়া গেলেন। ভাবিলাম, কি আশ্চর্য্য লোক ! যে স্ত্রীর কথায় এখনো তাঁহার চোখে জল আসে, সেই স্ত্রীর গহনা-বিক্রয়লব্ধ অর্থে মানুষ হইয়াও যে ভাই তাঁহাকে এ রকম চিঠি লিখিল, তাহার উপরেও কোন রাগ নাই।

তাই ভাবিতেছিলাম—জীবনে দাদার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, স্বহস্তরচিত স্বর্গের ভগ্নস্তূপের মধ্যে বসিয়া পরানুগ্রহে তাঁহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। বাঁচিয়া থাকায় ইঁহার কি লাভ ? কার প্রয়োজনে ইনি এখনো বাঁচিয়া আছেন ?

ভগবানের ?—তাই বোধ হয়!…ভগবান!

সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কথামুখ

নিবিড় বিন্নাঘাসের মধ্য দিয়ে কাঞ্চন নদীর নীল জল যেখানে এঁকে বেঁকে মহানন্দায় নামতে চলেছে, শেষ পর্য্যন্ত দলটী সেখানে এসে থেমে দাঁড়াল।

আকাশে বর্ষা-মেঘের গুঞ্জন। দূরে সিংহাবাদের হিজল বন যেন একটা সবুজ প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে, তার মাথায় সাদা বক ফেনার মতো জমে রয়েছে। ওই হিজল গাছটায় না আছে এমন জন্তু নেই। ওখানে শ্যাওলা-ধরা সবুজ গুঁড়ির গায়ে হরিণেরা সিং ঘষে চলে, আর ঘন ঘাসবনের মধ্যে দু' চোখে হিংসার প্রখর আলো জ্বালিয়ে ডোরাকাটা ক্ষুধার্ত্ত বাঘ তাদের পর্য্যবেক্ষণ করে। মেঘের গুরু মৃদঙ্গ শুনে হিজলের ডালে ময়ূরেরা পেখম মেলে দেয়, বকের ছানা খাওয়ার আশায় কালো রঙের যে গোক্ষুর সাপটি গাছের আগায় উঠে এসেছিল, ভটস্থ হয়ে সে লুকোবার চেষ্টা করে পাতার আড়ালে। ঘাসের বন দলিত ক'রে নক্ষত্র গতিতে একটা নীল গাই ছুটে চলে যায়, ক্রুদ্ধ শঙ্খচূড় তাকে ধরতে না পেরে নিষ্ফল আক্রোশে মাটির ওপর ঠকাস্ ঠকাস্ শব্দে ছোবল মারে। কাকচক্ষু জলের মধ্যে প্রকাণ্ড নরখাদক কুমীর মেঘের মতো ভেসে বেড়ায়।

চলতে চলতে যাযাবরের দল যেখানে এসে বিশ্রাম নিতে চাইল, সেখানে পুরাণো দীঘিতে থরে থরে রক্তপদ্ম ফুটে রয়েছে, ভাঙা মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের ওপর কন্টিকারীর বেগুনী শোভা। মৃত্তিকার অণুতে অণুতে মিশে রয়েছে অতীত সভ্যতার বিবর্ণ ইষ্টকচূর্ণ। কাঞ্চন নদীর ওপারে প্রশস্ত বিল, শাপলায় কলমীতে জল আর চোখে পড়ে না। শীত করে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের ওপর থেকে তার সাদা কুয়াশার জাল সরিয়ে নিয়ে গেছে, কিন্তু দূরের যাত্রী বনহংসীর দল এই নির্জ্জনতার মায়া কাটাতে পারে নি। ঢোল কলমী আর শাপলা লতার মাঝখানে একেবারে তীরের কাছ ঘেঁসে তারা বাসা বেঁধেছে, দু'পুরের রোদে চোখ বুজে বসে তারা সাদা সাদা ডিমগুলোতে তা দেয়।

বিহারের অনুর্ব্বর কাঁকরের দেশ থেকে যারা এখানে এসেছে, সবুজের এই সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তারা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। এ এক অপূর্ব্ব জগৎ। যেদিকে চাওয়া যায়, রঙের স্নিগ্ধতায় যেন চোখ পরিপূর্ণ হয়ে আসে। শোভায় দাক্ষিণ্যে পরিপূর্ণ পৃথিবী—এ যেন কল্পনার স্বর্গলোক।

ঝিনুকের রেখা-আঁকা বালির তীরে বসে নদীর জলে তারা ছাতু ভিজিয়ে নিলে। ক্লান্তি দূর হলে ঢোল আর করতাল সহযোগে উৎসব সুরু হল তাদের:

"আরে বিলাখী বিলাখী করে রোয়ে সিয়া জানকীয়া—"

ওদিকে তিন মাইল দূরে কুমারদহে রায়বর্ম্মারা তখন প্রবল পরাক্রমে জমিদারী করছিলেন।

বক্তিয়ার খিলিজীর সপ্তদশ অশ্বারোহীর সঙ্গে মুসলমান রাজতন্ত্রের যে প্রবল বন্যা এসেছিল, তার জোয়ারে একদিন দেবীকোট-রাজবংশও তলিয়ে গেল। দেবীকোটের নাম হল ঘোড়াঘাট, আর ঘোড়াঘাট সরকারের শাসনে উত্তরবঙ্গের একটা বিরাট অংশও নিয়ন্ত্রিত হতে লাগল। প্রাচীন রাজবংশ ইসলাম গ্রহণ করে আত্মরক্ষা করলে, যারা তত সহজেই ধর্ম্মটাকে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হতে পারল না, তাদেরই একটী শাখা এখানে এসে জমিদারীর একটা খণ্ডাংশ নিয়েই খুসী রয়ে গেল। এরাই রায়বর্ম্মাদের পূর্ব্বপুরুষ।

রায়বর্ম্মাদের শিরায় শিরায় পূর্ব্বগামীদের রক্ত। ক্ষাত্র তেজ যা আছে প্রজারাই তার উত্তাপ অনুভব করে। মেজাজ প্রসন্ন থাকলে তারা 'নার্ব্বিকার মু'খ বিশ বিঘা ব্রহ্মত্র লিখে দেয়, অসন্তুষ্টির কারণ ঘটলে গলায় ইঁট ঝুলিয়ে হাঁসমারীর খাঁড়িতে ডুবিয়ে মারতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগে।...

বর্ষা-পিছল গ্রামের পথ বেয়ে জমিদার রাঘবেন্দ্র রায়-বর্ম্মার পালকী এসে থামল।

রূপো আর হাতীর দাঁতে পালকীর সর্ব্বত্র খচিত। ভেতরে সবুজ মখমলের তাকিয়া, তাতে হেলান দিয়ে আল্‌বোলা টানছেন রাঘবেন্দ্র। মাথায় জরির কাজ করা শাদা রেশমের পাগড়ি, গায়ে সোনালা পাড় দেওয়া রেশমী আচকান। আগুনের শিখার মতো একটা দীর্ঘ দেহ তার মাঝখানে জ্বলছিল।

পালকী থেকে না নেমেই রাঘবেন্দ্র ডাকলেন—দেওয়ানজী?

দেওয়ানজী সম্মুখে এসে সসম্ভ্রম প্রতীক্ষায় নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

রাঘবেন্দ্র বললেন, পেছনের পালকীতে লক্ষ্ণৌয়ের সরযূ বাঈজী এসেছেন। রং মহলে তাঁর থাকবার সব রকম বন্দোবস্ত করে দিন।

সসংকোচে দেওয়ানজী বললেন, যে আজ্ঞে।

প্রতি বছরই রাঘবেন্দ্র একবার ক'রে পশ্চিম ভ্রমণে যান এবং প্রতিবারেই একটি করে নারীরত্ন সংগ্রহ করে আনেন। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। নারী বীরের ভোগ্যা। এ কথা রাঘবেন্দ্র জানেন। তাই সুন্দরী নারী সম্বন্ধে তাঁর লালসা এবং দুর্ব্বলতা সীমাহীন।

রাঘবেন্দ্র নেমে এলেন পাল্‌কী থেকে।

মদ ও আলবোলা বয়ে অনুচরের দল পেছনে পেছনে এগিয়ে চলল ছায়ার মতো, যেন স্বতন্ত্র কোনো সত্তা নেই তাদের।

তারপর দেড় শো বছর পার হয়ে গেল।

রাঘবেন্দ্র রায়বর্ম্মার স্মৃতি আজ ইতিহাসের বস্তু। কিন্তু সে ইতিহাস কেউ লিখে রাখেনি, জনশ্রুতির স্রোত বাহে নানা কল্পনায় রঙীন হয়ে সে স্মৃতি বেঁচে আছে। মারাঠা'র বিলের দক্ষিণ দিকে যে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ জটা নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওইখানে ভাঙা ইঁট-পাথরের স্তূপের মধ্যে ছোট একটি থান আছে। এখন ওখানে চৈত্রমাসে রাজবংশীর দল মহা উৎসাহে গাজনের উৎসব করে, মুখোস এঁটে দেখায় কালীর নৃত্য। কিন্তু জনপ্রবাদ বলে, দেড় শো বছর আগে ওখানে অমাবস্যার রাতে রাঘবেন্দ্র রায়বর্ম্মা কালীপুজো করতেন। তখনও কাঞ্চন নদীর জলে এমন করে বালির পাহাড় জমে ওঠেনি, ভেলার খাল দিয়ে তখনও এমন করে জল বেরিয়ে যেত না। এই নদী তখন ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রধান প্রাণপথ ছিল। সিঙ্গাবাদের বাঁক ঘুরে, রোহণপুরের বন্দর ছাড়িয়ে নদী যেখানে মহানন্দায় গিয়ে মিশেছে, সেখান দিয়ে বড় বড় ব্যবসায়ী নৌকো ভোলাহাট, ইংরেজবাজার, মালদহ, তারপর আরো দূরে নবাবগঞ্জ পর্য্যন্ত চলে যেত। আর মারাঠার বিলের ঘন কাশবনের মধ্যে রাঘবেন্দ্র রায়-বর্ম্মার যে সব ছিপ নৌকা দিনের বেলা লুকিয়ে থাকত, রাত্রির অন্ধকারে বিলের দাম ঘাস ঠেলে সে সব নৌকা সোজা কাঞ্চন নদীতে গিয়ে নামত শিকারের সন্ধানে। বৈদ্যনাথ-পুরের দীঘিতে আজো না কি রাঘবেন্দ্র রায়বর্ম্মার টাকার সিন্দুক ভেসে ওঠে, সিঁদুরের মতো টকটকে লাল তার রঙ। ডাকাতি করা ধন রাঘবেন্দ্র ব্যবহার করতে পারেন নি, জঙ্গলা-কীর্ণ অতল-স্পর্শ দীঘির শীতল কাদার মধ্যে বসে যক্ষেরা সযত্নে সে ধন পাহারা দিয়ে চলেছে।

কিন্তু রাঘবেন্দ্র রায়বর্ম্মার কথা যাক। তারপর আরো কয় পুরুষ কেটে গেল, সমান খ্যাতি অর্জন করে না হোক, সমান অপব্যয়ের মসৃণ পথে। ইংরেজ শাসনের আওতায় বংশকৌলীন্য ক্ষীণ হয়ে যেমন কাঞ্চনকৌলীন্য প্রধান ও মুখ্য হয়ে উঠতে লাগল, তেমনি তার সাথে সাথে তাল রেখে দেবীকোট-রাজবংশও চলল সমানভাবে লুপ্তশ্রী হয়ে। বংশ-মর্য্যাদাকে কে আর মূল্য দেয় এখন! দেবীকোট-রাজবংশ প্রথম এসেছিল রাজপুতানা থেকে, চিতোরের প্রতাপসিংহ তাদেরই সগোত্র, সূর্যবংশের রক্ত তাদেরই ধমনীতে খরস্রোতে বয়ে যাচ্ছে, এ সব কাহিনী আজ আর কে বিশ্বাস করবে?

কুমারদহের বর্ত্তমান জমিদার কুমার বিশ্বনাথ রায়-বর্ম্মাদের শেষ কুলপ্রদীপ। হাঁ, শেষই বলা যায় বই কি। কুলপ্রদীপ কথাটাও সমান অর্থেই সত্য, কারণ জমিদারীর অবশিষ্ট যেটুকু আছে কুমার বিশ্বনাথের বিলাসের মশাল হিসাবে হয় তো আর বছর কয়েকের মধ্যেই তা জ্বলে নিঃশেষ হ'য়ে যাবে। তারপরে বিস্মৃতির অন্ধকার।

পুরাণো সাতমহলা বাড়ী ভেঙে পড়েছে, ওদিকটাতে এখন অজগর জঙ্গল। সাবেকী বাড়ী ছাড়িয়ে প্রায় অনেকটা পূবদিকে সরে এসে নতুন বাড়ী তৈরী হয়েছে রায়বর্ম্মাদের। সাধারণ ধরণের কয়েকটি দোতলা চোখে পড়বার মতো নয়। অথচ ওদিকে দোতলা নহবৎখানার ভেতর দিয়ে অশ্বত্থের অসংখ্য শিকড় নামছে এখন, সিলখানায় পাথরের থামগুলোকে ঘিরে ঘিরে উইয়ের মাটি জমছে, অন্দরের দীঘিতে মানুষপ্রমাণ উঁচু হয়ে কচুরির দল হাওয়ায় হাওয়ায় মাথা নাড়ছে।

তবু কুমার বিশ্বনাথ সত্যিকারের জমিদার। এখনও বহু ব্রাহ্মণ-পরিবার তাঁদের দেওয়া ব্রহ্মত্র ভোগ করে। জগদ্ধাত্রী পুজোয় কলকাতার সেরা যাত্রার দল, সেরা খ্যামটা, কোনো কোনো বার থিয়েটারেরও আমদানী হয় পর্য্যন্ত। যে জমিদারী নিশ্চিত ভাবে ডুবতেই চলেছে, তাকে বাঁচাবার কোনো ব্যর্থ চেষ্টাই কুমার বিশ্বনাথ করেন না। নিভতেই যদি হয়, তা হ'লে বুক-জ্বলা প্রদীপের মতো একবার অতি প্রখর আলো ছড়িয়েই সেটা নিভে যাক।

দেড়শো বছর। কেবলমাত্র এক যুগ নয়, একটা মন্বন্তর। রায়বর্ম্মারা যখন দিনের পর দিন এক রকম আত্মহত্যার মতোই নিজেদের সর্ব্বস্ব পুড়িয়ে ছাই ক'রে চলেছে, তখন পারিপার্শ্বিক পৃথিবীটাও নিষ্ক্রিয় আর নিশ্চল হ'য়ে বসে নেই।

দেড়শো বছর আগে কাঞ্চন নদীর পারে যেখানে যাযাবর পশ্চিমার দল এসে বিশ্রামের জন্যে ডেরা বসিয়েছিল, সে জায়গাটাকে দেখলে এখন আর চিনতে পারা যাবে না। এখন সেখানে প্রকাণ্ড বন্দর। পুরোণো দীঘিতে যেখানে থরে থরে রক্তপদ্ম ফুটত, সেখানে হরিশরণ লালার প্রকাণ্ড ধানের গোলা। শুধু কি একটা? নদীর ধার দিয়ে প্রায় পনেরো বিশটা গোলার মালিক হরিশরণ লালা। অত বড় ব্যবসায়ী এ জেলায় খুব বেশি নেই।

নবীপুরের বন্দর।

উত্তর-বাংলার শস্যভাণ্ডার এই জেলা। বসতি বিরল, মাঠের পর মাঠ জুড়ে এখানে সবুজ ধানের ঢেউ খেলে যায়,

হেমন্তের সোণালি রৌদ্রে হাজার বিঘার মাঠগুলো সোণার জোয়ারে ভরে ওঠে। বাংলার নানা অঞ্চল থেকে ব্যবসায়ীদের ছোটবড় নৌকা ধান কিনবার জন্যে নবীপুর বন্দরের ঘাটে নোঙর ফেলে বসে থাকে। এইটুকু তো নদী, অথচ ধানের সময় দুই কূল দিয়ে প্রায় একমাইল পর্য্যন্ত নৌকার মাস্তুল উদ্যত হয়ে থাকে আকাশের দিকে। এই মরা নদী দিয়ে হাজার হাজার মণ ধান নেমে যায় দিগ্‌দেশের বুভুক্ষা মেটাবার জন্যে। বর্ষার সময় যখন ডুবেব মাঠগুলো সব তলিয়ে গিয়ে সিংহাবাদ রোহণপুর পর্য্যন্ত একটা আদি-অন্তহীন বিলের সৃষ্টি করে, তখন সোজাসুজি পাড়ি জমিয়ে সুদূর ভাগলপুর থেকে হাজারমণী নৌকাগুলো অবধি ভিড়ে যায় এখানকার ঘাটে।

এই বিখ্যাত বন্দরের কেন্দ্রস্থলে বসে আছেন লালা হরিশরণ।

লালা হরিশরণ পশ্চিমা কায়স্থ। আদি নিবাস ছিল আরায়, এখনো সেখানে সম্পর্কিত জ্ঞাতি ও স্বজনেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে লাঙল ঠেলে ; পাটনার আদালতে কেউ সামান্য একটু চাকরী করে, আবার কেউ বা ছোট এতটুকু তালুক নিয়েই রাজচক্রবর্ত্তী সেজে বসে আছে।

তাদের কারো সঙ্গেই আজ আর লালা হরিশরণের তুলনা হয় না। কেবল ব্যবসার দিক থেকে ধরলে তাঁর ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় না কিছুই। হাঁসমারীর খাঁড়িটা পার হয়ে একবার তাকিয়ে দেখ সামনে,—ওই যে বিশাল ধানের জমিটা দূর চক্রবালে কালো কালো গাছগুলি পর্য্যন্ত একেবারে ধূ ধূ করছে, ওর সমস্তটাই লালা হরিশরণের সম্পত্তি। সমস্তটাই। এতবড় মাঠখানার ভেতরে একদাগ জমির ওপরেও কেউ দাবী জানাতে পারে না।

কেবল এখানেই ? আশে-পাশে, পূবে-পশ্চিমে, উত্তরে দক্ষিণে—কোথায় নেই লালাজীর জমি ? আট দশটা খামার থেকে গাড়ী গাড়ী ধান বোঝাই হয়ে এসে গোলায় জড়ো হয়—তারপর নৌকার খোল ভর্ত্তি করে কোথা থেকে কোথায় যে চলে যায়, কে তার অত হিসাব রাখে ? মোটের ওপর, যেদিক থেকেই বলো, অফুরন্ত টাকা আসছে লালাজীর। আর আসছে বললেই যথেষ্ট হ'ল না, ঠিক বন্যার মতো ধারায় আসছে। লোহার সিন্দুক থেকে উপছে ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক থেকে আট দশটা ব্যবসার মধ্যে টাকাগুলি নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত ধারায় ছড়িয়ে পড়ছে। লালা হরিশরণের নাম শুনলে জেলার ইংরেজ-ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত তটস্থ হয়ে ওঠেন। কলকাতায় বিবেকানন্দ রোডে তাঁর বিশাল প্রাসাদের দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন বাংলার গভর্ণর স্বয়ং।

কোথা থেকে কী হয়ে গেল। যেন যাদুমন্ত্র। যে যাযাবরের দল সেদিন কাঞ্চন নদীর বালুতটে বসে ছাতু ভিজিয়ে খেয়েছিল, তাদেরই একটা খণ্ডাংশ অনিশ্চিত ভাবে ডেরা বাঁধতে চাইল এখানে। কিন্তু কেবল ডেরা বাঁধলেই তো চলে না, জীবিকারও একটা ব্যবস্থা থাকা চাই। রাঘবেন্দ্র রায়বর্ম্মার অনুমতি নিয়ে তারা ছোট ছোট চালা বাঁধল। তারপর কেউ আরম্ভ করল ভুট্টার চাষ, কেউ হলুদের ব্যবসা, আবার কেউ বা ধানের জমিতে 'জন' খাটতে লেগে গেল।

হরিশরণ লালার পূর্ব্বপুরুষ রামসুন্দর লালা। জমিদার-বাড়ীতে তার চাকরী জুটল — ঘোড়াকে 'চাল' শেখাতে হবে। আরো অনেক আনুষঙ্গিকের সঙ্গে রাঘবেন্দ্র ঘোড়া সম্পর্কেও দুর্দ্দান্ত নেশা পোষণ করতেন।

অলক্ষ্য যে চাকাটা চিরকাল ধরে অসংখ্য ভাঙ্গাচুরোর মধ্য দিয়ে ঘুরে চলেছে অব্যাহত ভাবে, রামসুন্দরের পক্ষে অস্বাভাবিক দ্রুত হয়ে উঠল তার আবর্ত্তটা। কিছুদিন পরেই রামসুন্দর জমিদারবাড়ীর চাকরী ছেড়ে দিয়ে সুরু করল কাটা কাপড়ের ব্যবসা। ছোট একটা টাট্টু ঘোড়ার পিঠে কাপড়ের একটা গাঁটরি চাপিয়ে সে এ-হাট ও হাট ঘুরে বেড়াত। আস্তে আস্তে তার কাটা-কাপড়ের গাঁটরি গদীতে রূপান্তর লাভ করল এবং আরো কিছু দিনের মধ্যে কাপড়ের ব্যবসায়ে রামসুন্দর এ তল্লাটে একচ্ছত্র হয়ে উঠল।

সময় গড়িয়ে চলল স্রোতের মতো, আর তার তীরে শ্যাওলার মতো জমতে জমতে ক্রমে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল নবীপুর বন্দর। রামসুন্দরের আত্মা মর্ত্ত্যে ফিরে এলে সেই কি এই বন্দরকে চিনতে পারে এখন ? সিংহাবাদের হিজল বনটা এখনও দিগন্ত-বিস্তৃত 'ডুবা' বা ঢালু জমির মাঝখানে টিকে আছে বটে, কিন্তু তার সে পূর্ব্ব গৌরব আর অবশিষ্ট নেই এতটুকুও। সাঁওতালদের তীর আর শিকারীদের বন্দুকের ভয়ে ডোরাকাটা বাঘগুলি হয় তো বা সন্ন্যাস নিয়েই উত্তরে হিমালয়ের গুহায় সাধনা করতে চলে গেছে ; মানুষের তাড়ায় সন্ত্রস্ত হরিণ আর নাল গাইয়ের দল দ্রুত ক্ষুরের শব্দ বাজিয়ে কোথায় যে অদৃশ্য হয়েছে কে বলতে পারে। কাঞ্চন নদীর নীল জলে কালো কালো মেঘের মতো যে সব কুমীর পুত্র-কলত্র নিয়ে নির্ভয়ে ভেসে বেড়াত, এখন তাদের দুই একটি বংশধর পুরোপুরি মৎস্যাশী হয়ে এবং খালে বিলে লুকিয়ে কোনক্রমে আত্মরক্ষা করছে। এই তো—বেশী নয়—মাত্র পঁচিশ বছর আগেই এ তল্লাটে এসেছিল "কুমীর মারার" দল। বাড়ী তাদের গোরখপুর জেলায় এবং সবচেয়ে প্রিয় তাদের কুমীরের মাংস। নানা রকমের তুক-মন্ত্র জানত তারা ; মন্ত্র পড়ে স্রোতের জলে জবা-ফুল ভাসিয়ে দিত, ফুলটা চলতে চলতে হঠাৎ যেখানে গিয়ে থেমে দাঁড়াত, বোঝা যেত সেখানে কুমীর আছে। অমনি

কুমীর মারারা ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ত জলে; আর সব চাইতে আশ্চর্য্যের ব্যাপার, একেবারে খালি হাতেই নাকি তারা জলজ্যান্ত ভয়ঙ্কর কুমীরটাকে নির্ঘাত তুলে আনত। সেই তারা এসেই এদিককার কুমীরগুলোকে একেবারে নির্ব্বংশ করেছে বলা চলে।

আর সাপ! তা দু' চারটে সিংহাবাদের হিজল বনে এখনো আছে বটে। কিন্তু তাই বলে শঙ্খচূড়েরা কোথায়? হিজল বনের অন্ধকারে তাদের মাথায় না কি মণি জলত, সেই মণি সহ তারা আসামের পাহাড়ে তিরোহিত হয়েছে। তবে কালো কালো গোক্ষুর সাপের এখনো অভাব নেই, বকের ছানা খাওয়ার আশায় এখনো তারা হিজল বনের মাথায় উঠে যায়, কিন্তু ময়ূরের ভয়ে আর তাদের তটস্থ বোধ করতে হয় না। বিস্মৃতিমগ্ন উজ্জয়িনীর ভবন-শিখরেই কেকীর নৃত্য চলছে হয় তো।

এ সবই নবীপুর বন্দরের কল্যাণে। বর্ষায় ভরা ডুবার ভেতর দিয়ে মাল বোঝাই নৌকা চলে যায় রোহনপুর ইষ্টিশানে, কার্ত্তিক মাসে জল নেমে গেলে আবার গোটা শুকনোর সময় অসমতল 'লিক' পথ ধরে অসংখ্য গরুর গাড়ী বুলবুলির পথে যাত্রা করে। ডুবার যে সব উঁচু জায়গা-গুলোতে জল উঠতে পারে না, সেই সব পরিত্যক্ত টিলার ওপর ক্রমে ছোট ছোট গ্রাম গড়ে উঠছে। এই সব নতুন বসতির বাসিন্দা প্রায়ই 'দিয়াড়িয়া' বা মুর্শিদাবাদের একদল ঘরছাড়া মুসলমান—হিন্দুস্থানী গোয়ালা সংপ্রদায়েরও অভাব নেই। ডুবার মধ্যে পাশাপাশি অনেকগুলো ছোট বড় চালা তুলে এই গোয়ালারা বাস করে, মহিষ চরায়, দুধ, দই, ক্ষীর নিয়ে বিক্রী করে নবীপুরের বাজারে। আশে-পাশে সাঁওতাল, তুরী, ওঁরাওঁ, ভুঁইমালী প্রভৃতির ব্রাত্য সম্প্রদায়ের ছোট বড় কতগুলো গ্রাম ছড়িয়ে আছে ছন্দো-হীনভাবে।

মোটের ওপর নবীপুর বন্দর যে কেবল বাইরের প্রকৃতিরই রঙ বদলে দিয়েছে, তাই নয়, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সব জায়গায় নতুনের ছায়া পড়েছে। এদিকে নবীপুর বন্দরে থানা বসেছে, সরকারী ডাক্তারখানা বসেছে, বসেছে তারশুদ্ধ ডাক-ঘর। চারদিকের ছোট ছোট গ্রামে যারা বাস করে, তারা তো এটাকে সহর বলেই জানে। অবশ্য মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে যাদের দু' একবার ইংরেজবাজার কিংবা দিনাজপুর থেকে ঘুরে আসতে হয়েছে, তাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু বেশির ভাগ লোকই নবীপুরকে অদৃশ্য কল্পলোক কলকাতার সমতুল্য বলে ভাবতে ভালোবাসে।

সময় সত্যি বয়ে চলেছে স্রোতের মতোই। তাই তার এ কূল ভাঙে তো ও কূলে বড় বড় চড়া দেখা দেয়। ঠিক এমনিই হয়েছে নবীপুর আর কুমারদহের অবস্থা। মাত্র দু তিন মাইল ব্যবধানে এত বড় দুটো গ্রাম, শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতারও অন্ত নেই। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা! পঁচিশ বছর আগেই কি একথা কেউ ভাবতে পারত! নবীপুর অবশ্য বেড়ে চলছিল, কিন্তু কুমার বিশ্বনাথের বাবা কুমার চন্দ্রনাথের পায়ের কাছে হাত জোড় করে সারাক্ষণ বসে থাকত হরিশরণের খুড়া বিষ্ণুশরণ লালা। ওরা যখন মসনদ গদাতে বসে হলদে খাতায় দেবনাগরী হরফে হিসাব কষত, তখন এদের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে ভারতের সেরা বাঈজীর পায়ে ঝুনঝুন করে ঘুঙুর বাজত। দেবাকোট-রাজবংশের রক্ত এদের শরীরে, কুমারদহ এদের রাজধানী। তার সঙ্গে কি তুলনা চলে যাযাবর পশ্চিমাদের এই গ্রাম, এই নবীপুরের?

কিন্তু দিন বদলেছে, কালের হাওয়াও বদলেছে তার সঙ্গে সঙ্গে। তাই কুমারদহ যে পরিমাণে জনশূন্য হয়ে আসছে, সেই পরিমাণেই ভরাট হয়ে উঠছে নবীপুরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। সহরের মতো কাঠা-দরে সেখানে জমি বিক্রি হয়, অথচ কুমারদহে যে সব পোড়ো ভিটে দাঁড়িয়ে আছে, বিনা পয়সায় দিতে চাইলেও সেগুলি কেউ নিতে রাজী হবে কি না সন্দেহ।

এই তো যুগ। একালের শীর্ষশিখরে বণিক বসে আছে অধিকারের রত্নমুকুট পরে, নরপতির চক্রহীন রত্নরথ কোথায় পথের মাঝখানে কোন্ পঙ্ককুণ্ডে যে আবদ্ধ হয়ে রইল, তার সন্ধান কোনো ঐতিহাসিকই বুঝি দিতে পারে না। শ্রেষ্ঠীর লোভ-লোলুপ বাহুতে রাজদণ্ড তুলে দিয়ে সম্রাট্ চলে গেল প্রব্রজ্যা নিয়ে, তার পদধ্বনি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে বিস্মৃতির পরপারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

কথারম্ভ

এক

কুমারদহ আর নবীপুরের মাঝখানে শোভাগঞ্জের হাট।

তিথিটা শ্রাবণ-সংক্রান্তি। হাটের ঠিক মাঝখানে ঝাঁকড়া বটগাছ, বারোয়ারী তলা। তার নীচে সিমেণ্টের বেদী, আর সেই বেদীতে দেবী বিষহরী অধিষ্ঠিতা।

অবশ্য দেবী বিষহরী সশরীরে বসে নেই, আছে তাঁর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি। রাজবংশী মেয়েদের মতো ছাঁচে ঢালাই নির্ব্বোধ মুখ, গায়ে যাত্রার দলের সখী আর সেনাপতির মিশ্রিত পোষাক। শোলার সাপগুলো হাওয়ায় হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। দেবীর পায়ের একপাশে একটি রাজহাঁস বসে আছে ধ্যানস্থ হয়ে, আর একপাশে কালো রঙের প্রকাণ্ড একটা সাপ ফণা তুলে রয়েছে। সাপের মুখে ব্যাং জাতীয় কী একটা পদার্থ দেখা যাচ্ছে, তবে সেটা চিংড়ি মাছ হওয়াও আশ্চর্য্য নয়।

এটা গ্রামের বারোয়ারীতলা। শ্রাবণী-সংক্রান্তি উপলক্ষে এ অঞ্চলের রাজবংশীরা খুব ঘটা করেই বিষহরী পূজোর আয়োজন করেছে। অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত একটা বিরাট জনতার সামনে চলছিল আল্‌কাপের গান।

উত্তর-বাংলার পল্লীজীবনের একেবারে প্রত্যন্ত প্রদেশে বাঙালির নিজস্ব এই সব আদিম আনন্দ কোনোক্রমে টিকে রয়েছে এখনো। কাপ অর্থে রঙ্গ-ব্যঙ্গ। খানিকটা অভিনয় এবং প্রচুর গানের মধ্য দিয়ে খানিকটা অমার্জ্জিত হাস্যরস সৃষ্টি করাই আল্‌কাপের উদ্দেশ্য। প্রয়োজন হলে ব্যক্তিগত আক্রমণও যে কিছু কিছু না করা হয় এমন নয়। দরকার হলে অনায়াসে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে পর্য্যন্ত ব্যঙ্গ করতে এরা ভয় পায় না, তবে এই সমস্ত মশক সম্বন্ধে ব্রিটীশ সিংহ কখনই খুব বেশী সচেতন নয়।

দাড়ি-গোঁফ-কামানো ভূষণ মুচি মুখে খানিকটা রঙ মেখে সেজেছিল নায়িকা। তবে কেবল নায়িকা নয়, নায়িকার শাশুড়ী এবং কাহিনী-বর্ণিত কোনো বিদগ্ধা নাপিত-বধূর ভূমিকাতেও সে একাই অভিনয় করছিল। 'মেক-আপ'টা দেখবার মতো। কোথা থেকে পুরাণো একখানা চেলি সংগ্রহ করে এনেছে, কোনো বিয়ে বাড়ীতে ঢাক বাজাতে গিয়ে বখশিস মিলেছে সম্ভবতঃ। কাপড়টার রঙ জ্বলে গেছে, সর্ব্বত্র হলুদের ছোপ লাগা, ঝোলের দাগ হওয়াও বিচিত্র নয়। পাটের তৈরী খোঁপাটার আয়তন দেখে কেশবতী রাজকন্যারও ঈর্ষ্যা জাগতে পারে। নাকের মধ্য দিয়ে প্রকাণ্ড একটা নথ চালিয়ে দিয়েছে, গোরুর গাড়ীর চাকার মতোই সেটা মুখের ওপর ঝুলছিল। তিনটি বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করবার মতোই সর্ব্বজনীন 'মেক-আপ'।

পনেরো টাকায় কেনা হারমোনিয়মের ছেঁড়া বেলো দিয়ে ভস্ ভস্ করে হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। তবু একজন সেটাকে টেপাটেপি করে প্যাঁ-পোঁ শব্দে একজাতীয় সুরের সৃষ্টি করছিল। একজন মাথা দুলিয়ে যে রকম প্রচণ্ড উৎসাহে তবলা ডুগি ঠুকছিল, তা দেখে সন্দেহ হয় ও দুটোকে যে-করে-হোক্ ফাটাবে, এই তার স্থির প্রতিজ্ঞা। করতাল ও ঘুঙুরের বেতালা ঝম্‌ঝমানিতে কানের পর্দ্দা ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম।

কিন্তু ভূষণ মুচি হারবার পাত্র নয়। যন্ত্রের এই বেসুর কোলাহলকে ছাপিয়ে উঠবার মতো বিধিদত্ত কণ্ঠস্বর নিয়ে সে অবতীর্ণ হয়েছে আসরে। চেলির আঁচলটা যাত্রার সখীদের ভঙ্গিতে ধরে সে আসরের চারদিকে বার কয়েক ক্যাঙারুর মত লাফিয়ে এল, অর্থাৎ নৃত্যকলা প্রদর্শন করলে। তারপর উদারা-মুদারার পরোয়া না রেখে সোজা তারাতেই সুরু করে দিলে;

"পতি হে, দুঃখের কথা কী কহিতে পারি,
পরবাসে গেইলা তুমি ঘরেতে রহিনু হামি
কৈইদা মরি বিয়োহিনী নারী—
খাদেতে হয়াছি শীর্ণ
আহার নাই পান্তা ভিন্ন
মদনের তুষানলে বুঝি জ্বল্যা মরি—"

বেশভূষা দেখে সে যে নারী সেটা স্বীকার করতেই হয় এবং বিরহিণী হওয়াও তার পক্ষে এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু সে যে খেদে শীর্ণ হয়েছে এবং পান্তা ভিন্ন তার আর কোনো আহার নেই, চেহারা দেখে সে কথা মনে হওয়ার জো নেই কিছুতেই।

নায়ক সেজে রঙ্গমঞ্চে হাবু মুচি আবির্ভূত হল। পায়ে এক জোড়া বিবর্ণ ক্যাম্বিশের জুতা, কাপড়ের কালো পাড় দিয়ে তার ফিতে বাঁধা। কাপড়টা পরেছে মালকোঁচা এঁটে। গায়ে হাতকাটা সাদা ফতুয়া, কাঁধে একখানা গামছা। চোখে ছ' আনা মূল্যের এক জোড়া 'সান গগলস' নায়কের আধুনিকত্ব সম্পাদন করেছে।

এল অশ্বারোহণে। বীরের পক্ষে অশ্বারোহণটাই প্রশস্ত, অন্ততঃ এখন পর্য্যন্ত মোটর-গাড়ীর কল্পনাটা ওদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করেনি। তাই বলে সত্যিই কিছু ঘোড়া নয়। ছোট ছোট ছেলে-পেলেরা যেমন লাঠি নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে, তেমনি একটা লাঠিতে দড়ির লাগাম ঝুলিয়ে নিজেই লাফাতে লাফাতে এসে দর্শন দিলে।

তাকে দেখে নায়িকা আর একবার রঙ্গমঞ্চের চারদিকে ক্যাঙারু-নৃত্যে ঘাঘরা ঘুরিয়ে এল। ঘোড়াটাকে একটা চেয়ারের পায়ার সঙ্গে বেঁধে নায়ক গান ধরলেঃ গান তো নয়, নিজের প্রবাস-বর্ণনা আর বিরহ-বেদনার সুদীর্ঘ ফিরিস্তি। তার ভেতর না আছে এমন ব্যাপারই নেই। মোটামুটি ভাবার্থ এইঃ "ওগো প্রিয়া, তুমি তো ঘরে বসিয়া দিব্যি ইনাইয়া বিনাইয়া গান গাহিতেছ। পান্তাই খাও আর যাই খাও ফুলিতেছ নেহাৎ মন্দ নয়। কিন্তু আমার অবস্থা তো আর জানো না। একে তো বিরহ-আগুনে দিবারাত্রি শাল কাঠের মতো ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছি, খাইতে স্বোয়াস্তি নাই, শুইতে স্বোয়াস্তি নাই, তার উপরে আবার জমিদারের অত্যাচার। এমন হারামজাদা জমিদার ভূ-ভারতে মিলিবে না। ধরিয়া ধরিয়া জোর করিয়া বেগার খাটায়, জমি হইতে জোর করিয়া ধান কাটিয়া লয়—জমিদারের গ্রাসে যথা-সর্ব্বস্ব গেল। সেদিন আবার লইয়া গিয়া বিশ ঘা জুতা মারিয়াছে। পিঠের জ্বালায় তিন রাত ঘুমাইতে পারি নাই, এখানে আসিয়া তোমার বিরহ-যন্ত্রণা নির্ব্বাপিত করিব কি প্রকারে।"

শুনে স্ত্রী খেদোক্তি করলে খানিকটা। অত্যন্ত সযত্নে স্বামীর পিঠটা দু' একবার ডলে দিলে, ক্যাঙারুর ভঙ্গিতে আসরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে নেচে এল একবার। তবে নৃত্যটা এবারে দুঃখ না আনন্দের অভিব্যক্তি—সেটা ঠিক বোঝা গেল না।

দর্শকদের হাততালি বেজে উঠল। বাহবা, বাহবা, সাবাস। গান থেমে গেছে কিন্তু তবলচীর উৎসাহে ভাটা পড়ে নি তখনো। অথবা ভাবে সে এতটাই বিভোর হয়ে পড়েছে যে, বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে তার। দু'হাতে দুম দুম করে সে তবলা ঠুকে চলেছে।

কিন্তু দর্শকেরা এসেছে তামাসা দেখতেই। যে সব সমস্যার বাস্তবরূপ প্রতিদিন তাদের জীবনকে দুর্ব্বহ করে তোলে, সে সব সমস্যা যে আল্‌কাপের আসরেও তাদের তাড়া করে আসবে—এ তারা চায় না। পাঁচ সাত জন চীৎকার করে বল্‌লে, "কাপ চাই কাপ, তামাসা।"

নায়ক-নায়িকা ঝুঁকে পড়ে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাল দর্শকদের। হারমোনিয়াম আর তবলার সুর ফিরল, প্রবল কণ্ঠে দ্বৈত-সঙ্গীত জুড়ে দিলে তারা। কিন্তু দ্বৈত-সঙ্গীতটাও মাত্র দু' এক মিনিটের জন্যেই। হারমোনিয়াম, তবলা ও করতালওয়ালারাও নিজেদের কণ্ঠ-কাকলির পরিচয় দেবার এই সুবর্ণসুযোগটির জন্যেই মুখিয়ে ছিল বোধ করি, মুহূর্ত্তে সকলের সমবেত চীৎকারে বারোয়ারীতলা মুখর হয়ে উঠল। বেদীর ওপর শিউরে উঠলেন দেবী বিষহরী।

গানটা আধুনিক কালকে ব্যঙ্গ করে :

"মাথাতে লম্বা টেরী
হাতেতে বান্ধা ঘড়ি,
বুকেতে ফণ্ট্যানপ্যান
আই এম এ জ্যাণ্টেল ম্যান—"

এবং তারপরে

"মিঠাই মোণ্ডা ঘরের ইস্ত্রী পরাণ ভরে খেতে পান,
বাপে মায়ে চাইলে পরেই পয়সার বড় টা—ন্—"

কটাকট করে প্রবলভাবে চারদিকে 'ক্লাপ' পড়ে গেল। এই—এতক্ষণে জমেছে। এ নইলে আবার 'কাপ'। সহরের আলোক-প্রাপ্ত একজন ছিল, সে বল্‌লে, অ্যান্‌কোর, অ্যান্‌কোর।

একপাশে একখানা চেয়ারে লালাজী বসেছিলেন। সমস্ত জেলায় লালাজীর নাম, কলকাতার ব্যবসায়ী মহলে অসাধারণ খাতির। কিন্তু দেশে এলে তিনি ইতর-ভদ্রের সঙ্গে মিশে যান সমানভাবে। এই কারণে দেশের লোক শ্রদ্ধা করে তাঁকে, বিশ্বাস করে অনেক বেশি। যে লোকটা তাঁর ঋণের জালে পড়ে ফাঁসে আঁটা প্রাণীর মতো মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছে, তাঁর হাসিমুখ দেখে সেও তাঁকে একান্ত সুহৃদ্ বলেই মনে করে। আর কেনই বা করবে না? দিনের পর দিন চক্রবৃদ্ধির করাল চক্রে তিনি যাদের ভিটে মাটি উচ্ছেদ করছেন, তাদের গ্রামেই নিজের ব্যয়ে বসাচ্ছেন ইঁদারা। মহরম থেকে শুরু করে ছট পরব পর্য্যন্ত, তাঁর কাছে হাত পাতলেই অক্লেশে পাঁচ দশ টাকা তুলে দেন তিনি।

গানটা লালাজী উপভোগ করছিলেন। বাঙালী নন বটে, কিন্তু বাংলা দেশকে গ্রহণ করেছেন মাতৃভূমি হিসাবে। উত্তর-বাংলার এই সব নগণ্যতম গ্রাম, চাষাভূষার দৈনন্দিন জীবন, তাদের চিন্তাভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তিনি আশৈশব পরিচিত। তাঁদের পরিবারের মধ্যে হিন্দী ভাষাটা এখনো চলে বটে, কিন্তু সে ভাষায় আধাআধি পরিমাণ প্রাদেশিক বাঙলার খাদ মিশেছে। তাঁর ছেলেরা কলকাতায় পড়ে, বাঙালীর মতো করে চুল ছাটে, কাপড় পরে; লালাজী আশঙ্কা করেন দশ বছর পরে তারা একেবারে বাঙালী হয়ে যাবে। অবশ্য সে জন্য তিনি খুব চিন্তিত নন। পশ্চিমে তাঁর কিই বা আছে। আরা জেলার কোন্ গ্রামে তাঁর আদি নিবাস সেটা তিনি নিজেও মনে করতে পারেন না সব সময়ে।

গান শুনে লালাজী বললেন, সাবাস্! বেড়ে গান। কোথাকার দল তোমরা?

তবলচী তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণে ভাল করে দেখা গেল লোকটাকে। বোঝা গেল সেই এদের দলপতি, চলতি কথায় ম্যানেজার। গায়ে ফুলকাটা পাতলা বিলাতী ছিটের পাঞ্জাবী, তার স্বচ্ছ আবরণের তলায় গোলাপী গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে, একটা গলায় এক গাছা সূতার সঙ্গে তিন চারিটি মেডেল ঝুলছে, টিনের অথবা রূপোর বোঝবার জো নেই। পাঞ্জাবীর পকেট থেকে নগ্ন পরীর মূর্ত্তি আঁকা একখানা ছাপা রুমাল মাথা তুলেছে।

তবলচী সামনে ঝুঁকে অসীম সম্ভ্রমভরে অভিবাদন জানাল। বললে, আমরা হুজুর আইহোর দল।

—আইহো? মুচিয়া?

তবলচী আপ্যায়িত হয়ে ঘাড় নাড়ল।

—কত টাকায় বায়না নিয়েছ এখানে?

—মোটে সাত টাকা হুজুর।—ম্যানেজারের স্বরে নৈরাশ্য: আলকাপ-কবির সে সব দিন আর নেই। শহরে বায়স্কোপ, থিয়েটার। এই বিষহরী-পূজোর সময়টা কিছু কাজ থাকে, তা ছাড়া সারা বছরে তো কোনো কারবার নেই আর।

—সাত টাকা!—লালাজী সহানুভূতির স্বরে বললেন, তা হলে ভাগে তোমাদের কী থাকে?

—কিচ্ছু না হুজুর, কিচ্ছু না।—ম্যানেজার উৎসাহিত হয়ে উঠল : এখন দল টিকিয়ে রাখাই কঠিন। এই মালদা জেলায় যে দু' চারটে দল আছে, দু' এক বছরের মধ্যেই সব উঠে যাবে। আর আগে—আগে হুজুর, বড় বড় সায়েবরা অবাধ আল্‌কাপের গান শুনতে আসতেন।

লালাজী পকেট থেকে সোনার সিগারেট-কেস বের করলেন একটা। সেটা খুলে তিনি ম্যানেজারের দিকে বাড়িয়ে দিলেন, নেবে না কি?

ম্যানেজার জিভ কেটে পিছিয়ে গেল তিন হাত। এত

বড় একটা ঘটনা সে বিশ্বাস করতে পারছে না। লালা হরিশরণ, সারা দেশ জুড়ে যাঁর নাম, যাঁর গোলায় হাজার হাজার মণ ধান মজুত থাকে, স্বয়ং লাট সাহেবের সঙ্গে যার 'খানাপিনা' তাঁর হাত থেকে সিগারেট নেবে সে, আইহোর নগণ্য দোকানদার ব্রজহরি পাল!

লালাজী হাসলেন, নাও।

—আজ্ঞে, এঁ-এঁ—

—লজ্জা কিসের? তুলে নাও না।

কাঁপা হাতে ব্রজহরি একটা সিগারেট টেনে নিলে, অনেকটা যেন স্পর্শ দোষ বাঁচিয়েই। জ্বলন্ত মোমের মতো আবেগে গলে গিয়ে শুধু বললে, এঁ-এঁ-এঁ—

চার-পাশের জনতা দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে। তা'রা আরো কিছু অঘটনের প্রত্যাশা করছে। লালাজীর বাক্স থেকে বার্ডসাই তুলে নিয়েছে লোকটা, আকাশ থেকে স্বর্গীয় পুষ্পকরথ নেমে এসে তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেলেও এতটা বিস্মিত হ'ত না কেউ। নির্ঘাত শেয়াল বাঁয়ে রেখে সে বেরিয়েছিল, নইলে লালাজীর এমন অনুগ্রহ! একটা তীক্ষ্ণ ঈর্ষ্যাবোধ পাঁজরের মধ্যে খোঁচা মারছিল তাদের। দলের অন্যান্য সবাই, বিশেষ করে ভুষণ মুচি রীতিমত মানসিক বিক্ষোভ বোধ করছিল। ঝাড়া তিন ঘণ্টা নাচে-গানে সে আসর মাৎ ক'রে দিলে, আর বাহাদুরি যা কিছু সব জুটল ম্যানেজারের ভাগ্যে!

লালাজী একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, তারপর, আর কোথাও বায়না আছে নাকি তোমাদের? যেমন করে গাঁজার কলকেতে টান দেয়, তেমনি ক'রে দু' হাতের মধ্যে সিগারেটটা নিয়ে ম্যানেজার ব্রজহরি একটা টান মারলে আর সেই টানে সিগারেটটা পুড়ে এল প্রায় অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত। ওটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। ধোঁয়াটা গিলে সে খানিকক্ষণ বুঁদ হ'য়ে ছিল, অমন দামী সিগারেটের আস্বাদ-টাকে সে অত সহজেই মুখ থেকে ছেড়ে দিতে চায় না। গদ্‌গদ স্বরে বললে, আজ্ঞে, আছে বই কি—কুমারদ'য়। তিন-রাত গাইতে হবে।

—কুমারদ'য়?—লালাজী ভ্রূ দুটোকে সঙ্কুচিত করলেন একবার: কত করে দেবে সেখানে?

—দশ টাকা।

আর সাত টাকা এখানে?

ম্যানেজার হাওয়াটা অনুমান করেছিল আগেই, সুযোগ বুঝে এবার আত্ম-প্রকাশ করলে। বললে, এঁ-এ হুজুর নিজেই বুঝে দেখুন না। আপনি থাকতে—গাঁয়েরও অপযশ হয়ে যায় একটা।

—অপযশ হয় বই কি!—লালাজী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার আসর আর একবার জনতার দিকে তাকালেন। মাথার মধ্যে মতলব খেলছে একটা। কিছুদিন থেকেই দেবীকোট রাজবংশের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার বাসনা বোধ করছেন তিনি।

—সাত রাত গান গাইতে হবে এখানে। এই বারোয়ারী-তলায়। পনরো টাকা করে পাবে, রাজী আছ?

—পনরো টাকা!—শুধু ব্রজহরি নয়, দলশুদ্ধ সকলে একসঙ্গে প্রতিধ্বনি করে উঠল। সাত রাত পনরো টাকা হিসাবে, উঃ, সে যে অনেক টাকা। তার পরিমাণ ভাবলেও যে কূল-কিনারা পাওয়া যায় না।

ম্যানেজারের চোখ চক চক করতে লাগল: আজ্ঞে হুজুর, রাজী বই কি, নিশ্চয় রাজী। কুমারদ'র বায়নাটা সেরে এসেই—

লালাজীর ঠোঁটের কোণে সিগারেটটা দুলে উঠল একবার। বললেন, না, কুমারদ'র বায়না সেরে নয়, এখানেই আগে গাইতে হবে। কাল থেকে সাত রাত্তির।

ম্যানেজার দমে গেল। অতখানি উৎসাহ তার কণ্ঠস্বরে আর প্রকাশ পেল না। বললে, রাজবাড়ীর গান হুজুর, আগাম বায়না দিয়ে গেছে—

বায়নার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে এস।

ম্যানেজার চুপ করে রইল, সমস্ত দলটাও রইল মাথা নত করে। এমন প্রস্তাব মেনে নেওয়া অসম্ভব। কুমার বিশ্বনাথকে তারা চেনে। রাঘবেন্দ্র রায়বর্ম্মার রক্ত তাঁর শরীরে। এতবড় অপরাধ তিনি সহজে ক্ষমা করবেন না। এবং তাঁর ক্রোধের পরিণাম যে কী সেটাও অনুমান করা অসম্ভব নয় তাদের পক্ষে। আর—আর—বায়নার টাকা ফিরিয়ে দিতে পারে, এতবড় সাহসীই বা কে আছে! কার ঘাড়ে দশ দশটা মাথা! তারা ছা-পোষা সংসারী মানুষ, স্ত্রী-পুত্রকে অনাথ করলে তাদের চলবে না।

দামী সিগারেটের মিঠে ধোঁয়াটা ম্যানেজারের মুখে তেতো আর বিস্বাদ হয়ে গেল। অস্পষ্টস্বরে বললে, না হুজুর, পারব না।

লালাজী সোজা হয়ে উঠে বসলেন: পারবে না? কেন পারবে না?

রাজবাড়ীর বায়না হুজুর। খেলাপ করলে ঘাড়ে মাথা থাকবে না।

ঘাড়ে মাথা থাকবে না? লালাজীর দৃষ্টি ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠল মুহূর্ত্তে। কিন্তু গলার স্বরে কিছু টের পাওয়া গেল না, ব্যবসায়ী জীবনে সংযম জিনিষটাকে আয়ত্ত করেছেন তিনি। বললেন, ইংরেজের রাজত্ব। এ নবাবী আমল নয় যে ইচ্ছে করলেই হাতে মাথা কেটে আনা যায়। আমি বলছি তোমাদের, বায়নার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে এস।

সিগারেট পেয়ে ম্যানেজার যে পরিমাণ স্ফীত হয়ে উঠেছিল, একটা কাঁটার খোঁচায় যেন তার দ্বিগুণ চুপসে গেছে। ক্ষীণস্বরে আবার বললে, মাপ করুন হুজুর, ওখান থেকে ফিরে এসে গাইব। রাজবাড়ী!

রাজবাড়ী! লালাজীর মুখ অপমানে কালো হয়ে গেল। বুকের ভেতর যেন বিষাক্ত সাপে ছোবল মেরেছে একটা। শূন্যগর্ভ একটা নাম, রাজ্যহীন রাজবাড়ীর এত প্রতাপ যে তার আওতায় তিনি শুদ্ধ চাপা পড়ে গেলেন। অথচ কুমারদ'র রাজবংশের আজ যে কী অবশিষ্ট আছে, সে কথা তাঁর চাইতে ভালো ক'রে আর কে জানে। কিস্তিতে কিস্তিতে একখানি করে মহাল লাটে ওঠে, দেনার দায়ে একটু একটু করে যায় বিকিয়ে। বিশ্বনাথের মদ আর রেসের বিল শোধ করতে ওই বাড়ীটাও যে একদিন বিক্রী হয়ে যাবে, সে খবর লালাজী কি রাখেন না? তবু ওই নামটা যেন লোকের মনের ওপর যাদুমন্ত্র বিস্তার করে আছে। রাজার নাম শুনলেই তাদের অভ্যস্ত মাথা ভয়ে সম্ভ্রমে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। অথচ তাঁর পাশে রায়বর্ম্মারা! ইচ্ছা করলে অক্লেশে ওরকম আট দশটা জমিদারকে তিনি কিনতে পারেন, তাতে তাঁর ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের গায়ে আঁচড়ও লাগবে না। রাজবাড়ী! কথাটাকে স্বগতোক্তির মতোই একবার উচ্চারণ করলেন তিনি। ওই রাজবাড়ীকে একবার দেখে নিতে হবে। কুমারদ'র এতদিন যথেষ্ট রাজমর্য্যাদা ভোগ করে এসেছে, রাজ্যহীন রাজার নামমাত্রে কপালে হাত ঠেকিয়েছে বিমূঢ় প্রজার দল। লালাজী সেদিকে দৃক্‌পাত করেন নি কোনো রকম। তখন তাঁর সময় ছিল না। ব্যবসাকে বাড়াতে হবে, বড় করতে হবে, বড়, বড়, আরো বড়। পৃথিবীব্যাপী ঐশ্বর্য্যের যে খরস্রোত বয়ে চলেছে, তার তীরে কেবল দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই চলবে না। কাজেই জীবনের কুড়িটা বছর এদিকে তিনি চোখ তুলে তাকাবার সময় পান নি। কিন্তু আজ আসন্ন বার্দ্ধক্যে কর্ম্মোদ্যম হ্রাস হয়ে এসেছে; ব্যবসার কাজকর্ম্ম দেখা-শোনা করে ছেলেরাই, এখন লালাজী ভালো করে বাইরের দিকে চোখ তুলে চাইবার সময় পেয়েছেন। যশ চাই তাঁর, সম্মান চাই। বিশাল ব্যবসা তাঁকে যে সোনার সিংহাসনে তুলে বসিয়েছে, সেই স্বর্ণাসনকে সমস্ত পৃথিবী এখন প্রণাম করুক।

লালাজী বললেন, কুড়িটাকা করে দেব।

কুড়ি টাকা। ম্যানেজার ঠোঁট চাটল। দলের অন্যান্য সকলের চোখগুলো বিস্ফারিত হয়ে কোটরের বাইরে ঝুলে পড়ার উপক্রম ক'রছে। নীলামের ডাকের মতো দর চড়ছে, কুড়ি টাকা করে আলকাপের বায়না! কিন্তু—কিন্তু—রাজবাড়ীকে অপমান করে—

ম্যানেজার শুকনো ভীত গলায় বললে, আমরা—আমরা ঠিক করে আপনাকে জানাব হুজুর।

তাই জানিয়ো।—লালাজী উঠে দাঁড়ালেন হঠাৎ। তারপর ছেঁড়া কাগজের টুকরোর মতো দশটাকার একখানা নোট মুঠো করে ম্যানেজারের মুখের ওপর ছুঁড়ে মারলেন। বরকন্দাজকে বললেন, চল্‌, শিউপাঁড়ে।

বিস্মিত অভিভূত জনতা কোনো কথা বলতে পারল না। আর রাজবংশীর নির্ব্বোধ মুখ নিয়ে সেনাপতির সাজ-পরা দেবী বিষহরী নিষ্পলক নির্ব্বোধ চোখে তাকিয়েই রইলেন।

ক্রমশঃ

গান

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চাঁদ উঠেছিল রাতে
আমার অলকে রজনীগন্ধা
পরালে আকুল হাতে।
তোমার স্মৃতির মধু সে সুবাস
মনোবনে মোর রচে ফুলবাস,
আলোর কমল তুমি যে আমার
প্রেমারুণ নব প্রাতে।

ফেলে রেখে গেছ স্বপন তোমার,
নিয়ে গেছ হিয়া মোর;
বিদায় লগনে নয়নের লোর
দিয়ে গেছ চিতচোর।
সে আঁখির জল আঁখিতে শুকায়,
ব্যথা-মরু-মৃগ বিজনে লুকায়,
বীণা গায় মোর—তুমি যে আমার
আছ চির আঁখি-পাতে।

স্বাগত নবীন

(চিত্র-রূপিকা)

বাণীকুমার

[ভূমিকা]

এই নাট্যাঙ্কের মর্ম্ম প্রকাশিত হয়েছে মানব-কল্পিত বিজ্ঞানাভাস ও দর্শনের মধ্যে,স্বাভাবিক বিরোধকে আশ্রয় ক'রে। যা' শাশ্বত, যা' চিরন্তন, যা' নিরলঙ্কার নিরহঙ্কার সত্য, যা' ধর্ম্ম, শান্তি ও আনন্দ—তাই ধ্রুব, তা'র বিজয়-রথ ক্ষণেকের জন্য বাধা-বিঘ্নের আঘাতে স্তব্ধ হ'লেও—সেই রুদ্ধগতি হয় মুক্ত অনিবার্য্য নিয়মে। মানুষ আপাত-দৃষ্টিতে যে ভ্রান্ত পূর্ণ অশ্রুবের মনোরম রূপে পরিমুগ্ধ হয়, সত্যকে চূর্ণ ক'রে যে কৃত্রিম বস্তু-তন্ত্রকে সেবা ক'রে মানুষ তা'র কল্পনার মিথ্যা সৃষ্টি নিয়ে মত্ত হ'য়ে ওঠে, সে-ই তা'র চোখের 'পরে বিপুল সংস্কারের আবরণ টেনে দিয়ে তা'র সহজ-দৃষ্টিকে মোহান্ধ ক'রে তোলে। কিন্তু এ প্রকৃতির প্রতিক্রিয়ার মত ক্ষণস্থায়ী। বিশ্বশিল্পী ভুবনেশ্বর মানুষের এ-ভ্রূকুটি সহ্য করেন না। এই সত্যটি গ্রহণ ক'রে একটি তথ্যের অবতারণা করা হয়েছে। এই নাট্যের মধ্যে প্রত্যেক চরিত্র এক একটি ভাবের প্রতীক।-

প্রজ্ঞাসুন্দর—মহা যন্ত্র-বিজ্ঞানবিৎ, আপন-সৃষ্ট বিজ্ঞানের ছায়ায় বা আভাসে অচলায়তন দম্ভ নিয়ে অসীম সত্যকে আবিষ্কার করবার দুরাকাঙ্ক্ষায় প্রমত্ত।...

শাশ্বতনাথ—। দর্শন-শাস্ত্রজ্ঞ—দর্শন সত্য, তা'র আবিষ্কার হয় না,—সত্য সম্পূর্ণ, সত্য চিরন্তন, সত্য অনন্ত—এই ভাবেরই প্রবল প্রচারক।·

মৈত্রী - সরলতা-রূপিণী, প্রেম ও আনন্দের প্রতিমা।...

দীপ্তি—বিজ্ঞানবিদের শক্তি-মুগ্ধা উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী রমণী।...

পূর্ণা— সত্য-রূপ—শান্তি ও কল্যাণ-বাণীর দূতী।...

প্রবীণ ও নরেশ—যন্ত্রের শাসনে আহত-প্রাণ।...

যন্ত্রসিদ্ধি—বৈজ্ঞানিকের কৃত্রিম-উপায়ে বাঞ্ছিত মায়া-মমতাশূন্য যন্ত্রমানব।...

চক্রপাল— অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব যন্ত্রমানব—।

এই নাট্য-ব্যাপারের আশ্রয়স্থল এক বিশাল 'যন্ত্রনগরী'।...

এর মধ্যে একটি দৃশ্যই বর্ত্তমান—পুরোভাগে বৃক্ষ-পল্লব-পত্র-পুষ্প-শোভিত শ্যামল ভূমির অংশ-বিশেষ,—পার্শ্বে ও পশ্চাতে বিরাট যন্ত্র-সৌধের প্রাচীর-লগ্ন বিচিত্র যন্ত্রের রহস্য প্রকট রয়েছে,—উত্তর-ভাগে বিজ্ঞানের বিজয়োদ্ধত একটি সুবিশাল প্রাসাদোপম 'নির্ম্মাণ-কৌশল' যেন আকাশকে ভ্রূকুটি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।...]

*

[নবীনের উদ্দেশে অভিবন্দনা-সঙ্গীত বেজে উঠেছে গতি-রাগে-যতি-ছন্দে।—কিছুক্ষণ পরেই পূর্ণার গীত-ভাষণ]

গান

পূর্ণা।

এসো সুন্দর নবযৌবন
নিরলঙ্কার সাজে!
অন্ত-বিহীন মুক্তির গীতি
বংশীতে তব বাজে।
অরুণ-বর্ণ জ্যোতিঃ-সঞ্চারে—
হানো বাধা-ঘন অন্ধকারে,—
আনো সত্যের পূর্ণ মহিমা
জাগ্রত ধরা-মাঝে॥

[সচকিত-ভাবে নরেশের প্রবেশ]

নরেশ। পূর্ণা—পূর্ণা—তোমার ডাক শুনে আর থাকতে পারলুম না, ছুটে বেরিয়ে পড়েছি!

পূর্ণা। নরেশ! এমন কাজ কেন করো! যে যন্ত্র-দৈত্যের সেবায় তুমি নিজে বাঁধন সেধে নিয়েছ, তা'র শাসন তোমাকে মেনে চলতেই হ'বে। মুক্তির নেশায় তুমি যদি এ-রকম সময়ে অসময়ে চঞ্চল হ'য়ে ওঠো, তা' হ'লে ওদের কাছে কি তুমি ক্ষমা পাবে?

নরেশ। আনন্দের প্রতি টান্ মানুষের সহজ অধিকার, সে-অধিকার থেকে আমাকে ফাঁক দেবে কে?

পূর্ণা। কিন্তু নরেশ এ-যে ওদের কাছে দুর্ব্বলতা! তুমি কিছুতেই ওদের এড়িয়ে যেতে পারবে না। আঘাত পাবে তুমি, সেই আমার ভয়।

নরেশ। আঘাত পেয়েছি অনেক, আরো পাবো, সেই মারের মধ্য দিয়েই ফিরে পাবো চেতনা—যা' আজ যন্ত্রের মোহে হারিয়ে ব'সে আছি।

পূর্ণা। না—না: নরেশ! তোমাদের মত তরুণরা কত পীড়ন ভোগ করো, সে আমি চোখে দেখ্‌তে পারি না। ওদের প্রাণ নেই, ওরা প্রাণের মূল্য বোঝে না। ওরা মানুষকে মনে করে পণ্যদ্রব্য, তাকে নিপুণভাবে চালিত করতে পারলেই ওদের উদ্দেশ্য সফল হয়।

নরেশ। সেইজন্যেই তো আমার অন্তরবাসী মন আজকে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে। আর যন্ত্রের পায়ে আমার সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিতে মন চায় না।

পূর্ণা। এ জন্যে তোমাকে অশেষ দুঃখ সইতে হ'বে, নরেশ! তা' তুমি পারবে?

নরেশ। কেন পারবো না—পূর্ণা! যে মিথ্যার জালে আমি জড়িয়ে গেছি, সে-জাল আমি ছিঁড়বো। আর আমি স্থির থাক্‌তে পারি না। এই বিজ্ঞানের ছায়া-দৈত্য আমার মত অনেককে এমন্ গ্রাস করেছে যে—এই জালের আবরণ ভেদ করা কঠিন ব্যাপার, মন এম্‌নি আড়ষ্ট হ'য়ে গেছে—সে কল্পনা করতেও ভুলেছে। এই পক্ষাঘাতগ্রস্ত মনের 'পরে আর বিশ্বাস নেই। এই বিজ্ঞান-বিভূতির ইন্দ্রজালে মন মুগ্ধবিস্ময়ে শান্ত-শিষ্টের মত ধরা দেয়,—বারংবার জাগে সন্দেহ! প্রশ্ন ওঠে—কা'র শক্তি বেশী, কোন্‌টা সত্য? কিন্তু···কল্যাণদূতী তুমি, তোমার কণ্ঠে যখন বেজে ওঠে কোন্ সে বীরের অভিনন্দন, আমার মন ওঠে দুলে, যেন সত্যের ডাক দূর থেকে ভেসে আসে। তখন সব সঙ্কল্প ভেঙে যায়, মনে হয় যেন আমি এক বিকট মিথ্যার মোহে আত্ম-বিক্রয় ক'রে ব'সে আছি।

তখন আর চুপ ক'রে থাকতে পারি না, ঐ যন্ত্র-কারা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। মন সাজে পলাতক।

পূর্ণা। এই বাস্তব জগতে যা'র সঙ্গে তোমার পরিচয়, তা'কে তুচ্ছ ক'রে আর এক নতুন পরিচয়ের আশায় ছুটে চলা কি সুবুদ্ধির কাজ! এম্‌নি ক'রে সর্ব্বনাশকে ডেকে আনতে হয়?

নরেশ। পূর্ণা, সর্ব্বনাশের কথা মনে থাকে না। হোক্ সর্ব্বনাশ, তবুও জানবো মিথ্যার দাসত্ব আমার টুটেছে।

[তীব্র ঘণ্টা-সঙ্কেত—]

পূর্ণা। ঐ ঘণ্টা বেজে উঠেছে, ঐ ডাক যতই কঠোর হোক্—তোমাকে সাড়া যে দিতেই হ'বে, নরেশ! যাও যন্ত্রাগারে—আর দেরী কোরো না। যেদিন সব ওলট্ পালট্ হ'য়ে যাবে নবীনের খড়্গাঘাতে, সেদিন তাঁর ডাকে সাড়া দেবার জন্যে প্রস্তুত থেকো। আজও সময় হয়নি।

[যন্ত্রের বিচিত্র প্রকাশ ও শব্দের অভিব্যক্তি]

নরেশ। তাহ'লে আমায় আবার ফিরে যেতে হ'বে! সেই ভালো—সেই ভালো। ঐ যন্ত্র-বিজ্ঞানই সত্য, ওর শক্তি অসীম। এর চেয়ে বড় সত্য আজকে কেউ শোনাতে পারে নি।

পূর্ণা। হাঁ: বঞ্চনা আজ বেড়ে উঠচে,—সত্যের সমস্ত পুঁজি যাচ্ছে নষ্ট হ'য়ে। নরেশ, তোমার প্রাণে কতখানি সাহস আছে? তোমার মত তরুণরা ভরসায় বুক বেঁধে তুফানের মাঝখানে পাড়ি দিতে পারবে?—যদি পারো, নতুন অথচ চিরপুরাতন সমুদ্র-তীরের সন্ধান পাবে। নইলে প'ড়ে প'ড়ে মার খেতে হ'বে।...ঐ দেখো যন্ত্র-চালিতের মতো দলে দলে লোক চলেছে—চেয়ে দেখো ওদের যেন প্রাণ নেই। ঐ দেখো—ওরা তোমারই মত যন্ত্র-দানবের বলি।

[অদূরে দৃষ্ট হ'বে—কঙ্কালসার কয়েকটি ব্যক্তি চালিত হ'চ্ছে—তাদের গতি ঠিক জড়-পদার্থের মত,—তাদের 'পরে তাড়না চলেছে।]

নরেশ। ঐ যে আসচে শাশ্বতনাথ! ওকেই আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমাদের বাঁচবার রাস্তা কি ওর জানা আছে?

পূর্ণা। তুমি জিজ্ঞাসা করো। আমি যাই—আমাকে এখুনি নবীনের আহ্বান-আয়োজনে যোগ দিতে হ'বে।

নরেশ। আমি যেতে পাবো না?

পূর্ণা। না: ছুটি পাবে না। বিপদ আসবে।

[প্রস্থান—।
পরক্ষণেই শাশ্বতনাথের প্রবেশ]

নরেশ। ভগবানের রাজত্বে এই সর্ব্বনাশের খেলা আর কতকাল চলবে?—শাশ্বতনাথ—তোমার দর্শন-তত্ত্ব শুনিয়ে আমাদের সান্ত্বনা দিতে এসেছ? বিজ্ঞানের শক্তির কাছে তুচ্ছ তোমার দর্শন, যে আজ প্রমাণিত হয়েছে। দর্শন আমাদের বাঁচাতে পারে?

শাশ্বত। দর্শন সত্য। যা' সত্য, তার শক্তির সীমা নেই।

নরেশ। তা'র তো কোনো পরিচয় আমরা পাচ্চি না।

শাশ্বত। কেমন ক'রে পাবে?—সহজ সত্যের তো আড়ম্বর নেই। সত্য চিরদিনই সম্পূর্ণ। কিন্তু মিথ্যা ইন্দ্রজালের আবরণ ভেদ ক'রে অসংস্কৃত জনসাধারণ সত্যের সহজ রূপটা দেখতে জানে না। প্রবুদ্ধ মনের কাছে সত্যের পূর্ণবিকাশ। যে কুহকে সত্য বন্দী হ'য়ে রয়েছে, সেই কুহক থেকে সত্যকে উদ্ধার ক'রে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরতে হ'বে—তবেই সত্যের মহিমা তোমরা বুঝতে পারবে।

নরেশ। সত্যের মহিমা! কঠিন সত্য প্রচার করছে কে?—বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞাসুন্দর।

শাশ্বত। হ্যাঁ: প্রজ্ঞাসুন্দর আপন-সৃষ্ট বিজ্ঞানের দম্ভ নিয়ে ব'সে আছে, তা'র অন্তরে অন্তরে দুরাকাঙ্ক্ষা—অসীম সত্যকে সে আবিষ্কার করবে। কিন্তু প্রকৃত বিজ্ঞান তো তা' নয়,—বিজ্ঞান ও দর্শন এক,—যা'কে বলি সত্য। বিজ্ঞানের ছায়া বা আভাস—বিজ্ঞান নয়। যে আবিষ্কার জগতের কল্যাণ আনে না, সে বিজ্ঞানের আবিষ্কার নয়, তা' অসত্য।—তা'র প্রমাণ আজ না হয় কাল পাবে।

নরেশ। কিন্তু এই সকল আবিষ্কার জগতে বিস্ময় এনে দিয়েছে—এ-কথা মানতেই হ'বে।

শাশ্বত। তাই বিজ্ঞানের মায়ার ক্ষণেক দিগ্বিজয়ে মানুষ নিজেকে অসীম শক্তিশালী মনে ক'রে অনন্ত শক্তির আধার সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে পাল্লা দিতেও পিছোয় না। নব নব আবিষ্কার-মত্ত মানুষ সর্ব্বশক্তিমানের সৃষ্টির অপূর্ব্ব কৌশল পর্য্যন্ত তুচ্ছ করবার নির্লজ্জ স্পর্দ্ধা ভ্রান্ত ধারণার বশে মনে মনে পুষে' রাখে। ভগবান প্রত্যক্ষ নন্, তাই তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করতেও এই বস্তু-তান্ত্রিক জগৎ অসম্মত। যন্ত্রের অসম্ভাব্য কার্য্যকারিতা দেখে—মানুষ যন্ত্রের স্রষ্টাকেই গৌরবের অর্ঘ্য দিচ্চে। কিন্তু এ-র পরাজয় কোন্‌খানে জানো? সে নিজের দম্ভেই নিজে ধ্বংস হয়।

নরেশ। আমরা চোখে দেখতে চাই। তোমার কেবল দু'টো কথায় আমরা ভুলছি না। মানবজাতির মঙ্গল যদি এনে দিতে পারো, তবেই হে নবীনের পতাকাধারী—তোমার শক্তির জয়গান করবো। নইলে মহাশিল্পী বিজ্ঞান-সাধক প্রজ্ঞাসুন্দরের প্রভাব চিরদিনই সকলে মাথা পেতে নেবে।

শাশ্বত। আজ থেকে এই মিথ্যাচারী মায়া-বিজ্ঞানের সেবকের বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ শুরু হোলো। সে নিজেকে বিশ্বকর্ম্মা মনে করতে চায়, কিন্তু এই অহঙ্কারই একদিন তা'র বিনাশ এনে দেবে। এ বিড়ম্বনার খেলা কতদিন আর চলে, দেখি।

[সঙ্গীত-ব্যঞ্জনায় 'নবীন যৌবনে'র নির্ভয় অভিযানের ভাব প্রকাশ।—একটি দল কণ্ঠে সুর তুলে এগিয়ে আসছে দেখা গেল।]

নরেশ। ঐ আসচে পূর্ণা, ঐ আসচে তরুণ প্রাণের দল—! ওরা কোথায় চলেছে? কিসের এই উৎসাহ? এই উৎসব-সমারোহ কা'র জন্যে?

শাশ্বত। আজ নিরলঙ্কৃত নিরহঙ্কৃত সত্যকে বরণ করবার জন্যেই ওদের আগ্রহ। ওদের আমি দীক্ষা দিয়েছি। ওরা সেই প্রতারিত মায়াচ্ছন্ন জনগণের অলস-তন্দ্রা ভাঙতে চলেছে,—ওদের অভিযান—তাদের বিরুদ্ধে—যারা মানব-জীবনের সত্য রীতি-নীতিকে অন্ধ সংস্কার ব'লে আখ্যা দিয়ে নিজেরাই আপন-সৃষ্ট সংস্কারের দাস হ'য়ে পড়েছে। অহঙ্কার আর আত্মাভিমানের বশে যা'রা মানুষের প্রাণধর্ম্মকে ক্লিষ্ট করতে চায়—তাদের সতেজ কণ্ঠকে মূক ক'রে দেবার জন্যেই এই আয়োজন, তাদের উদ্যত হাতকে অকর্ম্মণ্য ক'রে দেওয়াই সত্যব্রতীদের সঙ্কল্প। মানুষকে বাঁচতে হ'বে, তার দিন-যাপন সহজ সুন্দর গতি লাভ করুক। সত্য-শিব সুন্দরকে সে চিনতে শিখুক। তবেই এই মনুষ্যত্বঘাতী কাড়াকাড়ি খেয়োখেয়ির জীবন-যাত্রা থেকে নিষ্কৃতি পাবে···আবার হারিয়ে-যাওয়া প্রাণ ফিরে পাবে।

[অভিযান এগিয়ে এলো—]

অভিযানের গান

তোমার নূতন যাত্রা শুরু
বরণের মহোৎসবে।
সূর্য্য আনেন অরুণ-বাণী—
জীবনের বার্ত্তা ক'বে।
সত্য তোমার মুকুট রতন,
অমর ভাগ্য করলো বরণ,
পথের সঙ্গী বীর্য্য তোমার,—
দেবতা সহায় হ'বে॥
পূর্ব্ব হ'তে পশ্চিমেতে বাজিয়া উঠুক্ ভেরী।
উড়ুক্ তোমার জয়ধ্বজা অসীম ঐ গগন ঘেরি।
মন্ত্র জ্যোতির বর্ম্ম তোমার,
প্রকৃতি যে অঙ্গ তোমার,
বিজয়-অস্ত্র প্রজ্ঞা তোমার,—
রাজো হে সগৌরবে॥

[এই দলের সঙ্গে শাশ্বতনাথ ও নরেশের প্রস্থান—।—সঙ্গীত-সুর দূরে অতিদূরে চ'লে যাবে,—তার মৃদু রেশ আসবে ভেসে।......]

[প্রজ্ঞাসুন্দর ত্বরিতগতিতে প্রবেশ করলে। তা'র মুখে কঠোর ভাব, তা'র বিস্তৃত ললাট রেখা-কুঞ্চিত।]—

প্রজ্ঞাসুন্দর। জানি না—আজ কিসের এ উচ্ছ্বাস? কে সে নবীন—যার এই অভিযান শুরু হয়েছে!—এ যেন লজ্জাহীন স্পর্দ্ধার মত শোনাচ্চে।......

(আত্ম-চাটুবিলাসী দম্ভের হাস্যে তা'র মুখ কুটিল হ'য়ে উঠ্‌লো)

আজ আমার শক্তির অভিষেকের দিন। উর্দ্ধে—উর্দ্ধে চলেছে আমার বায়ু-রথ, এই রথে মহাশিল্পীর গান বেজে উঠবে। স্তব্ধ হ'য়ে জগৎ চেয়ে দেখবে—প্রজ্ঞাসুন্দরের শক্তি কত বিরাট্!

[কয়েক মুহূর্ত্তকাল শুধুমাত্র সঙ্গীত-মুখর থাকবে]

প্রজ্ঞাসুন্দর। আমার আবিষ্কার, আমার কর্ম্মশক্তির কাছে সকলের মাথা অবনমিত হবে। বিশ্বকর্ম্মার কার্য্য-কাহিনী মানুষের কল্পনা, তার কোনো বাস্তব নিদর্শন নেই, আমি সেই সুচির-লালিত কল্পনাকে ক'রে তুলবো সত্য। যন্ত্রের পাকে পাকে সমস্ত মানুষজাতি ঘুরবে, বিজ্ঞানের প্রবল শক্তির কাছে মাথা নোয়াবে, যন্ত্রের নিয়মে তাদের বেঁধে দেওয়া হ'বে, ডাইনে-বাঁয়ে ফিরে তাকাবারও তাদের অবসর মিলবে না, পৃথিবীর কাজ ঠিক যন্ত্রের শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিত হ'বে।

[তা'র বাক্যস্রোত বাধা পেলো প্রবীণদাসের প্রবেশে।—প্রবীণের মূর্ত্তি রুক্ষ, তা'র মুখে বিপন্ন ভাব। সে এগিয়ে এলো, ভারী নিশ্বাস-প্রশ্বাসে তার যেন অত্যন্ত কষ্টবোধ হচ্ছিল। তা'র গতি অনুসরণ করলে নরেশ ও মৈত্রী।]

প্রজ্ঞাসুন্দর। কে—কে আসে?

(প্রবীণ প্রাণপণ চেষ্টায় যেন সমস্ত ক্লেশ দমন ক'রে কথাগুলি বলতে লাগ্‌লো)

প্রবীণদাস। আমি—আমি···প্রজ্ঞাসুন্দর!

প্রজ্ঞাসুন্দর। প্রবীণদাস! তোমার কি হ'য়েছে? মৈত্রীও এসেছে দেখছি,—নরেশকেও ছেড়ে আসোনি!

প্রবীণ। আজকে তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে, তা'র সঙ্গে এদেরও সম্বন্ধ রয়েছে।

প্রজ্ঞাসুন্দর। কি বলবে তুমি?

প্রবীণ। হিসেব-নিকেশ করতে চাই—

প্রজ্ঞাসুন্দর। হিসেব-নিকেশ! আমার সঙ্গে?—তোমার?

প্রবীণ। আশ্চর্য্য হ'চ্চো কেন?—আজ আমি অসুস্থ হ'য়ে পড়েছি।—দেহে মনে এখন জরার আক্রমণ!

প্রজ্ঞাসুন্দর। সে জন্যে কি আমাকে দায়ী করতে এসেছ? তাই কি তোমার বোঝাপড়া?

প্রবীণ। তোমার কাজে আমি এই জীবন বিলিয়ে দিয়ে এসেছি, তুমি ভিন্ন কে আমার হিসেবের খাতা খুলবে?—তোমার শক্তির পায়ে নিজের সকল উদ্যম,

সমস্ত ইচ্ছা অকৃপণের মত দান করেছি। আজ দেহের শক্তি কমে গেছে, মন বিষিয়ে উঠেছে, নির্বেদ হয়েছে আমার সঙ্গী। মিথ্যা কল্পনার রাজ্যে বাস ক'রে আর দম্ভের পূজা দিতে কি প্রাণ চায়?

প্রজ্ঞাসুন্দর। আমি সাধনায় যে শক্তি বাড়িয়ে তুলেছি,—আমার সেই সাধন-লব্ধ ঐশ্বর্য্যকে অপমান করতেও তুমি কুণ্ঠিত নও?

প্রবীণ। আমার চরম বিদায়ের দিন এসে গেছে, আর আমার কোনো কুণ্ঠা নেই। আমি তোমার সৃষ্ট যন্ত্র-দানবের বলি।—তুমি আপনার শক্তির নিরুদ্ধ অভিমান নিয়ে স্ফীত হয়ে আছো,—কিন্তু সে-শক্তির সীমা কতটুকু?

প্রজ্ঞাসুন্দর। আমার শক্তি সীমাহারা।—তা'র প্রত্যক্ষ প্রমাণ তোমরা পাওনি?—আমি যে যন্ত্র সৃষ্টি ক'রে তুল্‌ছি—তা' জগৎকে শাসন করতে পারে—জানো!—

প্রবীণ। জানি তোমার সৃষ্টির কৌতুক দু'দিনের জন্যে, জগতে সামান্য ক্ষতি আন্‌তে পারে,—কিন্তু চিরন্তন সত্যের কাছে তা'কে হার মান্‌তে হ'বেই।

প্রজ্ঞাসুন্দর। প্রজ্ঞাসুন্দর অসীম সত্যকেই আবিষ্কার করতে চায়,—সে জানে না পরাজয়।—তা'র বুকে আছে অগ্নিশিখা, চোখে আছে অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বজয়ের ছবি।—

প্রবীণ। মিথ্যা তোমার বিশ্বজয়ের কল্পনা,—এই অন্ধ দর্প তোমাকে একদিন মার্‌বে।—মানি—তোমার বুকে অগ্নি-শিখা আছে, কিন্তু সে পবিত্র করে না, দগ্ধ করে।—তোমার যন্ত্র-সৃষ্টি অশান্তির দহন-জ্বালা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে।—এই দুঃখ থেকে কে উদ্ধার করবে জানি না,—তবে মুক্তির দিন আস্‌বেই। বিরল-ভূষণ সত্যের কাছে তুমি লাঞ্ছিত হ'বে।—

প্রজ্ঞাসুন্দর। আর কোনো কথা নয়—প্রবীণ। জরার ভারে তুমি নুয়ে পড়েছ, তুমি কৃপার পাত্র!—সামান্য আঘাত সইবার মতও তোমার সামর্থ্য নেই।—কিন্তু তুমি বজ্রের কামনা করচো।—মনে রেখো—বজ্র যখন পড়ে—দুর্ব্বল-প্রবল তা'র কাছে সমান।—তুমি কি চাও—?

প্রবীণ। আমি চাই ছুটি।—আর আমার ছেলে নরেশকে তোমার মনুষ্যত্বঘাতী তাণ্ডব-লীলার সঙ্গী হ'তে দোবো না।—এই আমার পণ।—ওকে মুক্তি দাও!—

প্রজ্ঞাসুন্দর। মুক্তি চাও—ভালো!—কিন্তু তারপর? সর্ব্বনাশের পথে ওকে টেনে নিয়ে যেতে চাও?—

প্রবীণ। তোমার সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধ চালাবার মত বুকের বল তুমিই নিঃশেষ ক'রে দিয়েছ। আমি অসুস্থ হ'য়ে উঠেছি। এখন শান্তি চাই—আমার যা' বল্‌বার আছে, সে-সমস্তই শুনতে পাবে—নরেশ আর মৈত্রীর কাছে।—ওরা রইলো—আমি আর এখানে থাকতে পারবো না। আমার দম্ আটকে আস্‌চে।—

(প্রস্থান)

প্রজ্ঞাসুন্দর। নরেশ, এখনো কোনো বিবাদী সুর তুলতে সাহস রাখো?

নরেশ। সাহসের শিক্ষা আমি পেয়েছি। ভীরুতাকে বড় ক'রে তুলে আপ্‌নাকে আর অপমান করতে চাই না। যার ভরসা নেই—তার জীবনে কোনো লাভের আশা নেই। আপনি কি মনে করেন—যন্ত্রের পেষণে সকলকে ভয় দেখানোই কি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য?—শাশ্বতনাথ বলে—বিজ্ঞান সত্য—বিজ্ঞান কোনো দিন মানুষের অমঙ্গল আনে না।—আমি সেই বিজ্ঞানের চর্চ্চা করবো,—এই বিজ্ঞানই আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে।—

প্রজ্ঞাসুন্দর। নরেশ—আজীবন ব্রতচারী আমি,—বিজ্ঞানের সেবায় আমি নিজেকে উৎসর্গ করেছি,—আমার শিষ্য হ'য়ে আমাকে শিক্ষা দিতে এসেছ?—

নরেশ। সত্যদর্শী শাশ্বতনাথের মতে—আপনি বিজ্ঞানের সাধক নন্,—আপনি যা'র সাধনা করছেন—সে বিজ্ঞানের আভাস মাত্র—বিজ্ঞানের ছায়া—বিজ্ঞানের প্রেত।

প্রজ্ঞাসুন্দর। শাশ্বতনাথ—! যে দর্শন-তত্ত্ব নিয়ে দিন কাটায়?···সে যন্ত্র-বিজ্ঞানের মহিমা কি জানে?—

মৈত্রী। শাশ্বতনাথ যে কথা প্রচার করছে—তা' আজ মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।—সত্যের সহজ রূপটি সে সকলের মনে এঁকে দেবার ব্রত নিয়েছে।

প্রজ্ঞাসুন্দর। পঙ্গুর পাহাড়ে ওঠ্‌বার দুরাশা!—মৈত্রী—তুমি শুধু শুনে রাখো—শাশ্বতনাথের মত ছেলেরা অকালবোধনে দেশকে মারতে ব'সেছে।—তোমার কাছে অনুরোধ—যদি পারো—এই লক্ষ্মীছাড়াদের মাথা ঠাণ্ডা করো।—তোমরা নারী—মায়ের জাত,—ওদের শাস্তি নিজে নিয়েও যদি ওদের বাঁচাতে পারো,—মরণ সার্থক্ হ'বে।—

মৈত্রী। আপনার এ-কথাগুলো সবখানি যে একেবারে মিথ্যে—তা' আমি বল্‌বো না।—কারণ, পদে পদে ওদের আঘাত সইতে হ'বে—ওরা বাধা পাবে প্রতি মুহূর্ত্তে!—ঐ নবীনের দল হ'তে পারে সর্ব্বনেশে—কিন্তু ওদের আমি ভালোবাসি,—অমন বীর আছে

কোথায়!—ওরাই আজ ছুটেছে মৃত্যুদূতের পিছে পিছে মরিয়া হ'য়ে—মিথ্যার দুর্গ জয় ক'রে সত্যকে উদ্ধার করতে।—ওরাই যদি মরতে ছোটে আমি ঘরের কোণে বেঁচে থাকতে চাই না।—

প্রজ্ঞাসুন্দর। বৎসে,—যা' বললে—ও অবলা নারীর মায়ার কথা।—শক্তিমানের কাছে ওদের মাথা নত ক'রতেই হ'বে।—শক্তির গোড়ায় নিষ্ঠুরের সাধনা,—শেষে হয়তো ক্ষমা—কিন্তু এখন ক্ষমার কথা আসতেই পারে না।—

মৈত্রী। তা' হ'লে বলতে চান্—অমন্ সব তরুণকে এক অন্ধশক্তির কাছে বলি দিতে হ'বে! আর ক্ষমাই বা কিসের?—তা'দের দোষ কি?—যা' সত্য—তা'রা তাই মানে।—আর বড় বড় কথা ব'লে ভোলাবার দিন চ'লে যাচ্চে।—আপনি আসলে যা', তা'র চেয়ে দাবী আপনার অনেক বেশী।—এতটা সইবে না।—

প্রজ্ঞাসুন্দর। মৈত্রী, দাবীর জোরেই দাবী সত্য হয়।—আমাকে বিশ্বাস করো,—দেখো আমার সাধনা কেমন ক'রে সত্য হ'য়ে ওঠে।—আর দেরী নয়,—আজ আমার পূর্ণ বিজয়-অভিষেক।—ঐ চেয়ে দেখো—! আকাশকে তুচ্ছ ক'রে উঠেছে—ঐ বিরাট অচলায়তন স্তম্ভ।—ঐ স্তম্ভের সর্ব্বোচ্চ গম্বুজে আমি আমার জয়ের মালা ঝুলিয়ে দিয়ে আস্‌বো।—

মৈত্রী। তোমার মরণ-সুতোয় গাঁথা সেই বরণমালা সত্যের গলায় গিয়ে পড়বে।—

[এস্থলে—সঙ্গীতের চঞ্চলতা প্রকাশ পাবে।—পরক্ষণেই শোনা যাবে অদূরাগত—গান।]

প্রজ্ঞাসুন্দর। বলো কি—এত বড় স্পর্দ্ধা!—সেই মুহূর্ত্তে আমার শক্তির কাছে শির অবনত করতে হবে—সকলকেই, নির্ব্বাক বিস্ময়ে সকলকে দাঁড়িয়ে সেই শক্তির স্তব করতে হ'বে।—আমি অঙ্গীকার করছি—আমার সঙ্কল্প আমি রক্ষা করবো।—নইলে লজ্জার আর সীমা থাকবে না।—তা' সহ্য করাও অসম্ভব।—কা'দের দুর্বিনীত কণ্ঠ আজ মুখর হ'য়ে উঠেছে?—

মৈত্রী। শুনতে পাচ্ছেন—নবীনের জয়ধ্বনি!—ঐ সমস্ত কণ্ঠ সত্যের মন্ত্র-উচ্চারণে পবিত্র—সতেজ, ও-কণ্ঠ দুর্ব্বার।—সত্যের রূপ কঠিন, তা'র বিনয় নেই।—

প্রজ্ঞাসুন্দর। কি বলছো মৈত্রী!—তোমার কথা, বলার ভঙ্গী আমার কাছে প্রগল্‌ভতার নামান্তর ব'লে মনে হ'চ্ছে।—তুমি জেনে রাখো,—অকর্ম্মণ্যদের কণ্ঠ রুদ্ধ হ'তে বেশী দেরী লাগবে না।—ওরা যদি বেশী মুখর হ'য়ে ওঠে—ওদের গুমরে-ওঠা দুঃখ-সমুদ্রের ধ্বনি তোমাদের কাণে এসে আঘাত করবে।—যাও—এখান্ থেকে যাও!—

মৈত্রী। তোমার বলবার অপেক্ষা আমি রাখি না।—ওদের মাঝখানে গিয়ে আমাকে পড়তে হ'বে।—এসো—এসো নরেশ!—ওরা এগিয়ে এসেছে।—

প্রজ্ঞাসুন্দর। তোমরা যাবে যাও,—কিন্তু তোমরা যে বিদ্রোহ সূচনা করেছ—তা' অনায়াসেই চূর্ণ ক'রে দেবো।—তোমাদের ভয়ঙ্কর পরিণাম আজ আমাকে বিচলিত ক'রে তুলেছে।—এই গতিশীল জগতে তোমরা পিছনের ভ্রূকুটির দিকে ফিরে চেয়ো না—হতমান হ'বে।—তোমাদের আজ রক্ষা করবে এই প্রবল প্রাণ।—অন্যথায় প্রতিফল পাবে, নিষ্ঠুর তা'র প্রকৃতি,—এখনো সাবধান হও।—শোনো—

[সঙ্গীত ও গানের প্রাবল্যে তা'র কথা বাধাপ্রাপ্ত হোলো]—

উদ্দীপনার গান

চলো অমৃত-সম্পদ ধন্য—
ল'য়ে তব চিত্ত প্রসন্ন!
বিকশিত ক্ষণে ক্ষণে
জীবন-মৃত্যুর আলিঙ্গনে—
নব-যৌবন-লাবণ্য॥
এসো সুন্দর নিরলঙ্কৃত!
এসো শাশ্বত নিরহঙ্কৃত!
মিথ্যার গুপ্ত প্রেমে
ইন্দ্রজালের মায়াতে থেমে
রবে না কুহকে নিমগ্ন॥
করো স্বপ্নের দুর্গ বিচূর্ণ!
করো প্রতিষ্ঠা মুক্তির তূর্ণ!
যাত্রার আনন্দ-গানে
পূর্ণ করো আজি গগন-প্রাণে,—
জয়ী হোক্ সত্য শরণ্য॥

[সকলের দূরাপসরণ। মৈত্রী মন্ত্রমুগ্ধ নরেশকে টেনে নিয়ে প্রস্থান করলে]

প্রজ্ঞাসুন্দর। আমিই সেই সত্যের প্রতিষ্ঠা করবো।—কে আমার যাত্রার পথে এসে বিজয়-যাত্রা রোধ করে?—ঐ সমস্ত ভাব-প্রবণতার আকস্মিক আক্রমণে জন-চিত্ত দুর্ব্বল, অসহায় হ'য়ে ওঠে। আমি কিছুতেই এ-আচরণ মার্জ্জনা করবো না।—আমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যন্ত্রসিদ্ধিকে আমার কাজে লাগাবো।—তা'র কায়াকে আমি আমার যন্ত্রের কৌশলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে অতিরিক্ত দীর্ঘ ক'রে তুলেছি, সে দুর্নিবার ··বিধাতা-সৃষ্ট মানুষের চেয়ে অনেক কর্ম্ম বহুগুণে শক্তিশালী। তা'কে ছেড়ে দোবো ওদের দলের মধ্যে দাবানলের মত। সব পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দেবে।—ধ্বংসের নেশায় যন্ত্রসিদ্ধি দানবের মতো উন্মাদ হ'য়ে উঠবে।

[সাঙ্কেতিক তীব্র যন্ত্রের রণন]

[ক্ষণপরেই বিরাট্‌বপু—অতিদীর্ঘ—বিকট-দর্শন যন্ত্রসিদ্ধি মত্তহস্তীর মত প্রবেশ করলে।—এই যন্ত্রমানবের মুখ অভিব্যক্তি-বর্জ্জিত—ভাব-লেশ-শূন্য—তা'র চলা-ফেরা সম্পূর্ণ কৃত্রিম—ঠিক যেন যন্ত্র-চালিত একটি বস্তু-বিশেষ। তা'র কণ্ঠ অত্যন্ত ভারী অথচ কর্কশ, কথা বলার রীতি ঠিক তীরের মত সোজা—নীরস।]

যন্ত্রসিদ্ধি। আমি এসেচি।

প্রজ্ঞাসুন্দর। যন্ত্রসিদ্ধি, যথার্থ তুমি যন্ত্র-মানব হ'তে পেরেচ কি-না—তারই প্রমাণ আজ নোবো। সেই সুযোগ এসেছে। তোমার বল আর ভরসা যে এই সমস্ত ভগবানের সৃষ্ট মানুষের চেয়ে অনেক গুণে দুর্দ্দম—সেইটেই আমি পরীক্ষা করতে চাই। তুমি আমার সৃষ্টি—আমার সৃষ্টিকে সার্থক ক'রে তুল্‌তে পার্‌বে তুমি ?—

যন্ত্রসিদ্ধি। তুমি আমাকে তৈরী করেচো—জানো না আমার কি কাজ ? আমি কাজে জবাব দিই—কথায় নয়। আমি মানুষ নই—কাজ-ছাড়া কথা কইতে জানি না। আমি যন্ত্র-মানুষ—সব পারি। মানুষ শুধু হুকুম কর্‌তে পারে, আমাদের মতো কাজ কর্‌তে পারে না। মানুষ কি আমাদের বল ধরে ? যন্ত্র-মানুষের তেজের সঙ্গে চেনা তোমার নেই ? আবার বল্‌চো ?

[মাথা ঝাঁকানি দিয়ে আরো উঁচু ক'রে সদম্ভে দাঁড়ালো]

প্রজ্ঞাসুন্দর। উত্তেজিত হোয়ো না—যন্ত্রসিদ্ধি! তোমাকে সামান্য পরিহাস করছিলুম।

যন্ত্রসিদ্ধি। পরিহাস আবার কি ?

প্রজ্ঞাসুন্দর। বটে-বটে—আমি ভুলেই গিয়েছিলুম—পরিহাস তুমি বোঝো না।—তুমি যে সকলের চেয়ে বড—তাই পরখ্‌ করাই আমার ইচ্ছা।

যন্ত্রসিদ্ধি। বলো—কি কর্‌বো ? আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখো না অকেজোর মতো।

প্রজ্ঞাসুন্দর। কিন্তু তোমাকে বিবেচনা ক'রে কাজ করতে হ'বে।—সমস্ত যন্ত্রমানুষের মধ্যে তোমার বুদ্ধি তো বেশী।

যন্ত্রসিদ্ধি। আমার বুদ্ধিতে বিবেচনা নেই। কাজ শুরু করলে আমি নিজেকে সামলাতে চাই না।

প্রজ্ঞাসুন্দর। কিন্তু নিজের ভালো মন্দ মেনে তবে তো কাজ কর্‌তে হ'বে। নইলে যে তোমাকে সকলে পাগল বলবে। আমার সৃষ্টির অপমানে আমারই তো অপযশ।

যন্ত্রসিদ্ধি। ও-সব আমি মানতে শিখি নি। আমি যন্ত্রের মত কাজ ক'রে যাবো, তা'র বেশী-কম নয়।

প্রজ্ঞাসুন্দর। শোনো—শোনো—যন্ত্রসিদ্ধি। যে-দিন তুমি আট বছরের শিশুটি আমার কাছে এলে—তোমাকে আমি নতুন ক'রে গ'ড়ে তোল্‌বার জন্যে কি গবেষণাই না করেছি।—বিজ্ঞান-মতে অদ্ভুত যন্ত্রের আবিষ্কার করেছি, সেই যন্ত্রের সহায়ে তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিনের পর দিন অতি সাবধানে বাড়িয়ে তুলেছি। তখন তুমি যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে উন্মাদের মত কাঁদ্‌তে। তোমাকে শান্ত করতুম নানা উপায়ে। রসায়ন-প্রক্রিয়ার তৈরী বিষ তোমাকে খাইয়েছি—সে-বিষ তোমার পক্ষে অমৃতের কাজ করেছে।—তারপরে সব স'য়ে গেল। তুমি আশ্চর্য্যরূপে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লে—তোমার পেশী হোলো বজ্রের মত কঠিন।—যে-দিন তোমাকে সকলের সাম্‌নে প্রকাশ কর্‌লুম—তা'রা বিস্ময়ে হতবাক্‌ হ'য়ে গিয়েছিল। সৃষ্টিকর্ত্তার ভুল আমি সংশোধন করেছি—তোমাকে নতুনরূপে গঠন ক'রে। সেই তুমি—আমারই যন্ত্রসিদ্ধি—আমারই হাতের সৃষ্টি। বিজ্ঞানের কি শক্তি—তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ তুমি।—তাই তোমার স্রষ্টার কথা বিনা দ্বিধায় শুন্‌তে হ'বে।

যন্ত্রসিদ্ধি। এখুনি শুন্‌তে চাই।

প্রজ্ঞাসুন্দর। আজ শাশ্বতনাথের দলকে তোমায় শেষ ক'রে দিয়ে আস্‌তে হ'বে। বিজ্ঞানের গৌরব-ভিত্তিকে যা'রা নাড়া দেবার দুঃসাহস মনের মধ্যে পুষে' রেখেছে, তাদের কাছে প্রমাণ ক'রে দাও, বিজ্ঞানের কত শক্তি! ...নরেশ! কি চাও—বিদ্রোহী!

[নরেশের ত্বরিতপদে পুনঃ প্রবেশ]

নরেশ। আপনি না-কি যন্ত্রসিদ্ধিকে মাতিয়ে তুলছেন নির্দ্দোষদের 'পরে অত্যাচার এনে দিতে ?

প্রজ্ঞাসুন্দর। কেমন ক'রে জানলে ?

নরেশ। আমি সব শুনেছি।

প্রজ্ঞাসুন্দর। তুমি আমারই অধীন হ'য়ে—এই হীন গুপ্তবৃত্তি নিয়েচ ?

নরেশ। ও প্রবৃত্তি আমার নেই। আপনার মুখে হিংসার রেখা ফুটে উঠ্‌তে লক্ষ্য করেছিলুম, সন্দেহ হয়েছিল—আপনি অভিমানের আবেগে ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নিতে মনে মনে জল্পনা করছেন। আমার সন্দেহ সত্য জেনেই সকলের বাধা অগ্রাহ্য ক'রে এখানে আবার ছুটে এসেছি। আপনার উন্মত্ত আচরণকে ধিক্কার দিতেই এসেছি।

প্রজ্ঞাসুন্দর। কি! এসেচ ধিক্কার দিতে—আমাকে ? তোমার শক্তিশালী প্রভুকে ? ক্ষুদ্র মানবক!...যন্ত্রসিদ্ধি!

যন্ত্রসিদ্ধি। কি কর্‌তে হ'বে ?

নরেশ। যন্ত্রসিদ্ধি—তুমি কি আমাদের ঘৃণা করো ? কেন ?

যন্ত্রসিদ্ধি। তোমরা আমার চেয়ে দুর্ব্বল। তোমাদের মতো আমি দাসখৎ লিখে দিইনি। আমি মানুষের হুকুম মান্‌তে চাই না। সকলের আমি প্রভু হ'বো।

নরেশ। শুনুন—শুনুন ছায়া-বৈজ্ঞানিক, আপনারই সৃষ্টি—ঐ মূর্ত্তিমান অমঙ্গল একদিন আপনাকেই মারতে উদ্যত হ'বে।

প্রজ্ঞাসুন্দর। ওরে পথভ্রষ্ট, তুই আমার সৃষ্টিকে অবমাননা করিস্? তা'র অমিত শক্তির পরীক্ষা এখুনি শুরু হোক্। যন্ত্রসিদ্ধি—ঐ অকৃতজ্ঞ তোমার শক্তির প্রথম বলি।

নরেশ। ঐ যন্ত্রদানবের হাত তুমিও এড়িয়ে যেতে পারবে না।

প্রজ্ঞাসুন্দর। স্তব্ধ করো ওকে!···

[যন্ত্রসিদ্ধি বিদ্যুৎবেগে অগ্রসর হ'য়ে নরেশকে আঘাত করলে।—নরেশ মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌লো।] ··

কৃপার পাত্র ক্ষুদ্র জীব! এই পরিণাম তোদের সকলকে ভোগ করতে হ'বে।

[নিষ্ঠুরতার নেশা যেন যন্ত্রসিদ্ধিকে পেয়ে বসেছে—এই ভাব পরিলক্ষিত হোলো—তা'র অঙ্গ-ভঙ্গীতে ও পেশীবহুল মুখের রেখা-কুঞ্চনে।]

যন্ত্রসিদ্ধি। এবার কি আমার কাজ? আমি স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পাচ্ছি না।

প্রজ্ঞাসুন্দর। ঐ দুর্ব্বল হতপ্রাণ মানুষটাকে অলিন্দে সরিয়ে দাও। তার পরে সেই বিজ্ঞানদ্রোহী দলকে দমন ক'রে এসো। তাদের উদ্ধত মাথা যেন চিরদিনের জন্যে নুয়ে পড়ে।···

[যন্ত্রসিদ্ধি অনায়াসে নরেশের জ্ঞানহীন দেহ তুলে নিয়ে প্রস্থান করলে—]

বিজ্ঞানের দান—এই যন্ত্রমানব পৃথিবীকে কর্‌বে শাসন, আর তা'র প্রভুশক্তি হ'বে বৈজ্ঞানিক।···

[অনতিদূর থেকে কয়েকটি মর্ম্মর ও লৌহমূর্ত্তি চূর্ণ করার ভীষণ শব্দ শোনা গেল—]

কিসের ঐ শব্দ?—যন্ত্রসিদ্ধি কি ক্ষেপে গেল? ও কি নির্ব্বিচারে উন্মাদের মত বিজ্ঞানের আদর্শ প্রস্তর আর লৌহমূর্ত্তিগুলো ধ্বংস করছে? ··

[অদূরাগত...সঙ্কেত-জ্ঞাপক বংশী-রব তীব্রতর হ'য়ে বেজে উঠ্‌লো।—জন কোলাহল শোনা গেল।]

হা হা হা-হা-হা!—আর নিস্তার নেই! এখন লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ কর্‌বার সময় নয়।—যন্ত্রমানব উঠেছে জেগে, তার আক্রমণ শুরু হয়েছে।

[মৈত্রীর প্রবেশ]

মৈত্রী। এ কি সর্ব্বনাশ কর্‌তে চলেছ, প্রজ্ঞাসুন্দর! তুমি কি যন্ত্রের সাধনায় নিজের মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছ?

প্রজ্ঞাসুন্দর। মৈত্রী, তোমার উপদেশ শোনবার মত আমার দীন অবস্থা এখনো আসে নি। বিপদ হ'বে—চ'লে যাও এখান থেকে, নিজের ক্ষুদ্রপ্রাণ বাঁচাও গে! যাও!

[আর্ত্তরব ক্রমোচ্চ]

মৈত্রী। না-যাবো না। তোমার এ অন্যায়ের প্রতিবাদ কর্‌তে এসেছি। তোমার নিষ্ঠুর প্ররোচনায় যন্ত্রসিদ্ধি কত নিরীহের প্রাণ হরণ কর্‌তে ছুটেছে—তা'র তুলনায় আমার প্রাণের মূল্য কতটুকু? তুমি ও-কে বারণ করো, নিরপরাধ নির্ব্বিরোধ জনগণের ওপর তোমার ঐ দানব অত্যাচারের বিষ ছড়িয়ে দিচ্চে। চারিদিকে উঠেছে হাহাকার—সেই করুণ-ধ্বনিতে কাণ পাতা যায় না। ঐ শোনো আর্ত্তরব।

প্রজ্ঞাসুন্দর। এ ইঙ্গিত আমি আগেই তোমাকে দিয়েছিলুম। তোমাদেরই কর্ম্মফল ভোগ কর্‌ছে ঐ দুর্গতরা। দোষ করে একজন—শাস্তি পায় অন্যলোক, এই পৃথিবীর নিয়ম। এখন আর উপায় নেই, যে-তীর একবার তূণ থেকে বেরিয়ে গেছে, তা'কে ফেরাবো কেমন ক'রে? সকলে জানুক, বিজ্ঞানের কি অপ্রতিহত শক্তি,—তা'রা শ্রদ্ধায় না হোক্—ভয়ে বিজ্ঞান-দেবতাকে স্তুতি কর্‌তে থাকবে।

মৈত্রী। কিন্তু এ-ভয় বেশীদিন থাকে না, সত্যের অভয় খড়্গাঘাতে এই ভয়ের হয় মৃত্যু। যা' অহঙ্কারী মিথ্যা, তা'র আধিপত্য দু'দিনের,—তা'র সঙ্গেই আমাদের বিরোধ। তুমি অসত্যের পূজারী—তথাবাচ্য বিজ্ঞানের ইন্দ্রজাল আয়ত্ত ক'রে তুমি হ'তে চাও যাদুকর?

প্রজ্ঞাসুন্দর। চুপ্ করো—আর নয়। যদি তুমি সংযত না হও, তা' হ'লে তোমার এ-দুর্ম্মতির জন্যে নরেশের মতো তোমাকেও যন্ত্রের বলি হ'তে হ'বে।

মৈত্রী। বলো কি! নরেশকে তুমি হত্যা করেছ? নরেশ!···কোথায় সে? ওরে সর্ব্বনেশে, এই সর্ব্বনাশা জালে তুমি নিজে জড়িয়ে পড়্‌বে। তা'কে দেখাও।

[একটি যোজক-দ্বার উন্মুক্ত হোলো—নেপথ্যের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করলে প্রজ্ঞাসুন্দর—]

প্রজ্ঞাসুন্দর। চেয়ে দেখো, মৈত্রী—ঐ তোমাদের নরেশ। ওকে ক্লীবত্ব থেকে আমি উদ্ধার এনে দিয়েছি।

মৈত্রী। (অশ্রু-সজল সবেদন কণ্ঠে) নরেশ—নরেশ! ·· তোমাকে আমার শেষ অভিনন্দন, ভাই! তুমি সত্যের ডাক যেদিন পেলে—সেই মুহূর্ত্তেই সব তুচ্ছ ক'রে মিথ্যার মোহশৃঙ্খল খুলে ফেল্‌তে গিয়েছিলে। তুমি কত বড় বীর, প্রাণের মূল্যে তুমি সত্যের মর্য্যাদা রেখেছ।·· (প্রজ্ঞাসুন্দরের প্রতি পরুষকণ্ঠে) ওরে ভ্রান্ত পথের পথিক, ওরে প্রাণহীন, তুই আমাদের আঘাত যত দিবি, আমাদের শক্তি ততই বেড়ে উঠ্‌বে। আমাদের কোনো অনিষ্ট কর্‌বার মত তোর সামর্থ্য নেই। এই মৃত্যুর তাণ্ডবে জেগে উঠ্‌বে জীবনের পরম সত্যের কল্যাণ-রূপ। তোর শোচনীয় পরাজয় কেউ রোধ কর্‌তে পার্‌বে না।

প্রজ্ঞাসুন্দর। এখুনি এই স্থান ছেড়ে চ'লে যাও, আর আমি ক্ষমা করতে পারবো না। যন্ত্রসিদ্ধির সাম্‌নে পড়লে তোমাকে রক্ষা করা কঠিন হ'য়ে উঠ্‌বে।

মৈত্রী। তোমার যন্ত্রসিদ্ধির শক্তির সঞ্চয় এতক্ষণে নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। শান্তিময়ী পূর্ণার মুখোমুখি পড়লেই সে বিকল হ'য়ে যাবে।

প্রজ্ঞাসুন্দর। যা' সম্ভব নয়, সেই কল্পনা ক'রে অশান্ত ভীরু মনকে সান্ত্বনা দিতে চাও তুমি?

মৈত্রী। বিধাতার সৃষ্টির সাম্‌নে তোমার মত ক্ষুদ্র মানুষের সৃষ্টি লাঞ্ছিত হয়। ঐ যন্ত্রসিদ্ধির পেষণে তোমার ধ্বংস হ'বে।

প্রজ্ঞাসুন্দর। মৈত্রী, এখনো বল্‌ছি, আমাকে আর চঞ্চল ক'রে তুলো না। শক্তিশালীকে তুচ্ছ করবার মত অস্ত্র তোমাদের ভাণ্ডারে নেই।

[অদূরাগত কতিপয় কণ্ঠের চীৎকার—
"যন্ত্রসিদ্ধি পাগল হ'য়ে গেছে—পালাও—পালাও—রাস্তা ছাড়ো—ছুটেছে ঐ উন্মাদ যন্ত্রাগারে—"]

মৈত্রী। ঐ শোনো, উন্মাদ যন্ত্রসিদ্ধি এবার তা'র সৃষ্টিকর্ত্তাকে মার্‌তে ছুটে আস্‌ছে।

প্রজ্ঞাসুন্দর। ও ভয় আমাকে দেখিয়ো না—দুর্ব্বলা রমণী! নিজেকে এখন বাঁচাও। আমি ওকে আবার সংস্কার ক'রে কার্য্যক্ষম ক'রে তুল্‌বো।

মৈত্রী। এইবার তোমার হার আরম্ভ হোলো।

[প্রস্থান]

প্রজ্ঞাসুন্দর। আমার হার! (তাচ্ছিল্যের হাসি) নির্ব্বোধ নারী, তুমি কি জানবে—কতখানি শক্তির সঞ্চয় আমার আছে! আমি অসীম শক্তিধর।—ঐ যে যন্ত্রসিদ্ধি ছুটে আস্‌ছে! ও কি ওর রূপ! (যন্ত্রসিদ্ধির উন্মাদের মত প্রবেশ) যন্ত্রসিদ্ধি!

যন্ত্রসিদ্ধি। তোমাকে মানবো না। আমি কারো হুকুম শুনবো না। আমি হবো সকলের প্রভু। তুমি সামান্য মানুষ, তোমাকেও মারবো। (আক্রমণে উদ্যত)

[প্রজ্ঞাসুন্দর মারণ-অস্ত্র-নিক্ষেপে যন্ত্রসিদ্ধিকে স্তব্ধ ক'রে দিলে।]

প্রজ্ঞাসুন্দর। (শ্রান্তকণ্ঠে) এখন নিশ্চল নিশ্চল! তুমি যন্ত্রসিদ্ধি!—যা' যায়—সে যত বড় ক্ষতিই হোক্—তা'র জন্যে ক্ষোভ করা আমার অভ্যাস নয়। কিন্তু এ পরাজয়ের গ্লানি আমাকে কিছুতেই স্পর্শ করতে দেবো না। জনগণের পরে ওরা আধিপত্য করবে? তা' হ'লে আমার অগৌরবে সারা দেশ ভ'রে যাবে। সে আমার পক্ষে অসহ্য! বিজ্ঞানের অপরাজিত শক্তির পরিচয় আমাকে দিতে হ'বে—নইলে সাধারণের দোলায়মান চিত্তে উঠবে সন্দেহ।......

[দীপ্তির প্রবেশ]

কে তুমি, কে তুমি!

দীপ্তি। আমি তোমাকে অভিনন্দন দিতে এসেছি, মহাশিল্পী! তোমার শক্তিতে আমি মুগ্ধ। আমাকে চিন্‌তে পারলে না! আমার নাম দীপ্তি।

প্রজ্ঞাসুন্দর। (স্মরণ-ছলে) দীপ্তি! দীপ্তি! আমার অগ্নিশিখা! আমার প্রেরণা!

দীপ্তি। আজ আমাকে এতোখানি বাড়িয়ে তুলচো কেন?

প্রজ্ঞাসুন্দর। জানো না—আজ আমি সত্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ক'রব? তাই আরও শক্তি চাই। তোমরা শক্তি দাও পুরুষকে।

দীপ্তি। তাইতো আমি এসেছি এখানে তোমার বিজয়ের দিনে। কিন্তু মনে আছে, যেদিন তুমি আকাশ জয় ক'রতে আমাকে বিমান-রথে সঙ্গিনী ক'রে নিলে?

প্রজ্ঞাসুন্দর। হ্যাঁ—হ্যাঁ; মনে আছে,—তুমি সেদিন ব'লেছিলে—আমার বিজয়-অভিযান একদিন জগতের বিস্ময় হ'য়ে থাক্‌বে।

দীপ্তি। কিন্তু, সেই মুহূর্ত্তে আমাকে তুমি কি ব'লছিলে—মনে পড়ে? আমাকে একটি অপূর্ব্ব রাজ্য গ'ড়ে দেবে? আমি এসেছি সেই রাজ্য চাইতে।

প্রজ্ঞাসুন্দর। রাজ্য! কোন্ রাজ্য?

দীপ্তি। ভুলে গেলে! এম্‌নি তোমার স্মরণশক্তি! আমার আকাঙ্ক্ষায় গড়া নবজীবনের রাজ্য—মহতী আশার রাজ্য?

প্রজ্ঞাসুন্দর। আজ আমার কঠিন পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় আমাকে বিজয়ী হ'তে হ'বে—তারপরে—

দীপ্তি। তুমি বিজয়ী হ'লেই আমি হ'বো বিজয়িনী!—

প্রজ্ঞাসুন্দর। দীপ্তি, সেই বিজয়োৎসবে তোমার রাজ্য-গড়ার কল্পনা সফল হ'য়ে উঠবে। কিন্তু যে দুঃসাহসের কাজ আমি করতে যাচ্ছি—তা' একমাত্র অসীম শক্তিশালীকেই সাজে।—

দীপ্তি। আমি পূর্ণ বিশ্বাস করি।—আমি দেখ্‌তে চাই—তুমি ঊর্দ্ধে আরও ঊর্দ্ধে ঐ আকাশ-গম্বুজ-প্রসারী স্তম্ভের শিখরে বিশ্ব-জয়ীর মত দাঁড়িয়ে আছ,—আর পায়ের তলায় বিশ্ব-মানব দেখ্‌বে চেয়ে—বিরাট্ পুরুষ আমার মহাশিল্পীকে—সেই ঊর্দ্ধলোকে।—

প্রজ্ঞাসুন্দর। (বিমর্ষভাবে) কিন্তু আজ দুর্ব্বলতা আমাকে মাঝে মাঝে শঙ্কিত ক'রে তুল্‌চে!—যদি পতন হয়!—

দীপ্তি। সে কল্পনা কোরো না—প্রজ্ঞাসুন্দর!—(আবেগোচ্ছ্বাসে)—শক্তিমানের পতন কিসের?—আমি

তোমাকে শক্তি দোবো।—তোমার উচ্চ শির অভ্রভেদী ক'রে জগৎকে দেখাতে হ'বে—আমার কামনা!—(মিনতির স্বরে)—শুধু একটিবারের জন্যে এই অসাধ্য সাধন করো!—এই অসম্ভব আর একবার সম্ভব করো!—

প্রজ্ঞাসুন্দর। যদি তাই করি—দীপ্তি!—আমারই সৃষ্টি ঐ সমুন্নত স্তম্ভ-চূড়ায় উঠে—উচ্চশির ঊর্দ্ধে তুলে স্রষ্টাকে আমি পূর্ব্ববারের মত সম্বোধন ক'রে আমার বাণী প্রেরণ করবো।—

দীপ্তি। (বর্দ্ধিত উত্তেজনার বশে) কি বলবে তুমি?—

প্রজ্ঞাসুন্দর। তাকে ডেকে বলবো,—শোনো—শোনো—হে সৃষ্টি-কর্ত্তা গর্ব্ব-বিদিত সর্ব্বশক্তিশালী বিধাতা—তোমার যা' ইচ্ছা—তাই আমার সম্বন্ধে ধারণা করতে পারো। কিন্তু তুমি মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ করতে পারোনি।—এর পরে আমি যা' সৃষ্টি করবো—সে হ'বে জগতের শ্রেষ্ঠ বস্তু—

দীপ্তি। (বিমুগ্ধ ভাবে) অপরূপ হ'বে সে সৃষ্টি!—

প্রজ্ঞাসুন্দর। (প্রতি শব্দের 'পরে জোর দিয়ে দৃঢ়স্বরে) আর সেই সৃষ্টির রাজকন্যা হ'বে—সেই দীপ্তিময়ী রমণী যে আমার শক্তি—আমার প্রিয় লীলাসঙ্গিনী!—তা'র রাজ্যের আমি প্রতিষ্ঠা ক'রে দোবো।—

দীপ্তি। (হর্ষোৎফুল্ল হ'য়ে হাততালি যোগে)

ওঃ! অপূর্ব্ব—মনোহর! আমার রাজা! আমার কামনার রাজা!

প্রজ্ঞাসুন্দর। হ্যাঁ: তা'র প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় ভিত্তির 'পরে।—

[দূর থেকে সঙ্গীত ও জন-কোলাহল ভেসে আসতে লাগলো]

—কিসের এই কোলাহল? আর দেরী নয়, ঐ জন-সমুদ্রের মনকে আমি বশীভূত করবো—আমার অপূর্ব্ব কৌশল দেখিয়ে! সকলে বিস্ময়ে চেয়ে দেখবে—বিজ্ঞানের কি অপূর্ব্ব শক্তি! ঐ সঙ্গীত আমারই স্তুতি-রূপে পরিবর্ত্তিত হ'বে।

[তীব্র যন্ত্র-ঝঙ্কার—
যন্ত্রমানব চক্রপালের প্রবেশ]

—চক্রপাল—!

চক্রপাল। আমাকে ডাকচো তুমি?

প্রজ্ঞাসুন্দর। হ্যাঁ! প্রচার যন্ত্রের চাকা ঘোরাও—উঠুক ঝঞ্ঝনা, সকলকে জানিয়ে দাও—আজ আমার সৃজন-কৌশলের মহাশক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দোবো। এখুনি যাও।

চক্রপাল। চাকা ঘোরাবো—চাকা ঘোরাবো—সেই আওয়াজে সকলে চমকে উঠবে। সকলে কালা হ'য়ে যাবে—বোবা হ'য়ে যাবে। যন্ত্রের জয়!

[চক্রপালের প্রস্থান]

[সঙ্গীত-যোগে সম্মেলক গান ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো—জনতার কোলাহল—]

দীপ্তি। ঐ শোনো বীর! তোমাকে অভিনন্দিত করতে আসছে দলে দলে লোক! এবার তোমার বিজয়-যাত্রায় যেতে হ'বে।

[সমস্ত শব্দকে ডুবিয়ে দিলে সতেজ চক্রমুখর মন্দ্র]

সম্মেলক গান

সভ্য-গর্ব্ব জীর্ণ সঙ্গমে নব জ্যোতির্ময় আলোকে—
সত্যপন্থা-যাত্রী চলো পুলকে।
নবীন আশার শুভ্র শঙ্খ বাজিল আজি ভুলোকে॥

[জন-কলরবের উচ্ছ্বাস]

মহাগৌরব মন্দিরে আজি,
বিজয় ভেরী উঠুক বাজি',
জাগ্রত করো যন্ত্র-রাজ পূর্ণ প্রাণের আলোকে।
রচো নির্ভয় ইন্দ্রজাল,
তুমি দুর্জ্জয় বজ্রপাল,
সৃজন করো ধরণীতে নব-তন্ত্র-পালিত দ্যুলোকে॥

[জন-কোলাহলের উচ্ছ্বাস ও তীব্র চক্র-যন্ত্রের ঝনৎকার]

দীপ্তি। যাও বীর-সমস্ত জনতা তোমার অপেক্ষায় অধীর হ'য়ে আছে। তোমার বিজয়ী-কণ্ঠে দুলে উঠুক অম্লান অভিনন্দনের মালা।

প্রজ্ঞাসুন্দর। আমি পৃথিবীতে চমক লাগিয়ে দিয়ে স্রষ্টার আসন গ্রহণ করবো। তুমি আমাকে প্রেরণা দিয়ো। চেয়ে দেখো আমার অমিত শক্তির লীলা!

[প্রস্থান]

[জন-কোলাহল ও সঙ্গীত তরঙ্গিত হ'য়ে উঠবে]

[অনাড়ম্বর সৌম্যমূর্ত্তি শাশ্বতনাথের প্রবেশ]

শাশ্বতনাথ। দীপ্তি! তুমি এখানে? প্রজ্ঞাসুন্দর কোথায়?

দীপ্তি। কেন—শাশ্বতনাথ? আজ তিনি রণজয়ের অভিযানে গেছেন। তোমরা বুঝি শঙ্কিত হয়েছ?

শাশ্বত। শঙ্কা কিসের—দীপ্তি? এতোদিন যে দম্ভ-সেবী সত্য আবিষ্কার করবার দুরাকাঙ্ক্ষা নিয়ে ব'সে ছিল, তার পরাজয়-বার্ত্তা ঘোষণা করতে এসেছি।

দীপ্তি। ক্ষুদ্র তোমরা, তাঁর বিপুল শক্তির কাছে তোমরা ধূলোর সঙ্গে মিশে যাবে।

শাশ্বত। যে আপন শক্তির অভিমানে বন্দী হ'য়ে আছে, সে-ই নিজ-হাতে সাজিয়ে আনবে হার মানবার ডালা নবীনের পায়ে। সে যত অত্যাচার দিচ্ছে নিজেকে প্রমাণ করবার জন্যে, তারো দুর্ব্বলতাও ততো বেশী প্রকাশ পাচ্ছে। নবীনের কাছে তা'র প্রভাব তুচ্ছ হ'য়ে যাবে।

দীপ্তি। বলো কি শাশ্বত? তুমি নবীনের কথা তুল্‌চো কেন? তুমি তো প্রাচীন-পন্থী, পুরাতনের সেবক!

শাশ্বত। পুরাতনই তো চিরনবীন। যা' পুরা অথচ নব নব—সেই পুরাতন।······আজ প্রজ্ঞাসুন্দর বিজ্ঞানের ছায়াতে আত্মসমর্পণ ক'রে পর্ব্বতপ্রমাণ দর্প রচনা করেছে, তা' ধ্বংস হ'বে। কারণ, সত্য চিরন্তন—তা'কে আবিষ্কার করতে হয় না,—তা' প্রকাশ বিশ্বলোকে।—এই সত্যের অভিযানে সমস্ত মিথ্যা ভেঙে যাবে।

দীপ্তি। বৃথা তর্কে কাজ নেই! প্রজ্ঞাসুন্দরের শক্তির প্রমাণ এখুনি পাবে।···ঐ চেয়ে দেখো, আকাশকে তুচ্ছ ক'রে শক্তিশালীর বিজয়-যাত্রা! তোমাদের বিধাতাকে কৌতুক ক'রে উনি বার্ত্তা পাঠাবেন—এই ওঁর সঙ্কল্প।

শাশ্বত। তোমার কথা শুনে হাসি পায়। বিধাতার কাছে যে অতি ক্ষুদ্র—অণু-পরমাণু তা'র এই বাতুলতা দেখে কৃপা জাগে। তুমি বলচো—কৌশল দেখিয়ে ইন্দ্রজাল রচনা ক'রে প্রজ্ঞাসুন্দর তা'র শক্তির পরীক্ষা দিতে চায়?

দীপ্তি। (নেপথ্যের দিকে চেয়ে) ঐ দেখো—আমার বীর শিল্পী ঊর্দ্ধ থেকে ঊর্দ্ধলোকে উঠছে!···ওঠো—ওঠো! আরও উচ্চে ওঠো! দেখো—দেখো কি সাহস—কি দুর্জ্জয় শক্তি!······[প্রবীণের প্রবেশ] এই যে প্রবীণ! দেখতে এসেছ—শক্তির লীলা?

প্রবীণ। থামো—থামো!—আর না—আর উঁচুতে উঠো না!—দীপ্তি ওকে নিষেধ করো—থামাও ওকে! ও পাগল হয়েছে! বিধাতাকে আর কৌতুক করবার আস্পর্দ্ধা বাড়িয়ে তুলো না—প্রজ্ঞাসুন্দর,—নেমে এসো!

[জনতার বিপুল জয়ধ্বনি শোনা গেল]

[নেপথ্য থেকে কয়েকটি কণ্ঠের উক্তি—

"ধন্য—প্রজ্ঞাসুন্দর—ধন্য—ধন্য"······

দীপ্তি। (আনন্দে উল্লসিত হ'য়ে) শক্তিমানের জয়!

[কতিপয় কণ্ঠ]

এ কি—এ কি!—প'ড়ে যাচ্চে—প'ড়ে যাচ্চে—প্রজ্ঞাসুন্দর পড়চে—

(হতবুদ্ধি জনতার সোরগোল)

দীপ্তি। (সশঙ্কচিত্তে) আমার মহাশিল্পী!

প্রবীণ। (ভীতকণ্ঠে) ওহো—এ কি বিরাট্ পতন! আজ দুর্ব্বুদ্ধির ফলে উঁচু মাথা গুঁড়িয়ে গেল ব'লে! কে রক্ষা করবে—কে রক্ষা করবে!···আর রক্ষা হোলো না—বুঝি!—

[সকলের ভয়ব্যাকুল চীৎকার—ভীষণ পতনের শব্দ]

[যন্ত্রের উচ্চঘোষণা সহসা স্তব্ধ]

শাশ্বত। [গভীর সংযত কণ্ঠে] সব শেষ হ'য়ে গেছে।

[মৈত্রীর প্রবেশ]

মৈত্রী। এ কি ভীষণ পরীক্ষা! এ কাজ মানুষের পক্ষে অসম্ভব! আমি জানতুম—ও-র অন্ধ শক্তিমত্ততা একদিন এম্‌নি ক'রেই ওর বিনাশ এনে দেবে।

দীপ্তি। (যেন নিস্পন্দ মন্ত্রমুগ্ধ জয়োল্লাসের প্রেরণায় ব'লে উঠ্‌লো)—কিন্তু বীর তিনি—ঊর্দ্ধশিখরে তিনি উঠেছিলেন—আকাশে ঠেকেছিল তাঁর উন্নত শির! সেই সময়ে আমি শুনেছি অসীম শূন্যে জেগেছে তাঁর জয়ধ্বনি আর রুদ্রবীণার ঝঙ্কার!···

(হঠাৎ ক্ষিপ্ত প্রগাঢ়তায় বলে)

···বিজয়ী আমার—আমার মহাশিল্পী!

[বলতে বলতে প্রস্থান]

মৈত্রী। (দুঃখিত হ'য়ে) আশা-ভঙ্গের আঘাত ঐ রমণী সইতে পার্‌লে না। আজ্‌কে হর্ষে-বিষাদ ওকে উন্মাদিনী ক'রে তুলেছে।

শাশ্বত। এম্‌নি ক'রেই মিথ্যার হয় মৃত্যু। এই মিথ্যার সমাধির 'পরে সত্য জাগ্রত হোক্! পূর্ণাকে ডাকো—পূর্ণা—পূর্ণা! এখনো পূর্ণার আবির্ভাব হ'চ্চে না কেন?

[পূর্ণার প্রবেশ]

পূর্ণা। তোমার ডাক্‌বার আগেই আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি।

মৈত্রী। শাশ্বতনাথ, তুমি সত্যের বিজয় রথের নবীন সারথি। আজ অশান্তি দূর হোক্। শান্তির প্রতিষ্ঠা আনো। তার শুভ আবাহন করো!

শাশ্বত। আজ আহ্বান করি বিধাতার মানস-কন্যা সেই শান্তিকে। তিনি আসুন—অন্ধকার-চারী পিশাচের রক্তদীপশিখা লজ্জিত ক'রে! পূর্ণা—আজ বিজয়-উৎসব। মানবের কল্যাণে ডাক দাও শান্তিকে!

[পূর্ণার গান আরম্ভ হোলো]

পূর্ণা।

গান

মৃদুমন্দ তালে এসো কান্তিময়ী—
ধরা-মন্দতলে!
মধু-স্বপ্ন-মায়া রচো শান্ত-সুরে
প্রেম-মন্ত্র-বলে!—
লহো রিক্ত অকিঞ্চন চিত্ত-দানে,—
প্রীতি-মুগ্ধ গানে—
বাধা-মুক্ত অশান্ত আকাঙ্ক্ষা আনি'
পাদ-পদ্মদলে।
আনো রঞ্জিত ললিত আলোর সাধনা,
বিশ্বের অন্তরে নব-চেতনা!—
এসো নির্ভীক সত্যের অর্ঘ্যপাণি—
মোহ-ভ্রান্তি হানি',—
কোন্ সুধা-ভরা গন্ধের মালা দোলে
তব শোভন গলে॥

[মধুর সঙ্গীত-ঝঙ্কার]

মৈত্রী। হে নবীন তোমার দিকে সমস্ত জগৎ এক-দৃষ্টে চেয়ে আছে। তুমি সকলের অন্তর-বাসনা পূর্ণ করো, শাশ্বত!

প্রবীণ। শাশ্বতনাথ, বীরের হাতে তুমি অক্ষয় খড়্গ! বিশ্বের তপস্যা তোমাকে অজেয় বীর্য্যবলে অনুপ্রাণিত করুক্। তুমি বজ্রপাণি-রূপে হও লোকদ্বেষী দানব-জয়ী! আমাদের এই কামনা পূর্ণ করো। তুমি দেবতার রুদ্রদূত—বিধাতার জয়-তিলক তোমার ললাটে।

মৈত্রী। আসুক জগতে কল্যাণী শান্তি! বিশ্বমানব আবার নব প্রাণ সম্পদে সঞ্জীবিত হোক্! যা'রা দীন, যারা উদাসীন—তা'রা বাঁচার মত বাঁচতে শিখুক্।

শাশ্বত। মৈত্রীর অন্তর বাসনা পূর্ণ হবেই। অহঙ্কারের আধিপত্য বেশীদিন থাক্‌তে পারে না। সমুজ্জ্বল প্রভায় পরম সত্যের মহিমা আজ জগৎকে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলুক। বিশ্বের জন্যে আছে দেবতার আশীর্ব্বাদ। ভগবানের সেই দান নেবার শক্তি আজ অর্জ্জন কর্‌তে হ'বে। মদমত্ত মানুষ যখন নিজের মর্ত্ত্য-সীমা চূর্ণ কর্‌তে চায়, তখন বিধাতার অমর মহিমা কি দেখা দেয় না? এ পরম সত্যের কোনোদিন অপলাপ হয়নি। আজ কুহক থেকে প্রেমের মুক্তি আসুক সহজ সত্যের গৌরব-সঙ্গীতে।

প্রবীণ। শাশ্বত নবীন, তুমি আজ প্রবীণের আশীর্ব্বাদ নাও। প্রাচীর ঐ উদয়-দিগন্তে মুক্তি-অভ্যুদয় হয়েছে মঙ্গলদূত জীবনদাতার!

শাশ্বত। ধন্য হোক্ জাগরণ-দীপ্ত জীবন!
তমঃক্লিষ্ট রাত্রি হোলো শেষ—
উদয়-দিগন্তপানে চাহি অনিমেষ
অন্ধকার লভুক্ মরণ
আলোকের খড়্গাঘাতে,
জাগুক্ নবীন আজি চিরজীবী
আনন্দের সাথে,
আসুক্ প্রবল প্রাণ শঙ্খনাদে উচ্চকি' আকাশে,
লক্ষ বক্ষে উঠুক্ স্পন্দন সেই জাগার আভাষে।
কঙ্কর-কণ্টক কীর্ণ দীর্ঘ পথ 'পরে
জয়ধ্বজা উড়ায়ে অম্বরে—
যেতে হ'বে সত্যশিবসুন্দরের প্রতিষ্ঠা সাধিতে
অপমান-ক্লিষ্ট প্রাণে মুক্তি এনে দিতে।
আহ্বান এসেছে আজ—
ডাকিছেন বিশ্বপতি—
"করো ত্বরা সাজ,
মিথ্যার সে দুর্গ করো লয়,
হবে জয়, হবে পূর্ণ জয়।"

[গীতবাকের নবীনের অভিবন্দনা]

পূর্ণা ও গীতবাক্

(অভিনন্দন গান)

তোমার গলে পরাই অরুণ-জ্যোতির মালা!
সাজাই আমার আত্মনিবেদনের ডালা।
বক্ষ তোমার সুধায় ভরা,
মুক্তি আনো ক্লান্তি-হরা,
শোনাও তুমি বিশ্ব-হৃদয়-
জয়ের পালা॥
বিধাতারি গর্ব্ব তুমি,
পূর্ণ আপনা।
যৌবনেরি কান্তি তুমি—
সর্ব্ব কামনা।
চিত্তে জ্বালো হোমের শিখা,
দৃপ্তভালে আঁকো টিকা,
আহ্বান দাও জগত জুড়ে'
শান্তি ঢালা॥

মৈত্রী নমো নমো নমো হে অমৃত নবীন! প্রচার করো দিকে দিকে মুক্তির মহামন্ত্র-বাণী

[গম্ভীর শান্তিমগ্ন

সম্পূর্ণ

চক্র
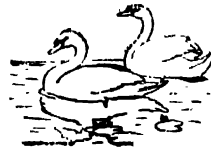
(The Hoop)

শ্রীমতী প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

এক

সবেমাত্র ভোর হয়েছে। রাস্তায় লোক চলাচলের তখনও অনেক দেরী!

বড় সহরের শেষের দিকে যে-দিকটা সহরতলী, নির্জ্জনতাপ্রিয়, অথচ সহরের সুবিধাগ্রহণেচ্ছু ধনীরা সেখানে আপনাদের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তেমনি একটি গৃহের সম্মুখস্থ বৃহৎ উদ্যানে একটি ছোটছেলে খেলা করিতেছিল, এবং তাহার মাতাও তাহারি সহিত ঘুরিতেছিলেন।

ছেলেটি তাহার নূতন পাওয়া রঙ্গীন চাকা ও রঙ্গীন ষ্টিক্ নিয়ে গড়িয়ে খেলা করছিল, আনন্দের তাহার অন্ত নাই। তার আনন্দ ও অর্থহীন উচ্ছ্বাস দেখে তার মাতা সস্মিত আনন্দের হাসির সহিত সস্নেহে তাহার প্রতি তাকাইয়া ছিলেন এবং তাহার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছিলেন।

ছেলেটির খুসীর সীমা নাই। কি চমৎকার চাকা! কি সুন্দর চাকা!

বাবা তাহার জন্যই আনিয়া দিয়াছেন। কয়দিন আগেও সে বাবাকে তাগাদা দিয়াছিল কিন্তু বাবা রোজই ভুলিয়া যাইতেন। ক্রমে সে হতাশ হইয়া গিয়াছিল।

কাল রাত্রে বাবা যখন প্যাকেট খুলে এত সুন্দর এমন ঝক্‌ঝকে হলুদ রং-এর চাকা ও তাহার ছড়ি বাহির করিলেন তখন তার আনন্দ সে কেমন করে প্রকাশ করবে ভেবে পেলো না। কত ভাল বাবা তার।

কি জোরে চাকাটা চলছে! এখনি রাস্তায় পৌছে যাবে। অনাবশ্যক উঁচুতে ষ্টিকটা তুলে ধরে ছেলেটি ছুটছিল। আজ তার ঘুম ভেঙ্গেছিল ভোরে, আজ তাকে ডেকে তুলতে হয় নি, সেই মাকে ডেকে নিয়ে এসেছে বাগানে। আজকের দিনের মত আনন্দময় দিন তার স্মরণ হচ্ছে না। ছুটতে ছুটতে চলে এসেছে রাস্তায়।

শিশুর জগত সব সময়ই আনন্দময়। আনন্দহীন শিশুর সংখ্যা জগতে বিরল। যে শিশু আনন্দহীন, তাহার আনন্দহীনতার জন্য দায়ী তার অভিভাবক।

দুই

একটি বৃদ্ধ চলেছিল রাস্তা দিয়ে। মলিন সজ্জা, নতদেহ ন্যুব্জবৃদ্ধ মাতাপুত্রের গতির মধ্যে এসে পড়ে থমকে দাঁড়ালো। তাঁরা ততক্ষণে পুনরায় তাঁদের উদ্যানে প্রবেশ করেছেন। ছেলেটির কলকণ্ঠের উচ্চহাসি ভেসে এসে বৃদ্ধের কাণে লাগলো। প্রত্যুত্তরে মায়ের মিষ্টকণ্ঠের কথা ও স্নেহভরা মধুর হাসি বৃদ্ধ দেখতে পেলে।

ফ্যাক্টরীর পথে এগিয়ে যেতে যেতে বৃদ্ধের মুখে একটি স্তিমিত হাসি ফুটে উঠলো।. বালকটির পানে তাকিয়ে কেমন যেন এক নূতন জগতের মানুষ ওরা বলে বৃদ্ধের মনে হয়। সে ভাবতে থাকে কি সুন্দর ছেলেটি? 'চমৎকার ছেলে, কেমন স্ফূর্ত্তিবাজ? ভদ্রলোকের ছেলে কি না, তাই? এদের ছেলেরা এই রকম হয়। মা'টিও কেমন সুন্দর দেখতে? কি চমৎকার কাপড়-চোপড়, মুখে কেমন যেন একটা মিষ্টভাব লেগে রয়েছে। বড় আরামের জীবন ওদের। ভদ্রলোক, বড়লোক কি না, তাই।

ছেলেকে ওরা কত আদর করে, কিন্তু ছেলেরা তো ভালই থাকে? হঠাৎ বৃদ্ধের মনে হয় আপনার বাল্যকালের কথা। কি জীবন ছিল তাহাদের? ঘৃণ্য পশুর জীবন যাপন। বকুনী, মার, আর আধপেটা খেয়ে থাকা। খেলনা? অমন একটা চাকা অথবা বল, কি তেমন কিছু একটা অল্প দামী খেলনা কোথায় পাবে তারা? তাদের শিশুকাল কেটে গেছে অভাবে ও অনশনে। তাদের বিগত বাল্য-জীবনের কোন মধুময় স্মৃতি মনকে আনন্দিত করে না। কি আশ্চর্য্য একটি দিনও কি তাদের আনন্দে আর আরামে কাটে নি? কেবল দুঃখ আর কেবল কষ্ট? কেমন একটা অদ্ভুত হাসি বৃদ্ধের দন্তহীন মুখে ফুটে ওঠে।

হঠাৎ যেন ও মনে মনে বালকটিকে হিংসা করে। With a silver spoon in the mouth.

ফ্যাক্টরীর পথে চলতে চলতে ও কেবলি সেই বালকটি ও তার স্নেহময়ী মায়ের কথা ভাবতে লাগলো। আজিকার প্রভাতে দেখা দৃশ্য বৃদ্ধ শ্রমিকের মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়াছে। ধনীগৃহের সংস্কৃতিপূর্ণ জীবন ও বাৎসল্যময়ী মাতা যেন একখানি চিত্রের মত তাহার মনে ছাপ দিয়াছে। বুভুক্ষুহৃদয় বৃদ্ধ বুঝিতে পারে না কেন তাহার এত ভাল লাগিয়াছে। ফ্যাক্টরীর অভ্যস্ত কাজের মাঝে জেগে ওঠে ঐ বালকটির মূর্ত্তি। ক্রীড়ারত বালক দৌড়াইতেছে, হাসিতেছে। কি সুন্দর ধপধপে পরিচ্ছন্ন মোটা মোটা পা-গুলি তাহার। কেমন দৌড়াইতেছে।

অকারণে বার বার ষ্টিকটা উঁচু করিতেছে।

সমস্ত দিন কাজের মাঝে ঘুরে ফিরে এই কথাগুলি তার মনে হতে লাগলো।

কর্ম্মক্লান্ত বৃদ্ধ আজ ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলে সেই বালকটির।

তিন

পরের দিনও তার স্বপ্নের রেশ কাটলো না।

হঠাৎ দেখা পথের দৃশ্য তার মনকে যেন আচ্ছন্ন করে ধরেছে।

মেসিন ঘুরছে, কাজ হচ্ছে, সারাটা কারখানা জন-কোলাহলে মুখর হয়ে উঠেছে। লাফিয়ে লাফিয়ে মেসিনটা ঘুরছে, ঘর ক্রমেই গরম হয়ে আসছে।

বৃদ্ধ অভ্যস্ত হস্তে কাজ করে যায়, কিন্তু স্তিমিত চোখে দন্তহীন মুখে মৃদুহাসির রেখায় মনে হয়, সে যেন কি এক চিন্তায় বিভোর হয়ে রয়েছে। মেসিনের আওয়াজ দ্রুততর হচ্ছে, হিস্ হিস্ শব্দের সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে চাকাগুলো ঘুরছে। কর্ম্মরত শ্রমিকগণ ঘুরছে মেসিনের মতই। তাদের নিঃশব্দ চলাফেরায় মনে হচ্ছে তারা যেন অশরীরী। নিস্তব্ধতার মাঝে মানুষের কথাগুলো যেন মেসিনের গায়ে বাজে।

কিন্তু সকল কর্ম্মব্যস্ততাই বৃদ্ধের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে এক অদ্ভুত চিন্তা বৃদ্ধের মাথায় আশ্রয় নিয়েছে; সে মনে মনে ভাবছে—সে যেন আবার তার বাল্য-কালে ফিরে গেছে, হাতে তার ষ্টিক; সঙ্গে চাকা রয়েছে, সে খেলে বেড়াচ্ছে, সঙ্গে রয়েছেন তার স্নেহময়ী মা, ওই মায়ের মত।

তার বেশভূষা পরিচ্ছন্ন, তার হাত পা গুলি মোটা মোটা থপ থপ করছে।

সারা জীবনের অতৃপ্ত শিশুজীবনের বুভুক্ষা যেন সহসা আত্মপ্রকাশ করিয়া কল্পনার মধ্যে আশ্রয় লয়। আপনার রচিত স্বপ্নে সে আপনিই বিভোর হইয়া থাকে।

সে ছিল যেন একটি ছোট ছেলে এবং তার মা ছিল…

চার

একদিন কাজের শেষে বাড়ী ফেরবার সময় সে পথের ধারে একটি ছোট চাকা দেখতে পেল। সেই ছেলেটির চাকার মত। তবে বিবর্ণ পুরানো রং-ওঠা চাকা। কোনও ছোট ছেলে খেলার শেষে ফেলে দিয়েছে হয় ত। হয় ত সেই ছেলেটিই? বুড়ো আনন্দে শিউরে উঠলো। বলি-রেখাঙ্কিত চোখের কোণে অশ্রু এসে জমলো। হঠাৎ এক অদ্ভুত ইচ্ছা তার মনে জেগে উঠলো। চাকাটা নিলে কেমন হয়? প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই সে হাত বাড়িয়ে চাকাটা তুলে নিল। হাতটা তার ভয়ে লজ্জায় কাঁপছিল। চারি-দিকে সে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকালো, কেউ দেখছে না কি? তার পর ছেলে মানুষীর লজ্জায় তার মুখটা শিশুর সরল লজ্জিত হাসিতে ভরে উঠলো। কে তাকে দেখছে এই সন্ধ্যার অন্ধকারে? না না, কেউ লক্ষ্য করছে না তাহাকে। একজন মজুর শ্রেণীর লোক পথ থেকে যদি একটা চাকা কুড়িয়ে নিয়ে যায়, তাতে তো বিস্ময়কর কিছু নেই।

কিন্তু সে প্রায় চোরের মতই লুকিয়ে চাকাটা নিয়ে গেল আপনার ঘরেতে। কেন যে সে চাকাটা নিয়ে গেল, তা নিজেই বুঝতে পারলো না। হয় ত ওই ছেলেটির চাকার মত চাকা বলে নিয়ে গেল, এও হতে পারে।

কয়দিন ধরে চাকাটি তার নিজের বিছানার পাশে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে পড়ে রইল।

পাঁচ

রবিবার ভোরে সেদিন তার ঘুম ভাঙ্গতেই তার বড় ভাল লাগলো। রোজই সে প্রত্যুষে ওঠে। আজ তার চাইতে আরো আগে তার ঘুম ভেঙ্গেছে।

শিশির-ভেজা সকালটি যেন নূতন রূপ নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালো। পাখীর কূজনধ্বনি সবেমাত্র সুরু হয়েছে।

শয্যা হতে নেমেই চোখে পড়লো সেই চাকাটি, এক লজ্জিত মৃদু হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে। তার বুভুক্ষু বাল্য-জীবন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগলো। বৃদ্ধ সন্তর্পণে সেই চাকাটি তুলে নিয়ে চলে গেল দূরে নির্জ্জন বড় বাগানটার মধ্যে। গাছপালার জন্য বাগানের ভিতরটা দেখা যায় না।

কাশতে কাশতে বৃদ্ধ এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

মুক্তার মত শিশিরবিন্দু পাতায় পাতায় জমে রয়েছে, নাড়া পেয়ে তারা ঝরে পড়লো। সদ্য ঘুমভাঙ্গা পাখীর কাকলীতে বন যেন পরীরাজ্য।

মোটা মোটা শিকড়ের বাধা পেরিয়ে বৃদ্ধ একটি গাছ থেকে শুকনো ডাল ভেঙ্গে নিয়ে চাকাটি গড়িয়ে দিল, তারপর চললো তার খেলা। চাকাটিকে গড়িয়ে দিয়ে সে ছুটে বেড়াতে লাগলো। শিশুর মত সরল অকৃত্রিম হাসি তার মুখে। ষ্টিকটা বার বার উঁচু করে ধরছিল, বৃদ্ধ ছুটল বালকের মতই।

এমনি খেলার মাঝে তার মনে হতে লাগলো সে ভাবনা-চিন্তাহীন একটী ছোট ছেলে অবস্থাপন্ন ধনীর পুত্র। নিশ্চিন্ত আরামপূর্ণ তার জীবন। শিশুকালে সে খেলে বেড়াচ্ছে। আর তার স্নেহময়ী মা স্নেহভরা মৃদুহাস্যভরে যেন তার দিকে তাকিয়ে আছেন। হাসির সঙ্গে কাশির শব্দ যোগ দেয়, দৌড়তে গিয়ে শীর্ণপদদ্বয় দেহভার বহন করতে পারে না।

তবু তার স্বপ্ন তাকে জাগ্রত রাখে। সে কম্পিতপদে দৌড়ায় আর দৌড়ায়। সে ছোট একটী ছেলে, এবং তার মা…

ছয়

বৃদ্ধের আপনার নিকট যে সঙ্কোচ তাহা সেদিন হইতে ভাঙ্গিয়া গেল, ইহার পর হইতে ছুটির দিনে সে আসিত খেলা করিতে। ইহা যেন এক অদম্য আকর্ষণে তাহাকে

টানিত। এবং এই অদ্ভুত হাস্যকর খেলা বৃদ্ধ দিনের পর দিন তন্ময় হইয়া খেলিত।

সময় সময় চমক ভাঙ্গিয়া বৃদ্ধ ত্রস্ত হইয়া দেখিত তাহার এই খেলা কেহ দেখিতেছে কি না। কেহ নাই দেখিয়া লজ্জিত হাসিমুখ ফিরাইয়া লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া খেলিত।

খেলার শেষে যখন গৃহে ফিরিত তখন বৃদ্ধের মুখে তৃপ্তির অনাবিল মধুর হাসি লাগিয়া থাকিত।

সাত

এর পর আর নূতন কোন ঘটনা ঘটে নাই।

এই রকম খেলা সে কিছুদিন খেলেছিল এইমাত্র।

তারপর ভোরে ওঠার জন্য ঠাণ্ডা লেগেই হউক বা অন্য কারণেই হউক হঠাৎ নিউমোনিয়া হয়ে বৃদ্ধটি মারা গেল। হস্‌পিটালেই সে মারা গেল, যেহেতু গৃহে তাহার আপন বলিয়া কেহ ছিল না।

হস্‌পিটালের লোকেরা দেখেছিল তার মৃত্যুমলিন মুখে তৃপ্তির মধুর হাসি লেগে রয়েছে। কেন?

হয় ত বিকারের ঘোরে সে দেখেছিল দুঃখ-দুর্ভাবনাহীন ছোট ছেলেটি হয়ে সে ঘাসের উপর ছুটাছুটি করে খেলা করছে, এবং অদূরে দণ্ডায়মানা তার মা তার খেলা দেখছেন পরম স্নেহভরে।

ভারতবাসীর মিলন হয় না কেন?

প্রায় এক হাজার বৎসর আগে সর্ব্বপ্রথমে ইয়োরোপের স্থানে স্থানে, মানুষের প্রয়োজনে যাহা যাহা লাগে, তাহার অনেক বস্তুর অত্যন্ত অভাব দেখা দিয়াছিল এবং ঐ ঐ স্থানের মানুষ স্ব স্ব অন্নবস্ত্রের অভাব পূরণ করিবার জন্য আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া বিপদসঙ্কুল রাস্তায় ভারতবর্ষে গমনাগমন করিবার জন্য প্রযত্নশীল হইতেছিলেন; কারণ ভারতবর্ষে যে জগতের অন্যান্য দেশের তুলনায় মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তুর প্রাচুর্য্য অত্যধিক, তাহা তখনও ইঁহারা পরিজ্ঞাত ছিলেন।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে ভারত ও চীন ছাড়া জগতের প্রত্যেক দেশেই মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব হইতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং বহুদিন পর্য্যন্ত কেহই নিজ নিজ দেশে যাহাতে প্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপত্তি বৃদ্ধি পায়, তাহার চেষ্টা করেন নাই। তখনও ভারতবর্ষে প্রাচুর্য্য এত অধিক ছিল যে, জগতের অন্যান্য দেশের পক্ষে ভারতবর্ষ হইতে স্ব স্ব অভাব পূরণ করা সম্ভবযোগ্য হইত।

ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের প্রাচুর্য্য কমিতে আরম্ভ করে এবং ভারতবর্ষ হইতে সকল দেশের অভাব সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা অসম্ভব হয়, এইরূপে গত তিনশত বৎসর হইতে জগতের বহুদেশে পুনরায় প্রচুর পরিমাণে মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপন্ন করিবার আয়োজনের সাড়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু যে বিদ্যা থাকিলে স্বাস্থ্যকর বস্তু অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা সম্ভব হয়, সেই বিদ্যা অদ্যাবধি জগতের কোন দেশ লাভ করিতে পারে নাই। ঐ বিদ্যা একদিন একমাত্র ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল এবং ভারতবাসিগণ উহা সারা জগৎকে বিতরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহাদের আলস্যের ফলে এক্ষণে তাঁহারা পর্য্যন্ত উহা বিস্মৃত হইয়াছেন এবং আধুনিক জগতে বিদ্যা ও শিল্পের নামে যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি মানুষের উপকার সাধন করা ত' দূরের কথা, বস্তুত পক্ষে তাহাদের অপকারই সাধন করিতেছে।

বঙ্গশ্রী—মাঘ, ১৩৪৩

প্রভু দর্শনে

(গল্প)

শ্রীজনরঞ্জন রায়

তুলসী বাবু সকাল বেলা প্রভু দর্শনে বাহির হইতেছিলেন। সম্মুখেই সপুত্র প্রভুপাদ। কি শুভযাত্রা! তুলসী বাবু ওরফে গৌরচরণতুলসী চৌধুরী একেবারে গৌরগতপ্রাণ। প্রতি বৎসর চট্টগ্রাম হইতে নিয়ম-সেবার সময় ধামে আসিবেনই আসিবেন। এবার নূতন উৎপাতে প্রাণ হাতে নিয়াও আসিয়াছেন। এককালে তিনি ছিলেন প্রভুপাদদের কামধেনু। প্রভুপাদরা এখনো তাঁর মায়া কাটাইতে পারেন নাই।

সপুত্র প্রভুপাদ হাজির হইয়াছেন। আজ তাঁর প্রভু সেবার পালা। তুলসী বাবু শশব্যস্তে তাঁদের পায় মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলেন। প্রভুপাদ সবিস্ময়ে বলিলেন—তুলসী বাবু যে আসিয়াছেন, তিনি তাহা মোটেই জানিতেন না...সবই প্রভুর ইচ্ছা...ভক্ত ছাড়া যে ভগবান থাকিতেই পারেন না।

তুলসী বাবু কাল রাত্রে আসিয়াছেন। কখন আসিয়াছেন তাহাও প্রভুপাদ জানেন। তাই সকালেই তাঁকে সপরিবারে প্রসাদের নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন। তুলসী বাবুর মত ভক্ত কয়টাই বা মিলে—তা' যতই তিনি হাত গুটাইয়া থাকুন না কেন।

কারবার ও তেজারতিতে তুলসী বাবু আস্তিল ব্যক্তি। সন্তান না হওয়ায় দ্বিতীয়...তৃতীয় সংসারও করিতে হইয়াছে। প্রভুর ইচ্ছায় শেষ বয়সে বংশধর লাভ করিয়াছেন। ভক্ত-পদরেণু শশিকলার মতো দিন দিন বাড়িতেছে। পুত্রমুখ দর্শনের পর তিনি হাত কষিলেন। তবে প্রভুপাদদের প্রতি একেবারে অকরুণ ন'ন।

বেঁটে রোগা কালো লোকটি...মোটা নাকের উপর তিলক...ছোট ছোট চোখে কঠোর কুসীদজীবীর দৃষ্টি। মাথায় টিকি...গলায় মালা...গায়ে হাতকাটা বেনিয়ান। পায়ে দড়ির জুতা...হাতে নামের ঝোলা। তুলসী বাবু প্রভু দর্শনে চলিয়াছেন। পিছনে ঐ বেশে দেওয়ানজী...তবে শুধু পা। সামনে রাধাতত্ত্ব বলিতে বলিতে চলিয়াছেন প্রভুপাদ। হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন তুলসীবাবু। সভয়ে প্রভুপাদের হাহাকার রব...দেওয়ানজীর আর্ত্তনাদ। তুলসী বাবু বসিয়া পড়িয়াছেন...পা দিয়া রক্ত পড়িতেছে। দড়ির জুতা ফুড়িয়া পায়ে কাঁচ ফুটিয়াছে। জল জল রবে প্রভুপাদদ্বয় ছুটাছুটি করিতেছেন। বাবুকে কোলে নিয়া দেওয়ানজীর বিটল চোখে সাতার পাথার বহিল। জল আসিল। প্রভুপাদদের ছোয়া জল তুলসী বাবু পায়ে দিলেন না। পাশেই ছিল কালীকুমার ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারী। ডাক্তার ডাকিল—আসুন, আসুন, কি হয়েছে দেখি। ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার তুলসী বাবুর পা ধুয়াইতে গিয়া দেখিল একটা সরু কাঁচের টুকরা পায়ের ভিতর ঢুকিয়া আছে। ডাক্তার বলিল—মাইনার অপারেশন্...একটু চিরে বার কর্‌তে হবে...চার টাকা লাগবে। শুনিবামাত্র তুলসী বাবু উঠিলেন...প্রভুপাদও উঠিলেন। দুই দল অবশ্য দুই কারণে উঠিলেন। তুলসীবাবু উঠিলেন চার টাকা গরসেলামি দিবার ভয়ে...আর প্রভুপাদরা উঠিলেন টাকা কয়টা মোহন বেণুর জায়গায় কালীকুমার পাইয়া যায় দেখিয়া। প্রভুপাদ বলিলেন—চলুন বেণু ডাক্তারের কাছে...আপনার বাড়ীর ডাক্তারই তো মোহনবেণু বাবু।

কালী ডাক্তার নূতন পাশ করা ছোকরা লোক...নেহাৎ অব্যবসায়ী...টাউট রাখে না। প্রভুপাদদের সে শুনাইয়া দিল—যত সব আড়কাটী...সেখানে না গেলে দু' পয়সা কমিশন হবে কেন?

মোহনবেণু ডাক্তার বৃদ্ধ ঘাগী লোক...প্রভুপাদদের দাসানুদাস। তাঁদের কাছে এক পয়সা ভিজিট নেয় না। তাই প্রভুপাদদের যত অনুগত ভক্ত বাড়ীতে বেণু ডাক্তারের একচেটে অধিকার। বেণু ডাক্তারেরও গলায় মালা... মাথায় টিকি...খালি গা...পরণে কেটের শুদ্ধ কাপড়।

তাঁরা তিন জনে পাঁজাকোলা করিয়া তুলসী বাবুকে বেণু ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারীতে নিয়া গেলেন। রোগী দেখিয়া বেণু ডাক্তার যেন আতঙ্কে অস্থির হইয়া উঠিল। রোগী যেন এখনি মরিয়া যায় এমন ভঙ্গী করিল। বলিল—কি সর্ব্বনাশ, কাঁচ যে গমকে গমকে হাড়ে গিয়ে বিঁধেছে... এখনো যে টিটেনাস হয়নি খুব ভাগ্যি! তুলসী বাবুর বুকে পিঠে নল বসাইয়া...হাতে ব্লাড-প্রেশারের পটি বাঁধিয়া—সে তুমুল কাণ্ড বাধাইল। কম্পাউণ্ডার ক্লোরোফরম্ করিল... অর্থাৎ নাকে কি একটা শুকাইল...তুলসী বাবু অবশ্য সজ্ঞানেই রহিলেন। বেণু ডাক্তার অপারেশন্ করিল। লাগিল কিন্তু ষোল টাকা। প্রভু রক্ষে করো...প্রভু রক্ষে করো রবে প্রভুপাদরা আকাশ ফাটাইয়া ফেলিলেন।

বাঙ্গলার ঘরোয়া প্রবাদ

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

(দ্বিতীয় স্তবক)

কাঁচায় না নোয়া'লে বাঁশ,
পাকায় করে টাঁস্ টাঁস্।

বাঁশের কঞ্চিকে কাঁচা অবস্থায় নোয়ানো যায়, পাকিলে আর বাকানো যায় না, তখন বাঁকাইতে গেলে কঞ্চি ভাঙ্গিয়া যাইবে। মাটির জিনিসে কাঁচা অবস্থায় যাহা কিছু লেখা বা খোদা যায়, তাহা পোড়াইয়া লইবার পর আর তাহাতে কোনকিছু লেখা বা খোদাই করা চলে না। ছেলেবেলায় কিছু না অভ্যাস করাইলে বড় হইলে পর আর সে অভ্যাস করানো কঠিন হয়।

কভু গাড়ী 'পর্ না;
কভু না 'পর্ গাড়ী।

আবশ্যক হইলে, গোরুর গাড়ী করিয়া শূন্য নৌকা লইয়া যাওয়া হয়। আবার সময় বিশেষে, অর্থাৎ নদী পারের সময়, নৌকার উপর গরুর গাড়ী তুলিয়া তাহা পার করা হয়। জগত, সংসার, সমাজ সর্ব্বত্রই এই নিয়মে কাজ চলিতেছে। কখনো রামকে শ্যামের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হইতে হইতেছে, আবার কখনো শ্যামকে রামের কাছে সাহায্যের জন্য আসিয়া দাঁড়াইতে হইতেছে। আরও দূরে ইহার অর্থ যাইতে পারে। অর্থাৎ, সংসারে পিতার অধীনে অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রকে একদিন থাকিতে হয়, আবার উত্তরকালে, পিতার বৃদ্ধাবস্থায়, তাঁহাকে সেই পুত্রেরই অধীনে থাকিতে হয়। অবস্থার পরিবর্ত্তনই বাক্যটির মূল ভাব।

কান শুনতে ধান শোনে
অথবা
ধান শুনতে কান শোনে।

ইহাতে অমনোযোগিতা বুঝাইতেছে। ইহা ছাড়া অন্য কোন অর্থ আছে বলিয়া মনে হয় না। অর্থাৎ এমনি অন্যমনস্ক লোক, যে তাহাকে 'ধান' বলিলে সে শোনে 'কাণ'; বা 'কাণ' বলিলে শোনে—'ধান'। যাহারা কোন কথাই মনোযোগ দিয়া শোনে না। তাহাদেরই বুঝাইতেছে।

৩২। **কা'রো সর্ব্বনাশ; কা'রো পৌষমাস।**

জগতের নিয়ম—ঠিক একই সময়ে কাহারো সুখের অবস্থা, কাহারো দুঃখের অবস্থা। একই পল্লীতে কাহারো গৃহে পৌষের উৎসব আনন্দ; অর্থাৎ খামারে ধান্য উঠিতেছে, ধান্য ঝাড়া হইতেছে, নূতন ধান্যে গোলা বোঝাই হইতেছে, নূতন গুড়ের সুগন্ধে গৃহ ভরপুর, পায়েস হইতেছে; পিঠা হইতেছে; চারিদিকে উৎসব ও আনন্দের সাড়া। আবার কাহারো গৃহে বিপদের পর বিপদ আসিয়া গৃহবাসীদের উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছে। বাক্যটি পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরেই বেশী খাটে। গ্রামে পাড়া-প্রতিবাসীর মধ্যে যে পরিমাণ সমবেদনা ও সহানুভূতি পাড়াগাঁয়ের থাকে, সহরে ততটা থাকে না। তবে এই গ্রাম ধ্বংশের যুগে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কাজে কুঁড়ে, ভোজনে দেড়ে!

ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। এই শ্রেণীর 'মহৎ লোক' সংসারে বিরলও নহে। আমাদের প্রায় সকলেই এই শ্রেণীর জীবের সহিত অল্প-বিস্তর পরিচিত। আমাদের ঘরের পরেশকে এই শ্রেণীভুক্ত করিলে তাহার অপমান করা হয়। সে কাজে কুঁড়ে বটে, কিন্তু ভোজনে কিছুতেই 'দেড়ে' নয়; ভোজনে সে 'আড়াই-য়ে'—কিম্বা তারও উপর।

কালি, কলম, মন—
লেখে তিন জন।

কালি ভাল হওয়া চাই, কলমটি ভাল হওয়া চাই; তার উপর লেখকের লেখার প্রতি গভীর মনোযোগ থাকা চাই, তবেই হাতের লেখাটি ভাল হইবে। তাহা না হইলে, নিজের হাতের লেখা, নিজেই না পড়িতে পারিয়া—'কোন্ ষ্টুপিড্ লেখা হ্যায়' বলিয়া হয়ত তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে হবে।

কোঁচা ছোট, কাঁচা টান্,
তা'র বাড়ী বর্দ্ধমান।

আগেকার দিনে, বোধ হয়, বর্দ্ধমান জেলার সাধারণ স্তরের লোকেরা ছোট কাপড় ব্যবহার করিতেন, তাহাতেই কথাটার সৃষ্টি। বলা বাহুল্য, এখন সে সব ছোট কাপড় পরার রেওয়াজ আর অভ্যাস তাঁহাদের নাই। সঙ্গে সঙ্গে তখনকার দিনের মত সে 'সীতাভোগ' 'মিহিদানা'ও আর নাই।

কার শ্রাদ্ধ কেবা করে,
খোলা কেটে বামুন মরে।

মৃতের শ্রাদ্ধাধিকারীদের খোজ খবর নাই, পুরোহিত 'কলার খোলা' কাটিয়া, অন্য সব যোগাড়পত্র করিয়া তাহাদের অপেক্ষায় বসিয়াছে, কিন্তু কাহাকেও পাইতেছে না। তাহারা, হয়—মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা লইয়া মসগুল, নয়—আর কোন ব্যাপারে মত্ত, শ্রাদ্ধের কথা তাহাদের মনেই নাই। এই সূত্রেই এই খেদোক্তির সৃষ্টি। ঠিক এই শ্রেণীর প্রবাদ আরও যাহা আছে, তাহা ইহার পরই দেওয়া হইল।

যার কাজ সে নেইকো কোথা,
পাড়া-পড়সীর মাথা ব্যথা।
যার বিয়ে, তার মনে নেই;
পাড়ার লোকের ঘুম নেই।

তিনটি বাক্যেরই ভাব এক।

কথায় চিঁড়ে ভিজে না, কাজ চাই।

টীকার কোন প্রয়োজন নাই। সুপরিস্ফুট ভাব। মুখের কথা দ্বারা কাজ সম্পন্ন হয় না। কাজ করিতে হইলে, দরকার হয়—মন এবং হাত। তাহা না করিয়া, যাহারা শুধু 'মুখ-সর্ব্বস্ব' তাহাদেরই উদ্দেশে এই উক্তি।

কাণা গরু বামুনকে দান।

দানজনিত পুণ্যসঞ্চয়ের ইচ্ছা আছে, অথচ কাহাকে কিছু দিতে গেলেও বুক ফাটে। এই সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া, বুদ্ধি সহকারে দুইকুল রক্ষা করিল - একটা কানা গরু বামুনকে দান করিয়া। দাতা হয়ত মনে করিল যে, তাহার পুণ্য হইল; কিন্তু এরূপ দানে যে পুণ্য সঞ্চয় হয় না, তাহা ঐ প্রকৃতির লোককে ৭ দিন ৭ রাত্র ধরিয়া বুঝাইলেও সে বুঝিবে না।

কাক, কাঙ্গালী, ভাট্— তিন নিয়ে—কালীঘাট।
তাল, মান, সুর— তিন নিয়ে ভবানীপুর।
চিঁড়ে, মুড়কী, ঝ্যাতলা— তিন নিয়ে চেতলা।
টিকে, তামাক, কলকে— তিন নিয়ে সালকে।
ষাঁড়, সিঁড়ী, সন্ন্যাসী— তিন নিয়ে কাশী।

উপরোক্ত পাঁচটি বাক্যের মত আরো ঐ শ্রেণীর বাক্য প্রচলিত আছে। বাক্যগুলি সার্থক। যাঁহারা কাশী গিয়াছেন, তাঁহারা ঐ স্থানের পথচারী ষাঁড়, গঙ্গার ঘাট সকলের সিঁড়ী এবং সন্ন্যাসীর প্রাচুর্য্যের বিষয় অবগত আছেন। চেতলা—কালীঘাটের পশ্চিমে, আদিগঙ্গার পরপারে। চেতলার হাট বিখ্যাত ও বহুকালের এবং সে হাটে চিঁড়ে, মুড়কী ও ঝেতলা নামক এক প্রকার মোটা মাদুরের অত্যন্ত আমদানী হয়। ভবানীপুরে সত্যই সেকালে বহু সঙ্গীতজ্ঞ লোকের বাস ছিল। হাওড়ার সংলগ্ন সালকিয়ার কথা বলিতে পারি না, তবে বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকের কালীঘাটেই বাড়ী, কালীঘাট সম্বন্ধে যে বাক্য, তাহা খাঁটি। তবে 'ভাট্' সম্প্রদায় বর্ত্তমানে কমিয়া গিয়াছে। কাকও কমিয়াছে, তবে কাঙালীর সংখ্যা ঠিকই আছে,—সেই 'স্বর্ণলতা'র দিনেও যেমন, এখনও তেমনি।

কিসে আমি কম্—কিসে আমি কম্?
পায়ের নূপুর আমার বাজে ঝম্ ঝম্।

বোধ হয় অর্থ এই, যে, তাহার আর কোন শিক্ষা বা সম্বল নাই, শুধু পায়ে তাহার নূপুর বাঁধা। সেই নূপুরের ঝম্ ঝম্ শব্দে যখন চারিদিক মুখরিত হয়, তখন অন্য কাহারো অপেক্ষা সে ছোট কিসে? অথবা, সে নৃত্য করিতে পারুক আর নাই পারুক, তার নূপুরের যখন ঝম্ ঝম্ শব্দ হয়, তখন নৃত্যের আর বাকী রহিল কি।

আমার দ্বারা কার্য্যসম্পন্ন হো'ক বা নাই হো'ক, হট্ট গোল ত হয়। হট্ট গোলের সৃষ্টিই বা কয়জন করিতে পারে? কথাটার মধ্যে আত্মগরিমার ভাব নিহিত বলিয়া মনে হয়।

কাণা গরুর ভিন্ন গোঠ (বা গোয়াল)।

কাণা গরুর জন্য ভিন্ন গোঠে রের বা গোয়ালের দরকার। নচেৎ ভাল গরুদের অর্থাৎ চোখওয়ালা গরুদের বহু বিষয়ে ভুগিতে হয়। সে দেখিতে না পাওয়ায় অন্য গরুর ঘাড়ে পড়ে, অন্য 'ডাবা'য় মুখ দিয়া অপরের 'জাব্' খাইয়া ফেলে। এই অর্থে—স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোকের সাধারণ লোকের সঙ্গে থাকা চলে না; তাহাতে সাধারণ লোককে নানা অসুবিধায় পড়িতে হয়।

কম্বল নষ্ট খাটে, কাপড় নষ্ট টাটে।

কম্বল বিছানায় বারমাস পাতিয়া রাখিলে পোকা লাগিয়া নষ্ট হয়। কম্বলকে মেঝেয় পাতিয়া, মাটীতে বিছাইয়া, উঠানে পাতিয়া প্রত্যহ তার অযত্ন—ব্যবহার চাই, তবে কম্বল ভাল থাকিবে। নচেৎ 'পুতু-পুতু' করিয়া কম্বল তুলিয়া রাখিলে, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে।

কাপড় 'টাটে' নষ্ট হয়, সম্ভবতঃ 'টাট' মানে এখানে রৌদ্র বুঝাইতেছে, যদিও ইহার আভিধানিক অর্থ তাহা নহে। সূতির কাপড় খুব কড়া রৌদ্র পাইলে নষ্ট হয়। এই বাক্যের আরও একটি ছত্র আছে, তাহা সুরুচিসম্পন্ন নহে বলিয়া বাদ দেওয়া হইল।

কাণা বক—শুকনো গড়ে, খাই-নাখাই, আছি পড়ে।

আমি কাণা বক, অসহায়, দেখিতে পাই না। এ অবস্থায় খাই বা না খাই, জলশূন্য এই শুকনো গড়ে পড়ে আছি। গড়ে জল নাই, সুতরাং মাছও নাই, তবুও পড়ে আছি, তার কারণ—আমি চক্ষুহীন। নিরুপায়। সম্ভবতঃ বাক্যটির দ্বারা নিরুপায় অবস্থার কথা প্রকাশ করা হইয়াছে।

খালি পেটে বেল, ভরা পেটে তাল।

সহজ কথা। কথাটা শরীর এবং খাদ্য সম্বন্ধীয়। তাল খাওয়ার বিধি - ভরা পেটে, আর বেল খাওয়া উচিত খালি পেটে। এই শ্রেণীর 'বচন' বহু আছে, তার মধ্যে গুটিকয়েক আমরা এই সংগ্রহের মধ্যে দিব। সব দিতে হইলে প্রবন্ধের আকার খুব বাড়িয়া যাইবে।

উচ্ছে খাবে কচি, পটল খাবে বীচি।
দইয়ের অগ্র, ঘোলের শেষ, কচি পাঁঠা পাকা মেষ,
মাছের মা, শাকের ছা— এই সব তুই বেছে খা।
ঘৃতে আয়ু, দুধে বল, শাকেতে বাড়ায় মল।
গরম ভাতে গাওয়া ঘি; তার তুল্য আর আছে কি?

এই সমস্ত আহার সম্পর্কীয় বাক্যের টীকা নিষ্প্রয়োজন। 'মাছের মা,—অর্থাৎ বড় মাছ। 'শাকের ছাঁ'—মানে বাচ্চা শাক, কচি শাক। ভিতরে বীচি জন্মিয়াছে, এরূপ পটলই খাইতে হয়! 'পটল খাবে বীচি' মানে ইহা নয় যে পটলের বীচিই শুধু খাবে। বীচি যার হয় নাই এরূপ অত্যন্ত কচি পটলের কোন স্বাদ পাওয়া যায় না।

খোঁড়ার পা-ই খানায় পড়ে।

পথ চলিবার সময় খোঁড়া 'খানা'কে ভয় করে, পাছে তাহার মধ্যে পড়িয়া যায়। কিন্তু, তার পা-ই 'খানা'র মধ্যে আসিয়া পড়ে। যে সেবিষয়ে বেশী সতর্ক, সেবিষয়ের বিপদ কি তাহারই বেশী আসে? সতর্কতা মাত্রা ছাপাইয়া বেশী হইলেই অনর্থ ঘটে। ইহার মধ্যে খুব বড় একটা মনস্তত্ত্ব যাহা আছে তাহা প্রণিধানযোগ্য।

খেয়ে উঠে দৌড়ে যায়। মরণ তার পেছনে ধায়।

আহারের পরই ছুটাছুটী অত্যন্ত মন্দ। খাইয়া যদি কেহ প্রত্যহ ছুটাছুটী করে, তাহার কঠিন ব্যাধি হইবে এবং তাহাতে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। আহারের পর দৌড়ানো ত অত্যন্ত খারাপ কাজ, হাঁটাও খারাপ। খাবার পর অন্ততঃ ১৫ মিনিটকাল বিশ্রাম করিয়া তবে স্কুল আফিসে, কাজকর্ম্মে যাওয়া উচিত। ইংরাজী মতেও আছে, "after dinner rest a while, after supper walk a mile"। রাত্রের আহারের পর কিছুক্ষণ পায়চারী করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। আমাদের আয়ুর্ব্বেদের আইনও এ বিষয়ে আছে—

শত পদ—আহার শেষে
চলিয়া, শোবে বামপাশে।

আহারের পর একশত পা (অর্থাৎ কয়েক পা) বেড়াইয়া তাহার পর বামকাতে শুইবে। ইহাতে ভুক্তদ্রব্য সহজে জীর্ণ হইবার সুযোগ পায়। কিন্তু আহারের অব্যবহিত পরেই দৌড়ান অতিশয় খারাপ, ইহাতে হঠাৎ মৃত্যু আনিতে পারে—ডাক্তারী মতে ডান কাতে শুইবার বিধি, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের বিধিই অধিকতর বৈজ্ঞানিক বলিয়া মনে হয়।

[ক্রমশঃ]

ললিত-কলা

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

পাঁচ

যশোধরেন্দ্র জয়মঙ্গলা-টীকায় গীত-বাদ্য-নৃত্যের বিস্তৃত কোন বিবরণ না দিয়া বলিয়াছেন—এ কলাগুলি প্রায় তত্তৎ শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। তথাপি সংক্ষেপে এইটুকু বলা যায় যে, স্বরগ-পদগ-লয়গ-চেতোঽবধানগ-ভেদে গেয় (অর্থাৎ গান চতুর্ব্বিধ।১

(২) **বাদ্য**—কাশী সংস্করণের ভরত-নাট্যশাস্ত্রে অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে 'আতোদ্য-বিধি' বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত অধ্যায়ের প্রারম্ভে মহর্ষি ভরত বলিয়াছেন—আতোদ্য (অর্থাৎ বাদ্য) চতুর্ব্বিধ—(১) তত, (২) অবনদ্ধ, (৩) ঘন ও (৪) সুষির। তত—তন্ত্রীগত বাদ্য, অবনদ্ধ পুষ্কর-জাতীয় বাদ্য, ঘন তাল-জাতীয় বাদ্য ও সুষির বংশ-নির্ম্মিত বাদ্য।২

যশোধরও তাঁহার টীকায় অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন—কেবল নাট্যশাস্ত্রের 'অবনদ্ধ' সংজ্ঞার পরিবর্ত্তে তিনি 'বিতত' সংজ্ঞার ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার মতে—ঘন, বিতত, তত, ও সুষির—এই চারি শ্রেণীর বাদ্যের দৃষ্টান্ত—যথাক্রমে কাংস্য, পুষ্কর, তন্ত্রী-বাদ্য ও বেণু।৩

ঘন হইতেছে—তাল অর্থাৎ করতাল জাতীয় বাদ্য—ধাতু নির্ম্মিত, যথা—করতাল, খঞ্জনী, মন্দিরা, পেটা-ঘড়ি ইত্যাদি। অবনদ্ধ (যশোধরমতে—বিতত)—পুষ্কর-জাতীয় অর্থাৎ ঢকা-জাতীয় বাদ্য—চামড়া দিয়া যাহা ছাওয়া হয়, যথা—পুষ্কর (ঢাক), মৃদঙ্গ (পাখোয়াজ,) তবলা, খোল, ঢোল, জয়ঢাক ইত্যাদি। তত—তন্ত্রীবাদ্য অর্থাৎ তারের বাজনা, যথা—বীণা, স্বরদ, সেতার, এস্রাজ, তানপুরা ইত্যাদি। সুষির—বেণু-জাতীয় বাদ্য—যাহার ছিদ্রমধ্যে বায়ু পুরিয়া বাজাইতে হয়, যথা—বাঁশী, সানাই ইত্যাদি।৪

মহর্ষি নাট্যশাস্ত্রের অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে (কাশী সং) অর্কেষ্ট্রার উল্লেখও করিয়াছেন। অর্কেষ্ট্রার নাট্যশাস্ত্র-সম্মত নাম—'কুতপ'। তত-বাদ্য-বিধিতে এক প্রকার কুতপ-বিন্যাস হইত (উহা অনেকটা এখনকার String Orchestraর মত); আবার অবনদ্ধ-বিধিতে আর এক প্রকার কুতপ-সন্নিবেশ করা হইত। (নাঃ শাঃ, কাশী সং, ২৮।৪-৫, পৃঃ ৩১৬ দ্রষ্টব্য)।

কাশী সংস্করণ নাট্যশাস্ত্রের একোনত্রিংশ অধ্যায়ে তত-আতোদ্য-বিধান, ত্রিংশ অধ্যায়ে তাল-ব্যঞ্জন (ঘন-আতোদ্য-বিধি) বিবৃত হইয়াছে। শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত-রত্নাকরেও এ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বাদ্য-সম্বন্ধে অন্যান্য গ্রন্থের তালিকা পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।

(৩) **নৃত্য**—ইহাও অতি প্রসিদ্ধ কলা—ইহার পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। যশোধর বলিয়াছেন—করণ, অঙ্গহার, বিভাব, ভাব, অনুভাব ও রস—সংক্ষেপে এই ছয়টিই নৃত্য বলিয়া কথিত হয়।৫ এই নৃত্য আবার দ্বিবিধ—নাট্য ও অনাট্য। এ প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে—স্বর্গ,

---

১ "গীতবাদ্যনৃত্যালেখ্যানি চত্বারি প্রায়ঃ স্বশাস্ত্রবিদিতপ্রপঞ্চানি। তথাপি সংক্ষেপতঃ কথ্যন্তে—স্বরগং পদগঞ্চৈব তথা লয়গমেব চ। চেতোঽবধানগঞ্চৈব গেয়ং জ্ঞেয়ং চতুর্ব্বিধম্"—যশোধরেন্দ্রপাদ-কৃত জয়মঙ্গলা-টীকা।

২ "ততঞ্চৈবাবনদ্ধঞ্চ ঘনং সুষিরমেব চ।
চতুর্ব্বিধন্তু বিজ্ঞেয়মাতোদ্যং লক্ষণান্বিতম্ ॥ ১ ॥
ততং তন্ত্রীগতং জ্ঞেয়মবনদ্ধন্তু পৌষ্করম্।
ঘনং তালস্তু বিজ্ঞেয়ঃ সুষিরো বংশ উচ্যতে" ॥ ২ ॥

—নাঃ শাঃ, কাশী সং, ২৮ শ অঃ, পৃঃ ৩১৬

৩ "ঘনং চ বিততং বাদ্যং ততং সুষিরমেব চ।
কাংস্যপুষ্করতন্ত্রীভির্ব্বেণুনা চ যথাক্রমম্ ॥"—জয়মঙ্গলা।

৪ 'সুষির' শব্দের অর্থ ছিদ্র বা গর্ত্ত।

৫ "করণান্যঙ্গহারাশ্চ বিভাবো ভাব এব চ।
অনুভাবো রসাশ্চেতি সংক্ষেপান্নৃত্যসংগ্রহঃ"।

—যশোধর-কৃত জয়মঙ্গলা।

করণ ও অঙ্গহার—নৃত্যের দুইটি প্রধান বিভাগ। নাট্যশাস্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। করণ—ক্রিয়া। কাহার ক্রিয়া?—নৃত্তের—অর্থাৎ গাত্রাবয়ব-সমূহের হস্ত-পাদ-সমাযোগ। মহর্ষি ভরত বলিয়াছেন—"হস্তপাদ-সমাযোগো নৃত্তস্য করণং ভবেৎ" (নাঃ শাঃ, বরোদা সং, ৪।৩০)। অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—"ক্রিয়া করণং, কস্য ক্রিয়া? নৃত্তস্য। গাত্রাণাং হস্তপাদসমাযোগঃ" (নাঃ শাঃ, পৃঃ ৯২)। মহর্ষি ভরতের মতে করণ অষ্টোত্তরশত। দাক্ষিণাত্যে 'চিদম্বরম্' নামক স্থানে যে নটরাজের সুবিখ্যাত মন্দির আছে, তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম গোপুরের কক্ষগুলিতে পাথরে খোদাই-করা এই ১০৮ করণের চিত্র দৃষ্ট হয়—প্রত্যেকটি করণের নিম্নে উহার নাট্যশাস্ত্রোক্ত লক্ষণও যথাযথভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ১০৮ করণের মধ্যে ৯৩টি করণের চিত্র মাত্র পাওয়া যায়—অবশিষ্ট ১৫টির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। বরোদা সংস্করণের নাট্যশাস্ত্রে প্রথমখণ্ডে ঐ গুলির আলোকচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। অঙ্গহার—করণগুলিই অঙ্গহারের উৎপত্তির কারণ—এ কারণে দুইটি করণের মিশ্রণকে 'নৃত্তমাতৃকা' বলা হয়—"দ্বে নৃত্তকরণে চৈব ভবতো নৃত্তমাতৃকা" (নাঃ শাঃ ৪।৩১)। "নৃত্তস্য অঙ্গহারাত্মনো মাতৃকা উৎপত্তিকারণম্" (অভিনবভারতী, পৃঃ ৯৩)। দুই, তিন বা চারিটি নৃত্তমাতৃকার যোগে অঙ্গহারের উৎপত্তি হইয়া থাকে—"দ্বাভ্যাং ত্রিভিশ্চতুর্ভির্বাপ্যঙ্গহারস্তু মাতৃভিঃ" (নাঃ শাঃ ৪.৩১) এক একটি অঙ্গহারে তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট বা নয়টি পর্য্যন্ত করণের সংযোগ থাকে। অঙ্গহার নাম হইল কেন, আচার্য্য অভিনব তাহা সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন—হর-কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া এ প্রয়োগের নাম 'হার'। অঙ্গ-কৃত হার=অঙ্গহার—অঙ্গসমূহের সমুচিত দেশান্তরে প্রাপণ, অর্থাৎ—যথাযথভাবে অঙ্গবিক্ষেপ—"অঙ্গানাং দেশান্তরে সমুচিতে প্রাপণ-প্রকারোঽঙ্গহারঃ; হরস্য চায়ং হারঃ প্রয়োগঃ; অঙ্গনির্ব্বর্ত্ত্যো হারোঽঙ্গহারঃ" (অভিনবভারতী, পৃঃ ৯১) যদিও অঙ্গহারের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না, তথাপি নাট্যশাস্ত্রমতে প্রধান অঙ্গহারের সংখ্যা বত্রিশ। বিভাব—মহর্ষি ভরত নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠাধ্যায়ে (রসাধ্যায়ে) বলিয়াছেন—স্থায়িভাবের সহিত বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারি-ভাব-সংযোগে রস-নিষ্পত্তি হয়—বিভাবানুভাব-

মর্ত্ত্যলোক বা পাতালের অধিবাসিগণের কৃত-কার্য্য-সমূহের অনুকরণই নাট্য, আর অনাট্য নৃত্য নর্ত্তকাশ্রিত ব্যাপার। শাস্ত্রান্তরে, নৃত্য-কলা ও নাট্য-কলা যে পরস্পর বিভিন্ন কলা—ইহা বুঝাইবার নিমিত্তই পৃথগ্ ভাবে নাট্য-কলার উল্লেখ করা হইয়াছে। যশোধরের অভিপ্রায় এই যে নাট্যশাস্ত্রাদি গ্রন্থে নাট্য-কলাকে নৃত্য-কলার অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই—দুইটিকে সম্পূর্ণ পৃথক্ কলা বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু মহর্ষি বাৎস্যায়ন তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে—নৃত্য মূল-কলা, উহার দুইটি শাখা—অনাট্য নৃত্যকলা ও নাট্য-নৃত্য-কলা: নাট্য নৃত্য-কলা অনুকরণাত্মক;—পক্ষান্তরে অনাট্য-নৃত্য-কলা (অর্থাৎ—খাঁটি নৃত্য-কলা)—অনুকরণ-প্রবণ নহে।৬

শ্রীভগবন্নন্দিকেশ্বর-কৃত 'অভিনয়-দর্পণ' গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, নাট্য ও নৃত্যের সাধারণ নাম—নটন। নটনের চতুর্বিধ অঙ্গ—পাঠ্য, অভিনয়, গীত ও রস। যথাক্রমে—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদ হইতে উক্ত অঙ্গ-চতুষ্টয় গ্রহণ করিয়া পদ্মযোনি নটন-শাস্ত্র রচনা করেন। নাট্যশাস্ত্রেরও ইহাই সিদ্ধান্ত।৮

ব্যভিচারি-সংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ" (নাঃ শাঃ, ৬ অঃ, বরোদা সং, পৃঃ ২৭৪)। স্থায়ী ভাব—অবিরুদ্ধ অথবা বিরুদ্ধ কোন প্রকার সঞ্চারী (অর্থাৎ ব্যভিচারী) ভাবই যে ভাবের তিরোভাব ঘটাইতে পারে না—যাহা আস্বাদাঙ্কুর-স্বরূপ, তাহারই নাম 'স্থায়ী ভাব'। উহা অন্তঃকরণের বৃত্তি-বিশেষ। রতি-হাস ইত্যাদি উহার অষ্টবিধ ভেদ। নব-রসবাদীর মতে নবম স্থায়ী ভাব শম (বা মতান্তরে নির্ব্বেদ)। বিভাব—এই রত্যাদি স্থায়িভাবগুলির উদ্বোধক—হেতু—করণ বা নিমিত্ত—"বিভাবো নাম বিজ্ঞানার্থঃ। বিভাবঃ কারণং নিমিত্তং হেতুরিতি পর্য্যায়াঃ" (নাঃ শাঃ, ৭ম অঃ, বরোদা, সং, পৃঃ ৩৪৭)। বিভাব দুই প্রকার—(১) আলম্বন—যথা-নায়ক-নায়িকাদি—যাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া রসোদ্গম হয়। (২) উদ্দীপন—আলম্বনের চেষ্টা, বেশ-ভূষাদি, যাহা রসকে উদ্দীপিত করে,—আলম্বনের চেষ্টা বেশ ভূষা রূপাদি ব্যতীত দেশ, কাল, চন্দ্র, চন্দন, কোকিলালাপ, মলয়পবন, ভ্রমরগুঞ্জনাদিও উদ্দীপন। ভাব—সাধারণতঃ 'ভাব' বলিলে—অষ্ট স্থায়ী ভাব, ত্রয়স্ত্রিংশৎ ব্যভিচারি-ভাব ও অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব—এই একোনপঞ্চাশৎ ভাবকেই বুঝায়। কিন্তু যশোধর-কর্ত্তৃক উদ্ধৃত শ্লোকে বিভাব ও অনুভাবের পৃথক্ উল্লেখ থাকায়—'ভাব' বলিতে স্থায়ী অথবা ব্যভিচারী বুঝিতে হইবে। অনুভাব - আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব-রূপ কারণ-সমূহ দ্বারা উদ্বুদ্ধ রত্যাদি স্থায়ী ভাবের বহিঃপ্রকাশ-রূপ কার্য্যের নাম 'অনুভাব'। অনুভাব দ্বারা স্থায়ি-ভাব সহৃদয় দর্শক-সমাজে অনুভাবিত বা প্রকাশিত হয়। ভ্রূবিক্ষেপ, কটাক্ষ, হাস্য, বাহু ইত্যাদি অঙ্গের বিক্ষেপ ইত্যাদিকে অনুভাব বলা হয়। বিভাব—কারণ, অনুভাব—কার্য্য। সাত্ত্বিক ভাব—এগুলি অনুভাবেরই অন্তর্গত। তথাপি সত্ত্ব সম্ভূত বিকার বলিয়াই এগুলির পৃথক্ গণনা করা হইয়া থাকে। সত্ত্ব—বাহ্য প্রমেয় বস্তুর প্রতি বিমুখতা-জনক কোন এক আন্তর ধর্ম্ম বিশেষ। সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ বলেন—রজঃ ও তমঃ কর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট মন 'সত্ত্ব'—উহা রসের উদ্বোধক। ভরতের মতেও সত্ত্ব মনঃপ্রভব। মন সমাহিত হইলেই সত্ত্ব-নিষ্পত্তি হয়। সাত্ত্বিক ভাব আটটি—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ ইত্যাদি। ব্যভিচারী বা সঞ্চারী—ভরতের মতে—রসের প্রতি বিবিধ প্রকারে অভিমুখভাবে চরণশীল ভাব 'ব্যভিচারী' নামে খ্যাত। (মতান্তরে—স্থিরভাবে বর্ত্তমান রত্যাদি স্থায়ী ভাবের প্রতি বিশেষ অভিমুখ-ভাবে চরণশীল ভাবই ব্যভিচারী)। ইহারা অস্থায়ী। ইহাদিগের সংখ্যা তেত্রিশ—নির্ব্বেদ গ্লানি ইত্যাদি। রস - বিভাব অনুভাব-সাত্ত্বিক-ভাবও ব্যভিচারি ভাব দ্বারা আস্বাদন-যোগ্য অবস্থায় আনীয়মান স্থায়ী ভাবের নাম রস। রতি ইত্যাদি অষ্ট স্থায়ী ভাব হইতে যথাক্রমে শৃঙ্গারাদি অষ্ট রসের উৎপত্তি হয়। মতান্তরে—নব-রস-বাদি মতে শান্ত নবম রস। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—সত্ত্বের উদ্রেক বশতঃ অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, চিন্ময় আনন্দ-স্বরূপ, বেদ্যান্তর-স্পর্শশূন্য, ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর রস স্বাভিন্ন-রূপে আস্বাদিত হয়। লোকোত্তর চমৎকার (বা বিস্ময়) এই রসের প্রাণ। জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ বলিয়াছেন—রস 'ভগ্নাবরণা চিৎ' অর্থাৎ অনাবৃত চৈতন্য-মাত্র-স্বরূপ। যে রসকে উপনিষদে ব্রহ্মস্বরূপ বলা হইয়াছে ("রসো বৈ সঃ")—সেই ব্রহ্মস্বরূপ-ভূত রস (বা ব্রহ্মানন্দ) ও কাব্যরস জগন্নাথের মতে অভিন্ন। বিশ্বনাথ তবু একটু কমাইয়া বলিয়াছেন—রসাস্বাদ ব্রহ্মাস্বাদ-তুল্য। জগন্নাথ উভয়কে অভিন্নই বলিয়াছেন। এ রসাস্বাদন-কালে অপর জ্ঞেয় বস্তুর কোন অনুভবই হয় না (বেদ্যান্তর-স্পর্শশূন্য)। বিভাবাদি-দ্বারা অজ্ঞান-রূপ আবরণ-ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই রস স্বতঃ প্রকাশমান হইতে থাকে—ইহাকেই রসের চর্ব্বণা বা আস্বাদন বলে। মহর্ষি ভরত এই ব্যাপারকেই রস-নিষ্পত্তি বলিয়াছেন। সহৃদয় সামাজিকগণের চর্ব্বণা বা আস্বাদনই এই অলৌকিক রসের অস্তিত্বের প্রতি একমাত্র প্রমাণ। অর্থাৎ—রস তাহার আস্বাদন হইতে অভিন্ন। এই রস নিষ্পত্তিই কাব্য নাটক-নৃত্য গীত-বাদ্য ইত্যাদি সকল কলা-সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। (রস সম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ মাসিক বসুমতীতে গত দুই বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত মদীয় 'রস'-প্রবন্ধ ও বর্ত্তমানে প্রকাশ্যমান 'ভাব'-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। মদীয় 'অভিনয়-দর্পণ', পৃঃ ২০—২৫ দ্রষ্টব্য)।

যশোধর বলিয়াছেন—করণ-অঙ্গহার-বিভাব-ভাব-অনুভাব ও রস এই ছয়টিই নৃত্য বলিয়া কথিত হয়। নৃত্যে কিরূপে ধীরে ধীরে রস-নিষ্পত্তি হয় তাহাই যশোধর এই কারিকাটির সাহায্যে বুঝাইয়াছেন। কেবল হাত-পা নাড়িলে বা ধপ্ ধপ্ করিয়া পা ফেলিলেই নৃত্য হয় না। নৃত্যে বা অভিনয়ে রস স্ফূর্ত্তি না হইলে উহা সহৃদয়-হৃদয়হারী হইতে পারে না। তাই প্রথমে করণ ও অঙ্গহারের সাহায্যে অঙ্গ-বিক্ষেপ পূর্ব্বক—ভাবের (অর্থাৎ স্থায়ী ভাবের) বিভাব-দ্বারা উদ্বোধন, অনুভাব-দ্বারা পুষ্টিসাধন করিয়া উহা আস্বাদন-যোগ্য রস রূপে নিষ্পন্ন করিতে পারিলে তবেই নৃত্য-কলার সার্থকতা হইয়া থাকে।—ইহাই কারিকাটির মর্ম্মার্থ।

৬। "তদ্দ্বিবিধম্—নাট্যমনাট্যঞ্চেতি। তথোক্তম্—'স্বর্গে বা মর্ত্ত্য-লোকে বা পাতালে বা নিবাসিনাম্। কৃতানুকরণং নাট্যমনাট্যং নর্ত্তকা-শ্রিতম্'॥ ইতি। তন্ত্রান্তরে তু নৃত্যাদ্ভেদজ্ঞাপনার্থমেব পৃথঙ্ নাট্যকলোক্তেতি বিজ্ঞেয়ম্'।—জয়মঙ্গলা।

৭। "ঋগ্ যজুঃ সামবেদেভ্যো বেদাচ্চাথর্ব্বণঃ ক্রমাৎ ॥৭
পাঠ্যং চাভিনয়ং গীতং রসান্ সংগৃহ্য পদ্মজঃ।
ব্যরীরচচ্ছাস্ত্রমিদং........ ....॥৮॥

অভিনয়দর্পণ

৮। এবং সঙ্কল্প্য ভগবান্ সর্ব্ববেদাননুস্মরন্।
নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্ব্বেদাঙ্গসম্ভবম্ ॥১৬॥
জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্ব্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্ব্বণাদপি" ॥১৭॥

—নাঃ শাঃ, বরোদা সং, প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ৪১

ঋগ্বেদ মন্ত্রময়—একারণে উহা হইতে পাঠ্যাংশ (বাচিক অভিনয়) গৃহীত হইয়াছিল। যজুর্ব্বেদ ক্রিয়াত্মক—এ হেতু উহা হইতে আঙ্গিকাভিনয় গৃহীত হওয়া স্বাভাবিক। সামবেদ গানময়—তাই উহা হইতে গীতের সংগ্রহ। আর মারণাদি অভিচার-কর্ম্ম-প্রতিপাদক বলিয়া অথর্ব্ববেদ রস-প্রধান—অতএব উহা হইতে রসগ্রহণ যুক্তিযুক্ত।

এই চতুর্ব্বিধ অঙ্গযুক্ত নটনের ত্রিবিধ ভেদ—নাট্য, নৃত্য ।৯

নাট্য—দশরূপকাদি—উহা প্রাচীন কথাযুক্ত—ইহাই অভিনয়দর্পণের মত ।১০

নৃত্ত—ভাবাভিনয়-হীন নটন-মাত্র ।১১

নৃত্য—রস-ভাব-ব্যঞ্জনাদি-যুক্ত নটন ।১২

মহর্ষি ভরত-প্রণীত নাট্যশাস্ত্র বর্ত্তমানে উপলভ্য-মান নাট্যগ্রন্থগুলির মধ্যে প্রাচীনতম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া এক-বাক্যে স্বীকৃত হইয়া থাকে। নাট্যশাস্ত্রের বর্ত্তমান সংস্করণ-গুলির কোনটিতেই নৃত্ত ও নৃত্যের ভেদ সূচিত হইতে দেখা যায় না।

'দশরূপক'-নামক সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কারগ্রন্থের রচয়িতা ধনঞ্জয় বলেন—ভাবাশ্রয় নৃত্যে পদার্থাভিনয় বর্ত্তমান—উহাই 'মার্গ' (নৃত্য) নামে প্রখ্যাত; আর তাল-লয়াশ্রিত নৃত্তের নাম 'দেশী' ।১৩

'ভাব-প্রকাশন'-নামক বিখ্যাত অচির-প্রকাশিত অলঙ্কার-গ্রন্থের কর্ত্তা শারদাতনয় বিষয়টি বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন। যাহা রসাত্মক, তাহাই বাক্যার্থাভিনয়-প্রধান। যাহা ভাবাশ্রয়, তাহাই পদার্থাভিনয়াত্মক। নৃত্য ভাবাশ্রয়—অতএব পদার্থাভিনয়াত্মক। নৃত্ত রসাশ্রয়—অতএব বাক্যার্থাভিনয়াত্মক। এ উভয়ই আবার নাট্যের উপকারক। শারদাতনয়ের মতে দৃশ্যকাব্য ত্রিশ প্রকার। তন্মধ্যে নাটক-প্রকরণাদি দশটির নাম রূপক, উহারা রসাশ্রিত ও বাক্যার্থাভিনয়-প্রধান। অবশিষ্ট তোটক-নাটিকাদি বিংশতি প্রকার দৃশ্যকাব্য (যাহা মতান্তরে 'উপরূপক' নামে খ্যাত—শারদাতনয় অবশ্য রূপক ও উপরূপকের ভেদ করেন নাই, সব গুলিকেই রূপক বলিয়াছেন)—ভাবাত্মক ও পদার্থাভিনয়-প্রধান।

শারদাতনয়ের মতে নটের কর্ম্ম নাট্য, আর নর্ত্তক কর্ম্ম পদার্থাভিনয়। নট-কর্ম্ম ও নর্ত্তক-কর্ম্ম—এতদুভয়ই আবার নৃত্য-নৃত্ত-ভেদে দ্বিবিধ। তাহার মধ্যে ভাবাশ্রয় (নৃত্য)—মার্গ ও তদ্রহিত (নৃত্ত)—দেশী নামে খ্যাত। ডোম্বী, শ্রীগদিত ইত্যাদিতে পদার্থাভিনয়ের প্রাধান্য। ঐ বিংশতি প্রকার দৃশ্য-কাব্যকে শারদাতনয় নৃত্যের প্রকারভেদ বলিয়াছেন। এই নৃত্যের লক্ষণ—গীতের মাত্রানুসারে অঙ্গ-উপাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমূহ-দ্বারা পদার্থাভিনয়। পক্ষান্তরে, নাটকাদি মূল দশরূপকে যে 'নৃত্ত' প্রযুক্ত হয়, তাহার স্বরূপ লয়-তাল-সমন্বিত অঙ্গ-বিক্ষেপ মাত্র। অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির অভিনয় বিহীন কেবল বিক্ষেপাত্মক যে ব্যাপার, তাহাই 'নৃত্ত'; আর উহাতে অভিনয়ের যোগ থাকিলে হয় 'নৃত্য'। মোটের উপর 'নৃত্য'—নটাশ্রিত রসাভিনয়, আর 'নৃত্ত'—নর্ত্তকাশ্রিত ও ভাবাভিনয়—ইহাই শারদাতনয়ের সিদ্ধান্ত ।১৪

আবার সঙ্গীত-রত্নাকরে শার্ঙ্গদেব বলিয়াছেন—আহার্য্যা-ভিনয় (বেশভূষাদি)-বর্জ্জিত, আঙ্গিক-বাচিক-সাত্ত্বিক অভিনয়-যুক্ত কেবল ভাবের অভিব্যঞ্জক নর্ত্তনের নাম 'নৃত্য'। নৃত্য-বিদ্‌গণ ইহাকেই 'মার্গ' শব্দ দ্বারা অভিহিত করিয়া থাকেন। আর আঙ্গিক-বাচিক-আহার্য্য-সাত্ত্বিক—এই চতুর্ব্বিধ অভিনয়-বর্জ্জিত সাধারণ গাত্র-বিক্ষেপ-মাত্রের নামই 'নৃত্ত'। অবশ্য গাত্র-বিক্ষেপ করিতে যাইলেই কিছু না কিছু আঙ্গিকাভিনয় তাহাতে আসিয়া পড়ে। তবে যথাশাস্ত্র আঙ্গিক অভিনয়ের প্রয়োগ ইহাতে করা চলে না—ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়। এই নৃত্তই 'দেশী' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পার্শ্বদেব-রচিত 'সঙ্গীতসময়সারে' নৃত্য ও নৃত্তের ভেদ ধরা হয় নাই। এক নৃত্তের লক্ষণই প্রদত্ত হইয়াছে। নৃত্ত অবস্থানুকরণাত্মক গাত্র-বিক্ষেপ—তাল-ভাব-লয়ায়ত্ত—বাক্য-

---

৯। "এতচ্চতুর্ব্বিধোপেতং নটনং ত্রিবিধং স্মৃতম্ ॥১১॥
নাট্যং নৃত্যং নৃত্তমিতি মুনিভির্ভরতাদিভিঃ" ॥
অভিনয়দর্পণ

চতুর্ব্বিধ অঙ্গ—পাঠ্য, অভিনয়, গীত ও রস।

অন্যরূপে—বাচিক, আঙ্গিক, আহার্য্য (বেশ-ভূষাদি) ও সাত্ত্বিক (স্তম্ভ-স্বেদাদি ভাব প্রকাশক) অভিনয়—অভিনয়ের এই চারি প্রকার ভেদ।

১০। "নাট্যং তন্নাটকঞ্চৈব পূজ্যং পূর্ব্বকথাযুতম্"—এ স্থলে 'নাটক' শব্দটি রূপক বা দৃশ্যকাব্য—এই সাধারণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। নাট্য অর্থে বুঝায়, আঙ্গিক-বাচিক-আহার্য্য-সাত্ত্বিক—এই চতুর্ব্বিধ অভিনয়যুক্ত রসাভি-ব্যঞ্জক নটন-বিশেষ।

১১। "ভাবাভিনয়হীনং তু নৃত্তমিত্যভিধীয়তে" ॥১৫॥ অঃ দঃ

১২। "রসভাবব্যঞ্জনাদিযুক্তং নৃত্যমিতীর্য্যতে"।—অঃ দঃ (১৬)

১৩। "অন্যদ্ভাবাশ্রয়ং নৃত্যং নৃত্তং তাললয়াশ্রয়ম্।
আদ্যং পদার্থাভিনয়ো মার্গো দেশী তথা পরম্ ॥৯॥
(দঃ রূঃ ১।৯)। "রসাশ্রয়ান্নাট্যাদ্ভাবাশ্রয়ং নৃত্যমন্যদেব"—অবলোক।

১৪। "যত্তদ্রসাত্মকং তত্তদ্বাক্যার্থাভিনয়াত্মকম্।
যত্তদ্ভাবাশ্রয়ং তত্তৎ পদার্থাভিনয়াত্মকম্ ॥
নৃত্যং ভাবাশ্রয়ং নৃত্তং রসাশ্রয়মুদাহৃতম্।
নৃত্যনৃত্তবিভাগশ্চ বহুভির্বহুধোদিতঃ ॥
তদ্দ্বয়ং নাটকাদীনাং ভূয়সাং হ্যুপকারকম্।
নৃত্যনৃত্তবিভাগস্তু পরস্তাৎ কথয়িষ্যতে" ।—ভাবপ্রকাশন
৭ম অধিকার, পৃঃ ১৮১

অষ্টম, নবম ও দশম অধিকারও এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

নাটকস্থিতবাক্যার্থপদার্থাভিনয়াত্মকম্ ॥ নটকর্ম্মৈব নাট্যং স্যাদিতি নাট্যবিদাম্মতম্। পদার্থমাত্রাভিনয়রূপং নর্ত্তককর্ম্ম যৎ। তন্নৃত্তনৃত্যভেদেন তদ্দ্বয়ং দ্বিবিধং ভবেৎ। তত্র ভাবাশ্রয়া মার্গো দেশী তদ্রহিতা মতা ॥......

রসপ্রধানাভিনেয়ং মার্গঃ নৃত্তং নটাশ্রয়ম্ ॥ ভাবাভিনেয়ং মার্গঃ তন্নৃত্যং যন্নর্ত্তকাশ্রয়ম্। রসভাবসমাযুক্তমঙ্গচালনসংশ্রয়ম্। মার্গদেশীবিমিশ্রং তু নটনর্ত্তকসংযুতম্" ।—ভাবপ্রকাশন, পৃঃ ২৯৭

অঙ্গৈরুপাঙ্গৈঃ প্রত্যঙ্গৈর্গীতমাত্রানুগামিভিঃ ॥ পদার্থাভিনয়ো নৃত্যং ডোম্বী-শ্রীগদিতাদিষু। অঙ্গবিক্ষেপমাত্রং যল্লয়তালসমন্বিতম্ ॥ তন্নৃত্তং নাটকাদ্যেষু রূপকেষু প্রযুজ্যতে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিক্ষেপঃ শূন্যো যোগোঽভিনয়েন চ ॥ তন্নৃত্তং তত্র নৃত্যং তু যথোক্তাভিনয়ান্বিতম্" ।—ভাবপ্রকাশন, পৃঃ ২৯৮

অঙ্গ-আহার্য্য-সত্ত্ব-সম্ভূত। অবশ্য বাচিক-আহার্য্য-সাত্ত্বিক প্রধানতঃ নাট্যাভিনয়েই গণনীয়। অতএব, এক আঙ্গিকাভিনয়ই মুখ্যভাবে নৃত্তে প্রযোজ্য।১৫

মহর্ষি ভরত নৃত্ত বা নৃত্যকে পুনশ্চ দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন—তাণ্ডব ও লাস্য।

ব্রহ্মা চতুর্ব্বেদের অঙ্গসম্ভূত নাট্য-বেদ ভরতমুনিকে প্রথমে শিক্ষাদান করেন। পরে মহর্ষি ভরত নিজ শত পুত্রকে অভিনেতৃরূপে ও চতুর্বিংশতি-সংখ্যক অপ্সরাকে অভিনেত্রীরূপে শিক্ষিত করিয়া হিমাচল-পর্ব্বতপৃষ্ঠে মহাদেবের সম্মুখে নাট্য-প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সেই সময় অমৃত-মন্থন সমবকার ও ত্রিপুর-দাহ ডিমের অভিনয় দর্শনে প্রীত হইয়া মহাদেব ভরতকে তণ্ডু-দ্বারা স্বাবিষ্কৃত নৃত্যের উপদেশ দেওয়াইয়াছিলেন। নাট্যশাস্ত্রের প্রথম ও চতুর্থ অধ্যায়ে ইহার বিবরণ আছে। 'তণ্ডু' নন্দিকেশ্বরের অপর নাম।১৬ তণ্ডু-কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া এই শ্রেণীর নৃত্যের নাম হয় 'তাণ্ডব'।১৭ আর পার্ব্বতী সুকুমার-নৃত্য-প্রয়োগের আবিষ্কর্ত্রী।১৮

নন্দিকেশ্বরের অভিনয়-দর্পণেও এই বিষয়টি সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। পুরাকালে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ভরতমুনিকে নাট্য-বেদ শিক্ষা প্রদান করেন। অনন্তর ভরত গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ সহ শম্ভুর সম্মুখে নাট্য-নৃত্য-নৃত্তের প্রয়োগ প্রদর্শন করেন। তখন মহাদেব স্বীয় উদ্ধত প্রয়োগ স্মরণপূর্ব্বক স্বগণাগ্রণী তণ্ডুর সাহায্যে উহা ভরতকে শিক্ষা দেওয়ান। আর প্রীতিবশতঃ পার্ব্বতীকে দিয়া ভরতকে লাস্যের উপদেশ প্রদান করাইয়াছিলেন।১৯

দশরূপক-মতেও নৃত্য-নৃত্ত উভয়ই মধুর ও উদ্ধত ভেদে দ্বিবিধ। সুকুমার নৃত্য-নৃত্য—লাস্য, আর উদ্ধত নৃত্য-নৃত্ত—তাণ্ডব। ইহারা উভয়েই নাট্যের উপকারক।২০

শারদাতনয়ের মতেও নৃত্য-নৃত্ত উভয়ই মধুর ও উদ্ধত ভেদে দ্বিবিধ। মধুর-লাস্য, উদ্ধত-তাণ্ডব। নট ও নর্ত্তকগণ মিলিত হইয়া রস-ভাব-যুক্ত যে অঙ্গচালনা করেন, যাহাতে মার্গ (নৃত্য) ও দেশী (নৃত্ত) মিশ্রিত, যাহাতে অঙ্গহার ও লয়গুলি ললিতভাবময়, কৈশিকী বৃত্তি ও গীতির যাহাতে প্রাধান্য—তাহাই লাস্য। আর যাহার করণ ও অঙ্গহারগুলি উদ্ধত, বৃত্তি আরভটী—তাহাই তাণ্ডব।২১

আবার অন্যত্র শারদাতনয় বলিয়াছেন—নৃত্তই তাণ্ডব ও নৃত্য লাস্য। তাল-মান-লয় যুক্ত উদ্ধত অঙ্গহার প্রয়োগই তাণ্ডব-নৃত্ত। আর অনুদ্ধত অঙ্গহার প্রদর্শনের নাম লাস্য-নৃত্য। উদ্ধত করণ ও অঙ্গহার সমূহ দ্বারা সম্পাদিত, আরভটী-বৃত্তিযুক্ত, তণ্ডু-কথিত উদ্ধত প্রয়োগ—তাণ্ডব। ললিত অঙ্গহার ও ললিত লয়-দ্বারা সম্পাদিত, কৈশিকী বৃত্তিযুক্ত, কামাশ্রিত সুকুমার প্রয়োগ—লাস্য।২২

১৫। "নৃত্তং স্যাদঙ্গাত্রবিক্ষেপোঽবস্থানুকৃতিলক্ষণঃ।
তালভাবলয়ায়ত্তো বাগঙ্গাহার্যসত্ত্বজঃ ॥২॥
নাট্যস্যাভিনয়াংস্তত্র বাচিকাহার্যসাত্ত্বিকান্।
ত্যক্ত্বা নৃত্তাদিযোগং তং বক্ষ্যে ত্রিবিধমাদিকম্" ॥৩॥
সঙ্গীতসময়সার, ৬ অধিঃ

১৬ "অহো নাট্যমিদং সম্যক্ ত্বয়া সৃষ্টং মহামতে।...ময়াপীদং স্মৃতং নৃত্যং সন্ধ্যাকালেষু নৃত্যতা। নানাকরণসংযুক্তৈরঙ্গহারৈর্বিভূষিতম্ ॥১৩॥ পূর্ব্বরঙ্গবিধাবস্মিংস্ত্বয়া সম্যক্ প্রযোজ্যতাম্।...ততস্তণ্ডুং সমাহূয় প্রোক্তবান্ ভুবনেশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥ প্রয়োগমঙ্গহারাণামাচক্ষ্ব ভরতায় বৈ"। নাঃ শাঃ, বরোদা সং, চতুর্থ অঃ, পৃঃ ৮৯-৯০ "তণ্ডুমুনিশব্দৌ নন্দিভরতয়োরপরনামনী" —অভিনবভারতী, পৃঃ ৯০

১৭ "রেচকা অঙ্গহারাশ্চ পিণ্ডীবন্ধাস্তথৈব চ ॥ ২৬৬ ॥ সৃষ্টা ভগবতা দত্তাস্তণ্ডবে মুনয়ে তদা। তেনাপি হি ততঃ সম্যগ্‌গানভাণ্ডসমন্বিতঃ ॥২৬৭॥ নৃত্তপ্রয়োগঃ সৃষ্টো যঃ স তাণ্ডব ইতি স্মৃতঃ"। নাঃ শাঃ ৪র্থ অঃ, পৃঃ ১৭১-৭২। "অতএব তণ্ডোরয়ং তাণ্ডব ইতি বৈয়াকরণৈঃ স্মৃতম্"—অভিনবভারতী, পৃঃ ১৭২।

১৮ "রেচকৈরঙ্গহারৈশ্চ নৃত্যন্তং বীক্ষ্য শঙ্করম্। সুকুমারপ্রয়োগেণ নৃত্যন্তীং চাপি পার্ব্বতীম্ ॥ ২৫৭ ॥ সুকুমারপ্রয়োগশ্চ শৃঙ্গাররসসম্ভবঃ"। (২৫৫) ইত্যাদি (নাঃ শাঃ, ৪র্থ অঃ, পৃঃ ১৬৬-২০৭)। মূলে লাস্য শব্দটি নাই। তবে অভিনবগুপ্তাচার্য্য টীকায় লাস্য যে দেবীর প্রীতিকর তাহার উল্লেখ করিয়াছেন—' যৎ কিঞ্চিল্লাস্যমেতেন দেবী তুষ্যতি নিত্যশঃ। যৎকিঞ্চিৎ তাণ্ডবং তেন সোমঃ সানুচরঃ শিবঃ"—অভিনবভারতীতে উদ্ধৃত শ্লোক, পৃঃ ১৭৯।

১৯ "নাট্যবেদং দদৌ পূর্ব্বং ভরতায় চতুর্ম্মুখঃ। ততশ্চ ভরতঃ সার্দ্ধং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণৈঃ ॥২॥ নাট্যং নৃত্তং তথা নৃত্যমগ্রে শম্ভোঃ প্রযুক্তবান্। প্রয়োগমুদ্ধতং স্মৃত্বা স্বপ্রযুক্তং ততো হরঃ ॥৩॥ তণ্ডুনা স্বগণাগ্রণ্যা ভরতায় ন্যদীদিশৎ। লাস্যমস্যাগ্রতঃ প্রীত্যা পার্ব্বত্যা সমদীদিশৎ" ॥৪॥
অভিনয় দর্পণ।

২০ "মধুরোদ্ধতভেদেন তদ্দ্বয়ং দ্বিবিধং পুনঃ।
লাস্যতাণ্ডবরূপেণ নাটকাদ্যুপকারকম্" ॥ ১০ ॥
দশরূপক (১) "সুকুমারং দ্বয়মপি লাস্যম্, উদ্ধতং দ্বিতয়মপি তাণ্ডবমিতি" অবলোক।

২১ "পুনরেতদ্দ্বয়ং দ্বেধা মধুরোদ্ধতভেদতঃ।
মধুরং লাস্যমাখ্যাতমুদ্ধতং তাণ্ডবং বিদুঃ ॥
... ...
ললিতৈরঙ্গহারৈশ্চ নির্ব্বর্ত্ত্যং ললিতৈর্লয়ৈঃ ॥
বৃত্তিঃ স্যাৎ কৈশিকী গীতির্যত্র তল্লাস্যমুচ্যতে।
উদ্ধতৈঃ করণৈরঙ্গহারৈর্নির্ব্বর্ত্তিতং সদা ॥
বৃত্তিরারভটী গীতকালে তত্তাণ্ডবং বিদুঃ"। ভাবপ্রকাশন, পৃঃ ৪৫-৪৬ ও পৃঃ ২৯৬-৯৭

২২ "গীতাদৌ কৈশিকীবৃত্তিবহুলং ভাবমন্থরম্।
সুকুমারপ্রয়োগং যত্তল্লাস্যং মন্মথাশ্রয়ম্ ॥
লস্ সংশ্লেষণ ইত্যস্য ধাতোর্লাস্যস্য সংগ্রহঃ।
সংশ্লেষণাদঙ্গহারাণামঙ্গৈর্লাস্যং প্রচক্ষতে ॥
তণ্ডুক্তমুদ্ধতপ্রায়প্রয়োগং তাণ্ডবং বিদুঃ"। ভাবপ্রকাশন, পৃঃ ৪৬

লাস্য চতুর্ব্বিধ—লতা, পিণ্ডী, ভেদ্যক ও শৃঙ্খলা। তাণ্ডব ত্রিবিধ—চণ্ড, প্রচণ্ড ও উচ্চণ্ড।২৩

ঐ সম্বন্ধে আর কিঞ্চিৎ আলোচনা বারান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

২৩ 'সুকুমারপ্রয়োগো যো নিয়তো লাস্যমুচ্যতে।
তচ্ছৃঙ্খলালতাপিণ্ডীভেদ্যকৈঃ স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্" ॥ পৃঃ ২৯৭
"তাণ্ডবং তত্ত্রিধা চণ্ডপ্রচণ্ডোচ্চণ্ডভেদতঃ"। পৃঃ ২৯৮
"চণ্ডোচ্চণ্ডপ্রচণ্ডাদি ভেদাত্তাণ্ডবং ত্রিধা।
অনুদ্ধতং চোদ্ধতং চ তথাত্যুদ্ধতমিত্যপি।
তত্র তাণ্ডবভেদস্তু পরস্তাদেব বক্ষ্যতে"। পৃঃ ৪৫

বৃত্তি—বিলাস-বিন্যাস-ক্রম—বৃত্তি—'নাট্যমাতৃকা' নামে খ্যাত।
বৃত্তি—চতুর্ব্বিধ—কৈশিকী, সাত্বতী, আরভটী ও ভারতী।
কৈশিকী—স্ত্রীবহুলা ললিতা বৃত্তি। আরভটী—উদ্ধতা বৃত্তি।

ক্রমশঃ

তোমারই

(উপন্যাস)

শ্রীঅলকা মুখোপাধ্যায়

এই ত সেদিনের কথা···

বার ছিল বৃহস্পতি, তিথি ছিল পূর্ণিমা, চাঁদ তখনও ওঠেনি, সবে দু'পুর গড়িয়ে বিকেলে পড়েছে, জ্যোতির হঠাৎ মনে হল ওর বুঝি নূতন জীবন আরম্ভ হ'ল।

মেয়েটির নাম সুলেখা।

সুলেখা মেয়েটির বয়স বোধ হয় একুশ, ধবধবে ফর্সা, রোগা গড়ন। দেখতে সুন্দরী, স্বভাব গম্ভীর, দৃষ্টিতে তার ঝরে পড়ছে মায়া। আজও তার চোখ দুটি তার সম্পদ্। স্বপ্নময়? ঠিক নয়; হোলিমাখা।···

সুলেখাকে জ্যোতি প্রথম দেখেছিল পাঁচ বছর আগে শুধু একদিনের জন্য। মাত্র পনেরো মিনিটের আলাপ। কোন এক বন্ধুর জন্মদিনে সুলেখা একরাশ সাদা ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে হাসছিল।

সেই প্রথম দিনের কথা জ্যোতির আজ একবার মনে পড়ে গেল। বন্ধু হাসতে হাসতে যখন বললে 'সুলেখা, সাদা ফুল আনলে জন্মদিনে কিন্তু ও যে বনের বিধবা মেয়ে, মরণের পরে মৃতের বুকেই ত ওর শোভা।"

সুলেখা রাগ করেছিল, অভিমান করেছিল, আজও চোখ দু'টিতে ঝরে পড়েছিল রুদ্র কশাঘাতের তীব্র শিখা···

জ্যোতি ভেবেছিল সুলেখা বুঝি বন্ধুকে ভালবাসে।

তখন যদি জানিত ও ভুল ভেবেছিল!··

বন্ধু আদর করে বলেছিলো, "রাগ করলে সুলেখা? তোমাকে আঘাত করবার জন্যে ওকথা বলিনি, বলেছিলাম তোমার মনকে জানবার জন্যে। যাক সে কথা, ঘরের কোনখানে রাখবে ফুলগুলো?"

যে ভাষায় সুলেখা ফুল রাখবার কথা বলেছিল সে ভাষা প্রিয়তমার মুখেই মানায়, তাই জ্যোতি ভুল করেছিল।

তার পর কতদিন, কত রাত কেটে গেছে। পাঁচটি বসন্ত জীবন্ত হ'য়ে পাঁচটি বর্ষায় মিলিয়ে গেছে ওদের সকলের জীবনের ইতিহাসে।

জ্যোতি নিজের মনকে চিনতে পারে নি, সুলেখাকে চিনতে পারে নি, বন্ধুকে চিনতে পারে নি, তাই জানা-অজানার অন্ধকারে ভুলের মধ্য দিয়ে ভুলে যাবার মতন পাঁচটি বছর কেটে গেছে। জ্যোতি বিয়ে করে ঘরে আনল বৌ, নাম তার অমিতা।

বন্ধু চলে গেল প্রবাসে চাকরি নিয়ে।

সুলেখা সকলের মনে চমক লাগিয়ে বিয়ে করল সাত সমুদ্র তের নদী পারের কুড়িয়ে আনা মণিকে। পরে জানা গেল, মণিতে ঔজ্জ্বল্য আছে কিন্তু স্থিতি নেই।

ঠিক অনিতার মতন। অনিতা ছিল কলেজের পরীক্ষায় পাশ করা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা সৌন্দর্য্যে মোড়া কলের পুতুল, সেই ধরণের মেয়ে—যাদের টু-সিটারে পাশে বসিয়ে সিনেমা হলে ঢুকতে হয় আলো নেভাবার আগে, বন্ধুর বিয়েতে কিম্বা জন্মদিনের আসরে ডাকতে হয় বিলেতী ধার করা নামে। বিলেত-ফেরতাদের চায়ের মজলিসে যারা চলতি, মাসিমা-পিসিমার নেমন্তন্নতে যারা অচল, অমুক সোসাইটি অথবা অমুক কালচার সেণ্টারে যারা সেক্রেটারী তাদের মধ্যেই ওর আসল স্থান।

ঠিক এইস্থানটাতেই জ্যোতির ভুল হয়েছিল। জ্যোতি পালিস করা শান দেওয়া ছেলে, চকচকে, ভয়ানক ধার, কিন্তু হ'লে কি হবে, মনটা ছিল ওর ভয়ানক সেকেলে, আউট অফ ডেট! মাকে আপনি বলতে ভালবাসত, মামি বলে অপমান করত না! একান্নবর্ত্তী পরিবারের গোলমালের মধ্যেই ও নিজের স্বাতন্ত্র্য চাইত এবং পেত, আলাদা টু রুমড়

ফ্ল্যাটে গ্লাস-কেসের মধ্যে বৌকে সাজিয়ে রাখাকে ঘৃণা করত !

বৌকে সন্ধ্যাবেলায় চায়ের মজলিসে জর্জিয়েটের চাকচিক্যের মধ্যে দেখতে চাইত না, দেখতে চাইত ওদের মধ্যবিত্ত সংসারের ছোট্ট দু' তিনখানা ঘর দেওয়া একতলা বাড়ীর উঠানের কোণে তুলসীতলায় গলবস্ত্র অবস্থায় প্রণামরত ! বৌকে ডার্লিং বলে কিম্বা প্রিয়তমাসু বলে পাঁচজনের মধ্যে স্ত্রী-প্রীতি প্রকাশ করতে চাইত না, চাইত সবার আড়ালে নিজস্ব নীরব রাত্রের অন্ধকারে "বৌরাণী" বলে ডেকে আদর করতে !

বিপরীতমুখী স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হল এই সব ব্যাপার নিয়ে। নিজস্ব মনোভাব এক তিল ছাড়তে কেউ রাজী হল না, ফলে দুই ফুল দুই স্রোতের মধ্যে দু'দিকে ভেসে গেল ; মাঝখানের ব্যবধান ক্রমেই প্রসার লাভ করতে করতে এতদূর প্রসারিত হল যে, মিলনের কোন আশাই রইল না !

অগ্নিশিখার মধ্যস্থতায় একদিন ওদের দু'জনকার জীবন-বিনিময় হয়েছিল, একথা ওরা দুজনেই প্রায় ভুলে গেল। সে ঘটনা রইল ভুলে যাওয়া স্বপ্নের মতন অস্পষ্ট অলীক।

জ্যোতির মাঝে মাঝে মনে পড়ত সেই রাত্রের কথা, যেদিন আচমকা একটা জীবনের দায়িত্ব ওর ঘাড়ে পড়ল। সবাই বলেছিল, "যৌবনের স্বপ্নসীমা পেরিয়ে প্রকৃতির রাজ্যে পা পড়ল, পৃথিবীর মানুষ তোমরা দু'জন, বোঝা তোমার কাঁধে !"

আজ ভাবে, পৃথিবীর মানুষ ও ঠিকই যৌবনের স্বপ্নসীমা পেরিয়েছে, কিন্তু যা পেয়েছে বলে সেদিন ওর মনে হয়েছিল তা পায়নি, সবাই যা বলেছিল তাই পেয়েছিল। স্ত্রী পায়নি, পেয়েছিল বোঝা

জীবনের চব্বিশটি বসন্ত ঘুমিয়ে পড়ল ঐ একটি দিনের ভুলে···আচমকা, হঠাৎ, সকলের অগোচরে, এমন কি অনিচ্ছারও।

সুলেখার জীবনটাও প্রায় তাই হল। জীবন-বীণার তারে সুর বাঁধান ভৈরবীর পর্দাগুলো পর পর সাজিয়ে মধু-রাগিণীর ঝঙ্কারে জীবনের প্রস্তাবনা হল অপূর্ব সুন্দর কিন্তু সংসারের তালে সমতালে চলতে গিয়েই দেখল তাল কাটছে। এমন একটা কিছুর অভাব হল, যাতে স্বামীর ওপর ভালবাসা কমল না, কমল জীবনের প্রতি আকর্ষণ। বিয়ের তিন বছর পরেও যখন শাশুড়ী, ননদ ভাজেরা গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দুঃখ করলে, প্রকাশ্যে সুলেখাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, "ছোট ছেলে না হলে কি বাড়ী মানায় ? তোমরা কি বুঝতে পার না !" তখন সুলেখার মাতৃত্ব কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রকাশ্যে বলে, "নূতন বৌ আন, সাধ মিটবে।

সমাজ, সংসার সুলেখাদেরই এর জন্য দায়ী করেছে, আজ নয় চিরদিন !

বিয়ের তিন বছর আশা-নিরাশায় কেটে গেল। বিবাহের তৃতীয় বার্ষিকী এল বসন্তের পূর্ণিমাতে, সঙ্গে আনল না মধু-মালতীর মালা, সুলেখা জানল না কোন ঘরের কোন দরজা দিয়ে বসন্তের দাক্ষিণ বাতাস বইছে।

ওর বিয়ের তৃতীয় বার্ষিকী ওর চির জীবনের কলঙ্ক, ওর মাতৃত্বের চিরনির্ব্বাসনের প্রথম রাত্রি, ওর সংসারের সব চেয়ে বড় অভাবের প্রথম সূচনা, সেইদিন থেকে ও আশাও ছাড়ল।

গভীর রাত্রের নির্জ্জনতা, গোপনে কাঁদছিল, স্বামীর ঘুম গেল টুটে, জিজ্ঞেস করল, "কেন, কাঁদছ কেন ?

কেন কাঁদছে ? পুরুষ কি করে বুঝবে নারী কেন কাঁদে ? কোন ফাঁদে পা পড়লে, মাটীর মতন সর্ব্বসহা কল্যাণী স্ত্রী—যে সংসার চায়, স্বামী চায়, শিশু চায়, সে কাঁদে···বললে আমার মধ্যে যে চিরদিনের নারী, পুতুলখেলায় ছোট্ট মাটীর ঢেলাকে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো দিয়ে পরমাদরে সাজিয়ে সংসার গুছিয়ে দিয়ে যার প্রথম প্রকাশ, সে যে আজ কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ছে স্বামী বুঝল না, বললে "কিসের অভাব তোমার ?

"জীবনের।"

স্বামী পাশ ফিরে ঘুমুলো, সুলেখার অন্তঃস্থল ভেদ করে বেরিয়ে এল দীর্ঘ নিশ্বাস।

বাইরে জ্যোৎস্নার প্লাবন বইছে, সমস্ত পৃথিবীর বুকের ওপর প্রকৃতি বিছিয়ে দিয়েছে আদরের চাদর, ঘুমহারা পাখী কাঁদছে সাথীকে আহ্বান করে, আর ? ··

মাতৃত্বকে চিরনির্ব্বাসন দিয়ে সুলেখার মন নূতন ছন্দে নিজকে প্রস্তুত করল···

নিয়তির এই পরিহাস ও সহ্য করবে সমস্ত জীবন, তবু কাঁদবে না, কাঁদবে না, কাঁদবে না···

*

নূতন জীবন আরম্ভ হ'ল সুলেখার ! ভোরের কাকলী থামল প্রখর সূর্য্যের প্রাচুর্য্যে, পথের ধারের ফুলগুলো ঘুমিয়ে পড়ল পথিকের পদাঘাতে, মেঘের ধারের রূপালী আলো অন্ধকারে গেল মিলিয়ে, গানের সুর ভেসে গেল অনন্ত হাহাকারের মধ্যে। হাসি মিলিয়ে গেল, থমকে দাঁড়াল নিভৃত নির্জ্জনের অশ্রু-বিসর্জ্জনের মুহূর্ত্তটির প্রথম আভাষে, একটি কথা নয়, একটি অনুযোগ নয়, সর্ব্বসহা, সর্ব্বহারা নারী জীবনের প্রাতপল নূতন ছন্দে পা ফেলল জীবনের সঙ্গে সমতালে।

জীবনের সূর্য্য দু'পুরের আকাশে উঠল,···"শূন্য জীবনের মরীচিকা বিভীষিকাময় হয়ে উঠল···প্রান্তরে বেণুর সুর গেল।

থেমে, রাখালবালক পড়েছে ঘুমিয়ে, পথের কোলাহল গেল থেমে, শিশুর দল বাড়ী ফিরে ঘুমিয়ে পড়ছে।

সুলেখার সাথীহারা জীবন এমনি করে এগিয়ে চলল। ওর আত্মীয় স্বজন হাসল, ঠাট্টা করল, ও ঘুমোনো মাতৃত্বকে আঘাত করল, কেউ কিন্তু সহানুভূতি প্রকাশ করল না, দোষ যে ওরই!

জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণায় ওর মন ভরে উঠল, সবাই এগিয়ে গেল, ও ইচ্ছে করেই পিছিয়ে পড়ল, ক্রমে সবাই অসীমের পারে মিলিয়ে গেল, ওর পথকে পেরিয়ে···সংযোগ হল ছিন্ন, ভিন্ন হল একই সংসারের দু'জন যাত্রীর পথ, ওর আর ওর স্বামীর।

নির্জ্জনতা জীবনের প্রতি পলকে বাস্তব হয়ে উঠল·· জ্যোতির মতন সুলেখাও হয়ে উঠল সাথীহারা।

*

এমনি করে পাঁচ বছর কেটে গেল। সুলেখা আর জ্যোতি আপন আপন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে সাথীহারা জীবনকে বরণ করল, অর্ঘ্য দিল, জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনাকে ত্যাগের আবরণে সাজিয়ে আরতি করল, যে ভালবাসা কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে তার প্রদীপ জ্বেলে।

ভাগ্য-বিধাতা পরিহাস করলেন, হাসলেন অলক্ষ্যে।

ওরা দুজনে ভাবতেও পারেনি জীবনের আরও অনেক ত্যাগ বাকি, আরও অনেক ভালবাসার আরতি হবে, জ্যোতি জানত না—আবার ওর জীবনে জাগবে শাদা শুভ্র ফুলের মতন সৌন্দর্য্যের প্রসার।

সুলেখা জানত না, ভালবাসা আবার ওকে জাগিয়ে দেবে আচমকা···নূতন জীবন আবার হবে আরম্ভ। মাতৃত্ব ওর আবার জাগবে শত বসন্তের মাধুর্য্য নিয়ে।

জীবনটা এমনি করেই চলে, এমনি বিচিত্র তার গতি।

ক্রমশঃ

ভারতবাসীর মিলন হয় না কেন?

মানুষ ইয়োরোপেই জন্মগ্রহণ করুক, আর আফ্রিকা অথবা ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করুক, মানুষ মুসলমানই হউক আর খৃষ্টানই হউক, আর হিন্দুই হউক, মানুষ যে মানুষ, মানুষের শরীর বিধানের কর্ম্ম (physiological function) এবং তাহার শরীরের গঠন (anatomical composition) যে, সমস্ত মানুষের মধ্যে মূলতঃ এক, ইহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে হইলে যে বিদ্যা ও শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা বিদ্যমান থাকিলে মানুষের আর্থিক অভাব এতাদৃশ ভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারিত না এবং মানুষের মধ্যে অমিলন এতাদৃশ ভাবে পরিলক্ষিত হইত না। হিন্দুই হউক, আর মুসলমানই হউক, আর খৃষ্টানই হউক, ইংরাজই হউক, আর তুর্কীই হউক, আর ভারতবাসীই হউক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও মলমূত্র ত্যাগের প্রবৃত্তি; আহার, বিহার, শিক্ষা, কর্ম্মপ্রচেষ্টা এবং বিশ্রামের লালসা; বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়তা এবং বার্দ্ধক্য যে সকল মানুষেরই আছে, তাহা যথাযথভাবে লক্ষ্য করিলে ধর্ম্ম ও জাতি লইয়া মানুষের মধ্যে এত বিদ্বেষের উদ্ভব হইতে পারে কি?···

বঙ্গশ্রী—মাঘ, ১৩৪৩
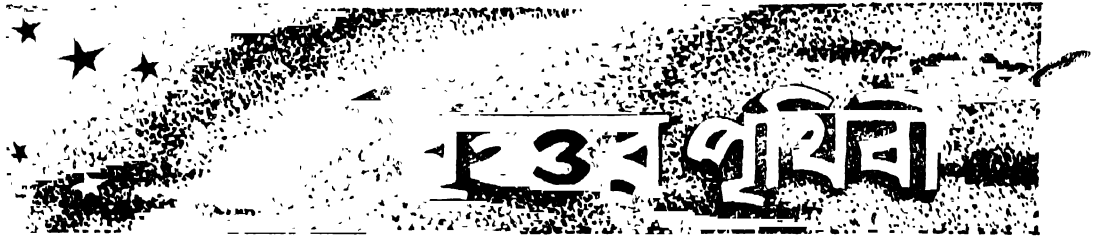
ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে

শ্রীতারানাথ রায় চৌধুরী

আমরা সমতল বাঙ্গলার অধিবাসী। আমাদের উত্তর পূর্ব্ব অংশে পার্ব্বত্য আসাম ও ত্রিপুরা এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম। এই আসামেই লুসাই, খাসিয়া জয়ন্তিয়া, নাগা এবং মণিপুর। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরে চীন পর্ব্বত, লুসাই পর্ব্বতমালার ঠিক পূর্ব্ব দিকে, এই চীন পর্ব্বতের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমায় আরাকান রাজ্য, সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহারও অধিকাংশ স্থল পর্ব্বতময়। মধ্য আসাম ও চট্টগ্রামের কতক অংশ ছাড়া আর সর্ব্বত্রই পার্ব্বত্য জাতি বাস করে। ইহার মধ্যে মণিপুর রাজ্য উন্নতশ্রেণীর সভ্য লোক দ্বারা অধ্যুষিত; নাগা-পর্ব্বত ও লুসাই পাহাড় কিম্বা চীন পাহাড়ে অসভ্য জাতিদের বাস। এই অসভ্য জাতিদের মধ্যে বহু হিংস্রজাতি বাস করে। লুসাই পর্ব্বত-রাজ্য ও চীন পর্ব্বত-রাজ্য উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। মণিপুরে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী জাতিদের বাস। কোহিমা নাগাপর্ব্বতমালার ঠিক পার্শ্বেই, এখানেও পার্ব্বত্য অসভ্য জাতি বাস করে। আরাকানের অধিবাসী মগ ও আরাকানরা কতকটা সভ্য, কতকটা অসভ্য। তবে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বহু মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু উক্ত অঞ্চলে কৃষিকার্য্য ও ব্যবসা উপলক্ষে বাস করিতেছে। ইহাদের ভাষা অবোধ্য। লুসাই, নাগা, খাসিয়া জয়ন্তিয়া চীন প্রভৃতি স্থানের পার্ব্বত্য জাতির ভাষাও অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য। ইহাদের রং কালো কিন্তু লুসাইগণের বর্ণ তামাটে, উহারা লম্বা এবং দীর্ঘ কেশযুক্ত। ইহাদিগের নাসিকা লম্বা। তবে মণিপুর ও কোহিমার লোক অনেকটা বেঁটে, নাক চ্যাপটা, কেশ কাল। ইহাদিগের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন বেশী এবং ইহারা দেবদেবীর উপাসক, কালী ও শিবভক্ত, বর্ত্তমানে বৈষ্ণবের সংখ্যাও বেশী। নাগারা খৃষ্টান মিশনারীগণের নিকটে খৃষ্টধর্ম্ম লাভ করিয়া এখন কতকটা সভ্য হইয়াছে, তাহারাই ইংরেজভক্ত, কিন্তু পার্ব্বত্য অঞ্চলে নাগা, কুকী, মিসমী ল্যাপসা প্রভৃতি জাতি—এখনও তাহাদের প্রাচীন প্রথানুযায়ী ভূত, প্রেতের পূজা করে গভীর রজনীতে পর্ব্বত অরণ্যে ভূত পূজার সময় তাণ্ডবনৃত্য করে। উহারা প্রচণ্ড শিকারী, দলপতির অধীনে বাস করে। পশুমাংস ভক্ষণ করে এবং ভুট্টার চাষ করে। ধান ক্ষেত আছে, ধান্য উৎপন্ন করে, তরিতরকারী খাইতে জানে না, মাছ খায় না, তবে মধ্যে মধ্যে নিকটে সহরে আসিয়া শুষ্ক মৎস্য খরিদ করে। উহারা চিংড়ী শুঁটকি খুব ভালবাসে। বিবাহ-ধর্ম্ম আছে, গ্রামের ওঝা বা পুরোহিত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী। কোন কোন জাতি মাথায় পাখীর পালক পরে, হাতে তীর, ধনুক, বর্শা, রামদায়ের মতন একপ্রকার প্রকাণ্ড ফলা-বিশিষ্ট দা উহারা ব্যবহার করে। আজ এই বিস্তীর্ণ পার্ব্বত্য অঞ্চলে ভারতে জাপ অভিযান আশঙ্কায় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আমেরিকানদের সাহায্যে বিপুলভাবে প্রতিরোধ-ব্যবস্থা করিয়াছে বলিয়াই প্রকাশ। আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের চট্টগ্রাম অঞ্চল ও আরাকান রণস্থলে পরিণত হইয়াছে।

বাঙ্গালার অধিবাসী মাত্রই জানেন, এই যুদ্ধায়োজনের ফলে বাঙ্গালার দুর্দ্দশা চরমের উপরে উঠিয়াছে। বাঙ্গালার ব্যবসা বাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে। ১৩৫০ সালে ভীষণ দুর্ভিক্ষে প্রায় এককোটি লোক মৃত ও অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। মৎস্যজীবি, কামার, কুমার, তাঁতি ইহারা প্রায় নির্ব্বংশ হইয়াছে। বাঙ্গালার গ্রাম-নগর ধ্বংস হইয়াছে। ৪।৫ টাকা মণ দরের চাউল কোন কোন স্থানে ১০০৲ একশত টাকায়ও বিকাইয়াছে, এমন দুর্দ্দৈব বাঙ্গালার পক্ষে কখনও ঘটে নাই। ভারতের পূর্ব্ব-সীমান্ত-অধিবাসীগণেরও দুর্দ্দশার অন্ত হইয়াছে, যুদ্ধ বিগ্রহ, সেনা পরিচালন এবং যুদ্ধের আনুষঙ্গিক ব্যাপারে আরাকান ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম এবং আসাম অঞ্চলের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে।

অপর দিকে সীমান্ত প্রদেশ শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সুদৃঢ় করিতে হইয়াছে, তাহাতে নূতন নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ, নূতন দুর্গ ও বিমানাগার প্রভৃতি নির্ম্মাণেও সহস্র সহস্র একর জমি নষ্ট হইয়াছে এবং শস্যক্ষেত্র ও মূল্যবান্ বনভূমি নষ্ট হইয়াছে, সামরিক কারণে অনেকগুলি সীমান্তস্থিত পর্ব্বত ডিনামাইট্ সাহায্যে নষ্ট করা হইয়াছে, ইহাতেও দেশের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে। ব্রিটিশ সরকার আমেরিকার সাহায্যে কতকগুলি রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে আরাকান অঞ্চলের সমুদ্রতীরের গ্রাম্য পল্লী মংড হইতে বিশ

মাইল দুরবর্ত্তী বুথিডং পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত রাস্তা রহিয়াছে। এই রাস্তার সংস্কার সাধন করা হইয়াছে, মংড হইতে চারি মাইল দূরে রাজাবিল নামক স্থানে সুদৃঢ় ঘাঁটি তৈয়ারী করিতে হইয়াছে।

চট্টগ্রাম ও দোহাজারী রেলপথের পরেও মায়ু উপত্যকা অভিমুখে সৈন্য চলাচলের জন্য একটী প্রশস্ত রাস্তা করিতে হইয়াছে। দোহাজারী চট্টগ্রাম হইতে পঁচিশ মাইল দূরে। অন্য একটী পথ কক্সবাজার হইতে উখিয়া হইয়া বরাবর সমুদ্রতীরের টেক্‌নাফ নামক স্থানে গিয়াছে, এই টেক্‌নাফের অপর দিকেই মংড গ্রাম। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের উপরেই চীন পর্ব্বত, এই পর্ব্বতে একটী প্রচীন দুর্গ রহিয়াছে, উহার নাম হোকাইট দুর্গ, এই দুর্গের নিকটেও অপর একটী দুর্গ রহিয়াছে, ঐ দুর্গটীর নাম ট্রেগার।

টিড্ডিম হইতে—টামু—পানেল হইয়া একটী বড় রাস্তা মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল পর্য্যন্ত গিয়াছে, এই রাস্তাটী বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ব্রিটিশ সরকার প্রস্তুত করিয়াছে। ইম্ফল হইতে আর একটী প্রশস্ত রাজপথ কোহিমা হইয়া ডিমাপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই পথের উপরেই ডিমাপুরের সংলগ্ন মণিপুর রোড্ ষ্টেশন। ইহার দূরত্ব প্রায় এক শত ত্রিশ মাইল।

চিন্দুইন নদী মণিপুর ও ব্রহ্মদেশকে বিভক্ত করিয়াছে। এই চিন্দুইন নদীর তীরে হোমালিন নামক একটী স্থান আছে, এই হোমালিন হইতে একটী পথ উখরুল ও কোহিমা হইয়া ডিমাপুর গিয়াছে। কিন্তু এই পথটি অত্যন্ত জটিল, পর্ব্বত অরণ্য এবং উচ্চ স্থানে অবস্থিত। কোন কোন স্থান ১০ হইতে ১২ হাজার ফিট উচ্চ। এই গভীর অরণ্যে সিংহ ছাড়া আর সকল প্রকার জীবজন্তুই রহিয়াছে। বিশেষতঃ হস্তী ও সর্প এই জঙ্গলের মারাত্মক জীব। পৃথিবীর কোথায়ও এমন বিরাট ও হিংস্র সর্প নেই। আর একটী জীবও এ-দেশে বড় মারাত্মক. উহাদিগকে স্থানীয় লোকেজোক বলে। ইহারা সাপের মতন গাছেও থাকে। এই পথটীতে বর্ত্তমানে জাপানের সৈন্য ও ব্রিটিশের মারাত্মক লড়াই হইতেছে, অপর একটী রাস্তা চীন পাহাড়ের টিড্ডিম হইতে লুসাই-এর রাজধানী আইজল পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই আইজল বৃটিশ পক্ষের একটী প্রকাণ্ড সৈন্য-নিবাস। আইজল হইতে বরাবর শিলচরের অদূরবর্ত্তী লালবাজার পর্য্যন্ত একটী পার্ব্বত্য নদী বহিয়া চলিয়াছে, এই নদীপথে আইজলের ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হয়।

অপর একটী রাস্তা বিষেণপুর গিয়াছে। ইম্ফাল হইতেও একটী রাস্তা বিষেণপুর গিয়াছে, নিম্নলুসাই হইতে একটী পার্ব্বত্যপথ পার্ব্বত্যত্রিপুরার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই পথ ধরিয়া বরাবর উদয়পুর নামক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে যাওয়া যায়। পৌষমাসে উদয়পুরের কালীবাড়ীতে বিরাট পূজা-উৎসব হইয়া থাকে। বহু মণিপুরী এবং লুসাই-এর পার্ব্বত্যজাতি এখানে দেবীর পূজা দিতে আসিয়া থাকে। গৌহাটি হইতে একটী রেলপথ ডিমাপুর হইয়া তিন্‌সুকিয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে, তিন্‌সুকিয়া হইতেই ডিগবয় নামক প্রসিদ্ধ তৈলক্ষেত্রে যাইতে হয়, অপর দিকে খাসিয়া পাহাড়ের পার্ব্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ীজাতিদের চলার পথ রহিয়াছে। এই পথেও শিলচরকে দক্ষিণে রাখিয়া মণিপুরে প্রবেশ করা যায়।

দেশের নিরাপত্তার জন্য ব্রিটিশ এই সকল অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে প্রশস্ত পথ নির্ম্মাণ করিয়াছে। অপর দিকে কালিংপং হইতেও একটী রাস্তা ভুটান অতিক্রম করিয়া চীন অভিমুখে গিয়াছে, এই রাস্তাটী নির্ম্মাণ করিতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রায় প্রতি মাইলে এক লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে।

হোমালিনের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেমেরা পার্ব্বত্য অঞ্চল এই হোমালিনের পশ্চিমে। উহারও পশ্চিমে বেরি পর্ব্বতমালা কোহিমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, কোহিমার উপরে নাগা পর্ব্বত, এখানে দুর্দ্দান্ত নাগারা বাস করে। যদিও এই সকল অঞ্চল পর্ব্বত-সঙ্কুল দুর্ভেদ্য, তবুও সমর-পরিচালনার দিক দিয়া অতিশয় উৎকৃষ্ট স্থান। এই অঞ্চল যাহার অধিকারে থাকিবে, তাহার পক্ষে আসাম এবং পূর্ব্ববঙ্গ মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর সীমা পর্য্যন্ত দখল করা অসম্ভব নহে।

আমরা বাঙ্গালী এমন বিপদজনক পরিবেষ্টনের মধ্যে বর্ত্তমানে বাস করিতেছি। জাপান যদি এই পথে অভিযান করে এবং ব্রিটিশের নির্ম্মিত রাস্তাগুলির সাহায্য পায়, তাহা হইলে আমাদের বিপদ বাড়িয়াই যাইবে।

এই সকল পার্ব্বত্যদেশে পূর্ব্বে কোন রাস্তাঘাট ছিল না এবং এই সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া আমাদের সমতল ভূমিতে পদার্পণ করাও কাহারও শক্তিতে কুলাইত না। কাজেই আমরা নিরাপদ ছিলাম, কিন্তু আজ ব্রিটিশেরই নির্ম্মিত প্রশস্ত পথগুলি আমাদের বিপদের কারণ হইয়াছে। তারপর—ভবিষ্যৎ জানে।

বিল্বমঙ্গলের ভিক্ষুক

শ্রীশ্রীপদ মুখোপাধ্যায়

নাটকের "ঘাত-প্রতিঘাত" বলিয়া যে কথাটা আছে, তাহারই মূর্ত্তিমান্ উদাহরণ-স্বরূপ যেমন "আমি দেখে নেবো, দেখে নেবো, দেখে নেবো" বলিতে বলিতে বিল্বমঙ্গলের প্রথম রঙ্গ-মঞ্চে প্রবেশ, তেমনই তার অব্যবহিত পরেই—

"ওঠা নামা প্রেমের তুফানে

টানে প্রাণ যায় রে ভেসে, কোথায় নে যায় কে জানে?"

গাহিতে গাহিতে ভিক্ষুকের আবির্ভাব। "উঃ—প্রাণের টানই বটে বাবা!... আচ্ছা, এ-পিরীতের ব্যাপারটা কি বল্‌তে পারিস্?...তুই বল্‌তে পার্‌লি নি? গলায় গামছা দিয়ে টানে। আমি আর ভুল্‌চি নি"। হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের এমন সহজ, সরল, সুন্দর উদাহরণ আর দেখা যায় না—পাঠকের মনশ্চক্ষে বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণি-হৃদয়ের প্রেম-তরঙ্গের ওঠা-নামা ভিক্ষুকের ঐ এক গানেই প্রত্যক্ষীভূত হইয়া গেল। বিল্বমঙ্গল রাগ করিয়া এতক্ষণ ভাবিতেছিল বটে যে, সে আর চিন্তামণির কাছে যাইবে না কিন্তু তাহার মন তাহাতে ষোল আনা সায় দেয় নাই। ভিক্ষুকের গান তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল যে প্রিয়ার পিরীতি গলায় গামছা দিয়া টানে, না যাইয়া থাকিবার তাহার সাধ্য নাই। তাই সে এতক্ষণে বলিল, প্রেমের এই প্রথম পাঠ কদাপি আর বিস্মৃত হইবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভিক্ষুক তাহার প্রথম আবির্ভাবেই নাটকের একটা কাজের মত কাজ করিয়া দিল। নাটকের কাজ ত' করিলই, উপরন্তু চোর-ভিক্ষুক এইখানেই তাহার নাটকীয় চরিত্রের মর্ম্মস্থলটুকুও প্রকাশ করিয়া ফেলিল—"এ, বাবা, আমার চোরাই গান নয় বাবা"। ভিক্ষা ত' একদম্ একটাকা দিতে চাহিতেছ, কিন্তু "ফাঁড়িদার ধরিয়ে দেবে না তো বাবা"? বিল্বমঙ্গল যখন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁ রে, তুই কখনও পিরীতের টানে পড়েছিস্"? তখন যেন সে কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই বলিয়া ফেলিল, "আজ্ঞে, ও-সব আমার নেই, আপনি যে শুনেছেন হাতটান্—সে গেরোর ফেরে হয়েছিল; সেই অবধি নেশাটা-ভাঙটা কদাচ কখন করি, পেলুম, কল্লুম, নইলে নয়"। স্পর্শমণির স্পর্শে লোহা সোনা হইয়া যায়। ভবিষ্যতে কি নাটকীয় পরিণতিতে, কি ভাবের দিক দিয়া, চোর-ভিক্ষুক যে লৌহ-জন্ম ত্যাগ করিয়া সুবর্ণ-জন্ম গ্রহণ করিবে, তাহার ছায়া পূর্ব্বগামিনী হইয়া দর্শকের মনে যেন কিঞ্চিৎ রেখাপাত করিয়া গেল। অন্য কোনও নাট্যকারের হাতে পড়িলে, লোহা হয় ত' শেষ পর্য্যন্ত লোহাই থাকিয়া যাইত—তাহাতে অবশ্য মূল নাটকীয় ক্রিয়ার কোনই ব্যাঘাত ঘটিত না, কিন্তু সিদ্ধ-কবিদের লেখনীর স্পর্শই স্বতন্ত্র।

ভিক্ষুক উপযুক্ত পাত্র-জ্ঞানে বিল্বমঙ্গল-কর্ত্তৃক চিন্তামণি-ঘটিত প্রণয় ব্যাপারে দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইল। ঘটনাক্রমে পরে সাধকের সহিত তাহার দেখা। কথায় বলে "জহুরী-তেই জহরৎ চেনে"। প্রথম আলাপেই ভিক্ষুকের তিন প্রস্থ হাত-টানের পরিচয় পাওয়া গেল—একটা বাঁধা-হুঁকা কাশীধামে এক মোহন্তের জটার ভিতর হইতে একখানা সোনার বাটি, আর শান্তিপুর হইতে একটা সোনার বাটি। তদবধি পুলিশের একখানা পরওয়ানা সঙ্গের সাথী হইয়া আছে—গাছের পাতাটা নড়িলে তাহার গা কাঁপিয়া উঠে। সাধক তাহাকে যোগ্য চেলা বানাইবার জন্য মাঝে মাঝে তালিম দিতে লাগিল বটে, কিন্তু ভিক্ষুকের মন তেমন ভিজিতে চাহিল না। সাধক কেমন যেন সাদা কথা কহে না, থাকমণির সঙ্গে তাহার "ফুসুর-ফাসুর ঢের কথা" হয়, ভিক্ষুকের কেমন যেন মনে হয়—চোরও বুঝি চোরকে চুরীর খবরা ছাপাইতে চাহে! এই কাজটাতে কেমন যেন তাহার অরুচি জন্মিতেছে! পাগলিনী বেশ গান গাহিয়া বলে—

"ওমা—কেমন মা—কে জানে?
'মা' বলে মা ডাক্‌চি কত বাজে না মা তোর প্রাণে?
মা ব'লে ত ডাকব না আর,
লাগে কিনা দেখব তোমার—
বাবা বলে ডাকব এবার প্রাণ যদি না মানে।
পাষাণী পাষাণের মেয়ে, দেখে না'ক একবার চেয়ে
পেত্নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে বেড়ায় শ্মশানে!"—

তাহার বেশ লাগে, মন কেমন যেন উন্মনা হইয়া যায়. পাগলিনীর তত্ত্ব লইতে ইচ্ছা করে। এই পাগলিনী যাঁহাকে "পাষাণের মেয়ে" বলিয়া অনুযোগ করিতেছে, তাঁহাকে ডাকার মত ডাকিলে তিনি কি অধম মানুষের প্রতি ফিরিয়া চাহেন? তাহার পর, বিল্বমঙ্গলের "মই লাগিয়ে পিরীত", সেটাও ত চোখের উপর দিয়া ঘটিয়া গেল। "উঃ লোকটা পিরীতের টানে জল-ঝড়-তুফান-নদী পেরিয়ে কাল-সাপ ধ'রে পাঁচীল টপকালে! যদি চোর হোত, সাত-মহলের ভেতর থেকে টাকার তোড়া বার করে আন্‌তে পারত"। চোরের মনের কি সহজ সুন্দর প্রতিচ্ছবি। প্রাণের একটা টান অনুভবে আসিতেছে বটে, কিন্তু চোর-মনের ছোঁয়াচ তখনও লাগিয়া রহিয়াছে! টহলদাররা এবার গাহিয়া বলিল—

"কি ছাব আর কেন মায়া, কাঞ্চন কায়া ত রবে না।
দিন যাবে দিন রবে না ত, কি হবে তোর তবে?
আজ পোহালে কাল কি হবে, দিন পাবি তুই কবে?

সাধ কখন মেটে না ভাই, সাধে পড়ুক্ বাজ.
বেলাবেলি চল্‌রে চলি, সাধি আপন কাজ!
কেউ কারো নয় দেখ না চেয়ে, কবে ফুটবে আঁখি ?
আপন রতন বেছে নে চল্, হরি ব'লে ডাকি।"

টহলদারেরা কি তাহাকে উদ্দেশ করিয়াই ঐ গান গাহিতেছে ? সে নিজেও' ত মিথ্যা কাঞ্চনের ভিখারী, তাহার কি আঁখি ফুটিবে না ? "আজ পোহালে কাল কি হবে, দিন পাবি তুই কবে" ? ভাবিবার কথা বটে ! "হরি ব'লে ডাকি"—সে আবার কেমন ? কিন্তু পূর্ব্ব সংস্কার—যাই যাই করিতে চাহিলেও সহজে যায় না। ওই না—পাগলিনী আসিতেছে ? "আচ্ছা, পাগলী মাগী গয়না পেলে কোথা ? চিন্তামণির গয়নার মত ঠেকচে। ষণ্ডা মাগী,—কি ক'রে হাতাই ?" কিন্তু কি আশ্চর্য্য, পাগলিনী আসিয়া তাহাকেই ডাকিয়া বলিল—

"দেখ, তুমি আমার ননীচোরা গোপাল ! বাবা, নেবে ? খেলা কর"। পাগলিনী সত্যই যে গহনা দিয়া চলিয়া গেল ! "বেটী গোয়েন্দা নয় ত ? না, বাবা গোয়েন্দা না, পাগলই বটে। (গহনা লইতে অগ্রসর হইয়া) ঐ না পাতাটা নড়চে ? কে আস্‌চে বুঝি ? (ত্রস্তভাবে গহনা লইয়া) যদি বেচতে পারি, একটা আড্ডাধারী টাড্ডাধারী হ'য়ে বস্‌বো !"

গিরিশচন্দ্র "পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ" প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন—"তাঁহার শিক্ষাদানের এক আশ্চর্য্য কৌশল, বাল্যকাল হইতে আমার প্রকৃতি এই যে, যে কার্য্য নিবারণ করিবে সেই কার্য্য আগে করিব। পরমহংসদেব একদিনের নিমিত্ত আমায় কোনও কার্য্য করিতে নিষেধ করেন নাই। সেই নিষেধ না করাই আমার পক্ষে পরম নিষেধ হইয়াছে। অতি ঘৃণিত কার্য্য মনে উদয় হইলে, আমার পুরুষ-প্রকৃতিকে প্রণাম আসে। সেস্থানে পরমহংসদেবের উদয়। কোথায় কোন ঘৃণিত আলোচনা হইলে,পরমহংসদেবের কথায় বহুরূপী ভগবান্‌কে মনে পড়ে"। গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনে এই অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়াই, তিনি ভিক্ষুককে প্রথমে তাহার প্রবৃত্তির পথেই চলিতে দিয়াছেন, পাগলিনীকে দিয়া নিষেধ ত করান নাই, বরং গহনা দান করাইয়া সেই প্রবৃত্তিতে রীতিমত ইন্ধন যোগাইয়াছেন। তিনি জানিতেন, যদি কালক্রমে মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে কখনও আলোকরেখার একবিন্দুও উদয় হয়, তাহা হইলে প্রবৃত্তির পথে চলিতে চলিতেই, নিবৃত্তি আসিবে। ভিক্ষুকেরও তাহাই হইয়াছিল।

সাধক ও থাকমণি এদিকে গোপনে মন্ত্রণা করিয়াছে যে, চিন্তামণিকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিবে। ভিক্ষুক সেই গুপ্ত মন্ত্রণা অন্তরালে থাকিয়া শুনিয়াছে। "ও বাবা ! তোমার ভিতরে এত ? যা থাকে কপালে—মাগী আস্‌চে। আমি ব'লে দিই। আহা ! সেই পাগলীটা আস্‌চে। যাঃ, ওর জন্যে খাবার আন্‌তে ভুলে গেলুম। বাবা, পাপ কল্লে মনের ধোকা সারে না,—আহা ! ওই নেলা-খেলা মাগীকে মনে করেছিলুম গোয়েন্দা ! যে যা দেয়, তাই খায়। পাগলীবেটী আবার তখন বল্লে—'বাবা, তুই আমার ছেলে !" আর কি রক্ষা আছে ? মন না গলিয়া যাইবে কোথায় ? 'ছেলে' বলিয়া যে ডাকিয়াছে,—তাহাকে 'মা' বলিতে, তাহার যোগ্য সন্তান হইতে, প্রাণ যে আন্‌চান্ করে। এমন সময়ে চিন্তামণি আসিয়া পৌঁছিল, পাগলিনী আসিয়াও দেখা দিল। পাগলিনীও চিন্তামণিকে বিষ প্রয়োগের ষড়যন্ত্রের কথায় ইঙ্গিত করিল, ভিক্ষুকও সেই কথায় সমর্থন করিয়া সাধক-থাকমণির ও গুপ্ত মন্ত্রণা ফাঁক করিয়া দিল। চিন্তামণির অর্থের প্রতি, বিষয়-বিষের প্রতি, লোক-চরিত্রের প্রতি ঘৃণা জন্মিল, সে সংসার ত্যাগ করিয়া পাগলিনীর সহিত বৃন্দাবন চলিল এবং অঞ্চল হইতে সিন্দুকের চাবি খুলিয়া পথে নিক্ষেপ করিল। পাগলিনী সেই চাবি ভিক্ষুককে দিয়া চিন্তামণিকে লইয়া গেল। ভিক্ষুকের এই দ্বিতীয়বার আত্মপরীক্ষা, কিন্তু সে চাবি ফেলিয়া দিয়া ভাবিতে লাগিল—"একি ! বেশ্যা সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চ'ল্লো না কি ! আঃ, দূর্ মন ! আমি আর কার জন্যে গাঁট দিই ? আমিও পিছু নিলুম। দেখচি, দুটি খেতে পাওয়া যায় ; তবে ঐ পরওয়ানার কি করি ? এখনই বা কি কচ্চি ? যা থাকে বরাতে, হবে ; সেই ত ঘুরে ঘুরে বেড়াই, হরিনাম ক'রে বেড়াব"। টহলদারেরা সেদিন এই হরিনামের কথাই বলিয়াছিল। লোভ কি সাম্‌লাতে পার্ব্বো ? দেখি মা দুর্গা আছেন" ! পাগলিনীর কথা মনে করিয়াই কি তাহার অকস্মাৎ "মা দুর্গা"র কথা মনে হইল ? "এইত চিন্তামণি যমের হাত থেকে বেঁচে গেল ; আমি আর দারোগার হাত থেকে বাঁচব না" ? পাষাণে প্রেম জন্মিতে আরম্ভ করিয়াছে, শুধু বাঁচা নহে, এইবার তাহার পূর্ণজীবন লাভ হইবে। চিন্তামণির মনে অর্থের প্রতি, লোক-চরিত্রের প্রতি, ঘৃণা জন্মাইয়া দেওয়াতে ভিক্ষুক-চরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা প্রায় শেষ হইয়াছে কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা তাহার জীবনে যে বীজ বপন করিয়াছেন, তাহার সুসঙ্গত পরিণতি দেখাইবার প্রয়োজন এখনও শেষ হয় নাই। সাধক-থাকমণি-হৃদয়ের ঊর্দ্ধগতি আর হইল না, তাই তাহাদের চরিত্র-সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের জীবন-নাটকের যবনিকা পড়িয়া গেল। ভিক্ষুকের হৃদয়ের তখনও ক্রম-বিবর্ত্তন হইতেছে, সেই জন্য শেষ পর্য্যন্ত রহিয়া গেল।

পাগলিনী চিন্তামণিকে বৃন্দাবনের পথে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। চিন্তামণি একাকিনী অকূল পাথারে পড়িয়া কাঁদিতেছে। ভিক্ষুকও বৃন্দাবনের পথ ধরিয়াছিল, চিন্তামণির

সহিত পথিপার্শ্বে তাহার সাক্ষাৎ হইল। ভিক্ষুক পাগলিনীর নিকট হইতে প্রাপ্ত চিন্তামণির গহনাগুলি চিন্তামণিকে প্রত্যর্পণ করিতে চাহিল, কিন্তু চিন্তামণির তাহাতে আর তখন প্রয়োজন ছিল না—

চিন্তা। না, না, ও গহনা তোমার।

ভিক্ষুক। আচ্ছা ভাল; পাগলী দিয়েছে ব'লে যদি আমার হয়, তোমায় দিলুম, এবার ত তোমার হ'ল ?

চিন্তা। না বাছা, আমার গহনায় কাজ নাই।

ভিক্ষুক। বলি, তুমি একবার নাও না, আমি আবার—নোব এখন।

চিন্তা। আঃ! এ পাগল না কি ?

ভিক্ষুক। তুমি মনে ক'চ্চ, আমি খুব বোকা—আর তুমি খুব সেয়ানা। কথাটা কি বুঝিয়ে বলি, শোন। দেখ, আমার কিছু হাতটান্‌টা আছে; দেখে শুনে ভেবেছি যে, ও রোগটা ছেড়ে দোব; কিন্তু চুরি-টুরি কর্‌তে না পার্‌লে রাত্রে নিদ্রা হয় না—ওই একটা দোষ হয়েছে। তাই করি কি জান? একটা গাছকে মনিষ্যি ক'রে বল্লুম, "এই তোর"। তক্কে-তক্কে ফিরচি,—গাছটা যেন ডাল নাড়লেই জেগে আছে! দু'পুর রাত্রে যখন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমি অম্‌নি পোঁট্‌লা নিয়ে সর্‌লুম; দৌড়-দৌড় যেন চৌকিদার আস্‌ছে; তারপর একটা ঝোপে গিয়ে পোঁট্‌লা মাথায় দিয়ে তবে ঘুমুই। তোমার ঠেঁয়ে গয়না নিলে, আমি চুরি কর্‌ব, আর গয়না বেঁচে খাব; আর সব গয়না ফুরিয়ে গেলে, ইট বেঁধে পোঁট্‌লাটা নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌ব"।

চোর-ভিক্ষুক-চরিত্রের বিশ্লেষণ বা ক্রমিক বিবর্ত্তন বুঝাইবার জন্য, উদ্ধৃত অংশই যথেষ্ট, উহার উপর টীকা-টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন। সূর্য্যকে অন্য আলোকের সাহায্যে দেখাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। পূর্ব্ব সংস্কারের প্রভাব যে কতদূর প্রভাবশালা এবং তাহা হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টায় ভিক্ষুক যে তাহার মনের সঙ্গে কতটা এবং কিরূপ বোঝাপড়া করিতেছে, তাহার উৎকৃষ্টতর উদাহরণ বোধ-করি আর হইতে পারিত না। চিন্তামণির মনের উপরও ইহার প্রতিক্রিয়া বড় অল্প হইল না। চিন্তামণিও তাহার পূর্ব্ব-জীবনের স্মৃতির দংশনে বিকল হইয়া উঠিল। "আর ভাবছিস্ কি? মা-বেটার মতন দু'জনে চ'লে যাই আয়"। ভিক্ষুক চিন্তামণিকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া, এক অননুভূত-পূর্ব্ব আশার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, চিন্তামণিকে সঙ্গে লইয়া—গাহিতে গাহিতে চলিল—

"ছাড়ি যদি দাগাবাজী, কৃষ্ণ পেলেও পেতে পারি।
আমি কি পার্‌ব বাবা?—দেখি বেয়ে—পারি হারি।
যদি কেউ বাত্‌লে দিত, এমন লোক দেখ্‌লে হ'ত,
দাগাবাজীর উপর বাজী, খেলা বড় বিষম ভারি।"

চোর-ভিক্ষুকের মুখের এই চারি ছত্র গানের তুলনা হয় না। গান যদি কেবল মাত্র কতকগুলি নরম-নরম ধোঁয়া ধোঁয়া শব্দের গোলক-ধাঁধা হয়, তাহা হইলে অবশ্য ঐ গান সঙ্গীত-পদ-বাচ্য হইবে না। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে গান যদি গায়কের হৃদয়স্থিত সুপ্ত, অব্যক্ত বা অর্দ্ধব্যক্ত ভাবরাশির বহিঃপ্রকাশ হয়, তাহা হইলে ভিক্ষুকের তখনকার অবস্থা স্মরণ করিয়া ইহাই বলিতে হয় যে, অমন গানের ত আর জোড়া মিলিতে দেখি না। সত্য কথা বলিতে কি, এই হিসাবে গিরিশচন্দ্র গানের রাজা ছিলেন এবং আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাকে ঘরোয়া ভাষায় ঘরোয়া ভাবের বঙ্গদেশের সর্ব্বশেষ গীতিকার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভিক্ষুক লোকটা আসলে তেমন কিছু মন্দ ছিল না, যৌবনে নেশার বশবর্ত্তী হইয়া হাতটানটা অবশ্য তাহার হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণি-পাগলিনীর যে আবহাওয়ার ভিতর দিয়া সে চলিয়াছে, তাহাতে তাহার মনে দাগাবাজী ছাড়িবার বাসনা এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ দর্শন পাইবার বাসনা ধীরে ধীরে উদয় হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্ব সংস্কারের প্রাবল্যে সে নিজের মনে তেমন জোর পাইতেছে না, অন্তর্দ্বন্দ্বে কিছু ব্যাকুল হইয়াছে, তাহার এখন এমন একজন কেহ চাই, যিনি তাহাকে পথ বাত্‌লাইয়া দিয়া—"দাগাবাজীর উপর বাজী" একটা "বিষম ভারী খেলা" খেলাইবেন। পাগলিনী তাহাকে পূর্ব্বেই "ননীচোরা গোপাল" বলিয়া ডাকিয়াছে, এখন সেই ননীচোরা গোপালকে—"মাখন-চোর"কে চুরি করিতে পারিলেই তাহার চুরি-বিদ্যা সার্থক হয়। বলা বাহুল্য স্থান-কাল-পাত্র-বিদ্ অন্তর্য্যামী গুরু সোমগিরি অধিকারি-ভেদে ভিক্ষুককে পরে এই পথই বাত্‌লাইয়া দিয়াছিলেন। তাই বলিতেছিলাম যে উদ্ধৃত চারি ছত্রের গানখানি কেবলমাত্র আসর জমাইবার জন্য ভিখারীর মুখের একটা ফাঁকা গান নহে—উহা ভিক্ষুকের নবজাগ্রত জীবন-বেদের মূলমন্ত্র। ঐ গান ভিক্ষুকের নাট্য-জীবন হইতে তুলিয়া লওয়া যায় না, উহা তাহার "লাখ কথার এক কথা"। বর্ত্তমান দেশ-কাল-পাত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহাও বলিতে ইচ্ছা হয় যে, উহা আমাদেরও জীবন-বেদের বীজ-মন্ত্র হওয়া উচিত। জীবনের সর্ব্ববিভাগে আমরা যতই দাগাবাজির দাগা বুলাইতেছি, কৃষ্ণ-বস্তু আমাদিগের নিকট হইতে ততই দূরে সরিয়া যাইতেছে। আমাদিগকেও এখন উঠিতে বসিতে এই "ছাড়ি যদি দাগাবাজি" মন্ত্র জপ করিতে হইবে। এই চোর-চূড়ামণি ভিক্ষুককে আমাদের গুরু-বরণ করিতে পারিলে ভাল হইত, কৃষ্ণ মিলিত।

ভিক্ষুক বৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, চিন্তামণির সহিত

কথোপকথনে ব্যাপৃত একটি রাখাল-বালককে দেখিয়া তাহার ভারি ভাল লাগিয়াছে—

"আহা, আহা, কি সুন্দর রাখালের ছেলেটিরে!—যেন ব্রজের বালক।

রাখাল। ও ভাই, তোমার সঙ্গে আমার ভাব।

ভিক্ষুক। হ্যাঁ ভাই, তোমার সঙ্গে আমার ভাব।

রাখাল। তবে রে চোর! ভাব বল্লে তবে পোঁট্‌লাটা লুকুচ্চ যে? আমায় দাও [পুঁটুলি কাড়িয়া লইল]

ভিক্ষুক। ওতে ত কিছু নেই।

রাখাল। নেই, তবে গেরো কেন?

ভিক্ষুক। সত্যি; দেখ, পথে ভুলে গেরো দিয়েছি।

(স্বগত) বৃন্দাবনে এলে কি হবে! হাত-পা-মন ত আমার!

রাখাল। (পুঁটুলি ফিরাইয়া দিয়া) আর গেরো দিও না।

ভিক্ষুক। আচ্ছা ভাই রাখাল, আমি এই ফেলে দিলুম, আর গেরো দোব না"।

আমরা এইখানে এক ভক্ত সাধকের কয়েক ছত্র গান উদ্ধার করিয়া দিতেছি, পাঠক অবস্থাটা মিলাইয়া দেখিবেন—

"ফিরিয়ে নে তোর বেদের ঝুলি,
আর মন্তর্ নে মা আমায় কালী।
ভোজের খেলা খেল্‌তে ভবে আমাকে একলা পাঠালি,
ওমা, কি ভাব ভেবে, নল্‌না শিবে, ভানুমতীরে যুটিয়ে দিলি?
মায়ায় ম'জে বেদে সেজে, বারে বারে যতই খেলি
ও তোর এম্‌নি অধঃপেতে ঝুলি, খেলার জিনিষ
হয় না খালি!
মনে করি খেল্‌বো না আর, ভানুমতীরে ছাড়তে বলি,
কিন্তু এম্‌নি কুহকিনীর কুহক, আবার তার কুহকে ভুলি"!

* *

আমরা সকলেই আমাদের সংস্কারজনিত কর্ম্মফলের পুঁটুলিতে গেরো দিতে ব্যস্ত—এই গেরো দিবারও অন্ত নাই, পুঁটুলির ভিতর খেলার জিনিষেরও অন্ত নাই। বহু-ভাগ্যগুণে কচিৎ কোন সাধু সদাশয় কুহকিনীর কুহক এড়াইয়া পুঁটুলি ফিরাইয়া দিতে সচেষ্ট হন। ভিক্ষুকের আন্তরিকতা জন্মিয়াছিল, তাই স্বয়ং রাখালরাজ তাহাকে পুঁটুলিতে আর গেরো দিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু তিনি পুঁটুলি কাড়িয়া লইয়াও লইলেন না, কারণ তিনি পুঁটুলি ফিরাইয়া লইবার মালিক নহেন; যিনি মহামায়ার আবরণে এই 'পুঁটুলি' ও 'ভানুমতীকে' জুটাইয়াছেন, তিনি পাগলিনী-রূপে পরে আসিতেছেন এবং পূর্ব্বেই তাহাকে কৃপা করিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে পাগলিনী ও শিষ্যগণ সহ সোমগিরি আসিয়া দেখা দিলেন। পাগলিনী চিন্তামণিকে লইয়াই ব্যস্ত—ভিক্ষুকের প্রতি তাঁহার যেন নজর নাই। তাই ভিক্ষুক ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে অনুযোগ করিল—

"মা তোর ব্যাটাকে যে ভুলে গেলি"।

পাগলিনী। ভুল্‌বো কেন? বাবাকে ব'লে তুইও আমার সঙ্গে আয় না।

বাবাকে বলিতেই হইবে, অর্থাৎ 'গুরুবরণ' করিতেই হইবে—সন্ন্যাসী সোমগিরির একবার মুখের কথা চাই-ই চাই।

ভিক্ষুক। বাবা, আমার উপায় কিছু কি হবে?

সোম। তুমি সাধু, এ বৃন্দাবন আনন্দধামে আনন্দময়ের কৃপায় এখানে কেউ নিরানন্দ থাকে না।

ভিক্ষুক। বাবা, আমি যে চোর।

সোম। মাখন-চোরকে চুরি ক'রবে।

ভিক্ষুক। গুরুদেব, পারি যদি, চুরির মতন চুরি বটে!"

পরমহংসদেব গিরিশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "যে পাপ পাপ সর্ব্বদা করে, সেই শালাই পাপী হ'য়ে যায়। হাজার হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো আসে, সে কি একটু একটু ক'রে আলো হয়? না, একবারে দপ ক'রে আলো হয়"?

তাই কি সোমগিরি চোর-ভিক্ষুককে একেবারে 'সাধু' বলিয়া সম্বোধন করিলেন? হাজার হাজার বছরের অন্ধকার ঘর আলোকের স্পর্শে একবারে দপ্‌ করিয়া আলো হইয়া গেল—মাখন-চোরকে চুরি করা এইবার তাহার চুরি-বিদ্যায় অনায়াস-সাধ্য হইবে।

এইবার কৃষ্ণদর্শনের মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইল। পাগলিনী ভিক্ষুককে বলিলেন—

"বাবা, ব'স, চুপ ক'রে ব'স। এই নে।" বলিয়া "কাঞ্চন প্রদান" করিলেন। কাঞ্চন-পিয়াসী ভিক্ষুকের এই বার বার তৃতীয়বার এবং শেষ পরীক্ষা।

"ভিক্ষুক। আর কেন, মা?

পাগলিনী। নিবি নে? তা, না নিস্, কিন্তু এবার যদি কিছু পাস্ ত নিস্।

ভিক্ষুক। তা আচ্ছা, মা।"

মহামায়া এতদিন পরে ভিক্ষুকের মায়ার আবরণ মুক্ত করিয়া দিলেন। ভিক্ষুক এইবার যাহা পাইল, অবশ্যই তাহা লইল। কৃষ্ণ-পদ-লাভ হইতেই সে উল্লাসে বলিয়া উঠিল, "মাখন-চোর, তোমায় চুরি ক'র্ত্তে পারি, তা হ'লেই আমার চুরিবিদ্যা সার্থক।" ভক্ত ভগবান্‌কে যেরূপভাবে ভজনা করিবে বা চাহিবে, তিনি তাহাকে সেইরূপেই ধরা দিবেন।

পতিত-পাবন যুগে যুগে পতিতকে এইরূপেই কৃপা করিয়া থাকেন। চাই ব্যাকুলতা, চাই একান্তভাবে আত্মসমর্পণ, চাই ভাব-শুদ্ধি। ভিক্ষুকের জীবনে ভাবের এই রূপান্তর ঘটিয়াছিল বলিয়াই ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন তাহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। সে কপটতাশূন্য হইতে পারিয়াছিল বলিয়া, দাগাবাজী ছাড়িয়াছিল বলিয়াই কৃষ্ণ তাঁহাকে ধরা দিয়াছিলেন। একটি ভণ্ড চরিত্রের এরূপ সহজ-সরল-সুন্দর পরিণতি অন্য কোনও নাটকে দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে পড়ে না। "The greatest art is to conceal art"—এই বাক্য যে কতদূর সত্য তাহা ভিক্ষুক-চরিত্র-চিত্রণে প্রকাশ পাইয়াছে! ভিক্ষুকের রূপান্তর দেখাইতে নাট্যকারের টানিয়া-বুনিয়া যোড়া দিবার কোনও চেষ্টাই প্রকাশ পায় নাই—একটা জীবন যেন সংসার-তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইয়া "ওঠা-নামা" করিতে করিতে স্বকীয় চেষ্টায় কূলে পৌছিয়া গেল। নাটকের প্রারম্ভেই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত বিল্বমঙ্গল ও ভিক্ষুকের পরস্পর সাক্ষাৎ। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে কালক্রমে এই কামিনী-কাঞ্চনের পিপাসা তাহাদের যেমনই দূর হইল, কৃষ্ণ আসিয়া অমনি তাহাদিগকে কৃপা করিলেন। রামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা ও উপদেশ তাঁহার ভক্তশিষ্য গিরিশচন্দ্র-কর্ত্তৃক এই নাটকে বেমালুম ভাবে অপূর্ব্ব মুন্সিয়ানার সহিত আকার-প্রাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষুক কাঞ্চনভ্রমে কাচের অনুসন্ধান করিতে গিয়া—

"ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্ অপি দিব্যরত্নম্
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥"—

শিশু ধ্রুবের ন্যায় কৃষ্ণদর্শন রূপ দিব্যরত্ন লাভ করিয়াছিল—তাই, সে পাগলিনী-প্রদত্ত অনিত্য কাঞ্চনখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া নিত্যবস্তু লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিয়াছিল।

গিরিশচন্দ্র

শ্রীশৈলেশনাথ মুখোপাধ্যায়

কবি-প্রতিভা

অলঙ্কার শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ কাব্যপ্রকাশে প্রকৃত কবি হইতে গেলে কি কি গুণের প্রয়োজন হয় কাব্যপ্রকাশ-রচয়িতা মম্মট ভট্ট তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি বলেন :—

শক্তির্নিপুণতা লোকশাস্ত্র কাব্যাত্তবেক্ষণাৎ॥

কবি হইতে গেলে চাই শক্তি, চাই নিপুণতা, লোক শাস্ত্র কাব্য প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সে নিপুণতা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গিরিশচন্দ্রের জীবনে স্বাভাবিক কবিত্ব-শক্তি এবং লোকশাস্ত্র প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণে ও অকাতর পরিশ্রমে অর্জ্জিত নিপুণতা পূর্ণমাত্রায় ছিল।

তাই, প্রকৃত কবির বর্ণনা করিতে গিয়া সুনিপুণ আলঙ্কারিক, কবির যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে আমরা গিরিশচন্দ্রেরই প্রতিভার সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাই।

তাঁহার হৃদয়ে অবরুদ্ধ কবিত্ব শক্তির প্রস্রবণ বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য প্রথম আহ্বান পাইল সে সময়ের প্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে দেখিয়া। গিরিশচন্দ্র তখন মাত্র পঞ্চদশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন—বঙ্গাব্দ ১২৬৫, ইংরাজি ১৮৫৮ সাল। এই দর্শন সম্বন্ধে গিরিশের ভাষায় বলি :—"আমাদের পাড়ায় ভগবতী গাঙ্গুলীদের বাড়ী হাফ আকড়াই শুনিতে গিয়া দেখি যে এতবড় ভিড় বড় বড় লোকও ঢুকতে পাচ্ছে না। এমন সময় সামান্য কাপড়-চোপড়-পরা একটি লোক এল, আর অমনি সভায় বড় বড় লোক তাঁকে আপ্যায়িত করবার জন্য ছুটে এল। সমস্ত লোক যেন তাঁকে এক সঙ্গে অভ্যর্থনা করলে।"

কবির এত আদর! গুপ্ত কবির দীপ্ত প্রতিভার মলয়-মারুত গিরিশচন্দ্রের সুপ্ত কবিকে জাগাইবার দোলা দিয়া গেল। চিত্ত তাঁহার লোলুপ হইল কবিযশঃপ্রার্থী হইতে।

ঈশ্বর গুপ্ত এক হিসাবে যুগান্তের কবি, অন্য হিসাবে যুগপ্রবর্ত্তক। বাঙ্গালী তাঁহার নিকট চিরঋণী। বঙ্কিমের ভাষায় বলি :—মহাত্মা রামমোহন রায়ের—কথা ছাড়িয়া দিলে রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশ-বাৎসল্যের প্রধান নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বরচন্দ্রের দেশ-বাৎসল্য তাঁহাদেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী। ঈশ্বরগুপ্তের দেশ-বাৎসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও তাঁহাদের অপেক্ষা তীব্র ও বিশুদ্ধ।...ঈশ্বরগুপ্তের কথায় যা, কাজেও তাই ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরদের প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেন না, দেশের কুকুর লইয়াও আদর

করিতেন। "গুপ্ত কবি ছিলেন বাঙ্গালীর নিতান্ত আপনার জিনিষ, খাঁটি বাঙ্গালী কবি।"

দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই এই ঈশ্বরগুপ্তের নিকট হইতেই তীব্র ও বিশুদ্ধ দেশাত্মবোধের প্রেরণা পাইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রও ইঁহারই নিকট হইতে সেই প্রেরণা পাইলেন।

ইহার পর হইতে আরম্ভ হইল সাধন,—নিপুণতা অর্জ্জন, লোকশাস্ত্র-কাব্যাদি চর্চ্চা, দেশ-বিদেশের গ্রন্থ অধ্যয়ন। দেশী এবং বিদেশী ভাবধারা আয়ত্ত করিয়া নিজস্ব করিবার প্রচেষ্টা। আট বৎসর ধরিয়া এই প্রচেষ্টা চলিল। একদিকে যেমন পুস্তক অধ্যয়ন এবং বিদেশী গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়া নিজের ভাব ও ভাষাতে সম্পদ বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস, অপর দিকে তেমনি লোকের সহিত মিশিয়া লোকের চিত্ত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। মানুষের চিত্ত নামে নদী দুই মুখে প্রবাহিত হয়। একমুখে যায় কল্যাণ-পথে আর একমুখে যায় পাপ-পথে। চিত্ত-নদীর এই উভয় ধারা বাহিয়াই তিনি নিজের এবং পরের চিত্তশাস্ত্র আয়ত্ত করিলেন।

যাহা কিছু নূতন যাহা কিছু চিত্তাকর্ষক তাহাই শিখিবার হইত দারুণ আগ্রহ এবং না শিখিয়া ছাড়িতেন না। ধাঙড় ঝাড়ুদারদের পর্য্যন্ত ডাকিয়া তাহাদের ঝাড়ু চালনা ও নাচ দেখিয়া তাল, সঙ্গীত ও তাদের বেশভূষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

কথক দেখিয়া শিখিতেন কথকতা, যাত্রা করিয়া শিখিতেন যাত্রা করা।

মানুষকে মানুষ বলিয়া তাহার সহিত মিশিবার শক্তি ছিল তাঁহার। তাই পুণ্য ও পাপ-পথে বিভক্ত এবং মিশ্রিত মানুষের হৃদয়-শাস্ত্র জানিতে তাঁহার দেরী হইত না। তাঁহার মিষ্ট আলাপ, বাক্‌পটুতা ও সহৃদয় ব্যবহার সকলের ভাল লাগিত। তাই তাঁহাকে ঘিরিয়া হইত লোকের ভিড়। লোকের নেতা হইতেন তিনি। যে নেতা হইয়া দল চালাইতে পারে তাহার দলের মত মানিয়া চলিবারও শক্তি থাকা চাই। গিরিশের সেই শক্তিও ছিল। প্রাণ দিয়া মিশিতেন তিনি প্রাণের সঙ্গে। তাই পাইতেন তিনি প্রাণের পূজা। প্রাণের ভাব, প্রাণ ঢালা ভাষায়, শব্দের স্বাভাবিক লালা-গতির জড়তাশূন্য আবরণ সচ্ছন্দ প্রবাহে, বর্ণনার অনুকরণীয় ভঙ্গীতে, পরের মর্ম্ম স্পর্শ করিবার শক্তি অর্জ্জন করিলেন। ভাব ও ভাষার আড়ষ্ট ভাব চলিয়া গেল। কবি কোলরিজ বলিয়াছেন প্রাণ দিয়া যাহা লেখা যায়, পরের প্রাণ তাহা স্পর্শ করে। গিরিশের পক্ষে তাহাই হইল।

১৮৬৭ সালে গিরিশচন্দ্র তাঁহার সখের যাত্রা দলের জন্য প্রথম সঙ্গীত রচনা করিয়া গীত-রচয়িতা বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিলেন। তখন তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর; গুপ্ত কবির সহিত সাক্ষাতের প্রায় ৮।৯ বৎসর পরে। ইহার পরে বার বৎসর গিরিশচন্দ্র অপরের লিখিত গ্রন্থ ও নাটক অভিনয় করিয়া ও উপন্যাস নাটকাকারে পরিণত করিয়া নাট্যকলায় নৈপুণ্য অর্জ্জন করিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে (১২৮৬ বঙ্গাব্দ) তাঁহার ৩৫ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার প্রথম গীতিনাট্য আগমনী লিখিয়া গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয় করিলেন। তখন সেই শক্তিমান নিপুণ কবির প্রতিভা মনীষা লক্ষ্মীর ষড়ৈশ্বর্য্যে অপ্রতিহত গতিতে সমানভাবে চলিল। তাঁহার সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ রহিল না। পর পর ৭০ খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গের রঙ্গালয়ের প্রাণ, মর্য্যাদা ও প্রতিভা প্রতিষ্ঠা করিয়া কবিযশের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিয়া বঙ্গের রঙ্গনাথ ৬৮ বৎসর বয়সে বঙ্গাব্দ ১৩১৮ সালে (ইংরাজি ১৯১২, ৮ই ফেব্রুয়ারি। ২৫শে মাঘ ইহলীলা সম্বরণ করেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিভা অক্ষুণ্ণ ছিল ও তাঁহার লেখনী সমভাবেই চলিয়াছিল। পরম্পরাগত জাতীয় জীবনের আচার-পদ্ধতি ও ধারাবাহিক প্রবাহের গতির বিশিষ্টতা উপলব্ধি করিতে না পারিলে জাতীয় জীবনের বিশিষ্টতা উপলব্ধি করা যায় না। বাঙ্গালী জীবনের ধারা বুঝিতে হইলে তাহার জাতীয় জীবন কোন দৃঢ় ভূমির উপর গঠিত তাহা দেখিতে হইবে। সে বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

সে আজ হাজার বৎসরের কথা। পঞ্চ গৌড়ের স্বাধীন ক্ষত্রিয়-নরপতি, মহারাজা আদিশূর দেখিলেন যে সারা বঙ্গদেশে তখন সপ্তশত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সাগ্নিক ও বেদজ্ঞ না থাকায় যজ্ঞ-সম্পাদনে ও বৈদিক আচার পালনে অসুবিধা হইত। তখন পঞ্চগৌড়ের স্বাধীন ক্ষত্রিয় নরপতি কান্যকুব্জের স্বাধীন ক্ষত্রিয় মহারাজাকে যজ্ঞানুষ্ঠানে দক্ষ বেদজ্ঞ পঞ্চ ব্রাহ্মণের জন্য লিখিলেন। কান্যকুব্জপতি গৌড়েশ্বরের সম্মান রাখিয়া বেদজ্ঞ, যাজ্ঞিক পঞ্চ ব্রাহ্মণ পাঠাইলেন। সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণ সঙ্গে আনিলেন দেব-দ্বিজ-ভক্ত পঞ্চজন কায়স্থ। এই পঞ্চজন ব্রাহ্মণ ও এই পঞ্চজন কায়স্থ রাজ-সম্মানিত অতিথি হইলেন। ব্রাহ্মণেরা যে আদর্শে নিজেদের জীবন গঠিত করিলেন, দ্বিজ-ভক্ত কায়স্থেরা সেই আদর্শেই নিজেদের জীবন গঠিত করিলেন। দেশের রাজা সেই আদর্শেই সারা দেশের সমাজকে গড়িয়া তুলিলেন ও দেশের লোক সেই আদর্শকেই সগৌরবে বরণ করিয়া লইলেন। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ছিল ব্রাহ্মণের কাজ। তাঁহাদের নিজের নিজের টোলে নিজের নিজের ছাত্রেরা পড়িতেন। বিদ্যা বিক্রয় হইত না, বিদ্যাদান হইত। বিনা খরচায় বিদ্যালাভ হইত। রাজকোষ হইতেও বিদ্যানুশীলনের জন্য কোন ব্যয়ভার লাগিত না। রাজার

নিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীন ভাবে সসম্মানে অনুশীলিত হইত বিদ্যা। স্বাধীন স্বাবলম্বনের ভাব ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল দেশের মধ্যে। তরুণ কৃত্তিবাসের শ্লোক দেখিয়া গুণাকৃষ্ট বঙ্গেশ্বর পুরস্কার দিতে চাহিলে, তরুণ কৃত্তিবাস উত্তর করিলেন :—

কারো কিছু নাহি চাই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥

স্বাধীন রাজা এই স্বাধীন মনোবৃত্তির সম্মান রাখিলেন, নিজের কণ্ঠের মালা দান করিয়া, রাজসম্মানের গৌরব আসন দিয়া, দেশের জন্য, দশের জন্য সুললিত ভাষায় ও ছন্দে রামায়ণ লিখিবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া।

তারপর যে-দিন মন্ত্রমুগ্ধের মত পঞ্চসভা কৃত্তিবাসের রামায়ণ-গান তাঁহার নিজের মুখে শুনিলেন রাজা ও প্রজার হৃদয়-সিংহাসন পাতা হইল কৃত্তিবাসের জন্য।

বহুশত বৎসর পরেও নবদ্বীপের 'বুনো রামনাথ' এই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখেন নবদ্বীপের মহারাজা কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত অর্থ-সাহায্য অস্বীকার করিয়া।

বুনো রামনাথের শেষ শিষ্য কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি সরস্বতী সেই আদর্শ পথেই চলিলেন সংস্কৃত-কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদ অস্বীকার করিয়া।

ব্রাহ্মণদের নিত্যকার্য্য ছিল, স্নান ও তর্পণ, সন্ধ্যা ও দেবপূজা, অতিথিসেবা ও পশু-পক্ষীকে আহার দেওয়া।

ব্রাহ্মণদের এই কার্য্য কায়স্থ এবং অন্যান্য জাতিরাও অনুসরণ করিতেন এবং রাজাও সদাচার বলিয়া ইহার অনুমোদন করিতেন ও সম্মান রাখিতেন। ব্রাহ্মণদের আচরিত রীতি, শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট সাধুজনোচিত শাশ্বত সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া দেশের ও দশের নিকট প্রতিষ্ঠিত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবত ১১দশ স্কন্ধে ২৭ অধ্যায়ে উপনীত দ্বিজগণের জন্য সগুণ ও নির্গুণ ভক্তিযোগের সাধন স্বরূপ বৈদিক ও ও তান্ত্রিক মিশ্র পদ্ধতিতে যে পূজার কথা আছে, বাঙ্গালী নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ আজ হাজার বৎসর ধরিয়া সেই পদ্ধতি অনুসারেই পূজা করিয়া আসিতেছেন এবং কত কত মহাপুরুষ ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং সে দিনও যুগাবতার শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংস এই মিশ্রপদ্ধতিতেই সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়া যুগাবতারের প্রয়োজন যে ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করা, তাহা দেখাইয়া দিয়া গেলেন।

বৈদিক পূজায় সকলের অধিকার না থাকিলেও তান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে পূজায় কাহারও বাধা ছিল না। তাই সন্ধ্যা, তর্পণ ও দেবপূজা, অতিথিসেবা ও পশুপক্ষী প্রভৃতি সেবা সকল বাঙ্গালীরই অবশ্য কর্ত্তব্য দৈনন্দিন ধর্ম্ম হইয়া উঠিল।

ঋত এবং সত্য ছিল সাধারণের আদর্শ। ঋত—মনে মনে সত্য সঙ্কল্প করা, সত্য - বাক্যে সেই সত্য প্রকাশ করিয়া কার্য্যে তাহা পরিণত করা। আজীবন নিষ্ঠায় সাধিত হইত এই ঋত এবং সত্য।

প্রায় প্রত্যেকেরি ঘরে ঘরে বিগ্রহ স্থাপিত ছিল ও বিগ্রহ-সেবা ছিল। বিগ্রহ বা দেবলিঙ্গ সেবায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চারি বর্গই সাধিত হইত।

রাজা লক্ষ্মণ সেন ও তাঁহার পুত্রগণের পর যখন মুসলমানগণ রাজা হইলেন, তখনও দেশের সাধারণ জীবনধারা এই পথেই চলিতে থাকিল।

ক্রমে যখন আনুষ্ঠানিক নিয়ম প্রবল হইয়া শ্রদ্ধার শুদ্ধি কমিয়া ধর্ম্মের গ্লানি আসিল তখন পরাভক্তিযুত শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম দেহ ধারণ করিলেন শ্রীচৈতন্যরূপে, ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিতে।

চন্দ্র নাচে সূর্য্য নাচে আর নাচে তারা।
পাতালে বাসুকি নাচে করি গোরা গোরা॥

শচীর দুলাল হইলেন প্রতি বঙ্গ-জননীরই দুলাল।

ইহার বহু পরে ১৭৫৭ সালে হইল পলাসীর যুদ্ধ। ১৮৫৭ সালে হইল সিপাহী বিদ্রোহ।

এই একশত বৎসরের মধ্যে বহুশত বৎসরের সুপ্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালী ভাবধারায় বহিল প্রবল ঝঞ্ঝা।

মেকলে বলিলেন, "বোল্‌তার হুল যেমন বোল্‌তার বল, মিথ্যা কথা বলা তেমনি বাঙ্গালীর বল, তিনি আরও বলিলেন যে, সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে সার বলিয়া কোন পদার্থ নাই। এই বলিয়া সেই মেকলে—যাহার কোন প্রবন্ধেই কোন দিন সম্পূর্ণ সত্য কথা থাকিত না এবং যাহার বহুপ্রসবিনী লেখনী জলের মত মিথ্যা প্রসব করিয়া যাইত, তিনই দিতে চাহিলেন ঋত ও সত্যে গঠিত বাঙ্গালী জীবনে দারুণ আঘাত এবং করিলেন দেবভাষার অক্ষয় ভাণ্ডারের অপমান। ইংরাজী কবির ভাষাতেই বলি, "Fools rush in where angels fear to tread."

যে ভূমিতে পদার্পণ করিতে দেবদূতেরাও সঙ্কুচিত হয় আহাম্মকেরাই সেখানে দৌড়াইয়া যায়।

গিরিশের সগর্ব্ব উক্তি, "দেবভাষা পৃষ্ঠে যার কিসের অভাব তার" এবং গৌরবময় সাফল্যপূর্ণ অনুষ্ঠান এই সব আহাম্মকদের আহাম্মকি ও দাম্ভিকতার প্রকৃত উত্তর দিয়াছে।

ম্যাক্স্ মুলার আমাদের আর্থিক সাহায্যে ঋগ্বেদ-সংহিতা ছাপাইলেন কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল মিশনারিদের সাহায্য করা।

Under these circumstance it was felt that nothing would be of greater assistance to the missionaries in India than an edition of the Veda.

Chips from a German Workshop by Maxmuller.
Vol. I, P. 306

এই রকম অবস্থায় ও কারণে বুঝিলাম যে, বেদ ছাপা হইলে মিশনরিদের যেরূপ সাহায্য হইবে এমন আর কিছুতেই নহে।

বেদকে মৌখিক ভাবে বড় করিয়া ব্রাহ্মণকে একদম হেয় প্রতিপন্ন করানই ম্যাক্স্ মুলারের উদ্দেশ্য ছিল। ব্রাহ্মণ হেয় হইলেই বেদ আপনা আপনি হেয় হইয়া পড়িবে। দুর্বুদ্ধি ম্যাক্স্ মুলারের এই ছিল দুরভিসন্ধি।

It should be shown to the natives of India that the religion which the Brahmins teach is no longer the religion of the Veda, though the Veda alone is acknowledged by all as the only divine source of faith.

Chips from a German Workshop by Maxmullar.
Vol. I, P. 309

"ভারতবাসী নেটিভদের বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, যদিও সেই সকল নেটিভেরা বেদকেই একমাত্র অপৌরুষেয় ধর্ম্মের মূল বলিয়া স্বীকার করে তথাপি ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে যে ধর্ম্মশিক্ষা দেয় তাহা বেদবিহিত নহে॥"

ম্যাক্সমুলার প্রণীত "জারমান কারখানার কয়েকটি টুক্‌রা" নামক গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে ৩০৯ পৃঃ।

ব্রাহ্মণেরা নিত্যপূজায় আচমন মন্ত্রে ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডলের ২২শ সূক্তের "বিংশী ঋক্ "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি বলিয়া পূজা আরম্ভ করেন। এই সূক্তের ১৬ হইতে ২১শ ঋক্ বিষ্ণুসূক্ত বলিয়া পরিচিত এবং বিষ্ণুর বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কার্য্য ও সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কার্য্য হইতে তাঁহার পৃথক্ ভাবে অবস্থিতি এই অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাব জ্ঞাপন করিয়া ধ্যানে বিষ্ণুর মায়াতীত স্বরূপ নিত্য নিজের আত্মার সহিত অভেদে দর্শন করা যায়—এই কথা বলা হইয়াছে এবং সমগ্র বেদের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান। ব্রাহ্মণেরা ইহাই উপদেশ দেন। ব্রাহ্মণেরা বেদবিহিত ধর্ম্ম শিক্ষা দেন না বলিতে হইলে এই মন্ত্রগুলির অপব্যাখ্যা করিতে হয়, নহিলে ব্রাহ্মণদের নীচু করা যায় না। তাই এই ঋক্‌গুলির ম্যাক্সমুলার ব্যাখ্যা করিলেন যে, এই মন্ত্রগুলিতে বলা হইয়াছে যে, বিষ্ণু নামে একজন প্রধান আর্য্য, আর্য্যদলকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া অনার্য্যদের পরাস্ত করিবার জন্য এসিয়ামাইনর হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশের কথা আছে। যাহাদের দেশ চিরদিন শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের প্রতি অশ্রদ্ধা আনিবার কূট কৌশল অবলম্বন করা হইল। সেই উদ্দেশ্যে যে "সহস্র শীর্ষা-পুরুষঃ" বলিয়া নিত্য নারায়ণকে স্নান করান হয় এবং "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্" ইত্যাদি বলিয়া পুরুষসূক্তে চারিবর্ণ পুরাণ পুরুষ নারায়ণ হইতে হইয়াছে বলিয়া পুরুষের অর্চনা করা হয়, ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের সেই ৯০ সূক্ত একেবারে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিয়া ব্রাহ্মণেরা যে পূজা শিক্ষা দেন তাহা বেদবিহিত নয়—এই তাঁহা মিথ্যা চালাইতে চাহিলেন এবং কতক লোক তাহা বিশ্বাসও করিল। প্রকৃত প্রস্তাবে বিষ্ণু-সূক্তে আর্য্য বলিয়া কোন জাতি বা শব্দের উল্লেখ নাই এবং ভারতবর্ষ-শব্দেরও প্রয়োগ নাই। নিছক্ কল্পনার উপর রটাইলেন কুৎসা। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান উপদেশকে দেখাইতে চাহিলেন যে, তাহা জ্ঞান নহে, দাম্ভিকতা-পূর্ণ, জাতির বিরুদ্ধে জাতির হিংসার অভিযান মাত্র। যখন ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্তকে এরূপ অপব্যাখ্যা করিতে পারিলেন না, তখন তাহাকে প্রক্ষিপ্ত করিয়া উড়াইয়া দিলেন।

প্রথম প্রথম তাঁহার এই কূটনীতি লোকে বুঝিল না। দেশের যুবকেরা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল।

খৃষ্টান মিশনারীদের খুব প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল।

খৃষ্টান মিশনারী, ম্যাক্সমুলার ও তৎপন্থীগণ এবং ব্রাহ্ম সমাজ—ইহাদের নিন্দা, ঘৃণা ও অপব্যাখ্যার আঘাত সহ্য করিয়া জাতির যখন আত্মবোধ ও সত্য দৃষ্টি ফিরিয়া আসিতেছে, সেই পরম শুভ মুহূর্ত্তে আরম্ভ হইল গিরিশ চন্দ্রের কৃষ্টি-সাধনা। তিনি নিজে দেখিয়া, নিজে পড়িয়া, নিজে ভাবিয়া, নিজেকে গড়িলেন। পরের মুখে ঝাল খাইবার লোক তিনি ছিলেন না। স্বাধীন নিরপেক্ষ গবেষণায় তিনি নিজের জাতীয় ভাব ও তাহার শক্তি বুঝিলেন।

দেব ভাষা পৃষ্ঠে যার, কিসের অভাব তার—
কোন্ ভাবে বাক্যে ভাবে হেন সংযোজন॥

তাঁহার মনের ভাব লেখনীতে বাহির হইল। তিনি বুঝিলেন শব্দ ও ভাবের অপরিমিত ধন-ভাণ্ডার তাঁহার করগত। শ্রীধর সেবায় তাঁহার পিতৃবংশ এবং গিরিধারী সেবায় তাঁহার মাতৃবংশ যে দৈবী ভাবধারার অধিকারী ছিলেন। উত্তরাধিকারী সূত্রে যেন তিনি তাহা প্রাপ্ত হইলেন এমনি স্বাভাবিক সহজ ভাবে সেই ভাবধারা তাঁহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। নিজের বাড়ীতে নিত্য পুরাণ-কথা শ্রবণ করিয়া যে পতিত-পাবনী শ্রদ্ধা তাঁহাকে অধিকার করিয়াছিল এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লোকের সহিত মিশিয়া তাহাদের চিত্ত-নদীর উভয় ধারায় স্নান করিয়া—যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, হৃদয়ের রক্ত দিয়া তিনি সেই হৃদয়-বেদ লিখিয়া গিয়াছেন। জীবন-সমুদ্র মন্থন করিয়া যে বিষ উঠিয়াছিল, তিনি তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া কাব্য লক্ষ্মীর অফুরন্ত সৌন্দর্য্য-সুধা আমাদের জন্য দুই হাতে বিলাইয়া গিয়াছেন।

কাব্যপ্রকাশ যেরূপ কবিচিত্র আঁকিতে চাহিয়াছিলেন, গিরিশের কাব্য-সাধনায় সেই চিত্রই সজীব হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র জীবন-কাব্য বিকাশত হইয়া উঠে যে কবির কবিতায়,

যে কবির কাব্যে ভুক্ত ভোগ, সুখ-দুঃখের ইন্দ্রজালে জড়িত হৃদয়ে কবিতার ইন্দ্রধনু ফুটিয়া ওঠে প্রকৃত কবিতা-রসের রসজ্ঞ কাব্য-প্রকাশ সেই কবিকেই আঁকিয়াছেন। কাব্য-প্রকাশের সে আদর্শ গিরিশচন্দ্রে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আমাদের মনের মত, আমাদের শাস্ত্রের মত, গিরিশচন্দ্র তাই প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কবি।

উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত বাঙ্গালী জাতির সহস্র বৎসরের কৃষ্টি-সম্পদ তাঁহার প্রতিভাবলে নূতন জীবন পাইয়া জাগিয়া উঠিল। ইউরোপের ধর্ম্মধারা, ভাবধারা ও সাহিত্য-ধারা অবাধে প্রবেশ করিল—তাঁহার প্রতিভার মুক্ত দুয়ার দিয়া, কিন্তু তাহারা তাঁহার স্বজাতীয় দেশাত্মবোধকে বিদেশী ভাবাপন্ন করিতে পারিল না। তাঁহার প্রতিভায় বিদেশী ভাবধারার বিদেশী খোলস পড়িয়া গেল, থাকিল তাহাদের অন্তর্নিহিত উৎসাহ, উদারতা ও প্রাঞ্জলতা এবং ইহারা তাঁহার স্বদেশী ও স্বজাতীয় বিশিষ্টভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পরিপুষ্ট করিয়া তুলিল।

নাট্য-প্রতিভায় আধুনিক জগতে গেটে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছেন। প্রতিভায় তাঁহার কোন ত্রুটি ছিল না। কিন্তু তাঁহার মনের গতি ও ব্যক্তিগত প্রকৃতির এমন একটি ত্রুটি ছিল যাহাতে তিনি যদিও বহু লোকের সহিতই মিশিতেন তথাপি কাহারও সহিত তিনি তাহাদের নিজের মত হইয়া মিশিতে পারিতেন না, একটু আলাদা হইয়া থাকিতেন। তাই তাঁহার বর্ণিত চরিত্রগুলি যদিও বর্ণনার দিক দিয়া দেখিতে গেলে নিখুঁত হইত কিন্তু সজীবতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে একটু একটু আড়ষ্ট, জীবনীশক্তিহীন বলিয়া বোধ হইত। বিখ্যাত সমালোচক নিবার, গেটের বিস্তীর্ণ গ্রন্থ "উইলহেল্‌ম্‌ মিষ্টার" সম্বন্ধে বলিয়াছেন—গ্রন্থখানি যেন পোষা পশু-পাখীর চিড়িয়াখানা। তাহার অঙ্কিত চরিত্রগুলিতে উৎসাহ ও জীবনী শক্তির অভাব দেখা যায়।

যেন সারি সারি রেলগাড়ী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে কিন্তু এঞ্জিন নাই। উৎকৃষ্ট ভাব ও ভাষা-সম্পদ থরে থরে সাজান কিন্তু উদ্যম উৎসাহ বা বাধাহীন ক্রীড়ার অভাবে চিত্রগুলিতে প্রাণ জাগিয়া উঠিত না।

গিরিশের প্রতিভা কিন্তু অন্য রকমের ছিল—তিনি যাহা কিছু লিখিতেন তাহাতেই তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি জাগিয়া উঠিত। তিনি রাখিয়া ঢাকিয়া মিশিতেন না। নিজেকে বড় মনে করিয়া নিজে জগতের একটি অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ জীব এবং আর সকলে তাঁহা অপেক্ষা হীন এই মনে করিয়া তিনি মিশিতেন না। তিনি আপনার ভাবিয়া আপনার করিয়া লোকের সহিত মিশিতেন এবং তাঁহার প্রাণস্পর্শ অনুভূতি লোকের ভিতর-বাহির স্পর্শ করিত। তিনি লোকের মর্ম্ম নিজের মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিতেন। সেই অনুভবে অনুভাবিত তাঁহার চিত্রগুলি জীবনের জীবনী-শক্তির উচ্ছ্বাসে সরসিত হইয়া জীবন্ত জাগ্রতরূপে দেখা দিত।

সার ওয়ালটার নিজের চাকর-বাকর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকের সহিত এমনভাবে মিশিতেন যেন তাহার সহিত তাঁহার রক্তের টান রহিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের মিশিবার শক্তিও ঠিক সেইরূপ ছিল। তেজস্বিতায় ও জীবনী শক্তিতে গিরিশের রচনারীতি স্কটের সমতুল্য ছিল। স্কট লিখিত অশ্বারোহী সৈন্যের আক্রমণের বর্ণনা পড়িলে মনে হয়, যেন স্কট ঘোড়া চালাইতে চালাইতে লেখনী চালাইয়াছেন।

গিরিশের সৈন্যচালনা ও যুদ্ধবর্ণনা পড়িলেও মনে হয়—গিরিশ যেন যুদ্ধক্ষেত্র হইতেই দেখিয়া লিখিতেছেন। কিন্তু স্কট সঙ্গীতে অনভিজ্ঞ ছিলেন। সুরবোধ তাঁহার ছিল না বলিলেই হয়, নারী-চরিত্রেও তাঁহার অভিজ্ঞতা অপেক্ষাকৃত কম ছিল।

গিরিশচন্দ্র সুর ও সংগীতে অভিজ্ঞ ছিলেন ও সমান দক্ষতার সহিত নরনারীর চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন।

এভন নদী-তীরে যাদুকর সেক্সপীয়ার, গেটে ও স্কটের মতই বহুলোকের সঙ্গে মেলামেশা করিতেন ও বহুলোকের সঙ্গেই তাঁহার জানাশোনা ছিল। কিন্তু তাঁহার মেলামেশার ধরণে গেটের অপেক্ষা স্কটের সাদৃশ্যই বেশী ছিল। তিনি গেটের মতন নিজেকে আলাদা রাখিয়া লোকের সহিত মেলামেশা বা জানা শোনা করিতেন না। স্কটের মতই তিনি যেন তাদের সহিত রক্তের টান আছে এইরূপ ঘনিষ্ঠ ভাবেই মেলামেশা করিতেন।

তিনি যে সম্বন্ধেই বর্ণনা করিতেন, তিনি নিজের চিত্তের মধ্যেই সেই সকল ভাবের বীজ ও প্রবণতা উপলব্ধি করিতেন। সাধারণ লোকের সহিত ছিল তাঁহার অসাধারণ সহানুভূতি। সহানুভূতির প্রাণস্পর্শে সাধারণ চিত্রগুলিও তাই তাঁহার হস্তে সরস ও প্রাণবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিত। স্কটের মত তিনি কিন্তু সুর ও সঙ্গীতরসে বঞ্চিত ছিলেন না, অপরন্তু সুর ও সঙ্গীতে অসামান্য অভিজ্ঞতা ও নিপুণতা ছিল তাঁহার।

গিরিশের প্রতিভাও সেক্সপীয়ারের প্রতিভার সহিত এবিষয়ে সমযোগ্য ছিল।

গিরিধারী ও শ্রীধরের সেবায় গিরিশ দেখিতেন যে জগতের হিত ও জগতের দেবতা একই পদার্থ। "জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ" এই বলিয়া নিত্য প্রণামে তিনি এই সত্য উপলব্ধি করিতেন। নিজের আত্মার মধ্যে সর্ব্বজীব ও সর্ব্বভূতকে দর্শন করা ও সর্ব্বভূত আর সর্ব্ব-জীবকে নিজের আত্মা বলিয়া অনুভব করা যে নৈষ্টিক ধর্ম্ম,

পুরাণের ধর্ম্ম, ভাগবতের ধর্ম্ম, বেদের ধর্ম্ম, উপনিষদের ধর্ম্ম, তাঁহার নিজের জাতির নিজস্ব ধর্ম্ম—ইহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন। তাই তিনি লোকের সঙ্গে মিশিতেন লোকদেখান ভাবে নয়। তিনি মিশিতেন প্রাণের টানে প্রাণের জন বলিয়া। লোকের সঙ্গে মিশিয়া লোকের কাজে আসিতে পারা ধর্ম্ম ও সৌভাগ্য বলিয়া মনে ভাবিতেন। নিজের মর্ম্ম দিয়া তাই সে দরদী কবি বুঝিতেন অপরের মর্ম্ম।

তাই তাঁহার চিত্রিত অতি সাধারণ লোকের চিত্রও তাঁহার অসাধারণ সহানুভূতির বলে বিশিষ্ট গুণ সম্পন্ন হইয়া চিত্তাকর্ষণ করিত। প্রাণের টানে চিত্রগুলি প্রাণবন্ত হইয়া উঠিত। যেখানে যেরূপ গান ও সুরের প্রয়োজন পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী সেইরূপ গান ও সুরের সন্নিবেশে তাঁহার নাট্য-প্রতিভা পূজারিণী রূপে রঙ্গালয়ে বঙ্গ-দেবতার অর্চ্চনা করিয়া দেবতাকে প্রসন্ন করিত।

গিরিশের প্রতি গ্রন্থে তাই দেখিতে পাই প্রথম শ্রেণীর কবিত্ব-শক্তির সহিত মিলিয়াছে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্জ্জিত প্রথম শ্রেণীর অভিজ্ঞতা। ইহার সহিত আছে আপ্রাণ চেষ্টা, একনিষ্ঠ অধ্যবসায় ও অকাতর শ্রম। স্বাভাবিক কবিত্ব-প্রতিভার সহিত মিলিত হইল প্রাণপণে অর্জ্জিত নিপুণতা। আসিল তাই প্রতিবাস্তবের মধ্যে বিশিষ্ট মাধুর্য্য, লক্ষ্য করিবার অনুপম শক্তি। তাই অভিজ্ঞতাজাত বাস্তব জ্ঞানের সহিত সহজাত কল্পনাময়ী কবিত্ব-শক্তি মিলিত হইয়া যে অভিনব রস সৃষ্টি করিয়াছে—

গৌড়জন তাহে, আনন্দে করিবে পান
মধু নিরবধি॥

পূর্ব্ব-যবদ্বীপে হিন্দু-মন্দির

স্বামী সদানন্দ

পূর্ব্ব-যবদ্বীপের ইতিহাস চারভাগে বিভক্ত; যথা:—

(১) এরলঙ্গার রাজত্ব—ইহার পর যবদ্বীপ সাম্রাজ্য ছোট ছোট রাজত্বে বিভক্ত হয়। (২) কেদিরি বা দহে রাজত্বকাল—১০০০-১২২২। (৩) সিংহসারির রাজত্বকাল—১২১২-১২৯৩। (৪) মজপহিত রাজত্বকাল—১২৯৪-১৫২০। সুরকরতা হইতে রেলপথে মদ্যান (Modioen) ৭৫ মাইল, মদ্যান হইতে কেদিরি ৫২ মাইল। কেদিরির নিকট সেলমঙ্গলেঙ (Selamangleng) গুহায় যবদ্বীপ-বাসী কবি কণ্ব কর্ত্তৃক রচিত "অর্জ্জুন বিবাহ" উৎকীর্ণ আছে। যথা:—দেবরাজ ইন্দ্র পদ্মের আসনে বসিয়া স্বর্গীয় অপ্সরাদের আজ্ঞা করিতেছেন যে, অর্জ্জুনের নিকট যাইয়া তাহাকে প্রলোভনে মুগ্ধ কর; শত্রু সংহার করিবার জন্য অর্জ্জুনের বাণ প্রাপ্তি, স্বর্গীয় অপ্সরা সুপ্রভার সহিত অর্জ্জুনের আকাশে ভাসমান প্রভৃতি। সম্ভবতঃ এই গুহায় কোন রাজা নির্জ্জনে তপস্যা করিতেন। কেদিরির নিকট চণ্ডী সরবান (Sarwana) অবস্থিত; সম্ভবতঃ ইহা হয়ম্ বুরুকের পিতৃব্য রাজা বেঙ্করের (Wengker) সমাধি-মন্দির। একটী বরাহ শিকার লইয়া শিব ও অর্জ্জুনের দ্বন্দ্ব ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক শিবকে ভূমি হইতে উত্তোলন প্রভৃতি অর্জ্জুন-বিবাহ হইতে অতি সুন্দর ভাবে মন্দিরে উৎকীর্ণ আছে।

কেদিরি হইতে মোটরে আমরা ব্লিতারে (Blitar) আসিয়া একটী সিন্ধির দোকানে উঠিলাম। ব্লিতার হইতে মোটরে চড়িয়া ৭½ মাইল দূরে পানতারমে আসিলাম। চণ্ডী পানতারমের ভূমি ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। মন্দিরগুলির অধিকাংশ মজপহিতের প্রথম রাজার কন্যা, হয়ম্ উরুকের মাতা মহীয়সী মহারাণী ত্রিভুবনতুঙ্গদেবী বুরুকের জয়শ্রীবিষ্ণু বর্দ্ধনীর রাজত্ব-কালে (১৩২৯—১৩৫০ খৃঃ) নির্ম্মিত হইয়াছিল। চণ্ডী পানতারম যবদ্বীপের সুবৃহৎ মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম। প্রধান মন্দিরটী ১২৯১ শকাব্দে (১৩৬৯ খৃঃ অঃ) নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রধান মন্দিরের সম্মুখে সভা ও উৎসবাদি করিবার জন্য

কারুকার্য্যখচিত উচ্চ বেদী। প্রধান মন্দিরের বামদিকে নাগমন্দির। নাগমন্দিরের কার্ণিসে জড়ানো সর্প দেখিলে প্রাচীন যবদ্বীপের ভাস্কর্য্য বলিয়া মনে হয়। প্রধান মন্দিরের গাত্রে প্রস্তরফলকে রামায়ণ ও কৃষ্ণায়ন উৎকীর্ণ আছে। চণ্ডী পানতারমের নিকট একটী স্নানাগার আছে। স্নানাগারটিকে একটী প্রাচীর দিয়া দুই ভাগ করা,—একভাগ পুরুষদিগের জন্ম ও অপরটি স্ত্রীলোকদিগের জন্ম। প্রাচীরের পশ্চাৎদিকে ফোয়ারা আছে। পানতারমের নিকট চণ্ডী সুকু (Sukuh) অবস্থিত। চণ্ডী সুকুর কারুকার্য্য চণ্ডী পানতারমের ন্যায়।

চণ্ডী পানতারম দেখিয়া ব্লিতার হইতে ৬৮ মাইল (Malang) মালাংএ আসিলাম। মালাংএ কবুপতেন নামক স্থানে যাদুঘর আছে। এই যাদুঘরে মজপহিত হইতে আনীত নানাবিধ প্রস্তরের দেবদেবীর মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। মালাং হইতে ৭ মাইল দূরে সিংহসারিতে হিন্দু মন্দির দেখিতে গেলাম। সম্ভবতঃ এই মন্দির সিংহসারির শেষ স্বাধীন রাজা শ্রীকৃতনগরের সমাধিমন্দির। রাজা কৃতনগরের রাজত্বকাল (১২৬৮—১২৯২ খৃঃ অঃ)। মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের উপরে একটী অসমাপ্ত কীর্ত্তিমুখ আছে ও দ্বিতলের কুলঙ্গির উপরেও একটী কীর্ত্তিমুখ আছে। মন্দিরের দুইদিকে দুইটী প্রকাণ্ড অসুর আকারের দ্বারপাল জানু পাতিয়া বসিয়া আছে। এক একটী দ্বারপাল এক এক খণ্ড প্রস্তর হইতে কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে। দ্বারপালের চক্ষু দুইটী বাহির হইয়া আসিতেছে, দুইটী দীর্ঘ দন্ত, গলায় সর্পবেষ্টিত উপবীত, কর্ণে ও মস্তকে নরমুণ্ড অলঙ্কারে ভূষিত ও বাম হস্তে গদা রহিয়াছে। সিংহসারিতে প্রাপ্ত প্রস্তরের নরমুণ্ডের উপর দণ্ডায়মান ভৈরব মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটীর গলায় নরমুণ্ডের মালা ও চারিহস্তে ডমরু, ত্রিশূল, খড়্গ, নরমুণ্ড রহিয়াছে; কর্ণ ও মস্তক নরমুণ্ডের অলঙ্কারে ভূষিত। নরমুণ্ডের উপর উপবিষ্ট গণেশমূর্ত্তি। মহিষমর্দ্দিনী দুর্গামূর্ত্তির বাম হস্ত দুইটী ও দক্ষিণ হস্ত দুইটী। অবশিষ্ট বাকী কয়টী হস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বামদিকের একটী হস্তে ঢাল ও অপর হস্তে একটী শিশুর মস্তক রহিয়াছে, দক্ষিণে একটী হস্তে মহিষের পুচ্ছ ধরিয়া আছে। সিংহসারিতে প্রাপ্ত প্রস্তরের মূর্ত্তিগুলিতে তন্ত্রের প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

সিংহসারিতে প্রাপ্ত ১২৭৩ শকাব্দের (১৩৫১ খৃষ্টাব্দে) শিলালিপিতে যে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে তাহার তারিখ ১২১৪ শকাব্দ (১২৯২ খৃঃ অঃ)। শেষোক্ত বৎসরে সিংহসারির রাজা শ্রীকৃতনগর সপরিষদ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের সহিত নিহত হইয়াছিলেন। এই শোকাবহ ঘটনার ৫৯ বৎসর পরে তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে মহাপতি (প্রধান মন্ত্রী) গজমদ কর্ত্তৃক সিংহসারিতে উৎসর্গীকৃত দেবমন্দিরের স্থাপন উপলক্ষ্যে উক্ত শিলালিপি মন্দিরের সন্নিকটে রক্ষিত হইয়াছিল।

যবদ্বীপের অন্তর্গত প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু নরপতির বংশধরগণ নিজেদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতেন। ইহার ফলে ১২২২ খৃষ্টাব্দে গেন্তারের (Genter) রণক্ষেত্রে কেদিরির রাজা নিজের জামাতা আঙ্গরকের নিকট পরাস্ত হইলে আঙ্গরক সিংহসারি রাজত্ব লাভ করেন। তাঁহারই বংশধর উক্ত রাজা শ্রীকৃতনগর।

যবদ্বীপের রাজাদিগের সহিত যবদ্বীপবাসীদের নিয়ত যুদ্ধ হইত। উক্ত শিলালিপিতে বর্ণিত শকাব্দের (১২৯২ খৃঃ অঃ) রাজা শ্রীকৃতনগর সপরিষদ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের সহিত নিহত হইবার কারণ হইতেছে—এই বৎসরে তিনি তাঁহার সমুদয় সৈন্য সুমাত্রার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন ও সেইজন্য প্রজারা বিদ্রোহী হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রজাদের সহিত যুদ্ধে কৃতনগর নিহত হইবার ফলে যবদ্বীপে প্রজাদের প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করে।

যবদ্বীপে মধ্যযুগের হিন্দু রাজারা শিব ও বুদ্ধ উভয় দেবতারও পূজা করিতেন। সেইজন্য যবদ্বীপের "মহাবেদ"নামক ধর্ম্মপুস্তকে শিব ও বুদ্ধের পূজার মন্ত্র দেখিতে পাই। শৈব ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের এই সংমিশ্রণের ফলে শিব ও বৌদ্ধমন্দিরে ভারতবর্ষের প্রাচীন পৌরাণিক ইতিহাসোক্ত ঘটনাবলীর পাষাণময় আখ্যান স্থাপত্য-শিল্পের কৃপায় স্থান পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শিব ও বুদ্ধের পূজা যবদ্বীপের জাতীয় ধর্ম্মরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। গেন্তারের যুদ্ধের পরে যবদ্বীপে প্রজাশক্তি প্রবল হইবার ফলে যে সামাজিক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা উল্লেখ-যোগ্য। অতঃপর সংস্কৃত ভাষার পরিবর্ত্তে যবদ্বীপীয় ভাষা অর্থাৎ প্রজাদের মাতৃভাষা বিস্তৃতি লাভ করে।

মালং হইতে ৭ কিলোমিটার (প্রায় সাড়ে চার মাইল) দূরে চণ্ডীকিদল (Kidal)। ইহা সিংহসারির দ্বিতীয় রাজা অনুশপতির সমাধিমন্দির (১২২৭—১২৪৮)। ইহার প্রবেশদ্বারের উপর কীর্ত্তিমুখ আছে। মালং হইতে ১৭ কিলোমিটার (প্রায় ১১ মাইল) দূরে চণ্ডীজগো (Tumpang). এই মন্দিরে সিংহসারির রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধনকে (১২৪৮—১২৬৮) সমাহিত করা হইয়াছিল। মন্দিরের চূড়া ও প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র প্রবেশদ্বার অবশিষ্ট আছে। চণ্ডী-জগোতে প্রাপ্ত বৌদ্ধদেবী ভৃকুটির প্রস্তরের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটীর দুই পাশে পদ্মগাছের মূল ও পত্র খোদিত আছে। মূর্ত্তিটীর চারিহস্তে চারটী গুণ প্রকাশ করিতেছে। অপর একটী পিতলের বোধিসত্ত্ব অমোঘপাশের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তিটী সিংহসারির রাজা কৃতনগরের অনুমতি-ক্রমে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মালং হইতে রেলপথে নোঙকোদজদজর (Nongkod-jadjar) ২৯ মাইল, নোঙকোদজদজর হইতে তোসারি (Tosari) ৫০ মাইল, তোসারি হইতে সুরবায়া (Sourabaya)) ৬৫ মাইল। সুরবায়ায় যাইয়া মালবার হোটেলে উঠিলাম। মালবার হোটেলের সত্বাধিকারী শ্রীমণীন্দ্রনাথ দে, নিবাস চট্টগ্রাম। (দে মহাশয় একবার আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখেছিলেন যে, যদি কোন বাঙ্গালী চাকরি অথবা ব্যবসা করিবার জন্য যবদ্বীপে আসেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার হোটেলে বিনা ব্যয়ে ছয়মাসকাল থাকিতে ও থাইতে দিবেন।" বলা বাহুল্য অনেকে চাকুরির জন্য তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—"আপনি যদি আমার চাকরি না করিয়া দেন তাহা হইলে আমি আত্মহত্যা করিব)।"

সুরবায়া ওলন্দাজ অধিকৃত দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পোতাশ্রয়। সুরবায়া হইতে সকালে ট্রেণে চড়িয়া বেলা ৮টার সময় মোড়কোকেরতোয় পৌছিলাম। মোড়-কোকেরতোর নিকট প্রসিদ্ধ মজপহিত বা তিক্তবিল্ব নগরের ধ্বংসাবশেষ আছে। ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে কবিপ্রপঞ্চ লিখিত নগরকৃতগম্ নামক কাব্যে মজপহিত নগরের রাজা রজসনগরের (হয়ম্ বুরুক) প্রাসাদ ও বহু ঐতিহাসিক তথ্য বিশদভাবে বর্ণিত আছে। মজপহিতের নিকট এবুলনে (Tranbulan) চালাবাড়ীর ভিতর মজপহিত হইতে আনীত নানাবিধ প্রস্তরের সামগ্রী রক্ষিত আছে। মজপহিতের নিকট চণ্ডী তিকুস্ (Tikus) নামে স্নানাগার অবস্থিত। এই ইমারতটী ইট দিয়া প্রস্তুত। কেবলমাত্র জলের ফোয়ারাটী ছাদের উপর হইতে দেখা যায়। চণ্ডী তিকুস্ দেখিয়া আমরা জলছন্দার স্নানাগার দেখিতে পেলাম। জলছন্দা পেনংগুঙ্গম্ (Penanggnagan) পর্ব্বতের পূর্ব্ব তলদেশে অবস্থিত। উহার দেওয়ালে "রাক্ষস কর্ত্তৃক একটী স্ত্রীলোককে লইয়া পলায়ন ও একটী পুরুষের পশ্চাদ্ধাবন" খোদিত আছে। পেনংগুঙ্গম্ পর্ব্বতের উত্তর তলদেশে অবস্থিত বেলহন (Belahan) নামক সমাধি-ক্ষেত্র ও স্নানাগারের দুইটী কুলুঙ্গির ভিতর লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পাথরের মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তি দুইটী ফোয়ারার ন্যায় ব্যবহার হইত। গরুড়ের উপর উপবিষ্ট বিষ্ণুমূর্ত্তি ছিল। গরুড় দুইটী পায়ে দুইটী সর্প ধরিয়া আছে ও বিষ্ণুর দক্ষিণ হস্তে সুদর্শন চক্র ও বাম হস্তে শঙ্খ এবং অপর দুইটী হস্ত মুদ্রাবদ্ধ করিয়া ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসিয়া রহিয়াছে। মূর্ত্তিটী টেরাকোটা দ্বারা প্রস্তুত। ইহা মালংএ মজকরতো যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এরলঙ্গার চিতাভস্ম ঐ স্নানাগারে সমাহিত করা হইয়াছিল। মোড়কোকরতো হইতে সুরবায়া আসিয়া বালদ্বীপ অভিমুখে রওনা হইলাম।

চণ্ডী কেদাতন (Kedatan)

চণ্ডী কেদাতন বেমুকিয়া সিমলায় অবস্থিত। গরুড় কাহিনী হইতে তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প ইহাতে উৎকীর্ণ আছে। যথা :—

১। দ্বীপের অধিবাসীদের গরুড়ের মুখব্যাদানকে পর্ব্বতগুহা মনে করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ ও গরুড় কর্ত্তৃক তাহাদিগকে গলাধঃকরণ।

২। বৃক্ষতলদেশে অবস্থিত সন্ন্যাসীদিগকে গরুড় কর্ত্তৃক রক্ষা।

৩। গরুড়কর্ত্তৃক অমৃতভাণ্ড লইয়া দ্রুত গমন।

চণ্ডী কেদাতনে অর্জ্জুন-বিবাহের তিনটী বিবরণ খোদাই করা আছে, যথা :—

১। অর্জ্জুনের পাশুপত অস্ত্র প্রাপ্তির জন্য কঠোর তপস্যা। দেবগণের ভীতি উৎপাদক ঐ তপস্যা হইতে অর্জ্জুনের ধ্যানভঙ্গ করিবার জন্য দুইটী অপ্সরীর প্রলোভন।

২। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে অর্জ্জুনের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, "তুমি ঐশ্বরিক শক্তি লাভের জন্য অথবা যুদ্ধজয়ের জন্য এরূপ কঠোর তপস্যা করিতেছ ?"

৩। ইন্দ্র ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলে অর্জ্জুন অত্যন্ত ভীত হন ও দেবরাজ তাঁহাকে বর দেন যে, "শত্রুবিনাশকারী যে অস্ত্রের জন্য তুমি তপস্যা করিতেছ তাহা পাইবে।"

ভারত সীমান্তের লড়াই—আমেরিকার মন্তব্য

আসাম সীমান্তের যুদ্ধ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানিতে পারি না এবং স্থানীয় গভর্ণমেণ্টও এই বিষয়ে নীরব। তবুও বিদেশীর মারফতে যেটুকু সংবাদ আমরা পাই, তাহাতেই যথেষ্ট আতঙ্কের কথা। নিউইয়র্ক টাইম্‌সের সংবাদদাতা মিঃ হ্যান্‌সন্ বলডুইন গত ৭ই এপ্রিল তারযোগে নিউইয়র্কে যে সংবাদ পাঠান, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, সম্প্রতি প্যাসিফিকের যুদ্ধে জাপান পরাজিত হইলেও জাপানের শক্তি ক্ষয় হয় নাই। ভারত অভিযানে দেখা যায়, মধ্যব্রহ্ম অতিক্রম করিয়া ইম্ফলের চতুর্দ্দিকে জাপানীদের আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। ব্রিটিশ সৈন্যগণ খুব দৃঢ়তার সহিত বাধা দিতেছে। "But it is amply evident that the enemy hasn't yet been stopped. A definite threat to Imphal, Kohima, and Dimapur above all to the Bengal-Assam Railway still exists. Moreover Japanese troops are now on Indian soil." ইহার উপর আমাদের মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

আসাম যুদ্ধক্ষেত্র

এতদিন ভারত সীমান্তেই যুদ্ধ চলিতেছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে সরকারী রিপোর্ট হইতে দেখা যায়—আসামের এক অংশে দস্তুরমত যুদ্ধ হইতেছে। মণিপুর রাজ্য ব্যতীতও লুসাই পর্ব্বতের উত্তর প্রান্তে এবং শ্রীহট্টের পূর্ব্বাংশে যুদ্ধক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে। বিষেনপুর হইতে যে রাস্তা শিলচর অভিমুখে গিয়াছে, শত্রুপক্ষ সে-রাস্তায়ও অভিযান করিয়াছে; এই যুদ্ধের গতি দেখিয়া আমরা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি; আসাম যুদ্ধক্ষেত্রের পরিণতির উপরে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে; যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা এবং আমাদের কর্ত্তব্য কি, এই সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রকৃত তথ্য জানিতে আগ্রহান্বিত। একদিকে জটিল খাদ্য-সমস্যা; অপর দিকে আসামের যুদ্ধক্ষেত্র, এই উভয়বিধ চিন্তা আমাদের ভাবনার কারণ হইয়া উঠিয়াছে, সুদৃঢ় আসাম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া শত্রুগণ ভারতের ভিতরে প্রবেশ করাতে আমাদের চিন্তা বাড়িয়া গিয়াছে।

লবণ সমস্যা

সম্প্রতি কলিকাতা সহরে ও মফঃস্বলে লবণ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। বাজারে গোপনে আট আনা দরে, স্থানে স্থানে একটাকা দরেও লবণ বিক্রয় হইতেছে। বাঙ্গলায় অনেকগুলি লবণের কারখানা রহিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট যদি উক্ত কারখানাগুলিকে এই সময়ে উৎসাহ প্রদান করেন এবং যাহাতে কারখানাগুলি চালু হয়, তাহার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে লবণ-সমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারে। গভর্ণমেণ্ট তার ব্যবস্থা করিবেন কি?

কেরোসিন তেল

কলিকাতা সহর এবং মফঃস্বলে লবণের ন্যায় কেরোসিন তেলও দুর্ঘট হইয়াছে। বহু গৃহস্থকে রাত্রিতে অন্ধকারে থাকিতে হইতেছে, এই সহরেও প্রকাশ্যে তেল পাওয়া যাইতেছে না। গভর্ণমেণ্ট অচিরাৎ তেল সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের অসুবিধা দূর করিবেন কি?

ভারতে ভৈষজ্য উদ্যান

গত ৩০শে চৈত্র কলিকাতা কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে ডাক্তার বল ভারতে ভৈষজ্য উদ্যান প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি বিশেষ জোরের সহিতই বলেন, যে চিকিৎসার উন্নতিকর আদর্শ বজায় রাখিতে হইলে এবং ঔষধাদিকে সুলভ করিতে হইলে এ দেশেই ঔষধী বৃক্ষাদির চাষ করিবার বিশেষ প্রয়োজন। উল্লেখযোগ্য ভৈষজ্য উদ্যান আমাদের দেশে নাই, অথচ ঔষধী বৃক্ষ লতা গুল্ম প্রভৃতির চাহিদা অত্যন্ত বেশী। তিনি এ দেশের উৎসাহী কর্ম্মী ও ধনীদিগকে এই বিষয়ে তৎপর হইতে উপদেশ দিয়াছেন। ডাক্তার বলের এই উপদেশ বিশেষ সমীচীন। ভৈষজ্য উদ্যানের বিশেষ প্রয়োজন, এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ধনী ও ব্যবসায়ীগণ এই বিষয়ে উৎসাহী হইবেন কি?

কলিকাতা কর্পোরেশনের বর্ত্তমান বৎসরের সাধারণ নির্ব্বাচন

গত ২৯শে মার্চ্চ কলিকাতা কর্পোরেশনের এই বৎসরের সাধারণ নির্ব্বাচন শেষ হয়। সাধারণ নির্ব্বাচনে পূর্ব্বেকার কর্পোরেশনে কংগ্রেস ২৩টি আসন অধিকার করিয়াছিলেন, এবারে ২১টি পাইয়াছেন। পূর্ব্বে কর্পোরেশনে হিন্দু মহাসভার আসন ছিল ২১টি, এবারে তাঁহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা হইয়াছে ১৬টি। পূর্ব্বের কর্পোরেশনে মুসলমানদের ২২টি আসনের মধ্যে মুস্লীম লীগ ১৮টি আসন অধিকার করিয়াছিলেন, এবারে তাঁহাদের সদস্য সংখ্যা ১৯। কর্পোরেশনের ৮৫ জন নির্ব্বাচিত সদস্য ও ৮ জন গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত সদস্য ৫ জন অল্ডারম্যান নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। এইবারের কর্পোরেশনে বিভিন্ন দলের সদস্য সংখ্যা নিম্নরূপ :—

কংগ্রেস	২১	৮। পোর্ট কমিশনার্স	২
মুস্লীম লীগ	১৯	৯। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান	২
হিন্দু মহাসভা	১৬	১০। শ্রমিক সদস্য	২
মুস্লিম মজলিস	২	১১। মনোনীত	৮
স্বতন্ত্র মুসলমান	১	১২। অল্ডারম্যান	৫
স্বতন্ত্র	১০		
ইউরোপীয়	১০	মোট	৯৮ জন

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

সম্প্রতি বাংলার নূতন গভর্ণমেণ্ট মাধ্যমিক শিক্ষা বিলকে পুনরুজ্জীবিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। বাংলার শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার আগ্রহে প্রথম হক্‌মন্ত্রিমণ্ডলের আমলে ইহার পরিকল্পনা হয়। তখনই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও চিন্তাশীল জননায়কগণ ইহার অনিষ্টকারিতার কথা ভাবিয়া প্রতিবাদ তুলিয়াছিলেন। ফলে বিলটি অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। জানা গিয়াছে—বিলটি যাহাতে যথাশীঘ্র কার্য্যকরী হয়, গোপনে গোপনে তাহারই তাড়াহুড়া চলিতেছে।

আশা করি, দেশের বর্ত্তমান চাতুষ্পার্শ্বিক দুর্য্যোগের দিনে স্যার নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিমণ্ডল ও নূতন গভর্ণর মিঃ কেসি বিলটি যথোপযুক্তভাবে বিচার ও বিবেচনাধীন হইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া পাশ করাইবার অযথা ব্যস্ততা দেখাইবেন না।

ঘাট্‌তি প্রদেশ বাঙলা

ইতিপূর্ব্বে বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বাজেট আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি,—আর্থিক ক্ষেত্রে সরকারী অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেটে বাঙলার ঘাটতির পরিমাণ হইতেছে, ১০ কোটি ১০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে ঘাটতির পরিমাণ ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা বলিয়া অনুমিত হইতেছে। অথচ আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছি, ভারতের অন্যান্য কোন প্রদেশে এইরূপ দুর্দ্দশা তো দেখা দেয়ই নাই, বরঞ্চ সংখ্যাগুরু উদ্বৃত্তাংশ দেখা যাইতেছে। বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের বাজেটে উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইতেছে ৮৬ হাজার টাকা, এতদ্ব্যতীত যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের জন্য স্বতন্ত্র জমা আছে ৪॥০ কোটি টাকা এবং স্পেশাল ডেভলেপমেণ্ট্ ফণ্ডে জমানো অর্থের পরিমাণও ১২৩ লক্ষ টাকা। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের উদ্বৃত্ত আছে ৭৭ হাজার টাকা, এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের জন্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা হইতেছে ৫॥০ কোটি টাকা। পাঞ্জাবের উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ ৩৮৬ লক্ষ টাকা, যুক্তপ্রদেশের ৪২৮ লক্ষ টাকা, বিহারের ২২২ লক্ষ টাকা, উড়িষ্যার ৬৫ হাজার টাকা, এবং সিন্ধু প্রদেশের ৭৫৫ লক্ষ টাকা। তাই বলিতে ইচ্ছা হয়, সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলা মা'এর আজ এ দীন হীন অবস্থা কেন? কর্ত্তৃপক্ষ তলাইয়া দেখিবেন কি?

বিভিন্ন প্রদেশের এই বৃহত্তর উদ্বৃত্তাংশের কাছে বাঙলার এই ঘাটতির পরিমাণ যে কতবড় দুঃখদায়ক, তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। উপরন্তু দেখা যাইতেছে, ১৯৪৪ সালের শেষে বাঙলা গভর্ণমেণ্টের মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা, এবং ১৯৪৫ সালের শেষে ১৯ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। চরম বিপদগ্রস্ততার মধ্য দিয়া বাঙলা গভর্ণমেণ্টের ঋণের পরিমাণ ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠিতেছে।

ঋণ ইজারা ব্যবস্থা

মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থানুযায়ী সম্প্রতি ভারতে বহু কোটি টাকার যুদ্ধ-সামগ্রী পাঠাইতেছেন। এতদ্ব্যতীত ভারতে অবস্থিত মার্কিণ সেনাবাহিনীর সর্ব্বপ্রকার ব্যয় মিটাইতে ভারত গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতেছেন। এই সাহায্য ব্যবস্থাকে "বিপরীত ঋণ ইজারা সাহায্য" বলিয়া অবিহিত করা হইয়াছে। ভারতের এই কঠিন দুর্য্যোগের সময়ে এই দ্বিবিধ ব্যবস্থা ক্রমেই যে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে, সেদিকে গভর্ণমেণ্টের বিন্দুমাত্র চিত্ত-চাঞ্চল্যের বহির্বিকাশ আমাদের নজরে আজও পড়ে নাই। ভারত গভর্ণমেণ্টের অর্থসচিব মহাশয় জানান যে, ১৯৪৪-৪৫ সালের শেষে "বিপরীত ঋণ ইজারা সাহায্য" বাবদ ভারতকে মোট ৮১ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইবে। কিন্তু ভারতের ভাগ্যে আমেরিকার সাহায্য আসিয়া কতটুকু জুটিতেছে, তাহা অর্থসচিব মহাশয় জানেন না। তাঁহার ধারণা—১৯৪৪-৪৫ সালের শেষ অবধি এই বাবদ আমেরিকা হইতে মোট ৩৫০ কোটি টাকা মূল্যের

যুদ্ধ-সামগ্রী ভারতে আসিবে। তাহা হইতে শুধু ভারতের সামরিক স্বার্থ-সুবিধার জন্য যতটা, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজনেও তাহার অধিক ব্যতীত কম ব্যয়িত হইবে না।

এইভাবে দেখা যাইতেছে, ঋণ ইজারা ব্যবস্থায় ভারতের উপর ক্রমেই অসম্ভব বোঝা চাপানো হইবে, সেই বোঝা তাহার পক্ষে বহন করা আদৌ সহজসাধ্য নয়। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বলেন: সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধক্ষেত্রে ভারত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং ভারতে বহুবিধ যুদ্ধসামগ্রী পাঠাইয়া ভারতের সামরিক বলবৃদ্ধি করা হইতেছে।—ইহার পিছনে ভারতকে পূর্ণ সাহায্য করিবার সম্পর্কে কতখানি যুক্তিযুক্ততা আছে, তাহা রুজভেল্ট সাহেবেরই একমাত্র বিচার্য্য বিষয়। ভারত আমেরিকার নিকট হইতে ঋণ ইজারা ব্যবস্থায় যাহা কিছু সামগ্রী পাইতেছে, তাহার ব্যয়ভার বণ্টনের নীতি ইতিমধ্যেই একরূপ স্বীকৃত হইয়াছে। আমেরিকাকে ভারতের কি পরিমাণ মূল্য দিতে হইবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে। এইভাবে বিভ্রান্ত নীতির 'গোলে-হরিবোলে' পড়িয়া ভারতকে যে অচিরেই আরও তীব্রতর দুর্য্যোগে পড়িতে হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ভারতের শান্তি-শৃঙ্খলা বিধানের জন্য এই "বিপরীত ঋণ ইজারা সাহায্য" সম্পর্কে ভারত গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই একটা সন্তোষজনক ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হউন—ইহাই আজ ভারতবাসীর অন্যতম দাবী।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের মূল সভাপতিত্বে সম্প্রতি দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনের প্রধান কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র দাশ, আই-সি-এস্-এর প্রচেষ্টায় এবারে শুধু বিভিন্ন প্রদেশের সুধী ও সাহিত্যিকবৃন্দই নহেন, বহু বৈদেশিক সম্মানিত অতিথি ও প্রতিনিধিও এই অধিবেশনে আসিয়া যোগ দিয়াছেন। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এই কারণেই এবারের অধিবেশন নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য।

উক্ত অধিবেশনে যে সব অভিভাষণ পঠিত হইয়াছিল, বাঙ্গালী পাঠকেরা দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা মারফত তাহা পড়িতে পাইয়াছেন। অধিবেশনের বিবরণও কিছু কিছু বাহির হইয়াছে; কিন্তু গৃহীত প্রস্তাবের কোন আলোচনা এখনও আমাদের চোখে পড়ে নাই। অথচ এইবারকার প্রস্তাব সমূহ একটু বিশেষ গুরুত্ব রাখে। আমরা দেরাদূনের শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র পাল কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবত্রয়ের কথাই বলিতেছি।

নরেশবাবু অধিবেশনের প্রাক্কালে, তিনটি জোরাল ইংরাজী ও দুইটি বাংলা প্রবন্ধে তাঁহার উত্থাপিত বিষয়গুলি আলোচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজী প্রবন্ধ বিহার হেরাল্ডের ১৫ই ও ২৯শে ফেব্রুয়ারী ও ৭ই মার্চ্চ তারিখে বাহির হয়। বাংলা দুইটি লেখা "অন্ধতনে দেহ আলো" নামে আনন্দবাজারের রবিবাসরীয় আলোচনীতে ২০শে ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বাহির হইয়াছিল।

ঐ তিনটির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব বিশ্বভারতীয় লোকশিক্ষা সংসদ প্রবর্ত্তিত বাংলা পরীক্ষাসমূহ সম্বন্ধীয়। প্রস্তাবক চান যে, ঐ পরীক্ষাসমূহ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত পরীক্ষার সঙ্গে এমনভাবে অন্বিত হউক যাহাতে বাংলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিদ্যার্থী শুধু ইংরেজীতে ক্রমান্বয়ে উচ্চ উচ্চতর পরীক্ষা দিয়া প্রাইভেট বি-এ, এম্-এ, ডিগ্রীলাভ করিতে পারেন।

ব্যাপারটি এমনই সমস্যা সঙ্কুল যে সহজে সমাধান হইবার নহে। তবে ইহার ব্যাপক আলোচনা আমরা কাম্য মনে করি। আমাদের পাঠক ও লেখকগণ এবিষয়ে মতামত প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

রেলের ভাড়া

ইতিপূর্ব্বে যানবাহনসচিব স্যার এড্ওয়ার্ড বেন্থলের ঘোষণা অনুযায়ী বর্ত্তমান বৎসরের ১লা এপ্রিল হইতে রেলের ভাড়া টাকা প্রতি চারি আনা বাড়িবার কথা ছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ রেলের ভাড়া এখনো বাড়ানো হয় নাই। প্রকাশ যে, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট রেল ভাড়া বৃদ্ধি সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় পরিষদের মতামত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিবেন না। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে এখনো জনসাধারণ সন্দিহান। তবে, দুর্গত বাংলা ও ভারতের কথা চিন্তা করিয়া রেলকর্ত্তৃপক্ষের সুমতি হউক, ইহাই আমরা কামনা করি।

বৈদেশিক প্রসঙ্গ

ষ্ট্যালিনের কূটনীতি

রাশিয়ার সাম্প্রতিক উদ্দেশ্য একমাত্র নাৎসী-ফ্যাসিষ্ট আক্রমণ প্রতিহত করা। বর্ত্তমান রাশিয়ার রণনীতিতে ইহাই সুস্পষ্ট। কিন্তু তাহার রাজনীতি ও কূটনীতি কখন

কোথা দিয়া চলে, তাহা বুঝা দুঃসাধ্য। সম্প্রতি সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ইতালীর বাদোগ্লীও গভর্ণমেণ্টের রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। মুসোলিনীর পতনের পর ইতালীতে এই গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আজ অবধিও এই গভর্ণমেণ্ট ইতালীর সর্ব্বসাধারণের ঐকান্তিক সমর্থন বা প্রীতি লাভ করিতে পারেন নাই। মিত্রপক্ষের সহিত তাহার যুদ্ধবিরতির চুক্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু মিত্রপক্ষের অন্যতম সহযোগী রাষ্ট্ররূপে বাদোগ্লিও গভর্ণমেণ্ট এখনো স্বীকৃত হন নাই। ইহার পিছনে যে সমস্ত ছোট বড় কারণ রহিয়াছে, তাহা এখন পর্য্যন্ত দূর হইয়াছে বলিয়া কোন সংবাদ আমরা পাই নাই। ঠিক এইরূপ একটি জটিল মুহূর্ত্তে মিত্ররাষ্ট্রের মধ্যে রাশিয়াই সর্ব্বপ্রথম বাদোগ্লীও গভর্ণমেণ্টের রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা স্বীকার করিয়া লইলেন। দক্ষিণ ইতালী হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতার সংবাদে জানা যায় যে, রাশিয়ার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর বৃটেন, আমেরিকা ও অন্যান্য মিত্র রাষ্ট্রগুলির সহিত বাদোগ্লিও গভর্ণমেণ্টের অনুরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে এই সংবাদে কিছু কিছু ফাঁক আছে বলিয়া মনে হয়। পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন: ইতালীতে আমরা রাজা ও বাদোগ্লীও গভর্ণমেণ্টের জন্য কাজ করিতেছি। আমার বিশ্বাস, এই গভর্ণমেণ্ট সশস্ত্র বাহিনীর যেরূপ আনুগত্য লাভ করিতেছেন, সেরূপ আনুগত্যলাভে সক্ষম অপর কোন গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে ইতালীতে গঠিত হইতে পারে না।

এদিকে মার্কিণ পররাষ্ট্রসচিব মিঃ কর্ডেল হাল স্পষ্টই বলিয়াছেন: মঃ ষ্ট্যালিন আমেরিকার গভর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ না করিয়াই বাদোগ্লীও গভর্ণমেণ্টের মর্য্যাদা স্বীকার করিয়াছেন। এ বিষয়ে বৃটেনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার পরামর্শ হইয়াছে বলিয়াও মনে হয় না। এই কারণেই সম্ভবতঃ বৃটেনে ইহা লইয়া কিছু আলোড়ন দেখা দিয়াছে।··· কিন্তু মিঃ চার্চ্চিলের বক্তব্যে তেমন কোনো নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। তবে কোনো সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা লণ্ডন হইতে জানাইয়াছেন—মঃ ষ্ট্যালিনের আকস্মিক এই কার্য্যে বৃটেনে উদ্বেগ ও বিস্ময় প্রকাশ করা হইতেছে।

ইহার পশ্চাতে যে-কোনো কারণই নিহিত থাকুক না কেন, রাষ্ট্রীক ব্যাপারে সমস্তই কূটনৈতিক বিশ্লেষণ মাত্র ও অনুমান মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের এই কার্য্যের মূলে কি অভিসন্ধি বা কারণ রহিয়াছে, তাহা অবিলম্বে উদ্‌ঘাটন করা সহজসাধ্য নয়।

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে কূটনীতিক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়া উপর্য্যুপরি এমন কয়েকটি লোক-বিস্ময়কর অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ১৯৩৯ সালে হিট্‌লার-গভর্ণমেণ্টের সহিত অনাক্রমণচুক্তি, ১৯৪১ সালে ষ্ট্যালিন কর্ত্তৃক রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ, ১৯৪৩ সালে কোমিণ্টার্ন ভাঙিয়া দেওয়া—সমস্ত কিছুই বিরাট হেঁয়ালীপূর্ণ। সাম্প্রতিক বাদোগ্লাও গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইবার মধ্যেও তেম্‌নিতর হেঁয়ালীই অনুভূত হইতেছে।

পরলোকে সুগায়িকা শৈল দেবী

গত ১২ই মার্চ্চ রবিবার রাত্রি ৩-১৫ মিনিটের সময় সুগায়িকা শ্রীযুক্তা শৈল দেবী এ্যাপেণ্ডিসাইটিশ রোগে মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।
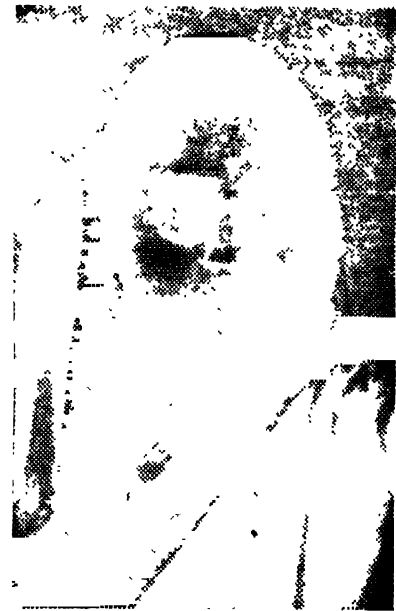
শৈল দেবী

শ্রীযুক্তা শৈল দেবী শৈশবকাল হইতেই সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন।

১৯৩১ সালে কুমিল্লা নিবাসী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ দেব মহাশয়ের সহিত ১৩ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর তাহার উচ্চ-সঙ্গীত শিখিবার আকাঙ্ক্ষা হওয়ায় ১৯৩৭ সালে কলিকাতার বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করেন। ১৯৩৭ সালেই তিনি প্রথম রেডিও ও গ্রামোফোনে গান করেন। সকল শ্রেণীর সঙ্গীতে তাহার সমঅধিকার ছিল বলিয়াই অল্প দিনের মধ্যে চারিদিকে তাহার প্রতিভা ছড়াইয়া পড়ে এবং মহিলা-শিল্পীদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী বলিয়া গণ্য হন।

তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশেষ একজন ভক্ত ছিলেন, তাহার কণ্ঠ-নিঃসৃত যে সব রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ড আছে, তাহা রেকর্ড কোম্পানীর একটী মূল্যবান সম্পত্তি। ইহা ছাড়া কবি নজরুল ইস্‌লামের গানও তাহার অতি প্রিয় ছিল এবং এতদিন রেডিওর সাহায্যে 'নজরুল গীতি'র প্রতিভা তিনিই চারিদিক জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। খেয়াল, ঠুংরি, কীর্ত্তন, পল্লী-গীতি, আধুনিক রবীন্দ্র সঙ্গীত ও প্রত্যেক ভাষায় চলচ্চিত্র সঙ্গীত বাদে তিনি ৮০ খানা রেকর্ড করিয়াছেন। স্বভাব-সুলভ মিষ্টভাষী ও সদা হাসিমুখ ছিল তাঁহার জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। তাহার মৃত্যুতে বাংলার একজন সত্যিকারের গীত-শিল্পীর যে অভাব হইল, তাহা অপূরণীয়।

তিনি মৃত্যুকালে স্বামী, এক পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। ভগবানের নিকট তাহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি ও তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পুস্তক ও আলোচনা

মুক্তির ডাক ঃ ঔপন্যাসিক চিত্র। শ্রীহরিপদ দে। মূল্য—এক টাকা বারো আনা মাত্র।

নবীন কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত হরিপদ দে'র 'মুক্তির ডাক' প'ড়লাম। বর্ত্তমানকালের বহুধা-বিদীর্ণ জীবনের স্বাদ লেখক অভিনব শৈলীতে পরম নিপুণতার সংগে পরিবেশন ক'রেছেন। কার্পণ্য দোষদুষ্ট সমাজ ও পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর অনুদার আবেষ্টনীর লৌহবন্ধনী সহজ সুন্দর জীবনের পক্ষে অতিবড় অন্তরায়। জীবনের দলগুলি সে উত্তাপে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হওয়ার পথেই নাশ পায়। একজন্যই হরিপদবাবুর বন্ধনহীন প্রাণবন্ত জীবনের জন্য 'মুক্তির ডাক'।

নায়ক শিহরণের অন্তরের মধুচক্র প্রতিদানহীন নিরন্তর নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে নিঃশেষিত প্রায়। এ জন্যই ধনিকবৃত্তির উপর তার এত অবজ্ঞা, জীবনের প্রতি এই তাচ্ছিল্য এবং তারুণ্যের এমন জয়গান। ক্ষুদ্রায়তন রচনার দর্পণে লেখকের ব্যর্থ জীবনের ইতিহাস এবং তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রতিবিম্ব যেন মাঝে মাঝে নজরে পড়ে।

বাণীর কমলবনে এঁর অভিসার অসংযত বা অশোভন নয়, স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমি অকুণ্ঠিতচিত্তে বল্‌তে পারি: এ রচনা আনন্দ দানই করেচে। কারণ অসাধ্য সাধন ত' প্রত্যাশা করা যায় না।

হরিপদ দে'র পরবর্ত্তী রচনার জন্য আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করবো।

শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী

শ্রীহরি ঠাকুর ঃ লেখক—শ্রীসুরেশ বিশ্বাস। ঊষা পাব্লিশিং হাউস, ৯০ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য ॥৵০ আনা মাত্র।

শ্রীযুক্ত সুরেশ বিশ্বাস স্বভাবতঃ কবি। 'দীপশিখা', 'কলহংস' ও 'মধুমতী' কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়া বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। 'শ্রীহরি ঠাকুর' কবির প্রথম গদ্য রচনা। কথিত ভাষায় শিশুদের উপযোগি করিয়া তিনি এই গ্রন্থে শ্রীহরি ঠাকুরের জন্মবৃত্তান্ত ও আদর্শাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সর্ব্বত্যাগী সাধুপুরুষ শ্রীহরি ঠাকুর, আদর্শ মহাপুরুষদের অমর কাহিনী শিশুদের জীবন-সংগঠনের সহায়ক। এই দিক হইতে 'শ্রীহরি ঠাকুর' বাংলার শিশু-চিত্তকে যে বৃহত্তর আদর্শস্বপ্নে উদ্বুদ্ধ করিবে, তাহা স্বভাবতঃই মনে হয়।

শ্রীযুক্ত সুরেশ বিশ্বাস রত্ন-সন্ধানী। এখনো নদীমাতৃক বঙ্গপল্লীর আনাচে কানাচে এমন অনেক ব্রহ্মপুরুষের জীবন-গাঁথা লুকাইয়া রহিয়াছে, যাহার দিকে দৃষ্টি দিবার মতো মরমী লোকের সংখ্যা একরূপ নাই বলিলেই চলে। শ্রীহরি ঠাকুরের আদর্শ ও জীবনী রচয়িতা সেই শ্রমলব্ধ রত্নোদ্ধারের জন্য যথার্থই প্রশংসনীয়।

গ্রন্থখানির ব্যাপক প্রচার হউক, ইহাই কামনা করি।

শ্রীরণজিৎ কুমার সেন

নি[illegible]তর উপায়

চঞ্চল মহানগরী—উদ্দাম জনস্রোত—চারিদিকে কর্ম্ম-ব্যস্ততা। এরই মাঝে একটি সংসারের অবগুণ্ঠন তুলে দেখা গেল দু'টী প্রাণীর ছোট একটি নিটোল নিখুঁত হিসেবী সংসার—মাত্র দু'টী লোক—স্বামী ও স্ত্রী। ঐশ্বর্য্যও নেই, অস্বচ্ছলতাও নেই। স্বামী কোন এক অফিসে অল্প বেতনের কেরাণী, তবু তাদের সংসারে আনন্দ বিদ্যমান। দুঃখ তার কালো হাতের কঠিন পরশ এই গৃহের অধিবাসীদের উপর বুলিয়ে দেয় নি। ভোরের আলো যখন এই মহানগরীর সৌধের উপর তার সোনার ছোঁয়াচ দিতে সুরু করে, তখন বউটি ব্যস্ত হয়ে পড়ে সাংসারিক কাজ নিয়ে—স্বামীর চা ও জলখাবার তৈরী করে' কোমরে কাপড় জড়িয়ে আফিসের রান্না আরম্ভ করে। স্বামী দশটায় অফিসে যান। বউটি দুপুর বেলা পাশের ভাড়াটে মেয়েদের সঙ্গে তার ঘরের ছোট্ট জানালা দিয়ে আলাপ করে' নিঃসঙ্গ সময়টাকে টেনে ছোট ক'রে আনে—আবার চারটে বাজতে না বাজতেই স্বামীর বিকেলের জল-খাবার তৈরী ক'রে ও তার ছোট সংসারের খুঁটি নাটি অনেক কাজ সেরে রাখে। স্বামী অফিস থেকে ফিরে আসেন—আসবার সময় বাজার থেকে এটা ওটা আনতে ভোলেন না। রাত্রে সমস্ত কাজ শেষ হয়ে গেলে স্বামী-স্ত্রীতে সুখ-দুঃখের কথা হয়—এমনি নিছক আনন্দের ভেতর বছর গড়িয়ে যায়, আবার নতুন বছর ঘুরে আসে—নতুন অতিথির আগমনে সংসারে আনন্দের জোয়ার ব'য়ে যায়—কিন্তু এই আনন্দের মাঝেই ধীরে ধীরে দেখা যায় দারিদ্র্যের কালো ছায়া। সংসারে খরচ বেড়ে গেছে—খোকার দুধ এবং আরও অনেক কিছু। অল্প বেতনে আর স্বচ্ছলতা হয়ে উঠে না, তাই আরও রোজগারের জন্য টিউশনী নিতে হয়। কিন্তু ক্রমশঃই গৃহস্বামী দুর্ব্বল হয়ে পড়তে লাগলেন। একটুতেই হাঁপিয়ে উঠেন—অফিসে আর পূর্ব্বের মতন পরিশ্রম করতে পারেন না—ধীরে ধীরে হৃদ্‌-যন্ত্রও দুর্ব্বল হয়ে পড়তে লাগলো। বাধ্য হয়ে টিউশনী ছাড়তে হ'ল। এই আখ্যানের পুনরাবৃত্তি বাঙ্গালা দেশের প্রায় প্রত্যেক গৃহে গৃহে হচ্ছে। কিন্তু এর সমাপ্তি এভাবে নাও হ'তে পারতো—যদি সময়মত হৃদ্‌যন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্র সবল করার ঔষধ তাদের খাদ্যের সঙ্গে গ্রহণ করা হ'ত। দরিদ্র কেরাণীর পক্ষে বেশী দামের ঔষধ খাওয়া অবশ্য কঠিন এবং হয় ত সম্ভবও নয়, কিন্তু অব্যর্থ কার্য্যকরী অথচ সস্তা ঔষধ যেমন, **ভাইনো মল্ট** খাওয়া খুব শক্ত ব্যাপার হয় ত হ'ত না এবং এরূপভাবে নির্জ্জীব ও অকর্ম্মণ্য না হয়ে অজ্ঞাত শত্রুর হাত হ'তে সহজেই নিষ্কৃতি পেত।

চোর যখন চুরি করতে আসে, তখন ঢাক ঢোল না বাজিয়ে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে গৃহস্বামীকে সজাগ না করেই আসে; তেমনি রোগও ধীরে ধীরে অজ্ঞাতভাবে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে' আমাদের জীবনীশক্তি হরণ করে। তাই যথাসম্ভব রোগ-বীজাণুর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে শ্বাসযন্ত্র ও হৃদ্‌যন্ত্র সবল করার জন্য **পেট্রোমালসন উইথ গোয়াইকল্**-এর মত ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। এর দামও অল্প অথচ কার্য্যকরী।

মেট্রোপলিটনের ক্রমোন্নতির পরিচয়

নূতন কাজের পরিমাণ

১ম বৎসর ১৯৩১	প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা
৭ম বৎসর ১৯৩৮	৭৫ লক্ষ টাকার উপর
১৩শ বৎসর ১৯৪৩	১ কোটী ৩২ লক্ষ টাকার উপর

দাবী প্রদানের পরিমাণ

১ম বৎসর পর্য্যন্ত	২ হাজার টাকা
৭ম " "	২ লক্ষ ৬১ হাজার টাকার উপর
১৩শ " "	১২ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকার উপর

কলিকাতা

-ব্রাঞ্চ এবং সাব-অফিসসমূহ—

হাওড়া, ঢাকা, চাঁদপুর, পাটনা, লক্ষ্ণৌ,
দিল্লী, লাহোর, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ।

অর্গেনাইজিং কেন্দ্র—ভারতের সর্ব্বত্র

FOR Graceful
ORNAMENTS INSIST ON
Mira MOOKHERJEE & CO.
• RENOWNED SINCE 1884 •
BANKERS and JEWELLERS
35, ASHUTOSH MUKERJEE ROAD, CALCUTTA
SOUTH 1278 • GRAM. METALITE

ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা চাই-ই...

শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে হ'লে প্রত্যহ [illegible] খেলাধুলা চাই-ই। খোলা মাঠে [illegible] বিশুদ্ধ হাওয়া ও সূর্যের আলো নিশ্চয় ছেলেমেয়েদের পক্ষে অমূল্য সম্পদ। সেই সঙ্গে ভাল আহার্যও চাই। পুষ্টিকর খাদ্যে তাদের শরীর সুদৃঢ়, সবল ও কর্মঠ করে—সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক সৌন্দর্যও বাড়ায়।

বি-ই শ্রেষ্ঠ খাদ্য

২য় খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ—১৩৫১ একাদশ

বি. সরকার এণ্ড সন্স

লিমিটেড্

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কারাদি এবং রৌপ্যের বাসনাদি নির্ম্মাতা

আমাদের নামের সহিত অনেকটা সাদৃশ্যযুক্ত আছে, এরূপ কয়েকগুলি নূতন দোকান হইয়াছে তাহার কোনটিকে আমাদের দোকান বলিয়া ভ্রম না হয় এ জন্য আমাদের দোকান "গিনি হাউস" নামে অভিহিত ও রেজেষ্ট্রি করা হইয়াছে। একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানাবিধ অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত থাকে এবং অর্ডার দিলেও অতি যত্নের সহিত প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। ভিঃ পিঃ পোষ্টে সর্ব্বত্র গহনা পাঠাই। পুরাতন সোনা বা রূপার বাজার-দর হিসাবে মূল্য ধরিয়া নূতন গহনা দেওয়া হয়। জগদ্ব্যাপী অর্থ সঙ্কটপ্রযুক্ত আমাদের সমস্ত গহনারই মজুরি কম করা হইয়াছে। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

১৩১, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা

আমাদের আর কোন ব্রাঞ্চ দোকান নাই।

আমাদের কোন অংশীদারদিগের ভিতর কেহ পৃথক্ গহনার দোকান করেন নাই।

RENOWNED JEWELLER of TASTE AND NOVELTY:

D. N. ROY & BROS.

Manufacturing Jewellers.

YOUR KIND PATRONAGE SOLICITED.

CATALOGUE SENT FREE ON APPLICATION.

153-5, Bowbazar Street, Calcutta.
(Near Sealdah Church)

চা

BLOCKS
DESIGNS
PRINTING
SLIDES
TAGS

বর্ত্তমান কালে যুদ্ধ জয় ও ব্যবসায় উন্নতির একমাত্র উপায় সুন্দর ব্লক ও নিখুঁৎ প্রিণ্টিং

আমরা অভিজ্ঞ কারিকর দ্বারা লাইন, হাফ্‌টোন, কালার, ষ্টিরিও, ইলেক্‌ট্রো, সেলাইড, ডিজাইন এবং কালার প্রিণ্টিং করিয়া থাকি।... ... ...

DAS GOOPTA & Co

PROCESS ENGRAVERS. COLOUR PRINTERS

PHONE B.B. 5437

42-HURTOOKI BAGAN LANE. CALCUTTA

DAS GOOPTA

আপনার আজকের "সঞ্চয়ই" আপনার

বার্দ্ধক্যের এবং আপনার পরিজনবর্গের

ভবিষ্যতের সহায়

গ্রাম—"জনসম্পদ" | ফোন—ক্যাল্ ২৭৬৭

প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন

এসিওরেন্স লিঃ

হেড অফিস—

সেন্ট্রাল অফিস :

ব্যাঙ্ক অব্ ক্যালকাটা প্রিমিসেস্

৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

RELIABLE TOOLS FOR TO-DAY & TOMORROW. B. I. S. W.

HEAD OFFICE & MAIN WORKS :
GOTISTA
(Burdwan)

CALCUTTA WORKS :
121, RAJA DINENDRA STREET, CALCUTTA.

CODES USED :
Oriental 3 Letters Bentley Com Phrase & A. B. C. 6th Edn. & Private.

Telegram :
'LOHARBAPAR' (Cal)

Telephones :
Office—Cal. 4716.

Cal. Works—B.B.1506

BRANCH WORKS :
PURULIA, GOMOH

CITY SALES OFFICE
8, Canning Street, CALCUTTA.

B. I. S. W. the BRAND that BEARS MANUFACTURERS GUARANTEE.

TO GET FAITHFUL REPRODUCTION

A nice picture, True-To-Original solely depends on better blocks and neat printing. So many persons take excellent care of their advertisement pictures, but neglect the block-making and printing. To get better result of your advertisement campaign, you should rely on our skilled men who are always ready to help you with their expert advice and will do justice to the original in reproducing it to its proper tone value, depth of etching, neat but bright and charming prints.

Make us responsible for all your process works and colour printings

REPRODUCTION

PROCESS ENGRAVERS ***Syndicate*** **COLOUR PRINTERS**

7·1 CORNWALLIS STREET CALCUTTA

সদ্য প্রকাশিত

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের বাংলা-সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিকথা

বাংলা সাহিত্যের খসড়া—২৲

বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের সামাজিক নাটক—২য় সংস্করণ

বিশ বছর আগে—১৷৷০

এজেন্সি-পুস্তক

শক্তিশালী কথা-সাহিত্যিক জ্যোতির্ম্ময় রায়ের

পদ্মনাভ—১৷৷০

মুদ্রণ-কার্য্য চলিতেছে

ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ- দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম সংস্করণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। (দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ-ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অনুমতিক্রমে প্রাপ্ত)

A fruitful dependable survey of higher education in India

University Education in India Past & Present

By Prof. Anathnath Basu, M.A. (Lond) T. D. (Lond)
Head of Teachers' Training Dept.,
Calcutta University.

দি বুক এম্পোরিয়াম লিঃ,

২২।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রখ্যাত কবি **শ্রীমতী মমতা ঘোষের—**

১। বাংলা গীতিকাব্যের ভাণ্ডারে উজ্জ্বল ঐশ্বর্য্য এনেছে। কাব্যরসপিপাসুদের এবং বিবাহাদিতে উপহারের জন্য অবশ্য সংগ্রহযোগ্য। দাম—২৲।

২নং বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীটে
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ে
পাওয়া যায়।

২। **মৌন ও মুখর**
কবিতার বই। দাম—১৲

৩। **গীতাংশুক**
গান। দাম—১৲

এই পুস্তকের বহু গান গ্রামোফোনে ও রেডিওতে গীত হয়েছে।

·*and here they throw on the tragedy a light that never fails*"—'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড'-এর (২-৪-৪৪) এই সম্পাদকীয় মন্তব্য 'মহামন্বন্তর' সম্পর্কে করা হইয়াছে।

মহামন্বন্তর

শ্রীপরিমল গোস্বামী সম্পাদিত

দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় লেখা

প্রসিদ্ধ লেখকদের বারোটি গল্পের মহামূল্য সঙ্কলন। ভবিষ্যৎ লেখক, সমাজসেবী ও ঐতিহাসিকের অপরিহার্য্য **রেফারেন্স বই**। ১৩৫০ সালের শ্মশানে ব'সে লেখা এই গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য মনীষীদের দ্বারা এক-বাক্যে স্বীকৃত। মূল্য তিন টাকা।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে 'মহামন্বন্তর'

ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন—

"...গল্পগুলি পড়িতে পড়িতে দেশের সেই সদ্য অতীত, করাল ভয়াবহ দৃশ্যগুলি যেন চক্ষের সম্মুখে পুনরায় অভিনীত হইতে থাকে।... 'মহামন্বন্তর' বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ্..."

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রস্কোর
ক্যা র অয়েল
ফ্রাঙ্ক রস্ এণ্ড কোং লিঃ
কলিকাতা

বঙ্গশ্রীর নিবেদন ও নিয়মাবলী

"বঙ্গশ্রী"র বার্ষিক মূল্য সডাক ৬॥০ টাকা। ষাণ্মাসিক ৩।০ টাকা। ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। মূল্যাদি—কর্মাধ্যক্ষ, বঙ্গশ্রী, c/o মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, হেড অফিস—১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

আষাঢ় হইতে "বঙ্গশ্রী"র বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া চলে।

প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠিপত্র সম্পাদককে ১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হয়। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট দেওয়া না থাকিলে পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

লেখকগণ প্রবন্ধের নকল রাখিয়া রচনা পাঠাইবেন। ফেরতের জন্য ডাক-খরচা দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত লেখা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে 'বঙ্গশ্রী' প্রকাশিত হয়। যে-মাসের পত্রিকা, সেই মাসের ১০ তারিখের মধ্যে তাহা না পাইলে স্থানীয় ডাক-ঘরে অনুসন্ধান করিয়া তদন্তের ফল আমাদিগকে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে না জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে আমরা বাধ্য থাকিব না।

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ও সিকি পৃষ্ঠা যথাক্রমে ২০৲, ১১৲, ৬৲। বিশেষ স্থানের হার পত্র লিখিলে জানানো হয়।

বাংলা মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পুরাতন বিজ্ঞাপনের কোনও পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশ না আসিলে পরবর্ত্তী মাসের পত্রিকায় তদনুসারে কার্য্য করা যাইবে না। চলতি বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলে ঐ তারিখের মধ্যেই জানানো দরকার।

নৃত্যকুশলা ছায়া-চিত্রশিল্পী শ্রীমতী সাধনা বসুর অনিন্দ্য-সুন্দর অভিনয় ও নৃত্য পূর্ণতা লাভ করিয়াছে তাঁহার অঙ্গের নিখুঁৎ ত্বক্ ও উজ্জ্বল বর্ণ-সমন্বয়ে ; এবং আমাদের গর্ব্ব এই যে, প্রতি রাত্রে নিয়মিত ওটীন ক্রীম ব্যবহারের ফলেই তাঁহার নিখুঁৎ ত্বক্ ও উজ্জ্বল বর্ণ এখনও অম্লান আছে।

OATINE CREAM is indispensable for my toilet. I have been using it for a long time, and find it delightful, and extremely necessary to preserve a perfect skin.

Sadhona Bose

CREAM *for nightly massage*

SNOW *for daily protection*

সম্ভব-যদি আপনি
প্রত ২ সবন

কল্পতরু আ ়ুর্বেদ ভবন
কল্পতরু প্রাসাদ
২২৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কাল

৩১শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা   বিষয়-সূচী   জ্যৈষ্ঠ--১৩৫১

[পরপৃষ্ঠা

বিষয়-সূচী—২১ পৃষ্ঠার পর

চিত্র-সূচী

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১
১১শ বর্ষ—২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

"দুর্গা-পূজা"র প্রয়োজনীয়তা

ভট্টাচার্য্য

(৬)

কার্য্যকারণের শৃঙ্খলাযুক্ত বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়-বস্তু

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা বিষয়ে মানুষের দায়িত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের দ্বিতীয়ভাগ

দ্বিতীয়ভাগের বক্তব্যের সংক্ষেপ

যে যে প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হইলে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়, সেই সেই প্রতিষ্ঠানের সংগঠনসমূহের ব্যাখ্যা করা এই দ্বিতীয়ভাগের প্রধান লক্ষ্য।

দ্বিতীয়ভাগের বক্তব্য প্রধানতঃ কি কি তাহা স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে হইলে "প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন" বলিতে কি বুঝায় তাহার ব্যাখ্যা করিতে হয়।

প্রতিষ্ঠানসমূহের "সংগঠন" বলিতে কি বুঝায়

প্রথমতঃ, প্রতিষ্ঠানসমূহের সমাবেশ; দ্বিতীয়তঃ, প্রতিষ্ঠানসমূহের হস্তে যে সমস্ত অনুষ্ঠান সাধন করিবার দায়িত্বভার অর্পিত হয়,—প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের বণ্টন; এবং তৃতীয়তঃ, ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান সাধন করিবার জন্য যে সমস্ত কর্ম্মী নিযুক্ত হ'ন সেই সমস্ত কর্ম্মিগণের মধ্যে অনুষ্ঠানসমূহের বণ্টন—এই তিন শ্রেণীর ব্যাপারের সমষ্টিকে সংস্কৃত ভাষায় রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সংগঠন বলা হয়।

যে যে প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হইলে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়—প্রথমতঃ, সেই সেই প্রতিষ্ঠানের সমাবেশের কথা; দ্বিতীয়তঃ, সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের হস্তে যে সমস্ত অনুষ্ঠান সাধন করিবার দায়িত্বভার অর্পিত হয়, প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের বণ্টনের কথা; এবং তৃতীয়তঃ, ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান সাধন করিবার জন্য যে সমস্ত কর্ম্মী নিযুক্ত হ'ন সেই সমস্ত কর্ম্মীর মধ্যে অনুষ্ঠানসমূহের বণ্টনের কথা—এই দ্বিতীয় ভাগে আলোচনা করিব।

প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের আলোচনার মধ্যে প্রভেদ

প্রথম ভাগে আমরা "প্রতিষ্ঠান" ও "অনুষ্ঠান"সমূহের বর্ণনা করিয়াছি। দ্বিতীয় ভাগেও আবার আমরা সেই প্রতিষ্ঠানের সমাবেশ, অনুষ্ঠানের বণ্টন এবং কর্ম্মিগণের বণ্টন সম্বন্ধে আলোচনা করিব। প্রথম ভাগের আলোচনার সহিত দ্বিতীয় ভাগের আলোচনার পার্থক্য কি তাহা পাঠকবর্গকে জানাইয়া না রাখিলে আমাদিগের বক্তব্য তাঁহাদিগের কাছে সুস্পষ্ট নাও হইতে পারে।

এই আলোচনার প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য ছিল—মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান রচনা করা এবং কোন্ কোন্ অনুষ্ঠান

সাধন করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয় তাহা খুঁজিয়া বাহির করা।

দ্বিতীয় ভাগের উদ্দেশ্য -যে যে প্রতিষ্ঠান রচনা করিলে এবং যে যে অনুষ্ঠান সাধন করিলে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়—সেই সেই প্রতিষ্ঠানের সমাবেশের কথা, সেই সেই অনুষ্ঠানের বণ্টনের কথা এবং কর্ম্মিগণের বণ্টনের কথা বর্ণনা করা।

দুই ভাগেই প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানসমূহের কথা থাকিবে বটে; কিন্তু ঐ সমস্ত কথা সর্ব্বতোভাবে এক রকমের হইবে না।

যাঁহারা পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র, তাঁহাদিগের পক্ষে এই আলোচনার প্রথমভাগ পর্য্যন্ত যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত কথার প্রত্যেকটী প্রয়োজনীয়। আর যাঁহারা অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের ছাত্র, তাঁহাদিগের পক্ষে দ্বিতীয় ভাগের কথাগুলি প্রয়োজনীয়।

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার মূলসূত্র

প্রতিষ্ঠানসমূহের সমাবেশ এবং অনুষ্ঠানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টন সম্বন্ধে আমরা যে সমস্ত কথা এই দ্বিতীয় ভাগে বিবৃত করিব, প্রতিষ্ঠানসমূহের সমাবেশ এবং অনুষ্ঠানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টন সেইরূপভাবে সাধিত হইলে যে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে হইলে "মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়ার মূল সূত্র" কি, তৎসম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়।

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়ার *মূলসূত্র তিনটী*; যথা :

(১) কোন মানুষের কোন কার্য্যে, জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার কোন অংশের অভ্যন্তরস্থ প্রাকৃতিক তেজ ও রসের পরিমাণের ও কার্য্যের যাহাতে কোনরূপ অসমতা অথবা বিষমতার উদ্ভব না হইতে পারে; এবং প্রাকৃতিক কারণে ঐ অসমতা ও বিষমতা ঘটিলে, জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার প্রাকৃতিক উৎপাদিকা গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির যে ক্ষুণ্ণতা ঘটিয়া থাকে—তাহা যাহাতে পূরণ করা হয়, তাহার ব্যবস্থা করা;

(২) কোন মানুষের অভিমানের ও বৈকৃতিক ইচ্ছার শক্তি ও প্রবৃত্তি যাহাতে অসংযত না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা;

(৩) যে শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান রচনা করিলে সমগ্র মানব-সমাজের প্রত্যেক মানুষ ঐ প্রতিষ্ঠানকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হন; এবং স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ঐ প্রতিষ্ঠানের নির্দ্দেশ-সমূহ পালন করেন—সেই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান রচনা করিবার ব্যবস্থা করা।

এই তিন শ্রেণীর ব্যবস্থাকে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার মূল সূত্র বলিয়া কেন ধরিতে হয়, তাহার সমস্ত কথাই আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। পাঠকগণের সুবিধার জন্য ঐ সমস্ত কথার সারাংশ আমরা পুনরুল্লেখ করিব।

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া যাহাতে স্বতঃসিদ্ধ হয় তাহা করিতে হইলে উপরোক্ত প্রথম দুইটী ব্যবস্থার প্রয়োজন কেন অপরিহার্য্য—তাহা বুঝিতে হইলে, মানুষের অভীষ্ট কি কি; এবং উহা মানুষের অর্জ্জন করা সম্ভব হয় কোন্ কোন্ উপায়ে—তাহা স্মরণ করিতে হয়। মানুষের **অভীষ্ট পদার্থ** তিন শ্রেণীর যথা :

(১) দ্রব্য-শ্রেণীর,

(২) গুণ-শ্রেণীর এবং

(৩) শক্তি-শ্রেণীর।

সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে এই কথাটী বুঝা অপেক্ষাকৃত দুরূহ। ঐ কথাটী দুরূহ বটে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে সত্য।

দ্রব্য-শ্রেণীর যাহা যাহা মানুষের অভীষ্ট তাহা উৎপাদন করা সম্ভব হয়, প্রধানতঃ, সাত শ্রেণীর কার্য্যের দ্বারা, যথা :

(১) কৃষিজাত কাঁচা মাল উৎপাদন ও সংগ্রহ;

(২) খনিজাত কাঁচামাল উৎপাদন ও সংগ্রহ;

(৩) পশু-পক্ষি প্রভৃতি প্রাণিজাত কাঁচামাল উৎপাদন ও সংগ্রহ;

(৪) জলজাত কাঁচামাল উৎপাদন ও সংগ্রহ;

(৫) শিল্পকার্য্য ;

(৬ কারুকার্য্য এবং

(৭) ক্রয় বিক্রয়ের কার্য্য অথবা বাণিজ্যকার্য্য।

দ্রব্য-শ্রেণীর যাহা যাহা মানুষের অভীষ্ট তাহা উৎপাদন করিতে হইলে উপরোক্ত সাত শ্রেণীর কার্য্যের আশ্রয় লইতে হয় বটে; কিন্তু ঐ সাত শ্রেণীর কার্য্যের মধ্যে প্রথমোক্ত চারি শ্রেণীর কাঁচামাল উৎপাদন করিবার কার্য্য ঐ সাত শ্রেণীর কার্য্যের ভিত্তি।

গুণ-শ্রেণীর ও শক্তি শ্রেণীর যাহা যাহা মানুষের অভীষ্ট তাহা মানুষের অর্জ্জন করিবার একমাত্র উপায়—শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রস্তুত করা। মানুষের বৈকৃতিক ইচ্ছা ও অভিমান অসংযত হইলে কোন মানুষের পক্ষে তাহার শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে তাহার অভীষ্ট গুণ-শ্রেণী ও শক্তি-শ্রেণী উপার্জ্জন করিবার মত উপযুক্ত করা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না।

উপরোক্ত চারি শ্রেণীর কাঁচামাল এবং মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই দুই শ্রেণীর বস্তুই মানুষ, মূলতঃ, প্রকৃতির নিকট হইতে পাইয়া থাকে। চারি শ্রেণীর কাঁচামাল—জমি, জল ও হাওয়ার দান। মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি যে কাহার দান তাহা মানুষ আজকালকার দিনে জানে না বটে; কিন্তু উহা জানিতে পারিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা জমি, জল ও হাওয়ার দান। জমি অথবা জল অথবা হাওয়া এই তিনটীর কোনটীই মানুষ উৎপাদন করিতে পারে না। ঐ তিনটীর প্রত্যেকটীর উৎপত্তি, অস্তিত্ব, পরিণতি, বৃদ্ধি ও ক্ষয়মূলক পরিবর্ত্তন স্বতঃই ঘটিয়া থাকে। ইহারই জন্য *সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, চারি শ্রেণীর কাঁচামাল* এবং মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই দুই শ্রেণীর বস্তুই (যাহা মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়ার ভিত্তি) মানুষ মূলতঃ প্রকৃতির নিকট হইতে পাইয়া থাকে এবং ঐ প্রকৃতির প্রকাশিত রূপ জমি, জল ও হাওয়া।

চারিশ্রেণীর কাঁচামাল এবং মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি যে মানুষের প্রয়োজনানুরূপ ভাবে ও প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হয় তাহার প্রধান কারণ—জমি, জল ও হাওয়ার উৎপাদন করিবার প্রাকৃতিক গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তি; এবং জমি, জল ও হাওয়ার উৎপাদন করিবার প্রাকৃতিক গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ কারণ ঐ জমি, জল ও হাওয়ার অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের পরিমাণের ও কার্য্যের সমতা।

জমি, জল ও হাওয়ার অভ্যন্তরস্থ তেজের পরিমাণ অথবা কার্য্য রসের পরিমাণের অথবা কার্য্যের তুলনায় অধিক অথবা কম হইলে, সংস্কৃত ভাষায়, জমি, জল ও হাওয়ার "অসমতা" ঘটিয়াছে, ইহা বলা হয়। জমি, জল ও হাওয়ার অভ্যন্তরস্থ তেজের কার্য্যের পরিণতি ও রসের কার্য্যের পরিণতি পরস্পরের বিরোধী হইলে, সংস্কৃত ভাষায়, জমি, জল ও হাওয়ার "বিষমতা" ঘটিয়াছে—ইহা বলা হয়।

জমি, জল ও হাওয়ার অভ্যন্তরস্থ তেজ ও রসের পরিমাণের ও কার্য্যের সমতা বিদ্যমান থাকিলে যেরূপ চারিশ্রেণীর কাঁচামালের এবং মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির উৎপাদন—মানুষের প্রয়োজনানুরূপ ভাবে হওয়া স্বতঃই সিদ্ধ হয়, সেইরূপ উহা "অসমতা" অথবা বিষমতা-যুক্ত হইলে ঐ কাঁচামালের এবং মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির উৎপাদন—মানুষের প্রয়োজনানুরূপ ভাবে হওয়া, কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না।

উপরোক্ত কারণে, মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে—জমির, অথবা জলের অথবা হাওয়ার যাহাতে "অসমতা" অথবা "বিষমতার" উৎপত্তি না হয় তাহার ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে।

জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার যাহাতে অসমতা অথবা বিষমতার উৎপত্তি না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে, কিরূপ ভাবে জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার অসমতা ও বিষমতার উৎপত্তি হইতে পারে তাহার সন্ধান করিতে হয়। ঐ সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে, ঐ "অসমতার" ও "বিষমতার" উৎপত্তি হয় দুই কারণে, যথা:

(১) মানুষের কতকগুলি কার্য্যে এবং
(২) প্রাকৃতিক কতকগুলি কার্য্যে।

মানুষের যে কার্য্যসমূহের জন্য জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার অসমতা অথবা বিষমতার উৎপত্তি হয়, সেই কার্য্যগুলি না করিবার জন্য মানুষ কৃতসঙ্কল্প ও বদ্ধপরিকর হইলেই বন্ধ হইতে পারে। মানুষের কার্য্যসমূহ ঐরূপ ভাবে বন্ধ করা যায় বটে; কিন্তু প্রাকৃতিক কার্য্যসমূহ বন্ধ করা যায় না। ফলে, প্রাকৃতিক কার্য্যবশতঃ জমি, জল ও হাওয়ার যে অসমতা ও বিষমতার উৎপত্তি হয় তাহা অনিবার্য্য হইয়া থাকে এবং তাহার জন্য জমি, জল ও হাওয়ার প্রাকৃতিক উৎপাদিকা গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির ক্ষুণ্ণতাও অনিবার্য্য হয়। প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ জমি, জল ও হাওয়ার অসমতা ও বিষমতা এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে উহাদের প্রাকৃতিক উৎপাদিকা গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির ক্ষুণ্ণতা অপরিহার্য্য বটে; কিন্তু ক্ষুণ্ণতার পূরণ করা সর্ব্বতোভাবে মানুষের সাধ্যায়ত্ত। ঐ ক্ষুণ্ণতার পূরণ করিবার উপায়—যাজ্ঞিক কার্য্যসমূহের আশ্রয় লওয়া।

জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার "অসমতার" অথবা "বিষমতার" উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ কারণে এবং ঐ অসমতার ও বিষমতার জন্য যাহাতে উহাদের প্রাকৃতিক উৎপাদিকা গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির কোনরূপ ক্ষুণ্ণতা না হয়, তাহার ব্যবস্থার উপায় কি কি—তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যায় যে—মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভব হয়, তাহা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে কোন মানুষের কোন কার্য্যে জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার কোন অংশের অভ্যন্তরস্থ প্রাকৃতিক তেজ ও রসের পরিমাণের ও কার্য্যের যাহাতে কোনরূপ অসমতা অথবা বিষমতার উদ্ভব না হইতে পারে এবং প্রাকৃতিক কারণে ঐ অসমতা ও বিষমতা ঘটিলে জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার প্রাকৃতিক উৎপাদিকা গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির যে ক্ষুণ্ণতা ঘটিয়া থাকে—তাহা যাহাতে পূরণ করা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

ঐ ব্যবস্থা সাধিত হইলে দ্রব্য-শ্রেণীর যে যে বস্তু মানুষের অভীষ্ট, সেই সেই দ্রব্য মানুষের প্রয়োজনানুরূপ ভাবে ও প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে উৎপাদন করা সর্ব্বতোভাবে অনায়াসসাধ্য হয় এবং গুণ-শ্রেণীর ও শক্তি-শ্রেণীর যে যে পদার্থ মানুষের অভীষ্ট সেই সেই পদার্থও অর্জ্জন করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত হয়। উপরোক্ত ব্যবস্থা সাধিত হইলে গুণ-শ্রেণীর ও শক্তি-শ্রেণীর যে যে পদার্থ মানুষের অভীষ্ট সেই সেই পদার্থ অর্জ্জন করা সাধ্যায়ত্ত হয় বটে; কিন্তু মানুষের অভিমানের ও বৈকৃতিক ইচ্ছার শক্তি ও প্রবৃত্তি যাহাতে অসংযত না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে গুণ-শ্রেণীর ও শক্তি-শ্রেণীর যে যে পদার্থ মানুষের অভীষ্ট সেই সেই পদার্থ কোন মানুষের পক্ষে অর্জ্জন করা সহজ-সাধ্য হয় না। ইহার কারণ—জমি, জল ও হাওয়ায় সমতা এবং তাহাদের প্রাকৃতিক উৎপাদিকা গুণ, শক্তি ও প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ থাকিলেও মানুষের নিজ নিজ অভিমান ও বৈকৃতিক ইচ্ছা বশতঃ নিজ নিজ শরীরে তেজ ও রসের পরিমাণে ও কার্য্যে, অসমতা ও বিষমতার উদ্ভব হইতে পারে। মানুষের নিজ নিজ শরীরস্থ তেজ ও রসের পরিমাণে ও কার্য্যে অসমতার অথবা বিষমতার উদ্ভব হইলে গুণ-শ্রেণীর ও শক্তি-শ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থসমূহ অর্জ্জন করিবার জন্য মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির যে শ্রেণীর শিক্ষা ও অভ্যাসের প্রয়োজন হয়—সেই শ্রেণীর শিক্ষা ও অভ্যাস অসম্ভব হয়।

উপরোক্ত কারণে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে, প্রথমতঃ, যেরূপ কোন মানুষের কোন কার্য্যে জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার কোন অংশের অভ্যন্তরস্থ প্রাকৃতিক তেজ ও রসের পরিমাণের ও কার্য্যের যাহাতে কোনরূপ অসমতার অথবা বিষমতার উদ্ভব না হইতে পারে; এবং প্রাকৃতিক কারণে ঐ অসমতা অথবা বিষমতা ঘটিলে জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার প্রাকৃতিক উৎপাদিকা গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির যে ক্ষুণ্ণতা ঘটিয়া থাকে তাহা যাহাতে পূরণ করা হয়—তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়; সেইরূপ, দ্বিতীয়তঃ

কোন মানুষের অভিমান ও বৈকৃতিক ইচ্ছার শক্তি ও প্রবৃত্তি যাহাতে অসংযত না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও করিতে হয়।

উপরোক্ত কথাগুলি বুঝিতে পারিলেই উপরোক্ত দুইটী ব্যবস্থা করা যে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্বন্ধে সর্ব্বাগ্রে ও অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়, এবং তদনুসারে ঐ দুইটী ব্যবস্থা যে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার দুইটী মূলসূত্র, এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়।

কোন্ কোন্ কার্য্য-সঙ্কেত অবলম্বন করিলে উপরোক্ত দুইটী মূলসূত্র কার্য্যে পরিণত করা যায়—তদ্বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হইলে দেখা যায় যে, মানুষের যে সমস্ত কার্য্যে জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার অসমতার অথবা বিষমতার উদ্ভব হইয়া থাকে, সেই সমস্ত কার্য্যের কোনটী যাহাতে কোন মানুষ না করেন তাহার ব্যবস্থা করিবার একমাত্র উপায়—সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষ যাহাতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া জমি, জল ও হাওয়ার অসমতার ও বিষমতার উদ্ভবকর প্রত্যেক কার্য্য পরিত্যাগ করেন—তাহার ব্যবস্থা করা।

মানুষের যে-সমস্ত কার্য্যে জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার অসমতার অথবা বিষমতার উদ্ভব হইয়া থাকে সেই সমস্ত কার্য্যের কোনটী যাহাতে কোন মানুষ না করেন—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে, একদিকে যেরূপ, সমগ্র মনুষ্যসমাজের সকল মানুষের মিলিত হইয়া এই ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার মানুষ যাহাতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ঐ ব্যবস্থা করেন তাহা করাও অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে।

সমগ্র মনুষ্যসমাজের সকলে মিলিয়া ঐ ব্যবস্থার সাধন না করিলে যে কোন মানুষ জমি অথবা জলের অথবা হাওয়ার যে কোম অংশে উহাদের অসমতার অথবা বিষমতার উদ্ভবকর যে কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন।

প্রত্যেক মানুষ যাহাতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া জমি, জল ও হাওয়ার অসমতা ও বিষমতার উদ্ভবকর প্রত্যেক কার্য্য সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করেন—তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে মানুষকে ভয় দেখাইয়া অথবা মানুষকে কেবলমাত্র আইনের নিগড়ে বদ্ধ করিয়া মানুষের যে সমস্ত কার্য্যে জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার অসমতা অথবা বিষমতা ঘটিতে পারে সেই সমস্ত কার্য্য সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করা যায় না। ইহার প্রধান কারণ, জমি জল ও হাওয়ার বিস্তৃতি। স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া জমি, জল ও হাওয়ার অসমতার ও বিষমতার উদ্ভবকর প্রত্যেক কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প না হইলে, জমি, জল ও হাওয়ার যে কোন অংশে যে কোন মানুষ অপরের চোখের অন্তরালে—জমি, জল ও হাওয়ার অসমতার ও বিষমতার উদ্ভবকর যে কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। তাহা ছাড়া, ভীতি প্রদর্শন অথবা আইনের নিগড় বশতঃ ঐ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইলে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা হয় না। নির্ভরশীলতা মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত একটী ইচ্ছা। সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষ যাহাতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া জমি, জল ও হাওয়ার অসমতার ও বিষমতার উদ্ভবকর প্রত্যেক কার্য্য পরিত্যাগ করেন অথবা ঐ শ্রেণীর কোন কার্য্য না করেন তাহার ব্যবস্থা করিবার একমাত্র উপায়—যে শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান রচনা করিলে সমগ্র মানব সমাজের প্রত্যেক মানুষ ঐ প্রতিষ্ঠানকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হন এবং স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ঐ প্রতিষ্ঠানের নির্দ্দেশসমূহ পালন করেন সেই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান রচনা করিবার ব্যবস্থা করা; এবং জমি, জল ও হাওয়ার অসমতার ও বিষমতার উদ্ভবকর প্রত্যেক কার্য্য যাহাতে ঐ প্রতিষ্ঠানের নিষিদ্ধ কার্য্য-সমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়—তাহার ব্যবস্থা করা।

উপরোক্ত কারণে উপরোক্ত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের রচনার ব্যবস্থাকে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার অন্যতম নীতিসূত্র বলিয়া গণনা করা হয়।

এই প্রবন্ধে উপরোক্ত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানকে আমরা "কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান" বলিয়া অভিহিত করিব। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য্য-পরিচালনার জন্য অন্যান্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান রচিত হয় এবং যে সমস্ত অনুষ্ঠান সাধিত হয় ও যে সমস্ত কর্ম্মী নিযুক্ত হন সেই সমস্তের সমষ্টিকে আমরা "কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠন" বলিয়া অভিহিত করিব।

জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার অসমতার উদ্ভবকর সর্ব্ববিধ কার্য্য যাহাতে সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হয় তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে যে—জমি, জল ও হাওয়ার সমতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না; এবং জমি, জল ও হাওয়ার সমতা রক্ষিত না হইলে যে—একদিকে, কোন মানুষের গুণশ্রেণীর ও শক্তিশ্রেণীর অভীষ্ট পদার্থসমূহ প্রয়োজনানুরূপ ভাবে অর্জ্জন করা সম্ভব হয় না, এবং অন্যদিকে দ্রব্যশ্রেণীর পদার্থসমূহ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব হয় না, তাহা লক্ষ্য করিলে, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে—সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে কোন মানুষের কোন ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া আদৌ সম্ভবযোগ্য হয় না।

জমির অথবা জলের অথবা হাওয়ার অসমতার উদ্ভবকর সর্ব্ববিধ কার্য্য যাহাতে সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হয় তাহার ব্যবস্থা সাধন করা যে সমগ্র মনুষ্যসমাজের সকলে মিলিত হইয়া উহা না করিলে সম্ভবযোগ্য হয় না—তাহা লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে—সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সকল মানুষের সর্ব্বতোভাবের মিলন মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণের ব্যবস্থা সংগঠনে অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়।

সমগ্র মানবসমাজের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণের প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠনের ব্যবস্থায় উহার তিনটি মূলসূত্র যেরূপ স্মরণ রাখিতে হয়, সেইরূপ নিম্নলিখিত দুইটী কথাও সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হয়:—

(১) সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে কোন মানুষের কোন ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া আদৌ সম্ভবযোগ্য হয় না;

(২) সমগ্র মনুষ্যসমাজের সকল মানুষের সর্ব্বতোভাবের মিলন মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণের ব্যবস্থার সংগঠনে অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়।

উপরোক্ত দুইটা কথাকে ভিত্তি করিয়া আনুষঙ্গিক ভাবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সমগ্র মনুষ্যসমাজের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার পরস্পরের মধ্যে মিলনের প্রবৃত্তি ও প্রযত্ন যে শুধু ভাবপ্রবণতার সন্তুষ্টির জন্যই মধুর অথবা মহানুভাবতা দেখাইবার জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা নহে। মানুষের প্রয়োজনীয় ইচ্ছাসমূহ পূরণ করিয়া মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে হইলে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে উচা (অর্থাৎ সমগ্র মনুষ্যসমাজের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার পরস্পরের মধ্যে মিলনের প্রবৃত্তি ও প্রযত্ন) অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়।

মনুষ্যসমাজের যাঁহারা মনে করেন যে, "আদার ব্যবসায়ীর জাহাজের খবরের প্রয়োজন নাই" এবং তদনুসারে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের কথা না ভাবিয়া নিজেদের ব্যক্তিগত অথবা পরিবারগত অথবা সম্প্রদায়গত অথবা তথাকথিত জাতিগত অথবা দেশগত দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য অথবা সুখ-শান্তি বিধান করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়া থাকেন তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা লক্ষ্য করিবার যোগ্য যে, সমগ্র মনুষ্যসমাজের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হইবার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে কোন মানুষের কোন ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না।

বর্ত্তমান সভ্যতার কি পরিণাম হইয়াছে তাহা বিচার করিয়া লক্ষ্য করিলে উপরোক্ত কথার সত্যতা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। বর্ত্তমান সভ্যতার যত রকমের বৈশিষ্ট্য আছে, তন্মধ্যে দেশগত জাতীয়তাবাদ এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতাবাদ সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। যাঁহারা মনে করেন যে, যে-সমস্ত দেশ দেশগত জাতীয়তাবাদে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন এবং জাতিগত স্বাধীনতা উপভোগ

করিতেছেন তাঁহারা তাঁহাদের দেশের অথবা জাতির অধিকাংশ মানুষের ধনপ্রাচুর্য্য অথবা কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন অথবা প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মতবাদ খণ্ডন করা আমাদিগের বর্ত্তমান লেখায় সম্ভবযোগ্য নহে। আপনার ভাবে অথবা সংস্কারে ভোলা, বিশ্লেষণে অপটু, এই সমস্ত ভদ্রমহোদয় যাহাই মনে করুন না কেন, বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজ গত দেড়শত বৎসর আগেকার তুলনায় এক্ষণে কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান সভ্যতা প্রসার লাভ করিতেছে এবং বর্ত্তমান সভ্যতার প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে ধনাভাবগ্রস্ত বেকার, অলস ও পশুভাবাপন্ন মানুষের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ধনাভাবগ্রস্ত বেকার, অলস ও পশুভাবাপন্ন মানুষের সংখ্যা—সংখ্যার দিকে বর্ত্তমানে শুধু যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা নহে, ধনাভাবের তীব্রতা, বেকারের তীব্রতা, আলস্যের তীব্রতা ও পশুভাবের তীব্রতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সমগ্র মনুষ্যসমাজের ভিত্তি পর্য্যন্ত টলটলায়মান হইয়াছে।

আমাদিগের সিদ্ধান্তানুসারে মানবসমাজের বর্ত্তমান এই অবাঞ্ছনীয় অবস্থার কারণ অনেক। এই কারণসমূহের মধ্যে চারিশ্রেণীর কারণ সাক্ষাৎভাবে বর্ত্তমান এই অবাঞ্ছনীয় অবস্থার জন্য প্রধানতঃ দায়ী, যথা :

(১) সমগ্র মনুষ্যসমাজের একজাতিত্ববোধের অভাব ;
(২) জমি, জল ও হাওয়ার স্বাভাবিক উৎপত্তির কারণ নির্দ্ধারণে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের অক্ষমতা ;
(৩) দেশগত জাতীয়তা-বাদের প্রভাব ;
(৪) জাতিগত স্বাধীনতা-বাদের প্রভাব।

মানুষ যদি মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে চায় এবং মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান অবাঞ্ছনীয় অবস্থা সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে চায়, তাহা হইলে সমগ্র মনুষ্যসমাজ হইতে বর্ত্তমান জাতিগত স্বাধীনতাবাদ, দেশগত জাতীয়তাবাদ এবং কার্য্য-কারণের শৃঙ্খলা নির্দ্ধারণে অক্ষম এবং বর্ত্তমান বাজীকরের বিজ্ঞান (অথবা গুণ্ডাগণের স্বকপোলকল্পিত জ্যোতিষবাদ এবং আলোকবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থতত্ত্ববাদপূর্ণ বিজ্ঞান) সর্ব্বতোভাবে মুছিয়া ফেলিতে হইবে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মনুষ্যসমাজের একজাতিত্ববোধ যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবযুক্ত হয়, তাহার জন্য প্রযত্নশীল হইতে হইবে।

দেশগত জাতীয়তাবাদের প্রভাবে জাতিগত স্বাধীনতাবাদ প্রভাবযুক্ত হইয়াছে এবং মানুষ বিভিন্ন দেশের মধ্যে ও বিভিন্ন মানুষের মধ্যে অনেক বিভিন্নতা দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিভিন্ন দেশের অথবা বিভিন্ন মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির মধ্যে যে কোন বিভিন্নতা নাই, তাহা মনে করা চলে না। উহা মনে করা চলে না বটে; কিন্তু বিভিন্ন দেশের অথবা বিভিন্ন মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির মধ্যে বিভিন্নতা কতখানি আর অভিন্নতাই বা কতখানি তাহা পরিমাপ করিয়া তুলনা করিতে শিক্ষা করিলে সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইতে হয় যে, বিভিন্ন দেশের অথবা বিভিন্ন মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির মধ্যে অবিভিন্নতার তুলনায় বিভিন্নতা অতীব নগণ্য। যে জমি, জল ও হাওয়া প্রত্যেক দেশের ও প্রত্যেক মানুষের প্রাণের প্রাণ—সেই জমি, জল ও হাওয়া যে কখনও সর্ব্বতোভাবে বিভিন্ন অথবা পৃথক্ করা যায় না—তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথার সত্যতা নিঃসন্দিগ্ধভাবে উপলব্ধি করা যায়।

সমগ্র মনুষ্যসমাজের একজাতিত্ববোধ যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবযুক্ত হয় তাহা করিবার একমাত্র পন্থা—সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের প্রতিনিধি লইয়া "কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের" রচনা করা।

যুদ্ধ-বিরতির পর মানুষের দুঃখ মোচন করিবার অনেক কথা আজকালকার অনেক দেশের অনেক নেতৃবর্গ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মিত্রশক্তির নেতৃবর্গের অনেকেই বলিতেছেন যে, যুদ্ধ-জয়ের পর মানুষের দুঃখ মোচন করিবার পরিকল্পনাসমূহে হস্তক্ষেপ করা হইবে। এই নেতৃবর্গকে আমাদিগের উপরোক্ত কথাসমূহ বুঝিতে হইবে। সমগ্র মনুষ্যসমাজের সকল মানুষের সর্ব্বতোভাবের মিলন ব্যতীত যে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা আদৌ সম্ভবযোগ্য হয় না এবং সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা

সর্ব্বতোভাবে পূরণ করার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে কোন মানুষের কোন ইচ্ছা যে সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা সম্ভব-যোগ্য হয় না, তাহা ঐ নেতৃবর্গকে ধারণা করিতে হইবে। উহা ধারণা করিতে না পারিলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, কোন শক্তি পরাজয়ের কলঙ্কে কলঙ্কিত হইলে সমগ্র মনুষ্যসমাজের সকল মানুষের সর্ব্বতোভাবের মিলন কখনও আদৌ সম্ভবযোগ্য হয় না। উহা ধারণা করিতে পারিলে ঐ নেতৃবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, যুদ্ধজয়ের পরে মানুষের দুঃখ দূর করিবার যে সমস্ত কার্য্যে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া মনে করিতেছেন, সেই সমস্ত কার্য্যে তাঁহাদিগের এখনই হস্তক্ষেপ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। যে পক্ষ মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার সংগঠনে হস্তক্ষেপ করিবেন,সেই পক্ষ বিপক্ষকে পরাজয়ের কলঙ্কে কলঙ্কিত না করিয়াও তাঁহাদিগের হৃদয় জয় করিতে সক্ষম হইবেন এবং সর্ব্বতোভাবে জয়ী হইবেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাসীর দুর্ভাগ্য যে, মিত্রপক্ষীয় নেতৃবর্গের মধ্যে উপরোক্ত সাদা ও সহজ কথাগুলি বুঝিতে পারেন এমন একজনেরও পরিচয় পাওয়া যায় না।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠন প্রয়োজনানুরূপ-ভাবে সাধিত হয় কি না তাহা পরীক্ষা করিবার সঙ্কেত

কোন্ কোন্ নীতিকে ভিত্তি করিয়া কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান রচনা করিলে—উহাকে সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হন, এবং স্বেচ্ছায় ও সানন্দে উহার নির্দ্দেশসমূহ পালন করেন—তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠন প্রয়োজনানুরূপ ভাবে সাধিত হয় কিনা তাহা পরীক্ষা করা যায়।

সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেক মানুষ যাহাতে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হন, এবং স্বেচ্ছায় ও সানন্দে উহার নির্দ্দেশসমূহ পালন করেন তাহা করিতে হইলে—কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানকে যাহাতে প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ প্রতিনিধির প্রতিষ্ঠান এবং নিজ নিজ সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হন তদনুরূপ ভাবে উহার রচনা করিতে হয়।

মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষ যাহাতে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানকে সর্ব্বতোভাবে নিজ নিজ প্রতিনিধির প্রতিষ্ঠান এবং নিজ নিজ সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে পারেন তাহা করিতে হইলে ঐ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে ছয় শ্রেণীর ব্যবস্থা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়, যথা :

(১) সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষ যাহাতে ঐ প্রতিষ্ঠানকে নিজ নিজ প্রতিনিধির প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(২) সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষ যাহাতে ঐ প্রতিষ্ঠানকে নিজ নিজ সর্ব্ববিধ ইচ্ছা পূরণ করিবার প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(৩) ঐ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা যে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া সুনিশ্চিত, তদ্বিষয়ে যাহাতে প্রত্যেক মানুষ নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(৪) ঐ প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গ যে সমগ্র মনুষ্যসমাজের কাহারও উপর প্রভুত্বপ্রয়াসী নহে পরন্তু জনসাধারণের উপর সর্ব্বতোভাবে সমদর্শী, তদ্বিষয়ে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকে যাহাতে সুনিশ্চিত হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা ;

(৫) কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গ যে জনসাধারণের ব্যথায় ব্যথিত হন এবং ঐ ব্যথা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট, তাহা জনসাধারণ যাহাতে বুঝিতে পারেন, এবং তদ্বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হন, তাহার ব্যবস্থা ;

(৬) কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের পরিচালনা-কার্য্য-সংক্রান্ত কোন কর্ম্মীর মধ্যে যাহাতে কোনরূপ অসন্তুষ্টি অথবা বিরক্তির উদ্ভব না হইতে পারে এবং প্রত্যেকে যাহাতে সন্তুষ্ট এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ থাকেন, তাহার ব্যবস্থা।

এই ছয়টী ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান-সংগঠনের ছয় শ্রেণীর নীতি-সূত্র বলা হইয়া থাকে।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনের উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর নীতি-সূত্র কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠনকার্য্যে ছয় শ্রেণীর সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়।

প্রথমতঃ, সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষ যাহাতে "কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানকে" নিজ নিজ প্রতিনিধির প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে পারেন, তাহা করিবার জন্য ঐ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান যাহাতে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয় তদ্বিষয়ে সতর্ক হইতে হয়। ইহা "কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান" সংগঠন বিষয়ে প্রথম সতর্কতা।

দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষ যাহাতে "কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানকে" নিজ নিজ সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে পারেন, তাহা করিবার জন্য ঐ "কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের" হস্তে যাহাতে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার অনুষ্ঠানসমূহ সাধন করিবার দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক হইতে হয়। ইহা "কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান" সংগঠন বিষয়ে দ্বিতীয় সতর্কতা।

তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা যে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া সুনিশ্চিত, তদ্বিষয়ে যাহাতে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় তাহা করিবার জন্য মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার অনুষ্ঠানসমূহ যাহাতে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠনে স্বতঃই সাধিত হয় এবং কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও গুণ ও শক্তি সম্বন্ধে কোন মানুষের যাহাতে কোনরূপ অভাব না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা হয়—তদ্বিষয়ে সতর্ক হইতে হয়। ইহা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান-সংগঠন বিষয়ে তৃতীয় সতর্কতা।

চতুর্থতঃ, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গ যে সমগ্র মনুষ্যসমাজের কাহারও উপর প্রভুত্বপ্রয়াসী নহেন, পরন্তু জনসাধারণের উপর সর্ব্বতোভাবে সমদর্শী, তদ্বিষয়ে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকে যাহাতে সুনিশ্চিত হইতে পারেন—তাহা করিবার জন্য কোন মানুষ যাহাতে নিজেকে অপর কাহারও অধীনতা-পাশে বদ্ধ বলিয়া মনে করিতে অথবা ব্যথা অনুভব করিতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা বিষয়ে সতর্ক হইতে হয়। ইহা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান-সংগঠন বিষয়ে চতুর্থ সতর্কতা।

পঞ্চমতঃ, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গ যে জনসাধারণের ব্যথায় ব্যথিত হয় এবং ঐ ব্যথা দূর করিবার জন্য যে সর্ব্বদা সচেষ্ট, তদ্বিষয়ে যাহাতে জনসাধারণ নিঃসন্দিগ্ধ হয়, তদুদ্দেশ্যে জনসাধারণের অভিযোগ দূর করার প্রযত্ন বিষয়ে সচেষ্ট হইতে হয়। ইহা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠন বিষয়ে পঞ্চম সতর্কতা।

ষষ্ঠতঃ, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠন-পরিকল্পনা-কার্য্য সংক্রান্ত কোন কর্ম্মীর মধ্যে যাহাতে কোনরূপ অসন্তুষ্টি অথবা বিরক্তির উদ্ভব না হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে পরিচালনা-কার্য্যের কোন কর্ম্মী যাহাতে স্ব স্ব সাধনার প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যের কোনরূপ অভাব বোধ করিতে না পারেন এবং প্রত্যেক কর্ম্মীর মধ্যে যাহাতে উপযুক্ততার তারতম্যানুসারে দায়িত্বভারের গুরুত্বের তারতম্য ন্যস্ত হয়—তদ্বিষয়ে সতর্ক হইতে হয়। ইহা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান-সংগঠন বিষয়ে ষষ্ঠ সতর্কতা।

উপরোক্ত ছয় শ্রেণীর সতর্কতাকে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান-সংগঠনে ছয় শ্রেণীর ব্যবস্থা-সূত্র বলা হয়।

যদি দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠন উহার ছয় শ্রেণীর নীতি-সূত্র ও ব্যবস্থা-সূত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সাধিত হইয়াছে, তাহা হইলে ঐ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠন যে প্রয়োজনানুরূপভাবে সাধিত হইয়াছে—তদ্বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়।

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের ব্যাখ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের ব্যাখ্যা প্রধানতঃ তিন অংশে বিভক্ত করা হইবে, যথা :

(১) পূর্ব্বাংশ ;
(২) মধ্যমাংশ ;
(৩) উত্তরাংশ।

যে যে প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হইলে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়, প্রথমতঃ, সেই সেই প্রতিষ্ঠানের সমাবেশের কথা ; দ্বিতীয়তঃ, সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের হস্তে যে সমস্ত অনুষ্ঠান সাধন করিবার দায়িত্বভার অর্পিত হয়, প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের বণ্টনের কথা ; এবং তৃতীয়তঃ, ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান সাধন করিবার জন্য যে সমস্ত কর্ম্মী নিযুক্ত হন, সেই সমস্ত কর্ম্মীর মধ্যে অনুষ্ঠানের বণ্টনের কথা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের ব্যাখ্যার পূর্ব্বাংশে আলোচনা করা হইবে। ইহা ছাড়া, জনসভাসমূহের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন, সংগঠন ও কার্য্যপদ্ধতির ব্যাখ্যা এবং সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার অনুষ্ঠানসমূহের মূল নীতিসূত্রের ব্যাখ্যা উপরোক্ত পূর্ব্বাংশের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

পূর্ব্বাংশের আলোচ্য বিষয়বস্তু

উপরোক্ত পূর্ব্বাংশের আলোচ্য বিষয়বস্তু নয় শ্রেণীর যথা :

১। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান-সংগঠনে দেশ ও গ্রাম বিভাগের বিবরণ ;
২। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনের প্রতিষ্ঠানসমূহের রচনার শ্রেণীবিভাগের বিবরণ ;
৩। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনের অনুষ্ঠানসমূহের শ্রেণী-বিভাগের বিবরণ ;
৪। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে কর্ম্মীসমূহের শ্রেণী বিভাগের বিবরণ ;
৫। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান-সমূহের মধ্যে অনুষ্ঠানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টন ;
৬। জনসভাসমূহের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন পদ্ধতি, সংগঠনের বিবরণ ও কার্য্য পদ্ধতি ;
৭। মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার অনুষ্ঠানসমূহের মূল নীতিসূত্র এবং ঐ অনুষ্ঠানসমূহ সাধন করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান সমূহের বণ্টন (অর্থাৎ সমাবেশ) ;
৮। চারিশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের কার্য্যপরিচালনা সভাসমূহের কর্ম্মিগণের শিক্ষা-পদ্ধতি ও নিয়োগ-পদ্ধতি ;
৯। চারিশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয়ের স্থান নির্দ্ধারণ করিবার নীতিসূত্র।

মধ্যমাংশের আলোচ্য বিষয়বস্তু

ছয়শ্রেণীর নীতি-সূত্র ও ছয় শ্রেণীর ব্যবস্থা-সূত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠনে যাহা যাহা করা হয়, তাহার কথা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের ব্যাখ্যার মধ্যমাংশে আলোচনা করা হইবে।

মধ্যমাংশের আলোচ্য বিষয়বস্তু ছয় শ্রেণীর যথা :—

(১) কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান যাহাতে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়, তদ্বিষয়ক ব্যবস্থার বিবরণ ;
(২) সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার প্রত্যেক অনুষ্ঠান সাধন করিবার দায়িত্বভার যাহাতে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের হস্তে ন্যস্ত হয়, তদ্বিষয়ক ব্যবস্থার বিবরণ ;
(৩) মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার অনুষ্ঠানসমূহ যাহাতে স্বতঃই সাধিত হয় এবং কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য, গুণ ও শক্তি সম্বন্ধে কোন মানুষের যাহাতে কোনরূপ অভাব না হইতে পারে তদ্বিষয়ক ব্যবস্থার বিবরণ ;
(৪) কোন মানুষ যাহাতে নিজেকে অপর কাহারও অধীনতাপাশে বদ্ধ বলিয়া মনে করিতে অথবা ব্যথা অনুভব করিতে না পারেন তদ্বিষয়ক ব্যবস্থার বর্ণনা ;
(৫) জনসাধারণের অভিযোগ দূর করিবার প্রযত্ন বিষয়ে সচেষ্টতা-বিষয়ক ব্যবস্থার বিবরণ ;
(৬) কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনের পরিচালনা-কার্য্যের কোন কর্ম্মী যাহাতে স্ব স্ব সাধনার প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যের কোনরূপ অভাব বোধ করিতে না পারেন এবং প্রত্যেক কর্ম্মীর হস্তে যাহাতে উপযুক্ততার তারতম্যানুসারে দায়িত্বভারের গুরুত্বের তারতম্য ন্যস্ত হয়, তদ্বিষয়ক ব্যবস্থার বিবরণ।

উত্তরাংশের আলোচ্য বিষয়বস্তু

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠনে যে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হইয়া থাকে, এবং মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া যে আর কোন পন্থায় হইতে পারে না—তাহার কথা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের ব্যাখ্যায় উত্তরাংশে আলোচনা করা হইবে।

উত্তরাংশে আলোচ্য বিষয় বস্তু তিন শ্রেণীর, যথা :—

(১) কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে গ্রামের অবস্থার, মানুষের বাসভবনের অবস্থার, ও জীবনযাত্রা প্রণালীর বর্ণনা;
(২) কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে মানুষের শিক্ষার ও জ্ঞানের অবস্থার বর্ণনা;
(৩) কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে মানুষের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার বর্ণনা।

আমরা অতঃপর একে একে উপরোক্ত আঠার-শ্রেণীর আলোচ্য বিষয়-বস্তুর আলোচনা করিব।

১। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে দেশ ও গ্রাম বিভাগের বিবরণ

দেশ ও গ্রাম-বিভাগের কথা স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইলে, তিন শ্রেণীর কথার আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয়, যথা :

(১) দেশ ও গ্রামবিভাগের বর্ণনা;
(২) দেশ বিভাগের নীতিসূত্র;
(৩) গ্রামবিভাগের নীতিসূত্র।

এই তিন শ্রেণীর কথা "দেশ ও গ্রাম বিভাগের বিবরণে" আলোচনা করা হইবে।

সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া যাহাতে স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহা করিতে হইলে, যেমন সমগ্র মনুষ্যসমাজের সর্ব্বতোভাবের মিলন অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়, সেইরূপ সমগ্র ভূ-মণ্ডলকে কতকগুলি দেশে ও প্রত্যেক দেশকে কতক-গুলি গ্রামে শৃঙ্খলিতভাবে বিভাগ করাও অপরিহার্য্য-ভাবে প্রয়োজনীয়। এই বিভাগ-কার্য্য সম্পাদিত না হইলে তিন শ্রেণীর দুষ্টতা ঘটিবার আশঙ্কা থাকে।

ঐ বিভাগ-কার্য্য শৃঙ্খলিতভাবে সম্পাদিত না হইলে প্রথমতঃ "কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভা" মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধন-প্রাচুর্য্য সাধন করিবার জন্য এবং পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার জন্য যে-সমস্ত বিধি-নিষেধ অথবা নির্দ্দেশ স্থির করেন, সেই সমস্ত বিধি-নিষেধ ও নির্দ্দেশ সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক মানুষ যে-ব্যবস্থায় জানিতে পারেন, বুঝিতে পারেন ও তদনুসারে কার্য্য করেন সেই ব্যবস্থা সম্পাদন করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

ঐ বিভাগ-কার্য্য শৃঙ্খলিতভাবে সম্পাদিত না হইলে, দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ সুখ দুঃখের কথা এবং অভিযোগের কথা কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণকে প্রয়োজনমত জানান সম্ভব-যোগ্য হয় না।

তৃতীয়তঃ, ঐ বিভাগ-কার্য্য শৃঙ্খলিতভাবে সম্পাদিত না হইলে কৃষিযোগ্য জমির এবং বাসভবন ও বাগান-যোগ্য জমির বিভাগ মনুষ্যসংখ্যার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

ঐ কথাটী স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইলে, ইহা মনে রাখিতে হয় যে, মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করা অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় হয় এবং মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার প্রধান উপকরণ—কৃষিযোগ্য ও বাগান-যোগ্য জমি। ইহার কারণ, কৃষি যোগ্য ও বাগান-যোগ্য জমি না হইলে মানুষের খাদ্যাদি ব্যবহারের কোন দ্রব্যের কাঁচামাল উৎপাদন করা সম্ভব-যোগ্য হয় না। এই কারণে প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজনমত কৃষিযোগ্য ও বাগান-যোগ্য জমি যাহাতে প্রত্যেক মানুষ পাইতে পারেন, তাহা করিবার জন্য প্রথমতঃ মনুষ্য-সংখ্যার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া জমি বিভাগ করা একান্ত-ভাবে প্রয়োজনীয় হয়; দ্বিতীয়তঃ, মনুষ্যসংখ্যা সহর নির্ম্মাণ করিয়া যাহাতে একস্থানে পুঞ্জীভূত হইতে না পারেন, পরন্তু জমির বিস্তীর্ণতা অনুসারে যাহাতে লোক-সংখ্যা বণ্টন করা হয়, তাহার ব্যবস্থা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়।

উপরোক্ত কথাসমূহ হইতে দেশ ও গ্রাম-বিভাগের প্রয়োজন কি, তাহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় এবং ইহা বলা যায় যে, দেশ ও গ্রাম-বিভাগের প্রয়োজন প্রধানতঃ **তিন শ্রেণীর**; যথা :

(১) কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনাসভার প্রত্যেক নির্দ্দেশ যাহাতে সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক মানুষ পাইতে

পারেন, বুঝিতে পারেন ও তদনুসারে কার্য্য করেন, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(২) সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রত্যেক মানুষ যাহাতে নিজ নিজ সুখ-দুঃখের কথা ও অভিযোগের কথা কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণকে প্রয়োজনমত জানাইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা ;

(৩) মনুষ্য-সংখ্যার সহিত সর্ব্বতোভাবের সামঞ্জস্য রাখিয়া যাহাতে কৃষিযোগ্য ও পালনযোগ্য জমি বিভাগ করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা।

(১) দেশ ও গ্রাম বিভাগের বর্ণনা

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহার সংগঠন করিতে হইলে সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রাকৃতিক বিভাগানুসারে সমগ্র ভূমণ্ডলকে কতকগুলি দেশে এবং প্রত্যেক দেশকে কতকগুলি গ্রামে বিভক্ত করিবার প্রয়োজন হয়। গ্রাম তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে, যথা :

(১) সামাজিক গ্রাম ;

(২) সামাজিক কার্য্য-পরিচালনার গ্রাম ;

(৩) রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনার গ্রাম।

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহার সংগঠনে সমগ্র ভূমণ্ডলকে যে-সমস্ত বিভাগে বিভক্ত করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত বিভাগের মধ্যে "সামাজিক গ্রাম" সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম। সাধারণতঃ চারিখানির কাছাকাছি "সামাজিক গ্রাম" লইয়া এক-একটি "সামাজিক কার্য্য-পরিচালনার গ্রাম" গঠিত হইয়া থাকে। চারিখানির ঊর্দ্ধ এবং নয়খানির অনূর্দ্ধ "সামাজিক কার্য্য-পরিচালনার গ্রাম" লইয়া এক-একটি "রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনার গ্রামের" গঠন করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক দেশ কতকগুলি "রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনার গ্রামের" সমষ্টিতে সম্পূর্ণ হইয়া থাকে।

সামাজিক গ্রামসমূহের আয়তন সাধারণতঃ চারি বর্গ-মাইল হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক পরিস্থিতির সুবিধা ও অসুবিধাভেদে বিভিন্ন সামাজিক গ্রামের আয়তনে সামান্য কিছু প্রভেদ থাকিতে পারে বটে, কিন্তু ঐ প্রভেদ প্রায়শঃ অর্দ্ধ বর্গ মাইলের অধিক হয় না।

বিভিন্ন দেশের অন্তর্ভুক্ত "রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনার গ্রামের" সংখ্যা প্রায়শঃ সমান হয় না। পরন্তু অনেক প্রভেদ হইয়া থাকে। ইহার কারণ, দেশ বিভাগের প্রধান ভিত্তি পৃথিবীর প্রাকৃতিক বিভাগ। পৃথিবীর প্রাকৃতিক বিভাগের চিহ্ন—সমুদ্র, সরিৎ, পর্ব্বত ও জঙ্গল প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবস্থানসমূহ। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক ঘনত্বের বিভিন্নতা নিবন্ধন বিভিন্ন অঞ্চলের চলৎশীলতার (Dynamicity-র) দিক্ (Direction) ও বেগ (Velocity) বিভিন্ন হইয়া থাকে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের চলৎশীলতার দিকের ও বেগের বিভিন্নতাবশতঃ সমুদ্র, সরিৎ, পর্ব্বত ও জঙ্গল প্রভৃতির পরস্পরের অবস্থানের দূরত্বের ভেদ ঘটিয়া থাকে এবং ঐ ভেদ বশতঃ দেশসমূহের প্রাকৃতিক বিভাগ বিভিন্ন আয়তনের হইয়া পড়ে। পৃথিবীর প্রাকৃতিক বিভাগসমূহের আয়তন যে কেন এত বিভিন্ন হয়, তাহা স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনেক কথা আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয়। এই প্রবন্ধে ঐ সমস্ত আলোচনা করা সম্ভব-যোগ্য নহে। পৃথিবীর প্রাকৃতিক বিভাগসমূহের রকম ও আয়তন যে কেন এত বিভিন্ন হয়, তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে না পারিলেও ঐ প্রাকৃতিক বিভাগের রকম ও আয়তন যে অনেক শ্রেণীর হইয়া থাকে তাহা মানুষের চেহারা দেখিলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

প্রাকৃতিক যে যে কার্য্যধারায় (Process of works) পৃথিবীর ও দেশসমূহের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে, মূলতঃ, সেই সেই কার্য্যধারাতেই প্রত্যেক মানুষের সমষ্টিগত চেহারার ও তদন্তর্ভুক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির উৎপত্তি হয়।

ঐ হিসাবে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিভাগের সহিত পৃথিবীর দেশবিভাগের তুলনা করা যাইতে পারে। মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশ (যথা মস্তিষ্ক, স্কন্ধ, বক্ষ, উদর, বস্তি, উরু প্রভৃতি) যেরূপ স্বতঃই বিভিন্ন রকমের ও বিভিন্ন আয়তনের হইয়া থাকে, সেইরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জ্ঞানসম্পন্ন বিভিন্ন আয়তনের হইয়া থাকে। বিভিন্ন দেশের আয়তনে বিভিন্নতা থাকে বলিয়া বিভিন্ন দেশান্তর্গত "রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনার গ্রামের" সংখ্যা বিভিন্ন হইয়া থাকে।

(২) দেশ-বিভাগের নীতি-সূত্র

দেশবিভাগের প্রধান ভিত্তি পৃথিবীর প্রাকৃতিক বিভাগ। ঐ কথা দেশ ও গ্রাম-বিভাগের বর্ণনায় পাঠকবর্গকে শুনান হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় পৃথিবীর এক একটী প্রাকৃতিক বিভাগের নাম এক একটী "দেশ"।

দেশবিভাগ সুশৃঙ্খলিত করিতে হইলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক বিভাগের সহিত সুপরিচিত হওয়া একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়। পৃথিবীর প্রাকৃতিক বিভাগের সহিত সুপরিচিত হইতে হইলে, স্বতঃই পৃথিবীর উৎপত্তি হয় কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক কার্য্যধারায়, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিজ্ঞাত হইতে হয়। পৃথিবীর প্রাকৃতিক বিভাগের সহিত সুপরিচিত হইতে পারিলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর প্রাকৃতিক বিভাগ স্বতঃই সর্ব্বতোভাবে সুশৃঙ্খলিত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে খানিকটা জলভাগ এবং খানিকটা স্থলভাগ বিদ্যমান থাকে। প্রত্যেক দেশের স্থলভাগ প্রধানতঃ পাঁচ অংশে বিভক্ত; যথা:

(১) বাগান ও বাসভবনোপযুক্ত অংশ;

(২) বনাংশ;

(৩) পর্ব্বতাংশ;

(৪) অনুর্ব্বরাংশ এবং

(৫) কৃষিযোগ্যাংশ।

সমগ্র পৃথিবীর স্থলভাগের কৃষিযোগ্যাংশসমূহের সমষ্টিগত আয়তনকে সমগ্র পৃথিবীর সমগ্র লোকসংখ্যার দ্বারা বিভাগ করিলে, সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের ভাগে কতখানি কৃষিযোগ্য জমি প্রকৃতি দান করিয়াছেন—তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়।

সেইরূপ, কোন একটী দেশের স্থলভাগের কৃষি-যোগ্যাংশ-সমূহের সমষ্টিগত আয়তনকে (areaকে) সেই দেশের সমগ্র লোকসংখ্যার দ্বারা বিভাগ করিলে সেই দেশের প্রত্যেক মানুষের ভাগে কতখানি কৃষিযোগ্য জমি প্রকৃতি দান করিয়াছেন তাহা স্থির করিতে পারা যায়।

এইরূপভাবে সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের ভাগে, এবং প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের ভাগে কত পরিমাণের কৃষিযোগ্য জমি—প্রকৃতি দান করিয়াছেন তাহা নির্দ্ধারণ করিলে দেখা যায় যে, সমগ্র পৃথিবীরই হউক আর প্রত্যেক দেশেরই হউক, প্রত্যেক মানুষের ভাগে সর্ব্বত্রই কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ যাহা প্রকৃতি দান করিয়াছেন—তাহা সর্ব্বতোভাবে সমান। এক এক দেশে প্রত্যেক মানুষের ভাগে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণে যে সামান্য সামান্য পার্থক্য দেখা যায়, তাহার একমাত্র কারণ—মানুষের জ্ঞানের দুষ্টতা বশতঃ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন লোকসংখ্যার পরমায়ুর পরিমাণের পার্থক্য। প্রকৃতির এমনই বিচিত্রময় গতি যে, পৃথিবীর লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আর, লোকসংখ্যার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণও হ্রাস পাইতে থাকে।

পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাকৃতিক বিভাগে (অর্থাৎ প্রত্যেক দেশে) প্রত্যেক মানুষের ভাগে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ স্বতঃই সমান হইয়া থাকে বলিয়া, ইহা সিদ্ধান্ত করা হয় যে, পৃথিবীর প্রাকৃতিক বিভাগ স্বতঃই সর্ব্বতোভাবে সুশৃঙ্খলিত হইয়া থাকে।

যে যে প্রাকৃতিক কার্য্যধারায় স্বতঃই পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়া থাকে—তাহা সঠিকভাবে পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলে, পৃথিবীর স্থলভাগের কতখানি লইয়া উহার এক একটী প্রাকৃতিক বিভাগ হইয়া থাকে, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। উপরোক্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যখন মনুষ্যসমাজের অজ্ঞাত থাকে, তখন দেশবিভাগের প্রধান সূত্র হইয়া থাকে ছয়টী, যথা:

(১) পৃথিবীতে সমুদ্র অথবা সরিৎ, অথবা পর্ব্বত অথবা জঙ্গল প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবস্থানসমূহের একটী হইতে আর একটী পর্য্যন্ত যে এক একটী বিস্তৃত অঞ্চল আছে, সেই প্রত্যেক বিস্তৃত অঞ্চলের আয়তন স্থির করা এবং তদন্তর্গত কৃষি-যোগ্যাংশের আয়তন নিরূপণ করা;

(২) উপরোক্ত প্রত্যেক বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে যে লোক-সংখ্যা (বালক, বালিকা পরিণতবয়স্ক পুরুষ ও পরিণত-বয়স্কা রমণী) বিদ্যমান থাকে, সেই লোক-সংখ্যার যথা-সম্ভব নির্ভুলভাবে নির্দ্ধারণ করা;

(৩) উপরোক্ত প্রত্যেক বিস্তৃত অঞ্চলের আয়তনকে তন্মধ্যস্থ লোক-সংখ্যার দ্বারা বিভাগ করা এবং এক একটী বিস্তৃত অঞ্চলের প্রত্যেক মানুষের অংশে কত কৃষি-যোগ্য জমি আছে, তাহা নিরূপণ করা;

(৪) সমগ্র পৃথিবীর কৃষি-যোগ্যাংশের আয়তন নিরূপণ করা ;

(৫) সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যা যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে নির্দ্ধারণ করা ;

(৬) সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের অংশে কত কৃষি-যোগ্য জমি আছে, তাহা নিরূপণ করা।

উপরোক্ত ছয়টী সূত্রের আশ্রয় লইলে, পৃথিবীর সমুদ্র অথবা সরিৎ অথবা পর্ব্বত অথবা জঙ্গল প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবস্থানসমূহের একটী হইতে আর একটী পর্য্যন্ত এক একটী বিস্তৃত অঞ্চলে প্রত্যেক মানুষের অংশে কত এবং সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের অংশে কত আয়তনের কৃষি-যোগ্য জমি আছে, তাহা নিরূপণ করা যায়। যদি দেখা যায় যে, উপরোক্ত প্রত্যেক বিস্তৃত অঞ্চলের এবং সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের অংশে যে কৃষিযোগ্য জমি আছে, তাহার পরিমাণ সর্ব্বত্রই প্রায়শঃ সমান—তাহা হইলে বুঝিতে হয় যে, দেশ-বিজ্ঞান পৃথিবীর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুরূপ হইয়াছে। যে বিস্তৃত অঞ্চলের প্রত্যেক মানুষের অংশের কৃষি-যোগ্য জমির পরিমাণে অসমানতা দেখা যায়, সেইখানে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি অথবা হ্রাস সাধন করিয়া সমানতা সম্পাদন করিবার প্রয়োজন হয়।

প্রত্যেক দেশের অধিবাসীরা যাহাতে যথাসম্ভব একই শ্রেণীর ভাষাভাষী হন, তাহার ব্যবস্থা করা দেশবিভাগের অন্যতম নীতি-সূত্র।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সমগ্র মনুষ্যসমাজের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার মধ্যে যেরূপ গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির অনেকাংশে সমানতা বিদ্যমান আছে, সেইরূপ আবার প্রত্যেক মানুষেরই স্ব স্ব গুণ, শক্তি এবং প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান আছে। মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উপরোক্ত সমানতা বশতঃ সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার মধ্যে স্বভাবতঃ এক শ্রেণীর সমপ্রাণতা বিদ্যমান আছে। আর মানুষের পরস্পরের মধ্যে যে অসম-প্রাণতা অথবা শত্রুভাবের উদ্ভব হয়, তাহার কারণ মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উপরোক্ত ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উপরোক্ত ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রশ্রয় পাইলে মানুষের পরস্পরের মধ্যেয় অসমপ্রাণতা অথবা শত্রু-ভাব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, এবং মনুষ্যসমাজ দ্বন্দ্ব-কলহ প্রভৃতি অশান্তির আধার হইয়া পড়ে। মনুষ্যসমাজ যাহাতে অশান্তির আধার না হয়, তাহা করিবার অন্যতম উপায়—মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ঐ গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির সমানতাসমূহের উৎকর্ষ সাধিত হয়—তদনুরূপ শিক্ষা প্রত্যেক মানুষকে প্রদান করিবার ব্যবস্থা করা। একই শ্রেণীর ভাষাভাষী যুবকগণের শিক্ষাকার্য্য যত সহজ হয়, বিভিন্ন শ্রেণীর ভাষাভাষী যুবকগণের শিক্ষাকার্য্য তত সহজ হয় না। তাহা ছাড়া একই শ্রেণীর ভাষাভাষিগণের মধ্যে মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির সমানতা যত অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, বিভিন্ন শ্রেণীর ভাষাভাষিগণের মধ্যে মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির সমানতা তত অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে না। উপরোক্ত দুইশ্রেণীর কারণে একই শ্রেণীর ভাষাভাষিগণ যাহাতে নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসী হইতে পারেন, পৃথিবীর দেশ-বিভাগে তদ্বিষয়ে সতর্ক হইতে হয়।

(৩) গ্রামবিভাগের নীতি-সূত্র

গ্রামবিভাগের নীতি-সূত্র অনেকটা দেশবিভাগের নীতি-সূত্রের অনুরূপ।

দেশবিভাগে যেরূপ পৃথিবীর সমুদ্র অথবা সরিৎ অথবা পর্ব্বত অথবা জঙ্গল প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবস্থানসমূহের একটি হইতে আর একটি পর্য্যন্ত যে এক একটি বিস্তৃত অঞ্চল থাকে, সেই এক একটি বিস্তৃত অঞ্চলকে এক একটি 'দেশ' বলিয়া বিভক্ত করা হয় ;—গ্রামবিভাগে সেইরূপ এক একটি দেশের মধ্যে যে সমস্ত সরিৎ অথবা পর্ব্বত অথবা জঙ্গল প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবস্থান থাকে, সেই সমস্ত প্রাকৃতিক অবস্থানের একটি হইতে আর একটি পর্য্যন্ত যে এক একটি বিস্তৃত অঞ্চল থাকে, সেই এক একটি বিস্তৃত অঞ্চলকে এক একটি রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনার 'গ্রামে' বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনার গ্রামকে ষোল বর্গ-মাইলের কাছাকাছি এক একটী অংশে বিভক্ত করা হয়। এই ষোল বর্গমাইলের কাছাকাছি এক একটী অংশকে 'সামাজিক গ্রাম' বলিয়া অভিহিত করা হয়। চারিটী করিয়া সামাজিক গ্রাম লইয়া সাধারণতঃ এক একটী 'সামাজিক কার্য্য পরি-

চালনার গ্রাম' গঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনার গ্রামের সামাবদ্ধতা বশতঃ কখন কখন চারিটীর স্থলে দুইটী অথবা তিনটী অথবা পাঁচটী সামাজিক গ্রাম লইয়া এক একটী সামাজিক কার্য্যপরিচালনার গ্রাম গঠন করিবার প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনার গ্রামের অন্তর্গত সামাজিক কার্য্যপরিচালনার গ্রামের সংখ্যা সর্ব্বদা সমান রাখা সম্ভব-যোগ্য হয় না। ঐ সংখ্যা সমান রাখা সম্ভব হয় না বটে; কিন্তু উহা কখনও পাঁচটীর কম এবং নয়টীর বেশী করা হয় না।

প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের অংশের কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ যেরূপ সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের অংশের কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণের কাছাকাছি রাখা হয়, সেইরূপ প্রত্যেক সামাজিক গ্রামের, সামাজিক কার্য্য-পরিচালনার গ্রামের এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনার গ্রামের প্রত্যেক মানুষের অংশের কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণও সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের অংশের কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণের কাছাকাছি রাখা হয়।

প্রত্যেক দেশের অধিবাসীরা যাহাতে যথাসম্ভব একই শ্রেণীর ভাষাভাষি হন, তাহার ব্যবস্থা করা যেমন দেশ-বিভাগের অন্যতম নীতিসূত্র, সেইরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর গ্রামের অধিবাসীরা যাহাতে যথাসম্ভব একই শ্রেণীর ভাষাভাষী হন তাহার ব্যবস্থা করা গ্রামবিভাগের অন্যতম নীতিসূত্র।

২। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান-সংগঠনের প্রতিষ্ঠান-সমূহের রচনার ও শ্রেণী বিভাগের বিবরণ

মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে যে যে প্রতিষ্ঠানের রচনা করিতে হয়, সেই সেই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, যথা :

(১) কেন্দ্রীয় জনসভা ;
(২) কেন্দ্রীয় কার্য্য পরিচালনা-সভা ;
(৩) দেশস্থ জনসভা ;
(৪) দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভা ;
(৫) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জন-সভা ;
(৬) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভা ;
(৭) গ্রামস্থ সামাজিক জনসভা ;
(৮) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভা, ;
(৯) গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের প্রতিষ্ঠান।

যে যে প্রতিষ্ঠান রচনা করিলে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়ার অনুষ্ঠানসমূহ স্বতঃই সাধিত হইতে পারে, সেই সেই প্রতিষ্ঠান স্থানগত বিভাগের দিক হইতে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা :

(১) কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ;
(২) দেশস্থ প্রতিষ্ঠান ;
(৩) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ;
(৪) গ্রামস্থ সামাজিক তত্ত্বাবধারণের প্রতিষ্ঠান ;
(৫) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের প্রতিষ্ঠান।

দায়িত্বগত বিভাগের দিক হইতে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান দুইটী শাখায় বিভক্ত ; যথা :

(১) কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভা ;
(২) কেন্দ্রীয় জনসভা।

দায়িত্বগত বিভাগের দিক হইতে দেশস্থ প্রতিষ্ঠান দুইটী শাখায় বিভক্ত ; যথা :

(১) দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভা ;
(২) দেশস্থ জনসভা।

দায়িত্বগত বিভাগের দিক হইতে গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দুইটী শাখায় বিভক্ত, যথা :

(১) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভা ;
(২) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভা।

দায়িত্ব-গত বিভাগের দিক হইতে গ্রামস্থ সামাজিক তত্ত্বাবধারণের প্রতিষ্ঠান দুইটী শাখায় বিভক্ত, যথা—

(১) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনার সভা ;
(২) গ্রামস্থ সামাজিক জনসভা।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের প্রতিষ্ঠানের কোন শাখা-বিভাগ থাকে না। উহাতে থাকে কেবলমাত্র অনুষ্ঠান-বিভাগ। এই অনুষ্ঠান-বিভাগের ভিত্তি—প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়ার তিন শ্রেণীর মুখ্যানুষ্ঠানের প্রত্যন্তর-শ্রেণীবিভাগ।

সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়ার অনুষ্ঠানসমূহ যাহাতে স্বতঃই সাধিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের রচনা করিতে হয় এবং ঐ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। তাহার পর যুগপৎ দেশস্থ প্রতিষ্ঠানের, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের এবং গ্রামস্থ সামাজিক তত্ত্বাবধারণের প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকের 'কার্য্য-পরিচালনা-সভার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। সর্ব্বশেষে গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যসমূহের প্রতিষ্ঠানের রচনা করিতে হয় এবং সামাজিক কর্ম্মিগণের মধ্যে উহার অনুষ্ঠান সমূহের বণ্টন সম্পাদন করিতে হয়। ঐ গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যসমূহের প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানসমূহের বণ্টন সম্পাদিত হইলে গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার রচনা সম্পাদিত হইলে, ক্রমে ক্রমে, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় জনসভার, দেশস্থ জনসভার এবং কেন্দ্রীয় জনসভার প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়।

সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়ার অনুষ্ঠানসমূহ যাহাতে স্বতঃই সাধিত হয়, তাহা করিতে হইলে যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান রচনা করিবার প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম—"কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান" এবং তাহার দুইটি শাখা—অর্থাৎ

(১) কেন্দ্রীয় কার্য্য পরিচালনা-সভা এবং

(২) কেন্দ্রীয়-জন-সভা।

মানবসমাজের অবস্থাভেদে ঐ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার জন্য বিভিন্ন রকমের পন্থা অবলম্বন করিতে হয়।

যখন মানবসমাজে "বাজীকরের বিদ্যা" বিজ্ঞান নামে শ্রদ্ধা লাভ করে, তখন সর্ব্বব্যাপী অন্নাভাব, অর্থাভাব, দ্বেষ-হিংসা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ সমগ্র মানবসমাজ অধিকার করে। তখন মানবসমাজের পর-প্রাণ যে কেহ প্রযত্নশীল হইলে ঐ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের রচনা করা সম্ভব হয়। তখন সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার অনুষ্ঠানসমূহের কথা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠনের কথা মানবসমাজকে শুনাইতে হয়। এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অস্থায়ীভাবের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের রচনা করিতে হয়। কোন দেশের কোন শ্রেণীর নেতৃবর্গ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে উহা অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে। তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রবন্ধাকারে করিবার ইচ্ছা আমাদের আছে।

৩। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে অনুষ্ঠানসমূহের শ্রেণীবিভাগের বিবরণ

তিন শ্রেণীর মুখ্যানুষ্ঠান

সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া যাহাতে স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহা করিতে হইলে মুখ্যতঃ তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান যাহাতে স্বতঃই সাধিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়, যথা :—

(১) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(২) মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৩) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান যাহাতে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সর্ব্বত্র স্বতঃই সাধিত হয়, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত হইলে প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু ঐ তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান যাহাতে সমগ্র মনুষ্যসমাজের সর্ব্বত্র স্বতঃই সাধিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে, আনুষঙ্গিকভাবে আরও ছয় শ্রেণীর ব্যবস্থা সম্পাদন করিবার প্রয়োজন হয়। প্রথমোক্ত তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠানকে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার "মুখ্যানুষ্ঠান" বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। আর শেষোক্ত ছয় শ্রেণীর অনুষ্ঠানকে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার "আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান" বলিয়া অভিহিত করিতে হয়।

ছয় শ্রেণীর আনুষঙ্গিকানুষ্ঠান

এই ছয় শ্রেণীর "আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের" নাম—

(১) বিভিন্ন কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মী নিয়োগ করিবার এবং বিভিন্ন জনসভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(২) কোন শ্রেণীর কর স্থাপন না করিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-সমূহের অর্থপ্রয়োজন নির্ব্বাহ করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৩) মানুষের পরস্পরের মধ্যের ব্যক্তিগত বিবাদের বিচার করিবার ও পরস্পরের মধ্যে সৌখ্য স্থাপন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ;

(৪) বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন গ্রামের সীমানা নির্দ্ধারণ করিবার, সীমানা রক্ষা করিবার এবং সীমানা-সংক্রান্ত বিবাদের বিচার করিবার অনুষ্ঠানসমূহ;

(৫) বিভিন্ন বিষয়ের অথবা ব্যাপারের বিজ্ঞান ও তত্ত্ব দর্শন করিবার, প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান ও তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিবার এবং কেন্দ্রীয়, দেশীয় ও গ্রাম্যভাষায় প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান-গ্রন্থ ও তত্ত্বগ্রন্থসমূহ রচনা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ;

(৬) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানসমূহের সংগঠন ও বিধি-নিষেধ নির্দ্ধারণ করিবার এবং কেন্দ্রীয়, দেশীয় ও গ্রাম্যভাষায় সংগঠনের ও বিধি-নিষেধের প্রয়োজনীয় গ্রন্থসমূহ রচনা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ।

প্রতিষ্ঠানভেদে উপরোক্ত অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীর, যথা :—

(ক) কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহ;

(খ) দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহ;

(গ) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহ;

(ঘ) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহ;

(ঙ) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের অনুষ্ঠানসমূহ।

(ক) কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহ

কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ নয় শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা :—

(১) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে প্রচার ও পরিদর্শন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ;

(২) মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে প্রচার ও পরিদর্শন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ;

(৩) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে প্রচার ও পরিদর্শন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ;

(৪) কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার, দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার, গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার এবং গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের কর্ম্মী নিয়োগ করিবার এবং কেন্দ্রীয় জনসভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ;

(৫) কোন শ্রেণীর কর স্থাপন না করিয়া উপরোক্ত নয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সম্বাবধ অর্থপ্রয়োজন নির্ব্বাহ করিবার অনুষ্ঠানসমূহ;

(৬) মানুষের পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তিগত বিবাদের বিচার করিবার ও পরস্পরের মধ্যে সৌখ্যস্থাপন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ;

(৭) বিভিন্ন দেশের সীমানাসমূহ নির্দ্ধারণ ও রক্ষা করিবার এবং সীমানাসংক্রান্ত বিবাদের বিচার করিবার অনুষ্ঠান-সমূহ;

(৮) বিভিন্ন বিষয়ের অথবা ব্যাপারের বিজ্ঞান ও তত্ত্ব দর্শন করিবার এবং প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান নির্দ্ধারণ করিবার এবং কেন্দ্রীয় ভাষায়[১] প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান-গ্রন্থ ও তত্ত্ব-গ্রন্থসমূহ রচনা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ;

(৯) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানসমূহের সংগঠন ও বিধি-নিষেধ নির্দ্ধারণ করিবার এবং কেন্দ্রীয় ভাষায়, প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধের গ্রন্থসমূহ রচনা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ।

কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার উপরোক্ত নয়শ্রেণীর অনুষ্ঠান একবট্টিটি প্রত্যন্তরশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে।

১ কেন্দ্রীয় ভাষা—প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন হিব্রু এবং প্রাচীন আরবী এই তিনটী ভাষা, ব্যাসদেবের কথানুসারে, শব্দ করিবার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির কার্য্যকারণের শৃঙ্খলার বিজ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া রচিত। এই তিনটী ভাষা ছাড়া, আর কোন ভাষায় আপাত-দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের নিকট যাহা অব্যক্ত তাহা প্রকাশ করা যায় না। একমাত্র ঐ তিনটী ভাষাতেই ঐ অব্যক্ত বিষয়সমূহ প্রকাশ করা সম্ভব-যোগ্য। এই তিনটী ভাষাতে একদিকে যেরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ব্যাপার আদ্যোপান্ত ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব; সেইরূপ আবার এই তিনটী ভাষা সর্ব্বতোভাবে সাধনা-নিরত প্রত্যেক মানুষের পক্ষে বুঝা ও উপলব্ধি করা সম্ভব। দেশগত কোন লৌকিক ভাষা, ঐ দেশীয় মানুষ ছাড়া অপর কোন মানুষের পক্ষে, সর্ব্বতোভাবে বুঝা ও উপলব্ধি করা সম্ভবযোগ্য নহে। প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন হিব্রু ও প্রাচীন আরবী ভাষাকে আমরা "কেন্দ্রীয় ভাষা" বলিয়া অভিহিত করিতেছি। বর্ত্তমানে যাহা সংস্কৃত, আরবী ও হিব্রু নামে পরিচিত, তাহার সহিত এক অক্ষরমালা বিষয়ের সাদৃশ্য ছাড়া, প্রাচীন সংস্কৃত, আরবী ও হিব্রু ভাষার কোন সাদৃশ্য নাই।

(খ) দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহ

দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার ও গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহ, কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহের মত, প্রধানতঃ, নয় শ্রেণীতে বিভক্ত।

দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠানের নাম :—

(১) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধিনিষেধ সম্বন্ধে প্রচার ও পরিদর্শন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(২) মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধিনিষেধ সম্বন্ধে প্রচার ও পরিদর্শন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৩) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধিনিষেধ সম্বন্ধে প্রচার ও পরিদর্শন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৪) গ্রামস্থ সামাজিক, সামাজিক তত্ত্বাবধায়ক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের এবং দেশস্থ রাষ্ট্রীয় সভার কর্ম্মী নিয়োগ করিবার এবং দেশস্থ জনসভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৫) কোন শ্রেণীর কর স্থাপন না করিয়া সামাজিক, সামাজিক তত্ত্বাবধারণের এবং রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ম্মিগণের অর্থপ্রয়োজন নির্ব্বাহ করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৬) মানুষের পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তিগত বিবাদের বিচার করিবার ও পরস্পরের মধ্যে সৌখ্য স্থাপন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৭) রাষ্ট্রীয় গ্রামের সীমানা নির্দ্ধারণ ও রক্ষা এবং সীমানা-সংক্রান্ত বিবাদের বিচার করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৮) দেশগত বিভিন্ন বিষয়ের অথবা ব্যাপারের বিজ্ঞান ও তত্ত্ব দর্শন করিবার এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সাধন করাইবার এবং দেশীয় ভাষায় প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান-গ্রন্থ ও তত্ত্ব গ্রন্থ রচনা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৯) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানসমূহের সংগঠন ও বিধিনিষেধ-বিষয়ক দেশগত বৈশিষ্ট্যসমূহ দর্শন করিবার এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সাধন করাইবার এবং দেশীয় ভাষায় প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধের গ্রন্থসমূহ রচনা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ।

দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার উপরোক্ত নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান উনসত্তরটী প্রত্যন্তর-শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে।

(গ) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহ

গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠানের অনুরূপ।

গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা সভার নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাতান্নটী প্রত্যন্তর-শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে।

(ঘ) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহ

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—

(১) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার সামাজিক কার্য্যসমূহের সংগঠন ও পরিদর্শন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(২) মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা দূর করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার সামাজিক কার্য্যসমূহের সংগঠন ও পরিদর্শন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৩) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার সামাজিক কার্য্যসমূহের সংগঠন ও পরিদর্শন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৪) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের কর্ম্মী নিয়োগ করিবার এবং গ্রামস্থ সামাজিক জনসভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৫) কোন শ্রেণীর কর স্থাপন না করিয়া, গ্রামস্থ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সর্ব্ববিধ অর্থপ্রয়োজন নির্ব্বাহ করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৬) মানুষের পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তিগত বিবাদের বিচার করিবার ও পরস্পরের মধ্যে সৌখ্য স্থাপন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ।

(ঙ) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের অনুষ্ঠানসমূহ

গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা :—

(১) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(২) মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৩) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ।

(১) ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ

মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ, পনের শ্রেণীর,২ যথা :—

(১) কৃষিকার্য্য-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(২) জলজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও সংগ্রহবিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৩) বন ও বাগানজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও সংগ্রহবিষয়ক পাঁচটী প্রত্যন্তর-শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;৩

(৪) খনিজাত দ্রব্যের সংগ্রহ ও উৎপাদন-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৫) শিল্প ও কারুকার্য্য-বিষয়ক ষোলটী প্রত্যন্তর শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;৪

(৬) যন্ত্রপরিচালনা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৭) ভবন নির্ম্মাণ ও রক্ষা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৮) খাল-খনন ও স্থলপথ নির্ম্মাণ ও রক্ষা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৯) রোগী ও ভোগিগণের পারিচর্য্যা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

২ ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দিক দিয়া দেখিলে, প্রধানতঃ, [illegible] শ্রেণীর হইয়া থাকে। সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের দায়িত্ববণ্টনের দিক দিয়া দেখিলে পনর শ্রেণীর হইয়া থাকে। সামাজিক কার্য্যের চতুর্থশ্রেণীর কর্ম্মিগণের দায়িত্ববণ্টনের দিক দিয়া দেখিলে, প্রধানতঃ, আটত্রিশ শ্রেণীর হইয়া থাকে। সামাজিক কার্য্যের চতুর্থশ্রেণীর কর্ম্মিগণের প্রত্যন্তর শ্রেণীর দায়িত্ববণ্টনের দিক দিয়া দেখিলে অসংখ্য শ্রেণীর হয়।

৩ বন ও বাগানজাত দ্রব্য উৎপাদন ও সংগ্রহ করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীর, যথা :—

(ক) বাগান নির্ম্মাণ ও রক্ষা করিবার এবং বাগানজাত উদ্ভিদাদি উৎপাদন ও রক্ষা করিবার সামাজিক অনুষ্ঠান সমূহ ;

(খ) বন রক্ষা করিবার এবং বনজাত উদ্ভিদ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি রক্ষা করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(গ) পশু পালন করিবার এবং পশুজাত সর্ব্বশ্রেণীর কাঁচামাল উৎপাদন করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(ঘ) পক্ষী পালন করিবার ও পক্ষিজাত সর্ব্বশ্রেণীর কাঁচামাল উৎপাদন করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(ঙ) কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ প্রভৃতি পালন করিবার এবং তজ্জাত সর্ব্বশ্রেণীর কাঁচামাল উৎপাদন করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ।

৪ শিল্প ও কারুকার্য্য-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ ষোলশ্রেণীর, যথা :—

(ক) খাদ্য ও পানীয়-বিষয়ক শিল্পসম্বন্ধীয় সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(খ) ঔষধ, পথ্য, বর্ণ ও গন্ধ এবং প্রসাধনবস্তু ও উপভোগ্য বস্তু উৎপাদন করিবার রাসায়নিক শিল্পকার্য্য-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(গ) কার্পাসবস্ত্র সম্বন্ধীয় শিল্পকার্য্য ও কারুকার্য্য-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(ঘ) রেশমবস্ত্র সম্বন্ধীয় শিল্পকার্য্য ও কারুকার্য্য-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(ঙ) পশমবস্ত্র-সম্বন্ধীয় শিল্পকার্য্য ও কারুকার্য্য-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(চ) কুম্ভকারের কার্য্যসম্বন্ধীয় (অর্থাৎ মৃত্তিকা ও প্রস্তর সম্বন্ধীয় বিবিধ শিল্পকার্য্য ও কারুকার্য্য সম্বন্ধীয়) সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ।

(ছ) ছুতারের কার্য্যসম্বন্ধীয় (অর্থাৎ কাষ্ঠবিষয়ক বিবিধ শিল্প-কার্য্য ও কারুকার্য্যসম্বন্ধীয়) সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(জ) কর্ম্মকারের কার্য্যসম্বন্ধীয় (অর্থাৎ লৌহবিষয়ক বিবিধ শিল্পকার্য্য ও কারুকার্য্যসম্বন্ধীয়) সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(১০) ক্রয়-বিক্রয় কার্য্যবিষয়ক দুইটী প্রত্যন্তর-শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;৫

(১১) যান-পরিচালনা-বিষয়ক দুইটী প্রত্যন্তর-শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;৬

(১২) মানুষের পরস্পরের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের কার্য্যবিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(১৩) ভূমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন বিষয়ের সংবাদ প্রচারের কার্য্যবিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(১৪) গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যরক্ষা বিষয়ক চারিটী প্রত্যন্তর শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;৭

(১৫) মানুষের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ।

(২) কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ

মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ সাত শ্রেণীর, যথা :

(১) সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের শিক্ষা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(২) সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের শিক্ষা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৩) সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের শিক্ষাবিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৪) রমণীগণের গৃহিণীপণা শিক্ষাবিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠান-সমূহ ;

(৫) সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণের শিক্ষাবিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৬) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনার কর্ম্মিগণের শিক্ষা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৭) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনার কর্ম্মিগণের শিক্ষাবিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ।

(ঝ) কাংস্যকারের কার্য্যসম্বন্ধীয় (অর্থাৎ কাঁসা, তামা, পিত্তল প্রভৃতি ধাতুবিষয়ক শিল্পকার্য্য ও কারুকার্য্যসম্বন্ধীয়) সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(ঞ) স্বর্ণকারের কার্য্যসম্বন্ধীয় (অর্থাৎ সোনা, রূপা প্রভৃতি ধাতুবিষয়ক শিল্পকার্য্য ও কারুকার্য্যসম্বন্ধীয়) সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(ট) রত্ন (অর্থাৎ হীরা, মুক্তা প্রভৃতি রত্নদ্রব্য) সম্বন্ধীয় শিল্প ও কারুকার্য্য-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(ঠ) কাগজ, কলম, পেন্সিল প্রভৃতি দ্রব্যসম্বন্ধীয় শিল্প ও কারুকার্য্য-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(ড) যান-নির্ম্মাণ সম্বন্ধীয় শিল্প ও কারুকার্য্য-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(ঢ) যন্ত্র-নির্ম্মাণ সম্বন্ধীয় শিল্প ও কারুকার্য্য-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(ণ) তার-পথ নির্ম্মাণ ও রক্ষা সম্বন্ধীয় শিল্প ও কারুকার্য্য-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(ত) চিত্র ও বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি উৎপাদন করিবার শিল্প ও কারুকার্য্য-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ।

৫ ক্রয়-বিক্রয় করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর, যথা :

(ক) ক্রয়-বিক্রয়-স্থল পরিচালনাবিষক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(খ) ক্রয়-বিক্রয় করিবার কার্য্য-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠান-সমূহ ।

৬ যান-পরিচালনা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর, যথা :

(ক) জলযানপরিচালনাকার্য্য-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(খ) স্থলযানপরিচালনাকার্য্য-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ।

৭ গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ চারি শ্রেণীর, যথা :

(ক) মল ও ধৌত জল নিকাশের পথ নির্ম্মাণ ও রক্ষা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ,

(খ) পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা, নির্ম্মাণ, রক্ষা ও পরিচালনা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(গ) গমনাগমনের পথ পরিষ্কৃত রাখিবার সামাজিক অনুষ্ঠান-সমূহ ;

(ঘ) গমনাগমনের পথ আলোকিত রাখিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ।

(৩) প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ

মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীর, যথা :

(১) পঞ্চম বৎসরের উর্দ্ধবয়স্কা এবং দশম বৎসরের অনূর্দ্ধ-বয়স্কা বালিকাগণের শিক্ষাবিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠান-সমূহ ;

(২) পঞ্চম বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক এবং পঞ্চদশ বৎসরের অনূর্দ্ধ-বয়স্ক বালকগণের শিক্ষাবিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৩) জনসাধারণের চিকিৎসা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠান-সমূহ ;

(৪) বিবাহ, গর্ভ, গর্ভিণী, এক বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্ক শিশু, এক বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক ও পঞ্চম বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্ক শিশু, একাদশ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক বালকগণের ইন্দ্রিয়, নবম বৎসরের উর্দ্ধবয়স্কা বালিকাগণের ইন্দ্রিয় এবং পশুত্বনিবারণ সম্বন্ধীয় প্রচার—এই আটশ্রেণীর বিষয় সম্বন্ধীয় সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৫) যাজ্ঞিক কার্য্য সম্বন্ধীয় সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ।

৪। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে কর্ম্মিগণের শ্রেণীবিভাগের বিবরণ

সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার কর্ম্মিগণ প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীর, যথা :

(১) কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনার কর্ম্মিগণ ;

(২) দেশস্থ কার্য্যপরিচালনার কর্ম্মিগণ ;

(৩) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনার কর্ম্মিগণ ;

(৪) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনার কর্ম্মিগণ ;

(৫) সামাজিক কার্য্যের কর্ম্মিগণ।

কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহ যেরূপ নয় শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, সেইরূপ কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনার কর্ম্মিগণও অনুষ্ঠানসমূহের বিভাগানুসারে প্রধানতঃ নয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন।

কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনার প্রধান নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান যেমন একষট্টিটী প্রত্যন্তর শ্রেণীতে বিভক্ত হয় ; সেইরূপ কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণও একষট্টিটি প্রত্যন্তর শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন।

দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহ যেরূপ নয় শ্রেণীতে বিভক্ত, দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণও সেইরূপ নয় শ্রেণীতে বিভক্ত।

দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহ যেরূপ উনষাট প্রত্যন্তর-শ্রেণীতে বিভক্ত, দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণও সেইরূপ উনষাটটী প্রত্যন্তর শ্রেণীতে বিভক্ত।

গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহ যেরূপ নয়শ্রেণীতে বিভক্ত, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণও সেইরূপ নয়শ্রেণীতে বিভক্ত।

গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার নয়শ্রেণীর অনুষ্ঠান যেরূপ সাতান্নটী প্রত্যন্তর-শ্রেণীতে বিভক্ত, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার নয়শ্রেণীর কর্ম্মীও সেইরূপ সাতান্নটী প্রত্যন্তর-শ্রেণীতে বিভক্ত।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহ যেরূপ ছয়শ্রেণীতে বিভক্ত ; গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মিগণও সেইরূপ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার ছয়শ্রেণীর অনুষ্ঠান যেরূপ চল্লিশটী প্রত্যন্তর-শ্রেণীতে বিভক্ত, গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার ছয়শ্রেণীর কর্ম্মীও সেইরূপ চল্লিশটী প্রত্যন্তর-শ্রেণীতে বিভক্ত।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যের কর্ম্মিগণ প্রধানতঃ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত, যথা :

(১) সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মী ;

(২) সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মী ;

(৩) সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মী ;

(৪) সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মী।

সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মী প্রধানতঃ নয়-শ্রেণীর হইয়া থাকে, যথা :—

(১) সামাজিক কার্য্যের চতুর্থশ্রেণীর কর্ম্মীর শিক্ষকতা-বিষয়ক তিনশ্রেণীর সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মী ;

(২) সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মীর শিক্ষকতা-বিষয়ক দুই শ্রেণীর সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মী ;

(৩) সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মীর শিক্ষকতা-বিষয়ক দুই শ্রেণীর সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মী ;

(৪) দশম বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্কা এবং ত্রয়োদশ বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্কা বালিকাগণের গৃহিণীপণার শিক্ষকতা-বিষয়ক দুই-শ্রেণীর সামাজিক কার্য্যের প্রথমশ্রেণীর কর্ম্মী ;৮

(৫) পঞ্চমবৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্কা এবং দশমবৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্কা বালিকাগণের শিক্ষকতা-বিষয়ক দুইশ্রেণীর সামাজিক কার্য্যের প্রথমশ্রেণীর কর্ম্মী ;৯

(৬) পঞ্চমবৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক এবং পঞ্চদশ বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্ক বালকগণের শিক্ষকতা-বিষয়ক দশশ্রেণীর সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মী ;১০

(৭) জনসাধারণের চিকিৎসা করিবার সামাজিক কার্য্যবিষয়ক সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর শ্রমিক ;

(৮) বিবাহ, গর্ভ, গর্ভিণী, এক বৎসরের অনধিকবয়স্ক শিশু, এক বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক ও পঞ্চম বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্ক শিশু, একাদশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক বালকগণের ইন্দ্রিয়, নবম বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্কা বালিকাগণের ইন্দ্রিয় এবং প্রচার—এই আট শ্রেণীর সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মী ;

(৯) যাজ্ঞিক কার্য্যবিষয়ক সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মী।

মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার দায়িত্ব-ভার সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের হস্তে ন্যস্ত হয়।

মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ যেরূপ পনের শ্রেণীতে বিভক্ত ; সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণও সেইরূপ পনের শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন।

সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণ প্রধানতঃ আটাত্রিশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন। সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণকে চলতি ভাষায় "শ্রমিক" বলা হয়।

শ্রমিকগণের উপরোক্ত আটত্রিশ শ্রেণীর শ্রেণীবিভাগ নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে হয়, যথা :

(১) জলজাত দ্রব্য উৎপাদন ও সংগ্রহ করিবার সামাজিক কার্য্যের এক শ্রেণীর "শ্রমিক" ;

(২) বন ও বাগান-জাত দ্রব্য উৎপাদন ও সংগ্রহ করিবার সামাজিক কার্য্যের অনুষ্ঠানসমূহের বিভাগানুযায়ী পাঁচটী শ্রেণীর "শ্রমিক" ;

(৩) খনিজাত দ্রব্য সংগ্রহ ও উৎপাদন করিবার সামাজিক কার্য্যের এক শ্রেণীর শ্রমিক ;

(৪) শিল্প ও কারুকার্য্য-সম্বন্ধীয় সামাজিক কার্য্যের অনুষ্ঠান-সমূহের বিভাগানুযায়ী ষোলটী শ্রেণীর শ্রমিক ;

(৫) যন্ত্র পরিচালনা করিবার কার্য্যবিষয়ক সামাজিক কার্য্যের এক শ্রেণীর শ্রমিক ;

(৬) ভবন-নির্ম্মাণ-কার্য্যবিষয়ক সামাজিক কার্য্যের এক শ্রেণীর শ্রমিক ;

(৭) খাল-খনন ও স্থলপথ-নির্ম্মাণ ও রক্ষা করিবার সামাজিক কার্য্যের এক শ্রেণীর শ্রমিক ;

(৮) রোগী ও ভোগিগণের পরিচর্য্যা কার্য্যবিষয়ক সামাজিক কার্য্যের এক শ্রেণীর শ্রমিক ;

(৯) ক্রয়-বিক্রয় করিবার কার্য্যবিষয়ক সামাজিক কার্য্যের অনুষ্ঠানসমূহের বিভাগানুযায়ী দুইটী শ্রেণীর শ্রমিক ;

(১০) যান-পরিচালনা-কার্য্য বিষয়ক সামাজিক কার্য্যের অনুষ্ঠানসমূহের বিভাগানুযায়ী দুইটী শ্রেণীর শ্রমিক ;

(১১) মানুষের পরস্পরের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের কার্য্যবিষয়ক সামাজিক কার্য্যের এক শ্রেণীর শ্রমিক ;

(১২) ভূমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন বিষয়ের সংবাদ প্রচারের কার্য্য-বিষয়ক সামাজিক কার্য্যের এক শ্রেণীর শ্রমিক ;

(১৩) গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার কার্য্য-বিষয়ক সামাজিক কার্য্যের অনুষ্ঠানসমূহের বিভাগানুযায়ী চারিটী শ্রেণীর শ্রমিক ;

(১৪) মানুষের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার কার্য্য-বিষয়ক সামাজিক কার্য্যের এক শ্রেণীর শ্রমিক।

সামাজিক কার্য্যের উপরোক্ত আটত্রিশ শ্রেণীর শ্রমিকগণের মধ্যে শেষোক্ত দশ শ্রেণীর শ্রমিক ছাড়া আর বাকী আঠাশ শ্রেণীর শ্রমিকগণের প্রত্যেক শ্রেণীর শ্রমিকগণের হস্তে কৃষি-কার্য্যের দায়িত্বভার অর্পিত হইয়া থাকে।

৮ (ক) মাতা অথবা অভিভাবিকাগণকে শিক্ষকতা শিখাইবার একশ্রেণী, আর (খ) শিক্ষকতা বিধিবদ্ধভাবে সাধিত হইতেছে কি না তাহা পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিবার একশ্রেণী ;

৯ (ক) মাতা অথবা অভিভাবিকাগণকে শিক্ষকতা শিখাইবার একশ্রেণী ; আর (খ) শিক্ষকতা বিধিবদ্ধভাবে সাধিত হইতেছে কি না তাহা পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিবার একশ্রেণী ;

১০ দশশ্রেণীর—ষষ্ঠ বৎসরের বালকগণ হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ বৎসরের বালকগণ পর্য্যন্ত দশশ্রেণীর বয়সের দশশ্রেণীর শিক্ষকতা করিবার জন্য দশশ্রেণীর শিক্ষক।

৫। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অনুষ্ঠানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টন

এই আলোচনায় আমাদের বক্তব্য পাঁচ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণ।

এই চারি শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণের নাম—

(১) কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহের কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণ;

(২) দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণ;

(৩) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণ;

(৪) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভার অনুষ্ঠান-সমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণ;

(৫) গ্রামস্থ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণ।

আমরা অতঃপর উপরোক্ত কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণ বিবৃত করিব।

(১) কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠান-সমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণ

কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার দায়িত্বসমূহ নয়টী কার্য্যবিভাগের দ্বারা নির্ব্বাহ করা হইয়া থাকে। তিন শ্রেণীর মুখ্যানুষ্ঠানের এবং ছয় শ্রেণীর আনুষঙ্গিকানুষ্ঠানের বিভিন্ন নামানুসারে, কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার নয়টী কার্য্যবিভাগের নামকরণ করা হয়। কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার প্রধান কর্ম্মীকে সংস্কৃত ভাষায় "বিরাট পুরুষ" বলিয়া অভিহিত করা হয়। নয়টী কার্য্যবিভাগের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়—নয় শ্রেণীর কার্য্যবিভাগের ভারপ্রাপ্ত অমাত্যগণের হস্তে। ঐ নয়জন অমাত্যকে নয় শ্রেণীর কার্য্যবিভাগের নামানুসারে এক একটী বিভাগের "কেন্দ্রীয় অমাত্য" বলিয়া অভিহিত করা হয়।

"কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার" নয়টী কার্য্যবিভাগের নাম—

(১) বিভিন্ন বিষয়ের অথবা ব্যাপারের বিজ্ঞান ও তত্ত্ব দর্শন করিবার এবং প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান ও তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিবার এবং কেন্দ্রীয় ভাষায় প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানগ্রন্থ ও তত্ত্বগ্রন্থ-সমূহ রচনা করিবার কার্য্যবিভাগ। এই কার্য্যবিভাগটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ";[১১]

[১১] বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ সাতটী শাখায় বিভক্ত থাকে, যথা:

(ক) মানুষের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও অভ্যাস-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবার এবং কেন্দ্রীয় ভাষায় ঐ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান-গ্রন্থ ও তত্ত্বগ্রন্থ রচনা করিবার কার্য্যশাখা;

এই শাখাটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"শিক্ষা ও অভ্যাস সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণাবিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যশাখা।"

(খ) নীতি-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার এবং কেন্দ্রীয় ভাষায় ঐ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানগ্রন্থ ও তত্ত্বগ্রন্থ রচনা করিবার কার্য্যশাখা;

এই শাখাটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"নীতি-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণাবিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যশাখা।"

(গ) সর্ব্বব্যাপী তেজ ও রসের দশ শ্রেণীর অবস্থামূলক সাধারণ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার এবং কেন্দ্রীয় ভাষায় ঐ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান-গ্রন্থ ও তত্ত্বগ্রন্থ রচনা করিবার কার্য্যশাখা;

এই শাখাটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণাবিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যশাখা।"

(ঘ) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন-বিষয়ক বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবার এবং কেন্দ্রীয় ভাষায় ঐ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানগ্রন্থ ও তত্ত্বগ্রন্থ রচনা করিবার কার্য্য-শাখা;

এই শাখাটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণাবিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যশাখা।"

(ঙ) মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন-বিষয়ক বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবার এবং কেন্দ্রীয় ভাষায় ঐ

(২) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানসমূহের সংগঠন ও বিধি-নিষেধ নির্দ্ধারণ করিবার এবং কেন্দ্রীয় ভাষায় প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধের গ্রন্থসমূহ রচনা করিবার কার্য্যবিভাগ। এই কার্য্যবিভাগটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"বিধি-নিষেধ প্রণয়ন-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্য-বিভাগ;"১২

সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানগ্রন্থ ও তত্ত্বগ্রন্থ রচনা করিবার কার্য্য-শাখা;

এই শাখাটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"কর্ম্মী শিক্ষা সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যশাখা।"

(চ) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন-বিষয়ক বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবার এবং কেন্দ্রীয় ভাষায় ঐ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানগ্রন্থ ও তত্ত্বগ্রন্থ রচনা করিবার কার্য্যশাখা;

এই শাখাটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"বালক-বালিকা ও যুবতীগণের শিক্ষাসম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণাবিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যশাখা।"

(ছ) মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানসমূহ পরিচালনা-বিষয়ক বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবার এবং কেন্দ্রীয় ভাষায় ঐ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান-গ্রন্থ ও তত্ত্বগ্রন্থ রচনা করিবার কার্য্যশাখা।

এই শাখাটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান-সমূহের সংগঠন ও বিধিনিষেধ-সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যশাখা"।

১২ বিধি-নিষেধ প্রণয়ন বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্য-বিভাগ পাঁচটী শাখায় বিভক্ত, যথা—

(ক) কেন্দ্রীয় চারি শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সংগঠন ও বিধি-নিষেধ প্রণয়ন করিবার এবং কেন্দ্রীয় ভাষায় তৎসম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করিবার কার্য্যশাখা;

এই শাখাটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন ও বিধি-নিষেধ প্রণয়ন-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যশাখা।"

(খ) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধন-প্রাচুর্য্য-সাধন বিষয়ক সংগঠন ও বিধি-নিষেধ প্রণয়ন করিবার এবং কেন্দ্রীয় ভাষায় তৎসম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করিবার কার্য্য-শাখা:

এই শাখাটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"ধননীতি সম্বন্ধীয় সংগঠন ও বিধি-নিষেধ প্রণয়ন-বিষয়ক কার্য্যশাখা।"

(গ) মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন-বিষয়ক সংগঠন ও বিধি-নিষেধ প্রণয়ন করিবার এবং কেন্দ্রীয় ভাষায় তৎসম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করিবার কার্য্যশাখা;

এই শাখাটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"কর্ম্মীগণের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় সংগঠন ও বিধি-নিষেধ প্রণয়ন বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যশাখা।"

(ঘ) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন বিষয়ক সংগঠন ও বিধি-নিষেধ প্রণয়ন করিবার এবং কেন্দ্রীয় ভাষায় তৎসম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করিবার কার্য্য-শাখা;

এই শাখাটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"বালক-বালিকাগণের ও যুবক-যুবতীগণের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় সংগঠন ও বিধি-নিষেধ প্রণয়ন-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যশাখা।"

(ঙ) মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার আনুষঙ্গিক ছয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন-বিষয়ক সংগঠন ও বিধি-নিষেধ প্রণয়ন করিবার এবং তৎসম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করিবার কার্য্যশাখা;

এই শাখাটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"আনুষঙ্গিক ছয় শ্রেণীর অনুষ্ঠানের সংগঠন ও বিধি-নিষেধ প্রণয়ন-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্য শাখা;

১৩ সীমানা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগের কোন শাখা-বিভাগ থাকে না।

(৩) বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন গ্রামের সীমানা নির্দ্ধারণ, রক্ষা এবং সীমানা-সংক্রান্ত বিবাদের বিচার করিবার কার্য্যবিভাগ। এই বিভাগটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"সীমানা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ;১৩

(৪) মানুষের পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তিগত বিবাদের বিচার করিবার ও পরস্পরের মধ্যে সৌখ্য-স্থাপন করিবার

কার্য্যবিভাগ। এই বিভাগটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"বিচার-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ";১৪

(৫) কোন শ্রেণীর কর-স্থাপন না করিয়া সামাজিক, সামাজিক তত্ত্বাবধারণের এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থপ্রয়োজন নির্ব্বাহ করিবার কার্য্যবিভাগ; এই বিভাগটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"কোষ-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ।"১৫

(৬) সামাজিক, সামাজিক তত্ত্বাবধারক ও রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভাসমূহের কর্ম্ম-নিয়োগ করিবার এবং জনসভাসমূহের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার কার্য্য-বিভাগ; এই বিভাগটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"নিয়োগ ও নির্ব্বাচনবিষয়ক কেন্দ্রীয় কর্য্যবিভাগ"১৬

(৭) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে প্রচার ও পরিদর্শন করিবার কার্য্যবিভাগ; এই বিভাগটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"বালক-বালিকা এবং যুবক-যুবতীর শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্য-বিভাগ।"১৭

(৮) মানুষের অলস ও বেকার জীবনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার

---

১৪ বিচার-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ তিনটী শাখায় বিভক্ত হয়, যথা:

(ক) ধন-সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিবাদের বিচার-বিষয়ক কার্য্য-শাখা;

(খ) উত্তেজনা ও বিষাদ-প্রসূত বিবাদের বিচার-বিষয়ক কার্য্য-শাখা।

(গ) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধি-নিষেধের অমান্যজনিত অপ-রাধের বিচার-বিষয়ক কার্য্য-শাখা।

১৫ কোষ-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্য-বিভাগ নয়টী শাখায় বিভক্ত, যথা—

(ক) সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের পারিশ্রমিক প্রদান-বিষয়ক কার্য্যশাখা;

(খ) সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের পারিশ্রমিক প্রদান-বিষয়ক কার্য্যশাখা;

(গ) সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণের পারিশ্রমিক প্রদান-বিষয়ক কার্য্যশাখা;

(ঘ) সামাজিক কার্য্যপরিচালনার কর্ম্মিগণের পারিশ্রমিক প্রদান-বিষয়ক কার্য্যশাখা;

(ঙ) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনার কর্ম্মিগণের পারিশ্রমিক প্রদান-বিষয়ক কার্য্যশাখা;

(চ) দেশস্থ কার্য্যপরিচালনার কর্ম্মিগণের পারিশ্রমিক প্রদান-বিষয়ক কার্য্যশাখা;

(ছ) কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনার কর্ম্মিগণের পারিশ্রমিক প্রদান-বিষয়ক কার্য্যশাখা;

(জ) সাধারণ ব্যয়নির্ব্বাহ-বিষয়ক কার্য্যশাখা;

(ঝ) রাষ্ট্রীয় কাঁচামাল ও শিল্পসমূহের মূল্য আদায়-বিষয়ক কার্য্যশাখা।

১৬ নিয়োগ ও নির্ব্বাচন-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ নয়টী শাখায় বিভক্ত, যথা:

(ক) সামাজিক প্রতিষ্ঠানের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মি-নিয়োগ-বিষয়ক কার্য্যশাখা,

(খ) সামাজিক প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মি-নিয়োগ-বিষয়ক কার্য্যশাখা;

(গ) সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মি-নিয়োগ-বিষয়ক কার্য্যশাখা;

(ঘ) সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মি-নিয়োগ-বিষয়ক কার্য্যশাখা;

(ঙ) সামাজিক কার্য্যপরিচালনার কর্ম্মি-নিয়োগ-বিষয়ক কার্য্যশাখা;

(চ) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনার কর্ম্মি-নিয়োগ-বিষয়ক কার্য্যশাখা;

(ছ) দেশস্থ কার্য্যপরিচালনার কর্ম্মি-নিয়োগ-বিষয়ক কার্য্য-শাখা

(জ) কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনার কর্ম্মি-নিয়োগ-বিষয়ক কার্য্য-শাখা;

(ঝ) জনসভাসমূহের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন-বিষয়ক কার্য্যশাখা।

১৭ বালক-বালিকা ও যুবতীগণের শিক্ষা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ পাঁচটী শাখায় বিভক্ত; যথা—

(ক) পঞ্চম বৎসরের উর্দ্ধবয়স্কা এবং দশম বৎসরের অনূর্দ্ধ-বয়স্কা বালিকাগণের শিক্ষা-বিষয়ক কার্য্যশাখা,

(খ) পঞ্চম বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক এবং পঞ্চদশ বৎসরের অনূর্দ্ধ-বয়স্ক বালকগণের শিক্ষা-বিষয়ক কার্য্যশাখা;

বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে প্রচার ও পরিদর্শন করিবার কার্য্যবিভাগ ;

এই বিভাগটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"কর্ম্মিগণের শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ।"১৮

(৯) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে প্রচার ও পরিদর্শন করিবার কার্য্যবিভাগ।

এই বিভাগটীর সংক্ষিপ্ত নাম—"সর্ব্বসাধারণের ধনপ্রাচুর্য্য-সাধনবিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্য-বিভাগ"।১৯

কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার নয়টি কার্য্যবিভাগের এক একটী কার্য্যবিভাগে যেরূপ এক একজন ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় অমাত্য থাকেন সেইরূপ প্রত্যেক কার্য্যবিভাগের প্রত্যেক কার্য্যশাখাতেও এক একজন ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় অমাত্য বিদ্যমান থাকেন

এইরূপে নয়টি কার্য্যবিভাগের ভারপ্রাপ্ত "কেন্দ্রীয় অমাত্য" নয়জন ; একষট্টিটি কার্য্যশাখার ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় অমাত্য একষট্টি জন এবং সর্ব্বোপরি "বিরাট পুরুষ"—সর্ব্বসমেত একাত্তর জন, "কেন্দ্রীয় অমাত্যের" দ্বারা "কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভা" গঠিত হইয়া থাকে।

এই উপরোক্ত একাত্তর জন "কেন্দ্রীয় অমাত্যের" মধ্যে সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়িত্ব ন্যস্ত হয় "বিরাট পুরুষের" হস্তে। তিনি তাঁহার ঐ দায়িত্ব নির্ব্বাহ করেন বাকী সত্তর জন "কেন্দ্রীয় অমাত্যের" সাহায্যে।

বালক-বালিকা-বিজ্ঞানের শিক্ষানুষ্ঠান-বিজ্ঞান, কর্ম্মিগণের শিক্ষানুষ্ঠান-বিজ্ঞান, ধনপ্রাচুর্য্য সাধনের অনুষ্ঠান সমূহের বিজ্ঞান এবং মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ত্রিবিধ মুখ্যানুষ্ঠান যাহাতে স্বতঃই সাধিত হয়,

(গ) জনসাধারণের চিকিৎসা-বিষয়ক কার্য্যশাখা ;

(ঘ) বিবাহ, গর্ভ, গর্ভিণী, এক বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্ক শিশু, এক বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক ও পঞ্চম বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্ক শিশু, একাদশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক বালকগণের ইন্দ্রিয়, নবম বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্কা বালিকাগণের ইন্দ্রিয় এবং পশুত্ব নিবারণ সম্বন্ধীয় প্রচার—এই আট শ্রেণীর শিক্ষা-বিষয়ক কার্য্যশাখা ;

(ঙ) যাজ্ঞিক কার্য্য-বিষয়ক কার্য্যশাখা।

১৮ কর্ম্মিগণের শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্য-বিভাগ সাতটী শাখায় বিভক্ত যথা—

(ক) সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক কার্য্যশাখা ;

(খ) সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক কার্য্যশাখা ;

(গ) সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক কার্য্যশাখা ;

(ঘ) গৃহিণীপণা শিক্ষা-বিষয়ক সামাজিক কর্ম্মিগণের শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক কার্য্যশাখা ;

(ঙ) সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণের শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক কার্য্যশাখা ;

(চ) সামাজিক পরিচালনাকার্য্যের কর্ম্মিগণের শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক কার্য্যশাখা ;

(ছ) রাষ্ট্রীয় কার্য্যের কর্ম্মিগণের শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক কার্য্যশাখা।

১৯ সর্ব্বসাধারণের ধনপ্রাচুর্য্য সাধন-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ পনেরটী কার্য্যশাখায় বিভক্ত ; যথা—

(ক) কৃষিকার্য্য-বিষয়ক কার্য্যশাখা ;

(খ) জলজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও সংগ্রহ-বিষয়ক কার্য্যশাখা ;

(গ) বন ও বাগানজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও সংগ্রহ-বিষয়ক কার্য্যশাখা ;

(ঘ) খনিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও সংগ্রহ-বিষয়ক কার্য্যশাখা ;

(ঙ) শিল্প ও কারুকার্য্য-বিষয়ক কার্য্যশাখা ;

(চ) যন্ত্রপরিচালনা-বিষয়ক কার্য্যশাখা ;

(ছ) ভবন নির্ম্মাণ ও রক্ষা-বিষয়ক কার্য্যশাখা ;

(জ) খাল-খনন ও স্থলপথ-নির্ম্মাণ ও রক্ষা-বিষয়ক কার্য্যশাখা ;

(ঝ) রোগী ও ভোগিগণের পরিচর্য্যা-বিষয়ক কার্য্যশাখা ;

(ঞ) ক্রয়-বিক্রয়কার্য্য-বিষয়ক কার্য্যশাখা ;

(ট) যান-পরিচালনা-বিষয়ক কার্য্যশাখা ;

(ঠ) মানুষের পরস্পরের সংবাদ আদান-প্রদান-বিষয়ক কার্য্যশাখা ;

(ড) ভূমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন-বিষয়ক সংবাদ প্রচার সম্বন্ধীয় কার্য্যশাখা ;

(ঢ) গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যশাখা ;

(ণ) মানুষের শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষা-বিষয়ক কার্য্যশাখা।

তাহার ছয় শ্রেণীর আনুষঙ্গিকানুষ্ঠান-বিজ্ঞান নির্দ্ধারণ করেন বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগের নির্দ্ধারিত বিজ্ঞান মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার সর্ব্ববিধ সঙ্কেত আবিষ্কার করিয়া থাকেন। এই কার্য্যবিভাগের কার্য্য-সাফল্য মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ভিত্তি।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগের নির্দ্ধারিত সঙ্কেতসমূহ অনায়াসে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যে যে পদ্ধতিতে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান রচনা করিতে হয় এবং যে সমস্ত অনুষ্ঠান সাধিত করিতে হয় এবং যাহা যাহা নিষিদ্ধ করিতে হয় তাহা নির্দ্ধারণ করিবার দায়িত্বভার ন্যস্ত হয় "বিধি-নিষেধ-প্রণয়ন-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগের" হাতে।

বিধি-নিষেধ-প্রণয়ন-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ একদিকে যেরূপ প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানসমূহের সংগঠন ও বিধি-নিষেধ প্রণয়ন করিয়া থাকেন, সেইরূপ আবার ঐ সংগঠন ও বিধিনিষেধ যাহাতে কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার অপর সাতটি কার্য্যবিভাগের অমাত্যগণ শিখিতে পারেন এবং তদনুসারে কার্য্য করেন তাহাও করিয়া থাকেন।

কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার অপর সাতটি কার্য্যবিভাগের দায়িত্ব প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর।

(১) যে সমস্ত অনুষ্ঠান সাধন করা প্রত্যেক কার্য্যবিভাগের দায়িত্বান্তর্ভুক্ত, সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটির বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধিনিষেধের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিচিত হওয়া;

(২) প্রত্যেক কার্য্য-বিভাগের অনুষ্ঠানসমূহের বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার ঐ ঐ কার্য্যবিভাগের ও কার্য্যশাখার অমাত্যগণকে জানাইয়া দেওয়া ও বুঝাইয়া দেওয়া;

(৩) দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার প্রত্যেক কার্য্যবিভাগের ও কার্য্য-শাখার অমাত্যগণ তাঁহাদের স্ব স্ব দায়িত্বভার বিধিবদ্ধভাবে নির্ব্বাহ করিতেছেন কি না—তাহা পরিদর্শন করা ও পরীক্ষা করা।

উপরোক্ত ভাবে কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার নয়টি কার্য্যবিভাগের মিলিত কার্য্য মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার কার্য্যানুষ্ঠানসমূহের মেরুদণ্ডস্বরূপ হইয়া থাকেন।

কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার নয়টি কার্য্যবিভাগের মিলিত কার্য্য মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার কার্য্যানুষ্ঠানসমূহের মেরুদণ্ডস্বরূপ হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহা করা কেবল মাত্র কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার নয়টী কার্য্যবিভাগের দ্বারা সম্ভবযোগ্য হয় না, উহার জন্য যেমন কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার নয়টী কার্য্যবিভাগের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার, গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার এবং গ্রামস্থ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানসমূহ মিলিতভাবে সাধন করিবার প্রয়োজন হয়। উপরোক্ত তিন শ্রেণীর কার্য্যপরিচালনা-সভায় এবং গ্রামস্থ সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে কোন্ কোন্ অনুষ্ঠান কি কি কার্য্য-পদ্ধতিতে সাধিত হয়, তাহা জানা না থাকিলে কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার নয়টী কার্য্যবিভাগের মিলিত কার্য্যে যে কি করিয়া সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়—তাহা বুঝা সম্ভবযোগ্য হয় না। কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার নয়টী কার্য্যবিভাগের মিলিত কার্য্যে যে কি করিয়া সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহা বুঝিতে হইলে দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার, গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনা-সভার এবং গ্রামস্থ সামাজিক প্রতিষ্ঠান-সমূহের অনুষ্ঠান ও কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণের সহিত পরিচিত হইতে হয়। আমরা অতঃপর একে একে ঐ চারিটী বিবরণ বিবৃত করিব।

(২) দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠান-সমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণ

কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার দায়িত্বসমূহ যেরূপ নয়টী কার্য্যবিভাগের দ্বারা নির্ব্বাহ করা হয়, দেশস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভার দায়িত্বও সেইরূপ নয়টী কার্য্যবিভাগের দ্বারা সাধিত হয়। কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার দায়িত্ব যেরূপ নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করা, দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার দায়িত্বও সেইরূপ নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করা। কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিবার সর্ব্ববিধ দায়িত্ব যেরূপ বিরাট পুরুষের স্কন্ধে ন্যস্ত হয়, সেইরূপ দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিবার সর্ব্ববিধ দায়িত্বও একজন প্রধান পুরুষের হস্তে ন্যস্ত হইয়া থাকে। যে কোন নামে এই প্রধান পুরুষ অভিহিত হইতে পারেন। সংস্কৃত ভাষানুসারে ইঁহাকে "দেশস্থ রাষ্ট্রীয় সভাপতি" বলিয়া অভিহিত করিতে হয়।

কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার নয়টী কার্য্যবিভাগের প্রত্যেকটীর দায়িত্ব যেরূপ এক একজন "কেন্দ্রীয় অমাত্যের" হস্তে অর্পিত হয়, দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার নয়টী কার্য্য-বিভাগের প্রত্যেকটীর দায়িত্বও সেইরূপ এক একজন "দেশস্থ রাষ্ট্রীয় অমাত্যের" হস্তে ন্যস্ত হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহ যেরূপ নয়জন কার্য্যবিভাগীয় অমাত্যের হস্তে ন্যস্ত থাকে, দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহ সাধন করিবার দায়িত্বভারও সেইরূপ নয়জন কার্য্যবিভাগীয় দেশস্থ অমাত্যের হস্তে অর্পিত হয়।

দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার নয়টী কার্য্যবিভাগের নাম কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার নয়টী কার্য্যবিভাগের নামের অনুরূপ হয়।

দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার নয়টী কার্য্যবিভাগের সংক্ষিপ্ত নাম :

(১) বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক দেশস্থ কার্য্যবিভাগ ;
(২) বিধি-নিষেধ-প্রণয়ন-বিষয়ক দেশস্থ কার্য্যবিভাগ ;
(৩) সীমানা-বিষয়ক দেশস্থ কার্য্যবিভাগ ;
(৪) বিচার-বিষয়ক দেশস্থ কার্য্যবিভাগ ;
(৫) কোষ-বিষয়ক দেশস্থ কার্য্যবিভাগ ;
(৬) নিয়োগ ও নির্ব্বাচন-বিষয়ক দেশস্থ কার্য্যবিভাগ ;
(৭) বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীগণের শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক দেশস্থ কার্য্যবিভাগ ;
(৮) কর্ম্মিগণের শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক দেশস্থ কার্য্যবিভাগ ;
(৯) সর্ব্বসাধারণের ধনপ্রাচুর্য্যসাধন-বিষয়ক দেশস্থ কার্য্য বিভাগ।

দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার নয়টী কার্য্যবিভাগের কার্য্যশাখা-বিভাগও প্রায়শঃ কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগের শাখা-বিভাগের অনুরূপ।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ যেরূপ সাতটী শাখায় বিভক্ত, সেইরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক দেশস্থ কার্য্যবিভাগও সাতটী শাখায় বিভক্ত। বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগের হস্তে যেরূপ কেন্দ্রীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক-গ্রন্থ ও তত্ত্ব-গ্রন্থসমূহ রচনা করিবার দায়িত্বভার অর্পিত থাকে ; বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক দেশস্থ কার্য্যবিভাগের হস্তেও সেইরূপ দেশীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক-গ্রন্থ ও তত্ত্ব-গ্রন্থ রচনা করিবার দায়িত্বভার ন্যস্ত থাকে।

বৈজ্ঞানিক তথ্য-সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার দায়িত্ব, বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগের হস্তে ন্যস্ত থাকে। কোন দেশস্থ কার্য্যবিভাগ কোন বিষয়ক বৈজ্ঞানিক তথ্যের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার দায়িত্বভার অর্পিত হন না, প্রত্যেক অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয় প্রত্যেক রকম দর্শন ও মনন যেরূপ কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ করিয়া থাকেন, দেশস্থ কার্য্য-বিভাগেরও সেইরূপ করিতে হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক দেশস্থ কার্য্যবিভাগের দর্শন ও মনন, কেন্দ্রস্থ কার্য্যবিভাগের কর্ণগোচর করাইতে হয়, এবং কেন্দ্রস্থ কার্য্যবিভাগ যাহা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন, তাহাই বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক দেশস্থ কার্য্যবিভাগ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বিধি-নিষেধ-প্রণয়ন-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ যেরূপ পাঁচটী শাখায় বিভক্ত, ঐ-বিষয়ক দেশস্থ কার্য্যবিভাগও সেইরূপ পাঁচটী শাখায় বিভক্ত। বিধি-নিষেধ-প্রণয়ন-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ যেরূপ কেন্দ্রীয় ভাষায় সংগঠন ও বিধি-নিষেধ সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া থাকেন, ঐ বিষয়ক দেশস্থ কার্য্যসভাও সেইরূপ দেশীয় ভাষায় সংগঠন ও বিধি-নিষেধের

গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক দর্শন ও মনন করা যেরূপ ঐ-বিষয়ক ঐরূপ দেশস্থ কার্য্যসভার দায়িত্বান্তর্ভুক্ত, অথচ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঐ সভার দায়িত্বের বহির্ভূত; সেইরূপ সংগঠন ও বিধি-নিষেধ সম্বন্ধীয় দর্শন ও মনন ঐ বিষয়ক দেশস্থ কার্য্যসভার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত অথচ কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঐ সভার দায়িত্বের বহির্ভূত।

সীমানা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগের যেমন কোন শাখা-বিভাগ থাকে না, ঐ-বিষয়ক দেশস্থ কার্য্যবিভাগেরও তদ্রূপ কোন শাখা-বিভাগ থাকে না। সীমানা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগের দায়িত্ব প্রধানতঃ বিভিন্ন দেশের সীমানার নির্দ্ধারণ, রক্ষা ও বিবাদ লইয়া। বিভিন্ন 'রাষ্ট্রীয় গ্রামে'র অথবা বিভিন্ন 'সামাজিক কার্য্যপরিচালনার গ্রামে'র সীমানা সম্বন্ধীয় কোন দায়িত্ব সাক্ষাৎভাবে কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগের হস্তে ন্যস্ত থাকে না। রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনার অথবা সামাজিক কার্য্যপরিচালনার অথবা 'সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের গ্রামে'র মধ্যে সীমানা-সংক্রান্ত কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে, ঐ সমস্ত বিবাদের পুনর্ব্বিচারের দায়িত্বভার কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার দায়িত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনার গ্রামসমূহের সীমানা-সংক্রান্ত কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে, তাহা মীমাংসা করিবার দায়িত্ব—সাক্ষাৎভাবে, দেশস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভার সীমানা-বিষয়ক কার্য্যবিভাগ উহার নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন। বিচার-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ যেরূপ তিনটী শাখায় বিভক্ত; ঐ বিষয়ক দেশস্থ কার্য্য-বিভাগও সেইরূপ তিনটী শাখায় বিভক্ত।

কোষ-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ যেরূপ নয়টী শাখায় বিভক্ত, ঐ-বিষয়ক দেশস্থ কার্য্যবিভাগও সেইরূপ আটটী শাখায় বিভক্ত। কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার কর্ম্মি-গণের পারিশ্রমিক প্রদানের জন্য যেরূপ একটী কেন্দ্রীয় কার্য্য-শাখা রচিত হয়, দেশস্থ কার্য্যবিভাগে সেইরূপ কোন শাখার প্রয়োজন হয় না। ইহার কারণ, কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনার কর্ম্মিগণের পারিশ্রমিক প্রদান-বিষয়ক কোন দায়িত্ব দেশস্থ কার্য্যবিভাগের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নহে।

নিয়োগ ও নির্ব্বাচন-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ যেরূপ নয়টী শাখায় বিভক্ত, ঐ-বিষয়ক দেশস্থ কার্য্যবিভাগ সেইরূপ আটটী শাখায় বিভক্ত। কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার নিয়োগ ও নির্ব্বাচন-বিষয়ক কোন দায়িত্ব ঐ-বিষয়ক দেশস্থ কার্য্যবিভাগের হস্তে থাকে না।

বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীগণের শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় বিভাগ যেরূপ পাঁচটী শাখায় বিভক্ত, ঐ-বিষয়ক দেশীয় কার্য্যবিভাগও সেইরূপ পাঁচটী শাখায় বিভক্ত।

কর্ম্মিগণের শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্যবিভাগ যেরূপ সাতটী শাখায় বিভক্ত, ঐ-বিষয়ক দেশীয় কার্য্য-বিভাগও সেইরূপ সাতটী শাখায় বিভক্ত।

সর্ব্বসাধারণের ধনপ্রাচুর্য্য সাধন-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্য্য-বিভাগ যেরূপ পনেরটী শাখায় বিভক্ত, ঐ-বিষয়ক দেশীয় কার্য্যবিভাগও সেইরূপ পনেরটী শাখায় বিভক্ত।

দেশীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার নয়টী কার্য্যবিভাগের এক একটী কার্য্যবিভাগে যেরূপ এক একজন ভারপ্রাপ্ত দেশীয় অমাত্য থাকেন, সেইরূপ প্রত্যেক কার্য্যবিভাগের প্রত্যেক কার্য্যশাখায়ও এক একজন ভারপ্রাপ্ত দেশীয় অমাত্য বিদ্যমান থাকেন। এইরূপে নয়টী কার্য্যবিভাগের ভারপ্রাপ্ত দেশীয় অমাত্য নয়জন, উনষাটটী কার্য্যশাখার ভারপ্রাপ্ত দেশীয় অমাত্য উনষাটজন এবং দেশস্থ রাষ্ট্রীয় সভাপতি—সর্ব্বসমেত উনসত্তরজন দেশীয় অমাত্যদ্বারা দেশীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভা গঠিত হইয়া থাকে।

দেশীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার নয়টী কার্য্যবিভাগের দায়িত্ব প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর, যথা :

(১) যে সমস্ত অনুষ্ঠান সাধন করা প্রত্যেক বিভাগের দায়িত্বান্তর্ভুক্ত, সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটীর বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধিনিষেধের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিচিত হওয়া ;

(২) প্রত্যেক কার্য্যবিভাগের অনুষ্ঠানসমূহের বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধিনিষেধ গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার ঐ ঐ কার্য্যবিভাগের ও কার্য্যশাখার অমাত্য-গণকে জানাইয়া দেওয়া ও বুঝাইয়া দেওয়া ;

(৩) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার প্রত্যেক কার্য্য-বিভাগের ও কার্য্যশাখার অমাত্যগণ তাঁহাদের স্ব স্ব দায়িত্বভার বিধিবদ্ধ ভাবে নির্ব্বাহ করিতেছেন কি না—তাহা পরিদর্শন করা ও পরীক্ষা করা।

(৩) গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণ

কেন্দ্রীয় ও দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার দায়িত্বসমূহ যেরূপ নয়টী কার্য্যবিভাগের দ্বারা নির্ব্বাহ করা হয়, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার দায়িত্বসমূহও সেইরূপ নয়টী কার্য্যবিভাগের দ্বারা সাধিত হয়। কেন্দ্রীয় ও দেশস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভার দায়িত্ব যেরূপ নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করা, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার দায়িত্বও সেইরূপ নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করা। কেন্দ্রীয় ও দেশস্থ কার্য্য-পরিচালনা-সভার নয় শ্রেণীর দায়িত্ব যেরূপ একজন প্রধান পুরুষের হস্তে ন্যস্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার নয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধন করিবার সর্ব্ব-বিধ দায়িত্বও একজন প্রধান পুরুষের হস্তে ন্যস্ত হয়। এই প্রধান পুরুষকে "গ্রামস্থ প্রধান রাষ্ট্রীয় অমাত্য" বলিয়া অভিহিত করা হয়।

কেন্দ্রীয় ও দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা সভার নয়টী কার্য্য-বিভাগে প্রত্যেকটীর দায়িত্ব যেমন এক একজন কেন্দ্রীয় ও দেশস্থ অমাত্যের হস্তে অর্পিত হয়, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার নয়টী কার্য্যবিভাগের প্রত্যেকটীর দায়িত্বও সেইরূপ এক একজন গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় অমাত্যের হস্তে ন্যস্ত হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় ও দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহ যেরূপ নয়জন কার্য্যবিভাগীয় অমাত্যের হস্তে ন্যস্ত থাকে, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার অনুষ্ঠান-সমূহ সাধন করিবার দায়িত্বভারও সেইরূপ নয়জন কার্য্য-বিভাগীয় গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় অমাত্যের হস্তে অর্পিত হয়।

গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার নয়টী কার্য্যবিভাগের নাম দেশস্থ কার্য্যপরিচালনা-সভার নয়টী কার্য্যবিভাগের নামের অনুরূপ হয়। গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার নয়টী কার্য্যবিভাগের কার্য্যশাখা প্রায়শঃ দেশস্থ কার্য্যবিভাগ-সমূহের শাখাবিভাগের অনুরূপ হইয়া থাকে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক দেশস্থ কার্য্যবিভাগ যেরূপ সাতটী শাখায় বিভক্ত, গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যবিভাগও সেইরূপ সাতটী শাখায় বিভক্ত। বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক দেশস্থ কার্য্যবিভাগের হস্তে যেরূপ দেশীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ও তত্ত্বগ্রন্থসমূহ রচনা করিবার দায়িত্বভার অর্পিত থাকে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যবিভাগের হস্তেও সেইরূপ গ্রাম্যভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ও তত্ত্বগ্রন্থসমূহ রচনা করিবার দায়িত্বভার ন্যস্ত থাকে।

বিধিনিষেধ-প্রণয়ন-বিষয়ক দেশীয় কার্য্যবিভাগ যেরূপ পাঁচটী শাখায় বিভক্ত, ঐ বিষয়ক গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-বিভাগও সেইরূপ পাঁচটী শাখায় বিভক্ত। বিধিনিষেধ-প্রণয়ন-বিষয়ক দেশস্থ কার্য্যবিভাগ যেরূপ দেশীয় ভাষায় সংগঠন ও বিধিনিষেধ সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া থাকেন, ঐ বিষয়ক গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যসভাও সেইরূপ গ্রাম্যভাষায় সংগঠনের ও বিধিনিষেধের গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া থাকেন।

সীমানা-বিষয়ক দেশস্থ কার্য্যবিভাগের যেমন কোন শাখাবিভাগ থাকে না; ঐ-বিষয়ক গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-বিভাগেরও সেইরূপ কোন শাখাবিভাগ থাকে না।

বিচারবিষয়ক দেশস্থ কার্য্যবিভাগ যেরূপ তিনটী শাখায় বিভক্ত, ঐ-বিষয়ক গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যবিভাগও সেইরূপ তিনটী শাখায় বিভক্ত।

কোষ-বিষয়ক গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যবিভাগ সাতটী শাখায় বিভক্ত।

নিয়োগ ও নির্ব্বাচন-বিষয়ক গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যবিভাগ সাতটী শাখায় বিভক্ত।

বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীগণের শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যবিভাগ পাঁচটী শাখায় বিভক্ত।

কর্ম্মিগণের শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-বিভাগ সাতটী শাখায় বিভক্ত।

সর্ব্বসাধারণের ধন-প্রাচুর্য্য সাধন-বিষয়ক গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-বিভাগ পনের শাখায় বিভক্ত।

গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভায় এক একটী কার্য্য-বিভাগে যেরূপ এক এক জন ভারপ্রাপ্ত গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় অমাত্য থাকেন; সেইরূপ প্রত্যেক কার্য্য-বিভাগের প্রত্যেক শাখাতেও এক একজন ভারপ্রাপ্ত গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় অমাত্য থাকেন। এইরূপে নয়টী কার্য্য-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় অমাত্য নয়জন, সাতান্নটী কার্য্য-শাখার ভারপ্রাপ্ত গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় অমাত্য সাতান্ন জন, এবং গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় সভা-পতি—সর্ব্বসমেত সাতষট্টি জন গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় অমাত্য দ্বারা

গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভা গঠিত হইয়া থাকে। গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালনা-সভার নয়টী কার্য্য-বিভাগের প্রত্যেকটীর দায়িত্ব প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর, যথা :

(১) যে সমস্ত অনুষ্ঠান সাধন করা প্রত্যেক বিভাগের দায়িত্বান্তর্ভুক্ত, সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটীর বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিচিত হওয়া ;

(২) প্রত্যেক কার্য্য-বিভাগের অনুষ্ঠানসমূহের বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভার ঐ ঐ কার্য্য-বিভাগের ও কার্য্য-শাখার অমাত্যগণকে জানাইয়া দেওয়া ও বুঝাইয়া দেওয়া ;

(৩) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভার প্রত্যেক কার্য্যবিভাগের ও কার্য্য-শাখার অমাত্যগণ তাঁহাদের স্ব স্ব দায়িত্বভার বিধিবদ্ধভাবে নির্ব্বাহ করিতেছেন কি না—তাহা পরিদর্শন করা ও পরীক্ষা করা।

(৪) গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভার অনুষ্ঠানসমূহের ও কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণ

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভার দায়িত্বসমূহ ছয়টী কার্য্যবিভাগের দ্বারা নির্ব্বাহ করা হয়। গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভায় "বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক কার্য্য-বিভাগ," "বিধি-নিষেধ প্রণয়ন-বিষয়ক কার্য্য-বিভাগ," এবং "সীমানা-বিষয়ক কার্য্য-বিভাগ" বিদ্যমান থাকে না।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভার ছয়টী কার্য্য-বিভাগের নাম—

(১) বিচার-বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনার কার্য্য-বিভাগ ;

(২) কোষ-বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনার কার্য্য বিভাগ ;

(৩) নিয়োগ ও নির্ব্বাচন-বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনার কার্য্যবিভাগ ;

(৪) বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীগণের শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনার কার্য্য-বিভাগ ;

(৫) কর্ম্মিগণের শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনার কার্য্য-বিভাগ ;

(৬) সর্ব্বসাধারণের ধনপ্রাচুর্য্য সাধনবিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনার কার্য্যবিভাগ।

উপরোক্ত ছয়টী কার্য্য-বিভাগের সর্ব্বোপরি দায়িত্ব গ্রামস্থ একজন প্রধান পুরুষের হস্তে অর্পিত হয়। তাঁহার নাম হয় "গ্রামস্থ প্রধান সামাজিক কার্য্যের পরিচালক" তিনি ছয়টী কার্য্য-বিভাগের ছয় জন ভারপ্রাপ্ত সামাজিক কার্য্য-পরিচালকের সহায়তায় তাঁহার দায়িত্ব নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

প্রত্যেক কার্য্য-বিভাগ কতকগুলি কার্য্য-শাখায় বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক কার্য্যশাখার অনুষ্ঠানসমূহ নির্ব্বাহ করিবার দায়িত্ব-ভার এক-একজন কার্য্য-শাখার গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালকের হস্তে ন্যস্ত হয়।

বিচারবিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্যপরিচালনার কার্য্য-বিভাগ তিনটী কার্য্য-শাখায় বিভক্ত হইয়া থাকে। এই তিনটী কার্য্য-শাখা ঐ-বিষয়ক গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য-বিভাগের কার্য্য-শাখার অনুরূপ

কোষবিষয়ক গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনার কার্য্য-বিভাগ পাঁচটী কার্য্য-শাখায় বিভক্ত হইয়া থাকে।

নিয়োগ ও নির্ব্বাচনবিষয়ক সামাজিক কার্য্য-পরিচালনার কার্য্যবিভাগ পাঁচটী কার্য্য-শাখায় বিভক্ত হয়।

অপর তিনটী কার্য্যবিভাগের কার্য্যশাখা-বিভাগ ঐ তিন গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় বিষয়ের কার্য্য-বিভাগের শাখা-বিভাগের অনুরূপ।

ছয়টী কার্য্য-বিভাগ সর্ব্বসমেত চল্লিশটী কার্য্য-শাখায় বিভক্ত হইয়া থাকে।

চল্লিশটী কার্য্য-শাখার চল্লিশ জন গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালক, ছয়টী কার্য্য-বিভাগের ছয় জন গ্রামস্থ কার্য্য-পরিচালক এবং সর্ব্বোপরি "প্রধান পুরুষ"—সর্ব্বসমেত এই সাতচল্লিশ জন গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালক মিলিত হইয়া গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভা গঠিত করিয়া থাকেন।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভার তিন শ্রেণীর

মুখ্যানুষ্ঠান সাধনের তিনটী কার্য্য-বিভাগের প্রত্যেকটীর দায়িত্ব প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর, যথা :

(১) যে সমস্ত অনুষ্ঠান সাধন করা প্রত্যেক বিভাগের দায়িত্বান্তর্ভুক্ত, সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটীর বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিচিত হওয়া,

(২) গ্রামস্থ তিন শ্রেণীর সামাজিক মুখ্যানুষ্ঠানসমূহের বিজ্ঞান, তত্ত্ব, সংগঠন ও বিধি-নিষেধ গ্রামস্থ সামাজিক মুখ্যানুষ্ঠানের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণকে জানাইয়া দেওয়া ও বুঝাইয়া দেওয়া ;

(৩) গ্রামস্থ সামাজিক মুখ্যানুষ্ঠানের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব দায়িত্ব-ভার বিধিবদ্ধভাবে নির্ব্বাহ করেন কি না তাহা পরিদর্শন ও পরীক্ষা করা।

(৫) গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের ও সামাজিক কর্ম্মিগণের বণ্টনের বিবরণ

গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠান যে তিন শ্রেণীর, তাহা আমরা "অনুষ্ঠানসমূহের শ্রেণীবিভাগের বিবরণ" প্রসঙ্গে বিবৃত করিয়াছি। সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে হইলে যে তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান মুখ্যতঃ সাধন করা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয় হয়, সেই তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান প্রত্যেক গ্রামে সাধিত হইয়া থাকে এবং সেই তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠানকে "গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠান" বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে।

গ্রামস্থ সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের তিনটী শ্রেণীবিভাগের নাম—

(ক) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(খ) মানুষের অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(গ) মানুষের ধনাভাব নিবারণ করিয়া ধনপ্রাচুর্য্য সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ।

(ক)

মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহের ও তৎসম্বন্ধীয় কর্ম্মিগণের দায়িত্ব বণ্টনের বিবরণ

মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ বারটী প্রত্যন্তর শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা :

(১) তরুণ-তরুণীগণের বিবাহ সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যপালন-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ ;২০

(২) তরুণীগণের গর্ভধারণযোগ্য গর্ভাশয় সমূহের অস্বাস্থ্য নিবারণ সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যপালন-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ ;২১

(৩) গর্ভিণীগণের গর্ভস্থ শিশুর২২ অস্বাস্থ্য এবং পরবর্ত্তী

২০ তরুণ তরুণীগণের বিবাহবিষয়ক উল্লেখযোগ্য সাত শ্রেণীর অনুষ্ঠানের নাম—

(ক) প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক তরুণী ও সপ্তদশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক যুবক পরস্পরের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির যোগ্যতানুসারে যোগ্যভাবে বিবাহের সম্বন্ধে যাহাতে মিলিত হন, তদ্বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(খ) কোন চতুর্দ্দশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্কা তরুণী এবং দ্বাবিংশতি বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক যুবক যাহাতে অবিবাহিতা অথবা অবিবাহিত না থাকেন, তাহা সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(গ) দ্বাদশ বৎসরের নিম্নবয়স্কা কোন তরুণী ও সপ্তদশ বৎসরের নিম্নবয়স্ক কোন তরুণ যাহাতে বিবাহিতা অথবা বিবাহিত না হইতে পারেন অথবা না হন, তদ্বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(ঘ) গ্রামের মধ্যে কুত্রাপি যাহাতে কোন পৈশাচিক প্রবৃত্তি, যথেচ্ছ অথবা অসবর্ণ বিবাহ অথবা যৌন সম্বন্ধ না হইতে পারে, তাহা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(ঙ) প্রত্যেক বিবাহিতা তরুণী ও বিবাহিত যুবক যাহাতে বিবাহের সময় পরস্পরের প্রতি অবশ্য কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য সম্বন্ধে এবং বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য সম্বন্ধে কার্য্যকারণের যুক্তিসহকারে আদ্যোপান্তভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন এবং স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ঐ সমস্ত কর্ত্তব্য করেন এবং অকর্ত্তব্য না করেন, তাহা শিখাইবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(চ) বিবাহিত জীবনে যাহাতে যুবতী ও যুবকগণের কামপ্রবৃত্তি কখনও অতৃপ্ত অথবা অসংযত হইতে না পারে, তজ্জন্য যে সমস্ত আবয়বিক ও রাসায়নিক কার্য্য করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা যাহাতে প্রত্যেক যুবক-যুবতী শিখিতে ও অভ্যাস করিতে পারেন, তাহা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(ছ) প্রত্যেক বিবাহিত যুবক ও বিবাহিতা তরুণীকে গর্ভাশয়, গর্ভধারণ, প্রসব, গর্ভাবস্থায় কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিবার অনুষ্ঠান-সমূহ।

২১ তরুণীগণের গর্ভধারণযোগ্য গর্ভাশয়সমূহের অস্বাস্থ্য নিবারণকল্পে তাঁহাদিগের গর্ভাশয় সম্বন্ধীয় আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান সাধন করিতে হয়।

২২ গর্ভিণীগণের গর্ভস্থ শিশু যাহাতে কোনরূপ বিকৃত না হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে গর্ভস্থ শিশু সম্বন্ধীয় আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানসমূহ দুই শ্রেণীর, যথা :—

(ক) গর্ভাশয়স্থিত বায়বীয় অবস্থা যখন শিশুশরীরস্থ বাষ্পীয় তরল ও স্থূল অবস্থায় পরিণতি লাভ করিতে আরম্ভ করে, তখন শিশুর শরীর যাহাতে কোনরূপ ব্যাধিগ্রস্ত না হইতে পারে, অথবা ভবিষ্যৎকালে কোনরূপ বৈকৃতিক ইচ্ছার অথবা অভিমান-প্রবৃত্তির উৎপাদক না হইতে পারে, অথবা প্রসবকালে প্রসূতির কোনরূপ ক্লেশপ্রদ না হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানসমূহ ;

জীবনে অভিমান ও বৈকৃতিক ইচ্ছার আশঙ্কা নিবারণ সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যপালন-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৪) এক বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্ক শিশুগণের[২৩] অস্বাস্থ্য এবং পরবর্ত্তী জীবনে অভিমান ও বৈকৃতিক ইচ্ছার আশঙ্কা নিবারণ সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যপালন বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৫) এক বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক এবং পঞ্চমবৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্ক শিশুগণের[২৪] অস্বাস্থ্য এবং পরবর্ত্তী জীবনে অভিমান ও বৈকৃতিক ইচ্ছার আশঙ্কা নিবারণ সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যপালন-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৬) একাদশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক বালকগণের ইন্দ্রিয়ের[২৫] অস্বাস্থ্য ও পরবর্ত্তী জীবনে অভিমান ও বৈকৃতিক ইচ্ছার আশঙ্কা নিবারণ সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যপালন-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(৭) নবম বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্কা বালিকাগণের ইন্দ্রিয়ের[২৬] অস্বাস্থ্য ও পরবর্ত্তী জীবনে অভিমান ও বৈকৃতিক ইচ্ছার আশঙ্কা নিবারণ সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যপালন-বিষয়ক অনুষ্ঠান-সমূহ ;

(৮) মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার ষড়বিধ প্রচার[২৭] সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যপালন-বিষয়ক অনুষ্ঠান-সমূহ ;

(খ) গর্ভস্থ শিশুর শরীরের অস্থিসমূহ এবং ইন্দ্রিয়সমূহ যখন শক্তিযুক্ত হইতে আরম্ভ করে, তখন শিশুর শরীর যাহাতে কোনরূপ ব্যাধিগ্রস্ত না হইতে পারে অথবা ভবিষ্যৎকালে কোনরূপ বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমান প্রবৃত্তির উৎপাদক না হইতে পারে, অথবা প্রসবকালে প্রসূতির কোনরূপ ক্লেশপ্রদ না হইতে পারে তজ্জন্য প্রয়োজনীয় আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানসমূহ ;

২৩। এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুগণের পালনসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান-সমূহ পাঁচ শ্রেণীর, যথা :

(ক) এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুগণের পালন সম্বন্ধে তাহাদিগের মাতা-পিতাগণের যাহা যাহা জানিবার ও শিখিবার প্রয়োজন, তাহা যাহাতে প্রত্যেক গ্রামস্থ এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুর প্রত্যেক পিতামাতা জানিতে পারেন এবং করিতে পারেন তাহা শিখিবার ও অভ্যাস করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(খ) ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরে নূতন আকাশ বাতাসের সহিত সংস্পর্শবশতঃ শিশুগণের শরীরে ব্যাধির, বৈকৃতিক ইচ্ছার ও অভিমান প্রবৃত্তির যে সমস্ত আশঙ্কা থাকে, সেই সমস্ত আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য যে সমস্ত আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্মের প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্ম করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(গ) কোন্ শ্রেণীর খাদ্য, পানীয় ও চালচলন কোন্ শিশুর শৈশব অবস্থায় অথবা ভবিষ্যৎকালে হিতকারী অথবা অহিতকারী, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে প্রত্যেক শিশুর গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে যে বিষয়ে যে যে প্রণালীতে পর্য্যবেক্ষণ করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সেই বিষয় সেই সেই প্রণালীতে পর্য্যবেক্ষণ করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(ঘ) শিশুগণের মন ভবিষ্যৎকালে যাহাতে অশান্ত অস্থির না হইতে পারে, তাহা করিবার জন্য শৈশব অবস্থায় যে সমস্ত আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্ম করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(ঙ) শিশুগণের ভবিষ্যৎকালে খাদ্য, পানীয় ও চালচলনের রুচি যাহাতে বিকৃত না হইতে পারে, তাহা করিবার জন্য শৈশব অবস্থায় যে সমস্ত আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত আবয়বিক ও রাসায়নিক কর্ম্ম করিবার অনুষ্ঠানসমূহ।

২৪। এই অনুষ্ঠানসমূহ দুই শ্রেণীর, যথা :

(ক) শিশুগণের খাদ্য, পানীয়, চালচলন প্রভৃতি যাহাতে তাহাদের ভবিষ্যৎ-কালে উত্তেজনা অথবা বিষাদের উদ্ভবকর হইতে না পারে, তাহা করিতে হইলে, ঐ শিশুগণের মাতা-পিতাকে যে যে বিষয় শিক্ষাদান করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সেই বিষয়ে শিক্ষাদান করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(খ) উপরোক্ত শিক্ষানুযায়ী শিশুগণের খাদ্য, পানীয় ও চালচলন প্রভৃতি সম্বন্ধে সতর্কতা রক্ষা করা হয় কিনা এবং শিশুগণের মনে উত্তেজনা অথবা বিষাদের বীজ রোপিত হইতেছে কিনা তাহা পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ।

২৫। এই অনুষ্ঠানসমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা :

(ক) কোন একাদশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক বালকের কোন ইন্দ্রিয়ের কোনরূপ অতিরিক্ত তীব্রতা অথবা কোনরূপ দৌর্ব্বল্যের আশঙ্কা আছে কিনা তাহা পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(খ) কোন একাদশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক বালকের কোন ইন্দ্রিয়ের কোনরূপ অতিরিক্ত তীব্রতা অথবা কোনরূপ দৌর্ব্বল্যের আশঙ্কার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ঐ লক্ষণসমূহের কোনটি যাহাতে অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারে, তজ্জন্য বালকগণকে যে সমস্ত রাসায়নিক অথবা শারীরিক অথবা মানসিক অভ্যাস শিখাইবার প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত রাসায়নিক, শারীরিক অথবা মানসিক অভ্যাস বালকগণকে শিখাইবার অনুষ্ঠানসমূহ।

২৬। এই অনুষ্ঠানসমূহও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা :—

(ক) কোন নবম বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্কা বালিকার কোন ইন্দ্রিয়ের কোনরূপ অতিরিক্ত তীব্রতা অথবা কোনরূপ দৌর্ব্বল্যের আশঙ্কা আছে কিনা তাহা স্থির করিতে হইলে, বালিকাগণের শরীর ও কার্য্য সম্বন্ধে যাহা যাহা লক্ষ্য করিতে হয়, সেই সমস্ত লক্ষণীয় বিষয় যাহাতে প্রত্যেক মাতা অথবা অভিভাবিকা শিক্ষা ও অভ্যাস করিতে পারেন তাহা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(খ) কোন নবম বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্কা বালিকার কোন ইন্দ্রিয়ের কোনরূপ অতিরিক্ত তীব্রতা অথবা কোনরূপ দৌর্ব্বল্যের আশঙ্কার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ঐ লক্ষণসমূহের কোনটী যাহাতে অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারে, তজ্জন্য বালিকাগণের যে সমস্ত রাসায়নিক অথবা শারীরিক অথবা মানসিক অভ্যাসের প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত রাসায়নিক, শারীরিক ও মানসিক অভ্যাস বালিকাগণকে শিখাইবার ও অভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠানসমূহ।

২৭। ষড়বিধ প্রচার :

(ক) মানুষের যে সমস্ত কার্য্যে জমি অথবা জল অথবা বাতাসের কোনরূপ

(৯) পঞ্চম বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্কা এবং দশম বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্কা বালিকাগণের২৮ শিক্ষাসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যপালন-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(১০) পঞ্চম বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক এবং পঞ্চদশ বৎসরের অনূর্দ্ধ-বয়স্ক বালকগণের২৯ শিক্ষাসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যপালন-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ ;

(১১) জনসাধারণের চিকিৎসা৩০ সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যপালন-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ ;

অসমতা অথবা বিষমতার উদ্ভব হইতে পারে, সেই সমস্ত কার্য্যের নাম ও অনিষ্টকারিতা বিষয়ক প্রচার ;

(খ) প্রত্যেক মানুষ যে সমগ্র মনুষ্য সমাজের এক একটী অংশ এবং সমগ্র মনুষ্য সংখ্যায় যে মানব সমাজের পূর্ণতা তাহা বিস্মৃত হইয়া দেশগত অথবা বিদ্যাগত অথবা বংশগত অথবা ধনগত অথবা প্রতিষ্ঠাগত অথবা সাধনাগত অথবা অন্য কোন শ্রেণীর কারণ প্রসূত কোনরূপ অভিমান অথবা অহঙ্কার পোষণ করিবার অনিষ্টকারিতা বিষয়ক প্রচার ;

(গ) সমতা ও স্বাবলম্বনের প্রবৃত্তির স্থলে, আত্মসম্মানের ছলে, উচ্চ, নীচ ভাব এবং স্বাধীনতা ও জাতীয়তার নামে দলাদলির ও উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব পোষণ করিবার অনিষ্টকারিতা বিষয়ক প্রচার ;

(ঘ) কার্য্যকারণের বিচার বিশ্লেষণযুক্ত বিজ্ঞান, নীতি ও বিধি নিষেধ শাস্ত্রের স্থলে কাল্পনিক সংস্কার অথবা মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-নীতি ও বিধি-নিষেধ শাস্ত্রের অনিষ্টকারিতা বিষয়ক প্রচার ;

(ঙ) প্রথমতঃ, স্বাভাবিক গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির মিশ্রণেই যে মানুষের প্রকৃত ধর্ম্ম ; দ্বিতীয়তঃ, যাহাতে মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির অপকর্ষ হয় তাহাই যে ধর্ম্মের অপকর্ষ এবং তৃতীয়তঃ, যাহাতে মানুষের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উৎকর্ষ হয় তাহাই যে ধর্ম্মের উৎকর্ষ—এই তিনটী কথা বিস্মৃত হইয়া সংস্কারমূলক ধর্ম্মে বিশ্বাসী হওয়ার এবং ধর্ম্ম সংস্কার লইয়া বাগদ্বেষ পোষণ করার অথবা দ্বন্দ্ব-কলহ করার অনিষ্টকারিতা বিষয়ক প্রচার ;

(চ) যাহাতে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির স্বাস্থ্য ও তৃপ্তি যুগপৎ সম্পাদিত হয়, তাহাই যে প্রকৃত উপভোগের—তাহা বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র শরীরের অথবা ইন্দ্রিয়ের অথবা বুদ্ধির তৃপ্তিজনকতা অথবা স্বাস্থ্যজনকতা উপভোগ্য মনে করার অনিষ্টকারিতা-বিষয়ক প্রচার।

২৮। এই অনুষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ ছয় শ্রেণীর, যথা :

(ক) প্রত্যেক ৫ বৎসরের অধিক বয়স্কা বালিকাগণের প্রত্যেক মাতাকে অথবা প্রত্যেক অভিভাবিকাকে দশ শ্রেণীর অভ্যাস, দশ শ্রেণীর নীতি এবং দশ শ্রেণীর পদার্থ-বিজ্ঞান বালোচিত প্রণালীতে বালিকাগণকে শিখাইবার শিক্ষাপ্রণালী অন্তঃপুর মধ্যে অভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠানসমূহ ,

(খ) উপরোক্ত মাতা বা অভিভাবিকাকে নৃত্যগীত, দুই শ্রেণীর শিল্পকার্য্য (যথা : খাদ্য সম্বন্ধীয় শিল্পকার্য্য ও পানীয় সম্বন্ধীয় শিল্পকার্য্য) ও চারি শ্রেণীর কারুকার্য্য (যথা : খাদ্য সম্বন্ধীয় কারুকার্য্য, বস্ত্র সম্বন্ধীয় কারুকার্য্য, প্রসাধন দ্রব্য সম্বন্ধীয় কারুকার্য্য ও উপভোগের উপকরণ সম্বন্ধীয় কারু-কার্য্য) বালোচিত প্রণালীতে শিখাইবার শিক্ষা-প্রণালী অন্তঃপুর মধ্যে অভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(গ) উপরোক্ত মাতা বা অভিভাবিকাকে সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ছয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সংগঠন বালোচিতভাবে শিখাইবার শিক্ষাপ্রণালী অন্তঃপুর মধ্যে অভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(ঘ) উপরোক্ত মাতা ও অভিভাবিকাকে মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ছয়চল্লিশ শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানের বিধিনিষেধ বালোচিত ভাবে শিখাইবার শিক্ষা প্রণালী অন্তঃপুর মধ্যে অভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠান সমূহ ;

(ঙ) উপরোক্ত মাতা বা অভিভাবিকাকে বালোচিত ভাবে গৃহিনীপণা শিখাইবার শিক্ষা প্রণালী অন্তঃপুর মধ্যে অভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠান সমূহ ;

(চ) দশশ্রেণীর অভ্যাস, দশশ্রেণীর নীতি, দশশ্রেণীর পদার্থ বিজ্ঞান, দুই শ্রেণীর শিল্পকার্য্য, চারি শ্রেণীর কারুকার্য্য, নৃত্যগীত, গৃহিণীপণা, সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার প্রতিষ্ঠান সমূহের সংগঠন এবং ছয়চল্লিশ শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানের বিধিনিষেধ—বালোচিত ভাবে উপরোক্ত মাতা বা অভিভাবিকাগণের দ্বারা অন্তঃপুর মধ্যে, শৃঙ্খলিত ও নিয়মিত ভাবে শেখান ও অভ্যাস করান হয় কিনা—তাহা পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিবার অনুষ্ঠান সমূহ।

২৯। এই অনুষ্ঠান সমূহ, প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত :

(ক) উপরোক্ত দশ শ্রেণীর অভ্যাস বালকের যোগ্যতা ও প্রয়োজন বিচার করিয়া তদনুরূপভাবে শিখাইবার ও অভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠান সমূহ ;

(খ) উপরোক্ত দশ শ্রেণীর নীতি বালকের যোগ্যতা ও প্রয়োজন বিচার করিয়া তদনুরূপভাবে শিখাইবার ও অভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠান সমূহ ;

(গ) উপরোক্ত দশশ্রেণীর পদার্থ বিজ্ঞান বালকের যোগ্যতা ও প্রয়োজনের বিচার করিয়া তদনুরূপভাবে শিখাইবার ও অভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠান সমূহ ;

(ঘ) মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার ছয়শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সংগঠন বিজ্ঞান বালকের যোগ্যতা ও প্রয়োজন বিচার করিয়া তদনুরূপ ভাবে শিখাইবার ও অভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠানসমূহ ,

(ঙ) মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার অনুষ্ঠানসমূহের বিধিনিষেধ বিজ্ঞান বালকের যোগ্যতা ও প্রয়োজন বিচার করিয়া তদনুরূপ ভাবে শিখাইবার ও অভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠানসমূহ।

৩০। এই অনুষ্ঠানসমূহ, প্রধানতঃ, চারিশ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা :

(ক) জমি, জল ও বাতাসের যে যে অবস্থা ঘটিলে, মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধির কোনরূপ অস্বাস্থ্যের অথবা ব্যাধির আশঙ্কার উদ্ভব হয়, জমি, জল, ও বাতাসের সেই সেই অবস্থার কোনটী ঘটিতেছে কিনা, তাহা পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(খ) জমি, জল, ও বাতাসের যে যে অবস্থা ঘটিলে, মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির কোনরূপ অস্বাস্থ্য অথবা ব্যাধির আশঙ্কার উদ্ভব হইতে পারে ; জমি, জল ও বাতাসের সেই সেই অবস্থা দূর করিতে হইলে যে যে সঙ্কেতের ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সেই সঙ্কেত ব্যবহার করিবার অনুষ্ঠানসমূহ ;

(গ) গ্রামের কোন মানুষের শরীরের অথবা ইন্দ্রিয়ের অথবা মনের অথবা বুদ্ধির কোনরূপ ব্যাধি ঘটিলে, ঐ ব্যাধি যাহাতে কোন চিকিৎসকের বিনা পারিশ্রমিকে আমূলভাবে চিকিৎসিত হয়—তাহা করিবার অনুষ্ঠান-সমূহ ;

(ঘ) সর্ব্বরকমের ব্যাধির চিকিৎসার জন্য যত রকমের ঔষধের প্রয়োজন হয়, তাহার প্রত্যেকটী যাহাতে গ্রামের মধ্যে প্রস্তুত হয় এবং প্রত্যেক ব্যাধিগ্রস্ত যাহাতে বিনামূল্যে প্রত্যেক প্রয়োজনীয় ঔষধ পাইতে পারেন, তাহার অনুষ্ঠানসমূহ।

(১২) যান্ত্রিক কার্য্য৩১ কর্ত্তব্যপালন-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ।

মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহ যাঁহারা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণের অন্তর্ভুক্ত।

মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণ প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন।

মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবার অনুষ্ঠানসমূহের যে বারটী প্রত্যন্তর শ্রেণীবিভাগ দেখান হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত আটটী প্রত্যন্তর-শ্রেণীর অনুষ্ঠানসমূহ একশ্রেণীর "সামাজিক কার্য্যের" প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণের এবং বাকী চারিটী প্রত্যন্তর শ্রেণীর অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান সমূহ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে চারিশ্রেণীর সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণ সাধন করিয়া থাকেন।

প্রথমোক্ত আটটী প্রত্যন্তর-শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধনের জন্য গ্রামস্থ প্রত্যেক কুড়িটী হইতে পঁচিশটি সংসারের দায়িত্বভার এক একজন সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মীর উপর অর্পিত হয়। সেইরূপ পঞ্চম বৎসরের উর্দ্ধবয়স্কা এবং দশম বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্কা বালিকাগণের শিক্ষানুষ্ঠানের জন্য গ্রামস্থ প্রত্যেক কুড়ি হইতে পঁচিশটি সংসারের দায়িত্বভার এক একটী সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মীর উপর অর্পিত হয়। পঞ্চমবৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক এবং পঞ্চদশ বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্ক বালকগণের শিক্ষানুষ্ঠান সাধারণ শিক্ষাগারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এতদুদ্দেশ্যে বালকগণের সংখ্যানুসারে গ্রামের বিভিন্নস্থানে শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ্রামস্থ প্রত্যেক কুড়িটী হইতে পঁচিশটী সংসারের চিকিৎসানুষ্ঠান-সাধনের দায়িত্বভার এক একটী সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মীর উপর ন্যস্ত হয়।

উপরোক্ত চতুর্ব্বিধ কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কার্য্যের কর্ম্মিগণ প্রয়োজনানুসারে যান্ত্রিক কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন।

মানুষের পশুত্ব নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্ব সাধন করিবার সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণ সামাজিক কার্য্য-পরিচালনা-সভার ঐ বিষয়ক কার্য্যবিভাগের পরিচালকগণের নির্দ্দেশ ও তত্ত্বাবধারণানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন।

পঞ্চম বৎসরের উর্দ্ধবয়স্কা এবং দশম বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্কা বালিকাগণের শিক্ষণীয় বিষয় তিন শ্রেণীর, যথা:

(১) দশ শ্রেণীর অভ্যাস;
(২) দশ শ্রেণীর নীতি;
(৩) দশ শ্রেণীর পদার্থ-বিজ্ঞান।

পঞ্চম বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক এবং পঞ্চদশ বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্ক বালকগণের শিক্ষণীয় বিষয়ও তিন শ্রেণীর; যথা:

(১) দশ শ্রেণীর অভ্যাস;
(২) দশ শ্রেণীর নীতি;
(৩) দশ শ্রেণীর পদার্থ বিজ্ঞান।

বালিকাগণকে তাহাদিগের যোগ্যতার ও প্রয়োজনের বিচার করিয়া তদনুরূপভাবে উপরোক্ত দশ শ্রেণীর অভ্যাস, দশ শ্রেণীর নীতি ও দশ শ্রেণার পদার্থ-বিজ্ঞান শিখাইবার ও অভ্যাস করাইবার ব্যবস্থা করা হয়।

বালকগণকেও তাহাদিগের যোগ্যতা ও প্রয়োজনের বিচার করিয়া তদনুরূপভাবে উপরোক্ত দশশ্রেণীর অভ্যাস, দশশ্রেণীর নীতি ও দশশ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান শিখাইবার ও অভ্যাস করাইবার ব্যবস্থা করা হয়

যদিও একই শ্রেণীর অভ্যাস, নীতি ও পদার্থবিজ্ঞান বালক ও বালিকা উভয়কে শেখান ও অভ্যাস করান হয়; তথাপি, শিক্ষণীয় বিষয় ও প্রণালীর ভেদহেতু বালক ও বালিকাগণের শিক্ষা পৃথক্ হইয়া থাকে।

দশ শ্রেণীর অভ্যাসের নাম

(১) লিখন, পঠন, দর্শন, শ্রবণ, মনন, কথা বুঝা, কথা বলা, বাক্য বুঝা, বাক্য বলা, লিখিত রচনা বুঝা ও লিখিত রচনা করার প্রণালী বিষয়ক শিক্ষা ও অভ্যাস;

(২) মানুষের নিজের মনকে অনুভব করিবার প্রণালী এবং নিজের মনকে অনুভব করিয়া নিজের গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির দোষ-গুণ পরীক্ষা ও নির্দ্ধারণ করিবার প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা ও অভ্যাস;

৩১। যান্ত্রিক কার্য্য:—জমি, জল ও বাতাসের প্রাকৃত অসমতা ও বিষমতা বশতঃ উহাদের উৎপাদিকা শক্তির, উৎপাদিকা প্রবৃত্তির এবং মানুষের স্বাস্থ্য-রক্ষার শক্তির ও প্রবৃত্তির স্বভাবতঃ যে হ্রাস ঘটিয়া থাকে, সেই হ্রাস পূরণ করিতে হইলে, কৃত্রিমভাবে সাধনানিরত শক্তি দ্বারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাতাসের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য যে সমস্ত কার্য্য করিবার প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত কার্য্যকে "যান্ত্রিক কার্য্য" বলা হয়।

(৩) অপর মানুষের শরীর অথবা চেহারা দেখিয়া তাহার গুণ, শক্তি ও প্রবৃত্তির উৎকর্ষ অপকর্ষ পরীক্ষা ও নির্দ্ধারণ-প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা ও অভ্যাস ;

(৪) অপর মানুষের কার্য্য দেখিয়া তাহার প্রবৃত্তির ও কার্য্যশক্তির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ পরীক্ষা ও নির্দ্ধারণ-প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা ও অভ্যাস ;

(৫) একাগ্রতা অথবা একনিষ্ঠ থাকিবার প্রণালী-সম্বন্ধে শিক্ষা ও অভ্যাস ;

(৬) মানুষের নিজের দোষ ও অপরের গুণ নির্দ্ধারণ করিবার প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা ও অভ্যাস ;

(৭) প্রকৃতি ও স্বভাবের স্বপক্ষতা ও বিরুদ্ধতা নির্দ্ধারণ করিবার প্রণালী এবং ঐ বিরুদ্ধতা হইতে নিজেকে বজায় রাখিবার প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা ও অভ্যাস ;

(৮) কি কি জ্ঞেয় তাহা নির্দ্ধারণ করিবার এবং জ্ঞেয় বস্তু পরিজ্ঞাত হইবার প্রণালী-বিষয়ক শিক্ষা ও অভ্যাস ;

(৯) মানুষের পরস্পরের সহিত ব্যবহার করিবার প্রণালী বিষয়ক শিক্ষা ও অভ্যাস ;

(১০) খাদ্য, পানীয়, পরিধেয়, প্রসাধন, উপভোগ প্রভৃতি আহার ও বিহারের যাবতীয় দ্রব্য নির্ব্বাচন ও ব্যবহার-প্রণালী সম্বন্ধীয় শিক্ষা ও অভ্যাস।

দশ শ্রেণীর নীতির নাম

(১) বাসভবন নির্ব্বাচন ও ব্যবহার-প্রণালী সম্বন্ধীয় নীতি ;

(২) যানবাহন নির্ব্বাচন ও ব্যবহার প্রণালী সম্বন্ধীয় নীতি ;

(৩) উপভোগ্য পদার্থ-নির্ব্বাচন ও ব্যবহার-প্রণালী সম্বন্ধীয় নীতি ;

(৪) আত্মরক্ষার পন্থা ও উপকরণ নির্ব্বাচন ও ব্যবহার প্রণালী সম্বন্ধীয় নীতি ;

(৫) সংসার যাত্রার উপকরণ ও সাংসারিক সম্বন্ধ-নির্ব্বাচন ও ব্যবহার-প্রণালী সম্বন্ধীয় নীতি ;

(৬) চিকিৎসা-শাস্ত্র, চিকিৎসক ও ঔষধ নির্ব্বাচন ও ব্যবহার-প্রণালী সম্বন্ধীয় নীতি ;

(৭) জীবিকার্জ্জন বৃত্তি নির্ব্বাচন এবং ঐ বৃত্তিতে সিদ্ধিলাভ করিবার প্রণালী সম্বন্ধীয় নীতি ;

(৮) মানুষের সর্ব্ববিধ ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবার প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয়তার শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধীয় নীতি ;

(৯) মানুষের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, শিল্পজাত দ্রব্য এবং কারুকার্য্যজাত দ্রব্য উৎপাদন করিবার ও ক্রয়-বিক্রয় করিবার নীতি ;

(১০) বিভিন্ন গ্রামের ও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিষয়ের এবং মানুষের পরস্পরের সংবাদ আদান-প্রদান করিবার নীতি।

দশ শ্রেণীর পদার্থ-বিজ্ঞান

(১) ভূমণ্ডলের কারণ ও কার্য্য পদার্থ-বিষয়ক অথবা অখণ্ড ও খণ্ডপদার্থ-বিষয়ক অথবা সম্পূর্ণত্ব ও সংখ্যাত্ব-বিষয়ক অথবা নিশ্চলতা ও চলৎশীলতা-বিষয়ক বিজ্ঞান ;

(২) ভূমণ্ডলের খণ্ডপদার্থসমূহের স্বাভাবিক আকৃতি অথবা স্বাভাবিক অঙ্কন-বিষয়ক (যথা—ঈক্ষণমিতি, ত্রিকোণমিতি ও জ্যামিতি-বিষয়ক) বিজ্ঞান ;

(৩) ভূমণ্ডলের খণ্ড পদার্থ সমূহের বীজ ও শ্রেণীবিভাগ (যথাঃ বীজগণিত ও পাটীগণিত)-বিষয়ক বিজ্ঞান ;

(৪) ভূমণ্ডলের চলৎ-শীলতার গাণিতিক নিয়ম সম্বন্ধীয় এবং দিন-রাত্রি প্রভৃতি কালগত বিভাগ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ;

(৫) জমি, জল ও বাতাসের অথবা স্থূল, তরল ও বাষ্পীয় অবস্থার প্রাকৃতিক গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, সমতা, অসমতা, বিষমতা এবং উৎপাদিকা গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি সম্বন্ধীয় এবং তাহাদের প্রাকৃতিক গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তিগত ও দেশগত শ্রেণীবিভাগ-সম্বন্ধীয় পদার্থ বিজ্ঞান ;

(৬) উদ্ভিদসমূহের প্রাকৃতিক গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি ; সমতা, অসমতা, বিষমতা ও উৎপাদিকা গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি সম্বন্ধীয় এবং তাহাদের দেশগত ও প্রাকৃতিক গুণশক্তিগত শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ;

(৭) বিচারশক্তিহীন চরজীবসমূহের প্রাকৃতিক গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, সমতা, অসমতা, বিষমতা ও উৎপাদিকা গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি সম্বন্ধীয় এবং তাহাদের দেশগত ও প্রাকৃতিক গুণশক্তিগত শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ;

(৮) মনুষ্যজাতির শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির প্রাকৃতিক গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তি, সমতা, অসমতা, বিসমতা ও উৎপাদিক

গুণ শক্তি প্রবৃত্তি সম্বন্ধীয় এবং তাহাদের দেশগত, সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক গুণ, শক্তি, প্রবৃত্তিগত ও সাধনাগত শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞান;

(৯) মনুষ্যজাতির শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ শক্তির ও প্রবৃত্তির ধর্ম্ম ও কর্ম্মবিষয়ক এবং উহাদের শ্রেণীবিভাগ (অর্থাৎ উৎকর্ষ ও অপকর্ষ) সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। মনুষ্যজাতির প্রকৃতিগত ও স্বভাবগত উত্থান-পতনের ইতিহাস এই বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত;

(১০) মনুষ্যজাতির শরীর ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির স্বাস্থ্যরক্ষার দ্রব্য-সমূহের উৎপাদন ও ব্যবহার এবং ব্যাধি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান।

(খ)

মানুষের অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন-সাধন করিবার সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের ও তৎসম্বন্ধীয় কর্ম্মিগণের দায়িত্ব বণ্টনের বিবরণ

মানুষের অলস ও বেকার জীবন নিবারণ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত ও উপার্জ্জনশীল জীবন-সাধন করিবার সামাজিক অনুষ্ঠান যে সাত শ্রেণীর—তাহা আমরা আগেই উল্লেখ করিয়াছি।

এই সাত শ্রেণীর অনুষ্ঠানের মধ্যে চারি শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধনের দায়িত্বভার সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণের হস্তে অর্পিত হয়। ঐ চারি শ্রেণীর অনুষ্ঠানের নাম—

(১) সামাজিক কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মিগণের শিক্ষা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ;

(২) সামাজিক কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের শিক্ষা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ;

(৩) সামাজিক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মিগণের শিক্ষা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ;

(৪) রমণীগণের গৃহিণীপণা শিক্ষা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠান-সমূহ;

উপরোক্ত চারি শ্রেণীর অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠান সাধারণ শিক্ষাগারে সাধিত হয়।

রমণীগণের গৃহিণীপণা শিক্ষা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠান-সমূহ সাধিত হয়, প্রত্যেক সংসারের অন্তঃপুরের মধ্যে। উহা সাধন করিবার দায়িত্ব মাতা অথবা অন্যান্য অভিভাবিকা-গণের হস্তে সাক্ষাৎভাবে ন্যস্ত হয়। সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণের হস্তে মাতা ও অন্যান্য অভিভাবিকা-গণকে উহা শিখাইবার দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়। প্রত্যেক কুড়িটী হইতে পঁচিশটী সংসারের দায়িত্বভার এক একটী সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মীর হস্তে ন্যস্ত হয়।

সামাজিক কার্য্যের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মিগণের শিক্ষা-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহ সাধন করিবার দায়িত্বভার অর্পিত হয় গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য পরিচালনা-সভার "কর্ম্মিগণের শিক্ষা ও সাধনা বিষয়ক কার্য্যবিভাগের" পরিচালকগণের হস্তে। এই অনুষ্ঠানসমূহ সাধারণ শিক্ষাগারে সাধিত হইয়া থাকে।

গ্রামস্থ সামাজিক কার্য্য পরিচালনার কর্ম্মিগণের শিক্ষা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ সাধন করিবার দায়িত্বভার অর্পিত হয় গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনা-সভার "কর্ম্মিগণের শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক" কার্য্যবিভাগের গ্রামস্থ আমাত্যগণের হস্তে। গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনার কর্ম্মিগণের শিক্ষা-বিষয়ক সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ সাধন করিবার দায়িত্বভারও গ্রামস্থ রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা-সভার "কর্ম্মিগণের শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ক" কার্য্যবিভাগের গ্রামস্থ আমাত্যগণের হস্তে অর্পিত হইয়া থাকে।

উপরোক্ত দুই শ্রেণীর অনুষ্ঠানই সাধারণ শিক্ষাগারে সাধিত হয়।

ক্রমশঃ

'লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী'

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫১

১১শ বর্ষ, ২য় খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা

আমাদের জীবন ও সাহিত্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

জীবন ও সাহিত্য যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, এটা বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে সর্ব্বজনগ্রাহ্যরূপে স্বীকৃত হয়েছে। সাহিত্য যে জীবনেরই প্রতিচ্ছবি—এ সম্বন্ধে আজ আর কেউ সংশয় পোষণ করেন না। 'জীবন" বলতে কী বোঝায় এ নিয়েও আজ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে কোনও মত-ভেদ নেই। জীবনের সবচেয়ে সবল ব্যাখ্যা হচ্ছে—"নলিনীদলগতজলবৎ তরলং, মানবজীবনং অতিশয়-চপলম্!" কিন্তু, আধুনিক যুগে এই বৈরাগ্যের বাণী অনু-রাগের বর্ণে রঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে। জীবন বলতে আমরা এখন বুঝি—A struggle for existence.

আজ আমাদের আশেপাশে নানাদিক-দেশাগত এমন অনেক জীবন্ত মানুষকে ঘুরে বেড়াতে দেখছি—যাদের "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন!" এরা যেন দলে দলে গান গেয়ে চলেছে—"হেসে নাও দু'দিন বই ত নয়।" সেই প্রাচীন চার্ব্বাকীয় নীতি আজ যেন সারা পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার ক'রে ব'সেছে—"Eat, drink and be merry for to-morrow you shall die!"

আমাদের দেশ জ্ঞানের প্রথম অরুণোদয়েই মানুষকে 'অমৃতের পুত্র' বলে অভিনন্দন জানিয়েছিল। জানিয়ে-ছিল—জীবন চির-চলমান। সৃষ্টির রথচক্রের অবিরাম গতির সঙ্গে অনন্তের পথে অনন্তকাল ধ'রে ধাবমান। এর ছেদ নেই, ক্ষয় নেই, সমাপ্তি নেই। আছে শুধু এর ওঠানামা—ঊর্দ্ধে উন্নত লোকে বা অধোলোকের নিম্নস্তরে।

পাশ্চাত্য দেশের মনীষীদের মুখেও আমরা জীবন সম্বন্ধে এই ধরণের উচ্চ ধারণার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। গ্যয়েটে বলেছেন:—"Life is the childhood of our immortality. It is a quarry out of which we are to mould and chisel and complete a character. There is nothing in life so irrational, that good sense and chance may not set it to rights, nothing so rational, that folly and chance may not utterly cofound it. A useless life is only an early death!"

এই জীবন ও মৃত্যু এবং মৃত্যুঞ্জয়ী অমরত্ব যুগে যুগে মানুষের চিরজীবনের সমস্যা ও স্বপ্ন! তার ধ্যান ও কল্পনার অফুরন্ত উপকরণ! গ্যয়েটের কথার প্রতিধ্বনি করেই যেন অমর কবি শেলী বলেছেন—

"Life like a dome of many colored glass
Stains the white radiance of eternity!"

'নলিনীদলগতজলবৎ'' হলেও মানুষের জীবনকে তার অধ্যাত্ম সাধনা যেমন অমর করে তুলতে পারে, তার সাহিত্য-সাধনাও তাকে তেমনিই অমরত্ব দিতে পারে। বাণীর সাধনায় যেখানে সাধকের চিত্তশুদ্ধি ঘটে, সেখানে তার চিরন্তন ঠাঁই মেলে সাহিত্যলক্ষ্মীর অমরাবতীতে। মানুষের সৃষ্ট সাহিত্য তার অনবদ্য মানস-পদ্মের দিব্য

ভাবরসে Devine হয়ে ওঠে। তখনই সে বলে আমাদের মিনতি করে :—Tell me not in mournful numbers, Life is but an empty dream! তার মনে পড়ে যায়—"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়"—সে তখন দৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারে—"Dust thou art—dust returnest!"

যে দেশ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার দিক দিয়ে যতটা অগ্রসর হতে পেরেছে, তাদের জীবনও তত বিচিত্র ও অভিনব হয়ে উঠেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাহিত্যও বড় হয়ে উঠতে পেরেছে।

বাংলা সাহিত্য নিয়ে আমাদের গর্ব্ব আর অহঙ্কারের সীমা নেই। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্য কতদূর অগ্রসর হয়েছে জানি না এবং তার খবরও রাখি না। কিন্তু যাদের সজীব সাহিত্যের অনুকরণ ও অনুসরণে বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি, উন্নতি ও প্রগতি সম্ভব হয়েছে এবং আজও যাদের সাহিত্যের মানদণ্ডেই মেপে আমাদের সাহিত্যের পরিমাপ করি, তাদের সেই বিরাট বিশাল সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, আমাদের সাহিত্য প্রদীপ্ত সূর্য্যের পাশে মেটে প্রদীপের মৃদু আলো। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলার সাহিত্য গগন মেঘলা-দিনের মতোই ম্লান মনে হবে। শরৎচন্দ্র শুকতারার মতো একপাশে মিট মিট করলেও সে আলোয় পথ চলা যায় না। বাংলা কথা-সাহিত্যের একমাত্র ক্লাসিক বঙ্কিম-চন্দ্র একমেবাদ্বিতীয়ং! এই আঙুলে গোনা সম্পদ্ নিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যেতে পারে হয়ত, কিন্তু অহঙ্কার করা সাজে না।

আমি জানি এ অভিমত অনেকেরই মনঃপূত হবে না। বিশেষ করে যাঁরা সকলে তথাকথিত স্বদেশপ্রেমিক, তাঁরা হয়ত এটাকে Inferiority complex বলে মনে মনে অবজ্ঞাই করবেন। কারণ, তাঁদের অনেকেরই বিশ্বাস যে, যেহেতু আমরা বাঙালী, অতএব আমাদের যা কিছু সবই শ্রেষ্ঠ! তাঁদের এ মনোভাবের মধ্যে অন্ধ গোঁড়ামীর সংকীর্ণতা যতটা উগ্র, অকৃত্রিম স্বাদেশিকতা ততটা নেই।

স্বদেশানুরাগ যে খুব একটা বড় জিনিস এবং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সকল দেশের এবং সকল জাতির পক্ষেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু এ কথা ঠিক। প্রাচীন পৌরাণিক যুগে এটা যে আন্তরিকতার গুণে একান্ত সত্য হয়ে উঠেছিল ইতি-হাসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু, আধুনিক সভ্যতার যুগে পৃথিবীর ভৌগোলিক ব্যবধান ক্রমশঃ হ্রস্ব হয়ে পড়ায় এবং একদেশের মানুষের সঙ্গে অপর দেশের মানুষের অন্তরঙ্গতা ও মিলন সহজ হওয়ায় মানুষের দেশাত্মবোধের আদর্শও আজ বদলে এসেছে। সাম্রাজ্যবাদের সূর্য্য আজ অস্তাচলচূড়াবলম্বী। দেশে দেশে আজ গণ জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে। তাই এ যুগে আর্য্যদর্পী হিটলারের 'নাজী নীতি' ও রোমান এম্পায়ারের দুঃস্বপ্নে মগ্ন মুশো-লিনীর 'ফ্যাসিজম্' বিশ্বের সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হয়েছে। রুশিয়ার সাম্যবাদ পৃথিবীকে আজ এক-পরিবারভুক্ত হবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে। স্বাজাত্য-বোধ ও স্বদেশপ্রীতি তাই এক শ্রেণীর উদার প্রকৃতির লোকের কাছে আজ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ সংকীর্ণতার নামান্তর মাত্র!

নিজেদের সব কিছু মন্দ মনে করাটাকে inferiority complex বলে অবজ্ঞা ভরে উড়িয়ে দিতে চাইলেই আমাদের দোষত্রুটি অভাব বিচ্যুতিগুলো কিন্তু সেই সঙ্গে উড়ে যায় না বা লোপ পায় না। উপরন্তু, আমাদের সব কিছুই ভালো মনে করার মধ্যে যে superiority complex কাজ করছে, সেটা যে আমাদের দেশকে ও জাতকে কোথায় নামিয়ে নিয়ে চলেছে—সে সম্বন্ধে আমরা রয়েছি সম্পূর্ণ উদাসীন। অথচ, এ সত্য তো অস্বীকার করা যায় না যে, নিজেদের দোষ-ত্রুটি অভাব ও অক্ষমতা সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন থাকাটা জাতির পক্ষে সকল দিক দিয়েই কল্যাণকর।

ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণেতরদের অবজ্ঞা করেন 'শূদ্র' বলে। পশ্চিম-বঙ্গ পূর্ব্ব-বঙ্গকে অবজ্ঞা করেন 'বাঙাল' বলে। বেহারী ও মাড়োয়াড়ী সম্প্রদায়ের লোকগুলিকে আমরা 'খোট্টা বেটারা' ও 'মেড়ুয়াবাদীরা' বলে তাচ্ছিল্য করি। প্রতিবেশী মুসলমান ভাইদের আমরা অপমান করি 'নেড়ে' বলে। উড়িষ্যাবাসীদের 'উড়ে' বলে উড়িয়ে দেই, মানুষের মধ্যে গণ্য করি না। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের 'ট্যাশ-ফিরিঙ্গী' বলে ঘৃণা করি। অথচ আমাদের যখন শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা 'ব্ল্যাকনিগার্' বলেন—অথবা কেবল মাত্র 'নেটিভ'

বলেন, আমাদের ক্রোধ, ক্ষোভ ও অভিমানের অন্ত থাকে না।

এ ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু বাইবেলের সেই অমূল্য উপদেশটির কথা একেবারেই মনে থাকে না—"Do unto others what you would like to be done for you!" ফলে আমাদের এই মিথ্যা Superiority complex ভারতের সমস্ত প্রদেশকে আজ বাঙালী-বিদ্বেষী করে তুলেছে। তোলবারই কথা। কারণ Hate begets hate! আমরা যতই সকল বিষয়ে অন্যান্য প্রদেশ থেকে পিছিয়ে পড়ছি, ততই খুঁড়িয়ে বড় হবার লোভ ও আগ্রহ আমাদের বেড়েই চলেছে।

বাংলা সাহিত্য যে বড় হতে পারছে না, নানাদিকে আপনাকে প্রসারিত করতে পারছে না, জীবনের বিচিত্র রূপে রসে ভাবে ও সৌন্দর্য্যে অনবদ্য এবং মানব চরিত্রে রহস্যের বৈশিষ্ট্যে জীবন্ত সত্য হয়ে উঠিতে পারছে না, তার কারণ আমাদের দেশের অধিকাংশ লেখকেরই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি করবার যোগ্যতার অভাব। উপযুক্ত শিক্ষার অসম্পূর্ণতা এবং বহু বিষয়ে আমাদের সম্যক জ্ঞানের অভাব; গভীর চিন্তাশীলতা, অনুসন্ধিৎসা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব। আবার অনেকে বলেন, এর প্রধান কারণ—আমাদের এই সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ সমাজের মধ্যে এই অতি একঘেয়ে sedentary জীবন। এর পরিধি যেমনি ক্ষুদ্র, এর প্রকৃতিও তেমনি জড় ও নিষ্ক্রিয়। আমাদের জীবনকে প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম ও একান্ত অলস বলা চলে।

কি নাগরিক জীবন, কি পল্লী-জীবন, কোথাও যেখানে প্রাণের আনন্দ স্পন্দন নেই, উচ্চ আকাঙ্ক্ষার উল্কাবেগ নেই, দুঃসাহসিক অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়বার উদ্দাম প্রবৃত্তি নেই, কোনও দুঃসাধ্য সাধনের জন্য প্রবল প্রতিযোগিতার প্রচণ্ড উন্মাদনা নেই, নারীহৃদয় জয় করে নেবার দুর্দ্দম আবেগ ও কৃচ্ছ্রসাধনা নেই, সে দেশে উঁচুদরের সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়, এ যুক্তি অবশ্যই মানি; কিন্তু একথাও তো অস্বীকার করতে পারিনি যে, প্রতিভার অসাধ্য কিছু নেই। শক্তিশালী লেখকের রচনা বিষয়বস্তুর মুখাপেক্ষী নয়। যাঁর যোগ্যতা আছে, কোন বাধাই তাঁর সৃষ্টিকে প্রতিহত করতে পারে না। He can create something out of anything!

কিন্তু, সে যাই হোক, আমাদের এই স্বল্পপরিসর জীবনের মধ্যেও যা কিছু উপাদান আছে তাই নিয়েই বা আজ পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য কী রচনা পেয়েছি আমরা? য়ুরোপীয় সাহিত্যে আমরা দেখেছি ঘোড়দৌড় নিয়ে শিকার নিয়ে, কতরকমের খেলার প্রতিযোগিতা নিয়ে, বক্সিংম্যাচ, থিয়েটার, সার্কাস, সিনেমা ও আর্ট ষ্টুডিও নিয়ে একাধিক উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচিত হয়েছে। আমাদের এই পরাধীন দেশে বিদেশী শাসনকর্ত্তাদের দৌলতে অনেকদিন হল ও সব ব্যাপারগুলোই আমাদের জীবনেও আমদানি হয়েছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের দরবারে এখনও ওদের আবির্ভাব ঘটে নি।

বাংলার অসংখ্য ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক ঐ আধুনিক অশ্বমেধ যজ্ঞে, রঙ্গালয়ের যবনিকার অন্তরালে এবং সুরা ও নারীর সংস্পর্শে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেলেও, বহু পরিবারে এই বিষ ঢুকে অনেক মর্ম্মান্তিক ট্রাজেডি ঘটালেও সাহিত্যে তারা আজও উপযুক্ত মর্য্যাদার সঙ্গে ঠাঁই পায় নি

ওদের Army life, High sea life-এর সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ যোগ না থাকলেও ভারতের একাধিক দেশী সিপাহী অনন্যসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনের ফলে 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' পেয়েছে, সংবাদপত্র মারফৎ আমরা এ খবর প্রায়ই পাই, কিন্তু আমাদের সাহিত্যে তাদের সন্ধান পাইনি। আমাদের দেশের খালাসি লস্করেরা অনেকেই ডুবো জাহাজের উৎপাতেও সমুদ্রবক্ষে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেওয়ার জন্য লণ্ডনে সম্বর্দ্ধিত হয়েছে দেখতে পাই, কিন্তু সাহিত্যে আজও তাদের দেখা পাইনি। ওদের Church life আমাদের সমাজের ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে ঠিক মেলে না একথা সত্য, কিন্তু, আমাদের দেশেও ত' মঠ আছে, মন্দির আছে, মোহান্ত মহারাজেরা আছেন, অসংখ্য আশ্রম আছে, গুরুদেবেরা আছেন, মাতাজীরা আছেন, তাঁদের বহু প্রবীণ ও তরুণ ভক্ত আছেন, সাধক-সাধিকা ও ব্রহ্মচারীরা আছেন, তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে, দ্বেষ আছে, প্রেম আছে, ঈর্ষ্যা আছে, অনাচার আছে, ব্যভিচারও

আছে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁরা আজও অস্পৃশ্য হয়ে আছেন।

এর কারণ অনুসন্ধান করলে বোঝা যায় ঐ ঘোড়দৌড় খেলাধূলা, আমোদ প্রমোদ ওদেশের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে যেমন ওতোপ্রোতভাবে জড়িত, আমাদের জীবনে ও সমাজে ঠিক তেমনভাবে ওগুলো সত্য-বস্তু, ও জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বা অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার বলে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে নি। পরাধীন দেশের সিপাহী ও নাবিকদেরও কোনও মর্য্যাদা নেই। আর ধর্ম্ম আমাদের বর্ত্তমান জীবনে একটা বাহিরের আচার মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্ম্মকে আমরা ভয় করি, কিন্তু ভক্তি করি না, তাই আমাদের আধুনিক জীবনে ওটা সত্য বস্তু নয়।

মনেপ্রাণে আন্তরিকভাবে যেটাকে আমরা গ্রহণ করতে পারিনি, যা আমাদের জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত সত্যবস্তু হয়ে উঠতে পারেনি, সাহিত্যে তার স্থান নেই। সেই সব মূলহীন পরগাছা উপাদান নিয়ে সাহিত্যে কিছু সৃষ্টি করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র! সেটা না হয় সত্য—না হয় সার্থক। বাস্তব ত' নয়ই। এদিক থেকে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে উনবিংশ শতাব্দীর বহু সম্মানিত বাংলা সাহিত্যও যেমন কৃত্রিম কল্পনা-বিলাস, বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর অতি আধুনিক ও তথাকথিত বাস্তব বাংলা সাহিত্যও ততোধিক কৃত্রিম ও কাল্পনিক।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের আদর্শ ছিল অষ্টাদশ শতাব্দী ও তৎপূর্ব্বকালীন ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্য। তাঁদের মুখের বুলি ছিল—A beautiful literature springs from the depth and fulness of intellectual and moral life, from an energy of thought and feeling, to which, nothing ministers so largely as enlightened religion!

একদা সাহিত্যের একমাত্র নিরিখ ছিল রসসৃষ্টি। স্বর্গ-মর্ত্ত্য, পাতালের যা কিছু সম্ভব অসম্ভব কল্পনা, রূপকথা, স্বপ্ন-কাহিনী ও অদ্ভুত ঘটনা অবলম্বনে কাব্য, উপন্যাস ও নাটক লেখা চলতো। কিছুই absurd, unnatural, superhuman বা grotesque বলে গণ্য হত না। বাস্তবতার স্তাবকতা সেদিন কারুর মুখেই শোনা যেত না এবং বিষয় বস্তুরও কোনও বিশেষ আবেদন ছিল না। সেদিন সাহিত্যের বিচার হ'ত অলঙ্কার-শাস্ত্রের মাপকাঠি দিয়ে এবং সুসাহিত্যের মর্য্যাদা পেত একমাত্র সেই রচনা—যা সকল দিক দিয়ে রসোত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

স্বপ্ন-বাসবদত্তার কবি ভাস, শকুন্তলা ও মেঘদূতের মহাকবি কালিদাস, উত্তর-রামচরিত রচয়িতা শ্রীকণ্ঠ ভবভূতি, কিরাতার্জ্জুনের কবি ভারবি, রত্নাবলী ও নৈষধের কবি শ্রীহর্ষ, 'শিশুপাল বধ' রচয়িতা কবিশ্রেষ্ঠ মাঘ, দশকুমার চরিত প্রণেতা দণ্ডী, কাদম্বরীর কবি বাণভট্ট বা মৃচ্ছকটিকের কবি শূদ্রকের লেখনীকে একদা শাসন করেছিল অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি প্রভৃতি শব্দালঙ্কার এবং রূপক, উৎপ্রেক্ষা, উপমা প্রভৃতি অর্থালঙ্কার। এরাই ছিল সেদিন ভাষার ভূষণ ও রচনার ঐশ্বর্য্য।

বাংলা সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল এই প্রাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সূতিকাগারে। তাই এর শৈশব কেটেছে অবাঙালী ধাত্রীর ক্রোড়েই। মুসলমান যুগেও এর প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ও রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের রচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংরাজী আমলেও এর জের চলেছিল অনেকদিন। রাজা রামমোহন রায় থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্য্যন্ত বাংলা ভাষা সংস্কৃতের নিগড় থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে নি। এই সময় একমাত্র মাইকেল মধুসূদনের মধ্যে আমরা প্রথম এ প্রচেষ্টা দেখতে পাই। তার পর কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণেতা প্যারিচাঁদ মিত্র বাংলা ভাষাকে স্বীয় গৌরবে ও স্বাধীনভাবে স্বপ্রতিষ্ঠ হবার পথ দেখিয়েছিলেন। এদেরই পদাঙ্ক অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু আমাদের সাহিত্যকে প্রকৃত বাংলা-সাহিত্য ক'রে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোমপ্যাচার নক্সা' সেদিন অতি আধুনিকতার শঙ্খ বাজিয়ে চল্‌তি ভাষার ভাগীরথীকে সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছিল। চল্‌তিভাষার এই জীবন্ত স্রোতকে আরও পরিপূর্ণ শক্তিসঞ্চারে বেগবতী করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ ও বীরবল।

এই ত হ'ল আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের

মোটামুটি ইতিহাস। কিন্তু এর মধ্যেও বাঙালীর সমাজ ও জীবনাদর্শের প্রভাব যে বড় বড় প্রতিভাবান্ শিল্পীকেও কি ভাবে সাহিত্যরচনায় পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি নীতি ও আদর্শের জোয়ালে জুতে বাঁধাপথে চলতে এবং আর্টকে ক্ষুণ্ণ করতে বাধ্য করেছিল, সেই শোচনীয় ব্যাপারের প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাবান শিল্পীর অপূর্ব্ব সৃষ্টি শৈবলিনীকেও বাল্য-প্রণয়ী প্রতাপের প্রতি অবৈধ অনুরাগ পোষণের পাপে পাগল হ'তে হয়েছিল। এবং সে পাগলামী সারাতে হয়েছিল ডাক্তার-বৈদ্য ডেকে এনে নয়, এক সন্ন্যাসীর অবধূত চিকিৎসার জোরে। সূর্য্যমুখীর স্বামীর উপর তার ন্যায়-ধর্ম্মানুমোদিত অধিকার ছেড়ে দেবার জন্য এবং পুনর্বিবাহের অপরাধ স্খালনে বালবিধবা কুন্দনন্দিনীকে বিষ খেতে হয়েছিল। কুলটা রোহিণীর ব্যভিচার জন্য ভ্রমর ও গোবিন্দলালের দুরবস্থার অন্ত ছিল না! কল্যাণীর প্রতি ভবানন্দের আসক্তির জন্য আনন্দমঠ ব্যর্থ হ'য়ে গেল। 'শ্রী'র প্রতি দুর্ব্বলতার জন্য সীতারাম পরাজয়ের গ্লানি বরণ করেছে। 'দেবী চৌধুরাণীও' ব্রজেশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিঃসহায়া!

বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলিতে তিনি যে নর-নারীর চিত্র অঙ্কিত করেছেন, তদানীন্তন যুগের সামাজিক জীবনের সেগুলি বাস্তব চিত্র নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাঙালীর সমাজ-জীবনে এসে পড়েছিল দেবেন্দ্র দত্ত ও হীরে মালিনীর প্রভাবটাই বেশি। কিন্তু, সুনীতি ও শুচিতার প্রচার কল্পে বঙ্কিম-প্রতিভাকেও সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'তে হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' ও 'চোখের বালিতে' যৌবনের যে সুতীব্র বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ তার সত্যরূপ নিয়ে বিকীর্ণ হয়েছিল, 'নৌকাডুবি', 'ঘরে বাইরে' বা 'যোগাযোগে' জীবনের সে দিকটাকে তিনি সত্য বলে স্বীকার করতে পারেননি। জীবনের উচ্চতম আদর্শ, হিন্দুর সামাজিক ঐতিহ্য এবং নীতি ও ধর্ম্মবিশ্বাস-জনিত সংযম এই লোকোত্তর প্রতিভার লেখনীকেও বাস্তব জীবনের অনাবৃত ক্ষেত্র থেকে দূরে স'রিয়ে নিয়ে গেছে, যেখানে ক'বির কল্পনা তাকে মনোহর বর্ণে রঞ্জিত ক'রে উচ্চাদর্শের শরণাপন্ন হয়েছে।

শরৎচন্দ্র চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই 'নষ্টনীড়' ও 'চোখের বালির' জের টেনে চলতে। নাগরিক জীবনের রাজপথ ছেড়ে তিনি গ্রামের পায়ে-চলা পথে পল্লীজীবনের মধ্যে তাঁর সৃষ্টির নব নব উপকরণ সংগ্রহ করতে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু পল্লীই বলুন আর শহরই বলুন, নর-নারীর জীবনই যেখানে কৃত্রিমতায় ভরা, সাহিত্য সেখানে বাস্তব সত্য হয়ে উঠবে কেমন করে? কাজেই শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নর নারীরা হয়ে উঠেছেন অসাধারণ। দু'একটা 'বেণীঘোষাল' ও 'রাসবিহারী' ছাড়া পুরুষ চরিত্রগুলি প্রায় মেরুদণ্ডহীন। শক্ত শির-দাঁড়া নিয়ে যারা এসেছিল, যেমন ইন্দ্রনাথ বা শিবনাথ, তারা অর্দ্ধপথেই অদৃশ্য হয়েছে। রমা নির্ব্বাসিতা; কিরণময়ী পাগল। ফলে মানব-মনস্তত্ত্বের এতবড় এক নিপুণ শিল্পীর রচনাও 'রোমান্টিক' ছাড়া আর কিছু হয়ে উঠতে পারে নি।

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, আমাদের জীবন পরিণত ও সুসম্পূর্ণ নয়। যে জাতির অর্দ্ধাংশ থাকে অন্দর মহলে চিরদিন 'অন্তরীণ' হয়ে, পুরুষের বহির্মুখী জীবনের সঙ্গে যাদের কোনও যোগ নেই, পুরুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার যারা অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী নয়, পুরুষের কর্ম্মশক্তিকে উৎসাহ ও প্রেরণা দেবার জন্য যারা কোনও দিনই পুরুষের পাশে পাশে সমতালে পা ফেলে চলে না, যে দেশের তরুণ-তরুণীদের জীবনে পূর্ব্বরাগ, প্রেম, মিলন ও বিরহের কোনও বালাই নেই, যৌবনে জীবনের সাথী নির্ব্বাচনের ভার যেদেশের ছেলে মেয়েদের অভিভাবকের অধিকারভুক্ত, এমন কি ছাত্রাবস্থায় ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবনের নির্দ্দেশ নির্ভর করে যেখানে অভিভাবকদেরই উপর, সেই চিরনাবালকদের দেশের সাহিত্য কোনওদিনই পরিণত ও পুষ্ট হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। তবু যে এ দেশে বঙ্কিম, রবীন্দ্র ও শরৎ সাহিত্য গড়ে উঠেছে, সেটাকে বলা চলে 'inspite of' অর্থাৎ এরা ব্যতিক্রম বা প্রতিভার বিস্ময়কর অভিব্যক্তি! আবার গ্যয়েটের কথায় বলি—Literature is a fragment of fragment: of all that ever happened

or has been said, but a portion has been written, and of this but little is extant. অর্থাৎ সাহিত্যে মানবজীবনের খণ্ডাংশমাত্রের ছায়াটুকু শুধু প্রতিফলিত হয়। কিন্তু গ্যয়েটেকে প্রাচীনপন্থী বলে বাতিল করে এ-যুগের মনীষীরা বলেছেন যে, The Literature of an age in but the mirror of its prevalent tendencies! সাহিত্য হ'ল যুগের দর্পণে প্রতিফলিত তৎকালীন সমাজচিত্র।

এ-কথা যদি মানতে হয় তা'হলে স্বীকার করতেই হবে যে, যাদের জীবনটাই খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, অসমাপ্ত—তাদের সাহিত্যে কোথায় পাওয়া যাবে তার সত্য প্রতিচ্ছবি? বাংলা সাহিত্য তাই এক সৃষ্টিছাড়া বস্তু! এ-কে বহুলাংশে নাগরিক সাহিত্য বলা চলে। যে নাগরিক জীবনের কোনও নাড়ীর যোগ নেই এ-দেশের মাটীর সঙ্গে, আমাদের জীবন ও সাহিত্য অনেকটা যেন মূলহীন তরুর ফুলের মতো। আমাদের নকল দো-আঁসলা জীবনের মিথ্যা ভণ্ডামী দেশের সাহিত্যে আজ কলঙ্কের ছায়াপাত করছে। যে সমস্যা আমাদের সমাজে নেই, যে-জটিলতা আমাদের জীবনে নেই, যে দৃঢ়তা আমাদের চরিত্রে নেই, তাই নিয়ে আজ আমাদের সাহিত্যের কারবার চলেছে। Pedantry আর Plagiarism আমাদের সাহিত্যকে কলঙ্কিত করছে। সাবানের ফেনার বুদ্বুদের মতো যারা শূন্যে ভাসছে, সেই শিক্ষাভিমানী আভিজাত্য-গর্ব্বিত অশিক্ষিত পটু সবজান্তা বাঙালী ভদ্রলোকেরা সমাজের নিম্নস্তরের সমস্ত বিভাগ থেকে আজ বিচ্যুত। এ অবস্থায় আর যাই করা যাক্ না কেন, বাস্তব সাহিত্য সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। তাই হাড়ীবাগদীর মেয়ে আঁকতে গিয়ে এ দেশের নামকরা লেখকেরাও ভদ্রলোকের মেয়ে এঁকে বসেন। কামার-কুমোরের চিত্র দিতে গিয়ে বামুন কায়েতের প্রতিকৃতি গড়ে বসেন। গ্রাম্য কুটিরের মধ্যে এনে ফেলেন শহরের বিলাস-বিভ্রম! তাঁদের শিক্ষিতা বিদুষী নায়িকারা হয়ে ওঠেন ইংরেজী নভেলে পড়া য়ুরোপীয় মেয়ে! সেকেণ্ড-ক্লাশ ট্রাম ও বাসের ভীড়ে যাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, তাদের উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা—Rolls Royce ছাড়া চড়ে না, Firpo'র Restaurant ছাড়া ডিনার বা ল্যঞ্চ খান না। পাওনা-দারের ঠেলায় যাদের ছাতি আড়াল দিয়ে পথ চলতে হয়, তাদের সৃষ্ট নায়কেরা বইয়ের পাতায় পাতায় যখন তখন 'নোটে'র হরিরলুঠ দিয়ে বেড়ায়। দোষ দিই নে তাদের। বক্ষের অতৃপ্ত কামনা ও অবচেতন মনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের এই পথেই সার্থকতার সন্ধান করে। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যকে তাই অকুতোভয়ে বলা চলে—It is a Hybrid Literature!

সুতরাং, বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র! জীবনের ধর্ম্ম যা, সাহিত্যের ধর্ম্মও ত' তাই। তা'ছাড়া বাস্তববাদীরা যতই বলুন যে, আমাদের জীবনের রথ যে ধূলি-কঙ্করময় পঙ্কিল পথ অতিক্রম করে চলেছে দিনের পর দিন—তার চক্রতলের প্রত্যেক রেখাটির নিখুঁত চিত্র এঁকে যাবো, কারণ, সেইটেই হবে জীবনের সত্য ও অনাবৃত বাস্তবরূপ!

কিন্তু একটা কথা তাঁরা ভুলে যান যে, যা কিছু সত্য অনাবৃত ও বাস্তব, হুবহু সেই চিত্র আঁকতে পারলেই তা' উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য হয়ে ওঠে না। ফটোগ্রাফির ক্যামেরা আর শিল্পীর তুলি এ দু'য়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে এবং থাকবেই। তা' ছাড়া যা অনাবৃত, যা নগ্ন—পৃথিবীর সভ্য মানুষেরা প্রকাশ্যভাবে তা গ্রহণ করতে পারবে না কোনওদিনই। কারণ, দীর্ঘ কাল ধরে সে তার নগ্নতাকে আবৃত করে রাখতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। যেমন দেহের নগ্নতাকে লোকচক্ষে প্রকাশ করতে লজ্জা পায় সে, তেমনি মনের নগ্নরূপকেও সে সকলের সামনে অনাবৃত করে দেখাতে চায় না। যখন মানুষকে এই ধরণের রুচি-বিগর্হিত কিছু করতে দেখা যায়, তখন আমাদের বোঝবার অসুবিধা হয় না যে, বেচারার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। উৎসব-রজনীর প্রমত্ত উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রভাতের আলোকে কেউ প্রকাশ করতে চায় না। ভদ্রমনের রীতি ও প্রকৃতিই এই। সুতরাং সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম দেখলে বুঝতে হবে সেটা সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থার পরিচায়ক নয়, পরন্তু রুগ্ন মনের সাময়িক বিকার মাত্র! য়ুরোপীয় পোষ্টওয়ার লিটারেচার এই মানসিক বিকৃতি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। একে যাঁরা অতি আধুনিক সাহিত্যের আদর্শ বলে মনে

ক'রে উন্মাদের মতো তার অনুকরণ ও অনুসরণ করছেন, তাঁরা যে মারাত্মক ভুল করছেন একথা বলাই বাহুল্য। এই ধরণের সাহিত্যকে লক্ষ্য করেই ওদেশের সমালোচকেরা বলেছেন—"Literary dissipation is no less destructive of sympathy with the living world than sensual dissipation." "ভাবতন্ত্র" ও 'বস্তুতন্ত্র' ছাড়াও সাহিত্যে অধুনা আর এক তৃতীয় উৎপাত দেখা দিয়াছে—যেটার নাম দেওয়া চলে 'বুদ্ধিতন্ত্র'। সাহিত্যের এই বুদ্ধিবাদীরা 'হৃদয়কে নাড়া দেয় বটে কিন্তু মস্তিষ্কে কোনও সাড়া জাগায় না' বলে অনেক কিছু রচনাকেই বাতিল করে দেন। তাঁরা সম্ভবতঃ জানেন না যে—"Mere intellect is as hard-hearted and as heart-hardening as mere sense; and the union of the two, when uncontrolled by the conscience and without the softening and purifying influences of the moral affections, is all that is requisite to produce the diabolical ideal of our nature!"

কোনও দেশের সাহিত্য যদি এইভাবে অধঃপতনের দিকে নামতে থাকে, তা'হলে বুঝতে হবে যে, সে জাতির জীবনও শেষ হয়ে এসেছে। তাই গ্যয়েটে বলেছেন—

"The decline of literature indicates the decline of a nation, the two keep pace in their downward tendency!"

আমরা পরাধীন জাতি। সুদীর্ঘকাল বিজয়ীদের পদতলে নিষ্পেষিত হ'য়ে দেহে মনে আমরা দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি। তাই সহজেই কালের হাওয়ায় আমাদের জীবন-তরণীর পালখানি উড়ে চলে। মানসিক বলিষ্ঠতার অভাবে আমরা যুগের বিকৃত ধারাকেও অন্ধের মতো অনুসরণ করে চলি। Disraeli ঠিকই বলেছেন যে বেশভূষার ফ্যাশানের মত সাহিত্যসমাজেও এক একটা ফ্যাশান আসে—"There is such a thing as literary fashion and prose and verse have been regulated by the same caprice that cuts our coats and cocks our hats!" কিছুদিন থেকে বাংলা সাহিত্যে নোংরা গল্প আর অর্থহীন গদ্য-কবিতা এ সত্য সপ্রমাণ করছে।

বর্ত্তমান যুগ হ'ল Industrialism-এর যুগ। কলকারখানার কুলি-মজুরে ছেয়ে গেছে দেশ দেশান্তর। ভারতবর্ষের বুকেও তার ঢেউ এসে লেগেছে। ধনী বণিকের উৎপীড়নের অত্যাচারে এ দেশেও শ্রমিকদের লাঞ্ছনার অন্ত নেই। ট্রেড ইউনিয়ন' গজিয়েছে। Strikeও চলছে মাঝে মাঝে প্রায়ই। এসব নিয়ে ওদেশে বিরাট সাহিত্য গড়ে উঠেছে; কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে আমরা এর আভ্যন্তরীণ বিচিত্র রূপ দেখে মুগ্ধ হই। Stock Exchange বলে একটা 'শেয়ার বাজার' এ দেশেও আছে এবং বছর বছর বহু লোক এর কল্যাণে একদিনে ধনী অথবা পথের ভিখারী হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের সাহিত্যে কি শ্রমিক, কি ধনী, কি speculator কি কোনো Successful Businessman কারুরই জীবন-রহস্যের উদ্দেশ মেলে না! এর কারণ কুলিমজুরদের জীবনের সঙ্গে আমাদের অন্তরের যোগ নেই এবং অন্তরঙ্গ পরিচয়ও নেই। ধনীর আমরা ঈর্য্যা করি এবং ব্যবসায়-বুদ্ধির অভাবে আমরা Businessman ও Speculator উভয়কেই উপেক্ষা করে চলি। নিজেরা কেরাণীগিরী বা সামান্য বেতনে সাংবাদিকের কাজ করলেও মনে মনে আমরা সকলেই এক একজন ক্ষুধে Capitalist! এ সত্যটা ধরা পড়ে, যখন আমরা ট্রেনে উঠে রেলের কুলি-ভাড়া দিতে গিয়ে ঝগড়া ক'রি, বাজারের মুটে ভাড়া দশ পয়সার জায়গায় ছয় পয়সায় রফা করতে চাই, রিক্সা ওয়ালাকে দু' মাইল টেনে নিয়ে গিয়ে তার হাতে দু' আনা দিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা করি। ওদের প্রতি আমাদের অন্তরের কোনও অকৃত্রিম সহানুভূতি নেই, তাই সাহিত্যে ওরা আজও অস্পৃশ্য ও অপাংক্তেয় হ'য়ে আছে।

প্রাণবন্ত জীবনের অভাবে বাংলা সাহিত্য মূলতঃ রোম্যাণ্টিক গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ হ'য়ে আছে, যাঁরা এই গণ্ডী পার হ'য়ে সাহিত্যে বাস্তবতার আমদানী করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার অভাবে শিব গড়তে বানর গড়ছেন। এঁদের সম্বন্ধে Colton ভারি সুন্দর কথা বলেছেন—Literature has her quacks, no less than medicine, and

they are devided into two classes; those who have errudition without genius, and those who have volubility without depth; we get second hand sense from the one and original nonsense from the other!

বর্ত্তমান যুগের বাঙালীর জীবন ও তার সাহিত্যের প্রকৃত রূপ হ'ল এই। তা' বলে হতাশ হবার কোনও কারণ নেই, দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতি, শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি, আর্থিক উন্নতি, শিক্ষার প্রসার ও চরিত্রের মহত্ত্ব যেমন স্বদেশের স্বাধীনতার অপেক্ষায় পথ চেয়ে রয়েছে, ঠিক সেই রকম সাহিত্যের উন্নতিও এদেশে স্বাধীনতার আবহাওয়ার প্রতীক্ষা করছে। Mrs. Stowe ঠিকই বলেছেন—

"The literature of a people must spring from the sense of its nationality, and nationality is impossible without self-respect and self-respect is impossible without liberty.!"

গাল ও গল্প*

প্রথম পর্য্যায়—"গেছো বাবা"

শ্রীনরেশচন্দ্র পাল

"ডাক্তার! ডাক্তার!"

জ্বালাতন করিল! এই অন্ধকারে—

আপনারা ভাবিতেছেন দিনদুপুরে পুকুর চুরি না হয় তাই!

"নিশীথে" গল্পের ডাক্তারটি কি প্যাথ ছিলেন, আবিষ্কার করিতে পারি নাই। তবে রবীন্দ্রনাথের যে রকম হোমিওপ্যাথি ভক্তি ছিল, তাহাতে তাঁহার গল্পের ডাক্তার হোমিওপ্যাথ হইতেও পারেন। যাই হোক, আমি হোমিওপ্যাথই বটি। তবু ডাক্তার ত'। তা ছাড়া এখন ঠিক অর্দ্ধরাত্রি না হইলেও এগারোটা বাজিয়া পনেরো মিনিট। এমন সময়ে এই উৎপাত। রোগীর আগমন হইলে ঘাবড়াইবার কথা ছিল না, কিন্তু ওই পিলে চমকানো গলা কি ভুলিবার! বুঝিলাম বন্ধুবর প্রাত্যহিক উৎপাত করিতে আসিয়াছেন। সমস্ত দিন দেখা দেন নাই বলিয়া ভাবিয়াছিলাম একটি দিন অন্ততঃ নিরুপদ্রবে কাটিল, কিন্তু এমন কপাল কি করিয়া আসিয়াছি! আচ্ছা এক পাগলের পাল্লায় পড়িয়াছি যা হোক! ক্রমে মেজাজের পারা যে রকম চড়িতেছে, আর বেশী দিন ভালমানুষী দেখানো চলিবে না।

দরজা খুলিতেই দমকা হাওয়ার মত ঘরে ঢুকিলেন কিন্তু প্রশ্ন করিলেন অস্বাভাবিক শান্ত স্বরে, "বলতে পার বাঙ্গালীরা এত irrational কেন?" আমার মেজাজ চড়িয়াই ছিল, কিন্তু তাঁহার অপ্রত্যাশিত মৃদুকণ্ঠে কিঞ্চিৎ ভড়কাইয়া গেলাম। আমার মুখ দিয়া পাল্টা প্রশ্ন বাহির হইল—"আজ আবার হল কি?"

অমনি আরম্ভ করিলেন—"আজ আমার ক্লাসে—" দাঁতে দাঁত চাপিয়া শক্ত হইয়া বসিলাম। আজ তিন বৎসর এই ক্লাসের কথা শুনিতে শুনিতে কান ঝালাপালা হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের কল্যাণে পৃথিবীময় ওলটপালট হইয়াছে ও হইতেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার জীবনে যুদ্ধজনিত করুণতম বিপর্য্যয় এই বেকার বন্ধুটির চাকুরী প্রাপ্তি। প্রায় ভাসিয়া বেড়াইতেছিলেন, হঠাৎ গভর্ণমেণ্ট-স্থাপিত একটি সাময়িক প্রতিষ্ঠানে কাজ জুটিয়া গেল এবং সেই দিন হইতে সুরু হইল আমার দুর্ভোগ। ইংরেজ-ভারতীয়ে মেশানো তিন চারজনের এক ক্লাসে বাংলা শেখানোই কাজ। পড়াইতেন ত একঘণ্টা, তাও

* এই প্রবন্ধে শনিবারের চিঠির বারবার উল্লেখের কারণ এই যে, ইহা ঐ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লিখিত হইয়াছিল। সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক গৃহীতও হইয়াছিল।—লেখক।

আবার প্রথম শিক্ষার্থীকে, কিন্তু এরই মধ্যে দুই ঘণ্টা গল্প করিবার মাল-মশলা সংগৃহীত হইত। এ যেন ছেলে মানুষ খেলনা পাইয়াছে, তরুণ প্রেমে পড়িয়াছে, ছা-পোষা লোক লটারী জিতিয়াছে। বাংলা ভাষা, বর্ণমালা, বানান ইত্যাদির মধ্যে এমন উত্তেজক পদার্থ নিহিত আছে, তাহা কস্মিন্‌কালেও কল্পনা করি নাই। প্রথম প্রথম তাঁহার উৎসাহ-উত্তেজনা আমাতেও সঞ্চারিত হইয়াছিল; Psora Psychosis-এ ভরা জীবনে এই বৈচিত্র্যের স্বাদ মন্দ লাগিত না। সেই ক্লাসের এখন তৃতীয় বৎসর চলিতেছে। প্রতিবৎসর নূতন লোক আসে, কিন্তু বিষয়ের নূতনত্ব আর নাই। তবে বন্ধুর উৎসাহে তেমন ভাটা পড়ে নাই। আমি আর পারি না।

তিনি বলিতেছিলেন—"আজ ক্লাসে রবীন্দ্রনাথের 'গেছো বাবা' পড়াইতেছিলাম"—বলিয়াই মুখ তুলিয়া আমার কঠিন মুখভাব লক্ষ্য করিলেন। ঝাঁঝিয়া উঠিতে বিলম্ব হইল না—"নাও নাও আর martyr সাজতে হবে না। তুমিই না একদিন বাংলার ভুঁইফোড় অবতারদের কথায় বক্তৃতার খই ফুটাচ্ছিলে? দেড়গজী প্রবন্ধ ফাঁদালে, কাগজে পাঠালে, ছাপালে না,—টিকিটশুদ্ধ হজম করে দিলে বলে কাঁদুনী গাইলে। তুমি তখন যা বলেছিলে, আমি ত তাই বলে এলাম। এখন মেজাজ দেখানো হচ্ছে। হোমিওপ্যাথীর দোষই এই। দয়া করতে হবে না আমার ওপর। চললুম আমি"—বলিয়া ঝড়ের বেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। জানিতাম এই নিষ্ক্রমণ পুনরাগমনায় চ এবং তাহাতে এক বৎসর লাগিবে না। রাগ করিয়া যে দুটা দিন না আসেন হাড়ে বাতাস লাগে। দরজা বন্ধ করিতে গিয়া লক্ষ্য করিলাম—একখানা পাঠপ্রচয় প্রথম ভাগ ফেলিয়া গিয়াছেন।

দুই

বলিতে ভুলিয়াছি অথবা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই যে, পরদিন সপ্তমীপূজা। পশ্চিমের নাতিক্ষুদ্র সহর। শ'খানেক বাঙ্গালী আছেন। প্রবাসে বাঙ্গালীয়ানার নিদর্শন একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকালয় ও জীর্ণ দুর্গাবাড়ী আমাদের ছিল। অঞ্জলি দিতে গিয়া দেখি মহামারী কাণ্ড। বাঙ্গালীদের মধ্যে একদল প্রৌঢ়ের ও বৃদ্ধের সংখ্যাই বেশী, এক বাঙ্গালী সন্ন্যাসিনীকে প্রতিমার সম্মুখে ঘটের পাশে বসাইয়া পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন। ইহাতে অন্য দল ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে।

মহিলাকে আমি ইতোপূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম। বয়সে প্রৌঢ়া, ঢলঢল মুখখানি, বেশ 'মা-মা' ভাব। তাঁহার অবাঙ্গালী শিষ্য সামন্তের বহর দেখিয়া এই ভাবিয়া পুলকিত হইতাম যে, সাধুগিরিতে বাঙ্গালীরা অন্য প্রদেশ-বাসীদের সঙ্গে বেশ পাল্লা দিতেছে। এই সব অঞ্চলে অনেক মোহন্ত বিপুল দেবোত্তরের মালিক। কালে হয় ত এদিকে বাঙ্গালী মোহন্তরা জমিদারী ফাঁদিয়া বসিবেন। কিন্তু তাই বলিয়া দেবীর সম্মুখে মানবীকে পূজা করা? মনটা কেমন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। চিন্তিত মনে নত মস্তকে পথ চলিতেছি। কলরবে সচকিত হইয়া চোখ তুলিতেই দেখি, হিন্দী উর্দ্দু-ভাষী পথচারীদের পরম কৌতুক উৎপন্ন করিয়া দুইজন তুমুল তর্ক করিতে করিতে পথ চলিতেছেন। চেনা লোক, দুইজনই বরিশাল-বাসী। সাধারণতঃ ইঁহারা স্বকীয় উচ্চারণে কলিকাতার ভাষায় কথা বলেন, আজ উত্তেজনার আধিক্যে দুইজনেই মাতৃবুলি ধরিয়াছেন। উদ্দাম তর্ক ইহাদের গতিকেও প্রখর করিয়া তুলিয়াছিল। আমি সাইকেলে আসিতেছিলাম। আমার দিকে চাইবার উহাদের অবসর কোথায়! চলিতে চলিতে একজনের একটিমাত্র কথা শুনিতে পাইলাম। অন্যের জবাব শুনিবার পূর্ব্বেই আমি দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কথাটি এই—"আপনি ত রামকৃষ্ণ-ভক্ত; আপনার ত গায়ে লাগবেই! কিন্তু পরমহংসদেবের স্ত্রীকেও ত ভক্তরা এমনি পূজো করেছিল। তাতে দোষ হয়নি বুঝি!"

মনে হইল কিসে আর কিসে!

ঘরে ফিরিয়া 'পাঠপ্রচয়'খানা খুলিয়া বসিলাম। 'গেছো বাবা' শেষ করিয়া বন্ধুর সঙ্গে ভাব করিতে গেলাম। রাগ ভাঙ্গাইতে বেশী কিছু করিতে হইল না। গল্প বলিতে না পাইয়া তাঁহার পেট ফুলিতেছিল। দু'একটা মনরাখা কথায়ই মেঘ কাটিয়া গেল। তিনি রসায়িত করিয়া যাহা বলিলেন, তাহার নির্গলিতার্থ এই যে, রবীন্দ্রনাথের এই ছেলেভুলানো রঙ্গরসের কোন

সামাজিক পৃষ্ঠভূমি (social background) আছে কি না—ছেলেরা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বাংলাদেশের ভুঁই-ফোড় অবতারদের কথা বলেন। কেমন করিয়া পাশ্চাত্ত্য সংস্পর্শে ইংরেজীশিক্ষিত লোকের মন হইতে সন্ন্যাস, ধর্ম্ম ইত্যাদির প্রতি শ্রদ্ধা লোপ পাইয়াছিল, কেমন করিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অভ্যুদয়ে লুপ্ত শ্রদ্ধা ফিরিয়া আসে ও প্রতিক্রিয়া প্রবল হইয়া বাবাজী মাতাজীতে দেশ ছাইয়া গিয়াছে—তাহার ইতিহাস বলেন। এই মনোবৃত্তির উপর কশাঘাত করিয়া যে-সব রঙ্গব্যঙ্গ ও অন্যরকম রচনা বাংলায় লিখিত হইয়াছে,—যেমন 'বিরিঞ্চিবাবা' ও 'নকুড়ঠাকুরের আশ্রম' তাহারও কিছু কিছু উল্লেখ করেন। শুনিয়া একটি সিন্ধুদেশীয় ছোকরা প্রশ্ন করে—Are the Bengalis so irrational as that ?" বন্ধু প্রত্যুত্তরে এই ব্যাধির ভারতব্যাপিতার কথা বলিয়া, দৃষ্টান্তস্বরূপ সিন্ধুর ওম্-মণ্ডলীর ব্যাপার উল্লেখ করিলে সে জবাব দেয়—"We destroyed it in no time" 'আমরা অবিলম্বে তাহা নির্ম্মূল করিয়াছি'।

তিন

ঘরে আসিয়া ভাবিতে বসিলাম। সত্যই চার পাঁচ বৎসর আগে একটি গরম প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, কিন্তু পত্রিকায় ছাপিবে কি, প্রবন্ধটি ফেরতও দেয় নাই, যদিও সঙ্গে টিকিট দেওয়া ছিল। লেখা ভাল হয় নাই—এ-ই একমাত্র কারণ বলিয়া মন মানিতে চায় না। সেই সময় বেলুড় মঠে কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। মিশন-কর্ত্তৃপক্ষ সাহায্যের আবেদন করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বিদ্যার্থী জীবন গড়িয়া তুলিবেন—এই সঙ্কল্প। ধর্ম্মসম্প্রদায় পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে কি রকম ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা জানিতাম বলিয়া সেই বিষয়েই কিছু লিখিয়াছিলাম। এতদিন পরে ভাল মনে পড়ে না। ইতিমধ্যে পরিবর্ত্তনও অনেক হইয়াছে। প্রবন্ধে উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ আর ইহধামে নাই, কেহ কেহ ভোল বদলাইয়াছেন। কিন্তু পুরাতন কথাই আবার মনে জাগিতে লাগিল।

'গেছো বাবা' পড়াইবার সময় বন্ধু যাহা বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই হয় ত অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু উপলক্ষ্য যাহাই হৌক, অবতার সমস্যা ত' অপ্রাসঙ্গিক নয়। যাহা বলিতে চাই, তাহা গুছাইয়া বলিতে পারিব না, যুক্তি-তর্ক ভাল দিতে পারিব না, তথ্যাদিও নির্ভুল হইবে না। কিন্তু যোগ্যতর ব্যক্তি কেহ ত ইহাতে হাত দিতেছেন না। অনধিকারীর বাগ্‌বিস্তার সেই জন্যই। পাণ্ডিত্য নাই, লিপিকুশলতা নাই, কিন্তু ব্যাকুল ব্যগ্রতা আছে।

হালসীবাগানের হত্যাকাণ্ড আমরা ইতিমধ্যেই বিস্মৃত হইয়াছি, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ আমাদিগকে এমনি চাপিয়া ধরিয়াছে যে, দু'দিন আগের কথা ভাবিবার ফুরসৎ পাই না। 'শনিবারের চিঠি'তে হালসীবাগানের নরমেধ সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে এই কথাগুলিও ছিল—"হালসীবাগানের ঘটনায় আরও একটি বিষয়ে জনসাধারণের চিন্তিত হইবার কারণ আছে। বাংলাদেশের স্থানে স্থানে যে মারাত্মক গুরুবাদ প্রচার ও প্রসার লাভ করিতেছে, সে সম্বন্ধেও আমাদের অবহিত হইবার সময় আসিয়াছে। গুরুরূপ অগ্নিশিখার আকর্ষণে বহু পতঙ্গ আকৃষ্ট হইয়া এরূপ প্রত্যক্ষ ভাবে এবং অত্যল্পকালে না হউক, ভিতরে ভিতরে এবং ধীরে ধীরে দগ্ধ হইয়া সংসার পরিজনকেও যে দগ্ধ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার দৃষ্টান্ত বাংলাদেশে মোটেই বিরল নয়। এরূপ দুর্ঘটনার সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান। এই ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতেও একজন তথাকথিত গুরুর আকর্ষণ আছে শুনা যাইতেছে। স্ত্রী ও শিশু-সন্তানদের হত্যাযজ্ঞে পুরুষদের অনুপস্থিতির ইহাও একটা কারণ নয় তো ? মোটের উপর নানাদিক দিয়া আমাদের সাবধান হইবার সময় আসিয়াছে।"

কিন্তু চিন্তিত হইবার কারণ থাকিলেও জনসাধারণ চিন্তিত বা সাবধান হইয়াছেন কি ? কোন পত্র-পত্রিকায় ত' তেমন কোন সাড়া পাই না। এমন কি 'শনিবারের চিঠি'তেও উক্ত প্রসঙ্গ আর উত্থাপিত হয় নাই। এই পত্রিকায় গোড়ার দিকে বাঙ্গালীজীবনের সর্ব্ববিভাগকে জঞ্জালমুক্ত করিবার একটা প্রয়াস লক্ষিত হইত। "নকুড় ঠাকুরের আশ্রম" নামক যে উপন্যাস উহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার লক্ষ্য কে বা কাহারা, সে-বিষয়ে আনাড়ীরও সংশয় ছিল না। ইদানীং 'চিঠি'র পরিধি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে—সাহিত্যের বাহিরে পা বাড়াই-

বার অনিচ্ছা সুস্পষ্ট। কখনও কখনও ছিঁটে-ফোটা আলোচনা দেখিয়াছি—যেমন গৌড়ীয় মঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত এক বেদান্ত-গ্রন্থের উৎকট ইংরেজীর প্রতি কটাক্ষ (গৌড়মঠের বাংলাভাষার নমুনাও এমনি উৎকৃষ্ট)। আর পড়িয়াছিলাম 'মিস্ মেয়ো' নামক গল্প (ভাদ্র, ১৩৪৬) কিন্তু রঙ্গব্যঙ্গের কাজ নয়, একেবারে কষিয়া বেত লাগাইতে হইবে। 'আনন্দবাজার'-এর পৃষ্ঠায় বহুদিন আগেও প্রণবানন্দ ও নিগমানন্দ সম্বন্ধে এই রকম খোলা-খুলি আলোচনা হইয়াছিল।

অবতারব্যাধি ক্রমশঃই বিস্তৃত হইতেছে। একবার আমি নাম সংগ্রহ করিয়াছিলাম। রুই-কাতলা হইতে চুণোপুঁটি পর্য্যন্ত গুণিয়া পঞ্চাশের বেশী নাম পাওয়া গিয়াছিল। প্রণবানন্দ, নিগমানন্দ, মুক্তানন্দ, জ্ঞানানন্দ, দয়ানন্দ, স্বরূপানন্দ; যোগানন্দ, ভক্তিবিনোদ কেদার দত্ত ও তৎপুত্র অন্নদা ঠাকুর, অনুকূল ঠাকুর, প্রভু জগবন্ধু, জনকয়েক মাতাজী—এমনি আরও কত। এই রকম গুরু ও অবতারবাদ বাংলাদেশে আসিল কোথা হইতে? বাংলা-দেশে সহজিয়া কর্ত্তাভজাদের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বোধ হয় খুব বেশী আলোচনা হয় নাই।

ডাঃ দীনেশ সেনের "শ্যামল ও কজ্জল" উপন্যাস প্রকাশিত হইলে পর শনিবারের চিঠির পৃষ্ঠায় গ্রন্থলেখক ও ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার মধ্যে যে তর্কযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা পুনরায় পাঠ করিলাম ও ঐ সব বাদপ্রতিবাদের মধ্যে উল্লিখিত "চারুদর্শন" ও 'Discovering of Living Buddhism in Bengal' সংগ্রহ করিয়া পড়িলাম। কূল-কিনারা না পাইয়া হাল ছাড়িয়া দিলাম।

কিন্তু উৎপত্তি যেমনই হোক, গুরুবাদ যে বাংলাদেশে জাতীয় জীবনের অন্তস্থল পর্য্যন্ত শিকড় চালাইয়া দিয়াছে, সে-বিষয়ে সংশয় নাই। আশ্চর্য্য ভুতুড়ে কাণ্ড। প্রত্যেক শক্তিধর পুরুষের প্রবণতা এই দিকে—All paths lead to Rome! গুরুপদবীর মোহ এমনই যে, শীঘ্র হোক বিলম্বে হোক সকল শক্তিমান ব্যক্তি কালে মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায় এই অজগরের চারিপাশে ঘুরিতে থাকেন। প্রতীকবিরোধী কালাপাহাড় (iconoclast) সমাজেরও একই দশা। অরবিন্দ ঘোষ এখানে ঋষি ঔরবিন্দ (Aurobindo), মতিবাবু শ্রীমতিলাল রায়, এমন কি কবি সম্রাট্ পর্য্যন্ত শেষকালে গুরুদেব বনিয়া গেলেন। মজার কথা এই, ব্রাহ্মসমাজের ছোঁয়াচ এ-দেশে আর্য্যসমাজেও লাগিয়াছে। আর্য্যসমাজীরা অবতারবাদ মানেন না। কিন্তু কেহ স্বামী দয়ানন্দকে ঋষি দয়ানন্দ বলিয়া উল্লেখ না করিলে মনঃক্ষুণ্ন হ'ন। প্রথম হইতে ঋষির স্থলে মহর্ষি না চালাইয়া কেহ কেহ পস্তাইতেছেন।

এক রকম গুরুপূজা ভারতের অন্যান্য অংশেও আছে বটে। ভারতে কেন, জগতের সর্ব্বত্রই শক্তিমানের প্রতি শ্রদ্ধাবনত ভাব বিদ্যমান। ভারতে একটু বেশী। কিন্তু বাংলাদেশে ইহা বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্বলিত বিদ্যায় (Art) পরিণত হইয়াছে এবং ইহার থিওরী সম্বন্ধেও বাগ-বিস্তার কম হয় নাই। ভারতের অন্যপ্রদেশে সাধু-সন্ন্যাসীর অপ্রতুল নাই, তাহাদের চেলাও অনেক, কিন্তু কই বাংলাদেশের মত পাদসম্বাহন চরণামৃত পান উচ্ছিষ্ট-ভক্ষণ ত' দেখি না। ভক্তানী লইয়া কাণ্ড-কারখানাও তেমন শোনা যায় না। আর একটা কথা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলিয়া রাখি। জওহরলাল কোথাও বোধ হয় তাঁহার আত্মজীবনীতে, পা-ছুঁইয়া প্রণাম করাকে দাসমনোভাব বলিয়াছেন। তাঁহার এই নিন্দা যে শুধু পাশ্চাত্যপ্রভাবের ফল, তাহা না হইতেও পারে। পশ্চিমাঞ্চলে পা-ছুঁইয়া প্রণাম করার প্রথা ব্যাপক নহে। কেহ কেহ মা-বাপের পাদস্পর্শ করে মাত্র। নহিলে সর্ব্বত্রই কাষ্ঠ প্রণামের রেওয়াজ।

মারাত্মক ধরণের গুরুবাদ কবে কোথায় কি ভাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিল, তাহার অবিসম্বাদিত ইতিহাস আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে শেষের দিকে ইহা বাংলা-দেশের নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কি করিয়া তাহা পুনরুজ্জীবিত হইল? আমরা যদি গুরুবাদের এই বিকৃত রূপকে আঘাত করিতে চাই, তবে তাহার উৎপত্তি, অন্ততঃ পুনরুত্থানের কথা জানা দরকার। আমি যেমন বুঝিয়াছি নিবেদন করিব। আনুষঙ্গিক অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারে যথাতথ তথ্য দিতে পারিব না। আসল কথাটি যদি বুঝাইতে পারি, তবেই যথেষ্ট।

চার

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে স্বদেশীয় সমস্ত কিছুর উপর লোকের শ্রদ্ধা লোপ পাইতেছিল। বাঙ্গালীচিত্তের বিদেশমুখী গতি অনেক পরিমাণে রোধ করিলেন ব্রাহ্ম-সমাজ। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজকে আমি প্রধানতঃ সমাজ সংস্কার আন্দোলন বলিয়া গণ্য করি, কারণ আমার ধারণা সন্ন্যাস ও মোক্ষ ধর্ম্মের প্রধান কথা। যে-গৃহস্থের জীবন এই আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না—প্রথমেই না হৌক, অন্ততঃ সংসার ভোগান্তেও যে সংসার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়, তাহার মুখে ধর্ম্ম শুধু কথার কথা। ত্যাগ তপস্যা প্রত্যক্ষ ভাবে দুই দশ জনের দ্বারা এবং পরোক্ষভাবে সমগ্র মণ্ডলীদ্বারা আদর্শরূপে স্বীকৃত হওয়া চাই। জপ-তপ, ধ্যান-ধারণা, ত্যাগ-বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, মোক্ষ ইত্যাদির উপর বিশেষ কোন জোর না দেওয়াতে আমি ব্রাহ্মসমাজকে ধর্ম্মান্দোলন বলিতে প্রস্তুত নহি। এই সবের উপর শিক্ষিত সাধারণের কোন শ্রদ্ধা তাঁহারা জাগাইবার চেষ্টা করেন নাই। লোকে তুকতাক, গেরুয়া, কমণ্ডলু, যোগ-তপকে একই পর্য্যায়ে ফেলিয়া সমস্ত এক বুজরুকী মনে করিত। সেই সময় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অভ্যুদয়। বিবেকানন্দ স্বামী অসামান্য প্রতিভা, ত্যাগ, তপস্যা ও সেবাদ্বারা বাঙ্গালীচিত্তে ভারতের জাতীয় ধর্ম্মের ও সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের আসন দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। ক্ষুরধার বুদ্ধির ও অলোকসামান্য চরিত্রের বলে তিনি সমস্ত বাধাকে অপসারিত, সমস্ত বিরোধিতাকে পরাস্ত করিলেন। তপস্যার ভারে দেহ ভগ্ন করিয়া ত্যাগ, তপস্যা, ঈশ্বরানুরাগের মাহাত্ম্য লোকের মনে জাগ্রত করিলেন।

এক পুরুষের উপার্জ্জিত ধন দশ পুরুষে বসিয়া বসিয়া খায়। প্রাণপাত করিয়া যে ধন উপার্জ্জন করে, ভোগ করিবার পূর্ব্বেই তাহার পরপারের ডাক পড়ে। স্বামীজী জীবিতকালে বাঙ্গালী জনসাধারণ হইতে নিন্দাগ্লানির তুলনায় কি পরিমাণ শ্রদ্ধাপূজা পাইয়াছিলেন, তাহার হিসাব নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু তিনি যে বিত্ত সঞ্চয় করিয়া গেলেন, শুধু রামকৃষ্ণমণ্ডলী নহে, সমগ্র সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তাহার উত্তরাধিকারী হইল। রবাহূতের দল ধর্ম্মের দুয়ারে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল এবং কেহ নিরাশ হইয়া ফিরিল না। দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ করিয়া, ছিন্নবাসধারী সহায়-সম্বলহীন বীর সন্ন্যাসী তপস্যার যজ্ঞানলে আত্মাহুতি দিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞ হইতে উদ্ভূত বৈভব আজ অন্যদের ভোগে লাগিতেছে। সকলে বাড়া ভাতে বসিয়া গিয়াছে। ইহাদের ঠেকাইবে কে এবং কি করিয়া?

বাপের টাকা ব্যাঙ্কে থাকিলে চোখ বুজিয়া হাত-পা ছড়াইয়া নিশ্চিন্তে দিন কাটানো যায়। পূর্ব্বগামী কর্ত্তৃক সম্প্রদায়ের জন্য পুনরর্জিত শ্রদ্ধা ও ধন কিন্তু টাকার চেয়ে একটু বেশী হেফাজতের দরকার রাখে। সুতরাং এই সব নব্য 'গেছোবাবা'রা এই নবজাগ্রত শ্রদ্ধাবোধকে জিয়াইয়া রাখিবার নানা ফন্দী-ফিকির অবলম্বন করিয়াছিল। এবং সেই সব উপায়ের বেলায়ও বিবেকানন্দ স্বামী পথ-প্রদর্শক। একে একে এই সব উপায়ের আলোচনা করিব।

প্রথম উপায় সঙ্ঘ-স্বামীর অবতারত্বখ্যাপন। সারা-জীবন অসাম্প্রদায়িক বেদান্তধর্ম্ম প্রচার করিয়া পূজা, ঘণ্টা নাড়া, চালকলাবাঁধাকে বিদ্রূপ করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকাশ্য অবতারত্বখ্যাপনের বিরোধিতা করিয়া, শেষকালে স্বামীজী স্বয়ং পরমহংসদেবকে অবতার-গরিষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই মহাজনপন্থা পরে বহুধা অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু অবতার বলিলেই লোকে বিশ্বাস করিবে কেন? পরমহংস রামকৃষ্ণের অদ্ভুত চরিত্র, ত্যাগ, তপস্যা ত যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না; তবে কি দেখিয়া লোকে লুটাইয়া পড়ে? এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে বিবেকানন্দ স্বামী প্রবর্ত্তিত জনহিতকর কার্য্যাদি স্মরণ করিতে হয়। সন্ন্যাসীদের মধ্যে যাঁহারা সারাদিন ধ্যান-জপ লইয়া থাকিতে পারেন না, ধ্যানধারণা-প্রীতি ছাড়া লৌকিক কর্ম্মস্পৃহা যাঁহাদের মধ্যে বলবতী, তাঁহাদের প্রবৃত্তি এবং শক্তিকে তিনি এমন খাতে বহাইয়াছিলেন, যাহাতে লোক-কল্যাণও হয়, অথচ তপস্যা-ব্রত কর্ম্মী প্রধান লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট না হন। শিবজ্ঞানে জীবসেবার মধ্যে তিনি সমষ্টির হিত ও ব্যষ্টির তপস্যা (আত্মনে-মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ) দুইটি মিলাইয়া দিলেন। সন্ন্যাসীর জীবনকে যুগপৎ তাঁহার নিজের ও সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করিবার এই পন্থা আবিষ্কার, ভারতের প্রাচীন

সন্ন্যাসাশ্রমকে এই ভাবে নূতন রূপ দেওয়াই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। এই পন্থা উদ্ভাবনে দেশহিতের কথাই আগে ভাবিয়াছিলেন, অথবা মোক্ষমার্গীর তপস্যা-পথ সুগম করিবার কথাই তাঁহার মনে প্রথমে উঠিয়াছিল,—পৌর্ব্বাপর্য্যের এই প্রশ্ন অবান্তর। তিনি সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া লোককল্যাণব্রতকে সঙ্ঘের অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আরম্ভ হইল—বন্যা দুর্ভিক্ষে মহামারীতে সেবাকার্য্য। আর আরম্ভ হইল বিদ্যালয় স্থাপনপূর্ব্বক শিক্ষাদান।

দুঃস্থের সেবায় চিত্তশুদ্ধি হইবে—এই হইল সেবাকারীর উদ্দেশ্য। চিত্তশুদ্ধি কতটুকু কার্য্যতঃ হয়, তাহার হিসাব দুরূহ। কর্ম্মী নিজেও তাহা অনেক সময় বুঝিতে পারেন না। কর্ম্মই শেষকালে নাগপাশের মত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া ধরে, ত্যাগ-তপস্যা ভুলাইয়া অধিকতর মোহময় দ্বিতীয় সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করে। রামকৃষ্ণ মিশনের কোন কোন কর্ম্মী এইজন্য কর্তৃপক্ষের আদেশ সত্ত্বেও কর্ম্মস্থল ছাড়িতে চাহেন নাই। এই জন্যই নিয়ম হইয়াছে, কোন কর্ম্মী কোথাও নির্দ্দিষ্টকালের বেশী (পাঁচ বৎসর?) থাকিতে পারিবেন না। বলিতেছিলাম যে, কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি কি পরিমাণে হয়, তাহার হিসাব করা শক্ত, কিন্তু সৎকর্ম্মের একটা নগদ বিদায় আছে—বিপন্নের শ্রদ্ধা। নিষ্কাম, মন-মুখ-এক নিবিষ্ট সেবাব্রতীকে লোকে দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করে। এই শ্রদ্ধা সঙ্ঘের বড় কাজে লাগে। তাহার দ্বারা আত্মপূজা, সঙ্ঘ-নায়কের পূজা-প্রবর্ত্তন সহজ হয়। এখন আমাদের দেশে যত সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ ও অবতার আছেন, অল্প বিস্তর সকলেরই এই এক কার্য্য-প্রণালী। বিপন্নের সেবা, সেবাদ্বারা সৃষ্ট সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতার ভিত্তির উপর আত্মপূজার প্রাসাদ নির্ম্মাণ। জন-সেবার জন্য অর্থ সংগ্রহ কর্ম্মী সংগ্রহে আজকাল বেগ পাইতে হয় না। প্রথম ঝক্কী পথিকৃৎগণ পোহাইয়া লইয়াছেন। চাঁদার আবেদন বাহির হইলেই থলি ভরিতে থাকে। গভর্ণমেণ্টও আজকাল ইঁহাদিগকে সাহায্য করেন।

পাঁচ

আর শিক্ষাবিস্তার? ইহাই বোধকরি ভক্ত-সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ উপায়। আমাদের দেশের স্কুল-কলেজে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয় না—এ একটা বড় নালিশ। কিন্তু সম্প্রদায়-পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে যে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা দেখিয়া মনে হয়, এই ভাল, নিরীশ্বর শিক্ষাই বাঞ্ছনীয়।

আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বিদ্যার্থী-জীবন গড়িয়া তুলিবেন—এই ব্রত নিয়া ধর্ম্ম-সঙ্ঘসমূহ বিদ্যায়তন স্থাপন করেন। আধ্যাত্মিক আবহাওয়া বলিতে কে যে কি বোঝেন বলা এক কঠিন সমস্যা। কার্য্যতঃ দেখা যায়, সঙ্ঘস্থাপন কর্ত্তাকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরাবতার বোধে পূজা করাই, অথবা তাহার সমপর্য্যায়ভুক্ত কোন সাম্প্রদায়িক মতবাদ ও উপাসনাই আধ্যাত্মিকতা। আর্য-সমাজ ব্রাহ্ম-সমাজ প্রভৃতি যে সব সম্প্রদায় নিরাকারবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের শিক্ষাসত্রসমূহেও একরকমের পরমত-অসহিষ্ণু গুরুপূজা প্রবেশ লাভ করিতেছে। আমি প্রত্যক্ষ গুরুবাদের প্রচার ও প্রসার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি বলিয়া আর্য্য-সমাজ ও ব্রাহ্ম সমাজ মুখ্যতঃ আমার বিবেচনার গণ্ডীর মধ্যে পড়ে না। প্রচ্ছন্ন গুরুবাদ লইয়া টানাটানি করিতে গেলে শেষে ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড় হইয়া যাইবে। যে সব শিক্ষায়তনে খোলাখুলি সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকের পূজা প্রচলিত, আপাততঃ তাহারাই আমার লক্ষ্য। এই ধরণের যে কোন বিদ্যালয়ে যান, দেখিবেন সঙ্ঘ-নেতার ও তৎপারিষদ্‌গণের তিথি পূজা, নিত্য পূজা, ভোগরাগ আরাত্রিক হইতেছে। অল্পবয়স্ক ছাত্রগণ সোৎসাহে পূজা-অর্চ্চনাতে যোগ দেয়। তৎন ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, নব্য-অবতার-পূজা, দুর্গাপূজা-কালীপূজার মতই হিন্দুধর্ম্মের অচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং সমগ্র হিন্দু-সমাজ উক্ত সঙ্ঘের জনহিত-কার্য্যাদির সঙ্গে ইহাও মানিয়া লইয়াছে। যে বয়সে বিচার-বুদ্ধির উন্মেষ হয় না, সেই বয়সে এই নব্য অবতার পূজা শিশু মনের সহজাত সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা ও সঙ্গীতপ্রিয়তাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার নির্ম্মীয়মান চরিত্রের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে। মূর্ত্তিপূজার এক অতি শক্তিশালী Æsthetic Appeal আছে। ধূপ-ধুনার সৌরভ, পত্র-পুষ্পের সজ্জা, সঙ্গীত-বাদ্যাদির সমারোহ, সুললিত কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ, ভোগরাগ—এই সবের এক অতি উন্মাদনাকর (intoxicating)

প্রভাব আছে, তাহা স্বতঃ স্বীকার্য্য। মূর্ত্তিপূজার এই সব অঙ্গ অবতারপূজায় প্রবেশ করানো হইয়াছে। শিশুর রক্তের ধারায় ইহা মিশিয়া যায়, সারা জীবনে আর মোহাবেশ কাটে না। জীবনে আর বুদ্ধির বাধাহীন বিকাশ হইতে পারে না। আমি এক কালাপাহাড় বন্ধুকে জানি। তিনি প্রচণ্ড নাস্তিক এবং নিন্দুক। রামকৃষ্ণ-মিশনের এমন কটু সমালোচনা আমি আর কোথাও শুনি নাই। অথচ রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর প্রতি নাড়ীর টান এমন যে, নিজে যাহাকে দিনরাত আক্রমণ করিতেছেন, অপরের মুখে সেই সমালোচনার সামান্য প্রতিধ্বনিও সহিতে পারেন না। ভাবখানা এই—"আমার জিনিষ, আমি যেমন ইচ্ছা কাটিব, তোমরা কথা কহিবার কে?" বুদ্ধি যাহা গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহা সোজা পথে হৃদয়ে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। বাল্যে তিনি ত্যাগব্রতী কয়েকজন পূতচরিত্র রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুর সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তার ফলে বুদ্ধি ও হৃদয়ের দ্বন্দ্বে বুদ্ধি পরাজিত হইয়াছে। চরিত্রবান ধর্মৈকজীবন আদর্শবাদী শিক্ষক-সাধুগণের সংস্পর্শে আসিয়া শিশুগণ্ শিক্ষাগুরুর আধ্যাত্মিক মত আপনার অজ্ঞাতসারেই হৃদয় দিয়া শুষিয়া লয়, (absorbs)। পূজানুষ্ঠানের বেলায় যেমন, এখানেও তেমনি শুধু হৃদয়ের কারবার। বিচারবুদ্ধির লেশমাত্র বালাই নাই। বিদেশী শিক্ষক বিশেষতঃ ধর্ম্মপ্রচারক শিক্ষকের নিকট অপরিণত বুদ্ধি বালকবালিকাগণকে শিক্ষার্থে প্রেরণের অনেকেই বিরোধী। এই বিষয়ে স্বর্গত চিন্তাবীর ডক্টর হরদয়ালের এক সুচিন্তিত প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম—যাহা তাঁহার মৃত্যুবৎসরে পুনরায় মডার্ণরিভিয়ুতে ছাপা হইয়াছিল। কিন্তু নজীর নিষ্প্রয়োজন। মিশনরী মেমদের মমতাবিষ্ট হইয়া অনেক বালিকার কি দশা হয়, তাহা আমি এখানে প্রতি বৎসর দেখি। এখানকার মিশনারী-পরিচালিত বালিকা-বিদ্যালয়ের কথা জানি—প্রতি বৎসর দু'চারটি মেয়ে খৃষ্টান হয়। মিশনরীরা হাসপাতাল-স্কুল কুষ্ঠাশ্রম প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্য করেন (বিবেকানন্দ স্বামী তাঁহাদের দৃষ্টান্তে প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন) কিন্তু পাকেচক্রে ধর্ম্মান্তরিত করিবার ফিকিরে থাকায় তাহাদের এমন সব মহৎ কর্ম্ম রাহুগ্রস্ত হইয়া আছে। দারুণ রাহু এমন চাঁদেরেও হানে। যে আপত্তি বিদেশী শিক্ষাদাতাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, সেই আপত্তি কি আমাদের দেশীয় ধর্ম্মপ্রচারকদের সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা যায় না?

ছয়

বলা যাইতে পারে বিদ্যার্থীর উন্নত জীবন গঠন করাই উদ্দেশ্য—তা যে উপায়েই হোক। অবতার-পূজা করিয়া কতলোক মহামানব-পদবীতে আরূঢ় হইয়াছেন, এতে দোষ কি?

দোষ বোধ করি নাই, কিন্তু কোন্ অবতারের পূজা? কালক্রমে শ্রীচৈতন্য অবতার বলিয়া স্বীকৃত ও পূজিত হইতেছেন, কালক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণও বাঙ্গালী হৃদয়ে অনুরূপ স্থান গ্রহণ করিবেন। যদি এখনই তাহা সম্ভব হয়, তবে আনন্দেরই কথা। অবতারবাদ আমি বুঝি না, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও আমি অন্ধকার দেখি, কিন্তু অল্প যাহা বুদ্ধি আছে, তাহাতে মানিতে বাধ্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণের মত মহামানব সহস্র বৎসরে একজন আবির্ভূত হন না। কিন্তু তাঁহার অনুকরণে এই যে দেশময় অবতারের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, যাহাদের জ্বালায় ভদ্রলোকের দেশে তিষ্ঠানো দায় হইয়া উঠিতেছে, তাহাদিগকে রোধ করিব কি করিয়া? রামকৃষ্ণ-ভক্তেরা বলুন না, এই নিত্য নূতন লীলাধারীদের আবির্ভাব লাগে কেমন? প্রণবানন্দ-পূজায় আপত্তি আছে, কি নাই? দক্ষিণেশ্বরের অন্নদাঠাকুর নিজেকে রামকৃষ্ণের অবতার বলিতেন। তাহার নামে বহু রামকৃষ্ণ-ভক্তকে মুখ বিকৃত ও অপভাষা প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি। একদল অপর দলের নিন্দা-কুৎসা না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। পরস্পর মুণ্ডপাতেচ্ছু এই সব সাধু-সঙ্ঘের প্রেম-কলহের অন্ত নাই। রামকৃষ্ণ-মিশনের মধ্যে কয়েক ভাগ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের পারস্পরিক কলহ সুবিদিত। ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘের এক সন্ন্যাসীকে আমি একবার এ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি সুপরিচিত হিন্দী শ্লোক আওড়াইয়া গেলেন, "সাধু চলে বজারমে কুত্তা ভুকে হাজার!" ধন্য ধর্ম্মানুরাগ! একে অন্যকে কুকুর বলিতেছে, কিন্তু কে সাধু কে কুকুর, জানিব কি প্রকারে? বাইরের কার্য্য সকলেরই প্রায় একরকম—লোকসেবা

দ্বারা শ্রদ্ধার্জ্জন, তৎসহায়ে আত্মপূজা-প্রবর্ত্তন এবং বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া পূজা-আড়ম্বর দ্বারা শিশু-মস্তিষ্ক মোহাবিষ্ট করিয়া ভবিষ্যৎ ভক্তদল গঠন। বিবেকানন্দের অনুকরণে আগে শ্বেতচর্ম্ম-বিজয় যোগ্যতার লক্ষণ বলিয়া লোকে ধরিত; কিন্তু বারবার চাটিতে চাটিতে অমৃতও বিস্বাদ হইয়া উঠে। ইউরোপ ও আমেরিকায় যে সে যায়। Hinduism invades America গ্রন্থে দেখি যোগদা-সৎসঙ্গের যোগানন্দ স্বামী (রাঁচী ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় যাঁহাদের) আমেরিকায় যোগদা-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। জগবন্ধু-ভক্ত ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী আমেরিকা-বিজয় করিয়া ফিরিয়াছেন। গৌড়ীয় মঠের ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ হিটলারের সঙ্গে পর্য্যন্ত দেখা করিয়াছিলেন। ('বন' এখন গৌড়ে নাই, জঙ্গলে—wilderness এ গা ঢাকা দিয়াছেন) এখন ইউরোপ-আমেরিকায় যোগব্যবসা যে সে করে। মাঝে মাঝে শ্লেষাত্মক রসাল বর্ণনা কাগজে বাহির হয়। শ্বেতচর্ম্ম হইলে হইবে কি? মূর্খের অভাব কুত্রাপি নাই। জরাগ্রস্তবুদ্ধি মরণকাতর বৃদ্ধ ও ভাবপ্রবণ হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত মহিলা ভক্ত সংগ্রহের জন্য উচ্চ আধ্যাত্মিকতার দরকার হয় না। চাই লোকচরিত্রজ্ঞান ও দৃঢ় একনিষ্ঠা। দীর্ঘকাল যদি কেহ অনন্যমনে কোন বুজরুকী আচরণ করে, তবে শুধু একনিষ্ঠতাব বলেই সে লোকচিত্তে মোহবিস্তার করিতে সক্ষম হয়। 'বিরিঞ্চি বাবা'র মত লাঞ্ছনা অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে, কিন্তু দেশের লোকের চৈতন্যোদয় হইল কই?

আমি এ-কথা বলি না যে প্রত্যেক 'গুরু' ও 'অবতার'ই জোচ্চোর। ভক্তসংগ্রহ পূর্ব্বক অবতার হইতে গেলে শুধু বিবেকানন্দের অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য কীর্ত্তির সস্তা অনুকরণ করাই যথেষ্ট নয়, যৎকিঞ্চিৎ ধ্যান ধারণাও প্রয়োজন। গোড়ার দিকে হয় ত' এঁদের প্রত্যেকেরই কিছু পরিমাণ ত্যাগ-তপস্যা ছিল। হয় ত' কোনপ্রকার যোগবিভূতি অর্জ্জন করিয়াই, সাধনায় কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, মধ্যপথে পথভ্রষ্ট হইয়াছেন। জীবনের অন্যক্ষেত্রে যাঁহারা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন—ডাক্তার, উকিল, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, এইরূপ শত শত সম্ভ্রান্ত বিদ্বান্ চরিত্রবান লোককে এই সব ক্ষুদে 'শ্রীবাবা'-দের আজ্ঞাবহ দাসরূপে জীবন কাটাইতে দেখিয়া, এই ধারণাই হয়। কিছু না কিছু জিনিস আছে, যাহা প্রথম আকর্ষণ সৃষ্টি করে, যাহার প্রভাবে তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিরা আসিয়া এলাইয়া পড়েন। কারবার সুরু করিবার মত যৎসামান্য মূলধন ইঁহাদের থাকা সম্ভব—বাকী সব স্বপ্ন-মায়া-মতিভ্রম। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ধর্ম্মসম্বন্ধে সংশয় অবিশ্বাস এমন ভাবে নির্মূল করিয়া গিয়াছেন যে, এই ধর্ম্মোন্মাদ দেশে এখন ত্যাগতপস্যা না হইলেও, শুদ্ধমাত্র দৃঢ় একনিষ্ঠতার বলেই অবতারপূজা চালানো যায়। এমনিই বাংলার জলহাওয়ায় এক রকম গদগদ ভাব, রোমাণ্টিক আদর্শ-প্রাণতা ছাইয়া আছে। জন্ম হইতেই আমাদের দেহে-মনে ইহা অনুপ্রবিষ্ট। জলভরা মেঘের মত থমথমে হইয়া আছে, একটু হাওয়া লাগিল কি শতধারে ভাঙ্গিয়া পড়িলাম। কীর্ত্তনের সুর শুনিলে গায়ে কাঁটা দেয়, 'মা' বলিতে প্রাণ আন্‌চান্ করে, চোখে জল ভরিয়া আসে। তার উপর শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত আদর্শে পাশ্চাত্যশিক্ষায় নবোন্মেষিত বিচারবুদ্ধি একেবারে বিকল হইয়া গিয়াছে। এখন শুধু হৃদয়ের কারবার—দাও আর ফিরে নাহি চাও. তা হৃদয়ে সম্বল থাকুক আর না থাকুক। যুবকেরা সন্ন্যাস-ধর্ম্মে এক রকম রোমান্সের আস্বাদ পায়, ও দলে দলে সন্ন্যাসীর দরজায় ধর্ণা দেয়। এদিকে বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়রাও কষিয়া পরলোকের দিকে দৌড় লাগাইয়াছেন। যুবকরা যদি আসে রোমান্সের টানে, বৃদ্ধেরা আসেন ভয়ে। তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকিয়াছে, যৌবনের তেজ, বুদ্ধি, উৎসাহ নাই। রকমারী ভোগ-বিলাসে জীবন কাটিয়া গিয়াছে, এখন পরকালের ভাবনা জোর চাপিয়াছে। কে জানে সেখানে কি রকম অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হইতেছে। নিজের অতীত স্মরণে হৃৎকম্প উপস্থিত। যেহেতু উদ্যম-অধ্যবসায়ের অভাব, তাই সস্তায় বাজীমাৎ করিতে হইবে। পরলোকে ভাল সীট চাই। ফ্রীপাস হইলেই ভাল—নিদেন কনসেশন। সকলেই 'ব-কলমা' দিতেছেন। এই বিষয়েও রামকৃষ্ণমণ্ডলী পথ-প্রদর্শক। রহস্যময় আধ্যাত্মিক ব্যাপার বুঝি না, তবে শুনিয়াছি, নিজের খুব চেষ্টা চাই—'উদ্ধরেৎ আত্মনাত্মানং।'

কিন্তু গিরিশ ঘোষ যে 'ব-কলমা' দিয়েছিলেন! তাই এখন দলে দলে সকলকে বকলমায় পাইয়া বসিয়াছে। ত্যাগ-তপস্যা নাই, ধ্যান-ধারণা নাই,, দেশশুদ্ধ মুক্তি নেবে চল। স্বামী সারদানন্দ "লীলাপ্রসঙ্গে" এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া লোককে মন-মুখ এক করিতে বলিয়াছেন, আত্মপ্রতারণা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যে পরে কা কথা, রামকৃষ্ণমণ্ডলীর গুরুকৃপাসম্বল প্রহ্লাদবৃন্দই নিরস্ত হন নাই। কত লোককে বলিতে শুনি "আমাকে কিছু করিতে হইবে না। আমার ভার গুরুমহারাজ নিয়াছেন।" বস্ আর কি! মনের সাধে চুরী-চামারী করিয়া বেড়াও, শেষকালে নৌকা লইয়া মাঝি আসিবেন। ফল কথা, ফাঁকি দিয়া পরলোকে ভাল ব্যবস্থার যোগই বৃদ্ধদের দলে দলে গুরুবরণের কারণ। ইহাদের তর সয় না, ভাল মন্দ বাছিবার সময় নাই। মরি বাঁচি করিয়া নিকটবর্ত্তী দরগায় ধর্ণা দিতে ছুটিতেছেন। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিয়া Paul Brunton সাধুর সন্ধানে সমস্ত ভারত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিয়াছিলেন। (A scowch in India দ্রষ্টব্য) রজোগুণী জাতির রক্তগত কর্ম্মোদ্যম তাঁহাকে এই ক্ষেত্রেও পরিত্যাগ করে নাই।

এখন প্রশ্ন এই, শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব অব্যাহত রাখিয়া এই সব অনুকারীদিগকে নিরস্ত করার কোন উপায় আছে কি?

সাত

সাহিত্যিকগণ সৌন্দর্য্যের পূজারী। বৈজ্ঞানিকদের শুষ্ক যুক্তিবাদ বা অবিশ্বাস-প্রবণতা ইঁহাদের নাই, তবু যেন অবতারের পায়ে লুটাইয়া পড়িতে কোথাও একটা বাধা আছে। সাহিত্যিক মাত্রেরই একটা সুস্থ sense of humour আছে; তাই হয়ত সকল রকম অতি-আচার হইতে ইঁহাদিগকে টানিয়া রাখে। সুসঙ্গতি-বোধ (sense of proportion) ইঁহাদিগকে সকল প্রকার বাড়াবাড়ি হইতে রক্ষা করে। কিন্তু কোন আন্দোলন, জাতীয় চেতনায় কোন রকম বিক্ষোভ যদি একবার সত্যকার সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, তবে সেই আন্দোলন জাতির জীবনে অমরত্ব লাভ করে। সাহিত্য তাড়াতাড়ি কিছু গ্রহণ করে না কিন্তু করিলে চিরকালের জন্য ধরিয়া রাখে। বাংলার বৈষ্ণবধর্ম্ম নানা অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া বিকৃতিদুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। যদি এমন দিন আসে যে বাংলায় একজনও বৈষ্ণব থাকিবে না, তখনও বৈষ্ণব-পদাবলী থাকিবে। শুধু কি তাই? মহাজন-পদাবলীর মধ্য দিয়া এই ভক্তিধারা জাতির সর্ব্বস্তরকে রসসিক্ত করিতে করিতে একেবারে নিম্নতম শিকড় পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। আমরা আর কোনকালে অবৈষ্ণব হইতে পারিব না। সাহিত্য আশ্রয় করিয়া প্রেমধর্ম্ম মরমের পরতে পরতে, রক্তধারায় মিশিয়া গিয়াছে।

রামকৃষ্ণ-আন্দোলন সাহিত্যে এতকাল তেমন শিকড় গড়িতে পারে নাই। আমি শুধু সমসাময়িক সাহিত্যের কথাই বলিতেছি না। বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল; মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের সঙ্গে যখন দেখা হয়, তখন বোধ হয় যুবক রবীন্দ্র নাথও উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদের জীবনে বা সাহিত্যে রামকৃষ্ণপ্রভাব নাই। বাংলাদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অভ্যুদয়ের মত যুগান্তকারী সমসাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত জীবন একপ্রকার নীরব ছিলেন।

বিবেকানন্দ স্বামীর সঙ্গে কোন সাহিত্যিকের সৌহৃদ্য ছিল কিনা জানি না। পরবর্ত্তীকালে শ্রীযুক্ত সুরেশ সমাজপতি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই দিকে ঝুঁকিয়া ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের এক কবিতার অনুবাদ করিয়া-ছিলেন, বীরসন্ন্যাসী বিবেকের বাণীর উল্লেখও করিয়াছেন। কিন্তু এ সবই ছিটে-ফোঁটা ব্যাপার। একমাত্র গিরীশ ঘোষ ও ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ-প্রভাবিত সাহিত্য রচনা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদিগকে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক বলিয়া মানিতে অনেকের দ্বিধা আছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে এতদিন পরিণত হন নাই

কিন্তু সেই অবস্থা ঘুচিতেছে। বাংলাদেশে যে সাহিত্যিক গোষ্ঠী সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী, তাঁহাদের নিকট জাতীয় জীবনের ত্রয়ী (Trinity) বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ। ধীরে ধীরে ইঁহারা বাঙ্গালীর এক সর্ব্বাঙ্গ-

সম্পূর্ণ জীবন-বেদ রচনা করিতেছেন। সাহিত্যে যেমন ইঁহাদের মতামত সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে, আপত্তি থাকিলেও ভয়ে কেহ কিছু বলিতে সাহস পায় না, মর্ম্মেও এমনি অবস্থা হইবে। বিবেকানন্দ-প্রশস্তিমূলক কবিতার মধ্যে সজনীবাবুর "বহ্নি-স্তোত্র" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শুধু বিষয়-গৌরবে নহে,ইহা কবিতা হিসাবেও অতি উৎকৃষ্ট সাহিত্য। সেদিন শনিবারের চিঠিতে দেখিলাম সুরনর ত্রাস মোহিত বাবু 'মানুষপূজা' প্রসঙ্গ শেষে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়াছেন ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁহার আরো দুইটি সাহিত্যিক রচনা আগে পড়িয়াছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ধর্ম্ম আমি ভাল বুঝি না। অথবা যেমন বুঝি তাহা অধিকাংশের মতের বিপরীত। রহস্যময় আধ্যাত্মিক ব্যাপারের এই ক্লেশকর অনিশ্চয়তা বোধ হয় আমার মত আরো অনেককে পীড়া দেয়। স্বীকার করা উচিত যে, ধর্ম্ম অনেক অংশে বিশ্বাসের ব্যাপার এবং বিশ্বাসের শক্তি সকলের সমান নহে। তবু এত গণ্যমান্য ব্যক্তি মনে প্রাণে ধর্ম্ম বিশ্বাসী দেখিয়া যুক্তিবাদীরও খটকা লাগে। সে মানিতে বাধ্য যে তাহার বুদ্ধির অগম্য হইলেও এটা জীবনের খুব বড় একটা motive force। শ্রীরামকৃষ্ণপূজা বেশ কথা। কিন্তু তাঁহার অনুকরণে এই যে দেশময় অবতারের ছড়াছড়ি হইতেছে, তাহার কি হইবে? রামকৃষ্ণ পূজা বন্ধ না করিয়া নবা গেছোবাবাদের পূজা-আরাধনা বন্ধ করা যাইবে কি? রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে সাহিত্য সৃষ্টির উপজীব্য করিবার পূর্ব্বে এইসব কথা ভাবিয়া দেখা দরকার।

কাহারও ধর্ম্মসাধনায় বা ধর্ম্মস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার কথা উঠে না। নিজগুরুকে ঈশ্বরবোধে পূজা করারও বাধা নাই, কিন্তু এই গুপ্ত সাধন-রহস্যের দেশময় প্রচার বিশেষ করিয়া বালকদের মস্তিষ্ক চর্ব্বণ কেমন কথা?

ক্ষণ-পরশ

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

পাতাঝরা মোর বুকে তোমার চরণ পরশনে
উদাস যে-সুর জাগে তন্দ্রাতুর পবনে পবনে,
তারি ব্যথা ভেসে যায় জীবনের কূল হ'তে কূলে,
পাষাণের কারাগারে ঘুরে মরে পথ ভুলে ভুলে।

ভাষাহীন কণ্ঠ মোর আশাহীন ধূসর হৃদয়,
ছন্দহীন পথচলা গন্ধহীন জীবন সঞ্চয়,
নিঃস্ব আমি, তাই তব পরিচয়ে হানি' মোর বুক
কি ব্যথা বাজায়ে প্রিয় বারে বারে করিছ কৌতুক!

আমার আকাশে কভু তাই বুঝি জ্বলিল না তারা,
সুদূর দিগন্ত মোর আঁধারেই হল পথহারা।
এ ধরার অন্তঃপুরে লক্ষশত মানবের সনে
আমারে রাখিলে তুমি চিরদিন এ কোন্ বিজনে!

আমার কুসুম কভু হাসিল না পুলক-হরষে,
ঝরা পাতাগুলি শুধু মর্ম্মরিছে তোমারি পরশে।

চিত্ত-চোর

(গল্প)

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীযুক্ত বিজন সিংহের পদমর্য্যাদা এবং শিল্পবিচার ক্ষুণ্ণ হ'ল যখন শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁকে অন্তরালে জানালেন যে, তাঁর সংগ্রহ-শালার চিত্ত-চোর চিত্রখানি নকল।

—বলেন কি ?

শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী বললেন—ঠিক বলছি। ছ'বৎসর পূর্ব্বে যখন এ ছবি আমার কাছে দেখাতে এনেছিল, আমি তখনই লোকটিকে আমার সন্দেহের কথা জানিয়েছিলাম।

ছয় বৎসর পূর্ব্বের কথা শুনে বিজন সিংহ আহত হ'ল। কারণ সত্যই তো ঐ সময় সে নগদ পাঁচ শত টাকায় এই রাজপুত-শিল্পের উৎকৃষ্ট বিকাশ, এই মনোরম চিত্রখানি কিনেছিল! তার ধারণা চিত্ত-চোর ষোলো শতকে আঁকা। সে আর একবার চেষ্টা করলে নিজের শিল্পবোধ সমর্থন করতে।

—কে বেচতে এসেছিল, মিঃ গাঙ্গুলী ?

—একজন দিল্লীবালা নাম—নাম—হ্যাঁ অম্বাপ্রসাদ।

সত্যই তো সে ছবি বিজন সিংহ কিনেছিল অম্বাপ্রসাদের নিকট। কিন্তু এটা নকল এ কথা কেন বলেন মিঃ গাঙ্গুলী।

মিঃ গাঙ্গুলী বললেন—কারণ, আমার জেরায় সে কথা সে স্বীকার করেছিল। আসল ছবিখানাও আমাকে দেখিয়েছিল! আমি সে-ছবি দৌলত সিংহ মহাশয়কে কিনে দিয়েছি।

শিল্প-বিদ্যা-বিশারদ গাঙ্গুলী মহাশয় যদি একটা ছ' নলা বিভলভার হতে তার দুই জানুতে একাদিক্রমে দুটা গুলি মারতেন, তা হ'লে হয়তো শ্রীযুক্ত বিজন সিংহ আপনাকে ওরূপ দুর্ব্বল ও অসহায় বিবেচনা করত না। আসল ছবি দৌলত সিংহের সংগ্রহ-শালায়, আর তার ঘরে নকল চিত্ত-চোর! আজকের সান্ধ্য ভোজের আয়োজন তার নিজের সাফল্য অপেক্ষা দৌলতের পরাজয়ের উৎসব। যাকে একুনে একশো উনিশ ভোটে হারিয়ে বিজন আজ এম, এল, এ, অকৃত্রিম প্রাচীন চিত্ত-চোর, সেই দৌলতের দৌলতখানায়, এ চিন্তা কাঁকড়া বিছার আকার ধারণ করে তার বুকে হুল বিঁধিয়ে দিল।

বিজন কল্পনার চক্ষে দেখলে পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীর গর্ব্বস্ফীত নির্ব্বোধ মুখ। তার কর্ণে তার ঢাকের বাজনার মত কণ্ঠস্বর প্রবিষ্ট হল। আরে! এম, এল, এ তো বহুত আছে—দুনিয়ার আর কার ঘরে অকৃত্রিম প্রাচীন চিত্ত-চোর বিদ্যমান ?

বিচক্ষণ গাঙ্গুলী মশায় কলাবিদ্যার সঙ্গে লোক-চরিত্র বোঝবার বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন। বিজনের উপস্থিত চিত্তের নিখুঁত ছবির প্রত্যেক রেখাটি, প্রতি বর্ণটি তাঁর গোচরীভূত হল। আহা বেচারা! আজ এই সাফল্যে পরাজয়, লক্ষ্মী পূজার বাসরে অলক্ষ্মীর কালো পেঁচা!

তিনি বললেন—এ ছবিখানা সে ছবির এমন হুবহু নকল যে ভূ-ভারতে দু'তিন জন লোক ছাড়া তা ধরতে পারবে না। শিল্প আপনি বোঝেন, কারণ আপনার সাধনা আছে। সাধারণ লোকের পক্ষে পার্থক্য বোঝবার অবকাশ নাই।

সামান্য একটু মলম পড়লো তার দগদগে ঘায়ে। সে বললে—কিন্তু তবু তো নকল! গিল্‌টি করা টিন চক্‌চকে হতে পারে, কিন্তু সে তো সোনা নয়!

এবার গাঙ্গুলী মহাশয় হাসলেন! তিনি বললেন—যে লোকটা বেচতে এসেছিল, সে নিজেও তেমন সমঝদার নয়! আসল ছবিখানার পিছনে ঠিক কদম গাছের তলায় তিনটে সোনার জলের দাগ আছে। তাকে নিজেকে সেই দাগ দেখে ঠিক করতে হল ভেদাভেদ।

কিন্তু তবু বিজনের চিত্তের অন্তস্তল ভেদ করে মুদারা স্বরে ধ্বনিত হল—তবু তো নকল। আসল দৌলতের ঘরে। চিত্ত-চোরের হাতের বাঁশী বিপক্ষের ধামাধরাদের হাতের কুলো বাজাবার কাঠি হয়ে দাঁড়ালো! বাঁশীর উদাত্ত স্বর পর্য্যবসিত হ'ল—দুয়ো, দুয়ো শব্দে।

সত্যের খাতিরে গাঙ্গুলী ম'শায়কে স্বীকার করতে হ'ল, যে, ব্যাপারের ঐটাই দারুণ কুৎসিত দিক।

দৌলত দু'হাজার একত্রিশ টাকায় চিত্র ক্রয় করেছিল। বিজন তার দ্বিগুণ দাম দিতে সম্মত—তিন গুণও দিতে পারে। যেমন করে হ'ক এ ছবি তার চাই, চাই, চাই।

গোঁফে তা দিয়ে বিনয়ের হাসি হেসে শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী বললেন—অসম্ভব। এ ছবি সে বেচবে না! বিশেষ, আপনাদের এই রেসারেষির দিনে!

দুই

সারারাত বিজন ভাবলে। ভোরের আলো যখন সবুজ কাঁচের ভিতর দিয়ে ঢেকে এসে তার ঘুম ভাঙ্গালো, একটা সুবুদ্ধির রশ্মি তার মগজে বিজলীর রশ্মির মত খেলে গেল। হ্যাঁ, ছলে বলে কৌশলে যখন মরা মানুষের ভোট জীবন্তদের ভোটের সঙ্গে মিশে তাকে আইনসভার সভ্য করেছে, তখন চিত্ত-চোর সংগ্রামে ন্যায়-অন্যায় বাছা ভণ্ডামী। তার বল বুদ্ধি ভরসা—কাঙ্গালীচরণ। কাঙ্গালীচরণ নামে কাঙ্গালী, কিন্তু বুদ্ধিতে ক্রোড়পতি! বিজন আবদার ধরলে ছবি যদি তার ঘরে না আসে, দৌলতের ঘরেই ছবিতে উই পোকা কিম্বা আগুন লাগাতে হবে।

সব শুনে বুদ্ধিকুবের বললে—গঙ্গার জল গঙ্গায় থাকবে, পিতৃপুরুষ উদ্ধার হবে, হ্যাঁ, হবে।

—হবে ? বল কি কাঙ্গালী, হবে ?

—আজ্ঞা! হবে। যার পুঁজিতে টাকা আছে, তার আর কিসের ভাবনাটি। হুজুর বাবুর বাঘের দুধ চাই ? এক মণ তালশাঁসের জল চাই ? আলপিনের পুল তৈরী করতে হবে বারাণসীর গঙ্গার উপর ? ঢালুন রূপচাঁদ, সব হবে।

অধীরভাবে বিজন বললে—থাক থাক, ওসব ঝঞ্ঝাট চাই না। চিত্ত-চোর ছবি চাই।

কাঙ্গালীচরণ দরদী। কাজের লোক কঠোর হয়। কিন্তু

কাঙ্গালী-চরিত্র কর্ম্মকুশলতা এবং সহানুভূতির প্রয়োগ। সে বললে —আহা! এই তুচ্ছ ব্যাপার ভেবে ভেবে আমার হুজুর বাবুর পেরাণটা ভেপে উঠেছে। তিন দিনের মধ্যেই কি ছবি বললেন, চিত্তি-বিচিত্তির—

—আঃ! সব মাটি করলে! চিত্তি-বিচিত্তির নয়—চিত্ত-চোর।

কাঙ্গালী বললে,—নামে কি এসে যায়? কই দেখি কেমন ছবি। বিষের ওষুধ বিষ, চোরের ছবি চুরি করতেই হবে।

চিত্র দেখে কাঙ্গালী বললে—ওঃ! কানুর বাঁশী। তবে শুনুন কথাটা। নিছক যদি তার ছবিটা চুরি হয় তো থানা পুলিশ নানা কাণ্ড কারখানা হবে। ওসব ঝঞ্ঝাটে যাব না! টুক্ করে এই ছবিখানা দৌলত বাবুর ঘরে রেখে তার ছবিখানা আনিয়ে নোব।

—কিন্তু ফ্রেম যে ভিন্ন।

এবার কাঙ্গালী হাসলে। সে বললে—ফেরেমে তো ছবি আটকে থাকে, ছ'টা কি আটটা কাঁটা পেরেক। যে ছবি সরিয়ে আনতে পারে, সে আর আটটা পেরেক খুলে লাগিয়ে দিতে পারবে না? যে খায় চিনি তাকে যোগান চিন্তামণি!

এবার স্বস্থ হল বিজনের প্রজ্ঞা। সে এক চুমুকে এক গেলাস বাদামের সরবত খেয়ে ফেললে, তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন। যার কাঙ্গালীচরণ নাই, দুনিয়াতে সে কেমন করে জীবন ধারণ করে, সে সমস্যা বিজনের মানসপটে একটা প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসার চিহ্ন এঁকে ফেল্লে।

তিন

গোপীনাথ খাসনবীশ পাবনা জেলার সম্ভ্রান্ত বংশের তরুণ। তার সম্ভ্রান্ত দারিদ্র্য তাকে দৌলত সিংহের পুত্রের অভিভাবক-শিক্ষকের কর্ম্ম জুটিয়ে দিয়েছিল। তারপর নিজগুণে সে দৌলতের মিত্রতা অর্জ্জন করেছিল। উভয়ে একত্র সিনেমা, ঘোড়দৌড়ের মাঠ প্রভৃতি মনোরম স্থলে বিচরণ করত। কিন্তু গোপীনাথ কোনো দিন নিজের অবস্থা বিস্মৃত হ'ত না। যতই মিত্রতা গজিয়ে উঠুক—বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ। এক মাসের নোটিশ পেলেই তাকে অন্যত্র অন্নের চেষ্টা করতে হবে।

কাঙ্গালীচরণ তাকে স্নেহ দেখাতো। আর সেই প্রদর্শনীর মূল্য স্বরূপ প্রভুর প্রতিদ্বন্দ্বী গৃহের দু'একটা গোপন কথা সংগ্রহ করত। কাঙ্গালী জানতো গোপীনাথের জীবনের উদ্দেশ্য— স্বগ্রামে একটা চালের কল প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সে কার্য্যের মূল বাধা অর্থাভাব।

কাঙ্গালী তাকে ধর্ম্মতলার মোড়ে ধরলে। ঠিক যে সময় গোপীনাথকে কর্ম্মস্থলে যাবার জন্য ধর্ম্মতলা পৌঁছতে হয়, কাঙ্গালীর সে মহেন্দ্রক্ষণ বিধিমতে বিদিত ছিল।

—ভায়া, তোমার সে চালের কলের কি হ'ল? রূপচাঁদ চাই।

গোপীনাথ বল্লে—দাদা দুনিয়ায় রূপচাঁদই বড়! কলকব্জাই বল, আর ধান-চালই বল, সকল কাজেই টাকা চাই।

কাঙ্গালী বল্লে—কও কেন কথা? ঘর বাঁধতে দড়ি, আর বউ আনতে কড়ি। তবে দৌলতবাবু লোক ভাল, চাইলে কি আর দু'এক হাজার টাকা ধার দেবে না।

গোপীনাথ অট্টহাস্য করলে। বালীগঞ্জের গাড়ীর জন্য মিস্ চঞ্চলা মল্লিক অপেক্ষা করছিলেন। তিনি প্রথমটা সন্দেহ করলেন, সে হাসির উৎসে আছে নারীজাতির প্রতি উপেক্ষার কুবুদ্ধি। কিন্তু তাদের অনপেক্ষ ভাব দেখে তিনি বুঝলেন—সে উচ্চহাস্য শূন্য মনের লক্ষণ কিম্বা ভোতা রসিকতার বিকাশ।

গোপীনাথ বল্লে—দাদা হাত বেঁকিয়ে এদের ভাঁড় থেকে মন খানেক গাওয়া ঘী তোলা যায়, কিন্তু সোজা হাতে এদের কলসীর জল লাগে না দাদা। কচুপাতার মত হাতের জল পিছলে যায়।

ইত্যবসরে ট্রামগাড়ি এলো। এরা উভয়ে গাড়িতে বসে বড় লোকদের বৃহত্ত্ব ব্যবচ্ছেদ ক'রে প্রমাণ করলে যে পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে মানুষ ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করে। তারপর হীনতা, দীনতা ইত্যাদি ইত্যাদি কালো কাজের ফল অর্জ্জন করে আবার অনেকে জন্মান্তরে কয়লার দোকানের মোট বহে কিম্বা আল-কাতরার কারখানার পীপে ভর্ত্তি ক'রে পরজন্ম কাটায়।

কাঙ্গালীর আহ্বানে গোপীনাথ যখন তিনকোণা পার্কের নিভৃতে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে, সে বুঝলে গোপন মিলনের উদ্দেশ্য। এ কাজে নগদ দু'হাজার টাকার দশ টাকার নোট তার খাসনবীশ রাইস মিলের ভিত্তি স্থাপন করবে। রাজসাহী জেলায় বিজনবাবুর জমিদারীর ধানও ভবিষ্যতে সুবিধা দরে তার ধান-মাড়া কারখানায় সুড়সুড় করে প্রবেশ করবে। ছবির বদলে ছবি রাখলে পৃথিবীতে কার কি এসে যায়?

শেষে কাঙ্গালীচরণ বললে—গঙ্গার জল গঙ্গায় থাকবে, পিতৃ-পুরুষ উদ্ধার হবে।

রাত্রি তখন প্রায় বারোটা। প্রাচীরের ছায়ায় প্রতীক্ষা করছিল কাঙ্গালীচরণ। সে টাকার ঝলক দেখিয়েছে খাশনবীশকে। লুব্ধ তরুণ হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে পারে না। কিন্তু তবু যদি সে না আসে।

জীবনে যত ঝঞ্ঝাট আছে, তাদের মধ্যে সবার চেয়ে তিক্ত, প্রতীক্ষা। ধীর কাঙ্গালীচরণও প্রতীক্ষার দুর্বিষহ দোদুল দোলায় মনের ওঠা-নামা উপলব্ধি করছিল। ঐ এল, ঐ এলো না—বড় জ্বালার চিন্তা। এ জ্বালা সনাতন না হ'লে বড় বড় কবিকে জমিদারী সেরেস্তায় মুন্সীগিরি ক'রে কালাতিপাত করতে হ'ত। ইরাণ এবং ভারত কান্ত-কবিতা সম্পদে বিশ্বজয়ী হ'তে পারত না।

কিন্তু তার শরশয্যা ধন্য ক'রে যখন গোপীনাথ খাশনবীশ প্রাচীরতলে এসে তাকে অভিবাদন করলে, এক অনির্ব্বচনীয় বিজয়-সুখ উৎফুল্ল করলে কাঙ্গালীচরণকে।

—কি ভায়া?

—সব ঠিক। কই ছবি?

পাটকিলে কাগজে জড়ানো, নকল চিত্ত-চোর চিত্র-চোরের হাতে হস্তান্তরিত হ'ল।

গোপীনাথ বললে—দাদা বড়লোকের ব্যাপার। টাকাটা, অর্থাৎ—

অন্ধকারে তার বিকশিত দাঁত দেখা গেল না। সে হেসে

বললে—ভায়া হে! এ কাঙ্গালীচরণ। এ বড় ভীষণ ঠাঁই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই।

গোপীনাথ গ্র্যাজুয়েট, বি, কম্‌। সে বহু ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়েছিল। এ ক্ষেত্রে লোকে নোটের তাড়ার উপরে নিচে দু'চার খানা নোট রেখে মাঝে সাদা পার্চমেণ্ট কাগজ ভর্ত্তি ক'রে বাণ্ডিল বাঁধে। সাবধানের বিনাশ নাই। সে বিনীতভাবে বললে—কি জান দাদা, অর্থাৎ ওরা বড় লোক। আমাদের স্বভাব-শত্রু। বাণ্ডিলগুলা একবার আদ্যোপান্ত—অর্থাৎ।

কাঙ্গালীর মন প্রবচনমূলক কবিতার ভাণ্ডার। সে বললে—ভায়া, পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার। এই দেখ না।

নোটের বাণ্ডিল পরীক্ষা ক'রে খাসনবীশ তুষ্ট হ'ল। এ-ক্ষেত্রে কবিতা ও প্রবচনে জবাবই সুষ্ঠু! সে বললে—দাদা, খোঁটার জোরে মেরা লড়ে। দাও ছবি। যা' থাকে কপালে আর যা' করেন কালী।

মা কালী ভালই করবেন—ব'লে কাঙ্গালী তাকে বিদায় দিল। মনে মনে ভাবলে—বে-গতিক দেখি যদি পিট্‌টান দেব। কাযা-কালে খোঁজো সবে নিজ নিজ পথ।

আবার প্রতীক্ষা। সে গুন গুন স্বরে গান গেয়ে প্রতীক্ষার কঠোরতা এড়াবার চেষ্টা করলে। বুঝি শ্যাম না এলো। অলস অঙ্গ শিথিল কবরী বুঝি বিভাবরী গত হ'ল।

ছবি নিয়ে গোপীনাথ দৌলতের বসবার ঘরে প্রবেশ করলে। প্রতীক্ষায় বসেছিল দৌলত। সে বললে—কই ?

চিত্রখানি তার হাতে দিয়ে গোপীনাথ খুব হাসলে। দৌলতও এক পালা হেসে নিলে। তারপর একটা তুলি দিয়ে ছবির উল্টো পিঠে কদম গাছের তলায় তিনটে সোনার জলের ফোঁটা দিলে। পরিশেষে অদৃশ্য কালিতে ছবির পিছনের কোণে কি লিখলে!

ছবিখানা গোপীনাথের হাতে দিয়ে বললে—ওর দু' হাজার, আমার এক হাজার, তিন হাজারে বোধ হয় তোমার একটা ছোট কারখানা আরম্ভ হবে। পরে—

কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই গোপীনাথ অদৃশ্য হ'ল।

সে কাঙ্গালীচরণের এক হাতে ছবি দিল, অন্য হাতে দু' হাজার টাকা নিল।

কাঙ্গালী হিসেবী। সে একটা পকেট বাতির আলোয় ছবির পিছনের ফুটকী দেখে নিলে।

খুব হাসি টিপে গোপীনাথ বললে—কি দেখছ দাদা ?

সে বললে—ভায়া হে, সাবধানের বিনাশ নাই।

সেই মহেন্দ্রক্ষণে দৌলতবাবুর দ্বিতলের একটা জানালা খুললো। গবাক্ষে দেখা গেল দৌলতের মুখ। তারপর গভীর কণ্ঠে শব্দ হ'ল—কে ?

গোপীনাথ বললে—এই রে! মারা গেলাম।

ছবি বগলে ক'রে কাঙ্গালীচরণ, দে ছুট—দে ছুট।

খুব হাসলে গোপীনাথ। হ্যাঁ! গঙ্গার জল গঙ্গায় রইল, পিতৃকুল উদ্ধার হ'ল। সে ধান-মাড়া কলের ঝগ-ঝগ শব্দ শুনতে পেলে। কিন্তু দৌলতবাবু চালাক লোক। ঠিক বুঝেছিল ওরা ছবির পিছনের ফোঁটা দেখে নেবে। ওঃ! তাই তিনি ফোঁটা আঁকলেন।

ছবি হাতে করে বিজন নাচলে। তার একাদশে বৃহস্পতি। পৃথিবীর যত শুভ সুড় সুড় করে তার মুঠোর ভেতর আসবে।

পরদিন রৌদ্রের আলোয় আবার যখন সে তিনটি ফোঁটা দেখে আনন্দে ফাটবার মত হ'ল—সূর্য্যের আলো লেগে অদৃশ্য কালির লেখা ফুটে উঠলো। একাদশের বৃহস্পতি—শিয়রের শনি হ'ল। অ্যাঁ! এ কি লেখা ?

—ধিক্‌ চোর!

প্রথম পাওয়া

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এস্‌-সি

সখীর দলে অশেষ করে মিনতি সই করবে যবে—
বঁধুর কাছে মধুর রাতে কী পেয়েছিস বলতে হবে।
ঈষৎ হেসে এক সখীরে মৃণাল ভুজে জড়িয়ে ধরে'
ওষ্ঠ 'পরে আঁকিস চুমা রাতের কথা স্মরণ করে'।

বলিস তাদের অসাধারণ এমন কী বা রয়েছে তার ?
মোর প্রিয় সে মানুষ শুধু—অতিমানব নয় তো আর!
হর্ষ-লাজের অধীরতায় কণ্ঠ যদি হারায় বাণী,
গোপন হ'তে বাহির করে' খুলে ধরিস এ পাতখানি।

মন্ত্র ও কন্ত্র

ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

তিন

হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছে বিকাশ টিকিট কাটলে কাশীর। কাশীর কোনও ট্রেন ছাড়বার বিস্তর বিলম্ব, কাজেই সে প্লাটফরমে বসে ভাবতে লাগলো, কঃ পন্থা ?

হুস্ হুস্ করে একটার পর একটা ট্রেন আসছে—যাচ্ছে। যে গুলো আসছে তা' থেকে গিজ্ গিজ্ ক'রে লোকের স্রোত বেরিয়ে আসছে সরু পথ দিয়ে। বিকাশ চেয়ে আছে সে দিকে, কিন্তু দেখছে না। তার মনে কেবল ভাবনা—কি করা যাবে ?

মাসিমাকে একটা খবর দিতেই হবে, নইলে তিনি ভেবে সারা হবেন, আর চাই কি চারদিকে বিজ্ঞাপন দিয়ে পুলিশে খবর দিয়ে এমন একটা হৈ চৈ লাগিয়ে দেবেন, যাতে সে ধরা প'ড়ে যাবে। তাই তাকে একটা খবর দিয়ে নিশ্চিন্ত ক'রে দেওয়া ভাল। কিন্তু কি খবর সে দেবে ? অনেকক্ষণ ধ'রে অনেক রকম মুসাবিদা ক'রে সে মনস্থির ক'রে পোষ্টাফিসে গেল। সেখান থেকে একখানা পোষ্টকার্ড নিয়ে লিখলে :

"মাসিমা,

কিছুদিন থেকে শরীরটা বিশেষ খারাপ হ'য়ে পড়েছে। ডাক্তার বললেন চেঞ্জে যাওয়ার দরকার, তাই যাচ্ছি। বিশেষ কিছু হয় নি, কিছুদিন চেঞ্জে থাকলেই সেরে যাবে, আপনারা ভাববেন না। আর আমাকে নীচের ঠিকানায় একশো টাকা পাঠিয়ে দেবেন।"

ঠিকানাটা দিলে তার এক বন্ধুর—সে সম্প্রতি পড়াশুনা ছেড়ে হরিদ্বারে ভোলানন্দ গিরির আশ্রমে চেলা হ'য়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই বন্ধুকে লিখে দিলে যে তার নামে কোনও টাকাকড়ি চিঠিপত্র এলে কাশীর একটা ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়।

চিঠি দু'খানা বাক্সে ফেলে দিয়ে বেশ খাতির জমা হ'য়ে ব'সতে এতক্ষণে তার পেট তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে যে সকালে চা খাওয়ার সময় পায় নি সে, আর মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়ও আসন্ন। সে ষ্টেশনের খাবার ঘরে গিয়ে উদরকে শান্ত ক'রে আবার প্ল্যাটফরমে এসে বসতেই—

"এই যে বিকাশ, কি মনে ক'রে ?" ব'লে তাকে চেপে ধ'রলে হরিপদ ব'লে একটা ছেলে। সে বিকাশের সঙ্গেই পড়ে, শ্রীরামপুর থেকে ডেলী প্যাসেঞ্জার হ'য়ে রোজ আসে যায়।

বিকাশ চমকে' উঠলে। তার পর সামলে ব'ললে, "এই এলাম—মানে একটু যাচ্ছি।"

"এখন যাচ্ছ—কোথায় ? কলেজ যাবে না ?"

"না ভাই, আজ আর কলেজ যাওয়া হবে না", ব'লে সে তাড়াতাড়ি স'রে প'ড়লো, ভাবটা এই—যেন এক্ষুণি ট্রেণ ধ'রতে হবে তার। চোঁ চাঁ ছুট দিয়ে শেষ প্লাটফরম পার হ'য়ে একেবারে Goods Shed-এর ভিতর ঢুকে হাঁফ ছাড়লে।

মনে হ'ল একটা ফাঁড়া কেটে গেল। প্লাটফরমের মত অমন একটা প্রকাশ্য জায়গায় বসা তার পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়।

Goods Shed-এর একটি ছোকরা কেরাণী এলো, নমস্কার ক'রে ব'ল্লে, "এই যে বিকাশবাবু, ভাল আছেন বেশ ? এখানে কোনও কাজ আছে ? বলুন আমি এক্ষুণি ক'রে দিচ্ছি।"

এ আবার কে রে ? কোনও জন্মে একে বিকাশ দেখেছে ব'লে মনে হ'ল না। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে সে শুধু ব'ল্লে, "না কোনও কাজ নেই, এমনি।"

"ও ! কালকে আপনার ভারী unfortunate miss হ'য়ে গেল। বলটা ভারী পেছল ছিল, না ?"

ও বাবা, এ যে কালকের খেলার কথা বলে ! বিকাশ কোনও মতে পালাবার অছিলে খুঁজতে লাগলো।

ছোকরা ব'লেই গেল, "আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না। চেনবার কথাও নয়। আমি তো আপনার মত সব চিন্ খেলোয়াড় নই। তবে এক আধটুক্ খেলি আর খেলা দেখতে রোজ যাই। আপনার খেলা বোধ হয় কোনও দিন মিস্ করি নি। আর দেখুন—অনিলবাবু ওটা কি ক'রলেন, একটা sure goal mis-kick ক'রে মাটি ক'রলেন।"

বিকাশ ঘেমে উঠলো। কালকের খেলা সম্বন্ধে আলোচনায় তার বিশেষ রুচি ছিল না। কাজেই সে তাড়াতাড়ি বললে, "ও রকম accident খেলতে গেলে হ'য়েই থাকে—আমি এখন আসি, আমার ট্রেনে উঠতে হবে।" ব'লে সে ষ্টেশনের দিকে ফিরলে।

কিন্তু এতে ছোকরাটির হাত এড়ান গেল না। "ও ! ট্রেনে উঠবেন ? 5 Up না 7 Up ? চলুন আমি আপনাকে উঠিয়ে দিয়ে আসি।" ব'লে সে সঙ্গ নিলে।

বিকাশ বুঝলো সে শক্ত পাল্লায় প'ড়েছে। এ ছোকরা 'ফ্যান'—এরা জোঁকের মত লেগে থাকে, ছাড়ান দায়। এখন কোনও ট্রেনে কোথাও যাওয়া যেতে পারে কি না সে সম্বন্ধে বিকাশের কোনও ধারণা ছিল না, তা ছাড়া 5 up 7 up প্রভৃতি ভাষা যা রেলকর্ম্মচারীদের মুখে মুখে থাকে, তা বিকাশের সম্পূর্ণ অপরিচিত।

অথচ বিকাশ বুঝতে পারলে যে, এই লেপ্‌টান সঙ্গীর হাত থেকে উদ্ধার হবার একমাত্র উপায় এক্ষুনি ট্রেনে উঠে লম্বা দেওয়া! ট্রেনের সময়গুলি তার কণ্ঠস্থ না থাকায় কোনও একটা বিশিষ্ট ট্রেনের নাম ক'রে তার উদ্ধার হবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল! এই ফ্যানটিকেই কাজে লাগাতে হবে। সে বললে, "কোন ট্রেনে গেলে সুবিধে হবে ঠিক বুঝতে পারছি নে! আপনি রেলের লোক, আপনি নিশ্চয় ব'লতে পাবেন!

"নিশ্চয় নিশ্চয়! কোথায় যেতে হবে বলুন!"

"যাব আমি অনেক দূর, আপাততঃ কাশী—"

"কাশী যাবার ট্রেনের তো অনেক দেরী—"

"কিন্তু ভাবছি যাবার পথে, ওর নাম কি ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে নেমে আমার পিশে মশায়ের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাবো!"

"ব্যাণ্ডেল—তা এই তো এক্ষুনি 7 up ছাড়বে। চলুন তাড়াতাড়ি! টিকিট ক'রেছেন? তবে আর কি? চলুন।" ব'লে লোকটা বিকাশকে এক পাশ দিয়ে ঢুকিয়ে একেবারে প্লাটফরমে নিয়ে ফটকের কাছে গিয়ে বললে "আপনার টিকিটটা দিন পাঞ্চ করিয়ে নি!"

বিকাশ টিকিট দিলে। যে লোকটি টিকিট পাঞ্চ করছিল সে টিকিট দেখে বললে, "এ যে কাশীর টিকিট, এগাড়ীতে কেমন ক'রে যাবেন?"

"আমি ব্যাণ্ডেলেই একবার নামবো"—

"ব্যাণ্ডেলে তো journey break ক'রতে পারবেন না।"

'ফ্যান'টি বললে, "তবে এক কাজ করুন, টিকিটটা আপনি পকেটে রেখে দিন, অমনি চলে যান, আমি গার্ডকে বলে দিচ্ছি।" তারপর টিকিট চেকারকে বললে, "ইনি কে জানেন তো, বিকাশ বাবু,—কলেজের প্রসিদ্ধ গোলকীপার—

টিকিট কলেক্টর হেসে বললে, "তাই নাকি? নমস্কার! আচ্ছা তাই যান আপনি—যাও তুমি সব ঠিকঠাক ক'রে দাও গে!"

ট্রেনে বিকাশকে বসিয়ে দেবার আগে তার ফ্যানটি এমনি ক'রে আর পাঁচ সাতটি লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে—যারা সবাই অল্পবিস্তর ফুটবল ফ্যান এবং সকলেই বিকাশের খেলার খবর রাখে। এতে বিকাশ যথোচিত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। তার সঙ্কল্প চুপি চুপি সরে পড়া! তার বদলে হোল একটা বিরাট বিজ্ঞাপন। ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঢাক পিটিয়ে যদি কেউ মেগাফোন যোগে ব'লতো যে বিকাশ 7 up train এ কলকাতা ছেড়ে কাশী যাবার পথে ব্যাণ্ডেল যাচ্ছে তবে এর চেয়ে বেশী জানাজানি হ'ত না!

যা' হ'ক ট্রেনটা ছাড়লে বাঁচে বিকাশ। গাড়ীতে তার সামনে ব'সে ফ্যানটি যে অনর্গল বকে যাচ্ছে ও বকাচ্ছে তাতে সে প্রচুর অস্বস্তি বোধ করছিল! এ আপদ কাটলে বাঁচে।

শেষে এ আপদ কাটলো বটে, কিন্তু বিপদ কাটলো না। ট্রেন যখন ছাড়ে তার একটু আগে কাকে দেখে ফ্যানটি সুট ক'রে নেমে গিয়ে একজনকে ধ'রে এনে বিকাশের পাশে বসিয়ে দিল। বললে, "এইবারে খুব সুবিধে হয়েছে! what luck যে ইনি এই ট্রেনেই যাচ্ছেন। ইনি সুনীল বাবু ব্যাণ্ডেলের A. S. M; D. T. S ও C. M. O-র কাছে এসেছিলেন ছুটির দরবারে; এই ট্রেনেই ফিরছেন! ইনি ব্যাণ্ডেলে আপনার সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। আমি ব'লেছি সব।"

রেলের কর্ম্মচারীগুলি A. B. C. D প্রভৃতি অক্ষর এমন গড়্ গড়্ ক'রে বলে যায় যেন সে সব সাঁটের তাৎপর্য্য বিশ্বসংসারের সবারই বেশ সড়গড় আছে। বিকাশ কিন্তু হকচকিয়ে গেল। A. S. M কথাটার অর্থ সে বেশ একটু মানসিক গবেষণা ক'রে স্থির ক'রলে, অ্যাসিষ্ট্যান্ট ষ্টেশন মাষ্টার। কিন্তু D. T. S ও C. M. O-র কোনও হদিস পেলো না। সেইটার অর্থ উদ্ধার করবার চেষ্টা করছে, এমন সময় ট্রেন ছেড়ে দিলে এবং ফ্যানটি চলতি গাড়ী থেকে লাফিয়ে নামলেন।

A. S. M সুনীল বাবু বাক্য স্ফুরণ ক'রতেই জানা গেল যে ইনিও ফুটবল 'ফ্যান' এবং শুধু ফ্যান নয়, এঁর নিজের বর্ণনা অনুসারে ইনি একজন সুদক্ষ খেলোয়াড়। ইনিও কাল ইলিয়ট শীল্ডের সেমি ফাইন্যাল দেখতে গিয়েছিলেন, শুধু সুবোধ চ্যাটার্জ্জীর খেলা দেখতে। তার খেলা একটা trat! A.S.M যখন E. B. Railwayতে প্রথম চাকরী করতেন, তখন অনেক বার E. B. R টিমে খেলে সুবোধ চ্যাটার্জ্জির বিরুদ্ধে খেলেছেন। অবশ্য ব্যাক হিসাবে সুনীল বাবুরও যথেষ্ট নাম ছিল, কিন্তু তবু সুবোধের কিকের তারিফ তিনি না করে পারেন না; সুনীল যেবার শীল্ডে খেলেছিলেন—"

ফুটবলের ইতিহাস বিকাশের যতদূর জানা ছিল, তাহাতে E. B. Railway টীমে সুনীল ব'লে কেউ কোনও দিন খেলে নি—অন্ততঃ ঐ নামে কোনও নাম করা খেলোয়াড় কখনও ছিল না। তা' হোক, এই সুস্পষ্ট হামবাগটি যত ইচ্ছা আত্মপ্রশস্তিগান করুক, তাতে বিকাশের তত আপত্তি ছিল না, কিন্তু তার সঙ্গে ঐ সুবোধ চ্যাটার্জ্জির যে যাচ্ছে-তাই খোসামুদী করতে লাগলো সেটা বিকাশের ভাল লাগলো না। অবশ্য সুবোধ খেলে ভাল, আর বেশ কৃতি ক্যাপ্টেন ও ব্যাক, কিন্তু তবু তার কলেজ টীমের খেলার কথায় লোকটা যে কেবলই সুবোধের নামে বাহবা দিতে লাগল, তা বিকাশের মোটেই ভাল লাগল না! ব্যাক সুবোধের সঙ্গে সঙ্গে গোলকীপার বিকাশের নামটাও অবশ্য করা উচিত।

লোকটার অসহ্য ধৃষ্টতার মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চল্ল! সে বললে, "কাল যদি সুবোধ ব্যাকে না থাকতো, তবে আপনারা অন্ততঃ আর তিনটে গোল খেতেন—সে যা বাঁচিয়েছে সে তিনটে বল, সে wonderful! সে ঠেকাতে না পারলে আপনি কিছুই ক'রতে পারতেন না।"

এ কথায় বিকাশ ভিতরে ভিতরে রাগে ফুলতে লাগলো। সুবোধের যে কটা খেলার তারিফ লোকটা করলে, সে গুলোকে সে অতটা বাড়ালে লোকটা খেলার কিছু জানে না বলে। কেন না সুবোধের সে কটা শট্ অত্যন্ত সহজ। পক্ষান্তরে বিকাশ গোলে দাঁড়িয়ে তিন তিনবার যে সঙ্কটময় বল ধ'রে ফিরিয়েছে সেটা সত্য সত্যই বাহাদুরী কাজ। লোকটা সে সম্বন্ধে কিছু জানে না, জানে শুধু যে, একটা বল বিকাশের হাত থেকে ফস্কে পড়ে গোল হ'য়ে গেছে।

লোকটার কথা ক্রমশঃই অসহ্য হয়ে উঠছিল। কিন্তু চরম হ'ল যখন সে বিকাশকে বেশ মুরুব্বীর চালে বললে যে "বিকাশের খেলায় খুব 'প্রমিস্' আছে এবং কালে সে ভাল খেলোয়ার হতে পারবে, কিন্তু"—ব'লে ফুটবল খেলায় বিশেষতঃ গোলকীপারের কখন কি করা উচিত সে সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ ক'রলে!

বিকাশের দম ফাটবার মত হ'ল! লোকটাকে মুখে জবাব দেওয়ার চেয়ে সোজা ঘা' কতক লাগিয়ে দেওয়াই তার সঙ্গত মনে হ'ল, কিন্তু A.S.M. বাহাদুরকে চটাতে তার ভরসা হ'ল না। সে রেলের আইন ভঙ্গ ক'রে ব্যাণ্ডেল নামতে যাচ্ছে—A.S.M. বাহাদুর তাকে সে অপরাধের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন—তিনি চটলে তাকে নাকাল ক'রবেন। তাই সে চেপে গেল।

বিকাশের হয় জানা ছিল না, না হয় তার তখন মনে ছিল না যে A.S.M.-এর তাকে নাকাল করবার শক্তি, এবং তার অপরাধের শাস্তি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। হয়তো তার অপরাধ হয়ই নি, আর হ'য়ে থাকলেও রেল কর্ম্মচারীরা তার কাছে কেবল হাওড়া থেকে ব্যাণ্ডেল পর্য্যন্ত ডবল ভাড়া আদায় ক'রতে পারেন, তার বেশী কিছুই পারেন না।

কিন্তু বিকাশ একে কলকাতা থেকে পলাতক, তাতে আবার A.S.M.-এর কথায় তার মাথা হয়ে গেছে গরম, অত ভেবে চিন্তে স্থির করবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না। সে অনেকক্ষণ ধ'রে অন্তরে অন্তরে ফুলতে ফুলতে লোকটার কথাগুলো গলাধঃকরণ ক'রলে।

তারপর সুনীল তাকে আপ্যায়িত ক'রতে আরম্ভ ক'রলে এবং জানালে যে বিকাশ যেখানে যেতে চায়, সেখানে সে তাকে পাঠিয়ে দেবে, তবে খাওয়া দাওয়াটা সুনীলের ওখানে ক'রতে হবে। তারপর সুনীলের বাড়ীতে কিম্বা ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে একটু বিশ্রাম ক'রে বৈকালে আহারাদির পর কাশী যাবার সব চেয়ে সুবিধা গাড়ীতে সুনীল তাকে উঠিয়ে দেবে, যাতে কোনও কষ্ট না হয়। সুনীল এও জানালে যে ব্যাণ্ডেলে অনেক ফুটবল-ভক্ত লোক আছে। বিকেলে চা' খাবার সময় তাদের ডেকে বিকাশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে।

এই শেষ কথাটায় বিকাশের কর্ত্তব্য স্থির হ'য়ে গেল চট্‌পট্। এতক্ষণ সে ভাবছিল, এ আপদ থেকে উদ্ধার হবার কি উপায়? একে এর কথাবার্ত্তা অসহ্য, তাতে আবার ব্যাণ্ডেলে গেলে একেবারে এর কাছে নজরবন্দী হ'য়ে থাকবে! তার উপর যখন শুনলে যে আরও ফুটবল ফ্যান জুটিয়ে তার ব্যাণ্ডেল ভ্রমণটাকে ঢাক পিটিয়ে জানাবে এবং হয় তো বা খবরের কাগজে ছাপাবে, তখন ভাবলে, আর নয়!

গাড়ীটা চুঁচুড়ার প্ল্যাটফরমে লাগতেই সে চট্ ক'রে তার সুটকেস নিয়ে নেমে প'ড়লো। বললে, "ভেবে দেখলাম এখান থেকে চুঁচড়োর বড় বাজারে একটা বরাত সেরে পিশেম'শায়ের কাছে যাওয়াই সুবিধে হবে।" বলেই হন্ হন্ ক'রে চললো। A.S.M.-কে কোনও কথা বলবার সুযোগ দিলে না।

Overbridge ডিঙ্গিয়ে গেটে গিয়ে সে কাশীর টিকিট দেখিয়ে বললে, যে ভুল ক'রে সে এ গাড়ীতে উঠেছে।

টিকেট কালেক্টর বললে, "সে তো ঠিক করেন নি,—Penalty দিতে হবে, হয়তো—" তারপর একটু থেমে—"যাক্ গে, যান চ'লে।" আবার এই সামান্য কিছু পয়সা আদায় ক'রবার জন্য বই দেখে খাতা টেনে লেখবার হাঙ্গামা করার প্রবৃত্তি লোকটির ছিল না।

বিকাশ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। পেনালটী দিয়ে তাকে ছেড়ে দিলেও সে যথেষ্ট হাঁফ ছাড়তো। কেবল একটা আপশোষ হ'ল তার এখন এমনি একটা বাজে জুজুর ভয়ে সে ঐ A.S.M.-এর বিষাক্ত কথাগুলো নির্ব্বিবাদে হজম ক'রেছে! মনের মত দু'ঘা লাগাবার—নিদেন বেশ লাগসই কয়েকটা কথা বলবার নষ্ট সুযোগের জন্য তার হাত এবং জিভ যেন টন্ টন্ ক'রে উঠলো।

যাক, একটু স্বস্তি পেয়ে তার প্রথম মনে হ'ল এখানে একটু ঘুমিয়ে নিলে হয়। কিন্তু তখনি ভাবলে, না এখানে ভিড়ের মধ্যে আর থাকা হবে না—কোথা থেকে কোন 'ফ্যানের' পাল্লায় প'ড়ে যাব।

রেলের এক কর্ম্মচারীর কাছে সে কাশী যাবার ট্রেণের সময় জানতে গেল। সে লোকটি বললে, "একটা লোক্যাল ট্রেণে ব্যাণ্ডেল গেলে সেখান থেকে একটা দ্রুতগামী ট্রেণে যাওয়াই সব চেয়ে সুবিধে। কিন্তু—ব্যাণ্ডেল! একেবারে সেই A.S.M.-এর খপ্পরে আবার? প্রাণ গেলেও নয়। যা হ'ক একটা মন্থরগামী প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে টিকিয়ে টিকিয়ে যাওয়া স্থির ক'রে সে বাইরে ভেসে প'ড়লো নির্জ্জনতার সন্ধানে।

চার

যাক, কাশী এসে পৌছোন গেছে।

পরম স্বস্তির সঙ্গে বিকাশ এই কথাটা আয়ত্ব ক'রে একটা লম্বা নিঃশ্বাস টেনে নিলে।

এখন কি ক'রবে সেই চিন্তা!

একটা ধর্ম্মশালায় গিয়ে আস্তানা নিলে। দোকানে গিয়ে কিছু খেয়ে সে বেরিয়ে প'ড়লো কাশী দর্শন ক'রতে। ভাবলে—এখানেই কিছুদিন একটা কাজকর্ম্ম করা যাক, তার পর ধীরে সুস্থে ওদিককার গোলমালের কথা লোকে একটু ভুলে গেলে বাড়ী ফেরা যাবে।

এদিক ওদিক ঘুরে সে হরিদ্বারে বন্ধুর কাছে কাশীর যে ঠিকানার কথা লিখেছিল সেখানে গেল চিঠির খোঁজ ক'রতে। ঠিকানাটা একটি দোকানদারের, বিকাশের সঙ্গে তার সামান্য জা' হ'য়েছিল এককালে।

ক্রমশঃ

গিয়ে দেখলে চিঠি এসেছে একখানা, কিন্তু টাকা আসে নি। চিঠিখানা খুলে দেখে সে হতভম্ব হ'য়ে গেল! চিঠিখানা হরিদ্বারের ঠিকানায় লেখা; সেখান থেকে redirect করা! তাতে তার মেশোম'শায় লিখেছেন, "তুমি তোমার মাসিমাকে লিখেছ হরিদ্বার যাচ্ছ, শরীর খারাপ ব'লে! কাগজে দেখলাম সেই দিন তুমি ফুটবল খেলেছিলে এবং খেলার রিপোর্টার লিখছেন যে তুমি in the pink of condition. এমন স্বচ্ছ মিথ্যেকথা বানিয়ে লিখে ক'লকাতা থেকে হঠাৎ পালাবার মানে কি?—

"যা হ'ক তুমি পত্র পাওয়ামাত্র ফিরে আসবে। তোমার আসবার খরচের জন্য মোহান্ত মহারাজের কাছে টাকা পাঠালাম, তিনি তোমাকে টিকিট কিনে গাড়ীতে চড়িয়ে দেবেন, এবং তুমি সোজা বাড়ী চ'লে আসবে। কোনও ওজুহাত আমি শুনবো না।"

চিঠি প'ড়ে প্রথমে সে হ'য়ে গেল একেবারে স্তব্ধ। মিথ্যে কথাটা এমন ক'রে হাতে নাতে ধরা প'ড়ে যেতে সে দারুণ লজ্জায় ম'রে গেল। তার মনে হ'ল, আগের কথা চুলোয় যাক; তার এই ধরা পড়া মিথ্যে কথার পর আর মেশোম'শায়ের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না।

এখন উপায় কি? টাকা যে ক'টা তার কাছে ছিল, তা' প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, এখন কাশীবাসের খরচা আসবে কোথা থেকে?

টাকার ব্যাগটা বের ক'রে নিয়ে তার শীর্ণ সঞ্চয়ের দিকে অনেক ক্ষণ সে হাঁ' ক'রে চেয়ে রইল কেবল। সে হিসেব ক'রে দেখলে যে যা' আছে তাতে দিনে চার আনা খরচ ক'রলে বড় জোর চার দিন চলে। কত কমে দু' বেলার খাওয়া চলে তার নানা রকম মুসাবিদা ক'রতে লাগলো। হিসাব ক'রে দেখলে যে শুধু ছোলার ছাতু ও গুড় খেলে বেশ কিছুদিন চালান যাবে। কত গরীব লোক তো এ দেশে তাই খেয়ে থাকে।

ছাতু গুড় খেয়ে ধরমশালায় শুয়ে যতদিন পারে চালাবে, আর এর মধ্যে কোনও একটা রোজগারের উপায় ক'রতে হবে। তার পর ধীরে সুস্থে বিচার করা যাবে শেষ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে—অর্থাৎ মেসোমশায়ের সমস্যার কি করা যাবে সে সম্বন্ধে নির্ণয় করা যাবে। এই স্থির ক'রে সে ছাতু ও গুড় কিনে ধরমশালায় ফিরবে, এমন সময় মনে হ'ল—জল খাবার একটা পাত্র তো নিতান্তই দরকার। একটা যে কোনও রকমের গেলাস কিনতে গেলেই তো তার খোরাকীর সম্বলের গায় একটা মোটা রকমের ঘা লাগবে! অনেক বিবেচনা ক'রে শেষে একটা মাটীর খুঁটি কিনলে।

তার কাপড় চোপড় ও দরকারী আর কিছু জিনিষ সে নিয়ে এসেছিল একটা মাঝারী রকম স্যুটকেসে। ধরমশালায় সেটা বন্ধ ক'রে রাখবার কোনও স্যুযোগ নেই দেখে একদিন সে তাকে হাতে ক'রেই সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছিল। তার পর সেটা সে রেখে দিয়ে যেতো ধরমশালার একটা ঘরে একজন পশ্চিমা ব্যবসায়ী ছিলেন তার কাছে। ব্যবসায়ীটি পরম সজ্জন। বাঙালী জাত, বিশেষ বাঙালী যুবকের প্রতি তাঁর অশেষ শ্রদ্ধা। তিনি দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা ক'রে থাকেন এবং তাঁর স্থির বিশ্বাস যে বাঙালীর যুবশক্তিই ভারতের আশা। ভারী আত্মীয়তা হ'য়ে গিয়েছিল তাঁর সঙ্গে বিকাশের শুধুই বাঙালী যুব-শক্তির জন্য।

আজ ছাতু গুড় নিয়ে ফিরে সে দেখলে যে, সেই পশ্চিমা ব্যবসায়ী পাততাড়ি গুটিয়ে নিরুদ্দেশ হ'য়েছেন, বিকাশের স্যুটকেসটি ফিরিয়ে দেবার কোনও ব্যবস্থা করা আবশ্যক মনে করেন নি।

মাথায় হাত দিয়ে ব'সে প'ড়লে বিকাশ! এখন তার মনে হ'ল যে তার স্যুটকেশের ভিতর যা সব জিনিষ পত্র ছিল, তার মোট দাম দেড় শো' দুশো টাকার কম হবে না। শাল, সিল্কের পাঞ্জাবী, চাদর, সৌখীন পশমী পাঞ্জাবী প্রভৃতি এবং—তার ঘড়িটা!—ভাবতে তার দম বন্ধ হ'য়ে এলো, গাল চাপড়াতে ইচ্ছে হ'ল। কি মূর্খ সে! ধর্ম্মশালায় অজানা অচেনা যাযাবর লোকের কাছে ওটা রাখবার কোনও দরকারই ছিল না। সোজা বুদ্ধি হ'ত তার ঐ চেনা দোকানদারটির কাছে রেখে দেওয়া। এই সোজা বুদ্ধিটা যে তার মাথায় খেলে নি, এতে নিজেকে পরম বেকুব বলে তার জ্ঞান হ'ল। লোকসানে যত দুঃখিত সে হ'ল, তার চেয়ে বেশী সে হ'ল লজ্জিত এই পরম বেকুবীর জন্য।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে ছাতু গুড় ও জল নিয়ে খেতে ব'সলো—কেন না তার দুশ্চিন্তা যতই থাকুক তার সুস্থ সবল জঠরের তলবের তীব্রতা এখন সব দুশ্চিন্তাকে জোর গলাধাক্কা দিচ্ছিল। দু গ্রাস খেয়ে এক গ্লাস জল খাবার পর যখন ক্ষিদের বেগটা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হ'ল, তখন সে আবার ভাবতে পারলো। এখন চট ক'রে বিদ্যুতের মত তার মাথায় এই কথাটা চমক দিয়ে গেল যে তার মেসোম'শায়ের চিঠি সাত দিন আগে লেখা। এতদিন তার কোনও উত্তর না পেয়ে তিনি নিশ্চয়ই তাকে ফিরিয়ে নেবার অন্য ব্যবস্থা ক'রেছেন। তার কাশীর ঠিকানা নিশ্চয়ই তিনি হয় পেয়েছেন কিম্বা পাবেন দু' একদিনের ভেতর। কে জানে টেলিগ্রাম মারফৎ এখনি হয় তো কাশীতে খোঁজ তল্লাস আরম্ভ হ'য়ে গেছে। এখানে থাকলে তার ধরা প'ড়তে দেরী হবে না। ধরা প'ড়লে—ওরে বাপরে! সে যে কী ভয়ানক লজ্জার কাণ্ড হবে তা ভাবতেই পারলে না সে!

পালাতে হবে কাশী থেকে।—আরও পশ্চিমে কোথাও। কেমন ক'রে?—টাকার থলির দিকে চেয়ে সে হতাশ হ'ল। এ যে শুধু সাড়ে তিন দিনের খাবার সম্বল। রেল ভাড়ায় খরচ ক'রলে সে খাবে কি?

তার শোনা ছিল যে কাশীতে কেউ নাকি অভুক্ত থাকে না। অনেক নাকি 'ছত্র' আছে যেখানে বিনা পয়সায় রোজ আহার পাওয়া যায়, তা তার জানা ছিল না। তবু তার মনে হ'ল কাশীতে থাকলে যদিও বা কোনও একটা ছত্রে খেয়ে কয়েকটা দিন কাটান যেত, কাশীর বাইরে গেলে তো সে উপায় থাকবে না! সুতরাং এই সামান্য সম্বল রেল ভাড়ায় খরচ ক'রলে শেষে সে খাবে কি?

অনেক গবেষণার পর স্থির হ'ল যে রেল ফেল হবে না—হেঁটে লম্বা দিতে হবে। বেঁচে থাকুন শের শা— মানে, বাঁচবেন আর

কেমন ক'রে ?—যেখানেই থাকুন সুখে থাকুন—তিনি পত্তন ক'রে গেছেন গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড়ের। সেই পথে যাত্রা ক'রতে হবে!

মনে হ'ল সুটকেসটা গিয়ে বাঁচা গেছে! নইলে সেটা হ'ত একটা বোঝা!

বুদ্ধি স্থির হ'য়ে যাবার পর বিকাশ মনে একটা অপূর্ব্ব আরাম ও শান্তি অনুভব ক'রতে লাগলো। এ বেশ একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চার—পরকালে একটা গল্প করবার মত বিষয় হবে। হাঁটা কিছু শক্ত কাজ নয়। পা' দুটো আছেই তো হাঁটবার জন্য! তার যখন কোনও বিশেষ স্থানে বিশেষ সময়ে যাবার তাড়া নেই, মিছেমিছি রেলগাড়ী বা বাস্-ফাস্ চ'ড়ে ছুটোপাটি করে যাবার কি প্রয়োজন? যাবে সে ধীরে সুস্থে হেঁটে আপন খুসীতে। বিশ পঞ্চাশ মাইল হাঁটা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়! এই তো আমাদের দেশের সন্ন্যাসীরা এখনো হেঁটে সারা ভারত ভ্রমণ করে। আর বেশী কথা কি? মাসিমার কাছে শুনেছে তাঁর দিদিমা নাকি দেশ থেকে পায়ে হেঁটে জগন্নাথ গিয়েছিলেন, আর সেই দিদিমার কোন ঠাকুরদা' নাকি বৃন্দাবন থেকে একটা বিগ্রহ মাথায় ক'রে হেঁটে এসেছিলেন বিক্রমপুরে! দু' চার দিন হেঁটে বেড়ান সে একটা তুচ্ছ কথা!—

বিশেষ যেখানে হাঁটবার দরকার আছে। এতদিন যে বিনা দরকারে শুধু এক্‌সারসাইজের ওজুহাতে সে মাইল রেস, ক্রস কাণ্ট্রী রেস প্রভৃতি ক'রেছে, অথবা ফুটবল নিয়ে মাঠে খানিকটা ছুটোপাটি ক'রে বেড়িয়েছে তার চেয়ে এই প্রয়োজনে হাঁটা ঢের ভাল। গরীব হওয়ার এ একটা মস্ত সুবিধা! তাদের শরীর খাটাবার জন্য দায়ে প'ড়ে এক্‌সারসাইজ করতে হয় না—কাজই তাদের এক্‌সারসাইজ! মনে পড়লো সে যেদিন খেলায় মাঠ থেকে শ্রান্ত হ'য়ে এসে তার তেতলার ঘরে চা' খেয়ে শ্রান্তি দূর ক'রছিল সেই দিন সেই সময় নীচের বস্তীর লোকটিও চা খাচ্ছিল শ্রান্তি দূর করবার জন্য। তার চা' খাওয়াটা ছিল সার্থক, সারা দিনের সত্যি খাটুনীর পুরস্কার! বিকাশ শুধু অযথা বল নিয়ে ছুটোপাটি ক'রে তার পর দু'মাইল সাইকেল চালিয়ে সৌখীন শ্রান্তি অর্জ্জন ক'রে, সেই শ্রান্তি দূর করবার জন্য খাচ্ছিল চা'। কি মিথ্যা ক্লান্তিভরা এই ভদ্র লোকের জীবন! তার চেয়ে বিকাশের আজকের জীবনের এই কঠোর পরিশ্রমের শান্তি ঢের ভাল! নাঃ ওই মিথ্যা-ভরা ভদ্র-জীবনে আর ফেরা হবে না। এই বেশ!

এই জীবনের সম্বন্ধে সে মনে মনে চটপট স্বপ্নজাল বুনে গেল! তার মনে হ'ল এই পথে যেতে যেতে তার হয় তো দেখা হবে একটি বিপন্ন লোকের সঙ্গে! হয় তো সে গুণ্ডার হাতে প'ড়েছে, বিকাশ দাই করে গুণ্ডাটাকে আঘাত ক'রে তাকে উদ্ধার ক'রবে। কৃতজ্ঞ ভদ্রলোক বিকাশকে ডেকে নিয়ে যাবে তার বাড়ীতে। সে হয় তো মস্ত বড় লোক—মস্ত বড় তার ব্যবসা! বিকাশকে নিয়ে সে ব্যবসায়ে লাগিয়ে দেবে, তার মেয়ের সঙ্গে দেবে বিয়ে—যেমন বিকাশের সহপাঠী জ্যোতি হঠাৎ বড়লোক হ'য়ে গেল, জষ্টিন কোম্পানীর পার্টনারের নাতনীকে বিয়ে ক'রে!

এই স্বপ্ন-স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে বিকাশ স্মরণ ক'রতে ভুলে গেল যে এক মুহূর্ত্ত আগে সে সম্পন্ন ভদ্র জীবনে ফিরবে না ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'লেছে।

যা' হ'ক প্রতিজ্ঞা স্থির ক'রে বিকাশ রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়লো, গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধ'রে পশ্চিমে যাবে স্থির ক'রে। হাঁটতে হাঁটতে সে আরও কত বিচিত্র স্বপ্নরচনা ক'রতে লাগলো—বলা বাহুল্য সে সকল স্বপ্নেরই শেষ পরিণতি বিকাশের সম্পন্ন জীবন লাভ এবং—পত্নীলাভ—বর্ত্তমান জীবনের অবিচিত্র জের টানা নয়।

মাইল পোষ্ট দেখলে—দু' মাইল! বিকাশ ভাবলে, মাত্র দু' মাইল? এতক্ষণে? মনে হ'ল যে সাইকেলটা না এনে সে ভুল ক'রেছে। বাইক থাকলে এতক্ষণে সে চ'লে যেতো বহুদূর—অনেক দূর। আর এতটা ক্লান্তও হ'ত না। আর একটু পরে এই পথ দিয়ে মাঝে মাঝে যে সব মোটর ভোঁ ভোঁ শব্দে শন্ শন্ ক'রে ছুটে চ'লেছে সেগুলোর দিকে অসূয়ার দৃষ্টিতে সে চাইতে লাগলো। এখন নিজেকে সে মনে ক'রলে দরিদ্র ভারতবাসীর প্রতীক। এই যে কোটি কোটি ক্ষুধিত লোক তার মত আধপেটা খেয়ে ক্ষীয়মান্ শক্তি নিয়ে ট্যাঙাস্ ট্যাঙাস্ ক'রে পায় হেঁটে দীর্ঘ পথ যাতায়াত ক'রছে, তাদের পাশে এই সব স্পর্দ্ধিত ধনীর অযথা গতিবিলাসের স্পর্দ্ধা তার চোখে বড়ই লজ্জাকর ব'লে মনে হ'ল। মনে হ'ল এদের কোনও অধিকার নেই, এমনি শুধু হন্ হন্ ক'রে চলবার সখ মেটাবার, যেখানে কোটি কোটি লোক তাদের গন্তব্য-পথে শ্রান্ত চরণ আর তুলতে পারে না। তিন মাইল এসেই একটু শ্রান্ত চরণের অভিজ্ঞতা আস্তে আস্তে হচ্ছিল তার—তার মনে হ'ল সমস্ত দেশটা ছেয়ে যাওয়া উচিত রেল ও ট্রামে—কিম্বা বাসে—আর সেই সব রেল, ট্রাম ও বাসে প্রত্যেককে আবশ্যক মত বিনা পয়সায় যাতায়াত ক'রতে দেওয়া উচিত।

বিকাশ বিশ্বের খেলার খবর বিস্তর রাখে কিন্তু সোশ্যালিজমের কোনও খবর রাখে না। আর তখন সোভিয়েট রাশিয়ার অভ্যুদয় হয় নি, এ দেশে সোশ্যালিজম, কমিউনিজমের সম্বন্ধে গোটাকয়েক তথাকথিত মাথা-পাগলা কল্পনাবিলাসী ছাড়া কারও কোনও জ্ঞানই ব'লতে গেলে ছিল না। কিন্তু হঠাৎ খেয়ালের বসে এক বেলা গরীব সাজতেই প্রয়োজনের তাড়ায় তার মাথায় এমন সব আইডিয়া খেলতে লাগলো যা আজকের দিনের সোভিয়েট রাশিয়ার চেয়েও অগ্রসর।

সঙ্গে সঙ্গে তার প্রোগ্রাম স্থির হ'য়ে গেল। সে যখন বড় লোক হবে—'যদি' নয়, 'যখন'—অর্থাৎ বড় লোক যে হবেই সে বিষয়ে কোনও সংশয় তার মনে উকি মারলো না—এই প্রসঙ্গে! সে যখন বড়লোক হবে তখন সে মাত্র পাঁচশো টাকা মাসে নিজের জন্য খরচ ক'রবে—পাঁচশো টাকায় লোকে বেশ চালাতে পারে—খুব না জাপানে পাঁচশো টাকার বেশী মাইনে নেই কারও। পাঁচশো টাকায় তার নিজের খরচ চালাবে, আর সব—মাসে মাসে দশ বিশ হাজার হয়তো—গরীবদের জন্ত খরচ ক'রবে। চাই কি দরকার হ'লে তিনশো টাকায় তার সব খরচ চালাবে—

দিবা স্বপ্নের দোষ এই যে এতে বাহ্যজ্ঞান লোপ পায়।

গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে পৌঁছিবার আগেই বিকাশের আকাশ-কুসুম রচনা এত নিবিড় হ'য়ে গিয়েছিল যে পথ সম্বন্ধে তার কোনও জ্ঞান ছিল না। পা দুটো চল্‌ছিল শুধু তাদের নিজের খেয়ালে। তাই পশ্চিম দিকে না গিয়ে সে চ'লেছিল সোজা পূব দিকে; আর মাইল তিন চার যাবার পর সে সোজা চল্‌ছিল সামনের একটা মোটর গাড়ীর নাকের দিক লক্ষ্য ক'রে।

ঠিক সেই সময় সে মনে মনে হিসাব ক'রছিল, বছরে লাখ টাকা আয় হ'লে কি কি কাজ করা যেতে পারে। এদিকে তার চৈতন্যের আশেপাশে সব সদর ও খিড়কী দরজায় সম্মুখস্থ মোটরের হর্ণ অবিরত নিষ্ফল আঘাত ক'রছিল। শেষে হঠাৎ তার সব গুলো দ্বার ফট ক'রে খুলে গেল—সামনে তার দু' হাত দূরে মোটরটা একটা বিকট ক্যাচ ক্যাচ শব্দ করে থেমে গেল, তার একটা টায়ার গেল ফেটে, আর বিকাশ এমন একটা লম্ফ দিয়ে রাস্তার পাশের ঘাসের উপর হুমড়ী খেয়ে প'ড়লো যা' দেখলে মহাবীর হনুমান হয় তো একটু ঈর্ষ্যান্বিত হ'তেন।

"ইডিয়ট" বলে হুমকী দিয়ে গাড়ীর চালক ভদ্রলোক নেমে ফাটা চাকা খুলে ষ্টেপনী লাগাবার উদ্যোগ ক'রলেন আর গাড়ীর ভিতর থেকে আর চারটি যুবক সুড় সুড় করে বেরিয়ে এলো আড়ষ্ট পা-গুলোকে একটু সোজা ক'রে নেবার জন্যে। তার মধ্যে একজন ঘুসি বাগিয়ে গেল তাদের বিঘ্নকারী পাপিষ্ঠকে পথ চলার বিজ্ঞান হাড়ে হাড়ে শিখিয়ে দিতে।

বিকাশ তখন উঠে কাপড় চোপড় ঝাড়ছে। তার কাছে এসে সেই রক্তচক্ষু বদ্ধমুষ্টি যুবক যেই তার মুখের দিকে চাহিল অমনি তার মুষ্টি চট্‌ ক'রে মুক্ত হ'য়ে আলিঙ্গনে পর্য্যবসিত হ'য়ে গেল, হারানিধি পাওয়ার আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো তার মুখ।

কেন না, আগন্তুক আর কেউ নয়, সুবোধ চাটার্জ্জী।

বেনারেস ইউনিভারসিটির আমন্ত্রণে কলকাতা ইউনিভারসিটির একটা টীম ফুটবল খেলবার জন্য কাশী আসছিল। সুবোধ এ দলের ক্যাপ্টেন, আর সবাই ট্রেণে আসছে; এরা পাঁচজন কলকাতা থেকে মোটরে আসছে।

"আরে বিকাশ যে! তুমি এখানে, আর আমি তোমাকে সারা বিশ্বে গরু খোঁজা ক'রে ম'রছি। অবশেষে কি না ওই গাড়ল গোবরা ঘোষটাকে গোলকীপার ক'রে আনতে হ'য়েছে। দুগ্ধা-ভাবে একেবারে ঘোলং। কোথায় ডুব মেরেছিলে এতদিন।"

ফাঁসী কাঠের সামনে ফাঁসীর আসামীর হৃৎপিণ্ডের গতি কি রকম হয়, তা' বিকাশের জানা ছিল না, কিন্তু নিজেকে ঠিক সেই অবস্থায় অনুভব ক'রে দেখতে পেলো যে বুকের ভিতর যাচ্ছে-তাই এলো মেলো স্পন্দন সুরু হ'য়ে গেছে। এই মুহূর্ত্তে সে পৃথিবীর প্রত্যেক লোকের সঙ্গে দেখা ক'রতে বরং প্রস্তুত ছিল, চাই কি বাঘের সামনে দাঁড়াতেও কুণ্ঠিত হ'ত না! চাই কি সুড় সুড় ক'রে বাড়ীর ভিতর লুকিয়ে মেশোমশায়ের সামনে দাঁড়ানও বরং ভাল ছিল! কিন্তু কলেজের হষ্টেলের ছাত্র বিশেষ ক'রে সুবোধ চ্যাটার্জী—এদের সামনে দাঁড়াবার সাহস তার মোটে ছিল না। মনে ক'রতে লাগলো যে সুবোধ এক্ষুণি তার হষ্টেলের কেলেঙ্কারীর কথা নিয়ে এমন সব চোখা চোখা কথা বলবে যে, তাতে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর থাকবে না।

কিন্তু সুবোধ সে কথা মোটেই বললে না। বরং হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে এমনি ক'রে বিকাশকে পেয়ে সে এমন একটা প্রচণ্ড উল্লাস প্রকাশ ক'রলে যে তার একটু ছোঁয়াচ প্রায় বিকাশের প্রাণেও লেগে গেল।

তার উল্লাসের ধ্বনি শুনে আর সবাই এগিয়ে এলো। সবাই শুধু নাচতে বাকী রাখলো।—তাদের টীমটি এবার একেবারে ছাঁকা ছাঁকা খেলোয়াড় নিয়ে হ'য়েছে। আগে থেকেই ঠিক ছিল যে বিকাশ হবে গোলকীপার! কিন্তু কার্য্যকালে সে নিখোঁজ হওয়ায় সুবোধ একেবারে অকূলে প'ড়ে গিয়েছিল। চারি দিক টেলিগ্রাম ক'রে যখন তাকে পাওয়াই গেল না, তখন বাধ্য হ'য়ে গোবরাকে নিতে হ'ল। এতে কেবল গোল সম্বন্ধে সবার মনে দারুণ খুঁৎখুঁতি ছিল। ইউনিভারসিটির ছাত্রদের মধ্যে বিকাশ ছাড়া প্রথম শ্রেণীর গোলকীপার কেউ নেই, গোবরা ঘোষ তার পরেই, কিন্তু একেবারে তৃতীয় শ্রেণীতে তার স্থান। তাই সুবোধের মনে ভারী ভয় ছিল যে, এমন দশ দশটা সেরা খেলোয়াড়ের খেলা পাছে গোবরার অকৃতিত্বে মাটি হয়। বিকাশকে পেয়ে তার বুক সাত হাত উঁচু হ'য়ে উঠলো। সে বললে, "এইবার মার দিয়া কেল্লা! হুরে! ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি ফর এভার।"

সঙ্গে সঙ্গে সকলে "হুরে" ধ্বনি ক'রে উঠলো।

এরা সবাই মিলে এতটা মাতামাতি নাচানাচি সুরু ক'রে দিলে যে অনেকক্ষণ বিকাশের কোনও কথা বলবার অবকাশই হ'ল না। তাতে সে বাঁচলো, কেন না এই অপূর্ব্ব কল্পিত পরিস্থিতিতে তার যে স্তব্ধতা এসে প'ড়েছিল সেটা কাটাবার সময় পেল এতে।

ষ্টেপনী লাগান হ'য়ে গেলে আবার সবাই সুড় সুড় ক'রে বিকাশকে নিয়ে গাড়ীতে উঠলো। গাড়ী চ'ললে পর সুবোধ বললে, "আরে ছি, ছি বিকাশ, তুমি ভীষণ sentimental, একটা খেলায় একদিন একটা ভুল কার না হয়? সেই লজ্জায় একেবারে দেশছাড়া হওয়া, এ কি Sportsman-এর কাজ? আমাকে তুমি ডুবিয়েছিলে আর কি?"

লজ্জায় বিকাশের কান লাল হ'য়ে উঠলো। সে আমতা আমতা ক'রে বললে, "কে বললে? মানে আমি দেশছাড়া তো হই নি—তা ছাড়া মেসোম'শায়কে তো জানিয়ে এসেছি।"

"তোমার মেসোমশায়ের কাছে খোঁজ নেওয়া হ'য়েছিল। তাঁর কাছে তুমি লিখেছিলে তোমার শরীর খারাপ বলে হরিদ্বারে গেছ। শরীর খারাপের নমুনা তো এই!" ব'লে বিকাশের পেশীবহুল বাহুমূলে সুবোধ লাগালে এক ঘুসি।

"তা ছাড়া লিখেছ তুমি হরিদ্বারে গেছ, সেখানে মোহান্ত মহারাজের কাছে তার ক'রেছিলাম, তিনি জানালেন তুমি হরিদ্বারের ত্রিসীমানায় যাও নি। এখন পাওয়া গেল তোমাকে কাশীর পথে। এর যদি কোনও রোমাণ্টিক কারণ থাকে, বুঝতে পারি। তা নইলে, তোমার এমনি ক'রে মিছে ব'লে দেশত্যাগী

হবার আর কোনও কারণই থাকতে পারে না—সেদিনকার খেলার accident-এর জন্য একটা morbid আত্মগ্লানি ছাড়া।"

বিকাশ চোখ দুটো ঈষৎ বিস্ফারিত ক'রে সুবোধের মুখের দিকে চাইলে। সে কৌতুক ক'রছে বা মিথ্যা ব'লছে এমন মনে হ'ল না।

তবে কি এ ছাড়া কিছুই কেউ জানে না। সেই বস্তীবাসীর মিথ্যা অভিযোগ বা তার হস্তগত টাকাটার খবর কি কারও কাছে পৌঁছায় নি। বিকাশের বুকের ভিতর আশা দপ ক'রে লাফিয়ে উঠলো।

সে বললে, "রোমান্স ভাই আমার কুষ্ঠিতে লেখে নি।"

"তবে? তবে এ ছাড়া আর কি কারণ হ'তে পারে?—হাঁ, ব'লতে পার, সেদিন সন্ধ্যেবেলায় আমি তোমার খেলার ভুলের খোঁটা দিয়েছিলাম, তার জন্যে যদি তুমি দুঃখ পেয়ে থাক, আমি ভাই মাপ চাইছি। আমি অতটা মনে ক'রে কিছু বলি নি, মুখের ডগায় যা এসেছে ব'লে গেছি।"

বিকাশের বুক থেকে দশ মণ বোঝা নেমে গেল। তবে সে শুধু মিথ্যা ভয়ে এতটা কাণ্ড ক'রে ব'সেছে! এইবারে আবার সে নিজের কাছে ভারী লজ্জিত হ'য়ে প'ড়লো। মনে হ'ল একটা মনগড়া বিপদের ভয়ে এতটা করা নিতান্ত কাপুরুষের কাজ হ'য়েছে। এ কথা যদি কেউ জানে তবে সে লজ্জাটাও কম নিদারুণ হবে না।

সে বললে, "ও কি ব'লছেন আপনি, আপনি ক্যাপ্টেন, আপনি খেলার দোষ দেখলে কথা ব'লবেন তাতে রাগ ক'রবো কেন? তবে হাঁ, সেদিনকার ঐ বোকার মত ভুলের জন্য মনে ভারী আত্মগ্লানি হ'য়েছিল। ভেবেছিলাম, আর খেলবো না।"

এই কল্পিত হেতুটাকে মাথা পেতে নেওয়াই এখন বিকাশের কাছে একমাত্র সুযুক্তি ব'লে মনে হ'ল। তাতে সেন্টিমেণ্টাল ব'লে তাকে ঠাট্টা করার চেয়ে বেশী কিছু কেউ ব'লতে পারবে না।

সহরের ভিতর এসে সবাই বললে, "বিকাশকে এখন আর ছাড়া হবে না। তোমার আর বাসায় যাওয়া হবে না। আমাদের সঙ্গেই থাকবে। পরশু দিন ম্যাচ হ'য়ে গেলে তবে ছুটি।"

সুবোধ বললে, "তখনও ছুটী পাবে না। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরছি। বরং তোমার তল্পী-তল্পা কোথায় আছে তা' ব'লে দেও, আনিয়ে নিচ্ছি।"

বিকাশ হেসে বললে, "তল্পী যা ছিল উধাও হ'য়েছে। তল্পা, এই যা প'রে আছি।" ব'লে সে তার সুটকেস চুরির বৃত্তান্ত ব'ললে।

শুনে সুবোধ ব'ললে, "তুমি একটি খোকা! এবার তোমার মেসোম'শায়কে ব'লে দেবো একটা চুশীকাঠী নিয়ে একটা নার্স যেন তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। একলা পথে বেরুলে কোনদিন বেঘোরে মারা যাবে। আজই তো গেছলে একটু হ'লে, মোটর চাপা প'ড়ে।"

এর পর বিকাশ গেল ইউনিভারসিটিতে; দলের সঙ্গে। সেখান থেকে তার মেসোম'শায়কে তার করা হ'ল যে ম্যাচ খেলে সে ফিরবে।

আসল কথাটা এই। সেদিন ভয় পাবার কোনও হেতুই বিকাশের ছিল না। যদি মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভাবা তার পক্ষে সম্ভব হ'ত, তবে সে অনায়াসেই বুঝতে পারতো যে, ওই ঘরে টাকা ফেলা যেতে পারে দোতলা, তেতলার ছ'টা জানালা থেকে—আর বস্তীর ভিতর থেকে তো পারেই। সুতরাং কেউ কথাটা শুনে যে তাকেই সন্দেহ ক'রবে এ রকম ভাববার কোনও হেতু ছিল না। তা ছাড়া, বাস্তবিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে কোনও নালিশই হয় নি। সেই রাতের হাঙ্গামার পর উঠতে একটু বেলা হওয়ায় হুড়মুড় কোরে আফিস যাবার তাড়ায় স্বামীর আর নালিস করবার কথা মনেও হয় নি। সন্ধ্যাবেলায় যখন মনে হ'ল তখন সেই টাকাটা ভাঙিয়ে তার স্ত্রী বেলের পানা আর ঘুগ্নি দানা তাকে পরিবেশন করায় স্বামী হেসে ব'ললে, "আচ্ছা, ব্যাপারটা কি বল দিকিনি সত্য ক'রে।"

স্ত্রী স্বামীর পা ছুঁয়ে এবং ছেলের মাথায় হাত রেখে শপথ ক'রলে সে কিছুই জানে না, হোটেলের কোনো বাবুর সঙ্গে কোনও দিন তার চোখোচোখিও হয় নি। তারপর স্বামীর খোসমেজাজের সুযোগে সে বললে, "আর হোটেলের বাবুদের কি আর মরবার জায়গা নেই যে, তোমার এই বুড়ী কালপেঁচীকে টাকা ছুঁড়ে মারতে যাবে!"

স্বামী হো হো ক'রে হেসে স্ত্রীকে কাছে টেনে নিলে!

[ক্রমশঃ

বাংলা সমালোচনা সাহিত্য ও তৎসংক্রান্ত প্রাবন্ধিক দল

শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

উপস্থিত প্রবন্ধে সমালোচনা বলিতে সাহিত্য সমালোচনাই বুঝিব। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-১৮৯৪) 'বাঙ্গালা-ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থদ্বারা সমালোচনা সাহিত্যের শুভ সূচনা করিয়া গেলেও ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ণে ৺দীনেশ চন্দ্র সেন বাঙ্গালী বিদগ্ধমণ্ডলীর পথ প্রদর্শক।

দীনেশ চন্দ্র সেন

দীনেশ চন্দ্রেরই প্রেরণারসে পুষ্ট হইয়া আধুনিক গবেষকগণের রচনাবলী অজস্র শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বাংলার সমালোচনা সাহিত্যটিকে এক মহামহীরুহে পরিণত করিতে উদগ্রীব হইয়াছে। ডাঃ সুকুমার সেন ও ডাঃ তমোনাশ দাশগুপ্তের সুবৃহৎ গ্রন্থমালা দীনেশ চন্দ্রের অনুকরণ ও অনুশরণ সঞ্জাত বলিলে প্রতিবাদের কোন সমর্থনযোগ্য কারণ মিলিবে না। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের মঙ্গল কাব্যের সমালোচনা কিংবা অক্লান্ত সাহিত্য-সেবী যোগেন্দ্র নাথ গুপ্তের মহিলা কবিগণের কাব্য-ব্যাখ্যা প্রভৃতি যাবতীয় আলোচনা-সংগ্রহ সম্ভবতঃ সেই এক মূল প্রেরণা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" খ্যাতনামা গ্রন্থকার সত্ত্বেও "বৃহত্তর বঙ্গ" দীনেশ চন্দ্রের জীবনের অবিনশ্বর কীর্ত্তি। বাংলার বীর্য্য ও বীরত্ব, বাংলার শিল্প ও স্থাপত্য, বাংলার প্রতিভা ও মননশীলতা—সহজ কথায় বাংলার দেহ ও মানসের সাংস্কৃতিক রূপটির পরিচয় লাভ করিতে "বৃহত্তর বঙ্গ" সাহিত্য রস-নিষিক্ত এক অপূর্ব্ব অভিধান।

দীনেশচন্দ্র খণ্ড খণ্ড নিবন্ধ রচনা করেন নাই, তথাপি তাঁহার রচনারীতিটি বিশুদ্ধ প্রবন্ধ-ধর্ম্মী।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মহাভাগ আশুতোষ বাংলা সাহিত্যের আলোচনা-মূলক সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধ মালার ভিতর দিয়া ইনি বাংলার যুবক সম্প্রদায়কে একটি শুভ সাহিত্য সৃজনের সন্ধান দিয়াছেন। আশুতোষ স্বয়ং বঙ্গবাণীর প্রত্যক্ষ সেবক হওয়ার চেয়ে পরোক্ষভাবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মারফৎ মাতৃভাষার যেই আলোকারতির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সেই ব্যবস্থার ফলে বঙ্গ-ভারতীর বিশাল অঙ্গন একদিন মহারম্য আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে; তখন সহস্র কিরণ-বিভাসিত মহাদ্যুতিময় এই অঙ্গনে দাঁড়াইয়া বাঙ্গালী জাতি সুদূরদর্শী এই পুরুষ সিংহের প্রতিষ্ঠাকেই সগৌরবে স্মরণ করিবে।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও মোহিতলাল মজুমদার

অধ্যাপক ধূর্জ্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার বিশেষ করিয়া সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ে বহু সংখ্যক দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি অতি উন্নতস্তরের; সুতরাং উভয়েরই রচনা সাধারণের সম্পত্তি হইতে পারে নাই; অনুশীলন-প্রিয় বিশিষ্ট পাঠকগোষ্ঠীর আওতায় সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

মোহিতলালের আলোচনা মৌলিক ও সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্ভাবিত:

> "কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টি জিনিষটা যে রস আহরন করে, সেটা সকল সময় সার্ব্বজনিক হয় না। সাহিত্যের এটাই হোলো অপরিহার্য্য দৈন্য। তাকে পুরস্কারের জন্য নির্ভর করতে হয় ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধির উপরে। তার নিম্ন আদালতের বিচার সেও যেমন বৈজ্ঞানিক বিধি-নির্দ্দিষ্ট নয়, তার আপিল আদালতের রায়ও তথৈবচ। এস্থলে আমাদের প্রধান নির্ভরের বিষয় বহু সংখ্যক শিক্ষিত রুচির অনুমোদনে। কিন্তু কে না জানে যে শিক্ষিত লোকের রুচির পরিধি তৎ-কালীন বেষ্টনীর দ্বারা সীমাবদ্ধ, সময়ান্তরে তার দশান্তর ঘটে।"*

যাহা হউক, তাঁহার রবীন্দ্রনাথের আলোচনামূলক কিয়দংশ পরীক্ষিত হউক:

> "...রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-শক্তির মূলে আছে—অন্তর ও বাহির, ভাব ও বস্তু, চিন্তা ও অনুভূতির সঙ্গতিমূলক এক অপূর্ব্ব গীতি-প্রবণতা; ইহাতেই

---

* রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, কবিতা—আষাঢ়, ১৩৪৮।

তাঁহার মনের মুক্তি; সেই মুক্তির আনন্দে তাঁহার কল্পনা সকল সংস্কার সকল বিরোধ উত্তীর্ণ হইয়া এমন এক রস-ভূমিতে অধিষ্ঠান করে, যেখানে জীবনের সকল অসামঞ্জস্য, বাস্তবের সকল বৈষম্য কবির প্রাণে একটি ভাবৈক-পরিণাম রাগিণীতে সমাহিত হয়। † † তিনি যখন যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার অন্তর্গত এই সঙ্গীত পাঠককে আবিষ্ট করে, তাহার সমগ্র চেতনাকে সেই সর্ব্ব-সমঞ্জসকারী গীতি-রাগে বিগলিত করিয়া যে ভাব-দৃষ্টির অধিকারী করে, তাহাতে জগতের কোন কিছুতেই উচ্চ-নীচ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, সত্য-মিথ্যার অভিমান থাকে না—একটি সুগভীর সর্ব্বাত্মীয়তার প্রীতি-কল্পনায় ধূলিও পরম রম্য হইয়া উঠে।"†

মোহিতলাল মজুমদারের ন্যায় সিদ্ধ সমালোচক বা সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ রচয়িতা এ কালের অন্যান্য বহু বাঙ্গালীর পরিচয় আমরা পাইয়াছি। ইঁহাদের মধ্যে প্রবীণ সমালোচক শশাঙ্ক মোহন সেন, নলিনী কান্ত গুপ্ত এবং অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, মজুমদার মহাশয়ের প্রাক্‌কালবর্ত্তী। আধুনিক দলের মধ্যে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও নন্দলাল সেনগুপ্ত প্রভৃতির নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ্য। উল্লিখিত পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রত্যেকেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে শ্রেষ্ঠ ও স্মরণীয়।

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" নামক বিরাট গ্রন্থে সমালোচনার মূলে এক অসাধারণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। এত দীর্ঘ ও একঘেয়ে আলোচনার ভিতরও তাঁহার ভাব, ভাষা ও বিশ্লেষণ সমপরিমাণে হৃদ্য ও রম্য হইয়া রহিয়াছে, কোথায়ও ক্লান্তিকর বিরক্তির অবকাশ ঘটায় নাই। ইংরেজীতে যাহাকে land mark বলে, নব প্রবর্ত্তনার ইতিহাসে এই পুস্তকখানাও সেইরূপ সমালোচনা সাহিত্যের বিভাগ-সীমায় দৃঢ় প্রোথিত প্রস্তরের মত স্থিতিশীলতায় অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

"বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" মূলতঃ ধারাবাহী প্রবন্ধ সমষ্টির সংকলন।

শশিভূষণ, নন্দলাল ও শশাঙ্ককুমার

শশিভূষণের সমালোচনা নির্ভীক ও তত্ত্বদর্শী। নন্দলালের সমালোচনা সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণাত্মক ও রূঢ় সত্যপ্রচারী; অধিকন্তু ইনি সাহিত্যকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য হানি করেন নাই, ব্যবচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় নিপুণ রসজ্ঞের পরিচয় দিয়া অপরকে মুগ্ধ করিয়াছেন; ফলে তাঁহার বিশ্লেষণাত্মক রচনা রসোত্তীর্ণ হইয়া নবতর এক সাহিত্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

শশাঙ্ককুমারের চেতনা নিছক গুণদর্শী ও গুণগ্রাহী হওয়ায় তাঁহার সমালোচনা একদেশদর্শীতার দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। স্বজাতীয় কবি ও সাহিত্যিক তাঁহার নিকট অন্ধ মমতায় সমাদৃত হইয়াছেন বলিয়া ইনি তাঁহাদের বরং পঞ্চমুখে গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, দোষ ও গুণের অপক্ষপাত বিচার করিতে পারেন নাই; সুতরাং আধুনিক দৃষ্টির সম্মুখে তাঁহার সমালোচনার সমাদর ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা রাখে। ইংরাজী সাহিত্যের অনুসরণের ফলস্বরূপই হয়তো ইংরেজ জাতির স্বভাবসুলভ স্বদেশীয় সাহিত্যিকগণের প্রতি অন্ধ অনুরাগ শশাঙ্ক-কুমারের চরিত্রে অনুবর্ত্তিত হইয়াছিল।

সাহিত্য হইতে নিজের অন্তর দিয়া যেই আনন্দ রস উপভোগ করা হয়, সেই রস ভাষায় পরিবেশন করিয়া যদি অপরাপর সকলের তৃপ্তি সাধন করিতে পারা যায়, অন্য কথায়—স্বকীয় উপলব্ধিকৃত রস অন্যের মনে সংক্রামিত করিতে পারা যায়, তবেই সমালোচনা সার্থকতা লাভ করে। সমালোচক অপরের চিত্তে এই তৃপ্তি সাধনের জন্য তাঁহার আবিষ্কারী অন্তর্দৃষ্টি দিয়া অনাবিষ্কৃত তত্ত্ব সমূহের উদ্‌ঘাটন করেন; কখন বা সাধারণের মগ্ন-চৈতন্যে সুখস্রাবী এই রসকে তাহাদের অনুভাব্য সম্বিতে আনিয়া ধরেন। সমালোচকের এই দুষ্কর কার্য্য দুইটি শশিভূষণ ও নন্দলাল যতটুকু পারিয়াছেন, শশাঙ্কমোহন তাহার কিঞ্চিন্মাত্র পারেন নাই। শুধু শশাঙ্কমোহন নন্, এই দুরূহ কার্যাবলীর কর্ত্তা, একাল ও সেকালের বহু সমালোচকই হইতে পারেন নাই। এই কার্য্য দুইটি

---

† মোহিতলাল মজুমদার।

শুধু নিপুণ সমালোচকের ধর্ম্ম নয়, নিপুণ সাহিত্যিক মাত্রেরই ধর্ম্ম এবং এই জন্যই খাঁটি সমালোচকের আসন অনেকের মতে স্বয়ং সাহিত্যস্রষ্টার নিম্নে নয়। বস্তুতঃ সমালোচক কবি বা কথাশিল্পী না হইলেও তাঁহার মনে সাহিত্যরসের ফল্গুধারাটি স্বতঃ প্রবাহিত হইয়া থাকে।

রচনার নিগূঢ় রসটি উপলব্ধি না করিয়াই ভাষা ভাষা কথায় ভাসা ভাসা ভাবের রোমন্থনকারী সমালোচকের অভাব কোন সাহিত্যেই নাই; বাংলা সাহিত্যেও তাহা অব্যতিক্রমনীয় হইয়া আছে। এই জাতীয় প্রাবন্ধিকগণের নাম বর্ত্তমান প্রবন্ধে করিব না। এ নিমিত্ত অনুল্লিখিত ব্যক্তিদের সকলেই যে এজাতীয় নন্ বরং বহু শ্রেষ্ঠ সমালোচকও উঁহাদের ভিতর বিদ্যমান—এই কথা বিস্তারিত করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়কে আধুনিক বাংলার নব নাগরিক সাহিত্যটির প্রতি যেন কতকটা বীতরাগ বলিয়া মনে হয়। দুঃস্থ, অবজ্ঞাত, অজ্ঞানতার অন্ধকারে অবসাদগ্রস্ত শত সহস্র মানব, যাহাদের অন্ন, আয়ু ও উন্মুক্ত আহ্লাদ সুপরিমিত, তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট সাহিত্যের দর্শনের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া আছেন। এরূপ সাহিত্যকেই তিনি সত্যিকারের সাহিত্য বলিতে অধিক প্রয়াসী। তাঁহার "বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য" নামক সমালোচনা গ্রন্থে এই মূল সুরটিই যেন সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে।

> "আমাদের সাহিত্য এখনও সহজ ও সরল প্রেমে অধম ও পতিতকে আলিঙ্গন করে নাই। বীণা, বেণু, মালতী ও মল্লিকা ফুলের ডালি আমাদের সাহিত্য ছাড়িতে পারে নাই। বস্ত্র ছিঁড়িবে, অলঙ্কার হারাইবে, ধূলাবালি লাগিবে এই ভয়ে আমাদের সাহিত্য রাস্তায় বাহির হয় নাই, ঘরের ভিতর দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্ধকারে লুকাইয়া আছে। বাহিরের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে আমাদের সাহিত্যের আলাপ হইতেছে না; তাই তাহার realism এর অভাব দূর হইতেছে না; তাই তাহা এখনও শুধু কল্পনার সামগ্রী রহিয়াছে। এখন সাহিত্যকে অন্ধকার ঘর ছাড়িয়া বৈশাখের রৌদ্রে রাস্তায় কুলী মজুরের সঙ্গে বাহির হইতে হইবে। পূর্ণিমা-নিশি ও মায়া-কুহেলিকার মোহ দূর করিতে হইবে। ফুল, মালা, অলঙ্কার এখন বিসর্জ্জন দিতে হইবে।***কৃষক-বধূর মত রাস্তার ধূলা, মাঠের কাঁদা, মাথার ঘাম এখন সাহিত্যের অলঙ্কার হইবে। শুভ্র পরিচ্ছন্ন বস্ত্র ছাড়িয়া সাহিত্যকে কৃষক-বধূর অপরিচ্ছন্ন অল্প বস্ত্রে সাজিতে হইবে। কৃষকের নিখিল দুঃখ দারিদ্র্যের বোঝা বুকে করিয়া, কৃষক-বধূর সহিত নীরবে নির্ব্বিবাদে ক্লান্তিবিহীন কাজের মধ্যে প্রভাত-কুসুমের ঘ্রাণ লইয়া, সন্ধ্যায় পাখীর গান শুনিয়া সাহিত্যকে দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে।"*

নলিনীকান্ত গুপ্ত

প্রবীণ সমালোচক নলিনীকান্ত গুপ্তের লেখনী অধুনা বিশ্রান্ত। গুপ্ত মহাশয়ের তত্ত্বদৃক্ মানস ও অনাড়ম্বর বৈদগ্ধ সমালোচনা সাহিত্যের একটি সর্ব্বজনগ্রাহ্য রূপ দান করিয়াছে। বাংলা সমালোচনার দ্বারোদ্ঘাটন কালে তাঁহার ধ্যানীদৃষ্টি অনাগত কালের চিন্তাশীলদের জন্য পন্থাপ্রদর্শিকার মত একটি অমৃতময়ী কিরণলেখা উন্মীলিত করিয়া রাখিয়াছে; এই উচ্ছ্রীয়মান রশ্মিজাল তাঁহার মাধুর্য্যমণ্ডিত ভাষাভঙ্গিটি হইতে স্বতঃই রসান্বেষীকে মুগ্ধ-বিস্ময়ে অভিভূত করে। তাঁহার রবীন্দ্র সমালোচনামূলক প্রবন্ধাবলীও অনুরূপ সম্পদ্‌শালী। নিম্নোদ্ধৃত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্য মানসের বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদটি পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে নলিনীকান্ত অনেকের মত পাণ্ডিত্যের সাড়ম্বর ভান কোথায়ও করেন নাই, সহজ সাবলীলতার ভিতর দিয়া গভীর পাণ্ডিত্যই পরিবেশন করিয়াছেন এবং ঐ সঙ্গে পরিবেশন করিয়াছেন রসঘন মাধুর্য্য যাহাতে সমালোচনাও উপাদেয় সাহিত্যে স্ফূর্ত্ত হইয়াছে।

> "ভারতীয় কলাসৃষ্টি মূলতঃ হইতেছে শান্ত-রসাস্পদ, উহা সর্ব্বোপরি চায় ধ্যানের নিস্তব্ধতা,

* রাধাকমল মুখোপাধ্যায় কৃত বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য।

প্রসন্নতা। মিলনের হাস্যে উহার পর্য্যবসান। বুদ্ধ মূর্ত্তির কথা ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু দেখ, নটরাজ রুদ্রের তাণ্ডব-নৃত্য—তাহার মধ্যে অপার্থিব শান্তিই ফুটিয়া উঠিয়াছে, প্রতি পদ-বিক্ষেপে সৃষ্টি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু অন্তরালে নবসৃষ্টির শতদল যেন বিকশিত হইতেছে। অন্যপক্ষে ইউরোপীয় কবি-প্রকৃতি এক আসুরিক তীক্ষ্ণতায় ভরা, উহা প্রধানতঃ রজোগুণের খেলা। তাই গতি, সংঘর্ষ, বিক্ষোভের মধ্যেই তাহার আনন্দ। ইউরোপীয় শিল্পের ভঙ্গিমা একীকরণ ততখানি চায় না, সে চায় প্রকাশের বৈচিত্র্যের ছন্দোময় দ্বন্দ্ব। এই ভারতীয় সাহিত্যে প্রতিফলিত জ্ঞানের প্রশান্ত কিরণলেখা, ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রতিফলিত কর্ম্মের বিক্ষোভিত তরঙ্গমালা। ভারতীয় কবি উদাসীন, উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত যোগীর চক্ষে জগৎ দেখিতেছেন—তাঁহার নয়নে প্রতিভাত 'শান্তং শিবং' সৃষ্টির ভরাটের দিকটি। ইউরোপীয় কবি কর্ম্ম-স্থাপিত কর্ম্মীর চক্ষে জগৎ দেখিতেছেন—সংঘর্ষের, জগতে ভাঙ্গনের ভঙ্গিমাটিই তাঁহার চক্ষে বড় হইয়া উঠিয়াছে। তাই মিলনের রসে ভারতীয় কবি-প্রাণ আপনাকে এমন মহনীয় করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন আর বিচ্ছেদের রসেই ইউরোপীয় কবির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সমুদায়।"†

অধুনা 'রবীন্দ্র সমালোচনা'মূলক একটি অভিনব সাহিত্য সৃষ্টির পিরামিড্ গড়িয়া উঠিতেছে; সেই সৃষ্টির মূলে অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, অধ্যক্ষ সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, নলিনী গুপ্ত, অধ্যাপক আবদুল ওদুদ্, অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন সেনগুপ্ত, অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশি, ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়, অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতির দল অগ্রণীর দাবী করিতে পারিবেন।

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

অধ্যক্ষ দাশগুপ্ত কেবল রবীন্দ্র প্রসঙ্গই আলোচনা করেন নাই, সাহিত্য বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধাবলী দার্শনিকতত্ত্বের ভিত্তিতে স্থাপিত, রসসন্ধানকারী দৃষ্টির ভঙ্গিটিও দার্শনিক তত্ত্বের পেঁচালু রেখায় সম্প্রসারিত, সুতরাং ইহাদের ভিতর সাধারণ রসামোদীর অনুপ্রবেশ এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিলে—দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধসমূহে সাহিত্যকে ভিত্তি করিয়া সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন অথবা সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বাবলীকে ভিত্তি করিয়া সাহিত্যের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার প্রবন্ধাবলী সাধারণ রসামোদীর দুরধিগম্য হইয়া রহিয়াছে। অপেক্ষাকৃত সহজ একটুকুন অংশ নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করিলাম :

"তত্ত্বচিন্তা ও যুক্তি প্রণালীর মধ্য দিয়া যেমন একটি দুর্জ্ঞেয় গভীর ধ্যানশক্তি আপনাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, কবির কাব্যের মধ্য দিয়াও তেমনি একটি গভীর উপলব্ধি, চিত্তের একটি অনির্ব্বাচ্য রসনির্ঝরিণী, তাহার সেই অলৌকিক রূপকে মূর্ত্ত কল্পনার সাহায্যে, শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। যিনি যন্ত্রী তিনি থাকেন অন্তরালে, আর তাঁহারই প্রেরণায় সমস্ত দুঃখ-সুখের তার লইয়া কবির চিত্ত যন্ত্রটি ভাষা ও ছন্দের ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। মেঘদূতের মধ্যেও আমরা এই রকম একটি স্পর্শ বা তত্ত্বোপলব্ধির পরিচয় পাই। সেই উপলব্ধিটি যেন তা'র আপন আত্মপ্রকাশের নিবিড় বেদনায় ছন্দ ও শব্দ-বিন্যাসের মধ্য দিয়া একটি কবি-পরিকল্পনার আশ্রয় লইয়া আত্মপ্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে।"*

এতটা সত্ত্বেও ভাসা ভাসা কিছুটা আভাস পাওয়া যায়; কিন্তু যখন দেখি—

"কবি বা চিত্রীর মধ্যে একটা ব্যক্তিগত প্রাকৃতিক জীবন আছে। কবি তাঁহার রূপায়নের মধ্যে তাঁহার প্রাকৃতিক জীবনকে বিসর্জ্জন দিয়া একটী রূপায়ণিক বীক্ষার মধ্যে আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করেন। পাঠকও তেমনি রূপায়ণ-বস্তুর সঙ্কেতের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া আপন বীক্ষা-শক্তির

† নলিনীকান্ত গুপ্ত কৃত 'ইউরোপীয় ট্রাজেডি ও ভারতীয় করুণ রস' প্রবন্ধ।

* মেঘদূত ও কালিদাস।

ব্যাপারের দ্বারা কবির সে অলৌকিক অনুভূতির সহিত আপনাকে একেবারে অভিন্ন করিয়া দেখেন। যে পরিমানে এই কার্য্যটী সফল হয় সেই পরিমাণেই কবি বা চিত্রীর রূপায়ণকে আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারি।"

তখন এই প্রস্তরীভূত রস লেহন করিয়া আস্বাদন গ্রহণে সক্ষম কয়জন বাঙ্গালী বিদ্যমান দেখি? অথচ সুরেন্দ্রনাথের 'সাহিত্য পরিচয়' নামক পুস্তকে জাতীয় অনেক কিছু সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বুদ্ধদেব বসু

উপরোক্ত আর আর সকলের মত বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক ও ধারাবাহিক আলোচনা করেন নাই; তথাপি তাঁহার স্বল্পভাষার ভিতর দিয়া আপন হৃদয়ের রস পাঠকদের চিত্তে সংক্রামিত করিতে পারিয়াছেন। রবীন্দ্র-সমালোচনা ব্যতিরেকেও বুদ্ধদেব তাঁহার অন্যান্য প্রবন্ধাবলীতে একটি তীক্ষ্ণ ও সত্যসন্ধানী রস পরিবেশন করিয়াছেন।

অজিত চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য সমালোচকদল

অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী সকলের অজ্ঞাতে একান্ত আচম্‌কা ভাবে রবীন্দ্রসমালোচনার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। আবদুল ওদুদের আলোচনা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা লাভ করিয়াছে। চারুচন্দ্রের আলোচনায় রস অনুসন্ধান অপেক্ষা ব্যাখ্যাবৃত্তি অধিক প্রকট। স্মরণ রাখা প্রয়োজন সমালোচনায় রস সন্ধান মুখ্য, ব্যাখ্যা গৌণ এবং এই দুইটির উৎকর্ষ অপকর্ষের ব্যবধান স্বর্গ ও পাতাল। প্রমথনাথ রবীন্দ্র সৃষ্টির উৎসমুখে মানবধর্ম্মের প্রেরণাটিকেই মুখ্য প্রমাণিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। শচীন সেনের আলোচনা ভক্তহৃদয়ের শুভদর্শিতায় পর্য্যবসিত হইলেও রম্য ও রসদৃক্। নীহাররঞ্জন তাঁহার আলোচনায় কোন বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখেন নাই।*

* লেখকের "প্রবন্ধ সাহিত্য—একাল ও সেকাল" প্রবন্ধের একাংশ। লেখকের সহিত সর্ব্বত্র আমরা একমত নহি।—বঃ সঃ

জননী মেল গো আঁখি

শ্রীনকুলেশ্বর পাল

জননী মেল গো আঁখি।
তোমারি শিয়রে ছেলে কেঁদে মরে
'মা মা' বলে ডাকি' ডাকি'।
দুখের শিশুর মুখে দুধ নাই,
মায়ের বক্ষে নাহি তার ঠাঁই;
রোদনে তাহার কাঁপে ধরাতল
জননী দেখিছ নাকি?
খোল রসনা—পাষাণী মেলগো আঁখি।

জননী গো আঁখি খোল;
সন্তান মরে ক্ষুধার জ্বালায়
বুকে টেনে তারে তোল।
ছিন্ন বসনে মোছে আঁখিধার,
ঢাকিতে পারে না লজ্জা যে আর,
অন্নহীনের বস্ত্রহীনের
আছে কি ভাগ্যে বাকী,
বরাভয়করা মেলিবে না কি মা আঁখি?

মা বুঝি রে বেঁচে নাই;
কার কাছে আর দুঃখ জানাব
কাঁদিব রে কার ঠাঁই।

শস্য শ্যামলা বাংলার বুকে,
ক্ষুধার জ্বালায় মরে ধুকে ধুকে;
আজি এ শ্মশানে অয়ি শবাসনা
জাগিয়া উঠিবে নাকি?
অশিবের বুকে রক্তচরণ রাখি'।

ব্যাকুলতার আকর্ষণ

(গল্প)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

চৈত্র মাস। অসহ্য গরম পড়িয়াছে। সন্ধ্যার পর গ্রাম্য ডাক্তার হরিশ বাবু ডাক্তারখানার বাহিরে চেয়ার পাতিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। যুদ্ধ, বোমা, দুর্ভিক্ষ,—রোগীপত্রও বিশেষ নাই। লোকে খাইতে পাইতেছে না, পয়সা খরচ করিয়া রোগের চিকিৎসা করানো এ দিনে সাধারণের পক্ষে অসহ্য বিলাসিতা! স্বাধীন ব্যবসায়ী চিকিৎসকদের দিন চলা ভার। মনের অবস্থা ভাল নাই। কিঞ্চিৎ জমিদারীর অংশ আছে, তাই রক্ষা।

প্রৌঢ় অধ্যাপক মহানন্দ বাবু ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি পূর্ব্বে কলিকাতার কোনও কলেজে কাজ করিতেন। উপস্থিত বোমার প্রভাবে বেকার। গ্রামের বাড়ীতে আসিয়া সপরিবারে বাস করিতেছেন। দর্শনশাস্ত্র ও ব্রহ্মবিদ্যার চর্চ্চায় সর্ব্বদাই গাঢ় মনোযোগ। সাধারণের হট্টগোল হইতে সাধ্য পক্ষে দূরে থাকেন।

তিনি আর একটা চেয়ারে বসিয়া সবে মাত্র দু' একটা কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় ব্যস্ত উত্তেজিত ভাবে পরেশবাবু আসিয়া উপস্থিত। ভদ্রলোকের বয়স অল্প, গ্রাম্য স্কুলের এ্যাসিষ্টাণ্ট হেড-মাষ্টার। এখনো অবিবাহিত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশ-ভূষা। সাহিত্যের নেশা আছে, সম্প্রতি বৈষ্ণব-পদাবলী চর্চ্চায় অত্যুৎসাহী।

একটা চেয়ার লইয়া বসিয়া বিনা ভূমিকায় উত্তেজিত ভাবে পরেশবাবু বলিলেন, "আপনারা কেউ চণ্ডীতলায় চব্বিশ প্রহরার কীর্ত্তন শুনতে যান নি?"

অধ্যাপক মৃদু হাসিয়া নীরবে চুরুট ধরাইতে মনো-যোগী হইলেন। ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন, "আপনি শুনতে গিয়েছিলেন বুঝি? কেমন লাগ্‌ল?"

"আর বল্‌বেন না মশাই! অধর্ম্মের ভোগ! শুন্‌লাম সন্ধ্যার দিকে কে একজন ভাল গায়ক নৌকাখণ্ড গাইবেন, তাই ছুটেছিলাম। ভাবলুম, রূপকের অন্তরালে উচ্চতম ভগবৎপ্রেমের রূপ-রসের অভিব্যক্তির যে সূক্ষ্মস্পর্শ যে মহান্ তত্ত্বের ইঙ্গিত নিহিত আছে, তার মাধুর্য্যে খানিক মুগ্ধ হব। কিন্তু ঘণ্টাখানেক ধ'রে গলদঘর্ম্ম হ'য়ে বুঝলাম—গোপী-প্রেমের মহান্ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ছিটেফোঁটাও গায়ক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। তাই কৃষ্ণ-লীলার দোহাই দিয়ে অকুতোভয়ে শত শত নরনারী বালক-বালিকার সামনে বর্ণনা করছেন,—অতি-স্থূল দৈহিক লালসা-বিলাসের কদর্য্য রুচির প্রলাপ! প্রচার করছেন—অশ্লীল ভাবোন্মাদনা!"

ডাক্তার সকৌতুকে বলিলেন, "কে গাইছে? সারদা দাস ত? সিফিলিসের রোগীর কাছে এর বেশী কি চাইছেন?"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া অধিকতর উত্তেজিত ভাবে পরেশবাবু বলিলেন, "আর ওখানকার ঠাকুরের পূজারীটি,—তিনি দেখলুম সুযোগ পেয়ে কীর্ত্তনের দলে ভিড়ে মেলা কায়দায় 'ভাব' দেখাচ্ছেন!"

ডাক্তার নির্ব্বিকার মুখে বলিলেন, "দেখাবেন বৈ কি। তিনিও যে গণোরিয়ার আসামী!"

"গণোরিয়া?"

"বের করব প্রেসক্রিপসান? সবাইকে চিনি। সারদা দাস, রমাপদ ভট্টাচার্য্য—সবাইকার ঠিকুজি কোষ্ঠি আমার ফাইলে আছে। ওঁরা ধর্ম্মপ্রচারকের আসনে ব'সে লোকশিক্ষাদান করুন, আর যত মহৎ কাজই করুন, ক্ষমার অযোগ্য অধর্ম্মাচরণে সবাই সুদক্ষ। তার প্রমাণ আমাদের হাতে, আমরা ডাক্তার!"

হতভম্ব হইয়া পরেশবাবু বলিলেন, "সিফিলিস্? গণোরিয়া? বলেন কি? চব্বিশ প্রহরার কর্ত্তারা, মানে—বাজারের আড়ৎদাররা পয়সা খরচ ক'রে কীর্ত্তন করাবার জন্য এনেছে এঁদের?"

মৃদু-হাস্যে ডাক্তার বলিলেন, "সস্তায় কিনে চড়াদামে চাল বেচে লাল হ'য়েছে। নিজেদের 'নামকা ওয়াস্তে'

কীর্ত্তন করাচ্ছে ওরা। ধ'রে নিন্ ওতেই ওদের ধর্ম্ম-জীবনের উন্নতি হবে।"

চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে অধ্যাপক চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "বেয়ারিং পোষ্টে। পয়সার জোর আছে, ভাড়াটে উপাসকের দ্বারা নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবনের মঙ্গলের জন্য উপাসনা করাচ্ছে, ভাল কথা। কিন্তু উন্নতিটা ধোপে টিক্‌বে ত ?"

ডাক্তার বলিলেন, "আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির প্রমাণ,—দুর্ভিক্ষে লাখ লাখ লোকের অনশন-মৃত্যুতে প্রকট ! এখন স্ফূর্তির জন্য চাই, রাধাকৃষ্ণের নামের প্যাচে কদর্য্য রুচির লীলা বিলাস। কচি কচি ছেলেমেয়েদের আর বিচার শক্তিহীন মূর্খ স্ত্রীলোকদের আধ্যাত্মিক জীবন চষে সার দিয়ে উর্ব্বর করা চাই।"

ক্ষণেক গুম্ হইয়া থাকিয়া পরেশবাবু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিলেন, "উঃ, সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্বজ্ঞ ঋষি বটে বিবেকানন্দ ! তিনি যে বলেছিলেন, 'যেখানেই রাধাকৃষ্ণের লীলা-গান, সেখানেই গিয়ে লেফ্‌ট এণ্ড রাইট্ চাবুক মারুন'—ভারি দামি কথা ! আশ্চর্য্য হচ্ছি মশাই, ওই লাভখোর ব্যবসাদারের দল,—গজ ফুট ইঞ্চি মেপে ঠিক নিজেদের বীভৎস কদর্য্য রুচির উপযুক্ত গায়ক আমদানী ক'রেছে।"

অধ্যাপক সনিঃশ্বাসে বলিলেন, "থিয়সফিষ্ট্‌রা বলেন, পৃথিবীতে যে যে রকম প্রকৃতির লোক,—ইহলোক তো তুচ্ছ কথা, *পরলোক থেকেও তার কাছে সেই রকম* প্রকৃতির আত্মা এসে দৃশ্য ও অদৃশ্যভাবে তার জন্য ভাল মন্দ কাজ ক'রে যায়। সৎপ্রকৃতির লোকেরা সদাত্মার সাহায্য লাভে উপকৃত হয়, অসৎপ্রকৃতির লোকেরা প্রেতাত্মার দ্বারা উৎপীড়িত হয়—"

বাধা দিয়া ডাক্তার সহসা উত্তেজিত বিস্ময়ে বলিলেন, "আপনিও এ কথা মানেন ? সৎ ব্যক্তিরা সদাত্মার সাহায্য পায়, এ কথা ঠিক ?"

অধ্যাপক বলিলেন, "তোমরা মেডিক্যাল ম্যান, মানুষের জড় দেহটা মাত্র নিয়ে তোমাদের কারবার। জড়াতীত সূক্ষ্ম সত্তার প্রমাণ ডাক্তারী ছুরি-কাঁচির নাগালের বাইরে। তোমরা অবিশ্বাস করলেও দোষ দেব না। কিন্তু আমি শুধু প'ড়ে শুনে নয়, নিজে উপলব্ধি ক'রেছি আগে, তারপর হ'য়েছি থিয়সফিষ্ট্।"

ডাক্তার নীরবে নিবিষ্টচিত্তে কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। বহু—বহুদিনের কি একটা বিস্মৃত স্মৃতিকে যেন হাতড়াইয়া খুঁজিতেছেন।

পরেশবাবু বলিলেন, "বৈষ্ণব-সাহিত্যই আমাকে খেয়েছে মশাই। কিন্তু আজ যা নাকাল হ'য়েছি, উঃ ! একটু থিয়সফির চর্চ্চা করুন, মনের গ্লানি কেটে যাক। ডাক্তার না হয় কাণে আঙুল দিন—"

ডাক্তার বিনীতভাবে বলিলেন, "ওসব জটিল তত্ত্বে আমার দখল নাই। অনধিকার-চর্চ্চা করবার সাহসও নাই। কিন্তু একটা অদ্ভুত সত্য ঘটনার কথা জানি। তার অর্থ আজও বুঝতে পারি নি। আপনি থিয়সফিষ্ট, আপনি হয়তো তার মর্ম্মনিহিত অর্থ বল্‌তে পারেন। ব্যাপারটা বলুব ?"

পুনশ্চ নূতন চুরুট ধরাইয়া অধ্যাপক বলিলেন "বল, আগে শুনি।"

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, "আমার বাবার পেশা ছিল ডাক্তারী। কিন্তু নেশা ছিল অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে উচ্চ শ্রেণীর তত্ত্ব আলোচনায় এবং নীরব সাধনায়।—

তখন ছোট ছিলাম, সে সব বিষয়ের মানে বুঝতাম না। এখন অতীত স্মৃতি স্মরণ করে বুঝতে পারি, তাঁর *সারা জীবনের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ছিল অসামান্য।* স্বভাবতঃ তিনি চাপা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কিন্তু মনের মত সঙ্গী পেলে উচ্চ তত্ত্বের আলোচনায় গভীর ভাবে নিমগ্ন হতেন।—

জাতি, ধর্ম্ম, সম্প্রদায়, সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধে তিনি কোনও গোঁড়ামির ধার ধারতেন না। তাঁর ঐ সকল আলোচনার সঙ্গীদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ মুসলমানকে দেখেছিলাম। তাঁর প্রকৃত নাম বলুব না। কারণ, ঘটনাটা সম্পূর্ণ সত্য। সুতরাং এ-ব্যাপার নিয়ে তাঁর জীবিত আত্মীয়দের মনে কোনরূপ আঘাত দিতে আমি অনিচ্ছুক।

ধরে নিন্—তাঁর নাম বাবুল মিঞা।

এককালে কি একটা ছোট খাট চাকরি করতেন। বুড়ো বয়সে সমান্য পেন্সন ও একমাত্র বিধবা মেয়ে নিয়ে গ্রামের বাড়ীতে তখন ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও অন্য ছেলে-মেয়েগুলি আগেই মারা গিয়েছিল।

বাবার কাছে প্রথমে এসেছিলেন তিনি রোগীরূপে। পরে দেখা গেল, রোগ সেরে যাবার পর,—বাবার অবকাশ সময় খুঁজে নিয়ে তিনি এসে দীর্ঘকাল বাবার সঙ্গে নিভৃত আলাপে সময় কাটাচ্ছেন। তাঁদের আলোচ্য বিষয় কি ছিল জানি না। জানবার মত বয়স বা বুদ্ধিও তখন হয় নি। তবে দুই বৃদ্ধের মধ্যে অন্তরঙ্গতা যে গভীরতর হয়েছে এবং অধ্যাত্ম-জীবন সম্বন্ধে কি সব আলোচনা হচ্ছে, তা' শুনতে পেতাম।

ক্রমে শুনলাম, ভদ্রলোকটি অতি নিরীহ, শান্তিপ্রিয় ধর্ম্মচর্চ্চাশীল মানুষ। সর্ব্বদা নিজের ঘরে শাস্ত্রপাঠ ও উপাসনায় সময় কাটান। প্রতিবেশী মুসলমান-কৃষকদের মধ্যে তালরস, রসিকতার ঝোঁকে অনেক অশান্তিকর ব্যাপার প্রায়ই ঘটে, সেজন্য কেউ তাঁকে মধ্যস্থ মান্তে এলে মৃদু হেসে জবাব দেন আমার চেয়ে ওদের বুদ্ধি বেশী। আমার পরামর্শ বা অনুরোধ ওখানে টিক্‌বে না ত'

একদিন ওঁদের গ্রামে অতি তুচ্ছ-কারণ-জাত কি একটা গুরুতর দাঙ্গাহাঙ্গামার খবর শোনা গেল। সেটা নিয়ে ও-দিকের জন-সাধারণের মধ্যে খুব চাঞ্চল্য,বিক্ষোভ দেখা দিল। দিন দুই পরে বৃদ্ধ মিঞা সাহেব তাঁর বার্দ্ধক্য-দৌর্ব্বল্য-জনিত কি একটু অসুখের চিকিৎসার জন্য বাবার কাছে এলেন। যথারীতি ঔষধ দিয়ে, এ-কথা ও-কথার পর বাবা সেই দাঙ্গার প্রসঙ্গ তুলে অনুযোগ করে বললেন, "আপনাদের মত জ্ঞানী, ধর্ম্মভীরু আত্মীয়-মুরুব্বিরা থাক্‌তে, এরা এমন অসংযত, শান্তিভঙ্গকারী, অশিষ্টাচারী কেন হয়? সম্পর্কে ত' এরা আপনাদেরই য় ?"

প্রশান্ত মুখে বৃদ্ধ জবাব দিলেন, "যত বড় ঘনিষ্ঠ য়ই হোক, যারা দুষ্কৃতিকারী, কলহকারী, বিদ্রোহ-কারী, অত্যাচারী, তাদের সঙ্গে কোনও প্রকৃত মুসলমান কোনও সম্পর্ক রাখবে না, এই আমাদের ধর্ম্মনীতি। ধর্ম্মান্ধতার অভিযানে নয়, ধর্ম্মনীতিকে শ্রদ্ধা করি বলে, এই সব দুর্নীতিপরায়ণ তথাকথিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সংস্রব এড়িয়ে চলি।"

"স্কুলের ছাত্র তখন আমি। আহারান্তে বই-পত্র নিয়ে সেখান দিয়ে স্কুল যাচ্ছিলাম। কথাটা শুনে চম্‌কে গেলাম। আশ্চর্য্য হয়ে বৃদ্ধের মুখপানে তাকালাম। বার্দ্ধক্য-ক্লান্ত, শীর্ণ শুষ্ক মুখ, কিন্তু কি প্রশান্ত পবিত্রতার জ্যোতিঃ তাঁর চোখে। কি উজ্জ্বল বুদ্ধিমত্তার দীপ্তি তাঁর প্রশস্ত উন্নত ললাটে!

বুঝলাম, বাবা কেন এই বিশুদ্ধ-চেতা উদার-হৃদয় বৃদ্ধকে এতটা শ্রদ্ধা করেন।

বহুদিন সে-দিনের কথা মনে রইল।

তারপর লেখাপড়া শেখার জন্য বিদেশে গেলাম। বছরের পর বছর কেটে গেল। বৃদ্ধের স্মৃতি মনে ক্ষীণ হয়ে এল।

এমনি ভাবে চার পাচ বছর কেটে গেল। বাবার মৃত্যু হ'ল। তার দু'বছর পরে এই ব্যাপারটা ঘটেছিল।

আমি তখন মেডিক্যাল কলেজের ফোর্থ ইয়ারে পড়ছি। জমি-জমা সংক্রান্ত কি একটা গোলমাল বেঁধে-ছিল। জমীদারীর কর্ম্মচারী আমাদের সাবেক গ্রাম্য কাছারীতে মীমাংসার জন্য আমাকে উপস্থিত হতে বাধ্য করলে। গিয়ে ব্যাপারটার মীমাংসা করে দিলাম।

প্রজারা যখন বিদায় নিলে, তখন বেলা দু'পুর হয়ে গেছে। গ্রীষ্মকাল, রোদ অত্যন্ত তীব্র। কর্ম্মচারীদের স্নানাহার করতে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে একা কাছারীতে বসে রইলাম। উদ্দেশ্য, রোদের ঝাঁজ কম্‌লে বিকালের দিকে বাড়ী ফিরব। সঙ্গে সাইকেল ছিল। দেড় মাইল রাস্তা অতিক্রম করতে বেশী সময় লাগবে না।

গেটের পাশে একটা ঘরে বসেছিলাম। সে-ঘরের খোলা জানালা দিয়ে সদর দুয়ারটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। দুয়ারের সামনে পল্লীর গাছপালার ছায়া-ঢাকা গ্রাম্য পথ।

জানালার কাছে একটা চেয়ারে বসে সময় কাটাবার

জন্যে একখানা বই পড়ছিলাম। কাছারীতে তখন জন-প্রাণী নাই। চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম।

হঠাৎ মৃদু শব্দ শুনে জানালার দিকে চাইলাম। দেখলাম শীর্ণ কঙ্কালসার মূর্ত্তি এক অসমর্থ বেপথুমান্ বৃদ্ধ অতি কষ্টে লাঠিতে ভর দিয়ে টল্‌তে টল্‌তে জানালার দিকে এগিয়ে আসছেন।

স্তিমিত নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে অস্ফুট স্খলিত স্বরে কি বলছেন, বুঝতে পারলাম না। তবে থর-কম্পিত ঠোঁটের দ্রুত স্পন্দন দেখে বুঝলাম, গলা দিয়ে স্বর বেরুবার সামর্থ্য না থাকলেও তিনি আকুল ব্যগ্রতায় আমায় কি যেন বলছেন।

সশঙ্কিত হয়ে উঠলাম। এমন ভয়ঙ্কর রুগ্ন দুর্ব্বল বৃদ্ধ এই রৌদ্রে রাস্তায় বেরিয়েছেন! এখনি যে হার্টফেল, আর্টারী ছেঁড়া, কত কি দুর্ঘটনার আশঙ্কা!

ব্যস্ত ভীত হয়ে ছুটে বাইরে গেলাম। তাঁকে ধরে গেটের পাশে পাচীলের ছায়ায় বসিয়ে বললাম, "কি চান আপনি?"

দম নিয়ে, থর-কম্পিত ওষ্ঠে, অতি ক্ষীণ স্বরে প্রবল আবেগে থেমে থেমে তিনি বললেন "আমি দেখেছি, দেখেছি, আপনার বাবার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তাই বল্‌তে এসেছি!"

পরিচিত কণ্ঠস্বর! কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলাম না ভদ্রলোক কে? না পারবারই কথা। বার্দ্ধক্য ও রোগের অত্যাচারে মুখ-চোখের চেহারা অত্যন্ত শীর্ণ বিকৃত হয়ে গেছে। সমস্ত চামড়া ঝুলে পড়েছে। রক্তহীন পাংশু বিবর্ণ মূর্ত্তি। মনে হয়, বৃদ্ধ এই মাত্র মৃত্যুর রাজ্য থেকে ফিরে এসেছেন!

তবু মনে হোল, চেনা মুখ। সংশয়ভরে বললুম, "আপনি?"

ক্ষীণ কম্পিত স্বরে জবাব এল, "বাবুল মিঞা!"

বাবুল মিঞা! তাই ত বটে। চকিতে মনে পড়ল এই গ্রামেই কোথায় মুসলমানপাড়ায় তাঁর বাড়ী, শুনেছিলাম বটে। কিন্তু কোথায় তা জানতাম না। ইনি তা হলে তিনিই! আমার পিতৃবন্ধু। সম্ভ্রমে অভিবাদন করলুম। ব্যথিত স্বরে বললুম, "এই কাহিল শরীরে এত দূরে এসেছেন এই রৌদ্রে! কেন সাহেব?"

ধুঁকতে ধুঁকতে ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি জবাব দিলেন, "আপনার বাবার সঙ্গে প্রকৃতই আমার দেখা হয়েছিল। আমি মরে গিয়েছিলাম, তিনি এসে ওষুধ দিলেন, তাই আবার বেঁচে উঠেছি। সেই কথা আপনাকে জানাতে এসেছি। বিশ্বাস করুন, তিনি এসেছিলেন। সত্যই এসেছিলেন, আমায় ওষুধ দিয়ে বাচিয়েছেন।"

অবিশ্বাস্য ব্যাপার! দু' বছর আগে বাবার মৃত্যু হয়েছে, ইনি কি তা জানেন না? কিম্বা ইনি রোগ-বিকৃত মস্তিষ্কে অসম্বদ্ধ প্রলাপ বক্‌ছেন।

ক্ষীণ কণ্ঠে প্রবল আবেগ ঢেলে আন্তরিক ব্যাকুলতায় তিনি জোর গলে উঠলেন, "বিশ্বাস করুন, তিনি সত্যই এসেছিলেন। এই কথা আপনাকে জানাবার জন্য এই মুমূর্ষু দেহটা টেনে নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে এতদূরে এসেছি।"

বিশ্বাস করলাম না। কিন্তু অত্যন্ত বিব্রত হলাম। ভয় হতে লাগল—হয় বুঝি বৃদ্ধের হার্টফেল! সঙ্গে ঔষধ-পত্র যন্ত্রপাতি কিছু নাই, অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে বুঝি মানুষটার আকস্মিক মৃত্যু দেখতে হয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ছাত্র। এমন অশাস্ত্রীয় ভাবে মানুষকে মরতে দেওয়া আমার পক্ষে মহা অধর্ম্ম! করি কি?

হঠাৎ দেখি দশ বারো জন বলিষ্ঠ মুসলমান উৎকণ্ঠা-কুল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাইতে চাইতে ছুটে আসছে। দেখেই তারা চেঁচিয়ে উঠল, "ওই যে, ওই যে—"

উদ্ধশ্বাসে ছুটে তারা কাছে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে একজন বাবুল মিঞাকে বল্‌লে, "করছেন কি? চলে এসেছেন! মারা যেতেন যে! আমরা খাবার জন্য উঠে গেছি, আর এই কাণ্ড করেছেন!"

বৃদ্ধ জবাব দিলেন, "মরবার আগে ওঁকে যে সেকথা বলতেই হবে। তোমরা যে কেউ বলতে এলে না।"

সে ব্যক্তি বললে, "তার জন্য দুঃসাহসীর মত নিজে আসবেন তা ভাবতেও পারি নি। আচ্ছা ওঁকে সব বলছি, আপনি কথা কইবেন না, বাড়ী চলুন। আপনার মেয়ে কান্নাকাটি করে মাথা খুঁড়ছে। শীঘ্র চলুন।"

"সব বল্‌বে ?"

"সব বল্‌ব।"

আমার দিকে চেয়ে অতি কষ্টের সঙ্গে থেমে থেমে বৃদ্ধ বললেন, "আমার ক্ষমতা নাই। কথা বল্‌তে বড় কষ্ট হয়। শুনুন এর কাছে সব। এ আমার ভাগিনেয় নিজের চোখে দেখেছে, সব জানে। বিশ্বাস করুন, সত্যই আপনার বাবা এসেছিলেন, আমায় ঔষধ দিয়ে বাঁচিয়ে গেছেন।"

হতবুদ্ধি বিমূঢ় হয়ে বললাম, "আচ্ছা ওঁর কাছে শুনছি। আপনি বাড়ী যান।"

ছাতা খুলে বৃদ্ধকে ধরাধরি করে নিয়ে তারা চলল। সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা গেলাম। হাত নেড়ে বৃদ্ধ ইসারা করে আমাকে ও তাঁর ভাগিনেয়কে ফিরিয়ে দিলেন।

ঘরে এসে বস্‌লাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে বৃদ্ধের ভাগিনেয় বললেন, "আপনারা শিক্ষিত লোক, সেজন্য কথাটা আপনাকে বলতে সঙ্কোচ হয়েছিল। উনি বার বার জেদ করা সত্ত্বেও তাই বল্‌তে আসি নি। এখন বলতে বাধ্য হলাম, অপরাধ নেবেন না। বিশ্বাস করুন, আর না করুন, সত্য কথা শুনুন।

বার্দ্ধক্যজনিত দুর্ব্বলতায় উনি বহুদিন থেকে শয্যাশায়ী। মাসখানেক আগে হোল ডবল-নিউমোনিয়া। দিন কুড়িক আগের কথা বলছি, খুব বাড়াবাড়ি হোল। ডাক্তাররা জবাব দিলেন। ধাত ছেড়ে চব্বিশ ঘণ্টা পড়ে রইলেন। পরদিন বেলা তিনটের সময় সব শেষ হয়ে গেল।

হাঁ মশাই, বিশ্বাস করুন, সত্যই মারা গেলেন। হৃদ্‌স্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস সব বন্ধ। দেহ ঠাণ্ডা, অসাড়।

আড়াই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা মৃতদেহ পড়ে রইল।

সামাজিক প্রথামত অনুষ্ঠান পালনের ব্যবস্থা হচ্ছে। সহসা মৃতদেহ নড়ে উঠল। উনি চোখ মেলে চাইলেন। ডান হাত মুঠো করে ওঁর মেয়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "এই ওষুধ। বেঁটে আমাকে খাইয়ে দাও।"

ব্যাপার দেখে সকলে অভিভূত। আমাদের মধ্যে একজন কৌতূহলী হয়ে, ওঁর মুঠো খুলে জিনিসটা হাতে নিলে। ঘরের মধ্যে তখন সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলো ঘনিয়ে এসেছিল। বাইরে এসে আমরা পরীক্ষা করে দেখলাম, সেগুলো কুচি কুচি শুকনো গাছের শিকড় কিম্বা মাদুরের ভাঙা কাঠি।

আমরা ভাবলুম যে মাদুরে উনি শুয়েআছেন এগুলা বোধ হয় তারই ভাঙ্গা কাঠি। জ্ঞান ফেরার পর উনি হয়ত কোনও রকমে এগুলা মুঠায় তুলে নিয়েছেন। বিকারের ঘোরে এগুলা ঔষধ মনে করেছেন।

রোগ-বিকারের প্রলাপ ধর্ত্তব্য নয় স্থির করে, সেগুলা আমরা বিনা বাক্যে বাইরের দুয়ারের পাশে ফেলে দিলাম।

আশ্চর্য্য ব্যাপার!—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ঘরের ভিতর রোগী ক্ষীণ কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করে উঠলেন, "ওষুধ ওরা ফেলে দিলে? কুড়িয়ে নাও—কুড়িয়ে নাও। শিলে বেঁটে আমায় খাইয়ে দাও।"

আমরা হতবুদ্ধি অপ্রস্তুত। ওঁর মেয়ে প্রাণের ব্যাকুলতায় ছুটে এসে সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে তখনি বেঁটে খাইয়ে দিলে।

আমরা মনে করলাম, টাল সামলালেন, কিন্তু টিকবেন না বেশীক্ষণ। কিন্তু আশ্চর্য্য, উনি ধীরে ধীরে মোহাচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করলেন। আপনার বাবার নাম করে বললেন, 'বহুবার তিনি রোগ-যন্ত্রণা থেকে আমায় মুক্ত করেছেন। এবারও বন্ধুত্বের অনুরাগের আকর্ষণে পরলোক থেকে এসে ঔষধ দিয়ে বাঁচালেন। আর তাঁর কোন যন্ত্রণা নাই, শুধু দুর্ব্বলতা মাত্র আছে।'

তারপর উনি আর কোনও ঔষধ গ্রহণ করলেন না। বিনা চিকিৎসায় রোগ কেটে গেল। তখন থেকে ব্যাকুল হয়ে ক্রমাগত আমাদের অনুরোধ করতে লাগলেন "আপনার পিতার এই অলৌকিক দয়ার কথা আপনাকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জানাবার জন্য। কিন্তু আপনারা শিক্ষিত লোক। আমাদের মূর্খতা, কুসংস্কারে পাছে বিরক্ত হন, সেই ভয়ে আসি নি। আদাব।"

লোকটি চলে গেলেন। আমি হতবুদ্ধি বিমূঢ় হয়ে

বসে রইলাম। বিশ্বাস করতে পারলাম না, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বাবার প্রকৃতিগত বিশেষত্বগুলো সেদিন উজ্জ্বলভাবে মনে পড়তে লাগল। সব চেয়ে তীক্ষ্ণভাবে স্মরণ হোল, তাঁর চিকিৎসক-জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য! রোগী হাতে থাকলে প্রবল উৎকণ্ঠায় তিনি সারারাত ঘুমাতে পারতেন না, আহারেরও সামর্থ্য থাকত না। রোগীর যন্ত্রণা তাঁর সহানুভূতি-প্রবণ চিত্তকে এত অভিভূত করে দিত। আমার আক্ষেপ হয়, এই জন্যই তাঁর জীবনীশক্তি দ্রুত হ্রাস হয়ে গিয়েছিল।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া ডাক্তার চুপ করিলেন। সকলে নির্ব্বাক্।

হাতের দগ্ধাবশিষ্ট চুরুট ফেলিয়া চিন্তামগ্ন অধ্যাপক বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "তুমি বিশ্বাস কর না কর, এ-রকম বহু অলৌকিক ব্যাপার এ পৃথিবীতে বহুবার ঘটেছে, এখনো ঘটছে, এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে। অবশ্য জুয়াচোর, মিথ্যাবাদী, সুবিধাবাদীদের জন্য নয়, প্রকৃত নিষ্কপট ধার্ম্মিক সদাত্মাদের জীবনে এমন বহু ঘটনা বহুবার ঘটে। আমার নিজের জীবনেও এমন অলৌকিক অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ঘটেছে. কিন্তু সে-কথা এখন বলব না। উপস্থিত এ-ব্যাপারটা থিয়সফির দিক থেকে ব্যাখ্যা করলে এই দাঁড়ায়,—হয় ত' জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে ওই ধার্ম্মিক পবিত্রচেতা বৃদ্ধের সূক্ষ্ম জগৎ দর্শন করবার মত দিব্যদৃষ্টি খুলে গিয়েছিল। হয় ত' যে লোকান্তরিত চিকিৎসকের চিকিৎসায় তিনি পূর্ব্বে রোগমুক্ত হয়েছিলেন, তাঁর প্রতি বৃদ্ধের শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের মাত্রা খুব বেশী ছিল। হয় ত' এই রোগযন্ত্রণার সময় ব্যাকুল আগ্রহে তাঁকে স্মরণ করেছিলেন, হয় ত' সেই তীব্র চিন্তার আকর্ষণে চিকিৎসকের আত্মা বা কোনও পরোপকারী সাধুর আত্মা চিকিৎসকের রূপ ধরে এসে রুগ্নের উপকার করে গেলেন। শিকড় বা মাদুরের ভাঙা কাঠিগুলা মাত্র। শক্তিশালী আত্মা ইচ্ছা মাত্রেই যেকোন উপলক্ষ বস্তুতে শক্তিসঞ্চার করতে পারেন। ওই কাঠি বা শিকড়েও সম্ভবতঃ রোগ আরোগ্যের উপযুক্ত শক্তি সঞ্চার করা হয়েছিল। তাই বৃদ্ধ সে যাত্রা মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এলেন।"

ডাক্তারখানার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিল।

পরেশবাবু উঠিয়া সনিঃশ্বাসে বলিলেন, "বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্রও স্বীকার করে, জীবাত্মার প্রবল অনুরাগ-ব্যাকুলতার আকর্ষণে পরমাত্মাও আকৃষ্ট হয়ে কৃষ্ণরূপে আসেন। এও সেই ব্যাকুলতার আকর্ষণ।"
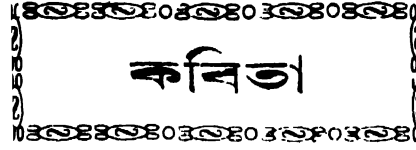
পুরস্কার

শ্রীআশুতোষ সান্যাল, এম-এ,

চিরদিন করিয়াছি—করিতেছি আজো সেবা তোর
হায় বাণী, হংসারূঢ়া কুন্দেন্দুধবলা অয়ি মোর,
শতদল-বিহারিণী, বাক্-বিধায়িনী ! মোর পূজা
দরিদ্রের পূজা বলি' লাগে নি কি ভালো শ্বেতভুজা ?
জানি আমি অকিঞ্চন অকৃতী অক্ষম,—ওগো তবু
জননী বিরূপ হয় সন্তানে কি কোনো দিন কভু ?
কমলারে হতাদরে দ্বার হ'তে দূরে দিয়ে ঠেলি'
কথার কুহক রচি' জীবনের সুধারস ফেলি'
স্বপ্নের ভুবনে বসি' ! তপস্বীর মত সঙ্গীহীন
কৃচ্ছ্র কাব্য-সাধনায় এক প্রান্তে কাটাইনু দিন !

চাহি নাই স্বপ্নে কভু লোভনীয় রাজার সংসদ ;
চাটু-বাক্য ছুরিকায় বিবেকেরে করি নাই বধ
স্বার্থবেদীতলে ! শুধু আপনার প্রাণের সম্পদ
সার ক'রে ছুটিয়াছি—তুচ্ছ করি' সকল বিপদ—
সকল দুর্য্যোগ। মাগো, অতি-বিজ্ঞ বায়সের দল
নিভৃত কুলায়ে মোর তুলিয়া দুঃসহ কোলাহল
ডুবাতে চেয়েছে মোর কণ্ঠস্বর—আনন্দ-কূজন—
করি নাই দৃকপাত ! আজীবন সাধনার ধন
দুঃখ আর দুরদৃষ্ট—তাই নিয়ে পল্লী বাট 'পরে
গাহিয়াছি কত গীতি নিরন্তর প্রফুল্ল অন্তরে।

এ সংসার-সিন্ধু মথি' কেহ লয় অমৃত তরল—
কেহবা কৌস্তুভরত্ন—আমি শুধু তীব্র হলাহল
পাইয়াছি বেদনার ! বুকে চাপি' দারুণ ক্রন্দন
অম্লান বদনে দেবী, ছন্দে তোর ক'রেছি বন্দন—
এই তার পুরস্কার ! এ বিশ্বের মূঢ় কবিকুল
এক হাতে অশ্রু মুছি' আর হাতে যত্নে তুলি' ফুল
মরম-যাতনা সহি' দুঃখ বহি' কেন পূজে তোরে ?
দিবি তুই অমরতা ? মিথ্যা কথা ! সর্ব্বনাশী ওরে,
কে চাহে অমর হ'তে এ ধরায় মরণের পরে—
ব্যথার অনলে পুড়ে অবিশ্রাম এ জনম ভ'রে ?
জীবন-আহুতি চাস্ ?—তাই হোক্—আজি এ জীবন
অর্ঘ্যরূপে পদতলে চিরতরে করিনু অর্পণ !

আশা

শ্রীবিমলাশঙ্কর দাশ

অস্তাচলে তপনের সপ্তবর্ণা রূপরশ্মি লেগে
যে বিচিত্র চিত্রপট ফুটে উঠে পশ্চিমের মেঘে,
তা'রি সম বর্ণময়ী স্বর্ণময়ী মূর্ত্তিখানি ধ'রে
জাগিয়া রয়েছে আশা উদ্যোগীর অশান্ত অন্তরে।
নিবিড় নিশার আগে গোধূলিতে অতর্কিত ক্ষণে
যেমন ক্ষণেক ছলি' ডুবে আলো পশ্চিম গগনে,
তেমনি ছলিতে মন ক্ষণিক রঙীন্ আশা জাগে
ঝলমল রূপ ল'য়ে অন্তহীন নৈরাশ্যের আগে।
আলো-আঁধারের মাঝে ধরণীর বিধিবদ্ধ ধারা
ফোটায় গগন প্রান্তে শান্তভাতি নিত্য ধ্রুবতারা।
আশা-নিরাশার মাঝে তারি সম অচঞ্চল সাজে
অপার আনন্দ থাকে কামনা-বাসনা-হীন কাজে ;
দুরন্ত আশার সনে অফুরন্ত রয়েছে নিরাশা,
যোগীর সাধনা তাই নিষ্কাম নির্লিপ্ত ভালবাসা।

দুঃখময়

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

আরও কতদিন কাটিবে জীবন এমনি অন্ধকারে ?
এমনি নিরাশ, কীর্ত্তিবিহীন,
দৈন্যে, আপদে, দুঃখে বিলীন,
নিতি অপমান, অবজ্ঞা, ঘৃণা, নিতি লাঞ্ছনাভারে ?
নিয়ত হেরিব উল্কা সমান
খসিয়া পুড়িয়া করে খান খান,
গোপন বাসনা, আশা, অভিলাষ তলহীন পারাবারে !
আরও কতদিন কাটিবে জীবন এমনি অন্ধকারে ?

আরও কতদিন সহিতে হইবে ভাগ্যের পরিহাস ?
র'বে কতদিন গোপন কাঁদন,
দ্বারে দ্বারে শুধু ভিক্ষা যাচন,
দ্বারে দ্বারে শুধু ভ্রূকুটি-বদন ঘুচাবে মুখের হাস ?
আরও কতদিন সহিতে হইবে ভাগ্যের পরিহাস ?

আরও কতকাল বিঘ্নের পরে বিঘ্ন রোধিবে পথ ?
একটি সুযোগে মুখে আসে হাসি,
ক্ষণ পরে আসি' বিপদের রাশি
সুযোগ হরিয়া দুর্যোগ আনি' উন্নতি করে রদ।
আরও কতকাল বিঘ্নের পরে বিঘ্ন রোধিবে পথ ?

*

আরও কতকাল সাথে রবে দুখ—বাল্যের সহচর ?
শিশুকাল হতে কাটে স্নেহহীন,
অন্নবিহীন দীন হতে দীন,
পথে পথে মাগি পরের করুণা বেঁচেছি নিরন্তর।
আরও কতকাল সাথে র'বে দুখ বাল্যের সহচর ?

আরও কতকাল সাধিয়া ভজিয়া পিছনে লভিব ঠাঁই ?
কেহ না ডাকিবে আদরে, সোহাগে,
সমাদর করি' গুণ-অনুরাগে
কেহ না বুঝিবে শকতি আমার, দরদী কোথাও নাই।
আরও কতকাল সাধিয়া ভজিয়া পিছনে লভিব ঠাঁই ?

আরও কতকাল অবহেলাভরে সকলে রাখিবে দূরে ?
যাদের করেছি শত উপকার,
নিয়ত করিবে তারা অপকার ?
সহায় হয়েছি যাহার সে-জন দেখিয়া দাঁড়াবে ঘুরে।
আরও কতকাল অবহেলা-ভরে সকলে রাখিবে দূরে ?

*

ওরে ভাগ্যের অভিশাপ আমি, সবার হেলার দাস।
লভি নাই স্নেহ, প্রীতি ও যতন ;
ব্যথার মাঝারে করেছি রচন
আপন হৃদয়ে গোপন ভবন,—তাতে কাটে দিন মাস।
ওরে ভাগ্যের অভিশাপ আমি, সবার হেলার দাস।

ওরে সে ভবনে দুখের আগুনে যে তেজে জাগিছে প্রাণ,
তারি বলে আমি সব অনাদর
সব অপমান দলি ধূলি 'পর,
দলিয়া মথিয়া হব দুর্জ্জয় উদ্দাম-গতি-মান।
ওরে সে ভবনে দুখের আগুনে তেজীয়ান্ মম প্রাণ ॥

হৃদয় নামে যার পরিচয় কোথায় পাবে তারে!

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ধূলির দেহ মিশবে ধূলায়, ডুব্‌বে জীবন-রবি
থাক্‌বে না'ক প্রেমের প্রদীপ জ্বালা।
নদীপারের শ্যামল ছায়া ডাক্‌ছে তোমায় কবি!
কোন্ আশাতে গাঁথছ' কথার মালা?

মিথ্যা ধরা আয়ুর-পাতা রাখ্‌বে ক'দিন তুমি,
হিসেব নিকেশ এবার করো শেষ;
পারের খেয়া মৃদুল বায়ে দুলছে তট চুমি'
নূতন করে পরো তোমার বেশ।
মাণিক হ'য়েও মেকির পাশে তোমার হ'লো ঠাঁই
সত্যিকারের ক'জন কবি আছে!
ঝুঁটোর যুগে সাচ্চা হ'য়ে মূল্য যাহার নাই
অশ্রু কেন ঝরায় মরুর মাঝে!
সামনে যারা তোমায় বলে মস্তদরের লোক
আড়াল হ'লেই ঠাট্টা করেই তারা,
তোমার যশ সইতে নারে তাদের কুটিল চোখ
মানুষ নেই এমনি মানুষ ছাড়া।

ভাগ্য-জাঁতার পেষণ পেয়েও সইলে হাসিমুখে
কাব্য-সুরা পান ক'রেছ সদা।
মুখের কথাই মূল্য পেলে দুঃখ এবং সুখে
অর্ঘ দিতে কেউ কহে না কথা।
হৃদয় নামে যার পরিচয় কোথায় পাবে তারে!
কি ফল হবে তর্কবাগীশ হ'য়ে,
কবি! তোমার গুটিয়ে খাতা চলো নদীর ধারে
বৃথাই সময় গেল আঘাত সয়ে'।
বিদায় বেলা প্রণাম ক'র তোমার ঠাকুর-ঘরে
রক্ত-জবা রক্ত হউক তব।
সেই জবাতে অর্ঘ্য দিয়ে মায়ের চরণ 'পরে
এপার হ'তে খেয়ায় ওঠো নব।

বিচিত্র-রূপিণী

শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী

চাঁদিনী রাতিতে অলস আবেশে সকলে ঘুমায় যবে,
দেখেছি তোমারে ক্ষমা-সুন্দরী আলোকের উৎসবে।
স্নেহকর তব বুলায়েছ ধীরে আমার মাথার 'পরে,
পরতে পরতে অন্তর মম খুলিয়াছ ধীরে ধীরে।
হিমগিরি-শিরে তুমি তাপসিনী বন্দিনী ঊষা সম
মেঘ-কন্যার চঞ্চল লীলা দেখালে পরাণে মম।
তোমার মাঝারে তাই রচিয়াছি আমার অমরাবতী
অমৃতলোক জানি না কেমন জানিলেও নাই ক্ষতি।

তরুলতিকায়, পল্লবদলে, শিশির ভিজানো ঘাসে
দেখেছি তোমারে নব নব রূপে অপূর্ব্ব উল্লাসে।
ফাল্গুন দিনে, যৌবন গানে, খেলেছি প্রেমের খেলা;
করুণ শ্রাবণে ভাসিয়েছি বুক গাঁথিয়া বিরহ-মালা।
বুকভরা রূপ, শস্যশ্যামলা, মৃদু তটিনীরে দিলে;
পূজা গন্ধের সুবাসিত ধূপ জ্বালিলে শেফালি তলে।
আম্র-মুকুল ঘন-বন-ছায় শীত-সমীরণে কাঁপে,
দিগন্তপারে, মন্থর মেঘে, চাতকী কাহারে ডাকে!

সে ত' তুমি দেবী, কল্যাণময়ী, অপরূপ শান্তিতে
ভরেছ আমার হৃদয়-কমল সীমাহীন রেখাপাতে।

চন্দ্র

শ্রীমমতা ঘোষ

হিন্দু-পুরাণ পুরুষ বলে—মান্‌ল না তা য়ুনান দেশে,
শ্বেতাম্বরা রমণী রূপ দেখ্‌ল তারা নির্নিমেষে।
জ্যোতিষেরি যাদুর ছোঁয়ায় ঘুচুক তোমার পুরুষ-বেশ,
নারী ব'লে জান্‌ল তোমায় এ-ধার ও-ধার দেশ-বিদেশ
রবির সাথে বুঝি তোমার আছে মধুর আত্মীয়তা,
সাতাশ তারার মণ্ডলেতে নয় তো সপ্তপদীর কথা,—
দ্বাদশপদী গমন চলে ঘুরে ঘুরে—বিরতি নাই,
চল্‌ছ তুমি চপল পায়ে,—মন বসে না একটি ঠাঁই।
দু'চোখ ভ'রে দেখি তোমার পূর্ণ রূপের পূর্ণিমা যে,
যখন থাকো তোমরা দু'জন দুই পারে ওই আকাশমাঝে।
রাশির পরে রাশি ঘুরে পক্ষ যখন পূর্ণ হয়,
তখন আসে প্রেমের লাগি' আত্মদানের সুসময়।
আর তোমারে যায় না দেখা—একেবারে নিঃশেষে
আপ্‌নাকে দাও, সত্তা তোমার তপন-ছায়ায় তখন মেশে।
আত্মত্যাগী এমন প্রণয়, এমন আত্মবিসর্জ্জন,
সকল ছেড়ে সফল হওয়া নারীর খাঁটি এ-লক্ষণ।
দ্বিধা যে তাই যাচ্ছে দূরে; হচ্ছে মনে এ-বিশ্বাস,
ঠিক রমণী,—নিখিলেরি হৃৎ-কমলে তোমার বাস।
কল্পনা যে দান তোমারি, অনুভূতির সকল প্রকাশ
তোমার কোঠায় পড়ে সবই আবেগ, স্নেহ, প্রেমোচ্ছ্বাস।

কান্ত রবির যোগে ঘটাও জোয়ার-ভাঁটা জাহ্নবীতে,
আরোগ্য রোগ ঘটে তোমার প্রভাবে এই ধরিত্রীতে
রমণী নও চন্দ্র তুমি বিজ্ঞানে এই কয়,
পুরুষ তুমি, দেব্‌তা তুমি, তাও তো দেখি নয়।
প্রেয়সী রূপ নয়ক' তোমার, নও যে প্রিয়তম,
ভাবি এ-রূপ কাহার তবে এমন অনুপম?
সুদূর চন্দ্রলোকের মাঝে পাহাড় আছে না কি,
বিজ্ঞানীরা দেখ্‌ল সে-সব পাঠিয়ে "আঁখি-পাখী"।
এই যে অমল চোখ-জুড়ানো মন-ভুলানো আলো,
এ নাকি চাঁদ ধার করেছে—বুঝ্‌ছি নাক' ভালো
ভাস্করেরি রশ্মিমালা চাঁদের উপর ঝ'রে
এমন মোহন রূপ দিয়েছে এমন মিষ্টি ক'রে।
চাঁদের গোরা গায়ের 'পরে অসিত ছায়া যত
এতকাল যে লাগত চোখে কলঙ্কেরি মত,—
রায় দিয়েছেন বিদ্বানেরা দূরবীণে চোখ রেখে
কলঙ্ক নয়,—কূপের মত লাগছে দূরে থেকে।
চন্দ্রে অনেক অগ্নিগিরি ছিল না কি আগে
সে-সব থেকে উথ্‌লে পড়া ভস্মরাশি জাগে।
বৈজ্ঞানিকের চোখেতে চাঁদ শুধুই ভস্মস্তূপ,
সুষমা তার কিছুই নাহি—নাই নিজস্ব রূপ।

ভাবছি এত তর্ক কেন মিছে—
পুরাণ জ্যোতিষ বিজ্ঞানেতে মিলে
যার যা খুসী দেখুক তেমন রূপে,
সূক্ষ্ম বিচার করুক তিলে তিলে।

মনে ভাবি সুন্দরেরি কাছে
যুক্তি-তর্ক কেমন ক'রে চলে?
বুদ্ধি হেথায় ঘুম-পাড়ানো থাকে—
অনুভবই সকল কথা বলে।
এই যে অগাধ জ্যোছ্‌না-পারাবারে
ডুব দিয়ে মন মূর্ত্তি নতুন লয়,

স্বপন-কাজল চোখে পরায় চাঁদ—
তাই তো সবই লাগছে মায়াময়।
প্রিয়কে সে করছে প্রিয়তম—
মন যে মদির লাবণ্য পান ক'রে,
তর্কে এ-তো নয়কো বোঝাবার—
দেখব কেবল চিত্ত-নয়ন ভ'রে।

মায়ের চিঠি

শঙ্খের কথা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দশ বছরের শিশু গিয়াছি বিদেশে,
পেলাম মায়ের চিঠি আশীর্ব্বাদভরা,
কি আনন্দ, কি উল্লাস, বেড়ায়েছি হেসে,
কত কথা—স্নেহ, ভয়, সাবধান করা।
কত চিঠি আসিয়াছে আসা ত সহজ,
কি যে তাহা আনিয়াছে বুঝিবে না কেউ,
চিঠি নয় সে যে রক্ষা-বিজয়-কবচ,
কাগজের নৌকা-বুকে অমৃতের ঢেউ।
প্রতি চিঠি তাহে শুধু কামনা মঙ্গল,
পুণ্যময়ী জননীর আকাঙ্ক্ষার ভিড়,
স্বর্গ আর মরতের সংযোগ-শৃঙ্খল—
সুদীর্ঘ কামনা তাঁর অর্দ্ধ শতাব্দীর।
আজও শুষ্ক পত্রপুটে মায়ের প্রসাদ,
পাই আমি পাই তাতে অমৃত-আস্বাদ।

বাস লবণাক্ত জলে—দুঃখ ছিল ঢের,
সঙ্গী দীর্ঘ দিন মৎস্য, শুক্তি, শম্বুকের।
করিতে হয়েছে ক্ষুদ্র জীবন-সংগ্রাম,
লভিয়াছি ক্ষুদ্র দুঃখ আনন্দ আরাম।
মহাসাগরের ছবি জাগিত এ বুকে,
গম্ভীর কল্লোল যেন ভাষা দিত মুকে,
হেরিয়াছি সবিতার অস্ত ও উদয়,
জীবনের ক্ষণ হতো কি উৎসবময়।
মৃত্যু এলো সঙ্গে লয়ে যেন দিব্য প্রাণ,
তুচ্ছ শঙ্খ মোর হলো মন্দিরেতে স্থান।
জীবনেতে অবজ্ঞাত—দীন হীন ঠিক
মরণ করিয়া দিল সহসা ঋত্বিক্।
দেবতারে ডাকি—কই তাহাদেরও কথা,
জীবনে অখ্যাত যাঁরা মরণে দেবতা।

সপ্তদশীর শশী

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস, এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

আমার সপ্তদশীর শশী!
যেন ভাদ্র মাসের ভরা-নদীর দুকূল গেছে খসি'।

স্বাতী তারার বিন্দুবারি,
শুক্তাবুকে সে সঞ্চারি'
মুক্তা হ'য়ে উঠ্‌ল ফুটে লাবণ্যে উচ্ছ্বসি!
আমার সপ্তদশীর শশী।
তার আনন্দ-উদ্বেলতা,
জান্‌ল কি বাসন্তী লতা?

মন-ভুবনে নৃত্য-রতা স্বপ্নেরই উর্ব্বশী!
আমার সপ্তদশীর শশী।
অধীরতায় পূর্ণ চাঁদের মন হ'ল চঞ্চল;
সপ্তদশীর পড়্‌ল খসি' বক্ষেরই অঞ্চল।
এ মোর বুকের রক্তরেখা অশ্রুজলের মসী।
আমার সপ্তদশীর শশী।

গান

মিশ্র—কাহারবা

কথা—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত সুর ও স্বরলিপি—শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

কণ্ঠে তোমার দিয়েছিলাম
নিবেদনের মালা
সন্ধ্যাকাশে হ'ল যখন
তারার প্রদীপ জ্বালা

তখন তোমার দেবালয়ে
ছিলাম রূপে মগন হ'য়ে,
চন্দনেরি সুবাস ছিল
বেদীর 'পরে ঢালা।

স্বপ্ন ছিল নয়নে মোর
কণ্ঠে নীরব গীতি,
অশ্রুজলে ভিজিয়েছিলাম
দুঃখভরা স্মৃতি।

গন্ধ জাগার শিহরণে
ফুল ফুটেছে মনোবনে,
দখিণ বায়ে জানালো সে
শেষ মিনতির পালা।

—স্বরলিপি—

সা -মা মা গা	মা -া -া -মা	জ্ঞা -মা জ্ঞা রা	রা -সা -া -া
ক ন্ ঠে তো	মা ঃ ০ র্	দি ০ য়ে ছি	লা ০ ০ ম্
সরা -া রা -রা	রগা -া মা পা	রা -া -সা -া	-া -া -া -া
নি০ ০ বে দ	নে০ ০ র ০	মা ০ লা ০	০ ০ ০ ০
সা রা মা রমা	মপা -া -া -া	পা ধা ণা র্রা	র্সা -া -া -া
স ন্ ধ্যা কা০	শে ০ ০ ০	হ ল ০ য	খ ০ ০ ন্
র্সনা -র্রর্সা র্সা -পা	পা -পা মপা -ণদা	পা -া -া -া	-জ্ঞমা -পমা -জ্ঞা -া
তা০ রা০ র্ প্র	দী প্ জ্বা০ ০০	লা ০ ০ ০	০০ ০০ ০০

"নিবেদনের মালা"

পা মজ্ঞা -জ্ঞা মা	পা -া -া -া	পা না না ধনা	না -র্সা -া -া
ত খ০ ন্ তো	মা ০ ০ র্	দে ০ বা ল০	য়ে ০ ০ ০
র্রা র্রা -র্রা র্রর্সা	র্সা -ণা -া -া	ধা পা মা মধা	ধা -পা -া -া
ছি লা ম্ রূ০	পে ০ ০ ০	ম গ ন হ০	য়ে ০ ০ ০

সা পা মা ধপা | মা -জ্ঞা -া -া | সরা সরা -রা ণ্‌া | ণ্‌া -পা -া -া |
চ ন্‌ দ নে॰ | রি ॰ ॰ ॰ | সু॰ বা॰ স্‌ ছি | ল ॰ ॰ ॰ |

প্‌া রা -রা রা | রা -গা মা ণা | ণা -পা -া -া | -া -া -া -া ||
বে দী র্‌ প | রে ॰ ঢা ॰ | লা ॰ ॰ ॰ | ॰ ॰ ॰ ॰ ||

"নিবেদনের মালা……'

| সা -রা মা পা | ধা -া -া -া | পা মা -রা সা | সধ্‌া -সা -া -া |
| স্ব প্‌ ন ছি | ল ॰ ॰ ॰ | ন য় ॰ নে | মো ॰ ॰ র্‌ |

ধ্‌া -সা সা সা | ধ্‌া -সা সরা -মজ্ঞা | রা -া -া -া | -া -া -া -া |
ক ন্‌ ঠে নী | র ব গী॰ ॰॰ | তি ॰ ॰ ॰ | ॰ ॰ ॰ ॰ |

সা -রা জ্ঞা পা | জ্ঞা -পা -া -া | পা ধা -র্সা -ধা | র্সা -া -া -া |
অ ॰ শ্রু জ | লে ॰ ॰ ॰ | ভি জি য়ে ছি | লা ॰ ॰ ম্‌ |

র্রা -র্সা ধা পা | জ্ঞা -রা সা -জ্ঞা | রা -রা -রা -রা | -গা -া -া -া |
দুঃ ॰ খ ভ | রা ॰ স্মৃ - | তি ॰ ॰ ॰ | ॰ ॰ ॰ ॰ |

গা -মা গা রা | গা -সা রা -ধ্‌া | সা -া -া -া | -া -া -া -া |
ক ন্‌ ঠে নী | র ব গী ॰ | তি ॰ ॰ ॰ | ॰ ॰ ॰ ॰ |

সা -পা মা পা | মা -জ্ঞা -মা -া | পা -না র্সা র্জ্ঞা | র্রা -া -া -া |
গ ন্‌ ধ জা | গা ॰ ॰ র্‌ | শি ॰ হ্‌ র | ণে ॰ ॰ ॰ |

র্রা -র্রা র্সা র্গর্রা | র্সা -ণা -া -া | ধা -পা মা মধা | ধা -পা -া -া |
ফু ল্‌ ফু টে॰ | ছে ॰ ॰ ॰ | ম ॰ নো ব॰ | নে ॰ ॰ ॰ |

সা -পা -পা মপা | না -জ্ঞা -া -া | সরা সরা -রা সণ্‌া | সা -া -া -া |
দ খি ন্‌ বা॰ | য়ে ॰ ॰ ॰ | জা॰ না॰ ॰ লো॰ | সে ॰ ॰ ॰ |

সা -রা জ্ঞা পা | ধা -পা ধা -র্সা | র্সা -ধা -া -া | -া -া -া -া ||
শে ষ্‌ মি ন | তি র্‌ পা ॰ | লা ॰ ॰ ॰ | ॰ ॰ ॰ ॰ ||

"নিবেদনের মালা……'

ভারতীয় চিত্রকলার অন্তরঙ্গ তত্ত্ব

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

ইতিহাসে যে ক'টি সভ্যতা মাথা তুলেছিল এবং যে অবসরে নিজেদের বিভূতির আলঙ্কারিক ঐশ্বর্য্য প্রকট করেছিল, তাদের ভিতর মিশর, পারস্য, চীন, গ্রীস সুষ্ঠু-ভাবে বিশ্লিষ্ট ও অনুধ্যাত হয়েছে, সন্দেহ নেই। এদের সভ্যতার জটিলতা থাকলেও সে সব জটিলতাভেদ দুঃসাধ্য হয় নি। কিন্তু ভারতবর্ষের ভাব ও চিন্তা অধ্যয়নে বার বার বৈকল্য দেখা গেছে আধুনিক পণ্ডিতগণের। একথা তাঁরা স্বীকার করতে ইতস্ততঃ করেন নি। বিখ্যাত ঐতিহাসিক

হরগৌরী

(রসপ্রধান—মধুর রস)

E. M. Forester তাঁর ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় উপন্যাসে বলে-ছেন: "India is a riddle"—"Nothing in India is identifiable" এসব কথা পরিহাসের ব্যাপার নয়, বাস্তবিকই ইউরোপ ভারতবর্ষের দৃষ্টিভঙ্গী বুঝতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করতে না পারলে ভারতীয় দর্শন ও কলা-বিচার ব্যর্থ হতে বাধ্য। স্মরণাতীত কাল হ'তে এই দুর্ব্বোধ্যতা ভারতীয় শীলতার উপর অবগুণ্ঠন নিক্ষেপ করেছে।

উপনিষদের যুগে বলা হয়েছে—এ সংসারের মূল উর্দ্ধে এবং শাখা নিম্নদিকে—

"ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ" কঠ ২৷৩৷১

পরবর্ত্তী মহাভারতের যুগেও এই দৃষ্টিভঙ্গী অটুট ছিল; ভগবদ্গীতাতে এই উক্তির প্রতিধ্বনি আছে।

এ দৃষ্টিভঙ্গী ইউরোপের ঠিক বিপরীত। কাজেই কোন অশ্বত্থবৃক্ষকে উর্দ্ধমূল ও নিম্নমুখী শাখাযুক্ত দেখলে তা যেমন অদ্ভুত ও রহস্তময় মনে হবে, ভারতীয় চিন্তাও সে রকম মনে হবে। গ্রীক রোমক চিন্তাও এ কারণে ভারতের চোখে একান্ত সাময়িক ও বহিরঙ্গ মনে হয়েছে। এর ঐতিহাসিক প্রমাণও দুর্লভ নয়। কথিত আছে, কয়েকজন ভারতীয় সাধুর সহিত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের (Socrates) দেখা হয় *। ভারতীয় সাধুরা প্রশ্ন করে— "দর্শনের লক্ষ্য কি?"

সক্রেটিস—"মানবের নানা ব্যাপার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা।" একথা শুনে একজন ভারতীয় উচ্চ হাস্যে প্রশ্ন করে, "মানুষ দিব্য ব্যাপার উপলব্ধি না করে কি করে পার্থিব ব্যাপার বুঝবে?

এর মানে হল ঐহিক বিধি-বিধান তুরীয় অবস্থারই প্রকাশ, উপর দিক হ'তে বোঝা পড়া না হলে নীচু দিক হ'তে এর অর্থ উপলব্ধি হবে না। ভারতবর্ষ ইহলোকের দাবীকে তুচ্ছ করে নি, কিন্তু এ দাবী পূরণ সম্ভবও মনে করে নি আংশিক দৃষ্টির ভিতর দিয়ে। ধর্ম্ম ও মোক্ষ যেমন, তেমনি কাম ও অর্থ সাধনার ব্যাপার ছিল। না হ'লে চৌষট্টি কলা এবং তাদের অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যে ভারত-বর্ষে চিরবসন্ত কখনও বিরাজ করত না।

উপনিষদের আত্মবাদ বর্জ্জন করে বৌদ্ধযুগ গ্রহণ করে অনাত্মবাদ। তাতে ভারতের চোখ ভাল করেই দুনিয়ার দিকে ফিরে। বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতরকার প্রচ্ছন্ন বৈরাগ্যবাদ ক্রমশঃ মহাযানবাদের উষ্ণ স্পর্শে তান্ত্রিক ভোগবাদের

---

* Euselbius Praep-Evang. XI. 3. Vide G.T. Garrat The Legacy of India P. 8.

শক্তিতত্ত্বে দীক্ষিত হয়। তাতে করে সমগ্র ভারতে একটি প্রবল সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির ঝটিকা প্রবাহিত হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্য তান্ত্রিকতার তুরীয় ও ঐহিক রসসঙ্গমে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি সম্ভব ক'রে সমগ্র এশিয়াকে উদ্বুদ্ধ করে। তান্ত্রিক রসদৃষ্টির ভিতর এই ভাবের সঙ্গমকে সঙ্গীতরত্নাকর অতি চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

> তে জীবা নাত্মনো ভিন্না ভিন্নং বা নাত্মনো জগৎ।
> শক্ত্যা স্বজন্তিযোঽসৌ সুবর্ণং কুণ্ডলাদিবৎ। প্রথম স্বরাধ্যায়।

এজন্য ভারতীয় কলা-পর্য্যায়কে ইউরোপীয় swrface art এর সঙ্গে তুলনা করা চলে না। এর পরীক্ষা বা রস-সম্ভোগও পাশ্চাত্ত্য পথে বিফল হয়।

মিশরীয় তত্ত্ব প্রাচীন যুগে জীবন-মৃত্যুর সমস্যাপূরণে অগ্রসর হয়। মৃত্যুর কৃষ্ণযবনিকা ভেদ করার সাধনা মিশরের মৃত্যুগ্রন্থে (Boot of the dat) পাওয়া যাবে। মিশর পিরামিড রচনা করেছে বাইরে অমরত্বের প্রতীক রূপে। পিরামিডের ভিতরকার হুবহু কামূর্ত্তিগুলি রচনা করেছে মৃত আত্মাকে আবার আশ্রয় দিতে এবং সযত্নে মৃতদেহও রক্ষা করেছে মৃত ব্যক্তির আত্মার সাহায্যে জীবন প্রতিষ্ঠা করতে। মৃত্যুকে উত্তীর্ণ করে বৃহত্তর সত্তালাভ নয়, মৃত্যুর অজানা রাজ্যের জন্যও এ জীবনের আয়োজনকে পুঞ্জীভূত ক'রে মিশর শান্তি পায়। এ অবস্থায় জীবনের হিল্লোল মিশরীয় আর্টে সুস্পষ্ট হয় নি। ঐহিক আয়োজনের ভিতর একমাত্র মাতৃত্ব কল্পনা করেই জীবনের বিরাট তোরণে অর্ঘ্য দেয়। আইসিস্ ও হোরাস এই অনুভূতির ফল।

গ্রীকদের ভিতর মিশরের এই সাময়িকতা সংক্রামিত হয়। গ্রীক শিল্প বস্তু বা জড়স্তরকে অতিক্রম করে জীবনের কোন নিবিড় সমস্যার সম্মুখীন হতে উৎসাহিত হয় নি। শুধু দেহের নানা ভঙ্গী ও মাংসপেশীর নানা অবস্থা দ্যোতিত করে গ্রীক-চিত্ত আত্মবিনোদন করে। ইতালীর সমালোচক Della scla বলেন যে, মনোরাজ্যেরও কোন বার্ত্তাকে গ্রীক-চিত্ত চিত্র বা মূর্ত্তিতে রূপান্বিত করতে যায় নি—। "The power of showing in the countenance a certain state of mind was absent from Greek art…"ফলে গ্রীক-চিত্তের প্রেরণা বহিরাবরণ ছিন্ন করে মানসিক স্তরে যেতেও উৎসাহিত হয় নি। অর্দ্ধপথে আবদ্ধ হয়ে আত্মপ্রতারণা করেছে মাত্র।

গ্রীষ্টীয় জগৎ দেবতার মৃত্যু ঘোষণা করেছে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে এবং গ্রীষ্টীয় গির্জ্জা মানুষের কবরকে ক্রোড় দান

মোগল চিত্র
(দরবারের দৃশ্য বাস্তবপন্থী চিত্র।...)

করে' মৃত্যুচিহ্ন বহন করা মুখ্য কর্ত্তব্য মনে করেছে। এই মৃত্যু-সম্পর্ক গ্রীষ্টীয় বিধিতে সংক্রামিত করেছে দুরপনেয় ছায়া। উপরোক্ত ইতালীয় লেখকের উক্তিতে একথা প্রমাণিত হবে। তিনি বলেন : And so Christianity which had the death of its God as the culminating point of its conception has connected with it, the death of man--repugnant to other religions of antiquity."

এসব সভ্যতা এজন্যই জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে। এজন্য সাময়িক উচ্ছ্বাসের শিরেই জয়মাল্য দান করেছে—সনাতন বা শাশ্বত কোন সত্যের উপর নয়। আধুনিক ইউরোপ এই তিনটি সভ্যতা হ'তে জ্ঞানের সঞ্চয় করেছে বলে ইউরোপীয় আর্টও হয়েছে সাময়িক এবং বিধিও হয়েছে অহরহঃ পরিবর্ত্তনের বা আধুনিকতার উপর নিহিত। গভীর ভিত্তির অভাবে গ্রীক ও রোমক সভ্যতা অন্তর্হিত হয়। ঐহিকতার সকল গভীর দিক বর্জ্জন করে শুধু বাইরের স্তরটিকে মুখ্য করা ভুল। বাইরের আঘাতে সে স্তর জীর্ণ হলে আর নূতন কোন ভিত্তির উপর নির্ভর করে বাঁচা যায় না। কাজেই এসব সভ্যতার প্রশ্নগুলি এই মৃত্যুকে আর অতিক্রম করতে পারে নি। উপস্থিতকে চরম মনে করে গ্রীস আত্মবঞ্চনা করেছে, যেমন মিশরও মৃত্যুভেদী মন্ত্র সংগ্রহ করতে শুধু বিপুল স্থূলতার ও স্থিতিমূলক সম্ভারেরই শরণাপন্ন হয়েছিল।

ভারতবর্ষ এই বিরাটকে একদিক্ দিয়ে দেখে নি। তা যেমন 'মহৎ',হ'তে 'মহৎ' তেমনি 'অণু' হতে অণু'বলে' শুধু ভারতেই কল্পিত হয়েছে। এই অন্তর-দৃষ্টি হচ্ছে "Sense of the far". এই দূরত্ব দেখবার জন্য এ দেশে দেবদেবীর তৃতীয় নয়ন কল্পিত হয়েছে—গ্রীক দেবদেবী বা অন্য কোন সভ্যতার দেবতাদের এরকমের চোখ কল্পিত হয়নি। ঈশ উপনিষদ অতি সংক্ষেপে বলেছে :—

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে
দে-তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।

বস্তুতঃ ভারতবর্ষ বলেছে সত্য আবরণে ঢাকা—বাইরের স্তরে বা আচ্ছাদনে তাকে পাওয়া যায় না। এই আবরণ দূর করা প্রয়োজন—

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে। ঈশ। ১৫।

যে দেশে এই তত্ত্ব ক্রমশঃ বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকযুগে আরও গভীরতর ভাবপ্রসঙ্গে উপস্থিত হয়েছে সে দেশের সাহিত্য ও কলা অনুধাবন ইউরোপীয় প্রণালীতে সম্ভব নয়। গ্রীক-তত্ত্ব আত্মবঞ্চনার উপর নিহিত, তাই গ্রীক শিল্পও এই আত্মবঞ্চনায় সিদ্ধহস্ত। যেন কলাকৃত্যের শেষ কথাই বঞ্চনা—কোন গভীর সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটন নয়।

ভারতীয় চিত্রকলার প্রাথমিক যুগকে অজন্তাযুগ বল্‌লেও চলে। এর আগেকার প্রাগৈতিহাসিক রচনা সমগ্র পৃথিবীতেই প্রায় এক ধারায় রচিত। তখন জীবনের কোন কঠিন সমস্যা কোথাও উপস্থিত হয়নি। স্পেনের Dordogne গুহার চিত্র বা মধ্যভারতের Kaimur শৈলের রচনা এই স্তরের। মাহেঞ্জোডারো ও হারাপ্পা যুগের মূর্ত্তি প্রভৃতিতে মনে হয় বহু নূতন প্রশ্ন জমাট হয়েছিল সে-যুগে এবং ভোগধর্ম্মের কাঞ্চনজ্জ্বায় নূতন উষারাগ অপূর্ব্ব সফলতার রেখাপাত করেছিল।

অজন্তার বৌদ্ধতত্ত্ব এক বিরাট সৃষ্টি উদ্‌ঘাটিত করে আমাদের সচকিত করে দেয়। এতে গ্রীসের আড়ষ্ট ও কঠিন আলো ও ছায়ার বঞ্চনা নেই, অথচ দূরত্ব দেখবার প্রচুর কৌশল আছে। অজন্তার আদর্শ ষষ্ঠ শতাব্দীর শ্রীগৃহে, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর বাঘগুহায়, দক্ষিণ ইউলিকে, সহস্রবুদ্ধগুহায় ও হরউইজিতে প্রচুর আলোকপাত করেছে। ইউরোপীয় মনোবীক্ষণে এর বিচার হয়েছে। এই বিরাট সংগ্রহ যে কোন পাশ্চাত্য galleryকে হতশ্রী করে দেয়। যদিও এর সময় খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতক হতে সুরু হয়েছে বলে নিরূপিত হয়েছে, তবুও এর মুখ্য দান হচ্ছে গুপ্ত আমলের। গুপ্ত আমলের সৌন্দর্য্য-কল্পনা কাব্য-ক্ষেত্রে আমরা কালিদাসে দেখতে পাই। অথচ কালিদাসের নাটকের সহিত এই রচনার সমান ধর্ম্ম দেখবার এপর্য্যন্ত কোন চেষ্টাই হয়নি। যারা পশ্চিম হ'তে ছবি দেখতে গেছে—কালিদাসের কাব্যের সহিত তাদের কোন পরিচয়ই নেই। ফলে, ইউরোপের বহু পরবর্ত্তী classic যুগের রচনার সহিত তুলনা করবার উৎসাহ এসব সমালোচকদের হয়েছে। কেউ কেউ ব্যঙ্গ করেছে যে, এ রচনা মোটেই স্বাভাবিক বা বাস্তব হয়নি। বাস্তবতাও যে অনেক সময় গভীর দিক হ'তে অবাস্তবতায় মণ্ডিত হয়, একথা সকলে ভুলে যায়।

কয়েকটি ভাবুকের বা দর্শকের উক্তি সংগ্রহ করলে দেখা যাবে যে, এর ভিতর বর্ণ ও রেখালীলার অসীমতা সুস্পষ্ট হয়েছে। সীমার মধ্যে কাদা ঘাঁটা নয়, অসীমের

ভিতর আনাগোণা করা হয়েছিল এর লক্ষ্য। এই অসীমকে ঐহিকতার অনবরুদ্ধ প্রপঞ্চে লক্ষ্য করতে হয় এবং অজস্র প্রাচুর্য্যের ভিতর আহরণ করতে হয়। এই প্রাচুর্য্যবোধ প্রাচীন কোন সভ্যতারই ছিল না। অত সামান্য গণ্ডীর ভিতরও এই অসীমকে নিয়ে লীলা শুধু ভারতীয় সভ্যতার পক্ষেই সম্ভব। Griffith বলেন, নকসা-রচনার বৈচিত্র্য দেখে তাক্ লেগে যায়—"Their variety is infinite, repetition is rare". এই অসীম ও

পলেনোরুয়ার চিত্র

(নারীদেহের লিলায়িত বৈচিত্র্য অজন্তার আদর্শেই চিত্ত আকর্ষণ করে। রস উদ্‌ঘাটনই এই কলার লক্ষ্য)

অক্লান্ত রূপরচনার নীহারিকা - সত্যের উপরকার আচ্ছাদন বর্জ্জন করেই ভারতবর্ষ পেয়েছে। কালিদাস মেঘদূতে এই অফুরন্ত, অবিচ্ছিন্ন পুলকোজ্জ্বল জগৎকে মেঘপুঞ্জের লীলায়িত প্রাচুর্য্যের ভিতর বিরহী যক্ষের চক্ষুগোচর করে। বিরহের চোখ দূরকে নিকট করে—অসম্ভবকে সম্ভব করে এবং এই হিল্লোল মথিত চিত্তবৃত্তিকে সোণার হরিণের অশেষ আলেয়ায় মুগ্ধ করে। অজন্তার রূপরচনার কোন অধ্যায়েরই বা সীমা আছে? এর রঙের বাহাদুরীর শেষ কোথা? অজন্তায় লাল, হ'লদে, নীল,সবুজ, কাল ও সাদা রঙ এবং এদের মিশ্রণজাত অভিনব বর্ণবিজ্ঞান ব্যবহৃত হয়েছে। রামধনুও যে এর নিকট হতপ্রভ হয়ে যায়। অজন্তার শিল্পী তারকাখচিত নৈশ আকাশের বাণীকে যেমন গ্রহণ করেছে, তেমনি দিবসের শিরে অর্পিত রামধনুর উষ্ণীষ হ'তেও সে প্রেরণা গ্রহণ করেছে। অজন্তায় বুদ্ধমূর্ত্তির বহুমুখী বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করবার বিষয়। সম্প্রতি Yazdani অজন্তার রচনা প্রসঙ্গে কতকটা অবান্তর ভাবে একটি উক্তি করেছেন। যেমন বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের দিব্যমূর্ত্তির প্রাচুর্য্য দৃষ্টিতে শিল্পীর হাতের তুলিকা কম্পিত বা স্খলিত হয়নি—তেমনি ইহলৌকিক সৌন্দর্য্যের চরম প্রসূনরূপী নারীমূর্ত্তি রচনার ঐশ্বর্য্য, বৈচিত্র্য ও বহুমুখী রূপসম্পর্ক প্রসঙ্গেও সে এক মুহূর্ত্তের জন্য শিথিল বা অপটু হয়নি। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের এরূপ আশ্লেষ জগতের কোন শিল্পকলায় পাওয়া যাবে না। Yazdani বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি না করেও আদমসুমারী গণৎকারদের মত বলেছেন :—"The artists of Ajanta have painted woman in a variety of graceful poses standing, kneeling, sitting and lying" এরকমের বিচিত্র দেহ-ভঙ্গী অন্য কোন শিল্পে পাওয়া যাবে না। শুধু একটি অবস্থারই—যেমন দাঁড়ান যে কতরকম রূপলালিত্য সম্ভব, তা ভারতীয় চিত্রকলাতেই শুধু উপলব্ধি হয়। অজন্তার সমসাময়িক লঙ্কাদ্বীপের পলেনোরুয়ার একখানি চিত্র হ'তে এই বহুমুখী রূপব্যঞ্জনার কৃতিত্ব সুস্পষ্ট হবে।

এত বিচিত্র বহুত্ববোধে ভারতবর্ষ অদ্বিতীয়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে এর প্রচুর প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়। এদেশের বাণী ছিল "ভূমৈব সুখম্", ক্ষুদ্র, শীর্ণ, সাময়িক তুচ্ছতাকে ব্যাপক বহুমুখী সত্যকে উদ্‌ঘাটন এবং সত্যের সঙ্গম ছিল এদেশের লোভনীয়।

ইউরোপীয় সমালোচকেরা বলেছে, প্রাচ্য অঞ্চলে রেখাই ছিল চিত্রকলার মুখ্য উপাদান (medium)। একথা চীন ও চীনপ্রভাবিত পারস্য সম্বন্ধে কতকটা বলা যেতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বলা যায় না। অজন্তায় রেখার কালোয়াতী আছে প্রচুর—বর্ণ-বৈচিত্র্যও এর ভিতর অসাধারণ আছে দেখা যায়। তাছাড়া Lawrence Binyon স্বীকার করেছে, এর ভিতরে "reticent light and shade"ও আছে। তা হলে এসব পণ্ডিতরা অজন্তার হস্তরেখা বিচারে যে গুরুতর ভুল করে বসেছে। এ যে কল্পনা বা একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়, তা বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরের এই উক্তি হতে সুস্পষ্ট হবে :—

"রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্য্যা বর্ত্তনাঞ্চ বিচক্ষণা।
স্ত্রিয়ো ভূষণমিচ্ছন্তি বর্ণাঢ্যং ইতরে জনাঃ।"

কাজে Percy Bradu প্রমুখ সাহেবদের এরকমের বহিরঙ্গ দিক হ'তে কলাসমালোচনা একেবারে ব্যর্থ হয়ে পড়ে। হিন্দু কলালীলায় সকল বিধিরই সামঞ্জস্যের চেষ্টা হয়েছে। বর্ণ, বর্ত্তনা (depth), আলঙ্কারিক ঐশ্বর্য্য ও বর্ণ-বৈচিত্র্য যথাক্রমে আচার্য্য, বিচক্ষণ, নারী ও ইতরজনের উপভোগ্য হয়েছে, কাজেই বহিরঙ্গ দিক দিয়ে ভারতীয় কলালোচনা ব্যর্থ। এই কলালালিত্যকে উর্দ্ধমূল অশ্বত্থের মত উর্দ্ধ হতে দেখতে হবে।

তা ছাড়া, আরও দেখতে হবে রসবিন্যাসের বিপুল বিস্তৃতি। নারীর কেশ-প্রসাধন, অঙ্গহিল্লোল, নৃত্যরস, মা ও মেয়ের বাৎসল্য-রস, ভগবান তথাগতের নিকট প্রকট ভক্তিরস প্রভৃতি নানারসের অবতারণায় অজন্তা ভরপুর। ভারতবর্ষের কলাকৌলীন্য প্রমাণিত হয় রসের অবতারণায়। এই রসকে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর বলা হয়েছে। ভাব ও রসকে আলঙ্কারিকগণ কলাব্যঞ্জনার মুখ্য বস্তুরূপ মনে করেন। নাট্যকলায় এই সব রসের অবতারণা যেমন অবশ্যম্ভাবী, তেমনি অন্যান্য কলায়ও ইহা অপরিহার্য্য। এই রস অন্তরঙ্গ বস্তু—ভারতীয় কলাবিচারে রস উদ্‌ঘাটনই প্রধান—আর সব গৌণ ব্যাপার। চৈনিক চিত্রকলার রেখাসম্পুটের সূক্ষ্মতা ও বৈচিত্র্য দেখে শিল্পীর স্থান নির্দ্দেশ হয়। 'ভাব' বা রসের ব্যঞ্জনা চৈনিক চিত্রা-বলীর মুখ্য ব্যাপার নয়। পঞ্চাশ শতাব্দীর Hsiet—Ho সৌন্দর্য্যসৃষ্টির যে-সব উপকরণ নির্দ্দেশ করেছে, সেসব হচ্ছে (১) আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্য (২) তুলিকা প্রয়োগ (৩) সাদৃশ্য (৪) বর্ণের যথাযথ প্রয়োগ (৫) পরিমাপ (৬) বিস্তার।* এতে ভাবসৃষ্টির কোন প্রসঙ্গ নেই।

ভারতীয় চিত্রকলার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা মুঘল ও রাজপুত চিত্রকলার সম্মুখীন হই। ইউরোপীয় এবং এদেশীয় প্রায় সকলেই এদু'টি সমসাময়িক চিত্রপদ্ধতিকে মূলতঃ একশ্রেণীর বলেছে। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার বলেছেন, রাজপুতদের ভিতরকার ছোট ছোট রাজাগুলি সম্রাটদের অনুকরণে চিত্রকর রেখে মুঘল-রীতির অনুকরণে চিত্র তৈরীর ফরমাস করত। এরা দিল্লীশিল্পীদের ন্যায় উচ্চস্তরের কারিগর মোটেই ছিল না। অপরদিকে দিল্লীর দরবারে চিত্রশিল্পীদের ভিতর মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু শিল্পী কম ছিল না। কিন্তু দিল্লীর দপ্তরে পারস্য কলার কদর ছিল। এই পারস্য চিত্রকলা আবার চৈনিক চিত্রকর দ্বারা একসময় প্রভাবিত হয়—এদের "নক্কাশ—ই—চীন" বলা হ'ত। পারস্যের ধনীরা মুসলমানের চিত্র আঁকা নিষিদ্ধ বলে চীনেদের দ্বারা ছবি আঁকাত।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে তৈমুরের বংশধরের আনুকূল্যে পারস্য চিত্রাকলার একটা বিরাট সমুত্থান হয়। সুলতান হোসেনের আমলে বিখ্যাত শিল্পী বিহজাদ কাজ করেন। "আইনি আকবরিতে" আবুল ফজল যে কয়েকজন পারস্য চিত্রকরের নাম উল্লেখ করেছেন, তার ভিতর আবদুলসমদ, মির সৈয়দালীর নাম শীর্ষস্থানীয়। হিন্দুদের ভিতর বাসোয়ান, দশব ও কেশুদাসের কৃতিত্ব ছিল অসামান্য। এরা নিজামীর কাব্যগ্রন্থ চিত্রান্বিত করে। Waquiat-L-Debasi গ্রন্থ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয়। সাহা-জাহানের আমলে (১৬২৭—৫৮) এ চিত্রকলার মধ্যাহ্ন এযুগের চিত্রমন, অনুপছত্র প্রভৃতি হিন্দু শিল্পী বাদসাহের মনোরঞ্জন করেছে।

এসব চিত্রের বিচার হয়েছে কিরূপে? অবশ্য বাদসাহের হুকুম বা করতালি সেকালে চরম ডিপ্লোমা স্থানীয় ছিল। কিন্তু ভারতীয় চিত্রকলার বিচারে দেখতে হবে সৌন্দর্য্যের মাপ-কাঠি কোন হিসেবে ব্যবহৃত হত।

---

* Kokka No 338

অবশ্য ইউরোপীয়ানদের মামুলী বুলি আছে, কলা যাচাইর ক্ষেত্র—কোনটি 'realistic' বা হুবহু এবং কোনটি তা নয়। কিন্তু রূপকৌলীন্য বিচারে এ প্রশ্ন যে অবান্তর তা আধুনিক বিচারকগণ বারবার বলছেন। একে Roger Fry "Cheapest Mersionist art" বলেছেন। এ নিয়ে কোন শিল্পের দর কষতে যাওয়া বিড়ম্বনা। সেকেলে পাশ্চাত্ত্য সমঝদারগণ মোগল-চিত্রকলা বিচার করতে গিয়ে গোলমালে পড়ে গেছে। Perey Brodu একবার বলেছেন—এ চিত্রকলার "realism is the key note" -আবার দেখছেন এতে আছে অদ্ভুত জিনিষ, "unusual flowers" "rare animals" বা অনেকটা কাল্পনিক ব্যাপার। জাপানী চিত্রে পাখীকে নানা কাল্পনিক রঙ দেওয়া হয়। সৌন্দর্য্যের বিচারে ইউরোপীয় প্রাচীন মাপকাঠি একান্ত অপ্রচুর।

এই 'unusual' ও 'rare' রচনার প্রেরণা পারস্য গঙ্গোত্রী হ'তে এসেছে। সেখানে এক দিকে আরব্য উপন্যাসসুলভ ইসলামীয় রহস্যবাদ ছিল আকর্ষণের ব্যাপার—অন্যদিকে ঐহিকতার ঐক্য ছিল একটা প্রধান উপাদান। ইসলামীয় ঐক্য সব কিছু এক ভূমিতে দাঁড় করাতে উৎসাহ পায়। এই এক ভূমি মুঘল আমলে, বাদসাহের দরবারই দান করেছে। কাজেই মুঘল দরবার, তাঁবু, শিকার প্রভৃতির ছবি এই চিত্রকলার প্রধান সম্পদ্। এ সব জিনিষের বহিরঙ্গ ঘটাই মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। কোন আলোচক এ চিত্রকলাকে secular বলেছে—লেখক ভুলে গেছে, ইসলামীয় একেশ্বরবাদ ও মূর্ত্তিবিরোধবাদ চিত্রকলাকে ঐহিক স্তরে নামাতে বাধ্য করেছে। তা' বলে ঐহিকস্তরও সামান্য নয়—তা' বাইরের কোন ঘটাকে শেষ ব্যাপার সব সময় মনে করে না।

ভারতীয় শিল্পে যে বহুমুখী রসসম্পর্ক বর্ত্তমান, তা' অতি যৎসামান্যই মুঘল চিত্রে ফলিত হয়েছে। কাজেই চিত্রের বহিরঙ্গ-বিচার অবশ্যম্ভাবী হয়েছে।

রাজপুত চিত্রকলাকে বহিরঙ্গ দিক দিয়ে বিচার করতে যাওয়া বৃথা। অন্তরের দিক্ থেকে হিন্দু শিল্প এ ক্ষেত্রে নব নব রস উদ্ঘাটনে ব্যাকুল হয়েছে এবং রসই যে সর্ব্ববিধ কলার মুখ্য প্রতিপাদ্য ব্যাপার তা' আবার প্রমাণিত করেছে। রাধা-কৃষ্ণলীলার অফুরন্ত গমকে এসব চিত্রাদি পরিপূর্ণ। বৈষ্ণব কাব্যের মত নানা রসের উদ্ঘাটনে রাজপুত চিত্রকলা উন্মনা হয়ে যায়। দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত কোন আলোচকই ভারতের এই কলার এই গূঢ় রসসমাবেশের বিষয় উপলব্ধিই করে নি।

কাজেই ভারতীয় চিত্রকলার এই নব্য অধ্যায়ে দেখা যাচ্ছে, আবার শিল্পীরা আরব্য মরুর শুষ্কতা ও পারস্য কল্পনার তন্দ্রাবেশ ছেড়ে ভারতীয় চিত্তাকাশে ষড়্‌ঋতু-সঙ্গমের বৈচিত্র্য দেখতে উৎসাহিত হয়েছে। ৮০ যেমন অফুরন্ত জীবনলীলার ভিতর দিয়ে যেমন জন্ম জন্মান্তরের ধারাকে এক করে' ভারত আশ্বস্ত হয়েছিল, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের ভিতর দিয়ে মানব-চিত্তের সকল ঐশ্বর্য্য ও আয়তনকে উদ্ঘাটিত করে' নিখিল রসামৃতমূর্ত্তিকে রসোৎসের প্রতিমাস্থানীয় করে' তুলেছে। এরূপ একটি অফুরন্ত ও অসীম অবলম্বন না হ'লে বিরাটকে উপস্থাপিত করা চলে না। এ যুগে রাজপুত-চিত্রকলার ভিতর ভারতবর্ষ আবার কাব্য ও চিত্রের ভিতর রসধারার সঞ্চারই যে মুখ্য ব্যাপার, তা' প্রতিপাদন করেছে। এ জন্য ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাস এই অন্তরঙ্গ দিক্ দিয়েই অধ্যয়ন করতে হবে।

সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

দুই

রাঘবেন্দ্র রায়বর্ম্মার রংমহল।

লক্ষ্ণৌয়ের সরযূ বাঈজীর পায়ের ঘুঙুর নিস্তব্ধ হয়ে গেছে বহুকাল আগে। বিচিত্র পেশোয়াজের স্বচ্ছ আবরণের তলায় নগ্নপ্রায় দেহবল্লী নেশা জাগাত চোখে; হাজার ডাল-ওয়ালা ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় ছুরির আগার মতো ঘন তরল চোখ ঝক্ ঝক্ করে উঠত, সুর্ম্মার রেখাঙ্কিত, সুরায় বিহ্বল। পুরুষের শিরায় শিরায় টগবগ করে ফুটত রক্ত, ঝাড়-লণ্ঠনের আলো যেন আগুন হয়ে গলে পড়ত। বাঘের মতো মানুষ-গুলো যেন আদিম আর আরণ্য কামনায় উদ্দাম হয়ে উঠত, সুরাপাত্রের আচম্‌কা আঘাত লেগে ঝন্ ঝন্ করে নিভে যেত ঝাড়-লণ্ঠন। তারপর কালো অন্ধকার।

তারপরেই কালো অন্ধকার। সুরা পাত্রের শেষ আঘাত ঝাড়-লণ্ঠনে কবে এসে লেগেছিল কেউ জানে না। কিন্তু সেই থেকে আর আলো জ্বলে না রংমহলে। ছিন্নবিচ্ছিন্ন কাশ্মীরী কার্পেট একপাশে রাশি রাশি ধুলোর মধ্যে জড়ো হয়ে রয়েছে, কতগুলো তারছেঁড়া যন্ত্র বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে এককোণে। দেওয়ালের গায়ে যে-সব ছবি লালসার ইন্ধন দিত, তারা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে, আর ছাদের ওপর কঠিন তুলির আঁচড় কাটছে ফাটা ছাদ দিয়ে চুঁইয়ে নামা বর্ষার জল।

রংমহলে রং নেই, তবু কুমার বিশ্বনাথ এখনো এর মায়া কাটাতে পারেন নি। ভাঙা দেউড়ী মুমূর্ষুর মতো ঝুঁকে রয়েছে, সাত মহলা বাড়ী সাপের রাজত্ব। কিন্তু আজো এই রংমহলেই কুমার বিশ্বনাথের আসর বসে। হুইস্কির পয়সা না জুটলে ধেনো মদ আসে, সরযূ বাইজীরা দুর্লভ হলেও ওঁরাওঁ মেয়েরা অপ্রাপ্য নয় এখনো। অবশ্য ওঁরাওঁ মেয়েরা রূপবতী নয়, কিন্তু তাদের যৌবন আছে। হিংস্র, তীক্ষ্ণ যৌবন। আর অন্ধকারে সেই যৌবনটাই সত্য হয়ে ওঠে, রূপের প্রশ্ন তখন অবান্তর।

এই রংমহলে যখন কুমার বিশ্বনাথের ঘুম ভাঙল, তখন বেলা অনেকখানি উঠে এসেছে। জানলার ভাঙা সার্সীর ভেতর দিয়ে অনেকখানি ঝলমলে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর চোখে-মুখে। রোদের আলোয় চোখ জ্বালা করছে। অসীম বিরক্তি নিয়ে পাশ ফিরলেন বিশ্বনাথ।

সমস্ত দেহে জড়তা। স্নায়ুগুলো এখনো শিথিল হয়ে আছে, ইচ্ছার দাসত্ব তারা মানতে চায় না। শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত উন্মত্ত জাগরণ এখনো প্রভাব ছড়িয়ে রয়েছে। অলস কণ্ঠে ডাকলেন, মতিয়া।

গড়গড়া নিয়ে মতিয়া ঘরে এল। সকাল থেকে সে তিনবার তামাক সেজেছে এবং তিনবারই সে তামাক নিজেই টেনে শেষ করেছে। এর জন্য তাকে অবশ্য দোষ দিয়ে লাভ নেই। ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রভুকে তামাক দিয়ে আসতে হবে এবং এমন দৈবজ্ঞও সে নয় যে, ঠিক কোন মুহূর্ত্তটিতে প্রভু তাঁর সুখনিদ্রা থেকে জেগে উঠবেন সেটা আন্দাজ করে নিতে পারে।

গড়গড়ায় টান দিয়ে বিশ্বনাথ বললেন, মেলায় লোকজন আসছে রে?

—আসছে হুজুর। এবার বোধ হয় জাঁকিয়ে বসবে। সোনাদীঘির পাড়ে অনেকগুলি গাড়ি তো জড়ো হচ্ছে সকাল থেকেই।

—জাঁকিয়ে বসবে! তিন বছর থেকে তো ফাঁকাই যাচ্ছে এক রকম।

—সব ওই রূপাপুরের কামারদের জন্যে হুজুর। বড্ড হাঙ্গামা করে ওরা। ওদের ভয়েই মেলায় মানুষ আসতে চায় না। সে-বার আট দশটা দোকান লুঠ করে নিলে। পুলিশকে পরোয়া করে না, জেল-ফেরত দাগী সব।

—রূপাপুরের কামারেরা!—বিশ্বনাথের চোখ হঠাৎ ঝকঝক করে উঠল। দেবীকোট রাজবংশের রক্ত ফেনিয়ে উঠল শরীরে।

—ওরা কিন্তু দিব্যি তাজা আছে এখনো। ঝিমিয়ে মরে যায়নি। ওদের পোষ মানাতে পারলে মস্ত একটা কাজ হয়, না-রে মতিয়া?

মতিয়া চুপ করে রইল খানিকক্ষণ।

—না হুজুর, বুনো বাঘের জাত ওরা। পোষ মানে না।

—পোষ মানে না?—বিশ্বনাথ সোজা হয়ে উঠে বসলেন: কিন্তু কুমারদয়ের রায়বর্ম্মারা তো চিরকালই বুনো বাঘকে পোষ মানিয়ে এসেছে। আমার ঠাকুর্দা কুকুর পুষতেন না, শিকলে বাঘ বেঁধে নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন। এবার কি মেলায় আসবে ওরা?

—কে জানে হুজুর। ওদের মতলবের ঠিক-ঠিকানা নেই কিছু।

বিশ্বনাথ সামনে দেওয়ালটার দিকে তাকালেন। ছাতের পাশে পাশে যেখানে রঙ-বেরঙের নক্সার বাহার ছিল একদিন, আজ সেখানে সবুজ শ্যাওলা জমে উঠছে। রং-মহালে কত দিন যে রঙ পড়েনি। আর রঙ দিয়েই বা কী হবে। এত বড় বাড়িটার সমস্ত ভিত্তিমূলই জীর্ণ হয়ে গেছে, আঙুলের চাপ লাগলে ঝুরঝুর্ করে নেমে আসে চুণ-সুড়কি, এক একটা দমকা হাওয়ায় ঝুপ ঝাপ করে কার্ণিশ থেকে ইট খসে পড়ে। আর বেশিদিন এর পরমায়ু নয়। সমস্ত জমিদারীর দশাই তো এই রকম। লাঠিয়াল যারা ছিল, তারা ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে অস্থি আর প্লীহাসার হয়ে দাঁড়িয়েছে, এই রংমহালের নড়বড়ে বড় বড় থামগুলোর মতোই। গড়গড়ার নীল ধোঁয়াটা বঙ্কিম রেখায় ঘরময় খেলা করতে লাগল। এক জায়গায় টিকটিক করে উঠল টিকটিকি। বাইরে কোথায় এই সাতসকালেই সাপে ব্যাঙ ধরছে, একটা কাতর গোঙানি থেকে থেকে ছড়িয়ে পড়ছিল আকাশে।

ম্যানেজার ব্যোমকেশ লঘু-চরণে এসে দেখা দিলে। কাপ্তান চেহারার লোক, পাকা চুলে লম্বা সিঁথি কাটা। চেহারার কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, শুধু যেন কিসের একটা আচম্কা ঘা লেগে নাকের অনেকখানি মুখের ভেতর সেঁধিয়ে বসেছে। তাই তার কথাবার্ত্তায় চন্দ্রবিন্দুর প্রকোপ একটু বেশী।

ব্যোমকেশ বললে, লালাজী চিঠি পাঠিয়েছেন।

মুখ থেকে গড়গড়ার নল সরিয়ে বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, কী লিখেছেন।

—টাকা দেবেন। তবে—

—থামলে কেন?

—একটা সর্ত্ত আছে। অনেক টাকা তো বাকী পড়ে গেছে, সুদে আসলে কিছুই দেওয়া হয়নি। তাই বলেছেন সোনাদীঘির মেলাটা পাঁচ বছরের জন্যে ওঁকে লিখে দিলে তবেই টাকা দিতে পারেন, নইলে নয়।

—সোনাদীঘির মেলা!

বিশ্বনাথ চমকে উঠলেন এক মুহূর্ত্তের জন্যে। দু'বছর থেকে দেশে দেখা দিয়েছে অজন্মা। বছরে একটি মাত্র ফসল হয় এই অঞ্চলে, পর পর দু'বছর ধরে সেই ফসলের অর্দ্ধেকও ঘরে তুলতে পারেনি লোকে। বৃষ্টি হয় না। জলকর কিছু কিছু আছে। কিন্তু মহানন্দায় এবার তেমন করে বান ডাকেনি বলে তার অবস্থাও খারাপ। যে কৃষ্ণ-কালীর বিল পাঁচ হাজার টাকায় ডাকে উঠত, সে বিলের দর এবার পাঁচশো টাকার বেশী ওঠেনি।

ব্যোমকেশ চিন্তিত মুখে বললে, সোনাদীঘির মেলা গেলে সবই গেল। সারা বছর ধরে ওরই ওপরে যা কিছু ভরসা। লালাজী তো সবই জানেন। অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে কী, বুঝতে পারছেন? সাপের মতো পাক কষছেন লালাজী, তারপর সবশুদ্ধ এক গ্রাসে সাবাড় করে দেবার মতলব।

বিশ্বনাথ বললেন, হুঁ। ঘরের সমস্ত বাতাসটা যেন ভারী হয়ে উঠেছে পাষাণের মতো। রংমহলের ফাটল ধরা রন্ধ্রপথে অশথের বীজ কবে পড়েছিল কে জানে, দেওয়াল বেয়ে জালের মতো শিকড় নামছে অসংখ্য। বাইরে সাপের মুখে ব্যাঙটা তখনো কাঁদছে অন্তিম আক্ষেপে। লালাজী সত্যি সত্যিই সাপের মতো পাঁচ কষিয়ে চলেছেন।

তীব্র—একটা অতিতীব্র শারীরিক আর মানসিক অস্বস্তি যেন বিশ্বনাথকে পীড়ন করতে লাগল।

মতিয়া!

হুজুর,—মতিয়া সামনে এসে দাঁড়াল।

ভাখ তো সাপে ব্যাঙ্ ধরেছে কোথায়। মেরে আসবি সাপটাকে।

একটা লাঠি নিয়ে মতিয়া বেরিয়ে গেল।

ব্যোমকেশ বললে, অথচ, টাকাটা যে করেই হোক দরকার। ডিগ্রী কালই বেরিয়ে যাবে, আজই সহরে টাকা না পাঠালে লাটে উঠে যাবে সমস্ত। লালাজী লিখেছেন অনুমতি পেলে তিনিই হুজুরের কাছে এসে দেখা করবেন।

ব্যোমকেশের শেষ কথাটায় শ্লেষের সুর বাজল। আশ্চর্য্য বিনয় লালা হরিশরণের। তাঁর পূর্ব্বপুরুষ কুমার-দহের অন্নেই মানুষ, একথা লালাজী কখনই ভুলে যান না। বিশ্বনাথকে দেখলে তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন, ভক্তিতে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ তরল হয়ে ওঠে। অর্থ, সম্মান আর প্রতিপত্তি যত বাড়ছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে চলেছে লালাজীর বিষয়, দেবীকোট রাজবংশের প্রতি তাঁর অতুলনীয় রাজভক্তি। অথচ এই ভক্তির অন্তরালে নিঃশব্দে একখানা ছুরি যে দিনের পর দিন শানিয়ে উঠছে, ব্যোমকেশের বিষয় মন তা অবচেতন ভাবেই অনুভব করতে পারে। করযোড়ে যখন হুজুরের সামনে লালাজী তাঁর বক্তব্য সবিনয়ে নিবেদন করেন, তখন তাঁর দু'চোখে মাঝে মাঝে ঝলক দিয়ে ওঠা আগুনের আলো ব্যোমকেশের দৃষ্টি এড়ায় না।

বিশ্বনাথ একথা বোঝেন কিনা কে জানে, কিন্তু বুঝতে রাজী নন তিনি। লালা হরিশরণের ঐশ্বর্য্য যত অভ্রভেদীই হয়ে উঠুক না কেন, রাঘবেন্দ্র রায়বর্ম্মার ঘোড়াকে চাল দেখাত রামসুন্দর লালা; সেদিনকার সেই সামাজিক মর্য্যাদার এতটুকুও তারতম্য এ পর্য্যন্ত ঘটেনি। বানরকে রাজার পোষাক পরালেই সে রাজা হয় না। অথচ রাজা প্রতাপসিংহের ক্ষত্রিয়রক্ত এখনো দেবীকোট রাজবংশের শিরাপথে বয়ে চলেছে, রাজ্য না থাকলেও তারা চিরদিনই রাজা।

ব্যোমকেশ বললে, তা হলে লালাজীকে আসবার জন্যে খবর দেব কি?

কী ভেবে বিশ্বনাথ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, না, আমিই যাব। ঘোড়া ঠিক করতে বলুন।

ব্যোমকেশ সবিস্ময়ে বললে, আপনি কোথায় যাবেন।

—নবীপুর।

ব্যোমকেশ কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না। কুমার বিশ্বনাথ নিজে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছেন লালা হরিশরণের সঙ্গে দেখা করতে। আভিজাত্যের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয় এবং একমাত্র সঞ্চয়—সেও কি শেষে এই ভাবেই পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল বণিকের।

ব্যোমকেশ ইতস্ততঃ করে বললেন, যদি যেতেই হয় আপনি আর কষ্ট করবেন কেন? আমরাই তো আছি, আর খবর দিলে লালাজী নিজেই—

না। কথাটাকে সংক্ষেপে শেষ করে দিয়েই বিশ্বনাথ বললেন, ঘোড়া ঠিক করতে বলুন। কালো ঘোড়াটা, যেটা দুলে চলে।

ব্যোমকেশ সনিশ্বাসে বললে, আজ্ঞে ঠিক করছি।

* * * *

রূপাপুরের কামারেরা একসঙ্গে হাতুড়ি ঠুকে চলেছিল। ঠক্ ঠক্ ঠনাঠন। গনগনে আগুনে টকটকে রাঙা ইস্পাতগুলো লোহার আঘাতে মুহূর্ত্তে রূপান্তর নিচ্ছে। গড়ে উঠেছে দা, বঁটি, কাস্তে, কোদাল। যাদের হাত ভালো তারা ছুরি, কাঁচি, তৈরী করে। সেগুলো বিক্রী হয় বাজারে। তা ছাড়া আরও অনেক কিছুই তারা তৈরী করে, কিন্তু সেগুলো সূর্য্যের আলোয় মুখ দেখায় না। সিঁদ কাঠি, কাস্তা, দু'হাত লম্বা হাসুয়া। তাদের কাজ রাত্রির কালো অন্ধকারে।

রূপাপুরের কামারেরা একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর জীব। বাংলা দেশের বাসিন্দা বটে, কিন্তু পুরোপুরি বাঙালি নয়। কথাবার্ত্তায় এবং আচার-ব্যবহারে স্পষ্ট বিহারের ছাপ। ওদের চেহারা থেকে পণ্ডিতেরা অনার্য্য-রক্তের সন্ধান খুঁজে বার করতে পারেন। ওরা সেই সব মন্ত্রহীন ব্রাত্যের দল—যাদের তলোয়ারের মুখে আর্য্য-সংস্কৃতির যাত্রারথ বার বার থমকে থেমে দাঁড়িয়েছে। তারপর কালক্রমে ভারতবর্ষের মহামানবের মহাসাগর ওদের গ্রাস করে নিয়েছে। বিশাল হিন্দুসমাজের একটা খণ্ডাংশ ওরা। তবু ওদের জীবনযাত্রায় অনার্য্য-সংস্কার আজ অবধি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রয়েছে, ওদের পেশল সুস্থ শরীরে আসুরিক বলশালিতা।

ঠক্-ঠক্-ঠনাঠন্। একসঙ্গে কুড়িটা হাতুড়ির ঐক্যতান বাজছে। হাজার হাজার কাটা ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসা মৃত্যু-নিশ্বাসের মতো শব্দ করছে হাপরগুলো। উনুনে ধাঁ ধাঁ করে জলছে কাঠ-কয়লার আগুন, ওদের আয়নার মতো উজ্জ্বল চোখগুলো থেকে আগুনের দীপ্তি পিছলে

পড়ছে। কব্জী থেকে কাঁধ পর্য্যন্ত পেশীগুলোয় দোলা লাগছে—যেন দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠছে শক্তির তরঙ্গ।

সোনাদীঘির মেলা লাগবে কাল থেকে। এ তল্লাটে এত বড় মেলা আর নেই। এক মাস ধরে মেলায় কেনা-বেচা চলে, তেসরা ভাদ্র থেকে আশ্বিন পর্য্যন্ত। নবাবী আমলে কোন এক ফকির এসে দরগা বানিয়ে বসেছিলেন, দীঘি কাটিয়েছিলেন। আজও সেই সোনা ফকিরের স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে এই সোনাদীঘির মেলায়। একটা মাস তাঁর ভাঙা দরগায় সিন্নী পড়ে, সহস্র চূর্ণ সমাধির ওপর মিট মিট করে চেরাগ জ্বলে। সিদ্ধপুরুষ ছিলেন সোনা ফকির। তাঁর মন্ত্রবলে গাছপালা মাটি থেকে উঠে উধাও হ'য়ে যেত, আর সেই গাছে বসে তিনি দেশদেশান্তর পরিভ্রমণ ক'রে বেড়াতেন। তাঁর আদেশ পেলে পশুপাখী মানুষের ভাষায় কথা কইতে পারত; তাঁর অনুগ্রহে প্রতিবছর পনেরোই ভাদ্র দরগার দীঘির জল দুধ হয়ে যেত। আর সেই দুধ একবার পান করলে যা কিছু জটিল রোগ নিঃশেষে ভাল হয়ে যেত। সারাজীবনে আধিব্যাধির বিড়ম্বনা বহন করতে হত না।

তাঁরি স্মৃতি উপলক্ষে সোনাদীঘির পাড়ে মহাসমারোহে মেলা বসে এখনো। দরগার দীঘির জল এখন আর অবশ্য দুধ হয় না, অবিশ্বাসী যুগের আওতায় তার গুণ নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু লোকের বিশ্বাস শিথিল হয় নি। নানা দূর দেশ থেকে জটিল ব্যাধিগ্রস্ত অসংখ্য লোক এখনো চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে সোনাদীঘির জল খেতে আসে। ঘড়ায় করে নিয়ে যায়। আর সেই উপলক্ষে প্রায় দু' মাইল জায়গা জুড়ে মেলা বসে। সহর থেকে দোকানদার আসে, যাত্রা আসে, গণিকা আসে, বদমায়েসের দল আসে। গিল্টির গয়না থেকে গোরু, ঘোড়া অবধি বিক্রী আসে। পঁচিশ বছর আগে হাতী অবধি আসত, মেলার একটা অংশ এখনও হাতী-হাটা নামে পরিচিত।

রূপাপুরের কামারদের হাতুড়ী বেজে চলেছে একটানা দ্রুতছন্দে। আর সময় নেই। আজ সন্ধ্যার মধ্যেই কাজ শেষ করে ওরা বেরিয়ে পড়বে মেলার উদ্দেশ্যে। সেখানে একমাস ধরে কাজ চলবে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। তিরিশখানা চালা নিয়ে দোকান খুলে বসবে ওরা। বিক্রী করবে লোহার যন্ত্রপাতি, কাঁসার ফুটো কলসী আর ভাঙা বাটি ঝালাই করে দেবে। চাষের বলদ আর একার ঘোড়ার পায়ে লোহার নাল পরিয়ে দেবে, গোরুর গাড়ির চাকা বাঁধিয়ে দেবে পাতলা ইস্পাতের পাত দিয়ে। আর একটা মাস ধরে পরিতৃপ্ত করবে বৈচিত্র্যহীন বৎসরের তৃষ্ণার্ত্ত সম্ভোগের স্পৃহা। যাত্রা আসবে, খ্যামটা আসবে, পানের দোকান আসবে, জুয়া আসবে; আর মদের দোকানের দু'পাশে বসবে "খোপরা পট্টি"—সুলভপ্রাপ্য নারী-মাংসের সদাব্রত।

আশে-পাশের সমস্ত অঞ্চল থেকে তিনদিন যাবত লোক-যাত্রা সুরু হয়েছে মেলার অভিমুখে। আধিব্যাধির শান্তিকামী তীর্থযাত্রীর দল চলেছে, আর ওদের পেছনে অনুসরণ করে চলেছে একদল লোক—তাদের দৃষ্টি গলার হার আর কানের মাকড়ীর দিকে স্থিরনিবদ্ধ। কত রকমের লোকই যে চলেছে তার সীমাসংখ্যা নেই। গোরুর-গাড়ীর সামনে কালো শাড়ীর পর্দ্দা ঝুলিয়ে চলেছে মুসলমান পুরমহিলা, পর্দ্দার ফাঁকে ফাঁকে বোরখা ঢাকা এক একটা ভৌতিক মূর্ত্তির মতো চোখে পড়ছে। খঞ্জনী বাজিয়ে চলেছে একদল বৈষ্ণব, তাদের পেছনে চলেছে পাঁচগুণ বৈষ্ণবী; কপালে রসকলি, চোখের দৃষ্টি তির্য্যক্ আর চটুল। কানে সোনার আংটা, সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধানো, বাসন্তী রঙের কাপড় আর পাগড়ী-পরা একদল হিন্দুস্থানী ধাঙড় চলেছে, অহেতুক উল্লাসে ডুম্ ডুম্ করে ঢোল বাজাচ্ছে, থেকে থেকে চীৎকার করে উঠছে এক একটা অশ্লীলতম গানের কলি; রঙীন শাড়ী পরা বলিষ্ঠগঠনা সঙ্গিনীদের তার কিছু মাত্র সঙ্কোচ নেই, সমান উৎসাহেই তারা সে রসিকতায় যোগ দিচ্ছে, উজ্জ্বল হাসিতে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা ঘোড়ার পিঠে দোকান নিয়ে চলেছে, শীর্ণ আর খর্ব্বকায় টাট্টুগুলো বোঝার ভারে ভেঙে পড়বার উপক্রম করছে। মাথায় বোঝা নিয়ে চলেছে অর্দ্ধাবৃত সাঁওতাল আর রাজবংশী মেয়েদের দল; সাঁওতাল মেয়েরা এক টুকরো কাপড় দিয়ে পিঠের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে শিশুকে, রোদের ঝক্‌ঝকে আলোয় তাদের গলার হাঁসুলী আর পায়ের রূপোর খাড়ু ঝিক্‌মিক্ করছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে চলেছে সাধারণ গ্রামের লোক, কাঁচা চামড়ার জুতো জোড়া হাতে তুলে নিয়ে কেউ বা হাঁটছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। একটা পুরানো সাইকেল চালিয়ে কোথা থেকে হাফ্-প্যাণ্ট আর টুইলের

সার্ট পরা জুট আফিসের একজন কেরাণী এসে দর্শন দিলে; সাঁওতাল মেয়েদের দিকে তাকিয়ে দেখলে লোলুপ দৃষ্টিতে, ধাঙড় মেয়েদের সঙ্গে একটু রসিকতা জমাবার চেষ্টা করলে, তারপর দ্রুত সাইকেল চালিয়ে বৈষ্ণবীদের দলটাকে ধরবার জন্যে এগিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে গোরুর-গাড়ীর মিছিল চলেছে নিরবচ্ছিন্ন স্রোতে। ব্যবসায়ীদের গাড়ী, জোতদারের গাড়ী, মালটানা গাড়ী, খালি গাড়ী। জাতি-গোত্রহীন গোটাকয়েক কুকুরও এই বিরাট জনতার সহযাত্রী হয়েছে, এতগুলো লোক একসঙ্গে দেখে কাছাকাছি কোথাও একটা উৎসব-ব্যাপার বোধ করি অনুমান করে নিয়েছে তারা।

রূপাপুরের তলা দিয়ে ছোট রাস্তাটা ধুলোয় অন্ধকার। হাতুড়ি ঠুকতে ঠুকতে কামারেরা আড় চোখে লক্ষ্য করে জনতা। মেলায় খুব লোক হবে এবার। কয়েক বছর আগে বড় গোছের একটা দাঙ্গা হয়ে যাওয়ায় কিছুদিন মেলায় লোক আমদানি কমে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে সে ভাঙন আবার জুড়ে উঠেছে। এবার আবার জাঁকিয়ে মেলা বসবে।

হাতুড়িটা রেখে রামনাথ এতক্ষণে সোজা হয়ে উঠে বসল। বয়স অনেক হয়েছে রামনাথের। প্রায় পাঁচহাত লম্বা মানুষটা। অতিরিক্ত দৈর্ঘ্যের জন্যে মেরুদণ্ডের কাঠামোটা একটুখানি বেঁকে নেমেছে আজকাল। হাত পায়ের হাড়গুলো অস্বাভাবিক মোটা, হাতের কব্জীগুলোকে মুঠো করে ধরা যায় না। কালো কপালের ওপর টলটলে ঘামের বিন্দুকে বাঁহাতের পিঠ দিয়ে মুছে ফেলে রামনাথ বললে, "এবার মেলায় কি রকম লোক আসছে, দেখেছিস!"

জলন্ত একখানা দাকে বাঁটের মধ্যে ঠুকতে ঠুকতে তরুণ সুরথ জবাব দিলে, হাঁ, দাঙ্গার পরে এত লোক আর মেলায় আসে নি।

দাঙ্গার নামে রামনাথ ভ্রূকুঞ্চিত করলে, অপ্রসন্নতার ছায়া মুখের ওপর ঘনিয়ে এল তার।

—সব তোদের জন্যে। মারামারির নামে তো আর মাথা ঠিক থাকে না। কথা নেই, বার্ত্তা নেই, লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়লি, কাপড়পট্টিতে আগুন লাগিয়ে দিলি।

—নাঃ, লাগাব না! সুরথ ঝলসে উঠল: পাড়ার সামনে এসে গোরু কাটবে, আর চুপচাপ বসে থাকব।

—তাই বলে তোরা তার বিহিত করতে যাবি না কি। জমিদারের মেলা, তার কাজ সে বুঝবে, তোরা খামোকা যা খুশি তাই গণ্ডগোল পাকিয়ে বসবি, না?

সুরথ বললে, রেখে দাও তোমার জমিদার। ও শালারা মানুষ না কি! চর্ব্বির ঢিবি সব, পেস্তা বাদাম খায়, বোতল টানে, আর হাতীর বাচ্চার মতো ফোলে। জমিদারের ভরসায় বসে থাকলে প্রজার মান-ইজ্জৎ থাকে না।

—কথা খুব শিখেছিস দেখছি। রূপাপুরের কামারেরা এবার যে অধঃপাতে যাবে, তার লক্ষণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি।

সুরথ অকৃত্রিম প্রসন্নতায় হেসে উঠল হো হো করে। রাম-নাথকে চটাতে ভারী ভালো লাগে তার। এত বয়স হয়েছে, এমন প্রকাণ্ড জোয়ান, সমস্ত রূপাপুর গ্রামের সে মাথা। যৌবনে সে লাঠির ঘায়ে বুনো জানোয়ার শিকার করেছে, তালুকদারবাড়ীতে হানা দিয়ে একা ডাকাতি করে এসেছে। দশ বছর আগেও সুলতানগঞ্জের মরা নদীতে বানের জলে কুমীর আসত, সেই কুমীর রামনাথের পা আঁকড়ে ধরায় রামনাথ টেনে সেটাকে পারে এনে ফেলেছিল, আর সরকার থেকে একশো টাকা পুরস্কার পেয়েছিল। সেই রামনাথ ভয় করে জমিদারকে, ভয় করে দাঙ্গা হাঙ্গামা মারামারিকে। এমন শক্তিমান্ পুরুষের এই জাতীয় মানসিক দুর্ব্বলতা অত্যন্ত বিস্ময়কর মনে হয় সুরথের কাছে।

সুরথের হাসিতে রামনাথ চটে উঠল।—কী যে লোকার মতো হাসিস ফ্যাক ফ্যাক করে, ভালো লাগে না। এবার মেলায় গিয়ে কেউ যদি এতটুকু বদমায়েসী করবি, তা হলে ভালো হবে না এই বলে রাখলাম। বলে দিস সবগুলোকে।

সুরথ বললে, আমি বলে দিলে কি শুনবে ওরা। সেবার জুয়োর আড্ডাতে ওরা যখন টিকিধারীর মাথা ফাটিয়ে এল, তখন আমি বার বার নিষেধ করছিলাম। কিন্তু কথা শুনবে না—আমি তার কী করব বলো।

রামনাথ বললে, আর ভালো মানুষ সাজতে হবে না। তোমাকে আর আমি চিনি না যেন। মায়ের পেট থেকে এই তো সেদিন পড়লি, এর মধ্যেই খুব চালাক হয়ে উঠেছিস। সব নষ্টামীর গোড়াতেই তুই—কামার পাড়ার হতভাগাগুলো তোর কথাতেই নেচে বেড়ায়, সে আমি জানি।

সুরয জিভ কেটে বললে, রাম রাম। সত্যি তাউই, আমার ওপর এ তোমার অন্যায় রাগ। আমি তোমার নতুন বউয়ের দিব্যি দিয়ে বলছি—

রামনাথ সামনে থেকে একটা বড় হাতুড়ি উঠিয়ে নিলে।

চুপ কর ফক্কড় কোথাকার। দেখেছিস তো? মাথা গুঁড়িয়ে দেব একদম।

সুরযের হাসিটা এবার সমস্ত কামারশালায় সংক্রামিত হয়ে গেল। নীরবে হাতুড়ি পিটতে পিটতে এতক্ষণ যারা কথার গতি লক্ষ্য করছিল, তারা এইবার এক সঙ্গে হাসতে সুরু করে দিলে উচ্ছ্বসিত ভাবে। কর্কশ হাসির প্রচণ্ড তরঙ্গে লোহার কঠিন শব্দ তলিয়ে গেল।

রামনাথ হাতুড়িটা ফেলে দিয়ে নিরাশ কণ্ঠে বললে, নাঃ, তোদের দিয়ে কিছু হবে না। তোদের জ্বালাতেই বউকে নিয়ে আমার দেশ ছাড়তে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে আর এক দফা হাসির জোয়ার তরঙ্গিত হয়ে উঠল। ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহার করেছে সুরয। নতুন বউয়ের কথা উঠলেই তৎক্ষণাৎ মুখ বন্ধ হয়ে যায় রামনাথের। আর তার সমস্ত দুর্ব্বলতার মূল এইখানেই প্রচ্ছন্ন।

জেলার এই অঞ্চলটা ক্রিমিন্যাল বা অপরাধমূলক এলাকা। রূপাপুরের কামারেরা আবার সেই সব ক্রিমিন্যাল-দের অগ্রবর্ত্তী। বয়স্ক পুরুষদের প্রায় সকলেই থানায় দাগী বলে উল্লিখিত। আশে পাশে খুন জখম চুরি ডাকাতি কিছু একটা ঘটলেই এই সব চিহ্নিত অপরাধীদের নিয়ে টানাটানি পড়ে, বাড়ী থানাতল্লাস হয়, হাজত থেকে দু'চারদিনের জন্যে মুখ বদলে আসতে হয়। কিন্তু রূপাপুরের কামারেরা আজ-কাল আর সত্যিই তেমন ক্রিমিন্যাল নয়, রক্তের নামে আজ-কাল আর ওদের মাথার রক্ত চন চন করে ওঠে না। সে সব বরং ঘটত দশ পনের কুড়ি বছর আগে। রূপাপুরের কামারেরা তখনো যাযাবর, মাটির মায়া ছিল না, ঘর বাঁধবার তাগিদ ছিল না। চলতে চলতে গ্রামের হাটখোলার পাশে ছাউনি গাড়ত, দু'একদিন লোহা পিটত, তারপর তৃতীয় রাত্রিতে কারো বাড়ীতে চড়াও হয়ে যথাসর্ব্বস্ব লুটে পুটে নিয়ে অন্ধকার দিগন্তে উধাও হয়ে যেত। ক্রমে ক্রমে সেই পথ চলার ওপর ঘনিয়ে এল শ্রান্তির অতি গভীর অবসাদ। মাটির বুক চিরে যে ঘনশ্যামল চিকণ ফসল প্রাণের জোয়ারে জেগে ওঠে, হেমন্তে রবিশস্যের মাঠে যে রঙের আগুন চোখে আগুন ধরিয়ে দেয়, আর বাঁশবনের ছায়ায় আমের বনের ঘনান্ধকারে জোনাকির আলোয় যে গ্রাম তন্দ্রাতুর হয়ে ঘুমিয়ে থাকে, তাদের অদৃশ্য শৃঙ্খল এসে পাকে পাকে জড়াতে লাগল ওদের। রূপকথার বাংলা, কবিগানের বাংলা, আত্মতৃপ্তিতে অলস বাংলা। সেই বাংলা তার ঘুমভরা আঁচল জড়িয়ে ওদের বুকের তলায় টেনে নিলে, তার উচ্ছলিত স্তনক্ষীরে পরিতৃপ্ত হয়ে ঘুমিয়ে রইল রূপাপুরের কামারেরা।

তবু মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে চমকে উঠেছে ওরা। ফুলে উঠেছে হাতের মাংসপেশী, বুকের মধ্যে শুনতে পেয়েছে নিদ্রিত অজগরের চকিত জাগরণের গজরানি, আদিম রক্তের কলধ্বনি। খুসিমত ডাকাতি করেছে, দাঙ্গা করেছে, নিজেদের মাথা ফাটিয়েছে, শত্রুর কাঁধে ফারসা বসিয়েছে। ছাঁচ তৈরী করে স্বদেশী সীসের টাকার পাল্লা চালিয়েছে সরকারী রূপোর টাকার সঙ্গে। রামনাথ সেই যুগের প্রতীক।

তার প্রথম বউ মরেছে আজ কুড়ি বছরের আগে। কি হয়ে মরেছে কেউ জানে না। শুধু একদিন সকালে উঠে তাকে আর কেউ দেখতে পায় নি। গভীর রাত্রে রামনাথের ঘরে কেউ কেউ না কি একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু কারো মনে কিছুমাত্র কৌতূহলের উদ্রেক হয়নি তাতে। অমন কত হয়।

তারপর থেকে রামনাথের বউকে আর কেউ দেখে নি। জিজ্ঞাসা করবার এতটুকু প্রয়োজনও বোধ করেনি কেউ। জীবনের মূল্য তখনো অত স্পষ্ট আর প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে নি ওদের কাছে। সমুখের মাঠে তখনো সবুজের শীষ তোলে নি প্রথম ফসল।

কাল থেকে কালান্তর। কত নদ-নদীতে চড়া পড়ে, মরা দীঘির শুকিয়ে আসা ফাটল-ধরা মাটিতে নামে লাঙলের আঁচড়। সেই চড়া জেগেছে রামনাথের রক্তে, সেই লাঙলের আঁচড় পড়েছে বুকের ভেতর। রোদে পোড়া পোড়ো জমিতে ফসলের স্বপ্ন-কামনা।

কুড়ি বছর পরে রামনাথ বিয়ে করেছে আবার। নতুন বউ, নাম তার কামিনী। ছিপছিপে লম্বা চেহারা, গায়ের উজ্জ্বল কালো রঙ যেন বার্নিস লাগানো বলে ভ্রম হয়। পাশের

গ্রামের মেয়ে, ছোটবেলা থেকেই রামনাথ তাকে দেখে এসেছে, কখনো চোখে পড়ে নি। কিন্তু প্রথম বর্ষার জল নেমেছে তখন, লাঙল দেওয়া লালমাটি ধারাবর্ষণে মাখনের মতো কোমল আর নরম হয়ে গেছে, আর সেই মাটিতে বীজ রুইতে এসেছে গ্রামের মেয়েরা। পথ চলতে রামনাথের সেই সময় আচমকা চোখে পড়েছিল কামিনীকে। ঝুঁকে পড়ে মাটিতে কাজ করবার সময় আঁচল সরে গিয়ে পূর্ণায়ত স্তনশ্রী আত্মপ্রকাশ করেছে, কালো মুখে লাল মাটি শুকিয়ে রয়েছে গোরোচনার তিলক চিহ্নের মতো। সেদিকে তাকিয়ে প্রায় ভুলে যাওয়া কি একটা অনুভূতিতে রামনাথের হৃৎপিণ্ড দু'টো দোলা খেয়ে উঠেছিল কয়েকবার। মনে পড়েছিল ঘরটা অত্যন্ত নির্জ্জন—শীতের রাত্রে চাটাইয়ের বেড়াটা অতিরিক্ত আর অস্বাভাবিক শীতল।

বিয়ের পরে কামিনী সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি কি আমাকেও খুন করে ফেলবে?

বিস্মিত হয়ে রামনাথ বলেছিল, খুন করতে যাব কেন তোকে?

—লোকে তো তাই বলে। আমার সতীনকে না কি তুমি গলা টিপে মেরে ফেলেছ, তাই—

—পাগল! রামনাথ ঘন করে কামিনীকে টেনে এনেছিল বুকের মধ্যে: তার 'হায়ভা' হয়েছিল।

—তা হোক। রামনাথের বলিষ্ঠ ঘর্ম্মাক্ত বুকের ভেতর মুখ লুকিয়ে অস্ফুট স্বরে কামিনী জবাব দিয়েছিল, আমার ভয়ানক ভয় করে।

গভীর স্নেহভরে কামিনীর জটাবাঁধা চুলগুলোর ভেতর হাত বুলিয়ে দিয়েছিল রামনাথ। বলেছিল, তোকে আমি এত ভালোবাসি, তোর ভয় কিসের।

মিথ্যে বলে নি রামনাথ। নতুন বউকে সত্যই সে ভালবাসে, পাগলের মতো ভালোবাসে। এই ভালোবাসাই আজ সব দিক থেকে তাকে পঙ্গু করে রেখেছে। তাই দাঙ্গার নামে সে ভয় পায়, তাই যে-কোনো উচ্ছৃঙ্খলতার কল্পনাতেই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে তার চেতনা। প্রেমের কাছে পশু আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

সুখে আবার বলে, মেলায় তো যাবে তাউই, কিন্তু সাবধানে থেকো। ভিড়ের মধ্যে তোমার বউ আবার হারিয়ে না যায়।

তিরিশটা চাপবের পেছন থেকে তিরিশ রকম কর্কশ-ধ্বনি আবার বেজে উঠল এক সঙ্গে। আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দেখা গেল দূরে মাঠের ওপারে একটা কালো ঘোড়া নক্ষত্র-বেগে উড়ে আসছে। কুমার বিশ্বনাথের ঘোড়া।

[ক্রমশঃ

চণ্ডীমঙ্গল

শ্রীকালিদাস রায়

বাঙ্গালী যে দেবীর নিকট ধনধান্য চাহিয়াছে—সঙ্কট হইতে পরিত্রাণও চাহিয়াছে, যাঁহাকে নানাভাবে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে তিনিই মঙ্গলচণ্ডী। শ্রীচৈতন্য-দেবের বহু পূর্ব্ব হইতে চণ্ডীমঙ্গলের মূল আখ্যানটি পাঁচালীর আকারে চলিয়া আসিতেছিল। ভক্ত বৃন্দাবন দাস লৌকিক কামনামূলক ধর্ম্মের অতিরিক্ত প্রভাবে প্রকৃত ধর্ম্মের মর্য্যাদা-হানি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সভে এই মাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।" মনসামঙ্গলের গান ও চণ্ডীমঙ্গলের গান বাংলা দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। লোকে এই গানে প্রচুর আনন্দও পাইত।১ কৃষ্ণদাস কাবরাজ বলিয়াছেন—নিমাইএর সংকীর্ত্তনে বিরক্ত হইয়া নবদ্বীপের হিন্দুরা বলিতেছে—

মঙ্গলচণ্ডী বিষহরী করে জাগরণ। তাতে বাদ্য নৃত্য গীত যোগ্য আচরণ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল, এই নিমাই পণ্ডিত। গয়া হইতে আসিয়া চলিলা বিপরীত॥

১ 'স্বর্গীয় প্রহসনে' রবীন্দ্রনাথ বলিতে চাহিয়াছেন—বঙ্গসাহিত্যে ও বাঙ্গালা জীবনে মনসা, শীতলা ইত্যাদি দেবদেবীর প্রভাব বাঙ্গালীর ধর্ম্ম-মর্য্যাদা ও বৈদিক আভিজাত্য নষ্ট করিয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মই বাঙ্গালীকে ধর্ম্মের ইতরতা হইতে রক্ষা করিয়াছে।

"একদা আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় উচ্ছৃঙ্খলতার সময় ভীতি-পীড়িত প্রজা আপন কবিদের মুখ দিয়া শক্তিরই স্তবগান করিয়েছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডী,

কবি জনার্দ্দনের চণ্ডীর ব্রতকথাই প্রাচীনতম। ইঁহার এবং অন্যান্য কবির পরিকল্পিত আখ্যানবস্তু পরবর্ত্তী যুগে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পরিণত হইয়াছে। কবিকঙ্কণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-রচয়িতা।২

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায় না। কবিকঙ্কণ অন্য কোন দেবতাকে ছোট করিয়া চণ্ডীকে বড় করেন নাই। গ্রন্থে বিষ্ণু-ভক্তির অজস্র নিদর্শন দেখিয়া মনে হয়, কবি বৈষ্ণব ছিলেন। জীবনীপাঠেই দেখা যায়,—ইনি ছিলেন মীন-মাংসত্যাগী দশাক্ষর-গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষিত।

দেবী জগতে তাঁহার পূজাপ্রচারের জন্য রত্নমালা অপ্সরাকে সাধুকন্যারূপে এবং ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে কালকেতু-রূপে অবতারিত করিলেন। সমাজের উচ্চতর ও নিম্নতর দুই স্তরেই যাহাতে পূজার প্রচার হয় তাহার জন্যই বোধ হয় এই ব্যবস্থা। খুল্লনার স্বামী ধনপতি চাঁদ সদাগরের মতই শিবভক্ত, স্ত্রীদেবতা চণ্ডীকে কিছুতেই মানিবে না। ধনপতি চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করিয়া সিংহল যাত্রা করিল। তাহার ফলে চাঁদের মতই তাহারও অশেষ দুর্গতি। খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত মাতার কাছে চণ্ডীর মহিমা উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছিল। সে কিশোর বয়সেই সিংহল যাত্রা করিল। সে গিয়া দেখে ধনপতি সেখানে কারারুদ্ধ। সেও কারারুদ্ধ হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল। তাহাকে মশানে লইয়া যাওয়া হইল। সুন্দরের মত চৌতিশা অক্ষরে চণ্ডীর স্তব করিয়া সে রক্ষা পাইল এবং পিতা ধনপতিকেও বাঁচাইল। ফলে চণ্ডীর জয় হইল। প্রকারান্তরে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পুরুষের পরাজয়। সগুণা সক্রিয়া প্রকৃতির জয়।

এদিকে কালকেতুকে দেখা দিয়া চণ্ডী সাত ঘড়া স্বর্ণমুদ্রা দান করিলেন। তাহার সাহায্যে সে গুজরাটের রাজা হইল। কলিঙ্গদেশের রাজার সহিত তাহার যুদ্ধ বাধিল, তাহাতে কালকেতুর পরাজয় হইল। চণ্ডীর কৃপায় শেষ পর্য্যন্ত কারামুক্ত হইয়া সে রাজ্য ফিরিয়া পাইল। কালকেতু ও শ্রীমন্ত চণ্ডীপূজা প্রচার করিয়া জীবনান্তে শাপমুক্ত হইল।

চণ্ডীমঙ্গলে এই দুইটি উপাখ্যান পাশাপাশি বর্ত্তমান। এক চণ্ডীপূজা প্রচারের অভিন্ন উদ্দেশ্য ছাড়া দুই উপাখ্যানে কোন সংযোগ নাই। কালকেতু ধনপতি-শ্রীমন্তকে চেনে না—ইহারাও কালকেতুকে চেনে না।

বরং মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের সঙ্গে ধনপতির পরিচয় ছিল। ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে চাঁদ সদাগরকে শ্রেষ্ঠ মান দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রিত বণিকগণ কুপিত হইয়া খুল্লনার সতীত্বের পরীক্ষা দাবি করিল।

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে আছে—চাঁদসদাগর সমুদ্রযাত্রা-পথে ধনপতির পুত্র শ্রীমন্তের নির্ম্মিত মনসা-মণ্ডপ ভাঙ্গিয়া দিতেছে। অন্নদামঙ্গলে ভাঁড়ুদত্তের পৌত্রী সোহাগী হরি-হোড়ের সহিত বিবাহিতা হইয়া সপত্নীকলহের দ্বারা অন্নপূর্ণার আসন বিচলিত করিতেছে।

চণ্ডীর মহিমাকীর্ত্তনই কবির একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, পাঠক বা শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য কবি তাঁহার গ্রন্থে বহু পুরাণের সার সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন।৩ বিশেষতঃ হর-গৌরীর লীলাটিকে আগাগোড়া এই গ্রন্থের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন। ইহা অবান্তর প্রসঙ্গ নয়। দাম্পত্য কলহের পর গৌরী যখন খেদ করিতে লাগিলেন—তখনই জয়ার উপদেশে গৌরী নিজপূজা প্রচারের জন্য ব্যাকুল হইলেন।

মনসামঙ্গল ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে অধর্ম্মেরই জয়গান। সেই কাব্যে অন্যায়-কারিণী ছলনাময়ী নিষ্ঠুর শক্তির হাতে শিব পরাভূত। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার এই যে এই শিবের মঙ্গলের পরাভবকে মঙ্গল গান নাম দেওয়া হ'ল।"

২ ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের কবি মাধবাচার্য্য একখানি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। তাহাই সর্ব্বপ্রথম পরিপূর্ণাঙ্গ চণ্ডীমঙ্গল। ইহার কয়েক বৎসর পরে দামুন্যা (বর্দ্ধমান) গ্রামের কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী একখানি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন—তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ডিহিদারের অত্যাচারে কবি স্বগ্রাম হইতে বিতাড়িত হইয়া মেদিনীপুর জেলার ভূস্বামী বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথের শিক্ষকরূপে আশ্রয় লাভ করেন। রঘুনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহারই অনুরোধে কবিকঙ্কণ চণ্ডী রচনা করেন। কবি বলিয়াছেন—দেবীর স্বপ্নাদেশে কাব্য রচনা করিয়াছেন—দেবাদেশের দোহাই দেওয়া সেকালের প্রথা ছিল, উহা একটি Convention মাত্র। মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল তখনও পশ্চিম বঙ্গে প্রচারিত হয় নাই। কাজেই তাঁহার চণ্ডী কবিকঙ্কণ দেখেন নাই। অথচ দুইজনের গ্রন্থের উপখ্যান ভাগে—এমন কি ভাষাতেই অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহাতে মনে হয়, দুই জনেই এক তৃতীয় কবির গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাধবের চণ্ডী সমগ্র দেশে চলে নাই, কবিকঙ্কণের চণ্ডী বাকি সমস্ত চণ্ডীকে কবলিত করিয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গলের রচনা কবিকঙ্কণের হাতেই চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

৩ সৃষ্টি প্রকরণ ইত্যাদি রচনায় কবি শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য়, ৪র্থ স্কন্ধের সহায়তা লইয়াছেন। শিবের তপস্যা ও ধ্যানভঙ্গ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ হইতে গৃহীত। রতিবিলাপ ও মদনভস্ম কুমারসম্ভব হইতে গ্রহণ করিয়াছেন সত্য কিন্তু এখানে তিনি কিছু মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। রতি বলিতেছে—'মোর পরমায়ু লয়ে চিরকাল থাক জীয়ে আমি মরি' একথা কালিদাস বলেন

সকল মঙ্গলকাব্যের মত চণ্ডীমঙ্গলেও দেবতা ও মানুষের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান রাখা হয় নাই। বরং দেব ও মানবের মধ্যে সহজ স্বাভাবিক পরিচয় ও ভাবের আদান-প্রদান দেখানো হইয়াছে। মানুষই পুণ্যবলে দেবতা হয়, দেবতাই পুণ্যক্ষয় ও আদর্শচ্যুতি হইলে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। দেবতাও মানুষের মত কামনা বাসনা পোষণ করে, মানুষের মত নানা বৃত্তির বশীভূত, মানুষও দেবতার মত অলৌকিক শক্তির কাজ করে। দেবতারা যেন উচ্চতর শ্রেণীর মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের চেয়ে তাহাদের শক্তি বেশী, সে জন্য তাহারা মানুষের উপাস্য। মর্ত্ত্যে উপাসনা লইয়া বিবাদ বাধিলে উপাস্যদের মধ্যেই বিবাদ বাধে, উপাস্যের জয়পরাজয়েই উপাসকদের জয় পরাজয়।

কবি তাঁহার কাব্যে অনেক অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। দেব মানবের এই প্রকারের সম্পর্ক স্থলে তাহা অস্বাভাবিক একেবারেই নয়। তাহাতে কাব্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার কথা নয়। কিন্তু সেই ঘটনার মধ্যে একটা রসশৃঙ্খলা থাকা চাই। কবি সর্ব্বত্র তাহা রক্ষা করেন নাই। কালকেতুর কুটীরে চণ্ডীর আগমন অসঙ্গত কিছু নয়, দেবীর অহেতুকী কৃপাও হইতে পারে। ফুল্লরার সংশয়ে ও দেবীকে বধ করিবার জন্য শরযোজনায় এখানে রসভঙ্গ হইয়া যাইতেছে মনে হয়। রঘুবংশে যে ছদ্মবেশী দেবতাকে বধ করিতে গিয়া দিলীপের বাহুস্তম্ভ হইয়াছিল, সে দেবতা সিংহরূপ ধরিয়া নন্দিনী গাভীকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল—সেখানে অলৌকিকতা থাকিলেও রসভঙ্গ হইতেছে না। সমুদ্রের কালীদহে ধনপতি কমলে কামিনী মূর্ত্তিদর্শন করিলেন তাহা অলৌকিক হইলেও কাব্যে অসঙ্গত নয়। কিন্তু তিনি পদ্মে বসিয়া হাতী গিলিতেছেন ও উগড়াইতেছেন এই দৃশ্যে রসভঙ্গ ঘটে।[৪] খুল্লনার সতীধর্ম্মের পরীক্ষা মঙ্গলকাব্যের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু একটা একটা করিয়া জতুগৃহ পর্য্যন্ত সমস্ত পরীক্ষা রামায়ণ মহাভারতেও কোন সতীকে দিতে হয় নাই। অথচ খুল্লনা সতী হইলেও সাধারণ নারী মাত্র। ময়নামতীর পক্ষে অসঙ্গত হয় নাই। কারণ, সে গোরক্ষনাথের নিকট হইতে মহাজ্ঞান লাভ করিয়াছিল।

মঙ্গলকাব্যে পুরাণের রচনাভঙ্গীই (technique) অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু পুরাণেও যে রসশৃঙ্খলা আছে—চণ্ডীমঙ্গলে তাহা সর্ব্বত্র অনুসৃত হয় নাই।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে Epical Grandeur কোথাও নাই। মহাকাব্যের চরিত্রের মত বিরাট চরিত্রও ইহাতে নাই। মানবজীবনের খুব বড় একটা সমস্যা বা আদর্শ লইয়াও ইহা বিরচিত নয়। ইহাতে Lyrical intensityও নাই—কোথাও অনুভূতির গাঢ়তা বা ভাবের গহনতা দেখা যায় না। ইহা বর্ণনাত্মক রচনা, ইহার কতকটা কাব্য, কতকটা নাটক, কতকটা উপন্যাস। ইহার রস সন্ধান করিতে হইবে—বিবৃতির স্বাভাবিকতায় ও অবিকলতায়, রচনা-চাতুর্য্যে, ভাষার স্বচ্ছন্দতায় ও পারিপাট্যে কবির বর্ণনাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বভাবসঙ্গত। বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে কবিকঙ্কণকেই প্রথম বস্তুতন্ত্রী (Realist) বলিতে পারা যায়। ঘটনা-সংস্থানে অস্বাভাবিকতা থাকিলেও বর্ণনায় স্বাভাবিকতা রক্ষা করা হইয়াছে অধিকাংশক্ষেত্রে। কালকেতুর ব্যাধ-জীবনের

নাই। শিবের বিবাহ ও গণেশের জন্ম কবি মৎস্যপুরাণ হইতে এবং কার্ত্তিকের জন্মকথা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কালকেতুর বর লাভ, চণ্ডীর গোধিকারূপ ধারণ, কমলে কামিনী, শালবাহন রাজা ও বণিকের কথা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আছে। ইহা ছাড়া গীতগোবিন্দ হইতে দশাবতার-স্তব, মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে মাণ্ডব্য ও বেদবতীর উপাখ্যান, মহাভারতের বনপর্ব্ব হইতে সাবিত্রী উপাখ্যান, কালিকাপুরাণ হইতে মহিষমর্দ্দিনী রূপ ধারণ, সংবর্ত্তসংহিতা হইতে খুল্লনার বিবাহ প্রস্তাব, মৎস্যপুরাণ হইতে অর্দ্ধনারীশ্বর কল্পনা, বৃহন্নারদীয় পুরাণ হইতে কলির দোষকীর্ত্তন ইত্যাদি গৃহীত। শ্রীমন্তের বাল্যলীলায় শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার ছায়াপাত হইয়াছে।

বাল্মীকির রামায়ণের কোন কোন অংশও পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণেরও ছায়াপাত কোথাও কোথাও দেখা যায়।

৪ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই চিত্রকে কাব্য-সৌন্দর্য্যহানিকর বীভৎস চিত্র বলিয়াছেন। দীনেশবাবু ইহার উত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহা কাব্য-সৌন্দর্য্যের পক্ষ হইতে নয়। তিনি বলিয়াছেন—ইহা ধর্ম্মকাব্য। বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণে দেবীর এই রূপের বর্ণনা আছে—কাজেই কবি তাহাই অনুসরণ করিয়াছেন। অন্যরূপে বিকৃত করার অধিকার তাঁহার ছিল না।

রামপ্রসাদ তাঁহার গানে ও ভারতচন্দ্র তাঁহার স্তবে এই রূপেরই উল্লেখ করিয়াছেন। এসমস্ত পুরাণের অনুসৃতি।

কবিগুরু কাব্যের দিক হইতে বিচার করিয়া রসাভাসের কথা তুলিয়াছেন। পুরাণের দোহাই দিয়া কাব্যের সৌন্দর্য্যহানির সমর্থন করা যায় না। মঙ্গলকাব্যের কবিরা পৌরাণিক আখ্যানকে অনেক স্থলেই যথাযথ রাখেন নাই। কবি ইচ্ছা করিলে গজমোক্ষণের প্রসঙ্গ বাদ দিতেও পারিতেন।

বর্ণনা বেশ স্বভাবসঙ্গত ও কলাশ্রী-সম্মত। কবি অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়াছেন কালকেতুর ব্যাধ-জীবনের আবেষ্টনী রচনায় এবং অতি নিঃস্ব ব্যাধগৃহের পারিপার্শ্বিকতার বর্ণনায়। তিনি বঙ্গদেশে এইরূপ ব্যাধের সংসার দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কল্পনার সাহায্যেই তিনি এই অদ্ভুত সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কালকেতুর বৈদিকমতে নামকরণ, কর্ণবেধ ইত্যাদি সংস্কার, তাহার মাতাপিতার কাশী-যাত্রা, তাহার ভাগবতের দোহাই দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে যেন তালভঙ্গ হইয়াছে মনে হয়। কালকেতু রাজা হইল তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু একেবারেই গুজরাট দেশের রাজা এবং তাহার শত্রুতা বাধিল কলিঙ্গরাজের সহিত। কোথায় গুজরাট আর কোথায় কলিঙ্গ। এ গুজরাট অবশ্য কলিঙ্গ দেশেরই অন্তর্গত। কলিঙ্গেরই বনভাগের উচ্ছেদের ফলে এই রাজ্যের উৎপত্তি। যুদ্ধটা বাধিল। ভাড়ুদত্ত নামে একটা পথের ফকিরের চক্রান্ত। কেমন যেন অস্বাভাবিক ব্যাপার।

খুল্লনা লক্ষপতি বণিকের কন্যা—গৌড়েশ্বরের সরকারী সদাগরের বধূ। সপত্নী তাহাকে লাঞ্ছিত করিবে তাহাতে অসঙ্গতি কিছু নাই, কিন্তু একেবারে বনের মধ্যে ছাগল চরানোর ব্যবস্থা। ইহা আদৌ স্বাভাবিক নয়।

কবি জাতিকুলসর্ব্বস্ব বাঙ্গালীদের কুটুম্বপীড়নের যে চিত্র দিয়াছেন, তাহা যেমন সত্য, তেমনি জীবন্ত। ধনপতি লক্ষপতি হইয়াও নিজের জ্ঞাতি কুটুম্বদের কাছে নিতান্ত অসহায়। প্রাচীন বাংলার নির্ম্মম ঈর্ষ্যান্ধ সমাজ-শাসনের চমৎকার চিত্রটি কবির রচনায় ফুটিয়াছে। জাতিকুলের যখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল—তখন ধনের এত প্রাধান্য ছিল না। ঈর্ষাতেই হউক আর যে কোন দুরভিসন্ধির বন্ধনেই হউক সঙ্ঘবদ্ধতার কাছে যে লক্ষপতিরও কৃতাঞ্জলি হইতে হইত, এই সত্যটি কবির কাব্যে আমরাও পাই। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, ধনগৌরবের উপর একটা নৈতিক শাসনও হয়ত ছিল।*

* জাতিকুলের বলে ও সামাজিক সংঘবদ্ধতার বলে ধনবান ব্যক্তিকে নৈতিক অপরাধের জন্য তাহার গৃহে ভোজ্যান্ন পরিত্যাগ ছাড়া অন্যভাবে দণ্ডিত করা হইত কিনা কবি তাহার ইঙ্গিত করেন নাই। কবি দেখাইয়াছেন—কতকটা ঈর্ষ্যা, কতকটা কুসংস্কার ও কতকটা অর্থ আদায়ের জন্য ধনবান ব্যক্তির উপর সামাজিক শাসন চালানো হইত।

বলে বেনে শঙ্খ দত্ত রাজগর্ব্বে হয়ে মত্ত জ্ঞাতিরে দেখাও রাজবল।
জ্ঞাতি যদি অতি রোষে গরুড়ের পাখা খসে ইহার উচিত পাবে ফল।

যে জন্যই হোক, একথা ধনগর্ব্বীদের শুনাইবার প্রয়োজন আছে,—দরিদ্র কবি তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন।

পুরাণকে এদেশের লোক চিরদিন ইতিহাস মনে করিয়া আসিয়াছে। পুরাণের নজির তুলিয়া আপন আপন প্রতিপাদ্যের জন্য যুক্তির অভাব মিটাইয়াছে। আজিও বহুলোক তাহাই করে। কবিকঙ্কণ বাঙ্গালীর এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছিলেন। পুরাণের নজির তোলার ছলে কবি তাঁহার রচনার মধ্যে যতদূর সম্ভব পুরাণপ্রসঙ্গ জুড়িয়া দিয়াছেন।

খুল্লনা সতীত্বের জন্য যে সকল পরীক্ষা দিয়াছিলেন সত্যই সে সকল পরীক্ষাগ্রহণের প্রথা সে সময় প্রচলিত ছিল অথবা রক্তমাংসের দেহের পক্ষে ঐ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব একথা কেহ বিশ্বাস করিবে না, কবি তাহা যে জানিতেন না তাহা নয়। কাজেই গতানুগতিক প্রথা অনুসরণ করিয়া এক প্রকারের কাব্যালঙ্কার সৃষ্টি এবং চণ্ডীর মাহাত্ম্য দেখানো ছাড়া ইহা অন্য কিছুই নয়।

কবি প্রচলিত ধরণের জাতি মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য প্রয়াসী হ'ন নাই। ব্যাধ কালকেতুকে তিনি আদর্শ-চরিত্রের ধর্ম্মভীরু পুরুষ বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন—ফুল্লরাও সাধ্বী সতী পতিব্রতা। নীচবংশীয় হইলেও কালকেতু চণ্ডীর কৃপার পাত্র।

সমাজের তৃতীয় স্তরের বণিক জাতীয় ধনপতি শ্রীমন্ত কাব্যের উত্তরাংশের নায়ক। শ্রীমন্তকে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যালাভের অধিকারী বলিয়া কবি স্বীকার করিয়াছেন। খুল্লনা আদর্শ হিন্দুজায়া ও জননী।

দুইজন ক্ষত্রিয়-নরপতি শ্রীমন্তকে কন্যাদান করিতেছে—তাহাতে কবির কোন দ্বিধা বোধ হয় নাই। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ গুরুর চরিত্রে কবি হীনতা ও নীচতা আরোপ করিতে এবং ব্রাহ্মণী লীলাবতীকে কদাচার ও কুক্রিয়ার সহকারিণী বলিয়া চিত্রিত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। এইরূপ জাতি-কুল সম্বন্ধীয় উদারতা সেকালের সকল কবিরই ছিল।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর প্রত্যেক সংস্কারটির কথা (উপনয়ন ছাড়া অবশ্য) ধনপতি শ্রীমন্তের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। কবি হিন্দুর বৈদিক ও লৌকিক

সংস্কারগুলির প্রত্যেকটিকে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। এইগুলি কাব্যের সৌন্দর্য্য বাড়ায় নাই বটে, কিন্তু কাহিনীটির পুষ্টি বিধান করিয়াছে। তাহা ছাড়া সেকালের সমাজধর্ম্মের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস এই পুস্তকে পাওয়া যায়।

কবি খুল্লনার পুষ্পোৎসব বা পুনর্ব্বিবাহ পর্য্যন্ত বাদ দেন নাই। ইহার বিস্তৃত বিবরণ দিতে কবি লজ্জাবোধ করেন নাই। এক্ষেত্রে কবি একেবারে Realist. কবি কলির দোষ বর্ণনাপ্রসঙ্গে তাঁহার সময়ে ব্রাহ্মণজাতির যে অধোগতি ঘটিয়াছিল, তাহা অকপটেই প্রকাশ করিয়াছেন—

"বেদ নিন্দা করিবে ব্রাহ্মণ।" "প্রতিগ্রহ নিবে দ্বিজ পরিহরি ধর্ম্ম নিজ সন্তে হবে শূদ্রের সমান।" "বৃথা মাংসে অভিরুচি নহিবে ব্রাহ্মণ শুচি হবেক ধার্ম্মিক উপহাস। লোভে অতিবড় মতি বিক্রম করিবে অতি অপথে সভার অভিলাষ।" "ব্রাহ্মণ না হবে ভব্য বেচিবে লবণ গব্য বিক্রয়ে সঞ্চয়ে বহু ধন।" "না জানিয়া পর্ব্বদিশ পরিহরি নিরামিষ দ্বিজ গাভী করিবে দোহন।"

শ্রীমন্তের লঘু অপরাধে প্রাণদণ্ডও অস্বাভাবিক। একজন Realist কবির কাছে আমরা এ-সমস্ত প্রত্যাশা করি নাই। কবিকঙ্কণের সময়ে বাঙ্গালীর সাগরে বাণিজ্য-প্রথা প্রচলিত ছিল না। পূর্ব্বে এ-দেশের বণিকরা সাগর পারে বাণিজ্য করিতে যাইত—এইকথা তিনি শুনিয়াছিলেন মাত্র। সাগর যাত্রা সম্বন্ধে কবির কোন ধারণাই ছিল না। সিংহলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধের কথা কবি সংস্কৃত নাটকে পড়িয়াছিলেন মাত্র। কবির লেখনীতে সাগর একটি নদী মাত্র। সাগরযাত্রা নদীতে নৌকায় ভ্রমণ মাত্র। সাগরের বিরাটত্ব, গাম্ভীর্য্য ও রূপ-বৈচিত্র্য কবির কাব্যে একেবারেই ফুটে নাই।

কেবল সাগর নয়, বঙ্গদেশের প্রকৃতি কবির কল্পনাকে কুতুকিনী করিতে পারে নাই। খুল্লনার ছাগপালিকা রূপে পরিভ্রমণ প্রসঙ্গে যে-টুকু প্রকৃতির কথা আসিয়া পড়িয়াছে—তাহা নিতান্তই মামুলী। বঙ্গদেশের বহিরঙ্গের প্রতি কবির দৃষ্টি ছিল না। কিন্তু কবি বঙ্গদেশের অন্তরঙ্গ বিষয়ে খুবই সচেতন ছিলেন। বাঙ্গালীর সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা কবির কাব্যে রস সঞ্চার করিয়াছে। বাঙ্গালী সমাজের ও গার্হস্থ্যজীবনের কয়েকখানি আলোকচিত্র কবির কাব্যে পাওয়া যায়। কবি বাঙ্গালী-চরিত্রের বিশেষত্ব মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীসংসারের সপত্নীকলহ, বাঙ্গালী সমাজের তুচ্ছ জাতিকুল ইত্যাদি লইয়া দলাদলি, রেষারেষি, হৃদয়হীনতা, বাঙ্গালী, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, বণিক ইত্যাদি জাতির চরিত্রবৈশিষ্ট্য, তাঁহার কাব্যে ঔপন্যাসিক সৌষ্ঠবের সহিতই ফুটিয়াছে।

কবি বাঙ্গালী পুরুষের মধ্যে বিশিষ্ট রূপ মহৎ কিছুই পান নাই—চেষ্টা করিয়া স্বজাতিপ্রেমের পরিচয় দেওয়ার জন্য কবি বাঙ্গালীপুরুষের চরিত্রে বিশিষ্ট রূপ মহত্ত্ব কিছুই দেখান নাই চেষ্টা করিয়া স্বজাতিপ্রেমের পরিচয় দেওয়ার জন্যও কাল্পনিক মহত্বেরও সৃষ্টি করেন নাই—যেমনটি দেখিয়াছিলেন—তেমনিই আঁকিয়াছেন। মুরারি শীল ও ভাঁড়ু দত্ত যে খাঁটি বাঙ্গালী সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। অগ্নিশর্ম্মা পুরোহিতটী সিংহলরাজার সভায় থাকিলেও খাঁটি বাঙ্গালী। ধূমদত্ত, শঙ্খদত্ত, নীলাম্বর দাস, রামদত্ত ইত্যাদি সমাজ-নায়কদের বংশ এখনো লোপ পায় নাই।

ধনপতি দত্তের চরিত্রে এক চণ্ডীর ঘট পায়ে ঠেলা ছাড়া পৌরুষের আর কোন পরিচয় নাই—তাহার চরিত্রবলের কোন পরিচয়ই নাই। ধনপতি লক্ষপতি হইয়াও কুসংস্কারান্ধ সামাজিকগণের মধ্যে মহাষ্টমীর ছাগের মত নিরাশ্রয়, অসহায়। পায়রা উড়ানোর খেলা হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধবয়সে পুত্রলাভের আশ্বাসপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত ধনপতির জীবনে বাঙ্গালী ভোগী লোকেরই চিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ধনপতির পৌরুষের পরিচয় তাহার মুখের একটি কথায়,—"স্ত্রীদেবতা আমি পূজা নাহি করি।"

নারীর মধ্যে ফুল্লরা কাঙালঘরের বাঙ্গালীবধূ—স্বামীর মতই শ্রম করিয়া দুই জনের সমবেত চেষ্টায় সংসার চালায়। খুল্লনা ভদ্রঘরের লাঞ্ছিতা ধর্ম্মভীরু সুশীলা বধূ। লহনা দোষে-গুণে মিশ্রিতা নির্ব্বোধ বাঙ্গালী গৃহিণী। আর দুর্ব্বলা ও লীলাবতী যথাক্রমে হীন প্রকৃতির দাসী ও প্রতিবেশিনী। এইগুলি খাঁটি বাঙ্গালী Realistic চরিত্র। এইগুলির গঠনে দৈন্যও নাই, আতিশয্যও নাই—কবির চোখে দেখিয়াই যথাযথ রূপে আঁকা।

কালকেতুর চরিত্রে কবি কিছু পৌরুষ দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাহা কতকটা পশুবলের অভিব্যক্তি—কতকটা চণ্ডীর

কৃপাবলে প্রাপ্ত। এই কালকেতুই কলিঙ্গরাজের ভয়ে লুকাইয়া রহিয়াছে এবং কারাগারে বন্দী হইয়া 'কান্দে বীর ফুল্লরার মোহে।' আর বলে—'মাংস বেচিতাম ভাল এতে যে পরাণ গেল কি বাদ সাধিল কাত্যায়নী।' এই চরিত্রেও বাঙ্গালী ছাপ পড়িয়াছে।

কাব্যের দিক হইতে চরিত্রগুলির অঙ্কন-কলায় কোন দোষ হয় নাই। কেবল মহত্ত্ব সৃষ্টির দ্বারা চরিত্রাঙ্কনের দক্ষতার বিচার হয় না—যথাযথ ও সুসমঞ্জস হইলেই চরিত্রাঙ্কন সার্থক হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কবির সৃষ্ট মানুষ-চরিত্রে শুধু নয়, পশুদের চরিত্রেও বাঙ্গালী চরিত্রের ও সেকালের বাঙ্গালীদের উপক্রুত জীবনের ছায়া পড়িয়াছে।

সবচেয়ে বড় কথা, কবির কল্পিত চরিত্রগুলির সবই রক্তমাংসে জীবন্ত। চিরপ্রচলিত মৌলিক চরিত্রগুলিতে তিনি রঙ ফলাইয়াছেন—সেগুলিতে বৈচিত্র্যসৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায় না। গৌণ চরিত্রগুলিকে তিনি মনের মতন করিয়া গড়িয়াছেন। সে-গুলির মধ্যেই কবির অপূর্ব্ব সৃজনীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কালকেতু চরিত্রটিকেও তিনি ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছেন। কালকেতু পশুবধ করে—কিন্তু তাহার প্রাণেও জীবের দুঃখে ব্যথা জন্মে। সে নির্ভীক সরল, কিন্তু মাঝে মাঝে ভয়-সংশয়ও তাহার মনে জাগে। পত্নীকে সে ভালবাসে, কিন্তু মিথ্যাকথা ব'ললে সে তাহাকে ক্ষমা করে না। সে মহাবীর বটে, দৈহিকশক্তি তাহার অসীম, কিন্তু তাহার মনের বল নাই, বিপদে কাঁদিয়া আকুল হয়—রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া লুকাইয়া থাকে। প্রকৃত জীবন্ত চরিত্র এইরূপই হয়। বাছিয়া বাছিয়া গুণগুলি একত্র করিয়া দেবপ্রতিমা রচনা করা যায়—দোষগুলি দিয়া মহিষাসুরের মূর্ত্তি রচনা করা যায়, কিন্তু মানুষ গড়া যায় না। কবি তাহা বুঝিতেন।

লহনা-চরিত্রের ভাবদ্বন্দ্ব লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে উহাও একটি জীবন্ত চরিত্র। লহনা জীবন্ত বলিয়াই পাটের জাদ ও পাঁচপণ সোণা পাইয়া স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করিতে অনুমতি দেয়, আবার দুর্ব্বলার কুমন্ত্রণায় সপত্নী-পীড়ন করে। খুল্লনাকে ছাগল চরাইবার জন্য বনে পাঠায়—আবার বন হইতে ফিরিতে দেরি হইলে কাঁদিয়া মরে।

ফুল্লরা জীবন্ত বলিয়াই নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়, বিনাইয়া বিনাইয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া এবং গৃহে রূপসী রমণীর সহসা আবির্ভাবে ক্রোধে সংশয়ে ঈর্ষ্যায় জ্বলিয়া উঠে। সে বড় কাঙালিনী—কিন্তু স্বামীসোহাগে ঐশ্বর্য্যবতী। চণ্ডীর প্রদত্ত ধনের লোভে চিরকাঙালিনী হইয়াও প্রলুব্ধ হয় না! ডিহিদারের অত্যাচারে স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া কবি একদিন দামুন্যাগ্রামে ভিটা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন কাঁদিতে কাঁদিতে। কেহ তাঁহাকে আশ্রয় দেয় নাই, পথে পুষ্করিণী হইতে মৃণাল তুলিয়া ক্ষুধিত সন্তানকে খাইতে দিয়াছিলেন। এ-দুঃখ ভুলিবার নয়। কবির রচনায় দারিদ্র্যদুঃখের চিত্র তাই অতি চমৎকাররূপেই ফুটিয়াছে। কাঙালিনী লাঞ্ছিতা বিজাতীয় শাসনে উপক্রুতা বঙ্গভূমি যেন ফুল্লরার কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়াছে! কেবল অন্নকষ্টের দুঃখ নয়, অত্যাচার অবিচারের দুঃখ, সমাজশাসনের ব্যথা, প্রবাসের বেদনা, প্রোষিতভর্ত্তৃকার বেদনা, গতযৌবনার ক্ষোভ, মাতৃমমতার দুঃখ, সপত্নীজ্বালা—এমনই কত দুঃখ-জ্বালার কথায় এই কাব্যখানি পরিপূর্ণ। সকল রচনার মধ্যেই বেদনার একটা ফল্গুধারা প্রবাহিত। ফুল্লরা ও খুল্লনার বারমাস্যায় তিনি বাঙ্গালী নারীর চিরন্তন দুঃখের কথা ঘনীভূত করিয়া দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালার অন্তরাত্মার দুঃখ তাঁহার কাব্যখানিকে অশ্রুভারাক্রান্ত করিয়াছে। কবির অন্তরের চিরসঞ্চিত বেদনা পশু, মানুষ ও দেবদেবীর মধ্য দিয়া যেন বিশ্বব্যাপ্ত হইয়াছে।

অন্নকষ্টের বেদনা পশুহন্তার জায়া ফুল্লরা হইতে পশুপতির জায়া অন্নপূর্ণা পর্য্যন্ত সকল নারীকেই বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে।

কালকেতু ও শ্রীমন্তের দুঃখ নিদারুণ। দেবপুত্র শাপ-ভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্তে ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া পুনরায় স্বর্গে ফিরিয়া যাইবে—কবি গোড়াতেই এই আশ্বাস দিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহাদের লাঞ্ছনা চণ্ডীমাতার লীলারই অন্তর্গত বলিয়াই আমরা ঐ দুর্বিষহ দুঃখের কাহিনী উপভোগ করি—নতুবা এইরূপ দুঃখের কাহিনী আমাদের চিত্তে রসসৃষ্টি করিতে পারিত না।

কবি দারিদ্র্যদুঃখের দুইটি রূপ দেখাইয়াছেন। একটী রূপকে তিনি তপস্যার মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। খুল্লনা ও ফুল্লরার প্রতি চণ্ডীর করুণাকে অহৈতুকী বলিয়া মনে হয়। তাহা ঐ তপস্যারই পুরস্কার। ইহারাও দুর্বিষহ দুঃখ সহ্য করা

ছাড়া অন্ত কোন তপস্যা করে নাই। কবি দুঃখের আর একটি রূপ দেখাইয়াছেন—ভাঁড়ুদত্তের চরিত্রে। নিদারুণ দারিদ্র্য-দুঃখ মানুষকে কি করিয়া পিশাচ করিয়া তুলে, এই রূপের মধ্যে তিনি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণই সর্ব্বপ্রথমে বাঙালীর ঘর-সংসারের ছোটখাটো সুখদুঃখ এবং খুঁটিনাটি লইয়া কাব্য রচনা করেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে কাব্যের রসমন্দিরে নিম্নশ্রেণীর লোকদের স্থান দিয়াছেন। একজন ব্যাধকে তিনি কাব্যের নায়করূপে দেখাইতে সাহস করিয়াছেন—অস্পৃশ্যকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে পাংক্তেয় করিয়া তুলিয়াছেন।

কেবল কালকেতুর কথা নয়। মুরারি শীল ও ভাঁড়ু দত্তের মত জীবন্ত চরিত্র নৈতিক জগতের ব্যাধ। পতিত-পাবন কবি এই ব্যাধদেরও কাব্যে ঠাঁই দিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে মৃচ্ছকটিকের যে মর্য্যাদা তাহা এই চণ্ডীমঙ্গল দাবি করিতে পারে। ভাঁড়ুদত্ত ও মুরারি শীল রসসৃষ্টির যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। কালকেতুও সারস্বত মন্দিরে স্থান পাইয়া চণ্ডীর কৃপালাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাব্য-সরস্বতীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে। চণ্ডীর কৃপালাভের পর সে আর ব্যাধও থাকিল না—সাহিত্যের মর্য্যাদা রক্ষায় সে সহায়তাও করিল না। বঙ্গসাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় এইরূপ চরিত্রচিত্রণ অভিনব, গতানুগতিকতার বিরোধী। পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীমঙ্গলের চরিত্রচিত্রণের কথা চিন্তা করিলে দেখা যায়, সমস্ত কৃতিত্বটুকু কবিকঙ্কণেরই প্রাপ্য নয়।

চণ্ডীমঙ্গলের ঐতিহাসিক ভিত্তি কিছু নাই বটে, কিন্তু উহা হইতে সেকালের প্রথা-পদ্ধতি, জাতিবিভাগ, জাতি-কুলের মর্য্যাদা, ব্যবসাবাণিজ্য, নগরপত্তন ও রাজসভা পারিবারিক আচার-পদ্ধতি, নৌযাত্রা, উৎসব-আমোদ ও দাম্পত্য জীবনের ইতিহাস উদ্ধার করা যায়। কবি তাঁহার সামসাময়িক জাতীয় জীবনের অনেক বার্ত্তাই আমাদিগকে জানাইয়াছেন। ঘরসংসারের খুটিনাটির কথা বলিতে গিয়া কবির তালিকা দেওয়ার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। এই রসসৃষ্টির পরম পরিপন্থী। কবি খুল্লনার রক্ষিত ছাগলগুলোর নামকরণ করিয়া তাহাদের নামেরও তালিকা দিয়াছেন। এয়োদের নামের তালিকা দেওয়া সেকালের একটা প্রথা ছিল। ইহা ছাড়া কত যে তালিকা আছে তাহার ইয়ত্তা নাই! কেবল মাত্র তালিকা সাজানোর পদ্ধতির অনুসরণ করিতে গিয়া শ্রীমন্তকে সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন।—কালকেতুকে ভোজনরাক্ষস বানাইয়াছেন। খুল্লনার পরীক্ষার সংখ্যা অযথা বাড়াইয়া ফেলিয়াছেন, গহনার একটা প্রকাণ্ড ফর্দ্দ দিয়া অলস ঐশ্বর্য্যের একটা পীতবর্ণের মায়ার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পণ্য বিনিময়ের একটা কাল্পনিক তালিকা দিয়া বর্ণনীয় বিষয়কে অসত্য করিয়া তুলিয়াছেন। এই নির্ঘণ্ট রচনার প্রথা বঙ্গসাহিত্যের সকল শাখাতে দেখা যায় বোধ হয়, কবিরা কল্পিত বা অকল্পিত কতকগুলো নামকে ছন্দে গাঁথিতে পারাকে একটা কৃতিত্বই মনে করিতেন। ৬

৬ কাব্যের বহু অংশ গতানুগতিক প্রথার অনুবর্ত্তী। • এবিষয়ে কবির মৌলিকতা কিছুই নাই। সেকালের কবিরা বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদির তালিকা দেওয়াকে কাব্যের একটা প্রধান অঙ্গ মনে করিতেন। চৈতন্য-চরিতামৃতের ন্যায় আধ্যাত্মিক কাব্যেও ভোজ্য দ্রব্যের দীর্ঘ তালিকা আছে। কবিকঙ্কণের কাব্যের প্রায় অর্দ্ধাংশ তালিকায় পূর্ণ।

কালকেতুর বধ্য পশুগণ, ফুল্লরার সাধের খাদ্যদ্রব্য, বনের ছেদ্য বৃক্ষ-গুল্ম, কাঁচলির চিত্র, গুজরাটে উপনিবিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও তাহাদের ব্যবসায়, বিবাহের অধিবাসের উপচার, বশীকরণের ঔষধ, রাঁধা খাদ্য ও ব্যঞ্জনাদি, ভেট উপহার, অলঙ্কার, বাজারে ক্রেয় দ্রব্য, খুল্লনার গর্ভসাধ-খাদ্য, শ্রীমন্তের অধীত গ্রন্থ ইত্যাদির তালিকা ত আছেই। তাহা ছাড়া, পাখী, ছাগল, পায়রা, এয়ো, ধনপতির কুটুম্ব ইত্যাদির নামেরও অত্যন্ত অনাবশ্যক তালিকা আছে।

এই সমস্ত নীরস তালিকা ও বহু অংশের পুনরাবৃত্তি বাদ দিলে গ্রন্থ সুন্দরতর হইতে পারিত। গার্হস্থ্য সংস্কারের বর্ণনা, স্তবস্তুতি, সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা, কমলে কামিনী দর্শন, নগরার দৃশ্য, বাণিজ্য দ্রব্য-বিনিময়ের কথা দুই বা ততোধিকবার পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। কোন কোন তালিকাও পুনরাবৃত্ত হইয়াছে।

পুরনারীগণের পতিনিন্দা একটি গতানুগতিক প্রথা। কুমন্ত্রণা দিবার জন্য এবং তদ্দ্বারা সাংসারিক শান্তি বিনাশের জন্য নীচ শ্রেণীর একটি দাসীর অবতারণার প্রথা রামায়ণ হইতেই সংক্রমিত। একটি কুচক্রিনী বামনী চরিত্রের অবতারণা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের নিজস্ব প্রথা।

স্বপ্নের সাহায্যে কাহিনীর গতি পরিবর্ত্তন একটি প্রথা! স্বপ্নে বিশ্বাস, গণক-বচনে বিশ্বাস, কুলক্ষণে বিশ্বাস, দিনক্ষণে পাঞ্জিপুঁথিতে এবং অদৃষ্টে বিশ্বাস—এ সমস্ত সকল কাব্যেই দেখা যায়। যে যাত্রার ফল ভাল হইবে না, সে যাত্রার সময় কতকগুলি কুলক্ষণের উল্লেখ করা একটি প্রথা। যতগুলি কুলক্ষণের কথা লোকাচারে প্রচলিত আছে কবিকঙ্কণ ধনপতির বাণিজ্য-যাত্রাকালে সবগুলির একটি তালিকা দিয়াছেন।

কথাকাটাকাটি ও কলহ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের একটি অঙ্গ। ইহা একটি রস রচনার ভঙ্গী। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে এই প্রথা বরাবর বঙ্গ সাহিত্যে চলিয়াছে। এই কথাকাটাকাটির ছলে—পৌরাণিক নজির দেখানোও গতানুগতিক প্রথা।

শুক সারীর মুখে কথা বসানোও সেকালের কবিদের একটি প্রথা এ বিষয়ে সম্ভব অসম্ভব, স্বাভাবিক অস্বাভাবিকতার কথা ভাবা হইত না।

কাব্যের নায়ককে দর্শন করিবার জন্য পুরনারীগণের ব্যাকুল উদগ্রীবতা এবং সে জন্য বেশভূষার বিপর্য্যয়,—কাব্যের এই অঙ্গ সংস্কৃত হইতে সংক্রামিত। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বা বৎসরের পর বৎসর কোন

স্থলে স্থলে কবি তালিকা দেওয়ার লোভ সংবরণও করিয়াছেন। যেমন—কালকেতুর কুটিরে দেবী আসিয়াছেন ছলনা করিতে। তাঁহার রূপে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। অন্য কোন কবি হইলে এখানে প্রতি অঙ্গের উপমা দিয়া একটা অলঙ্কারের ফর্দ্দ চালাইতেন। কবি শুধু বলিলেন—

ভাঙ্গা কুঁড়েঘরখানা করে ঝলমল।
কোটি ভানু প্রকাশিত আকাশমণ্ডল।

কবির রচনা সাবলীল স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ও সরল মাধুর্য্যে মণ্ডিত। প্রসাদগুণের অভাব কোথাও নাই। কতকাল আগের রচনা, অথচ বর্ত্তমান যুগের উৎকৃষ্ট রচনার মত ইহা আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করে। ডিহিদারের অত্যাচারে জন্মভূমি হইতে বিদায় গ্রহণের যে মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনা কবি দিয়াছেন, তাহার কারুণ্য-মাধুরী সর্ব্বযুগের উপভোগ্য।

কবিকঙ্কণের উপাখ্যানটি কবির নিজস্ব নয়। কবির সহানুভূতি ও রসানুভূতির গাঢ়তা সম্পূর্ণ তাঁহার নিজস্ব। চরিত্রগুলির নাম, রূপ ও আচরণ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের ভূষণ ও ভাষণ কবি তাঁহার চারিপাশের ঘরসংসার হইতে সংকলন করিয়াছেন—তাহাদের মধ্যে নিজের হৃদয়খানি সঞ্চারিত করিয়াছেন। কবি প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী সৃষ্টি করিতে পারেন নাই, নিসর্গশ্রীতে প্রাণসঞ্চার করিতে পারেন নাই, কিন্তু মানবসংসারের যে পটভূমিকা ও সামাজিক জীবনের যে আবেষ্টনী সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা যেমন যথাযথ, তেমনি জীবন্ত। কৈলাসভবন হইতে কিরাতভবন পর্য্যন্ত সকল আবেষ্টনীই তাঁহার তুলিকায় রসানুকূল ভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

কবি তাঁহার কাব্য সৃষ্টির মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতিকে একসঙ্গে মিলাইয়াছেন। তাই তিনি চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, প্রকৃত ধর্ম্ম ও ন্যায়, সত্য, সুনীতি ও সতীত্বেরও জয় ঘোষণা করিয়াছেন। কোন প্রকারের ধর্ম্মহানি অথবা নৈতিক অঙ্গহানিকে তিনি উপেক্ষা করিয়া যান নাই—প্রত্যেকটির দণ্ডবিধান করিয়াছেন। সত্যের জন্য বা সতীত্বের জন্য সর্ব্ববিধ দুঃখ-স্বীকারকে তিনি পুরস্কৃত করিয়াছেন। এমন কি, কালকেতু যখন বলিল—"মা, কেন আমি এত দুঃখ পাইলাম?" চণ্ডী বলিলেন, "বৎস, তোমার পশুবধ পাপের এই দণ্ড।"

লহনার চিত্তশুদ্ধি হইল; তাহার মনে কোন মালিন্য থাকিল না। তাহার পুরস্কার সে পাইল—প্রৌঢ় বয়সে সে পুত্রসন্তান লাভ করিল। যে শ্রেণীর কাব্য কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন—সে শ্রেণীর কাব্যের উৎকর্ষের দিক হইতে ইহার মূল্য আছে। কালকেতু যে অগাধ ধন লাভ করিল, কেবল তাহা অসীম দুঃখ ভোগের তপস্যার পুরস্কার স্বরূপ নয়—কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নৈতিক সরলতারও পুরস্কার।

এইকাব্যে শৈবদের সহিত শাক্তদের দ্বন্দ্ব অপেক্ষা ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের, সত্যের সহিত অসত্যের দ্বন্দ্বটি বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। আর একটি দ্বন্দ্ব গোড়া হইতেই চলিয়াছে—সে দ্বন্দ্ব রসসরস্বতীর সহিত চণ্ডীর দ্বন্দ্ব। ইহাতে কে হারিল কে জিতিল, তাহা রসজ্ঞগণের বিচার্য্য। কখনও চণ্ডীর জয় হইয়াছে অর্থাৎ চণ্ডীর পূজা-প্রচারের উদ্দেশ্য প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কখনও রস সরস্বতীর জয় হইয়াছে—চণ্ডীর মহিমা প্রচার গৌণ হইয়া কাব্যরস সৃষ্টিই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে।

ব্যাপারের অনুসরণ,—একটি প্রথা। কবিকঙ্কণ মাসের পর মাস গর্ভের ক্রমোন্মেষ অনুসরণ করিয়াছেন। বৎসরের পর বৎসর বালিকার বিবাহোপযোগিতা লইয়াও আলোচনা আছে। কিন্তু সব চেয়ে কবির বারমাস্যা বর্ণনাই উল্লেখযোগ্য। এই বারমাস্যা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ।

কাহিনীর ক্রম-পরিণতিতে পরে যাহা যাহা ঘটিবে, পূর্ব্বেই তাহা বলিয়া দেওয়ার প্রথা তখনকার কাব্যে প্রচলিত ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সমস্ত গণৎকারের গণনাচ্ছলে তাহার মুখেই বসানো হইত। শ্রীমন্তের বাণিজ্যযাত্রার পূর্ব্বেই সেই প্রথা অনুসারে গণক যাত্রার ফলাফল সমস্তই বলিয়া দিতেছে।

নারদ, বিশ্বকর্ম্মা ও হনুমানের সহায়তা গ্রহণ অধিকাংশ কাব্যেই দেখা যায়। এই সহায়তা গ্রহণও একটি পদ্ধতি। যাহা বিশ্বকর্ম্মা বা হনুমানের সৃষ্টি—তাহার সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য, প্রকৃত-অপ্রাকৃত বিচার করা মূঢ়তা। ইঁহাদের সাহায্য লইয়া কবি বাস্তবতার জবাবদিহি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন।

রামায়ণের হনুমান এ শুধু ধনপতির তরী ডুবায় নাই এবং শ্রীমন্তের সপ্ততরী নির্ম্মাণের ভার লয় নাই, গন্ধমাদন পর্ব্বত আনিয়া বিশল্যকরণীর সাহায্যে সিংহলে মৃত সৈন্যদের পুনর্জীবন দান করিয়াছে।

চৌতিশ অক্ষরে দেবীস্তব সংস্কৃত পুরাণ হইতেই মঙ্গলকাব্যে সঞ্চারিত। কবিকঙ্কণ ইহাকে চৌতিশা বলিয়াছেন—পরবর্ত্তী কাব্যগুলিতে এই প্রথা অনুসৃত হইয়াছে—সকল কালিকামঙ্গলেই এই চৌতিশা আছে।

চণ্ডীর জরতী বেশ ধারণ চণ্ডীমঙ্গল হইতেই অন্নদামঙ্গলে সংক্রামিত। দেবতার শ্লেষে আত্মপরিচয়—ইহা অল্পবিস্তর সকল মঙ্গলকাব্যেই আছে। অন্নদামঙ্গলের এই পরিচয়টি বঙ্গসাহিত্যে খুবই প্রসিদ্ধ। কিন্তু ভারতচন্দ্র ইহার প্রায় সমস্তটুকুই কবিকঙ্কণ হইতেই পাইয়াছেন।

বীভৎস রসের দুই একটা চিত্র সকল মঙ্গলকাব্যেই সংযোজনার প্রথা ছিল। সাধারণতঃ শ্মশান-মশানের বর্ণনা অথবা যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে এই রসের অবতারণা করা হইত। কবিকঙ্কণে সিংহল-যুদ্ধের শেষে এই বর্ণনা আসিয়াছে—ধর্ম্মমঙ্গলের মত ইহা ততটা জুগুপ্সাজনক হয় নাই।

কবিকঙ্কণে চণ্ডীর জরতী বেশের বর্ণনাতেও কিছু বীভৎসতা আছে। মনসামঙ্গলে বেহুলার মান্দাসে লখীন্দরের মৃতদেহ অবলম্বনে বীভৎসরসের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

নানাপ্রকার অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়া কাব্যের সমৃদ্ধি বাড়াইবার প্রথা সেযুগেও কোন কোন অকিঞ্চন বৈষ্ণব কবিদেরও ছিল। কবিকঙ্কণ চেষ্টা করিয়া নানাপ্রকার বক্রোক্তিমূলক অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত দিয়া কাব্যের সমৃদ্ধি বাড়াইতে চাহেন নাই। কবির ভাষা-সুন্দরী পল্লীরমণীর মত নিরাভরণা, সরলা, শুচিস্মিতা, কিন্তু তাহার অঙ্গে শাঁখা-সিন্দুর ও গলায় একগাছা হার যে পাই—তাহা নয়। তবে চন্দ্রহার নাই তাহার কটিতে, কঙ্কণ নাই তাহার প্রকোষ্ঠে, মুক্তার বেড় দেওয়া পাটের জাদ নাই তাহার পয়রে, আর ঝঙ্কার-মুখর নূপুর নাই তাহার চরণে।

কলঙ্ক

(গল্প)

শ্রীঅনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়

মাঠের ধারে প্রকাণ্ড বুড়ো বটগাছটার ছায়ায় কিশোরী বসে পড়ে! আঃ...ওর ক্ষুৎপিপাসাকাতর অবসন্ন দেহটা যেন নিদারুণ ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়তে চায়!...যেন কত যুগ-যুগ সঞ্চিত পুঞ্জীভূত অবসাদ!...আঃ!...কিন্তু না! বসে পড়লে তো ওর চল্‌বে না! যেমন কোরেই হোক্ কিছু শস্যকণা আজ ওকে যোগাড় করতেই হবে। কিছু চাল! অথচ, কোথায়?...কেমন করে?

গভীর হতাশায় ওর সমস্ত মন ছেয়ে গেছে। সকাল হ'তে কার কাছে না ও গিয়েছে? কার কাছে না ভিক্ষে ক'রেছে?...ভিক্ষে?...হাঁ, তাও আজ ওর বাধেনি।... মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের ছেলে কিশোরী। শিক্ষিত, মার্জ্জিত ওর মন,...সুন্দর, সুঠাম ব্যায়ামপুষ্ট দেহ! ভিক্ষা করাকে ও এতদিন মৃত্যুর চাইতেও বেশী কাম্য বলে মনে করত!... ওর অহঙ্কারের ছিটেফোঁটাও আজ আর অবশিষ্ট নেই!...

আশ্চর্য্য!...কত সহজেই না মানুষ কত নিচে নাম্‌তে পারে!...মাত্র কয়েক মাস আগে পর্য্যন্ত কে ভাবতে পেরেছিল যে নলদিঘীর কিশোরী চৌধুরী...গ্রামের সেরা ছেলে...আজ এমন ক'রে ভিক্ষে...

থাক্! ওকথা আজ আর ও ভাবতে চায় না...ভাবলে চল্‌বে না!...হয়তো সুখের দিনের স্মৃতি ওকে চালু করে তুল্‌বে।...আরও...আরও নীচে ও নামতে রাজী আছে। পাতালের পাঁক ঘেঁটেও কী কোন পঙ্কজ মিল্‌বে না?

ওঃ! কি যে একটা অসহ্য জ্বালা আজ দু'দিন হ'তে মাঝে মাঝে ওর সমস্ত পেটটাকে তচনচ ক'রে দিতে চায়?... কে যেন দু'পায়ে দ'লে মাড়িয়ে চলে নাড়ীগুলোকে...অথবা যেন একসঙ্গে শত সহস্র ছুঁচ ফুটতে থাকে...অথবা...

কী যে হয় পেটের মধ্যে ও যেন ঠিক বুঝতে পারে না!

নিজের জন্যে কিশোরী ভাবে না মোটেই—বিধবা বোনটার জন্যেও না কিন্তু ছোট্ট পাঁচ বছরের ভাইটী... দুলাল...

ওঃ! কী দুষ্টুই না হয়েছে ওটা আজকাল

সেদিনের কথা আজও কিশোরীর সামনে বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে!...আর, কতদিন আগেরই বা কথা? মাত্র তিন বছর বৈ তো নয়?

...মৃত্যুশয্যায় বাবা ওর হাতে ছোট ভাইটীকে সঁপে দিয়ে বললেন—"ওর মা নেই কিশোর! আমিও চল্লুম। বড় হতভাগা ওটা। ওকে দেখিস্ কিশোর, দেখিস্! ও যেন কোন দিন আমাদের অভাব না বুঝতে পারে। বড্ড দুষ্টু ও! তা' হোক্, ও বয়সে তুইও অমন ছিলি। ওটুকু সহ্য করিস্!

কিশোরী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আজ পর্য্যন্ত ও তার পালনও ক'রে এসেছে। সহস্র ঝড়ঝাপটার মধ্যে তাকে ও এতটুকু ম্লান হতে দেয় নি।...অথচ আজ? ওর সেই আদরের দুলালকে কাল রাত্রে বোনের কাছে বলতে শোনে— "কাল আমাকে দুটী ভাত দেবে দিদি? দিও না দুটী কি সব খেতে দাও আজকাল! পান্তাই দিও—না হয় দুটী ফ্যানেভাত!...দিদি ওকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে ঘুম পাড়ায়।

পাশের ঘরে কিশোরীর চোখ ফেটে রক্ত বার হতে চায়! ওর দুলাল...ওর কত আদরের ভাই...ওঃ!

দেওয়ালে টাঙানো ফ্যাকাসে হয়ে আসা বাবার ছবিখানার পানে তাকিয়ে ও কেঁদে ফেলে!...ক্ষমা করো, ক্ষমা করো!

প্রতিজ্ঞা করে যেমন করেই হোক্, কাল ও কিছু চাল যোগাড় ক'রে আন্‌বেই! এত লোক পায়, শুধু ওরই বেলায়...

তাই আজ সকাল হতেই ও না বলে বার হ'য়ে পড়ে! কিন্তু কই?...কোথায় মিলবে চাল?...সারা দেশটা থেকে থেকে যেন কোন্ মায়ামন্ত্রে শেষ শস্যকণাটুকু পর্য্যন্ত লুকিয়ে ফেলেছে! আর কতক্ষণ ও জোর ক'রে আশা আঁক্‌ড়ে ধরে থাক্‌বে? আর কতদিন? কত যুগ?...

একটা সশব্দ দীর্ঘশ্বাস ওর পাঁজরের মধ্য হতে বার হয়ে আসে। চমকে ওঠে কিশোরী! না-না, বসে থাক্‌লে ওর চল্‌বে না! যেমন করেই হোক...ওঃ! দেহটাও যেন

সময় বুঝে বিদ্রোহ কর্ত্তে চায়! যেন শেকড় গেড়েছে মাটীর মধ্যে!…

প্রবল একটা কাঁপনি দিয়ে দেহটাকে খাড়া ক'রে ও মাঠটা পার হ'তে থাকে। ওঃ! কী রোদ!…আবার বুঝি পেট্‌টার মধ্যে সেই শয়তানের কাণ্ড আরম্ভ হয়!… আকাশের নীলিমায় যেন ধূসর প্রলেপ।…

আঁধার ক্রমশঃ গাঢ় হ'য়ে আস্‌তে থাকে। কিশোরী ভাবে, ভালই! এ তবু ভালো! আসুক অন্ধকার, আরো, আরো বেশী! ঘন, গাঢ়…মৃত্যু কালো নিবিড় আঁধার নেমে আসুক পৃথিবীর বুকে।…অন্ধ হ'য়ে যাক্ সমস্ত মানব! এর চেয়ে তবু সেও ভাল! মানুষ কোন্ লজ্জায় আর মুখ দেখায়—পরস্পরকে? অন্ধকারেই তারা বেশ থাক্‌বে! লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই, কুণ্ঠা নেই!…সভ্য ভদ্রতার মুখোস্ টান্ মেরে খুলে ফেলে হয়ত তারা দু'দণ্ড সুস্থ, সহজ হ'বার অবসর পায়!…

দূরে ক'য়েকটা আলো টিম্ টিম্ করে। হয়ত কোন গ্রাম!…কিন্তু—না! লোকালয়ে ও আর যাবে না। অন্ধকারে ও তবু একলা,…কিন্তু আলোর মাঝে ও যেন নিজের মধ্যে সমষ্টির দেখা পায়, অনুভব করে ওর একার মধ্যে লক্ষকোটীর সহস্র অভাব-অভিযোগ! না-না, সে অসহ্য! এইখানে এই অন্ধকারেই ও পড়ে থাক্‌বে।…ঘর? সেখানে ফির্‌বে ও কোন্ মুখে? বৃথা…, সমস্ত দিনের অনাহার, পথশ্রম সবকিছু আজ ওর ব্যর্থতায় ভ'রে গেছে।…

দেখেশুনে একটা গাছের তলায় নরম ঘাসের ওপর কিশোরী এলিয়ে দেয় অবসন্ন দেহটাকে!…সোণার কাঠির পরশ লাগে দু'চোখের পাতায় পাতায়…আব্‌ছা, কুহেলিকা-ময় ঐ ক্ষুধার্ত্ত নিরন্ন পৃথিবী, অসীমের বিশাল শূন্যতা কানায় কানায় ভরে গেছে না জানি কার করুণ কান্নায়…

ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ও আবার টের পায় কোন ফাঁকে পুরাণো দানবটাও আবার জেগে উঠেছে পেটের মধ্যে!… ইস্! কী কুৎসিত, কী বীভৎস এই সকালটা!…সমস্ত যেন কোন নবাবী আমলের পোড়ো বাড়ীর মত একান্ত জীর্ণ অবস্থায় কোন মতে খাড়া হয়ে আছে!…কখন হয়ত ভেঙে পড়ে যাবে। যাক্—তাই যাক্! একেবারে গুঁড়ো হ'য়ে যাক্!…এ যে আর দেখা যায় না…অসহ্য! অসহ্য!…

চোখ্ রগ্‌ড়ে কিশোরী উঠে বসে। কী দরকার ছিল ঘুম ভাঙার? কিসের প্রেরণায় ও আজ করবে যাত্রা সুরু?

ওকি? কে শুয়ে না? কিশোরী আশ্চর্য্য হয়!… তাই তো! হাতকয়েক দূরে সত্যিই কে একজন শুয়ে অঘোরে ঘুমোয়! কে? কেও?…হয়ত ওরই মত কোন হতভাগা!…হয়ত দিনান্তের ব্যর্থ ক্লান্তিতে…

কিন্তু, ওর মাথার পাশে কিসের ওই আধখোলা পুঁটুলীটা? চাল না? ঠিক! তাইতো! ওঃ!…

আনন্দে কিশোরী শিষ দিয়ে উঠে। নিষ্প্রভ চোখের তারা দুটো ওর চিক্‌চিক্ ক'রতে থাকে, হয়ত আনন্দে, হয়ত লোভে! ওঃ! আবাল্য পরিচিত এই জিনিষটাকে ও যেন কত যুগ দেখেনি! যেন কতদিনের হারানো একান্ত প্রিয়জনের দেখা পেয়েছে ও!…যেন, যেন…

অত্যধিক আনন্দে কিশোরী যেন ক্ষেপে যায়! চুপি চুপি পা টিপে আগিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে ও পুঁটুলীটা তুলে নেয়! বেশ ভারী আছে! অন্ততঃ সের চারেক তো বটেই! যাক্,—তবু দিনকতক…

হঠাৎ ও যেন হারানো সম্বিত ফিরে পায়। তাইতো! ওকি পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি? এ যে পরের! কে জানে এটা ওর কত কষ্টের সংগ্রহ? হয়ত ওরও সংসারে দুলালের মত ছোট্ট একটী আদুরে ভাই, কিম্বা হয়ত বৃদ্ধা বিধবা মা, প্রতীক্ষারতা স্ত্রী…

হোক্—হোক্ তা!—ওর মনের মধ্যে কে যেন গর্জ্জে ওঠে! কে কার জন্যে ভাবে? ওর দুঃখে কারও তো এককোঁটা দয়া হয় নি! তবে ও-ই বা কেন? চুরি? শেষে চুরি ক'রবে? ক্ষতি কী? কেউ তো দেখছে না! এই নির্জ্জন সকাল, নিদ্রিত পথিক, পাশে একান্ত আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী, এ যোগাযোগ কী নিরর্থক? না, এ সুযোগ ও যেতে দেবে না বৃথায়! চুরিই কর্‌বে! বেশ কর্‌বে! যে যেখানে মরে মরুক্! এই পড়ে পাওয়া রত্নভাণ্ডার যত্ন ক'রে তুলে না নিলে ও নিজেও যে মর্‌বে। ওর দুলাল…

।ক্ষপ্রহস্তে চালের পুঁটুলীটা কিশোরী দু'হাতে তুলে নেয়! একবার বোধ হয় হাত-পাগুলো একটু কেঁপে ওঠে, পরক্ষণেই সারা দেহ মনেও যেন কী এক অজ্ঞাত শক্তির

সন্ধান পায়। শেষবার পিছন ফিরে নিদ্রিতের পানে তাকিয়ে ও মাঠের পানে ছুটতে আরম্ভ করে! পাগলের মত ও ছুটে চলে।…

আঃ! কী আনন্দ কী স্ফূর্ত্তি!… অন্ততঃ ক'টা দিনের জন্যও ও নিশ্চিন্ত…বড়লোক!

তীরের মত বেগে কিশোরী ছুটে চলে। জোরে, আরও জোরে! আরও…আরও, কে জানতো অতীতের প্রসিদ্ধ স্পোর্টস্‌ম্যান্‌ অনাহার-ক্লিষ্ট কিশোরী চৌধুরীর পায়ের প্রত্যেক শুষ্কপ্রায় পেশীগুলোতে আজও এত অসুরের শক্তি লুকানো ছিল?

… … …

হাঁটুদুটো দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে দুলাল জিজ্ঞাসা করে—"কোথায় ছিলে দাদা দু'দিন ধ'রে?"

সস্নেহে তার গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কিশোরী বলে—"তোর জন্যে চাল আনতে গিয়েছিলাম রে! তুই ভাত খাবি কি না, তাই।"

বিধবা দিদি জিজ্ঞাসা করে—"পেলি?"

"পাব' না?" মুরুব্বিয়ানা-চালে কিশোরী জবাব দেয়—"পাব না কি? আমি নিজে বার হয়েছিলাম না? এই নাও—"

নেহাৎ তাচ্ছিল্যভরে পুঁটুলীটা ও উঠানে ফেলে দেয় ধপ ক'রে। গোটাকতক চাল এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। দিদি তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে প্রত্যেকটী চাল খুঁটেখুটে তুলতে থাকে!…কিশোরী ব'লে চলে—"চাল,—জান দিদি, বাজারে যথেষ্ট আছে! ঐ তোমার আড়তদার গুলোই যে ছাড়তে চায় না মোটে! তাই না…মানে যতসব…

… … …

দ্বিতীয় গ্রাস ভাত মুখে তুলবার সময় হঠাৎ কিশোরীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে, প্রকাণ্ড মাঠ…গাছতলায় নিদ্রিত পথচারী, পাশে একটা পুঁটুলী! দু'টী চোখের লোলুপ দৃষ্টি, দু'খানা হাতের নিঃশব্দ চৌর্য্যবৃত্তি…! চুরী…

কিশোরী চমকে ওঠে! গলার মধ্যে ভাতগুলো কিছুতে নামতে চায় না, বিদ্রোহ করেছে যেন! ওঃ! যে ক'টা পেটের মধ্যে গিয়েছিল, তারাও কী আবার ঘুমন্ত দানবটাকে জাগিয়ে তুললো?…ওঃ!…ওঃ!

সমস্ত দেহের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে কী যেন এক বিদ্রোহ…মনের রুদ্ধতম কোণেও যেন কিসের গভীর গ্লানি…কত কলঙ্ককালিমা…থালার সাদা সাদা ভাতগুলো যেন ওকে বিদ্রূপ কর্ত্তে আরম্ভ করেছে! প্রখর দিনের আলো যেন ওর ভিতরটাকে পর্য্যন্ত স্বচ্ছ করে নিয়েছে, ওকে ধরিয়ে দিয়েছে সমস্ত জগতের কাছে! থালাটার পানে ভয়ে ও আর তাকাতে পারে না!…ছুটে গিয়ে রোয়াকের ধারে ব'সে গলায় আঙুল চালিয়ে দেয়!…

ওয়াক্‌! ওয়াক্‌!…

আরও…আরও ভিতরে!…যতদূর যায় আঙুলগুলো! সমস্ত হাতখানাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ভিতরের সমস্ত কিছুকে বার করে আনতে পারলে যেন ও তৃপ্তি পায়!…

সুন্দর মুখখানা ওর রাঙা টকটকে হ'য়ে ওঠে!… চোখ দিয়ে অজস্র ধারায় জল গড়িয়ে পড়তে থাকে! হয়ত যন্ত্রণায়—নয় ত অনুশোচনায়—শব্দ পেয়ে রান্নাঘর হ'তে বার হ'য়ে দিদি ছুটে এসে কাছে দাঁড়ায়। ব্যাকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করে—"কি হোল রে, কিশোর? এঁ্যা—কি হোল বল্‌ না?"

হঠাৎ একটা উদ্গারের সাথে কতকগুলো অর্দ্ধ চর্ব্বিত ভাত বার হ'য়ে এসে উঠোনে ছড়িয়ে পড়ে!

আঃ! এতক্ষণে যেন কিশোরী কতকটা শান্ত হয়। যাক্‌—বার হয়ে গেছে! হাঁফাতে হাঁফাতে ও মুখ না তুলেই দিদির প্রশ্নের জবাব দেয়—"কিছু না—কিছু না! এমনি—মানে হঠাৎ শরীরটা কেমন যেন…যাক্‌গে তুমি ভেবোনা দিদি, ভেবো না! ও সেরে গেছে! সব সেরে গেছে—"

বিজ্ঞান জগৎ

ব্যবহারিক সত্য ও গাণিতিক সত্য

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ব্যবহারিক সত্য ও গাণিতিক সত্য ঠিক এক জিনিস নয়—উভয়ের মধ্যে মাত্রাভেদ ও মূর্ত্তিভেদ রয়েছে। সম্প্রতি ওদের মধ্যে জাতিভেদেরও যে ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তা' জড়বাদের এই পূর্ণ পরিণতির দিনে, কেবল বিজ্ঞান জগতেই নয়, সাংসারিক ও সামাজিক ব্যাপারেও একটা অনিশ্চিত আশা বা আশঙ্কার অস্পষ্ট ইঙ্গিত দান কর্চ্ছে।

উক্ত প্রভেদের প্রধান কারণ এই যে, ব্যবহারিক সত্য-গুলি সত্য হয়ে থাকে বাস্তব জগতের মুখ তাকিয়ে এবং তার মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হয় মানুষের ব্যবহারযোগ্য মাপকাঠিকে আশ্রয় ক'রে; কিন্তু গাণিতিক সত্য আমাদের কারবারের দিকটার ওপর ততটা নজর দেয় না—যতটা দেয় সূক্ষ্ম এবং নির্ভুল হিসাব-নিকাশের ওপর। হিসাব-নিকাশ উভয়ত্রই রয়েছে এবং হিসাবের প্রণালীতেও ইতরবিশেষ নেই, তবু পার্থক্যটা দাঁড়ায় প্রধানতঃ এইজন্য যে, ব্যবহারিক সত্য নির্ণয়ের মাপকাঠিগুলি এমন হবার দরকার যে, তাদের হাতে-কলমে ব্যবহার করা চলে; অন্যপক্ষে, গাণিতিক সত্য নিরূপণের মাপকাঠি বহুক্ষেত্রেই উপস্থিত হয় নিছক কাল্পনিক পদার্থের আকারে। বাস্তব মাপকাঠি স্বভাবতঃই সসীম হয়ে থাকে, কিন্তু কল্পনার মাপকাঠির ক্ষুদ্রত্বেরও যেমন সীমা-পরিসীমা নেই, বৃহত্ত্বেরও তেমনি কূল-কিনারা নেই। আমাদের বাস্তব জ্ঞানের দৌড় দু'দিকেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু কল্পনার স্বাধীনতা লাগামহীন। মাপকাঠি সম্পর্কে এই মূল-গত পার্থক্যই ব্যবহারিক সত্যকে গাণিতিক সত্য থেকে অল্প-বিস্তর পৃথক ক'রে রেখেছে। এই পার্থক্য উপেক্ষা করলে কেবল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, সংসারে ও সমাজেও যে অনেক সময় ঠেকতে ও ঠকতে হয়, নিম্নোক্ত উদাহরণ থেকে তার কতকটা আভাস পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞানের কথা আমরা পরে তুলবো। প্রথমে সাধারণ সাংসারিক ব্যাপার থেকে একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক্। মাসে ৮৲ টাকা হিসাবে চাকর রাখা গেল। পাঁচ দিন কাজ করার পর সে কাজ ছেড়ে চলে যেতে চাইলো। ত্রিশ দিনে মাস। চাকরকে কত দিতে হবে? গাণিতিক হিসাব অক্লেশে বলে দেবে—দিতে হবে ১৲ টাকা ৫ আনা ৪ পাই। কারণ ৫ দিন হল মাসের ষষ্ঠাংশ এবং ৮ টাকাকে ছ'ভাগ করলে ঐ রাশিটাই পাওয়া যায়। কিন্তু সহজেই দেখা যায় এক্ষেত্রে ঠিক হিসাবমত মাইনে চুকিয়ে দেওয়া কার্য্যতঃ সম্ভব নয়, বা সহজ ব্যাপার নয়। ১৲ টাকা ৫ আনা অনায়াসেই দেওয়া যায়, কিন্তু ৪ পাইয়ের বেলাতেই মুশকিল। আগেকার দিনে যখন পাইয়ের প্রচলন ছিল, তখন বাধতোনা, কিন্তু বর্ত্তমানে পাই অচল। ৩ পাইয়ের বদলে একটা পয়সা দিলে অবশ্য দোষ হয় না, কিন্তু পয়সাও আজকের দিনে, অচল না হলেও, অত্যন্ত দুর্লভ পদার্থ। অগত্যা হিসাবের পাওনা থেকে ৪ পাই কেটে নিয়ে চাকরকে বিদেয় করতে হয়। মনিব হয়ত তা'ই চাইবেন, কিন্তু চাকর তা'তে রাজী হবে কেন? সে অবশ্যই বলতে পারে, পয়সা দুর্ঘট হলেও ডবল পয়সা ত দুর্ঘট নয়, আমাকে দু'টা পাই বেশী দিলেই ত চুকে যায়, তার বদলে আমি ৪টা পাই ছেড়ে দিতে যাব কেন? এ নিয়ে মোকদ্দমা হ'লে আদালতকে অবশ্য চাকরের অনু-কূলেই রায় দিতে হবে, কারণ এ ব্যাপারে যখন একজনকে কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে, তখন যে ব্যবস্থায়

ত্যাগের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম হয়, তা'ই হবে বিচারকের লক্ষ্যের বিষয়। কিন্তু চাকরের খুচরা পাওনাটা ৪ পাই না হয়ে যদি ৩ পাই বা এক পয়সা হতো তবেই হাকিমের হতো চক্ষু স্থির। কারণ, তখন চাকরকে তা'র পাওনা পয়সাটা ছেড়ে দিতে তাঁর ন্যায় বিচারে বাধতো, আর না ছাড়লেও মনিব তা' মিটিয়ে দেবে কোত্থেকে সংগ্রহ ক'রে, তা'র নির্দ্দেশ দানও হাকিমের বিশিষ্ট কর্ত্তব্যের অন্তর্গত হতো—যা' সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন, আমরা সবাই জানি, বর্ত্তমানকালে, আমাদের দেশে সহজ ব্যাপার নয়।

মোটের ওপর বিরোধটা দাঁড়ায় গাণিতিক সত্য এবং ব্যবহারিক সত্যের মধ্যে। গাণিতিক সত্য চায় সূক্ষ্ম বিচার এবং তা'র নির্দ্দেশ হচ্ছে পূর্ণ মাত্রায় হিসাব মিটিয়ে দেওয়া, আর ব্যবহারিক সত্য বলতে চায়, এ ক্ষেত্রে পাওনাটা ঠিক মত মেটানো যখন সম্ভব নয়, তখন যতটা সম্ভব তা'কেই খাঁটি সত্য বলে মেনে নিতে হবে। ফলে, হয় চাকরকে নয় মনিবকে কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে। মোটের ওপর দেখা গেল, উভয় সত্যের লক্ষ্য এক হলেও ওদের মাত্রা ও মূর্ত্তি সম্বন্ধে সকল ক্ষেত্রে কাঁটায় কাঁটায় মিল হ'তে পারে না। আরো দেখা গেল যে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বিরোধের সৃষ্টি হচ্ছে ক্ষুদ্রতম মাপকাঠির মাত্রা নির্দ্দেশ নিয়ে।

আবার বৃহত্তম মাপকাঠির মাত্রাভেদ নিয়েও উভয় শ্রেণীর সত্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হতে পারে। এর একটা চল্‌তি উদাহরণ এইরূপ। গরীব বেচারী হরি ঘোষ রামধন পোদ্দারের তহবিল থেকে একটা টাকা ধার নিয়েছে। বন্দোবস্ত এই যে, সামনের বৈশাখে হরি ঘোষকে দেনার অর্দ্ধেক শোধ দিতে হবে, এবং তার পর থেকে প্রতি বৈশাখে, গত বৈশাখের ঠিক অর্দ্ধেক মাত্রায় শুধতে হবে। অধিকন্তু সুদের বালাই নেই। গরীব বলে এই ব্যবস্থা। প্রশ্ন, কত দিনে হরি ঘোষ ঋণমুক্ত হবে? স্পষ্ট দেখা যায়, প্রতি বছরে সে যতটা শোধ দেবে, ঋণও ঠিক ততটাই রয়ে যাবে; যথা—প্রথম বৈশাখে আট আনা শোধ দেবার পর বাকির অঙ্ক হবে আট আনা, দ্বিতীয় বৈশাখে চার আনা শোধের পর বাকি রইবে ঠিক চার আনা এবং এই নিয়মে বছরের পর বছর চলতে থাকবে। ফলে পর পর বৎসরে দেনার মাত্রা দাঁড়াবে—আট আনা, চার আনা, দু' আনা, এক আনা, দু'পয়সা, এক পয়সা, আধ পয়সা, সিকি পয়সা,...এইরূপ কতকগুলি ক্রম-ক্ষীয়মাণ বকেয়া রাশি, যা'রা যতটা কয় হয়, রয়েও যায় ঠিক ততটা পরিমাণে, এবং যাদের উক্তরূপে পর পর লিখে গেলে পাওয়া যায় একটা Infinite Series বা অনন্ত শ্রেণী। এই অনন্ত শ্রেণীটার যোগফল হচ্ছে ঠিক একটাকা। সুতরাং গাণিতিক সত্য দৃঢ় কণ্ঠেই বলবে যে, ঋণমুক্ত হতে হরিঘোষের সময় লাগবে অসংখ্য বৎসর। এর সহজ অর্থ যে, পূর্ণ মাত্রায় ঋণ শোধ করতে হ'লে হরি ঘোষকে বাঁচতে হবে অনন্তকাল। স্পষ্ট বোঝা যায়, ব্যবহারিক সত্য এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লাঠি তুলে দাঁড়াবে। ব্যবহারিক সত্য বলবে, দেনা শোধ হবে ঠিক পাঁচ বৎসরে। এর অনুকূলে প্রথম যুক্তি দেখাবে এই যে, পাঁচ বৎসরে টাকাটার সাড়ে পনের আনাই শোধ হয়ে যাবে এবং বাকি দু' পয়সা শোধের অযোগ্য—কারণ, ঐ নিয়মে শোধ দিতে গিয়ে ষষ্ঠ বৎসরে হরি ঘোষকে শুধতে হবে এক পয়সা, যা' সে খুঁজে পাবে না। সুতরাং কারবারের জগতে ঐ অনন্ত শ্রেণীর প্রথম পাঁচটা অঙ্কেরই মূল্য রয়েছে এবং পরের অঙ্কগুলি সবই অর্থহীন। প্রচলিত মুদ্রার সসীমতাই এক্ষেত্রে ঐ অনন্ত শ্রেণীর অনন্তের পথে অগ্রসর হবার পক্ষে অলঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, যদি ক্ষুদ্রতম মুদ্রার ক্ষুদ্রতার কোন সীমা নাও থাকতো—যদি সিকি পয়সা, পয়সার আট ভাগের এক ভাগ এমন কি লক্ষ ভাগের ভাগ নিয়েও কারবার করা চলতো, তা' হলেও হরি ঘোষকে পূর্ণ মাত্রায় ঋণমুক্ত হবার জন্ম তা'র পরমায়ুর মাপকাঠিকে গড়তে হতো এতবড় ক'রে যা' বাস্তব জগতে পাই-পয়সা বা সিকি-পয়সার চেয়েও বহু গুণে দুর্ল্ভ। হরি ঘোষের পরমায়ু যে অনন্ত নয়, সান্ত, এটা তা'র অপরাধ হতে পারে না; সুতরাং সত্যনিষ্ঠ হরি ঘোষ তার বিবেক-বুদ্ধিকে সান্ত্বনা দেবে এই ব'লে যে, গাণিতিক সত্য নির্ভুল হ'লেও এক্ষেত্রে খাঁটি সত্য নয়,—ব্যবহারিক সত্যই সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র খাঁটি সত্য। সে এও দেখতে পাবে যে, উভয় সত্যের মাপকাঠির মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘটে কেবল ক্ষুদ্রতম রাশির ক্ষুদ্রতার সীমা নিয়েই নয়, বৃহত্তম রাশির বৃহত্তের সীমা নির্দ্দেশ নিয়েও বটে। এ কথাও সে বুঝতে পারবে যে, ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম মাপকাঠিগুলো কখনো উপস্থিত হয়

প্রচলিত মুদ্রার আকারে, কখনো বা মানুষের পরমায়ু আকারে। মোটের ওপর আমরা দেখতে পাই—দেশ, কাল, জড়, সর্ব্বপ্রকার পদার্থের মাপকাঠির মাত্রা নির্দ্দেশ নিয়েই গাণিতিক ও ব্যবহারিক সত্যের মধ্যে বিরোধ চলতে পারে এবং আবহমান কাল চলে আসছে। প্রশ্ন এই, প্রাধান্য দিতে হবে কোন্ সত্যকে? ওর গাণিতিক সূক্ষ্ম হিসাবের কাল্পনিক মূর্ত্তিকে, না অপেক্ষাকৃত স্থূল হিসাবের বাস্তব মূর্ত্তিকে? বিজ্ঞানের তরফ থেকে এ সম্বন্ধে কি বলবার আছে, অতঃপর আমরা তা'র কিছুটা পরিচয় দানের চেষ্টা করবো।

বিজ্ঞানের অবস্থাটা হলো দু' নৌকায় দাঁড়াবার মত। বিজ্ঞানের সকল কারবার ও সকল মাপজোখ, বাস্তব জগৎ ও বাস্তব মাপকাঠি নিয়ে। ফলে, ব্যবহারিক সত্য বা ব্যবহারিক মাপকাঠিকে বিজ্ঞান কোনক্রমেই উপেক্ষা করতে পারে না। আবার যে সকল Formula বা সূত্রের ভেতর দিয়ে বৈজ্ঞানিকগণ প্রাকৃতিক নিয়মসমূহকে ফুটিয়ে তুলতে চান, গণিতের উত্তমরূপ সূক্ষ্ম ও নির্ভুল হিসাবই হচ্ছে তা'র একমাত্র অবলম্বন। ফলে বিজ্ঞানকে অগ্রসর হ'তে হয় দু' নৌকায় পা দিয়ে বাস্তবের সাথে কল্পনার সামঞ্জস্য বিধান ক'রে। কিন্তু এ ব্যাপারে টাল সামালানো যে কত কঠিন, তা' বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছেন। দু'টা বিভিন্নদিগ্‌গামী চিন্তাধারাকে এক খাতে বহাতে হবে। কাজটা যে সহজ নয়, তা' একটা ছোট দৃষ্টান্তের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে। উদাহরণটা গল্প হলেও সত্য। অধ্যাপক এবং গাণিতিক রূপে সুপরিচিত বন্ধুবর হরিদাস বাগচী মহাশয় একসময়ে বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে হরিদাসবাবু একদিন বলে ফেললেন যে, আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের ওপর তাঁর ভক্তি অনেকটা চটে গেছল এই দেখে যে, বৈজ্ঞানিক তথ্যের ব্যাখ্যা দান উপলক্ষে জগদীশ চন্দ্র ক্লাশে এক দিন যে আঁক কষলেন, তার ফলটা লিখলেন $\cdot 5 = \frac{1}{2}$ (nearly) হরিদাসবাবুর রাগের কারণ হয়েছিল ঐ 'nearly' শব্দটা। ·5 যে হুবহু $\frac{1}{2}$-এর সমান, ওর পাশে 'nearly' লেখা চলে না, এ খেয়াল জগদীশচন্দ্রের নেই! হরিদাসবাবুর বিস্ময়ের বিষয় এইটাই। এখানে আমাদের দেখবার বিষয় এই যে, গাণিতিকের এই বিস্ময় এবং বৈজ্ঞানিকের এই অখেয়ালের মধ্যে বনিবনাও হতে পারে কি না। একদিকে গাণিতিক চান নির্ভুল গণনা, অপরদিকে বৈজ্ঞানিককে সত্য আবিষ্কার করতে হয় মাপজোখ করে, যা' কোন ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ নির্ভুল হয় না। এর কারণ আমাদের অজানা নয়। বাস্তব মাপকাঠি মাত্রেরই ক্ষুদ্রতার সীমা রয়েছে এবং আমাদের দৃষ্টিশক্তির সূক্ষ্মতাও অসীম সূক্ষ্ম নয়। ফলে পরিমাপলব্ধ রাশিগুলির মধ্যে বৈজ্ঞানিক যে সম্বন্ধটা গড়ে তোলেন, তা' সাধারণতঃ সরল মূর্ত্তি গ্রহণ না ক'রে অপেক্ষাকৃত জটিল আকার ধারণ করে। বৈজ্ঞানিক জানেন ঐ সম্বন্ধ বা নিয়মটা বস্তুতঃ সরল। ওকে জটিল আকারে পাওয়া যাচ্ছে শুধু এইজন্য যে, যে সকল পরিমাপকে ভিত্তি ক'রে নিয়মটার আবিষ্কার, তা'র কোনটাই সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। তাই কোন জটিল সম্বন্ধ বা জটিল অঙ্ককে তার অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী সরল সম্বন্ধ বা সরল অঙ্ক দ্বারা প্রকাশ ক'রে তার পাশে ব্রাকেটে 'nearly' লেখাটা বৈজ্ঞানিক মাত্রেরই একটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায়। এ অভ্যাস অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের ফল। গণিত ও বিজ্ঞানের এই বিরোধ শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থেকে। দৃষ্টিভঙ্গী মিলিয়ে নিতে পারলে বিরোধটাও ঘুচে যায়। এই উদাহরণ থেকে ব্যবহারিক ও গাণিতিক সত্যের মধ্যে পার্থক্যটা যেমন সহজে আমাদের নজরে পড়ে, সেইরূপ ওদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনীয়তাও স্পষ্ট উপলব্ধ হয়।

সত্য কথা এই যে, বিজ্ঞান এ যাবৎ সত্যের ব্যবহারিক মূর্ত্তিকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমে বদলে যাচ্ছে। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ, প্লাঙ্কের কণাবাদ, ব্রগলির জড় তরঙ্গবাদ এবং হাইসেন্‌বার্গের অনিশ্চয়তাবাদ বর্ত্তমান বিজ্ঞান জগতে এমন একটা ওলট-পালটের সৃষ্টি করেছে যে, বৈজ্ঞানিক-সমাজের গতানুগতিক চিন্তাধারা সহসা দিশে-হারা হয়ে পড়েছে। মোটের ওপর আধুনিক বিজ্ঞানের ঝোঁকটা দেখা যাচ্ছে নিছক গাণিতিক সত্যের অভিমুখে। নব্য বিজ্ঞান বলতে চায় জড়জগতের বাস্তবরূপ খুঁজে আমরা এ যাবৎ হয়রাণ হয়েছি মাত্র। ওর সত্যকার রূপ আমরা

এযাবৎ জানতে পারি নি, ভবিষ্যতে পারবো ব'লে ভরসাও বিশেষ নেই। যা' জানা সম্ভবপর, তা' হচ্ছে ওর গাণিতিক মূর্ত্তি—কতকগুলি Formula বা সূত্রমাত্র। এই Formula গুলি বিভিন্ন বাস্তব পদার্থের মধ্যে নানারকমের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করে। এই সম্বন্ধগুলিকে বলা যায় প্রাকৃতিক নিয়ম। আমাদের প্রকৃত কারবার এদের নিয়েই। যে সকল বাস্তব রাশির (দেশ, কাল, জড়, তড়িৎ, চুম্বক, বল, শক্তি প্রভৃতির) মধ্যে সম্বন্ধ তাদের স্বরূপের কথা তুললেই বিভ্রাটে পড়তে হবে। এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত, অথচ কোন মতই সম্পূর্ণ মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই সকল উক্তির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত এই যে, পাশ্চাত্ত্য জড়বাদ ক্রমেই অনিশ্চয়তাবাদ ও অধ্যাত্মবাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

এ কথা স্বীকার্য্য যে, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি সম্ভব হয়েছে জড়বাদকে আশ্রয় ক'রে। এই মতবাদের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রায় তিন শতাব্দী পূর্ব্বে এবং তা' হতে পেরেছিল নিউটনীয় গতিবিজ্ঞানকে আশ্রয় করে যার মূল সূত্র হচ্ছে নিউটন বর্ণিত জড়ের গতি সম্পর্কীয় নিয়ম-ত্রয় এবং তার মহাকর্ষের নিয়ম—The three laws of motion and the Law of Gravitation. জড়বাদীর মূল বক্তব্য এই যে, বাস্তব সত্তা রয়েছে শুধু জড়বস্তুসমূহের—সংখ্যাতীত জড়কণা এবং কণার সমষ্টিরূপে জড়পিণ্ডগুলির। ছড়িয়ে রয়েছে ওরা সমগ্র বিশ্বে এবং ছুটোছুটি করছে অহরহঃ। এই গতি উদ্দেশ্যহীন কিন্তু বিশৃঙ্খল নয়—গতি বিজ্ঞানের নিয়মত্রয় এবং মহাকর্ষের নিয়ম দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। এই সকল নিয়ম আমাদের জানা আছে, সুতরাং ঘটনাময় জগতের বর্ত্তমান চিত্রটার দিকে তাকিয়ে এবং বিভিন্ন জড়-দ্রব্যের অবস্থান ও গতিবেগ পরিমাপ ক'রে সুদূর অতীতে কখন কি ঘটেছিল এবং ভবিষ্যতের তিমিরগর্ভে কখন কি ঘটবে, তা' আমরা নির্ভুল রূপেই গণে বলে দিতে পারি। তাই যখন পারি, তখন জগৎযন্ত্র পরিচালনের পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য আছে কি নেই, কিম্বা ওর কোন চালক রয়েছে কি না—তা' নিয়ে মাথা ঘামাবার আমাদের প্রয়োজন নেই। এই হলো খাঁটি জড়বাদের গর্ব্বিত উক্তি। নীহারিকাবাদের প্রতিষ্ঠাতা লাপ্লাস যখন বিশ্বের অভিব্যক্তি সম্পর্কীয় তাঁর গ্রন্থখানি নেপোলিয়নকে উপহার দিয়েছিলেন, তখন সম্রাট তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আচ্ছা লাপ্লাস, তোমার পুস্তকে বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তাকে তুমি কোথায় বসিয়েছ?" উত্তরে লাপ্লাস বলেছিলেন, "Sire, I have managed without Him" পরবর্ত্তীকালে লাপ্লাসের মত বদলে গেছিল, কিন্তু খাঁটি জড়বাদের লক্ষ্য ঐ-ই—To manage without Him. এই মতবাদ নাস্তিকতারই নামান্তর। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নিউটনীয় গতিবিজ্ঞান এই মতবাদের প্রধান স্তম্ভ হ'লেও নিউটন স্বয়ং ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন

সে যাই হোক, জড়বাদী বৈজ্ঞানিকের কাছে এ যাবৎ জড়ের বাস্তব সত্তাই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। ফলে বিজ্ঞানের পটভূমিতে ব্যবহারিক সত্যই খাঁটি সত্য—এই মত আঁকড়ে ধরে পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণ এ যাবৎ জগতের খাঁটি চিত্র অঙ্কনে প্রয়াসী হয়েছিলেন এবং বিশ্বসৃষ্টির মূল উপাদানরূপে গ্রহণ করেছিলেন অণু ও পরমাণুরূপী কতগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অথচ সসীম জড়কণাকে—যাদের গ'ণে শেষ করা যায় না এবং যারা বিশিষ্ট অর্থে অচ্ছেদ্য অভেদ্য অজয় ও অমর। কিন্তু তাঁদের এ চেষ্টা সফল হয় নি। ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হ'তে না হ'তে পরমাণুগুলি ভেঙ্গে চুরে ইলেক্ট্রন্, প্রোটন্, পজিট্রন নামক বিভিন্ন সূক্ষ্মতর কণায় বিভক্ত হয়ে তাঁদের জানিয়ে দিল যে, অণুপরমাণুরূপ যে-সকল সসীম মাপকাঠিকে আশ্রয় করে তোমরা জগৎযন্ত্রের স্বরূপ বর্ণনায় অগ্রসর হয়েছিলে, তারা অচ্ছেদ্য বা অভেদ্য নয় এবং আদৌ মাপকাঠি হবার যোগ্য নয়; সুতরাং বিশ্ব রচনার মূল ভিত্তির সন্ধানে তোমাদের নূতন পথের পথিক হতে হবে।

আকবরের রাষ্ট্রসাধনা

এস, ওয়াজেদ আলি, বি-এ (কেন্টাব), বার-এট-ল

চুয়াল্লিশ

পিতা হুমায়ুনের মৃত্যুর পর ১৫৫৬ খৃঃ অব্দে আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। বয়স তখন তাঁর মাত্র ত্রয়োদশ বৎসর। হুমায়ুনের বিশ্বস্ত সেনাপতি বৈরাম খাঁন আকবরের অভিভাবক রূপে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। আকবরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোহাম্মদ হাকেম উত্তরাধিকার সূত্রে কাবুল রাজ্য লাভ করেন।

দিল্লীর সুর বংশীয় যোদ্ধা সেকেন্দার সুরকে পরাজিত ক'রে হুমায়ুন পৈতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধার করেছিলেন সে কিন্তু নামে মাত্র। ভারতবর্ষ তখন বিভিন্ন খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত। পরাজিত সেকেন্দার সুর উত্তর-ভারতে নিজের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। সুর বংশের সিংহাসনচ্যুত বাদশা মোহাম্মদ শাহ আদীল সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চলে নিজের অধিকার বিস্তার করবার চেষ্টা করছিলেন। আদীলের সুযোগ্য হিন্দু সেনাপতি হীমু বিরাট এক বাহিনী সংগ্রহ করে মোগলদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। পাণিপথের ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মোগলবাহিনীকে পরিচালিত করেছিলেন বৈরাম খাঁন। তাঁর কর্ম্মকুশলতার ফলে পাঠানবাহিনী সম্পূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত হয়। হীমু বন্দী হন। এই যুদ্ধেব ফলে আকবর দিল্লীর সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন।

পাঠান-নেতা সিকান্দার সুর সেওয়ালিক পর্ব্বতশ্রেণীতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। বৈরাম খাঁন তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজ পাঠালেন। মোগলবাহিনী সেকেন্দারকে মানকোট দুর্গে অবরুদ্ধ করে। তিনি শেষে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। আকবরের তরফ থেকে ভরণ-পোষণের জন্য সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চলে তাঁকে যথেষ্ট জায়গীর দান করা হয়। সুরবংশীয়দের দ্বিতীয় নেতা মোহাম্মদ আদীল বাঙ্গালার নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করে ১৫৫৭ খৃঃ অব্দে নিহত হন। ফলে আকবরের তিনটী প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। বৈরাম খাঁনের চেষ্টায় ১৫৫৮ খৃঃ অব্দে আজমীর, গোয়ালিয়ার এবং জোনপুর, মোগল শাসনাধীনে আসে। দিল্লী এবং আগরা পূর্ব্বেই হস্তগত হয়েছিল। বৈরাম খাঁন এখন এই সব বিজিত রাজ্যের শাসন-সৌকার্য্যে আত্মনিয়োগ করলেন।

পঁয়তাল্লিশ

বৈরাম খাঁন উদ্ধত প্রকৃতির এবং ক্ষমতাপ্রিয় লোক ছিলেন। আকবরকে তিনি নিজের মুঠার মধ্যে রাখার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। ফলে তরুণ সম্রাটের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। প্রাসাদের মহিলারা এবং দরবারের লোকেরা এই বিরোধকে জটিল এবং ঘনীভূত করে তুললেন। আকবর শেষে নিজেকে বৈরাম খাঁনের আধিপত্য থেকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে রাজধানী দিল্লীতে এসে উপস্থিত হলেন এবং রাজকীয় এক ঘোষণা প্রচার করে রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন এবং বৈরাম খাঁনকে মক্কা যাত্রা করবার জন্য আদেশ দিলেন। ফলে বৈরাম খাঁন আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করলেন। যুদ্ধে কিন্তু বৈরাম খাঁন সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হলেন এবং বন্দী অবস্থায় বাদশার সকাশে নীত হলেন। বৃদ্ধ সেনাপতি নতজানু হয়ে বাদশার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

আকবর তাঁর সঙ্গে যে ব্যবহার করেন তা থেকে তাঁর চরিত্রের স্বাভাবিক মহত্ত্ব এবং উদারতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। বৃদ্ধ সেনাপতিকে ভূমিতল থেকে সযত্নে উঠিয়ে, সিংহাসনের পার্শ্বে, সমবেত আমীর-ওমরাহদের শীর্ষস্থানে তাকে তিনি সাদরে বসালেন। সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে মূল্যবান্ খেলাতে তাকে বিভূষিত করলেন। আর উভয় পক্ষের ভবিষ্যত মঙ্গলের জন্য তাঁর কাছে তিনটী প্রস্তাব উপস্থিত ক'রে তাদের যে কোন একটীকে নির্ব্বাচন করতে তাঁকে অনুরোধ করলেন। প্রস্তাবগুলি হচ্ছে (১) তিনি যদি দরবারে থাকতে চান তাহ'লে রাজবংশের উপকারী বন্ধুরূপে তাঁকে সর্ব্বোচ্চ সম্মান দান করা হবে, (২) তিনি যদি চাকরি করতে চান তাহ'লে তাঁকে কোন একটী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হবে, আর (৩) তিনি যদি ধর্ম্মসাধনার জন্য রাজকার্য্য থেকে অবসর গ্রহণ করতে চান, তাহ'লে তাঁকে প্রচুর ধনসম্পদ্ দান করা হবে এবং মক্কা গমনের সুবিধার জন্য যথেষ্ট দ্রব্যসম্ভার এবং দেহরক্ষী সৈনিক প্রভৃতি দেওয়া হবে।

বৈরাম খাঁন এই শেষোক্ত প্রস্তাবই গ্রহণ করেন। বাদশা তাঁর ভরণ-পোষণের জন্য যথেষ্ট বৃত্তির ব্যবস্থা করেন এবং তার অনুগমনের জন্য যথেষ্টসংখ্যক দেহরক্ষী নিযুক্ত করেন। বৈরাম খাঁন মক্কায় উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে এক ব্যক্তিগত শত্রুর হস্তে তিনি নিহত হন। আকবর বৈরাম খাঁনের সঙ্গে যে উদার ব্যবহার করেছিলেন, প্রত্যেক পরাজিত শত্রুর প্রতিই তিনি সেই ব্যবহার করেন। এদিক থেকে পৃথিবীর ইতিহাসে আকবরের তুলনা পাওয়া যায় না। তিনি যুদ্ধে যেমন অতুলনীয় বীরত্ব দেখিয়েছেন, যুদ্ধ-বিরতির পর তেমনি অতুলনীয় মহানুভব দেখিয়ে শত্রুর মন জয় করেছেন। অমানুষিক শৌর্য্য এবং দেবতুল্য মহানুভবতা, এই দুই উপাদানে আকবরের চরিত্র গঠিত হয়েছিল। শক্তির এবং করুণার এমন অপূর্ব্ব সমাবেশ আর কখনও হয় নি।

ছেচল্লিশ

সপ্তদশ বর্ষীয় তরুণ বাদশা সাম্রাজ্যের তরঙ্গবেষ্টিত তরণীর পরিচালনার ভার এবার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। বৈরাম খাঁন দিল্লী, আগরা, আজমীর, গোয়ালিয়র এবং জোনপুর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে গিয়েছিলেন। আকবর ধীরে ধীরে মোগল-শাসন সমস্ত ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর মৃত্যুর সময়, অর্থাৎ ১৬০৫ খৃঃ অব্দে মোগল সাম্রাজ্য সমগ্র উত্তর-ভারতে এবং দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করেছিল। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে গোদাবরী, পশ্চিমে আরব সাগর এবং পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর— এই ছিল আকবরের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের সরহদ্দ। এই বিশাল সাম্রাজ্য অষ্টাদশ প্রদেশে বিভক্ত ছিল, যথা, (১) দিল্লী (২) আগ্রা, (৩) অযোধ্যা (৪) এলাহাবাদ (৫) আজমীর (৬) গুজরাট (৭) বাঙ্গালা (৮) বিহার (৯) উড়িষ্যা (১০) মালওয়া (১১) সিন্ধু (১২) মুলতান (১৩) লাহোর (১৪) কাবুল (১৫) কাশ্মীর (১৬) খান্দেশ (১৭) আহম্মদ নগর (১৮) আসির গড়।

আকবর তাঁর এই সুবিশাল সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর অসাধারণ সমর-কুশলতা এবং অতুলনীয় রাজনীতি-জ্ঞানের সাহায্যে। যোদ্ধা হিসাবে আকবরের বৈশিষ্ট্য কি ছিল তারই এখন আলোচনা করা যাক।

সাতচল্লিশ

একজন আদর্শ যোদ্ধার সব গুণই আকবরের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। তিনি স্বল্পাহারী ছিলেন। তাঁর দৈনন্দিন জীবন সর্ব্বদা সুনিয়ন্ত্রিত থাকতো। সদাই তিনি কাজে রত থাকতেন। তিন ঘণ্টার বেশী তিনি শুতেন না। নিদ্রিত অবস্থাতেও তিনি সজাগ থাকতেন। যে সব খেলা শরীরের শক্তি বাড়ায় এবং মানুষকে কর্ম্মঠ করে তোলে সে সব তিনি একান্তভাবে ভাল বাসতেন। ঘোড়া দৌড়ে পলো (Polo) খেলতে তিনি খুব ভাল বাসতেন। রাত্রিযোগে আগুনের বলের সাহায্যে তিনি পলো খেলা উপভোগ করতেন। ব্যাঘ্র, হস্তী, চিতা প্রভৃতি বন্যজন্তুর শিকার বিশেষ ভাবে তিনি উপভোগ করতেন। এক দিনের মধ্যে একবার তিনি ৩৫০টী হস্তী বন্দী করেছিলেন। একবার একাদিক্রমে তিনি ৩৫ মাইল পথ বন্য গর্দ্দভের এক দলের অনুসরণ করেন এবং ১৬টী গর্দ্দভ শীকার করেন। আজমীর থেকে আগরা পর্য্যন্ত যে সুদীর্ঘ ২৪০ মাইল বিস্তৃত পথ আছে, সে পথ তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে অতিক্রম করতেন। একটী অশ্ব ক্লান্ত হলে অন্য অশ্বের সাহায্যে তিনি পথ অতিক্রম করতেন।

যুদ্ধে তিনি ক্লান্তি জানতেন না। শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি এত দ্রুত অগ্রসর হতেন যে, ফৌজের লোকেরা অনেক পিছনে পড়ে থাকতে বাধ্য হত। কয়েকজন মাত্র সঙ্গী নিয়ে সর্ব্বাগ্রে তিনি আক্রমণ করতেন। তাঁর গতিবেগ দেখে বিস্মিত শত্রু পলায়ন পর হতো।

ভয় যে কি জিনিস আকবর তা জানতেন না। ১৫৭২ খৃঃ অব্দে তিনি সুরাটের মির্জ্জাদের আক্রমণ করেন। চিরাচরিত প্রথামত বিদ্যুৎ গতিতে তিনি অগ্রসর হন। মাহেন্দ্রী নদীর তীরে উপস্থিত হয়ে তিনি দেখলেন মাত্র চাল্লিশজন লোক তাঁর সঙ্গে আসতে সক্ষম হয়েছে। অবশিষ্ট বাহিনী পিছনে পড়ে আছে। কিছুক্ষণ পর আরও ষাটজন লোক এসে উপস্থিত হলো। এই একশত জন লোক সঙ্গে নিয়েই সন্তরণের সাহায্যে নদী অতিক্রম করে তিনি নগর দখল করলেন। আর নগরপ্রান্তে অবস্থিত শত্রু-বাহিনীকে আক্রমণ করলেন। শত্রুরা সংখ্যায় ছিল দশগুণ। ভীষণ যুদ্ধ চলতে লাগলো। আকবর এমন এক কণ্টকাকীর্ণ

স্থানে উপস্থিত হলেন, যেখানে একসঙ্গে তিনজন অশ্বারোহীর বেশী অগ্রসর হতে পারতো না। তিনি স্বয়ং তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনীর অগ্রভাগে ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন রাজপুতবীর ভগবান দাস এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার মানসিংহ (উত্তর কালে ইনি আকবরের প্রধান সেনাপতি হয়েছিলেন)। তিনজন অশ্বারোহী শত্রু একসঙ্গে তাঁদের আক্রমণ করলে। ভগবান দাস বর্শার আঘাতে একজন শত্রুকে ভূপাতিত করলেন। অবশিষ্ট দুইজনকে আকবর এবং মানসিংহ ভূপাতিত করলেন। ইতিমধ্যে দুইজন সেনানী আকবরের সাহায্যের জন্য এসে উপস্থিত হলেন। আকবর বললেন আমাকে রক্ষা করবার জন্য তোমাদের এখানে থাকার দরকার নেই। তোমরা পলায়নপর শত্রুদের অনুসরণ কর। এখানে বলে রাখা দরকার যে, বাদশা এবং রাজপুত বীরদ্বয়ের বিক্রম দেখে শত্রু পলায়নপর হয়েছিল। বাদশার সাহস এবং বীরত্বে অনুপ্রাণিত হইয়ে শাহী ফৌজের লোকেরা ভীম পরাক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলো। অচিরে শত্রুবাহিনী শোচনীয় ভাবে পরাভূত হল। আকবর নদী সন্তরণে অসাধারণ পটুত্ব রাখতেন আর অনেকবার সন্তরণের সাহায্যে নদী অতিক্রম করে তিনি শত্রুকে বিস্মিত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় করেছিলেন।

আটচল্লিশ

সেনাপতি হিসাবে তখনকার যুগে আকবরের একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। যুদ্ধের কাজে যন্ত্রপাতির ব্যবহারের তিনি পক্ষপাতি ছিলেন। যন্ত্রপাতির নির্মাণে এবং ব্যবহারিক প্রয়োগে তিনি অসাধারণ পটুত্ব রাখতেন। প্রকৃতপক্ষে একজন অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকের মনোবৃত্তির তিনি অধিকারী ছিলেন। তিনি এক প্রকার তোপের নল উদ্ভাবন করেছিলেন যা গোলা বর্ষণে ফাটতো না। তিনি একপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন যার সাহায্যে ১৬টী তোপের নলকে একসঙ্গে পরিষ্কার করা যেতো। আর একপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন যার সাহায্যে একসঙ্গে ১৭টী তোপ থেকে একই আলোকশিখার সাহায্যে অগ্নি সংযোগ করা যেতো। আরও বহু রকমের যন্ত্রপাতির আবিষ্কার তিনি করেছিলেন।

প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যেই আকবর মিবারের দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধাদের পরাভূত করেন। মিবারের রাণা উদয় সিং আকবরের বিরুদ্ধে বৈরিভাব পোষণ করতেন। মালওয়ার পাঠান নরপতি বাজ বাহাদুর মোগলদের কাছে পরাজিত হয়ে উদয় সিংহের আশ্রয় নেন। রাজপুতনার অন্যান্য রাজন্যেরা এসে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলেন। উদয়সিং দূরেই রইলেন। এই সব বিভিন্ন কারণে সম্রাটের সঙ্গে মিবারের যুদ্ধ অনিবার্য্য হয়ে উঠে।

মিবারের রাজধানী চিতোর গড়। এই দুর্গ অজেয় বলেই মিবারবাসীরা বিশ্বাস করতো। বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে সুউচ্চ এক পর্ব্বতশিখরে চিতোর অবস্থিত। এই পর্ব্বত সমতল ভূমি থেকে সোজা চারিশত ফিট উচ্চে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পর্ব্বত-শিখরে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর একান্ত মজবুত ভাবে প্রস্তুত এই দুর্গ যেন শত্রুকে পরিহাস করছে। দুর্গে খাদ্য সম্ভার সর্ব্বদা যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত থাকতো। ব্যবহার্য্য জলের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি দুর্গের মধ্যে ছিল। আট সহস্র দুর্দ্ধর্ষ খিলোট যোদ্ধা দুর্গ-রক্ষার জন্য মোতায়েন ছিল, আর তাদের সেনাপতি ছিলেন বিখ্যাত বীর রাজা জয়মল্ল। আকবর যখন চিতোরের উদ্দেশ্যে অভিযান করলেন রাণা উদয়সিংহ তখন রাজধানীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার জয়মল্লের হস্তে ছেড়ে স্বয়ং আরাবলীর দুর্গম পর্ব্বতশ্রেণীতে গিয়া আশ্রয় নিলেন।

তারিখে আলফির লেখক এই স্মরণীয় যুদ্ধের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন :

"চিতোর দুর্গ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে এক পর্ব্বতচূড়ায় অবস্থিত। আর কোন পাহাড় কিম্বা পর্ব্বত সে প্রান্তরে নাই। পর্ব্বত মূলের পরিধি হচ্ছে ১২ মাইল। এই পর্ব্বতের পূর্ব্ব এবং উত্তরদিকে আছে সোজা, অতি শক্ত পাথর। সে দিক থেকে শত্রুর আক্রমণ একেবারে অসম্ভব। অবশিষ্ট দুইদিক থেকেও কামান, প্রস্তর-নিক্ষেপকারী যন্ত্র, প্রস্তর খননকারী যন্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে দুর্গের বিশেষ কোন ক্ষতি করা যায় না। এরূপ সুরক্ষিত দুর্গ যে পৃথিবীর আর কোথাও আছে, ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্ত পড়ে তা তো মনে হয় না। পর্ব্বতের বিস্তীর্ণ মালভূমি সুউচ্চ অট্টালিকারাজিতে ভরা। বহু তল বিশিষ্ট সে সব অট্টালিকা। দুর্গের প্রাকার দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধাদের দ্বারা সুরক্ষিত। দুর্গে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রসদ সঞ্চিত।

দুর্গের সৈনিকেরা যখন শুনলে যে দিল্লীর বাদশাহ তিন চার সহস্র সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে দুর্গ অবরোধ করতে আসছেন, তখন তারা বিদ্রূপের হাসি হাসতে লাগলো। তাদের সে হাসিতে আশ্চর্য্য হবার কিছু ছিল না।"

তবে চিতোরবাসীদের বিরুদ্ধে যিনি শক্তিপরীক্ষায় অগ্রসর হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার—দুর্ব্বার যান্ত্রিক শক্তির পরিচালক। বিজ্ঞানের সাহায্যে অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করেছিলেন। বিশেষ যন্ত্রের সঙ্গে আকবর অবরোধ কার্য্য আরম্ভ করলেন। দুর্গের চতুর্দ্দিকে কামানের ব্যূহ রচনা করা হল। স্থানটিকে চতুর্দ্দিক থেকে অবরোধ করা হল। যাতে বাহির থেকে কোন সাহায্য আসতে না পারে এই উদ্দেশ্যে আকবর দক্ষ সেনানীদের অধীনে দুইটি বাহিনী পাঠালেন রামপুর এবং উদয়পুর নামক নিকটস্থ স্থান দুটিকে দখল করতে এবং আশপাশের লোকালয় শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি বিধ্বস্ত করতে। অবরোধকারী ফৌজ প্রত্যেক দিনই অবরোধের জালকে সংকীর্ণতর করতে লাগলো। বলাবাহুল্য অবরুদ্ধ বাহিনীর অগ্নি বর্ষণের ফলে বহুলোক হতাহত হয়েছিল। কিন্তু শাহী ফৌজের উদ্যম তাতে কিছুমাত্র কমেনি। বাদশা পরিখা, সুড়ঙ্গ প্রভৃতি খনন করতে আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় পাঁচ হাজার ছুতার মিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী, কামার, কোদালধারী মজুর প্রভৃতি একত্রিত করা হল। "সাবাত" বা সুড়ঙ্গ ছিল হিন্দুস্থানের বিশিষ্ট একটি যুদ্ধ-কৌশল। সে যুগের সুরক্ষিত দুর্গগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণে তোপ, বন্দুক প্রভৃতি আত্মরক্ষার অস্ত্রশস্ত্র এবং যন্ত্রপাতি মজুদ থাকতো। সাবাত বা সুড়ঙ্গের সাহায্য ছাড়া এসব স্থানকে হস্তগত করা যেতো না। সাবাত বা সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করা হতো, একটি প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করে আর তার উপরিভাগ ইষ্টক প্রস্তর প্রভৃতির সাহায্যে সুরক্ষিত করে। এই সাবাতের আশ্রয়ে আক্রমণকারীরা নির্ব্বিঘ্নে দুর্গের প্রাকার পর্য্যন্ত পৌঁছে যেতো, আর সেখান থেকে দুর্গের ভিতরে আক্রমণ চালাতো। আকবর এক সঙ্গে দুইটি "সাবাত" প্রস্তুত করতে আদেশ দিলেন, তাদের একটির মুখ প্রাসাদের দিকে। এই সাবাতটি এত চওড়া এবং উঁচু করে প্রস্তুত করা হয়েছিল যে, দুইটি হস্তী এবং দুইটি অশ্ব তাদের আরোহীদের উচ্চ বর্শা সমেৎ এক লাইনে এই প্রচ্ছন্ন পথ বেয়ে অগ্রসর হতে পারতো। এই সাবাত আরম্ভ করা হয়েছিল নিম্নের পাহাড়ের চূড়া থেকে—যেখান হতে উপরের পাহাড়টা সোজা উঁচু হয়ে উঠেছিল। সাত আট হাজার শত্রুসৈন্য এবং গোলন্দাজ এই সমস্ত নির্ম্মাণের কাজে বাধা দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। মিস্ত্রী মজুর প্রভৃতিকে রক্ষা করার জন্য গরুর চামড়ার ছাউনি প্রস্তুত করা হয়েছিল। তবু কিন্তু প্রত্যহ শতাধিক লোক শত্রুর গুলির আঘাতে নিহত হতো। নিহত লোকদের সুড়ঙ্গের দেয়ালের মধ্যেই কবরস্থ করে মিস্ত্রী এবং মজুরেরা কাজ করে যাচ্ছিল। আকবর হুকুম দিয়েছিলেন কাউকে জোর করে খাটানো হবে না। অজস্র পুরস্কারের সাহায্যে স্বেচ্ছা-কর্ম্মীদের উৎসাহিত করা হয়েছিল। অনতিবিলম্বে একটা "সাবাত" দুর্গপ্রাকারের উপরিভাগ পর্য্যন্ত পৌঁছে গেল। সাবাতের ছাদের উপর একটা গ্যালারী প্রস্তুত করা হ'ল, বাদশা যাতে করে সেখান থেকে শত্রুবাহিনী পর্য্যবেক্ষণ করতে পারেন সেই জন্য।

ইতিমধ্যে খননকারীরাও অলস ছিল না। দুর্গের দুইটা বুরুজের নিম্নভাগ খুঁড়ে সেইখানে বারুদ ঢালা হল। যথা সময় বারুদে অগ্নিসংযোগ করা হল। একটী বুরুজ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। শাহী ফৌজ জয়ধ্বনি করতে করতে দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে। উভয় দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে, হিসাবের একটু ভুল হওয়ার দরুণ, দ্বিতীয় "মাইন"-টীও ভীষণ এক বিস্ফোরণের সৃষ্টি করলে। ফলে যুদ্ধরত উভয় দলের লোকই খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হ'ল। এই "মাইনে" বিস্ফোরক পদার্থ এমন সুকৌশলে রাখা হয়েছিল, যে, ইট, শিলাখণ্ড, শবদেহ প্রভৃতি কয়েক মাইল দূরে গিয়ে পড়ল। শাহী-ফৌজের লোকেরা ধুঁয়া, ধূলা, শিলাখণ্ড এবং শবদেহের অজস্র বর্ষণে ক্ষণেকের তরে দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছিল।

প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হল। আকবর দ্বিতীয় "সাবাতের" নির্ম্মাণকার্য্য যতদূর সম্ভব দ্রুত চালাতে আদেশ দিলেন। মনে মনে তিনি সঙ্কল্প করলেন, এ দুর্গকে বাহুবলের সাহায্যে দখল করতেই হবে, ভবিষ্যতে কোন দুর্গাধিপতি তাঁর বিরুদ্ধে মস্তকোত্তোলন করবার দুঃসাহস মনের মধ্যে পোষণ না করে,

এই উদ্দেশ্যে। সাবাতের ঊর্দ্ধে অবস্থিত গ্যালারিতে গিয়ে তিনি আসন গ্রহণ করলেন—হাতে এক বন্দুক—যেন যমরাজের বুর্শাফলক। যে চোখের সামনে উপস্থিত হল, তাকেই গুলির আঘাতে তিনি ভূপাতিত করলেন। মাইনের বিস্ফোরণের ফলে দুর্গপ্রাকার ভূমিসাৎ হল। আকবর তখন দুর্গ আক্রমণের হুকুম দিলেন। চিতোর-সেনাপতি জয়মল্ল সমস্ত দিন ধরে একান্ত দক্ষতা এবং অতুলনীয় সাহসের সঙ্গে দুর্গ রক্ষা করছিলেন, এবং সৈনিকদের উৎসাহিত করছিলেন। সন্ধ্যা-সমাগমে তিনি শাহী তোপশ্রেণীর সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। অনতিদূরে পর্য্যবেক্ষণ গ্যালারীতে বসে আকবর তাঁর বন্দুক "সংগ্রাম" চালাচ্ছিলেন। জয়মল্ল বুরুজে দাঁড়িয়ে রক্ষিবাহিনীর পরিচালনা করছিলেন। হঠাৎ এক অগ্নিশিখা দপ করে জ্বলে উঠল আর জয়মল্লের দেহ আকবরের চোখের সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠল। শ্যেনদৃষ্টি আকবর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করে তাঁর মারাত্মক গুলি ছুঁড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে জয়মল্লের প্রাণহীন দেহ ভূমিতলে লুটিয়ে পড়লো।

সেনাপতির আকস্মিক মৃত্যুতে চিতোররক্ষীরা নৈরাশ্যে অভিভূত হয়ে পড়লো। আকবরকে প্রতিরোধ করবার সাহস তাদের আর রইল না। নিহত সেনাপতির শবদেহ প্রজ্বলিত চিতায় ভস্মীভূত করে তারা ভীষণ "জহর-ব্রত" পালন করলে—অর্থাৎ বিরাট এক অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করে তাদের স্ত্রী-পরিজন এবং আসবাব-পত্র তাতে নিক্ষেপ করলে, আর তারপর, সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে যুদ্ধে আত্মাহুতি দেবার জন্য অগ্রসর হল। শাহী ফৌজ সদর্পে নগরের মধ্যে প্রবেশ করলে। "সাবাতের" গ্যালারীতে বসে আকবর তাঁর বাহিনীর পরিচালনা করতে লাগলেন। রাজপুত বীরেরা প্রত্যেক ইঞ্চি জমির জন্য, প্রত্যেক গলির জন্য, প্রত্যেক বাড়ীর জন্য' প্রত্যেক বাজারের জন্য, প্রত্যেক মন্দিরের জন্য, প্রাণপাত করে লড়তে লাগলো। এই ভীষণ যুদ্ধে প্রায় আট সহস্র রাজপুত নিহত হয়েছিল। অবশিষ্ট নগর রক্ষীরা বন্দী হল। চিতোর জয় সম্পূর্ণ হল। সঙ্গে সঙ্গে রায়তামভোর এবং কালিঞ্জর দুর্গও অধিকৃত হল। রাজপুত নরপতিরা দলে দলে এসে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করতে লাগলেন। স্পষ্টই বুঝলেন তাঁরা, আকবরের প্রতিরোধ করতে যাওয়া বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। তিনি তো সাধারণ মানুষ নন। মানবোত্তর শৌর্য্য এবং প্রতিভার অধিকারী তিনি। তাছাড়া তিনি পরমতসহিষ্ণু, দয়া-দাক্ষিণ্যে অতুলনীয়, সকলেরই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। রাজপুতানার নরপতিরা আনন্দে তাঁর সার্ব্বভৌমিকত্ব স্বীকার করলেন। ইংরাজ ঐতিহাসিক Laee Pooln এর কথায়—The Rajas, agreed to acclaim a power which they found as irresistible as it was just and tolerant.

উনপঞ্চাশ

আকবর জীবনে অনেক যুদ্ধ করেছেন। কোন শত্রু তাঁর প্রতিরোধ করতে পারে নি। সাহসে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। শত্রু অপ্রত্যাশিত ভাবে, অপ্রত্যাশিত স্থানে তাকে দেখে আত্মসংযম হারিয়ে পলায়নপর হতো। তাঁর গতিবিধি ছিল বিদ্যুতের মত দ্রুত এবং আকস্মিক, শত্রুকে তিনি ষড়যন্ত্র পাকাবার কিম্বা শক্তি সঞ্চয়ের অবসর দিতেন না। যুদ্ধে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মূল্য তাঁর মত সে যুগে কেউ বুঝতো না। শত্রুর সাহস এবং বিক্রম তাঁর বৈজ্ঞানিক শক্তির বিরুদ্ধে কার্য্যকরী হতো না। তা ছাড়া সৈনিকদের মনে সর্ব্বজয়ী উৎসাহ এবং উদ্দীপনা সৃষ্টি করবার স্বভাব-দত্ত ক্ষমতা তাঁর ছিল। Lawrence Binyon এ বিষয় গ্রীক বীর এলেকজেণ্ডারের সঙ্গে তাঁর তুলনা করেছেন। তিনি কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি করেন নি। তবে এলেকজেণ্ডার এবং অন্যান্য বিশ্ববিজয়ী বীরের মধ্যে এবং আকবরের মধ্যে বিশেষ এক পার্থক্য আছে। তারই আলোচনা এখন করা যাক।

অতুলনীয় যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও আকবর যুদ্ধ-বিগ্রহ ভালবাসতেন না। এইখানেই বিশ্ববিজয়ী যোদ্ধাদের সঙ্গে তাঁর বিরাট পার্থক্য। এলেকজেণ্ডার, নেপোলিয়ান, চেঙ্গীজ খাঁন, তাইমুরলঙ্গ প্রভৃতি বীরেরা যুদ্ধকেই জীবনের প্রধান কাম্য বলে মনে করতেন, আর দিগ্বিজয়ে বের না হয়ে তাঁরা থাকতে পারতেন না। পক্ষান্তরে আকবর যতদূর সম্ভব যুদ্ধ বর্জ্জন করে চলতেন। উদ্দেশ্য সাধনের উপায়ন্তর না থাকলে তিনি যুদ্ধে অগ্রসর হতেন বটে, কিন্তু শান্তি স্থাপনই ছিল তাঁর লক্ষ্য, আর শত্রু বশ্যতা স্বীকার করবার সঙ্গে সঙ্গে তার সাথে তিনি আত্মীয়তায় কিম্বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনে যত্নবান হতেন।

পঞ্চাশ

আকবর যুদ্ধক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর আজন্ম যুদ্ধের ক্রোড়েই লালিত হয়েছিলেন। তাঁর পিতা হুমায়ুন শের খাঁন কর্তৃক পরাজিত হয়ে আত্মরক্ষার জন্যে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। ১৫৪২ খৃঃ অব্দে তিনি সপরিবারে জয়সালমীরের রাজার কাছে আশ্রয়প্রার্থী হন। তাঁর স্ত্রী হামিদা বানু তখন অন্তঃসত্ত্বা। রাজা তাঁকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেন। আশ্রয়ান্বেষণে হুমায়ুন আবার মরুভূমি অতিক্রম করতে লাগলেন। পানীয় জলের অভাবে তাঁর ক্ষুদ্র দলের কষ্টের সীমা-পরিসীমা ছিল না। মরুভূমি অতিক্রম করে শেষে তিনি অমরকোটে পৌঁছুলেন আর সেখানকার রাজার কাছে আশ্রয়প্রার্থী হলেন। অমরকোট-অধিপতি আদরে তাঁকে আশ্রয় দিলেন। এই অমরকোট নগরেই ১৫ই অক্টোবর মাসে ১৫৪২ সালে আকবর জন্মগ্রহণ করেন। হুমায়ুন তখন অমরকোটের অনতিদূরে যুদ্ধে রত ছিলেন। পুত্রের জন্মসংবাদ শুনে তিনি খোদাকে ধন্যবাদ দিলেন। অনুচরেরা এসে তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। তাদের পুরস্কৃত করার উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্বস্ত ভৃত্য জহরকে (ঐতিহাসিক) ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন হাতে কিছু ধন-দৌলত সঞ্চিত আছে কি না? জহর বললেন দুই শত ইরাণী মুদ্রা, একটী চাঁদীর বালা আর একটী মৃগনাভি রাজকোষ ছিল; মুদ্রা এবং চাঁদীর বালা তাদের মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে; মাত্র মৃগনাভিটী হাতে অবশিষ্ট আছে।' পলায়নপর ভারতেশ্বর যে কি আর্থিক অস্বচ্ছলতায় পড়েছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। হুমায়ুন মৃগনাভিটী আনতে আদেশ দিলেন আর সেটীকে ভেঙ্গে অনুচরদের মধ্যে বিতরণ করলেন। জহর লিখেছেন উত্তরকালে এই শিশুর জীবন মৃগনাভিরই মত বিশ্বময় সৌরভ বিতরণ করেছিল।

হুমায়ুন বেশী দিন ভারতবর্ষে থাকতে পারলেন না। ১৫৪৩ সনের জুলাই মাসে হামিদা বেগম এবং আকবরকে নিয়ে তিনি কান্দাহারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সেখানে গিয়ে খবর পেলেন, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসকারী শক্তিশালী এক বাহিনী নিয়ে তাঁকে বন্দী করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছেন। পলায়ন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। স্বামী স্ত্রী তো অশ্বপৃষ্ঠে পালাতে পারেন, কিন্তু এক বৎসরের শিশু আকবরের কি ব্যবস্থা করবেন? তাঁরা ভাবলেন আসকারী তাদের প্রতি যে ব্যবহারই করুন না কেন, ভ্রাতুষ্পুত্র আকবরের প্রতি তিনি নির্দ্দয় হতে পারবেন না। আকবরকে ধাত্রীর হাতে ছেড়ে স্বামী-স্ত্রী তখন ইরাণ রাজ্যের সরহদ্দের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

হুমায়ুন আসকারী মির্জ্জার বিষয় যে ধারণ পোষণ করেছিলেন তা শেষে সত্য সাব্যস্ত হল। আসকারী শিশু আকবরকে সাদরে গ্রহণ করলেন, আর যত্নের সঙ্গে তাঁর লালন-পালন করতে লাগলেন। কয়েক বৎসর পর ১৫৪৫ খৃঃ অব্দে হুমায়ুন আকবরকে আবার ফিরে পান। তারপর হুমায়ুন পৈতৃক সাম্রাজ্যের উদ্ধারের জন্য স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। আকবর সর্ব্বদা পিতার সঙ্গেই থাকতেন। ১৫৫০ খৃঃ অব্দে হুমায়ুন ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। আকবরও সঙ্গে ফেরেন। পিতা পুত্র উভয়কেই যুদ্ধক্ষেত্রেই জীবন যাপন করতে হয়। আকবর যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁর সামরিক শিক্ষা লাভ করেন। হঠাৎ এক দুর্ঘটনার ফলে ১৫৫৬ খৃঃ অব্দে হুমায়ুন মৃত্যুমুখে পতিত হন। ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক আকবর পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। হুমায়ুনের বিশ্বস্ত সেনাপতি বৈরাম খাঁন আকবরের অভিভাবকরূপে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আকবর উপস্থিত ছিলেন, তবে মোগলবাহিনীকে পরিচালিত করেছিলেন তাঁর অভিভাবক সেনাপতি বৈরাম খাঁন।

একান্ন

অখণ্ড ভারতীয় সাম্রাজ্যের আদর্শ, রাজচক্রবর্ত্তী বা শাহিন শাহের আদর্শ এই ভারতভূমিতে আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। এ-আদর্শ আমরা রামায়ণে দেখতে পাই, মহাভারতে দেখতে পাই, বৌদ্ধ যুগের চন্দ্রগুপ্ত এবং অশোকের মধ্যেও দেখতে পাই। দিল্লীর পৃথ্বীরাজ ও রাজচক্রবর্ত্তিত্বের দাবী করতেন। দিল্লীর মুসলমান বাদশারা এ-আদর্শ হিন্দুদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রেই পেয়েছিলেন। প্রকৃত পক্ষে, ভারতের ইতিহাস, কৃষ্টি, ভৌগোলিক আকার এবং পরিস্থিতির বিষয় চিন্তা করলে সহজেই বোঝা যায়, প্রকৃতি এই সুবিস্তৃত দেশকে এক অখণ্ড সাম্রাজ্য করেই সৃষ্টি করেছেন। তবে ভারতের বিভিন্ন অংশের বৈশিষ্ট্যের বিষয় চিন্তা করলে এও বোঝা যায়, যে, এই বিশাল দেশের

বিভিন্ন অংশের যথেষ্ট স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকা দরকার। যথেচ্ছাচারী খণ্ড খণ্ড সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব দেশের জন্য, জাতির জন্য, এবং জনসাধারণের জন্য কিরূপ অশান্তিকর, কিরূপ বিপজ্জনক, আকবর বাল্য জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্টই তা বুঝতে পেরেছিলেন। তারপর পিতার দুঃখ-দুর্দ্দশার কথাও আকবর কখনও ভুলতে পারেন নি। পিতা কি করে যে এত সহজে পৈতৃক সাম্রাজ্য থেকে বিতাড়িত হলেন, আকবরের তীক্ষ্ণ, অনুসন্ধিৎসু মন সে বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা-গবেষণা করেছিল। আকবর একান্তভাবে ধর্ম্মগতপ্রাণ লোক ছিলেন। চিন্তা, গবেষণা এবং অন্তরের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশের ফলে আকবর বুঝেছিলেন, যে, ভারতবর্ষে একছত্র সাম্রাজ্য স্থাপিত হোক—এই খোদার ইচ্ছা। আর তিনি এই ঐশ্বরিক ইচ্ছারই অমোঘ অস্ত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তবে খোদার ইচ্ছাকে সার্থক করতে হলে কেবল বাহুবলের প্রয়োগ করলে চলবে না। পিতার সহজ পরাজয় এ সত্যটিকে তাঁর কাছে পরিস্ফুট করেছিল যে, সাম্রাজ্যকে স্থায়ী আকার দিতে হলে ছোট বড়, হিন্দু-মুসলমান সকলকে প্রেমের ডোরে বাঁধতে হবে, আর তার জন্য প্রয়োজন উদার, সার্ব্বজনীন রাজনীতির, আর প্রয়োজন ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রেম এবং করুণা মিশ্রিত ব্যবহারের। এই সুমহান্ আদর্শই আকবরের রাজনীতি এবং সমর-নীতিকে পরিচালিত করেছিল।

ঐতিহাসিক Col. Malleson লিখেছেন :—

The problem to his (Akbar's) mind was, how to act so as to efface from the minds of princes and people these recollections (of war and enemity); to conquer that he might unite; to introduce, as he conquered, principles so acceptable to all classes, to the prince as well as to the peasant, that they should combine to regard him as the protecting father, the unit necessary to ward off from them evil, the assurer to them of the exercise of their immemorial rights and previlages, the asserter of the right of the ablest, independently of his religion, or his caste, or his nationality, to exercise command under himself, the maintainer of equal justice, for all classes. Such became as his mind developed, the principles of Akbar. He has been accused, he was accused in his life time by bigoted Muhammaden writers, of arrogating to himself the attribute of the almighty. This charge is only true in the sense that, in an age and in a country in which might had been synonimous with right, he did pose as the messanger of Heaven, the representative on earth of the power of God, to introduce union, toleration, justice, mercy, equal rights, amongst the peoples of Hindusthan.

বাহার

দেশের সর্ব্বজাতির এবং সর্ব্ব মানবের মঙ্গল সাধনের সুমহান্ আদর্শ অন্তরে পোষণ ক'রে আকবর রাষ্ট্রসাধনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ক'রে আত্মীয়োচিত ব্যবহার করেই রাজপুতদের এবং সাধারণ হিন্দুদের অন্তর তিনি একান্তভাবে জয় করেছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তারে এবং সংরক্ষণে রাজপুত এবং সাধারণ হিন্দুদের সাহায্য এবং সহযোগিতা যে কতদূর কার্য্যকরী হয়েছিল, ইতিহাসপাঠক মাত্রেই তা জানেন। ভগবানদাস, মানসিং, টোডারমল্ল, বীরবল প্রভৃতির নাম King Arthur Round Table এর Knight দের মতই ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। পাঠান শত্রুদের প্রতি করুণা প্রদর্শনেও আকবর কার্পণ্য করেন নি। মালওয়ার পাঠান শাসনকর্ত্তা আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং একটী মোগল বাহিনীকে আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করেছিলেন। পরে তিনি আকবরের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। আকবর তাঁকে এক হাজারীর পদ প্রদান করেন এবং কিয়ৎকাল পরে দুই হাজারীর পদে উন্নীত করেন। এই পাঠান বীর আকবরের জন্য যুদ্ধ করেই শেষে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। আকবর শত্রুকে অপমানিত কিম্বা লাঞ্ছিত কিম্বা বঞ্চিত করবার উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধারণ করতেন না। তিনি অস্ত্র ধারণ করতেন শত্রুকে নিজের কাছে টেনে নেবার উদ্দেশ্যে, শত্রুকে আপনজন করবার উদ্দেশ্যে, শত্রুকে উচ্চতর জীবনের, প্রশস্ততর ক্ষেত্রের, ব্যাপকতর সাধনার সন্ধান দেবার উদ্দেশ্যে। শত্রু তাঁর সংসর্গে এসে ছোট হতো না, আরও বড় হয়ে যেতো। প্রকৃত পক্ষে আকবরের মত উন্নতমনা দিগ্বিজয়ীর সন্ধান ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

অনিবার্য্য কারণ না থাকলে আকবর যুদ্ধে নামতেন না। যতদূর সম্ভব ত্যাগ স্বীকার করেও যদি প্রতিপক্ষকে বন্ধুত্বের এবং নামমাত্র আনুগত্যের মধ্যে আনতে পারা যায়, আকবর সেই পথই অবলম্বন করতেন। তারপর যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শত্রুকে উচ্চ পদ দান করতেন এবং সম্মানের আসনে তাকে বসাতেন [ক্রমশঃ

মৃত্যু-[illegible]হকে

(গল্প)

শ্রীজনরঞ্জন রায়

নিথর রণক্ষেত্র, নিস্পন্দ রক্তস্রোত, দেহে মৃত্যুর অবসাদ। পাহাড়ের এ-দিকটা দিয়া শত্রু যে আসিতে পারে, এমন কল্পনাও ছিল না। যুদ্ধ খুব শক্ত জিনিষ…বিশেষতঃ আজ-কালকার যুদ্ধ। রাস্তাহীন গভীর বন, বন্যজাতিদের বিলক্ষণ উৎকোচ দেওয়া হইয়াছে। সে-দেশে না-আছে ঘরদোর, না-আছে খাবার, না-আছে রাস্তা। একটা লোক কোনো রকমে চলাফেরা করিতে পারে এমনি সব পাহাড়ে-পথ। একবার পা পিছলালে তিন চার-শো ফিট নীচে কামরূপে পতন—ঠিক গোলকধাম খেলার মতো। মশার কামড়ে এক ঘণ্টা টেকা দায় এই সব জঙ্গলে। তাই আমাদের গোয়েন্দা ওড়াজাহাজগুলো আর ওদিকটা তাকাইত না। কিন্তু অসভ্য শত্রুরা আসিল সেই পথে, ঠাহর করা শক্ত হইতেছে কেমন করিয়া। মরিতেই আসিয়াছে বুঝিতেছি, এ-সব যুদ্ধে তো ভেল্কি চলে না। আনিয়াছে সব হাল্কা হাল্কা সাজ-সরঞ্জাম। কি দুঃসাহস! মরণের পাখা না উঠিলে কি এতোটা দুঃসাহস হয়। দিকে দিকে আমাদের সিমেণ্ট-বাঁধানো নতুন পথ, মাঝে মাঝে দীর্ঘ সব পাথর-বাঁধা সুড়ঙ্গ—তা'তে হাঁসপাতাল, খাদ্যসম্ভার, গোলাবারুদ, ট্যাঙ্ক। দূরে দূরে তৈরী জঙ্গলে ওড়াজাহাজমারা কামান। দুর্ভেদ্য এই গভীর মধ্যে একবার তাদের আনিয়া ফেলিতে যা' দেরি।

আমি একজন অগ্রগামী গাইড, এই পথটাই খবরদারী করিতেছিলাম, আহত হইয়া পড়িয়া আছি, একটু একটু করিয়া জ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেছি।

চোখের কাছে কিসের ছায়া আসিল?

সেবার মরুভূমির মাঝে আহত হইয়া দু'দিন পড়িয়া-ছিলাম। নীল নদীর সৈকতে চাঁদের আলোর জ্যোৎস্নায় মৃত্যুর বিভীষিকা ভুলাইয়া দিতেছিল। জ্যোৎস্নার এত পূর্ণতা, এত মধুর মাধুর্য্য আর কোথাও দেখা যায় কি না জানি না। দূরে দূরে সিন্দুকে ভরা ঐ সব 'মমি', অনন্তকাল হইতে মৃত্যুকে স্বীকার করিয়া নিয়া কেন তারা মাটির তলায় পড়িয়া আছে? এই প্রেতপুরীর উপর কেন এই অনন্ত জ্যোৎস্না? মনে পড়িল এই সেই অপূর্ব্ব সুন্দরী ক্লিওপেট-রার দেশ, যে দেশ স্থাপন করে মানব বা 'মেনা' নামে এক রাজা সেই দ্বাপর যুগে। অক্ষর তখন তৈরী হয় নি, পাখি আঁকিয়া, পশু আঁকিয়া মানুষ তখন প্রকাশ করিত মনের কথা।

হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিলাম, কে যেন আমার হাতে এমনি একটা কি আঁকিয়া দিয়া গেল। চীৎকার করিয়া উঠিয়া-ছিলাম—প্রতিমা, প্রতিমা, এসো এসো, এরা নিয়ে যায় আমায় ঐ খুকুর পিরামিডের কবরে, আর বেরুতে দিবে না!

জ্ঞান হইল যখন পাঁচ দিন পরে, তখন আমি কায়রোর হাঁসপাতালে। 'হোম্-সিক' বলিয়া সবাই আমাকে ঠাট্টা করিল। বাড়ী ফিরিবার ছুটী পাইলাম। ফিরিবার সময় আর একটা ক্রাউন পাইলাম। পদোন্নতি হইল।

জাহাজে উঠিয়া খুকুর সেই বিরাট পিরামিডের দিকে চাহিতে চাহিতে ভাবিলাম—এরাই ছিল পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যলোক। রাজা হইয়াই যারা মাটির নীচে কবর-প্রাসাদ তৈরী করা প্রধান কাজ মনে করিত, আর মরিবার পর সেখানে লইয়া যাইতে তার যত বেগম, দাসদাসী, গাই ঘোড়া উট, সোনা রূপার থালাবাসন লোক-লস্কর, হীরে মুক্তা পরকালের সঙ্গী করিতে। এখন যা' দেখিয়া জগতের লোক শুধু হাসিতেছে। যদিও খুকুর এই কবর-প্রাসাদ পৃথিবীতে সাতটা আশ্চর্য্য জিনিষের একটা…এক লক্ষ লোক নাকি ত্রিশ বছরে এটা তৈরী করিয়াছে।

মনে পড়িয়া গেল আজ আমি কোথায় কি ভাবে পড়িয়া আছি, স্বদেশের একটা পর্ব্বতময় জঙ্গলে, সেই মরুতে রেড-ক্রশদল আমায় বাঁচাইয়াছিল, আজ কে বাঁচাইবে?

চোখের কাছে আবার সেই ছায়াটা আসিল। তার সবুজ রং, খাকীর পোষাক, সৈনিকের বেশ। সে তার দুই দৃঢ় হাতে আমাকে বুকে তুলিয়া লইল, আমার শুষ্ক মুখে একটা চোকোলেট গুঁজিয়া দিল।

কে এ?…কোথায় নিয়া চলিয়াছে? তার বুকের স্পর্শে বুঝিলাম সে নারী—তার চোখের গগল্‌স্ তাকে একেবারে

চিনিতে দিল না। মনে হইল সে শত্রু—সে নারী পাইলট। সে আমায় লইয়া চলিল বক্রপথে…সুঁড়িরাস্তা দিয়া একটা গুহার মধ্যে…আমার কানে মৃদু মৃদু কি সব বলিল—সে কি প্রণয়ের কথা? আমি তার কোনো কথারই জবাব দিতে পারিতেছি না…আমার সব যেন ঘুলাইয়া যাইতেছে! কেন? নারী-হৃদয়ের স্পর্শে?…ছিঃ ছিঃ! আমি না সৈনিক?

ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। কানে যেন আসিতেছে একটা বাঁশির শব্দ। অন্ধকার রাত, গুহার মধ্যে একা আমি—নাগদের দেশ। নাগিনীরা নিশ্চয় বাঁশি বাজাইতেছে। নাগিনীরা কুহক জানে, খুব কুহক জানে। কিন্তু গান যে একটা কুহক তা'কি তারা জানে? কবিগুরু বলিয়াছেন—মানুষ তখন চিন্তা করিতে শেখে নাই, অথচ চীৎকার করিত, তার সেই আওয়াজ আজ বিধিবদ্ধ হ'য়ে গানে পরিণত হয়েছে।

তাইতো, তবে কি ভাষা সৃষ্টির আগে হইয়াছে স্বরের সৃষ্টি। হাঁ তাই। অসভ্য মানুষ প্রথমে অর্থহীন চীৎকার করিত—পাখীরা যেমন না বুঝিয়া শিষ দিয়া যায়, কেনেরী দ্বীপের মানুষ নাকি শিষ দিয়া মনের কথা বলে—তা'দের ভাষা সৃষ্টি হইতে এখনো বাকী আছে।

ভাবিতেছি এই নাগিনীরা বাঁশিতে যা' বাজায় তা' কি শুধু পশু-মনের প্রেরণা? কিন্তু কি মিষ্টি, কি মিষ্টি! তাঁর নির্জ্জন অজ্ঞাতবাসে একদিন অর্জ্জুনের মতো বীর এদেরই গানে তো মুগ্ধ হইয়াছিলেন।…এদের চিত্রাঙ্গদাকে নিজে আসিয়া মদনঠাকুর কুহকিনী সাজাইয়া দেয়। শুধু কি তাই? আর বলিয়া যায়—

> "আমি হব সহায় তোমার।
> অয়ি শুভে, বিশ্বজয়ী অর্জ্জুনে জিনিয়া
> বন্দী করি' আনি দিব সম্মুখে তোমার!
> রাজ্ঞী হয়ে দিয়ো তারে দণ্ড পুরস্কার
> যথা ইচ্ছা! বিদ্রোহীরে করিও শাষণ।"

আমি বেশ মশগুল হইয়া গুহার মধ্যে পড়িয়াছিলাম। ক্ষুধার তাড়নায় মাটির দেশে আবার যেন ফিরিয়া আসিলাম। এমন সময় আবার সেই ছায়া।…আমার চিত্রাঙ্গদা বসন্তের পুষ্প-শোভা নিয়া আমায় কি আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে? মুখ দিয়া যেন আনমনে বাহির হইল—

> "কাহারে হেরিনু? সে কি সত্য, কিম্বা মায়া?
> নিবিড় নির্জ্জন বনে…।"

কিন্তু আমার চিত্রাঙ্গদা এবার আমার মুখে দিল উষ্ণ পানীয়, আমার মাথার ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিল…দেখিলাম সে রেডক্রশ রমণী, তার হাতমুখ গাছের পাতার রঙে রঙানো। তবে—?

শত্রুরা পিছু হটিতে বাধ্য হইয়াছে…তাদের ফাঁকিবাজী ধরা পড়িয়া গিয়াছে। মিলিটারী হাসপাতালে আমি তিনটি ক্রাউন পাইয়া ক্যাপ্‌টেনের পদ লাভ করিলাম। রণজয়ের গভীর আনন্দ সকলের চোখে মুখে।

ছুটীতে আবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছি। একদণ্ড স্ত্রী প্রতিমা কাছ ছাড়া হয় না। তাকে বলিলাম, "রেডিওটা খুলে দাও—শুনি।"

রেডিও বলিতেছে যুদ্ধোত্তর দুনিয়ার কথা। কিন্তু বলিতেছে যে, তার চোখে অহঙ্কারের লেন্স আঁটা সেই চশমা, কূটনীতির রঙীন চশমা। তার ভিতর দিয়া সে ভাবি দুনিয়ার রূপই দেখিতে পাইতেছে না! মনে মনে হাসিলাম।

আমার বুকের উপর চিত্রাঙ্গদা বইখানা। প্রতিমা অতি সন্তর্পণে কি খুটখাট করিতেছে। বোধ হয় বৈকালে আমায় যে ফল খাইতে দিবে তাহা কাটিতেছে। আমি তাকাইতেই সরস সুরে সে বলিল, "কি ভাবিছ নাথ?"

আমি বলিলাম—

> "রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা
> কেমন না জানি, তাই ভাবিতেছি মনে।"

স্ত্রী বলিল,—

> "…কুৎসিৎ কুরূপ! এমন বঙ্কিম ভুরু
> নাই তার, এমন নিবিড় কৃষ্ণতারা!
> কঠিন সরল বাহু বিঁধিতে শিখেছে
> লক্ষ্য, বাঁধিতে পারে না বীরতনু হেন
> সুকোমল নাগপাশে!"

আমি হাত বাড়াইলাম…।

কৌশাম্বী

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল, প্রত্নতত্ত্ববিদ্

বর্ত্তমান এলাহাবাদ নগর হইতে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে যমুনা নদীর তীরবর্ত্তী 'কোশাম' নামক স্থানটি সুপ্রাচীন কালে 'কৌশাম্বী' নামে অভিহিত ছিল।

খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দে পরাণতপ নামে জনৈক ক্ষত্রীয় বীর বৎসরাজ্যের অধিপতি হইয়া কৌশাম্বীতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র উদয়ন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

রাজা উদয়নের জীবন কাহিনী বিশেষ রহস্যময়। মিথিলার অন্তর্গত চম্পারণ্যের অরণ্যে সূর্য্যোদয় কালে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। উদয়কালে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার জননী উদয়ন নাম রাখিয়াছিলেন। তত্রস্থ মহর্ষি অল্লকপ্পক তাঁহাকে স্বীয় সন্তানের ন্যায় লালনপালন করিয়াছিলেন। তৎপরে রাজা পরাণতপের মৃত্যু হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া মহর্ষি উদয়নকে সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য কৌশাম্বীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মহর্ষির আশীর্ব্বাদে উদয়ন কৌশাম্বীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পরম যত্ন সহকারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। এই প্রকার সুখ্যাতির সংবাদে অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের ক্রোধ জন্মিল। অবন্তীরাজ উদয়নকে পরাস্ত করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন।

উদয়ন মন্ত্রবলে হস্তী শিকার করিতে ভাল বাসিতেন। প্রদ্যোত একটি যন্ত্র চালিত কাঠের হস্তী নির্ম্মাণ করাইয়া উহার অভ্যন্তরে সশস্ত্র সৈন্য রাখিয়া উদয়নের রাজ্যের সীমানায় বিন্ধের অরণ্যাভ্যন্তরে রাখিয়াছিলেন এবং এই নূতন হস্তীটির সংবাদ প্রচারের জন্য একজন ছদ্মবেশী চরকে উদয়নের নিকট প্রেরণ করিলেন। উদয়ন হস্তীটি শিকার করিবার জন্য কালবিলম্ব না করিয়া প্রস্তুত হইলেন। তিনি অরণ্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া সৈন্য-সামন্ত রাখিয়া স্বয়ং মন্ত্রবলে শিকার করিবার মানসে সেই সংবাদদাতাকে সঙ্গে লইয়া গমন করিলেন। ক্রমে যেমন তিনি সেই হস্তীটির নিকট উপস্থিত হইলেন, অমনি লুক্কায়িত সৈন্যগণ হস্তীটির উদর হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিল। অতঃপর সৈন্যগণ তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় অবন্তীরাজের নিকট লইয়া গেল। অবন্তীরাজ আনন্দে অধীর হইয়া উদয়নকে কারাগারে রাখিবার জন্য আদেশ দিলেন।

রাজা প্রদ্যোত কিছুদিন যাবৎ উদয়নকে কারাগারে রাখিবার পর হস্তী শিকারের মন্ত্রটি শিক্ষা করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। তিনি উদয়নকে মন্ত্র শিক্ষা দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে উদয়ন বলিলেন,—"যদি আপনি আমাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন তবেই আমি মন্ত্র শিক্ষা দিব।" তখন প্রদ্যোত এই প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া কুঁজি নামে এক দাসীকে মন্ত্র শিকার জন্য নিযুক্ত করিবার মনস্থ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে এক গৃহভ্যন্তরের মধ্যস্থলে পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া একদিকে উদয়ন এবং অপরদিকে কুঁজিদাসী থাকিবার ব্যবস্থা হইল। যথাকালে উদয়ন মন্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য পর্দ্দার একদিকে উপবেশন করিলেন। কিন্তু অপর পার্শ্বে কুঁজির পরিবর্ত্তে রাজকুমারী বাসবদত্তা মন্ত্রশিক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু বিধাতার বিধানে মন্ত্রশিক্ষার অসুবিধা ঘটায় সহসা উভয়ের মধ্যে মিলন হইল। এক্ষণে তাঁহারা কৌশলে অবন্তীনগর হইতে বহির্গত হইয়া কৌশাম্বী-রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজপুরীতে উপনীত হইবার পর এক শুভদিনে শুভক্ষণে তাঁহাদের পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। এই শুভ সংবাদ রাজা প্রদ্যোতের কর্ণগোচর হইলে

তাঁহার পূর্ব্বজ্বর দূর হইল তৎপরে তিনি উদয়নের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন।

রাজা উদয়ন ভগবান বুদ্ধের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বত্রই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব উদয়নের গুণে মুগ্ধ হইয়া মধ্যে মধ্যে কৌশাম্বীতে শুভাগমন করিতেন। কৌশাম্বী বুদ্ধের প্রচার স্থল বলিয়া বৌদ্ধজগতের অন্যতম প্রসিদ্ধ তীর্থ।

উদয়নের রাজত্বকালে কৌশাম্বী এক সুপ্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। কৌশাম্বীর বণিকগণের মধ্যে ঘোষিত, কোকদ ও প্রভার্য্যের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঘোষিত ভগবান বুদ্ধের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি কৌশাম্বীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে এক সুবৃহৎ বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

খৃঃ পূঃ ২৫০ অব্দে ধর্ম্মাশোক কৌশাম্বী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় যে লিপিযুক্ত প্রস্তর স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন, আজিও তাহা দণ্ডায়মান থাকিয়া কৌশাম্বীর প্রাচীন গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে কৌশাম্বী কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। কৌশাম্বীবক্ষে যে বুদ্ধমূর্ত্তিটি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা কণিষ্কের সময়কালীন এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া অনুমিত হয়।

খৃষ্টীয় ৪০০ অব্দে ফাহিয়ান এবং খৃষ্টীয় ৬০০ অব্দে হিউয়েন সাঙ্ কৌশাম্বী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বর্ণিত কৌশাম্বীর সীমা নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু তৎকালীন কীর্ত্তিগুলি এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। আমার অনুমান হয় খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দী পর্য্যন্ত কৌশাম্বী সুসমৃদ্ধ ছিল।

কৌশাম্বীতে যে সকল প্রত্নদ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে তিনটি ব্রাহ্মীলিপি সবিশেষ মূল্যবান ঐতিহাসিক সম্পদ। এই সকল প্রত্নদ্রব্য এলাহাবাদ "মিউনিসিপাল মিউজিয়মে" সংরক্ষিত হইয়াছে১।

কৌশাম্বীর ধ্বংস স্তূপের মধ্যে বহু সংখ্যক ছাঁচে ঢালাই তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রার কতকগুলিতে লিপি নাই।২

স্বর্গীয় মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ কাশীপ্রসাদ জয়াস্ওয়াল মহোদয় কৌশাম্বীতে আবিষ্কৃত মুদ্রাসমূহ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীর নিদর্শন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।৩

হিমাদ্রিপাদ-নিঃসৃতা পুণ্যসলিলা যমুনাতটে পুণ্যতমা পুণ্যক্ষেত্র কৌশাম্বী অবস্থিত। কালের অনিবার্য্য গতি কে রোধ করিতে পারে? একদা পরমশোভা—সমৃদ্ধিশালিনী জনাকীর্ণা কৌশাম্বী নগরী আজি নিস্তব্ধ, নিষ্প্রভ ও জনশূন্য স্থানে পরিণত হইয়াছে। সেই সুরম্য প্রাসাদের স্থলে আজি পক্ষীকুল-নিনাদিত বিবিধ-তরু-গুল্মাদি-শোভিত কানন। আর এই কানন মাঝারে ধর্ম্মাশোকের সংস্থাপিত প্রস্তর স্তম্ভটি যেন চিরদর্শনীয় ও চিরসুন্দর। কৌশাম্বীর ধ্বংস স্তূপাদি বহুবিধ মহামূল্য প্রত্নদ্রব্যে পরিপূর্ণ। এইগুলিতে যথাযথ খনন কার্য্য আরম্ভ হইলে তবেই সেই প্রাচীন যুগের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইবে এবং কৌশাম্বীর লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধার সাধিত হইবে। এই স্থানে খনন কার্য্যের জন্য ভারতীয় সরকারী প্রত্নতত্ত্ববিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

---

১ The following is an account of the works done by the Archaeological Survery of India reproduced from "India in 1932-33"

"The Allahabad Municipal Museum which was started only a few years ago already contains a considerable number of valuable antiquities brought together by the Executive Officer of the Municipality. Of these, three early Brahmi inscriptions found among the remains at Kosam (ancient Kansambi) are of considerable historical value."

২ Epigraphica India vol. II p. 242.

৩ I may draw the attention of the members of Society to the important Site Kosam (ancient Kansambi). On the surface every year numerous coins of the second and the first centuries B. C. are picked up. Seven hundred coins have been recently collected in one visit for the Nagari Pracharim Sabha Museum by Rai Krishna Das. Last year unique coins were brought to light from the Site. If the Site is excavated we can have untold wealth for numismatics from the place. It is the most extensive ruins in India, the history of which is fully known. The site covers several square miles and is well defined like a table-land,"

—Dr. K. P. Jayaswal's of the Numismatic Society of India held at Udaipur, Rajputana, on the invitation of the Maharana, in November, 1936.

শেষের পরিচয়

শ্রীমতী নীহার দাশগুপ্ত

শেষের পরিচয় শরৎচন্দ্রের শেষ উপন্যাস। তিনি এই উপন্যাস শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই, সেই জন্য এই উপন্যাসখানি পাঠকের মনে যে বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার করে, তাহার সঙ্গে একটা বিষাদময় অপরিতৃপ্তিও জড়িত হইয়া থাকে। সমালোচক মনে করেন, এই কাহিনীর চুলচেরা বিশ্লেষণ ও নিরপেক্ষ বিচার শোভন ও সঙ্গত হইবে না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেইরূপ সমালোচনার চেষ্টাও করা হইবে না—কিন্তু অসমাপ্ত হইলেও এই উপন্যাসে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা পাঠকের চিত্তকে আকৃষ্ট করে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শুধু সেইরূপ কয়েকটী বৈশিষ্ট্যের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইবে। বিস্তারিত বিশ্লেষণ বা দোষগুণের নিরপেক্ষ বিচার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে প্রধান বৈশিষ্ট্য রমণীর চরিত্র সৃষ্টি। তাঁহার সৃষ্ট অধিকাংশ নায়িকা রমা, রাজলক্ষ্মী, অচলা, ষোড়শী—পরমাশ্চর্য্য রমণী। অধিকাংশ উপন্যাসে শরৎচন্দ্র এমন একটী নায়িকা-চিত্র আঁকিয়াছেন যাহার প্রণয়াস্পদ তাহার স্বামী নয়। প্রণয়ী ও প্রণয়িণীর মধ্যে রহিয়াছে সমাজ ও ধর্ম্মের অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রাজলক্ষ্মী, রমা, অচলা—ইহাদের নাম করা যাইতে পারে। ইহাদের চিত্তে যে অবিরাম দ্বন্দ্ব চলিয়াছে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় আমরা বহুবার পাইয়াছি। ইহাদের প্রেমলিপ্সা অন্তর্নিহত ও রহস্যাবৃত রহিয়া গিয়াছে, তাহা কখনও পরিপূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে নাই। ইহাদের প্রেম সর্ব্বদাই সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে জড়িত হইয়া বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

তথাকথিত অবৈধ প্রণয়ের পবিত্রতা ও দুর্ব্বার গতি-বেগ শরৎ সাহিত্যে অপরূপ অভিব্যক্তি পাইয়াছে। শেষের পরিচয় উপন্যাসখানিতে শরৎ প্রতিভার ছাপ রহিয়াছে, কিন্তু ইহা অন্যান্য উপন্যাস হইতে পৃথক। এই উপন্যাসেও নারী-হৃদয়ের বৈচিত্র্য প্রকাশিত হইয়াছে। এখানেও রমণীর প্রেম বাধাহত হইয়া তীব্রতা লাভ করিয়াছে, কিন্তু যে পুরুষের পদতলে সবিতার প্রেম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে সে তাঁহার স্বামী। সবিতা কায়মনোবাক্যে ব্রজবাবুকে পাইতে চাহিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে না পাওয়ার ব্যর্থতা এই কাহিনীকে ট্র্যাজিডিতে পরিণত করিয়াছে; অথচ সবিতা ব্রজবাবুর পরিণীতা প্রেয়সী স্ত্রী। বাহিরের দিক হইতে সবিতার জীবনের ব্যর্থতার কোনও কারণ ছিল না। সে দুর্জ্ঞেয় রহস্য সবিতা নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। তাহার ফলে এই স্নেহপরায়ণ উদার স্বামীর নিকট হইতে বিচ্যুত হইয়া তিনি আশ্রয় লইলেন এমন একটি পুরুষের সঙ্গে, যাহাকে তিনি কখনও ভালবাসিতে পারেন নাই। এই পতিগতপ্রাণা পদস্খলিতা রমণীর বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা উপন্যাসটীকে অভিনবত্ব দান করিয়াছে। যাহার সঙ্গে সবিতা কুলত্যাগ করিলেন, তিনি কোনদিন তাহাকে ভালবাসিতে পারেন নাই। তাঁহার স্বামী-প্রীতি যে কত গভীর কত নিবিড় তাহা তিনি টের পাইলেন স্বামীকে ত্যাগ করিবার পর। দীর্ঘ বার বৎসর সবিতা অনুতাপে দগ্ধ হইলেও কোনদিন জোর করিয়া স্বামীর কাছে আসিতে পারেন নাই, কিন্তু সুযোগ পাইবামাত্রই তাঁহার মাথা আপনা হইতেই ব্রজবাবুর পদতলে লুটাইয়া পড়িল। সবিতা জানু পাতিয়া তাঁহার দুই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। আজ তিনদিন হইল তিনি সর্ব্ববিষয়েই উদাসীন, বিভ্রান্ত-চিত্ত, অনির্দ্দেশ্য শূন্যপথে অনুক্ষণ ক্ষ্যাপার মতো ঘুরিয়া মরিতেছেন, নিজের প্রতি লক্ষ্য করিবার মুহূর্ত্ত সময় পান নাই। তাঁহার অসংযত রুক্ষ কেশরাশি বর্ষার দিগন্ত প্রসারিত মেঘের মতো স্বামীর পা ঢাকিয়া চারিদিকে ভিজা মাটির পরে নিমেষে ছড়াইয়া পড়িল।

ব্রজবাবুর ও সবিতার বিচিত্র প্রণয়ের কাহিনী উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করিলেও মনে হয় সবিতার কাহিনীকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে তাঁহার ক্ষুধিত, আহত, লাঞ্ছিত প্রেম নহে। রেণু তাঁহার নিজের সন্তান। যে প্রলয়ের রাত্রিতে তিনি তাঁহার স্বামী-সংসার-সমাজকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সে রাত্রিতেও বিদায়ের চরম মুহূর্ত্তে ব্রজবাবু তাঁহাকে রেণুর কথাই স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। রমণী-

বাবুর সাহচর্য্যে তিনি যে কলুষিত উৎসবের মধ্যে দিন কাটাইতেছিলেন, তাহা যে কত মিথ্যা কত অলীক তাহার পরিচয় আমরা পাই রেণুর জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়া। বার বৎসর তিনি বাহিরের লোকের সংস্পর্শে আসেন নাই। যে জীবন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু রেণুর অবাঞ্ছিত বিবাহ সম্বন্ধের সম্ভাবনায় তিনি এত বিচলিত হইয়াছিলেন যে, নিজেকে সংবরণ করিয়া রাখিতে পারেন নাই। সন্তানের জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা তাঁহাকে অসহ্য পীড়া দিতেছিল—তাই তিনি সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া রাখালের গৃহে উপস্থিত হইলেন। সুদীর্ঘ বার বৎসর তিনি যাহাদের সংস্রব অতি কষ্টে এড়াইয়া ছিলেন, সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার সংযমের বাধ ভাঙ্গিয়া গেল—তাই তিনি আবার স্বামীর নিকট গেলেন। তাহার লক্ষ্যহীন জীবনে রেণুই ছিল একমাত্র আনন্দের পরিতৃপ্তির উৎস। নতুন মার বাহ্যিক বিলাস ব্যসনের অন্তরালে যে অফুরন্ত স্নেহ জমান ছিল, তাহার প্রকাশ আমরা বহুপ্রকারে পাইয়াছি। অহরহ তাঁহার মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে, তাহা তাঁহার মুখের মধ্যে আভাস পাওয়া যায় না। ইঁহাকে বুদ্ধিমতী অত্যন্ত সংযত দেখাইয়াছেন। কিন্তু সকল বুদ্ধির অন্তরাল ভেদ করিয়া তাঁহার মাতৃস্নেহের নির্ঝর উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। সবিতা যখন বহুমূল্য বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সারদার ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি রাখালের না খাওয়ার কারণই জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু যখন বুঝিতে পারিলেন—তাঁহার নিজ কন্যা রেণু পীড়িত, তাহারই চিকিৎসার জন্য রাখাল অর্থের সাহায্যে আসিয়াছিল, তখন সবিতার সমস্ত মুখখানা গভীর পরিতাপে ও লজ্জায় ছাইএর মতন ফ্যাকাসে হইয়া গেল, সারদা প্রদত্ত পাণটী তাঁহার হাতেই রহিয়া গেল; পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল নিথর হইয়া তিনি বসিয়া রহিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত বাদে তিনি নিজের ঘরে ফিরিয়া গেলেন। "মিনিট পাঁচ ছয় পরে সারদা প্রদীপ নিভাইয়া ঘর বন্ধ করিতেছিল, তিনি ফিরিয়া আসিলেন। পরণে সে বস্ত্র নাই, গায়ে সে সব আভরণ নাই, মুখ উদ্বেগে ম্লান—বলিলেন, আমার সঙ্গে তোমাকে একবার বাইরে যেতে হবে"—সারদা পরদিন দুপুরবেলা যাবার কথা উত্থাপন করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আজ রাত্তির যাবে, কাল সকাল যাবে—তারপরে দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া সেরে তবে যাব? ততক্ষণে যে পাগল হোয়ে যাব সারদা?" আরেক জায়গায় দেখিতে পাই—"একটী রুমালে বাঁধা বাণ্ডিল সারদার হাতে দিয়া সবিতা বলিলেন, আঁচলে বেঁধে রাখত মা, রাজু আমার হাত থেকে হয়ত নেবে না, তাকে তুমি দিয়ো।" জননী-হৃদয়ে বাৎসল্যের সুন্দর ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বহু বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও মাতৃস্নেহ উৎসারিত হইয়াছে। শরচ্চন্দ্রের লেখনীর বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই উপন্যাসে অন্যতম প্রধান বিষয় রমণীবাবুর সঙ্গে সবিতার সম্পর্ক। রমণীবাবু সকল দিক দিয়া ব্রজবাবুর বিপরীত। এই অশিক্ষিত, অমার্জ্জিতরুচি কামার্ত্ত পুরুষের প্রতি সবিতার মনে ভালবাসার সঞ্চার হইবে ইহা কল্পনা করাও অসম্ভব। কিন্তু মনুষ্যহৃদয়ের গতি এত বিসর্পিত যে, ইহাকে সঙ্গে করিয়া সবিতা তাঁহার দেব-প্রতিম স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—ইহারই উপপত্নী রূপে তিনি বার বৎসর কাটাইয়াছিলেন। সবিতার এই অধঃপতন ব্রজবাবু মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহার মনে কেবলই প্রশ্ন জাগিয়াছে, যে দিন সবিতা কুলত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, সে দিন বাস্তবিক কি হইয়াছিল? ব্রজবাবু বলিলেন, "তুমি ছিলে শুধুই কি স্ত্রী? ছিলে গৃহের লক্ষ্মী,...কিন্তু একটা কথা আমি প্রায়ই ভাবি নতুন বউ, কিছুতেই জবাব পাই না। আজ দৈবাৎ যদি কাছে পেয়েছি, বল'ত সেদিন কি হয়েছিল? এত আপনার হয়েও কি আমাকে সত্যিই ভালবাসতে পারো নি? না বুঝে তুমি তো কখনো কিছু করোনা, দেবে এর সত্যি জবাব?" সারদাও বারম্বার প্রশ্ন করিয়াছে যে, যদি সবিতা রমণীবাবুকে ভালই না বাসিয়া থাকে, তাহা হইলে সে রমণীবাবুর সঙ্গে গৃহত্যাগ করিল কেন? এবং তাহার সঙ্গে কেমন করিয়া সুদীর্ঘ বার বৎসর কাটাইতে পারিল? আমাদের মনে এইরূপ প্রশ্ন জাগে—সবিতার সঙ্গে রমণীবাবুর যে কলুষিত সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার মূল কোথায়? ইহা অনুমান করা যাইতে পারে

যে, সবিতা তাঁহার স্বামীকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি যতই করুক না কেন, তাহার মধ্যে এমন একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল, যাহা পরিতৃপ্তি খুঁজিত সেই পুরুষের কাছে যে প্রীতির পাত্র নহে, যে ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারে না—যে শুধু কামনা জাগ্রত করিতে পারে। প্রচলিত নীতি অনুসারে আমরা মনে করিয়া থাকি যে, নরনারীর মধ্যে যে দৈহিক সম্পর্ক থাকে তাহা অন্তরের ভালবাসা হইতে অবিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিতে পারে না। কিন্তু সবিতা ও রমণীবাবু প্রভৃতি দৃষ্টান্ত পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের সন্দেহ হয় যে, যৌন আকর্ষণ ও আন্তরিক প্রীতি দুইটি বিভিন্ন জিনিষ। সমাজ যে ইহাদিগকে একত্র করিয়া দেখিয়াছে, তাহাই গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সন্দেহ বিস্তৃততর প্রশ্নের ইঙ্গিত করে। সবিতার সমস্যা কি একটি নারীর ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা? না—ইহার সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে মানবের সভ্যতার মৌলিক ও আদিম প্রশ্ন? ভালবাসা কি হৃদয়ের সামগ্রী না দেহের আকর্ষণ? না উভয়ের সমবায়? শরৎচন্দ্র এই প্রশ্নের ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু ইহার বিস্তৃততর আলোচনা করেন নাই। তিনি শুধু এই রহস্যের চিত্র আঁকিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। তাঁহার উপন্যাস পড়িয়া মনে হয়, ইহা একটী অনন্য সাধারণ রমণীর অদ্ভুত জীবন কাহিনী মাত্র নহে, ইহা নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে যে দুর্জ্ঞেয় রহস্য রহিয়াছে, তাহারই জীবন্ত চিত্র। সবিতা নিজেকেই এই প্রশ্ন বারম্বার করিয়াছেন, তাহার উত্তর পান নাই। সবিতা মুখ তুলিয়া ব্রজবাবুর প্রশ্নের উত্তর করিলেন, "না, মেজকর্ত্তা, আমি তোমাকে চিঠিও লিখব না, মুখেও বোলব না।"—"তবে, জানবো কি করে?"—"জানবে যেদিন আমি নিজে জানতে পারবো।" "কিন্তু এ যে হেঁয়ালি হোলো।" "তা হোক। আশীর্ব্বাদ করো এর মানে যেন একদিন তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারি।" আমাদের মনে হয় সবিতার মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্র এই প্রশ্নের উত্তর দিতে নিজের অক্ষমতা জানাইয়াছেন।

শেষের পরিচয়ে কাব্যের উপেক্ষিতা সারদা। সারদা উপন্যাসের অনেকখানি যায়গা জুড়িয়া বসিয়াছে। তাহার সঙ্গে আমাদের যখন প্রথম পরিচয় হয়, তখনই তাহার চরিত্রের মধ্যে একটা স্নিগ্ধ ও বিষাদময় মাধুর্য্য দেখিয়া আমরা তাহার প্রতি আকৃষ্ট হই। তাহার পরে উপন্যাসের সমস্ত আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের মধ্যে তাহার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ট হয়। কিন্তু সবিতা···রেণুর কাহিনী এত প্রাধান্য পাইয়াছে যে, আমরা সারদাকে জানিয়াও জানি না। কেমন করিয়া এই বালবিধবা জীবনবাবুর সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়াছিল, কেমন করিয়া তাহাদের প্রণয় বিশীর্ণ হইয়া গেল, রাখালের প্রতি তাহার মনে যে শ্রদ্ধা-বিগলিত প্রীতি সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহাই বা কি সমস্যার সৃষ্টি করিল? ইহার কোন পরিচয়ই গ্রন্থকার দেন নাই। সারদাকে আমরা খুব নিকটে দেখি, কিন্তু তবু মনে হয় সে আমাদের নিকট অপরিচিতাই রহিয়া গেল। সে খুব কাছে আসিলেও মনে হয় তাহার জীবনের রহস্যের সন্ধান রহিয়াছে সুদূর অপরিজ্ঞাত রাজ্যে। শরৎচন্দ্র বিশ্লেষণ-পন্থী ঔপন্যাসিক। তিনি রমণীহৃদয়ের রহস্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র আঁকিয়া তাঁহার নায়িকাগুলিকে আমাদের কাছে সুচিরপরিচিত করিয়াছেন—কিন্তু সারদার চরিত্র অঙ্কণে তিনি পৃথক পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি শুধু আভাষ ও ইঙ্গিতের সাহায্যে তাহার চরিত্র আঁকিয়াছেন। সে শুধু সারদা, কিন্তু তাহার একটী পরম বিস্ময়কর ইতিহাস আছে, যাহা শুধু ব্যঞ্জনার সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার সম্পর্কে আমার কৌতূহল অপরিতৃপ্ত রহিয়া গিয়াছে —তাই বলিতে পারা যায় যে, সারদা কাব্যে উপেক্ষিতাদের মধ্যে অন্যতম।

চ্যারিটি শো

(গল্প)

শ্রীপ্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

ক্ষুধার্ত নরনারী শিশু বালক বৃদ্ধায় মহানগরীর প্রশস্ত রাজপথ ছাইয়া গিয়াছে। "দুটি ভাত মা, একটু ফেন, একটু খেতে দে মা," দিবারাত্র এই আকুল ক্রন্দনধ্বনি, মহানগরীর পাষাণ হৃদয়কেও যেন চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

কোন পাপে যে ১৩০৬ খৃষ্টাব্দের চিতোরনগরীর পুনরাভিনয় বাংলার বুকে সুরু হইয়াছে, তা কে জানে। বুকের রক্ত ঢালিয়া দিয়াও বাংলা যে মায়ের "ম্যয় ভুখা হুঁ" ধ্বনি মিটাইতে পারিতেছেন না। কার অভিশাপে, কোন পাপে সুজলা, সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলা আজ নিরন্ন তাহা কে বলিবে?

গৃহহারা, অন্নহারা, বস্ত্রহারা, দুঃস্থ জনসাধারণের প্রতি সকল রকমেই তাহার দেশের লোক কারুণ্য প্রকাশ করিতেছে। তবুও এই '৪৩-এর মন্বন্তর যেন মিটিতে চাহিতেছে না। আরো আরো চাই। দেশ বিদেশ হইতেও সাহায্যের পরিসীমা নাই, তাঁহাদের সুখ্যাতি সব কাগজে কাগজে প্রকাশিত হইতেছে।

সেই কথাটাই আজ বিশেষ করিয়া মিসেস্ বটব্যাল ভাবিতে বসিয়াছিলেন। একটা চ্যারিটি শো করিলে কেমন হয়?

তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা নবনীতা নৃত্যে বিশেষ পারদর্শিনী, নাচের জন্য তাহার বিশেষ খ্যাতি আছে। তাহাকে মূল করিয়া একটি নৃত্যনাট্য অভিনয় করিলে চমৎকার হয়। ইহাতে নবনীতার খ্যাতি ও বিবাহ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা হইবে। তাঁহার নেতৃত্বে এমন একটি নাট্যাভিনয় হইলে এবং কলিকাতা নগরীর ওই দুঃস্থ নরনারীদিগের জন্য অর্থ পাঠাইলে কাগজের পৃষ্ঠায় যে খ্যাতি বাহির হইবে, চীফ-কমিশনার মিষ্টার বটব্যালের পত্নী শ্রীযুক্তা বটব্যালের সুপরিচালিত অভিনয়ের সাফল্যে...ইত্যাদি...তাহাও কম আনন্দের কথা নহে।

মানসিক উত্তেজনার আধিক্যে মিসেস বটব্যাল তাঁহার ইজিচেয়ারে একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। পায়ের উপর ঢাকা দেওয়া শালখানা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। পুত্রের ফক্স টেরিয়ারটা তাহা লইয়া খেলা করিতেছে। হাত বাড়াইয়া শালখানা তুলিয়া লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাও লাফাইয়া তাঁহার কোলে উঠিয়া হাত শুঁকিতে লাগিল। বোধ হয় খাদ্য চায়। ও ডিয়ার, ও ডিয়ার,—তাহার মাথায় মৃদু আঘাত করিয়া আদর করিতে করিতে মিসেস্ বটব্যাল ডাকিলেন, "আয়া, কুত্তাকে বাস্তে বিস্কিট্ ঔর পাঁওরোটি লে আও।"

দুই

মহাসমারোহে "উর্ব্বশী অর্জ্জুন" নৃত্যনাট্যের rehearsal আরম্ভ হইয়াছে। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার দে'র ভাগিনেয়ী মণীষা দত্ত, বেথিয়া ষ্টেটের ম্যানেজার মিষ্টার সহায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী মিস্ সহায়, এবং আরো কত সম্ভ্রান্ত গৃহের বালিকা, কিশোরী ও যুবতীগণকে লইয়া পার্টি সংগঠিত হইল।

মিসেস্ বটব্যাল organizer, মিসেস বসুও তাঁহার সঙ্গে কাজ করিতেছেন। মিস তরঙ্গিনী Music Director, মিস নবনীতা Dance Composer ইত্যাদি হইয়াছেন। রিহার্শেল চলিতেছে, মিসেস বটব্যালের গৃহে। অভিনয় হইবে, ডিসেম্বরের মধ্যভাগে।

প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় মিসেস বটব্যালের গৃহে পূর্ণ রিহার্শেল হয়। আজও হইতেছিল।

সুসজ্জিত ডাইনিংরুমে আপনি দাঁড়াইয়া মিসেস বটব্যাল তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। সাইডবোর্ডে কার্বার্ডে রূপার ও পোর্সিলেনের বাসনগুলি ঝক্ ঝক্ করিতেছে। উজ্জ্বল ইলেকট্রিক লাইটের শুভ্র তীব্র আলোকে তাঁহার সাদা দুধের ফেনার মত কাশ্মিরী সিল্কের শাড়ি, গ্রীবায়, হস্তে, কর্ণে, হীরকাভরণ যেন দ্যুতি বিকীর্ণ করিতেছিল।

ডাইনিং টেবলের শুভ্র আস্তরণের উপর বাবুর্চ্চির অনবধানতায় কিসের দাগ লাগিয়া গিয়াছে। মিসেস বটব্যাল তাহা দেখিতে পাইয়াছেন এবং সেই চাদরখানি বদলাইতে বলিয়া দাসী ভৃত্য ও বাবুর্চ্চিকে তিরস্কার করিতেছিলেন। ত্রস্তা দাসী শুভ্র আস্তরণ আনিয়া বিছাইয়া দিল এবং স্বস্থানে

তাজা গোলাপ ডালিয়াফুলে ভরা, ভাস্ ও ফুলদানীগুলি সাজাইয়া রাখিল। মশলার পাত্র যথাস্থানে রহিল। বেয়ারা আসিয়া আপেল, কমলালেবু, বেদানা, আঙ্গুর, কিসমিস্, বাদাম, আখরোটে ভরা পাত্রগুলি রাখিল। অতঃপর বাবুর্চি আসিয়া চপ, কাটলেট, কেক্, ডিম, পেষ্ট্রী, স্যাণ্ডউইচ, টোষ্টের ট্রে রাখিল। ঠাকুর গরম সিঙ্গারা, নিমকী, ঘুগুনী পাপর ভাজা ইত্যাদি পূর্ব্বেই রাখিয়া গিয়াছিল।

শুভ্র ন্যাপকিন্‌গুলি কোনটি ফুলের আকারে, কোনটি কুঁড়ির আকারে বয় সাজাইয়া রাখিতে লাগিল।

গৃহিণী ঘুরিয়া ফিরিয়া আর একবার চারিদিক দেখিলেন। রেফরিজারেটারে আইসক্রীম প্রস্তুত কি না, জলের বোতল-গুলি ঠাণ্ডা হইবার জন্য উহার ভিতর রাখা হইয়াছে কি না, বেসিনের ট্যাপে গরমজলের বন্দোবস্ত ঠিক কি না, প্রশ্ন করিয়া অবশেষে চেয়ারের উপর হইতে তাঁহার গ্রেটাগার্ব্বোর-কাটের ভেনিসিয়ান সার্জ্জের কোটটি হাতে তুলিয়া লইয়া, নৃত্যগীত করিয়া ক্লান্ত মনুষ্যগুলিকে জলযোগ করিতে আহ্বান করিবার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন। উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত, হাসি, গল্প, গানে মুখরিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহারি কন্যা নবনীতা তখন কনসার্টের সুরে সামঞ্জস্য রাখিয়া তবলার তালে ঘুঙুর ঝঙ্কৃত পা ফেলিতেছে—এক, দুই, তিন, চার, এক···

তিন

কলিকাতার ফুটপাতে, ধনীর গাড়ীবারান্দায় গৃহস্থের রোয়াকে সন্ধ্যার অন্ধকারে পা ফেলিবার উপায় নাই। যে হতভাগ্যের দল আপাত মধুর অর্থের লোভে নোটের গোছা হাতে লইয়া বাস্তু বিক্রয় করিয়া আজ গৃহহারা, অন্নহীন, যাহাদের বন্যায় সর্ব্বনাশ হইয়াছে, যাহাদের ঘরের চাল অভাবের তাড়নায় বিক্রয় করিয়া আজ খাদ্যহীন, তাহারা আজ বড় আশায় আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে কলিকাতার ফুটপাতে। মনে করিয়াছে এই রাজসমারোহময়ী নগরীর বুকে একবার আসিয়া পড়িতে পারিলে হয় ত' বাঁচিয়া যাইবে, হয় ত' দুঃখের অবসান হইবে।

কিন্তু শত সহস্র অনাহারক্লিষ্ট আশ্রয়হীন নরনারীকে আশ্রয়, আহার দিবার সামর্থ্য দেশবাসীর আছে কি? অজস্র করভারে, মূল্যবৃদ্ধিভারে জর্জ্জরিত দেশবাসী সকলেই যে প্রায় মৃতপ্রায়, কেহ আগে, কেহ পিছে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। খাইতে দিবে কে? দেখিবে কে? দেশবাসীর সামর্থ্য নাই বলিয়াই আজ দেশের লোক ইঁদুরের মত কুকুর, শেয়ালের মত রাস্তায় অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মরিতেছে। আত্মসম্মানহীন পরাধীন জাতীর পাপের ভরা কতখানি যে পূর্ণ হইয়াছে, তাহাই আজ ভগবান চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতেছেন। তবুও চেতনা হয় না।

কোন আশায় প্রবুদ্ধ হইয়া এই অনাহারক্লিষ্ট নরনারীর দল আসিয়াছিল, তাহা কে জানে? তাহারা ফুটপাতেই তাহাদের সংসার পাতিয়া বসিয়াছে এবং সেই স্থলেই তাহাদের মৃত্যুলীলা চলিয়াছে, তখন শীত ছিল না, যখন তাহারা আসিয়াছিল। ক্রমেই শীতের দিন অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। ইহারা কোথায় আশ্রয় লইবে? সারাদিন রৌদ্র যেমন মিষ্টি লাগে, সন্ধ্যার ধুম ও কুয়াসাচ্ছন্ন অন্ধকার তেমনি ভয়াবহ মুর্ত্তি লইয়া তাহাদের নিকট দেখা দেয়।

গৃহস্থলটি হইতে প্রাপ্ত ছিন্নবসন বা কম্বলখানিতে কঙ্কাল-সার পুত্র বা কন্যাকে ঢাকিয়া কঙ্কালসার পিতা বা মাতা প্রায় অনাবৃতদেহে শীতের রাত্রি কাটাইয়া প্রভাতের আশায় বসিয়া থাকে, কতক্ষণে রৌদ্র উঠিবে। উপস্থিত ইহা আহারের মতই প্রয়োজনীয়।

বদান্যদাতাদিগের প্রদত্ত কম্বল অধিকাংশের ভাগ্যেই জোটে নাই আগত শীতের দিন তাহাদের পক্ষে এবং চক্ষের পর্দ্দাযুক্ত সহৃদয় অথচ অক্ষম ভদ্রদেশবাসীর পক্ষে এক সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

ধনী মাড়োয়ারীগণের বদান্যতার দানেও তুলনা নাই, বাঙ্গালা চিরদিন এ-দানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে। কিন্তু তাঁহারা একটা সমগ্র জেলার অভাব তো মিটাইতে পারেন না।

চার

মিসেস বটব্যালের ড্রইংরুমে তাঁহাদের Women Council-এর Working Committeeর একটি urgent মিটিং বসিয়াছিল।

তাঁহাদের নৃত্যপড়া এ্যামেচার তারকার প্রায় প্রত্যেকে আসিয়া টেষ্ট দিয়াছে, কেহ আই-এ, কেহ বি-এ, কেহ বা

ম্যাট্রিকুলেশনের ছাত্রী। তা' ছাড়া বলিতেছে অভিনয় পিছাইয়া দেওয়া হউক।

জাষ্টিস্ সরকারের কন্যা জানাইয়াছেন—তাহা না হইলে তাঁহার পক্ষে অভিনয়ে যোগ দেওয়া সম্ভবপর হইবে না। সেই জন্যই এই জরুরী মিটিং।

ক্ষুধার্ত্তেরা বরং অপেক্ষা করিতে পারিবে, কিন্তু Miss Saila Sircar যোগ না দিলে অভিনয়ের আভিজাত্য যে ব্যর্থ।

অতএব সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে জানুয়ারীর মধ্যভাগে অভিনয় হইবে।

নারীসঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারীর সম্মতিক্রমে রেজোলিউশন পাশ হইয়া গেল।

পাঁচ

কিন্তু সেই ধরিত্রীর মত সহনক্ষম, অসহায়, মৃত্যুশীল, হতভাগ্যগণের কর্ম্মফল ভোগ বোধ করি পূর্ণ হইয়াছিল, তাই তাহাদের বেশীদিন ফুটপাতের কঠিন শীতল পেভমেণ্টের উপর শীতের কষ্টভোগ করিতে হইল না। একেবারে নগরী প্রত্যন্ত প্রদেশে চালাঘরে তাহাদের চিরবিশ্রাম লাভের ব্যবস্থা হইতে লাগিল।

সুশৃঙ্খল শাসন পরিচালনায় রাত্রির নীরব নিরন্ধ্র অন্ধকারে লরী আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল, এবং ফুটপাথ শূন্য করিয়া আবর্জ্জনা দূর হইতে লাগিল; কে কোথায় উঠিল কে জানে। কত জায়গায় পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন পিতা মাতার ক্রন্দনে পরাধীন দেশের পরাধীন জাতির মসীলিপ্ত ললাটের মসী আরো গাঢ়তর হইয়া উঠিল।

কত বৃদ্ধ পিতামাতার যুবক পুত্রের সক্ষম বাহুর আশ্রয় হারাইয়া হাহাকার করিতে গিয়া ভয়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। তবে প্রভাতে উঠিয়া দেখা যায়, ফুটপাত কতকটা পরিস্কার, হাঁটিবার জায়গা পাওয়া যাইতেছে। উহারি মধ্যে নিত্য পথচারী কেহ কেহ আপনাকে আপনি প্রশ্ন করে, "আহা সেই বুড়োটা কিম্বা ছোট মেয়েটা কোথায় গেল?" পরাধীন জাতির পরাধীন ভগবান জবাব দিলেন না, হয়ত' বা ভয়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

ছয়

ফেব্রুয়ারীর শেষ অভিনয়ের দিন আরও কিছু পিছাইয়াছিল, মেয়েদের সর্দ্দির জন্য।

অবশেষে সাকসেসফুল্ অভিনয় রজনী শেষ হইয়া গেল। প্রত্যেক কাগজের রিপোর্টারগণ সাদর নিমন্ত্রণ পাইয়াছিল। গভর্ণর নগদ পঞ্চাশ টাকা দিয়া টিকিট লইয়াছিলেন এবং নবনীতার নৃত্যে মুগ্ধ হইয়া স্বয়ং তাহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া বলিয়াছেন wonderful dance,

মিসেস বটব্যাল গর্ব্বে ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছেন। সার্থক তাঁহার গর্ভধারণ। সার্থক তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা। টিকিট বিক্রয়ের টাকার সুনিপুণ হিসাব করিয়া অভিনয়ের নিমিত্ত খরচ কাটিয়া লইয়া টাকা রহিয়াছে, ৪০০৮/৫, এক সপ্তাহ পরে সেই টাকা সাউথ সেণ্ট্রাল্ রিলিফফাণ্ডে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

সাউথ সেণ্ট্রাল রিলিফ ফাণ্ডের সেক্রেটারী অহমানন্দ ওঝা বিস্মিত হইলেও টাকাটা হাতছাড়া করিলেন না।

মিসেস বটব্যাল ও নারী সঙ্ঘকে thanks দিয়া পত্র দিলেন। টাকাটা ভবিষ্যত দুর্গতদিগের জন্য সেক্রেটারীর ব্যাঙ্কে জমা রহিল।

সাত

রৌদ্রকরোজ্জ্বল পশ্চিমের বারান্দায় ভিক্টোরিয়ান ইজিচেয়ারে চাইনিজ সিল্কের মোটা কুশনটায় হেলান দিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় মিসেস বটব্যাল সংবাদপত্র পড়িতেছিলেন।

সম্মুখে ছোট একটা টেবলে আরো কতকগুলি সংবাদপত্র রহিয়াছে। মিসেস বটব্যাল পড়িতেছিলেন।

নারীসঙ্ঘের সহ-সভানেত্রী শ্রীমতী বটব্যালের পরিচালন কৃতিত্বে দুর্গতদিগের সাহায্য নিমিত্ত যে নৃত্যনাট্য অভিনীত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। স্বয়ং গভর্ণর বাহাদুর ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। মিস নবনীতার নৃত্য এবং মনীষা দত্তের সঙ্গীত অতুলনীয়...ইত্যাদি।

মিসেস বটব্যালের মুখে সাফল্যের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

ললিত-কলা

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

ছয়

যে স্থলে লয়—বিলম্বিত, গ্রহ—অতীত, বৃত্তি—আরভটী, তাহার নাম 'চণ্ড-তাণ্ডব'।১

যথায় লয়—মধ্য, গ্রহ—সম, বৃত্তি—আরভটী, তাহাই 'প্রচণ্ড-তাণ্ডব' নামে খ্যাত।

আর যাহাতে লয়—দ্রুত, গ্রহ—অনাগত ও বৃত্তি—আরভটী, তাহাকে 'উচ্চণ্ড-তাণ্ডব' নাম প্রদত্ত হয়।

চণ্ড-তাণ্ডব—বীর-রৌদ্র-মিশ্র-রসে প্রযোজ্য। প্রচণ্ড-তাণ্ডব—রৌদ্র-বীভৎস-মিশ্রে প্রযোজ্য হয়। আর উচ্চণ্ড-তাণ্ডব—রৌদ্র-বীভৎস-ভয়ানকের মিশ্রণে বিনিযুক্ত হইয়া থাকে।২

'লাস্য'—ইহা 'রাসক'-নামেও খ্যাত। রাসক ত্রিবিধ—(১) দণ্ড-রাসক, (২) মণ্ডল-রাসক ও (৩) নাট্য-রাসক। শৃঙ্খলা ও ভেদ্যকের প্রত্যেক বিভাগটি দশভাগে বিভক্ত। তাহাদিগের বিস্তৃত বিবরণ এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অবান্তর। পিণ্ডী-বন্ধাত্মক 'নৃত্ত' দেবগণের আনন্দদায়ক।৩

বস্তুতঃ লাস্যের ভেদ বহু। ভাব-ভেদে উহা ভিন্ন।৪ ঐ লাস্য শাস্ত্রকথিত নিয়মহীন হইলেই দেশীয় রুচি অনুযায়ী 'দেশী' নৃত্ত নামে কথিত হয়। শারদাতনয় ঐ দেশী নৃত্তকেই 'গুণ্ডলী'-নৃত্য নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই গুণ্ডলী-নৃত্ত নানা-দেশ-ভেদে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। দেশী তাল, দেশী বাদ্য, দেশী গীত সহ উহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।৫

শারদাতনয়—দেশী তাণ্ডব ও লাস্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

যে ক্ষেত্রে করণগুলি প্রায়ই উদ্ধত ও যাহার করণগুলি দেশী রুচি অনুযায়ী কল্পিত, যাহাতে দেশী তাল লয় বর্ত্তমান ও যাহা দেশীয় ভাষা-মিশ্রিত, তাহাই দেশী 'তাণ্ডব'।

যাহাতে মৃদু ভূমিচারী মিশ্রিত, ললিত লয় ও দেশী লাস্যাঙ্গ বিদ্যমান, তাহাই দেশী 'লাস্য'।৬

১। "জটাটবীগলজ্জলপ্রবাহপাবিতস্থলে
গলেহবলম্ব্য লম্বিতাং ভুজঙ্গতুঙ্গমালিকাম্।
ডমড্-ডমড্-ডমড্-ডমান্নিনাদবড্ডমর্বয়ং
চকার চণ্ডতাণ্ডবং তনোতু নঃ শিবঃ শিবম্"॥
—রাবণ-কৃত শিব-তাণ্ডব-স্তোত্র (১)

২। "বিলম্বিতো লয়ো যত্র নু (গ্র)হশ্চাতীতকল্পিতঃ॥
তথৈবারভটী যত্র তৎ খ্যাতং চণ্ডতাণ্ডবম্।
সমগ্রহো মধ্যলয়স্তথৈবারভটীযুতঃ॥
প্রচণ্ডতাণ্ডবং তৎ স্যাদিতি তত্র প্রযোজিতম্।
অনাগতো গ্রহো যত্র লয়ো যত্র দ্রুতো ভবেৎ॥
তাদৃশ্যারভটী যত্র তৎ স্যাদুচ্চণ্ডতাণ্ডবম্।

[ধ্রুপদ-সঙ্গীতে পাখোয়াজ-বাজনা যাঁহারা অভিনিবেশ সহকারে শুনিয়াছেন, তাঁহারা এই অতীত, সম ও অনাগত গ্রহ কিরূপ পদার্থ, তাহা বুঝিবেন—ইহা লিখিয়া বুঝান সম্ভব নহে।]

চণ্ডাখ্যং তাণ্ডবং বীররৌদ্রমিশ্ররসে ভবেৎ।
প্রচণ্ডতাণ্ডবং খ্যাতং রৌদ্রবীভৎসমিশ্রণে॥
উচ্চণ্ডং রৌদ্রবীভৎসভয়ানকসমুচ্চয়ে"।
—ভাবপ্রকাশন, পৃঃ ২৯৮।৯৯

৩। "লাস্যং রাসকনাম স্যাৎ তৎ ত্রেধা রাসকং ভবেৎ।
দণ্ডরাসকমেকন্তু তথা মণ্ডলরাসকম্॥
একন্তু যোষিদ্ভিরয়ন্নাট্যরাসকমীরিতম্।

[নাট্যরাসক—অন্যতম উপরূপক—বিশ্বনাথাদির মতে। শারদাতনয়ের মতে—বিংশতি প্রকার নৃত্য-ভেদের মধ্যে নাট্যরাসক ও রাসক - দুইটি ভেদ (ভাবপ্রকাশন, পৃঃ ২৫৫, ২৬৩-৬৬)।]

শৃঙ্খলা ভেদ্যকঞ্চাপি দশধা ভিদ্যতে পুনঃ॥
তদ্দোরপদমিত্যাদি লাস্যাঙ্গত্বেন কথ্যতে।
পিণ্ডীবন্ধে তু বহুধা ভেদস্তৎ তাণ্ডবস্য তু॥
পিণ্ডীবন্ধাত্মকং নৃত্যং তদ্দেবত্রপ্রহর্ষণম্।"—ভাবপ্রঃ, পৃঃ ২৯৭

পিণ্ডীবন্ধ—যাহাতে করণ-অঙ্গহার ইত্যাদি পিণ্ডীকৃত—"পিণ্ডনাত্তু ভবেৎ পিণ্ডী",—ভাবপ্রকাশ, পৃঃ ২৩৪। নাট্যশাস্ত্রের চতুর্থাধ্যায়ে পিণ্ডীবন্ধের বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হয়। নাচিতে নাচিতে যখন কয়েকটি করণ-অঙ্গহার একত্র পিণ্ডীকৃত হইয়া একটি বিশিষ্ট আকৃতির (figure, যথা—কোন পক্ষী ইত্যাদির) সৃষ্টি করে, তখন তাহার নাম হয় পিণ্ডীবন্ধ। বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন 'পিণ্ডীবন্ধ' প্রিয়; যথা, ব্রহ্মার প্রিয় পদ্মপিণ্ডী, গরুড়পিণ্ডী বিষ্ণুর প্রিয়, ইত্যাদি—নাঃ শাঃ, বরোদা সং, পৃঃ ১৬৭-১৭০ দ্রষ্টব্য।

৪। "ভাবভেদাল্লাস্যভেদো বহুধা কথ্যতে বুধৈঃ।"
—ভাবপ্রঃ, পৃঃ ২৯৭

৫। "তদেব নিয়মৈর্হীনং দেশে রুচ্যা প্রবর্ত্তিতম্॥
গুণ্ডলীনৃত্তমিত্যুক্তং তৎ স্যাদ্দেশেষনেকধা।
দেশী তালৈশ্চ বাদ্যৈশ্চ দেশীগীতৈশ্চ কল্পিতম্॥
চতুঃষষ্ট্যঙ্গসংযুক্তগতিশ্চা? লয়রীতিমৎ।
শুদ্ধং চিত্রং চ মিশ্রং চ গুণ্ডলীনর্ত্তনং ত্রিধা॥"
—ভাবপ্রঃ, পৃঃ ২৯৭

৬। "উদ্ধতপ্রায়করণং রুচ্যা যদ্দেশ্যকল্পিতম্।
করণং বক্রগং চেতি তদ্দেশীতাণ্ডবং বিদুঃ॥
দেশীতাললয়োপেতং দেশভাষাবিমিশ্রিতম্।
তদ্বীরাদ্ভুতশৃঙ্গারহাস্যেষু বিনিযুজ্যতে" ॥—ভাবপ্রঃ, পৃঃ ২৯৯
"তদেব ভূমিচারীভির্মৃদ্বীভির্ললিতালয়ৈঃ।
দেশীলাস্যাঙ্গসংযুক্তং দেশীলাস্যমিতীরিতম্॥"
—ভাবপ্রঃ, পৃঃ ৩০১

শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত-রত্নাকর-মতেও নৃত্য-নৃত্তের দুইটি ভেদ—তাণ্ডব ও লাস্য। বৰ্দ্ধমানক, আসারিত ইত্যাদি গীত, প্রাবেশিকী ইত্যাদি ধ্রুবা, তলপুষ্পপুট ইত্যাদি করণ ও স্থির-হস্ত ইত্যাদি অঙ্গহার-সমাযুক্ত তণ্ডু-কথিত উদ্ধত নর্ত্তন-প্রয়োগের নাম তাণ্ডব। লাস্য—কামবৰ্দ্ধক, সুকুমার প্রয়োগ।

নৃত্ত আবার ত্রিবিধ—বিষম, বিকট ও লঘু। ঋজু ভ্রমণাদির নাম 'বিষম'। বিরূপ বেশ ও অবয়ব-ব্যাপারের নাম 'বিকট'। ক্রিয়া-বৈচিত্র্যের অভাববশতঃ অল্পকরণ প্রয়োগের নাম 'লঘু'।

পার্শ্বদেবের 'সঙ্গীতসময়সারে' যেরূপ কেবল 'নৃত্ত'-লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে—'নৃত্যে'র স্বরূপ পৃথক্ উল্লিখিত হয় নাই, নারদের 'সঙ্গীতমকরন্দে' ঠিক তাহার বিপরীতভাবে কেবল 'নৃত্যে'র স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে—'নৃত্তে'র লক্ষণ পৃথক্ বলা হয় নাই। ইঁহার মতে—গীত, বাদ্য ও নৃত্য…এই তিনের নাম 'সঙ্গীত'।৭

অহোবল-কৃত 'সঙ্গীত-পারিজাত' গ্রন্থ শার্ঙ্গদেব-কৃত 'সঙ্গীতরত্নাকর' অপেক্ষা বহু অর্ব্বাচীন। উহাতেও উক্ত হইয়াছে—গীত, বাদিত্র ও নৃত্য—এই তিনের নাম সঙ্গীত। ইহাদিগের মধ্যে গানই প্রধান। তাই গানকেও 'সঙ্গীত' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। সঙ্গীতের দুইটি ভেদ—মার্গ ও দেশী। স্বয়ং ব্রহ্মা মহর্ষি ভরতকে 'মার্গ' নামক সঙ্গীতের উপদেশ দিয়াছিলেন। এই মার্গ-সঙ্গীত অপ্সরাঃ গন্ধর্ব্বগণের সহযোগে ভরত-কর্ত্তৃক শম্ভুর সম্মুখে প্রযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার নিকট হইতে তাণ্ডব ও উমার নিকট হইতে লাস্য শিক্ষাপূর্ব্বক ভরতমুনি শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই সঙ্গীতই দেশ-ভেদে 'দেশীয়' নামে কথিত হইয়া থাকে।৮

শুকম্ভর-কৃত 'সঙ্গীত-দামোদর' গ্রন্থেও কেবল নৃত্যের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। দেবগণের রুচিকর, তাল-মান-রসাশ্রয় সবিলাস অঙ্গবিক্ষেপের নাম 'নৃত্য'। নৃত্য দ্বিবিধ—তাণ্ডব ও লাস্য। তাণ্ডব আবার দ্বিবিধ—পেবলি ও বহুরূপ। লাস্যও দ্বিবিধ—ছুরিত ও যৌবত।

পেবলি—ইহাতে অঙ্গবিক্ষেপের বাহুল্য, কিন্তু অভিনয়-শূন্যতা দৃষ্ট হয়। ইহার লৌকিক সংজ্ঞা—'দেশী'।

বহুরূপ—ইহাতে ছেদন-ভেদনাদি নানা প্রকার উদ্ধত ভাবের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে।

ছুরিত—যাহাতে নায়ক-নায়িকা অভিনয়াঙ্গ ভাব-রসাদি প্রকাশপূর্ব্বক আলিঙ্গন চুম্বনাদি সহকারে নৃত্য করিতে থাকেন।

যৌবত—নটীগণ লীলাসহকারে বশীকরণাত্মক যে মধুর নৃত্য করিয়া থাকেন।

সঙ্গীত-দামোদরে আরও উক্ত হইয়াছে যে—গীত হইতে বাদ্যের উৎপত্তি। বাদ্য হইতে লয়ের উদ্ভব। অতঃপর লয়-তাল-সমারব্ধ নৃত্য প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।৯

অভিনয়দর্পণে নন্দিকেশ্বরও এই প্রসঙ্গে কয়েকটি মূল্যবান্ মন্তব্য করিয়াছেন—

নৃত্য—গীত ও অভিনয়, ভাব ও তাল-যুক্ত হওয়া উচিত। বদন গীতের আশ্রয়স্থল (অর্থাৎ—মুখ হইতেই গীতের

চারী—পাদক্রিয়া-বিশেষ। নাট্যশাস্ত্রাদির মতে উহার মোট দুইটি ভেদ—আকাশ-চারী ও ভৌম-চারী।

৭। "গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে"—সঙ্গীতমকরন্দ, সঙ্গীতাধ্যায় প্রথম পাদ, শ্লোক ৩।

৮। "গীতবাদিত্রনৃত্যানাং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।
গানস্যাত্র প্রধানত্বাৎ তৎ সঙ্গীতমিতীরিতম্ ॥ ২০
মার্গদেশীয়ভেদেন দ্বেধা সঙ্গীতমুচ্যতে।
দ্বেধা মার্গাখ্যসঙ্গীতং ভরতায়াব্রবাৎ স্বয়ম্ ॥ ২১
ব্রহ্মণোঽধীত্য ভরতঃ সঙ্গীতং মার্গসংজ্ঞং তৎ।
অপ্সরোভিশ্চ গন্ধর্ব্বৈঃ শম্ভোরগ্রে প্রযুক্তবান্ ॥ ২২
ততোঽপি তাণ্ডবং জ্ঞাত্বা লাস্যং জ্ঞাত্বোমযোদিতম্।
তৎসর্ব্বং শিষ্যসঙ্ঘেভ্যঃ প্রোক্তবান্ ভরতো মুনিঃ ॥ ২৩
তদ্দেশীয়মিতি প্রাহুঃ সঙ্গীতং দেশভেদতঃ"।—সঙ্গীত-পারিজাত।

৯। "দেবরুচ্যা প্রতীতো যস্তালমানরসাশ্রয়ঃ।
সবিলাসোঽঙ্গবিক্ষেপো নৃত্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ"।—সঙ্গীতদামোদর
"তাণ্ডবঞ্চ তথা লাস্যং দ্বিবিধং নৃত্যমুচ্যতে।
পেবলির্বহুরূপঞ্চ তাণ্ডবং দ্বিবিধং মতম্ ॥
অঙ্গবিক্ষেপবাহুল্যং তথাভিনয়শূন্যতা।
যত্র সা পেবলিস্তস্যাঃ সংজ্ঞা দেশীতি লোকতঃ ॥
ছেদনং ভেদনং যত্র বহুরূপা মুখাবলী (?)।
তাণ্ডবং বহুরূপং তদ্বারুণাগলমুদ্ধতম্ (?) ॥
ছুরিতং যৌবতঞ্চেতি লাস্যং দ্বিবিধমুচ্যতে।
যত্রাভিনয়াদৈর্ভাবৈ রসৈরাশ্লেষচুম্বনৈঃ।
নায়িকানায়কৌ রঙ্গে নৃত্যতশ্ছুরিতং হি তৎ ॥
মধুরং বন্ধলীলাভির্নটীভির্যত্র নৃত্যতে।
বশীকরণবিদ্যাভং তল্লাস্যং যৌবতং মতম্" ॥—সঃ দাঃ
"গেয়াদুত্তিষ্ঠতে বাদ্যং বাদ্যাদুত্তিষ্ঠতে লয়ঃ।
লয়তালসমারব্ধং ততো নৃত্যং প্রবর্ত্ততে" ॥—সঃ দাঃ

[৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহোদয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত কল্কিপুরাণের পাদটীকায় উদ্ধৃত, পৃঃ ৭০—৭২, তৃতীয় অংশ, নবম অধ্যায়।]

অভিব্যক্তি)। হস্তের সাহায্যে গীতের অর্থ প্রদ করিতে হয়। নেত্রদ্বয়-দ্বারা ভাব প্রদর্শনীয়। আর পাদদ্বয়ে তাল রক্ষা করা উচিত।

এই নৃত্যক্রিয়ায় কিরূপে রসসৃষ্টি হয়, তাহাও অভিনয়-দর্পণে উক্ত হইয়াছে—যেখানে হস্ত, সেখানেই নয়ন (দৃষ্টি); যেখানে নয়ন, সেখানে মন; যেখানে মন, সেখানেই ভাব; আর যেখানে ভাব, সেখানেই রস।১০

একটু বিস্তৃতভাবে বুঝাইতে হইলে একথা বলা চলে—গীতের বাণী মুখগহ্বর হইতে নির্গত হয়—এ কারণে নন্দিকেশ্বর মুখকে গীতের আলম্বন বা আশ্রয় বলিয়াছেন। কেবল নানারূপ হস্তভঙ্গী-দ্বারাই পরকে অনেক জিনিষ বুঝান যায়; তাই বলা হইয়াছে—গীতের অর্থ-প্রদর্শনের উপায় হইতেছে হস্ত। সাধারণ ভাষায় ইহাকেই 'ভাও বাতলান' বলে। হৃদয়স্থিত ভাবের বাহ্য অভিব্যক্তি-কেন্দ্র হইল নয়নদ্বয়—কারণ, নয়নেই মানব-মনের প্রতিচ্ছবি পড়ে। তাই চক্ষুর সাহায্যে ভাবাভিব্যক্তির কথা বলা হইয়াছে। আর তাল (অর্থাৎ কাল-ক্রিয়া-মান) রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় পাদদ্বয়। নর্ত্তক-নর্ত্তকীর পাদদ্বয় বিশেষরূপে তালানুগ হওয়া উচিত। প্রথমে পদদ্বারা তাল দিতে শিক্ষা না করিলে নর্ত্তন বা গীত-বাদ্য শিক্ষায় অধিকারই জন্মে না।

হস্তসঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গেই উহা জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যদি এই হস্তভঙ্গীগুলি নয়নের তৃপ্তিকর হয়, তবে উহার প্রতি মনও আকৃষ্ট হইয়া থাকে। মন একাগ্র হইলেই অভিব্যজ্যমান স্থায়ী ভাবটির উদ্রেক হয়। আর সমগ্র দর্শকসমাজে একই ভাবের উদ্রেক হইলেই উহা রসাকারে পরিণত হইয়া আস্বাদন-যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকে।১১

নৃত্য-সম্বন্ধে পূর্ব্বোল্লিখিত নানাবিধ মতামত আলোচনার পর ইহাই সিদ্ধান্ত করা সমীচীন মনে হয় যে—দশরূপক-কার এ প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবোধ্য ও সুসঙ্গত—নাট্য—রসাশ্রয়, নৃত্য—ভাবাশ্রয় ও নৃত্ত—তাল-লয়াশ্রয়—ইহাই এ তিনের সংক্ষিপ্ত ভেদ।

নৃত্য-কলার প্রসঙ্গ আপাততঃ এই স্থলেই সমাপ্ত করা হইল।

(৪) আলেখ্য—চিত্র-বিদ্যা—চিত্র-শিল্প। যশোধর বলিয়াছেন—চিত্র-শিল্পের ছয়টি অঙ্গ—

(১) রূপভেদ—বিভিন্ন প্রকার আকৃতির (রূপ) সমাবেশ,

(২) প্রমাণ—পরিমাণ, অথবা প্রামাণিকতা। যথায় যেরূপ ভাবে আকার ও বর্ণ-বিন্যাস করিলে চিত্রখানি শোভন হয়, তদ্রূপ করণ। [অথবা, এরূপ ভাবে ছবিখানি আঁকিবার কৌশল, যাহাতে উহা যথার্থ—(lifelike) বস্তু বলিয়া মনে হয়—স্বাভাবিক ভাবে চিত্রণ।]

(৩) ভাবযোজন-ইহার অর্থ চিত্রে ভাবের স্পষ্ট সংযোজন।

(৪) 'লাবণ্য' বলিতে বুঝায়—ঢলঢলে ভাব—মুক্তা-ফলের মধ্যে যে তরল ছায়া দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ।

(৫) সাদৃশ্য—ব্যাবহারিক বস্তুর সহিত চিত্রের সাম্য। 'সাদৃশ্য' বলায়—কিছু ভেদ যে আছেই,—ইহা বুঝিতে হইবে।১২ একেবারে যথাযথ ভাবে বাহ্য বস্তুর প্রতিচ্ছবি গ্রহণে চিত্রকলার উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হয় না—উহা কেবল আলোকচিত্র হইয়া থাকে—উত্তমশ্রেণীর চিত্রশিল্পের মধ্যে উহা অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হয় না।

(৬) বর্ণিকাভেদ—'বর্ণিকা' অর্থে তুলি। বর্ণিকাভঙ্গ—তুলির খেলা। ভাল ভাল ছবিতে তুলি দিয়া যে সব টান দেওয়া হয়, তাহাদিগের বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্য থাকে—ইহা চিত্রবিদ্‌গণ ও চিত্র-সমালোচকবৃন্দ একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন।১৩

১০। "নৃত্যং গীতাভিনয়নভাবতালযুতং ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥
আস্যেনালম্বয়েদ্ গীতং হস্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ।
চক্ষুর্ভ্যাং দর্শয়েদ্ভাবং পাদাভ্যাং তালমাদিশেৎ ॥ ৩৬ ॥
যতো হস্তস্ততো দৃষ্টির্যতো দৃষ্টিস্ততো মনঃ।
যতো মনস্ততো ভাবো যতো ভাবস্ততো রসঃ" ॥ ৩৭ ॥
—মৎসম্পাদিত অভিনয়দর্পণ, পৃঃ ১৯-২০

১১। মৎসম্পাদিত অভিনয়দর্পণ, পৃঃ ২০-২৪ দ্রষ্টব্য।

১২। সাদৃশ্যং—"তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্‌গতভূয়োধর্ম্মবত্ত্বম্।"

১৩। মহারাজ ৺কুমুদচন্দ্র সিংহ তাঁহার 'কৌমুদী' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"রূপে বৈশিষ্ট্য (যাহার যে স্থানে যে রূপ হওয়া সঙ্গত, সেইরূপ যথাযথ প্রদর্শন), প্রমাণ, ভাব ও লাবণ্য যোজন, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ (নানাপ্রকার বর্ণদ্বারা তুলিকাযোগে চিত্রের উৎকর্ষসাধনজন্য শ্রেণীবদ্ধরূপে বর্ণবিন্যাস), এই ছয় প্রকার চিত্রযোগ। আলেখ্য চিত্রণের এই বর্ণনা পাঠে কি প্রতিপন্ন হয় না যে, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে চিত্রবিদ্যার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল? সংস্কৃত নাটক ও কাব্য প্রভৃতিতে চিত্রবিদ্যার বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।"—কৌমুদী, পৃঃ ২৭

'চিত্রযোগ'—শব্দটি এ স্থলে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয় নাই। চিত্রকলা

যশোধর বলিয়াছেন—এই সকল কলা (গীত-বাদ্য-নৃত্য-আলেখ্য) পরের অনুরাগ-জনক ও নিজের চিত্তবিনোদন-কর।১৪ .

চিত্র-বিদ্যা প্রাচীন ভারতে যে কিরূপ সমাদর লাভ করিয়াছিল, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় সংস্কৃত সাহিত্যের চারিজন মহাকবির রচনা হইতে প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) মহাকবি ভাস তাঁহার সুবিখ্যাত 'দূতবাক্য' নামক ব্যায়োগে১৫ দ্রৌপদীর কেশাম্বরাকর্ষণের বিষয় চিত্রিত হওয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। দুর্য্যোধন ঐ চিত্রখানি দেখিতেছিলেন, এমন সময় বাসুদেব আসিয়া পড়িলেন। চিত্রখানি যে অত্যন্ত সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল—ইহা দুর্য্যোধন ও বাসুদেব উভয়েরই প্রশংসাবাক্য হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। চিত্রখানির বিষয়-বস্তু অবশ্য বাসুদেবের নিকট অপ্রীতিকর বোধ হইয়াছিল।১৬

(২) মহাকবি কালিদাস তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত "অভিজ্ঞান-শকুন্তল" নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কের প্রারম্ভে দেখাইয়াছেন যে—মহারাজ দুষ্মন্ত প্রিয়তমা শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিবার পর পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হওয়ায় বিরহাবস্থায় চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে আশ্রমগতা শকুন্তলার তাপসবালা-মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছেন। চিত্রখানি এতই স্বাভাবিক হইয়াছিল যে, বিদূষক ও অপ্সরাঃ সানুমতী সেই অসমাপ্ত চিত্রখানিরও মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। মহারাজ অতঃপর তাহাতে আরও কি কি আঁকিবেন—তাহার যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন তাহা পাঠে মনে হয়, তিনি একজন অনন্যসাধারণ চিত্রকর ছিলেন।১৭

(৩) মহাকবি শ্রীহর্ষ তাঁহার 'রত্নাবলী' নাটিকায় দেখাইয়াছেন যে—সাগরিকা (রত্নাবলী) মদনদেবের ছলে বৎসরাজ উদয়নের চিত্র অঙ্কন করিতেছেন, আর—পরিহাসচ্ছলে সখী সুসঙ্গতা উহাতে রতির চিত্রাঙ্কনের ছলে সাগরিকার চিত্র যোজনা করিয়া দিতেছেন। এস্থলে দুই সখীর চিত্রবিদ্যায় সমান নিপুণতার আভাস পাওয়া যাইলেও সুসঙ্গতা সাগরিকার চিত্রাঙ্কণ-কুশলতার প্রশংসা করিয়াছেন।১৮

(৪) মহাকবি ভবভূতির 'উত্তর-রাম-চরিত' নাটকের প্রথম অঙ্কটির নামই দেওয়া হইয়াছে—'আলেখ্য-দর্শন'। সীতার চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে নির্জ্জনে বসিয়া শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে আদেশ দিতেছেন যে—'অতীত ঘটনাবলী যে চিত্রফলকে অঙ্কন করা হইয়াছে সেগুলি আনিয়া জানকীর সম্মুখে দেখাও'। তদনুসারে লক্ষ্মণ সীতার সম্মুখে চিত্রফলক প্রসারিত করিয়া ধরিয়াছেন। বাল্যজীবন হইতে সীতার অগ্নিপরীক্ষা পর্য্যন্ত নানা ঘটনার চিত্র উহাতে বর্ত্তমান ছিল। চিত্রগুলি যে অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছিল তাহার প্রমাণ এই যে,—ঐগুলি দেখিতে দেখিতে সীতাদেবী কখনও আনন্দ-বিহ্বলা, কখনও ভয়-চকিতা, আবার কখনও পরিহাস-মুখরা হইয়া উঠিতেছিলেন।১৯

কবিরাজ রাজশেখর তাঁহার 'কাব্যমীমাংসায়'—চিত্রকুশল কলাবিদ্‌গণের নাম দিয়াছেন—'চিত্রলেপ্যকৃতঃ'। রাজসভা-মধ্যে পশ্চিম দিকে—অপভ্রংশকবিগণের পশ্চাতে ইঁহাদিগের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত।২০

আলেখ্যবিদ্যার পরিচয় এই পর্য্যন্ত।

[ক্রমশঃ

(আলেখ্য) ও চিত্রযোগ ভিন্ন কলা। 'চিত্রযোগ'—ত্রয়োদশ সংখ্যক কলায় ইহার পরিচয় মিলিবে।

১৪। "রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্।
এতানি পরানুরাগজননাত্মাত্মবিনোদার্থানি চ"—জয়মঙ্গলা।

১৫। ব্যায়োগ—একাঙ্ক দৃশ্যকাব্য-বিশেষ।

১৬। দুর্য্যোধন—"অহো দর্শনীয়োঽয়ং চিত্রপটঃ!" (ইহার পর চিত্রে অঙ্কিত বিষয় ও ব্যক্তিগণের যে বর্ণনা আছে, তাহা অতি অপূর্ব্ব)… বাসুদেবঃ—…অহো দর্শনীয়োঽয়ং চিত্রপটঃ! মা তাবৎ! দ্রৌপদী-কেশাম্বরাকর্ষণমত্রালিখিতম্"—দূতবাক্য।

১৭। "চতুরিকা।—ইঅং চিত্তগদা ভট্টিনী!…
বিদূষকঃ—সাহু বঅস্স!…থঅদি বিঅ মে দিট্‌ঠী ণিণ্ণুণ্ণপ্পদেসেসু।
সানুমতী—অহো! এসা রাএসিণো নিউণদা! জাণে সহী অগ্গদো মে বট্টদি ত্তি!……
রাজা।—কার্য্যা সৈকতলীনহংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী ইত্যাদি—
(—শাকুন্তলে ষষ্ঠ অঙ্ক)

১৮। "সুসঙ্গতা—অহো দে নিউণত্তণং!…তা অহং পি আলিহিঅ রইসণাহং করিস্সং"—রত্নাবলী, ১ম অঙ্ক।

১৯। "লক্ষ্মণঃ—…আর্য্যা! তেন চিত্রকরেণাস্মদুপদিষ্টমস্যাং বীথিকায়ামার্য্যস্য চরিতমভিলিখিতম্।…যাবদার্য্যায়া হুতাশনে বিশুদ্ধিঃ।…
সীতা—বচ্ছ! ইঅং বি অবরা কা?
লক্ষ্মণ—(সলজ্জস্মিতম্—অপবার্য্য) অয়ে! উর্ম্মিলাং পৃচ্ছত্যার্য্যা?…
ইত্যাদি—উত্তররামচরিতে প্রথমাঙ্ক।

২০। "পশ্চিমেনাপভ্রংশিনঃ কবয়ঃ; ততঃ পরং চিত্রলেপ্যকৃতো মাণিক্যবন্ধকাঃ…"
(—কাব্যমীমাংসায়াং কবিরহস্যে দশমোঽধ্যায়ঃ, বরোদা ২য় সং, পৃঃ ৫৫)

দুহিতা ও অন্যান্য পরিজন

জনৈক গৃহী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বালক-বালিকা—ইতিপূর্ব্বে ফুটপাথের কথা বলিয়াছি। কিন্তু ফুটপাথও সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। গাড়ী চাপা পড়িবার ভয় না থাকিলেও লোকের অপরিণামদর্শিতার জন্য মধ্যে মধ্যে বিপদের উদ্ভব হয়। আম, কমলালেবু, কলা প্রভৃতির খোসা নির্ব্বিচারে ফুটপাথের সর্ব্বত্র নিক্ষিপ্ত হয়। এ-গুলির উপরে পথিকের পা পড়িলেই সে পিছলাইয়া সজোরে কঠিন সিমেণ্টের মেঝের উপরে আছাড় খায় এবং সাজ্ঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হয়। মিউনিসিপ্যালিটীর ঝাড়ুদারগণ প্রাতে ও অপরাহ্ণে ঝাট দিয়াই খালাস; ইহার মধ্যে বা পরে ফুটপাথের অবস্থা কিরূপ হয় তাহা পরিদর্শনের জন্য মিউনিসিপ্যালিটীর কোন ভৃত্য দৃষ্টিগোচর হয় না। উত্তর-কলিকাতায়, বিশেষতঃ আমের মরসুমে এরূপ দুর্ঘটনার সংবাদ প্রায়ই শ্রুতিগোচর হয়। এই কারণে ফুটপাথের উপরেও সতর্ক ভাবে চলিতে হয় এবং বালক-বালিকাদিগকে অনুরূপ উপদেশ দিতে হয়।

বালক-বালিকাদিগকে এমন জুতা পরাইতে হয়, যাহার মধ্যে তাহাদের পা স্বচ্ছন্দভাবে থাকিতে পারে। যে-জুতার অগ্রভাগ সরু (fine toe) তাহা পরিলে নখ ও অঙ্গুলি বেদনাযুক্ত হয় এবং নখের কোণ অঙ্গুলির মধ্যে বসিয়া কুনখার সৃষ্টি হইতে পারে। তদ্ভিন্ন অঙ্গুলিতে কড়া জন্মিতে পারে। কুনখা ও কড়া উভয়েই যন্ত্রণাদায়ক। হয়ত কেহ কেহ সামান্য কথা বলিয়া ইহা উড়াইয়া দিবেন কিন্তু যাঁহারা অল্প বয়সে আগা-সরু জুতা প'রে কুনখা ও কড়ার যন্ত্রণা ভোগ করেন তাঁহারা ইহা তুচ্ছ জ্ঞান করিবেন না। যাঁহারা আগা-সরু জুতা ব্যবহার করেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য বাবুয়ানা। বালক-বালিকার যাহাতে বেশভূষা ও অন্যান্য বিষয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার অভ্যাস জন্মে তাহাদিগকে তদ্রূপ উপদেশপ্রদান কর্ত্তব্য, কিন্তু যাহাতে তাহারা বাবুয়ানা অভ্যাস না করে এবং "বাবু" হইয়া না উঠে সেদিকেও দৃষ্টির প্রয়োজন। তাহাদের সর্ব্বসাময়িক বেশভূষা মোটামুটি হওয়াই বাঞ্ছনীয়, তবে শারদীয়া পূজা, নিমন্ত্রণ ও অন্যান্য উৎসবের সময়ে এ নিয়মের ব্যতিক্রম অবশ্যম্ভাবী এবং প্রশ্রয়যোগ্য।

বালক-বালিকা সন্তরণ শিক্ষা করিতে গেলে, এমন কি জলাশয়ের কিনারায় যাইলে অনেক পিতামাতা আপত্তি ও তাহাদিগকে এরূপ করিতে নিষেধ করেন, অথচ সন্তরণ একটি বিশিষ্ট ব্যায়াম এবং সন্তরণক্ষমতা মানবজীবনে বিশেষ প্রয়োজনীয়। রমণীর পক্ষে অশোভন হইলেও, পুরুষের বৃক্ষারোহণ-ক্ষমতা বাঞ্ছনীয় ও অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। যে বৃক্ষের নিম্নদেশ হইতে শাখা-প্রশাখা নির্গত হয় তাহাতে আরোহণ সহজ। নারিকেল জাতীয় বৃক্ষে আরোহণ কঠিন ও ক্লেশসাধ্য। বৃক্ষারোহণ-প্রয়াসী বালককে নিষেধ করা অনুচিত। বৃক্ষারোহণ করিলেই ছেলে ডাংপিটে হয় না, অথচ সাহসী বালক ও যুবককে "ডাংপিটে", "গোঁয়ার" "গোয়ারগোবিন্দ" প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত করিয়া লোকে তাহাদিগকে অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিরুৎসাহ করে। মানুষ মাত্রেরই বুকের পাটা (pluck) থাকা উচিত। যে ব্যক্তি সৎপথে থাকিয়া ও সত্য অবলম্বন করিয়া সংসারক্ষেত্রে কর্ম্মলিপ্ত

হয়েন, তাঁহার নির্ভীকতা স্বাভাবিক, তাঁহার সৎসাহসের কখন অভাব হয় না। যে নীতিবিগর্হিত বা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করে তাহাকে সে কার্য্য গোপনে করিতে হয় এবং পাছে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে এই ভয়ে সর্ব্বদাই তাহার চিত্তচাঞ্চল্য বিদ্যমান থাকে। কার্য্যগোপনের জন্য তাহাকে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। যে ছেলে স্কুল পালায় পিতা বা অন্য অভিভাবকের নিকট শিক্ষা-কার্য্যের পরিচয় দিতে হইলে তাহাকে অনেকরূপ মিথ্যার অবতারণা করিতে হয়। যে-ছেলে আলস্যপ্রযুক্ত অথবা অতিরিক্ত ক্রীড়ানুরক্তির ফলে পাঠাভ্যাসে বিরত হয়, শিক্ষকের হস্তে লাঞ্ছনার ভয়ে বিদ্যালয়ে যাইবার সময়ে তাহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং নানাপ্রকার মিথ্যা কথা বলিয়া লাঞ্ছনা হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করে। ইহারাই যথার্থ কাপুরুষ। নিজকৃত কার্য্যের গোপন-চেষ্টা কাপুরুষতার পরিচায়ক। যে-কার্য্য করিয়া গোপন করিতে হয় তাহা কখনই সৎকার্য্য নহে; তাহার মূলে অবশ্যই অসৎ-প্রবৃত্তির বা অভিসন্ধির সন্ধান পাওয়া যায়। এরূপ কার্য্য না-করাই উচিত। সাধুচরিত্র যুবক স্বীয় পত্নীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশিত হইলে, পিতামাতার নিকটে লজ্জিত হইবে না অথবা তাঁহাদের সম্মুখে স্বীয় সন্তানকে কোলে লইয়া আদর করিতে লজ্জা বোধ করিবে না। বলা বাহুল্য, পুত্রবধূ ও দুহিতা অন্তর্বত্নী হইলে এবং তাহাদের অপত্য জন্মগ্রহণ করিলে শ্বশুর শ্বাশুড়ী ও পিতামাতা নিরতিশয় আনন্দলাভ করেন। এ-দেশের একটি চিরন্তন প্রথা এই যে, কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার পরে যতদিন দৌহিত্রের জন্ম না হয়, ততদিন কন্যার পিতা জামাতৃগৃহে কোন দ্রব্য আহার করেন না। যাহা হউক, এ-বিষয়ের চর্চ্চা প্রবন্ধান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

বালকগণের "ইস্কুল পলাইবার" প্রবৃত্তি জন্মগত বা স্বভাবজাত নহে। অন্যান্য অসৎপ্রবৃত্তির ন্যায় ইহাও সঙ্গদোষঘটিত। বালক-বালিকার সহচর নির্ব্বাচন সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কিছু কিছু বিবৃত হইয়াছে। দীর্ঘতর বিবৃতি নিষ্প্রয়োজন। বালিকাদিগকে "ইস্কুল পলাইতে" দেখা যায় না; তাহার কারণ—প্রথমতঃ, বালিকারা ভীরু-প্রকৃতি এবং দ্বিতীয়তঃ, কেহ কেহ তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে পৌঁছাইয়া দেয় ও তথা হইতে ফিরাইয়া আনে। যে-সকল বালকের বিদ্যালয়-গমনাগমন সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা থাকে, তাহারাও পলায়নের সুযোগ পায় না। যাহাদের জন্য ভৃত্যের হস্তে বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নের জলখাবার (lunch বা tiffin) প্রেরিত হয়, তাহারাও ধরা পড়িবার ভয়ে পলায়ন করে না।

শিক্ষক কোন বালককে প্রহার করিলেও তাহার জনক-জননী বা অভিভাবকের আপত্তি করা উচিত নহে। ছাত্র পাঠে অবহেলা বা কোনরূপ অনুচিত আচরণ করিলে তাহাকে শাসন করা শিক্ষকের কর্ত্তব্য। যদিও ছাত্রগণকে দৈহিক শাস্তি প্রদান (corporal punishment) শিক্ষাবিভাগের নিয়মবিরুদ্ধ, তথাপি শিক্ষকগণ প্রয়োজন-বোধে তাহাদিগকে অল্প-বিস্তর শারীরিক দণ্ড দিয়া থাকেন। চপেটাঘাত ও কর্ণমর্দ্দন চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে যষ্টি-প্রহার করিতেন এবং শিক্ষাবিভাগের কোন ইন্স্পেক্টর (inspector) বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থে উপস্থিত হইলে যষ্টিগুলি ব্ল্যাক্ বোর্ডের (Black-board) পশ্চাতে আশ্রয় লাভ করিত। কোন গ্রাম্য বিদ্যালয়-সংক্রান্ত একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। এক শিক্ষক একটি অল্পবয়স্ক ছাত্রকে পাঠ তৈয়ার করে নাই বলিয়া যষ্টিপ্রহার (সম্ভবতঃ গুরুতরভাবেই) করিয়াছিলেন। ছাত্রের একটি বয়ঃপ্রাপ্ত জ্ঞাতি-ভ্রাতা ঘটনাচক্রে সেই সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন; তিনি এ-বিষয়ে প্রতিবাদ করেন এবং শিক্ষককে দুই চারি কথা শুনাইয়া দেন। ছাত্রের পিতা তখন বিদেশে ছিলেন। এ-বিষয় ছাত্রের মাতার কর্ণগোচর হইলে তিনি শিক্ষককে ডাকিয়া পাঠান। ঐ ছাত্রটি তখন পিতামাতার একমাত্র পুত্র। শিক্ষকের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া মাতা কোন রকম অনুযোগ বা আপত্তি না করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"ছেলের হাড় কয়খানি বজায় রেখে তাহার শাসনকল্পে যেরূপ আবশ্যক মনে করবেন সেইরূপ শাস্তি দেবেন।" ভবিষ্যৎ জীবনে এই ছাত্রটি কৃতবিদ্য ও উপার্জ্জনক্ষম হইয়া জনক-জননীর আশা পূর্ণ ও আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিল। বিবেক-বুদ্ধিমতী

জননীর যত্নে ও চেষ্টায় অনেক পুত্র সংসারক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে—ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

স্থানীয় শিক্ষায়তনসমূহের প্রতি বৎসর দুইটি দীর্ঘ অবকাশ থাকে—গ্রীষ্মাবকাশ ও পূজাবকাশ। এ-দু'টি অবকাশ নিরবচ্ছিন্ন অবকাশে পরিণত না করিয়া বালক-বালিকাগণ যাহাতে বিদ্যালয়ে অধ্যাপিত বিষয়গুলির একাধিকবার পুনরাবৃত্তি করে সেদিকে অভিভাবক ও অভিভাবিকাদিগের দৃষ্টি আবশ্যক। পরীক্ষা দূরবর্ত্তী হইলেও তাহার জন্য প্রস্তুত হইবার পক্ষে এই অবকাশদ্বয় বিশেষ সুবিধাজনক। এ-সুবিধা কোনক্রমেই নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নহে।

অদ্যাপি অনেকের ধারণা এই যে, সঙ্গীত শিক্ষা করিলে ছেলেরা "বকাটে" হইয়া যাইবে। সঙ্গীত বা নাট্যকলা নিন্দনীয় নহে, পরন্তু বিদ্যার সংজ্ঞাভুক্ত এবং শাস্ত্রাভিধানখ্যাত। ইহাদের সম্পর্কে যদি কোন দোষ বা কলঙ্কের উদ্ভব হয় তাহা সংসর্গজনিত। কুসংসর্গ সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। স্বগৃহে বা নিকটস্থ প্রতিবেশীর গৃহে অভিভাবকের দৃষ্টিসীমান্তবর্ত্তী থাকিয়া যে-বালক এই উভয় বিদ্যার অনুশীলন করে, কুসংসর্গজনিত দোষ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যদি রুটিনের বশবর্ত্তী হইয়া নিয়মিতরূপে এই শিক্ষা ও অনুশীলনের কার্য্য চালিত ও সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষায় উপযোগী সময়েরও অভাব হয় না। অসার আত্মমর্য্যাদার গণ্ডী হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া, পিতা নিজে কলাবিদ্যাবিৎ হইলে, স্বয়ং, নতুবা শিক্ষকের সাহায্যে, স্বীয় তত্ত্বাবধানে পুত্রকে কলাবিদ্যায় শিক্ষিত করিতে পারেন।

বর্ত্তমান যুগে কন্যার সঙ্গীতশিক্ষায় কেহ আপত্তি করেন না। পরন্তু, বিবাহযোগ্যা করিয়া তুলিবার জন্য সাগ্রহে কন্যাকে সঙ্গীত শিখান হয়। সঙ্গীতবেত্তৃত্ব বিবাহের বাজারে কন্যার একটি বিশিষ্ট গুণ (qualification)। কন্যানির্ব্বাচনকালে পাত্রপক্ষ অধুনা লেখাপড়া, সীবনকার্য্য ও সঙ্গীত সম্বন্ধে পাত্রীকে প্রশ্ন করেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গান গাওয়াইয়া থাকেন। নির্ব্বাচন-কর্ত্তা নিতান্ত সেকেলে ধরণের লোক না হইলে আজকাল এই পদ্ধতিতেই পাত্রীনির্ব্বাচন হয়।

কেবলমাত্র গৃহে অথবা কেবলমাত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেই বালকদিগের শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করে না। উভয় স্থানে প্রকৃত শিক্ষাপ্রাপ্তির ফলেই বালক প্রকৃত মানুষ হইয়া উঠে। "পাঁচ জনের" সঙ্গে মেলামেশা না হইলে সামাজিক শিক্ষালাভ অর্থাৎ কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় না। এই হিসাবে অধ্যাপক বা তদ্বৎ কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক তত্ত্বাবহিত বা পরিচালিত ছাত্রনিবাস বা হোষ্টেল (hostel) বালকদিগের এইরূপ সামাজিক শিক্ষার পক্ষে প্রকৃষ্ট স্থান। বালকবালিকা সম্বন্ধীয় অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় কোন কোন পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় বিবৃত হইলেও যাহারা সংসারের ভবিষ্যৎ নরনারী, তাহাদের সম্বন্ধে এই বিবৃতি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইল এবং ইহাতে অনেক "খুঁটিনাটী"র অবতারণা হইল বলিয়া, আশা করি কেহ ইহাকে অতিপ্রাচুর্য্যদোষে দুষ্ট মনে করিবেন না। [ক্রমশঃ
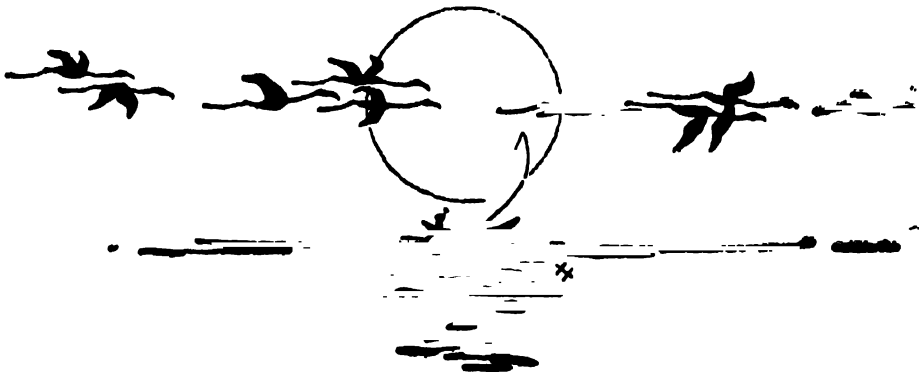
শিশু-সংসদ

উদয়ন-কথা

প্রিয়দর্শী

(গোড়ার কাহিনী : তৃতীয় পর্ব)

মহারাজ উদয়ন বিদূষকের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে উঠেছিলেন। বিদূষক থাম্‌তেই তিনি মহা আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন—"ধন্য যৌগন্ধরায়ণ! আচ্ছা ফন্দী এঁটেছ! তার পর—বন্ধু—তারপর—?'

বিদূষক একবার দম নিয়ে আবার বলা স্বরু করলেন,—"মহারাজ! তার পর সকাল হ'তে না হ'তে যখন এই খবর গিয়ে প্রদ্যোতের কানে পৌঁছুবে, তখন তিনি অন্য কোন উপায় না দেখে এসে মহারাজের শরণাপন্ন হবেন। অবশ্য হাতীটাকে এক মেরে ফেল্‌লে আপদ্ চুকে যায় বটে, কিন্তু প্রদ্যোত তা কিছুতেই করতে দেবেন না। কারণ নড়াগিরি তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তার দৌলতে তিনি অনেক বিপদ্ থেকে উদ্ধার পেয়েছেন। আর এযাবৎ নড়াগিরি কখন কারও কোনও অনিষ্ট করে নি। এই প্রথম সে ক্ষেপ্‌ছে! এ অবস্থায় তাকে জীবন্ত ধ'রে এনে ঠাণ্ডা করবার ইচ্ছাই প্রদ্যোতের হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়বে যে—যতবড় পাগলা দুর্দ্দান্ত হাতীই হোক না কেন, আপনার সামনে পড়লে সে আর পাগলামি করতে পারবে না। তাই কাল সকালে প্রদ্যোত আপনার ঘোষবতী বীণা এনে আপনার হাতে দিয়ে বল্‌বেন—"বৎসরাজ! আমার ছেলের মত প্রিয় হাতীটাকে ধ'রে দিন।" একবার নজরবন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পেলে ঘোষবতী বীণার সাহায্যে নড়াগিরিকে বাগ মানাতে আপনার দু' দণ্ড সময়ও লাগ্‌বে না। তখন নড়াগিরির পিঠে চেপে তাকে পোষ মানাবার ছলে একবার যদি উজ্জয়িনীর নগর-দ্বারের বাইরে গিয়ে পড়তে পারেন, তখন সোজা তাকে প্রাণপণে নিয়ে যাবেন আপনার বন্ধু ব্যাধরাজ পুলিন্দকের রাজ্যে। সেখান থেকে তাঁর দেওয়া পৃষ্ঠরক্ষী সৈন্য সঙ্গে নিয়ে একই দিনের মধ্যে বিন্ধ্যারণ্য পার হ'য়ে উঠতে পারবেন কৌশাম্বীর সীমানায়। আর একবার নিজের রাজ্যে পা দিতে যদি পারেন, তা হ'লে শত্রুসৈন্যের এ সাহস বা ক্ষমতা হ'বে না যে সেখানে আপনাকে তেড়ে গিয়ে আক্রমণ করে। এখান থেকে কৌশাম্বী পুরো দশ বারো দিনের পথ। এক নড়াগিরির পক্ষেই এই পথটা এক-দিনে অতিক্রম করা সম্ভব হবে। সৈন্যেরা ঘোড়া ছুটিয়ে চল্‌লেও এ পথটা তিন দিনের আগে ফুরাতে পারবে না। তা ছাড়া, তারা প্রথম বাধা পাবে— এই নগরের মধ্যেই—মন্ত্রী ম'শায়ের ছদ্মবেশী চর আর সেনাপতি ম'শায়ের ছদ্মবেশী দেহরক্ষী সেনাদের হাতে। তারপর আপনার বন্ধু পুলিন্দক মস্ত এক দল ব্যাধসৈন্য নিয়ে তাদের মাঝপথে গতিরোধ করবেন। এই দুটো যুদ্ধ জিত্‌তে না পারলে ত আর তারা আপনার পিছু ধাওয়া করতে পারবে না। তাই মহারাজ! আপনাকে এই শেষ জানিয়ে চল্‌লুম—কালই আপনার মুক্তির দিন। আপনি প্রস্তুত থাকুন। আর এখানে আমাদের দেখা হবে না। হবে—পরশু নাগাদ একেবারে আমাদের রাজধানী কৌশাম্বীতে। আর যদি প্রদ্যোতের সেনাদের হাতে মারা যাই, বা ধরা পড়ি— তা হ'লে বোধ হয় এই শেষ দেখা।"

বিদূষক যখন এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো ব'লে থাম্‌লেন, তখন দারুণ উত্তেজনায় তিনি হাঁফাচ্ছেন, আর ভাবী অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় তাঁর দু'চোখে জল টল্-টল্ করছে। কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য! এমন একটা অদ্ভুত উপায়ে শত্রুর

চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে পারলেন জেনেও কৈ মহারাজ উদয়ন ত একটুও উৎসাহ প্রকাশ করলেন না! ব্যাপার কি! মহারাজের মুখের দিকে চেয়ে বিদূষক দেখ্‌লেন—মুখ যেন অসম্ভব গম্ভীর!

গভীর বিস্ময়ে বসন্তকের মুখ দিয়ে প্রথমটা কথাই সরে না। অনেক কষ্টে ঢোক গিলে তিনি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"মহারাজ! মন্ত্রী ম'শায় আমায় খবর দিতে বলেছেন যে—তাঁর ফন্দী অনুসারে আপনি কাজ করতে রাজি কি না? তা আমি এখন গিয়ে তাঁকে কি উত্তর দোব?"

উদয়ন বল্‌লেন—"প্রিয় বসন্তক! বন্ধু! তুমি গিয়ে মন্ত্রিবরকে জানাও যে আমি তাঁর প্রস্তাবে রাজি নই। প্রথম কারণ, প্রদ্যোত যদি আমার উপর বিশ্বাস ক'রে নড়াগিরিকে ধরবার ভার আমাকে দেন, তা হ'লে আমি তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব কি ক'রে? তিনি আমার সঙ্গে শঠতা ক'রে থাক্‌তে পারেন, কিন্তু তাই ব'লে আমি তাঁকে ঠকাব—এতটা নীচ উদয়ন হ'তে পারে না! দ্বিতীয়তঃ, যদি আমি তাঁর চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়েই যাই—তাতে লাভ কি হবে? তিনি আমায় কৌশলে ধ'রেছিলেন, আমিও কৌশলে তাঁর হাত এড়িয়ে পালাচ্ছি—এত সমান-সমান হ'ল। বরং যদি তাঁর মেয়েটিকে নিয়ে পালাতে পারি, তবে তাঁর উপর একহাত নেওয়া হবে। অবশ্য বন্ধু, ভেব না যে আমি রাজকুমারী বাসবদত্তাকে বিয়ে করতে চাই বলেই একথা বলছি। আমাদের বিয়ে হোক্ বা না হোক্—সে পরের কথা! কিন্তু এই কাজটা করতে পারলে তবে দাম্ভিক প্রদ্যোতের দর্প চূর্ণ হবে। মন্ত্রিবরকে এই কথা বল গিয়ে।"

বিদূষক তাঁর জয়ঢাকটি গলায় ঝুলিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। উদয়নের কথায় তিনি বেশ স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে রাজা মুখে যতই বীরত্ব দেখান না কেন তিনি বাসবদত্তার রূপে মুগ্ধ হয়েছেন। অতএব তাঁকে একলা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা বৃথা। তাই তিনি ঢাক বাজাতে বাজাতে নগরের বাইরে ভাঙ্গা মন্দিরের দিকে চল্‌তে চল্‌তে ভাবছিলেন—'এবারও দেখছি প্রদ্যোতেরই জয়-জয়-কার! মন্ত্রী ম'শায়ের সকল ফিকিরই দেখছি প্রদ্যোতের এই এক চালে ভেস্‌তে যায়'!

মন্দিরের কাছে পৌছে দেখলেন তখনও সেখানে দু'চার জন লোক রয়েছে। দূরে পাগ্‌লার ছদ্মবেশে যৌগন্ধরায়ণ দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে দেখেই তিনি পথিকদের ডেকে বল্‌তে লাগলেন, "দেখুন ত, দেখুন ত, মশাইরা! কি অত্যাচার! অনেক কষ্টে কিছু মিষ্টান্ন জোগাড় করেছিলুম। তাও ঐ পাগলটা হাত মুচ্‌ড়ে কেড়ে নিলে। আবার কিছু বলতে গেলেই তেড়ে কাম্‌ড়াতে আসে!" এই বলে বিদূষক একবার পাগ্‌লার দিকে তেড়ে গেলেন—"দে দে, পাগলা, আমার খাবারের পোট্‌লা দে"! পাগ্‌লার সাজে যৌগন্ধরায়ণ ঠিক আসল পাগলের মতই হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে এলেন তাঁকে কাম্‌ড়াতে। ঠিক এই সময় এক বৌদ্ধ ভিক্ষু তাঁর হাতের দণ্ড উঠিয়ে তেড়ে গেলেন পাগলাকে—"এই পাগলা! কেন ও বেচারীর খাবার কেড়ে নিয়েছিস্! শীগগির ফিরিয়ে দে—নইলে এক লাঠির ঘায়ে তোর মাথা দো-ফাঁক ক'রে দেব।" বলা বাহুল্য এই বৌদ্ধ ভিক্ষু ছদ্মবেশে সেনাপতি রুমন্বান্। তার হাতের লাঠি দেখে পাগ্‌লাটা যেন ভয়ে কাঁপছে এই রকম ভাব দেখিয়ে খাবারের পোট্‌লাটা ঝপ ক'রে রাস্তার উপর ফেলে দিয়ে এক দৌড়ে ঢুকল গিয়ে ভাঙ্গা শিবমন্দিরে। তাই দেখে রাস্তার লোকেরা খুব খানিকটা হাসাহাসি ক'রে যে যার কাজে চলে গেল। পথ প্রায় জনশূন্য দেখে বিদূষক ও বৌদ্ধ-ভিক্ষুবেশী রুমন্বান্‌ও আস্তে আস্তে ঢুক্‌লেন গিয়ে সেই মন্দিরে।

মন্দিরটির প্রথম দিকটা ভাঙ্গা হলেও ভিতরটা ভালই ছিল। শূন্য মন্দির বলে তার মধ্যে বড় কেউ একটা ঢুকত না। সামনের নাটমন্দিরে এক বিরাট গণেশ-মূর্ত্তি বসান ছিল। তার পিছনে ছিল একটা গুপ্ত পথ। সেই পথ দিয়ে যেতে হ'ত রান্নাবাড়ীতে। মন্দিরটা খালি আর পোড়ো ব'লে যদিও সেই দুপুরে সেখানে কোন লোক আস্‌বার সম্ভাবনা ছিল না, তবু যৌগন্ধরায়ণ,

বসন্তক ও রুমন্বান্ সেই গুপ্ত পথ দিয়ে রান্নাবাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে পাগলার পোষাক খুলে ফেলে যৌগন্ধরায়ণ হাসিমুখে বসন্তককে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন বন্ধু! সব ঠিক! মহারাজ রাজি ত?" বিদূষক অত্যন্ত করুণ ও গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন "না! "না! যৌগন্ধরায়ণ ও রুমণ্বান্ একসঙ্গে চমকে উঠে প্রায় সমস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহাবাজ রাজি নয়? ব্যাপার কি?"

বিদূষক বললেন, "ব্যাপার খুবই গুরুতর!"

যৌগন্ধরায়ণ একটু অসহিষ্ণু ভাবে বল্লেন, "ওসব হেঁয়ালি রাখ এখন বসন্তক! ব্যাপার কি, কিছুই ত বুঝতে পারছি না"।

বিদূষক একটু ম্লান হাসি হেসে উত্তর দিলেন, "মন্ত্রী মশায়! এ ব্যাপার আপনি বুঝবেন না সহজে। এসব ব্যাপার আমিই আগে বুঝি। তারপর আমি বুঝিয়ে দিলে আপনারা বুঝ্তে পারবেন। নয়ত পারবেন না।"

যৌগন্ধরায়ণ ধৈর্য্য হারিয়ে ফেল্ছিলেন। তিনি বিদূষকের দুই কাঁধ ধ'রে সজোরে দিলেন দুই ঝাঁকুনি। তারপর বল্লেন, "সব ভেঙ্গে বল। এখন ভাঁড়ামির সময় নয়"।

বিদূষক তখনও হাস্ছেন—"মন্ত্রী ম'শায়! এত বুদ্ধি খাটিয়ে, এত লোক লাগিয়ে, এত ধন-রত্ন জলের মত খরচ করে এমন একটা অদ্ভুত ফন্দী আঁট্লেন। কিন্তু মহারাজের একটা না-তেই সব ভেস্তে যাবার জোগাড়। ব্যাপার কি, শুনুন তা হ'লে। আমাদের মহারাজ প্রদ্যোতের মেয়ে বাসবদত্তাকে দেখে অবধি মুগ্ধ হ'য়ে পড়েছেন। এখন ত তিনি আর প্রদ্যোতের নজরবন্দী নয়, বাসবদত্তারই নজরে বন্দী। রাজকন্যাকে ফেলে রেখে তিনি একলা পালাতে চান না। আমায় অবশ্য বলেছেন যে, ভেবো না যে রাজকন্যার মোহে পড়ে আমি যেতে চাইছি না। তাঁকে চুরি ক'রে নিয়ে পালাতে পারলে তবে প্রদ্যোত আমায় যে অপমান করেছেন তার উচিত মত প্রতিশোধ দেওয়া হবে। তবে আমার কাছে চাপলে চলবে কেন! ভিতরের আসল কথা কি আমার কাছে চাপা থাকে! ও সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে! আসল কথা তিনি রাজকুমারীর রাঙা মুখখানি দেখেই ভুলে গেছেন। এখন মন্ত্রী ম'শায়! এর কোন উপায় বাতলাতে পারেন ত দেখুন"।

যৌগন্ধরায়ণ ত ব্যাপার শুনে স্তম্ভিত। কিছুক্ষণ বাদে জিজ্ঞাসা করলেন, "কবে থেকে এ ব্যাপার সুরু হয়েছে"?

বিদূষক, "তা অনেকদিন। গেল মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে রাজকুমারী খোলা পাল্কীতে চ'ড়ে এসেছিলেন ভগবতী অবন্তিসুন্দরী যক্ষিণীর মন্দিরে পূজো দিতে। মহারাজ ছিলেন তখন সঙ্গীতশালায় বন্দী। মন্দিরের খিড়কীর দরজা আর সঙ্গীতশালার সদর দরজা, ঠিক সাম্না-সাম্নি পথের এদিক্ ওদিক্। রাজকন্যা খিড়কী দিয়েই মন্দিরে ঢুক্ছিলেন, এমন সময় উপরের গবাক্ষের পাশে দাঁড়িয়ে মহারাজ তাঁকে দেখতে পান। অবশ্য এ সব ব্যাপারই প্রদ্যোতের গড়া-পেটা ছিল। তাই তাঁর পায়ের বেড়ী খুলে দিয়ে সর্দ্দার প্রহরী শিবক তাঁকে গবাক্ষের ধারে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল। নয়ত পায়ে বেড়ী থাক্লে এ ব্যাপার ঘট্ত না। তারপর সর্দ্দার প্রহরী শিবককে দিয়ে তিনি প্রদ্যোতকে চিঠি লেখেন যে তিনি তাঁর প্রস্তাব মত রাজকন্যাকে বীণা-শিক্ষা দিতে প্রস্তুত। তার পর যতই দিন যাচ্ছে দুজনের ততই ভাব জমে উঠছে। এখন এমন হয়েছে যে মহারাজ আর তাঁর বন্দিদশার জন্য এতটুকুও কাতর নন"।

যৌগন্ধরায়ণের প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছিল, তিনি শুধু একবার জিজ্ঞাসা করলেন, "আমায় কি বলে পাঠিয়েছেন তিনি?"

বিদূষক, "বলেছেন—'মন্ত্রিবরকে বল গিয়ে, কৌশলে যদি আমি পালাতে পারি, তাতে লাভ কি? প্রদ্যোতও জুয়াচুরি করে আমায় ধরেছিলেন, আমিও তাঁর চোখে ধূলো দিয়ে পালালুম, এত সমান-সমান হল। বরং যদি তাঁর মেয়েটিকে চুরি ক'রে নিয়ে পালাবার ফন্দী তিনি বার করতে পারেন তবেই প্রদ্যোতের উপর এক হাত নেওয়া হবে। একথা তাঁকে ভাবতে বারণ কোরো যে—আমি প্রদ্যোতের কন্যার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে একথা বল্ছি। কিন্তু এই আমার নিশ্চয় তাঁকে জানিও'।"

যৌগন্ধরায়ন,—"ওঃ! কি লজ্জার কথা! এই কি মহারাজের বিলাসের সময়! ধিক্! শত ধিক্! পরের রাজ্যে বন্দী—পায়ে বেড়ী লাগান। শুধু মেঝের উপর ছেঁড়া মাদুর—তাঁর শয্যা। যে সব প্রহরী তাঁকে নজরবন্দী রেখেছে, তারা আবার তাঁকে 'মহারাজ' সম্বোধনে পরিহাস করে। কিন্তু এতেও তাঁর লজ্জা না হ'য়ে হ'ল শত্রুর কন্যার উপর অনুরাগ। ধিক! এই কি তাঁর মত বীরের উচিত কাজ"!

অনুশোচনায় বিদূষকের দু'চোখ দিয়ে জলধারা গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি ধরা গলায় বল্লেন,—"মন্ত্রী ম'শায়! আপনি প্রভুভক্তি অনেক দেখিয়েছেন। প্রভুকে মুক্ত করবার চেষ্টারও ত্রুটি করেন নি। এখন এ কাপুরুষ রাজাকে ফেলে রেখে চলুন ফিরে যাই"।

যৌগন্ধরায়ণ তখন সস্নেহে বিদূষকের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে বল্লেন,—"পাগল! তুমি না বসন্তক! তোমার মুখে কি একথা শোভা পায়! সঙ্গে রুমণ্বান্! যেমন ক'রেই হোক মহারাজকে মুক্ত করতে হবে। তাতে যদি পাগলের ছদ্মবেশে থাকতে থাকতে বুড়ো হ'য়েও যেতে হয়—তাও স্বীকার। কেমন রাজি ত?"

রুমণ্বান্ ও বসন্তক ছজনেই ব'লে উঠলেন—"রাজি না হয়ে আর উপায় কি?"

তখন যৌগন্ধরায়ণ বল্লেন—"ওহে শোন, আমার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা—অর্জ্জুন যেমন সুভদ্রাকে হরণ করেছিলেন, উদয়ন যদি বাসবদত্তাকে সেইভাবে হরণ করতে না পাবেন, তাহ'লে আমার নামই যৌগন্ধরায়ণ নয়। আরও শোন—প্রথমে ভেবেছিলুম যে নড়াগিরি আর ঘোষবতীর সঙ্গে মহারাজকে নিয়ে কৌশাম্বী ফিরব। এখন দেখছি—তা আর হয় না। এখন ঘোষবতী বীণা, রাজকুমারীর বাহন ভদ্রবতী ব'লে মাদী হাতী, রাজকন্যা নিজে, আর মহারাজ উদয়ন—এই চারটিকে যদি হরণ না করতে পারি, তা হ'লে আমার নাম যৌগন্ধরায়ণ নয়।—এই আমার তৃতীয় প্রতিজ্ঞা। প্রিয় বসন্তক। তুমি আবার মহারাজের কাছে ফিরে যাও। গিয়ে বল—নড়াগিরিকে খেপিয়ে দেবার যে ফন্দী আঁটা হয়েছে, তার তোড়-জোড় এতদূর এগিয়ে গিয়েছে যে এখন আর তা বন্ধ করা যায় না। কাল ভোরে হাতীটা খেপে বেরিয়ে পড়বেই। আর তখন প্রদ্যোত এসে মহারাজের শরণাপন্ন হবেন—এ সুনিশ্চিত। এমন অবস্থায় মহারাজ ঘোষবতী হস্তগত ক'রে যেন নড়াগিরিকে বশে আনেন—আমার এই অনুরোধ তাঁকে জানিও। নড়াগিরির পিঠে চেপে কৌশাম্বীর দিকে না পালিয়ে তিনি যেন উজ্জয়িনীর রাজপ্রাসাদে প্রদ্যোতের কাছেই ফিরে আসেন। পালাবার সুযোগ পেয়েও উদয়ন পালালেন না দেখে বুদ্ধিমান্ প্রদ্যোত নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে, বৎসরাজ তাঁর কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়েছেন। অতএব এরপর আর তাঁকে পায় বেড়ী দিয়ে নজরবন্দী রাখবার কোন দরকার নেই। তাই তিনি কাল থেকেই মহারাজের বাঁধন খুলে দেবেন, আর তাঁর দোরে পাহারাও থাকবে না। এতে সাধারণের কাছে তাঁর বলবার সুবিধা হবে যে, বৎসরাজ নড়াগিরিকে ঠাণ্ডা ক'রে উজ্জয়িনীর প্রজাদের উপকার করেছেন, তার জন্যে কৃতজ্ঞতা দেখান তাঁর উচিত। এই কৃতজ্ঞতার চিহ্নরূপে তিনি বৎসরাজকে আর বন্দী ক'রে রাখবেন না—বিশিষ্ট অতিথিরূপে তাঁকে পরমসমাদরে উজ্জয়িনীতে বাস করতে অনুরোধ করছেন। এই ব্যাপারটা আগে শেষ হ'য়ে যাক্। তারপর আমি অন্য উপায় ঠিক ক'রে একদিন সুবিধামত অদৃশ্যভাবে গিয়ে মহারাজের সঙ্গে দেখা করব। যাও, আপাততঃ এই কথা বলগে"।

এই ব'লেই যৌগন্ধরায়ণ পাগ্লার পোষাক প'রে আবার হি-হি শব্দে বিকট হাসি হাস্তে হাস্তে রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁকে ঐভাবে ছুটতে দেখে ছেলের দল তাঁর গায়ে ধূলো দিতে দিতে তাঁর পিছু পিছু ছুটল। সুযোগ পেয়ে বিদূষকও চাক ঘাড়ে ক'রে গর্ভাগশালার দিকে রওনা হলেন।

পরের দিন ভোর হ'তে না হতেই উজ্জয়িনীর বুকের উপর যেন মহাকালের প্রলয়-নৃত্য সুরু হ'য়ে গেল। হিমালয়ের চূড়ার মত বিরাট দেহ নিয়ে বিদ্যুতের বেগে নড়াগিরি রাজপথে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিলে—সঙ্গে সঙ্গে বিকট গর্জ্জন! চারিদিকে 'গেল গেল' রব। হাতীটা খুবই শিক্ষিত, তাই খেপে গিয়েও লোকজনের উপর

তখনও অত্যাচার করে নি। কিন্তু যত বেলা বাড়বে—রোদ লেগে ততই ত তার মেজাজ যাবে বিগ্‌ড়ে। তখন কি আর সে প্রাণ না নিয়ে ছাড়বে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাজবাড়ীতে খবর পৌঁছে গেল। শালঙ্কায়ন, ভরতরোহক প্রভৃতি মন্ত্রীরা মহারাজ প্রদ্যোতকে গিয়ে জানালেন—“মহারাজ! এখনই এর একটা বিহিত করতে হয়, নয়ত বিলম্বে শত শত নিরীহ প্রজার ধন প্রাণ সব যাবে”।

মহারাজ ব্যাকুল হ’য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—“আপনারা কি পরামর্শ দেন? মহামাত্র কোথায়? মাহুতরা সব কোথায়”?

শালঙ্কায়ন—“আপনার মহামাত্রটি এখনও নেশায় চুর হ’য়ে পড়ে আছে হস্তিশালে। মাহুত দু’জন নড়াগিরিকে রুখ্‌তে গিয়ে জখম হয়েছে। তাই দেখে আর সব মাহুতই পালিয়েছে। মহারাজ! এখন আর মাহুতের কম্ম নয় ও হাতীকে বাগ মানায়। এখন বরং তীরন্দাজ সেনাদের হুকুম দিন—হাতীটাকে মেরে ফেলুক।”

প্রদ্যোত—“বলেন কি মন্ত্রিবর! নড়াগিরি যে আমার ছেলের চেয়েও প্রিয়। তাকে আমি মারবার হুকুম দেব! কখনই তা হবে না। আর কি উপায় বলুন।”

ভরতরোহক—“আর একটি উপায় আছে, মহারাজ। কিন্তু সে কাজ কি আপনার পক্ষে করা উচিত বা সম্ভব হবে।”

প্রদ্যোত—“প্রজাদের আর নড়াগিরিকে দু’দিক বাঁচাবার জন্যে আমি সব করতে প্রস্তুত। কি উপায়—বলুন।”

ভরতরোহক—“মহারাজ! বিনা অস্ত্রে পাগ্‌লা হাতী বশ করতে পারে এমন লোক এ জগতে একজন মাত্র আছেন। তিনি আজ আপনারই বন্দী। বৎসরাজ উদয়ন! যদি তাঁর ঘোষবতী বীণাটি তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে মহারাজ নিজে গিয়ে তাঁকে একটু অনুরোধ জানান, তা হ’লে নড়াগিরি এক মুহূর্ত্তে ধরা পড়বে। কারুর গায়ে এতটুকু আঁচও লাগ্‌বে না।”

প্রদ্যোত—“এতে আর লজ্জার কি আছে? চলুন, এখনই গিয়ে বৎসরাজকে অনুরোধ করি। ওরে, কে আছিস্?”

একজন প্রতিহারী এসে জোড়হাতে প্রণাম ক’রে জিজ্ঞাসা করলে—“কি আদেশ, প্রভু?”

প্রদ্যোত—“রাজকুমারীকে বল্ গিয়ে ঘোষবতী বীণাটি এখনই আমায় পাঠিয়ে দিতে।”

প্রতিহারী আবার প্রণাম ক’রে প্রস্থান করলে! একটু বাদেই সে ফিরে এল—হাতে তার ঘোষবতী বীণা।

* * *

কিছুক্ষণ পরে মহারাজ প্রদ্যোত স্বয়ং মন্ত্রীদের সঙ্গে সঙ্গীতশালার সাম্‌নে এসে হাজির হলেন। প্রধান প্রহরী শিবক ব্যস্ত-সমস্ত হ’য়ে দোর খুলে দিতেই প্রদ্যোত প্রথমেই তাকে বললেন—“যা বৎসরাজের বাঁধন সব খুলে দিগে।”

মুহূর্ত্তপরেই বাঁধন-খোলা বৎসরাজকে সস্নেহে আলিঙ্গন ক’রে প্রদ্যোত তাঁর হাতে ঘোষবতী বীণাটি দিয়ে বললেন—“বৎসরাজ! আজ আপনার কাছে আমি ভিক্ষাপ্রার্থী। এ নগরীর নিরীহ প্রজাদের ধনপ্রাণ রক্ষার ভার আপনার উপর! সেই সঙ্গে প্রার্থনা—যেন নড়াগিরি হাতীটির গায়েও কোন অস্ত্রাঘাত না হয়। শুনেছি বিনা অস্ত্রে হাতী ধরা—এ দুষ্কর কম্ম এক আপনি ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ করতে সমর্থ নয়। তাই আজ আপনাকে সসম্মানে মুক্তি দিয়ে আমি আপনার শরণাগত।”

উদয়ন একটু হেসে উত্তর দিলেন—“মহারাজ। আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।” পরক্ষণেই তিনি বীণা হাতে ক’রে রাজপথে বেরিয়ে এলেন। রাজপথে তখন তুমুল কাণ্ড চলেছে। নড়াগিরি দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞান হারিয়ে একটা ছোট কুঁড়ে ঘরের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে। বেগতিক দেখে কুঁড়ে ঘরটিতে যে সব লোকজন বাস করত, তারা সকলেই পিছনের দোর দিয়ে পালিয়ে গেছে। কিন্তু বছর পাঁচেকের একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে নি। হাতীটা যখন ঘরখানার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন ছেলেটা দোর গোড়ায় ব’সে ধুলো মেখে খেলা করছিল। হঠাৎ সাম্‌নে হাতী দেখে সে ভাব্‌লে হাতী হয় ত তাকে পিঠে চড়াবে ব’লে এসেছে। সে খুব উৎসাহের সঙ্গে হাতীটাকে চীৎকার ক’রে ডাক্‌তে

লাগল। নড়াগির তখন থমকে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছে—আগে ছেলেটাকে পায়ের চাপে পিষে মারবে, না আগে কুঁড়ে ঘরটাকে উপ্‌ড়ে ফেল্‌বে! হঠাৎ সে শূন্যে শুঁড় তুলে সাম্‌নের পা উঁচু ক'রে ছেলেটার দিকে ছুটে গেল। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে রাস্তার দু'পাশে যে সব লোক জমেছিল তারা 'হায়! হায়! গেল! গেল!' শব্দ ক'রে উঠ্‌ল। এদিকে ছেলেটার মা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাবার পর পিছু ফিরে দেখে যে তার ছোট ছেলেটা ত সঙ্গে নেই! সর্ব্বনাশ! একটু ফিরে এসে দূর থেকে তার চোখে পড়ল ঐ ভয়ানক দৃশ্য—তার ননীর পুতলী হাত বাড়িয়ে হাতীটাকে 'আয় আয়' ব'লে ডাক্‌ছে—তার হাতীটার একখানা পা প্রায় ছেলেটার মাথায় উপর পড়ে আর কি! করুণ চীৎকার ক'রে সে বেচারী পাগলিনীর মত ছেলের দিকে যেই ছুটে যাবে—অমনিই রাস্তার লোকেরা 'হাঁ-হাঁ-কর-কি-কর-কি-ধর-ধর' ব'লে তাকে আট্‌কে ফেল্‌লে। 'ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, আমার দুধের বাছা আমার চোখের সাম্‌নে হাতীর পায়ে পিষে মারা যায়—আমার এ প্রাণে আর কি দরকার'!—এই বলে সেই সন্তানহারা জননী লোকেদের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ল। ঠিক এই সময় ঘটল এক অদ্ভুত ব্যাপার। সকলে বীণার শব্দে চম্‌কে উঠে ফিরে দেখ্‌লে দেবকুমারের মত এক পরম সুন্দর যুবা পুরুষ বীণা বাজাতে বাজাতে ছুটে চলেছেন নড়াগিরির দিকে। বীণার শব্দ কানে যাবা মাত্রই হাতীটার যে পা ছেলেটার মাথায় পড়বে বলে সকলে আশঙ্কা করছিল, সে পা আর মাটীতে পড়ল না। সে পা-টা উঁচু ক'রে রেখেই নড়াগিরি যেন বীণার তালে তালে নাচতে লাগ্‌ল—সঙ্গে সঙ্গে কুলোর মত কান দুটো তার তালে তালে দুল্‌তে সুরু হ'ল। হঠাৎ হাতীটা শুঁড় নামিয়ে ছেলেটাকে তুলে নিলে তার পিঠের উপর। তার পর খুব ধীরে ধীরে সে এগিয়ে এল ঐ বীণা-হাতে লোকটির দিকে। প্রথমে শুঁড় তুলে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে সে হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়ল তাঁর পায়ের তলায়। চোখের পলক পড়তে না পড়তে রাজপথের সব লোক বিস্ময়ে অবাক্ হ'য়ে দেখ্‌ল—নড়াগিরির পিঠের উপর সেই সুন্দর যুবক ব'সে—তাঁর কোলে ধুলায় ধূসর ছোট ছেলেটি—আর তার ডান হাতে এক অপূর্ব্ব বীণা অতি মধুর সুরের লহরী তুলে বাজ্‌ছে। প্রাসাদের মধ্যে অনেকেই উদয়নকে চিন্‌ত, কারণ যেদিন তাঁকে বন্দী ক'রে উজ্জয়িনীতে আনা হয় সেদিন অনেকেই তাঁকে দেখেছিল। তারা বুঝ্‌ল—বৎসরাজের অদ্ভুত বীণা বাজাবার কৌশলে পাগলা নড়াগিরি তাঁর কাছে পোষ মেনেছে। সঙ্গে সঙ্গে হাজার কণ্ঠে—"জয় বৎসরাজ উদয়নের জয়!"—শব্দ উঠে উজ্জয়িনীর আকাশ বাতাস ভরে তুল্‌ল। সে জয়ধ্বনি রাজপ্রাসাদে প্রদ্যোত ও তাঁর মন্ত্রীদের কানে ঢুকে তাঁদের চঞ্চল করে দিলে। রাজ-অন্তঃপুরে সে জয়ধ্বনির ক্ষীণ রেশ ঢুকে বাসবদত্তার কানে মধু-বর্ষণ করল—রাণী অঙ্গারবতীর বুকটা আনন্দে ও গর্ব্বে যেন দশ হাত হ'য়ে উঠ্‌ল। আর নগরের বাইরে সে শব্দের প্রতিধ্বনি গিয়ে পৌছুল রক্তচামুণ্ডার মন্দিরে। মন্দিরের দোরে ব'সে পাগ্‌লার ছদ্মবেশে যৌগন্ধরায়ণ সে জয়ধ্বনি শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন।

নড়াগিরি ধীর-মন্থর-গমনে এসে রাজপ্রাসাদের সাম্‌নে চুপ ক'রে দাঁড়াল। মহারাজ প্রদ্যোত মন্ত্রীদের নিয়ে তাড়াতাড়ি রাজসভা থেকে বেরিয়ে এলেন। হাতী তখন একেবারে শান্ত—আগে যে খেপে উঠেছিল তার চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। উদয়ন ছেলেটিকে নিয়ে নড়াগিরির পিঠ থেকে নাম্‌তেই মাহুতরা হাতীকে নিয়ে গেল তার আস্তাবলে। আর মহারাজ প্রদ্যোত বৎসরাজকে আলিঙ্গন ক'রে ব'লে উঠলেন—"বৎসরাজ! আজ থেকে আপনি আমার বন্দী নন—সম্মানিত অতিথি। তবে আমার অনুরোধ, আপনি আমার কন্যাকে আর কিছু দিন বীণা শিক্ষা দিন।"

উদয়ন উত্তর দিলেন—"উজ্জয়িনীপতি! আমার কোন আপত্তি নাই। তবে অগ্নিসাক্ষী ক'রে রাজকুমারী আমার শিষ্যত্ব স্বীকার না করলে আমি তাঁকে আর শিক্ষা দিতে পারব না। আর একটি কথা—আমি যে গৃহে বাস করছিলাম, সেখানেই এখন বাস করব। রাজ-অতিথি রাজপ্রাসাদে থাকা আমার চল্‌বে না!"

প্রদ্যোত সম্মতি জানিয়ে বল্‌লেন—"আপনার যেমন অভিরুচি

[ক্রমশঃ

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

"ধুত্তোর! সভ্যতার নিকুচি করেচে!..."

এই ব'লে পিপঁড়েটা, ঘন ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে সেঁধিয়ে মাথার বোঝাটা ধুম্ ক'রে ফেলে দিল। ফেলে দিয়ে তারপরে নিজে তার ওপরে বস্‌ল গাঁট হয়ে। হাত-পা গুটিয়ে গুম্ হয়ে বস্‌ল সে!

"একেই কি ব'লে সভ্যতা? ছ্যাঃ!" বিরক্তির উত্তুঙ্গ শিখরে গিয়ে সে পৌঁছেচে তখন। "পিপড়েদের সব হ'ল কি? য়্যাঁ? ছি ছি ছি?" আপন মনেই অব্যয় শব্দগুলো সে আউড়ে যায়।

"এই ভাবে চল্‌লে, যে-রকম দেখছি, কেবল চাপের ধাক্কাতেই জাতটা অকালে উচ্ছন্ন যাবে। এ-রকম কাঁহাতক পোষায়?" ভাবতে ভাবতে অচিরেই সে কাহিল হয়ে পড়ে।

সত্যি, ভাবনার কথাই বটে।

বরাতক্রমে, প্রকাণ্ড এক টুক্‌রো চিনি, শান-বাঁধানো উঠোনের কোণ থেকে সে আবিষ্কার করেছিল। খানিকটা তার চেখে, খানিকটা চেটে, নানাভাবে কমিয়ে সমিয়ে, সেই বিরাট পর্ব্বতপ্রমাণ চিনির তালকে সাম্‌লে কোনোরকমে এখন সে সুবহ করে এনেছে। বেশ কিছুটা পেটের মধ্যে এবং বেশী কিছুটাই কাঁধের ওপরে আয়ত্ত করে' সে বয়ে' নিয়ে চলেছিল।

কিন্তু এই বোঝা কাঁধেই, পথচল্‌তি কত পিপঁড়ের সঙ্গেই না মুলাকাৎ হচ্ছে তার! পৃথিবীতে পিপঁড়ের তো আর কম্‌তি নেই। (পিপঁড়েদের জন্মেই তো এত বড় পৃথিবী!) এবং বলা বাহুল্য, প্রত্যেকের সঙ্গেই দাঁড়িয়ে একদণ্ড বাৎচিৎ না করলেই নয়। নইলে সামাজিকতা বজায় থাকে না। যদিও সেই মামুলি ছেঁদো কথা যত: "কেমন? ভালো তো সব? পারিবারিক কুশল? শরীরগতিক বেশ? দেখা হয়ে ভারী খুসী হলাম—ইত্যাদি ইত্যাদি!"—তা'হলেও তার অব্যবহারে এতদিনের সভ্যতা একদিনে গোল্লায় যায়।

কিন্তু কেবল তাতেই কি রক্ষে আছে? প্রত্যেকের সঙ্গে আবার করমর্দ্দন! করমর্দ্দনের ঠেলাই কি কম? করমর্দ্দন না ব'লে কোলাকুলি বলাই উচিত। কেবলমাত্র মৌখিক বাচালতাতেই রেহাই নেই; সর্ব্বাঙ্গীন সাষ্টাঙ্গ আলাপ! পিপঁড়ে-সমাজের যেমন চিরকালের দস্তুর! একজন আরেক জনের মুখোমুখি হলেই সারা গা-হাত-পা টিপে টিপে দেখবে, পরস্পরের আগাপাশতলায় হাত বুলিয়ে দিতে হবে। সুপ্রাচীন সভ্য সমাজের কেতাদুরস্ত আদব কায়দার কি রহস্য কে জানে। কিন্তু এ-সব না মান্‌লে চলে না।

কিন্তু ঘাড়ে বোঝা নিয়ে এত সব কি ভালো লাগে? যখন সোজা হয়ে দাঁড়ানোই দুরূহ, তখন কি আর ভদ্রতা রক্ষা করা পোষায়? এবং একবার নয়, বার বার—এক পা এগুতে না এগুতেই আরেক জন, এবং আরেক দফা আনুপূর্ব্বিক আড়ম্বর। পুনঃ পুনঃ এইরূপ সভ্যতার অত্যাচার বরদাস্ত করতে হলে, সূর্য্যবংশের আমদানিই হোক্ কিম্বা, চন্দ্রবংশের রপ্তানিই হোক্, অত্যন্ত কুলীন এবং অভিজাত অতীব মার্জ্জিতরুচিসম্পন্ন একজন পিপঁড়েরও সহ্যের সীমানা ছাড়িয়ে যায়।

"দুর্ দুর্! এমন সভ্যতার গলায় দড়ি! সবার সঙ্গেই কোলাকুলি আর হাতাহাতি! আর পাঁচশো বার করে'

আগাপাশ এ-রকম হাতড়ে দেখবার নই বা কী
আরে বাপু, আস্তই রয়েছি! খোয়াও
যায় নি, বাজে খরচও হয় নি কিছু! তবে—?"

নিজের সন্থলব্ধ আবিষ্কারের ওপরে চড়াও হয়ে বসে' অনন্ত ভবিষ্যতের উদ্দেশে এইসব সমস্যা-শানিত প্রশ্নবাণ সে নিক্ষেপ করে। এই সভ্যতা কি এইভাবে বেশী দিন টেঁকসই হতে পারে? এতদিন কোনোরকমে চলে এলেও এর পরে একে চালু রাখা চল্‌বে কি? যতই সে ভাবে, ততই আরো সে ভাবিত হয়। বাস্তবিক, ভদ্রতার ভয়ানক বাড় হলে তখন তা বাড়স্থ হয়ে পড়ে, সভ্যতাও চূড়ান্ত সীমায় উঠ্‌লে নিছক অসভ্যতা হয়ে দাঁড়ায়! প্রতি পদক্ষেপেই, পরিচিত অপরিচিত প্রত্যেকের গায়ে পড়ে এই আপাদমস্তক অনুভব করার কথাটাই একবার ভাবো দেখি! গা জ্বালা করে না?

"কেবল আদিখ্যেতা।" পিঁপড়েটা এবার আকাশকে ভেংচি কেটে দেয়: "য়্যাঁ নেই ওঁ আছে!"

"কী ভাবছো ভায়া? একলাটি বসে' যে এখানে?"

আরেকটি পিঁপড়ে, যেন ভুঁইফোড় হয়েই তার সামনে এসে উদয় হয় হঠাৎ। কিম্বা ঐ আকাশ থেকেই উড়ে আসে নাকি?

করমর্দ্দনের জন্যে সে হাত বাড়িয়ে দেয়।

মুখ শুঁকে দেখবার আগ্রহও জানায়। উড়ে এসেই জুড়ে বস্‌তে চায় যেন।

দার্শনিক পিঁপড়েটি কিন্তু থাকে। নবাগতের
অম্লানবদ
উপেক্ষা করে।

"কী! কী-হয়েছে তোমার? এমন সুন্দর প্রাতঃ-কালে—" এই পর্য্যন্ত বলে' কোলাকুলির জন্যে ব্যতিব্যস্ত আপনাকে খোলাখুলিই সে এগিয়ে নিয়ে যায়।

"এই আমাদের সভ্যতার কথা ভাবছি। ঘেন্না ধরে গেছে এই পচা সভ্যতায়।" প্রথম পিঁপড়েটি নাক সিঁটকে বলে।

জবাব দেবার সাথে সাথে অপরের সাদর আলিঙ্গনের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যুগপৎ সে নিজেকে কুঁকড়ে নিয়ে আসে। বাহুগ্রস্ত হবার জন্য একেবারেই তার উৎসাহ দেখা যায় না।

"কেন, সভ্যতার কী হোলো? পচা কেন?" দ্বিতীয়টি একটু হকচকিয়ে যায় এবার। নম্বর ওয়ানের বাক্যালাপ এবং ব্যবহার দুইই তার ভারী তাজ্জব লাগে। পিপীলিকা-সমাজে এহেন বিগর্হিত আচরণ ইতিপূর্ব্বে দেখা যায় নি।

"নাঃ, আর লোকালয়ে নয়। সভ্য-সমাজে আমার অরুচি ধরে গেছে। দিনরাত আদব-কায়দার ঠেলা সাম্‌লাতেই প্রাণ গেল। তুচ্ছ যতো নিয়ম-কানুন—দূর দূর্! প্রথম পিঁপড়েটি বিরস বদনে জবাব দেয়: "এর চেয়ে বানপ্রস্থই ভালো। ঘাসের মধ্যে সেঁধোও।" ক্ষণেকের জন্যেই সে থামে: "হ্যাঁ, সোজা একদম—বনের মধ্যে ফিরে যাও আবার।"

"তাই বুঝি তুমি এই জঙ্গলে এসে ঢুকেচ?"

"আলবৎ! কী চমৎকার এই অরণ্যানী! চারধারে তাকালেও একটা সভ্য পিঁপড়ের মুখ চোখে পড়বে না। কেবল ঘাস আর ঘাস। দৈবাৎ তোমার মতো দু-একটা বাউণ্ডুলে ছিট্‌কে এসে পড়তে পারে কদাচ, এই যা ভয়। কিন্তু তাহলেও সভ্যতার ধাক্কা তত ভয়াবহ নয় এখানে। তোমার সঙ্গে যদি আমি এখন কোলাকুলি না করি, কে করতে পারে? কার কি করবার আছে? বাধা দেবার কি বাধ্য করবার এক্তিয়ার আছে কারু, শুনি?'

"তা বটে," ঢোক্ গিলে বলে দ্বিতীয় পিঁপড়ে।

"তবেই বোঝ। আদিম অসভ্যতা কিরকম খাসা জিনিস, বুঝে দেখ তবে। আদিম জীবনের সরলতাই আমি চাই। কৃত্রিম সভ্যতার তুচ্ছ যতো মার প্যাঁচ আমার দু'চক্ষের বিষ।"

"সে কথা মন্দ না। দ্বিতীয় পিঁপড়েটি ভুরু কুচকে অদ্বিতীয় পিঁপড়েটিকে বলে এবার: তাহলে তো তোমাকে একটু উঠতে হচ্ছে ভায়া।"

"কেন, উঠব কেন? বলেচি তো কোলাকুলি করবার কোনো সখ নেই আমার। স্পৃহাই নেই একেবারে। সভ্যতার কোনো ধার আমি ধারি না। সমাজকে আমার থোড়াই কেয়ার।"

"তবু—তাহলেও একটু উঠতে হবে যে"—দ্বিতীয় পিঁপড়ে বলে: "ঐ চিনির টুক্‌রোটির জন্যই একটু কষ্ট দেব তোমায়! ওটি আমার চাই।"

"বা:' তোমাকে দিতে গেলাম আর কি! ওতো আমার নিজের জিনিষ।" প্রথম পিঁপড়েটি চিনির ওপর জাঁকিয়ে আরো জমাট হয়ে বসে, চীনের প্রাচীরের মত।

"আদিম সরল জীবনে সম্পত্তি বলে' তো কোনো বালাই নেই। কোনো কিছুর ওপরেই কারো ব্যক্তিগত অধিকার থাকতে পারে কি তখন? ভেবে দেখতে গেলে, ওসব হচ্ছে' সভ্যসমাজেরই তুচ্ছ যতো আইন-কানুন। তাই নয় কি?" দ্বিতীয় পিঁপড়েটি ব্যাখ্যা করে' দেয় পুনশ্চ:, "অবশ্চি, এম্‌নি যদি না দাও, একলা যদি না গায়ের জোরে পেরে উঠি, আরো সব পিঁপড়েদের ডেকে আনতে পারি আমি। একজনের জিনিষ দশজনে মিলে কেড়ে নিতে কতক্ষণ?"

এই ব্যাখ্যান শোনবা মাত্রই বানপ্রস্থীর মাথার টনক নড়ে। চিনির কুশাসন ছেড়ে তিড়িং করে' তৎক্ষণাৎ সে লাফিয়ে ওঠে। দু'একবার ডন্ বৈঠক ভেঁজে হাত-পা'গুলো খেলিয়ে নেয়। আলস্যি ভাঙে, কানের পেছনটা চুলকে নেয় বার কয়েক। তারপর এগিয়ে গিয়ে সমাগত পিঁপড়েটির সঙ্গে সমাদরে কোলাকুলি লাগায়। একবার নয়, বারবার। তারপরে বিনাবাক্যব্যয়ে বোঝা-কাঁধে ঘাসের বন থেকে বেরিয়ে এসে বরাবর উঠোনের

রাস্তা ধরে আবার লোকালয়ের দিকে ফিরে চলে সভ্যতার আলোকের দিকে।

চাঙ্গা হয়ে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলে সে।

পথে যত বন্ধু এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, সবার সঙ্গেই সাগ্রহে করমর্দ্দন করে, কোলাকুলি করতেও দ্বিধা করে না। যার খুসী তার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়, মাথায় হাত বুলিয়ে যায়। আপত্তিকরে না সে। পরম সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি হয়ে সবার ভদ্রতাব্যবহার অক্লেশে ঘাড় পেতে নেয়, ঘাড়ে উপরন্তু একটা বোঝা থাকা সত্ত্বেও।

এমন কি নিজের রাস্তা ছেড়েও, আস্তানা ছাড়িয়েও, আরো খানিকটা সে এগিয়ে যায়—বেশ খানিকটা বেশী পথই হাঁটে। ভয়ানক জনতার ভীড় ঠেলেই তাকে এগুতে হয়। আর কিছু না, কেবলমাত্র অচেনা পিঁপড়েদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আর করমর্দ্দন করবার আনন্দেই।

তারপর সে ফেরে: নিজের বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়। পুরণো পাড়াপড়শীর সঙ্গে আরেক দফা হাত চালাতে চালাতে তাকে আসতে হয়। হাত-পা চালিয়ে আস্তে আস্তে আসে।

তোমারই

[উপন্যাস]

শ্রীঅলকা মুখোপাধ্যায়

এমনি করে ওরা দু'জনে যখন আনমনে চলেছে দুই বিভিন্ন পথে, আলস্যকে লক্ষ্য করে, ওদের হঠাৎ দেখা হল পথের মোড়ে, বিকেলের পড়ন্ত আলোয়, মিলনের শুভ মুহূর্তের মাহেন্দ্রক্ষণে। দু'জনে দু'জনের দিকে চাইল, চোখে চোখে নির্ব্বাক কথার আদান প্রদান হল, দু'জনেরই নতুন করে মনে হল পৃথিবীটা শূন্য নয়, অশান্তিই মানুষের জীবনে একমাত্র পাথেয় নয়। সুদীর্ঘ পাঁচ বছর অভিনয় ঘেরা যে জীবন ওদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, মুহূর্ত্ত থেকে মুহূর্ত্তে পালিয়ে পালিয়ে, যে জীবনকে ওরা দু'জনেই জীবনের অনন্তরূপ বলে মেনে নিয়েছিল, সেটা সত্যি নয়, এই কথাটাই ওদের মনে আশার নতুন আলো হ'য়ে জ্বলে উঠল! সুলেখা অনুভবে বুঝল' পাষাণের নারায়ণ মিলনের শঙ্খ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, মিলনের তিথি আগতপ্রায়।···

জ্যোতি ভাবল—জীবনের এই নতুন পরিহাস।···

পাঁচ বছর পরে জ্যোতি ফিরেছে দিল্লীতে।

ছবির মতন সহর গ'ড়ে উঠেছে। কত নতুন বাড়ী, কত নতুন পথ। পাঁচ বছরে যে এই পরিবর্ত্তন হ'তে, তা যেন কল্পনাই করা যায় না, তবু হয়েছে। বন্ধুর বাড়ী কনোট্ প্লেস ছাড়িয়ে, পার্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্রীট দিয়ে গিয়ে কুইন্ ভিক্টোরিয়া রোডের ওপর।

সুন্দর ছোট্ট বাংলো। গেট থেকে লাল সুড়কির রাস্তা, মাঝখানে ফোয়ারাটাকে ঘিরে চলে গেছে বাড়ীর ঠিক সামনে পর্য্যন্ত। রাস্তার দুধারে ফুলের কেয়ারি, তার পাশে মখমলের মতন মসৃণ ঘাস ঢাকা মাঠ।

রাস্তার ওপর এসে পড়েছে বারান্দার খানকয় সিঁড়ি, দু'ধারে ফুলের টব দেওয়া, মরসুমি ফুলের মরসুম্। বারান্দার ডান দিকে বসবার ঘর।

বন্ধু বাড়ীতেই ছিল।

জ্যোতিকে নিয়ে সামনের লনে এসে বন্ধু বললে, জীবনটা বন্ধ ঘরের মধ্যে ছটফট্ করছে, তোকে নিয়ে আজ তাই আর ঘরের ভেতরে নয়, বাইরের অসীম মুক্ত আলোয়! জ্যোতি দেখলে বন্ধুর সেই পুরোনো দৃষ্টিতে মর্চে পড়েছে, পাঁচ বছর আগে ওর জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তে যে অস্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের দীপ্তি ছিল, আজ তার আভাষও নেই।

কারণটা জ্যোতি কিছুতেই খুঁজে পেল না।

সন্ধ্যার স্তিমিত আলোয় দুই বন্ধুর আলাপ জ'মে উঠল। কথায় কথায় জ্যোতি জিজ্ঞেস করলে, সুলেখা কোথায়, সে কেমন আছে?

এখানেই আছে, বিয়ে করেছে।

কাকে?

আমারই এক বন্ধুকে, বন্ধু বললে।

বন্ধু চুপ করলে, অপরূপ সন্ধ্যাটা বন্ধ্যা রমণীর নিস্তব্ধ আর্ত্তনাদে আর্দ্র। কোথায় ব্যথার একটা ক্ষীণ আভাষ, কোথায় বেদনার অস্পষ্ট ইঙ্গিত। সত্যিই কি তাই, না জ্যোতির কল্পনা?

ছেলেটি ভাল, বন্ধু ব'লে চলে, মানিয়েছে দুজনকে।

কেমন করে ওদের বিয়ে হল সেই কথাই বন্ধু থেকে থেকে ব'লে চলে, কিন্তু জ্যোতি তখন ভাবছে···

সেই প্রথম দিনের কথা,···সেই একগোছা ফুল·· শুভ্র, সুন্দর···সেই অভিমান ভরা দৃষ্টি ··সেই কথা···

বন্ধু হঠাৎ থেমে গেল গেট খোলার অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনে। সুলেখা এসেছে তার স্বামীকে নিয়ে বেড়াতে।

আশ্চর্য্য মিল, আজকেও ঠিক সেদিনকার মতন ফিকে নীল রঙের শাড়ীখানা পরা, হাতে তেমনি শুভ্র এক গোছা ফুল। আনত বড় বড় চোখ দু'টো আজও তেমনি মনকে আকর্ষণ করে। দৃষ্টিতে ওর অনুনয়, জীবনের প্রতি প্রচ্ছন্ন অভিমান। ওকে একবার দেখলেই বোঝা যায়—নিয়তি অতি নির্ম্মম কষাঘাত করেছে।

প্রথম পরিচয়ের প্রথম কয়েকটি কথার পর স্বামী বিদায় নিয়ে গেল, বিশেষ একটা প্রয়োজনীয় কাজের অজুহাতে। বলে গেল, ফেরার পথে নিয়ে যাবে সুলেখাকে।

জ্যোতির মনে হ'ল, আবহাওয়াটা হঠাৎ যেন হাল্কা হল।

আরও একটা কথা হঠাৎ ওর মনকে দোলা দিয়ে গেল। স্বামীর বিদায় নেওয়াটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক, অত্যন্ত গোপনে, অস্পষ্ট ভাবে ওর মনে হল সুলেখা সুখী নয়!

কথাটা মনে হ'তেই জ্যোতি মনে মনে হেসে উঠল। আশ্চর্য্য, মানুষের মনটা এত জটিল। কিই-বা জানে জ্যোতি ওদের বিবাহিত জীবনের কথা, তা ছাড়া সুলেখাকেই বা ও কতটুকু জানে? মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে ওর সঙ্গে সুলেখার দেখা হয়েছিল, তাও পাঁচ বছর আগে।

তাহ'লে?

তা হ'লে কেন ওর মনে হ'ল সুলেখা সুখী নয়?

বন্ধু বললে, নূতন ক'রে পরিচয়ের দরকার নাকি? সুলেখাকে নিশ্চয় তোমার মনে আছে!

জ্যোতি কোন উত্তর দেবার আগেই বন্ধু আবার বলল, মনে আছে নিশ্চয়, এত প্রশ্ন যখন করছিলে!

সুলেখার চাউনি উজ্জ্বল, স্পষ্ট।

জ্যোতিকে কিছু বল্‌তে হবে, তাই বল্‌লে, মনে আছে বই কি!

'সুন্দরী নারীকে ফুল হাতে দেখলে পুরুষ কি ভুলতে পারে?'

'কি ভুলতে পারে না?' সুলেখা প্রশ্ন করলে, 'নারীকে, না ফুলকে?'

'দু'জনকেই' জ্যোতি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে। একটু থেমে জ্যোতি আবার বল্‌লে, 'বিশেষ ক'রে, ফুল যদি শুধু ফুল না হ'য়ে হয় অর্ঘ্য…নিবেদনেই মেয়েদের পূর্ণ বিকাশ!'

'অর্ঘ্য কি সেদিন আমার হাতে ছিল?'

'ছিল' জ্যোতি বল্‌লে, 'অর্ঘ্য ঠিকই ছিল, দেবতা কে তা' জানতে না!

সুলেখা কোন উত্তর দিল না, ওর মনটা থম্‌কে দাঁড়াল। কি বল্‌ছে জ্যোতি, কি বল্‌তে চায়?—

বন্ধু বল্‌লে, 'তোমরা ঠিক কর দেবতার স্থান আর বিচার কর অর্ঘ্য ঠিক স্থানে পৌঁচেছিল কি না, আমি চায়ের ব্যবস্থা করি! বন্ধু উঠে গেল।

সন্ধ্যার শেষ লগ্ন, চারিদিকে আরক্তিম আভা। ওদের চারিদিকে নিস্তব্ধতা, দূরে অস্পষ্ট শব্দের আভাষ…গাড়ী চলে যাবার শব্দ কিম্বা পথিকের আপন মনে গাওয়া বেসুরো গানের রেশ। পৃথিবীটা যেন মা-মরা ছেলে। হতবাক্, থম্‌থমে, স্তব্ধ, আকাশটায় কান্না মাখা চোখের ঘোলাটে রূপ।

সুলেখা বল্‌লে, 'অর্ঘ্য নিয়ে মেয়েরা সাধারণতঃ খেলা করে না, ভুল যদিও বা হয়, অর্ঘ্য হাতেই ছিল, দেবতাও ছিল সামনে, নিয়তি শুধু চোখ বেঁধে মজা দেখছিল।

জ্যোতি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, ভাগ্যের দোষ আর নিয়তির পরিহাস, ঠিক যেমন প্রকৃতির অভিসার-সজ্জা বসন্তকালের শেষ লগ্নে, অথচ দৃষ্টিহারা ভাবে শীতের বুঝি পূর্ব্বাভাস! সুলেখা আর শুনতে রাজী নয়। ওর নির্জ্জন জীবন, ওর নীরব পৃথিবী। ওর ভালবাসার খাতায় শূন্য, মাতৃত্বের হিসেবে গভীর কাটাকুটি, কর্ত্তব্যের ঘরে দেশ। এই সব এড়িয়ে জ্যোতির কথা ও শুনতে রাজী নয়। কথা ত' নয়, মনের ব্যথায় রাঙান' এক একটি কাঁটা। ওর প্রত্যেকটি কথা সুলেখার ক্ষত বিক্ষত মনকে আলোড়িত করে, রক্তের বন্যা বইতে থাকে চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাসের রূপ নিয়ে।

সুলেখা নীরব তবু নিরত নয়। জ্যোতিকে সামনে রেখে ও ভাবছে অতীতের কথা। আজ ওর মনে পড়েছে প্রথম দিনের কথা, প্রথম যেদিন ও জ্যোতিকে দেখেছিল। সেদিনকার ওর চেহারা ছিল অপূর্ব্ব, ওর চেহারা ছিল অভূতপূর্ব্ব! বড় টানা টানা চোখ আর জোড়া ভুরু ছিল রাজার মুকুটের ঠিক মাঝখানে উজ্জ্বল মণির মতন মন-চোরা, হাসিটি ছিল ঠোঁটের কোণে জড়িয়ে, মেয়েদের সিঁথীর সিঁদুরের মতন, শ্যামল সৌন্দর্য্যের রূপ নিয়ে! ছিল না কোন রকম উগ্রতা, দৃষ্টিতে ছিল ব্যগ্রতা। সমস্ত মানুষটার মধ্যে ছিল একটা গভীর রূপ রেখা, চোখ এড়ান যায় না, মনকে ওর চিন্তা থেকে সরানো যায় না, ঐ মানুষটার বিপদের কল্পনাকে মন থেকে তাড়ান' যায় না তবে কি সেদিন সুলেখার ভাল লেগেছিল ওকে?

বার বার মন এই প্রশ্নই সেদিন সুলেখাকে করেছিল। ভাল লাগা আর ভালবাসা নিয়ে মন কত লুকোচুরি খেলেছিল ; আড়ালে, গোপনে মন কত কথা বলেছিল, উঁচু গলায় না নীচু গলায়। মনের কথা সেদিন ও বোঝে নি। বন্ধুকে পরে জিজ্ঞেস্ করেছিল জ্যোতির কথা। বন্ধু বলেছিল, ছেলেটি দেখতে এপোলো, গুণে র‍্যাফেল্, জন্ম বৃহস্পতির লগ্নে, অর্থাৎ উগ্র ভাষায় জোর করে মিল খাওয়ানো কবিতা লেখে না, কবি-মনের আভাষ আছে কথায়, দৃষ্টিতে, ভাবনায়। আরও বলেছিল, ছেলেটি গরীব।

তারপর টেবিলের ওপর থেকে একটি মেয়ের ফটো তুলে নিয়ে সুলেখাকে দেখিয়ে বলেছিল, এই মেয়েটিকে জ্যোতি ভালবাসে, নাম অনুপা।

একটি চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস বন্ধুকে এড়িয়ে সুলেখা ফেলেছিল। বলেছিল, 'ও বন্ধু তাহ'লে তোমার অল্প বয়সে পাকা, এরই মধ্যে হৃদয় দান করেছেন।'

ঠিক সেই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জ্যোতির কথা ও ভেবেছিল, তারপর থেকেই জ্যোতি হ'য়ে উঠল নিভে-যাওয়া ধূপের মতন। ধূপ শেষ হ'য়ে যায়, গন্ধ ছড়িয়ে থাকে, প্রথমে বাতাসে, তারপর মনে, তারপর শুধু বিস্মৃতির পর্দ্দায় একটুখানি স্মৃতির চিহ্ন হ'য়ে, ভুলে যাওয়া আর মনে রাখার মাঝামাঝি জায়গায়।

জ্যোতি চুপচাপ বসেছিল সুলেখাকে দেখেও না-দেখার ভাণ ক'রে। সুদূর প্রসারিত দৃষ্টি ছিল সুলেখার চারিধারে ঘিরে, ওকেই কেন্দ্র ক'রে। সুলেখা যেন মন্দিরের বিগ্রহ, ও এসেছে পূজারীর আগ্রহ নিয়ে। স্তব্ধ হ'য়ে দেখছে নিস্তব্ধ স্থির মূর্ত্তি, অস্পষ্ট কল্পনা করছে অনেক কিছু, বুনেছে অনেক জাল। ভাবছে মানুষটার কত পরিবর্ত্তনই না হ'য়েছে। সেদিন ফুল হাতে মানিয়েছিল সুন্দর, রাঙিয়েছিল মন, ভাঙিয়েছিল জীবনের ভবিষ্যৎ, শত রূপে, শত জীবনের আভাষে। পুরুষ জাতটার স্বভাবই তাই, আগে বর্ত্তমানের কথা ভাবে না, ভাবে ভবিষ্যতের কথা। মনের মতন মানুষটাকে সামনে পেয়ে ভাবে না পাওয়ার পরিপূর্ণতার কথা, ভাবে তাকে হারালে চলবে কি করে। সেদিন সুলেখাকে সামনে দেখে কল্পনায় ও দেখেছিল ভবিষ্যতের শত রূপ—তাকে বান্ধবী-রূপে, তাকে মাতৃত্বের আভরণে সাজিয়ে, তাকে স্ত্রীর আসনে বসিয়ে—ভাল লেগেছিল ভাবতে, কিন্তু সাহস পায়নি বলতে। বাসনা ছিল বহুল, আশা ছিল অনেক, বাধা ছিল পর্ব্বত প্রমাণ।

ও অনেক ভেবেছে সুলেখার কথা। কিন্তু মনের কথা মনের কোণেই লুকিয়ে ফেলেছে। বন্ধু ছিল তার অন্যতম কারণ। ভুল করেছিল, ভেবেছিল বন্ধু বুঝি সুলেখাকে ভালবাসে। কথার ছলে অনেকদিন অনেক ভাবে বন্ধুকে কথাটাও জানিয়েছিল, কিন্তু বন্ধু ওর ভুল ভাঙায় নি। বন্ধু জেনে শুনেও ছল করেছিল, নিয়তি করেছিল পরিহাস।

আরও একটা কারণ ছিল, অনুপা। অনুপাকে ও ভালবাসত। অনুপা ছিল ওর প্রথম যৌবনের ভালবাসা নেবার প্রথম বিগ্রহ। সেই অনুপার স্মৃতি মনে ছিল সজাগ !

যাক্ গে ওসব কথা, জ্যোতি ভাবল, কি হবে ওসব ভেবে, গোলমাল হ'য়ে যাবে সব, মনটা হবে খারাপ।

জ্যোতি বললে, ভাবছ কি অমন চুপচাপ ?

সুলেখা হাসল, বললে, কিছু না! থেমে আবার বললে, বিয়ে করলে, বৌ পেলে, আমরা পেলাম অবহেলা, নেমন্তন্নের চিঠিও ত' পেতে পারতাম, এক পাইও খরচা ছিল না!

সুলেখা এরই মধ্যে মনটাকে বেঁধে ফেলেছে, ভেবেছে কথায় কথায় বুঝবে জ্যোতির জীবনটাকে, বোঝাবে না নিজেকে। তা ছাড়া বিয়ের কথায় ছিল প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। স্বামী ওর যেমন বিশৃঙ্খল ভাবে বিদায় নিয়ে গেছে তাতে অশুভ ইঙ্গিত ছিল, ব্যথার সঙ্ঘাতের মতন মর্ম্মস্পর্শী। যে কথাটা মুখে বলে না, ওর স্বামী অথবা ও নিজে, আভাষে আজ তাই প্রকাশিত হয়েছে। স্বামী এলোমেলো বিদায় নিয়ে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছে। এদের সহজ রাজ্য থেকে ও দূরে, এদের কথা আর গল্পে ওর প্রাণ নেই। সুলেখা জানত' কোন কাজ নেই, অকারণেই স্বামী গেছে, ওদের সকলকে এড়িয়ে যাবার জন্যে। নারী-সুলভ অনুভূতি দিয়ে সুলেখা অনুভব করেছে জ্যোতির

মনকে, বুঝেছে যে জ্যোতি আভাষ পেয়েছে। তাই জ্যোতির মনকে সেই ভাবনা থেকে ও দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে।

তাছাড়া আরও একটা কারণ ছিল। একদিন না-বলা কথায়, প্রচ্ছন্ন ভাবে আচ্ছন্ন ওর দৃষ্টি সুলেখার মনকে স্পর্শ করেছিল। ওর ভাবনাকে বিচ্ছিন্ন করেছিল নানান ভাবে। জ্যোতির প্রতি ওর একটা সহজ টান আছে, জানবার কৌতুহল আছে। ওর জীবনের ধারাটাকে মনে ধরবার বাসনা আছে। জ্যোতির জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে ও জানতে চায়। বিশেষ করে সেই সব দিন-গুলোর কথা, যে দিনগুলো ওদের প্রথম দেখার দিনটিকে ক্রমেই দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সেইদিন থেকে আজকের দিন পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি দিনের ইতিহাস।

জ্যোতি কি ভাবছিল, সুলেখা বললে, আমার কথার জবাব কৈ? খাওয়াটা কি পাওনা রইল? অদূর ভবিষ্যতে নতুন সুখবরের যদি আশা থাকে তা হ'লে সুদে আসলে পাবার লোভে থাকতে ক্ষোভ নেই!

বিয়ের খাওয়ার কথা? জ্যোতি বললে, তুমি ঠিক যে কারণে বাদ দিয়েছিলে, আমিও তাই, তাছাড়া জ্যোতি অন্ধকারে একটা ঢিল ছুড়লে, বাদ দিয়ে আজ ঠিক যে কারণে তুমিও অনুতপ্ত নও, আমিও তাই!

থেমে আবার বললে, বিয়ের খাওয়াটা তাদের জন্যে, যারা আশীর্ব্বাদ করে গলাটাকে উঁচু করে, হিংসে করে মনটাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে, উপহার দেয় কম দামের জিনিষ দিয়ে বড় হরফের নাম লিখে, জাহির করবার জন্যে আর তাদের জন্যে যারা ত্যাগের মহিমাকে বড় করে মনের মধ্যে দুঃখটাকে চেপে!

আমি কোন দলে? সুলেখা জিজ্ঞেস করলে।

তুমি? হাসতে হাসতে জ্যোতি সুলেখার দিকে চেয়েই বললে, যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন তুমি ছিলে অল্প পরি-চয়ের মাধুর্য্য দিয়ে ঘেরা পরিচিতা, একটা সন্ধ্যার সাথিত্ব মাখান' সুখ স্মৃতি, বান্ধবীও নও, প্রণয়ের রঙ দিয়ে ঘেরা প্রতিমাও নও!

জ্যোতি আশ্চর্য্য নরম সুরে কথাগুলো বললে, সুলেখা তাই শুনে ভাবতে লাগল কত কথা। চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হল, ওর মনটা সেই প্রতিধ্বনি শুনবার জন্যেও ব্যাকুল হয়ে রইল।

চারিদিকে বিচ্ছিন্ন নীরবতা, অবিচ্ছিন্ন ভাব জড়িয়ে রয়েছে ওদের দু'জনের মনকে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে মনের ভাবনা এক হ'য়ে আছে, বাইরের থমথমে ভাবটা ওদের কথার মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে। ওদের দু'জনকার দৃষ্টিতে ওপরের আকাশের তারার ভাষা, তারার নীরবতা, তাদের কৌতুহল।

বন্ধু এল' চা নিয়ে। অবাক হ'য়ে বললে, হতবাক কেন? আজকের সন্ধ্যাটা দেখছি নীরব রাতের চাইতে বেশী নীরব, প্রাণের ক্ষীণ স্পন্দনও পাচ্ছি না যে!

সুলেখা জ্যোতিকে আগলে ফেলবে নিজের কথা দিয়ে। বন্ধুর কোন কথা যে ওকে ছুঁয়ে যাবে তাতে ও মোটেই রাজি নয়! বললে, অনেকদিন পরে দেখা হ'লে অনেকদিন আগের কথা মনে ভিড় করে। এত' কথা যে মন ব্যথা পায়, তাই নীরবতা মনে কায়েমি হ'য়ে বসে!

কি এমন কথা, বন্ধু বললে, যা ব্যথার রঙে রাঙান! সুলেখা হাসতে হাসতে বললে, জীবনের সব কথাই ত' তাই, দুঃখের কথা, অভাবের কথা, সুদিনের কথা; থেমে আবার বললে, দুঃখের কথায় আছে জীবনে কিছু একটা না পাওয়ার কথা, সুখের কথায় আছে, সেই সুখের অংশ নেবার উপযুক্ত লোকের অভাব! মনটা এমনই হতভাগা, যে, যা পায় তাই হারায়, যা পায় না তা হারায় না, মনকে পীড়া দেয়!

জ্যোতি কি বলতে চাইল, কিন্তু সুলেখার দৃষ্টিতে কথা হারিয়ে ফেললো, বুঝল সৃষ্টি ওর ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেছে গভীর বেদনায়। জ্যোতি তাই চুপ করে ভাবতে লাগল, কোথায় সুলেখার শূন্যতা!...

রাত্রি ঘনিয়ে এসেছে। সুলেখার স্বামী এসেছে নিয়ে যাবার জন্যে, বন্ধু কি একটা কথা বলছে তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে।

জ্যোতি কি ভাবছিল, হঠাৎ দেখলে সুলেখা ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

দৃষ্টি বি'নিময় হ'তেই সুলেখা সচকিত হ'য়ে উঠল। দূর থেকে স্বামী ডাক দিল।

সবার অলক্ষ্যে সুলেখা বললে, আজ আসি......কোন উত্তর দেবার আগেই জ্যোতি দেখলে স্বামীর সঙ্গে সুলেখা সামনের ঘন অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেছে! [ক্রমশঃ
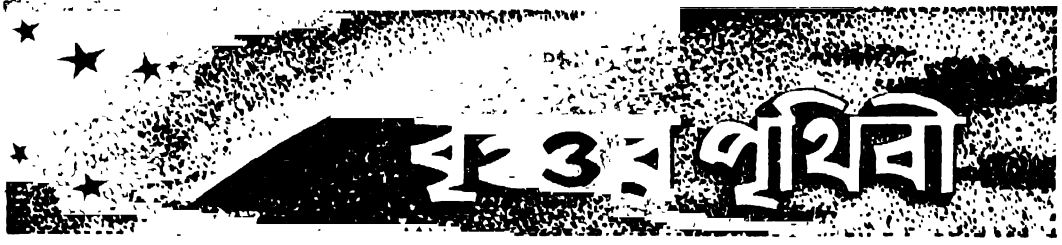
বর্ত্তমান বিশ্বযুদ্ধ

শ্রীতারানাথ রায়চৌধুরী

এ কয় বছর ধরিয়া সারা জগতে যুদ্ধ চলিতেছে। এ-যুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে বহু গবেষণা হইয়া গিয়াছে। অনেকে মনে করিয়াছিলেন—যুদ্ধটা সংক্ষেপে থামিয়া যাইবে। কিন্তু থামে নাই। এখন দুই পক্ষে যুদ্ধ চলিতেছে। এক পক্ষে ইংরেজ ও আমেরিকা, অপর পক্ষে জার্ম্মাণী ও ইতালী। প্রথম পক্ষকে মিত্র পক্ষ বলা হয়। এ-পক্ষে রুশিয়া ও চীন যোগদান করিয়াছে, অপর পক্ষে জার্ম্মাণী ও ইতালীর পক্ষে জাপান যোগদান করিয়াছে; কাজেই যুদ্ধটা সারা পৃথিবী-ব্যাপী হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এ-যুদ্ধে সমগ্র ইউরোপ যদি ধ্বংস হইত, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরেজের রাজত্ব বলিয়া জাপান ভারতও আক্রমণ করিয়াছে, বিপদ আমাদের এখানেই। জাপান ইংরেজ অধিকৃত সিঙ্গাপুর, মালয়, ব্রহ্মদেশ দখল করিয়া কিছুদিন হইল মণিপুর রাজ্য, নাগা পর্ব্বত, লুসাই পর্ব্বত ও আসামের কতকটা স্থান আক্রমণ করিয়াছে। ১৯৪৪ সালের এই এপ্রিল মাসেও আসাম সীমান্তে যুদ্ধ চলিতেছে। এই যুদ্ধের জন্যই আমরা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি।

এই বিশ্বসমরের কারণ সম্বন্ধে ১৯৩২ সালে 'জনমত' পত্রে লিখিয়াছিলাম, ভার্সেলিজের সন্ধির পরিণামে অচিরাৎ ইউরোপে সমরানল জলিয়া উঠিবে, এবং সেই সময়ে হিটলার সমগ্র ইউরোপ দখল করিবে, কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারিবে না। ১৯৪১।৪২।৪৩ সালেই দেখা গিয়াছে, জার্ম্মাণী নরওয়ে, ডেনমার্ক, হলাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্সের উত্তরার্দ্ধ এবং ইতালী ও ইউরোপের অন্যান্য ছোট ছোট রাজ্যগুলি অকস্মাৎ দখল করে। জার্ম্মাণীর বক্তব্য এই যে, জার্ম্মাণী যদি এ বিষয়ে শৈথিল্য প্রকাশ করিত, তাহা হইলে জার্ম্মাণীকে ধ্বংস করিবার জন্য ব্রিটিশপক্ষই ঐ সকল রাজ্য দখল করিত। ইউরোপে যে অবস্থা, ঠিক এশিয়ারও সেই অবস্থার উদ্ভব। জাপান খুব তড়িৎগতিতে প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার অধিকৃত দ্বীপগুলি এবং ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ ও ব্রিটিশের অধিকৃত সিঙ্গাপুর, মালয়, এবং ব্রহ্মদেশ দখল করিয়া বসে। জাপানের সামুদ্রিক এলাকায় যে সকল দ্বীপ, যেমন ফিলিপাইন প্রভৃতি বিস্তৃত লোক বসতিপূর্ণ দ্বীপ এতকাল আমেরিকা এবং ইউরোপের অন্যান্য শক্তি দখল করিয়াছিল, জাপান সেইগুলি দখল করে। ঐ সকল দ্বীপের অধিবাসীগণের স্বাধীনতা ব্রিটিশ এবং অপরাপর শ্বেতাঙ্গজাতি অন্যায়ভাবে যে একদিন হরণ করিয়াছিল, জাপান সেইরূপ সুযোগেরই অনুসন্ধান করিয়া এতকাল পরে সেই দ্বীপগুলি শ্বেতাঙ্গ কবল হইতে উদ্ধার করে। আত্মরক্ষার জন্য জাপানের এই দ্বীপগুলি দখল করিবার প্রয়োজন ছিল। হংকং, চীন সাম্রাজ্য ও জাপানের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ, এই দ্বীপ ব্রিটিশ অনেক দিন আগে দখল করে। জাপান নিজ নিরাপত্তার জন্য এবং চীনের নিরাপত্তার জন্য, ঐ দ্বীপটীও দখল করিয়াছে।

চীন সাম্রাজ্যে ইংরেজ, আমেরিকা এবং রুশিয়া অত্যন্ত ধীরে ধীরে আধিপত্য বিস্তার করিয়া জাপানের বিরুদ্ধে চীনকে উত্তেজিত করে। জাপান অনেকদিন হইতে ইহা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ জাতি এবং রুশকে চীন হইতে না দূর করিলে একদিন জাপান বিপন্ন হইতে পারে এই কারণেই সামান্য কতটুকু প্রদেশ ব্যতীত চীনের অধিকাংশ স্থান জাপান দখল করিয়াছে। চিয়াং কাইশেক প্রতিবেশী জাপানের সহিত সখ্য সূত্রে আবদ্ধ না হইয়া বহু দূর দেশাস্থিত শ্বেতাঙ্গ জাতির সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়, ইহাও জাপান

সহ্য করিতে পারে নাই। জাপানের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ারও ইহা এক কারণ, এবং নানকিং-এ একটি চীন-সাধারণতন্ত্র স্থাপনও এই উদ্দেশ্যে জাপান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

১৯১৪-১৯ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের পরে জগতের অনেকেই মনে করিয়াছিল, ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ self-determinatian এবং নীতির বলে পৃথিবীর ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল রাজ্যকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার দান করিবে, কিন্তু কার্য্যকালে তাহা করে নাই, বরং বৃটিশের কূটনীতি অন্য রাজ্যগুলির চির পরাধীনতার কারণ হইয়া উঠে।

ইউরোপ ও এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি গত একশত বৎসরে যে ভাবে উদ্ভব হয় এবং ব্রিটিশের কূটনীতি ও রুশিয়ার অগ্রসর নীতি যেভাবে জগতের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক শান্তি নষ্ট করে, তাহাতে একটা বিরাট যুদ্ধের সম্ভাবনা যে গড়িয়া উঠে নাই, তাহা কে বলিবে?

ইউরোপীয় 'দরিয়ায়' আজ যাবৎ এশিয়ার কোন শক্তি অনধিকার প্রবেশ করে নাই, অথচ এশিয়ার দরিয়ায় অন্যায় ভাবে ইউরোপীয় জাতি প্রবেশ করিয়া এশিয়ার রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অশান্তি আনায়ন করিয়াছে। আজ যে প্রশান্ত মহাসাগরে, ভারত মহাসাগরে, বঙ্গোপসাগরে, ভূমধ্য মহাসাগরে, উত্তর মহা-সাগরে, ইংলিস্ চ্যানেলে এবং আটলান্টিক মহাসাগরে জলপথে বিরাট যুদ্ধ চলিতেছে, ইহার পরিণাম কি? ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন থাকিত, তাহা হইলে হয়ত যুদ্ধের গতি অন্য রকম হইত, কিন্তু একমাত্র ভারতের পরাধীনতার জন্য আজও বঙ্গসাগরে এবং ভারত মহাসাগরে ইংরেজ ও আমেরিকার রণতরীবহর জাপানের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে প্রস্তুত রহিয়াছে। কিন্তু ভারতের বহির্বাণিজ্যের পক্ষে অপরিসীম ক্ষতি হইতেছে।

১৯৫০ সাল পর্য্যন্তও এই যুদ্ধ চলিতে পারে। এখনও যদি ইংরেজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার করে, তাহা হইলে আজই এশিয়ার যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যায়। জাপান ভারতবর্ষকে পদানত করিবে অথবা ভারতবর্ষকে জাপসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবে, এ কল্পনাও আমরা করিতে পারি না। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকিলে আজ জাপান বঙ্গের সীমান্তে আসিতে পারিত না, আসিলেও আমরা বাধা দিতাম, লোক বলে ও যুদ্ধকৌশলে ভারতবর্ষ জাপ হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। ভারতের মনুষ্যত্বের মস্তকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট একটা প্রকাণ্ড পাথর চাপাইয়া দিয়া ভারতের মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করিয়াছে, আজ যে আমেরিকান সৈন্য, বা অষ্ট্রেলিয়ান ভারত রক্ষার্থ ভারতে আসিয়াছে, এই আসিবার প্রয়োজন হইত না, অথবা আফ্রিকা হইতে অসভ্য জংলী কাফ্রি জাতিকেও ভারতবর্ষে আনিতে হইত না। জার্ম্মানী ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, এই জনরব মাঝে মাঝে আমরা শুনিতে পাই, ইংলণ্ডও আমেরিকার সাহায্যে জার্ম্মান অধিকৃত ইউরোপ আক্রমণ করিবে বলিয়া উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছে। এই উদ্যোগ আয়োজনের পশ্চাতে যে মনোবৃত্তি রহিয়াছে, সেই মনোবৃত্তি অত্যন্ত নীচ চিন্তাসম্ভূত। জার্ম্মানী ইউরোপের কোন রাজ্যই আপনার অধিকারে রাখিতে পারিবে না, এবং রাখিবেও না। প্রত্যেক ইউরোপীয় প্রদেশ পূর্ব্বের ন্যায় আপন স্বাধীন স্বত্ব বজায় রাখিতে পারিবে।

গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ইংলণ্ড এবং আমেরিকা যুদ্ধ করিতেছে, এই কথাই প্রত্যহ শুনিতে পাই, যদি ইহা সত্য হইত তাহা হইলে আজই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইত, আমে-রিকান ও বৃটিশ সৈন্য ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যাইত; পৃথিবীর ছোট বড় সকল দেশ স্বাধীনতা ভোগ করিত। একমাত্র শ্বেতাঙ্গ জাতির সাম্রাজ্য বিস্তারের অহেতুকী লিপ্সাই এই বর্ত্তমান সমরের কারণ এবং এখনও সেই জন্য যুদ্ধ চলিতেছে। তবে এ কথা সত্য, বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা এই যুদ্ধে সমাধিপ্রাপ্ত হইবে।

বাঙ্গলার ঘরোয়া প্রবাদ

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

গয়নার মধ্যে বালা,

কুটুমের মধ্যে শালা।

যখন বিলাতী ফ্যাসানের চল হয় নাই, জাতীয় বৈশিষ্ট্য যখন সজীব ছিল, তখন হিন্দুর সংসারে সধবাদিগের হাতে 'নোয়া'র পাশে 'বালা'ই ছিল শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। ইহা পূর্ব্বযুগের 'খাড়ু'রই সৌখিন সংস্করণ। সিঁথীর সিঁদুরের মত সধবাদের মণিবন্ধে 'নোয়া' এবং 'বালা'ই ছিল তখন আয়তির লক্ষণ। এখন বালার রেওয়াজ উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু কুটুমের মধ্যে শ্যালকের আসন এখনো শ্রেষ্ঠ হইয়া রহিয়াছে—। চিরকাল থাকুক।

গাছের শত্রু 'চিলে'।

মানুষের শত্রু 'পিলে'।

পরগাছাকে চলতি ভাষায় 'চিলে' বলে, যাহাকে ইংরাজীতে সাধারণভাবে 'অর্কিড্' (Orchid) বলা হয়। গাছেতে 'চিলে' জমাইলে সে গাছ ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়ে। তাহার খাদ্যরস 'চিলে'ই ভোগ করিয়া পরিপুষ্ট হয়। আমাদের দেশে ভাল ভাল আমগাছে 'চিলে' জমাইয়া গাছগুলিকে নষ্ট করিয়া দেয়। সুতরাং গাছের শত্রু—'চিলে'। আর প্লীহা রোগটিও মানুষের—বিশেষতঃ বালক বালিকাগণের—একটি বড় শত্রু। জ্বরের ইহা প্রিয় সহচর।

গাছেরও পাড়বে,

তলারও কুড়ুবে।

অর্থাৎ কোনদিকেই বাদ দিবে না। গাছে উঠিয়া প্রথমতঃ যত পারিল তত খাইল। তারপর—কোঁচড় ভরিয়া সংগ্রহ করিল। শেষকালে গাছ হইতে নামিয়া আসিয়া তলায় যেগুলি পড়িয়াছিল, সেগুলিকেও বাদ দিল না। সাংঘাতিক হিসাবী—তার আর ভুল নাই। তবে নিজের গাছ হইলেই এরূপ শোভা পায়; পরের গাছে এরূপ যে করে তাকে সেই গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখাই যুক্তিসঙ্গত।

গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল।

কোন কার্য্যের ফল পাইবার পূর্ব্বেই ফলপ্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া নিজেকে তদ্বিষয়ে প্রস্তুত করা। জ্ঞানবানে এরূপ করে না। কার্য্যের ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে কতরকম বাধাবিঘ্ন আসিতে পারে। গাছ হইতে কাঁঠাল পাড়িয়া খাইব, সেজন্য আগে হইতেই কাঁঠালের আঠা যাহাতে গোঁফে না লাগে, সেজন্য গোঁফে তৈল লাগাইতে বসিলাম। কাঁঠাল যে না-পাওয়া যাইতে পারে কিম্বা পাওয়া গেলেও, হয়ত কোন দৈব কারণে তাহা আমার খাওয়া না-ও হইতে পারে, এসব চিন্তা না করিয়া আমি যদি আগে হইতেই গোঁফে তেল মাখাই, তাহা হইলে আমার জ্ঞানহীনতাই প্রকাশ পাইবে। কাঁঠালের উদাহরণে সব কাজেই কথাটা খাটে। এই ধরণের ইংরাজী প্রবাদ:—
To count one's chickens before they are hatched.

গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল।

সমাজে কেহই তাহাকে ডাকে না; না কোন কাজে কর্ম্মে, কেহই তাহাকে কোন ভারার্পণ করে না; কিন্তু তা সত্বেও সে অনাহুত হইয়া সেখানে গিয়া মোড়লগিরী করে। নির্ব্বোধ লোকেই এরূপ করিয়া থাকে। জোর করিয়া মান্য আদায় করা যায় না। দশে মিলে যাহাকে কর্ত্তার আসনে বসাইবে, সেই হবে সত্যকার কর্ত্তা, সেই হবে আসল মোড়ল।

গাঙ পেরিয়ে কুমীরকে ফাঁকি।

কুমীরের সঙ্গে বন্দোবস্ত হইল, যে নদী পার হইবার আমার আর দ্বিতীয় উপায় নাই, তুমি পিঠে লইয়া আমাকে পার করিয়া দাও, এর পরিবর্ত্তে তোমাকে পারিশ্রমিক দিব। তারপর কুমীরের পিঠে নদী পার হইয়া ওপারে যখন গিয়া উঠিলাম, তখন কুমীরকে আর কিছুই না দিয়া—দিলাম ফাঁকি। অর্থাৎ, কাজ উদ্ধারের আগে নানারূপ প্রস্তাব ও লোভ দেখাইয়া কাহারো দ্বারা আমার কাজটি সম্পন্ন করিলাম, তারপর, যখন কাজটি হাসীল হইয়া গেল, তখন আর আমার পূর্ব্ব প্রস্তাবের কথা মনে থাকিল না, বা ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে ফাঁকি দিয়া সরিয়া পড়িলাম।—কিন্তু মানুষকে এই ভাবে ফাঁকি দিয়া হয়ত সরিয়া পড়া যাইতে পারে, ভগবানের কাছে এরূপ ফাঁকি দেওয়ার শাস্তি হইতে কাহারো সরিয়া পড়িবার শক্তি থাকে না। এর শাস্তি একদিন না একদিন তাহাকে পাইতেই হইবে। সুতরাং 'গাঙ পেরিয়ে কুমীরকে ফাঁকি' দিলে, কোন-না-কোনদিন তাহাকেই ফাঁকিতে পড়িতে হইবে।

গেঁও-যোগী ভিখ্ পায় না।

যে যোগীর গ্রামেতেই বাস, সে যোগীর প্রতি কাহারো ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে না। মানুষের স্বভাব যে, তাহার চোখের অন্তরালে যে জিনিষ থাকে, তাহাকেই সে

বড় বলিয়া মনে ধারণা করিয়া লয়। সুলভ দ্রব্যের আদর থাকে না। কালীঘাট বাসীদের কাছে 'কালী দর্শন' খুবই সুলভ; সেজন্য বছরের মধ্যে একবারও হয়ত তাঁরা কালী দর্শনে যান না; কিন্তু দূর দূরান্তর হইতে কত তীর্থযাত্রী অধীর আগ্রহে কালীঘাটে কালীদর্শনের মানসে আসিয়া থাকেন। বাংলার অত্যন্ত সহজপ্রাপ্য 'টোটকা টুটকী'র প্রতি বড় একটা কাহারো শ্রদ্ধা বিশ্বাস নাই; কিন্তু বাহিরের অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ঔষধের প্রতি অসম্ভব বিশ্বাস এবং প্রীতি, বহু বিষয়ে এই প্রবাদটি খাটে।

ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরায়।

একবার যে লোক কোন একটা বিপদে পড়েচে, ভবিষ্যতে সে ঐরূপ বিপদের আভাস মাত্রেই আতঙ্কিত হইয়া পড়ে। আকাশের গায় সিঁদুরের মেঘ দেখিয়াই অতীতের ঘর পোড়া গরু সেই মেঘকে আগুন জ্ঞানে ডরাইয়া উঠে। অতীত বিপদের অভিজ্ঞতা, ভবিষ্যতে মিথ্যা বিপদের ছায়াপাতেও হৃদয়-মন কাঁপাইয়া দেয়। এই শ্রেণীর ইংরাজী প্রবাদ– A burnt child dreads the fire.

ঘি-ছাড়া ডা'ল,
'লক্ষ্মীছাড়া' গাল।

ঘৃত-সংযোগহীন দাইল খাওয়া স্বাস্থ্য বিধি নয়। কাহাকেও 'লক্ষ্মীছাড়া' গালও দিতে নাই। কলাইয়ের দাল ছাড়া আর সব প্রকার দালে ঘি দেওয়া বিধি। ঘৃত সংযোগে দাল সম্পূর্ণ গুণপ্রাপ্ত হয় এবং সম্ভবতঃ তাহাতে পাকস্থলীর কোন দোষ জন্মায় না। সুতরাং 'ঘি-ছাড়া ডাল' যেমন নিকৃষ্ট, তেমনি 'লক্ষ্মীছাড়া' গালিও নিকৃষ্ট। মা-লক্ষ্মীই আমাদের বাংলা-দেশের মাঠে মাঠে ঘরে-ঘরে বিরাজ করেন; তিনিই আমাদের সর্ব্বপ্রকার ধনসম্পদের দেবী। আমাদের ঘরে ঘরে যেন তিনি তাঁর সোনার আঁচল বিছাইয়া বসতি করেন; লক্ষ্মী ছাড়া হইয়া বাঁচিয়া থাকা—ইহা অপেক্ষা বড় অভিশাপ আমাদের এই হিন্দুর দেশে আর নাই। সুতরাং 'লক্ষ্মীছাড়া' গালি কাহাকেও দিতে নাই।

ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ্ দেখনি।

বহুল-প্রচলিত অতি সাধারণ প্রবাদ বাক্য; সুতরাং বিশেষ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। খুব চতুর ব্যক্তিকে ঘুঘুর সহিত তুলনা করা হয়। কিন্তু সেই চতুরকেও জব্দ করিবার লোক আছে। সে লোক হইল, সেই ঘুঘুকে ধরিবার ফাঁদ স্বরূপ। কেহ যেন গর্ব্ব করিয়া বলিতেছে যে তুমি ঘুঘু দেখিয়াছ, সে চতুর বটে, কিন্তু ফাঁদ দেখ নাই আমি হলুম সেই ঘুঘু ধরিবার ফাঁদ! অর্থাৎ ঘুঘুর যম!

ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে।

গোবর হইতেই ঘুঁটের উৎপত্তি, একই জিনিস, কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া ঘুঁটে হইয়াছে। সেই ঘুঁটে যখন পোড়ে, তখন যদি তার বিপদ দেখিয়া গোবর হাসে, তখন বুঝিতে হইবে যে, নিজের বিপদেই সে দুঃখের বদলে হাসিতেছে। ইহা অপেক্ষা অস্বাভাবিক আর মূর্খের কাজ কি হইতে পারে! অনেক পরিবারে এই 'ঘুটে গোবর' এর ব্যাপার ঘটে। একই গোষ্ঠীভুক্ত একের বিপদে অন্যজন আনন্দভোগ করিতেছে। ইহা অজ্ঞানতার চরম বিকাশ।

চোরকে বলে চুরি করতে;
গেরস্তকে বলে সাবধান হতে।

অর্থাৎ—সমাজে এমন দু'একটি লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁরা একদিকে ভাঙতেও আছেন, আর এক দিকে গড়তেও আছেন। এই শ্রেণীর লোক সমাজের ক্ষতিকর। ইহারা একহাতে ঘরে অগ্নিসংযোগ করিয়া অপর হাতে জলের কলসী লইয়া সেই অগ্নি নিভাইতে প্রবৃত্ত হ'ন। এরূপ লোককে আমাদের উচিত, একহাতে তার নাক কর্ত্তন করিয়া আর একহাতে তার মুণ্ডিত মস্তকে ঘোল মর্দ্দন করিয়া দেওয়া; এবং তৎপরে তাহাকে সমাজ হইতে বিতাড়িত করা।

চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।

অধর্ম্ম পথের পথিক চোরের কাণে ধর্ম্মের কথা বিষবৎ লাগে। চোরকে জোর করিয়া নীতিশাস্ত্র শুনাইলে, হয় ত হার্টফেল হইয়া তাহার মৃত্যু ঘটিবে। ইংরাজীতে আছে—The devil would not listen to the scriptures

চেনা বামুনের পৈতার দরকার হয় না।

অর্থাৎ পরিচিত দ্রব্যের কোন পরিচয়—চিহ্ন আবশ্যক হয় না। যাহার বিষয় সকলেই জানে, সেবিষয়ের কোন বিজ্ঞাপন অনাবশ্যক। ইংরাজীতে এই শ্রেণীর প্রবাদে আছে:—Good wine needs no bush.

চোখের আড়্;
মনের বার্।

কেহ সুদীর্ঘ দিন যদি চোখের আড় থাকে, অর্থাৎ নিকটে না থাকিয়া দূরে থাকে, তাহা হইলে তার কথা বড় একটা আর মনে থাকে না, সে মন হইতে ও দূরে সরিয়া যায়। খুব আপনার জনও পর হইয়া যায়, যদি বহুদিন পর্য্যন্ত সে দূরে থাকে। আবার, পরও সদাসর্ব্বদা কাছে থাকিলে সে পরমাত্মীয় হইয়া পড়ে।

চোরের মন পুঁই-আদাড়ে।

চোর নির্জ্জন গোপন স্থান ভালবাসে, সুতরাং ঐরূপ স্থান সে খোঁজে। আলো যেমন সে চায় না, তেমনি প্রকাশ্য স্থানেরও সে বিরোধী। সে চায় —অন্ধকার এবং ঘুঁজি ঘাঁজি। আদাড়-পাঁদাড় স্থানে ঘাপ্‌টি মেরে থেকে সুযোগের অপেক্ষা করাই তার স্বভাব।

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

অর্থাৎ, উভয়েই সম ব্যবসায়ী; সুতরাং ভারি ভাব—যেন এ উহার মাস-তুতো ভাই। সহোদর ভাই নয়; কারণ সহোদর ভাই হইলে এ-যুগে প্রায়ই তাহাদের মধ্যে শত্রুতা দেখা দেয়। সেজন্য—মাসতুতো ভাই। চোরে চোরে যেমন মাসতুতো ভাই, তেমনি গাঁজাখোরে গাঁজাখোরে, মাতালে মাতালে, মূর্খে মূর্খে—মাসতুতো ভাই।

চালুনী বলে ছুঁচ্‌কে, তোর গায়ে কেন ছেঁদা ?

যার নিজ অঙ্গে সহস্র ছিদ্র, সে অপরের অঙ্গে একটি মাত্র ছিদ্র দেখিয়া তাহার ছিদ্রান্বেষণে উৎসুক। অত্যন্ত বেহায়াপনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ধরণের লোককে উপযুক্ত শিক্ষা না দিলে তাহাদের এই নির্লজ্জতা দূর হয় না। এর উৎকৃষ্ট ঔষধ, তার গায়ের সেই অসংখ্য ছিদ্রগুলিতে বাবলা কাঁটা ফুটাইয়া দেওয়া। যার নিজের গায়ের গন্ধে সমস্ত পাড়ার লোকে অতিষ্ঠ, তিনি অপরের যৎসামান্য গাত্রগন্ধে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকেন। পাড়ার লোকের উচিত, তাহার ঐরূপ নৃত্যপর অবস্থাতেই তাহাকে ধরিয়া পাগলাগারদে দিয়া আসা।

ছাগলকে দিয়ে যব মাড়ানো।

কোন বৃহৎ কাজ ক্ষুদ্রকে দিয়া সম্পন্ন হয় না। যব-মাড়ানো কাজ গরু কিংবা মহীষের দ্বারা হয়, তাহা ছাগলের দ্বারা সম্ভব হয় না। যাহার যা কাজ, তাহাকেই সাজে। নাপিতের দ্বারা অস্ত্রোপচার হয় না; অধার্ম্মিকের দ্বারা দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানের আশা করা বৃথা।

ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো।

উনানের ছাই বাহিরের ছাই গাদায় ফেলিবার জন্যই গৃহস্থঘরে ভাঙ্গা কুলার ব্যবহার। ভাঙ্গা কুলার এইরূপই দুর্ভাগ্য। কোন কোন লোকেরও এইরূপ দুর্ভাগ্য ঘটিয়া থাকে। সংসারে বা সমাজে কোন ভালকাজের জন্য তাহার ডাক আসে না; ডাক আসে কোন হীন এবং অপকৃষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য। এইরূপ ব্যক্তিরাই এই বাক্যটি দুঃখের সহিত বলিয়া থাকে।

ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ।

ছুঁচোর গাত্রগন্ধ অতি খারাপ। একটা বাঘকে যদি মারিতে পারা যায় এবং তাহাতে হাত যদি দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তাহা হইলেও সেকাজ গৌরবের। কিন্তু একটা ছুঁচা মারিয়া হাতে গন্ধ করার মধ্যে কোন গৌরব নাই। কোন নির্জ্জীবপ্রায় শক্তিহীনকে ধ্বংস করা পৌরুষের কাজ নয়।

ছেলের করলুম—জানলে না।
বুড়োর করলুম—মানলে না।

যখন ছোট ছেলে ছিল, তখন সেই ছেলের পিছনে একজন অনেক খাটিয়াছে, কিন্তু ছেলেটির তখন অজ্ঞানাবস্থা; সুতরাং তাহার পিছনে সেই লোকটি যাহা খাটিয়াছে তাহা সে জানিতে পারিল না, ফলে কোনরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশও কোনদিন করিল না। অপরদিকে, বৃদ্ধের পিছনেও সে অনেক খাটিয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধ তাহা স্বীকার করিল না। অতএব সেই লোকটির খুবই দুঃখ, ছেলে অজ্ঞানতার জন্য জানিতে পারিল না, বৃদ্ধ জানিতে পারিয়াও স্বীকার করিল না।

জন, জামাই, ভাগনা—
এ তিন নয় আপনা।

জন—অর্থাৎ পর, জামাতা এবং ভাগিনা, ইহাদের যতই সদ্ব্যবহারের দ্বারা জয় করা যাউক না কেন, ইহারা কখনই আপন হয় না। উপকারের প্রত্যুপকার করার বদলে, সুবিধা পাইলেই ইহারা অপকার করিবে। জন, জামাই এবং ভাগিনাদের ঠিক এইরূপ স্বভাব—কি না, তাহা ভুক্তভোগীরাই বলিতে পারিবেন।

'জানি না,' 'পারি না,' 'নেইকো ঘরে'—
এ তিন কথায় দেবতা হারে।

কোন কথা—বিশেষতঃ দারিদ্র্যমূলক কথা সম্বন্ধে—যদি বলা হয় যে, আমি জানি না, ঐরূপ শ্রেণীর কোন কার্য্য সম্বন্ধে যদি বলা হয়—'আমি পারি না,' এবং কোন দ্রব্য কেহ চাহিতে আসিলে যদি বলা হয় যে, আমার ঘরে উহা নাই, তাহা হইলে কোন হাঙ্গামায় পড়িতে হয় না। দেবতাকেও এই তিন প্রকার উত্তরে পরাভব মানিতে হয়। ভুক্তভোগী মাত্রেই ভাল জানেন যে—''আমি জানি,' 'আমি পারি' বা 'আমার ঘরে আছে'—এইরূপ বলায় কত-না দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে। তবুও স্বভাব-গুণে মিথ্যা করিয়া অনেকেই 'না' বলিতে না পারায় অনেক কিছুই তাহাদের ভুগিতে হয়।

জাতও গেল, পেটও ভরল না।

অন্নাভাবের জন্য অন্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিলাম; আশা—যে এইবার অন্নাভাব ঘুচিবে; কিন্তু ফলে এই হইল যে, অন্নাভাব যেমন ছিল তেমনই রহিল, মাঝে হইতে স্বধর্ম্মচ্যুত হইলাম। এইজন্যই আমাদের শাস্ত্রের উক্তি:—'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ'। এই প্রবাদটি নানা বিষয়েই প্রযুক্ত হইতে পারে।

জানে বেশী—বলে না।
বলে বেশী—জানে না।

সহজ বাক্য। যে অনেক জানে, অনেক বিষয়ে জ্ঞানী, সে লোক বাচাল হয় না; অন্তরের শিক্ষা এবং জ্ঞানের গভীরতার জন্য তাহার বাহিরের ভাব স্থির এবং গম্ভীর। কিন্তু যে কিছুই জানে না বা যৎসামান্য জানে, সেই বেশী বকে; ইংরাজীতে যেমন—Empty vessel sounds much.

জানু, ভানু, কৃশানু—
শীত জব্দ তিনে।

শীত কম বোধ হয়, যদি দুই হাঁটু উঁচু করিয়া গুটিসুটিভাবে বসা যায়, কিংবা ভানুর—অর্থাৎ রৌদ্রের উত্তাপে, কিংবা অগ্নিসেবা দ্বারা।

জীব দিয়েছেন যিনি,
আহার দেবেন তিনি।

ভগবানই জীবন দিয়া জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং জীবের আহার ও তাঁকে যোগাইতে হইবে এবং তাহাই তিনি যোগান। তাঁর উপর বিশ্বাস এবং নির্ভরতা থাকিলে, তাঁর ইচ্ছামত কাজ করিয়া গেলে, কাহারো অন্নাভাব ঘটিবার কথা নাই।
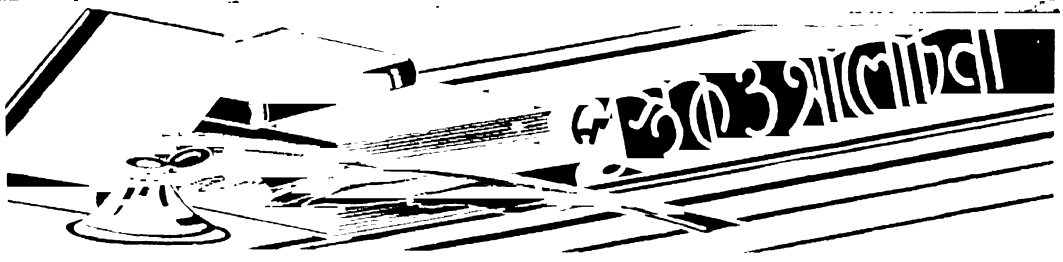
"প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য"*

শ্রীঅনিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বার-এ্যাট্-ল

বঙ্গবাণীর মন্দিরে কবিশেখর শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় দীর্ঘকাল ধরিয়া একনিষ্ঠ পূজারীর দর্ভাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার কৈশোরের রচনা "কুন্দ" ও "কিশলয়" সে-কালের সাহিত্যরথিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের কাব্যপ্রতিভার নিদর্শন দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

"তোমার কবিতা বাঙ্গলা দেশের মাটির মতই স্নিগ্ধ ও শ্যামল। বাঙ্গলা দেশের প্রতি গভীর ভালবাসায় তোমার মনটি কানায় কানায় ভরা, সেই ভালবাসার উচ্ছলিত ধারায় তোমার কাব্যকানন সরস হইয়া কোথাও বা মেদুর কোথাও বা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাঙলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।"

কবিগুরুর এবংবিধ মন্তব্যের পরে কিন্তু কিছু দিনের জন্য কালিদাসের কাব্যকাননে "স্নিগ্ধ-শ্যামলতা"র রূপান্তর ঘটিয়াছিল; তাহার মধ্যে রসপিপাসু বাঙ্গালী পাঠক "মেদুরতা" বা "প্রফুল্লতা"র সন্ধান পায় নাই। "সোম" "ইন্দ্র" "বরুণ" "হিমালয়" ইত্যাদি কবিতার বিষয়ের গুরুত্ব এবং ভাষার সংস্কৃতানুগতা সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুরধিগম্য হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি কালিদাসবাবুর সে যুগের রচনাকে কেহ কেহ "সেকেলে" ও "নীরস" বলিয়াছিল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত বেদ-পুরাণ-সাহিত্যের সমুদ্র মন্থন করিয়া কালিদাসবাবু বঙ্গভাষার যে সমৃদ্ধি সাধন করিলেন, সেজন্য তিনি শ্রদ্ধার যোগ্য। নিজস্ব প্রাণের কথারও একটা সীমা আছে। এই সীমায় পৌছিবার পরও যদি লিখিতে হয়—তবে হয় পরের অনুকরণ করিতে হয়, নয় ত নিজের কথাই পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। কালিদাস বাবু দুই-এর একটিও না করিয়া ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির নব নব interpretation দিয়া কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন। কাব্যক্ষেত্রে ইহা তাঁহার রূপান্তর সূচিত করিতেছে। তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জের স্মৃতি জাগাইয়া যে কবি বাঙ্গলার হৃদয় জয় করিয়াছিলেন, তাঁহার রচনা—"পর্ণপুট" "বল্লরী" "ব্রজবেণু" "ক্ষুদ-কুঁড়া" "লাজাঞ্জলি"। আর যিনি—ব্রতজ্ঞান, বৈশ্বানর, গঙ্গা, বেদ, অশ্বত্থ, আদিত্য ইত্যাদি কবিতা লিখিয়াছেন, তিনি যেন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তিনিই 'ঋতুমঙ্গল', 'হৈমন্তী', 'আহরণী' ও 'বৈকালী'র কবি। কালিদাসবাবুর সাহিত্য-সাধনার এই দুইটি দিকের কোনওটিই উপেক্ষণীয় নয়। তিনি একাধারে লোককান্ত কবি ও লোকশিক্ষক—বাঙ্গালী পাঠককে যুগপৎ রবীন্দ্রনাথের "শেষের কবিতা"র ভাষায় কবিসুলভ "ডাব-নারিকেলের রস" ও দার্শনিক-সুলভ "ঝুনা-নারিকেলের শাঁস" পরিবেশন করিয়াছেন। কাব্য রচয়িতা ও কাব্য-ব্যাখ্যাতার এই দ্বৈত-দাবীতেই বর্ত্তমান আলোচ্য গ্রন্থখানি লিখিবার জন্য তাঁহার পরম যোগ্যতা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য।

"প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য" গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ ১৪টি প্রবন্ধের সংকলন। যথা:—প্রথম খণ্ডে "বিদ্যাপতি", "কৃত্তিবাস" "বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন", "গোবিন্দদাস", "জ্ঞানদাস", "বৈষ্ণব কবিতার স্বরূপ", এবং দ্বিতীয় খণ্ডে, "বৈষ্ণব কবিতার ভূমিকা", "মঙ্গল-কাব্য", "চণ্ডীদাস

* কবিশেখর কালিদাস রায় প্রণীত "প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য"—রস-চক্র সাহিত্য-সংসদ হইতে প্রকাশিত। মূল্য চারি টাকা।

(১)", "গৌরপদাবলী", "মাথুর", "শ্রীচৈতন্য চরিত", "চণ্ডীদাস (২)", "বৈষ্ণবপদাবলীর ছন্দ"।

এই গ্রন্থকে ইতিহাস বলা চলে না। তারিখ ও ঘটনা পরম্পরার সূক্ষ্ম বিচার ইহাতে নাই। সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির ধারাবাহিক ক্রমনির্ণয়ের চেষ্টাও গ্রন্থকার করেন নাই—ভূমিকাতে সে-কথা তিনি পাঠককে জানাইয়াছেন। প্রত্যেকটি অধ্যায় স্বতন্ত্রভাবে খণ্ড খণ্ড প্রবন্ধ আকারে রচিত এবং স্বয়ং-পর্য্যাপ্ত। গ্রন্থকার সাহিত্য-স্রোতস্বিনীর সাবলীল গতিচ্ছন্দ ধরিয়া দিবার চেষ্টা করেন নাই—ইনি নিজের মনের-মতন মুক্তা আহরণ করিয়া একটি মনোহর মালা গাঁথিয়াছেন। ভূমিকাতেই তিনি বলিয়াছেন—যাহা যথার্থ সাহিত্য নয়, তাহার আলোচনার দায়িত্ব তাঁহার নাই। ঐতিহাসিকের আদর্শ—নিজেকে অন্তরালে রাখিয়া, বক্ষ্যমান বিষয়কে Objectively বা বস্তুগতভাবে বর্ণনা করা। আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকারের ব্যক্তিত্বের ছাপ পত্রে পত্রে সুপরিস্ফুট। ঐতিহাসিক বস্তু ও ঘটনার গণ্ডীদ্বারা পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু কালিদাসবাবুর কল্পনা ও মৌলিকত্বের গুণে যাহা রচিত হইয়াছে, তাহা ইতিহাস নয়, নব সাহিত্যসৃষ্টির গৌরবে পরিপূর্ণ। ইতিহাসকে যদি ঘটনা-পরম্পরার ফটোগ্রাফের সহিত তুলনা করা যায়, এই জাতীয় পুস্তককে হাতে-আঁকা ছবি বলা চলে—এখানে শিল্পীর তুলিকার স্পর্শে বস্তুর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইহাই কালিদাসবাবুর লেখার পরম বৈশিষ্ট্য।

গ্রন্থকারের সাহিত্য-সাধনার back ground বা পট ভূমিকাতে যে-দুইটি প্রভাব সঞ্চারিত হইয়াছে, বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহা সুস্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এখানে দেখিতে পাই—এক দিকে, দীর্ঘ সাধনার ফলে লেখকের মনের মাঝে কাব্য-রচনার যে studio গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারই প্রতিচ্ছবি; অপর দিকে, ব্যকরণ ছন্দ-অলংকার-শাস্ত্রপুষ্ট সাহিত্যের উপাধ্যায়সুলভ মনোবৃত্তি। যেন তর্জ্জনী সঙ্কেতে গ্রন্থকার অবোধ এবং অনবহিত পাঠককে বুঝাইতেছেন কাব্য-বিশ্লেষণ কাহাকে বলে, কোন্ কবির রচনাতে কোন অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, রসের দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনা কোথায়, রহস্যের গভীরতা কত, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই দুইটি বিভিন্ন এবং বিশিষ্ট প্রভাবের সংমিশ্রণে রচিত "প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য" গ্রন্থখানিকে রস বিশ্লেষণ ও মুদ্রিত অধ্যাপনা বলা যাইতে পারে। এ কথা জোর করিয়া বলা যায় যে, কালিদাসবাবু 'নিকষে কমল' যাচাই করিতে বসেন নাই। তিনি ফুলবাগানের মালাকর—জহুরীর মতন আপেক্ষিক দর করিতে আসেন নাই, সৌরভ, বর্ণচ্ছটা ও মধু—এই তিনের পক্ষ হইতে কাব্য-কাননের বিভিন্ন কুসুমের সমুচিত উৎকর্ষ বিচার করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছেন। মাত্র দুই খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থে তাঁহার বলা শেষ হয় নাই। মালাকর তাঁহার পুষ্পচয়নের অবশিষ্ট অংশ তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিবেন—ভূমিকাতে এইরূপ প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। পাঠক-সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে গ্রন্থকারকে নিবেদন জানাইতেছি, "শুভস্য শীঘ্রং"।*

প্রাচীন সাহিত্যের রস ও রীতি-বিচারে কালিদাসবাবু কোনও কোনও স্থলে স্বীয় বক্তব্য কবিতার আকারে প্রকাশ করিয়া "সব্যসাচিতা"র পরিচয় দিয়াছেন। গদ্যে লিখিলেও কবিতার ভাষাতেই কবিতার রস বিচার করিবার কথা। কালিদাসবাবু সেই কবিতার ভাষাকেই ছন্দোরূপ দান করিয়াছেন। কবিতার আকৃতি হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা রস-বিচার ছাড়া আর কিছুই নয়। কিঞ্চিৎ নমুনা উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"কৃত্তিবাসের রামায়ণ" বাঙ্গালী জাতির জীবন গঠনে কি সহায়তা করিয়াছে, তাহা কবিতায় বলিয়া নিবন্ধের উপসংহার করি।

বাংলার বাল্মীকি-কবি দেবীর আদেশ লভি শুভক্ষণে কবে নাহি জানি
সীতার নয়ন-জলে বসিয়া অশোকতলে লিখেছিলে রামায়ণখানি।
তালপত্রে সেই লেখা সে ত অশ্রুজল-রেখা, অনল অক্ষরে আজ জ্বলে,
বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তার তাপে সুধা ক্ষরে, পাষাণ-হৃদয়ও তায় গলে!
জানকীর আঁখি নীর গৃহে গৃহে গৃহিণীর ক্ষণে ক্ষণে তিতায় বসন,
তাঁদের পায়ের কাছে নতশিরে আজ্ঞা যাচে শত শত দেবর লক্ষ্মণ।
কাঙালের তুচ্ছ পুঁজি তাই নিয়ে যোঝাযুঝি ভায়ে ভায়ে, তা'ও তুচ্ছ নয়,
হে কবি, তোমার গান গলায় তাদের প্রাণ, আঁখিজল দ্বন্দ্ব করে জয়।
শাশুড়ী তোমার গানে বধূরেও বক্ষে টানে ভুলে যায় অবলা-পীড়ন,
স্মরিয়া সীতার কথা ভুলে যায় সব ব্যথা গৃহে গৃহে অভাগিনীগণ।
কি মহিমা রচনার উদয়ন-কথা আর কহে না ক' গ্রামবৃদ্ধদল,
তাহাদের চারিপাশে যুবা শিশু কেন আসে? তব বাণী তাদের সম্বল।
পশারী পশারা শিরে থমকি দাঁড়ায় ফিরে শুনে যদি রামায়ণপাঠ,
গুহকের ভাগ্য স্মরে দুই চোখে ধারা ঝরে ভুলে যায় বেচা-কেনা-হাট।

---

* তৃতীয় খণ্ডের প্রবন্ধগুলি বঙ্গশ্রীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। বঃ সঃ।

বঞ্চক 'মুরারি শীল' ছাড়ে না সে একতিল মেকি দিতে তারও হাত কাঁপে,
পাপ করি দিন কাটে সাঁঝে রামায়ণ পাঠে রাতে শুয়ে মরে অনুতাপে।
শিখাইলে কি যে সত্য গ্রামে গ্রামে 'ভাঁড়ুদত্ত, মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে ভুলে যায়,
কৃপণ তোমার পানে ভিক্ষুকে ডাকিয়া আনে যক্ষদেরও হৃদয় গলায়।
দিনে হাটে হট্টগোল কাড়াকাড়ি ডামাডোল সন্ধ্যায় সকলি চুপচাপ।
লঙ্কাকাণ্ড শেষ করি উত্তরা-কাণ্ডটি পড়ি দোকানী দোকানে দেয় ঝাঁপ।
বৈকালে বটের ছায় সুর করি নিতি গায় দা-ঠাকুর কাহিনী সীতার,
কৃষকেরা দলে দলে ভাসিয়া নয়ন জলে একই কথা শুনে বারবার।
তব বাণী মধুছন্দা নন্দিত করেছে সন্ধ্যা স্নিগ্ধশান্ত—গ্রীষ্মের দিবস,
জরাজীর্ণ গ্রন্থখানি কি সুধা তাতে না জানি শুষ্ক দৈন্যে করেছে সরস।
মোদকের খইচুড় তব গীতি সুমধুর আরো যেন মিঠা ক'রে তুলে।
তব গ্রন্থখানি ছাড়ি উঠে যায় বার বারই দাম নিতে মুদী যায় ভুলে।
জমিদার ঘরে ঘরে প্রজা নির্য্যাতন করে তব পুঁথি পড়ে মাতা তার,
প্রজা-রঞ্জনের সুর লাগে তার সুমধুর গ'লে যায় তায় করভার।
অসংযত রসনায় যে ভ্রম করিল হায় অযোধ্যার নির্ব্বোধ প্রজারা,
আজি বঙ্গ ঘরে ঘরে তারি প্রায়শ্চিত্ত করে চক্ষে ঝরে সরযূর ধারা।
আর কারে নাহি মানি মানি শুধু তব বাণী, শুনিয়াছি বাল্মীকির নাম,
তব চিত্তভূমে কবি নূতন জনম লভি অবতীর্ণ বঙ্গে পুন রাম।
এ রাম মোদেরই মত যুঝেছে, কেঁদেছে কত অদৃষ্টেরে দিয়াছে ধিক্‌কার,
এ রাম মোদেরই মত করিয়াছে ভক্তিনত নীলপদ্মে পূজা অম্বিকার।
এ রামে আপন জানি বক্ষে লইয়াছি টানি, দুঃখে তাঁর হয়েছি অধীর,
লক্ষ্মণের সাথে সাথে অবিরল অশ্রুপাতে পম্পাহ্রদে বাড়ায়েছি নীর।
তুমি রস-গঙ্গা হতে আনিলে নূতন স্রোতে আগে আগে দেখাইয়া পথ,
নব রস-ভাগীরথী উদ্বেল তাহার গতি তুমি তার নব ভগীরথ।
সে প্রবাহ অনাবিল ভাসাইল খাল বিল, একাকার গোষ্পদ পল্বল,
সে ধারার দুই কূলে লতা তৃণ শস্য ফুলে ফলিতেছে সোনার ফসল।
বধূরা গাগরি ভরে নিয়ে যায় ঘরে ঘরে তৃষা তৃপ্ত করে সেই বারি,
করি তায় নিত্য স্নান জুড়ায় তাপিত প্রাণ 'জয় রাম' গায় নরনারী।
সেই রস-ধারা বাহি 'জয় সীতারাম গাহি' ভেসে যায় কত মধুকর,
লঙ্কায় বাণিজ্য তরে যুগে যুগে যাত্রা করে ধনপতি চাঁদ-সদাগর।
শত শাখা-প্রশাখায় সে ধারা বহিয়া যায় বিপ্লাবিত অশ্রুর তুফানে,
'এ হো বাহ্য' নহে শেষ, চলে যায় নিরুদ্দেশ শেষ ধারা অনন্তের পানে।

বৈষ্ণবকবিগণ শ্রীমতীর বিরহ বেদনার করুণ রস সাহিত্যে অমর করিয়া গিয়াছেন। কালিদাসবাবু তাঁহাদের রচনার একটি সংক্ষিপ্তসার রচনা করিয়াছেন, সখীদের জবানীতে—তাহা পরম উপভোগ্য। এইভাবে শ্রীচৈতন্য দেবের রূপ, গুণ, ভাবাবেশ ও ভাগবত মহিমা সম্বন্ধে বৈষ্ণবকবিগণ যাহা কিছু লিখিয়াছেন—পুনরাবৃত্তি বর্জ্জন করিয়া—তাঁহাদের সে সমস্ত বক্তব্যকে একসূত্রে গুম্ফিত করিয়া লেখক একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করিয়াছেন; স্থানাভাবের জন্য উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ সম্বন্ধে কবিতাটি। ইহাতে কবিরাজ গোস্বামীর সাধকজীবনের পরিচয়ের সঙ্গে যথাসম্ভব তাঁহারই ভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সারমর্ম্ম-টুকু বিবৃত হইয়াছে। ইহাকে রস বিচারের অভিনব পদ্ধতি বলা যাইতে পারে

ঐতিহাসিক পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে চণ্ডীদাসের ইতিবৃত্ত লইয়া বাদানুবাদের অন্ত নাই। কালিদাসবাবু কবির দৃষ্টিতে তাহার উত্তর দিয়াছেন :

কোথা কবে জন্ম নিলে পণ্ডিতেরা করিছে বিবাদ
তাই নিয়ে। তব রস-কমলের মাধুরী আস্বাদ
দ্বন্দ্ব-কোলাহলে আজ দাদুরীর কলরবে হায়
কমল-মাধুরী সম সরোবরে কোথায় হারায়।
এ পৃথ্বী বিপুলা বটে, তাই বলি অন্নজল দিয়া
রক্তমাংসময় তব একখানি শরীর গড়িয়া
তোমাকে করিবে বন্দী হেন শক্তি আছে কি তাহার?
কাল নিরবধি বটে, তাই বলি জীবন তোমার
পরিচ্ছন্ন পরিমিত করিবে সে বর্ষের গণ্ডীতে,
হেন স্পর্দ্ধা নাহি তার। যত দ্বন্দ্ব করুক পণ্ডিতে।
সর্ব্ব দেশময় তুমি হে বিরাট সর্ব্বযুগময়
জুড়িয়া রয়েছ তুমি চিরদিন সকল হৃদয়।

তবু তুমি জন্ম নিলে বাঙ্গালীর মনোবৃন্দাবনে।
বিরহিণী শ্রীমতীর গূঢ় মর্ম্ম-কুটীর অঙ্গনে
স্বপ্নময় বেদনায়। স্থূলদেহ করি নি ধারণ।
গীতিময় দেহ ধরি বিশ্বময় আত্মাবিষ্করণ
করেছিলে একদিন। রসজ্ঞের স্বপ্নে তুমি আজো
যেমন সেদিন ছিলে গীতিদেহে তেমনি বিরাজো।
কোথায় পরম সত্য সন্ধানিব রূপে কিংবা ভাবে?
নিজেই অসত্য হয়ে দেশকাল কি সত্য জানাবে?
ভাবে আছ, রসে আছ। মধুগন্ধে তৃপ্ত যেই জন,
পদ্মের মৃণাল কোথা কভু কি সে করে অন্বেষণ?

কালিদাসবাবুর রচনার আরও কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতে বাসনা ছিল। স্থানাভাবে সম্ভব হইল না। "প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য" পুস্তকখানির নামকরণ সম্বন্ধে একটু বক্তব্য আছে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গ-সাহিত্যের পাঁচটি যুগ-বিভাগ করিয়াছেন, তাহা এই :

১। প্রাচীন বা মুসলমান-পূর্ব্ব যুগ	১২০০ খৃঃ পর্য্যন্ত
২। তুর্কী-বিজয়ের যুগ	১২০০—১৩০০
৩। আদি-মধ্য যুগ বা প্রাক্-চৈতন্য যুগ	১৩০০—১৫০০
৪। অন্ত্য-মধ্য যুগ	১৫০০—১৮০০
(ক) চৈতন্য যুগ বা বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্রধান যুগ	১৫০০—১৭০০
(খ) অষ্টাদশ শতক (নবাবী আমল)	১৭০০—১৮০০
৫। নবীন বা আধুনিক ইংরেজী যুগ	১৮০০—হইতে

উপরিউক্ত মতানুসারে কালিদাস বাবুর "প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে"র আলোচ্য বিষয়গুলি বাস্তবিকপক্ষে বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসের আদি-মধ্য যুগ ও অন্ত-মধ্য যুগের অন্তর্গত—প্রাচীন যুগের নয়। সম্ভবতঃ এ ক্ষেত্রে "আধুনিক বা অর্ব্বাচীন নয়", এই অর্থেই "প্রাচীন" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। তা'ছাড়া সৎ-সাহিত্যের বয়স লইয়া সাহিত্য-রসিকের মাথা ঘামাইবার কোনও প্রয়োজন নাই —সৎ-সাহিত্যের মূল্য শাশ্বত। ভাষাতত্ত্ববিদের নির্দ্দিষ্ট বিভাগ সাহিত্য রসিকরা অনুসরণ না করিতেও পারেন। আলোচ্য গ্রন্থে যে কয়টি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার আদর চিরন্তন। প্রত্যেকটি বিষয়কে, পর্দ্দা খুলিয়া খুলিয়া, কালিদাসবাবু তাহার ভিতরের রস ও রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। সৌন্দর্য্যবোধের চাবির সন্ধান তিনি পাঠককে জানাইয়া দিয়াছেন। ভাষা ও ছন্দের কৌটার মধ্যে যে রত্ন আছে তাহা আবিষ্কার করিয়া তাহার 'জৌলুষ' বুঝাইয়া দিবার মত দরদী জহুরী তাঁহাকে বলা যায়। রস-বিচার সম্বন্ধে কালিদাসবাবু অনেক ক্ষেত্রে নিজের রসাদর্শের উপরই নির্ভর করেন নাই—নিজের অভিমতের সমর্থনকল্পে মুহুর্মুহুঃ রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। মূল গ্রন্থগুলির সহিত যে-পাঠকের পরিচয় আছে, তাঁহার কাছে বর্ত্তমান গ্রন্থকার রসাস্বাদনের নূতন পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন; যাঁহার পরিচয় নাই, তাঁহার জিজ্ঞাসা প্রবুদ্ধ করিয়াছেন। আলোচনা ও সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে কবিশেখর মূল হইতে যে দীর্ঘ অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পুস্তকখানি সংকলন হিসাবেও সার্থক হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের ভূয়োদর্শন এবং "প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে"র বহুল প্রচার

ঢেউগুলি শুধু গণি

শ্রীনিশীথচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আজও বসে' সেই ধানের শিষের ঢেউগুলি শুধু গণি,
শালিক পাখীর ভাঙ্গা সুরমাঝে শুনি তারি কল-ধ্বনি।
সন্ধ্যা উষায় সাতটী বরষ ঘুরে ফিরে এসে গেল,
দীগন্ত-জোড়া দীপ্ত উছাস—মন তায় নাহি পেল।
কোমল-সোহাগ-পাপড়ি-আঙুলে, ধানশিষে দিতে ঢেউ,
শত মানিকের সে যে ছিল সেরা খোঁজ কি রাখিত কেউ?
পাখীরা জমাত গানের আসর তারই সুর কেড়ে নিয়ে
মলয় আসিত নব হিল্লোলে সোনা-মাঠ পাড়ি দিয়ে,
কাজ অবসানে ক্লান্ত-শরীরে ফিরিতাম যবে ঘরে,
সোনার দুলাল দিত ভালবাসা মিলাইয়া দুই করে;
ভোমরার মত চুমিয়া জানাত ছোট্ট হিয়ার দান—
কে জানিত হায় এতটুকু মাঝে অতবড় ছিল প্রাণ!
লতার বাঁধনে জড়াইত মোরে—বেহুস্ ঘুমের ঘোরে
পাছে চলে যাই একেলা ফেলিয়া দেখা নাহি হয় ভোরে।
স্বপনে কাঁদিত, বলিত বুঝি সে "দিওনা গো মোরে ফাঁকি,
তোমারই বুকের সান্ত্বনা নিয়ে আমি যে ঘুমিয়ে থাকি।"
মা'র তস্বীর নয়নে হেরিয়া ভাসাইত কেঁদে বুক—
স্নেহ মোর পেয়ে তবুও ভোলেনি মাতৃহারার দুখ!
বিদায় বেলায় কেমনে মুদিল মায়ের করুণ আঁখি,
মিনতি করিয়া শুধাইত হায় মোর বুকে মাথা রাখি!
কণ্ঠ হারানু আধ-বলা-পথে অতল চোখের জলে,
সব ভুলে গেনু, বাছারে ঘিরিয়া ভগ্ন বুকের তলে।
আজ সেও নাই, কোথা উড়ে গেল, পাখা তার বাঁধি গায়,
আকাশে বাতাসে পাখীর সুরেতে তারই ভাষা শোনা যায়।
হয়তো আসিবে সেই আশা-পথে নূতন স্বপন বুনি।
আজও বসে' সেই ধানের শিষের ঢেউগুলি শুধু গণি।

আমাদের কথা ঃ—বর্ত্তমান জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার সঙ্গে বঙ্গশ্রীর একাদশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইল। আগামী আষাঢ় সংখ্যা হইতে বঙ্গশ্রী দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করিবে।

এই সুদীর্ঘ একাদশ বৎসর কাল আমাদিগকে বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে। কোনো ক্ষেত্রেই আমরা আত্মস্বকীয়তাকে বিসর্জ্জন দিয়া দেশ, কাল বা বৃহত্তর সমাজের ঘূর্ণাবর্ত্তে বঙ্গশ্রীর বৈশিষ্ট্য হারাইতে দেই নাই। নিরপেক্ষ চিত্তে দেশ ও জাতির সেবায় আত্মাকে নিয়োজিত করিবার যে মহান শক্তির উৎস ভগবান আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহার কতটুকু মর্য্যাদা আমরা রক্ষা করিতে পারিয়াছি, দেশের ভবিষ্যৎই একদিন সে বিচার করিবেন।

বর্ত্তমান বিশ্বযুদ্ধের সময় কাগজ বণ্টনের দিনেও আমরা যথাসাধ্য যুদ্ধপূর্ব্ব কালের মতই বঙ্গশ্রীকে বৃহদাকারে প্রকাশ করিয়া পাঠক জনসাধারণকে বৃহত্তর আনন্দ পরিবেশন করিতে চেষ্টার ত্রুটী করিতেছি না। ভগবানের অসীম করুণা ভিন্ন ইহা আদৌ সম্ভব হইত না।

আশা করি, আগামী নতুন বৎসরেও বঙ্গশ্রী তাহার লেখক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও সর্ব্ব-জন সাধারণের নিকট হইতে সমান প্রীতি ও সহানুভূতিই লাভ করিবে।

নূতন ভাইস্ চ্যান্সেলার

খ্যাতনামা আইনজীবী ও কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ পাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস্ চ্যান্সেলার হইয়াছেন। আমরা তাঁহার সুষ্ঠু কর্ম্মকুশলতা কামনা করিয়া তাঁহাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতার নূতন মেয়র

আগামী বৎসরের জন্য শ্রীযুক্ত আনন্দীলাল পোদ্দার ও মিঃ রফিক্ যথাক্রমে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমরা আশা করি, কর্পোরেশনের যে-সকল ভুলত্রুটী ও কলিকাতার নাগরিক-বৃন্দের যে-সমস্ত অসুবিধা, তাহার যথাসম্ভব সংশোধন ও সমাধান করিয়া মেয়র ও ডেপুটী মেয়র মহোদয় জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইবেন। আমরা তাঁহাদের এই নব নির্ব্বাচনে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে ডাঃ বিজয় রাঘবাচারিয়ার

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ডাঃ সি, বিজয় রাঘবাচারিয়ার গত ১৯শে এপ্রিল তাঁহার সালেম বাসভবনে পারলোকগমন করেন।

১৮৫২ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি কালিকটে প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং ১৯১৮ সালে মাদ্রাজে বিশেষ প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯২০ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। এতদ্ব্যতীত লেজিসলেটিভ কাউন্সিল হইতে আরম্ভ করিয়া বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সারা জীবন যুক্ত ছিলেন। ভারতের যে সকল সুসন্তান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও গঠনের জন্য নিঃস্বার্থে আত্মবিসর্জন দিয়াছেন, ডাঃ রাঘবাচারিয়ার তাঁহাদের অন্যতম। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯২ বৎসর হইয়াছিল।

পরলোকে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের সত্বাধিকারী ও মাসিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

২৬শে এপ্রিল প্রাতঃকালে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। ইহার অল্প দিন পূর্ব্বে তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মারা যায়। গত কিছুকাল যাবৎ সতীশ বাবু ক্রমাগত অসুখে ভুগিতেছিলেন; পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুজনিত শোকে সেই রোগ আরও বৃদ্ধি পায়।

মাত্র ১২ বৎসর বয়সেই সতীশ বাবু তাঁহার পিতা ৺উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন এবং তীক্ষ্ণ ব্যবসায়বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের বলে তাহাকে গৌরবের উচ্চ শিখরে উন্নীত করেন। বাংলা সংবাদ-পত্র ও বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রসারকল্পে তাঁহার দান বাঙ্গালীর দীর্ঘকাল স্মরণে থাকিবে। বাংলা দৈনিক সংবাদ-পত্র মুদ্রন কার্য্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম রোটারী যন্ত্র ব্যবহার করেন। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বাংলার বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিকের গ্রন্থাবলীর সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করিয়া তিনি যে মহত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার কাছে বাঙ্গালী মাত্রেই ঋণী। মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যু শুধু তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারেরই ক্ষতি করিয়া গেল না, বাংলা দেশেরও এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করিল।

পরলোকে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার

আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার গত ৩১শে চৈত্র পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৬১ বৎসর বয়স হইয়াছিল। কিছুকাল হইতে তিনি যকৃতের পীড়ায় ভুগিতেছিলেন।

তাঁহার এই আকস্মিক পরলোক গমনে বাংলা সংবাদপত্র জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি হইল। বিশ বৎসরের অধিককাল তিনি অনন্য চিত্তে সাংবাদিকের গুরু দায়িত্ব পালন করেন। এতদ্ব্যতীত বঙ্গভাষার উন্নতির জন্য তাঁহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা বহু নিষ্ঠাশীল সাহিত্যিককেই ছাড়াইয়া গিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষায় রূপায়িত করিবার প্রচেষ্টা তাঁহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লেখক হিসাবেও বাংলা সাহিত্যে প্রফুল্লকুমারের দান কম নয়। তাঁহার উপন্যাস 'অনাগত',

প্রফুল্লকুমার সরকার

'লোকায়ণা', 'বালির বাঁধ', 'ভ্রষ্ট লগ্ন', 'বিদ্যুৎলেখা', এবং জীবনী 'শ্রীগৌরাঙ্গ' এবং সামাজিক সমস্যামূলক গ্রন্থ 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু' তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল

গত সংখ্যায় আমরা মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। বাংলার নতুন গভর্ণমেণ্ট বা লীগ-মন্ত্রিমণ্ডলী বাংলার শিক্ষাব্যবস্থাকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার আগ্রহে সম্প্রতি বিলটি লইয়া উঠিয়া

পরিয়া লাগিয়াছেন। দেশের চাতুষ্পার্শ্বিক দুর্যোগের দিনে যখন একমাত্র জীবনধারণ করাই দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন এই বিলের প্রয়োজন যে কী বিষময়, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইতিমধ্যে ইহার প্রতিবাদ করিয়া আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীগণ প্রকাশ্য জনসভায় ও সংবাদ-পত্রাদিতে বিবৃতি দিয়াছেন এবং প্রতিদিনই ইহার বিষময়তার বিরুদ্ধে ক্রমাগত জনমত প্রচারিত হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী এখনো তাঁহাদের নীতিতে থারা ঢেকীর মতো অবিচলিত রহিয়াছেন।

বাংলার রাষ্ট্রক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের ন্যায় শিক্ষাক্ষেত্রেও আজ দ্বৈতশাসন চলিয়াছে। এই বিলে শিক্ষার সংস্কার না হইয়া শিক্ষার সংহারই হইবে বলা চলে। ইহার উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে মুসলীম লীগের স্বার্থ রক্ষায় মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ। সম্প্রতি স্যার নাজিমুদ্দিনের গয়ায় বক্তৃতা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে যে, পাকিস্থান ভিন্ন তাঁহার আর দ্বিতীয় লক্ষ্য নাই। শিক্ষা-ক্ষেত্রেও সেই একই নাটকের অভিনয়। অথচ এই সহজ কথাটা সম্ভবতঃ তিনি তলাইয়া দেখেন নাই যে, বাংলায় বিদ্যালয়ের শতকরা ৮০টি ছাত্র হিন্দু এবং রাজস্বের ৭০।৭৫ ভাগ জোগায় হিন্দুরা। এক্ষেত্রে পাকিস্থানী ধর্ম্মরক্ষার্থে স্যার নাজিমুদ্দিনের উষ্মা প্রকাশের গভীর কারণ রহিয়াছে বটে। পাকিস্থানী নীতি সম্পর্কে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ যথার্থই বলিয়াছেন যে, মুসলীম লীগ পূর্ব্ব ফ্রন্টে যদি পাকিস্থান বজায় রাখিতে চান, তবে আসামে গিয়া লড়াই করুন না কেন! ভোটের জোরে বিল পাশ করা যায়, কিন্তু শিক্ষা দেওয়া যায় না। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বলিয়াছেন যে, এমন একটি প্রতিষ্ঠান থাকার দরকার, যাহার হাতে বিদ্যালয় অনুমোদন, পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারণ, অর্থসাহায্য, বৃত্তি ও পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। ছাত্রদের মধ্যে বেকার সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, সুতরাং ছাত্রদিগকে কার্য্যকরী শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। অথচ এই বিলে তেমন কোনো ব্যবস্থা নাই। সাম্প্রদায়িক নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখাই ইহার গোড়া হইতে শেষ লক্ষ্য। এতদ্‌সম্পর্কে দৈনিক নবযুগ পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য নবযুগের মতে—"হিন্দুদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি জন-কল্যাণকর বিষয়ে তাঁহারা যে অপূর্ব্ব বিদ্যোৎসাহিতপূর্ণ কর্ম্ম শক্তি ও ত্যাগের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাকে অস্বীকার করিলে কেবল যে বাতুলতার পরিচয় দেওয়া হয়, তাহা নহে, ইহা দ্বারা চরম কৃতঘ্নতারও পরিচয় দেওয়া হয়।" সম্ভবতঃ স্যার নাজিমুদ্দিন এখনো এই সহজ বাংলাটা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

আশা করি, বাংলার নতুন গভর্ণর মিঃ ক্যাসি আর যাহাই করুন, অন্ততঃ চেলা চামুণ্ডার তালে নাচিয়া অবিবেচকের পরিচয় দিবেন না। সমগ্র বাংলার দাবীতে যথাশীঘ্র তিনি বিলটি প্রত্যাহার করিয়া লউন।

মহাত্মা গান্ধীকে বিনাসর্ত্তে মুক্তি দান

জন্ম—২রা অক্টোবর, ১৮৬৯

—কারাবাস—

আফ্রিকায়—১৯০৮; ভারতে—১৯২১, ১৯৩০, ১৯৩১, ১৯৪২ [গ্রেপ্তার—৯ই আগষ্ট; মুক্তি—৬ই মে, ১৯৪৪]

শেষোক্তবার বোম্বাইতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে মাহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের পূর্ণ নেতৃত্বভার গ্রহণ করায় বিগত ১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট তিনি তাঁহার সদস্যবৃন্দসহ গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের পর তাঁহাকে পুণায় আগা খাঁ প্রাসাদে আটক রাখা হয়। ১৫ই আগষ্ট তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই সেই প্রাসাদেই পরলোক গমন করেন। ইহার পর ১৯৪৩ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী মহাত্মাজী তিন সপ্তাহব্যাপী অনশন আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে ভারত সরকার মহাত্মাজীকে সর্ত্তাধীনে মুক্তি দিতে চান, কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাহার করেন। ইহার পর গত ২২শে ফেব্রুয়ারী আগা খাঁ প্রাসাদ-কারায় মহাত্মার সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা কস্তুরবা পরলোক গমন করায় তিনি যে দুঃসহ শোক পাইয়াছেন, তাহা অভিব্যক্তির বাহিরে।

মহাত্মা গান্ধী

সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধীর স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ায় চিকিৎসক-

দের রিপোর্ট অনুযায়ী বিগত ৬ই মে সকাল ৮ ঘটিকায় ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিনাসর্ত্তে মুক্তি দান করিয়াছেন।
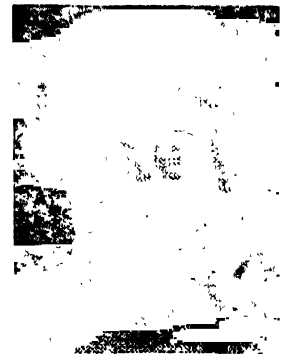
বর্ত্তমানে মহাত্মার স্বাস্থ্য অনেকটা উন্নত দেখা যাইতেছে।

বোম্বাই ডকে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড

বিগত ১৪ই এপ্রিল অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বোম্বাই ডকে অবস্থিত একটি জাহাজে দৈবক্রমে আগুন ধরে। কিছু গোলাবারুদে আগুন লাগে এবং দুইবার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। ফলে চতুষ্পার্শ্বস্থ গুদামগুলিতেও আগুন ছড়াইয়া পড়ে। কেবলমাত্র ডকস্থিত জাহাজগুলিই নয়, স্থানীয় 'টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া' অফিস, অসংখ্য বিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডে বিনষ্ট ও ভস্মীভূত হইয়াছে। আগুন ক্রমে সহরের একটি জনবহুল অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ায় কয়েক সহস্র লোক নিরাশ্রয় ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই বিরাট অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধানের জন্য বড়লাট বাহাদুর একটা কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। আমরা কমিশনের রিপোর্টের জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

আসন্ন মার্কিণ নির্ব্বাচন

সম্প্রতি আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন লইয়া তোড় জোড় চলিয়াছে। রিপাব্লিকানদলের পক্ষ হইতে নিউইয়র্কের গভর্ণর টমাস ডিউই এবং ডেমক্রেটিক দল হইতে বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুজভেল্ট নতুন নির্ব্বাচনে পদপ্রার্থীরূপে মনোনীত হইবেন বলিয়া জানা যাইতেছে। মিঃ রুজভেল্ট ক্রমাগত প্রেসিডেণ্ট পদ বহাল রাখায় সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। রিপাব্লিকানদল এবং আমেরিকার জনসাধারণের একটা বিশিষ্ট অংশ এইরূপ মতই পোষণ করিতেছেন যে, বারংবার একই ব্যক্তিকে জাতির প্রধান নেতৃত্বপদে বরণ করার অর্থ জাতীয় জীবনের নব নব বিকাশের ধারাকেই প্রতিহত করা। এই প্রসঙ্গে জানা প্রয়োজন যে, চতুর্থবারের জন্য যদি এবারে মিঃ রুজভেল্ট প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন, তাহা হইলে ১৬ বৎসর কাল একই ব্যক্তি আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট থাকিবেন।

সম্প্রতি রুজভেল্টের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাবের মূলে তাঁহার বিরোধীদলের মতে দেখা যায়: এক যুদ্ধকালের মধ্যেই গত এক বৎসরে আমেরিকায় ছোট বড় ৩১৭৫০টি শ্রমিক ধর্ম্মঘট হইয়াছে। প্রেসিডেণ্টের সমর্থকগণ যদিও প্রচার করিয়া থাকেন যে, ধর্ম্মঘটের ফলে বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় নাই, উৎপাদন বৃদ্ধিই পাইয়াছে, কিন্তু যথাযথভাবে শ্রমিক-প্রশ্ন সুবিবেচিত না হওয়ায় যুদ্ধ পরিচালনায় যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বক্তব্যের বাহিরে।

অবশ্য সুদূর আমেরিকার প্রেসিডেণ্টপন্থী অথবা প্রেসিডেণ্ট পরিপন্থির ঘরোয়া সংঘর্ষ সম্পর্কে আমাদের বিক্ষুব্ধ হইবার বিশেষ কোনো কারণ নাই, কিন্তু পৃথিবীর রাষ্ট্রতন্ত্র এমন ভাবেই গ্রথিত যে, একটি খণ্ড অংশের আলোড়নে সমস্ত পৃথিবীকে আলোড়িত হইতে হয়। যদিও টমাস ডিউইর কর্ম্মদক্ষতা সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল নহি, তথাপি ইতিমধ্যেই তাঁহার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি হইতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও কর্ম্মলিপ্সু মনের যথেষ্ট পরিচয়ই আমরা পাই! আসন্ন নির্ব্বাচনে মিঃ রুজভেল্ট পুনরায় প্রেসিডেণ্ট পদ অধিকার করিলে আমরা ক্ষুব্ধ হইব না, যদি দেখি—রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও যুদ্ধ কার্য্যে অন্ততঃ তাঁহার বিরুদ্ধদলবর্ণিত গলদগুলি ঢাকা পড়িয়াছে

লণ্ডনে সাম্রাজ্য সম্মেলন

লণ্ডনে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ডোমিনিয়ানসমূহের প্রধান মন্ত্রীদের একটা সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে ভারতের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না, তবে কাশ্মীরের মহারাজা এবং ফিরোজ খাঁ নুন নাকি একদিন সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। দর্শক হিসাবেই তাঁহারা উপস্থিত ছিলেন মাত্র। এই সম্মেলনে যুদ্ধোত্তর কালে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা কিরূপ হইবে এবং জার্ম্মানীকে কি ভাবে জব্দ করিতে হইবে প্রভৃতি অনেক কিছুই ঠিক করা হইয়াছে। ভারতের সমস্যা সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তের বিষয় আমরা অবগত নহি। ইহা ভারতের দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কি হইতে পারে!

গোধূলি স্বপন

ওরা বসেছিল এসে লেকের একটা কোণ ঘেঁষে। তখন ঐ দূরের সুপুরী গাছটার মাথা বেয়ে সূর্য্য ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে। ফুরিয়ে যাবার পূর্ব্বে তার লাল আভা এসে পড়েছে এদের মুখে।

'এই যে' শব্দে ওরা চমকে পেছনে তাকিয়ে দেখে সুবোধ। ওরা দু'জনেই হৈ হৈ ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুবোধ বল্লে—'উঠে পড়লি কেন, এলুম বসতে আর তোরা'—ব'লে তারা তিনটীতেই ব'সে পড়লো আবার।

দীপক বলল—'কি হে ডাক্তার, এতদিন গা' ঢাকা দিয়ে ছিলে কোথায়? তোমার বাসায় গেলুম সেদিন, উড়ে চাকরটা কি বল্লে তার ভাষায় সে-ই জানে, তবে এটুকু বুঝলুম—তোমরা কেউ নেই এবং অনেক দিন থেকেই। সেই কথাই সুহৃদকে বল্‌ছিলুম, কবে এলে? তোমার শরীর ত' সেরকম ভাল হয় নি কিছু—'

কথাটার পিঠেই সুবোধ বল্লে—'চেঞ্জে গিয়েছিলুম কি যে শরীর ভাল হবে?'

সুহৃদ্ ওধার থেকে ব'লে উঠল—'তবে কোন্ রাজকুমারী কল্ দিয়েছিল তার অসুখে?'

সুবোধ হেসে উত্তর দিল—'রাজকুমারীই কল্ দিয়েছিল, তবে তার অসুখে নয়।'

দীপক হাত জোড় ক'রে বলল—'হেঁয়ালী রেখে একটু সোজা ভাষায় বল্ না কি ব্যাপারটা।'

সুবোধ বলল—'এক কথায় বললে বলতে হয় পঞ্চাক শেষে ড্রপ পড়েছে।'

দীপক তাকে একটা জোড়ে ধাক্কা মেরে বল্লে—'যাক্, চুপ কর ভাই, শুনতে চাই না।'

সুবোধ হেসে আরম্ভ করল—'সেদিন মঙ্গলবার কি বুধবার বিকেলে', একটু চিন্তা ক'রে বল্লে, 'কোথা থেকে যেন এলুম মনে নেই—যাক্, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছি, মা বল্লেন—আবার বের হ'বি কি না। আমি 'না' ব'লে সটান আমার ঘরে ঢুকে পড়লুম।

ভিতরের পর্দ্দাটা ফাঁক ক'রে ডটি' এসে বলল—'জ্যাঠা-মশাইএর খুব অসুখ—টেলিগ্রাম করেছেন যেতে।' কিছুক্ষণ বাদে মা এসে ঐ কথা আরম্ভ করতেই বললুম, 'শুনেছি'।

মা বল্লেন—'তোর কি যাবে দিয়ে দে আমার বাক্সেই।'

আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লুম—'তোমরাও যাবে না কি? সেই গাড়ো পাহাড়ের কাছে, আর যে রাস্তা—বাপ্‌স!'

মা বল্লেন—ওকথা বলিস নে সুবো! তিনি বুড়ো মানুষ, একলা অসুখে পড়ে কত না জানি কষ্ট পাচ্ছেন। এখন আমাদের না গেলে কি চলে? তা' হ'লে আপন আর পরে প্রভেদ কি রে?'

যাক্, রওনা হলুম রাত ১০টার গাড়ীতে। বার ছয়েক রেল আর ষ্টীমার বদলে পৌছলুম যেখানে তার পর আর রেলগাড়ী নেই। এর পরেই ছোট একটি নদী পার হ'য়ে যেতে হয় প্রায় বার মাইল। আধুনিক যান্ত্রিক যুগেও পৌরানিকত্ব বেঁচে আছে সগর্ব্বে তার মাথা উঁচিয়ে। অর্থাৎ যেতে হয় হেঁটে কিংবা গরুর গাড়ীতে, অন্য কোন যান-বাহন নেই। জ্যাঠামশাই ওখানে জমিদারী এষ্টেটে কাজ করছেন বহুকাল, তাঁর কাছেই শুনেছি ঐটুকু রক্ষা ক'রে না কি তাদের কৌলিন্য বজায় রেখেছেন। আমরা গো-যানে যখন যেয়ে পৌছলুম তখন সবে সন্ধ্যা, ঘরে ঘরে শাঁকের ধ্বনি ভেসে আসছে কানে। গাড়ী থেকে নামতেই দেখি গেটে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে, একটু আশ্চর্য্য হলুম আমরা সবাই, কারণ আমার জ্যাঠামশাই অকৃতদার। মেয়েটি সলজ্জ নম্র-ভাবে এগিয়ে এসে মাকে প্রণাম ক'রে আমার বোন্ ডটিনীর হাত ধ'রে বলল—'আসুন ভিতরে, উনি একটু ভাল, ঘুমুচ্ছেন। মেয়েটীর এই সলজ্জ সপ্রতিভ ভাব আমার বেশ ভাল লাগল।

'অমনি ভালবেসে ফেললে ত'?' ব'লে উঠল মাঝখানে সুহৃদ্।

দীপক সুহৃদকে চুপ্ চুপ্ ব'লে সুবোধকে বলল, 'তারপর?'

সুবোধ বলল—'যাক্, ওরা সবাই ঢুকে পড়লো জ্যাঠা-মশাইর ঘরে। একটি বিধবা মহিলাকেও দেখলুম সে ঘরে। আমি পাশের ঘরের বারান্দায় ইজি চেয়ারটার মধ্যে গা এলিয়ে দিলুম।

সুহৃদ্ বলল—'ভাই, যে ভাবে আরম্ভ করেছ তাতে শেষ হ'তে রাত হ'য়ে যাবে দেখছি।'

সুবোধ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল—'কবে এত লক্ষ্মী ছেলে হয়েছ যে সন্ধ্যা হ'তেই বাড়ী যাও?'

দীপক বলল—'যাক্, বল এখন।'

কিছুক্ষণ বাদেই ওখানকার ডাক্তারবাবু এলেন। আমি উঠে তাঁর পেছনে পেছনে গেলুম। তিনি যা যা বল্লেন তার সারমর্ম্ম হচ্ছে যে, রোগটা হয়েছে বেরীবেরী এবং অবহেলার ফলেই না কি খারাপ দিকে গিয়েছিল। অনেক রকম ঔষধ পড়েছে, কিন্তু কোন উপকার লক্ষিত না হওয়ায় **বাই-ভিটা-বি** দিন সাতেক হ'ল দিচ্ছেন এবং তাতে কিছু কিছু উপকার দেখতে পাচ্ছেন। আমি কলকাতা নিয়ে আসবার প্রস্তাব করলুম, কিন্তু রাস্তাঘাটের অসুবিধার জন্য ডাক্তারবাবু অমত করলেন। উপকার বেশ হ'য়েছে ঐ ওষুধে এবং এখনও চলছে। সব শুদ্ধ নিয়ে এসে পৌচেছি গেল শনিবারে।

দীপক বলল—'সবাই মানে—রাজকুমারীকেও?'

সুবোধ—'হাঁ ভাই, মার কাছে শুনলুম ওদের দেখবার না কি ত্রিকূলে কেউ নেই। মেয়েটির বাবা ঐ এষ্টেটেই কাজ করতেন। মারা গিয়েছেন অল্পদিন। সেই থেকে জ্যাঠা-মশাই ওর মাকে নিজের মেয়ের মত বাসায় নিয়ে এসেছিলেন।

সুহৃদ্—'মেয়েটির নাম কি ভাই?'

'শুভ্রা' ব'লে সুবোধ থামল।

দীপক—'তা' হ'লে' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুবোধ নিজেই বলল—'হাঁ, ডটির কাছে শুনলুম তাকে না কি চির-দিন যাে [illegible] চ্ছে।'

শিলং-সিলেট্ লাইনের টিকেট্ সমূহ আমাদের শিলং অফিস এবং সিলেট্ অফিসে পাওয়া যায়। সিলেট্ লাইনে শিলং যাইবার থ্রু টিকেট্ এ. বি. জোনের ষ্টেশন-সমূহ হইতে পাওয়া যায়। শিলং হইতে সিলেট্ লাইনে এ. বি. জোনের ষ্টেশনসমূহের থ্রু টিকেট্ শিলং অফিসে পাওয়া যায়।

ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা চাই-ই...

শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে হ'লে প্রত্যহ ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা চাই-ই। খোলা মাঠে ব্যায়াম, বিশুদ্ধ হাওয়া ও সূর্য্যের আলো বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের পক্ষে অমূল্য সম্পদ্। সেই সঙ্গে ভাল আহার্য্যও চাই। পুষ্টিকর খাদ্যে তাদের শরীর সুদৃঢ়, সবল ও কর্ম্মঠ করে—সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক সৌন্দর্য্যও বাড়ায়।

বি-ই শ্রেষ্ঠ খাদ্য

কে. ভি. আপ্পারাও কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ—৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
সম্পাদক—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস